সচিত্র মাসিক বসুমতী

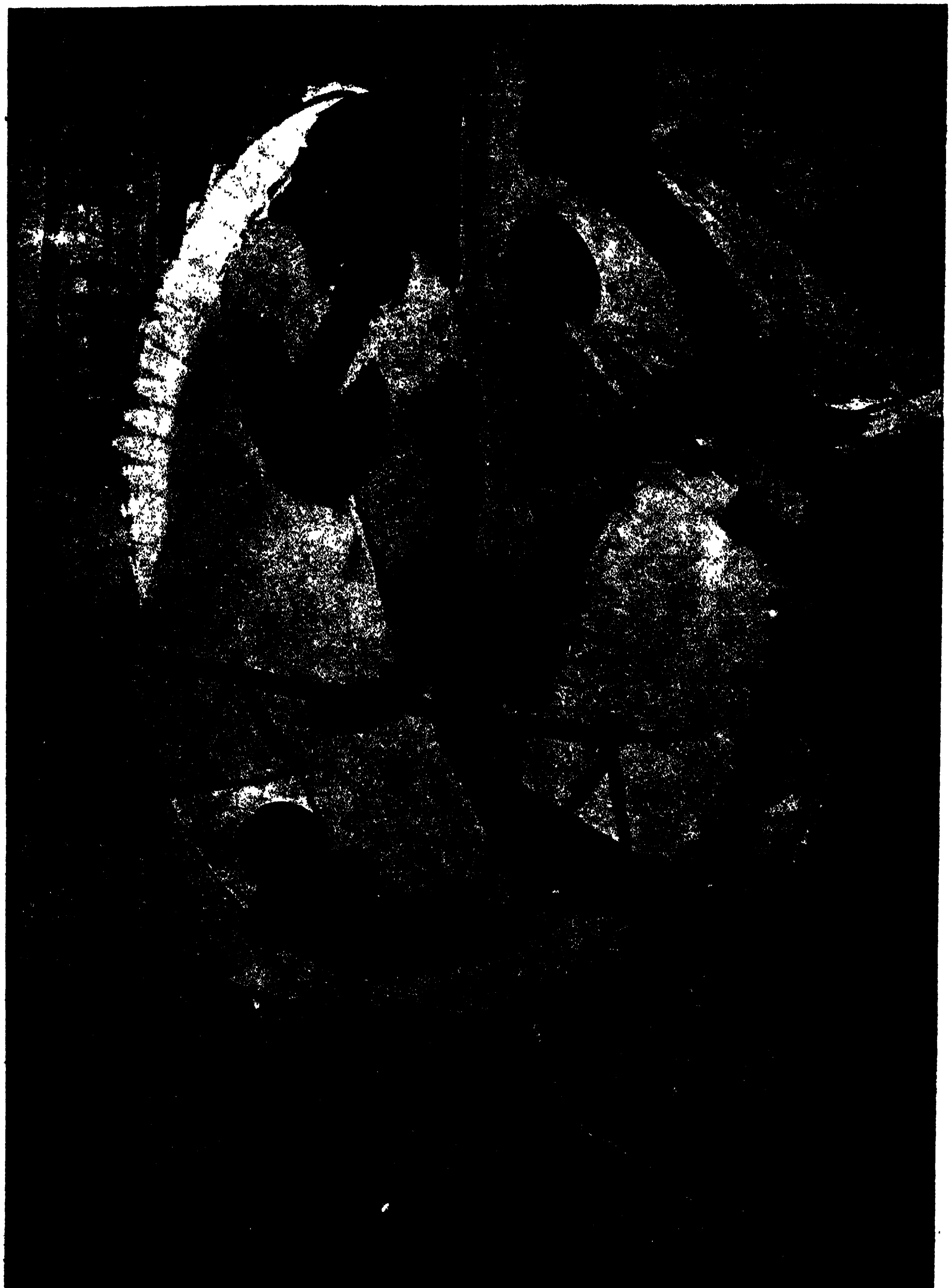
২৫শ বর্ষ] ১৩৫৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন সংখ্যা পর্য্যন্ত [১ম খণ্ড

সূচীপত্র

সূচীপত্র

স্ট্রীট সিঙ্গার

শিল্পী—মাখন দত্তগুপ্ত





ভেঙ্গেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ম্ময়
তোমারি হউক জয় !

মাসিক বসুমতী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত



২৫শ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৫৩ প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা

আমি বলি সকলেই তাঁকে ডাকছে, দ্বেষাদ্বেষীর দরকার নেই। কেউ বলছে সাকার কেউ বলছে নিরাকার। আমি বলি যা'র সাকারে বিশ্বাস সে সাকারই চিন্তা করুক, যার নিরাকারে বিশ্বাস, সে নিরাকারই চিন্তা করুক। তবে এই বলা যে, মতুয়ার বুদ্ধি (Dogmatism) ভাল নয়;—অর্থাৎ আমার ধর্ম্ম ঠিক আর সকলের ভুল। 'আমার ধর্ম্ম ঠিক আর ওদের ধর্ম্ম ঠিক কি ভুল, সত্য কি মিথ্যা, এ আমি বুঝতে পাচ্ছিনে—এ ভাব ভাল।' কেন না ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না করলে তাঁর স্বরূপ বুঝা যায় না। কবীর বলতো সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ—। কাকো নিন্দো কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী!

* * *

যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ' 'আমি বদ্ধ', বার বার বলে সে শালা বদ্ধই হ'য়ে যায়। যে রাতদিন 'আমি পাপী,' 'আমি পাপী' এই করে সে তাই হ'য়ে যায়। ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই কি! আমি তাঁর নাম করেছি আমার এখনো পাপ থাকবে? আমার আবার পাপ কি, আমার আবার বন্ধন কি?······কেবল পাপ আর নরক এই সব কথা কেন? একবার বল, যে, অন্যায় কর্ম্ম যা করেছি আর করবো না।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ



আজ নববর্ষের-১৩৫৩র প্রথম দিন, পয়লা বৈশাখ। "বসুমতীর" স্বত্বাধিকারী ৺উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সময় হতে প্রথা চলে আসছে—প্রতি বর্ষের বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে একটি লেখা থাকবে।—আমি কার্য্যান্তরে জন্মভূমি দর্শনে গিয়াছিলাম। প্রত্যাবর্ত্তনের পর সহসা আসন্ন সময়ে মনে পড়ায়, কিছু লিখিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছি। বাধা কিন্তু বহু। সামান্য বিষয়কে মনগড়া ভাবে বাড়াইয়া লেখার সাহস আমার নাই, উচিতও নয়। নিজের দেখা বিষয় লেখাই উচিত। বিশেষরূপে জানা ভক্তদের উপর নির্ভর করাও চলে, করিতেও হয়, অবশ্য যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন ও সঙ্গের সৌভাগ্য পাইয়াছেন। সেরূপ ভাগ্যবানও অধুনা বিরল। আরো কঠিন কথা—এমন সব ঘটনা আছে যাহা সহজে বিশ্বাস করা অনেকের পক্ষেই ততোধিক কঠিন। কিন্তু সে কথা ভাবিতে হইলে লেখাও চলে না। যাঁহারা ঠাকুরকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁর সম্বন্ধে যে অসম্ভব কিছুই ছিল না, এ কথা স্বীকার করিবেন। আমি সামান্যই দেখিয়াছি, তাহাতেই আমার ধারণা, তিনি অলৌকিকের পক্ষপাতী ছিলেন না, অলৌকিকের সাহায্য তাঁহাকে নিতে হয় নাই। অসহ্য রোগ-যন্ত্রণায়ও কোনো দিন তাঁহাকে মায়ের কাছে কষ্ট লাঘবের প্রার্থনা কেহ করাইতে পারেন নাই,—অনেকেই সে চেষ্টা পাইতেন। তাঁর ভাবটা ছিল—"এই ভঙ্গুর দেহটার সুখের জন্য প্রার্থনা আবার কি! প্রার্থনার আর কি কিছু নাই, এ-তো এক দিন যাবেই।"

কয়েক বার অলৌকিক কিছু প্রকাশ হইয়া পড়ে—সে সব পূর্ব্বের কথা। ঠাকুরের "লীলা প্রসঙ্গে" উল্লেখ আছে। যথা—নৌকার মাঝিতে মাঝিতে ঝগড়া। ঠাকুর ছিলেন স্নানের ঘাটে উপস্থিত,—অবাক্ হইয়া দেখিতেছিলেন। সহসা ক্রোধান্ধ বলিষ্ঠ মাঝি অপর মাঝিটির পিঠে একটি বিষম চপেটাঘাত করায় ঠাকুর "উহু: হু:—বড় লেগেছে" বলিয়া কাঁদিয়া উঠেন ও নিজের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বসিয়া পড়েন। তাঁর ভাগিনেয় 'হৃদয়' তখন সঙ্গেই থাকিত,—রাগে অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে ছুটে আসে। ঠাকুর তখন বালকের মত কাঁদছেন। হৃদয় দ্যাখে—সে কঠিন চড়ের পাঁচটি আঙুল তাঁর পিঠে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। যাক্, এ ঘটনা তাঁর ইচ্ছাকৃত ছিল না। সে সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদাই সাবধান থাকতেন। যা সামলাতে পারতেন না, লোকে তাই দেখেছে। যেমন ঈশ্বরীয় কথায় বা গান শুনতে শুনতে সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন, সাবধান হওয়া সত্ত্বেও রুকতে পারেতন না। তদ্ভিন্ন তাঁর স্বেচ্ছাকৃত অলৌকিকের প্রকাশ ছিল না।

ফল কথা,—তিনি আমাদেরি ভাই-বন্ধুর মত সাধারণ মানুষ ছিলেন, ও সেই ভাবেই কাজ করে গেছেন। তাঁর ছোট ছোট কথাগুলি বেদ-বাক্যের মত কাজ করেছে। তাঁর গত জন্মতিথি দিনে শ্রদ্ধাস্পদ যোগী শ্রীঅরবিন্দ না কি বলেছেন,—"এখন পাঁচ শত বৎসর অবতারাদির আবশ্যক নাই, ঠাকুরের প্রভাব সকল অভাব মেটাবে। যাঁর প্রয়োজন ও শ্রদ্ধা আছে তিনি তাঁর মধ্যে সবই পাবেন। তিনি এসেছিলেন সর্বদেশের সকলের জন্যে। পূর্ব পূর্ব অবতারেরা যেন পথ পরিষ্কার করে বাধা মুক্ত করে দিতে এসেছিলেন, পরে তিনি এসেছিলেন আপনার জন হয়ে—পিতা মাতা ভাই বন্ধুর মত।

কাশীপুরে অবস্থিতি কালে, সিউলিয়া রসের আশায় খেজুর গাছ ছুলে ভাঁড় ঝুলিয়ে রেখে যেত। রাত্রে ছেলেরা এসে রস ঢেলে খেত, ভাঁড় ভাংতো। গরীব সিউলিরা সকালে এসে নিরাশ ও হতাশ হয়ে বিষণ্ণ মুখে ফিরতো। পয়সা দিয়ে গাছ জমা নিয়েছে। জীবিকার উপায় খুইয়ে দুঃখে কষ্টে গালাগালাজ করাও স্বাভাবিক। ঠাকুর তা দেখে কষ্ট পান।—পরদিন রসের লোভে এসে ছেলেরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও খেজুর গাছ আর খুঁজে পেলে না। ফিরতে বাধ্য হল! ভোরে সিউলিরা এসে কিন্তু সকল ভাঁড়েই রস পায় ও আনন্দে ফেরে। এটা রহস্য বা ধাঁধা লাগানো। তিনি রহস্যপ্রিয়

ছিলেন, তবে তার প্রকাশ বড় ছিল না,—কখনো কদাচ মাষ্টার মশায়ের প্রতি তার প্রয়োগ ছিল বটে।

স্বামীজি মাষ্টার মশাইকে কথা-প্রসঙ্গে একদিন নিজেই বলেছেন—ঠাকুর আমাকে একলা একদিন বল্লেন—"আমার (ঠাকুরের) তো সিদ্ধাই করবার যো নাই। তোর ভিতর দিয়ে করব, কি বলিস ?" স্বামীজি বলেন—"তাতে ভগবান লাভের সুবিধা হবে কি ?" ঠাকুর বললেন—"না।" স্বামীজি বলেন—"তবে আমার দ্বারা তা হবে না।"

বোধ হয় আধার বুঝে স্বামীজির মুখ থেকে ঠাকুর যেন ওই কথাটিই শুনতে চেয়েছিলেন। প্রথম থেকেই পরীক্ষা আরম্ভ করেছিলেন।

পরে কাশীপুরে তিনি স্বামীজির উপর শক্তি সঞ্চার করেন। স্বামীজির কাছে শুনে মাষ্টার মশায় নরেন্দ্রকে বলেন—"বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। তোমার দ্বারা অনেক কাজ হবে।" একদিন ঠাকুর একখানা কাগজে লিখে বলে দিলেন—"নরেন শিক্ষে দিবে।"

তাতে নরেন্দ্র মাষ্টার মশায়কে বলেন—"আমি কিন্তু বলেছিলাম—"আমি ও-সব পারব না।"—"তিনি বলেন—তোর হাড় করবে।"

পরে যা ঘটেছিল তা জগৎ-বিদিত। ঠাকুরের নিজের সহজ ও সরল কথাই সকলের মন হরণ করেছে,—আকৃষ্ট করেছে, সিদ্ধায়ের প্রয়োজন হয়নি। তাঁর কাছে সেটা কেবল ঝুটো বস্তুই ছিল না—ঘৃণার বস্তুই ছিল। কারণ তা ভগবান লাভের অন্তরায়—সাধুদের পরম শত্রু। তার মোহ ভাল ভাল সাধুদেরও নষ্ট করে।

"কথামৃতে" ঠাকুরের সে গল্পটি অনেকেই উপভোগ করে' থাকবেন। এক শক্তিশালী সাধু নাম-যশের মোহে পড়ে নষ্ট হ'তে বসেছেন দেছে ভগবান্ মানুষরূপে তাঁর কাছে উপস্থিত হন, যেন তাঁর খ্যাতি শুনে এসেছেন, ও বলেন—"শুনেছি আপনি অসামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন—যা ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন।—আমার দেখতে বড় ইচ্ছা হয়।—এই যে প্রকাণ্ড হাতীটা যাচ্ছে, ওকে ইচ্ছা-শক্তি বলে মারা যায় ?" সাধু বল্লেন—"হাঁ-হো সেক্তা" বলেই হাতীটাকে মেরে ফেল্লেন। মানুষরূপী ভগবান্ বললেন—"ওকে আবার বাঁচাতেও পারেন ?" সাধু বল্লেন—"হ্যাঁ—ও ভি হো সেক্তা।" হাতী বেঁচে উঠলো। তখন ভগবান্ বললেন—"ধন্য আপনার ক্ষমতা। কিন্তু বুঝতে পারলুম না—হাতী মোলো, হাতী বাঁচলো,—তাতে আপনার লাভটা কি হোলো ?" বলেই ভগবান্ অদৃশ্য হলেন। সাধুও নিজের মূঢ়তা বুঝতে পারলেন।

ঠাকুর—ভক্ত ও সাধক মাত্রকেই শক্তি প্রকাশেচ্ছা সম্বন্ধে সাবধান ও নিষেধ করতেন। বিশেষ—কুমার সন্ন্যাসীদের উপর তাঁর কঠিন আদেশ ছিল—"মনে রেখ'—জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য সর্ব্বাগ্রে ভগবান্‌কে লাভ করা।" থাক, আজ কেবল তাঁর অলৌকিকত্ব (miracle) সম্বন্ধে কথাই মনে পড়ছে। তিনি আমাদের মধ্যে আমাদেরি মত থেকে কাজ করতে এসেছিলেন, করেও গেছেন। তাঁকে মানুষ ও আপনজন বলেই দেখিছি। দেবতা কদাচ কখনো কোনো ভাগ্যবান্‌কে ক্ষণিকের জন্য দেখা দেন, দু'-এক কথা ক'য়ে অদৃশ্য হন—সে ইঙ্গিত কেহ বুঝুক বা না বুঝুক।—সে ইঙ্গিত সাধারণের বোঝাও সম্ভব নয়।

তিনি ছিলেন সবার তরে সর্ব্বদা মুক্ত, তাঁর ভাষাও ছিল সহজ, মা যেমন ছেলের সঙ্গে কথা কন। মথুর বাবু তাঁকে কিছু কিছু চিনেছিলেন। বিশ্বাসও রাখতেন অসীম। তাই প্রথম অবস্থায় তাঁর সত্য ও আন্তরিক অনুরোধ এড়াতে না পেরে আসন্ন মৃত্যু হ'তে তাঁর পত্নীকে রক্ষা করেছিলেন শুনেছি।

আর নয়, বেড়ে যাচ্ছে। তাঁর দেহরক্ষার পর অনেক ভক্তই তাঁর কৃপা লাভ করেছেন ও এখনো করেন। অনেকের জানা একটি ঘটনা বলে শেষ করি।

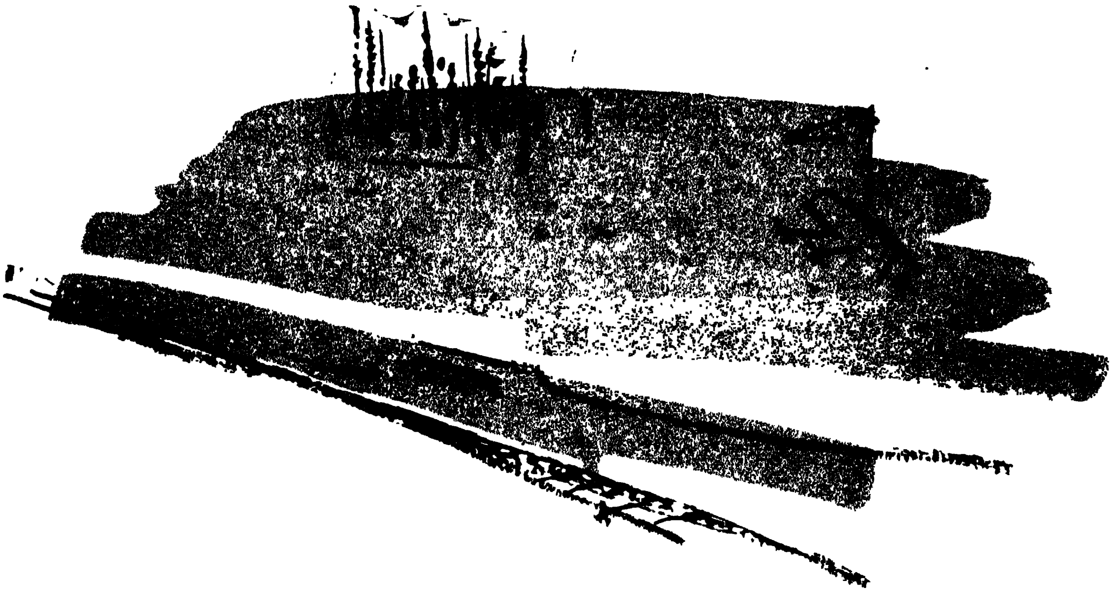
তখন উদ্বোধন আপিসেই শ্রীমা থাকেন, সারদানন্দ মহারাজ তাঁর দরোয়ানরূপে দ্বার রক্ষা করতেন। একটি ভক্ত এসে অন্য এক ভক্তকে দুই শত বা ঐরূপ কিছু টাকা দিয়ে—সে টাকা অপর এক জনকে দিবার ভার দেন,—সে লোক বোধ করি তাঁর গ্রামেরই লোক। বলেন—"আমি তাঁর কাছে ঋণী আছি, দয়া করে' টাকাগুলি তাঁকে দিয়ে আমাকে ঋণমুক্ত করে দাও ভাই।" কাজ কিছুই কঠিন ছিল না, লোকটি স্বীকৃত হয়ে গ্রহণ করেন। বাড়ী যাবার পথে ভক্তটি সন্ধ্যাগম দেখে গঙ্গাকূলে সন্ধ্যাহ্নিক করতে বসেন। টাকার থলিটি বা পুটুলিটি পাশেই রাখেন। কিছু পরে বান ডেকে জোয়ার আসে, ভক্ত তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন,—পরক্ষণেই টাকার থলির জন্য ছুটলেন। স্রোত তখন প্রবল, জল দেখতে দেখতে ৩।৪ হাত বেড়ে গেছে। পাগলের মত জল ঘাঁটাঘাঁটি ও ছুটোছুটি করে, কোন ফলই হল না।

"কি করলুম, এ কি হল!" লোকটি অতি গরীব—"কে আমার কথা বিশ্বাস করবে!" মুখে কেবল "ঠাকুর বাঁচান।" কয়েক ঘণ্টা পাগলের মত কান্না আর গড়াগড়ি—"ও ঠাকুর বাঁচান।" জল কমে গেল, থলির চিহ্ন নাই! কানে এলো—স্থাখ না, ঐ যে রয়েছে রে।" কে যে বললে তা হুঁস নেই—দেখার দিকেই মন। কোথাও দেখতে পান না। "ঐ যে ইট চাপা।"

একখানা ইট পড়েছিল। ছুটে গিয়ে তুলতেই দেখে টাকার থলি তার নীচেই রয়েছে! যাক্, এ কথা অনেকেরি জানা কথা। এটা ঠাকুরের দেহরক্ষার পরের ঘটনা। এমন কত ঘটনা এখনো ঘটছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



আকাশে বোমারু বিমানের গর্জ্জন, পৃথিবীতে গোলা ও বোমার বিস্ফোরণ, বাংলা দেশের হাওয়াতেও বারুদের গন্ধ।

মহাযুদ্ধের এই বিভীষিকাময় আবহাওয়ায় বাংলা দেশের সাহিত্যে হঠাৎ বই বার করবার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। আগাছার মত প্রকাশক গজিয়ে উঠেছিল ফাঁপানো টাকার বাজারে, চৈত্রের ঝরা পাতার মত রাশি রাশি বই-এ সাহিত্যের আসর গেছল ছেয়ে।

বইএর সেই হট্টগোলে সাত নকলে আসল যে খাস্তা হয়ে যাবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। বেসুরো গলার সোরগোলে সুরের রেশ বেশীর ভাগ চাপাই পড়ে গেছে।

তবু তেরশ' উনপঞ্চাশের বাংলা দেশের সাহিত্যের আড্ডায় বৈঠকে, কখনো কখনো একটি নাম দু'চার জনের মুখে উচ্চারিত হয়েছে। পতঞ্জলি রায় নামটি একটু অদ্ভুত বলেই শুধু নয়, ময়ূরাক্ষী নামে বইখানিও একেবারে অবহেলা ভরে উপেক্ষা করবার মত নয় বলে। পতঞ্জলি রায় নামটা সাহিত্যের আসরে আগে কখনো শোনা যায়নি, মাসিক সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠাতেও নয়। ময়ূরাক্ষীই লেখকের প্রথম প্রকাশিত বই। তবু রসিক-সমাজে যেটুকু কৌতূহল এই লেখক ও তার প্রথম রচনা সম্বন্ধে দেখা গেছল, যে কোন নবীন লেখকের পক্ষে তা গর্বের কথা। সজনীকান্ত দাস থেকে বুদ্ধদেব বসু, মাণিক সেনগুপ্ত থেকে অচিন্ত্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত এমন বিভিন্ন বিশিষ্ট সাহিত্যরথীদের দৃষ্টি একটি মাত্র বই-এর সাহায্যে আকর্ষণ করা সত্যিই কম কথা নয়।

পতঞ্জলি রায়ের ময়ূরাক্ষী সাহিত্য-জগতের অভিনন্দনই শুধু পেয়েছিল এমন কথা বলছি না, ময়ূরাক্ষী সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্যও বড় কম হয়নি।

'ময়ূরাক্ষী নামটা বড় রোম্যাণ্টিক' কিন্তু কেউ কেউ বলেছে, 'আসলে লেখককে 'এসকেপিষ্ট' ছাড়া আমি কিছু বলতে রাজি নই।'

ময়ূরাক্ষীর কাহিনী সম্বন্ধে অম্ল-মধুর, কটু-তিক্ত, সব রকম সমালোচনাই অল্প-বিস্তর শোনা গেছে।

"রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতার নামটা ও ভাবে নেওয়া কিন্তু **sacrilege**" কারুর মুখে শোনা গেছে। কেউ বা বলেছে, 'নামটা ধার নিলেও ক্ষতি ছিল না, যদি সুরটা পর্য্যন্ত না, তার ওপর চুরি করা হত।'

এ সব বিরুদ্ধ মন্তব্য সত্ত্বেও, এমন কি এক হিসেবে এইগুলির দরুণই এই কথাটা অন্ততঃ বোঝা গেছে যে, ময়ূরাক্ষীর প্রতি প্রসন্ন না হতে পারলেও উদাসীন কেউ বড় থাকতে পারেনি।

দু'-চার জন উদার ও রসিক সাহিত্যরথী অবশ্য ময়ূরাক্ষীকে উচ্চকণ্ঠে অভিনন্দন জানাতেও কুণ্ঠিত হ'ননি। কবি তারাশঙ্কর দত্ত স্বনামেই তাঁর কাগজে লিখেছেন, 'ময়ূরাক্ষীকে উপন্যাস না বলে একটি সুদীর্ঘ লিরিক কবিতা বলাই উচিত। নিছক গদ্যে প্রায় দু'শ পাতার একটি লিরিক কবিতার সুর যে অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, এ বইখানি পড়বার আগে বিশ্বাস করতে পারতাম না। বালির বিছানায় শোয়ানো একটি স্বচ্ছ ক্ষীণধারা নদী, তারই পাড়ে একটি থোপা থোপা ফুলে-ঢাকা প্রাচীন শিরিষ গাছ, আর একটি টালিতে ছাওয়া ভাঙ্গা

ময়ূরাক্ষী

কুটীর নিয়ে এমন মধুর দিবা-স্বপ্ন যিনি রচনা করেছেন, মুগ্ধ চিত্তে তাঁর কলমের তারিফ করবার সঙ্গে সঙ্গে শুধু এইটুকু মন্তব্য না করে পারি না, যে—এই কি আমাদের স্বপ্ন দেখবার সময়। লেখকের পরিচয় আমাদের জানা নেই,—কিন্তু আমাদের ভাবতে ইচ্ছে করে যে, এ যুগের মানুষ তিনি ন'ন। কোনো আশ্চর্য্য ভবিষ্যতের এক শক্তিমান্ সাহিত্যিকের রচনার পাণ্ডুলিপি, কেমন করে দেশ-কালের অলৌকিক সংস্থান-বিপর্য্যয়ে সময়ের স্রোত ডিঙিয়ে বুঝি আমাদের হাতে এসে পড়েছে। সে এমন এক ভবিষ্যৎ যেখানে আকাশে বোমারু বিমানের গর্জ্জন নেই, বাতাসে নেই বারুদের কটু গন্ধ; মানুষের লোভ পৃথিবীকে হিংসার কাঁটা-বেড়ায় ভাগ করে রাখেনি।

নইলে সে-কালের রোমের মত বর্ত্তমান দেশ যখন পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে, তখন কাউকে যত মধুরই হোক, সঙ্গীত আলাপ করতে শুনলে মন পুরোপুরি প্রসন্ন হ'তে বুঝি কিছুতেই পারে না। ময়ূরাক্ষী হয়ত অপরূপ স্বপ্নের দেশের নদী। পতঞ্জলি রায় হয়ত ছদ্ম নাম। এ ছদ্ম নামের পেছনে যদি কেউ আত্মগোপন করে থাকেন তাতে আমাদের ক্ষুণ্ণ হবার কিছু নেই। কিন্তু এ রকম শক্তিশালী লেখকের বর্ত্তমান বাস্তবতা থেকে ময়ূরাক্ষীর তীরে আত্ম-অপসারণই আমাদের একটু ব্যথিত না করে পারে না।'

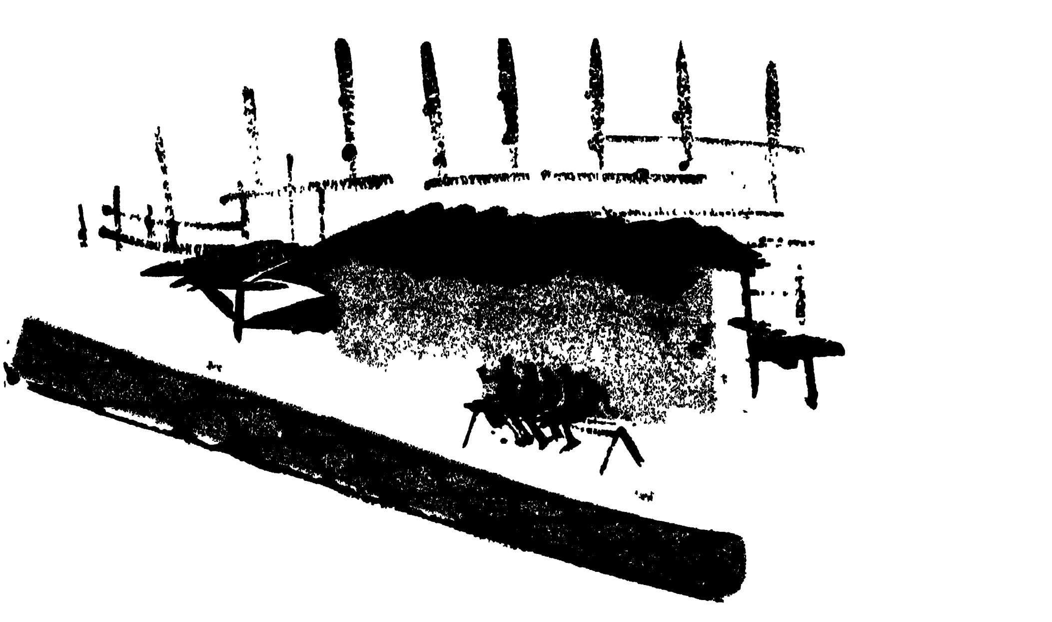
ময়ূরাক্ষী ও পতঞ্জলি রায় সম্বন্ধে সাহিত্যিক-মহলের এই কৌতূহল যাদের মধ্যে কিছুটা সংক্রামিত হয়েছিল, আমিও ছিলাম তাদের এক জন।

ঘটনাচক্রে পতঞ্জলি রায়ের সত্যকার পরিচয় পাবার সুযোগ আমারই প্রথম ঘটে। ইতিপূর্ব্বে দু'-চার জন উদ্যোগী পাঠক ও সাময়িক পত্র-সম্পাদক পতঞ্জলি রায়ের খোঁজ নেবার চেষ্টা করেননি এমন নয়। ময়ূরাক্ষীর প্রকাশককে শুধু চিঠি লিখেই অনেকে ক্ষান্ত হননি, কেউ কেউ তাঁদের দোকান পর্য্যন্ত ধাওয়া করে পতঞ্জলি রায়ের আসল পরিচয় ও ঠিকানা জানতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রকাশক সকলকেই সেই একই উত্তর দিয়েছেন—পতঞ্জলি রায়কে তাঁরা নিজেরাও জানেন না। বুক-পোষ্টে কয়েক মাস আগে তাঁদের কাছে বইখানির পাণ্ডুলিপি আসে, তারই সঙ্গে একটি চিঠি। সে চিঠিতে শুধু এই কথাই লেখা ছিল যে, বইখানি পছন্দ করে যদি প্রকাশক ছাপতে রাজি হ'ন তাহলে লেখকের পারিশ্রমিকের দরুণ প্রাপ্য অর্থ তাঁরা যেন কোন বিশেষ একটি প্রতিষ্ঠানের তহবিলে দান করেন। প্রকাশক যথারীতি সে নির্দ্দেশ যে পালন করেছেন, উক্ত প্রতিষ্ঠানের স্বাক্ষরিত রসিদ দেখিয়ে তাঁরা সকলের কাছেই তা প্রমাণ করেন।

বলা বাহুল্য, প্রকাশকের মারফৎ পতঞ্জলি রায়ের কোন সন্ধান আমি পাইনি। পেয়েছিলাম দৈবাৎ, অপ্রত্যাশিত ভাবে।

মফস্বলের এক শহরে একটা কাজ নিয়ে কিছু দিনের জন্যে যেতে হয়েছিল।

নামহীন নগণ্য একটা ব্র্যাঞ্চ লাইনের ষ্টেশন। টাইম-টেবলে নামটা খুঁজে বার করতেও কষ্ট হয়। যুদ্ধের হিড়িকে হঠাৎ তার বরাত ফিরে গেছে। ষ্টেশনের এক ধারে শালের জঙ্গল। আর এক ধারে চোরকাঁটায় ঢাকা একটা শুকনো বাঁজা মাঠ। বর্ষার কয়েকটা দিন ছাড়া গরু-ছাগলেরও সেখানে চরে বেড়াবার মজুরি পোষাত না। সেই মাঠ এখন আর চেনবার জো নেই। চোরকাঁটা, আগাছা সব সাফ করে, মেজে ঘসে পিটিয়ে, তার ভোল একেবারে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মস্ত বড় হ্যাঙ্গার তৈরী হয়েছে মাঠের এক ধারে। দশ-বিশটা এরোপ্লেন সেখানে ঘাপটি মেরে থাকে। মাঠের মাঝখানের লম্বা খুঁটির ডগা থেকে হাওয়ার গতি জানাবার কাপড়ের খোলের নিশান উড়ছে। মাঠের ধারে ধারে অ্যান্টি এয়ার ক্রাফ্ট কামানের লুকোন ঘাঁটি। বড় বড় দু'টো চওড়া নতুন রাস্তা দু'দিকে বেরিয়ে গেছে যেন দিগন্তের সন্ধানে। সেই রাস্তার একটিতে



টেলিগ্রাফের তার বসান হচ্ছে, বহু দূরের আর একটি এয়ারফিল্ডের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে।

এই তার বসাবার ভার যিনি নিয়েছেন সেই কণ্ট্রাক্টরের সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিলাম আর এক জন ব্যবসায়ীর তরফ থেকে। দু'পক্ষের মধ্যে ব্যবসা-সংক্রান্ত একটা বোঝা-পড়া করিয়ে দিতে পারলে মাঝখান থেকে আমার কিছু হবার আশা ছিল।

কিন্তু ঠায় দু'দিন নির্বান্ধব ষ্টেশনে অপেক্ষা করা সত্ত্বেও দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ কণ্ট্রাক্টরের একবার দেখা পেলাম না। ইতিমধ্যে তাঁর সম্বন্ধে যে সমস্ত কিংবদন্তী শুনলাম, তাতে দেখা হ'লেও বিশেষ কোন সুবিধে হবে বলে মনে হ'ল না। তাঁর প্রকৃত নাম যে কি এখানে কেউই তা জানে না। 'ল্যাংড়া সাব' বলেই তিনি সকলের কাছে পরিচিত। সামনে অবশ্য ও-নামটা কেউ ব্যবহার করে না, বলে, 'রায় সাহেব।' রায় সাহেব একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন বলেই তাঁর এ-রকম নামকরণ। ত্রুটি কিন্তু তাঁর শুধু শরীরেই নয়, চরিত্রেও না কি যথেষ্ট। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যেটুকু নিদ্রায় বাধ্য হয়ে কাটাতে হয় সেই সময়টুকু ছাড়া সারাক্ষণ নাকি সুরার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখেন। কাজ-কর্মে অবহেলা নেই কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট বাঁধাধরা নিয়মেরও অভাব। খেয়াল হ'লে দিনরাত্রি নাগাড়ে কুলি-কামিনের অধম হয়ে কাজ করে যান, আবার হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই দিন কয়েকের জন্যে কোথায় যে ডুব মারেন কেউ খোঁজ পায় না। তাঁর হিন্দুস্থানী চাকর চমনলালের ওপরই তখন সব-কিছুর ভার থাকে।

আপাততঃ তাঁর এই রকম একটা আত্মনির্ব্বাসনপর্ব্বই চলছিল। চমনলালের সঙ্গে ইতিমধ্যে আলাপ করেছি। ত্রেতায় যদি শ্রীহনুমান প্রভুভক্তির আদর্শ হ'ন তাহলে এ-যুগে চমনলাল তাঁর তুলনায় ক'নম্বর কম বা বেশী বলা কঠিন। মনিবের গতিবিধি সম্বন্ধে আলাপ করতে সে একান্ত নারাজ। জরুরী কাজে তিনি বাইরে গেছেন এর বেশী কোন সংবাদ তার কাছে আদায় করা গেল না। দু'এক দিনের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে গেলে হয়ত তিনি ফিরতেও পারেন শুধু এইটুকু ভরসা সে দিলে।

দু'দিন এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে বৃথা অপেক্ষা করে তৃতীয় দিন বিরক্ত হয়ে ঠিক করলাম যে, পরের দিন সকালের ট্রেণেই এখান থেকে বিদায় নেব। যাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে আমি এসেছি রায় সাহেব সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা যত উঁচুই হোক আমার বিবরণ শুনলে তাঁর নিজেদের খুব ক্ষতিগ্রস্ত বোধ হয় মনে করবেন না।

থাকবার জায়গার অভাবে ষ্টেশনের এক জন কর্ম্মচারীর কোয়ার্টারেই আশ্রয় নিয়েছিলাম। ভদ্রলোক এখানকার হেড্‌ সিগ্‌নালার। কিছু দিন আগে পরিবারের সকলকে স্বগ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমার অবস্থা দেখে নিজেই উপযাচক হয়ে তাঁর সঙ্গে ক'টা দিন থাকতে অনুরোধ করেন। বয়সে ভদ্রলোককে আর নবীন বলা যায় না। কিন্তু আমুদে রসিক লোক। তাঁর সঙ্গ ও আশ্রয় না পেলে দু'দিন এই মরুভূমিতে কাটান কঠিন হত।

পরের দিন ভোরের গাড়িতে রওনা হবার জন্যে আগে থাকতেই জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখছিলাম। অনুপম বাবু বিকেলের ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরে এসে বল্লেন, "সে কি আপনি যে পাত্তাড়ি গুটোচ্ছেন দেখছি। ল্যাংড়া সাহেবের দর্শন তাহলে আজ পেয়ে গেছেন?"

হোল্ড্‌-অলটা গুটোতে গুটোতে জবাব দিলাম, "না মশাই, অতখানি পুণ্য বরাতে নেই। ভোরের গাড়িতেই রওনা হব ঠিক করেছি।"

অনুপম বাবু আলনায় আফিসের কোটটা টাঙিয়ে রাখতে রাখতে হেসে বললেন, "অত অধৈর্য্য হলে চলবে কেন মশাই! জানেন ত ল্যাংড়া সাহেবের পা মাত্র দেড়খানা বলা চলে। যেখানে গেছেন সেখান থেকে এসে পৌঁছোতে তাই একটু দেরী হচ্ছে।"

বললাম, "কোথায় গেছেন জানতে পারলেও ত' একবার হানা দেবার চেষ্টা করতাম!"

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে একটু চুপ করে থেকে অনুপম বাবু বল্লেন, "সত্যি চেষ্টা করতেন? আপনার গরজ কি এতই বেশী!"

প্রথমটা অনুপম বাবুর কথা বুঝতে না পেরে একটু ক্ষুন্ন স্বরেই বল্লাম, "বলেন কি! গরজ বেশী না হলে কি সখ্‌ করে আপনাদের এই স্যানাটোরিয়মে বেড়াতে এসেছি!"

এবার একটু হেসে অনুপম বাবু বল্লেন। "সখ্‌ করে আসেননি জানি, কিন্তু ল্যাংড়া সাহেব যেখানে আছেন সেখান পর্য্যন্ত হানা দিতে হলে নিছক ব্যবসার অনুরাগের চেয়ে গরজ একটু বেশী দরকার···"

অনুপম বাবুকে কথা শেষ করতে না দিয়ে উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় তিনি আছেন আপনি জানেন না কি?"

"জানি বলেই ত মনে হয়!"

অনুপম বাবু রায় সাহেবের ঠিকানা সত্যিই জানেন শুনে, উৎসাহ ভরে বললাম, "আগে যে একথা বলেননি!"

অনুপম বাবু যেন একটু অকারণে গম্ভীর হয়ে বল্লেন, 'বলিনি নয়, বলতে চাইনি। তবে আপনার যদি এখনো উৎসাহ ও সাহস থাকে তাহলে জায়গাটা আপনাকে জানিয়ে দিতে পারি। দায়িত্ব কিন্তু সম্পূর্ণ আপনার।"

হেসে বল্লাম, "সাহস! দায়িত্ব! আপনি যে ব্যাপারটা বেশ রোমাঞ্চকর করে তুলছেন। বলি জায়গাটা কি কাছে-পিঠে কোথাও, না, দূর দুর্গম কিছু!"

"দূর নয় তবে দুর্গম কি না সেটা আপনি নিজে বিচার করবেন। আপাততঃ যদি ইচ্ছে করেন, চলুন দেখিয়ে আসছি।"

রাতটা অন্ধকার। ষ্টেশনের এলাকা ছাড়িয়ে নাতিপ্রশস্ত একটি কাঁচা রাস্তায় আধা-বাজার ও আধা-গ্রামের মত যে জায়গাটিতে গিয়ে পৌঁছোলাম সেটা কিন্তু এমন কিছু ভয়াবহ নয়। শুধু একটু নোংরা ও ঘিঞ্জি। বাড়িগুলির অধিকাংশই খোলায় ছাওয়া, টিনের চাল মাঝে মাঝে এক-আধটা আছে।

রাস্তায় আলোর কোন বালাই নেই। যে সব দোকানঘর এখনও পর্য্যন্ত বন্ধ হয়নি তাদেরই কালিপড়া লণ্ঠন বা কেরাসিনের কুপি থেকে যে সামান্য উদ্‌বৃত্ত রাস্তায় এসে পড়েছে তারই সাহায্যে পথ চিনে নিতে হয়।

বাজারটি সেই সাবেকী আমলের সাক্ষী; যুদ্ধের দৌলতে তলায় তলায় কেঁপে উঠে থাকলেও বাইরে এখনো কিছু প্রকাশ পায়নি।

বাজারের ভেতর কিছু দূর গিয়েই একটি সঙ্কীর্ণ সম্পূর্ণ অন্ধকার গলির মত পথে ঢুকে অনুপম বাবু বললেন, "আমার কর্ত্তব্য এইখানেই শেষ। এই গলি দিয়ে মিনিট খানেক এগুলেই বাঁ পাশে একটি আস্তানা দেখতে পাবেন। আস্তানাটি ভুল করবার কোন উপায়

নেই। সুতরাং বিস্তারিত পরিচয় দিলাম না। সেখানে গিয়ে ল্যাংড়া সাহেবের খোঁজ করলে আশা করি তাঁকে চাক্ষুষ দেখতে পাবেন। তবে যে উদ্দেশ্যে এসেছেন তা সিদ্ধ হবে কি না বলতে পারি না।"

অনুপম বাবু কথাগুলো শেষ করে আর দাঁড়ালেন না। আমার সমস্ত দায়িত্ব যেন ত্যাগ করার ভঙ্গিতে গলি দিয়ে বেরিয়ে রাস্তার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

জেদ করে এত দূর এলেও এখন আর সামনে অগ্রসর হবার বিশেষ উৎসাহ বোধ করছিলাম না। যে গলিটায় এসে দাঁড়িয়েছি সেটা মানুষের হাঁটবার পথ, না কাঁচা নর্দ্দমার একটা পাড় বলা শক্ত। নর্দ্দমার দুর্গন্ধটা আগেই পাচ্ছিলাম। অন্ধকারে না জেনে পা বাড়াতে গিয়ে তার গভীরতাটাও আর একটু হ'লে মাপবার সৌভাগ্য হয়ে যাচ্ছিল।

দু'-এক মুহূর্ত্ত দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে মরিয়া হয়েই সামনে অগ্রসর হলাম। আস্তানাটা ভুল করবার সত্যিই উপায় নেই। কাছে পৌঁছোতে না পৌঁছোতেই নর্দ্দমার সুবাস ছাপিয়ে সুপরিচিত তীব্র গন্ধে তার প্রথম অভ্যর্থনা পেলাম। সেই সঙ্গে বহু কণ্ঠের জড়িত অর্থহীন কোলাহল।

ঠিক ভাটিখানা নয়। এই অঞ্চলের একেবারে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর কুলি-মজুর প্রভৃতির একটি সুরাপান-কেন্দ্র। রাস্তার পাশেই একটা ভাঙা কাঠের গেট। সেটি পার হলেই দেখা যায় উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটি বেশ বিস্তৃত মুক্ত স্থানে মাটির ওপর বহু ছোট ছোট দল সুরাপাত্র কেন্দ্র করে বসে আছে। পিছন দিকে একটি কেরোসিনের বাতি একটি টিনের ছাউনি দেওয়া ঘরের বারান্দার মাঝে টাঙান। সেই ক্ষীণ আলোর সুবিধে এই যে, পরস্পরকে চেনবার কোনো প্রয়োজন হয় না।

এত দূর যখন আসতে পেরেছি তখন আর না অগ্রসর হওয়ার কোনো মানে হয় না। মাটির ওপর যারা বসেছিল সন্তর্পণে তাদের পাশ কাটিয়ে বারান্দায় গিয়ে উঠলাম। সামনে বেঞ্চের ওপর যে দু'টি লোক বসেছিল আমার দিকে বেশ একটু বিরক্তি ভরেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তারা তাকালে। আমার মত খরিদ্দার তাদের ঠিক মনঃপূত নয়।

তাদের বিরক্তি গ্রাহ্য না করেই জিজ্ঞাসা করলাম, "রায় সাহেব এখানে আছেন?"

ভ্রূকুটি ভরে আমার দিকে তাকিয়ে এক জন বললে, "সাহেব-টাহেব হেথাকে কুথা থেকে আসবে। দেখছ নাই—কুলি-কামিনদের জায়গা বটে।"

তর্ক না করে দু'টো টাকা টেবিলের ওপর ফেলে দিলাম, "ল্যাংড়া সায়েবকে আমার বিশেষ দরকার।"

দু'জনে একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নেবার পর দ্বিতীয় লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "তাই বল বটে, ল্যাংড়া সাহেবকে তালাস করতে আসেছ। রায় সাহেব বললে, কি না তাই চিনতে লারলাম। ঘুরে ওই ধারের বারন্দায় যাও না কেনে, সাহেব বেহুঁশ হই পড়ি আছে।"

পেছন দিকের বারান্দাতেই ঘুরে গেলাম। এদিকে একেবারে আলোর কোন বালাই নয়। প্রথমটা চোখে কিছুই দেখতে পেলাম না। তার পর চোখে অন্ধকার একটু সয়ে যাবার পর দেখলাম বেশ সুবিশাল একটি ছায়ামূর্ত্তি, বারান্দার রেলিঙের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে সে বললে, "কে ওখানে?"

বললাম, "আমি রায় সাহেবকে খুঁজতে এসেছি।"

লোকটি এবার ফিরে দাঁড়াল, "রায় সাহেব! রায় সাহেবকে খুঁজতে এখানে আসার ত নিয়ম নেই। কে আপনি!"

নামটা বলে বললাম, "নাম শুধু বললে চিনতে বোধ হয় পারবেন না!"

ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে বললেন, "আপনার সঙ্গে পরিচয় হবার সৌভাগ্য কখনও হয়েছে বলে ত' মনে হচ্ছে না। কি চান আপনি?"

"আপনিই তাহলে রায় সাহেব?"

ভদ্রলোক একটু চুপ করে রইলেন তার পর হঠাৎ হেসে উঠে বললেন, 'না রায় সাহেব আমি নই ল্যাংড়া সায়েবও নয়। এখন আমি পতঞ্জলি রায়! আর কিছু প্রয়োজন আছে?"

সত্যিই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে জবাব দিতে পারলাম না কিছুক্ষণ।

প্রথম বিস্ময়টা কাটবার পর নিজেকে একটু নির্বোধই মনে হল। পতঞ্জলি রায় নামটা অসাধারণ সন্দেহ নেই, আমার মনের মধ্যে সে নামটা সম্বন্ধে একটা সদাজাগ্রত কৌতূহল আছে এ-কথাও সত্য, কিন্তু তাই বলে প্রথম সে নামটা উচ্চারিত হতে শুনেই যে-কোন সাধারণ উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের এক কনট্রাক্টরকে, বাংলা সাহিত্যে সাড়া তোলবার উপযুক্ত রহস্যময় পুরুষ ভেবে নেওয়া একটু বাড়াবাড়ি বই কি!

পতঞ্জলি রায় আমায় চুপ করে থাকতে দেখে একটু অধৈর্য্যের সঙ্গে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "কই কি চান আপনি বললেন না?"

গলার স্বরে সামান্য একটু জড়তা আছে সত্য। কিন্তু কয়েক দিন ব্যাপী পানোৎসবের লক্ষণ তাকে বলা চলে না।

বললাম, "আমার রায় সাহেবের সঙ্গেই দরকার ছিল!"—

"সে দরকার নিয়ে ত' এখানে আসবার কথা নয়। রায় সাহেবের সঙ্গে ব্যবসা-সংক্রান্ত আলাপ করবার আলাদা আস্তানা আছে।" পতঞ্জলি রায়ের কণ্ঠ এবার বেশ রুক্ষ।

"সে আস্তানায় তিন দিন অপেক্ষা করে তাঁর দেখা না পেলে বাধ্য হয়েই এখানে হানা দিতে হয়।"

কথাটা খোঁচা দেবার জন্যেই বলেছিলাম। কিন্তু পতঞ্জলি রায় এবার আর উষ্ণ হয়ে উঠলেন না। খানিক চুপ করে থেকে বললেন, "আপনার দরকার কি খুব জরুরী?"

"তা নাহলে তিন দিন ধরণা দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত এখানে পর্য্যন্ত ধাওয়া করি।"

পতঞ্জলি রায় এবার একটু হেসে উঠলেন। তার পর আমায় হাতটা হঠাৎ ধরে ফেলে বারান্দার অপর কোণের একটি চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে নিজেও আরেকটিতে বসলেন।

চোখ অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার দরুণ অন্ধকারটা এখন অনেক ফিকে মনে হচ্ছিল। দেখলাম, ছোট একটি নিচু টেবিলে তাঁর পানীয় সাজান। গ্লাসটি সেখান থেকে তুলে নিয়ে এক চুমুকেই সেটি নিঃশেষ করে তিনি বললেন, "জায়গাটা আপনার কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য মনে হচ্ছে, না? প্রায় নরককুণ্ডের সামিল?"

উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বলে চুপ করে রইলাম।

পতঞ্জলি আবার বললেন, "টিনের ছাউনি না হয়ে জায়গাটা যদি বিলাতি বার হত, কেরাসিনের ভাঙ্গা লণ্ঠনের বদলে এখানে বিজলি বাতির ঝাড় ঝ্লত, আর নোংরা হতভাগা কুলি-মজুরের বদলে যদি সুবেশ ভদ্র বড়লোকের অপদার্থ ছেলেরা এখানে ভীড় করে থাকত, তাহলে বোধ হয় আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা এত নীচু হ'ত না। কেমন তাই না ?"

একটু হেসে বললাম, "দেখুন, আমার ধারণা এ-বিষয়ে যাই হোক তাতে আপনার কি আসে যায়।"

"রায় সাহেবের হয়ত আসে যায় না, কিন্তু পতঞ্জলি রায়ের অনেক কিছু আসে যায়।" পতঞ্জলি হাতের গ্লাসটা সজোরে টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন, "রায় সাহেবের সীমানা ছাড়িয়ে পতঞ্জলি রায়ের এলাকায় যখন অনধিকার প্রবেশ করেছেন তখন কিছু দণ্ড দিয়েই যেতে হবে। শুধু বাজার-দর সেরেই নয় মানুষের দরদস্তরও না করে ছাড়া পাবেন না।"

পতঞ্জলি রায় শূন্য পাত্রে আরও খানিকটা পানীয় ঢেলে বললেন, "দেখুন এদের কিছু নেই, তাই এরা নেশা করে, জীবনের শূন্যতাকে রঙীন করবার আশায়, আর ওরা নেশা করে, অতি প্রাচুর্য্যের বিতৃষ্ণা কাটাবার দুরাশায়। সর্ব্বনাশের পথের সঙ্গী যদি দরকার হয় তাহলে এরাই সব চেয়ে যোগ্য। এদের মধ্যে অন্ততঃ জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার মিথ্যা ভণ্ডামি নেই।"

এতক্ষণে মনে হচ্ছিল পতঞ্জলি রায়ের আসল পরিচয় সম্বন্ধে খুব ভুল বোধ হয় করিনি। শুধু তাঁর কথার ধারা প্রবাহিত রাখবার জন্যেই বললাম, "আমায় সুযোগ দিয়েছেন বলেই বলছি, সর্ব্বনাশের পথ কি সাধ করে বেছে নেবার জিনিষ!"

পতঞ্জলি একটু হাসলেন। তারা-ভরা আকাশের পশ্চাৎ-পটে তাঁর মুখের ছায়াময় আকৃতিটি এবার বেশ বোঝা যাচ্ছে। বিশাল বলিষ্ঠ চেহারার আভাষ আগেই পেয়েছিলাম, মুখের গঠনেও সেই স্থাপত্যসুলভ জোরালো রেখার পরিচয়।

পতঞ্জলি রায় হাসি থামিয়ে বললেন, "সর্ব্বনাশের পথ সাধ করে বেছে নেবার জিনিষ নয়ই বা কেন! সব চেয়ে দামী যা কিছু, তা পাবার, আর জীবনের সব কিছু হারাবার ত একই রাস্তা। নিরাপদে জীবনের লোহার সিন্দুক আগলে যারা থাকে তারা হারায়ও না কিছু যেমন, তেমনি পায়ও না কিছু!"

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পতঞ্জলি রায় একেবারে অন্য সুরে বললেন, 'ব্যবসার আলাপ করবার আশায় এসে আমার এ-সব প্রলাপ শুনে আপনি হয়ত মনে মনে হাসছেন। ভাবছেন, আচ্ছা বেহদ্দ মাতালের পাল্লায় পড়া গেছে। তা যাই ভাবুন আমার কিছু আসে-যায় না। আপনাকে আমি চিনি না। মুখটাও ভাল করে দেখিনি। আপনি আমার কাছে একটা সত্তাহীন ছায়া মাত্র। তবু এ-সব বলছি কেন জানেন? নিজের কাছেও নিজে যা বলা যায় না তা বলবার জন্যে মাঝে মাঝে এ-রকম ছায়াও দরকার হয়। ছায়া না পেলে ছেঁড়া কাগজে লিখে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে হয়।"

একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, "পতঞ্জলি রায় তেমন ভাবে ছেঁড়া কাগজের লেখা কখনও হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছেন কি?"

অন্ধকারেই পতঞ্জলি রায় একটু চমকে উঠলেন, 'না, নিরাকার ছায়ার পক্ষে আপনার স্পর্দ্ধা যেন একটু বেশী। আপনাকে বাস্তবতায় নামান প্রয়োজন।"

আমাকে একটু বিস্মিত করেই পতঞ্জলি বারান্দাটা ঘুরে হঠাৎ চলে গেলেন। তাঁর একটু খুঁড়িয়ে হাঁটবার ভঙ্গিটা অন্ধকারেও আমার দৃষ্টি এড়াল না।

কয়েক সেকেণ্ড বাদেই ওদিকের লণ্ঠনটা নিয়ে এসে তিনি টেবিলের মাঝখানে বসিয়ে দিলেন। কালিপড়া লণ্ঠনের সেই অনুজ্জ্বল আলোতেই দু'জনের মুখের দিকে তখন আমরা সবিস্ময়ে চেয়ে আছি।

দু'জনেই বোধ হয় একসঙ্গে বললাম,—"আপনি!"

হ্যাঁ পতঞ্জলি রায়কে আমি চিনি। আমি নিজেও তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত বোধ হয় নয়।

পরিচয় ইতিপূর্ব্বে যখন হয়েছিল তখন অবশ্য পটভূমিকা ছিল আলাদা, সেই সঙ্গে দু'জনের ভূমিকাও।

আমায় সেদিন দর্শনপ্রার্থী হয়ে যেতে হয়নি, পতঞ্জলি রায়ই এসেছিলেন আমার কাছে নিজের গরজে। নামটা সেদিন হয়ত তাঁর পতঞ্জলি রায় ছিল না, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা এই যে, সেদিনও তাঁর মাঝে ময়ূরাক্ষীর রচয়িতার কোন আভাস না পেলেও, কৌতূহলী হয়ে ওঠবার যথেষ্ট খোরাক পেয়েছিলাম।

জীবিকার্জ্জনের তাগিদে ছোটনাগপুরের এক অভ্রের কারখানায় তখন ম্যানেজারী করি। ম্যানেজারী মানে কুলি-কামিনের সর্দ্দারী। যুদ্ধের কয়েক বছর আগেকার কথা। বাজার মন্দা। বড় বড় সদাগরেরা ব্যবসা গুটিয়ে এনেছে, চুনো-পুঁটির দল অনেক আগেই সাবাড়। সাগর-পারে সবেস মালের খোঁজ নেয় না কেউ। আমাদের কোম্পানী ডাকসাইটে অভ্রের কারবারী। শুধু মানের দায়ে তাই তাঁরা একটা কারখানার বাতি কোন রকমে টিম-টিম করে জ্বালিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করেছেন। যেখানে এ অঞ্চলের বিশটা কারখানায় তাঁদের দু'-তিন হাজার কুলি-কামিন কাজ করত, সেখানে একটা ছোট টিনের ছাউনির তলায় জন পঞ্চাশ সন্তাদরের খেলো ফাকনি ফাড়ে।

এই ম্যানেজারী করবার সময়ই এক দিন কোম্পানীর হেড অফিস থেকে এক চিঠি পেলাম এই মর্ম্মে যে, ডোমনী নদীর ওপারে কোম্পানীর যে বিরাট কারখানা-বাড়ি এখন তালাবন্ধ হয়ে পড়ে আছে, সেটা যেন ঝাড় পোঁছ করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়। কলকাতা থেকে কে এক জন সে বাড়ি ভাড়া নিতে আসছেন নতুন কারখানা বসাবেন বলে।

এই মন্দার বাজারে হঠাৎ অত বড় কারখানা নতুন করে সুরু করবার নির্বুদ্ধিতা যার মাথায় আসে তার বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। বিশেষ করে নদীর এপারের এত জায়গা থাকতে ওপারের ওই বেয়াড়া বাড়ি ভাড়া করাটায় আর যাই হোক ব্যবসা-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না।

শুধু ব্যবসা-বুদ্ধির তাগিদে ভদ্রলোক যে কারখানা খুলতে আসেননি তার প্রমাণ পেতে খুব দেরী হ'ল না। হেড অফিসের নির্দ্দেশ মত ভদ্রলোকের জন্যে যথাসাধ্য ব্যবস্থা আমি তখন করেছি, এমন কি একটু অতিরিক্ত আগ্রহ দেখিয়ে তাঁর জন্যে নদীর এপারে একটা বাসাও ঠিক করে রেখেছি।

ভদ্রলোক কারখানা-বাড়ির চেহারা দেখে খুশিই হ'লেন মনে হ'ল,

কিন্তু বাসা-বাড়ির কথা শুনে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "ও-রকম কোন কথা কি হয়েছিল?"

বেশ একটু ক্ষুন্ন হয়ে বললাম, "কথা হয়নি বটে, তবে আপনার থাকবার একটা জায়গা ত' দরকার। অবশ্য আপনি যদি আলাদা কোন ব্যবস্থা আগেই করে থাকেন···"

আমায় বাধা দিয়ে তিনি বললেন, "আলাদা ব্যবস্থা করবার দরকার ত' নেই কিছু। এই কারখানা-বাড়িতেই থাকব।"

"নদীর এপারে এই কারখানা-বাড়িতে!" কারখানার মালিকের পক্ষে এ-রকম জায়গায় বাস করা যে শুধু অসুবিধাজনক নয়, মান-সম্মানের দিক্ থেকেও হানিকর আমার কথার সুরে সেটুকু বোধ হয় উহ্য রইল না।

ভদ্রলোক তাই একটু হেসে বললেন, "আপনাদের ওপারের ঘিঞ্জি শহরের চেয়ে এপারটা খুব অস্বাস্থ্যকর বলে ত' মনে হয় না। তাছাড়া দিনে যেখানে কারখানা চালাতে পারি রাতে সেখানে একটু বিশ্রাম করলে এমন কি মাথা কাটা যাবে!"

প্রতিবাদ করলাম না, কিন্তু ভদ্রলোকের ওপর অপ্রসন্ন মন নিয়েই ফিরে এলাম। এ-রকম মাত্রাজ্ঞানহীন আনাড়ির হাতে কারখানা যে দু'দিন বাদেই শিঙে ফুঁকবে সে বিষয়ে আমার তখন বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

কিন্তু আমাদের সমস্ত ধারণাকে ধূলিসাৎ ক'রে ভদ্রলোকের কারখানা যেন দিন দিন শশিকলার মতই বেড়ে উঠতে লাগল। ১৯৩৯এর যুদ্ধের প্রচ্ছন্ন টান তখন থেকেই সুরু হয়েছে। হঠাৎ জোয়ারের সাড়া এসেছে অভ্রের বাজারে।

দেখতে দেখতে আমার মনিব কোম্পানীর পর্য্যন্ত চোখ টাটিয়ে উঠল। যে অজ্ঞ আনাড়িকে একটা লোকসানের কারখানা ফাঁকি দিয়ে গছিয়ে একদিন তাঁরা খুব একটা দাঁও মেরেছেন বলে মনে করেছিলেন, আজ সেই অজ্ঞ আনাড়িই তাঁদের সব-চেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে তাঁরা ভাবতে পারেননি।

বাজার চড়ার সঙ্গে সঙ্গে কারখানায় উপরি কুলি-কামিনের চাহিদা প্রতিদিন বাড়ছে কিন্তু নদী পার হয়ে তারা আমাদের কাছে পর্য্যন্ত পৌছোয় না। ডোমনীর কারখানাতেই আটকা পড়ে যায়।

ওপরওয়ালাদের হুকুমে আর কতটা নিজের গায়ের জ্বালায়, ভয়, লোভ, ঘুষ, কোনটাই বাদ দিলাম না। কিন্তু তবু এঁটে ওঠা গেল না ডোমনীর কারখানার মালিকের সঙ্গে। তখন তাঁর নাম ল্যাংড়া সাহেব নয়,—ডোমনী-রাজ। ডোমনীরাজ কি যেন ভেল্কী জানে। কাহার-কুর্ম্মী-সাঁওতালদের যাদু করে রেখেছে কোন কৌশলে। উপরি মজুরীর লোভ দেখিয়ে যাদের অনেক কষ্টে ফুসলে ফাসলে ভাঙিয়ে আনি দু'দিন বাদে তারা আবার নিঃশব্দে নদীর পারে পালিয়ে যায়।

আমাদের আড়কাঠি মংলু সর্দ্দার অনেক দিন গালি-গালাজ খেয়ে একদিন বেঁকে দাঁড়িয়ে বললে, "উরা তুর ইখানে আসবেক কেনে বল দেখি! ইখানে কি মজা আছে উথানকার মত।"

"মজা! কারখানায় আবার মজাটা কিসের?"

'খালি কারখানার কাম উয়ারা ত' করে নাই। দিনে ফাকনি আর রাতে রোশনি? বুঝলি বটে!'—মংলু সর্দ্দারের সব কটা দাঁত মাড়ি পর্য্যন্ত বেরিয়ে পড়ল খুশিতে।

ধমক দিয়ে তার উচ্ছ্বাস দমন করে বললাম, "রাতে রোশনি মানে?'

মংলু সর্দ্দার মানেটা যা বুঝিয়ে দিল কানা-ঘুষায় কিছু তার আগেই আমার কানে এসেছিল। ডোমনী-রাজের কারখানায় শুধু ফাকনি ফাড়াই হয় না। রাতে সেখানে ফূর্ত্তির আসরও বসে। গান-বাজনা আর অঢেল মহুয়া। রসদ না কি ডোমনীরাজই বেশীর ভাগ যোগান। শুধু তাই নয় সে মজার মজলিসে তিনি নিজেও না কি অনুপস্থিত থাকেন না। বিবরণ শেষ করে মংলু সর্দ্দার বললে, "মরদগুলাকে যদি বা বুঝ-শুঝ করি টানি আনতে পারি, কামিনগুলা কিছুতে আসবেক নাই।"

"কেন কামিনদের কাছে উনি বৃন্দাবনের কানাই না কি!"

"হঃ তাই ত বটে। উরা বলে কি, জানিস? মেহন্নত করলি মজুরি ত সবাই দিবে গ', কিন্তুক এমন মুনিব কুথাকে মিলবে বটে। কামিনগুলা আসতে নারাজ তাই মরদগুলাও সাথে সাথে মাথা লাড়ে।"

অপদার্থ মরদগুলোর সঙ্গে তাদের মালিকের মাথাটা গুঁড়িয়ে দিতে পারলে তখন আমার রাগ মেটে। ওপরওয়ালাদের কড়া চিঠি প্রত্যেক দিন চাবুকের মত এসে পিঠে পড়ছে। কারখানার কাজ না বাড়াতে পারলে চাকরী রাখা দায়।" কিন্তু ডোমনীরাজের বিরুদ্ধে নিষ্ফল আক্রোশে হাত কামড়ান ছাড়া কাজ বাড়াবার আর কিছুই করতে পারছিলাম না। ওদিকে নদীর পারের কারখানা প্রতিদিন ফেঁপে ফুলে উঠছে। উঠছে নতুন ছাউনি। ডোমনীর পাড়ে নতুন বসতিই গড়ে উঠেছে কুলি-কামিনদের। আর কিছু না পারলেও একদিন সুবিধে পেয়ে গায়ের ঝাল মেটালাম ডোমনীরাজের ওপর।

মাসিক ভাড়ার টাকা দিতে আমাদের আফিসে এসেছিলেন। রসিদটা সই করতে করতে কোন রকম ভূমিকা না করেই বললাম, "প্রথম এসেই কারখানা-বাড়িতে কেন আপনি থাকতে চেয়েছিলেন এখন বুঝতে পেরেছি।"

হঠাৎ একবার একটু চমকিত হলেও তাঁর মুখে তা প্রকাশ পেল না। ঈষৎ হেসে বললেন, "কি বুঝেছেন?"

মনের তিক্ততা কোন রকম গোপন না করে বললাম, "কুলি-কামিনদের নিয়ে রাতের পর রাত এমন মজা করবার সুবিধে নইলে হয় না।"

ভদ্রলোকের মুখের হাসি তবু মিলিয়ে গেল না। তেমনি স্মিত মুখেই বললেন, "ঠিকই বুঝেছেন তাহলে!"

কণ্ঠস্বরে যত দূর সম্ভব ঘৃণার বিষ ঢেলে দিয়ে বললাম "মহুয়া আর মাতলামির লোভ দেখিয়ে কত দিন কারখানা চালাবেন? কারখানার মালিক হয়ে লজ্জা করে না ওই সব কুলি-মজুরদের সঙ্গে মদ খেয়ে মজা করতে!"

ভদ্রলোকের মুখে তবু কোন ভাবান্তর নেই। সকৌতুক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, "মালিক হয়ে ওদের মেহ্‌নতের মুনাফা নিতে যদি লজ্জা না থাকে, তাহলে ওদের সঙ্গে একটু মজা করতেই কি যত লজ্জা!"

হেসে নমস্কার করে তিনি বেরিয়ে গেলেন। নিষ্ফল আক্রোশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি ফুলতে লাগলাম।

কিন্তু যা কল্পনাতীত তাই এক দিন হঠাৎ আলৌকিক ভাবে ঘটে

গেল। আমাদের সমস্ত চেষ্টাতেও যা পারিনি একদিন তিনি নিজেই তা করে গেলেন।

হঠাৎ একদিন শুনলাম, ডোমনীরাজ সাংঘাতিক জখম হয়ে কলকাতায় চলে গেছেন। ভেলোয়ার জঙ্গলে ভালুক শিকার করতে গিয়েই না কি এই দুর্ঘটনা আহত ভালুক তাঁর পায়ে না কি থাবা মেরেছে।

কিছু দিন বাদেই জানতে পারলাম, ডোমনীরাজ আমাদের কোম্পানীকেই জলের দরে তাঁর কারখানা বেচে দিয়েছেন।

তাঁর ব্যবসা তখন জমজমাট। ডোমনীর কারখানা এ অঞ্চলের সকলকে তখন কানা করে দিয়েছে। এই লাভের মরশুমে নিতান্ত উন্মাদ ছাড়া কেউ যে সে কারখানা বেচে দিতে পারে তা বিশ্বাস করা যায় না।

সেই উন্মাদ ডোমনীরাজের সঙ্গে এত কাল বাদে এমন আশ্চর্য্য ভাবে এই অপরূপ আস্তানায় দেখা হবে কে জানত!

ডোমনীরাজের অদ্ভুত চরিত্রের সঙ্গে পতঞ্জলি রায়ের রহস্যও যে জড়িয়ে থাকতে পারে, তাই বা কে কল্পনা করেছিল!

পরের দিন সকালে রায় সাহেবের ক্যাম্পে বসে সেই কথাই বলছিলাম। সুস্থ অবস্থায় রায় সাহেব মাঠের মাঝে এই বস্ত্রাবাসে থেকেই তাঁর কাজ-কর্ম্ম চালান। ক্যাম্পের আসবাব-পত্র যা আছে তা থেকে বোঝা যায় যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা বিলাসিতার প্রতি কিছু মাত্র আকর্ষণ তাঁর নেই। তাঁর সকালবেলার চেহারা দেখেও বোঝবার উপায় নেই যে গত কয়েক দিন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের রাজ্যে তিনি ছিলেন না।

তাঁবুর ভেতর দু'টি ক্যাম্বিশের চেয়ারে আমরা বসে আছি। ভোর রাত্রি থেকেই আকাশ ঘনঘটায় ঢাকা। বেশ কয়েক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেছে। বর্ষণের জের তবু এখনো একেবারে মেটেনি। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ফোঁটা পড়েই চলেছে।

তাঁবুর খোলা দরজা দিয়ে দমকা হাওয়ার মাঝে মাঝে সে বৃষ্টির কোঁটা আমাদের ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। চমনলাল একবার পর্দ্দাটা ফেলে দেবার জন্যে এল। রায় সাহেব হাত নেড়ে তাকে বারণ করলেন।

দরজার বাইরে মেঘলা আকাশের বিষণ্ণ আলোয় দিগন্ত-বিস্তৃত ঢেউখেলান শূন্য প্রান্তর দেখা যাচ্ছে। এরোড্রোমের রাস্তাটা সোজা সাঁথির মত সে প্রান্তর দ্বিখণ্ডিত করে দূরের বালি-নদীতে নেমে গিয়েছে।

সে-দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললাম, "দূরের নদীটাকে দেখলে ডোমনীর কথা মনে পড়ে যায়,—না?'

রায় সাহেব আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে খানিক চুপ করে থাকবার পর ঈষৎ হেসে বললেন, "আপনি অন্ততঃ মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছেন, বুঝতে পারছি!"

সরল ভাবেই স্বীকার করলাম, "তা চাইছি। ডোমনীরাজ আর পতঞ্জলি রায়ে রহস্য কি করে এক জনের মধ্যে জড়িয়ে থাকতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে।"

রায় আমার দিক্ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে খানিক নীরবে সামনের প্রান্তরের দিকে চেয়ে রইলেন। তেরপল-ঢাকা একটা লরী, এই মেঘ-মেদুর আকাশ ও বর্ষণ-স্নিগ্ধ পৃথিবীর কাব্যে, ছন্দোপতনের মত কর্কশ শব্দে আমাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে দূরের নদীর দিকে চলে গেল। আমার কথার উত্তর দেবার ইচ্ছে হয়ত রায়ের নেই ভেবে যখন প্রায় হতাশ হয়ে উঠেছি তখন হঠাৎ তিনি বললেন, "ডোমনীরাজ আর পতঞ্জলি কি একেবারে বিপরীত চরিত্র? আসলে তারা কি এক নয়? দু'জনের কোন মিল কি আপনি খুঁজে পাননি?"

"মিল শুধু এইটুকু বলা যায় যে দু'জনেই ভিন্ন ভাবে জীবনের কাছে হার মেনেছেন। দু'জনেই 'পলাতক'!"

"পলাতক!" রায় তিক্ত ভাবে একটু হাসলেন। বললেন, "হুজুগে সাহিত্যের বাঁধা বুলির ছোঁয়াচ আপনাদের মনেও লেগেছে দেখছি। জীবনের কদর্য্যতা কলঙ্ককেই এক মাত্র সত্য বলে মানতে যে নারাজ সে-ই আপনাদের কাছে 'পলাতক'। জীবনের উলঙ্গ কুৎসিত বাস্তবতার মাঝেও সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন দেখবার সাহস যার আছে সে শুধু অক্ষম কল্পনাবিলাসী!"

একটু থেমে রায় আবার বললেন, 'মানুষ একদিন আশ্চর্য্য সব রূপকথা তৈরী করেছে। সে কি শুধুই মিথ্যার মৌতাতে বুঁদ হয়ে, যা বাস্তব, তাকে ভুলিয়ে দেবার ও ভুলে থাকবার জন্যে? সে রূপকথার মধ্যে সেই দুঃসাহসী আশার বর্ত্তিকা কি নেই, বিকৃত বর্ত্তমানকে অবজ্ঞাভরে বিদ্রূপ করে ভবিষ্যতের সঙ্কেত যা বহন করে! জীবনকে তার সমস্ত কদর্য্যতা, গ্লানি আর অসম্পূর্ণতা নিয়ে সত্য করে জানবার দুর্ভাগ্য যাদের হয়নি, বাস্তবতার ফাঁকা বুলির হুজুগে তারাই সব চেয়ে মেতে ওঠে। জীবনকে সত্য করে যে জেনেছে, সে সত্যের চেয়ে আরো বেশী-কিছু দিয়ে তা প্রকাশ করে;—সেই বেশী-কিছুই হ'ল মানুষের স্বপ্ন।"

বৃষ্টির বেগ আবার বেড়ে উঠেছে। জলের ধারার চিক্ ফেলে আকাশ যেন আমাদের আলাদা করে দিয়েছে সমস্ত পৃথিবী থেকে। পতঞ্জলি তাঁর সেই ছায়ার সঙ্গেই কথা বলছেন বুঝে কোন মন্তব্য না করে চুপ করে রইলাম।

পতঞ্জলি বলতে লাগলেন, "অবশ্য আমার নিজের সম্বন্ধে এসব কোন কথাই খাটে না। আপনাদের ভাষায় আমি সত্যি পলাতক। স্বপ্ন নিয়ে থাকবার নিষ্ঠা ও সাহস নেই বলেই আমি কারখানা চালাই, কণ্ট্রাক্টরি করি। উলঙ্গ নির্লজ্জ সত্য প্রকাশ করতে আমার মন সঙ্কুচিত হয় বলেই আমি অলীক স্বপ্নে সান্ত্বনা খুঁজি।"

একটু চুপ করে থেকে পতঞ্জলি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি ময়ূরাক্ষী পড়েছেন?"

মাথা নেড়ে জানলাম, 'পড়েছি!"

"ময়ূরাক্ষীর আসল নাম কি জানেন? তার নাম ডোমনী। চাঁদের আলোকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে স্বপ্নের বালুচর সে পেতে রাখে না, শহরের নালার জলে নোংরা হ'য়ে, সরকারী সড়কের পোলে ধাক্কা খেয়ে জলের কলের পাম্পে অর্দ্ধ-শোষিত হয়ে অতি ক্ষীণ ধারায় সে কোন মতে দুই তীরের মাঝখানের ময়লা বালি একটু ভিজিয়ে রাখে।

সেই ডোমনীর শুকনো পাথুরে তীরের একটি কারখানা-বাড়ির সত্যকার কাহিনী লেখবার সততা নেই বলে আমি ময়ূরাক্ষীর স্বপ্নলোকে আশ্রয় নিয়েছি।

ডোমনীর কারখানা সম্বন্ধে অনেক কথা আপনি শুনেছেন। সব তার মিথ্যেও নয়। দিনে আমি যাদের নিয়ে কারখানা চালিয়েছি, রাত্রে তাদের নিয়েই হল্লা করতে আমার বাধেনি, এ খবরও আপনার অজানা নয়। একদিন এই প্রশ্নই আপনি আমায় করেছিলেন সে কথা আমি ভুলিনি। তবে সেদিন যে উত্তর আমি দিয়েছিলাম

তা মিথ্যে না হলেও, অসম্পূর্ণ। দিনে যাদের কাজে খাটিয়েছি, রাত্রেও তাদের সঙ্গ আমি কেন ছাড়িনি, জানেন? কি নিয়ে তারা বেঁচে থাকে তাই শুধু আবিষ্কার করবার জন্যে, শুধু জানবার জন্যে ওই ডোমনী নদীর মত তাদের বিকৃত বিড়ম্বিত অভিশপ্ত জীবনের নোংরা বালিতে, এক দিন যে তারা মানুষ ছিল সেই স্মৃতির এতটুকু সরসতা এখনো আছে কি না!

কঠিন নীরস মাটির অনেক নীচের স্তরে অনেক সময় জলের ধারা গোপনে লুকিয়ে থাকে। মাটিকে আঘাত দিয়ে, নিষ্ঠুর ভাবে বিদ্ধ করে কখন কখন তার সন্ধান নিতে হয়। সেই নিষ্ঠুর আঘাত দিতেও আমি দ্বিধা করিনি।

কারখানার-ই একটি ঘর আমার রাত্রের বিশ্রামের জায়গা ছিল আপনি জানতেন। এক দিন অনেক রাত্রে সকলকে বিদায় করে দেবার পর ঘরে ঢুকে চমকে উঠলাম একটা চাপা হাসির শব্দ শুনে। অবাক্ হয়ে আলো জ্বাললাম। অচেনা কেউ নয়। আমারই কুলি-কামিনদের এক জন। যথাসম্ভব কঠিন স্বরে বললাম, 'ঘর যা কোইলি!'

'নেশায় অর্দ্ধমুদ্রিত চোখে কোইলি একটু হেসে, জড়িত স্বরে বললে, "এহি তো ঘর বা।'

কোইলি অপ্রিয়দর্শন নয়, যৌবনের যাদু তা। সমস্ত অঙ্গে লেগেছে। নিজেকেও নিষ্কলঙ্ক চরিত্র বলতে পারি না। তবু সেদিন কোইলিকে জোর করেই বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। কারণ, এই মেয়েটি সম্বন্ধে দৈহিক কৌতূহলের চেয়ে বেশী কিছু আমার ছিল। আন্তু কাহারের মেয়ে। ছেলেবেলা যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সে কোন বিদেশের শহরের চাকরী নিয়ে দশ বছর নিরুদ্দেশ। ইতিমধ্যে কোইলি যৌবনে পা দিয়েছে। আমারই কারখানার গাড়োয়ান পরমা তাই দু'বছর ধরে আন্তু কাহারের কাছে ধন্না দিচ্ছে। আন্তুরও আপত্তি নেই। নগদ একশ'টি টাকা পেলেই সে আবার মেয়ের 'চুয়ান' সাদি দিতে প্রস্তুত। পরমা সেই টাকাই সংগ্রহ করছে প্রাণপণে। গাড়োয়ানী করে যা পায় তার ওপর যে কোন উপায়ে উপরি রোজগার করবার জন্যে সে ব্যাকুল। কারখানায় আনাগোনার পথে মাঝে মাঝে দু'চার বাণ্ডিল মাল যে কার হাত সাফাইএর গুণে লোপাট হয়ে যায় তা আমার অজানা নয়। নালিশটা বেশীর ভাগ সুখনের তরফ থেকেই আসে। সুখন পরমার প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু চেহারা সাহস শক্তি কোন দিক্ দিয়েই কোন ভরসা তার নেই।

পরের দিন সকালে সুখনই প্রথম খবরটা নিয়ে এল। কোইলির কাছে কি সব শুনে পরমা না কি ক্ষেপে গেছে। বলেছে 'খুন সে দেখবেই।' খুনটা যে কার তাও সে না কি উহ্য রাখেনি।

না, কোইলি, না, সুখন,—কারুর আচরণেই আশ্চর্য্য হবার কিছু নয়। সুখনকে তাই হতাশ করে একটু হেসে বল্লাম, 'একবার তোকে বাজারে যেতে হবে সুখন!'

'বাজার!' সুখন অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কাহেকে?' ক'টা টাকা বার করে দিয়ে বল্লাম। 'সব্ সে বঁঢ়িয়া শাড়ী মোল কর কোইলি কো পাশ লে যানা। বোলনা কেয়া ডোমনীরাজনে ভেজা।

শাড়ীটা যথা-সময়ে ফেরৎ এল। শোনা গেল আন্তুর বা কোইলির বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু পরমা একেবারে মার-মূর্ত্তি হয়ে উঠেছে। এ শাড়ী কোইলির গায়ে উঠলে সেই শাড়ী নিয়েই তাকে চুলহায় চড়তে হবে।

সমস্ত সকাল মনটা খুশিতে ভরে রইল। কোইলি অবশ্য যথারীতি সময়-মাফিক কাজে এল। দুপুরের খেপ নিতে পরমাও এল শেষ পর্য্যন্ত।

পরমাকে ডেকে বললাম, জামুণ্ডা যেতে হবে তাকে আজ দুপুরেই। জামুণ্ডার খাদ দু'দিনের যাওয়া-আসার রাস্তা।

উৎসুক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে ছিলাম। শুধু একটা স্ফুলিঙ্গ। ধনুকের ছিলা একবার শুধু টান হয়ে উঠুক।

পরমা মাথা নীচু করেই বল্লে, দু'দিন বাদে গেলে হয় না?'

'না হয় না!' পাঁচটা টাকা সামনে ফেলে দিয়ে বল্লাম, "সেখানে গিয়ে মহুয়া খাস।'

টাকাটা নিয়ে মাথা নীচু করেই পরমা চলে গেল।

বিকালে কাজের শেষে কোইলিকে ঘরে ডেকে পাঠালাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'শাড়ি ফেরৎ দিয়েছিস্ কেন?'

কোইলি জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বল্লে, 'তোহার পাশ কুছু ন লেই।"

হেসে বল্লাম, 'বেশ নিতে তোকে কিছু হবে না। একবার আসিস অন্য সময়ে। যখন গোলমাল থাকবে না। অনেক কথা আছে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে কোইলি চলে গেল।

গোলমাল থাকে না একমাত্র গভীর রাত্রে। রাত গভীর হবার আগেই ষ্টেশনে চলে গেলাম। রাতটা কাটালাম সেখানেই।

সকালে ফিরে শুনলাম, পরমা মাঝপথ থেকেই নেশায় চুর হয়ে ফিরে এসেছে। কোইলি তাকে কি বলেছে কেউ জানে না কিন্তু কাহার-বস্তির কারুর না কি আর জানতে বাকি নেই যে দুষমনের জান না নিয়ে সে ফিরবে না শপথ করেছে।

সুখন সাবধান করার জন্যে ব্যাকুল। বড় গোঁয়ার খুনে ওই পরমা। খুন-জখম করে একবার হাজত-বাস পর্য্যন্ত করে এসেছে। আমি যেন আগে থাকতেই ব্যবস্থা করি।

ব্যবস্থা করলাম। দুপুরে পরমাকে ডাকিয়ে বল্লাম। ভেলোয়ার জঙ্গলে শীকারে যাচ্ছি। তাকে সঙ্গে যেতে হবে। পরমার শীকারের সুনাম আছে। গাদা বন্দুক দিয়েই সে এর আগে দু'-চারটে চিতা ভালুক মেরেছে।

পরমা আপত্তি করলে না।

ফাল্গুন মাস। মহুয়ার ফুলে বনের মাটি ছেয়ে থাকে। ভোরের অন্ধকারে ভালুকেরা আসে সেই মহুয়ার লোভে।

পরমার হাতে গাদা বন্দুক আমার হাতে দোনলা। অন্ধকারে বনের পথে সন্তর্পণে যেতে যেতে বল্লাম, 'সাবধানে থাকিস পরমা, ভালুক ভেবে তোকেই না মেরে বসি। শীকারে এ-রকম ভুল হামেশা হয়।' অন্ধকারেই পরমার তীব্র দৃষ্টি যেন অনুভব করলাম মুখের ওপর।

বনের মধ্যে তখন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছি। হঠাৎ অদূরে একটা আবছা মূর্ত্তি দেখে বন্দুক লক্ষ্য করে চীৎকার করে উঠলাম। পরমাও বন্দুক বাগিয়ে ফিরে দাঁড়াল। কিন্তু বন্দুক তার হাতে রইল না। হাত থেকে মাটিতে পড়ে গাদা বন্দুক ছুটে গিয়ে গুলীটা ছিটকে এসে লাগল আমার পায়ে।

বসে পড়ে চীৎকার করে উঠলাম, কিন্তু পরমা আর সেখানে নেই। সেই যে সভয়ে ছুটে পালাল, সেই থেকেই সে নিরুদ্দেশ।

ডোমনীর কারখানায় আর ফিরে যাইনি। জখম পা নিয়ে কলকাতাতেই গেলাম চিকিৎসা করাতে। ঘা সেরেছে। কিন্তু ময়ূরাক্ষীর স্বপ্নের মত একটা ব্যথা এখনো যায়নি।"

সুভাষ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এদেশে বিশ বৎসর রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত থাকিয়া সুভাষচন্দ্রের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, জলে বাস করিয়া যেমন কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করা চলে না, ইংরেজাধিকৃত দেশে বাস করিয়া তেমনি ইংরেজী শাসন ধ্বংস করা সম্ভবপর নয়। সঙ্গে সঙ্গে এ সন্দেহও তাঁহার মনে জাগিয়াছিল যে, কংগ্রেসের যে সমস্ত নেতা এদেশে স্বাধীনতার আন্দোলন চালাইবার ভার লইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত পুরাতন মডারেট দলের কর্ম্মপন্থার পার্থক্য থাকিলেও আদর্শের খুব বেশী পার্থক্য নাই। সেকালের মডারেট নেতৃবৃন্দের প্রধান সম্বল ছিল আবেদন ও নিবেদন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, ইংরেজকে জব্দ করিবার কোন অস্ত্রই যখন তাঁহাদের হাতে নাই তখন moral pressure দিয়া অর্থাৎ বড় বড় তত্ত্বকথা আওড়াইয়া ইংরেজের মনে সুবুদ্ধি উদ্রেক করিবার চেষ্টা করাই স্বায়ত্ত-শাসন লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। এই moral pressure প্রয়োগ করিবার পরেও যদি ইংরেজের বুদ্ধি ঘোলাটে হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পণ্য বর্জ্জন করিয়া বিশুদ্ধ নৈতিক চাপকে অর্থ নৈতিক চাপে পরিণত করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। ইহার ফলে এক দিন না এক দিন স্বায়ত্ত-শাসন আমাদের হাতের মুঠোর ভিতর আসিয়া পড়িবে এবং এদেশের লোকের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

স্বদেশী যুগে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ লইয়া এক দল লোক কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সহিত কংগ্রেসের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ ছিল না; এবং কংগ্রেসের নামজাদা নেতাদের মধ্যে অধিকাংশই ইহাদের কার্য্যকলাপ বেশ সুনজরে দেখিতেন না। কাজেই কংগ্রেসী আদর্শ ও কর্ম্মপন্থার আলোচনায় ইহাদের উল্লেখ না করাই ভাল।

১৯২০ সালে যখন কংগ্রেসের নেতৃত্ব মহাত্মা গান্ধীর হাতে গিয়া পড়িল, তখন কংগ্রেসের আদর্শ হইল স্বরাজলাভ; কিন্তু স্বরাজ অর্থে ঠিক যে কি বুঝিতে হইবে তাহা কেহই স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহিতেন না। চাপিয়া ধরিলে তাঁহারা বলিতেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি এদেশের শাসন-ভার আমাদের হাতে তুলিয়া দেন, তাহা হইলে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় স্বায়ত্ত-শাসন পাইলেই আমরা সন্তুষ্ট হইব, এবং ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিব। আর যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সে শুভবুদ্ধি না হয় তাহা হইলে বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে যাইতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি সব কংগ্রেসী নেতাই এই মতাবলম্বী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার মনে করিতেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ অপেক্ষা ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের আদর্শ উচ্চতর।

১৯২০ সালের পরে কংগ্রেসী নেতারা আবেদন-নিবেদনের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া স্থির করিলেন যে, এদেশের বিদেশী গবর্ণমেণ্টের সহিত এদেশের লোক যদি সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করে তাহা হইলে শাসনকর্ত্তারা নৈবেদ্যের মাথায় মোণ্ডার মতো ধুপ করিয়া নীচে গড়াইয়া পড়িবেন। ধীরে ধীরে কেমন করিয়া এই সংস্রব পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং সারা দেশে বিদেশী শাসনযন্ত্রের পরিবর্ত্তে কংগ্রেসী শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, সারা দেশব্যাপী কংগ্রেসী কেন্দ্র হইতে লোকের মধ্যে সেই শিক্ষা প্রচারিত হইতে লাগিল। পাছে কোন অজুহাতে বিদেশী গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত কেন্দ্রগুলি ভাঙ্গিয়া দেয়, সেই জন্য দেশের লোককে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল যেন কোন কারণেই তাহারা হিংসাত্মক কার্য্যে লিপ্ত না হয়।

ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্‌কে সুভাষচন্দ্র কস্মিন্ কালেও আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তবুও তিনি মহাত্মাজী প্রবর্ত্তিত এই অসহযোগ আন্দোলনের ভিতর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, অসহযোগ আন্দোলনের ফলে আর কিছু হোক আর নাই হোক, দেশের লোকে শত্রু মিত্র চিনিতে পারিবে এবং দেশের লোকের মনে যে জড়তা ও উদ্যমহীনতা আসিয়া পড়িয়াছে তাহা কতকটা দূরীভূত হইবে।

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে দেশের জড়তা অনেকটা দূর হইল বটে; কিন্তু চৌরিচৌরার পরে দেখা গেল যে, নেতৃবৃন্দ যে পথে দেশের উত্তেজনা ও উদ্যম প্রবাহিত করাইতে চাহিয়াছিলেন, দেশের জনসাধারণ ঠিক সে পথ না ধরিয়া একটু ভিন্ন পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। অহিংসার প্রভাবে শত্রুর মানসিক পরিবর্ত্তন সাধন প্রভৃতি যে সমস্ত আধ্যাত্মিক ব্যাপারের মহাত্মাজী এই আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনসাধারণের বোধগম্য হয় নাই। কাজেই চৌরিচৌরার পর মহাত্মাজী যখন অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিলেন তখন দেশের লোক আবার নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতে লাগিল।

এই নিরুৎসাহের কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য কংগ্রেস সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স এনকোয়েরি কমিটি বসাইলেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, দ্রাবিড়, মগধ, পাঞ্চাল পরিভ্রমণ করিয়া কমিটি স্থির করিলেন যে, দেশের জনসাধারণ এখনও আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয় নাই; অর্থাৎ অহিংস ভাবে কিরূপে অত্যাচার দমন করিতে পারা যায় তাহা তাহারা এখনও শিখিয়া উঠিতে পারে নাই। কাজেই কমিটি স্থির করিলেন যে, তাড়াতাড়ি আইনভঙ্গের চেষ্টা না করিয়া অন্য উপায়ে দেশের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করিবার চেষ্টা করাই ভাল। ব্যবস্থাপক সভাগুলি দখল করিয়া যদি দ্বৈতশাসন ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে দেশের লোকে আবার নূতন আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে; এবং নির্ব্বাচনের সময় দেশে যে প্রচার

কার্য্য চলিবে তাহার ফলে ভবিষ্যতে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করারও হয়ত সুবিধা হইতে পারে। এই কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিয়া কংগ্রেসের ভিতর একটি নূতন দল গড়িয়া উঠিল; এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হইলেন এই দলের নেতা।

চৌরিচৌরার পর অসহযোগ আন্দোলন থামাইয়া দেওয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বা সুভাষচন্দ্রের অভিপ্রেত ছিল না। অহিংসার উপর মহাত্মাজী যতটা জোর দিতেন, দেশবন্ধু বা সুভাষচন্দ্র তাহা দিতেন না। দেশবন্ধুর সম্ভবতঃ ধারণা ছিল যে, ব্যবস্থাপক সভাগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়াই হোক আর দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াই হোক, বর্ত্তমান শাসনযন্ত্র যদি অচল করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে ঠিক ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ না হউক, উহার কাছাকাছি একটা কিছু আদায় করা যাইতে পারে। স্বরাজ দলের ভিতর সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইলেও মহাত্মা গান্ধীর বা দেশবন্ধুর কর্ম্মপন্থার উপর তাঁহার ষোল আনা আস্থা ছিল না। পূর্ণ স্বাধীনতাই ছিল তাঁহার কাম্য। নৈষ্ঠিক অসহযোগীদিগের গঠনমূলক কর্ম্মপন্থার প্রভাবে দেশের লোকে যে কখনও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় ভাবে দাঁড়াইবার সামর্থ্য লাভ করিবে, এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল না। ব্যবস্থাপক সভাগুলি ভাঙ্গিয়া দিলেও যে বিদেশী শাসনযন্ত্র অচল হইয়া পড়িবে, ইহাও তিনি মনে করিতেন না। কোন্ আন্দোলনে কতটুকু ফল পাওয়া যায়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য।

রাউণ্ড টেবিলের বৈঠক বসিবার পর হইতে তাঁহার মনে এই সন্দেহ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতেছিল যে, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ মুখে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ স্বীকার করিয়া লইলেও হয়ত অবশেষে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত একটা আপোষ করিয়া স্বাধীনতার উদ্‌যাপন করিয়া ফেলিবেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কেহ রাউণ্ড টেবিলের বৈঠকে যোগ দিন, ইহা সুভাষচন্দ্র চাহিতেন না। স্বাধীনতা লাভের জন্য এক দিন না এক দিন যে অহিংসার সীমা অতিক্রম করিয়া প্রকৃত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইবে, সে বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহই ছিল না। কংগ্রেসের পুরাতন নেতৃবৃন্দের হাত হইতে পরিচালন-ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া কংগ্রেসকে একটি প্রকৃত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য; এবং সেই লক্ষ্য অনুসরণ করিয়াই তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হইতে চাহিয়াছিলেন।

কংগ্রেসের পুরাতন নেতৃবৃন্দ যে তাঁহার কার্য্য-কলাপ সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই; এবং তিনি দ্বিতীয় বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবার পর মহাত্মাজী যখন সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন, তখন কংগ্রেসের ভিতর যে দুইটি ভিন্ন আদর্শ ও কর্ম্মপন্থার প্রচ্ছন্ন সংগ্রাম চলিতেছে, এ কথা বুঝিতে আর কাহারও বাকী রহিল না। সুভাষচন্দ্র তখন কংগ্রেসের ভিতরকার সমস্ত বামপন্থী দলগুলিকে সংঘবদ্ধ করিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ক্রমশঃই তিনি আবিষ্কার করিতে লাগিলেন যে, মৃত মডারেট নেতৃবৃন্দের প্রেতাত্মাগুলি যত দিন কংগ্রেসের ভিতরকার তথা-কথিত অহিংস প্রাচীন নেতৃবৃন্দের স্কন্ধে ভর করিয়া থাকিবেন তত দিন কংগ্রেস প্রকৃত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

তখন তাঁহার মনে হইল—কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সহিত এই প্রচ্ছন্ন সংঘর্ষে শক্তিক্ষয় করিয়া লাভ কি? এক দিকে প্রবল শত্রু গবর্ণমেণ্ট সহস্র চক্ষু বিস্তার করিয়া তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য-কলাপের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছে, অপর দিকে আধা-মডারেট নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে—After all, he is not an enemy of the country—এই সার্টিফিকেট দিয়া ধন্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন! স্বদেশপ্রেম যে কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে এবং দেশকে স্বাধীনতা অর্জ্জনের পন্থা দেখাইবার ভার যে ভগবান্ কোন নেতৃবিশেষের হাতে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই—এ কথা কি দেশের লোকের কাছে প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায় না?

বিদেশে যাইবার সংকল্প তখন তাঁহার মাথায় গজাইল। এক দিন দেশের লোক চমকিত হইয়া শুনিল যে, ভারতবর্ষের বাহিরে একটা স্বাধীন ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এবং সহস্র সহস্র সুসজ্জিত সৈন্য লইয়া সুভাষচন্দ্র এদেশের বিদেশী গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছেন।

* * * *

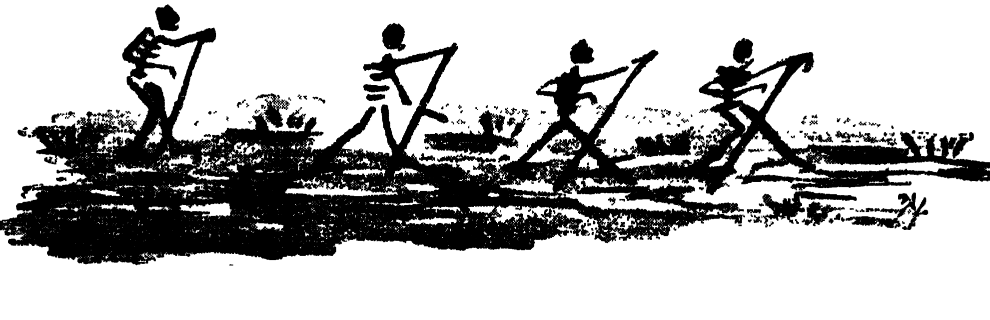
সুভাষচন্দ্রের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মনের ভিতর প্রশ্ন জাগিয়া উঠে—সত্যই কি ব্যর্থ হইয়াছে? তাঁহার 'জয় হিন্দ্' মন্ত্র যে আজ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, ইহা কি নিরর্থক?

* * * *

মহাত্মাজী বলিয়াছেন, সুভাষচন্দ্র যুদ্ধে বিজয়ী হইলেও দেশ স্বাধীনতা লাভ করিত না; আর স্বাধীনতা লাভ করিলেও সে স্বাধীনতা রক্ষা করা যাইত না!!

* * * *

হবেও বা! রামধনের ইচ্ছা রামধনই জানেন। [ক্রমশঃ।





"সহকর্মী"

সুভাষচন্দ্রের 'ফরোয়ার্ড' দেশবন্ধুর ও স্বরাজ্য দলের মুখপত্র মাত্র ছিল না। 'ফরোয়ার্ড' ছিল, ভারতের চরমপন্থী বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সমর্থনপুষ্ট নব ভারতের নতুন ধরণের মুখপত্র। 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা', 'স্বাধীন ভারত' 'বন্দে মাতরম্', 'নব ভারত', 'নব শক্তি', 'কেশরী' এক ভাবে ভারতের যুব-মন তৈরী করত—কতকটা গোপনে, কতকটা হেঁয়ালীর ভাষায়। বৈপ্লবিক সংবাদ পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-দুনিয়ার নব জাগরণ-বার্ত্তা এনে এর পূর্ব্বে কেউ এদেশে পরিবেশন করেনি। সুভাষ কাজে সুহযোগিতা পেয়েছিলেন—জার্ম্মাণীতে বীরেন চাটুজ্যে, নাম্বিয়ার আর ডাঃ তারক দাসের; জাপানে রাসবিহারী বসুর; চীনে এগনেস স্মেডলির; আমেরিকায় শৈলেন ঘোষের। বৃটেন তাঁর প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিলেন পুলিন শীলকে, তাঁর যোগে আইরিশ বিপ্লবী দলগুলোর বার্ত্তা ও কর্ম্মপদ্ধতির কাহিনী তিনি সংগ্রহ করে এনে দিনের পর দিন ভারতের যুব-সমাজকে পরিবেশন করেছেন। সাংবাদিকতার দিক্ দিয়ে সুভাষচন্দ্রের এ সব কীর্ত্তি অসামান্য। আরও অসামান্য জাতীয় সংবাদ সংগ্রহ ব্যবস্থা স্থাপনের চেষ্টা। আজ এ কথা কয় জন জানেন বলতে পারি না যে 'ফ্রি প্রেস অব ইণ্ডিয়ার' (যার বিপন্ন অবস্থায় রাতারাতি নাম পালটে ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া করা হয়) সৃষ্টির মূলে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর 'ফরোয়ার্ড'। ভারতীয় সংগ্রামের সংবাদ বিশ্বময় পরিবেশন করবার জন্য সুভাষ পুলিন বাবুর সাহায্যে লণ্ডনে 'ওরিয়েণ্ট প্রেস সার্ভিস' গড়েছিলেন। পুলিন শীলের কাছে আমরা শুনতে পাই সুভাষের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ ২৩ বছরের সম্পর্কের চাঞ্চল্যকর কাহিনী।

নির্ব্বাসিত দেশ-ভক্তদের সাহায্য ফরোয়ার্ড বা স্বরাজ্য দলের পক্ষে অপরিহার্য্য কেন ছিল তা জানতে হলে প্রথম মহাযুদ্ধে এঁদের প্রচেষ্টার কথা না জানলে চলবে না।

এর মাত্র ১০ বছর আগের কথা।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলগুলিতে বিশেষতঃ আমেরিকা ও কানাডায় 'হিন্দু এসোসিয়েশন' প্রবাসী ভারতবাসীদের মধ্যে বিষ ছড়াচ্ছে। হিন্দু এসোসিয়েশন মাত্র হিন্দুর নয় মুসলমানেরও। ওদের বৈদ্যুতিক শক্তি কর্ম্মী হরদয়াল, পরমানন্দ, বরকতুল্লা। ওদের কেন্দ্র পৃথিবীর প্রায় সব দেশে। এই বিশ্বব্যাপী ভারতীয় বৈপ্লবিক দলের নাম 'ঘাদর' বা অভ্যুত্থান। এদের ইংরেজী, গুজরাটি, হিন্দী, ও উর্দ্দু ভাষায় প্রচারিত মুখপত্র সে-সময় ভারতবাসীদের আহ্বান করে বলেছিল—

"This is the time to prepare yourself for mutiny while the war is raging in Europe. Oh brave people! Hurry up, end all these taxes by mutinying······

"Wanted—brave soldiers to still up Ghadr in India. Pay—death: prize—martyrdom: pension—liberty; field of battle—India···

"Get up and open your eyes! Accumulate bags of money for the Ghadr and proceed to India. Sacrifice your lives to obtain liberty."

ঘাদরের এক ইশলামী সংস্করণ কনষ্ট্যান্টিনোপল্ থেকে প্রচার করা হত ইংরেজী, আরবী, তুর্কী, হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায়। এ প্রচারপত্রের নাম—'জাহান-ই-ইসলাম'। মিশরী জগলুল দলের জাতীয়তাবাদী নেতা ফরিদ বে, মনশুর আরিফৎ প্রভৃতি এতে লিখতেন। এর এক সংখ্যায় তুর্কী নেতা আনওয়ার পাশা লিখেছিলেন—

"This is the time that the Ghadr should be declared in India, the magazines of the English should be plundered, their weapons looted and they should be killed therewith ···He who will die and liberate the country and his native land will live for ever. Hindus and Muhammedans, you are both soldiers of the army and you are brothers and this low degraded English is your enemy. You should become Ghazis by declaring Jihad,···and liberate India."

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মতন. প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ও দেখতে পাই, ভারতের স্বাধীনতার বৈপ্লবিক চেষ্টায় হিন্দু মুসলমানে ভেদ বাধিয়ে কেউ সুবিধে করে উঠতে পারেনি। বর্ম্মার মুসলমানেরা যেমন ইংরেজ-বিরোধী হয়ে বিপ্লবে যোগ দিয়েছিল, তেমনি ১৩০তম বেলুচি রেজিমেণ্টও সে সময় বিদ্রোহের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। মালয় ও সিঙ্গাপুর সেদিনও অশান্ত হয়ে উঠেছিল। রেঙ্গুনে মুসলমান 'ঘাদর'দল ১৯১৫, অক্টোবরে বকরিদের সময় বিদ্রোহ করবে ঠিক করে ঘোষণা করেছিল—এই পর্ব্বে ছাগল গরুর বদলে ইংরেজ কোরবাণী করতে হবে ("when the English were to be killed instead of goats and cows")

ভারতের দুই দিক্ থেকে বিপ্লবীরা সেবার আয়োজন করেছিল।

এক বর্মায় অন্য আফগানিস্থানে। বর্মার দিকে ব্যাঙ্ককে ভারতীয় বিপ্লবীরা জমায়েৎ হয়ে জার্মাণদের সাহায্যে শ্যাম-সীমান্ত অতিক্রম করে বর্মা আক্রমণের যেমন ফন্দী এঁটেছিল, তেমনি রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের নেতৃত্বে কাবুলে Provisional Government of India"—অস্থায়ী স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র স্থাপন করেছিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে জার্মাণরা আফগানিস্থান ছেড়ে চলে গেলেও এই স্বাধীন ভারতীয় সরকারের রাষ্ট্রপতি রাজা মহেন্দ্র স্বর্ণপাত্রে উৎকীর্ণ এক পত্রে রুশ সম্রাটকে অনুরোধ করেছিলেন, ইংরেজের মৈত্রী ছেড়ে দিয়ে ভারতে তিনি বিপ্লবীদের সাহায্য করুন।

মানবেন্দ্র রায় ব্যাটাভিয়ায় জার্মাণ কন্‌সালের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এ সময় বাংলার বিপ্লবীদের জন্য কম চেষ্টা করেননি।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার এ সব বিপ্লবী-প্রচেষ্টা ইংরেজ আর তাদের মিরজাফর বন্ধুরা ব্যর্থ করেছিল বিপ্লবী নেতাদের পিঞ্জরাবদ্ধ করে, আর অন্য দিকে শাসন-সংস্কারের মিষ্টি মিষ্টি প্রতিশ্রুতি দিয়ে। ইংরেজরা এতে এতটা সফলকাম হয়েছিল যে গান্ধীজী পর্য্যন্ত মণ্টেগু শাসন-সংস্কার আহ্লাদে আটখানা হয়ে লুফে নেবার জন্য এমন ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন যে বাংলার বিপ্লবীদের হয়ে সি আর দাশ আর বিপিন পালকে তাঁর উৎসাহে বাধা দিতে হয়েছিল কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে।

১৯২১এ কংগ্রেসের নতুন নিরামিষী অভিমানপন্থী গান্ধী আন্দোলন যখন প্রবর্ত্তিত হ'ল তখন ইংরেজ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। পূর্ব্বেই বলেছি, বিপ্লবী কর্ম্মীরা তখনও জেলে পচছে, অনেকে দেশ থেকে পালিয়েছে। অহিংস গান্ধী-আন্দোলন প্রবল হ'ল দেখে ইংরেজ একে একে বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তি দিলেও গান্ধীজী বিপ্লবীদের আপনার মতে দীক্ষিত করতে পারেননি।

১৯২২এ রুশিয়া থেকে মানবেন্দ্রনাথ রায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে এই মর্ম্মে এক পত্র লেখেন বলে কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় প্রকাশ হয়েছিল—

গয়া কংগ্রেসে আমাদের আন্দোলনের এক যুগ শেষ···মহাত্মা গান্ধী যে অসহযোগ প্রচার করেছিলেন, তাতে রাজনীতি ক্ষেত্র ধর্ম্ম-ক্ষেত্র হয়ে পড়ছিল, জাতীয় সংগ্রাম উপাসনায় পর্য্যবসিত হচ্ছিল। এ আন্দোলনেরও শেষ।···এক দল লোক বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত না হ'লে দেশে কখন কাউন্সিল ভাঙ্গবার আন্দোলন সফল হবে না। কাউন্সিল-প্রবেশ সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপনার দলে কংগ্রেসের ভিতরের ও বাহিরের বহু বিপ্লবী যোগ দেবে। এতে গণবিপ্লবের সূচনা হবে।···কংগ্রেস যেন বিদেশী বুরোক্রেসীর কাছে কিছু ভিক্ষে করতে না যায়। জগতের সম্মিলিত বিপ্লববাদী দল কৃষক ও শ্রমিক দল এখন থেকে কংগ্রেসকে সাহায্য করবে।···কংগ্রেসে তিন দল—(১) শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণী—এরা শাসন-সংস্কার বিধিতে কিছু লাভ করতে পারেনি বলে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, সচরাচর তাদের মনের মত কিছু দিলেই এরা তুষ্ট। (২) ছোট ব্যবসায়ী ও স্বল্প শিক্ষিত মধ্যম শ্রেণীর দল—এদের অর্থবল বা বিত্তবল নাই, এরা সমাজ ভেঙ্গে নতুন ভাবে কিছু গড়তে চাইবে, এরা সত্য যুগের অপেক্ষায় আছে। (৩) ভারতের জনসাধারণ। যারা গয়ার সিদ্ধান্তে তুষ্ট হয়নি, যারা জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম আরও জোরে চালাবার পক্ষপাতী তাদের উচিত জনগণের দল গঠন করে তাদের আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করা ও শ্রমিক ও কৃষকদল গঠন করে তাঁদের দ্বারা প্রকৃত কার্য্য পরিচালনা করা।···প্রকৃত পক্ষে যারা বিপ্লববাদী সেই কৃষক ও শ্রমিক-সম্প্রদায়কে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনতে হবে।"

আদালতকে চিত্তরঞ্জন অবশ্য জানিয়েছিলেন মানবেন্দ্রের চিঠি তিনি পাননি, পেলেও পূর্ব্ব আদেশ মত তাঁর সেক্রেটারী তা নষ্ট করে থাকবেন। কিন্তু আমরা সে সময় দেখেছি, দেশবন্ধু মানবেন্দ্র নাথের প্রস্তাবিত পন্থা আগে থেকেই অবলম্বন করেছিলেন। কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করবার জন্য তিনি বিভিন্ন জমিদার-অত্যাচার ক্ষেত্রে শক্তিশালী সংগঠক প্রেরণ করেছিলেন। মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীকে সে সময় বার বার প্রজাবিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র এ সময় পুরাদমে বৈপ্লবিক পাঠ নিচ্ছেন। সমাজ তন্ত্রবাদের নেশায় তখন তিনি ভরপুর, 'তরুণের স্বপ্নের' সঙ্গে দেশবন্ধুর কাছে মানবেন্দ্রনাথের প্রস্তাবের কোন ফারাক দেখি না। এ সময় দেশবন্ধুও শ্রমিক সংগঠন আরম্ভ করলেন। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের তিনি হলেন প্রথম সভাপতি। সুভাষ শ্রমিক সংগঠনে মাতলেন। জামসেদপুরে যে সংগঠন-কৃতিত্ব তিনি প্রদর্শন করেন তা টাটা শ্রমিকরা চিরদিন মনে রাখবে।

এ সময় স্বরাজ্য দলকে তিন দিকে নজর রেখে সংগ্রাম পরিচালন করতে হয়—

(১) বিপ্লবী শ্রমিক ও কৃষাণ সংগঠন (২) আমলাতন্ত্রের প্রভাব কেল্লাগুলো দখল (৩) আসন্ন যুদ্ধের সুযোগ নেবার জন্য তাড়াতাড়ি দেশকে তৈরী করা।

স্বরাজ্য দলের আফিস আর দলের মুখপত্র 'ফরোয়ার্ড' পরিচালনার সঙ্গে সুভাষকে শ্রমিক সংগঠনের ভার নিতে হয়েছিল। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে সুভাষচন্দ্র যেমন কংগ্রেসের গান্ধী-পন্থী নেতাদের অনুরোধ করেন যে ইংরেজকে ছ'মাসের নোটিশ দাও, এর প্রায় ২০ বছর আগে দেশবন্ধুও এমনি একটা প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির গয়া অধিবেশনে করেছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন—"মনে করুন কাল যুদ্ধ বাধল। আমার মতে সে-ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের ভারতবাসীর তখনই সরকারের সহযোগিতা থেকে ক্ষান্ত হয়ে আইন অমান্য করা উচিত। কেন না, তুরস্কের যুদ্ধ এশিয়ার স্বাধীনতার যুদ্ধ।···কংগ্রেস এ প্রস্তাবের আলোচনা পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করেছেন। কাজেই এ অবস্থার মধ্যে আর আমি থাকতে পারিনে।"

গান্ধীজীর এতে মহা আপত্তি। এ সময় তিনি হাকিম আজমল খাঁকে চিঠি লিখে সাবধান করে দেন, আইন অমান্য যেন করা না হয়। কারণ, দেশে নিছক বুদ্ধের দল তৈরী হয় নাই। কারণ—

(১) কর্ম্মীর অভাব। ভাঙ্গনের কাজে কর্ম্মী নিয়োগ করলে তা হবে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর।

(২) পরস্পর আমরা বিশ্বাস ও প্রীতি হারিয়েছি। দ্বেষ ও হিংসায় আমরা পূর্ণ হয়েছি। স্বার্থের জন্য কাটাকাটি করছি।

(৩) কংগ্রেসে কর্ম্মীই নেই। স্বেচ্ছাসেবকদের শৃঙ্খলা ও কংগ্রেস-প্রীতি নেই। কংগ্রেস-ভাণ্ডারে অর্থ সংগৃহীত হচ্ছে না।

সুতরাং রাজনীতিক গুরুজীর উপদেশ—

সব কাজ ফেলে অহিংস হও। খদ্দর প্রচার কর। অস্পৃশ্যতা ছেড়ে দাও।

কংগ্রেসের কোকনদ অধিবেশনের সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলি তাঁর অভিভাষণে বললেন—"মহাত্মা গান্ধী ভারতকে স্বরাজের দ্বারে উপস্থিত করবার উপক্রমে হঠাৎ যখন ঘোষণা করলেন যে আইন অমান্যের দ্বারা ঐ দ্বার সবলে উন্মোচন করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়, তখন ভারতে যে অবসাদের সঞ্চার হয়েছিল স্বরাজ্য দল তাহারই অভিব্যক্তি মাত্র···আমার মনে হয়, মহাত্মাজীর কারা-গমনের অব্যবহিত পরেই উগ্র নিরাপদে প্রযুক্ত হতে পারত। আমি হ'লে প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করে ঐ অস্ত্রে সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করতাম। চিকিৎসক স্বয়ং পীড়িত হলে তাঁর ব্যবস্থা অনুসারে ওষুধ প্রয়োগ করতে নেই। সুতরাং তাঁর আজ্ঞা পালন না করে তাঁরই অস্ত্র, সেই অহিংস অসহযোগের নীতি প্রয়োগ করলেই কার্য্য-সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট হবে।"

বাংলার তথা ভারতের ও ভারতের বাহিরের বিপ্লবীরা গুরু-গান্ধীর হুকুমে তাদের বিশ বছরের চেষ্টা পরিহার করে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে সম্মত হয়নি। কারু হাতে রাজনীতিক বকলমা দিয়ে তারা তকলীর পাকে পাকে জাতের অদৃষ্ট ফিরে আসচে কল্পনা করে অপেক্ষমান ক্লিষ্ট জনগণ ও মুক্তিকাম তরুণদের প্রতারিত করতে সম্মত হয়নি। যুগ-যুগের সামাজিক অসমতা ও রাষ্ট্রনৈতিক অস্পৃশ্যতার পথে প্রতি মানুষে, প্রতি ঘরে, প্রতি সমাজে ও সম্প্রদায়ে যে পচন ধরেছে, সে পচনের আদি অকৃত্রিম দাওয়াই যে সুতো কাটা আর আচণ্ডালে অনুষ্ঠান অভিনয় করে কোল দেওয়া, দীর্ঘকাল ধরে এ experiment করার মত মগজও তাদের ছিল না, ধৈর্য্যও তাদের ছিল না।

দেশবন্ধু জনসাধারণের বন্ধন-বেদনায় অস্থির হয়ে যেদিন বললেন —Life is unbearable without Swaraj—তরুণ সুভাষ সে unbearable কথার মধ্যে নিপীড়িত জনসাধারণের অধৈর্য্য-বেদনায়, আর-সইতে-পারিনে বেদনার আর্ত্তনাদ শুনতে পেয়েছিলেন—আর সে আর্ত্তনাদ-ধ্বনিতে ঝুনো বিপ্লবীরা বসে বসে সুতো কেটে সময় নষ্ট করতে সম্মত হয়নি।

অতুল ঘোষ, অরুণ গুহ, সতীশ চক্রবর্ত্তী আছেন। কিরণ মুখুজ্জে, কারাদণ্ড ভোগ করে দীর্ঘদিন পর শান্তি সেনার বিপ্লবী নায়ক পূর্ণ দাস বাইরে এসেছেন। দেশময় রাজনৈতিক ফুটন্ত অবস্থা সৃষ্টির জন্য বিপ্লবীদের সাহচর্যে স্বরাজ্য দল নির্ব্বাচনে জয় লাভ করে শাসন পরিষদে দো-ইয়াকি শাসনতন্ত্রের মুখোস খুলেছে। আরও উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের আয়োজন হচ্ছে।

সহসা এক চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড। ১২ই জানুয়ারী। চৌরঙ্গীতে ২১।২২ বছরের যুবক গোপীনাথ সাহা টেগার্ট ভ্রমে আর্ণেষ্ট ডে-কে গুলী ক'রল যুরোপে তৈরী এক টোটায়।

সন্ত্রাস-ভীত সরকার যেন বিপ্লবীদের দমনের জন্যই, গান্ধীজীকে যারবেদা জেল থেকে মুক্তি দিলেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯২৪) গোপীনাথের বিচার শেষ। গোপীনাথের ফাঁসী। বিচারপতি পিয়ার্শনের দণ্ডাদেশ উচ্চারণ শেষ হতে না হ'তে গোপীনাথ বলে উঠল—

"আমি চললাম। আমার রক্তের প্রতি বিন্দু যেন ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ বপন করে।"

বিচারপতি আর জুরীরা আসন ছেড়ে উঠ্‌লেন—গোপীনাথ আবার চীৎকার করে বলে—

"যত দিন পর্য্যন্ত জালিয়ানওয়ালাবাগ আর চাঁদপুরের মত ঘটনা ঘটবে, তত দিন এই রকম কাণ্ড ঘটবেই ঘটবে। এমন একদিন আসবে, যেদিন সরকারকে এর ফল ভোগ করতে হবে। মনে রাখবেন আপনারা, যত দিন চলবে দমননীতি তত দিন এ রকম ব্যাপারের অবসান হবে না।"

আদালতে গোপীনাথের বিবৃতি বাংলার তরুণ সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করে তুলেছিল। সুভাষচন্দ্র উন্মাদের মত বিচলিত হয়েছিলেন। সুকিয়া ষ্ট্রীটের কংগ্রেস কার্য্যালয়ে তাঁর সে সময়ের উচাটন ভাব দেখে অনেক বিপ্লবী নেতা বেশ শঙ্কিতই হয়ে উঠেছিলেন।

এ সময় কলকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনের আয়োজন করছেন সুভাষচন্দ্র। পূর্ণ-দাস নির্ব্বাচনে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনের ভার নিয়েছেন, তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের ভার তার শান্তি সেনার হাতে পড়বে।

সুভাষচন্দ্র এক বিবৃতিতে বললেন—"কাউন্সিল নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে এক দলকে গ্রেপ্তার করে আটক রেখেছে সরকার। আবার মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে ধরা হবে কত জনকে কে জানে। কলকাতার ভোটদাতারা বুরোক্রেশীর এ কাজে কি উত্তর দেবেন না?"

পুলিস সে-দিন ফেলেছিল বেড়াজাল। দলে দলে বিপ্লবী নেতারা ধরা পড়েছিল। ধরা পড়লেন অতুল ঘোষ, অরুণ গুহ, বাংলা কংগ্রেসের সহ-সম্পাদক সতীশ চক্রবর্ত্তী—ধরা পড়লেন গোপেন্দ্রলাল রায়, কিরণ মুখুজ্জে। মুক্তির ৩ মাস পরই আবার পূর্ণ দাশ ধরা পড়লেন দিনাজপুরে কনফারেন্সে বক্তৃতা করবার সময়। ধরা পড়লেন ফেরারী বিপ্লবী বিপিন গাঙ্গুলী হাওড়ার দৃম্বুড়ী গ্রামে।

তবু বোমা! ডে-হত্যার আড়াই মাস যেতে না যেতেই (১৬ই মার্চ, ১৯২৪)। পুলিসের মাণিকতলার বোমার আড্ডা আবিষ্কার। বিপিন পালের আত্মীয় আর প্রাচীন বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের ভাগনে যশোদা পাল, আরও অনেকে ধরা পড়ল।

ভারতময় আবার ধর-পাকড়।

মার্চ্চের মাঝামাঝি বলশেভিক চর বলে গ্রেপ্তার করা হ'ল অমৃত ডাঙ্গে, সৌকৎ উসমানী, নলিনীভূষণ গুপ্ত, মজঃফর আমেদকে। আমেরিকা থেকে লেখা মানবেন্দ্রের ৬০খানা চিঠি পুলিসের হাতে পড়ল।

১লা এপ্রিলে কর্পোরেশন স্বরাজ্য দলের হাতে এল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মেয়র হলেন,ডেপুটি মেয়র হলেন স্বরাজ্য দলের সহিদ সুরাবর্দ্দী।

মে মাসে মেদিনীপুরের বিপ্লবী নেতা বীরেন শাসমলের আশা ভঙ্গ করে যখন সুভাষচন্দ্রকে কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত করা হ'ল, তখন ডামাডোলে বিপ্লবীদের নেতৃত্বে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ সুরু হয়ে গেছে, আর দিনের পর দিন শতে শতে সহস্রে সহস্রে সত্যাগ্রহী কারাগারগুলো পূর্ণ করে ফেলছে। আমলাতন্ত্রের আধা সরকারী কেল্লা কর্পোরেশন হাতে করে সুভাষচন্দ্র আহ্বান করলেন দুঃস্থ ও সুস্থ বিপ্লবী কর্ম্মীদের ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য পরিপূর্ণ ভাবে প্রস্তুত হতে।

[illegible]

অমিয় চক্রবর্তী

স্বপ্নপসরা দুই হাতে নিয়ে
চলেছে কে সংসারে—
তাকে আমি একা গহন নদীর তটে
দেখেছি সেদিন রাতে।

ম্লান অরণ্যে ভরা চাঁদ আলো ঢালে,
ডালে ডালে পাতা চমকিত নেয় জ্যোৎস্নাধারা,
বাব্‌লা গন্ধে মুচ-কুন্দের মুগ্ধ হাওয়ায়
কে সে উজ্জ্বলা—
আঁচল উড়িয়ে স্বর্গমাটিতে নামে।
দেখি সেই পসারিণী ॥

সেই পসারিণী বেলাবনে গিয়ে
সুধার পাত্র দিয়েছিল তাঁর হাতে,
মহাজীবনের অন্ন সহজে বহে'
ঘরে ঘরে সে যে কল্যাণীব্রত আনে।
তাপস-চিত্তে করুণার জল দিয়ে
মুক্তির পথ সিঞ্চিত ক'রে যায়;
প্রতিদিন তার সেবার আঁচলে ভ'রে
মায়া দিয়ে ছোঁয় সংসার বেদনাকে—
কর্মবহ্নি জ্বালে।
এই সেই পসারিণী।
চিনি আমি তাকে ক্ষণে ক্ষণে যবে
সহরের পথে চলি ॥

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি আলোর ঝলক—
পলক ফেলিতে মোর নয়ন ঝলসি কোথা যাও
মেঘের অলক-মাঝে হাসিয়া লুকাও।
তুমি বজ্র—তুমি ঝঞ্ঝা
তবু তোমারেই শুধু তোমারেই মন চায়—
তুমি আলোর ঝলক।
ঘরের কোণে টিম্‌-টিম্‌ মৃদু আলো
আমি চাহি না
চাই না চাই না দখিন-সাগর ছোঁয়া
লঘু দখিনা।
আমি চাই তোমার ও উগ্র বেগুনী আলো
আমার বুকের মাঝে রূপের চিতা জ্বালো
আনো বহ্নি—আনো বন্যা
ঝড়ের ঝাপটে হানা দাও—
তুমি আলোর ঝলক।



পেটে ব্যথা

কথা মত মানোর মা শেষ রাত্রে ভৈরবকে তুলে দিতে গিয়ে টের পায় সে জেগেই আছে। মুখে আগে ডেকে আর দেখবে কি, একেবারে ঠেলা দিয়ে মানোর মা বলেছে, 'ওগো ওঠো। শুনছো ওঠ গো।'

তাতে গোসা হয়েছে জাগন্ত ভৈরবের।

'এত তাড়া কিসের, আঁ, কিসের তাড়া এত? ঘুমোসনি রাতে বুঝি কত্‌খনে কালীকে তাড়ায়ে হাড় জুড়োবি ভেবে?'

এ পর্য্যন্ত বললে কোন কথা ছিল না, মানোর মা গায়ে মাখত না কথা। পুরুষ মানুষ অমন বলেই থাকে। কিন্তু উঠে বসে হাই-টাই তোলার পর জানলার চাঁদের আলোয় নেংটি ছেড়ে ছেঁড়া মোটা হেঁটো ধুতিটি পরবার সময়তক্ জের চলে ভৈরবের গোসার।

'হাঃ,' সে বলে মাঝখানে যত ঘরোয়া কথা হয়েছে তা ডিঙিয়ে তার প্রথম রাগের কথাটাই একটানা বলে যাওয়ার মত, মেয়েলোক নইলে বলে কাকে। পেলে ঠেলে মেয়ে বেচে দেয় পেটের লেগে। মেয়ের মত পেলে একটা ছাগল বেচতে পাগল হবে সে তো ডাল-ভাত।'

এতে অগত্যা গোসা করতে হয় মানোর মাকে।

'ছাগল লোকে বেচে না পোড়ারমুখো, অভাবে নয়তো স্বভাবে?' মানোর মা বলে কলহের গরম অবস্থায় গাল দেবার সুরে, 'মেয়ের কথা বলো না যদি সরম থাকে একরত্তি। না খেয়ে মরেছে মেয়েটা, হায় গো! ছাগলটা বেচলে তখন বাঁচতো মেয়েটা। ছাগলের মায়ায় নিজের মেয়েকে খেতে না দিয়ে মারতে পারে কেউ পুরুষলোক ছাড়া!' হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে মানোর মা কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে।

'ছাগল বেচলে বাঁচতো?' মানোর ধাঁধাঁয় কাবু হয়ে পড়ে ভৈরব, 'ছাগল কোথা ছিল তখন? কালী তো জন্মালো দু'-চার দিন আগে, মানো যাওয়ার দু'-চার দিন আগে ওই গোয়াল-ঘরটায়।'

ওর মা-টাকে বেচা যেত না? -বাচ্চা ক'টাকে?

কার ছাগল কি বিত্তান্ত কিছু জানি না, বেচে দেব? আর সবে বিইয়েছে দু'টো তিনটে দিন আগে?

'রওনা দেও না? এসো না গিয়ে ভালয় ভালয়?' মানোর মা বলে লড়ায়ে জেতা রাণীর মত, বেলা যে দুকুর হয়ে যাবে সদরে পৌছতে ছাগল খেদিয়ে নিয়ে?

গলায় কাপড়ের পাড় বেঁধে কালীকে টানতে টানতে ভৈরব রওনা দেয় সদরের উদ্দেশে শেষ রাত্রির অস্তগামী চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্নায়। দু'পা গিয়েছে কি না গিয়েছে মানোর মা ছুটে এসে বাঁশের কঞ্চিটা হাতে তুলে দেয়। উপদেশ দেয় যে টানতে টানতে ছাগল নিয়ে যাওয়া চলে তিন কোশ পথ? কালীকে সামনে দিয়ে পেছন থেকে কঞ্চির বাড়ি মেরে মেরে নিয়ে গেলে যদি ভরসা থাকে আজ সদরে পৌছবার।

উপদেশটা কাজে লাগে ভৈরবের, বৌয়ের উপদেশ। সে যেন জানে না ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে যাবার কায়দা, জন্ম-ভোর ক্ষেত চষে আর গরু-ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে চুলে তার পাক ধরেছে। তবে কি না কালীকে বার বার কঞ্চির বাড়ি মারতে হয় এই যা দুঃখ। পাড়ের দড়ি বেশ লম্বা ও শক্ত। বাঁধন খুলে পালাবার চেষ্টা করে করে কালী শেষে হার মানে। যুদ্ধের আগের সস্তা শাড়ীর পাড়, চওড়া যেমন শক্ত তেমন। ঘরে কাপড় নেই ভৈরবের। এই ক'টা পাড় আজও টিঁকে আছে, গরু-বাঁধা দড়ির কাজ পর্য্যন্ত

বুঝি ভাল চলত আজকালকার দড়ির চেয়ে এই পাড় দিয়ে, যদি গরুটা তার থাকত।

কোথা থেকে কার একটা ছাগল এসে তার ভাঙ্গা গোয়ালের ফাঁকা চালার নীচে পাঁচটা বাচ্চা বিইয়েছিল। মানোর শোকে কাতর, না খেয়ে না খেয়ে আধমরা মানোর মা শুকনো পাতা জ্বেলে মাঘের বাঘ-মারা শীত থেকে বাঁচিয়েছিল ছাগল আর তার বাচ্চা ক'টাকে, নয়তো ছাগলটা বাঁচলেও ক'টা বাচ্চা টিঁকত কে জানে! দশ-বার দিন পরে জাফর এসেছিল তার ছাগল আর বাচ্চা নিয়ে যেতে। একটা বাচ্চা পুরস্কার দিয়ে গিয়েছিল।

'দুধ না খেয়ে বাঁচবে তো?' জাফর শুধিয়েছিল। 'বাঁচাবো।' বলেছিল ভৈরব উদাসীন ভাবে। মনে মনে সে ভাবছিল, বাঁচে তো বাঁচবে, না বাঁচে তো কচি ছাগলের মাংস এক দিন মন্দ লাগবে না খুদের সঙ্গে, দু'টো পেঁয়াজ যদি কোন মতে তুলে আনা যায় কালুর ক্ষেত থেকে।

মানো কিন্তু না খেয়ে মরেনি। চলতে চলতে এলোমেলো ভাবনার মধ্যে খাপছাড়া ভাবে ভৈরব অন্ততঃ দশ বার মনের মধ্যে জোর-গলায় বলে যে মানো না খেয়ে মরেনি। মানোর মা ও-কথা বলে গায়ের জ্বালায়। নয় তো পেটের জ্বালায়। মানো মরেছে রোগ হয়ে, ব্যারামে। না খেয়ে না খেয়ে গায়ে শক্তি না থাকায় হয় তো সে মরেছে রোগে, তেমন পথ্য পেলে হয় তো মরত না, তবু না খেয়ে যে মরেছে এ-কথা কোন মতে মানবে না ভৈরব তার বাপ হয়ে। মানোর মা মরত না তা হলে? যোয়ান মদ্দ মেয়েটা খেতে না পেয়ে মরল আর তার মা বেঁচে রইল, এ কখনো হয়! সেও তো মরেনি, তার আর দু'টো ছেলে মেয়ে। দুভিক্ষটা কোন মতে সামলেছে ভৈরব। এক বেলা আধ বেলা শাক-পাতা খুদ-কুঁড়ো কোন মতে জুটিয়ে হাড় চামড়া টিঁকিয়ে রেখে কোন মতে বেঁচে থেকেছে সবাই মিলে,—মানো ছাড়া। মানোর অসুখ হল। ওই অবস্থায় পোয়াতি মেয়ে বাঁচে কখনো অসুখ হলে। অসুখটা যদি না হতো, না খেয়ে মানো মরত না, শাক-পাতা খুদ-কুঁড়ো তারও জুটত, মানোও বেঁচে থেকে দেখত ক্ষেতে ক্ষেতে ভরপুর অজস্র ফসল, অনেক কাল যেমন ফসল কারো মাটিতে ফলেনি।

আর ক'টা দিন পরে মাঠের ফসল তার ঘরে উঠবে—জমিদার অবশ্য যদি কেড়ে না নেয় বাকী খাজনার দায়ে। তা, করালী বাবু কি এমন রাক্ষস হবে যে একটা বছর তাকে সময় দেবে না সামলাবার জন্ম, এত বোকা কি হবে করালী বাবু যে সে বুঝতে পারবে না একটা বছর তাকে সময় না দিলে সে উৎখাত হয়ে যাবে, বছর বছর খাজনা দেবার কেউ আর থাকবে না তখন!

আনমনা ভৈরবের সামনে দাঁড়িয়ে কৈলাস বলে, 'বলি চলেছ কোথা ছাগল নিয়ে শুঁড়ির পো?'

গায়ে যেন হাজার বিছে লাগে ভৈরবের। সা' বটে তার উপাধি, কিন্তু পাঁচ-পুরুষে শুঁড়ির কর্ম্ম তো কেউ করেনি তার বংশে, পাঁচ-পুরুষে তারা চাষী। তার এক দূর-সম্পর্কের কুটুম সদরে মদ বেচে টাকা করে। এ জন্ম তাকে শুঁড়ি বলা আর বাপ মা বৌ মেয়ে তুলে গাল দেওয়া সমান কথা।

'এই যাচ্ছি হেথা হোথা।'

কৈলাস ব্যাপার বুঝে মুহূর্ত্তে নিজেকে সামলে নেয়। সুর বদলে বলে, 'রাগ করো না। ওটা নিছক তামাসা। তামাসা বোঝো না, কেমন চাষী তুমি? যাই হোক, যত হোক, তুমি লোক ভাল, তা কি জানি না আমি? তবে কথা কি জানো, ছাগল নিয়ে যাচ্ছো কোথা?

সদরে বেচে দেব ছাগলটা। ফসল তোলা-তক্ ক'টা দিন আর চলে না কোন মতে।'

'সদরে গিয়ে ছাগল বেচবে?' কৈলাস বলে আশ্চর্য্য হয়ে, 'তোমার তো আস্পদ্দা কম নয় ভৈরব! গাঁয়ের গরু-ছাগল সব কিনে নিচ্ছি আমি যে যা বেচতে চায়, আমার লোক চাদ্দিকে রয়েছে, বেচতে যাতে কারো অসুবিধা না হয়, তুমি সদরে চলেছ একটা ছাগল বেচতে? আমাকে ছাড়িয়ে উঠতে চাও দেখছি তুমি!'

পূবের আকাশে সূর্য্য তখন কয়েক হাত উঠেছে। কালাপুর ছাড়বার পথ এটা, একটু আগেই পুল। খালের চেয়েও মরা-মজা ছোট-খাটো নদীটা লোকে অনায়াসে হেঁটেই পার হয়ে যেত, পুল তৈরী করে দেবার কণ্ট্রাক্ট নিয়ে কৈলাস গুছিয়ে নিয়েছিল। ভোরের রোদে ঝলমলে বাঁকাটে পুলটার দিকে চেয়ে ভৈরব ভয়-ডর ভুলে যায়।

আপনাকে ছাগল দেয়া মানে তো খয়রাৎ করা।'

'বটে না কি? সবাই তাই গছিয়ে দিতে পাগল!' নাক ঝেড়ে কৈলাস বলে, 'শোন্ বলি তোকে, ছ'টাকা সবাই পায়, তোকে আট



দিচ্ছি। আর কাউকে বলিস না। এই ছাগলের জন্ত আট টাকা করে দিতে হলে ব্যাবসা গুটোতে হবে। গাঁয়ে গিয়ে লতিফকে এ চিটটা দিবি ক—পেন্সিলে লিখে দিলাম তো কি হয়েছে, ওতেই হবে। ছাগলটা জমা দিলে লতিফ তোকে আটটা টাকা দেবে। দাঁড়া, চিট লিখে দিচ্ছি।'

'রও, রও।' ভৈরব সাহসে বলে, 'আট টাকা কিসের? সদরে এ ছাগল আঠারো টাকায় বেচবো।'

কৈলাসের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়।—'বাড়াবাড়ি করিস নে ভৈরব। ছাগল নিয়ে সদরে যাবার তোর রাইট নেই। তা জানিস ব্যাটা?'

'কি জন্তে? আমার ছাগল আমি যেথা খুসী নিয়ে যাব।'

'যাইবি?' কৈলাস খেঁকিয়ে ওঠে বাঘা কুকুরের মত, 'আমি দশ-বিশ হাজার ঢেলে লাইসেন্স নেবো সরকারের কাছ থেকে, আর তোমরা যার যেথা খুসী নিয়ে গরু-ছাগল বেচবে? সরকার আইন করে দিয়েছে, চাল, কাপড়, কেরাসিনের মত গরু-ছাগল কেউ গাঁয়ের বাইরে নিতে পারবে না। আরে বোকা, আইন যদি না থাকবে তো অত টাকা ঢেলে কে নেবে লাইসেন্স?'

ভৈরবকে ভড়কে যেতে না দেখে কৈলাস আশ্চর্য্য হয়ে যায়। ভৈরব নিশ্চিন্ত ভাবে বলে, 'বোকা পেলে না কি কৈলাস বাবু? আইন শুধিয়েছি। চালানী কারবারে নামি যদি তো আইন দেখিয়ো তখন।'

ভৈরব বলতে সুরু করলে কৈলাস ভুরু কুঁচকে তার দিকে চেয়ে ভাবে। একটা ছাগল কিছুই নয়, কিন্তু লক্ষণটা মন্দ। দশ জনে জেনে বুঝে সাহস পেয়ে এ রকম সুরু করলেই তো সে গেছে। এ বিদ্রোহ দমন করা দরকার।

সহরে ঢুকতে না ঢুকতে সহজেই কালী বিক্রী হয়ে যায় একুশ টাকায়। ভৈরব খুসী হয়। শুধু ভাল দাম পেয়েছে বলেই নয়, গেরস্ত ঘরে কালীকে বেচতে পেরেছে বলে। পোষা ছাগল বেচতে হওয়ার খোঁচা-তার দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল এই ভাবনায় যে কার কাছে কালীকে বেচবে, কেটে-কুটে গভিনী কালীকে হয় তো খেয়ে ফেলবে, নয় মাংস বেচে দেবে। যে দিন-কাল পড়েছে। কৈলাসের কাছে তো গরু মহিষ পাঁঠা খাসী ছাগলের কোন তফাৎ নেই, মাংস হলেই হল। কুকুর-বেড়ালও না কি সে মেশাল দেয়, সে যে মাংস দৈনিক যোগান দেয় তাতে। কালী ভাল ঘরে পড়েছে। ফল ফুল আনাজের মস্ত বাগানের মাঝখানে পুরানো একতলা বাড়ী, ছেলে-পুলে নিয়ে সংসারী ভদ্র গৃহস্থ, কালী বিয়োলে তার দুধটা খাবে, কালীকে নয়। বাড়ীর লাগাও মাঠ-জঙ্গল আছে, কালী চরে বেড়াতেও পারবে।

কিছু সওদা করতে বাজারে যায় ভৈরব। একখানি গামছা কেনে, শাড়ীর বদলে এতেই মানোর মার এক রকম চলে যাবে। আধ সের আলু, এক সের ডাল মোট সাড়ে ছ'আনায় হলুদ লঙ্কা ধনে আর জিরে, চার পয়সাতে সোডা আর দু'আনার একটি কাপড়-কাচা সাবান কিনে গামছায় বাঁধে। শেষে ভেবে-চিন্তে দু'আনার তামাক-পাতাও কিনে ফেলে মানোর মার জন্ত।

তার পর পথের ধারে তেলে-ভাজার দোকানে গিয়ে বসে গাঁয়ের দিকে চলতে সুরু করার আগে একটু বিশ্রাম করতে ও কিছু তেলে-ভাজা খেয়ে নিতে। তেলেভাজা বড়ই পছন্দ করে ভৈরব।

খাদ্যর তেলের চেনা গন্ধে পুরোনো দিনের খিদে যেন পাক দিয়ে চেগে ওঠে ভৈরবের মন ও পেটের মধ্যে। বসে বসে অনেকগুলি তেলেভাজা সে খেয়ে ফেলে, জল ও তেলেভাজায় পেট ভরে যাওয়া পর্য্যন্ত। পেটভরার আরামে অলস অবশ হয়ে আসে সর্ব্বাঙ্গ, মাথা ঝিমিয়ে আসে মধুর শান্তিতে। শুধু তার জীবনটা নয়, জগৎটাও জুড়িয়ে গেছে ভৈরবের। সামনে নোংরা রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে যে মিলিটারী লরীগুলো চলছে, দিক কাঁপিয়ে যেগুলি চলতে সুরু করার পর দেখতে দেখতে দুর্দ্দশা তার চরমে এসে ঠেকেছে, সেগুলিও এখন আর বুকের মধ্যে অভিশাপের দপদপানি জাগায় না। রাগ দুঃখ আপশোষ দুর্ভাবনা সব তলিয়ে গেছে ভরা-পেটের তেলেভাজার তলে।

ঘুম-আসা চোখে ভৈরব বাইরে বেলার দিকে তাকায়। গাঁয়ে যখন ফিরতে হবে, রওনা দেওয়াই ভালো। তেমন নাছোড়-বান্দা হয়ে যদি চেপেই ধরে ঘুম, পথের ধারে কোন গাছতলায় ঘুমিয়ে নিলেই হবে খানিক। গামছায় বাঁধা জিনিষ কাঁধে তুলে আস্তে আস্তে সে হাঁটতে সুরু করে। আসবার সময় চোখে লাগান ছিল নানা ভাবনার ঠুলি, দেখতে পায়নি, এবার সহর ছাড়িয়েই দু'দিকে ছড়ানো পরের ক্ষেতের ফসল দেখে চোখ তার জুড়িয়ে যায়, মন ভরে যায় ওই সবুজের মতই তাজা খুসীতে। তার নিজের ক্ষেতটুকু যেন লুকিয়ে আছে যেদিকে তাকায় সেইখানে।

ডাক দিয়ে তাকে দাঁড় না করিয়ে এবার কৈলাস সামনে থেকেই তার পথ আটকায়। তার সঙ্গে এবার দু'জন ষণ্ডা-গুণ্ডা চেহারার মানুষ।

'ছাগল বেচলি ভৈরব?'

ভৈরব উৎসাহের সঙ্গে বলে, বেচেছি গো কৈলাস বাবু, তোমার আশীর্ব্বাদে। দর পেয়েছি এক কুড়ি এক টাকা।'

তাই না কি! তা বেশ করেছিস, আমার বেচা-কেনায় ক্ষতিটা তুই নিজেই পুইয়েছিস। আট গণ্ডা কমিশন দেব তোকে। বার কর দিকি টাকাটা।'

কৈলাস তাকে ছোঁয় না, সঙ্গের লোকে দু'জন ভৈরবকে ধরে কোমরে-বাঁধা টাকা বার করে তার হাতে দেয়। টাকা পয়সা গুণে হিসাব করতে করতে কৈলাস বলে, 'হুঁ, খরচ করা হয়েছে এর মধ্যে? দাঁড়া, হিসেব করে তোর পাওনা বুঝিয়ে দিচ্ছি। তোর ছাগলের দাম বাবদ আট টাকা আর আট আনা মেহনৎ—সাড়ে আট টাকা। একুশ থেকে সাড়ে আট গেলে থাকে সাড়ে বারো, এই আমি নিলাম সাড়ে বারো, বাকীটা তোর।'

'এ কেমন ধারা তামাসা কৈলাস বাবু? ছাড়ো আমায়, ফেরত দাও।'

'তামাসা? ব্যাটা, তুই আমার তামাসার পাত্র?' দাঁতে দাঁত ঘষে কৈলাস গালে এক চড় বসিয়ে দেয় ভৈরবের, 'বলিনি তোকে, আমি ছাড়া এ এলাকায় গরু-ছাগল কেনা-বেচার লাইসেন্স কারো নেই, ছাগল বেচতে হলে আমাকে বেচতে হবে? ঘাড়ে তোর ক'টা মাথা রে হারামজাদা, গট-গট করে সদরে চলে গেলি ছাগল বেচতে বারণ না মেনে?'

ভৈরব ক্রুদ্ধ অসহায় আর্ত্তনাদের সুরে বলে, 'ডাকাতি করে গরীবের পয়সা কেড়ে নেবে? নাও—আমি থানায় যাবো, নালিশ করবো।'

'থানায় যাবি ? নালিশ করবি ?' কৈলাসের মুখে হাসির ব্যঙ্গ দেখা দেয়, 'যা ব্যাটা থানায়, নালিশ কর গা।' বলে তাকে থানার দিকে এগিয়ে দেবার জন্যই যেন পা তুলে জোরে এক লাথি কষিয়ে দেয় তার বাঁ কোমর লক্ষ্য করে। লাথিটা লাগে ভৈরবের পেটে।

পথ-চলতি রাম শ্যাম যদু মধুরা ভৈরবকে জমিদার শ্রীযুক্ত লক্ষীনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওদের মধ্যে রাম শ্যাম কাছাকাছি এসে পড়েছিল ঘটনাটা ঘটবার সময়। লাথি মারাটা তারা দেখেছে,—কৈলাসকেও কে না চেনে এ অঞ্চলে! তারা কাছে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে কৈলাসেরা অবশ্য চলতে শুরু করে দিয়েছিল ভৈরবকে রাস্তায় ফেলে রেখে,—দৌড়ে পালায়নি, কৈলাস আগে আগে হাঁটছিল হেলে-দুলে, পিছনে চলছিল সঙ্গী দু'জন, কিছুই যেন ঘটেনি এমনি ভাবে। পথে পড়ে মানুষটাকে দুমড়ে মুচড়ে কাতরাতে দেখে, বমির সঙ্গে রক্ত তুলতে দেখে, রাম শ্যাম গোড়াতে ভড়কেই গিয়েছিল খানিকটা। কিন্তু যদু মধুরা এসে পড়বার আগেই কাছাকাছি খানা থেকে আঁজলা ভরে জল এনে ভৈরবের মুখে-চোখে ছিটিয়ে দিতেও আরম্ভ করেছিল।

কিন্তু দু'হাতে পেট চেপে ভৈরবের বেঁকে তেবড়ে যাওয়া কিছুতে কমছে না দেখে সবাই পরামর্শ করে চলতি এক গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে।

আর ভৈরবের এমনি সৌভাগ্য যে, এই অসময়ে বাড়ীতে দিবানিদ্রা দেওয়ার বদলে স্বয়ং কুঞ্জ ডাক্তার হাসপাতালে হাজির ছিল। কৈলাসের প্রতিনিধি বলাই-এর সঙ্গে কুঞ্জ ডাক্তারের কুইনিন সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল একটা।

হাসপাতালে পৌঁছেই আরেক বার বমি করে ভৈরব। এক গাদা তেলে-ভাজার সঙ্গে উঠে আসে এক গাদা রক্ত। কুঞ্জ ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করতে করতে শুধোয়, 'কি হয়েছে ?'

মধু বলে, 'রাস্তায় পড়ে ছটফট করছিল আর রক্ত-বমি করছিল ডাক্তার বাবু। আমরা তুলে এনেছি।'

যদু বলে, 'কারা না কি মার-ধোর করেছে।'

শ্যাম বলে, 'পেটে লাথি মেরেছে এক জন।'

রাম বলে, 'ছি, ছি, পেটে এমন লাথি মানুষ মারে মানুষকে! মরে যদি যায়!'

কুঞ্জ ডাক্তার বলে, 'লাথি মেরেছে ? কে লাথি মেরেছে ? ধরতে পারলে না তোমরা তাকে ?'

রাম বলে, 'আজ্ঞে, লাথিটা মারলেন কৈলাস বাবু।'

শুনে বলাই বলে, 'হুম্।'

শ্যাম বলে, 'মোরা দু'জন আসতেছিলাম, কাছে যেতে যেতে লাথি মেরে কৈলাস বাবু চলে গেলেন সাথের লোক নিয়ে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে। থামো বাবু তোমরা একটু, লোকটাকে দেখতে দাও!' বলে কুঞ্জ ডাক্তার গম্ভীর মুখে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ভৈরবকে পরীক্ষা করে, লোক-দেখানো অনাবশ্যক পরীক্ষাও করে ডাক্তারী যন্ত্রপাতি দিয়ে। বমিটা ভাল করে দেখে। তার পর সে রায় দেয়, 'কলিক। কলিক হয়েছে।'

বলাই বলে, 'অঃ! তাই বটে। পেট চেপে ধরে মোচড় খাচ্ছে দেখে আমারও তাই মনে হচ্ছিল।'

রাম শ্যাম যদু মধুদের শুনিয়ে কুঞ্জ ডাক্তার বলে, 'কলিকের ব্যথা উঠেছে। কলিকের ব্যথা হল, যাকে তোমরা শূল বেদনা বলো। ঠেসে তেলেভাজা খেয়েছে, দেখছো না বমি তেলেভাজায় ভর্ত্তি ?'

মধু বলে, 'কিন্তু ডাক্তার বাবু—ও রক্তটা ?'

'কলিকে রক্ত ওঠে।'

যদু বলে, 'পঞ্চু মোকে শূল বেদনায় ধরেছিল ডাক্তার বাবু। রক্ত তো ওঠেনি ? বমি হতে পেট ব্যথাটা নরম পড়ল।'

'রোগের লক্ষণ সবার বেলা এক রকম হয় না কি ?'

শ্যাম বলে, 'আমরা যে দেখলাম ডাক্তার বাবু লাথি মারতে।'

'দেখেছো তো বেশ করেছো। ডাক্তারের চেয়ে বেশী জানো তুমি ? লাথি কে মেরেছে কি মারেনি জানি না বাবু, তেলেভাজা খেয়ে ওর কলিকের ব্যথা উঠেছে।'

রাম বলে, 'কৈলেস বাবু লাথি মারতেই পড়ে গেল, রক্ত-বমি করতে লাগল—'

'যাও দিকি তোমরা, যাও। যাও, যাও, বাইরে যাও, ভিড় কোরো না। ওষুধ-পত্তর দিতে দাও মানুষটাকে, চিকিৎসা করতে দাও। বেরোও সব এখান থেকে।'

রাম শ্যাম যদু মধুরা হাসপাতালের প্রাঙ্গণে নেমে যায়। ভৈরব দুমড়াতে মোচড়াতে থাকে হাসপাতালের দু'টি লোহার খাটের একটিতে। আরেক বার সে বমি করে। এবার তেলেভাজা ওঠে কম, রক্ত ওঠে বেশী। মনে হয়, রক্ত-বমি করে তার পেট ব্যথা বুঝি একটু নরম হয়েছে। তার ছটফটানি অনেকটা কমে আসে।

ঝড় ও ঝরা পাতা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

৩

(১৩ই ফেব্রুয়ারী)

সাড়ে আটটা বেজে গিয়েছে। এখনও অগাধ ঘুমে ঘুমুচ্ছে গোপেন। আজ আর তার স্ত্রী তাকে ডাকে নাই। গত কাল গভীর রাত্রে রক্তমাখা জামা গায়ে দিয়ে, মাথায় একটা দগ্‌দগে ক্ষত চিহ্ন নিয়ে ফিরে যে তাণ্ডব সে করেছে তার পর আর ঘুমন্ত গোপেনকে ডেকে জাগাতে সাহস হচ্ছে না শান্তির। গোপেনের স্ত্রীর নাম শান্তি। কুম্ভকর্ণের ঘুমিয়ে থাকাই ভাল। ঘুম ভাঙালেই সে বেরুবে, এবং আজ বেরুলে সে আর ফিরবে না—এই তার দৃঢ় ধারণা। এক দিনে গোপেন কুম্ভকর্ণের মতন ভীষণ হয়ে উঠেছে। ওর এই ঘুম দেখে শান্তির মনে কুম্ভকর্ণের উপমাটা জেগে উঠল—নইলে কাল রাত্রে ধারণা হয়েছিল সে পাগল হয়ে গিয়েছে।

গোপেনের রক্তমাখা মূর্ত্তি দেখে শান্তি শিউরে উঠেছিল। শিউরে ওঠা দেখে গোপেনের সে কি উল্লাস! সে কি হাসি! হাসি থামিয়ে গান গেয়ে উঠল—আগুন—জ্বা—লা—আগুন—জ্বা—লা!

—ওগো! ওগো! শান্তি ভীত শঙ্কিত হয়ে তাকে ডেকেছিল!

উত্তরে গোপেন গান থামিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল জয়—হি-ন্দ্‌! ইনকিলাব জিন্দাবাদ! ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদ—বর বা—দ! ইয়া!

সুস্থ মানুষ অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে যেমন শঙ্কিত হয় সকলে, চিরদিনের অসুস্থ মানুষ হঠাৎ সুস্থ হয়ে উঠলেও সকলে তেমনি শঙ্কিত হয়, বিভ্রান্ত হয় অন্ততঃ। চিরটা কাল গোপেন রাত্রিতে ফিরে শান্তিকে—ছেলেগুলোকে তিরস্কার করে, প্রহার করে; মধ্যে মধ্যে জিনিষ-পত্র ভাঙে। ফিরবার সময় তার সাড়ে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে; কোন ক্রমে যেদিন সাড়ে ন'টা হয় সে দিন আগে থেকেই শান্তি প্রস্তুত হয়ে থাকে। সে দিন গোপেনের মেজাজ হয়—দু'ডিগ্রির কাছাকাছি উত্তাপের জ্বরগ্রস্ত রোগীর মত। সমস্ত কিছু প্রলাপ-চিৎকারের অন্তরালে থাকে তার শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন মনের বিলাপের সকরুণ পরিচয়। কাল ফিরেছিল রাত্রি দু'টোয়, প্রথমেই শান্তির গালে মেরেছিল প্রচণ্ড এক চড়। তার পর সে এক তাণ্ডব। নিজের কপালে করাঘাত করেছিল, মৃত্যু কামনা করেছিল; ঘুমন্ত বড় ছেলেটার গায়ের লেপ খুলে যাওয়ায় সে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল, তাকে একটা লাথি মেরেছিল। আজ সকালেও সে যখন কাজে বেরিয়েছে তখনও সে নিজের মৃত্যু কামনা করেছে, ছেলেগুলোকে 'রাস্তার কুত্তার বাচ্চা' নামে অভিহিত ক'রে তাদের মৃত্যু কামনা করেছে। শান্তির দিকে সে হিংস্র পশুর মত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, সে দৃষ্টি শান্তির চোখের উপর ভাসছে। সেই মানুষ ফিরল সাড়ে আটটার জায়গায় রাত্রির শেষ প্রহরে, কপালে দগদগে ক্ষত, সর্ব্বাঙ্গে রক্তের দাগ নিয়ে; আজ তো তার বীভৎস ক্রোধে, উন্মত্ত প্রলাপে, অন্তরাত্মার আর্ত্তনাদে বাড়ীটাকে প্রেতপুরী বানিয়ে তুলবার কথা! সে মানুষ এমন উল্লাস নিয়ে ফিরল কি ক'রে? এমন সন্তোষের প্রাণখোলা হাসি হাসে কোন্ যাদুর স্পর্শে! তবে কি সে পাগল হয়ে গিয়েছে? শুধু হেসেই ক্ষান্ত হয় নাই গোপেন, উল্লসিত চিৎকারে জয় হিন্দ্‌, ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলেই ক্ষান্ত হয় নাই, সে শান্তিকে মিষ্ট কথা বলেছে, সমাদর করেছে, ঘুমন্ত ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে প্রত্যাশার কথা বলেছে, গুন্-গুন্ করে গান গেয়েছে, এই সব হাঙ্গাম চুকে গেলে এক দিন ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে বলেছে, ভেটকী, গল্‌দা চিংড়ী, মাংস, সন্দেশ—অনেক কিছুর ফর্দ্দ করেছে মুখে মুখে। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী গিয়ে মা কালীর পূজো দিয়ে আসবার মানত করেছে। শান্তিকে বলেছে, তাঁতের কাপড় কিনে দেবে। বলতে বলতেই সে ঘুমিয়ে পড়েছে। শান্তির ঘুম আসে নাই। এই পাড়াতেই আছে এক পাগল—সে রাস্তার লোক পেলেই তাকে ধরে বলে—"ওই যে বেলুড়ের রাজা—মহারাজ রামকৃষ্ণের বংশধর—রাজ্য ওদের পাওনা নয়। বুঝলে—মানে স্বত্বদোষ হয়েছে। স্বত্ব হ'ল আমার। এইবার আমি রাজা হব। রাজ্য পেলেই তোমাকে একটা বড় চাকরী দেব। মোটর আমি কিনব না, কিনব এরোপ্লেন—আর জুড়িগাড়ী। ঘোড়া—খুব বড় বড় তেজী ঘোড়া। টগো—বগ্‌ টগো-বগ্‌, এই তফাৎ যাও হট যাও—হট যাও!" বলতে বলতে সে নিজেই ছুটতে থাকে। শান্তি এক দিন দরজায় দাঁড়িয়েছিল, তাকেও সে সবিনয়ে এসে কথাগুলি শুনিয়ে

গিয়েছিল। তার কথা ও কল্পনার সঙ্গে গোপেনের কথা ও কল্পনার তফাৎ কোথায়? তফাৎ শুধু এক জায়গায়—পাগলের কথা শুনে সে অপার কৌতুক অনুভব করেছিল—প্রাণভরে হেসেছিল। আর গোপেনের কথা শুনে সে নিদারুণ আশঙ্কায় প্রায় শ্বাসরোধী উদ্বেগ অনুভব করেছে; নিঃশব্দে বাকী রাত্রিটুকু কেঁদেছে।

সকাল বেলায় তাই সে গোপেনকে ডাকলে না। ছেলেগুলোকে চিৎকার করতে নিষেধ করলে। ঘরের জানালা দু'টো শীতের রাত্রে বন্ধই থাকে, সকাল বেলায় খুলে দেওয়া হয়, আজ তাও খুললে না। দরজাটা ভেজিয়ে দিলে।

মানুষের শরীরে কত সয়? দুঃখী গরীব হলেও ওরও তো মানুষের শরীর! বেচারী ঘুমিয়ে সুস্থ হোক্। ঘুমই হ'ল মায়ের কোল। শীতের দিনে গরম, গ্রীষ্মের দিনে বাতাস—মায়ের হাতের স্পর্শ। বড় ছেলেটাকে পাঠাবে বাজারে, ওই গিয়ে বাজার ক'রে আনুক।

রাস্তা-ঘাটের এই অবস্থা! গুলী চলছে। এই বস্তীর মধ্যে বাড়ীতে বসেও শান্তি খবর পাচ্ছে। ছেলেরা খবর আনছে, প্রতিবেশীরা খবর আনছে, পথে লোক চলছে—তাদের মুখে এই ছাড়া কথা নাই, পানের দোকানের সামনে এই কথা চলছে, গঙ্গার ঘাটে এই কথার জটলা, আকাশে এই কথা—বাতাসে এই কথা; আশপাশের বাড়ীতে কেউ কাতরে উঠলে মনে হচ্ছে—কেউ বুঝি গুলী খেয়ে বাড়ী ফিরল, কান্নার আওয়াজ শুনলে মনে হচ্ছে—ও-বাড়ীর কেউ রাস্তায় গুলী খেয়ে মরেছে, এল বুঝি সেই খবর। এই বস্তীটায় ঘরে ঘরে মেয়েরা অভিশম্পাৎ দিচ্ছে। তাদের ভদ্র-গৃহস্থদের পাশেই—ঝি-চাকরের কাজ যারা করে, মজুর খেটে যারা খায় তাদের বস্তী; এই বস্তী থেকে ঝিয়ের দল সকাল বেলায় বেরিয়ে যায়—কেউ তিন বাড়ী কেউ চার বাড়ী ঠিকের কাজ করে। এই বাগবাজার থেকে শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড় পার হয়ে, নতুন রাক্ষুসে বড় রাস্তাটা পার হয়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত কাজ করতে যায়। ওদিকে হাতিবাগানের মোড় পর্য্যন্ত, এদিকে খাল-ধার পর্য্যন্ত, অন্য দিকে কুমোরটুলী আহিরীটোলা শোভাবাজার পর্য্যন্ত। কাল বিকেল বেলা থেকে কেউ আর কাজে বার হ'তে পারে নাই। গলি-গলি যত দূর যাওয়া যায় গিয়ে বড় রাস্তা যেখানে পড়েছে সেখান থেকেই ফিরে এসেছে। আজও ভোর বেলায় কয়েক জন বেরিয়েছিল। এ-পাড়ার জগো মাসীর প্রবীণ বয়স, পাড়ার ঝিয়েদের একটা দলের সে মুরুব্বী। সে ভোর বেলায় শ্যামবাজারের মোড় পর্য্যন্ত গিয়ে পালিয়ে এসেছে। আর যেতে সাহস হয় নাই। কালীঘাটের বাসগুলো যেখানে দাঁড়ায় সেইখানে একটা বড় বাড়ীতে লালমুখো গোরা-পল্টন গিস-গিস করছে! দোতলা তেতলার বারান্দায় সারি সারি দাঁড়িয়ে ঝুঁকে দেখছে। রাস্তাঘাট যেন তেপান্তরের মাঠ,—ট্রাম নাই, বাস নাই, গাড়ী-ঘোড়া, রিক্সা—কিছু নাই; মিলিটারী লরী যেগুলো পাড়া কাঁপিয়ে সকাল বেলা কারখানার বাবুদের, ফিরিঙ্গী মেমসায়েবদের আনতে যায় সেগুলো পর্য্যন্ত আজ বন্ধ। মোড়ের উপর বন্দুক ঘাড়ে ক'রে লালমুখোরা টহল দিচ্ছে। বাজার-হাট দোকান-পাট সব বন্ধ। তবুও জগো রাস্তাটা পার হবার চেষ্টা করেছিল। ঠিক রাস্তার মাঝ বরাবর গিয়েছে এমন সময় একটা বিকট আওয়াজ উঠল—হি—! চমকে উঠে জগো দেখলে—এক জন লালমুখো তার দিকেই আঙুল দেখিয়ে চেঁচাচ্ছে—হি—। এক জন তাকে দেখালে বন্দুকটা। অন্য কেউ হলে সে সেইখানেই পড়ে যেত। কিন্তু জগো—জগো মাসী বলেই কোন রকমে ছুটে পালিয়ে এসেছে। তার পালানো দেখে তাদের সে কি অট্টহাসি! এটা আমোদ হল ওদের। জগো বুঝতে পারলে সে কথা। কিন্তু আমোদ করতে ওরা অনেক কিছু করতে পারে। জগোর মনে পড়ল—বাগবাজারের মাঠে ছেলের দলের ইন্দুর মারার কথা। একটা দোকানের মেঝে থেকে পঁচিশ-তিরিশটা ইন্দুর বেরিয়েছিল—সেগুলোকে ঘিরে ওই মাঠে তাড়া করে তারা ঠেঙিয়ে মারছিল। সে কি আমোদ তাদের। জগো ফিরে এসেছে। যারা যাচ্ছিল তাদের ফিরিয়ে এনেছে। যারা যাবার উদ্যোগ করছিল তাদের বারণ করেছে। দল বেঁধে বসে তারা এখন অভিশম্পাৎ দিচ্ছে। ভগবান্‌কে ডাকছে। বলছে বিচার করো তুমি।

কাল রাত্রেই না কি একটা প্রকাণ্ড বড় ট্যাঙ্ক এনে শ্যামবাজারের বাজারের পিছনে কোথায় রেখেছে। ট্যাঙ্ক দেখেছে শান্তি। রাস্তার উপর দিয়ে যেতে দেখেছে। দুনিয়ায় এমন ভয়ঙ্কর জানোয়ারও নাই। বাঘের পা আছে, মুখ আছে, চোখ আছে, হাতীরও আছে, গণ্ডারেরও আছে। কিন্তু এর পা নাই—রাস্তা কাঁপিয়ে—বাড়ী কাঁপিয়ে—বিকট শব্দ করে বুকে হেঁটে চলে—চোখ নাই—সুমুখ নাই—পিছন নাই—বেরিয়ে আছে কামানের নল। ওই চালাবে আজ। মানুষের বুকের উপর দিয়ে চালিয়ে দেবে। পিষে—দলে—মানুষের রক্তমাংস চটকে দিয়ে চালাবে। ওই রাক্ষুসে পাঁচ মাথার মোড়ে কত মানুষকে চাপা দিলে, তার হিসেব নাই। সেগুলো তবু মোটর—বড় বড় দৈত্যদানার মত আকার হলেও রবারের চাকা। আজ এই কয়েক বৎসর ধরে ওই এক আতঙ্কের উদ্বেগ নিত্য নিয়মিত ভোগ ক'রে আসছে শান্তি। ছেলেগুলো বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেই উদ্বেগটা জাগতে

আরম্ভ করে, ফিরতে যত দেরী হয়—তত সে উদ্বেগ বাড়ে। রাস্তায় মানুষ চাপা পড়ার খবর এলেই মনে হয় এবার উদ্বেগে হৃৎপিণ্ডটা ফেটে যাবে। গোপেনের জন্য তার এ ভাবনা ছিল না। মনে হয়, বড় ছেলেটা বুঝি চাপা পড়েছে। কিন্তু আজ তার ভাবনা গোপেনের জন্য। কাল রাত্রে সে গোপেনের যে মূর্ত্তি দেখেছে তাতে সে আজ নিঃসন্দেহ হয়েছে যে, গোপেন আজ পাঁচ মাথার মোড়ে যাবামাত্র ওই ট্যাঙ্কটার তলায় পড়ে পিষে—চটকে—রক্তেমাংসে হাড়ের কুচিতে ছেত্‌রে রাস্তার পিচের উপর সেঁটে যাবে, পানের দোকানের সামনে পিচে সেঁটে বসে যাওয়া সোডাওয়াটারের বোতলের মুখের পিতলের ঢাকনীর মত, না—ঢাকনীটা বসে গেলেও গোটাই থাকে; সেঁটে যাবে দুপুরের রৌদ্রে গলা পিচের উপর উড়ে-পড়া শুক্‌নো পাতার মত।

জগোর উচ্চ কণ্ঠস্বর এখনও শোনা যাচ্ছে। অভিশম্পাতের ভাণ্ডার তার ফুরিয়ে গিয়েছে বোধ হয়; কিন্তু আক্রোশ মেটে নাই। ভগবান্‌কে বিচার করতে বলেছে, কিন্তু তাতেও বোধ হয় ভরসা রাখতে পারছে না। কবে অভিশম্পাৎ ফলবতী হবে, কবে ভগবান্‌ বিচার করে দণ্ড দেবে—তার প্রতীক্ষা করে থাকবার মত ধৈর্য্যও আর নাই। জগো উচ্চকণ্ঠে বলছে—আপশোষ হচ্ছে আমার—ছুটে পালিয়ে এলুম কেনে? গুলী করে মারত—মারত, মরতাম, ফুরিয়ে যেত, যন্ত্রণার শেষ হত, খালাস পেতাম।

এক জন উত্তর করলে—মরণকে তো ভয় নাই দিদি; গুলী লেগেও যদি না মরি, একটা অঙ্গ যদি খোঁড়া হয়ে যায়—ভয় তো সেই।

অন্য এক জন বললে—মেরে ফেলায় সে তো চুকে-বুকে যায় মাসী। মুখপোড়ারা যে ধরে নিয়ে যায় গো। বেপদ তো সেইখানে।

তার কথাকেই সমর্থন করে আর এক জন বললে—মাগো! বাঁশবুকোরা মোটর গাড়ীতে যায় ইশারা করে ডাকে। গাড়ী থেকে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে ধরতে যায়।

—এই সে-দিন! আর এক জন বলে উঠল—সে-দিনে সন্‌জে বেলায় ভোলা দাসী কাজ সেরে বাড়ী ফিরছে—গলিটির মুখে ঢুকবে, পিছু থেকে কেঁউড়ি মেঁউড়ি শুনে ফিরে চেয়ে দেখে দু'জনা তাকে ডাকছে—পিছু নিয়েছে। ভোলা দাসী দে ছুট ভয়ে। ভোলা দাসীও ছোটে—তারাও ছোটে। খালের ধার—পথে লোকজন নাই, সন্‌জে হয়ে গিয়েছে—কি বিপদ বল দিকিনি? ভোলা দাসীর অদৃষ্ট ভাল, ধরতে পারলে না—তার আগেই গলিতে ঢুকে একটা বাড়ীতে সেঁদিয়ে গেল। লোকজন দেখে মুখপোড়ারা আর আসে নাই।

হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে জগো বলে উঠল—চল্‌ কেনে আমরা সব দল বেঁধে যাই, রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলি—দাও দাগো বন্দুক—মেরে ফেলাও আমাদিগে দাও—মার—দাও।

* * * *

ঘুমুক। কাল কাজে না গিয়ে এই মাতনে মাতামাতি করে রাত্রির শেষ প্রহরে ফিরেছে। আজও সে আপিস কখনই যাবে না, যাবে ওই মাতনে মেতে উঠবার জন্যে। চাকরী গেলে এতেই যাবে। তবে প্রাণে না ম'রে বেঁচে যাতে থাকে তাই করতে হবে শান্তিকে।

বাড়ীতে এক টুকরো আলু নাই, এক ফালি কুমড়ো নাই, শাকের পাতা পর্য্যন্ত নাই। কাল গিয়েছে হরতাল। বাজার বসে নাই। শান্তি নিজেই বাজার করে। গোপেন আপিস গেলে সে যায় গঙ্গার ঘাটের দিকে। পথে বাগবাজারের বাজার। ফুটপাথেও ফড়েরা তরকারী বিক্রী করে। সবই প্রায় দাগীধরা জিনিষ কিন্তু দরে সস্তা। আজ এখনই—এইক্ষণে বাজার না করলে চলবে না; রান্না চড়বে না। পয়সার জন্য ভাবনা নাই। গত কাল ওই যে বড় বাড়ীখানা—ওই বাড়ীর ঝি এসে আধ সের চিনি এক সের মুগের ডাল কিনে নিয়ে গিয়েছে। ঝিটা নিজের জন্যে কিনেছে আধ-পো নারকেল তেল। পয়সা আছে। কিন্তু গোপেনকে বাড়ীতে রেখে শান্তির বাইরে যেতে সাহস নাই। ভালবাসা ভক্তি—এ-সবের কথা নয়, কথাটা হল নেহাৎ সাদা কথা, গোপেনের কিছু হলে এই বাচ্চাগুলোকে নিয়ে দাঁড়াবে কোথা? জায়গা অবশ্য পাশেই রয়েছে ওই জগোদের বস্তীর এলাকায়, মেপে দেখতে গেলে তফাৎ মাত্র বিশ হাত, কিন্তু ওই বিশ হাত পার্থক্য অতিক্রম করবার কথা মনে করতেও শান্তি শিউরে ওঠে। ওরা খারাপ লোক বলে নয়; রাত্রে অবশ্য ওখানে অনেক খারাপ কাণ্ড ঘটে। চেঁচামেচি, মারধর, হল্লা, গালাগাল অনেক কিছু হয়। মেয়েদের অনেকেই খারাপ। তবে তারা বাজারের বেশ্যা নয়, জানা চেনা লোক দু'-চার জন আসে যায়। ওদের পাশেই অনেক গেরস্তও থাকে। বামুন-কায়েত-বদ্যি সব রকম জাতই আছে। বামুনের মেয়েরা সকাল বেলা গামছা ঢেকে থালা নিয়ে ঠিকের রান্না করতে যায়। রোজগারও বেশ করে। বামুনের মেয়ে আধবুড়ী ওই 'টিয়েপাখী'—ও না কি রোজগার করে মাসে পঁচিশ টাকা। লম্বা হিলহিলে চেহারা টিয়েপাখীর মত নাক আর অনর্গল বকে; পাখীতে যেমন শুনে বুলি বলে তেমনি ভাবে যে যা বলবে ঠিক সেই কথাটি নিজে একবার বলবে, তাই ওকে লোকে বলে টিয়েপাখী। ঠিক ওই জন্তেই শান্তি ওই টিয়েপাখীর অবস্থার কথা ভাবলে শিউরে ওঠে। সে বেশ জানে, টিয়েপাখী যে ওই ভাবে পরের কথাটি অবিকল বলে যায় সেটা তার পরের তোষামোদ করার প্রয়াস। দু'-বাড়ীতে

ঠিকের রান্না ক'রে মাইনে পায় পঁচিশ টাকা আর তোষামোদে তুষ্ট ক'রে পুরনো কাপড় থেকে আরম্ভ করে ছেঁড়া জুতো পর্য্যন্ত সংগ্রহ করে। টিয়েপাখীর একটি মেয়ে আছে তার স্বামী কাজ করে কারখানায়, মাইনে যা পায় তার অর্দ্ধেক যায় নেশায়! কাজেই টিয়েপাখীকে জোগাতে হয় মেয়ের কাপড় থেকে আরম্ভ ক'রে নাতনীর ফ্রক, জুতো, খেলার জন্যে ভাঙ্গা পুতুল পর্য্যন্ত। মধ্যে মধ্যে চুরিও করে। চুরি করে আনে কয়লা, ঘুঁটে, বাটা মসলা, পান, দোক্তা পর্য্যন্ত। ওই দশায় উপনীত হতে শান্তি পারবে না। এই বিশ হাত তফাৎ অতিক্রম করার চেয়ে, বৈতরণীর খেয়া-পার হ'তে সে রাজী। ঘুমুক, গোপেন ঘুমুক।

গোপেন দেখতে কুৎসিত। আসলে এমন কুৎসিত সে ছিল না কিন্তু বসন্তের দাগে মুখখানা বিশ্রী করে দিয়েছে, গোপেন যখন রাগে তখন ওই ক্ষত-চিহ্নে ভরা মুখখানা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। ঘুমন্ত গোপেনের মুখের দিকে চেয়ে আজ কিন্তু শান্তির মন মমতায় ভ'রে উঠল। ওকে একটু ভাল খেতে দেওয়ার প্রয়োজন, যত্ন করার প্রয়োজন। ওই তো গোটা সংসারের ভরসা। কিন্তু যত্ন করবে কখন! বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই মানুষের। শান্তি হঠাৎ উঠল। ডাকলে বড় ছেলেকে—দেবা! দেবা!

দেবুর সাড়া নাই। শান্তি বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে। গলিটার বাঁক পর্য্যন্ত দেবা নাই, মেজ ট্যাবাটাও নাই। সাত বছরের তৃতীয় ছেলে হাবুটা দাঁড়িয়ে আছে বাঁকের মাথায়। শান্তি তাকেই ডাকলে—হাবা! দেবা কই, ট্যাবা কই?

দিগম্বর ছেলেটা অনবরত সর্ব্বাঙ্গ চুলকাচ্ছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাবা বললে—মেজ্ডা গেল "জয়হিণ্ড" করটে। ডাডাও গেল।

জয় হিন্দ্ করতে? শান্তির সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল। ওই মেজ ট্যাবাটা হল তার গর্ভের আপদ। খুদে শয়তান। ওরই জন্যই পাড়ার লোকের সঙ্গে ঝগড়া। পাড়ার ছেলেকে ঠেঙিয়ে আসবে। চোর হয়েছে, চুরি করবে। ভোরে অন্ধকার থাকতে উঠবে, বাড়ীর দরজা খুলে বেরিয়ে, যার সঙ্গে ঝগড়া তার বাড়ীর দরজাটাকে পায়খানায় পরিণত করে দিয়ে আসবে। সরস্বতী পুজোর ভাসান দেখতে চলে গিয়েছিল হাওড়া পোলের ধার পর্য্যন্ত। শেয়ালদার কাছে মেলা বসে মুসলমানদের পর্ব্বে—সেখানে চলে যাবে। হাতীবাগানে বোমা পড়েছিল সেখানে গিয়েছিল। তখন তো আরও ছোট ছিল। গ্রে ষ্ট্রীটে একটা বোমা পড়েছিল—পড়েই সেটা ফাটে নাই, পুলিশ থেকে গাড়ী ঘোড়া ট্রাম লোক যাতায়াত বন্ধ রেখেছিল—ট্যাবা সেইখানে বসেছিল সমস্ত দিন। সমস্ত দিন পরে সন্ধ্যায় ফিরে এসে হতাশ ভাবে বলেছিল—বোমাটা ফাটল না। আপদ! ওটাই তার জীবনের সব চেয়ে বড় আপদ! 'ডাকপুরুষের' কথায় আছে,—'আগলাগুলা যেথানে যায়, পিছলাগুলাও সেথানে ধায়'; ট্যাবা সে কথাকে রদ করেছে, উল্টে দিয়েছে, ট্যাবা যায় আগে দেবা যায় পিছনে; ট্যাবাই মাটি করলে দেবাকে। মরুক—মরে তো ট্যাবাই যেন মরে। ট্যাবার খোঁজে মাঝে মাঝে তাকে নিজেকে বার হতে হয়। কিন্তু আজ আর তার বার হবার উপায় নাই। ট্যাবা যায় যাক, দেবাও যদি তার সঙ্গে মরে মরুক, আজ সে গোপেনকে ছেড়ে এক পা নড়বে না। সে ডাকলে—নেবু।

নেবু হ'ল বড় মেয়ে, সব চেয়ে বড় সন্তান। চৌদ্দতে পা দিয়েছে, লম্বা হয়ে উঠেছে তার মাথার সমান। ভারী শক্ত মেয়ে। শান্তির সন্তানদের মধ্যে ওই সব চেয়ে সবল—শক্ত। ছেলেবেলায় মেয়েদের খেলাধুলায় সবকিছুতে ও ফার্ষ্ট হ'ত। লেখা-পড়াতেও ভাল ছিল। কিন্তু মাইনে কোথা থেকে আসবে, বইয়ের দাম কে দেবে? নেবু ঘরের কাজ করে আর বাপের তাড়ায় গান শেখে। কোন কালে গোপেন একটা হারমোনিয়ম পেয়েছিল লটারীতে, সেটা ভেঙে এত দিন পড়েছিল—হঠাৎ একদা গোপেন সেটাকে মেরামত করিয়ে এনে নেবুকে দিয়েছে। বলেছে—গান শেখ। মধ্যে মধ্যে নাচ শিখতেও বলে। গোপেনের ধারণা—নাচ-গান জানলে বিয়ের পক্ষে সুবিধে হবে। শান্তি ডাকলে—নেবু।

—বাসন মাজছি।

—থাক বাসন, আমি গিয়ে মাজছি। তুই শোন্।

নেবু এসে দাঁড়াল। একটা হাফ প্যাণ্ট আর বাপের ছেঁড়া একটা কামিজ গায়ে দিয়ে কোন মতে লজ্জা নিবারণ করেছে। শান্তির চোখে ওটা খুব লাগে না, দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। শান্তি বললে—তুই আজ বাজারটা ক'রে নিয়ে আয়।

—বাজার?

—হ্যাঁ। একটা আলু পর্য্যন্ত নাই। দেখ, এই বাগবাজারের বাজারে কি পাস্, নিয়ে আয়। ভাল দেখে চিংড়ী আনবি এক পোয়া। তোর বাপ চিংড়ী খেতে ভালবাসে। আমার কাপড়টা পরে নে। এক ফালি কুমড়ো, একপো আলু। একটা চিংড়ী একটু বড় দেখে আনবি। গলদার দর বেশী—বড় বাগদা আনবি বরং। আর পথে যদি ট্যাবা-দেবার দেখা পাস—তবে নিয়ে আসবি। বলবি—মা বলেছে মুখে রক্ত তুলে দেবে আজ। তাতে না শোনে—তবে একটা পথের পাথর তুলে কপালে মেরে ফাটিয়ে দিয়ে আসবি—আমি তোকে বলছি—ফাটিয়ে দিয়ে আসবি।

অত্যন্ত সাহসী মেয়ে নেবু আর এই ধারার কাজে ভারী খুসী হয় সে। ব্লাউজ তার নাই, আছে গোটা

দুয়েক খাটো ফ্রক। সেই ফ্রকটাকে প'রে তার ওপর পড়লে সে মায়ের কাপড়খানা। বাজারের থলিটা হাতে বেরিয়ে গেল। আবার ফিরল সব চেয়ে ছোট ভাইটাকে টানতে টানতে। বছর তিনেক বয়েস ওটার, ওটার বাতিক হ'ল সিগারেটওয়ালার দোকানের সামনে থেকে লেমনেড সোডার বোতলের মুখের টিনের ঢাকনী সংগ্রহ করা। বললে—নাও এটাকে। ট্যাবা আর দ্যাবা শুনলাম—পাড়ার ছেলের সঙ্গে দল বেঁধে বেরিয়েছে। লরী পোড়াতে গেছে।

নেবু আবার চলে গেল।

শান্তির ইচ্ছে করছিল এই ছোটটাকে মেরে খুন ক'রে ফেলে। কিন্তু না;—চিলের মত চেঁচাবে। গোপেনের ঘুম ভেঙে যাবে।

উনোনের আগুনটা দেখতে হবে। চায়ের বন্দোবস্ত ঠিক করে রাখতে হবে। পোয়াটেক চিনি এখনও আছে ঘরে—খানিকটা ভিজিয়ে রেখে দেবে, সারা রাত জেগেছে একটু সরবৎ খেলে শরীরটা ঠাণ্ডা হবে। আহা রে, বড় ভুল হয়ে গেল, অন্ততঃ একটা নেবুর জন্য বললে হ'ত। অনেক দাম। অন্ততঃ চার পয়সা। কিন্তু তার মেয়ে খুব চালাক একটা নেবুর পয়সা লাগত না। নেবু-লঙ্কা-আমড়া এ সব সংগ্রহে নেবুর নিপুণতা অদ্ভুত।

জগো এখনও চীৎকার করছে।

* * * *

শান্তি দু'হাতে দু'টো গেলাস নিয়ে একটা থেকে অন্যটায় সরবৎ 'ঢাল-উপুড়' করে চিনিটাকে গলিয়ে ফেলছিল। উনোনটা ধরে উঠেছে। সরবৎটা রেখে এইবার ডাল চড়িয়ে দেবে। একটা গোলমাল শুনে সে চমকে উঠল। হাতের কাজ তার বন্ধ হয়ে গেল। সে কান পেতে শুনবার চেষ্টা করলে। অনেক লোক একসঙ্গে উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলছে। গেলাস দু'টো নামিয়ে রেখে সে দ্রুতপদে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল গলির মোড়ে। এক দল লোক বেরিয়ে গেল। জয় হিন্দ—ইনকিলাব জিন্দাবাদ! লাগ গিয়া রে বাবা। চলো মুসাফের।

সামনে রহমান সেখের বিড়ির কারখানা। রহমান দোকান বন্ধ করছে। রহমানকে শান্তি চেনে, কিন্তু কথা বলে না। শান্তি মিনিট খানেক দ্বিধা করলে, তার পর সে রহমানকেই ডাকলে—কি হয়েছে বলুন তো?

রহমান ফিরে তাকিয়ে শান্তিকে কথা বলতে দেখেও বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করলে না; উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে বললে—শ্যামবাজারের পাঁচ মাথায় গুলী চালিয়াছে।

—গুলী চালিয়েছে? শ্যামবাজারেরর পাঁচ মাথায়?

—হ্যাঁ; সাত-আট আদমী গিরেছে।

—আমার ট্যাবা-দেবা—

রহমন যেতে যেতে বললে—দেখব আমি। ট্যাবা খুব হুঁসিয়ার আছে, আপনি ভাববেন না। সে চলে গেল।

শান্তি কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে। তার পর সে বেরিয়ে পড়ল। গোপেনকে সে ডাকবে না। ছেলে দু'টো—হেবু আর সবুটা থাকল, থাক। তাকে যেতেই হবে। শ্যামবাজারের পাঁচ মাথায় সাত-আটটা লোক পড়েছে, তার মধ্যে ট্যাবা আর দেবা নিশ্চয় আছে। ট্যাবা হয় তো বাঁচলেও বাঁচতে পারে, দেবা যে আছে তাতে আর কোন সন্দেহ নাই; দেবা বোকা। তার বুদ্ধি কম। ছুটল শান্তি।

দেবা কি ট্যাবা যদি মরে থাকে তবে শান্তি আজ সামনে পেলে ওদের উপর লাফিয়ে পড়বে। মারুক—ওকেও তারা গুলী করে মেরে ফেলুক।

শ্যামবাজারের পাঁচ মাথা।

ফুটপাথ ঘিরে চারি পাশে জনতা। এত মনুষ—তবু স্তব্ধ। রাস্তাটা ফাঁকা; জনশূন্য পিচ পাথরের পথ মানুষ ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া নদীর মত ভয়াল মনে হচ্ছে। ফুটপাথের জনতা পাড়ের মানুষের মত—ওই তরঙ্গে ঝাঁপ দেবে কি না ভাবছে।

উত্তরে পুলিশ ব্যারাকটার বারান্দায় শাদা মানুষগুলো ঝুঁকে দেখছে। সম্ভবতঃ ঘৃণা আক্রোশ এবং ক্রোধ-পরিপূর্ণ অন্তরে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখছে—কালা আদমীদের।

শান্তি ভিড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়িয়ে চারি দিক্ চেয়ে দেখছিল। কোথায় দেবা-ট্যাবার গুলী খাওয়া রক্তে ভেসে যাওয়া শরীর। গল্-গল ক'রে রক্ত বার হচ্ছে গুলীর ছিদ্র দিয়ে!

কে তার কাপড় ধরে টানলে পিছন থেকে!

কে রে? কে রে সয়তান—হারামজাদা—

—আমি। নেবু।

—নেবু!

—হ্যাঁ।

—তুই এখানে?

—চারটে লোককে গুলী ক'রলে এক্ষুণি। আমি দেখলাম।

—চার জন?—দেবা—ট্যাবা?

—তারা এখানে নাই। আমি ওদিকের বাজারে যাইনি। এখানে এসেছিলাম। বললে—গোরা পল্টন এসেছে। তাই—। নির্ভয় হাসি হাসলে নেবু।—চল বাড়ী চল।

—দেবা-ট্যাবা নেই এখানে? যারা গুলী খেয়েছে তাদের তুই দেখেছিস্?

—হ্যাঁ। এক জন ওই সারকুলার রোড থেকে আসছিল—কাদের বাড়ীর চাকর—তার লেগেছে। এক জন যাচ্ছিল সাইকেলে চড়ে তার লেগেছে। আরও দু'জনের লেগেছে। সব হাসপাতালে নিয়ে গেছে। এস।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল জনতা। বন্দুক উঁচিয়ে লরী-বোঝাই নিষ্ঠুর-দর্শন মানুষ আসছে। এক কালে ওদের সাদা রঙ বিস্ময়ের উদ্রেক করত মানুষের, মনে হ'ত কত সুন্দর ওরা। আজ মানুষের মনের আয়নার পিছনের পারা পালটে গিয়েছে। এখন সেখানে ওদের মুখের যে ছবি ফুটে ওঠে তাতে নিষ্ঠুরতা মাখানো, ওদের নীল চোখের প্রতিবিম্বের মধ্যে দেখা যায় হৃদয়হীন হিংসা, ঘৃণা।

নেবু টেনে নিয়ে এল ভিড়ের পিছনে। চল বাড়ী চল।

—দেখি একটু দাঁড়া।

আর গুলী চালানো দেখতে পেলে না শান্তি। ফিরল।

বাড়ীর দরজা খোলা। ঘর শূন্য। গোপেন নাই। তার জামা নাই, জুতো নাই। কয়েকটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল উদ্গ্রীব হয়ে।—কি হ'ল গো? তুমি যে ছুটে গেলে! দেবা না ট্যাবা?

নেবু চীৎকার করে উঠল—ও কি কথা?

—লোকে যে বলছে মা। তোমার মা ছুটে গেল। তোমার মায়ের ছুটে যাওয়া দেখে তোমার বাবাকে ডেকে দিলে। বাবা তোমার ছুটে গেল।

শান্তি পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

নেবু বললে—বাবাকে দেখব মা?

কথা বলতে পারলে না শান্তি; ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলে।—দেখ! দেখে আয় যা।

নেবু ফিরে এল অনেকক্ষণ পর।—না, বাবাকে পেলাম না।

দেবা-ট্যাবাও ফেরে নাই।

জগো গালাগাল দিচ্ছে। কাঁদছে। জগোর ভাই এসেছে এই মরণ-তাণ্ডবের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে। জগোর ভাই কাজ করে যে বাড়ীতে—সেই বাড়ীর একটি চৌদ্দ বছরের মেয়ে গুলী লেগে মারা গিয়েছে। জগোই ও-বাড়ীতে এক কালে কাজ করত, নিজের ভাইকে জগো ও-বাড়ীতে চাকরী করে দিয়ে নিজে এখন ঠিকের কাজ করে। ওই মেয়েটিকে সে দশ বছর বয়স পর্য্যন্ত কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছে। মেয়েটি বসেছিল তে-তলার ঘরে—সেইখানেই গুলী-বিদ্ধ হয়েছে। বিক্ষুব্ধ উন্মত্ত জনতার ইট-পাটকেলের মধ্যে লরী থামিয়ে নেমে মুখো-মুখী গুলী চালাতে সাহস করে নাই। চলন্ত লরী থেকে গুলী ছুড়েছে—সেই গুলী এসে লেগেছে মেয়েটিকে। চৌদ্দ বছরের ফুলের মত মেয়ে।

জগো ছুটে বেরিয়ে গেল।

—মাসী, তুমি আর যেয়ো না বাছা এর মধ্যে। মাসী।

—মরব। আমিও মরব। ওরে আমার নিজের হাতে মানুষ করা রে।—বুক চাপড়াচ্ছে জগো।

জগোর ভাইও বলছে—আয়, আয়, একবার দেখবি না? আয়। মরণ তো একবার ছাড়া দু'বার হয় না। আয়। বন্দুকের গুলীকে আর ভয় নাই—আয়। বাচ্চা মল'—জোয়ান মল'। বুড়ো মল'—কুলী মল'—মজুর মল,—বাবু মল'—ভাই মল', আয়—। চলে আয়। মরব। চলে আয়!

শান্তি সেই থেকে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

জগোর ভাই খবর নিয়ে এল। শান্তির তো ভাই নাই; না থাক—দেবা-ট্যাবা দুই ভাই গিয়েছে, দেবা মরলে ট্যাবা খবর আনবে, ট্যাব্যা মরলে দেবা আসবে কাঁদতে কাঁদতে।

আসছে, আসছে— দু' জনের এক জন আসছে। কিন্তু গোপেনের তো ভাই নাই! শান্তিও জগোর মত বেরুবে না কি? [ক্রমশঃ।

নববর্ষের সূর্য্য

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

(ধ্যান)

'রক্ত-অম্বুজ-আসন-সমাসীন
জগৎপতি ভানু গুণের সিন্ধু,
পদ্মে বরাভয়ে শোভিত চারি কর,
মাণিক-ঝলমল মুকুট শিরোপর,
অরুণ তনু ঝলে
বিশাল ভালে জ্বলে
তৃতীয় নয়নের তিলকবিন্দু।
ও-ওম্ হ্রীং হ্রীং সঃ নমস্কার,
নমি শ্রীভগবান সূর্য্যে বার বার।'

হে সবিতা, উঠ, জাগো!
নববর্ষে তব মুখে
শুনিবারে নব সৌরগীতা
তোমারি আশ্রিতা পৃথ্বী
তোমারে ধেয়ায় ঊর্দ্ধমুখে।
হেমগর্ভমণিময়মুকুট-ময়ূখে
উদ্ভাসিয়া নিজ পথ
উঠে এস, হে সূর্য্য,
জাগাও তব এ সৌর জগৎ।
তোমার অদৃশ্য আকর্ষণে
বাঁধা আমাদের পৃথ্বী বসন্তে বর্ষণে।
বাঁধা বুধ শুক্র বৃহস্পতি গ্রহবর,
মঙ্গলামঙ্গল শনৈশ্চর।
কত উপগ্রহ উল্কাপুঞ্জ কত,
দূর হ'তে দূরে
অচ্ছেদ্য বন্ধনে তোমা করে প্রদক্ষিণ।
ছিন্ন করি তব
প্রেমের কৈতব
মুক্তি কামনায় যারা
ছুটাইল তাহাদের ঊর্দ্ধকেতু রথ,—
তারা যুগান্তরে—
হেরিল বিস্ময় ভরে
সেই তোমা পানে ঘুরে এল পথ!
সকল চক্রের চক্রী,—
সব বন্ধনের কেন্দ্র তুমি।
সপ্তাশ্বযোজিত রথে
সংহৃত-সহস্ররশ্মিধর
প্রণতোঽস্মি তোমা জবাকুসুমসঙ্কাশ
দিবাকর!
নববর্ষে কর সুপ্রকাশ
বন্ধন-বন্দনা মন্ত্র।
লহ অর্ঘ্য সচন্দন সদ্য-ফোটা ফুলে
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে তুমি যার মূলে।
বৃন্তের উপর সে শুকায়,
খসিয়া সে পড়ে মৃত্তিকায়,
পুনরায় ঘুরে সে মুকুলে,—
তুমি আছ এ চক্রের মূলে।
ফুলে-ফলে জীবনে-মরণে
হাসি ও ক্রন্দনে
ঘুরিছে সকল চক্র তোমারি বন্ধনে,
বন্দিনী এ ধরণীর সনে।
হে সবিতা, উঠ, জাগো!
নববর্ষে তব মুখে
শুনিবারে নবতর বন্ধনের গীতা
আমিও উন্মুখ আজি।
আমি প্রতিদিন জাগি তুমি না জাগিতে,
ভোরের কাকের ডাক শ্রবণে লাগিতে।
কাল মহাবিষুব সংক্রান্তি দিনে
উঠেছিলে বুঝি মীনে?
আজিকে উদয় তব মেষে?
আমার যে হ'ল সারা প্রভাতী ভ্রমণ,
কখন হইবে তব
মীন, হ'তে মেষে সংক্রমণ?
জানি না কোথায়
কোন্ নক্ষত্রের দেশে
বিশাখা মিলিছে চন্দ্রমায়।
জানি না, সে কোন্ দুঃসাহসী
অন্তরীক্ষে পশি
তব করে বাঁধিছে বৈশাখী রাখী।
আমি শুধু জানি,—
আমার মাঠের শেষে—
বৃদ্ধ অশ্বত্থের বলিজীর্ণ শাখে
আতাম্র নধর যুগল নব পল্লবের ফাঁকে
কাল তব হেরেছি উদয়!
আজও তারি পানে আছি চেয়ে,
বৃদ্ধ অশ্বত্থের বুক বেয়ে
দেখিব তোমার
শ্যাম পত্র হ'তে পত্রান্তরে—
নিঃশব্দ সঞ্চার।
চেয়ে আছি আর শুনিতেছি,
মনে মনে মনে গুণিতেছি—
বুকের ঘড়ির চক্রে
ঘুরে কাঁটা মিনিটে মিনিটে,
বন্ধনের প্রতিধ্বনি মর্ম্মরিয়া
সেকেণ্ডের প্রতি গিঁঠে গিঁঠে।
আজি নববর্ষ-প্রাতে, তোমার উদয় সাথে—
মিলায়ে আমার ঘড়ি
খড়ি টানি দিয়ে যাব আঁক,—
দুর্ভাগিনী ধরিত্রীর
মহাশূন্যে নির্ব্বন্ধ-বন্ধন-চক্রপথে—
এই হেথা নব শুভ পহেলা বৈশাখ।

পলাশী

(নবীনচন্দ্র স্মরণে)

বিমলচন্দ্র ঘোষ

সোনার গোধূলি। গভীর সবুজ বনান্তরালে সূর্য্য ডোবে,
ছায়া-গম্ভীর আম্রকানন। রক্ত-আলোয় গঙ্গাজল—
বিষাদ-মগ্ন। সপ্ত কোটির ব্যথিত আত্মা তীব্র ক্ষোভে
ধূ ধূ পলাশীর প্রাঙ্গণে জাগে মুক্তির পণে অচঞ্চল।
আকাশ এখনো রক্তে লাল
প্রতিহিংসার ক্রূর হাসি হাসে দুর্ভাগা বীর মোহনলাল।

হামাগুড়ি দিয়ে এসেছিল যা'রা কটাচোখ রাঙা চামড়া গায়ে,
আতঙ্কে মেশা আম্রকাননে লুব্ধ বিদেশী বণিক্ দল—
নবাবী-স্বপ্নে বৃদ্ধ শকুন মীরজাফরের পক্ষছায়ে
ঘোলাটে ঘরোয়া পাৎকোর বুকে বিদেশের কালো বন্যাজল।
বন্যার মুখে লাগাও বাঁধ—।
শূন্যে শূন্যে প্রতিধ্বনিত সিরাজকণ্ঠে সিংহনাদ।

ষড়যন্ত্রের সুড়ঙ্গপথে পাপযোনি যত অবিশ্বাসী
লোভের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরা ভাগাড়ে মাটির অংশীদার
জন্মভূমিকে ক'রে গেছে যা'রা বিদেশী বেণের নবীনা দাসী
যা'দের ঘৃণ্য নামোচ্চারণে অযুত রসনা আজো অসাড়।
আজো কোটি কোটি মীরমদন—
শাস্তিদানের অস্ত্র শাণায় অরণ্যবাসে কঠোর-পণ।

ব্যঙ্গ অথবা প্রশংসাভরে? ব্রিটিশের রণদামামাতে
ক্লাইভের জয়। আজো সতেরশ' সাতান্ন খৃষ্টাব্দকাল
কলুষ আখরে ইতিহাসে লেখা, কাব্যে নীরব বেদনাতে
স্তব্ধ ক'রেছে নবাবের ঢোল বিজয়ী প্রাণের স্বপ্নজাল।
বাংলার সাথে গোটা ভারত—
দেড়শ' বছর ভেঙেছে পাঁজর ছুটেও ছোটে না মুক্তিরথ।

রাক্ষসীদের উদরে যা'দের জন্ম বানর-ঔরসে
লোভের পঙ্কে জলৌকা যা'রা কথায় কথায় গুলী চালায়
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হিন্দু মুসলমানেরে সবংশে
ঘৃণ্য নরকে বন্দী রেখেছে শাসনে শোষণে অজ্ঞতায়।
তুমি তো দেখনি স্বরূপ তা'র—
পলাশীর পাপে নিখিল ভারত ভাগ্য-আকাশ অন্ধকার।

চাকায় চাকায় স্ফুলিঙ্গ ছোটে মৌন প্রভাস রৈবতক
বিপ্লবীদল পেয়েছে এবার চক্রব্যূহের নিষ্ক্রমণ.
কাপুরুষ যত সপ্তরথীর জেগেছে শঙ্কা প্রাণান্তক
এ যুগের অভিমন্যুরা আজ ত্যাগী নির্ভীক অজেয় মন।
কুরুক্ষেত্র? রূপকথা।
জোয়ার এসেছে নবযৌবনে পদতলে কাঁপে ব্যর্থতা।

স্বাধীনতা পেলে হে কবি তোমার গা'বো অবকাশরঙ্গিনী
শতবর্ষের পার হ'তে শোনো নবজীবনের বন্দনা,
রস-বিচারের অবকাশ কোথা? জননী যে আজো বন্দিনী
হাতে পায়ে জ্বলে শৃঙ্খল ক্ষত ম্লান মুখে সহে যন্ত্রণা।
এ যুগের নেই ক্ষণ-বিরাম
মুক্তিরথের চাকায় চাকায় স্ফুলিঙ্গ ছোটে অবিশ্রাম।

শেষ আহুতি

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

দুবিরা পৃথিবী ব'লে
কত বার করেছি ভর্ৎসনা;
তোমারে উপেক্ষা করি'
দুর্বিনীত সন্তান তোমার
অপমান করেছে তোমারে।
স্পর্দ্ধিত সে অবহেলা
বার বার করিয়াছ ক্ষমা—
দুর্ব্বল মা'তার ব্যর্থ নিরুপায় অশোভন ক্ষমা।
কোনো দিন দেখিনি ত ক্ষুব্ধ অভিমানে
ক্রোধের উত্তপ্ত বাষ্পে
ভূ-গর্ভের উৎক্ষিপ্ত বেদনা
শতধা বিদীর্ণ হ'তে
সর্ব্বধ্বংসী নিষ্ঠুর লীলায়।
পথে পথে অশ্বখুরে ধূলির জঞ্জাল
আবৃত করিয়া ছিল
অনাবৃত অনন্ত আকাশ— ;
যে ধূলার অন্ধকারে
গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে
অসময়ে সন্ধ্যা নামিয়াছে
সে সন্ধ্যার মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী।
পর্ব্বতে অরণ্যে আ'র সমুদ্রের তরঙ্গিত বুকে
তুমি যে স্তিমিত প্রাণে যাপিয়াছ অলস প্রহর,
বৈশাখের খর রৌদ্রে
শ্রাবণের অশ্রান্ত বর্ষণে
আড়ষ্ট শীতের ক্লৈব্যে
বসন্তের অশান্ত আবেগে
তোমারে দেখেছি একা আ'পনার একক প্রহরী;
নিশ্চল মুহূর্ত্তগুলি
নিস্তব্ধের উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে
বুঝি বা মরিয়া ছিল
ক্লেদ-হীন শষ্পে ও শৈবালে।
এবার এ কী এ মূর্ত্তি দেখিনু তোমার?
রক্তাম্বরা-ছিন্নমস্তা তুমি—
কটিবন্ধে—বাঘছাল দোলে মুণ্ডমালা
আপনার কণ্ঠ ছেদি শাণিত কৃপাণে
আপনি করিলে পান শোণিতের ধারা
উৎসারিত উষ্ণ ঊর্দ্ধমুখী।
অভিমান নাহি মোর আর
হে ধরিত্রী মাতা স্নেহময়ী,
ধাতার মানস-কন্যা, হে পৃথিবী ঐশ্বর্য্যসম্ভবা,
নিস্তব্ধ সাধনা-সুপ্ত অন্তরাল হ'তে
বাহিরে দাঁড়ালে তুমি এ কী নব বেশে!
তোমার দক্ষিণ হস্তে খড়্গ—
জ্বলে প্রদীপ্ত কিরণে
নূতন প্রভাতে সূর্য্য মনে হয় আজ নবতম।
বাম হস্তে বরাভয়
রোষ শান্ত নয়নে তোমার
করুণা উছলি ওঠে সর্ব্বরিক্ত সন্তানের তরে।
তারা কি খুঁজিয়া পাবে অনাদৃত স্বর্ণ-সিংহাসন
ধূলায় লুকান তব পট্টবাস, রত্ন অলঙ্কার?
তোমার মন্দিরে দেবী শঙ্খধ্বনি করি
কখন স্থাপিবে তারা মঙ্গল কলস
শেষ আহুতির ঘণ্টা বাজিবে কখন—
সেই প্রতীক্ষায় আছি দিবস-শর্ব্বরী।

একটি পুরোনো কবিতা

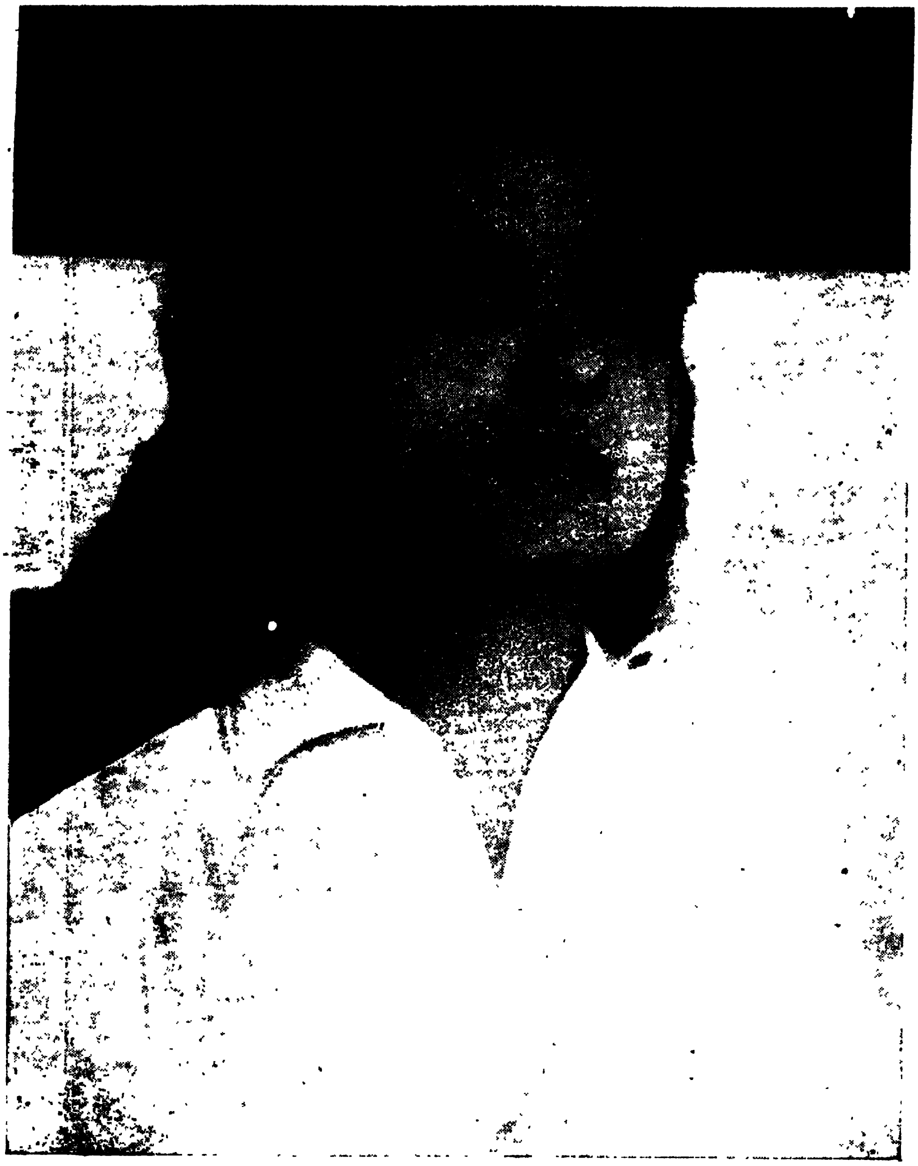
দিনেশ দাস

গড়ের মাঠের এই সবুজ কানাচে
তুমি আর আমি:
অনেক—অনেক ক্ষণ দু'জনে চলেছি ভেসে
অফুরন্ত সবুজের ছলছলানিতে।
দূরে ওই জাহাজের চূড়া হ'তে
নিবে আসে রক্তিম সোনালী:
উপরেতে নিভন্ত আকাশ
তার নীচে তুমি আর আমি।
অদূরে কেল্লার গায়ে এক জোড়া লাল আলো জ্বলে
টক্‌টকে লাল আলো
তোমার আমার দু'টি হৃৎপিণ্ড যেন
ভেসে যায় সবুজ আকাশে।
ভেসে ভেসে চ'লে যায় অফুরন্ত সবুজের
ছলছলানিতে।
আমরা দু'জন
পরম নির্জন
তার মাঝে তোমার ধমনী
যেন কথা কয়ে উঠে
তোমার রক্তের স্রোতে হঠাৎ কল্লোল!
আজ আর প্রেম নয়
এ সুলভ প্রেমের নিশ্বাসে
মুছে যাবে সবুজের সুর
ছিঁড়ে যাবে ছলোছলো হাওয়া
ছিঁড়ে খুঁড়ে যাবে এই—
তোমার আমার বুকে ধ্যানী নিথরতা।
তার চেয়ে এসো এসো—তুমি আর আমি
আমাদের চেতনাও ডুবায়ে মিশায়ে দিই
অফুরন্ত সবুজের ছলছলানিতে!



মাঃ

শিল্পী—শ্রীশৈল ৰ্তী



"স্বাধীনতা হাতের মুঠোয়
—এ-কথায় ভুলো না"
—অরুণা আসফ আলি

শ্রীমতী অরুণা

ভারতের মুক্তি-যুদ্ধে তেজস্বিনী বিপ্লবী নায়িকা
মহিমা-মণ্ডিত স্থির বিদ্যুতের অকম্পিত শিখা
দেখেছি আত্মায় তব আধুনিকা অয়ি যাজ্ঞসেনী;
ত্যাগ শক্তি দুঃসাহসে বিদ্রোহে তোমার রুক্ষ বেণী,
বেদনার কালো মেঘে শত্রু-রক্তে বন্ধনের পণ—
ভারত-নারীর ভাগ্য বিজয়ের দুরন্ত স্বপন।
স্বাধীনতা-সংগ্রামের মন্ত্রমুগ্ধা অয়ি বীরাঙ্গনা
তুমি যে বাংলার মেয়ে সেই গর্ব্বে হৃদয় উন্মনা,
কনিষ্ঠা এ ভগিনীর লহ নারী লহ নমস্কার
মন্ত্র দাও রমণীরে নিজ ভাগ্য জয় করিবার।



শ্রীমতী লক্ষ্মী স্বামীনাথন, অমিতা মিত্র, ও তাঁহার কন্যা



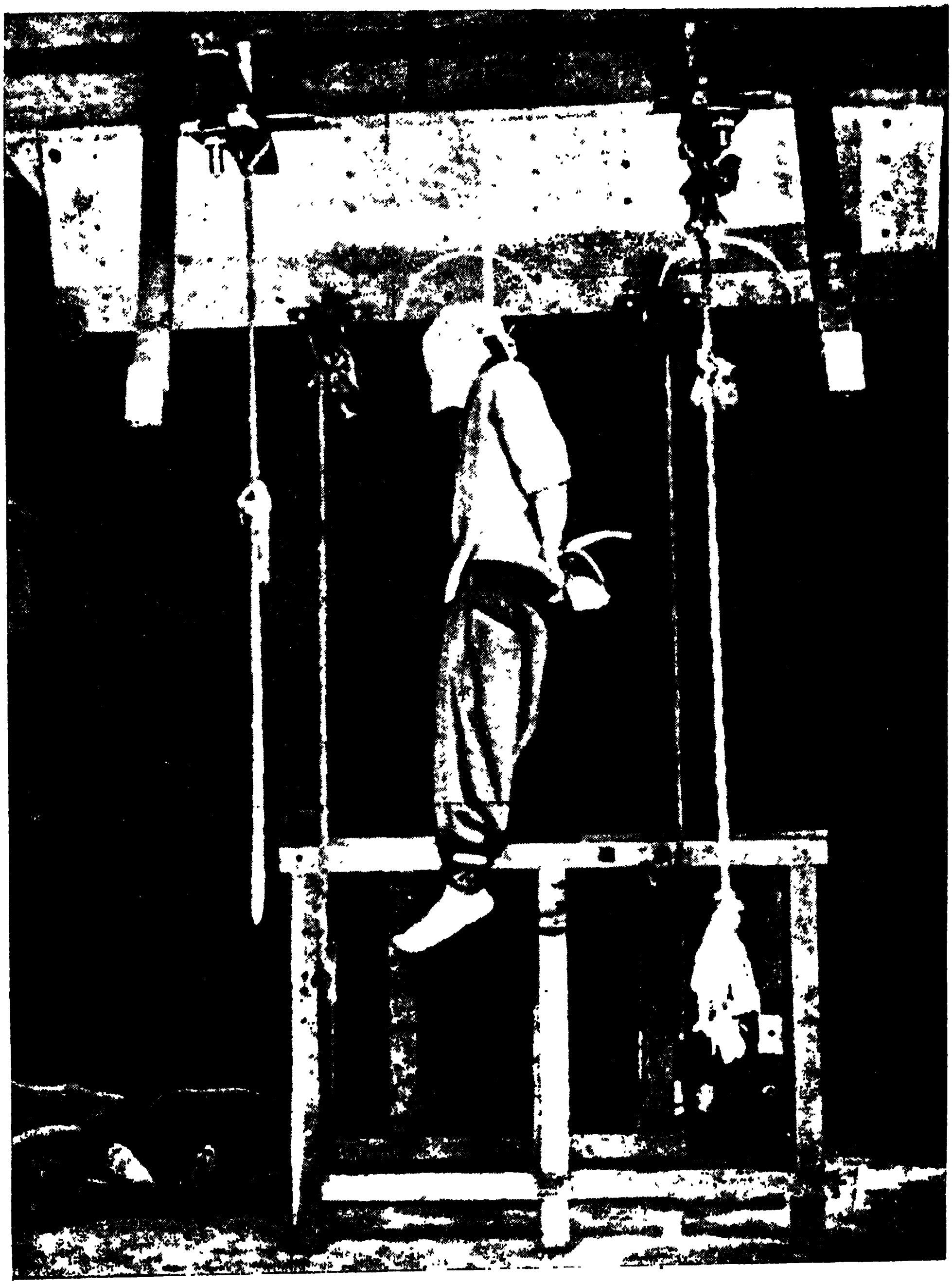
নেতাজীর বাসভবনে শ্রীমতী লক্ষ্মী স্বামীনাথন

ফটো—রঞ্জিত বসু

★



জয়প্রকাশ বম্বেতে নামছেন



ফাঁসী হয়ে যাচ্ছে

(জাপানী ক্যাপ্টেন মিৎসুওকা ফাঁসীকাঠে)

★

মাসিক বসুমতী



★

মাসিক বসুমতী

দেখতে কষ্ট হচ্ছে নাকি!

(এটলি ও চার্চ্চিল)



মার্চেন্ট বল মারতে গিয়ে চিৎপটাং



রাজনীতিক পঞ্চায়েৎ

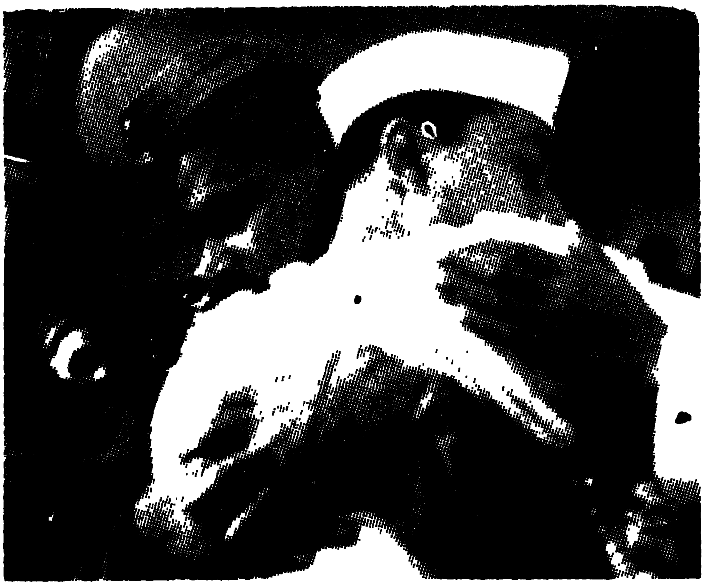
(ওয়াভেল, প্যাথিক লরেন্স আজাদ, ক্রিপস্, আলেকজাণ্ডার !



·দেখিয়া যাইতে পারিলাম না

ভুলাভাই দেশাই

মোডি ব্যাট করছেন



ভোঁসলে ও অরবিন্দ বসু

পুনর্মিলন



আহতা স্ত্রী (নার্স) ও রণক্লান্ত স্বামীর (সৈনিক) যুদ্ধের পর প্রথম মিলন



মোদি বল পাকড়েছেন

★

মাসিক বসুমতী



উইকেটকীপার মুস্তাক আলির ক্যাচ ধরেছেন



জ্যোতির্ময় রায়ের দ্বিতীয় চিত্র কাহিনী "অভিযাত্রী"র একটি দৃশ্য।
দৃশ্যটি পরিকল্পনা করেছেন প্রখ্যাতনামা শিল্পী সুভো ঠাকুর



মোডি ও গুলমহম্মদ ব্যাট করতে যাচ্ছেন

মহাপুরুষদের মৃত্যু নাই। তাঁহাদের তিরোভাব হয়। ভক্তেরা তাঁহাদের বারে বারে আপন জীবনে নব ভাবে জিয়াইয়া তোলেন। তাই মৃত্যুর পরেই তাঁহাদের যথার্থ জয়ন্তী উৎসব। এই জয়ন্তী উৎসবে আজ বলিতে চাই :

নমো নেদিষ্ঠায় চ নমঃ।
নমো দবিষ্ঠায় চ নমঃ॥

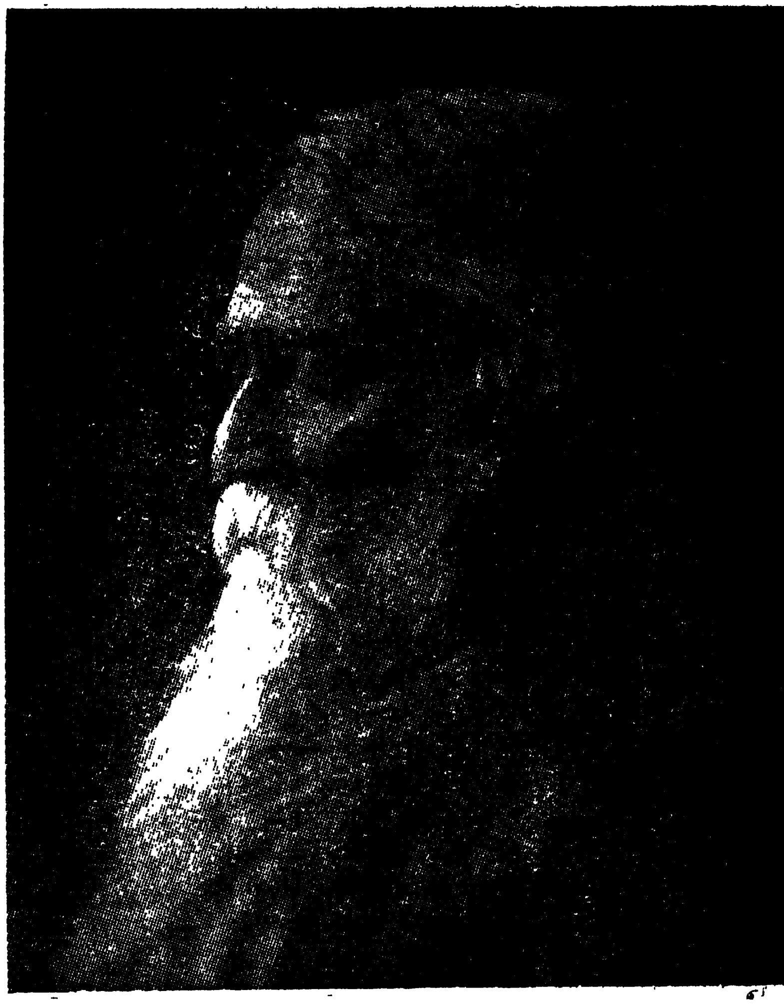
"নিকট হইতে নিকটে যখন তিনি ছিলেন তখন তাঁহাকে নমস্কার, দূর হইতে সুদূরে এখন তাঁহাকে নমস্কার।"

কাহাকেও বা দূর হইতে দেখিতেই ভাল লাগে, সম্মুখে আসিলে সে মোহটুকু মুছিয়া যায়। কাহাকেও বা সম্মুখেই ভাল লাগে দূর হইতে প্রণতি লইবার মত মহিমা হয়তো তাঁহার নাই। খুব অল্প লোকই আছেন যাঁহাকে বলা যায়, "দূর হইতেও তুমি পরম প্রিয়, সম্মুখেও তুমি পরম-আনন্দ।" ঋগ্বেদ বলেন, "হে দেবতা, যখন তুমি অতিথিরূপে দেখা দিলে তখনও তুমি পরম প্রিয়—"

প্রেষ্ঠং বো অতিথিম্॥ ৮, ৮৪, ১

"আবার আপন ঘরে আসীন তোমাকে যখন দেখিলাম তখনও দেখা দিলে পরম প্রিয়রূপে—"

প্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ উপস্থঃ সৎ॥ ১০, ১৫৬, ৫



দূর হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়িয়া তাঁহাকে মনে মনে প্রণাম করিয়াছি। তখন আমরা কাশী-প্রবাসী। ভারতের প্রাচীন ভক্ত ও সাধকদের বাণীর সঙ্গে তাঁহার বাণীর সাধর্ম্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। সেই সুদূরে তাঁহার নিন্দা শুনিবার সুযোগ ঘটে নাই। সেখানে তাঁহাকে কেহ জানিতই না। বাংলা দেশে আসিলে তাঁহার কুৎসা নিন্দা অনেক শুনিতে পাইতাম। মনে ভাবিতাম হয়তো ইনি দূর হইতেই প্রণম্য, সম্মুখে আসিলে আর সে ভক্তি টেকে না।

রবীন্দ্র জয়ন্তী

ক্ষিতিমোহন সেন

কিন্তু সম্মুখেও যাইতে হইল। ১৯০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ আমাকে তাঁহার কাজে ডাকিলেন। তখন শান্তিনিকেতনের নাম-ডাক প্রতিষ্ঠা সবই সামান্য, তাই বন্ধু-বান্ধব সকলেই সেখানে যাইতে নিষেধ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দূর হইতে চাকরী বাকরী সব বজায় রাখিয়া রবীন্দ্র-ভক্তি জানাও। তাহাতে অর্থ প্রতিপত্তিও থাকিবে আর রবীন্দ্র-ভক্তির প্রতিষ্ঠাও পাইবে। তাহাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। ওখানে গিয়া মর কেন?"

যা লোকদ্বয়সাধনী তনুভৃতাং
সা চাতুরী চাতুরী।

কিন্তু চাতুরী করা গেল না। ডাক শুনিতে হইল। তার পর ৩৩।৩৪ বৎসর খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাছে কাছে থাকিয়া সুখে দুঃখে একত্র কাজ করিয়া দেখিলাম দূর হইতে যিনি প্রিয় ছিলেন সম্মুখে আসিয়া তিনি প্রিয়তর হইলেন। সব কুৎসা-নিন্দা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহার জীবনের অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথকে কেমন করিয়া চিনিলাম তাহা বলি। ছিলাম প্রবাসী বাঙ্গালী। বাংলাদেশ হইতে দূরে কাশীতে ছিলাম বলিয়া তাঁহার নিন্দা বেশি শুনি নাই। তাঁহাকে বুঝিবার মত বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোচনা কাশীতে খুব কমই ছিল। এখন কাশীকে বাংলার এক বিশিষ্ট খণ্ড বলিলেই হয়, সেই দিনে সেখানে বাঙ্গালী ছেলেরা হিন্দী ও উর্দু পড়িয়া পরীক্ষা পাশ করিতেন। তাহা ছাড়া সেখানে তখন সনাতন আচার ও নিষ্ঠার দৃঢ় প্রাচীর বাধা ছিল। তাহাকে ভেদ করার মত প্রাণশক্তি কোথাও ছিল না। নব নব স্বাধীন জীবন্ত দেশ-বিদেশের চিন্তা ও ভাবের তখন সেখানে প্রবেশের কোনই পথ ছিল না। তবে কেমন করিয়া রবীন্দ্রবাণী আমার ভাল লাগিল?

দৈবক্রমে এমন দিনেও কাশীতে দুই-এক জন সন্ত সাধক ও বাউলের দেখা মিলিত। কিন্তু তখন বয়স ছিল অল্প আর বুদ্ধিও

ছিল একান্ত সঙ্কীর্ণ, তাঁদের সরল বাণীর মধ্যে যে বিশালতা ও গভীরতা তাহা উপলব্ধি করিবার মত সামর্থ্য তখন কোথায়? ক্রমে সেই সূত্র ধরিয়াই কবীর দাদূ প্রভৃতি সাধকের সাধনায় অনুরাগী সাধু-সন্তদের সঙ্গ মিলিল এবং তাঁহাদের কৃপায় ক্রমে ক্রমে মধ্যযুগের সাধকদের মুক্ত বাণীর পরিচয়ও মিলিতে লাগিল।

একটা সময় আসিল যখন তীর্থযাত্রীর দল ছাড়া বাংলাদেশ হইতে শিক্ষিত যুবকরাও দুই-এক জন মাঝে মাঝে কাশীতে আসিতে আরম্ভ করিলেন, রবীন্দ্রনাথের নামও শোনা যাইতে লাগিল। কিন্তু অনেকেই বলিলেন, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্যে প্রবেশ দুষ্কর। ভাগ্যক্রমে একজনের কাছে রবীন্দ্রনাথের একখানা কাব্য-গ্রন্থ দেখিলাম। দুর্ব্বোধ্য বলিয়া যে কবিতাটি তিনি দেখাইলেন সেইটিই আমার মনে হইল অপূর্ব্ব মনোহর, তাহার কারণ পূর্ব্বোক্ত বন্ধনহীন মুক্ত ভক্তবাণীর সঙ্গে এই বাণীর একটি গভীর অন্তরগত সাধর্ম্য ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের বাণীর মধ্যে যেন চিরপরিচিত মিত্রকে নব যুগের মহা ঐশ্বর্য্যময়রূপে নূতন করিয়া পাইলাম। সেই পরমানন্দ আজিও মনে উজ্জ্বল হইয়া আছে।

এই সাধর্ম্য কথাটিকে ভুল বুঝিলে চলিবে না। মহাকবিরা মানব-জগতে নূতন নূতন ভাব-সম্পদ আনেন বটে কিন্তু তাহাও তাঁহাদের প্রকাশ করিতে হয় পিতৃ-পিতামহগণেরই ভাষায় ও ভঙ্গীতে। তাই বলিয়া কেহ বলে না যে তাঁহাদের প্রতিভালব্ধ ভাবগুলি সব তাঁহাদের পিতৃ-পিতামহগণের কাছেই পাওয়া। পিতৃ-পিতামহগণের ভাষার পাত্রেই তাঁহাদের নূতন উপলব্ধ সাধনার অমৃত পরিবেশন করিতে হয়।

ভাবপ্রকাশেরও এক এক দেশে প্রচলিত এক এক রীতি আছে, ভাবুক ও সাধক জনের মধ্যেও মরমের গভীরতা প্রকাশের একটা ভাষা ও চিরপ্রচলিত রীতি চলিয়া আসে। তাহাকে আধ্যাত্মিক ভাষা বলা চলে। অনেক সময়ে তাঁহারা না জানিয়াও সেই ভাষাই ব্যবহার করেন।

রবীন্দ্রনাথ কখনও সাধু-সন্তগণের ভাবপ্রকাশের সেই রীতি শিক্ষা করিবার সুযোগ পান নাই তবু কোনো কোনো স্থলে যে তাঁহার লেখায় ঐ সব পদ্ধতিকে ধরিতে পারি সেখানেই সূচিত হয়, না জানিয়াও তিনি ভারতের চিরন্তন ভাবধারার সঙ্গে অন্তরে অন্তরে যুক্ত হইয়া জন্মিয়াছেন। চিরপ্রচলিত ভারতীয় এই রীতি যেন তাঁর মর্মে মর্মে। এই ধারার সঙ্গে না জানিয়াও তাঁহার এই সহজ যোগটি দেখিলে মনে হয় ভারতের চিরন্তন ভাবমন্ত্রের দ্রষ্টাগণেরই তিনি এই যুগের প্রতিনিধি। চিন্তায় সকল ক্ষেত্রে সাহিত্যের সকল বিভাগে সার্ব্বভৌম ঐশ্বর্য্যে সম্রাট্ করিয়াই যেন ভগবান তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন! কিন্তু এইখানেই নিহিত ছিল রবীন্দ্রনাথের অনেক দুঃখের মূল।

দাদূর শিষ্য ভক্ত রজ্জবজী মহাপুরুষদের একটি চমৎকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লক্ষণটি হইল, "মহাপুরুষদের বিরুদ্ধে সমসাময়িক কুক্কুরদের চিৎকার।' গভীর রাত্রে সুপ্তগ্রামে মানুষের আগমন বুঝা যায় কুকুরের বিরুদ্ধ কোলাহলে। শয্যায় থাকিয়াই লোকে বুঝিতে পারে এক জন মানুষ আসিয়াছে। মোহসুপ্ত জগতেও মহাপুরুষগণের আগমন সূচিত হয় ক্ষুদ্রচেতাগণের নীচ বিরুদ্ধ কোলাহলে। সাচ্চা মহাপুরুষদের এই একটি অমোঘ পরখ।" রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্বের অশেষবিধ পরখের মধ্যে এই পরখটিই সর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল।

দরিদ্র শক্তিহীন সমাজে যদি কোনো সমর্থ পুরুষ আপন সাধনার বলে সম্পন্ন হইয়া ওঠেন তবে চারিদিক্ হইতে সব হতভাগ্য অধমের দল ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করে যে ঐ ব্যক্তি দৈবক্রমে কোনো পূর্ব্ব-সঞ্চিত সম্পদ্ পাইয়াছে। এই চিত্ত দৈন্যই দরিদ্রের সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গতি।

রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভায় ও অশ্রান্ত সাধনায় যখন এই দেশের গানে কাব্যে সাহিত্যে সকল-দারিদ্র্য-হরা অপার ভাব-সম্পদের বন্যা বহিয়া গেল তখন প্রথম প্রথম এই খবরটি বাহির করার চেষ্টা হইল যে, "ওর মধ্যে কিছুই নাই।" তবু যখন তার পসার কমান গেল না তখন শোনা গেল, "ওগুলো সব দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালি।" ইহার পরেও যখন তাহার প্রতিষ্ঠা বাড়িয়াই চলিল তখন কেহ কেহ উচ্চ-কণ্ঠে ঘোষণা করিতে লাগিলেন, "ও অশাস্ত্রীয়, বাজে, অজানা, নব্য, অর্ব্বাচীন, বিদেশী আমদানী চিজ ইত্যাদি।" তাতেও যখন কুলাইল না বিদেশে তাঁর পূজা প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন হঠাৎ তাঁহারা ঠিক উল্টা সুরু ধরিলেন, "ও সবই তো আমাদের চির পুরাতন সম্পদ, আগা-গোড়া পুরাতন কবিদের ভাণ্ডার হইতে চুরি করা বস্তু।" কেহ কেহ বা সেই সব চুরি ধরাইয়া দিবার সাধনাতেই রহিলেন অহর্নিশ লাগিয়া। অযোগ্য ক্ষেত্রে চালিত হইয়া তাঁহাদিগের সাধনা যদি বা লজ্জিত হইল, তবু তাঁহারা একটুও লজ্জিত হইলেন না। চিত্তের দৈন্যবশতঃ সেই শক্তি তাঁহারা যে বসিয়াছেন হারাইয়া।

রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে হইলে প্রশস্ত রকমের উদার শিক্ষার প্রয়োজন, সেই সঙ্গে দেশের প্রাকৃত চিরন্তন ভাবধারার সঙ্গে পরিচয়ও থাকা চাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষাবিধির দোষে আমরা হয় স্বদেশী শাস্ত্রে নয় তো বিদেশী শাস্ত্রের পুঁথিগত গ্রন্থবদ্ধ সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই বদ্ধ। সে বিদ্যাও আবার চিত্ত দিয়া আয়ত্ত করা নয়। শুধু পাখীর মত বাহিরেই আওড়ানো সেই বুলি! দেশের সহজ প্রাকৃত ভাব-ধারার সঙ্গে পরিচয় আমাদের অনেকের একেবারেই নাই। এমন অবস্থায় রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে না পারা একটুও আশ্চর্য্যের কথা নয়। বুঝিতে না পারিলেই অপবাদ দেওয়া স্বাভাবিক।

কৃত্রিম শিক্ষার পীঠস্থল বিদ্যালয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া মহর্ষির সাধনাপূত মুক্ত চিন্ময় জ্ঞানমণ্ডলের মধ্যে বর্দ্ধিত হওয়ায় অতি উদার ভাবে সহজ ও সাচ্চা সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হইল। দেশের প্রাকৃত ধারার সঙ্গে যে তাঁর যোগ ঘটিল সে শুধু তাঁর আত্ম-প্রকৃতির গুণে অজ্ঞাতসারে। এ বস্তু যদি স্বভাবে না থাকে তবে বাহ্য শিক্ষায় তাহা মেলে না।

এইখানে কবির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার বিশেষ একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার আছে। তেমন করিয়া এই কথাটি আর কখনো বলার সুযোগ রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে আমার ঘটে নাই। এখন মৃত্যুর পরবর্ত্তী তাঁহার জয়ন্তী মহোৎসবের উপলক্ষে কথাটার একটু উল্লেখ করিতে চাই।

মধ্যযুগের ভক্তগণের মহাবাণী সংগ্রহে রত হইয়া অনেক সাধু ভক্ত-জনের মধ্যে আমাকে বিচরণ করিতে হইয়াছে। ঐ সব মহাবাণী সাম্প্রদায়িক অর্থ ও উদ্দেশ্য তাঁহারা নিজেদের মত করিয়া বুঝিলেও উহার শাশ্বত সার্ব্বভৌম তাৎপর্য্য সব সময়ে তাঁহারাও ঠিক ধরিতে পারেন নাই, কারণ, সেরূপ শিক্ষা তো তাঁহাদের নাই। যদিও দেখিয়াছি বাউলদের প্রতিভা এই বিষয়ে আশ্চর্য্য রকম মুক্ত।

রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে কখনো পরিচয় ছিল না। কিন্তু পুরাতন

ভক্তবাণীর সঙ্গে পরিচয় ছিল বলিয়াই যখন রবীন্দ্রনাথের লেখা দেখিলাম তখন পরিচয়ের সূত্র পাইলাম। তখনই কি সেই সব প্রবীণ বাণীর যথার্থ গভীরতা বুঝিয়াছিলাম ? পরে যখন রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য্যের সৌভাগ্যও জীবনে ঘটিল তখন তাঁহারই সহায়তায় অনেক পরিমাণে সেই সব বাণীর গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারিলাম ; তখন দেখিলাম বহু কাল ঐ সব বাণী ঘাঁটিয়াও তাহার সে মর্মটি বুঝিতে পারি নাই, অসামান্য প্রতিভা বশতঃ কবি তাহা শোনা মাত্র ধরিতে পারিয়াছেন।

মধ্যযুগের ভক্তবাণীতে আমার এই নেশার কথা কেহ জানিতেন না। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে আসিলাম। এখানেও অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার এই নেশার কথাটা চাপাই রাখিতে পারিলাম। কবিও ইহা জানিতেন না, ক্রমে কবির সঙ্গে কথাবার্ত্তায় এই খবরটা বাহির হইয়া পড়িল। কবি এই সব বাণী শ্রবণ মাত্রই তাঁহার মর্মের কথা বুঝিতে পারিলেন, এই বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ ও এই সব বাণীতে সহজ প্রবেশ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কবির সঙ্গে এই সব বিষয়ে আমার বার বার আলাপ করিতে হইল। সেই সব আলাপে যে উপকার পাইয়াছি তাহা কখনো ভুলিবার নহে। তাঁহার দৃষ্টির সহায়তা পাইয়াই সেই সব বাণীর যথার্থ গভীরতা বুঝিলাম।

বাউলদের সহিত সামান্য একটু-আধটু পরিচয় পূর্ব্বেই কবিরও ছিল। ভদ্রলোকেরা কিন্তু তখন সে সব দিকে দারুণ অবজ্ঞা বশতঃ কখনই একটু দৃষ্টিপাতও করিতেন না। কবি যখন সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তখন তাঁহার স্বভাবোচিত গভীর শ্রদ্ধার সহিত দৃষ্টিপাত করিলেন। আমার সহিত আলাপাদির সূত্রে কবীর দাদূ প্রভৃতি ভক্তদের বাণীর সহিতও কবির পরিচয় ঘটিল। চিত্তের দৈন্যে ভাব-কার্পণ্যে শোচনীয় বর্ত্তমান যুগের আমাদের এই দেশে, কবির জন্যে যে কত দুঃখ আঘাত সৃষ্টি করিতেছি তাহা বুঝিতে পারিলে আমি তখনই নিবৃত্ত হইতাম। কিন্তু তখন আমার সে সব বাণীর মর্মে প্রবেশ করিতে কবির প্রতিভা-আলোকের সহায়তার একান্ত প্রয়োজন। প্রতিভার উদারতা বশতঃ সে আলোক দানে তিনি একটুও কার্পণ্য করিলেন না। এবং এইখানেই আমাদের দেশের কৃপণ সঙ্কীর্ণ-মনা লোকদের তাঁহাকে আঘাত করার একটি সুযোগ রচিত হইয়া রহিল। স্বাভাবিক রসজ্ঞতা গুণে তিনি এই সব বাণীর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন বলিয়া ইহা বুঝায় না যে তিনি এখানে ঋণী। বরং এই সব বাণীই এই যুগে সকল চিত্তে প্রবেশোচিত সহায়তা তাঁহার কাছেই পাইল।

তাঁহার চিন্তার ঐশ্বর্য্য যে কতখানি, দীর্ঘকাল সাহচর্য্যে তাহা কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। তিনি স্বীয় গভীর চিন্তার ও ভাবের অতি সামান্য অংশই গানে, কাব্যে, নানাবিধ সাহিত্যরচনায় ও বক্তৃতায় প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন ; যদিও বিশাল তাহার পরিমাণ। তাঁহার কত চিন্তা ও ভাব দিয়া তিনি বহু অনুবর্ত্তী লেখকদের পুঁজি পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, বন্ধু-বান্ধবদের আলোচনা-সভা নিত্য মসগুল করিয়া রাখিয়াছেন, তবু তাঁর অধিকাংশ ভাব ও চিন্তা তাঁহারই চিন্ময় ধ্যানলোককে নিস্তব্ধ মৌন ঐশ্বর্য্যে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা আর প্রকাশ করিবার অবসর কবি পান নাই। জীবন ভরিয়া এত অশ্রান্ত সাধনায় লিখিয়াও সব ভাব ও চিন্তা প্রকাশ করার মত সময় ও সামর্থ্য তাঁহার কুলাইয়া উঠে নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাউল ও মধ্যযুগের ভক্তদের বাণীর প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা এবং কোথাও কোথাও তাঁহাদের বাণীর সঙ্গে তাঁহার বাণীর একটু সাধর্ম্ম্যও আছে তবু কবির বাণীর ও তাঁহাদের বাণীর ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিদ্‌গণ বলেন, বাঁশ ও ঘাস একই জাতীয়। জাতির সমতা বলিতে মাহাত্ম্যেরও সমতা বুঝায় না। প্রাচীন গল্পে আছে—ডোবার মধ্যে একটি মৎস্য ক্রমাগত বড় হইতে থাকায় ক্রমে তাহাকে সরোবরে পরে নদীতে ও পরিশেষে সমুদ্রে রাখিতে হইল। শেষে দেখা গেল সাগরেও আর কুলায় না। এখন সেই ডোবার মাছ ও সাগরের মাছকে এক পর্য্যায়ে ফেলা চলে না। আজ মানবের সার্ব্বভৌম বিরাট সম্পন্ন গৌরবময় সভ্যতার সঙ্গেও আদিম মানবের চিন্তা কোনো কোনো বিষয়ে এক-আধটু মিল আছে। তাই কি এখনকার দিনের মহৈশ্বর্য্যপূর্ণ জ্ঞান বিজ্ঞানকে সেই দিনের ঐ সব আদিম জ্ঞানের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত করা চলে ? অতি সামান্য রসবোধ থাকিলেও সেকালের সেই এক-তারায় সাধা একস্বরের সঙ্গে আজিকার দিনের মহাকবির সহস্রতন্ত্রী বীণার অনন্ত বিচিত্র সুরের সঙ্গে তুলনা করায় অশোভনতা ধরা পড়িত।

নাগরী প্রচারিণী সভার মত প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর সম্পাদিত কবীরের উপক্রমণিকায় ৬৩পৃষ্ঠায় দেখি—"বাংলার কবীন্দ্র রবীন্দ্রকেও কবীরের ঋণ স্বীকার করিতে হইবে। রহস্যবাদের (mysticism) বীজ তিনি কবীরের কাছেই পাইয়াছেন। শুধু তাহাতে জমকালো পাশ্চাত্য পালিশটি দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় রহস্যবাদকে ইনি পাশ্চাত্য ঢঙ্গে সাজাইয়াছেন ইহাতেই তো য়ুরোপে তাঁর এত প্রতিষ্ঠা।" তার পর লেখক এই দুঃখও করিয়াছেন যে, যেই কবি নোবেল প্রাইজ পাইলেন আর সবাই লাগিয়া গেলেন অসম্ভবরূপে তাঁহার নকল করিতে।*

—"মর্ম্মরিত বনে বনে, নির্ঝরে নির্ঝরে, সেই সব পুষ্পের পরাগ গন্ধে যাহা সেই দিব্য চুম্বনের সুখস্পর্শে শম্বিত ও মর্ম্মরিত মৃদু পবনকে তার পরিচয় দিতেছিল, তেমনি মন্দ বা তীব্র সমীরণে, প্রত্যেক আসা-যাওয়া মেঘখণ্ডের বরিষণে, বসন্তকালীন বিহঙ্গকুলের কল কূজনে, সকল ধ্বনিতে ও স্তব্ধতায় প্রিয়তমারই মধুর বাণী শুনাইয়াছে।"

হিন্দী কেন, বাংলার পক্ষেও এই ভাষা খুবই হালের। বাংলায় আজও রবীন্দ্রনাথকে এই ভাষার প্রবর্ত্তনের অপরাধে অশেষবিধ নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়। হিন্দীতে দেখিতেছি ইহা সহজেই গৃহীত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষার সম্পদ্‌ কতখানি তাহা বুঝিতে পারিলে তাঁহাদের পক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে এমন ভাবে লেখা সম্ভব হইত না। তাঁহার অসীম প্রতিভা-গুণেই তিনি তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত প্রাচীন যুগের রীতিতে প্রকাশিত অনেক স্থলে অসম্পূর্ণ বাণীর মধ্যেও গভীর ভাবে প্রবেশ করিতে পারেন দেখিয়া আমি নিজের প্রয়োজনে কখনো কখনো সে সব বাণীর মর্ম কোথাও কোথাও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তিনি বুঝিতে পারেন এই অপরাধেই যদি তাঁহাকে ঋণী

* একটি জিনিষ লক্ষ্য করিলাম, এই উপক্রমণিকায়ই ৫৬ পৃষ্ঠায়। ভাষার বেশ একটি নবীন রূপ দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ বোধও করিলাম।

সাব্যস্ত হইতে হয় তবে বড়ই দুঃখের কথা। হবুচন্দ্র-রাজ্যের সঙ্গে এইরূপ বিচারপদ্ধতির অবসান হইয়াছে বলিয়াই আমার এত কাল বিশ্বাস ছিল।

এত কাল এই সব ভক্তবাণীর প্রতি আমাদের দেশের বিদ্বৎ-সমাজের উপেক্ষাই দেখিয়া আসিয়াছি। 'হিন্দী নবরত্ন' নাট্যে যে হিন্দীর বিখ্যাত কাব্য সংগ্রহ মিশ্রবন্ধুগণ করেন তাহাতে তো প্রথমে কবীরকে ধরাই হইয়াছিল না। বহু কাল পরে সকলে এখন কবীর সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন। এখন চারি দিকের চিৎকারে নবরত্নের শেষের দিকে অতি কষ্টে কবীরের একটু স্থান জুটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথই এই দিকে শিক্ষিতবর্গের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণের চেষ্টা করেন। তাঁহারই চেষ্টায় ও অনুবাদের জোরে কবীর-বাণী পরিচিত ও আদৃত হইল। অনেকের মতে মূল অপেক্ষা তাহাতে অনুবাদের কৃতিত্বই অধিক। যাহা হউক, তখন হঠাৎ সেই সব বাণীর রচয়িতাগণের বর্ত্তমান কালের স্বদেশবাসিগণ অবজ্ঞায় মোহনিদ্রা হইতে উঠিয়া উপকারীকেই গ্রেফ্‌তার করিয়া বসিলেন। উপকারের প্রতিদানটা ভালই! বাংলা দেশের বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে কবি বাল্যকাল হইতেই পরিচিত, বৈষ্ণব কবিতার বাণীর ঝঙ্কার কিছু কাল কবিকে পাইয়া বসিবার উপক্রমও করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার কলারসিক মুক্ত মনকে কিছুতেই দীর্ঘকাল বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। তবু বাংলার বৈষ্ণব-সাহিত্যের জন্যও কবি কম সেবা করেন নাই। নিজে সে জন্য লিখিয়াছেনও অনেক আর কবিশ্রেষ্ঠ বলরাম দাসের বংশধর শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে মিলিয়া পদরত্নাবলী নামে একটি সুনির্বাচিত বৈষ্ণব পদ-সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সাহিত্যের চিন্ময় সারস্বত-লোকে কবিকে এমন একটা দারুণ অপবাদ দিবার পূর্ব্বে ধীরভাবে এই কয়টি কথা বিবেচনা করা উচিত ছিল।

(১) রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মধ্যে কি এতই দীনতা যে ঋণ না করিলে তাঁহার আর চলিত না?

(২) গীতাঞ্জলিতে কি অন্য যে সব লেখায় কবি তাঁর পূর্ব্ব-বর্ত্তীদের কাছে ঋণী এরূপ সন্দেহ করা হইয়াছে তাহা ছাড়া কি তাঁহার প্রতিভার প্রমাণস্বরূপ অন্য বহু প্রকার রচনা নাই?

বরং যে গীতাঞ্জলিতে তাঁর এত নাম তাহা তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীত রচনা নহে। তাঁহার পরবর্ত্তী গানগুলি আরও গভীর ও সুন্দর।

(৩) দেশে বিদেশে বিদ্বৎ-সমাজে ও সাহিত্য-জগতে আলাপ-আলোচনায় বক্তৃতায় তিনি কি তাঁহার অসামান্য প্রতিভার কোনো পরিচয় দিতে পারেন নাই?

(৪) এই সব প্রাচীন বাণীর সঙ্গে পরিচিত হইবার পূর্ব্বে কি তিনি তাঁর প্রতিভার কোনো পরিচয় দিতে পারেন নাই?

ইহার উত্তরে বলা যায় যে:—

(১) তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা সবাই বলিবেন কবি তাঁহার ভাব সম্পদের শতাংশের এক অংশেরও সম্যক্ পরিচয় দিতে পারেন নাই। সমস্ত জীবনের চেষ্টায়ও তাহা অসম্ভব।

(২) গীতাঞ্জলি-জাতীয় লেখা ছাড়াও তাঁহার অন্যান্য নানা শ্রেণীর অপূর্ব্ব কাব্য, ছোট গল্প, উপন্যাস, ব্যঙ্গ কাব্য, নাটক, ব্যঙ্গ নাট্য, সমালোচনা, কলা ও সাহিত্য বিচার, নীতি, ধর্ম্ম, সাধনা, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বহু বহু বিধ ক্ষেত্রে তাঁর লেখা এত অজস্র, এত বিচিত্র, এত গভীর চমৎকার যে তাঁর প্রতিভার সম্বন্ধে কোনো দিক্ দিয়া সংশয় ঘটিবার কোনো কারণ নাই। কোনো দিকেই তাঁহার ভাব-দৈন্য নাই।

(৩) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ধর্ম্মতত্ত্ববিদ প্রভৃতি তাঁর আলাপে আলোচনায় বক্তৃতায় একেবারে চমৎকৃত হইয়াছেন। সর্ব্বদেশে তাঁর কথাবার্ত্তা ও বক্তৃতাদির কত সমাদর তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই।

(৪) পরিশেষে ঐতিহাসিক হিসাবে বলিতে হয়, কবীর, দাদূ প্রভৃতির বাণী শোনার বহু পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতাঞ্জলি লেখেন। তাহার কতক অংশ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে, কতক ১৯০৭এ এবং একেবারে শেষ অংশেরও সর্ব্বশেষ কবিতাটি ১৯১০এর ১১ই আগষ্ট তারিখে। গীতাঞ্জলির মধ্যে মধ্যযুগের বাণীর কিছু ভাবসাম্য দেখিয়া আমিই কবীরের বাণীর বিষয় তাঁহাকে প্রথম জানাই। তাতেই আমি কবির কাছে ধরা পড়ি। তাহা ঘটে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। তাহার কিছুকাল পরে আবার কবীরের প্রথম খণ্ড বাহির হয়। কবীর বাণী দেখিয়া তিনি গীতাঞ্জলি লেখেন নাই। গীতাঞ্জলি দেখিয়া তাঁহাকে আমি কবীর বাণী দেখাই।

যে "রহস্যবাদের" (mysticism) জন্য তাঁহাকে কবীরের কাছে ঋণী বলা হইল সেই রহস্যবাদেরও কি আদি কবীর? কবীরের পূর্ব্বে নাথপন্থের বাণীতে, যোগীদের কাব্যে, নিরঞ্জন গ্রন্থে, তন্ত্রে, উপনিষদে, অথর্ব্ব প্রভৃতি সংহিতায় এই রহস্যবাদই নানা বিচিত্র আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদের নানা স্থলে, অথর্ব বেদের নৃসূক্তে, মহীসূক্তে, ব্রাত্য প্রকরণে উচ্ছিষ্ট প্রকরণে ও আরও নানা অংশে এই রহস্যবাদ গভীর ভাবে প্রকাশিত। এই রহস্যবাদ এত প্রাচীন যে, তাহা কোনো মতেই বেদের অন্যান্য অংশের পরবর্ত্তী নহে। বৌদ্ধদের মধ্যে অসঙ্গ, বসুবন্ধু ও অন্যান্য বহু আচার্য্যদের বাণীতে শূন্যবাদী ও আরও বহু সম্প্রদায়ের মহাযানদের বাণীতে ও অপভ্রংশ ভাষার বহু গ্রন্থমধ্যে রহস্যবাদ পূর্ণমাত্রায় ও গভীর ভাবে বিরাজমান। ইহা ভারতের চিরন্তন ও চিরপ্রবহমান ভাবধারা। এ দেশে যে কবি, মনস্বী বা সাধকই গভীর আধ্যাত্মিক সত্যের সাধনা করিবেন তাঁরই অন্তরে অজ্ঞাতসারে এই ভাবের ধারা উচ্ছসিত হইয়া উঠিবে। কবীরের মধ্যেও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নাথপন্থের যোগিগণের শূন্যপুরাণের সব কথা পংক্তিতে পংক্তিতে গৃহীত হইয়াছে। প্রশ্নোত্তর গুণিয়া লিখিলে তো কথাই নাই। এই সব বিষয়ে যাঁরা যথেষ্ট অনুশীলন করেন নাই তাঁহারাই হয়তো বৃথা এমন সব যুগ-গুরুদের প্রতি অবিচার করিবেন এবং নানাবিধ সঙ্কীর্ণ বিরুদ্ধ চিৎকারে মহাত্মা রজ্জবের কথাই প্রমাণিত করিবেন।

চীনদেশে একটি গল্প আছে যে, একবার এক পার্ব্বত্য কুণ্ডের ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী আসিয়া জ্ঞান-দেবতার কাছে অভিযোগ করিল যে, "আমার সর্ব্বস্ব লইয়াই মহাসাগরের এই পরিপূর্ণতা। তবু কেহই আমার নাম করে না। সবাই দেখি সাগরেরই নাম করে।" দেবতা বলিলেন, "এখানেই বহু লোকের তৃষ্ণা মিটাইয়া তোমার জল কি তত দূর গিয়া পৌঁছিতে পারিয়াছে? তবু যদি এই কথায় তৃপ্তি না হয় তবে তোমার আপন খুসী মত তোমার দেওয়া যতখানি জল তুমি সম্ভব মনে কর, তুমি নিজেই সাগর হইতে তাহা

উঠাইয়া লইয়া যাও। দেখ তাহাতে সাগরের পরিপূর্ণতার কিছু হ্রাস হয় কি না।"

রবীন্দ্রনাথের যে সব কবিতায় ইঁহারা মধ্যযুগের ভক্তদের সঙ্গে একটু মিলও আছে মনে করেন সে সব গান ও কবিতা বাদ দিলেও তাঁহার কাব্যের একটুও কম্‌তি পড়িবে না।

গীতাঞ্জলি যখন প্রথমে অনুবাদিত হয় তখনই পশ্চিম দেশের লোক তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হয়। তার পর যেমন যেমন তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়া চলিল তেমন তেমনই তাঁর কাব্যের প্রতি ঐ দেশের রসজ্ঞদের গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বাড়িয়াই চলিল। জার্ম্মাণীতে তাঁহার "সাধনার" বেশি আদর হইয়াছে। অনেক দেশে কাব্যের মধ্যে তাঁহার "চিত্রা" সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সমাদৃত হইয়াছে।

ভারতে রহস্যবাদের যে তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তক নহেন ইহা দেখাইবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ নিজেই কবীরের ইংরাজী অনুবাদ করেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব অনুবাদ না হইলে দেশে বিদেশে কোথাও কবীরের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি এতটা আকৃষ্ট হইত না। অনেকে বরং মনে করেন, কবীরকে বিদেশেও সর্ব্ব জনের শ্রদ্ধার ও অনুরাগের বস্তু করিতে গিয়া কবি তাঁর আপন ঐশ্বর্য্যও তাহাতে এতটা ঢালিয়া দিয়াছেন যে তাহাকে ঠিক অনুবাদ বলা অন্যায়। এ যেন কবীরের নামে নূতন এক সৃষ্টি। নহিলে মিশনরীদের কৃত বীনকেয় অনুবাদ কেহ পড়ে না কেন? যদি কেহ তাহাতে মুগ্ধ হয় তবে সে ধন্য। এই শ্রদ্ধার প্রতিদান রবীন্দ্রনাথ যাহা পাইলেন তাহা অপ্রত্যাশিত। অথবা ইহাই হয়তো কাহারও কাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের রকম। সজারু বলিয়াছিল, "বন্ধু আর্ত্তনাদ করিও না, এইরূপই আমার আলিঙ্গন।" ভুজঙ্গ ঝগড়াই না কি বিড়ালের প্রেমালাপ!

যাহা হউক, কবি যদি কবীর হইতে চুরি করিতেন তবে নিজেই কি তাহার অনুবাদ করিয়া সর্ব্ব জগতে কবীরকে পরিচিত করিতেন? আপনার বিরুদ্ধ সাক্ষী কে কবে এমন সমাদর করিয়া ডাকিয়া আনে? এতটুকু সাধারণ বুদ্ধিও যে কবির নাই ইহা যে কেহ মনে করিতে পারেন তাহাই শোচনীয়! কবিরই চেষ্টায় কবীরের বাণীর সর্ব্বত্র যেরূপ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা এদেশের বহু প্রতিষ্ঠানের বহু যুগের বহু চেষ্টাতে সম্ভব হইত না। তারই কৃতজ্ঞতা হইল এইরূপ!

একে তো আমাদের দেশে যথার্থ মহাপুরুষের একান্ত অভাব। মহাপুরুষ লাভ করিবার যোগ্য তপস্যাও আমাদের নাই। তার পর যদি বা ভগবানের কৃপায় তাহারই শ্রেষ্ঠ দানরূপে এক-আধ জন মহাপুরুষকে পাই তাঁহাদিগকেও যদি এমন ভাবে অপমানিত করি, তবে আমরা জগতের কাছে মুখ দেখাইব কেমন করিয়া?

সত্য সত্যই যদি রবীন্দ্রনাথের ভাব-সম্পদের এতই দৈন্য হইত যে ঋণ না করিলে তাঁর আর চলে না, তবে তিনি আপন ঘরের কাছে বাউল থাকিতে কেন বৃথা এত দূরে ঋণ করিতে যাইবেন? স্বদেশী যুগে বঙ্গ-সন্তানের হৃদয় স্পর্শ করিতে তিনি আপন গানে বাউলের ভঙ্গী ও সুর বহু পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন। সেখানেও তিনি ঋণ না করিয়া বরং নিজের ঐশ্বর্য্য এত অজস্র ভাবে ঐ ক্ষেত্রে ঢালিয়া দিয়াছেন যে, বাংলার বাউল গীত-সাহিত্য তাঁর প্রসাদে এক অপরূপ গভীরতা ও অভিনব বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের বহু গানে বাউলদের সুর ও ভঙ্গী আছে, যদিও সেখানেও ঐশ্বর্য্য তাঁহার নিজের। আমাদের দেশী আর কোনো মণ্ডলীর গানের সঙ্গে তাঁর এত মিল নাই। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, বাউলদের মধ্যে বহু গভীর সাধক এবং ভাবুক ভক্ত থাকিলেও এমন বুদ্ধিমান কেহ নাই যে বিনা কারণে এক জনকে আসিয়া খপ্‌ করিয়া চোর বলিয়া সম্ভাষণ করিতে পারে। বরং তাঁদের ভাবের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে যোগযুক্ত নূতন সব গভীর গান শুনিয়াই তাঁহারা মুগ্ধ। তাঁরা যে পল্লীর সরলপ্রাণ ভক্ত সাধক। সহরের সুচতুর কোলাহলে তাঁহারা ভড়কাইয়া যান। স্নিগ্ধ পল্লী-ভবন হইতে সহরের দারুণ ভীড়ের মধ্যে আসিয়া তাঁহারা একেবারে চমকাইয়া ওঠেন যখন দেখেন অনবরত গাঁঠ-কাটারাই ত অন্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সমুচ্চ কণ্ঠে চোর চোর করিয়া চেঁচাইয়া সাধু-লোকের হাত এড়াইয়া ফেরে।

মোট কথা, রবীন্দ্রনাথকে যদি ঋণ করিতেই হইত তবে তিনি করিতেন বাউলদেরই কাছে। কারণ তাঁরা তাঁর ঘরের লোক, চিরদিন তাঁদের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। ভাষায়, ভাবে ভঙ্গীতে সব দিকে তাঁদের সঙ্গে যোগ তাঁর সহজ।

ভাবের চিরন্তন তারুণ্য, সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে নিত্য বিদ্রোহ, সম্প্রদায়ের অতীত মানুষের প্রতি অনুরাগ, পুরাতন সর্ব্ববিধ বন্ধনকে অস্বীকার, সহজ সত্যের প্রতি আস্থা, অপরিসীম সাহস প্রভৃতি নানা দিক্‌ দিয়া বাউলদের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের গভীর মিল, যদিও তাঁদের গান ও বাণী তিনি অল্পই জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন। না জানিয়াও বাউলদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই গভীর মিল দেখিয়াই আমরা বুঝিতে পারি ভারতের আধ্যাত্মিক নিত্য ধারার স্বরূপটি কি।

এই যুগে আমাদের দেশে যে মহাপুরুষ বিধাতার একটি বিশেষ মহা দান, যাঁহাকে পাইবার মত কোনো যোগ্য তপস্যাই আমরা করি নাই বরং নানা নীচ সঙ্কীর্ণতায় সর্ব্ব ভাবে ইহাই প্রমাণ করিয়াছি যে বিধাতার কাছে এত বড় একটি বর লাভের আমরা একান্তই অযোগ্য, আজ তাঁহার দেহগত প্রয়াণের পর যেন তাঁহার শুভ জয়ন্তীর দিনে তাঁহার প্রতি আমাদের চিত্ত নির্ম্মল নিষ্কলুষ ও সহজ হয়। আজিকার দিনের উৎসবে বাউল গানের সহজ সাহসের পুরাতন সব বাণী হইতে এমন কিছু নবীন অঞ্জলির অর্ঘ্য দিতে চাই যাহাতে তাঁহাদের সহিত কবির অন্তরের যোগটি হৃদয় মন দিয়া বুঝিতে পারি। প্রাচীন ভাবের সঙ্গে কবির এই ভাবের যোগ কবির পক্ষে কোনরূপ লজ্জার বিষয় নহে। তাঁর কি নিজের কোনো ভাব-ঐশ্বর্য্যের অভাব আছে?

যেখানে অভাব সেইখানেই পদে পদে শঙ্কা। সাত্ত্বিক সম্পদের অভাব থাকিলে হয়তো আমরাও রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে শঙ্কাযুক্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু যখন দেখিতেছি ভাব-ঐশ্বর্য্যে তিনি রাজরাজেশ্বর ও শিরোমণি, তখন তাঁহার সম্বন্ধে ক্ষুদ্র শঙ্কা ও সন্দেহ অমার্জনীয়।

না জানিয়াও কোনো উৎসব-ভূমিতে হঠাৎ যদি একজন রাজচক্রবর্ত্তী আসিয়া পড়েন তবে কি কেহ মনে করেন যে অভাবের ও দারিদ্র্যের তাড়নাতেই পেটের দায়ে তিনি সেখানে উপস্থিত? বরং তাঁহার আকস্মিক উপস্থিতিতে উৎসব-ভূমি আরও ধন্য হইয়া যায়, তিনিও তাঁহার ঐশ্বর্য্যোচিত অজস্র দাক্ষিণ্যে উৎসবক্ষেত্রের সর্ব্ববিধ দৈন্য দূর করিয়া দেন। আমাদের দেশে ভাব ও চিৎ-সম্পদের যে-কোনো উৎসব-ভূমিতেই এই কবি জানিয়া বা না জানিয়া পদার্পণ

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্য-রূপ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম সাধারণ রঙ্গালয়—ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হয়। তদবধি ন্যাশনাল, বেঙ্গল, ষ্টার, মিনার্ভা, ক্লাসিক প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে দর্শকগণের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি উপন্যাসগুলির নাট্য-রূপ প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে। নাট্য-সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে যাঁহারা এই সকল নাট্য-রূপ রচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বিহারী-লাল চট্টোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, অতুলকৃষ্ণ মিত্র ও অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য; ইঁহারা প্রত্যেকেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার ও অভিনেতা। ইঁহাদের কৃত নাট্য-রূপের সবগুলি বর্ত্তমানে পাইবার উপায় নাই। যেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলিরও সংবাদ অনেকে রাখেন না। আমরা মুদ্রিত নাট্যরূপগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা নিম্নে দিতেছি:—

বিষবৃক্ষ	অমৃতলাল বসু	২৩ মার্চ ১৯২৫
চন্দ্রশেখর	ঐ	১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৫
রাজসিংহ	ঐ	১৮ মে ১৯২৬
দেবী চৌধুরাণী	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	২ জুলাই ১৯৩২
দুর্গেশনন্দিনী	গিরিশচন্দ্র ঘোষ *	৩ মার্চ ১৯৩৩
কপালকুণ্ডলা	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	১৪ অক্টোবর ১৯৩৯
সীতারাম	গিরিশচন্দ্র ঘোষ *	২৭ অক্টোবর ১৯৩৯
ভ্রমর (কৃষ্ণকান্তের উইল)	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত	১৯৪০ (?)
ইন্দিরা ও কমলাকান্ত	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত	১ জুন ১৯৪০

* পুস্তকের আখ্যা-পত্রে ভুলক্রমে "অতুলকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক নাট্যাকারে গ্রথিত" বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'শনিবারের চিঠি'তে (আশ্বিন ১৩৫২) প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এই ৯খানি নাট্য-রূপ বসুমতী-প্রবর্ত্তিত "নাট্য-সিরিজে" প্রকাশিত হইয়াছে। এগুলিতে কোন প্রকাশ-কাল পাইবার উপায় নাই। আমাদিগকে যথেষ্ট পরিশ্রমে বেঙ্গল লাইব্রেরী-সঙ্কলিত মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা হইতে প্রকাশ-কাল সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আরও কয়েকটি নাট্য-রূপের উল্লেখ করিতেছি যেগুলি সাধারণ রঙ্গালয়ে বহুবার প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু কখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। এগুলি পুস্তকাকারে না পাইলেও ইহার গানগুলি মুদ্রিত হইয়াছে:—

মৃণালিনী	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	'গিরিশ-গীতাবলী'
কপালকুণ্ডলা	ঐ	ইং ১৯০৪
হিরণ্ময়ী	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	বসুমতী-প্রকাশিত
(যুগলাঙ্গুরীয়)		'অতুল-গ্রন্থাবলী' ১ম ভাগ।
বিষবৃক্ষ	ঐ	ইং ১৯৩০ (?)
সীতারাম	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত	'অমর-গ্রন্থাবলী'
দেবী চৌধুরাণী	ঐ	ইং ১৯০২

সম্প্রতি 'আনন্দমঠের' নাট্য-রূপ প্রকাশিত হইয়াছে; ইহা বাণীকুমার-কৃত 'সন্তান' (বৈশাখ ১৩৫২), রঙ্গমহলে অভিনীত হইয়াছে।

করিয়াছেন, সর্ব্বত্রই তিনি আপন ঐশ্বর্য্যের দাক্ষিণ্য অজস্র ভাবে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার শুভাগমনকে সন্দেহের চক্ষে দেখিবার কোনোই কারণ তিনি রাখিতে দেন নাই। তবু যদি কোনো কৃপণ বুদ্ধি আমাদের মনে আসিয়া থাকে তবে বুঝিতে হইবে তাহার হেতু আমাদের চিত্তের দৈন্য ও ভাবের দারিদ্র্য। আমাদের সকলের চিত্ত হইতে এই কৃপণ দারিদ্র্য অবগত হউক. আজিকার মহোৎসব দিনে মহেশ্বরের চরণে ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। কবির কাব্যসম্পদে আমাদের দেশ ও সর্ব্ব মানব আরও সমৃদ্ধ হউক, অজ্ঞাতপর অজ্ঞাত বাস হইতে মুক্ত হইয়া আমাদের দেশ সকল মানবের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। দারিদ্র্যের ও উপেক্ষার নিঃসঙ্গ তামস মৃত্যু হইতে এই দুর্ভাগ্য দেশ রক্ষা প্রাপ্ত হউক। দেশে বিদেশে সকল মানবের সাধনা, কল্যাণে ভাব-সম্পদে সার্থক হউক। বিধাতার প্রেম ও আশীর্ব্বাদ সর্ব্বত্র বর্ষিত হউক, কবির সকল ভক্ত অনুরাগী জনের সঙ্গে আজিকার দিনে আমাদের এই সমবেত ঐকান্তিক প্রার্থনা। বেদের বাণীর মধ্যে যে সব মহাসত্য পাই তাহার মধ্যে একটি কথা আজ বার বার মনে আসিতেছে,

অংতি সংতং ন জহাতি অংতি সংতং ন পশ্যতি।

কাছের বস্তু যতই মহৎ হউক তাহার মর্ম আমরা বুঝি না। তাহাকে হারাইলে তখন তার মর্ম বুঝি। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির মর্ম আমরা বুঝি তাহাদের হারাইয়া। জীবনের অবসানে বুঝিতে পারি জীবনের পরম মূল্য। আপন জনকেও না হারাইলে তার মূল্য বুঝিতে পারি না, তাই কি বিধাতা মৃত্যুর দ্বারা আমাদের মহত্তের পরিচয় দিয়া যান?

আজ কায়ার জগতে রবীন্দ্রনাথ নাই। আজ তবে কেন তাঁহাকে চিনিব না? আজ তিনি আমাদের মর্মে নবরূপে প্রতিষ্ঠিত হউন, আমাদের জীবনে তিনি নব জন্মলাভ করুন। মহাপুরুষদের তো মৃত্যু নাই, আমাদের জীবন তাঁর জয়ন্তীর মহাতীর্থ হউক।

পতঞ্জলিই শেষনাগের অবতার

চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামী

তাহার পর পতঞ্জলিদেব যে অনন্তনাগের অবতার, তাহার আর একটি প্রমাণ—তাঁহার যোগসূত্রের উপর ব্যাস-বিরচিত ভাষ্যের মঙ্গলাচরণ শ্লোক বলা হয়। যথা—

যস্ত্যক্ত্বা রূপমাদ্যং প্রভবতি জগতোঽনেকধাঽনুগ্রহায়,
প্রক্ষীণক্লেশরাশিবিষমবিষধরোঽনেকবক্ত্রঃ সুভোগী।
সর্বজ্ঞানপ্রসূতিভুজগপরিকরঃ প্রীতয়ে যস্ত নিত্যং,
দেবোঽহীশঃ স বোঽব্যাৎ সিতবিমলতনুর্যোগদো যোগযুক্তঃ।

ইহার অর্থ—যিনি আদ্যরূপ ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ সর্পদেহ ত্যাগ করিয়া জগৎকে অনেক প্রকারে অনুগ্রহ করিবার জন্য অর্থাৎ শব্দশাস্ত্র যোগশাস্ত্র এবং বৈদ্যকশাস্ত্র প্রণয়ন দ্বারা অনুগ্রহ করিবার জন্য সমর্থ হন, যিনি প্রক্ষীণক্লেশরাশি হইয়া থাকেন, যিনি বিষম বিষধররূপ অনেক বদনযুক্ত, এবং সুভোগী অর্থাৎ সুন্দর ফণাযুক্ত, যিনি সকল প্রকার জ্ঞানের প্রসূতি, ভুজগপরিকর অর্থাৎ সর্পসমূহদ্বারা পরিবৃত, যাহার প্রীতির জন্য, নিত্য যোগশাস্ত্র প্রবর্ত্তক, যোগযুক্ত, সেই যোগী শুভ্র নির্ম্মলমূর্ত্তি দেব, সর্পগণের রাজা, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন। বলা বাহুল্য, এই শ্লোকের শিবপক্ষের ব্যাখ্যাও হয়, যথা—বিষম বিষধর অর্থ তখন নীলকণ্ঠ-শিব হইবেন। অনেকবক্ত্র—অর্থ তখন পঞ্চমুখযুক্ত, সুভোগী অর্থ—তখন সুন্দর পালন কর্ম্মরত, এবং দেব অর্থ—তখন শিব হইবে ইত্যাদি। ফলতঃ, এই মঙ্গলাচরণে অনন্তনাগ এবং শিব এই উভয়েরই স্তব করা হইয়াছে বলা যায়। যাহা হউক, পাতঞ্জল যোগদর্শনের গ্রন্থকার এতজ্জন্য শেষনাগের অবতার অনন্তদেব ইহা বলিতে বোধ হয় কোন বাধা হইবে না। আর তজ্জন্য ইঁহার নাম মহাভারতে দেখা যায় না। কারণ, পুষ্যমিত্রের সময় ইনি বর্ত্তমান ছিলেন এবং পুষ্যমিত্রের নাম মহাভারতেও নাই।

পতঞ্জলি ও ব্যাসদেব একাধিক

তাহার পর পতঞ্জলিদেব ও ব্যাসদেব যে একাধিক তাহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয়। নচেৎ কতকগুলি প্রমাণকে মিথ্যা বলিয়া বর্জ্জন করিতে হয়। অথচ মিথ্যা বলিবার কোনও কারণই দেখা যায় না। এই কারণে ব্যাস ও পতঞ্জলির নাম মাত্র হইতে যোগসূত্রকে কলির প্রারম্ভের গ্রন্থ বলিবার আবশ্যকতা নাই। বস্তুতঃ, ব্যাস যে বহু, তাহা পুরাণাদিতেই প্রসিদ্ধ আছে। আর পরে এই ব্যাস যে একটি শাস্ত্রব্যাখ্যাতার উপাধিতে পরিণত হইয়াছে তাহাও পণ্ডিত মাত্রেরই বিদিত আছে। যেমন সদানন্দ ব্যাস নামক এক পণ্ডিতের অদ্বৈতসিদ্ধিসিদ্ধান্তসার নামক একখানি গ্রন্থ দেখা যায়। বস্তুতঃ, এরূপ আরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কাশীধামে ৺বেণীমাধবের ধ্বজার পার্শ্বে ব্যাস-গদি এখনও বর্ত্তমান। সেখানে যিনি শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করেন তাঁহাকেও ব্যাস বলা হয়। ব্যাস অনেকের বংশগত উপাধিও দেখা যায়। তদ্রূপ বৃদ্ধ চরক ও চরক, এবং বৃদ্ধ প্রভাকর ও গুরু প্রভাকর, আদি শঙ্করাচার্য্য এবং পরবর্ত্তী শঙ্করাচার্য্য, ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র এবং স্মার্ত্ত বাচস্পতি মিশ্র এইরূপ এক নামের দুই অথবা বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন ইহা যথেষ্টই দেখা যায়। অতএব ব্যাসভাষ্যের ব্যাস এই নাম দেখিয়া পাতঞ্জল যোগসূত্রের পতঞ্জলি মুনিকে পাঁচ ছয় হাজার বৎসরের প্রাচীন বলিবার কোন কারণ দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, পাণিনির ও পতঞ্জলি মহাভাষ্যের কাল অনুসারে খৃষ্টীয় ৩।২ পূর্বশতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ১।২ শতাব্দী পর্য্যন্ত জীবী একজন মুনিবিশেষ বলিতেই প্রবৃত্তি হয়।

বৌদ্ধমত খণ্ডনের জন্য যোগদর্শন আধুনিক নহে

কেহ কেহ বলেন, যোগদর্শনে এবং তাহার ব্যাসভাষ্যে বৌদ্ধ-বিজ্ঞানবাদ খণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া যোগদর্শন খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীর গ্রন্থ হইতে পারে না। উহা শঙ্করাচার্য্যের পূর্ববর্ত্তী গ্রন্থ মাত্র। কিন্তু তাহাও অসঙ্গত কল্পনা। কারণ, বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের সূচনা মৈত্রেয় ও অসঙ্গের গ্রন্থে দেখা যায়। এ জন্য হিরি ভারতীয় দর্শন ৩৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বস্তুতঃ এই বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ, বৈদিক বিজ্ঞানবাদের বিকৃতি মাত্র। বিজ্ঞানবাদের মূল বেদেই রহিয়াছে। "বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম"—ইহা বৃহদারণ্যক উপনিষদেরই কথা। বৌদ্ধগণ ইহারই বিকৃতি করিয়া ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বিষ্ণুপুরাণেও বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের কথাই আছে। বিষ্ণুপুরাণের ৩য় অংশে বৌদ্ধমতের উৎপত্তি বর্ণন কালে শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদের উপদেশ দেখা যায়। বিষ্ণুশরীরোৎপন্ন মায়া-মোহ নামক পুরুষ-বিশেষ এই বৌদ্ধবাদের প্রবর্ত্তক। আসুর-প্রকৃতি-সম্পন্ন রাক্ষসবর্গকে কর্ম্মকাণ্ড হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য এই পুরুষের আবির্ভাব। বস্তুতঃ, রাবণ কর্ম্মকাণ্ড বলেই দেবতাগণকে ভৃত্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। এ জন্য দেবগণের প্রার্থনায় বিষ্ণুই ঐ মায়ামোহরূপে উৎপন্ন হন। 'বৌদ্ধদিগের প্রাচীন গ্রন্থ লঙ্কাবতার সূত্রে দেখা যায় "বিরজ" নামক আদি বুদ্ধ রাবণকে বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদের উপদেশ দিতেছেন। অতএব যোগদর্শনে বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন দেখিয়া তাহাকে পরবর্ত্তী গ্রন্থ বলা সঙ্গত হয় না। বৌদ্ধমত বৈদিক মতের বিকৃতি। বৌদ্ধমতের মূল বেদ-মধ্যেই পাওয়া যায়। বিজ্ঞানবাদের মূল যেমন "বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম" এই বেদবাক্য, তদ্রূপ শূন্যবাদের মূল ছান্দোগ্যোপনিষদের "অসদ্ বা ইদম্ অগ্র আসীৎ" এই বেদবাক্য। মৈত্রায়ণী উপনিষদে বৌদ্ধগণের নৈরাত্ম্যবাদ অর্থাৎ আত্মা নাই এই মতবাদ প্রভৃতি নানা কথাই আছে। সেখানে বেদান্তমতের নৈরাত্ম্যবাদকে বৌদ্ধমতের নৈরাত্ম্যবাদের মূল বলা যাইতে পারে। বেদান্ত-মতে জীবের আত্মাই ব্রহ্ম, জীবাত্মা আর পৃথক্ কিছুই নাই, একমাত্র ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব জীব বলা হয়। এই কথাকে বৌদ্ধগণ আত্মাই নাই এইরূপে বুঝিলেন বা প্রচারিত করিলেন। এই সব কারণে যোগদর্শন মধ্যে বৌদ্ধমত দেখিয়া তাহাকে খৃষ্টীয় ৩য় পূর্বশতাব্দীর গ্রন্থ নহে বলা সঙ্গত হয় না। আর ব্যাসভাষ্যকে যে খৃষ্টীয়, ৮ম শতাব্দীর পরবর্ত্তী গ্রন্থ বলা হয় তাহাও তাহাতে বৌদ্ধমত খণ্ডিত দেখিয়া বলা সঙ্গত হয় না। তবে কুমারিল প্রভাকর শঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্যগণ ব্যাসভাষ্যের উল্লেখ কোথায় করিতেছেন না দেখিয়া তাহাকে ঐ সময়ের পূর্ববর্ত্তী গ্রন্থ বলা সঙ্গত হয় না।

এখন এই ব্যাসভাষ্য দ্বারা যদি অতি প্রাচীন সাংখ্যমতের পরিপূর্ত্তি বা পুষ্টিসাধন করা হয়, তাহা হইলে তাহা শোভন মার্গ হইবে না। আর তজ্জন্য সাংখ্যমতের বিশেষ পরিচয় পাইতে হইলে মহাভারতই আমাদের অবলম্বনীয় হওয়া ভাল।

সাংখ্য ও যোগমত একশাস্ত্র নহে

তাহার পর যাঁহারা সাংখ্য ও যোগমতকে একশাস্ত্র বলিয়া যথা—সাংখ্যটি জ্ঞানকাণ্ড এবং যোগটি সাধনকাণ্ড, ইত্যাদি বলিয়া যোগশাস্ত্রের ব্যাসভাষ্য দ্বারা সাংখ্যমতের পরিপূর্ত্তি সাধন করেন, তাঁহাদের মতটি আলোচনা করা যাউক। আমাদের বোধ হয়, এই একশাস্ত্রত্বজ্ঞাপক মতটি সমীচীন মত নহে। কারণ,—

প্রথম—সাংখ্য ও যোগ একশাস্ত্র হইলেও মহাভারতে তাহাদিগের নির্দ্দেশ করা কেন হইল? সেখানে একই শ্লোকে সাংখ্যের বক্তা কপিল এবং যোগের বক্তা হিরণ্যগর্ভ বলা হইল কেন? মহাভারতে সাংখ্যমত বর্ণনার পর যোগমত বর্ণনা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক করা হইতেছে দেখা যায়। যথা—

"সাংখ্যজ্ঞানং ময়া প্রোক্তং যোগজ্ঞানং নিবোধ মে।"

(মহাঃ শাঃ মোঃ ৩১৬।১)

"যোগদর্শনমেতাবৎ উক্তং তে তত্ত্বতো ময়া।
সাংখ্যজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি পরিসংখ্যানিদর্শনম্।"

(ঐ ৩০৬।২৬) ইত্যাদি।

অতএব সাংখ্যমত ও যোগমত এক মত নহে বা একশাস্ত্রও নহে।

যদি বলা হয়, অনেক স্থলে বলা হইয়াছে—সাংখ্যমতের যাহা ফল যোগমতেও তাহাই ফল, অথবা সাংখ্য ও যোগ একই শাস্ত্র ইত্যাদি, যথা—

"যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।" গীতা ৫ ৫
"যদেব শাস্ত্রং সাংখ্যোক্তং যোগদর্শনমেব তৎ।"

মহাঃ শাঃ মোঃ ৩০৭।৪৪)

"একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স তত্ত্ববিৎ।"

(ঐ ৩১৬।৪) ইত্যাদি।

তাহা হইলেও তাহাকে অর্থবাদের মধ্যে গণ্য করা যায়, অথবা পরস্পর সম্বন্ধে একফলপ্রদ বলিতে পারা যায়। এই কথা গীতার টীকায় পরিব্যক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উপক্রম করিয়া উপসংহার দ্বারা যখন সাংখ্য ও যোগকে পৃথক্ বলিয়া গণ্য করা হয়, তখন তাহার অন্যথা করিয়া উভয়ের একশাস্ত্রত্ব বিধান সঙ্গত হয় না।

দ্বিতীয় কথা—যদি বলা যায়, সাংখ্য ও যোগকে পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসার ন্যায় একশাস্ত্র বলিতে বাধা কোথায়? তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, তাহারা উভয়ে একশাস্ত্র—একথা সর্ববাদিসম্মত নহে। রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি একশাস্ত্র বলিয়াছেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য পৃথক্ শাস্ত্র বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যে সব যুক্তি ও প্রতিযুক্তি আছে তাহা উভয় ভাষ্য-মধ্যে দ্রষ্টব্য। আর কিয়দংশে দুইটি শাস্ত্র একমত হইলেই তাহারা সর্ব্বাংশে যে একমত এরূপ বলাও সঙ্গত নহে। এরূপ হইলে সকল শাস্ত্রই একশাস্ত্র বলিতে পারা যায়।

তৃতীয় কথা—সাংখ্য ও যোগ যদি একশাস্ত্র হয়, তবে তাহাদিগকে পৃথক্ ভাবে গণনা করিয়া ষড়্দর্শনের প্রসিদ্ধি হয় কেন? আস্তিক দর্শন ছয়খানি না বলিয়া পাঁচখানি বলিলেই ত সঙ্গত হইত? অতএব এই দুই শাস্ত্রকে একশাস্ত্র বলা সঙ্গত হয় না।

চতুর্থ কথা—যদি বলা যায়—সাংখ্যবক্তা কপিল ও যোগবক্তা হিরণ্যগর্ভ ইঁহারা শব্দতঃ বিভিন্ন হইলেও অর্থতঃ অভিন্ন। হিরণ্য অর্থাৎ সুবর্ণ তাহা কপিলবর্ণই হয়। এতদ্ব্যতীত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কপিলকে শাঙ্করভাষ্যে হিরণ্যগর্ভই বলা হইয়াছে। অতএব উভয়ের বক্তা অভিন্ন হওয়ায় উভয়ই একশাস্ত্র। কিন্তু একথাও অসঙ্গত। কারণ, কপিলকে ব্রহ্মার মানস পুত্র বলা হইয়াছে, যথা—

"সনঃ সনৎ সুজাতশ্চ সনকঃ স সনন্দনঃ।
"সনৎকুমারঃ কপিলঃ সপ্তমশ্চ সনাতনঃ। ৩৪১।৭২
"সপ্তৈতে মানসা প্রোক্তা ঋষয়ো ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
"স্বয়মাগতবিজ্ঞানা নিবৃত্তিং ধর্ম্মমাস্থিতাঃ। ৩৪১।৭৩

(মহাভারত)

আবার গৌড়পাদাচার্য্য যে বচন একটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাও সেই এক কথা ঘোষণা করিয়া থাকে। যথা—

"সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
আসুরিঃ কপিলশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সপ্ত প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ।"

(গৌড়পাদ-ভাষ্য)

অতএব হিরণ্যগর্ভ ও কপিল অভিন্ন ব্যক্তি নহেন। অন্ততঃ পক্ষে সাংখ্যবক্তৃরূপে অভিন্ন ব্যক্তি নহেন বলিতে হইবে। আদি বিদ্বানরূপে অভিন্ন বলাই শ্বেতাশ্বতর ভাষ্যের উদ্দেশ্য।

পঞ্চম কথা—সাংখ্যমতে ২৫ তত্ত্ব, যোগমতে ২৬ তত্ত্ব। যোগমতে ঈশ্বর স্বীকার করা হয় যথা—"ক্লেশকর্ম্মবিপাকআশয়" হইতে "অপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষই ঈশ্বর"; কিন্তু সাংখ্যমতে যোগসিদ্ধ মুক্ত আত্মাই ঈশ্বর। যোগমতে ঈশ্বর এক, সাংখ্যমতে ঈশ্বর অনেক। যোগ বা ন্যায়মতের ন্যায় ঈশ্বর নাই এ সম্বন্ধে সাংখ্যসূত্র যথা—"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" ১।৯১ সূত্র হইতে ১।৯৪ সূত্র দেখা যাইতে পারে। তাহার পর ঈশ্বরাস্তিত্ববাদীর মতখণ্ডন "নেশ্বরাধিষ্ঠিতে…" ৫।২ সূত্র হইতে ৫।১২ সূত্র এবং ৫।১২৭ ও ৫।১২৮ সূত্র দেখা যাইতে পারে। আর সাংখ্যমতের যে ঈশ্বর অর্থাৎ সিদ্ধ পুরুষই ঈশ্বর এই মতবাদ স্থাপনের জন্য সাংখ্য সূত্রের "ন কারণলয়াৎ…"৩৫৪ সূত্র হইতে "ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধাঃ" এই ৩।৫৭ সূত্র পর্য্যন্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। যোগের ঈশ্বর নিত্যসিদ্ধ আর সাংখ্যের ঈশ্বর সাধনসিদ্ধ বা জন্য ঈশ্বর। পাতঞ্জল ভাষ্যে ঈশ্বরের নানাত্বই খণ্ডিত হইয়াছে। অথচ সাংখ্য মুক্ত পুরুষকেই ঈশ্বর বলেন। তন্মতে পুরুষ বহু বলিয়া ঈশ্বরও বহু। অতএব সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র এক অখণ্ড বা অভিন্ন শাস্ত্র ইহা বলা কোনরূপেই সঙ্গত হয় না।

ষষ্ঠ কথা—সাংখ্যে স্ফোটবাদের খণ্ডন আছে আর যোগে তাহার মণ্ডন আছে। অতএব এই শাস্ত্রদ্বয় অভিন্ন বা একশাস্ত্র বলা কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না। (৩৫১ পৃঃ ভারতীয় দর্শন দ্রষ্টব্য।)

সপ্তম কথা—পাতঞ্জল যোগসূত্র যদি সাংখ্যশাস্ত্রের পরিশিষ্ট বা অঙ্গ-বিশেষ হয়, অর্থাৎ সাংখ্য জ্ঞানকাণ্ড এবং যোগ তাহার সাধনকাণ্ড হয়, তবে পাতঞ্জল যোগসূত্রে সাধনের ফলস্বরূপ কৈবল্যপাদ দেখা যায় কেন?

অষ্টম কথা—সাংখ্যের মত জ্ঞানে মুক্তি আর যোগের মতে জ্ঞান ও যোগ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি-নিরোধ এই উভয়ে মুক্তি। যোগমতে ঈশ্বর-প্রণিধানও মুক্তির হেতু।

এইরূপে বহু বিষয়ে এই উভয় শাস্ত্রে বিশেষ মতভেদ লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ, সাংখ্য-কারিকাতে যমাদি সাধনের কথা কিছুই নাই। যাহা আছে তাহা "নাহং" "নাস্মি" এবং "ন মে" ইত্যাদি চিন্তনরূপ জ্ঞান অভ্যাসের কথাই আছে। (৬৪ কারিকা দ্রষ্টব্য)। পক্ষান্তরে, যোগসূত্রে যম-নিয়মাদি এবং ঈশ্বর-প্রণিধানাদি বহু সাধনের উল্লেখ আছে। এজন্য এই দুই শাস্ত্র কখনই এক শাস্ত্র নহে।

অতৃপ্তি

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

কিছু কি হয়েছে মনোমত ?
কবিতা তো লিখিলাম কত,
কলসীটি নিয়ে রোজ ভোরে
পুকুরের ঘাটে যাও যত
সবুজ ঘাসের ফাঁকে
সরু সাদা পথ
তোমার পায়ের দাগে রাঙা হয় তত

কিন্তু বলতো
কি করে লাগিবে কাব্যে
আলতার গাঢ় রঙ অত।
অনুরক্ত তবু মোর কবিতা নয়তো
তোমার পায়ের তলে
অতখানি বিনয়াবনত।

পিঠ-ভরা ভিজে চুল
দুপুরের রোদে
রোজ তুমি শুকাতে বসতো
হাঁটুতে ঠেকায়ে মুখ
আনমনে কি যে ভাব কত
স্তব্ধ ঠিক পৃথিবীর মত

আমার কাব্যে কি আছে
ওইটুকু তাপ অন্ততঃ
তোমার চুলের রাশ
শুকাবার মত।

কিংবা সেই দুপুরের স্তব্ধতা অত
নিজের মধ্যে নিজে
ডুবিবার মত
আমার মুখর কাব্যে
কোথায় বলতো।

বিকালের জানালায় নদীর ওপারে
সূর্য অস্তগত ;
তোমার টেবিলে আর আয়নার ধারে
টুকিটাকি প্রসাধন সরঞ্জামে কত
তবু সূর্য ছড়ায়ে গেল তো
মৃত্যুর রঙ তার আবিরের মত।

সেই রঙে আয়নায়
আপনারে যত দেখ
দেখিবার সাধ যায় তত।
অমন আবির কোথা
কাব্যে বলতো
তোমার মনের মধ্যে
ছিটাবার মত,
অমন স্বচ্ছতা কোথা
কাব্যে বলতো
রূপে তব অপরূপ
আয়নার মত।

অন্ধকার ঘরে
তোমার খোঁপায় গোঁজা
বেলের কুঁড়িটি
সারা রাত ভ'রে
গন্ধ ছড়ায়ে গেল কত
যত বার ঘুম ভাঙে
ঘুমে ভেঙে আসে চোখ তত।

অমন ফুলের গন্ধ
অমন চুলের গন্ধ
কোথা মোর কাব্যে বলতো
কবিতা তো লিখিলাম কত।

অর্থাৎ "সাংখ্য" জ্ঞানকাণ্ড আর "যোগ" সাধনকাণ্ড এইরূপে এই দুই শাস্ত্রকে এক বলা কখনই সঙ্গত হয় না। আর তজ্জন্য ব্যাসভাষ্য দ্বারা সাংখ্যমতের ব্যাখ্যা করাও সঙ্গত নহে। আর এই সকল কারণে ব্যাসভাষ্যোক্ত পঞ্চশিখের বাক্য দ্বারা সাংখ্যমতের পরিপুষ্টি সাধন করিবার প্রয়োজনও শোভন হয় না। পঞ্চশিখের কয়েকটি মাত্র বাক্য যোগমতের কোন অংশে সহায়তা করে বলিয়া যোগমত যে সাংখ্যমতের সাধনকাণ্ড ইহা বলা নিতান্ত সাহসের কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়। সাংখ্য-মত জানিতে হইলে মহাভারতই মুখ্য ভাবে অবলম্বন হওয়া উচিত। মহাভারতোক্ত পঞ্চশিখবাক্য ব্যাসভাষ্যের পঞ্চশিখবাক্য অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ। ইহার প্রধান একটি কারণ ব্যাসভাষ্যটি কোন্ সময়ের কোন্ ব্যাসের ভাষ্য সে বিষয়ে দারুণ সন্দেহ বর্ত্তমান।

এই মহাভারতের শান্তিপর্বের মোক্ষধর্ম্ম-পর্বাধ্যায়ে ২১টি অধ্যায়ে ১টি আখ্যায়িকার দ্বারা সাংখ্য ও যোগমত নানারূপে বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত করা হইয়াছে। ইহাদের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে, মহাভারতের সময়েই সাংখ্যমতের কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আদি বিদ্বান্ কপিলের কি যে মত ছিল, তাহা জানিবার ঠিক উপায় আর নাই। ব্রহ্মসূত্রে এই জন্যই বোধ হয় সাংখ্যমতের খণ্ডনের আবশ্যকতা হইয়া পড়িয়াছিল। শাঙ্করভাষ্যেও একাধিক কপিলের উল্লেখ দেখা যায়। এজন্য ব্রহ্মসূত্রে শাঙ্করভাষ্য ২।১।১ সূত্র দ্রষ্টব্য। বস্তুতঃ, কপিল যে এক জন নহেন তাহা জীবনীকোষ নামক গ্রন্থ দেখিলে বেশ সহজেই বুঝিতে পারা যায়।



বিদ্রোহী

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

গেরুয়া রঙের ছোট দোতলা বাড়ি। নাম—'শান্তি-কুটির'। বাড়ির কর্তার নাম অবিনাশচন্দ্র রায়,—অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।

বাড়ির ছোট ফটকের এক-পাশের দেয়ালে গাঁথা একটি প্রস্তর-ফলকে ঐটুকু পরিচয়ই শুধু লেখা আছে। বাড়িটি বেশ ছিম্‌ছাম্‌ এবং ঝামেলাহীন।

আজ ক'দিন ধরেই এই 'শান্তি-কুটির'-এ বেশ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। অধিবাসীদের সবারই মনের উপর একটা পাষাণ-শিলা এসে যেন চেপে বসেচে এবং সকলকেই কেমন যেন একটু দাবিয়ে রেখেচে। এ-বাড়ির সহজ আনন্দের সুরটা এক নাগাড়ে কিছু দিন বেজে হঠাৎ যেন চিড় খেয়ে গেচে কেমন। আর সেটা ধরা প'ড়ে গেচে সবারই কাছে। কাজেই প্রত্যেক অধিবাসী পরস্পরের দৃষ্টি থেকে নিজেকে যতটা আড়ালে রাখতে পারে তারই চেষ্টায় যেন সর্বদা ব্যস্ত।

কর্তা অবিনাশ রায় মধ্যাহ্ন-বিশ্রামান্তে নিচে নেমে এসে বৈঠক-খানা-ঘরে পা দিয়ে ঘরের মাঝের টেবিলটির ওপর দেখলেন, তাঁরই নামে একখানি পোষ্টকার্ড এসে পড়ে আছে। পোষ্টকার্ডখানি হাতে তুলেই তিনি চম্‌কে উঠলেন এবং সর্বশরীর রাগে পুড়ে যেতে লাগলো। চিঠি লিখেচে প্রকাশ। প্রকাশ অবিনাশ রায়ের প্রথম পুত্র। এই প্রকাশের কারণেই আজ তিন দিন ধ'রে শান্তি-কুটির'-এ এসেচে অশান্তির বন্যা।

প্রকাশ আই-এস্‌-সি সেকেণ্ড ইয়ারে পড়তে পড়তে হঠাৎ আজ তিন দিন আগে বাড়ি ছেড়ে চ'লে গেচে এবং কোথায় গিয়ে নাকি একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছে। উদ্দেশ্য তার পরিষ্কার—একটি বিধবা কায়স্থ-কন্যাকে সে অনতিবিলম্বে বিবাহ করবে। বাড়িতে বাধার সৃষ্টি হ'তে পারে জেনেই সে স'রে পড়েচে এবং স'রে পড়ার পর প্রথম জানা গেল যে, মা'র নিজস্ব ক্যাশ খোয়া গেচে প্রায় শ'-পাঁচেক টাকার মত।

প্রকাশ লিখেচে,—

৭।১ বকুলবাগান লেন
২০শে ফাল্গুন।

বাবা, আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। আপনার যুগে আর আমার যুগে বিরাট মতভেদ দেখা দিয়েচে। পরস্পরের মতে মিল ঘটানো আজ অসম্ভব। কাজেই আমার মতটা আমি জোর ক'রে আপনাদের ওপর চাপাতে চেষ্টা না ক'রে বাড়ি থেকে স'রে এসেচি নিজের ইচ্ছায় এবং নিজ মতে দুনিয়ায় স্বাধীন ভাবে চলবার জন্যে। বিরোধ আমি চাইনি—চাই নির্বিবাদে নিজ পথে চলতে। যারা মনে করচে আমি মস্ত ভুল করচি জীবনে—তাদের—দয়া ও সহানুভূতি যেন না আমাকে কোন দিন স্পর্শ করতে পারে।

আগামী ২২শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার; আমাদের বিয়ে হবে রেজিষ্ট্রী ক'রে এবং বন্ধু-বান্ধবদের প্রীতিভোজের জন্য সামান্য আয়োজন করা হবে তার পরের দিন রাত্রে। বাড়ির সকলকেই আমি নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি—যে কেউ ইচ্ছা করলে আসতে পারে যোগ দিতে এবং যথাযোগ্য সমাদরে কোন ত্রুটি হবে না তার।

প্রণামান্তে—
প্রকাশ।

অবিনাশ রায় একখানি চেয়ারে ব'সে চিঠিখানি নীরবে পড়লেন। ভেতরে তাঁর রীতিমত উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও বাইরে কেমন একটা স্থির নিষ্করুণ দৃঢ়তা ফুটে উঠছিল। চিঠি পড়া শেষ ক'রে অবিনাশ রায় পোষ্টকার্ডখানা ছুঁড়ে রেখে দিলেন আবার টেবিলের ওপর। তার পর একবার শুধু ঘরের এদিক্‌-ওদিক্‌ তাকিয়ে কি যেন একটু ভেবে নিয়ে ক্ষণিকের জন্য অস্ফুট দৃঢ়কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, বিদ্রোহী! প্রকাশ হ'লো বিদ্রোহী! সুন্দর পরিহাস! আমিও—

দুঃসংবাদ শুনে অবিনাশ রায়ের বড় মেয়ে মণিকা ছুটে এলো তার এক ঠাকুরপোকে সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়ি।

যে-কথাটা ভরসা ক'রে বাড়ির আর কেউ অবিনাশ রায়কে বলতে পারছিল না, মণিকা সেই কথাটাই এসে বললো প্রথম।

অবিনাশ রায়কে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে, মণিকা বললো, ভুল সকলেই করে বাবা, প্রকাশও ভুল করেছে, তা' ব'লে ছেলেকে তো আর তুমি ফেলে দিতে পারবে না। আজ হোক্, কাল হোক্, এক দিন সে আবার ঘরে ফিরে আসবেই এবং আমাদেরও তাকে ঘরে তুলে নিতেই হবে। এই দুনিয়ার নিয়ম। আমার ননদের বাড়িতেও ঘটলো ঠিক তাই। কাজেই তুমি গিয়ে বাবা ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি ওর মত বদলাতে পারো ভালই, নইলে ওদের নিয়ে আসাই উচিত বলে আমি মনে করি। তা'তে দু'পক্ষেরই শান্তি ফিরে আসবে তাড়াতাড়ি।

অবিনাশ রায় মৃদু একটু হাসলেন, আর সে-হাসিতে ফুটে উঠলো একটা বলিষ্ঠ 'না'। জবাব কিছু দেওয়ার আর প্রয়োজন ছিল না তাঁর।

অবিনাশ রায়ের চরিত্রে চিরদিনই একটা অদ্ভুত দৃঢ়তা প্রকাশমান। তাঁর মতের বিরুদ্ধে বা তাঁর কথার বিরুদ্ধে এত কাল পর্য্যন্ত এ-সংসারে কোন সামান্য কিছু ব্যাপারও ঘটতে পায়নি। অবিনাশ রায়ের প্রথম স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাওয়ার পর তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। কিন্তু দ্বিতীয়পক্ষ গ্রহণ করার পরেও তাঁর চরিত্রে বা কার্যে কখনও দুর্বলতা প্রকাশ পেতে দেখা যায়নি। অবিনাশ রায় চিরদিন নিজের এই বৈশিষ্ট্য বাঁচিয়ে রেখেচেন সযত্নে এবং সে-বৈশিষ্ট্য বাঁচিয়ে রাখতে পারার গর্বও তাঁর অন্তরের একটা ঐশ্বর্য ব'লে তিনি মনে করেন। নিজের দৃঢ়তা সম্বন্ধে এমন সচেতন নিষ্করুণ মানুষ খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন।

মণিকার বিবাহ হ'য়ে গেচে। এখন সে বৎসরান্তে একবার বাপের বাড়ি আসে কি না তারও ঠিক নেই—যদিও শ্বশুরবাড়ি তার টালা এবং বাপের বাড়ি টালিগঞ্জে। কাজেই মণিকার পক্ষে অনেক-কিছু আব্দার করাই সম্ভব, এবং তা'তে ভয়ানক ভাবে মর্মাহত হবার আশঙ্কা নেই ব'লেই মনে হয়।

মণিকা তাই বাপের ঐ ঘা-মারা হাসির পরেও সাহস ক'রে বললো, আমাদের এ আব্দার তোমায় রাখতেই হবে বাবা। ঘরের ছেলে তো আর পর হ'য়ে যেতে পারে না। হাজার অন্যায় করলেও আবার তাকে ঘরে এনে ঠাঁই দিতেই হবে। আর তা না হ'লে কোন পক্ষেরই মনে শান্তি ফিরে আসবে না।

অবিনাশ রায় আবার হাসলেন এবং এবার তিনি বললেন, তা হয় না, হ'তে পারে না। কেতনপুরের রায়-বংশ একদিন ধনী ব্রাহ্মণ জমিদার-বংশ ছিল, তার পরে অর্থের বড়াই বা গৌরব একদিন তার ভেঙ্গে পড়েছিল, কিন্তু কোন দিনই সে-বংশের মর্য্যাদায় ফাটল ধরেনি, কেউ কোন দিন বিদ্রূপের বেয়নেট দিয়ে খোঁচা দিতে তাকে সাহসী হয়নি। তার কারণ কি জানিস্ মণিকা? কারণ—এ-বংশের নিষ্ঠা এত দিন অক্ষুণ্ণ অটুট ছিল, শ্রদ্ধা তাই লোকের আপনি জাগতো। আর আমি তা বাঁচিয়ে চলেছিলাম্ এত কাল সগৌরবে—সেখানে কি না আজ এই নিষ্ঠুর পদাঘাত! কিন্তু আমার উপায় নেই মণিকা। আমার অক্ষমতাকে আমি নিজে কোন দিনই পারবো না ক্ষমা করতে। কাজেই ও আর আমার দ্বারা সম্ভব হবে না কিছুতেই। প্রকাশের আর কোন দিনই রায়-বংশে ফিরে আসবার পথ সে রাখেনি।

মণিকা বাবার মুখে এত কথা কোন দিনই শোনেনি কোন কারণে। কারণ, অবিনাশ রায় মুখরতার চাইতে নীরবতায় ব্যক্ত হ'য়ে ওঠেন বেশী। মণিকা তাই ভরসা পেল আরও কথা বাড়াবার—যদিও সে জানতো যে, কথা বাড়িয়েও এ-ক্ষেত্রে লাভ নেই কিছু।

তবুও সে বললো, প্রকাশ ছেলেমানুষ—ও কি বংশ-মর্য্যাদা, বংশের গৌরব—এ-সব বোঝে কিছু? আর বুঝলে কি কেউ কখনও এ-কাজ করে? ও তো দোল খাচ্ছে কালের হওয়ায় শুধু। এক দিন এর জন্যে অনুতাপও ওকে করতে হবে সুনিশ্চিত।

অবিনাশ রায় মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, কিন্তু অনুতাপে মর্য্যাদা আর ফিরে আসবে না কোন দিনই। সে-মর্য্যাদা আমাকেই করতে হবে রক্ষা যত দূর সম্ভব। কাজেই প্রকাশের এ-সংসারে ফিরে আসবার পথ চিরদিনের মত রুদ্ধ আমার জীবদ্দশায়।

মণিকা হতাশ হ'য়েও শেষে বললো, বেশ, ওরা না হয় এ-বাড়িতে নাই এলো, কিন্তু ওরা যাতে অসুবিধার মধ্যে না পড়ে সেটা তো দেখা উচিত আমাদের। তুমি না হয় সেখানে কোন দিন নাই গেলে, আমাদের অন্ততঃ একটু দেখা-শুনো করবার অনুমতি দাও।

অবিনাশ রায় মৃদু হেসে বললেন, প্রকাশ তো অনুমতির অপেক্ষা রাখেনি, কাজেই তোরা কেন রাখতে যাবি আমি বুঝি না। তবে অনুমতির অপেক্ষা না রাখলে প্রকাশের যে-ব্যবস্থা এ-ব্যাপারে তাদেরও তাই। আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেটী আইন বলে, অপরাধী আর তার সাহায্যকারীর অপরাধ সমানই—সাজার ব্যবস্থাও এক। যাক্, ও-বিষয়ে আর কোন কথা চলবে না আমার সঙ্গে। কারণ, যা ব্যবস্থা তা আমার ঠিক করা হ'য়ে গেচে। প্রকাশের মৃত্যু হ'য়ে গেচে আমার চোখে—তাকে আর বাঁচাতে পারবে না কেউ কোন দিন শত চেষ্টায়ও।

অবিনাশ রায়ের দুই পুত্র ও দুই কন্যা। মণিকাই সকলের বড়, তার পরে প্রকাশ, তার পরে বিকাশ এবং বিকাশের ছোট হ'লো কণিকা। অবিনাশ রায়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বনলতার কোন বিষয়েই কোন' কথা বলবার অধিকার নেই এ-বাড়িতে—শুধু ঠাকুর-চাকরদের আদেশ করা ছাড়া। রান্না-বান্না খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে তার একাধিপত্য সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্য কোন ব্যাপারেই তার সামান্য কথাটি বলবার পর্যন্ত অধিকার নেই। আর বললে পরেই বিপদ। কর্ত্তা ব'লে উঠবেন, যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলতে যেও না। ছেলে-মেয়েরা ব'লে উঠবে, মা'কে নিয়ে ঐ বিপদ। বোঝা নেই, সোঝা নেই, ধাঁ ক'রে ব'লে বসবে একটা কথা।

বনলতা এ-ধরণের বহু কথা শুনে শুনে এখন নীরবে সব শুনতে শিখেচে এবং নিজেকে সব-কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখার ক্ষমতা আয়ত্ত ক'রে ফেলে বেশ শান্তিতেই আছে।

কিন্তু এত-বড় একটা ব্যাপারে কথা না বলতে পারার দুঃখ তাকে রীতিমত নির্জীব ক'রে তুলেছিল। মণিকাকে দূতরূপে তাই বনলতা চেয়েছিল কাজ করাতে, কিন্তু তা'তেও কোন ফল ফলেনি। ফলে, বাড়িময় একটা হতাশা বিরাজ করতে লাগলো। আর কোন দিকে যে কোন পথ আছে এমন ভরসা কারও মনেই জাগে না। মণিকার স্বামী পবিত্রকে খবর দিয়ে আনানো হ'য়েছিল, কিন্তু সে তার শ্বশুরের সামনে গিয়ে একটা প্রণাম ক'রে স'রে আসতেই বাধ্য হ'য়েছিল। কাজের কাজ তাকে দিয়েও কিছু হয়নি। কারণ, অবিনাশ রায়ের মূর্তিতে যে বলিষ্ঠ 'না' রূপায়িত হ'য়েছিল তা পবিত্র প্রথম দৃষ্টিতেই ধরতে পেরে নিজেকে আর খেলো ক'রে তুলতে চায়নি।

সব পথই যেন রুদ্ধ ক'রে দিয়ে অবিনাশ রায় অনড় পাষাণে রূপান্তরিত হ'য়ে গেচে। কোন কিছুতেই আর যেন তাঁকে টলাতে পারা যাবে না।

অবিনাশ রায় প্রথমটা কেমন যেন গুম্ মেরে গিচলেন, তার পরে নিজেকে ভাল ভাবে আয়ত্ত ক'রে নিয়ে আবার নিয়মিত গীতা ও বৈষ্ণব-পদাবলীতে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু বাড়ির আর সকলের মধ্যে দিবারাত্রি গুঞ্জন ও শলাপরামর্শ চলতে লাগলো নেপথ্যে। পথ কিন্তু কিছুই আবিষ্কার করা গেল না। প্রকাশকে এ-বাড়িতে ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা রইলো না আর কোন মতে। আশা সকলকে পরিত্যাগ করতেই হ'লো। বনলতা নিভৃতে চোখের জল ফেলে সে কথা স্বীকার করলো। আর সবাই চোখের জল না ফেললেও মুখের গুমোটে চাপতে পারলো না সে-কথা।

প্রকাশ বিয়ে করলো আরতিকে। কিন্তু আরতিকে বিয়ে করার মধ্যে কি যে আকর্ষণ ছিল তা ভেবে পায় না অনেকেই। কারণ, আরতি বিধবা এবং কায়স্থকন্যা। দেখতেও যে সুরূপা তা নয়—আর শিক্ষিতা ব'লে তার দাবীও কিছু নেই। প্রথম বিবাহের পূর্বে স্কুলে বছর তিন-চার বড় জোর সে পড়েছিল—তার বেশী নয়। তার পরে আরতির অর্থের দিকের অঙ্কও শূন্য। তার আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে যারা জীবিত তারা তার পূর্বের শ্বশুরবাড়িরই লোক—পিতৃকুল নিষ্প্রদীপ। সমস্ত দিক্ চিন্তা ক'রে প্রকাশের প্রতি সবারই কেমন যেন একটা করুণা দেখা দিল। শুধু এ-সব কোন কিছুই একবারও চিন্তা ক'রে দেখলেন না অবিনাশ রায়। কারণ, চিন্তাটা তাঁর চিরদিনই একবোখা—বিদ্রোহীর অপরাধ গুরুতর কি সামান্য, তা তাঁর চিন্তা ক'রে দেখবার কোন দরকার নেই। একমাত্র চিন্তা তাঁর শুধু যে, বিদ্রোহীর সাজা হওয়া চাই। গুরু হোক্ লঘু হোক্,—সাজা তার সমানই এবং তা'তে কুণ্ঠিত হবার কিছু নেই।

প্রকাশের সহপাঠী কমলাক্ষের মারফৎ প্রকাশের বিয়ের এবং প্রীতিভোজের সমস্ত খবরই বাড়ির সবাই পেল, শুধু কর্তা অবিনাশ রায়ের কানে তার কিছুই পৌছালো না। মাঝে মাঝে আরও অন্যান্য সব খবরও কমলাক্ষের মারফৎ তারা পেতে লাগলো। কিন্তু এ-সবে বনলতার মন ভরে না। সে চায় ছুটে গিয়ে দেখে আসতে একবার যে, প্রকাশ কি ভাবে চালাচ্ছে তার সংসার। এই দারুণ দুর্দিনে কত দিনই বা চলবে তার সংসার এই সামান্য পাঁচশো টাকায়। ও টাকা ফুরিয়ে গেলে তারা করবেই বা কি? প্রকাশ তার ভেতরে একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নেবে নিশ্চয়ই। আর যুদ্ধের বাজারে চাকরি পাওয়া তো সহজই। তা চালাক্-চতুর ছেলে আছে—ও কি আর তার ব্যবস্থা না ক'রে নেবে। বনলতা এইভাবে তবু সাহসে বুক বাঁধে। ওরা ফিরে আসুক—বেঁচে থাক্, সুখে থাক্। এইটুকু হ'লেই এখন অন্তর তার খুসি থাকতে পারে।

প্রকাশ চাকরি একটা জুটিয়ে নিল ঠিকই। কিন্তু মাস-তিনেক চাকরি করার পরেই হঠাৎ একদিন দুঃসংবাদ এলো কমলাক্ষেরই মারফৎ যে, প্রকাশ টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত। আজ সতেরো দিন চলেচে। কমলাক্ষ খবর অবশ্য আরও আগেই পেয়েছিল, কিন্তু ভরসা ক'রে প্রকাশের মা'র কাছে পৌছে দিতে পারেনি। পাছে বনলতা দেবী আবার উতলা হ'য়ে ওঠে। কারণ, কমলাক্ষ এত দিনে এ-কথা ভাল ভাবেই বুঝেছিল যে, তার উতলা হওয়া ভিন্ন অন্য-কোন সাহায্য পাঠাবার ক্ষমতা একেবারেই নেই। কাজেই অকারণে তাকে উতলা ক'রে তোলার কোন মানেই হয় না—কমলাক্ষ ভেবেছিল। কিন্তু রোগটা একটু খারাপের দিকে দাঁড়াতেই কমলাক্ষ খবর পৌছে না দিয়ে আর থাকতে পারেনি।

এবার বনলতা দেবী ছোট মেয়ে কণিকার সাহায্য নিতে হ'লো বাধ্য। নিজে অবশ্য সে কণিকার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো নীরব আবেদনের মত।

কণিকাই বললো, বাবা, বড়দা'র ভারি অসুখ—টাইফয়েড—আজ সতেরো দিন। টাকা-পয়সার অভাবে চিকিৎসাও তেমন না কি ভাল ভাবে হ'চ্ছে না।

অবিনাশ রায় খবরের কাগজের উপর ঝুঁকে বসেছিলেন, সহসা সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে বললেন, তা না হ'লে আমি কি করতে পারি?

কণিকা বললো, তুমি আর কিছু না করতে চাও, এই বিপদের সময় টাকা-পয়সাও তো কিছু সাহায্য পাঠাতে পারো বড়দা'কে? অন্ততঃ যাতে ওর চিকিৎসাটা হয়।

অবিনাশ রায় মৃদু একবার হেসে বললেন, না মা, তা আর পারিনে। প্রকাশ সম্বন্ধে বিচার শেষ ক'রে রায় পর্যন্ত দিয়ে ফেলা হ'য়েচে। ওর আর আপীল নেই আমার কাছে। ওপর আদালতে গিয়ে যা হবার হবে মা। বিচারে ভুল যদি ক'রে থাকি তো সেখানে ও খালাস পাবে। আমার হাতে আর কিছু নেই ও ব্যাপারের এবং যারা আমাকে অনুরোধ করবে তাদের আমি হতাশ করতে পারি বড় জোর।

কণিকা আবার বললো, তুমি অন্ততঃ একবার আমাদের অনুমতি দাও বড়দা'কে দেখে আসবার জন্যে। ভগবান না করুন, বড়দা'র যদি সত্যিই খারাপ কিছু একটা হয় তো সারা জীবন যে আমাদের এর জন্যে অনুতাপ করতে হবে।

অবিনাশ রায় বললেন, না, কিছু না। প্রকাশের জন্যে অনুতাপ করবার তো কিছু থাকতে পারে না কারও। কারণ, সে তো নিজেই বেছে নিয়েচে তার মরণের পথ—তাকে ঠেকাবে কে শুনি? যাক্, সেখানে তোমাদের কারও গিয়ে কাজ নেই। আর তাছাড়া ওর চিকিৎসার ভাবনা থেকে ও আমাদের অব্যাহতি দিয়েচে যখন, তখন তা আর গায়ে প'ড়ে কারও নেবার দরকার নেই।

কণিকা বললো, বাবা, এ তোমার অদ্ভুত রাগ। ভুল তো মানুষই করে, কিন্তু তা' বলে তার কি আর ক্ষমা নেই কোন কালে?

অবিনাশ রায় তাচ্ছিল্যভরে আবার একটু হেসে বললেন, অন্যত্র আছে হয়তো, কিন্তু আমার কাছে নেই।

এমন সময় বনলতা দেবী প্রায় আকুল হ'য়ে ব'লে উঠলো, তুমি কি পাষাণ! লোককে জেলে পাঠিয়ে পাঠিয়ে তোমার ভেতরের মানুষটা ম'রে গেচে একেবারে।

অবিনাশ রায় আবার হাসলেন। এবার একটু জোরেই হাসলেন, তার পরে বললেন, হয়তো ম'রেই গেচে, কিন্তু তা' ব'লে বংশমর্য্যাদাকে

তো মরতে দিতে পারি না। ব্যস্, এই আমার শেষ কথা—না, কোন সাহায্য, কোন সহানুভূতি, কিছুই কেউ করতে বা দেখাতে পারবে না প্রকাশকে। আর যদি তা কেউ করতে চাও আমার আদেশের বিরুদ্ধে তবে এ-বাড়িতে তার আর স্থান হবে না।

অগত্যা কণিকা ও বনলতা দেবীকে ব্যর্থ হ'য়ে বিদায় নিতেই হ'লো। মণিকাকে আবার খবর পাঠিয়ে আনা হ'লো, কিন্তু অবিনাশ রায় অবিগলিত শিলাই র'য়ে গেলেন। শেষে সকলে মিলে পরামর্শ ক'রে বিকাশকে পাঠিয়ে অবিনাশ রায়ের বাল্যবন্ধু ও কর্মজীবনের বন্ধু শ্রীমন্ত বাঁড়ুয্যেকে ডাকিয়ে আনিয়ে অবিনাশ রায়ের মত-পরিবর্তনের চেষ্টা করলো।

শ্রীমন্ত বাঁড়ুয্যে এসেই কিছুমাত্র ভূমিকা না ক'রে বলতে সুরু করলেন, এ তুই আরম্ভ করেছিস্ কি অবিনাশ? নিজে না হয় কিছুই না করলি, কিন্তু বাড়ির আর সবাইকে এ-ভাবে দম বন্ধ ক'রে মারবার দরকারটা কি শুনি? ছেলে মরো-মরো—মার কাছে ব্যাপারটা কি কঠিন একবার ভেবে দেখ তো? জাত যা যাবার সে গেচে—আর জাত যায় মানুষের একবারই—এখন আর ছেলের এ বিপদের সময় মা যদি গিয়ে একটু সাহায্য করে তাকে, তাতে আর নূতন ক'রে জাত যাবে না ঠিকই।

অবিনাশ রায় এবার কিন্তু হাসলেন না। শুধু আস্তে আস্তে বললেন, ওরা বুঝি শেষ পর্যন্ত তোকে পাকড়েচে মুরুব্বি। আমার মনে আছে, একবার একটা মাম্‌লায় এক আসামী এক মুরুব্বি পাক্‌ড়ে তদ্বিরের জন্যে পাঠায় আমার কাছে। আসামীর মামলা ছিল কিন্তু খালাসের। এই অপরাধেই তার সাজা দিলাম সে-বার।

শ্রীমন্ত বাঁড়ুয্যে অম্‌নি হেসে বললেন, সে তো হ'লো পরের বাছুর খোঁয়াড়ে পূরে দেয়া। কিন্তু এ যে নিজের কি না।

অবিনাশ রায় বললেন, নিজের ভাববার এখন আর কোন কারণ নেই। সম্পর্ক সে তো চুকিয়ে দিয়েই গেছে। কর্তব্য তাই নেই কিছু আমার প্রকাশের প্রতি। তার জীবনের প্রতি কোন মমতাই আজ আমার নেই।

শ্রীমন্ত বাঁড়ুয্যে বললেন, চিরদিনই তোর ঐ এক গোঁয়ার্তুমি। সাধ্য কি যে কারও তাকে টলায়। পৃথিবীটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল এই যুদ্ধে—অত-বড় গোঁড়া যে জাত ইংরেজ তাদেরও কি না ভোড্‌কা খেতে হ'লো গিয়ে রাশিয়ায়—কেঁদে কেঁদে বেড়াতে হ'লো এর-তার দোরে গিয়ে,—আর তুই কি না একটুও বদলালি না—আশ্চর্য!

অবিনাশ রায় এতক্ষণে মৃদু একবার হাসলেন। তার পরে বললেন, তা হবে—হয়তো লোকে আশ্চর্য হয় আমার কাণ্ড-কারখানা দেখে। কিন্তু সব মানুষ তো আর এক হ'তে পারে না, বা তাদের চিন্তাধারাও এক হ'তে পারে না। আমাকে তাই অনুরোধ করা বৃথা।

শ্রীমন্ত বাঁড়ুয্যে বললেন, সে আমি জানি। কিন্তু ভবিষ্যতে বিষ আরও বেড়ে উঠতে পারে—সমস্ত সংসারটাকে জ্বালিয়ে দিতে পারে, সেই ভয়েই শুধু আমার এই অনুরোধ করা। যাই হোক্, সব দিক্ চিন্তা করে আমি একবার দেখতে বলি। প্রকাশকে ঘরে ফিরিয়ে আনার কথা অবশ্য আমি বলি না। কিন্তু তার বিপদে সামান্য সাহায্য করাটা খুব কিছু একটা গর্হিত কাজ হ'তো ব'লে আমি মনে করি না।

অবিনাশ রায় নীরব রইলেন। শুধু তার চোখে-মুখে ফুটে রইলো একটা নির্বিকার দৃঢ়তা।

সে-দৃঢ়তা টললো না কিন্তু সে-দিনও—যে-দিন খবর এলো প্রকাশের মৃত্যুর। বাড়িময় জেগে উঠলো একটা সুনিবিড় অস্ফুট কান্না। ঘরে ঘরে জেগে রইলো বিষন্ন ও প্রচ্ছন্ন অভিমানের গুমোট্। কেউ যেন কারও মুখের দিকে পারে না চাইতে, কেউ যেন পারে না কাউকে একটা সামান্য সান্ত্বনার বাক্য শোনাতে।

অভিমান সবারই অবিনাশ রায়ের জিদের উপর। সামান্য একটু জিদের জন্য তাঁর এত-বড় একটা অবিচার যেন ঘটে গেল এই সংসারের উপর। ছেলের সামান্য একটা ত্রুটি কিছুতেই তিনি পারলেন না আর ক্ষমা করতে—যে জন্য প্রকাশকে দিতে হ'লো তার মূল্যবান্ প্রাণ এক রকম প্রায় বিনা চিকিৎসায় ও পরিচর্যায়। এত-বড় দুঃখ সাম্‌লে ওঠা আর কারও পক্ষে সম্ভব হ'লেও হয়তো সম্ভব হবে না কোন দিনই বনলতা দেবীর।

প্রকাশের মৃত্যু-সংবাদের তিন দিন পরে সে-বাড়িতে দেখা দিল প্রথম পরিবর্তন। অর্থাৎ, বিরাট্ অনড় অচল পাষাণ-স্তূপ ন'ড়ে উঠলেন। অবিনাশ রায় হলেন বিচলিত। সকালে উঠেই সন্ধ্যাহ্নিক শেষ ক'রে তিনি ডেকে পাঠালেন বিকাশকে। বিকাশ এসে দাঁড়ালো তাঁর সামনে।

অবিনাশ রায় বললেন, বিকাশ, তুই জানিস্ কি প্রকাশের বাসাটা বা তার ঠিকানা?

বিকাশ বললো, বাসার ঠিকানা আমার জানা নেই বটে, তবে কোন্ বাসাটা তা আমার ধারণা আছে, কারণ, দাদার বন্ধু কমলাক্ষদা'র মুখে আমি শুনেচি।

অবিনাশ রায় বললেন, তা'হলে তো বাসা খুঁজে বের করা খুব শক্ত হবে না তোর পক্ষে। তুই এক কাজ কর তা'হলে, এখুনি বেরিয়ে পড়, খোঁজ নিয়ে আয় বৌমা এখন কোথায় আছে। আর সাক্ষাৎ যদি তার পাস তো অমনি গাড়ী ভাড়া ক'রে এখানে নিয়ে আয়। হাজার হ'লেও সে প্রকাশের বউ—তাকে তো যেখানে-সেখানে ফেলে রাখা যায় না। এখুনি—আর দেরী করবার কিছু নেই—যা, বেরিয়ে পড় তা'হ'লে। আসতে না চাইলেও তাকে আনতে হবে যেমন ক'রে হো'ক—বুঝেচিস্?

আচ্ছা!—ব'লে বিকাশ বেরিয়ে গেল সে-ঘর থেকে।

খবর সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়লো সবার কানে। সকলেই হ'লো এ ব্যাপারে বিশেষ ভাবে বিচলিত। প্রকাশ বেঁচে থাকতে যেখানে জেগে ছিল শুধু বিষাক্ত বিরোধ, সেখানে আজ কিসে যে ফলবে সোনার ফসল তা' তো কেউ জানে না। আর সত্যই যদি আরতিকে এ-বাড়িতে এখন আনা সম্ভব হয় তো সে কি মূর্তিমতী হ'য়ে থাকবে না চিরদিন সবার চোখের সামনে সেই বিষাক্ত বিরোধের জ্বালাময়ী প্রতিশোধরূপে। সে মূর্তি কল্পনা করতে ভয় হয় আজ বনলতা দেবীর।

বনলতা দেবী তাই ব'লে ওঠে,—গিয়ে তোর কাজ নেই বিকাশ। সে আমি পারবো না কিছুতেই সইতে। আর কোন্ মুখে আমি চাইবো তার মুখের পানে এ জীবনে জানি না।

বিকাশ বললো, আমিও ভাল বুঝি না, কিন্তু বাবাকে আমি তা বলতে পারবো না। বাবার যখন খেয়াল হ'য়েচে একবার তখন তিনি বৌদিকে ঘরে এনে তবে ছাড়বেন নিশ্চয়—কেউ

জন্মাতে পারবে না কোন বাধা। তোমরা চেষ্টা ক'রে দেখো যদি পারো—আমার দ্বারা কিছু হবে না ও-সবের।

বনলতা দেবী বললো, আমি কি করবো বাবা, আমার কথা কি কেউ শোনে এ-বাড়ির?

বনলতা দেবী আবার কেঁদে উঠলো অঝোরে।

প্রতিবাদ হ'লো শেষ পর্যন্ত অবিনাশ রায়ের এই কার্যের এবং বনলতা দেবীই করলো কাঁদতে কাঁদতে—এ তুমি করচো কি? যা আমার গেচে তা আমি আর কোন দিনই ফিরে পাবো না। যা আমি পারিনি করতে প্রকাশের জন্যে তা আমি কোন দিনই পারবো না ভুলতে। তবে কিসের জন্যে এই আপদ এখন ঘরে আনা শুনি? আমার চোখের সামনে প্রকাশের চিতা চিরদিন জ্বালিয়ে না রাখলে তোমার চলবে না?

অবিনাশ রায় মৃদু হাসি হেসে বললেন, তোমরা মেয়েমানুষ—ব্যাপারটা তোমরা ঠিক বুঝবে না। দুঃখ-কষ্ট সংসারের চিরসাথী—তা'তে ভয় পেলে মানুষ তো কর্তব্যে পিছিয়ে যাবে, কিন্তু পিছিয়ে গেলে তো চলবে না। সেইখানে দরকার হয় পুরুষের মনের জোর আর সাহসের। সেই সাহস আর মনের জোর আমার আছে ব'লেই আমি অবিনাশ রায়।

বনলতা দেবী এবার ডুকরে কেঁদে উঠে বললো, তুমি পাষাণ।

অবিনাশ রায় আবার সেই অবজ্ঞার মৃদু হাসি হেসে বললেন, হ্যাঁ, আমি পাষাণ। আর পুরুষের পাষাণ হওয়াই উচিত। বৌমাকে যেমন ক'রে হোক্ এখন আমার ঘরে এনে তুলতেই হবে। এ তোমরা বুঝচো না—প্রকাশ বেঁচে থাক্ আর নেই থাক্—সে তো প্রকাশেরই বৌ—অর্থাৎ রায়-বংশের বৌ! সে যদি আবার বিয়ে করে আর কাউকে বা পথে পথে ঘুরে বেড়ায় মান-মর্যাদা খুইয়ে তো তা'তে কি কলঙ্ক হবে না রায়-বংশের? সেই কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাতে হবেই রায়-বংশকে আমার। কাজেই অনর্থক কান্নাকাটি ক'রে বাধা দিও না আমার কাজে। আমি শেষ হ'লে তোমাদের যার যা খুসি তোমরা ক'রো।

এর পরে আর কোন কথাই চলে না, বনলতা দেবী শুধু কান্না সম্বল ক'রে ফিরে যায় সেখান থেকে।

বিকাশ খবর নিয়ে ফিরে এলো—সে-বাসা ছেড়ে দিয়ে আরতি অন্যত্র গিয়ে কোথায় যেন উঠেচে এবং সেখানকার সঠিক খবর কেউই তাকে দিতে পারলো না।

অবিনাশ রায় খবর শুনে চিন্তিত হ'লেন। বললেন, বেশ, যে-বাসায় আগে ছিল সে-বাসায় আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে পারিস্ একবার?

বিকাশ বললো, তার চেয়ে কমলাক্ষদা'কে আমি বিকেলে আসবার জন্যে খবর দিয়েচি, সে এলে পরে তার সঙ্গে খোঁজ করতে বেরুলেই সব চেয়ে ভাল হয়। কারণ, দাদার সমস্ত খবরই কমলাক্ষদা' রাখতেন এবং শেষ দিনের খবরও জানেন।

—বেশ, তা'হ'লে কমলাক্ষ আসুক্। কিন্তু বিলম্ব না হ'য়ে যায়।

বিকালে কমলাক্ষ এলো এবং কমলাক্ষকে নিয়ে অবিনাশ রায় নিজেই বেরিয়ে পড়লেন। তার পরে আরতির এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ি থেকে খবর পেল আরতি এখন কোথায় আছে। আরও খবর পেল তারা যে, আরতি মিলিটারিতে কি-যেন একটা চাকরি নিয়েচে নতুন—সারা দিনই সেখানে থাকে এবং রাতে ফেরে কি ফেরে না তারও ঠিক নেই।

অবিনাশ রায় অবিলম্বে কমলাক্ষকে নিয়ে সেখানে গিয়ে পৌছলেন। একটি পাঁচ-ভাড়াটের টিনের বাড়িতে আরতি একখানি ঘর ভাড়া নিয়ে আছে। ঘরে তার তালা লাগানো।

পাশের ঘরের একটি লোকের মুখে তারা শুনতে পেল—আরতি মিলিটারিতে কাজ করে—সেই ভোরে বেরিয়ে যায় আর ফেরে কখনও আটটায়—কখনও আবার আরও বেশী রাতেও। তবে টাইম কিছু বাঁধাবাঁধি নেই ফেরার।

অবিনাশ রায় কমলাক্ষকে বললেন, তা বাবা একটু ব'সে যাওয়াই ভাল, দেখাটা আমার আজই হওয়া দরকার যে!

কিন্তু অপেক্ষা তাদের আর বেশীক্ষণ করতে হলো না। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আরতি এসে হাজির। খাঁকি শাড়ী ব্লাউজে আরতির মিলিটারি মূর্তি—বৈধব্যের চিহ্ন কোথাও কিছু ধরা পড়ে না। হাতে একটা ছোট ভ্যানিটি ব্যাগ—তাও খাঁকি ক্যান্‌ভাসের। কাঁধের শেষ সীমান্তে পিতলের অক্ষরে লেখা—W. A. C (1).

রাস্তাতেই তাদের দেখা। কমলাক্ষ পরিচয় করিয়ে দিতে আরতি কোন প্রশ্নের পূর্বেই অবিনাশ রায়ের পা স্পর্শ ক'রে সেখানেই প্রণাম জানালো।

অবিনাশ রায় বললেন, মা, তোমাকে আমি নিতে এসেচি যে। তোমাকে এখনি যেতে হবে আমার সঙ্গে।

আরতি বললো, তা' তো হ'তে পারে না আর।

অবিনাশ রায় সহসা চমকিত হ'য়ে বললেন, হ'তে পারে না মানে? আমি নিজে এসেচি তোমাকে নিতে; তবু তুমি যাবে না?

আরতি সংযত ভাবেই বললো, যাবো না নয়, যাবার আমার কোন অধিকার নেই।

অবিনাশ রায় বললেন, অধিকার আজ হ'য়েচে। তুমি রায়-বংশের বৌ—তোমার অন্যত্র কোথাও থাকা চলতে পারে না।

আরতি আবার সংযত কণ্ঠেই বললো, অধিকার আমি পারিনি সৃষ্টি করতে একদিন, কাজেই সে-অধিকার আজ আর কিছুতেই আমার সৃষ্টি হ'তে পারে না। যেখানে স্বামীর হাত ধ'রে পাইনি প্রবেশের পথ—সেখানে কপালের চিতা-চিহ্ন নিয়ে প্রবেশ করবার অধিকার আমি চাই না। আমাকে মার্জনা করবেন আপনি।

অবিনাশ রায় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, তবে কি আমার একাই ফিরতে হবে বৌমা? তুমিও হবে বিদ্রোহী?

আরতি বললো, আপনি বিচলিত হবেন না। এ আমার অভিমান নয় কারও প্রতি—আক্রোশ নয় কারও প্রতি—বা জেদ নয় কোন কিছু। এ আমার সেণ্টিমেণ্ট মাত্র—এর আমি সমাদর না ক'রে পারি না। কাজেই আমার অপরাধ নেবেন না।

ব'লে আরতি আরও একবার নত হ'য়ে প্রণাম জানালো।

অবিনাশ রায় সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কতক্ষণ—কোন কথাই বললেন না। তার পরে যখন ফেরবার জন্যে কমলাক্ষের হাত ধরলেন তখন মনে হ'লো, সামান্য একটা তুফান উঠে যেন আছড়ে তুলে দিয়ে গেল মাটির বুকে শিকড় শুদ্ধ বহু কালের সহনশীল নির্ভীক বৃদ্ধ অশ্বত্থ গাছটাকে।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ



আমাদের আজিকার কর্ত্তব্য

শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবী

নেতাজীর জন্মোৎসব—স্বাধীনতা দিবস—জাতীয় সপ্তাহ প্রভৃতি হয়ে গেল মহা আড়ম্বরে, আজও অনেক বাড়ীর ছাদ আলো করে আছে জাতীয় পতাকা, আমাদের আশার প্রতীক। স্বাধীনতার সংকল্প বাক্যও পড়েছে অনেকে। উত্তেজনার মাথায় অনেকে স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণও করেছে।

কিন্তু এবার উৎসবের উত্তেজনা থেমে গেছে। আপন ঘরে আপন অঙ্গের দিকে তাকাবার সময় এসেছে সকলেরই! গৃহস্থ-ঘরের নারী-পুরুষের প্রকাশ্যে কোন যোগাযোগ নেই স্বাধীনতা-সংগ্রামে। কিন্তু পরোক্ষে দেশ কি তাদের সাহায্য চায় না? দেশের প্রতিটি নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ের কাছে দেশ চায় সহানুভূতি—সাহায্য। সে সাহায্য জাতীয় পতাকা উড়িয়ে বা সভা-সমিতিতে যোগ দিয়ে নয়, স্কুল-কলেজ কামাই করে—জয় হিন্দ্, বন্দে মাতরম্ বলেও নয়। দেশ চায় তার শিল্পের উন্নতি—শিল্পীর জীবনের উপজীবিকা। দেশ চায় বিদেশী বর্জ্জন। আর গৃহস্থ নর-নারীর দ্বারাই তা সম্ভব। গৃহত্যাগী কর্ম্মীদের দ্বারা নয়। তাঁরা প্রয়োজন-শূন্য। প্রয়োজন যাদের আছে—দেশের শিল্প-শিল্পী তাদেরই মুখ চেয়ে বাঁচে, স্বাধীনতা আসে তাদেরই সহযোগিতায়।

ভারতে দেশীয় শিল্পের উন্নতির মন্থরতায় জন্য প্রধানত দায়ী পুরুষেরাই, কিন্তু অপরাধিনী নারীও কম নয়।

সখের খাতিরে হয়ত খদ্দর পরেছেন কেউ, কিন্তু ড্রেসিং টেবিলে তাঁর শোভা পাচ্ছে পণ্ডস্-ক্রীম, কটির প্রসাধন-সামগ্রী বা 'ইয়ার্ডলে'র স্নো-ক্রীম।

ছেলে-মেয়েদের গায়ে বিদেশী জামা পরাতে, মুখে বিদেশী পাউডার মাখাতে, বিলিতি দুধ খাওয়াতে আজও মায়েদের 'কিন্তু' আসে না। অনেকেরই হয়ত এ বিষয়ে খেয়াল নেই, আবার অনেকে খেয়াল করেই করে থাকেন। দেশী বর্জ্জন! 'অজন্তা স্নোতে মোম দেয়', 'মীরা স্নো মাখলে মুখ চড়-চড় করে', 'হিমানীটা একেবারে জল' —এ কথা মেয়েরাই বলে থাকেন।

'সব চাইতে ভাল হেজলিন স্নো, ওটীন ক্রীম, প্যারিসের সেন্ট'—এ কথাও শুনেছি নারীর মুখে। মিহি মেম-সাহেবী সুরে অভিজাত আধুনিক 'মেয়েকে বলতে শুনেছি—"লিপ-ষ্টিক্ দেশী ব্যবহার করে দেখেছি—খেবড়ে যায়; সেপটি-পিন হেয়ার-পিন ত দেশে তৈরী হয় না. আমরা বিলিতি না কিনে করব কি?' বিদেশী অনুকরণে সিগারেট্ খেতেও ভারতীয় মেয়েদের দেখা বিরল নয় আজ-কাল। দেখিনি —অন্য দেশীয়ের মত আমাদের দেশের লোকের স্বদেশের শিল্প-প্রীতি! ওদের মত আপনার দেশের শিল্পকে আমরা ভালোবাসতে শিখিনি আজও। তাই আজ এত বিজ্ঞানের উন্নতির যুগেও বিদেশী জিনিষের মত শুদ্ধ সুন্দর হোল না আমাদের দেশের শিল্প।

আজও ডাক্তারে দেখতে চান ওষুধের মেকার, পার্ক ডেভিস্ ওয়েলকাম বরোজে তাঁরা ভরসা রাখেন; সংশয় করেন বেঙ্গল ইমিউনিটি, বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি দেশীয় কোম্পানীর ওষুধে। এখনও নারী কেনে কাচের চুড়ি, টীনের বাঁশী, রবারের বল। শিক্ষিত ভদ্র-পরিবারের টেবিলে শোভা পায় জ্যাকবস্ ক্রীম-ক্র্যাকার, বিদেশী সস্, জ্যাম, জেলি। বিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তির ঘরে থাকে বিদেশী জিনিষের সমারোহ। জানি না, ভারতবাসীর এ মোহ—এ আত্মধ্বংসকারী ভুল কবে নিরসন হবে!

ভারতের সন্তান বুকের রক্ত দিয়ে তাদের মায়েদের বুকে জাগাতে চেয়েছে দেশপ্রেম, আত্ম-চেতনা। কিন্তু জাগছে কই ভারতের চেতনাহীনা মায়েরা? মায়েদের, মেয়েদের মুখ চেয়ে বাঁচতে চেষ্টা করছে এখনও আমাদের দেশের অগণিত বুভুক্ষু শিল্পী! আমার দেশের ধূলো-মাটীও আমার কাছে চন্দন তুল্য—পরদেশীর জিনিষ বিষ্ঠা!—এ চেতনা আমাদের মনে আজও কেন আসছে না? আমাদের দেশে দেশাত্মবোধ জাগাবার শিক্ষা ছিল না সত্য, কিন্তু আজও নেই—এ কথা তো বলা চলে না! কি সহর, কি পল্লীগ্রাম, কি ধনী, কি নির্ধন—সকলেরই কানে প্রাণে তো পৌঁছে গেছে আমাদের সন্তান-হত্যার কাহিনী.—নিরীহ নির্দ্দোষ ছাত্রদলনের কীর্ত্তি! কারো ত অজানা নেই।

যে দেশের লোকের নিষ্ঠুর আচরণে আজ খালি হয়ে গেল কত মায়ের কোল, সে দেশের শিল্পকে আজও আমরা ঘরে স্থান দিচ্ছি? এ কী মাতৃধর্ম্ম—নারীধর্ম্ম?

নাই বা হোল আমাদের ভারতের শিল্প নিখুঁত—নিখাদ, তবু সে তো আমাদের দেশের জিনিষ।

কালো ছেলেকে ভালোবাসতে মা কার্পণ্য করে না। কু-চরিত্র স্বামীকেও নারী প্রেমের অর্ঘ্য দিয়ে পূজো করে—কদাচারী পিতাও পেয়ে থাকেন কন্যার কাছে ভক্তি, সম্মান।

আর দেশ? দেশ আমাদের কাছে পিতার চাইতেও পূজনীয়, স্বামীর চেয়েও প্রিয়তম, সন্তানের অপেক্ষা স্নেহের ধন। দেশকে ভালবাসা—দেশীয় শিল্পকে ভালবাসাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। নারীর মন স্বতঃই স্নেহপ্রবণ, তাই নারীর স্নেহদৃষ্টিপাতের আশাই আজ দেশ সর্ব্বতোভাবে কামনা করে। এ-ও কি নারী আজ বোঝেনি?

আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও মেয়েদের কর্তব্য

মীরা চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে, এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের ক্ষতি হইয়াছে প্রচুর ও ব্যাপক। ভারতবাসী আশা করিয়াছিল, যুদ্ধ থামিলে আবার পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া আসিবে কিন্তু সে আশা সফল হইবার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না, যুদ্ধ থামিতে না থামিতেই ভারতবর্ষ জুড়িয়া আসন্ন দুর্ভিক্ষের ছায়া ঘনাইয়া উঠিয়াছে। ১৩৫০ সালের মন্বন্তরের জের মিটিবার পূর্ব্বেই ভারতের বুকের উপর মহা মন্বন্তরের পদধ্বনি শোনা যাইতেছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে ৫০ লক্ষ লোক রাস্তায়, পথে-ঘাটে কি ভাবে প্রাণ দিয়াছিল তাহা আজ সর্ব্বজনবিদিত। গত দুর্ভিক্ষের ফলে সোনার বাংলা শ্মশানে পরিণত হইয়াছে—বাঙ্গালী সমাজের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

গত দুর্ভিক্ষে—দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের বাঁচাইবার জন্য বহু ব্যবস্থা করা হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু ফল হয় নাই। সেই জন্য এইবারের আসন্ন দুর্ভিক্ষের জন্য এখন হইতে ভাবিয়া-চিন্তিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহাতে এইবারের দুর্ভিক্ষে আমরা দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের প্রাণরক্ষা করিতে পারি। সমবেত ভাবে চেষ্টা না করিলে এই দুর্ভিক্ষ হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

আজ আমি মেয়েদের কথাই বলিব। কারণ, মেয়েদের ভিতরেও বিরাট শক্তি আছে, আজ সেই শক্তিকে কাজে লাগাইবার দিন আসিয়াছে। গৃহ নারীর কেন্দ্র, এই গৃহের সমস্ত কাজ করিয়া গৃহে থাকিয়াও তাহাদের অনেক কিছু করিবার আছে। আমরা দেখিতে পাই, স্ত্রী-শিক্ষা পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশী বাড়িয়া গিয়াছে, শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে চলিবে না—তাহার সহিত আরও কিছু শিক্ষার প্রয়োজন আছে, তদ্ভিন্ন শিক্ষার সার্থকতা কোথায়?

যে সকল মেয়েরা বাহিরে বাহির হইবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা নানা ভাবে এই কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। নারীরা স্বভাবতঃ কোমলস্বভাবা, স্নেহশীলা ও কর্ত্তব্যপরায়ণা। অন্যের দুঃখে সহজেই তাঁহারা কাতর হইয়া পড়েন। এই স্নেহশীলা নারীর নিকট প্রয়োজনের সময় বাহির হইতে অনেক আবেদন-নিবেদন আসে। আর আমাদের নিজেদের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া থাকিলে চলিবে না, দিন আসিয়াছে—কর্ম্ম আমাদের আহ্বান করিতেছে, দেশ চায় দেশের কার্য্যে আমাদের সক্রিয় যোগদান। আমরা সমবেত ভাবে চেষ্টা করিব, সফল হইব কি না তাহা ভাবিবার সময় ইহা নহে, আপ্রাণ চেষ্টাই বড় কথা।

আমাদের চারি পার্শ্বের লোকের মুখে অন্ন থাকিবে না, বস্ত্র থাকিবে না, আর আমরা তাহাদেরই সম্মুখে নিশ্চিন্তে আরামে বাস করিব, ইহা হইতে পারে না। আমরা অবলা নারী, আমরা কি করিতে পারি, এই ভাবে অদৃষ্টকে দোষ দিলে চলিবে না। প্রত্যেক নারীর মধ্যে "মানুষ" আছে। মানুষের মনুষ্যত্বই সব চেয়ে বড় জিনিষ—"ধনের মানুষ মানুষ নয় মনের মানুষ মানুষ"। এই মনকে ত্যাগের জন্য, সেবার জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে।

এক সময়ে এই বাংলা দেশ আতিথ্যপরায়ণের জন্য বিশ্ব-বিখ্যাত ছিল। যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল রীতি-নীতিরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইংরেজ সরকারের শোষণের ফলে আজ ভারতবাসীর ঘরে অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, কেবল আছে মানুষের জীর্ণশীর্ণ কঙ্কাল আর রোগ। তবুও বৃটিশের দোষ দেখাইয়া আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না—এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

আমাদের দেশের মেয়েরা নিম্নলিখিত কাজগুলি যোগ্যতা অনুসারে করিতে পারেন—

১। এখনও দুর্ভিক্ষ ঠিক আসিয়া উপস্থিত হয় নাই, তবে আগতপ্রায়। এখন হইতেই যদি প্রত্যেক বাড়ীর গৃহিণীরা প্রত্যহ সকালে হাঁড়িতে চাল দিবার সময় অন্ততঃ পক্ষে এক মুষ্টি চাল একটি আলাদা পাত্রে তুলিয়া রাখেন, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে কিছু চাউল সঞ্চিত হইবে। কিন্তু এই সঞ্চিত চাউল কোন প্রকারেই তাঁহারা নিজেদের প্রয়োজনে খরচ করিবেন না। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের মুখে অন্ন তুলিয়া দিবার জন্য এ চাউল ব্যবহার করিতে হইবে।

২। এখনও আমরা রাস্তার ধারে ভাত-তরকারী ফেলিয়া দিতে দেখিতে পাই। যাহাতে এইরূপ অপচয় আর না ঘটে সেই জন্য এখন হইতেই সচেষ্ট হইতে হইবে। আমাদের এই অপচয় এখন আর কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। যে দেশের লোকেরা অন্নাভাবে মৃত্যুর দ্বারে দণ্ডায়মান সেই দেশে কোন কিছু অপচয় গুরুতর অপরাধ।

৩। আর একটি কথা, গতবারের দুর্ভিক্ষে বহু লোক ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা দেখিয়াছেন—খিচুড়ী খাওয়াইয়া লোকের প্রাণরক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। এই দুর্ভিক্ষে আমরা যদি ঠিক করিয়া লই যে, যে পরিবারবর্গের অবস্থা স্বচ্ছল এবং যে সমস্ত পরিবারে ১০।১২ জন লোক বাস করে, সেই পরিবার অন্ততঃ পক্ষে এক জন বুভুক্ষুকে এই দুর্ভিক্ষের সময় আশ্রয় দেন, তাহা হইলে বহু লোককে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করা যাইবে। অসুবিধা হয়ত অনেকেরই হইবে এবং হওয়াও স্বাভাবিক। অসুবিধার দোহাই দিলে কোন কর্ম্ম জগতে করা সম্ভব নয়। প্রয়োজনের খাতিরে এই অসুবিধাকে জয় করিতেই হইবে। গৃহিণী—যিনি সংসার চালান তিনি যদি সুষ্ঠুভাবে সংসার চালাইয়া উদ্বৃত্ত হইতে এক জন লোককে আহার দিয়া আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতে পারেন—সেটাও বড় কম কথা নয়—উহাও যে মস্ত বড় দেশসেবা ইহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

৪। আজ-কাল ছেলে-মেয়েরা সিনেমায় এবং নিজেদের বেশ-ভূষায় বহু পয়সা নষ্ট করিয়া থাকে। বাড়ীর মেয়েরা যদি ভাল ভাবে চেষ্টা করেন তাহা হইলে এই জিনিষটি বন্ধ করিতে পারেন। যে মেয়েরা বিলাসিতায় অর্থ নষ্ট করেন তাঁহাদের ভাবিতে হইবে পরাধীন জাতির বিলাসিতা করিবার অধিকার নাই। যাহাদের মা-বোনেরা অন্নাভাবে মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত, যে জাতের ছেলেমেয়েরা লজ্জা নিবারণ করিতে না পারিয়া গলায় দড়ি দেয়—সে জাতের আবার বিলাসিতা, কি? তাহাদের ঐ অর্থ যদি সঞ্চয় করিয়া রাখা হয় তাহা হইলে উহার দ্বারা দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের অনেক উপকার করা যাইবে।



পদোন্নতি

সুনীতি বসু

বর্ষা নামিয়াছে।

বাড়ীর ঠিক পাঁচিলের গায়ে একটা ডুমুর গাছ।

ডুমুর গাছটার ডালে বসিয়া একটা কাক ভিজিতেছে।

মনে মনে একটা হিসাব করিতেছি। ছোট খোকার একটা স্যুট করাইতে হইবে। আমার অনেক দিনের সখ। ভাবিতেছি টাকার কথা। টাকাটা কোন্ দিক্ হইতে তোলা যায়?

মুদীর কাছে দেনা নাই। নগদ পয়সা দিয়া র‍্যাশন আসে। ক্যাস-মেমো কর্ত্তাকে দিতে হয়। দুধের পাট নাই। বাড়ীতে চা কেউ খায় না, ছেলের জন্য ফুডের ব্যবস্থা। আপিস হইতে কর্ত্তা ওটা কণ্ট্রোল প্রাইসে পান। ছোটটি খায় ফুড, বড়টি সবই খায় এক এই দুর্ভাগিনী মাকে ছাড়া। পাঠকবর্গ ভাবিতে পারেন—তবে আর ভাবনা কি? জোগাড় করা কঠিন কিসে? আমার মুখের হাসিটা দেখিতে পাইতেছেন না। সুতরাং প্রকাশ করিয়া বলি। সখটা আমার, কিন্তু টান হাতটা কর্ত্তার। জল হয়তো পড়িলেও পড়িতে পারে, কিন্তু হাল আমলের ফুটা পয়সাও পড়িতে পড়িতে ভদ্রলোকের কড়ে আঙুলে আংটির মত আটকাইয়া যায়। ধার থাকিলে তো সহজ হইত ব্যাপারটা; বোঝার উপর শাকের আটিটা কোন খাতে চালাইয়া দিতাম। নাঃ—উপায় নাই!

ঝিপ ঝিপ বর্ষণের শব্দ ডুবাইয়া একখানা ছ্যাকরা গাড়ী চলিয়া গেল। কাকটা ভিজিতেছে।

ক্যাশ-বাক্সের চাবীর সন্ধান রাখি; কিন্তু হস্তগত করা সহজ নয়। চাবীর উপর তাঁহার চাপিয়া শোওয়া অভ্যাস; চাবীটা গায়ে না ফুটিলে ঘুম আসে না। উপায় নাই!

খোকা গিয়াছে পাশের বাড়ীতে, বড়টা ইস্কুলে। নিরবচ্ছিন্ন অবসর। পাড়ার লাইব্রেরীর চাঁদা কর্ত্তা বাকী ফেলিয়াছেন—তাগাদা দেওয়ায় ঝগড়া করিয়াছেন—তাহারা বই বন্ধ করিয়াছে। এই বর্ষণ-মুখর দুপুর বেলাটায় করি কি? ঘুমও আসিতেছে না, স্যুটের কাট—প্যাটার্ণ মাথায় ঘুরিতেছে।

মাথাও গরম হয় না যে খানিকটা কাঁদিব। দিব্য ভিজে ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছে।

ডুমুর গাছটার পাতাগুলি দুলিতেছে। কাকটা এবার উড়িবার চেষ্টা করিল। এ-ডাল হইতে ও-ডালে গিয়া বসিল। কাকটার গলার রংটা চক্‌চক্ করিতেছে। খোকার রঙ ফরসা, অমনি কাল রঙের স্যুটে চমৎকার মানাইবে।

এম্‌ব্রয়ডারী করিয়া বিক্রী করিলে কি হয়? কিন্তু—। ও-কাজটা ভাল জানি না, শিল্পকলাকুশলা নহি, তা ছাড়া সুতাও সস্তা নয়। বিক্রী করার হাঙ্গামা আছে। ম্যাট্রিক পাশটা করিয়াছি; টিউশনি করিলে হইতে পারে। বিজ্ঞাপন দিলে যোগাড় হইবে নিশ্চয়। কিন্তু—। বিজ্ঞাপন স্বামীর চোখে পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা। ঐ কলমটা তিনি নিয়মিত পড়িয়া থাকেন। কারণ এ আপিসের চাকরীতে তিনি সুখী নন; আজও একটাও পদোন্নতি হয় নাই।

দরজায় কড়া নড়িতেছে। বাঁচিলাম। নীচে গিয়া দরজা খুলিয়া দিলাম। ওদের ঝি খোকাকে দিয়া গেল। ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিছানায় শোয়াইয়া দিলাম। এক ঝলক হালকা রোদ আসিয়া খোকার মুখে পড়িল। ফরসা রঙ ঝলমল করিতেছে। সুন্দর যে হয় তাহাকে যে কোন রঙের পোষাকেই মানায়। যে কোন রঙের কাপড়ের স্যুট!

জুতার শব্দ উঠিতেছে। কৃপণ অসন্তুষ্ট মানুষটি।

স্বামী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মুখে প্রসন্ন হাসি। নূতন বটে। পিছন দিক্ হইতে সামনে আনিয়া ধরিলেন কাগজের একটা বাণ্ডিল। খবরের কাগজ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন উনান ধরাইবার জন্য। বাণ্ডিলটা খুলিতে খুলিতে বলিলেন—খোকার স্যুট করাবে বলেছিলে না? নাও।

এ কি ভাগ্য! প্যাকেটের মধ্যে খানিকটা গাঢ় লাল রঙের কাপড়।

হাসিয়া স্বামী বলিলেন—নতুন পোষ্ট পেয়েছি আজ। ক্লথ কমিটির মেম্বার হয়েছি।



—"হ্যালো, কংগ্রেস কলিং!"

আগষ্ট আন্দোলন-কালে নিষিদ্ধ বেতারের প্রথম প্রচারিকা-
কুমারী উষা মেটা

রাধারাণীকে রাজী করানো নিয়েই ভাবনা। সে নিঃসন্তান নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ ঝামেলা পোহাতে চাইলে তো? তবু সাহসে ভর করে বলেই ফেললে বিভূতি কথাটা। রাত্রে খেতে বসে ছাড়া আর কখন বলবে?

রাধারাণী দুধটা বেশী গরম করে ফেলে তাড়াতাড়ি একটা থালায় ঢেলে জুড়িয়ে দিচ্ছিল—বিভূতির প্রস্তাব শুনে মুখ তুলে শুধু বললে—কি বললে?

বাঁচা গেল! শুনতে পায়নি তাহলে রাধারাণী, বিভূতি ভাবলে আর কোনো কথা তুলে আগের কথাটা চাপা দিয়ে ফেলি, কিন্তু অমলের মুখখানা? দু'খানা ঘর খুঁজে বেড়ানোর জন্তে তার পাগলামী? দূর ছাই বলতেই বা কি?

গম্ভীর ভাবে বললে—বলছি—আমাদের নীচের ঘর দু'খানা তো পড়েই আছে—

—পড়ে থাকবে না তো কি ডানা মেলে উড়ে যাবে?

কিন্তু বিভূতির এতই বা ভয় কেন? বাড়ী কি রাধারাণীর? যা থাকে কপালে—বললে—ভাবছি ভাড়া দেব।

—ভাড়া দেবে? তা ভালো। কাবলীওলা না মোছলমান গুণ্ডা?

এই। এই জন্তেই রাধারাণীর সঙ্গে কথা কইতে ভয় করে বিভূতির। প্রতিবাদ করুক না? তার কাটান আছে, তর্ক করুক—যুক্তি আছে, রাগ করুক—তারও উত্তর আছে কিন্তু এ রকম ঠাণ্ডা-বিদ্রূপের কি ছাই আছে? থাকলেও বিভূতির জানা নেই, যা জানা আছে সেটা ভয় চাপা দিয়ে বিরক্তির ভাণ, সেই সুরেই বলে—

—গুণ্ডা? গুণ্ডার কথা ওঠে কেন? দিই তো অফিসের একটি ছোকরাকে—

—ওঃ, ব্যবস্থা হয়েই গেছে তা'হলে?

—না ঠিক হয়ে যায়নি। ছোকরাই দুঃখ করছিল অফিসে—'দু'খানা—নিদেন একখানা ঘরও যদি পাই,' কলকাতার সহর না কি চষে ফেলেছে ঘরের জন্তে।···এদিকে মুস্কিল এই সম্প্রতি মা গিয়েছেন মরে; কচি বৌটা একলা দেশে পড়ে আছে—থাকেই বা কি করে? ও তো হপ্তায় একবার বাড়ী যায়। আবা, শুনছি না কি এ অবস্থায় একলা থাকা ভালো নয়—পাড়াগাঁয়ের গাছপালা ঝোপ-জঙ্গলের বাড়ী—

এতক্ষণে রাধারাণী কথা কয়, সন্দিগ্ধ ভাবে বলে—এ অবস্থা! মানে?

—মানে আর কি, ইয়ে—ছেলে-পুলে হবে না কি বলছিল।

—তবে আর কি তোমার বাড়ীতে এনে তোলো।

বিভূতির ভাণ করা বিরক্তিতে আর কুলোয় না, কুণ্ঠিত ভাবে বলে—ছোকরার অস্থিরপণা দেখে সত্যি, মানে—কথা না দিয়ে থাকা যায় না। তবে ওই যত দিন না বাড়ী পায়—

রাধারাণীর দিক্ থেকে আর কোনো সাড়া পাওয়া যায় না।

অথচ পরদিন অফিসে গেলেই অমল ছোকরা নিশ্চয় ধরে বসবে—কি দাদা, বৌদিদিকে রাজী করাতে পারলেন?

দূর ছাই, বললেই হবে ঘর দু'খানা বিভূতি আগে দেখেনি, ছাদ দিয়ে জল পড়ছে···কিন্তু দোতলার নীচে একতলার ঘরে কি জল পড়ে?

পরদিন রাত্রে নিজেই হঠাৎ কথাটা পাড়লে রাধারাণী,—তোমার ভাড়াটে কবে থেকে আসছে?

বিভূতি উদাস ভাবে বলে—আসছে আর কই? বারণ করে দিলাম তো—

—কেন? বারণ করবার মানে? আমি বলেছি কিছু? যাতে তা'তে আমার বদনাম বার করাই কাজ তোমার। কি বললে শুনি? 'ভাই আমার তো খুবই ইচ্ছে ছিল—আমার স্ত্রীটিকেই রাজী করান কঠিন—জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ—'

বিভূতি হঠাৎ হেসে ফেলে—হ্যাঁ বলেছি ওই সব।

—তা তুমি পারো। নইলে বারণ করলে কি বলে? পোয়াতী



আশাপূর্ণা দেবী

বৌটা একলা গাছ-পালার ছায়া দেখে আৎকে মরুক ? মরুক না পাপের ভাগী তো রাধি বামনী, কি বল ?

বিভূতি সোৎসাহে বলে—তবে আসতে বলে দিই ?

—সে তো তুমি বলবেই, আমি বারণ করলেই শুনছো কি না ?

অতএব দিন কয়েক পরেই অমল দু'টো ট্রাঙ্ক একটা বালতি দেড়-খানা হ্যারিকেন একটা বেডিং আর একটি বৌ নিয়ে এসে হাজির হ'ল, বিভূতির নীচের তলার ঘর দু'খানা দখল করতে।

দু'খানা ঘর একটু দালান আর টিনের ঘের-দেওয়া সামান্য একটু রান্নার জায়গা, এই অমল আর অরুণার নতুন রাজ্য-পাট।

অরুণা যখন তখন বলে—আপনি না থাকলে যে আমার কি দশা হত দিদি, কোন কালে মরে ভূত হয়ে থাকতাম।

রাধারাণী হেসে ওর টুসটুসে গালটা টিপে দেয়—ব্যাকরণ ভুল করিস না, বল 'মরে পেত্নী হয়ে থাকতাম'।

—তা' যা বলেন—সত্যি এক এক দিন এমন ভয় করতো—আর রাগ হ'ত আপনার দেওরের ওপর উঃ। অথচ ওরই বা দোষ কি, বাড়ী খুঁজতে তো আর কসুর করেনি, সত্যি আপনার দয়া না পেলে—

—আচ্ছা খুব পাকামী হয়েছে—এখন আয় দিকিনি চুলটা বেঁধে দিই। মাথা করে রেখেছে দেখ না।···

প্রকাণ্ড চুল অরুণার, সত্যি ছেলেমানুষের পক্ষে সামলানোও দায়। এই চুলের কাঁড়ি নিয়ে নেড়ে-চেড়ে মনের মতো খোঁপা বেঁধে দিতে ভারী সুন্দর লাগে রাধারাণীর, সুদীর্ঘ অবসরের কিছুটা শূন্যতা যেন ভরে।

মাথা-সমান প্রকাণ্ড খোঁপাটি বেঁধে দিয়ে কাঁটা বিঁধতে বিঁধতে রাধারাণী মুচকে হেসে বলে—'পদ্মফুলে ভোমরা ভোলে খোঁপায় ভোলে বর'—আজ আর অমল ঠাকুরপোর রক্ষে নেই—এসেই মূর্চ্ছা।

—যাঃ। বলে উঠে পালায় অরুণা।

বেশ লাগে রাধারাণীর এই মিষ্ট লজ্জাটুকু।

বিভূতি মাঝে মাঝে অবাক্ হয়ে যায়।

ভেবেছিল রাধারাণীর বাক্যির চোটে দু'দিনেই অমলকে পাততাড়ি গুটোতে হবে—কিন্তু এ আবার কি উল্টো ব্যাপার ? রাধারাণীর স্বভাবটাই যে বদলে যেতে বসেছে, বিভূতির সঙ্গে সুধু আজ-কাল সোজা ভাষায় কথা কয় ! সব সময়ই বেশ হাসি-খুসি ভাব।

মেয়েদের বোঝা ভার।

রাধারাণীর গড়ে-দেওয়া ছোট্ট উনুনটিতে রান্না চাপিয়ে ব্যস্ত-হাতে এটা-সেটা কাজ করতে করতে অরুণা গলার সুর সামান্য খাটো করে ডাকে—ও দিদি, আপনার দেওর কি বলছে শুনুন ?

রাধারাণী খুন্তি নাড়া স্থগিত রেখে হেসে বলে—কি বলছে ?

—বলছে আপনার রান্নাঘরের গন্ধ না কি ওর মন উতলা করে তুলছে।

—হরেকেষ্ট ! আমি তো রাঁধছি সবে নিম-বেগুণ—

অমল ওদিক্ থেকে মহোৎসাহে বলে—ওই ওই তো—আমরা পাড়াগাঁয়ের ছেলে, ওই সব বিশুদ্ধ স্বদেশী রান্নার গন্ধে আকুল হয়ে উঠি আর আপনার আধুনিকা জা'টি কি বলে জানেন বৌদি—'নিম-বেগুণ আবার মানুষে খায় ?'

রাধারাণী হাসতে হাসতে একটা রেকাবিতে খানিকটা নিম-বেগুণ ভাজা আর ঝালের মাছ এনে অমলের জন্য পাতা আসনের সামনে নামিয়ে রেখে বলে—'তা'হলে এই পৌরাণিকার হাতের নিমই খাও।'

—আর ওটা কি ? ইলিশের ঝাল ? সর্ষে বাটা দিয়েছেন তো ? ···আড়-চোখে একবার অরুণার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলে —আমার ভাত ক'টা এই বেলা দেওয়া হোক, নইলে ও ইলিশ মাছ—বুঝলেন বৌদি, আপনি পিছন ফিরলেই একদম হাওয়া। একে ইলিশ, তায় সর্ষে বাটা—আঃ ও আর দেখতে হবে না।

—হ্যাঁ—সব জিনিষ অমনি তোমার হাওয়া হয়ে উড়ে যায় ! দিদি, দেখছেন তো বদনাম দেওয়া ?

—দেখছি তো।

রাধারাণী হাসে—দিন-রাত পিঠোপিঠির মত ঝগড়া করিস কেন বলতো দু'জনে ? বিয়ের সময় বুঝি কুষ্ঠী মেলানো হয়নি ?

অমল চক্ষু বিস্ফারিত করে বলে—হয়নি আবার ও বাবা ! তা হলে শুনুন বৌদি, বিয়ের আগে—দুই বর-কনের কুষ্ঠী নিয়ে গার্জ্জেনদের কী দুশ্চিন্তা, ওর রাক্ষসগণ আমার রাক্ষসগণ, ওর কর্কট রাশি আমার বৃশ্চিক রাশি, ওর ক্ষত্রিয় বর্ণ আমার—

ওদিকে বঁটি কাৎ করে রেখে অরুণা হেসে কুটিকুটি হয়—এত মিথ্যে কথাও বানাতে পারে উঃ। সব বাজে কথা দিদি, মা-বাপ-মরা মেয়ে আমি—কুষ্ঠীই ছিল না আমার।

—হতে পারে। কিন্তু রাক্ষসগণ আর কর্কট রাশি ছাড়া ওর আর কিছু হওয়া সম্ভব ? বলুন তো বৌদি ?

* * * *

দুপুর বেলা অরুণার সামনে পাথরবাটিটা নামিয়ে দিয়ে রাধারাণী সস্নেহে অরুণার ঈষৎ পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে কোমল ভাবে বলে—এই আচারটুকু খা দিকিন অরুণা, অরুচির মুখে ভালো লাগবে অখন ! ওবেলা তো ভাত ক'টা মোটে খেতে পারিসনি।

অরুণা সোৎসাহে পাথরবাটিটা তুলে নিয়ে চেখে চেখে খায় আর বলে—আর জন্মে তুমি আমার সত্যি দিদি ছিলে দিদি, নইলে মনের কথাটি কি করে টের পাও ? ঠিক এখুনি মুখটা এমন করছিল—

রাধারাণী পা ছড়িয়ে বসে পড়ে বলে—আর জন্মে কেন না ? এ জন্মেই বা নয় কেন ? পাতানো সম্পর্ক কি মিথ্যে ? অমল ঠাকুরপোর সঙ্গেও তো তোর পাতানো সম্পর্ক।

—বাবা, দিদির এত কথাও জোগায়। সত্যি দিদি আমার নিজের মার পেটের বোনই তো রয়েছে এই কলকাতায়, শ্যামবাজারে বুঝি—তা মরে গেলে কি খোঁজ নেয় ? দিদির কথা বলছি—সেই যে সে-দিন জামাইবাবু এসেছিলেন ?

তা' দিদিকে এক দিন আনতে বললি না কেন ?

—বলিনি আবার ? ওঁদের হ'চ্ছে বনেদী চাল—বাস-ট্রামে চড়তে দেন না, এদিকে গাড়ীভাড়াও সাংঘাতিক, দিতে নারাজ।

—অমন বনেদী চালের কাঁথায় আগুন।

রাধারাণী বিরক্ত ভাবে বলে—এক-একটা বাড়ীতে ওই বাতিক আছে, আরে বাবু গাড়ী-জুড়ি থাকলে তবে বনেদী চাল মানায়,

নইলে যর মেয়েমানুষরা দম আটকে। জীবনান্তে একবার আত্মীয়-স্বজনের মুখ দেখতে পাবে না।···নিবি আর একটু? বেশী দিতে ভয় করে অম্বল-টম্বল না হয়।

স্নেহ করবার আদর করবার একটা সুযোগ পেয়ে রাধারাণী যেন বেঁচেছে। শুধুই কি স্নেহ পরিতৃপ্তি? আত্মতৃপ্তিই কি কিছু নেই? নিজে সে বন্ধ্যা, তবু আসন্ন মাতৃত্বের কোনো রহস্যই তার অজ্ঞাত নয়, এটুকু জানানোর মধ্যে কিছু সুখ আছে বৈ কি।

তাই উঠতে-বসতে খেতে-শুতে অরুণাকে সাবধান করতে থাকে, উপদেশেরও অন্ত নেই।

অমল বলে—হয়েছে হয়েছে—বৌদির জাটি কি যেন এক রাজ্য-পদ পেয়েছে—বলি আমি কি একেবারেই গৌণ? রাজ্য-প্রতিষ্ঠার মূলে কি এ হতভাগ্যের কোনো পার্টই ছিল না?

অরুণা আরক্ত মুখে চাপা গলায়—অসভ্য—বলে উঠে যায়।

কিন্তু অমল ঐ রকমই, তার হাসি-ঠাট্টার চোটে অস্থির হ'তে হয় তবু ভারী ভালো লাগে। ও যে রাধারাণীর সত্যি কেউ নয় এ কথা এখন নিজেই আর বিশ্বাস করতে পারে না রাধারাণী। তার না ছিল ছোট ভাই, না আছে দেওর, ছেলে-পুলেও হয়নি—সূক্ষ্ম বুদ্ধিহীন ভালো মানুষ স্বামীটিকে নিয়ে একলা সংসার করতে করতে অনুভূতির ধারগুলো হয়ে গিয়েছিল ভোঁতা, প্রকৃতিতে এসে গিয়েছিল কঠোর রুক্ষতা, এত দিনে শুকনো গাছে যেন জল পড়েছে।

বিভূতি সূক্ষ্ম বুদ্ধিহীন। তবু এ পরিবর্ত্তন তারও চোখ এড়ায় না। রাধারাণীকে যে এখন সর্ব্বদা ভয় করে চলতে হয় না এটা কি আর চোখ এড়িয়ে যাবার জিনিষ? সেও ঠাট্টা করবার চেষ্টা করে, বলে—ব্যাপার কি বল তো? তোমার যে আবার নব-যৌবন ফিরে এলো দেখছি, বলি আপ-টু-ডেট দেওরটির প্রেমে-ট্রেমে পড়ে যাওনি তো?

রাধারাণী দমবার মেয়ে নয়, সঙ্গে সঙ্গে বলে—আশ্চর্য্য কি? পড়তে কতক্ষণ? বরং না পড়াই আশ্চর্য্য, গুণ কত তার হিসেব রাখো? তুমি পারো—হপ্তায় হপ্তায় বায়োস্কোপ দেখাতে? বাজারে যা নেই তাই জোগাড় করতে? ব্ল্যাক মার্কেটের চিনি এনে দিতে? এগারো হাত মিলের শাড়ী খুঁজে বার করতে?

—থাক থাক আর শুনিও না, ওর কিছুই আমি পারি না স্বীকার করছি, কিন্তু একটা জিনিষ—যা অমল পারেনি—আমি পারি—

কি?

—এই, বাড়ী জোগাড় করতে?

—ইঃ। সে যাই আমি দিলাম তাই।

এখন চারটি মানুষের সংসার-চক্র আবর্ত্তিত হচ্ছে একটি ভাবী মানুষকে কেন্দ্র করে।···রান্না-বান্না করতে কষ্ট হয় বলে অরুণাকে রাধারাণী ছুটি দিয়েছে, অমলের টিনের ঘরের মধ্যে হাঁড়ি-কুঁড়ি নিষ্কর্ম্মা, রাধারাণীর রান্নাঘরে ঘটা।

বিভূতির লক্ষ্য কম, তবু এক দিন বলে—আচ্ছা এ-ভাবে যে চালাচ্ছো হিসেব-পত্র কি রকম হচ্ছে?

রাধারাণী বিরক্ত হয়ে বলে—সে তুমি কষো গে বসে, আমি অত হিসেব-নিকেশের ধার ধারি না। আপনার লোকের সঙ্গে আবার হিসেব! মাসী-পিসীর পেট থেকে না পড়লে সে আর আপনার হয় না কেমন?···

আসল কথা—অমলের টাকাটা সে জমাচ্ছে অরুণাকে সাধের সময় চুড়ি গড়িয়ে দেবে বলে।

চুড়িতে অরুণার আপত্তি নেই, কিন্তু পরের কাছে এতটা নিতে সে প্রস্তুত নয়, ঘরের ভিতর অমলের ওপর তম্বি করে। বলে—ও আবার কি, উনি দিচ্ছেন বলেই নিতে হবে? নিজেদের একটা মান-সম্ভ্রম নেই?

অমল স্বভাবসিদ্ধ হাসির সঙ্গে বলে—সম্ভ্রম আছে বলেই তো খাই-খরচা দিতে যেতে পারি না।

—তা বলে এমনি করে পরের ঘাড়ের ওপর দিয়ে চালাতে হবে?

—পর ভাবলেই পর।

—কিন্তু উনি না হয় খামখেয়ালি, বিভূতি বাবু কি মনে করবেন?

—সে ওঁরা কর্ত্তা-গিন্নী বুঝবেন, কিন্তু দাদাকে তুমি বিভূতি বাবু বল কেন অরুণা? তোমাদের সেই 'বটঠাকুরপো' না কি যে বলতে হয় ভাসুরকে—

অরুণা ঈষৎ অপ্রস্তুতের ভঙ্গীতে বলে—দিদির সামনে বলি, সত্যি তো আর ভাসুর নয় যে নাম করতে নেই?

—তোমাদের সত্যি-মিথ্যের জ্ঞানটা কি প্রখর তাই ভাবি।

দোতলা থেকে রাধারাণী ডাকে—ও ঠাকুরপো একবার ওপরে এসো।

অমল দাড়ি কামাচ্ছে, বলে—কি বলছো?

—এসোই না একবার, অত কৈফিয়ৎ দিতে পারি না।

অমল সাজ-সরঞ্জামগুলো গুটিয়ে তুলতে তুলতে বেশ নিরীহ ভাবে বলে—কি করে যাই বলো তো···এ-দিকে এক জন কিছুতেই ছাড়ছে না—

এইগুলো অরুণা দেখতে পারে না, রেগে আগুন হয়ে ওঠে। 'অসভ্য' 'ফাজিল কোথাকার' প্রভৃতি শ্রদ্ধাসূচক সম্বোধন করতেও ছাড়ে না স্বামীকে। অমল আর রাধারাণী যে এক-বয়সী, মুখের আট-ঘাট যে ও'দের কম, এইটাই ওর দু'চক্ষের বিষ।

রাধারাণী তবু নাছোড়, বলে—ভালো চাও তো এসো বলছি ঠাকুরপো, নইলে দেখাবো মজা।

—দেখার পক্ষে ওর চাইতে ভালো জিনিষ আর কি আছে?

—অমল গালে স্নো ঘষতে ঘষতে এসে দাঁড়ায়।

রাধারাণী তখন একখানা ঘর সম্পূর্ণ খালি করবার সাধনায় লেগেছে, একটা ভারী ট্রাঙ্ক নিয়েই দুর্ভাবনা তাই অমলকে ডাকাডাকি।

—এ আবার কি? হঠাৎ এ জিনিষগুলো কি দোষ করলো?

—দোষ আবার কি, ঘরটা খালি করতে হবে না?

—কেন বল তো?

—জানো না, ন্যাকা! এই বর্ষাকালে ওই আঁতুড়ে পোয়াতীকে কি আমি নীচের ঘরে ফেলে রাখবো না কি?

—এই ঘরটাকে তুমি আঁতুড় করবে?

অমল সত্যিই একটু হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে, বাড়ীর মধ্যে এইটাই সবচেয়ে ভালো ঘর।

রাধারাণী কৌতুকে চোখ নাচিয়ে বলে—গোঁয়োমী করে আঁতুড় বললেই আঁতুড়, আমি বলবো এটি অনাগত শিশুদেবতার ভাবী জন্মাগার।

—কবিত্বর চূড়ান্ত! কিন্তু এটা সত্যি বড্ড অন্যায় হচ্ছে বৌদি, দাদার ওপর বড্ড বেশী অত্যাচার করা। বৃদ্ধ ভদ্রলোক নির্ঘাটে এক পাশে পড়ে আছেন—তাঁকে কোণঠাসা করে কানের কাছে এ-সব কি ভূতের নেত্য! না, বৌদি না, এত ঝামেলা পোহাতে হলে দাদা আর আমার মুখ দেখবেন না।

—ওই ভয়ে পিপঁড়ের গর্ত্তে সেঁধোও। দাদার সঙ্গে মুখ-দেখাদেখি হয় কখন লক্ষ্মণ ভ্রাদারের, তা-ও তো দেখি না।

অমল সেই ভারী ট্রাঙ্কটার উপর বসে পড়ে হাসতে হাসতে বলে—সত্যি বৌদি, দাদাকে দেখলেই আমি পাশ কাটাই, সামনে পড়তে চাই না! আমার কেমন ভয় করে, হাজার হোক অফিসের ওপর-ওলা কি না।

কথায় কথায় অফিসের গল্প জমে ওঠে—হাতের কাজ কারোরই এগোয় না…এক সময় ভারী শরীর নিয়েও অরুণা পা টিপে-টিপে উপরে উঠে এসে উঁকি মেরে চলে যায়।

যায় বটে কিন্তু যাবার খবরটা গোপন রাখতে পারে না। সিঁড়ির ধাপে ধাপে তার চিহ্ন ধরা পড়ে।

—এই রে—ছুঁড়ি রেগে মরছে, আহা, ওকে খেতে দিয়ে আসিনি—পোয়াতী মানুষ ক্ষিদে পেয়েছে, ট্রাঙ্কটা আর বড় সেল্ফ্টা ঠাকুরপো সরাও তুমি, আমি আসছি—ওকে ভাত দিয়ে আসি।

কিন্তু অরুণার সে-দিন আদৌ ক্ষিদেই নেই, ভাতই খায় না।

নির্ম্মল আকাশের কোথায় যেন একটু মেঘ জমে।……

কিন্তু চাঁদও যে উঠলো আকাশে।

সত্যি, অরুণার ছেলেটি যেন পূর্ণিমার চাঁদের টুক্‌রো।

এত সুখ রাখবে কোথায় রাধারাণী, এত রূপ দেখাবে কাকে। বিভূতিকে বলে—খবরদার বলছি অমনি হাতে মাণিক দেখতে পাবে না, গিনি বার করো। জ্যেঠা হওয়া অমনি নয়।…ঠাকুরপো, তোমার একখানা গিনিতে চলবে না—গিনির মালা চাই।

বিভূতি রাধারাণীর এ-রকম বেয়াড়া আবদারে মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হয়—খপ্ করে বলে—আর নিজে তো বেশ অমনি অমনি জ্যেঠি হয়ে বসলে—

—ইস্ তাই বই কি, খোকনের জন্তে আমি অমৃতি পাকের বালা গড়িয়ে রাখিনি যেন।

মেঘটা যেন উড়েছে…আকাশের মুখ পরিষ্কার…অরুণার মুখে 'দিদি' ছাড়া কথা নেই। সংসার সামলে চব্বিশ ঘণ্টা ওর ফরমাস খাটতে রাধারাণী নাজেহাল।

তবু ওই ওর সুখ।

খবর পেয়ে এক দিন অরুণার নিজের দিদি এলেন ছেলে দেখতে।…

আঁতুড়ের দোরে চেপে বসে দু'টো টাকা ছুঁড়ে দিয়ে এক-নজরে ছেলে দেখে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন—ওই বুঝি সেই বাড়িওলী মাগী?

অরুণা অপ্রতিভ ভাবে বলে—'মাগী' আবার কি? ছিঃ!

—মাগী না তো 'মিনসে' না কি, তোর এক কথা। বলি লোক কেমন?

অরুণা উচ্ছ্বসিত সুরে বলে—চমৎকার! সত্যি পৃথিবীতে যে এমন মানুষ থাকে এ আমাদের ধারণা ছিল না, মাকে মনে পড়ে না, মা থাকলেও এমন যত্ন করতে পারতেন কি না সন্দেহ।

বোনের কথা আর তোলে না।

তোলে না কিন্তু বোনের গায়ে লাগে। নীরস স্বরে বলে—তিন কুলে কেউ নেই, বাঁজা মাগী যা করছে শোভা পাচ্ছে, আমার মতন শ্বশুর ভাসুর শাশুড়ী ননদ নিয়ে রাবণের পুরীতে ঘর করতে হলে বুঝতো। তবে যাই বলিস বাবু, মাগী বড় বেহায়া।…ওই তো দেখে এলাম নীচে…অমলকে খেতে দিয়েছে—আর মাথার কাপড় খুলে বসে কী হাসি-গল্পর ঘটা। বাবা আমার নিজের দেওরদের সঙ্গে আমি এখনো হাসি-গল্প দূরের কথা, কথাই কই না।

—কেন বলো তো?

অরুণার স্বরে কৌতূহল।

—তোর ভগিনীপতি ভালোবাসেন না—বলেন—'কী দরকার অত হুল্লোড় করবার, মানুষের মন না মতিভ্রম, যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো।'

এত ভালোটা অরুণা ঠিক বরদাস্ত করতে পারে না, তবু নীচের দালানের একটি ছবি কেবলই তার মনের মধ্যে ছায়া ফেলতে থাকে।

কিসের সেই হাসি-গল্প?

অত হাসির কী ব্যাপার হয়েছে আজ?

হয়তো খোকার কথা নিয়েই—কিন্তু—

যোগের হিসেবে ফলটা বসলো শূন্য, 'কিন্তু' রইল হাতে।

আনমনা ভাবে বলে—তুমি কার সঙ্গে এলে? কই জামাই-বাবুকে দেখছি না?

—দূর, সে থাকলে কি আর আসা হ'ত? অফিসের কাজে পাটনা গেছে, ভাসুর গিয়েছিলেন শাশুড়ীকে নিয়ে পুরী, তাই না এত সাহস, ভাগ্নের সঙ্গে এলাম ট্রামে। তাই তো বলছিলাম—ক'আনা পয়সাই বা খরচ, আর গাড়ীতে আসতে আট-দশ টাকা। মনে করছি যে দু'মাস ওরা না আসে, আসবো মাঝে মাঝে। চোখের আড়ালে থাকলেই পর, নইলে এখন পাতানো দিদি হ'ল মস্ত আপনার।

তা' তিনি কথা রাখেন, মাঝে মাঝে আসতে থাকেন।…

এর মধ্যে একটা যা ঘটনা ঘটলো অপ্রত্যাশিত।

বিকেল বেলা…অরুণা বাদলা হাওয়ায় নীচে না নেমে ছেলে নিয়ে উপরের ঘরে বসে আছে, রাধারাণী রান্নায় ব্যস্ত। অরুণা এখনো ছুটিতে আছে, হাঁড়ি আর আলাদা হয়নি। অমল এক গঙ্গা ভিজে এসে চীৎকার করতে করতে ঢোকে—বৌদি বৌদি, সাংঘাতিক সুখবর।

—তার মানে ভিজে রসগোল্লা হয়েছো এই তো? শিগ্‌গির ছেড়ে ফেলো কাপড়-জামা।

বলে রাধারাণী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

গায়ের গেঞ্জিটা খুলে মাথা মুছতে মুছতে অমল তার-স্বরে বলে—আরে দূর, এখন নিমোনিয়া হয়ে মলেও ক্ষতি নেই।

—আহা, কথার ছিরি দেখ।

—সত্যি বৌদি, তোমার জায়ের ভবিষ্যৎ সংস্থান এক রকম হয়ে থাকলো—লটারীর টিকিটে নাম উঠেছে।

রাধারাণী অবশ্য বিশ্বাস করে না, অমলের পরিহাস-প্রবণতার পরিচয় তো সে দণ্ডে-দণ্ডেই পাচ্ছে, হেসে বলে—এত ইয়ার্কিও জানো, রোজ এক-একটা নতুন ধুয়ো নিয়ে বাড়ী ঢোকা চাই বাবাঃ। ভিজে এসে একটু জ্ঞান নেই, নাও নাও শিগ্‌গির ছাড়ো ও-সব, দু'পেয়ালা চা পাবে আজ।

অমল উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে—বিশ্বাস হচ্ছে না? সত্যি সত্যি সত্যি, এই তিন সত্যি করলাম। অবিশ্যি এ হতভাগ্যের ভাগ্যে নয়, বারে বারে নিজের নামে ফেলিওর হয়ে ওর নামে করেছিলাম বৌদি বুঝলে? ব্যাস্, এক-দম কেল্লা ফতে!

রাধারাণী সন্দিগ্ধ ভাবে বলে—টিকিটে নাম উঠলেই যে দেদার টাকা পাওয়া যায় তারও কোনো মানে নেই কিন্তু। আমার এক পিসেমশাই, একবার অমনি টিকিটে নাম উঠেছে বলে "পঞ্চাশ হাজার পাবো চল্লিশ হাজার পাবো" খুব হৈ-চৈ করলেন—কালীঘাটে পূজো দেওয়া—সত্যনারায়ণের সিন্নি মানা—সে সব কত কাণ্ড, ও-মা, তার পরে সব ফরসা! কুল্লে হাজার দেড়েক টাকা পেলেন বুঝি শেষটা।

অমল বুকের ওপর হাত চাপড়ে গম্ভীর ভাবে বলে—এ শর্ম্মাকে তেমন বেকুব পাওনি বুঝলে মহাশয়া? নগদ করকরে ষোলটি হাজার টাকা গুণে নিয়ে—একটি লোভার্ত্ত মাড়োয়ারী-পুঙ্গবের হাতে টিকিট-খানি সমর্পণ করলাম।

—সে টিকিটটা কিনে নিল?

—নেবে না? ওই তো পেশা ওদের।

—আচ্ছা, আর যদি ফার্ষ্ট প্রাইজ পেতে—কত টাকা হ'ত তোমার।

—সে হয় তো অনেক হ'ত, কিন্তু বেশী আশা করতে নেই, বেড়ালের ভাগ্যে ক'বার শিকে ছেঁড়ে? এ বাবা দিব্যি নগদ টাকাটি এনে ঘরে তুললাম, ব্যস।

অবিশ্বাসের যখন সত্যই কিছু থাকে না, তখন রাধারাণী ছুটে উপরে যায় অরুণাকে খবরটা দিতে—কিন্তু অরুণা বোধ করি বাদলা হাওয়ার প্রভাবে অসময়ে পড়েছে ঘুমিয়ে, আপাদ-মস্তক একটা মোটা চাদরে ঢাকা।

বার বার ডেকেও সাড়া আদায় করতে পারে না রাধারাণী।

অমল এসে মুখের চাদরটা খুলে দিয়ে অবাক্ হয়ে বলে—বৌদি এত ডাকলেন—উত্তর দিলে না যে?

—আমার খুসি—বলে অরুণা পাশ ফিরে শোয়।

—তোমার খুসির বহরটা মন্দ নয়, রাগ হয়েছে বুঝি? কিন্তু এমন একটি খবর শোনাতে পারি, মহারাণীর মেজাজটি সপ্তম থেকে একেবারে খাদে নেবে আসবে।···আচ্ছা বল দিকিনি কি হ'তে পারে?

অরুণা নিরুত্তর।

—বল না, দেখি তোমার অনুমানশক্তির বাহাদুরী, সে একেবারে আশাতীত কল্পনাতীত স্বপ্নাতীত বললেও চলে···পারলে না তো? বলি···বলি তা'হলে?

—ঝাঁটা মারি আমি অমন সুখবরের মুখে, যেখানে বলে চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়েছে, আগে-ভাগে সেখানে বলেছ তো? তা'হলেই হ'ল—বলে আর একবার চাদরখানা টেনে মুখে ঢাকা দেয় অরুণা।

কিন্তু এত কথা রাধারাণীর জানার কথা নয়।

সে নিত্যকার মতই নীচের কাজ সেরে ছুটে ছুটে এসে খোকনকে দুধ খাওয়াতে বসে, ছেলে নিয়ে নাচাতে নাচাতে বলে—ঠাকুরপোর কাছে শুনেছিস্ তো সব? খোকন আমাদের ভারী পয়মন্ত, কি বলিস? খোকনের পয় না হলে—কই এত দিন কি কিছু হয়েছিল? সত্যি এমন আশ্চর্য্যি লাগছে—বিশ্বাসই হচ্ছে না যেন, সত্যি যে আবার লটারীতে টাকা পাওয়া যায়—এমনি নিজের লোকেদের নামে প্রাইজ ওঠে কক্‌খনো শুনিনি কিন্তু? তুমি কখনো কাউকে পেতে দেখেছ ঠাকুরপো? অরুণা শুনেছিস্?

অরুণা বিরক্ত স্বরে বলে—শোনাশুনির আবার কি আছে—মানুষে পায় না তো কি আর ভূত-পেত্নীতে পায়।

রাধারাণী মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে মৃদু হেসে বলে—তোর আজ কি হ'ল বল দিকিন? টাকার নামেই মেজাজ বিগড়োল—হাতে পেলে কি করবি? ভূতে পায় না, মানুষেই পায় মানলাম, কিন্তু পেয়ে যদি মানুষ ভূত বনে যায় সে-ও তো আচ্ছা বিপদ—কি বল ঠাকুরপো?

—এর মধ্যে আর ঠাকুরপোকে টেনো না বৌদি, ও তোমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক, মোটের মাথায় উনি আমার সঙ্গেও যা ব্যবহার করছেন দুর্ব্বোধ্য।

অরুণার আপাদমস্তক জ্বালা করে ওঠে রাগে।

এই সব ন্যাকামী ওর অসহ্য।

রোসো, এই বাড়ী ছেড়ে তবে আর কাজ।···ইচ্ছে করলে কি আর আস্ত একখানা বাড়ী ওরা এখন ভাড়া করতে পারে না?···রোসো, দিদিকে একটা চিঠি লিখে দেওবে—সেদিন বলছিল যেন একটা বাড়ীর কথা।···সুখবরটাও দেওয়া হবে।

স্বামি-পুত্র সবই যদি হাতছাড়া হয়ে যায়—অরুণার তবে রইল কি? দিদি তো ঠিকই বলে—'মাগী মন্তর জানে' নইলে আর অমলকে—নিশ্চয় তাই, অরুণা নিজেই কি প্রথম প্রথম কম বশ হয়েছিল? নেহাৎ দিদি এসে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বলেই না চৈতন্য হল?

কিন্তু চৈতন্য শুধু একা অরুণার হলেই তো চলবে না? অমলের না হলে? দিনরাত্রির সাধনায় অমলের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা চলে। কিন্তু চৈতন্য কি ওর কোনো দিন হবে?

এই যে সর্ব্বদা অরুণার ছেলেকে আগলে রাখে রাধারাণী, সে কি ভালো মতলবে? বন্ধ্যার ক্ষুধার্ত্ত স্নেহ যে শিশুর পক্ষে কত অনিষ্টকর সে কথা কি অমল জানে?

নিজের ভ্যাবা গঙ্গারাম স্বামীটিকে 'থো' করে রেখে অমলকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ির অর্থ কি? অমল কি কচি খোকা? ঘরে কি ওর বৌ নেই? অসুখ করলে সেবা করতে জানে না, না ক্ষিদে পেলে খেতে দিতে শেখেনি?

অমলকে বলা মিথ্যে—সব কথা হেসে ওড়াবে···বলে কি না—স্বামী আর কার তুখোড় হয়? প্রেয়সীর কাছে সবাই ভ্যাবা গঙ্গারাম, এই আমার কথাই ধর না?···রান্নার কথা? ও-কথা আর তুলো না অরুণাময়ি, তবু দুটো খেয়ে-দেয়ে বাঁচছি, তোমার রান্না—প্রেমের মহিমাতেও—গলাধঃকরণ করা শক্ত।···রোগের সেবা? ঈশ্বর করুণাময় তাই আজ পর্য্যন্ত ওই জিনিবটির আস্বাদ পেতে হয়নি, হলে যে কি হ'ত ঈশ্বরই জানেন।

বাড়ী খোঁজার কথা তুললে এমন হাসবে, যেন অরুণা পাগল, কী বুঝি পাগলামীই করেছে। বলে কি না—অফিসের বড়বাবুকে এবার পাকড়ে দেখি যদি নীচের তলার দু'টো ঘরটর—

আস্ত একখানা বাড়ী কি এতই দুর্লভ?

কিন্তু অরুণার কি সাধও যায় না মনের মত করে সংসার করতে? —ভগবান যদি দিন দিয়েছেন। সেই দুটো রং-চটা ট্রাঙ্ক আর দেড়খানা এনামেলের বাসন নিয়ে চিরদিন সংসার করবে সে?

—বাড়ী তুমি দেখবে কি না তাই বলো—

ছেলেটাকে বিছানায় শুইয়ে প্রবল ভাবে চাপড়াতে চাপড়াতে অরুণা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে—বাড়ী যদি না দেখো ছেলে নিয়ে আমি দিদির কাছে গিয়ে থাকবো তা' বলে দিচ্ছি।

—বরং ছেলেটাকেই রেখে যেও, নইলে দাদা বৌদিদির টেঁকা ভার হবে—বলে অম্লান বদনে চিরুণী নিয়ে চুল ফেরাতে থাকে অমল।

—তোমার দাদা বৌদির টেঁকার ভাবনায় তো ঘুম হচ্ছে না আমার, ছেলেটাকে এমন বশ করে নিয়েছে যে হতচ্ছাড়া ছেলে একবার আমার কাছে দুধ খায় না, ঘুমোয় না।

—ভালোই তো, বেশ একটি বিনি-মাইনের ধাইমা পেয়েছো ছেলের।

—এমন নইলে বুদ্ধি! আমারও যেমন গলায় দেবার দড়ি জোটে না।

হঠাৎ ধারা-শ্রাবণ নামে।

আর এই জিনিসটিকেই অমলের বিষম ভয়।

শ্যালিকাও এক দিন এসে অমলের বুদ্ধির বালাই নিয়ে মর্ম্মাহত হয়ে কেবলমাত্র মরবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন।···ছেলে হওয়া অবধি অরুণাদের আর নীচের ঘরে নামতে হয়নি, দোতলার ঘরে কায়েমী বাসা বেঁধেছে, পাশেই বিভূতির ঘর। ক'দিন ধরে কি জানি কেন বিভূতি ঘরেই আছে।

অমল অসন্তুষ্ট সুরে বলে—কথা একটু সাবধানে বলবেন দিদি, ও-ঘরে দাদা রয়েছেন।

মুখের একটি বিশেষ ভঙ্গী করে অরুণার দিদি বলেন—"তোমার দাদার ভয়ে তুমি পিঁপড়ের গর্ত্তে লুকোও গে ভাই, আমি কারো কেয়ার করি না। তবে এও বলি—অরুণাকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে না তোমার? ভগবান্ যখন দিন দিয়েছেন ওকে, ও কেন পরের এক্তারে পাশতলানিতে লোকের মুখ-ঝামটা খেয়ে পড়ে থাকবে?

—মুখ-ঝামটা আবার কে দিল?

—কেন এ-বাড়ীর খোদ গিন্নী! ওর ছেলের যত্ন ও বুঝবে না, বুঝবে পাড়ার লোকে—দেখে-শুনে মরি।···অমলের পিত্যেস করিস নে অরু, তোর ভগ্নীপতিকে বলবো বাড়ী দেখতে।···এ বাড়ীতে কত ভাড়া দিতে হয়?

অমল মুচকে হেসে বলে—আপনার বোনকেই জিগ্যেস করুন, কত দিতে হয় অরুণা?

অরুণা মুখও তোলে না, কথাও বলে না।

কিন্তু অধ্যবসায়ের ফল কিছু আছে বৈ কি।

অরুণার দিদি বাড়ী জোগাড় করেন, মাস মাস আশী টাকা ভাড়া. —তা' হোক—বাড়ীখানি কেমন? একশো টাকা হলেও নিন্দে করা যায় না।

আসবাব-পত্রে সাজিয়ে-গুছিয়ে সংসার কেমন করে করতে হয়, একবার দেখিয়ে দেবেন তিনি। অরুণা শুধু টাকা ফেলে খালাস।

অরুণা আজ-কাল প্রায়ই ছেলের কাজগুলো নিজের হাতে এনে ফেলেছে, আজও ছেলেকে তেল মাখাচ্ছিল, অমল গম্ভীর ভাবে এসে বলে—তোমার দিদি তো আচ্ছা ফ্যাসাদ বাধিয়েছেন দেখি, কে ওঁকে সর্দ্দারী করতে ডাকে?

—যার দরদ থাকে তাকে ডাকতে হয় না, কেন কি তোমার পাকা ধানে মই দিয়েছেন তিনি?

—সে তুমি বুঝবে না, কিন্তু দাদাকে ছেড়ে যাওয়া এখন সম্ভব নয়, সে তো জানো?

—জানি বই কি—অরুণা জ্বলে ওঠে—উনি বুড়ো বয়সে সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করে চাকরী খুইয়ে বসে আছেন, এখন তুমি ওঁর সংসার পোষো, আর কি? সেই জন্যেই আরো যাওয়া দরকার, আমার ওই টাকা ক'টা দিয়ে আমি ভূত-ভোজন করাতে পারবো না।

—অনেক নতুন নতুন কথা শিখেছ তো—বলে অমল চলে যায়।

কিন্তু অরুণার মতলবে বাধা দেবার চেষ্টা আর করে না।

একসঙ্গে দরজায় অরুণার ভগিনীপতি ও ঠ্যালা গাড়ীর আবির্ভাব দেখে রাধারাণী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে—গাড়ীতে কি হবে রে অরুণা?

—দেখতেই তো পাচ্ছেন বাড়ী উঠছি—বলে অরুণা একটি ঝুড়ির ভিতর বাসনপত্র চাপাতে থাকে।

—বাড়ী উঠছিস?

রাধারাণী মিনিট খানেক স্তব্ধ থেকে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে—আগে তো কিছু বলিস্নি?

—আমার বলার অপেক্ষা কি, আর এক জন তো চব্বিশ ঘণ্টাই সব খবর দিচ্ছেন।

নতুন বাড়ীতে অরুণার দিদিই সব গোছ-গাছ করছিলেন, ব্যস্ত ভাবে অভ্যর্থনা করেন—আয় অরু, এসো খোকন বাবু, কিন্তু অমল কই?

—অফিস গেছে।

—আজকের দিনেও অফিস? অফিস এবং অফিসের বাবু সম্বন্ধে অনেক বাক্যবাণ প্রয়োগ করে দিদি বলেন—অফিস ফেরত এখানেই আসতে বলে দিয়েছিস্ তো? না কি ভুলে—

—অত ভুল আর হবে না। কি চমৎকার বাড়ীখানি ভাই!

—এই তো তোর ভগিনীপতির একজোড়া জুতোই ক্ষয়ে গেল—হ্যাঁ রে, আসবার সময় ওরা কি বললে টললে?

—সে আবার আচ্ছা জ্বালা, তোমার বোনাইটি যে আবার কিছুই বলেননি তা' কেমন করে জানবো? কর্ত্তা তো শুনে অবাক্, শেষে ছেলেটাকে কোলে নিয়ে কী কান্না, এমন অস্বস্তি হচ্ছিল।

—আর গিন্নী?

—তাঁর কথা আর বোলো না, খোকনকে একবার কোলে নেওয়া নেই, চোখে এক ফোঁটা জল নেই—কাঠ। ঘটা করে আমাকে এদিকে চুল বেঁধে আলতা পরিয়ে সিঁদুর ছুঁইয়ে দেওয়া হল।

এ-বেলাটা দিদিই রান্না করলেন, অরুণা সন্ধ্যাবেলা গা ধুয়ে একখানা ছাপা ছিটের শাড়ী পরে ছেলে কোলে নিয়ে বাইরের বারান্দায় বসলো। পথ-চলতি লোকের মাঝখান থেকে কখন আবির্ভাব হবে তার প্রিয় পরিচিত মানুষটির।

রাধারাণীর আওতা থেকে দূরে এসে নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছে সে, স্বামীকে সম্পূর্ণ করে পাবে এত দিনে।···কিন্তু আসবে তো? ঈস্ আসবে না বই কি? এই এত যে ঝগড়া, কই অরুণাকে ছেড়ে একটা রাতও? মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে মুখে···পুরুষ মানুষের দুর্ব্বলতা কোথায়, সে কথা তার জানা আছে!

কিন্তু কই অমল?

ঘড়ির কাঁটা যে যত ইচ্ছে সরে যাচ্ছে।

ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছিল—আস্তে তাকে তুলে শুইয়ে দিতে গিয়ে হঠাৎ শুনলো নীচে অমলের গলা। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে কেশ-বেশে আনলো একটু নূতন সংস্কার, ঠোঁটে কৃত্রিম অভিমানের ভঙ্গিমা ···এতক্ষণ অরুণা পথের ওপর চোখ পেতে বসে রইল—আসা হ'ল না আর এখুনি—অমনি বাঃ। ও নীচে নামবার আগেই অমল উঠে এসেছে।

—বাঃ ইতিমধ্যেই বাড়ী-টাড়ী গোছানো কম্পপ্লীট? কাজের মেয়ে তো? খোকন ঘুমোচ্ছে? এ ঘরটা কার, তোমার বুঝি?

অরুণা মুচকি হেসে বলে—হ্যাঁ আমাদের, কিন্তু আজকে শুড়ে বালি, দিদি রাতটা থেকে যাবেন—দুই বোনের এক জায়গায় ব্যবস্থা, তোমার বিছানা ওই পাশের ঘরে পেতে রেখেছি।

—আমার বিছানা?

অমল যেন আকাশ থেকে পড়ে—আমার বিছানাটাও এখানে এনে তুলেছ না কি? কী আশ্চর্য্য! এই রাত্রে আবার বিছানা বওয়াবে? আমার কাপড়-জামাগুলোও এনে বসে থাকোনি তো? এনেছ? কী সর্ব্বনাশ! তা' হলে তো দেখছি নিজের ঘাড়ে কুলোবে না, রিক্সা ডাকতে হবে। এত কাজ বাড়াতেও পারো আঃ।

—তুমি তা' হলে এ বাড়ীতে থাকবে না?

—আমি? পাগল হয়েছ? সত্তর টাকার কেরাণী, আশী টাকার বাড়ীতে বাস করলে গায়ে ধুলো দেবে যে লোকে।···দাও দাও আমার বিছানাটা আর ট্রাঙ্কটা ঠিক করে।···এই যে দিদি, আপনি রইলেন তো? সাবধানে থাকবেন।

—আবার কোথায় চললে এখন? একেই তো রাত দুপুর করলে—খাবে এসো?

—খাবো? খাবো কি বলুন? ক'বার খাবো? বাড়ী গিয়ে খেয়ে তবে তো আসছি।



অন্ধ গায়ক হোমার

শিল্পী—হ্যারি বেটস্



স্বর্গাদপি গরীয়সী

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৩

এক-একটা অলস অবসরের মধ্যে তবুও পাণ্ডুলের জন্য মনটা হু-হু করিয়া ওঠে, চারি দিকে চারটি মাটির ঘর দিয়া ঘেরা সেই ক্ষুদ্র জগৎটি, মাঝখানে প্রশস্ত উঠান, এক পাশে তুলসী-চবুতরা—বৈকালের পড়ন্ত রৌদ্র চালের উপর, ও-বাড়িতে যাওয়ার পথে সজনে গাছটির উপর পড়িয়া ঝিলমিল করিতেছে, দাওয়ায় মা ঠাকুরঝির চুল বাঁধিতে বসিয়াছেন, নিচেই পাড়ার মেয়েরা—পড়াউয়ের বৌ, শনিচ্‌রার বোন, দুখনার খুড়ি—তাহাদের সব কথাতেই একটা বিস্ময়ের ভাব জাগাইবার চেষ্টা করিয়া গল্প—"আই হে দুলহীন!—শুনলিয়েই?"… হয়তো দুলারমন বসিয়া আছে সামনেই—সেই ছেলেবেলার দুলারমন—হাস্যময়ী—পড়াউয়ের বৌয়ের কথার উপর একটা ঠাট্টার কথা বলিয়া হাসিতে যেন উল্টাইয়া গেল।…আহা, দুলারমন—যা অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছেন! আর খঞ্জনী! ওঁরা সব কত করিয়া বলিলেন, কিন্তু আর আসিতে চাহিল না।

একটি সখীর মতোই পাণ্ডুল যেন সারা অঙ্গ জড়াইয়া আছে। নিজেদের আলাদা করিয়া ভাবা যায় না।…কে আছে সেই বাড়িতে এখন? কাদের কণ্ঠস্বর? ঘরে, দাওয়ায়, উঠানে কি রকম সব পায়ের আঘাত পড়িতেছে?—কি রকম শিশুর কলহাস্য? কাহারা আসে যায়? দুলারমন আর আসে না কি? খঞ্জনী কি আবার নবাগতদের শিশুর ভার লইল?…না, খঞ্জনী আর শিশু ছুঁইবে না বলিয়া শপথ করিয়াছিল,—আসিবার এক দিন আগে অরুকে খুব করিয়া একবার বুকে চাপিয়া গিরিবালার কোলে ফিরাইয়া দিয়াছিল—চোখ ডব ডব করিতেছে—বলিল—"আর আমির বাচ্চার মায়ায় কখনও ভুলব না গো দুলহীন—বড্ড বেইমান—বড্ড বেইমান।…ঝর ঝর করিয়া চোখের জল ঝরিয়া পড়িল। গিরিবালা বলিলেন—"পরের ছেলেই তো? তুই এবার সংসারী হ'খঞ্জনী—নিজের খোকা মানুষ কর।"…"নেই হে দুলহীন!" বলিয়া যেন কত আতঙ্কেই খঞ্জনী সেই যে পলাইল, আসিল তাহার পরদিন একেবারে যাত্রার সময়—শাম্পেনী থেকে খানিকটা দূরে আতাগাছের তলায় ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মায়ের প্রাণ দিয়া গিরিবালা এই ইচ্ছা-বন্ধ্যা খঞ্জনীর মন বুঝিতে পারেন,—ছেলেরা বেইমানই—সত্যই তাহারা যে কত বেইমান হইতে পারে!…অহির কথা মনে পড়ে—মায়ের বত্রিশ নাড়ীর অত দরদ—সবই তো ভুলিল সে?—শেষ পর্য্যন্ত সব পাণ্ডুলই অহি-ময় হইয়া রহিল তাঁহার কাছে। গিরিবালা চোখ মোছেন—ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখেন—কেহ আসিয়া পড়িল না তো? শুধু দুঃখের পাণ্ডুলই পড়ে মনে, তাই যেন ভালো লাগে আরও বেশি করিয়া। পাণ্ডুল যেন জায়গা নয়, বাড়ি নয়—যেন একজন কে—অভিমানে মুখ ভার করিয়া আছে।

তবুও দ্বারভাঙ্গা ধীরে ধীরে পাণ্ডুলকে চাপা দিয়া ফেলিতে লাগিল। পাণ্ডুলে প্রথম প্রথম আসার কথা মনে পড়ে—চারি দিকেই অপরিচয়, চারি দিকেই বিধি-নিষেধ, দিন দিনই মনটা যেন নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। দ্বারভাঙ্গা সম্পূর্ণ আলাদা, এখানে নিত্য নূতন অভিজ্ঞতার মধ্যে, নিত্য নূতন অভিজ্ঞতার আগ্রহে ও আশায় মনের দল যেন বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।

ওঁরা শ্রাবণ মাসে আসিলেন, আশ্বিনের শেষাশেষি পূজা আসিয়া পড়িল। এখানে বারোয়ারী দুর্গাপূজা নাই, তবুও পূজার যে সাড়াটা পড়িয়া গেল, ওদের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত তাহার প্রতিধ্বনি উঠিল। আরও একটা ব্যাপার—সে রকম ব্যাপার বোধ হয় কুড়ি বৎসরের মধ্যে তাঁহার জীবনে ঘটে নাই। অষ্টমীর দিন গেলেন প্রতিমা দেখিতে। ঘোড়ার গাড়ি করিয়া যাইতে যাইতে সে যে কী আগ্রহ! অনেকটা যেন শিশুর কৌতূহলের সঙ্গে পরিণত বয়সের ধর্ম্মভাব মিশিয়া গিয়াছে। গাড়ি হইতে যখন নামিলেন মনে হইল কি যেন এক নূতন লোকে আসিয়া গেছেন।—সামনেই বর্ষার জলে কূলে-কূলে ভরা বাগমতী নদী—উত্তর হইতে আঁকিয়া-বাঁকিয়া আসিয়া মন্দিরের সামনে খানিকটা বিস্তার লাভ করিয়া আবার লীলায়িত গতিতে দক্ষিণের দিকে চলিয়া গিয়াছে। ওপারের ভাঙা তটের উপর আম-বাগান, কাশবন, গাছে-লতায় ঢাকা এক-আধটা ঘর; এপারে ছায়াবৃত কাঁচা ঘাট, তাহার পরেই নানাবিধ দোকানের সারি, তাহার পরেই মন্দির। নানা রকম নানা বয়সের মানুষ, মেয়ে, বেটা-ছেলে; মাঝে মাঝে বাঙালীর মুখ দেখা যায়, পরিচিত, আবার অপরিচিতও। গাড়ি থেকে নামিয়া চারি দিকে একবার বিহ্বল ভাবে চাহিয়া গিরিবালা কতকটা যেন ছেলেমানুষের মতোই প্রশ্ন করিয়া বসিলেন—"হ্যাঁ মা, এই নদীতেই নাইব তো?"—এত বড় সৌভাগ্যটা যেন কল্পনাতেই আনিতে পারিতেছেন না।

চাপা-গলায় একান্তেই বলিলেন, কিন্তু চণ্ডীচরণের কান এড়াইল

না, হাসিয়া বলিলেন—"না, বেলেতেজপুরের গোঁসাই-ঠাকুরুণের জন্তে একটা আলাদা আসবে।···ইষ্টিশনের রেলগাড়ি না কি বৌদি?"

নিস্তারিণী দেবী হাসিয়া বলিলেন—"পাতুলে যা হয়েছিল বাবা, বিশ্বাসই করতে পারছেন না।"

সমর্থন পাইয়া গিরিবালা চাপা-গলায় বলিলেন—"নদীতে নাওয়া সেই সাঁতরায় মা, শৈলেন কোলে।"

বাইরের মাটির প্রতি কণাটি মাড়াইয়া যেন নদীতে নামিলেন। স্নান হইল থরধার, মুক্ত স্রোতের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া ডুব দিয়া দিয়া আশ আর মেটে না। এদিকটা সব মেয়েই, বেশ মুক্ত দৃষ্টিতেই সামনের দিকে চাহিয়া রহিলেন, চারি দিকের পূর্ণতার ছোঁয়াচেই মনটা যেন কিসে পূর্ণ হইয়া গেছে। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সেই বহুপূর্বে সাঁতরার গঙ্গায় প্রথম স্নান। এটা হয়তো অত-বড় কিছু নয়, তবুও বয়সের, অভিজ্ঞতার পরিণতিতে, তাহার উপর বোধ হয় দিনটির মাহাত্ম্য-অনুভূতিতে আজও যেন একটা নূতন কি উপলব্ধ হইল,—নদীর স্রোতে জলের আর এক উচ্চ-তর স্তর সৃষ্টি করিয়া যেমন বান ডাকে সেই রকম গোছের।··· সবাই উঠিয়া আসিয়াছে, গা মুছিতেছে, বেটা-ছেলেদের কাপড় ছাড়া পর্যন্ত হইয়া গেছে. গিরিবালা তখনও জলে—স্রোতের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে সামনের পানে চাহিয়া আছেন। বিপিনবিহারী বলিলেন—"কবির মেয়ে, টেনে না তুললে উঠবে না চণ্ডী, ব্যবস্থা কর।" চণ্ডীচরণের আদেশে হরেন গিয়া ডাকিল—"মা, তোমার হোল না?"

যাহাকে মন্দির বলা হইয়াছে, সেটি মন্দির গোছের কিছু নয়, খুব বড় একটা চৌকো ঘর। মাঝখানে বড় একটি বেদীর উপর শ্যামা মূর্তি। শ্যামাই এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সমস্ত এই দেবভূমিটুকুর নাম কালী-স্থান। জনশ্রুতি এই যে, কোন বাঙালী তান্ত্রিক এইখানে কালী-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন, পরে দ্বারভাঙ্গারাজ দেবীর জন্ত এই মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। বাংলার মতো মিথিলাও তন্ত্র-সাধনার ক্ষেত্র; রাজপরিবারের কুলদেবীই কঙ্কালী কালী।

স্থায়ী মূর্তি কালীই, তবে নবরাত্রে এখানে মাটির প্রতিমা গড়িয়া দশভূজার পূজার ব্যবস্থা আছে। তাহার জন্ত কালী-মন্দিরের পাশেই অনুরূপ আর একটি ঘর আছে, অপেক্ষাকৃত ছোট: দেশের মতোই ঘুরিয়া ঘুরিয়া পূজোর জন্ত নৈবেদ্য মাল্য কিনিয়া, প্রতিমা দেখিয়া, একটা মাটির পুতুলের সামনে দাঁড়াইয়া দর করিতেছেন, সামনে দুইটা ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল এবং ননীবালা, তাঁহার জননী ও আরও অনেকে অবতরণ করিলেন। নজর পড়িতেই ননীবালা হন-হন করিয়া আগাইয়া আসিয়া গিরিবালার হাতটা ধরিয়া বলিলেন—"বা কি চমৎকার! তোমরাও এসেছ?"

মাঝে আরও কয়েক বার দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে, হৃদ্যতা বাড়িয়াছে।

গিরিবালা বলিলেন—"আমাদের তো হয়েও গেল, ফিরতি।"

"ফিরতি বললেই শুনছি কি না; চলো আর একবার ঠাকুর দেখে আসবে।" বলিয়াই ননীবালা "ঐ যাঃ!"—বলিয়া চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া হাতটা একটু উঁচাইয়া এমনি সতর্কতার ভঙ্গিতে দাঁড়াইলেন যে, গিরিবালাকে বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিতে হইল—"কি হোল?"

"ঠাকুর দেখবার কথাটা মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল কি না—ভয় হচ্ছিল 'যাব না'—না বলে বসো আবার।"

ফিকির দেখিয়া দুই জায়েই হাসিয়া উঠিলেন। গিরিবালা পাশেই শাশুড়ী এবং অল্প দূরে স্বামি-দেবরকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—"নিজের হাতে তো নয় ভাই।"

"ও, এই কথা? জেঠাই মা তো আমার হাতে।"—নিস্তারিণী দেবী পাশে একটা দোকানে তুলসী কাঠের মালার দর করিতেছিলেন, ননীবালা কাছে গিয়া বলিলেন—"বৌদিদের আমরা একটু নিয়ে যাই জেঠাই-মা; আমরা এই এলাম।"

"আমাদের তো হোয়ে গেছে দেখা মা, ফিরছি যে এবার।"

দুই জায়ে আসিয়া পাশে দাঁড়াইলেন। ননীবালা বলিলেন—"আর কিছু না, দেখাটা হয়ে গেল বৌদির সঙ্গে, এখন মনটা এই দিকে পড়ে থাকবে, পূজোর ব্যাঘাত হবে, সঙ্গে সঙ্গে থাকলে আর সেটুকু···"

নিস্তারিণী দেবী হাসিয়া বলিলেন—"তাহলে নিয়ে যাও।"

গিরিবালা বলিলেন, "তোমরা তো দেখছি স্নান করে এসেছ···"

ননীবালা ভ্রূযুগল কপালে তুলিয়া বলিলেন—"নিশ্চয়, না হলে তোমায় ছুঁতে সাহস করি?"

ভিড়ের মধ্যে সকলেই সম্ভব-মত সংযত হইয়া হাসিয়া উঠিলেন। গিরিবালা বলিলেন—"আমি তাই বললাম? দেখো তো মা! বললাম, নাওয়াটা সারা হয়ে থাকলে তাড়াতাড়ি হয়ে যায়।"

নিস্তারিণী দেবীকেও আবার যাইতে হইল; ননীবালার মা সবাইকে গুছাইয়া লইয়া উপস্থিত হইলেন, সঙ্গিনী হিসাবে তাঁহাকেও টানিলেন। নিস্তারিণী দেবী পুত্রের পানে চাহিতে বিপিনবিহারী বলিলেন—"হয়ে এসো তাহলে, আমরা এখানে দাঁড়াচ্ছি।"

পাশেই মন্দিরের সঙ্গে সংলগ্ন, উঁচু দেয়াল দিয়া ঘেরা খানিকটা বাগান গোছের; প্রতিমা দর্শন করিয়া সকলে সেখানে উপস্থিত হইলেন। জায়গাটায় পুরুষ মানুষ কেহ যায় না, স্ত্রীলোকেরাই বিশ্রামের জন্ত ব্যবহার করে, নিজেদের মধ্যে দেখা-শোনা আলাপ-আলোচনা হয়। সেইখানে অনেকগুলি নূতন বাঙালী-পরিবারের সঙ্গে দেখা হইল, ননীবালা, তাঁহার জননী এঁদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। দ্বারভাঙ্গা সহর দ্বিধা-বিভক্ত, এক নিজ দ্বারভাঙ্গা, অন্যটি লাহেরিয়া সরাই,—আদালত, কাছারি সব সেইখানেই—অনেক-গুলি উকিল, মুন্সেফ, ডেপুটির পরিবারের সঙ্গে জানা-শোনা হইল। কয়েক জনের গায়ে একেবারে আধুনিক গহনা পরিচ্ছদ; কেহ বেশ গায়ে পড়িয়া ভাব করে; কেহ একটু গম্ভীর, একটি অপরিস্ফুট হাসির সঙ্গে নিজের বিভিন্নতাটুকু বজায় রাখিতে চায়। এক জন ননীবালার বোধ হয় বেশি পরিচিত, গিরিবালার পরিচয় করাইয়া দিতে একটি ভঙ্গি সহকারে বেটা ছেলের মতো হাত তুলিয়া নমস্কার করিল, ভ্রূ কপালে তুলিয়া প্রশ্ন করিল—"এখানকার পাড়াগাঁয়ে সতের-আঠার বছর কাটিয়েছেন আপনি! এখানকার সহরে-সহরেই আট বছর কাটল—ভাগলপুর, ছাপরা, গয়া, দুমকা—তবু বছরে অন্ততঃ বার তিনেক কলকাতায় না গেলে হাঁফ ধরে যায়!"

হাসিল, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটু কি মিশাইয়া চোখ ফিরাইয়া ফিরাইয়া গিরিবালার পানে চাহিল, যেন অদ্ভুত কি দেখিতেছে।

একটু সরিয়া আসিয়া ননীবালা একটু নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"দেখে নাও বৌদি, পাণ্ডুলে পড়ে থাকলে এ জিনিষ দেখতে পেতে? আমাদের দ্বারভাঙ্গা একটি চিড়িয়াখানা।"

গিরিবালা একটু সঙ্কুচিত ভাবে বলিলেন—"আস্তে ঠাকুরঝি, শুনতে পাবেন।"

"বয়ে গেল। মানুষের মতন একটু আলাপ কর, না, 'কলকাতায় না গেলে হাঁপিয়ে উঠি।' কেউ আর মুন্সেফের 'বৌ হয় না; কলকাতাতেই পড়ে থাকে।"

একটি বর্ষীয়সীর আবার কেমন করিয়া গিরিবালাকে চোখে লাগিয়া গেল। পরিচয় প্রসঙ্গে বার-বারই তাঁহার মুখের পানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চাহিয়া লইয়া কখনও ননীবালার মা, কখনও নিস্তারিণী দেবী, কখনও বা ননীবালাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—কত রকম মন্তব্যও করিতে লাগিলেন—পাঁচটি ছেলের মা!···কোলে একটি মেয়ে?—বড় আদরের বোন হবে···সাঁতরায় এদের বাড়ি? ও মা, সে যে খুব সমাজ জায়গা গো···এক এক জনকে দেখলেই কেমন একটা আহ্লাদ হয়, মায়া বসে যায়—যায় না?—আপনার বৌটি সেই রকম দিদি···বেশ লক্ষণমন্ত বৌ···একবার আমাদের ওখানে নিয়ে আয় না এঁদের সবাইকে ননী, দোষ কি? আমার বৌমা দেখলে বর্তে যাবেন; নতুন পোয়াতি, আসতে পারলেন না তিনি! তিনিও এই রকম শান্ত-শিষ্টটি কি না—বর্তে যাবেন একেবারে···"

ননীবালা বলিলেন—"কিন্তু আমি সে একেবারেই শান্ত নয়, ঢুকতে দেবে কেন?"

সকলের মধ্যেই একটা হাসি পড়িয়া গেল। বর্ষীয়সী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শোন কথা ননীর! অথচ সে-বেচারি ননী-ঠাকুরঝি বলতে অজ্ঞান। যাবি, নিশ্চয় যাবি শীগ্‌গির।"

আবার, থিয়েটার আসিতেছে, দিন পনের পরেই; বাঙালীদের কালীপূজার বারোয়ারীতে।

জীবনের গতি বড় বিচিত্র, মানুষ চলিতে চলিতে হঠাৎ এক এক সময় নিজের বয়স ছাড়িয়া দশ-বারো বছর আগাইয়া যায়—হয়তো আরও বেশি। তেমনি আবার পিছাইয়াও যায়—প্রৌঢ়া হয় তো হইয়া পড়ে একেবারে কিশোরী···থিয়েটার আসিতেছে, গিরিবালা ছোট্ট মেয়ের মতোই উদ্বেগ লইয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। ও-জিনিষটা তাঁদের জীবনে দেখা হয় নাই। যাত্রা অপেরার অভিজ্ঞতা আছে প্রচুর, থিয়েটার বাদ পড়িয়া গেছে; ওঁদের ছেলেবেলায় ওটা এখনকার মতো গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করে নাই। তাহার পরই পাণ্ডুল—সেখানে যাত্রাই বলো, অপেরাই বলো, থিয়েটারই বলো—সেই এক নটুয়া?

অবশ্য আগ্রহটা বাহিরে বাহিরে প্রকাশ করেন না, তবে ছেলেরা যখন গল্প করে, সীন-সীনারির বর্ণনা দেয়, হাতের কাজ ভুলিয়া আগ্রহভরে শোনেন।

শৈলেনের এখনও মনে পড়ে—মা ছিলেন একেবারে আদর্শ শ্রোত্রী। রান্নাঘরের এক দিকে বসিয়া ওরা তিন ভাইয়ে আহার করিতেছে, শৈলেন বলিতেছে—"নীরোদ বাবুর জনার পার্ট দেখো, কাঁদিয়ে যদি না ছাড়েন তো আমায় তখন বোলো! ইস্কুল থেকে আসবার সময় রোজ রিহার্সেল শুনছি···আর সে গান! দাদা, যখন সেই 'চন্দনচর্চিত নীলকলেবর' গানটা গান!···"

গিরিবালা পিঁড়ির উপর বসিয়া একটি ঈষৎ-হসিত উৎসুক দৃষ্টিতে ঘাড় বাঁকাইয়া চাহিয়া আছেন, তরকারি দিয়াছেন, খুন্তিটা হাতে রহিয়াই গেছে, প্রশ্ন করেন—"খুব মিষ্টি গলা বুঝি?"

শশাঙ্ক গম্ভীর ভাবে বলে—"কলকাতার দানীবাবুর নাম শুনেছ?"

শোনেন নাই বলিয়াই প্রশ্ন। গিরিবালা মানিয়াও লন, বলেন—"পাণ্ডুলে পড়েছিল তোদের মা, শুনবে না!···খুব ভালো গাইতে পারে বুঝি দানীবাবু?"

একটা বেশ কৌতুককর ব্যাপার চলিতে থাকে, বেশ চমৎকার। মা হইয়া গেছেন ছোট, অভিজ্ঞতায় ছেলেরা হইয়া গেছে বড়; ছেলের থাকে দর্প—সে যে বেটাছেলে, অনেক দেখিয়াছে, শুনিয়াছে, পড়িয়াছে; মায়ের মুখে থাকে একটা অদ্ভুত ধরণের হাসি। ছেলে যদি বুঝিত তো দেখিত সেটাও একটা প্রসন্ন দর্পেরই। ছেলের কাছে পরাভবই যে মায়ের বিজয়!

গিরিবালার প্রশ্নে শশাঙ্ক একটু হাসিয়া শৈলেনের দিকে চায়, নিরীহ ব্যঙ্গের স্বরে বলে—"দানীবাবু গাইতে পারে! শুনে রাখ রে শৈলেন!"

মায়ের দৃষ্টির সে-অমৃত শৈলেন এখন বোঝে। লজ্জিত হইবারই কথা তো? কিন্তু ছেলেদের পানে চাহিয়া একটা অপূর্ব্ব শান্ত হাসিতে মুখটা আলো হইয়া গেছে, বলিতেছেন—"ঠাট্টা রাখ বাপু, মা জানে না বলেই তো জিজ্ঞেস করেছে, তোরাও যেন জন্মেই এতটা বড় হয়েছিস্, এত দেখেছিস, এত শুনেছিস!···ভাখো মা!···"

যাহা বহু প্রত্যাশিত তাহা যখন আসিয়া পড়ে, তখন অধিকাংশ স্থলেই নৈরাশ্য বহন করিয়া আনে। থিয়েটার সম্বন্ধেও তাহাই হইল। যাহাকে ছেলেরা ষ্টেজ বলিতেছে সেটার একটু নূতনত্ব আছে বটে, তবে আরও উঁচুদরের কিছু আশা করিয়াছিলেন বলিয়া কয়েক বিষয়ে যেন বিসদৃশ ঠেকিল,—নদীও গুটাইয়া যাইতেছে, পাহাড়ও গুটাইয়া যাইতেছে, ঘর-বাড়িও গুটাইয়া যাইতেছে। একবার একটা যুদ্ধের দৃশ্যে মৃত সৈন্যেরা মাটিতে পড়িয়া আছে, হঠাৎ মাঝে একটা প্রকাণ্ড রাস্তা সমেত দুই সারি চারতলা পাঁচতলা বাড়ি হুড়মুড় করিয়া তাহাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়িল; অপঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কয়েক জন মৃত সৈন্যকে তাড়াতাড়ি বাঁচিয়া উঠিতে হইল।···উপর থেকে মুড়ি ছড়াইয়া বৃষ্টি দেখানো হইল। প্রথমটা একটু লাগিয়াছিল ধোঁকা, কিন্তু হঠাৎ ষ্টেজের মধ্যে থেকেই কাহার একটা কালো বিলাতি কুকুর চেনশুদ্ধ ঢুকিয়া পড়িয়া সেগুলা খুব ব্যস্তভাবে খুঁটিয়া বেড়াইতে থাকায় একটা উগ্র রকম গোলমাল বাধিয়া গেল। যাহার কুকুর সে ষ্টেজের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া চেন ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল—এদিকে প্রেক্ষাগার হইতে কতকগুলা দুষ্টু ছেলে "টমি-টমি" বলিয়া চিৎকার করিতে কুকুরটা দোটানায় পড়িয়া প্রবল আপত্তিসূচক নানা রকম ডাক শুরু করিয়া দিল। "ড্রপ ফেল্, ড্রপ ফেল্" করিয়া একটা শব্দ উঠিল, সামনের পট'টা মাঝ পর্য্যন্ত নামিয়া আটকাইয়া গেল, দুইবার ঝাঁকানি খাইয়া নামিয়া আসিয়া কুকুরের ব্যাপারটা চাপা দিল। এদিকে উগ্র হাস্যের গোলমাল আর ওদিকে ষ্টেজে কথা-কাটাকাটি



শিল্পী—সমর ঘোষ

আহত কুকুরের কাতরানি—এই সব মিলিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একটা তুমুল বিশৃঙ্খলা লাগিয়া রহিল। ননীবালা গিরিবালার পাশেই বসিয়াছিলেন, উগ্র হাসিতে নিজের পেট'টা চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমি এই জন্তেই আরও আসি বৌদি, ভূভারতে আর কোথাও এত হাসির খোরাক জোগাতে পারে না···ওঃ—বাবা গো!—কুকুরে বিষ্টি খাচ্ছে!···মুড়ির কথা কার পোড়া মাথায় ঢুকল বল তো!···কী, না, জলের মতন চকচক করতে করতে পড়বে; বাবাঃ, এতও জানে!···তাও, মুড়ির কথা ভাবলি তো কুকুরটার কথাও ভাব—ওঃ!···"

—হাসিতে দুই জনে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিলেন।

যাই হোক্, রাতটা গোলমালে কাটিল মন্দ নয়। লাভের মধ্যে লাভ—আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইল; একটা জায়গা থেকে অপরিচয়ের আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়া গিয়া বেশ একটি নিজস্বতার ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে, আর ভালো-মন্দ সব কিছুর উপরই একটা দরদ আসিয়া পড়িতেছে! লাহেরিয়াসরাই হইতে একটি পরিবার দেখিতে আসিয়াছিল, একটু নাক সিঁটকাইয়া বলিল—"পোড়া কপাল! এই দেখতে আবার তিন মাইল পথ বেয়ে এলাম!"

পাশাপাশি দুইটি সহর—ভাব-আড়ি দুই-ই আছে; ননীবালা মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া. চিপটেন কাটিলেন—"এর চেয়েও খারাপ হয় বলে আমরা দ্বারভাঙ্গা ছেড়ে অন্য কোথাও যাই-ই না।"

গিরিবালা একটু অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিলেন। থিয়েটার ভাঙিয়া গেলে বলিলেন—"বেশ বলেছ ঠাকুরঝি; হ্যাঁ গা, অমন একটু বেগোছ সব কাজেই হয়ে যায়, তাই বলে···"

—দ্বারভাঙ্গা দোষে-গুণে মায়া বিস্তার করিতেছে।

[ক্রমশঃ

হীনমন্যতা

চিত্রগুপ্ত

৭

বিবাহ ও বিবাহিত জীবনের সঙ্গে হীনমন্যতার সম্বন্ধ নিয়ে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করা হ'য়েছে। এবারে যৌন-ব্যাপার ও যৌন জীবনের সঙ্গে হীনমন্যতার সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা করা যাক্।

বিবাহ-সম্পর্কিত আলোচনায় দেখা গেছে যে, বেশীর ভাগ লোকের মধ্যেই জীবনের অন্যান্য ব্যাপারের তুলনায় প্রেম ও বিবাহের ব্যাপারে একটা সুষ্ঠু পূর্ব্বাহ্নিক প্রস্তুতির অভাব দেখা যায়। যৌন ব্যাপার ও যৌন-জীবনের বেলায় কথাটা আরও বেশী ক'রে খাটে।

এ সম্পর্কে মানুষের মনে আশৈশব-সঞ্চিত অনেক কুসংস্কার জমা থেকে যায়, উত্তর-জীবনে মানুষের সুষ্ঠু সামাজিক জীবনযাপনের পক্ষে যা অত্যন্ত ক্ষতিকর হতে পারে। সমাজের মধ্যে বাস ক'রে সুস্থ যৌন-জীবন যাপন ক'রে সুখী হ'তে হ'লে এই সব কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ হওয়া আগে দরকার।

এ্যাড্‌লারের মতে এ বিষয়ে সবচেয়ে সাধারণ কুসংস্কার, যেটা প্রায় সব লোকেরই মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে, সেটা হ'চ্ছে এই রকম একটা ধারণা, যে, যৌন-প্রবৃত্তির ন্যূনতা বা আধিক্য জিনিসটা মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে পূর্ব্বপুরুষদের কাছ থেকে পায়; সুতরাং মানুষ চেষ্টা ক'রে এর মধ্যে আর কোনো পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারে না।

এ্যাড্‌লার বলেন, এ ধারণাটা একেবারেই ভুয়ো। তিনি বলেন, সমস্যাকে এড়াবার জন্যে মানুষের এটা একটা মন-গড়া কৈফিয়ৎ। অন্য অনেক ব্যাপারেই মানুষ যেমন উত্তরাধিকারের দোহাই পেড়ে নিজেরা চেষ্টা ক'রে উন্নতি করবার হাঙ্গামা থেকে বাঁচ্‌তে চায় এ ক্ষেত্রেও তাই। আসলে এর মধ্যে কোনো সত্য নেই। সুতরাং এ রকমের একটা ভ্রান্ত ধারণাকে মনের মধ্যে প্রশ্রয় দিলে তাতে মানুষের উন্নতিই শুধু ব্যাহত হয়। লাভ কিছুই হয় না।

আসলে উত্তরাধিকার-সম্পর্কিত তথ্যাদির সাহায্য নিয়ে তার আড়ালে প্রকৃত সত্যকে চাপা দিতেই বেশীর ভাগ লোক সমুৎসুক। উত্তরাধিকারের নাম নিয়ে নিজের সৃষ্ট সমস্যার দায়িত্বটিকেই এরা আসলে এড়াতে চায়। অথচ অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের ব্যক্তিগত যৌন-সমস্যার জন্যে দায়ী এ সম্পর্কে তার আশৈশবের শিক্ষা ও মনের কৃত্রিম গঠন-প্রণালী।

মানুষের অতি শৈশবেই তার মধ্যে যৌন-প্রবৃত্তির অস্তিত্ব দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যে কোন ধাত্রী বা মাতা-পিতা একটু লক্ষ্য করলেই দেখ্‌তে পাবেন যে, জন্মের পর দু'-চার দিনের মধ্যেই শিশুর অঙ্গ সঞ্চালনের মধ্যে দিয়ে তার মধ্যেকার যৌনপ্রবৃত্তি ও তজ্জাত 'যৌন-কণ্ডূতি'র অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য যৌন-কণ্ডূতির এই সব লক্ষণ ও তার প্রকাশটা অনেকাংশে শিশুর পরিবেশের ওপরই নির্ভর করে। কাজেই যে ক্ষেত্রে শিশুর মধ্যে এই ধরণের যৌন-কণ্ডূতির লক্ষণ দেখা যাবে, সে ক্ষেত্রে মাতা-পিতার পক্ষে উচিত হবে শিশুর মনোযোগকে ওদিক্ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা। এইখানেই কিন্তু আসল গোলযোগের উৎপত্তি হবার সম্ভাবনা। কারণ, তার চিত্তকে যৌন-ব্যাপার থেকে অন্য দিকে আকর্ষণ করার চেষ্টায় প্রায়ই লোকে ভুল উপায়ের আশ্রয় নেয় ও তারই ফলে সেই শিশু যখন বড়ো হয় তখন তার মধ্যে নানা জটিল যৌন-সমস্যা দেখা দেয়।

শিশুর মধ্যেও যৌন প্রবৃত্তির অস্তিত্ব যখন আছেই, তখন তার সেই প্রবৃত্তির প্রকাশ-লক্ষণ দেখবা মাত্র চম্‌কে উঠ্‌লে চল্‌বে না। জিনিষটাকে একান্ত স্বাভাবিক মনে ক'রে ধীর ভাবেই গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ আর সব ব্যাপারকে তুচ্ছ বলে ছেড়ে দিয়ে কেবল মাত্র তার যৌন-উত্তেজনার প্রকাশটাকেই বড়ো ক'রে দেখে, সে বিষয়ে বেশী ভয় পাওয়া অনুচিত। প্রকৃতিই তার মধ্যে এই প্রবৃত্তির বীজ দিয়ে রেখেছেন—কারণ, ভবিষ্যতে এ নিয়েও প্রকৃতির উদ্দেশ্য আছে। তাই যদি হয়, তাহ'লে এটা দেখেই বা ঘাবড়ালে চলবে কেন? তার মধ্যে প্রকৃতি আরও নানা জিনিষের বীজই তো দিয়ে রেখেছেন। এই সব কিছুরই ব্যবহার তো আর তখনি তখনি হবে না? সবই তো তার মধ্যে ধীরে ধীরে একটু একটু করে বিকশিত হবে—দিনে দিনে যেমন যেমন সে একটু একটু ক'রে বড়ো হ'য়ে উঠ্‌বে।

কথা হ'চ্চে, অন্য সব ব্যাপারে যেমন শিশুকে ধৈর্য্য ধরে প্রতীক্ষা করতে হয় বড় হ'য়ে যখন সে পূর্ণতা পাবে, অধিকারী হবে সেই সময়কার জন্যে,—এ বিষয়েও তেমনি।

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করবার চেষ্টা করা যাক্। শিশুর যখন বই পড়বার সময় হয়নি তখন যদি সে দাদা বা দিদির বই নিয়ে নাড়াচাড়া করে তাহ'লে কি আমরা সশঙ্কিত হ'য়ে হৈ-চৈ ক'রে একটা হাঙ্গামা বাধাই? তা' করি না। কিন্তু তবুও হাসিমুখে তা' থেকে তাকে নিবৃত্ত ক'রতে চেষ্টা করি পাছে দাদা বা দিদির বই সে ছিঁড়ে ফেলে। বুঝিয়ে দিই—'আর একটু বড়ো হ'লে যখন পড়বার সময় হবে তখন পড়্‌বে।'

এই রকম, বাবার বড়ো বড়ো জুতোয় পা' গলিয়ে বড় ছাতাটা বুকে জাপটে ধ'রে যখন সে টল্‌তে টল্‌তে আপিস্ যাওয়ার অভিনয় করে তখনও তাকে এজন্যে তীব্র ভর্ৎসনার প্রয়োজন বোধ করি না। অথচ তবুও তাকে এদিকে বিশেষ উৎসাহ না দিয়ে বরং তাকে এই চেষ্টা থেকে শান্ত ভাবেই নিবৃত্ত ক'রতে চেষ্টা করি এই ভয়ে, পাছে সে প'ড়ে গিয়ে আঘাত পায় কিম্বা রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে গাড়ী চাপা পড়ে।

যৌন-কৌতূহল ও যৌন-কণ্ডূতি থেকেও শিশুকে নিবৃত্ত ক'রতে হবে এই রকম অনুত্তেজিত ও অচঞ্চল ভাবে। ধীর মস্তিষ্কে তার এই রকম ব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। যৌনাঙ্গের অপরিচ্ছন্নতা বা যৌন-কণ্ডূতির অন্যবিধ স্থানীয় কারণটি দূর করতে যত্নবান হ'তে হবে। এজন্যে দরকার মত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শও নিতে হবে। কিন্তু তাই বলে মাথা গরম ক'রে শিশুর প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন করা কোন মতেই চল্‌বে না। কারণ, তাতে ফল ভবিষ্যতে ভয়ানক খারাপ হ'তে পারে। ছেলেটির মনে এবং চরিত্রে যৌন-সম্পর্কিত এমন জট্ পাকিয়ে যেতে পারে যার ফলে ভবিষ্যতে তার জীবনে নানা জটিল সমস্যা দেখা দেবে।

মনে রাখ্‌তে হবে যে, ছেলে বড় হ'য়ে এক দিন যৌন-ব্যাপারে লিপ্ত হবেই! প্রকৃতিই আপনি তা ঘটাবে। এখন, তার ভবিষ্যতের সেই ক্ষণটি যখন আসবে তখন সেটি যাতে বৈধ এবং সুস্থ ভাবেই আসে,—তার পথটি যাতে পরিষ্কারই থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখার গুরু কর্ত্তব্যও তার পিতা-মাতারই। পিতা-মাতাকেই লক্ষ্য রাখতে হবে যে তাদের দ্বারা শিশুর যৌন-প্রবৃত্তি বাঁকা পথে চালিত হয়ে তার ভবিষ্যৎ জীবনে যেন অজ্ঞাতেও কোনো জটিলতার সৃষ্টি না করে।

সাধারণতঃ জন্মগত বিকৃতি বা অপরিপুষ্টতা সম্পর্কে মানুষের মনে এমন একটা বদ্ধমূল ধারণা থাকে যে তার ফলে লোকে এই সহজ কথাটা ভেবে দেখতেই ভুলে যায় যে অপরিপুষ্টি এবং বিকৃতিটা আসলে অর্জ্জিত হওয়াই বেশী স্বাভাবিক। আসলে ছেলে তার দৈনন্দিন জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই নিজেকে নানা বিষয়ে শিক্ষিত করে তুলছে। তা সে শিক্ষা ভুলই হোক আর ঠিকই হোক। আর সেই শিক্ষারই ফল সে ভোগ করে তার পরবর্ত্তী জীবনে।

অনেক লোকের মধ্যে যে সব যৌন-প্রবৃত্তিঘটিত 'অপচার' দেখা যায় লোকে সাধারণতঃ সেগুলোকে বংশানুক্রমিক ভাবে পাওয়া ব'লে ধ'রে নেয়। সেই লোক নিজে যে সেই রকমের বিকৃতিকে কু-অভ্যাসের শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা অর্জ্জন করতেও পারে, এই কথাটা ভেবে দেখতে তারা ভুলে যায়। কিন্তু সে বিকৃতি যদি সে শুধু উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়ে থাকে তা'হলে এই সব লোককে মনে মনে সেই সব বিকৃতির 'মহলা' (rehearsal) দিতে দেখা যায় কেন ?

কে না জানে যে, যৌন-বিকারগ্রস্ত লোকরা নিজেদের যৌন-মানসিক বিকৃতিকে কেন্দ্র ক'রে মনে মনে দিবা-স্বপ্ন দেখে থাকে। এ স্বপ্নের সৃষ্টি করে সে নিজের ইচ্ছাতেই। এবং তার দ্বারা সে প্রচুর তৃপ্তিলাভও ক'রে থাকে। স্বেচ্ছায় তার এই দিবা-স্বপ্ন দেখার অভ্যাসই হ'চ্চে সেই মহলা বা রিহার্সাল। বিকৃত যৌনানুষ্ঠানের পূর্ব্বাভ্যাসরূপ এই রিহার্সালের সাহায্যেই সে নিজের বিকৃত যৌনাচারের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করে তোলে।

অনেক লোক তাদের এই অভ্যাসকে সহসা এক সময়ে থামিয়েও দেয়। অনেক লোক আছে যারা হার মানতে ভয় পায়। তাদের মনের মধ্যে হীনমন্যতা শেকড় গেড়ে ব'সে আছে। তারা এই বদ্ধমূল হীনমন্যতার জন্যেই এমন ভাবে নিজেদের মনকে তৈরী করে, যাতে তাদের এই অন্তর্নিহিত হীনমন্যতাটা শ্রেয়োমন্যতায় রূপান্তরিত হ'য়ে যায়। যৌন-ঘটিত ব্যাপারে শ্রেয়োমন্যতায় রূপান্তরিত এই হীনমন্যতাটা দেখা দেয় অতিমাত্রিক কামুকতার ছদ্মবেশে। এমন কি, এই রকম লোকদের মধ্যে যৌন-শক্তিরও মাত্রাধিক্য লক্ষিত হ'তে পারে।

পরিবেশের প্রভাবে এই ধরণের প্রচেষ্টার আবার পরিবর্দ্ধনও ঘটতে পারে। সকলেই জানেন যে, বিশেষ ধরণের ছবি, বই, চলচ্চিত্র এবং নরনারীর সঙ্গ ও মিলন-সম্পর্কিত সামাজিক অনুষ্ঠানাদির প্রভাবে মানুষের যৌনপ্রবৃত্তি কি ভাবে উত্তেজিত হ'তে পারে। বর্ত্তমান যুগে সমাজের সর্ব্বত্রই আমাদের পরিবেশটি এমনতর হ'য়ে উঠেছে যাতে ক'রে সর্ব্ব ব্যাপারেই যেন যৌন-প্রবৃত্তির উত্তেজনার কারণগুলিই বিশেষ করে প্রকট হ'য়ে উঠচে। যাতে ক'রে যৌনব্যাপারে মানুষের ঝোঁকটা ক্রমশঃই বেশী করে দেখ দিচ্ছে। এর দরুণ বিবাহ ও বংশবৃদ্ধির সিংহদ্বারস্বরূপ নরনারীর প্রেম ও যৌন-সম্বন্ধের দিক্ দিয়ে যে অধিকতর আনুকূল্যের রাস্তাটি গ'ড়ে উঠচে তাকে নিন্দা না ক'রেও একথা বলা চলে যে, বর্ত্তমান যুগে যৌন-ব্যাপারকে অতিরিক্ত মূল্য দেওয়া হয়।

এখন ছেলে মানুষ-করার ব্যাপারে বাপ-মাকে কিন্তু এই দিক্ দিয়ে সাবধান হ'তেই হবে। যৌন-আবেদনের আতিশয্যের আক্রমণ থেকে ছেলেদের রক্ষা করা একান্ত দরকার। দেখতে হবে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের অন্য সব দিকে ঝোঁকের বৃদ্ধির সঙ্গে তার যৌন-ব্যাপারের যেন ছন্দ-পতন না হয়। অর্থাৎ আর সব দিকে ঝোঁক তার যে অনুপাতে বাড়ছে যৌন-ব্যাপারে তার ঝোঁকটা যেন অন্ততঃ সেইটুকুই মাত্র বাড়ে—তার চেয়ে বেশী যেন না বাড়ে।

অনেক মা-বাপ তাদের শিশু-সন্তানদের মধ্যে যৌন-প্রবৃত্তির লক্ষণ দেখতে পেলে এমন আচরণ করেন যাতে ক'রে শিশুর মনোযোগটা সেই দিকে বেশী ক'রে চালিত হয়। শিশু তখন কোনো রকমে বুঝে নেয় যে, এই যৌন-ব্যাপারটার মধ্যে গুরুত্বটা যেন কিছু বেশী আছে। এটা যে হ'তে পারে সেটা খেয়ালই না ক'রে অনেক বাপ-মা ছেলেদের এই যৌন-প্রবৃত্তির লক্ষণকে দমন করবার জন্যে উঠে-প'ড়ে লেগে যান। দিন-রাত চলতে থাকে তিরস্কার ও অন্যবিধ শাস্তি।

এখন, যে সব ছেলে বাপ-মায়ের মনোযোগের কেন্দ্র হ'য়েই থাকতে চায় তাদের পক্ষে এর ফলটা খুব খারাপ দাঁড়ায়। তারা ঐ বকুনি খাবার লোভেই তখন এদিকে বেশী ক'রে ঝোঁকে। যেটা করতে নেই ব'লে দেওয়া হোলো, বাপ-মার মনোযোগ লাভ করবার জন্যে সেইটাই তারা বার বার করে। কারণ, তাহলেই বাপ-মা আর সব ছেড়ে তাকে নিয়েই মেতে থাকবেন। তা, হোক না কেন সে মেতে থাকার অর্থ তাকেই লাঞ্ছিত করা। লাঞ্ছনাকে সে তো গায়েই মাখে না। সে যে বাপ-মার একান্ত আদরের নিধি, তাকে নিয়ে যে তাঁদের মাথা-ব্যথার অন্ত নেই, এই সান্ত্বনাটুকুও তো ওরই মধ্যে লুকানো থাকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, শিশুর মধ্যে যৌন-প্রবৃত্তির লক্ষণ দেখা গেলে বাপ-মা বা অভিভাবকের পক্ষে উচিত হবে জিনিষটাকে অতিরিক্ত মূল্য না দিয়ে আর পাঁচটা শিক্ষার মতন সহজ ভাবেই এ বিষয়ে তাকে যথোচিত উপদেশাদি দান করা। শিশু যদি দেখে যে তার বাপ-মা বা অভিভাবক বিশেষ বিচলিত হননি তা হ'লে তাঁদের পক্ষে ঝঞ্ঝাটটাও অনেক কম হয়ে যাবে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত সহজে ফলোদয় হবে।

অনেক সময় এই সব শিশুদের এ রকম আচরণের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় যে তার অতি শৈশবে তার মা হয়তো তাকে ঘন ঘন চুম্বন-আলিঙ্গনের দ্বারা 'অতিরিক্ত' রকমের আদর প্রকাশ করে ফেলেছেন। মায়েদের মনে রাখা উচিত যে, এই আতিশয্য শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর তা যতই কেন তাঁরা বলুন না যে শিশুপুত্রকে ঐ ভাবে আদর না করে তারা পারেন না। ছেলের মঙ্গল চাইতে গেলে ওটুকু লোভ সংযত করতে হবে। কারণ, এ রকম আচরণ আসলে ঠিক আদর্শ মাতৃস্নেহের পরিচায়ক নয়। কথাটা হয়তো মায়েদের ভালো না লাগতে পারে, কিন্তু অসহায় শিশুসন্তানদের প্রতি এ রকম আচরণ আসলে শত্রুতারই নামান্তর। এই ধরণের 'আদরে-গোবরে' মানুষ ছেলেরা ভবিষ্যতে সুস্থ ও সুষ্ঠু যৌন-জীবনের অধিকারী হ'তে পারে না।

এই সম্পর্কে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, অনেক চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানীর ধারণা যে, শিশুর মানসিক এমন কি শারীরিক বিকাশ পর্য্যন্ত সব কিছুই নির্ভর করে তার যৌন-প্রবৃত্তির বিকাশের ওপর। এ্যাডলার কিন্তু এ কথা মানেন না। তাঁর মতে শিশুর যৌন-প্রবৃত্তির বিকাশ জিনিষটা একান্ত ভাবে তাঁর ব্যক্তিত্বের ওপরেই নির্ভর করে। যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ নির্ভর করে তার জীবনের ধরণ ও তার প্রোটোটাইপের ওপর।

অর্থাৎ যদি দেখা যায়, কোনো ছেলে একটি বিশেষ ধরণে তার যৌন-কণ্ডূতির পরিচয় দিচ্ছে এবং অন্য একটি ছেলে তার যৌন-প্রবৃত্তিকে অবদমিত করছে, তা'হলে পরিণত বয়েসে তাদের যৌন-জীবন কি রকম দাঁড়াবে তা আন্দাজ করে নেওয়া যায়। যদি দেখা যায়, কোনো ছেলে সর্ব্বদাই চাইছে সকলের মনোযোগের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠতে এবং বিজেতার ভঙ্গীটি সকল ক্ষেত্রেই প্রকাশ করতে চাইবে, তাহলে সে বড় হ'য়ে যৌন-ব্যাপারেও ওই ধরণটি আশ্রয় করবে। অর্থাৎ তখনও তার যৌন-জীবনে দেখা যাবে সে সেদিক্ দিয়েও সকলের মনোযোগের পাত্রই হতে চাইচে এবং যৌন-ব্যাপারে সর্ব্বত্রই সে একটা বিজেতৃসুলভ দৃপ্ত ভঙ্গীকে অবলম্বন করে চলচে।

অনেক লোক, যৌন-ব্যাপারে যারা বহু বিহারে আসক্ত এবং যৌন-সঙ্গিনীর ওপর আধিপত্য বিস্তারে অভ্যস্ত, নিজেদের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে একটা মজ্জাগত বিশ্বাস তাদের মনে বদ্ধমূল থাকে। তাদের ধারণা যে, ওই বহু ভোগলিপ্সাটাই তাদের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ। সেই জন্যে নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করবার জন্যেই তারা বহু রমণীতে আসক্ত হয়। তাদের এ রকম আচরণের কারণটা অতি সহজেই বোঝা যায়। আসলে তাদের এই শ্রেয়োমন্যতাটা কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভূয়ো। মনের মধ্যে তাদের শেকড় গেড়ে বসে আছে একটা হীনমন্যতা। সেই হীনমন্যতাটাকেই 'ধামা চাপা' দেবার জন্যে তাদের ঐ শ্রেয়োমন্যতার ছদ্মবেশ। তাদের মনেরই গোপন কারসাজিতে তারা ঐ হীনমন্যতাকে কাটিয়ে ওঠবার একটা উপায় বার করে 'বিজেতা' সাজবার চেষ্টা ক'রে। আর সেই জন্যই তাদের যৌন-সঙ্গিনীর ওপর ঐ আধিপত্য বিস্তারের আর বহু ভোগলিপ্সার আয়োজন।

এ্যাড্‌লার বলেন, সব রকমের যৌন অনাচার ও অপচারের মূলেই থাকে মানুষের অন্তর্নিহিত হীনমন্যতা। হীনমন্যতার অত্যাচারে যে জর্জ্জরিত, সে-লোক অহরহঃ তার ঐ হীনমন্যতার হাত থেকে মুক্তি চাইচে—আর সেই জন্যেই কষ্টকর শক্ত রাস্তাটি বর্জ্জন ক'রে কোনো সহজ 'শর্ট-কাট্' অর্থাৎ সোজা রাস্তা খুঁজ্‌চে। আর এই সোজা রাস্তা খুঁজতে গিয়েই তারা ভুল রাস্তাও বেছে নিচ্ছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের মতে সোজা ও আসলে ভুল, 'এই রাস্তাটি হ'চ্চে জীবনের ভারী ভারী সমস্যাগুলোকে এড়িয়ে গিয়ে যৌন-চর্চ্চার নিভৃত কন্দরে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে একান্ত ভাবে যৌন-চর্চ্চাতেই লিপ্ত হওয়া।

এ ক্ষেত্রে ঐ লোকটাকে হয়তো সাধারণ লোকে প্রবল যৌনশক্তি-যুক্ত ঘোরতর ইন্দ্রিয়পরায়ণ একটা মানুষ ব'লেই মনে করবে। আসলে কিন্তু তার যৌনশক্তিটা সাধারণের চেয়ে বেশী না হ'লেও সে জীবনের অন্য সব সমস্যা থেকে পালিয়ে এসে যৌন-চর্চ্চার নিভৃত নিলয়ে আত্মগোপন ক'রে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যেই তাকে ঐ রকম দেখাচ্ছে। তার এই অবস্থা যৌনশক্তির প্রাবল্যে নয়, হীনমন্যতারই আধিপত্যে।

[ক্রমশঃ

আঁচ

পরিমল মুখোপাধ্যায়

রঙীন ধোঁয়ার মত একটু ব্যথার ছোঁয়া
লেগে থাকে মনে :
জীবনের মরুভূমে কোথা মোর ওয়েসিস
খুঁজে মরি শুধু।
বন্ধ্যা অভিসার শেষ—
পিছনের আদিম গহনে
তবু কিছু সবুজের সমারোহ ছিল,
আজ সেথা শতাব্দীর সংস্কৃতির মদালসা নগরীর
অতন্দ্র ধূসর জাগে !
কান পাতি গর্ভবতী ধরণীর বুকে—
আর্ত্তি শুনি আসন্ন ভ্রূণের,
বার্ত্তাবাহী বর্ত্তিকার ভবিষ্য ফসল !

দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব ভুলি,
ঘড়ি আর দিনপঞ্জী হেরি আর বার :
রাত এগারটা বাজে,
বিংশতি শতকের ছ'চল্লিশ সাল,
রক্তের স্বাক্ষরে মাথা তের ফেব্রুয়ারি !

দাম্পত্য জীবন

সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দাম্পত্য জীবন কি ভাবে সুখকর ও শান্তিপূর্ণ করা যায় এ প্রশ্ন অতি পুরাতন। পুরাতন হ'লেও সম্ভবতঃ আজও এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। এ কথা অজানা নেই, দাম্পত্য জীবন সুখকর করবার জন্য প্রচলিত নিয়মগুলি যথেষ্ট নয় এবং এ বিষয়ে কোন সমাজ তার নিয়ম ও শাসনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশেষ কোন সফলতার দাবী করতে পারে না। প্রতি সমাজে দাম্পত্য জীবনের সমস্যাগুলি ক্রমে জটিল হয়ে দেখা দিচ্ছে। প্রতিদিন নূতন প্রশ্ন এসে উপস্থিত হচ্ছে।

মানুষের যৌন-বোধ যে সব ক্ষেত্রে সমাজের নিয়ম নিষ্ঠা অতিক্রম ক'রে অতি কৌশলে আত্মপ্রকাশ করে সমাজকেও অস্বীকার করে, সে ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবন সুখময় হবে এ কথাও বলা যায় না। যে স্থলে যৌন-বোধের প্রশ্ন প্রশ্ন নয়, সমাজের নামে ত্যাগ ভক্তি প্রভৃতি একমাত্র বিবেচনার বিষয়, সে স্থলে দাম্পত্য জীবন কতটুকু সফলতা লাভ করতে পারে গভীর সন্দেহ আছে।

সমাজের নিয়ম ও শাসন পরিবর্ত্তনের উপরেই কি দাম্পত্য জীবনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে—এ প্রশ্ন নিয়ে গবেষণার অন্ত নাই। অনেকে মনে করেন, শৈশবের শিক্ষা পরিবর্ত্তন আবশ্যক—এ-কথাও আলোচনা হয়ে গেছে। এ কথা সকলেই জানেন যে, কোন বিষয়ে জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করলেই আমরা শিশুর জীবনের সম্বন্ধে আলোচনা করি। শিশুর জীবনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন—এ কথা বলার কি অপেক্ষা রাখে। শৈশবের শিক্ষা পরবর্ত্তী কালের যৌন-সমস্যার উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করে, তথাপি স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যৌবনে বংশানুক্রমিক ও পারিপার্শ্বিক জটিলতার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া সম্ভব হয় না। দাম্পত্য জীবনের প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায়। পিতা-মাতার দাম্পত্য জীবনের সফলতার উপরে অনেকাংশে শিশুর ভাবী কালের গতি নির্ভর করে। দাম্পত্য জীবনে সফলতা ভাবী শিশুর সফলতা ও পরিপূর্ণতার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী। দাম্পত্য জীবনের সফলতার প্রভাব অতি সুদূরপ্রসারী, কোন সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে ব্যক্তিগত জীবন পর্য্যালোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

ব্যক্তিগত জীবনে সামাজিক নিয়ম প্রতিপালিত হয়েছে, তথাপি আশানুযায়ী দাম্পত্য-সম্পর্ক স্থায়ী হয় নাই—এমন দৃষ্টান্ত সর্ব্বদাই আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়। অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। শাস্ত্র অনুযায়ী অতিশয় নিষ্ঠাবান্ কোন হিন্দু-দুহিতা বিবাহিতা হলেন, বিবাহের পরে পরস্পরের মিলন এতই আশাপ্রদ হয়েছিল যে উভয় পক্ষের পিতা-মাতা এ বিবাহে বিশেষ শান্তি লাভ করেছিলেন। এত মিল সত্ত্বেও কিন্তু কিছু কাল পরেই অমিল দেখা দিল। ক্ষুদ্র বিষয়েও অত্যন্ত তিক্ততা এসে উপস্থিত হল। তথাপি পরস্পরের বিরক্তিকর তিক্ততার অবসান হল না—উপরন্ত বৃদ্ধি পেল। সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে স্ত্রী পিতৃ-গৃহে প্রস্থান করলেন। পরে স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করেই দিনাতিপাত করছিলেন। স্বামীও বিচ্ছিন্ন ভাবে তাঁর স্বাভাবিক কর্ম্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে সুর-সাধনায়—গানে ও যন্ত্রসঙ্গীতে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। দীর্ঘ দিনের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও দাম্পত্য জীবনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হল না। এ ক্ষেত্রে যারই ত্রুটি-বিচ্যুতি হোক্ না কেন, অনেক স্বামী স্ত্রীর প্রতি সমস্ত দোষ আরোপ ক'রে আর একটি বিবাহ ক'রে বসেন, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সমাজে এ পদ্ধতি প্রচলিত আছে—স্বামী এ অধিকার থেকে অবশ্য বঞ্চিত হন নাই। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে পরস্পরের দাবী বিবেচনা করলে অনেক সময় স্বামীকে হয় কৃপার চক্ষে দেখতে হবে, নয়'ত অলৌকিক কোন কারণ সন্ধান করে স্বামীকে তাঁর নূতন দাম্পত্য সম্পর্কের দাবী সমর্থন করতে হবে। যেখানে সমর্থন করাই উদ্দেশ্য সেখানে যুক্তির অভাব ঘটে না। সে কথা যাই হোক, পরস্পরের অমিলের কারণ অনুসন্ধান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। প্রথমেই আমরা প্রচলিত ঝোঁক থেকে মুক্ত হতে চাই, সেই কারণেই বিষয়টি বিশ্লেষণ করে সামাজিক রীতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করাই প্রয়োজন। স্বামীর প্রতি বিরূপ হওয়ার প্রয়োজন নাই। যে পরিবারের সমস্যা আমরা আলোচনা করছি সেখানে স্বামী দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন নাই। স্ত্রীর প্রধান অভিযোগ ছিল—তিনি তাঁর স্বামীর যথেষ্ট আদর লাভ করেন নাই। কাপড় গহনার প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল না, তিনি স্বামীর আন্তরিকতার অভাব অনুভব করতেন। বাহ্যিকতা তিনি ঘৃণাই করতেন।

স্বামীর অভিযোগ ছিল—বহু যত্ন করেও তিনি স্ত্রীর মন পেতেন না, এই কারণে তিনি অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করতেন।

উভয় পক্ষেরই প্রেম লাভের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না, তথাপি প্রেম লাভ হয় নাই।—প্রেম লাভ না হওয়ার কি কারণ?

অনুসন্ধানে জানা গেছে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই নিজের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে পারেন নাই। স্বামী মনে করতেন, নারীর পক্ষে যা স্বাভাবিক—সেই সকল বস্তুই তাঁর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করবে; সুতরাং স্ত্রীকে প্রচুর গহনা থেকে সুরু করে নারীসুলভ বাসনার ধারণা অনুযায়ী বিভিন্ন উপাদানে ভূষিত করতেন।—তিনি একবারও মনে করেন নাই—তাঁর স্ত্রী সম্পূর্ণ নারী নন, তিনি এক অংশে পুরুষ এবং তার পুরুষ অংশ পুরুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা নিয়েই বুভুক্ষু অবস্থায় পীড়িত।

নারী ও পুরুষ দুইটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বর্ত্তমান, এ কথা স্বামীটি জানতেন না। স্বামীর মধ্যেও যে নারী বর্ত্তমান তিনি যে কেবল পুরুষ নন, এক অংশে তিনিও একান্ত ভাবে নারী, এ কথা উপলব্ধি করতে পারেন নাই। তাঁর পুরুষ অংশ শাড়ী গহনা প্রভৃতি দান করে উৎসাহ ও আনন্দ বোধ করতেন, কিন্তু তাঁর নারী অংশ এই দানে ক্ষুন্ন হতেন। স্বামীটির এই নারী অংশই অন্তরে ক্লেশ অনুভব করতেন। এই নারী অংশ লক্ষ্য করতেন—শাড়ী গহনা তিনি পাচ্ছেন না অপর একটি নারীর ভোগে চলে যায়। কিন্তু যে নারীর কাছে ঐ সব বিষয়গুলি পাঠান হয় সেগুলি প্রত্যাখ্যাত হয়, এই সুখটুকু তিনি অনুভব করতেন এবং এই কারণেই বিশেষ হিংসা করার প্রয়োজন হয় নাই।

অপর পক্ষে তাঁর স্ত্রীর পুরুষ অংশ গহনা শাড়ী ও আদর আপ্যায়ন প্রভৃতি পেয়ে সন্তুষ্ট হতে পারতেন না ও মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুন্ন হতেন। কারণ পুরুষের কাছে পুরুষের প্রেম সার্থক হয় না, সেখানে স্বাভাবিক আকর্ষণ নেই—অপূর্ণতার ব্যর্থতা আছে মাত্র।

উভয়ের পরিণতি লক্ষ্য করলে বিষয়টি সহজে স্পষ্ট হবে। স্ত্রী সন্তান লাভ করেও শান্তি লাভ করতে পারেন নাই। তিনি

পিতৃগৃহেই প্রস্থান করলেন। অবশেষে স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করে দিন কাটাতে মনস্থ করলেন। জীবিকা অর্জ্জনে মনে প্রভূত শান্তি অনুভব করতেন। প্রকৃত পক্ষে পুরুষসুলভ বাসনা জীবিকা অর্জ্জনের সাহায্যে পূর্ণ হ'বার সুযোগ লাভ করেছিল। এই পুরুষ-সুলভ বাসনার চরিতার্থতায় তিনি যে শান্তি লাভ করেছিলেন তার অর্থ তাঁর পুরুষ অংশে বাসনার চরিতার্থতার প্রয়োজন ছিল। সামাজিক বিধি-নিষেধের গণ্ডী অতিক্রম না করে ঐ বাসনা পরিপূর্ণ-রূপে চরিতার্থ হওয়ার সফলতার উপরে নারীসুলভ চরিত্রের স্বাভাবিক রূপ প্রকাশ পাওয়া নির্ভর করে। পুরুষসুলভ বাসনা নারীর মধ্যে লক্ষ্য করে বিচলিত হলে মানুষ স্বাভাবিক বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হয় ও মনের বিকৃতি প্রকাশ পায়।

স্বামীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, অবশেষে তিনি গান-বাজনা প্রভৃতি বিষয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর মধ্যে নারী গান-বাজনার মধ্যেই তৃপ্তি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ক্রমে মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে বৃত্তীয় চিকিৎসায় (Occupational Therapy) উভয়েই বিকৃত মনের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। তখন পুনর্মিলন সম্ভব হয়েছিল।

অপর একটি গৃহে দাম্পত্য জীবনের সুরু থেকে পরিণতি লক্ষ্য ক'রলে দেখা যাবে, কি ভাবে পরস্পরের প্রতি যৌন আকর্ষণও অর্থহীন হয়ে যায়।

যুবকটি বিবাহের বহু পূর্ব্ব থেকেই বালিকাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন। উভয়েই পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধায় স্বভাবতঃই মুগ্ধ ছিলেন। কিন্তু বিবাহে বিঘ্ন ছিল—সামাজিক নিয়ম তাঁদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিল। অবশেষে তাঁরা প্রচলিত নিয়ম অতিক্রম করাই স্থির করলেন। আইনের সাহায্যে বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে বিবাহ করতে হয়েছিল। যুবকটি অবস্থাপন্ন ছিলেন, স্ত্রীকে যত দূর সম্ভব আদর-যত্নে রাখতেন, অভাব এমন কিছু ছিল না। স্ত্রীকে সর্ব্ব বিষয়েই সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করতেন এ কথা অনেকেই জানতেন। এবং তিনি স্থানীয় অনেকের সমালোচনার পাত্র হয়ে পড়েছিলেন—তিনি স্ত্রৈণ এ কথাও অনেকে বলতেন। তথাপি স্ত্রীর মন তিনি পান নাই—ক্রমে এ কথার প্রমাণ পাওয়া গেল। তাঁর স্ত্রী তাঁকে সন্দেহ করতেন—তিনি অপর স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত। সন্দেহ ক্রমে ক্রোধে পরিণত হল। অবশেষে মহিলাটি মানসিক রোগে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে।

এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে, অনেক ক্ষেত্রে স্বামী ঐরূপ আসক্ত হয়ে পড়েন ও কৌশলে বিষয়টি গোপন রাখেন। অনেকে এ বিষয়ে তাঁদের সফলতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু তাঁদের গোপন মনের নির্জ্জান অংশের কৌশল সম্বন্ধে তাঁরা অত্যন্ত অনভিজ্ঞ। গোপন কথা গোপন নির্জ্জান মনের অধিশাস্তা (Super-Ego) অতি অজানা কৌশলে গোপনে সমস্ত তথ্যই অতি সহজে প্রকাশ করে দেয়। অতি চতুর স্বামী তা জানতে পারেন না। সুতরাং স্ত্রীর মানসিক রোগপ্রবণতার জন্ম স্বামী দায়ী না হতে পারেন কিন্তু রোগ প্রকাশের জন্ম সম্পূর্ণরূপে তিনি দায়ী। গৃহে আগুন লাগার জন্ম যেমন আগুনকে দায়ী করা যায় না—যে ব্যক্তি আগুন ধরিয়ে দেয় তাকেই দায়ী করা প্রয়োজন।

মহিলাটির সন্তান হবার পর কি হল সে কথাই আমরা এখন আলোচনা করছি। মহিলাটি সন্তান লাভ ক'রে সন্তানকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন ও ক্রমে তাঁর ভুল ধারণা চলে যাবে অনেকে এই রকম আশা করেছিলেন। কিন্তু তিনি সন্তানকে ক্রমে অযত্নই করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি সমাজে থাকার সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে পড়লেন। তাঁকে চিকিৎসার জন্ম হাসপাতালে পাঠাতে হল। রোগ তখন ক্রমে বেড়েই চলেছে—নানা রকম ভ্রান্ত ধারণা তাঁর মনে আসত। তিনি মনে করতেন, অসংখ্য যুবক তাঁকে বিবাহ করার জন্ম ব্যস্ত কিন্তু তিনি তাদের ঘৃণা করেন। কিছু কাল পরে বিপরীত কথা বলতে লাগলেন—যুবকদের দেখলেই তিনি বিবাহ করার জন্ম উপরোধ-অনুরোধ করতে লাগলেন।

এখন ভেবে দেখা যাক, তিনি তাঁর স্বামীর প্রতি যে সন্দেহ করতেন সে সন্দেহ কি ভাবে সৃষ্টি হল।

স্ত্রীর মধ্যে নারী ও পুরুষ বর্ত্তমান আছেন, তার মধ্যে নারী-অংশ মনে মনে অনুভব করতেন; তাঁর বহুগামিতার (Polygamous) প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে। এই নারীটি স্বামীর মধ্যে পুরুষটিকে আকাঙ্ক্ষা করতেন কিন্তু স্বামীর অপর অংশে যে নারী বর্ত্তমান, তাকে হিংসা ও ঘৃণা করতেন এবং স্বভাবতঃই তাকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। সম্ভবতঃ তাঁর বহুগামিতার পক্ষে ঐ নারী কণ্টকস্বরূপ,—এইরূপ অনুভব করতেন। অনুরূপ ভাবে তাঁর অপর অংশ অর্থাৎ পুরুষ-অংশ স্বামীর মধ্যে নারীকেই আকাঙ্ক্ষা করতেন কিন্তু পুরুষ-অংশকে ঘৃণা ও হিংসা করতেন এবং নানারূপ সন্দেহ করতেন। এই ভাবেই মনে হিংসা ও সন্দেহ এসে বদ্ধপরিকর হয়ে বসল। যেহেতু নিজের বহুগামিতার আকাঙ্ক্ষা অন্তরে অজ্ঞাতসারে হলেও অনুভব করা সম্ভব সেই কারণেই বাস্তব ঘটনার অপেক্ষা না রেখেই অপরের মধ্যেও বহুগামিতার আকাঙ্ক্ষা আছে এই সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল। নিজের মনের গতি ও অনুভূতি দিয়েই অপরের মনের গতি সম্বন্ধে ধারণা জন্মায়। স্ত্রী যখন স্বামীর চরিত্রে সন্দেহ করেন তখন তিনি তাঁর নিজের অনুভূতি দিয়েই স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা করেন। এ কথা জানা দরকার, প্রত্যেক মানুষের মনেই এই রকম বহুগামিতার আকাঙ্ক্ষা আছে। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা অসামাজিক, সুতরাং সমাজে অসামাজিক কামনাকে বাধা দিতেই হয়। ঘৃণা ক্রোধ প্রভৃতি দিয়ে বাধা দেওয়া হয়—ঐগুলি না থাকলে বাধা দেওয়া সম্ভব হত না, ঘৃণা প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু বহুগামিতার আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা নাই। যেখানে অসামাজিক আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করার তাগাদা আসে সেখানে ঐ আকাঙ্ক্ষা সজোরে নিজেকে প্রকাশ করে, প্রতিষ্ঠা করে ও চাপা নির্জ্জান মন থেকে বার হ'য়ে মনের সামনে সংজ্ঞান মনে এসে উপস্থিত হয়, তখনই মানসিক বিকৃতি দেখা যায়।

মহিলাটির ইচ্ছা-সমষ্টি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তাঁর অসামাজিক আকাঙ্ক্ষা কিন্তু নারী-অংশের নয়—পুরুষ-অংশেরই। নারী হলেও তার মধ্যে পুরুষ-অংশের কামনা বাসনা বর্ত্তমান আছে, সেই কারণেই তিনি সন্তান লাভ করেও সুস্থ হতে পারেন নাই। তাঁর পুরুষ-অংশ অতৃপ্ত, ক্ষুধার্ত্ত ও পীড়িত অবস্থায় ছিলেন। এই বয়সে অতৃপ্ত পীড়িত ব্যক্তি আমরা সর্ব্বদাই

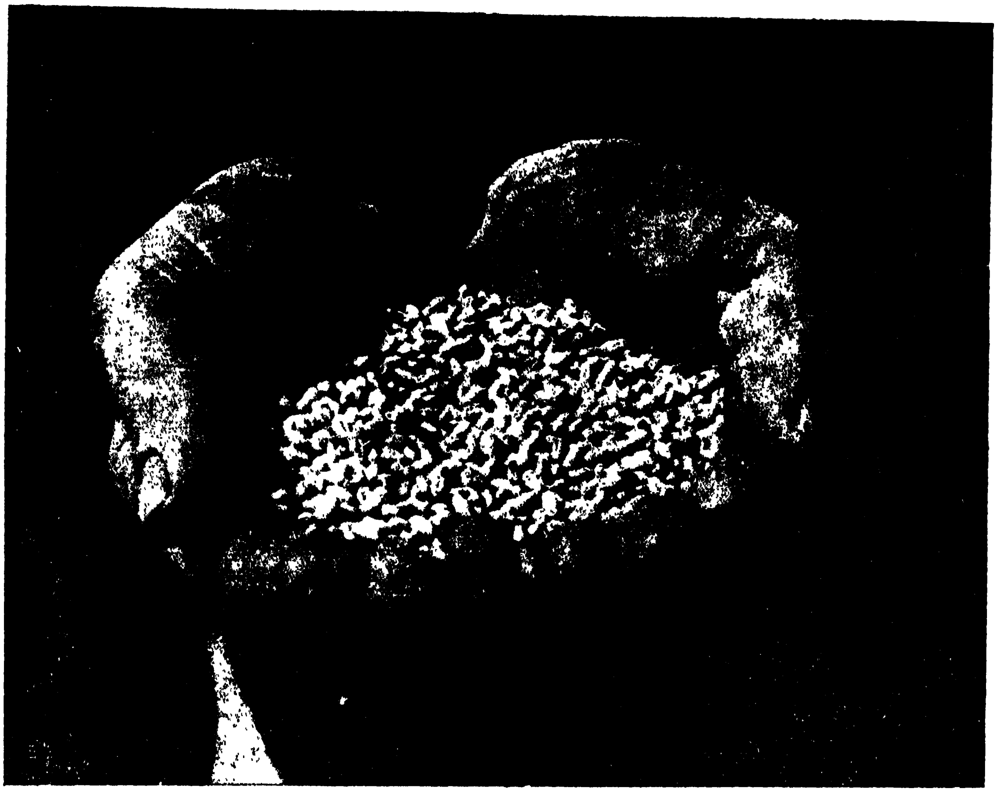
দেখতে পাই—তাঁরা খুব সুস্থ নন। যে কোন সময়ে মানসিক রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। যাই হোক, তিনি তাঁর স্বামীকে বহুগামিতার জন্ম যে সন্দেহ করতেন এই সন্দেহ করার মধ্যে বিশেষ একটি কৌশল (mechanism) ছিল। নিজের বহুগামিতার আকাঙ্ক্ষা তাঁর স্বামীর উপরে আরোপ করতেন, তার প্রমাণ তিনি নিজেই বহু যুবকের সঙ্গেই যৌন-সুখের আকাঙ্ক্ষা করতেন। যদি এই অসামাজিক আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায় এই ভয়েই তিনি ঐ আকাঙ্ক্ষার সামনে প্রচুর ঘৃণা এনে উপস্থিত করতেন। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ হবার পূর্ব্বেই তিনি নিজের আকাঙ্ক্ষা বহু যুবকের সম্বন্ধে আরোপ করতেন ও বলতেন তাঁরা তাঁকে বিবাহ করতে চান। নিজের আকাঙ্ক্ষা অপরের প্রতি আরোপ করার বিশেষ কারণ আছে। এই অসামাজিক আকাঙ্ক্ষার জন্ম নিজের কোন দায়িত্ব থাকে না। এই ভাবে নিজেকে সামাজিক আবহাওয়ায় নির্দোষ রাখার চেষ্টা হয়। যতক্ষণ মানুষের সমাজের প্রতি নির্ভর ও শ্রদ্ধা সামান্য পরিমাণেও থাকে ততক্ষণ বাস্তব জগতের সঙ্গে কিছু সম্পর্ক থাকে।

দাম্পত্য জীবনের অপর একটি সমস্যা আমরা আলোচনা করব। সচরাচর বালিকাদের বিবাহ সম্পর্কে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমানে অনেক ক্ষেত্রে মতামত গ্রহণ করা হয়! যে বালিকাটি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব তাঁর মতামত গ্রহণ করা হয়েছিল। এই বিবাহে তাঁর সম্পূর্ণ অমত ছিল, অমত থাকা সত্ত্বেও সামাজিক অনুরোধে ও পিতা-মাতার মুখরক্ষা করার জন্ম অবশেষে তিনি মত দিলেন! বিবাহের পরে স্বামীর ব্যবহার ও মতামত লক্ষ্য করে তিনি অত্যন্ত নিরাশ হয়েছিলেন। নিরাশ হয়েও তিনি নীরবে সমস্তই সহ্য করতেন। স্বামীর কাছে স্বাভাবিক দাবী উপস্থিত করে তিনি ব্যর্থ ও ক্ষুণ্ণ হলেও সংসারে তিক্ততা আনতেন না। তিনি তাঁর ভক্তি, ত্যাগ প্রভৃতি গুণগুলি এমনই সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন যে, তাঁর স্বামীর মনের কদর্য্যতা অনেক পরিমাণে কমে এসেছিল। স্ত্রীর স্বামি ভক্তি দেখে সকলেই নিশ্চিন্ত ছিলেন। দীর্ঘ দিন যায় নাই হঠাৎ এক দিন শোনা গেল স্ত্রী হিষ্টিরিয়া রোগে ভুগছেন। যখন হিষ্টিরিয়া রোগ আক্রমণ করে তার কিছু পূর্ব্বেই তিনি বুঝতে পারতেন। পূর্ব্ব থেকেই তিনি সাবধান হতেন। লেপ-তোষক, কাপড়-জামা নিজের শরীরের উপরে রাখতে বলতেন ও সকলকে অনুরোধ করতেন—তাঁর হাত-পা যেন বেঁধে ফেলা হয়। কিছুক্ষণ পরেই তিনি নিজের কাপড় জামা খুলে ফেলবার চেষ্টা করতেন ও ধস্তাধস্তি করতেন, চিৎকার করে বলতেন, "ছেড়ে দাও—আমায় ছেড়ে দাও।" কিন্তু হাত-পা বাঁধা থাকার জন্ম ও প্রচুর লেপ-তোষক চাপা থাকায় পেরে উঠতেন না। যত দিন কুমারী ছিলেন তত দিন তিনি মুক্ত ছিলেন, যে কোন যুবকের কাছেই যেতে পারতেন—তাঁর এ ধারণা ছিল। এখন এই রকম স্বামীর ঘরে এসে বন্ধনে পড়েছেন এ ধারণা তাঁ'র কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। কিন্তু সামাজিক ভাবে এ বন্ধন ছিন্ন করা যায় না, সেই জন্ম রোগের মধ্যে ঐ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেত! বহুগামিতার অসামাজিক বাসনা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা দেখেই এই রোগ প্রকাশ পেয়েছিল। এ বাসনা নির্জ্ঞান মনের এতো গভীর স্তরে সম্পূর্ণ অজানা ছিল যে, সংজ্ঞান মনে তা জানার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। এ বাসনা কেবল দীর্ঘ দিন মন-বিশ্লেষণের ফলেই জানা সম্ভব।

দাম্পত্য জীবন গভীর রহস্যপূর্ণ! কি ভাবে রহস্যের রচনা হয় তার আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

কোন একটি ভদ্রলোক মাথায় দীর্ঘ চুল রাখতেন, সরু চাপা গলায় কথা বলতেন, অনেকটা স্ত্রীলোকদের অনুকরণে কাপড় পড়তেন। বেশ ঘাড় বাঁকা করে, সলজ্জ ভাবে আড় ভাবে তাকিয়ে দেখতেন। তিনি বিবাহের সময় একটি মেয়েকে পছন্দ করলেন, মেয়েটি দৃঢ় রুক্ষ মূর্ত্তি—মিলিটারীতে কোন কাজ করেন। সন্তান হবার পরে মহিলাটি কাজ করতে পারতেন না—ক্রমে তাঁর কোমল কমনীয় নারীর মূর্ত্তি প্রকাশ পেল। নারীভাবাপন্ন স্বামীটি ক্রমে সব বিষয়েই অত্যন্ত উদাসীন হয়ে পড়লেন। তখনও তাঁর নারী-সুলভ বাসনা পরিপূর্ণরূপে চরিতার্থ করতে পারেন নাই। স্ত্রী সম্বন্ধে ক্ষুদ্র বিষয়েও নানা অভিযোগ করতেন। অবশেষে স্বামীটি সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ত্যাগ করলেন।

আমরা দাম্পত্য জীবনের পরিণতি লক্ষ্য করে মাত্র কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করেছি। যে সব বাসনার কথা বলা হয়েছে সেগুলি স্পষ্ট ভাবে থাকে না—চাপা নির্জ্ঞান মনে থাকে, সুতরাং সহজ ভাবে জানা সম্ভব হয় না। নানা ভাবে মনের অসামাজিক অপূর্ণ বাসনা প্রকাশ হবার চেষ্টা করে। একমাত্র কর্ম্মের ভেতরেই বাসনা প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু এ কর্ম্মগুলি সামাজিক বিধি-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যেই প্রকাশ পাওয়া প্রয়োজন। কোন্ কর্ম্মে কোন্ বাসনা পূর্ণ হওয়া সম্ভব, বৃত্তীয় চিকিৎসায় (Occupational Therapy) জানা যায়। এ সম্বন্ধে ব্যবহারিক কর্ম্মে আত্ম-প্রকাশ করার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা অর্জ্জন করাই প্রথম কথা। এই ক্ষমতা অর্জ্জন করতে হলে নিজের মনঃসৃষ্টির (Phantasy) অনুসন্ধান করতে হয়। কি ভাবে নিজের অনুভূতি পরিচালিত হয় এবং অপরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে নিজেকে মনঃসৃষ্টি অনুযায়ী একান্ত অভিন্ন (Identified) করে ফেলা হয় তা সহজে ধরা যায় না। এ বিষয়ে মনের অদ্ভুত কৌশল (mechanism)গুলি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। অস্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনে সুখী হ'তে হলে শরীর সম্বন্ধে যেমন মন সম্বন্ধেও অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান থাকলেই বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে বৃত্তীয় চিকিৎসার সাহায্য গ্রহণ করা যায়। রোগ ও রোগী অনুযায়ী ক্ষেত্রবিশেষে কর্ম্মের নির্ব্বাচন হওয়া প্রয়োজন ও যথানির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম—যে ভাবে ওষুধ ব্যবহার করা হয়—সেই ভাবেই ব্যবহার করা প্রয়োজন। সামান্য কর্ম্ম এমন কি পাখী-পোষা পুতুল-গড়া সেলাই করা, ছবি-আঁকা গুরুতর রোগে চিকিৎসার জন্ম প্রয়োজন হতে পারে। বয়স্ক পুরুষ রোগীর পক্ষে পুতুল-গড়াও অনেক সময় রোগ আরোগ্যের জন্য প্রয়োজন হয়। বয়স্কা মহিলাকে পাখী-পোষা ও লাল বল খেলতে দিয়ে দেখা গেছে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে গেছেন, কিন্তু যে ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবনে কোন সমস্যা নাই মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য—সে ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবন উন্নত করার ও ভাবী সন্তানদের উপরে প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান যুগের বৈষম্য-মূলক ব্যবস্থা দাম্পত্য জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করেছে তার পরিণতি থেকে মানুষকে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, এ কথা স্বীকার করে নেওয়াই প্রয়োজন।



দি গুড আর্থ

শিশির সেনগুপ্ত

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

সেই দিন থেকে দিনের আলোয় পথে বের হওয়া ত্যাগ করলে ওয়াঙ। বড় ছেলেটিকে দিয়ে রিক্‌শা পাঠিয়ে দিলে মালিকের কাছে। রাত্রি হোল যখন মালের গুদামে গিয়ে সে আধা-মজুরীতে বড় বড় মালের বাক্স টেনে নিয়ে যাবার কাজ নিলে। প্রত্যেকটি ওয়াগন টানে বারো জন মজুর। টানে আর কাতরায়। সেই সব বাক্সে সিল্ক, তুলা আর তামাক ঠাসা। সে তামাকের সুরভি কাঠের পাটাতন চুঁইয়ে আসে। তাছাড়া তেল আর মদ চালান হয়।

সারা শরীর ঘামে ভিজে যায় সারা রাত ধরে। রাত্রের কুয়াসায় ভেজা পাথরের উপর খালি পা পিছলে যায়। অন্ধকারের জন্য কুলীদের সামনে দিয়ে চলে এক জন ছোকরা হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে সেই মশালের আলোয় পথের পাথর আর কুলীদের গা সমান চক-চক করে। ভোর হবার আগেই ওয়াঙ বাসায় ফেরে হাঁফাতে হাঁফাতে। সারা শরীর ঘুমে ভেঙে আসে। খাবার ইচ্ছা থাকে না। বাসায় খড়ের গাদা দিয়ে ওলান তার জন্যে যে হারেম তৈরী করে দিয়েছে, সারা দিন ওয়াঙ সেখানে নিরাপদে ঘুমোয়। পথে-পথে সৈন্যেরা দাপাদাপি করে জোয়ান মানুষ খুঁজে বেড়ায়।

কোথায় কারা লড়াই করছে তা ওয়াঙ জানে না। সারা দিন সহরের পথে বড়লোকদের গাড়ী ছুটে চলে নদীর দিকে। সেই সব গাড়ীতে যায় বড়লোকরা, তাদের দামী আসবাব আর অলঙ্কার আর যায় তাদের সুন্দরী মেয়েমানুষদের দল। নদীর তীরে এসে জাহাজ ভেড়ে। সব নিয়ে বড়লোকরা ভিন-দেশে চলে যায়। আগুনে গাড়ীতেও অনেকে পালাচ্ছে। ছেলে দুটি পথ থেকে খবর আনে। বড় বড় ডাগর চোখ তুলে বাপকে তারা বলে—

'আজ আমরা অমুককে দেখলাম, তমুককে দেখলাম। এক জনকে দেখলাম, বাপ মন্দিরের ভগবানের মত এমনি মোটা। সারা গায়ে ঝলমল করছে সাটিন আর হীরে-মুক্তো। সারা গায়ে চর্বি যেন ফেটে পড়ছে।'

বড়টি বলে—'কত যে বাক্স যাচ্ছে তার আর ইয়ত্তা নেই। আমি এক জনকে বললাম, ঐ সব বাক্‌সে কি আছে? সে বললে, ওতে খালি সোনা আর রূপো আছে। কিন্তু বড়লোকরা সব ত আর নিয়ে যেতে পারবে না। এক দিন ও-সব আমাদের হবে। হ্যাঁ, বাবা, আমাদের হবে কি করে?'

ওয়াঙ ছোট করে জবাব দেয়—'কে কি বলছে কি করে জানব।'

ছেলেটি লুব্ধ চোখে চেয়ে বলে, 'আমার ইচ্ছে করে এখুনি গিয়ে আমাদের সোনা-রূপো নিয়ে আসি। কেক খেতে ইচ্ছে করে আমার খুব। পেস্তা-বাদাম দেওয়া মিষ্টি কেক আমি কখনো খাইনি।'

দাদুর তন্দ্রা ভাঙল। নিজের মনেই বিড়-বিড় করে তিনি বললেন—'যে বছর ফসল ভালো হয়, তখন শরৎ উৎসবে আমরা অমন কেক তৈরী করেছি। পেস্তা, বাদাম বিক্রী করার আগে কেক করার জন্যে কিছু আমি রেখে দিতাম।'

নতুন বছরে ওলান যে চালের গুঁড়ি আর চর্বি দিয়ে কেক তৈরী

করেছিল তার কথা মনে পড়তেই ওয়াঙের জিবে জল আসে। যেদিন চলে গেছে তার স্মরণে ওয়াঙের বুক টন-টন করে ওঠে।

'যদি দেশে ফিরতে পারতাম।'

হঠাৎ মনের মধ্যে কি বিদ্রোহ হোল ওয়াঙের তা সে বুঝলে না। মনে হোল যে কুঁড়েতে হাত-পা ছড়িয়ে সে শুতে পারে না, সেখানে আর সে থাকবে না। মনে হোল রাতের অন্ধকারে শরীর মাংস কেটে নেওয়া দড়ি টেনে-টেনে সে আর বেঁচে থাকার কৌতুক করতে চায় না। রাস্তার পাথরের প্রত্যেকটি তার শত্রু। দুটি পাথরের মধ্যের খাঁজে পা দিয়ে টানলে শরীরের যে সামান্যতম শক্তিও সে বাঁচাতে পারে তার প্রতি তার গভীর দরদ। যে সব রাত্রে বৃষ্টি হয়েছে, পাথরের উপর যেলে যখন ভারী বোঝার চাপে আর পা তুলতে পারে না সে, তখন তার সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ে ঐ পাথরগুলোর উপর।

'আমার সোনার দেশ।' হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠে ওয়াঙ। বাপকে কাঁদতে দেখে ছেলে দুটিও ভয়ে কাঁদতে সুরু করে। বুড়ো বাপ দাড়ী নাড়িয়ে মুখ এ-পাশ ও-পাশ করেন অস্থির হয়ে। মায়ের কান্না দেখলে কচি ছেলে অমনি করেই বুঝি মাথা ঝাঁকায় অসহায় হতাশায়।

শুধু ওলান তার স্বাভাবিক গলায় বললে—'আর একটু ধৈর্য ধর। কিছু ঘটবেই। সহরে নানা কথা রটছে।'

নিজের কুঁড়েতে শুয়ে ওয়াঙ সৈন্যদের পদধ্বনি শুনতে পায়। সারা দিন সৈন্যদের নানা বাহিনী কুচ-কাওয়াজ করে চলে। মাদুরের ফাঁক দিয়ে ওয়াঙ চেয়ে চেয়ে দেখে আর রাত্রে মাল টানতে টানতে মশালের আলোয় জেগে জেগে আতংকের দৃশ্য দেখে। কাউকে কিছু প্রশ্ন করে না। সারা রাত গোঁয়ারের মত খাটে। তার পর বাসায় ফিরে ভাত খেয়ে ঘুমোতে যায়। আতংকে ঘুমের মধ্যে চমকে চমকে ওঠে। পরস্পরের মধ্যে কথা বন্ধ হয়েছে সহরে। যতটুকু কাজ থাকে, দ্রুত সেরে নিয়ে যে যার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে।

সন্ধ্যা বেলা কুঁড়ের পাশে আর কেউ জমায়েত হয় না। বাজারে খাবারের দোকান খালি। অন্য সব দোকানও বন্ধ। দুপুর বেলা সহরের মধ্যিখান দিয়ে গেলে মনে হয় যেন একটা ঘুমন্ত পুরীতে এসেছি।

কানাকানি সুরু হয়েছে যে শত্রু সহরের নিকটেই এসে পড়েছে। যাদেরই কিছু মালিকানা আছে তারাই সন্ত্রস্ত হয়েছে। কিন্তু এই সব কুঁড়ের বাসিন্দাদের ভয়ের কিছু নেই, ভয় তারা পায়ওনি। শত্রু কে তা তারা জানে না। তাছাড়া একমাত্র প্রাণ ছাড়া আর তাদের কিছু নেই। আর প্রাণ যাওয়াও এমন কোন মারাত্মক ক্ষতি নয়। শত্রু যদি এসেই থাকে, তাকে আরো এগিয়ে আসতে দাও। যে অবস্থায় এরা বাঁচে তার চেয়ে আর শোচনীয় কি হতে পারে। একটা বেপরোয়া ভাব এসেছে মনে—কিন্তু কথা বন্ধ হয়েছে মুখে।

তার পর এক দিন মাল-গুদামের ম্যানেজার কুলীদের ডেকে বললে যে, কেনা-বেচা বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুণ তাদের প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। সুতরাং ওয়াঙ বেকার হয়ে দিন-রাত্রি বাসায় লুকিয়ে থাকতে লাগল। কত দিন সে বিশ্রাম পায়নি। যতটুকু ঘুমিয়েছে মড়ার মত পড়েছে। সুতরাং প্রথম দিকে এই বিশ্রামে ওয়াঙের মন খুসীতে উপচে পড়ল। কিন্তু তার পর মনে পড়ল এমনি বেকার দিন কাটালে তার বাঁচানো পয়সাগুলি ক'দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। একটা গভীর নিরাশায় তার বুক ভেঙে গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্য একা আসে না। সস্তা লঙ্গরখানাগুলি বন্ধ করে দিয়ে উদ্যোক্তারা দরজায় খিল বন্ধ করে দিলেন যখন, তখন সারা সহরে না রইল কাজ, না রইল আহার্য্য, আর না রইল পথচারীর কাছে ভিক্ষা লাভের আশা।

ছোট মেয়েটিকে বুকে করে নিয়ে ওয়াঙ দুয়ারের ধারে এসে বসল। কচি মুখখানির দিকে চেয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে—'ঐ পাঁচীলের ওপারে যে বড়লোকের বাড়ী আছে সেখানে যাবি? পেট ভরে খেতে পাবি, গা ঢাকা জামা পাবি।

মেয়েটির মুখ অবোধ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কচি কচি আঙুল দিয়ে সে বাপের চোখ ছোঁয়। ওয়াঙ চেঁচিয়ে বৌকে বলে—'বড়লোকের প্রাসাদে তুমি কি রোজ মার খেতে?'

ওলান সহজ কণ্ঠে বলে—'রোজ।'

বৌ যে স্বামীর কথার গূঢ়ার্থ বুঝতে পেরেছে তা জানতে পেরেও যেন শেষ আশার জন্য ওয়াঙ বলে—'কিন্তু আমাদের মেয়ে ত দেখতে ভাল। সুশ্রী ক্রীতদাসীরাও কি সমান শাস্তি পায়?'

তেমনি স্বাভাবিক কণ্ঠে ওলান বলে, 'খেয়ালমত ক্রীতদাসীরা হয় মার খায় আর নয়ত পুরুষের বিছানায় গিয়ে ওঠে। শুধু এক জন কর্ত্তার কাছেই নয়, যে কোন কর্ত্তার কাছে যে তাকে রাত্রে নিয়ে শুতে চায়। ছোটকর্ত্তাদের মধ্যে এই নিয়ে ব্যবস্থা হয়, ঝগড়া হয়। শেষ অবধি মীমাংসা হয় 'আচ্ছা তুমি সুখ কর, কাল আমার ঠিক রইল।' সব কর্ত্তাদের লালসা যার উপর মিটে যায় সে তখন দাসেদের লালসা মেটায়। সেখানেও সুরু হয় দর-কষাকষি, মন-ভাঙাভাঙি। তার উপর যে মেয়ে আবার সুশ্রী হয় দেখতে, তাকে ত ক্ষুদে কর্ত্তারা যৌবন হবার আগেই ভোগের জন্যে লাগায়।'

কচি মেয়েটিকে বুকের মধ্যে নিয়ে ওয়াঙ কান্না-ভাঙা গলায় বিড়-বিড় করে—'হতভাগী—হতভাগী!' কিন্তু তার বুকের মধ্যে একটা অসহায় কান্না আছড়ে পড়তে থাকে—'উপায় কি, উপায় কি!'

হঠাৎ যেন আকাশ ভেঙে পড়ার মত একটা বিকট আওয়াজ হোল। আতঙ্কে সবাই মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল। বুড়ো বাপ চীৎকার করে বললেন—'জন্মে কখনো শুনিনি এ কি আওয়াজ!' ছেলে দুটি ভয়ে আর্ত্তনাদ করতে লাগল।

একটু যখন চুপ-চাপ হোল, ওলান বললে—'যা শুনছিলাম তাই হয়েছে। শত্রুরা নগরের দরজা ভেঙে ফেলেছে। ওলানের কথার জবাব দেবার আগেই সবাই কান পেতে আর একটা আওয়াজ শুনতে লাগল। ঝড় আসার আগে যে ভাবে হাওয়ার বেগ চাপা গুঞ্জন তোলে, তেমনি করে সারা সহর থেকে জনতার গুঞ্জন নিম্ন গ্রাম থেকে উর্দ্ধে উঠে মন্দ্রমুখর হয়ে উঠতে লাগল।

ওয়াঙ সোজা হয়ে বসে রইল। কেমন একটা ভয় বিশ্রী সরীসৃপের মত তার গায়ের উপর দিয়ে চলাফেরা করতে লাগল। শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মাথা ঝাড়া দিতে লাগল। অন্য সকলেও সোজা হয়ে বসে পরস্পরের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। বাইরে লক্ষ কণ্ঠে গর্জন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ফুলে ফুঁসে উঠছে।

একটু পরেই তাদের কুঁড়ের কাছেই কোথায় একটা ভারী দরজা আর্তনাদ করে খুলে গেল। এক দিন সন্ধ্যায় যে পাইপওয়ালা লোকটি ওয়াঙের সঙ্গে কথা কয়েছিল, সেই লোকটি ওয়াঙের দরজায় উঁকি দিয়ে চীৎকার করে বললে—'এখনো ঘরে বসে আছ? সময় এসেছে আমাদের, বড়লোকের দরজা ভেঙে পড়েছে।' কিন্তু ওয়াঙ কথাটা বোঝবার আগেই ওলান আগন্তুক লোকটার হাতের তলা দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে যেন যাদুর মত।

মেয়েটিকে মাটিতে বসিয়ে দিয়ে ওয়াঙ পথে বেরিয়ে পড়ল। বড়লোকের বাড়ীর খোলা দরজার সামনে বিক্ষুব্ধ জনতা সেই চাপা গর্জন তুলছে। বিশৃঙ্খল জনস্রোত ইচ্ছার বেগে ছুটে চলেছে। এত দিন যারা ছিল সর্বহারা, বড়লোকের ইচ্ছার ক্রীতদাস, যারা জেল খেটেছে, খেতে পায়নি, তারা আজ সব বড়লোকের দরজায় হানা দিচ্ছে। স্বেচ্ছাচারের দিন পেয়ে তারাও আজ মেতে উঠেছে। দরজার সামনে মানুষের ভীড়ে আর সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও চোখে পড়ছে না। কখন্ নিজের অলক্ষ্যেই ওয়াঙও সেই জনতার সঙ্গে এক হয়ে গেল তা সে জানতেও পারলে না।

ভীড়ের চাপে পা যেন মাটী স্পর্শ করছে না। দরজার পর দরজা পার হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সে। শুধু কানে বাজছে ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত জনতার গর্জন।

কত মহল পার হয়ে গেল সে কিন্তু মহলবাসী একটি প্রাণীকেও দেখতে পেলো না। মনে হোল যেন কত দিন ধরে এই প্রাসাদ শূন্য হয়ে পড়ে আছে। এই মৃত্যুপুরীর মধ্যে কেবল পাহাড়ের কোলে ছোট ছোট লিলি আর সোনালী ফুল জীবনের ছন্দে দুলছে।

চাকরদের মহল পার হয়ে অবশেষে জনতা কর্তাদের মহলে গিয়ে পৌঁছল। ঘরে ঘরে লাল কালো সোনালী রঙের বাক্স, সিল্কের পোষাকের বাক্স, নানা আকৃতির টেবিল-চেয়ার, দেওয়ালে দেওয়ালে পত্রলেখা। এক একটি লুব্ধ হাত সেই সব বাক্স আছড়ে ভেঙে ফেলছে। ভিতরের মূল্যবান জিনিষ হাত থেকে হাতে চালান হচ্ছে, কেউ ফিরেও দেখছে না কার অধিকারে কি এল। শুধু একটা ক্ষমাহীন দস্যুতায় তচনচ করে ফেলছে সব লোকগুলি।

এই বিশৃঙ্খলতার মধ্যে কেবল ওয়াঙ কিছুই স্পর্শ করলে না। জীবনে পরের জিনিষ সে কখনো নেয়নি, তাই আজ সহজে নিতে পারলে না। প্রথম কিছুক্ষণ ভীড়ের চাপে এপাশ ওপাশ করবার পর শেষে ওয়াঙ নিজের বলিষ্ঠ বাহুর চাপে জনতার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে সমুখে গিয়ে দাঁড়াল। এতক্ষণ পরে অন্ততঃ নিজেকে দেখতে পেলে সে।

প্রাসাদের সব থেকে শেষ মহলে পৌঁছে ওয়াঙ দেখলে যে মহলের খিড়কি দরজা খোলা। কোন দিন এমনি বিপদের আশংকা করে ধনীরা তাদের মহলের গোপন দরজা তৈরী করাত পলায়নের পথ করে। আজও এই দরজা দিয়ে বেরিয়ে তারা জনতার সঙ্গে মিশে গেছে—মিশে আত্মরক্ষা করেছে। এই সব পলায়নের পথকে বলা হোত শান্তি-দ্বার। দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘুরতে ঘুরতে একটি শূন্য ঘরে হঠাৎ ওয়াঙ এক জনকে আবিষ্কার করলে যে ধনীদেরই এক জন। এ ঘরে উন্মত্ত জনতা অনেক বার আসা-যাওয়া করেছে কিন্তু এমন নিভৃতে লোকটি বিছানায় শুয়ে আছে যে কারুরই নজর পড়েনি। বিরাট মোটা চেহারা, শরীরের নানা স্থানে মেদ অস্বাভাবিক ভাবে জমে উঠেছে। সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় মাতাল হয়ে শুয়েছিল লোকটি. নিরিবিলি দেখে পলায়নের যোগাড় করছিলো।

মাঝবয়সী এই মোটা বড়লোকটি এতক্ষণ কোন সুন্দরী মেয়ে নিয়ে সুরত করছিলেন, কেন না নগ্ন গায়ে মাত্র একটি পাতলা সাটিনের আবরণ। ছোট ছোট চোখ ওয়াঙের দিকে পড়তেই লোকটি এমন আর্ত চীৎকার করে উঠল যেন কেউ তার মাংসের ভিতর ছুরি চালিয়ে দিয়েছে। নিরস্ত্র ওয়াঙ প্রায় হেসে ফেলে। মোটা লোকটি তার সামনে জানু পেতে বসে মেঝের পাথরে মাথা ঠুকে কাকুতি করতে লাগল—'বাঁচাও, আমায় বাঁচাও। অনেক টাকা দেবো তোমায়, অনেক টাকা।'

টাকা! একটি মাত্র কথায় ওয়াঙের এতক্ষণের বিস্ময়ের ঘোর কাটল। টাকা! কে যেন কানের কাছে বলছে, 'মেয়েটি বাঁচবে। জমি কিনবে। আবার সুখের দিন!'

অস্বাভাবিক কর্কশ গলায় ওয়াঙ চেঁচিয়ে উঠল—'কই টাকা দাও।'

মোটা লোকটি কাঁদতে কাঁদতে উঠে দাঁড়াল। তার পর জামার পকেট হাতড়িয়ে সোনার মুদ্রা দিতে লাগল ওয়াঙকে। নিজের জামার পকেট ভরে নিতে লাগল ওয়াঙ। আবার তেমনি নির্মম কণ্ঠে বললে— আরো দাও।'

লোকটি কোঁপাতে কোঁপাতে তার সম্বল শেষ করে দিলে। তার ঝুলে-পড়া গাল দিয়ে তেলের মত চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। কেঁদে কেঁদে বললে—'আর কিছু নেই আমার কাছে শুধু জানটা ছাড়া।'

সেই রোরুদ্যমান মানুষটার দিকে চেয়ে এক জঘন্য ঘৃণায় ওয়াঙের মন শিরশিরিয়ে উঠল। এমন ঘৃণা আর কখনো সে মানুষকে করেনি। আরো কঠিন করে সে বললে—'দূর হও সামনে থেকে। নইলে পোকার মত টিপে মেরে ফেলব।'

যে ওয়াঙ একটা পশুকে মারতে পারেনি, সেই এ কথা বলতে পারল। লোকটি ছুটে পালিয়ে গেল তার সমুখ থেকে।

সেই সোনা গুণে অবধি দেখলে না ওয়াঙ। জামার ভিতরে নিয়ে সেও শান্তিদ্বার দিয়ে পিছনের রাস্তায় গিয়ে পড়ল। সেখান থেকে চলে এল কুঁড়েতে। বুকের কাছে সোনার মুদ্রাগুলি কেমন গরম বোধ হচ্ছে। আর এক জনের দেহের তাপ রয়ে গেছে তাতে। সেই মুদ্রাগুলিকে আদর করতে করতে সে আপন মনেই বললে—

'আমরা দেশে ফিরব। কালই দেশের মাটীতে ফিরে যাব।'

১৫

কয়েকটা দিন যেতে না যেতেই ওয়াঙের বোধ হোল যেন সে কোন দিন তার জমি ছেড়ে যায়নি। বস্তুতঃ, মন তার কোন দিনই জমির সঙ্গহারা হয়নি। তিনটে সোনার মুদ্রা দিয়ে সে গম, ধান আর ভুট্টার টাটকা বীজ কিনে এনেছে! প্রাচুর্যের ফলে বেপরোয়া হয়েই সে এমন বীজ কিনেছে যা আগে আর সে কখনো বোনেনি মাঠে। পুকুরের জন্য পদ্ম আর কলমিলতার বীজ এনেছে। ভোজের আসরে শূয়োরের মাংসের সঙ্গে রান্না হয় যে সব লাল মূলো তাও কিনেছে। ছোট ছোট লাল সুগন্ধ মটর-বীজও কিনেছে ওয়াঙ।

বাড়ী ফেরার পথেই এক জন চাষার কাছ থেকে সে দশটা রূপার মুদ্রা দিয়ে বলদও কিনেছে একটা। মাঠে লোকটা লাঙল দিচ্ছিল।

দেখে ওয়াঙ থামল। সবাই পশুটার দিকে তাকাল। পশুটার কাঁধের পেশীগুলি বিস্মিত করে ওয়াঙকে। লোকটিকে ডেকে বললে সে—'বাজে বলদ। যাকগে, আমার যখন চাষের জন্ত নেই আর দরকারও খুব একটা, তখন যা হোক একটা কিছু কিনতে ত হবেই। এটার জন্তে কত রূপো লাগবে বল দেখি ?'

চাষীটি উত্তরে বললে—'বলদটাকে বেচবার আগে বরং ঘরের মেয়ে-মানুষটিকেই বেচব। এই ত সবে সাড়ে তিন বছর বয়স হয়েছে। মদ্দ জোয়ান হয়নি এখনো।'—ব'লে ওয়াঙের জন্তে অপেক্ষা না করে লাঙল দিতে লাগল লোকটি।

ওয়াঙের মনে হোল দুনিয়ায় যত বলদ আছে তার মধ্যে এইটিরই তার একমাত্র প্রয়োজন। বাপ আর বৌকে উদ্দেশ করে সে বললে—'বলদটা কেমন ?'

বৃদ্ধ উঁকি মেরে দেখে বললেন—'দেখে ত মনে হচ্ছে ভাল মতেই খাসী করেছে এটাকে।' ওলান বললে—'লোকটা যত বয়সের কথা বলছে তার চেয়ে বেশীই হবে।'

কিন্তু ওয়াঙ কোন কিছুরই উত্তর দিলে না। বলদটি সে কিনবেই। মসৃণ হলুদ-রাঙা গা—টানা টানা কালো চোখ। জমিও চষে ভাল। একে দিয়ে জমিও চাষ করা চলবে আর ধান ভাঙানোও চলবে। চাষীর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে ওয়াঙ—'অন্ত একটা বলদ কেনার মত দাম তোমায় আমি দেব। তারও বেশী পাবে। কিন্তু এ বলদটা আমার চা-ই।'

অনেক দর-কষাকষি-বচসার পর শেষটায় রাজী হয় চাষী। এ মহল্লায় বলদের যা দাম তার দেড় গুণ দামে তবে রাজী হয়। কিন্তু বলদটাকে দেখে হঠাৎ ওয়াঙের কাছে সোনা কিছুই নয় বলে মনে হয়। দাম শোধ করে দেয় সে চাষীকে। চাষীটি জোয়াল থেকে খুলে দেয় বলদটাকে। ওয়াঙ নাকের ভিতর দিয়ে দড়ি গলিয়ে দিয়ে টেনে নিয়ে চলে পশুটাকে। অধিকারের আনন্দে গা তার গরম হয়ে ওঠে।

ভিটেতে ফিরে এসে তারা দেখতে পেলে, দরজা কে খুলে নিয়ে গেছে। চালের ছাউনিও নেই। ভিতরে যে কোদাল আর আঁচড়া ছিল তাও নেই। পড়ে আছে শুধু মাটির দেয়াল আর অনাবৃত চালের বাতা। জলে তুষারে দেয়ালও ধ্বসে যাচ্ছে। কিন্তু প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কাটলে পর এ-সব তুচ্ছই মনে হয় ওয়াঙের কাছে। সহরে গিয়ে সে নূতন কাঠের ভাল একটা লাঙল, দুটো আঁচড়া, দুটো কোদাল আনল আর চাল ছাওয়ার জন্ত নিয়ে এল চাটাই। খড় দিয়ে ঘর ছাইতে হলে তাকে বসে থাকতে হবে নূতন ফসল কাটার অপেক্ষায়।

বেলা পড়ে এলে বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে ওয়াঙ তাকিয়ে দেখে মাঠের দিকে। সম্মুখে এলিয়ে আছে জমি—তার নিজের জমি। শীতের বরফ গলার পর চাষের পক্ষে তৈরী হয়ে আছে নরম অহল্যা মাটি। এখন ভরা বসন্ত। খানা-ডোবার অগভীর জলে ভেকেরা অলস সুর তুলেছে। কোণের বাঁশ-ঝাড় দুলছে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ হাওয়ায়। গোধূলির আলোয় ওয়াঙ অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে নিকটের মাঠের খালের ধারের গাছের সারি। এগুলো পীচ আর উইলো। পীচ গাছে বেগুনী রঙের কুঁড়ি ছেয়ে গেছে আর কচি-কচি সবুজ পাতায় ঢেকে ফেলেছে উইলো গাছের ডাল-পালা। মাঠের মৃত্তিকা থেকে একটা পাতলা কুয়াসার রূপালী ওড়না উপরে উঠে গাছের পাতায় শাখায় জড়িয়ে যাচ্ছে।

শুধু এখন নয়, আরো অনেক দিন ধরে, ওয়াঙের ইচ্ছা হচ্ছিল যেন আর কোন মানুষের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ না হয়। একাকী সে শুধু থাকবে তার জমিতে। নিজে সে গ্রামের কোন বাড়ীতে গেল না। শীতের অনাহার মৃত্যুর পর যারা বেঁচে ছিল, তারা যখন দেখা করতে এল রীতিমত চটে গেল ওয়াঙ তাদের উপর—'কে আমার দরজা খুলে নিয়ে গেছে। কে নিয়েছে আমার কোদাল আর আঁচড়া। আমার চালের খড় কে জ্বালিয়েছে উনুনে।'

ধার্মিকের মত মাথা নাড়ল প্রতিবেশীরা। এক জন বললে—'তোমার কাকাই ত!' আর এক জন বললে—'দুর্ভিক্ষ আর যুদ্ধের মধ্যে যখন চোর-ডাকাত সারা দেশ তচ-নচ করে বেড়াচ্ছিল তখন কে যে কোন্‌টা চুরি করেছে বলা কঠিন। ক্ষিধেতে মানুষ চোর হয়, ডাকু হয়।'

প্রতিবেশী বন্ধু চীংও এল তার সঙ্গে দেখা করতে। বললে—'সারা শীতটা এক দল চোর তোমার ঘরে আস্তানা নিয়েছিল। তারা গ্রামে সহরে যেখানে যা পেয়েছে হানা দিয়ে নিয়েছে। তোমার কাকা না কি ওদের সম্বন্ধে অনেক খবর রাখে। যা সময় গেছে, সত্য-মিথ্যা বিচার করতে পারেনি মানুষ। কাউকে আমি দোষ দিতে চাই না।'

লোকটা ছায়া হয়ে গিয়েছে। গায়ের চামড়া হাড়ের সঙ্গে যেন বেমালুম জুড়ে গিয়েছে। বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশী হবে না কিন্তু এর মধ্যেই মাথা সাদা হয়েছে। ওয়াঙ এক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে তাকে—তার পর মমতার সঙ্গে বলে—'আমাদের চেয়ে তোমার দিনই খারাপ গেছে বেশী। কি খেয়েছ এত কাল।'

চীংয়ের বুকের ভিতর থেকে একটা গভীর শ্বাস বেরিয়ে এল। 'কি খেয়েছি? সহরে যখন ভিক্ষা করতে যেতুম কুকুরের মত পথের জঞ্জাল কুড়িয়ে খেতাম। মরা কুকুর খেয়েছি। একবার, তখনও বৌটা মরেনি, মাংস দিয়ে খানিকটা ঝোল তৈরী করেছিল। জানতে সাহস হয়নি কিসের মাংস। শুধু বিশ্বাস ছিল যে মানুষ খুন করার সাহস তার হবে না। কুড়িয়ে যা পেতুম তাই দিয়ে পেট ভরাতুম আমরা। এমনি কষ্ট সইতে না পেরেই একদিন সে মরে গেল। তার মৃত্যুর পর মেয়েটাকে এক জন সৈন্তের হাতে দিয়ে দিলাম। চোখের সামনে সে শুকিয়ে মরবে তা আমি সইতে পারতুম না।' একটু ক্ষণ চুপ করে চীং আবার বললে—'যদি কিছু বীজ পাই ত আবার মাঠে বুনি। একটি দানাও ঘরে নেই আমার।'

ওয়াঙ পুরাতন বন্ধুর হাত ধরে টেনে নিয়ে এল। কর্কশ কণ্ঠে বললে—'চলে এস।' বাড়ীর ভিতর নিয়ে গিয়ে দক্ষিণ থেকে আনা বীজের কয়েক মুঠি ঢেলে দিলে বন্ধুর ছেঁড়া জামার আঁচলায়। গম, ধান আর বাঁধাকপির বীজ দিলে তাকে। তার পর বললে—'কাল গিয়ে তোমার জমি আমি চষে দেব।'

চীং হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললে। নিজের চোখ মুছতে মুছতে যেন রাগ করেই ওয়াঙ বললে—'তুমি কি মনে কর সব আমি ভুলে গেছি। একদিন অসময়ে তুমিই আমায় এক মুঠো কড়াই দিয়েছিলে।'

বন্ধুর কথার উত্তর দিলে না চীং। কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে গেল।

কাকাকে গ্রামে না দেখে খুসী হল ওয়াঙ। কোথায় যে তিনি গেছেন নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না। কারুর মতে তিনি সহরে গেছেন, কেউ বা বলে তিনি ছেলেদের নিয়ে ভিনগাঁয়ে চলে গেছেন। ওয়াঙ যখন শুনল যে কাকা টাকার জন্ত মেয়েদের বিক্রী করেছেন—লজ্জায় আর রাগে লাল হয়ে উঠল। সব থেকে সুন্দরী মেয়েটিকেই প্রথম বেচেছিলেন তিনি। মুখে বসন্তের দাগওয়ালা শেষেরটিকেও তিনি রাখেননি। এই গ্রামের পথে এক দল সেনা যাচ্ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে, তাদেরই এক জনের কাছে সামান্ত কিছু পেন্সের বিনিময়ে তিনি মেয়েটিকে দিয়েছিলেন।

ক্ষেতের কাজে মেতে উঠল ওয়াঙ। খাওয়া আর ঘুমানোর সময়টুকুও সে নিলে না। মাঠে দাঁড়িয়ে নানা চিন্তা করতে করতে খেতে বড় ভাল লাগে তার। কাজ করতে করতে যখন সে শ্রান্ত হয়ে পড়ে আলের ধারে শুয়ে সে বিশ্রাম নেয়। নিজের জমির স্নিগ্ধ উষ্ণতার আলিঙ্গনে ঘুমিয়ে পড়ে ওয়াঙ।

ঘরে ওলানও বসে থাকে না। নিজের হাতে সে চালের বাতায় শক্ত করে বাঁধল চাটাই। মাঠ থেকে মাটি এনে জলে মিশিয়ে বাড়ীর দেওয়াল সারাল। নতুন করে তৈরী করল উনুন। বৃষ্টির জলে ঘরের মেঝেতে যে সব গর্ত হয়েছিল, সারিয়ে ফেললে সে।

তার পর এক দিন ওয়াঙের সঙ্গে সহরে গিয়ে বিছানা, টেবিল, ছুটো বেঞ্চ, একটা বড় লোহার সিন্দুক কিনে আনলে। আর আনল নিছক বিলাসিতার জন্ত কালো ফুলকাটা লাল মাটির চায়ের পাত্র আর তার সঙ্গে মিলিয়ে ছটা বাটি। সব শেষে একটা ধূপধুনোর দোকানে গিয়ে মাঝের ঘরের দেওয়ালে টাঙানোর জন্ত একটা লক্ষ্মীর ভাল পট কিনে আনলে।

এই সব কেনার সময় মন্দিরের বিগ্রহ ছুটির কথা মনে পড়ল ওয়াঙের। বাড়ী ফেরার পথে উঁকি মেরে সে দেখলে ভিতরে। কী করুণ অবস্থাই হয়েছে তাঁদের। বৃষ্টির জলে চোখ-মুখ ধুয়ে গেছে, রং উঠে মাটী বেরিয়ে পড়েছে। কাগজের সাজ বিবর্ণ হয়ে সেই মাটীর গায়ে আটকে গেছে। ছুদিনে কেউই তাদের দিকে চোখ তুলে দেখেনি। রুক্ষ দৃষ্টিতে চাইলে ওয়াঙ। হ্যাঁ, মনে মনে খুসীই হয়েছে সে। দুরন্ত শিশুকে যেমন করে শাসায় লোকে, তেমনি করে বললে ওয়াঙ—'লোকের যারা অমঙ্গল করে তাদের এই শাস্তিই উচিত।'

তবু সংসার যখন আবার শ্রীমন্ত হল, একটা সংস্কার ওয়াঙের মনে ভরে গেল। ওলান আসন্নপ্রসবা। ছেলেগুলি স্বাস্থ্যের আনন্দে ঝাঁপাঝাঁপি করে বেড়াচ্ছে। বুড়ো বাপ দক্ষিণের দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমোন। ঘুমোতে ঘুমোতে শিশুর মত হাসেন। মাঠে ধানের নবীন মঞ্জরী কাঁপছে হাওয়ায়। ছোট ছোট কড়াই শুঁটির চারারা মৃত্তিকার তলা থেকে ঘোমটা-ঢাকা মাথা তুলে ধরেছে। তারা যদি সমঝে খরচ করে, যে টাকা আছে তাতে ফসল ওঠার আগে পর্যন্ত হেসেই দিন কাটবে। মাথার উপর নীল আকাশে বিত্তহীন মেঘের দল ভেসে বেড়ায়। বৃষ্টি-ভেজা মাঠে রোদের স্নেহ লাগলে যেমন রোমাঞ্চিত হয় তৃণ, সে রোমাঞ্চের অনুভূতি হয় ওয়াঙের।

আপন মনেই ওয়াঙ ভাবে, 'না, ঐ ছোট মন্দিরে কিছু ধূপধুনা পোড়ান প্রয়োজন। হাজার হোক, পৃথিবীর অমঙ্গল করারও ক্ষমতা ত আছে দেবতাদের।'

১৬

এক দিন রাত্রে বৌয়ের পাশে শুয়ে ওয়াঙ বৌয়ের ছুই স্তনের মধ্যে মানুষের বদ্ধ মুঠির মত কি একটা বস্তু অনুভব করলে। বৌকে সে বললে—'তোমার বুকের মাঝখানে ওটা কি?'

বুকের মধ্যে হাত দিয়ে ওয়াঙ কাপড়-মোড়া একটা বস্তু পেলে। জিনিষটা শক্ত কিন্তু একেবারে নিরেট নয়। জিনিষটা নেবার জন্ত ওয়াঙ চেষ্টা করতেই বৌ প্রবল বাধা দিলে প্রথমে, কিন্তু পরে তাকে সমর্পণ করতেই হোল। ওলান বললে—'দেখবেই যদি, দেখো।' বলে গলার দড়িটি খুলে কাপড়ের পুঁটলিটি স্বামীর হাতে দিলে।

উপরের নেকড়াটি ছিঁড়ে ফেললে ওয়াঙ। বিস্মিত হয়ে সে দেখলে তার হাতে এসে পড়ল অনেকগুলি মণি-মুক্তা। এতগুলি মণি-মুক্তা একসঙ্গে দেখার সৌভাগ্য সে স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। আর সে সব মুক্তার রঙই বা কত রকম। কোনটি টুকটুকে লাল, কোনটি সোনার বরণ, কচি পাতার সবুজ রঙ কারুর গায়ে, কেউ বা মৃত্তিকা চুঁইয়ে ওঠা বর্ণহীন জলের মত স্বচ্ছ। ঘরের আধা অন্ধকারের মধ্যে নিজের বাদামী হাতের মুঠোর মধ্যে সেগুলি ধরে ওয়াঙ বুঝলে যে সে ঐশ্বর্য্য পেয়েছে মুঠির ভিতরে। ছুটি স্বামি-স্ত্রী সেই বর্ণ-সুষমা আর ঔজ্জ্বল্যের দিকে তাকিয়ে রইল বিস্ময়ে অনেকক্ষণ। তার পর ওয়াঙ বৌকে বললে—'কোথায় পেলে এ-সব—'

তেমনি নরম গলায় ওলান বললে—'বড়লোকের বাড়ীতে। কারুর প্রিয় অলঙ্কার এ সব। দেওয়ালের মধ্যে একটি আলগা ইট দেখে তার ভিতর এগুলি আমি রেখে দিয়েছিলুম যাতে কেউ না দেখতে পায়, কেউ না ভাগ চায়। বড়লোকের বাড়ীর দেওয়ালের আলগা ইট সরিয়ে আমি চকচকে জিনিষ জামার ভিতরে ঢুকিয়ে নিলাম।'

'তুমি কেমন করে জানলে?' চোখে অনন্ত প্রশংসা নিয়ে স্বামী বললে। ওলানের চোখে আশ্চর্য এক খুসী উপচে উঠল—'বড়লোকদের প্রাসাদে আমার ত দিন কেটেছে। বড়লোকগুলো ভারী ভীতু। এক খারাপ বছরে এক দল দস্যু বাড়ীর দরজা ভেঙে ঢুকে পড়তেই বাড়ীর দাসী ও উপপত্নীরা যে যার মণিমুক্তা নানা জায়গায় লুকিয়ে ফেললে। সে সব ঠাঁই আগেই ঠিক করা থাকে কি না। সেই জন্তে আলগা ইটের রহস্য আমি জানতুম।'

ছু'জনে আবার চুপচাপ করে সেই অমূল্য বস্তুগুলির দিকে চেয়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে ওয়াঙ দৃঢ় কণ্ঠে বললে—'কিন্তু এমন জিনিষ ত ঘরে রাখা চলে না। এ-সব বিক্রী করে নিরাপদ করে ফেলতেই হবে। জমি কিনে ফেলার চেয়ে নিরাপদে রাখার আর অন্ত উপায় নেই। কেউ যদি জানতে পারে যে আমাদের ঘরে এ-সব আছে, কালই ডাকাত এসে আমাদের খুন করে এসব নিয়ে পালাবে। আজ রাত্রেই আমাকে জমি কিনতে হবে—নয় ত আমার ঘুম হবে না।'

কাপড়ের মধ্যে সেগুলিকে বেঁধে দড়ির ফাঁস দিয়ে ওয়াঙ পুঁটলিটি নিজের বুকের ভেতর ঢুকিয়ে নিলে। বৌ এতক্ষণ বিছানার ধারে পা মুড়ে বসেছিলো। ওয়াঙ মুখ তুলে দেখলে বৌ ভারী-মুখ করে বসে আছে। ছুটি গোলা ঠোঁটে যেন বাসনা ঝরে পড়েছে। সামনের দিকে ঝুঁকে কি যেন চাইছে সে।

অবাক হয়ে ওয়াঙ বললে—'কি বল ত?'

'তুমি কি সব বেচে দেবে?' ধরা-গলায় বৌ বললে।

'সবই ত। তা ছাড়া আমাদের মাটির কুঁড়েতে এ-সব মুক্তো রাখার দরকারই বা কি?'

'অন্ততঃ ছুটো নিজের জন্তে রাখতে চেয়েছিলাম।' সামান্ততম চাওয়ার ভঙ্গীতে বৌয়ের কথায় শিশুসুলভ লুব্ধতা ব্যক্ত হয়ে পড়ে। ওয়াঙের মনে হয় যেন তার ছেলে ছুটি সামান্ত কোন খেলনা বা মিষ্টি নেবার আবদার করছে।

'কি নেবে বল ত?'

তেমনি স্নিগ্ধ গলায় বৌ বললে—'অন্ততঃ ছুটো। ঐ যে সাদা রঙের মুক্তো ছুটো···।'

অবাক্ হয়ে ওয়াঙ বললে—'ছুটো মুক্তো!'

'পরব না—শুধু রেখে দেব কাছে। রেখে দেব।' বলতে বলতেই চোখের পাতা নামালে ওলান। বিছানার ধারে একটি ছিন্ন সুতা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। এমন ভাব দেখালে যেন তার কথার উত্তর সে প্রত্যাশাই করে না।

মনের রহস্ত বুঝলে না ওয়াঙ। শুধু এইটুকু বুঝলে যে এই বোবা বিশ্বাসী মেয়েটি, যে সারা জীবন তার জন্ত খেটে যাচ্ছে কোন পুরস্কারের প্রত্যাশা না করেই, কিন্তু বড়লোকের বাড়ীতে ক্রীতদাসী হয়ে থাকবার সময় অনেক মণি-মুক্তো দেখেছে কিন্তু কখনো হাতে করতে পায়নি, তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধকে পূরণ করতেই চাইছে।

যেন নিজের মনেই বললে ওলান—'অন্ততঃ মাঝে মাঝে হাতে করতে ত পারব।'

বুকের ভেতর থেকে পুঁটলিটি বের করে ওয়াঙ বৌকে দিলে। কাপড় খুলে ওলান প্রত্যেকটি মুক্তা নিয়ে নাড়াচাড়া করে শেষে সাদা মুক্তো ছুটি আলাদা করে রাখলে। তার পর আবার ভাল করে বেঁধে সে স্বামীকে সব শুদ্ধ ফিরিয়ে দিলে। জামার প্রান্তভাগ ছিঁড়ে নিয়ে তাই দিয়ে মুক্তো ছুটি জড়িয়ে ওলান সেটিকে বুকের ভেতর রেখে তবে নিশ্চিন্ত হোল।

বৌয়ের দিকে বিস্মিত দৃষ্টি চেয়ে দেখলে ওয়াঙ। এর পরের দিন এবং আরো অনেক দিন সে কত বার বৌয়ের সামনে এসে থেমেছে—তার দিকে চেয়ে মনে মনে ভেবেছে—'বুকের মধ্যিখানে আজো ও মুক্তো ছুটি রেখে খুসী হয়ে আছে।' কিন্তু কোন দিন সে ছুটিকে বার করতে দেখতে পেলে না ওয়াঙ।

অন্ত মণি-মুক্তোগুলি নিয়ে ওয়াঙ এদিক্ ওদিক্ অনেক বিবেচনা করলে। তার পর স্থির করল যে, সে বড় প্রাসাদেই যাবে, দেখবে আরো জমি বিক্রী আছে কি না।

আজ-কাল আর প্রাসাদ-দ্বারে প্রহরী নেই। দরজাটি তালা দিয়ে বন্ধ। বহুক্ষণ ধরে সেই তালায় ধাক্কা দিলে ওয়াঙ, কিন্তু ভিতর থেকে কোন মানুষ বাইরে এল না।

পথচারী এক জন তার দিকে এগিয়ে এসে চেঁচিয়ে বললে—

'ধাক্কা দিলে কি হবে? বুড়ো কর্তা যদি জেগে থাকেন হয় ত আসতে পারেন। আর যদি কোন দাসী থাকে ইচ্ছে হলে সেও এসে খুলে দিতে পারে।'

অনেকক্ষণ পরে ভিতর থেকে পায়ের আওয়াজ পেল ওয়াঙ। টেনে টেনে থমকে থমকে কে যেন এগিয়ে আসছে। তার পর লোহার খিলের আওয়াজ হোল! প্রাসাদ-দ্বার আর্তনাদ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর থেকে ভগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন এল—'কে?'

চমকিত ওয়াঙ চীৎকার করে বললে—'আমি ওয়াঙ লাঙ।'

যেন ভীত কণ্ঠে উত্তর এল—'ওয়াঙ, সে আবার কোন হারামজাদা।'

গালাগালির ভঙ্গিমা দেখে ওয়াঙ বুঝলে যে এ বড়কর্তা ছাড়া আর কেউই নয়। তিনিই চিরকাল দাসদাসীদের এমনি ভাবেই গালি-গালাজ করেন। পূর্বের চেয়েও নম্র কণ্ঠে তাই সে বললে—'হুজুর, আপনাকে বিরক্ত করতে আসিনি। হুজুরের গোমস্তার সঙ্গে কিছু কাজের কথা কইতে এসেছি।'

দরজার ফাঁক দিয়ে ঠোঁট বার করে কর্তা বললেন—'সে হারামজাদা ক'মাস আগে আমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। সে এখানে নেই।'

এর পর কি করবে ভেবে পায় না ওয়াঙ! কর্তার সঙ্গে জমি কেনার আলোচনা করা অসম্ভব বটে। কিন্তু তার বুকের কাছে মণি-মুক্তোগুলো আগুনের মত তেতে উঠেছে। যেমন করে হোক জমি কিনে এগুলি হস্তান্তরিত করাও তার প্রয়োজন। সেই জমিতে ভাল বীজ সে বুনবে। সে-ভালো জমি আছে এই হোয়াং-পরিবারের।

'কিছু টাকার জন্তে এসেছি। খলিত কণ্ঠে সে বললে।

শোনা মাত্রই কর্তা দরজা বন্ধ করে দিলেন—'এ বাড়ীতে টাকা নেই! শয়তান চোর ডাকাতগুলো, তাদের বংশ উচ্ছন্নে যাক্—মরুক সব. সব টাকা নিয়ে পালিয়েছে। ধার শোধ দিতে পারব না আমি।'

'না, না। শোধ নিতে আসিনি। টাকা দিতে এসেছি।'

ভিতর থেকে নারীকণ্ঠের একটা উচ্চগ্রাম ধ্বনি উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দরজার ফাঁকে একটি মেয়ের মুখ দেখা গেল। অনেক মাস এমন কথা আমরা শুনিনি। ভেতরে এস।' দ্রুত কণ্ঠে বলে মেয়েটিও দরজা খুলে দিলে। সেইটুকু মাত্র খুললে যাতে ওয়াঙ ভিতরে প্রবেশ করতে পারলে। তার পিছনে দরজা আবার বন্ধ হোল।

বুড়ো কর্তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাসছেন। তাঁর গায়ে ময়লা ধূসর রঙের সাটিনের পোষাক—তার প্রান্তে জীর্ণ ফার। এক সময় পোষাকটি ছিল দামী, এখন তার গায়ে লেগেছে দাগ, বিছানার চাদরের মত নানা জায়গায় কোঁকড়ান। অর্দ্ধত্রস্তে ওয়াঙ বুড়ো কর্তার দিকে তাকিয়ে রইল। সারা জীবন সে বড়লোকের প্রাসাদের বাসিন্দাদের ভয় করে এসেছে, সুতরাং এখন অবাক্ হবার কারণ ঘটল তার! আগে মোটা ছিলেন, এখন রোগা হয়ে গেছেন। গায়ের চামড়া যেন ঝুলে গেছে মনে হয়। অসংস্কৃত চেহারায় তাঁকে অত্যন্ত সাধারণ বলে মনে হোল! তার বাবার মতই নিরীহ সাধারণ এই বুড়ো মানুষটিকে দেখে কিছুতেই বড়ো কর্তা বলে মনে হোল না ওয়াঙের।

বরং মেয়েটি অনেক পরিচ্ছন্ন। তীক্ষ্ণ মুখ, গরুড় নাসিকা, প্রখর কৃষ্ণ চোখের দৃষ্টি। ঠোঁট ছুটি যেমন বলিষ্ঠ তেমনি রক্তিম। মাথার চুলের কৃষ্ণতা যেন কালো চকচকে আয়না। কথা শুনেই ওয়াঙ বুঝতে পারলে যে হোয়াঙ-পরিবারের এ কেউ নয়। এ প্রাসাদের কোন ক্রীতদাসীই হবে সে। এত বড় আঙিনায় এরা ছুটি প্রাণী ছাড়া আর কেউ নেই। যদিও এর আগের বারে এসে ওয়াঙ দেখেছে যে অগণ্য মেয়ে-পুরুষ এ প্রাসাদের বাসিন্দাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধানের জন্ত ছুটোছুটি করে বেড়াত। '

'টাকার কথা কি বলছিলে?' তীক্ষ্ণ গলায় বললে মেয়েটি।

ওয়াঙ ইতস্ততঃ করতে লাগল। ওয়াঙ যে 'বড় কর্ত্তার সামনে কথা কইতে পারছে না এ বুঝে নিলে মেয়েটি তৎক্ষণাৎ। তেমনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে কর্ত্তাকে বললে—'আপনি চলে যান।'

বৃদ্ধ আর কোন কথা না করে ভেলভেটের জুতা খটখট করতে করতে কাশতে কাশতে বিদায় নিলেন। মেয়েটির সঙ্গে একাকী হয়ে ওয়াঙ কি করবে, কি বলবে, ভেবেই পেলো না! এ প্রাসাদের নিঃশব্দ যেন তার বাক্‌শক্তি হরণ করে নিয়েছে। আঙিনায় এ-পাশে ও-পাশে তাকিয়ে দেখলে ওয়াঙ চারিপাশে আবর্জ্জনা জমে উঠেছে প্রচুর। পড়ে আছে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে বাঁশের শাখা, ময়লা, খড় আর ফুলগাছের শুকনো ডাল। বহু কাল ধরে যে এখানে কেউ ঝাঁটা দেয়নি এ বুঝতে দেরী হয় না।

'কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছ কি করতে।' এমন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠল মেয়েটি যে ওয়াঙ লাফিয়ে উঠল চমক ভেঙ্গে। 'কি দরকার তোমার? টাকা দেবার থাকে আমার হাতে দাও।'

ওয়াঙ সতর্ক হয়ে কথা কয়। 'টাকা নয়। আমার কিছু কারবারের কথা আছে।'

'কারবার মানেই টাকা। হয় টাকা আসবে, নয় টাকা যাবে। এ-বাড়ী থেকে যাবার মত টাকা আর নেই।'

'তা হোক্। কিন্তু মেয়েছেলের সঙ্গে কারবারের কথা কইতে পারি না। নরম গলায় আপত্তি জানায় ওয়াঙ। কি অবস্থায় এসে সে পড়েছে তা সে নিজেই অনুধাবন করতে পারে না। শুধু ফ্যাল-ফ্যাল করে চারি পাশে চেয়ে দেখে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গর্জ্জে ওঠে মেয়েটি—'তাতে হয়েছে কি? তুমি জানো না বোকা যে এ বাড়ীতে আর কেউ নেই!'

অবিশ্বাসী চোখে তবু চেয়ে থাকতে দেখে মেয়েটি ওয়াঙকে বলে—'আমি আর বড়ো কর্ত্তা ছাড়া এখানে আর কেউই থাকে না।'

'তবে আর কোথায় আছে?'

'বুড়ীমা মারা গেছেন।' মেয়েটি জবাব দেয়—'সহরে ডাকাতের দল এসে কি ভাবে এ বাড়ীর ক্রীতদাসী আর মাল-পত্তর নিয়ে পালিয়েছে তার গল্প শোননি সহরে? ডাকাতরা বুড়ো কর্ত্তাকে হাত ধরে ঝুলিয়ে বেদম প্রহার করেছে। বুড়ীমাকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে চুপ করিয়ে রেখেছে। চাকর-বাকর সব কে কোথায় পালিয়ে গেছে কে হিসাব রাখে। শুধু আমি পুকুরে আধ-গলা জলে ডুবে বসেছিলাম। ডাকাতের দল চলে গেলে বাইরে এসে দেখলুম চেয়ারে বুড়ী-মা মরে পড়ে আছেন। ডাকাতরা তাঁর গায়ে হাত দেয়নি, শুধু আতঙ্কেই তিনি মরে গেছেন। আফিম খেয়ে খেয়ে তাঁর শরীরে আর কিছু ছিল না—একটু ভয় পেতেই প্রাণ শরীর ছেড়ে পালিয়েছে।'

'চাকরের দল আর প্রহরীরা কি করছিলো?'

'শীতের মাঝামাঝি সময় থেকেই এ-বাড়ীতে আর খাবার ছিলো না। সুতরাং যে যে-দিকে পেরেছে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছে। তাছাড়া ডাকাত-দলের মধ্যে এ-বাড়ীর পুরানো চাকররাও ছিলো। বাইরের দরজায় যে লোকটা প্রহরীর কাজ করত সেই ত দস্যুদলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল। বড়ো কর্ত্তার সামনে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেও তার গালের তিনটে লম্বা চুল দেখে আমি ঠিক চিনতে পেরেছিলাম। তা ছাড়া এ বাড়ীর পুরানো চাকর ছাড়া বাইরের লোক কেমন করে জানবে কোথায় মণি-মুক্তো আর দামী জিনিষ থাকে। গোমস্তাকে আমি ধরতে চাইছি না—কেন না, এ বাড়ীর দূর-সম্পর্কের আত্মীয় হিসাবে প্রকাশ্য ভাবে এ-রকম ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়া তার পক্ষে লজ্জার বিষয়।'

[ক্রমশঃ।

জন্মদিন

শ্রীমহাদেব রায়

হে কবীন্দ্র, আজিকার স্মৃতি-শুভক্ষণে,
অন্তরের কথা তব জাগিছে স্মরণে,—
আমাদের অমানুষ হেরি' মনস্তাপে,
স্নেহ-মুগ্ধ জননীরে নিবিড় সন্তাপে,
নিবেদিলে শ্লেষ-বাক্যে হৃদয়ের ব্যথা—
জানাইলে বেদনার গোপন বারতা।
সে বেদনা হবে দূর—এই আশা বুকে
জননীর জাগে আজ; ভাষা তারই মুখে
জোগাইল জনে জনে যে বীর সন্তান,
হে কবি, তাহারে ঘেরি তব পুণ্য গান
গাহে আজ বঙ্গদেশ পঁচিশে বৈশাখে,
তোমারই স্মৃতির স্তুতি সঁপিতে তোমাকে।
যে মুগ্ধ জননী সাত কোটি সন্তানেরে
রেখেছে বাঙ্গালী করে' মানুষ না করে'
মোহ তার করে' দূর আজ অবহেলে,
গৃহ-ছাড়া, দৃঢ়-পণ এ মায়েরই ছেলে
ম্লান, মূক মুখে এনে দিলে নব ভাষা,
জাগায়ে মায়ের প্রাণে মোহ-মুক্ত আশা।

স্তন্যদায়িনীর স্তন্যধারা সুধাময়ী
করিয়াছে বল-বীর্যে সন্তানেরে জয়ী,
একতার মহামন্ত্র বলে গরীয়ান্
ধ্বনিতেছে কোটি কণ্ঠে "নেতাজী মহান্",
তব জন্মদিনে আজ তার গুণ গ্রামে,
কবি-গুরু, পূজা তব দক্ষিণে ও বামে।
তোমার "একের মন্ত্র" উঠিয়াছে ধ্বনি'
রচিতে "ভারত-তীর্থ" আজি রণ-রণি';
তনয়ের রক্ত-ধারা-স্রোতে অবগাহি'
সহাস্যে জননী কহে, "শোক-দুঃখ নাহি,
মুক্তির আনন্দ-স্রোতে করাইতে স্নান,
তোমরা মায়ের আশা—স্নেহের সন্তান,
দাঁড়াও নির্ভীক বক্ষে ধরি বীর্য-বল,
করি দূর কপটের অনৈক্যের ছল,
শান্তি-মন্ত্রে পৌরুষের ব্রতে মুক্ত-প্রাণ,
তোমরা দাঁড়াও মোর পুত্র বীর্যবান্।
নব জন্মে সর্ব গ্লানি যাক—মুছে' যাক,
সুপুত্রের জন্মদিন পঁচিশে বৈশাখ।



রক্তনদীর ধারা

পঞ্চানন ঘোষাল

২

বস্তি-বাড়ীর দক্ষিণ কোণের ঘরখানা ছিল খোকাবাবুর। ঘরখানির পিছন দিকেও একটা দরজা আছে। অনেকটা চোরা দরজার মত। একটা সরু গলি দরজাটার সম্মুখ পর্য্যন্ত এসে আবার মোড় ঘুরে বড় রাস্তার দিকে চলে গিয়েছে। সোজা পথে আঙিনায় এসে পুলিশে হানা দিলে চোরা দরজা খুলে, এই গলিটা দিয়ে চম্পট দেওয়া যায়। জানালাগুলো মোটা চটের পর্দা দিয়ে ঢাকা। জানালাগুলিতে কোন গরাদ নেই, বোধ হয় পালাবার সুবিধার জন্যে।

ঘরের আসবাব-পত্রের মধ্যে এক দিকে আছে একখানি তক্তপোষ, অপর দিকে একটি কাঠের আলনা, একটি কাঠের বেঞ্চি। তক্তপোষের নীচে একটি লোহার সিন্দুক। সিন্দুকের পাশে একটা ষ্টিল ট্রাঙ্ক, একটা উঁচু কাঠের কাঠামোর উপর বসান রয়েছে। তক্তপোষের উপর একটা পুরু গদি। গদির উপর বিছান সিল্কের চাদর।

ঘরে ঢুকেই খোকাবাবু চট্ করে ট্রাঙ্কটা খুলে ফেলে একটা দামী সেন্টের শিশি বার করে তার ভিতরের পদার্থটুকু নিঃশেষে তার গরদের পাঞ্জাবীর উপর ঢেলে দিল। তার পর সেন্টের খোসবাইটুকু উপভোগ করতে করতে, বিছানার উপর উঠে বসে, সামনের বেঞ্চিটার দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করে সাকরেদদের বলল—"বস সব ওইখানে। জরুরী কথা আছে।"

সাকরেদদের সকলেই একে একে বেঞ্চিটায় বসে পড়ল। কেবলমাত্র সুরমা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। দলের সে কেউই নয়, অথচ সেখানে তার ডাক পড়ায় সুরমা একটু অস্বস্তি অনুভব করছিল। এই বেপরোয়া খুনেদের সে ভয়ও করে। একটু এগিয়ে এসে সুরমা খোকাবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, "আমাকে ডাক দিয়েছিলেন খোকাবাবু? কিছু বলবেন আমাকে?"

সুরমার এই "কিন্তু-কিন্তু" ভাব খোকাবাবুর নজর এড়ায়নি। খোকাবাবুর স্বভাব-সুলভ শঙ্কিকতা সামান্য মাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতিও সহ্য করতে পারে না। কিছুক্ষণ ক্রুর-দৃষ্টিতে সুরমার দিকে তাকিয়ে থেকে খোকাবাবু জানাল, বড্ড গোমর হয়েছে, তোর না? দেখ আমি সব বরদাস্ত করি, কিন্তু অবাধ্যতা বরদাস্ত করি না, বুঝলি। মনে থাকে যেন, আমি খোকাবাবু—

বেগতিক দেখে সুরমা শান্ত-শিষ্ট জেনানার মত একটা ছোট টুল টেনে নিয়ে আসন গ্রহণ করল এবং তার পর বিনীত ভাবে বলে উঠল, কি বলেন খোকাবাবু, আমি কি সেই মানুষ না কি?"

ভেলভেটের ওয়াড় দেওয়া বালিশের তলা থেকে হাভানার সিগারেটের টিনটা সাকরেদদের দিকে ছুড়ে দিয়ে খোকাবাবু সুরমাকে বলল, এই ত চাই। একেই তো বলে ভালো মানুষের মেয়ে। তোকে এখানে ডেকেছি কেন, জানিস? প্রেম করবার জন্যে ডাকিনি, সন্দেশ খাওয়াবার জন্যেও নয়। তোকে ডেকেছি একটা জরুরী দরকারে। কথাটা কিন্তু খুব সাবধানে গোপন রাখতে হবে। খবরদার, বুঝলি, যেন ফাঁস না হয়ে যায়।

সুরমার ধারণা ছিল, খোকাবাবু বরুণার সম্বন্ধে কোনও কথা বলবে, এই জন্য সুরু থেকেই সে বিশেষ অস্বস্তি অনুভব করছিল। খোকাবাবুর সহিত কোনও কারবার সুরমা ইতিপূর্ব্বে করেনি। তার পর খোকার মত এক জন দুর্দ্দান্ত লোককে বিশ্বাস করাও ছিল কঠিন। এদের সঙ্গে কায-কর্ম্মে আশাতীত পয়সা পাওয়া বা না পাওয়া নির্ভর করে এদের ইচ্ছা এবং খেয়ালের উপর। কিন্তু ইহা জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও সুরমা কীর্ত্তনী খোকাবাবুর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি। খোকাবাবুর দরবারে সে বাধ্য হয়েই হাজির হয়েছে। একটু ইতস্ততঃ করে সুরমা উত্তর করল, আমি খুকি নই, খোকাবাবু। কথা ফাঁসের ভয় একেবারে নেই। তবে মোর দিক্‌টা একবার ভেবে দেখবেন। আমার তো আর কোনও ভাত-ভিত্তি নেই। কীর্ত্তন করে আর কিই বা পাই বলুন।"

বরুণার উপর খোকাবাবুর বিশেষ কোনও যে লোভ ছিল তা নয়। খোকার মনোবৃত্তির সহিত তার সাকরেদদের মনোবৃত্তির প্রচুর প্রভেদ আছে। সুস্থ অবস্থায় ব্যক্তিগত যৌন স্বার্থের চেয়ে দলগত স্বার্থের প্রতি তার লক্ষ্য স্বভাবতঃই অনেক বেশী। কিন্তু তার দলের অপরাপর ব্যক্তিদের প্রকৃতি ছিল ভিন্নরূপ। বরুণা সম্বন্ধে খোকাবাবুর প্রকৃত মনোভাব জ্ঞাত না হওয়া পর্য্যন্ত চুপচাপ থাকাই সমীচীন, এই কারণে দলের অপরাপর সকলে চুপ করেই বসে রইল। দলের কালু ওরফে কালু বাবু কিন্তু বেশীক্ষণ আর চুপ করে থাকতে

পারল না। নূতন মাতাল সে, একটু মদও খেয়েছিল। বরুণার কথায় উৎফুল্ল হয়ে সে সুরমাকে অনুরোধ করল, "এটাকে যদি ঠিক করতে পারিস মাসী, এক চোটেই তোকে পাইয়ে দোব পানশ। ভাল মক্কেল একটা আমার হাতে আছে, মাইরী।"

ভ্রূকুঁচকে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে খোকাবাবু ততক্ষণে কি এক। জটিল বিষয় ভেবে নিচ্ছিল। কালুর কথা কয়টা কানে যাবা মাত্র ক্ষেপে উঠে খোকাবাবু ধমকে উঠল, ওরকম করে টাকা উপায় করবি তো চলে যা ওই সুরমার সঙ্গে, ও-সব ছেঁচড়া পেশা এখানে চলবে না, বুঝলি ? ভাল লাগে থাক্, নইলে চলে যা এখান থেকে।"

আর পাঁচ জনের ন্যায় দলের লোকেরাও খোকাবাবুকে ভয় করে চলে। ধমক খেয়ে কালুবাবু চুপ করে গেল। কালুবাবু চুপ করলেও গোপীনাথ চুপ করল না। গোপী ছিল খোকাবাবুর প্রধান সাকরেদ,—পরামর্শদাতাও বটে। গোপীনাথ এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "চুলোয় যাক্ ও-সব কথা। এখন আসল ব্যাপারটা কি বল দেখি ? মিলের ম্যানেজারকে ঘুষ দিয়ে তো ওর চাকরী যোগাড় করলি, তার পর ভুজুং-ভাজাং দিয়ে ওকে এখানে আনালি। অথচ তুই নিজে রইলি তফাতে। ওর সঙ্গে না কইলি কথা, না করলি দেখা। আসলে তোর মতলবটা কি বল দেখি ?"

খোকাবাবুর আসল উদ্দেশ্যটা দলের কৃষ্ণচন্দ্র চোরাই মাল পাচার করার এজেন্ট বিট্‌ঠল ভাইয়ের কাছ থেকে কথায় কথায় সেই দিনই জেনে নিয়েছিল। খোকারই নির্দেশ মত বিট্‌ঠল বাবু না কি বরুণার স্বামী সুধীরের সহিত চায়ের দোকানে আলাপ জমায় এবং উপযাচক হয়ে তাকে তেলের কলের এই চাকুরী,— এমন কি বর্ত্তমান বাসা বাড়ীটাও সেই তাকে ঠিক করে দেয়। বিট্‌ঠলের বারণ থাকায় "বলি বলি" করেও কথাটা কৃষ্ণবাবু তখনও পর্য্যন্ত কাউকে বলেনি। কিন্তু কালুবাবুর ব্যয়ে কৃষ্ণচন্দ্রও সেদিন মদ খেয়েছিল। মদের ঝোঁকে কেষ্টবাবু বলে ফেলল, "আমি কিন্তু জানি সব কথা। বিঠলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ওস্তাদের উদ্দেশ্য কি জানিস্ ? উদ্দেশ্য একটা ডুব্লিকেট খোকাবাবু তৈরী করা, ঠিক ডুব্লিকেট হিটলারের মত।"

অপকর্ম্মের সুচতুর মতলবগুলি পূর্ব্বাহ্নেই কাউকে জানিয়ে দেওয়া খোকাবাবুর রীতিবিরুদ্ধ ছিল। কেষ্ট-বাবুর কথা শুনে ক্ষেপে উঠে খোকাবাবু বলল, "আ রে! শালা আগে ভাগেই ফাঁক করে দিয়েছে ? আচ্ছা! দেখে নিচ্ছি শালাকে আমি।"

খোকাবাবুকে রেগে উঠতে দেখে গোপীনাথ অনুযোগ করে জানাল, "এ কিন্তু ভাই তোর ভারী অন্যায়। যা তুই বিঠলকে বলতে পারিস্ তা তুই আমাদের বলবি না।"

গোপীর কথায় শান্ত হয়ে খোকাবাবু উত্তর করল, "বলব বলেই তো তোদের ডেকেছি। শুধু শুধু কোনও কথা কাউকে বলতে নেই, বুঝলি।"

উত্তরে গোপীনাথ জিজ্ঞেস করল, "তা হলে নিশ্চয়ই ওর ওই বৌটার ওপরই তোর লক্ষ্য।"

স্মিত হাস্যে খোকা উত্তর দিল, "না রে না, তা নয়। ওর বৌর উপরেও নয়, বৌএর গহনার উপরও না। আমি কি চাই জানিস্ ? বলছি শোন্। কিন্তু তার আগে চেয়ে দেখ আমার মুখের দিকে একবার। দেখছিস্ তো ? কি দেখছিস্ ভাল করে দেখে রাখ এগুলো। কালই দরকার হবে।"

কৌতূহলী হয়ে গোপী খোকার মুখের দিকে চেয়ে দেখল। ডান চোখের উপর একটা গভীর কাটা দাগের উপর আঙুল রেখে খোকা কথা বলছিল। গোপী খোকার নির্দ্দেশ মত লক্ষ্য করল। খোকার থুতনীর নীচে আছে একটা দাগ। এ ছাড়া নীচের ঠোঁটটা তার কাটা এবং সেলাই করা। খোকার মুখের উপরকার চিহ্নগুলি যে গোপীর নিকট অপরিচিত ছিল তা নয়। খোকার আদেশ মত চিহ্নগুলি ভাল করে পরিলক্ষ্য করে গোপী জিজ্ঞাসা করল. "ও তো রোজই দেখছি। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি ? আমাদের কাযের সঙ্গে কি ওদের কোনও সম্পর্ক আছে না কি ?"

উত্তরে খোকাবাবু ঠোঁটের উপর অঙ্গুলি ন্যস্ত করে শান্ত ভাবে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, "চু-উ-প।" এবং তার পর তাকের উপর থেকে একটা ছোট বোতল পেড়ে এনে ভিতরের তরল পদার্থ টুকু গলাধঃকরণ করতে করতে জানিয়ে দিল, "সম্পর্ক নেই মানে ? সম্পর্ক আছে বই কি। শোন বলি তবে। আপাততঃ আমি ওরও মুখের উপর এই সব দাগ এঁকে দিতে চাই। অর্থাৎ কি না ওর মুখটাও আমি করে দিতে চাই ঠিক আমার মুখেরই মত।"

গোপী ছিল ভদ্রঘরের ছেলে। লেখাপড়াও সে কিছু কিছু শিখেছে। অভ্যাসের দোষে ধীরে ধীরে সে এই দলের মধ্যে এসে পড়ে। বুদ্ধির পরিমাণ তার দলের অপর লোকেদের অপেক্ষা একটু বেশীই ছিল; সুধীরের দেহাকৃতি গোপীর নজর এড়ায়নি। খোকার আসল উদ্দেশ্যটা বুঝে নিয়ে গোপীনাথ জিজ্ঞেস করল, "তা ভাই বুঝলাম তো সবই, তবে একটা কথা। বাইরেটা না হয় ওর তুই জোর করে বদলে দিলি, কিন্তু ভিতরটা ওর তুই বদলাবি কি করে ?"

কোনওরূপ বাধা-বিঘ্ন তো দূরের কথা, সামান্য মাত্র প্রতিবাদও খোকা কখনও সহ্য করতে পারত না। গোপীর এইরূপ অমূলক সন্দেহ প্রকাশে ক্রুদ্ধ হয়ে খোকা মদ্যের গেলাসটা ঠং করে মাটিতে নামিয়ে রাখল। এবং চেঁচিয়ে উঠে তার আপন অভিমত জানাল, "যেমন সকলে বদ'লায় রে শালা, তেমনি করে ও-ও বদ'লাবে। ভালো মানুষের ছেলেরা লড়াইয়ে গিয়ে মানুষ মারে কি করে ? আমাদের মত খুনের পর খুন করে হাত না পাকিয়েই তারা মানুষ মারে। জানিস্ তো মানুষের নাম মহাশয়, যা সওয়ান যায় তাই সয়। শেখালে ও-ও শিখবে, বুঝলি।"

ব্যক্তিগত জীবনে গোপী এই রকম অনেক সৎ লোককে অসৎ হতে দেখেছে। মনে পড়ল তার নিজের কথা, মনে পড়ল খোকার কথা। ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছিল তারা সমপাঠী। কত আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাদের জীবন কাটছিল। হঠাৎ এক দিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক খোকাকে ডাকিয়ে নিয়ে গেলেন আফিস-ঘরে। খোকা গেল, কিন্তু আর ফিরল না। শোনা গেল, খোকাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পিতা-মাতার না'কি সে অবৈধ সন্তান। সমস্ত বৈধতার বিরুদ্ধে গোপী বিদ্রোহী হয়ে উঠল। গোপনে তার চলতে লাগল খোকার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপন। এর পর দ্বিতীয় শ্রেণীতে উর্ত্তীর্ণ হওয়ার পর মাত্র এই কারণেই তাকেও স্কুল হতে বিতাড়িত হতে হয়। সে মাত্র কয় বছরের কথা। আজ সে খুনী, ডাকাত, গৃহহারা, হতভাগা। গোপী আর ভাবতে পারল না। সে তাড়াতাড়ি

পকেট থেকে মদের একটা দেশী পাঁইট বার করে ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা মদ খেল। এবং তার পর ছিপিটা শিশিটার মুখে জোর করে ঠেসে দিয়ে, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে বসে রইল, কিন্তু কোনও কথা বলল না।

গোপীর এই চিত্তচাঞ্চল্য খোকার নজর এড়ায়নি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গোপীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখে খোকা বলল; "পাগল"। এবং তার পর বোতলের বাকি তরল পদার্থ টুকু গলাধঃকরণ করতে করতে খোকা সুরমাকে জানাল, "শোন বলি। বৌটাকে যে রকম করে হোক, একেবারে ওর ওই সোয়ামীর নাগালের বাইরে সরিয়ে দিতে হবে। তবে জোর-জবরদস্তি করে না, বলে-ক'য়ে, ফুসলে—"

সুরমা কীর্ত্তনীর ঘরে সে-দিন এক ছোকরা বাবুর আসবার কথা ছিল, এই ডাকাতগুলোর সঙ্গে বেশীক্ষণ থাকতে তার আর মন চাইছিল না। তা ছাড়া, তার পারিশ্রমিকের কথাও খোকা কিছু বলে না। একটু ইতস্ততঃ করে সুরমা উত্তর করল, "সে দেখা করে অমন"।

আর কোনও কথা না বলে সুরমা চুপ-চাপ সরে পড়ছিল। সুরমাকে হঠাৎ বেরিয়ে যেতে দেখে, খোকা তাড়াতাড়ি তক্তপোষ থেকে নেমে এসে সুরমার হাতখানি চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল, "আরে যাস্ কুতা। আগে, পারবি কি না তা বলে যা।"

সুরমা তার হাতখানি জোর করে ছাড়িয়ে নিতে চাইল, কিন্তু খোকার মুঠি ছিল বজ্রমুঠি। বারকতক টানাটানি করার পর অপারগ হয়ে সুরমা বিরক্তির স্বরে বলে উঠল, "যান্, পারমুনি আমি। দিন ছাড়ি, ছাড়ি দিন বলছি।"

অবাধ্যতা খোকা কখনও বরদাস্ত করতে পারেনি. সেই দিনও সে তা পারল না। মদের নেশায় সে মশগুল। সুরমার এই সাহসে খোকার মুখের সহজ ভাব ধীরে ধীরে অপসৃত হয়ে গেল। পরিবর্ত্তে সেখানে ফুটে উঠল, একটা নিষ্ঠুর দানবীয় ভাব। খোকাবাবু সুরমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে এইবার দুই হাতে তার গলাটা চেপে ধরে বলে উঠল, "কি বললি পারবি না? এঁ্যা। পা-র-বি না। বল শীগ্‌গির বল। পারবি কি, না?"

কণ্ঠনলীর উপর চাপ পড়ায় সুরমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিল। কক্ষের মধ্যে আরও চার-পাঁচ জন মানুষ উপস্থিত, কিন্তু কেহই তার সাহায্যে আসে না। তার এই দুর্দ্দশা তারা উপভোগ করে, বাধা দেওয়া তো দূরের কথা. নিরুপায় হয়ে মাথাটা দেওয়ালের উপর এলিয়ে দিয়ে, অতিকষ্টে ক্ষীণ স্বরে সুরমা উত্তর করল, "পারমু। পারমু আমি। পারমু বলছি। ছাড়ী-ই দিন।"

আদিম নিষ্ঠুরতা খোকার মধ্যে সাময়িক ভাবে আশ্রয় নিয়েছিল। সুরমার এই অসহায় ভাব খোকাকে শীঘ্রই অপ্রস্তুত করে তুলল। নিমেষে খোকাবাবুর এই আদিম ভাব দূর হয়ে গেল। খোকাবাবু ততক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায়ই শান্ত হয়ে উঠেছে। খোকা লক্ষ্য করল, সুরমা তখনও চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভীত ভাব তখনও তার কাটেনি। খোকা সস্নেহে এইবার সুরমার গাল দুটো চাপড়ে দিয়ে অনুযোগ করে বলল, "এই শোন্। কিছু মনে করিস্ না। মাথাটা হঠাৎ আমার বিগড়ে গিছ্‌ল। এই রকম মাঝে মাঝে আমার হয়ে যায় বুঝলি। এই শোন্। আর হবে না সত্যি বলছি।"

সুরমা এইবার ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইল। রাগ এবং ভয়ের যুগপৎ সমাবেশে তার মুখখানাকে অত্যন্ত মলিন ও বিকৃত করে তুলেছে। খোকার কথার কোনও প্রত্যুত্তর না করে সে তেমনি ভাবেই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সুরমাকে চুপ করে থাকতে দেখে খোকা তাকে আদর করতে করতে বলল, "মাসী আমার, লক্ষ্মী আমার।" তার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে খোকা বলে চলল, "যারা আমার কথা শোনে তাদের আমি কত ভালবাসি, পয়সা দি. বিপদে পড়লে রক্ষা করি। কিন্তু যারা আমার কথা শোনে না তাদের—"

খোকার এইরূপ আদরে সুরমা হেসে ফেলল। হাসি ছাড়া তার অন্য কোনও উপায় ছিল না। হেসে ফেলে সে জিজ্ঞেস করল; "কেতো টাকা দিবি?"

উত্তরে খোকা জানাল, যা চাইবি তাই দেব, পাঁচশ, হাজার। বল তুই কত চাস্?"

খোকার উদ্দেশ্য আর সুরমার উদ্দেশ্য এক নয়। এই ক্ষেত্রে বরুণার উপর খোকার সত্য সত্যই কোনও লোভ ছিল না। সে চাইছিল সুধীরকে। সুধীরকে হাত করবার সহজ উপায় বরুণাকে সরিয়ে দেওয়া। কার্য্যগতিকে উভয়ের গৌণ উদ্দেশ্য এক হয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তরের আশায় খোকা সুরমার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এতক্ষণে সুরমা খোকার প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারল, কথার ভাবে খোকার মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সুরমা উত্তর করল, "মেয়েটা, কিন্তু, বড় বেয়াড়া। গেরস্তোর মেয়ে, বড় দুঃখে পড়েই এখানে এসেছে। কাযটা শক্ত হবে।"

উত্তরে খোকা বলল, "তা আমি জানি। মেয়েমানুষ আমিও চিনি। একটু করে শাদা ওষুধ খেতে শেখা না, দোক্তা দেওয়া পানের সঙ্গে। নেশা-ভাঙ্গ মানুষকে অমানুষ করে চোর বানিয়ে দেয়, আর সতীকে অসতী করতে পারে না? এ তো তোর আর প্রথম কায নয়। এঁ্যা, কি বলিস্, মাসী—"

হাতের কৌটা থেকে একটা কোকেন-দেওয়া গোটা পান মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে সুরমা কীর্ত্তনী উত্তর করল, "অগত্যা তাই করতে হবে। এমনি আর কোন গেরস্তোর বৌ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। এমনি ভাবেই ছাড়াতে হয়। কত পাপই না করছি। জানি না কপালে কি আছে।"

[ক্রমশঃ

কেতকী

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

[কথাচিত্র]

১

রান্নাঘরে মায়া রাঁধছিল। কাঠের উনান, ডাল চড়িয়েছে মাটির হাঁড়িতে। মায়া খুন্তি দিয়ে নাড়ছে, আর এক একবার জানলার দিকে চাইছে। এমন সময় তার বড় বৌদি ঘরে ঢুকলো। তার হাতে এক ফালি কপি। মায়ার দিকে চেয়ে করুণা বললো: কি চড়িয়েছিস মায়া, ডাল বুঝি ?

ধরা গলায় মায়া উত্তর দিলে: হ্যাঁ, বৌদি।

করুণা বললো: বেশ বাস ছেড়েছে। হ্যাঁ, তোর বড়দা এই মাত্র এলেন। সদরে গিয়েছিলেন নতুন বাঁধাকপি একটা এনেছেন। খানিকটা কেটে পাঠিয়ে দিলেন। ডালের ওপর কপি চড়চড়ি বেশ হবে।

মায়া: রাখ ওখানে বৌদি।

করুণা: ও কি, তোর গলাটা ধরা-ধরা কেন লা?—বলেই কপিটি রেখে খপ করে মায়ার মুখখানা তুলে ধরে বললো: অ মা, কাঁদছিলি বুঝি ?

মায়া: কাঁদবো কেন, দেখছ না ভিজে কাঠ দিয়ে কি রকম ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

করুণা: কাঠের দোষ কেন খামকা দিচ্ছিস্ বোন, ও ত দিব্যি জ্বলছে। তা কান্না ত আসবারই কথা ভাই, মৃগকে দেখলেই ছোট ঠাকুর জ্বলে ওঠেন। বেচারীকে কি অপমানটাই করলে, ভাল মানুষের ছেলে আর পেটে বিদ্যেও আছে তাই গায়ে মাখলে না—হেসেই উড়িয়ে দিলে, আর ওর পেল্লাদে কানাই ঢোল গলায় বেঁধে যেই নাচতে নাচতে এলো, ওর আর মুখে আহ্লাদ ধরে না—আমি সব বলেছি তোর দাদাকে।

মায়া: তুমি দাদাকে এরই মধ্যে সব বলেছ বৌদি ?

করুণা: বোলব না? আমার গা যে কর্‌কর্ করছিল রে! উনি ত শুনে একবারে গুম্ হয়ে গেলেন। বললেন—রায় মশাইকে চটিয়ে দিয়ে একে ত নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছেন, ওরা এই কুরসদে উঠে-পড়ে লেগেছে মিগেনের মনটাও যাতে ভেঙে যায়। কিন্তু উনি বলেছেন—তা হতে দেবেন না, বাপ ছেলে দু'জনকেই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মিল করে দেবেন।

কথাটা শুনে মায়ার মুখখানা যেন আনন্দে চকচক্ করে উঠলো। করুণা বললো: কপির ফালিটা রেখে গেনু দিদি, কুটে-কাটে দিয়ে যাব যে, সে সময় এখন নেই—মনিষ্যি তেতে পুড়ে এসেছে কি না—

করুণা চলে গেল। মায়া আপন মনে বলল: একেই বলে নাঁতের টান। ঝগড়া-ঝাঁটির পরেও বড়দার দরদ ঠিক আছে, বড়দা দেবতা—

খুন্তি দিয়ে ডাল তুলে টিপে দেখে মায়া সরাটি চাপা দিল হাঁড়ির মুখে। তার পর খুন্তি পিঁড়ের পাশে রাখা টুকনি থেকে কাত করে জল ঢেলে হাতটি ধুলো—সঙ্গে সঙ্গে গুন্-গুন্ করে মিগেনের রচা গান একটি গাইতে লাগলো—

ওদিকে কলকে হাতে করে কানাই এসে যে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে গান শুনছিল তা সে জানতে পারেনি। এই সময় সহসা ঘরে ঢুকে কানাই বলল—বা! খাসা গলা ত তোমার মায়া! ইচ্ছে করছিল—ছুটে গিয়ে ও-ঘর থেকে ঢোলটা এনে সঙ্গত চালাই—মাইরি, ভারি মিষ্টি তোমার গলা—

অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে কানাইয়ের পানে তাকিয়ে মায়া বললো: তুমি এখানে কি করতে মরতে এসেছো ?

কানাই: মরতে আসব কেন, আগুন নিতে এসেছি, এই দেখ না কলকে। ছোড়দা তামুক খাবে, ওদের উনুন এখনো ধরেনি কি না···

মায়া: আগুন নেবার আর জায়গা পাওনি মুখপোড়া—বেরোও বলছি—

কানাই: মাইরি, রাগলে তোমায় কি সোন্দর মানায়! ও কি, অমন করে তাকাচ্ছ কেন মায়া, আমি তোমাকে এত ভালবাসি, আর—

মায়া এই সময় হাতখানা ঘুরিয়ে উনান থেকে জলন্ত একখানা কাঠ তুলে আক্রমণের ভঙ্গিতে বলে উঠলো: তোমার ভালবাসার নিকুচি করেছে পোড়ারমুখো ড্যাগরা কোথাকার—

অস্ফুট স্বরে—'বাপ রে' বলেই কলকে হাতে করে চম্পট দিল কানাই। কাঠখানা উনানে আবার গুঁজে দিয়ে হাঁড়ির মুখের সরাখানি খুলে খুন্তিতে করে ডাল পরীক্ষা করছে মায়া, এমন সময় ঘরে ঢুকলেন পীতাম্বর। সামনে কপির দিকে দৃষ্টি পড়তেই জিজ্ঞাসা করলেন: কপি কোত্থেকে এলো রে—এখন ত এর সময় নয়, কে আনলে ?

মায়া বললে: বড়দা শহর থেকে এনেছিলেন, বড় বৌদি দিয়ে গেল।

চটে উঠে পীতাম্বর বললে: দিয়ে গেল, দিয়ে গেলেই হোল, তুই নিলি কেন ?

মুখখানা শক্ত করে মায়া বলে উঠলো: তুমি যেন দিনকের দিন কি হোচ্ছ বাবা, ঘরে এসে বৌদি যত্ন করে দিয়ে গেল, আর আমি ফিরিয়ে দেব ?

মায়ার কথায় পীতাম্বর শান্ত হোলেন—বড় ছেলের দরদে মন তাঁর ভিজে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছেলের জন্যে মনে জাগলো দরদ; বললেন: সে হতভাগা ত ঘরে বসেই আছে, কি করে চলছে কে জানে!' মায়াকে বললেন: 'বঁটিতে এর আধখানা কেটে অতুলের ঘরে দিয়ে আয় মা!

অতুলের রান্নাঘরে গিয়ে মায়া দেখে প্রসাদী বঁটিতে কপি কুটছে। মায়া বুঝলো কপিটা তিন ভাগ করে বড়দা তিন ঘরের জন্যেই ব্যবস্থা করেছেন। মায়াকে দেখে মুখঝাপটা দিয়ে প্রসাদী বললো: এ সব আধিখ্যেতা, বড়মানষী জানানো, আমি তো ফিরিয়ে দিচ্ছিলাম, উনি হাঁ হাঁ করে উঠলেন তাই।

মায়ার গলার স্বর শুনে অতুল ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলো: হ্যাঁ রে, কানাইকে এক কলকে আগুন আনতে পাঠিয়েছিলুম, তুই না কি পোড়া কাঠ নিয়ে মারতে গিয়েছিলি তাকে ?

মুখখানা উঁচু করে মায়া জবাব দিল: মুখপোড়া পালিয়ে এলো যে, নইলে জন্মের মতন মুখখানা পুড়িয়ে দিতুম তার! আর কোন কথা শোনবার প্রত্যাশা না করেই মায়া ছুটে চলে এল ছোড়দার ঘর থেকে। অগত্যা অতুল বৌকে শুনিয়ে পণ করলো: এই কানায়ের গলায় ওকে ঝুলিয়ে দিয়ে গুমর ওর ভাঙবো ভাঙবো ভাঙবো।

১০

যাদব রায়কে কানাই গ্রাম সুবাদে বেদো মামা বলে। যাদব রায়ের রাগও ক্রমশঃ পড়ে এসেছিল; পীতাম্বরও উসখুস করছিল—যাতে মিল হয়ে যায়। কিন্তু কানাই লাগিয়ে-ভাঙিয়ে যাদব রায়কে এমনি তাতিয়ে দিলে যে, যাদব রায় কড়া নজর রাখলো মৃগেন যাতে পীতাম্বরের বাড়ীর ত্রিসীমাতেও না আসতে পারে। আর এই আসা-আসির দিকে অতুল, প্রসাদী ও কানাই তিন জনেই যেন আড়ি আগলে থাকে। অনেক বুদ্ধি খেলিয়ে মৃগাঙ্ক শেষে দুঃসাহসে ভর করে পুকুরঘাটে মায়ার সঙ্গে দেখা করবার এক ফন্দী এঁটে বসলো। পল্লীগ্রামে পুকুরে গভীর রাতে ভোঁদড় নেমে মাছ খেয়ে যায়। তাই হঠাৎ এসেই যাতে ভয় পেয়ে পালায়—এই উদ্দেশ্যে বাঁকারির একটা তেকাটা তৈরী করে পুরাতন জামা তার ওপর চড়িয়ে মাথায় একটা চুন-মাখানো হাঁড়ি বসিয়ে পুকুরের এক কোণে পুঁতে রেখে দেওয়া হয়। হঠাৎ তার দিকে নজর পড়লেই মনে হয় যেন একটা কিম্ভুত-কিমাকার মানুষ হাত দুটো মেলে দাঁড়িয়ে আছে। শহরবাসীন্দাদের কাছে জানোয়ার তাড়াবার এই কৌশলটি অভিনব হলেও, পল্লী অঞ্চলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার এটি পরিচিত ব্যাপার।

সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে ঘাটে বসে বাসনগুলি একে একে মেজে সিঁড়ির ওপর রেখে কাপড় কাচতে জলে নেমেছে মায়া, এমন সময় ওপারে আঘাটার একটা অংশে পোতা মানুষের নকল মূর্তিটার মুখের হাঁড়ির ভিতর দিয়ে অস্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে কে ডাকলো: মা-য়া!

অন্য মেয়ে হলে শুনেই হয় ত ভয়ে ভীমি যেত জলেই, না হয় আঁত্‌কে চীৎকার তুলে বাড়ীর ও পাড়ার লোক জড় করত। এই মেয়েটির প্রকৃতি কিন্তু একেবারে আলাদা ধাতুতে গড়া। তাই শব্দ শুনে প্রথমটা চমকে উঠলেও, পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে চোখ দুটো বড় করে সন্ধ্যার ধূসর আবরণ যতটা ভেদ করে ও-পারে ফেলা যায় সেই চেষ্টাই করলো।

হাঁড়ির ভিতর থেকে এই সময় হুম্‌কীর মত একটা গুরুগম্ভীর স্বর আবার নির্গত হোল: হুম্!

মায়া এবার স্থির হয়ে দাঁড়ালো, তার পর আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে ঘাটের দিকে একটু এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে সিঁড়ি থেকে লোহার হাতাখানা টেনে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সাঁতার কেটে ওপারে বুক-জলে মাটিতে পায়ের তল ঠেকতেই একটু থেমে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তার পর হাতাটাকে হাতিয়ারের মত বাগিয়ে ধরে জলের মধ্যে পা টিপে টিপে মূর্তিটার মুখখানা লক্ষ্য করে এগিয়ে চললো।

শক্তের ভক্ত সবাই। শক্তি পরীক্ষার সম্ভাবনা দেখে মূর্তিই আগে মুখোস খুললো ভয়ে। চুণ-মাখানো হাঁড়ির ভিতর থেকে মুখখানা বা'র করে মৃগেন সভয়ে বলে উঠলো: আমি কানাই নই—মৃগ।

চাপা-গলায় মায়া বলল: সে আমি আগেই জেনেছিলুম। কানাই হলে টিল ছুঁড়ত, এমন করে ভোল বদলাবার মতলব তার মাথায় ঢুকত না। আজকের মতলবখানা কি শুনি?

মৃগেন: যেদিনই আসি দেখা করতে, অমনি একটা না একটা বাধা এসে পড়বেই। কথাটা বলবার আর ফুরসদ পাই না।

মায়া: আমারো তা জানতে বাকি নেই। তোমার সে পালা শেষ হয়েছে?

মৃগেন: কবে। কিন্তু তোমাকে না শুনিয়ে শান্তি পাচ্ছি নে।

মায়া: আমারো মন পড়ে আছে তোমার পালার দিকে। কিন্তু কোন উপায় ত দেখছি নে। সবাই যেন আড়ি আগলে আছে।

মৃগেন: একটা উপায় ঠিক করেই তোমাকে জানাতে এসেছি। ভাগ্যিস্ এ পুকুরে ভোঁদড় পড়তো, নৈলে কেউ এটাকে এখানে রাখতো না, আর আমারও কথা বলবার এমন ফুরসদ মিলত না।

মায়া: এই বক্তৃতাই তোমাকে খেয়েছে। বাজে কথা ছেড়ে কাজের কথাটাই বলে ফেল আগে, আবার কেউ এসে পড়বে।

মৃগেন: ভারি নিরিবিলি জায়গা একটা খুঁজে বা'র করেছি।

মায়া: সত্যি? কিন্তু কানায়ের অগম্য জায়গা এ তল্লাটে কোথাও আছে?

মৃগেন: আছে। তবে জায়গাটা ভাল নয়। বাবুদের সেই ভূতুড়ে বন্দটা। বহু কাল থেকে পড়ে আছে। ভূতের ভয়ে কেউ ওর ত্রিসীমানায় যায় না। মস্ত একটা অশোক গাছ আছে সেখানে। তার তলাটা সান-বাঁধানো। খাসা জায়গা, ঐখানে আমাদের পালা শোনার বৈঠক বসবে। কি বল?

মায়া: একবারে মিলে গেছে। আমিও ঐ পোড়ো বাগানটার কথা ভেবেছিলুম যে, কিন্তু বলা আর হয়নি। তাহলে একটা লগি নিয়ে আমি যাবো, যেন অশোক ফুল পাড়তে গেছি। সত্যি, তুমি শুনলে হয়ত হাসবে, রাত্তিরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি যেন তুমি পালা পড়ছো, আর আমি বসে বসে শুনছি।

মৃগেন: তাহলে ঐ কথাই রইলো। কাল দুপুর বেলায় খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই যখন ঘুমুবে—

মায়া: সেপাইডাঙ্গার চরে আমাদের বৈঠক বসবে। কিন্তু দুঃখ্যু হচ্ছে কানাই বেচারীর কথা ভেবে—আড়ি পাতাই তার বৃথা হবে কাল।

১১

নির্জন, দুর্গম ও সাধারণের অগম্য কুখ্যাত ভৌতিক বাগানে সংকেত অনুযায়ী দুটি উৎসাহী তরুণ-তরুণী মিলিত হয়ে মিলনের এক অপরূপ আদর্শ সৃষ্টি করে। বাইরে থেকে স্থানটিকে যত দুর্গম ও ভীষণ মনে হয়, কিনারার দিকে বেত ও নল-খাগড়ার বনের পাশ দিয়ে ভিতরে সেঁধুলে আর সে ধারণা থাকে না। মনে হয়, বনদেবী যেন বাহ্যিক বিশ্রী আবেষ্টনের মাঝখানে স্বহস্তে একটি মনোরম নিভৃত আস্তানা রচে রেখেছেন। যে সব নিরস গাছ সুন্দর বনের গাম্ভীর্য বজায় রাখে, তার প্রায় সবগুলিই এই জঙ্গলটির সামিল হয়ে আছে। শাল, শিশু, শিমুল, সুন্দরী, তিন্তিড়ি, সোঁদাল, গর্জন প্রভৃতি গাছের কাণ্ডগুলো, স্তম্ভের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথার উপরে শাখা-প্রশাখাগুলোকে এমন নিবিড় ভাবে মিলিয়ে দিয়েছে

দেখলে মনে হয় যেন প্রাকৃতিক একখানা চন্দ্রাতপ শোভা পাচ্ছে। কিনারার দিকে বেতান, হেঁতাল, নলখাগড়া, সোনাগাছ ও বলার ঝোপগুলি গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে প্রাচীরের মতন দাঁড়িয়ে আছে। সব চেয়ে মনোরম হচ্ছে—মাঝখানে একটি অতিকায় অশোক গাছের অপূর্ব বিকাশ। প্রকাণ্ড মূলটি পাথর দিয়ে ঘেরা। বছরের সকল ঋতুতেই গাছটি পুষ্প প্রসব করে, এইটিই এর বৈশিষ্ট্য। এই বেদীটি আশ্রয় করে আমাদের প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন-বৈঠক বসে।

মায়ার মনে হয়, মৃগেন তার রচনায় তাকে উপলক্ষ করেই কথা সাজায়। নূতন পালাটিতে যে তেজস্বিনী সংকোচহীনা গ্রাম্য কিশোরীর চিত্রখানি সে এঁকেছে, পুঁথি শুনতে শুনতে মায়া তার প্রতি কথা প্রত্যেক ভঙ্গিটি নিজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে। এদের এই মিলনী ও নিবিড় বন্ধুত্বের মধ্যে বাহ্যিক ভাবে যদিও কোন কালিমা ছিল না—নির্মল কাব্যরস উপভোগ করেই মনের আনন্দ তাদের কাণায় কাণায় ভরে ওঠে, কিন্তু তারই মধ্যেই যে প্রচ্ছন্ন থাকতো গোপন একটা রসধারা ফল্গুর মত তলে তলে, সেদিকে দৃষ্টি দেবার ফুরসদও তারা পেত না।

লম্বা একটা বাঁশের লগি নিয়ে অশোক ফুল পাড়বার ছলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে মায়া, আর মৃগেন তার আগেই এসে বেদীটির উপর হাতে-লেখা খাতাখানি খুলে মায়ার প্রতীক্ষা করতে থাকে। মায়া এলেই তার মুখে ফোটে হাসি, বড় বড় অপূর্ব ছুটি চোখ আরও অপূর্ব হয়ে ওঠে। পড়ার পর বিভিন্ন ভঙ্গিতে তার প্রসাধন চলে। নায়কের অংশ ভাবের আবেগে পড়ে মৃগেন, তখন নায়িকার কথাগুলি না পড়ে মায়ার আর উপায় থাকে না। গানগুলিতে সুর সংযোগ করে মৃগেন; তার পর দুজনে কণ্ঠ মিলিয়ে করে তার সদ্‌ব্যবহার। মৃগেন ভাবে, তার রচনা হয়েছে সার্থক। মায়া ভাবে, কবির প্রসাদে তার জীবন হয়েছে ধন্য। জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি ছাড়া ও কি কখন সম্ভব হয়! আনন্দে তার কিশোরী-চিত্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু এ সুখেও একদিন কানাই এসে বাদ সেধে বসলো। কানাই ছেলেটিও গোঁয়ার বড় কম নয়, ভয়-ডর বা লজ্জা-সরমের তোয়াক্কাও সে রাখে না। সেদিন গ্রামান্তর থেকে ফেরবার সময় অতুলদের বাড়ীতে যেতে পথটি সোজা হবে বলে এই পোড়ো বাগানের ভিতরেই ঢুকে পড়লো সে। হঠাৎ কানাইকে দেখে মৃগেন ও মায়া চমকে উঠলো। তারা ভেবে পেল না—কি মতলবে কানাই সবার অগম্য এই ভুতুড়ে বাগানে এসে সেঁধুলো কিন্তু উপস্থিত-বুদ্ধিতে দুজনেই ওস্তাদ। তখনি একটা ফন্দি ঠিক করে নিল। মৃগাঙ্ক সড় সড় করে জামরুল গাছের আগডালে উঠে গেল, আর মায়া তাড়াতাড়ি আঁচলটি মাথায় ঘোমটার মতন করে দিয়ে তফাতে অশোক গাছের গুঁড়িটির আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো। বিষহরির গান গাইতে গাইতে কানাই পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু মাটিতে লম্বা লগিটা পড়েছিল—পা লাগতে চমকে উঠলো সে। এ কি, লগিটা যে চেনা—অতুলদা'দের বাড়ীতে দেখেছে, এখানে এলো কি করে?—চার দিকে চঙমঙ করে চাইতেই অবগুণ্ঠনবতী মূর্তিটি তার চোখে পড়লো। ভয়ে বিষহরির গান ছেড়ে রাম নাম সুরু করে দিল। কিন্তু মায়ার হাতের কাঁকণ আর পায়ের বুড়ো আঙুলের চুটকী দেখেই মনে তার সন্দেহ জাগলো. তার পর আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—জয় রাম! তাহলে সাঁকচুন্নি নয়—আমারই হবু গিন্নী মায়ারাণী! সঙ্গে সঙ্গে দু হাতে ঘোমটাটি খুলে দিয়ে থুতিটি ধরতে যেতেই মায়া তাকে ঠেলে দিয়ে ঝংকার দিল: খবরদার বলছি।

বটে! পেত্নী সেজে ভয় দেখানো হচ্ছিল, এখন আবার ধমকানো হচ্ছে?

কোন জবাব না দিয়ে আঁচলটি কোমরে জড়িয়ে লগাটি দুহাতে তুলে মায়া আপন মনে অশোকফুল পাড়তে মনোযোগ দিল। কানাই অমনি দন্তপাটি বিকাশ করে বলে উঠলো: কেন আমাকে হুকুম করলেই ত হোত।

মায়া: তোমাকে হুকুম করতে যাব কেন, আমার কি হাত নেই—

কানাই: তোমার আবার হাত নেই; যে জোরে ঠেলা দিয়েছ তাতেই বুঝেছি হাত দুখানা কি। কিন্তু এই ভর সন্ধ্যে বেলায় ভূতের বাগানে ঢুকতে ভয় করে না তোমার?

মায়া: ভূতের চেয়ে মানুষকেই আমার ভয় বেশী। চুপি-চুপি দুটো ফুল পাড়তে এসেছি তাতেও বাদ সাধতে চাও। ভাল চাও ত চলে যাও, নইলে—

কানাই: তা কি কখন হয়? আমি থাকতে তুমি পাড়বে ফুল? কিন্তু লগি দিয়ে কি অশোক ফুল পাড়া যায়?—দাঁড়াও, আমি গাছে উঠে পেড়ে দিচ্ছি, তুমি আঁচল পেতে কুড়োও—

মায়া: আমার ফুলে দরকার নেই—

কানাই: খুব আছে, নৈলে লগা নিয়ে এসেছ কেন? আমি শুনছি নে, লগা নামিয়ে আঁচল পেতে দাঁড়াও, ওপর থেকে আমি পুষ্পবৃষ্টি করি দেখ না—বলতে বলতে কানাই গাছে উঠে গেল। ইতিমধ্যে জামরুল গাছ থেকে নেমে এসে কোঁচাটি খুলে মাথায় ঘোমটার মত করে দাঁড়ালো মৃগেন—তার ইঙ্গিতে সুকৌশলে সরে গেল মায়া। গাছ থেকে ফুল ফেলতে ফেলতে রসিকতা করতে লাগলো কানাই—অবগুণ্ঠনবতী মৃগেন ঘাড় নাড়ে—চাপা স্বরে জবাব দেয়: হুঁ।

এর পর নেমে এসে কানাই দেখে রাশি রাশি ফুলে মূর্তিটি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।—

'আবার ঘোমটা টেনেছ কেন': বলেই কানাই যেমন এগিয়ে গিয়ে ঘোমটাটি খুলে দিয়েছে মৃগাঙ্ক অমনি হিঃ হিঃ করে অট্টকণ্ঠে হেসে উঠল।

বিস্ময়ের সুরে কানাই বলল: য়্যাঁ, এ কি ম্যাজিক না কি? মায়া কোথায় গেল?

অবাক হয়ে মৃগেন বললো: মায়া? সে এখানে এসেছিল না কি?

চোখ দুটো বড় করে কানাই মৃগেনকে যত দেখে, মৃগেন গলা চড়িয়ে ততই হাসে।　　[ক্রমশঃ।

রাত্রির তপস্যা

[উপন্যাস]

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

সে দিন সন্ধ্যার সেই অশ্রুপ্লাবিত চোখ দুইটির মধ্য দিয়া ভূপেন শুধু যে সন্ধ্যারই মনের ছবিটা পরিষ্কার দেখিতে পাইল তা নয়, সে-আয়নাতে এত দিন পরে সে নিজেরও মনের চেহারাটা স্পষ্ট করিয়া দেখিল এবং যা ছিল এত দিন মনের অবচেতনে ঝাপসা অস্পষ্ট হইয়া, আজ তাহাকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া হইতে বাধ্য হইল। আর আত্মপ্রবঞ্চনা করা সম্ভব নয়। পুরুষ জন্ম হইতে জন্মান্তরে যে একটি মাত্র মেয়ের জন্যই সাধনা করে সে নারী তাহার সন্ধ্যা—কল্যাণী নয়।

কিন্তু সে অভিভূতের মতই দাঁড়াইয়া রহিল। সবটা জড়াইয়া যেন তাহার মানসিক ধারণা-শক্তির চেয়ে অনেক বেশী, মস্তিষ্ক এতখানি বিভিন্ন চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে পারে না। এমন কি, সন্ধ্যার ওষ্ঠ দুইটি কথা কহিতে গিয়া যে শুধু নীরবে কাঁপিতেই লাগিল, সে দিকে চাহিয়া একটি সান্ত্বনার বাণীও সে উচ্চারণ করিতে পারিল না।

সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল প্রথম কল্যাণীরই। সে একেবারে কাছে আসিয়া সন্ধ্যাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। তার পর নিজের আঁচল দিয়া তাহার চোখ মুছিয়া লইয়া কহিল, 'এস ভাই, ভেতরে এস। আনন্দের দিনে চোখের জল ফেলতে নেই। তোমার মাষ্টার মশাই তোমারই রইলেন—এক দিন সে কথাটা বুঝতে পারবে। তোমাদের সম্পর্ক যে অনেক বড় বোন!

সে এক-রকম জোর করিয়াই সন্ধ্যাকে ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল। সন্ধ্যা অবশ্য একটু পরেই অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া উঠিল, কিন্তু কিছুতেই যেন ভূপেনের কাছে সহজ হইতে পারিল না। বরং মনে হইতে লাগিল যে, নিজের ক্ষণিক দুর্ব্বলতার লজ্জায় তাহার দিকে সে মুখ তুলিয়া তাকাইতেও পারিতেছে না।

সে দিন রাত্রিটাও কাটিল একটা থমথমে আবহাওয়ার মধ্যে। পরের দিন কলিকাতা হইতে লোক-জন আসিয়া পড়িল, ভোজের আয়োজন ও লোক-জনের কোলাহলে স্বভাবতঃই যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়—সে তপ্ত হাওয়ায় ইহারাও একটু তাতিয়া উঠিল কিন্তু ভূপেনের মনের ক্লান্তি ও জড়তা যেন কিছুতেই কাটিতে চাহিল না। আহারাদির আয়োজন হইয়াছিল দিনের বেলাতেই—কিন্তু শেষ হইতে হইতে বাজিয়া গেল রাত্রি নয়টা। সন্ধ্যা তখনই তাড়া লাগাইয়া ফুলশয্যার ব্যবস্থা করিল—মহেশ বাবুর স্ত্রী ও ডাক্তার বাবুর স্ত্রী এয়োতির কাজ করিবেন, সে জন্যও অবশ্য একটা তাড়া ছিল ; কারণ, তাঁহাদের বেশী রাত্রে বাড়ী ফিরিতে অসুবিধা হইবে। কিন্তু সন্ধ্যার তাড়ার কারণটা যে অন্য সেটা একটু পরেই বোঝা গেল—সে নিজে হাতে কল্যাণীকে ফুলের গহনায় সাজাইয়া দিল বটে, তবে অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই অপেক্ষা করিল না—দাদুর অসুখের অজুহাতে এগারোটার ট্রেণেই কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। রাত্রিটা এখানেই কোন রকমে কাটাবার জন্যে সকলে অনুরোধ করিলেন, সন্ধ্যা উৎসাহ দিলে মহেশ বাবুর স্ত্রীও রাতটা থাকিয়া তাহার সহিত এক সঙ্গে আড়ি পাতিতে পারেন, এমন প্রস্তাবও করিলেন। এমন কি, স্বয়ং ভূপেনও একবার অনুরোধ করিল কিন্তু সন্ধ্যা কিছুতেই রাজি হইল না। এত রাত্রে বর্দ্ধমানে গিয়া রাত্রি আড়াইটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে—রাত্রির ট্রেণ নিরাপদ নয়, এ-সব কোন যুক্তিই তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না।

ফলে সারা দিনের মধ্যে ভূপেনের বুকের পাষাণ-ভার যতটা হালকা হইয়া আসিয়াছিল তাহা যেন দ্বিগুণ ভারী হইয়া চাপিয়া বসিল। কল্যাণীও একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, যেন নিজেকে খানিকটা অপরাধীও মনে হইতে লাগিল তাহার। শুধু তাহাই নয়, মহেশ বাবুর স্ত্রী প্রভৃতি যে দুই-এক জন মহিলা ছিলেন, তাঁহাদেরও যেন এই ব্যাপারের পর কোন আর উৎসাহ রহিল না—অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা যে যাহার বাড়ী চলিয়া গেলেন।

ফুলশয্যার রাত!

নিঃশব্দে নব-বিবাহিত স্বামি-স্ত্রী পাশাপাশি শুইয়া—কেহ কাহারও অপরিচিত নয়, তবু প্রেমালাপ ত দূরের কথা—কথা কহিবারও ইচ্ছা যেন নাই। প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে জীর্ণ খড়ের চালাটার দিকে চাহিয়া ভূপেন সেই কথাটাই ভাবিতে লাগিল! ইহারই জন্য কি সে এত কাণ্ড করিয়া বাপ-মার অমতে হঠাৎ এই বিবাহ করিয়া বসিল!···এই রাতটি সম্বন্ধে মানুষের কত স্বপ্নই থাকে—ভূপেনেরও কম ছিল না—কিন্তু এ কী হইল? তাহার হঠকারিতায় শুধু তাহার নিজের জীবন এবং ভবিষ্যৎই বিড়ম্বিত হইয়া উঠিল না—আরও দুইটি জীবনও বোধ করি নষ্ট হইয়া গেল। বেচারী কল্যাণী! তাহাকে ত ভূপেনই জোর করিয়া বিবাহ করিয়াছে, সে ত দাবীও করে নাই আশাও রাখে নাই—শুধু শুধু তাহাকে এ দুর্ভাগ্যের ঘূর্ণাবর্ত্তে টানিয়া না আনিলেই ভাল হইত বোধ হয়। কে জানে হয় ত তাহার এক দিন ভাল ঘরেই বিবাহ হইতে পারিত, এমন ত কত অসম্ভবই সম্ভব হয়, সে-ক্ষেত্রে সে স্বামি-পুত্র লইয়া সুখেই ঘর-সংসার করিতে পারিত।

কল্যাণীর কথাটা মনে হইতেই সে স্ত্রী সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল। যে কাজ সে করিয়াছে তার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বুঝিয়াই করিয়াছে, এখন পিছাইলে চলিবে না। সন্ধ্যার মান-অভিমান সন্ধ্যারই থাক্—তাহাদের দিবাস্বপ্ন হয় ত বিলাস, প্রতি দিন-রাত্রির মধ্যে সে বিলাসের স্থান নাই। আজ আর ভূপেনের কিছু অজানা নাই—আজ সমস্তটাই চোখের সামনে স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে। যেটাকে সে সন্ধ্যার ঔদাসীন্য ও উপেক্ষা বলিয়া মনে করিয়াছে আসলে সেটা প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা ও অভিমান। হাঁ—কল্যাণী সম্বন্ধে সে ঈর্ষাই বহন করিত, শিক্ষা ও সংস্কারে যত. অসাধারণ মেয়েই সে হোক্, ভালবাসার এই স্তরে সব মেয়েই সমান। সেখানে সন্ধ্যার সহিত অন্য যে-কোন মেয়ের কোন তফাৎ নাই।

অথচ, আশ্চর্য্য এই যে, এই সহজ কথাটা আজ যেমন সে অনায়াসে বুঝিল, সেদিন একবারও কী কল্পনা করিতে পারে নাই! তাহা হইলে হয় ত—ভূপেন মনে মনে বুঝি একটা অনুশোচনাই অনুভব করে—একটা তাড়াতাড়ি সে করিত না।···

কিন্তু না—সে জোর করিয়া মনকে কল্যাণীর দিকে ফিরাইয়া আনে। যে কথা সন্ধ্যার দাদু সেদিন বলিয়াছিলেন তাহার পর আর অন্য কোন আশা রাখা সম্ভব ছিল না। কোন আত্মসম্মানবিশিষ্ট লোকের পক্ষে সে আশা রাখা উচিতও নয়। সন্ধ্যা ধনি দুহিতা, তাহার নানা রকম খেয়াল শোভা পায়—ভূপেন দরিদ্র স্কুল-মাষ্টার, তাহার কল্যাণীই ভাল। যে মেয়েটিকে সে জোর করিয়া সঙ্গিনী করিয়াছে তাহার মনের অর্দ্ধ বিকশিত বাসনার সহস্র দল টিকে পূর্ণ প্রস্ফুটিত করিবার দায়িত্ব তাহারই—আর তা যদি সে পারে তবেই জীবন ধন্য হইবে।

কল্যাণীর দিকে ফিরিয়া দেখিল, সে কাঠ হইয়া শুইয়া আছে। একবার সন্দেহ হইল বুঝি সে নিঃশব্দে কাঁদিতেছে, কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝিতে পারিল; কান্নাও আর তাহার নাই, শুকাইয়া গিয়াছে। ভূপেন আস্তে আস্তে একখানা হাত কল্যাণীর গায়ের উপর রাখিয়া ডাকিল, কল্যাণী!

কল্যাণী শিহরিয়া উঠিল একবার, কিন্তু উত্তর দিল না। তখন ভূপেন তাহাকে জোর করিয়াই কাছে টানিয়া লইল, একেবারে বুকের মধ্যে আনিয়া আবার ডাকিল, 'কল্যাণী, আমার কি কিছু অপরাধ হয়েছে?'

কল্যাণী স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া তাহার অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের অভাবনীয়ত্ব অনুভব করিতে করিতে মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

তবে?···জোর করিয়া কল্যাণীর মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া তাহার নিমীলিত নয়নে নিজের ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া চুপি চুপি কহিল, 'তবে কি আমার ওপর তোমার বিশ্বাস নেই? তোমার ভাগ্য আমার সঙ্গে জড়িয়ে কি তোমার ভয় করছে?'

ইহার উত্তরে অনেক কথাই কল্যাণী বলিতে পারিত কিন্তু বলিল না, তেমনি মাথা নাড়িয়াই জানাইল, না। ভয় ত তাহার করিবার কথা নয়—ভূপেনকে স্বামী বলিয়া উল্লেখ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াই সে ধন্য, কৃতার্থ। তাহার আর ভয় কি—যে কোন দুঃখের মূল্যই সে এই একটি রাত্রির জন্য দিতে প্রস্তুত আছে। তাহার সহিত ভাগ্য জড়াইয়া স্বামী ভয় পাইতেছেন কি না—এই তাহার আশঙ্কা।

ভূপেন নির্ব্বোধের মত বলিয়া ফেলিল, তবে কথা কইছ না কেন? অমন চুপ ক'রে আছ কেন?

এবার কল্যাণী কথা কহিল। চোখ না খুলিয়াই ম্লান একটু হাসিয়া কহিল, 'কথা কি আগে আমারই কইবার কথা?'

'তা বটে!' ভূপেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। কল্যাণীর হাসি-মুখের ঐ অল্প কয়েকটি কথা যেন নিশ্বাসে অনেকগুলি অভিযোগ বহন করিয়া আনিল। সে কল্যাণীকে সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, 'তা নয়। তবে তোমার শুয়ে থাকবার ভঙ্গিতে যেন আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ প্রকাশ পাচ্ছিল। তাই কি?'

মুহূর্ত্ত কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া কল্যাণী আস্তে আস্তে কহিল, অভিযোগ কি আমার থাকা সম্ভব? তবে নিজেকেও অপরাধী ভাবছিলাম বলেই—

সে মধ্যপথেই থামিয়া গেল। ভূপেন কহিল, অপরাধ? তোমার কী অপরাধ থাকতে পারে কল্যাণী?

কল্যাণী মুখখানা যেন আরও নিবিড় ভাবে ভূপেনের বুকের মধ্যে গুঁজিয়া কহিল, 'আমাকে দয়া করতে গিয়েই ত নিজের এত বড় সর্ব্বনাশ করলেন!'

'ছিঃ! দয়া কথাটা উচ্চারণ করতে নেই। আমি তোমাকে ভালবেসে নিয়েছি এটা কেন ভাবতে পারছ না?'

হয় ত তাই! কল্যাণী চরম সাহসে ভর করিয়া বলিল, 'তবু আমি যে তা বিশ্বাস করতে পারি না। আমার কোন যোগ্যতা নেই, সে কথা আমি কী ক'রে ভুলব বলুন।···তা ছাড়া আপনি যেটা ভাবছেন হয় ত সেটাই ভুল—সে ভুল যে দিন ভাঙবে সে দিন এত বড় অনিষ্ট করবার জন্য আমাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবেন না।'

তার পর মুহূর্ত্ত কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার কহিল, 'আমি নিজেকে দিয়েই সন্ধ্যাদি'র দুঃখের কথাটি বুঝতে পারছি—আর লজ্জায় মরে যাচ্ছি, আমার মত সামান্য মেয়ের জন্য তাঁর জীবন ব্যর্থ হ'তে দেওয়াটা কোন মতেই উচিত হয়নি।'

ভূপেন তাহার ললাটে একটি চুম্বন করিয়া কহিল, 'তোমার কোন লজ্জা, কোন অপরাধ নেই। সন্ধ্যা বড়লোকের মেয়ে—তার জীবন এত সহজে ব্যর্থ হয় না।'

কল্যাণী এবারও মৃদু হাসিয়া কহিল, বড়লোকের মেয়েদের হৃদয় থাকে না এ কথা অন্ততঃ সন্ধ্যাদি'কে দেখবার পর আর বিশ্বাস করতে পারি না। আপনি তার যা অনিষ্ট করেছেন—তার ওপর অন্ততঃ এ অপবাদটা দেবেন না।

তীক্ষ্ণ ছুরির মত ভূপেনের বুকে কী যেন একটা আঘাত বিঁধিল। সেই প্রায়ান্ধকারে প্রদীপের আলোতে কল্যাণী স্বামীর মুখের চেহারাটা দেখিতে পাইল না—শুধু তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ব্যাপারটা অনুমান করিতে পারিল।

কল্যাণীর দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে চমক ভাঙ্গিয়া ভূপেন কথাটাকে চাপা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, কেউ যদি অকারণে দুঃখ পায় আমি কী করব বলো, আমার দিক্ থেকে অন্তত কোন প্রশ্রয় ছিল না। আমি যাকে বেছে নিয়েছি নিজের জীবন-সঙ্গিনী ক'রে, তাকে শুধু দয়া ক'রেই আত্মীয়-স্বজন সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করেছি, এ কথা মনে করবার কোন কারণ নেই। তুমি আমাকে বিশ্বাস করো—আমার ভালবাসায় বিশ্বাস রেখো, এইটুকুই শুধু চাই। তোমার মনে কোন সংশয় থাকলে জীবনের সোজা পথে কী ক'রে চলব বলো?

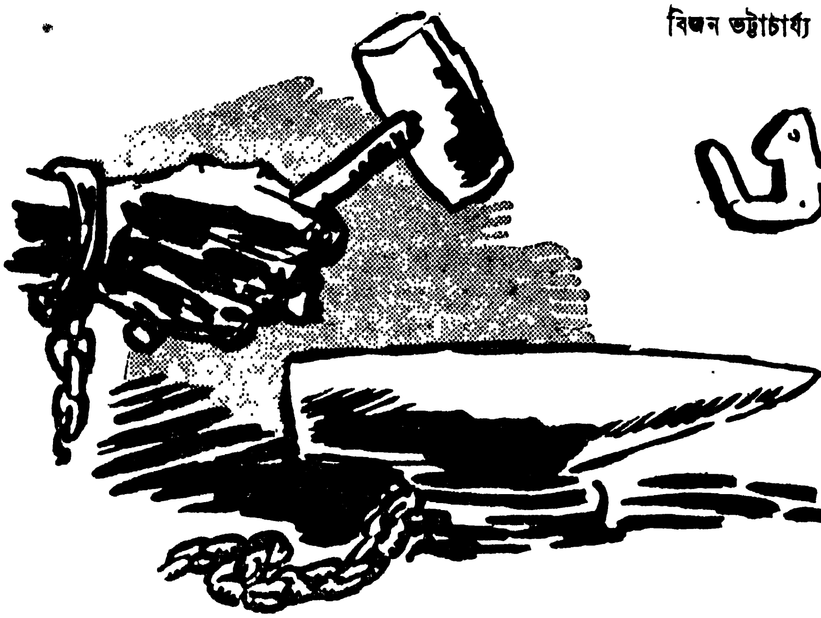
শেষের কথা সব বুঝিল না, বুঝিবার চেষ্টাও করিল না, শুধু প্রথম দিক্‌কার কথাগুলিই অসহ্য একটা সুখের বেদনাতে কল্যাণীর মনের মধ্যে রিণ্‌-রিণ্‌ করিতে লাগিল। হায় রে! তবু কথাটা যদি সে সত্য-সত্যই বিশ্বাস করিতে পারিত। সন্ধ্যার চোখের মধ্যে যে বিপুল ইতিহাস লিখিত ছিল তাহা ভূপেন অন্ধ বলিয়াই হয় ত এত দিন দেখিতে পায় নাই—কিন্তু কল্যাণী ঠিকই দেখিয়াছে। যেখানে ভালবাসার প্রশ্ন সেখানে বোধ হয় কোন মেয়েই ভুল দেখে না। তাহাদের সজাগ উদগ্র দৃষ্টিতে অনেক সময় মনের অবচেতন স্তরের কথাও ধরা পড়ে!

কল্যাণী প্রাণপণ চেষ্টায় আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস দমন করিয়া ভূপেনের উত্তপ্ত চুম্বনের মধ্যে নিজেকে যেন নিঃশেষে ছাড়িয়া দিল।

[ক্রমশঃ।

বিজন ভট্টাচার্য্য

অবরোধ



দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

[মিঃ সেনের ড্রইংরুম। মিসেস্‌ সেন নিবিষ্ট মনে সাবিত্রী দেবীর মুখোমুখি ব'সে উল বুনছেন। সর্ব্বাঙ্গে তাঁর প্রচুর গহনা। মিঃ সেনের পরণে একটা গাউন—ঘরের এক কোণে ফোন ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আর কবি খবরের কাগজ প'ড়ছে সোফার ওপর পা তুলে ব'সে।]

মিঃ সেন। (ফোনে) তাই নাকি! বেশ বেশ বেশ। কিন্তু আজকে তো ভাই আমি পারবো না। কি, পাগল নাকি, মরবার ফুরসুৎ পাব না আমি আজ! আচ্ছা কি করে যাব বল। ···হ্যাঁ নিশ্চয়ই, বুধবার তো, নিশ্চয়ই, আমি কথা দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা ছেড়ে দিলুম।

কবি। গ্রীস'এর ব্যাপারটা দেখছি ক্রমেই পোল্যাণ্ডের মত জটিল হ'য়ে উঠছে।

মিঃ সেন। পোল্যাণ্ডের মত, তার চাইতে বল না কেন আমার কারখানার মত!

সুচিত্রা। তোমার তো কেবল ঐ কারখানা! Business যেন আর কেউ করে না!···দেশ-বিদেশের কথা হচ্ছে শুনছো···

মিঃ সেন। কেন আমার কারখানাটা কি সৃষ্টিছাড়া নাকি! দেশ-বিদেশের ভেতরে পড়ে না! কবি!

কবি। উঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই—

সুচিত্রা। কারখানা কারখানা আর কারখানা। বিশ্ব সংসারটাই যেন···

মিঃ সেন। আজ্ঞে হ্যাঁ একটা কারখানা!

সুচিত্রা। (হেসে) তাই আর না, খুব retort ক'রতে ওস্তাদ হয়েছ!

মিঃ সেন। তুমি কিছুতেই condradict করতে পারো না সুচিত্রা, বললে কি হবে।

সুচিত্রা। আমার ভারী ব'য়েই গেছে, (কবিকে) দেখুন না কি রকম কথা ফিরোচ্ছে।

মিঃ সেন। তবে, এই কথার jugglery ক'রেই টিকে আছি বাবা দুনিয়ায়; নইলে আমার মত একটা অর্ব্বাচীনকে···

সাবিত্রী। যখন হরিদাসের চাইতেও যে বেশী বিনয়ী হ'য়ে যাচ্ছেন মিঃ সেন!

মিঃ সেন। চেপে যেতে বলছেন?

সাবিত্রী। না চেপে যাবেন কেন।

সুচিত্রা। এত বাজে কথা বলতে পারো তুমি।

মিঃ সেন। বাজে কথা!

সুচিত্রা। তা নয় তো কি! শুধু irrelevant Juxtapositicn of words—লোককে কথা ব'লে হয়রাণ করতেই যদি ভাল লাগে তো উকিল ব্যারিষ্টার হলেই পারতে—scope ছিল! Businessman হ'তে গেলে কেন!

মিঃ সেন। কথাটা যে আমিও ভাবিনি তা নয়।

কবি। Really, how do you talk সুচিত্রা দেবী—Scopeটা তো দেখছি আপনারও কম ছিল না।

সুচিত্রা। (হেসে) Scope হয় তো ছিল, কিন্তু opportunity পেলাম কৈ!

মিঃ সেন! বেশ তো, কারখানার কাজে আমায় তুমি সাহায্য করবে চল না—Free scope and opportunity পাবে।

সুচিত্রা। মুখেই, বাইরে একটু বেড়াতে যাব ব'ল্লে যাদের মুখ শুকিয়ে যায়···(কবিকে) ওপরটা এদের জানলেন খুব চটকদার, এমন ভাব দেখাবে যেন কতই না up-to-date, কিন্তু বেশ একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করুন, দেখবেন এদের প্রত্যেকে এক এক জন Tory number one.

কবি। কেন মিঃ সেনকে দেখলে তো তা মনে হয় না।

সুচিত্রা। দেখলে, বলেছি তো ওপরটা এদের···

কবি। হ্যাঁ, হয়তো আপনার মত ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করিনি, কিন্তু মিঃ সেনকে তো আমি ভাল করেই জানি, তাতে করে···

সাবিত্রী। No leg pulling please. (কবি Blush করে)

কবি। কি রকম!

সুচিত্রা। অত কথা কি। আমার দিকেই ভাল করে তাকিয়ে দেখুন না। এদের সত্যিকারের মানসিক গঠনটা কি ভাবে সালঙ্কারে ফুটে উঠেছে আমার প্রতিটি অঙ্গে। এই দেখুন কঙ্কণ, তাবিজ, চুড়ি, রুলি, দু' হাতে দুটো দুটো চারটে আংটি, গলায় লকেটওলা দায়মল-কাটা হার। আরও তো পরি না ব'লে কত কথা কাটাকাটি হয়। আচ্ছা বলুন তো,

এই অবস্থায় দেখলে আমায় কেউ আধুনিক কালের এক জন শিক্ষিতা মহিলা বলবে। অথচ দেখুন, অবিশ্যি তর্কের খাতিরেই বলছি, নইলে আমার নিজের কোন illusion নেই—আমি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট্—passed successfully with honours in philosophy, মানে হয়?

মিঃ সেন। মানে হওয়ালেই হয়। গ্রাজুয়েট হয়েছ বলেই যে রাস্তায় রাস্তায় ধেই-ধেই করে নেচে বেড়াতে হবে তার কি কোন যুক্তি আছে! কথায় বলে লক্ষ্মীরূপিণী, মেয়েরা থাকবে ঘরে—বললেই হলো! দু'পাতা philosophy প'ড়ে তুমি দেশের গোটা traditionটাকে উল্টে দিতে পারো না। চালাকি করলেই হ'লো!

সুচিত্রা। তাও যদি বুঝতে! Tradition বলতে তো বোঝ আমি তোমার ঠাকুমা হ'য়ে থাকবো।

মিঃ সেন। What! ঠাকুমা (অট্টহাসি) হো-হো-হো-হো।

কবি। By jove, what a tradition (তিন জনেই হাসতে থাকে)

সুচিত্রা। (হেসে) খুব humour হলো না!

মিঃ সেন। (হাসতে হাসতে) কি কাণ্ড, তুমি কি শেষ কালে আমায়···

সুচিত্রা। ঐ তো, seriously কোন কিছু বললেই তুমি হেসে উড়িয়ে দেবে—তোমার politics কি আর আমি বুঝি না। (হেসে) বারে খুব হাসির কথা হলো না, আমি চলে যাচ্ছি।

[প্রস্থান]।

কবি। আরে শুনুন, চলে যাবেন না রাগ ক'রে সুচিত্রা দেবী, সুচিত্রা দেবী!

সাবিত্রী দেবী। দেখি আমিও যাই।

মিঃ সেন। সে কি, আপনি বসুন, ও এক্ষুনি আবার আসবে।

সাবিত্রী দেবী। I leave this hall as protest.

মিঃ সেন। আরে এখানেও যে দেখছি trade union, কবি!

কবি। সর্ব্বত্র।

মিঃ সেন। (সাবিত্রীকে লক্ষ্য করে) দেখবেন আস্তে আস্তে যাবেন, আবার মাথা-টাথা না ঘোরে।

(আবৃত্তি)

কবি। "যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।
এ নহে মুখর বন-মর্ম্মর গুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে।
এ নহে কুঞ্জ কুন্দ-কুসুম রঞ্জিত
ফেন-হিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে।
কোথা রে সে তীর ফুল-পল্লব-পুঞ্জিত,
কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয়-শাখা।
তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর।
এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।"

কি রকম লাগলো?

মিঃ সেন। Wonderful, প্লেনে ক'রে Calcutta to Karachi যাবার কথা মনে হচ্ছিল। সে তোমায় বলবো কি কবি, একটা etherial Existence, নীচের দিকে চেয়ে থাকলে গোটা পৃথিবীটা মনে হয় যেন কোন Engineer'এর হাতে আঁকা plan—সুতোর মত ব'য়ে গেছে বড় বড় নদ-নদীগুলো, পাহাড়-পর্ব্বতগুলো মনে হয় যেন so many dots on a canvas—আর মানুষগুলো দেখতে তোমার গিয়ে এই ঠিক ক্ষুদে লাল পিঁপড়েগুলোর মত—নড়ছে চড়ছে—এমন funny লাগে।

কবি। funny লাগে!

মিঃ সেন। হাঁ, মানে তোমার সে গিয়ে বলবো কি এমন একটা অদ্ভুত sensation হয়, ঠিক বুঝিয়ে ব'লতে পারবো না। কত সহর, কত বন্দর, কত জনপদ—সব যেন অসাড় নিস্পন্দ হয়ে আছে! এমন অনেক vast tracts of land চোখে পড়ে যে দেখলে মনে হবে মানুষের সেখানে কোন দিন বসতি ছিল না। Creamy bluish একটি tint—অনেকটা মনে হবে তোমার এই, আরে কি যে বলে ওর নামটা—এই তোমার গিয়ে শ্যাওলার মত—miles after miles চ'লে গেছে···ওপরটায় পাতলা ধোঁয়ার একটা আস্তরণ—দেশটা মনে হয় as sombre and dull like a dead man's coffin তোমার আবৃত্তি শুনতে শুনতে সেই কথাই মনে হচ্ছিল। তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা··· বাস্তবিক।

কবি। বেশ একটা sense of resignation আসে, না!

মিঃ সেন। হাঁ, and that is inevitably infectious—সমস্ত দেহ মনটাকে আস্তে আস্তে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে, at times you feel like a sinking man—going down and down and down.

কবি। খুব deeply enjoy করেছ তো! চমৎকার লাগলো। না মিঃ সেন you are really great, নইলে প্লেনে তো কত লোকেই চড়ে কিন্তু এই ধরণের কাব্যিক ব্যাখ্যা তো আমি কারো মুখ থেকে শুনিনি।

মিঃ সেন। বলছো!

কবি। না sincerely.

মিঃ সেন। ছিল ভাই, অন্তরের সম্পদ অধমের ভেতরেও কিছু কিছু ছিল, কিন্তু কেউ দাম দিলে না। সবাই জানলো Mr. Sen is essentially a typical business man—খচ্চড় লোক। স্ত্রী পর্য্যন্ত মনে করে যে আমি তাকে একটা পণ্য দ্রব্য বই আর কিছু মনে করি না। See···

কবি। না, এ কি বলছো!

মিঃ সেন। বলতে আমারও খুব ভাল লাগছে না ভাই কিন্তু···আর বলবো কি, শুনলে তো কিছুটা নিজের কানে একটু আগেই।

কবি। ও কিছু না, তর্কের খাতিরে ও-রকম অনেক স্ত্রীই বলে থাকে।

মিঃ সেন। তর্কের খাতিরে!···But even when in love—how can you explain that, ত্যাখো কবি, may be not a psychoanalist, but certainly not a fool. যাক গে, I have no illusion to that—আছি, থাকতে হয়; this much···

(সুচিত্রার প্রবেশ)

য়্যাঃ, নাও সিগারেট খাও। তার পর কল্যাণী···দেবী, নিজ গুণেই এলেন না···

সুচিত্রা। কেন, disturb করলাম!

মিঃ সেন। না—া—া···

সুচিত্রা। I am sorry. যাচ্ছি···

কবি। আরে কি আশ্চর্য্য, বসুন, সুচিত্রা দেবী···না, এ রকম করলে আমি কিন্তু এক্ষুনি চ'লে যাবো।

সুচিত্রা। না আমার কাজ আছে, উলটা দিতে এসেছিলাম।

মিঃ সেন। Let her, let her, জোর ক'রে বসতে ব'ললে আবার বলবে civil libertyতে হস্তক্ষেপ ক'রছে।···চালাকি, সব সময় আইন বাঁচিয়ে চলবে, বুঝলে কবি···আমি বাবা হুঁসিয়ার হ'য়ে গেছি এখন।

সুচিত্রা। তা আর জানি না! আইন চেনো আর নাই চেনো, আইনের ফাঁকগুলো বেশ ভালো ক'রেই রপ্ত ক'রে রেখেছো···তুমি কি কম লোক!

মিঃ সেন। দেখলে, দেখলে কবি!

সুচিত্রা। আহা, ভয় খাবারই লোক কি না তুমি! (গমনোদ্যত)

মিঃ সেন। তুমি চ'লে যাচ্ছো!

সুচিত্রা। হ্যাঁ, কেন, আড্ডা মারবো ব'লে তো আমি এখন আসিনি। সংসারের কাজ-কর্ম্ম নেই!

মিঃ সেন। ও, তাহ'লে রাগ করে যাচ্ছো না, বেশ বেশ! তা if you dont mind হ'বাটি চা দিয়ে যেতে ব'লো তো! লক্ষ্মীটি!

সুচিত্রা। আহা, ঢং!

মিঃ সেন। কি হলো!

সুচিত্রা। (হেসে) পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মিঃ সেন। Thanks···(কবিকে) আর একটু চা খাওয়া যাক, কেমন যেন মিয়িয়ে যাচ্ছি।

কবি। আমাকে প্রশ্ন করা বৃথা।

মিঃ সেন। ও, তুমি তো মিয়িয়েই থাকো চা ছাড়া। তা বেশ, কিন্তু ক'টা বাজলো! (ঘড়ি দেখে) এগারোটা, বারোটা, সাড়ে বারোটা, একটা, thats all right.—ঠিক আছে।

কবি। (উদাত্ত স্বরে) ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ-মোহ বন্ধন
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা ব'সে ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুল-সেজ রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন
উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ ক'রো না পাখা॥

মিঃ সেন। তা বিহঙ্গ না হয় পাখা বন্ধ করলো কিন্তু এদিকে আমার কারখানাও যে সঙ্গে সঙ্গে অচল হ'য়ে প'ড়ছে।

কবি। কেন গোলমাল এখনও মেটেনি?

মিঃ সেন। কোথায় আর মিটছে বলো, সব ব্যাটা গোঁ ধরে ব'সে আছে! কম ঝামেলা!···

কবি। কেন নতুন করে আবার কি চাইছে?

মিঃ সেন। কি আবার চাইবে,—টাকা দাও, ভাতা দাও, কাপড় দাও—এই সব। হা-ভাতের দেশ! লোকগুলোও হয়েছে তেমনি—যত দেবে তত চাইবে। হারামি হারামি!

কবি। তা অনেক দিন ধরে তো চলছে, মিটিয়ে ফ্যালো এইবার যা হয় একটা রফা ক'রে। এই রকম ভাবে চ'লতে থাকলে তো Business দারুণ hamper ক'রবে। ক'রবে না?

মিঃ সেন। Hamper মানে ডুবিয়ে দেবে সব কিছু। এই তো আর ক'টা দিন মাত্তর বাকী আছে—এর ভেতরে যদি government'এর জরুরী অর্ডারটা supply ক'রতে না পারি তো লাটে উঠে যাবে Business। ষোল লাখ টাকার contract, চাড্ডিখানি কথা না!

কবি। তা হ'লে মিটিয়ে ফ্যালো যে ক'রে হোক। টাকা চায় তো তাই দাও না—risk নিচ্ছো কেন! কত আর তোমার লাগবে?

মিঃ সেন। উঁ, না, ব্যাপারটা ভাই এখন একটু অন্য-রকম দাঁড়িয়েছে কিনা! নইলে টাকা সে আমি দিয়ে দিতে পেছ পা হতুম না। কিন্তু একবার দেব না ব'লে ফেলেছি কিনা, এখন কথার খেলাপ ক'রতে পারি না।···বুঝতে পারছো না তুমি যে এখন surrender করার মানেই হচ্ছে সব মাথায় তুলে দেওয়া। ব্যাটারা ভাববে strikeএর হুমকি দিয়ে জব্দ করে দিলুম। কি বিশ্রী একটা Scandal বলতো! আর একবার যদি এই সুবিধে পেলো তো regular unbearable ক'রে তুলবে তোমার জীবন ভবিষ্যতে—তখন কথায় কথায় strikeএর হুমকি! মাথায় তুলতে আছে কখনও!

কবি। তা ব'লে মিটমাট তো তোমায় একটা করতেই হবে। ষোল লাখ টাকা তো আর তুমি তাই বলে risk করতে পারো না।

মিঃ সেন। না, মিটমাট মানে একটু কায়দা করে ক'রতে হবে আর কি।
দেব, ঐ টাকাই দেবো, তবে অন্য ভাবে—যে ভাবে দাবীটা উঠেছে ঠিক ও ভাবে নয়, বুঝতে পারলে?

কবি। কি রকম?

মিঃ সেন। ধরো এই extra profit taxএর কিছুটা অংশ, ও তো গিয়েই আছে বুঝতে পারলে না, আমি divident হিসেবে declare করলুম। কোম্পানীর কোন একটা function'এর ব্যাপারে···gestureটাও বেশ ভাল হয়, কেমন না! কিন্তু দাবী হিসেবে কখনই মেনে নেবো না।

কবি। ঘুরিয়ে নাক-দেখানোর tactics.

মিঃ সেন। হ্যাঁ, তার আর উপায় কি বলো। Business'এর ব্যাপারে এ সব একটুখানি করতেই হয়, particularly when you are dealing with the workers who are always under the peculier impression that they are being constantly exploited.

কবি। ধারণাটা সত্যিও তো বটে।

মিঃ সেন। হ্যাঁ, তা সে সত্যি, কিন্তু তোমার businessটা তো বাঁচিয়ে কাজ করতে হবে। লাভের কিছুটা অংশই তুমি তাদের দিতে পারো, তার বাইরে তো আর নয়। আর তারপর business করতে গেলে সব সময় যে তোমার লাভই হবে এমন কথা তুমি জোর ক'রে বলতে পারো না।···এই যে গত বার আমি some দেড় লাখ টাকার মত loss দিলুম, কই সেটা তো আমি আমার কর্মচারী বা সাধারণ মজুরদের ঘাড় ভেঙ্গে উশুল করিনি। সেই পুজোর সময় Bonusও দিলুম, দু'মাসের করে ভাতাও দিলুম। বলতে গেলে তো আমার একটা পয়সাও দেয়া উচিত ছিল না, কারণ Company loss খেয়েছে। শুনবে সে কথা! তা লোকসানের ঝুঁকি যদি না নাও তো লাভের অংশই বা পাও কি করে তুমি।···তা সে ভাই অনেক ব্যাপার, Business ক'রতে গেলে! সাধারণ লোকে জানে না, বোঝে না, ভাবে বেড়ে লাভ খাচ্ছে ব'সে ব'সে কারবার ফেঁদে।···এই তো যুদ্ধ, আর ক'দিনই বা আছে, দেখো না ফেটে সব দরজা হয়ে যাবে Businessmanদের। এই যে দেখছো inflated currency, ফেটে একেবারে চুপসে যাবে তখন বেলুনের মত।

কবি। যা হোক মিটিয়ে ফেল ঝামেলা।

মিঃ সেন। হ্যাঁ, মিটোতেই হবে, উপায় কি! ষোল লাখ টাকার contract, মাত্তর ক'টা দিন বাকী আছে—কি বিশ্রী position বল তো।···হতো না, কক্ষনও এতটা develop করতো না যদি আমি কলকাতা থাকতুম। কর্মচারীগুলোও হয়েছে তেমনি বুদ্ধু, করবো কি। এদিকে মাসের ভেতরে পাঁচ বার করে আমাকে ইল্লি-দিল্লী করতে হয়েছে।

কবি। খুব tour করতে হয় তো?

মিঃ সেন। Tour কি ভাই, নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। কানের মধ্যে এখনও propeller ভোঁ ভোঁ করছে।

কবি। কি সব সময়ই plane'এ?

মিঃ সেন। জরুরী সব war contracts—কত swiftly move করতে হয়! আর এ একদিন দু'দিন না, লেগেই আছে। ঐ চলিছি, কোথায় দিল্লী, কোথায় বম্বে, কোথায় মাদ্রাজ, কোথায় করাচী। ওপর দিয়ে আসি ওপর দিয়ে যাই। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া।

কবি। শুধু ধোঁয়া! আচ্ছা ধোঁয়ার ভেতরে মাঝে মাঝে আগুন দেখতে পাও না?

মিঃ সেন। আগুন!

কবি। হ্যাঁ

মিঃ সেন। মানে you mean fire.

কবি। Yes yes.

মিঃ সেন। No···not even now, perhaps I do'nt like to.

(অন্ধকারে পটক্ষেপ) [ক্রমশঃ।

মুহূর্ত

[টুর্গেনিভ থেকে]

মৃণালকান্তি পুরকায়স্থ

কী শূন্য, বোবা, ব্যর্থ দিন। দিনের পর দিন। এই দিন, ইতিহাস-হারা, নামহীন—কোন স্বাক্ষর রেখে যায় না সময়ের বুকে! কী অর্থহীন, আলোহীন, অন্ধ প্রহর—একে একে ঝরছে অভিশপ্ত দিন!

কিন্তু মানুষ তবু স্বপ্ন দেখে, আশার জাল বোনে;—গায় জীবনের জয়গান। অনির্বাণ আশা। নিজের উপর কী নিশ্চিত নির্ভর, ভবিষ্যতের ভরসা···হায়! কী আশীর্ব্বাদ সে আশা করে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কাছে!

সে ভাবে না—যে দিন ঝরে গেছে, যে মুহূর্ত ঝরে গেছে—কে জানে, আগামী দিনও তেমনি ব্যর্থ, বর্ণহীন হবে না?

না, সে তা কল্পনাও করতে পারে না। এ নিয়ে কোন ভাবনাই ভালবাসে না সে। নির্বিকার, নির্লিপ্ত।

হায়! কাল, কাল! আগামী দিনের মধুর মিথ্যার স্বপ্ন দেখে সে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। কিন্তু কাল আর আসে না। কাল তাকে নিয়ে যায় মহাকালের কবলে।

হ্যাঁ, এক দিন মৃত্যুই তাকে মুক্তি দেবে; সেদিন সকল ভালো-মন্দের ভাবনার হ'বে অবসান, ক্লিষ্ট কল্পনার তীক্ষ্ণ প্রহার।



দৃষ্টিপাত

যাযাবর

দশ

আরোগ্য-সম্ভাবনাহীন রোগীর অত্যাসন্ন মৃত্যু নিশ্চিত জানার পরেও যে-প্রফেশন্যাল নির্লিপ্ততা নিয়ে ডাক্তার প্রেসক্রিপ্‌সন লিখে যান, ক্রিপ্‌স-আলোচনা সম্পর্কেও বর্ত্তমানে আমাদের সেই মনোভাব উপস্থিত। এর ব্যর্থতা সম্পর্কে নয়া দিল্লীতে সমবেত জ্ঞানে 'লিষ্টদের মনে এখন আর সংশয় নেই। প্রশ্ন এখন শেষ মুহূর্ত্তে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটার নয়, প্রশ্ন কবে আলোচনার অসাফল্য সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হবে।

অথচ মাত্র সপ্তাহ-দুই পূর্ব্বেও ক্রিপস্‌-দৌত্যের এই পরিণতি আশঙ্কা করার কারণ ছিল না। বরং এই রাজনৈতিক আলোচনা দ্বারা শীঘ্রই ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে একটা সম্মানজনক মীমাংসার ফলে ভারতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হবে এই আশাই বেশীর ভাগ লোক পোষণ করেছে।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সুরু করলো। প্রথম দিনেই পার্ল হারবার বিধ্বস্ত হলো। তিন দিন পরে ব্রিটিশ নৌবহরের অন্যতম গর্ব্ব ও নির্ভর প্রিন্স অব ওয়েলস ও রিপালস্‌ জাপানী বোমার আঘাতে প্রশান্ত মহাসাগরের গর্ভে সলিল-সমাধি লাভ করলো। দেখতে দেখতে হংকং ও মালয় জাপানীরা কেড়ে নিল। ১৫ই ফেব্রুয়ারী সুদূর প্রাচ্যে ব্রিটিশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘাঁটি—যা দুর্ভেদ্য বলে সবার ধারণা ছিল—সিঙ্গাপুরের পতন ঘটলো। দুই শত বৎসর ব্রিটিশ শাসনকালে এই প্রথম জল এবং স্থলপথে ভারতবর্ষ শত্রু-আক্রমণের সম্মুখীন। কর্ত্তৃপক্ষের মনে উদ্বেগ, সাধারণের মনে ভীতি এবং সহজ-বিশ্বাসপ্রবণ জনজনের অসংবদ্ধ রসনায় নানাবিধ ত্রাসজনক রটনা উদ্ভূত হলো। এই পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাউস অব কমন্‌সে প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল ঘোষণা করলেন—ওয়ার ক্যাবিনেট সর্ব্বসম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্যা সম্পর্কে একটি চূড়ান্ত ও ন্যায়সঙ্গত সমাধান—জাষ্ট এণ্ড ফাইন্যাল সলিউসন—স্থির করেছেন এবং লর্ড প্রিভি সীল স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস্‌ নিজে ভারতীয় নেতৃবর্গের সম্মতি সংগ্রহের জন্য মন্ত্রিসভার প্রস্তাবটি নিয়ে ভারতে যাচ্ছেন।

যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর থেকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে জাতীয়তাবাদী ভারতের দাবী, বারম্বার উপেক্ষিত হয়েছে কংগ্রেসের সহযোগিতার প্রস্তাব। মাসখানেক পূর্ব্বে মার্শাল চিয়াং কাইসেক ও মাদাম এসেছিলেন ভারতবর্ষে। তাঁরা প্রকাশ্য বিবৃতিতে ব্রিটেনকে ভারতীয়দের হাতে যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতায় প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদানের অনুরোধ করেছিলেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তার পরেই সুস্পষ্ট ভাষায় চার্চ্চিলের উক্তির প্রতিবাদ করে বললেন, এটলাণ্টিক চার্টার সমগ্র পৃথিবীর জন্য, কেউ তা থেকে বঞ্চিত হবে না। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অষ্ট্রেলিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রী এভাট সেখানকার পার্লামেণ্টে ভারতের স্বাধীনতার দাবীকে ন্যায্য বলে স্বীকার করে বললেন সে-দাবীর প্রতি অষ্ট্রেলিয়ানদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। ভারতবর্ষে জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি সম্মিলিত জাতিগুলির এই ক্রমবর্দ্ধমান অনুকূল মনোভাব ও প্রকাশ্য উক্তি দ্বারা ব্রিটেনের রক্ষণশীল কর্ত্তৃপক্ষ বিব্রত হচ্ছিলেন সন্দেহ নেই।

কিন্তু তার চাইতেও গুরুতর কারণ ছিল প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণার। সে-কারণ সহৃদয়তার নয়, অনুরোধ উপরোধ বা উপদেশজাত নয়। কারণ কঠোর বাস্তব ঘটনা-পরম্পরায়। ৮ই মার্চ্চ রেঙ্গুনের পতন হলো, বার্ম্মায় ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তি ঘটলো! ভারতবর্ষের বিক্ষুব্ধ জনমতকে শান্ত ও ইংরেজের অনুকূল করার প্রয়োজনীয়তা এমন আর কখনও অনুভূত হয়নি। ১১ই মার্চ্চ চার্চ্চিল ক্রিপস মিশনের কথা ঘোষণা করলেন।

তবুও এ-কথা মানতেই হবে যে, প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব্ব উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। এ দেশের সংবাদপত্র ও জনসাধারণ ব্রিটিশ ওয়ার ক্যাবিনেটের এই নব প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করলো। এত দিনে সত্য সত্যই ব্রিটেন ভারতীয় সমস্যার সত্যিকার সমাধানে উৎসুক। ক্ষমতা হস্তান্তরে স্বীকৃত।

ভারতে এই অনুকূল মনোভাবের পশ্চাতে ছিল মন্ত্রিসভার ভারপ্রাপ্ত আলোচনাকারী ব্যক্তিটির উপর ভারতবর্ষের আস্থা। স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতবর্ষ বর্ত্তমান শতাব্দীর মুষ্টিমেয় ভারত-হিতৈষী ইংরেজের মধ্যে অন্যতম জ্ঞান করে থাকে। ক্রিপস ইতিপূর্ব্বে দুবার ভারতবর্ষে এসেছেন। কংগ্রেসের নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় প্রত্যক্ষ। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর তিনি এক জন অন্তরঙ্গ সুহৃদ। একাধিক বার ভারতে ইংরেজ শাসনের ত্বরিত সমাপ্তি কামনা করে তিনি লেখনী চালনা করেছেন। বেশী দিনের কথা নয়, য়ুরোপে যুদ্ধ ঘোষণার সাত সপ্তাহ পরে হাউস অব কমন্‌সে দাঁড়িয়ে গভীর প্রত্যয়-ব্যঞ্জক স্বরে বক্তৃতা করেছেন,—"কংগ্রেসের নয়, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অনমনীয় মনোভাবের জন্যই ভারতীয়দের ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতার দাবী আজও অপূর্ণ রয়েছে। সাম্প্রদায়িক কলহের কথাটা একটা ছুতো মাত্র।"

সেই ক্রিপসের আপোষ-আলোচনা নিরর্থক হতে চললো। মতভেদের বর্ত্তমান কারণ দেশরক্ষার প্রশ্ন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবানুসারে দেশরক্ষার ভার থাকবে একান্ত ভাবে প্রধান সেনাপতির হাতে। কংগ্রেসের দাবী দেশরক্ষার দায়িত্ব দেশবাসীর। সে-দায়িত্ব পালনের জন্য জনসাধারণের মধ্যে যে প্রেরণার সৃষ্টি প্রয়োজন তা একমাত্র ভারতীয় দেশরক্ষা সচিবের পক্ষেই সম্ভব, বিদেশী কমাণ্ডার-ইন-চীফের নয়। যুদ্ধ পরিচালনার প্রত্যক্ষ ভার কংগ্রেস প্রধান সেনাপতির উপরে ন্যস্ত করতে রাজী ছিলেন, সে ব্যাপারে তাঁকে সর্ব্বাধিক স্বাধীনতা দানে কংগ্রেসের আপত্তি ছিল না। কিন্তু দেশরক্ষার মূল দায়িত্ব ভারতীয় দেশরক্ষা-সচিবের হাতে না থাকলে স্বাধিকার লাভের অর্থ থাকে না। বিশেষতঃ যুদ্ধের সময়ে দেশের অন্যান্য সমস্যা ও ব্যবস্থা দেশরক্ষার বৃহত্তর প্রশ্নের দ্বারাই বহুলাংশে প্রভাবান্বিত। সত্যিকার দায়িত্ব ও স্বাধীনতা লাভের পরিমাপ দেশরক্ষার নিরবচ্ছিন্ন অধিকারের দ্বারাই নিরূপিত হয়।

এই যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করা ক্রিপসের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। তাই তিনি বিকল্প প্রস্তাব করলেন, প্রধান সেনাপতি যুদ্ধ-সচিবরূপে সমর পরিচালনা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করবেন এবং "দেশরক্ষা-সচিব" আখ্যা নিয়ে আর এক জন জন-প্রতিনিধি দেশরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন।

ভালো কথা। কিন্তু এ-দুজনের কর্ম্ম-বিভাগ হবে কী ভাবে? ক্রিপস-প্রস্তাবিত নব দেশরক্ষা-সচিবের করণীয় কর্ম্মের একটি তালিকা দিলেম। সে তালিকায় আছে—(১) পেট্রোল সরবরাহ, (২) ষ্টেশনারী অর্থাৎ কাগজ, পেন্সিল, নিব, কালী, কলম কেনা ও রাখার ভার, ফর্ম্ম ছাপানো (৩) ক্যাণ্টিন পরিচালনা ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গাম্ভীর্য্য রক্ষা করে এই তালিকাটি পাঠ করা কঠিন। এ দেশের অন্তঃপুরে পানের ভিতরে লঙ্কার কুচি, লুচির মধ্যে স্থাকড়া ও সরবতে চিনির বদলে নুণ মেশানো প্রভৃতি কতকগুলি জামাই-ঠকানো প্রাচীন মেয়েলী কৌতুকের কথা শোনা আছে। কিন্তু চল্লিশ কোটি নরনারীর ভাগ্য নিয়ে দুই দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যেখানে চরম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছে, সেখানে এই পিঁড়ির নীচে সুপুরি বেখে আছাড়-খাওয়ানো রসিকতা নিশ্চয়ই কেউ প্রত্যাশা করে না।

অপরাহ্নে ইম্পীরিয়াল হোটেলে এক সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। বন্ধুটি কংগ্রেসের সমর্থক নন, গান্ধীজীকে তিনি অকেজো স্বপ্নবিলাসী আনপ্র্যাকটিক্যাল আইডিয়েলিষ্ট মনে করেন। ভারতীয় নন, আমেরিকানও নন,—ইংরেজ। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে তিনি বললেন—"ব্রিটেনের কোন্ শত্রু এই তালিকাটি রচনা করে ক্রিপসের হাতে দিয়েছে?" জাপানীদের টাকা খাচ্ছে এমন কোনো ফিফথ্-কলামিষ্ট নয় তো?"

· অসম্ভব নয়।

বন্ধুটি রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। বললেন, "পেট্রোল, ষ্টেশনারী, ক্যাণ্টিন! খ্যাংরা কাঠি, দাঁতের খড়কে নয় কেন? হোয়াই নট্ ক্রসষ্টিকস্ এ্যাণ্ড টুথপিকস্?"

ভারতবর্ষের প্রথম দেশরক্ষা-সচিব হবেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, এই কথা গত এক সপ্তাহ ধরে নানা ভাবে আমরা আলোচনা করেছি। একবার কল্পনা করে দেখা যাক, জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সমগ্র দেশব্যাপী জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে পণ্ডিত নেহরু তাঁর অনবদ্য ভাষায় বেতারে আবেদন করছেন, তার সঙ্গে পড়ে শোনাচ্ছেন কর্ম্মের তালিকা—পেট্রোল, পেন্সিল, নিব, আলপিন···। পৃথিবীতে সব জিনিষেরই নাকি মাত্রা আছে। নেই কি শুধু নির্ব্বুদ্ধিতার? পরিহাসের?

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এই—যুদ্ধের সময় দেশরক্ষার দায়িত্ব ব্রিটেনের। সে দায়িত্ব শুধু ভারতের অগণিত জনসাধারণের প্রতি নয়, সে-দায়িত্ব মিত্র-জাতিসংঘের প্রতি যাঁদের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে ব্রিটেন যুদ্ধ করেছে চক্রশক্তির বিরুদ্ধে। সে দায়িত্ব তারা পরিত্যাগ করতে পারে না।

দেশরক্ষার প্রশ্নটি ভারতবর্ষের পক্ষে নানা দিক্ দিয়ে জটিল। ইংরেজীতে ন্যাশন্যাল আর্ম্মি বললে যা বোঝায় ভারতবর্ষের তেমন কোন সেনাবাহিনী নেই। ভারতের সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছে পেশাদার সিপাহীদল থেকে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এই সিপাহীদের সংগ্রহ করা হতো দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। একের পর এক করে কোম্পানী নগর, প্রদেশ ও রাজ্য দখল করেছে, ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করেছে সিপাহীদল বেতনের আকর্ষণে।

সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে কোম্পানীর হাত থেকে রাজ্যশাসনের ভার নিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া। সেনাবাহিনীও সম্রাজ্ঞীর অধীন হলো। সুরু হলো পরিবর্ত্তন। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে দেশীয় সৈন্যদের সম্পর্কে কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন বোধ করলেন ইংরেজ সামরিক কর্তৃপক্ষ। প্রতি দুটি ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করলেন একটি ব্রিটিশ বাহিনী, যাতে কোনো দিন কোনো কারণে ভারতীয় বাহিনী বিরুদ্ধভাবাপন্ন হলে অবিলম্বে দমন করা চলে তাদের। সিপাহী বিদ্রোহের আগে ছয়টি ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে একটি মাত্র ব্রিটিশ বাহিনী থাকতো। গোলন্দাজ বাহিনীতে একটিও ভারতীয় নেওয়া হয়নি ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত। এই যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত অফিসার র‍্যাঙ্কে ভারতীয় যা ছিল তাদের আঙুলে গোণা যায় এবং যারা ছিল তাদের মধ্যেও কেউ মেজরের উপরে ওঠেনি। সামরিক বয়স-বিবেচনায় আমাদের জাতি বুঝি বা মেজরিটিপ্রাপ্ত হয়নি।

কিন্তু সবচেয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হলো সৈন্যদলের লোক নির্ব্বাচনে। 'সামরিক' ও 'অসামরিক জাতি' এই কৃত্রিম শ্রেণী বিভাগের দ্বারা ভারতীয় বাহিনী থেকে পঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রায় সকল প্রদেশের লোককে সযত্নে দূরে রাখা হয়েছে। অথচ ইতিহাসে যাঁদের কিছুমাত্র দখল আছে তাঁরাই জানেন, ভারতে ইংরেজের রাজ্য-বিস্তারের এক প্রধান অংশ সম্ভব হয়েছিল বর্ত্তমানে অসামরিক জাতি বলে উপেক্ষিত বাংলা ও মাদ্রাজের সিপাহী সান্ত্রীদেরই বাহুবলে। বর্ত্তমানে অত্যন্ত সহজবোধ্য কারণে যে-সকল ইংরেজ মুসলমানদের সামরিক কৃতিত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল এবং ইংরেজের অবর্ত্তমানে ভারতে সিভিল ওয়ার ঘটলে হিন্দুদের অসহায়ত্ব নিয়ে যাঁরা প্রায় অশ্রুবর্ষণ করেন, সেই ভারত-বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, ইংরেজের রাজ্য-বিস্তারের কালে যারা শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি বলে স্বীকৃত ছিল এবং যাদের কাছে ইংরেজ সর্ব্বাধিক প্রতিরোধ পেয়েছেন, তারা মারাঠা ও শিখ। এদের প্রথমটির ধর্ম্মমত হিন্দু, দ্বিতীয়টিরও হিন্দু ধর্ম্মেরই সংস্কারোত্তর রূপ। একটিও মুসলমান নয়।

পঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের প্রতি সেনাবিভাগের এই পক্ষপাতের কারণ কী? কেউ কেউ বলেন, উত্তর-ভারতের লোকেরা সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে ও দৈহিক গঠনে দক্ষিণ ও পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসীদের চাইতে উন্নত। কিন্তু সেটাই 'সামরিক জাতি' বলে অভিহিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাহোলে গুর্খাদের কখনোই খাকি পরতে হোত না। বিশেষ করে সৈন্যদের কৃতিত্ব যে-যুগে তাদের দৈহিক সামর্থ্যের উপরেই নির্ভর করতো আগ্নেয় অস্ত্র উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গেই তার সমাপ্তি ঘটেছে।

কোনো বিশেষ অঞ্চল থেকে সৈন্য সংগ্রহের সুবিধা এই যে, তার ফলে একটা নতুন জাতিপ্রথা সৃষ্টি করা চলে। সামরিক বৃত্তিও অনেকাংশে পারিবারিক হয়ে দাঁড়ায়। পুরুষানুক্রমে পিতামহ থেকে পিতা এবং পিতা থেকে পুত্রে সেই বৃত্তি প্রসারিত হয় এবং একই বাহিনীতে বংশপরম্পরা চাকুরীর দ্বারা বাহিনীর প্রতি একটা কায়েমী স্বার্থ-বোধ জাগে। নিজেকে তারা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত অংশ বলে জ্ঞান করে, ঠিক যেমন করে কলকাতার বড় বড় বিলাতী

কোম্পানীগুলির ক্যাশিয়ার, বড়বাবু বা বেনিয়ানরা। বিদেশী শাসকের পক্ষে শাসনযন্ত্রের প্রতি শাসিতদের এই মমত্ববোধ সৃষ্টির সার্থকতা সামান্য নয়।

তার চাইতেও বড় কারণ আছে। সে-কারণ রাজনৈতিক। স্বীকার করতেই হবে যে কিছু কাল পূর্ব্বেও ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত ছিল রাজনৈতিক চেতনাহীন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় পঞ্জাব ছিল একমাত্র প্রদেশ যেখানে ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশীয় জনগণ অস্ত্র ধরেনি। আধুনিক কালেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পঞ্জাবে জাতীয় জাগরণের চিহ্ন অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। গদর দল ও কোগাটামারুকে নিয়ে যাঁরা পঞ্জাবের দেশপ্রাণতার দৃষ্টান্ত তালিকা রচনা করেন, তাঁদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সে-পঞ্জাবীরা বিদেশে গিয়েই দেশাত্মবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, দেশে থাকতে নয়। সাধারণ পঞ্জাবী স্বচ্ছল জীবনযাত্রা, মোটা মাইনে, অজস্র আহার ও দামী পোষাক পেলেই খুশী থাকে, দেশ নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় না। ভগৎ সিং নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম।

ভারতীয় সেনা বিভাগে বাঙ্গালীরাই সবচেয়ে বেশী অবাঞ্ছিত। আর্ম্মি মনুসংহিতায় তারা হরিজন। আশ্চর্য্য নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশ থেকে সুরু করে তারাই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিবাদ করেছে অবিরত, সংগ্রাম করে আসছে অমিততেজে। ভারতের আধুনিক জাতীয় জাগরণের প্রথম উন্মেষ ঘটেছে এইখানে। জাতীয় যজ্ঞে এখানে মায়েরা আহুতি দিয়েছে পুত্র, মেয়েরা দিয়েছে প্রেরণা, ছেলেরা দিয়েছে প্রাণ। এদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করতে কার্জ্জন করেছে বঙ্গ-ভঙ্গ, হার্ডিঞ্জ স্থানান্তরিত করেছে রাজধানী, ম্যাকডোনল্ড কায়েম করেছে কমিউন্যাল এওয়ার্ড। সর্ব্বনাশ! এদের সেনাদলে নিলে রক্ষে আছে? এইখানে স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম লক্ষণও প্রকাশ পেয়েছিল বাংলাদেশেরই এক ছাউনিতে। ব্যারাকপুরে।

'সামরিক জাতির' প্রতি পক্ষপাত ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে সহায়ক হয়েছে সন্দেহ নেই। অভাব-অভিযোগের ফলে পাছে তাদের ব্রিটিশ অনুরক্তি হ্রাস পায় সেজন্য ব্রিটিশ শাসকেরা এই সামরিক জাতির পার্থিব কল্যাণ-সাধনে অনেকটা তৎপর হয়েছেন, সে-কথাও সত্য। সেনা বিভাগের বেতনের হার ও পেনসন্ সাধারণ দরিদ্র গ্রামবাসীর পক্ষে যথেষ্ট লোভনীয়। তা ছাড়া বার্দ্ধক্যে অবসর গ্রহণকালে অনেকে জায়গীরও পেয়ে এসেছে।

পঞ্জাব সেনা বিভাগের সৈন্য ও অশ্ব জোগায়, তাই পঞ্জাব সর্ব্বদাই কর্ত্তৃপক্ষের অধিকতর সস্নেহ মনোযোগ লাভ করে এসেছে। কৃষির উন্নতি, স্বাস্থ্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পঞ্জাবে হয়েছে বেশী। সমবায় আন্দোলন ও কৃষিবিদ্যার গবেষণা সুরু হয়েছে সেখানে এবং ভারতে ব্রিটিশ যুগের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও ব্যয়বহুল কৃত্রিম সেচকার্য্যের নিদর্শন আছে পঞ্জাবে ও সিন্ধুপ্রদেশে। সেখানে বেশীর ভাগ চাষীরই ক্ষেত্রে ধান, গোয়ালে গরু এবং ঘরে আর্ম্মির মেডেল আছে। সেখানে সাহেবকে বলে হুজুর, দারোগাকে বলে ধর্ম্মাবতার, গভর্ণমেণ্টকে বলে সরকার বাহাদুর। সেখানে স্বরাজের গরজ থাকবে কার?

কিন্তু বন্যা যখন আসে, তখন তাকে বালির বাঁধ দিয়ে ঠেকানো যায় ক'দিন? সমুদ্র যদি ক্যানুটের আদেশ মেনেই চলতো তবে আর ভাবনা ছিল কী? সমস্ত প্রতিষেধক ও সাবধানতা ব্যর্থ করে দেশাত্মবোধের ধারা এসেছে ধীরে ধীরে; ভারতবর্ষের পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—কোথাও কোন প্রান্তে তার আর বাধা রইল না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে খান আব্দুল গফুর খান এই ভাব-গঙ্গার ভগীরথ।

এই বহু-অনুগৃহীত অঞ্চলের রাজনীতির সম্পর্ক-বর্জ্জিত সরল অধিবাসীদেরও তাদের স্বদেশ এবং স্বজাতির বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার এখন আর আগের মতো নিরাপদ নয়। বোধ হয় অনেকেই জানেন না যে, ১৯৩০ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কালে একদল হিন্দু গাড়োয়াল সৈন্য পেশোয়ার মুশলিম স্বেচ্ছাসেবকদের উপর গুলীবর্ষণে অস্বীকৃত হয়ে অস্ত্র পরিত্যাগ করেছিল। সে সংবাদ এদেশের খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়নি। অর্থাৎ প্রকাশিত হতে দেওয়া হয়নি।

তবুও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে বিপ্লব বা রাজনৈতিক আন্দোলন দমনের জন্য এই সামরিক জাতি থেকে নিযুক্ত সৈন্যদলের উপরে নির্ভর করতে পারবে ইংরেজ। সম্প্রদায়ের দিক্ দিয়ে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত এই সেনাদলের শতকরা ৩৫ ভাগ ছিল মুসলমান, ২৩ ভাগ শিখ ও ৪২ ভাগ হিন্দু। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এ হিসাব থেকেও হিন্দুদের বিরুদ্ধে বহু-প্রচারিত সামরিক অযোগ্যতার অপবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

খুব সামান্য হলেও ভারতবর্ষের সামরিক নীতির প্রথম পরিবর্ত্তন ঘটে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পর। একান্ত ভাবে য়ুরোপীয় অফিসার পরিচালিত বাহিনীর সামান্য অংশ তখন ভারতীয়করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভারতীয়েরা সেনা বিভাগে 'কিংস কমিশন' প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হয় এবং ভারতীয় সেনানায়কদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে দেরাদূনে ভারতীয় 'স্যাণ্ডহার্ষ্ট'এর প্রতিষ্ঠা ঘটে।

বর্ত্তমান যুদ্ধে এই ভারতীয়করণ দ্রুত হয়েছে। বলা বাহুল্য, ভারতীয়দের প্রতি মমত্ববোধে নয়, ইংরেজের নিজ প্রয়োজনের তাগিদে। অসামরিক জাতি বলে সেনা বিভাগে ইতিপূর্ব্বে যাদের প্রবেশের সম্ভাবনা মাত্র ছিল না, তারাও এখন অফিসার হতে পারে। অবশ্য এই বাধা অপসারণের ফলে সেনা বিভাগে বাঙ্গালীর সংখ্যা এখনও খুব উল্লেখযোগ্য বলে আমার বিশ্বাস নেই, যদিও বিমানবহরে তাদের সংখ্যা তেমন হতাশাজনক নয়। সুদক্ষ বৈমানিকরূপে কয়েক জন বাঙ্গালী তরুণ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট খ্যাতিও অর্জ্জন করেছেন।

এত কাল ভারতবর্ষে দেশরক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, কমাণ্ডার-ইন-চীফের সবগুলি কামানের মুখ ছিল আফ্রিদিদের দিকে। একচক্ষু হরিণের মতো পার্ল হারবার বিধ্বস্ত হওয়ার পরে সেনাপতিরা প্রথম হৃদয়ঙ্গম করলেন, বিপদ ঠিক সে-দিক্ থেকেই উপস্থিত যে-দিকে তার সম্ভাবনা তাঁরা কল্পনাও করেননি। যুদ্ধশাস্ত্র মতে জাপানের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম প্রতিরোধ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন নৌবহর। তা নেই। জলপথ সবটাই শত্রুর দখলে। ব্রিটিশ ও ভারতীয় যে পেশাদার সেনা বাহিনী ভারতে বর্ত্তমান, তা আধুনিক যুদ্ধযন্ত্রে পুরাপুরি সজ্জিত নয় এবং তাদের ঘাঁটিগুলি সম্ভাবিত রণক্ষেত্র থেকে বহু শত যোজন দূরে, দেশের অপর প্রান্তে।

এই আসন্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার উপায় কী? এ প্রশ্ন সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের মনে উদিত হয়েছে কি না জানার উপায় নেই। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রহীন যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞতাশূন্য জনসাধারণের মনে এ-জিজ্ঞাসা জেগেছে। অবশেষে এক জন এই প্রশ্নের উত্তর নির্দ্দেশ করলেন। তাঁর নাম পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু।

পঞ্চাশ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহের এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করলেন পণ্ডিত নেহরু। কাশ্মীরী পণ্ডিতের বংশধর তিনি। তাঁর ঊর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষ রাজ-কাউল ছিলেন প্রখ্যাতনামা ফার্সি ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, প্রপিতামহ লক্ষ্মীনারায়ণ নেহরু ছিলেন মোগল দরবারে ব্যবহারজীবী। ব্যারিষ্টার জনকের সন্তান জওহরলাল নিজেও মসীজীবিরূপেই জীবন সুরু করেছিলেন। দেশরক্ষার আয়োজনে তিনিই সর্ব্বপ্রথম পরিকল্পনা করলেন সর্ব্বসাধারণের অসি-চালনার। জনগণের কথা যিনি ভাবেন তাঁকেই তো আমরা বলি জনগণ-মন-অধিনায়ক।

অস্ত্র? চাই বৈ কি। অবশ্যই চাই। পঞ্চাশ লক্ষ সৈন্যের অস্ত্র জোগাতে দেশে নতুন কলকারখানা স্থাপন ও পুরাতন কলকারখানার বিস্তার প্রয়োজন। সেটা সময়সাপেক্ষ। শত্রু তো তার জন্যে অপেক্ষা করবে না। পণ্ডিতজী অত্যন্ত নিকটে থেকে গভীর ভাবে অনুধাবনের সুযোগ পেয়েছিলেন স্পেন ও চীনের গণবাহিনীর যুদ্ধ-সজ্জা ও যুদ্ধ-নীতি। স্পেনে চাষী-মজুরদের সমিতি থেকেই গড়ে উঠেছিল সেনা-বাহিনী, সেখান থেকেই উদ্ভব হয়েছে একাধিক সেনাপতির যাঁরা প্রথম জীবনে কেউ চালিয়েছে লাঙ্গল, কেউ বুনেছে তাঁত। চীন থেকে যুদ্ধবিদ্যা শেখাবার লোক আনবার প্ল্যান করলেন জওহরলাল।

গতিশীলতাই এই বাহিনীর সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা। রাইফলের অভাবে হাতবোমা দিয়ে এর কাজ চলে। সর্ব্বত্র এদের সহযোগিতার জন্য গ্রামবাসীরা ব্যগ্র। ক্ষুধায় অন্ন এবং বিপদে আশ্রয় জোগাতো তারা। দেশপ্রাণতার প্রেরণায় এই বাহিনীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকতো। ইউরোপীয়ান পরিচালনায় বেতনভুক্ সৈন্যদলের মতো তারা আদেশ পালনের যন্ত্রমাত্র হতো না। জনশ্রুতি এই যে, কোন কোন ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষও এই পরিকল্পনা শ্রদ্ধার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন এবং বিলাত থেকে মেজর টম উইনট্রিংহাম ভারতবর্ষে এসে এই সৈন্য বাহিনীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করবেন এমন প্রস্তাবও শোনা গেছে। উইনট্রিংহাম স্পেনে ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে গণতান্ত্রিক দলের সেনা বাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত নেহরুর পরিকল্পনা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রীতির চক্ষে দেখবেন এ-আশা যাঁরা করেছিলেন তাঁরা আর যাই হোন মানব-চরিত্র সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞ নন। তাঁদের জানা উচিত ছিল, ব্রিটিশ প্রস্তাবে সৈন্য সামন্ত বা অস্ত্রশস্ত্রের কথা থাকে না। থাকে পেট্রোল, ষ্টেশনারী ও ক্যাণ্টিন। রুল ব্রিটানিয়া, রুল দি শ্লেভস্!

'ইম্পিরিয়্যাল' থেকে ফিরছি স্বস্থানে। গেটের বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখি হঠাৎ ব্রেক কশে সশব্দে একটি গাড়ী দাঁড়ালো একেবারে ঠিক সামনে। গাড়ীর ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে আরোহীটি বললেন, "তাই তো, আমাদের বোচ্কা যে। এখানে কী করছিস? আয় উঠে আয়।"

'বোচ্কা' আমার পিতৃদত্ত বা মাতৃদত্ত নাম নয়, পারিবারিক সম্বোধনও নয়। কিশোর বয়সে সহপাঠীদের দ্বারা আবিষ্কৃত উত্যক্ত করার একটি উপকরণমাত্র। লাটিমের অধিকার, আমসত্ত্বের অংশ ও লজঞ্চুষের বণ্টন নিয়ে মতভেদজনিত কলহের পরিণামে বিক্ষুব্ধ পক্ষ ঐ শব্দটির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা আমার উপরে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করতো এবং বহুল পরিমাণে সফলকামও হতো। মনে আছে, অনেক দিন খেলার মাঠে বা ক্লাশে ঐ নামটা শুনে ক্রোধে ও অপমানে প্রচুর অশ্রুপাত করেছি।

নামটা একেবারে আকস্মিক নয়, তার পশ্চাতে কিঞ্চিৎ ইতিহাস আছে। প্রথম যে-দিন বৃন্দাবন পণ্ডিতের পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ সে-দিন দিদিমা একখানা শান্তিপুরী জড়ী ধুতি ও সিল্কের জামা পরিয়ে দিয়েছিলেন। পোষাকটা গুরুগৃহগামী ব্রহ্মচারী বিদ্যার্থীর চাইতে সদ্য বিবাহান্তে শ্বশুরালয়ে আগত জামাতা বাবাজীর পক্ষেই অধিকতর উপযোগী ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু বিপদ্ দেখা দিল বস্ত্রটি নিয়েই। প্রথমতঃ তার অবস্থান যথাস্থানে রাখা রীতিমত আয়াসসাধ্য ব্যাপার, তার উপরে সযত্নে কুঞ্চিত লম্বমান কোঁচার প্রান্তভাগ অমোঘ মাধ্যাকর্ষণে কেবলই নিম্নাভিমুখী হয়ে ভূমিতে লুণ্ঠিত হয়। এক হাতে শ্লেট ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়', অপর হাতে ধৃত শিথিল-বন্ধন বসনের প্রান্ত। কোন রকমে তালপাকানো অগ্রভাগ, দেখতে পোটলা-আকৃতি। গোঁসাইদের বাড়ীর সিধু ছিল পাঠশালার সর্ব্বাপেক্ষা বখা ছেলে। বয়সে আর ছাত্রদের চাইতে অনেক বড়, লেখাপড়ায় বৃহস্পতি। বার-দুই ধরে এক ক্লাশেই আছে। এরই মধ্যে বিড়ি ধরেছে। কাছে এসে অত্যন্ত নিরীহের মতো প্রশ্ন করলো:

"হাতে বোচ্কাটি কিসের বাপু, মুড়কির না বাতাসার?"

ক্লাশ শুদ্ধ সবাই হেসে উঠলো। সেই থেকেই সুরু হলো 'বোচ্কা'। খাতা নিয়ে পেন্সিল নিয়ে ঝগড়া হলেই বলে, বোচ্কা! সিধুকে কত সাধ্য-সাধনা করেছি। এন্তার মার্কেল, রাশি রাশি জলছবি ঘুষ দিয়েছি। যেমন আজকাল গভর্ণমেণ্ট গরম-গরম কাগজকে subsidy দিতে চেষ্টা করে বলে শুনেছি। আর যেন কোন দিন না বলে। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে জিনিষগুলি পকেটে পূরে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে,—

"ক্ষেপেছিস্? আর বলি কখনও বোচ্কা? তোর ঐ লাল পেন্সিলটা কিন্তু আমাকে দিতে হবে।"

কিশোর বালকের পক্ষে সে-দিন ঐ লাল পেন্সিলটা দান করা কর্ণের কবচ-কুণ্ডল দানের চাইতে কোন অংশে কম কঠিন ছিল না। কিন্তু তাতেও স্বীকৃত হয়েছি। অত্যন্ত অনুনয় করে বলেছি, "দেখো ভাই, অন্য ছেলেরাও যেন আর না বলে, বারণ করে দিও।"

সিধু পেন্সিলটার ডগায় জিভের লালা লাগিয়ে কাগজে মোটা মোটা অক্ষরে নিজের নাম লিখতে লিখতে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মন্তব্য করলো, "হুঃ, বলুক দেখি সাহস আছে কোন্ শা······?"

সিধুর বিবাহের নিকট বা সুদূর কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু তার সম্ভবপর পত্নীর কাল্পনিক সহোদরের উল্লেখ না করে একটি বাক্যও সমাপ্ত বা আরম্ভ করা তার পক্ষে কঠিন। ঐ বয়সেই ভাষায় তার এমন সব শব্দ-সম্ভার যা এ-বয়সেও উচ্চারণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু প্রতিশ্রুতি দান ও তা পালনের মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধন নিয়ে সিধুর কোন মাথা ব্যথা ছিল না। এ বিষয়ে তার রেকর্ড প্রায় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সমতুল্য। পরের দিনই ক্লাশে পণ্ডিত মশায়ের উপস্থিতি সত্ত্বেও পিছনের বেঞ্চি থেকে পরিচিত কণ্ঠের চাপা স্বরে আওয়াজ এলো, "বো···।" অমনি চার দিক্ থেকে অন্য ছাত্রেরা শ্লেটের আড়ালে মুখ লুকিয়ে হাসি চাপতে চেষ্টা করলো—হিঃ হিঃ হুঃ হুঃ, ফিক্।

কাছে এসে দেখি সিধুই বটে। যদিও চেনা খুব সহজ নয়।

পরনে লাইট গ্রে রং-এর সার্কস্কিনের মহার্ঘ্য স্যুট; পায়ে দামী বিলাতী জুতা যার চকমক্ করা পালিশে প্রায় মুখ দেখা যায়। দুই হাতে গোটা-চারেক আংটি, পকেটে পার্কার ফিফ্‌টি—টু কলম ও পেন্সিলের সেট, যা একমাত্র আমেরিকান সেনানায়কদের কাছে ছাড়া এদেশে এখনও আর কেউ দেখেনি বললেই হয়। এই কি সেই সিধু যে পাঁচ-বছর আগে পটলডাঙ্গার পাইস হোটেলের নীচের তলায় এক টাকা বারো আনা ভাড়ায় আর ৬ জন লোকের সঙ্গে একটা অন্ধকার কুঠ্‌রীতে থাকতো? কোন্ তেলের কলের বিল্-কালেক্টর ছিল। মাইনে আঠারো টাকা। চিবুকের নীচে কালো বড় আঁচিলটা না থাকলে সিধু বলে বিশ্বাস করাই কঠিন হতো।

"তুই এখানে কেন? বিলাত থেকে ফিরলি কবে? বিয়ে-থা করেছিস তো?" একসঙ্গে তিনটা প্রশ্ন করলো সিধু।

"সে-সব পরে হবে, এখন তোমার খবর কী বল দেখি।"

"আমার খবর ভালো। মিলিটারী কণ্ট্রাক্ট করছি। হাতে দু'পয়সা আসছে রে।" সে কথা বিশেষ করে বলার প্রয়োজন ছিল না। সিধুর সত্যভাষণেরও এই বোধ হয় প্রথম নিদর্শন।

তার কাহিনী যা শোনা গেল সংক্ষেপে তা এই: তেলের কলের সেই চাকরী ছেড়ে সে অনেক কিছু করেছে। সাবানের ক্যানভাসারি, এক টাকার ইনসিওরেন্সের দালালী, মায় কাগজের প্যাকেটে চানাচুর বিক্রী পর্য্যন্ত। কোনটাতেই কিছু হয় না। মাসের মধ্যে দু'মুঠো ভাত জোটে না অনেক দিন, এমন অবস্থা। হঠাৎ বাধলো যুদ্ধ। এরোড্রোম তৈরী করে, এমনি এক কণ্ট্রাক্টরের মধ্যে কুলীর তদারকের কাজ নিয়ে চলে গেল আসামের কোন্ জঙ্গলে। সেখানেই কপাল ফিরল। কিছু হাতে নিয়ে এসে বসলো কলকাতায়, জঙ্গল থেকে **civilisation of the jungle**এর পীঠস্থান। প্রথমে ছোটখাটো জিনিষ সাপ্লাই, পরে বড় বড় কণ্ট্রাক্ট। এখন দিল্লীতে এসেছে ডিপার্টমেন্টের কোন এক বড় সাহেবকে ধরতে।

পুরানো দিল্লীর সুইস হোটেলে তার আস্তানা। সেখানে এসে গাড়ী থেকে নেমে নিয়ে গেল তার ঘরে। জিজ্ঞাসা করল, "থাকিস কোথায়? কুইনসওয়ে? আচ্ছা গাড়ী তোকে নামিয়ে দেবে সেখানে। এই দেখো, ড্রাইভার, আভি ঠাহারো। এ সাবকো কুইনসওয়ে ছোড়নে পড়েগি।" কুলির তদারক করে হিন্দীটা রপ্ত করেছে সিধু মন্দ নয়।

বাধা দিয়ে বললাম, "না, না, আমার জন্য ভাবনা নেই। আমি বাস্ নেবো এখান থেকে।"

"ক্ষ্যাপা নাকি? বাস্, যা ঝাঁকুনি আর যা ভীড়! ভদ্রলোকের ওঠা দায়। গাড়ী থাকতে সে দুর্ভোগ কেন? ভাড়া তো ওকে পূরা দিনের জন্যই দিচ্ছি।"

এতক্ষণে বুঝলাম, গাড়ীটা ট্যাক্সি এবং সমস্ত দিনের জন্যই ভাড়া করা হয়েছে। নয়া দিল্লীর ট্যাক্সিতে মিটার নেই, তার নম্বরও T দিয়ে আরম্ভ হয় না। না জানলে বুঝবার সাধ্য নেই যে ভাড়ার গাড়ী। কিন্তু বিস্ময়ের অন্ত পাইনে। ঝাঁকুনি আর ভীড়ের জন্য সিধুর ন্যায় ভদ্রব্যক্তির বাসে ওঠা দায়! মনে আছে, পটলডাঙ্গা থেকে দুপুর রোদে পায়ে হেঁটে এক দিন টালীগঞ্জে দেখা করতে এসেছিল এই সিধু। সে খুব বেশী দিনেরও কথা নয়।

বয়কে হুইস্কি হুকুম করলো সিধু। নিষেধ করলেম। হেসে বললে, "ভাবছিস বুঝি 'সোলান' কিম্বা "মারি"? ও-সব দেশী মাল ছোঁবে এমন শর্ম্মা নয় সিধুচন্দ্র। চেখেই দেখ্ না। খাশ স্কচ্। খাশা। বাবা, খাবো তো খাঁটি জিনিষ খাবো, নয়তো নয়।"

"সে জন্তে নয়। কিন্তু স্কচ পাও কোথায়, বাজারে তো শুনছি···।"

"হ্যাঁ, সাদা বাজারে নেই, কিন্তু কালো বাজারে অভাব কী? ভাই রে, সবই টাকার মাম্‌লা। ঝন্‌ঝনে টাকা ফ্যালো, জিনিষ দেবে না কোন্ শা—।"

স্বচক্ষে দেখলাম কথায় এবং কাজে তফাৎ করে না সিধু। তিন বোতল সোড়া কিনে এনে একটা পাঁচ টাকার নোটের অবশিষ্ট ফেরৎ দিচ্ছিল বেয়ারা। "ঠিক হ্যায়, লে লাও" বলে অত্যন্ত নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে সমস্তটাই বকশিষ করলো তাকে। লোকটা প্রায় আভূমিপ্রণত সেলাম করে প্রস্থান করলো।

সিধু তার বর্ত্তমান দিল্লী আগমনের কারণ ব্যক্ত করলো। কলকাতায় ছোট সায়েব না কি তার নামে লাগিয়েছে অনেক কিছু। এখান থেকে তার ফ্যাক্টরী দেখতে যাবে কোন এক জন অফিসার। তাই একটু ভাবনায় ফেলেছে।

ভাবনাটা কিসের ঠিক বুঝতে পারলেম না। "দেখে আসুক না ফ্যাক্টরী। ক্ষতিটা কিসের?"

"আরে ফ্যাক্টরী থাকলে তো দেখবে? ফ্যাক্টরীই নেই যে।"

"ফ্যাক্টরী নেই, তবে মাল জোগাচ্ছ কেমন করে?"

"তুই এখনও সেই বোচ্‌কাই আছিস্। বিলাত ঘুরেও বুদ্ধি খুললো না এতটুকু! আরে মাল যোগাবার জন্যে ফ্যাক্টরী থাকার দরকার কী? অন্য লোকের ফ্যাক্টরী নেই? সেখান থেকে তৈরী করিয়ে নিজের লেবেলে চালাতে আটকাবে কোন্ শা—? ছাপাখানার কিছুটা খরচ আছে। খানকয়েক চালান ফরম, লেটার হেড, রবার ষ্ট্যাম্প, ব্যস্। অর্ডার কি ফ্যাক্টরী দেখে হয়, অর্ডার তো হয়" বলে মুখে-চোখে এমন একটা ইঙ্গিত করল যে তার অর্থ কিছুটা স্পষ্ট ও কিছুটা ঝাপসা হয়ে আমার কাছে একটা প্রহেলিকার সৃষ্টি হলো। জিজ্ঞাসা করলেম—

"মাল জোগাচ্ছ এত দিন, এর মধ্যে তোমার ফ্যাক্টরী আছে কি নেই সে-খোঁজ হয়নি?"

"হবে না কেন? তিন-চার বার ইনসপেকশন হয়ে ভালো রিপোর্ট চলে গেছে। এবারও কি যেতো না? শা—ছোট সায়েব ব্যাটার খাই বেড়েছে এত যে আর মেটাতে পারছিনে। তাই না এ-ঝামেলা। যাক্ পরোয়া করিনে। জানতে পারবো সবই।"

"কেমন করে?"

"কেন, আপিসের কেরাণীরাই খবর দেবে। দেবে না? আরে ভাই দেবে কি আর অমনি? সংসারে বিনে পয়সায় পরহিতার্থে আর কাজ করে কোন শা—? আশী টাকার কেরাণী, একসঙ্গে পাঁচশ' টাকা দেখেছে এর আগে? খবর তো খবর, দরকার হলে ফাইলকে ফাইল গাপ্ করিয়ে দেওয়ার দাওয়াই পর্য্যন্ত জানি। এই যে মধু বাবু, আসুন, আসুন। কী খবর আচ্ছা এক মিনিট বোস্ ভাই, এঁর সঙ্গে একটু প্রাইভেট,—চলুন মধু বাবু বারান্দায়।" সদ্য-আগত আগন্তুককে নিয়ে বাইরে গেল সিধু।

প্রায় মিনিট কুড়ি পরে ফিরে এসে বলল, "মোটা হাতে কিছু চালতে হবে দেখছি। যাক, পরে পুষিয়ে নেবো।"

বিস্মিত হওয়ার পালা শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগেই। শুধু

জিজ্ঞাসা করলেম, "আচ্ছা এ-সব কি শেষ পর্য্যন্ত চাপা থাকে? ডিপার্টমেন্টের অন্য লোকেরা কি জানতে পারে না?"

"কেমন করে জানবে? এই যে এসেছিলেন ভদ্রলোক, খবর দিয়ে গেলেন কোন্ সায়েব যাচ্ছে এখান থেকে তদন্ত করতে, কবে যাচ্ছে ইত্যাদি। আপিসে যখন যাবো তখন উনি কি আমার সঙ্গে কথা কইবেন নাকি? এমন ভাব দেখাবেন যে, জীবনে এর আগে কখনও আমাকে চোখেও দেখেননি। ব্যস্ তা'হলেই হলো। সব কাজেরই সিষ্টেম আছে তো।"

এক জন বেয়ারা গোটা-দুই বিরাট প্যাকেট নিয়ে এসে বললো, "ফেসপস্ কোম্পানী পাঠিয়েছে।"

সিধু বললে, "ঠিক হ্যায়। কাল দোকানে সওদা করেছি কিছু। তাই পাঠিয়েছে। দেখ্ তো জিনিষগুলি। তোরা মডার্ণ টেষ্টের লোক, আপ-টু-ডেট ফ্যাশানের খবর রাখিস। হ্যাঁ সার্ট। এক ডজন। হ্যাঁ, ছাব্বিশ টাকা পনের আনা করে। ওদের সেই পনের আনার কায়দা জানিস্ তো, পুরো সাতাশ টাকা লিখবে না কিছুতেই। রুমাল হ্যাঁ, পিরামিড। ডজন সত্তর টাকা। পাওয়া যে যাচ্ছে এই ঢের, সত্তর হলেই কি, আশী হলেই কি? এটাকে কী বলে রে? দেখছি, আজ-কাল আমেরিকান সায়েবরা পরে খুব। ডার্কিন? ডার্কিন নয়? তবে কী জার্কিন? বর্গীয় জ-এয়ে আকার তো? দোকানে তো আর জিনিষের নাম জিজ্ঞাসা করতে পারিনে! ভাববে কী? কিন্‌লেম তো, কখন পরবো সে পরে দেখা যাবে। দাম বেশী নয়। দুশো আশী টাকা। চামড়াটা ভালো কোয়ালিটির।"

বিল দেখলাম। আরও খুঁটি-নাটি অনেক কিছু মিলিয়ে সাতশ' টাকার উপরে। সাহেব তার ওয়ালেট খুলে দু'খানা পাঁচশ' টাকার নোট বেয়ারার হাতে দিলেন দাম চুকিয়ে দিতে।

চুপ করে স্মরণ করতে চেষ্টা করলেম, এর আগে ঠিক কখন সিধুর গায়ে তালিহীন জামা দেখেছি।

প্রচুর আদর আপ্যায়ন করল সিধু। বাল্যবন্ধুর প্রতি তার এই সহৃদয়তা দেখে মুগ্ধ হওয়া উচিত। তার চাল-চলন দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, আমাকে দশ বছর মাইনে করা কর্ম্মচারী করে রাখার মতো অর্থ আছে তার ব্যাঙ্কে। কিন্তু কর্ম্মচারীর বদলে অংশীদার করতে চাইল। বললে, "আরে ব্যারিষ্টার হবি, যখন হবি। এখন খবরের কাগজে রিপোর্ট লিখে আর ক'টাকা আসবে? তার চেয়ে আমার সঙ্গে জুটে যা, নেহাৎ মন্দ হবে না। আমারও সুবিধে হবে, চিঠিপত্র লেখা, সায়েব-সুবোর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা তো আমার তেমন আসে না।"

হেসে বললেম, "তার দরকার কী? তোমার হয়ে টাকা কথা কইবে। তুমি যা বলছো তাতে কন্ট্রাক্ট পেতে ও-সবের যে কিছু দরকার আছে তা তো মনে হয় না।"

"নেহাৎ মিথ্যে বলিসনি। যে-পূজার যে-বিধি তা না হলে কিছুই হয় না। তবে হ্যাঁ, ইংরেজী বলতে কইতে পারে, লিখতে পারে এমন লোক থাকলে আরও সুবিধে। তোকে পেলে আমি এখন যা পাচ্ছি তার ডবল আয় করতে পারি। বলেছিলাম নিত্যানন্দকে। মনে নেই তাকে? সেই যে পুরুত-ঠাকুরের ছেলে নিতাই রে। পাঠশালায় এক দিন তার পৈতে ছিঁড়ে দিয়েছিলেম। আর কথা কইতে পারে না। কেবলই হাত দিয়ে ইসারা করে জবাব দেয়। শেষে পণ্ডিত মশায়ের কাছ থেকে পৈতে ধার করে কথা বলল। নালিশের ফলে শাস্তি পেলাম দু'ঘণ্টা দুই কানে ধরে বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে থাকা। সেই নিত্যানন্দ এখন ডেপুটি হয়েছে। মাঝে ক'দিন সাপ্লাইয় কাজে ছিল। রাস্তা বাৎলে দিলেম, কী করলে দু'পয়সা হবে। বলে কিনা, সিধু, ছেলেবেলায় ইস্কুলে অনেক অকাজ কুকাজ করেছিস, বড় হয়ে এখন আর করিসনে। শোন কথা একবার! টাকা উপায় করতে আমি করছি ঠিকাদারী, তুই করছিস চাকরী। যাতে দু'পয়সা উপরি আসে তার চেষ্টা করবো, তাতে কুকাজটা কোন্‌খানে? হরিনাম জপতে তুইও বসিসনি, আমিও বসিনি।"

যাক, তবুও ভালো। সংসারে তাহলে দু'-একটা লোক এখনও আছে যারা ব্যাঙ্কের পাশ-বইর উপরে দৃষ্টি রাখাটাই জীবনের চরম মোক্ষ মনে করে না।

সিধু বলল, "হ্যাঁ, লাভটা কী হচ্ছে? ওর সঙ্গে কাজ করতো আর এক অফিসার। সে লেক্ রোডে বাড়ী কিনেছে দু'খানা, গাড়ী কিনেছে। তার বউএর গায়ে হীরের গয়না। আর আমাদের নিত্যানন্দ রামকৃষ্ণ পরমহংস হয়ে বসে আছেন। ট্রামে বাদুড়-ঝোলা হয়ে আপিসে আসেন, চাদনীর সুট পরেন। আহাম্মক এক নম্বর।"

তাতে আর সন্দেহ কী!

জিজ্ঞাসা করলেম, "আচ্ছা ভাই যুদ্ধের বাজারে অনেষ্টি বলে কি কোথাও কিছু আর অবশিষ্ট নেই?"

"অনেষ্টি? তার মানে সততা? সে অনেষ্টির অন্ত্যেষ্টি হয়েছে। ভায়া হে, ও-সব ভালো ভালো কথা যা আমরা ছেলেবেলায় কপিবুকে লিখেছি—না, লিখেছি বলতে পারিনে; আমি তো লেখাপড়ার ধার ধারতেম না, কেবল মাষ্টারের বেতই খেয়েছি—তোরা লিখেছিস। সে-সব ঐ ছাপার বইতেই থাকে। ছোটবেলায় মুখস্ত করতেও মন্দ লাগে না। কিন্তু সংসারে ও-সব একদম ফালতু। এই বুকে হাত দিয়ে বলছি বোচ্‌কা, জান্‌বি, এমন কোন লোকই নেই যাকে কেনা যায় না। দামের কম-বেশী নিয়ে কথা। কেরাণীবাবুকে দিতে হয় দশ, বড়বাবুকে পঁচিশ, সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে পঞ্চাশ, ইন্‌স্পেক্টারকে একশ'। যত বেশী মাইনের অফিসার, তত বেশী তার দক্ষিণা। টাকায় না হয় এমন কাজ নেই। তবে হ্যাঁ, কেউ কেউ হয়তো সোজাসুজি টাকাটা নিতে ভয় পায়। তাদের বেলায় বিলাতী হলে পাঠাবে এক কেস্ 'হোয়াইট লেবেল,' দেশী হলে মেয়ের বিয়েতে দেবে বেনারসী শাড়ী।"

সিধুচন্দ্রের ওখানে ডিনার খেয়ে তারই ভাড়া-করা ট্যাক্সি চেপে বাড়ী ফিরলেম অনেক রাত্রে। অনেকগুলি সিগারেট ভরে দিয়েছিল আমার সিগারেট-কেসে। শাদা-কালো, অর্থাৎ ব্ল্যাক য্যাণ্ড হোয়াইট। সাদা বাজারে তার দর্শন এখন দুর্লভ। কিন্তু দেশে অভাব কি কালো বাজারের? অভাব কি সিধুচন্দ্রদের?

[ক্রমশঃ

বিজ্ঞান জগৎ

জগতের উপাদান

শ্রীনিখিলচন্দ্র রায়

এই দার্শনিক ভারতবর্ষে আমরা বহু কাল হইতে জানিয়া আসিতেছি যে, সমগ্র জগৎ জড় ও চেতন অথবা প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইয়ের সমষ্টি। এই তত্ত্ব সাংখ্যমতসিদ্ধ, কিন্তু বেদান্ত মতানুসারে কেবল চেতনেরই অস্তিত্ব আছে, জড় জগৎ তাহার ভ্রমমাত্র। ইহার অর্থ এই যে, জগৎ জড়রূপে হইলেও রজ্জুতে সর্পভ্রমবৎ ঐ জড়ের অস্তিত্ব ভ্রমের উপর স্থাপিত, আসলে ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। অর্থাৎ ইহা অনিত্য এবং প্রলয়কালে সমগ্র জগৎই চেতনে পর্য্যবসিত হয়। এই হেতু এক চেতন মাত্রই অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া বর্ত্তমান আছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অনুসারে জগতের সমস্ত জড় পদার্থই কতকগুলি মূল পদার্থের পরমাণু দ্বারা গঠিত এবং এই পরমাণু তাহার মূলগত ইলেকট্রন নামে অতিসূক্ষ্ম পদার্থে নির্ম্মিত আর সেই ইলেকট্রন ও শক্তির আকার বিশেষ ভাবে প্রকাশ মাত্র। অতএব বৈজ্ঞানিকের মতে সমস্ত জড়ই শক্তি হইতে উৎপন্ন। এই শক্তি শব্দটি গত শতাব্দীর কিছু পূর্ব্ব হইতে বৈজ্ঞানিকগণ ব্যবহার করিতেছেন। ইহা দ্বারা সকল গতি ও ক্রিয়ামূলক ব্যাপার সম্পাদিত হয়। কিন্তু মূল চেতন বা প্রাণশক্তি কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সেই তথ্যে এখনও পৌঁছাইতে পারে নাই। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকদ্বয়—সার উইলিয়াম ক্রুকস্ ও সার ওলিভার লজ দেহান্তের পর চেতনমূলক আত্মারও পরিস্থিতি স্বীকার করিয়াছেন এবং উভয়েরই মতে জড় কিংবা চেতন কোনটিই অপর অপেক্ষা স্থূলতর নহে, অর্থাৎ উভয়েই সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্ম উপাদানভূত। এখানে বলা আবশ্যক যে, এই ক্রুকসই প্রথমে জড় পরমাণুর মূলগত ইলেকট্রন আবিষ্কার করিয়াছিলেন ও লজ তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, যদিও বৈদান্তিকের চেতন ও বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের বর্ণিত শক্তি একই জিনিষ এরূপ বিবেচনা করিবার কোনরূপ প্রমাণ নাই, তাহা হইলেও উভয় মত অনুসারেই সমগ্র জগৎ একটি মাত্র মূল উপাদান হইতে উদ্ভূত ইহা দেখা যাইতেছে। আবার ইহাও সত্য যে, চেতন সমস্ত শক্তির আধার, কারণ যেখানেই চেতনের অস্তিত্ব সেইখানেই জীবন বা প্রাণ আছে ও তাহা দ্বারা শক্তির বিবিধ কার্য্য হইতেছে। অতএব আজকাল পাশ্চাত্য জগতে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে যে সকল উচ্চতর গবেষণা অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা দ্বারা পরিশেষে ঐ বৈদান্তিক উক্তিই সমর্থিত হয়।

জড় যে শক্তির রূপান্তর মাত্র তাহা জড়ের তড়িতাত্মক সিদ্ধান্ত এবং কতকগুলি পর্য্যবেক্ষণাবিষ্কৃত বিষয় হইতে বেশ বুঝা যায়। যদি কখনও আমরা জড় পরমাণু সৃজন করিতে পারি তাহা হইলে তাহাতে জাগতিক অনন্ত শক্তির সামান্ত অংশ মাত্র থাকিবে। কিন্তু উহা যত সামান্ত অংশই হউক না (যথা, কোটি অংশের একাংশ হইলেও), তাহাতে যেটুকু শক্তির লীলা প্রকাশ হয় তাহা অতীব বিস্ময়কর। কয়েক বৎসর আগে সার আর্ণষ্ট রাদারফোর্ড পরমাণুকে চূর্ণ করিবার পন্থা শিখাইয়াছেন। কিন্তু এইরূপ চূর্ণ করিতেও বহুশক্তির আবশ্যক এবং পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তি এই বীকরণ কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া যায় বলিয়া কোন শক্তি বাহিরে উন্মোচিত হয় না। আবার কোন কোন দ্রব্যের পরমাণু—যথা, রেডিয়াম, নিজ শক্তির আধিক্য বশতঃ ও উহাতে ঐ শক্তির সংহতি অল্প বলিয়া আপনা আপনি নিজ গাত্র হইতে সূক্ষ্ম কণা সকল বেগে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। অতএব জড় পরমাণু হইতে শক্তির আবির্ভাব করিতে হইলে উল্টা উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, অর্থাৎ সরল পরমাণু হইতে জটিল পরমাণু প্রস্তুত করা আবশ্যক।

ইহা খুব সহজ ভাবে এইরূপে বুঝা যায়। অ্যাষ্টন সাহেবের গবেষণা হইতে এক্ষণে বেশ জানা গিয়াছে যে, সমস্ত মূল পদার্থের পরমাণুই মোটামুটি হাইড্রোজেনের পরমাণু অথবা হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ামের পরমাণু দ্বারা গঠিত। অতএব অন্য প্রত্যেক পদার্থের পরমাণুর ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের পূর্ণ গুণিতক হইবে। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, এই গুণিতক প্রায় পূর্ণসংখ্যক হইলেও ঠিক পূর্ণ নহে। এমন কি, যদি কতকগুলি হাইড্রোজেন পরমাণু একত্রিত করিয়া সমষ্টিবদ্ধ করা যায় তাহা হইলে প্রত্যেক পরমাণুর ওজন সামান্ত কমিয়া ১·০০৭ হইতে ১ ওজনে নামিয়া যায়। এইটুকু মাত্র জড়ের হ্রাস হইলেও তাহা শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হয়।

আইনষ্টাইনের অপেক্ষবাদ হইতেও ইহা নিশ্চিতরূপে প্রতিভাত হয় যে, জড় পদার্থ বিলোপপ্রাপ্ত হইলেই তাহার পরিবর্ত্তে শক্তি আবির্ভূত হইবে। অন্য কথায় বলিতে হইলে ব্যোমস্থ ঈথারের শক্তিময় সংগঠনের অবস্থাই জড়। এই জড়ে ঈথারের প্রভূত শক্তি নিহিত আছে এবং জড় শক্তি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা নির্ম্মিত নহে। অতএব আমরা আশা করিতে পারি যে, কোন না কোন উপায়ে (যাহা এখনও কার্য্যকরী হয় নাই) ভবিষ্যতে জড় ও ঈথারের শক্তি এক হইতে অন্যে পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে। বর্ত্তমান কালের গবেষণা-লব্ধ ফল অনুসারেও যদি হাইড্রোজেন পরমাণুর চারিটিকে নিবিড় ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এক হিলিয়াম পরমাণু নির্ম্মাণ করা হয়, তাহা হইলে উহাদের প্রত্যেকটির এক হাজারের সপ্তাংশ ওজন বা জড়ত্ব কমিয়া যাইবে এবং ঐ হ্রাসের তুল্য পরিমাণ শক্তি উন্মোচিত হইবে।

কিন্তু পরমাণু হইতে উন্মোচিত শক্তি এত অধিক পরিমাণে কেন হয়? ইহার কারণ এই যে, ঐ শক্তি আলোকের গতিবেগের দ্বারা নিরূপিত হয়, ইহা নিম্নের অনুচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। যদি অতি সূক্ষ্ম এক টুকরা জড় আলোকের গতিতে (অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৭,০০০ মাইল গতিতে) চালিত হয়, তাহা হইলে ঐ বৃহৎ বেগের প্রভাবে সূক্ষ্ম জড়টিও ভীষণ গতিজনিত শক্তির আধার হইয়া উঠে তাহা গণিতশাস্ত্র হইতে জানা আছে। আবার ঠিক প্রমাণিত না হইলেও এতাবৎ কালের বৈজ্ঞানিকগণের পর্য্যবেক্ষণাবিষ্কৃত তথ্য সকল আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, ঈথার কোন প্রকারে জড়ে পরিণত হইলে তাহার অভ্যন্তরে ঐ ঈথার আলোকের গতিতে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। এই আবর্ত্তবাদ জড়ের উৎপত্তির কারণ বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করেন। যদি নির্গমনশীল জলের এক প্রবল ধারা তীব্রবেগে ঘুরান যায় তাহা হইলে জল তরল বস্তু হইলেও উহার ঐ ধারা ঠিক কঠিন বস্তুর ন্যায় আচরণ করিবে, এবং উহাকে কেহ হাতুড়ির দ্বারা আঘাত করিতে পারিবেন। এইরূপে জড়ও ঈথারের অতি দ্রুত আবর্ত্তনের এক প্রকার রূপ মাত্র। কিন্তু মনে রাখিতে

হইবে যে, এই ঈথারের আবর্তন উহার সাধারণ গতি হইতে বিভিন্ন। এতাবৎ কাল আমরা কেবল আপেক্ষিক শক্তির সহিতই পরিচিত ছিলাম। যেমন কামানের গোলা কি শক্তিতে ধাবিত হয় তাহা পৃথিবীর গতিশক্তির তুলনায় নিরূপিত হয়, সূর্য্য ও নক্ষত্রগণও কি শক্তিতে ধাবিত হইতেছে তাহা পরস্পরের তুলনায় নিরূপিত হয় ইত্যাদি। পরম শক্তির প্রকৃতি আমাদের জানা ছিল না। অবশেষে আইনষ্টাইনের অপেক্ষবাদের সাহায্যে আপাতবিরুদ্ধমূলক হইলেও পরম শক্তির বিষয় এক্ষণে ধারণা করিতে পারিয়াছি। এই পরম শক্তিই জড় সৃজনের উপাদান এবং অপেক্ষবাদ মতে আলোক শক্তিই এই পরম শক্তি। সকলেই জানেন যে, দমকল হইতে নিক্ষিপ্ত জলস্রোতের জোর বা তোড় আছে, সেইরূপ আলোক-রশ্মিরও জোর আছে এবং আলোক উৎপাদক বস্তু ও আলোকের আপতন স্থানের যথা দর্পণের মধ্যে ঐ রশ্মি সত্য সত্যই চাপ বা শক্তি উৎপন্ন করে। আলোকরশ্মির এই শক্তি বদ্ধ করিতে পারিলে উহা জড়ে পরিণত হয়। কিন্তু সাধারণতঃ শক্তিকে বাধা দিলেই উহা উত্তাপে পরিবর্তিত হয়, কিরূপে জড়ে পরিণত হইবে? ইহার উত্তর এই যে, কিছুই বাধা দিবার আবশ্যক নাই, আলোকরশ্মিকে আবর্তে পরিণত কর তাহা হইলেই একটি ইলেক্ট্রন সৃজন হইবে। এই নিমিত্ত আমরা ইলেকট্রনকে আবর্তমান আলোক-শিখারূপে কল্পনা করিতে পারি এবং আবর্তমান ইলেকট্রনগুচ্ছ হইতেই পরমাণু নির্মিত হয় ইহাই এই যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। সার ওলিভার লজ লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভায় অসংখ্য উৎসুক শ্রোতার সম্মুখে জাগতিক জড়ের ধ্বংস ও পুনর্জন্ম বিষয়ে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন—

"আমাদের এই জগতে সূর্য্য প্রতিনিয়ত যে শক্তি বিচ্ছুরিত করিতেছে তাহা আণবিক শক্তি হইতেই উৎপন্ন। এই আণবিক বিশ্লেষণে সূর্য্যের ক্ষয় হইতেছে। কিন্তু উৎপন্ন শক্তির অর্বুদাংশেরও কম অংশ পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ ধরিয়া লইতে পারে এবং বাকী শক্তি কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া অনন্ত ব্যোমের মধ্যে কোথায় চলিয়া যাইতেছে কেহই জানে না। এইরূপে অসংখ্য নক্ষত্র সকল হইতেও (যাহারা অতি দূরবর্তী সূর্য্যবিশেষ) এত কাল ধরিয়া যে শক্তি বিকীর্ণ হইতেছে তাহাই বা কোথায় যাইতেছে? হয়ত ব্যোমের অতিদূর গভীরতম প্রদেশে কোন স্থানে সেই শক্তি শোষিত হইয়া আবর্তন প্রথায় জড়ে পরিবর্তিত হইয়া অন্য জগৎ গঠনের উপাদানভূত নীহারিকা সকল সৃজন করিতেছে।"

আমেরিকার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতমূলক জ্যোতিষের অধ্যাপক ডাঃ উইলিয়াম ডি ম্যাকমিল্যানও এই জগতের বিষয়ে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—"আমরা সকলেই জগৎকে জড় ও শক্তিরূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানি। এই জগৎ শূন্য হইতে সৃষ্ট হয় নাই এবং চিরকালই বর্তমান আছে। এই জগতে সূক্ষ্ম ব্যোমের মধ্য দিয়া শক্তি কখনও ধীরে কখনও বা বেগে প্রবাহিত হইতেছে। শক্তির এই অনুকূল বা প্রতিকূল স্রোতের প্রভাবে কোন বস্তু ধ্বংস হইতেছে এবং কোনটি বা নির্মিত হইতেছে। কিন্তু সর্বত্রই শক্তির সমষ্টি একরূপই আছে। শক্তি ও জড়ের পরস্পর পরিবর্তনমূলক সিদ্ধান্ত প্রকৃত হইলে ইহা নিশ্চয়ই সত্য যে, যখন জগতের একাংশ ধ্বংসে পরিণত হয় তখন অপর এক অজ্ঞাত অংশে উহা পুনর্নির্মিত হইতেছে।"

আন্দাজে

পঙ্কিল রায়

সবই হয় আন্দাজে
বোঝে না তো তা'তে হয় খাঁচা-ছাড়া প্রাণটা যে!
আন্দাজে হয় যত জুতো-জামা কেনা-কাটা,
জামা হয় ঢল্-ঢলে, জুতোতে ঢোকে না পা-টা,
কারু যদি গা গরম, আন্দাজে জ্বর মাপে,
হদিস্ না পেয়ে কিন্তু রুগী কাঁদে সন্তাপে।
অথবা ওষুধ দেয় আন্দাজী মাত্রায়,
রুগী তা'তে অপঘাতে খাবি-জলে কাৎরায়,
সময়ের ঠিক নেই, ঘড়ি আছে দেয়ালে
কাঁটা দু'টো ঘোরে তার আন্দাজী খেয়ালে।
এ ওর কথার দেয় আন্দাজে উত্তর,
তার ফলে গোলমাল, গালাগাল—দুত্তোর!
মাসের খরচ চায় আন্দাজী হিসাবে,
সে নয় তাহার দায় দু' প্রান্ত মিশাবে।
ঠিকঠাক মাপ-জোঁক নাই কোনো বিষয়ে
—তবেই দেখুন বুঝে, আছি রোজ কী সয়ে।

প্রেম

মণীন্দ্র রায়

তোমাকে বেসেছি ভাল, হে প্রেম আমার!
মৃত্তিকার স্পর্শ খুঁজে অগ্নিবাষ্পে যবে
ছুটে চলি সঙ্গিহীন, উর্ধ্ব-আঁখি নভে
পাঠালে মিনতি তব ব্যগ্র কামনার;
রোমাঞ্চ কদম্বমূলে আদিম প্রণয়ে
স্তব্ধ শূন্যতার বুকে যৌবন আবেগ
সৃষ্টির লাবণ্যে করে মৌনে অভিষেক
হৃদয় আমার; জাগি মেঘের বিস্ময়ে।

এ আকাশে এল আজ শাওন রজনী।
বর্ষণে, বিদ্যুতে, ঝড়ে দুই তটে বাঁধা
কালিন্দী উদ্বেল তব; অন্ধ প্রতিধ্বনি
বাজায় বজ্রের বাঁশী; হে মৃত্তিকা রাধা!
মিলিত আকাশ-পৃথ্বী তীব্র অভিসারে
অনঙ্গের যন্ত্রশালে বেঁধেছে দোঁহারে॥

★

মহামুনি শ্রীভরত কৃত

নাট্যশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

চতুর্থ অধ্যায়

১

মূল :—এইরূপে পূজা করিবার পর, আমি পিতামহকে বলিয়াছিলাম—'বিভো! শীঘ্র আজ্ঞা করুন—কোন্ প্রয়োগ প্রযুক্ত করা উচিত?' ১।

সঙ্কেত :—নাট্যশাস্ত্রের চতুর্থাধ্যায়ের একটি ইংরেজী ভাষান্তর আছে—Tandava Lakshanam—Dr. B. V. Narayana Swami Naidu, P. Srinivasulu Naidu ও O. V. Rangayya Pantulu—এই ভাষান্তর করিয়াছেন—G. S. Press. Mount Road, Madras (1936) হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

মূলে আছে কর্ম্মবাচ্য—ময়া প্রোক্তঃ পিতামহঃ—মৎকর্ত্তৃক পিতামহ উক্ত হইয়াছিলেন। 'ময়া' বলিতে ভরতমুনিকে বুঝাইতেছে। বিভু—সর্ব্বব্যাপী হিরণ্যগর্ভরূপী ব্রহ্মা। প্রয়োগ—নাট্যপ্রয়োগ—নাটকাদি দশবিধ রূপকের অন্যতম রচনার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়; Production. শীঘ্র—পূজার পর নাট্যপ্রয়োগে বিলম্ব অবাঞ্ছনীয়।

মূল :—তত:পর শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক উক্ত হইলাম—'অমৃতমন্থনের প্রয়োগ কর—ইহা উৎসাহ-জনক ও সুরগণের প্রীতিকর।' ২

সঙ্কেত :—অমৃতমন্থন বা অমৃতমথন—পিতামহ-রচিত সমবকার—ইহা দেবলোকে অভিনীত অন্যতম অতি প্রাচীন দৃশ্যকাব্য। মূলে আছে—যোজয়ামৃতমন্থনম্। আচার্য্য অভিনবগুপ্ত অর্থ করিয়াছেন—'তোমার পুত্রগণ নট, তাহাদিগকে এই নাট্যরচনার শিক্ষায় যোজিত কর—অর্থাৎ তোমার পুত্র নটগণকে এই নাট্যরচনার শিক্ষাদান কর'। সুরপ্রীতিকরং তথা (ব), মহৎ (কাশী)।

মূল :—'হে বিদ্বান্! এই যে ধর্ম্মকামার্থ-সাধক সমবকারটি মৎকর্ত্তৃক সংগ্রথিত হইয়াছে, সেই প্রয়োগটি প্রযুক্ত হওয়া উচিত।' ৩

সঙ্কেত :—ধর্ম্মকামার্থসাধক—ধর্ম্ম-কাম-অর্থের উপায় যাহাতে উপদিষ্ট হইয়াছে। সমবকার—দশবিধ দৃশ্যকাব্য বা রূপকের অন্যতম—নাটক, প্রকরণ, (নাটিকা), সমবকার, ঈহামৃগ, ডিম, ব্যায়োগ উৎসৃষ্টিকাঙ্ক (বা অঙ্ক), প্রহসন, ভাণ ও বীথী—ভরতোক্ত দশবিধ রূপক। তন্মধ্যে সমবকার—তিন অঙ্কে সমাপ্ত, দেবাসুর-বীজাশ্রিত, প্রখ্যাত-উদাত্ত-দ্বাদশনায়ক-বিশিষ্ট দৃশ্যকাব্য-বিশেষ। অমৃতমন্থন—পিতামহ-রচিত আদি সমবকার; অভিনব পাঠ ধরিয়াছেন অমৃতমথন। সমবকার বীররসাত্মক—বীররসের স্থায়িভাব উৎসাহ—এ কারণে পূর্ব্ব শ্লোকে উহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে—উৎসাহ জনক। সুরপ্রীতিকর সুরগণের প্রীতি (রসনা বা চর্ব্বণারূপ যে আনন্দ)—তাহার উৎপাদক।

মূল :—সেই সমবকার প্রযুক্ত হইলে পর দেব-দানবগণ (নিজ নিজ) কর্ম্মভাবানুদর্শন-হেতু সকলেই হৃষ্ট হইয়াছিলেন। ৪

সঙ্কেত :—কর্ম্মভাবানুদর্শনাৎ—কর্ম্ম ও ভাব; তাহার অনুদর্শন। নিজ নিজ কর্ম্ম ও নিজ নিজ ভাব ত পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান আছে। অভিনয়কালে ঐ সকল কর্ম্ম ভাবের দর্শনে মনে হয়—'এই সকল কর্ম্ম আমি পূর্ব্বে করিয়াছি—এই সকল ভাব আমারই বটে! আজ অভিনয়ে ইহাদিগের পুনর্দর্শন হইল'। পূর্ব্বে কৃত কর্ম্মের পশ্চাৎ অভিনয়ে দর্শন—অনুদর্শন। এই অংশের ইংরেজী ভাষান্তর তাণ্ডব-লক্ষণে বাদ পড়িয়াছে।

মূল :—অনন্তর কিছু কাল অতীত হইলে পদ্মযোনি আমাকে বলিলেন—'আজ মহাত্মা ত্রিনেত্রকে নাট্য-সন্দর্শন করাইব'। ৫

সঙ্কেত :—অম্বুজসম্ভবঃ (মূল)—পদ্মযোনি—নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। সন্দর্শয়ামোহদ্য (ব), সন্দর্শয়ামোহত্র (কা)। সম্যগ্‌রূপে দর্শন করাইব—যাহাতে কোনরূপ খুঁৎ না থাকে—এরূপ সুন্দর ভাবে দেখাইব। ত্রিনেত্র—ত্রিলোচন, মহেশ্বর—"মহেশ্বরস্ত্র্যম্বক এব নাপরঃ"—কালিদাস—রঘুবংশ, ৩য় সর্গ—বহু দেবতার তিন নয়ন থাকিলেও ত্রিনেত্র বলিতে কেবল মহাদেবকেই বুঝায়।

মূল :—তাহার পর সুরগণসহ বৃষভাঙ্ক-নিকেতনে গমনপূর্ব্বক শিবকে সম্যগ্‌রূপে অর্চ্চনা করিয়া পরে পিতামহ ইহা বলিয়াছিলেন। ৬

সঙ্কেত :—বৃষভাঙ্ক—শিবের বাহন বৃষ; তাই তাঁহার বাহনই তাঁহার চিহ্ন (অঙ্ক)—তাঁহার রথধ্বজেও বৃষ-চিহ্ন। বৃষভাঙ্ক—শিব।

মূল :—'হে সুরোত্তম! এই যে সমবকারটি মৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে—ইহার শ্রবণে ও দর্শনে অনুগ্রহ করিতে আজ্ঞা হয়'। ৭

সঙ্কেত :—শ্রবণে দর্শনে চাস্য প্রসাদং কর্তুমর্হসি—অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার শ্রবণ ও দর্শন করিতে আজ্ঞা হয়। পূর্ব্বে পরীক্ষার্থ শ্রবণ, পরে সন্তুষ্ট হইলে অভিনয় দর্শন।

মূল :—দেবেশ দ্রুহিণকে 'দেখিব'—এই বাক্য বলিয়াছিলেন। তত:পর ভগবান্ (ব্রহ্মা) আমাকে বলিলেন—'হে মহামতে! সজ্জিত হও'। ৮

সঙ্কেত :—দেবেশ—দেবদেব মহাদেব। দ্রুহিণ—ব্রহ্মা। সজ্জিত হও—অভিনয়ের নিমিত্ত তৈয়ারী হও।

মূল :—হে দ্বিজসত্তমগণ! তাহার পর নানা-নগসমাকুল, নানা চূতদ্রুম-সমাকীর্ণ, রম্য-কন্দর-নির্ঝরযুক্ত হিমবৎ-পৃষ্ঠে পূর্ব্বে পূর্ব্বরঙ্গ করা হইলে তথায় উহা (অমৃতমন্থন সমবকার) ও ডিমসংজ্ঞক ত্রিপুরদাহ প্রয়োজিত হইয়াছিল। ৯-১০

সঙ্কেত :—দ্বিজসত্তমগণ—আত্রেয়-প্রমুখ ঋষিগণ—যাঁহারা ভরতের নিকট নাট্যশাস্ত্র-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। নানানগসমাকুলে (ব);—সমাবৃতে (কা)—নানা-বৃক্ষবিশিষ্ট। নগ-শব্দের অর্থ পর্ব্বত ও বৃক্ষ—দুই-ই হয়। হিমালয়ের পৃষ্ঠে পর্ব্বত ছিল—ইহা বলার কোন সঙ্গতি নাই—বরং নানাবিধ বৃক্ষ ছিল—ইহা বলা চলে—তাণ্ডব লক্ষণে অবশ্য অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে—Girt with numerous mountain-ranges; বহু চূতদ্রুমাকীর্ণে—এই সকল বৃক্ষের মধ্যে চূত (আম্র) বৃক্ষই ছিল প্রধান; কাশীর পাঠ—বহু ভূতগণাকীর্ণে। এই পাঠটি ভাল; কারণ একবার 'নগ' অর্থে বৃক্ষ করিয়া পুনরায় আম্রবৃক্ষের কথা বলায় যেন পুনরুক্তি দোষ হয়—এ পাঠে সে দোষ হয় না। কন্দর—গিরিগুহা। নির্ঝর—ঝরণা। অয়ং (সমবকারঃ) তথা ত্রিপুরদাহঃ চ প্রয়োজিতঃ—ইহাই অন্বয়। অয়ং এই—এই অমৃতমন্থন সমবকার। ত্রিপুরদাহঃ ডিম-সংজ্ঞঃ—ডিমসংজ্ঞাবিশিষ্ট নাট্য-রচনার নিদর্শন 'ত্রিপুরদাহ'—অর্থাৎ ত্রিপুরদাহ-নামক ডিম। ডিম—দৃশ্যকাব্য-বিশেষ—চতুরঙ্ক, প্রখ্যাত উদাত্ত ষোড়শ নায়কবিশিষ্ট, শৃঙ্গার-হাস্য-বর্জ্জিত অন্য ষড়্‌রসযুক্ত, মায়া-ইন্দ্রজাল-বজ্রপাত বাত্যাদি ঘটনাশ্রিত দৃশ্যকাব্য-বিশেষ।

ত্রিপুরদাহ—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে (৬।২।৩)—'ত্রিপুরদাহ' উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। নানা পুরাণেও ইহার বিবরণ আছে। স্বর্ণ,

রৌপ্য, লৌহ—এই তিন ধাতুময় দৈত্যগণের তিন পুর মহাদেব একটি বাণে ধ্বংস করেন—ইহাই ত্রিপুরদাহের মূল ঘটনা। অতএব, ইহা শিব-চরিত্রের বর্ণনামূলক।

মূল :—তাহার পর কর্ম্মভাবানুকীর্ত্তন-হেতু ভূতগণ হৃষ্ট হইয়াছিলেন। আর মহাদেবও সুপ্রীত হইয়া পিতামহকে বলিয়াছিলেন—। ১১

সঙ্কেত :—কর্ম্মভাবানুকীর্ত্তনাৎ (মূল)—দেবাধিদেবের কর্ম্ম ও ভাবের অভিনয় (অনুকীর্ত্তন) ত্রিপুরদাহ মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে—এই কারণে। ভূতগণ দেখিলেন যে, ত্রিপুরদাহ ডিম-মধ্যে তাঁহাদিগের প্রভু দেবদেবের কর্ম্ম ও ভাবের অনুকীর্ত্তনাত্মক অভিনয় বিদ্যমান, এই কারণে তাঁহারা হৃষ্ট হইলেন। Tandava Iakshanamএ অনুবাদ করা হইয়াছে—pleased with the acting—ইহা মূলানুগ নহে।

মূল :—হে মহামতে! অদ্ভুত এই নাট্য সম্যগ্‌রূপে ত্বৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে—(ইহা) যশস্য, শুভার্থক, পুণ্য ও বুদ্ধি বিবর্দ্ধক। ১২

সঙ্কেত :—অহো নাট্যমিদং—'অহো'—আশ্চর্য্যভাব-ব্যঞ্জক, অত্যদ্ভুত! বুদ্ধির পরিবর্ত্তে 'কীর্ত্তি' পাঠও পাওয়া যায়।

মূল :—সন্ধ্যাকালসমূহে নৃত্য করিতে করিতে মৎকর্ত্তৃকও নানা-করণসংযুক্ত অঙ্গহারসমূহে বিভূষিত এই নৃত্য স্মৃত হইয়াছে। ১৩

এই পূর্ব্বরঙ্গ বিধিতে (ইহা) ত্বৎকর্ত্তৃক সম্যগ্‌রূপে প্রযুক্ত হউক।

সঙ্কেত :—ময়াপীদং স্মৃতং নৃত্যং সন্ধ্যাকালেষু নৃত্যতা—নৃত্তং (বা)—নিত্যং পুরা সন্ধ্যামুপাসতা—বরোদার পাঠান্তর। উক্ত বাক্যটির অনুবাদ তাণ্ডবলক্ষণে প্রদত্ত হইয়াছে—'I shall always cherish the memory of it in my twilight dances—ইহা অত্যন্ত বিভ্রান্ত। মহাদেবের বলিবার তাৎপর্য্য এইরূপ—মহর্ষি ভরত যে কেবল অভিনয়ের ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন, তাহা নহে—দেবাদিদেবের নৃত্যের অনুকরণে তিনি নাট্যপ্রয়োগের স্থানে স্থানে নৃত্যেরও যোজনা করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া মহাদেব বলিলেন—এইরূপ নৃত্য ত সন্ধ্যাকালে আমিও স্মরণ করিয়াছিলাম। 'স্মরণ করিয়াছিলাম'—এইরূপ বাক্য-প্রয়োগের একটি বিশিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। মহাদেব ত স্বচ্ছন্দেই বলিতে পারিতেন যে—'এই নৃত্য আমারই উদ্ভাবিত—সন্ধ্যাকালে আমিই নৃত্য করিতে করিতে ইহার সৃষ্টি করিয়াছিলাম'। তাহা না বলিয়া তিনি কেন বলিলেন—'আমি ইহার স্মরণ করিয়াছিলাম'। ইহাতেই বুঝা যায় যে—পরমেশ্বর ইঙ্গিত করিতেছেন—নাট্যবেদ যেমন অনাদি নৃত্যকলাও সেইরূপ অনাদি। প্রতি কল্পেই নাট্য-নৃত্যের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটে মাত্র—উৎপত্তি বা ধ্বংস হয় না। এ কারণে, প্রজাপতি পিতামহ যেমন বেদস্মর্ত্তা—নাট্যবেদস্মর্ত্তা, দেবাদিদেব মহাদেবও সেইরূপ নৃত্যস্মর্ত্তা। পূর্ব্বকল্পীয় নৃত্যের কথা স্মরণ করিয়া তিনি বর্ত্তমান কল্পে নৃত্যের প্রথম প্রচার করেন। এই গূঢ় তথ্যটি প্রকাশের উদ্দেশ্যেই তিনি বলিয়াছেন—আমিও সন্ধ্যাকালে নৃত্য করিতে করিতে পূর্ব্বকল্পীয় মদীয় নৃত্য স্মরণপূর্ব্বক বর্ত্তমান কল্পেও উহার প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়াছি। ইদং নৃত্যং (মূল)—'ইদং' (এই)—যাহা এইমাত্র ভরত-প্রযুক্ত অভিনয়ে দেখা গেল। আচার্য্য অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—ভরত-মুনি ভগবান্ মহাদেবের 'নৃত্য-কৈশিকী' দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। উহা তাঁহার স্মরণে ছিল। উহার অনুকরণে তিনিও নৃত্য কোনরূপে তাঁহার নাট্যপ্রয়োগে যোজিত করিয়াছিলেন—কিন্তু যথাযথ উপদেশের অভাবহেতু তাহা বেশ সুশ্লিষ্ট হয় নাই (ভাল খাপ খায় নাই)। তাই মহাদেব বলিয়া উঠেন—'এই যে নৃত্য ভরতের প্রয়োগে দেখিলাম—পূর্ব্বকল্পীয় নৃত্য স্মরণে উহা আমিও প্রচারিত করিয়াছি। আমার নৃত্য করণাঙ্গহারযুক্ত সুশ্লিষ্ট। ভরতের নাট্যে উহা বেশ সুশ্লিষ্ট হয় নাই। অতএব, হে পিতামহ! তুমি পূর্ব্বরঙ্গমধ্যে উহা শুদ্ধভাবে যোজিত কর, যাহাতে বেখাপ্পা মনে না হইতে পারে (যেমন এখন মনে হইতেছে)। ["ভরতমুনিনা তাবত্তগবচ্ছত্তকৈশিকীদর্শনাৎ তৎপ্রয়োগার্থমনুস্মৃত্য কিঞ্চিন্নিয়োজিতম্। তত্তু সম্যগুপদেশাভাবান্নাতীব সুশ্লিষ্টমিতি। অতএব বক্ষ্যতি সম্যগিতি। স্মৃতমিত্যনাদিত্বমস্য দর্শয়তি।"—অভিনব-ভারতী, পৃঃ ৮১] অভিনবের উক্তি হইতে বেশ বুঝা যাইবে যে, তাণ্ডবলক্ষণের অনুবাদ কতদূর ভ্রমাত্মক।

অঙ্গহার—অঙ্গহার নৃত্যফলের প্রসব করে বরুণ অঙ্গহারের অঙ্গ। অঙ্গহার—দ্বাত্রিংশৎ প্রধান নৃত্তকর্ম্ম।

বরোদার পাঠ—নৃত্য, কাশীর পাঠ নৃত্ত। নাট্যশাস্ত্রে নৃত্য ও নৃত্তের ভেদ কিছু ধরা হয় নাই। কিন্তু গ্রন্থান্তর-সমূহে নৃত্য ও নৃত্তের ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। 'দশরূপক'-কার ধনঞ্জয় বলেন—ভাবাশ্রয় 'নৃত্যে' পদার্থাভিনয় বর্ত্তমান—ইহাই 'মার্গ'-নামে খ্যাত। আর তাল-লয়াশ্রিত 'নৃত্তে'র নাম 'দেশী'। 'ভাবপ্রকাশন'-কার শারদাতনয় বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা রসাত্মক, তাহাই বাক্যার্থাভিনয়-প্রধান। যাহা ভাবাশ্রয়, তাহাই পদার্থাভিনয়াত্মক। নৃত্য ভাবাশ্রয় ও নৃত্ত রসাশ্রয়। এ উভয়ই আবার নাট্যের উপকারক। শারদাতনয়ের মতে—দৃশ্যকাব্য ত্রিশ প্রকার। তন্মধ্যে—নাটক—প্রকরণ-ভাণ-প্রহসন-ডিম-ব্যায়োগ-সমবকার-বীথী-অঙ্ক (উৎসৃষ্টিকাঙ্ক) ঈহামৃগ—এই দশটি প্রধান রূপক রসাশ্রিত ও বাক্যার্থাভিনয়-প্রধান। অবশিষ্ট—ত্রোটক, নাটিকা, গোষ্ঠী, সল্লাপ (সল্লাপক), শিল্পক, ডোম্বী, শ্রীগদিত, ভাণিকা (ভাণ), প্রস্থান, কাব্য, প্রেক্ষক (প্রেক্ষণ বা প্রেক্ষণক), সট্টক, নাট্যরাসক, রাসক (লাসক), উল্লোপ্যক (উল্লাপ্য), হল্লীস, দুর্ম্মল্লিকা, মল্লিকা, কল্পবল্লী, পারিজাতক—এই বিংশতি রূপক ভাবাত্মক ও পদার্থাভিনয়-প্রধান। অবশ্য এই নামগুলি লইয়া বিভিন্ন অলঙ্কার-গ্রন্থে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়—কিন্তু তাহা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য নহে। শারদাতনয়ের মতে—নটের কর্ম্ম নাট্য—আর নর্ত্তক-কর্ম্ম পদার্থাভিনয়। নট-কর্ম্ম ও নর্ত্তক-কর্ম্ম—এতদুভয়ই আবার নৃত্য-নৃত্ত-ভেদে দ্বিবিধ। তাহার মধ্যে ভাবাশ্রয় 'নৃত্য' মার্গ ও ভাবরহিত 'নৃত্ত' 'দেশী' নামে প্রখ্যাত। ডোম্বী, শ্রীগদিত ইত্যাদিতে পদার্থাভিনয়ের প্রাধান্য বলিয়া ঐ বিংশতি রূপককে 'নৃত্যে'র প্রকারভেদ বলা হইয়াছে। এই নৃত্যের স্বরূপ—গীতের মাত্রানুসারে অঙ্গ-উপাঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের দ্বারা পদার্থাভিনয়। নাটকাদি দশরূপকে যে নৃত্ত প্রদর্শিত হয়, তাহার স্বরূপ—লয়-তাল-সমন্বিত অঙ্গবিক্ষেপ-মাত্র। আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির লয়-তাল-বিহীন কেবল বিক্ষেপাত্মক যে অভিনয়, তাহাই 'নাট্য'। মোটের উপর—নৃত্ত নটাশ্রিত রসাভিনয়ের ব্যাপার; আর নৃত্য নর্ত্তকাশ্রিত ভাবাভিনয়—ইহাই শারদাতনয়ের অভিমত। পক্ষান্তরে

নন্দিকেশ্বরের অভিনয়-দর্পণে বলা হইয়াছে যে—ভাবাভিনয়হীন নটন নৃত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে, আর রস-ভাব-ব্যঞ্জনাদিযুক্ত নটনের নাম নৃত্য। আবার সঙ্গীতরত্নাকরে শার্ঙ্গদেব বলিয়াছেন—আহার্য্যাভিনয়-বর্জ্জিত আঙ্গিক-বাচিক-সাত্ত্বিক-অভিনয়যুক্ত কেবল ভাবের অভিব্যঞ্জক নর্ত্তনের নাম নৃত্য। নৃত্যবিদ্‌গণ ইহাকেই 'মার্গ'-শব্দ-দ্বারা অভিহিত করেন। আর আঙ্গিক-বাচিক-আহার্য্য-সাত্ত্বিক—এই চতুর্ব্বিধ-অভিনয়-বর্জ্জিত সাধারণ গাত্রবিক্ষেপ-মাত্রেরই নাম নৃত্ত। অবশ্য এই গাত্রবিক্ষেপ আঙ্গিকাভিনয়-প্রকরণে উক্ত পদ্ধতি অনুসারে করিতে হয়, ইহা বলাই বাহুল্য। তথাপি যথাযথ-ভাবে আঙ্গিকাভিনয়-প্রয়োগ ইহাতে করা চলে না। গাত্রবিক্ষেপ করিতে যাইলেই আঙ্গিকাভিনয় কিছু না কিছু আসিয়াই পড়ে বটে; কিন্তু যথাশাস্ত্র আঙ্গিকাভিনয়-প্রয়োগ ইহাতে করা চলে না—গ্রন্থকারের ইহাই অভিপ্রায়। এই নৃত্তই 'দেশী' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পার্শ্বদেব-রচিত সঙ্গীতসময়সারে নৃত্য ও নৃত্তের ভেদ বলা হয় নাই। এক নৃত্তেরই স্বরূপ বলা হইয়াছে। নৃত্ত হইতেছে অবস্থানুকরণাত্মক গাত্রবিক্ষেপ—উহা তাল-ভাব-লয়ায়ত্ত—বাক্য-অঙ্গ-আহার্য্য-সত্ত্ব-সঞ্জাত। অবশ্য বাচিক-আহার্য্য-সাত্ত্বিক প্রধানতঃ নাট্যাভিনয়ের মধ্যেই গণনীয়; অতএব এক আঙ্গিক অভিনয়ই মুখ্যতঃ নৃত্তে প্রযোজ্য। আবার নারদ-কৃত সঙ্গীত-মকরন্দে শুধু নৃত্যেরই উল্লেখ আছে। তথায় বলা হইয়াছে—গীত-বাদ্য-নৃত্য—এ তিনকে সঙ্গীত বলা হয়। শুভঙ্কর-কৃত সঙ্গীতদামোদরেও কেবল নৃত্যেরই কথা উল্লিখিত হইয়াছে। দেবগণের রুচিসঙ্গত, তাল-মান-রসাশ্রয়, সবিলাস অঙ্গবিক্ষেপের নাম নৃত্য।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে যখন নৃত্য ও নৃত্তের কোন ভেদকরণ দৃষ্ট হয় না—তখন এ প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা অবান্তর।

করণ ও অঙ্গহারের ব্যুৎপত্তি ও লক্ষণ পরে বলা হইবে।

পূর্ব্বরঙ্গবিধিতে 'রঙ্গ' অর্থে নাট্যপ্রয়োগ। উহার (রঙ্গের) পূর্ব্বভাগই 'পূর্ব্বরঙ্গ'—নাট্যপ্রয়োগের প্রথম অংশ—সূচনা। ভরতের অভিনয়-প্রয়োগে এই পূর্ব্বরঙ্গ 'শুদ্ধ' অর্থাৎ বৈচিত্র্যবিহীন-ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছিল। দেবাধিদেব-প্রবর্ত্তিত নৃত্তের সহিত মিশ্রিতভাবে প্রযুক্ত হইলে উহাই 'চিত্র' নাম ধারণ করিবে—ইহাই মহাদেব অতঃপর বলিবেন। ভরতমুনি যবনিকার অন্তরালে অনুষ্ঠেয় প্রত্যাহারাদি নয়টি অঙ্গের (ও গীতকরচনান্ত দশটি অঙ্গের) কেবল কর্ত্তব্যবোধে প্রয়োগ করিয়াছিলেন—উহা কেবল অদৃষ্ট প্রয়োজন-সিদ্ধির অনুকূল ছিল; উহাতে নৃত্তসংযোগ তিনি করেন নাই। নৃত্ত সংযুক্ত হইলে উহা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সিদ্ধির অনুকূল হইবে। দৃষ্ট প্রয়োজন—দর্শক-চিত্ত-রঞ্জন; অদৃষ্ট-প্রয়োজন—বিঘ্নহানি, শুভাদৃষ্টবৃদ্ধি ইত্যাদি।

এই পূর্ব্বরঙ্গবিধিতে—'এই' বলিতে বুঝাইতেছে উদ্ধত পূর্ব্বরঙ্গ—যাহাতে মহাদেব-প্রবর্ত্তিত ও তণ্ডুদ্বারা উপদিষ্ট উদ্ধত করণাঙ্গহার (তাণ্ডব) প্রযুক্ত হয়; পক্ষান্তরে, সুকুমার পূর্ব্বরঙ্গে দেবী পার্ব্বতী-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত অনুদ্ধত অঙ্গহারাদি (লাস্য) প্রদর্শিত হইয়া থাকে। [অঃ ভাঃ, পৃঃ ৮১—৯০]

[ক্রমশঃ

নতুন বছর

অখিলেশ্বর ভট্টাচার্য

নব বর্ষ এলো!
বিচিত্র মনের পটে
পুরাতন বছরের
স্মৃতি এলোমেলো।

এক জোড়া কালো চোখে
আলো ছল্‌-ছল্‌;
একটি বিরহী মন
করে টল্‌ মল্‌।

গভীর আঁধার রাত;
বুক-ভরা দুখ;
ব্যর্থ করে স্নিগ্ধতায়
একখানি মুখ।

নব বর্ষ এলো;
গোপন মনের কোণে
পুরাতন বছরের
ছবি এলোমেলো।



ছোটদের আসর

জঁা ক্রিস্তফ

জগন্নাথ বিশ্বাস

রোমঁা রোলঁার পরিচয় 'জঁা ক্রিস্তফ' গ্রন্থে। এই দীর্ঘ উপন্যাসটি রোলঁার দীর্ঘ জীবন-সাধনার ফল। একে মহাকাব্য বললেই বোধ হয় ঠিক হয়।

'জঁা ক্রিস্তফ' রোলঁা লিখেছিলেন দীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু এর পেছনে না-লেখার অংশও কম ছিলো না। দীর্ঘ দিন ধরেই মনের ভেতর এর রূপ তৈরী হচ্ছিল। মহৎ কিছু সৃষ্টির প্রেরণা কৈশোর থেকেই তাঁর মনকে ঘিরে ছিলো। সেই প্রেরণায় তিনি নাটক সৃষ্টির প্রয়াস করলেন। কিছুটা সফলও হলেন, কিন্তু পূর্ণভাবে নয়। জনসাধারণ চাইলো না, রোলঁার নিজেরও মন ভরলো না। তাঁর নাটকগুলোতে অখণ্ডতা সৃষ্টির প্রয়াস ছিলো, কিন্তু সম্পূর্ণতা ছিলো না। অবশ্য তা থাকতেও পারে না, কারণ এগুলো সৃষ্টির পেছনে যতখানি হৃদয়ের আবেগ ছিলো ততখানি অভিজ্ঞতা ছিলো না, বয়সের সংগে দুঃখ তাপের মধ্যে দিয়ে ততখানি প্রস্তুতিও ছিলো না।

নাটকে ব্যর্থ হয়ে তিনি ইতিহাসের সত্য থেকে দৃষ্টি ফেরালেন। ইতিহাসে তাঁর মহৎ-সৃষ্টির পূর্ণ সুযোগ নেই। কল্প-জগৎ থেকে তাঁর চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে। জীবন সম্বন্ধে তিনি যা কিছু দেখেছেন ও ভেবেছেন তার পূর্ণ প্রকাশ দরকার। কল্পনা ও সত্যের সমন্বয়ে তা সম্ভব কিন্তু তার নায়কের আসল রূপ কি হবে সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা তখনো হয়নি। শুধু তিনি জানতেন যে, তাঁর নায়ককে হতে হবে সংগীতশিল্পী। শেষে তিনি পূর্ণভাবে তাঁর ভাবী নায়ককে উপলব্ধি করলেন ম্যালভিদা ভন মেসেনবুগের সংগে বিটোভেনের বাসস্থান দর্শন করতে গিয়ে। বিটোভেনের বাসভূমি তাঁর মধ্যে যে ভাবের ঢেউ তুলেছিলো তারই ফলে জঁা ক্রিস্তফের রূপ নির্দিষ্ট হলো। হ্যাঁ, তার নায়ককে হতে হবে—সংগীতশিল্পী, বীর,—বিটোভেন। পৃথিবীতে সে বাঁচবে মিথ্যার সংগে আপোষ না করে।

১৮৯৫ সালেই রোলঁা তাঁর গ্রন্থের মোটামুটি একটা খসড়া কল্পনায় খাড়া করেন। সুইজারল্যাণ্ডের এক দূর-পল্লীতে তিনি এর প্রথম কয়েকটি পরিচ্ছেদ লেখেন। তার পর বারো বছর ধরে বহু জায়গায় বসে এর কাজ অগ্রসর হতে থাকে। জুরিখ, অক্সফোর্ড, ইটালী, প্যারিস প্রভৃতি জায়গায়। তার মধ্যে ইটালী ও প্যারিসেই বেশীর ভাগ লেখা হয়েছিলো। ১৯০২ সাল থেকে ১৯১২ সালের অক্টোবর মাস 'জঁা ক্রিস্তফ' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় 'Cahiers de la quinzaine' পত্রিকায়।

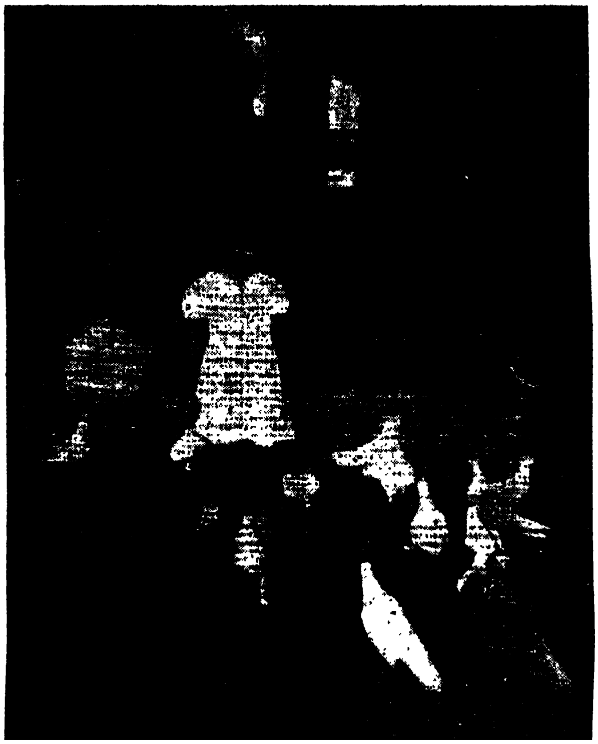
* * * *

বিটোভেনের দেশ রাইনল্যাণ্ডের একটি ছেলে জঁা ক্রিস্তফ। সে ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে উঠছে। তাদের বাড়ীর পেছন থেকে নদীর কলকল ধ্বনি ভেসে আসে। ঠাকুর্দার সংগে সে গীর্জায় গেছে। নড়াচড়া করা নিষেধ। সে ভয়ানক অস্বস্তি ও বিরক্ত বোধ করছে। "হঠাৎ কতগুলো শব্দের ঝংকার উঠলো, অর্গান বাজছে। তার মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে একটা বিদ্যুৎ-শিহরণ বয়ে গেল।…সে এর অর্থ বোঝে না; ধাঁধানো, এলোমেলো, সে কিছুই পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে না। কিন্তু তবু ভালো লাগলো। তার মনে হলো না যে, সে এক পুরোনো বাড়ীর এক অস্বস্তিকর চেয়ারে বসে আছে। সে যেন একটি পাখীর মত বাতাসে ভাসছে, আর যখন সংগীতের বন্যা খিলানে খিলানে ছুটে গিয়ে দেয়ালময় প্রতিধ্বনি তুলছে, তখন সে তার সংগে ভেসে বেড়াচ্ছে ইতস্ততঃ।…সে মুক্ত, সে সুখী।" (জঁা ক্রিস্তফ ১ম খণ্ড) বাল্যবয়সেই সংগীত ক্রিস্তফের মনের তারে সাড়া তুললো। রোলঁার নিজেরই ছোট বেলার ছবি। লেখার সময় ছবির মত তাঁর হারানো দিনগুলো আবার মনের সামনে ফিরে এসেছে। বাল্য-জীবনের কত রকম অনুভূতি, সমস্যা ও প্রশ্ন আবার অপূর্ব ভাবে 'জঁা ক্রিস্তফে'র প্রথম দুই খণ্ডে প্রতিফলিত হলো। কৈশোর কাটলো; কুড়ি বছর বয়সে বিদ্রোহ করে জার্মাণী থেকে পালিয়ে এলো প্যারিসে। সেখানে ধীরে ধীরে তার নাম-ডাক হলো। বন্ধু পেলো অলিভিয়েকে। ফ্রান্সকে ভালোবাসলো।

জঁা ক্রিস্তফের চরিত্র অদ্ভুত। শুধু রোঁলাও নয়, বিটোভেনও নয়, অনেকের সংমিশ্রণে এর সৃষ্টি। বলা যায় ক্রিস্তফের চরিত্র রোলাঁরই মনোবাসনায় পরিপূরণ।

ক্রিস্তফ কবি-প্রাণ। কিন্তু তার ক্ষেত্র সংগীত। বিটোভেন তার দেবতা। অন্য কোনো ভগবান সম্বন্ধে সে ভাবে না। সে নিজেই জানতো না, ধর্ম সম্বন্ধে তার মনোভাব কি! এ সমস্ত সমস্যা তার মনকে নাড়া দিতো না। বস্তুতঃ, যীশুখৃষ্ট তার মনকে যতটুকু অধিকার করতে পারতো, বিটোভেন তার চেয়ে কিছু কম পারতো না। সে ভগবানকে বিশ্বাস করতে পারে না এ কথা তার মনেও আসতো না, কিন্তু লিওনার্দের সংগে তর্ক করার পর হঠাৎ তার খেয়ালী কবি-মনে ধাক্কা লেগেছে; সে একলা অন্ধকার আকাশের দিকে মুখ তুলে বলছে: 'ঈশ্বর, ঈশ্বর, কেন আমি আর বিশ্বাস করতে পারি না? কেন আর আমি বিশ্বাস করি না? কি হয়েছে আমার?…'

ক্রিস্তফ অসুখী। তার মন অশান্ত, সব সময় চারি দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে যেন প্রকৃতির একটা অন্ধ শক্তি, সব সময় নিজের



ছবি—রমলা রায়

সংগে ও অন্তের সংগে উন্মত্ত ভাবে সংগ্রামে রত। নিরন্তর ভেতরের এই টানাটানি তাকে জীবনের কোনো নির্দ্দিষ্ট পথে চলতে দেয়নি।

কিন্তু তার কথাবার্তা একেবারে শাদা, সরল মনের অকৃপণ প্রকাশ। লোকের সংগে ব্যবহারে তার শালীনতা বা ভদ্রতাবোধ নেই। কিন্তু যারা পরিচিত তারা তাকে জানে। অপরিচিতেরও জানতে বেশী দেরী হয় না। ক্রিস্তফের দেহ ও মন শক্তিশালী। মন তো অসম্ভব শক্তিশালী। কিন্তু হলে হবে কি? খেয়ালী মন। জীবনের কাছ থেকে শিক্ষা অনেক দেরীতে উপলব্ধি করে। এ-রকম লোক চরম সুখ ও চরম দুঃখ দুই-ই পায়। বাস্তব পৃথিবীর সংগে প্রায়ই সংঘর্ষ লাগে। তখন হয় বিদ্রোহ। পৃথিবীর সাধারণ পারিপার্শ্বিকের সংগে এই অসাধারণ আত্মার সংঘর্ষই এই গ্রন্থের মূল আখ্যান।

তবে ক্রিস্তফ সংগীত-শিল্পী। "সংগীত তার নিশ্বাসের বায়ু, ওপরের আকাশ। প্রকৃতি তার প্রাণে সংগীতের সাড়া তোলে। তার আত্মা নিজেই সংগীত।" (জাঁ ক্রিস্তফ ৩য় খণ্ড) আর সে ভালোবাসে এই পৃথিবীকে। হাজার খেয়ালী মন সত্ত্বেও সে ভালোবাসে। কিন্তু লোক-জনের নিষ্ঠুরতা তাকে পীড়া দেয়। মাটির ওপর শুয়ে পড়ে পৃথিবীকে আঁকড়ে ধরে সে বলে: "কেন তুমি এতো সুন্দর, আর তারা—মানুষ—এতো কুৎসিত?" তাতে কিছু আসে যায় না, সে পৃথিবীকে ভালোবাসে: "আমি তোমাকে ভালোবাসি।···যা খুশি তারা করুক! তারা আমাকে দুঃখ দিক্! দুঃখভোগও জীবন!" এই দুঃখভোগ রোলাঁর নিজেরই জীবনদর্শন।

* * * *

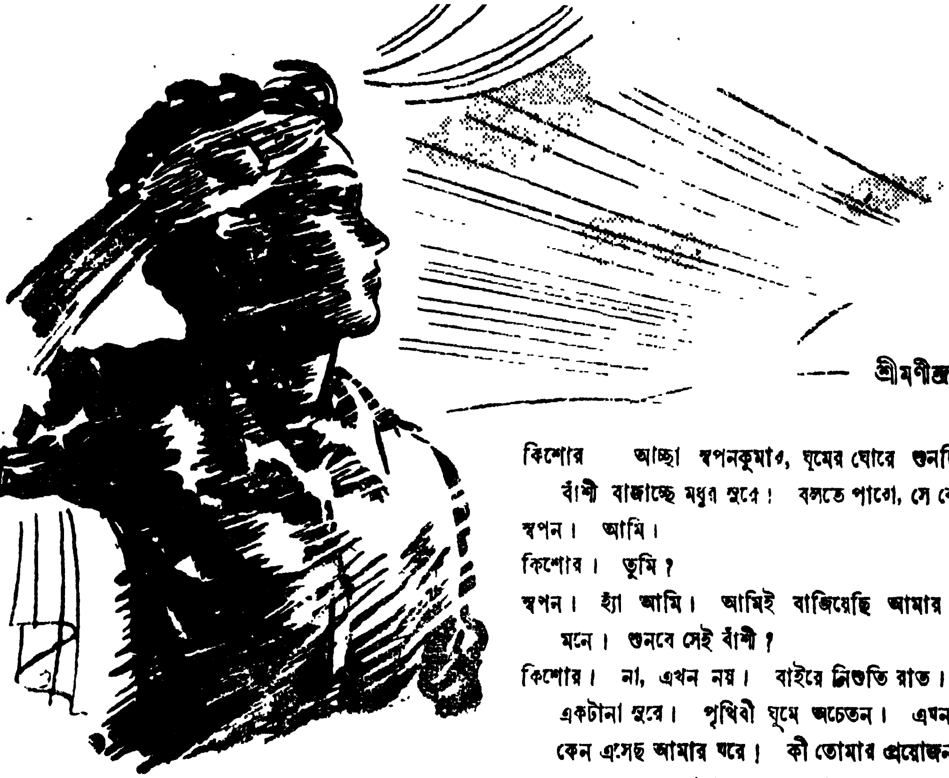
অলিভিয়ে ও ক্রিস্তফ পরস্পর বন্ধু। অলিভিয়ে আদর্শবাদী সাহিত্যিক, শান্ত ও দুর্বল। সে হচ্ছে ক্রিস্তফের পূর্ণতা। কেউ-ই সম্পূর্ণ নয়, দু'জনে মিলে সম্পূর্ণ। আরো অনেক চরিত্র আছে, প্রত্যেকটিই মনে দাগ কাটার মতো। নারী-চরিত্রের মধ্যে সাব্যাঁ, আঁতোয়ানেৎ। সাব্যাঁর অংশ খুব কম, কিন্তু কত মর্মস্পর্শী! আর আঁতোয়ানেৎ অপূর্ব। সাব্যাঁর অংশ খুব কম, কিন্তু কত মর্মস্পর্শী আর আঁতোয়ানেৎ অপূর্ব। তাকে ভোলা কল্পনা করাও যায় না এতো শান্ত, এতো নীরব-বেদনার মধ্যে দিয়ে কি গভীর যন্ত্রণা ও প্রেমের ট্র্যাজেডী ফুটে উঠেছে। মরবার সময়েও তার অপূর্ব নীরব বেদনা এমন নিঃশব্দে প্রকাশিত হচ্ছে যা' পড়তে পড়তে আমাদের বুক ভেঙে যায়। অথচ শোকের কোনো সমারোহ নেই। তার ভাই অলিভিয়ে শুনতে পেলো অতি মৃদুভাবে, যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে: "আমি সুখী···আমি আবার আসবো, প্রিয়, আমি আবার আসবো।"···

এই গ্রন্থখানি জীবন্ত য়ুরোপের আত্মার চিত্র। সম্পূর্ণ চিত্র। য়ুরোপ নবজীবন লাভের পথে চলেছে। বাধা, বিঘ্ন ও আঘাতের মধ্যে থেকেও ক্রিস্তফ নতুন আলো নিয়ে বার বার জেগে উঠছে। তার ভেতরের ঈশ্বর জেগে উঠছে, নতুন জীবনের পানে তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবী উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। যদিও যুদ্ধ আছে, দুঃখ আছে, তবুও। 'জাঁ ক্রিস্তফে'র শেষ দিকেও ভাবী যুদ্ধের ছায়াপাত হয়েছে। তবু নিরাশার কারণ নেই।

এই বিরাট গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটিমাত্র প্রশ্ন—কেমন করে বাঁচব? উত্তর হচ্ছে সত্যকে অবলম্বন করে বাঁচব। দুঃখ আসুক, দৈন্য আসুক, মিথ্যা নৈব নৈব চ। দুঃখও তো জীবন। জীবনকে জানতে হবে এবং জেনেও তাকে ভালোবাসতে হবে। "To know life and yet to love it."

যারা জীবন-জিজ্ঞাসু তাদেরই জন্যে রোলাঁর এই মহাকাব্য। জীবনকে জানতে হলে ও পেতে হলে এ গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য।

তবু শূন্য শূন্য নয়!



— শ্রীমণীন্দ্র

(দৃশ্য নাট্য)

[গভীর রাত। রংগমঞ্চ আবছা আঁধারে ঢাকা। বিছানায় ঘুমিয়ে আছে কিশোর। শিওরের জানালা বন্ধ। বহুদূর হতে ভেসে আসছে বাঁশীর মিষ্টি সুর। ঘুমের ঘোরেই কিশোর আবৃত্তি করছে :—

কিশোর। 'বীরের এ-রক্তস্রোত, মাতার এ-অশ্রুধারা,
এর যতো মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা!
স্বর্গ কি হবে না কেনা? বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না এতো ঋণ?—'

[প্রবেশ করলো স্বপনকুমার। হাতে বাঁশী। আলো জ্বলে উঠলো। থেমে গেলো নেপথ্যের বাঁশী। কিশোরের শিওরে বাঁশী রেখে যাদুকরের ভংগীতে স্বপনকুমার হাত বুলিয়ে দিলো তার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত। কিশোর জেগে উঠলো।

কিশোর। কে? কে তুমি আমার ঘরে?

স্বপন। আমায় চেনো না কিশোর ভাই? আমি তোমার বুকের কামনা—তোমার চোখের স্বপ্ন।

কিশোর। হেয়ালী রেখে স্পষ্ট কথায় বলো—কে তুমি?

স্বপন। সারা ভারতের কিশোর-প্রাণ পরাধীনতার বেদনায় উন্মাদ। শৃংখলমোচনের—স্বাধীনতার স্বপ্ন তার চোখে। আমি সেই কৈশোর স্বপ্ন। নাম স্বপনকুমার।

কিশোর। আচ্ছা স্বপনকুমার, ঘুমের ঘোরে শুনছিলাম, কে যেন বাঁশী বাজাচ্ছে মধুর সুরে! বলতে পারো, সে কে?

স্বপন। আমি।

কিশোর। তুমি?

স্বপন। হ্যাঁ আমি। আমিই বাজিয়েছি আমার বাঁশী তোমার মনে। শুনবে সেই বাঁশী?

কিশোর। না, এখন নয়। বাইরে নিশুতি রাত। ঝিঁঝিঁ ডাকছে একটানা সুরে। পৃথিবী ঘুমে অচেতন। এখন অসময়ে তুমি কেন এসেছ আমার ঘরে। কী তোমার প্রয়োজন?

স্বপন। প্রয়োজন আমার নয়, প্রয়োজন তোমার।

কিশোর। আমার?

স্বপন। হ্যাঁ কিশোর ভাই, তোমার। কতো তরুণ বালক মরলো কারাপ্রাচীরে মাথা ঠুকে। ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিলো কতো বীর। কতো কিশোরের রক্তে লাল হলো নগরীর রাজপথ। কতো ভাগ্যহীনা জননীর চোখের জলে ঝাপসা হলো ভারতের আকাশ। সব—সবই কি বিফল হবে—ব্যর্থ হবে? এই নিরাশার প্রশ্ন জেগেছে তোমার মনে। ঘুমের ঘোরে এই প্রশ্নই করছিলে তুমি ভারতের ভাগ্য-বিধাতার কাছে। তাই তো আমি এসেছি এই গভীর রাতে—শোনাতে এসেছি আশার বাণী।

কিশোর। কি তোমার আশার বাণী?

স্বপন। ব্যর্থ নয়—বিফল নয়। আজকের এই আত্মদান—এই রক্তপাত সৃষ্টি করবে নতুন ভারত।

কিশোর। তুমি সত্যি বলছ স্বপনকুমার?

স্বপন। হ্যাঁ ভাই, সত্যি বলছি। মানুষের চিরদিনের ইতিহাস এই কথাই বলে। সব পরাজয়ই পরাজয় নয়—নিষ্ফল নয়। স্মরণ করো থার্ম্মোপিলির গিরি-পথে বীর সহীদ লিওনিডাস ও তার তিনশো অনুচরের আমৃত্যু সংগ্রামের কাহিনী। স্মরণ করো হলদীঘাটের রক্তরাঙা রণক্ষেত্রে বীর প্রতাপের পরাজয়ের কথা। আরো স্মরণ করো পূর্ব্ব-এসিয়ার প্রান্তরে, পর্ব্বতে, অরণ্যে,



নদীপথে নেতাজী সুভাষ ও আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর গৌরবময় পরাজয়ের নিকট-ইতিহাস। মুক্তিকামী ভারতের হে বীর কিশোর, আশা ছেড়ো না, সাহস হারিও না। এসো আমার সাথে—নেমে এসো ইতিহাসের রক্তাক্ত পথে—

[রংগমঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেলো। দ্রুত তালে বেজে উঠলো গ্রীক রণবাদ্য। আবছা আলোয় একদল গ্রীক সেনানী মার্চ্চ করে চলে গেলো। আবার আলো জ্বললো। প্রবেশ করলো লিওনিডাস। হাতে বর্শা, কটিতে তরবারি। সংগে সৈনিক-কবি ডিয়েনিকস্।]

লিওনিডাস। দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক ইফিয়াল্‌টিস্—

ডিয়েনিকস্। আপনি উতলা হবেন না সেনাপতি।

লিওনিডাস। উতলা হবো না? তুমি বলো কি কবি? থার্ম্মোপিলির সংকীর্ণ গিরি-পথে যারাকিসসের 'অমর বাহিনী' বার বার ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে,—রাগে, ক্ষোভে, অপমানে যারাকিসস্ সিংহাসনের উপর বার বার কেঁপে কেঁপে উঠেছে, জয়লক্ষ্মীর মুখ ভরে উঠেছে প্রসন্ন হাসিতে, এমন সময় বিশ্বাসঘাতক ইফিয়ালটিস্ পারস্যরাজকে জানিয়ে দিলো গোপন পর্ব্বত-পথের কথা! সেই পথে নেমে আসছে অসংখ্য পারস্য সৈনিক। তাদের সামনে কতোক্ষণ দাঁড়াবে আমার মুষ্টিমেয় বীর স্পার্টান!

(একজন সৈনিকের প্রবেশ)

কি সংবাদ?

সৈনিক। অসংখ্য পারস্য সৈন্য আমাদের ঘিরে ফেলেছে। তাদের অগণিত শরজালে সূর্য বুঝি ঢেকে যাবে।

লিওনিডাস। শোনো কবি। শোনো আর ভাবো। ওমনি করেই বুঝি ঢেকে যাবে স্পার্টার সৌভাগ্য-সূর্য।

ডিয়েনিকস। আপনি হতাশ হবেন না সেনাপতি, আমি তো দেখছি এ শুভ লক্ষণ।

লিওনিডাস। শুভ লক্ষণ?

ডিয়েনিকস। আজ্ঞে হ্যাঁ। শত্রুসৈন্যের শরজালে সূর্য যদি ঢেকে যায়, তা'হলে যে তারি ছায়ায় আমরা আরামে যুদ্ধ করতে পারব।

সৈনিক। তাহলে কি আদেশ সেনাপতি?

লিওনিডাস। আদেশ যুদ্ধ। যাও কবি, স্পার্টান্ সৈন্যদের বলো, জন্ম হতেই তারা দেশের নিকট বলিপ্রদত্ত। প্রতি সৈনিকের হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও এই গিরিপথ রক্ষা করতে হবে। যদি সফল হয়, দেশবাসীর পূজার পুষ্পাঞ্জলি তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। আর যদি রণক্ষেত্রে মৃত্যুই হয় তাদের ললাটলিপি, তাহলেও তাদের পুণ্য-স্মৃতির পুজা করবে সকৃতজ্ঞ দেশবাসী—

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আবার আলো জ্বলে উঠলো। দিগন্তে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর ও স্বপনকুমার]

কিশোর। এতগুলি বীর-প্রাণ এমনি করেই বিফল হয়ে গেলো থার্মোপিলির গিরি-শংকটে?

স্বপনকুমার। বিফল নয় কিশোর ভাই, বলো সফল। মুষ্টিমেয় গ্রীক সৈন্যের এই অপূর্ব বীরত্ব গ্রীকবাহিনীর প্রাণে দিলো নতুন প্রেরণা, দুর্বার পারসী বাহিনীর অমরতার মুখোস খসে পড়লো। থার্মোপিলির পরাজয়ই সালামিসের চূড়ান্ত বিজয়ের অগ্রদূত। তাই তো গ্রীস থার্মোপিলির বীর শহীদদের কোন দিন ভুলতে পারেনি। তাই তো প্রতি গ্রীকের বুকের তারে আজো ধ্বনিত হয় তাদের অমোঘ নির্দেশ—

দাঁড়াও পথিকবর, স্পার্টার বলো ঘরে ঘরে,
এখানে ঘুমায়ে আছে বীরপ্রাণ তাহাদের তরে।

কিশোর। মরেও তারা কি তাহলে অমর হয়ে আছে?

স্বপনকুমার। হ্যাঁ। মৃত্যু তাদের দিয়েছে অমরতা। অনাগত কালের দেশভক্ত বীরের রক্তে রক্তে তাদের অমর আহ্বান। ওই শোনো মেবার পাহাড়ের চূড়া হতে ভেসে আসছে সেই ডাক—শোনো কান পেতে—

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেলো। পতাকা হাতে গান গেয়ে গেলো রাজপুত চারণ দল। গান শেষ হলে প্রবেশ করলো প্রতাপসিংহ, আলো জ্বলে উঠলো]

চারণ দল। "মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়
যুঝেছিল যেথা প্রতাপ বীর
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছ-দর্প
দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।"—ইত্যাদি।

প্রতাপ। যুদ্ধ বেধেছে। বিপুল বিরাট যুদ্ধ। এক দিকে আশী হাজার সুশিক্ষিত মোগল সৈন্য। আর এক দিকে মাত্র বাইশ হাজার অর্ধশিক্ষিত রাজপুত। হলদিঘাটের গিরি-শংকটে তবু

যুদ্ধ বেধেছে! প্রাণরক্ষার—মানরক্ষার এ যুদ্ধ—স্বাধীনতার এ যুদ্ধ।

[গোবিন্দসিংহের প্রবেশ]

গোবিন্দ। রাণার জয় হোক।

প্রতাপ। কে? গোবিন্দসিংহ? এমন অসময়ে?

গোবিন্দ। দুঃসংবাদ আছে রাণা। শক্তসিংহ কমলমীরের সুগম পথ মানসিংহকে দেখিয়ে দিয়েছে!

প্রতাপ। শক্তসিংহ? আমার ভাই?

গোবিন্দ। [খানিক চুপ করে থেকে] তা হোক; তবু যুদ্ধ হবে। হলদিঘাটের প্রতি ধূলিবিন্দুতে থাকবে প্রতাপের রক্ত স্বাক্ষর। স্বাধীনতার যুদ্ধ হতে সে কখনো বিরত হয়নি। সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দসিংহ, তোমাদের পূর্বপুরুষগণ স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। মনে থাকে যেন, আজ আবার সেই স্বাধীনতার জন্ত যুদ্ধ। তাঁদের কীর্তি স্মরণ ক'রে সমরানলে ঝাঁপ দাও।

[যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠলো রুদ্র তালে। তার পর বাজনা ক্ষীণতর হতে লাগলো। সেই সংগে আলো নিভে গেলো। আবার আলো জ্বললে দেখা গেলো মৃত চৈতকের উপর মাথা রেখে প্রতাপ ভূশায়িত। সময় সন্ধ্যা]

প্রতাপ। সব শেষ। তিন দিনের মধ্যে সব শেষ। আমার পনের হাজার সৈন্ত ধরাশায়ী। প্রিয় অশ্ব চৈতক নিহত। আমি অগণিত অস্ত্রাঘাতে দুর্বল। ভূপতিত।···ওই চিতোর। ওই তার দুর্জয় দুর্গ। কিন্তু পারলাম না। চিতোর উদ্ধার করতে পারলাম না। বীরচূড়ামণি বাপ্পারাও, পাঠানবিজয়ী সমরসিংহ, তোমরা আমায় ক্ষমা করো। আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। আমার দিন যে শেষ হয়ে এলো। কাযতো শেষ হলো না। উঃ—

[একটা করুণ রাগিণীর সংগে সংগে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আবার আলো জ্বলে উঠলো। দিগন্তে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর ও স্বপনকুমার]

স্বপন। রাণা প্রতাপ চিরঞ্জীব। সে মরেনি। মানুষের হৃদয়ে চিরদিন সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে তাঁর সংগ্রাম কথা। আরাবলীর প্রতি গিরিচূড়ায়, প্রতি উপত্যকায়, রাজস্থানের বনে পর্বতে প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হবে তাঁর কীর্তিকাহিনী চিরদিন তরে।

কিশোর। শুধু স্মৃতির পূজায় তো মন ভরে না স্বপনকুমার! সর্বস্ব পণ করে, আজীবন কঠোর ব্রত নিয়ে স্বাধীনতার যে স্বপ্ন রাণা প্রতাপ দেখেছিলো, কৈ, সে-স্বপ্ন তো সফল হলো না—ব্রত সম্পূর্ণ হলো না।

স্বপন। সব কার্য এক জনের দ্বারা হয় না। আবার এক দিন সেই ব্রতের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী আসে, আর অসম্পূর্ণ কায এগিয়ে চলে।

কিশোর। স্বাধীনতার সে-স্বপ্ন কি কোন দিন সফল হবে না? উপযুক্ত উত্তরাধিকারী কি আসবে না?

স্বপন। নিশ্চয় আসবে। আসতে তাকে হবেই। ওই শোনো তার পদধ্বনি। ইরাবতীর তীর অতিক্রম করে—ব্রহ্মের জংগল পার হয়ে—আরাকানের পাহাড় ডিঙিয়ে হাজার হাজার পায়ে উঠছে তার আগমনের প্রতিধ্বনি। শোনো শোনো কান পেতে শোনো—

[ধীরে ধীরে আলো নিভে গেলো। মার্চ করে চলে গেলো আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। মুখে তাদের রণ-সংগীত—কদম কদম বাঢ়ায়ে যা। আবার আলো জ্বললো। ···রেঙ্গুণ! ১৯৪৪। ২১ সেপ্টেম্বর। জুবিলি-হলে শহীদ দিবসের অনুষ্ঠান। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বক্তৃতা দিচ্ছে :

সুভাষ। আজকের এই পুণ্য দিনে আমরা স্মরণ করি ভগৎসিং, রাজগুরু ও শুকদেবের আত্মদান, চন্দ্রশেখর আজাদের অমর কীর্তি, লাহোর জেলে বীর শহীদ যতীন দাসের অনশনে মৃত্যু-বরণ। অতীতের এই বিপ্লবীদের মতো তোমাদেরও বিসর্জন দিতে হবে সুখ সম্ভোগ শান্তি, দিতে হবে অর্থ ও সম্পদ্। তোমাদের সন্তানদের তোমরা রণক্ষেত্রে পাঠিয়েছ। কিন্তু স্বাধীনতার মহাদেবী তাতেও তুষ্ট হয় নাই! আজ সে চায় নতুন বিদ্রোহী দল—বিদ্রোহী নারী ও নর। তাদের যোগ দিতে হবে আত্মঘাতী বাহিনীতে—বরণ করতে হবে নিশ্চিত মৃত্যু—বুকের রক্ত ঢেলে তারি খরস্রোতে ভাসিয়ে দিতে হবে শত্রুবাহিনীকে।

তুম্ হাম্‌কো খুণ দেও,
ময় তুম্‌কো আজাদী দুংগা।

তোমরা আমাকে দাও রক্ত, আমি তোমাদের দেব মুক্তি। স্বাধীনতার এই দাবী।

জনতা। রক্ত দিতে আমরা প্রস্তুত। তুমি গ্রহণ করো নেতাজী!

সুভাষ। শোনো। শুধু মুখের কথায় হবে না। কে আছ বীর, এগিয়ে এসো। স্বাক্ষর করো এই আত্মঘাতী বাহিনীর প্রতিজ্ঞা-পত্রে।

জনতা। করব স্বাক্ষর—স্বাক্ষর করব।

সুভাষ। মৃত্যুর সংগে রাখীবন্ধনের এই দলিলের স্বাক্ষর তো কালীতে হবে না। তোমাদের নাম এতে লিখতে হবে রক্তের অক্ষরে। এসো—কে স্বাক্ষর করবে সকলের আগে।

[বীরপদক্ষেপে এগিয়ে এলো যুবক সৈনিক। ছুরি দিয়ে আঙুলের ডগা কেটে করলো স্বাক্ষর। একে একে স্বাক্ষর করতে লাগলো সমবেত নরনারী। ধীরে ধীরে মঞ্চ আঁধার হয়ে এলো। নেপথ্যে বাজতে লাগলো রণবাদ্য। সে বাজনা ক্রমে করুণ সংগীতে হলো পরিণত। আলো জ্বলে উঠলো।

ব্রহ্ম-সীমান্ত। মারাত্মক ভাবে আহত অবস্থায় পূর্ব্ব-বর্ণিত যুবক অর্ধশায়িত। বারুদের কালি ও ধোঁয়ায় তার দেহ আচ্ছন্ন। পিছনে একটা বারুদ-স্তূপের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে সৈনিক বন্ধুরা।]

সৈনিক। আমার জন্তে দুঃখ করো না ভাই। নির্ভয়ে এগিয়ে যাও। মরতে আমার কোন কষ্ট নাই। শত্রুপক্ষের একটা বারুদের স্তূপ আমি উড়িয়ে দিয়েছি। এই আমার যথেষ্ট সান্ত্বনা। আমার প্রিয়জনকে বলো : ভারতের মাটিতে মাথা রেখে আমি মরেছি—বীরের মৃত্যু। ওই শোনো, ভারতমাতা আমাকে ডাকছে। নেতাজী, তোমার কথা আমি রেখেছি—বুকের রক্ত নিঃশেষে ঢেলে দিলাম—রাঙিয়ে দিলাম ভারতের

পথ। এই পথ ধরে আমাদের ফৌজ এগিয়ে চলুক দিল্লীর পথে— স্বাধীনতার পথে।

[কম্পিত হাতে রিভলবারের নলে মুখে দিয়ে সৈনিক ঘোড়া টিপলো।

জয় হিন্দ্……জয় হিন্দ্……জয়……

[সৈনিকের মৃতদেহ লুটিয়ে পড়লো। বন্ধুরা জানালো সামরিক অভিবাদন। মঞ্চ অন্ধকার হলো। করুণ সংগীত থেমে গেলো। আবার জ্বললো আলো। বিছানায় ঘুমিয়ে আছে কিশোর। শিওরের জানালা খোলা। ভোরের আলো এসে পড়েছে বিছানায়। একটা আর্তনাদ করে কিশোরের ঘুম ভেঙে গেলো।

কিশোর। উঃ, কী ভীষণ স্বপ্ন! এতো রক্ত, এতো আত্মদান, সব কি বিফল হবে? কোথায় কোথায় দিল্লী? স্বাধীনতা! কোথায় নেতাজী! কেউ কথা কয় না। উত্তর দেয় না। তবে কি সব ব্যর্থ? সব শূন্য? না না, ব্যর্থ নয়, শূন্য নয়। এই শূন্যতার বুক ভরে আছে নতুন প্রেরণা—নব জীবনের স্বপ্ন।

'তবু শূন্য শূন্য নয়
ব্যথাময়
অগ্নিবাণে পূর্ণ সে গগন।
একা একা সে অগ্নিতে
দীপ্ত গীতে
সৃষ্টি করে স্বপ্নের ভুবন।'

জয় হিন্দ্……জয় হিন্দ্……জয় হিন্দ্……

[কিশোর অভিবাদন জানালো নতুন দিনের সূর্যকে। ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে এলো। *

* [এই দৃশ্য-নাটক রচনায় অধ্যাপক বিউরি, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল ও ঝাঁসির রাণী বাহিনীর জনৈক সৈনিকের লেখার সাহায্য নিয়েছি। নাটকটির বাণীচক্র—স্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত।—শ্রীম]

১৩

শ্রীরবিনর্ত্তক

ত্রয়োদশীর দিন ক্রমে এগিয়ে এল। পূর্ব্বাহ্নেই শকটাল্ চাণক্যকে সঙ্গে নিয়ে রাজবাড়ী রওনা হলেন। রাজা যোগনন্দ স্নান-আহ্নিক সেরে শ্রাদ্ধের সময়ের অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় শকটাল্ তাঁর কাছে গিয়ে বললেন—'মহারাজ! এক জন পরম পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে আজ পেয়েছি—তিনি কৃপা ক'রে আপনার বাড়ীতে ভোজন করতেও রাজি হয়েছেন। আপনি যদি বলেন ত তাঁকে একবার আপনার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিই'। যোগনন্দ শুনে বললেন—'খুব ভাল কথা। চলুন, আমি গিয়ে তাঁকে দেখে আসি'। রাজা মন্ত্রী দু'জনে এসে দেখ্‌লেন—চাণক্য স্থির হয়ে ব'সে আছেন। যোগনন্দ চাণক্যের নাম শুনেছিলেন বটে, কিন্তু চোখে কোন দিন তাঁকে দেখেননি। কাজেই চিন্‌তে পারলেন না। শকটালও তাঁর পরিচয় দিলেন। শুধু এক জন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ এই ভেবে রাজা সবিনয়ে তাঁকে ভোজনের জন্যে অনুরোধ জানালেন। চাণক্যও রাজার ব্যবহারে কোন দোষ দেখ্‌তে না পেয়ে ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলেন। ক্রমে আরও সব ব্রাহ্মণ এসে পৌঁছুতে লাগ্‌লেন—শ্রাদ্ধে একশ' আট জন ব্রাহ্মণ খাবেন। তাঁদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি পাবেন এক লক্ষ সোনার মোহর ভোজন-দক্ষিণা। আর বাকী সকলে হাজার মোহর ক'রে পাবেন—এই ছিল ব্যবস্থা। চাণক্য প্রধান আসনেই বসেছিলেন—রাজাও প্রথমে তাতে কোন আপত্তি করেননি।

ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যাপারটা প্রায় নির্গোলে কেটে যায় দেখে শকটাল্ মনে মনে হতাশ হ'য়ে পড়ছিলেন। এমন সময় এমন এক বিষম দুর্ঘটনা ঘ'টে গেল—যার ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্য্যন্ত বদ্‌লে গেল। সুবন্ধু ব'লে এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন রাজা যোগনন্দের প্রিয়পাত্র। বিদ্বান যে তিনি খুব ছিলেন, তা নয়—তবে রাজার মন রেখে চল্‌তে পারতেন—শাস্ত্রের বচন সুবিধামত আওড়াতেন—আর খেতে পারতেন খুব—তাই রাজারা কয় ভাই-ই তাঁকে খুব ভালবাস্‌তেন। সেই সুবন্ধু এই সময় এসে উপস্থিত। বরাবর তিনিই হ'তেন প্রধান ব্রাহ্মণ—উপযুক্ত ব্রাহ্মণ রাজ্য মধ্যে আর কেউ বড় একটা না থাকায় তাঁর এই একচেটে ব্যবস্থার প্রতিবাদ কোন ব্রাহ্মণ এর আগে করতে সাহস করেননি—তা ছাড়া সকলেরই ভয় ছিল যে, সুবন্ধুর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করলে নন্দ রাজাদের কোপ এসে ঘাড়ে পড়বেই। আজ সুবন্ধু হেল্‌তে দুল্‌তে এসে দেখেন—কি সর্ব্বনাশ! তাঁর জন্যে বরাবরের পাকা ব্যবস্থা আজ উল্‌টে গেছে—তাঁরই জন্যে আলাদা রাখা থাকে যে প্রধান আসন সে আসনে আজ বসেছেন অন্য এক জন অজানা অচেনা ব্রাহ্মণ। রাগে অভিমানে মুখ ভার ক'রে তিনি গিয়ে যোগনন্দের কাছে নালিশ জানালেন—'মহারাজ! আপনার এ কি অবিচার! আমার জন্যে বাঁধা প্রধান আসনে আজ অন্য ব্রাহ্মণ বসেছেন কেন? কে ও ব্রাহ্মণ—কখন ত এ রাজ্যে দেখিনি ওকে!'

যোগনন্দ উত্তর দিলেন—'উনি আজই নতুন এসেছেন—মন্ত্রী শকটাল এনেছেন ওঁকে। যাক্, আপনার আসন আপনারই থাক্‌বে—আমি ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি'। এই ব'লে তিনি ব্রাহ্মণদের সভার মাঝে গিয়ে বল্‌লেন—'মন্ত্রিবর শকটাল্! আপনার ব্রাহ্মণকে প্রধান আসন ছেড়ে দিতে বলুন—ও আসনে সুবন্ধু বস্‌বেন'। মন্ত্রী শকটাল্—'যে আজ্ঞা, মহারাজ!'—ব'লে ভয়ে ভয়ে চাণক্যের কাছে গিয়ে বল্‌লেন—'দেব! মহারাজের আদেশ আপনাকে অন্য আসনে বস্‌তে অনুরোধ জানাচ্ছেন—এ আসনে সুবন্ধু বস্‌বেন। আমার অপরাধ নেবেন না—আমি মহারাজের আজ্ঞাবহ দূতের কাজ করছি মাত্র'।

শকটালের কথা শুনেই চাণক্যের চোখ জ্বলে উঠ্‌ল—হুঙ্কার দিয়ে বল্‌লেন তিনি—'আপনাদের মহারাজ কি আমাকে প্রধান আসনের অনুপযুক্ত মনে করেন না কি? এত বড় অপমান আমাকে! যাক্, এর প্রতিফল অতি শীঘ্রই পাবেন আপনাদের এই ধৃষ্ট মহারাজ'! চাণক্যের এই রকম গর্জ্জন আর কড়া কথা শুনে যোগনন্দও গেলেন খুব রেগে। তিনি বল্‌লেন—'মন্ত্রিবর! আপনার ব্রাহ্মণ যদি ভালয় ভালয় আসন না ছেড়ে দেন, তা হ'লে তাঁর টিকি ধরে উঠিয়ে দোব! এই বল্‌তে বল্‌তে তিনি এগিয়ে গেলেন চাণক্যের দিকে—অন্য আট জন নন্দও ছুটলেন তাঁর সঙ্গে

সঙ্গে। এদিকে এই ব্যাপার দেখে মন্ত্রিমণ্ডলে সাড়া পড়ে গেছে। বিচক্ষণ প্রধান মন্ত্রী রাক্ষস বুঝলেন যে, যোগনন্দ কাজটা অন্যায় করছেন। তাই তিনি অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে ছুটে এলেন—'হাঁ-হাঁ—মহারাজ, করেন কি, করেন কি!'—বলতে বলতে। কিন্তু তাঁরা এসে বাধা দেবার আগেই যোগনন্দ গিয়ে চাণক্যের গায়ে হাত দিয়ে ফেলেছিলেন! সঙ্গে সঙ্গে চাণক্য জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতই লাফিয়ে উঠলেন আসনের উপর—মাথার টিকি খুলে ফেলে উঁচু গলায় তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন—'এত বড় স্পর্দ্ধা যে অধম রাজার, সেই যোগনন্দকে সাত দিনের মধ্যে সবংশে নির্ব্বংশ করব—আজ থেকে আমার টিকি খোলা রইল—নন্দবংশ ধ্বংসের পর এ টিকি আমি আবার বাঁধব—তার আগে নয়।'

শকটাল্ আর চন্দ্রগুপ্ত দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলেন। এতক্ষণে তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'তে বসেছে দেখে তাঁরা এসে তাড়াতাড়ি চাণক্যের পা জড়িয়ে পড়লেন—'প্রভু! কি করেন, কি করেন—অবুঝের কথায় রাগ করবেন না।'

এদিকে যোগনন্দ তখনও গর্জ্জন করছেন। কাজেই বেগতিক দেখে রাক্ষস প্রভৃতি মন্ত্রীরা রাজাদের ন'জনকে অন্তঃপুরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। আর ওদিকে শকটাল্ আর চন্দ্রগুপ্ত মিলে চাণক্যকে চুপি চুপি সরিয়ে নিয়ে গেলেন রাজসভা থেকে। শকটালের বাড়ীর মধ্যেই চাণক্য গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তাঁর বন্ধু ইন্দুশর্ম্মা প্রস্তুত হয়েই ছিলেন—কেবল চাণক্যের আগুনের মত মুখের দিকে চেয়ে একবার বললেন—'কাল কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী—মারণ-যাগের উপযুক্ত তিথি। কাল রাত্রেই কাজ আরম্ভ করব ত'? চাণক্য শুধু বললেন—'হাঁ, কাল রাত্রেই'।

* * * *

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত প্রায় মাঝামাঝি এগিয়ে গেছে। রাজধানী থেকে কিছু দূরে নদীতীরে এক প্রকাণ্ড শ্মশানে চার জন লোক এক ভয়ানক ব্যাপারে মেতেছিলেন। সে রাতে দৈবের গতিকে শ্মশানে লোক-জন কেউ আসেনি। অন্ধকার রাত—তায় আকাশে ঘন ঘটা—মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল—তাতে অন্ধকার যেন আরও জমাট হ'য়ে দেখা দিচ্ছিল। এক জন লোক—সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক নেভান চিতার উপর একটি মড়ার পিঠে দক্ষিণ-মুখে ব'সে পূজা করছিলেন—তিনি আর কেউ নন—ইন্দুশর্ম্মা। তাঁর পাশে পুঁথি হাতে ব'সে স্বয়ং চাণক্য। দূরে খোলা তলোয়ার হাতে পাহারা দিচ্ছিলেন শকটাল্ আর চন্দ্রগুপ্ত। পূজা শেষ ক'রে চিতার আগুনে ইন্দুশর্ম্মা আহুতি দিলেন নানা মন্ত্র প'ড়ে—শেষ আহুতি দেওয়া হ'ল—'যোগনন্দ-নিধনকারিণ্যৈ কৃত্যায়ৈ স্বাহা' ব'লে। সঙ্গে সঙ্গে শকটাল্ আর চন্দ্রগুপ্ত দেখলেন—এক অন্ধকারময়ী রাক্ষসী মূর্ত্তি সেই আহুতির ধোঁয়ার উপর যেন দেখা দিল—হাতে তার তীক্ষ্ণ অসি—আর মুখে খল্-খল্ করাল হাসি। ভয়ে চন্দ্রগুপ্তের বুকের স্পন্দন যেন থেমে যাবার মত হ'ল—শকটাল্ চোখ বুজে ব'সে পড়লেন। কিন্তু পরক্ষণে আর সেই ভীষণ মূর্ত্তিকে দেখা গেল না—সে যেন সেই গাঢ় অন্ধকারেই মিশিয়ে গেল। কিন্তু দূর থেকে তার সেই অট্টহাস্য বাতাসে ভেসে আসতে লাগল।

ইন্দুশর্ম্মা আর চাণক্য তখন নদীতে স্নান ক'রে উঠে এসে বললেন—'দৈবক্রিয়া ত নির্ব্বিঘ্নে শেষ হয়েছে! সপ্তাহের মধ্যে নিদারুণ দাহজ্বরে যোগনন্দ মারা পড়বে—কোন চিকিৎসকের সাধ্য নেই যে তাকে বাঁচায়—হোমের ফলে যে কৃত্যা আজ জন্মাল—সে এখনই গিয়ে অন্তের অলক্ষ্যে রাজার দেহে ঢুকে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বরে রাজা হ'য়ে থাকবে অচেতন—আর চৈতন্য তার ফিরবে না। সাত দিনের মধ্যেই যুদ্ধের আয়োজন শেষ করতে হবে। মন্ত্রিবর! বৃষল! এ যুদ্ধের ভার তোমাদের উপর'।

[ক্রমশঃ।

বোশেখ-দুপুর

শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী

বোশেখের, আগুন-ঝরা দুপুর বেলা,
দূরে ওই শালিখগুলো করছে খেলা।
হাওয়াতে, পাল উড়িয়ে নৌকা চলে,
রূপালি, রোদ পড়েছে নদীর জলে!
খুসীতে, ঝিক্‌মিকিয়ে উঠছে হেসে,
জানি না, নৌকা চলে কোন বিদেশে!
মাঝিরা, গল্প করে কচ্ছে হাতে,
দুপুরের, রৌদ্রময়ী নিঝুম রাতে!

খোলা এই, জানালা দিয়ে দেখছি চেয়ে
বোশেখের, দুপুর চলে কী গান গেয়ে!
দূরে কে, একলা পথে ফিরছে গাঁয়ে
বসেছে, ক্লান্তিতে সে বটের ছায়ে!
ঘুমেতে, জড়িয়ে আসে চোখের পাতা
বাতাস এ, মধুর লাগে আগুন তাতা!
ঘুঘু আর, দোয়েল ডাকে হঠাৎ থেকে
এ যেন, ছবি যে কেউ রাখলো এঁকে!

জানালায়, একলা বসে ভালই লাগে
চোখেতে, রঙীন কতো স্বপ্ন জাগে!



সোনার আনারস

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

চতুর্থ

সেই রাত্রে

ঢং ঢং ঢং ঢং—

জয়ন্ত প্রথম রাত্রেই শয্যাগ্রহণ করেছিল এবং মাণিকও। কিন্তু তাদের ঘুম অত্যন্ত সজাগ।

ঘড়ি বার-চারেক বাজতে না বাজতেই জয়ন্ত বিছানার উপরে ধড়্‌মড়্‌ ক'রে উঠে ব'সে ডাকলে, "মাণিক!"

মাণিকও তৎক্ষণে বিছানার উপরে উঠে বসেছে। দুই হাতে দুই চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বললে, "শুনেছি। রাত বারোটা বাজছে।"

—"আমাদের পোষাক পরাই আছে। উঠে পড়। ঐ ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিতে ভুলো না। চল, আর দেরি নয়।" জয়ন্ত গাত্রোত্থান ক'রে নিজের ব্যাগটার দিকে বাহু বিস্তার করলে।

মাণিক বললে, "সুন্দর বাবুর নাক এখনো গান গাইছে। যাবার সময়ে ওকে ব'লে গেলে হয় না?"

—"হুম্! না, আমার নাক এখনো গান গাইছে না! তোমার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি!"

মাণিক সবিস্ময়ে ফিরে দেখলে, সুন্দর বাবু জুল্‌-জুল্‌ ক'রে তাকিয়ে আছেন তারই মুখের পানে। বললে, "কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্! স্বচক্ষে দেখলুম আপনার নিদ্রিত চক্ষু, আর স্বকর্ণে শুনলুম আপনার জাগ্রত নাসিকা-ধ্বনি! অথচ আপনি—"

সুন্দর বাবু উঠে বসতে বসতে বাধা দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ! আমার নাক ডাকলেও আর আমার চোখ বুঁজে থাকলেও আমি নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়িনি। তোমরা যাবে হাড়ীকাঠে মাথা গলাতে, আর আমি ঘুমিয়ে অজ্ঞান হয়ে থাকব? আমি কি অমানুষ? আমি কি তোমাদের ভালোবাসি না?"

জয়ন্ত বললে, "প্রতাপ চৌধুরীর বাড়ীখানাকে আপনি হাড়ীকাঠ ব'লে মনে করেন না কি?"

—"নিশ্চয়! প্রতাপ চৌধুরীর যেটুকু বর্ণনা শুনেছি তাই-ই যথেষ্ট! তার উপরে, এই কালো ঘুটঘুটে রাতে, নর্দ্দমার নল ব'য়ে তোমরা ওঠবার চেষ্টা করবে এক অজানা শত্রুপুরীর তেতলায়! এমন অপচেষ্টার কথা কেউ কখনো শুনেছে না কি? উঃ! তোমাদের এই মৎলোব শুনে পর্য্যন্ত বুক এত ধড়্‌-ফড়্‌ করছে যে, হয় তো আমার কোন শক্ত ব্যামো হবে! এ-সব শুনেও কেউ কখনো নাকে সর্ষের তেল দিয়ে অঘোরে ঘুমোতে পারে?"

মাণিক মুখ টিপে হেসে বললে, "আপনি নাসিকার জন্য সর্ষের তৈল ব্যবহার করেননি বটে, কিন্তু আপনার নাসিকা যে ভীষণ কোলাহল করছিল, সে-বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই।"

সুন্দর বাবু বিছানার উপর থেকে লাফিয়ে প'ড়ে মার-মুখো হয়ে চীৎকার করে বললেন, "আমার নাসিকা কোলাহল করছিল, বেশ করছিল! আমার নাসিকা যত-খুসি কোলাহল করতে পারে তাতে তোমার কি হে বাপু? ফাজিল ছোক্‌রা! খালি খালি আমার পিছনে লাগা?"

জয়ন্ত মৃদু হেসে বললে, "শান্ত হোন সুন্দর বাবু, শান্ত হোন! মাণিক, এখন মস্করা করবার সময় নেই। জানো, আমাদের সামনে রয়েছে কি গুরুতর কর্ত্তব্য?"

মাণিক বললে, "জানি জয়ন্ত, জানি! কিন্তু সুন্দর বাবুর মাথার উপরে ঐ লাউয়ের মতন তেলা টাক, আর কাঁকড়ার মতন ওঁর ঐ এক জোড়া গোঁফ, আর ওঁর ঐ থল্‌-থলে বিপুল ভুঁড়িটিকে দেখলেই আমার মন যেন অট্টহাস্য না ক'রে থাকতে পারে না! বেশ সুন্দর বাবু, আমাকে ক্ষমা করুন! আজকের মত আমি মৌনব্রত অবলম্বন করলুম।"

সুন্দর বাবুর সমস্ত রাগ যেন জল হয়ে গেল একেবারে। তিনি হঠাৎ এগিয়ে এসে ডান হাতে জয়ন্তর কাঁধ এবং বাম হাতে মাণিকের কাঁধ চেপে ধ'রে করুণ কণ্ঠে বললেন, "ভাই জয়ন্ত! ভাই মাণিক! আমাকে এখানে একলা ফেলে কেন তোমরা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ?"

জয়ন্ত বললে, "আমি তো আপনাকে একলা থাকতে বলছি না। আপনিও তো অনায়াসেই আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন!"

সুন্দর বাবুর দুই ভুরু উঠে গেল কপালের দিকে এবং তাঁর সর্ব্বাঙ্গের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল একটা প্রবল উত্তেজনার শিহরণ! আড়ষ্ট ভাবে তিনি বললেন, "হুম্! ছাতের জল বেরুবার নল বয়ে আমি উঠব তেতলার উপরে? জয়ন্ত, তোমার মাথা কি একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছে? হুম্ হুম্, হুম্! আমার এই শরীরটিকে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না?"

—"বেশ তো, আপনি না হয় মাটির উপরে দাঁড়িয়ে থেকেই পাহারা দেবার চেষ্টা করবেন!"

—"পাগল! আজ আমি এখানে এক দিনেই তিন বার তিনটে গোখ্‌রে সাপকে স্বচক্ষে দেখেছি! এখানকার মাটি ছাতের জল বেরুবার নলের চেয়েও বিপদজনক! আমি ভাই ছাপোষা মানুষ—ঘরে আছে স্ত্রী আর আধ-ডজন ছেলে-মেয়ে। আমার পক্ষে এত তাড়াতাড়ি যমালয়ে যাবার চেষ্টা করা উচিত নয়।"

জয়ন্ত দরজার দিকে অগ্রসর হ'তে হ'তে বললে, "বেশ, তাহ'লে আপনি এইখানেই নিরাপদে অবস্থান করুন। আমাদের আর বাধা দেবেন না—আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

সুন্দর বাবু তাড়াতাড়ি জয়ন্তর সামনে এসে পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে বললেন, "তার চেয়ে জয়ন্ত, আমার আর একটা পরামর্শ শোনো।"

"কি পরামর্শ?"

—"কালকেই টেলিগ্রাফ করে আমি এখানে এক দল পুলিস ফৌজ আনাব। তার পর সদল-বলে গিয়ে ঘেরাও করব প্রতাপ চৌধুরীর বাড়ী।"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, "তা হয় না সুন্দর বাবু। হয়তো গ্রামের দিকে দিকে আছে প্রতাপ চৌধুরীর চরেরা। এখানে হঠাৎ পুলিস ফৌজের আবির্ভাব দেখলেই যথাস্থানে সেই খবর গিয়ে পৌঁছবে। তার পর? তার পর আমরা দেখব গিয়ে খাঁচা খালি—পাখীরা কোথায় অদৃশ্য! এখন আর কথা-কাটাকাটি করবার সময় নেই। এস মাণিক!"

সুন্দর বাবু হতাশ ভাবে আবার শয্যার উপরে ব'সে পড়লেন, তিনি আর একটিও বাক্যব্যয় করবার অবসর পর্য্যন্ত পেলেন না। জয়ন্ত এবং মাণিক ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুতপদে।

* * * *

আলো-হারা কালো রাতের বুকে জাগছিল খালি ঝিল্লীদের কণ্ঠ এবং থেকে থেকে তিমির-তুলি দিয়ে আঁকা গাছপালার পাতায় পাতায় বাতাস ফেলছিল সুদীর্ঘ নিশ্বাস। কোথাও আর কোন শব্দ নেই। রাতের নিজস্ব একটা ঝিম্-ঝিম্ ধ্বনি আছে বটে, কিন্তু সে ধ্বনি কানে কেউ শোনে না, প্রাণে করে অনুভব।

নির্জ্জন পল্লী-পথ। কাছে বা দূরে কোন কুটীর বা বাড়ীর ভিতর থেকে ফুটে উঠছে না এক টুকরো আলোক-রেখাও।

খানিক দূর অগ্রসর হবার পর জয়ন্ত হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মাণিক সুধোলে, "দাঁড়ালে কেন?"

—"পিছনে একটা শব্দ শুনলুম।"

—"কি-রকম শব্দ?"

—"শুক্‌নো পাতার উপরে পায়ের শব্দ।"

—"কুকুর কি শেয়াল যাচ্ছে।"

—"হ'তে পারে। চল।"

কিছু দূর এগিয়ে জয়ন্ত আবার দাঁড়িয়ে প'ড়ে বললে, "আবার পায়ের শব্দ শুনছি।"

এবারে মাণিকও শুনতে পেয়েছিল। সে বললে, "জয়ন্ত, কেউ কি আমাদের অনুসরণ করছে?"

—"অসম্ভব নয়। কেউ হয়তো আমাদের গতিবিধির উপরে লক্ষ্য রেখেছে। টর্চ জ্বালো।"

জয়ন্ত ও মাণিক দু'জনেই টর্চ জ্বেলে দিকে দিকে আলোক নিক্ষেপ করলে। কোন মনুষ্য-মূর্ত্তির বদলে দেখা গেল, একটা শৃগাল ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে।

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, "কিন্তু আমরা যে শব্দ শুনেছি তা শেয়ালের পায়ের শব্দ নয়। চুলোয় যাক্। এগিয়ে চল মাণিক!"

—"কিন্তু পিছনে শত্রু নিয়ে কি সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে?"

—"কত ধানে কত চাল দেখাই যাক্ না। এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।"

দু'জনে অগ্রসর হ'ল। কাছে এবং দূরে দুই গাছের ডালে ব'সে দু'টো প্যাঁচা চ্যাঁ-চ্যাঁ ভাষায় পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথন করছিল। রাত্রি-জগতের বিপুল কালো প্রজাপতির মত একটা বাদুড় উড়ে গেল বাতাসকে সশব্দে ডানা দিয়ে আঘাত করতে করতে। তার পর আবার নিস্তব্ধতা।

পিছনে সেই পদশব্দ।

জয়ন্ত চুপি চুপি বললে, "শুনছ?"

—"হুঁ।"

—"এই ঝোপটার আড়ালে তাড়াতাড়ি ব'সে পড়।"

দু'জনে গা-ঢাকা দিলে ঝোপের আড়ালে গিয়ে।

খানিকক্ষণ কিছু শোনা গেল না। তার পর মাঝে মাঝে শোনা যেতে লাগল পায়ের শব্দ। বেশ বোঝা গেল, কেউ চলতে চলতে থেমে দাঁড়িয়ে পড়ছে। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল একটা অস্পষ্ট অপচ্ছায়া।

ঝোপের প্রায় পাশে এসে আবার দাঁড়িয়ে প'ড়ে মূর্ত্তি নিজের মনেই বললে, "কি আশ্চর্য্য! এইখানেই তো ছিল, গেল কোথায়?"

জয়ন্ত হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে বাঘের মতন তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং নিজের দুই অতি-বলিষ্ঠ বাহু বাড়িয়ে তাকে করলে প্রচণ্ড আলিঙ্গন।

আর্ত্ত, অবরুদ্ধ কণ্ঠে লোকটা বললে, "ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে!"

বাহুর বন্ধন একটু আল্‌গা ক'রে জয়ন্ত বললে, "কে তুই?"

—"আমি এই গাঁয়েই থাকি।"

—"তুই আমাদের পিছু নিয়েছিস্ কেন?"

—"না, আমি আপনাদের পিছু নিইনি। আমি ভিন্ গাঁয়ে গিয়েছিলুম, ফিরতে রাত হয়ে গেল।"

—"তোর নাম কি?"

—"শ্রীমাণিকচাঁদ বিশ্বাস।"

—"আরে, তুমিও মাণিক? তাহ'লে এ যে হয়ে দাঁড়াল মাণিকজোড়! ওহে আমাদের পুরাতন মাণিক, এখন এই নতুন মাণিকটিকে নিয়ে কি করা যায় বল দেখি?"

—"আপাততঃ হাত-পা-মুখ বেঁধে ওকে এই ঝোপের ভিতরে ফেলে রেখে যাওয়া যাক্। তার পর বাসায় ফেরবার সময়ে ওর সঙ্গে ভালো ক'রে আলাপ জমালেই চলবে।"

—"উত্তম প্রস্তাব। তাহ'লে এস, আমাকে সাহায্য কর।"

—"আমাকে ছেড়ে দিন মশাই, ছেড়ে দিন! আমি নির্দ্দোষ, নিরীহ ব্যক্তি!"

তার পকেট হাৎড়ে জয়ন্ত আবিষ্কার করলে একখানা মস্ত বড় শাণিত ছোরা! বললে, "তুমি যে কি-রকম নিরীহ ব্যক্তি, এই বাঘ-মারা ছোরাখানা দেখেই বেশ বুঝতে পারছি। মাণিক, চটপট বেঁধে ফেল এই খুনে গুণ্ডাটাকে। আমাদের অনেক কাজ বাকি।"

লোকটার হাত-পা-মুখ বেঁধে তাকে ঝোপের ভিতরে নিক্ষেপ ক'রে জয়ন্ত ও মাণিক আবার হ'ল অগ্রসর।

আরো খানিক পরে তারা এসে দাঁড়াল প্রতাপ চৌধুরীর বাড়ীর সুমুখে।

চারি দিক নিঃসাড় এবং নিবিড় অন্ধকারের কালো বনাত দিয়ে মোড়া। বাড়ীর কোনখানেই কোন জীবনের লক্ষণ নেই।

অতি-অনায়াসেই তারা পাঁচিল টপ্‌কে ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল।

কিছুক্ষণ স্থির ভাবে তারা কাণ পেতে রইল, কিন্তু অন্ধকারের ভিতরে শুনতে পেলে না কোন রকম সন্দেহজনক শব্দ।

জয়ন্ত ফিস্‌-ফিস্‌ ক'রে বললে: "মাণিক, আমাদের ছাতে ওঠবার সিঁড়ি—অর্থাৎ বৃষ্টির জল বেরুবার সেই নলটা ঐ দিকের কোথাও আছে। এখানে টর্চ ব্যবহার করা নিরাপদ নয়। বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আমাদের নলটাকে খুঁজে বার করতে হবে।"

চক্ষু অন্ধকারে অন্ধ, কাজটা খুব সহজ হ'ল না। কিন্তু অবশেষে পাওয়া গেল নলটাকে।

—"মাণিক, একসঙ্গে আমাদের দু'জনের ভার এই নলটা হয়তো সইতে পারবে না। তুমি নীচেই দাঁড়াও। আগে আমি ছাতে গিয়ে উঠি—তার পর তুমি।"

দু'জনেই যখন ছাতের উপরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন হঠাৎ রাত্রির স্তব্ধতাকে যেন খণ্ড খণ্ড ক'রে দিয়ে কোথা থেকে চীৎকার ক'রে উঠল একটা কুকুর। বার-তিনেক ঘেউ-ঘেউ করেই আবার সে চুপ করলে।

জয়ন্ত চিন্তিত স্বরে বললেন, "মাণিক, কুকুরটা হঠাৎ কেন ডাকলে?"

—"কুকুর কেন ডাকছে, কুকুরই তা জানে। কুকুরের ভাষা আমি শিখিনি।"

—"কিন্তু ঐ কুকুরটার ডাক অস্বাভাবিক বলে মনে হল না কি?"

—"তা হ'ল বটে।"

—"আমার কি মনে হ'ল, জানো?"

—"কি?"

—"ও যেন নকল কুকুরের ডাক।"

—"মানে?"

—"কুকুরের স্বরের অনুকরণে চীৎকার করলে যেন কোন মানুষ।"

—"তুমি কি বলতে চাও জয়ন্ত?"

—"আমি বলতে চাই, ওটা কুকুরের ডাক নয়, মানুষের সঙ্কেত-ধ্বনি! কেউ যেন কাকে কোন কারণে সাবধান ক'রে দিলে।"

—"তাহলে শত্রুরা কি জানতে পেয়েছে যে, তাদের আড্ডায় আবির্ভূত হয়েছে আমাদের মতন দু'জন অনাহূত অতিথি?"

—"খুব সম্ভব, তাই।"

—"এ ক্ষেত্রে আমাদের কী করা উচিত?"

—"এখন উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন ভুলে যাও মাণিক! এখন ছাতের উপরেই থাকি, আর নল বয়ে আবার নীচেই নেমে যাই, দু'টোই হচ্ছে এক কথা। ঐ কোণে রয়েছে চিলের ছাত। ওর তলায় আছে বাড়ীর ভিতরে নামবার সিঁড়ি। এস, মরবার বা বন্দী হবার আগে দেখে নি, এই বাড়ীর ভিতরটা কি-রকম। কোন ভয় নেই, বিপদ নিয়েই তো আমাদের কারবার! এরও চেয়ে ঢের বেশী বিপদকে আমরা ফাঁকি দিয়েছি, আজও কি আর পারব না? এস, দেখি—সাধুর সহায় ভগবান্!"

চিলের কুঠুরীর তলাতেই ছিল সিঁড়ি। জয়ন্ত ও মাণিক দ্রুতপদে নীচের দিকে নেমে গেল—টর্চের আলো করলে তাদের পথনির্দ্দেশ!

টর্চের আলো ফেলে ফেলেই খুব তাড়াতাড়ি তারা দেখে নিলে, এদিকে বারান্দার কোলে রয়েছে পাশাপাশি তিনখানা ঘর। প্রথম এবং দ্বিতীয় ঘরের দরজা তালাবন্ধ, কিন্তু তৃতীয় ঘরখানা তালাবন্ধ নয়—যদিও বাহির থেকে তার শিকল ছিল তোলা।

দু'জনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে, তিনতলা থেকে দোতলায় নামবে কি নামবে না, এমন সময়ে শোনা গেল বোধ হয় একতলার সিঁড়িতেই উচ্চ পদশব্দ! এক জনের নয়, দুই জনের নয়—অনেক লোকের পদশব্দ। এবং তারা উপরে উঠছে অত্যন্ত দ্রুতপদেই!

—"মাণিক, মাণিক!"

—"কি জয়ন্ত?"

—"ফাঁদে পড়েছি—এক রকম যেচেই। আর ভাববার সময় নেই। এই দু'টো ঘরই তালাবন্ধ, কিন্তু ও-ঘরটার বাহির থেকে কেবল শিকল তোলা আছে। চল, আমরা ঐ ঘরেই ঢুকে ভিতর থেকে খিল এঁটে দি।"

—"কিন্তু তাহ'লে যে আমাদের অবস্থা হবে কলে-পড়া ইঁদুরের মতন!"

—"মোটেই নয়। অকারণেই আমরা অটোমেটিক' রিভলভার সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসিনি। একটা কোণ পেলে হয়তো আমরা যুদ্ধ ক'রে অনেক শত্রু বধ করতে পারব।"

চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে জয়ন্ত ও মাণিক তৃতীয় ঘরের শিকল খুলে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে খিল তুলে দিলে। বাইরের দ্রুত পদশব্দগুলো তখন হাজির হয়েছে ত্রিতলের বারান্দার উপরে!

অকস্মাৎ অন্ধকার ঘরের ভিতর থেকেই বিকট স্বরে হা-হা-হা-হা অট্টহাস্য করে কে বলে উঠল, "এসেছ বন্ধুগণ? এস, এস, আমি যে তোমাদেরই পথ চেয়ে আছি। হা-হা-হা-হা-হা!"

ঘরের বাইরে এবং ভিতরেও শত্রু! জয়ন্ত ও মাণিক দাঁড়িয়ে রইল মূর্ত্তির মত। এতটা তারা কল্পনা করতে পারেনি। [ক্রমশঃ



শিল্পী—জ্যোতিষ সিংহ





সূয্যিঠাকুর ওঠার সাথে
রাজ্যিখানা বেজায় তাতে
মাছেরা সব দলে দলে
জল থেকে লাফ দিয়ে বলে—
"এ কী বিষম সাজা
জলেই ভাজা ভাজা।"
শুনে ঠাকুর চটেই ল'ল
বলেন—"এটা গ্রীষ্মকাল।"

* * *

রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ
ঝলসায় সারা গাঁ,
গাছগুলো পুড়ে খাক্,
শুক্‌নো ডালেতে কাক
তেষ্টায় টা-টা
কাত্‌রায় কা—কা!
সেই ঠিক্ দুপুরে
পালেদের পুকুরে
নাকটি ভাসিয়ে ঘোষ
দম ছাড়ে ভোঁস্ ভোঁস্।



* * *

বুড়ো অশথের পাতায় পাতায়
খরো হাওয়া বয় তরতরিয়ে
জামরুল ফুল ঝরিয়ে বেড়ায়
কাঠবেড়ালিরা ঝর্‌ঝরিয়ে।



* * *

দুপুরের শেষে ঝিরঝিরে হাওয়া
দীঘি-পুকুরের বুক ছুঁয়ে
পানা ঝাঁঝি আর কলমীর দল
ছুটিয়ে নে' যায় এক ফুঁয়ে।
পাড়াগাঁর খুকু কুড়িয়ে বকুল
খোঁপায় তাদের মালা জড়ায়
হলদে পাখীরা ডেকে চলে যায়।
গরমের দিনে বেলা গড়ায়।



গরমদিনের ছড়াছবি

রেবতীভূষণ ঘোষ



এস ডি ডি

হকি খেলার অবসান :—

বাইটন :—কলিকাতায় হকি মরশুম শেষ হইয়াছে। পূর্ব্ব-ভারতের শ্রেষ্ঠতম প্রতিযোগিতা বাইটন কাপের শেষ নিষ্পত্তির পরে অন্যান্য স্থানীয় ছোট-খাটো প্রতিযোগিতার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হকি খেলার অবসান হইয়া গিয়াছে। এবার স্থানীয় হকি-মহলে পোর্ট কমিশনার্স দল একযোগে প্রথম ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বি, ই, কলেজ, রেঞ্জার্স ও কাষ্টমস অনুরূপ সম্মানের অধিকারী হইয়াছে। বাইটন প্রতিযোগিতায় এবার মোট ৪৩টি দলের মধ্যে ২০টি বহিরাগত দলকে যোগদান করিতে দেখা যায়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল, বোম্বায়ের ডকইয়ার্ড, ইন্দোরের কল্যাণমল মিলস, কানপুরের কমলা ক্লাব ও ভূপাল ওয়াণ্ডারার্সের ন্যায় শক্তিশালী ও খ্যাতনামা দল-চতুষ্টয় কলিকাতায় আসার সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহার মূলগত কারণ কি? প্রতি বৎসর বি, এইচ, এ কর্ত্তৃপক্ষের বিরাট বাইটন তালিকা প্রণয়নে উৎসাহের অন্ত থাকে না। কিন্তু ফলতঃ দেখা যায়, খ্যাতনামা দলগুলি প্রায় সকলেই অনুপস্থিত। বাঙলার ক্রীড়ামোদী জনসাধারণ প্রতিবারেই এইরূপ নিরুৎসাহতায় এখন সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন খেলোয়াড়ী দলের যোগদান কি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নহে? যদি তাহা হয়, তবে তাহাদের এই অখেলোয়াড়ী মনোভাবের কারণ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বাইটনে বিভিন্ন স্থানীয় ও আগন্তুক দলের পরিচয়ে ভারতীয় হকি সম্বন্ধে আশান্বিত হওয়ার মত কিছু কারণ নাই। ভারতীয় হকি দলকে তাহাদের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে এখন হইতে ভারতকে অবহিত হইতে হইবে। প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষদের নিজ নিজ দলকে আরও অধিকতর অনুশীলনের সুযোগ দিতে হইবে। শুধু বোম্বায়ের আগা খাঁ প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াই ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় খেলিলে খেলোয়াড়গণ পরস্পরের মধ্যে পরিচিত ও নিজ নিজ প্রকৃত অবস্থার স্বরূপ জানিবার সুযোগ পাইবে। এবার বহিরাগত দলগুলির মধ্যে বোম্বায়ের লুসিটানিয়ান্স ও এলাহাবাদের এম, ওয়াই, এম, এ দলের নাম উল্লেখযোগ্য। তাহারা উভয় প্রান্তে সেমিফাইন্যালে উন্নীত হয় ও যথাক্রমে পোর্ট কমিশনার্স ও বি এন রেলওয়ের বিরুদ্ধে পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয়। এক গোলে পশ্চাৎপদ হইয়াও পোর্ট দল শেষ পর্য্যন্ত ২-১ গোলে বি এন রেল দলকে পরাজিত করিয়া বাইটন কাপে জয়ী হইয়াছে। পোর্ট দল ইতিপূর্ব্বে ১৯৩০ সালে বাইটন ফাইন্যাল প্রথম বার খেলিয়া কাষ্টমসের নিকট পরাজিত হয়।

রেল দল এ যাবৎ মোট ১১বার ফাইন্যালে উঠিয়া পাঁচ বার বিজয়ী হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৯৪২ সাল হইতে এই পর্য্যন্ত তাহারা পাঁচটি ফাইনালে খেলার যোগ্যতা দাবী করিয়াছে ও ১৯৪৩-৪৫ সাল পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি তিন বৎসর তাহারা কাপ-বিজয়ী আখ্যা লাভ করিয়াছে।

এবার পোর্ট দল যথাক্রমে নাগপুর মুসলিমকে ৩—০, দিল্লী ইণ্ডেপেণ্ডেণ্টসকে ২—০, রামপুর হইতে আগত রোহিল্লা ক্লাবকে ৪—১ ও বোম্বাইয়ের লুসিটানিয়ান্সকে ১—০ গোলে এবং রেল দল বাটলী সিটি স্পোর্টসকে ৭—০, পুলিসকে ১—১ ও ৩—১; জব্বলপুর স্পোর্টিংকে ২—১ ও এলাহাবাদের এম ওয়াই এম এ'কে অতিরিক্ত সময়ে ১—০ গোলে পরাজিত করিয়া ফাইনালে উন্নীত হয়।

শেষ খেলায় প্রথমার্দ্ধে ১১ মিনিটে লেনন ও ২৩ মিনিটে ফুলস গোল করে (১—১)। বিরতির পরেই বেনসের দেওয়া গোলে খেলার নিষ্পত্তি হয় (২—১)।

পোর্ট কমিশনার্স :—পীক; সার্জেণ্ট ও মীড; ম্যাকমোহন, কাপুর ও এস দাস, ফুলস, বেনস, টোডী, জ্যাক্সেন ও রোচ।

বি এন রেলওয়ে :—ডেভিড; ট্যাপসেল ও মাইনস; পিণ্টো, ক্লডিয়াস ও গ্যালিবর্ডী; হিল, আর কার, গ্রাকেন, বুনীয়ান ও লেনন।

আম্পায়ারদ্বয়, বি সি মিশ্র ও ডব্লিউ স্কট।

লীগ প্রতিযোগিতা :—

লীগ-প্রতিযোগিতায় প্রথম ডিভিসনে এ বৎসর পোর্ট কমিশনার্স দল চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে। পোর্ট দল এ বৎসর শুধু যে বাইটন কাপে ও প্রথম ডিভিসন লীগে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে তাহা নহে, তাহারা শীতকালীন হকি লীগের শেষ মীমাংসার খেলায় মোহনবাগানকে পরাজিত করিয়া উক্ত লীগ চ্যাম্পিয়ন হইয়াছে। দ্বিতীয় ডিভিসন বি লীগেও তাহারা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। বস্তুতঃ আলোচ্য বৎসরে স্থানীয় হকি মহলে পোর্ট কমিশনার্স দল নিজেদের শ্রেষ্ঠতম দল বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে। লীগ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান দল বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন রাখিতে পারে নাই। গ্রীয়ারের বিরুদ্ধে অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ করায় ও পোর্ট দলের বিরুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় তাহাদের লীগ জেতার সমস্ত আশা বিনষ্ট হয়। রেঞ্জার্স ও পোর্ট কমিশনার্স—উভয়ে ২৪ পয়েণ্ট অর্জন করিয়া একযোগে প্রথম স্থান অধিকার করে। ফলে চরম মীমাংসার জন্য তাহারা পুনরায় মিলিত হইলে পোর্ট কমিশনার্স টোডী কর্ত্তৃক দেওয়া দুই গোলে জয়ী হয় ও লীগ-বিজয়ের গৌরব অর্জ্জন করে। মিলিটারী মেডিকেল দল শেষ পর্য্যন্ত নিজেদের নাম প্রত্যাহার করায় নিম্নতম স্থান এড়াইবার জন্য লীগ তালিকার নিম্নস্তরের দলগুলির মধ্যে সাড়া পড়িয়া যায়। বিভিন্ন দল পরস্পরের মধ্যে পয়েণ্ট-দাতব্য ব্যাপারে বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। আইনের গণ্ডী বজায় রাখিয়া শরণাগত দলকে রক্ষা করার বাসনা বহু দলকে প্রলুব্ধ করে। খেলার জগতেও এই কলুষ নীতির আবির্ভাবে খেলার খেলোয়াড়ী ভাব অন্তর্হিত হইতে চলিয়াছে। ক্ষমতা-পিয়াসী ক্লাব-কর্ণধারগণ নির্ব্বাচন-ব্যাপারে ভোটলিপ্সুতার বশবর্ত্তী হইয়াই এইরূপ মহানুভবতা দেখাইতে প্রয়াসী হইয়া পড়েন বলিয়া এক শ্রেণীর সমালোচকগণের ধারণা। শেষ পর্য্যন্ত সকলে পরিত্রাণ পাইলেও পুলিশ দল কোন ক্রমেই প্রথম ডিভিসন লীগ হইতে অবনমিত হওয়ার গ্লানি হইতে অব্যাহতি পায় নাই।

প্রেস ক্লাব একমাত্র গোলে ভবানীপুরকে পরাজিত করিয়া দ্বিতীয় ডিভিসন লীগে চ্যাম্পিয়ন হইয়াছে। তৃতীয় ডিভিসনে উক্ত গৌরব অর্জন করিয়াছে সাউথ ক্যালকাটা দল। তাহারা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির খেলায় সি, ই, এসকে ৩-০ গোলে পরাজিত করিয়া এই সম্মান লাভ করে।

লীগ কোঠায় কে কোথায়

প্রথম ডিভিশন খেলা

	খে	জ	প	ড্র	স্ব	বি	পঃ
পোর্ট কমিঃ	১৫	১০	৪	১	২৪	৬	২৪
রেঞ্জার্স	১৫	১০	৪	১	১৮	৪	২৪
মোহনবাগান	১৫	৯	৫	১	১৭	৬	২৩
গ্রীয়ার	১৫	১১	১	৩	১৯	১০	২৩
ডালহৌসী	১৫	৬	৪	৫	১৮	১৫	১৬
মেসারার্স	১৫	৬	৪	৫	১৬	১৭	১৬
বি জি প্রেস	১৫	৫	৫	৫	১৮	১৭	১৫
মহঃ স্পোর্টিং	১৫	৪	৫	৬	১০	১১	১৩
পাঞ্জাব স্পোর্টস	১৫	৪	৪	৭	১৩	১৮	১২
পার্শী	১৫	৩	৫	৭	১১	১৮	১১
কাষ্টমস	১৫	৩	৫	৭	১১	১৫	১১
বি এ রেলওয়ে	১৫	৪	৩	৮	১০	১৮	১১
আর্ম্মেনিয়ান্স	১৫	১	৯	৫	৮	১১	১১
ইষ্টবেঙ্গল	১৫	৩	৫	৭	৭	১৪	১১
কলেজিয়ান্স	১৫	৪	২	৯	১২	১৯	১০
পুলিশ	১৫	৪	১	১০	৮	২৫	৯

মিলিটারী মেডিক্যেলসের নাম প্রত্যাহৃত।

অন্যান্য হকি প্রতিযোগিতার বিজয়িগণ—

লক্ষ্মীবিলাস কাপ :—পার্শী ইষ্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে জয়ী হয়। ম্যাডান (২) ও ভ্যাপু গোল করে।

ল্যাগডেন শীল্ড :—মোহনবাগান ৩-১ গোলে বি জি প্রেসকে পরাজিত করে। প্রথমার্দ্ধে বিজয়ী দল একটি গোল করে। কুশলসিং অধীপ মুখার্জ্জী ও দীনদয়াল বিজয়িপক্ষে ও গার্ডনার বিজিত পক্ষে যথাক্রমে গোল করে।

কল্যাণ শীল্ড :—শেষ খেলায় কাষ্টমস পক্ষে ডেভিস জয়মূলক গোলটি প্রথমার্দ্ধের শেষ ভাগে করিলে পার্শীদল পরাজিত হয়।

কাইভান কাপ :—দুই দিন অমীমাংসার পরে ওয়াই এম, সি, একে ২-০ গোলে সেন্ট জোসেফস কলেজ পরাজিত করে। ম্যাকগাওয়েন ও ডি টেলর গোল দুইটি করে।

আশুতোষ চৌধুরী কাপ :—বি, ই, কলেজ সেন্ট জোসেফের বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে জয়ী হয়। এব্রাহাম (২) ও জে টেরী বিজয়ী দলের ও বিজিত পক্ষে ষ্টুয়ার্ট গোল করে।

বিলাতে ভারতীয় ক্রিকেট দল :—

ভারতীয় ক্রিকেট দল সর্বপ্রথম খেলায় উরষ্টার দলের নিকট ১৬ রাণে পরাজয় বরণ করিয়াছে। পরবর্ত্তী খেলাতে অক্সফোর্ড দলের সহিত অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ হইয়াছে। এই দুইটি খেলার একটি খেলাতেও ভারতীয় খেলোয়াড়গণ ব্যাটিং, বোলিং, এমন কি ফিল্ডিং বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে নাই। বৈদেশিক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞগণ যাঁহারা এই দুইটি খেলা দেখিয়াছেন তাঁহারা ভারতীয় দলের ফিল্ডিং বিষয়ের নিন্দা করিয়াছেন। তবে তাঁহারা ব্যাটিংয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়গণ যে ভাল ফলাফল প্রদর্শন করিবে ইহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। বোলিং বিষয়ে বিন্নু, মানকড় ও সিন্ধের খুবই প্রশংসা করিয়াছেন। ইঁহারা বলিয়াছেন যে, এই দুই জন বোলার ইংলণ্ডের জলবায়ুর সহিত পরিচিত হইলে উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবেন। ব্যাটিংয়ে মার্চেন্ট, হাজারী, গুল মহম্মদ ও আর এস মোদীর সুখ্যাতি তাঁহারা করিয়াছেন।

উরষ্টার বনাম ভারতীয় দলের খেলা

খেলার ফলাফল :—উরষ্টারের প্রথম ইনিংস :—১১১ রাণ (সিঙ্গলটন ৪৭, হুপার ৩৫, হাউওয়ার্থ ২৭, মানকড় ২৬ রাণে ৪টি, অমরনাথ ৩২ রাণে ২টি উইকেট পান)।

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস :—১১২ রাণ (আর এস মোদী ৩৪, মার্চেন্ট ২৪ গুল মহম্মদ ২১, পতৌদির নবাব ২১, মানকড় ২৩, সর্ব্বাতে নট আউট ২৪, পার্কস ৫৩ রাণে ৫টি, হাউওয়ার্থ ৪৭ রাণে ৩টি ও জ্যাকসন ৬০ রাণে ২টি উইকেট পান)।

উরষ্টারের দ্বিতীয় ইনিংস :—২৮৪ রাণ (সিঙ্গলটন ৬৩, হাউওয়ার্থ ১০৫, গিবনস্ ৩৪, জেনকিন্স ৩৫, মানকড় ৭৪ রাণে ৪টি ও সিন্ধে ৫০ রাণে ৫টি উইকেট পান)।

ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস :—২৬৭ রাণ (বিজয় মার্চেন্ট ৫১, আর এস মোদী ৮৪, এস ব্যানার্জ্জী ৫১, পার্কস ৫৫ রাণে ২টি, হাউওয়ার্থ ৫৯ রাণে ৪টি, জ্যাকসন ২৫ রাণে ২টি ও সিঙ্গলটন ৭২ রাণে ২টি উইকেট পান)।

অক্সফোর্ড বনাম ভারতীয় দল

খেলার ফলাফল :—অক্সফোর্ড দলের প্রথম ইনিংস :—২৫৬ রাণ (সেল ৪৭, কেরল্ড ৩৬, টমসন ৩১, ডোনেলী ৬১, মানকড় ৫৮ রাণে ৪টি, সিন্ধে ৭৩ রাণে ৪টি ও হাজারী ৪০ রাণে ২টি উইকেট পান)।

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস :—২৪৮ রাণ (হাজারী ৬৪, মানকড় ২৫, আর এস মোদী ৪১, হাফিজ নট আউট ৩০, ম্যাসিণ্ডো ৫৫ রাণে ৪টি, হেনলী ৩১ রাণে ২টি ও ট্রাভার্স ৪৮ রাণে ২টি উইকেট পান)।

অক্সফোর্ড দলের দ্বিতীয় ইনিংস :—৩ উইঃ ২৪৫ রাণ (সেল ৪৪, ডোনেলী ১১৬ রাণ নট আউট, মডসলী ৫৪ রাণ নট আউট, সি এস নাইডু ৬০ রাণে ৩টি উইকেট পান)।

ভারতীয় দলের অধিনায়ক পাতৌদী দুরন্ত শীতের জন্য অক্সফোর্ডের খেলা থেকে বিরত হন এবং সারের বিরুদ্ধে খেলায় মার্চেন্টকে অধিনায়ক নির্ব্বাচিত করেন। ভারতীয় দল বিলাতে তৃতীয় খেলা খেলে সারের বিরুদ্ধে। এবং এ খেলাটিতে তারা ৯ উইকেটে জয়লাভ করে। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে রাণ করে ৪৫৪। তার মধ্যে দশম ব্যাটস্‌ম্যান সর্ব্বাতে ১২৪ এবং শেষ ব্যাটস্‌ম্যান সুঁটে ব্যানার্জ্জী ১২২ ভারতীয় দলের রেকর্ড সৃষ্টি করে। শেষ উইকেট হিসাবে বিলাতে এস, ব্যানার্জ্জী যে কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। সারে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে ১৩৫ রাণ করে "ফলো অন" করতে বাধ্য হয় এবং দ্বিতীয় ইনিংসের ৩৩৮ রাণ করে। সুতরাং ভারতীয় দলের জয়লাভের জন্য ২০ রাণ বাকী থাকে। ২য় ইনিংসে ভারতীয় দল ১ উইকেটে ২৪ রাণ করে। ফলে মার্চেন্ট ইনিংস ডিক্লেয়ার করেন।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি!

শ্রীতারানাথ রায়

য়ুত—

প্রসিদ্ধ মার্কিণ সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যান দেড় মাস ইউরোপ ভ্রমণ করে এসে লিখছেন—

"An European Governments, all parties and all leading men are acting as if there would be another war. The German problem as seen in Moscow and London is whether in the event of war the Germans are to be used by Russians, or by Western powers."—ইউরোপের সব রাষ্ট্র, সব দল, সব প্রধান ব্যক্তি এই ধারণা নিয়ে কাজ করছে যেন আবার যুদ্ধ বাধবে। মস্কো ও লণ্ডনের জার্ম্মাণ-সমস্যা এই যে, আসচে যুদ্ধে জার্ম্মাণদের প্রয়োগ করবে কে—রুশরা, না পশ্চিমের শক্তিধররা?

ইংরেজের বিরুদ্ধে লিপম্যানের স্পষ্ট অভিযোগ যে, তারা নাৎসী দলের ভূতপূর্ব্ব লোকগুলোকে রুশিয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করছে। জার্ম্মাণীর ইংরেজ-অধিকার মণ্ডলে জার্ম্মাণ সৈন্য অটুট রাখা হচ্ছে। মার্কিণ সংবাদপত্রগুলো বলছে যে—"The British zone is enshrounded in silken curtains and the situation behind this silk curtain is most sinister."—গুরুতর অভিযোগ যে, ইংরেজরা অনেক স্থলে জার্ম্মাণ সৈন্যদল ভেঙ্গে দিলেও গুপ্ত সৈন্যদল তৈরী করছে। বৃটিশ পররাষ্ট্র বিভাগ এ সব চাঞ্চল্যকর অভিযোগ অস্বীকার করে সরকারী ভাবে কোন বিবৃতি আজ পর্য্যন্ত দেননি। অন্য দিকে জার্ম্মাণীর মার্কিণ-মণ্ডলে নাৎসী দলের ভূতপূর্ব্ব সভ্যদের চাকরী যাচ্ছে। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, কতকগুলো নাৎসী যেখানে বরখাস্তি চিঠি পেয়েছে, ঠিক সেইখানেই কমুনিষ্ট দলে যোগ দেবারও আমন্ত্রণ পেয়েছে। এ সব ব্যাপার থেকে ইউরোপে নতুন তোড়-জোড়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

কায়রো থেকে চুংকিং :—

মার্কিণ রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান সেদিন রুশিয়াকে লক্ষ্য করে বলেছেন—"Sovereignty and Middle East countries must not be threatened by coercion or penetration." পূর্ব্ব বা পশ্চিম-এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি সার্ব্বভৌম স্বতন্ত্র সত্তাকে কেউ যেন ভয় দেখিয়ে বা অনুপ্রবেশ দ্বারা শঙ্কিত না করে।

রুশিয়াও ত সোজাসুজি ইংরেজ আর আমেরিকানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। সে বলছে যে, ওরা আরবে, আর মুরি সৈয়দকে উস্কিয়ে দিয়ে ইরাণে নতুন পূর্ব্বদেশীয় রাজ্যসঙ্ঘ গঠন করার আয়োজন করছে।

'British soon came to feel that they were under Russian sttack along the entire Imperial life line from the Mediterranean to the Far East."—ইরাণে সোভিয়েট আয়োজন দেখে ইংরেজরা মনে করতে লাগল যে, ভূমধ্যসাগর থেকে পূর্ব্ব-এশিয়া পর্য্যন্ত বৃটেনের সমগ্র প্রাণবন্ধের বরাবর রুশিয়ার আক্রমণ আসন্ন। কথাটা বিশিষ্ট এক সাংবাদিকের। ইংরেজের এই প্রাণ-পথ, যা চলেছে শ্বেতাঙ্গ জাতদের শোষণ-ক্ষেত্রগুলোর বুকের উপর দিয়ে,—সে পথের দুধার দিয়ে প্রাচ্যের দুর্ব্বল জাতগুলো পর্য্যন্ত পরমুখাপেক্ষী হতে অস্বীকার করে বাধাল বিদ্রোহ। বৃটিশ-সোভিয়েট সংঘর্ষ যদি বাধেই—আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতে সেটাই হবে না বড় কথা—বড় কথা হবে, বৃটেনের প্রাণপথেরই দু'ধারের মুমুক্ষু জাতগুলোর জাগরণ। এ জাগরণ য়ুরোপীয় ও পাশ্চাত্য শক্তিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহেরই নামান্তর। রুশিয়া মিত্রশক্তি-বৈঠকে দাবী করেছিল যে, পরাধীন জাতগুলোর পরিত্রাণই তার একমাত্র কাম্য। দাবী যাই ই সে করুক না, মুক্তিপথের প্রতিবন্ধক হলে রুশিয়াকেও এশিয়া ও আফ্রিকার নবজাগ্রত নির্য্যাতিত জাতগুলো খাতির করবে না। কাজেই—' From Cairo to Chungking a repressed world tried to break old bonds."

ভারতে কিশোর বয়স থেকে চুলে পাকধরা পর্য্যন্ত যে সব জাগরণের অগ্রদূত স্বপ্ন দেখল আর সংগ্রাম করল, তারা ইংরেজের সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক অহিংস লড়াই করলেও বিদ্রোহী সমরোত্তর ভারত শ্বেত-প্রভুদের বিরুদ্ধে করল বিদ্রোহ—করছে বিদ্রোহ, আর করবেও বিদ্রোহ। ওরা ভয় পেয়ে বলল—"In India the most violent uprisings since the Sepcy Rebellion of 1857 were directed not only against the British but against all white intruders on Indian Soil."

মিশরেও তাই। মিশরী তরুণরাও ইংরেজদের মিশর ছেড়ে যেতে বলল। তারাও করল বিদ্রোহ। বিক্ষুব্ধ মিশরী তরুণের বুকের রক্তে নীল নদের তট হ'ল রঞ্জিত।

তরুণ-উত্থানে সংঘর্ষ ও সংঘাত অনিবার্য্য। ভারত মিশর, ইন্দোনেশিয়া—এশিয়ার সব বন্ধন-পীড়িত দেশে শাসক ও শাসিতের মধ্যে এ সংঘর্ষ ও সংঘাতের মূল কারণ একই। সফেদ জাতগুলো

যে এ কথা বুঝে না তা নয়। এক মার্কিণ সাপ্তাহিক পত্র এশিয়ার এই জোয়ানদের মনোভাবের সন্ধান নিয়ে অবশ্য লিখলেন—

—"The most inportant instigators of the violence seem to have been the impoverished hopeless hoodlum mobs that infest Indian cities and welcome an opportunity to loot. And behind them lies the desperation of a subcontinent which faces possible civil war, almost certain famine, and apparently no foreseeable solution to its problems."—News Week.

মিশরে—

মিশরীদের স্পষ্ট মনোভাব এই কথাগুলোতে সরল করে বলা হয়েছে—"We as a nation are not concerned with protecting British interests. We are demanding the fullest independence and only when that is acknowledged and achieved shall we consider what interests must come first, and if British interests can be served simulteneously or later we will be prepared to consider the terms and conditicns for a new treaty."

ইংরেজরা হয়ত বলবে—মিশরীরা অকৃতজ্ঞ, বলবে ওরা নির্ব্বোধ। তা বলুক, কিন্তু বোকা ও অকৃতজ্ঞ মিশরীরা ইংরেজের স্বার্থরক্ষার জন্য মাথা ঘামাতে মোটেই চাচ্ছে না।

মিশরীরা অবশ্য এটা চায় যে সুয়েজ খাল অঞ্চল ইংরেজরা যেমন রক্ষা করছে, করুক। কিন্তু নীল নদের উভয় তটে তারা ইংরেজকে থাকতে দেবে না। চরমপন্থী ওয়াফদ দলের চাপে প্রধান মন্ত্রী সিদকী পাশারও দাবী এই। এ দাবী তিনি ইংরেজের কাছ থেকে আদায় করতে না পারলে সম্ভবতঃ তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের সনদ আর তার সঙ্গে গোটা আরব জাতের সমর্থন পেয়ে মিশরীরা তাদের দাবীর সুর নরম করবে বলে মনে হয় না।

পশ্চিম-এশিয়ায়

প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ড্রু পিয়ার্সন ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে, এই গ্রীষ্মেই রুশিয়া তুর্কী আক্রমণ করবে ("Russia would invade Turkey by summer")। মার্কিণ রেডিও সংবাদ-সমালোচক ওয়াল্টার উইনচেল গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী শুনিয়েছেন যে, "war has already started"—যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

রুশিয়ার বিরুদ্ধে নালিশ করবার জন্য ইরাণী আর তুর্কী রাষ্ট্র-প্রতিনিধি হোসেন আলা আর হোসেন রাগিপ বেহুর আমেরিকায় আরজি নিয়ে যান। ইরাণী হোসেন জানিয়েছেন যে, আমেরিকা না বাঁচালে ইরাণ আর বাঁচে না। আমেরিকা চুপ করে থাকলে আবার বাধবে মহাযুদ্ধ। সেখ সাদীর বয়াদ পর্য্যন্ত অনুবাদ করে ইরাণী হোসেন আবেদন করলেন—

"Oh thou who hast the power,
fail not to wield it right
Ere the caprice of fortune
deprive thee of they might."

তুর্কী হোসেন জানালেন—দার্দ্দানেলিস এখন পর্য্যন্ত আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে। ইজিয়ান ঘাঁটিগুলো থেকে বিমান আক্রমণ যখন হচ্ছিল তখনই রুশ জাহাজগুলো যুদ্ধের সময় এ পথ ব্যবহার করেছে। আমেরিকা কিন্তু এই প্রণালী সম্বন্ধে চুক্তি দিয়ে তুষ্ট করতে চেয়েছে। যদি এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়, আর রুশিয়া যদি করে বলপ্রয়োগ, তা হলে তুর্কী তাকে বাধা দেবার জন্ম চেষ্টা করতে পারে নিজেরই উপর নির্ভর করে।

এ সব আরজি আবেদনের পরই দেখা গেল, রুশিয়া ইরাণের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চল থেকে কিছু সৈন্য সরিয়ে নিচ্ছে। এতে ইরাণ অনেকটা আশ্বস্ত। কিন্তু এই আংশিক সৈন্য অপসারণের ভিন্ন রকম উদ্দেশ্য আছে বলে অনেকে মনে করছে। আমেরিকান আর বৃটিশ রাজপুরুষরা মনে করছেন যে,—"The limited Red withdrawal apparently indicates the Russia's ultimate aim lies in another direction—Turkey·· By staying in Azerbaijan, the Soivet Union maintains its control of Turkey's eastern border and stands firm in an area that out-flanks the Turks."

অনেকে কিন্তু সন্দেহ করছেন যে—সম্প্রতি যে রুশ-ইরাণী চুক্তি হয়েছে, তাতে ক্যাস্পিয়ান সাগর থেকে পারস্যোপসাগর পর্য্যন্ত জায়গায় রেলপথের সমস্ত অধিকার রুশিয়ার থাকবে বলে গোপন এক ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এ রেলপথ প্রথমে ফেঁদেছিল বৃটেন আর আমেরিকা লড়াইয়ের সময়। ঋণ আর ইজারার মাল রুশিয়ায় পাঠান হ'ত এই পথে। শোনা যাচ্ছে, সোভিয়েট বিচক্ষণরা এ পথে ডবল মাল পাঠাবার পরিকল্পনা সম্প্রতি কাজে পরিণত করেছে। কুর্দিস্থানের সীমান্তে ইরাণী সৈন্য আজেরবাইজান আক্রমণ করেছে। এই ব্যাপার নিয়ে বিশ্ব-সংগ্রাম আবার জ্বলে উঠবে কি না কে জানে?

মাঞ্চুরিয়ায় রুশ-মতলব—

মাঞ্চুরিয়ায় জাপান সম্বন্ধে রুশিয়ার এক রহস্যজনক আচরণের কথা প্রকাশ পেয়েছে। গত আগষ্টে রুশিয়া মাঞ্চুরিয়া থেকে ৯ লক্ষ বেসামরিক জাপানী আর ৭ লক্ষ জাপ সৈন্যকে বন্দী করে। এ সব বন্দীকে রুশিয়া কোথায় গুম করেছে তা কেউ বলতে পারছে না। চীনা মার্কিণ সামরিক কর্তৃপক্ষ হাজার খুঁজেও সন্ধান পায়নি। রুশদের জিজ্ঞেস করলে তারা কথা বলে না। চীনারা সন্দেহ করছে যে, রুশরা সম্ভবতঃ এই ১৬ লক্ষ জাপানীকে নিয়ে গিয়ে কমুনিজমের পাঠ দিচ্ছে, পরে এদের কাজে লাগাবে।

মাঞ্চুরিয়ায় রুশরা যে সব রেলওয়ে কারখানা হাতে পেয়েছে তার চাইতে বড় কারখানা ওদিকে এশিয়ায় নেই। এ সব কারখানা রুশরা হাত-ছাড়া করবে না। তারা ৬০০ এঞ্জিনের জন্য মার্কিণ কোম্পানী-গুলোকে অর্ডার দিয়েছিল, এখন সে সব অর্ডার তারা বাতিল করেছে বলে শোনা যাচ্ছে।

ওদিকে আবার চীনা কমুনিষ্টরা ইয়াংসি নদের তট থেকে মাঞ্চুরিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রদেশগুলোয় (১০০০ মাইল) চিয়াং-সৈন্যদের আক্রমণ করেছে।

বর্ম্মা অঞ্চল—

বর্ম্মার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ইউ-স এবং অন্যতম বর্ম্মী নেতা ইউ-বা-পে অভিযোগ করেছেন, ইংরেজেরা বর্ম্মায় ফ্যাসিষ্ট নীতি অবলম্বন করছে। তাঁদের মতে বর্ম্মার নতুন একজিকিউটিভ কাউন্সিল একটা পুতুলখেলা—লেজিসলেটিভ এসেম্বলী মাত্র বিতর্ক

সভা। ইউ-স নিরুপায় হয়ে বলেছেন যে, অচল অবস্থার অবসানের কোন উপায় না দেখে তিনি তাঁর মাইওচিং দলের তিন জন সদস্যকে গভর্ণরের শাসন পরিষদ থেকে পদত্যাগ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু বর্মার সব চাইতে শক্তিশালী দল মাইওচিং নয়, সব চাইতে শক্তিশালী জেনারল আউং সানের এণ্টিফ্যাসিষ্ট পিপ্‌লস্ ফ্রিডম লীগের। এই দলের সমর্থন না পেলে কোন শাসন-ব্যবস্থা সফল হতে পারে না। আউং সানের দল বর্মার নব শাসন-ব্যবস্থা বয়কট করেছে। এবার ইউ-সর দলও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছে। বর্মার ইংরেজ শাসনকর্তা গত বছর ভারত থেকে বর্মায় যাবার সময় কিন্তু দম্ভ করে বলেছিল—বর্মা যথাসম্ভব শীঘ্র পূর্ণ স্বাধীনতা পাক এই তার কাম্য। যদি কাম্যই হয় তবে ফ্যাসিষ্ট-পদ্ধতি উনি অবলম্বন্ করছেন কেন বুঝা যাচ্ছে না।

ইন্দোনেশিয়ার যুদ্ধ—

ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ডাঃ শারিরের সঙ্গে ভূতপূর্ব্ব ডাচ গভর্ণর মিঃ ভ্যানমুকের কেমন যেন একটা আপোষের কথা শোনা যাচ্ছে। ওলন্দাজ সরকার ইন্দোনেশিয় "প্রজাতন্ত্রের" দাবী মেনে নেবে, ইন্দোনেশিয়ার "প্রজাতন্ত্রও" ওলন্দাজ সার্ব্বভৌমিকত্ব স্বীকার করে নেবে। বৃটেনের পদানত দেশগুলোর সঙ্গে বৃটেন যে সম্পর্ক পাতিয়েছে বা পাতাতে চায়, তার সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার এই ব্যবস্থার একটা সামঞ্জস্য দেখে মনে হয় এতে বৃটিশ ছল-বুদ্ধি আছে। আয়র্ল্যাণ্ডে ডি ভেলেরা আয়ার প্রজাতন্ত্র দাবী করলেও বস্তুতঃ তিনি বৃটেনের সার্ব্বভৌম প্রভুত্ব অস্বীকার করেন না।

প্রস্তাবিত হয়েছে যে, ইন্দোনেশিয়ায় একটা কনফিডারেশন বা ভ্রাতৃতন্ত্র স্থাপিত হবে। এতে থাকবে বোর্ণিও, সেলিবিস, মলাক্কা, ওলন্দাজ গিনি—যবদ্বীপও রইবে তার অংশ। এ অবশ্য বুঝা যাচ্ছে না যে, যবদ্বীপ যে প্রকারের স্বাধীনতা বা স্বায়ত্ত-শাসন পাবে, অনুরূপ রাষ্ট্র-সুযোগ অন্য দ্বীপগুলো পাবে কি না। এ সব দ্বীপের প্রতিনিধি ওলন্দাজ সরকারের মনোনীত জন-প্রতিনিধি নয়। কাজেই স্বাধীনতা না পেলে যবদ্বীপের অগ্রগতি ওরা রোধ করবে পেছন থেকে টেনে ধরে। আরও বিশেষ কথা এই যে, অন্ততঃ কিছু দিন যবদ্বীপের পররাষ্ট্রে আপন প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের স্বাধীন অধিকার রহিবে না। রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরীক্ষাই এই যে আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃপক্ষ বা অপর স্বাধীন রাষ্ট্রে স্বাধীন ভাবে প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষমতা কোন রাষ্ট্রের আছে কি না।

ভারতে ঘোষণা—

সে দিন মন্ত্রী-মিশন এসে এমনি একটা "স্বাধীনতা" ভারতকে দিয়েছে বলে ইংরেজরা দুনিয়ার কাছে ঢক্‌-নিনাদ করে ঘোষণা করেছে। যে কূটনৈতিক নিয়মতান্ত্রিক বচনের প্যাঁচে ঘোষণা এমন জটিল অথচ আপাতরম্য করে তোলা হয়েছে যে একটু না থিতোলে ওর দোষ-গুণের যাচাই করা চলবে না। তবে সোজাসুজি ভাবে দেখলে দেখা যাবে, ওলন্দাজদের ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রাধিকার প্রদানের ঘোষণার সঙ্গে এর বেশ সুসামঞ্জস্য আছে। ভারতের তথাকথিত প্রাদেশিক পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের আশার কথা ঘোষণা করা হলেও—অখণ্ড ভারতের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের কথা এ ঘোষণায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ভারতে বড়লাট ত রইবেনই চূড়ার উপর ময়ূর-পাখা। উনি আগে অন্তর্ব্বর্ত্তী কেন্দ্রী সরকার গঠন করুন ইংরেজের স্বার্থ ও ভেদনীতিসিদ্ধ নির্ব্বাচনাধিকারে নির্ব্বাচিত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রী সদস্যদের নিয়ে—কনষ্টেটুয়েণ্ট এসেম্বলী রচিত হোক—তার পর ধীরে ধীরে এর বচন আবরণ খসে গিয়ে স্বরূপ প্রকাশ পাবে।

তবে এ কথা ঠিক, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার পদানত দেশ ও দ্বীপগুলো স্বাধীন ভারতকে নেতৃরাষ্ট্র বলে মানবে। এর পত্তন করে গেছেন নেতাজী। বর্মা, মালয়, সিংহল, শ্যাম, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলো এ সব নিয়ে একটা মুক্তিকাম রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন অনিবার্য্য। এতে হল্যাণ্ড যেমন বাধা দিচ্ছে, ইংরেজও তেমন বাধা দিতে চায় না। সাম্রাজ্য-বাদ পটল তুললে ভারতকে ঘিরে যে অভিনব সংস্কৃতিমণ্ডল ও ভ্রাতৃতন্ত্র গড়ে উঠবে তা ছাড়া স্বাভাবিক কতকগুলো রাষ্ট্রসঙ্ঘ গড়ে উঠবেই—ইউরোপের জাতগুলোর জন্য, মার্কিণ ষ্টেটগুলোর জন্য, সোভিয়েট রুশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলোর জন্য, পশ্চিম-এসিয়ার আরব জাতগুলোর জন্য, আফ্রিকার জন্য, অষ্ট্রেলিয়ার জন্য।

গেল রাজ্য শেষ গেল মান—

বৃটিশ মন্ত্রী মিশনের ঝুটো আওয়াজ শুনেই বৃটেনের রক্ষণশীলরা আঁৎকে উঠ্‌ছে। চার্চিলের জামাই ভূতপূর্ব্ব বৃটিশ মন্ত্রী মিঃ ডানকান স্যাণ্ডিস—স্বভাবতঃ প্রাচ্যবিদ্বেষী ও সাম্রাজ্যবাদী। তিনি ত কেঁদেই ফেলেছেন। মিশর থেকে ইংরেজরা সৈন্য সরিয়ে নিচ্ছে শুনে সে ভদ্রলোক বলেছেন, তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়! "India yesterday, Egypt to-day. Who is to say that tomorrow it will not be Ceylon, Burma or the Sudan? What is to stop them giving Cyprus to Greece, Hongkong to China, Aden to Arabia, Malta to Italy or Gibralter to Spain?"

বিলাতী কাগজ 'ডেলি টেলিগ্রাফ' বলছেন যে কাইজার, হিটলার, মুসোলিনী সবাই মিশরের কূটনীতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতেন। ইংরেজের হাত থেকে রোমেল আর গ্রাজিয়ানী যা কেড়ে নিতে চেয়েছিল আজ বৃটেন তা অবাধে ছেড়ে দিচ্ছে। পার্লামেন্টের বিতর্ক কালে চার্চিল, ইডেন, হগ এঁরা এক রকম বলেই ফেলেছেন যে, বৃটিশ শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলে কতকগুলো উন্মাদ এসে ঢুকেছে, এরা যুগ-যুগের পাওয়া ইংরেজের অধিকার বিলিয়ে দিয়ে জাতকে নিঃস্ব করতে চায়। কিন্তু এও তারা বুঝতে পারছে যে, ইউরোপে যে সব আয়োজন হচ্ছে—রুশিয়ায় যে সব ব্যবস্থার প্রসার চলছে, তাতে পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-এশিয়ার অন্নক্ষেত্রে শান্তি ও তুষ্টি স্থাপিত না হলে ইংল্যাণ্ডকে আতলান্তিকের অতলে তলিয়ে যেতে হবে।

চার্চিলও যেমন ভারতের রক্তচোষা ইংরেজ, এটলিও তার চাইতে কম নয়। কাজেই চাচা আপন বাঁচা নীতি ত্যাগ করবার মত আত্মঘাতী বুদ্ধি বা রাষ্ট্রনৈতিক প্রবজ্যা-বুদ্ধি ওঁর থাকতে পারে না। তবে গরজ বড় বালাই। ১৭৫৭ আর ১৯৪৬এ ফারাক অনেক। যারা ছিল পায়ের তলায়, তারা বজ্র-পীড়ন আজ ব্যর্থ করছে। আজ অস্থিসর্ব্বস্ব জাতগুলোকে ওরা পীড়ন করে নিজেরাই আহত হচ্ছে। দধীচির সজীব অস্থির গায়ে হাত বুলিয়ে আজ বজ্রকে যে ভাবে বৈদ্যুতিক শক্তিহীন করতে চেষ্টা ওরা করছে, জানি না, সে আন্তরিকতা-বর্জ্জিত চেষ্টা সার্থক হবে কি না।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বৃটিশ স্বর্ণগোলক

বৃটিশ মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব যে হিন্দুস্থান, পাকিস্থান ও রাজস্থানের মাথার উপর রহিবে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র; আরব মণ্ডলে কুপল্যাণ্ড পরিকল্পনারই ইহা যেন অপর দিক্। প্রস্তাবিত ইউনিয়ন গঠন করিয়া বৃটেন যেন চাহে যে তিনটি পরস্পর-বিরোধী রাষ্ট্রাংশের উপর ইউনিয়ন—ব্যালেন্স অব্ পাওয়ার স্বরূপ রহিবে—ভারত ছাড়িয়া যাওয়া ত দূরের কথা। ইংরেজরা মনে করিতেছে যে, ইরাণের আজারবাইজান হইতে রুশ সৈন্য সরিয়া গিয়া ভারতের রুশ-ভীতি হ্রাস করিয়াছে, জাপানেরও নখদন্ত উৎপাটিত। এমন অবস্থায় ভারতের সমস্যার উপর পটি লাগাইয়া নেতাদের বচন উত্তেজনা স্তব্ধ করিয়া দিলেই আপাততঃ কাজ হইবে। তিন-ধারী বৈঠকে তাহা তাহারা ভেদ জিয়াইয়া রাখিয়া বৈঠক নিষ্ফল হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

বচনের কসরতিতে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তিন স্থানে বর্ত্তমান। এখন ভেদপন্থী প্রাদেশিক পরিষদ তথা রাজন্যদের স্বার্থে ঘূর্ণিপাকে তলাইতে দিয়া কোন না কোন প্রকারের একটা অন্তর্বর্ত্তী কেন্দ্রী সরকার স্থাপন করতঃ ভারতের আসন্ন খাদ্যাদির জটিল সমস্যার সকল অব্যবস্থা নয়া কেন্দ্রী সরকারের তথা ভারতের বিভিন্ন রাজনীতিক দলের স্কন্ধে চাপাইয়া পৃথিবীর নিকট উহারা সাধু সাজিতে চাহে।

বৃটেনের এ নীতি নূতন নহে। আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম যদি অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ না করিত, তাহা হইলে ইংরেজের চেষ্টায় উত্তর ও দক্ষিণে ভাগ হইয়া যাইত। আয়র্ল্যাণ্ডকেও উহারা ভাগ করিয়াছে। আরব রাষ্ট্র-সঙ্ঘকেও করিবে, ভারত এবং ব্রহ্মকেও করিবে। সুডেটান-ল্যাণ্ড সৃষ্টির অপরাধ মাত্র জার্ম্মাণদের নয়। মন্ত্রী-মিশনের শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবের প্রতি ছত্রের ফাঁকে ফাঁকে ইহারই আভাস পাওয়া যাইতেছে।

ভারতের নব শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব

বৃটিশ মন্ত্রী-মিশন অবশেষে ভারতের ভাবী শাসন-তন্ত্র সম্বন্ধে আপনাদের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন। প্রস্তাবগুলি সংক্ষেপে এই—

১। বৃটিশ-ভারত এবং ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা ইউনিয়ন অব ইণ্ডিয়া গঠিত হইবে। ইউনিয়নের হস্তে থাকিবে ভারতের পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। এ-সকল ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা ইউনিয়নের থাকিবে।

২। বৃটিশ-ভারত তথা দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত শাসন পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভা থাকিবে। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোন সাম্প্রদায়িক সমস্যার সিদ্ধান্ত করিতে হইলে ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থিত সদস্যগণের অধিকাংশের এবং দুই প্রধান সম্প্রদায়েরও সদস্যগণের ভোট-সমর্থন থাকা আবশ্যক।

৩। ইউনিয়নের হস্তে যে সকল বিভাগ থাকিবে, সে সকল বিভাগ ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপার প্রাদেশিক সরকারের হস্তে থাকিবে।

৪। দেশীয় রাজ্যগুলি তাহাদের যে সকল ক্ষমতা ইউনিয়নের হস্তে ন্যস্ত করিবে, সে সকল ব্যতীত অন্য ক্ষমতাগুলি তাহাদের হাতে থাকিবে।

৫। একাধিক প্রদেশ আপনাদের ইচ্ছামত প্রাদেশিক রাষ্ট্রদল বা গ্রুপ গঠন করিতে পারিবে। প্রদেশ বা প্রাদেশিক রাষ্ট্রদলের শাসন পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভা থাকিবে। প্রাদেশিক রাষ্ট্রদল বা গ্রুপ সমস্বার্থের কোন্ কোন্ বিভাগের পরিচালনা করিবেন তাহা আপনারা নির্ণয় করিবেন।

৬। কেন্দ্রী ইউনিয়ন বা প্রাদেশিক গ্রুপগুলির গঠন-বিধানে এমন ব্যবস্থা থাকিবে যাহাতে এখন হইতে ১০ বৎসর পরে এবং পরবর্ত্তী ১০ বৎসরের মধ্যে কোন প্রদেশ তাহার ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সদস্যের ভোটে গঠন-বিধানের সর্ত্তের পুনর্ব্বিবেচনায় দাবী করিতে পারিবেন।

উপরের প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে বা কোন প্রকারের বিশেষ সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলীর উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যের সিদ্ধান্তই গ্রাহ্য হইবে এবং এ সম্বন্ধে দুই প্রধান সম্প্রদায়ের ভোট বিবেচনা করিতে হইবে। কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে প্রস্তাব উভয় প্রধান সম্প্রদায়ের কোন সম্প্রদায়ের অধিকাংশ প্রতিনিধি উত্থাপন করিতে অনুরোধ করিলে, ফেডারাল কোর্টের পরামর্শ লইয়া এসেম্বলীর সভাপতি আপন সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

নূতন শাসনতন্ত্রের সকল ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইলে কোন প্রদেশ ইচ্ছা করিলে তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রাদেশিক মণ্ডল হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিবে। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচনের পর এরূপ বাহির হইয়া আসিবার সিদ্ধান্ত প্রাদেশিক নব ব্যবস্থা পরিষদকে করিতে হইবে।

শাসনযন্ত্র-নির্ণয়-পরিষদ

মিশন প্রস্তাব করিয়াছেন যে, নূতন শাসনতন্ত্র কার্য্যক্ষম করিবার জন্য অবিলম্বে শাসনযন্ত্র-নির্ণয়-পরিষদ বা কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলী গঠন করা আবশ্যক।

ভোটাধিকার—মিশন বলিয়াছেন, এ সম্পর্কে বয়স্কদের ভোটাধিকারে নির্ব্বাচনই সর্ব্বোত্তম। কিন্তু এখন এই প্রকারের নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা করিলে নূতন শাসনতন্ত্র রচনায় যে বিলম্ব হইবে তাহাতে কেহ সম্মত হইবেন না। সুতরাং সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনে গঠিত প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদগুলিকে নির্ব্বাচক-মণ্ডল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে ত্রুটিও আছে। প্রাদেশিক পরিষদগুলির সদস্য-সংখ্যা প্রত্যেক প্রদেশের জনসংখ্যার অনুপাতে নহে। যথা:—আসামের জনসংখ্যা ১ কোটি হইলেও তাহার

পরিষদের সদস্য-সংখ্যা ১০৮ জন, বাংলার জনসংখ্যা তাহার ৬ গুণ হইলেও তাহার পরিষদের সদস্য-সংখ্যা মাত্র ২৫০ জন। তাহার পর লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব তাহাদের প্রাদেশিক জনসংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা অধিক, এ জন্য গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সদস্য-সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে।

সম্প্রদায়—মিশন ভারতে তিন সম্প্রদায়কে মানিয়া লইয়াছেন—সাধারণ অমুসলমান, মুসলমান ও শিখ। দুই প্রধান সম্প্রদায় বলিতে তাঁহারা মুসলমান ও সাধারণ অমুসলমানদের বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলীর প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ proportional representation পদ্ধতিতে মাত্র ১ জন প্রার্থীকে ভোট দিতে পারিবেন।

কোন্ প্রদেশের কত জন প্রতিনিধি

	প্রদেশ	সাধারণ	মুসল	শিখ	মোট
গ্রুপ ১।	মাদ্রাজ	৪৫	৪	×	৪৯
	বোম্বাই	১৯	২	×	২১
	যুক্ত প্রঃ	৪৭	৮	×	৫৫
	বিহার	৩১	৫	×	৩৬
	মধ্য প্রঃ	১৬	১	×	১৭
	উড়িষ্যা	৯	০	×	৯
	মোট	১৬৭	২০	×	১৮৭
গ্রুপ ২।	পঞ্জাব	৮	১৬	৪	২৮
	সীমান্ত প্রঃ	০	৩	০	৩
	সিন্ধু	১	৩	০	৪
	মোট	৯	২২	৪	৩৫
গ্রুপ ৩।	বাংলা	২৭	৩৩	×	৬০
	আসাম	৭	৩	×	১০
	মোট	৩৪	৩৬	×	৭০
				সর্ব্বসমেত	২৯২
				দেশীয় রাজ্য	৯৩
					৩৮৫ জন

যথাসম্ভব শীঘ্র নব দিল্লীতে রাষ্ট্র যন্ত্র-নির্ণয়-পরিষদের অধিবেশন হইবে। পরিষদের প্রাথমিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত হইবেন—

পরিষদের সভাপতি,

অন্যান্য কর্ম্মকর্তা এবং

প্রজাধিকার, লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় এবং উপজাতি ও শাসন-বহির্ভূত অঞ্চলগুলি সম্পর্কে পরামর্শ কমিটী।

তৎপর প্রাদেশিক পরিষদ হইতে নির্ব্বাচিত সদস্যগণ তিন ভাগে বিভক্ত হইবেন। এ সকল ভাগ প্রাদেশিক শাসন-বিধান গঠন করিবেন এবং স্থির করিবেন প্রাদেশিক রাষ্ট্রদল বা গ্রুপ গঠন করা হইলে তাহা কোন্ কোন্ প্রদেশ লইয়া গঠিত হইবে এবং সে সকল প্রাদেশিক মণ্ডল কোন্ কোন্ প্রাদেশিক ব্যাপার সম্বন্ধে বিবেচনা করিবে।

বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিগণ ইউনিয়নের রাষ্ট্র-বিধান নির্ণয়ের জন্য সমবেত হইবেন।

লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়—

প্রজাধিকার, লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির অধিকার, উপজাতি সমূহ এবং শাসনতন্ত্র-বহির্ভূত অঞ্চলগুলির অধিকার নির্ণয় সম্বন্ধে এক এডভিসরী কমিটী বা পরামর্শ-সমিতি গঠিত হইবে। এই কমিটীতে এ-সকল সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি থাকিতে হইবে। প্রাথমিক রাষ্ট্রাধিকারগুলির তালিকা, লঘিষ্ঠদের রক্ষার বিষয়গুলি, উপজাতীয় ও শাসন-বহির্ভূত অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থার পরিকল্পনা সম্বন্ধে এই কমিটী কেন্দ্রী কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলীর নিকট রিপোর্ট প্রদান করিয়া পরামর্শ দিবেন যে, এ-সকল অধিকার প্রাদেশিক বা যুক্ত-প্রাদেশিক বা ইউনিয়ন কোন্ শাসন-বিধানের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

দেশীয় রাজ্য—

বৃটিশ রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর ভিতরেই হউক বা বাহিরেই হউক, বৃটিশ-ভারত যদি স্বাধীনতা লাভ করে, তাহা হইলে বৃটিশরাজের সহিত ভারতের দেশীয় রাজ্যের নরপতিদের যে সম্পর্ক এত দিন ছিল, তাহা রক্ষা করা আর সম্ভবপর হইবে না। দেশীয় রাজ্যগুলি বৃটিশ-ভারতের পররাষ্ট্র-ব্যবস্থার সহযোগিতা করিতে সম্মত হইয়াছে। এই সহযোগিতা সঠিক কি প্রকারের হইবে এবং উহা সকল রাজ্য সম্বন্ধে একই প্রকারের হইবে কি না, তাহা ভারতের নব শাসন বিধান রচনার সময় দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত কথাবার্ত্তার উপর নির্ভর করিবে।

মধ্যকালীন ব্যবস্থা—

মধ্যকালীন ব্যবস্থা এই হইবে—

১। বড়লাট অবিলম্বে প্রাদেশিক পরিষদগুলিকে আপন আপন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে এবং দেশীয় রাষ্ট্রগুলিকে একটি নিগোশিয়েটিং কমিটী স্থাপন করিতে অনুরোধ করিবেন।

২। অবিলম্বে প্রধান প্রধান রাজনীতিক দলের সমর্থন-পুষ্ট কেন্দ্রে মধ্যকালীন সরকার গঠন করিতে হইবে। এই সরকারের সকল বিভাগ, এমন কি, সমর বিভাগ ও ভারতীয় জন-প্রতিনিধির হাতে প্রদান করিতে হইবে।

৩। এই মধ্যবর্ত্তী সরকারের কাজ—(১) প্রাত্যহিক শাসন-ব্যবস্থা, (২) আসন্ন দুর্ভিক্ষ নিবারণ, (৩) সমরোত্তর উন্নতি বিধান, (৪) আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকগুলিতে ভারতের প্রতিনিধি প্রেরণ।

সংশয়—

মন্ত্রী-মিশনের সিদ্ধান্তগুলি পড়িয়া নিম্নলিখিত সংশয়গুলি আমাদের মনে জাগিয়াছে—

(১) মিশন বা ভারত-সচিব এ-কথা ঘোষণা করেন নাই যে, ভারতকে, বৃটেনের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া হৌক বা না রাখিয়া হৌক, পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে। অবশ্য বড়লাট ওয়াভেল বলিয়াছেন, কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলীর কার্য্য শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সুযোগ পাওয়া যাইতে পারে।

(২) পৃথিবীর আধুনিক কোন রাষ্ট্রবিধানে ধর্ম্মগত সাম্প্রদায়িকতা ভেদ মানিয়া লওয়া হয় নাই। মিশন তাহা মানিয়া লইয়াছেন। মিশন যেখানে নিজেরাই বুঝিয়াছেন যে, মসলেম লীগ নামক একটি দল ব্যতীত (সকল মুসলমান নহে) ভারতের অপর সকল সম্প্রদায় "has shown an almost universal desire for the unity of India", তখন সে unity

নষ্ট করিবার জন্ম তাঁহারা হিন্দুপ্রধান ও মুসলমানপ্রধান অঞ্চল-ভেদে প্রদেশগুলির তিন ভাগ করিলেন কেন? বৃটিশ-ভারতের প্রদেশগুলি সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমান ভেদ করিলেও, দেশীয় রাজ্যগুলির ব্যাপারে সে ভেদ তাঁহারা করেন নাই কেন?

(৩) ইংরেজ কবে ভারত ত্যাগ করিবে তাহার প্রসঙ্গও উল্লেখ করা হয় নাই। বৃটিশ সৈন্য অপসারণের কোন কথা নাই কেন?

(৪) কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলীতে চারি ভাগের ১ ভাগ সদস্য দেশীয় রাজ্যের; এ-সব সদস্য রাজন্যদের মনোনীত হইবে, না জনসাধারণের প্রতিনিধি হইবে?

(৫) পশ্চিম ও পূর্ব্বের মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলি যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ইউনিয়নে যোগ দিতে না চায়—অর্থাৎ পাকিস্থান কায়েম করিতে চায়, তাহা হইলে ত কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলী তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া যাইবে।

(৬) কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলী যদি সাবালক ভোটাধিকারে গঠিত না হয় তাহা হইলে তাহা গণতান্ত্রিক হইতে পারে না। অনুপযুক্ত এবং সাম্প্রদায়িক ও সঙ্কীর্ণ ভেদবুদ্ধির ভিত্তিতে ভোটাধিকারে যে নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে, যাহাতে ডাণ্ডার ভয়ে ভোট ভাঙ্গান ও ভোট সংগ্রহের সুবিধা মিশনের উপস্থিতিতেই অনেকে করিয়া লইয়াছেন, সেই নির্ব্বাচনের প্রতিনিধিগণকে গণপরিষদের গণ-প্রতিনিধি বলিয়া মানিলে সরিষার মধ্যে ভূত থাকিয়া যাইবে।

(৭) কংগ্রেস বা মসলেম লীগ বা উভয়ে যদি মিশনের পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করে, তাহা হইলে কি অবস্থা যাহা ছিল তাহাই থাকিবে?

(৮) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দুর (৩০ কোটি) ও মুসলমানের (৯ কোটি) প্রতিনিধি জনসংখ্যানুপাতে না হইয়া সমান সমান হইবে কোন্ যুক্তিতে?

(৯) প্রাদেশিক গ্রুপ বা প্রাদেশিক ইউনিটের স্বতন্ত্র শাসন পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভা থাকিলে তাহা Sub federation হইয়া যায়। প্রদেশ সমূহ ও দেশীয় রাজ্যের সাধারণ বিষয়গুলি ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রয়োজন।

বৈদেশিক দৃষ্টিতে—

বৈদেশিক বিচক্ষণদের দৃষ্টিতে মিশন-সিদ্ধান্তের কোন কোন বিশেষ ত্রুটি ধরা পড়িয়াছে—

বিলাতের এক জন রক্ষণশীল মুখপাত্র অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—পরিকল্পনাটি ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্ম কাগজে-কলমে অতি কৌশলপূর্ণ পরিকল্পনা। সার ষ্টাফোর্ড ক্রিপসের সুচতুর মস্তিষ্কের পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। লণ্ডনের 'ডেলি ওয়ার্কার' মন্তব্য করিয়াছেন—"The substance of national independence—withdrawal of British troops and the giving to India of full rights over its economic resources, including the huge sterling sums owed her by Britain—is not in the agenda"—স্বাধীনতা বলিতে বাস্তবিক যা বুঝায়—বৃটিশ সৈন্য অপসারণ, ভারতের অর্থ-সম্পদগুলির উপর ভারতবাসীর পূর্ণ অধিকার (প্রভূত পরিমাণের যে ষ্টার্লিং ভারত বৃটেনের নিকট পাইবে তাহা সহ)—এ-সব মিশনের আলোচনায় স্থান পায় নাই।

'ডেলী টেলিগ্রাফ' পত্রে সার এলফ্রেড ওয়াটসন বলিয়াছেন—কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলীর ও বৃটেনের মধ্যে সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হইবার প্রয়োজন হইবে। এসেম্বলীর শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধি অনুসারে ক্ষমতা ইউনিয়ন সরকারের হস্তে যাইবে। এই সন্ধি হইয়া থাকে সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাহীন কোন এসেম্বলীর স্বাক্ষরিত কোন দলীলে ইউনিয়ন সরকার আবদ্ধ হইবে না। ইউনিয়ন ইচ্ছা করিলে সন্ধির প্রতি ছত্র ও প্রতি ধারা অস্বীকার করিতে পারে। "দেশীয় রাজ্যগুলির শাসকদের সহিত সম্রাটের এ-যাবৎ যে সম্পর্ক ছিল তাহা বজায় রাখা আর সম্ভবপর হইবে না" বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের এ স্বীকারোক্তির দ্বারা বাধ্য-বাধকতার কিছু অংশ ত্যাগ করা হইয়াছে। তবু সংশয়ের অবসান হয় নাই। সন্ধি-পত্রে বৃটিশ প্রজাদের ব্যবসা ও কাজকর্ম্মাদি পরিচালনের সর্ত্তাবলী না থাকিলে চলিবে না।

মসলেম দাবী সম্বন্ধে মিশন—

তদন্ত কালে মন্ত্রী-মিশন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিতে পারেন—

মসলেম লীগের সমর্থকগণ ব্যতীত ভারতের সকল দল ও সম্প্রদায় অখণ্ড ভারতের পক্ষপাতী।

মুসলমানদের মধ্যে এই মনোভাবই অত্যন্ত প্রবল যে, চিরকালই তাহাদিগকে গরিষ্ঠ হিন্দু দলের শাসনাধীনে থাকিতে হইবে। তাই তাহারা পৃথক্ ও সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পাকিস্থান রাষ্ট্রের দাবী করিয়াছিল। ভারতের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা করিতে হইলে এমন সকল ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যাহাতে তাহাদের সংস্কৃতি, ধর্ম্ম, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য স্বার্থে মুসলমানরা আপনাদের নিয়ন্ত্রণাধিকার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারে।

পাঞ্জাব উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বৃটিশ-বলুচিস্থানের মুসলমান-সংখ্যা শতকরা ৬২'০৭ জন, অমুসলমান ৩৭'৯৩ জন। বঙ্গ ও আসামে মুসলমান-সংখ্যা শতকরা ৫১'৬৯ জন, অমুসলমান ৪৮'৩১ জন। পঞ্জাব, বাংলা ও আসামের যে সকল জিলায় অমুসলমানগণ সংখ্যা-গরিষ্ঠ তাহাদিগকে পাকিস্থানে লইবার কোন যৌক্তিকতা দেখা যায় না। পাকিস্থানের অনুকূলে যে সকল যুক্তি দেখান যাইতে পারে, পাকিস্থান হইতে অমুসলমানগণকে বাদ দিবার পক্ষেও সে সকল যুক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সুতরাং মাত্র যে সকল অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যা-লঘিষ্ঠ, মাত্র সে-সকল অঞ্চলে পাকিস্থান গঠন মসলেম লীগ সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন না। অর্থাৎ ইহাতে পঞ্জাবে সমগ্র আম্বালা ও জলন্ধর-বিভাগ, বাংলায় শ্রীহট্ট ব্যতীত সমগ্র আসাম, কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চল পাকিস্থান হইতে বাদ পড়িতেছে।

সুতরাং ছোট বা বড় কোন প্রকার স্বতন্ত্র পাকিস্থান রাষ্ট্রেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইবে না।

তাহার পর প্রস্তাবিত পাকিস্থানের পশ্চিম ও পূর্ব্ব দুই অংশ ভারতের দুই গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত অঞ্চল। ভারত-রক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইলে পাকিস্থান অঞ্চল যথেষ্ট নহে। উভয় পাকিস্থান অঞ্চলের মধ্যে প্রায় ৭০০ মাইল ব্যবধান। কাজে কাজেই সমরে ও শান্তিতে পাকিস্থানকে হিন্দুস্থানের শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করিতে হইবে।

বিভক্ত ভারতের সহিত ভারতীয় করদ রাজ্যগুলির যোগরক্ষা করার অসুবিধা যথেষ্ট। অতএব আজ বৃটিশের হাতে যে ক্ষমতা আছে, তাহা দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের হস্তে অর্পণ করা অসম্ভব।

Coty 'কো———টি'র



বণ্ড ষ্ট্রীটের শো-রুম

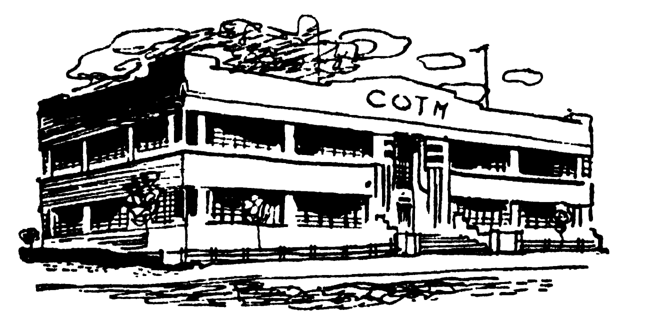
যুদ্ধের কালো মেঘ যখন আকাশ ঘিরে ফেলেছিলো, প্রত্যেক ব্যবসায়ী তখন মনে-প্রাণে তার অর্থবল এবং লোকবল নিয়োজিত করেছিল যুদ্ধের কাজে। ইংলণ্ডের প্রত্যেক নর-নারীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধে জয়লাভ করা।

কিন্তু প্রসাধনী এবং সুগন্ধির ব্যবসায়ী, যার বিদ্যা এবং বুদ্ধি রূপচর্চ্চা-কেন্দ্রিত, যুদ্ধে সে কিই বা করবে, এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হতে পারে? এই যুদ্ধে 'কোটি'রা কি করেছে? 'কোটি' প্রসাধনী জগৎ বিখ্যাত; তাদের প্রতিটি যন্ত্র সূক্ষ্ম এবং ত্রুটিহীন। তারা আবিষ্কার করল সেই যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিস্ফোরকের নিখুঁত প্যাক প্রস্তুত করা যায়। পাউডার তৈরী করার যন্ত্র দিয়ে রাসায়নিক দ্রব্যাদি চূর্ণ করতে পারা যায় অতি সূক্ষ্ম ভাবে। তাদের প্রকাণ্ড কটাহতে ক্রীম তৈরী হল, মুখে মাখবার। কমনীয় ত্বকের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য নয়, শত্রুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে মুখ লুকিয়ে রাখবার জন্য—কামোফ্লাজ ক্রীম।

আর জীবন-মরণ যুদ্ধেও মানুষ সম্পূর্ণরূপে দানব বনে যায় না। তার আর্টিষ্টিক রুচি থেকেই যায়। তাই সরকার থেকে তাদের ওপর হুকুম হল প্রসাধন-সামগ্রী তৈরীও যেন বন্ধ না থাকে। কারণ প্রসাধন-বিহীন নর-নারীর কার্য্যক্ষমতা কমে যায়।

লণ্ডনের ওপর বোমা বর্ষণ চলছিল। অনেক বিভাগ তাই সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল লণ্ডন থেকে অনেক দূরে। স্কটল্যাণ্ডের বেইনে গেল এক বিভাগ। আর এক বিভাগ গেল গ্লাসগোতে। আপিস গেল লেটনে।

বণ্ড ষ্ট্রীটের শো-রুমের চারি ধারে কাচের জানলা দরজা ঢেকে দিতে হল কাঠ দিয়ে। ষ্ট্র্যাটফোর্ড প্লেসের 'কোটি হাউস' শূন্য পড়ে রইল। ব্রেণ্টফোর্ড ফ্যাক্টরীর কাজ লণ্ডনেই চলতে লাগল। কত বার চারি ধারে বোমা বর্ষিত হল তার ইয়ত্তা নেই। একটা রকেট তো মাত্র ৩০০ গজ দূরে পড়েছিল। ১৯৪১ সালের মে মাসে বিখ্যাত 'কোটি' হাউস বোমার আগুনে প্রায় ভস্মীভূত হয়ে গিছল।



ব্রেণ্টফোর্ড ফ্যাক্টরী বোমায় বিধ্বস্ত হয়

কথা





স্কটল্যাণ্ডের একটি ফ্যাক্টরী

নতুন জায়গা, নতুন ফ্যাক্টরী। কত রকমের অসুবিধা। তবু কোন কর্ম্মচারী মনের জোর হারায়নি। লণ্ডনস্থিত ফ্যাক্টরীর লোকেরা চোখের সামনে বোমা পড়তে দেখেও পালায়নি। কারণ তাদের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। দেশকে জয়যুক্ত করা।

যুদ্ধের অবসানে তারা আবার ফিরে এসেছে নিজের পুরাতন বনেদী ফ্যাক্টরী এবং আফিসে। আবার বিশ্বব্যাপী নর-নারীর সৌখীন রুচি, রসিক মনের তৃপ্তি সাধনের সুযোগ পেয়েছে।

একটা প্রবাদ আছে যে, কোটি হাউসের গেটে যে দ্রাক্ষাকুঞ্জ আছে, তার জীবনীশক্তির সঙ্গে না কি বাড়ীর বাসিন্দাদের সুখ-ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পায়। এই বার সেই কুঞ্জ ফলে এবং পাতায় এতই সমৃদ্ধ যে লোকে বলে এমনটা না কি আগে কখনও হয়নি।

আশা করি, দ্রাক্ষাকুঞ্জের সৌন্দর্য্য তাদের ভাগ্যকেও সুন্দর করে তুলবে। আর তারা ভাগ্যবতী সুন্দরীদের ভাগ্য ও সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত করতে সক্ষম হবে।



লণ্ডনের বাইরের কার্য্যালয়



ইংলণ্ডের কোটি-গৃহে বোমা পড়ার পর

আগষ্ট-বিপ্লবের বীরবৃন্দ

অচ্যুত পটবর্দ্ধন—অরুণা আসফ আলির পর আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন আগষ্ট-বিপ্লবের অপর নেতা অচ্যুত পটবর্দ্ধন। ৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে যখন তিনি নাসিক রোড জেলে কারাবদ্ধ ছিলেন তখন তাঁহার রচিত সঙ্গীতে কারা পিঞ্জর মুখরিত হইত। লাঠির গান, গুলীর গান, বন্দীদের সুখ-দুঃখের সঙ্গীত সর্ব্বদা তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইত। তাহার পর তিনি আর গান করিতেন না। ৪২ সালের আগষ্ট-বিপ্লবে তিনি অগ্নি-বর্ত্তিকা হাতে করিয়া দেশে দেশে ফিরিয়াছেন। অজ্ঞাত স্থান হইতে তাঁহার 'ভারত ছাড়' বুলেটিন প্রচারিত হইয়াছে। ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া, ঊষা মেটা প্রভৃতির সহিত তিনি কংগ্রেস রেডিও হইতে বিপ্লবের সংবাদ প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার সহকর্ম্মী, জয়প্রকাশ লোহিয়া, এস, এম, যোশী একে একে ধরা পড়িলেন। মাত্র অরুণা ও অচ্যুত পুলিশের চোখে ধুলা দিলেন। তাঁহার পুণার বাড়ীতে নোটিশ লটকাইয়া দেওয়া হইল। সাতারা ছিল তাঁহার কর্ম্ম-কেন্দ্র। দাক্ষিণাত্যের কৃষকদের মধ্যে তিনি শিবাজীর বীরত্বের কথা প্রচার করিতেন। এ স্থানে তিনি "প্রতি-সরকার" প্রবর্ত্তিত করিলে গ্রাম্য প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইল। গবর্ণর কোল-ভীল ফৌজ পাঠাইলেন মারাঠা দেশময় অচ্যুতের সন্ধানে। তাঁহার ঝুটা দাড়ী ভেদ করিয়া পুলিশ অচ্যুতের সন্ধান পায় নাই। তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে পর্য্যন্ত যোগদান করেন। কংগ্রেসের সভাপতির নিকট এক চিঠিতে তিনি ও অরুণা গুপ্ত বিপ্লবীদের সমর্থন করিলেন। কংগ্রেসী সরকার বোম্বাইএর কর্ণধার হইবার সঙ্গে সঙ্গে অচ্যুত ফিরিয়া আসিয়াছেন।

শিবানন্দ ব্রহ্মচারী—যে সাহাবাদ জিলা হইতে শের শাহ দিল্লীর মসনদে বসিয়াছিলেন, ঔরাঙ্গাবাদ হইতে ১২ মাইল দূরে শোণ-তটে সন্ন্যাসী শিবানন্দ ব্রহ্মচারী বিপ্লব পরিচালন করেন। চারি বৎসর পর তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাঁর সহকর্ম্মী কুমার বদ্রীনারায়ণ সিং, অনন্তপ্রসাদ, অনন্তের বালক পুত্র কেদারনাথ, শ্রীকৃষ্ণ সিং এবার ২৮শে এপ্রিল অলক্ষ্য কর্ম্মকেন্দ্র হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন।

রামমনোহর—সঙ্গে ফিরিয়াছেন রামমনোহর লোহিয়া। লোহিয়ার জন্ম বোম্বাইয়ে, শিক্ষা কলিকাতায়। উচ্চতর শিক্ষা জার্ম্মাণীতে। ভারতে ফিরিয়া ভাল চাকরী তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু দেশ পরাধীন। পরাধীনতার বেদনাও তাঁহার অসীম। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলে তিনি যোগ দিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল তাঁহাকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর পররাষ্ট্র বিভাগে লইলেন (১১৩৫)। ৩৮ সাল হইতে লোহিয়া বড় বেশী জেলের বাহিরে থাকেন নাই। তার পর আগষ্ট-বিপ্লব। তিনি অচ্যুত, জয়প্রকাশ, অরুণার সহিত গুপ্ত সংগ্রাম চালাইলেন, ১৯৪৪ মে পুলিশ তাঁহার সন্ধান পাইয়া গ্রেপ্তার করিয়া লাহোর দুর্গে বন্দী করে।

জয়প্রকাশ—আগষ্ট-বিপ্লবী জয়প্রকাশ নারায়ণও ফিরিয়া আসিয়াছেন, গুপ্ত স্থান হইতে নহে, কারা-পিঞ্জর হইতে। প্রায় ৭ বৎসর পূর্ব্বে রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁহাকে কারাবদ্ধ করা হয়। তাহার পর তাঁহাকে বড় একটা বাহিরে দেখা যায় নাই, কিন্তু কারা-প্রাচীর এই দুর্দ্ধর্ষ বন্দীর তেজ স্তিমিত করিতে পারে নাই। দেওলী বন্দি-নিবাসে তিনি এক কেরাণীর যোগে তাঁহার সহকর্ম্মীদের সহিত সম্পর্ক রাখিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হন। স্ত্রীর নিকট তিনি যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র পাঠাইয়াছিলেন তাহা ধরিয়া ফেলিয়া সরকার বড় বাহবা লইয়াছিলেন। ইহার পর জয়প্রকাশকে হাজারিবাগ জেলে পাঠান হয়। এখান হইতে এক দেওয়ালীর দিনে ৪ জন সহ-বন্দিসহ তিনি পলায়ন করেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ভারতের সর্ব্বত্র পুলিশ তন্ন-তন্ন করিয়া সন্ধান করিতে থাকে। তাঁহার মাথার উপর সহস্র সহস্র টাকা ঘোষণা করা হয়। সঙ্গী রামমনোহরকে লইয়া তিনি ভারতের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করেন। নেপালে পুলিসের চোখে তিনি ধূলিনিক্ষেপ করেন। পঞ্জাবে বন্ধুরা তাঁহাকে ধরাইয়া দিলে পুলিশ জয়প্রকাশকে লাহোর কেল্লায় লইয়া আবদ্ধ করে। তার পর আগ্রা জেলে। তার পর কারা-নির্য্যাতন। কিন্তু নির্য্যাতনকারীরা তাঁহার পাষাণ সঙ্কল্প চূর্ণ করিতে পারে নাই।

জয়প্রকাশ মহা-পণ্ডিত। আমেরিকার ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে আঙ্গুরের ক্ষেতে, পীচের বাগানে দিনে দশ ঘণ্টা খাটিতে হইয়াছে। অনেক রেস্তোরায় তাঁহাকে 'বয়'র কাজও করিতে হইয়াছে। ২১ সালে ভারতে ফিরিলে পণ্ডিত জওহরলাল তাঁহার উপর কংগ্রেস শ্রমিক সংগঠন বিভাগের ভার প্রদান করেন, কয় মাস পরে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেসের সেক্রেটারীও হন।

বাংলায় পাকচক্র

বঙ্গজননীর অঙ্গ কাটিবে কি কাটিবে না ইহা লইয়া বাংলার পাক-চক্রীদের মধ্যে না কি মতভেদ হইয়াছে। বাংলার কংগ্রেসের গান্ধী-পন্থীদের কেহ কেহ না কি বঙ্গবিচ্ছেদের অনুকূলে মত দিয়াছেন বলিয়া বোম্বাইএর 'ফোরাম' পত্র প্রকাশ করিয়াছেন ("Some prominent rightist congress-men expressed themselves in favour of the proposed partition"), কিন্তু কংগ্রেসের চরমপন্থী নেতা ও কর্ম্মিবৃন্দ এই বিচ্ছেদের তীব্র বিরুদ্ধাচরণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

বাংলার মসলেম লীগ দলেও বঙ্গ-বিচ্ছেদ ব্যাপার লইয়া মতভেদ। খাজা নাজিমুদ্দীনের ভূতপূর্ব্ব অনুচর পূর্ব্ববঙ্গের পাকিস্থানবাদী মুসলমান নেতারা সুরাবর্দ্দীকে বড় একটা নেক-নজরে দেখিতেছেন না। লীগ-পতি জিন্না পূর্ব্বে স্বরাজী—অধুনা গোষ্ঠীচ্যুত মিঃ সুরাবর্দ্দী ও তাঁহার মন্ত্রিসভার কতিপয় পূর্ব্ব-কংগ্রেসপন্থী মন্ত্রীকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। সম্প্রতি দিল্লীতে যে লীগ কনভেনসন হইয়া গেল, তাহাতে লীগের প্রতিনিধিরূপে আহূত হইয়াছিলেন ইস্পাহানী, সুরাবর্দ্দী নহেন। লীগের সেন্ট্রাল বোর্ডে সুরাবর্দ্দীকে না লইয়া ইস্পাহানীকে লওয়া হইয়াছে। মিঃ জোয়াচিম আলভা লিখিতেছেন—"There is strong reasons to doubt that Ishpahani is being pitted against ths zamindary and business interests in Bengal."—ইহা সন্দেহ করিবার যথেষ্ট হেতু আছে যে, বাংলার জমিদারী ও ব্যবসায়ী স্বার্থের প্রতিষেধকরূপে ইস্পাহানীকে দাঁড় করান হইয়াছে। আসামের কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রী পাকিস্থানীদের হাতে শ্রীহট্ট ও গোয়ালপাড়া জিলা অর্পণের প্রস্তাব সমর্থন করিলেও কংগ্রেসের চরমপন্থী দল তাহাতে সায় দেয় নাই।

তাঁহারা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নির্ব্বাচনে তাঁহাকে আপনাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে অসম্মত হইয়াছেন। বাংলার নবাব-নাজিম সুরাবর্দ্দী তাঁহার প্রাক্তন গুরু ফজলুল হকের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তপশীলভুক্ত প্রতিনিধিদের সাহায্যে আপনার উজিরী-তক্ত অটল রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। রাজনৈতিক দলাদলি হিসাবে বাংলা পরিষদকে ও কলিকাতা কর্পোরেশনকে অভিন্ন দেখা চলে না। কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচন লইয়াও লীগ দলে ভেদ দেখা দিয়াছে। সেখানে আজ যাহাকে লীগ-কংগ্রেস মিতালী বলা হইতেছে তাহা এক প্রকার ছলনা বলাই ভাল। বাংলার কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, কর্পোরেশনে কংগ্রেস দলের সহিত বাংলার সরকারী কংগ্রেসের কোন সম্পর্ক নাই। কর্পোরেশনের নূতন মেয়র এস, এম, ওসমান সকল লীগ-সদস্যদের প্রতিনিধি নহেন। এই নির্ব্বাচন ব্যাপার লইয়া আব্দার রহমান সিদ্দিকী কর্পোরেশনের মসলেম লীগ দলের সভাপতি-পদ ত্যাগ করিয়াছেন। এ সকল হইতে মনে হইতেছে, সুরাবর্দ্দীর মন্ত্রিমণ্ডলের আসন নিরাপদ নহে! কখন কি হয় বলা যায় না।

লড়কে লেঙ্গের নমুনা

পঞ্জাবের জলন্ধর জিলা মুসলমান-প্রধান। মুসলমানরা সকলেই মসলেম লীগপন্থী। বর্ত্তমানে লীগপন্থীদের মধ্যে দুই দল হইয়াছে—এক দলের নাম 'ডাণ্ডাদল', অপর দলের নাম "গরীবদল"। ডাণ্ডাদলে আছে জবরদস্ত জমিদার। গরীবদলে দরিদ্র কৃষাণ। মুসলমানদের দেখাদেখি স্থানীয় হিন্দুরাও গরীবদল গঠন করিয়াছে। ডাণ্ডাদল দরিদ্র মুসলমান কৃষাণদিগকে ভয় দেখাইতেছে, তাহাদের ভয়ে দরিদ্র কৃষাণ বা তাহাদের স্ত্রীলোকরা নির্ভয়ে পথে চলাচল করিতে পারিতেছে না। এ সকল হইল পাকিস্থানের মুখবন্ধ। মাত্র তৃতীয় পক্ষের উস্কানীতে যাহারা নাচে, তাহাদের অন্তরে ও সংগঠনে দেশাত্মবোধ মোটেই নাই। লড়কে লেঙ্গের বুলিতে তাহারা বুঝে মাত্র পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে ছুরিকাঘাত—তা ভাইয়ের বুকে হয় হোক না।

ফিরোজ খাঁন কি চেঙ্গিস খাঁন ?

সার ফিরোজ খাঁন নুন কিছু দিন পূর্ব্বে নিখিল ভারত মসলেম লীগ পরিষদ সদস্যদের সম্মিলনে চেঙ্গিস্ খাঁন ও হুলাকু খাঁনের নামের অবতারণা করিয়া বৃটিশ মন্ত্রী-মিশন, কংগ্রেস ও হিন্দু জনসাধারণকে ভয় দেখাইয়াছিলেন এবং বিভিন্ন প্রদেশে ইসলামের ধ্বজাধারীরা তাহাতে ওয়াহ্,! ওয়াহ্,! করিয়া তারিফ করিয়াছিলেন। মাত্র ভারতের নহে, সমগ্র পৃথিবীতে হিন্দু ও মুসলমানের সমশত্রু হইল ইংরেজ। এই ইংরেজ যখন লীগপন্থীদের বিবেক-পরিচালক, তখন ইসলামের চিরশত্রু অমুসলমান চেঙ্গিস খাঁন ও হুলাকু খাঁন (আদিম শামানি ধর্ম্মাবলম্বী) লীগের উপাস্য কেন হইবে না? সার নুন ভারতের নুনের যে মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন না তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। ইহাতে আমরা বিস্মিত হইব না যদি দেখি যে ফিরোজ খাঁন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চেঙ্গিস খাঁন আর হুলাকু খাঁনের ন্যায় পৌত্তলিক সাজিয়া ইসলামী দেশগুলির নর-নারীর উপর বেপরোয়া খুন-খারাবী চালাইতেছেন। চেঙ্গিসের আদর্শবাদীরা যে ডাণ্ডাপন্থী হইবেন তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

ভুলাভাই দেশাই

প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা ভুলাভাই দেশাই ৫ই মে, শেষ রাত্রিতে ৬৮ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর দরিদ্র কৃষক-পরিবারে তাঁহার জন্ম। বোম্বাইএর ৮৯ নং ওয়ার্ডেন রোডের যে ভাড়াটিয়া ক্ষুদ্র কক্ষে তাঁহার জন্ম হয় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সে কক্ষ তিনি ত্যাগ করেন নাই। তিনি বলিতেন—"প্রাসাদ নির্ম্মাণের ক্ষমতা যদি আমার হয়, তবে সে প্রাসাদ এই কক্ষকে ঘিরিয়াই রচনা করিব। কেন করিব জানেন, আমার শৈশবের দৈন্য ও দুরবস্থার কথা আমি ভুলিব কি করিয়া? আমি দীনভাবে আমরণ কাল কাটাইয়া যাইব।" পিতা-মাতা ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। ৭ বছর বয়সে ভুলাভাইকে ৫ মাইল পায়ে হাঁটিয়া বিদ্যালয়ে যাইতে হইত। স্কুলের বেতন দিয়া পড়িবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইএর এলফিনষ্টোন কলেজে তিনি ভর্ত্তি হন। এম-এ ও ল পাশ করিয়া কিছু দিন তাঁহাকে আমেদাবাদের গুজরাট কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে হয়। বোম্বাই হাইকোর্টে যখন তিনি মর্য্যাদা লাভ করেন, তখন মিঃ জিন্না, শ্রীযুত জয়াকর, সার দিনশা মুল্লার মত ব্যবহারাজীবগণের সহিত তাঁহাকে প্রতিযোগিতা করিতে হয়। এ সময় রাজনীতিতে তিনি ছিলেন হোমরুলপন্থী—এনি বেসান্ত ও মিঃ জিন্নার সমর্থক। এ সময় মহাত্মা গান্ধী ও সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেলের সংস্রবে তিনি আসিয়া পড়েন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল যখন বারদোলি সত্যাগ্রহ সংগঠন করেন, তখন সরকারী ক্রমফিল্ড কমিটির নিকট বারদোলির কৃষাণদের তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁহারই কৃতিত্বের ফলে বারদোলির চাষীরা জয়লাভ করে। এই সময় হইতেই তাঁহার উপর গান্ধীজীর প্রভাব। দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাসাদ কংগ্রেসের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কর্ম্মী ও নেতাদের আড্ডায় পরিণত হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেসে প্রকাশ্য ভাবে যোগদান করিয়া সত্যাগ্রহী হন। ১৯৩২এ তিনি ১ বৎসর কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন।

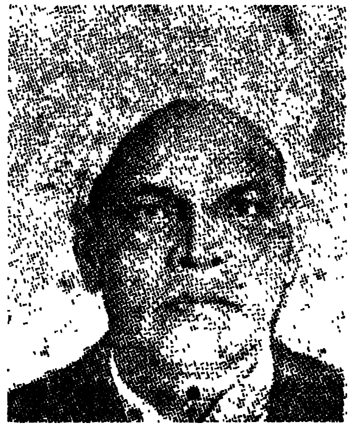
পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর মৃত্যুর পর যখন স্বরাজ্য দল নেতৃহীন হয় এবং লাহোর কংগ্রেসের সময় হইতে যখন এই দল উঠিয়া যায়, তখন (১৯৩৪) ডাঃ আন্সারী এই দলকে পুনর্গঠিত করিবার চেষ্টা করেন। দিল্লীতে এক বৈঠক বসে। স্বরাজ্য দলের পুনর্গঠনের প্রস্তাবে গুরু গান্ধীর আশীর্ব্বাদ সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত হন ডাঃ আন্সারী, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং ভুলাভাই দেশাই। গান্ধীজী সম্মত হন। রাঁচির বৈঠকে (মে, ১৯৩৪) ভুলাভাই শ্বেতপত্র সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ সময়ে পাটনায় কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি ডাঃ আন্সারীর নেতৃত্বে যে পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠন করেন, তাহার সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন ভুলাভাই। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের নব-নির্ব্বাচিত কেন্দ্রী পরিষদে ভুলাভাই কংগ্রেস দলের নেতা নির্ব্বাচিত হন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য হন।

১৯৪০, ১লা ডিসেম্বর ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে তাঁহাকে যারবেদা জেলে যখন আটক রাখা হয় তখন হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। স্বাস্থ্যের কারণে ১৯৪২-এর আগষ্ট প্রস্তাব রচনার সময় তাঁহাকে কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির পদ ত্যাগ করিতে হয়।

তার পর আই-এন-এ বিচার। সাহ নওয়াজ বলিয়াছেন—আজাদ-হিন্দ বাহিনীর বিচারকালে ভুলাভাই যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তাহা অমর হইয়া রহিবে। তিনি ভারতের মাত্র নহে, পৃথিবীর সকল দাস-জাতির সৈনিকদের শিখাইয়াছেন যে, সৈনিকের কর্ত্তব্য ও আনুগত্য বৃটিশ রাজার প্রতি নহে, কর্ত্তব্য ও আনুগত্য স্বদেশের প্রতি। ভুলাভাই বুঝিয়াছিলেন মৃত্যু আসন্ন ও নিশ্চিত, তাই অকুতোভয় নিষ্ঠায় এই কূটবিশারদ বাগ্মী নব আন্দোলন ও জাতীয় নব অভ্যুদয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন আই-এন-এ বিচারে ও রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভির উত্থানে। আই-এন-এ বিচারের সময় চিকিৎসকের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া চারি ঘণ্টা তিনি জ্বালাময়ী ভাষায় ও অকাট্য যুক্তিতে পূর্ণ বক্তৃতা করিয়া অবসন্ন হন, মাঝে মাঝে তাঁহাকে অক্সিজেন লইতে হয়। চিকিৎসকদের সতর্ক-বাণী অগ্রাহ্য করিয়া দেশভক্ত বলেন—"I dont care to live myself, I want to save lives of these three men." রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভির ধর্ম্মঘটের সময় ভুলাভাই বলেন—"We are willing to perish if Bombay is bombarded, but let them not lay down their arms." ভুলাভাই সুভাষচন্দ্রকে বড় ভালবাসিতেন, সুভাষচন্দ্রের অদ্ভুত প্রচেষ্টায় সমগ্র ভারতের নব শক্তি লাভ হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে যখন তাঁহার নাড়ীর গতি ১২০, লালা শঙ্করলাল আসিয়া তাঁহাকে জানাইলেন—"দেশাইজী, সুভাষ মরেন নাই।" ভুলাভাইর মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার নাড়ীর গতি নামিয়া হইয়াছিল ১০০। ভুলাভাই আজ স্বর্গে! জাতির কাম্য লাভ হইবেই। স্বাধীনতা অপ্রতিরোধ্য। স্বাধীন ভারত ভুলাভাইকে বিস্মৃত হইবে না।

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী

রাইট অনারেবল ভি, এস, শ্রীনিবাস শাস্ত্রীও দেহরক্ষা করিয়াছেন। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, নয়া ভারতের তরুণকে জাতি-গঠন করিতে হইলে গোখেল, গান্ধী ও শাস্ত্রী এই ত্রয়ীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা আমরা মানি না। তবু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে—এই ত্রিপুরুষের চিন্তাশক্তি, সক্রমবুদ্ধি ভারতের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রাণবন্ত করিয়াছে, সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটীতে শাস্ত্রী মহাশয় গান্ধীজীর ন্যায় গোখেলের শিষ্য ছিলেন। গান্ধীজীর সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য থাকিলেও তিনি তাঁহাকে ভালবাসিতেন। তাই দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের শেষে তিনি দেশে



ঐক্য ও সহযোগিতা স্থাপনের জন্য গান্ধীজীর নিকট আবেদন করেন। লিবারাল কনফারেন্সেও বহু বার তিনি রাজনৈতিক উগ্র ও চরমপন্থীদিগকে একটু নামিয়া আসিয়া সর্ব্বদলসম্মত কর্ম্মে লিপ্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। জাতি ও বর্ণ, সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক দলাদলির তিনি ঊর্দ্ধে ছিলেন। তিনি ছিলেন সংস্কারক, বিপ্লবী নহে। চরিত্রের দৃঢ়তা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা এবং বিবেকের প্রতিষ্ঠা যদি অতিমানবের সৃষ্টি করে, তাহা হইলে আমরা বলিব শাস্ত্রী মহাশয় নব্য ভারতের অতিমানবদের অন্যতম। গোখেল একবার বলিয়াছিলেন—"India that produced a Sastri need not despair"—যে ভারত শাস্ত্রীর জননী সে হতাশ হইবে কেন?

রিক্সার ভবিষ্যৎ

রিকসা উঠাইয়া দিবার জন্য একটা আন্দোলন চলিতেছে। লেবার ইনভেষ্টিগেসন কমিটির সদস্য ডাঃ আহমদ মুক্তার বলিয়াছেন যে, নরচালিত এই যান মানুষকে ভারবাহী পশুর পর্য্যায়ে ফেলিতেছে। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ছোটখাট মোটর-সাইকেল রিকসা সকল সহরে প্রবর্ত্তন করিলে, আজ যাহারা রিকসা টানিতেছে কাল তাহারা মোটর-রিকসা ড্রাইভার হইতে পারিবে।

এ দেশে রিকসার প্রবর্ত্তন উনবিংশ শতাব্দীতে হয়। ফরাসী ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কয়েক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে মাদ্রাজে আসিয়া মাদ্রাজে প্রথম রিকসা ব্যবহার চালু করেন। কলিকাতায় প্রথম রিকসা আসে, তাহার চালকরা ছিল চীনা। গত মহাযুদ্ধের সময় দেশী লোক চালক হয়। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে ৬১২২ জন এবং কলিকাতায় প্রায় ৩০ হাজার রিকসা-চালক ছিল, অধিকাংশই হিন্দু। সিমলায় ১৭১৩ জন রিকসা-ওয়ালার অধিকাংশই রাজপুত, ব্রাহ্মণ ও জোলা; মাদ্রাজে শতকরা সাড়ে ৭৮ জন তামিল। অবশিষ্ট তেলুগু। কলিকাতার অধিকাংশ রিক্সাওয়ালা বিহারী বা যুক্তপ্রদেশবাসী, বাঙ্গালী নাই বলিলেও হয়।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার



আমাকে যদি বাঁচিতে হয়, স্বরাজের জন্য বাঁচিব,
যদি মরিতে হয়, স্বরাজের জন্য মরিব।

—দেশবন্ধু

মাসিক বসুমতী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত



২৫শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩ প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা

যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত এবং কলহে সহস্র তিনিই বাবু। যাঁহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ. পৃষ্ঠে শতগুণ এবং কার্য্যকালে অদৃশ্য তিনিই বাবু। যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তক মধ্যে, যৌবনে বোতল মধ্যে, বার্দ্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে তিনিই বাবু। যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরেজ, গুরু ব্রাহ্মধর্ম্মবেত্তা, বেদ দেশী সংবাদ-পত্র, এবং তীর্থ ন্যাশানাল থিয়েটর, তিনিই বাবু। যিনি মিশনরীর নিকট খৃষ্টান, কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু, এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক তিনিই বাবু। যিনি নিজ গৃহে জল খান, বন্ধু গৃহে মদ খান, বেশ্যা গৃহে গালি খান এবং মনিব সাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান তিনিই বাবু।

—বঙ্কিমচন্দ্র

কল্যাণীয়

শ্রীযুক্ত অমিয় চন্দ্র চক্রবর্তী

হে বন্ধু নূতন ক'রে
আরোগ্যের স্বাদ দিলে মোরে
পুরাতন কাল হতে নূতন কী রস
আনি দিল সখ্যের পরশ।

অকৃত্রিম তোমার মিত্রতা,
তোমার বুদ্ধির বিচিত্রতা,
ভূয়োদর্শনের তব দান
বন্ধুত্বেরে করে মূল্যবান।

নবোদিত প্রভাতে যেমন
শিখরে শিখরে হয় আলোর ক্রমশ প্রকাশন
তেমনি আঁধার গুহা হতে
ফিরে যবে আসি মুক্ত সংসারের স্রোতে
জীবনের সার্থকতা একে একে নূতন আলোকে
ফিরে আসে চোখে ॥

৭ই জ্যৈষ্ঠ
১৩৪৭

রবীন্দ্রনাথ



ভারতীয় প্রিন্স — শিল্পী—শ্রীশৈল চক্রবর্তী



দু'বার বি. এ. ফেল ক'রে কোন জন্মে কলেজ ছেড়েছিলুম : এত দিনে কলেজ তার শোধ নিলো।

আমরা পুরোনো জমিদার। গেরিলার মতো আমাদের অবস্থা আজকাল : রাশিয়ার নয়, আফ্রিকার গেরিলা। আমরা মরতে বসেছি—কোনোরকম চেষ্টাতেই বাঙালি জমিদাররূপী সুখী শৌখিন প্রাণীটিকে বেশি দিন আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।

মদ, ঘোড়া, মামলা, আমলা, বেশ্যা, সন্ন্যাসী, স্বদেশী ব্যবসা—এই সব গতানুগতিক অপঘাতে বহু কাল ধ'রে ঝাঁঝরা হ'য়ে-হ'য়ে বহুবিভক্ত জমিদারির যে-অংশটুকু আমার পাতে পড়লো, সেটা এমনই আঁটোসাঁটো মাপের যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ভোগ করবার উপায় নেই, হয় খেটে-খুটে বাড়াতে হয়, নয় ফুঁকে দিতে হয় এক নিশ্বাসে। কিন্তু ও-দুয়ের কোনোটাই সম্ভব ছিলো না আমার পক্ষে। আমার জীবন-চরিতে বি. এ. পরীক্ষার পরিচ্ছেদটা আকস্মিক নয়, স্বভাবতঃই ফেল করবার দিকে আমার ঝোঁক : এমনকি যে-সব ক্ষেত্রে জমিদার-পুত্রের চিরাচরিত অধিকার—যেমন পরস্বাপহরণ কি পরোপকার, রাজনীতি কি লাম্পট্য—তার কোনোটিতেই কিছুমাত্র শক্তি নেই আমার, অভিরুচিও না। অম্বুরি তামাকের সৌগন্ধ্যে তাকিয়াশ্রিত তন্দ্রার আবছায়ায় আমার জীবনটা কেটে যেতে পারতো—আমি তাতে সুখীই হতাম—কিন্তু পারলো কই। জমিদার-জন্তু মারা পড়বে যার হাতে, সেই নখদন্তবান নব্য জন্তু আঁচড়ে-কামড়ে সব নষ্ট ক'রে দিচ্ছে চোখের উপর—গেলো শ্রী, শৃঙ্খলা, শান্তি, সম্ভ্রম, সৌজন্যও গেলো—এখন 'লাল বাতি জ্বললেই হয়। সে দুর্দিন আমার জীবনেই হয়তো আসবে—কিন্তু এমন দুর্দিনই বা কী। ভালোই তো। পুরোনো পাপের উচ্ছেদের জন্য টাটকা-টাটকা পাপ দাপাদাপি ক'রে বেড়াচ্ছে : এ অবস্থায় একমাত্র আশা করবার এই আছে যে শেষ যেন শিগগির হয়। তা-ই যদি, তাহ'লে শেষ হবার অপেক্ষায় না-থেকে শেষ ক'রে দেয়াই তো ভালো? যা কেড়ে নেবে, আগে থেকেই তা ঝেড়ে ফেলি?···হঠাৎ আমি ঠিক করলাম, আমাদের শহরে একটি কলেজ করবো।

একেবারে হঠাৎও নয়। ফেনিতে, মালদয়, বগুড়ায় কলেজ আছে, অথচ আমাদের এই বড়ো-সড়ো সচ্ছল জেলায় আজ পর্যন্ত একটি হ'লো না, এ নিয়ে কোথায় যেন লজ্জা ছিলো আমার। লজ্জার কারণ এই যে, প্রজারা এখনো আমাকে রাজা ব'লেই ভাবে, আর আমিও মানুষ হয়েছি প্রভুতন্ত্রে, শক্তি না-থাকলেই দায়িত্ব চুকে যায় এ-কথা ভাবতে শিখিনি কখনো। আসলে দায়িত্ববোধের শৈথিল্যেই শক্তি ক'মে আসে, তাই তো তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে আমার অনেক কলেজ-কল্পনা মিলিয়ে গেছে অনেক দিন। আর শেষ পর্যন্ত ইচ্ছাময়ের চরণেই আমার এই ইচ্ছাময় চিন্তার অবসান হ'তো, যদি না কলকাতায় বোমার হিড়িকের সঙ্গে-সঙ্গে মফস্বলে আরম্ভ হ'তো কলেজের হিড়িক। মহকুমায়, গঞ্জে, গ্রামে কলেজ গজিয়ে উঠলো দেখতে-দেখতে, অথচ আমাদের অঞ্চলে কোনো সাড়া-শব্দই নেই। মনের মধ্যে একটা হীন, সংকীর্ণ দেশপ্রেমের জ্বলুনি-পুড়ুনি এমন তীব্র হ'লো যে মন স্থির করতে আর দেরি হ'লো না। একেবারে পয়লা নম্বরি একটা কলেজ করা চাই; যা লাগে লাগুক, নিজেদের খাওয়া-পরার ঠিক সংস্থানটুকু বাঁচিয়ে সর্বস্ব দেবো। সব তো যাবেই, এ-ভাবেই যাক—মানে, কিছু একটা হ'য়ে থাক তবু। আমার ছেলে যদি জমিদারির আশা রাখে, সে তবে মূঢ়, আর আমি যদি তার জন্য সে-আশা করি আমি ততোধিক।

এ-কাজে আমার প্রধান সহায় হলেন হরিহর চক্রবর্তী। শহরের সব চাইতে বড়ো এবং বুড়ো উকিল তিনি : চল্লিশ বছর ধ'রে প্র্যাকটিস করছেন, এবং এই চল্লিশ বছরে আমাদের আদি সম্পত্তির প্রায় অর্ধেকই তাঁর অধিকারভুক্ত হয়েছে, এটা একাধারে তাঁর বুদ্ধি ও বিত্তের পরিচয়। সত্যি বলতে, তাঁর তুল্য যোগ্য ও মান্য ব্যক্তি পাশাপাশি দুটো-তিনটে জেলাতেও আর একজন নেই। যৌবনে স্বদেশী আন্দোলনের পাণ্ডা হ'য়ে প্রায় জেলে গিয়েছিলেন; উদ্যোক্তা ছিলেন প্রথম দিশি ব্যাঙ্কের স্থাপনায়—সে-ব্যাঙ্কের অপমৃত্যুতেই হরিহর চক্রবর্তীর উত্থানের সূত্রপাত এই রকম একটা প্রবাদ যদিও প্রচলিত আছে, আমি সে-কথা কখনোই বিশ্বাস

করিনি। ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, বাবার অগাধ আস্থা ছিলো তাঁর উপর—এবং মন্দ লোকে যদিও সর্বদাই ব'লে থাকে যে আমাদের বর্তমান দুর্দশার সেটাই কারণ, সে-কথাও মানি না আমি। দুর্দশার কারণ আমাদেরই অক্ষমতা: আমরা যদি মামলাবিলাসী হই, সেটা কি উকিলের দোষ? হরিহর বাবুকে দেশপ্রেমিক এবং কর্মবীর ব'লেই জেনে এসেছি; রোজ সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়িতে দু'তিনখানা খবরের কাগজ আর দু'তিন পেয়ালা চায়ের সহযোগে দেশের অবস্থাটা তিনি এমন দীপ্তিময়ী ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন যে তার প্রভাবে আমি যে আমি, আমিও একবার যৎকিঞ্চিৎ দেশোদ্ধারের চেষ্টা করেছিলুম। উনিশ-শো-একুশে আমাদের চরকা ধরিয়েছিলেন তিনি, আমার নিজের কাটা সুতোয় আট হাতি একখানা ধুতিও তৈরি হয়েছিলো—যদিও অন্তঃপুরে সেটা নিয়ে অত্যন্ত বেশি হাসাহাসি হবার ফলে সে-ধুতি আমার কটিলগ্ন হ'তে পারেনি।

হরিহরবাবুর কাছে কলেজের প্রস্তাব নিয়ে যখন গেলাম, তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'বেশ, বেশ, আমি নিশ্চয়ই জানতাম আমাদের সরোজ একদিন দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।'

আমি বললাম, 'আমি তো কিছুই জানি না, আপনি ভরসা।'

'আমি তো আছি, ভাবনা কী।'

মনে-মনে যতটা ভাবতে পেরেছিলাম, সব বললাম। ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত শুনে বললেন, 'আমার কাছে কী-আশা করো ঠিক ক'রে বলো তো।'

একটু কুণ্ঠিতভাবে বললাম, 'সরস্বতীর আসন রচনা করতে হ'লে প্রথমেই লক্ষ্মীর প্রসাদ চাই।'

'তার জন্মে আর ভাবনা কী—তুমিই তো আছো লক্ষ্মীর বরপুত্র।' হরিহরবাবু সশব্দে হেসে উঠলেন।

'একলা আমি কি সবটা পেরে উঠবো। আপনি যদি কিছু···'

হরিহর বাবুর মুখ গম্ভীর হ'লো। আস্তে-আস্তে বললেন, 'পৈতৃক বিত্ত কিছুই পাইনি আমি, নিজের জীবনে নিজের উপার্জনে সামান্য যা করেছি, তা বিলিয়ে দিলে পুত্রপৌত্রের প্রতি অন্যায় করা হবে। তাছাড়া, আমি যদি অর্থ দিয়ে তোমার কলেজে সাহায্য করি, তাহ'লে তোমার নিজের চেষ্টা হয়তো চরমে পৌঁছতে পারবে না—আমি বলবো সেটা তোমার পক্ষে ক্ষতিকর। ত্যাগের পথে মানুষকে বাধা দিতে নেই। অরবিন্দ ঘোষ বলতেন···'

অরবিন্দ ঘোষ কী বলতেন, তা শোনবার জন্য আমি উৎসুক হলাম, কিন্তু সে-কথা শেষ না-ক'রে হরিহরবাবু নিজেই আবার বললেন, 'এ-রকম কিছুই আমি করবো না যাতে কোনো-এক সময়ে তোমার মনে হ'তে পারে আমি তোমার আত্মশক্তি হরণ করেছিলাম।'

মানতে হ'লো তাঁর যুক্তির সারবত্তা। পৈতৃক বিত্ত নিয়ে আমিই যখন জন্মেছি, আর সেটা যখন এ-কালের নীতি অনুসারে অপরাধ, তখন সে-অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে, শোধ করতে হবে দেশের কাছে বহুকালের সঞ্চিত ঋণ। শোধ করবার সুযোগ সকলে পায় না, আমি যে পাচ্ছি সেটাই তো আমার ভাগ্য। অবশ্য হরিহরবাবুর পুত্র-পৌত্রে এ অপরাধ নতুন ক'রে বর্তাবে—কিন্তু তাতে কী? আমি বাপের পয়সা পেয়েছিলাম, অতএব আমার ছেলে পাবে না, হরিহরবাবু পাননি, অতএব তাঁর ছেলে পাবে—এর উপরে আর কথা কী। সাম্যনীতির প্রথম প্রস্তাবই তো এ-ই।

আরো খানিকক্ষণ আলোচনার পরে স্থির হ'লো যে হরিহরবাবু হবেন কলেজের প্রেসিডেন্ট, আমি সেক্রেটারি, কমিটির মেম্বর থাকবেন এ অঞ্চলের আরো কয়েকজন নামজাদা। হরিহরবাবুকে কয়েক দিনের মধ্যেই একবার কলকাতা যেতে হবে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়ো তরফে দেখাশোনা ক'রে সব ব্যবস্থা ক'রে আসবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি সহজেই পাওয়া গেলো। সামনের জুলাইতেই কলেজ খোলা হবে।

শহরের বাইরে পূর্বপুরুষ একটি সুবৃহৎ প্রমোদ-ভবন বানিয়েছিলেন; ব্যবহারের অভাবে বাবার আমল থেকেই পরিত্যক্ত। পঞ্চ সহস্র মুদ্রা ব্যয় ক'রে সেইটেকে কলেজের প্রয়োজন-মতো সংস্কার করিয়ে নিলাম: এক পাশে একশো ছেলের উপযোগী হস্টেল। দেখতে-শুনতে ভালোই হ'লো। বিলাস-প্রাসাদকে বিদ্যা-মন্দিরে রূপান্তরিত ক'রে মনে-মনে খুব আনন্দ হ'লো আমার, সেই সঙ্গে বেশ-একটু গর্ব—আমি যে আধুনিকতায় একেবারে অনধিকারী নই এটা কি তারই প্রমাণ নয়?

হরিহরবাবু তাঁর একটু দূর সম্পর্কের দু'জন আত্মীয়কে প্রোফেসরির জন্য আগেই ঠিক ক'রে রেখেছিলেন, অন্যান্য অধ্যাপকের জন্য কাগজে-কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়া হ'লো। কিন্তু বিজ্ঞাপন দিয়ে অধ্যক্ষ পাবার আশা কম, অথচ সদ্যোজাত কলেজের প্রতিষ্ঠা প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর করে শক্তিশালী ও যশস্বী অধ্যক্ষের উপর। দেশে তেমন লোক কে আছেন যাঁকে পাবার আশা আমরা করতে পারি? প্রশ্নটা মনে জাগতেই মাষ্টার মশায়ের কথা আমার মনে পড়লো।

রাজসাহীর সরকারি কলেজে ছাত্র ছিলাম তাঁর। সেই যুবা বয়সেই তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে দেশ ভ'রে গিয়েছিলো। কিন্তু মানুষ ছিলেন তিনি অত্যন্ত শান্ত আর নম্র, এত লাজুক যে কারো দিকে মুখ তুলে তাকাতেন না, তাই তাঁর কথা 'ভালো' ছেলেরাও মন দিয়ে শুনতো না, আর আমার মতো মূর্খরা তো নিয়মিত ক্লাশ পালাতো। তবু ক্লাশের বাইরে, আমরা কয়েকজন তাঁর সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছিলাম, বাড়িতেও যাওয়া-আসা ছিলো, আর তার ফলে আমরা তাঁকে ভক্তি করতে শিখেছিলাম পণ্ডিত ব'লে নয়, শিক্ষক ব'লে নয়, মানুষ ব'লেই। তাঁর সংস্পর্শে এমন একটি নিঃশব্দ মধুরতা অনুভব করতাম, এমন একটি ভয়-মেশানো ভালোবাসায় মন ভ'রে উঠতো যে আমি তখনই উপলব্ধি করেছিলাম তাঁর চরিত্রের অসামান্যতা। কলেজ ছেড়ে দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর

মাষ্টার মশাই

বুদ্ধদেব বসু

সম্বন্ধে আমার আগ্রহের অবসান হয়নি: তিনি যে গবর্মেন্টের আলিঙ্গনচ্যুত হ'য়ে কলকাতার একটি প্রাইভেট কলেজে আত্মনিয়োগ করলেন, তিনি যে বিপত্নীক হলেন, তাঁর প্রভাবে সেই প্রাইভেট কলেজ যে সর্ববিধ কৃপণতা সত্ত্বেও দেশের মধ্যে অগ্রগণ্য হ'য়ে উঠলো, ক্রমে-ক্রমে সাংসারিক জীবন থেকে একেবারে স'রে এসে তিনি যে একান্তরূপে গ্রন্থবিহারী হ'য়ে উঠলেন—এই সমস্ত খবরই লোকমুখে আমি শুনেছিলাম, তার উপর কলকাতায় গেলে মাঝে-মাঝে দেখাও করেছি তাঁর সঙ্গে। আমাদের কলেজে তাঁকে যদি আনতে পারি তাহ'লে আর ভাবনা থাকে না; তাঁর মহত্ত্বেই এই প্রচেষ্টার সফলতা অবধারিত।

এই সম্ভাবনা নিয়ে সুখ-স্বপ্ন দেখে সময় নষ্ট করলাম না, পরের দিনই চ'লে গেলাম কলকাতায়।

একতলার ঘরে ইজি-চেয়ারে শুয়ে মাষ্টার মশায় মোটা একখানা বই পড়ছিলেন। ঘর-জোড়া জোড়া তক্তপোশ মলিন চাদরে ঢাকা, তক্তপোশের উপরে দেয়াল ঘেঁষে তিন আলমারি বই; এদিকে ছোটো একটি টেবিল বইয়ের বাথান হ'য়ে আছে; ধুলো, কালির দাগ, ফলের খোশা, চায়ের পেয়ালা, ছিন্ন-ভিন্ন খবর-কাগজ;—আর সেই শ্রীহীন বিশৃঙ্খলার মধ্যে ব'সে-ব'সে মস্ত মোটা কালো একখানা বই থেকে নিঃশব্দে নিংড়ে-নিংড়ে তিনি ভোগ করছেন সুষমা, সৌন্দর্য, শান্তি। আমি ঘরে ঢুকে দু'তিন মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলুম, চোখই তুললেন না।

হঠাৎ আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে বললেন, 'এই যে।' আমাকে চিনতে না-পেরেই বললেন, বুঝতে পারলাম। আমি অস্ফুট একটু শব্দ করলাম শুধু।

বই নামিয়ে রেখে চোখের চশমা খুলে আমার দিকে তাকালেন, আমি সেই সুযোগে প্রণাম ক'রে বললাম, 'আমাকে চিনতে পারছেন?'

'সরোজ? বোসো। বড্ড মোটা হয়েছো।'

আর কিছু বললেন না, কেমন আছি, কেন এসেছি, কী চাই, কিচ্ছু না। আমার ভয় হ'লো পাছে আবার বই খুলে বসেন, তাই তাড়াতাড়ি কথা পাড়লাম:

'আমি বিশেষ একটু দরকারে আপনার কাছে এসেছি।'

'ও,' ব'লে মোটা বইটা ঠাশ ক'রে বন্ধ ক'রে হাতের সবুজ পেন্সিলটা দু' আঙুলের মধ্যে ঘোরাতে লাগলেন।

আমার বক্তব্য মনে-মনে ভালো ক'রে সাজিয়েই এসেছিলাম সেই অনুসারে আরম্ভ করলাম: 'ছাত্রজীবনে আপনার কাছে যত অপরাধ করেছি, আজ তারই প্রায়শ্চিত্ত করবো, এই আমার বাসনা।'

এটুকু ব'লে, উৎসাহসূচক কোনো-একটা উচ্চারণ শোনবার আশায়, মাষ্টার মহাশয়ের মুখের দিকে তাকালাম, কিন্তু তাঁর প্রশান্ত সমাহিত গম্ভীর মুখশ্রীতে এতটুকু ঔৎসুক্যের বিকার দেখতে পেলাম না। অচেনা কেউ হ'লে তখনই হতোদ্যম হ'য়ে পড়তো, কিন্তু আমি তো তাঁর স্বভাব জানি, তাই দম নিয়ে আবার বললাম, 'আমাদের ওখানে একটা কলেজ করেছি।'

'ও!' চকিতে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলেন, একপাতা খবর-কাগজ কোলে টেনে নিয়ে মাথা নিচু ক'রে সবুজ পেন্সিলের দাগ কাটতে লাগলেন তার উপর।

আমি অনর্গল ব'লে যেতে লাগলাম—জমিদারির অবস্থা, শিক্ষার সমস্যা, আমার ব্যক্তিগত জীবনের কথা, আমার আশা, আমার সংকল্প, আমার কর্ম-কল্পনা—বলতে-বলতে গলা চড়লো, ভাষা এলোমেলো হ'লো, ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম জ'মে উঠলো গালে, গলায়, কপালে। তারপর রুমাল বের ক'রে যখন ঘাম মুছছি, তাকিয়ে দেখি মাষ্টার মশাই খবর-কাগজের গায়ে একটি সবুজ পদ্মফুল আঁকা শেষ করেছেন।

'আপনি কী বলেন এ-বিষয়ে?'



'ভালো।'

'সব-শেষে একটি নিবেদন আছে আমার', ব'লে আমি আসল কথাটি উত্থাপন করলাম। মাষ্টার মশাই হঠাৎ যেন জেগে উঠে বললেন, 'অ্যাঁ ?'

আমার প্রার্থনা খুব স্পষ্ট ভাষায় পুনরায় জানালাম আমি। তারপর বললাম, 'আমার এ-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতেই হবে আপনাকে, আপনি রাজি না-হওয়া পর্যন্ত আমি ফিরে যাবো না, এই পণ ক'রে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি।'

পদ্মফুলের পাশে একটা পাখি আঁকতে লাগলেন মাষ্টার মশাই। আঁকতে-আঁকতে পাখিটা যখন প্রাগৈতিহাসিক টেরোড্যাকটিলের আকার ধারণ করলো, তখন হঠাৎ চোখ তুলে বললেন, 'ভেবে দেখি।'

আমি বললাম, 'ভেবে দেখবার আর কী আছে। কী আপনার অসুবিধে, কী-রকম ব্যবস্থা হ'লে আপনার পক্ষে এটি গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে তা যদি বলেন—'

'ভেবে দেখি।'

আমি অদমিত উৎসাহে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তক্ষুনি অন্য দু'জন ভদ্রলোক এলেন, আমাকে উঠতে হ'লো। যাবার সময় বললাম, 'কাল এই সময়ে আবার আসবো।' মাথা নেড়ে বিদায় দিলেন আমাকে, বললেন না কিছু।

রীতিমতো ধন্না দিয়ে প'ড়ে রইলাম আমি। এই নতচক্ষু নির্বাক অঙ্কনপ্রিয় মানুষটির মুখ থেকে দুটি-চারটি কথা যা আদায় করতে পারলাম তাতে মনে হ'লো যে ওঁর আগ্রহ নেই বটে, কিন্তু আপত্তিও বিশেষ নেই ; শুধু স্থানান্তরিত হবার হাঙ্গামাকে ওঁর ভয়, শুধু শারীরিক আলস্য, যেটা অনেক সময়ই মনস্বিতার অনুষঙ্গ—জিনিশ পত্র, বাঁধাছাঁদা, রেলগাড়ি, নতুন জায়গায় নতুন ক'রে বসা, এ-সব ভাবতেই ওঁর খারাপ লাগে—যেমন আছি, বেশ আছি, যে-ব্যবস্থা (বা অ-ব্যবস্থা) চলছে সেটাই সবচেয়ে ভালো, কিংবা, ভালো যদি সেটা না-ও হয় তার চেয়ে ভালো কী-ই বা হবে আর—ওঁর মনের ভাবটা, বুঝতে পারলাম, এই রকম। অর্থ মানুষের জীবনে উৎসাহের একটি বৃহৎ উৎস—সে-উৎস ওঁর রুদ্ধ হ'য়ে গেছে, পদমর্যাদাও আকর্ষণ করে না ওঁকে ; এ রকম মানুষকে অনুরোধে ক্ষত-বিক্ষত করা ছাড়া আর-কোনো উপায় নেই। তা-ই করলাম আমি, আর সেই সঙ্গে এই কথাটার উপরেও জোর দিতে লাগলাম যে কোনো হাঙ্গামা পোয়াতে হবে না ওঁকে, বইপত্র এবং অন্যান্য জিনিশ পৌঁছে যাবে আগেই, কিছু ভাবতে হবে না ও সব নিয়ে, চোখ বুজে গাড়িতে চড়বেন, আর গাড়ি থেকে নেমে সাজানো বাড়িতে উঠবেন। কখনো, কোনো কারণে, এতটুকু অসুবিধা যদি হ'তে দিই, তাহ'লে আমি আছি কী করতে ?

পর-পর সাত দিন আমার এই গলদ্‌ঘর্ম বাগ্মিতা তিনি নিঃশব্দে সহ্য করলেন। তারপর বললেন, 'সত্যি কি তোমরা আমাকে চাও ?'

আমি ব'লে উঠলাম, 'আপনাকেই চাই আমরা—অবশ্য আপনার কাছে যদি ব্যর্থই হই, তাহ'লে বাধ্য হ'য়ে অন্য কারো কাছে যেতেই হবে, কিন্তু অন্য কারো কাছে ব্যর্থ হ'য়ে আপনার কাছে আসিনি, কিংবা অন্য কারো কথা ভাবছিও না, ভাবিনি এখন পর্যন্ত।'

কথাটা এমন জোর দিয়ে বলেছিলাম যে শেষ ক'রে হাঁপাতে লাগলাম। মাষ্টার মশাই আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আচ্ছা।'

ফিরে এসে হরিহরবাবুকে যখন সুখবরটা দিলুম, তিনি ভুরু কুঁচকোলেন।

'একেবারে ঠিক ক'রে এসেছো ?'

'ঠিক ক'রে এসেছি মানে ? আমাদের কত ভাগ্য যে তাঁকে রাজি করাতে পেরেছি।'

'হ্যাঁ, এককালে নাম-ডাক ছিলো বটে সতীশঙ্করের। কিন্তু এখনকার ছেলেরা কি আর তাতে ভুলবে। বিলেতফেরৎও নন, ডক্টরেট ডিগ্রিও নেই।'

'বলছেন কি আপনি! শিক্ষক-মহলে ওঁর তুল্য মানুষ বাংলা-দেশে আজ আর কোথায়! উনি হলেন জাত-পণ্ডিত—মানে, উপার্জনবুদ্ধির জন্য পাণ্ডিত্য সংগ্রহ করেন না উনি, পাণ্ডিত্য ওঁর স্বভাবে। আর ও-রকম মহৎ চরিত্র যে-কোনো দেশেই বিরল।'

'হ্যাঁ,' আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে হরিহরবাবু বললেন, 'সেই স্বদেশী যুগে একটু চিনতাম ওঁকে। উনিও মেতেছিলেন, কিন্তু কাজে নামলেন না, ব'সে-ব'সে শুধু ইতিহাসই পড়লেন। বড্ড নিরীহ মানুষ।'

'ওঁকে তো আর ফ্যাক্টরির ম্যানেজর বা পুলিশের ইন্সপেক্টর হ'তে হচ্ছে না যে জবরদস্ত মানুষ হওয়া চাই,' আমি হেসে ফেললাম। 'কলেজের প্রিন্সিপালকে যে-রকম হ'লে মানায়, উনি সেইরকমই।'

'বেশ, তোমার কলেজ, তুমি যেমন বোঝো চালাবে। ভালো হ'লেই ভালো।'

আমি বুঝতে পারলাম যে হরিহরবাবু সুখী হলেন না, কিন্তু মাষ্টার মশাইর কথা ভেবে আমার এত বেশি ভালো লাগছিলো যে অন্য-কিছু গ্রাহ্যই মনে হ'লো না তখনকার মতো। পরে আমি ভেবে দেখেছি যে হরিহরবাবু যখন কলেজের প্রেসিডেন্ট, তখন কর্তৃত্বের উচ্চতম মর্যাদা তাঁরই প্রাপ্য, যে-কোনো সিদ্ধান্ত, অন্তত নিয়মরক্ষার খাতিরে, তাঁর অনুমোদন-সাপেক্ষ ; কিন্তু সতীশঙ্কর দত্তকে অধ্যক্ষের পদে আহ্বান করতে হ'লে যে কারও অনুমতি নেয়া দরকার, সেটা যে তর্কাধীন, বা একটা আলোচ্য বিষয়, এ-কথা কখনোই আমার মনে হয়নি। হয়তো আমার নির্জলা প্রশংসা-বাক্যগুলিও হরিহর বাবুর ঠিক মনঃপূত হয়নি ; সমসাময়িক জীবিত কোনো ব্যক্তিকে তাঁর অনুপস্থিতিতে যদি প্রশংসা করি, তাহ'লে শ্রোতার মনে এই আশাই জাগে যে 'তবে'-'কিন্তু'-সহযোগে ঘন-ঘন সেই প্রশংসা থেকে বিয়োগ করা হবে ; তা যদি না হয়, তাহ'লে সে-প্রশংসা যেন সহ্যই করা যায় না। হরিহরবাবুও তো কম কৃতী নন—সাংসারিক হিশেবে মাষ্টার মশায়ের চাইতে অনেক বেশি কৃতী—অতএব আমার ঐ উচ্ছ্বাসের তিনি হয়তো এই মানেই করেছিলেন যে তাঁর মূল্য আমি যথোচিত মাত্রায় স্বীকার করি না। মানুষের মনে কত দুর্বলতাই থাকে !

২

মাষ্টার মশাই এলেন, জুলাই মাসে শো'দুয়েক ছেলে নিয়ে কলেজ আরম্ভ হ'লো।

মাসখানেক পরে হরিহরবাবু একদিন বললেন, 'ওহে সরোজ, তোমার মাষ্টার মশাইকে আর-একটু কড়া হ'তে বলো।'

'কড়া মানে?'

'মাষ্টাররা নাকি ফাঁকি দিচ্ছে এর মধ্যেই?'

'ফাঁকি মানে?'

'ঘণ্টা বাজবার পর অন্তত দশ মিনিট না-কাটলে কেউ নাকি ক্লাশেই যায় না?'

'কী জানি, আমি তো...'

'সুধীর বলছিলো, নয়তো আমিই বা জানবো কী ক'রে—'

'সুধীর?'

'কেমিস্ট্রির সুধীর, আমার ভাগনে। বলছিলো যে প্রিন্সিপাল নিজেই দেরি ক'রে যান, তাই...তা ওঁকে যা মানায়, সকলকে তো আর তা মানায় না।'

কথাটা ভালো লাগলো না আমার। মুখে হাসির ভাব রেখে বললুম, 'এ-সমস্তর ভার ওঁর উপরেই ছেড়ে দেয়া ভালো, এর জন্যেই তো হাতে-পায়ে ধ'রে ডেকে এনেছি ওঁকে।'

'আহা—তুমি হ'লে কলেজের কর্তা, তুমি দেখাশোনা না-করলে চলবে কেন?'

'কী করতে বলেন আমাকে আপনি?'

'কী আর করবে, খোঁজ-খবর রাখবে আরকি সব। কেউ দেরি ক'রে ক্লাশে গেলো কিনা, না কি ঘণ্টা বাজবার আগে ছেড়ে দিলো, এ তো বেয়ারারাই বলতে পারবে তোমাকে। আর হেডক্লার্ককে ব'লে দেবে কোনো প্রোফেসর কলেজে না এলে, বা কলেজে এসে ক্লাশ না নিলে, তক্ষুনি যেন সেটা জানানো হয়। ষ্টাফ-এর মধ্যেও দু'একজনকে যদি একটু বেশি অনুগ্রহ দেখাও, তাহ'লে তারাও...'

'আপনি বলছেন কী! এটা একটা কলেজ, বিদ্যালয়, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান!'

একটু চুপ ক'রে থেকে হরিহরবাবু বললেন, 'তুমি এখনো ছেলেমানুষ আছো, দেখছি। যেখানে দশ জন নিয়ে কাজ, এ-সব করতেই হয় সেখানে।...লীভ রুলস ড্রাফট করা হয়েছে?'

'অত নিয়ম-টিয়ম ক'রে কী হবে—নিয়ম যত কম হয়, ততই নিয়মভঙ্গের সম্ভাবনা কমে।'

'ভুল বললে। প্রোফেসরি তো ওকালতি নয় যে যত কাজ, ততই পয়সা; তাই প্রথম থেকেই এটা বদ্ধমূল ক'রে দেয়া চাই যে অনিয়মটাই এখানে নিয়ম নয়। প্রোফেসরদের হাজিরার খাতায় কেউ-কেউ নাকি সই করে না?'

'সত্যি কি কোনো মানে হয় সই করার?'

'ঠিক বলেছো! শুধু ওখানে সই করার মানে হয় না—এমনও হ'তে পারে যে কেউ একদিন এলেন না, অথচ পরের দিন এসে দু'দিনের সই করলেন—'

'ছি-ছি!' আমার কান গরম হ'য়ে উঠলো।

'ছি-ছি-র কিছু নেই, কোনো অন্যায় অসম্ভব ব'লে যদি ভাবো, তাহ'লে তুমি কেবলই ঠকবে।...ক্লাশের রেজিস্ট্রি খাতাতেও প্রত্যেক-বার সই করতে হবে, এইরকম নিয়ম ক'রে দাও। আর ক্লাশ যেন প্রত্যেকের পাকা আঠারো ঘণ্টা থাকে সপ্তাহে—কুড়ি-বাইশ হ'লেও দোষ নেই—এমনিতে তা না হয় তো ট্যুটরিএল বাড়িয়ে দাও ঠেসে। বাবুরা খেয়ে দেয়ে, একটু ঘুমিয়ে নিয়ে, কোনোরকমে একবার কলেজে এসেই তক্ষুনি আবার বাড়ি ফিরে যাবেন, এ-রকম যেন না হয়।'

শুনতে-শুনতে মনটা ভারি খারাপ হ'য়ে গেলো আমার। আমি তো একটা ব্যবসা ফাঁদিনি, বা প্যাঁচালো পলিটিক্সেও প্রবেশ করিনি—আমি খুলেছি কলেজ, কিন্তু এখানেও কি শান্তি নেই, প্রীতি নেই, সৌজন্য নেই?

কথা যেন শেষ হ'য়ে গেছে, মুখের এই রকম ভাব ক'রে হরিহরবাবু টেবিলের উপর তাঁর নথিপত্রে মন দিলেন। আমি উঠবো-উঠবো করছি, এমন সময় চোখ তুলে হঠাৎ বললেন, 'সুধীরকে ভাইস-প্রিন্সিপাল ক'রে দাও।'

'আজ্ঞে?'

'সুধীর—আমার ভাগনে—তার কথা বলছি।'

'ও।'

'সতীশঙ্কর তাঁর পড়াশুনো নিয়ে থাকুন, ম্যানেজমেন্টের জন্য একজন পাকা লোক চাই তো। সুধীর দেখতে বোকা-বোকা হ'লে হবে কী—মানুষ খুব কাজের—ওর উপর নির্ভর করতে পারবে তুমি। দু'-দুটো ওষুধের কারখানায় কাজ ক'রে এসেছে, লোক খাটাতে জানে।'

আমি উৎসাহিত হ'য়ে বললাম, 'তাহ'লে তো ওঁকে হস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট ক'রে দিলে হয়—কিংবা কলেজের সুপারিনটেনডেন্ট হ'তেই বা দোষ কী—মানে, আপিশের চার্জে থাকলেন, ওখানে তো হাঙ্গামা কম নয়, ভালোই লাগবে ওঁর।'

হরিহরবাবু আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওকে ভাইস প্রিন্সিপাল করতে তোমার আপত্তিটা কী?'

'না, না, আপত্তি ঠিক নয়—' আমি চোখ নামিয়ে নিলাম।

'অযোগ্য নয়, জর্মন ইউনিভার্সিটির ডক্টরেট-ডিগ্রি আছে।'

'আমি তো শুনেছি জর্মনিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি মানেই ডক্টরেট। আমাদের যেমন বি. এ.।'

'অত তলিয়ে আর কে দেখছে বলো। ডক্টর কথাটাই ওজনদার। ডক্টর-ডিগ্রিওলা আর-একজনও তো নেই কলেজে, ওর জন্য কিছু না-করলে ভালোও দেখায় না। বেশি খরচ করতে বলছি না তোমাকে, পোঞ্চাশেক বাড়িয়ে দিলেই হবে মাইনে। টাকাটা জলে যাবে না তোমার, কাজ পাবে ডবল।...সামনের মাসে কমিটির মীটিং আছে, আমি কথাটা তুলবো ভেবে রেখেছি.' ব'লে হরিহরবাবু আর-একবার তাকালেন আমার দিকে।

পরের মাসের মীটিংএ সুধীরবাবুকে ভাইস-প্রিন্সিপাল করা হ'লো: অনেকেই অনেক কথা বললেন, আর সব কথার শেষে আমরা যখন মাষ্টার মশাইর মুখের দিকে তাকালাম, তিনি মাথা নেড়ে সায় দিলেন শুধু।

কলেজ নিয়মিত চলতে লাগলো; দেখতে-দেখতে একটা সেশন শেষ হ'য়ে এলো প্রায়। ঠিক হ'লো, গ্রীষ্মের ছুটির আগেই বার্ষিক পরীক্ষা হবে, এবং তার ফলাফলও জানিয়ে দেয়া হবে ছেলেদের। ফল বেরোতে দেখা গেলো, পঞ্চাশটির বেশি ছেলে ফেল করেছে।

নোটিস-বোর্ডের সামনে ছেলেদের হল্লা চললো সারা দিন ভ'রে, আর পরদিন থেকে একটি-একটি ক'রে ছেলে এসে দাঁড়ালো প্রিন্সিপালের

দরজায়, খাতা-ছেঁড়া এক-এক টুকরো কাগজ তাদের হাতে। রীতিমতো ভিড় জ'মে উঠলো।

কোত্থেকে ছুটে সুধীরবাবু এলেন তাদের কাছে।—'কী, কী করছো তোমরা এখানে? সব ফেল বুঝি? যাও এখন—তোমাদের বিষয়ে ভেবে দেখা হচ্ছে—পালাও!'

ছেলেদের মধ্যে একজন কী যেন বললো, সুধীরবাবু মুখের রেখায় কঠোরতার সঙ্গে সহৃদয়তা মিশিয়ে তার জবাব দিলেন। আর তার পরেই ছেলেরা বেশ খুশি-খুশি হ'য়ে স'রে পড়লো সেখান থেকে—একজনও রইলো না। দেখলাম, লোকটির ক্ষমতা আছে।

প্রিন্সিপালের ঘরে পরামর্শ-সভা বসলো: মাষ্টার মশাই, সুধীরবাবু আর আমি। সুধীরবাবু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'সাতান্নটি ছেলে তো ফেল করেছে।

মাষ্টার মশাই বললেন, 'হুঁ।'

'এদের সম্বন্ধে স্যর কী করতে চান?'

'আপনিই না বললেন ফেল করেছে ওরা?'

'কিন্তু ওদের কি আমরা আটকেই রাখবো সত্যি?'

'চিরকাল রাখবো না।'

সুধীরবাবুর মুখ একটু আরক্ত হ'লো। নেকটাইয়ে টান দিয়ে বললেন, 'অবশ্য ফেল যারা করেছে তাদের আটকানোই উচিত, কিন্তু তাহ'লে কলেজের কী অবস্থা হবে সেটাও ভেবে দেখা দরকার। ছেলেদের মধ্যে বেশির ভাগই গরিব, অতিরিক্ত এক বছর পড়া-খরচ চালাতে বললে প্রায় অত্যাচারই করা হয় তাদের উপর। আবার বেশির ভাগই অত্যন্ত সাধারণ ছেলে, সাধারণের চেয়েও নিচুতে, সুতরাং ফেল তারা করবেই। এখন কথা হচ্ছে, এই সাতান্নটি ছেলেকে এবারে যদি আটকে রাখি, তাহ'লে হবে কী? কথাটা রাষ্ট্র হবে চারদিকে, ছেলেদের মনে, গার্জেনদের মনে ভয় ঢুকে যাবে এ-কলেজ সম্বন্ধে, সামনের বছর ভর্তি ক'মে যাবে। গবর্মেন্ট কলেজ নয় আমাদের, গবর্মেন্টের গ্র্যান্টও নেই: ছাত্ররা যা মাইনে দেয়, সেই আয়েই কলেজ চলবে, সম্ভব হ'লে উদ্বৃত্তও থাকবে কিছু, এইটেই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। যাতে বেশি ছাত্র ভর্তি হয়, আরো বেশি, আরো বেশি, তারই জন্য সর্বতোভাবে সচেষ্ট হ'তে হবে আমাদের, আর সেজন্যই এই ফেল-করা ছেলেদের বিষয়ে আমি আবার ভেবে দেখতে বলি।'

সুধীরবাবু থামতেই আমি বললাম, 'কিন্তু ইউনিভর্সিটির পরীক্ষায় যদি ফেল করে তারা?'

'তা তো করবেই, অনেকেই করবে, কিন্তু সেখানে তো আর আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই। কলেজটাকে ছেলেদের পক্ষে একেবারে নিষ্কণ্টক করা চাই, তাহলেই ভর্তি বাড়বে। এ-বছর বজেটে আমাদের পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ডেফিসিট—আপনি সেটা দিয়ে দিচ্ছেন, স্যর, সামনের বছরও আপনিই দেবেন, হয়তো তার পরের বছরও, কিন্তু বছরের পর বছর এ-রকম হ'তে থাকলে শেষ পর্যন্ত কুলোনো যাবে কি? আপনিই ভেবে দেখুন, স্যর।'

সুধীরবাবু আমাকেও যখন স্যর বলেন আমার ভারি লজ্জা করে, আবার মুখ ফুটে সে-কথা বলতেও লজ্জা করে। একটু আড়ষ্টভাবে বললুম, 'তাহ'লে আর পরীক্ষা নেয়াই বা কেন?'

'শুধু তো ও-উপলক্ষ্যে ছেলেরা একটু বইয়ের পাতা ওল্টায়, সেদিক থেকে ওর মূল্য আছে। এ-পরীক্ষা কিছুই নয়, ধাপ্পা, কিন্তু ধাপ্পাটায় ফাঁকি থাকলে চলবে না। দুটো কি তিনটে লিষ্টে ভাগ ক'রে-ক'রে সকলকেই প্রোমোশন দেয়া হোক, কিন্তু সেটা যে সহজে হয়নি, অনেক ভেবে-চিন্তে দয়া ক'রে আমরা ছেড়ে দিলাম এই ভাবটা বজায় থাকা চাই পুরোপুরি। ছেলেরা তাতে খুশি হবে, কৃতজ্ঞ হবে, আর ছেলেদের খুশিতেই কলেজের সমৃদ্ধি।'

আমি হেসে বললাম, 'কলেজ বুঝি একটা দোকান, আর ছেলেরা খদ্দের?'

'বললে ভালো শোনায় না, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তো তা-ই। কলেজটা বেশিদিন আপনার গলগ্রহ হ'য়ে না থাকে, সেটাও তো দেখতে হবে।'

আমি একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'কিন্তু ছেলেরা যখন জেনে যাবে যে পরীক্ষা-টরীক্ষা সব ফাঁকি, তখন তাদের ফাঁকি নির্লজ্জতার শেষ সীমা অতিক্রম করে কি যাবে না?'

'এ-ভাবেই চলবে। ছাত্রসংখ্যা বাড়াতে হ'লে মনের ও-সব বাবুগিরি বাদ দিতেই হবে, আর ছাত্রসংখ্যা বাড়ানো ছাড়া কলেজ চালাবার কোনো উপায়ও নেই আমাদের।'

'মাষ্টার মশাই, আপনি—' তাকিয়ে দেখি, মাষ্টার মশাই মাথা নিচু ক'রে ব্লটিং কাগজের উপর নীল পেন্সিলে একটা অদ্ভুত চতুষ্পদ এঁকে ফেলেছেন।

জন্তুটার পুচ্ছদেশ পরিপুষ্ট করতে-করতে মুখ না-তুলেই মাষ্টার মশাই বললেন, 'বেশ।'

সুধীরবাবুর চোখে বিজয়ের বিদ্যুৎ খেলে গেলো। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি তাহলে সতীশবাবুকে প্রথম লিষ্টটা তৈরি করতে বলি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নিয়ে আসবে আপনার কাছে। আজই নোটিস-বোর্ডে দিলে ভালো হয়।'

গটগট জুতোর শব্দ ক'রে ব্যস্তভাবে সুধীরবাবু বেরিয়ে গেলেন।

আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলাম, কিন্তু মাষ্টার মশাই ছবি আঁকা থামালেন না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর আস্তে-আস্তে আরম্ভ করলাম, 'আমি কিন্তু ভেবেছিলাম—'

পেন্সিলটা হঠাৎ নামিয়ে রেখে মাষ্টার মশাই বললেন, 'আমি দেখলাম তোমারও তা-ই মত, তাই—'

'আমার! না তো! আমি তো বরং—'

'ঠিকই তো। অফুরন্ত টাকা তো তোমার নেই যে কলেজের পিছনে অফুরন্ত ঢালবে' ব'লে মাষ্টার মশাই চেয়ারে হেলান দিয়ে মুখের সামনে একখানা বই খুলে ধরলেন।

অধোবদনে নিঃশব্দে ব'সে রইলাম। কলেজ যদি একটা ব্যবসাই, তাহ'লে কলেজ করলাম কেন, দেশে আর কি ব্যবসা ছিলো না?

সন্ধ্যেবেলা হরিহরবাবু আমার বাড়িতে এলেন। গালের ভাঁজে-ভাঁজে হাসি তুলে বললেন, 'শুনলুম সব সুধীরের কাছে। তোমার মাষ্টার মশাইকে বোলো যে অত কড়া হ'লে কাজ চলে না।'

'আপনিই না তাঁকে বলেছিলেন আরো-একটু কড়া হ'তে?'

'সে তো ষ্টাফ-এর সম্বন্ধে। তাই ব'লে ছেলেদের উপর দাব-রাব! সুধীর আজ খুব বাঁচিয়ে দিয়েছে, বলতে হবে।'

'আপনি তাহ'লে বলছেন যে মাষ্টারদের কর্তা হ'লো কলেজ, আর কলেজের কর্তা হ'লো ছেলেরা?'

হরিহরবাবু নকল দাঁতের দ্যুতি দেখিয়ে হেসে উঠলেন। —'আরে, এ তো সোজা কথা। তোমায় পয়সা দিচ্ছে কে? ষ্টাফ। তোমাকে পয়সা দিচ্ছে কে? ছেলেরা। তবেই বোঝো কার মনরক্ষা করা দরকার। এই যে দু'হাতে টাকা ঢালছো, তা তো ফিরে আসাও চাই। কত জনকে দেখলুম কলেজ ক'রে ফেঁপে উঠতে—বুঝে-সুঝে চলতে পারলে তোমারও হবে হে, তোমারও হবে।' আর-একবার নকল দাঁতের আভা আমার চোখের সামনে ঝলসে উঠলো।

মনটা আমার অত্যন্ত খারাপ হ'য়ে গেলো সেদিন।

৩

গ্রীষ্মের ছুটিতে মাষ্টার মশাই দারজিলিং গেলেন, সুধীরবাবু রইলেন কলেজের চার্জে। আমিও মাসখানেকের জন্য পুরী গিয়েছিলুম, ফিরে এসে দেখি কলেজের ভর্তি বাড়াবার জন্য উঠে-প'ড়ে লেগেছেন সুধীরবাবু। শুধু কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েই ক্ষান্ত হননি, আশে-আশে লোকও পাঠিয়েছেন ছেলে ধরবার জন্য। উড়ো খবর এলো যে জলপাইগুড়ি স্কুলের একটি ছেলে নাকি ম্যাট্রিকে ফিফ্‌থ্‌ হয়েছে—পাছে গেজেট হবার সঙ্গে সঙ্গে রংপুরের কলেজ তাকে গ্রাস ক'রে ফেলে, কিংবা সে বোমার ভয় না-ক'রে মূঢ়ের মতো কলকাতার দিকে ধাবিত হয়, সেইজন্য সুধীরবাবু আগেই চর পাঠিয়েছেন তার কাছে—কলেজ ফ্রী, হষ্টেল ফ্রী, উপরন্তু দশ টাকা ক'রে ষ্টাইপেণ্ড! শহরের যে-ছেলেটিই এবার পরীক্ষা দিয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই অভিভাবকের সঙ্গে নাকি দেখা করেছেন তিনি, তাছাড়া এমন জনরবও শুনলাম যে কলকাতার গাড়ি আসবার সময় রোজ নাকি একবার ক'রে ষ্টেশনে হাজিরা দিতেন—ছুটিতে যে-সব ছেলে বাড়ি আসছে, কলকাতার কলেজ থেকে তাদের ভাঙিয়ে আনা যায় কিনা, সেই চেষ্টায়।

এতটা হয়তো বিশ্বাসযোগ্য নয়, কিন্তু এ-কথা মানতেই হয় যে সুধীরবাবুর চেষ্টার ফল হ'লো আশ্চর্য। ছাত্রসংখ্যা দু'শো থেকে সাতশো ছাড়িয়ে গেলো, জলপানি-পাওয়া ছেলেও এলো দু'চারটি। নতুন সেশনে জমজমাট কলেজ বেশ ভালোই লাগলো আমার। পুজো পর্যন্ত মসৃণভাবে চললো সব, আরো কিছু ছাত্রও বাড়লো, কিন্তু পুজোর ছুটির পরে টেষ্ট পরীক্ষার সময় এক কাণ্ড।

একটি ছেলে নকল করছিলো, ইংরেজির ছোকরামতো প্রোফেসর বিজনবাবু তাকে ধ'রে ফেলতেই সে তেড়ে উঠে অধ্যাপককে একটি অনুচ্চারণীয় সম্ভাষণ করলো। প্রোফেসর তার বই-খাতা কেড়ে নিতেই আশে-পাশে আট দশটি ছেলে হৈ-হৈ ক'রে উঠলো, কিন্তু বিজনবাবুকে কর্তব্য থেকে বিরত করতে পারলো না।

প্রিন্সিপালের ঘরে ডাক পড়লো ছেলেটির, আর মিনিট পাঁচেক পরেই অশ্রু-সজল চোখে সে বেরিয়ে এলো।

তারপর ছেলেটি আমার কাছে এসে ঘড়া-ঘড়া কাঁদতে লাগলো। আমি বললাম, 'তুমি আমার কাছে এসেছো কেন?'

'স্যর, আপনি সেক্রেটারি, আপনি ইচ্ছা করলে—'

'আমি ইচ্ছা করলে কিছুই পারি না; প্রিন্সিপালের কথাই শেষ কথা।'

হাঁকিয়ে দিলুম বাঁদরটাকে। পরে শুনলুম, সে হরিহরবাবুর কাছেও গিয়েছিলো, সুধীরবাবুর কাছেও, হাতে-পায়ে ধ'রে কিছু একটা প্রতিশ্রুতি নাকি আদায় ক'রে এনেছে। রাগে পিত্তি জ্ব'লে গেলো আমার। ছেলেমানুষ, ছাত্র—এর মধ্যে এত সব শিখেছে! একশো বার তাড়ালেও যথেষ্ট শাস্তি হয় না ওর।

পরের দিন বৈঠক বসলো। সুধীরবাবু আরম্ভ করলেন, 'সত্যব্রতকে একেবারে এক্সপেল ক'রে দিলেন, স্যর?'

'সত্যব্রত বুঝি নাম ছেলেটির?' মাষ্টার মশাই হাসলেন একটু।

'অবশ্য অন্যায় ও খুবই করেছে, কিন্তু দেশের অবস্থাও তো দেখতে হবে। চারদিকে অশান্তি, বিপর্যয়, এর মধ্যে সুস্থির হ'য়ে পড়াশুনো করাই মুশকিল।'

'কারো যদি মনে হয়', মাষ্টার মশাই ধীরে ধীরে বললেন, 'যে দেশের বর্তমান অবস্থায় পড়াশুনো করা যায় না, তাহ'লে সে পড়তেই বা আসবে কেন, আর পড়াতেই বা আসবে কেন?'

আমি একটু অবাক হলাম। এতখানি কথা একটানা বলতে মাষ্টার মশাইকে খুব কমই শুনেছি।

কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে হরিহরবাবু খক-খক ক'রে কেশে উঠলেন।—'সুধীরের কথা আপনি ছেড়ে দিন সতীশঙ্করবাবু, ও-রকম কতই বলে ও—বুদ্ধি ওর বেশি নেই, তবে উদ্দেশ্য ভালো। বিশ্বাস করুন আপনি, কলেজের কিসে ভালো হবে, এ ছাড়া ওর চিন্তাই নেই কোনো। তা কথাটা কী, লঘু পাপে গুরু দণ্ড না হ'য়ে যায়।'

আমি ব'লে উঠলাম, 'লঘু পাপ কেন? শুধু যে নকল করেছে তা তো নয় অত্যন্ত অসভ্যতা করেছে, এর পরে ওকে কলেজে রাখলে কলেজের কোনো মর্যাদাই থাকে না।'

হরিহরবাবু নরম সুরে বললেন, 'ছেলেটার ভবিষ্যৎ একেবারে নষ্ট করবে সরোজ?'

'ভবিষ্যৎ? পরীক্ষায় পাশ করাটাই ভবিষ্যতের একমাত্র রাস্তা নাকি? ওর যদি শক্তি থাকে, ও ব্যবসা ক'রে বড়োলোক হোক, কি সন্ন্যাসী হ'য়ে আশ্রম খুলুক, কি পার্টি বেঁধে বাংলার মন্ত্রী হোক—আমরা তো বাধা দিচ্ছি না।'

হরিহরবাবু তাঁর হাতের লাঠিটির সোনা-বাঁধানো মাথায় দু'বার চাপড় দিয়ে বললেন, 'তুমি আজ বড্ড রেগে আছো, সরোজ। ছেলেটি ভারি গরিব—'

কথার মাঝখানে ব'লে উঠলাম, 'গরিব হ'লেই অপরাধের অধিকার জন্মায় না।'

'ছেলেটি ফুটবল খেলে ভালো—'

'এটা মোহনবাগান ক্লাব নয়, কলেজ।'

হরিহরবাবু তবু বললেন, 'ভালো একটা টীম হ'লে কলেজের নাম হয়। ছেলেদের মধ্যে ও খুব পপুলার, টীমের ক্যাপ্টেন হবার উপযুক্ত ছেলে, তাই ভাবছিলুম ওকে দিয়ে একটা অ্যাপলজি লিখিয়ে নিয়ে—'

আমার ধৈর্যচ্যুতি হ'লো। ঠোঁট-কাটা ধরনে বললাম, 'আপনিই বা ওর হ'য়ে এত বলছেন কেন, জানতে পারি?'

হরিহরবাবু লাঠির মাথাটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধ'রে বললেন, 'আছে কারণ।…আচ্ছা, তুমিই বলো, সুধীর। বলো।'

'আমি জানতে পেরেছি সত্যব্রতকে এক্সপেল করলে ছেলেরা ষ্ট্রাইক করবে', বলতে-বলতে সুধীরবাবুর তলাকার ঠোঁটটা একটু বেঁকে গেলো। আমি তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর মুখে, চোখে, মোটা

মোটা ঠোঁটে কেমন-একটা ভঙ্গি, একটা গুপ্ত কুশ্রীতা, হিংসার চাতুরী যেন—হঠাৎ আমার মনে হ'লো আমি কোনো জন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি—আর একটা ভয়ারজনক সন্দেহ আমার বুক ঠেলে গলা পর্যন্ত উঠলো।

'কী ক'রে জানলেন ?'

'কী ক'রে জানলাম ? আমি চোখ-কান খোলা রাখি, ছেলেদের মধ্যে যখন যে-রকম হাওয়া দেয় কিছুই আমাকে এড়াতে পারে না।'

'ওরা আপনার কাছে এসেছিলো ?'

এসেছিলো বইকি, আমার কাছে একটু মন খুলেই কথা বলে ওরা' সুধীরবাবুর ভলাকার ঠোঁটটা আবার একটু বেঁকলো।

কী বললো ?'

'এ-ই বললো।'

'এ-ই মানে ?' সোজা তাকালাম সুধীরবাবুর চোখের দিকে।

'ষ্ট্রাইক করবে ওরা।'

চোখ থেকে চোখ না-সরিয়ে বললাম, 'আপনি কী বললেন ?'

চোখের পাতা কয়েকবার নড়লো সুধীরবাবুর, তারপর চোখ নত হ'লো।

'কী বললেন আপনি ?'

'কী আর বলবো—এটা সাম্যের যুগ, স্বাধীনতার যুগ, কেউ কারো বশবর্তী হবে না।'

'ছাত্রও শিক্ষকের না ?'

রুমাল দিয়ে লালচে মুখখানা মুছে সুধীরবাবু বললেন, 'এটা স্কুল নয়, ছেলেরা বালক নয়। দেশের কাজে তারাই অগ্রণী, যে-কোনো আন্দোলনে তারাই ঝাঁপিয়ে পড়ে—'

'আমি জানতে চাই আপনার কাছে কোনোরকম উৎসাহ তারা পেয়েছে কিনা।'

সুধীরবাবু তক্ষুনি জবাব দিলেন, 'কলেজের স্বার্থরক্ষাই আমার কাছে সবচেয়ে বড়ো কথা, এবং ডিপ্লমেসি ছাড়া সেটা সম্ভব নয়।'

'আপনি ভুল করছেন, সুধীরবাবু, ডিপ্লমেসির ক্ষেত্র কলেজ নয়', শান্ত গম্ভীর স্বরে এই কথা ক'টি ব'লে মাষ্টার মশাই উঠে দাঁড়ালেন। 'এ-বিষয়ে আর কথা বলা অনর্থক—আমি বাড়ি যাই।'

আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলেন মাষ্টার মশাই, তাঁকে আমার গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরে এসে দেখি, হরিহরবাবু একলা ব'সে আছেন। —আমাকে দেখে হেসে বললেন, 'সুধীরকে ওর ঘরে পাঠিয়ে দিলুম—একরোখা মানুষ, তার উপর ব্লাড-প্রেশার আছে, রেগে গেলে মুশকিল।'

'ব্লাড-প্রেশার আমারও আছে, আর সেই জন্ত আমি চেষ্টা করি যারা আমাকে রাগিয়ে দিতে পারে এমন মানুষের দূরে-দূরে থাকতে।'

একটু চুপ ক'রে থেকে হরিহরবাবু বললেন, 'সুধীর কথাটা কিন্তু ঠিকই বলেছে। দেখো তুমি, ছেলেরা গোলমাল করবে।'

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

'সেটা এড়াতে পারলেই ভালো। এমন-কোনো উপায় নিশ্চয়ই আছে, যাতে দু'দিকই রক্ষা হয়। ছেলেদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখাই চাই—বুঝেছো ? অত দিনের পুরোনো অত বড়ো নাম-করা সিটি কলেজ সেই একবার সরস্বতী পুজোর হাঙ্গামার পর কী-রকম প'ড়ে গেলো—আর আমরা-তো সত্তোজাত।'

তবু আমি কিছু বললাম না।

সতীশকর অত্যন্ত সৎ লোক—'

এবার আমি বললাম, 'সৎ হওয়াটা কি দোষের ?'

'না, না, দোষের নয়, দোষের নয়—তবে—'

'এর মধ্যে আবার তবে কী ?'

চেয়ারটা আমার একটু কাছে সরিয়ে এনে হরিহরবাবু নিচু গলায় বলতে লাগলেন, 'আচ্ছা, ব্যাপারটা কী বলো তো ? ছেলেরা কি নকল করে না পরীক্ষায় ? দিন-রাত করছে, চারদিকেই করছে: এ তো টেষ্ট পরীক্ষা, কত-কত ফাইনেল পরীক্ষায় নকলের মেলা ব'সে যায় তা কি জানো না ? সকলকে যদি ধরতে যাও তাহ'লে ইউনিভর্সিটিই তুলে দিতে হয়। আমাদের সময়ে সত্যি খেটে-খুটে পাশ করতে হ'তো—সবই অন্ত রকম ছিলো তখন—আমি যেবার বি. এ. দিলুম প্যারাডাইস লষ্ট-এর ষষ্ঠ ক্যাণ্টো ঝাড়া মুখস্থ বলতে পারতুম। হাজার-হাজারও পাশ করতো না তখন, আর চাষা-ভুষোর ছেলেও কলেজের ছাপ নিয়ে বাবু সাজবার জন্ত খেপে যায়নি।···ও-সব ছেড়ে দাও. এখন যে-যুগ এসেছে তারই তালে-তালে পা ফেলে চলতে হবে, নয়তো বাঁচবে না।'

মুখে আমার কথা সরলো না, নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলুম হরিহরবাবুর বার্ধক্য-রেখাঙ্কিত মুখের দিকে।

'ছেলেরা নকল করছে—চোখ বুজে থাকলেই হয়—বিজনবাবুরই বা অতটা বাড়াবাড়ি করবার কী দরকার ছিলো ? সেদিন কি আর কোনো ছেলে নকল করেনি ? না কি এই একটা ছেলেকে তাড়িয়ে দিলেই নকল করা বন্ধ হবে ?'

'তাই ব'লে বন্ধ করবার চেষ্টাও করবো না ?'

'চেষ্টা করবার আরো জরুরি বিষয় আছে আমাদের। পরীক্ষা সামনে, যে-সব সবজেক্টে কোর্স শেষ হয়নি, সেগুলিতে স্পেশল ক্লাস-এর ব্যবস্থা করো, আর মাষ্টারদের ব'লে দাও যে-ক'টি একটু ভালো ছেলে আছে, সকালে-বিকেলে তাদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে পড়াতে—কোনোরকমে একটা স্কলারশিপ যদি বাগানো যায়, তাহ'লে তো হ'লোই।'

কথা বলতে ইচ্ছা করছিলো না, তবু একটু প্রতিবাদ না-ক'রে পারলাম না, 'ওঁদের তাতে লাভ কী—ওঁরা কেন বেগার খাটতে যাবেন ?'

হরিহরবাবু ভাঙা-ভাঙা গলায় হেসে উঠলেন।—'খাটবেন এইজন্ত যে রেজল্ট ভালো হ'লে ছাত্র বাড়বে আর ছাত্র বাড়লে 'ওঁদের ইনক্রীমেণ্ট হবার সম্ভাবনা। মাষ্টারদের অত পেয়ার করলে সুবিধে হবে না হে।' 'মাষ্টার' কথাটা ম্যাষ্টের উচ্চারণ করলেন হরিহরবাবু। একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, 'কিছু মনে কোরো না, সরোজ—আমি তোমার বাপের মতো তাই বলছি—সাংসারিক বুদ্ধি তোমার যদি কিছু থাকতোই, তাহ'লে তোমার বিষয়-সম্পত্তিরও এ-অবস্থা হ'তো না আজ।···কথাটা শুনে লাফিয়ে উঠো না—কিন্তু, গলা বাড়িয়ে মুখের কাছে মুখ এনে ফিশফিশ ক'রে বললেন, 'পরীক্ষার সময় আমাদের ষ্টাফই তো ইনভিজিলেটর—একটু যদি ব'লে-ট'লে দেয় ছেলেদের—কেই বা দেখতে আসছে আর কে-ই বা জানছে—পাশের পর্সেণ্টেজ কম হ'লে আবার না এফিলিএশন নিয়ে টানাটানি লাগে—এবারই তো প্রথম পরীক্ষা দিচ্ছে কলেজ।···কী মুশকিল, মুখ তুলে

তাকাও না সুরোজ, এত লজ্জা কিসের—জানোই তো সবার উপরে সংখ্যা সত্য, তাহার উপরে নাই!' টেনে-টেনে, প্রফুল্ল পরিহাসের ধরনে শেষ কথাটি আবৃত্তি ক'রে বৃদ্ধ হরিহর লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারলাম না।

৪

সুধীরবাবুর সাবধানী বাণী ব্যর্থ হ'লো না; টেষ্ট পরীক্ষার পরে প্রথম যেদিন ক্লাশ হবার কথা, সেদিনই ছেলেরা ষ্ট্রাইক করলো।

সাড়ে-দশটায় যখন কলেজ বসলো, তখন কিছুই বোঝা যায়নি। প্রথম দুটি পিরিঅড অত্যন্ত শান্তভাবে সম্পন্ন হ'লো। ততক্ষণে কলেজের সব ছেলেই এসে গেছে; তৃতীয় ঘণ্টার আরম্ভে, অধ্যাপকেরা যখন নাম ডাকছেন, করিডোর কম্পিত ক'রে গর্জন উঠলো—'বেরিয়ে এসো! বেরিয়ে এসো সব!' হুড়মুড় ক'রে ভিন্ন ভিন্ন ক্লাশ থেকে দলে-দলে বেরিয়ে এলো ছেলেরা, পাঁচ মিনিটের মধ্যে কলেজ শূন্য। যুদ্ধযাত্রী সৈন্যদের মতো, সংঘবদ্ধ মজুরদের মতো সার বেঁধে-বেঁধে চীৎকার করতে-করতে মাঠে নামলো তারা, সকলের আগে বুক ফুলিয়ে মার্চ ক'রে চলেছে তাদের নেতা, বীর সত্যব্রত। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ!' 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ!' মাঝে-মাঝে সত্যব্রত 'জিন্দাবাদ'ও বলছিলো—তবে সত্যব্রত নিজেও সেটা বলছিলো কিনা, অতটা অবশ্য লক্ষ্য করতে পারি'ন।

অঘ্রানের রোদ্দুরে খোলা হাওয়ায় জমকালো মীটিং হ'লো ছেলেদের—বক্তৃতা, বিতর্ক, মন্ত্রণা—তারপর বেলা তিনটের সময় সেই সভার সিদ্ধান্ত একখানা টাইপ-করা ফুলস্ক্যাপ কাগজে প্রমাদ-বহুল ইংরেজিতে প্রিন্সিপালের দপ্তরে উপস্থিত হ'লো। তার মর্ম এই যে সত্যব্রত নায়ককে আবার কলেজে নিতে হবে, শুধু তা-ই নয়, আগামী ইণ্টারমিডিএট পরীক্ষাও সে যাতে দিতে পারে, এই রকম ব্যবস্থা চাই, তা যত দিন না হবে ততদিন ছেলেরা কেউ কলেজে আসবে না।

মাষ্টার মশাই কাগজটার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'ছেলেটির দুটি নামই বেশ', তারপর সেটাকে গোল ক'রে পাকিয়ে ফেলে দিলেন বাজে কাগজের ঝুড়িতে।

দু'দিন গেলো, চার দিন গেলো, কলেজ নিশ্ছাত্র। গোবেচারা গোছের ছেলেরা বই-খাতা নিয়ে ঘোরাঘুরি করলো, কিন্তু এই বিভীষণদের মনে বিভীষিকা উৎপাদন করতে অল্প-একটু বাহুবলই যথেষ্ট হ'লো। খুব অল্পই বা বলি কেমন ক'রে—একদিন হষ্টেলের একটি ছেলেকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেলো রেল-লাইনের ধারে। আবার অজ্ঞানকে সজ্ঞান করবার চেষ্টাও চললো সেই সঙ্গে: কাগজে উঠলো খবরটা, দুটো-একটা কাগজে বড়ো-বড়ো হরফে।

হরিহরবাবু প্রিন্সিপালের কাছে এসে বললেন, 'বড্ড বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে না?'

মাষ্টার মশাই বললেন, 'হ্যাঁ, বড্ডই বাড়াবাড়ি করছে।'

কাটলো সাত দিন। তার পর মিছিল বেরুলো ছাত্রদের, কলেজের ছাত্র, স্কুলের ছাত্র, এমন কি, গর্লস স্কুলের মেয়েরাও বাদ গেলো না—শহরের সব ক'টি বিদ্যালয়ে আকস্মিক লাল তারিখ ঘোষণা ক'রে সাত থেকে সতেরো পর্যন্ত শ'খানেক মেয়ে আর সাত থেকে কুড়ি-একুশ পর্যন্ত শ' পাঁচেক ছেলে সুদীর্ঘ সশব্দ বাহিনীতে শহরের প্রত্যেকটি রাস্তা ঘুরে-ঘুরে বেড়ালো—বার কয়েক কলেজ প্রদক্ষিণ করতে-করতে জয়ধ্বনি তুললো আকাশে. প্রিন্সিপালের বাড়ির সামনেও চেঁচামেচি করলো খুব, এবং শেষ পর্যন্ত আমার দেউড়িতে দাঁড়িয়ে কতগুলি বাছা-বাছা স্লোগানে আমার দৈবপ্রহরিক তন্দ্রাকে ফুটো ক'রে দিলে। অবাক হ'য়ে শুনলুম, ওরা বলেছে: 'জমিদারের ভিক্ষা চাই!' 'ধনতন্ত্র ধন্য হোক!' কিন্তু ভালো ক'রে কান পাততেই বুঝলুম যে আসলে ওরা বলছে 'জমিদারকে শিক্ষা দাও!' 'ধনতন্ত্র ধ্বংস হোক!'—সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হ'লে যে-কোনো ভালো কথায় একটু বিকৃতি তো ঘটবেই।

মোটের উপর জাঁক-জমক যেটা হ'লো আমাদের ছোটো শহরের পক্ষে তা রীতিমতো রোমাঞ্চকর। শিশুরা মত্ত হ'লো, মহিলারা মুগ্ধ হলেন। সকলেই স্বীকার করলো যে এতটা হৈ-চৈ একেবারে মিছিমিছি হ'তে পারে না। এমনকি আমার স্ত্রী পর্যন্ত বললেন, 'দুটো মিষ্টি কথা ব'লে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে দিলেই তো পারো ওদের। ছেলেমানুষ তো!' মিছিলে সত্যব্রতর হাতে ছিলো নিশান, দু'পাশে ছিলো তূরী-ভেরী, অর্থাৎ ধ্বনি-বর্ধক চোঙ—ভালোই দেখাচ্ছিলো তাকে—বালকদের কাছে, বালিকাদের কাছে হীরো হ'য়ে উঠলো সে, সম্ভবত তাদের মায়েদের কাছেও।

সন্ধেবেলা হরিহরবাবু এসে পাংশু মুখে বললেন, 'করছো কী! কলেজ কি তুলে দেবে!'

বললাম, 'এত সহজেই যদি উঠে যায়, যাক।'

'সত্যব্রত দলবল নিয়ে কলকাতা যাচ্ছে—হয়তো কলকাতার কলেজেও ষ্ট্রাইক ছড়াবে—তোমাকে ব'লে দিচ্ছি, সরোজ, এখনও যদি আমার কথা না শোনো, তাহ'লে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হবে, কেলেঙ্কারি হবে—লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না!'

'আপনি কি মনে করেন আমরা কোনো অন্যায় করেছি?'

দু'হাত তুলে হরিহরবাবু বললেন, 'আরে বাবা, ও-সব ন্যায়-অন্যায়ের কথা রেখে দাও—যত বড়োই ন্যায়বান হও, বন্যার সামনে দাঁড়াতে পারবে তুমি? আর এই যে সত্যব্রতর মতো একটা বদমাসকে লীডর বানিয়ে দিলে, এটাই কি খুব ন্যায়সংগত হলো?'

'আমি কিছু জানি না, মাষ্টার মশায়ের কাছে যান।'

'বেশ, তা-ই যাচ্ছি, তুমিও চলো।'

গিয়ে শুনি, মাষ্টার মশায়ের জ্বর হয়েছে। হরিহরবাবুকে বাইরের ঘরে বসিয়ে ভিতরে গেলাম। খদ্দরের চাদরে গা ঢেকে শুয়ে-শুয়ে একটি বিলেতি ত্রৈমাসিক পড়ছেন মাষ্টার মশায়। আমাকে দেখেই বললেন, 'এসো। ভাবছিলাম তুমি আসবে।'

ব্যস্তভাবে বললুম, 'না, না, আমি সেজন্য আসিনি মোটেও—আপনার অসুখ শুনলাম—'

'অসুখ কিছু না।' ব'লেই চুপ ক'রে রইলেন, যেন আমি কিছু বলবো, এই অপেক্ষায়।

বললাম, 'আপনি সেরে উঠুন, তারপর যা হয় হবে। আপাতত এক্ষুনি ডাক্তার পাঠিয়ে দিচ্ছি গিয়ে, আর একজন লোক, সারারাত থাকবে সে আপনার কাছে, আর-কিছু যদি দরকার মনে করেন—'

'দরকার আর কী—' ব'লে শিয়রের টেবিলে পোষ্টকার্ডে ঢাকা-দেয়া গেলাশ থেকে একটু জল খেয়ে চোখ বুজলেন। আমি কয়েক মিনিট নিঃশব্দে ব'সে থেকে আস্তে উঠে এলাম।

হরিহরবাবুকে বললাম, 'মাষ্টার মশায়ের জ্বর হয়েছে, আজ আর কোনো কথা হবে না।'

'ও, জ্বর হয়েছে? তা জ্বরের আর দোষ কী,' ব'লে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ক'রে হরিহরবাবু এমন-একটু হাসলেন যে আমার মাথার ভিতরে দপ ক'রে যেন আগুন জ্ব'লে উঠলো।

দু'দিন শয্যাগত থাকলেন মাষ্টার মশায়, এ-সময়টা তাঁকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হ'লো। একলা মানুষ—আর অত্যন্ত অন্যমনস্ক প্রকৃতির, হাতের কাছে এনে না দিলে কিছুই হ'য়ে ওঠে না—স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর ওখানেই থাকলুম বেশির ভাগ সময়, ওষুধ-পথ্য চললো ঘড়ি ধরে, তিন দিনের দিন জ্বর ছাড়লো।

বাঁচলুম। আমাদের এদিকে আবার বিশ্রীরকম একটা ম্যালেরিয়া আছে। বিছানায় উঠে ব'সে মাষ্টার মশাই বললেন, 'কলেজের কী খবর?'

'জানি না।'

মাষ্টার মশায় বললেন, 'খবর একটা নিলে পারতে।'

খবর এসে পৌঁছলো সেদিন বিকেলেই। এক গাল হেসে হরিহরবাবু বললেন, 'ওহে, আর ভাবনা নেই। সত্যব্রত একেবারে অনকণ্ডিশনাল অ্যাপলজি দিয়েছে।'

'তাতে কী হ'লো?'

'প্রিন্সিপাল তো অসুস্থ, তোমারও দেখা নেই, অগত্যা সুধীরকেই কাজ চালিয়ে নিতে হবে তো। সুধীর ওটা অ্যাকসেপ্ট করেছে।'

'করেছে!'

'সেই সঙ্গে ওকে ফাইনও করেছে দশ টাকা—বলতে পারবে না যে কোনো শাস্তি হয়নি। কাল থেকে ঠিক কলেজ চলবে আবার।'

আমি স্তম্ভিত হ'য়ে হরিহরবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'হয়েছে, হয়েছে, ছোটো জিনিশকে আর ঘেঁটে-ঘেঁটে বাড়িয়ে তুলো না, কলেজটাকে দাঁড়াতে দাও,' ব'লে হরিহরবাবু আমার কাঁধের উপর সস্নেহে হাত রাখলেন। তাঁর স্পর্শে শিউরে উঠে স'রে এলাম আমি।

এর পরেও আবার মাষ্টার মশায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হ'লো। কিছু বলতে পারলাম না—কিছু বলতেও হ'লো না, আমার মুখ দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন, যেন মনে-মনে ঠিক এই সম্ভাবনাকেই ভেবে রেখেছিলেন তিনি। অনেকক্ষণ পর বললাম, 'মাষ্টার মশায়, আমার অন্যায় হয়েছে, এখানে অপনাকে নিয়ে আসা আমার উচিত হয়নি, আমাকে ক্ষমা করুন।'

ক্লান্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'থাকগে।'

এর পর অবশ্য যথারীতি কলেজ চললো—যথারীতি কেন, রীতিমতো ভালোই। প্রোফেসররা কয়েকটি ছেলের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সকাল-সন্ধ্যা ইষ্টমন্ত্র জপ করালেন—বলতে লজ্জা হচ্ছে কথাটা, কিন্তু আর লজ্জাই বা কিসের। একটি ছেলে পঁচিশ টাকা স্কলারশিপ পেলো, আর একটি পনেরো টাকা। পরের সেশনে হাজার ছাড়িয়ে গেলো সংখ্যা। সত্যব্রত আই. এ. পরীক্ষা দিলো, পাশও করলে—কেমন ক'রে জানি না—তার পর বি. এ.-তে ভর্তি হ'য়ে ফুটবলের কাপ্তেন হ'লো সগৌরবে। শিক্ষার প্রতি দয়া হ'লে সে ক্লাশে যায় আর শিক্ষকের প্রতি দয়া হ'লে ক্লাশ পালায়: তার অনুচরপোষিত বর্বরতায় প্রোফেসররা পাগল হলেন; কমনরুম থেকে মাসিকপত্র চুরি করে সে, অ্যাথলেটিক ফণ্ড থেকে টাকা—কিন্তু তাতে কী। পুজোর আগে পাশের দুটো জেলার কলেজের সঙ্গে খেলায় জিতে এলো সে, আর সে-উপলক্ষ্যে একদিন ছুটি হ'লো, ভোজ হ'লো দু'দিন। ভর্তি আরো বাড়লো পরের বছর, কলেজ স্বাবলম্বী হ'লো, মাইনে বাড়লো প্রোফেসরদের, আরো দু'জন নিযুক্ত হলেন। সুধীরবাবু অব্যর্থ তথ্য-সহযোগে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন আশ্চর্য উন্নতি মফস্বলের কোনো কলেজেরই এ-পর্যন্ত হয়নি।

সবই হ'লো, কিন্তু এই কলেজে আমার আনন্দ আর নেই—সমস্ত জিনিশটা থেকে রস চলে গেছে। মিথ্যার, প্রবঞ্চনার, ইতরতার চলাফেরার জায়গা কি পৃথিবীতে এতই কম যে তার জন্য আবার নতুন ক'রে একটা বিদ্যালয় বানাতে হবে? বিদ্যালয়!...এর চেয়ে পূর্বপুরুষের প্রমোদ-ভবনই ভালো ছিলো, তা নামেও বা কাজেও তাই, তাতে কোনো ভাণ অন্তত ছিলো না। কিন্তু বিদ্যার নামে ব্যবসা? শিক্ষার ছলে দুর্নীতি? না, না, না। রস চলে গেছে, স্বাদ চ'লে গেছে, প্রাণ চ'লে গেছে।

মাষ্টার মশাইর মনের ভাব আমার অগোচর নয়। ভালো লাগছে না তাঁর, কিন্তু এই ভালো-না-লাগাটা যে-ক্ষেত্রের সেই ক্ষেত্রের পরিধি তাঁর জীবনে সংকীর্ণ। প্রতিদিন আমার মনে হয় তিনি চ'লে যাবেন, চ'লে যে যান না তারও কারণ আর-কিছুই নয়—সেই শারীরিক আলস্য, মনের উদাসীনতা, সংসারের কাছে কোনো প্রত্যাশার একান্ত অভাব। কলকাতা থেকে কখনোই নড়তেন না, যদি না আমি হঠাৎ গিয়ে পড়তুম; আবার, এখানে যখন এসেই পড়েছেন, এখানেই বাকি জীবন কাটালে ক্ষতি কী। সত্যি বলতে, বাইরের ঘটনা-জড়িত জগতে তাঁর অস্তিত্বটা নামমাত্র, আসল জীবন তাঁর মনের মর্মরে, চিন্তার নির্জনে, গ্রন্থের তন্ময়তায়। সেখানে বাধা না-পড়লে অনেক অপ্রিয়কে নিঃশব্দে মেনে নিতে পারেন তিনি, ভুলে থাকতে পারেন। এতদিনে তাঁর সম্বন্ধে লোকের বেশ সুস্পষ্ট একটা ধারণা হয়েছে—শুধু হরিহরবাবুর আর তাঁর ভাগনের নয়, অধিকাংশ অধ্যাপকের, ছাত্রের, শহরের ভদ্রলোকদের। সেটা এই যে তিনি নিতান্তই ভালোমানুষ, মানে, দুর্বল মানুষ, তাঁর অনভিপ্রেত কোনো প্রস্তাবে বার-বার না বলবার মতো উদ্যমটুকুও তাঁর নেই ব'লে একটু পীড়াপীড়ি করলে প্রায় যে-কোনো বিষয়ে রাজি হ'য়ে যান; তিনি কোনো বই লেখেননি, তাই তাঁর গ্রন্থ-মগ্নতার নাম হয়েছে এস্কেপিজম; চল্লিশ বছরে বিপত্নীক হ'য়ে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেননি, এবং তিরিশ বছর ধ'রে অর্থোপার্জন ক'রেও এ পর্যন্ত একটি বাড়ি করেননি, তাই তাঁর নাম হয়েছে বাউণ্ডুলে। এও আমি জানি যে ছেলেরা তাঁর পড়ানো পছন্দ করে না, যেহেতু তিনি নোটও দেন না, রসিকতাও করেন না; এবং লাইব্রেরিতে আধুনিক বাংলা কাব্য কিছু আনিয়েছিলেন ব'লে ম্যাথমেটিক্সের সীনিয়ার প্রোফেসর দেবাশিসবাবু তো প্রকাশ্যেই বিদ্রূপ ক'রে থাকেন—অবশ্য তাঁকে নয়, সেই সব কাব্যের কর্তৃপক্ষকে। মোটের উপর, এখন আর আমি সন্দেহ করি না যে আমি ভুল করেছিলাম: মাষ্টার মশায়ের যোগ্য আমরা নই। হরিহরবাবু ভাবে-ভঙ্গিতে স্পষ্টই বুঝিয়ে দেন যে সতীশঙ্কর এই কলেজের একটি অলংকার

মাত্র, মহামূল্য অলংকার, তার মানে মূল্যবান নয়, ব্যয়সাপেক্ষ; কার্যত তিনিই কলেজ চালাচ্ছেন ভাগনেকে দিয়ে। তিনি মাথা খাটান, আর সতীশঙ্কর মাথা নাড়েন; কাজ করেন সুধীরচন্দ্র আর সই করেন সতীশঙ্কর। আর আমাকে বোধহয় গণ্যই করেন না তিনি; মোটাসোটা বোকাসোকা জমিদার আমি, কলেজের শখ হয়েছে, ভালোই, কিন্তু শখ মিটতে আর ক'দিন—আর তারপর টিঁকিয়ে রাখার জন্য শক্ত-মাথা-ওলা মজবুত লোক চাই তো। হরিহরবাবু পিছনে না-থাকলে উপায় কী।

আমার অর্থ আমার অপরাধ, আমার কর্ম আমার অপবাদ, তাই আমাকে ওঁরা যা ইচ্ছে মনে করুন তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু স্বভাবতই যিনি বড়ো, তিনি যে ছোটো হ'য়ে থাকবেন, আর তাও আমাকে চোখের উপর দেখতে হবে আর সইতে হবে, এতে আমি মরমে ম'রে আছি। সত্যিই তো মাষ্টার মশাই শুধু মাথা নাড়েন আর সই করেন, ভালো-মন্দ কিছু বলেন না; আস্তে-আস্তে—মানে, দ্রুতবেগে সমস্ত কলেজটা একটা সুবৃহৎ ফাঁকি হ'য়ে উঠছে—বিশ্ববিদ্যালয়কে ফাঁকি দিচ্ছি আমরা, মাষ্টারদের ফাঁকি দিচ্ছি, ছাত্রদেরও ফাঁকি দিচ্ছি—আর নিজের অন্তরাত্মার কথা না-তোলাই ভালো। মাষ্টার মশাই যেন দেখেও দ্যাখেন না, বুঝেও বোঝেন না। হরিহরবাবু এ-কথা বলতেও ছাড়েন না শুনেছি যে কাজে যাদের গা নেই, অনেক দেখিয়ে বাহবা নিতে চায় তারাই, আর ভালোমানুষ না-হ'য়ে তাদেরই উপায় নেই, মাসের শেষে মাইনে যাদের মোক্ষম! এ-সব কথা যে মাষ্টার মশাইর কানেও না ওঠে তা তো নয়, তবু মুখে কথা নেই তাঁর, তবু চোখের দৃষ্টি বইয়ের পাতায় আনত। এক-এক সময় তাঁর উপরই অভিমান হয় আমার, কেন তিনি সহ্য করেন, কেন তিনি জ্ব'লে ওঠেন না, কেন প্রমাণ করেন না তাঁর শ্রেষ্ঠতা, ঘোষণা করেন না তাঁর কর্তৃত্ব? আর তা যদি না-ই করেন, তাহ'লে তিনি আছেন কেন।

কলেজের চতুর্থ বছর শেষ হ'তে চললো, বি. এ. পরীক্ষার সীট পড়লো কলেজে। প্রথম দিনের পরীক্ষার পরে ছেলেরা হৈ-হৈ করতে লাগলো এই ব'লে যে প্রশ্ন-পত্র দুঃসাধ্যরকমের দুরূহ হয়েছে। দুরূহ মানে, যে-সব নোটের আঠায় তারা মাছির মতো আটকে ছিলো, তা থেকে টপা টপ রসগোল্লার মতো তুলে দেয়া গেলো না উত্তর, কিংবা ভাষাটা ঈষৎ বাঁকা ব'লে প্রশ্নটাই ঢুকলো না মাথায়। দ্বিতীয় দিনে আরো প্রবল হ'লো আন্দোলন, অজ্ঞাতনামা প্রশ্নকর্তার বাপান্ত করতে-করতে ছেলেরা নিষ্কলঙ্ক আঙুল নিয়ে হল থেকে বেরলো, এবং মাঠে গোল হ'য়ে ব'সে-ব'সে জটলা করলো অনেক রাত পর্যন্ত। লক্ষণ ভালো না।

পরের দিন গণিত পরীক্ষা। পাছে কোনো বিপর্যয় ঘটে, আমি হাজির হলুম পরীক্ষা আরম্ভ হবার আগেই—তার মানে এ নয় যে গোলমাল হ'লে আমি কিছু করতে পারবো, বিপদের সময় উপস্থিত থাকাটাই আমার কর্তব্যপালন। পরীক্ষা আরম্ভ হ'লো, মিনিট কুড়ি পরে দেবাশিসবাবু হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে বললেন, 'ছেলেরা গোলমাল করছে।'

মাষ্টার মশাই চোখ তুলে তাকালেন।

'কিছু লিখতে পারছে না কেউ—"ব'লে দিন, স্যর" ব'লে চ্যাঁচাচ্ছে।'

'আপনি কী বললেন?'

'তাই তো এলুম আপনার কাছে।'

'ব'লে দেবেন কি দেবেন না, সেই কথা জিগেস করতে এলেন?'

'না, না, তা নয়, তা নয়—কিন্তু কী করা যায় এখন—একটা কালির আঁচড় কাটেনি কেউ—এক কথা একশো বার বোঝাতে-বোঝাতে ফুসফুস ফুটো হ'য়ে গেলো আমার, অথচ—' কথা শেষ না-ক'রে দেবাশিসবাবু মাথার চুল টানতে লাগলেন।

'কে আছেন ওখানে?'

'সুধীরবাবু—'

'আপনিও যান, আপনাকে দেখলেই উৎসাহ পাবে ওরা।'

পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়ালেন দেবাশিসবাবু।—'আপনি যদি একবার—'

গণিতের অধ্যাপকের দিকে এক পলক তাকিয়ে মাষ্টার মশাই বললেন, 'চলুন।'

একটু দ্রুত ভঙ্গিতেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি, অপ্রত্যাশিত দ্রুত গতিতে লম্বা বারান্দা ধ'রে হাঁটতে লাগলেন। টাট্টু ঘোড়ার মতো চটপটে দেবাশিসবাবু সঙ্গে-সঙ্গে চলতে লাগলেন, আমি মোটা মানুষ, থপথপ করতে-করতে কেবলই পিছনে পড়তে লাগলাম।

হল-এর দরজায় পৌঁছিয়ে দেখি, দরজার বাইরে সুধীরবাবু আর মাষ্টার মশাই। সুধীরবাবু বলছেন, 'সব ফেল করবে, স্যর, ম্যাসাকার হবে, নাম ডুববে কলেজের—'

'আপনি যান, বাড়ি চ'লে যান,' ব'লে মাষ্টার মশাই কোনো দিকে না-তাকিয়ে আবার হনহন ক'রে উল্টো দিকে হাঁটতে লাগলেন, আবার আমি পিছু নিলুম তাঁর। ঘরে ফিরে ঘাম মুছতে মুছতে জিগেস করলুম, 'কী হয়েছিলো?'

'শিক্ষকের কর্তব্যই করছিলেন উনি, ছাত্রদের সাহায্য করছিলেন।'

'সাহায্য করছিলেন!'

'শুধু ছাত্রদের নয়, কলেজকেও। একেবারে পাইকেরি হিশেবে ফেল করলে বড়োই বদনাম তো। বড্ড খাটেন উনি কলেজের জন্য, একটু বিশ্রাম দরকার, আমি তাই বাড়ি পাঠিয়ে দিলুম।'

আমি ব'লে উঠলাম, 'উদ্ধার করুন, মাষ্টার মশায়, কলেজটাকে উদ্ধার করুন।'

কাটা দরজায় ঠাশ ক'রে শব্দ হ'লো, সুধীরবাবু ঘরে ঢুকলেন। চোখ লাল, উশকোখুশকো চুল। মাষ্টার মশাই চোখ তুলে বললেন, 'আপনি—'

'ছেলেরা দোয়াত ছুঁড়ে মারছে, খাতা ছিঁড়ে ফেলছে, খেপে গেছে, খেপে গেছে তারা—লোহার হাতে চেপে না-ধরলে এখন আর উপায় নেই', বলতে-বলতে সুধীরবাবু কাঁপতে লাগলেন।

'দেখছি আমি—'

'আমাকে যদি বলেন—'

'আপনাকে তো বলেছি বাড়ি যেতে।'

'বেশ। তা-ই যাচ্ছি। এ-কলেজের জন্য প্রাণপাত করেছি আমি—এখন আমাকেই তাড়িয়ে দিচ্ছেন আপনারা। বেশ। কিন্তু তাড়িয়ে দিলেও কলেজের যাতে ভালো হবে তা করতে আমি ছাড়বো না।' ঠোঁট বাঁকিয়ে দুমদাম শব্দে বেরিয়ে গেলেন সুধীরবাবু।

মাষ্টার মশাইর সঙ্গে-সঙ্গে আমিও উঠলাম, পরীক্ষার হল-এর

কাছাকাছি আসতেই গোলমাল শোনা গেলো। দেবাশিসবাবুই চীৎকার করছেন, হাতজোড় করছেন, আরো তিনজন প্রোফেসর ছুটোছুটি করছেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। সত্যি খেপে গেছে ছেলেরা।

মাষ্টার মশাই ঢুকলেন, প্ল্যাটফর্মে উঠে দাঁড়িয়ে সজোরে চাপড় দিলেন টেবিলে। ছেলেরা সবাই যখন তাঁকে দেখতে পেলো, হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেলো মস্ত হলটি, এমন স্তব্ধ যে বাইরে কাকের কা-কা শব্দ স্পষ্ট শোনা যেতে লাগলো।

মৃদু-গম্ভীর স্বরে মাষ্টার মশাই বলতে আরম্ভ করলেন, 'তোমরা ভুল করেছো। বয়েস অল্প তোমাদের, কী করছো বোঝো না, বুঝলে নিশ্চয়ই করতে না। নিজেরা প্রস্তুত হওনি, সে-দোষ তোমাদেরই, পরীক্ষার নয়—'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো একটি ছেলে। তাকে আমি চিনলাম, সেই সত্যব্রত। বললো, 'দেশের এই অবস্থায় পড়াশুনো—'

'বেশ তো, মন না বসে পড়াশুনো করবে না। কিন্তু পড়াশুনোর সুবিধেটা চাইবে, অথচ করবে না কিছুই, তা তো হ'তে পারে না। যার যা কাজ তা-ই সে ভালো ক'রে করবে, মন দিয়ে করবে, এইটেই হ'লো মানুষের শক্তির পরিচয়, যে-শক্তির ফলে স্বাধীনতা, সম্পদ, সম্পূর্ণতা। এ-শক্তি হারিয়েছি ব'লেই আজ এই দুর্দশা আমাদের। স্বাধীনতা পাবার চেষ্টায় এই শক্তিকেই যদি আরো হারাই, তাহ'লে তো কখনো স্বাধীনতা পাবো না। পরাধীন ব'লে কি পকেট কাটবে তুমি? পরাধীন ব'লে প্রতারণা করবে? পরাধীন ব'লে আপন মনুষ্যত্বকে মাড়িয়ে দেবে পায়ের তলায়? না, তা নয়, তা হ'তে পারে না, আমি জানি তোমরাও তা বলবে না। তোমরা ছেলেমানুষ, বোঝো না, তাই ভুল করেছো। এখান থেকে তোমরা চ'লে যাও, আজ যারা এখানে আছো তাদের আর পরীক্ষা দেবার দরকার নেই, যদি ইচ্ছা করো, যদি পড়াশুনোর রুচি থাকে, চেষ্টা থাকে, বিশ্বাস থাকে, তাহ'লে সামনের বছরের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হও। আর তা যদি না থাকে, তাহ'লে কলেজ ছেড়ে চ'লে যাও, যা ভালো লাগে তা-ই করো তা-ই ভালো ক'রে করো।'

মাষ্টার মশাই চুপ করলেন, সমস্ত ঘরে নিস্পন্দ নীরবতা। একটু অপেক্ষা ক'রে আবার বললেন, 'আমি ধ'রে নিচ্ছি যে আমার কথায় তোমাদের সায় আছে, আস্তে-আস্তে বাড়ি চ'লে যাও সব, এখনই যাও, দেরি কোরো না।'

কিছু বললো না ছেলেরা, চোখ তুলে তাকালো না, পাথরের মূর্তির মতো ব'সে রইলো সব, কিন্তু যেই মাষ্টার মশাই বেরিয়ে এলেন, অমনি ভিতর থেকে দুরন্ত চীৎকার উঠলো, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ! ইনকিলাব জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ! ইনকিলাব জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ!'

মাষ্টার মশাই থমকে দাঁড়ালেন, একটি গভীর আরক্ত উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়লো তাঁর প্রশান্ত সম্বৃত মুখে। মাথা নিচু ক'রে ভাবলেন একটু, চোখ তুলে তাকাতেই পুলিশের খাকি-কোর্তা-পরা একজন লোক তাঁকে অভিবাদন করলো।

আমি ব'লে উঠলাম, 'ইন্সপেক্টরবাবু, আপনি কী মনে ক'রে?'

'ঠিক সময়েই এসে পড়েছি, দেখছি, এখনই ভাঙচুর শুরু হবে। বলুন তো রিং-লীডর কে? কয়েকটাকে ধ'রে এক রাত হাজতের মশা খাওয়ালেই ঠাণ্ডা হবে বাছারা। যে যাই বলুক, লাল ঝাণ্ডার ওষুধই লাল পাগড়ি,' ব'লে ইন্সপেক্টর বাবু এগোতে যাচ্ছিলেন, মাষ্টার মশাই সোজা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনাকে খবর দিলো কে?'

'সুধীরবাবু নিজেই গিয়েছিলেন সাইকেল নিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে। এখন আমার হাতে ছেড়ে দিন ব্যাপারটা—আপনারা সরে পড়ুন—কিছু ভাববেন না, ঠিক ক'রে দিচ্ছি।'

আস্তে আস্তে, প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট উচ্চারণ ক'রে, মাষ্টার মশাই বললেন, 'আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনাকে এক্ষুনি এখান থেকে চ'লে যেতে হবে।'

'আমাকে? চ'লে যেতে হবে?'

'হ্যাঁ, আপনাকে চ'লে যেতে হবে।'

'কিন্তু—'

'কিন্তু কিছু নেই। আমি কলেজের প্রিন্সিপাল, আমার অনুমতি না-নিয়ে কেউ ঢুকতে পারে না কলেজের মধ্যে, আপনি কেন, আপনার সবচেয়ে বড়ো যে উপরিওলা, সে-ও পারে না। আর আমি যতক্ষণ প্রিন্সিপাল আছি, আপনাকে ঢুকতে দেবো না কলেজের মধ্যে—কোনো কারণেই না—এক্ষুনি চ'লে যেতে হবে আপনাকে—এই মুহূর্তে!

ইন্সপেক্টরবাবুর মুখ কালো হ'লো। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখবেন, শেষটায় যেন আবার আমাদেরই শরণাপন্ন হ'তে না হয়।'

'শুনছেন না কথা!'

এমন প্রচণ্ড স্বর কখনো শুনিনি মাষ্টার মশায়ের। আমি পর্যন্ত কেঁপে উঠলাম।

ইন্সপেক্টরবাবু লাঠি-পুলিশের দল নিয়ে ফিরে গেলেন। মাষ্টার মশাই আবার হল-এর দরজার কাছে দাঁড়াতেই শতাধিক সিংহশিশু একসঙ্গে গর্জন ক'রে উঠলো, 'জয় হিন্দ!' দুটো-তিনটে দোয়াত আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে এসে ঝনঝন ক'রে দেয়ালে লেগে ভেঙে গেলো, সঘন করতালিতে তালা লাগলো কানে।

আর তারপর? তার পরের কথা কী আর বলবো। আস্ত একটা চিড়িয়াখানা যেন ছাড়া পেয়েছে, সেই সঙ্গে পাগলা গারদ। মনুষ্যজাতীয় জীবের কণ্ঠ দিয়ে এত রকমের বিচিত্র জান্তব চীৎকার যে বেরতে পারে, তা স্বকর্ণে না-শুনলে কখনোই বিশ্বাস করতুম না আমি। বেঞ্চি-টেবিল ভাঙলো ওরা, দেয়াল ক্ষত-বিক্ষত করলো, লাইব্রেরিতে ঢুকে ম্যাপ কাটলো ছুরি দিয়ে, বই ছিঁড়লো, ছারখার ক'রে দিলো ল্যাবরেটরি, আপিশের খাতাপত্র পুড়িয়ে দিলো। দিগ্বিজয় সমাধা ক'রে সগৌরবে বেরিয়ে এলো—সত্যব্রত বুক ফুলিয়ে সকলের আগে। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ! ইনকিলাব জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ!'

পশু-শক্তির সামনে কিছুই করা গেলো না।

সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্ত শহরে র'টে গেলো যে কলেজের প্রিন্সিপাল পুলিশ ডেকেছিলেন জোর ক'রে পরীক্ষা চালাবেন ব'লে, ছেলেদের রুখে দাঁড়াতে দেখে শেষ পর্যন্ত আর সাহস পাননি। সূর্যাস্তের আগে রাস্তার বড়ো-বড়ো প্রত্যেকটি মোড়ে প্ল্যাকার্ড পড়লো: খবর-কাগজের উপর জলজলে লাল কালির অক্ষরে শহর-সুদ্ধ

লোককে এই কথা জানানো হ'লো যে সতীশঙ্কর দেশদ্রোহী এবং গবর্ণমেণ্টের গুপ্তচর। শহর-সুদ্ধু লোক ছী-ছী করতে লাগলো।

তাঁর পদত্যাগপত্র আমার হাতে পৌঁছলো সন্ধ্যার পর।

রাত ন'টার পরে তাঁর কাছে গিয়ে আমি বললুম, 'গাড়ি রিজার্ভ ক'রে এসেছি, আপনি প্রস্তুত হ'য়ে নিন।'

'আমি প্রস্তুত।'

তাকিয়ে দেখলাম, জিনিশপত্র তেমনি ছড়ানো। ভৃত্যের সাহায্যে কাপড়-চোপড় আর খানকয়েক বই আমিই ভ'রে নিলাম সুটকেসে, বিছানাও বাঁধা হ'লো। খাওয়া হয়েছে কিনা, এ-কথা জিগেস না-করবার মতো বুদ্ধি আমারও হলো।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললুম, 'দশটা দশ মিনিটে গাড়ি।'

রাত্রির অন্ধকারে মিশে আমার মস্ত কালো ঢাকা গাড়ি এগিয়ে চললো ষ্টেশনের দিকে। পথে-পথে শুনলাম চীৎকার, অশ্লীল হাসি, হাততালি, একবার একটা ঢিল এসে লাগলো গাড়ির দরজায়। ষ্টেশনে ঢুকে দেখি, ষ্টেশনমাষ্টার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন, বোধহয় আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যই। মাষ্টার মশাইর দিকে চোখের ইশারা ক'রে বললেন, 'কলকাতা যাচ্ছেন বুঝি আজই?' ব'লে মুখ ফিরিয়ে মুখ টিপে হাসলেন একটু। প্ল্যাটফর্মে ভিড় ছিলো: মনে হ'লো শহরের অনেক লোকই কলকাতা যাচ্ছে আজ দুর্গন্ধ ওয়েটিংরুমে ব'সে রইলাম মাষ্টার মশাইকে নিয়ে।

গাড়ি এলো, পাঁচ মিনিট মাত্র দাঁড়াবে।

তাড়াতাড়ি বিছানা পেতে দিলাম—জলের কুঁজো রাখলাম হাতের কাছে, একখানা বই বের ক'রে দিলাম। 'ভুবন রইলো পাশের গাড়িতে, মাঝে-মাঝে এসে খবর নেবে।…আর এখানে আপনার জিনিশপত্র যা রইলো…' কথা শেষ করতে পারলাম না, নিচু হ'য়ে পায়ের ধুলো নিলাম, পাছে উনি আমার চোখ দেখতে পান; আর-কোনো কথা উচ্চারণ না-ক'রে একটু তাড়াহুড়োর ভঙ্গিতেই নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। মাষ্টার মশাই নিশ্চল হ'য়ে ব'সে রইলেন।

ঘণ্টা বাজলো। সঙ্গে-সঙ্গে প্ল্যাটফর্ম থেকে চীৎকার উঠলো, 'সতীশঙ্করকে ধিক! সতীশঙ্করকে ধিক! ইনকিলাব জিন্দাবাদ! ইনকিলাব জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ! জয় হিন্দ!' প্ল্যাটফর্মে শাদা-শাদা ছায়ামূর্তির মতো একটি দল দেখতে পেলাম—সেই অস্পষ্ট আলোতেও সত্যব্রতকে চিনতে পারলাম আমি। মাষ্টার মশাইকে বিদায়-সম্ভাষণ বেশ ভালোভাবেই জানালো ওরা।

গাড়ি ন'ড়ে উঠলো, গাড়ি চলতে লাগলো যেন ওদের চীৎকারের তালে তাল রেখে। আলো-জ্বলা জানলায় মাষ্টার মশায়ের মুখ চকিতে দেখলাম আমি, প্রবল প্রকাণ্ড সুদীর্ঘ গাড়িটা স'রে-স'রে গেলো চোখের সামনে থেকে, তারপর বিস্তীর্ণ প্রান্তর, আর তারা-জ্বলা আকাশ, আর গার্ডের গাড়ির ছোটো-হ'য়ে আসা লাল চোখ, আর আমার বুকের শূন্যতার মতো প্ল্যাটফর্ম। চীৎকারের শেষ পালা শেষ ক'রে দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো ওরা, নির্জন নিঃশব্দ হ'য়ে এলো ষ্টেশন, তবু আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগলাম রেলগাড়ির ক্ষীণ, অস্পষ্ট শব্দ—তারপর ক্ষীণতম কোনো শব্দও আর রইলো না, শব্দের রেশ পর্যন্ত না, স্মৃতি না, আশা না, ইচ্ছা না, অভিশাপ কি মনস্তাপ, সংকল্প কি সম্ভাবনা, কিছুই না—ঐ রেলগাড়ির শব্দের সঙ্গে-সঙ্গেই মিলিয়ে গেলো সব, সব গেলো।

মানভঞ্জন

নিশিকান্ত

দিয়ো না দিয়ো না দিয়ো না দুলায়ে
আশার লতিকা নিরাশা পবনে
বেদনা-তাপিত পরশ বুলায়ে!
যে ফুল ফুটালে, যাবে সে শুকায়ে
বহু সাধনাতে
আপনার হাতে
যে দীপালি দিলে আঁধার-ভবনে,
অধীর প্রাণের প্রতিকূল বায়ে
সে প্রদীপ-মালা ফেলো না নিবায়ে॥
হে মোর অবোধ জীবন-কিশোরী
তব অভিসার সরণী গমনে
কেন দোলো দ্বিধা সন্দেহ ধরি?
নিজেরে কাঁদাও কেন, মরি মরি।
অন্তর-মাঝে
শোনো বাঁশি বাজে—
সফলিতে তব আশার স্বপনে,
লুটালে পথের মলিন ধুলায়
কেন অভিমানে আপনা ভুলায়ে॥



ঝড় ও ঝরা পাতা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চার

১৩ই ফেব্রুয়ারী

বুধবার ১৩ই ফেব্রুয়ারী। দিন শেষ হয়ে এল। শান্তি স্তব্ধ হয়ে বসে আছে; গোপেন বেরিয়ে গিয়েছে—তার ফেরার কথা নয়; দেবা-ট্যাবাও ফেরে নাই। সে ভাবছে দু'টোই কি মরেছে? না হ'লে তো একটা অন্তত ফিরত কাঁদতে-কাঁদতে। পাড়ার ছেলেগুলোর অনেকে ফিরেছে। নেবু তাদের সন্ধান ক'রে এসেছে। তারা বলেছে—'সেই সকাল বেলাতেই তাদের সঙ্গে ওদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে। তার পর আর তারা ওদের খবর জানে না।' হুসিয়ার মেয়ে নেবু, খুঁটিয়ে খবর এনেছে। গ্রে ষ্ট্রীটে একটা রেশনের দোকানের সামনে লোক জমায়েৎ হয়। দোকান ভেঙে লুঠ করে নেবার জন্য দরজা ভাঙবার চেষ্টা করে। পুলিশের লরী এসে পড়ে। গুলী চালায়। গোলমালের মধ্যে যে যেদিকে পেরেছে ছুটে পালিয়েছে। ওদের দলে ছিল এগার জন। পাঁচ জন এক দিকে পালিয়েছিল—তারাই ফিরেছে। বাকী ছ'জনের মধ্যে দেবা-ট্যাবা ছাড়া চার জনের নাম-ঠিকানা নিয়ে নেবু তাদের খবরও করেছে। চার জনের দু'জন ফিরেছে। তারা বলেছে—ওরা ছ'জনেই একসঙ্গে ছিল। গ্রে ষ্ট্রীট থেকে গলি-গলি ওরা পালিয়ে যায়। হেদোর ধারে গিয়ে খবর পায়—মাণিকতলা বাজারের ওখানে খুব কাণ্ড চলছে। সেখানে গিয়েছিল ওরা। সেইখান থেকে দেবাদের সঙ্গে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে।

নেবু বললে—সেখানে না কি বিস্তর লোক। হাঙ্গামার দরুণে। দু'-তিন হাজার লোক। রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। গাড়ী এসে দাঁড়ালেই বোঁ-বোঁ করে ইট ছুঁড়ছে। পুলিশ ও মিলিটারী লরী এলেই সব যে যার গলিতে ঢুকে পড়ছে। লরীও চলতে আরম্ভ করছে; বাস্, গলি থেকে বেরিয়ে আবার বোঁ-বোঁ করে ঢেলা।

শান্তির আর এ সব শুনবার ধৈর্য্য ছিল না—সে চীৎকার ক'রে বলেছিল—বোঁ-বোঁ ক'রে ঢেলা, বোঁ-বোঁ করে ঢেলা! শুনতে আমি আর পারছি না নেবু। ওরা মরেছে—এই খবরটা এনে দিতে পারিস?

এই কথাটা শান্তির মুখেও নতুন নয়, নেবুর কানেও নতুন নয়; আজ তিন বৎসর ধরে, অর্থাৎ যত কাল মিলিটারী লরীর চাকায় আর গোঙানীতে কলকাতা কাঁপছে—তত কাল মাসে অন্তত তিন-চার দিন এই কথাটা বলে আসছে শান্তি। নেবুকেই বলে আসছে। কিন্তু আজকার কথাটা যে ভাবে মা বললে—সে ভাবে আর কখনও বলে নাই। নেবুর সকল উৎসাহ নিভে গেল। সে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে বললে—আর একবার দেখব মা?

—না। তোমার জন্যে আর আমি ভাবতে পারব না।

নেবুও কম নয়। মেয়ে হয়ে জন্মেছে তাই রক্ষা, বেটাছেলে হলে এত দিন ও চুরি করত, গাঁট কাটত, আরও অনেক কিছু করত। বাজার থেকে নেবু লঙ্কা চুরি ক'রে আনে, ফিরিওয়ালার ডালা থেকে জিনিষ তুলে নেয়; সেদিন কন্ট্রোলের কাপড়ের দোকান থেকে এক টুকরো ছিট সুকৌশলে পেট-আঁচলে পুরে নিয়ে এসেছে। গোপেন যে কাবুলীওয়ালাটার কাছে টাকা ধার করে—সেই কাবুলীওয়ালাটার কাছে ও আঙুর, বেদানা, হিং আদায় করে। সুদ চাইতে এলে—নেবু বাইরে যায়—তাদের সঙ্গে কথা বলে। তাদের বলে—আজ নেহি। আজ নেহি। ভাগো আজ!

তারা নেবুর গাল টিপে আদর ক'রে দিয়ে সত্যিই ভেগে যায়।

গলির মোড়ে এক দল জোয়ান ছেলের আড্ডা বসে। শান্তি নিজের চোখে দেখেছে—ওদের সঙ্গে নেবুর হাসি-খুসি। ঢেলা মেরে ছুটে নেবুকে পালিয়ে আসতে দেখেছে। সে লক্ষ্য করে দেখেছে—ওই ছেলের দলের নজর নেবুর উপর আর চানাওয়ালার একটি মেয়ে আছে—সেটার উপর। চানাওয়ালার মেয়েটা নেবুর চেয়ে বয়সে বড়। সেটার বদনাম হতে আরম্ভ হয়েছে।

গোপেনের চাকরীতে দিন কাটে। সে এ সব কথা জানে না। জানে শুধু কাবুলীওয়ালাদের সঙ্গে প্রীতির কথাটুকু। সেটুকু সে সহ্য ক'রে নিয়েছে। সহ্য না করে উপায় নাই তাই নিয়েছে। এ নিয়ে গোপেন মেয়েকে কিছু বলে না কিন্তু অন্য একটা কিছু ছুঁতো নিয়ে সে মেয়েকে প্রহার করে। যে দিন কাবুলীওয়ালা এসে শুধু

হাতে ফিরে যায়—সে দিন নেবুর অদৃষ্টে প্রহার নিশ্চিত। কথাটা নেবু ঠিক এখনও ধরতে পারে নাই কিন্তু শান্তি তো বুঝতে পারে সব! সে মুখ বুজে থাকে। নেবু লক্ষ্মী আনে নেবু বিনামূল্যে সে জন্যও শান্তি কিছু বলে না; মধ্যে মধ্যে মনটা কেমন করে উঠলেও এটা প্রায়ই তার সহ্য হয়ে এসেছে। কিন্তু নেবুর দেহের দিকে তাকিয়ে ওই ছেলেগুলোর সঙ্গে তার রীতি-আচরণ দেখে শান্তি শঙ্কিত হয়ে উঠেছে নেবুর সম্বন্ধে। নেবুকে এই সন্ধ্যার মুখে কোথাও যেতে দিতে তার ভরসা নাই।

নেবু পাশে বসল। মায়ের মুখ দেখে কথা বলতে সাহস হচ্ছিল না। তবু সে মধ্যে মধ্যে সাহস ক'রে দু'-চারটে কৌতুকজনক সংবাদ না ব'লে পারলে না; কৌতুকও বটে—আবার হয় তো মাকে একটু হাসাবার জন্যও বটে। মায়ের মুখের এ গুমোট সে সহ্য করতে পারছিল না।

—যা' তা' কাণ্ড। যাচ্ছে-তাই। 'হুষি-নিন্দুষী' নাই, গুলী ছুড়ছে যার গায়ে লাগে লাগুক। ওই যে অগো কাঁদছে! গণেশ টকীজ কাছে বাড়ী তাদের, মেয়েটি তেতলার জানালাতে দাঁড়িয়ে দেখছিল—

—কেন দেখছিল? শান্তি চীৎকার করে উঠল—কেন দেখছিল?

নেবু স্তব্ধ হয়ে গেল ভয়ে। বুঝতে পারলে না—অন্যায় সে কি বললে!

শান্তি আবার চীৎকার করে উঠল—আর এরা যে লরী পোড়াচ্ছে, ঢেলা মারছে, লুঠ করছে! যারা পোড়াচ্ছে তাদের ধরে এনে ধরে দিক ওদের বন্দুকের সামনে। ওরা নিন্দুষীকে মারবে না গুলী।

উত্তেজিত হয়ে শান্তি উঠে দাঁড়াল।—তুই বস। আমি দেখছি।

শান্তি চলে গেল। নেবু বসে রইল চুপ করে। নেবুর মনে উদ্বেগ না-থাকা নয়, চারি দিকে গুলী চলছে, মানুষ মরছে, কত রকম খবর সে শুনেছে এরই মধ্যে—কত গুলী খেয়ে মরার কথা, কত ঢেলা মেরে পুলিশ মিলিটারীর মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার কথা, কত লরী পোড়ানোর কথা; চোখেও সে খানিকটা খানিকটা দেখেছে। শ্যামবাজারের মোড়ে গুলী চালানো সে দেখে নাই কিন্তু গুলী খেয়ে যারা পড়েছিল তাদের সে দেখেছে। দেবা-ট্যাবার সন্ধানে বেরিয়ে ওদের সঙ্গীর কাছে গিয়ে তাদের কাছে শুনেছে কত কথা। ট্যাবার কথাই তারা বলেছে—বলেছে—"জান, নেবুদি, ট্যাবা একটা গলির মোড় থেকে যা ঢেলা একখানা হাঁকড়ালে। বাঁ—ই করে গিয়ে লাগল লরীতে। আমরা দে ছুট। দুম-দুম ক'রে গুলীর শব্দ হ'ল। আমরা ছুটে পালালাম। খানিকটা এসে দেখি ট্যাবা নাই। দেবা কাঁদতে লাগল। আমরা আবার ফিরলাম। দেখলাম ট্যাবা পড়ে গিয়েছিল সে উঠছে। আমরা ছুটে গেলাম। ট্যাবা হি-হি ক'রে হাসতে লাগল। বললে, পালাতে পারলাম না—পড়ে গেলাম। তো পড়েই থাকলাম। বুঝলি। ওরা ঠিক ভেবেছে আমার গুলী লেগেছে।" আরও বলেছে—ওরা শুনেছে—গুলী চালানোর সময় শুয়ে পড়লে আর ভাবনা নাই। "বুঝলে—সটান মাটির সঙ্গে সেঁটে উপুড় হয়ে পড়ে থাক—নড়ো না—বাস—মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে গুলী—সাঁই-সাঁই। গায়ে লাগবে না। ওরা ভাববে মরে গেছে। চলে যাবে তখন উঠে পড়। বুঝলে নেবুদি, ট্যাবাটা আস্ত বিচ্ছু, ও শুয়েছিল কিন্তু হাতের ঢেলাটি ছাড়েনি। যেই না মোটরের শব্দ হয়েছে চলে যাওয়ার—বোঁ করে উঠেই—সেটা হাঁকড়ে, একদম সড়াক—গলির মধ্যে।"

এ সব কথাগুলোর মধ্যে অফুরন্ত আনন্দ এবং উত্তেজনার আভাসই নেবু পেয়েছে, ভয় পায় নাই। তাই দেবা-ট্যাবার জন্য তার যে উদ্বেগ—সে উদ্বেগ খুব বেশী নয়। মায়ের মত নয়। নেবু দাওয়ার উপরে বসে পা দোলাতে আরম্ভ করলে। ভয় কিসের এত? দেবা-ট্যাবা মরবে না সে জানে। মরবে কেন? তা ছাড়া গুলী যদি লাগেও, তাই বা কি? গুলী লাগলেই কি মরে? ওদের গুলী আছে—এদেরও ঢেলা আছে। বাঁ হাতে যা ঢেলা ছোঁড়ে ট্যাবা, লাগলে আর রক্ষা নাই। মাথায় লাগলে ফেটে ঘিলু বেরিয়ে যাবে। ঠিক ফিরে আসছে—দেবা-ট্যাবা।

ছোট ভাই দু'টো খেলা করছে পথের উপর। হাবাটা উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দূরে। ছোটটা পথের ধুলোর উপর বসেছে—একটা কচি আমড়া আর একটা দেশলাইয়ের খোল-ভর্ত্তি ছোলা-ভাজা নিয়ে। নেবুর বন্ধু ওই চানাওয়ালার মেয়ে লছমনিয়া দিয়েছে নিশ্চয়। বড্ড নোংরা এই ছোট ভাই সবুটা। পথের ধুলোর উপর ছোলাগুলোকে ছড়িয়ে ফেলে তাই কুড়িয়ে খাচ্ছে। ঠিক ওইখানটাতেই—উঃ—গা বমি-বমি করে উঠল নেবুর। ওই বড় বাড়ীটাতে একটা অ্যালসেসিয়ান কুকুর আছে। সেটাকে নিয়ে ও-বাড়ীর ছেলেরা রোজ বিকেলে এইখানে খেলা দেয়। বল ছুড়ে দেয়, কুকুরটা ছুটে গিয়ে সেটাকে মুখে তুলে আনে। দু'দিন আগে সেই কুকুরটা ঠিক ওইখানটায় পায়খানা ফিরেছিল। হঠাৎ হেসে ফেললে নেবু। ঠিক তার মিনিট কয়েক পরেই এক জন হন-হন করে জুতো পায়ে দিয়ে চলে গেল পায়খানাটা মাড়িয়ে। খানিকটা চলে গেল বাবুটার জুতোর সঙ্গে—খানিকটা চেপটে বসে গেল ওইখানটায়। খা—খা, তাই খা মুখপোড়া—শয়তান—ওই ময়লাই খা। শয়তানকে সরিয়ে আনবার উপায় নাই। ওকে যদি এ সময় কেউ

ছোঁবে তো একেবারে চিলের মত চীৎকার ক'রে শুয়ে পড়বে।

—আরে! পথের ধুলোতে ছোলাগুলো ফেলে তাই কুড়িয়ে খাচ্ছে! এই নেবু—তোল না এটাকে।

নেবুদের প্রতিবেশী কানু। এ পাড়ার এ অঞ্চলের বিখ্যাত কানু। বেশ সেজে-গুজে বেরিয়ে যাচ্ছে কানু। নেবু কানুর কথার কোন জবাব না দিয়ে নির্ব্বিকার ভাবে উল্টে প্রশ্ন করলে—কি সেজে-গুজে বাবুর যাওয়া হচ্ছে কোথায়? উঃ! সাজ হয়েছে দেখি বাহারের! সায়েব সেজেছেন বাবু।

হাফ-সার্ট, হাপ-প্যাণ্ট, পায়ে গোড়ালীতে ষ্ট্র্যাপ বাঁধা 'স্বামি-স্ত্রী' স্যাণ্ডেল (অর্থাৎ নারী পুরুষ উভয়েরই ব্যবহার্য্য) পরেছে কানু।

—মেলা ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করিস নে। দেব এক ডাণ্ডা বসিয়ে মাথায়। কানু হাতের ডাণ্ডাটা দেখালে। লোহার ডাণ্ডা একটা।

অত্যন্ত চতুর মেয়ে নেবু। সে বুঝতে পেরেছে কানুর এই বেরিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য। সে ঘাড় নেড়ে বললে—হুঁ। অ কানুদা'র মা—। দেব বলে? এর পর অত্যন্ত মৃদু স্বরে সে বললে—চললে বুঝি লরী পোড়াতে? ঢেলা মারতে?

কানু গম্ভীর মৃদু স্বরে বললে—চেঁচাসনি। মা শুনতে পাবে।

—আমাকে সঙ্গে নেবে? আমি যাব?

—তুই যাবি?

—চল না সঙ্গে নিয়ে। তোমাদের চেয়ে আমি ভাল পারব।

কানুর তাতে সন্দেহ নাই। নেবুর উপর বিশ্বাস তার অনেক ছেলের উপরে বিশ্বাসের চেয়ে অনেক বেশী। অত্যন্ত খুশী হয়ে উঠল সে নেবুর উপর। কানু মোটের উপর অসৎ নয়, তবে তার সভ্যতার সংস্কার মধ্যে নেবুর সঙ্গে রহস্যালাপ করা গণ্ডীর বাইরে নয়; ঢেলা ছোঁড়াছুঁড়িও নয়; আজ সে তার গাল দু'টি টিপে দিয়ে বললে—আয়। চলে আয় তা' হলে।

—দাঁড়াও, কাপড়ের বদলে হাফ-প্যাণ্টটা পড়ে নি।

—আমি আসছি দাঁড়া। কানু হন হন ক'রে বাড়ীর দিকে ফিরল। ফিরে এল তার কাবলী জোড়াটা হাতে নিয়ে। নেবুদের দাওয়াটার উপর বসেই সে নিজে পরলে কাবলী জোড়াটা, নেবুর জন্যে রাখলে ওই স্বামি-স্ত্রী স্যাণ্ডেলটা। নেবুর পায়ে ঠিক হবে। হিলহিলে লম্বা নেবু সম্ভবত কানুর চেয়ে মাথায় আঙুল খানেক বড়। হাত-পা-ও বড় বড়। কানু মাথায় কিছু খাটো।

নেবু বেরিয়ে এল—হাফ-প্যাণ্ট হাফ-সার্ট পরে, মাথায় একখানা কাপড়ের পাগড়ী এঁটে; হাতের কাঁচের চুড়িগুলো পর্য্যন্ত খুলে ফেলেছে।

অবাক্ হয়ে গেল কানু।—ভারী চমৎকার মানিয়েছে রে তোকে।

—মানাবে না? নেবুর মুখখানা আশ্চর্য্য রকমের সুন্দর হয়ে উঠল এই মুহূর্ত্তটিতে।

কানু তার হাত ধরে বললে—বস।

নেবু বসতেই কানু তার পা টেনে নিয়ে জুতো পরাতে বসল। খিল-খিল করে হেসে উঠল নেবু।

ভাই দু'টো পথে খেলা করছে। নেবু একবার ভেবে নিলে। তার পর দু'টোকে দু'হাতে ধ'রে প্রায় ঝুলিয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে পুরে দিলে। কাগজের ঠোঙায় মুড়ি ছিল—মুড়ির ঠোঙাটা মেজের উপর ঢেলে দিয়ে বললে—খা।

কানু বললে—আহা, মাটিতে ঢেলে দিলি কেন? একটা কিছুতে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নেবু বললে—থামুন মশায়, আপনি কিছু জানেন না'। হাসতে লাগল সে। আরও একটা কি খুঁজছে নেবু।

কানু বললে—মিইয়ে যাবে, ধুলো লাগবে—

—হ্যাঁ! কিছুতে ক'রে দিলে—রাক্ষসেরা এখুনি সব খেয়ে ফেলবে। মাটিতে ঢেলে দিলাম তুলতে যাবে আর ছড়িয়ে পড়বে—কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাবে।

দেশালাইয়ের বাক্সটা খুঁজে বার করে সে উঁচু তাকের ওপর তুলে দিলে।

—আয়, আর দেরী করিস নে।

—যাচ্ছি। বঁটিটা তুলে দি। ওই ছোটটাকে বিশ্বাস নাই, ওটা সব পারে। রাগ হ'লে মেরে দেবে কোপ। ওটা বড় হলে খুব লড়াই করতে পারবে। তোমাদের চেয়ে অনেক ভাল।

ঘরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে নেবু বেরিয়ে এসে ঘরে শেকল দিয়ে বললে—থাক—কাঁদিস নে। আসছি আমি। চল।

লাফ দিয়ে সে নেমে পড়ল রাস্তায়।

—গলির মধ্যে দিয়ে চল কিন্তু।

লজ্জা পাচ্ছে নেবু। কানুর সঙ্গে এই বেশে সঙ্গে যেতে লজ্জা পাচ্ছে। আয়নাতে সে দেখে নিয়েছে মাথায় পাগড়ী পরে তাকে অবিকল শিখের বাচ্চাদের মত দেখাচ্ছে; বাসে সে শিখেদের ছেলে দেখেছে। খুব ভাল ক'রে দেখেছে। সেই দেখার ফলেই সে নিজের খোঁপাটা খুলে চুলগুলো পিছন দিক থেকে টেনে এনে সামনের দিকে চুড়োর মত বেঁধে তবে তার ওপর পাগড়ীটা বেঁধেছে। হাতের চুড়িগুলো খুলতেও ভুল হয় নাই তার। চিনতে কেউ পারবে না—নিজেই নিজেকে চিনতে তার কষ্ট হয়েছে, তবু লজ্জা পাচ্ছে।

হাতখানা ধরলে তার কানু—আয়।

—ছাড়, হাত ছাড়। হাত ছাড়িয়ে নিলে নেবু।

সঙ্কীর্ণ গলিটা থেকে সঙ্কীর্ণতর একটা গলি বেরিয়েছে। দু'ধারে বস্তী। তার মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে পথ। ডাইনে—বাঁয়ে—আবার বাঁয়ে—এবার সিধে, আবার বাঁয়ে। এবার সোজা দেখা যাচ্ছে বড় রাস্তা। আলো জলছে। আবার লজ্জা বোধ করছে নেবু।

—ধ্যেৎ—আমি যাব না।

কানু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠল। একটু আগেই তার দলবল অপেক্ষা করছে। সে বললে—যাবি না তো আমার দেরী করে দিলি কেন? ভাগ্। হাজার হলেও মেয়েছেলে তো! এ দিকে সিনেমার নামে—তখন ঠিক আছে। ভাগ—ভাগ—ভাগ।

কানু হন-হন করে এগিয়ে গেল।

এবার পিছন থেকে ছুটে এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নেবু এগিয়ে গেল—বললে—আয় না, আয় না রে! আয় না!

খিল খিল ক'রে সে হাসতে লাগল।

* * * *

নেশা লেগেছে নেবুর মনে। সে জন্মেছিল একখানা একতলা পাকা-ঘরে, তিন বছর বয়সে এসেছিল একটা টিনে ছাওয়া কোঠায়, পাঁচ বছর বয়স থেকে এই চৌদ্দ বছর পর্য্যন্ত সে বস্তীর খোলার ঘরে জীবনের আলো-বাতাস হাব-ভাব ধারা-ধরণ আয়ত্ত করেছে। তাদের বস্তীটা ভদ্র গৃহস্থের বস্তী। ওদের বস্তীর গায়ে চাকর ও ঝিয়েদের বস্তী। মজুরদের বস্তী। তার পর হ'ল দেহ-ব্যবসায়িনীদের বস্তী। সেই বস্তীর মেয়ে নেবু। ওই তিনটে পল্লীর বাতাসের সঙ্গে ওদের ছোঁয়াচ অল্প সল্প আছে ওর মধ্যে। আরও একটা পল্লীর ছোঁয়াচও আছে। ওই পল্লী দু'টোর বাতাসে নিশ্বাস নিতে নেবু অস্বস্তি বোধ করে—যেন ড্যাপসা অসুস্থ গন্ধ অনুভব করে—কিন্তু বাধ্য হয়ে নিতে হয়। অন্য পল্লীটার বাতাসে সে ইচ্ছে করে নিশ্বাস নিয়ে আসে। তাদের বস্তীর দক্ষিণ দিকে বাগবাজার ষ্ট্রীটের কাছাকাছি পাকা দালানের বসতি। ছেলেরা কলেজে যায়, মেয়েরা ঢাকাই শাড়ী—হিল-তোলা জুতো প'রে কপালে সিদুরের টোপা দিয়ে সিনেমায় যায়; জানালা দিয়ে দেখা যায় ঘরের মধ্যে সোফা কৌচ—চেয়ার টেবিল। বাতাসে সেণ্ট—সাবান—গন্ধ-তেলের সুবাস। করপোরেশনের সমালোচনা, ইলেকসনের মিটিং, ও-পাড়ার ছেলেদের ব্যায়াম সমিতির আখড়ায় তেরঙ্গা ঝাণ্ডা, সার্ব্বজনীন পুজো, মিটিং।

পিছনে ঝিয়েদের বস্তীতে—চাকর এবং ঝিয়ের ভালবাসা, ঝগড়া, মারামারি। সামনে কলেজে-পড়া ছেলে—ইস্কুলে-পড়া—কলেজে-পড়া মেয়ে চিঠি দেয় এ-ওকে। ওই তো বড় বাড়ীটার মেয়েটা কলেজে যায়—মোড়ে ট্রামষ্টপে দাঁড়িয়ে থাকে ওর এক জন ছেলে-বন্ধু। একতলা দালান বাড়ীটার দুই মেয়ের বড়জন চাকরী করে; ষ্ট্র্যাপ-দেওয়া ব্যাগটার ষ্ট্র্যাপ বাঁ কাঁধে ঝুলিয়ে চোখে গগল্‌স্ প'রে মসলা খেতে খেতে চাকরী করতে যায়, ফিরবার সময় রোজ ওর একজন পেণ্টালুন আর সার্ট-পরা বন্ধু তাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যায়; ছোট বোনটা যায় ডাক্তারী পড়তে, ষ্টেথিসকোপ হাতে বই বগলে যায় আসে। ওরও বন্ধু আসে সঙ্গে। বড় রাস্তায় দাঁড়ালে—হরদম চোখে পড়বে ছেলে আর মেয়ে—মেয়ে আর ছেলে—হাসতে-হাসতে চলেছে, কথা বলতে-বলতে চলেছে। তাদের বস্তীতেও এই হাল-চাল ঢুকেছে। ওই যে তাদের বস্তীর শেষ বাড়ীটার মোটা-সোটা কাল মেয়েটি—সেও রোজ বার হয়, ওদের বাড়ীর দু'খানা এদিকের বাড়ীর কালো কাঠির মত মেয়ে অনিলা সেও যায়; জুতো পায়ে দিয়ে—ফেরতা দিয়ে কাপড় প'রে ওরা যায় একটা সেলাই শেখার সমিতিতে। ওদেরও বন্ধু আছে। পথের মোড়ে আগে তারা দাঁড়িয়ে থাকত। এখন তো মোটা মেয়েটি—কি নাম ওর?—বিজলী—বিজলী ওর নাম,—বিজলীর বন্ধু তো এখন বাড়ী পর্য্যন্ত আসে। সে দিন নেবু ওদের দু'জনকে বাসে চেপে দক্ষিণেশ্বর যেতে দেখেছে। অনিলার বন্ধু এখন এই গলিটার মোড় পর্য্যন্ত আসে। তার মা-বাপের মধ্যে আলোচনা শুনেছে সে যে, এই ভাবেই এখন বিয়ে হচ্ছে অধিকাংশ ছেলে-মেয়ের। বিশেষ করে যে সব মেয়ের বাপের পয়সা নাই—তাদের বিয়ের এই ছাড়া আর উপায় নাই। আরও আছে। এই তো সে-বার—আগষ্ট আন্দোলনে—এ পাড়ার বড়-লোক, বড়লোকের ছেলে থেকে দোকানদার ওই যে মাখনের দোকান করে—সে পর্য্যন্ত জেলে গিয়েছিল, কমলাদি, নিরুদি, জয়ন্তীদি, সুনীতিদি এরাও জেলে গিয়েছিল। ওই যে বুড়ো ডাক্তার বাবুর মেয়ে ইলা সে এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল পুলিশে ধরবার আগেই। ওই এক জন বন্ধুর সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল বোম্বাই। সেইখানে তারা হাঙ্গামার মধ্যে ধরা পড়েছিল। এখন দু'জনে ছাড়া পেয়েছে, বোম্বাইয়েই আছে—দু'জনে বিয়ে করেছে—এই সব কাজই করে। যাও না সিনেমায়—সেখানে দেখবে—ছেলে আর মেয়ে হাত-ধরাধরি ক'রে চলা তো চলা—নাচছে। জানালার ধারে ঘরের মধ্যে মেয়ে—বাইরে রাস্তায় ছেলে দাঁড়িয়ে গান গাইছে—'চিঠি দিয়ো।' 'ভালো না লাগে তো দিয়ো না মন।' নেবুও ও গান গায়—ওই কানুর দলের সামনে দিয়ে আসবার সময় গুন-গুন করে গেয়ে চলে আসে।

আজ কলকাতার অবস্থা—শেকলে বাঁধা প্রহার-জর্জ্জরিত উন্মাদ পাগলের শেকল ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টায় দাঁড়িয়ে ওঠার মত অবস্থা। দাঁতে দাঁতে টিপে, বিস্ফারিত ঠোঁটের বিকৃতিতে বিকৃত মুখে দেহের সকল পেশী—সকল

স্নায়ু টান করে সর্ব্ব শক্তি প্রয়োগে সে শিকল ছিঁড়তে চাইছে। মাথার বিশৃঙ্খল ধুলো-মাখা ঝাঁকড়া চুল বাতাসে উড়ছে, রাঙা টকটকে চোখ দু'টো বড় বড় হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে চক্ষুকোটর হতে। তারই নেশা লেগেছে নেবুর মনে।

উনিশ শো ছেচল্লিশ সালের কলকাতার মেয়ে নেবু। কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের প্রান্তসীমায় পা দিয়েছে। পৃথিবীর সকল আওতা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের মনের খুসীতে চলবার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে পাখা গজানো পাখীর ছানার মত। কানু বা কানুর দলের কোন এক জনকে বন্ধু হিসেবে নিয়ে সে অন্য সকলের মত চলতে চায়। কিছু দিন থেকেই এ সাধ উঁকি-ঝুঁকি মারছে তার মনে।

উনিশ শো ছেচল্লিশ সালের কলকাতার মেয়ে নেবু। আগষ্ট আন্দোলন সে দেখেছে, সে জানে আগষ্ট আন্দোলন। 'ভারত ছাড়ো' জানে সে—"করেঙ্গে ইয়া মারেঙ্গে" তাও জানে সে; যুগান্তরের দরজায় তার ছবি সে দেখেছে। সে মহাত্মা গান্ধীকে জানে—মৌলানা আজাদ—পণ্ডিতজীকে জানে। আজাদ হিন্দ ফৌজ—নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে জানে। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীর নাম জানে। 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' গানটা সে মুখস্থ করে ফেলেছে—সুর শিখেছে। বিশ্ব-যুদ্ধের আতঙ্ক—কষ্ট—দুর্ভোগ সে ভোগ করেছে। সাইরেণ—কণ্ট্রোল—ব্ল্যাক আউট—লরীর তলায় মানুষের অপঘাত—পথের উপর না খেয়ে মানুষের মৃত্যু—সমস্ত কিছুর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তার মনের ধাতুকে দু'পিঠে হাতুড়ির মত ঘা মেরে মেরে এমন বেদনার্ত্ত স্পর্শাতুর করে রেখেছে যে, এতটুকু উত্তেজনার ছোঁয়ায়—চরমতম অধীরতায় চঞ্চল হয়ে ওঠে; মা-বাপের অনুপস্থিতির সুযোগে সে আজ যা করলে ঠিক তাই ছাড়া আর কিছু করতে পারত না। এ নেশা লাগা অনিবার্য্য নেবুর পক্ষে। শীতের শেষ—বসন্তের প্রারম্ভ—ঝড়ো হাওয়া ওঠে—পাকা পাতা ঝরে স্বাভাবিক নিয়মে। ঝোড়ো হাওয়ার বদলে এসেছে অকালের ঝড়। পাতা ঝ'রে উড়ে নেচে-নেচে চলেছে আকাশে।

আঃ—কমলাদি, নিরুদি, জয়ন্তীদি, সুনীতিদিদের সঙ্গে একবার দেখা হয় না! নেবু চলছে আগে আগে। ছেলের দল তার পিছনে। তাদের বুকে রক্ত দোলা দিচ্ছে প্রবলতর আন্দোলনে। আজকের নেশাকে দ্বিগুণিত করে তুলেছে নেবু।

*　　*　　*　　*

বোসপাড়ার ভেতর দিয়ে সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু। অন্ধকারে গলির মুখে মানুষের জটলা শুধু। আর কিছু নাই। একটা পানের দোকানের সামনে জটলাটা বেশী। ঝুঁকে গিয়ে পড়ল নেবু। জটলার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে এক জন কটাসে রংয়ের লোক আস্ফালন করছে।

—ঢেলার সঙ্গে গুলীর লড়াই। থুঃ—থুঃ—থুঃ! মাটির উপর থুথু ফেললে সে। এর পর হঠাৎ চোখ দু'টো তার জ্বলে উঠল; বেড়ালের চোখের মত কটা চোখ—সে চোখ জ্ব'লে উঠায় অদ্ভুত একটা ছটা বেরিয়ে আসে—অত্যন্ত ভয় লাগে দেখে; শুধু তাই নয়—ছোঁয়াচ লাগে সকল মানুষের চোখে। সে বলে উঠল—মরদের বাচ্চা হয়, সাহস থাকে তো দাও বাবা আমাদের হাতে রাইফেল রিভলভার—তার পর হোক সামনা-সামনি লড়াই। ধর্ম্মযুদ্ধ হোক।"

হঠাৎ সে হা-হা ক'রে হেসে উঠল, বললে—"খালি হাতে যারা লড়াই করছে তাদের হারাবার জন্যে ট্যাঙ্ক এনেছে—শ্যামবাজারের মোড়ে প্রকাণ্ড একটা ট্যাঙ্ক।" হা-হা করে সে হাসতেই লাগল।

—কি নাম মশাই আপনার? জটলার পিছন দিক্ থেকে এক জন প্রশ্ন করলে গম্ভীর ভাবে।

—নাম? ঘুরে তাকালে সে।

জটলাটা থম-থম করতে লাগল। হাসি বন্ধ হয়ে গেল, চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল চকিত আতঙ্ক—তার পর ঘৃণা—তার পর ঔদ্ধত্য।

প্রশ্নকারী বললে—হ্যাঁ, নামটা বলুন না আপনার?

এগিয়ে গেল বক্তা। জটলার মধ্য থেকে কয়েক জন সরে গেল। কয়েক জন চোখে চোখে ইসারা করে লোকটার পিছনের দিকে যাবার আয়োজন করলে।

—নিন নাম!

—বলুন। বলে লোকটা হা-হা করে হেসে উঠল। কটা লোকটাও হা-হা করে হেসে উঠল। ওরে শালা!

রসিকতা। লোকটা গোয়েন্দাগিরির অভিনয় করছিল রসিকতার কৌতুকে।

—কি খবর?

লোকটি বললে—খবর জগুবাজারে, হাজরায়, মাণিকতলায়, রাজা বাজারে। খবর কাঁকনাড়ায়, গুলী চলেছে, ষ্টেশন পুড়িয়ে দিয়েছে। ট্রেণ পুড়িয়ে দিয়েছে। বিলকুল ট্রেণ বন্ধ। লাইনের উপর লোক শুয়ে আছে—গাছ কেটে ফেলেছে। হা-হা হাসতে লাগল সে।

সতর্ক হয়ে উঠল নেবু। তার সামনের লোকটা পিছন ফিরে তাকে দেখতে চেষ্টা করছে। বুঝতে পেরেছে নেবু তার বিস্ময়ের কারণ। ভিড়ের চাপে—তার বুকের স্পর্শ লেগেছে লোকটার পিঠে। মুহূর্ত্তে নেবু ভিড় থেকে গুঁড়ি মেরে—মাথা দিয়ে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে পড়ল। কানুর জামাটা ধরে টান দিলে। সামনে বাঁকের মাথায় একটা পার্ক—এ পাশে পেট্রোল পাম্প; পার্কের ভিতরটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার—সেই অন্ধকারের আশ্রয় নিলে নেবু। পার্ক পেরিয়ে—সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু পার হয়ে গলিপথ। ঢুকে পড়ল গলিটায়।

মাণিকতলা জানে নেবু। বায়স্কোপ আছে একটা। সেখানে ছবি দেখে এসেছে।

দলটা এর মধ্যে ভেঙে গিয়েছে। তিন জন নাই। কোথায় খসে পড়েছে। পড়ুক। কানু আছে সঙ্গে। মাণিকতলার মোড়ে এসে নেবু-কানুর দল উৎফুল্ল হয়ে উঠল। জনতা জমে আছে। রাস্তায় ব্যারিকেড। তাদের বয়সী ছেলে অনেক। তারাই যেন সংখ্যায় বেশী। লুঙ্গি পাজামা—পাজামা লুঙ্গী। নেবু বললে—সব মুসলমান!

—হ্যাঁ।

এক জন ঘুরে তাকালে নেবুর দিকে। বললে—কালসে হিন্দু-মুসলমান এক হো গিয়া পাঁইজী। লালবাজারমে এক হো গিয়া। হিন্দু-মুসলিম—জিন্দাবাদ!

জোরালো শীষে সিটি বেজে উঠল উত্তর দিক্ থেকে। চঞ্চল হয়ে উঠল জনতা। গলির মুখে ভাঙাচোরা লোহার আড়তগুলোর মধ্যে লুকিয়ে গেল সব। যে লোকটি নেবুকে কথা বলেছিল—সে বললে—আ যাও পাঁইজী। আতা হ্যায় উ লোক।

জোরালো আলো তীব্রগতিতে এগিয়ে আসছে। লরী আসছে। নেবু ব্যস্ত হল ঢেলা সংগ্রহের জন্য।

—চলে আও। চলে আও। আ গেয়া—আ গেয়া!

একটা গলির মুখ। রাস্তার গ্যাস-লাইটটা নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্ধকার থমথমে হয়ে উঠেছে সঙ্কীর্ণতার আশ্রয়ে।

—বইঠ যাও—বইঠ যাও। আরে বসে পড় না।

লরী এসে থামল। থামল ঠিক নেবু-কানুরা যে গলিটায় আশ্রয় নিয়েছিল—তারই সামনে। ঢেলা হাতে নেবু উঠে দাঁড়াচ্ছিল, এক জন হাত চেপে ধরলে।—হুঁ। ও'দিকে লরীটার পিছন দিক্ হতে ঝাঁকে ঝাঁকে ঢেলা এসে পড়ছে। আ—। দু'জন মাথায় হাত দিয়েছে। পিছন দিকে ফিরল ওরা—বন্দুকের মুখ ঘুরল। জন দুয়েক লাফিয়ে পড়ে ব্যারিকেড সরাতে লাগল। পিছনের দিকে টর্চ ফেলে খুঁজছে, ঝাঁটার মত ক্রম-প্রসারিত আলোর সীমানার বাইরে—আলো-আঁধারির মধ্যে ছায়া-মূর্ত্তির মত দ্রুত সরে যাচ্ছে—বাচ্চার দল বেশী। বন্দুক উদ্যত করেছে ওরা। সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিক্ থেকে এল ঢেলার ঝাঁক।

বন্দুকের শব্দ হল।

—লাগাও—আর লাগাও।

উঠে পড়ল নেবু। ছুঁড়লে ঢেলা। একটা দু'টো তিনটে।

ওদিকে ব্যারিকেড সরে গেছে। একটা লোক ঢেলা খেয়ে জখম হয়েছে। তাকে টেনে তুলে নিলে লরীর উপর। লরী পূর্ণবেগে ছুটল। পিছনে ছুটে বার হল মানুষের দল—বুনো কুকুরের দলের মত। বাঘের সঙ্গে লড়াই দেয় বুনো কুকুরের দল। তাকে চারি পাশে আক্রমণ করতে করতে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে। চীৎকার করে আক্রোশে, পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আচড়ায় কামড়ায়। আক্রান্ত ক্রুদ্ধ শক্তিমত্ত বাঘ গর্জ্জন করে—মধ্যে মধ্যে হাঁকড়ায় তার থাবা—ডাইনে বাঁয়ে—যেটাকে লাগে সে থাবা—সেটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়ে, কখন বিদ্যুৎগতিতে পিছন ফিরে অগ্রগামীটার উপর লাফিয়ে প'ড়ে টুকরো টুকরো ক'রে দেয়; কিন্তু তবু সে থামতে পারে না—ছুটতে হয় তাকে; সমষ্টির শক্তির পরিচয় সে জানে; -সে ছুটে চলে। পাগল বুনো কুকুরের দল আহতদের পিছনে ফেলে বাঘের সঙ্গে সঙ্গে ছোটে। আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘের উপর।

এও প্রায় তাই। উন্মত্ত ক্ষোভে মানুষ হয়ে উঠেছে যেন বুনো কুকুরের দল। তাদের বনে এসেছে বাঘ; আহারের অভাব ঘটে গেছে তাদের, ভয়ে সঙ্কোচে অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রে ক'রে অধীর হয়ে উঠেছে তারা, তার উপর প্রকৃতি হয়েছে নির্ম্মম—শীতার্ত্ত বনভূমি; সহের সীমা অতিক্রম করেছে তাদের—তারা বেরিয়ে পড়েছে। ছুটছে—সাক্ষাৎ মৃত্যুর বসতি যে থাবায়—দাঁতে—সেই থাবার পাশে পাশে ছুটছে।

গুলী ছুটে এল এক ঝাঁক, ধাবমান লরী থেকে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল লোকেরা। লরী দূরে চলে গেছে, পিছনে দেখা যাচ্ছে—লাল দু'টো আলো।

এবার রাস্তার উপর ছোট-ছোট জনতা। এখানে ওখানে সেখানে। আহত হয়েছে যারা—তারা পড়েছে। তাদেরই ঘিরে দাঁড়িয়েছে সব। আরও একখানা লরী আসছে পিছনে। এ্যাম্বুল্যান্স আসছে—ডাক্তারদের গাড়ী—মিটিয়া কলেজে নিয়ে যাবে। তার আগেই ওরা তুলে নিয়ে যাচ্ছে বস্তীর মধ্যে। মিটিয়া কলেজ সম্বন্ধে ওদের অনেক আতঙ্ক, সেখানে ছুরি চালায়, মরা লাশ ফালি ফালি ক'রে চিরে ফেলে। তার পর তদন্ত। সে তদন্তে এই বস্তীতে ওর বাড়ী জানাজানির সঙ্গে সঙ্গে বস্তী ঘিরে লাল-পাগড়ী। খানাতল্লাস!

উঠাও। উঠাও। জলদি!

কানু কই? কানু! কানু! বিমল! হেমন্ত! নরেন! কই?

রাস্তার আলো কুয়াসায় ঢেকে যাচ্ছে, কুয়াসাটা কালো হয়ে আসছে। নেবু টলছে। সুখের তারা দুঃখের মেঘে ভরা গ্রীষ্মের আকাশের মত নেবুর মন—কালো কুয়াসায় হারিয়ে গেল; কলকাতার আলো—হাঙ্গামায় জমায়েৎ এত মানুষ—সব ঢেকে মিলিয়ে গেল। কিছুই মনে হচ্ছে না, কাউকে মনে পড়ছে না; শুধু একটা তীব্র যন্ত্রণা। তাও মিলিয়ে যাচ্ছে। নেবু পড়ে গেল রাস্তার উপর।

* * * *

—নেবু! নেবু! নেবু! ওরে—নেবু!

—নেবু খা লিয়া। কামলা নেবু! হা-হা ক'রে হেসে উঠল কতকগুলি লোক। আহতদের রেখে আবার তারা ফিরে এসেছে। অবশ্য এখন তারা সংখ্যায় অনেক কম। কানু নেবুকে খুঁজছে। বিমল—হেমন্ত—নরেন এরা সব কোথায় কে গেল? সব ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে। তাদের জন্য কানু ভাবছে না। সে খুঁজছে নেবুকে। গলির মোড়ে মোড়ে জনতার মধ্যে সে খুঁজছিল মাথায় পাগড়ী। গলির মধ্যে সে ঢুকে পড়ল।

—এ ভাই, এক জন—মাথায় পাগড়ী—শিখের ছেলে দেখেছ?

—হ্যাঁ। এক জন তো দেখেছিলাম। সে তো—গুলী আগে। পরে তো দেখি না।

—নেবু!

কোথায় নেবু? বস্তীর মধ্যে আহতদের কাতরাণি, চাপা কান্না, ক্রুদ্ধ উন্মত্ত কণ্ঠের চাপা শাসন। ঘুরতে ঘুরতে বেরিয়ে এসে বড় রাস্তায় পড়ল কানু! স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল!

—নেবু!

দূরে একটা জনতা জমেছে। রেডিয়োতে খবর বলছে। কথাগুলো এসে কানে অস্পষ্ট ভাবে বাজছে। ওখানে নেই তো। এগিয়ে গেল কানু!

"বাঙলা গভর্ণমেণ্ট কলকাতার অধিবাসীদের সাবধান করে এক ইস্তাহার জারী করেছেন। তার মর্ম্ম হচ্ছে যে, যে কেউ রাস্তা অবরোধ করবে বা রাস্তায় চলাচল বা ব্যবহারে বাধা জন্মাবে, পুলিশ বা সামরিক বাহিনী তাদের গুলী করতে পারবে। শহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত জনসভা বা শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করেছেন।"

গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে দৃঢ় ভাবে বলা হয়েছে এই ইস্তাহারে যে, প্রত্যেক শান্তিকামী নাগরিকের জীবন রক্ষা করতে হবে এবং বিনা বাধায় স্বাধীন ভাবে যাতে তাঁরা আইনসম্মত কাজকর্ম্ম করতে পারেন—তার ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য—সে কর্ত্তব্য তাঁরা অবশ্যই পালন করবেন।"

—আতা হ্যায়! আতা হ্যায়!

আবার মোটরের আলো এসে পড়েছে—আসছে। ব্যারিকেড ঠিক করো।

গাড়ীটার উপরে জোর আলো জ্বলছে। মাথার উপরে পাশাপাশি বাঁধা দু'টো ঝাণ্ডা। তেরঙ্গা আর সবুজ। কংগ্রেস-লীগ ঝাণ্ডা। গাড়ীখানা এসে দাঁড়াল।

"নেতৃবৃন্দের বিশেষ অনুরোধ, কংগ্রেস এবং লীগ—দুই প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের অনুরোধ—এই ধরণের উন্মত্ততায় আপনারা অকারণ শক্তিক্ষয় করবেন না। বৃহত্তর সংগ্রাম আমাদের সম্মুখে—।"

কানু আর দাঁড়াল না। নেবু! কোথায় গেল নেবু? নেবু! নেবু!

হঠাৎ মনে হ'ল এ্যাম্বুল্যান্সখানা এখান থেকে উত্তর মুখে ফিরে গিয়েছে। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ!

শেষ রাত্রির কলকাতা। তিনটে বাজছে। কানুর ক্লান্ত পায়ের কাবলীর আওয়াজ উঠছে পিচের রাস্তার উপর। শীতের রাত্রেও ঘেমে উঠেছে কানু; বুকের ভিতর অসহনীয় উদ্বেগ—চোখ জ্বলছে—কেঁদেছে সে প্রচুর কেঁদেছে—নেবুর জন্য। কারমাইকেল—মেডিকেল কলেজ – ক্যাম্পবেল—সমস্ত জায়গা ঘুরেছে সে। সঠিক খবর পায়নি—আহতদের দেখতে পায়নি রাত্রে—কিন্তু তার মধ্যে কিশোরী কুমারী কেউ নাই। মৃতদের দেখেছে সে। দেখে ভয় হয়নি তার। কিন্তু উদ্বেগ আক্ষেপ বেড়েছে। নেবু কোথায় গেল তবে? মহানগরীর রাজপথের শেষ রাত্রের জনহীন রূপ—সে রূপ ভয়ঙ্কর। যে প্রাণ-সমুদ্র এই বিরাট্ ইট-কাঠ-পাথরের প্রাণহীন কঠিন রূপকে ঢেকে রাখে—সে প্রাণ-সমুদ্র রাত্রের অন্ধকারে সুপ্তির মধ্যে অদৃশ্য। জড় রাজত্ব আপনাকে প্রকট করে তুলেছে এখন। মরা পাহাড়ের বুকে একক যাত্রীর মত চলতে চলতে কানু কেঁদেছে। অজস্র কেঁদেছে।

নেবু! নেবু!

থমকে দাঁড়াল কানু।

নেবুদের বাড়ীর দাওয়ায় বসে শান্তি, আর গোপেন।

—কে?

—আমি।

—কে? আমিটা কে?

—আমি কানু!

—কানু? নেবু—

—এ্যা ও—। হঠাৎ গর্জ্জন করে উঠল গোপেন। শান্তি স্তব্ধ হয়ে গেল।

কানু এবার সাহস ক'রে ঢুকল গলির মধ্যে। থমকে একবার দাঁড়াল—ঘরে আলো জ্বলছে। দেবা—ট্যাবা—হাবা—সবু—চার জনে শুয়ে রয়েছে। নেবু নাই। এতক্ষণে চোখে পড়ল—গোপেনের পায়ে ব্যাণ্ডেজ। কিন্তু প্রশ্ন করবার মত কণ্ঠস্বর বা'র হচ্ছে না। কান্নার আবেগে বন্ধ হয়ে গেছে। কথা বলতে গেলে কান্নার ঢেউ এসে আছড়ে পড়বে। নেবু! নেবু!

উঃ! ঝাঁকি দিয়ে মাথাটায় নাড়া দিয়ে—কানু দ্রুত চলে গেল নিজেদের বাড়ীর দিকে। দরজায় হাত দিয়ে দাঁড়াল। ডাকবার মত কণ্ঠস্বরও তার নাই। নেবুর জন্য কান্নায় সকল স্বর তার ভরে আছে। সে এক মুহূর্ত্ত ভেবে নিয়ে, দরজার গোড়াতেই এক টুকরো বাঁধানো রোয়াক,—তারই উপর শুয়ে পড়ল। [ক্রমশঃ।

রামগাথা

গোলোক ছাড়িয়া কে বা
ভূলোকে করিতে সেবা
মানুষের ঘরে আসি হ'ল অবতীর্ণ।
কার শ্যামরূপে ধরা
হ'ল হেন মনোহরা
কোমল দুর্ব্বাদল শ্যামশ্রীকীর্ণ॥

ভাই কার প্রিয়তম ?
সাথে ফিরে ছায়াসম
সুখে দুখে রণে বনে আপনারে ভুলিয়া।
বিমাতা-তনয় কার
না ল'য়ে রাজ্যভার
যুগল পাদুকা তার শিরে লয় তুলিয়া॥

বালক বয়সী কে সে
ঋষিসনে বনে এসে
নবনীত-কমকরে ধরি ধনু দুর্জ্জয়।
নির্ভয়ে দুর্গমে
দুষ্টে দমিয়া ক্রমে,
নাশি' যত রাক্ষসে হরে আশ্রম-ভয়॥
পরশি চরণপুটে
কাঠ সোনা হ'য়ে উঠে
পাষাণে পরাণ ফুটে ছুঁয়ে কার অঙ্গ।
হেলা ভরে দিয়ে টান
ভাঙি শিব-ধনুখান
কে লভিল ধরণীর বুকচেরা ধন গো॥
শত ক্ষত্রঘ্ন
ভীম জামদগ্ন্য
কার সনে বিনা রণে মাগি নিল পরাজয়।
পিতৃসত্য তরে
পুত্র কে অকাতরে
ত্যজিয়া সিংহাসন বনবাস বরি লয়॥

কোন দ্বিজ মিতা বোলে
চণ্ডালে নিল কোলে
বনবাস-দুখেও কে সুখনীড় বাঁধে গো।
প্রাণের প্রতিমা কার
ছলে হরে দুরাচার
কার দুখে পশু-পাখী তরুলতা কাঁদে গো॥
তোমার আমার মত
কে দেবতা কাঁদে অত,
বনের বানর আসি করে কারে শান্ত।





শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

বসিয়া সিংহাসনে
প্রজারে কে প্রভু গণে
গণমন সেবাপথে প্রাণধনে কে হারায়।
জাগাতে স্মৃতির চিতা
কে গড়ে সোনার সীতা
সসৈন্যে রণে হারি নিজসুতে কে বাড়ায়॥
গাহে গান আদি-কবি
রবিকুলে কেবা রবি
কে করে জগৎ আলো আপনারে দহিয়া।

বালীরে বধিয়া ছলে
কোন্ দেব নরে বলে
তোমাদেরি মত ভাই আমিও যে ভ্রান্ত॥
দুষ্ট দমন পণে
কে নামে অসম রণে
সাগরে জাঙাল বাঁধি তরে কার শৌর্য্য।

রাবণ ত্রিলোকজয়ী
কার ডরে কাঁপে ওই,
কার আশে কারাবাসে ধরে সতী ধৈর্য্য।
লাখো ছেলে দুর্ব্বার
সওয়া লাখ নাতি আর
অসহ সে পাপভার বসুধার কে হরে।
দুষ্কৃত দশাননে
নাশি সম্মুখ রণে
বন্দিনী-বন্ধন বিমোচন কে করে॥
বুঝাইতে প্রেম কি তা
অনলে কে দিল সীতা,
দহিল না দেহ তাঁর কার স্নেহ লেপনে।
দীর্ঘ দুঃখ পরে
রাজ্য লইয়া করে
আপনার সুখ কে বা স্মরেও না স্বপনে॥

পরে দিতে সব সুখ
কে সহিল সব দুখ
ফুরায় না কার কথা শতমুখে কহিয়া॥
গাও বীণা গাও তাই।
রামনাম মহিমাই॥



রবীন্দ্র জন্মতিথি উৎসব

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উপলক্ষে সারা দেশে উৎসব চলেছে। কোলকাতা সহরে রবীন্দ্র সপ্তাহ খোলা হয়েছে, এবং ছয়টি অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। এখনও সপ্তাহ শেষ হতে তিন দিন বাকী, অতএব আরো দু'-একটি সভায় বোধ হয় যোগ দিতে হবে। কিন্তু ইচ্ছে নেই। অনিচ্ছার কারণ অনেকগুলি।

ব্যক্তিগত বাধা, যেমন যাতায়াতের অসুবিধা, বসবার কাষ্ঠাসন, ভিড়, এবং জাতীয় সঙ্গীত শোনবার সময় পাঁচ দশ মিনিট খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা, সভার মধ্যে সিগারেট খাবার ইচ্ছা থাকলেও সঙ্কোচ বোধ, এ-সব না হয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু যেগুলি ছাড়া যায় না তাদের তালিকাও কম নয়। আমার বিশ্বাস, যে-সব দুর্লঙ্ঘনীয় বাধাগুলির উল্লেখ করব সেগুলি জনসাধারণের। আর যদি তা না হয় তবে এই রচনাটি স্বদেশ-প্রত্যাগত এক জন মধ্যবয়স্ক প্রবাসী বাঙালীর নতুন বাঙলার প্রতিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারার নিদর্শন হিসাবে গণ্য হোক। সুস্পষ্টতার জন্য বক্তব্য দফা দিয়ে সাজাচ্ছি।

(১) রবীন্দ্র জন্মতিথি উৎসবে অ-বাঙালীর কোনো উৎসাহ নেই। সন্দেহ হয় কর্তৃপক্ষরা তাঁদের উৎসাহ জাগ্রত করবার চেষ্টা করেন নি, কিংবা করতে জানেন না। কারণটিকে হেসে উড়িয়ে দিলে চলবে না। ব্যাপারটা এই : বাঙালী ভাবে যে রবীন্দ্রনাথ বাঙলার! সেটা অবশ্য সত্য। নিতান্ত প্রাথমিক ভাবে রবীন্দ্রনাথ বাঙালী ; তিনি বাঙলায় লিখেছেন, বাঙলার বিশেষত্বে ও ভবিষ্যতে তিনি বিশ্বাস করেছেন, বাংলার নদী, মাঠ, দৃশ্য তিনি ভালবেসেছেন, এমন কি বাঙালী মেয়েদের রূপগুণ সম্বন্ধে তাঁর একটু পক্ষপাতিত্ব ছিল। রবীন্দ্রনাথের এই প্রকার কাজে ও মতে অ-বাঙালীদের আপত্তি নেই। কেবল তাঁদের আপত্তি বাঙালীর দাবীতে যে রবীন্দ্রনাথ কেবল বাঙলার। বাঙালীরা অবশ্য মুখে তা বলেন না, কিন্তু ব্যবহারে প্রকাশ করেন। অথচ, প্রত্যেক বাঙালী রবীন্দ্রনাথকে সমগ্র ভারতের ঐক্য-সাধনার এক জন প্রধান সাধক ভাবেন। অ-বাঙালীরা ভাবেন, যদিও মুখে বলেন না, 'তাই যদি হয় তবে রবীন্দ্রনাথকে অতটা প্রাদেশিক করে দেখা অনুচিত, তাঁর মধ্যে ভারতীয় অংশটা দেখান, তাঁর সভায় অ-বাঙালীকে সভাপতি করা, তাঁর স্মৃতিসভামঞ্চে অ-বাঙালীকে বসানই শোভন। অ-বাঙালী আরো ভাবেন, 'বিশ্বকবি' আখ্যাটা ছেড়ে দেওয়াই ভালো, কারণ এই ক্ষণে বিশ্ববোধের বদলে দেশাত্মবোধটাই সকলের মনকে অধিকার করেছে। এবং দেশাত্মবোধ তাঁর নেহাৎ কম ছিল না। সে-বোধ হয়ত তাঁর ভিন্ন রকমের ছিল। বেশত, কতটা ভিন্ন, কতটা উৎকৃষ্ট তাই বুঝিয়ে দিন।' বলা বাহুল্য, মুসলমানদের উৎসাহ জাগাতে হলে তাঁর দেশাত্মবোধের ওপর জোর দিলে চলবে না। তাঁদের রবীন্দ্রপ্রীতি অন্য কারণে। সে যাই হোক, তাঁরাও রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করেন। এখন আমার বক্তব্য এই : বাঙালী অ-বাঙালী উভয়েই ভাবছে রবীন্দ্রনাথ ভারতের, কিন্তু বাঙালীরা কাজে দেখাচ্ছে যে তিনি একা বাঙলার। প্রক্রিয়াটি স্বাভাবিক। যত দিন নেতাজী না ফিরছেন তত দিন বাঙালীর প্রাণ খালি, তার মানের ঘর শূন্য থাকবে। কিন্তু শূন্যতা পূরণের জন্যই কি রবীন্দ্র-জন্মতিথির উৎসব চলছে ?

(২) আমার অন্য সন্দেহ আরো মারাত্মক। আমি অন্ততঃ চারটে বক্তৃতা শুনেছি যাতে রবীন্দ্রনাথকে কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু যে-ব্যক্তি চিরজীবন না হয় অন্ততঃ শেষ ত্রিশ চল্লিশ বৎসর দল ছাড়া হয়ে কাটালেন, যিনি দলাদলিতে দেশের সর্ব্বনাশ হয়েছে বলে গেলেন, যিনি ব্যক্তি বিশেষকে পূজা করা মনুষ্যত্ববিকাশের অন্তরায় ভাবতেন, এবং যাঁর স্থান দলের উপরে বলেই বিশ্বের ও চিরকালের, সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার বেলা তাঁকে বক্তার দলে টেনে আনার মধ্যে একটা ক্ষুদ্রতা ধরা পড়ে। এ-প্রক্রিয়াটাও স্বাভাবিক, কারণ সব কাজ ছেড়ে আমরা এখন দলই গড়ছি। তবু উপলক্ষটার দাবী থেকে যায়। রাজনৈতিক সভায় যেটা চলে সেটা জন্মতিথিতে অচল। রবীন্দ্রনাথ ষ্ট্যালিনকে, জহরলাল, গান্ধীজী, সুভাষকে শ্রদ্ধা করতেন কে না জানে! কিন্তু সেই সঙ্গে সকলেরই জানা উচিত যে তিনি কারুর পায়ে নিজকে কি দেশকে অর্ঘ্য দিতে চাইতেন না। রবীন্দ্র-নাথের কবিত্ব সম্বন্ধে কাল কি রায় দেবে জানি না, কিন্তু তিনি মানুষের আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ ছিলেন তাঁর স্বপক্ষে এ ডিক্রী দিতে কালের কলম কখনও কাঁপবে না। দই-সন্দেশের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের নাম দেখে এক কালে দুঃখ হত, কিন্তু এ-দুঃখ তার চেয়ে বেশী। দই-সন্দেশে দেহ পুষ্ট হয়, দলাদলিতে মন হয় অসুস্থ।

(৩) শ্রদ্ধার অর্থ কি ? প্রথমতঃ সেটা ভক্তি নয়। তাঁর রচনাবলী যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হয়েছে তখন নিশ্চয়ই তিনি নামজাদা সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর গান যখন রেডিওতে গাওয়া হয় তখন নিশ্চয়ই তিনি গান লিখতে জানতেন। তাঁর স্মৃতি-সভায় যখন ভিড় জমে, তাঁর সম্বন্ধে গান্ধীজী জওহরলাল থেকে বহু ইংরেজের ধারণা যখন উঁচু, তখন নিশ্চয়ই তাঁকে অবহেলা করা যায় না। অতএব ভক্তিভরে তিনি অমুক তিনি তমুক ছিলেন বলার মধ্যে মানুষের পুনরাবৃত্তির ও কালক্ষেপের প্রবৃত্তি ছাড়া আর কি জাহির হয় বুঝি না। পুনরাবৃত্তিরও প্রয়োজন আছে স্বীকার করি, উত্তেজনা বৃদ্ধির জন্য ; সময় কাটাবার দরকার আছে মানি, সদ্ব্যবহার থেকে অব্যাহতির জন্য ; কিন্তু দশ হাজার লোকের সামনে তাঁর উদ্দেশে হৃদয় বিগলিত করা একরকম মানসিক রোগ। শ্রদ্ধা সুস্থ মনের কাজ, পবিত্র মনের ব্যবহার। শ্রদ্ধা অর্থে বিনয়। বিষয়-বস্তুকে যখন নিজের সম্পত্তি ভাবা যায় তখন ওঠে ভক্তি, আর যখন তাকে ব্যক্তিসম্পর্ক রহিত হিসেবে দেখা হয় তখনই জন্মায় শ্রদ্ধার সূচনা। আত্মনিরপেক্ষ ভাবে দেখতে গেলে বহু সাধনার প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক ও আর্টিষ্ট সশ্রদ্ধভাবে বিষয়বস্তুর সাধনা করেন। বৈজ্ঞানিক যখন পরমাণু কি জীবাণুর রূপ দেখেন তখন তিনি হৃদয়াবেগ সংযত করেন; চিত্রকর ও কবি সুন্দরী স্ত্রী দেখে কিংবা কল্পনা করে পাগল হন না। তাঁরা গঠনকে, কল্পিত রূপকে পৃথক ভাবে জানতে চান প্রথমে, এবং জানবার পর গঠন ও রূপের নিয়মানুসারে তাদের ব্যক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথের

কীর্ত্তির কি রূপ, কি গঠন, কি নিয়ম ছিল জানাটাই শ্রদ্ধা, এবং সেই জ্ঞানের প্রকাশই জন্মতিথি উপলক্ষে সভাসমিতির উপযোগী বক্তৃতা।

(৪) উপযোগী শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উপায় আছে, এবং সে-ব্যবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষরা করেছিলেন। মুক্তধারার অভিনয় দেখলাম। রবীন্দ্রনাট্য শান্তিনিকেতন ছাড়া অন্যত্র অভিনীত হতে দেখলেই মনে হয় বাড়িতে বসে পড়লে বেশী মজা পেতাম। এটা রবীন্দ্রনাট্যের দোষ নয়, কারণ সেক্সপীয়রের নাটক সম্বন্ধেও অনেকে এই ধরণের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাট্যে নাটকত্ব অবশ্য আছে; এবং সেটা রঙ্গমঞ্চে ফোটানও যায়। তবে সেটা ভাবাশ্রয়ী ব'লে, অর্থাৎ নাটকের স্থায়িভাবের সূক্ষ্মতার দরুণ, ও তার প্রকাশে নিতান্ত সুচারু স্পর্শালুতার প্রয়োজন থাকার জন্যই, অভিনয় সাধারণত অসার্থক হয়। যদি চরিত্রের সংঘাত বেশী থাকত তবে ব্যাপারটা সহজ হত। এ-ক্ষেত্রে অভিনেতারা কবিতার যোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। তবু অভিনয়টি জমেনি, বোধ হয় রিহার্সেলের অভাবে। মোটামুটি, নাটকত্ব অটুটই ছিল। দৃশ্যপট, সাজসজ্জা ও অভিনেতাদের মধ্যে পার্ট সামান্য অদল বদল করলে পরের অভিনয় নিশ্চয়ই আরো জমবে। অবশ্য দর্শকবৃন্দ সাহায্য না করলে কিছুই হবে না। বাঙ্গালী স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে নাট্যগৃহে অভদ্রতা করবার সহজাত প্রবৃত্তি কবে কমবে জানি না। তাঁরা হয়ত বলবেন স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা কমালেই সুযোগ মিলবে। কোন্‌টা ঠিক জানি না: কিন্তু একথা জানি অন্ততঃ শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের অনুষ্ঠানে কচি বাচ্ছার চিল-চেঁচানি ও সোডা-লেমনেড বিক্রীর কর্কশ চীৎকার অচল। আবৃত্তি যা শুনলাম সে-সম্বন্ধে অধিক কিছু লিখতে চাই না। আবৃত্তির জন্য ছন্দজ্ঞান থাকা চাই। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিংবা শিশির ভাদুড়ির, যে-কোন ভঙ্গীই হোক না কেন, উচ্চারণ স্পষ্ট অর্থাৎ একটু গঙ্গার ধারের, মাত্রাবোধ, লয়জ্ঞান, বিরামবোধ, এগুলি নিতান্ত প্রাথমিক। কই, তার কোনো সাক্ষাৎ পেলাম না ত! অথচ বাঙালী মাত্রেই কবি শুনেছি। অবশ্য একজন আবৃত্তিকার ছাড়া, কিন্তু সে ছিল সাহিত্যের রসজ্ঞ। গান সম্বন্ধে লিখতে গেলেই মন্তব্য কটু হবে, তাই একটু সামলে লিখছি। ত্রিশ-চল্লিশ জন যুবক-যুবতী একটি পুরানো উৎকৃষ্ট গান গাইলে। সঙ্গে পাখোয়াজ বাজল; তাল ছিল সুরফাক্তা। তানপুরো ছিল একটা, জোর ছুটো। তবু আমি চতুর্থ সারিতে বসেও গানটা শুনতে পাইনি। একে গান-গাওয়া বলে না। বাসরঘরে নতুন বৌ ও শালীর দলও এর চেয়ে জোরে গায়। শিক্ষার দোষ দিতে মন চায় না, কারণ সমস্যাটি সঙ্গীত সম্পর্কিত নয়, অর্থনৈতিক! দুধের দাম কমলে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতে যাব মনস্থ করেছি। দুটি যুবকের রসালো গান শুনলাম। তাঁদের বেশের পারিপাট্য দেখে আশান্বিত হয়েছিলাম, কিন্তু তাঁরা কোন্ গান দুটি গাইলেন বুঝতে পারলাম না। কথার উচ্চারণ এতই অস্পষ্ট যে পাশের শ্রোতাকে প্রশ্ন করতে হোলো, 'রবীন্দ্রনাথ লুকিয়ে-চুরিয়ে উড়িয়া কি আসামী ভাষায় কবিতা লিখতেন না কি?' আরেকটি জিনিষের উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না। জানি আজকালকার যুবক-যুবতীদের প্রবেশিকায় অনেক কিছু বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়, নোট মুখস্থ করতে হয়, ও সেই সঙ্গে পুস্তিকার মারফৎ ল্যাস্কী-লেনিনের মতবাদ পড়তে হয়, তাতে নিশ্চয় স্মৃতির শক্তির ওপর টান পড়ে, যার ফলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে থাকবার কথা নয়। কিন্তু তাই বলে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে এসে দশবার লাইনের গানটাও যদি মনে না থাকে ও সেজন্যে চোখের সামনে গানের কথা যদি ধরে থাকতে হয় তবে বলতে হবে এই সব ছেলে মেয়েদের গান গাওয়া কেন? লেখাপড়াও বন্ধ করা উচিত। এটাও কি মাছের দামের দরুণ?

একটি মাত্র মেয়ের গান ভাল লাগল। সুচিত্রা মুখার্জ্জি চারখানা গান গেয়েছিল, তার মধ্যে একটি, 'সার্থক জনম আমার' সত্যই ভালো হয়েছিল। মেয়েটির গলায় জোর আছে, টপ্পার দানা আছে, আর ভাবও আছে, এবং প্রত্যেকটাই সংযত ব্যবহার করতে সে জানে। শুনলাম মেয়েটি কম্যুনিষ্ট। কম্যুনিজমে দেশে সাহিত্যের উন্নতি ঘটেছে কি না জানি না, তবে ঐ মেয়েটির গলার কোনো ক্ষতি হয় নি। বছর পাঁচেক প্রাণপণে ভালো লোকের কাছে শিখলে এ-মেয়ে রীতিমত গায়িকা হবে, যদি ইতিমধ্যে গৃহিণী না হয়। কিন্তু গোখরোর সলুই এ-দেশে ঢোঁড়া-ঢ্যামনা হয়ে যায়। কথাটা আমার নয়, রবীন্দ্রনাথের।

আসল কথা এই: রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে ভক্তিই পেয়ে গেলেন, শ্রদ্ধা পেলেন না। জন্মতিথি উপলক্ষে এই মাতামাতির মধ্যে কোথাও একটা মনের জুয়াচুরি আছে, নচেৎ অনুষ্ঠানে অতটা ফাঁকি থাকত না। একবার সুরেশ সমাজপতি আমাকে বলেছিলেন, 'তোমাদের রবি ঠাকুর আর কি চান বলতে পার? মাথা বিকিয়ে দিয়েছি ওঁর পায়ে, তবু আশা মেটে না!" এখন দেখছি রবীন্দ্রনাথ সমাজপতির চেয়ে বুদ্ধিমান ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মাথার কেনা-বেচা চান নি, যার মাথা তার কাঁধেই থাক চেয়েছিলেন। হৃদয় থাকলে মাথা থাকতে নেই?

এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? কর্ত্তব্যটা হল ভক্তিকে শ্রদ্ধায় পরিণত করা। জন সাধারণের মনোভাব যা লক্ষ্য করলাম তাতে কর্ত্তব্য-সাধন সহজ হবে না মনে হয়। আমাদের মন এখন ফাঁকা, এবং কাব্যালোচনা দিয়ে সে বিশাল ফাঁক ভরান যাবে না। রবীন্দ্রনাথকে অপেক্ষা করতেই হবে। ইতিমধ্যে যেটা সম্ভব তাই লিখছি। রবীন্দ্র-সৃষ্টির যথার্থ বিচারই হল, আমার মতে, একমাত্র সাম্প্রতিক বিধান। আমাদের দেশে একাধিক সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন বিশ্বভারতী, সাহিত্য পরিষদ, রবীন্দ্র-চক্র প্রভৃতি। তা ছাড়া মাসিক-পত্রিকাও বেরুচ্ছে বিস্তর। অধ্যাপকের দলও কম নয়। এখন যদি রবীন্দ্র-সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ অঙ্গবিচারের ভার বিশেষ প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত করা যায় তবে বিচারের সুবিধা ঘটে। ন্যস্ত কাঁরা করবেন, কাজ কতটা এগুচ্ছে কাঁরা দেখবেন, কাজের বিচারকর্তা কাঁরা হবেন, এ-প্রকার সমস্যা প্রাথমিক নয়। বিশ্বভারতীতে কিছু কাজ চলছে দেখছি। কিন্তু কোথাও যেন প্ল্যানের অভাব আছে। একটা প্রমাণ না দিয়ে থাকতে পারছি না। ধরুণ যদি হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত কি ছিল জানতে চাই, কি লিখতে চাই তবে আমাকে তাঁর সমগ্র গ্রন্থাবলী তন্নতন্ন করে খুঁজতে হবে। মহাত্মাজীর রচনাবলী গুজরাটে এমন ভাবে সম্পাদিত হচ্ছে যে যৌন-সমস্যা সম্পর্কেও তাঁর মতামত একটা ছোট, পৃথক্ বইএ পাওয়া সম্ভব। প্রচারের দিক থেকে রবীন্দ্রগ্রন্থাবলীর সম্পাদনা ভালো নয়। অথচ প্রচারের প্রয়োজন আছে, অন্ততঃ বিচারের জন্য। বড় বড় কাগজের সম্পাদকরাও প্ল্যান করে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচারে সাহায্য করতে সহজেই পারেন। অধ্যাপকবৃন্দের কাছে বিশেষ প্রত্যাশা করি না। সাহিত্যের ডিগ্রী সাহিত্য-বিচারে অন্তরায়। তা ছাড়া, অধ্যাপকরা বড়ই ব্যক্তিতান্ত্রিক; বিশেষতঃ এই দেশে যেখানে সকলে মিলে রিসার্চ করার অভ্যাস গড়ে ওঠে নি। রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডারে টাকা উঠছে, যদিও নিতান্ত মন্থর গতিতে। যদি কোনো কালে পঁচিশ লাখ টাকা ওঠে তবে যেন অন্ততঃ দশ লাখ টাকা রিসার্চ ও প্রচারের জন্য রাখা হয়। আপাততঃ যে প্রতিষ্ঠান, যে ব্যক্তি যতটা পারে ততটা বিচার করুক।



যাযাবর

এগারো

শাস্ত্রকাররা বলেছেন, রাজদর্শনে পুণ্য লাভ। অমাত্য দর্শনেও পুণ্য আছে কি না জানিনে। বোধ হয় আছে। নইলে একজিকিউটিভ কাউন্সিলরদের বাড়ীতে প্রত্যহ ভীড় জমে কেন? ভীড় জনতার নয়, ভীড় আই, সি, এসের।

সুদৃশ্য বাংলোর সম্মুখে তৃণাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ অঙ্গনে অপরাহ্নে গৃহস্বামী বসেন বিশ্রম্ভালাপে। হাতের কাছে ছোট টিপাইর উপরে টেলিফোন, সুদীর্ঘ তারের সাহায্যে প্রাইভেট সেক্রেটারীর কক্ষে প্লাগ পয়েন্টের সঙ্গে যুক্ত। সেখানে সুইচ আছে। কে কথা বলেন এবং কী কথা বলেন তার গুরুত্ব বিচার করে সেক্রেটারী সুইচের দ্বারা মনিবের টেলিফোনের সঙ্গে যোগাযোগ সাধন করেন। খান দশ-বারো চেয়ার। বেতের। সবুজ রংএর ভালস্পার এনামেলে স্প্রে-পেইণ্ট করা। বাগানে কাঠের চেয়ার ব্যবহার আভিজাত্যের চিহ্ন নয়। সূর্য্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ-উপগ্রহ-সমন্বিত সৌরমণ্ডলের ন্যায় আই, সি, এস. পরিবৃত একজিকিউটিভ কাউন্সিলরের সান্ধ্য-সভাস্থল। অমাত্যের প্রাত্যহিক আসর। সে-আসর গুণিজনের নয়, ধনিজনের।

পরিধানে সাদা শাটিন জিনের ট্রাউজার্স ও হাতকাটা কুলনেক্। টাই নেই, কোটও না। নয়াদিল্লীতে গ্রীষ্মকালে ঐটেই রীতি। আপিস থেকে ডিনার পর্য্যন্ত ঐ পোষাকই সর্ব্বজনগ্রাহ্য। যারা বয়সে তরুণ, তারা সার্টের বদলে পরেন স্পোর্ট সার্ট। সেটা আরও বেশী স্মার্ট। মোজাহীন চরণে শাদা কাবুলী চপ্পল। আর্ম্মিতে খাকীর মতো সিভিলিয়ানদেরও ইউনিফর্ম আছে। সে ইউনিফর্ম লিখিত অনুশাসনের নয়, অলিখিত ফ্যাশনের। বয়স্ক'ত্রীদের যেমন গিলেকরা ধুতি আর সোনার বোতামওয়ালা পাঞ্জাবী। গুজরাটী, মাদ্রাজী, বাঙ্গালী, সিন্ধী সবারই এক বেশ, এক ভাষা। বলা বাহুল্য, দুটোর একটাও তাদের স্বজাতীয় নয়।

যে-বন্ধুকে কাণ্ডারী করে এই সভার্ণবে প্রবেশ করা গেল তিনি গভর্ণমেন্টের এক জন পদস্থ অফিসার। প্রৌঢ়, অকৃতদার এবং অত্যন্ত সদাশয়। বহু-পরিচিত ব্যক্তি। এমন গৃহ অল্প যেখানে তাঁর গতি নেই, এমন গৃহিণী অল্পতর যাঁর ডিনার পার্টিতে তাঁর নিমন্ত্রণ নেই।

পুরুষ মাত্রেরই বউ না থাকলে বাতিক থাকে। কারো তাস, কারো থিয়েটার, কারো দেশোদ্ধার, আর কারো সাহিত্য বা স্বামীজি। এ-ভদ্রলোকের বাতিক পোষাকের। সবচেয়ে ভালো পোষাকের সাহেব,—*বেষ্ট-ড্রেসড্ ম্যান* বলে নয়াদিল্লীতে তাঁর পরিচিতি। গল্প আছে, চার দিনের জন্য হঠাৎ তাঁকে টুরে যেতে হয়। তাড়াতাড়িতে জামা-কাপড় বেশী সঙ্গে নেওয়ার অবকাশ না পাওয়াতে মাত্র দুটো ওয়ার্ড্রোব ট্রাঙ্ক ও একটা বৃহদাকার সুটকেশ নিয়েই নাকি তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হয়। সেগুলির গর্ভে শুধু গোটা পনের সুট, দেড় ডজন সার্ট, দশটা টাই ও কুড়ি-খানা রুমাল ছিল। ভাঁজভাঙ্গা সার্ট বা ক্রীজহীন প্যাণ্ট পরতে দেখেনি তাকে কেউ কোনো দিন। সকালবেলা গয়লা এবং খবরের কাগজওয়ালার মতই তাঁর বাড়ীতে প্রত্যহ নিয়মিত ধোবা আসে; বালিশের অড়, বিছানার চাদর, স্লিপিং সুট ও জামা-কাপড় প্রেস করে দিতে। বন্ধুরা ঠাট্টা করে পরামর্শ দেন, আফিসে একটা ইলেকট্রিক আয়রণ রাখতে,—বড় সাহেবের ঘরে ঢুকবার আগে একবার তাড়াতাড়ি গায়ের জামাটা ইস্তিরি করে নিতে পারবেন।

জামা-কাপড়ের প্রতি ভদ্রলোকের মনোযোগ আছে কিন্তু আসক্তি নেই। সুদৃশ্য টাই, মনোরম মাফলার অকাতরে দান করেন আপন বন্ধুদের। গৃহে তাঁর সর্ব্বদা আতিথ্যের অকৃপণ আয়োজন। অতিশয় অমায়িক লোক।

ইনি হচ্ছেন সেই স্বল্পসংখ্যক ভারতীয়দের অন্যতম যাঁদের সাহেব সম্পর্কে কোন দুর্ব্বলতা নেই। একবার যোদ্ধের পথে মাঝ রাত্রিতে এক ষ্টেশন থেকে ট্রেণে উঠবেন। প্রথম শ্রেণীর কামরায় এক সাহেব দোর-জানালা বন্ধ করে নিদ্রা দিচ্ছিলেন। হাকাহাকিতে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে দ্বার খুলে দেখলেন, কালা আদমী। "ভাগো" বলে সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করলেন। কিন্তু এ কালা আদমীটি অন্য জাতের। সাহেব দেখেই পশ্চাদপসরণের পাত্র নন। ষ্টেশন-মাষ্টার এসে অন্য গাড়ীতে তাঁর জন্য জায়গা করে দিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা। সাহেব তো গোটা কামরাটা রিজার্ভ করেনি, সুতরাং ঐ কামরাতেই তাঁর যাওয়া চাই। এতে সাহেবের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটা অস্বাভাবিক নয়। একটা নেটিভের স্পর্দ্ধা দেখ একবার। না হয় টাকা আছে, ফার্ষ্ট ক্লাশের টিকিটই কিনেছে। কিন্তু তাই বলে একেবারে এক জন খাশ সাহেবের সঙ্গে এক গাড়ীতে! মাই গড্, ইণ্ডিয়ার হলো কী? সেই আধ ন্যাংটো ন্যাংটি ইঁদুর গ্যাণ্ডীটা কি দিল্লীতে ভাইসরয় হয়েছে? উইলিংডন কি নেই? সাহেব তার চাবুক হাতে নিয়ে গাড়ীর দরজা রুখে দাঁড়িয়ে বললেন, "দেখছ চাবুক?" ভদ্রলোক তাঁর পকেট থেকে অবিলম্বে রিভলভার বের করে বললেন, "দেখছ পিস্তল?" সাহেব মিনিট খানেক হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তাঁর পানে, তার পরে আস্তে আস্তে দোর খুলে দিয়ে নিজের বার্থে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। এ-জাতের লোকদেরই সাহেবরা পুলিশের কর্ত্তা হয়ে লাঠিপেটা করেন, হাকিম হয়ে পাঠান জেলে, কিন্তু মনে মনে করেন গভীর শ্রদ্ধা। এদেরই জন্য বিদেশে নিজেকে ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে পারা যায় অকুণ্ঠিত চিত্তে।

আর্মির এক কর্ণেল কিছু কাল এই ভদ্রলোকের উপরওয়ালা ছিলেন। পাঞ্জাবী হাবিলদার ও সিপাহীদের ধমকিয়ে তিনি চুল পাকিয়েছেন। জানেন ভারতীয়দের দিয়ে কাজ করাবার ঐ একমাত্র উপায়। সে উপায় প্রয়োগ করলেন এক দিন এর উপরে। ভদ্রলোক অত্যন্ত ধীর ও শান্ত স্বরে বললেন, "কর্ণেল, এক জন অফিসারের সঙ্গে কথা বলার রীতি এটা নয়। তুমি চোখ রাঙালে আমিও পাল্টে চোখ রাঙাতে পারি—ইফ্, ইউ সাউট লাইক দ্যাট,

আই ক্যান সাউট ব্যাক্ টু।" শুনেছি এই কর্ণেলই পরে এঁকে নিজের বাড়ীতে ডিনার খাইয়েছেন বহু দিন। অসুখ হলে নিজে বাড়ী এসে আরোগ্য কামনা জানিয়েছেন এবং বিটায়ার করার কালে প্রমোশন সুপারিশ করেছেন উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়।

এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলরের সান্ধ্য সভায় আলোচনার মধ্যপথে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করলেম আমরা দু'জনে। বন্ধুর সহায়তায় যথারীতি পরিচিত হলেম গৃহস্বামী ও উপস্থিত পারিষদবর্গের সঙ্গে। সুদৃশ্য গ্লাসে সুস্বাদু পানীয় পরিবেশন করলো উর্দ্দি-পরিহিত বেয়ারা। রূপার সিগারেট-বাক্স থেকে সিগারেট। গৃহস্বামী নিজে বিরামহীন ধূমপায়ী, ইংরেজীতে যাকে বলে চেইন স্মোকার। একটা নিঃশেষ হতেই বাক্স থেকে আর একটা নিয়ে ঠোঁটে চাপেন। কে আগে তাতে দেশলাই জেলে অগ্নি-সংযোগ করতে পারেন তা নিয়ে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা।

বিলাত-প্রত্যাগতদের একটা বিশেষ মর্য্যাদা আছে এ-দেশে। তার উপরে বিলাতী সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলে তো কথাই নেই। সুতরাং মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলের মাননীয় সদস্য মহোদয় অমায়িক আচরণ ও অজস্র ধন্যবাদের দ্বারা প্রচুর আপ্যায়ন করলেন।

খণ্ডিত আলোচনার সূত্র অনুসরণ করে বোঝা গেল, বিষয়টি নয়াদিল্লীর গ্রীষ্মাধিক্য সম্পর্কে। জগন্নাথদেবের রথযাত্রার ন্যায় ভারত গভর্ণমেণ্টেরও বার্ষিক শৈলযাত্রা আছে। এপ্রিলের গোড়াতে দপ্তর স্থানান্তরিত হয় সিমলা পাহাড়ে, শরৎকালে উল্টা রথে প্রত্যাবৃত্ত হয় দিল্লীতে। বছরে দুবার করে সিমলার কার্ট রোড আর নয়াদিল্লীর পাহাড়গঞ্জের পথে গরুর গাড়ী বোঝাই বাক্স, পেটারা, লটবহরের মিছিল দেখা যায়। এই প্রথম শৈলবিহার স্থগিত হয়েছে সরকারী হুকুমে। নবনিযুক্ত অস্থায়ী সেনাপতি জেনারেল মোলস্ওয়ার্থ দাবী করেছেন, এবার সিমলা যাওয়া চলবে না। গরম? জাপানীদের সঙ্গে সৈন্যেরা বার্ম্মার বনে জঙ্গলে লড়তে পারে, আর সেক্রেটারিয়েটের সিভিলিয়ান সাহেবরা একটু গরমও সইতে পারবেন না? এত বাবুয়ানায় যুদ্ধ জেতা যায় না।

যুদ্ধের প্রয়োজনের উপরে কথা নেই। সুতরাং সেইটেই শিরোধার্য্য করতে হয়েছে নিতান্ত অনিচ্ছুক চিত্তে। সেক্রেটারী সাহেবরা বিচলিত—উঃ বাবা, মার্চ্চের শেষেই যা গরম, মে-জুনে না জানি কতই বেশী হবে! ডেপুটি সেক্রেটারীরা বেশীর ভাগই ভারতীয়, কাজেই তাঁরা আর এক ধাপ উঠে বলেন, "বেশী? মে-জুন মাসে মেডিক্যাল লীভ নিয়ে পালাতে হবে।" তাঁদের স্ত্রীরা ততোধিক। স্বামীরা আপিসে চলে গেলে দুপুর বেলা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করলেন, শুনেছ ভাই, নতুন কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের কীর্ত্তি? গরমে না কি এবার দিল্লী থাকতে হবে! মাই গুডনেস। তার চেয়ে চলো আমরা মেয়েরাই না হয় সিমলাতে গিয়ে মেস্ করে থাকি, ওঁরা থাকুন দিল্লীতে গরমে সেদ্ধ হয়ে মরতে!

এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলর জিজ্ঞাসা করলেন, "গরম কি এখানে খুব বেশী হয়?"

এক জন অমনি বললেন, "ভয়ানক! থাকতেই পারবেন না এখানে।"

আর এক জন বললেন, "শুনেছি গরমে গায়ে ফোস্কার মতো হয় অনেকের।"

তৃতীয় ব্যক্তি বললেন, "এপ্রিল থেকেই তো 'লু' চলবে।" 'লু' অর্থ রৌদ্রতপ্ত বাতাস।

এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলর বললেন, "তা দেখুন, সেক্রেটারিয়েটের ঘরগুলি তো সবই এয়ার কণ্ডিসনড। দুপুরবেলা সেইখানেই থাকবো। এক রকম করে কাটিয়ে দেওয়া যাবে বোধ হয়।"

চতুর্থ ব্যক্তি, যিনি এতক্ষণ কিছু বলবার সুবিধে না পেয়ে অস্বস্তি বোধ করছিলেন, তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে বললেন, "তা নিশ্চয়ই যাবে। গরমে কি আর দিল্লীতে লোক থাকে না?"

এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলর তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আর রাত্রিতে তো লু বইবে না।"

তিনি উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'যা' বলেছেন সার, রাত্রিতে সব সময়েই ঠাণ্ডা থাকে। তাছাড়া এইচ-এমদের বাংলোতে একটা করে ঘর এয়ার কণ্ডিসনড্ করে দেওয়া হবে। এমন কিছু কষ্ট হবে না।"

এইচ-এম মানে—অনরেবল মেম্বার বা মিনিষ্টার। এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলরদের ঐ সংক্ষিপ্ত নামেই উল্লেখ করা হয় সরকারী মহলে।

প্রথম বক্তা, যিনি গরমের আতিশয্য নিয়ে ইতিপূর্ব্বে বাগ্‌বিস্তার করেছিলেন, অত্যন্ত ক্ষুন্ন হলেন। চতুর্থ ব্যক্তির কথাগুলি তারই বলা উচিত ছিল। না বলতে পারায় মনে তীব্র অনুশোচনা ঘটলো। চতুর্থ ব্যক্তি বলেছে বলে তার উপরে রীতিমতো ক্রুদ্ধ হলেন। মনে মনে বললেন, "কেবল খোসামুদি! এইচ-এম যেই বলেছেন, গরম এক রকম করে কাটিয়ে দেওয়া যাবে, অমনি একেবারে প্রমাণ করার চেষ্টা যেন গরমটা কিছুই নয়! হামবাগ কোথাকার! নিশ্চয় জানি, এইচ-এম দিল্লী থাকা অপছন্দ করলে উনি তখন উল্টা সুর গাইতেন!" লোকটা যে একেবারে মোসাহেব প্রকৃতির এবং তিনি নিজে যে কোন কালেই এমন নির্লজ্জ চাটুকারিতা করতে পারতেন না, এ বিষয়ে মনে মনে নিজেকে আশ্বাস দিয়ে অনেকটা আরাম বোধ করলেন।

গরম থেকে প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করে এইচ-এম শুরু করলেন সরকারী কাজ-কর্ম্মের কথা, কাউন্সিলের কাহিনী। কী ভাবে ইংরেজ সহকর্ম্মীদের ব্রিটিশ-স্বার্থ রক্ষার প্রয়াস তাঁর প্রচেষ্টায় সর্ব্বদা প্রতিহত হয়, তাঁর প্রখর দূরদৃষ্টির ফলে কোথায় কখন গভর্ণমেণ্টে দেশের স্বার্থ সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তারই সালঙ্কার বর্ণনা। দেখা গেল, এ বিষয়ে শ্রোতাদের কাছে অধিক বলার প্রয়োজন ছিল না। তিনি না বলতেই তাঁরা এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। এইচ-এম না থাকলে অভাগিনী ভারতমাতার যে কী দারুণ দুর্গতি ঘটতো সে কথা কল্পনা করে দু'-এক জন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। প্রায় অশ্রু বর্ষণের উদ্যোগ!

কান টানলেই মাথা আসে; দেশের কথা তুললেই কংগ্রেস। এইচ-এম কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নিস্ফলা নীতির নিন্দা করে বললেন, শুধু জেলে গেলেই দেশ স্বাধীন হয় না। কি করে হয় তা স্পষ্টতঃ না বললেও সংশয়ের অবকাশ রইল না যে, এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলরদের প্রচেষ্টা দ্বারাই তা হয়। এ বিষয়েও পারিষদ দলের মধ্যে বিন্দুমাত্র মতদ্বৈধ নেই। এইচ-এম, বললেন, তিনি অত ভাবনা চিন্তার ধার ধারেন না, মুহূর্ত্তে মন স্থির করেন। অমনি

অনুমোদন শুনলেন, "সার, ভাবনা চিন্তা দেশে অনেক হয়েছে, এখন ঝাঁপিয়ে পড়াই দরকার।"

এইচ-এম সংশোধন করলেন, "অবশ্য আগের ভাগে না ভেবে চিন্তে হঠাৎ একটা কিছু করে বসাও আবার ঠিক নয়।"

"তাতে আর সন্দেহ কী সার. না ভেবে কাজ করার নাম তো হঠকারিতা।" পূর্ব্ব বক্তাই বলেন অম্লান বদনে।

পরবর্তী সপ্তাহে এক ডিনারের নিমন্ত্রণ স্বীকারান্তে এইচ-এমকে বিদায় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিক্রান্ত হলেম পথে। সঙ্গী ভদ্রলোক জানালেন তাঁর এক বন্ধু নাকি চমৎকার চাটুচাতুর্য্যপরায়ণ এই পারিষদ দলের নব নামকরণ করেছেন "হেঁহেঁ সংঘ"। নামটা সার্থক সন্দেহ নেই।

আসল কথাটা বোঝা কঠিন নয়। এরা আই, সি, এস। দেশীয় সংবাদপত্রের ভাষায় যাকে বলে স্বর্গোদ্ভূত চাকুরে—হেভেনবর্ণ সার্ভিস। সিজার-পত্নীর সতীত্বের মতো এদের যোগ্যতা প্রশ্নের অতীত, ভবিষ্যৎ অবারিত এবং ক্ষমতা সীমাহীন। এরা সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ। আজ যিনি বিহারের অখ্যাত মহকুমার এ্যাসিষ্টেন্ট কালেক্টর, কাল তিনি করাচী পোর্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান, পরশু তিনি কণ্ট্রোলার অব ব্রডকাষ্টিং, পরদিন ডিরেক্টার জেনারেল অব আর্কিওলজি এবং তার পরের পরদিন গভর্ণমেন্টের এ্যাগ্রিকালচারেল কমিশনার। তাঁরা জানেন, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরকে খুশী রাখতে পারলে পদোন্নতি ত্বরান্বিত হয়। তাই কেউ সস্ত্রীক এসে এইচ-এমকে নিয়ে যান সিনেমায়, কেউ নিমন্ত্রণ করেন ডিনারে, কেউ সকালে বিকালে হাজিরা দিয়ে প্রত্যেক কথায় করেন,—হেঁ হেঁ, হেঁ হেঁ! 'হেঁ হেঁ সংঘের' সদস্য হতে চাঁদা দিতে হয় না, শুধু যথাস্থানে হাজিরা দিতে হয়!

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এর মোট সংখ্যা এগারো শ'র কিছু উপরে, তার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকই ভারতীয়। পরাধীন জাতির মধ্য থেকেই সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক সংগ্রহ করার প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত এই সার্ভিস। স্ফীত বেতন এবং লোভনীয় পেন্সনের আকর্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রদের আকৃষ্ট করেন ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট। তরুণ সম্প্রদায়ের সর্ব্বোত্তম নিদর্শন বেছে নিয়ে নিয়োজিত করে শাসনকার্য্যে, যে-শাসন দেশের দাসত্বকে করে দৃঢ়মূল, দারিদ্র্যকে করে ক্রমবর্দ্ধমান এবং জাতীয়তাকে করে বিঘ্নসঙ্কুল।

অসাধারণ মোহ আছে ইংরেজী বর্ণমালার তিনটি অক্ষরে। I. C. S.। নামের পিছনে তাদের অবস্থিতি দ্বারা সাহেব হলে বোঝায় যে, লোকটা পাবলিক স্কুলের ছাত্র, অক্সফোর্ড কিম্বা কেমব্রিজের পাশ এবং কঠিন কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। একটি ভারতীয় ভাষা শিখেছে, ওভারসিজ এলাউয়েন্স পায়, চাকুরী শুরু করেছে এ্যাসিসটেন্ট কালেক্টাররূপে এবং শেষ করবে এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলার বা প্রাদেশিক গভর্ণর হয়ে। পাঁচশ টাকায় আরম্ভ, ছয় কিম্বা আট হাজারে শেষ। ষাট বছরে এক হাজার পাউণ্ড পেন্সন নিয়ে ইংল্যাণ্ড বা রিভেয়ারাতে বাড়ী, নিশ্চিন্ত অবসর এবং ভারতবর্ষের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা। ভারতীয় হলে বোঝাবে উচ্চ বংশ, কলেজে ভালো ফল, স্বদেশীর স্পর্শলেশশূন্য পুলিশের সন্দেহাতীত নিষ্কলঙ্ক ছাত্রজীবন, বিলাতের প্রতি ভক্তি এবং চাকুরীতে বিচার বিভাগের বদলে এক্জিকিউটিভ বিভাগে কায়েমীর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা। এদের জন্যই বারোয়ারী পূজার মণ্ডপে চেয়ারের ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণী সভার সভাপতিত্ব, মাসিক পত্রিকায় অপাঠ্য গল্প রচনার সুযোগ এবং অনূঢ়া বয়স্থা কন্যার উদ্বিগ্না জননীদের আকুলি বিকুলি।

চলতি কথায় এদের বলা হয় ভারতের ব্রিটিশ শাসনের কাঠামো, ষ্টিল ফ্রেম। এঁদের মধ্যে এমন লোক ছিলেন এবং হয়তো এখনও আছেন যাঁরা পাণ্ডিত্যে, প্রতিভায় ও কর্ম্মশক্তিতে যে-কোন ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান গ্রহণের অধিকারী। তাঁরা ঋগ্বেদের অনুবাদ করেছেন, ব্রিটিশ ভারতের অর্থনীতি আলোচনা করেছেন, ভারতবর্ষের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেছেন, সমবায় আন্দোলন প্রবর্ত্তন করেছেন এবং—সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা—ভারতীয় জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের গোড়াপত্তন করেছেন! জাতীয়তাবাদের গুরু সুরেন্দ্রনাথ, ঋষি অরবিন্দ এবং বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্র এই সিভিল সার্ভিসেরই অন্তর্ভুক্ত হতে হতে ছিটকে পড়েছিলেন।

কিন্তু ব্যতিক্রমের দ্বারাই নিয়মের প্রমাণ হয়। বেশীর ভাগ আই, সি এসই সাধারণ, ইংরেজীতে যাকে বলে মিডিওকার। তাঁরা লেখার মধ্যে লেখেন ফাইল, পড়ার মধ্যে পড়েন গেজেট এবং আলোচনা করেন ফার্লো, প্রমোশন বা রিটায়ারমেন্ট। অন্তিমে নিজের জন্য নাইটহুড, স্ত্রীর জন্য বুইক গাড়ী ও ছেলের জন্য ইম্পিরিয়েল সার্ভিস তাঁর জীবনের চরম উচ্চাভিলাষ।

কামানের চাইতে সোনার দাম কম। বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে, শিক্ষিতদের অসন্তোষ ঠেকিয়ে রাখবার অমোঘ অস্ত্র তাদের, শাসনযন্ত্রের অঙ্গীভূত করা। সে-তথ্য জানা আছে ইংরেজের। এগারো শ' আই, সি, এসের জন্য ভারতের রাজস্ব থেকে খরচ হয় বছরে আড়াই কোটি টাকা। প্রতি আড়াই লক্ষ ভারতীয়ের মাথার উপরে আছেন এক জন আই, সি, এস, প্রতি ৮৬৮ বর্গ মাইল এলাকার আধিপত্যে। প্রচুর অর্থ, প্রভূত প্রতিষ্ঠা এবং বৈদেশিক পরিবেশের ফলে একটি বিশেষ শ্রেণীতে পরিণত হন তাঁরা। দেশের কাছে বিযুক্ত, দশের সঙ্গে বিযুক্ত। আই, সি, এস একটা পেশা নয়, আই, সি, এস, একটা জাত। হোলি রোম্যান এম্পায়ার যেমন না ছিল হোলি, না ছিল রোম্যান এবং না বলা যায় এম্পায়ার; ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসও তেমনই ইণ্ডিয়ান নয়, সিভিল তো নয়ই এবং সার্ভিসের বাষ্প মাত্রও নেই তাতে।

[ক্রমশঃ।

সদানন্দ লোক

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ভালবাসি উহাদের সঙ্গ,
নয় মায়ামৃগ, ওরা কনক-কুরঙ্গ।
মুখে হাসি, সারা দেহে স্ফূর্ত্তি,
উল্লাস ধরিয়াছে মূর্ত্তি,
বুকের অমৃত-হ্রদে সুধার তরঙ্গ।

গতিতে ওদের নব ছন্দ
পুলক পিয়াল-রেণু করে আঁখি অন্ধ।
যেন এলো রামধনু থেকে রে,
সারা গায়ে নানা রঙ্ মেখে রে,
উছলিয়া চলে যায় নিবিড় আনন্দ।

নন্দনবন যেন চিত্ত,
অবিরাম চলিয়াছে হাসি প্রীতি গীত তো।
যেথা বসে, যায় তারা যত্র
খুলে দেয় যেন সুধা-সত্র,
সাথে সাথে উহাদের উৎসব নিত্য।

করে না তা দিকে কারা স্পর্শ,
বয়সেতে কমে না কো তাহাদের হর্ষ।
ছেয়ে যায় ফুলে ফুলে পন্থ।
তাদের আদর অফুরন্ত—
মধুমাস নয়—তাহাদের মধুবর্ষ।

প্রণিপাত বিশ্বের নাথকে!
আনিল মানুষ করে কে দোলের রাতকে?
মাণিক-কেশর হেমচম্পা
নর হলো পেয়ে অনুকম্পা?
কে দিল মানব রূপ 'উস্রী' প্রপাতকে।

রঙীন নিমেষ

প্রভাকর সেন

এই ক্ষণে এ আকাশ হয়তো বা কোন্ দূর গ্রামে
আমাদের পথ চেয়ে স্মরণীয় সন্ধ্যা হয়ে নামে,
হয়তো বা সন্ধ্যাঘন আন্‌মনা নীল ছায়াঞ্চলে
শব্দহীন ডানা নেড়ে আরে'কটি মাঠ যাবে চলে
স্বপ্নচোখ সারসেরা; দু'জন চলার পথ পাবে
জোনাকীঝোপের দেখা—চেনাপথ সহজে হারাবে।

সোণা হাওয়া, সাদা ফেনা মেখে কোন সমুদ্রের পারে
রূপাচল্‌কানো ঢেউ মুছে যায় জানি বারে বারে
ঝিনুকের আলপনা চিকিমিকি বালিয়াড়ি-ভাঙা,
সূর্য্যকে আড়াল করে ঘরে ফেরে খুশী মাছরাঙা:
নির্জ্জন সমুদ্রতীর আমাদের অপেক্ষায় থাকে,
মেরুন সন্ধ্যার রং আকাশ অনেক করে আঁকে।

হয়তো বা এ আকাশ জোনাকীতে জোনাকীতে জাগে
আঁধার নদীর হাওয়া যেখানে কাশবনে লাগে,
সর্‌সর্ কাশ ভেঙে ছইহীন নির্জ্জন সাম্পানে
তারায় তারায় জাগা আমাদের মৃত ব'লে জানে
হয়তো ভোরের হাওয়া: নিয়ে যায় কোন দূর চরে
যেখানে সবুজ লতা জোয়ারের জলে ঝুঁকে পড়ে।

সে আকাশ, সে সমুদ্র, সেই সব সাম্পানের দেশে
সময় অপেক্ষা করে আমাদের সব কথা শেষে।



[শিল্পী—অবনী সেন



ফটো—তিমিরবরণ

আবার এসেছি –



মরে যাচ্ছি যে !



দানা মিলছে না—





তিনি বলে দিয়েছেন —

নেতাজী এবং····



আমরা কি করব—

শা-নওয়াজ বক্তৃতা দিচ্ছেন



হাতিয়ার ধরতে হবে



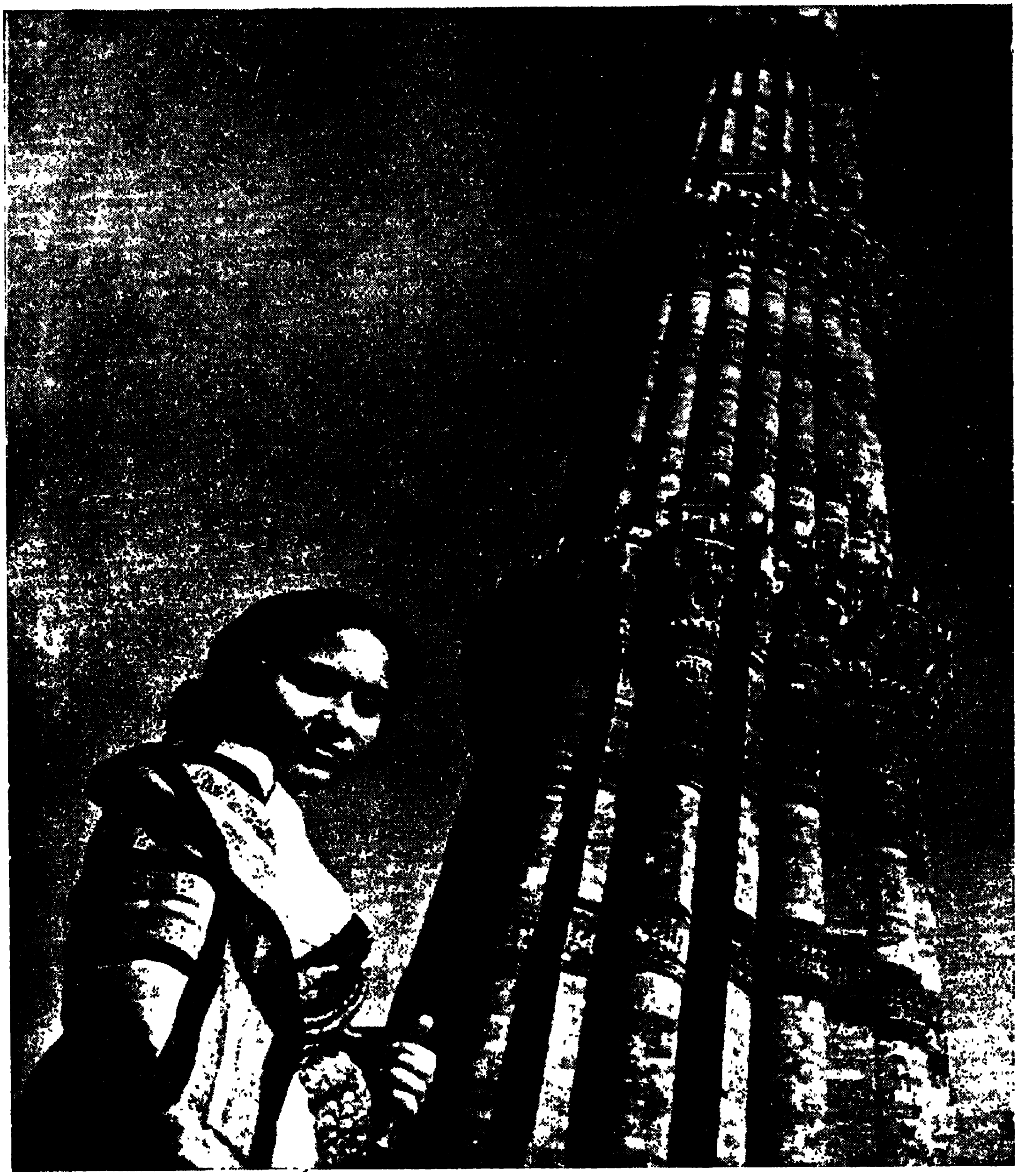
এটলীর বৈঠক



চাই অব্যর্থ লক্ষ্য—



সঙ্গে আমরা আছি
(বিদ্রোহী ভারতীয় নৌ-বাহিনী)



কুতুবের পাশে

ফটো—নীরোদ রায়



ফটো—নীরোদ রায়



জলকে চল

ফটো – রমলা রায়



দৃশ্য দেখছি
ফটো—রমলা রায়



কৌপীন থেকে কৃপাণ

"সহকর্ম্মী"

এ-কালের এক ঝানু সাংবাদিক সে-কালে বিদ্রূপ করে ছড়া কেটে ছিলেন—

"কলিকাতা মুন্সিপালে স্বরাজ দলের
বিজয় পতাকা উড়ে— মেয়র তাহার
'দেশবন্ধু'—আফিসেতে সুভাষ নায়ক।
ভাগাড়ে পড়িলে গরু শকুনের দল
ধায় যথা চাকুরীর লোভে—
সেইরূপ ধাইছে এম-এল-সি দল।......"

কিন্তু রাজনীতিক-সংগ্রামের কি উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে দেশবন্ধু আর সুভাষ কর্পোরেশন সংগঠনের ভার নিয়েছিলেন তার মর্ম্ম বুঝতে হলে যে সেই প্রবীণ ও নবীন ত্যাগীর ব্যক্তিত্বের সন্ধান নেবার প্রয়োজন ছিল, সে খেয়াল অনেক স্বার্থসর্ব্বস্ব মক্ষিকার মগজে তখন প্রবেশ করেনি।

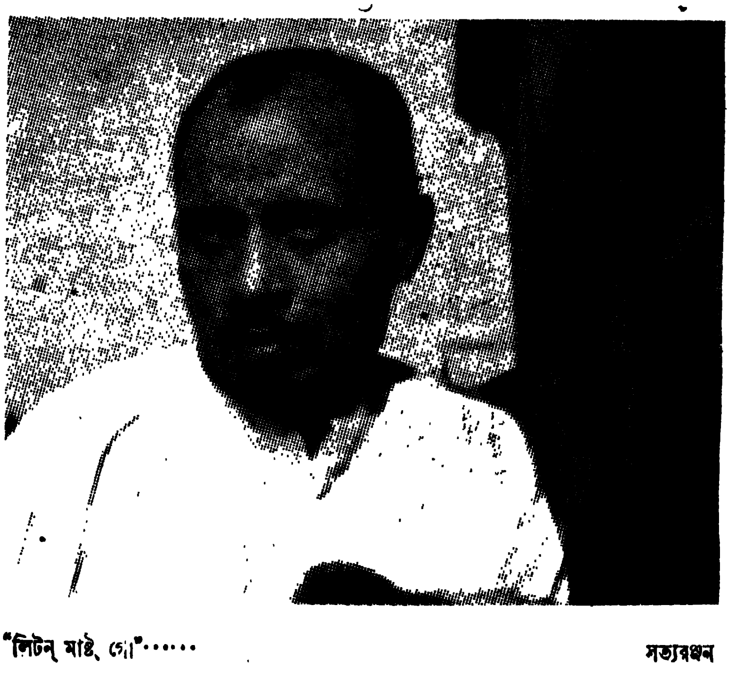
কর্পোরেশনের টাকা ট্যাকস্থ করবার বুদ্ধি নিয়ে সুভাষ যে একজিকিউটিভ অফিসারের পদ গ্রহণ করেননি তা তাঁর শক্ররাও স্বীকার করে। এ পদ পাবার কথা ছিল বীরেন শাসমলের। পদ পেলেন না বলে তিনি মাত্র যে দেশবন্ধুর উপর হাড়ে হাড়ে চটেছিলেন তা নয়, যে সুভাষকে তিনি বড় স্নেহ করতেন, সে সুভাষচন্দ্রও তাঁহার চোখের বিষ হয়েছিল। সে সময় পদ না পাবার আভাস পেয়ে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন—"ভবিষ্যতে এমন কিছু ঘটিতে পারে যাহার জন্য আমার দল ত্যাগ করা আবশ্যক হইবে।" এমন কিছু ঘটা মানে, তিনি স্বরাজ্য দলের মুখপত্র 'ফরোয়ার্ডের' ম্যানেজিং ডিরেক্টরও হতে পারেননি, কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসারও হতে পারেননি।

বাংলার বিপ্লবীরা এ সময় অনেক কিছুরই আয়োজন করেছিল। ভারত সরকারের কর্ণধার তখন ইংরেজের প্রতিনিধি লর্ড রেডিং। বাংলা সরকার চালাচ্ছেন রেডিংএরই ওপিঠ—লর্ড লিটন। বিপ্লবীদের তোড়জোড় এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠছিল যে লিটন চলতি আইনে ওদের বাঁধতে পারছিলেন না। ওদের গ্রেপ্তার করবার জন্য নতুন অর্ডিন্যান্স তৈরীর প্রয়োজন হয়েছিল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ ভেবেছিল, বিপ্লবীদের মুক্তি দিলে, সবাই বিপ্লবের পথ ছেড়ে দিয়ে অহিংসার কণ্ঠি গলায় পরবে। মন্টেগু-মাকাল দেখিয়ে তারা খোকাদের ভুলাতে পারবে। সে সময় লিটনের চীফ সেক্রেটারী মিঃ এ, এল, মোবার্লি জানিয়েছিলেন—"ভবিষ্যৎ বিপ্লবের জন্য ভেতরে ভেতরে ওরা তৈরী হচ্ছে। সে-কালের স্বদেশী আন্দোলনের অনুকরণে ওরা আশ্রমের পর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছে। ওদের কোন কোন নেতা ছাত্রসমাজ থেকে নতুন নতুন যুবক সংগ্রহ করেছে। প্রত্যেক উপদ্রবের সুযোগও যেমন তারা নিয়েছে, তেমনি সেই অছিলায় দল-পুষ্টিও করেছে। তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহের সঙ্গে বিপ্লবী আন্দোলনের সংস্রব না থাকলেও, এ সুযোগে বাংলার বহু তরুণকে বিপ্লবীরা নিয়োগ করেছে"

ওদের গুপ্তচররা গিয়ে জানাল—বিপ্লবীরা নতুন ধরণের সর্ব্বনাশকর বোমা বানিয়েছে, বিদেশ থেকে অবৈধ পদ্ধতিতে অনেক অস্ত্র-শস্ত্র আর রসদ আমদানী করেছে। এরা টেগার্ডকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে, ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করেছে, ডাকঘর লুঠ করেছে। অবস্থা এমন করে তুলেছে যে সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

সরকার ভেবেছিল, উপেন বাঁড়ুজ্জে প্রভৃতি যারা সুতো-কাটা দলকে আসর থেকে হটিয়ে দিয়ে যাদের নিয়ে বাংলার কংগ্রেস ফতে করেছিল, আর স্বরাজ্য দল গড়েছিল আধা-নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারী শাসনযন্ত্রগুলো অচল করতে, তারাই নয়া বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে অসীম বিক্রমে। বাংলা সরকার ইস্তাহার দিয়ে জানালেন—"বিপ্লবী সমিতির অস্তিত্বের কথা সকলেই জানেন, এমন কি মিঃ সি, আর, দাশ সম্প্রতি কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে ইহার অস্তিত্বের কথা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।" সত্যি কথা বলতে গেলে এ কথা বলতেই হয় যে, এ-সময়ে বিপ্লবীরা নানা কারণে তাদের কর্ম্ম-কৌশল ও কর্ম্ম-পরিচয় প্রকাশ না করলেও জন-সাধারণকে বিপ্লবভাবাপন্ন করবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা করছিল। সুভাষচন্দ্রের 'ফরোয়ার্ড', 'আত্মশক্তি' প্রকাশ্যে বিপ্লবীদের প্রশংসা করেছিল—বিপ্লবী তরুণদের আদর্শে তারা দেশের যুবকদের অনুপ্রাণিত করেছিল। বাংলার শ্বেতাঙ্গ শাসকরা



"লিটন্ মাষ্ট, গো"......   সত্যরঞ্জন

অভিযোগ করেছিল—"প্রত্যহ ভারতীয় সংবাদপত্রে জাতি-বিদ্বেষ প্রচার করা হচ্ছে আর আইন লঙ্ঘন না করে হিংসাপথের কথা যতটুকু বলা যেতে পারে, ততটুকু হিংসা-পন্থা অবলম্বন করবার জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।" (কলিকাতা গেজেট, ২৫শে অক্টোবর, ১৯২৪)

চীফ একজিকিউটিভ অফিসারের পদ পেয়ে সুভাষচন্দ্র এ হেন বিপ্লবীদের দিয়ে কলিকাতা কর্পোরেশনের মত ভারতের বৃহত্তম আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান গড়তে আপ্রাণ পরিশ্রম যখন করতে লাগলেন, ইংরেজ তখন আত্মরক্ষার চেষ্টা না করে পারেনি।

সুভাষকে এ সময় ভাবী সংগ্রামের সংগঠন নিয়েই সন্তর্পণে অথচ দ্রুত চলতে হয়। বাংলা নিয়েই, বিশেষতঃ কলকাতা নিয়েই তখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের নিজের কথা—"I do not think I left Bengal during the last 6 years except to visit members of our family or to attend meetings of the A. I. C. C. or the Congress ···Between October 1923 and Oct. 1924 I do not think I left Calcutta on more than two occasions···and between February, 1924 and Oct. 1924. I do not think I stirred out of Calcutta at all."

কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলে এ-সব বিপ্লবীর কর্ম্ম-কৌশলের খবর সরকারের কাছে বিক্রী করছিল যারা, তাদের পরিচয় সে সময়ের 'ফরোয়ার্ডে' in-set করে প্রকাশ করা হয়েছিল। বিপ্লবীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে আরও এক দল এ সময় কম চেষ্টা করেনি। নো-চেঞ্জার দলের কথা বলছি। তাঁদের দলে ছিলেন তখন পণ্ডিত শ্যামসুন্দর, হরদয়াল নাগ, সতীশ দাশগুপ্ত, সুরেশ মজুমদার (বর্ত্তমানে সুভাষ-পন্থী), বসন্তলাল মুরারকা (বর্ত্তমানে কাউন্সিলপন্থী), ইন্দ্রনারায়ণ সেন, জিতেন দত্ত, হরিপদ চাটুজ্জে, প্রফুল্ল ঘোষ, অনঙ্গ দাম, পুরুষোত্তম রায়, শরৎ ঘোষ, মাখন সেন—আরও কয় জন। এদের Sloganই ছিল "চিত্তকে দাশ ছাড়া করম্"—সুতরাং সুভাষপ্রমুখ চিত্তের অনুচরদের ছলে ও কৌশলে ঘায়েল করবার ফিকিরেই এরা ছিল, অবশ্য বলপ্রয়োগ করবার ইচ্ছেও যে এদের এক-আধটু না ছিল তা নয়।

সুভাষ ব্যস্ত তাঁর নয়া সংগঠন নিয়ে। 'ফরোওয়ার্ডে'র ভার পড়েছে সত্যরঞ্জনের হাতে। 'আত্মশক্তি' চালাচ্ছেন শিবরাম, গোপাল সান্যাল, শিক্ষানবীশ সরোজ রায় চৌধুরী। তিনি কর্পোরেশন থেকে পাচ্ছেন বেতন হিসাবে, তার প্রতি কপর্দ্দক ব্যয় করেছেন দক্ষিণ-কলকাতা সেবাসমিতি, সেবাশ্রম প্রভৃতির জন্য। বহু ছাত্রকে মাসিক অর্থ সাহায্য দিয়েও তিনি তৈরী করেছেন।

এ সময় (জুন, ১৯২৪) সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক সম্মিলন বসল। সভাপতি আজকের বাংলার মসলেম লীগের চাঁই মৌলানা আক্রাম খাঁন। সেখানে বিপ্লবী যুব-সম্মিলনের যে বৈঠক বসেছিল তার সভাপতি হয়েছিলেন আজকের পাকিস্থানপন্থী বাংলার প্রধান উজির সহিদ সুরাবর্দ্দী। এই বৈঠকে বিপ্লবী নেতারা গোপীনাথ সাহার প্রশংসা করে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন—

"অহিংসায় পূর্ণ আস্থা রাখিয়া এই সম্মিলন মিঃ ডের হত্যা সম্পর্কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত স্বর্গীয় গোপীনাথ সাহার দেশপ্রেমিকতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে।"

এ প্রস্তাব পরে পরিবর্ত্তন করে কাগজে প্রকাশ করা হয়েছিল—"কংগ্রেসের অহিংসা নীতিতে আস্থা রাখিয়া এই সম্মিলনী গোপীনাথের মহৎ উদ্দেশ্যকে সম্বর্দ্ধনা করিতেছে।"

গোপীনাথ সাহার প্রস্তাবে ভারতময় একটা মহা চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল। গান্ধীজী 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া'র প্রতিনিধির কাছে প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করলেন। তিনি বললেন—"আমার মতে সাহার কাজ নিন্দনীয়, তাতে দেশপ্রেমের কোন চিহ্ন নেই···বাংলা কনফারেন্স যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, কংগ্রেস কখন তা সমর্থন করবে না। আমি এ বিপজ্জনক আন্দোলন বন্ধ করে দেব···"

বিপ্লবী আন্দোলনের সুবিধে করবার জন্য এ সময় সিরাজগঞ্জে হিন্দু-মুসলমানে একটা রফাও হয়েছিল। এই দুই চাঞ্চল্যকর বিপ্লবি-ব্যবস্থায় সে সময় ভারতে যে ভীষণ কলরব উঠেছিল তার ফলে পরবর্ত্তী ৩০ বছরের ভারতীয় রাজনীতিক আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর আমেদাবাদ অধিবেশনে গোপীনাথ সাহার প্রস্তাব নিয়ে বেশ রেষারেষি হ'ল। ১৪৮ জন সদস্যের মধ্যে ৭০ জন যখন প্রস্তাব সমর্থন করলে—গান্ধীজী তখনই বুঝলেন—'তদা নাশংসে বিজয়ায়' ভবিষ্যৎ আবহাওয়া তাঁর অনুকূল নয়। তিনি বললেন—"আমার চোখ খুলে গেছে! দাশ যদিও ৮ ভোটে পরাজিত তবু আমি নিসংশয়ে মনে করি, এ তাঁর পক্ষে রীতিমত জয়।"

হাওয়া কোন্ দিকে বইছে ইংরেজ তা বুঝল। ভারত-সচিব লর্ড ওলিভিয়ার বললেন—"চিত্তরঞ্জন আর তাঁর অনুচরেরা যদি মনে করেন, ভারতের বিপ্লববাদীরা ২১৪ জন পুলিশের লোককে বোমা মারলেই বৃটিশ সরকার কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হবে, সে তাঁদের মস্ত ভুল।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় (৫ই আগষ্ট) লর্ড লিটন বললেন,—"দেশে আবার বিপ্লবীদের পুনরাবির্ভাবের সূচনা দেখা যাচ্ছে। পুলিশ হুঁসিয়ার!"

সিরাজগঞ্জের পর গুরু-গান্ধী হরদয়াল নাগের মারফতে বাংলার ভক্তদের লিখে পাঠালেন—"কসে সুতো কাটো, আর খদ্দর বানাও। আর কোন কাজ নেই।"

সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত শ্যামসুন্দরের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় অসহযোগ সমিতি গঠিত হ'ল। চাঁই সুরেশ মজুমদার, মাখন সেন, শরৎ ঘোষ প্রভৃতি। শরৎ ঘোষ বললেন—"স্বরাজীর গলায় দেবার জন্য লম্বা দড়ী দাও। যদি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, তা'হলে স্বরাজ্য দল অবিলম্বে অক্কা পাবে।"

বর্ত্তমানে স্বরাজী ও কাউন্সিলপন্থী সে-কালে দেশবন্ধু ও সুভাষদের বিরোধী হুগলীর নগেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বললেন—"তারকেশ্বরে যারা সত্যাগ্রহ চালাচ্ছে, তীর্থের সংস্কার ও পবিত্রতা রক্ষা তাদের উদ্দেশ্য নয়। তাদের অন্য গুরু উদ্দেশ্য আছে।"

কিন্তু স্বরাজ্য দলও অক্কা পেলে না, বিপ্লবীদের আন্দোলনও কোন গান্ধীজী দমন করতে পারলেন না।

বৈপ্লবিক সর্ব্ব আয়োজন সম্পূর্ণ করে স্বরাজ্য দল বৈঠক আহ্বান করলেন (আগষ্ট, ১৯২৪) ৬৫, বাগবাজার ষ্ট্রীটে পশুপতি বসুর গৃহে। বৈঠকে সুভাষ আর তাঁর বিপ্লবী বন্ধুরা কংগ্রেসের আদর্শ

বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে 'স্বরাজ কথার পরিবর্ত্তে পূর্ণ স্বাধীনতাই' স্বরাজ্য দলের কাম্য, এ নীতি গ্রহণ করবার দাবী করলেন। মতিলাল, বিঠলভাই-প্রমুখ নেতারা সুভাষকে সে-দিন কৌশলে নিরস্ত করেছিলেন।

সুতো-কাটা দলকে এ সময় যেমন বিপ্লবী প্রচেষ্টা পণ্ড করতে ঘর্ম্মাক্ত হতে দেখেছি, তেমনি দেখেছি সিরাজগঞ্জ প্যাক্ট ব্যর্থ করবার অজুহাতে সিরাজগঞ্জেই হিন্দু মহাসভা গঠনের চেষ্টা। এ কথা বেশ বলা যেতে পারে যে, আজকের হিন্দু মহাসভার ব্যর্থ বীজ সে-দিনই উপ্ত হয়েছিল, কি জানি কার প্রেরণায়।

নানা প্রকার প্রভাবে ও পরিস্থিতিতে, নানা প্রকারের উস্কানীতে সে-দিন ইংরেজ সরকার চঞ্চল হয়ে, নয়া বাংলা অর্ডিন্যান্স বানিয়ে সুভাষচন্দ্র ও স্বরাজ্য দলের বহু বিপ্লবী নেতা ও কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করল (২৫শে অক্টোবর ১৯২৪)। দেশবন্ধু ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন—

—"If love of country is a crime, I am a criminal. If Mr. Subhas Chandra Bose is a criminal, I am a criminal." তিনি বললেন—"দেশবাসী বুঝ, এ চণ্ডনীতির পেছনে গূঢ় উদ্দেশ্য। ওদের এ নীতি স্বরাজ্য দলের বিরুদ্ধে। সরকার আর কোন কোন স্বার্থবান্ ব্যক্তি এই দলের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব সইতে পারছে না।···আমরা এতে দুর্ব্বল হব না। আমাদের সঙ্গে নতুন নতুন কর্ম্মী আরও আসবে—আরও আসবে।"

শব্দ কিসের

(*W. H. Auden*এর *O what is that sound* কবিতা থেকে)

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

শব্দ কিসের। আসছে কারা। বাজছে দূরে—ঢাক্ না ?
উপত্যকা আসছে বেয়ে। জোরসে বাজে বাজনা।
নয়তো কেউ। সৈন্যদল। পোষাক লাল। কাঁপছে।
লাল পাগড়ী মাথায় বাহার। প্রিয়া, ওরা আসছে!

কিসের আলো ঝলকে ওঠে! স্পষ্ট দেখি দূর নীলে
যেন অনেক সূর্য্য জ্বলে। ছড়ায় আলো সব মিলে।
কিছু তো নয়, প্রিয়া শোনো, ওদের হাতের সঙ্গীনের
মাথায় পড়ে সূর্য্যালোক। ছড়ায় আলো ভর দিনের।

বন্দুক হাতে আসছে ওরা ক'রছে কী যে আজ ভোরে।
সদলবলে এগিয়ে এসে চলছে পথে কোন্ জোরে ?
কিছু তো নয়, প্রিয়া শোনো, মহড়া-ছলে আজ ওরা
হয়তো শাসায়, ভাবছে মানুষ কাঁপবে প্রাণে দেশজোড়া।

হেঁটে নয় তো চড়লো গাড়ী রাস্তা ছেড়ে কোন্ পথে
যাচ্ছে ওরা কার কাছে যে ছুটছে সবাই জোর রথে।
থাকেন ডাক্তার যে বাড়ীতে থামবে ওরা সেইখানে কি।
আহত ওদের কেউ যে নয় তবুও ওরা থামবে না কি।

শাদা চুল যার মাথায় অনেক তার বাসাতেই অবশেষে
থামবে ওরা, সেই কি এই, খুঁজলো যারে দেশে-দেশে ?
প্রিয়া শোনো, তাও যে নয়, চলছে ওরা অন্য দিকে—
ব্যস্ততা যে অনেক বেশী, দৃষ্টি ওদের দিকে-দিকে।

তাহ'লে যে ক্ষেতের কৃষক তার কাছেই ওরা এসে
বলবে অনেক বাছাই কথা, বলবে মনে হেসে-হেসে।
তাও যে নয়, প্রিয়া দ্যাখো, কৃষক ভায়ার বাড়ী ছেড়ে
চললো ওরা দ্রুতবেগে ছুটলো সবাই সঙীন নেড়ে।

আচ্ছা, তুমি যাচ্ছো কোথায়, পাশেই এসে থাকো এখন।
সন্দেহ হয় নানা প্রকার উঠছে কেঁপে হৃদয়-নয়ন।
কিন্তু প্রিয়া, এবার বিদায়, আর যে থাকা যায় না ঘরে।
ভালো যে বাসি গভীর ভাবে রেখো মনে যাওয়ার পরে।

হায় রে ওরা আসছে দেখি ভাঙছে তালা এই যে ঘরে।
এই বাড়ীরই দুয়ার খুলে সব কিছুরই খোঁজ যে করে।
ঘরের মেঝেয় শব্দ পায়ের ওদের চোখে রোষ জ্বলে।
বুঝছি কেন যাচ্ছো তুমি আসছে ওরা কোন্ ছলে॥

তোমাকে

জীবনানন্দ দাশ

মাঠের ভিড়ে গাছের ফাঁকে দিনের রৌদ্র অই :
কুলবধূর বহিরাশ্রয়িতার মতন অনেক উড়ে
হিজল গাছে জামের বনে হলুদপাখির মত
রূপসাগরের পার থেকে কি পাখনা বাড়িয়ে
বাস্তবিকই রৌদ্র এখন ? সত্যিকারের পাখি ?
কে যে কোথায় কার হৃদয়ে কখন আঘাত করে।
রৌদ্রবরণ দেখেছিলাম কঠিন সময়-পরিক্রমার পথে—
নারীর,—তবু ভেবেছিলাম বহিঃপ্রকৃতির।
আজকে সে সব মীনকেতনের সাড়ার মত, তবু
অন্ধকারের মহাসনাতনের থেকে চেয়ে
আশ্বিনের এই শীত স্বাভাবিক ভোরের বেলা হ'লে
বলে 'আমি রোদ কি ধূলো পাখি না সেই নারী ?'
পাতা পাথর মৃত্যু কাদের ভূকন্দরের
থেকে আমি শুনি ;
নদী শিশির পাখি বাতাস কথা ব'লে ফুরিয়ে
গেলে পরে
শান্ত পরিচ্ছন্নতা এক এই পৃথিবীর ঢলে
সুহাস হতে গিয়েও তবু বিষণ্ণতার মত।
যদিও পথ আছে—তবু কোলাহলে শূন্য দিগ্বিজয়ে
পুরুষ নারী রাষ্ট্র সমাজ ক্লান্ত হয়ে পড়ে ;
প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজের আত্মবোধের
দ্বীপের মত—
কী এক বিরাট অবক্ষয়ের মানব-সাগরে।
তবুও তোমায় জেনেছি, নারী, ইতিহাসের
শেষে এসে মানবপ্রতিভার
রূঢ়তা ও নির্জ্জনতার অবসানের মত
আলো আছে ব'লে তুমি মহাদেবের অপরিমেয় নীল-
কণ্ঠ মুছে নীলকণ্ঠ পাখির ব্যসনে তো পরিণত।

দূরেক্ষণ

হরপ্রসাদ মিত্র

অশোকের শিলালিপি এক দিকে,
সমতলে অন্য দিকে প্রাণ।
শস্য তোলে খামারেতে
জমা-খরচের বর্তমান।
ক্যামেরা-মুদ্রিত স্মৃতি
এ-যাত্রার বহু কাল পরে
যদি দেখি অন্য কালে, অন্য কোনো দূর অবসরে,
মনে হবে, এ ভ্রমণ আশ্চর্য প্রাচীন,
অনিন্দ্যমণ্ডিত ছিল এই সব পরিচিত দিন।

জীবনের স্রোত যায়,
তীরে জমে ছেঁড়া পাতা, ফুল।
প্রতিদিন সূর্য দেয় আলো,
কখনো মেঘের পর্দা কালো,
আলো-ছায়া বীথিকায় কতো
দীপ্ত চলেছে মিছিল,
ঝরা শেফালির মতো মৃত্তিকায় মুহূর্তে বাতিল।
নেবে সে উজ্জ্বল বেশ, নেবে সে সুবর্ণ স্মৃতিকণা
তার পর জ্বলে শুষ্ক, বালুবর্ণ, মৃত রাজপুতনা।

অশোকের শিলালিপি সেই মতো শ্মশান-প্রহরী
পাষাণের রন্ধ্রে জাগে এ কালের পুষ্পিত বল্লরী।

বললাম, বাসন মাজতে পারবি ?

বললে, পারবো।

জল তুলতে ?

কালো শরীরের পেশি ফুলিয়ে জবাব দিলে, খুব।

বাজার করতে ?

এবারে ও হেসে ফেললে, তা আর পারবনি ? তবে হিসেব করতে আমার মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যাবে। দু'-এক পয়সার গণ্ডগোল হয় যদি নিজগুণে মাপ করে নিবেন।

আর কিছু জিজ্ঞাসা করার ছিল না। খুসি হয়ে ওকেই বহাল করলাম। না করে উপায়ও নেই। ১৯৪২ সাল। কলকাতায় নতুন করে বাসা বেঁধেছি। লোকজন আবার সব একে একে ফিরে আসছে। কিন্তু আশানুরূপ চাকর পাওয়া যাচ্ছে না। দু'এক জন যা পাওয়া যায় তারাও দু'দিন থেকে চম্পট দেয়। রোজ বাজার করে অফিসে যেতে হিম-সিম খেয়ে যাই।

এরি মধ্যে এক দিন পাওয়া গেল মধুকে। ঘটনাটা স্মরণীয় বলে উপরে উল্লেখ করেছি। তখন সবে মেদিনীপুরে প্লাবন হয়ে গেছে। এক দিন বাজারে বেরুতে যাবো, দেখি, অত্যন্ত কালো, কর্কশ অথচ জোয়ান চেহারার এক জন বাইরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে উৎসুক চোখে কী দেখছে। আমাকে দেখে উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করল, বাবু, চাকর রাখবেন।

হাতে যেন স্বর্গ পেলাম। চাকরই তো খুঁজছিলাম। অবশ্য আমার ছোট সংসার। বাচ্চা মতন একটা চাকর হলেই ভালো হত। কিন্তু পাওয়া যায় না, উপায় কী। দরজার সমুখে দাঁড়িয়েই ওকে সব কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

নাম মধু। ভেসে-যাওয়া মেদিনীপুর থেকে এসেছে। জোত-জমি নোনা জলে থৈ-থৈ করছে, সেখানে আর শীগ্‌গির চাষ হবে না। স্বজন-পরিজন বলতে দু'টো বলদ আর স্ত্রী। বলদ দুটো বানে ভেসে গেছে, স্ত্রীকে এক চেনা-লোকের জিম্মা করে দিয়ে ও কলকাতায় চলে এসেছে।

আমার স্ত্রী প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। ওই গুণ্ডামার্কা লোকটাকে তুমি কোন্ সাহসে রাখলে। ও যদি, দুপুরে কেউ থাকে না, একটা কিছু নিয়ে সরে পড়ে। কিছু নিয়ে সরে পড়তে যে কোন চাকর পারে। তা হলে তো আর চাকর রাখাই হয় না। কিন্তু মধু যে অন্ততঃ সৎলোক সে পরিচয় দু'দিনেই পাওয়া গেল। বাজার খরচের হিসেবে দু'এক পয়সার গোলমাল ছাড়া ওঁর চরিত্রে আপত্তিকর কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি।

তাছাড়া লোকটা খাটে একেবারে অসুরের মত। সকালে উঠে বাসন মাজছে, উনুন ধরাচ্ছে, মসলা বাটছে, জল তুলছে, বাজার যাচ্ছে। ওর কাজের ত্রুটির জন্যে কোন দিন আফিসে যেতে আমার বেলা হয়নি।

আর খুকিকে ও ভালোবাসে খুব। এত কাজের ফাঁকে ফাঁকে ও খুকিকে সাজিয়ে দিচ্ছে, ঘুম পাড়াচ্ছে, পার্কে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। খুকিও মধুকে পেলে আর আমার কাছে ঘেঁষে না। এমন কি ওর মার কাছেও বোধ হয় না।

—তোমার ছেলে-পুলে নেই মধু ?

মধুর রোমশ ভ্রূযুগল স্ফীত হয়ে ওঠে। কালো কালো পুরু ঠোঁট দু'টি ফাঁক হয়ে সাদা দাঁত বেরিয়ে আসে। বলে, ছিল। একটা ছেলে, নাম দিয়েছিলাম গণেশ। তাইত আমার ইস্ত্রিকে ডাকি গণেশের মা বলে। তা ছেলেটা বাঁচলনি বাবু। গেল সনে মরে গেইচে।

মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করি, তোর দেশে যেতে ইচ্ছে করে না মধু।

লাজুক মধু ফিক্ করে হেসে ফেলল। বলল, করে বাবু। গণেশের মা রয়েছে। কিন্তু অনেক খরচ। থাকগে! তার চেয়ে ওকে ক'টা টাকা পাঠিয়ে দিলেই হবে।

মাইনে দিতাম ওকে সাত টাকা। তাছাড়া বাজারের হিসাবে দু'-তিন পয়সা গণ্ডগোল করে মধু আরো গোটা তিনেক টাকা রোজগার করত। নিজের বিশেষ কিছু খরচ ছিল না। সব আমার এখানেই পেত। খালি পান খেত খুব। আর একটা সখ ছিল মধুর। ছোট একটা হাত-আয়না নিয়ে অবসর মত টেড়ি বাগাত।

মুখ বুজে কাজ করে যায় মধু, খালি মাস-পয়লার পর একবার দেশে যেতে চায়। কিন্তু আমার স্ত্রী রাজি হন না। বলেন, তুমি গেলে আমার সংসার যে ছন্নছাড়া হয়ে পড়বে মধু, আমি একা সামলাব কী করে। তাছাড়া খুকিও তোমাকে ছাড়বে না দেখো।

মধুর চোখে বিষণ্ণ একটু ছায়া নামে। আমার স্ত্রী বোঝান—তাছাড়া যেতে-আসতে খরচও তো আছে। কুড়ি-পঁচিশ টাকার



বাবু

সন্তোষকুমার ঘোষ

কম না। তার চেয়ে দশটা টাকা তুমি গণেশের মার নামে পাঠিয়ে দাও। আর আমার থান-দুই পুরনো শাড়ীও দিচ্ছি।

মধু আর জবাব দেয় না। বিকেল বেলা বাসায় এসে দেখি কলতলায় বসে যথারীতি অসুর-বিক্রমে বাসন মাজছে।

—অনেক রাতে স্ত্রী শুতে আসেন। জানালা খোলা থাকে। দক্ষিণ থেকে ফুল-গন্ধবহ একটুখানি হাওয়া আসে। হেসে হাতের বই বন্ধ করি। বলি সারা হ'ল ?

—হাঁ।

—মধু কী করছে। শুয়েছে ?

স্ত্রী খিল-খিল করে হেসে উঠলেন। উহুঁ। দেখলুম, উঠোনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে কবিত্ব করছে।

—ওর বোধ হয় মন খারাপ হয়ে আছে।

—মন খারাপ হতে যাবে কেন ?

প্রবল আকর্ষণে স্ত্রীকে কাছে টেনে নিলাম। বললাম, কেন, তা বোঝ না ? আজ ছ'মাস ওর গণেশের মাকে দেখেনি। তাছাড়া অমন সুস্থ, সবল, জোয়ান মানুষ। জৈব প্রয়োজনও তো আছে।

স্ত্রী জৈব কথাটার মানে জানতেন না। আন্দাজে কী বুঝে আরক্ত হয়ে বললেন, যাঃ, তুমি ভারি বিশ্রী কথা বলো।

মাঝে মাঝে মধুর চিঠি আসে। গণেশের মা লিখে পাঠায়— গ্রামের লোক-জনকে খোসামোদ করে। সেখানেও সে সুখে নেই। ফসল ভাল হয়নি। খুব আক্রা চলছে। মধু যা টাকা পাঠায় তা ক'সের চাল কিনতেই ফুরিয়ে যায়। আর সব খরচ চলে কিসে ? গ্রামের অনেক লোক সহরে ভেগেছে। মধু একবার স্বচক্ষে এসে সব ব্যাপার দেখে যাক্। তার ওপর খানিক দূরে একটা মিলিটারির ছাউনি পড়েছে। লোকগুলো সব-দিন দুপুরে ঘুরে বেড়ায়। গণেশের মার ভারি ভয় করে।

মধুকে বলি, মন খারাপ করিস্ না মধু। টাকা জোগাড় কর। বড়দিনের সময় তোর বৌকে একবার দেখে আসিস্।

বড়দিন ? মধু বোকা চোখে তাকায়। মনে মনে হিসেব করে। এখনো দু'মাস। একষট্টি দিন !

আমারো একটু মায়া হ'ত। কিন্তু চিন্তাটাকে বেশি প্রশ্রয় দিতাম না। এমনি আরো হাজার মধু কলকাতায় আছে। তারা দু'-তিন টাকা রোজগার করে। দশ বছরেও দেশে গিয়ে একবার স্ত্রীকে দেখতে পায় কি না সন্দেহ।

হঠাৎ এক দিন শুতে এসে রাত্রে স্ত্রী গম্ভীর গলায় বললেন, দেখো, মধুকে আর রাখা চলবে না।

উচ্চকিত হয়ে বললাম, কেন ? পয়সা-কড়ি কিছু সরিয়েছে না কি।

গম্ভীর কণ্ঠে স্ত্রী বললেন,—না ওর···খারাপ অসুখ করেছে। সারা গায়ে কী সব···

খারাপ অসুখ ? বুঝলে কী করে ?

—আজ একটা মলম লাগাচ্ছিল যে। ও বেরিয়ে যেতেই মলমটার লেবেল পড়ে নিয়েছি। ওই সব খারাপ অসুখের কথা লেখা আছে।

বললাম, দেখলে তো। এত দিন বৌ-ছাড়া হয়ে পড়ে রয়েছে, হবেই তো। বেচারাকে বরং মাঝখানে একবার দেশে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

স্ত্রী টিপ্পনী কাটলেন, তোমরা পুরুষ জাতটাই পশু। বৌছাড়া হলেই ওই সব অসুখ জুটিয়ে আনতে হবে না কি।

পরদিন সকালে মধু খুকিকে তুলে মুখ ধুইয়ে দিতে যাচ্ছিল, আমার স্ত্রী বললেন, খবর্দার মধু, খুকিকে তুমি ছুঁয়ো না।

আদেশের নিষ্ঠুর তিক্ততায় মধু ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। বলল, কেন কী হয়েছে মা !

আমার স্ত্রী বললেন,- আমরা সব জেনে ফেলেছি। সব কথা মুখে আনা যায় না। এটুকু বলে রাখি, কোন ভদ্রলোকের বাড়ী তোমার স্থান নেই। আজই তোমার মাইনে চুকিয়ে দিচ্ছি, রোসো। মাইনে আনতে স্ত্রী ঘরের মধ্যে গেলেন। মাথা নীচু করে মধু বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। চোখে ওর দু'ফোঁটা জলও এসেছে দেখলাম। খুকিকে ও সত্যিই ভালবেসে ছিল।

কেমন একটু মায়া হ'ল। বললাম, তুমি চিকিৎসা করাবে মধু ?

ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল মধু, কোন জবাব দিল না। এ-সব রোগের চিকিৎসায় অনেক খরচ, সে জানত, তাই হাতুড়ে ওষুধ কিনে এনেছিল। তখন সবে এ-সব অসুখের জন্ম সরকারী হাসপাতাল খোলা হয়েছে। তাদেরি এক জন ডাক্তারকে চিনতাম। মধুকে নিয়ে গেলাম তার কাছে। শুনলাম কিছু দিন ওকে হাসপাতালে থাকতে হবে। একেবারে সম্পূর্ণ নীরোগ, সুস্থ হয়ে তবে বেরিয়ে আসতে পাবে।

মাসখানেক বাদে এক দিন সকালে দেখি আবার ফিরে এসেছে !

—কী রে মধু! রাহুমুক্ত মধু সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সহাস্যে বলল, আজ হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিলে বাবু।

—বেশ, বেশ, তার পর ?

তার পর আর কি, মধু আবার এখানেই থাকতে চায়। কলকাতা শহরে আর কোথাও তার আশ্রয় নেই; সে জানে, আমরাই তার মা-বাবা।

মধুর গলার সাড়া পেয়ে আমার স্ত্রীও পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তার দিকে তাকিয়ে মধুকে আশ্বাস দিতে ইতস্ততঃ করছিলাম।

মধু ব্যাপারটা বুঝল। উঠে গিয়ে স্ত্রীর পা দু'খানা ধরে শুয়ে পড়ল।—বিশ্বাস করুন মা, আমার আর কোন রোগ নেই। একবারে সেরে গেছি। একবার যে দোষ করেছি, আর তা কখনো হবে না।

সুতরাং মধু ফের কাজে বাহাল হ'ল। সংসারও চলছিল না। এই দৈত্যাকৃতি লোকটা ভাত কিছু বেশি খায় বটে, কিন্তু কাজ করে চতুর্গুণ।

এবারে ঠিক করেছিলাম, মধুকে মাঝে মাঝে দেশে যেতে দেবো। মাস খানেক পরে মধুকে এক মাসের মাইনে, আরও গোটা কতক টাকা দিয়ে বললাম, মধু দেশ থেকে ঘুরে এসো। অনেক দিন গণেশের মাকে দেখনি।

খুশি হয়ে মধু আমাদের দু'জনের পায়ের ধুলো নিলে। খুকিকে আদর করে পোঁটলাটা নিয়ে যাত্রা করলে। পোঁটলায়, আলতা ছিল, ছিল ফুলেল তেল, আর একখানা ডুরে শাড়ী। গণেশের মা ভালবাসত।



কার কপাল আর ফাটে কার

আশীষকুমার বর্ম্মণ

মাধুরী একা-একা। সে যেমন একা-একা তেম্নি। সঙ্গিহীন, নিঃসঙ্গ, কেবল নিজের প্রতিবিম্ব মাড়িয়ে মাড়িয়ে পায়চারী করে বেড়ায়। প্রতিচ্ছায়াটা মাঝে মাঝে কী উদ্ভট লম্বা হয় আর মাঝে মাঝে ছোট্টো বেঁটে গুরগুট্টি।

অদ্ভুত লাগে মাধুরীর ওটাকে, নিজের ছায়াকে। বড় হচ্ছে ছোটো হচ্ছে, এক রকম নয়, এক রকম থাকছে না, থাকে না। আর ছায়াটাকে দেখতে দেখতে কান্না এসে যায়, ব্যথাটা বড় হয়ে ওঠে, বুকের মধ্যের ক্ষতটার স্মরণ হতে থাকে।

দেখতে দেখতে আর দেখতে পারে না মাধুরী: দু'চোখ তখন ঝাপসা হয়ে গেছে। দু'গাল তখন নোনা-নোনা জলে চটচটে। চোখের পাতা ভিজে-ভিজে ভারী-ভারী। হঠাৎ ঠোঁটটা থরো থরো কাঁপে, থরো থরো। বাতাস-লাগা পাতার মত।

বড় বাড়ীটার মধ্যে মাধুরী তার দুঃসহ দহন নিয়ে বেড়ায়। ঘোরাঘুরি করে, তদারক করে, বকাবকি করে। রাত্রে স্বামিসঙ্গ। সমস্ত দিন তবু কাটে একটা ভারে ভারে, মনের মধ্যের এক আতুরতায়।

তবু তখন কর্ম্মব্যস্ত থাকে সে, ইচ্ছে করেই নিজেকে জড়িয়ে নেয় সংসারের সাতে-পাঁচে। খুটখাট আওয়াজ করে টুকটাক কাজ করে। টুকিটাকি নাড়ে, এটা-সেটা ঘাঁটে। নেহাৎ দুর্মদ বিরক্তি মাঝে মাঝে যখন মন ছেয়ে ফেলে, যখন মনে হয় সমস্ত সংসার, শান্তি আর পৃথিবী ছাই হয়ে উড়ে-পুড়ে যাক, তখন ঝি-চাকরগুলোর ওপর একটা ঝড় বইয়ে দিয়ে যায়।

বলে—মোক্ষদা, তোমার কী কাণ্ডজ্ঞান নেই?

—কেন মা, কী করলুম?

—কী করলে! কী করনি?—নাঃ, তোমায় নিয়ে অসম্ভব! ক্ষোভ জমে ওঠে মাধুরীর। কিছুক্ষণ নিষ্পলক নিঠুর চোখে সে চেয়ে রইল হেঁট মাথা মোক্ষদার পানে। পরে কথা বলে আবার—তুমি দিন দিন পুরোনো হচ্ছ কী নতুন হচ্ছ বুঝি নে। সাবানটা আমার যে সেই চানের ঘরে পড়ে আছে তো পড়েই আছে; অথচ কখন আমার চান হয়ে গেছে!

—হাঁ মা, বড্ড ভুল হয়ে গেছে, এক্ষুনি যাই। মোক্ষদা সুমুখ থেকে পালায়। আধ ঘণ্টাও হয়নি গিন্নী স্নানের ঘর থেকে বেরিয়েছেন, ইতিমধ্যেই আগুন কী করে জ্বলে মাথার মধ্যে?

দিন রাত্রি হয়। আকাশে—অনেক দূরের আকাশে নক্ষত্র চিকচিক করে ওঠে। শুকতারা কিরণ বিতরণ ক'রে, উজ্জ্বল হতে ম্লান হয়ে আসে। হলুদ হয়ে ডুবে যায়। শুক্লপক্ষে চাঁদ ওঠে, মাধুরীর ঘর-বারন্দা-বাড়ী এক নরম আলোয় শিরশির করে। স্নিগ্ধ হয়ে যায়।

কোনো সুদূর পাহাড়ের গায়ে-গায়ে, কোনো ঘন বনের গাছ-গাছড়ার ফাঁকে, কোনো বাতাস-দোলা ধান ক্ষেতের মধ্যে বা কোনো সুখী শান্ত চাষী-পরিবারের আঙ্গিনায়—এম্নি আলো-বিছানো আকাশের তলায় মাধুরীর চলে যেতে ইচ্ছে করে।

কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ায় অদূরের নারকেল গাছগুলোর ঝিরিঝিরির মধ্যে দিয়ে চাঁদ উঠতে মাধুরী দেখে। তামাটে মস্ত চাঁদ। মনে হয় বার বার কোনো ছোট্টো নদীর উপর কোনো ছোট্টো সাঁকোর কথা। ঝিকমিক ঝিকমিক ভেসে যাওয়া জল।

আর মাধুরী বাড়ীর মধ্যে নিজের ছায়া মাড়িয়ে মাড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়। ঘুরে বেড়ায় অশান্ত উত্তাপ নিয়ে।

—আমি একটা কথা বলব? জিগ্যেস করে স্বামীকে মাধুরী।

নীরোদ চোখ তুলে চায়, হাতের খাবারটা থালার ওপর ধরে রাখে, বলে—বল?

মাধুরী পাখাটাকে একটু ভালো করে নাড়াতে থাকে, বলে—তুমি আবার বিয়ে কর।

বললাম, কবে ফিরবে মধু?

বলল, এজ্ঞে দিন-সাতেকের মধ্যেই ফিরব।

দিন-সাতেক নয়, মধুর ফিরতে সাঁইত্রিশ দিন লাগল। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে লজ্জিত মুখে বলল, গণেশের মা ছাড়তে চাইলেক না। দু'বছর বাদে গেনু।

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে স্ত্রী সেখান থেকে ছুটে পালালেন।

এসেই কিন্তু মধু আবার জ্বরে পড়ল। দু'দিন বাদেই ওর শরীরে আবার সেই রোগের উপসর্গ দেখা দিল, সরকারী চিকিৎসায় যা সম্পূর্ণ সেরে গিয়েছিল।

বললাম, এ কী রে মধু। এ-সব আবার কী। দেশে গিয়েও স্বভাব শোধরাস্‌নি? আবার কী সব জুটিয়ে এনেছিস্?

মধু হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল। বলল,—কিছু করিনি বাবু, বিশ্বাস করুন।

নিজের চোখ দু'টোকে কি অবিশ্বাস করব।

মধু কেবলি কাঁদে। আমার কোন দোষ নেই বাবু, আমার অদৃষ্ট মন্দ।

যত পীড়াপীড়ি করি, কিছুতে খুলে বলে না। খালি বলে, সে ভারি লজ্জার! আমি বলতে পারবনি।

চোখের ইঙ্গিতে আমার স্ত্রীকে সরে যেতে বললাম। তার পর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম, কী করে আবার হয়েছে, আমার কাছে খুলে বল্।

মধু মাথা নীচু করল, তার পর অনেক সংকোচে ধীরে ধীরে বলল···গণেশের মা···ওখেনেও মিলিটারিরা এসেছিল।

—হয় না কেন ?

—হতে নেই ব'লে।

—আইনের বাধা আছে ?

—না।

—শাস্ত্রেও শাস্তির বিধান নেই।

নীরোদ নিরুত্তর।

—ছেলেপিলে হচ্ছে না, হবেও না—মাধুরীর গলা বসে আসে—তা আর একটা বিয়ে করতে দোষ কী ?

বলে—আমার কপাল ফাটা, কিন্তু আর এক জনকে আনো সে কল্যাণীরূপে আসবে।

—কী বলছ মাধু। নীরোদ বলে।

—ঠিক বলেছি। যা সবাই বলতো, যা সবার বলাই কর্ত্তব্য।

—তুমি কী কেবল কর্ত্তব্যই করছ ?

—সে প্রশ্ন থাক। তুমি বিয়ে কর আবার।

—আমি জানি নে, আমি ও-সব বুঝি নে। নীরোদ খাওয়া শেষে উঠে যায়।

রাতে নীরোদ শুয়ে শুয়ে ক্লান্ত হয়ে আসে। ঘুম কৈ ? ঘুম—ঘুম ? আজ এ কী ছল, খেলা ? কী বিরক্তিকর, বিশ্রী !

পাশে মাধুরী নিঃসাড়, ঘুমুচ্ছে। আর, অনবরত গুন গুন করে চলেছে ওর মাথার মধ্যে সেই চিন্তা। সেই বদখেয়াল, বেয়াদপি। পোকারা ঘুট-মুট ঘুট-মুট করে চলেছে মাথার মধ্যে। মাথা ঝাড়া দাও, চোখ বন্ধ কর, তাড়াও—কিছুতেই পরিত্রাণ নেই। নেই-নেই-নেই পরিত্রাণ নেই। চিন্তাশক্তি-বোধ-সংযম, খেয়ে ফেলল—খেয়ে ফেলল !

নীরোদ মাথা ঝাঁকি দিয়ে বালিশের ওপর কনুই রেখে দু'হাতের মুঠোর উপর থুতনিটা রাখে। জানলা দিয়ে তবু আকাশ দেখা যায়।

—শরীর খারাপ হয়েছে তোমার ?

নীরোদ হঠাৎ ভয়ানক ভাবে চমকে যায়, বলে—ঘুমোওনি তুমি ?

—ঘুম আসেনি।

—অ !

—কিন্তু তোমার কী হয়েছে, অমন চমকে উঠলে কেন ?

—কী আবার হবে—নীরোদ হাসার চেষ্টা করে, বলে—চমকে উঠলাম হঠাৎ তোমার গলা শুনে।

—কেন, নতুন রকম মনে হ'ল ?

—না···মানে···

—মনে হল এক বিশ্রী অমঙ্গল যেন ?

—কী বলছ মাধু, তোমার মাথার ঠিক আছে তো !

—নেই—না ?

—ছিঃ, অমন ভাবে কথা বললে আমি পারি না।

মাধুরী অন্ধকারে বিচিত্র ভাবে হাসে।

সকালে আবার বন্ধুরা বৈঠকখানায় হাসে।

—কী হে চোখ ফুলো-ফুলো, এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন ?

—সে এক অদ্ভুত···

—বল বল : থামছ কেন ?

—বড়বৌ আবার বিয়ে করতে বলছে।

—করে ফেলো, ছোটবৌ না থাকলে বড়বৌ নামের সার্থকতা নেই।

—রসিকতা নয়, সংসারে অনেক জটিলতা থাকে। গম্ভীর গাঢ় স্বর নীরোদের।

বন্ধুরাও গম্ভীর হয়ে গেল। দায়িত্বসম্পন্ন হতে চেষ্টা করল।

—নিশ্চয়ই। সমর্থিত হয় নীরোদ।

—তাই বলছি বলাটা সোজা, আসলে তা নয়।

—তা ঠিক, তবে উনি মহান, নইলে নিজে এ কথা বলেন ! ওঁর মহত্ত্বের কাছে আমাদের মাথা নীচু করতেই হবে। বেশী বকেন যতীনবাবু, আর তিনিই বলেন কথাগুলো।

—অবশ্যই, ওঁর উদারতাকে সন্দেহ করার ক্ষুদ্রতা যেন তোমার না হয় নীরোদ। সতীশ সিংহ বলেন।

—সকলেই আমরা একমত এ সম্বন্ধে।

—কিন্তু···

—আবার কিন্তু !

—দেখি। আমি কিছু বুঝছি নে।

বুঝতে বেশী সময় লাগে না, দেখতেও লাগে মাত্র ক'টা মাস। তার পর এক শুভদিনে শুভযোগে লক্ষ্মী এলো ছোটবৌ হয়ে ! সামাজিকতা, ধুমধাম যথানিয়মে হবার পর বড়বৌকে সে দিন আর কেউ খুঁজে পেল না। কোথায় মিলিয়ে গেল সে।

তেমনি মিলিয়ে গেল অনেকগুলো দিন। অনেক সময়। সময়ের হিসেবে বছর পরে বছর আসে। ক'টা দেয়ালপঞ্জী শেষ হয়ে যায়।

ছোটবৌ লক্ষ্মীও ঘোরাঘুরি করে, হাসে, কথা বলে। মনের মধ্যে সর্বক্ষণ এক দুঃখী, কী ভিক্ষে করে।

বড় কান্না আসে, বড় ম্লান লাগে দুনিয়া। সর্বত্র এক শূন্যতা, এক অপূরণ আকুলি। পৃথিবীতে রজনীগন্ধা ফোটে, প্রেম সঞ্চার হয় বহু হৃদয়ে, মানব-মানবীর দেহ-মিলনে সঞ্জাত হয় শিশু। ভালই হয়, রাষ্ট্রবিপ্লব জাগে : কিন্তু ছোটবৌ শুধু মনে করে পৃথিবীর কী কোন পরিবর্ত্তন নেই, অল্প আবর্ত্ত ? কেবল রাত্রি ভোর হবে, ভোর সকাল, সকাল দুপুর, দুপুর বিকেল, তার পর সন্ধ্যা—রাত্রি ? এ সব দিন-দুপুর-রাত-ভোরের বিস্ময় ছোটবৌকে স্পর্শ করে না।

শুধু একটা হাহাকার, ধু-ধু মাঠের মধ্যে দিয়ে উষর এক হাহাকার। আর নীরোদ আজকাল গাঢ় গম্ভীর হয়ে গেছে। হয়ে গেছে বেয়াড়া রকমের বে-মজলিশি। বন্ধুজন আশ্চর্য্য হয়েছে, সন্দিগ্ধ হয়েছে, ক্ষুব্ধ হয়েছে, শেষে নাচার বলে সরে গেছে।

নীরোদও সরে-সরে অবশেষে এক দিন সেই ডাক্তারের কাছে এসেই হাজির। সেই ডাক্তার, যার কাছে বহু দিন ধরে, বহু বার ভেবেছে যাওয়া উচিত। অথচ আসেনি। আসেনি লজ্জায়। যৌবনের লজ্জায়।

আর সেই লম্বা গাঢ় লাল টকটকে মুখেই সে শুনল—সব কিছু।

যুগ-সাহিত্য

আশু চট্টোপাধ্যায়

কোনো যুগ যে সাহিত্যের যুগ নয়, এ-কথায় আমি বিশ্বাস করি না। যদি স্বীকার করে নিতেই হয় যে পূর্ব্ববর্তন যুগের চেয়ে এখন অভাব-অভিযোগ বেশী এবং এই নিরন্ন পরিবেশে ভাব-বিলাসের অবসর বা রুচি থাকতে পারে না, তবু ব্যাপক ভাবে এটা সত্য হলেও, সকলের কাছে নয়। এবং সাহিত্য চিরদিনই সকলের জন্য নয়। যে-সব দেশে শতকরা ছিয়ানব্বই জন শিক্ষিত সেখানেও বা কয় জন সত্যিকারের সাহিত্য বোঝেন বা পড়েন। যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেন এবং যাঁদের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি হয় তাঁরা সব সময় মাত্র কয়েক জন লোক, দেশের লোক-সংখ্যা অনুপাতে তাঁরা অধর্তব্য ভাবে মুষ্টিমেয়। কিন্তু সাহিত্য তাঁদের কাছে ভাববিলাস নয়, তাঁরা শুধু অন্ন জল বা রুটি খেয়ে বাঁচেন না, সাহিত্য তাঁদের জীবনধারণের এবং সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টির অপরিহার্য্য অংশ। শ্রীযুক্তা রেবেকা ওয়েষ্ট যার নাম দিয়েছেন—the strange necessity.

শরীর-ধর্ম্ম এবং প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে প্রকৃতি আমাদের উপর প্রভুত্ব করে। এই দু'টি জিনিষ যত দিন আমাদের জীবনে প্রধান এবং অনেক ক্ষেত্রে একমাত্র স্থান অধিকার করে থাকে, তত দিন আমরা প্রকৃতির দাস, আমাদের বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা নেই। প্রথম মানবকে পরমেশ্বরের যে প্রথম অভিশাপ, তাই আমাদের দুই কাঁধের উপর ভারস্বরূপ হয়ে ওঠে। জীবন একঘেয়েমীর ক্লান্তিতে মৃত্যুর অভিমুখে ছুটে চলে। যে-মুহূর্ত্তে আমরা নিত্য প্রয়োজনের বাইরে দাঁড়িয়ে সাধারণ অর্থে বা অপ্রয়োজনে তার আকাশের দিকে হাত বাড়াই, চির-জ্যোতি নক্ষত্রের অজস্র আলোর সম্পদ্ আমাদের আত্মার অন্ধকারকে অভয় দেয়; সেই মুহূর্ত্তে আমরা অবিনশ্বর জীবনের অস্তিত্ব অনুভব করি। সেই মুহূর্ত্তে আমরা প্রকৃতির শাসনের বাইরে, মৃত্যুর শাসনেরও বাইরে। আমরা তখন ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ জীব, তাঁর আসনের অবিসংবাদী উত্তরাধিকারী। আমরা তখন নিজেরাই স্রষ্টা, আনন্দলোকের অধিবাসী। এই জীবনের ও এই আনন্দের স্বতঃ উচ্ছ্বসিত জয়গানই হচ্ছে সাহিত্য। তাই সাহিত্য মাত্র কয়েক জনে লেখেন এবং কয়েক জনে পড়েন।

সাহিত্যের প্রেরণা যেমন এই মহত্তর জীবন, তেমনি তার রূপ বা প্রকাশভঙ্গীও একটা আছে যেটা কখনই নিত্য নয়। এই রূপে পরিবর্ত্তন আসে বিভিন্ন যুগে লোকের বিভিন্ন জীবনযাত্রা ও রুচি অনুসারে। বিষয়বস্তুও যুগে যুগে বদলে যায়, কারণ, দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে লোকের দৃষ্টি-ভঙ্গী প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু এ-কথা কখনই ভুললে চলবে না যে, রূপটা সাহিত্যের বাহন মাত্র, বিষয়বস্তুও তাই। যে-অমৃতের স্পর্শে সাহিত্য রসায়িত জীবন লাভ করে, সেইটাই সাহিত্য-বিচারে এবং সাহিত্য-উপভোগে মুখ্য জিনিষ। যুগ-সাহিত্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা যখন সাহিত্য থেকে বিষয়বস্তু ও প্রকাশ-ভঙ্গীকে বিচ্ছিন্ন করে' নিয়ে সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করতে যাই তখন সেই প্রচলিত গল্পের অন্ধদের হস্তি-জ্ঞানের মতই ব্যর্থ ও হাস্যোদ্দীপক হয়ে ওঠে, হাতীর অঙ্গ-বিশেষকে হাতী বলে কল্পনা করি মাত্র।

তাই যে-কোনো বিষয়বস্তু ও যে-কোনো প্রকাশভঙ্গীকে আশ্রয় করে' সাহিত্যের সৃষ্টি হতে পারে। কোনো লেখক যদি দেশের আধুনিক সমস্যাকে বাদ দিয়ে অতি তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে এমন সাহিত্য তৈরী করতে পারেন যা রস-বিচারে গ্রাহ্য, তাহলেই তিনি নির্ভুল ভাবে সাহিত্যিক। দেশের অধুনাতন সমস্যা এবং দেশবাসীর জীবনের আশা-নৈরাশ্য কেন তাঁর মনে স্থান পায় না, এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করা চলতে পারে, হয়ত তাঁর উদাসীনতা নিয়ে তাঁকে ধিক্কার দেওয়াও যায়, তবু প্রথমে তাঁকে এক জন খাঁটি সাহিত্যিক বলে' স্বীকার করে নিতে হবেই। আর এ-কথাও স্বীকার্য্য যে, ওই সমস্যাগুলি নিয়েও সাহিত্য সৃষ্টি তিনি করতে পারতেন যদি অবশ্য তারা তাঁর মনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ হয়ে তাঁর নিজস্ব জিনিষ হয়ে উঠত। বিষয়-বস্তুকে সাহিত্য হয়ে উঠতে হলে' তাতে লেখকের ব্যক্তিত্বের অকপট স্পর্শ থাকা চাই-ই। লোকের উপহাসের ভয়ে এবং তথাকথিত সাহিত্যিক হবার লোভে লেখক যদি তাঁর উপলব্ধির বাইরের জিনিষ নিয়ে লিখতে যান তাহলে তাঁর লেখা আধুনিক হয়ত হবে কিন্তু সাহিত্য কখনই হবে না। লেখায় মুন্সিয়ানা থাকলে দিন-কতক হয়ত পাঠক-চিত্তকে তিনি ভোলাতে পারেন, কিন্তু রসিক-চিত্তে স্থান পাবেন না।

একটি ছোট নিজস্ব গল্প বলি। উত্তর-কলিকাতায় আমার বাড়ীর সামনে একটি প্রকাণ্ড পোড়ো বাড়ী ছিল, লতা-গুল্মে আচ্ছন্ন। খুব সম্ভব সহরের আদি-যুগে ওটির জন্ম এবং পথিক ও প্রতিবেশি-চিত্তকে প্রত্যহ পীড়া দিয়ে বাড়ীটির আজও এমন কদর্য্য ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার মানে কোনো দিন খুঁজে পাইনি। এক দিন বিপর্য্যস্ত মস্তিষ্ককে শীতল করবার জন্যে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি। শীতের মধ্য-রাত্রি, পথ জনশূন্য। হঠাৎ চেয়ে দেখি, অস্তোন্মুখ সোনালী চাঁদ সেই পোড়ো বাড়ীটার মাথার উপর নেমে এসেছে। দিনের আলোয় সে কথা স্মরণ করে হয়ত হাসি আসে, কিন্তু সেই অনির্ব্বচনীয় মুহূর্ত্তে মনে হয়েছিল পৃথিবীর সব রূপকথার উৎস হয়ত ওই পোড়ো বাড়ীটাই এবং ওই হলুদবর্ণ চাঁদ ভিতরে নেমে গেলেই সেখানকার রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, কোটালপুত্রেরা প্রাণ পেয়ে ঘরে ঘরে ঘুমন্ত রাজকুমারীর সন্ধান ক'রে বেড়াবে এবং রাজকন্যার দ্রুত সঞ্চারময়ী সখীদের চকিত পদশব্দে ও অস্ফুট হাস্যগুঞ্জনে সেখানকার বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে।

গল্পটি আধুনিক নয়। এর আগে বহু পোড়ো বাড়ীকে আশ্রয় করে বহু লোকের কল্পনা এমন বহু অনির্ব্বচনীয় মুহূর্ত্তে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। তবু সেই সময় গল্পটি হয়ে উঠেছিল একেবারে ব্যক্তিগত ভাবে আমার নিজস্ব, আমার নিজের উপলব্ধির দান।

তবে এ-কথা এক-শ'বার বলতে পারেন এবং আমিও তা স্বীকার

করে' নেব যে কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে লোকের দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে যে পরিবর্ত্তন আসে কোনো সাহিত্যিকের লেখায় তার দর্শন না পেলে বুঝতে হবে যে, তিনি জড়ধর্ম্মী এবং সেই জন্তই সাহিত্যিক হবার অনুপযুক্ত। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে, যিনি প্রকৃত সাহিত্যিক, তথাকথিত সাহিত্যিক নন, তিনি জীবন্ত হতে' বাধ্য এবং তাঁর লেখায় কালের ছাপ আপনি আসবে রসায়িত হয়ে, বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গীর উপর অতিমাত্রায় দৃষ্টি রেখে তাঁকে কষ্ট করে' উৎকট আধুনিকতার কসরৎ দেখাতে হবে না।

এখন, এই রসায়িত সাহিত্য স্বাভাবিক ভাবে যে-সব আধুনিক বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকাশভঙ্গীকে আশ্রয় করে, সেগুলি কি? এবং আমাদের দেশে এখন সেগুলি কি হতে' পারে?

প্রথমেই জানিয়ে রাখা ভাল যে, যাঁদের ধারণা সত্য সব সময় নিরঙ্কুশ ভাবে স্বতঃসিদ্ধ এবং সনাতন, আমি তাঁদের দলে নই। আমার মতে দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সত্য আপেক্ষিক। আমার কাছে যা সত্য, ইংল্যাণ্ডের লোকের কাছে তা সত্য নয়, এমন কি দশ বছর পরে আমার কাছেও তা হয়ত সত্য থাকবে না। কাজেই সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে সকলের কাছে সমান উপলব্ধির জিনিষ যে কোনো সাহিত্যই হতে' পারে না, এ-কথা আমি জানি। সেকসপীয়রের বা গ্যয়টের সাহিত্যের রস তাঁদের সময়ের ইংল্যাণ্ডের ও জার্ম্মাণীর লোকেরা যে রকম উপভোগ করেছিল আমরা এখন তার শতাংশও করতে পারি না। আর এ-যুগে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে-স্বাদ আমরা পাই, ইংল্যাণ্ডের লোকের তা আয়ত্তের বাইরে।

কিন্তু এ-কথাও মনে রাখা দরকার যে, আমাদের দেশেও তাঁর লেখার রসগ্রহণের ক্ষমতা সকলের পক্ষে সমান নয়। তাঁর অজস্র বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গী অপূর্ব্ব সাহিত্যরূপ পেয়েও সকলের কাছে সাড়া পায় না। তাঁর লেখা পড়ে' আনন্দ পেতে হলে' যতটুকু কালচার থাকা দরকার, তা যে মাত্র কয়েক জনেরই আছে তা বুঝি। কিন্তু আমার মনে হয়, সেইটাই একমাত্র কারণ নয়। তা যদি হত তাহলে "কল্লোল"—"কালী-কলম" যুগের বস্তি-সাহিত্য পাঠকদের মধ্যে প্রাধান্ত পেত। কারণ, তার বিষয়বস্তু কালচারের বাইরের জিনিষ। তবু আমরা জানি, সে-সাহিত্য দেশের অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও ব্যাপক ভাবে আসন পেতে পারেনি। আজ-কাল যে বামপন্থী সাহিত্যিকেরা শ্রমিকদের জন্ত অশ্রু-বিসর্জ্জন করছেন তাঁরাও তা পাচ্ছেন না ও পাবেন না।

এর একটি সহজ ও স্পষ্ট কারণ আছে। এঁদের কারুর সাহিত্যই সমাজের ব্যাপক ও বৃহৎ সত্যকে আশ্রয় করেনি। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথেরই যে শুধু আন্তরিকতা ছিল, তিনিই যে কেবল তাঁর বিষয়বস্তুকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং বস্তি-পন্থী ও শ্রমিক-পন্থী সাহিত্যিকরা তা করেননি, এ-প্রশ্ন আমি তুলব না, কারণ, তা প্রমাণ-সাপেক্ষ, যদিও এতে আমি আংশিক ভাবে বিশ্বাস করি। কিন্তু এই কথাই আমি স্পষ্ট ভাবে বলতে চাই যে, এঁদের কারুর সাহিত্যই ব্যাপক ও প্রধান ভাবে সামাজিক নয়! যুগ-সাহিত্য তাকেই বলব যা কোনো যুগের কোনো দেশের প্রধান ও ব্যাপক সমস্তাগুলিকে এমন ভাবে রূপ দেবে যে লোকের মনে সেগুলির সমাধানের ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠে সেই সমাধানগুলিকে এগিয়ে নিয়ে আসবে। অবশ্য সমাধান এগিয়ে না ও আসতে পারে কিন্তু লোকের চিত্ত প্রবল ভাবে নাড়া পাবেই এবং তখন লোকে সেই সাহিত্যকে উপভোগ করবে, তা থেকে আনন্দ পাবে, তাকে নিজস্ব সম্পদ্ মনে করবে, তাকে ভালবাসবে। কিছু অংশে শরৎ সাহিত্যকে লোকে এ-ভাবে নেয়।

এখন এখানে আপনারা তর্ক তুলতে পারেন যে, সাহিত্য আপনাদের নিজেদের ব্যক্তিগত অনুভূতির দান। আপনাদের নিজেদের আনন্দ এবং আপনাদের নিজেদের সমস্তা-সমাধানেই তার সার্থকতা। অপরে আনন্দ না পেলে এবং অপরের সমস্তা-সমাধানের ইঙ্গিত তাতে না থাকলে আপনাদের কিছুমাত্র যায়-আসে না। এর উত্তরে আমি বলব যে, মুখে এ-কথা বললেও আপনারা নিজেদের ব্যবহারেই এ-কথা প্রতিবাদ করছেন—আপনারা সে-লেখা ছাপিয়ে সকলের সামনে হাজির করেন। তার কারণ আপনারা সামাজিক জীব, সমাজের সঙ্গে আপনাদের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। সামাজিক চিন্তা ও মনন-ধারার সঙ্গে আপনাদের চিন্তা ও মননধারাকে মিলিত হতে দেখলে তবেই আপনারা তৃপ্ত হন, সার্থক হন।

এ-বিষয়ে আধুনিক চিন্তা-জগতের এক জন শ্রেষ্ঠ অধিনায়ক, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক এবং রয়্যাল সোসাইটির সদস্য Dr. A. N. Whitehead কি বলেছেন শুনুন—

"A man is more than a serial succession of occasions of experience. He has the unity of a wider society, in which the social co-ordination is a dominant factor in the behaviours of the various parts. Life is the co-ordination of the mental spontaneities throughout the Occasions of the society."

সেই জন্তই এবং প্রত্যেক যুগে চিন্তা, মননধারা এবং জীবন-যাপনের পদ্ধতি নূতন রূপ নেয় বলেই এমার্সনের ভাষায়, "The experience of each age requires a new confession, and the world seems always waiting for its poet." প্রত্যেক যুগ তার নিজস্ব সাহিত্যিককে চায়। সাহিত্যের ইতিহাসে সেই যুগস্রষ্টা ও যুগাধিপতিদের আসন চিরদিন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে।

কিন্তু এই যুগাধিপতি কবি ও সাহিত্যিকরা যুগের আংশিক ও তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে কালক্ষেপ করেন না। এঁরা যুগ-সৃষ্ট নন, এঁরা এঁদের যুগের আশা-নিরাশা, আনন্দ-ক্ষোভকে ত রূপ দেনই, এঁরা এঁদের যুগের চিন্তা ও ভাবধারাকে সুনিয়ন্ত্রিত করে' আদি-যুগ থেকে সাহিত্যের যে একটি বহমান স্রোত আছে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেন। এই tradition ও experimentএর মিলনের ভিতর দিয়েই আমাদের যুগ তৃপ্ত হয়, আমাদের আত্মা তৃপ্ত হয়, যে-আত্মা পিতৃপুরুষদের দেওয়া রক্তে অনবরত দোল খাচ্ছে

তাই জীবনের যে-একটি সূক্ষ্ম ধারা যুগ থেকে যুগে প্রসারিত, তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে' আমরা যখন কোনো যুগকে দেখতে যাই, তখনই ভুল করি। প্রত্যেক যুগের লোকেরাই কম-বেশী সুখী ও অসুখী। বাধা ও দুঃখ সব যুগেই থাকে। আধুনিক ইংল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনোবিদ্ প্রফেসর ফ্লুগেল বলেছেন, "All the zest of life is dependent upon obstacles and inhibitions of one kind or another." বাধা ও হাঙ্গামা না

থাকলে বাঁচার স্বাদ থাকে না। তাই এ-যুগেও নানা বাধা আছে, নানা বিপত্তি আছে। হয়ত গত মহাযুদ্ধে পৃথিবীর বাস্তব ও মনোজগতে যতটা ক্ষতি হয়েছে, এত ক্ষতি পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনই হয়নি। তবু J. M. Synge যখন বলেন, "Before verse can become human again, it must become brutal." তখন তাঁর সঙ্গে একমত হ'তে পারি না। কাব্য-জীবনের আনন্দ-ঘন পরিপূর্ণতার আভাস দেয়, যে আনন্দকে গভীরতম দুঃখের মধ্যেও খুঁজে পাবেন। তাই কাব্য কখনই পাশবিক হ'তে পারে না। আপনারা যদি আপনাদের লেখায় এ-যুগের হতাশাকে রূপ দিতে চান ত দিন। কিন্তু আপনারা যদি প্রকৃত সাহিত্যিক হন তাহলে আপনাদের লেখায় সেই হতাশা এমনি রসায়িত হয়ে উঠবে যে তা মানব-জাতির চিরকালের আকাঙ্ক্ষার আকাশকে স্পর্শ করে' উজ্জ্বল করে' তুলবে। আপনারা সার্থক হবেন।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রকাশভঙ্গী ও উপমা লক্ষ্য করবেন। তাতে এ-যুগের ছাপ স্পষ্ট পড়েছে, কিন্তু যে-বেদনা প্রকাশ পেয়েছে তা চিরকালের। ধরুন, এ-যুগের কাব্য-জগতের অধিনায়ক T. S. Eliotএর কয়েকটি লাইন—

Regard that woman
Who hesitates towards you in the
light of the door
Which opens on her like a grin.
You see the border of her dress
Is torn and stainted with sand.
And you see the corner of her eyes
Twists like a crooked pin.

The memory throws up high and dry
A crowd of twisted things;
A twisted branch upon the beach
Eaten smooth and polished
As if the world gave up
The secret of its skeleton,
Stiff and white.
A broken spring in a factory yard,
Rust that clings to the form that
the strength has left
Hard and curled and ready to snap.

ভাগ্যের ক্রীড়নক এই সঙ্কোচময়ীর দিকে তাকিয়ে আমরা আর 'grin' করতে সাহস পাই না, সে সোজাসুজি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশাধিকার পায়। আর এক জায়গায় এ যুগের স্বপ্নরিক্ততাকে ঠাটা করে তিনি লিখেছেন—

The moon has lost her memory,
A washed out smallpox cracks her face.

আর এক জায়গায়, ধরুন, যখন আপনারা পড়েন—

The lamp said,
Four o'clcck.
Here is the number on the door.
Memory!
You have the key
The little lamp spreads a ring on the stairs,
Mount.
The bed is open; the tooth-brush
hangs on the wall,
Put your shoes at the door, sleep,
prepare for life.
The last twist of the knife.

তখন এই জীবনের তুচ্ছতা আপনাদের বুকে পাথরের মত চেপে বসে, আপনাদের মধ্যে পূর্ণতর জীবনের যে-আদর্শ ঘুমিয়ে আছে তার দিকে আপনাদের মনের মোড় ফিরিয়ে দেয়। সেই জন্যেই এ-যুগের শ্রেষ্ঠ কবি T. S. Eliot, আর সেই জন্যেই আর কারুর কবিতা আপনাদের শোনাবার দরকার হয় না। আমার বক্তব্য নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে। তবু আমাদের বাঙ্‌লা ভাষাতেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের—

মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই
জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভীড়়।
মাল বয়ে বয়ে খাল হল যারা
আর যাহাদের মাস্তুল চৌচির,
আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল
বুকের আগুনে ভাই,
সব জাহাজের সেই আশ্রয়-নীড়।

পড়ি তখনও সমবেদনার একটি অনির্ব্বচনীয় মায়া আমাদের চিত্তকে আচ্ছন্ন করে, এই জীবনের ব্যর্থতার সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি করে' দেয়। মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাই—

দুনিয়ার কিনারায়,
যত হতভাগা-অসমর্থের নির্ব্বাসিতের নীড়!

তবু এ-কথা ভুললে চলবে না যে, এই বেদনা শাশ্বত, এ-হতাশা সব যুগেই ছিল, হয়ত কিছু কম অংশে ছিল এই মাত্র। ঠিক এই ভাবে না হোক, তাঁর এই নীচের লাইনগুলি প্রাচীন যুগের কোনো কবি কি লিখতে পারতেন না, বা ভবিষ্যতের কোনো কবি লিখতে পারবেন না?

ভুখ্ দিলে যে বুক দিলে যে
দুখ দিতে সে ভুলল না,
মৃত্যু দিলে লেলিয়ে পাছে পাছে।

তাই যখন দেখি 'কল্লোল' 'কালী-কলমে'র লেখকরা কয়েক জন বস্তিবাসীর দুঃখ নিয়ে আর এখনকার 'বামপন্থী' প্রগতিশীল লেখকরা মুষ্টিমেয় শ্রমিকদের দুর্গতি নিয়ে অশ্রু বিসর্জন করছেন, তখন হাসি আসে। বেদনাকে যদি রূপ দিতে হয় তাহলে তাকে বৃহৎ ও মহান্ রূপ দিতে হবে। হালের জগতের প্রতিনিধি না হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়ে বিক্ষুব্ধ জগতকে উপনিষদের গভীর বাণী শুনিয়েছিলেন রসায়িত ব্যঞ্জনায়। আর আজকের সাহিত্য কিসের প্রেরণা আনছে, কি আদর্শ দাঁড় করাচ্ছে যুব-শক্তির সামনে? কয়েক জন শ্রমিক ও বস্তিবাসী যে দুঃখ পাচ্ছে এই কথাটাই কি সব বড় লেখকদের বার বার জানাতে হবে এবং আমাদের বার বার জানতে হবে? তার সমাধানের ইঙ্গিত কোথায়? আর দুঃখের কথাই যদি জানাতে হয় তা'হলে এ-দেশের সব চেয়ে বেশী সংখ্যক লোক পল্লীবাসী, কৃষক।

তাদের সমস্যা ভয়াবহ। তাদের অবস্থা নিয়ে কোথায় সাহিত্যে প্রবল আলোচনা, কোথায় তাদের বোঝবার চেষ্টা, তাদের জন্ত সমবেদনা? আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের জীবনে প্রচুর গ্লানি, অপরিসীম নৈরাশ্য এবং অসহায় ব্যর্থতাকে ক'জন সাহিত্যিক রূপ দিলেন? চেষ্টা যে নেই তা নয়, কিন্তু তা সুনিয়ন্ত্রিত ও স্পষ্ট নয়। কৃষকদের জীবনে প্রবেশ করবার উদ্যম না থাকাই স্বাভাবিক কিন্তু লেখকরা যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত, তাদের অবস্থা শ্রমিকদের চেয়ে বেশী শোচনীয়। চাকরীর দরজা তাদের মুখের উপর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ব্যবসা করার অভ্যাস ও শিক্ষা কখনো ছিল না, আজ হঠাৎ চট করে' শেখাও প্রায় অসম্ভব। এদিকে অনেক পুষ্যি পালন করতে আর ঠাট্ বজায় রাখতে প্রচুর খরচ। স্বপ্ন নেই, আশা নেই। কোনো রকমে বেঁচে থাকার চেষ্টাতেই তাদের দেহের ও মনের শিরদাঁড়া বেঁকে যাচ্ছে।

অথচ পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাসে এই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক সম্প্রদায়ই সব সময় সভ্যতার বাহন হয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও তাই হবে। পেশীর জোরে যারা পৃথিবীর চাকা ঘোরাচ্ছে তারাও যে মানুষ, গরু-ঘোড়ার সামিল নয় এ-কথা প্রচার করা খুব ভাল। কিন্তু এই নির্দ্দয় সত্যকে স্বীকার করে' নিতেই হবে যে যাদের নিয়ে সভ্যতা এরা তারা নয়। চাকা না হলে' মোটর চলে না এ-কথা সত্য, চাকা মোটরের একটা অতিপ্রয়োজনীয় অপরিহার্য্য অংশ, তবু চাকাগুলিই মোটরের সব চেয়ে দামী অংশ নয়। মোটরের প্রাণ হচ্ছে তার যান্ত্রিক ভাগটি। আমাদের দেহের হাত পাগুলি খুব প্রয়োজনীয়, কিন্তু চালায় তাদের মস্তিষ্ক। যোগ্যতরের প্রভুত্ব থাকবেই। এবং এই যোগ্যতরেরাই সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বৃহৎ মানব-সমাজের মস্তিষ্ক, এই যোগ্যতর ব্যক্তিরা হচ্ছেন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা। এঁদের অবস্থা স্বচ্ছল হলে' এঁরাই ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যৎকে এগিয়ে আনতে পারবেন, প্রচুর অর্থসঙ্গতি পেলেও যে-কাজ ওই কারখানা ও বস্তির অধিবাসীরা কখনই পারবে না।

অথচ এই অভাবগ্রস্ত বাঙালী ভদ্রলোকদের, এই বেকার উদ্যমহীন বাঙালী যুবকদের জীবনের সীমাহীন নৈরাশ্যের কথা আজকালের বাঙলা সাহিত্যে এত কম দেখতে পাই যে, তা না থাকারই সামিল বলে' ধরে' নিতে পারি। তাদের দুঃখ কোথায়, এমন রসায়িত ভাবে গভীর হয়ে উঠছে যা পাঠক-চিত্তকে নাড়া দেয়। আজকালের বাঙলা সাহিত্য পড়লে মনে হয় যে, রাতারাতি দেশটা ইংল্যাণ্ডের মত এমনি ব্যবসা-প্রধান হয়ে গেছে যে কল-কারখানা আর শ্রমিক ছাড়া আর কিছু প্রায় নেই বললেই চলে। যেন যে-সব মাঠে ধান হ'ত সেখানে কারখানা বসেছে আর চাষীরা এবং ভদ্রলোকেরা সব দলে দলে মজুর দলে নাম লেখাচ্ছে। এবং লেখকেরা, যাঁরা কিছু দিন আগেও প্রেমের গল্প ও প্রেমের কবিতা লিখতেন তাঁরা হঠাৎ তারস্বরে মূলধনের অধিপতিদের গালাগাল দিচ্ছেন। সব চেয়ে মজার কথা এই যে, এই লেখকেরা প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত বেকার ভদ্রলোক, তাঁরা গরীবদের অবস্থা কিছুই জানেন না এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই কারখানা, বস্তি, এমন কি এক জন প্রকৃত গরীবের বাড়ীর ভিতর ঢুকে দেখেননি সেগুলো কি রকমের!

সমাজের যে সব জড়ধর্ম্মী সনাতন প্রথা অচলায়তনের সেই দক্ষিণ দিকের বন্ধ জানালাটার মতই জীবনের সূর্য্যালোককে আটকে রেখেছে তার বিরুদ্ধে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে কোথায় বেজে উঠছে উদ্ধত এবং শাণিত অবজ্ঞা? লেখনীর সাহায্যে মানব-চিত্তের নূতন পথ রচনা করে সেই পথে যাঁরা সভ্যতার রথকে জয়যাত্রায় এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তাঁরা চিরদিনই যৌবনধর্ম্মী, তাঁদের কল্পনা চিরদিনই ঈশ্বরের পাদ-পীঠকে স্পর্শ করে, নিজেদের উপর তাঁদের অসীম বিশ্বাস। এ-দেশের লোকরা দাস-মনোবৃত্তি নিয়ে জন্মেছে এবং উন্নতি যে বিদেশের অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কোনো পথেই আসবে না এ-কথা ভাবতে শিখেছে। তাই ইংল্যাণ্ডের জীবনে যে শ্রমিক-সমস্যা সত্যিকারের জাতীয় যুগ সমস্যা হয়ে সাহিত্যে স্বাভাবিক ও সহজ স্থান করে নিয়ে বামপন্থী লেখকদের সৃষ্টি করেছে, বাঙলার লেখকদের তা যদি পাশ কাটিয়ে যায় তাহলেই সর্ব্বনাশ! তাহলে বাঙালী স্বভাবের যে বিশেষত্ব থাকে না!

আমরা নিজস্ব ধরণে সাহিত্যে রূপায়িত করে তুলব, রসায়িত করে তুলব আমাদের জীবনের সব চেয়ে বড় অনুভূতিকে, সব চেয়ে বড় সমস্যাকে, যারা সব সময় সমাজের ব্যাপক ও বৃহত্তর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ও প্রভাবান্বিত হচ্ছে। এবং এর ভিতর দিয়েই আমরা তৃপ্ত হব, সমাজ ও সভ্যতা তৃপ্ত হবে, সাহিত্য সার্থক হবে। যুগ-সাহিত্যের এই একমাত্র মানে।

রাজপুত্র গৌতমের প্রতি

অসীম রায়

তুমি তো দেখেছ আজ জীবন জরায় জরজর,
সংসার বিলাপগ্রস্ত, রুগ্নতা অন্তিম সমাধি,
হৃদয় আশ্বাস খোঁজে মহত্ত্বের নিরপেক্ষতায়;
তবু রাত্রি কেন আসে মনোরম কপিলাবস্তুর
প্রাসাদে প্রাসাদে নিয়ে অগণিত আলোর উৎসব,
গৌতম সন্দিগ্ধ হও, বোধিদ্রুম আর কত দূর?

আমরা দেখেছি যারা জীবন জরায় জরজর,
আমরা শুনেছি যারা অজ্ঞাত শিশুর কলরব
তোমার সৈনিক মন তাদেরও সৈনিক করেনিক
দুর্গম চীনের পথে তিব্বতের পটভূমিকায়,

আলো পাক অন্ধজনে, প্রাণ পাক দুস্থ জনগণ,
সাক্ষ্য হোক সঙ্ঘমিত্রা, দারনাথ পতাকা উড়াক।
হে রাজকুমার আর দ্বিধা নয়, হও কীর্ত্তিমান,
তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ নও আজ।

৪

দ্বারভাঙ্গাতেও দেখিতে দেখিতে তিনটা বৎসর কাটিয়া গেল।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা শশাঙ্কর উপনয়ন। উল্লেখযোগ্য বিশেষ করিয়া এই জন্য যে, বিপিনবিহারী ও গিরিবালার সন্তান-সম্পর্কিত এই প্রথম কাজ; তাহা ভিন্ন নূতন বাড়িতেও এই প্রথম উৎসব। বিপিনবিহারী কতকটা সাধ্যাতীতই খরচ করিলেন। ছোট বোন অভয়া দেবী পূর্ব হইতেই আসিয়াছিলেন, কাজের সময় আর তিন জনেও আসিলেন; শিবপুর হইতে আসিলেন শশাঙ্কর দুই মামা। দ্বারভাঙ্গার বাড়িটার শ্রী কয়েক দিনের জন্য একেবারে অন্য রকম হইয়া উঠিল।

জীবনে পূর্বেকার অন্য সব উৎসব হইতে এ উৎসবের সুর বেশ একটু স্বতন্ত্র। অবশ্য সংসারে শাশুড়িই সব, তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া সব কিছু, তবুও এই উৎসবের লহরগুলি চারি দিক্ হইতে আসিয়া যে দোলা দেয় তাহাতে একটা নূতন ধরণের অনুভূতি জাগে,—মনে হয়, জীবনে একটা মস্ত বড় সার্থকতা আসিল—মা-হওয়ার যেন একটা নূতন অর্থ হইল। কাজ-কর্ম্মের ব্যস্ততার মাঝে হঠাৎ এক এক সময় অন্যমনস্ক হইয়া শশাঙ্কর পানে চাহিয়া থাকেন—তাহার উপর যেন একটি নূতন আলোক আসিয়া পড়িয়াছে—সেই আলোকে হঠাৎ বড় হইয়া ছেলে যেন একটু আলাদা হইয়া পড়িয়াছে। এক একবার এক অদ্ভুত ধরণের কষ্ট হয় সবাই বলে পৈতার সঙ্গে ওদের না কি আলাদা করিয়া জন্ম হয়—দ্বিজ মানেই না কি তাই। ওর ছেলেবেলা থেকে একটি ধারাবাহিক চিত্র-পরম্পরা চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে—ধীরে ধীরে বড় হইয়া আসিতেছে—তবু যেন নিতান্তই মায়েরই জিনিষ। পৈতা ওর জন্মান্তর, সবাই বলিতেছে—নিশ্চয় ঠাটা করিয়া বলিতেছে—পৈতার পর ছেলেদের জাতও যায় বদলাইয়া, এদিকে স্ত্রীলোক বলিয়া মায়ের জাত যে-কে সেই থাকে।···দেখেন, শশাঙ্ক উৎসবের আয়োজনে কোন না কোন ফরমাস লইয়া ব্যস্ত ভাবে ঘোরাফিরা করিতেছে—গম্ভীর মুখটা পরিশ্রম আর উৎসাহে রাঙা। একটা নূতন ধরণের ব্যথা লাগে মনে, ভয় হয়। ননীবালা বলেন—"দেখো বৌদি, দণ্ডী নেবার পর ছেলে যেন তিন পা'র বেশী না চলে যায়, তা' হ'লেই ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে।" হাসির মধ্যেই হয় কথা, নিজেও হাসিয়াই উত্তর দেন, কিন্তু একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় বুকটা দুরু দুরু করিতে থাকে।···কী যে অদ্ভুত জিনিষ এই সন্তান, এক জন্মে বেদনা, আর এক জন্মে যে-আশঙ্কা, যে-উদ্বেগ তাহাতে মনে হয় বেদনা ছিল সহস্র গুণ ভালো।

মন যে সর্বদাই এই রকম যুক্তিহীন হইয়া থাকে এমন নয়। এই তো চারি দিকেই ব্রাহ্মণদের পৈতা-হওয়া ছেলে, কে আর সন্ন্যাসী হইয়া গেছে? কে-ই বা হইয়া গেছে মা থেকে পৃথক্? বরং এই যে ছেলের একটা নূতন ব্যক্তিত্ব হইতেছে, এর জন্যই তাহাকে যেন আরও নূতন করিয়া পাওয়া যায়।

তবুও একবার একলা পাইয়া সতর্ক করিয়া দিলেন—"শশাঙ্ক, শোন্ বাবা, তুই যেন তিন পায়ের বেশী এগিয়ে যাস্‌নি দণ্ডী নেওয়ার পর।"

শশাঙ্ক এখন স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র, নূতন নূতন কথা শিখিয়াছে, হাসিয়া বলিল—"কী অন্ধ সংস্কার তোমার মা! ও-সব না কি ফলে?"

গিরিবালা যতটা সম্ভব নির্ভয়ের ভাব দেখাইয়া বলিলেন—"জানি গো জানি—কলিকালে ও-সব কিচ্ছু ফলে না আর, তবু তোমার বাহাদুরি করে তিন পায়ের বেশি যেতে হবে না।···বামন হ'তে যাচ্ছ, একটা কথা সর্বদা মনে রেখো বলে দিচ্ছি।"

"কি?

"গোড়াতেই মায়ের অবাধ্য হোয়ো না,—সেটা যে কত বড় দোষের!···পৈতেই বলো, যাই বলো, মায়ের চেয়ে কিছুই বড় নয়।"

—মাতৃত্বের গুমর নয়, শুধু একটা ভয় দেখাইয়া রাখা।

ভয় পাওয়ার উল্টা পিঠেই তো ভয়-দেখানো।

"ভবতি, ভিক্ষাং দেহি মে।"

দাদার পৈতার দিনের সমস্ত উৎসব-কোলাহলের উপর ঐ ক'টি সংস্কৃত কথার ঝঙ্কার শৈলেনের কানে যেন এখনও লাগিয়া আছে। সবার আগে ভিক্ষা চাহিল মায়ের কাছেই।···শাস্ত্রের ব্যবস্থায় বড় কৌতুক বোধ হয়—নারীর প্রতি অবহেলাটা যেন মাঝে মাঝে মনে পড়িয়া যায়, তাই মাঝে মাঝে অকস্মাৎ মাকে আনিয়া একেবারে সবার পুরোভাগে দাঁড় করাইয়া শাস্ত্র নিজের দোষটা স্খালন করিয়া লয়; ঋষি, আচার্য্য, পুরোহিত, এমন কি পিতা পর্য্যন্ত থাকেন পশ্চাতে।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়



মা শুধু সন্তানের নয়, শাস্ত্রেরও যেন মস্ত বড় একটা ভরসা।

দণ্ডী-ঘরের মধ্যে মায়ের সামনেই দাদা দাঁড়াইয়া ;—মুণ্ডিত কেশ, পরনে গৈরিক উত্তরীয়, হাতে বিল্বদণ্ড, গৌর বক্ষের উপর শুভ্র যজ্ঞোপবীত বাঁকা হইয়া নামিয়া আসিয়াছে। কতকটা এই নূতন বেশ-সংস্কারে, আবার কতকটা যেন একটা ভিতরেরই অভিনব কিছুতে সমস্ত শরীরটি ভাস্বর।···একটা রব উঠিল—"আগে মাকে ডাকো, মাকে ডাকো আগে···মারই হাতের ভিক্ষে আগে নিতে হবে, এখানে আর সবাই পরে, বাবা!···মার এদিকে খোঁজই নেই—কোথায় তিনি?···কোথায় গো নতুন ব্রহ্মচারীর মা?···"

ছোট পিসিমা গিয়া মাকে ডাকিয়া আনিলেন,—কি কাজে ব্যস্ত ছিলেন, একটা কাজ নয় তো তাঁহার আজ। রাঙাপেড়ে গরদের শাড়ীপরা, মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া যেন একটি জ্যোতিশ্চক্রের সৃষ্টি করিয়াছে; সবার নানা অভিমতের মধ্যে যেন একটু বিপর্যস্ত। বড় পিসিমা হাতে সাজানো ভিক্ষাপাত্র তুলিয়া দিলেন,—একখানি রেকাবিতে আলো চাল, পৈতা, দুটি টাকা। শশাঙ্ককে বলিলেন—ব্রহ্মচারী এবার বলো—"ভবতি ভিক্ষাং দেহি মে।" শশাঙ্ক কথাটা বলিয়া কাঁধের ভিক্ষার ঝুলিটা মেলিয়া ধরিল, মা রেকাবিটি উজাড় করিয়া দিলেন। পিসিমা শশাঙ্ককে বলিলেন—"এবার বলো—'স্বস্তি'।"

অনেকে জড়ো হইয়াছে, বড় পিসিমা সবার মুখের উপর সম্মিত দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া বলিলেন—"বুঝলেন ঠাকরুণ; তিন দিনের জন্যে ছেলে সন্ন্যাসী এখন, সে আর কাউকে প্রণাম করবে না, উল্টে তারই আশীর্বাদ নিতে হবে।"

অন্য কে এক জন অল্প অল্প মাথা দুলাইয়া বলিল—"হুঁ, শাস্ত্র বড় কড়া জিনিষ বাপু!"

মা একটু মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, চোখে অশ্রু জমিয়াছে, সেটাকে গোপন করা দরকার; একবার চকিতে একটু হাসিয়া বড় ননদের পানে মুখ তুলিয়াই তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। একটু মুখ-চাওয়া-চাওয়ি হইল, কে বলিল—"মায়ের মনই তো,—কেমন একটু উৎলে ওঠেই এই সময়টা।"

উপনয়নটা হইল পাণ্ডুল ছাড়িবার প্রায় বৎসরখানেক পরেই।

একটা জিনিস দিন দিন স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল,—সংসার অচল হইয়া আসিতেছে। মধুসূদনের মৃত্যুতে অর্থ-সংগতির দিক্ দিয়া যে অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছিল, বিপিনবিহারী পাণ্ডুলে থাকিতে ধীরে ধীরে সেটা কোন রকমে সামলাইয়া আনিয়াছিলেন মাত্র, বিশেষ কিছু সঞ্চয় করিবার অবসর হয় নাই। এই সময় পাণ্ডুলের চাকরি গেল। দ্বারভাঙ্গার জীবনটা আরম্ভ হইল অনিশ্চিত ভরসার উপর;—আশা করা ভালো, কিন্তু অনিশ্চিতের উপর ভরসা করিয়া থাকার মতো মারাত্মক আর কিছুই নাই; একটা কিছু হইবেই, ভগবান্ কি এতই বিরূপ হইবেন?—তিনিই যখন এতগুলিকে সংসারে আনিয়াছেন।··· কথাটা নিশ্চয় সত্য—চরম সত্যই, তাহাতে ভুল নাই, ভুল হইলে একটা কিছু ব্যবস্থা হইয়া যাইবেই, এই ভরসায় হাতে অল্প যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল সেটার খরচে হিসাবের বিশেষ বালাই না রাখা। নূতন সহরে বাস, বৃহত্তর সমাজের মধ্যে খরচও নানা আকারে হইয়া পড়ে; বুঝিতে বুঝিতে, টাকাগুলা যে কোন্ পথে বাহির হইয়া যাইতেছে ধরিতে ধরিতে তার অনেকটাই খালি হইয়া আসিল। এই সময় শশাঙ্কর উপনয়নও আসিয়া পড়িল। নিজেদের সাধ তো আছেই, তাহা ভিন্ন চারি দিক্ থেকেই আত্মীয়-কুটুম্বদের পত্র আসিতে লাগিল—বিপিনবিহারীর কাছে, আবার গিরিবালার কাছেও—প্রথম ছেলের প্রথম কাজ, কেহ কোন ছুতা-নাতা শুনিবেন না।

উপনয়নের পর প্রায় মাসখানেক পর্যন্ত বিপিনবিহারী হিসাবের দিকে ঘুরিয়াও চাহিলেন না। বোনেরা অনেক দিন পরে আসিয়াছে, তাও আসিয়াছে একেবারে তাঁহার সংসারে। পাণ্ডুলে ছিল মধুসূদনের পাতা পুরানো সংসারের ধারা, সেখানে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হইলে বিপিনবিহারীর বিশেষ কোন সংকোচ ছিল না, তাঁহাদেরও গায়ে লাগিত না। এখানে এখন আলাদা কথা। তাহা ভিন্ন বোনেরাও কি সেই রকমই আছে। কালের বিস্তারে শাখা-প্রশাখায় তাহারা হইয়া পড়িয়াছে সুদূর কুটুম্ব; ভাই-বোনের মাঝেও মর্যাদার কথা আসিয়া পড়ে।···বিরাজমোহিনীর বড় মেয়েটির বিবাহ হইয়াছে, নূতন জামাইটিও আসিয়াছে।

মাস-খানেক পরে, একে একে যখন সবাই চলিয়া গেলেন বিপিনবিহারী হিসাব করিতে বসিলেন। দেখা গেল, অদূর ভবিষ্যতে অনেক ভরসার সেই অনিশ্চিতের গর্ভে যদি একটা কিছু না আসিয়া পড়ে তো এত বড় সংসারটা যে কি করিয়া চলিবে তাহার কোন হদিসই পাওয়া যায় না।

তাহার পরও দুইটা বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এত বড় সংসার, কি করিয়া যে কাটিয়াছে যেন বুঝিয়া ওঠা যায় না। দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলে এখনও যেন আতঙ্ক আসিয়া পড়ে মনে। আর সংসার ঠিক সেইখানেই দাঁড়াইয়া নাই; চণ্ডীচরণের সন্তান-সন্ততি হইয়াছে, নিজেরও ছয়টি পুত্র একটি কন্যা। তা' ভিন্ন বড় হওয়া মানে তো শুধু আকারেই বিস্তার নয়, কত সমস্যার আবির্ভাব হয়, জটিলতা আসে। চারিটি ছেলে স্কুলে পড়ে; এক এক সময় মনে হয় ছাড়াইয়া লই, আর কিছু না হোক কাগজ-পেন্সিলেও তো একটা নিয়মিত খরচ আছে, পোষাক-পরিচ্ছদেও ওরই মধ্যে একটা ঠাট বজায় রাখিতে হয়, তাহাতে সংসারে টান পড়ে।···অভাবের কাছে প্রায় পরাভব স্বীকার করিতে করিতে বিপিনবিহারী আবার সিধা হইয়া ওঠেন। ভগবান্ যেমন দুঃখ দিয়াছেন সেই সঙ্গে দিয়াছেন অটুট স্বাস্থ্য আর অদম্য সাহস।···একটু যেন আশার আলো দেখা যায়, এক এক করিয়া দুটি ছেলের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার সময় হইয়া আসিয়াছে, পাশ করিবেই, তাহার পর···

ঋণ হইয়া পড়িয়াছে। দ্বারভাঙ্গা তখন বিদেশই, বিদেশে ঋণের চেহারা যেন আরও ভয়াবহ। তাহাকে তুষ্ট করিতে গিরিবালার গায়ের কয়েকখানি গহনা গেল। নিস্তারিণী দেবী ভাঙিয়া পড়িলেন। বলিলেন—"আমার ভয় হচ্ছে আরও কি দেখতে হবে বিপিন, চল্ পাণ্ডুলে ফিরে যাই। বিঘে কয়েক ক্ষেত রয়েছে, তারই একপাশে দু'টো কুঁড়ে তুলে থাকা যাবে। বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দে, তা থেকেও কিছু আসবে; সমাজের মধ্যে অভাবগুলো যেন আরও বিটকেল হয়ে দেখা দেয়। আর, সামনে থাকলে ক্ষেতের জিনিষগুলোও একটু পাওয়া যাবে, এমন ফাঁকি পড়তে হবে না।"

বিপিনবিহারী বলেন—"দেখি···"

স্ত্রীর মতটা জিজ্ঞাসা করেন। মত হইলে সেই অনুযায়ীই যে কাজ করিবেন তাহা নয়; একবার দেখেন—কে কতটা নুইয়া পড়িল।

গিরিবালার অনেক আশা,—বিকাশ দাদার কথাগুলো যেন তাঁহার রক্তকণার সঙ্গে মিশিয়া আছে—"বড় মা হতে হবে গিরি।"—এত দুঃখ-অভাবের মধ্যে যে তাহারই আয়োজনই হইতেছে। বিকাশ দাদা এখনও খোঁজ নেন মাঝে মাঝে। চিঠি যখন আসে, গিরিবালা সব অভিযোগের কথা যান ভুলিয়া—লেখেন এরা সবাই মানুষ হইয়া উঠিতেছে—গৌরবে মনটা ভরিয়া ওঠে বলিয়া লেখার মধ্যে নিজেকে একটু অন্তরালে রাখেন,· লেখেন—তিনি নিজে তো অত-শত বোঝেন না, তবে যেখানেই যান ওদের সুখ্যাতি শোনেন, সবাই বলে ওরা দিবেই পাশ, তার পর না কি কলেজে যাইবে—সে আবার এখানে নয়, কলকাতায় কি পাটনায় —ওঁর এখন থেকে এত ভাবনা হইতেছে—নিতান্ত ছেলে-মানুষ কি না ওরা, কখনও বাহিরে যায় নাই—আর পাটনা তো এখানে নয়, কলকাতা আরও দূর—কী যে করবেন, এখন থেকেই যেন ভাবনায় পড়িয়াছেন···

নিজের আশাটাকে আশঙ্কার সুরে বিনাইয়া বিনাইয়া লেখা। যে-দিন লেখেন, সমস্ত দিন এমন হালকা বোধ হয়, সংসারের ছোট-বড় দুঃখগুলা যেন স্পর্শই করিতে পারে না; সব কাজেই যেন নিজের মাতৃত্বকে অনুভব করিয়া ফেরেন।

হরেন, পূর্ণেন্দু, কি অরু—এরা সব ছোট, অত বোঝে না, গিরিবালা শশাঙ্ক কিম্বা শৈলেনকে কাছে ডাকিয়া প্রশ্ন করেন—"তোদের কষ্ট হচ্ছে বড্ড, না রে?

ছেলেরা হয় তো বিমূঢ় ভাবেই উত্তর দেয়—"কেন মা?"

গিরিবালা একটু অস্বস্তিতে পড়িয়া যান; প্রথমটা বাধো-বাধো ঠেকে, বলেন—"না, এমনি জিগ্যেস করছিলাম···"

সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা পরিষ্কার করিয়া দেন, একটু দ্বিধাজড়িত স্বরে বলেন—"এই ধর, ভালো খাওয়া-দাওয়া পাস না, কাপড়-জামার কষ্ট···"

যখন বলিয়াই ফেলিয়াছেন, স্পষ্ট করিয়া লইবার জন্য স্থির-দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া থাকেন।

দু'জনেই এ-সব বোঝে আজকাল। একটু হয়তো অপ্রতিভ হইয়া পড়ে, তাহার পরই হাসিয়া একটু চোখ নাচাইয়া বলে—"ভয়ঙ্কর কষ্ট হচ্ছে—ভয়ঙ্কর!—ভয়-ঙ্কর।···মা, তুমি যেন কী হয়ে পড়ছ দিন দিন!···"

শৈলেন আবার একটু ভাবুক-গোছের, এক দিন মাকে একলা পাইয়া গল্পে গল্পে মনের অনেক চোরা কুটুরি খুলিয়া ফেলিল। একবার বলিয়া উঠিল—"আমার কি মনে হয় জানো মা?"—একটু লজ্জিত দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"কি রে, বল্ না।"

"না, তুমি হাসবে।

"বল্ই না; না হাসব না।"

"মনে হয় আসছে জন্মে তোমরা দু'জনে গোড়া থেকেই খুব গরীব থাকবে, খু—ব গরীব; কিন্তু এই রকম ধার্মিক। তার পর কষ্ট যখন খুব বেশি সেই সময় আমি জন্মাব। তার পর অনেক দিন খুব দুঃখ-কষ্টের মধ্যে মানুষ হয়ে উঠে তোমাদের এত বড় করে তুলব যে···"

গিরিবালা একবারে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, হাসির মধ্যেই কিন্তু আবার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। হাসি আর অশ্রুর মাঝেই বলিলেন—"কি সাধ ছেলের বাবা! আমরা কোথায় মাথা কুটে মরছি—কি করে একটু ভালো খাবে, কি করে ভালো পরবে. ছেলের ওদিকে···"

একটু পরেই কিন্তু কতকটা বিস্মিত ভাবে বলিলেন—"শোন্ তাহলে, হঠাৎ মনে পড়ে গেল; বিকাশ দাদাও ঠিক তোর মতন কথাই মাঝে মাঝে বলতেন শৈল, মামা-ভাগনের একটা মিল থাকেই কি না। বলতেন—'গিরি. একেবারে বড়-মানুষ হয়ে জন্মাবার মতন দুর্ভাগ্য আর নেই, তাতে মনটা বাড়তে পায় না। মানুষের যত নিচু পর্যন্ত বনেদ তত উঁচুতে সে উঠতে পারবে—তত বেশি তার মনের প্রসার হবে।'···হ্যাঁ রে শৈল, আর জন্মের কথা আর জন্মে, এ-জন্মেও তো কষ্টটা কম পেলি না···আমরা দু'জনে তো তোদেরই মুখ চেয়ে আছি···"

এক দিন আবার হরেনকে প্রশ্ন করিয়া খুব একটা মজার উত্তর পাওয়া গেল। হরেন একটু চনমনে-গোছের, অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া মুখটা ঘুরাইয়া উত্তর করিল—"কষ্ট কেন?—যার বাবা নেই, মা নেই, তারই কষ্ট; আমাদের তো ঠাকুরমা পজ্জন্ত রয়েছেন!"

বিকাশ দাদাকে যখন উত্তর দেন, এই সব কথাও লিখিতে বড় ইচ্ছা করে,—কত বড় মা হইবার যে তাঁর আশা তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ দিতে; লজ্জায় অতটা পারিয়া ওঠেন না।

বিপিনবিহারীর প্রশ্নে গিরিবালা যে সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিতে পারেন এমন নয়। মনের আশাটা এত বড় যে সেটা প্রকাশ করিয়া বলিতে গেলে, বর্তমান অবস্থার সামনে নিজের মনেই কেমন বেখাপ্পা শোনায়। তা ভিন্ন আশাটা যতক্ষণ মনের গোপনে থাকে, থাকে এক রকম, আলোচনা করিতে গেলেই সেটা যে কত অসম্ভব তাহা যেন স্পষ্ট হইয়া ওঠে।···সাদা উত্তর না দিয়া ঘুরাইয়া বলিলেন—"গয়না দু'টো গেল কি না, মা বড় মুশড়ে পড়েছেন।"

বিপিনবিহারী বলিলেন—"মার কথা থাক্, সে তো তাঁর মুখেই শুনেছি। তোমার মতটা কি—ওদের ছাড়িয়ে নিই? মা যা বলছেন সেও তো মন্দ কথা নয়···"

গিরিবালা একটু ভীত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিলেন। মুখ দিয়া কোন উত্তরই বাহির হইল না।

বিপিনবিহারী অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে স্ত্রীর পানে চাহিলেন, বলিলেন—"মার কথা বলছ,—ননীবালাদের বাড়ি নেমন্তন্ন হোল, তুমি মাথাব্যথার ভান করে পড়ে রইলে, গেলে না—সেটাও তো গয়নার শোকই হোতে পারে; ভালো কাপড়ও নেই, গয়নাও গেল, তাই আমাদের ওপর অভিমান করে···"

গিরিবালার মুখটা হঠাৎ এমন হইয়া গেল যেন স্বামীর কথা মনের অন্তরতম প্রদেশে গিয়া আঘাত দিয়াছে, বলিলেন—"তুমি বলতে পারলে কথাটা—এত দিন আমায় দেখবার পর!"

বিপিনবিহারী উত্তরটা ঐ রকমই আশা করিয়াছিলেন, তবে এ আকারে নয়। যাহাকে চিরদিন নরম প্রকৃতির বলিয়া জানিয়া আসিয়াছেন, মনে হইয়াছিল সে নরম ভাবেই, রুচিকর করিয়া বলিবে কথাটা; একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। বলিলেন—"সত্যিই একটু ভুল হইয়া গেছে—এই বংশেরই আর এক বউ যে খালি পেটে শুধু পানে ঠোঁট রাঙা করে ঠাট বজায় রাখতেন' সে-কথা ভুলে গেছলাম।"

গিরিবালা মনের একটু চড়া সুরে বাঁধা তারটা ঢিলা করিয়া দিলেন, তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"অত বাড়ায় না, কোথায় তিনি, কোথায় আমি।"

একটু হাসিয়া বলিলেন—"গয়নার কথা বলছ—আসল গয়না তো ওরাই; বাঁ হাতে শাঁখাটা থাকলেই হোল আমার।"

এইখানেই আর একটা কথা বলিয়া রাখিতে হয়; এই সময়টার প্রায় পাশাপাশি বাইরে একটা রেল-আফিসে চণ্ডীচরণের চাকরি হইল। বিপিনবিহারী বলিলেন—"বৌমাকে তুমি নিয়ে যাও চণ্ডী।"

আপত্তি করিতে বলিলেন—"বুঝেছি তোমার মনের ভাবটা; কিন্তু এই রকম করাতেই আমার বেশি সাহায্য হবে, সেখানেও সামলাবে আমারই সংসারের একটা অংশ তো? তা ভিন্ন ঘরকন্না আর চাকরি দুই-ই সামলাতে গেলে, চাকরিটাই হাতছাড়া হবে; কত বড় দুঃসময় যাচ্ছে দেখছ না?"

৫

ভাইয়েরা বহু দিন হইতেই একবার লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, এবারে উপনয়নের সময় আসিয়া আরও ধরিয়া পড়িল। যাওয়া কিন্তু হইয়া উঠিতেছে না, কয়েক বৎসর ধরিয়াই একটা না একটা কিছু লাগিয়াই আছে। এমন সময় এক দিন খবর আসিল, মা হঠাৎ কিশোরের বিবাহের জন্য বড় জিদ ধরিয়া বসিয়াছেন, সামনের মাসে দিতেই হইবে। পাত্রী এখনও ঠিক হয় নাই, তবে অনেক জায়গায় দেখা শুনা হইতেছে। এ-উপলক্ষে গিরিবালাকে আসিতেই হইবে। এখানকার পত্রে দিন ধার্য করিয়া পাঠাইলেই সাতকড়ি আসিয়া লইয়া যাইবেন।

কয়েক দিন আগে ছোট জা চণ্ডীচরণের কর্মস্থানে চলিয়া গেলেন। গিরিবালা বিরূপ অদৃষ্টের উপর যেন অভিমান করিয়াই ঈষৎ হাসিয়া স্বামীর পানে চাহিয়া বলিলেন—"হবার নয়, শুধু ভগবানের ঠাট্টা করা!...কত দিন যে দেখিনি সবাইকে; বাবাও জেঠামশাইয়ের মত ফাঁকি দেবেনই—বুঝতেই পারছি।"

কয়টা দিন গেল, কি উত্তর দেওয়া হইবে আলোচনা হইতেছে, এমন সময় একটা পোষ্টকার্ড আসিল—বরদাসুন্দরী দিন-চারেকের জ্বরে হঠাৎ মারা গেছেন, দিন-দুই পরেই সাতকড়ি গিরিবালাকে লইয়া যাইবার জন্য রওয়ানা হইবেন।

শোকের প্রথম বেগটা কমিলে, সে-দিনটা বাদ দিয়া বিপিনবিহারী পরদিন প্রশ্ন করিলেন—"কি ঠিক করলে?"

গিরিবালা একটু বিস্মিত হইয়া প্রতি-প্রশ্ন করিলেন—"কি ঠিক করার কথা বলছ?"

"সামনেই এগ্‌জামিন ছেলেদের, এখন গেলে..."

গিরিবালার মুখটা কঠিন হইয়া উঠিল, বলিলেন—"ছাড়িয়ে নাও ছেলেদের স্কুল থেকে; না হয় একটা বছর ঐ ক্লাসেই থাক।"

সঙ্গে সঙ্গেই আবার ব্যাকুল মিনতির দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তোমরা কি ভাবো?"...আমি যেমন মা, আমারও তো এক জন মা ছিলেন? মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলেই এমন ভাবে সব মুছে দিয়ে সংসার করতে হবে?"

সমস্ত দিন চঞ্চল ভাবে কাটাইয়া বিকালে শাশুড়ির কাছে বসিয়া হঠাৎ পা দুইটা জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—"মা, একবার বাবাকে দেখবার উপায় করে দাও—দিতেই হবে তোমায় ক'রে।"

বধূর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"বিপিনকে বলেছি বৌমা, চণ্ডীকে তার করে দিয়েছে ছোটবৌমাকে নিয়ে আসবে।...কি করবে বল?—মেয়েছেলের সংসার করা এমনই, তুমি মা হারালে, আমি গঙ্গা হারিয়ে বসে আছি।"

গিরিবালা বারো বৎসর পরে পিত্রালয়ে আসিলেন। কান্না লইয়াই প্রবেশ করিতে হইল এবারে, কিন্তু দু'দিন পরে মায়ের শোকটা যখন একটু উপশম হইল, বাড়ির শোকে মনটা আচ্ছন্ন রহিল! চারখানা ঘর লইয়া ছোট্ট মাটির বাড়ি, কিন্তু সেইটুকুই যে কি একটা তৃপ্ত আনন্দ-কলরবে পূর্ণ থাকিত! এখন সে আনন্দ তো নাই-ই, শ্রীও যেন কোথায় চলিয়া গেছে। নিতান্ত যেটুকু সর্ব্বদা ব্যবহার হয় সেটুকু আছে এক রকম, তাহার পরই জঙ্গল। ব্যবহার করার ইতিহাসও শুনিলেন,—ভিটা কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিতেন শুধু তিনটি প্রাণী—রসিকলাল, বসন্তকুমারী আর বরদাসুন্দরী। তিন ছেলেই শিবপুরে, দুই বৌ-ও। না আসেন যে এমন নয়, শনিবারে শনিবারে কেউ এক জন আসেন, সে-রকম কিছু কাজ হইলে বৌয়েরাও দু'-তিন দিনের জন্য আসিয়া থাকেন! তেমনি আবার বরদাসুন্দরী মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি গিয়া কয়েক দিন করিয়া কাটাইয়া আসেন। আবার এমনও হয়, বাড়িতে তালা আঁটিয়া তিন জনেই দীর্ঘকালের জন্য শিবপুরে গিয়া রহিলেন।

গিরিবালা ভায়েদের প্রশ্ন করিলেন—"হ্যাঁ রে, ভিটে ছেড়ে দিলি সব?"

উত্তর রসিকলালই দিলেন—"ওদের দোষ দিই না গিরি: বেলেতেজপুর আর থাকবার জায়গা নেই; অন্ততঃ আমাদের পক্ষে তো নেই। পণ্ডিতমশাই গেছেন বিবাগী হয়ে, ঘোষাল কাকা গেছেন মারা, নিকুঞ্জ দাদা—সেও না-থাকার মধ্যেই। তুই বোধ হয় বলবি—সে যা ছিলেন তার চেয়ে এই ভালো, কিন্তু সেটা বোধ হয় ভুল—অনেক শত্রুতা করেছেন, তবুও নিজের লোকই তো? —দাদার কাজের সময় অত ঘোট হোল, পণ্ডিত মশাই নেই, ঘোষাল কাকা নেই, অকূল পাথারে পড়েছি—সরে তো দাঁড়াতে পারলেন না নিকুঞ্জ দাদা, বুক দিয়ে তো পড়তে গেল?...নিজের লোক, নিজের লোকই।...তা ভিন্ন ওরা আসবেই বা কি করে?—ম্যালেরিয়ায় দেশ ছেয়ে গেছে, দু'টো দিন যদি থাকে তো জ্বর নিয়ে যায়, বৌমাদের তো আরও সয় না।...এবার তো সব বাঁধনই ঘচল,—এক দিক্ ভেঙে দাদা বেরিয়ে পড়লেন, এক দিক্ ভেঙে এই ছোট বৌ, এবারে সদরে তালা ঝোলানো ভিন্ন আর কি উপায় আছে বল্? আর, আমাদেরও তো হয়ে এলো—এখন তো এই মনে হয় মা সিংহবাহিনী শিবপুরে যে একটু সঙ্গতি করে দিয়েছেন এই তাঁর দয়া, গঙ্গাই দরকার এখন দু'জনের, সেটুকু তো পাব?"

কী রকম যে হইয়া গেছেন বাবা গিরিবালা যেন ওঁর দিকে চাহিতে পারেন না, চুল প্রায় সবই পাকিয়া গেছে; অমন শরীর ঢিলা মারিয়া গেছে। যদি হাসেনও তো সেটা যেন হাসির মুখোস পরা।

সাতকড়ি একবার একান্তে পাইয়া বলিল—"ওঁকে এইখান থেকে শিবপুর নিয়ে যেতেই হবে দিদি, তুমিও জোর দাও, নৈলে উনি বাঁচবেন না। ওঁর কবে থেকে এ-দশা শুরু হয়েছে জানো?—যবে থেকে

পণ্ডিত মশাই গেছেন চলে। অর্জুনের যেমন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, কাকার সেই রকম ছিলেন পণ্ডিত মশাই। কী সুন্দর প্র্যাকটিস্ গড়ে উঠেছিল, লেখাতেও কী সুন্দর হাত খুলে গিয়েছিল,—সেই পণ্ডিত মশাই গেলেন, এক দিনেই যেন সব উবে গেল।···নিয়ে চলো শিবপুরে, সেখানে থাকেনও ভালো, দেখবে।"

নিকুঞ্জ জেঠার সঙ্গে দেখা করিলেন। উপরের ঘরে একটা খাটে আফিম খাইয়া এক রকম নিঝুম হইয়া পড়িয়া আছেন, একবার ডাকে সাড় হইল না, দ্বিতীয় বার একটু জোরে ডাকিতে চোখ খুলিয়া পিট-পিট করিয়া চাহিয়া রহিলেন। গিরিবালা পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন—"জেঠামশাই, আমি গিরি।"

সাড় হইল। একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, তাহার পর কতকটা বিড়-বিড় করিয়াই বলিলেন—"গিরি—গিরি।···বোস্।"

সামনের জল-চৌকি থেকে গড়গড়াটা নামাইয়া রাখিয়া গিরিবালা উপবেশন করিলেন।

নিকুঞ্জলাল নিজের কপালের উপর ডান হাতটা বুলাইয়া, পাঁচটি আঙুল দিয়া কপালটা যেন একটু খামচাইয়া ধরিলেন, মাথাটা একটু দুলাইয়া দুলাইয়া বলিলেন—"গিরি—গিরি—হুঁ—দেখতে যে আর পাব এমন আশা ছিল না···দেখ্, না, দিদি ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে গেল··· কৈ গো, গিরি এসেছে একবার এসো···বৌমাও চলে গেল···কত অত্যাচারটা করেছি তোদের ওপর—ঐ দু'টো নিরীহ বৌ আর লক্ষ্মণের মতন দু'টো ভাই মুখ বুজে···কি বলছিলাম যেন···"

গিরিবালা বললেন—"সে সব পুরনো কথা আর কেন জেঠামশাই?—সে সবই আপনার আশীর্বাদ।"

"ছেলেপুলে ক'টি বললিনি তো?"

"আপনার দু'টি নফর জেঠামশাই, কোলেরটি আপনার দাসী।"

"খাড়টা গোঁজাই আছে, নিকুঞ্জলাল হাতটা একটু তুলিলেন, বলিলেন—"আশীর্বাদ করব বৈ কি, ফলবেও দেখে নিস্···যাদের বুক ভেঙ্গে গেছে তাদের আশীর্বাদ ফলেই···হ্যাঁ, কি বলছিলাম?··· এই তো, ঠিকই বলছিলাম—ছোট বৌমা গেলেন—সতীলক্ষ্মী···দামুদিদি দিদি গেল কোথায়?—রসিকের একটা বিয়ে দিয়ে দেবে না?··· বাঃ, একা দাদাই?—ছোট ভাই কেউ নয়?···দেখলি নতুন জেঠাইমাকে?··· কৈ গো?···"

দরজার পাশেই একটি স্ত্রীলোক আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এক পা আগাইয়া আসিতেই গিরিবালার নজর গেল। বয়স আন্দাজ পঁচিশ-ছাব্বিশ, শ্যামাঙ্গী, একটু ঢ্যাঙা-গোছের, চোখ দু'টি রাইমণির মতোই নরম, একটি বছর ছয়েকের ছেলে হাঁটুর কাছের কাপড়টা খামচাইয়া গিরিবালার পানে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গিরিবালা গিয়া প্রণাম করিলেন।

স্ত্রীলোকটি নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"গিরিবালা, না?···কার সঙ্গে কথা কইছ—মানুষ?—দু'টো কথার মিল পাবে না। এসো বাইরে।"

গিরিবালা ফিরিয়া দেখিতে বলিলেন—"ও ভাবতে হবে না, নিঝুম হয়ে পড়েছেন। এসো তুমি।"

অনেকক্ষণ গল্প হইল; চোখ দু'টির মতো স্বভাবটিও রাইমণির মতো নরম। একটা বিশেষত্ব এই দেখিলেন—নিজের লইয়া গল্প করিলেন না বেশি—যে পরিচয়টুকু না দিলেই নয়, বা যেটুকু নেহাৎই প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িল শুধু সেইটুকু। বেশি ভাগ গল্পই হইল গিরিবালার শ্বশুরবাড়ি লইয়া—কেমন দেশ, কি বৃত্তান্ত—এই সব। নিজের সম্বন্ধে যেটুকু বলিতে হইল তাহাতেও যে একটা বেদনা বা অসন্তোষের সুর আছে এমন মনে হইল না। সোজা বলিয়া যাওয়া—কুলীনের মেয়ে—কি করিয়া সম্বন্ধটা হইল, কি করিয়া বিবাহ হইল···"এখন দু'টি ছেলে, এই ইনি বড়—তোমাদের পাঁচ জনের কল্যাণে থাকেন বেঁচে, ভালো, নৈলে করছিই বা কি বলো।"

রাইমণির মতোই লুচি-হালুয়া করিয়া জল খাওয়াইলেন, গিরিবালা আপত্তি করিতে বলিলেন—"ও মা, সে কি হয়?—এ-বাড়ির যিনি লক্ষ্মী ছিলেন তাঁর কাছে তোমরা কী ছিলে সে কি জানা নেই আমার?"

হারাণের আর সে ভাব নেই, কেন না ঘুড়িটা নেই, আর রসিকলাল নিয়মিত ভাবে প্র্যাকটিস্ও করেন না। বন্ধু-মনিবের অনুকম্পায় সে জোতজমি করিয়াছে কিছু, তাই লইয়াই থাকে। তবে প্রতিদিন সকালে আসিয়া একবার করিয়া হাজিরা দেয়, তিনটি প্রাণীর গৃহস্থালী, কিছুই কাজ থাকে না, তবু খুঁজিয়া পাতিয়া কিছু না কিছু একটা করিয়া দিয়াই যায়। বয়স হইয়াছে, তবে কষ্টে নাই বলিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই।···রসিকলাল তাগাদায় পড়িয়া যদি কোনও 'কলে' যান, পালকি ডাকিয়া আনে; পালকিতে যথেষ্ট স্থান থাকিলেও ঔষধের বাক্সটি পূর্বের মতোই নিজের হাতে ঝুলাইয়া লইয়া পাশে থাকিয়া গল্প করিতে করিতে চলিতে থাকে। গিয়া, রসিকলাল যখন রোগী দেখিতে ভিতরে ব্যস্ত থাকেন, পূর্বের মতোই বাহিরে লোক জড়ো করিয়া নানা রকমের মুড়ুলি করিতে থাকে, সান্ত্বনা দেয়,—বলে—"দেশে রোগ বেড়েছে তার তোয়াক্কাটা কি?—তোরা গা-ঢেলে অসুখে পড়্ না কেন'—বাবাঠাকুরকে আমি এখান থেকে ছেড়ে দিলে তো কলকাতা যাবেন গিয়ে?···আরও আছি এক ফিকিরে, সে দেখবি'খন।"

চোখ নাবাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে থাকে।

ফিকিরটা বোধ হয় একেবারে গিরিবালার কাছেই প্রকাশ করিবার জন্যে প্রতীক্ষা করিতেছিল।

উনি আসিবার দিন পাঁচেক পরে হঠাৎ এক দিন একটা মাস কয়েকের মাদি ঘোড়ার বাচ্ছা আনিয়া হাজির করিল—একেবারে বাড়ির মধ্যে। গিরিবালা তিনটি ছেলে এবং কোলের মেয়েটি লইয়া আসিয়াছেন, তাহা ভিন্ন কাজের আয়োজনের বাড়ি—মা, পিসি, বোনের সঙ্গে আরও ছেলেমেয়ে জুটিয়া উঠানে রকে জটলা করিতেছে, ঘোড়ার বাচ্ছা দেখা মাত্রই তাহাদের মধ্যে একটা উৎসুক চঞ্চলতা পড়িয়া গেল এবং একটু ডানপিটে-গোছের বলিয়া অরু দাওয়া হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া এক লাফে বাচ্ছাটার পিঠে চড়িয়া বসিয়া ঝুঁটিটা কসিয়া ধরিল। বাচ্ছাটা চঞ্চল হইয়া পড়ায় পড়ো-পড়ো হইতেই হারাণ তাড়াতাড়ি আনন্দে একরকম চিৎকার করিয়াই উঠিল—"গিরি দিদিমণি দেখো, শীগগির দেখোসে।"

ছেলেদের মধ্যে হাততালি, নাচ আর নানাবিধ অঙ্গবিক্ষেপের সঙ্গে একটা উৎকট কলরব পড়িয়া গেল। গিরিবালা ঘরে বেসন চালিতেছিলেন, চালুনি-হাতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন, আর সকলেও আসিয়া জড়ো হইল, রীতিমতো একটা হট্টগোল পড়িয়া গেল। গিরিবালা ভীত ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"শীগগির নামিয়ে দে, এখুনি পিঠ থেকে ছিটকে দেবে ফেলে ও-ডানপিটেকে।···নাব বলছি অরু।"

হারাণের মুখটা আনন্দে আর চাপা বিস্ময়ে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে; বলিল—"তুমি বাজে বকুনি দিদিমণি—পড়লেই হোল যেন! তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু লক্ষণটা মিলিয়ে যেয়ো···"

গিরিবালা ভয়ের সঙ্গে বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"ওরে, নাবিয়ে দে হারাণ—অক্ক নাব বলছি, কাজের বাড়িতে হাত-পা ভেঙে শেষে একটা···"

হারাণ শুধু সওয়ার আর সওয়ারি উভয়ের পানে প্রশংসার দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, বিজয় হাস্যের সহিত বলিল—"আমি যা বললাম—থির হয়ে তুমি শুধু লক্ষণটা মিলিয়ে যেয়ো···"

বাচ্ছাটা হয় তো একটু হতভম্ব হইয়া গিয়াই এক রকম শান্ত ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। হারাণের সাহায্য লইয়া অরু জিহ্বা ও তালুর সংযোগে টক্ টক্ করিয়া একটা শব্দ করিতেছে এবং মাঝে মাঝে নিজের শরীরের দোলা দিয়া সেটাকে গতিবান্ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ভয়টা লাগিয়া থাকিলেও ব্যাপারটা হইয়া পড়িয়াছে হাস্যোদ্দীপকই বেশি। গিরিবালা একবার সবার মুখের উপর চোখ বুলাইয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা, আমি লক্ষণ কি মেলাব বল দিকিন?···"

বসন্তকুমারী কতকটা রাগের ভান করিয়া, কতকটা হাসিয়া বলিলেন —"তুই নাবা দিকিন আগে—লক্ষণ তো দেখছি হাত-পা ভাঙবার··· আর ছেলেও তোর কি হয়েছে গিরি?—এ কী খোট্টা বোম্বেটে বাবা! ···নাব বলছি দাদু···"

হারাণ বলিল—"লক্ষণটা বুঝতে পারলেনি তোমরা?—এটা বাবা ঠাকুরের ঘুড়ির নাতনি···"

একটি মুহূর্ত শুধু সকলেই কিছু না বুঝিতে পারিয়া চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর সবার উচ্চহাস্যে উঠানটা যেন ফাটিয়া পড়িল, ঠাট্টার সম্বন্ধই বেশি লোকের, ভিড়ের মধ্যে থেকে এক জন বলিয়া উঠিলেন— "ওমা, সেই জন্যে বুঝি তুই···"

হারাণ একটু রাগিয়া উঠিল—"তোমরা লক্ষণটা কেউ বুঝবে না ঠাকরুণ, সেরেফ ঠাট্টা। শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে বাড়িতে তো এতগুলি ছেলেপিলে রয়েছে, কৈ, গিরি দিদিমণির এই ছেলেটি ছেড়ে তো কেউ লাগ্যে এসে আপন সওয়ারি ভেবে ঘাড়ে উঠে বসাল না···কেন? গিরি দিদিমণিই বলুন না, হারাণে সেই কোন্ কালে বলে দেয়নি সে তানার ছেলেই বেলেতেজপুরের মোক্তার হ'য়ে বসে বাবাঠাকুরের পাওনা গণ্ডাগুনো জোচ্চোরদের হাত থেকে খালাস করবে?···কৈ, 'না' বলুক দিকিন গিরি দিদিমণি?"

বাড়িতে হাসির একটা ছোঁয়াচ আসিয়া গিয়াছে, তাহার রাগাতে আর বলিবার ভঙ্গিতে হাসিটা বাড়িয়াই চলিল, বসন্তকুমারী বলিলেন— "বেশ, তোমার মোক্তারকে এখন নাবাও দৈবজ্ঞি ঠাকুর, যখন হবে তখন তার মোক্তারির ব্যাগ হাতে করে পাশাপাশি যেও···তোমার কপালের নেকন কে খণ্ডাবে?"

তাহার অত-বড় গুরু-গম্ভীর কথাটা সবাই ঠাট্টাতেই হাল্কা করিয়া দিতেছে দেখিয়া হারাণ একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছে, সেই জন্যই আরও একটু বেশি রাগিয়া তর্জনী সঞ্চার করিয়া বলিল—"কপালের নেকন আমার নয়, কপালের নেকন তাদের যারা বাবাঠাকুরকে অকর্মণ্যি ভালো মানুষ পেয়ে ফিসের ট্যাকা আটকে রেখেছে—কিছু নয় তো পাঁচশো—হাজার তো হবেই। হারাণে বসে নেই, সেই ঘুড়ির নাতনির পিঠে চড়িয়ে খোকাবাবুকে দিয়ে না আদায় করাই তো···"

একটা ঝাঁকানি দিয়া সওয়ারসুদ্ধ বাচ্ছাটার মুখ সদর দরজার দিকে ফিরাইয়া লইয়া বলিল—"চলো খোকাবাবু তুমি বাইরে— এখানে—কি যে বলে···"

একটু ঘাড় ফিরাইয়া বলিল—"তা হাসো সবাই, হাসতে তো মানা নেই, কিন্তু য্যাখন দুষমণের ঘরের ট্যাকা এনে ঝনঝনিয়ে ঢালবে ত্যাখন বোলো—হারাণে পরমাণিক এক দিন বলেছিল—আর ঢালবেই—সে আমি খোকাবাবুর ঘোড়ায় চড়বার দাপটেই টের পেয়েছি···"

মেয়েদের হাসি ও একপাল ছেলে-মেয়ের হুল্লোড়ের মধ্যে ভাবী মোক্তারকে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

এঁদের আর একটি আশ্রিত পরিবারের অবস্থাও এখন ভালো, চারি দিক্কার এত কষ্ট-নৈরাশ্যের মধ্যে গিরিবালা খানিকটা তৃপ্তি পাইলেন।

দুলাল বাগদি কাজের ক'টা দিন এক রকম সপরিবারেই এখানে পড়িয়া রহিল। নিজেদের বয়স হইয়াছে, আর বেশি খাটিতে পারে না, তবে তাহার ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতকুড় সবাই মিলিয়া আনা-থোওয়া, কাঠ-কাটা, জঙ্গল পরিষ্কার করা—তাদের অধিকারের মধ্যে সে সব কাজ তাহার জন্য একটি লোক রাখিতে দিল না। এই পরিবারটিও বেশ সুখেই আছে। কাজের ভিড়ের মধ্যেই এক দিন গিরিবালা তাহাদের সবাইকে একত্র করাইয়া পরিচয় লইলেন। তিনটি ছেলের বৌ, দুইটি জামাই,—একটিকে ঘরজামাই করিয়া রাখিয়াছে দুলাল। বলিল— "খেঁদিটা আমাদের দু'জনকে ছেড়ে থাকতে পারলেনি দিদিমণি— হুড়কো হয়ে উঠল—য্যাতবার শ্বশুরবাড়ি পাঠাই পেলিয়ে এসে—ত্যাখন ঐ সুমুন্দি-পোকে বললাম—তু ব্যাটাই তাহলে আমাদের এখেনে এসে থাক্···"

—বলিয়া নিজের রসিকতায় হাসিয়া উঠিল।

বেশ জামাইটি হইয়াছে—হৃষ্টপুষ্ট, যেন কালো পাথরে কোঁদা শরীরটা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া তেল-চুকচুকে চুল, টানা টানা দুটি চোখ, বয়স বাইস-তেইস। ডাক পড়িতে সে কাজের মধ্যেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, শ্বশুরের ঠাট্টায় হাসিয়া মুখটা কাৎ করিয়া লইল। দুলাল আরও একটু ঠাট্টা করিল, গিরিবালার পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল— "তা কিন্তু ব্যাটা আমার বেইমান নয় গো দিদিমণি, লোতুন বাপকে আগলে পড়ে থাকে—খেঁদির মতন হুড়কো লয়।"

ছেলেটি লজ্জায় আর দাঁড়াইল না। ওরা সকলে কাজে চলিয়া গেলেও গিরিবালা দুলাল আর তাহার বৌকে বসাইয়া রাখিলেন, বলিলেন—"তোরা একটু বোস্ বাছা তবু তোরা মা-সিংহবাহিনীর কৃপেয় বেঁচে-বর্তে আছিস, একটু কথা কইতে পারছি, এদিকে তো পণ্ডিতমশাই গেলেন, ঠাকুরমা গেলেন, ঘোষাল ঠাকুরদা গেলেন, নিকুঞ্জ জেঠামশাইয়ের ঐ অবস্থা···বাড়ির কথা তো ছেড়েই দিলাম···"

দুলাল একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল—হুঁ, আচি বৈ কি বেঁচে দিদিমণি—না বাঁচলে বড় কর্তার জন্যে, ছোটমা'র জন্যে কে শ্মশানে কাঠ বইত গিয়ে?"

হঠাৎই চোখে কাপড়ের খুঁট চাপিয়া খুক্-খুক্ করিয়া একটু কাঁদিয়া উঠিল। গিরিবালার চোখে জল আসিয়া গেল, দুলালের বৌ চোখে আঁচল দিল। প্রায় মিনিট দুই-তিন কেহই আর কিছু কথা বলিতে

পারিল না। তাহার পর গিরিবালা চোখ দুইটা মুছিয়া বলিলেন—"চুপ কর, দুলাল, কি আর করবি ?"

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শোকটা আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, আঁচলটা মুখে চাপিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তোর তো ভাগ্যি, ওটুকু সেবাও করতে পারলি, আমি মেয়ে হয়ে কি করতে পারলাম বল্? জেঠামশাই যাবার আট মাস পরে টের পাই···"

শোকের আবেগটা প্রশমিত হইতে বিলম্ব হইল। অনেকক্ষণ কোন কথাই জোগাইল না। তাহার পর গিরিবালা বলিলেন—"তা এখন কেমন আছিস-টাছিস বল্ দুলু—সে রকম কষ্টের ভাবটা আর নেই তো ? দিনকতক যেন বড্ডই কষ্টে পড়েছিলি পাঁচটা কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে।"

দুলাল নিজের পাকা চুলগুলা মুঠায় করিয়া উবু হইয়া বসিয়াছিল, বলিল—"কষ্টটা একটা মস্ত-বড় বিপদের মধ্যে দিয়ে যে কেটে গেল দিদিমণি, শোননি ?"

"বিপদ !—"—গিরিবালা একটু বিস্মিত ভাবে চাহিলেন।

"বিপদ নয় কেমন করে ? পণ্ডিতমশাই বাপের ভিটে বাগদির ঘাড়ে চাপ্যে গেলেন। তিনি বিবাগী—সন্নিসী, পাপ কাছে ঘেঁসতে পায় না, কিন্তু আমার যে কী দশাটা করে গেলেন !···অথচ গুষ্টিসুদ্ধ মরতে বসেচি—বলে, লোভ শত্তুরই—আরও শত্তুর হোয়ে দাঁড়িয়েচে। এদিকে পেটের জ্বালা, সম্পত্তির লোভ, উদিকে পরকালের ভয়···কেউ একটা সৎপরামর্শও দেয় না, মুখ ঘুরিয়ে বসে—ঐ যে, বামুনের একটু দয়া পেয়েচি ! বাবাঠাকুরের কাছে এলুন—উল্ট পরামর্শ—বলে, 'পাপটা কি এত সস্তা রে দুলু ? পণ্ডিতমশাই যা করে গেচেন তার ওপর চিত্তগুপ্তের আঁচড় চলবে না, এই বলে দিলুম—তুই কর্ তো ভোগ-দখল'···গুরুরই শিষ্য তো দিদিমণি ? শেষে ভেবে-ভেবে ধম্মঠাকুরের কাচে মাথা খুঁড়ে একটু বুদ্ধি জোগালো···"

গিরিবালা অধিকতর কৌতুকে একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, দুলাল বলিল—"বামুনের হাতে বেচে দিনু দিদিমণি,—রেজেষ্টারি করে চোখে একটু ঘুম এলো—একটুও মিথ্যে নয়, তোমার ছাওয়ায় বসে বলচি—ডাক্তার বাবাঠাকুরের মেয়ে তুমি ”

গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"নিলে কে ?"

"সে-কথা আর বলুনি—নিলে চক্কোত্তিঠাকুর··হকের আদ্দেক দামও দিলে না, চারটে ঘর, অতখানি বাগান ! তবে একটা কথায় রাজি করিয়েছি—পণ্ডিতমশাই যে-ঘরটাতে থাকতেন সে-ঘরটায় একটি শিবঠাকুর পিত্তিষ্টে করে নিত্যি ভোগ দিতে।"

দুলালের স্ত্রী একটি ছোট নাতনিকে কোলে লইয়া এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল। স্বামীর পানে খুব দ্রুত একটা কটাক্ষ করিয়া, মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া মন্তব্য করিল—"তা দিচ্ছে ঘটা করে, কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পাওনি রোজ সাঁজে-সকালে ?"

দুলাল একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—"দেবে, দেবে, করচে ব্যবস্থা, এক দিনেই হয় ? আমায় কাল পজ্জন্ত বললে—করচি ব্যবস্থা···"

তাহার বৌ মুখ না ঘুরাইয়াই টিপ্পনী করিল—"আর রান্না চড়িয়ে কাজ নেই,—পেসাদ খাবে দলা-দলা করে।"

দুলাল চটিয়া উঠিল, বলিল—"তুই চুপ কর, সে তোদের মতন হাড়ি-বাগদি কি না—ঠাকুরকে ভোগা দিতে যাবে।"

গিরিবালার পানে চাহিয়া বলিল—"তা ত্যাত দিন পজ্জন্ত পণ্ডিতমশাইয়ের পুণ্যির জন্যে আমি করে রেখেছি ব্যবস্থা—সেই ইস্তক ধম্মঠাকুরের ঘরে রোজ একটা বড় ঘিয়ের-পিদ্দিপের জোগাড় আচে ; তা' ভিন্ন তানার নাম করে বাবার মন্দিরটাও নতুন কোরে মেরামৎ করে দিনু—এই লক্ষ্মীর মা-ই সলা দিলে।···তবে কথা কি জান দিদিমনি ?—ধম্মবাবা আমাদের ছোটজেতের ঠাকুর কি না—পুণ্যি যা দেয় তাতে তেমন জোর হয় না···তার সাক্ষী এই আমাদেরই দেখো না গো···"

[ক্রমশঃ

বুদ্ধির ঢেঁকি

অমল ঘোষ

মানুষের খুলি ঠাসা ভাসা ভাসা জগতের জ্ঞান,
তাই নিয়ে জীবন ভাসান।
ভাসান চলচে বটে
বুদ্ধির ঘটে
যত কিছু রং কালি
ধূলো-কালি এক হয়ে মেশে
বিচিত্র এ জীবনের দেশে।
তার পর মন্থর গতি
আসে প্রাণ প্রাণের প্রগতি
রুদ্রের জ্যোতি
ঘট পট ভাঙনের স্পর্দ্ধিত শাঙনের সমুদ্র গান
আসে বেগ প্রচণ্ড বান।
কোথা ধুয়ে মুছে যায় মানুষের ভাবনায়
ফ্রেমে বাঁধা ছবি
কামনার কল্পিত রবি।

এমনি সে চিরকাল
রাঙা-জালে স্বপ্নের পাখি
বার বার ধরা পড়ে মানুষকে দিয়ে গেছে ফাঁকি।
আজো সেই পাখি ডাকে
শাখে শাখে জীবনের বনে
স্বপ্নের জাল নিয়ে
তবু লোক ফিরিছে নির্জনে।
পাখি তবু উড়ে যাবে
ধান খাবে দেবে নাকো ধরা
সে পাখি সোনার পাখি
জীবনের চরম মন্থরা।
তাই বলি খুলি ঠাসা
ভাসা ভাসা জগতের জ্ঞান
বুদ্ধির ঢেঁকিতে চড়ে
শূন্য জুড়ে ঢোলক বাজান।

বীরভোগ্যা

শ্রীকপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ঈডেন গার্ডেনে বর্ম্মিজ-প্যাগোডার পূবে ওই বাদাম-গাছটা— সরযূ তারই ছায়ায় পা ছড়িয়ে বসেছে। অঙ্গে তার আধুনিকার পরিচ্ছদ, সুডৌল পা-ছু'খানি কিন্তু নগ্ন! পাশে পড়ে আছে পুরানো একপাটি লেডিস্ সু।···

এখানটা যেন একটা অন্তরীপ, প্যাগোডার পশ্চিম থেকে ঝিলটা দক্ষিণ ঘুরে পূবে ঘিরেছে, এঁকা-বাঁকা ঝিল, ছোট্ট নৌকাটিতে ছেলের দল দাঁড় টানছে আর হল্লোড় করছে। ভাদ্দরের রদ্দুরে এম্‌নিই লোকের ঘাম ঝরে, দাঁড় টেনে ছেলে কয়টি তো একেবারে গলদ্‌ঘর্ম্ম! বট্‌লপাম গাছ-জোড়ার ধারে প্যাগোডার পূবের ঘাটে এসে একবার নৌকাখানা লাগালে, সরযূ ওই কাছেই বসে আছে। বরফ-লিমনেড্‌ওয়ালা ছেলেদের কয় বোতল মিষ্টি ঠাণ্ডা জল খাইয়ে দিলে।

পিছনে তৃণ-আস্তরণের মাঝে সাজানো রং-বেরংএর দোপাটি ফুলের শয্যা; ওই দূরে, ঝিলের একটা প্রশাখায় রাশি রাশি পদ্মফুল ফুটেছে, এখান থেকে ভাল করে দেখা যায় না, ছোট্ট সেতুটি, ওপারের ওই ফুলের ঝাড় আর ক্রোটন-গুল্মের কুঞ্জগুলো আড়াল করে দাঁড়িয়ে



আছে। ঝিলের দক্ষিণ কোণে ওই বটগাছের ছায়ায় বসে রয়েছে, ঠিক জলের ধারটিতে, কয়টি শ্বেতাঙ্গিনী মেয়ে, কয়টি যেন কুন্দফুল ফুটেছে জলের ধারে।

সরযূর মাথাভরা এক-রাশ কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, পরনে বাসন্তী রংএ ছোপানো ঢাকাই সাড়ী, আল্‌তা রংএর বেনারসী ব্লাউস, এই সতেরো-আঠারো বছর বয়স হবে তার, বাঙালী-কন্যাদের মধ্যে চমৎকার রূপসী বলেই গণ্যা হবে সে,···ঈডেন গার্ডেনের তৃণাস্তরণ, টলটলে জলে ভরা ঝিল, গাছ-গাছালির মাঝে বসে রয়েছে সে, একটি সজীব ডাগর স্থলপদ্মই ফুটেছে বুঝি এখানে।

শরতের নির্ম্মল আকাশের রূপালি আলোয় যেন একটা সোনালি আভার মায়া মেশানো থাকে, সে রশ্মি যেখানে পড়ে, সেখানটাই স্বপ্নের মধুরিমায় ভরে তোলে। সরযূর চোখেও সেই স্বপ্নের মাধুরী। আজ কয় দিন ধরে' সে স্বপ্নই দেখে চলেছে। অবুঝ শিশু যেমন এই কেঁদে খুন, আর পর-মুহূর্ত্তেই উচ্ছল হাসিতে ভরপুর, সরযূর মনও তেমনি যেন সহসা শিশুত্ব পেয়েছে, ক্ষণে ক্ষণে হাসি-কান্নার পরিবর্ত্তনে কী দোলাই খাচ্ছে তার মন। অনুভূতির জোয়ার কূল ছাপিয়ে তার বুকের দুয়ারে কী ছাপই দিচ্ছে কয় দিন ধরে।

প্রথম অনুরাগের অদম্য প্রেরণায় কিশোরী রাধা অভিসারে যাত্রা করত,—সরযূ ঈডেন গার্ডেনে এসেছে, সেই বালিগঞ্জ থেকে, ট্রামে প্রায় চল্লিশ মিনিটের রাস্তা, বাদাম গাছের তলায় বসে বসে প্রতীক্ষা করছে।···অমলকুমার তাকে এইখানে বসিয়ে রেখে তার জন্যে এক জোড়া মনের মত জুতো কিনে আন্‌তে গেছে। আজ ট্রামের ভিড়ে

ওর পুরানো জুতো একটু ছিঁড়ে গেছে, তারই একপাটি অমল সঙ্গে নিয়ে গেছে মাপের জন্যে।

কল্‌কাতার পথে-ঘাটে বাস, ট্রাম, গাড়ী-ঘোড়া, রিক্‌সা, লোকজন গিস্‌গিস্ কর্‌ছে, একটা বিষবাষ্প যেন শহরটার বুকে চাপ বেঁধেছে, সেই শহরেরই একপ্রান্তে সুরম্য ঈডেন গার্ডেনের ফুল গাছ, তৃণশয্যা, গাছ-গাছালি, টল্‌টলে জলে ভরা সরোবর, চোখে না দেখ্‌লে বিশ্বাস করা যায় না, আজকের এই যুদ্ধের দানবীয় তাণ্ডবে মানুষগুলো যখন পরস্পরের কণ্ঠ সবলে টিপে ধরাই তাদের একমাত্র করণীয় স্থির করে নিয়েছে, তখনও এ শহরে এমন একটা একান্ত কোণ রয়েছে, যেখানে সরযূ গাছতলায় পা ছড়িয়ে বস্‌তে পারে।

আকাশে অবশ্য বোমারু বিমানগুলো উড়ে উড়ে সামরিক শক্তির দাপট জানাচ্ছে, গঙ্গার ধারে বড় বড় জাহাজ এসে ঠেকেছে, বন্দরের জেটিতে ক্রেণগুলো ঘড়্‌-ঘড়্‌ শব্দে অবিরাম মাল খালাস করছে, ঈডেন গার্ডেন-ঘেরা প্রশস্ত রাজপথে গোদা গোদা লরী গাদা গাদা সমরোপকরণ বিকট উল্লাসে টেনে নিয়ে চলেছে—ঠেলাঠেলি, দাপাদাপি সোরগোলের মাতামাতিতে উষ্ণ তৃষাতুর কল্‌কাতার মাঝে ঈডেন গার্ডেন যেন মরুভূমির মাঝখানে এক টুক্‌রা স্নিগ্ধ শান্ত ওয়েসিস্।

ঈডেন গার্ডেনে আজ-কাল প্রেমিক-দম্পতিরাও বড় একটা আসবার অবসর পায় না। সিনেমা, ডান্‌সিং-হল, কাফে, রেস্তরাঁর দীপক রাগিণী, রং-এর আগুনের আকর্ষণের কাছে বর্ত্তমানের সমরায়োজনরত নর-নারীর পক্ষে ঈডেন গার্ডেনের স্নিগ্ধ শান্ত সুর বড় মৃদু, ওর রংএ মাদকতার রং ধরায় না একেবারে।

যারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সমরায়োজনের চাপা-কলে ধরা পড়ে গেছে, সরযূ তাদেরই এক জন, বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের প্রাচীন অট্টালিকা-ভাঙ্গা একখানা ইট। ঈডেন গার্ডেনের বর্ম্মিজ প্যাগোডার পূর্ব্ব প্রান্তে এই বাদাম গাছতলাটি তার বড় ভালো লেগেছে; এক একখানা পাখার মত বড় বড় পাতা বাদাম গাছের, শরতের বায়ু যখন দোলায়, মনে হয়, লক্ষ কিঙ্করে বুঝি ব্যজন করছে রূপকথার সেই মণিকাঞ্চন-খচিত পালঙ্কে শায়িত রাজকন্যাকে।

মনে যখন রং ধরে শ্রমোপজীবিনী বাঙালী-কন্যাও তখন ভাবে, ছেলেবেলায় শোনা রূপকথার রাজার দুলালীদেরই এক জন বুঝি সে, হয়ত কোন্ নিষ্ঠুর দৈত্যের অভিশাপে বন্দিনী, কোন্ পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চেপে কোথাকার কোন্ রাজপুত্র এবার তাকে উদ্ধার কর্‌বে,—সে-সুদিন বুঝি এসেছে।...

রং-বাহার পাতা-বাহারের কুঞ্জগুলির ফাঁক দিয়ে দূরের ওই পদ্মগুলো ঢলে ঢলে সরযূকে ঈশারায় কি জানাচ্ছিল, কে জানে? বৃন্দাবনের কদম্বমূলের মত তার কাছে এই বাদাম গাছতলাটি, এখানেই সে জলে পা ডুবিয়ে বসেছিল, আর পাশে বসেছিল অমলকুমার।...

বড় লাজুক ছেলে এই অমলকুমার, নিজের সম্বন্ধে বেশী কথা বল্‌তে পারে না সে। বলে শুধু অন্য নানান্ কথা। কথা বলে মৃদু মৃদু। বোঝা যায় কিন্তু কত কথার চাপ বেঁধেছে তার বুকে, পর্ব্বতের অতল গহ্বরে কঠিন প্রস্তরস্তূপের প্রাচীরের আড়ালে সলিলরাশির মত, ক্ষীণ নির্ঝরিণীর ধারায় তার বাণী ঝরে পড়ে, মৃদু মৃদু সুর-তান-লয়ে যেমন গুঞ্জিত হয় প্রকৃত গুণীর কণ্ঠে গানের পদগুলো, হট্টগোলের মত সে বাক্যের ঘূর্ণী ওড়ায় না। এমনি গুঞ্জনই সরযূর বড় ভাল লাগে। বাংলা সাহিত্যে এম-এ পাস করেছে অমলকুমার, অমলকুমার সাহিত্যিক, তার লেখা বাংলা পত্রিকাগুলোয় প্রকাশিত হয় মাঝে মাঝে। সরযূরই মত অনিচ্ছাসত্ত্বেই সে সমরায়োজনের চাপা-কলে পড়ে একই আপিসে চাকরি করে, কূটবুদ্ধি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্র এমন চাল চেলেছে যে, জীবনধারণের উপায়ান্তর নেই কারও। সেই ব্রিটিশের অধীনে চাকরি করা অমলকুমারের স্বদেশপ্রেমের অভিমানে বড় লাগে, মনকে আঁখি ঠেরে তাই আমেরিকান্ আর্ম্মিতে চাকরি নিয়েছে, আমেরিকান্ আর্ম্মির হেড কোয়াটার্সে সে সিভিলিয়ান্ পার্সোনেল্। আমেরিকান্ আর্ম্মির যুদ্ধের প্রয়োজনে নানান্ প্রোপাগাণ্ডা প্রাঞ্জল বাংলায় অনুবাদ করে অমলকুমার সবিনয়ে অফিসারের আদেশে। ঘরভরা আরও অনেক সহকর্ম্মী আর সহকর্ম্মিণী, এক একটা টেবিল পেয়ে বসে থাকে সারা দিন, ফাইল আর কাগজগুলোর উপর মাথা গুঁজ্‌ড়ে। সরযূর সিট্ থেকে অমলকুমারের সিট দেখা যায়। সরযূর টাইপ রাইটারটা একটু সরালেই, সে অমলের মুখখানি দেখতে পায়, চসমার পুরু কাচের আড়ালে অমলের চোখ দু'টো দেখায় কী বড় বড়! লাজুক অমলকুমার আপিসের মধ্যে সরযূর দিকে বড় একটা তাকায় না, তবুও দিনে অন্ততঃ দশ বার দু'জনের চোখোচোখি হয়ে যায়ই!...

অমল যেচে এসে তার সঙ্গে কোন দিন আলাপ করেনি, অথচ ক্রমশঃ দু'জনের আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তার টাইপ-করা কাগজে কোন শব্দের বানান্ ভুলের জন্যে প্রবন্ধটার অর্থ বুঝতে পারছে না, এ রকম অজুহাতও অমল নেয়নি সরযূর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে। এক বৃহৎ পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে পরিচয়টা যেমন স্বয়ংসিদ্ধ, হয়তো এ আপিসে কর্ম্মচারী কর্ম্মচারিণীদের মধ্যে তেমনি একটা সহজ আত্মীয়তার ভাব এসে গিয়েছিল। প্রধান অফিসার এক জন প্রবীণ ইয়াঙ্কি কর্ণেল, তাঁর ব্যক্তিগত সেক্রেটারি বিলাতফেরত বাঙালী মহিলা, কেমব্রিজের বি-এ, দামী জর্জ্জেটের সাড়ীতে, লিপ্‌ষ্টিকে রাঙানো ঠোঁটে, ঢেউ-তোলা কেশবিন্যাসে কেতা দুরস্ত। আপিসের সমস্ত নারী কর্ম্মচারিণীদের অভয় আশ্রয়। এঁর ব্যক্তিত্বকে পুরুষ কর্ম্মচারীরাও ভয় করে চলে। অধস্তন অফিসারদের অধিকাংশই বাঙালী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি দেশী সাহেব। সরযূদের সেক্‌শনের অধস্তন অফিসার বাঙালী—মিষ্টার চৌধুরী—মিষ্টার আর, চৌধুরী। রামচন্দ্র চৌধুরী কিংবা রহিমতুল্লা চৌধুরী হবে, কথাবার্ত্তায়, আচারে-ব্যবহারে বোঝবার উপায় নেই। মেহগনি পালিশ-করা সেগুন কাঠের তক্তার পর্দ্দার আড়ালে তাঁর খাস-কামরা, পর্দ্দার মাথার ঘসা কাচের মধ্যে দিয়ে আব্‌ছা আব্‌ছা দেখা যায় মাথার উপরে তার বিজলী পাখা অনবরত ঘুরছে প্রকাণ্ড হাভানা চুরুটের ধোঁয়া নিমেষে উড়িয়ে নিয়ে। মিষ্টার চৌধুরী নবীন যুবা, সুতরাং অনেক মেয়ে কর্ম্মিণীর কাছেই বেশ লোকপ্রিয়। তা'ছাড়া মেয়েদের নাড়া-চাড়া করতে তিনি বেশ সিদ্ধহস্ত। ইয়াঙ্কিস্থানে শিক্ষিত, শত সহচরীর সঙ্গে নায়গ্রার জলপ্রপাতে স্নান করেছেন, সমুদ্রস্নানে ঢেউ-এ ঢেউ-এ দোল খেয়েছেন। পুরুষ কর্ম্মচারীর ত্রুটি হলে ভ্রুকুটি করে বার বার টেবিলে হাত চাপ্‌ড়ান, মুখে ঘন ঘন বলেন, "ইডিয়ট্, ইডিয়ট"। মেয়ের ত্রুটিতে সহাস্যমুখে বলেন, "ইউ নটি গার্ল"—আবার তর্জ্জমাও করে দেন, "তুমি দুরন্ত মেয়ে!" (বাংলা কথাগুলোতে একটু বিদেশী অ্যাক্‌সেণ্ট্) বলেই আবার হাভানা চুরুটে

অগ্নিসংযোগ করেন। এঁর শ্বশুরঘর ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্‌এ, ইয়াঙ্কি-পত্নী কলকাতার থাকেন না, থাকেন দেরাদূনে, হিমালয়ের ক্রোড়ে সুশীতল আবহাওয়ায়।

সরযূ কিন্তু মিষ্টার চৌধুরীর কাছে বড় একটা ঘেঁসে না, তার বিশেষ প্রয়োজনও হয় না। তার উপরে ষ্টেনোগ্রাফার সেক্রেটারি আছেন, তিনিই নোট নিয়ে এসে দেন, সরযূ টাইপ করে। সন্দেহস্থলে সে ওই ষ্টেনোগ্রাফারের কাছেই যায়, মিষ্টার চৌধুরীর কাছে নয়। মিষ্টার চৌধুরী অবশ্য তাকে মাঝে মাঝে ডাকেন, যেমন আর সব মেয়েকে। এদের চাকরির উন্নতি বিষয়ে ওঁর অনেক হাত। একবার তিনি সরযূকে কামরায় একান্তে পেয়ে মুখের চুরুটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরেই বলেছিলেন, "সরযূ, তুমি চমৎকার মেয়ে, চমৎকার তোমার নামটি।" সরযূ কোনও উত্তর করেনি, একটু হাসেনিও। আর একবার দু'খানা বক্সের টিকিট দেখিয়ে বলেছিলেন, "তোমার জন্তে মেট্রোয় বুক করেছি, মিস্ চ্যাটার্জ্জি, রাত্রি ন'টার শো-এ যাবে?—" সরযূ কোন উত্তর না ক'রেই কাম্‌রা থেকে বেরিয়ে এসেছিল।…

মিষ্টার চৌধুরী রাগ করে সহসা লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার ছেলে নয়। মেয়েদের নাড়াচাড়া করবার ফাইন আর্টে তিনি একেবারে পাকা ওস্তাদ। অধ্যবসায় তাঁর অটুট, ধৈর্য্যও তাঁর অপরিসীম এ বিষয়ে। তিনি বলেন, ফুটন্ত সুন্দর ফুলটি তুলতে ঘোড়সওয়ারকে ঘোড়া থামিয়ে পথের ধারে নামতে হয়, ধীরে ধীরে ফুলটি তুলতে হয়—ব্যস্ত হলে চলে না।…বীরভোগ্যা নারী! আর এ-যুগে বীরত্ব তাদেরই যাদের আছে ছল-বল-কৌশল, শুধু বাহুবল নয়।

পরে সরযূ অন্য মেয়ের কাছে শুনেছিল মিষ্টার চৌধুরী বলেছেন, "মিস্ চ্যাটার্জ্জি বড় প্রুড্,—এই সোমত্ত বয়সেই কেমন পিসীমা-পিসীমা ভাব, আমোদ-আহ্লাদ করতে জানে না। মডার্ণ ওয়ার্লডে লাইফ এন্‌জয় করবে না—ভেরী ন্যারো মাইন্‌ডেড্! বড় সঙ্কীর্ণ মন, জীবনের আস্বাদই নিতে শিখ্‌ল না!"

কিন্তু অমলের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা বৃষ্টিধারার সঙ্গে কর্ষিত ভূমির সম্বন্ধের মত যেন প্রাকৃতিক নিয়মে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কবে যে প্রথম তারা আপিসের ফেরত ট্রামের জন্তে প্রতীক্ষা করতে করতে দু'-একটি কথা বলেছিল, মনে নেই। কবে যে প্রথম অন্যমনস্ক অমল তার শ্যামবাজারের ট্রামে না চড়ে সরযূর সঙ্গে বালিগঞ্জের ট্রামে চড়েছিল, মনে নেই। রবিবারের ছুটির দিনে অমল সরযূর নিমন্ত্রণে তাদের বাড়ী গিয়ে খেয়েছে। বাড়ীতে আছে তার বিধবা জননী আর দু'টি নাবালক ভাই, ইস্কুলে পড়ে। সরযূর উপার্জ্জনেই সংসার চলে। ফরিদপুর জেলায় অবশ্য কিছু পৈতৃক জমি-জমা আছে, কিন্তু জ্ঞাতিরা অংশ দেয় না। কেই-ই বা আদায় করে। মেয়েমানুষের সাধ্য নয়।

বাসন্তী রংএর সাড়ীর আঁচল উড়িয়ে বালিকা সরযূ প্রথম যখন গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ে পড়্‌তে যেত, কে জান্‌ত তখন, লেখাপড়া শিখে একদিন বেচারীকে কলকাতা শহরে সামরিক আপিসে উপার্জ্জন করে নিরুপায় জননী আর নাবালক ভাই দুটির ভরণ-পোষণ করতে হবে। মেয়েকে চাকরি করতে পাঠাতে হয়েছে, বলতে বলতে দুঃখিনী মায়ের চোখে জল আসে।…অমল এমন পরম তৃপ্তির সঙ্গে সামান্য রান্নাবান্না তরকারি ভাত খেল, সরযূর মায়ের আনন্দের পরিসীমা নেই।…

বাংলা দেশে সমাজের প্রাচীন অট্টালিকা আজ অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ে হুড়্‌মুড়্ করে ভেঙ্গে পড়ছে। সে অট্টালিকার রাবিশ দিয়ে কোথাও বা পঙ্কিল ডোবা ভরাট করা হচ্ছে, কোথাও বা রাস্তার বুকে ফেলে ষ্টীম-রোলার চালিয়ে পাকা সড়কের পত্তন হচ্ছে। দু'-চারখানি ইট এখানে-ওখানে ভগ্ন দেউলে জুড়ে দেউলটাকে খাড়া রাখতে চেষ্টা করা হচ্ছে।

অমলকুমার কলকাতার প্রাচীন অভিজাত বংশের সন্তান, এই সেদিনও তার প্রপিতামহ রূপার পাল্‌কিতে চড়ে তালুক পরিদর্শন করতে যেতেন—কৈবর্ত্ত, নমশূদ্র, হাড়ি, বাগ্‌দি প্রজারা তাঁর দাপটে সশঙ্কিত থাক্‌ত। পিতামহ নগদ টাকা গচ্ছিত রেখে ব্রিটিশ সদাগরি আপিসে বেনিয়ানগিরি করছিলেন, শেষ বয়সে সে সওদাগরি আপিসের লণ্ডনস্থ হেড আপিস্ হ'ল দেউলিয়া, ফলে তাঁরও হয় সর্ব্বনাশ। বড় সাহেবের অসীম কৃপা, অমলের পিতাকে একটা কেরাণীগিরি চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলেন, জ্যেঠামশাই কাকাদের কারো বা চাকরি জুটেছিল, কারো বা জোটেনি। মোটের মাথায় তাদের বংশের সন্তানদের আজ শুধু কেরাণীগিরির দ্বারই খোলা।

সমরায়োজনের ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে অমলকুমারও অবলীলাক্রমে কেরাণীগিরিতে বাহাল হয়ে গেছে।…

অন্তরঙ্গতার উদ্বেল উচ্ছ্বাস সুযোগ পেলেই তাদের দু'জনকে একত্রে আনে, বন্যার জলে ভাসমান কাটি কুটো যেমন একসঙ্গে জড়ো হয়ে ভাসে। ছুটির দিনে কোন দিন তারা দু'জনে ট্রেণে চড়ে চলে যায় কলকাতা থেকে পঁচিশ ত্রিশ মাইল দূরে বাংলার নিভৃত পল্লীর অন্তরালে—অবশ্য অমলেরই সখে। সেখানে বাতাবি নেবুর ফুলের গন্ধের সঙ্গে পথের পাশের ডোবার জলের পানার গন্ধ মিশেছে বাতাসে, ধুলো এড়িয়ে ধার দিয়ে চলতে গেলে সাড়ীতে ধুতিতে চোরকাঁটা বিঁধে যায়। দূরে চাষের মাঠের ধারে বটতলায় বসে বসে সারা বেলা সরযূ আর অমল কাপড়ের চোরকাঁটা ছাড়ায়, লাঙ্গলের জোয়াল থেকে ছাড়া পাওয়া শীর্ণকায় গরু একটা (রাম ছাগলের চেয়ে একটু বড় হবে আয়তনে) কৌতূহলে নাক বাড়িয়ে তাদের গায়ের গন্ধ আঘ্রাণ করে। কৌতুকে সরযূ আর অমল হেসে ওঠে। লাঙ্গলের জোয়াল থেকে স্বাধীনতা পাওয়া গরু তাদের চিনেছে বুঝি ঠিক। এ দু'টি জীবও তারই দলের!…

ইডেন গার্ডেনে বসে বসে সরযূর মনে হচ্ছিল, এত দিন অমলের সঙ্গে তার আলাপ, কিন্তু তার সঙ্গে ব্যবহারে অমল যেন এক সজ্জনতা ভদ্রতার পর্দার ব্যবধান খাটিয়ে রেখেছে। অমলের ভালবাসা মুখের ভাষায় প্রকাশ নেই, ব্যবহারেও তার সিনেমার প্রেমিকের মত কোনও কিছুই নেই। কথা সে যখন বলে, সে-সব বড় বড় কথা—বাংলা দেশের সমস্যা, পৃথিবীর সমস্যা, সাম্রাজ্যবাদীদের কূটবুদ্ধি, দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ পৃথিবীর কোটি কোটি নরনারীর উপায়হীনতার কথা। সংস্কার, দেশাচার লোকাচারের অচ্ছেদ্য নাগপাশ। সে-সব কথা থেকে কোনও তত্ত্ব সংগ্রহ করতে হয়ত সরযূ পারে না, শুধু অমলের কণ্ঠধ্বনিতে কথার উচ্ছ্বাস শুন্‌তেই তার ভাল লাগে। সে তন্ময় হয়ে শোনে, শুন্‌তে শুন্‌তে অকারণে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, কখনও বা কান্না পেয়ে যায়, কখনও বা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। অমল হয়ত' কিছুই লক্ষ্য করে না, উদ্দীপ্ত হয়ে বকেই চলেছে, বৃদ্ধা পৃথিবীর ক্রোড়ে মিথ্যাচারী দানব-শিশুর তাণ্ডব নৃত্য, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে' মিথ্যাচার, মিথ্যাচার, মিথ্যাচার…

সরযূর বড় ভাল লাগে, ভাবে গদ গদ হয়ে অমল যখন আবৃত্তি করে বাংলার পল্লীর প্রশান্ত প্রান্তরের ধারে বটচ্ছায়ায় বসে :

নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি।
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলা গেহ,
স্তব্ধ অতল দীঘি কালোজল নিশীথ শীতল-স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল ল'য়ে যায় ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ করে আন্‌চান্, চোখে আসে জল ভ'রে।

ভাবোচ্ছ্বাসে সত্যি সত্যিই অমল মৃত্তিকায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে, সঙ্গে সঙ্গে সরযূও,—লজ্জা করে না।···

কিন্তু আজ সরযূর সব চেয়ে ভাল লেগেছে, আজ প্রথম অমলের ব্যবহারে ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছে। ইডেন গার্ডেনে ঝিলের ধারে, বর্ম্মিজ প্যাগোডার কাছে বাদামতলায় তারা দু'জনে এসে বসেছিল। অমল অবশ্য আরম্ভ করেছিল পৃথিবীর বন্ধন-রজ্জুর কাহিনী, কেমন করে বৃটিশেরা দু'শ' বছরে এই ভারতবর্ষকে একখানা বিশাল কারাগারে পরিণত করেছে, যেখানে আজ মানুষ "স্বেচ্ছায়" সাম্রাজ্যবাদীর নির্দ্দিষ্ট কাজটুকু অক্লান্ত পরিশ্রমে করে দিচ্চে শুধু বেঁচে থাকবার দু'টি অন্ন খুঁটে নেবার জন্যে মিথ্যার তাপে সত্য এদেশ থেকে বাষ্পাকারে অদৃশ্য হয়ে রয়েছে,—ইত্যাদি, ইত্যাদি। সরযূ একদৃষ্টে জলের দিকে তাকিয়েছিল, সেখানে একটা কালো পাখী বার বার ডুব দিচ্ছে, পানকৌড়ি। ওই পদ্মবন থেকে ডুব-সাঁতার কেটে ওটা ওদের সামনে এল, আর দিঘীর মাঝখানটিতে ডুব গাল্‌তে লাগ্‌ল।

অমলেরও চোখ পড়্‌ল সেইখানে, সে তার বক্তৃতা থামিয়ে পানকৌড়ির জলক্রীড়া দেখ্‌তে লাগ্‌ল।···

তার পরে তার দৃষ্টি কখন ধীরে ধীরে সরযূর পানে আকৃষ্ট হয়ে গেছে, সে তার মায়া-মাখানো চোখ দু'টি দিয়ে একদৃষ্টে তাকে দেখ্‌ছে, চশমার কাচের অন্তরালে যেন বড় বড় দু'টি মুক্তাফল।···

খানিকক্ষণ পরে সরযূ জলের দিক্ থেকে চোখ ফিরিয়ে দেখ্‌তে পেল অমলের ভাবান্তর। পুলকে লজ্জায় তার শরীর যেন কাঁপছিল।···

সৌন্দর্য্য-পিপাসু শিল্পীর মত একদৃষ্টে সরযূর সুডৌল নগ্ন পা দু'খানি নিরীক্ষণ করতে করতে হঠাৎ অমলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "বাঃ, চমৎকার!"

লজ্জায় সরযূ তার পা গুটিয়ে নিতে চায়।

অমল কত কি বলে, এবার সুসংযত বক্তৃতা নয় ভাঙ্গা-চোরা কথার গুচ্ছ,···কিন্তু আঙুরের গুচ্ছের মতই ভারী মিষ্টি :···

যুগ-যুগ ধরে সাধনার ফলে আমাদের দেশের মেয়েদের এমন সুন্দর সুডৌল পা।···কত কারুকার্য্যময়, কত ধরণের চরণাভরণ···। নিরুপায় জাতির পুরুষের সামর্থ্যে যখন কুলায় না, তখনই তাদের নারীকে ডাকে কয়লার খনিতে মেয়ে-কুলি হ'য়ে খাটতে, দু'টি অন্নের ব্যবস্থা করতে :···

তার পরে অমল হঠাৎ হেসে ফেল্‌লে, "এ শ্রমোপজীবিকার নিষ্ঠুর বাস্তবতার যুগে পাঁইজোড়, নূপুর, মঞ্জীরা, পায়ের অলঙ্কার অচল। এখন ভালো জুতো দিয়ে সুন্দর পা সাজাতে হয়।···তুমি একটু বস, আমি তোমার জন্যে এক জোড়া মনের মত জুতো কিনে নিয়ে আসি।"

অমলের ব্যবহারে আজ এই প্রথম ব্যতিক্রম—সরযূর এত ভাল লেগেছে। বসে বসে আগাগোড়া কত কি ভাবছে। ক্ষণে ক্ষণে হাসি-কান্নার পরিবর্ত্তনে কী দোলাই খাচ্ছে তার মন। অমল অনেকক্ষণ গিয়েছে, প্রতীক্ষা করতে করতে সে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। চোখের পাতা দু'টি যেন ঘুমে ভারী হয়ে আস্‌তে চায়। অমল মাপের জন্যে তার জুতোর একপাটি খবরের কাগজে মুড়ে নিয়ে গিয়েছে, খালি পায়েই সে একবার একটুখানি পায়চারি করে নিয়ে আবার গাছতলাটিতে বসে পড়ল।···

পানকৌড়ির জলক্রীড়া তখনও থামেনি, খালি খালি ডুব গাল্‌ছে, দু'-চার মিনিট কালো লম্বা গলাটি ভাসাচ্ছে, আবার ডুব-সাঁতার কেটে সাঁকোর তলা দিয়ে পদ্মবনে গিয়ে ঢুক্‌ছে।

সরযূর মনে পড়ে যায় ছেলেবেলাকার সেই ছড়াটি :

"পানকৌড়ি! পানকৌড়ি!
ডাঙ্গায় ওঠ-সে।
তোমার শাশুড়ী বলে গেছে
বেগুন কোট-সে।"

চিক্কণ-কালো পাখীটিকে গৃহবধূরূপে কল্পনা করে নিয়ে বাংলা দেশের কোন অজ্ঞাত কবির সনির্বন্ধ অনুরোধ,—জলক্রীড়া ছেড়ে পাখী, গৃহকর্ম্মে মন দাও! শ্বশ্রূঠাকুরাণীর আদেশ।

ছোট একটি ছড়ায় বাংলার পল্লীর ঘরকন্নার ছবি। ছড়ায় যেন মন্ত্রশক্তি, ভাবতে সরযূর মুখখানি লজ্জায় রাঙা হ'য়ে আসে—বাঙালী ঘরের গৃহবধূ···শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, ননদ,···বধূর সজ্জা, রাঙা চেলি, অঙ্গভরা অলঙ্কার, সীমন্তে সিন্দুর-রেখা,···ঘরকন্না, "আলনায় সাড়ী ঝলমল করে," প্রাঙ্গণে তুলসীমঞ্চ, সন্ধ্যার প্রদীপ···। টাইপ-রাইটারের সামনে, এয়ার কন্‌ডিশন্-করা আপিস-ঘরে বাঙালী কন্যা—পূজা উপচারের জন্যে চয়িত পুষ্প যেন পুষ্পসারের কারখানায় এনে কে ফেলেছে।

কালো পাখীটা তখনও জলক্রীড়া করছে, অন্যমনস্ক সরযূ অস্ফুট স্বরে আওড়াতে লাগল ছোট্ট বালিকার মত :

"পানকৌড়ি! পানকৌড়ি!
ডাঙ্গায় ওঠ-সে।
তোমার শাশুড়ী বলে গেছে
বেগুন কোট-সে।"

সরযূ ভাবে ডগমগ। অমলের বিলম্ব যেন আর সয় না। ক-ত-ক্ষ-ণ সে গিয়েছে! জুতো কিন্‌তে তাকে যেতে না দিলেই হ'ত। কেন সে বাধা দিলে না—এতক্ষণ শুধু শুধু নষ্ট হ'ল, দু'জনে একসঙ্গে থাকা যেত!···অভিমানে তার কান্না পেয়ে যায়, ঠোঁট ফুলে ওঠে।···

সম্মুখে ফুলের ঝাড়টায় সবুজ পাতার মধ্যিখানে চমৎকার একটা ফুল ফুটেছে। একটা ভ্রমর ফুলের বুকে বসে মধু নিচ্ছে শুষে শুষে, ভ্রমরের ভারে ফুল নত হয়ে যায়, ভ্রমর একটুখানি উড়ে' আবার ফিরে ফুলের বুকে বসে, নিবিড় চুম্বনে মধুপান করে।···

দেখতে দেখতে সরযূর একটা কথা মনে হ'ল। আজ পর্য্যন্ত কই অমল তার হাতখানিও নিজের হাতের মধ্যে তুলে নেয়নি! পুরুষের পৌরুষ আদরের কামনায় তার যৌবনোচ্ছল বক্ষখানির ভার সে যেন আর ধরে রাখতে পারে না, অভিমানে তার কান্না পেয়ে

যায়।···মিষ্টার চৌধুরী অবলীলাক্রমে যেমন মেয়েদের আদর করতে জানে, অমল কি তা' শিখে নিতে পারে না?

আজ সে একটু দুষ্টুমি করবে।···একটা ভান করার কথা তার মনে এসেছে।···অমলের দেওয়া নতুন জুতো পায়ে দিয়ে খানিক পরেই সে একটু একটু খোঁড়াতে থাক্‌বে, বল্‌বে, নতুন জুতো কি না, তাই পায়ে লাগ্‌ছে।···অমল নিশ্চয়ই তার হাতখানি ধরবে তাকে হাঁটতে সাহায্য কর্‌তে। তার পরে।···তার পরে ভাবতে তার গা আনন্দে কাঁটা দিয়ে উঠছে।···

প্রকাণ্ড একটা হাভানা চুরুটে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হঠাৎ মিষ্টার চৌধুরী এসে হাজির, হাতে একখানা টেনিস র‍্যাকেট, "এই যে মিস্ চ্যাটার্জ্জি, একলাটি বসে আছেন!—অমল বাবু কোথায়?"

ঘৃণ্য জীব দেখলে যেমন মানুষের সমস্ত শরীরটা সঙ্কুচিত হয়ে আসে, সরযূও তেমনি আড়ষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল। সক্রোধে উত্তর করতে চায়, সে খবরে আপনার প্রয়োজন কি? নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে সে সহজ ভাবেই বললে, "অমল বাবু বাজারে গিয়েছেন, এক জোড়া জুতো কিনে আন্‌তে।"

"জুতো? কার জন্যে?" জিজ্ঞেস্ করেই পরক্ষণে মিষ্টার চৌধুরী বলে উঠ্‌ল, "এ আমি কি প্রশ্ন করছি!—জুতো যে আপনারই এ তো স্বয়ংসিদ্ধ—বিশেষতঃ এখানে যখন মাত্র একপাটি পড়ে রয়েছে, অন্য পাটিটি গিয়েছে তো মাপের জন্যে!—বেশ, মিস্ চ্যাটার্জ্জি!··· এ হতভাগ্যের প্রতি আপনার করুণা হ'ল না কেন বুঝতে পারলাম না, আমি কি জুতো-টুতো কিনে দিতে পারতাম না?"

সরযূ অসহায় ভাবে চতুর্দ্দিকে তাকাতে লাগল। মিষ্টার চৌধুরীর বাক্যের অভদ্র ইঙ্গিতে অপমানে তার শরীর থর থর ক'রে কাঁপছিল। একবার মনে হ'ল, ওই একপাটি জুতো ছুঁড়ে অভদ্রটাকে মারবে। কিন্তু সে তেমন কিছুই করতে পারলে না।···

মিষ্টার চৌধুরী বলে চলল, "মনস্থন ক্লাবে আমার টেনিস খেলা আছে, এখন চল্‌লাম। কাল আপিসে দেখা হবে।" একটু থেমে বললে, "আপনি মনে করেন, মিস্ চ্যাটার্জ্জি, অমলকুমার আপনাকে বিয়ে করবে? ছোঃ! আপনি জানেন, তার অলরেডি বিয়ে হ'য়ে গেছে, তার স্ত্রী আর দু'টি সন্তান বর্ত্তমান? বিশ্বাস না হয়, কাল আপিসে তার সার্ভিস রেকর্ডখানা আমার ঘরে দেখবেন,···চাকরির দরখাস্ত করবার সময়ে সে লিখেছে কি না তার স্ত্রী আর দুই সন্তান তার পোষ্য?"···

আধ মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে র‍্যাকেট ঘোরাতে ঘোরাতে মিষ্টার চৌধুরী চলে গেল।

দু'টো মাতাল নিগ্রো সৈনিক ইডেন গার্ডেনে এসে হুল্লোড় করছে, একবার গাছে উঠছে, একবার ঢিল ছুঁড়ছে,—একপাল কাক আকাশে উড়ে মহা সোরগোল তুলেছে।

শরতের আকাশে সূর্য্য সবে পশ্চিমে একটু ঢলেছে, সোঁদা গরম, 'চড়্‌বড়ে' রদ্দুর বুঝি ধরিত্রীর সমস্ত রস এক নিমেষে নিঃশেষে শুষে নিতে চায়!

অমলকুমার বিবাহিত? শুধু পরকীয়া প্রেমের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে সাহিত্যিক অমল তার সঙ্গে মিশেছে? মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে সে আবার বক্তৃতা করে! মিষ্টার চৌধুরী আর যাই হোক্ মিথ্যাচারী নয়।

সরযূর মাথার ভিতরটা যেন একেবারে খালি হয়ে গেছে, সে কিছুই ভাবতে পারছে না, কিছুই বুঝতে পারছে না। জলক্রীড়ারত পানকৌড়ি বুঝি অনেকক্ষণ ডুব খেয়ে খেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মন্থর-গতিতে জলের উপর ভাসছে সরযূ তার দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

অমলকুমার ফিরে এল, হাতে তার জুতোর বাক্স, মুখে তার বিজয় গৌরবের হাসি। বাক্স খুলে মিশ কালো রংএর এক জোড়া জুতো সরযূর সামনে রেখে বললে, "বেশ চমৎকার জুতো, নয়?" সরযূ কোনও উত্তর করলে না। অমল তার ভাবান্তর লক্ষ্য করলে না,—কোনও দিনই যেমন সে করে না। বিশেষতঃ আজ সে এক দুঃসাধ্য সাধন করে ফিরেছে তারই উত্তেজনায় নিজের খেয়ালে সে বলে চলল,—মনের মত এই জুতো কিন্‌তে সে আজ সারা কলকাতা ঘুরেছে। প্রথমে গিয়েছিল চৌরঙ্গীতে বিলাতী দোকানে। (মনের মত জুতো সংগ্রহ করতে সে স্বদেশীয়ানায় একটু ত্যাগস্বীকার করতে রাজি ছিল।) সেখানে এক জোড়া ভাল জুতোর দাম একখানা দামী জড়োয়া গহনার দামের সমান। তা'ছাড়া ওই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্ বিক্রয়িত্রী। আহা কি ফুটফুটে মেয়ে, চটপট্ খেটে খেটে খুন। হাজার হ'লেও ওরা এদেশেরই কন্যা, এক মিথ্যাচারের আবহাওয়ায় পরদেশী পোষাক পরে' থাকে।···

সরযূ তার নীচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে চুপচাপ অমলের বক্তৃতা শুনছে। আস্তে আস্তে তার হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে অমলকুমার সাহিত্যিক, কথার জাল বোনাই তার পেশা। অভিনেতাও সে মন্দ নয়!···অমলকুমার সোৎসাহে বকেই চলেছে: বিলাতী দোকানের জুতো সব বল-ডান্সে যাবার জুতো, উঁচু উঁচু হিল, হয়ত সরযূকে মানাবে না। শ্রমোপজীবিকার বাস্তবতার ক্ষেত্রেও সে জুতো অচল। চীনেদের দোকানেও গিয়েছিল সে। বাঙালী মেয়েদের সুকোমল পায়ের উপযোগী ভাল জুতো ওরা গড়েই না। শুধু শুধু তার পণ্ডশ্রম। তা'ছাড়া আজকাল তারা বাঙালী খদ্দেরের সঙ্গে ভাল করে কথাই বলে না, ব্রিটিশ, আমেরিকান্ মিলিটারি খদ্দেরের দেমাকেই মশগুল। এসিয়াটিক জাতির অধঃপতন তো চরমে উঠেছে।

আণবিক বোমা পড়ে সমগ্র এসিয়াটিক জাত পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেলেই পৃথিবীর মঙ্গল। ডি, ডি, টির পাউডার ছড়িয়ে এরোপ্লেন থেকে যেমন এক-একটা অঞ্চল থেকে মশা, মাছি, কীট, পতঙ্গ, ইঁদুর, ছুঁচো লুপ্ত করে দেয় ইউরোপীয়রা, অধঃপতিত পঙ্গু এসিয়াটিক জাতগুলোকে তেমনি লুপ্ত করে দিলেই পৃথিবীর কল্যাণ। কি হবে অধঃপতিত জাতির বেঁচে থেকে? জীর্ণ কঙ্কালে কি কখনও আবার প্রাণ সঞ্চার হয়?···ধর্ম্মতলার জুতোর দোকান-গুলোতে সোনালি রূপালি জুতোর বাহার, বাদশাহী আমোলের বেগম-মহলে সে জুতো চলতে পারে। লোকে কথায় বলে, বাঁশ-বনে ডোম কানা, মেয়েদের জুতোর রাজ্যে জুতো পছন্দ করা সহজ নয় ···পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিম-বঙ্গ, উত্তর-বঙ্গ, প্রভৃতি সোসাইটির জুতো বিভাগগুলোও সে আজ ভাল করে পরিদর্শন করে এসেছে।···শেষ পর্য্যন্ত মিশ্ কালো রংএর ফিতে দেওয়া এই জুতো সে নিয়ে এসেছে, সরযূর সুডৌল পায়ে চমৎকার মানাবে।

বিজয়-গৌরবে প্রফুল্ল স্মিতমুখে সে সরযূর মুখখানির পানে চাইল। ততক্ষণে ঘৃণায় সরযূর মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে। অমলের বক্তৃতার অবসরে সে তার হৃদয়াবেগ সাম্‌লে নিয়েছে, ধীরে ধীরে বললে, "চমৎকার অভিনয় করতে পারেন আপনি, অমল বাবু!···"

অমল প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারল না, তার সঙ্গে সম্বোধনে সরযূ বহু দিন 'আপনি'-'আজ্ঞে' ছেড়েছে, আজ আবার হঠাৎ এভাবে সম্বোধন কেন? খানিক পরেই তার মনে হ'ল, অনেকক্ষণ তাকে একলা বসিয়ে রেখে গিয়েছিল সে, তাই বুঝি সরযূ রাগ করেছে। তাড়াতাড়ি অমল বলতে গেল, "বড্ড দেরী হয়ে গেছে আমার···

ঝটিতি তাকে বাধা দিয়ে সরযূ কাটা-কাটা বাক্যে জিজ্ঞেসা করলে, "আপনার সন্তান দু'টি ভাল আছে তো?—এ জুতো কি আপনি আপনার বিবাহিত স্ত্রীর জন্যে কিনেছেন?"

অমলের মুখে একটা সত্যিকারের বিস্ময় ফুটে উঠল, সে বলতে গেল, "রাগ করে তুমি কি-সব বলছ সরযূ?"—

ক্রোধে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে সরযূ প্রায় চিৎকার করে উঠল, "আপনি কি বলতে চান, অমল বাবু, আপনার বিয়ে আজও হয়নি? কলকতার অভিজাত-বংশের ছেলে আপনি, আপনার পূজনীয় পিতামহ নাত-বৌএর মুখ আজও দেখেননি? মিথ্যে কথা বলতে চেষ্টা করবেন না অমল বাবু। সার্ভিস-রেকর্ডে আপনার চাকরির দরখাস্তখানা আজও আপিসে আছে, সেখানে আপনাকে ডিক্লেয়ার করতে হয়েছে, আপনার স্ত্রী আর দু'টি সন্তানের কথা।—মিথ্যাচার সামাজিক বন্ধন-রজ্জুর বুকনি দিয়ে আমায় খুব ভোলাতে চেষ্টা করেছেন।"

এক মুহূর্ত্তে অমলের মুখখানা একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অত্যন্ত কাঁচু-মাচু হ'য়ে ঢোঁক গিলে সে বলতে চেষ্টা করল, "হাঁ, কিন্তু···"

চকিতে সরযূ দাঁড়িয়ে উঠল। অশ্রুর বন্যায় চোখ দু'টির দৃষ্টি তার ঢাকা পড়ে গেছে, কান্নায় তার কণ্ঠরোধ হয়ে গেছে। মাথার চুলের বেণীটি খুলে তার পিঠে লম্বমান হয়ে গিয়েছে। তার মাথার একরাশ চুলগুলো যেন আহতা সর্পিণীর ফণা, দাঁতে দাঁত দিয়ে সে বলে উঠল, "ভদ্রতার আড়ালে আপনি জঘন্য নীচ!" বলতে বলতে সে হেঁট হয়ে নতুন জুতো জোড়া কুড়িয়ে নিল। অমলকুমার সভয়ে একটু কাত হয়ে এক পা পিছিয়ে গেল। আত্মরক্ষার জন্যে মানুষ স্বতঃই ওই রকম করে। সরযূ জুতো ছুঁড়ে' তাকে মারবে না কি? সরযূ কিন্তু তার দিকে জুতো ছুঁড়ল না, সবেগে সে দীঘির জলে জুতো জোড়া ছুঁড়ে ফেললে। এক জোড়া পানকৌড়ির মত কালো জুতো জোড়া দীঘির গভীর জলে ডুবে গেল। যে কালো পাখীটা ওখানে এতক্ষণ ডুব দিচ্ছিল আর সাঁতার কাটছিল, সে ফড়্-ফড়্ করে পাখা নেড়ে উড়ে গিয়ে পদ্ম-বনে লুকাল। সরযূ পুরানো জুতো জোড়াও কুড়িয়ে নিয়ে জলে ফেলে দিল।

সরযূ নগ্ন পদেই হন্ হন্ করে চলে গেল, দৌড়ে সে এখান থেকে পালাতে চায়, ঈডেন গার্ডেনের তৃণ-আস্তরণের উপর তার লম্বিত বেণী কালো চুলে ঢাকা মাথাটি দুলে দুলে চ'লে যাচ্ছে। অমলকুমার বলতে চাইছিল, "আমি তো, আমি তো···" সে তার কোন কথা শোনবার জন্যে অপেক্ষা করবে না। অমলকুমার বলতে পারলে না, সে সরযূকে একটুও প্রতারণা করেনি, প্রতারণা করেছে সে ইয়াঙ্কিদের আপিসকে। বিষয়-বুদ্ধিওয়ালা কোনও আত্মীয়ের প্ররোচনায় সে চাকরির দরখাস্তে মিথ্যা কথা লিখেছিল। সত্যিই তার আজও বিয়ে হয়নি।···স্ত্রী-পুত্র পোষ্য থাকলে, ইয়াঙ্কিরা দেড়-গুণ বেতন দেয়, এই তাদের দেশের আইন। সে ওই বেশী বেতনের লোভে একটু মিথ্যাচার করেছিল। কে জানত এই অণু-পরিমাণ মিথ্যাচার আণবিক বোমার মত হঠাৎ ফেটে তার এমন করে সর্ব্বনাশ করবে! এ কথা সরযূকে জানাবার সুযোগ তো সে কোনও দিন পায়নি, জানাবার প্রয়োজন তার মনেও আসেনি।···জীবনের কোন্ শুভ লগ্ন অজ্ঞাতে কখন ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে, সরযূ তার কাছ থেকে দ্রুতগতিতে দূরে চলে যাচ্ছে—একবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছেও না।···

অমল দৌড়ে চলল সরযূর দিকে, বর্ম্মিজ প্যাগোডার সন্নিকটে উষ্ট্রপৃষ্ঠ সাঁকোটার উপরে পৌঁছাল সে। দেখতে পেল, স্বর্গীয় ব্রিটিশ-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের ষ্ট্যাচুটা গঙ্গার ধারে সড়কের মাঝখানে উচ্চশির তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর তারই সামনে ঈডেন গার্ডেনের পশ্চিম ফটকের ধারে একখানা মোটর-কারের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে মিষ্টার চৌধুরী, মুখে তার প্রকাণ্ড হাভানা চুরুট, হাতে তার একখানা টেনিস্ র‍্যাকেট। স্বপ্ন-চালিতবৎ সরযূ জ্ঞানহারা ওই দিকেই ছুটে চলেছে, দলিতা সর্পিণী যেন কোন অন্ধবিবরের সন্ধান করছে।··· র‍্যাকেটখানা ঘোরাতে ঘোরাতে মিষ্টার চৌধুরী এগিয়ে আসছে।··· অমল থমকে দাঁড়াল।···

মিষ্টার চৌধুরী এগিয়ে এসে সরযূর বাহুখানা দৃঢ় হস্তে ধরলেন। সরযূর জ্ঞান ছিল কি না জানি না, আশ্রয় পেয়ে যেন তার মাথাটা মিষ্টার চৌধুরীর স্কন্ধে ঢলে পড়ল। মিষ্টার চৌধুরী তাকে তাঁর মোটরে তুলে নিলেন।

যে দৃশ্য বিলাতী ছায়া-ছবিতে দেখতে সেই কৈশোর থেকে অমলের কত মধুর লেগেছে, সেই দৃশ্য আজ চোখের সামনে অভিনীত হচ্ছে, অমলের কিন্তু একেবারে ভাল লাগছে না।···মিষ্টার চৌধুরী হতজ্ঞান সরযূর রাঙা রাঙা ঠোঁট দু'টির উপর একটি নিবিড় চুম্বন এঁকে দিচ্ছেন।···মনে পড়ে যায়, মিষ্টার চৌধুরীর কথা,—বীরভোগ্যা নারী!

অমলকুমার ব্রহ্মদেশের কারুকার্য্যময় চারুশিল্প-নিদর্শন প্যাগোডার দিকে চেয়ে রইল। বীরত্বে ব্রিটিশ ওটাকে ব্রহ্মদেশ থেকে উপড়ে এনে এখানে বসিয়েছে, কারও ধর্ম্ম-জ্ঞানে আঘাত লেগেছে কি না, সে খবর নেবার প্রয়োজন বোধ করেনি।···প্যাগোডার সামনে সাজানো বিশাল দুই ড্রাগনের বিকৃত হাঁ-করা মুখ থেকে নীচের চোয়াল ভেঙে কদর্য্য চুণ, সুরকি দেখা যাচ্ছে—বীভৎস, বিশ্রী।··· সমস্ত পৃথিবীটাই যেন শ্রী হারিয়েছে।

বিজ্ঞান জগৎ

উদ্ভিদের অনুভূতি ও বিচিত্র বৃত্তি

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সঞ্চরণক্ষম ও অনুভূতিশীল নয় বলিয়াই অনেকের ধারণা উদ্ভিদ্ প্রাণি-জগৎ হইতে পৃথকৃকৃত হইয়াছে। আপাত দৃষ্টিতে অবশ্য সঞ্চরণক্ষমতা ও বোধশক্তির অভাব থাকিলেও ছত্রাক বা শেওলা জাতীয় কয়েক প্রকার উদ্ভিদ্ অনুবীক্ষণ যন্ত্রে সঞ্চরমাণরূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছে এবং সূর্য্যমুখী ফুলের অদ্ভুত আলোক-বৃত্তি ও লজ্জাবতী লতার প্রখর স্পর্শানুভূতি হইতে উদ্ভিদের বোধশক্তিরও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নিম্নতম প্রাণীর সহিত প্রকৃতিতে খানিকটা সৌসাদৃশ্য থাকিলেও উদ্ভিদের সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য হইল ইহার দেহ সংগঠনে ও জীবনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়। উদ্ভিদের দেহ কোষে ক্লোরোফিল নামক এক প্রকার সবুজ রঞ্জক পদার্থ বিদ্যমান। এই ক্লোরোফিল ও সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে বাহিরের বাতাস হইতে গাছ কার্ব্বন ডায়োক্সাইড গ্যাস প্রশ্বাসরূপে গ্রহণ করে ও অক্সিজেন গ্যাস নিশ্বাসরূপে ছাড়িয়া দেয়। প্রাণি-জগতে ঠিক বিপরীত ভাবে এই শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে।

উদ্ভিদের প্রকৃতি ও বোধশক্তির কথা বলিতেছি, কিন্তু তাই বলিয়া ইহার 'মন' বলিয়া কিছু নাই, কারণ যাহার নার্ভ-প্রণালী বা মস্তিষ্কের অভাব তাহার 'মন' জন্মাইবে কেমন করিয়া! তথাপি এই যে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতা ও উত্তেজনায় উদ্ভিদ্ সাড়া দিয়া থাকে তাহা কতকাংশে চুম্বকের লৌহাকর্ষণের অনুরূপ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। পতঙ্গ আলোর দিকে ছুটিয়া যায়—তাহার এই Phototrpism বা আলোক-বৃত্তি যেমন কোন বুদ্ধি বা ইচ্ছার বশবর্ত্তী নয়—তেমনই উদ্ভিদের মধ্যেও কয়েক প্রকার বিচিত্র বৃত্তির স্ফুরণ দেখা যায়। এই বৃত্তিগুলি একেবারেই যে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয় সে কথা বলা যায় না—অন্ততঃ গাছের মধ্যে সেগুলি অন্ধ উত্তেজনা বলিয়া পরিগণিত হইলেও প্রকৃতি তলে তলে আপনার কাজ সাধন করিয়া লয়। আজ এইরূপ কয়েকটি অভিনব অনুভূতি ও বৃত্তির কথা আলোচনা করিতেছি।

স্পর্শানুভূতি

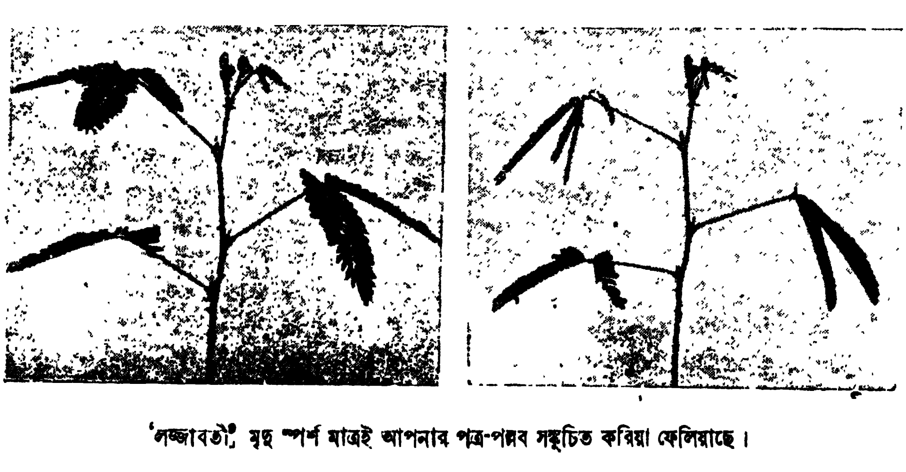
মৃত্তিকা নিম্নে শিকড় দৃঢ় সন্নিবদ্ধ থাকায় গাছের সঞ্চরণ ক্ষমতা অবলুপ্ত হইলেও সঞ্চালন শক্তি যথেষ্ট রহিয়াছে। লজ্জাবতী জাতীয় গুল্মগুলি (Mimosa) এরূপ অতিমাত্রায় স্পর্শ-চেতন যে মৃদু স্পর্শমাত্রই ইহাদের পত্রগুলি গুটাইয়া যায় ও আপনাদিগকে এক লহমায় সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে। আবার এমন গাছও রহিয়াছে যাহা কোন চলমান মেঘের ছায়া স্পর্শে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই স্পর্শ-চেতনার মধ্যেই উদ্ভিদের সঞ্চালন-শক্তির প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

আলোকবৃত্তি

বীজ হইতে যে চারা অঙ্কুরিত হয় তাহার কাণ্ড উপরের দিকে উঠিতে থাকে। গাছের ডগা কী যেন অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। এই অন্বেষণ আর কিছু নয়—আলো চাই। সূর্য্যমুখী আমরা জানি সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকে! পৃথিবীর আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের অবস্থিতির পরিবর্ত্তন ঘটিলে সূর্য্যমুখীও আপনাকে বিভিন্ন ভাবে সঞ্চালিত করিতে থাকে! কোন কোন গাছ দিন ছোট হইলে পুষ্পিত হয় আবার কোন কোন গাছ দিবাভাগ দীর্ঘতর না হইলে বাড়িতে পারে না। তাই শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন ফুলের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। Coreopsis প্রভৃতি যে সব গাছে গ্রীষ্মকাল ব্যতীত ফুল ফোটে না, সেগুলি যখন সবুজ কাঁচের আধারে সংরক্ষিত হইয়া বৈদ্যুতিক রশ্মি প্রাপ্ত হয় তখন শীতকালেও পুষ্পিত হইতে দেখা যায়। আবার যাহারা শীতকাল না হইলে পুষ্পিত হয় না সেগুলিকে যদি প্রত্যহ খানিকক্ষণ করিয়া কোন আচ্ছাদনের মধ্যে রাখা হয় তাহা হইলে গ্রীষ্মের মধ্যভাগে ফুল ফোটান যাইতে পারে।

ভূ-বৃত্তি

পৃথিবীর আকর্ষণে শিকড় যেন ভূগর্ভের অন্তরালে গভীরতর প্রদেশে নামিয়া চলে! জল ও খনিজ পদার্থের অনুসন্ধানে উদ্ভিদ্ এই প্রকার ভূ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে! শিকড় যে ভাবেই প্রলম্বিত করিয়া দেওয়া হোক না কেন, তথাপি ইহা পরিশেষে নিম্নাভিমুখী হইয়া পড়ে। শিকড়-সংলগ্ন অসংখ্য সূক্ষ্ম শুঁয়াগুলি আর্দ্রতা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে সচেতন, তাই জলের গতিপথে শিকড় প্রধাবিত হয়।

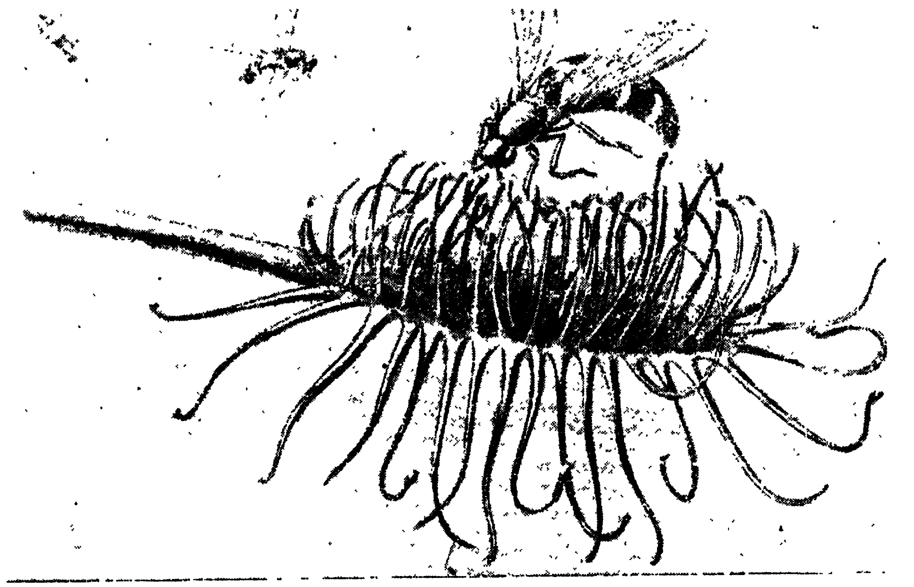


'লজ্জাবতী' মৃদু স্পর্শ মাত্রই আপনার পত্র-পল্লব সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছে।



গোলাকার পত্রবিশিষ্ট সানডিউ ; প্রত্যেকটি পাতায় প্রায় দুই শত প্রখর স্পর্শানুভূতিশীল শুঁয়া বিদ্যমান। এই শুঁয়াগুলির প্রান্তভাগে এক প্রকার চটচটে আঁঠাল পদার্থ থাকে এবং তাহা সৌরকিরণে সুন্দর দ্যুতিমানরূপে প্রতিভাত হইয়া পতঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

একবার একটি শিকড়কে ভূ-গর্ভস্থ ড্রেন-পাইপ বা পয়োনালী বিদারণ পূর্ব্বক ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া জল সংগ্রহ করিতে দেখা গিয়াছে। শিকড়ের দৌরাত্ম্যে ক্রমে যখন জলনিকাশের পথ অবরুদ্ধ হইল তখন মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক দেখা গেল দুইটি নলের সংযোজক স্থানের মধ্য



যে পর্য্যন্ত না কোন মাছি উহার মধু আহরণের নিমিত্ত সেই শুঁয়ার উপর উড়িয়া বসে ততক্ষণ সানডিউ যেন শতদলে শোভা পাইতে থাকে। কিন্তু যেই কোন মাছি ইহার ফাঁদে পা দেয় সঙ্গে সঙ্গে আঁঠাল পদার্থে তাহা ফুলের সহিত জড়াইয়া যায় ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

দিয়া ধীরে ধীরে বিদীর্ণ করিয়া শিকড় আপনার ঈপ্সিত পথে সাফল্যের সহিত অভিযান চালাইয়াছে।

তাপবৃত্তি

ক্লোভার গুল্মের ত্রিশিরা-বিশিষ্ট পত্র দিনের বেলা সম্প্রসারিত থাকে কিন্তু রাত্রির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহা ধীরে ধীরে গুটাইয়া যায়। সম্ভবতঃ তাপের হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটায় ঐরূপ হইয়া থাকে। গুল্মকেতু বা চুকাপালং (Sorrel) কেবল সন্ধ্যা সমাগমে নহে মেঘাচ্ছন্ন দিবসেও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। তখন যদি বেশ করিয়া ইহাকে আবার নাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে আবার গুটান পাতাগুলি খুলিয়া যায়। ঝাঁকানি বা নাড়িয়া দেওয়ার অর্থ হইল তাপের সঞ্চার করা। সুতরাং তাপের পুনঃপ্রয়োগে তাহা আবার সহজ সম্প্রসারিত অবস্থায় ফিরিয়া আসে। কুঙ্কুমলতা (Corcus) গাঁদা, ডেজি প্রভৃতি গাছগুলির মধ্যে এই প্রকার তাপবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়।



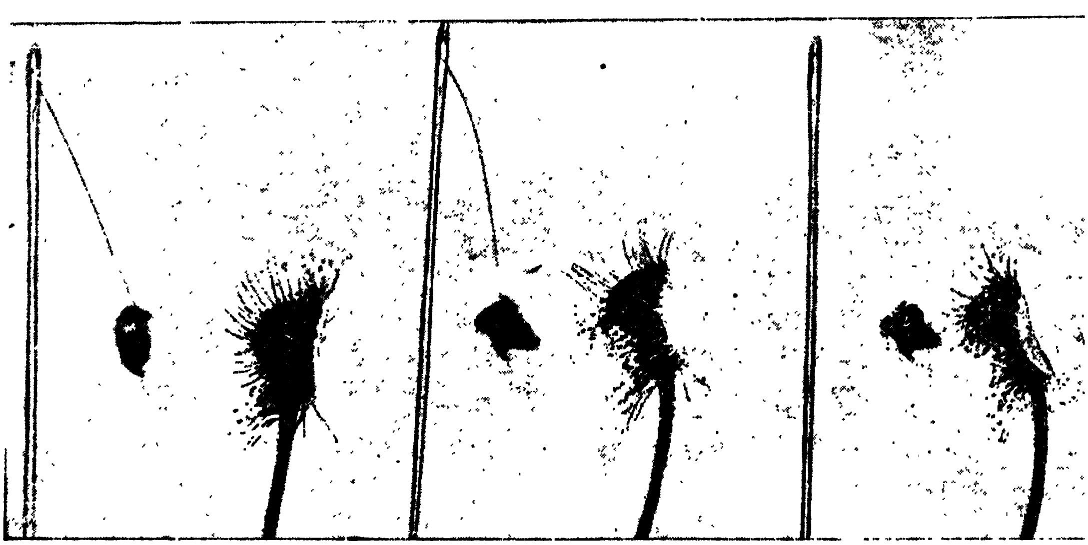
গোলাকার পাতা ধীরে ধীরে এমন ভাবে গুটাইয়া যায় যে সিকি ঘণ্টার মধ্যেই হতভাগ্য মাছি দম বন্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। ঐ সময়ে পত্র হইতে এক প্রকার জারক রস ক্ষরিত হইয়া উদ্ভিদকে মক্ষিকা-মাংস পরিপাক করিতে সাহায্য করে। পরিপাকক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন হইলে শুঁয়া সমেত পাতাগুলি আবার খুলিয়া যায় এবং ভুক্ত মক্ষিকার দেহাবশেষ পরিত্যক্ত হয়।

'রাক্ষসী বৃত্তি

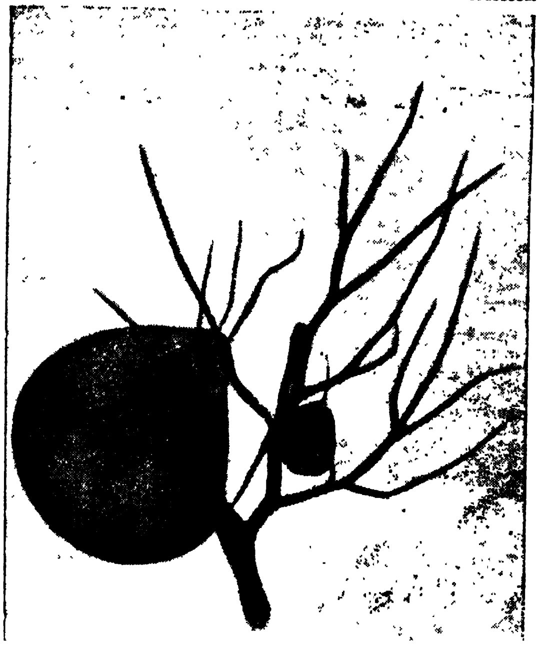
কয়েক প্রকার গাছের অভিনব রাক্ষসী বৃত্তির কথা শুনিয়া অনেকেই চমৎকৃত হইবেন। জলাভূমিতে সাধারণতঃ নাইট্রোজেন গ্যাসের মাত্রা কম থাকে তাই জলাভূমি-জাত সান-ডিউ (Drosera), পিঙ্গুইকিউলা (Butterwort), ইউট্রিকিউলেরিয়া (Bladderwort) প্রভৃতি গাছগুলি প্রাণী-শিকার পূর্ব্বক খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। নিম্নের চিত্রটিতে বিলাতের সান্‌ডিউ কেমন করিয়া পতঙ্গ শিকার করিয়া থাকে তাহা সুন্দর ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে।

শুধু পতঙ্গ নয়, যে কোন মাংসখণ্ডের প্রতিই যেন এই সান্‌ডিউ গাছের অল্পবিস্তর লোভ আছে। একটা কাঠিতে এক টুকরা মাংস ঝুলাইয়া ইহার সম্মুখে ধরিলে সেই মাংসখণ্ড গ্রাস করিবার জন্য বেশ ব্যগ্র হইয়া পড়ে। নিম্নের চিত্রটিতে দেখা যাইবে লোভাতুর সান্‌ডিউ সেই মাংসখণ্ড পাইবার জন্য কেমন করিয়া নিজেকে ঈষৎ হেলাইয়া দিয়াছে।

ইউট্রিকিউলেরিয়া নামক এক জাতীয় জলজ উদ্ভিদে সরু সরু পাতার ফাঁকে ফাঁকে মুখবিশিষ্ট থলি থাকে। উক্ত উদ্ভিদ অতি বিচিত্র ভাবে থলিসমূহ হইতে জল-নিষ্কাশন করিয়া দেয় এবং তাহা তখন চুপসানো ও মুখবন্ধ অবস্থায় ঝুলিতে থাকে। এই ভাবে ইউট্রিকিউলেরিয়া তাহার ফাঁদ পাতিয়া রাখে। সন্তরণশীল কোন ক্ষুদ্র জলপ্রাণী সহসা কোন থলির মুখ স্পর্শ করিয়া ফেলিলে তাহার আর রক্ষা থাকে না—সঙ্গে সঙ্গে বন্ধমুখ খুলিয়া যায় এবং তাহার ফলে যে আবর্ত্তের সৃষ্টি হয় তাহাতে উক্ত প্রাণী জলের সহিত সেই



সান্‌ডিউকে মাংস খণ্ডের দ্বারা প্রলুব্ধ করা হইতেছে।



ইউট্রিকিউলেরিয়া গাছের শিকার ধরা ফাঁদ স্বরূপ একটি মুখবিশিষ্ট থলি বর্দ্ধিত আকারে দেখা যাইতেছে।

স্ফীত থলির মধ্যে নীত হয়। অবশেষে পরিপাকক্রিয়া শেষ হইলে জলের সহিত তাহার দেহবিশেষ বাহিরে নির্গত হইয়া যায়।



গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের ঘটপত্রী গাছ (Nepenthes) মাংসাশী পেশীরূপে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেকটি পাতার প্রান্ত লম্বা শুঁড়ের ন্যায় নিম্নে প্রলম্বিত হয় এবং সেই শুঁড়ের সহিত একটি উজ্জ্বল বর্ণের ঢাকনি ও কাণা-সমেত ঘট ঝুলিতে থাকে। ঘটের কাণা বা প্রান্তদেশ হইতে মধু ক্ষরিত হইয়া অভ্যন্তর-প্রদেশে সঞ্চিত হয়। মধুলোভী পতঙ্গ সেই প্রান্তদেশে উপনীত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পিচ্ছিলতা প্রযুক্ত ভিতরে গড়াইয়া পড়ে এবং সঞ্চিত ক্ষরিত রসে নিমজ্জিত হইয়া নিহত হয়। ঘটপত্রী তখন সেই মৃত পতঙ্গ হইতে সারাংশ শোষণ করিয়া লয়।

ক্যারোলিনার ভিনাস-ফাঁদ প্রকৃতই চমকপ্রদ বলিয়া মনে হয়। কোন কিছু স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই এই ফাঁদ বন্ধ হইয়া যায়। তাই ইহাকে প্রতারিত করা খুব সহজ। কিন্তু অবাঞ্ছিত দ্রব্য ফাঁদে পড়িয়াছে ইহা যে মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারে তৎক্ষণাৎ বন্ধ ফাঁদ খুলিয়া যায়। এই ভাবে পর পর কয়েক বার প্রতারিত হইলে খানিক ক্ষণের জন্য উহা নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং ফাঁদ বন্ধ করিতে বিমুখ হয়। এই ব্যাপারকে হয়ত অনেকে গাছের বিরক্তি প্রকাশ বলিতে চাহিবেন। কিন্তু বিজ্ঞান আজও গাছের মধ্যে মনের সন্ধান করিতে পারে নাই।



ঘটপত্রীর শিকার-কৌশল।

অবরোধ

বিজন ভট্টাচার্য্য



দ্বিতীয় দৃশ্য

[কুলি বস্তি। সাঁরবন্দী খোলার দোচালা বাড়ী—মাঝে মাঝে সরু গলি-পথ। একজন লোক কোন মতে কাত হয়ে গলে যেতে পারে—এমনি সঙ্কীর্ণ। এর ভেতরে আছে অগণিত মানুষ—সবাই কারখানায় কাজ করে। সকাল বেলার shift'এ যারা কাজ করে তারা ইতিমধ্যেই যাবার উদ্যোগ ক'রছে। আর যাদের দুপুরের shift'এ কাজ, তারা পাশের একটা চায়ের দোকানের ভাঙ্গা বেঞ্চে ব'সে আসন্ন ধর্ম্মঘটের কথা জোর-গলায় জাহির করছে। চায়ের দোকানের সামনে উনুনের ওপর বসানো প্রকাণ্ড একটা কলাই-করা কেটলির মুখ দিয়ে হুস্ হুস্ শব্দে ধোঁয়া বেরুচ্ছে অনর্গল। প্রাতঃস্নান সেরে ঘরে ওঠবার পথে কেউ ডান হাতে কোচানো ধুতি আর বাঁ হাতে জলভরা লোটা হাতে ক'রে শুনে নিচ্ছে ধর্ম্মঘটের কথা। সরু গলিপথ দিয়ে মাঝে মাঝে বর্ষীয়ান্ ও যুবতী মেয়েরা টুকিটাকি কাজকর্ম্মের খাতিরে কেউ বাসন, কেউ বালতি, কেউ ঘুঁটের ঝুড়ি নিয়ে চলা ফেরা করছে। চায়ের দোকানের সামনেটাই সবগরম হয়ে উঠেছে একটু বেশী মাত্রায়। মুখোমুখি প্রায় জনা বারো শ্রমিক বসে কথা কাটাকাটি করছে। কেউ কথা বলছে, কেউ বা মাটির ভাঁড়ে ক'রে গরম চায়ে চুমুক দিচ্ছে। কেউ বা চুমুক দিতে গিয়ে মুখ তুলে একটা পাল্টা জবাব দিতেও ছাড়ছে না। একটা পেতলের বোতাম লাগানো খাকির ছেঁড়া কোট প'রে একটা রোগা বুড়ো মত লোক চা তৈরী করছে। আর হাফ প্যাণ্ট পরা নাদুস-নুদুস একটা কালো ছেলে চা সরবরাহ ক'রছে হাতে হাতে আর বার বার বুড়োর ধমক খাচ্ছে চটপ'টে না হওয়ার দায়ে। বুড়োকে খুব কর্ম্মব্যস্ত দেখাচ্ছে—অনর্গল কথা বলছে আর হাতে কাজ করে যাচ্ছে। দূরে খোলার বারান্দার ওপর সদ্য ঘুম ভেঙ্গে দাঁড়িয়ে একটা লোক বেড়ালের মত ডিঙ্গি মেরে মেরে আড়মোড়া ভাঙ্গছে আর পা চুলকোচ্ছে।]

নগিন ! ডেকে লিয়ে রসের কথা···এ বাবা···

বুধাই। চা লায় রে এ বাচ্ছা, জলদি। (নগিনকে) দুটো আঙ্গুল বিড়ি ধরার মত ক'রে ধ'রে টান মেরে ইঙ্গিতে বিড়ি দিতে বলে)

নগিন। লেই রে ভাই, ডাঁরা, আনাই।

গিট্টু। পণ্ডিতের গর্দ্দানাটা কত মোটা রে···দেখ তো শালা বেড়বে কি না!

ওসমান। এই যা যা থাম, খুব হ'য়েছে।

গিট্টু। কি বলছিস বে!

ওসমান। কি বলছিস বে, তুই কি বলছিস!

গিট্টু। যা কলা।

ওসমান। যা কোলা কি, যা কোলা কি? একটা কথা বললেই হ'লো! কি করেছে বড়বাবু পণ্ডিতের ঘরে।

নগিন। আরে সে কি করেছে তোমায় কি আর দেখিয়ে ক'রবে বড়বাবু! কি ক'রেছে···কি বলছিস রে তুই ওসমান।

ওসমান। আলটপকা যার তার নামে ও সব কথা ঠিক না।

গিট্টু। আলটপকা, ও শালা এখনও আলটপকা দেখছে। শালা চোখের ওপরে গাড়ী নিয়ে এলো, গাড়ী থেকে নামলো, শালা পণ্ডিতের ঘরে ভি ঢুকলো, তবু ব'লছে আলটপকা।

ওসমান। ঘরে ঢুকলো তুই দেখিছিস্ ।

গিট্টু। আবে আমি দেখিনি পাড়ার বিলকুল লোক দেখেছে ···ছোট কচির মা'কে তো বিশ্বাস করবি, প্রেমলাল, নগিনের বউ···যা না শুধোবি। বাজে বাত বলছিস কেন।

নগিন। এমন দরদ দেখাচ্ছে যেন পণ্ডিতের ও মাগ—শালা আমরা যেন সব ঝুটমুট ব'কে মরছি।···আরে বেশী কি কথা তুই পণ্ডিতকেই শুধোগে যা না!

গিট্টু! শেষকালে ঢুকবি তো ঢোক পণ্ডিতেরই ঘরে, যা শা···লা।

নগিন। ঐ যে সেই একদিন অফিসে ডেকে নিয়ে গেসলো না, ব্যস সেই দিনই বিগড়ে দিয়েছে মাথা।

গিট্টু। আরে হাঁ হাঁ ঐ হয়েছে, নইলে এত পীরিত যে শালা শাঁক বাজিয়ে ঘরে তুলে নেয়।

নগিন। মোটা হাতে মেরেছে বাবা মোটা হাতে মেরেছে। পীরিত কি আর এমনি হয়!

(গলিপথ দিয়ে ছোট কচি, বুধাই ও প্রেমলালের প্রবেশ)

গিট্টু। ঐ যে ছোট কচি আসছে।

নগিন। এই ক'চে!

ছোট কচি। কি বে।

নগিন। শোন শোন।

গিট্টু। হারিআপ ম্যান।

(ওসমান উঠে দাঁড়ায় যাবার মন ক'রে)

উঠছিস্ কেন, ব'স ব'স। শুনে যা ছোট কচি কি বলে,— এই ক'চে!

কচি! আরে বোল না।...এ বাবা, জলদি...বেশ কড়া করে দিও। (চা দিতে ইঙ্গিত করে)

বুধাই। (নগিনকে) কই রে তোর বিড়ি, দূস শালা...(উঠে দাঁড়ায়)

নগিন। আরে ব'স না, এই বাচ্চা বিড়ি নিয়ে আয় না!...প্রেম পিলাও না দোস...আছে! (ছোট কচি টিনের কৌটো খুলে সকলকে বিড়ি দেয়) এই যে, বাবু তো বাবু কচি বাবু। (বুধাইকে) লেঃ, শালা বিড়ি বিড়ি করে হামলে ম'লো।... ওসমান পেইছিস্।

গিট্টু। হ্যাঁ এইবার হয়ে যাক মোকাবিলা।

কচি। কিসের মোকাবিলা!

নগিন। আরে সেই বড় বাবুর ব্যাপারটা রে। ওসমান শালা বিশ্বাসই করছে না।

কচি। কেন, এয়েছেলো তো। ওসমান জানিস না!

গিট্টু। ও শালা খবরই রাখে না তার, আবার ব'লে বলে দূস ও মিথ্যে কথা, লাও।

ওসমান। না সে আসতে পারে, তবে পণ্ডিতকে লিয়ে যে কথাটা বলা হচ্ছিল সেটা ঠিক না!

গিট্টু। এখন বলছে আসতে পারে।

ওসমান। হ্যাঁ তা সে না হয় হ'লো কিন্তু ডেকে নিয়ে রসের কথা, শাঁক বাজিয়ে ঘরে তুলে নিয়েছে, তার পর মোটা হাতে মেরেছ —এই সব কথায় আমার আপত্তি আছে।

গিট্টু। আরে সে কে বলছে, তুই যে বলছিস বড় বাবু পণ্ডিতের ঘরেই ঢোকেনি।

ওসমান। এই ঝুটমুট বলিসনি। তুই বলিছিস, নাগিন বলেছে; এই তো বুধাই ছিল বলুক না, বুধাই!

বুধাই। আমি বাবা লেই এর মধ্যে।

ওসমান। বললেই হলো একটা কথা। পণ্ডিত শালা খেটে মরছে তোদেরই ভালর জন্তে, আর...খারাপই যদি লোক হবে পণ্ডিত তো ইউনিয়ন পাঠায় কেন পণ্ডিতকে!

নগিন। আরে ও ভি তো আমারও কথা, পাঠায় কেন ইউনিয়ন পণ্ডিতকে।

ছোট কচি। এ কি কথা বলছিস রে, ইউনিয়ন পাঠায় কি রে!

নগিন। ইউনিয়নই তো পাঠিয়েছে।

ছোট কচি। আরে হ্যাঁ হ্যাঁ কপচাসনি মেলা...ইউনিয়ন পাঠিয়েছে ...কোন্ ইউনিয়ন...তোদেরই তো ইউনিয়ন...

ওসমান। সে ইউনিয়নে তুই নেই, গিট্টু নেই?

নগিন। সে তো আছি।

ওসমান। তবে, ইউনিয়ন ইউনিয়ন করছিস! ইউনিয়ন কি তোদের বাদ দিয়ে না কি!...তো ছিলি তো তোরাও, পাঠালি কেন?

পণ্ডিত। সে তো তুইও ছিলি, ছোট কচি ছিল, বুধাই ছিল, শুধু কি আমরা?

ছোট কচি। সে কে না বলছে। তবে ঝুট-মুট ইউনিয়ন পাঠিয়েছে ইউনিয়ন পাঠিয়েছে বলছিস কেন!...এই রকম মগজ নিয়ে কথা বলবি তার ইউনিয়ন আর কত ভাল হবে!

ওসমান। বেশ তো এয়েছেলো বড়বাবু পণ্ডিতের ঘরে মানলুম, কিন্তু পণ্ডিতের মুখ থেকে একবার শোন্ কি ব্যাপার—কি ব'লেছে বড়বাবু পণ্ডিতের কানে কানে। হ্যাঁ! তার পর যদি বুঝিস যে না এমন সব কথা বলেছে পণ্ডিত বড়বাবুকে যে তাতে করে ইউনিয়নে বেইজ্জৎ হ'য়েছে, তখন বলতে পারিস্। তখন সে তুই পণ্ডিত কেন, পণ্ডিতের চোদ্দ পুরুষ তুলে গাল দে না, ওসমান কথা বলবে না। কিন্তু না শুনে মেলে খামখা এক জনের নামে এই রকম হামলা করার কোন মানে হয়?

ছোট কচি। আরে সে বড়বাবু যে পণ্ডিতের ঘরে এয়েছেলো এ কথা ওসমান হয় তো জানে না, কিন্তু আর সবাই জানে। কিন্তু তাই ব'লে পণ্ডিত যে বেফাঁস একটা কিছু কবুল করেছে বড়বাবুর কাছে এ কথা তো কেউই ব'লছে না। তুললে কে এ কথা?

ওসমান। আরে ভাই, কে তুললে কে জানে, আমি তো নগিনের মুখে এই প্রথম শুনলাম?

ছোট কচি। নগিনটা ঐ রকম।

নগিন। নগিন কি রে, গিট্টুই তো আমায় বললে।

গিট্টু। এই শালা, ডেকে লিয়ে রসের কথা কে বলেছে!

নগিন। যাগ গে বাবা ঘাট হয়েছে। সবাই চুপচাপ থাকে আমি শালা মুখ খুলেই মুস্কিলে পড়ি।...আজ ছোট কচি খুব এক হাত আমায় নিলে, লে বাবা লে, কিন্তু কাল রাতে মঙ্গল মিস্ত্রী যখন পণ্ডিতের নামে ওর কাছে কত কথা বললে সে বেলা কিছু হ'লো না। আমি তো বাবা সেই কথাই বলিছি। মিথ্যেই যদি হবে তো ছোট কচি তখন মঙ্গল মিস্ত্রীকে দু'কথা শুনিয়ে দিলেই পারতো। আমরাও সমঝে যেতুম। তখন তো দেখি রা কাড়লে না ছোট কচি।

ছোট কচি। ছোট কচি কি বলবে তখন। আর মঙ্গল মিস্ত্রীকে কি তোকে নতুন ক'রে চেনাতে হবে!

ওসমান। শালা একের নম্বর বিলাক লেগ, ও শালা এখানে আসে কেন।

ছোট কচি। আসে কেন—কাজে আসে। সে বোঝ না! কিন্তু সে দু'কথা ব'লে গেলেই শালা তোমার আমার যদি মাথা ঘুরে যায় তো ইউনিয়নে আছি কেন। সে তো বলবেই।

গিট্টু। নগিনটা বড্ড কান-পাতলা।

নগিন। যা শালা তুইও তো সায় দিচ্ছিলি এতক্ষণ।

গিট্টু। সায় দিচ্ছিলি এতক্ষণ...ঐ জন্যেই ওসমান দেখি সব সময় শালা মুখ গোমরা করে আছে।...যাক ভাই কিছু মনে করিসনি ওসমান।

ওসমান। যাক যাক ঢের হয়েছে, আমি ওসব কথা শুনতে চাই না। ও সে কার কথায় কে কি ভাবলো আর বলে,...আরে শালা এই যদি করবে তো লড়বে কখন! দিল্লাগির সময় এটা। আর দু রোজ বাদে কারখানায় ধর্ম্মঘট করতে যাচ্ছিস তোরা! লজ্জা করে না!

নগিন। ধর্ম্মঘট করবো তার আবার লজ্জা কিসের?

ওসমান। ধর্ম্মঘট করবো, মুখে তো দেখি কিছুই আটকায় না।··· শালা এই হিম্মত নিয়ে ধর্ম্মঘট করবে! ভেসে যাবে, বুঝলে ভেসে যাবে। ঐ মঙ্গল মিস্ত্রী এসে একটি ভাঁওতা মারবে আর দেবে ফাঁসিয়ে বিলকুল।

গিটু। আরে রাখ রাখ ভাঁওতা মেরে ফাঁসিয়ে দেবে!

ছোট কচি। দেবে কি দিয়েছে তো। এই ছাখ না কাল রাতে মঙ্গল মিস্ত্রী এসে একটা চাল মেরে গেল, আর অমনি তোরা তার কথামত আজ ইউনিয়নের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছিস; চাপাচ্ছিস কি না উত্তর দে! তো ফাঁসাবে কি বলছিস!

গিটু। আরে ওটা তো কথার পিঠে কথা, তাই বলে কি আর সত্যি সত্যি বলিছি।

ওসমান। হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা তুমি ঠিক করেছো যাও, ঠিক করেছো। এই করে ধর্ম্মঘট বানচাল হয়ে যাক, তার পর বলো আমরা কি আর সত্যি সত্যি বানচাল করেছি!

নগিন। ধর্ম্মঘট বানচাল করার কথা ওঠে কিসে রে, খুব···ঐ পিসিমা পিসিমা ভাব দেখাসনি ওসমান বলছি। শালা ইউনিয়ন তোর ইউনিয়ন আমারও আছে!

ওসমান। আর হাঁ হাঁ ভোয়াবী মারিস না বেশী নগিন। ইউনিয়ন তোর তো বেইজ্জতি করিস কেন ইউনিয়নের। মঙ্গল মিস্ত্রীর কথামত পণ্ডিতের নামে যা তা বলিস কেন? পণ্ডিতের নামে একটা খারাপ কথা ব'ল্লে যে ইউনিয়নেরই ইজ্জৎ চলে যায়, এই কথাটা বুজিস না কেন।···বাইরের লোক কে কি বলেছে সেই কথামত তুই ঘরের মা-বোনের ইজ্জত যাচাই করবি! বোল!

নগিন। বড় বেশী বাড়াচ্ছিস ওসমান। এতটা ঠিক না···নগিন বেইমান না।

ওসমান। তো করিস কেন বেইমানি!

নগিন। কে বেইমান, তুই চুপ কর। একদম চুপ···

ওসমান। হাঁ হাঁ তো লে লে (বড় একটা চাকু ফেলে দেয় নগিনের সামনে) লে, দেখা দে আব ইমান···লে, মার মার (নিজের গলাটা এগিয়ে দেয়)

নগিন। বেইমান—ন—ন—ন!

(ঈশ্বর পণ্ডিতের প্রবেশ। মাথায় পটি বাঁধা, হাত গলার সঙ্গে ঝোলান। সঙ্গে দু'-তিন জন সহকর্মী মজুর)

ছোট কচি। আরে পণ্ডিত তুমি···

ঈশ্বর। এই যে।

ছোট কচি। তুমি, এ কি, কি হলো কি?

ঈশ্বর। এ বাবা···খোড়াসে···উঁ, কি জানি বাবা কাল রাতে কারখানা থেকে বাড়ী ফেরবার পথে পেছন থেকে এসে কে লাঠি চালালো, (মাথার পটি দেখিয়ে) এটা তেমন কিছু না, হাতটাই চোট খেয়েছে জোর। অন্ধকারে ঠিক ঠাওর করতেও পারলাম না—তা দু'টো হাঁক-ডাক করতেই দেখি দৌড়ে পালিয়ে গেল লোকটা।···বাজে বদমাইস টদমাইস হবে···তার পর এখানে গোলমালটা কিসের?

ওসমান। বলছি, তার পর শুনি তোমার ঘরে কাল নাকি বড়বাবু এয়েছেলো?

ঈশ্বর। আরে হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলতে এলুম।···বড়বাবু এলো, শুধু এলো, গাড়ী চড়িয়ে আবার কারখানায় নিয়ে গেল। তার পর কথায় কথায় সেখানে বাধলো ঝগড়া, আমি রাগ করে বেরিয়ে এলুম। তারপর বাড়ী ফেরবার পথে তো এই কাণ্ড। এখন বোঝ ব্যাপার।

ছোট কচি। তবে ডেকে নিয়ে তো ভাল রসের কথা শুনিয়েছে দেখছি!

নগিন। ক'চে?

ওসমান। নগিন, গিটু, একবার মেপে দেখবি নাকি পণ্ডিতের গর্দ্দানাটা।

ঈশ্বর। কি ব্যাপার কি, নগিন?

(নগিন, গিটু মাথা নিচু করে এক দিকে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। অন্য দিকে রইলো ওসমান, ছোট কচি;—মাঝখানে পণ্ডিত)

(অন্ধকারে পটক্ষেপ)

তৃতীয় দৃশ্য

কারখানায় বিশ্বকর্ম্মা পূজো হচ্ছে। এই উপলক্ষে মিঃ সেন ও মিঃ সেনের বাবা উদ্যোগী হ'য়ে শ্রমিকদের আনন্দ-বাসরে উপস্থিত হ'য়েছেন। দূরে ডায়াসের ওপর বসে আছেন মিসেস্ সেন। সাবিত্রী দেবীও উপস্থিত আছেন। আর আছেন কারখানার বড় বড় কর্ম্মচারীরা। করগেটের টিনের খোলা দরজা দিয়ে ডায়াসটাই দৃষ্টিগোচর হ'চ্ছে। শ্রমিক সমাবেশ দেখা যাচ্ছে না। সামনেটা বেশ সাজান-গোছানো—লোহার গেটটার দু'পাশে দু'টো জলপূর্ণ মেটে কলসী ডাব সহ ঠেসান দেওয়া রয়েছে দু'টো কলাগাছের গায়ে। মাঝে মাঝে হৈ চৈ চেঁচামেচি হচ্ছে—বোঝা যাচ্ছে কারখানার ভেতরে অগণিত শ্রমিক মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠছে। স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে জাতীয় পতাকা গেটের মাথায় বেশ জাঁক-জমক সহকারে উড়িয়ে দিয়ে তার ওপর flash light ফেলা হয়েছে। করিডরে পায়চারি করছে মহাবীর ও আরও কয়েক জন সশস্ত্র শাস্ত্রী। মাঝে মাঝে বাইরে মোটর গাড়ীর হর্ণ বেজে উঠছে, আর তার একটু পরেই হাতে হাত ধরে প্রবেশ করছেন দিশি বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদ-পরা সমাজের হোমরা-চোমরারা। প্রথম থেকেই লাউড স্পীকারে কি যেন একটা গান বাজছিল; সভা আরম্ভ হতেই সেটা বন্ধ করে দেওয়া হল। পর্দা উঠতেই কবিকে আবৃত্তি ক'রতে শোনা যেতে থাকে।

(আবৃত্তি)

কবি। দুনিয়ার ভাই প'ড়ে কি দেখেছ নতুন উইলখানা
কার ভাগে কত প'ড়েছে হিসেবে গড়পরতায় সোনা;
দিন এসে গেছে বাহারী রঙীন সার্থক কামনার
চরাচরে আজ তারি পরোয়ানা সমান বাঁটোয়ারার।
বিষয়-আশয় মোহ-মদিরায় সোনার মূল্য ভাই
কাল যাহা ছিল আজ তাহা নাই বোঝ এই মজাটাই;
হিসেবের কড়ি চিৎ হ'য়ে গেছে কাল-পুরুষের হাতে
হাঁড়ি-কুড়ি আর ছাতুর সরাটা ভাঙবে না এক লাথে।
পেয়েছে যে বহু চোখে তার লহু মনের শান্তি নাই
ঠকা প'ড়েছে যে আজ সে হাসিছে কাঙ্গালেরই হ'লো ঠাঁই;
বড় যে বড়ই চিরদিনই বড়ো টাকা আছে কিবা নাই
কানা কড়ি নিয়ে টানাটানি ক'রে কি ফল ফলিবে ভাই।

সোনার মূল্য দেব তো তবেই বিনিময়ে দিলে সুখ
সুখ তারে কই অনুখন যাহা দেয় নব নব দুখ ;
সোনা যার আছে দুখ তার নাই বৈভব হ'লো মিছে
যার কিছু নাই সব তার আছে দাম মিলে গেছে পিছে।
শ্রমিক রাখুক মালিকের মান মালিকেও শ্রমিকের
হাত হেত্তেরের হ'য়ে যাক মিল বৈভবী ধনিকের
দুইখানা হাতে গ'ড়ে তো উঠুক মাটিতে স্বর্গধাম
আমি কবি গাই শুধু জয়গানে অমৃতত্বের নাম।
মালিক-মজুরে রাজায়-প্রজায় মিটে যাক সব গোল
দুনিয়াদারীর রঙ্গ-মেলায় ভেদাভেদ সব ভোল ;
বিরোধের আজ হ'লো অবসান থেমে গেল সংগ্রাম
ঝুটা মাণিকের মোহ গেল টুটি নেমে এলো বিশ্রাম।

(আবৃত্তি শেষ হলে ডায়াসের লোকেরাই হাততালি দিল, শ্রমিকরা নয়)

সেন সাহেবের বাবা। অসুস্থ বিধায় আমি আর পূর্ব্বের মত এখন কারখানায় আসতে পারি না, কিন্তু তবু কারখানা সম্বন্ধীয় যাবতীয় খোঁজ-খবর আমি এখনও রাখি এবং অবস্থাবিশেষে যতটুকু সম্ভব কারখানার কাজে আমি এখনও সহায়তা করে থাকি। এক দিন এই কারখানা ছিল ছোট, আয়তনে ও ব্যবসায়ের দিক্ থেকে এর প্রসার ছিল নগণ্য, কিন্তু স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশের মধ্যে আজ ন্যাশনাল মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরী বলতে গেলে শীর্ষ-স্থান লাভ ক'রতে চ'লেছে (মাথা নাড়ানাড়ি)—এটা খুবই গৌরবের বিষয়। আজ এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম শুধু দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বিদেশেও এর সুখ্যাতি অল্প-বিস্তর ছড়িয়ে পড়েছে। এখন শিল্প-প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের এই ন্যাশনাল মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরী যে দিন স্বাধীন দেশের মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলোর সম-মর্য্যাদা দাবী করতে পারবে সেই দিনই আমাদের আজীবন শ্রম-সাধনা সার্থক হবে বলে আমি মনে করব।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে আজ এই ন্যাশনাল মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরীর শ্রী ও মর্য্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, সর্ব্বাগ্রে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি বলছি সাধারণ কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদের কথা—যারা এই জাতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বনিয়াদ। বিশেষ করে নানান প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েও যে দৃঢ়তার সঙ্গে, যে নিষ্ঠার সঙ্গে তারা কাজ ক'রেছেন সে জন্য তাঁদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর সেই সঙ্গে ঘোষণা করছি যে কোম্পানী খুসী হ'য়ে ন্যাশনাল মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরীর প্রত্যেক কর্ম্মীকে একযোগে দু'মাসের বোনাস দিতে প্রতিশ্রুত হ'য়েছেন। (উল্লাস ধ্বনি ও সঙ্গে সঙ্গে হট্টগোল) আগামী মাসের মাইনের সঙ্গেই তাঁরা এই পুরস্কার লাভ ক'রবেন।

আশা করি, কোম্পানীর এই ঘোষণা আপনারা সকলে খুসী হ'য়ে মেনে নেবেন এবং আগামী বৎসরে এমন দিনে যাতে ক'রে কোম্পানী আবার এই ঘোষণা করতে পারে তজ্জন্য কারখানাকে সকল দিক্ দিয়ে সমৃদ্ধশালী করে তুলবেন।

যুদ্ধ শেষ হ'য়ে এলো। এক দিক্ থেকে এটা সুখের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দেশের মত আমাদের দেশেও অনিবার্য্য ভাবে যে ব্যাপক সঙ্কট দেখা দেবে সে সম্বন্ধেও আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে। সম্মুখে বাধা অনেক—সমস্যা অসংখ্য, কিন্তু সমবেত সহযোগিতার বলে আশা করি আমরা সে দুর্দ্দিনও কাটিয়ে উঠতে পারবো। মালিক আসবে মালিক চ'লে যাবে, শ্রমিক আসবে শ্রমিক যাবে, কিন্তু ন্যাশনাল মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে—তবেই আমাদের সকল প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এই মহৎ কাজে শ্রীভগবান্ আমাদেরকে সাহায্য করুন।

(ডায়াসের ওপর হাততালি পড়ল আর শ্রমিকরা বিক্ষিপ্ত ভাবে হাততালি ও উল্লাস প্রকাশ করলো—একযোগে নয়। উঠে দাঁড়ালো এবার মঙ্গল মিস্ত্রী। গোলমাল সুরু হ'লো)

মঙ্গল মিস্ত্রী। মাননীয় সরকার বাহাদুরের ঘোষণা আপনারা শুনলেন। আশা করি এতে আপনারা খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন। কারণ সত্যি কথা বলতে গেলে, এই বোনাসের দাবী আপনারা করবার আগেই কোম্পানী খুসী হ'য়ে আপনাদের দিয়েছেন। সাধারণ শ্রমিকদের পক্ষ থেকে আমি সরকার বাহাদুরকে এ জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা অতীতেও আন্তরিকতার সঙ্গেই কাজ করেছি—বোমা ও দুর্ভিক্ষের সময়ও কাজে আমরা এতটুকু অবহেলা করিনি—সে কথা সরকার অবগত আছেন। ভবিষ্যতেও আমরা সে দায়িত্ব পালন ক'রবো—শ্রমিকরা নেমকহারামী কখনই ক'রবে না। শেষকালে আমি আবার বলি, যে সরকার বাহাদুর অসুস্থ শরীর নিয়ে এসেও আজকে আমাদের এই উৎসবের দিনে যে ঘোষণা করে গেলেন তার জন্যে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি বলবো সরকার বাহাদুর, আপনারা বলবেন জিন্দাবাদ।

—সরকার বাহাদুর

—জিন্দাবাদ (মুর্দ্দাবাদও শোনা গেল)

—ন্যাশনাল ফ্যাক্টরী

—তুমুল হট্টগোল

[মিঃ সেনের বাবা, মিঃ সেন, কবি, মিসেস্ সেন ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বেরিয়ে এলেন খিলেনের পথ ধরে। পেছনে পেছনে এলো মঙ্গল মিস্ত্রী আর কিছু শ্রমিক। ভেতরে তুমুল হট্টগোল চলেছে। পণ্ডিত লাফিয়ে ওঠে ডায়াসে। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলতে থাকে। ডায়াসের ওপর তখনও কিছু নিম্নপদস্থ বাবু কর্ম্মচারীরা বসে থাকেন]

পণ্ডিত। ভাঁইয়োঃ বহুৎ আপশোষ কি বাত ইয়ে হ্যায় কি··· শুনিয়ে ভাইয়োঁ··· [ভীষণ চীৎকার। লাঠিসোটা উঁচিয়ে কে যেন পণ্ডিতকে আক্রমণ করতে যায় দেখা যায়। ঢিল মারছে কারা যেন পণ্ডিতকে। পণ্ডিত হাত তুলে সেগুলো রুখছে আর চেঁচাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে জনা-কয়েক মজুর ডায়াসের ওপর উঠে পণ্ডিতকে ঘিরে দাঁড়ালো—কেউ যেন অন্যায় ভাবে না মারতে পারে পণ্ডিতকে। তুমুল হট্টগোল আর লাঠি-সোটা নিয়ে চেঁচামিচি মারামারির মধ্যে পটক্ষেপ হয়।]

(অন্ধকারে পটক্ষেপ)

[ক্রমশঃ



ছোটদের আসর

জুতোকে জুতসই করা কি সহজ কাজ?

তার ওপর আমাদের ড্রিল্‌-মাষ্টার বেজায় কড়া লোক। রণ-দুর্ম্মদ বড়ুয়াকে যারা জানে তারাই জানে। বিচ্ছিরি জিনিস তাঁর দু'চোখের বিষ। কাজেই তাঁর নজর যে অনিবার্য্যরূপেই পিলুটুর বুট জোড়ার উপর পড়বে তা জানা কথা।

"নোংরা জুতো আমি একদম্ সইতে পারি না।"

এই কথা বল্‌তে তাঁর স্বাভাবিক বিকৃত মুখ এত বেশি বিকারলাভ করলো যে বল্‌বার নয়।

"জুতো যদি মুখের মতো না চক্-চক্ করলো তো সে কি জুতো?" ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন ড্রিল্‌-মাষ্টার।— "তেমন জুতোর মুখ আমায় দেখিয়ো না।"

আমার পাশেই দাঁড়িয়ে পিলুটুটা। আমি আড় চোখে ওর মুখের দিকে, আরেকবার ওর জুতোর দিকে তাকালাম।

ওর মুখ টক্‌টকে লাল হয়ে উঠেছে। মনে মনে ও যে ড্রিল্‌-মাষ্টারের মুণ্ডপাত করছিল তা বুঝতে বেগ পেতে হয় না।

ক্ষুব্ধ হবার কথাই ওর। কাল রাত্তিরে শোবার আগে দু'ঘণ্টা ধরে' ও জুতোর পরিচর্য্যা করেছে আমি জানি। সেই জুতোর জন্যই এখন ওকে খোঁটা সইতে হোলো!

জুতোর দুঃখ পিলুটুর জন্ম থেকে। ভগবান্ ওকে পা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন বটে। পায়ের মতো পা! অমন একখানা পা আর কোথাও আমি দেখিনি। কারো কাছেই না।

এবং একখানা হলেও কথা ছিল। পিলুটুর আবার দু'খানা।

বেশ চৌকস্ পা বল্‌তে হয়। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। জুতোর দোকানে গেলে পিলুটুর মাপসই জুতো পাওয়া মুস্কিল। এই তো ড্রিলের মাঠে সবাই আমরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে, তাকিয়ে ছাখো না, পিলুটুর পা আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে।

সবার থেকে ওর পা সর্ব্বদাই দু'ইঞ্চি এগিয়ে। কাজেই রণদুর্ম্মদের কোনো দোষ ছিল না, এতেও যদি ওঁর চোখ না ওর শ্রীচরণে পড়তো, বুঝতে হোতো ওঁর চোখের দোষ হয়েছে।

সত্যি, প্রকৃতি মুক্তহস্তে আমাদের পিলুটুকে পা দান করেছিলেন— বল্‌তে হবে।



পিলুটুর পা আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে

প্রকৃতির এ কিরূপ প্রকৃতি, এমন বিরূপ প্রকৃতি কেন, আমি জানি না।

এই তো ক'দিন হোলো, হোস্‌টেল্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পিলুটুকে নিয়ে এই জুতো জোড়াটা কিন্‌তে গিয়ে কি কম নাকাল হয়েছেন। বাজার ঘুরে কোনো দোকানেই জুতো না পেয়ে তিনি এমন ব্যাজার হয়েছিলেন যে কী বলব! তাঁর কেবলি মনে হচ্ছিল যে পিলুটু ইচ্ছে করে' তাঁকে কষ্ট দেবার জন্যেই

নিজের পা অমন করে বাড়িয়েছে। এমন কি, সে কথা মুখ ফুটে অকপটে বল্‌তেও তিনি কসুর করেননি।

"এইটুকু ছেলের এত বড়ো পা! কেবল আমাকে জ্বালাবার জন্যে—তা ছাড়া কি?" বিরক্ত হয়ে তিনি বলেছেন—"কেন, এমন পায়াভারি না হলে কি চল্‌তো না?"

"পা কি যথেচ্ছ বাড়ানো যায় সার?"

আপত্তির সুরে বল্‌তে গেছে পিল্‌টু।—"নিজের খুসি মতো কেউ বাড়াতে পারে?" আরো তার অনুযোগ।

"আমার মাথা খেতে তোমরা পারো। সব পারো তোমরা। তোমাদের অসাধ্য কিছু নেই।" এই বলে' পিল্‌টুর সঙ্গে হোস্‌টেলের সব ছেলের পদমর্য্যাদায় তিনি আঘাত করেছেন। পিল্‌টুর মতো পদগৌরব আমাদের কারো না থাকলেও রাগের মুখে আমাদের কাউকেই তিনি এক হাত নিতে ছাড়েননি।

পিল্‌টুর জুতো কেনা দেখতে আমরা সবাই গিয়েছিলাম। ভাগ্যিস্‌, এক দোকানে বারো নম্বরী এক জোড়া মিলে গেল, তা নইলে সেদিন কদ্দূর গড়াতো কে জানে! পিল্‌টুর পা-র সঙ্গে না পেরে উঠে তিনি সেই দিনই পদত্যাগ করে' হোস্‌টেল্‌ থেকে ইস্তফা দিয়ে চলে যাবেন বলে' শাসিয়েছিলেন।

শেষটায় পিল্‌টুর সঙ্গে বারো নম্বরের মিলন হওয়ায় আমরা পার পেলাম।

এই জুতো জোড়াকে দুরস্ত করতে কি কম খাটুনিটা গিয়েছে কাল পিল্‌টুর! আগে তো আধ ঘণ্টা ধরে আগাপাশতলা তেল মাখিয়েছে। তার পরে অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক ডুবিয়ে রেখেছে চৌবাচ্চায়। তার পরে নাইয়ে ধুইয়ে ভালো তোয়ালেয় গা মুছিয়েও—এখনো জুতোটার কী বদ্‌খৎ চেহারা, তবু ছাখো! তাকানো যায় না, এক মাসের রুগী বলে' ভ্রম হয়!

এ-রকমটা যে হতে পারে কাল রাত্তিরেই কি সে-কথা ওকে আমি বলিনি? বলেইছি তো, "যে ছেলে ঘুমোবার সময় জুতো পালিশ করে, আর জুতো পালিশ করার সময় ঘুমোয় সে কখনই জীবনে উন্নতি করতে পারে না।"



কেন? এমন পদবৃদ্ধি না হ'লে কি চলতো না?

"যা যা, রেখে দে।" জবাব দিয়েছিল পিলটুটা, "জুতোর থেকেই যাকে বলে পদমর্য্যাদা! তা জানিস্‌?"

তাহলেও পিল্‌টুকে কোনো দোষ আমি দিতে পারি না। ওর যথাসাধ্য ও করেছিল। তেলে জলে বাঙালীর শরীর—কে না জানে? (পিল্‌টুরও জানা ছিল।) আর, যাতে বাঙালীর শরীর খোলে তাতে যদি বাংলা দেশের জুতোর খোলতাই না হয় তার জন্য কি পিল্‌টু দায়ী?

"কাল রোববার আছে। সারা দিন ধরে জুতোকে দুরস্ত করবে। মানুষের মতো করবে।" ড্রিল-মাষ্টার তিরিক্ষে হয়ে বললেন: "নইলে, সোমবারও যদি তোমায় এই চেহারায়—মানে এই জুতোর মধ্যে দেখতে পাই—" এই পর্য্যন্ত বলে' এর বেশী আর তিনি বল্‌লেন না।

রণদুর্ম্মদ বাবু বেজায় কড়া লোক, সবাই আমরা জানি। ওর বেশি বলবার তাঁর দরকার হয় না।

পরের দিন রবিবার। অখাদ্য জুতোটাকে নিয়ে কী করা যায়, সকালে উঠে মাথায় হাত দিয়ে পিল্‌টু ভাবছে, আর আমি ওকে, 'হাতটা মাথায় না দিয়ে জুতোয় দেয়া উচিত' এই কথাই বার বার মনে করাচ্ছি। এমন সময়ে ড্রিল-মাষ্টার মশাই প্রকাণ্ড এক মাছ ঘাড়ে চান ক'রে ফিরলেন।



জুতো অখাদ্য নেই।

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

হোস্‌টেলের পুকুরের মাছ। বয়সে আমার চেয়ে বড়ো কি না জানি না তবে দেখতে আমার চেয়ে একটু ছোটই হবে মাছটা।

মাছটা না কি আর সব মাছের সঙ্গে ড্রিল করছিল, ড্রিল্‌-মাষ্টার বল্‌লেন। লেফ্‌ট্‌—রাইট্‌—ফর্ম্মফোর্‌ ইত্যাদি করতে করতে যেই না তাঁর সামনে এসে পড়েছে আর অমনি উনি হাঁক্‌ড়েছেন—হল্‌ট্‌! বল্‌তেই না থেমে গেছে মাছটা। আর তক্ষুনি উনি চেঁচিয়ে উঠেছেন—অ্যাটেন্‌শন্‌—ষ্ট্যাণ্ড্‌ অ্যাট্‌ ইজ্‌! বল্‌তে না বল্‌তেই মাছটা ভেসে উঠেছে জলের উপরে। একেবারে তাঁর সম্মুখে। আর অম্‌নি উনি ওটাকে পাঁজাকোলা করে' পাক্‌ড়ে কাঁধে ফেলে হোস্‌টেলে এসে হাজির।

সবাই আমরা খুসী। ছুটির দিন ফুর্ত্তি করে' মাছের শ্রাদ্ধ করা যাবে। মন্দ কি?

পিলুটু কেবল খুসি নয়। তখনো সে জুতো নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। হাত না ঘামিয়ে—তখনো।

এবং সমীরকেও বেশ অখুসি দেখা গেল। আমাদের ঠাকুর কয়েক দিন থেকে পালিয়েছিল, পালা করে' রাঁধতে হচ্ছিল আমাদের। সেদিন ছিল সমীরের পালা। সমীর আর ঝণ্টুর।

অতো বড়ো মাছটা ওদের দু'জনকেই সামলাতে হবে—ঠিক জুতো না হলেও তার গুঁতোও কিছু কম ছিল না।

ঝণ্টুর কিন্তু পরের দুঃখে কাতর হওয়া স্বভাব। পরের দুঃখ দেখলে নিজের দুঃখ সে ভুলতে পারে। ওর মতে, পরের দুঃখ বেশি না হলে নিজের দুঃখ লাঘব হবার কোনো উপায় নেই। পিলুটুকে ম্রিয়মাণ দেখে, মাছের গুরুভার মাথায় থাকা সত্ত্বেও সে এগিয়ে এলো।

"দে আমায়, দিচ্ছি তোর জুতো দুরস্ত করে'। কী দিবি বল্‌।"

কর্ম্মনীতির সঙ্গে ঝণ্টুর অর্থনীতি জড়ানো।

"কতো চাস্‌।" পিলুটুর উদাসীন জিজ্ঞাসা।

"একটা টাকা দিস্‌।...তাহলেই হবে।"

"য়্যাক টাকা!" পিলুটুর দুই চোখ তার জুতো-জোড়াকেও বুঝি টেক্কা মারতে চায়।

"বেশ, তাহলে দশ আনাই দিবি। তাই দিস্‌।"

"দশ আনা—সে যে অনেক রে! দু'টো সিকি আর দু'আনা যে! অন্য কথা বল্‌।"

"সেই সঙ্গে আমার গ্যারান্টি দেয়া থাকবে।" ঝণ্টু জানায়: "পালিশ পছন্দসই না হইলে সম্পূর্ণ মূল্য ফেরৎ।"

গ্যারাণ্টির কথায় পিলুটু একটু গলে। অনেক দরাদরি কষাকষির পরে অবশেষে আট আনায় দাঁড়ায়। ঝণ্টু বুট জোড়া নিয়ে চলে যায়, আর আমরা ছুটির দিনে গায়ে হাওয়া লাগাতে বেরুই।

আর, ফিরি একেবারে সেই খাবার-ঘরে।

অমন পাকা মাছের সোয়াদ ভালোই হবে আশা করা গেছল, কিন্তু এমন বিচ্ছিরি চাম্‌সে গন্ধ যে মুখে তোলা যায় না। মাছটা যেন জুতোর চামড়া খেয়ে জীবন ধারণ করতো বলে' মনে হয়।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মাছের গ্রাস মুখে তুলেই পাতের পাশে নামিয়ে রাখলেন—"মাছটাকে ড্রিল্‌ করতে দেখেছিলেন, আপনি সত্যি বল্‌ছেন?"

"আলবৎ।" বল্‌লেন ড্রিল্‌-মাষ্টার। "এবং আমি অ্যাটেন্‌শন্‌ না বল্‌তেই—"

"আমার মনে হয় মাছটা তিন দিন ধরে' ঐখেনে ভাসছিল, আপনি দেখেননি।" ড্রিল্‌-মাষ্টারের কথায় বাধা দিয়ে এবং অ্যাটেন্‌শন্‌ না দিয়ে বল্‌লেন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

ড্রিল্‌-মাষ্টার কিছু বল্‌লেন না। নিজের মাছ নিজেই খেয়ে চল্‌লেন—গোগ্রাসে আর প্রাণপণে। মাছ খেতে বসে কারো মুখের চেহারা যে অতো খারাপ হতে পারে ড্রিল-মাষ্টারকে তখন না দেখলে তার ধারণা করাও যায় না।

"ছেড়া জুতোর টেস্‌ট্‌ কেমন?" পিলুটু আমায় জিগেস্‌ করে।

"চেখে দেখিনি ভাই।" আমি জানাই।

"আমিও কখনো খাইনি, কিন্তু মনে হচ্ছে জুতোও বোধ হয় এর চেয়ে বেশি অখাদ্য হবে না।" পিলুটু আমার কানের গোড়ায় ফিস্‌ফিস্‌ করলো।

আমাদের মাছ আমরা ভাতচাপা দিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলাম। ড্রিল্‌-মাষ্টার মশাই আড়চোখে সবার পাতের দিকে তাকাচ্ছিলেন। খাইনি জানলে ড্রিলের সময়ে আর রক্ষে রাখবেন না। কাজেই, মাছটা যেমন তাঁকে ঠকিয়েছিল, আমরাও তেমনি মাছের পদাঙ্ক অনুসরণ করে' তাঁকে ঠকাতে বাধ্য হয়েছিলাম।

"মাছটা সদ্বংশজাত ছিল বলে' আমার মনে হয় না।" এই বলে' সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মশাই পাতের ওপরেই বমি করে' ফেল্লেন।

করে' আমাদের সবাইকে রেহাই দিলেন। তিনি 'ওয়াক্‌' না করলে অতো চট্‌ করে' রান্নাঘর থেকে walk out করতে আমরা পারতুম কি না কে জানে।

বিকেল বেলায় ঝণ্টু বুট জোড়া নিয়ে এল। এমন চক্‌চকে হয়েছে যে চেনাই যায় না—আয়নার মত ঝক্‌ঝকে করে' এনেছে—ওর গায়ে নিজের চেহারা দেখা যায়। আচ্ছা পালিশ লাগিয়েছে তো ঝণ্টুটা।

"ড্রিলের গ্রাউণ্ড কেন, এই জুতো পরে' আমি রাজবাড়ীতে যেতে পারি।" আমি বল্লাম।

"যেতে হবে না তোমায়।" আনন্দ আর গর্ব্বে

ডগমগ হয়ে পিল্‌টু বল্‌ল : "দাও তো এখন আট আনা পয়সা—কিম্বা একটা আধুলি দিলেও হবে।"

আমার কাছে আট আনা পয়সা বা আধুলি কিছুই ছিল না। দু'টো সিকি ছিল কেবল, তাই দিলুম। আমার থেকে ধার করে পিল্‌টু সিকি দু'টো ঝণ্টুকে দিল। পিল্‌টু এবং ঝণ্টুকে যুগপৎ এত খুসি আমি কখনো দেখিনি।

যতই অদ্ভুত হোক্ না, জুতোকে কি কেউ কখনো গাল দেয়? কিন্তু জুতো দু'টোকে গালের কাছে নিয়ে পিল্‌টুর যে কী আদর! সে রাত্তিরে জুতো জোড়াকে বুকের কাছাকাছি নিয়ে শুল।

তখনই আমি জানি যে অতো আদর দিয়ে ওদের মাথা খাওয়া হচ্ছে। বেশি আদরে বলে নিজের ছেলে-মেয়েই বিগ্‌ড়ে যায়—এ তো পরের জুতো! সে কথা আমি তখনই পিল্‌টুকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখালাম। ও কিন্তু গ্রাহ্যই করলো না। বল্লো—"তুই ভাবিস্ নে। আদর পেয়ে ছেলে-মেয়েরা মাথায় উঠ্‌লেও জুতো চিরদিনই পদে আছে। পদেই থাক্‌বে।"

কিন্তু আমার কথার প্রমাণ হাতে হাতেই পাওয়া গেল—জুতো পায়ে দিতে গিয়ে—তার পরদিনই।

ইস্কুল যাবার সময় যেই না পিল্‌টু তার ডান পা জুতোয় গলিয়েছে অমনি জুতোর সমস্ত উপর তলাটা ওর পায়ের উপর উঠে এলো। সটান একেবারে ওর হাফ প্যাণ্টের কাছাকাছি। কেবল এক তলাটা (তাকে সুখতলাও বলা যায়) পড়ে রইলো নীচে—একলা।

বাঁ পায়ের জুতো পরতে গিয়েও সেই এক দশা।

না, পরার কোনো গোলমাল হয়নি। ঠিক পায়েরটা ঠিক পায়েই লাগানো হয়েছিল, পিল্‌টু আর আমি লক্ষ্য করে দেখলাম। ভালো করেই লক্ষ্য করলাম।

তবে—তাহলে—জুতোর মধ্যে এরূপ উচ্চ নীচ ব্যবধান কেন? এমন ছাড়াছাড়ি আড়াআড়ি ভাব কিসের জন্যে?

আমি আর পিল্‌টু মাথা ঘামিয়ে কোনই কারণ বার করতে পারছি না, জুতো এধারে পিল্‌টুর মাথায় উঠেছে। ঠিক ওঠেনি, ওঠবার চেষ্টায়।

কিন্তু তাহলেও বলুব, পিল্‌টুর হাঁটুর কাছাকাছি ঠেকে জুতো জোড়া (মানে, ওর ওপরের ফিতে সমেত পালিশ-করা অংশটা) নেহাৎ মন্দ দেখাচ্ছিল না। ওর গায়ের রঙের সঙ্গে মিলে মানানসই হয়েছিল বল্‌তে হয়।

"জুতো পালিশ করেছে বটে ঝণ্টু। পালিশের মত পালিশ! জুতোর চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে। চোখ ফেরানো যায় না।" আমি বললাম। "তুই অম্‌নি করে' পরেই ইস্কুলে চ। ভালোই দেখাচ্ছে।"

"হ্যাঁ। আর ড্রিল্-মাষ্টার আমাকে ধরে বেশ করে' ঠেঙাক্। আজ আবার ফার্স্ট্ আওয়ারেই ড্রিল রে—কী সর্ব্বনাশ!"

কাঁদো-কাঁদো মুখে পিল্‌টু পা থেকে জুতো নামিয়ে খালি পায়েই ইস্কুলের পথে এগোয়, বেচারার অপর কোনো জুতো ছিল না। আর তড়ি ঘড়ি যে নতুন এক জোড়া বাজার থেকে কেনা যাবে তেমন কপাল (কিম্বা পা) করে' আসেনি পিল্‌টু।

"কিন্তু খালি পায়ে ড্রিলে নাম্‌লে কি রণদুর্ম্মদ বাবু রক্ষে রাখবেন?" আমি বলি।

"আজ আমারই একদিন—কি—" বলতে গিয়ে পিল্‌টুর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে—নিজের ছাড়া আর কারোই কোনো অশুভ দিনের কথা তার মনে আসে না।

"কি তোরই একদিন।" অগত্যা আমাকেই বলে' মনে করিয়ে দিতে হয়।

এমন সময়ে ঝণ্টুটা এসে ভারী চেঁচামেচি লাগায়—"এমন করে' ঠকাবার মানে? দু'টো সিকির একটা তাহা অচল।"

"আমি ঠকিয়েছি না কি? ওর তো সিকি—ওকে বলো না।" অম্লান বদনে পিল্‌টু আমাকেই দেখিয়ে দেয়।

আমি অচল সিকিটা ফেরৎ নিয়ে বলি—"দেখব চালিয়ে—চলে কি না। চললে চলবে।" বলে' মনে মনে নিজেকে ধন্যবাদ দিই—যথা লাভ।

"এক কড়াই ছাঁকা তেলে অমন করে' ভাজলাম—জুতো পালিশ কি চাট্টিখানি? আর আমার সঙ্গে এমন ঠকাঠকি ব্যাভার!" ঝণ্টু তবুও গজ-গজ করতে থাকে।



একটা টাকা দিস্ তাহ'লেই হবে



কাউন্ট লিও টলষ্টয়

যেখানে প্রেম সেখানে ভগবান

অনুবাদক ইন্দিরা ঘোষ

কোন একটি বড় সহরে মার্টিন নামে এক ব্যক্তি বাস করত। তার ব্যবসায় ছিল জুতা সেলাই করা। একতলার একটি ঘরে সে থাকত। জানালার ধারে বসে সে জুতা সেলাই করত, এবং কত পথিককে যাতায়াত করতে দেখত।

মার্টিন নিপুণ কারিগর ছিল, এবং লোকও সে খুব ভাল ছিল বলে সকলেই তাকে জান্তো ও অনেকেই তাকে জুতা সেলাই করতে দিত। তার স্ত্রী একটি মাত্র শিশুপুত্র রেখে মারা যাবার পরে মার্টিনই সেই শিশুটিকে মানুষ করে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্যবশতঃ তার পুত্রটি বড় হয়ে মারা যায়। এতে মার্টিন এত বিষাদগ্রস্ত হল যে, সে ভগবানের নিকটে নিয়ত মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা জানাত। তখন তার পরিচিত এক স্বদেশবাসী তাকে বোঝায় যে, ভগবান্ যা করেন তা মঙ্গলের জন্য। মার্টিনকে সে ধর্ম্মগ্রন্থ কিনে পাঠ করতে অনুরোধ করে।

বন্ধুর কথা-মত মার্টিন এখন থেকে নিয়ত ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করতে আরম্ভ করে, এবং ক্রমে ক্রমে তার শোকপূর্ণ হৃদয় শান্ত হয়ে আসে, সে একটা স্নিগ্ধ আনন্দ অনুভব করতে থাকে। একদিন রাত্রে পড়তে পড়তে টেবিলের উপরে হাত দু'টি রেখে সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এমন সময় "মার্টিন" এই শব্দটি তার কানে বেজে উঠ্‌ল।

মার্টিন চম্‌কে উঠে পড়ে—কিন্তু কা'কেও দেখ্‌তে পায় না। সে পুনরায় ঢুলতে থাকে।

হঠাৎ সে যেন পরিষ্কার শুন্‌তে পেল "মার্টিন, মার্টিন, তুমি কাল পথের দিকে দৃষ্টি রেখো, আমি কাল আসব।" স্বয়ং ভগবান্ কাল মার্টিনের কাছে আস্‌বেন !

পরদিন মার্টিন প্রত্যূষে উঠে জানালার ধারে বসে বসে জুতা সেলাই করে এবং তার আগের দিনের স্বপ্নের কথা ভাবে ও একবার একবার পথের দিকে তাকায়। এমন সময় সে দেখ্‌তে পেল এক জন দরিদ্র বৃদ্ধ সৈনিক তার দরজার সম্মুখে পথের উপরের জমা বরফগুলি কোদালি দিয়ে পরিষ্কার করছে। খানিক পরিশ্রম করবার পর সৈনিকটি ক্লান্ত হয়ে দেয়ালে ভর দিয়ে একটু বিশ্রাম করে। অবসন্ন বৃদ্ধটিকে দেখে মার্টিনের দয়া হল। সে ইসারা করে তাকে ভিতরে ডেকে এনে তাকে আদর করে চেয়ারে বস্‌তে দিল। নিজ হাতে চা তৈয়ারী করে মার্টিন তার অতিথিকে বারবার খাওয়াল। গরম চা খেয়ে এবং মার্টিনের সদয় ব্যবহারে বৃদ্ধ সৈনিকটির ক্লান্তি অনেকটা দূর হয়ে যায়। সে মার্টিনকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে তার নিজের কাজে চলে গেল।

মার্টিন পুনরায় জানালার ধারে তার কাজ নিয়ে বসে, এবং ভগবানের আগমন প্রতীক্ষা করে।

কতক্ষণ পরে সে দেখ্‌ল, এক জন অপরিচিত স্ত্রীলোক একটি শিশুকে নিয়ে তার জানালার নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। তার অঙ্গে যে সামান্য বস্ত্র আছে, তা শীত-নিবারণের মোটেই উপযোগী নয়। তার শিশুটিকে সেই দুর্জ্জয় শীতের বাতাস থেকে রক্ষা করবারও তার কিছু নেই। ক্রন্দনরত শিশুটিকে তার অভাগী মা শান্ত করবার জন্য বৃথা চেষ্টা করছিল। মার্টিন বাহিরে এসে দীন স্ত্রীলোকটিকে তার ঘরে এসে চুল্লীর ধারে বসে একটু গরম হয়ে নেবার জন্য অনুরোধ করল।

দুঃখিনী নারী অবাক্ হয়ে যায়। সে মার্টিনের কথা মত একটু বিশ্রাম করবার জন্য তার গৃহে প্রবেশ করল। মার্টিন তার নিজের খাদ্য থেকে তাকে রুটি ও ঝোল খেতে দিল।

স্ত্রীলোকটি বল্‌ল—তাকে দেখবার কেউ নেই। তার শেষ গরম শালখানাও তাকে দারিদ্র্যের দায়ে বাঁধা দিতে হয়েছে। দয়া-পরবশ মার্টিন তার একটি পুরানো কোট তাকে দিতেই, সে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে বল্‌ল—"ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন। আমার শিশু তো শীতেই জমে মারা যেত।"

যাবার সময় মার্টিন তাকে তার কষ্টে জমানো কিছু টাকা দিয়ে তার শালটি ফিরিয়ে আন্‌তে বলল।

সে চলে যাবার পর মার্টিন নিজে কিছু খেয়ে জানালার ধারে পুনরায় তার কাজ নিয়ে বস্‌ল। কিন্তু অপ্রত্যাশিত কিছুই ঘটতে দেখা গেল না। কিছুক্ষণ পরে মার্টিন দেখে, একজন বৃদ্ধা এক ঝুড়ি আপেল নিয়ে সম্মুখের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার বেশী ভাগ আপেলই বিক্রী হয়ে গিয়েছে। অবশিষ্ট আপেলসুদ্ধ ঝুড়িটি সে নামিয়ে রেখেছে। এমন সময় একটি ছোট ছেলে এসে একটি আপেল তুলে নিয়ে যেমন পালাতে যাবে, সেই বৃদ্ধা তাকে ধরে খুব গালাগালি দিতে আরম্ভ করল।

মার্টিন রুদ্ধশ্বাসে বেরিয়ে এসে সেই বৃদ্ধাকে সকরুণ ভাবে মিনতি করে—"ওকে, ক্ষমা করে ছেড়ে দাও।"

মার্টিনের কথায় বৃদ্ধা অনিচ্ছুক ভাবে ছেলেটিকে ছেড়ে দেয়।

লিমেরিক ~

অমিতাভ চৌধুরী

নটবর নন্দী
দিনরাত আঁটে মনে যত বদ ফন্দী
কিসে কারে ঠকাবে সে মস্তকে ঘুরছে
অপরের সুখ দেখে শুধু রাগে পুড়ছে
হয় কিসে পর ধন তার ট্যাঁকে বন্দী ?

সৈয়দ সুলতান
বাড়ী তার মুলতান।
গান গেতে গিয়ে সে যে
ধরে শুধু ভুল তান।
তাসে বসে গুলতান।

অজিতকুমার বিশ্বাস
ছাড়ছে কেবল নিশ্বাস
আরাম তাহার চাই তো
উপায় কিছুই নাই তো
ভাবছে কেবল তাই তো !

শ্যামলাল সরকার
স্বদেশী সে মস্ত
খাটে উদয়াস্ত।
বলে তার দরকার
একখানা চরকার।

জগদীশ চন্দ
কদাকার চেহারাটি, গায়ে বদ গন্ধ।
ঠোঁট চেপে দাঁতগুলো বেরিয়েছে ছিটকে।
বোম ভরা ভুঁড়ি দেখে উঠে নাক সিঁটকে,
মানুষ না আর কিছু মনে জাগে সন্দ।

কানু মহাপাত্র
ইস্কুল ছাত্র।
বসি দিবারাত্র
চুলকায় গাত্র,
থামে নাকো মাত্র।

গদাধর গুপ্ত
গায়ে জোর খুব তো
তার কথা না শুনিলে সকলে যে চড় খায়
হড়কিয়ে পড়ে গিয়ে এক দম ভড়কায়
সব তাই চুপ তো।

বিশুলাল ভঞ্জ
বাড়ী মধু গঞ্জ
কাঁথা গায়ে মুড়িয়ে
চলে পথে খুঁড়িয়ে
বিশু বুঝি খঞ্জ ?

বিপুলচরণ শর্মা
বড়ই করিৎকর্মা
গৃহস্থালী কার্য্য সকল তাহার হাতে ন্যস্ত
সন্ধ্যা সকাল তাই তো সে যে কাজের মাঝে ব্যস্ত
রান্না করে বাসন মেজে কাটছে বসে দরমা।

বেলারাণী বকসী
আসে রোজ হেথারে
পাকা হাত সেতারে
গান গায় বেতারে
সিনেমায় যায় খুব 'রূপবাণী' 'রক্সী'।

তখন মার্টিনের নির্দ্দেশমত বালকটি অশ্রুপূর্ণ নয়নে বৃদ্ধার ক্ষমা-প্রার্থনা করে। মার্টিন তাকে একটি আপেল দেয় এবং বৃদ্ধাকে বলে—"একটি সামান্য আপেলের জন্য যদি ওকে শাস্তি পেতে হয়, তাহলে আমরা যে সব দোষ করি তার জন্য আমাদের কি শাস্তি হওয়া উচিত ?" বৃদ্ধা নীরব হয়ে যায়।

মার্টিন পুনরায় বলে—"ভগবান আমাদের নির্দ্দেশ দিয়েছেন ক্ষমা করবার জন্য,—যাতে আমরাও আমাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা পেতে পারি। সকলেই ক্ষমা করা উচিত, বিশেষ করে যারা অবুঝ তাদের।"

বৃদ্ধা যাবার জন্য ফলের ঝুড়িটি তুলতে যাবে, তখন সেই বালকটি নিজেই অগ্রসর হয়ে আসে ঝুড়িটি বয়ে নিয়ে যাবার জন্য। বৃদ্ধা তার পিঠে ঝুড়িটি তুলে দিয়ে তার সঙ্গে গল্প করতে করতে চলে গেল। সে মার্টিনের নিকটে তার আপেলের দাম চাইতে অবধি ভুলে গেল।

তখন অন্ধকার রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। মার্টিন ঘরে এসে আলোটি জ্বেলে তার ধর্ম্মগ্রন্থটি যেমন খুলেছে, তার মনে হল ঘরের অন্ধকার কোণায় কারা সব ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। কে যেন মার্টিনের কানে কানে বললে—"মার্টিন তুমি কি আমাকে চিনতে পারনি ?"

"কাকে ?" বলে মার্টিন।

"আমাকে ?" সেই স্বরে উত্তর হল—সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃদ্ধ সৈনিকটি অন্ধকার থেকে এগিয়ে এসে একটু হাসে ও তার পর সে মিলিয়ে যায়।

"আর আমাকে ?" বলে সেই স্বর :—সেই দুঃখিনী স্ত্রীলোকটি তার শিশুকে নিয়ে হাসিমুখে সামনে এসে দাঁড়ায় এবং তার পর তারা মিলিয়ে যায়।

"আর আমাকে ?"—সেই বৃদ্ধা ও আপেল হাতে বালকটি এগিয়ে আসে এবং তার পরে তারাও মিলিয়ে যায় !

মার্টিনের প্রাণ আনন্দে ভরে উঠল। সে বুঝতে পারল তার স্বপ্ন বিফল হয়নি। সত্যই ভগবান তার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং সত্যই মার্টিন তাঁকে অভ্যর্থনা করতে পেরেছিল।



দুষ্টু ছেলের ডায়েরী

দীপেন্দ্র সান্যাল

প্রথম পরিচ্ছেদ

১

আঠারোই ডিসেম্বরের দুপুর বেলা। ময়নাপুর গ্রামের হাই ইস্কুলে আজ বছরের একটি বিশেষ দিন।

আজ হোল প্রোমশান-ডে। সমস্ত ইস্কুল-বাড়ীটায় এতটুকু আওয়াজ নেই। আশা-আকাঙ্ক্ষায় মুহূর্তগুলো পার হয়ে যাচ্ছে! ভয়ে আর উত্তেজনায় অপেক্ষা কোরছে ছেলেরা। ইস্কুলের জীবনে এই বোধ হয় একটি দিন যে দিন ওরা গোলমাল কোরতেও ভুলে গেছে। একটি দিনও নয়,—এই সময়টুকু শুধু। খবর এসে গেলেই হট্টগোলে ভেঙ্গে পড়বে ইস্কুল-বাড়ীর ছাদ, খুসীতে ফেটে পড়বে কেউ, কেউ ফিরে যাবে চোখের জলে।

ফার্ষ্ট ক্লাসে ওঠবার অপেক্ষায় যারা, আজ তাদেরই রেজাল্ট বেরুবে গোড়ায়। হেড-মাষ্টার মশাই, এসিষ্টেণ্ট হেড-মাষ্টার মশাই এবং আরও দু'জন মাষ্টার মশাই এসে ঢুকলেন ক্লাসে। সবাই একে একে এসে উঠে নিয়ে যেতে লাগল তাদের প্রোগ্রেস রিপোর্ট। সমস্ত ছেলেরা যখন নিয়ে গেলো তাদের প্রোগ্রেস রিপোর্ট—হেড-মাষ্টার মশাই তখন গুটিকয়েক কথা বলে বেরিয়ে এলেন ক্লাস ছেড়ে।

ততক্ষণে মৃদু গুঞ্জন সুরু হয়ে গেছে ওদের মধ্যে। নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল ওরা কয়েক জন বারান্দাটায়—তারই এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল সাগর। কোঁকড়ান কালো চুলের দু'টো-একটা এসে পড়েছে ওর ভিজে দু'টো চোখের ওপর, সাগর কাঁদছে। কেউ একটু মুচকি হেসে, কেউ একটু চেয়ে দেখে চলে গেলো। ওর সঙ্গে আজ তারা কথা বললে না কেউ! আজকের এই বিষণ্ণ অপরাহ্নে অভিমানে সাগর ফুলে উঠতে লাগল। একা একা ফিরে চলল—বাড়ীর দিকে নয়—নদীর ধারে, যেখানে কেউ নেই।

একলা বসে বসে ওর অনেক কথা মনে এলো। ইস্কুলের ওই বদ্ধ-ঘরে বসে পড়া মুখস্ত করা তার সইবে না। সে চায় ছবি আঁকতে। পৃথিবীর যত অমর শিল্পীদের সঙ্গে ও নিজেকে একবার মিলিয়ে নিলো। তাদের কারই বা ভাগ্যে প্রথম হওয়ার সম্মান জুটেছিল? ছবি আঁকাটা নেশার মত পেয়েছিল সাগরকে। পড়া-শুনো তাই চুলোয় গিয়েছিল। মাকেও সে কত দিন বলেছে সে চায় ছবি আঁকতে—সে চায় শিল্পী হতে। সে যাবে কোলকাতায়—ছবিতে হাত পাকাবে—তার পর জমাবে পাড়ি সমুদ্র-পারে। কিন্তু সাগরের দাদা চায়—সাগর হবে বড় ব্যবসাদার কি ব্যারিষ্টার, নিদেন পক্ষে এক-জন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার। তাই পড়া-শুনোটা চাই ভালো কোরে। তার দাদা এবার বলেছেন কোলকাতায় পাঠিয়ে দেবেন—ম্যাট্রিক দেবে সেখান থেকেই। কিন্তু এর পর—এর পর আর তার দাদা হয়ত কথাই বোলবে না তার সঙ্গে। নাই বা বলল—সাগরের তাতে বয়েই গেলো। ও এবার নিজেই পালিয়ে যাবে। কোলকাতায় তাকে পালাতেই হবে। নিজের জমানো টাকায় কোলকাতায় যাওয়ার ট্রেণভাড়া ছাড়াও থাকবে কিছু। হ্যাঁ, আজ রাতেই ওকে পালাতে হবে। ভোর-রাতের দিকে একটা ট্রেণ কোলকাতায় যায়। নিজের মনে মনে সব-কিছু ঠিক কোরে ফেলতে ওর মুহূর্ত্ত মাত্র। হয়ত অসম্ভব কল্পনা ওর, কিন্তু অসম্ভবকেই সম্ভব কোরে তুলবে সাগর।

আর একবার মনে পড়ল সেই সব শিল্পীদের চেহারা—যারা ওর জীবনে স্বপ্ন হয়ে আছে আজও। ছবির মত ভেসে এলো—লিওনার্দো দা ভিঞ্চি—আর ভেসে এলো তার আঁকা সব আশ্চর্য্য ছবি। সে-দিনটা ও ভুলতে পারবে না—সেই প্রথম যে-দিন ওর কাকা ওকে দেয় একখানা ছবির বই—পৃথিবীর বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা বিখ্যাত কত ছবি! সে সব ছবি আগুনের মত আজও জ্বলছে সাগরের মনে। কত রাত, কত দিন সেই সব ছবির রঙে রঙীন হয়ে রইল। সে নিজে ছবি এঁকেছে অসংখ্য—তার কত ছবি দেখে অবাক্ হয়ে গেছে কত লোক, এমন কি অবাক্ হয়ে গেছে তার দাদা। কিন্তু কেউ তাকে পাঠালো না ছবি-আঁকা শিখতে। এই সবে পনেরোয় পা দিয়েছে সাগর—কিন্তু পৃথিবীর কত শিল্পী পনেরো বছরেই কত বিচিত্র ছবির জন্ম দিলো। সাগরও এক দিন কি এমন ছবি আঁকবে না? জিওগ্রাফীর পাতায় সে পৃথিবীর পরিচয় পেতে চায় না—সে চায় পৃথিবীর পথ-প্রান্তে ছুটে বেড়াতে—আর তার ছবি ধরে রাখতে।

কিন্তু বাড়ীর সবাই চায় টাকা-রোজগার—শিল্পীর জায়গা সেখানে নেই। ওর ইস্কুলের বন্ধুদের ও যখনই এ-সব কথা বলতে গেছে তখনই কেউ তাদের অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকত, কি তাদের কেউ মুখের ওপরই হেসে দিয়েছে সাগরের—বলেছে 'পাগল'; আর পড়াতে এসে মাষ্টার মশাইরা মন্তব্য কোরেছেন—'ও-সব ছেলের পড়া-শুনো হয় না।'

শুধু কি তার বেলায়—পৃথিবীর প্রায় সমস্ত শিল্পীরই জীবনের পাতা ওল্টালে ওই একই ইতিহাস—সাগর ভাবে। শিল্পীর জীবনই হোল যুদ্ধের। তার যুদ্ধ—গতানুগতিক জীবনের বিরুদ্ধে, তার যুদ্ধ—বাঁধা নিয়মের বিরুদ্ধে, তার যুদ্ধ—তার নিজের সমাজেরই মানুষের বিরুদ্ধে; তাই হয়ত জীবনে দুঃখ না পেয়ে কেউ শিল্পী হয় না। বেদনার থেকে তাই বোধ হয় জন্ম শিল্পের।

তবু সাগর ভাবে তার নিজের দেশের ছেলেদের সঙ্গে কোথাও যেন মিল নেই তার। তারা যখন ভাবে ঘুড়ি ওড়াবে, কি ডাং-গুলী খেলবে, কি এগ্‌জামিনের পড়া তৈরী কোরবে—সাগর তখন হয়ত ভাবে কোন্ ছবিতে কি রং দেবে, কি হয়ত কল্পনা করে সেও একজন বিখ্যাত শিল্পী হয়েছে হয়ত লিওনার্দোর মতই।

বাড়ী থেকে বেরুতে তার একটুও ভয় করে না। বরং বাড়ীর মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকতেই তার ভালো লাগে না একটুও। কারুর সঙ্গে মিশতেও পারে না সে। শুধু ছিলেন তার কাকা—গেলো বছর এমনি সময়ে তিনি তিন দিনের অসুখে তাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আজ

তার কাকা থাকলে সাগরকে হয়ত এমন লুকিয়ে পালিয়ে যেতে হোত না। বাবার কথা ভালো করে মনে পড়ে না সাগরের। তিনি যখন মারা যান, তখন সাগর খুব ছোট। পালিয়ে যাবার কথা মনে কোরলেই মা'র কথা ভেবে সাগরের কষ্ট হয়। আর ঝুণু—ঝুণু তার ছোট বোন, এই ত মোটে দশ বছর হোল। সে কি খুব কাঁদবে দাদা চলে গেলে? কিন্তু দাদাকে ভয় করে সাগর। তাকে সে এড়িয়ে চলে। বড় রাশভারী লোক তার দাদা। কথা খুব কম বলেন। প্রায় সব সময়েই হাঁপানীতে কষ্ট পান বলে তাঁর মেজাজও ভালো নয়। বাড়ীতে এবং বাইরে খুব কম লোকের সঙ্গেই তার আলাপ জমে। বাড়ীর দিকে এগুতে এগুতে সাগর ভাবে কি কি জিনিষ সে নেবে? ছোট একটা স্যুটকেশ আছে—তার মধ্যে জামা-কাপড়গুলো নিতে হবে—জমানো টাকাটাও নেবে, আর—আর ছবির বইটাও; হ্যাঁ, সেটা সঙ্গে নিতে হবে বই কি! আর নিজের আঁকা ছবি, রং তুলি এ-সব না হলে ত চলবেই না তার।

২

অন্ধকারে প্রকাণ্ড পুরানো রঙ-ওঠা, ইট-বেরিয়ে পড়া বাড়ীটা দেখলে হঠাৎ ভুতুড়ে বাড়ী বলে মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয়; এ বাড়ীটা বানিয়ে রেখে গেছেন সাগরের বাবা। Contractor হিসেবে সমর বাবুর নাম যখন বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই সময়েই তাঁর মৃত্যু হোল। এ গ্রামে তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের কেটেছে অনেক কাল। তাই তাঁদের বাড়ীটা নূতন করে তুললেন তিনি। এবং এইখানেই স্ত্রী-পুত্রদের রেখে তিনি নিজে ঘুরে বেড়িয়ে কায জোগাড় করতে লাগলেন আর মাসে মাসে এসে কাটিয়ে যেতে লাগলেন এই গ্রামে; এইখানেই একটা ছোট জমিদারী গড়ে তুলেছেন যখন, সেই সময়েই দিন ফুরিয়ে গেল তাঁর। সেও আজ বছর দশেকের কথা হবে। সাগরের বয়স তখন মোটে পাঁচ।

সাগরের মা ছিলেন আর পাঁচ জনেরই মত। চোখের জলে বাকী দিনগুলো তাঁর কাটতে লাগল এক রকম। কিন্তু সাগরের দাদার হঠাৎ হার্টের অসুখটা স্পষ্ট হোয়ে উঠল এবং প্রায়ই তাকে বিছানায় শুয়ে দিন কাটাতে হয়। জমিদারী দেখা শুনো করেন বৃদ্ধ ম্যানেজার এবং অন্য কর্ম্মচারীরা। তবু সাগরকে তার দাদা বার বার বলেন যে জমিদারীতে বসে খেলে চিরকাল চলতে পারে না। সাগরকে তাই তিনি ভাল ভাবে পাশ করাতে চান। ও-সব ছবি-আঁকা বাতিক তাঁর সহ্য হয় না। এ-কথা বার-বারই স্পষ্ট করেই তিনি বলে দিয়েছেন সাগরকে।

সাগরকে বাড়ীতে ঢুকতেই চাকর খবর দিল—'বড় দাদাবাবু ডাকছেন।' সাগর বুঝলে সব; বললে, 'যাচ্ছি যা', সাগর ওপরে উঠতেই দেখতে পেল মাকে। মা বললেন—'খেয়ে যা।'

সাগর শুধু বললে, 'আসছি'। দাদার ঘরের দিকে এগুতে এগুতে দেখলে ঝুণুটা মুচকি হেসেই যেন সরে গেলো।

বড়দা'র ঘরে গিয়ে ঢুকতেই দেখল, বালিশে ঠেসান দিয়ে একটা বই ওলটাচ্ছেন তিনি আধ-শোয়া অবস্থায়। গ্যাসের আলোটা মাথার ওপর জ্বলছে। একটা হাতপাখা পাশে পড়ে আছে। সাগরের ঘরে ঢোকা তিনি টের পেয়েছিলেন। গম্ভীর গলায় বল্লেন, 'ইস্কুল থেকে ফিরতে এত দেরী হোল কেন?'

সাগর কিছু বললে না।

দাদা বললেন, 'কথা বলছ না যে, নিশ্চয়ই ফেল করেছ।'

এবারেও সাগর চুপ কোরেই রইল।

আবার দাদা বললেন, 'অন্য কিছু ত' আশা করিনি তোমার কাছে। সারাদিনে একবারও পড়ার বই না ছুঁলে, মাষ্টাররা ত আর নাম দেখে পাশ করিয়ে দেবে না? এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁদের কাছে কান্না-কাটি করছিলে বুঝি?'

ধরা-গলায় সাগর জবাব দিলে, 'না।'

'তবে কি আমায় তাদের হাতে-পায়ে ধরতে হবে তোমার জন্যে?' মরে গেলেও তা পারব না, তোমায় আগেই সে-কথা বলে দিয়েছি।' বড়দা বললেন।'

সাগর বললে, 'তোমায় কিছু করতে হবে না।'

দাদা জিজ্ঞেস কোরলেন, 'তবে কি কোরবে শুনি? আসছে বছর তোমার ম্যাট্রিক দেবার কথা। তা তোমার পড়াশুনোর যা ধরণ দেখছি তাতে টাকা গোণা অনর্থক হবে দেখছি।'

সাগরকে চুপ কোরে থাকতে দেখে তার বড়দা' বললেন—"কিন্তু মুখ্যু ছেলের জায়গা এ-বাড়ীতে কোন দিন হয়নি। আজও হবে না। তোমার ছবি আঁকা পরে হলেও চলবে, কিন্তু পাশ তোমায় কোরতেই হবে। এত দিন তোমার পড়াশুনোর ভার তোমার ওপরই ছেড়ে রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি সেটা ভালো করিনি। এবার থেকে আমাকেই লক্ষ্য রাখতে হবে—তা না হলে নিজে থেকে পড়াশুনো কোরবে তুমি—এটা আশা করি না। যাই হোক, ভেবে দেখ তুমি,—ভাববার মত যথেষ্ট বয়স তোমার হয়েছে। এখন আর ছেলে-মানুষ নেই তুমি, হয় আমার কথা-মত চলতে হবে—আর তা না হলে—' অসমাপ্ত রাখলেন কথাটা সাগরের বড়দা। সাগর বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। সারাক্ষণের মধ্যে দু'বার ছাড়া মুখ খোলেনি সে, কিন্তু কান্নায় তার চোখ ফেটে জল আসছিল। আর মনে আসছিল আবার সেই সব কথা। এই বাড়ীতে থেকে তার পক্ষে জীবনের স্বপ্ন সফল করা সম্ভব কি? এখান থেকে তাকে চলে যেতেই হবে। অনেক দুঃখ অনেক কষ্ট হয়ত আছে জীবনে, কিন্তু তারই সঙ্গে আছে বিপুল আশা—বিরাট সম্ভাবনা। দালানে পা দিতেই চোখে পড়ল—মা বসে আছেন ভাতের থালা নিয়ে। খেতে একদম ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু তাতে মা'রও খাওয়া হবে না হয়ত, কাজেই সাগরকে খেতে বসতে হোল একবার।

মা বললেন একটু চুপ কোরে থেকে,—'নিজের দোষেই ত বকুনি খাস বাবা। একটু পড়লেই ত পাশ কোরে যাস।'

সাগর চুপ।

মা'ই বললেন ফের—'আর তুই ফেল কোরলে নিন্দে যে আমাদের হয় সব চেয়ে বেশী। সবাই এসে যদি তোর সম্বন্ধে এত কথা বলে যায়, সেটা আমাদের গায়ে যে কত লাগে, তা কি বুঝিস্ নে রে? আজ এই যে সারা দিন খাওয়া নেই, কেঁদে কেঁদে চোখ দু'টো ফুলে গেছে—এ-সব কিসের শাস্তি—তুই ত নিজেই জানিস। আর সব বোঝবার মত ক্ষমতাও তোর ত হয়েছে। পাতের দিক চোখ পড়াতে কি বলতে গিয়ে থেমে গেলেন, তার পর ভাত আনতে উঠে গেলেন রান্নাঘরে। ভাত নিয়ে ফিরে এসে দেখেন, সাগর উঠে গেছে থালা ছেড়ে। একবার ভাবলেন ডেকে আনেন, তার পর মনে হোল, ডাকাডাকি কোরতে গেলে যদি আবার অনর্থ বাধে—মনে ক'রে ভাতের থালা নিয়ে ফিরে গেলেন নিঃশব্দে। [ক্রমশঃ



সোনার আনারস

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

পঞ্চম

তার পর

হা-হা-হা-হা-হা-হা! ঘরের ভিতরে আবার অট্টহাসি!

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি মাণিকের হাত ধ'রে টেনে পায়ে পায়ে পিছিয়ে গেল যে-দিক থেকে অট্টহাসি আসছিল না সেই দিকে। তার পর এমন ভাবে দেওয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়াল, যেন পিছন থেকে কেউ তাদের আক্রমণ করতে না পারে।

ঘরের ভিতরে আবার বিদ্রূপ-ভরা কণ্ঠস্বর জাগল—"এসেছ বন্ধুগণ! এস, এস, আমি যে তোমাদেরই জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি!" তার পরই সুরু হ'ল গান:

"এস এস বঁধু এস,
আধ আঁচরে বোসো,
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি!"

উদ্‌ভ্রান্ত কণ্ঠের এই হাসি, কথা ও গান শুনে সচকিত জয়ন্ত একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, "কে তুমি? তোমার গলা যে চেনা-চেনা বোধ হচ্ছে!"

—"হচ্ছে না কি? হচ্ছে না কি? হা হা হা হা! বন্ধু আর বন্ধুর গলা চিনবে না!

—"তুমি হচ্ছ ভুষো-পাগলা!"
—আয়নাতে ঐ মুখটি দেখে
গান ধরেছে বুদ্ধ বট,
মাথায় কাঁদে বকের পোলা,
খুঁজছে মাটি মোট্‌কা জট।

হা-হা-হা-হা-হা-হা! সোনার আনারসের এই ছড়া তোমরা জানো? তাহলে—"

কিন্তু ভুষো-পাগলার কথা আর শেষ হল না, হঠাৎ বাহির থেকে ঘরের দরজার উপরে শোনা গেল দমাদ্দম পদাঘাতের শব্দ! একসঙ্গে অনেকগুলো পা দরজার পাল্লা ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করছে!

ঘরের ভিতরের বিপদ সম্বন্ধে জয়ন্ত তখন নিশ্চিন্ত হয়েছে—কারণ, পাগলা হলেও ভুষো নিশ্চয়ই বিপজ্জনক নয়! জয়ন্ত ছুটে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বললে, "দরজা ভাঙবার চেষ্টা কোরো না! আমরা নিরস্ত্র নই!"

বাহির থেকে হো হো করে হেসে সচীৎকারে কে বললে, "ওরে ছিঁচকে চোর! তুই কি ভেবেছিস্ আমরাও সশস্ত্র নই?"

—"আমাদের কাছে 'অটোমেটিক' রিভলভার আছে—এক মিনিটে তারা কতগুলো গুলী বৃষ্টি করতে পারে তা জানো?"

—"আমাদের দলে লোক আছে পনেরো জন। তোমরা দু'-একটা গুলী ছুঁড়তে না ছুঁড়তেই আমরা তোমাদের দু'জনকে কেটে কুচি-কুচি করে ফেলব।"

—"বেশ, চেষ্টা করে দেখতে পারো। ব্যাপারটা যা ভাবছ ততটা সহজ নয়।"

—"ভাখ্, ভালো চাস্ তো ভালোমানুষের মতন ধরা দে।"

—তার পর?"

—"তার পর আবার কি?"

—তার পর আমাদের নিয়ে তোমরা কি করবে?"

—"আগে ধরা তো দে, তার পর সে-সব কথা নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে।"

—"চমৎকার! তোমার নাম কি বাছা?"

—"আমার নাম তো একটু আগেই তোরা শুনেছিস্!"

—"কি-রকম?"

—"আমার নাম মাণিকচাঁদ বিশ্বাস।"

জয়ন্ত হো-হো ক'রে হেসে উঠে সকৌতুকে বললে—"আরে, আরে, তুমি সেই ছোরাধারী মাণিকচাঁদ—যাকে আমরা ঝোপের ভিতরে ঘাস-বিছানায় শুইয়ে রেখে এসেছিলাম? তোমার হাত-পায়ের বাঁধান খুলে দিলে কে হে?"

—"ওরে গঙ্গারাম, তুই কি ভেবেছিস্ এখানে আমি ছাড়া আর কেউ তোদের উপরে দৃষ্টি রাখেনি? তোরা চলে আসবার তিন-চার মিনিট পরেই আমি মুক্তি পেয়েছি!"

—"বটে, বটে, বটে! তোমার সৌভাগ্যের কথা শুনে আমার হিংসে হচ্ছে যে!"

—"তার মানে?"

—"তুমি তো দিব্যি চট্ ক'রে মুক্তি পেলে। কিন্তু আমরা কি অত সহজে তোমাদের কদলী প্রদর্শন করতে পারব?"

—"সে আশায় জলাঞ্জলি দে। তোরা বাঘের গর্তে ঢুকেছিস্। আমাদের গুপ্তকথা জানতে পেরেছিস্। তোরা কি আর কখনো ছাড়ান পাবি ব'লে আশা রাখিস্?"

—"আশা রাখি বৈ কি মাণিকচাঁদ, আশা রাখি বৈ কি, খুব রাখি! কিন্তু বাপু, ঐ যে গুপ্তকথাটার উল্লেখ করলে, ওর অর্থ কি? তোমাদের কোন্ গুপ্তকথা আমরা জানতে পেরেছি?"

—"ভুষো-পাগলা যে এখানে আছে, এ কথা কি তোরা জানতে পারিস্‌নি?"

—"এও আবার একটা গুপ্তকথা না কি? ভুষো তো পাগ্‌লা মানুষ, ও যেখানেই থাকুক তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতে যাব কেন?"

—"তোরা তো ভুষোকে পাবার জন্যেই এখানে এসেছিস্ রে!"

—"মোটেই নয়।"

—"তবে কি তোরা এখানে এসেছিস্ হাওয়া খাবার জন্যে?"

—"আমরা এসেছি অন্য একটা কথা জানবার জন্যে।"

—"কি কথা?"

—"যে-বাড়ী সবাই জানে খালি বাড়ী, তার ভিতরে মানুষ থাকে কেন ?"

—"এ কথা জেনে তোদের লাভ ?"

—"লাভালাভের ধার ধারি না, আমরা এসেছি কৌতূহল চরিতার্থ করতে।"

—"কৌতূহল চরিতার্থ, না আত্মহত্যা করতে ?"

—"আমরা আত্মহত্যা করতে মোটেই রাজি নই। যাক্, এ-সব বাজে কথা। মাণিকচাঁদ, তোমার সঙ্গে তো অনেকক্ষণ আলাপ হ'ল, এইবারে আমরা আর এক জনের সঙ্গে আলাপ করতে চাই।"

—"কার সঙ্গে ?"

—"তোমাদের কর্ত্তা প্রতাপ চৌধুরীকে ডাকো।"

—"তিনি তো এখন কলকাতায় !"

—"এটা কি সত্য কথা ?"

—"তিনি এখানে থাকলে তোর মত পাজীর-পা-ঝাড়ার সঙ্গে কথা ক'য়ে আমাকে মুখ-ব্যথা করতে হ'ত না।"

—"ও, আপাততঃ তুমিই বুঝি এখানকার প্রধান সেনাপতি ?"

—"না, আপাততঃ আমিই এ-বাড়ীর মালিক।"

জয়ন্ত সবিস্ময়ে বললে,—"তার মানে ?"

—"প্রতাপ বাবুর সঙ্গে এখন এ-বাড়ীর আর কোনই সম্পর্ক নেই।"

—"সম্পর্ক নেই ! কেন ?"

—"এ বাড়ীখানা তিনি আমার কাছে বিক্রি করেছেন। প্রতাপ বাবু এ গ্রামে আর থাকতে চান না।"

—"কেন, এ গ্রাম কি তাঁর পক্ষে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ?"

প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না। নতুন এক গলায় শোনা গেল, —"মাণিক, তুমি লোকটার সঙ্গে এত কথা কইছ কেন বল দেখি ? তুমি কি বুঝতে পারছ না, ও তোমার পেটের কথা আদায় করবার চেষ্টা করছে ?"

—"ঠিক বলেছিস্ ভজা ! ধড়ীবাজটার সঙ্গে আর কোন কথা নয় ! ওহে জয়ন্ত, এইবার শেষ বার জিজ্ঞাসা করছি, দরজা তোমরা খুলবে, না আমরা ভেঙে ফেলব ?"

—"দরজা আমরা খুলব না, ভাঙতে চাও তো তোমরাই ভাঙো।......আমরা তোমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত। মাণিক, রিভলবার বার ক'রে দরজার পাশে এসে দাঁড়াও। দরজা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দু'জনে গুলীবৃষ্টি করব। হতভাগারা বোধ হয় 'অটোমেটিক' রিভলভারের মহিমা জানে না।" শেষের কথাগুলো জয়ন্ত এমন চীৎকার ক'রে বললে যে বাইরের সবাই শুনতে পেলে।

কিন্তু বাহির থেকে দরজা ভাঙার কোন চেষ্টাই হ'ল না। কেবল শোনা গেল, মাণিকচাঁদরা পরস্পরের সঙ্গে ফিস্-ফিস্ ক'রে কথা কইছে ! তার পর তাদের কণ্ঠস্বর হ'ল একেবারে নীরব।

জয়ন্ত মুখ ফিরিয়ে ঘরের অন্য দিকের একটা খোলা জান্‌লার ভিতর দিয়ে বাহিরটা একবার দেখবার চেষ্টা করলে। কিন্তু দেখা গেল কেবল অন্ধকার। রাত্রি তখন দিবসের দিকে অগ্রসর হয়েছে বটে, কিন্তু আকাশের কালিমা পাৎলা হবার কোন লক্ষণই নেই। পৃথিবীও যেন বোবা হয়ে আছে।

মাণিক চুপি চুপি বললে,—"জয়ন্ত, ওরা বোধ হয় আজ রাতে কোন গোলমাল করবে না।"

—"হুঁ, আমারও তাই বিশ্বাস। ওরা ভোরের জন্যে অপেক্ষা করছে, রাতের অন্ধকারে ওরা আমাদের গুলী হজম করতে রাজি নয়। এখন দেখা যাক্, এই অন্ধকারের সুযোগ আমরা গ্রহণ করতে পারি কি না ! আস্তে আস্তে একবার জান্‌লার কাছে গিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখ দেখি !"

মাণিক জানলার কাছে গিয়ে নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করলে। তার পর ফিরে এসে বললে, "নীচের জমির দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল, কারা যেন এদিকে-ওদিকে চলা-ফেরা করছে !"

—"মাণিকচাঁদ তা'হলে ওদিকেও পাহারা রাখতে ভোলেনি। দেখছি আমাদের অদৃষ্ট মন্দ। কালকের প্রভাত হয়তো আমাদের পক্ষে সুপ্রভাত হবে না।"

এতক্ষণ পরে ভুষো-পাগ্‌লা হঠাৎ মুখ খুলে ব'লে উঠল,— "সুপ্রভাত ! সুপ্রভাত ! আমি জানি আমার জীবনে আর সুপ্রভাত আসবে না ! কিন্তু তোমরা কে বাপু ? তোমরা এখানে কেন ?"

জয়ন্ত বললে,—"মানুষ নিজের বিপদকে কতখানি বড় ক'রে দেখে বুঝেছ তো মাণিক ! ভুষোপাগ্‌লা যে আমাদের সঙ্গেই আছে এ-কথা আমরাও ভুলে গিয়েছিলুম ! যাক্, এ তবু মন্দের ভালো। ভুষোর সঙ্গেই কথাবার্ত্তা ক'য়ে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাক্।" এই বলে সে টর্চের আলো জ্বেলে দেখলে, ঘরের মেঝের উপরে ভুষো-পাগলা লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে।

মাণিক বললে,—"এ কি ভূষণ, তোমার মাথায় আর মুখে যে চাপ্ চাপ্ শুক্‌নো রক্ত !"

ভুষো হেসে বললে,—"দুষমণরা লাঠি মেরে আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়ে আমাকে এখানে ধ'রে এনেছে। এই দ্যাখ না, আমার হাত-পা-ও বাঁধা !"

জয়ন্ত বললে,—"আহা, বেচারী ! মাণিক, ওর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দাও।"

বাঁধন খুলে দিতে দিতে মাণিক বললে,—"আচ্ছা ভূষণ, তোমার মতন নিরীহ মানুষের উপরে এমন অত্যাচার কেন ? তুমি কি ওদের কোন অনিষ্ট করেছ ?"

ভুষো মাথা নেড়ে বললে,—"কিছু না, কিছু না ! নিজের উপকার কি পরের অপকার, কিছুই আমি করতে পারি না। আমি খালি খাই-দাই, বগল বাজাই আর সোনার আনারসের গান গাই !"

—"তবে ওরা তোমাকে ধ'রে রেখেছে কেন, সে কথা কি জানো ?"

—"ওদের মুখেই শুনে জেনেছি।"

—"কি জেনেছ ?"

—"আমি সোনার আনারসের ছড়া জানি ব'লেই ওরা আমাকে ধ'রে রেখেছে।"

—"তাই না কি ?"

—"হাঁ। ওরা আমাকে আরো অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে। ওদের বিশ্বাস আমি আরো অনেক কথা জানি।"

জয়ন্ত বললে,—"বটে, বটে ? তুমি আরো অনেক কথা জান না কি ?"

—"অনেক কথা জানি গো, আবার অনেক কথা জানি না !

—"তুমি কি কি কথা জানো ভুবণ ?"

ভুষোর দুই চক্ষে ফুটল সন্দেহের ভাব। সে বললে,—"আমার কথা তুমি জানতে চাও কেন ? ও, তুমিও বুঝি ঐ দলে ? ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার মনের কথা জেনে নিতে চাও ?"

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি বললে,—"না ভুবণ, আমরা তোমার বন্ধু, তোমাকে উদ্ধার করতেই এখানে এসেছি।"

—"হা-হা-হা-হা ! আমরা তিন জনেই যে ইঁদুর-কলে ধরা-পড়া ইঁদুর ! এখন কে কাকে উদ্ধার করে ?"

—"ভুবণ, লোকে তোমাকে পাগল বলে বটে, কিন্তু তোমার কথাবার্ত্তা তো ঠিক পাগলের মতন নয় !"

—"লোকে ঠিক বলে গো, ঠিক বলে ! আমি পাগল নই তো কি ? ঐ সোনার আনারসের ছড়াই আমাকে পাগল করেছে !"

—"ছড়া আবার কারুকে পাগল করতে পারে না কি ?"

—"সোনার আনারসের ছড়ার মানে বুঝলে পাগল হওয়া ছাড়া উপায় নেই। ও বড় বিষম ছড়া গো, মানুষকে মত্ত ক'রে দেয় !"

—"কিন্তু ছড়ার শেষটা তো তুমি এখনো আমাদের শোনাওনি।"

—"শুনবে ? তা শোনাতে আমার আপত্তি নেই। আমার মুখে এ ছড়াটা তো আরো কত লোকে শুনেছে, কিন্তু কেউ পারেনি এর মানে বুঝতে !"

—"আমিও মানে বুঝতে পারব না, তবু ছড়ার সবটা শুনতে ক্ষতি কি ?"

—"তবে শোনো—"

ভুষোকে বাধা দিয়ে হঠাৎ ঘরের বাহির থেকে সগর্জ্জনে কে চীৎকার ক'রে উঠল,—"খবর্দ্দার ভুষো, খবর্দ্দার ! ছড়াটা ওদের কাছে বললে তোকে আমরা এখনি খুন ক'রে ফেলব !"

ভুষো ভয়ে কুঁচ্‌কে পড়ে বললে,—"শুনছ তো ? ঘরের বাইরে যমদূতরা আড়ি পেতেছে ? আর ছড়া বলে কাজ নেই বাবা !"

জয়ন্ত বললে,—"কাকে তুমি ভয় করছ ভুষণ ? ওদের বিষ নেই, কুলোপানা চক্কর ! দেখলে তো, আমাদের ভয়ে ওরা দরজা ভাঙতে সাহসই করল না।"

দরজার দিকে ত্রস্ত চক্ষে বার বার তাকাতে তাকাতে ভুষো বললে,—"তা'হলে ছড়ার শেষটা বলব ?"

—"নিশ্চয়ই বলবে। দেখি কে তোমার কি করে !"

ভুষো বললে :

'বাঘরাজাদের রাজ্য গেছে,
কেবল আছে একটি স্মৃতি,
ব্রহ্মপিশাচ শানাই বাজায়,
বাস্তুঘুঘু কাঁদছে নিতি।
সেইখানেতে জলচারী
আলো-আঁধির যাওয়া-আসা
সর্প-নৃপের দর্প ভেঙ্গে
বিষ্ণুপ্রিয়া বাঁধেন বাসা।"

জয়ন্ত খানিকক্ষণ ধরে লাইনগুলো মনে-মনে আউড়ে নিয়ে বললে, —"ভুবণ, তোমার ছড়ার সবটাই আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।"

—"মানে বুঝতে পারলে ?"

—"পরে সে চেষ্টা ক'রে দেখব বৈ কি।"

—"পরে কি আর সময় পাবে ?"

—"কেন পাব না ?"

—"আমরা যে কলে-পড়া ইঁদুর !"

জয়ন্ত উত্তর না দিয়ে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল।

বাইরে অন্ধকার তখন আর ততটা নীরন্ধ্র নয়। পূর্ব্বের আকাশে আলোকের প্রথম ইঙ্গিত জাগতে আর বেশী দেরি নেই। বাতাসে পাওয়া যাচ্ছে আসন্ন প্রভাতের প্রসন্ন স্নিগ্ধতা।

আচম্বিতে ওদিক্‌কার খোলা জানলাটার ও পাশে হ'ল কালো অপছায়ার মতন একটা মূর্ত্তির আবির্ভাব এবং চোখের পলক পড়বার আগেই মূর্ত্তিটা আবার অদৃশ্য হ'ল, ঘরের ভিতরে কি-একটা জিনিষ নিক্ষেপ ক'রে।

পর-মুহূর্ত্তে ভীষণ এক শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরটা ভরে উঠল বিষম তীব্র এক দুর্গন্ধে।

জয়ন্ত প্রায়রুদ্ধ কণ্ঠে ব'লে উঠল, "জানলার দিকে চল—জানলার দিকে চল ! ওরা বিষাক্ত গ্যাসের বোমা ছুঁড়েছে ! উঃ !"

কিন্তু তারা কেউ জানলা পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারলে না, সবাই মাটির উপরে পড়ে অসহ যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেল। [ক্রমশঃ

১৭

শ্রীরবিনর্ত্তক

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই রাজধানীর প্রায় সকল লোকই জানলে ভোর রাত থেকে মহারাজ যোগনন্দ হঠাৎ প্রবল বিকারের ঘোরে আধ-অচেতন হয়ে নানা রকম প্রলাপ বক্‌ছেন। প্রলাপের নমুনা—

'ব্যাড়ি ! কোথায় তুমি ! একবার দেখা দাও। বররুচি ! তোমার কাছে আমি অনেক অপরাধ করেছি—ক্ষমা কোরো। শকটাল্ ! তুমি এবার প্রতিশোধ নেবে—জানি। মৌর্য্য ! তোমার কাছে কিন্তু আমি নিজে কোন অপরাধ করিনি—যে করেছিল সে চ'লে গেছে—শুধু তার শরীরটার মধ্যে আমি ইন্দ্রদত্ত ঢুকেছি—এই আমার অপরাধ—তা চন্দ্রগুপ্ত বোধ হয় সে অপরাধটুকুও ক্ষমা করবে না। চাণক্য—তোমায় না চিনতে পেরে বোকার মত একটা দোষ ক'রে ফেলেছি—যদি তুমি তোমার পরিচয় দিতে, তাহ'লে কি আমি আর তোমায় আসন থেকে তুলে দিই ! তা যাক্ ! তোমার মারণের ফল ফলত না—যদি কাল রাতে আমি একটু শুদ্ধাচারে থাকতুম। কাল রাতে বিলাসে ডুবে ছিলুম, তাই ত অশুচি অবস্থায় পেয়ে অসতর্ক আমাকে পেড়ে ফেলেছে তোমার কৃত্যা রাক্ষসী। ভাল ভাল ! এবার সপ্তরথীতে মিলে আমায় অভিমন্যু বধ করবে দেখ্‌ছি। তাই করো সকলে ! আমি কি ছিলুম—কি হয়েছি ! কোথায় যোগী দার্শনিক পণ্ডিত ইন্দ্রদত্ত—আর কোথায় বিলাসী পাষণ্ড রাজা যোগনন্দ। হোক্ প্রায়শ্চিত্ত হোক্'।

মন্ত্রীরা ভোর থেকেই রাজপ্রাসাদে এসে আছেন। প্রধান মন্ত্রী রাক্ষস রাজবৈদ্যকে নিয়ে পরামর্শ করছেন কিন্তু রাজবৈদ্যের মুখ খুব গম্ভীর। তিনি শুধু বললেন—'চিকিৎসায় বিশেষ কিছু হবে ব'লে

আশা করি না। কারণ, বুঝতেই ত পারছেন—এ মারণের ফল—একে কাটাতে হ'লে দৈবক্রিয়া দরকার। কিন্তু উপযুক্ত লোক যোগাড় ক'রে দৈবক্রিয়া আরম্ভ করবার আগেই মহারাজের অন্তিম কাল উপস্থিত হবে। তাই বলছি যে, আপনারা প্রস্তুত থাকুন। দুপুরের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে'। শুনে রাক্ষসের মুখ ভার হ'ল। বাকী আট নন্দ মাথায় হাত দিয়ে বসলেন—কারণ তাঁদের বুদ্ধিদাতা ছিলেন এই যোগনন্দ।

খানিক পরে রাক্ষস মন্ত্রী শকটালকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—'মন্ত্রিবর! সেই যে ব্রাহ্মণকে কাল দুপুরে মহারাজ উঠিয়ে দিলেন—তিনি কোথায় জানেন কি'? শকটাল দেখলেন—মহা বিপদ! সত্য কথা বলা চলে না এ রকম ক্ষেত্রে। তাই তিনি অম্লান বদনে মিছে কথা বললেন—তা ত' জানি না—মন্ত্রিবর'! রাক্ষস তখন আবার জিজ্ঞাসা করলেন—'আচ্ছা, তাঁর পরিচয় কি? সত্যই কি তিনি চাণক্য'? শকটাল খুব সাবধানে কথা কইছিলেন—কারণ তিনি বেশ জানতেন যে, এই সময় এক পা ভুল পথে ফেললে সব ওলোট পালোট হ'য়ে যাবে। তাই এবারও তিনি সতর্ক হ'য়ে উত্তর দিলেন—'মহারাজের প্রলাপ শুনে ত তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি—তা ঠিক কি না—কি ক'রে বুঝব! চাণক্য—কৌটিল্য—বিষ্ণুগুপ্ত—এ সব নামই শুনে আসছি দূর থেকে—চাক্ষুস পরিচয় ত এর আগে কখনও হয়নি'। রাক্ষস বুঝলেন—শকটাল খুব সাবধানে কথাবার্ত্তা কইছেন—তাঁকে জেরা ক'রে কোনও কথা বার করা যাবে না। অগত্যা তিনি হাল ছেড়ে দিলেন। রাজ্যের মধ্যে যেখানে যত পুরোহিত ছিলেন, তাঁদের সকলকে একসঙ্গে ক'রে আনা হ'ল—রাজবাড়ীতে। খুব আড়ম্বরের সঙ্গে দৈবক্রিয়া আরম্ভ হ'ল বটে—কিন্তু মহারাজকে বাঁচান গেল না। তিনি রাজবৈদ্যের কথাটাকে মিথ্যা ব'লে প্রমাণ করলেন—সাত দিনের দিন ভোরের বেলা মহারাজ যোগনন্দ (অর্থাৎ যোগনন্দের দেহে প্রবিষ্ট যোগী ইন্দ্রদত্ত) চ'লে গেলেন পরলোকে।

* * * *

মহারাজ যোগনন্দ অসুখে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই চাণক্য বাইরের কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছিলেন—ইন্দুশর্ম্মা পর্ব্বতকের কাছে গিয়ে তাঁকে সপ্তাহ মধ্যে যুদ্ধে নামতে অনুরোধ জানিয়ে এসেছিলেন। পর্ব্বতকও সাম্রাজ্যের লোভে রাজি হয়েছিলেন। আর রাজ্যের দশ জন সেনাপতিও এই রকম আদেশ পেয়েছিলেন কৌটিল্যের কাছ থেকে যে, মহারাজ যোগনন্দের মৃত্যু-সংবাদ পেলেই তাঁরা বিদ্রোহী হ'য়ে রাজধানীতে তোলপাড় আরম্ভ ক'রে দেবেন।

* * * *

সম্রাট যোগনন্দের শবদেহ গঙ্গাতীরে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাকী আট জন নন্দ শোকে আকুল। রাক্ষসেরও চোখের জল বাধা মানছে না—আহা! তিনিই যে এই নবনন্দকে কত কষ্টে মানুষ করেছেন একটা মাংসের ডেলা থেকে! সে সব স্মৃতি তাঁর মনে ভেসে এসে তাঁর বুকের ভিতরটা জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তিনি এও বুঝেছেন যে, এ শকটাল ও চন্দ্রগুপ্তের প্রতিহিংসার ফল—কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি নিরুপায়! দৈবের উপর ত আর হাত দেওয়া চলে না।

ক্রমশঃ দাহের সময় এগিয়ে এল। চিতার উপর যোগনন্দের শব তুলে দিয়ে রাজকুমার হিরণ্যগুপ্ত মুখে দিলেন আগুন। ধু-ধু ক'রে চিতা জ্বলে উঠল। শ্মশান-বন্ধুরা সকলে নিস্তব্ধ। হঠাৎ ও কিসের শব্দ! দূরে চার দিকে যেন যুদ্ধের বাজনা বাজতে সুরু করেছে—অসংখ্য কণ্ঠের চিৎকার! রাক্ষস শুনেই বুঝলেন, এবার আর দৈব নয়—পুরুষকার সহায় ক'রে চন্দ্রগুপ্ত আগুয়ান হয়েছেন! শোকের সময় আর ত নেই—কিন্তু রাজদেহ চিতার উপর—ফেলে যাওয়াও যায় না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিশ্বাসী চর ছুটে গেল প্রধান সেনাপতির কাছে—ব্যাপার কি জেনে আসতে। প্রধান সেনাপতি রাক্ষসেরই নিকট-আত্মীয়।

কিছু পরেই চর ফিরে এল—মুখে-চোখে তাঁর ভয়ের চিহ্ন। সমগ্র রাজধানীকে ঘিরে ফেলেছে শত্রুরা। এক দিকে ম্লেচ্ছ রাজা পর্ব্বতক—আর তিন দিকে এ রাজ্যেরই বিদ্রোহী সেনাপতিরা যুদ্ধ আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। চন্দ্রগুপ্ত নিজে সেনাদের চালনা করছেন—তাঁর এক পাশে আছেন পর্ব্বতকের ছেলে মলয়কেতু—আর অন্য দিকে রক্ষকরূপে চাণক্য স্বয়ং। রাজপ্রাসাদ দখল হ'য়ে গেছে। প্রধান সেনাপতি অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি যুদ্ধে হেরে পালাননি—রাজপ্রাসাদের সামনে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছেন। এখন চাণক্য সদলবলে আসছেন শ্মশানে নন্দবংশ ধ্বংস করতে।

রাক্ষসের চোখ দু'টো জ্বলে উঠল! কিন্তু এবারও তিনি নিরুপায়! ব্যাপার কি বোঝবার আগেই চাণক্যের পরিচালনায় একদল সেনা এসে শ্মশানটাকে ঘিরে ফেললে। রাক্ষস দেখলেন—রক্ষার কোন উপায়ই নেই। তিনি নিঃশব্দে গঙ্গার জলে নেমে ডুব-সাঁতার কেটে স'রে গেলেন—গোলমালে কেউ তাঁর খোঁজ রাখল না। সঙ্গে সঙ্গেই চাণক্য শ্মশানে এসে ঢুকলেন—'রাক্ষস কোথায়?—রাক্ষসকে আটকাও—মেরো না—জীবন্ত ধর'—এই বলতে বলতে। কিন্তু কৈ! কোথায় রাক্ষস! চাণক্য—মহামতি চাণক্যের জিত হ'য়েও হার হ'ল—রাক্ষস তাঁর হাতে বন্দী হলেন না। তখন প্রলয় কালের রুদ্রমূর্ত্তি ধ'রে চাণক্য আদেশ দিলেন—'এই আট জন নন্দ আর রাজকুমার হিরণ্যগুপ্তকে এই শ্মশানেই পশুর মত হত্যা কর'। আট নন্দ এই ব্যাপারে এতই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁদের মুখে কোন কথাই সরল না। একবার একটা হাত নাড়বার শক্তিও হ'ল না তাঁদের—নিমেষ মধ্যে জ্বলন্ত চিতার আলোয় সেনাদের তলোয়ার ঝলসে উঠল—পরক্ষণে দেখা গেল আট নন্দ আর কিশোর রাজকুমার হিরণ্যগুপ্তের ছিন্নমুণ্ড শ্মশানের মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। কয়েক জন সেনা চিতা থেকে যোগনন্দের দেহ টেনে নামাতে যাচ্ছিল—কিন্তু মহাকালের মত ভীষণ হুঙ্কারে সাবধান ক'রে দিলেন—'যেন রাজাদের বা রাজকুমারের দেহ কলুষিত না করা হয়, বরং রাজার উপযুক্ত সম্মানে আরও নয়টি চিতা জ্বালিয়ে যেন শবগুলির দাহ করা হয়'।

চাণক্যের আদেশ। সঙ্গে সঙ্গে তা পালনের ব্যবস্থা হ'য়ে গেল।

* * * *

দূরে দাঁড়িয়ে রাক্ষস এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেখছিল—চোখ ফেটে তাঁর রক্ত পড়বার উপক্রম হয়েছিল—জল ছিল না চোখে তাঁর কিন্তু তবুও তিনি ভেঙ্গে পড়লেন না। নিজের মনকে বোঝালেন—'নন্দবংশ ত শেষ হয়ে গেল। তবে আর কিসের আশায় বাঁচি? যে



শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর, হা-হা করে ঘূর্ণি।
রুদ্রের রোষে কি যে ধরা যাবে চূর্ণি।
ধূম ধূলি কুণ্ডলি ঢেকে ফেলে সূর্য্য।
পাংশুল মেঘে বাজে বজ্রের তূর্য্য।
বৈকালে ঝড়, জল, আর শিলাবৃষ্টি।
বিদ্যুৎ হরে লয়, নয়নের দৃষ্টি।
কাঠ-ফাটা দুপুরেতে ঢুলে সারা বিশ্ব।
নাহি কোথা শ্যামলিমা, ধরা আজ নিঃস্ব।

পুরাতন বটতলে ঘুমায়েছে পান্থ।
পশরা নামায় ছায়ে পশারিণী ক্লান্ত।
দর দর ঝরে ঘাম জুড়ি সারা অঙ্গ।
আই ঢাই করে প্রাণ হায় এ কি রঙ্গ!
ভাল লাগে পানীয়টি, রুচি নাই খাদ্যে।
কর্কশ মনে হয় মধু গীত বাদ্যে।
জ্যৈষ্ঠই তবু আনে বরষার ইঙ্গিত।
বিদগ্ধা ধরা যবে ফিরে পাবে সম্বিৎ।

আশায় বাপ ভাই হারিয়ে চন্দ্রগুপ্ত বেঁচেছিল—যে আশায় শকটাল্ শত পুত্র হারিয়েও বেঁচেছিল—প্রভুপুত্রদের হারিয়েও সেই প্রতিহিংসা নেবার আশায় আমায় বাঁচতে হবে। এখন যদি আমি ধরা দিই—চাণক্য আমার প্রাণবধ করবে না—বরং আমাকে বশে আন্‌বার চেষ্টা করবে—কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতকতা আমার দ্বারা হবে না! তাই ধরা আমি দোব না—লুকিয়ে থেকে চাণক্যের উপর প্রতিশোধ নোব। এখনও ত বুড়ো মহারাজ মহাপদ্ম নন্দ সর্ব্বার্থসিদ্ধি বেঁচে আছেন। রাণীরা দু'জনেই মারা গেছেন বটে, কিন্তু আমার প্রভু এখনও বেশ সুস্থ আছেন তাঁর তপোবনে। যদি দরকার হয় ত আবার তাঁকেই তপোবন থেকে টেনে এনে বসাব রাজসিংহাসনে। তিনিই ত রাজ্যের মূল—তাঁকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারলে এ সব বিদ্রোহী সেনারাও আর বিদ্রোহ করবে না।' এই রকম ভেবে মন ঠিক ক'রে রাক্ষস ধীরে ধীরে গা-ঢাকা দিলেন! তাঁর এই পালান এক জন ছাড়া আর কেউ জান্‌তে পারলে না। যিনি তাঁর উপর লক্ষ্য রেখেছিলেন—তিনি চাণক্যের বন্ধু—তান্ত্রিক ও জ্যোতিষী ইন্দুশর্ম্মা।

* * *

নন্দবংশ ধ্বংসের কথা রাজপ্রাসাদে পৌঁছুলে রাণীরা পাগলের মত হ'য়ে চিতা সাজিয়ে পুড়ে মলেন। চাণক্য বাধা দিলেন না—বরং কড়া আদেশ দিলেন যেন রাজপুরীর নারীদের উপর এতটুকু অসম্মান না দেখান হয়। রাণীরা সহমৃতা হতে চাইলেন—এ ত তাঁর ফন্দীর অনুকূল। তাঁরা স্বেচ্ছায় প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়ে চন্দ্রগুপ্তের পথই নিষ্কণ্টক করে দিতে চাইছেন। রাজার রাণীর যোগ্য সম্মানের সঙ্গে তাঁদের অনুগমনের ব্যবস্থা হ'ল।

এমন সময় ইন্দুশর্ম্মা এসে চাণক্যকে জানালেন—তিনি রাক্ষসের সন্ধান জানেন। চাণক্যের প্রশ্নে তিনি বললেন—শ্মশানের কাছে এক গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তিনি নন্দদের হত্যা নিজের চোখে দেখেছেন, তার পর তিনি রাজধানী ছেড়ে বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছেন। চাণক্য উঠ্‌লেন চম্‌কে—কি সর্ব্বনাশ! চাণক্যেরও স্মৃতিলোপ হচ্ছে না কি! এখনও ত নন্দবংশের মূল পুরুষ—মহাপদ্ম নন্দ সর্ব্বার্থসিদ্ধি বেঁচে! তবে আর এ ক'জন অবলা নারীর স্বেচ্ছামৃত্যুতে চাণক্য হাঁফ ছেড়ে বাঁচছিলেন কি ক'রে! সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিশ্বাসী দেহরক্ষী সেনা কয়েক জন হাতীর পিঠে চল্‌ল সর্ব্বার্থসিদ্ধির তপোবনে।

* * * *

সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। রাজধানীতে যে বিষম বিপর্য্যয় ঘটে গেছে তার কোন সংবাদই রাখেন না—বুড়ো মহারাজ। অস্তগামী সূর্য্যের আভায় পশ্চিম দিক্ লাল হয়ে উঠেছে। বায়ুকোণের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সূর্য্যার্ঘ্য দেবার যোগাড় করছিলেন বৃদ্ধ রাজতাপস। হঠাৎ এক তলোয়ারের আঘাতে তাঁর ছিন্নমুণ্ড পড়ল তাঁর হাতের অর্ঘ্য-পাত্রে—রক্তচন্দন-গোলা অর্ঘ্যের লাল জল—রাজ-তপস্বীর রক্তে আরও গাঢ় লাল হ'য়ে উঠল—অস্তোন্মুখ সূর্য্যের কিরণে রঞ্জিত বনভূমি রাজশোণিতে ভিজে সিঁদূরে-রাঙা হ'য়ে গেল। ঘাতকেরা যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে ফিরে গেল।

এর আধ দণ্ড-বাদে মহামন্ত্রী রাক্ষস ধূলায় ধূসর হ'য়ে তপোবনে এসে দেখলেন—তিনি বিলম্বে এসে পৌঁছেছেন। চাণক্য নন্দবংশের একটি অঙ্কুরও জীবন্ত রাখেননি। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সমগ্র নন্দ-বংশ নির্ম্মূল ধ্বংস হ'য়ে গিয়েছে। এ ধাক্কা তিনি আর সাম্‌লাতে পারলেন না—একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে তিনি চেতনা হারিয়ে পড়ে গেলেন—তাঁর আগেকার প্রভুর পায়ের তলায়।

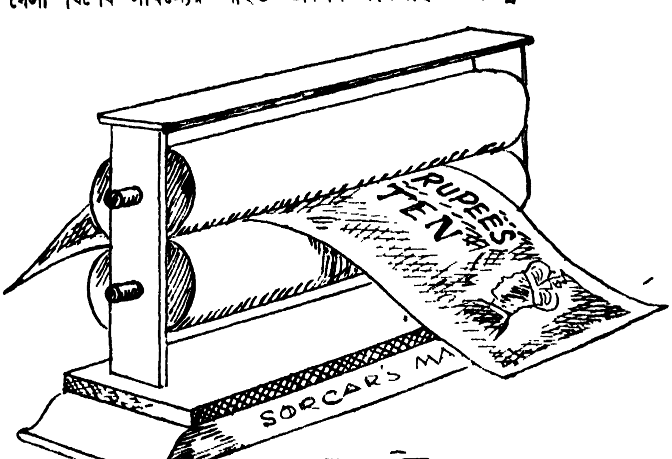
[ক্রমশঃ।

যাদুঘর

যাদুকর—পি, সি, সরকার

নোট তৈয়ার করা

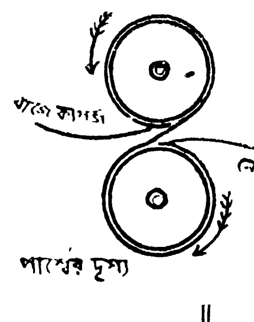
এবারে একটি ভারী মজার খেলা শিখাইয়া দিব। ইহাতে যাদুকর নিজের ইচ্ছামত এক টাকা, দুই টাকা, দশ টাকা হইতে লাখ টাকার পর্য্যন্ত নোট নিজে প্রস্তুত করিয়া দেখাইতে পারিবেন। খেলাটি ভারী সুন্দর এবং আমি জীবনে বহু বার এই খেলা বিশেষ সাফল্যের সহিত প্রদর্শন করিয়াছি। কিছু দিন



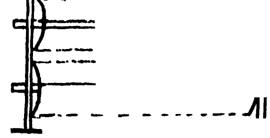
প্রথম চিত্র

পূর্ব্বে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাদুকর দান্তে (Dante) সাহেব তাঁহার হলিউডের "A haunting we will go" সিনেমা-চিত্রে এই খেলাটি দেখাইয়াছেন। সিনেমা-চিত্রে যাদু-বিদ্যা প্রদর্শন করিলে লোকেরা উহার বিশেষ মূল্য দিতে চাহেন না। তাঁহারা মনে করেন, উহার সমস্তই 'ক্যামেরা-ট্রিক!' আসলে সব ক্ষেত্রে কিন্তু উহা ঠিক নহে। পূর্ব্বোক্ত চিত্রে যে নোট তৈয়ারী করার খেলা দেখান হইয়াছে উহা আমেরিকার একটি বিশিষ্ট যাদু-সরঞ্জাম বিক্রেতা কোম্পানীর "The conjuring counterfeiter" নামক যন্ত্র দ্বারা করা হইয়াছিল। পাঠকবর্গের বুঝিবার সুবিধার জন্য আমরা ইহার নাম 'টাকা তৈয়ারীর যন্ত্র' বা Money making Machine নাম দিয়াছি।

টাকার প্রয়োজন মানব মাত্রেই অনুভব করেন, কাজেই টাকা তৈয়ারী করার খেলায় সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন। যাদুকর রঙ্গমঞ্চে আসিয়া প্রথমে একটি চমৎকার বক্তৃতা দিবেন। "মাননীয় ভদ্রমণ্ডলী! আপনাদের অর্থাৎ আমাদের সকলের দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশা ঘুচিল। আমি একটি যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছি যাহা দ্বারা ইচ্ছা মাত্র যে কোন নোট তৈয়ার করিতে পারা যাইবে। পুরাতন খবরের কাগজের টুকরা কতকগুলি এক শত টাকা, দশ টাকা, পাঁচ টাকা প্রভৃতি নোটের আকৃতিতে কাটিয়া লইবেন, তার পর সেই কাগজ-খণ্ডগুলি এই নোট তৈয়ারী করার মেসিনের মধ্য দিয়া চালাইয়া দিলে উহা নোটের ন্যায় ছাপান হইয়া বাহির হইয়া আসিবে।"—এই কথা বলিয়া তিনি দশ টাকার নোটের মাপের এক খণ্ড খবরের কাগজের টুকরা হাতে লইয়া দর্শকদিগকে দেখাইলেন এবং তার পর বলিলেন—"এই দেখুন, এই কাগজখণ্ডটি আমি নোট তৈয়ারীর মেসিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলাম, তার পর রোলার দুইটি ঘুরাইয়া উহার মধ্য দিয়া আনিলেই উহা নোট হইয়া বাহির হইবে। এই দেখুন দশ টাকার নোট বাহির হইল—এই দেখুন কেমন সুন্দর নূতন চক্‌চকে নোট। বাজারে দেওয়া মাত্র ইহা চলিয়া যাইবে। কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র চালান দরকার—ম্যাজিকের ছাপান নোট বেশীক্ষণ হয়ত নাও থাকিতে পারে। মাননীয় বন্ধুগণ, এই মেসিন দ্বারা জগতে অসাধ্য সাধন করা যাইবে। দিনে কয়েক ঘণ্টা মাত্র মেসিনটি ঘুরাইলে আমি প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার নোট তৈয়ার করিয়া দিতে পারিব। দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য ঘুচিল ৬০৲ টাকা মণ চাউল আর ৩০৲ টাকা জোড়া ধুতি কোনটিরই ভয় করি না। কেহই আমাদিগকে মারিতে পারিব না।" "এতদ্দর্শনে সকলেই আনন্দে করতালি দিতে থাকিবেন। প্রদত্ত প্রথম চিত্রে দেখান হইয়াছে—কি ভাবে নোট তৈয়ারী করার কলের মধ্য দিয়ে একটি সাধারণ বাজে কাগজ প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়ার পর রোলার ঘুরাইয়া উহা দশ টাকার নোট ছাপা হইয়া বাহির হইতেছে। এইবার খেলাটির গোপন কৌশল প্রকাশ করা যাইতেছে। A ও B দুইটি রড আছে যাহা রোলাররূপে কাজ করে। ঐ রড দুইটিতে ইংরাজী অক্ষর Sএর মত করিয়া একটি কলে কাপড় জড়ান হয়। দ্বিতীয় চিত্রে সম্মুখের ও পার্শ্বের দৃশ্যে যথাক্রমে A এবং B রোলার দুইটি এবং উহাতে কাপড় জড়াইবার কৌশল দেখান হইয়াছে। দর্শকগণ বুঝিতে পারেন না যে A এবং B উভয়টিতেই একই খণ্ড কাপড়ের দুই প্রান্ত গুটান হইয়াছে—তাঁহাদের ধারণা—দুইটি বিভিন্ন রোলার। 'S' অক্ষরের ন্যায় কাপড় জড়ান হওয়াতে যখন উপরকারটি জড়ান হয় তখন নীচেরটি খুলিয়া যায়, যখন নীচেরটি জড়ান হয় তখন


দ্বিতীয় চিত্র

পার্শ্বের দৃশ্য


সম্মুখের দৃশ্য

উপরেরটি খুলিয়া যায়। যাদুকর প্রথমতঃ মেসিনের মধ্যে দ্বিতীয় চিত্রের অনুযায়ী দশ টাকার বা এক শত টাকার নোট গুটাইয়া রাখিবেন। নিজের নিকট (পকেটে) কত টাকার নোট আছে তাহার উপরেই ইহা নির্ভর করে। এই ভাবে মেসিনে পূর্ব্বাহ্নে গুটাইয়া রাখিয়া খেলা আরম্ভ করিতে হয়। এইবার ঐ নোটের মাপের খবরের কাগজের টুকরা মেসিনের এক দিক্ হইতে দিয়া রোলারটি ঘুরাইয়া দিলেই কাগজখণ্ড ভিতরে আড়ালে ঢুকিয়া যাইবে এবং লুক্কায়িত নোট বাহির হইবে, চিত্রে ইহা স্পষ্ট দেখান হইয়াছে। প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ইহা অনেকের পক্ষে বোঝা কষ্টকর হইতে পারে, কিন্তু নিজে যন্ত্রটি তৈয়ার করিয়া দেখিলেই দেখিবেন ইহা নিরতিশয় সহজ। এর মত সহজ খেলা আর দ্বিতীয় নাই। তবে কত টাকার নোটের পর কত টাকার নোট রাখা হইয়াছে তাহা মনে রাখিতে হইবে এবং সেই আকৃতির খবরের কাগজ দিতে হইবে। নতুবা দশ টাকার মাপের কাগজের টুকরা দিয়া দুই টাকার নোট বাহির হইলে—নোট বাহির হইয়া পড়িবে কিন্তু কাগজের অনেকাংশ মেসিনে বাহির হইয়াই থাকিবে—ইহাতে খেলা ধরা পড়িবে। কাজেই এই বিষয়ে খুব সাবধান। এই খেলাটি সম্পূর্ণ ভাবে প্রদর্শনের যোগ্যতা ও সরস কথাবার্ত্তার উপর নির্ভর করে। এমন সমস্ত কথা বলিতে হইবে যে, দর্শকগণ তন্ময় হইয়া যাইবেন। একবার গয়াতে যুদ্ধভাণ্ডার তহবিলের সাহায্য-কল্পে খেলা দেখাইতে গিয়াছিলাম—বহু বিশিষ্ট দর্শকের সমাবেশ হইয়াছিল। আমি নোট তৈয়ারী করার কলে একখণ্ড কাগজ দ্বারা এক শত টাকার নোট তৈয়ার করিলাম এবং দর্শকদিগের নিকট নোট ২০৲ বিশ টাকায় বিক্রয় করিতে চাহিলাম কিন্তু কেহই কিনিতে সাহসী হইলেন না। দর্শকগণ এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে আমার ঐ আসল ১০০৲ এক শত টাকার নোটটিও আমার তৈয়ারী মনে করিয়া বিশ টাকা দিয়াও কেহ কিনিতে সাহসী হইলেন না। ম্যাজিকে ইহাই মজা।

দুঃসাহসী বৈজ্ঞানিক

শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ

"নাশিতে ধরার আঁধার, কালিমা, ভয়,
প্রদীপ নিজেরে পুড়ায়ে করিছে ক্ষয়।"

পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা এই প্রদীপের মতই পরের উপকারের জন্য, সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য স্বেচ্ছায় অভূতপূর্ব্ব দুঃখ বরণ করে নেন। আজ এই রকম কয়েক জন পরোপকারী বৈজ্ঞানিকের কথা বলবো। যাঁরা বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য স্বেচ্ছায় অদ্ভুত শারীরিক কষ্ট বরণ করে নিয়েছেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এঁদের নাম কোন দিন ম্লান হবে না। প্রদীপের মতই এঁরা মানুষের অজ্ঞতাকে আলো দেখিয়ে চেয়েছেন দূর করতে।

St. Andrews Universityর ডক্টর ডেভিস এই রকম এক অদ্ভুতকর্ম্মা লোক। মানুষের স্পর্শানুভূতি ও বেদনানুভূতির মধ্যে সত্যিকারের কতটুকু পার্থক্য আছে, এই সত্য আবিষ্কার করার জন্য তিনি এক অদ্ভুত উপায়ে নিজেকে নির্য্যাতন করতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে আঙুলের কয়েক পর্দা চামড়া চেঁচে ফেলেন, তার পর নিজের ধমনীর মধ্যে ছুঁচ ফুটিয়ে দিয়ে নিজের পরীক্ষার কাজ চালাতে থাকেন। ইনি আশা করেন, তাঁর এই বিচিত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ হ'লে ভবিষ্যতে এমন কোন উপায় আবিষ্কার হবে যাতে কোনও অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করার পরে মানুষের একটুও বেদনা অনুভব হবে না।

প্রফেসর জে, বি, এস, হ্যালডেন হলেন এক জন পৃথিবী-বিখ্যাত বায়োকেমিষ্ট। সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য তিনি যে ভাবে আত্মনির্য্যাতন করেছিলেন, তা রীতিমতই বিস্ময়কর। তোমরা সকলেই হয় তো জানো যে, হাইড্রোক্লোরাইট এ্যাসিড এত ভীষণ তীব্র যে, এর ব্যবহারে দাঁতও একেবারে গলে যেতে পারে। প্রফেসর হ্যালডেনের এক দিন ইচ্ছা হোল যে, মানুষের দেহের উপর এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে দেখবার জন্য। কিন্তু কেউই তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে চাইলো না। অগত্যা তিনি তখন নিজেরই শরীরের উপরে এই এসিড প্রয়োগ করলেন। এই পরীক্ষা চালাবার সময়ে তিনি এত বেশী মাত্রায় এই তীব্র এ্যাসিড গ্রহণ করলেন যে, তাঁর তখনকার শরীরকে একটি চলন্ত রাসায়নিক কারখানা বলা চলত। এই জ্ঞান-পাগল হ্যালডেন সাহেব একবার একটি কাঁচের ঘরে কিছুক্ষণ ধরে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। কিছু কাল পরে কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইড বা অঙ্গার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে করতে তাঁর শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হোল। সেই সময়ে তাঁরই নির্দ্দেশে তাঁর সহযোগীরা তাঁর তখনকার দেহের অবস্থা লক্ষ্য করতে লাগলেন।

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ন্যাথানিয়াল ক্লাইটম্যান, রিচার্ডসন নামে এক জন ছাত্রকে নিয়ে কেণ্টাকির Mammoth cavesএ ভূপৃষ্ঠ থেকে একশো ফুট নীচে ৩২ দিন বাস করে আবার সুস্থদেহে দিব্যি খোস-মেজাজে উপরে উঠে এসেছিলেন। পৃথিবীর উপরে ২৪ ঘণ্টায় আমাদের এক দিন হয় এবং এই ২৪ ঘণ্টার মাপকাঠি আমাদের দেহে ও মনে এমনি প্রভাব বিস্তার করেছে যে, এর অন্যথা করতে গেলে আমাদের জীবনে একটা বিপর্য্যয় দেখা দেয়। এই ২৪ ঘণ্টায় এক দিনকে ২৮ ঘণ্টায় এক দিন করা যায় কি না, তারই পরীক্ষার জন্য তাঁরা সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের হাত এড়িয়ে একশো ফুট নীচে নেমে আমাদের ঘড়ির হিসাবে ৩২টি দিন ও রাত কাটিয়ে এসেছিলেন। স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণে দেহের উপরে কোন ক্ষতি হয় কি না তাই দেখা এঁদের উদ্দেশ্য ছিল।

এই দুই জনে বৈজ্ঞানিক ২৮ ঘণ্টায় এক দিন ও ছয় দিনে এক সপ্তাহ বলে ধরতেন। এঁরা রোজ নয় ঘণ্টা ঘুমোতেন, বাকি সময় খাওয়া-দাওয়া, পড়া-শুনা ইত্যাদি অন্য কাজে কেটে যেত। মিঃ রিচার্ডসন দুদিনেই নতুন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিলেন। তিনি ঠিক মতো খাওয়া-দাওয়া-ঘুম করতে লাগলেন এবং তাঁর দেহের উত্তাপও এই নতুন অবস্থা অনুযায়ী স্বাভাবিক হয়ে উঠল। কিন্তু মিঃ ক্লাইটম্যানের হোলো মুস্কিল। তিনি যখন জাগবার সময় তখন ঘুমিয়ে পড়তেন আর ঘুমোবার সময়ে তাঁর চোখে একটুও ঘুম আসত না। পিপাসা পেতো খুব। কয়েক দিন এই ভাবে দৈহিক ও মানসিক উদ্বেগের মধ্যে কাটিয়ে অবশেষে মিঃ ক্লাইটম্যান নতুন জগতের নতুন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁদের এই ২৮ ঘণ্টার দিনরাতের জগতে তাঁরা চাঁদ বা সূর্য্যের মুখ কোন দিন দেখতে পাননি।

এই সকল দুঃসাহসীরাই চিরকাল যুগের আলো বহন করে এনেছেন অন্ধকার পৃথিবীতে।

তারাশঙ্করের 'দুর্গা'

জিতেন্দ্রকুমার নাগ

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসন্ন গোয়ালিনী, শরৎচন্দ্রের চন্দ্রমুখী, বিজলী*, শিবানী, সাবিত্রী পড়িতে পড়িতে রহস্যময়ী নারীচরিত্রের ঃ পূর্ব অঙ্কনে আমাদের বিস্ময় লাগ্‌ত কিন্তু তাহারও অপেক্ষা অধিক বিস্ময় লাগ্‌ল আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অগ্রণী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চণ্ডীমণ্ডপ উপন্যাসের বাউরিণী দুর্গা-চরিত্রে। নীচজাতীয়া স্বৈরিণী দুর্গার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখ্‌তে পাব যে আর কিছু না হোক—সে মিষ্টিক নারী একটি। তাহার ধমনীতে উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃতিসম্পন্ন অভিজাতবংশের রক্ত বিদ্যমান, তাই বাউরিণীর ঘরে জন্ম নিয়েও তার আভিজাত্যের গর্বের মত গর্ব ছিল। নিম্নতম সমাজের মেয়েদের বা ছেলেদের সঙ্গে অল্প-বিস্তর বিবাহ এক সময় চল্‌তি ছিল, যার পরিচয় পাই অনুলোম-প্রতিলোম বিবাহ বিধানের বা দাসীপুত্রের উল্লেখ প্রভৃতিতে। বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজ সেটা পছন্দ করেন না বলে, উচ্চজাতীয় ধনী অভিজাত-বংশের ছেলেরা এই সব নিম্নতন সমাজের স্ত্রীলোকদের গোপনে ভোগ করে থাকে মাত্র, যার ফলে তাদের ছেলে-মেয়েরা নিম্ন সমাজেই থেকে যায়। সাধারণ কুশ্রী চেহারার মাঝে মধ্যে মধ্যে সুশ্রী চেহারা এই জন্যেই চোখে পড়ে। তাই লেখক লিখছেন—'বাউরি মেয়েদের ধনিসম্প্রদায় ভোগ করিয়া থাকে তাহা লুক্কায়িত কথা নহে। বাউরি স্ত্রীলোকদের মধ্যে সুশ্রী ও সুগঠিত অবয়ব প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়'।। তারাশঙ্কর বাবু তাঁহার সোনার পদ্ম বা দ্বীপান্তরে পদ্ম-চরিত্রকেও ঠিক এই ঘটনাপ্রসূত ভাবেই গড়েছেন। গণদেবতার ৬৮ পৃষ্ঠাতে পাই—'দুর্গা মেয়েটি বেশ সুশ্রী মেয়ে। তাহার দেহ-বর্ণ পর্যন্ত গৌর, যাহা তাহাদের স্বজাতির পক্ষে দুর্লভ এবং আকস্মিক। ইহার উপর দুর্গার রূপের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহা মানুষের মনকে মুগ্ধ করে—আকর্ষণ করে।······ দুর্গার রূপের আকস্মিকতা পাতুর মায়ের সেই স্বভাবের জীবন্ত প্রমাণ।'

স্বল্পবুদ্ধি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন আদিম অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য লোকসমাজে সন্তান-সন্ততি ধারণ সম্পর্কিত ফিজিওলজিক্যাল কারণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা দেখা যায়। সেজন্য এ সম্বন্ধে ওদের কোন কঠোর বিধান নাই। তারাশঙ্করও বলেছেন, 'এ স্বভাব দমনের জন্য কোন কঠোর শাস্তি বা পরিবর্ত্তনের জন্য কোন আদর্শের সংস্কার ইহাদের সমাজে নাই। অল্প-স্বল্প উচ্ছৃঙ্খলতা স্বামীরা পর্যন্ত দেখিয়াও দেখে না; বিশেষ করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত যদি উচ্চবর্ণের স্বচ্ছল অবস্থার পুরুষ জড়িত থাকে।'

'দুর্গা কিন্তু প্রথমে স্বৈরিণী হয় নাই, তাহার বিবাহ হইয়াছিল। শাশুড়ী এক বাবুর বাড়ীতে ঝাড়ুদারণীর কাজ করিত। এক দিন শাশুড়ীর অসুখ করিয়াছিল—দুর্গা গিয়াছিল শাশুড়ীর কাজে। বাবুর বাড়ীর চাকর কৌশলে ঝাঁট দিবার ছুতায় একটি নির্জন ঘরে ঢুকাইয়া দিল। ঘরে ছিল বাবু। বাহির হইতে দরজা বন্ধ।······বাড়ী ফিরিল···কাপড়ের খুঁটে পাঁচ টাকার নোট। আতঙ্কে, ভয়ে ও অর্থপ্রাপ্তির আনন্দে দুর্গা সেই দিনই মায়ের কাছে পলাইয়া আসে। লোকে দায়ী করে মাকে—মা তাহাকে এই অসৎ পথে চালিত করে নিজের ভরণ-পোষণের জন্য।'

'মার স্বভাবকেও কিন্তু দুর্গা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। সে স্বেচ্ছাচারিণী, স্বৈরিণী, কোন সীমাকেই তাহার অতিক্রম করিতে দ্বিধা নাই। নিশীথ রাত্রে কঙ্কণার জমিদারদের প্রমোদ-ভবনে যায়, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে সে জানে; লোক বলে দারোগা হাকিম পর্যন্ত তাহার অপরিচিত নহে।······উচ্চজাতীয় লোকেরা যে দুর্গার সংস্পর্শে আসিবার জন্য এত ব্যগ্র সেটা দুর্গার একটা মস্ত অহঙ্কার। সে এত বেপরোয়া যে এই সমস্ত কলঙ্ক সে গোপন করে না, বাউরিণীদের নিকট সে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে।'

কিন্তু এ হেন দুর্গার সবচেয়ে বড় সার্টিফিকেট দিয়াছিল বিলু—নায়ক দেবু ঘোষের স্ত্রী। ৩২২ পৃষ্ঠায় দেখি—'দুর্গা বিচিত্র, দুর্গা অদ্ভুত, দুর্গা অতুলনীয়া। বিলু সমস্ত শুনিয়া দুর্গার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া দুর্গার কথাই তাহার স্বামীকে বলিয়া যাইতেছিল।'—বিলু বলছে—'গল্পের সেই লক্ষহীরে বেশ্যার মত—দেখো তুমি, আসচে জন্মে ওর ভাল ঘরে জন্ম হবে, যাকে কামনা করে মরবে সেই ওর স্বামী হবে।'

দুর্গা এখানে সুখ্যাতি পেয়েছে তাহার গোয়েন্দাগিরি করে গ্রামের গণ-আন্দোলনের নেতা হিতৈষী পণ্ডিত দেবু ঘোষকে, নজরবন্দী যতীনকে ও জগন ডাক্তার প্রভৃতিকে বাঁচাবার জন্য। সে-ও যে কতটা গ্রামকে ভালবাসত, তারও রক্তে যে দেশপ্রেম কতটা ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায় এখানে।

অনিরুদ্ধের বাড়ীর সম্মুখে বসেছে প্রজা-সমিতির বৈঠক—রাত্রে। ওদিকে শ্রীহরি সে খবরটা গোপনে পাঠিয়েছে জমাদারকে। গ্রামের প্রান্তে বাউরি বায়েনদের পল্লী, সেখান থেকে দুর্গা দেখ্‌লে লণ্ঠন হাতে আসছে ভূপাল থানাদার, জমাদার আর সেপাই। দুর্গা তার প্রিয়জন দেবু, যতীন প্রভৃতির অমঙ্গল আশঙ্কা করে তাদের অনুসরণ করল।

শ্রীহরির বাড়ীর গোপনতম পথের সন্ধান তাহার সুবিদিত, কত রাত্রে সে আসিয়াছে। হাতের চুড়িগুলি উপরে তুলিয়া নিঃশব্দে আসিয়া সে শ্রীহরির ঘরের পিছনে দাঁড়াইল।

জমাদার বলিতেছিল—নির্ঘাৎ দু'বছর ঠুকে দোব।

শ্রীহরি বলিল—চলুন তা হলে জোব কমিটি বসেছে···উঠুন তা হলে।

* আঁধারে আলো।

। গণদেবতা (চণ্ডীমণ্ডপ) ২য় সংস্করণ।

জমাদার—চা নিয়ে এস, চা খাওয়া হয়নি।

শ্রীহরিই খবর পাঠাইয়াছিল।

শুনে দুর্গা শিহরে উঠ্‌ল, সে নিঃশব্দে দ্রুতপদে পথের উপর এসে চুড়ি বাজিয়ে ঝঙ্কার তুলে চল্‌তে আরম্ভ করল। শব্দ শুনে ডাক আসিল—'কে যায়?'

দুর্গা ঘরে এসে বল্‌লে—'আঃ মরণ···'

ইচ্ছা করে বাজে কথাবার্ত্তা করে উহাদের দেরী করে দিল এবং আরও যাতে দেরী হয় তার জন্য লোভের ইঙ্গিত করে বল্‌লে, 'ঘাট থেকে আসি জমাদার বাবু।'

মিথ্যা কথা বলে পাহাড়ী পল্লী মেয়ে বাউরিণী দুর্গা বনজঙ্গলপূর্ণ শর্ট-কাট পথ দিয়ে গিয়ে খবরটা তাড়াতাড়ি অনিরুদ্ধের বাড়ী পৌছে দিয়ে এল···কি দুঃসাহসে তাই দেখি।

'শ্রীহরির খিড়কির পুকুরের পাড় বন-জঙ্গলে ভরা। বাঁশের ঝাড়, তেঁতুল, শিরীষ প্রভৃতি গাছ এমন ভাবে জন্মিয়াছে যে দিনেও কখনও রৌদ্র প্রবেশ করে না। নীচেটায় জন্মিয়াছে ঘন কাঁটা বন। চারি দিকে উই-ঢিবি। ওই উই-ঢিবিগুলির ভিতর না কি বড় বড় সাপ বাসা বাঁধিয়াছে। শ্রীহরির পুকুর সাপের জন্য বিখ্যাত। বিশেষ চন্দ্রবোড়া সাপের জন্য। সন্ধ্যার পর হইতেই চন্দ্রবোড়ার শীষ শোনা যায়। দুর্গা প্রবেশ করিল ওই জঙ্গলে নিশাচরীর মত নির্ভয় পদক্ষেপে, দ্রুতগতিতে সে জঙ্গলটা অতিক্রম করিয়া আসিয়া নামিল এ পাশের পথে। অনিরুদ্ধের বাড়ী কাছেই। ছুটিয়া গিয়া ছায়া-ছবির মত অনিরুদ্ধের খিড়কীর দরজায় প্রবেশ করিল। পদ্মকে দিয়া অনিরুদ্ধকে ডাকাইয়া সংক্ষেপে সংবাদটা দিয়াই দুর্গা চকিতে বিলীয়মান রহস্যের মত মিলাইয়া গেল। আবার পুকুর-পাড়ের জঙ্গলে ঢুকিয়া শর্ট-কাট করিয়া শ্রীহরির বাড়ীর নিকট আসিল। কিন্তু সর্পদংশনের আঘাতের ছল করিবার জন্য বেলকুঁড়ি দিয়া পায়ের এক জায়গায় ক্ষত করিল। ভাবিল ইহাতে ত কিছু দেরী হইতে পারে উহাদের পৌছাইতে।

জমাদার জিজ্ঞাসা করিল—হাঁপাচ্ছিস্ কেন?

আতঙ্কের অভিনয়ে দুর্গা বলিল—সাপ!

জমাদার—কোথায়?

দুর্গা—খিড়কীর ঘাটে, প্রকাণ্ড বড় চন্দ্রবোড়া—দেখুন জমাদার বাবু, বলিয়া ডান পাখানি আলোর সম্মুখে ধরিল। ক্ষতস্থান হইতে কাঁচা রক্তের ধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল।'

দুর্গা নিজের রক্ত দেখে ভয়ও পেয়েছিল তাহার উপর অভিনয় করিতেছিল সে, বিবর্ণ মুখে করুণ দৃষ্টিতে জমাদারের দিকে চেয়ে বল্‌লে···

···চোখে তার জল। সে জল বাহিরে অভিনয় করলেও—সাফল্যের আনন্দ হেতু। এ অশ্রু, তার পূরা অভিনয়ের নয়—সাফল্যের আনন্দ, ভয় এবং অন্তরস্থিত কোন প্রিয়জনের প্রতি প্রেমানুরাগের সুখ-মিশ্রিত অশ্রু। এইখানেই দুর্গার চরিত্রের ক্লাইম্যাক্স ফুটিয়ে তুলেছেন ঔপন্যাসিক—ইংরেজীতে বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয় 'ইউনিক'। ইটালীর নোবেল-প্রাপ্ত ঔপন্যাসিক লুইগি পিরাণ্ডেলোর 'অ্যাজ ইউ ডিজায়ার মি'তে এইরূপ ধরণের ভাব যেন পড়েছি মনে হয়।

২

স্বৈরিণী দুর্গা পুরুষকে জয় করবার আনন্দে ঘুরে বেড়াত—সকলেই যে তার কাছে কামনার আগুন নিবাতে আসত—শ্রীহরি, অনিরুদ্ধ, জমাদার প্রভৃতি, কিন্তু একজন বাদ, দেবু ঘোষ—যার চরিত্র-দোষ ছিল না। কিন্তু চরিত্রহীনা দুর্গা চরিত্রবান দেবুকেই ভালবেসে ফেল্‌ল। দেবুর ধরা সে পায়নি, নিজেকেই বার বার ধরা দিতে গেছে। ওর রক্তে ছিল অভিজাত-বংশের উচ্চ রক্ত তাই দেবুকে সে যেমন appreciate করেছিল দেবুর মহত্ব, গণদেবতাপ্রীতি, স্বাদেশিকতা প্রভৃতি সে যেমন উপলব্ধি করেছিল—ওদের জাতে সেরূপ আর কেউ করতে পেরেছিল কি? গ্রামের মেয়েদের মধ্যে এক রাঙাদি' ভিন্ন আর কেই বা তা বুঝেছিল। ছোট জাতের মধ্যে জন্ম নিলেও দুর্গা দেবুর মতই স্বামী অন্তরে কামনা করেছিল। বিবাহ আবার সে ওদের সমাজে করতে পারত অসৎ অভ্যাস ছেড়ে দিয়ে—যা সে শেষ পর্যন্ত করেছে দেবুর মতই পরশ-কাঠির ছোঁয়াচ পেয়ে। কিন্তু করেনি, কারণ দেবুর মত পুরুষকে দেখে অন্য পুরুষের প্রতি তার আসক্তি আসেনি। দেবুর প্রতি দুর্গার ভালবাসার কয়েকটি ঘটনা দেখি—

১১০ পৃষ্ঠায়—"দেবু চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ভাবিতেছিল। পথ হইতে কে ডাকিল—পণ্ডিত মশায় গো!

—কি?

—ওরে বাস্ রে! বসে বসে এত কি ভাবছ গো? মুচিদের দুর্গা দুধ বেচিতে যাইতেছিল, পথ হইতে দেবুকে ডাকিয়া সেই কথা বলিল। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেবু বলিল—'সে খবরে তোর দরকার কি?' মেয়েটাকে সে দু'চক্ষে দেখিতে পারে না···।

দুর্গা হাসিয়া বলিল 'খবরে আমার দরকার নাই, দরকার তোমার বউএর—ডাকছে বিলু দিদি···।'

দেবু চলিয়া গেলে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল—দেবুর পথ-পানে চাহিয়া। পণ্ডিতকে তাহার ভাল লাগে—খুব ভাল লাগে—বরাবরই লাগে কিন্তু আজ যেন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বেশী লাগিল।"

যেচে যেচে দুর্গার কথা কওয়া ওমনই আরেক দিন—পৃ-১১৫

"দেবু পাঠশালাতে ইতুর ছুটী দিয়া বাড়ী আসিল—দেখিল তাহার স্ত্রী বিলু ইতুলক্ষ্মীর ব্রতকথা বলিতেছে—আর বসিয়া আছে পদ্ম, অনিরুদ্ধের স্ত্রী এবং দুর্গা অদূরে।

দেবু বলিল—কি রে দুর্গা?

দুর্গা হাসিয়া বলিল—কথা শুনতে এসেছি দিদির কাছে। এমন কথা কেউ বলতে পারে না, বাবু। হাজার হোক পণ্ডিত-গিন্নি তো!

ভ্রূ কুচ্‌কাইয়া দেবু বলিল—দিদি?

—হ্যাঁ গো। দিদি! তোমার গিন্নির সঙ্গে দিদি পাতিয়েছি, তুমি জামাই বাবু।

দেবু বলিল—অনিরুদ্ধের বউকে জল খাইয়ে ছেড়ো—

আর আমি? দুর্গা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—ওঃ আমি বুঝি বাদ যাব? বেশ জামাইদাদা যা হোক।'

স্বৈরিণী মেয়েটার কথা বলার ভঙ্গী, আত্মীয়তার সুর এত মিষ্ট যে কিছুতেই রাগ করা যায় না। সকলেই হাসিল।

দুর্গা—টাকার চেয়ে টাকার সুদ মিষ্টি গো, দিদির চেয়ে দিদির বরের আদর মিষ্টি। তা আমার কপাল।

দেবু হাসিয়া বলিল—নে—আর ফাজলামি করতে হবে না।"

দুর্গার স্বভাবই এই—গায়ে-পড়া তার অভ্যাস কিন্তু দেবুর ক্ষেত্রে যে সে নিজে শেষে মজে যাবে এ বোধ হয় ও নিজেও বুঝতে পারিনি।

দেবু ঘোষকে পুলিশের লোক ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল—তার মুক্তির জন্য দুর্গা গিয়াছিল নৈশ অভিসারে কঙ্কণায় সেট্‌লমেণ্ট ক্যাম্পে। আমিন, পিওন, এমন কি কানুনগোদের মধ্যেও দুই-এক জন স্থানীয় দুর্গা-শ্রেণীর নারীদের উপর অনুগ্রহ করিয়া থাকে। পেশকারটি এ বিষয়ে সেরা—দুর্গার কাছে কয় দিন আহ্বান পাঠাইয়াছিল দুর্গা যায় নাই। আজ সে গিয়াছিল নিজে। বলিয়াছিল—পণ্ডিতকে কিন্তু হাকিমকে বলে ছাড়িয়ে দিতে হবে।

৩১১ পৃষ্ঠায় যেখানে দেবু ঘোষ তাহার গৃহিণীর নিকট একমাত্র ছেলের বালা-জোড়াটি বাঁধা দিয়ে টাকা ধার করে বাউরিদের গরুগুলি ছাড়িয়ে আনল এবং যার জন্য গ্রামে সুখ্যাতির অন্ত ছিল না। সে সময় দুর্গার মনের অনুভূতির বর্ণনাটি ভারী সুন্দর হয়েছে—

"তাহাদের পাড়ায় আজ ঘরে ঘরে পণ্ডিতের কথা—দুর্গার মা পর্যন্ত মুক্তকণ্ঠে আশীর্বাদ করিতেছে। সোনার মানুষ···।

কোঠার উপরে আপনার ঘরে বিছানায় বালিশে বুক রাখিয়া জানালার বাহিরের দিকে চাহিয়া দুর্গাও ওই কথা ভাবিতেছিল—সোনার মানুষ! পণ্ডিত সোনার মানুষ! বিলু দিদি তাহার ভাগ্যবতী। তাহার ইচ্ছা হইল একবার মজলিসে যায়, দশের মধ্যে পণ্ডিত উঁচু মাথা করিয়া বসিয়া আছে, সেই দৃশ্যটি আড়ালে থাকিয়া দেখিয়া আসে।"

নজরবন্দী যতীনকে তার যুবা বয়সের জন্য দুর্গার হয়ত ভাল লাগে, কামনাও জাগে মনে কিন্তু দেবু ঘোষের প্রতি তার শ্রদ্ধা যেন বেড়ে চলেছে। তাকে প্রেমের আসনে কি করে বসায়, সে যে ধরা দেয় না, তার ওপর তার মতন কলঙ্কবতীর পক্ষে দেবুর মতন নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের লোককে কামনা করা বৃথা। তবে কি না—love is blind—প্রেম, সে যে অন্ধ। দুর্গার মন যে বশ মানে না—পাপী হলেও সে পাপকে ঘৃণা করে এবং পুণ্যকে শ্রদ্ধা করে।

দেবুর সঙ্গে কথা কইবার জন্য দুর্গা আগ্রহান্বিত। মন বলিল, জামাই-পণ্ডিতের সঙ্গে দুটো কথা কয়ে এলে কেমন হয়। রসিকতা করবার জন্য সে পাগল হয়ে উঠল যেটুকু ভাবে তাকে পাওয়া যায়।

পণ্ডিতকে ও কি বলিবে? সে যে বড় গম্ভীর লোক—কেন, ও বলিবে—জামাই-পণ্ডিত—তুমি ভাই আবার পাঠশালা খোল।

যদি বলে—কে পড়বে?

ও বলবে—কেউ না পড়ে, আমি পড়ব। লেখাপড়া শিখব আমি।

দেবু যতীন প্রভৃতিকে মিটিংএ পুলিশের হাতে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা হতে রক্ষা করে দুর্গা নিজকৃত ক্ষত পা নিয়ে রাত্রে নিজের বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগল (পৃ ৩২০)

কিন্তু নজরবন্দী; জামাই-পণ্ডিত—একবার তাহাকে দেখিতে আসিল না?

কেহই সত্য কথা জানে না (দুর্গা মাথার খোঁপার একটা বেলকুঁড়ির কাঁটা খুলিয়া আলোর সম্মুখে তাহার অগ্রভাগ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল।

পাতুর বউ বলিল—সাপ তুমি দেখেছ ঠাকুরঝি? কি সাপ?

দুর্গা বলিল—কাল সাপ······(কর্মকারের বাড়ী হইতে ফিরিবার পথে সে বেলকুঁড়ির কাঁটা ফুটাইয়া রক্তমুখী দংশনচিহ্ন সৃষ্টি করিয়াছিল। নইলে কি সকলে পলাইবার অবকাশ পাইত, না, জমাদার তাহাকেই নিষ্কৃতি দিত?)

নজরবন্দীর, না হয় রাত্রে বাহির হবার হুকুম নাই। কিন্তু জামাই-পণ্ডিত? জামাই একবার আসিল না?

অভিমানে তাহার চোখে জল আসিল···দুর্গা বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

ঠিক ওই সময় নীচে দেবুর সাড়া পাওয়া গেল।

দুর্গার চরিত্রটি এমন বাস্তব ও স্বাভাবিকরূপে এঁকেছেন লেখক যে তার প্রশংসা না করে থাকা যায় না। দোষে-গুণে ভরা পাড়াগাঁয়ে নীচজাতীয়া স্ত্রীলোক—স্বল্প বয়সের জন্য চঞ্চল এবং বিপথগামিনী বলে প্রগল্‌ভা। সে কলহ করে কিন্তু তার অন্তরে দরদের অভাব নাই। গ্রামের গণ-নায়কদের সে যে কত ভালবাসত তার পরিচয় পাওয়া যায় ৩৫৬ পৃষ্ঠায়—

"ভোঁ শব্দে উচ্চিংড়ে দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল—'দারোগা এসেছে'। জগন ডাক্তার, নজরবন্দী যতীন, দেবু ঘোষ, অনিরুদ্ধের বাড়ীতে যতীনের ঘরে বসিয়া মিটিং করিতেছিল।

জগন শঙ্কিত হইয়া উঠিল, বলিল, যতীন বাবু, বেটা নিশ্চয় আমাদের সব এজাহার দেবে সন্দেহে। পুলিশও হয়ত চালান দেবে। জামিনের ব্যবস্থা আপনাকেই কিন্তু···। কংগ্রেসের সেক্রেটারীকে চিঠি লিখুন।

দুর্গা আসিয়া দাঁড়াইল—জামাই-পণ্ডিত!

—দুর্গা?

—কেন রে?

—পুলিশ এসেছে ঘর দেখবে।

* * * *

পথে যাইতে যাইতে বলিল—জামাই-পণ্ডিত!

—কি রে?

—ঘরে কিছু থাকে ত আমায় দেবে? আমি ঠিক পেট-আঁচলে নিয়ে বাহিরে চলে যাব।

দারোগা পণ্ডিতকে বলিল—আপনার ঘর সার্চ করব। দুর্গা তুই ভেতরে যাসনে।

দুর্গা বলিল—ওরে বাবা, আমার ঘরে যে ঘটি রয়েছে দারোগা বাবু। আমাকে নিয়ে পড়লেন কেনে?

হাসিয়া দারোগা বলিল—'তুই ভারী বজ্জাৎ, ঘটি চৌকিদার এনে দেবে।"

এই স্থানেও বোঝা যায় দুর্গা দেবুকে কতটা ভালবাসত। পাছে সে আবার বিপদে পড়ে, সেজন্য সে নিজের দুষ্টামি স্বভাবের আশ্রয় নিয়েও তাকে রক্ষা করছিল। স্বৈরিণীর প্রেম এই রকমই বোধ হয়। ছায়ার মত দেবুর সাথে সাথে ফিরে তাকে সে বিপদ হতে রক্ষা করবার জন্য চেষ্টা করত, কত ব্যাকুল হত। হাজার হোক নারী ত সে, এর চেয়ে আর বেশী কি করবে। গেস্তাপো নারী—কুলটা, সে।

যতীনের যাইবার দিন।

যতীন দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইল।

সকলেই আসিল, জগন, সতীশ, দেবু ত নিশ্চয়ই। কিন্তু—আশ্চর্য! দুর্গা আসে নাই।

গ্রাম পার হইয়া তাহারা মাঠে আসিয়া পড়িল।

ফিরুন এবার আপনারা।

দেবু বলিল—চলুন, আমি বাঁধ পর্যন্ত যাব।

* * * *

পথে নির্জন একটি মাঠের পুকুর-পাড়ে গাছতলায় দাঁড়াইয়াছিল দুর্গা। তাহাকে কেহ দেখিল না। কিন্তু সে তাহার দিকে চাহিয়া যেমন দাঁড়াইয়াছিল দাঁড়াইয়া রহিল।

৩

গণদেবতার দ্বিতীয় খণ্ডে অর্থাৎ পঞ্চগ্রামে আগাগোড়া দেখি দুর্গা তেমনি ছায়ার মত দেবুর পিছু পিছু ঘুরে বেড়ায়।

একখানা গ্রাম থেকে পাঁচখানা গ্রামের গণদেবতার গল্প করতে গিয়ে ত তারাশঙ্কর দুর্গাকে ভুলিতে পারেননি। তাঁর মানস-কন্যা নীচজাতীয়া কলঙ্কবতী দুর্গা কেমন সহজ ভাবে গ্রামের সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শ্রীহরির পঞ্চায়েতও কিছু সুবিধা করতে পারল না।

পঞ্চগ্রাম—মহাগ্রাম, শিবকালীপুর, দেখুড়িয়া, কুসুমপুর ও কঙ্কণা—সর্বত্রই দেবুর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে; কারণ তার কার্যক্ষেত্র এক্ষণে সামান্য শিবকালীপুরেই নিবদ্ধ নহে—পাঁচখানা গাঁয়েই। যারা দেবুকে চিনেছিল তারা তার চরিত্রের উপর দোষারোপ করেনি এবং বাউরিণী দুর্গার স্বভাব তারা জানত বলেই তার জন্য তাকে ঘৃণা কখন করেনি। দুর্গার মন ছিল উঁচু, জন্ম ছিল নীচঘরে এবং উচ্চঘরে জন্ম নিয়েও মন যাদের নীচু তাদের কাছে দুর্গা-চরিত্র ম্লান নয়।

দেবুর বাড়ীতে হরেন দেবুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল—দুর্গাও ছিল এবং তারা নাপিত ও গিরীশ ছুতার প্রভৃতি। (পৃ-৫১—পঞ্চগ্রাম)

রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া দুর্গা দেবুর খাবার তৈরী করাইতেছিল। (পৃ-৫২) "পাতু বলিল—আমি এই বেরিয়েছিলাম লণ্ঠন নিয়ে। দুর্গা ভাইকে পাঠাইয়াও ছিল দেবুর সন্ধানে।

দুর্গা বলিল—রাত হল দেখে কামার-বৌকে দিয়ে রুটি করিয়ে রেখেছি। মুখ-হাতে জল দাও, নিয়ে—চল খেয়ে আসবে। আজ আর রান্না করতে হবে না জামাই-পণ্ডিত।"

দেবুর প্রতি দুর্গার অনুরাগের কথা কিছু গোপন নয়। (পৃ-১৪১) সে মুখে বলে না, কিন্তু কাজে কর্ম্মে ব্যবহারে তাহার অনুরাগ প্রকাশে এতটুকু সঙ্কোচ—দ্বিধা নাই···

শ্রীহরি দেবুকে জব্দ করিবার জন্য দেবুর নামে দুর্গাকে জড়াইয়া কুৎসা রটাইয়াছিল এবং তাহাদের বিরুদ্ধে পঞ্চায়েৎও বসাইয়াছিল। তাহার প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ দেবু দুর্গাকে তাহার বাড়ীতে থাকিতে অনুরোধ করিতেছিল।

দেবু বলিল···তা ছাড়া তুই আমাকে মায়া-ছেদ্দা করিস্ সে ত কারুর মা-বোনের চেয়ে কম নয়। তোর হাতে আমি জল খাব। জাত আমি আর মানি না। পঞ্চায়েতের কাছে খুলেই বলব।

—না। সে আমি পারব না জামাই-পণ্ডিত। আমার হাতের জল—কঙ্কণার বামুন কায়েৎ বাবুরা লুকিয়ে খায়, মদের সঙ্গে জল মিশিয়ে দিই, মুখে গ্লাস তুলে ধরি—তারা দিব্যি খায়। সে আমি দি—কিন্তু তোমাকে দিতে পারব না।···দুর্গার চোখে জল আসিয়াছিল—গোপন করিবার জন্যই অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায় সহিত সে ঘুরিয়া দরজার চাবি খুলিতে আরম্ভ করিল (পৃ-২৪৮)। গ্রামে বান আসিতেছে। রঙ্গিণী দুর্গা (পৃ-২৭০) বুকে বালিশ দিয়া উপুড় হইয়া জানালা দিয়া বান দেখিতেছে। শুধু বান দেখা নয়, গানও গাহিতেছে—

কলঙ্কিনী রাইএর তরে কানাই আজ লুটায় ধুলাতে।
ছিদ্র কুম্ভে আনবে বারি কলঙ্কিনীর কলঙ্ক ভুলাতে।

দুর্গার মা বার বার ডাকিয়াছে—দুগ্‌গা বান আসছে। ঘর-দুয়োর সামলিয়ে নে···

* * * *

হঠাৎ তাহার কানে আসিয়া পৌছিল—মাঠ হইতে প্রত্যাগত লোকগুলির কোলাহল। সে বুঝিল পণ্ডিতের ব্যর্থ উত্তেজনায় লোকগুলি অনর্থক বানের সঙ্গে লড়াই করিয়া হার মানিয়া বাড়ী ফিরিল। সে একটু হাসিল। পণ্ডিতের যেমন খাইয়া-দাইয়া কাজ নাই, এই বান আটক দিতে গিয়াছিল!···দুর্গার মা নীচে হইতে চেঁচাইয়া উঠিল—দুগ্‌গা দুগ্‌গা!···ওলো জামাই-পণ্ডিত ভেসে যেয়েছে লো।

দুর্গা এবার ছুটিয়া নামিয়া আসিল—কি? কে ভেসে যেয়েছে?—জামাই-পণ্ডিত। বানের তোড়ের মুখে পড়ে—

দুর্গা বাহির হইয়া গেল। কিন্তু পথে জল থৈ-থৈ করিতেছে··· দিনের আলো পড়িয়াছে। দুর্গা জল ভাঙ্গিয়া চলিতেছে—বাউরি-পাড়া ভদ্রপাড়া পার হইয়া গেল—জল হাঁটু ছাড়িয়া উপরে উঠিয়াছে (পৃ-২৭৫) মাঠে সাঁতার জল।···জামাই-পণ্ডিত তবে কি ভাসিয়া গেল?···চোখ ফাটিয়া তাহার জল আসিল। তাহার জামাই পণ্ডিত—পাঁচখানা গ্রাম যাহার নাম লইয়া ধন্য ধন্য করিয়াছিল, পরের জন্য নিজে যে সোনার সংসার ছারখার হইতে দিল, গরীব-দুঃখীর আপনার জন···কেহ খবর আনিল না। দুর্গা গ্রামের পূর্ব মাথায় আসিয়া দাঁড়াইল। নির্জনে সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া সারা হইয়া গেল, বার বার মনে মনে গাল দিতে লাগিল কামার-বউকে।

কুসুমপুরের রহম সেখের সহিত দেখা হল। সে-ও দেবুর খবর নিতে এসেছে।

—আরে দেবু বাপের খবর কিছু পালি দুগ্‌গা···সেখের কণ্ঠস্বরে গভীর উদ্বেগ।

রহমের প্রশ্নে দুর্গার চোখ দিয়া দর-দর ধারে জল বহিয়া গেল। এতক্ষণে একটা লোক তাহার জামাই পণ্ডিতের খবর করিল। না—কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই।

রহম মাঠের জলে নামিয়া পড়িল। দুর্গা বলিল—দাঁড়ান সেখজী, আমিও যাব।

রহম বলিল—আয়। পানি সাঁতাব! এতটা সাঁতার দিতে পারবি ত?

* * * *

দুর্গা প্রশ্ন করিল—কোথায়? ইরসাদ মিয়ে—কোথা জামাই-পণ্ডিত?

—দেখুড়েতে। দেখুড়ের ধারে গিয়ে রাম ভল্লা টেনে তুলেছে।

—বাঁচবে তো?

—জগন ডাক্তার রয়েছে। ছিদেম জগন ডাক্তারের বাক্স নিয়ে যাবে।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। জগন ডাক্তারের ওষুধের বাক্স লইয়া জোয়ান ছিদাম ভল্লা চলিয়াছে, পিছনে পিছনে দুর্গা। সে অহরহ মনে মনে বলিতেছে—বাঁচাও, মা, বাঁচিয়ে দাও। মা কালী, তুমিই মালিক! জামাই-পণ্ডিতকে বাঁচিয়ে দাও। এবার পূজায় আমি ডাইনে-বাঁয়ে জোড়া পাঁঠা দোব মা!

বার বার তাহার চোখে জল আসিতেছিল। মনকে সে প্রবোধ দিতেছিল—আশায় সে বুক বাঁধিতে চাহিতেছিল—জামাই-পণ্ডিত নিশ্চয় বাঁচিবে! এতগুলি লোক—গোটা গ্রামশুদ্ধ লোক তাহার জন্য দেবতার পায়ে মাথা কুটিতেছে, তাহার কি অনিষ্ট হয়?……

*　　*　　*　　*

মানুষের কদর্যপণার সঙ্গেই দুর্গার জীবনের পরিচয় ঘনিষ্ঠ। মানুষকে সে ভাল বলিয়া কখনও মনে করে নাই। আজ তাহার মনে মনে হইল—মানুষ ভাল—মানুষ ভাল।

জামাই-পণ্ডিতকে তাহারা ভুলিয়া যায় নাই। তাহার জামাই পণ্ডিত বাঁচিবে। দেখুড়িয়াতে তিনকড়ির বাড়ীতে পৌঁছেই দুর্গা জগন ডাক্তারকে ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিল—ডাক্তার বাবু, জামাই-পণ্ডিত কেমন আছে?

তিন বৎসর পর ১৯৩৩ সাল।

৪৬০ পৃষ্ঠা—"দুর্গার জীবনে পারবর্তন আসিয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। দেবু বহু দিনের জন্য স্বদেশী আন্দোলনের জের টানিতে জেল-অবরোধে ছিল। ছাড়া পাইয়া দেবু দেশের গ্রামে প্রবেশ করিল।

ছেলেরা হাঁকিল—জয়, দেবু ঘোষের জয়!

গ্রামের ভিতর হইতে কে ছুটিয়া আসিতেছে।

দেবু নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না! ও কি দুর্গা? হ্যাঁ দুর্গাই তো! ক্ষারে-ধোয়া একখানি সাদা থান কাপড় পরিয়া, নিরাভরণা, শীর্ণ দেহ, মুখের সে কোমল লাবণ্য নাই, চুলের সে পারিপাট্য নাই—সেই দুর্গা এ কি হইয়া গিয়াছে!

দেবু বলিল—দুর্গা! এ কি তোর শরীরের অবস্থা, দুর্গা? তুই এমন হয়ে গিয়েছিস কেন?

দুর্গার সব গিয়াছে—কিন্তু ডাগর চোখ দুইটি আছে—মুহূর্তে দুর্গার বড় বড় চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল।

ডাক্তার বলিল—দুর্গা আর সে দুর্গা নাই। দান ধ্যান—পাড়ায় অসুখ-বিসুখে সেবা—

দুর্গা লজ্জিত হইয়া বলিল—থামুন ডাক্তার দাদা। তার পর বলিল—উঃ, কত দিন পর এলে জামাই!

সবুজ জল

অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঠিক দুপুরে চিলে-কোঠার ঘরে
　　রোদের ঝাঁ ঝাঁ তাপ

আকাশের উনুনে লাভা ফোটে,
　　তবু তো উত্তুরে জানলার ফাঁকে
দূরের মাটি-ভাঙা ঘাসের চাপড়া ঠেলে
　　উঠেছে সবুজ তালগাছ;
ঝুলে-পড়া পাতাগুলো রঙে মিলিয়েছে
　　রোদের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে,
কিন্তু ঠেলে-ওঠা পাতাগুলো খসখসে সবুজ,
　　নরম নয়, খাঁজকাটা, এলোমেলো,
　　তবু সবুজ, গাঢ় সবুজ।

গরম হাওয়ার দমকা বাঁচিয়ে
　　পশ্চিমের দরজাটা ভেজানো,
মাঝে মাঝে হাওয়ায় খটখট্ করে ওঠে,
　　ছিটকিনিটা ঠেলে দিতে মন সরে না।
কিন্তু গাছটা তো দরজা বন্ধ করেনি,
　　তেতে ওঠা হাওয়ার দিব্যি তেতে উঠেছে,
পাতা কাঁপে মাটির উপর ধুলোর তাপে
　　ধোঁয়া ওঠে, সেও কাঁপে।

ওই দরজাটা খুললে চোখে পড়বে
　　বাঁধে আর খোয়াইএ লড়াই
খোয়াই হারছে,
　　তার খরখরে শরীর উঠছে মসৃণ হয়ে,
তবু তো রক্ত-মেশানো লাল জল, ঘোলাটে,
　　কিন্তু তবু তো জল, ঠাণ্ডা, মসৃণ।
এমন ভাবে হারতে আমিও চাই।

ডান দিকে তাকাই, খোলা জানলায়
　　সাদা রোদ, তেরচা হয়ে পড়েছে
সিমেন্টের ঝিলমিল্ রেলিঙের ফাঁকে
　　লাল মাটির মেঠো রাস্তা।
ভারি আশ্চর্য্য লাগে—ওর উচিত ছিলো কংক্রিটের হওয়া
কিন্তু ও গেরুয়া, একেবারে উদাসীন সন্ন্যাসী!
অল্পবয়সী ইউক্যালিপটাস, পাতার জংগল খুব সামান্য,
　　পয়সার খেয়ালে '৩৭ সালে পোঁতা;
　　বাড়েনি, বাড়তে পারে না।

এদিকে যে মাটি ঢালু, বর্ষার লাল ঘোলা জল
　　এখানে দাঁড়াবার সময় পায় না,
চলে যায় লাল ধুলো মাখা সন্ন্যাসীর কাছ থেকে
শক্ত, কঠিন কাঁকর আর ডেলা বালির সংগমে,
　　সেখানে লড়াই করে, হারায়।

তবু হাওয়ায় হেলে অল্পবয়সী ইউক্যালিপটাস
　　পাতায় জংগল খুব সামান্য
পয়সার খেয়ালে '৩৭ সালে পোঁতা।



বিভ্রাট

সুহাসচন্দ্র মল্লিক

[ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়েতে একটি কবিতা চাই। ভদ্রলোকের ইচ্ছে হল—এই নিয়ে একটি কবিতার প্রতিযোগিতা করেন। প্রতিযোগীদের রচিত পদ্যের মধ্যে যেটি সব চেয়ে ভালো লাগবে—সেইটিই বেছে নেওয়া হবে এবং রচয়িতাকে দেওয়া হবে সমুচিত পুরস্কার। এরই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল—'পদ্য লেখার লোক চাচ্ছি—খবর করুন' ইত্যাদি কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অর্থ নৈতিক ও অভিনেতা এই পাঁচ জন সুধী আসছেন বিজ্ঞাপন দেখে। তাদের আগমনের পর জানানো হল—কবিতা রচনা করতে হবে বিবাহ সম্বন্ধে। তাদের রচনার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ও দেওয়া হল। পদ্য রচনা সকলের শেষ হয়েছে। মঞ্চে তাঁরা অধিষ্ঠিত। ভদ্রলোক ও তাঁর কন্যা বিচারকরূপে সমাসীন। অচল বাবু বলে এক ব্যক্তি কিয়দ্দূরে উপবিষ্ট। তাঁর কাজ সুধীগণ যখন রচনা পাঠ করবেন সেগুলি টুকে যাওয়া। ভদ্রলোকের সেক্রেটারীও উপস্থিত। মঞ্চের পর্দা উঠলো। ভদ্রলোক অর্থাৎ কন্যার পিতা এগিয়ে যান দর্শকদের সম্মুখে—]

পিতা। (দর্শকদের প্রতি)

সমাগত বন্ধুগণে জানাই আমি নমস্কার।
আজিকার এই দিনটি অতি মধুর এবং চমৎকার।
অদ্য শুভ-লগ্নে আমার কন্যার শুভ মিলন-রাত
শুভ রাত্রে বন্ধুগণের পেলাম শুভ এ' সাক্ষাৎ।
মিলনের এই মধুর রাতে নতুন কিছু করতে চাই
এইখানে এক ছোট্ট সভার আয়োজনটি হয়েছে তাই।
আয়োজন সে' ক্ষুদ্র বটে—তবু নতুন ধরণ তার—
শ্রবণ করুন অদ্য সভার নিবেদনটি সবিস্তার।

(স্বস্থানে উপবেশন করেন এবং সেক্রেটারী এগিয়ে আসেন)



সেক্রেটারী। (দর্শকদের প্রতি) নমস্কার।

আজকের এই মিলন-রাতে বিবাহের এক পদ্য চাই,
কর্ত্তাবাবুর ইচ্ছে হল এই সূত্রে অদ্য তাই
এক কবিতা প্রতিযোগিতার হ'ক এখানে ব্যবস্থা;
মানে—দিনটাকে আজ নতুন ধাঁচে মুখর করার প্রচেষ্টা।
যথাযোগ্য ব্যবস্থাও হল তাহার নির্দ্দেশেই—
বিজ্ঞাপনও প্রচার হল প্রতিযোগীদের উদ্দেশেই,
বিজ্ঞাপনের ঘোষণাটির এক অংশ জানিয়ে দি—
'পদ্য লেখার লোক চাচ্ছি—খবর করুন' ইত্যাদি।
বিয়ের পদ্য লিখতে হবে—থাক বা না থাক কবিত্ব,
জটিল ভাবও নিষ্প্রয়োজন—নিষ্প্রয়োজন ছবিত্ব,
রাখতে হবে প্রাঞ্জলতা—সরল ভাবের প্রাচুর্য্য,
এক কথাতে, মনের ভেতর স্পর্শে যেন মাধুর্য্য।
বিজ্ঞাপনের আমন্ত্রণে সুধীবৃন্দ উপস্থিত,
পদ্য লেখাও শেষ করেছেন, এই যে সভায় অধিষ্ঠিত।
কন্যা এবং পিতার মতে লাগ্‌বে যেটি চমৎকার
সেই পদ্যের রচয়িতাই লাভ করবেন পুরস্কার।

(অচল বাবুর প্রতি)—

অচল বাবু, এঁরা যে-সব পদ্যগুলি পড়বেন
আপনি বিশেষ যত্ন সহ খাতায় কপি করবেন!
সরঞ্জাম ঠিক আছে তো?

অচল বাবু। সবই আছে প্রস্তুতই।

সেক্রেটারী। দেখবেন যেন টুকতে গিয়ে হয় না কোন দোষ-ত্রুটি।

(একটু থেমে)

(সকলের প্রতি)—

হ্যাঁ, আরেক কথা জানিয়ে রাখি—করুন আমায় মার্জ্জনা
শীঘ্রই শেষ করব সভা—সময় অধিক ধার্য্য না।
সভার কার্য্য আরম্ভ হ'ক—আপনি কে—ও বৈজ্ঞানিক?

বৈজ্ঞানিক। বাস্তবেরি পথিক—তবু কাব্যলোকেও রই খানিক,
Ultra modern পদ্য লিখি পাঠক বলে চমৎকার—
প্রেরণা এর যুগিয়েছিল নামজাদা এক গণৎকার,
তাহার মতে রয়েছে আমার কাব্য রচার দক্ষতা
হস্তরেখার নির্দ্দেশ এই—ভবিতব্যের লক্ষ্যতা'—
তাই ইদানীং লিখছি কত কাব্য, কত কল্পনা—

পিতা। Kindly sir, শুরু করুন সময়টা কি অল্প না?

বৈজ্ঞানিক। Excuse me—I am sorry—please hear
(পাঠ)—'আজি মিলনের রাতে

মনের screenএ রং এর আমেজ vibgyor
উঠলো ফুটে



Spectrometerএর নতুন ভাবের যন্ত্রে।
স্বামি-স্ত্রীর জীবন-তরঙ্গ ভেসে যাক medium waveএর মত।
সুখের বিদ্যুৎ-প্রবাহ সেই সঙ্গে—সর্ব্ব অঙ্গে
ছেড়ে দিক প্রাণের voltaic cell—

সেক্রেটারী। (স্বগত)—Go to hell!

পিতা। এই কি আবার পদ্য হল—ছন্দ মিল আর অর্থ কই?

বৈজ্ঞানিক। অর্থ যদি জানতে চান তো ঘটবে কেবল অনর্থই;
Ultra modern পদ্য এ যে—ভালো কিংবা মন্দ নেই,
আবেগ ভরে চল্‌বে লেখা,—মিলের বাঁধা ছন্দ নেই;
অর্থগুলি লুকিয়ে থাকে মিষ্ট ভাষার অন্তরে—
ডাকলে তারা দেয় না সাড়া—দেয় না ধরা মন্তরে
যতই কেন ভাবতে থাকুন—আপনার সব ফন্দিকে
পাশ কাটিয়ে স্বাধীন ভাবে পালিয়ে যাবে কোন দিকে
কোন হদিস পাবেন না আর।

সেক্রেটারী। কিন্তু তাতে লাভটা কি—
অর্থগুলো বুঝবে না কেউ—কাব্য লেখার ভাবটা কি?

বৈজ্ঞানিক। স্বাধীনতার যুগ এসেছে, স্বাধীনতা চায় সবাই,
মুক্তিপ্রিয় অর্থগুলি বন্দী হতে চায় না তাই—
চায় না তারা মস্তিষ্কের বন্দিশালায় আটককে
তাই কাব্যের অর্থগুলি দেয় না ধরা পাঠককে
স্বাধীনতাই কাম্য তাদের,—তাই তো এত মিষ্টতা
ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে থাকে—কাব্যের বৈশিষ্ট্যতা'।
যতই আপনি পাঠ করবেন স্পর্শ পাবেন হর্ষরই
Modern কাব্য কেমন জানেন—সাক্‌সব্জির চচ্চড়ী—

সেক্রেটারী। (বাধা দিয়ে) থামুন মশাই ব্যাখ্যান থাক—

বৈজ্ঞানিক। দেন বাধা যে অস্থানে
যাক, পদ্যের শেষটা শুনুন—

সেক্রেটারী। বসুন মশাই স্বস্থানে
অল্প সময়, পাঠও বাকী—দেখতে হবে সব দিকে
পদ্য শোনার যোগ্যও নয়,—আপনি আসুন—আপনি কে?

অর্থনৈতিক। অর্থনৈতিক আমি—বড় সকরুণ
কাব্য-জীবনের ব্যথা—

সেক্রেটারী। (বাধা দিয়ে) এবার পড়ুন।

অর্থনৈতিক। কত কথা বয়ে গেছে কাব্যের জীবনে
সব কথা একে একে ধর্ণা দেয় মনে।
পিতার ত্যাজ্যপুত্র করার শাসন-ভীতিতে
কাব্য ছেড়ে ভিড়েছিলাম অর্থনীতিতে।
কিন্তু কোথায় যাবে প্রাণের সে' আবেগ!
কবিতা আর নেই পুরোণো সাবেক,
বাঁধা ধরা সনাতনী গদ গেছে উঠে
তাইতো উল্কার মত কাব্য চলে ছুটে
পিতাকে গোপন করি' খাতার মাঝারে।
সবারই দখল আছে কাব্যের বাজারে
দেশ জুড়ে দেখা গেছে সাম্য মন-ভাব
কতখানি আশাপ্রদ!—

সেক্রেটারী। সময়ের একান্ত অভাব
কেন মিছে বলে যান অবান্তর আর—?

অর্থনৈতিক— বেশ তো, শুনুন—স্যার
(পাঠ) আজ উদ্বাহ দিন
দুইটি অচেনা সাথী সঙ্গী ও সঙ্গিনী হয়ে এক পথে চলে
যেন দু'চোখের দৃষ্টি একদিকে যাচ্ছে।
জীবনের যাত্রা-ক্ষেতে ফলুক ফসল—হ'ক মধুময়।
এ মিলনে Import Exportএর মত
প্রেম-বস্তুর আদান প্রদান চলুক অবিরাম
এই শুভ উদ্বাহে ভর্ত্তা ভার্য্যার সন্ধি
হয়ে থাক অন্যূন অনুষ্ঠিত,
দুঃখ জ্বালায়-যত শিংনাড়া তেজীয়ান-গুঁতো-ে া-ে া—
(থেমে গেলেন)

পিতা (বিরক্তিভরে)। তারপর—তারপর পড়ে যান—

অর্থনৈতিক। বাকী আছে অর্দ্ধ আর
(রচনাটির দিকে চেয়ে)
দাঁড়ান—বসে-চিন্তা-করি-গুলিয়ে-গেছে-অর্থ-তার।



(স্বগত) অর্থগুলো শক্ত এমন বুঝছি না ঠিক মানে তো,

অভিধান ফের খুলতে হবে,—অভিধান ঠিক জানে তো

(স্বস্থানে বসে পড়লেন এবং Pocket Dictionaryটা খুলে দেখতে লাগলেন। মহা ফ্যাসাদ। ওদিকে দার্শনিকের ভাবের আতিশয্য, তিনি স্বস্থানে আর টিঁকে থাকতে না পেরে বিহ্বল ভাবে পায়চারি সুরু করলেন)

সেক্রেটারী। আপনি আবার ঘোরেন কেন—?

দার্শনিক। (আবেগের কণ্ঠে)— একান্ত দিকভ্রান্ত—

ভাবের দোলায় বিহ্বলতা—

সেক্রেটারী। এইবারে হন শান্ত,—

কবিতা পাঠ সাঙ্গ করে ঘুরুন যথাসাধ্য।

দার্শনিক। মহাশয়ের ইচ্ছে যখন পড়তে আমি বাধ্য।

(পাঠ)। 'এ মিলন যেন চন্দ্র-রাহুর সন্ধির মত

অতি সুন্দর।

দু'জনে বন্দী হল বিবাহের 'ও'এর বাঁধনে

বিধাতার আশীর্ব্বাদে জীবনের যা কিছু সঞ্চয়'—

পূর্ণ ভাবে তারা পেতে চায়—হায়—নাঃ

(থেমে গিয়ে পায়চারি)

দার্শনিক। (ভাবাবেগ) কিন্তু-কিন্তু-কিন্তু বৃথা আর—

পিতা। পড়ে যান স্যার

দার্শনিক। আমি জানি আমি Philosopher

এ সংসার—এ জীবন, ধন, মান, স্বপন, সুখ-দুঃখ

হে অজ্ঞান মূর্খ—হে মানুষ

বিশ্ব শুধু মরীচিকা মায়াময়—শূন্যের ফানুস।

যত কিছু বিদ্যমান ক্ষণিকের জন্য সবি তা'—

সেক্রেটারী। পড়ে যান শীঘ্র কবিতা—

দার্শনিক। কবিতা ? কবিতা-কাব্য-শিল্প—এ-ও মিথ্যে সব

মানবের হাসি-কান্না—পৃথিবীর ভ্রান্ত কলরব

সকলি তো মায়ার ফানুস ;

আপনি তো মূর্খ বোকা—জ্ঞানহীন যে অজ্ঞ মানুষ

কালের আকাশে বুদ্‌বুদ্

উফ ! কি অদ্ভুত

বুদ্‌বুদ্ !



পরিজনবর্গ সহ বসে আছি হেথা সুখের শারদে

এখুনি হয়তো মোরে চলে যেতে হবে—

সেক্রেটারী। (গম্ভীর ভাবে) পাগলা গারদে।

দার্শনিক। (বিস্মিত) পাগলা গারদে ?—না, না—পাগলা গারদে নয়—

মৃত্যুর পুরে

কালের দন্ত খায় আমার আয়ুকে কুরে কুরে

উফ, কি ভীষণ কষ্ট, যন্ত্রণার কি জটিল ফাঁদ—

সেক্রেটারী। উফ কি উন্মাদ ! (স্বস্থানে বসে পড়লেন)

দার্শনিক। সবই যাবে ধ্বংস হয়ে কিছুই রবে না পড়ি' বাদ

হায় রে মানুষের সাধ— (পায়চারি)

পিতা। (বিব্রত) মহাশয়, দয়া করে স্বস্থানে বসুন

দার্শনিক। বসে কিছু লাভ নেই—রসুন-রসুন

(Bulbএর দিকে আঙুল দেখিয়ে)

দেখুন পূর্ণচন্দ্র আজ ক্ষয়প্রাপ্ত,—মাত্র এক কলা

পিতা। (বিস্মিত)

চাঁদ কই ? ওতো Bulb, হন যে নিতান্ত উতলা।

দার্শনিক। আবার জেগেছে ভাব—চাই একান্ত নির্জ্জন

পছন্দ করি না আমি এত লোকজন

উফ কি নিবিড় ভিড়—

লাখে লাখে কালো কালো শির !

(বিরক্তিভরে পায়চারি করতে থাকেন এবং অভিনেতা হাতে কবিতাটি নিয়ে সটান এগিয়ে আসেন দর্শকদের সামনে)

অভিনেতা। কবিতা শুনুন মোর,—আমি অভিনেতা বিখ্যাত,

আমার প্রচুর নাম—সারা দেশ জুড়ে আমি খ্যাত।

আমার ভীমের পাট—প্রসিদ্ধ অতি চমৎকার !

একটা নমুনা দি—ভীমের পাটের পসুচার।

(পসুচার দেখান)

হিড়িম্বা রাক্ষুসী—ঘটৎকচের পাটখানা দেখুন কেমন লাগে—

সেক্রেটারী। (ভীষণ বিরক্তি) বলেন কি—খ্যাপা না কি—না, না

—কবিতা পড়তে এসে এ কি বিদ্‌ঘুটে পাগলামি ?

অভিনেতা। দর্শক দেখে আর সামলাতে পারি না যে আমি—

অভিনয় করে ফেলি—

পিতা। মহাশয় শীঘ্র পড়ুন

হাত জোড় করে বলি—কবিতা আরম্ভ করুন।

(অভিনেতা একটু ইতস্তত করেন)

অভিনেতা। আমার কবিতাখানি অতিশয় নতুন ধরণ

আধুনিক কবিতা ও থিয়েটারি ফ্যাসানে গড়ন।

(পাঠ)— 'শূন্যে আবর্ত্তময়ী পৃথিবী এক রঙ্গমঞ্চ

এরি মধ্যে শ্রীরঙ্গম, রংমহল, ষ্টার, মিনার্ভা, কালিকার

লীলা-খেলা চলছে অবিরাম'—

সেক্রেটারী। থাক থাক কবিতায় কাজ নেই আর

অভিনেতা। 'এর চাবি যার

গিরীশ, শিশির, দানী, অহীন্দ্র, দুর্গাদাসের

অভিনয়ের প্রতিচ্ছবি'—

কে একজন বললেন—খাপা বিবাহের পদ্য বানিয়েছে কবি

অভিনেতা। ঘাবড়ান কেন স্যার আসছে তো সবই

(পাঠ)—'আজ রাতে অভিনেতা বর আর অভিনেত্রী কনের

মিলনের দৃশ্য ; প্রেমের নাটক—

প্রেমের বন্ধন চির অটুট অক্ষয়

হয়ে থাক নাটকের প্রতি অঙ্কে অঙ্কে।

অভিনেতা অভিনেত্রী একসঙ্গে মিলে

বসুমতী-মঞ্চের সংসার-sceneএর মধ্যে দিয়ে

নির্বিঘ্নে চলে যাক অভিনয় করে।'

অভিনয় প্রাণ দিয়ে করা চাই খালি

Promter না থাক তাতে যায় না আসে না কিছু

পাওয়া চাই শুধু করতালি।

'স্টার নাট্যমঞ্চের নাটকে—

গিরিকা, গুড়াকা, নর, গামী গুটিপোকা'—

সেক্রেটারী। (ব্যস্তভা) কর্ত্তামশাই, এ কি বলে—যায় না যে বোঝা

ও মশাই, থেমে যান হয়েছে অনেক (করজোড়ে) একটু থামুন—

অভিনেতা। বেশ, থামছি ক্ষণেক

পিতা। কবিবর, শীগ্‌গির কবিতা পড়ুন,

পদ্য-চাবুক থেকে রক্ষা করুন।

কবিতা যে লেখা যায় এমন বিকট

অজ্ঞাত ছিল এটি আমার নিকট

কাব্য সংকট!

(কবি কপাল টিপে ধরে বিরক্তিভরে উঠে দাঁড়ালেন—তিনি desperate, কর্ত্তা তাঁর ভাবটি দেখে সন্দেহ করলেন)

পিতা। কবি মশাই, ওঠার কিছু দরকার নেই—বসুন না

কবি। (দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে)—বাড়ীর দিকে যাচ্ছি আমি

পিতা। (মিনতির সুরে)—দয়া করে বসুন না।

আমরা কিছু দোষ করেছি—মিথ্যে অভিমান কেন?

আপনিই তো শ্রেষ্ঠ হবেন বাড়ীর দিকে যান কেন?

কবি। মনটা বেজায় মুসড়ে গেছে (দীর্ঘশ্বাস) হায় রে আমার অদৃষ্ট

এ সব পদ্য শুনতে হল, মাপ করবেন অতিষ্ঠ—

আর এখানে যায় না থাকা—আচ্ছা চলি—নমস্কার

পিতা! পদ্যখানা পড়ে ফেলুন—পাবেন সেরা—পুরস্কার

কবি। এঁদের মাঝে শ্রেষ্ঠ বলে করতে চাই না প্রমাণটা

শ্রেষ্ঠতা নয়—ধৃষ্টতা ও অগৌরবের সমান তা'

(স্বগত) তাছাড়া, সব রচয়িতার মাথায় আছে বিকার যে

হেরে গেলেই আমায় ধরে করবে তারা শিকার যে—

কোন কিছুই যায় না বলা—অদ্ভুত ভাবভঙ্গ তো

শুধুই নিজের জয়লাভটা নয়ক' মোটেই সঙ্গত।

পিতা। কিন্তু পুরস্কারের টাকা?

কবি। তার জন্যে ভাবনা কি?

ভাগ করে দিন এঁদের মাঝে—

পিতা। কিন্তু তাতে লাভটা কি?

আজ কন্যার মিলন রাতে বিবাহের এক পদ্য চাই,

সেই পদ্য পাব বলেই বসলো সভা অদ্য তাই।

একটা যা হয় উপায় করুন, বুঝচেন তো অবস্থা

কবি। মাপ করবেন—নাচার আমি—আপনি করুন ব্যবস্থা

আমার পক্ষে পদ্য পড়া কেমন করে সম্ভবে?

প্রথমতঃ মান তো যাবে—বিপদটা কি কম হবে?

(নিম্ন কণ্ঠে)—এরা যদি আমার দ্বারা জয়লাভে হন বঞ্চিত—

ভবিষ্যতের ভাগ্যে আমার কি-যে হবে সঞ্চিত

আপনি বারেক চিন্তা করুন—

পিতা। বুঝেছি সবই পরিষ্কার

তাহলে কি, কবি মশাই, নেইক' কোন উপায় আর?

পদ্য একটা পেতেই হবে—নিজের লেখার সাধ্য কই

দেখছি শেষে এদের থেকেই বেছে নিতে বাধ্য হই

গত্যন্তর নেইক' কোন—এ'ছাড়া আর নেই তো পথ

কবি মশাই, জানতে পারি আপনার কি মতামত?

কবি (ঈষৎ ভেবে)

আচ্ছা, এদের পদ্যগুলির কপি একবার দ্যাখান তো

পদ্য একটা চাই আপনার—আবশ্যকও একান্ত—

দেখছি কিবা করতে পারি—মহা মুস্কিল—যাগ্‌গে

পিতা। অচল বাবু—

অচল বাবু। আজ্ঞে!

পিতা। কপি-করা কাগজখানা কোথায়—দেখি দিন—

স্পষ্ট করে টুকেছেন? (অচল বাবুর সম্মতি)

বেশ, কবি মশাই নিন। (কবিকে দেওন)

কবি। (সমস্তটা পড়ে)

না, এদের থেকে বেছে নেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব

কেউ কারো চেয়ে কম যায় না—আগাগোড়াই সমান সব।

(স্বগত) তবে, কতক কতক লাইন আছে পদ্যগুলির মাঝে

দেখছি তাদের অর্থ আছে—নয়ক' নেহাৎ বাজে

কোনক্রমে লাইনগুলি লাগাই যদি কাজে (চিন্তিত)

পিতা। কবি মশাই—একটা কোন পথ করে দিন শেষটা

কবি। সব দিকটা সামলে তা'লে করতে হবে চেষ্টা

পিতা। বেশ তো মশাই ভালোই হবে—

কবি। সেই রকমই ইচ্ছে

আধো আধো একটা উপায় আভাস যেন দিচ্ছে

ঠিক জানি না কেমন হবে—

দেখছি তবে।

কবি। (স্বগত) এক যেন আবছা উপায় করছি আমি কল্পনা

উপায়খানি ভালো না হ'ক—মোটের ওপর মন্দ না।

রচয়িতাদের রচিত এই পদ্যগুলির মধ্যে

দেখছি যে সব সভ্য লাইন রয়েছে এঁদের পদ্যে

সেইগুলিকে সঠিক ভাবে এক সাথে যোগ করে

একটি কোন পদ্য যদি তুলতে পারি গ'ড়ে—

সেই পদ্যেই তবে,

আজকের এই ব্যাপারগুলির মীমাংসা ঠিক হবে।

(Copy করা পদ্যগুলির ওপর চোখ বুলিয়ে কাগজটি মুড়ে রাখলেন এবং ভাবতে ভাবতে খাতায় একটি পদ্য রচনা করে ফেললেন)

কবি। শুনুন তবে—

(পাঠ) 'আজি মিলনের রাতে

যুগল প্রাণের যাত্রা পূর্ণ হ'ক শ্যামল ধরাতে



'প্রেমের বন্ধন চির অটুট অক্ষয়
হ'ক মধুময়
বিধাতার আশীর্ব্বাদে জীবনের যা কিছু সঞ্চয়।'

পিতা। কবিবর, রচনাটি অতি চমৎকার!

কন্যা : বাবা, এঁরাকেই দাও শ্রেষ্ঠ পুরস্কার

পিতা। (সকলের প্রতি) এ পদ্য বিচারে হল শ্রেষ্ঠ প্রমাণ—
কবিকে শ্রেষ্ঠতার দিতেছি সম্মান।

(পিতা কবির গলায় মাল্য দিলেন—করতালি পড়ল। পুরস্কারের অর্থ-থলিও কবি গ্রহণ করলেন। কিন্তু পুনরায় সেই দু'টি—অর্থাৎ মাল্য ও অর্থের থলি ফিরিয়ে দিতে যাবেন এমন সময়)

অর্থনৈতিক। (চীৎকারে) পেয়েছি পেয়েছি অর্থ—শুনুন মশাই

দার্শনিক। আমারও থেমেছে ভাব তা'লে পড়ে যাই

সেক্রেটারী। চলুন নেপথ্যে গিয়ে শুনি দু'জনার

অর্থ নৈতিক। নেপথ্যে কি—এইখানে হবে যে বিচার—

সেক্রেটারী। বিচার হয়েছে শেষ—

দুজনে। (ব্যগ্রতার কণ্ঠে) কার হল জয়?

কবি। (সেক্রেটারীকে বাধা দিয়ে) জয় সকলেরই ভাগ্যে সমান ম'শায়।
(পিতার প্রতি)। নিন্ পুরস্কার-থলি—এই মাল্য নিন
সকলকে মাল্যের অধিকার দিন
অর্থ দিন ভাগ করে সবারে সমান (ফেরত দেওন)

পিতা। সবারই যে জয় হল তার কি প্রমাণ?
কেন মিছে কবিবর দেখান বিরাগ—

কবি। বিরাগ নয়ক' এটা—সকলের ভাগ
সমান সমান আছে শ্রেষ্ঠ রচনায়—
পরীক্ষা করুন যদি বিশ্বাস না হয়,
চারিটি লাইন এর চারিটি কবিতা থেকে নেওয়া
আরেকটি যোগ করে কোনমতে খাড়া করে দেওয়া
দেখুন বিচার করে—এই নিন শ্রেষ্ঠ রচনা
(কবিতাটি কর্ত্তাকে দিলেন)
এঁদের রচনা সাথে মিলিয়ে দেখুন ঠিক কি না
(copy করা কাগজটিও দিলেন)

(পিতা copy করা পদ্যগুলির সঙ্গে শ্রেষ্ঠ রচনাটি মিলিয়ে দেখলেন সত্যই তাই। শ্রেষ্ঠ রচনাটির দ্বিতীয় লাইনটি কবির নিজের দেওয়া এবং প্রথম লাইন বৈজ্ঞানিকের, তৃতীয় লাইন অভিনেতার, চতুর্থ লাইন অর্থ-নৈতিকের ও পঞ্চম লাইন দার্শনিকের কবিতা থেকে নেওয়া—এই পাঁচ লাইনে কবিতাটি রচিত)

সেক্রেটারী। কবি মশাই, রচনাটি নয় আপনার নিজস্ব?

কবি। নিজের হলে মানটা আমার ক্ষুণ্ণ হ'ত অবশ্য

সেক্রেটারী। ক্ষুণ্ণ কেন—আপনি তাতে লাভ করতেন শ্রেষ্ঠতা—

কবি। এঁদের মাঝে শ্রেষ্ঠ হওয়া নিতান্ত যে ধৃষ্টতা।
তাছাড়া সব রচয়িতার জয়লাভটা আবশ্যক
নয় তো এঁরা ক্ষুব্ধ হতেন—হয় তো পেতেন দারুণ শক্
তাই তো দিলাম জয়লাভকে সমান ভাগে ভাগ করে
এঁদের যাতে ফিরতে না হয় আমার ওপর রাগ করে

পিতা। কবি মশাই, তাই শ্রেষ্ঠ রচনাটির মধ্যে
প্রত্যেকেরই একটি লাইন যোগ করেছেন পদ্যে,
যাতে—সমান সমান জয় ঘটবে প্রত্যেকেরই ভাগ্যে?

কবি। ঠিক ধরেছেন—যাগ্‌গে—
আপনি তুষ্ট হয়েছেন তো?—

পিতা— ধন্যবাদ—সাবাস সাবাস
কবি মশাই, আপনার দক্ষতার পাচ্ছি আভাস।
একটি কবিতা দিয়ে করলেন সব সামাধান:
বজায় রইলো তাতে আপনার মর্য্যাদা মান,
রচয়িতা সকলেই পেলেন সমান ভাবে জয়,
সন্তুষ্ট হলাম আমি—সত্য অতিশয়—
বিয়ের ঐ কবিতাটি পেয়ে—।
কবি বটে আপনি—কবিবর
সব দিকই রেখেছেন—উপায়টি অতি সুন্দর
আপনি অশেষ গুণধর

সকলকে গলায় মালা দেওয়া হল এবং সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়া হল পুরস্কারের টাকা। করতালি পড়লো—

পিতা—কবির দক্ষতা ধন্য—কবিত্বও সাবাস—বাহবা,
নমস্কার বন্ধুগণ আজ এইখানে ভঙ্গ হক সভা।
[যবনিকা পড়লো]

রক্তনদীর ধারা



পঞ্চানন ঘোষাল

৩

মাণিকতলার * * নং বাটীতে থাকত একজন রূপ-জীবিনী। উজ্জ্বলা তার নাম। ধনীর দুলালেরা তাদের শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত নিঃশেষ করেও তার প্রেম ক্রয় করে। রূপের ন্যায় ঐশ্বর্য্যের খ্যাতিও ছিল তার প্রচুর। সেদিন গোপী অনেক চেষ্টায় অভাগিনীর বিশ্বাসী চাকরটার কাছে প্রয়োজনীয় অনেক খবর সংগ্রহ করেছে। প্রফুল্ল চিত্তে খবরটা খোকাকে জানাতে এসে গোপী দেখতে পেল, খোকা তার ঘরে বসে তখনও মদ খাচ্ছে।

দলের কানু ওরফে কানাই বাবু এবং সুরমা কীর্ত্তনী ছাড়া খোকার ঘরে অপর কোনও ব্যক্তি নেই। বিশেষ একটা বার্ত্তা খোকাকে জানাবার জন্যে সুরমা ঘরে ঢুকেছিল কিন্তু পানোন্মত্ত খোকাকে তখনও সে তার বক্তব্যটুকু জানিয়ে উঠতে পারেনি। দলের অপরাপর ব্যক্তিগণ কার্য্য শেষে তখনও আড্ডায় এসে পৌঁছায়নি। গোপীকে দেখে খোকা দাঁত দিয়ে বোতলের ছিপিটা খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করল, "কি রে শালা, রাজবাড়ীর সেই খবরটার করলি কি? রেস্ত তো ফুরিয়ে এ'য়ছে, একটা ভালো দেখে কাম-টাম কর। বসে বসে মদ আর কদ্দিন খাব। ফুর্ত্তি তো অনেক দিন করা হ'লো। আয়, এইবার কাযে-টাযে লাগি।'

শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত ব্যয়িত না হলে অপরাধীরা পুনরায় অপকর্ম্মে বহির্গত হয় না, অপরাধবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতরা এইরূপ বলে থাকেন। এই দিন তাদের আহারের জন্য একটি পয়সাও অবশিষ্ট ছিল না, এই কারণে সেই দিন গোপী স্বয়ং খবরের সন্ধানে বার হয়েছিল। চোখ দু'টা বড় বড় করে গোপী উত্তর করল "উজ্জ্বলা বিবির বাড়ীর সে খবরটা আজ পাকা করে এলাম। দাঁওটা বেশ বড় রকমেরই হবে, মাইরি। আজ রাতেই শেষ করা যাবে, কি বলিস্?"

এই রূপজীবিনীদের উপর খোকার প্রকৃত সহানুভূতি ছিল। ক্ষেপা কুকুরের মত সন্ধানী পুলিশের দল তাদের পল্লী থেকে পল্লীতে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। কোনও গৃহস্থ তাদের আশ্রয় দেয়নি, দিয়েছে রূপজীবিনীরা। তারা দিয়েছে তাদের আহার, শয্যা এবং এক-জন সাময়িক স্ত্রীও। খোকা চোর-ডাকাত, কিন্তু অকৃতজ্ঞ নয়, উপকার সে ভুলে না। বিরক্ত হয়ে খোকা উত্তর করল, "তোর যত জুলুম ওই গরীবদের উপর। অথচ আমাদের ওরাই একমাত্র আশ্রয়স্থল। শুধু ওরাই আমাদের ঘেন্না করে না, আদর করে ঘরে ডাকে। ওরা ছাড়া আমাদের আর আছে কে রে? সহর-ভং কত বজ্জাত ধনিলোক রয়েছে, তাদের একটারও খবর আনতে তুই পারলি না। তুই শালা দেখছি একেবারে ইয়ে হয়ে গিছিস্!"

অপকর্ম্মের জন্য ক্ষেত্র-নির্ব্বাচনের মধ্যে কোনও-রূপ জাতবিচার গোপী সাধারণতঃ পছন্দ করে না। এ বিষয়ে খোকার সহিত গোপীর প্রায়ই মতভেদ হয়েছে। তবে এই দিন রূপজীবিনী উজ্জ্বলার উপর কোনও জোর-জুলুম করবার কথা সে ভাবেনি। তার লক্ষ্য ছিল উজ্জ্বলার এক ধনী অতিথির উপর। হীরার আংটী, সোনার বোতাম ও সোনার ঘড়ি প'রে পকেটে কয়েক শত টাকা নিয়ে তার উজ্জ্বলার বাড়ীতে সেদিন রাত্রিযাপনের কথা ছিল। গোপী আদ্যোপান্ত বিষয়টি খোকাকে বুঝিয়ে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুরমাকে সেখানে উপস্থিত দেখে সে চুপ করে গেল। এমন সময় বাইরে থেকে সুধীর বাবু ডেকে উঠল, "মাসী—ও মাসী! মাসী আছো না কি?"

সুরমার সামনে কাযের কথা পাড়তে খোকার একটু আপত্তি ছিল। হাজার হোক সে বাইরের লোক, মেয়েমানুষও বটে। বলব বলব করেও গোপী সুরমাকে এতক্ষণ চলে যেতে বলেনি। সুধীরের ডাকে খুসী হয়ে গোপী সুরমাকে বলল, "যা যা, যা দেখি। ডাকে কেন দেখ্।"

বেরিয়ে যেতে যেতে সুরমা জিজ্ঞাসা করল, "কি গো ছেলে, যাও কোথা?"

সুধীরের সেদিন নাইট ডিউটী ছিল। খাওয়া দাওয়া করে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল। কয় দিন প্রাণপণ চেষ্টায় সুরমা তাদের বিশ্বাসও উৎপাদন করেছে। অনেকটা নির্ভরতার সহিত সুধীর উত্তর করল, "আজ, নাইট্ ডিউটী মাসী, বৌমা রইল তোমার। তেনাকে দেখো একটু: ভোরের আগে ফিরতে পারব না।"

সুধীর বাবু বেরিয়ে গেল বুঝে, দলের কানাই দরজটা ফাঁক করে গলাটা বাড়িয়ে দিচ্ছিল; উদ্দেশ্য—বরুণাকে একবার আড়-চোখে দেখে

নেওয়া। খোকা কানাই বাবুকে ঘাড় ধরে টেনে এনে ধমকে উঠল, "ফের নজর ওদিকে, বারণ করেছি না। তোদের জ্বালায় ওরা বাড়ী ছেড়ে না পালায় আবার; তা হলেই সব মাটী। ওদিকে তাকাতে পর্য্যন্ত পাবি না, তো শালারা। বলে দিচ্ছি আমি, খবরদার—"

সুধীরকে বিদায় দিয়ে ফিরে এসে মুখ ফেরাতেই সুরমা লক্ষ্য করল তার দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে লক্ষ্মীকান্ত বাবু। কয় দিন ধরে উদ্বিগ্ন চিত্তে সুরমা লক্ষ্মীকান্তর জন্ম অপেক্ষা করছিল। সোহাগ ভরে তাকে হাতে ধরে ঘরে নিয়ে যেতে যেতে সুরমা জিজ্ঞাসা করল, "বেশ বাবা! একেবারে ডুব; এঁ্যা? সপ্তাহ-ভর বাবুর দেখাই নেই!"

বাইরে থেকে লক্ষ্মীকান্ত বাবুকে ভদ্র-সন্তান বলেই মনে হয়। বয়সে সুরমার চেয়ে সে দুই-এক বছরের ছোটই হবে। দেহের মধ্যে তার একটা জৌলুষও আছে। তার ভিতরের কদর্য্যটুকু তাই সহজে ধরা পড়ে না। হৃষ্ট-পুষ্ট ছিল তার চেহারা, আর রঙটা ছিল কটা। সাজলে গুজলে তাকে বেশ ভালোই দেখায়। আদর করে সুরমার গালে একটা আঙুলের টোকা দিয়ে লক্ষ্মীকান্ত বলল, "খবর-টবর থাকলে তবে তো আসব, তা না হলে শুধু শুধু এসে লাভ কি আছে, বল?"

সুরমা নারী। তখনও পর্য্যন্ত সে অনুভূতির বাইরে গিয়ে পৌঁছায়নি। বিক্ষুব্ধ চিত্তে পিছিয়ে এসে সে উত্তর করল, "তা আস্‌বি কেন? আমার সাথে তোর শুধু ব্যবসারই সম্বন্ধ কি না? আচ্ছা।"

অপ্রস্তুত হয়ে লক্ষ্মীকান্ত জানাল, "আচ্ছা পাগলী তুই তো, শোন বলি—"

লক্ষ্মীকান্তকে থামিয়ে দিলে সুরমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, "আর শুনতে হবে না, আসিস্ না তুই আর। আমি আর কিছু পারবো না। আমার দ্বারা আর কিছু হবে না। এবার থেকে আমি ভিক্ষে করে খাব। দুখ-ভীখ করে খাব।"

সুরমার রাগের সঙ্গে ছিল অনুযোগ,—অনুরাগও। কারণ বুঝতে লক্ষ্মীকান্তর দেরী হয়নি। কাকুতি মিনতি করে লক্ষ্মীকান্ত জানাল, "খবরে ছিলাম ভাই, মাইরি বলছি। সময় পাইনি। এই শোন, রাগ করিসনি। এই—"

ঠোঁট বেঁকিয়ে সুরমা জিজ্ঞাসা করল, "কি কাযে ছিলি, শুনি? এমন কি কায!—সাত দিন নিখোঁজ! আমার বুঝি মন কেমন করে না? কোথায় ছিলি বল তো?"

সুরমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে লক্ষ্মীকান্ত উত্তর করল, "শোন বলি তবে। ** নং বস্তীতে দেখে এলাম, একজনকে মাইরি। স্বামীটা তার মাতাল, চেষ্টা করলে বাগানো যাবে। দেখবি একবার? এক শালা বোকা কাপ্তেনও পাকড়েছি। ক'দিন খুব মটোরে ঘোরা গেল।"

লক্ষ্মীকান্ত সুরমার সম-ব্যবসায়ী। সুযোগ মত জায়গায় জায়গায় তারা ডেরা ফেলে। ফুসলে বৌ-ঝি বার করা তাদের কায। অভাগিনীদের দিনকতক এধার-ওধার ঘুরিয়ে তাদের নরকের পথে নামিয়ে আনা ছিল তাদের ব্যবসা। কাপ্তেন বুঝে তাদের চালান করে বেশ কিছু তারা উপায়ও করত। লক্ষ্মীকান্তর কথায় উৎফুল্ল হয়ে সুরমা উত্তর করল, "তাই না কি? তা বেশ। কিন্তু তোরটা এখন জিয়োন থাক, বুঝলি। এখন দেখবি তো চল আমারটা, আয় না, আয় আয়—"

সুরমা লক্ষ্মীকান্তের হাত ধরে টানতে টানতে বরুণার ঘরের সামনে এনে হাজির করল।

বরুণাকে দেখে লক্ষ্মীকান্ত আর চোখ ফেরাতে পারে না। অনিমেষ নয়নে সে চেয়ে থাকে নিদ্রিত বরুণার দেহ-পল্লবের দিকে। সুরমার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে বরুণা ঘুমিয়ে পড়েছিল। শরীরটাও তার সেদিন ভাল ছিল না। একবার বরুণার জ্যোৎস্না-প্লাবিত দেহের দিকে, আর একবার ঘরের মুক্ত বাতায়নের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে লক্ষ্মীকান্ত বলল, "মাইরি—মাইরি! এ অপ্সরী—"

কোমরের কাপড়ে হাতিয়ার গুঁজে রাতের অভিযানে সদলে খোকা বাবু বেরিয়ে যাচ্ছিল, উঠান দিয়ে যেতে যেতে তাদের নজর পড়ল সুরমা কীর্ত্তনী ও লক্ষ্মীকান্তর দিকে। বরুণার ঘরের খোলা দরজার দিকে হাঁ করে উভয়কে চেয়ে থাকতে দেখে দলের কানাই বাবু থমকে দাঁড়িয়ে সক্রোধে বলে উঠল, "দেখ্‌, দেখ্‌, বদমায়েস মাগীর কাণ্ড দেখ! যত দোষ শুধু আমাদের বেলাতেই না? আমরা হলেই খোকা বাবু তেড়ে আসেন, এখন?"

খোকা বাবু কানাইয়ের এই অভিযোগ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না, বরং খুসী হয়ে সুরমার দিকে চোখের ইসারা করে সাকরেদদের তাড়া দিয়ে খোকা ধমকে উঠে বলল, "চল চল, ও-সব ঠিক আছে। কাযের কথা ভাববি, না বাজে মাথা ঘামাবি। দুনিয়াতে কি আর মেয়ে-মানুষ নেই? যত সব—। চল চল—"

লক্ষ্মীকান্তর মধ্যে পুরুষোচিত ভাব ছিল খুব কম। এতগুলো গুণ্ডা-প্রকৃতির লোককে একত্রে দেখে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আতঙ্কে শিউরে উঠে লক্ষ্মীকান্ত জিজ্ঞাসা করল, "কারা রে বাবা! এরা আবার কারা? এঁ্যা?"

অভয় দিয়ে সুরমা উত্তর দিল, "চুপ চুপ। ভয় নেই, চেনা লোক।"

অভিযানে বার হবার সময় খোকা বাবুর দল হট্টগোল করতে করতেই বার হত। হট্টগোল এবং সেই সঙ্গে লক্ষ্মীকান্তর অস্ফুট আর্ত্তনাদে বরুণার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। ভয় পেয়ে বরুণা অস্ফুট স্বরে ডেকে উঠল, "মাসী-ই! ও মাসী!"

কুনুইয়ের গুঁতোয় লক্ষ্মীকান্তকে নিজের ঘরের দিকে ঠেলে দিয়ে সুরমা এক ছুটে বরুণার ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, "কি দিদি? কি হয়েছে, ভয় কি?"

উঠে বসে সভয়ে বরুণা জিজ্ঞেস করল, "ও কিসের গোলমাল মাসী?"

চৌকির উপর উঠে বসে বরুণার মুখটা নিজের বুকের মধ্যে টেনে এনে আদর করে সুরমা বলল, "ও কিছু না, শুয়ে পড়ো তুমি। ঘুমোও। আমি আছি, বসে আছি।"

রূপগাছি অঞ্চলের একটা প্রধান রাস্তার উপর উজ্জ্বলা বিবির বাড়ী। সুমার্জ্জিত আলোকোজ্জ্বল প্রকোষ্ঠ। একটা পুরু গদির উপর বসে তাকিয়া হেলান দিয়ে উজ্জ্বলা গান গেয়ে চলেছে। এক জন ভদ্রবেশী যুবক উজ্জ্বলার পাশে বসে তবলা বাজাচ্ছে।

গদির এক পাশে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একজন পানোন্মত্ত সুবেশ যুবক। গানের শেষ কলিটি শেষ করে উজ্জ্বলা বিলোল

কটাক্ষে যুবকটির উদ্দেশ্যে বলে উঠল, "কেয়া বাবুসাহেব! ভালো লাগলো তো?"

অত্যধিক মদ্যপানে যুবকটি উত্থানশক্তিরহিত হয়ে পড়েছে। পাত্রের শেষ সুরাটুকু অতিকষ্টে নিঃশেষ করে, উপুড় হয়ে যুবকটি পড়ে জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল, "বহুৎ ভালো লাগলো ভাই,—বোড়ো চমৎকার! আউর একটা তো হোক।"

যুবকটিকে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়তে দেখে তবলচি বাবু বেশ একটু খুশী হয়ে উঠল। তবলচি বাবু সুযোগ বুঝে দাঁড়িয়ে উঠে পাশের টেবিলের উপর থেকে একটা চাদর তুলে এনে অসহায় মাতাল যুবকটির আপাদমস্তক ঢেকে দিয়ে বলে উঠল, "এই না হলে বাবু, জমীদারের ছেলে! আর কে বড় ঘরের ছেলে, আর কে নয়, তা কি আর কারুর গায়ে লেখা থাকে? হাতে হাতেই সব মালুম হয়। দেখো দেখি, কেমন লক্ষ্মী ছেলে!"

তবলচি বাবুর মতলব বুঝতে উজ্জ্বলার বাকি থাকেনি। কোলের হারমোনিয়মটা দূরে ঠেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে উজ্জ্বলা উত্তর করল, "ভারি সুবিধে হলো তোর, না? ভারি আনন্দ।"

"সুবিধে হোলই তো"—বলে তবলচি বাবু এগিয়ে আসছিল। উজ্জ্বলা কয়েক পা পিছিয়ে এসে আপত্তি জানিয়ে বলল, "না না, ও-সব এখন হবে না। না, না বলছি—"

তবলচি বাবু ভদ্রলোকের ছেলে। বাড়ী বাড়ী তবলা বাজান ছিল তার পেশা। ছেলেবেলায় সখ করে শেখা তবলা বাজান এমনি ভাবে একদিন কাযে লাগবে, তা সে কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবেনি। রূপজীবিনীদের মধ্যে উজ্জ্বলাই তাকে বেশী আমোল দিত। অনুরূপ ভাবে সে-ও অন্য সকলের চেয়ে উজ্জ্বলাকেই খুশী করত বেশী। এমনি আদান-প্রদানের মধ্যে তবলচি প্রতুল বাবুর সঙ্গে রূপজীবিনী উজ্জ্বলার একটা প্রগাঢ় সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। রাত্রি বারোটার পর ব্যবসার শেষে প্রত্যহই তাদের মিলন ঘটে। উৎফুল্ল হয়ে এগিয়ে এসে প্রতুল বাবু উজ্জ্বলাকে বুকের মধ্যে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে বলল, "আনন্দ তো হচ্ছেই, তবে দুঃখও যে হচ্ছে না, তা নয়। দুঃখ হচ্ছে ওর কথা ভেবে। দেখ না, ২০০৲ টাকা খরচ করে, করকরে কুড়িখানা নোট গুণে হতভাগা যে সময়টুকু কিনলো তা ওর আর নিজের ভোগে লাগল না, ভোগে লাগলো এই আমার।

প্রতুলের উক্তিতে উজ্জ্বলা শয্যাশায়িত ধনীর দুলালটির দিকে একবার চেয়ে দেখল। চাদরের তলা থেকে আরক্ত চোখ দু'টো বড় বড় করে সে তাদের দিকে চেয়ে দেখছে। করুণার দৃষ্টিতে যুবকটির প্রতি একবার চেয়ে দেখে উজ্জ্বলা বলল, "বড় যে সাধুতা দেখাচ্ছিস্? তুই খাস না মদ, না? দুষ্টু কোথাকার!"

উজ্জ্বলার মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে প্রতুল উত্তর দিল, "হাঁ, আমি মদ খাই, কিন্তু মদে আমায় খায় না। মদে মোহ আছে কিন্তু আনন্দ নেই। প্রমাণ তো ওই সামনেই রয়েছে।"

অবস্থা যতই না কাহিল হোক, যুবকটি তার স্নায়ুর শক্তি তখনও হারায়নি, ভিতরে ভিতরে জ্ঞান তার পুরামাত্রায় বর্তমান। তার নির্দ্ধারিত প্রিয়তমাকে এক জন সামান্য তবলচির কণ্ঠলগ্না দেখে রোষ-কষায়িত চক্ষে সে তাকাতে থাকে, কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও মুখ দিয়ে তার কোনও শব্দ বা প্রতিবাদ বার হয় না। অক্ষমতার গ্লানিতে যুবকের মনটা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। ক্ষুব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সে গুমরে গুমরে কেঁদে ফেলল। মাতালের সান্নিধ্য উজ্জ্বলার নতুন নয়। তার এই ক্রন্দনের প্রকৃত কারণ বুঝতে উজ্জ্বলার বাকি থাকেনি। আঁচলের খুঁটে-বাধা নোট ক'টা মুঠি করে চেপে ধরে উজ্জ্বলা অতুলের আলিঙ্গন-পাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল এবং তার পর অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে উত্তর করল, "যত বাঁদরামী তোর ব্যবসার সময়, না? এমন করলে কি ব্যবসা চলে? চার ঘণ্টাও সবুর সয় না তোর? না না, এ ভালো নয়। না ভাই, এতে পাপ হয়।"

কথা কয়টি শ্রুতি-কঠোর হলেও তার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে। লজ্জিত হয়ে প্রতুল বাবু কয়েক পা পিছিয়ে এসে দাঁড়াল। উজ্জ্বলা জিজ্ঞাসা করল, "কি রে, রাগ করলি?"

বেরিয়ে যেতে যেতে প্রতুল উত্তর দিল, "না না। আমি যাই এখন। দোষ তো আমারই, ঠিক বলেছিস তুই।"

উত্তরে উজ্জ্বলা বলতে যাচ্ছিল, "আসবি তো একটু পরে?"

ঠিক এই সময় এক দল লোক দরজার সামনে এসে ভীড় করে দাঁড়াল। ভিড়ের মধ্য থেকে যে লোকটি ছোরা হাতে প্রথম এগিয়ে এল, সে খোকা নিজে। প্রতুল খোকাকে চিনত। একটা ছুরি মারার কেসে সে খোকার বিরুদ্ধে আদালতে একবার সাক্ষ্যও দিয়েছে। প্রতুল মেঝের উপর দাঁড়িয়ে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে থাকে, না পারে এগুতে না পারে পিছুতে।

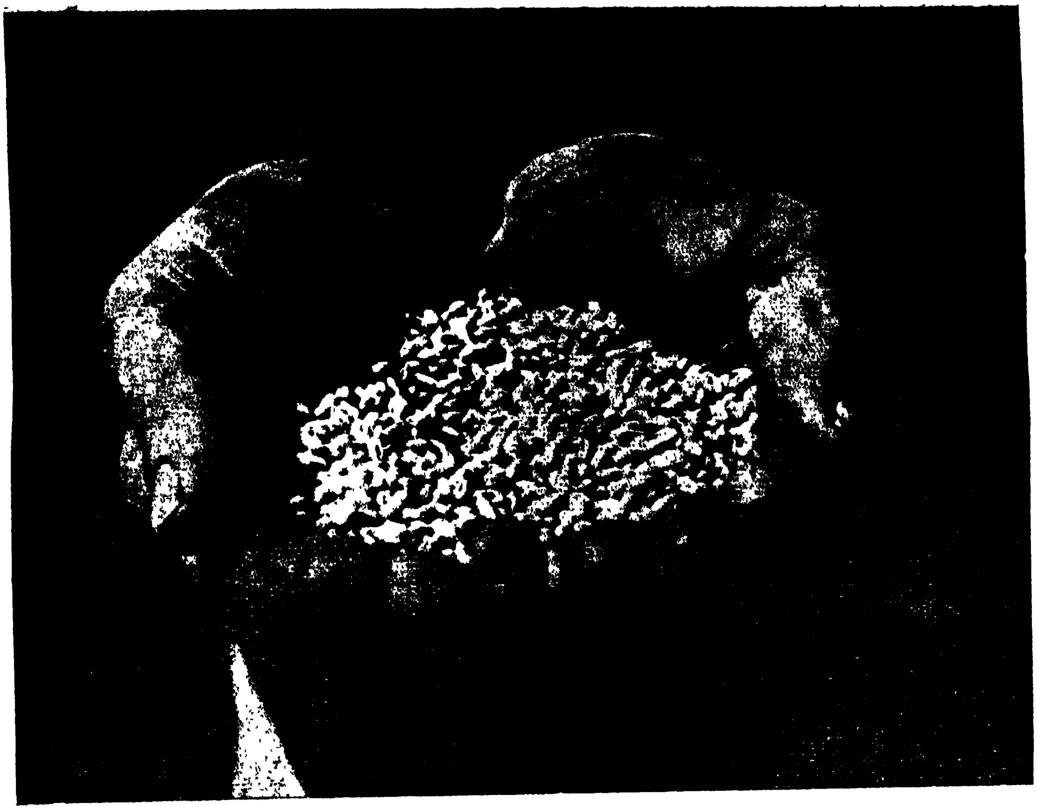
খোকা ঘরের মধ্যে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠল, "খবরদার সব! যে যেখানে আছিস্ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবি।" এর পর খোকা যুবকটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে গোপীকে জিজ্ঞাসা করল, "কি রে, এই তোর সেই মক্কেল না কি? এতো একটা মড়া রে! এ্যা? না, তোর জন্যে মান-ইজ্জৎ সবই গেল দেখছি।"

"ভারি বাজে বকিস্ তুই"—বলে গোপী এগিয়ে এসে যুবকটির পকেট কয়টি চট্-পট্ তল্লাসী সুরু করে দিল। যুবকটির পকেটে সর্ব্বসমেত ছ'শো বাইশ টাকা ছিল। নোট ও টাকা কয়টি বার করে নিয়ে গোপী যুবকটির সোনার হাত-ঘড়ি ও হীরের আঙটিও খুলে নিল। যুবক সবই বুঝল, কিন্তু বাধা দিতে পারল না। ঘড়ি, নোট, আঙটি প্রভৃতি দ্রব্যগুলি পকেটস্থ করতে করতে গোপী বলল, "লোকটা একেবারে বেসামাল হয়ে পড়েছে। আর একটু হ'লে এই মাগীই সব বার করে নিত। যাক্, ভালই হয়েছে।"

হঠাৎ খোকার নজর পড়ল প্রতুলের দিকে। খোকা ছুটে এসে প্রতুলের গলাটা বাম হাতে টিপে ধরে, ডান হাত দিয়ে ছুরিখানা তার নাকের উপর উঁচিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, "কে রে, কে তুই? এ্যা? চেনা-চেনা মনে হচ্ছে যেন! কে বল দিকি তুই?"

ছুরি হাতে খোকাকে প্রতুলের উপর ঝাপিয়ে পড়তে দেখে উজ্জ্বলা আর স্থির থাকতে পারল না। সত্যই সে প্রতুলকে ভালবাসত। উজ্জ্বলা ছুটে গিয়ে খোকা ও প্রতুলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলে অনুযোগ জানাল, "না না, ওকে মারবেন না। মারবেন না ওকে। ও, ও তো তবলচি। সত্যি বলছি, ও কিচ্ছু জানে না। গরীব লোক ও—"

তবলচির উপর উজ্জ্বলার এইরূপ দরদ দেখে খোকা হেসে ফেলল। আসল বিষয়টি বুঝতে তার বাকি থাকেনি। হেসে ফেলে একটু রগড় করার উদ্দেশ্যে পুনরায় ছুরিখানা উঁচিয়ে ধরে খোকা হেঁকে উঠল, "না, ওকে আমি মারবই। মারবই আজ ওকে আমি।"



দি গুড আর্থ

শিশির সেনগুপ্ত

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

১৭

মেয়েটির কথা থামতেই একটা মৃত্যু-নীরবতা নামল যেন প্রাসাদে। তখন মেয়েটি আবার বল্লে—'কিছুই ঝপাৎ করে ঘটেনি। বুড়ো কর্তার বাপের আমল থেকেই এ সংসারে ভাঙন ধরেছে। গত পুরুষ থেকে কর্তারা জমিদারী দেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। নায়েবদের হাত থেকে টাকা নিয়ে দু'হাতে জলের মত খরচ করে গেছেন। এ পুরুষে জমির ফসলও এক দিকে যেমন কমতে সুরু করেছে তেমনি জমির টুকরোও পরের হাতে গিয়ে পড়েছে।'

'ছোট কর্তারা সব কোথায়?' বিমূঢ় দৃষ্টিতে চারি পাশে তাকিয়ে ওয়াঙ বল্লে। কোন কথাই তার যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না;

'এখানে ওখানে ছিটকে পড়েছে।' মেয়েটি নিস্পৃহ কণ্ঠে বল্লে। 'তবু ভাল যে মেয়ে দু'টির আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। বাপ মার কথা যখন শুনল বড় ছেলে, তাদের নিয়ে যাবার জন্যে সে লোক পাঠালে। কিন্তু বড়ো কর্তাকে না যাবার জন্যে আমি তাগিদ দিলাম। আমি বল্লাম, এ প্রাসাদে কে থাকবে আপনি চলে গেলে। আমি ত মেয়েমানুষ মাত্র।'

মেয়েটি রাঙা চিকণ ঠোঁট দু'টি বঙ্কিম করল। বড় বড় দু'টি নির্ভীক চোখ তুলে বল্লে—'তা ছাড়া বুড়ো কর্তার বহু দিনের বাঁদী আমি। আমার নিজের কোন ঘর নেই।'

এই মেয়েটির দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে ওয়াঙ দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নিলে। মুমূর্ষু বৃদ্ধের কাছ থেকে শেষ সম্বলটুকু হস্তগত করার জন্যেই এই মেয়েটি আজো তাকে আঁকড়ে ধরে আছে ভাবতেই তীব্র ঘৃণার সঙ্গে বল্লে সে—'তুমি বাঁদী। তোমার সঙ্গে ব্যবসার কথা বলব কি করে?'

মেয়েটি রুক্ষ হয়ে বল্লে—'আমি যা বলব তাই হবে।'

এ উত্তরে দ্বিধাগ্রস্ত হোল ওয়াঙ। জমি যখন রয়েছে, সে যদি না কেনে অপর কেউ হয়ত এই মেয়েটিরই মধ্যস্থতায় তা কিনে নেবে।

'আর কত জমি আছে?' অনিচ্ছুক কণ্ঠে প্রশ্ন করল ওয়াঙ। কিন্তু মেয়েটি ইতিমধ্যেই তার ইচ্ছা জেনে ফেলেছে।

'যদি জমি কিনতে এসে থাক—জমি আমাদের আছে। পশ্চিমের জমি একশো একর আর দক্ষিণের জমি দু'শো একর উনি বেচবেন। সব জমি অবশ্য এক নয়—তবে এক এক ভাগ খুবই বড়। আমরা শেষ একরটি অবধি বেচতে চাই।

এ কথায় ওয়াঙের বুঝতে বিলম্ব হোল না যে, এই মেয়েটি বড় কর্তার-সম্পত্তির সব সংবাদই রেখেছে নিজের কাছে। কিন্তু মনের বিশ্বাস তার যেন আর আসতে চায় না।

'ছেলেদের পরামর্শ না নিয়ে কর্তা সব জমিই বা বেচবেন কেন?'

'সে কথা যখন তুল্লেই তখন বলছি শোন। ছেলেরা বাপকে বলেছে যখন পারবে জমি বিক্রী করে দিতে। যে সব জমি এখন বেচা হচ্ছে, সেখানে ছেলেরা কেউই বাড়ী করে থাকতে চায় না। এই সব দুর্ভিক্ষের সময় ডাকাতদের অত্যাচার সুরু হয় ঐ সব এলাকায়। ছেলেরা বলেছে—আমরা যখন বাসই করব না তখন জমি বেচে টাকা ভাগ করে নাও।'

'কিন্তু দাম আমি কার হাতে দেবো?'

'বড়ো কর্তার হাতে দেবে, আবার কোথায়?' সরল কণ্ঠে বল্লে বটে মেয়েটি কিন্তু ওয়াঙ বুঝলে যে বুড়ো কর্তার মুঠি শ্লথ হয়ে যায় এই বাঁদীটির কাছে।

সুতরাং আর কথা না বাড়িয়ে ওয়াঙ 'আরেক দিন আসা যাবে' বলে মুখ ফেরালে। দরজার দিকে পা বাড়াতেই মেয়েটিও চীৎকার করতে করতে তার পিছু নিলে। 'নয় আজ, নয় কাল। আজ কালের আবার কি কথা আছে। যখনই নেবে তখনই সময়।'

নিঃশব্দে ওয়াঙ গেট পেরিয়ে পথে এসে দাঁড়াল। কোন কিছু করার আগে ভালো করে চিন্তা তাকে করতেই হবে। যা সব শুনল সে, তাদের ওজন করতে হবে মনে মনে। কাছের ছোট চায়ের দোকানটিতে বসে চা খেতে খেতে ওয়াঙের মন যেন একান্ত অকারণেই খুসী হয়ে উঠল। যে বংশ তার পিতা এবং পূর্বপুরুষের আয়ুষ্কাল ব্যেপে বিরাট আভিজাত্য ও বিপুল গরিমার মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তার এই পতনের কথা চিন্তা করে সে আরো পুলকিত হোল।

'মাটীর সঙ্গছাড়া হওয়ার এই হোল সাজা।' মনে মনে ভাবলে ওয়াঙ। আর সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত করল মনে মনে যে, তার যে দু'টি ছেলে বসন্তের নবীন বেতস-চারার মত মাথা তুলছে তাদের সে মাঠের কাজে নিযুক্ত করবে। রৌদ্রে ছুটোছুটি খেলা ছেড়ে তারা মাঠের কাজ করতে শিখবে। মৃত্তিকার রস নেবে মজ্জায় মজ্জায়—পায়ের নীচে কোমল কঠিন মাটীর স্পর্শ পাবে। হাতের তালুর মধ্যে অনুভব করতে শিখবে লাঙলের কাঠিন্য।

যাই ভাবুক মনে মনে, বুকের কাছে লুকিয়ে রাখা মণিগুলি যেন পীড়া দেয়। ভয়ও মনে মনে। হয়ত বা ছিন্ন আবরণ ভেদ করে সেগুলির দীপ্তি ঠিকরে পড়বে বাইরে। হয়ত কেউ দেখে চীৎকার করে বলবে—ঐ দেখ, একটা ফকির বাদশাহের সম্পদ নিয়ে বেড়াচ্ছে।'

মণিগুলির বিনিময়ে যতক্ষণ না জমি আসছে তার নাগালে, মনের শান্তি নেই। অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর এক ফাঁকে ওয়াঙ দোকানীকে ডেকে বললে—। 'এসো না ভাই—আমার দামে এক কাপ চা খেয়ে দু'টো কথা কও পুরো এক বছর সহরে ছিলাম না—কি সব খবর আছে বলো না।'

দোকানী খুব্ধ হয়ে ওয়াঙের কাছে এসে বসল; লোকটির গায়ের জামা ময়লা। সে নিজেই দোকানের খাবার রান্না করে—তাই কেউ প্রশ্ন করলে সে বলে—'যে ভাল রাঁধতে জানে তার কখনো জামা পরিষ্কার থাকে না, এই কথাই লোকে বলে।'

ওয়াঙের দিকে তাকিয়ে লোকটি বল্লে—' দুর্ভিক্ষের কথা বাদ দাও। ও ত লেগেই আছে। কিন্তু বড় খবর হোল হোয়াং-প্রাসাদে ডাকাতি।'

তার পর লোকটি নানা ভাবে সেই ডাকাতির গল্প করতে লাগল। কি ভাবে চাকরগুলি সব ত্যাগ করে পালিয়েছিল। কি ভাবে ডাকাতেরা উপপত্নীদের উপর অত্যাচার করে, তার পর তাদের নিয়ে পালিয়েছে। সারা প্রাসাদের উপর এমন রাহাজানি করে গেছে যে এখন আর কেউ সেখানে থাকে চায় না। কেউই থাকে না শুধু বুড়ো কর্তা আর কোকিলা ছাড়া। এই মেয়েটা বহু দিন ধরে বুড়ো কর্তার খাস-কামরায় কাজ করছে। মেয়েটা এমন চতুর যে কর্তার খাস-কামরায় আর কেউই বেশী দিন টিকতে পারেনি।

'মেয়েটার কেমন জোর খাটে কর্তার উপর?'

'এখন অবশ্য মেয়েটাই সর্বেসর্বা। বুড়ো কর্তার সব কিছুর ওপর তারই তাঁবেদারী। সেই সব নিচ্ছে দিচ্ছে। কিন্তু এক দিন যখন কর্তার ছেলেরা আসবে সেদিন তার কপালে বিতাড়ন আছে বলে দিলাম। তবে মেয়েটা যা করে নিয়েছে তাতে ওর একশ' বছর ভাল ভাবেই চলে যাবে।'

'আর জমিগুলো?' কৌতূহলে ওয়াঙের সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে থর থর করে।

'জমি?' লোকটা নিস্পৃহ কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করলে মাত্র। এ কথা তার মনে কোন সাড়া জাগালে না।

'জমি কি বেচবে ওরা?'

এমন সময় এক জন নতুন খরিদ্দার এসে পড়ায় লোকটি তাড়াতাড়ি করে বল্লে—'শুনেছি, জমি না কি বেচবে ওরা। শুধু যেটুকুতে ওদের পূর্বপুরুষের গোরস্থান আছে সেটুকু বাদ দিয়ে।'

এ কথা শোনবার পর ওয়াঙ আবার বড় বাড়ীর দরজায় এসে ধাক্কা দিলে। মেয়েটি দরজা খুলতেই ওয়াঙ তাকে প্রশ্ন করলে—'আগে আমাকে বলো, বড়ো কর্তার নিজের শীলমোহরে সব লেন-দেন হবে ত?'

'দিব্যি করে বলছি—তাই হবে—তাই হবে।'

তখন ওয়াঙ তাকে সহজ করে প্রশ্ন করলে—'জমির দাম নেবে রূপোয়, না সোনায়? মণি-মুক্তো চাও ত তাও দিতে পারি।'

মেয়েটির চোখ দু'টি লোভে চিকচিক করে উঠল—'মণি-মুক্তো নিয়েই জমি বেচব।'

১৮

এখন একটি মানুষ আর একটি বলদে ওয়াঙের জমি আর কুলায় না। এক জন লোকের পক্ষে গোলাজাত করার চেয়ে ঢের বেশী ফসল ফলে জমিতে। কাজেই ওয়াঙ তার বাড়ীর কাছে আরো একটা ছোট ঘর তুলে একটি গাধা কিনে এনে রাখলে। তার পর এক দিন প্রতিবেশী চাংকে ডেকে বললে সে—'তোমার জমির টুকরোটি বিক্রী করে দাও আমার কাছে। তোমার ও শূন্য আঙিনা ছেড়ে চলে এস আমার বাড়ীতে। সাহায্য করবে আমাকে মাঠের কাজে।' চাং রাজী হ'লে সানন্দে।

এ বছর ঠিক সময়েই বর্ষা নেমেছে। কচি ধানের চারায় জীবনের জোয়ার লাগে। গম কাটার শেষে ভারী ভারী শীষ শুদ্ধ গম মাড়াই করে তারা দু'জনে ঐ কচি ধানের চারা জল-প্লাবিত মাঠে রুয়ে দিল। এত দিন যত ধান বুনেছে তার চেয়ে অনেক বেশী ধান রুইল ওয়াঙ। এত প্রচুর জল হয়েছে যে আগে যে সব জমি বন্ধ্যা থাকত এবার সেখানেও ফসল ফলবে। তার পর যখন ধান কাটার সময় এল দু'জনে মিলে সে সব ঘরে তোলা অসম্ভব হয়ে ওঠল। ওয়াঙ দিন-মজুরীতে আরো দু'জন লোক আনলে। সবাই মিলে এবার ধান তুলল তারা।

কাজ করতে করতে ওয়াঙের মনে পড়ে বড়-বাড়ীর অলস কর্তাদের কথা। যাদের আভিজাত্য, আর আলস্য প্রকৃতির হাতে মার খেয়ে মাটীতে লুটিয়েছে। সেই কারণে নিজের ছেলে দু'টিকে প্রতিদিন মাঠে যাবার জন্য কঠোর ভাষায় আদেশ দেয়—ছোট হাতে যে কাজ করা সম্ভব সে রকম কাজ দেয় তাদের। বলদ আর গাধা চরায় ছেলে দু'টি। ভারী পরিশ্রমের কাজ না পারুক অন্ততঃ খোলা গায়ে সূর্য্যের

তাত লাগুক। আলের পথে বারবার আসা-যাওয়ার শ্রান্তির অভিজ্ঞতা হোক।

কিন্তু ওলানকে আর সে মাঠে যেতে দেয় না। আজ সে ত আর একান্ত গরীব চাষীর ঘরণী নয়। এখন তাদের জন খাটাবার সামর্থ্য হয়েছে। এবারকার মত এমন ফসল আর হয়নি কখনো। ফসল গোলাজাত করতে আরো একটা গোলাঘর ওঠাতে বাধ্য হয় সে। ওয়াঙ একপাল মুরগী আর তিনটে শূয়োর কিনে এনেছে। মাড়াইয়ের পর পড়ে থাকা শস্যের দানা খুঁটে খায় তারা।

ওলান ঘরেই থাকে। প্রত্যেকের জন্যে সে নতুন নতুন জামা তৈরী করে। প্রত্যেকের বিছানার জন্য নতুন ফুলকাটা ওয়াড়ে টাটকা তুলো ভরে তোষক সেলাই করে। এই ভাবে নূতনত্বে ভরে ওঠে গৃহস্থালী। এমনি করে এক দিন ওলান আবার শয্যাগত হয়। আবার শিশু-সম্ভাবনা হয়। কিন্তু এখনও সে কারুর সাহায্য নেয় না।

এবার প্রসব হতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। বিকেলে বাড়ী এসে ওয়াঙ দেখলে তার বাবা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। হাসতে হাসতে বললেন—'এবার যমজ।'

ওয়াঙ ঘরে ঢুকে দেখলে পাশে দু'টি নবজাত শিশু নিয়ে ওলান বিছানায় শুয়ে আছে। একটি ছেলে, একটি মেয়ে।

একটি বীজ থেকে দু'টি শস্যদানা। স্ত্রীর কৃতিত্বে ওয়াঙ হো হো করে হেসে উঠল। একটা চমৎকার কথা ওর মনে পড়ে গেল। এই জন্যেই বুঝি তুমি বুকে দু'টি মণি পরেছিলে।'

নিজের চিন্তায় আবার হাসে ওয়াঙ। ওলানও হাসে সেই করুণ স্মিত হাসি।

এবার আর ওয়াঙের কোন ক্ষোভ নেই। শুধু একটি দুঃখ এই যে, বড় মেয়েটি এখনও কথা বলতে পারে না। শুধু বাপের সঙ্গে দেখা হলে সেই মুখ স্নিগ্ধ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ অপূর্ণতা কি শিশুটির প্রথম বছরের দুর্দিনের জন্য? এ কি সেই সময়কার অনশনের ফল? মাসের পর মাস কাটে। ওয়াঙ অপেক্ষা করে মেয়েটির মুখের প্রথম ভাষাটির জন্য; বাপকে ডাকার মিষ্টি দু'টি কথার জন্য। কিন্তু বোবা মুখ মুখর হয় না। শুধু সেই রিক্ত হাসি কাঁপে। বাপ তার দিকে চেয়ে বলে—'বোকা মেয়ে আমার—ছোট বোকা মেয়ে।'

নিজের মনে মনেই সে বলে—হতভাগিনীকে যদি বেচে ফেলতুম হয়ত তারা একে মেরে ফেলত কোন দিন।'

এই মেয়েটি যেন নির্যাতিত মনে হয়। তাই বাপের স্নেহসিক্ত হয় সে-ই বেশী। মাঝে মাঝে ওয়াঙ তাকে মাঠে নিয়ে যায়। মেয়েটি নিঃশব্দে বাপকে অনুসরণ করে। কিছু বললে হাসে। ওয়াঙ তাই চেয়ে চেয়ে দেখে।

মহাচীনের যে অংশে ওয়াঙ বাস করে, যেখানে তার পিতৃ-পুরুষের ভিটে, সেখানে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর দুর্ভিক্ষ আসে। যদি দেবতাদের একটু দয়া হয় ত সাত-আট এমন কি দশ বছর অন্তর আসে বিপর্যয়। এর কারণ হয় অত্যধিক ধারা-বর্ষণ নয় ত অনাবৃষ্টি অথবা বৃষ্টি আর দূরের পর্বতমালার গলিত তুষারের ফলে উত্তরের নদী ফুলে ফেঁপে শতাব্দীর বহু মানুষের শ্রমনির্মিত বাঁধ ভাসিয়ে প্লাবিত করে দেয় মাঠ—প্রান্তর।

বার বার মানুষ ভিটেমাটী ছেড়ে পালিয়ে গেছে, আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু এখন ওয়াঙ তার ভবিতব্যকে এমন দৃঢ় বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে লাগল যে, অনাগত দুর্দিনে আর সে কিছুতেই মাটী ছেড়ে নড়বে না। এখানে এই সুদিনের ফসল ভোগ করবে, আর প্রতীক্ষা করবে দুর্যোগের কালো রাত্রির পর সোনালী দিনের জন্য। সেই মত সে প্রস্তুত করতে লাগল। ভগবানও সহায় হলেন। ক্রমান্বয়ে সাত বছর মাটীর দাক্ষিণ্যে ওয়াঙ সুখী হোল। প্রতি বছর ক্ষেতের কাজের জন্য আরো বেশী জন খাটিয়েছে সে। এখন দিন-মজুরের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছয়। পুরানো বাড়ীর পিছনে আর একটি নতুন বাড়ী তৈরী করাল ওয়াঙ। সামনে আঙিনা; আঙিনার পর প্রকাণ্ড একটি ঘর আর তার দু'পাশে দু'টি ছোট ছোট ঘর। ঘরগুলোর ছাদ তৈরী হোল টালি দিয়ে কিন্তু দেয়ালে ওয়াঙ ছেনা মাটী দিলে। কেবল চূণকাম করে পরিচ্ছন্ন করে নিল ঘরগুলিকে। এই নূতন গৃহে সে তার পরিবার নিয়ে চলে এল আর চাকররা আর তাদের সর্দার চীং পুরানো বাড়ীতেই বাস করতে লাগল।

এত দিনে ওয়াঙ চীংকে ভাল করে পরীক্ষা করবার সুযোগ পেয়েছে। লোকটি অত্যন্ত সৎ ও বিশ্বাসী। ওয়াঙ তাকে মাহিনাও দেয় ভাল। কিন্তু ওয়াঙের মমতাময় প্রীতি সত্ত্বেও চীংয়ের গায়ে একটুও মাংস লাগে না। সারা দিনই চীং কাজে ব্যস্ত থাকে। কথা বলে কম, কেবল ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোদাল চালিয়ে যায়, বালতি বালতি জল বা সার টেনে নিয়ে যায় মাঠে জমিকে সুফলা করবার জন্য।

কিন্তু ওয়াঙ জানে যদি কোন চাকর খেজুর গাছের ছায়ায় বেশীক্ষণ ঘুমায় বা ন্যায্য ভাগের চেয়ে বেশী কড়াইয়ের ঘণ্ট খেয়ে ফেলে অথবা কেউ যদি বৌ-ছেলে নিয়ে এসে মাড়াইয়ের সময় ছিটকে পড়া শস্যকণা মুঠি ভরে ঘরে চালান দেবার চেষ্টা করে, তাহলে চীং ওয়াঙকে জানিয়ে দেবে। আর উপদেশ দেবে যেন আগামী সনে তাকে আর কাজে আর না রাখা হয়।

মনে হয়, যেন এক মুঠি মটর আর শস্যদানার বিনিময়ে এই দু'টি মানুষ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। কিন্তু চীং কোন সময়েই ভোলে না যে সে মাত্র মজুরের সর্দার, যে বাড়ীতে সে বাস করে সেখানে তার দাবী নেই।

পঞ্চম বছরের শেষে ওয়াঙ নিজে খুব কম কাজই করতে লাগল মাঠে। চাকরদের সংখ্যা অনেক বাড়ার ফলে সে ভাল বেচা-কেনা আর তত্ত্বাবধানের কাজই করতে লাগল। লেখা-পড়া না জানায় ভারী অসুবিধা হোল ওয়াঙের। কাগজে উটের লোমের তুলি আর কালি দিয়ে কি যে লেখা হয় কোন ধারণা নেই তার। এটা তার পক্ষে বড়ই অপমানকর যে শস্যের দোকানে যেখানে বেচাকেনা হয় সেখানে কোন চুক্তিপত্রে মুসাবিদা করতে হলে সহরের মেজাজী গোলদারদের কাছে তাকে বিনীত হয়ে বলতে হয়—দয়া করে পড়ে দিন না কি লিখেছেন। আমরা মুখ্য মানুষ।

আরো অপমান বোধ হয় যখন সেই চুক্তিপত্রে সই করবার জন্য কোন নগণ্য কেরাণীর কাছে সাহায্য নিতে হয়। হয় ত লোকটি উপহাস করে বলে—'তোমার লুঙের বানান কি আমি বুঝব!

আরো নীচু হয়ে ওয়াঙ তখন বলতে বাধ্য হয়—'আপনাদের যা মর্জি হয় লিখুন। আমরা হলাম হাবা লোক।'

এই রকম একটি দিনে ফসল তোলার সময় শস্যের দোকানে এসে কেরাণীদের হাসির রোল শুনে অত্যন্ত তপ্ত হয়ে ওয়াঙ নিজের মনে বিড় বিড় করতে করতে মাঠে ফিরে এল।

'সহরের এই সব মুখ্যুগুলোর এক কড়ি জমি নেই অথচ আমি কাগজের উপর তুলির টানের অর্থ বুঝি না বলে আমাকে দেখে ঐ ভাবে হাসতে লজ্জা হয় না ওদের।' তার পর রাগ পড়ে এলে মনে মনে সে আবার ভাবে—'সত্যিই লিখতে পড়তে না জানা অতি লজ্জার কথা। বড় ছেলেটাকে মাঠ থেকে সরিয়ে এনে ভর্তি করে দেব সহরের স্কুলে। সে লেখাপড়া শিখবে। আমি যখন শস্যের দোকানে যাব সে আমার লেখাপড়ার কাজ করে দেবে। তা হলেই আমার মত চাষীর প্রতি ওদের উপহাসেরও শেষ হবে।'

মনের এই ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই বড় ছেলেকে ডেকে পাঠালে ওয়াঙ। বারো বছরের ছেলে। মায়ের মতই তার শরীরের গড়ন। ছেলেটি এসে দাঁড়ালে, ওয়াঙ বললে—'আজ থেকে আর মাঠে যাবার দরকার নেই। পরিবারের এক জনের লেখা-পড়া জানা দরকার, যে আমার হয়ে বেচা-কেনার কাগজ তদারক করতে পারবে। আমাকে আর তা হলে অপমান হতে হবে না।'

বাপের কথায় ছেলের মুখ লাল হয়ে উঠল। উজ্জ্বল দু'টি চোখ তুলে সে বললে—'গত দু'বছর ধরে আমিও মনে মনে তাই ইচ্ছা করেছি বাবা, কিন্তু সাহস করে এক দিনও বলতে পারিনি।'

এ কথা শুনে ছোট ছেলেটিও কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হোল। এই ছেলেটির যে দিন থেকে মুখ ফুটেছে সে সব সময় বকে—হৈ-হৈ করে, অন্যের চেয়ে তাকে কম দেওয়া হয়েছে বলে চেঁচামেচি করে বায়না ধরে! এখন সে বাপের কাছে ঘ্যানঘ্যান শুরু করে দিলে।

'বেশ। আমিও তাহলে মাঠে কাজ করব না। দাদা চুপচাপ চেয়ারে বসে লেখা-পড়া করবে আর আমি তোমারই ছেলে মাঠে মজুরদের মত কাজ করব? তা হবে না।'

এই ছেলেটির হৈ-চৈ ওয়াঙ কোন দিনই বরদাস্ত করতে পারে না। কাজেই সে তাড়াতাড়ি বললে—'বেশ, দু'জনেই যেও। ঈশ্বর না করুন, যদি এক জনের অমঙ্গল হয় আমার ব্যবসায়ের জন্য আর একটি ত থাকবে।'

তখন ছেলেদের মা সহরে গিয়ে তাদের জন্যে ঢিলে পোষাকের কাপড় কিনে আনলে। আর ওয়াঙ সহর থেকে তাদের লেখার কালী আর তুলি নিয়ে এল। দোকানে গিয়ে ভালো-মন্দ নির্বাচন করার ক্ষমতা নেই জেনে সে দোকানীর সব কিছুকেই বাজে বলে উড়িয়ে দিতে লাগল। অবশেষে সব ঠিক-ঠাক হলে ছেলেদের সহরে পাঠান হোল। নগরদ্বারের কাছেই ছোট পাঠশালাটি। এক জন বৃদ্ধ পণ্ডিতের সেটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। বাড়ীটির মধ্যিখানের ঘরে টেবিল-বেঞ্চি পেতে তিনি ছাত্রদের জ্ঞান দান করেন। বিনিময়ে প্রতি বৎসর উৎসবের সময় এককালীন পারিশ্রমিক আদায় করেন। ছেলেরা যদি পড়া-লেখায় ফাঁকি দিতে চায় অথবা মুখস্ত পড়া ঠিক-মত দিতে না পারে পণ্ডিত মশাই তার ভাঁজ করা বড় পাখাটি দিয়ে তাদের প্রহার করতে কসুর করেন না।

শুধু গ্রীষ্ম আর বসন্তের তপ্ত মধ্যাহ্নগুলিতে ছাত্রেরা একটু আলস্য ভোগ করতে পায়। এ সময় আহারের পর পণ্ডিতের মাথা ঘুমে ঢুলে আসে। ছোট অন্ধকার ঘরটি তার নাসিকাগর্জনে গম-গম করতে থাকে। ছেলেদের মধ্যে তখন কলরব ওঠে। এক সময় বৃদ্ধের ঝুলে পড়া মুখের চারি ধারে একটি মাছি উড়তে থাকে। ছেলেরা হৈ-হৈ করে—তর্ক করে মাছিটির মনস্তত্ত্ব নিয়ে। পণ্ডিতের জ্ঞানী মুখবিবরে সেটি ঢুকবে কি না এ নিয়ে ঝগড়া বাধে। কিন্তু হঠাৎ বৃদ্ধ চোখ খোলেন। মনে হয়, তিনি এতক্ষণ জেগেই ছিলেন। বিশেষ করে এই ভাবে প্রাক্-সঙ্কেত না দিয়ে জেগে ওঠার কোন অর্থ পায় না ছেলেরা। তখন পণ্ডিত সামনে যেটিকে পান তাকেই প্রহার করতে সুরু করেন। তাঁর পাখার শব্দ আর ছেলেদের আর্তনাদ শুনে প্রতিবেশীরা বলাবলি করে—'যাই বল, এই রকম পণ্ডিত দেখা যায় না।'

এই সুনামের জন্য ওয়াঙও তার ছেলেদের এই পণ্ডিতের কাছে লেখাপড়া শিখতে আনল।

প্রথম দিন ওয়াঙ ছেলে দু'টিকে এখানে নিয়ে এল। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বাপের পিছু-পিছু ছেলে দু'টি হেঁটে এল। ওয়াঙ একটু নীল ঝাড়নে টাটকা ডিম এনেছিল। পণ্ডিতকে ডিমগুলি উপহার দিলে সে। পণ্ডিতের মস্ত পেতলের চশমা, আলখাল্লার মত পোষাক আর বিরাট পাখা দেখে সে রীতিমত বিব্রত বোধ করল। নমস্কার করে বললে ওয়াঙ—'পণ্ডিত মশাই, এই আমার দু'টি বোকা ছেলেকে এনেছি। এদের মাথায় বিদ্যে ঢোকাতে হলে আপনার হাতের মার দরকার হবে ওদের। এদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য দরকার করে মারতেও আপনি কসুর করবেন না।'

ছেলে দু'টিকে পিছনে রেখে একাকী বাড়ী ফিরবার সময় ওয়াঙের বুক গর্বে ভরে ওঠে। তার মনে হোল, পাঠশালার সকল ছেলের মধ্যে কোনটিই তার ছেলেদের মত অমন লম্বা আর বলিষ্ঠ নয়! কারুরই মুখ অমন উজ্জ্বল নয়। নগর-দ্বার পার হবার সময় আর এক জন প্রতিবেশী চাষার প্রশ্নের উত্তরে সে বললে—'ছেলেদের পাঠশালায় দিয়ে এলাম।' লোকটির বিস্ময় সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে সে—'তাদের ত আর মাঠে দরকার হোল না। তারা এখন পেট ভরে লেখা-পড়া শিখুক।'

আরো এগিয়ে এসে ওয়াঙ নিজের মনে মনে বললে—বড়টি যদি মস্ত পণ্ডিত হয়ে ওঠে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

এর পর থেকে ছেলে দু'টিকে 'বড়' 'ছোট' বলে ডাকা বন্ধ হোল। বৃদ্ধ পণ্ডিত তাদের নূতন নামকরণ করেছেন। বাপের পেশার কথা জেনে নিয়ে তিনি তাদের নাম দিয়েছেন নাঙ এন আর নাঙ ওয়েন।

'নাঙ' শব্দের অর্থ যে মানুষ মাটী চষে লক্ষ্মীর আশীর্বাদ পেয়েছে।

১৯

এই ভাবে ওয়াঙ গড়ে তুলেছে তার সৌভাগ্যের ইমারৎ।

সপ্তম বছরের শেষে উত্তর-পশ্চিমে নদীর যেখানে উৎস সেখানে প্রচুর ধারা-বর্ষণ ও তুষারপাতের ফলে উত্তুরের জল এমন ফুলে ফেঁপে উঠল যে দুকূল ছাপিয়ে তেড়ে এল বন্যার জল। প্লাবিত করে দিল দিক্-দিগন্ত। কিন্তু ওয়াঙ একটুও ভয় পেলে না। তার জমির পাঁচ ভাগের দু'ভাগ এক বুক গভীর হ্রদে পরিণত হলেও একটুও ভয় পেলে না সে।

বসন্ত শেষ হয়ে গ্রীষ্ম এলেও, বর্ষার জল কমবার কোন লক্ষণই

দেখা গেল না। বিরাট সমুদ্র-মহিমায় বারিশয্যায় শুয়ে থাকে নদী। অলস মন্থর। জলের আয়নায় মুখ দেখে আকাশের চাঁদ আর মেঘ, উঠলো আর বাঁশের ঝাড়। জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেছে গুঁড়ি-গুলো। এখানে ওখানে পরিত্যক্ত মাটীর ঘর দাঁড়িয়ে থাকে, তার পর কয়েক দিন পরে জলের বুকে ধ্বসে পড়ে। ওয়াঙের মত যাদের বাড়ী কোন টিলার উপরে নয় তাদের প্রত্যেকের কপালে একই দুঃস্থতা। টিলার উপর বাড়ীগুলি ঠিক দেখায় দ্বীপের মত। লোকেরা সহরে যাওয়া-আসা করে নৌকায়।

কিন্তু ওয়াঙের ভয়ের কোন কারণ নেই। শস্যের দোকানে তার টাকা পাওনা। ঘরের ভাণ্ডার গত দু'মাসের উদ্বৃত্ত ফসলে ভরা। তার বাড়ী এত উঁচুতে যে বানের জল তার নাগাল পায় না। ওয়াঙের ভয় নেই।

এ বছর অনেক জমিই অনাবাদী রয়ে গেল। প্রচুর অবসর। জীবনে এমন কর্মহীন দিন কখনো আসেনি ওয়াঙের। এই অবিচ্ছিন্ন আলস্য আর গুরু ভোজনে ক্রমশঃ অস্থির হয়ে উঠল ওয়াঙ; ঘুমিয়েও আর দিন কাটে না। করবার যা সবই করা হয়ে গেছে। তা ভিন্ন যে সব বছর হিসাবী চাকর তার ভাত ধ্বংস করেছে তারা থাকতে সে কেমন করে নিজের হাতে কাজ করবে। চাকর-বাকররাই অর্দ্ধেক দিন কাটায় অলস ভাবে। অথচ জল নামবার কোন আশাই দেখা যায় না। পুরানো বাড়ীটার চাল ছাইতে আর নতুন বাড়ীর যে সব টালি ফুটো হ'য়ে গেছে সেগুলো বদলে দিতে সে হুকুম দিয়েছে। কোদাল, আঁচড়া, লাঙল প্রভৃতি মেরামত করতেও নির্দেশ দিয়েছে চাকরদের। গরুগুলোর খবরদারী করা, হাঁস কেনা আর শন পাকিয়ে দড়ী তৈরী করারও কাজ দিয়েছে তাদের। অতীতে যখন নিজের হাতে জমি চষত এ সব কাজ নিজেই তখন সে করত। এখন কর্মহীন দিন কেমন করে কাটাবে ভেবে পায় না সে।

কোন লোকই সারা দিন চুপচাপ বসে বসে বন্যার জল দেখতে পারে না। প্রতিবারে পেটে যা ধরে তার চেয়ে বেশী ত আর খাওয়া চলে না। ঘুমেরও ত শেষ আছে। অধৈর্যের মত সারা বাড়ী সে ঘুরে বেড়ায়। সব কেমন নিঝুম—তার দুরন্ত রক্তের পক্ষে অতি বেশী নিঝুম। বুড়ো বাপ আরও অথর্ব হয়ে পড়েছিল। আধা অন্ধ আর আধা কালা। 'খেয়েছেন কি না? শীত করছে না ত' অথবা 'চা খাবেন কি না' এমনি ধারা প্রশ্ন করা ছাড়া তাঁর সঙ্গে কথা বলারও প্রয়োজন নেই আর। এতে ওয়াঙ আরো অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে এই ভেবে যে বাবা ত দেখতে পাচ্ছেন না তাঁর ছেলে কত ধনী হয়ে উঠেছে। এখনও বিড়-বিড় করে বকেন তিনি—'ঘরে চায়ের পাতা নেই ত। একটু গরম জল হলেই চলবে—চা ত রূপোর সামিল।' বৃদ্ধকে কিন্তু বলারও প্রয়োজন হয় না—কারণ তিনি তখুনি সব ভুলে গিয়ে বিভোর হয়ে থাকবেন নিজের স্বতন্ত্র জগতে। সারা ক্ষণ চোখ বুজে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। দেখলে মনে হয় না এক সময় তাঁরও স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য ছিল।

বড় মেয়েটি বোকা। সে সারা ক্ষণ ঠাকুর্দার পাশে বসে এক ফালি কাপড় নিয়ে ভাঁজ করে আর খোলে, নিজের মনে হাসে। শুধু এদের দু'জনেরই এই শ্রীমন্ত মানুষটিকে বলার কিছু নেই। ওয়াঙ বাটি ভর্তি করে চা ঢেলে বাপকে এগিয়ে দেয়। মেয়েটির গালে হাত দিয়ে স্নিগ্ধ আদর করে ডাকে। মেয়েটির মুখও নিষ্পাপ শিশু-হাসিতে ভরে ওঠে। কিন্তু সেই বোবা হাসি এমন সহজে মিলিয়ে যায়—আবার চোখ দু'টিতে বিশ্বের রিক্ততা ফিরে আসে। ওয়াঙ বলার কথা ভুলে যায়। মেয়েটির মুখের এই মূক ব্যঞ্জনায় সে ক্ষুব্ধ হয়। অথচ পাশের ঘরে তার দুটি যমজ সন্তান আনন্দে ঘরময় দাপাদাপি করে বেড়ায়।

কিন্তু মানুষ সারা দিন শুধু ছোটদের ছেলেমি নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারে না। কিছুক্ষণ হাসি, হুলোড় আর জ্বালাতনের পর তারা নিজেদের খেলায় মেতে ওঠে। ওয়াঙ তখন আবার একাকী হয়। মন অশান্ত হয়ে ওঠে। এখন ওলানের দিকে মন ফেরে। পুরুষের মন নারীর দেহ চায়। এমন নারীকে—যার দেহের প্রতিটি খুঁটিনাটি তার জানা, যে তার সঙ্গে বাস করছে অনেক দিন, যে মিটিয়েছে তার সমস্ত ক্ষুধা, যার অজানা এমন কিছু নেই যা তার কাছে চাওয়ার বাকী আছে।

ওয়াঙের মনে হোল, জীবনে এই বুঝি প্রথম সে ওলানের দিকে তাকিয়ে দেখলে। এই তার প্রথম মনে হোল, ওলান অতি সাধারণ নিষ্প্রভ মেয়ে যে অন্যের চোখে নিজেকে প্রতি মুহূর্তে যাচাই না করে আপন মনে গৃহস্থালী করে চলেছে। এই প্রথম সে দেখলে ওলানের চুল তামাটে, তেলহীন রুক্ষ। তার মুখ চ্যাপ্টা। গায়ের চামড়া খসখসে। সর্বাঙ্গে না আছে দীপ্তি না আছে ছন্দ। ঠোঁঠ দুটি পুরু, হাত-পা লম্বা। ওলানের দিকে তাকিয়ে ওয়াঙ চেঁচিয়ে বল্লে—'তোমায় দেখলে যে কেউ বলবে তুমি সাধারণ লোকের বৌ। যার ক্ষেত-খামার, হাল-লাঙল আছে তার বৌ নও।'

এত দিন পরে ওলান শুনলে স্বামীর ধারণার কথা। আর্ত শিথিল চোখ তুলে ওলান জবাব দিলে। এতক্ষণ বেঞ্চে বসে বড় সূচ নিয়ে সে জুতার শুকতলা সেলাই করছিল। স্বামীর মুখের দিকে হাঁ করে তাকাতে তার কালো দাঁতগুলি দৃশ্যমান হয়ে উঠল। স্বামী যে পুরুষমানুষের মত তার দিকে তাকিয়ে আছেন, এ কথা মনে আসতেই ওলানের হাড়-জাগা গালে এক ছোপ লাল লাগল। ফিসফিস করে বল্লে সে—'শেষের যমজ দু'টির পর আমার শরীর একটুও ভাল যাচ্ছে না। বুকের ভেতর যেন খাক্ হয়ে যাচ্ছে।'

ওয়াঙ ভাবল যে সরল মনে ওলান ভাবছে যে সাত বছর তার পেটে ছেলে আসেনি বলে স্বামী অনুযোগ করছেন। নিজের ইচ্ছার অতিরিক্ত রূঢ়তার সঙ্গে ওয়াঙ বৌকে বল্লে—'কি বলছি জান। বলছি আর সব মেয়েদের মত একটু তেল কিনে মাথায় দিতে পার না? কালো কাপড়ের একটা জামা তৈরী করে গায়ে দিতে পার না? পায়ে যে জুতো দাও তা কোন জমির মালিকের বৌয়ের পায়ে মানায় না। কি হয়ে যে থাক বুঝি না।'

ওলান কোন জবাব দিল না। ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে বেঞ্চির নীচে পা দু'টি লুকিয়ে বসে রইল। ওয়াঙ অবশ্য তাকে এই ভাবে তিরস্কার করার জন্য মনে মনে লজ্জিত হোল। বিয়ে হওয়ার পর এই ক' বছর বিশ্বস্ত অনুচরের মত সে তার অনুসরণ করেছে। যখন ওয়াঙ গরীব ছিল, যখন নিজের হাতেই সে কাজ করত মাঠে তখন প্রসবের পরের দিনই ওলান বিছানা ছেড়ে তাকে সাহায্য করতে এসেছে মাঠে। তবু ওয়াঙ বুকের জ্বালা মুছে ফেলতে পারলে না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে নির্দয় ভাবে বলতে লাগল—'মাঠে খেটেছি—খেটে

এখন বড় মানুষ হয়েছি। আমার বৌকে চাষাদের বৌয়ের মত দেখায় তা চাই না আমি।'

দম নিলে ওয়াঙ। তার মনে হোল ওলানের চেহারায় সবটাই কুৎসিত কিন্তু সব চেয়ে বীভৎস হোল তার ঢলঢলে কাপড়ের জুতোয় ঢাকা মস্ত মস্ত পা দু'টো। এমন তীব্র দৃষ্টিতে চাইল ওয়াঙ যে ওলান পা দু'টিকে বেঞ্চির নীচে আরো ঢুকিয়ে নিলে।

অনেকক্ষণ পরে তেমনি ফ্যাকাশে গলায় বললে ওলান—'মা ছেলেবেলায় আমার পা বেঁধে দেননি। শিশু থা'তেই আমায় তিনি বেচে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার মেয়ের পা আমি বেঁধে দেব।'

এক ঝাঁকুনিতে উঠে দাঁড়াল ওয়াঙ। স্বামীর রাগের মুখে ওলান যে শুধু ভয়ে কুঁকড়ে যায় এই কারণে সে আরো তেতে উঠল। কালো পোষাকটা গায়ে দিয়ে ওয়াঙ রুক্ষ কণ্ঠে বললে—'যাক। চায়ের দোকানেই যাই। দেখি নতুন কিছু মেলে কি না সেখানে। বাড়ীতে ত এক দংগল উজবুক, দু'টো বাচ্চা আর হাবা বৌ ছাড়া কেউ নেই ত আমার।'

নগরের পথে যতই এগোতে লাগল ওয়াঙ ততই তার মেজাজ চড়তে লাগল। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, ওলান যদি না মণিগুলো সেই বড় লোকের বাড়ী থেকে সংগ্রহ করে আনত এবং যদি না দিত স্বামীকে, তাহলে চারি ধারের এই সব নতুন জমি সে সারা জীবনেও কিনতে পারত না। নিজের মনের বিদ্রোহকে সে শাসায়—'তাই হোক না। কিন্তু ওলান ত আর জানতো না সে কি করছে। শিশু যেমন লাল বা সবুজ মিষ্টি দানা দেখে হাত বাড়ায় তেমনি নিছক লোভের বশেই সে নিয়েছিল মণিগুলো। আমি যদি না দেখতে পেতুম তাহলে সারা জীবন সে হয়ত সেগুলিকে বুকের ভেতর লুকিয়ে রাখত।'

অবাক্ হয়ে ওয়াঙ ভাবলে, হয়ত আরো মণি লুকানো আছে তার বৌয়ের দুটি কুচগিরির উপত্যকায়, ওলানের দু'টি স্তন তার কাছে ছিল রহস্যের হাতছানি। কত দিন গেছে, সে কারণে অকারণে সে দু'টির কথা ভেবেছে। এখন বহু সন্তান লালনের পর সে দু'টি শিথিল হয়েছে। সৌন্দর্য আর কিছু অবশিষ্ট নেই তাদের। সেখানে মণি আর থাকতে পারে না।

কিন্তু তবুও এ সব কিছুতেই কিছু হোত না যদি ওয়াঙ এখনও তেমনি গরীব থাকত যদি এখনও জলে ডুবে থাকত মাঠ। কিন্তু তার ত রূপোর অভাব নেই। দেয়ালের ফাঁকে রূপো আছে, রূপো আছে নতুন ঘরের মেজেতে একটি টালির নীচে, যে ঘরে বৌকে নিয়ে সে ঘুমোয় সেখানে কাপড় জড়ানো একটি বাক্সে রূপো আছে। বিছানার নীচে মাদুরে রূপো সেলাই করা আছে। তাঁর কোমরের বেল্টের মধ্যে লুকানো আছে রূপো। রূপোর তার অভাব নেই। এখন টাকা খরচ করলে মনে হয় না যে হৃৎপিণ্ড দিয়ে রক্ত ফিনিক দিয়ে ছুটছে। এখন কোমরের বেল্টে হাত লাগলে হাত পুড়ে যায় যেন। এটা-ওটায় খরচের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে মন। এখন টাকার প্রতি একটা ঔদাসীন্য এসে গেছে। জীবনকে উপভোগ করতে হলে টাকা দিয়ে কি করা যায় তারই কথা ভাবে ওয়াঙ।

আগেকার মত সব কিছুই আর এখন ভালো লাগে না। এক সময় যে চায়ের দোকানে ভয়ে সে ঢুকত, সাধারণ গেঁয়ো চাষী মনে হোত নিজেকে, এখন তা অতি অপরিষ্কার ঠেকে তার চোখে। অপমান বোধ হয়। আগে সেখানে কেউ চিনত না তাকে, চাকরগুলো অবহেলা করত। এখন ঘরে ঢুকলেই লোকেরা সম্ভ্রমে গা-টেপাটেপি করে। সে স্পষ্ট শুনতে পায় তারা বলাবলি করে—'ওয়াঙ গ্রামের ওয়াঙ এই। যে সন শীতকালে হোয়াং-পরিবারের বুড়ো কর্তা মারা যান আর চার দিকে ঘোর মন্বন্তর লাগে, সেই সনে ও হোয়াং-বংশের সব জমি কেনে। এখন ও মস্ত ধনী।'

এ সব কথা ওয়াঙ প্রসন্ন ঔদাসীন্যের সঙ্গে শোনে। নিজের কৃতিত্বে বুক তার গর্বে ভরে ওঠে। কিন্তু আজ ঘরে বৌকে গঞ্জনা দিয়ে আসার পর এই সমাদরও তাকে খুশী করতে পারল না। ক্ষুণ্ণ মনে বসে বসে চা পান করতে লাগল সে। আজ তার প্রথম মনে হোল, জীবনটাকে যত সুখের মনে করেছে সে ঠিক তা নয়। নিজের মনে ভাবতে লাগল সে—'এই দোকানে বসে কেন আমি চা খাব, যে দোকানের মালিকের চেহারা গোলচোখো বেজীর মত। আমার ক্ষেতের চাষীর চেয়েও যার কানের মাকড়ি ছোট। আর আমার কত জমি, আমার ছেলেরা পাঠশালায় যায়—আমি এখানে আসতে যাব কেন?'

ভাবা মাত্রই উঠে দাঁড়াল ওয়াঙ। টেবিলের উপর পয়সা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে বেরিয়ে এল। কী যে তার মনের বাসনা তাই ভাবতে ভাবতে সে নগরীর পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কথক গল্প করছেন পথে তাই সে শুনল খানিক। ভীড়ের মধ্যে বেঞ্চির উপর বসে শুনল সেই তিন রাজ্যের কাহিনী যখন মল্লবীরেরা ছিল নির্ভীক্ আর সুচতুর। কিন্তু মনের অস্থিরতা কমল না। কথকের কাহিনী আর তার কণ্ঠের যাদু মুগ্ধ করতে পারল না তাকে।

সহরে একটি বড় চায়ের দোকান খুলেছে নতুন। দক্ষিণের একটি লোক তার মালিক। নিজের ব্যবসা লোকটা ভাল রকমেই জানে। ওয়াঙ এই দোকানের সামনে দিয়ে বহুবার আসা-যাওয়া করেছে, জুয়া, পাশা আর ভ্রষ্টা মেয়েদের পেছনে কত টাকা যে জলের মত গলে যায় এখানে ত্রাসের সঙ্গে কত দিন ভেবেছে সে কথা। কিন্তু এখন আলস্যজনিত মনের অস্থিরতায় এবং স্ত্রীর প্রতি অন্যায় আচরণের তাড়নায় সে দোকানের ভিতর প্রবেশ করল। ভঙ্গীতে একটা সাহসিকতার ভাব এনে, মনের ভীরুতাকে ছদ্ম বলিষ্ঠতায় আবৃত করে সে ভিতরে গিয়ে বসল। এই ত ক'বছর আগে তার কাছে একটি বা দু'টির বেশী রূপোর মুদ্রা ছিল না। সেদিনও দক্ষিণের সহরে সে রিকশা টেনেছে। সে সব কথা মনে পড়তে লাগল ওয়াঙের।

নিঃশব্দে বসে বসে চা পান করতে লাগল ওয়াঙ। বিস্মিত চোখে চেয়ে দেখতে লাগল চারি দিক্। বিরাট ঘরটির অভ্যন্তরের ছাদে গিল্টির কাজ করা, দেয়ালে সাদা পত্রলেখা টাঙান। পত্রলেখাগুলিতে মেয়েদের ছবি। মেয়েগুলিকে দেখে মনে হোল এরা বুঝি স্বপ্ন-জগতের বাসিন্দা। মর্তের মাটাতে এমন চেহারা কখনো দেখেনি ওয়াঙ। প্রথম দিন শুধু চা খেয়ে আর চোখ চেয়ে দেখে চলে এল ওয়াঙ।

কিন্তু ক্ষেত-খামার যত দিন জলে ডুবে রইল সে রোজই যেতে লাগল চায়ের দোকানে। প্রতিদিনই সে আগের দিনের চেয়ে বেশীক্ষণ বসে থাকে। নিজেকে গেঁয়ো চাষীর বেশী কিছু মনে হয় না তার। একমাত্র তার গায়েই সিল্কের পোষাক নেই। সহুরেদের কারুর পিঠে বেণী ঝোলে না—তার শুধু আছে বেণী। এমন এক দিন সন্ধ্যায় যখন

এই ভাবে হলের একপ্রান্তে একটি টেবিলে বসে চা পান করতে করতে চেয়ে দেখছিল ওয়াঙ তখন কে এক জন সংকীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল। সিঁড়িটি দ্বিতলে যাওয়ার পথ।

সারা সহরে এই চায়ের দোকানই একটি মাত্র যার দ্বিতল আছে। পশ্চিম গেটের প্যাগোডা অবশ্য পাঁচতলা উঁচু। কিন্তু প্যাগোডাটি কোণাকৃতি—যতই উপরে উঠেছে ততই চিকণ হয়েছে। কিন্তু চায়ের দোকানের দ্বিতল একতলার মতই সমান বড়। রাতে দ্বিতলের জানলা থেকে নারীকণ্ঠের সংগীত আর তরল হাসির চূর্ণিকা ভেসে আসে বাতাসে। সুন্দরীদের অংগুলি শৃঙ্গারে সারেঙ্গে মধুর ঝংকার ওঠে। কিন্তু ওয়াঙ এখন যেখানে বসে আছে সেখানে সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে চা-পায়ীদের কলরব আর পাশার হাড়ের ঘুঁটির তীক্ষ্ণ শব্দ।

কাজেই একটি মেয়ে যে তার পিছনে ক্যাচ-ক্যাচ শব্দে সিঁড়ি দিয়ে নামছে একটুও টের পায়নি ওয়াঙ। হঠাৎ কাঁধের উপর হাতের স্পর্শে সে রীতিমত চমকে উঠল! এখানে কেউ যে তাকে চিনবে এ আশা কখনো করেনি ওয়াঙ। মুখ তুলে দেখলে ওয়াঙ সুন্দরী নারী-মুখ—কোকিলার মুখ। যেদিন সে জমি কিনেছিল এই মেয়েটির হাতেই সে ঢেলে দিয়েছিলো মণিগুলো। এই মেয়েটিই বৃদ্ধ কর্তার সকম্পিত হাত দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে জমি-বিক্রীর দলিলে তাকে ঠিক মত সই করতে সাহায্য করেছিল। ওয়াঙকে দেখে সে হেসে উঠল। সে হাসিতে প্রজাপতির ডানার গুঞ্জন।

'আরে চাষী ওয়াঙ যে' বললে সে। ঈর্ষ্যায় চাষী কথাটার উপরেই যেন বেশী জোর দিলে সে—'তোমায় এখানে দেখবে কেউ ভাবতে পারে?'

ওয়াঙ মনে মনে ভাবল, যে প্রকারেই হোক, এই মেয়েটাকে দেখাতে হবে যে সে আর গেঁয়ো চাষী নেই। একটু হেসে চড়া পর্দাতেই ওয়াঙ বললে—'খরচের টাকার কি আর জাত আছে? টাকার অভাব আজ আর আমার নেই। ভাগ্য এখন প্রসন্ন আমার উপর।'

এ কথায় কোকিলা নির্বাক্ হোল। তার সাপের মত ছোট ছোট চোখ ঝলসে উঠল। কলসী থেকে তেল গড়িয়ে পড়ার মত মোলায়েম কণ্ঠে সে বললে—' 'সে কথা কে না জানে। শুধু খাওয়া-পরা ছাড়া টাকা খরচের আর এমন যোগ্য স্থান কোথায়? এখানে ধনীরা ফুর্তি করতে আসে আর আসে কর্তারা আহারে ব্যসনে আনন্দ সঞ্চয় করতে। আমাদের এখানকার মত ভাল মদ আর কোথাও নেই। চেখেছ সে মদ?'

'না, শুধু চা খেয়েছি।' ওয়াঙ একটু লজ্জিত হোল। 'আমি মদ আর পাশা ছুঁই না।'

'শুধু, চা' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হাসল কোকিলা, 'শুধু চা খেতে যাবে কেন?' ওয়াঙ যতই মাথা নাড়ায় মেয়েটি ততই বলে 'আমার মনে হয়—এখানকার অন্য সব তুমি কিন্তু দেখনি। দেখেছ? মিষ্টি হাসি আর নরম ঠোঁট!'

ওয়াঙের মাথা আরও ঝুঁকে পড়ে। মুখে রক্ত ছুটে আসে। তার মনে হয়, আশে-পাশে সবাই তার দিকে উপহাসের হাসি হাসছে। শুনছে এই মেয়েটির প্রগলভতা! সাহস করে যখন ওয়াঙ চোখ তুলে দেখলে, বুঝলে কেউ তাদের দিকে লক্ষ্য করছে না। শুধু পাশার কড়্-কড়্ শব্দ কানে এসে লাগল। বিমূঢ়ের মত ওয়াঙ বললে—'না, দেখিনি—শুধু চা খেয়েছি।'

মেয়েটি আবার হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ছবি আঁকা সিল্কের কাপড়ের দিকে দেখিয়ে বললে—'ঐ যে সব রয়েছে তাদের ছবি। কোন্‌টা চাও পছন্দ কর। তার পর আমার হাতে রূপো দিলেই তাকে আমি এনে হাজির করব তোমার সামনে।'

'ওরাই' ওয়াঙের চমক লাগে—'আমি ভেবেছিলাম ও-সব বুঝি পরীদের ছবি। গল্প-কথকেরা যাদের গল্প বলে সেই কিয়েন লিয়েন পাহাড়ের অপ্সরীদের ছবি।'

'হ্যাঁ, ওরা স্বপনচারিণীই বটে।' কোকিলার বিদ্রূপ কণ্ঠে রহস্যের আমেজ—'কিন্তু রজত মুদ্রা খরচ করলেই ঐ স্বপন-কন্যারা রক্ত-মাংসের মূর্তিতে এসে দাঁড়াবে।' এই বলে মেয়েটি চলে গেল। আশে-পাশে যে সব দাস-দাসী ছিল তাদের দিকে এমন ইঙ্গিত করে গেল যেন সে স্পষ্টই বলতে চায়—'এই লোকটা গেঁয়ো ভূত।'

ওয়াঙ আবার নতুন করে তাকাতে লাগল ছবিগুলির দিকে। এই সরু সিঁড়ি বেয়ে যেতে হয় দোতলার ঘরগুলিতে। যেখানে তার মত বহু লোকই আসা-যাওয়া করে। ধর, তুমি যদি অত সাধু না হও—যদি স্ত্রীপুত্রের কথা ভোলো, যদি তুমি অন্য লোক হও, তাহলে ঐ ছবিগুলির কোনটিকে তুমি পছন্দ করবে। প্রত্যেক ছবিটি আবার সে খুব গভীর উৎসাহের সঙ্গে নিরীক্ষণ করতে লাগল—যেন ছবিগুলি বাস্তব। এর আগে প্রত্যেকটি মুখই সুন্দর ঠেকেছে। তখন পছন্দ করার বালাই ছিল না। কিন্তু এখন দেখা গেল, কতকগুলি অন্যদের তুলনায় অনেক ভাল। বিশেষ করে তিনটিকে সে নির্বাচিত করলে। সেই তিনটি থেকে সব চেয়ে যেটি সুন্দর সেটিকে মনোনয়ন করলে ওয়াঙ। ছোট একটুখানি মেয়ে যেন ফুলের মত লঘু।

নিষ্পলক নেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল ওয়াঙ। মনে হোল শরীরের শিরা-উপশিরা বেয়ে একটা উত্তাপ প্রবাহিত হচ্ছে।

'মেয়েটি যেন ফুলের মত।' সরবে বলে ফেলেই ওয়াঙ লজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি দাম দিয়ে সে বাইরে চলে এল।

বাইরে তখন মাঠে-ঘাটে জলের উপর জ্যোৎস্না বান ডেকেছে। যেন সবার উপর কে বিছিয়ে দিয়েছে একখানি রূপালী বীতংস। তার দেহেও সংগোপনে রক্ত তপ্ত হয়ে উঠেছে।

[ক্রমশঃ



অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

"যারে বাঁধি ধরে তার মাঝে আর
রাগিণী খুঁজিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।"

যৌবনের উন্মাদনায় মানুষের সহজ বিচারবুদ্ধি যায় হারিয়ে, সে তখন অসুন্দরকেও কোন অজানা কারণে ভালবাসে, নির্গুণের মাঝেও দেখে বহু গুণের সমাবেশ। কিন্তু কঠিন বাস্তব জগতে কয়েক দিন বিচরণ করবার পরই তার মোহ কেটে যায়, তখন তার সংগ্রাম তাকে পদে পদে পীড়িত করে তোলে। এই সন্ধিস্থলে প্রবীণ ও নবীন এক হয়ে যায় না, পুরাতন ও নূতনে বাধে দ্বন্দ্ব। সব সময়েই কি যুবক-যুবতীর চোখ তাকে ভুল দেখায় ?

অধিকাংশ সংসারেই মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে মেয়ের মতটা সম্পূর্ণ ভাবেই উপেক্ষিত হয়। কারণ, আমাদের দেশের ধারণা মেয়েরা মাটীর ঢেলা, তারা যে ছাঁচে পড়ে সেই ছাঁচেই গড়ে ওঠে। কিন্তু এই বাক্যের সার্থকতা তখনই ছিল যখন মেয়েদের স্বতন্ত্র মতামত গড়ে উঠবার আগেই, তাদের ধারণা কোনও রূপ গ্রহণ করবার পূর্ব্বেই তাদের বিবাহ হয়ে যেত। যে ছেলের মতামতের সঙ্গে—যে পরিবারের জীবনযাত্রার সাথে সে সুপরিচিত নয় তার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। এক্ষেত্রে হয় তাকে সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ করে সেই পরিবারের আদর্শকে মেনে নিতে হয়, অথবা বাধে পদে পদে সংঘর্ষ। তার চেয়ে যে ছেলের সাথে অল্প-বিস্তর মেশবার সুযোগ পেয়েছে, যার সঙ্গ ও মতামতের সাথে সে সুপরিচিতা সে ক্ষেত্রেই সুখী হবার সম্ভাবনা বেশী নয় কি ?

মেয়ের সুখই যেখানে কাম্য, প্রচুর অর্থব্যয় জাতির পাঁতি, করকোষ্ঠী যদি তারই সন্ধান দিতে অক্ষম হয় তাহলে প্রয়োজন কি সেই বিবাহের ?

যৌবনের উন্মাদনাকে সংযত করা যেতে পারে কিন্তু তার আবেদনকে নিষ্ফল করা চলতে পারে না—তাকে প্রবীণরা সুপরিচালিত করতে পারেন কিন্তু তার চলার পথ রুদ্ধ করতে পারেন না।

যৌবনের ভ্রান্তি ?

শ্রীনন্দিতা দাশগুপ্তা

মেয়েদের লেখা-পেশা

শিপ্রা দত্ত

মেয়েদের আজকাল বিভিন্ন অফিসে, হাসপাতালে, স্কুলে, কলেজে কর্ম্মে রত থাকিতে দেখা যায়। বিবর্ত্তনশীল পৃথিবীতে যেমন সর্ব্বত্রই বিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে—সেইরূপ মেয়ে-মহলেও পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। রুচি ও যোগ্যতা অনুযায়ী মেয়েরা আজ বহির্জ্জগতে বিভিন্ন কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিজেদের কর্ম্মকুশলতা দেখাইয়া প্রশংসা অর্জ্জন করিতেছে ও পরিবারের আর্থিক ব্যাপারে সহায়তা করিতেছে। কিন্তু অল্প মেয়েই তাহাদের এই সব কর্ম্মকে



জীবনের পেশা-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকে, অনেকে ছাত্রী-জীবনের অবসানে কুমারী-জীবনে কিছু দিন অফিসের কাজ ইত্যাদি করিয়া থাকে। গার্হস্থ্য-জীবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই বহির্জ্জগতের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া থাকে। অবশ্য যাহারা বাল-বিধবা বা যাহাদের উপর সংসারের অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের ভার নির্ভর করে—তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাহারা এই সকল কাজগুলিকেই জীবনের পেশা-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকে। মেয়েরা স্বভাব-কোমল ও ভাবপ্রবণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাহাদের স্বভাবের সহিত তাহাদের দৈহিক সাদৃশ্যও আছে অর্থাৎ তাহাদের দেহও লতার ন্যায় কোমল। শারীরিক শক্তি যে সব কর্ম্মে প্রয়োজন, সেই সব কর্ম্মে তাহারা অপারগ। তবে এমন কতকগুলা কাজ আছে যাহা তাহারা অনায়াসে সকল অবস্থাতেই গ্রহণ করিতে পারে। তাহাদের মধ্যে একটি আজ এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

অনেক সময় দেখা যায়, মেয়েদের মধ্যে অনেকের লিখিবার শক্তি বা যোগ্যতা আছে। হয়ত চর্চ্চার দ্বারা এই প্রকৃতিদত্ত গুণের উন্নতি সাধন করা যায়। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মেয়েরা তাহাদের এই গুণের প্রতি উদাসী থাকে অথবা কুমারী-জীবনের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই গুণটির চর্চ্চা করাও বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু এইরূপ একটি গুণের অপব্যবহার কোনক্রমেই করিতে দেওয়া সঙ্গত নয়।

প্রাচীন কালে মেয়ে সাংবাদিকা ছিল না। বিশেষ করিয়া আমাদের বাংলা দেশে মেয়ে সাংবাদিকা সম্বন্ধে কেহ কোন দিন হত চিন্তাও করেন নাই। লেখিকার সংখ্যাও ছিল মুষ্টিমেয়। সেকালে অনেক স্থলে মেয়েদের লেখাপড়া জানাকে দোষণীয় কর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইত। সেজন্য সময় সময় শুনা যায়—কোনও বধূ লিখিতে পড়িতে জানে বা কবিতা, গল্প ইত্যাদি লিখিতে জানার অপরাধে শ্বশুরালয়ে তাহাকে অশেষ নির্য্যাতন পাইতে হইত এবং তিরস্কার বা বাক্যবাণের ভয়ে বেচারীকে এই সব চর্চ্চা ত্যাগ করিতে হইত। অবশ্য সকল পরিবার বা সকল মেয়ের অদৃষ্টেই যে এই সব ঘটিত তাহা নয়, ইহার ব্যতিক্রমও মাঝে মাঝে ঘটিয়া থাকিত।

এ যুগে সভ্যতা ও শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যেমন পুরুষদের শিক্ষা, সভ্যতা ও কৃষ্টির উন্নতি হইতেছে তেমনি মেয়েদের মধ্যেও উন্নতি দেখা দিয়াছে। আজ লিখিতে জানা বা শিক্ষিতা মেয়েদের এই বিশেষ গুণ থাকার দরুণ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিতে হয় না পরন্তু আজ ইহা সমাজে ও দেশে বরণীয়। তাই আজ গৃহে গৃহে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দানের ধুয়া উঠিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, সমাজ ও দেশের কতটা অগ্রগতি হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাংলা দেশে সাংবাদিকার কাজেও মেয়েদের নিযুক্ত করিতে দেখা যাইতেছে। কয়েকটি পত্রিকায় সম্পাদকের পদটি মেয়েদের দ্বারা অলঙ্কৃত হইতে দেখা যাইতেছে। অবশ্য এই সব পদে আজও এত অল্প মেয়ে নিযুক্ত হইয়াছে যে তাহা নগণ্য বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তবে দিন দিন লেখিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে দেখা যাইতেছে। মেয়েরা যদি তাদের এই গুণের প্রতি উদাসীন না থাকিয়া নিয়মিত ইহার চর্চ্চা করে তবে এই ক্ষেত্রেও তাহারা প্রসার লাভ করিবে এবং সমাজ ও দেশ বিদুষী রমণীদের যোগ্য সম্মান দিবে। অফিস বা অন্য যাবতীয় কাজ করিতে হইলে মেয়েদের বহির্জ্জগতের সহিত নিবিড় ভাবে জড়িত হইয়া পড়িতে হয়, অনেকের পক্ষে ইহা সম্ভবপর নয়। যাহারা গৃহিণী বিশেষ করিয়া তাহাদের পক্ষে অফিস বা শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতির কাজ করা সম্ভবপর নয়। কারণ একত্রে ঘর ও বাহির দুইটির কাজ সমান ভাবে সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপে করা সম্ভব নয়। অবশ্য আজকাল বহু গৃহিণীকে অফিসে বা বিভিন্ন বহির্জ্জগতের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু গৃহস্থালী কর্ম্ম এই সব গৃহিণীরা ততটা সুন্দররূপে তদারক করিতে পারে না। ইহাতে যে তাহাদের যোগ্যতার অভাব তাহা নয়, হয়ত সময়ের অভাবে তাহাদের গৃহস্থালী কর্ম্ম ঝি-চাকর বা ঠাকুরের উপর ন্যস্ত করিতে হয়। কিন্তু গৃহস্থালী কর্ম্মের তদারক করিয়াও গৃহে বসিয়া অবসর সময় তাহারা যদি কিছু কিছু লিখিতে পারে তবে ইহার দ্বারা অর্থোপার্জ্জনও করা যায় পরন্তু লেখাপড়ার সংস্পর্শে থাকার দরুণ জ্ঞান বৃদ্ধিও হয়। লেখার দ্বারা গৃহিণীর গৃহস্থালী কর্ম্মের কোনও ক্ষতি হইবে না পরন্তু হয়ত তাহার দ্বারা (যদি আর্থিক অবস্থা তাহাদের স্বচ্ছল না হয়) আর্থিক সাহায্য হইবে। যে সব মেয়েদের লিখিবার ক্ষমতা আছে, তাহারা যদি এই বিষয়ে উৎসাহ সহকারে নিজে মনোযোগী হয় ও অপরকেও উৎসাহ দেয় তবে সুদূর ভবিষ্যতে পত্রিকাগুলিতে সম্পাদিকার স্থান এবং লেখিকার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে দেখা যাইবে।

মেয়েদের পক্ষে লেখাকে জীবনের পেশারূপে গ্রহণ করাকে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী কাজ বলিয়া আমার মনে হয়। অফিস প্রভৃতি বহির্জ্জগতের কাজে স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে এবং প্রায়ই দেখা যায় যে সব মেয়েরা অফিস, হাসপাতাল, স্কুল বা কলেজে কাজ করিয়া থাকে, ১০টা—৫টা কাজ করিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায় কিন্তু গৃহে বসিয়া অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান সঞ্চয়ের চেষ্টা করিলে স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার কোনই

অর্থকরী শিক্ষা

রেখা রায়

"পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্।
কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্॥"

অর্থ সম্বন্ধে না হোক অন্ততঃ বিদ্যা সম্বন্ধে আমাদের দেশে এবং বিশেষ করে বাঙালীর পক্ষে এ কথা যে মর্ম্মান্তিক ভাবে সত্য, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। বাঙালীর মস্তিষ্কের প্রখরতা ভারতবিখ্যাত; কিন্তু সেই মস্তিষ্কের কিরূপ অপব্যবহার হচ্ছে বহু দিন পূর্ব্বে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সে-দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি কতকটা আকর্ষণ করেছিলেন। বাঙলায় প্রতি বছর হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করে, দলে দলে গ্রাজুয়েট হয়, উকিল হয়; কিন্তু তবু বাঙালীর চালে খড় নেই, ঘরে ভাত নেই অর্থাৎ তার দৈন্য-দশা বেড়েই চলেছে। কেন? এর একমাত্র কারণ তার অর্থকরী বিদ্যা ও শক্তির অভাব। নিদারুণ পরিশ্রমের ফলে যে বিদ্যা সে অর্জ্জন করে, কার্য্যক্ষেত্রে যৌবনেই ভগ্ন দেহ ও ভগ্ন মন নিয়ে সে দেখে তার বলে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হওয়া যায় না। তাই এত কৃতবিদ্য হয়েও বাঙালী আজও কেরাণীর জাতি।

বাস্তবিক বর্ত্তমান যুগ প্রতিযোগিতার যুগ—জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ। যে সকল জাতি উন্নত হয়েছে জগৎ-সভায় যারা আজ সগর্ব্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে তারা সকলেই জ্ঞান বিজ্ঞানকে অর্থোৎপাদনে নিয়োজিত করেছে, ল্যাবরেটারির বিজ্ঞানকে টেনে এনে ব্যাবহারিক বিজ্ঞানরূপে কৃষিক্ষেত্রে শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত করেছে, সর্ব্বত্রই জ্ঞানকরী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। শুধু তাই নয় যে কয় জন বুদ্ধিমান্ ও ধনবান্ ছাত্র সহজে ও স্বচ্ছন্দে ব্যয়বহুল বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত যেতে পারেন, পাশ্চাত্যের সে সব দেশে তাঁদের জন্যই জ্ঞানকরী শিক্ষার ব্যবস্থা—বাকী সকলের জন্যেই অর্থকরী শিক্ষার সুলভ ও সুপ্রচুর ব্যবস্থা আছে। ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, আমেরিকা জাপান ও রাশিয়ায় এর ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। তাই আজ সে সকল দেশ ধনী, অনেকটা স্বাবলম্বী এবং সে সকল দেশে বেকার-সমস্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম।

এই সব দেশের আদর্শে ভারতবর্ষে এবং বিশেষ করে বাঙলা দেশে কার্য্যকরী শিক্ষা বা উপজীবিকা শিক্ষার প্রবর্ত্তন হওয়া উচিত। কৃষি ও শিল্পই জাতির প্রধান সম্পদ্। কৃষি অপেক্ষা শিল্পের অর্থোৎপাদিকা শক্তি বেশী। সেই জন্যে কৃষি এবং বিশেষ করে শিল্প সম্বন্ধে কার্য্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা যাতে অবিলম্বে এ দেশে প্রবর্ত্তিত হ'তে পারে, কর্ত্তৃপক্ষের সে ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। বাংলা কৃষি-প্রধান দেশ বলে খ্যাত। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে চাষের যে ব্যবস্থা ছিল, এই বিংশ শতাব্দীতে উন্নত বিজ্ঞানের যুগে—যে যুগে পাশ্চাত্য দেশ তাদের কৃষি-সম্পদ্ চার-পাঁচ গুণ বাড়িয়েছে—আমাদের চাষের অবস্থা অবিকল তাই-ই আছে। সেই ন যযৌ, ন তস্থৌ। ব্যাবহারিক কৃষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতাই এই লজ্জাকর দুরবস্থার জন্য দায়ী। কুটীর-শিল্প উপজীবিকা শিক্ষার আর একটি প্রধান অঙ্গ। কুটীর-শিল্পের দ্বারা দেশের আর্থিক অবস্থার কিরূপ উন্নতি হতে পারে জাপানই তার জলন্ত দৃষ্টান্ত। বাঙলা দেশে কয়েকটি কৃষি বিদ্যালয়, শিল্প-বিদ্যালয় আছে বটে কিন্তু সাত কোটি বাঙালীর প্রয়োজনের তুলনায় সেগুলি সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্যবৎ। আর কুটীর-শিল্প শিক্ষা দেবার কোনো ব্যবস্থাই এখন বাঙলা দেশে নেই। মিঃ এস্, সি, মিত্রের পরিচালনায় কিছু দিন আগে ছাতার বাঁট প্রস্তুত করা, কাঁসা-পিতলের বাসন প্রস্তুত করা প্রভৃতি কুটীর শিল্প মুক্ত রাজবন্দীদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল কিন্তু সে ব্যবস্থাও বোধ হয় বাতিল হয়েছে।

শিক্ষা বিষয় নিয়ে যাঁরা নাড়া-চাড়া করেন তাঁরাই ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনার নাম শুনেছেন। মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হওয়ায় এই পরিকল্পনাটি শুধুই ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও খ্যাতি-লাভ করেছে। এই পরিকল্পনাটিতে গান্ধীজী একমাত্র কার্য্যকরী শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন অর্থাৎ এটি উপজীবিকা শিক্ষা-দানেরই পরিকল্পনা। বিদ্যালয়ের নিম্নতর শ্রেণীগুলিতে ষষ্ঠমান পর্য্যন্ত মাতৃভাষার সাহায্যে ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ জ্ঞান প্রভৃতি নাম মাত্র পরিবেশন করে ছাত্রদের কার্য্যকরী শিক্ষাই দিতে হবে। শুধু তাই নয়, ছাত্রদের হাতের কাজের দ্রব্যগুলি বিক্রয় করেই ক্লাসের খরচ চালাতে হবে অর্থাৎ বিদ্যাকে শুধুই কার্য্যকরী নয়, স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে। এই পরিকল্পনার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে কত বাদানুবাদ হয়েছে এবং হচ্ছে। বোম্বাই, মধ্য-প্রদেশ, মাদ্রাজে কোথাও কোথাও এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যালয়ও স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাতেও এই সম্বন্ধে পরীক্ষা হওয়া দরকার।

যুবশক্তিই দেশের স্তম্ভস্বরূপ। নিরন্ন, বেকার-সমস্যায় প্রপীড়িত বাঙলায় সেই যুবশক্তি আজ হতাশায় মুহ্যমান। এই সব শুষ্ক ভগ্ন বুকে আশার ধ্বনি তুলতে হ'লে চাই বেকার-সমস্যার দূরীকরণ, আর বেকার-সমস্যা দূর করতে হ'লে চাই অর্থকরী শিক্ষা, কার্য্যকরী শিক্ষা। বাঙলায় প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র লোক ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, যক্ষ্মায় মারা যায়। ডাক্তার, চিন্তাশীল মনীষিগণ এবং রাজনৈতিক সকলেই বলেন যে, এ দেশের প্রধান ব্যাধি—অনশন, অর্দ্ধাশন। অনশনে, অর্দ্ধাশনে রোগাক্রমণ-প্রতিষেধক শক্তি না থাকায় এ দেশে মৃত্যুর হার এত অধিক। এই অনশনক্লিষ্ট, অর্দ্ধাশন-ক্লান্ত জনগণকে পুনরুজ্জীবিত করতে হ'লে চাই সেই অর্থকরী শিক্ষা।

গভর্ণমেণ্ট, বিশ্ববিদ্যালয়, তথা দেশের দায়িত্বশীল জনগণ যত শীঘ্র এ সম্বন্ধে সচেতন হন, ততই মঙ্গল।

সম্ভাবনা নাই। অপর পক্ষে ইহার দ্বারা মানসিক উন্নতি ও আনন্দ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। কায়িক পরিশ্রমের উপযোগী করিয়া মেয়েদের সৃষ্টি করা হয় নাই। মেয়েদের মন ও দেহকে কোমল পুষ্পের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে বহির্জ্জগতের বিভিন্ন কর্ম্ম অপেক্ষা 'লেখা পেশা'টি মেয়েদের মন ও দেহের উপযোগী। অবশ্য স্থান, কাল ও সময়-ভেদে মেয়েদেরও বহির্জ্জগতের কর্ম্ম, বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু আমার মনে হয়, মেয়েদের লেখা পেশা পুরুষদের অপেক্ষা বেশী উপযোগী ও সম্ভব। পুরুষদের বাস্তবের কঠিন শ্রমসাধ্য কর্ম্মেই বেশী সময় ব্যয় করিতে হয়, সুতরাং গৃহকোণে বসিয়া সাহিত্যচর্চ্চা করা বা লেখা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

রাতের গান

আশা দেবী

যবে তুমি চলে গেলে দূর বিদেশে,
মরা চাঁদ ডুবে গেল ক্লান্ত হেসে।
পথে চলা পদধ্বনি শুনিয়া কানে,
রাতের চাঁদোয়া সরে কোথা কে জানে।

নিথর পাহাড় ঘেরা গ্রামখানিরে,
পিছনে ফেলিয়া গেলে গাঢ় তিমিরে।
তুষার চাদর-ঢাকা জড় হিমালয়,
তন্দ্রা-জড়িম চোখে তোমা দেখে লয়।

তিমিরে তমাল-ছায়ে বন-হরিণী,
চমকি জাগিয়া ভাবে : ওরে কি চিনি ?
দেওদার নীড় হতে ঘুমানো পাখী,
স্বপনে তোমায় যেন উঠিল ডাকি।

দূরের তরাই-মাঠে আলেয়া জ্বলে,
হিহিহি অট্ট হেসে কি যেন বলে।
রাতের পরীরা চলে লঘু-চরণা,
তাদের হাসির সুরে নামে ঝরণা।

ঘনবনে দাবানল লেলিহ জাগে,
রাত্রির বীণা বাজে দীপক-রাগে—।
তমসা বিদায় নিল তোমারে লয়ে,
উষার চরণ রাগ দিগ্বলয়ে॥



পুনরাবিষ্কার

রেণুকা ঘোষ

পুরোনো লেখার খাতার পাতায় তুই ছিলি ওরে কাব্য-শিশু
তরুলতাহীন বিস্মৃতি-মরু রাজ্যের ধূ ধূ তেপান্তরে
সুখের বন্যা প্রাণে এল যেই প্রাণ-মৃত্তিকা সরস হ'ল
সবুজ শ্যামল কচি পাতা মেলে এসেছিস্ নব জন্মদিনে।

রত্নাকরের উইঢিপি ভেঙে বাল্মীকি তুই জগতে এলি
জীর্ণ খাতার পোড়ো বাড়ীটার ভাঙা কক্ষের কপাট ভেঙে
দু'টি চোখে তোর কৌতূহলের বিস্ময়-ভরা নতুন আলো
দিনের সূর্য্য ম্লান হ'য়ে যায় আত্মার আলো শরীরে কাঁপে।

সংশোধনের কাটাকুটি লেগে ক্ষত-বিক্ষত মলিন দেহ
সরস্বতীর বরাভয় শিখা তবুও নেবেনি উপেক্ষাতে
সুপ্ত বীণার সহস্র তারে মূর্চ্ছনা মীড় আত্মহারা
মায়াবীর যাদুদণ্ডে বেজেছে সুরঝঙ্কৃত স্বর্গপথে।

আগেকার দিনে পুড়তো না জানি পল্লী-নগর বোমার তাপে
বেঁচে গেলি তাই পুরোনো খাতার জীর্ণপাতায় বরাত জোরে
আবর্জ্জনায় পড়তিস্ যদি আবার ও দেহ কাগজ হ'ত
টিটাগড়ে গিয়ে হয় তো পেতিস্ মিলের যাঁতায় পরমাগতি।

কী শুভ লগ্নে হঠাৎ সেদিন পড়লি আমার সুস্থ চোখে
তাই তো ছাপার অক্ষরে আজ মসৃণ তাজা শরীর পেলি,
উদ্ধত মনে তাই তো ক্ষ্যাপালি সমালোচকের মাথার পোকা
রসিকের মনে দিলি সুখাবেশ রূপায়িত নব আবির্ভাবে।

সমবায় রন্ধন বা Community kitchen.

বীণা ভট্টাচার্য্য

আমাদের দেশে আসন্ন দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া ক্রমশঃ দীর্ঘায়িত হ'য়ে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। জাতির এই দুর্দ্দিনে সকল দিকে ব্যয় সঙ্কোচ সকল ভারতবাসীর কর্ত্তব্য। যদি খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা না করি তা হ'লে পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় যেমন লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়েছিল, তেমনি এবারেও অনাহারে বাংলার পল্লী-অঞ্চল আবার শ্মশানে পরিণত হবে। খাদ্য-শস্যের দারুণ অভাব বশত সহর অঞ্চলগুলিও হয় তো এবার দুর্ভিক্ষের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পাবে না!

ইয়োরোপ ও আমেরিকাতে যুদ্ধকালীন খাদ্যসঙ্কটময় পরিস্থিতির দরুণ Community kitchen বা সমবায় রন্ধন প্রচলিত হয়েছে। এই সমবায় রন্ধন ব্যবস্থায় ও-সব দেশে গৃহিণীরাই অগ্রণী হয়েছেন এবং খাদ্যদ্রব্য ও কয়লা প্রভৃতির অপচয় নিবারণ ক'রে দেশের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। বাংলার গৃহিণীরা যদি সমবায় রন্ধনশালা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তা'হলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ থেকে তাঁরা অনেক দরিদ্র দেশবাসীর জীবন রক্ষা করতে পারবেন সন্দেহ নেই!

Community kitchen সমবায় রন্ধনের স্বরূপ কী জানা প্রয়োজন। সহরের বা গ্রামের প্রত্যেক পল্লীর গৃহকর্ত্রীরা পৃথক পৃথক ভাবে নিজের বাড়ীতে রান্না না ক'রে—সমবেত ভাবে একটি কেন্দ্রীয় রন্ধনশালা প্রতিষ্ঠা ক'রে সেই পল্লীর সমস্ত পরিবারের দৈনিক আহার্য্য তৈরীর ব্যবস্থা ক'রতে পারেন।

ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রচলিত সমবায় রন্ধনশালার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কতগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ক'রতে পারি।

১। এই উপায়ে খাদ্য-শস্য ও কয়লা প্রভৃতি জ্বালানী দ্রব্যের ব্যয়সঙ্কোচ করা যেতে পারে। প্রায় প্রতি মধ্যবিত্ত পরিবারেই কিছু না কিছু খাদ্যদ্রব্য অপচয় হয়। এই অপচয়ের মাত্রা অবশ্য কম। তাহা দ্বারা কোনো বুভুক্ষু লোকের উদরপূরণ হয় না; কিন্তু সমবায় রন্ধনশালায় এই অপচিত অংশগুলি একত্রিত হ'য়ে—হয় তো একাধিক লোকের আহার্য্যের ব্যবস্থা হ'তে পারে।

২। আমাদের দেশে কয়লা প্রভৃতি জ্বালানী দ্রব্য খুব দুর্ম্মূল্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কয়লার দাম পূর্ব্বাপেক্ষা চার গুণ। যদি রেল ধর্ম্মঘট সুরু হয় তবে দাম আরো বৃদ্ধি পাবে। সমবায় রন্ধন ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে আমরা কতকাংশে ইন্ধন সমস্যার সমাধান ক'রতে পারি।

৩। যে ক'টি পরিবার একত্র হ'য়ে কেন্দ্রীয় রন্ধনশালা স্থাপন ক'রবে তার মধ্যে একজন বা একাধিক মহিলা রন্ধনশালার যাবতীয় ভার গ্রহণ করবেন। এই ব্যবস্থা দ্বারা গৃহকর্ত্রীদের দৈনিক খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত এবং রন্ধন ও পরিদর্শনের কাযে সময় ও শক্তিক্ষয় ক'রতে হয় না। এই সময় ও শক্তি তাঁরা সংসারের নানা কাযে এবং নানা জনহিতকর কাযে ব্যয় ক'রতে পারেন।



৪। সমবায়ী রন্ধনশালাগুলি সরকারী খাদ্য বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যের ব্যবস্থা ক'রতে পারে।

৫। এই রকমের সমবায় ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে পল্লীতে সঙ্ঘবদ্ধতা ও প্রীতির সম্বন্ধ গ'ড়ে ওঠবার সুযোগ পায়।

৬। এ ছাড়া অনেকগুলি পরিবার নিয়ে সংগঠিত কেন্দ্রীয় রন্ধনশালার খাদ্যদ্রব্য একসঙ্গে ক্রয় করা সম্ভব হয় ব'লে পাইকারী দরে অর্থাৎ খুচরা দরের চাইতে অনেক কমে প্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহ করা সহজ হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কয়লা ও জ্বালানী কাঠ গ্যাস্ ইলেক্ট্রিসিটি খাদ্যদ্রব্য ও রান্নার বাসন প্রভৃতি রন্ধনশালার যাবতীয় জিনিষে যে ব্যয় লাঘব হয় তার পরিমাণ সামান্য মোটেই নয়। আমাদের দেশে আজ আবার দুর্ভিক্ষ আসন্ন, এই জন্য খাদ্যের অপচয় নিবারণ ও অন্যান্য দিকে ব্যয় সংকোচ করা দেশসেবার একটি উৎকৃষ্ট পন্থা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। সমবায় রন্ধনশালার সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত খাদ্য দেশবাসীকে পরিবেশন করা সম্ভব হ'লে—জনসাধারণের স্বাস্থ্যের অবনতির আশঙ্কাও কিছুটা ক'মে যাবে সন্দেহ নেই।

পারিবারিক বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দিক্ থেকে বিবেচনা ক'রে দেখতে গেলে হয় তো অনেকে সমবায় রন্ধনশালার উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হ'বেন। তাঁরা হয় তো ব'লবেন যে সমবায় রন্ধনশালার খাদ্য-তালিকা সকলের রুচি অনুযায়ী প্রস্তুত করা খুবই কঠিন। কিন্তু যাঁরা এমন আপত্তি তোলেন তাঁদের ভেবে দেখা উচিত যে প্রতি গৃহস্থালীতে পৃথক পৃথক রন্ধন-ব্যবস্থাতেও একই পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির নিজ রুচি অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্য সব দিন পাওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ—পারিবারিক সমবায় রন্ধনশালা খাদ্য ও ইন্ধন-সংকটের দিনের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী। দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় এই পরিকল্পনা গ্রহণ না ক'রলেও চলতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান আর্থিক সমস্যার যুগে সকল গৃহকর্ত্রীর সমবায় রন্ধনশালার উপকারিতা সম্বন্ধে ভেবে দেখা দরকার।

আমাদের দেশে সমবায় রন্ধনশালার ব্যবস্থা করা যে সব কারণে সুকঠিন, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। ভারতীয়দের স্বাভাবিক রক্ষণশীলতা, জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, রুচিভেদ, নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব ও সঙ্ঘবদ্ধ জীবন সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ জ্ঞান প্রভৃতি বাধা অতিক্রম ক'রে—সমবায় রন্ধনশালার পরিকল্পনা সফল ক'রে তোলা যে কত কঠিন তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আজকের দিনে আর্থিক সমস্যা ও অন্যান্য সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য এই সব বাধা-বিঘ্ন লঙ্ঘন ক'রে আমাদের সমবায় রন্ধন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা প্রয়োজন।

রাত্রির তপস্যা

[উপন্যাস]

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

২৪

উপেন বাবুর দিক্ হইতে যে আক্রমণটা আশঙ্কা করিয়াছিল ভূপেন, সেটা আর আসিল না। তাঁহারা কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই বলিয়াই বোধ হয় অত চেঁচামেচি করিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু ঘটনাটা যখন সত্য সত্যই ঘটিল তখন সে আঘাতের তীব্রতায় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। মায়ের মনে কী ছিল কে জানে—হয়ত বা শেষ পর্য্যন্ত তিনি ক্ষমা করিয়া পুত্র-পুত্রবধূকে ডাকিতেও পারিতেন কিন্তু উপেন বাবুর মুখের চেহারা দেখিয়া তিনিও চুপ করিয়া থাকিতে বাধ্য হইলেন। উপেন বাবুর সমস্ত প্রকৃতি যেন এই একটা আঘাতে একেবারে বদলাইয়া গেল। তিনি এখন কাহারও সহিত কথা বলেন না—মেয়েদের আগে কারণে-অকারণে বকিতেন, এখন তাহাদের সঙ্গেও কথা কওয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। মাথা নীচু করিয়া অফিস যান, অফিস হইতে আর বাড়ী আসেন না—একেবারে একটা টিউশনী সারিয়া গভীর রাত্রে বাড়ী ফেরেন এবং কোন মতে হু'টি মুখে গুঁজিয়া শুইয়া পড়েন। শুধু তাই নয়, মানুষটা যেন এই কয় দিনে একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছেন।

এ-সব ভূপেন অবশ্য জানিতে পারে না—তবে তাঁহাদের এই স্তব্ধতায় অনেকখানিই অনুমান করিতে পারে। তিরস্কার, অনুযোগ কোনটাই যখন আসিল না তখন তাঁহাদের আঘাতের গুরুত্ব বুঝিতে তাহার দেরী হইল না। মাসের প্রথমে সে নিয়মিত ভাবেই টাকা পাঠাইয়াছিল—সে-টাকা যথারীতি ফেরৎ আসিল। এ আশঙ্কাটা ভূপেনের ছিলই, সুতরাং সে বিস্মিত হইল না, টাকাটা আলাদা করিয়া পোষ্ট অফিসে জমা রাখিয়া দিল।

বিবাহের কিছু দিন পরে ভূপেন হু'খানা চিঠি লিখিল, একটা সন্ধ্যাকে ও একটা শান্তিকে। শান্তি জবাবই দিল না—সন্ধ্যার কাছ হইতে যথাসময়ে উত্তর আসিল। সে চিঠি পড়িয়াই ভূপেন বুঝিল যে সন্ধ্যা প্রাণপণ চেষ্টায় মুখোস পরিয়াছে। চিঠি ছোট নয়—ইচ্ছা করিয়াই বড় চিঠি লিখিয়াছে, পাছে মনের কোন দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। অথচ সে চিঠিতে অন্তরঙ্গ কথা একটিও নাই। এ কথা সে-কথা—লেখাপড়ার কথাই বেশী। দাদুর অসুখের কথা, ভূপেনের ইস্কুলের কথা এমনি আরও অনেক কথা আছে। সহজ হইবারই চেষ্টা করিয়াছে সে, কল্যাণী সম্বন্ধে একবার একটা রসিকতাও করিয়াছে, তবু যে সে সহজ হইতে পারে নাই সেটা ভূপেনের কাছে ছাপা থাকে না।

এমনি করিয়া আত্মীয়-স্বজন এবং সহস্র আত্মীয়াধিক সন্ধ্যার নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূপেনকে নূতন জীবন শুরু করিতে হইল। সে কাজের মধ্যেই নিজেকে ডুবাইয়া দিল। ইস্কুলের অনেক বেশী কাজ করে সে ইচ্ছা করিয়া—তার পর কোচিং আছে। সালেক ও পদনকে এবং আরও গুটি-পাঁচ-ছয় ছেলেকে লইয়া আজকাল সে বাড়ীতেই পড়াইতে বসে। এখানে বিজয় বাবুও তাহাকে খানিকটা সাহায্য করেন, মুখে মুখে তিনি অনেকটা পড়ান। অন্য ছেলেদের ছাড়িয়া দিবার পরও সে ঘণ্টা-খানেক সালেক ও পদনকে লইয়া কাটায়—মনে হয় যেন তাহাদের সার্থকতার উপর তাহার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে। এই সব কাজের ফাঁকে যেটুকু সময় পায় সে, অভাবের সংসারে জোড়াতালি দিতে দিতে কাটিয়া যায়। বাজার-হাট সবই তাহাকে দেখিতে হয়—রাধু অবশ্য শারীরিক খানিকটা সাহায্য করে। এ ছাড়া কোথায় ঘরের চাল সারানো, সস্তায় কোথায় খড় পাওয়া যায় সংগ্রহ করা—এজন্যও খানিকটা ছুটাছুটি আছে। বছর-দুই আগেকার কলিকাতার ছাত্র ভূপেনকে এখন যেন সে নিজেই চিনিতে পারে না। এ-সব কাজ হয়ত সব তাহার না করিলেও চলে কিন্তু খানিকটা সে ইচ্ছা করিয়াই করে। সংসারের সব-কিছুর সঙ্গে সে পরিচিত হইতে চায়—অনেক পোড় খাইয়া খাঁটি ইস্পাত হইবার ইচ্ছা তাহার।

এ সমস্ত কাজে ও অকাজে সারা দিন কাটাইয়া গভীর রাত্রে ও ভোর বেলা সে নিজের পড়া পড়িতে বসে। আর অবহেলা করা সম্ভব নয়—এম-এ পরীক্ষা দিয়া পার্থিব উন্নতির কিছু চেষ্টা করিতেই হইবে। এই সামান্য আয়ে এত বড় একটা সংসার চালাইয়া ভগিনীদের বিবাহের জন্য টাকা জমানো অত্যন্ত কঠিন। বস্তুতঃ তিনটি সংসারের চিন্তা তাহার—একটা নিজের, একটা বিজয় বাবুর এবং আর একটা তাহার বাবার। সুতরাং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের ছেলেদের তৈরী করার কাজে আত্মত্যাগ করার মত অবস্থা আর তাহার নাই।

কিন্তু—এক এক সময়ে সে নিজেকে প্রশ্ন করে—তাহার একটানা কর্ম্মের মধ্যে ডুবাইয়া রাখার মূলে কী এই বাহ্যিক কারণগুলিই সব? অত্যন্ত লজ্জার সহিত হইলেও, তাহাকে তখন মনে মনে স্বীকার করিতে হয় যে, নিজের সত্ত-সচেতন মনের কাছ হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টাও কতকটা আছে ইহার মধ্যে। সন্ধ্যার কাছ হইতে চিরকালের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার আগে পর্য্যন্ত সে বুঝিতে পারে নাই যে, সন্ধ্যা ঠিক তাহার কতখানি। তাহার সম্বন্ধে সমস্ত আশা চিরকালের মত বিসর্জ্জন দিয়া সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, সে এত কাল নিজেকে প্রবঞ্চনাই করিয়াছে—অনেক আশা তাহার এই মেয়েটিকে কেন্দ্র করিয়া ছিল। সহজে সে এই ছাত্রীটিকে ভালবাসিয়াছিল বলিয়া ভালবাসার প্রকৃতিটা বুঝিতে পারে নাই। আজ সে বুঝিয়াছে—শুধু সন্ধ্যাকে দিয়া নয়, এখানকার ছাত্রদের দিয়াও—যে, বাপ-মা যেমন আত্মজদের মধ্যে নিজেদেরই দেখেন, তেমনি দেখেন গুরু তাঁহার মেধা-সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নিজের আত্মাকেই। যা নিজের সৃষ্টি, যাহার মধ্যে নিজের মনন ও কল্পনা প্রতিফলিত হয় তাহার প্রতি আকর্ষণ উগ্র হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ, মানুষ ভালবাসে সব চেয়ে নিজেকেই। ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধে অন্য আকর্ষণ থাকা সম্ভব নয় তবু যে পরিমাণ ঈর্ষা ও একাগ্রতা সে দেখিয়াছে, তাহাতেই ভালবাসার তীব্রতাটা অনায়াসে অনুমান করিতে পারে। অনেক ভাড়াটেদের সহিত ভূপেন বাস করিয়াছে—জীবন দর্শন করিবার সুযোগ মিলিয়াছে তাহার বিস্তর, পুত্রবধূদের সম্বন্ধে শাশুড়ীদের যে প্রকার বিদ্বেষ সে দেখিয়াছে তাহাতে অনেক ক্ষেত্রে এমন প্রশ্নও মনে উঁকি মারিয়াছে যে পুত্রের হৃদয়ে ভাগ বসাইবার জন্যই কি বিদ্বেষ তাঁহাদের। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের বেলায়, যেখানে সম্পর্কগত কোন বাধা নাই, যেটুকু আছে

শুধুই সংস্কারগত—সেখানে যদি আকর্ষণটা যৌন-সম্পর্কে পরিণত হয় ত ঠেকাইবে কে? অবশ্য এ পরিণতিটা আজও ভূপেন মানিতে প্রস্তুত নয়—আজও শব্দটা মনে হইলে সে শিহরিয়া ওঠে—তবু ঐ ছাত্রীটি যে তাহার জীবনের প্রায় সমস্ত আনন্দদায়ক অনুভূতির সহিত জড়াইয়া গিয়াছে, এ কথা আজ সে অস্বীকার করে কেমন করিয়া?···এ সব কথা এত দিন এমন করিয়া ভাবে নাই, অনভিজ্ঞ ও অন্ধ ছিল বলিয়াই সে মোহিত বাবুর উপর সে-দিন অভিমান করিয়াছিল কিন্তু আজ তাঁহার সতর্কতার কারণ সম্বন্ধে ভূপেনের মনে কোন সংশয় নাই। বরং মনে হয় অনেক আগেই তিনি সাবধান হইলে ভাল করিতেন!

তবু—নিজের মানস-সমস্যার জটিলতায় ভূপেন নিজেই বিস্মিত হয়, কল্যাণী সম্বন্ধেও আকর্ষণ তাহার ত কম নয়। বিশেষ করিয়া যত দিন যাইতেছে সেটা শ্রদ্ধার সহিত মিশিয়া দৈহিক আকর্ষণের স্তর ছাড়াইয়া যেন আরও অনেক উপরে উঠিতেছে। কল্যাণী আশ্চর্য্য, কল্যাণী অদ্ভুত। শুধু যে সে প্রাণপণে তাহার সাংসারিক দায়িত্বের বোঝা হাল্কা করিয়া নিজের কাঁধে তুলিয়া লইতেছে কিংবা প্রতিটি মুহূর্ত্ত অতন্দ্র থাকিয়া ইচ্ছা বুঝিয়া তাহার সেবা করিতেছে তাই নয়—মেয়েদের যেটা সব চেয়ে বড় দুর্ব্বলতা সেই অভিমান পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছে। সে বোঝে যে তাহার স্বামী কেন এমন করিয়া প্রাণপণে নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন। তবু কোন দিন একটি অনুযোগ করে না, বরং নিজেকে সযত্নে তাহার সামনে হইতে সরাইয়া রাখে। তাই বলিয়া সে সরাইয়া রাখার মধ্যে এতটুকু অভিমানের প্রশ্ন নাই—ভূপেন তাহার মানসিক বিপ্লবের মধ্য হইতে স্ত্রী সম্বন্ধে যখনই সচেতন হইয়া ওঠে, যখনই কাছে ডাকে, তখনই সে ভূপেনের আদরের মধ্যে নিজেকে নিঃশব্দে ও নিঃশেষে বিলাইয়া দেয়। প্রয়োজন মত কাছে আসে, প্রয়োজন ফুরাইলেই কোন ক্ষোভ, কোন দাবী না রাখিয়া দূরে সরিয়া যায়—নিজের উপস্থিতি বা অধিকার কোনটা দিয়াই স্বামীর জীবনকে বিড়ম্বিত করে না। যে মেয়েটি নিজের আত্মসম্মান পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া তাহাকে ভালবাসিয়াছে তাহার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও বিস্ময় বোধ না করিয়া পারে না ভূপেন। হাঁ—কল্যাণীকে পাইয়া তাহার জীবন সার্থক হইয়াছে, কল্যাণী মধুর, কল্যাণী অপরিহার্য্য—কল্যাণীর জন্য আর সকলকে ছাড়িয়াও কোন ক্ষোভ নাই তাহার—অথচ, তবু যেন কোথায় একটা অভাব, একটা শূন্যতাবোধ পীড়া দিতে থাকে। মনে হয়, কল্যাণী তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনী কিন্তু সহধর্ম্মিণী নয়, কল্যাণী প্রিয়া কিন্তু মানসী নয়। কল্যাণী অনেকখানি তবু সবটা নয়। কল্যাণীকে পাইলে জীবন সার্থক হয়—কিন্তু তাহার জন্য তপস্যা করা যায় না। তাহার আত্মা যুগ যুগ ধরিয়া যাহার পদধ্বনি গণিয়াছে সে আর কেহ—কল্যাণী নয়!

তবু দিন কাটে। সাধারণ দরিদ্র গৃহস্থের মত সংসার করে আর বাংলা দেশের অধিকাংশ ইস্কুল-মাষ্টারের মতই শিক্ষকতা করে ভূপেন। মহেশ বাবু তাঁহার কথা রাখিয়াছেন—নিজের ব্যক্তিগত প্রভাব খাটাইয়া কমিটির বিরোধিতা সত্ত্বেও ভূপেনের পাঁচ টাকা মাহিনা বাড়াইয়া দিয়াছেন। যাহার মোট আয় ছিল পঁয়তাল্লিশ টাকা—সেটা পঞ্চাশ টাকা হওয়াতে সুবিধা হয় বৈ কি! মহেশ বাবুর প্রতি দিন দিনই সে আকৃষ্ট হইতেছে। বেশ মানুষটি! সব চেয়ে যেটা তাঁহার বড় গুণ, তিনি মোটেই কান-পাৎলা নন্। ইস্কুল হইতে তাহার ঈর্ষাতুর সহযোগীরা অনেক কথাই মহেশ বাবুর কানে তোলেন, তাহা সে ঠিকই জানিতে পারে কিন্তু মহেশ বাবু সে সব অভিযোগের সত্য-মিথ্যা এক দিনও যাচাই করেন না, নিজের মানুষ চিনিবার ক্ষমতায় অটল হইয়া বসিয়া থাকেন।

আর বিস্মিত হয় সে ললিত বাবুকে দেখিয়া। নিয়মাবলীর বাহিরে তিনি এক পা-ও বাড়াইবেন না, কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদন থাকিলেও না। সেক্রেটারী কোন কথা বলিলেও তিনি বলেন, আপনি লিখিত অর্ডার দিন—নইলে পারব না। তাঁহার মূল কর্ত্তব্য যে ছেলেদের শিক্ষাদান করা এবং শিক্ষালাভের উপায়টাকে অব্যাহত রাখা, এ-কথা তিনি কিছুতেই মানেন না—অফিসের কাজ চালানোকেই তিনি তাঁহার সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। এ কথা লইয়া প্রায়ই ভূপেনের সহিত তাঁহার ঠোকাঠুকি বাধে। তবে ভদ্রলোকের একটা গুণ আছে যে, তিনি ভূপেন সম্বন্ধে অন্য শিক্ষকদের মতই ঈর্ষিত হইলেও, অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করেন না।

ললিত বাবুর এই অদ্ভুত মনোভাবের যে একটা ইতিহাস আছে ভূপেন তাহা বোঝে—কিন্তু কোন মতেই আসল কারণটা তাঁহার মুখ হইতে বাহির করিতে পারে না। শিক্ষকদের কর্ত্তব্যবোধের কথা উঠিলেই তিনি বিরক্ত হন কেন, এ কৌতূহল তাঁহার দিন দিন বাড়িয়াই যায়। অবশেষে এক দিন কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িল। ভূপেন সে-দিন তাঁহার ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, দেখুন আপনি ত আমার সব কথাকেই বাড়াবাড়ি মনে করেন—কিন্তু ক্লাসে বসে শিক্ষকদের সিগারেট খাওয়া এবং থিয়েটারের গান গাওয়াটাও কি আপনি অনুমোদন করতে বলেন?

একটু বাঁকা হাসিয়া ললিত বাবু প্রশ্ন করিলেন, লোকটি কে?

ভূপেন মুহূর্ত্ত-কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, নামটা ত আমার করা উচিত নয়—এ-সব আপনারই দেখবার কথা। তবু আমিই বলছি—সেকেণ্ড পণ্ডিত মশাই ক্লাসে বসে তামাক খেতেন আমরা বলাতেই তিনি বন্ধ করেছেন কিন্তু অধর তার সিগারেট খাওয়া বন্ধ করতে রাজী নয়। সেটা যদি বা সহ্য করেছিলুম—যে-সব গানের নমুনা পাচ্ছি ছাত্রদের মারফৎ—তার পরেও যদি চুপ করে থাকি ত অপরাধ হবে।

অধর মহেশ বাবুর দূর-সম্পর্কের ভাগিনেয়—আই-এ ফেল করিয়া মাষ্টারীতে ঢুকিয়াছে। গান-বাজনায় অত্যন্ত ঝোঁক, অবসর পাইলেই বাড়ী গিয়া তবলা ঠোকে।

ললিত বাবু জবাব দিলেন, ক্লাসে বসে সিগারেট খাওয়ার দোষটা কি মশাই? আমাদের আইনে ত কোথাও বাধা নেই। ছাত্ররা ত আর গুরু-জন নয়।

গুরু-জনদের সাম্‌নে খেলে আমি কিছুই বলতাম না, কারণ তাঁদের আর চরিত্র গঠন করবার সময় নেই, তাঁদের যা হবার তা ত হয়েই গেছে! কিন্তু ওরা ছেলেমানুষ, শিক্ষকদের ওরা আদর্শ বলে মনে করে, তিনি যদি ওদের সামনে বসেই বিড়ি খান আর প্রেমের গান ভাঁজেন ত সেটাকে ওরা অন্যায় বলে ভাববার অবসরই যে পাবে না। এর পর মুখে ওদের অন্যায় বললে শুনবে কেন? ভাববে একটা মজার জিনিষ থেকে নিতান্ত স্বার্থপরের

মত আমরা ওদের বঞ্চিত করতে চাইছি! আমার ত মনে হয় যে, প্রত্যেক লোকেরই, যারা ছেলেদের মানুষ করতে চায়, গুরুজনদের সমীহ না করে ছেলে-মেয়েদেরই সমীহ করা উচিত, অন্যায় কাজের জন্য তাদের কাছেই বেশী লজ্জাবোধ করা উচিত!

ললিত বাবু এবারেও বিদ্রূপের সুরে কহিলেন, যাদের জন্য আপনার অত মাথা-ব্যথা তাদের মধ্যে শতকরা সত্তরটা ছেলেই বাড়ীতে তামাক ধরেছে কি না সেটা আগে খবর নিন!

ভূপেন শান্ত ভাবেই জবাব দিল, হয়ত তাই, হয়ত বা আরও বেশী—খুব সম্ভব শতকরা নব্বই জনই খায়। কিন্তু যে দশ জন এখনও ধরেনি আমরা কি তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করব না? যে দশ জনের এখনও কিছু হবার আশা আছে তাদের জন্যই ত আমাদের আরও সতর্ক হওয়া দরকার।

বিড়ি-সিগারেট ত আজ-কাল সবাই খাচ্ছে—এমন কি অনিষ্ট হচ্ছে তাদের? কলকাতার সব ছেলেরাই প্রায় খায়। ওদেরও বাপ-দাদা ছেলেবেলা থেকে তামাক খেয়ে আসছে, তারা ত আর মরে যায়নি।

তা যায়নি বটে—তবু সেটা না খেলে যে ওরা আরও সুস্থ থাকত এটা বোধ করি আপনিও মানবেন। তাছাড়া ওটা একটা symbol—ঐ বাধাটা ভাবলে কোথায় গিয়ে থামবে কে জানে। ঐ বাধাটুকুতেই অনেক কিছু ঠেকিয়ে রাখি।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ললিত বাবু প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, আপনি কি সত্য সত্যই মনে করেন যে ওদের কারুর কিছু হবে?

ভূপেন বিস্মিত হইয়া কহিল, সে কী! সে কথা মনে না করলে এ ভূতের বেগার দিচ্ছি কার জন্য বলুন? ঐ একমাত্র আশাতেই ত সব-কিছু দুঃখ সহ্য করছি মাষ্টার মশাই!

অকস্মাৎ কথাগুলিতে অতিরিক্ত জোর দিয়া বিষাক্ত কণ্ঠে ললিত বাবু কহিলেন, তাহ'লে সে আশা বিসর্জ্জন দিয়ে পুকুরের জলে ডুবে মরুন গে। বাংলা দেশের লোক! হুঁ···কিচ্ছু হবে না—কোন আশা রাখবেন না! যে ক'টা দিন পরমায়ু আছে দিনগত পাপক্ষয় করে যান! যাদের জন্য আপনার এত মাথা-ব্যথা তারা সবাই জাতসাপের বাচ্চা তা ভুলবেন না—সব ক্ষুদে শয়তান!

কেন বলুন তো আপনার এত পেসিমিজ্‌ম্?

পেসিমিজ্‌ম্! বলেন কি মশাই—কী'ই বা আপনার বয়স, জানেনই বা কি? কী জ্বালায় জ্বলেছি তা যদি জানতেন! আমিও মশাই আপনারই মত আদর্শবাদী ছিলুম, তাই এই লাইনে আজ পচছি; নইলে হয়ত চেষ্টা-চরিত্র করে সরকারী চাকরী একটা বাগাতে পারতুম। এম-এ পাস করতে সবাই বলেছিল সেই চেষ্টাই করতে, তখন কারুর কথা শুনিনি—দেশে গিয়ে বসলুম গ্রামের উন্নতি করব বলে।···গ্রামের ইস্কুলটা বহু কালের কিন্তু দলাদলিতে তখন প্রায় উঠে যাবার দাখিল হয়েছিল। হেড-মাষ্টার নেই, বাইরে থেকে ভাল লোক এনে তার মাইনে দিতে পারে এমন সঙ্গতিও নেই—বৃদ্ধরা বললেন এত কালের ইস্কুল, তোর বাপ দাদা এইখানে পড়েছে—উঠে যাবে? তার চেয়ে তুই ভার নে ···নিলুম ভার, আপনারই মত উৎসাহ তখন, দিন-রাত খাটি আর কিসে ছেলেদের ভাল হবে, কিসে ইস্কুলের উন্নতি হবে তাই ভাবি। উন্নতি হয়েও ছিল, ছেলে বাড়ল, আয় বাড়ল—একটা সরকারী সাহায্য পাবারও আশা হ'ল—কিন্তু যাঁরা ইস্কুল নিয়ে দলাদলি করছিলেন তাঁরা গেলেন বিষম চটে। বিশেষতঃ গ্রামের জমিদার, আমাদের কোন কোন রাজনৈতিক নেতাদের মত তাঁরও ধারণা ছিল যে গ্রামের উন্নতি যদি তাঁর সাহায্যে ও যথেচ্ছচারিতায় আসে ত আসুক—নইলে এসে দরকার নেই। নেতাদেরও যেমন ব্যক্তিগত হাততালি পাওনাটা আগে, দেশের স্বাধীনতা পরে, তাঁরও তাই। তাঁর মনে হ'ল ইস্কুলটা বাঁচাবার সমস্ত বাহাদুরীটা ঐ ছোঁড়া পাবে, জেলার হাকিম থেকে শুরু ক'রে সমস্ত কর্ত্তারা জানবেন যে যা কিছু করেছে ঐ ছোঁড়া—এ ত তাঁরই অপমান। বাস্! তিনি আদা-জল খেয়ে লাগলেন আমার পেছনে। প্রথমে ইস্কুলের টাকা তছরুপের দায়ে জড়াতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না; ইস্কুলের ছেলেদের গোপনে রাজদ্রোহ শেখাচ্ছি এমন সুনামও দিলেন—তাতে প্রায় সফলও হয়েছিলেন কারণ হাকিমরা এইটেই বিশ্বাস করতে চান—তবু শেষ পর্য্যন্ত সে ধাক্কাও কাটিয়ে উঠ্‌লুম। ইতিমধ্যে মজা হ'ল যাঁরা ইস্কুল নিয়ে এর আগে দলাদলি করছিলেন হঠাৎ দেখি সেই দু'পক্ষই আমার বিরুদ্ধে এক হয়ে গেছেন। তাঁদের সকলেরই ধারণা যে তাঁরা থাকতে ইস্কুলটাকে বাঁচিয়ে আমি খুব অন্যায় করছি। ফলে শেষ পর্য্যন্ত আমার মায়ের বয়সী এক বিধবার ঘরে জোর ক'রে ঢোকা ও অসদুদ্দেশে তাঁর শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে ধরা পড়লুম। আমার তখন তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স মশাই—মনে কত আদর্শ ও আশা—ও-সব কথা তখন ভাবতেও পারতুম না। আমি কী করব তাই ভেবে পাই না, এমন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম। আরও অবাক হবেন শুনলে যে সাক্ষীদের মধ্যে ইস্কুলেরও দু'টি ছাত্র ছিল। সব চেয়ে দুঃখের কথা এই, এমনই সাক্ষ্য-প্রমাণ আমার বিরুদ্ধে যে, নিজের মা-সুদ্ধ ছেলের চরিত্রে বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। নেহাৎ বরাত জোর—বামুনের ছেলে, উকীলের পরামর্শ মত আদালতে পৈতে বার করে সেই মেয়েছেলেটিকে শাসাতে সে ভয় পেয়ে মকদ্দমা কাঁচিয়ে ফেললে!···এর পরেও বলেন এ দেশ সম্বন্ধে আশা রাখতে?

ভূপেন স্তম্ভিত ভাবে, হতভম্বের মত তাঁহার কথা শুনিতেছিল—একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নড়িয়া-চড়িয়া বসিল। এক রকম যেন জোর করিয়াই—নিজের হতচেতন মনকে ধাক্কা মারিবার জন্যই বলিল, হ্যাঁ, তবুও আশা রাখতে হবে। বরং এই জন্যই ত আরও আমাদের চেষ্টা করা উচিত মাষ্টার মশাই—এই কাজ যাঁরা করলেন, কুশিক্ষা ও অশিক্ষাতেই তাঁরা এটা করতে পেরেছেন। ছেলেবেলা থেকে সতর্ক না হ'লে তারা এর পর ভাল নাগরিক হবে এটাই কি আশা করেন? আমাদের মতই আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যরা নিজেদের কর্ত্তব্যে অবহেলা করেছেন বলে এটা সম্ভব হয়েছে—আর যাতে এ রকম না হয়, আপনার মত আর কেউ বিড়ম্বিত না হন, সে চেষ্টা করা কি উচিত নয়।

মুখখানা বিকৃত করিয়া ললিত বাবু বলিলেন, পারেন করুন গে যান। আমার অত উদ্যম বা উৎসাহ নেই। অধর ত শুনেছি মহেশ বাবুর আত্মীয়, আর মহেশ বাবুও আপনার হাতের লোক, তাঁকেই বলুন গে।

এক মাস দুই মাস করিয়া ভূপেনের বিবাহিত জীবনের পুরা একটি বৎসর কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে ভূপেনের দুর্ভাবনা এবং

দায়িত্ব আরও বাড়িয়াছে—কল্যাণী অন্তঃসত্ত্বা। কথাটা মনে পড়িলেই দুশ্চিন্তায় ভূপেনের রক্ত জল হইয়া যায়। অর্থ-বল নাই—লোকবল নাই। বাড়িতে সে দুই-একখানি চিঠি লিখিয়াছিল কিন্তু সেখানকার অবস্থা পূর্ব্ববৎ—শান্তির না কি বিবাহের ভাল সম্বন্ধ আসিয়াছিল, অর্থাভাবে হয় নাই। এ-সব খবর সে বিশুর মারফৎ পায়। কিছু টাকা ভূপেন দিতে পারে বিশু এরকম আভাসও দিয়াছিল কিন্তু উপেন বাবু সে কথা কানে তোলেন নাই, বলিয়াছেন—তার আগে মেয়ের গলা টিপে মেরে ফেলব। ভূপেনের মা গোপনে আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন—বোন শান্তি বৌদির জন্য কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছে কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। এ সময়ে যদি সে স্ত্রীকে নিজের বাড়ীতে পাঠাইতে পারিত কিংবা মা বোন কাহাকেও এখানে আনাইতে পারিত ত বাঁচিয়া যাইত কিন্তু সে সম্ভাবনা মোটেই নাই। বন্ধুদের সঙ্গে বহু কালই ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে—এক বিশু এখনও চিঠি দেয় বছরে দুই-তিনখানা কিন্তু সে ও বিবাহ করিয়াছে, সামান্য মাহিনার চাকরী করে—নিজের জীবন লইয়া সে-ও বিব্রত। তাহার কাছে কোন আশা রাখাই বিড়ম্বনা।

এক আছে সন্ধ্যা—কিন্তু তাহারও চিঠির সংখ্যা খুব কমিয়া আসিয়াছে। ভূপেনও চিঠি দিয়া আর পুরাতন স্মৃতি জ্বালাইতে চায় না। যাহা হইবার নয়—যাহার চিন্তামাত্রও তিন জনের কাছেই বেদনাদায়ক তাহা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল। ভূপেন কল্যাণীর কথাই বেশী করিয়া ভাবে আজ কাল—অন্ততঃ তাহার জীবনটা যাতে ব্যর্থ না হয়!

চিন্তার শেষ নাই—অথচ যে কাজের মধ্যে সে চিন্তা ভুলিয়া থাকিতে পারিত সেই কাজও কম। এম-এ পরীক্ষার পড়া শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন শুধু পরীক্ষা দেওয়া বাকী। এক গাদা টাকা ফী দিতে হইবে—তাহার কোন জোগাড়ই নাই। সংসারের অনটন বাড়িয়াই চলিয়াছে আর বাড়ে নাই। বোনের বিবাহের জন্য যে ক'টা টাকা রাখিয়াছে এক ভরসা সে-ই ক'টা টাকাই কিন্তু তাহাতে হাত দিতে ইচ্ছা করে না। ওটা প্রায়শ্চিত্তের টাকা—তা ছাড়া কল্যাণীর এই অবস্থা, অসুখ-বিসুখ ত যে-কোন সময়ই হইতে পারে, তখন আর দ্বিতীয় উপায় থাকিবে না। প্রভিডেন্ট ফণ্ডে সামান্যই আছে, সেখান হইতেও ধার করিয়া সে পড়ার বই আনাইয়াছে—কোথাও কিছু নাই। শেষ পর্য্যন্ত হয়ত মহেশ বাবুর কাছেই হাত পাতিতে হইবে।

এ ধারে পড়ানোর কাজও কমিয়াছে—গ্রামের কয়েক জন মহেশ বাবুর কাছে নালিশ করিয়াছে যে ছোকরা মাষ্টারটি না কি বেশী পড়াইয়া ছেলেদের বিগড়াইয়া দিতেছেন। ছেলেরা এভাবে পড়িলে ধর্ম্মকর্ম্ম সংস্কার কিছুই মানিবে না, এখনই বাঁকা বাঁকা কথা বলে। চাষার ছেলে চাষ করিয়া খাইতে হইবে, জমিদারের রাজ্যে বাসও করিতে হইবে যখন—তখন এ-সব বাঁদরামো শিখিলে চলিবে কেন? তাহারা না কি এখনই বলে যে, হাত-পা থাকিলেই মানুষ হয় না—সম্পর্কে গুরুজন হইলেই প্রণাম করিবার উপযুক্ত হয় না। তাহারা বলে বড় হইয়া চাষের কাজ ভাল করিয়া শিখিয়া নূতন ধরণে চাষ করিবে! এমন করিলে কোন্ ভরসায় ছেলেদের স্কুলে পাঠানো যায়?

অগত্যা কোচিং ক্লাস বন্ধ করিতে হইয়াছে। অপূর্ব্ব বাবুর দল ললিত বাবুকে হাত করিয়া এধারেও পদে পদে তাহাকে লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা করেন—সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া চলিতে হয়। এ-সব আর ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে মোহিত বাবুর কথা মনে করার চেষ্টা করে বটে—তিনি বলিতেন, এ-দেশের লোকের যদি ভাল করতে চাও ত সব চেয়ে বড় বাধার কথাটা মনে রেখো, অকৃতজ্ঞতা। যাদের ভাল করছ তারাই তোমার সব চেয়ে বেশী অনিষ্ট করবে। কিন্তু তা বলে পেছোলে চলবে না,—বাধা না থাকলে ত ভাল কাজ সবাই করতে পারত।···এ সবই ভাল ভাল কথা, তবু ভূপেনের সহ্যের সীমা যেন অতিক্রম করিয়াছে। ছাত্রদের মধ্যে এখনও কাছে আসে শুধু পদন ও সালেক—তাহাদের লইয়াও আজকাল খাটিতে হয় না, তাহারা অনেকটা তৈরী হইয়া গিয়াছে। সুতরাং হাতে সময় বেশী—আর সে সময়টা দুশ্চিন্তাতেই ব্যয় হয়। একটা কিছু আর না করিলেই নয়। এ আয়ে ও অবস্থায় আর চলিবে না। তার মন আজকাল শহরের দিকে ঝুঁকিয়াছে। সে পত্রিকা দেখিয়া আজকাল দুই-একটি করিয়া দরখাস্ত পাঠায় শহরের ইস্কুলে—অবশ্য, বলাই বাহুল্য যে, কোন জবাব আসে না। শহরের ইস্কুলে গেলে কল্যাণীকে এখানেই রাখিয়া যাইতে হইবে তা সে বোঝে—সে একটা দুর্ভাবনা আছেই। তবু না গেলেও চলিবে না। রাধু একটু বড় হইয়াছে, সামনের বছরেই সে পরীক্ষা দিবে—খুব সম্ভব পাসও করিবে। তখন সে-ই দেখা-শুনা করিতে পারিবে। রাধু পাস করিলে যাহাতে এখানে সামান্য বেতনে একটা মাষ্টারী পায় সে ব্যবস্থা সে মহেশ বাবুকে বলিয়া করিয়া রাখিয়াছে—এবং সে-ক্ষেত্রে সেই সুদূর ভবিষ্যতে যাহাতে ঘরে পড়িয়া অন্য পরীক্ষাগুলি দিতে পারে সে জন্য এখন হইতেই ভূপেন তাহাকে গড়িয়া পিটিয়া রাখিতেছে। রাধু ছেলেটি তেমন ধারালো নয়, মনে হয় তাহার বুদ্ধিবৃত্তি অতিরিক্ত দারিদ্র্যে ও দুর্ভাগ্যে ভোঁতা হইয়া গিয়াছে—তবু উন্নতি করার দিকে একটা ঝোঁক আছে, এইটুকুই যা ভরসা।

সে যা-ই হউক—শুধু শুধু বসিয়া ভাবিলে কোন উপায় হয় না—ফিস্ জমা দিবার আর মাত্র সাতটি দিন বাকী। অগত্যা তাহাকে মহেশ বাবুর বাড়ীর উদ্দেশ্যেই যাত্রা করিতে হয়। যিনি বার বার উপকার করিয়াছেন আবার তাঁহার কাছে হাত পাতিতে লজ্জা করে। তাছাড়া—একমাত্র আশার স্থল পাছে এই ভাবে নষ্ট হইয়া যায়—প্রীতিটা পাছে বিরক্তিতে পরিণত হয়, সে ভয় ত আছেই।

তবু যাইতে হয়।

মহেশ বাবু তাহাকে দেখিয়াই কেমন যেন কষ্ট করিয়া হাসিলেন। বলিলেন, আসুন, আপনার কথাই ভাবছিলুম।

তাঁহার সে হাসিমুখের দিকে চাহিয়া কে জানে কেন ভূপেনের বুক কাঁপিয়া ওঠে। সে বলিল, কেন বলুন ত? কী ব্যাপার?

আর ব্যাপার! ম্লান ভাবে হাসিয়া মহেশ বাবু কহিলেন, পণ্ডিত মশাই আর যতীন বাবু ছাড়া সমস্ত মাষ্টার মশাই সই করে এক দরখাস্ত পাঠিয়েছেন—ললিত বাবু সুদ্ধ যে, আপনি নাকি ছেলেদের মোরেল একেবারে নষ্ট ক'রে দিয়েছেন তারা আর ওঁদের মানতে চায় না! পদে পদে ওঁদের অধিকার ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অপ্রিয় প্রশ্ন করে, ওঁদের সঙ্গে সমানে তর্ক করে—এমন কি পড়ানোর পর্য্যন্ত ভুল ধরতে যায়। এ-রকম অবস্থায় এখানে চাকরী করা পোষাবে না—এই কথাই জানিয়েছেন ওঁরা।

মহেশ বাবু এই পর্য্যন্ত বলিয়া থামিলেন। ভূপেন একটুখানি

চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তার মানে কি এটা আমার উপর নোটিশ হ'ল ?

মহেশ বাবু উত্তর দিলেন, কী হ'ল তা আমিই বুঝতে পারছি না যে! আমার অবস্থাটা কল্পনা করুন—ক'রে আপনিই উপায় বলে দিন। আমার বাপ-পিতামহ ইস্কুল করে দিয়েছিলেন বটে, তবু এখন ত আমি সর্ব্বময় কর্ত্তা নই। কমিটি আছেন এবং তাঁরা এত ভাল-মন্দ কিছুতেই বুঝবেন না। এক জন শিক্ষকই ঠিক—আর এঁরা সব ভুল, এ-কথা তাঁদের বোঝানো শক্ত হবে না কি? তাছাড়া সেখান থেকে কোন জোর না পেলে এঁরা এত দিন পরে এমন bold step নিতে কিছুতেই সাহস করতেন না।

তা বটে। ভূপেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, এ অবস্থায় আমারই এখন কাজে ইস্তাফা দেওয়া উচিত—কিন্তু বড়ই নিরুপায়। ওঁদের কাছ থেকে যদি আরও ক'টা দিন সময় নিতে পারেন ত ভাল হয়। এম-এ পরীক্ষা দিতে কলকাতায় যাবো—সেই সময় উঠে পড়ে চেষ্টা করব ওখানে যদি একটা মাষ্টারী পাই। এখন আর অন্য চাকরী নিতে পারব না—যা হয় করে এই লাইনেই থাকতে হবে। একটু সময় অন্ততঃ দিন।

নিশ্চয়, নিশ্চয়! আমি কি আপনাকে এখনই চাকরী ছাড়তে বলছি। আপনি গেলে কী হবে এবং আপনার দ্বারা কি উপকার হয়েছে তা আমিই ভাল জানি ভূপেন বাবু। আমার দুঃখ আপনি বুঝে আমার ওপর অভিমান ত্যাগ করবেন, এই প্রার্থনা। তবু একটা সান্ত্বনা এই যে—আপনার দ্বারা যদি গ্রামের দু'টো ছেলেও মানুষ হয়ে থাকে, তাহ'লেও অনেকটা কাজ হয়েছে।

ভূপেন কহিল, শুধু তাই নয়—আপনি একটু নজর রাখবেন যাতে একেবারে পুরোনো প্রথায় না ফিরে যায় সব।

সে আমার মনেই আছে। আমার চোখ আপনি খুলে দিয়েছেন —আর সহজে তা বুজবে না। যত দিন আমি আছি একেবারে জিনিষটা নষ্ট হ'তে দেবো না। আপনার পরীক্ষা কবে?

আসছে মাসে। সেই জন্যই আমি আপনার কাছে এসেছি।

ভূপেন টাকাটার কথা পাড়িতেই মহেশ বাবু চিন্তিত মুখে কহিলেন, তাই ত, এই সময়টা হাত একেবারে খালি। তার ওপর আশ্বিন কিস্তি এসে পড়ছে—বড়ই দুর্ভাবনায় আছি। আপনি আমাকে দু'টো দিন সময় দিন, তার মধ্যে দেখি যদি কিছু সংগ্রহ করতে পারি। যদি নিতান্ত না হয়—ইস্কুল থেকেই special loan ঠিক ক'রে দেবো।

ভূপেন মহেশ বাবুর বাড়ী হইতে প্রায় টলিতে টলিতেই বাড়ী ফিরিল। এ চাকরীও গেল! অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন রচিত হইয়াছিল তাহার মনে—যখন প্রথমে এখানে আসে। এখন আর সে-সব নাই, তবু এমন ভাবে যে এখান হইতে বিতাড়িত হইতে হইবে তা কে ভাবিয়াছিল। সে যখন মানুষের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতেছে তখন এক দিন তাহারই জয় হইবে এমনি একটা ধারণা ছিল, পৃথিবীতে যাহা সত্য এক দিন তাহারই জয় হয়—এইটাই সে জানিত, আজ সেই মূল বিশ্বাসটাতেই যেন একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে।...

বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ মারা একটা প্রকাণ্ড লেফাফা আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহার নামে। এ কী ব্যাপার? এ কি ফিসের তাগাদা? দরখাস্ত করা ছিল বোধ হয় সেই প্রসঙ্গেই তাঁহারা তাগাদা পাঠাইয়াছেন। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এতখানি কর্ত্তব্য-বোধ যে একেবারে নূতন। সে সব-কিছু ভুলিয়া তাড়াতাড়ি কৌতূহলী হইয়া খামখানা খুলিল, দেখিল ব্যাপার মোটেই তা নয়। সে না কি মণিঅর্ডার যোগে ফিয়ের টাকা পাঠাইয়াছে কিন্তু অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই জানায় নাই। পত্র পাঠ তাহা না জানাইলে টাকাটার ঠিক-মত ব্যবস্থা ও পরীক্ষার্থীর তালিকায় নাম ওঠা সম্ভব হইবে না।

তাহার টাকা জমা পড়িয়া গিয়াছে! সে মণিঅর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইয়াছে! কিন্তু কে এ কাজ করিল?

উত্তরটা প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মনে পড়িয়া গেল। সন্ধ্যা ছাড়া তাহার সমস্ত গতিবিধি এমন করিয়া কেহ লক্ষ্য করে না, এমন ভাবে তাহার অবস্থার কথা জানিয়া পূর্ব্বাহ্নেই ব্যবস্থা করাও আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়।

সন্ধ্যা যখন তাহাকে প্রায় ভুলিয়া আসিয়াছে মনে করিয়া ভূপেন মনে মনে একটা স্বস্তি অনুভব করিতে শুরু করিয়াছিল, ঠিক সেই সময়েই ভুলটা এমন ভাবে ভাঙ্গিয়া গেল! ভোলে নাই—তাহার সন্ধ্যা কিছুই ভোলে নাই। দূরে থাকিয়া নিঃশব্দে এখনও তাহার মঙ্গল কামনা করিতেছে, এখনও তাহার উন্নতিই সন্ধ্যার একমাত্র লক্ষ্য, এমন কি বোধ হয় তপস্যা!

হয়ত এ দান না লওয়াই উচিত, হয়ত এখনই এটা ফেরৎ দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু ভূপেন শেষ পর্য্যন্ত সে দান স্বীকার করিয়াই লইল। শুধু যে সাহায্যটা বড় অসময়ে আসিয়া পড়িয়াছে তাই নয়—ভূপেনের মনে হইল সন্ধ্যার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি দারুণ গরমে এক ঝলক দক্ষিণা বাতাসের মতই তাহার ক্লান্ত মনে স্নিগ্ধ একটা প্রলেপ লাগাইয়া দিয়া গেল। আছে, এখনও তাহার কথা লইয়া চিন্তা করে—দূরে বসিয়া উদ্বেগ ও আশার আরতি-প্রদীপ জ্বালাইয়া অপেক্ষা করে স্ত্রী ছাড়া এমন লোক একটি এখনও আছে। সব মানুষই সমান নয়—সব মানুষ অকৃতজ্ঞ নয়। বাঁচিবার জন্য সাধনা করা যায়, জীবনের সে মূল্য এখনও তাহা হইলে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই।

খোলা চিঠিখানা হাতে লইয়া ভূপেন স্থির হইয়া বসিয়াই রহিল।

[ক্রমশঃ

ফাগুন-চোতের গান

শ্রীশান্তি পাল

পাতার ছাউনী ঘেরা,—
পল্লী-মায়ের কুটীর আমার রাজপ্রাসাদের সেরা।
মাথার উপরে উদার আকাশ, যে দিকে ফিরাই আঁখি,
ক্ষেত ও খামার আথাল বাথান, সবুজে ফেলেছে ঢাকি।
শ্যাপ্‌লা লতায় ভরেছে পুকুর—দীঘল গাঁয়ের বাট,
ব্যাকুল বাতাস জড়ায়ে রয়েছে উধাও সে খোলা মাঠ।
বারোমাসে হেরি তেরো পার্ব্বণ হেথায় লাগিয়া আছে,
ষষ্ঠী-মাকাল ওলাইচণ্ডী, পূজো সে অশথ গাছে।

ফাগুনের শেষে আজ,—
গাঁয়ের মেয়েরা পাতিয়াছে ঘেঁটু, জমিয়াছে হাতে কাজ।
কেহ দেখি সেথা চরকা ঘুরায় ঘেনর ঘেনর ক'রে,—
কেহ বা তূলায় পাঁজ দিয়ে যায় ব'সে ব'সে খেই ধরে।
পৈতা কাটিছে, সূতোলী ভাঙিছে সঘনে ঘুরায়ে ঢেঁড়া,
ভাঁটন ছাঁটন করিয়া বাঁধিছে জুড়িয়া বাঁশের বেড়া।
মাটির দেয়াল নিকাইছে কোথা গোবরের জল গুলে,
উঠান ঝাঁটায়ে আলপনা আঁকে, বিচিত্র ফুল তুলে।
কুমারী মেয়েরা সাজিটি লইয়া আগানে বাগানে ঘুরে,
ঘেঁটুর গলার মাল্য রচিছে দাওয়ার কোণটি জুড়ে।
তিলের পাটালী গড়িছে কোথাও ফেলিয়া নানান ছাঁচে,
নারিকেল লাড়ু পাকায়ে পাকায়ে থুইছে ভেঁনের কাছে।
গন্ধে গুজবে, ছড়ায় ছড়ায়—ছড়ায় ফুল ও খই,—
দু'-একটি কলি তোমারে শুনাই ছন্দে গাঁথিয়া সই।—

"আমার ঘেঁটু যায় রে,—
ধূলা গুঁড়ি পায় রে।"

আয় লো দিদি পূজবি যদি ঘেঁটুর দু'টি পা,—
থাকিস্ নে লো অমন ক'রে এলিয়ে দিয়ে গা।
হলুদে কানি আন্ স্বজনি শাঁখ বাজালো সই,
ফুল ছিটিয়ে ভাঙা খোলায় ভাজ্ লো মুড়ি খই।
পূজোর বেলা উতরে গেল রাজবালারা চল্,
বিল্ব জবা তুলবি চ লো সইতে চলো জল।
ঘেঁটু ঠাকুর বাউল হয়ে ভিক্ষে করে সে,—
বছর পরে সদর দোরে দাঁড়িয়ে সে যে রে।
ঘেঁটুর পূজো সাঙ্গ হল ফিরছি ঘুরে গাঁ—
বিহান গেল বেবাক কেটে দুপুর কাটে না।

দুই

ড্যা-ডাং ড্যা-ডাং বাদ্যি বাজে শিবের দোরে ওই—
পূজারতির সময় হ'ল দুয়ার খোলে কই?
এ-গাঁও ও-গাঁও এক হয়েছে লোকে লোকাকার
হাট ব'সেছে বাটের ধারে পথ চলা যে ভার।
পুঁতির মালা, ময়ূর পাখা তালের পাখা নে,'
চিনে সিঁদুর কাঁকই ফিতের বেসাত করে কে?
কাঁচের চুড়ি মাটির খেলা গামছা শাড়ি ক্ষার,
গাঁয়ের গড়া জিনিষ নানা বলব কত আর?
সাত গাঁ থেকে লোক জুটেছে চড়ক-তলায় ভাই,
হদ্দ মজা রং তামাসা দেখে দিন কাটাই।
গাজন-গাজি ধান-ভানা আর হরেক রকম গান
এখান সেখান চ'লছে কত জুড়িয়ে দিয়ে কান।
দখিণ পাড়ায় মূল গায়নে শিবের বিয়ে গায়,—
পল্লী কবি সেথায় ব'সে আখর দিয়ে যায়।

"দুয়ার ছাড়িয়া দাও দুয়ারী গোঁসাই
করিব মহেশ পূজা পূত করি ঠাঁই।"

নারদ বলে— শোন মাতুল তোমার না কি বে
নগ-রাজের মেয়ের সাথে সত্যি না কি এ?
বিহান বেলায় গিয়েছিলাম গিরিরাজের ঘর
গৌরী দেখি হলুদ মেখে ব'সে পিঁড়ির' পর।
লগ্ন-পাত্তা দিলেন রাজা কন্যা দেবেন দান,
বাজনা-বাজি চলছে কত বিয়ের সরঞ্জাম।
রাজার বাড়ী বে' এ মামা সস্তা কথা নয়,
তোমায় দেখে লোকে যেন মন্দ নাহি কয়।
ডমুর শিঙে ফেল মামা, মুকুর হাতে লও,
ছাই না মেখে হলুদ বাটা মেখে ব'সে রও।
গরদ চেলী সাপটে পর, ছালটি ফেলে দাও,
রাঙা সূতোয় দুব্বো বেঁধে গঙ্গা জলে নাও।
ভাঙের ঝুলি কল্‌কে সাঁপি লুকিয়ে ফেল আজ,
ও-সব লেঠা দেখলে মেনা পাবেন বড় লাজ।
নিন্দে হবে তোমার নামে বল্‌বে লোকে কি,
তিনটে দিন এ ঠাণ্ডা থেকো দিব্যি দিয়ে দি।
শম্ভু কহে ভাগনে শোন বিয়ের সকল ভার
নিমন্ত্রণ ও বাজনা-বাজি যা' কিছু সব আর;
সে সব তুমি একলা সেরো, বল্‌তে হবে কি?
বিশাই খুড়ো আসেন যেন—পত্র লিখে দি।

গাঁয়ের বধূরা যত
বুড়ো শিবের সে মন্দির-তলে আসিতেছে অবিরত।
শিবের বিয়ে সে দেখিবারে আসে নানা আভরণে সাজি,
মিশি দাঁতে দিয়া তিলক আঁকিয়া কাজলে চক্ষু মাজি।
হাওয়ায় হাওয়ায় উড়িয়া চলেছে রং-বেরং-এর শাড়ি,—
জামদানী ডুরে গঙ্গাজলীতে পাতিয়াছে সেথা আড়ি।
পায়েলা পাঁজোর গুজরীপঞ্চ জলতরঙ্গ আর,
তোড়ার উপরে চারিগাছি মল কটিতে চন্দ্রহার,
যবহার বিছে, কঙ্কণ চুড় লবঙ্গ ফুল করে,
বায়লা বাউটি রুলি অনন্ত বাজু ও তাবিজ প'রে;
মটর-মালা ও পাঁচ-নরী হার চিকদানা সোনা পাকা,
সিঁথি ও ঝাপটা নাকে নথ টানা কানে কান-বালা ঝাঁপা;
মাছি-মাকড়ি ও নোলক-টেকা নাক-কড়াই না প'রে,
চুলে কাঁটা-চুল পদ্ম ও পান খোপায় চিরুণী ভ'রে,
মেনার জামাই দেখিতে আসিল কত না মনের সুখে,
প্রেমের-উৎস উথলি উঠিল কাঁচলী ফাটিল বুকে।

দেখিয়া ভোলারে কদলী তলায় বিভোল হইয়া নাচে,
সরমে ভরমে পাড়া-পড়সীরা ঘেঁসিল না কেহ কাছে।
কেহ বলে—ছি ছি লাজে মরে যাই, এমন পাগল বরে,
কেমন করিয়া মেনকা দিদি সে তুলিয়া আনিল ঘরে ?
কেহ বলে—মাগো ঘেন্নার কথা কি করে বরণ করি,
বিষ-পত্রে ডুবিয়া র'য়েছে, সারা গায়ে উঠে খড়ি !
বাসি বিয়ে আর হ'ল না উমার সকলি চলিয়া যায়
রহিল পড়িয়া বরণের ডালা কবি ভাবে নিরুপায় !

তিন

"তারকনাথের চরণে সেবা লাগে—
মহাদেব" !
তাক্ ধুমাধুম বাদ্যি বাজে চণ্ডীতলায় সে,—
উত্তর পাড়া দক্ষিণ পাড়া মিলল সেথায় গে'।
ডুইল্যা এল, পুঁইল্যা এল, এল মহেশ পুর,
গাজন তলায় গোল বেধেছে কে ধরিবে সুর।
পুঁইল্যা বলে—আমরা আগে, তোমরা পিছে ভাই,
ডুইল্যা বলে—মায়ের পূজো আমরা আগে পাই।
খেয়ো খেয়ির মধ্যে কেহ কাঁটায় মারে ঝাঁপ,
কেউ বা পরে বঁটির পরে, আগুনে লয় তাপ।
কেউ লুকিছে কল-ফুলুরি বরুজে পুঁই পান,
কেউ বা সেথায় ধুলায় প'ড়ে গড়াগড়ি খান।
"চড়ক গাছে—ঘুরতে হবে
চল ভাই সবাই মিলে যাই,
সারা মাস সন্ন্যাস ক'রে
আর দেহে শক্তি নাই।"
ড্যা-ডাং ড্যাডাং বাদ্যি বাজে চড়ক তলায় রে,—
চড়ক গাছে চড়কী-ঘোরে মোচায় ঘোরে কে ?
কাঠের ঘোড়া নাগর-দোলা ঘুরছে কত কি,—
তাহার সাথে ঘুরছি মোরা চক্ষে ঠুলি দি।
বাণ ফুঁড়িতে বেদের বেটা বাধিয়ে দিল গোল,
চলল লাঠি বাজল কাঠি নাকড়া কাড়া ঢোল।
গাঁয়ের নামে লাফিয়ে ওঠে রাখতে তা'রি মান,
একশো লেঠেল এগিয়ে আসে কবুল করি জান।
এমনি দেখি প্রাণের সাড়া এমনি দেখি বল,
এমনি দেখি গাঁয়ের ধারা গেঁয়ো চাষীর দল।
চলছে তবু হাট-বেসাতি গ্রাহ্য নাহি তায়,
বেচা-কেনার হট্টগোলে মুড়কি কিনে খায়।
পাঁপড়-ভাজা তেল-ফুলুরি শীতল মিঠে জল,
কিনছে কত বৌ-ঝিয়েরা—কচি-কাঁচার দল।
টিনের বাঁশী কিনতে এসে বায়না ধরে কে ?
পাতার বাঁশী না হয় তারে একটি কিনে দে।
বাজিয়ে বাঁশী যাক্ সে ফিরে ঘরের ছেলে ঘর
পল্লী কবি বাঁশীর ডাকে মজুক নিরন্তর।

চার

ঘড়ের ছাউনী ঘেরা—
পল্লী মায়ের কুটীর আমার রাজপ্রাসাদের সেরা।
এইখানে এলে জুড়াইয়া যায় তাপিতের তনুমন,
এইখানে এলে বিভোল হইয়া ব'সে থাকি অনুখন।
সকল শ্রান্তি সকল ক্লান্তি নিঃশেষে হয় দূর,
সকাল সন্ধ্যা ভেসে আসে কানে ভাটিয়ালী মেঠো সুর !
রাখাল ছেলেরা গোধনে ছাড়িয়া বৈঁচীর মালা গড়ে,
নকল রাজার দুলাল সাজিয়া পাতার মুকুট পরে।
রাখাল মেয়েরা নয়ন আঁজলি' খুলিয়া আপন হিয়া—
ভরিয়া দিতেছে সারা গাঁওখানি মৌন মাধুরী দিয়া।
গোখুর ধুলায় আবীর ছড়ায় মাঠের আঙিনা ভরি
ব্যাকুল বাঁশরী কাঁদিয়া ফিরিছে কাহার কথা সে স্মরি।
সরল গাঁয়ের চাষী,—
জীবনের সুখ দুঃখ লইয়া বাজায় বাঁশের বাঁশী।
হেথায় তাহারা দিবস গোঙায় ক্ষেত ও খামার লয়ে,
উদয় অস্ত খাটিছে বৃষ্টি রৌদ্র মাথায় সয়ে।
হেথায় তাহারা লাঙল ঠেলিয়া ফেলিয়া মাথার ঘাম
সকল লোকের খোরাক যোগায় পায় না যশ ও নাম।
সকলেই বলে—চাষা ও যে চাষা, বুদ্ধি নাইক ঘটে,
লিখিতে পড়িতে কহিতে জানে না, শিক্ষা পায়নি মোটে !
বিজলীর বাতি দেখেনি চক্ষে, দেখেছে অগ্নি-শিখা,
গ্রীষ্মের দিনে আকাশে পড়েছে গেরুয়া মেঘের লিখা !
বরষার দিনে বিদ্যুৎ-ভাঙা, কাজল মেঘের ভেলা
শরতের দিনে চাঁদে ও চকোরে মেঘায় মেঘায় খেলা।
হেমন্ত দিনে সোণার ছড়ায় মাঠের মাঝারে দুলে,—
শীতের দিনে সে কুয়াসা জমিয়া মাথার উপরে বুলে।
বসন্ত দিনে মিহিন বাতাস যেমনি লেগেছে গায়,
দরদ কাটিয়া বাহির হয়েছে কিশোর মনের ছায়।
যায় না পরের দোরে
সেলামী গোলামী খাতে সে সহে না মাটিরে আঁকড়ি ধরে।
মাটির তাহারা মাটি ব'লে জানে গড়ে সব মাটি দিয়ে,
মাটিতে মিশ'য়ে মাটির গন্ধে জুড়ায় তাপিত হিয়ে।
মাটি যে তাদের গলার ভূষণ সোনার চাহিতে দামী,
মাটির লাগিয়া করে হানাহানি, মাটির নামেতে নামী।
এই মাটি তারা কাড়িয়া লইতে যেদিন করিবে মনে,
মাটির মা-ও সে মুক্তি পাইবে সেই সে পরম খনে !
মাটির মাঝারে শুনিতে কি পাও মাটির মায়ের গান,
গাঁয়ের দিকে সে তাকাও বন্ধু পাবে তারি সন্ধান।
যাহারে শুধাই তাহার নিকটে প্রাণের যে সাড়া পাই
মাটির মায়ায় শহরের মোহ ভুলে যাই—ভুলে যাই।
গাঁয়ের মাটিরে ছাড়িতে আমার পরাণ নাহিক চায়,
বাঁধিয়া রেখেছে জড়ায়ে জড়ায়ে শিকল পরায়ে পায়।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি!

শ্রীতারানাথ রায়

রুশিয়ার অভিযোগ—

২৮শে মে ২০ বছরের মিয়াদী ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তির ৪র্থ বার্ষিকী উপলক্ষে রুশিয়া আর বৃটেনের পররাষ্ট্র-সচিবরা মুখে অন্ততঃ শুভেচ্ছার বিনিময় করে। কিন্তু তার পর পরই সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মলোটভ বৃটেন আর আমেরিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে, চাপ দিয়ে, ভয় দেখিয়ে বা নানা প্ররোচনা-প্রয়োগে ওরা সোভিয়েট ইউনিয়নকে তাদের তালে তাল দিতে বাধ্য করতে চাচ্ছে। আমেরিকা তার ইংরেজ বন্ধুদের সমর্থনে পৃথিবীর সর্ব্বত্র,—প্রশান্ত ও আটলান্টিকের দ্বীপগুলোয়, আর পূর্ব্ব ও পশ্চিম গোলার্দ্ধের বিভিন্ন রাজ্যে নৌ ও জঙ্গী বিমান ঘাঁটি স্থাপন করতে উঠে পড়ে লেগেছে। এর উত্তরে ইংরেজ পররাষ্ট্র-সচিব বেভিন বলেছেন—রুশিয়ার এ ধারণা বড় অন্যায় যে, মাত্র সোভিয়েট-পদ্ধতিই সাচ্চা গণতন্ত্র-সম্মত আর সব পদ্ধতি হয় ফ্যাসিষ্ট না হয় গুপ্ত ফ্যাসিষ্ট।

জার্ম্মাণীতে আবার ফ্যাসিজম—

জার্ম্মাণী খুব শান্তশিষ্টের মত পরাধীনতার শেকল পায়ে পরছে বলে মনে হচ্ছে না। মার্কিণ অধিকার মণ্ডলের প্রায় সর্ব্বত্র নাৎসী-পন্থী জার্ম্মাণ তরুণ দলের আক্রমণ চলছে। ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ যেন এদের চেষ্টা দেখেও দেখছেন না। বরং বলছেন, ও কিছু না, তরুণদের জন্য নতুন পরিকল্পনা হয়ে গেলেই এ সব কিছু থাকবে না।

সোভিয়েট সরকারী মুখপত্র 'ইজভেস্তিয়া' কিন্তু স্পষ্ট জানিয়েছেন—জার্ম্মাণীর পশ্চিম অধিকৃত অঞ্চলে এখনও লক্ষ লক্ষ পুরানো জার্ম্মাণ সৈন্য সুসংগঠিত ভাবে অবস্থান করছে। ওদের সামরিক দল, হেড-কোয়ার্টার, কর্ম্মচারী প্রভৃতি জীইয়ে রাখা হয়েছে। তার পর সম্প্রতি আমেরিকানরা স্থির করেছে যে, যে সব জার্ম্মাণ কারখানায় হাতিয়ার তৈরী হত, যা ভেঙ্গে দেবারই কথা হয়েছিল, সে সব কারখানায় পূর্ব্বের মতই হাতিয়ার তৈরী হতে থাকবে।

কৃষাণ রাষ্ট্রপতি কালিনিন—

অতিবৃদ্ধ রুশ-বিপ্লবী কালিনিন, সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম কাউন্সিলের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, রুশ জাতির 'বাপুজী' (Little Father) দেহরক্ষা করেছেন। ইতিহাসে তাঁর পরিচয়—কমুনিষ্ট রুশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি, কিন্তু সোভিয়েটতন্ত্রের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার তিনি ছিলেন অন্তর-পুরুষ, প্রিয়তম কমরেড। সাধারণ কৃষাণ-সন্তান যে আপনাদের সৃষ্ট রাষ্ট্রে শ্রেষ্ঠতম মর্য্যাদা লাভ করতে পারে, এই অভিনব আভিজাত্যের প্রতিষ্ঠা করেছে সোভিয়েট রুশিয়া। কালিনিন এই আভিজাত্যের প্রথম অভিজাত বলে চিরকাল সম্মান পাবেন।

ইংরেজের মুসলিম প্রেম—

ইংরেজের মুসলমানদের হাত থেকে পশ্চিম ও দক্ষিণ-এশিয়ার অনেক অংশ হস্তগত করেছিল—সে সব দেশের অর্থ সম্পদ লুটেছিল, সে সব দেশের শিল্পবৈশিষ্ট্য নির্জ্জীব করে বৃটেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শিল্প প্রধান রাষ্ট্র বলে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তার পর প্রায় দুই শতাব্দী কেটেছে। প্রত্যেকটি শোষণ-ক্লিষ্ট জাত আর্ত্তনাদ করে। তাঁদের বাঁচবার চেষ্টার নাম দেয় ইংরেজ—বিদ্রোহ বা বিপ্লব। ইংরেজের প্রতিদ্বন্দ্বীরা সুযোগ নেয়। ইংরেজের প্রতিদ্বন্দ্বী জার্ম্মাণী দুই যুদ্ধে ঘায়েল। প্রতিদ্বন্দ্বী জাপান এটম বোমার ঘায়ে এখন অণু হ'য়ে উড়ছে আকাশে। অপর আপদ 'Russian Menace'। এই আপদকে মুমুক্ষু জাতগুলোর সঙ্গে ভাব করতে দেখে ইংরেজ মিশরে, প্যালেষ্টাইনে, ভারতে স্বাধীনতা দেবার বড় বড় ফন্দি আঁটছে—মুসলমানদেরই সুবিধে দিয়ে। এজেন্ট-ভিক্সার চেষ্টায় ভারতের মুসলমানরা টোপ গিলেছে। সুয়েজ খালের এপারে ইরাক, ইরাণ, সাউদী আরব, প্রভৃতি তৈল-অঞ্চল আর খালের ওপারে মিশরের মুসলমানরা মিঠি বুলিতে মর্য্যাদা বিক্রী করতে চাইছে না।

প্যালেষ্টাইন বিপ্লব—

জেরুজালেমের গ্র্যাণ্ড মুফতি হাজেস্মিল-এল-হুসেনি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্যালেষ্টাইন থেকে পালিয়ে লেবাননে যান। এর চার বছর পরে ভূতপূর্ব্ব ইরাকী প্রধান মন্ত্রী রসীদ আলি যে ইংরেজ-বিরোধী বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন, তার সঙ্গে মুফতির যোগ ছিল বলে জানা যায়। এর পর তিনি জার্ম্মাণীতে গিয়ে আরবী ভাষায় বেতার বক্তৃতা দিতে থাকেন। ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হবার পর মুফতি ফরাসী সৈন্যদের হস্তে আত্মসমর্পণ করে ফ্রান্সে যান। ৮ই জুন সংবাদ পাওয়া যায় যে, তিনি গোপনে ফ্রান্স থেকে পালিয়ে সোজা গিয়ে পৌঁছেছেন ডামাস্কাসে।

পালাবার কয় দিন আগেও প্যারি থেকে তিনি আরব জাতকে প্যালেষ্টাইন রক্ষার জন্য শক্ত হয়ে দাঁড়াতে বলেন। তিনি বলেন—"আরব দুনিয়ার পহেলা ত্রাণ-ব্যূহ হ'ল প্যালেষ্টাইন, এ ব্যূহ ভাঙ্গতে দিলে অন্যান্য আরব দেশ রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। ওদিকে মিশর, সাউদী আরব, ট্রান্সজর্ডন, ইরাক, লেবানন ও ইমেনের শাসকদের মধ্যে বৈঠক হয়ে তাঁরা বৃটেন ও আমেরিকাকে জানিয়েছেন প্যালেষ্টাইনে নতুন ইহুদী যদি এসে পড়ে, তা হ'লে তোমরা যাকে আন্তর্জাতিক শান্তি বলছ, তা আর থাকবে না। তোমরা ৫০ লক্ষ ইহুদীর স্বার্থরক্ষার জন্য সাড়ে চার কোটি আরবীর স্বার্থ হরণ করতে চাচ্ছ। স্পষ্ট করেই এঁরা বলছেন যে, প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে ইঙ্গ মার্কিণ সুপারিশ অনুসারে কাজ হতে থাকলে রীতিমত গেরিলা লড়াই বাধবে, যদি আর এক লক্ষ নতুন ইহুদী আমদানী করা হয়, তাহলে এক

লক্ষ নতুন শবও তৈরী হবে। আরব লীগ ইতিমধ্যে প্যালেষ্টাইন-ইহুদীদের পণ্য বর্জ্জন করবার নির্দ্দেশ দিয়েছে। ইহুদীরাও গুপ্ত বিপ্লবী দল 'ষ্টার্ণগ্যাঙ্গ' গড়ছে। এরা আরবপন্থী ইংরেজ-বিদ্বেষী। সে দিন ওদের 'ভয়েস অব দি আণ্ডারগ্রাউণ্ড' গুপ্ত বেতার কেন্দ্রের তরুণী প্রচারক জেনিয়া কোহেনের সাজা হয়ে গেছে। ইংরেজ জঙ্গী আদালতে দাঁড়িয়ে সে স্পষ্ট বলেছে, সে ষ্টার্ণগ্যাঙ্গভুক্ত, সে ইংরেজের আদালত মানে না। বলেছে—"অত্যাচারীরা তাকে যদি হত্যাও করে, কুছপরোয়া নেই।" বলেছে—"তোমাদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য যে আন্দোলন চলছে আমি তার সদস্য। আমার জাতের স্বাধীনতা অর্জ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমার লড়াই থামবে না।"

ইন্দোনেশিয়ার মনোদ্যম—

হল্যাণ্ডের নয়া নির্ব্বাচনে ক্যাথলিক সোশ্যালিষ্ট-প্রভাব প্রবল হয়েছে। কাজেই ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে পূর্ব্বের সব চুক্তি বাতিল করে দিয়ে তারা কথাবার্ত্তা চালাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ওলন্দাজরা মনে করেছে, এবার তারা কতকটা শক্তি পেয়েছে ইন্দোনেশিয়াকে তাঁবে রাখতে, তাই তারা নানান অজুহাত দেখাচ্ছে। কিন্তু মুমুক্ষুরা এ ছেঁদো কথা বুঝে, তাই তারা প্রস্তুত হচ্ছে। রয়টার সংবাদ দিচ্ছেন, যবদ্বীপে সমরোত্তেজনার প্লাবন বইছে। "With thoroughness, and determina'ion, the island's population of 40 millions is being organised for active hosilities."

ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ডাঃ আর আই সোকর্ণো ৮ই জুন বেতারে ঘোষণা করেছেন যে, প্রজাতন্ত্র রক্ষা-পরিষদ গঠিত হয়েছে, কারণ স্বদেশ বিপন্ন। এই পরিষদে আছে ইন্দোনেশিয়ার সামরিক সরকারী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি। সোকর্ণো পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, ওলন্দাজরা যদি ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীদের সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রাধিকার মেনে না নেয়, তাহলে তারা "answer force with force"—হাতিয়ারের জবাব দিবে—হাতিয়ার দিয়ে।

বর্ম্মায় সংগ্রাম আসন্ন—

বর্ম্মায় এণ্টিফ্যাসিষ্ট পিপলস্ ফ্রিডম লীগই শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ওদের জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, পিপলস ভলাণ্টিয়ার অর্গানাইজেশন। বর্ম্মা সরকার এদের সামরিক কুচকাওয়াজ বন্ধ করতে চান। লীগের সর্ব্বাধিনায়ক জেনারল আউং সান বলেছেন, তাঁদের দলকে বাধা দিলে বাধবে লড়াই। তিনি বলেছেন, দেশে দারুণ অন্নাভাব, অথচ বিভিন্ন জিলা থেকে ধান-চাল সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পেগু জিলায় জনসাধারণ এ কাজে পুলিসকে বাধা দিয়েছে। ১৫ হাজার বুভুক্ষু সে দিন কাওয়াতে ডেপুটী কমিশনারের আফিসে দিয়েছিল হানা। ওদিকে জাতীয়তাবাদী মিয়োচিং দলের নেতা ইউ-স তাঁর দলের কাউন্সিলরদের জানিয়েছেন যে, যুদ্ধের আগে গবর্ণরের শাসন পরিষদে যে মন্ত্রিসভার মর্য্যাদা ছিল, সে মর্য্যাদা তাদের না দেওয়া হ'লে তাঁর দলের সদস্যদের পদত্যাগ করতে হবে।

মিশরে বিপ্লব—

৮ই জুন ইংরেজরা বিজয়োৎসব করেছে মহা সমারোহে। এ উৎসবের প্রতিবাদে মিশরের নানা স্থানে বিশেষতঃ আলেকজান্দ্রিয়ায় বৃটিশ সামরিক হেড কোয়ার্টারে আর বিভিন্ন সামরিক জঙ্গী-ব্যারাকে মিশরী বিপ্লবীরা রীতিমত বোমা ও হাত-গ্রেনেড ছুড়েছে। সে দিন কমন্স সভায় বেভিনের সঙ্গে চার্চ্চিল ও ইডেনের কথা-কাটাকাটি হয়ে গেল এই মিশর নিয়ে। ইডেন এ কথা মেনে নিতে চাননি যে, ইঙ্গ-মিশর সন্ধিতে মিশরীরা অসন্তুষ্ট। এ কথাও তিনি স্বীকার করেননি যে. সুয়েজ খাল অঞ্চলে বৃটিশ সৈন্য ও বিমানবহর রাখলে মিশরী সার্ব্বভৌমিকতা ক্ষুণ্ণ হবে। কিন্তু এ কথা ওরা বুঝতে পারেনি যে. ইংরেজ সৈন্য মিশরে থাকবে কি না থাকবে তার বিচার করবে মিশরীরা, ইডেন-চার্চ্চিলকে মাথা ঘামাতে তারা দেবে কেন? বিদেশী সৈন্য বুকের উপর বসিয়ে রেখে স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াতে ইংরেজ পারে? ওরা উদাহরণ দেখিয়েছে, ফিনল্যাণ্ডে সোভিয়েট রুশিয়া ঘাঁটি পেতেছে, আমেরিকাও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে ইংরেজদের রাজ্যে ঘাঁটি চালিয়ে যাচ্ছে। ওরা কিন্তু এ উদাহরণ দেয়নি যে, আইরিশ ফ্রী ষ্টেটে ইংরেজ যেমন ঘাঁটি পাতবার সুযোগ পায়নি, তেমনি আফগানিস্থানে রুশ-ঘাঁটি স্থাপন করতে দিতে ইংরেজ সম্মত হতে পারেনি।

ইডেনী যুক্তি—ইংরেজ মিশর থেকে সৈন্য হটিয়ে নিলে আর একটি ঝঞ্ঝাটে-রাষ্ট্র ও-দেশ দখল করে নেবে। চার্চ্চিল বলেছেন, অন্য দেশ কেন—মিশরীরাই হয় ত নেবে।

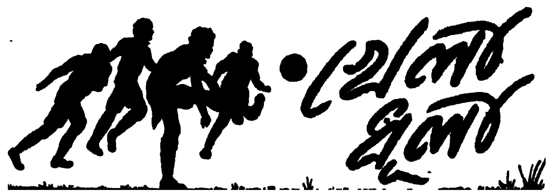
ভারতের তোরণ—

আসল কথা—ওদের প্রাণ-উৎস ভারতের গেট ওরা আগলে থাকতে চায়। আগে ছিল যখন ইউরোপের জাতগুলোর রাজনীতির পেছনে ছিল Eastern Question: এখন ভারতীয় সমস্যা। এই সমস্যা থেকেই ইংরেজ-রাজনীতির জন্ম। নেপোলিয়ন যখন মিশর জয় করতে পারলেন না, তখন থেকেই ইংরেজ বিশ্ব-রাজনীতির আসরে নামবার সুযোগ পেল। তাই গত দেড়শ' বছর ওরা আর কোন জাতকে মিশরের প্রভাব বিস্তার করতে দিতে চায়নি। বিসমার্ক যে সুয়েজ খালকে "jagular vein of the British Empire" বলতেন, সে সুয়েজ খালকে সে কোন মতেই বিপন্ন করতে দিতে চায় না।

তবু মুমুক্ষু জাতের স্বাধীনতা রোধ করতে কেউ পারে না। মিশরের রাষ্ট্র সবিতা জগলুল ও তাঁর বিপ্লবী দল দাবী করলেন স্বাধীনতা প্রথম মহাযুদ্ধের পর। হাবসী যুদ্ধে ইটালী যখন মিশর বিপন্ন করল, তখন ইংরেজ মিশরকে তাঁবে রাখবার জন্য মিশরীদের গায়ে হাত বুলিয়ে অদ্ভুত এক সন্ধি করল (১৯৩৬, ২৬শে আগষ্ট)। এ সন্ধির ফলে মিশরে প্রত্যেকটি বিদেশী সমাজ State within a State হয়ে দাঁড়িয়েছিল, বিদেশী ভাগ্যান্বেষী ধনিক ও বণিকরা মিশরী রাজধানী প্রায় গ্রাস করে ফেলেছিল।

গত মহাযুদ্ধে ভারত যেমন ইংরেজকে জুগিয়েছিল সৈন্য আর রসদ, মিশরও তেমনি ইংরেজের তোরণ-ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভারতের মত মিশর থেকেও সে-দিন থেকে এ-দিন পর্য্যন্ত ইংরেজ হরণ করেছে দেশবাসীর অন্ন, পণ্য, যথাসর্ব্বস্ব।

তাই ভারতের মত মিশর চায়—ইংরেজ দূর দূর! ভারতের মত মিশরেও তাদের ধ্বনি—হটাও হাতিয়ার! ওরা বলছে, বুকের উপর খাপখোলা তলোয়ার রেখে প্রাণরক্ষার শ্বাস-প্রশ্বাস নিতেও শঙ্কা। তাই মিশরী বিপ্লবী ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের দাবী—ইংরেজদের সরে যেতে হবে দেশ ছেড়ে। দেশের অখণ্ড ভৌগোলিক স্বাধীনতায় ভেদের কাঁটা রাখলে চলবে না।



এম, ডি, ডি,

ভারতীয় দলের ক্রিকেট সফর :—

১৯৩৬ সালের ক্রিকেট-সফরে ভারতীয় দল আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করিতে না পারায় এবারের ভারতীয় দল সম্বন্ধে বিলাতে বিভিন্ন রকম মতবাদের উদ্ভব হয়। মোটের উপর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট-জগতে তাদের স্থান যে প্রথম ও প্রধান পংক্তিতে নয় এ বিষয়ে প্রায় সমস্ত সমালোচকের মত আভাসে ইঙ্গিতে এবং প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। ছোট ছোট দলে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়গণ বিমানযোগে ইংলণ্ডে পৌঁছে। দলের ম্যানেজার ধুরন্ধর মিঃ পঙ্কজ গুপ্ত কয়েক দিন পূর্ব্বেই গিয়া পৌছেন। তাঁর গুরু দায়িত্ব ছিল যে খেলোয়াড়দের 'রেশন', থাকা ও সময়োপযোগী সমস্ত সুযোগ-সুবিধার জন্য সুবন্দোবস্ত করা। ভারতীয় অধিনায়ক পাতৌদীর নবাব ২৭শে এপ্রিল শেষ দলসহ ইংলণ্ডে পৌছেন।

ভারতীয় দলের প্রথম খেলা হয় ৪ঠা মে—উর্স্টার দলের বিরুদ্ধে। দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় ও দারুণ শীতে অনভ্যস্ত আমাদের খেলোয়াড়-গণের অসুবিধার অন্ত থাকে না। অসহ্য শীতে কেহই স্বাভাবিক পর্য্যায়ের খেলা দেখাইতে পারে নাই। ফলে ভারতীয় দলকে শেষ পর্য্যন্ত ১৫ রাণে পরাজয় বরণ করিতে হয়। বিরুদ্ধ সমালোচকদের অসংযত রসনার চমৎকার খোরাক পাওয়া যায়। তাহারা একবাক্যে ঘোষণা করিতে থাকে যে ভারতীয় দল মোটের উপর খুব সুবিধা করিতে পারিবে না! উর্স্টারের হাওয়ার্থ ব্যাটে-বলে চৌকশ খেলোয়াড় বলিয়া প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে তার ১০৫ রাণ ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে প্রথম সেঞ্চুরী। বোলিংয়ে হাওয়ার্থ ও আমাদের মানকড় কৃতিত্ব প্রকাশ করে। দ্বিতীয় খেলায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত শেষ নিষ্পত্তি হয় না। নিউজীল্যাণ্ডের অধিবাসী ও অক্সফোর্ডের ছাত্র ডনেলী দ্বিতীয় ইনিংসে ১১৬ রাণ করিয়া নট, আউট থাকে। সি এস নাইডু এই খেলায় দ্বিতীয় ইনিংসে হ্যাট্রিক সম্পাদন করার গৌরব অর্জন করে।

ভারতীয় দলের জয়-জয়কার পড়িয়া যায় যখন তাহারা সারের ন্যায় শক্তিশালী কাউণ্টীকে ৯ উইকেটে পরাজিত করে। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসে ৪৫৪ রাণের প্রত্যুত্তরে সারে মাত্র ১৩৫ রাণ করিয়া ফলো-অন করিতে বাধ্য হয়। মানকড়, ব্যানার্জী ও হাজারী দুইটি করিয়া ও নাইডু তিনটি উইকেট দখল করে। দ্বিতীয় বারে গ্রেগরীর দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং তাহাদিগের ৩৩৮ রাণ তুলিতে সহায়তা করে। গ্রেগরী ব্যক্তিগত শত রাণ করিয়া আউট হয়। ভারতীয় দল একটি উইকেট খোয়াইয়া প্রয়োজনীয় রাণ-সংখ্যা উত্তীর্ণ করে। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসে দশম উইকেটে সর্ব্বাতে নট, আউট ১২৪ ও ব্যানার্জী ১২২ রাণ করে। দশম উইকেটে এই জুটী ২৪৯ রাণ সংগৃহীত করিয়া ১৯০১ সালে উলী-ফিল্ডিং জুটীর ২৩৬ রাণের রেকর্ড অতিক্রম করিয়া বিলাতী ক্রিকেটে নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করে।

ভারতীয় দল ১৯৩২ সালে অক্সফোর্ডের বিরুদ্ধে আট উইকেটে জয়ী হয় ও ১৯৩৬ সালের খেলা অমীমাংসিত থাকে। কিন্তু সারের বিরুদ্ধে এই তাহাদের প্রথম জয়লাভ। পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি সফরেই তাহাদের খেলা অমীমাংসিত ছিল। চতুর্থ খেলাতেও ভারতীয় দল কেমব্রিজের বিরুদ্ধে এক ইনিংস ও ১১ রাণে অনায়াসে জয়ী হইলে বিলাতী ক্রিকেটভক্তগণ ভারতীয় দল সম্বন্ধে প্রশংসনীয় মন্তব্য প্রকাশ করিতে থাকে। সর্ব্বাতের মারাত্মক বোলিং তাহাদের এই বিপর্য্যয় ঘটায়। মুদী ও পাতৌদী যথাক্রমে ১০৩ ও ১২১ রাণ করিয়া বিলাতে প্রথম সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব দাবী করে। লীষ্টারের বিরুদ্ধে খেলা অমীমাংসিত থাকে। প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে মাঠের অবস্থা খেলার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হওয়ায় দুই দলের কেহই ব্যাটিংয়ে সুবিধা করিতে পারে নাই। অমরনাথ ১৪ রাণে ৪টি উইকেট পায় ও লীষ্টারের টাইলী ও স্পেরীর বল কার্য্যকরী হয়। ১৯৩২ সালে লীষ্টার এক ইনিংস ও ১৫ রাণে পরাজয় স্বীকার করিলেও ১৯৩৬ সালের খেলা অমীমাংসিত থাকে। স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলায় ভারতীয় দলের বিরাট সাফল্যের মূলে ছিল হাজারী ও সর্ব্বাতের অবদান। হাজারী বিশেষ ধৈর্য্য ও সংযমের সহিত খেলিয়া ভিজা মাঠে ১০২ রাণ করার কৃতিত্ব অর্জন করে। সর্ব্বাতের বোলিং পড়তা উভয় ইনিংসে যথাক্রমে ১২-১-৩০-৫ ও ১৫-২-৪২-৭ হয়। বিলাতের ক্রিকেট-মহলে রীতিমত সাড়া পড়িয়া যায় ভারতীয় দলের সপ্তম খেলার ফলাফলে। শক্তিশালী এম, সি, সি, দলকে 'ফলো অনে' নাস্তানাবুদ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত এক ইনিংস ও ১১৪ রাণে শোচনীয় ভাবে বিপর্য্যস্ত করিয়া ভারতীয় দল বিলাতের খেলোয়াড়ী মহলে বিশেষ উদ্বেগের সৃষ্টি করে। মার্চেণ্ট স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্যের প্রতীক-স্বরূপ ১৪৮ রাণ করিয়া আউট হয়। তাহার ব্যাটিং-চাতুর্য্যের সমস্ত ক্রীড়ামোদী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। হাজারী দুর্ভাগ্য বশতঃ ১৬ রাণে আউট হয়। মানকড় ও অমরনাথের বোলিং এম, সি, সির ধুরন্ধর খেলোয়াড়গণকেও বিধ্বস্ত করে। তাহারা যথাক্রমে দুই ইনিংসে ৭৭ রাণে ১০টি ও ৮৩ রাণে ৭টি উইকেট দখল করে। ১৯৩২ সালের খেলা বৃষ্টির জন্য অসমাপ্ত থাকিলেও ১৯৩৬ সালে এম, সি সি, দশ উইকেটে জয়ী হয়। ভারতীয় জিমখানা দলের বিরুদ্ধে প্রীতি অনুষ্ঠানে এক দিনব্যাপী খেলায় ভারতীয় পর্য্যটক দল ছয় উইকেটে জয়ী হয়। জিমখানা দলে খ্যাতনামা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জগদ্বিখ্যাত খেলোয়াড় লীয়ারী কনষ্ট্যাণ্টাইন ও কার্য্য-ব্যপদেশে বিলাতে অবস্থানকারী প্রবীণ ভারতীয় খেলোয়াড় প্রোফেসর দেওধরকে খেলিতে দেখা যায়। হ্যাম্পসায়ারের সহিত খেলায় প্রথম ইনিংসে মোট ১৩০ রাণ ভারতীয় দলের বর্ত্তমান সফরে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পসংখ্যক রাণ। শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় দল ৬ উইকেটে জয়ী হয়। কাউণ্টী দলের নট, প্রথম ইনিংসে ৩৬ রাণ দিয়া সাত জনকে আউট করে। ১৯৩২ সালে হ্যাম্পসায়ার অনায়াসে এক ইনিংস ও ১০৩ রাণে জয়ী হয়। কিন্তু ১৯৩৬ সালে তাহারা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর মাত্র দুই রাণে পরাজয় স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হয়। গ্ল্যামোর্গ্যান সময়ের অজুহাতে 'ফলো-অন' করিয়া ইনিংস পরাজয়ের গ্লানি হইতে রক্ষা পাইয়াছে। অমরনাথ এই খেলায় শতাধিক রাণ করিয়া ব্যাটিং-কৃতিত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মানকড় ও সর্ব্বাতের বোলিংয়ে গ্ল্যামোর্গ্যান খেলোয়াড়গণ পর্য্যুদস্ত হয়। ১৯৩৬ সালে এক ইনিংস ও ১২ রাণে পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে ভারতীয় দল অসমর্থ হয়।

ফলাফল—রাণ-সংখ্যা

চতুর্থ খেলা :—

কেমব্রিজ—১ম ইনিংস—১৭৮ ; ২য় ইনিংস—১৩৮

(সর্ব্বাতে ৫৮ রাণে ৫টি, সিদ্ধে ৪০ রাণে ৬টি)

ভারতীয় দল—১ম ইনিংস—৬ উইকেটে—৩৩৫

(মুদী ১০৩, পাতৌদী ১২১, মুস্তাক আলী ৫৪, রডকিন ৬৬ রাণে ২টি) ভারতীয় দল ১ ইনিংস ও ১১ রাণে জয়ী।

পঞ্চম খেলা :—

লীষ্টার—১ম ইনিংস—১৪৪ (বেরী ৬৭, অমরনাথ ১৪ রাণে ৪টি)

২য় ইনিংস—১ উইকেটে ২৪

ভারতীয় দল—১ম ইনিংস—৭ উইকেটে ১২৮ (মার্চেন্ট নট্ আউট, ১১১)

২য় ইনিংস—৬ উইকেটে ১০৭

(মার্চেণ্ট নট্ আউট ৫৭, স্পেরী ৩৩ রাণে ৫টি)

খেলা অমীমাংসিত থাকে।

ষষ্ঠ খেলা :—

স্কটল্যাণ্ড :—১ম ইনিংস—১০১ (সর্ব্বাতে ৩০ রাণে ৫টি)

২য় ইনিংস—১০ (সর্ব্বাতে ৪২ রাণে ৭টি)

ভারতীয় দল—১ম ইনিংস—২৪৭ (হাজারী ১০২, ম্যাকেঞ্জী ৯২ রাণে ৬টি)। স্কটল্যাণ্ড এক ইনিংস ও ৫৬ রাণে পরাজিত।

সপ্তম খেলা :—

ভারতীয় দল—১ম ইনিংস—৪৩৮ (মার্চেণ্ট ১৪৮, হাজারী ১৪, ওয়াট ৪৫ রাণে ৪টি)

এম, সি, সি—১ম ইনিংস—১৩১ (ইয়ার্ডলে ২১, অমরনাথ ৪১ রাণে ৪টি, মানকড় ৪০ রাণে ৩টি)

এম, সি, সি, এক ইনিংস ও ১১৪ রাণে পরাজিত।

অষ্টম খেলা :—

ভারতীয় জিমখানা—৯৭ (কুপার ২২, মানকড় ২৬ রাণে ৬টি, নাইডু ২০ রাণে ৩টি)

ভারতীয় দল—৮ উইকেটে ১৪১ (মুদী ৫১, মার্চেণ্ট ৩০, ক্লার্ক ৬৪ রাণে ৫টি)

ভারতীয় দল ৩ উইকেটে জয়ী।

নবম খেলা :—

হ্যাম্পসায়ার—১ম ইনিংস—১১৭ (হিল ৪১, হার্ম্যাণ ৪৪, নাইডু ৩৩ রাণে ৩টি)

২য় ইনিংস—১৪২ (বেলী ৫৬, হাজারী ১৮ রাণে ৪টি)

ভারতীয় দল—১ম ইনিংস—১৩০ (মানকড় ৩০, নট্ ৩৬ রাণে ৭টি)

২য় ইনিংস—৪ উইকেটে—২১২

ভারতীয় দল ৬ উইকেটে জয়ী।

দশম খেলা :—

ভারতীয় দল—১ম ইনিংস—৬ উইকেটে ৩১৬ (অমরনাথ ১০৪ নট্ আউট)

গ্লামোর্গ্যান—১ম ইনিংস—১৪১ (মানকড় ৬৮ রাণে ৪টি)

২য় ইনিংস—৭ উইকেটে ৭৩ (সর্ব্বাতে ১১ রাণে ৩টি, মানকড় ৩১ রাণে ৩টি)

খেলা অমীমাংসিত থাকে।

ফুটবল লীগ :—

ফুটবল লীগের প্রথম ডিভিসনের প্রথমার্দ্ধের খেলা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ফুটবল মরশুমের প্রাক্কালে খেলোয়াড়গণের দল বদলের পালা শেষ হইলে দলগত শক্তি-সমৃদ্ধির সম্বন্ধে বহু জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হয়। কিন্তু প্রকৃত পরিচয়ে বিভিন্ন দলের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

গত বৎসরের লীগ-বিজয়ী ইষ্টবেঙ্গল দলের সূচনায় মোটেই আশানুরূপ কৃতিত্বের আভাস পাওয়া যায় নাই। কিন্তু খেলার গতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দলগত সংহতি ও প্রাধান্য বাড়িতে থাকে। মাত্র এক পয়েন্টে পশ্চাৎপদ হইলেও তাহারা বর্ত্তমান লীগে শীর্ষস্থানীয় মোহনবাগান অপেক্ষা অধিকতর মনোবল ও দৃঢ়তার সঙ্গে খেলিতেছে। যে উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঙ্গে মোহনবাগান জয়-গর্বে লীগ-অভিযান সুরু করিয়াছিল, স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ড্র করিবার পর হইতে তাহাদের গতি মন্থর হইয়া আসিয়াছে। এ যাবৎ অপরাজেয় থাকিলেও তাহাদের খেলায় দ্রুত অধঃপাতের লক্ষণ প্রকট। ফরোয়ার্ড-গণের চিরাচরিত জড়তা ও লক্ষ্যভ্রষ্টতা ক্রমশঃ বিরক্তিকর হইয়া উঠিতেছে। দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্ভেদ্য রক্ষণ-বিভাগের সহায়তা-পুষ্ট মোহন-বাগানের পুরোভাগ ঠিকমত তাহাদের দায়িত্ব সম্পাদন করিতে পারিলে লীগ জয় তাহাদের কেহ রোধ করিতে পারিবে না। বহু বাছাই ও নাম-করা খেলোয়াড় লইয়া ভবানীপুর একটি শক্তিশালী দল গঠিত করে। খেলোয়াড়গণের মধ্যে উপযুক্ত বোঝা-পড়ার অভাবে তাহারা যেন ঠিকমত অনুপ্রেরণা পাইতেছে না। বি, এ, রেলওয়ে দলের খেলোয়াড়-গণ একাগ্রতার সঙ্গে খেলিলে অনেক বেশী সাফল্য লাভ করিত। মহমেডান স্পোর্টিংয়ে বহু খেলোয়াড়কে খেলিতে দেখা গিয়াছে। তাহারা নিয়মিত দল-গঠনের জন্য পরীক্ষামূলক ভাবে খেলোয়াড় পরিবর্ত্তনের ফলে কয়েকটি মূল্যবান পয়েণ্ট নষ্ট করিলেও বর্ষার মধ্যে অনেক টীমকে তাহারা যে বিশেষ বেগ দিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় দলগুলির দুর্দ্দশার একশেষ। তাহারা একযোগে লীগ-তালিকায় নীচের দিকে নিজ নিজ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। অন্যূন ৫০ জন খেলোয়াড়কে খেলাইয়াও কাষ্টমস দুই বৎসর পরে লীগে পুনরায় আত্মপ্রকাশে ১৩টি খেলায় ৭৮টি গোল হজম করিতে বাধ্য হইয়াছে। রেঞ্জার্সের বিরুদ্ধে খেলায় জয়ী হইয়া তাহারা এ বৎসর লীগে প্রথম পয়েণ্ট অর্জন করে। পুলিশের অবস্থা তথৈবচ। তবে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত সবুট খেলোয়াড়ী দল অবস্থার উন্নতি করিবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী।

সতীশচন্দ্র

দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের স্বত্বাধিকারী ও প্রাণ-স্বরূপ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দুই বৎসর হইল আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, সহজে তাহার পূরণ হইবে না। তিনি ছিলেন কৃতী পুরুষ। তাঁহার ত্রিশ বৎসরের কর্ম্মজীবনে অকপট সাহিত্যসেবা ব্যবসায়ে বসুমতী প্রসন্ন, বসুমতী-নাম সার্থক।

কালের সঙ্গে মানুষ গভীরতম ব্যথাও ভুলিয়া যায়, কিন্তু স্মৃতি কখনও মন হইতে মুছিয়া যায় না। বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার নাম এমন ভাবে জড়িত যে, তাহা কখনও ভোলা সম্ভব নয়। যিনি সৃষ্টি করেন তাঁহার দায়িত্ব যেমন, যিনি সেই সৃষ্টি জনসাধারণের হাতে তুলিয়া দেন তাঁহার দায়িত্বও সেইরূপ। বৈজ্ঞানিকের সৃষ্টি সার্থক হয় প্রসারতা লাভ করিয়া, সাহিত্যিক জীবন সফল হয় প্রচারিত হইয়া। আজ যে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে বিখ্যাত প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যিকদের জীবনের সাধনা ও সৃষ্টি স্থান লাভ করিয়াছে, তাহার মূলে আছে সতীশচন্দ্রের বসুমতী সাহিত্য মন্দির। প্রসার এবং প্রচারের দিক্ দিয়া তাঁহার প্রচেষ্টা অতুলনীয়। তিনি মহাপুরুষ, কারণ, তাঁহার দ্বারা বাঙ্গালা শিক্ষিত হইয়াছে। দেশের উৎকৃষ্ট সাহিত্যকে দরিদ্র দেশবাসীদের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়া তাঁহার এক বিরাট কীর্ত্তি।

সতীশচন্দ্রের পিতা ৺ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম কৃপা-প্রাপ্ত ছিলেন এবং তাঁহারই আশীর্ব্বাদে বসুমতী ও গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগের প্রবর্ত্তন দ্বারা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। সতীশচন্দ্র পিতার আরব্ধ কার্য্যের আশাতীত উন্নতি বিধান করিয়া নিজ কর্ম্মকুশলতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালা সাহিত্য ও সংবাদপত্রের সেবক সতীশচন্দ্রের কীর্ত্তি বাঙ্গালা ইতিহাসের একটা অধ্যায়। বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদপত্র মুদ্রণ-কার্য্যে তিনিই প্রথম রোটারী যন্ত্র ব্যবহার করেন এবং রয়টারের সংবাদ পরিবেশন বসুমতীর দ্বারাই সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রচেষ্টায় দরিদ্র বাঙ্গালাদেশ সাহিত্য-রসের আস্বাদ পাইয়াছে। তাঁহার অকাল তিরোধানে বাঙ্গালা সাহিত্য ও সমাজ শোকাচ্ছন্ন।

কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মবীরের মৃত্যু হয় না। তিনি অমর, বাঙ্গালীর হৃদয়ে তাঁহার আসন চির-প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।



চারুতোষ ঘটক ভবতোষ ঘটক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সাময়িক প্রসঙ্গ

বৃটিশ শ্রমিকদলের হাবভাব

বৃটিশ শ্রমিক দল এখন কতকটা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, বাধ্যতামূলক প্রাদেশিক মণ্ডল গঠনের সুযোগে জিন্না প্রকৃত পক্ষে পাকিস্থান বখশিশ পাইয়াছেন। এ দলের অনেকে আজ বলিতেছেন, লীগকে প্রদেশগুলিতে সুবিধা দিয়া ত খুসী করা হইয়াছে, তাহার উপর কেন্দ্রী সরকারে তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিবার জন্য প্যারিটি বা সংখ্যা-সাম্যের কোন যৌক্তিকতা দেখা যায় না। তাঁহারা বলিতেছেন যে শ্বেতপত্রে ভারতীয় শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে এই নীতি অবলম্বিত হইয়াছে যে, হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব নির্ণয়ের মাপকাটি। কিন্তু কেন্দ্রী মন্ত্রিমণ্ডলে যে সংখ্যা-সাম্যের আব্দার লীগ করিতেছে তাহাতে এই মাপকাটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে। সম্প্রতি বোর্ণমাথের হুইটসন কনফারেন্সে শ্রমিক দলের যে সকল প্রতিনিধি যোগ দেন তাঁহারা বেসরকারী ভাবে পরামর্শ দিয়াছেন যে, মধ্যকালীন কেন্দ্রী সরকারে দুইটি লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কংগ্রেস দলীয় প্রতিনিধি লইলে সমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে। অপর এক দল এরূপ পরামর্শ দেন যে বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যসংখ্যা ১৫ জন করিয়া কংগ্রেস দলকে ৭ জন, মসলেম লীগকে ৫ জন এবং লঘিষ্ঠ দলগুলির ৩ জন মন্ত্রী নিয়োগ করা হউক। ইহাতে মধ্যকালীন সরকারে কংগ্রেস সর্ব্বদলনিরপেক্ষ সংখ্যা-বলিষ্ঠ হইয়া পড়ে, কাজে কাজেই মসলেম লীগের আপত্তি। লীগের গাত্রদাহের হেতু এই যে, ভারতের ১১টি প্রদেশের ৮টি প্রদেশে কংগ্রেস দল সর্ব্বেসর্ব্বা, তাহার পর তাঁহারা কেন্দ্রেও সংখ্যা-বলিষ্ঠ, তাহা হইলে কংগ্রেসী স্বরাজের আর বাকী কি রহিল?

—

লীগের হিংসার যৌক্তিকতা কোথায়

লীগের এই হিংসার কোন যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হিংসায় অবশ্য যৌক্তিকতাও থাকে না। গত নির্ব্বাচন সম্বন্ধে ভারত সরকার সম্প্রতি বিভিন্ন প্রদেশের যে প্রশংসনীয় তুলনামূলক হিসাব রচনা করিয়াছেন তাহার অঙ্কগুলি শুদ্ধ করিয়া পড়িবার মত বিদ্যা ও ধৈর্য্য হিংসাশ্রয়ী লীগ-বন্ধুদের থাকিলে দেখিতে পাইবেন—

(১) ভারতে মুসলমান জনসংখ্যা-অমুসলমান জনসংখ্যার যত ভাগ, তত ভাগের অধিক প্রতিনিধিত্বের দাবী তাঁহারা করিতেছেন।

(২) কেন্দ্রী সরকার যে সকল প্রাদেশিক ইউনিটগুলি লইয়া গঠিত হইবে, সে সকল ইউনিটের মুসলমান জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দাবীই মাত্র তাঁহারা করিতে পারেন।

(৩) গত নির্ব্বাচনে কত জন মুসলমান ভোটার লীগের পক্ষে ভোট দিয়াছেন এবং কত জন অমুসলমান ভোটার কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দিয়াছেন, তাহাদের অনুপাত কত? এই অনুপাতের অধিক দাবী করা গণতন্ত্রসম্মত, না আব্দারসম্মত?

মসলেম লীগের সম্মতি

মসলেম লীগ মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা মানিয়া শাসনতন্ত্র-নির্ণয়-পরিষদে যোগদান করিতে সম্মত হইলেও লীগ কাউন্সিলের এ সম্বন্ধে গৃহীত প্রস্তাবের ভাষায় ধমকানি ও চোখরাঙানীর অভাব নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, পরিষদের আলোচনা কালে যদি বুঝা যায় যে আলোচনার ফল তাঁহাদের সুখপ্রদ হইবে না, তাহা হইলে যে কোন সময়ে তাঁহারা পরিষদ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া পাকিস্থান লাভ করিবার জন্য সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিবেন। লীগ কাউন্সিলের ৩৬ জন সদস্য (ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই কমুনিষ্ট) মিশন-প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

মধ্যবর্ত্তী সরকার গঠনের চেষ্টায় কংগ্রেস ও মসলেম লীগের মধ্যে সংখ্যা সাম্য রক্ষা করিবার মতলব করিলে কংগ্রেস তাহার বিরোধিতা করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছেন। লীগ মনে মনে তুষ্ট হইলেও মুখে নহে। লীগ যথেষ্ট সুবিধা সংগ্রহ করিয়াছেন। মধ্যবর্ত্তী মন্ত্রিসভায় 'ক' প্রদেশ ও 'খ' প্রদেশের মধ্যে প্যারিটি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের ইচ্ছামত মুসলমান ও শিখ সদস্য 'খ' ও 'গ' গ্রুপ হইতে আসিয়াছে এবং 'ক' গ্রুপ হইতে আসিয়াছে হিন্দু ও খৃষ্টান সদস্য।

মিঃ জিন্নার জিগীর ছিল—পাকিস্থান নীতি মানিয়া না লইলে মধ্যবর্ত্তী সরকারে লীগ যোগ দিবে না। কিন্তু কি জানি কি বুঝিয়া এ সরকারে তাহারা যোগ দিবে স্থির করিয়াছে।

—

ঝগড়া বাধাইয়া মোড়লি কর

মন্ত্রী মিশনের অভিনব সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ মার্কিণ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'টাইম' (১৮ই এপ্রিল সংখ্যায়) মন্তব্য করিয়াছেন—"The British policy of 'divide and rules has been turned by Mr Jinnah to the Pakistan demand, 'divide and quit'—মিঃ জিন্না ইংরেজের 'ভেদপন্থার শাসন'-নীতির পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নীতির সুপারিশ করিয়াছে। এ নীতি হইল 'ভেদ বাধাইয়া সরিয়া পড়।'

জিন্নার পাকিস্থান দাবী সম্বন্ধে 'টাইম' মন্তব্য করিয়াছেন—জিন্নার মুসলমান-ব্যাঘ্র হিন্দু গাভী গ্রাস করিতে চাহে।

ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে পত্রখানি বলিয়াছেন যে যদিও নিয়মতান্ত্রিক সমস্যাগুলির সমাধান হইয়া ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠা হয় তাহা হইলেও ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ নয়। অধিকতর সেচ-ব্যবস্থা, অধিকতর সার, প্রকৃষ্টতর কৃষিপদ্ধতি এবং অধিকতর শ্রমশিল্পের প্রবর্ত্তন না হইলে মাত্র স্বাধীনতায় খাদ্য-সমস্যার সমাধান হইবে না।

উহাদের সমাধান যুক্তি হইল—ভারতীয় সমস্যার সমাধান করিতে হইলে যুদ্ধের সময় বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতের নিকট যে সকল ঋণ করিয়াছিল, বৃটেনের কর্ত্তব্য হইবে আমেরিকার নিকট ঋণ করিয়া সেগুলি ডলারে শোধ দেওয়া। এই ডলারই ব্যয় করিয়া ভারত আমেরিকা হইতে খাদ্য আমদানী করিতে পারিবে।

প্যারিটির মূলে কে ?

গত মহাযুদ্ধ বাধিবার অব্যবহিত পরে লর্ড লিনলিথগো যখন তাঁহার শাসন পরিষদের সদস্য-সংখ্যা বর্দ্ধিত করিবার প্রস্তাব করেন, তখন মিঃ জিন্নাই সর্ব্বপ্রথম কংগ্রেসের সহিত প্যারিটি বা সংখ্যা-সাম্যের দাবী করেন। তিনি এ দাবীও করেন যে, কংগ্রেস প্রস্তাবিত শাসন পরিষদে যোগ দিতে অসম্মত হইলে অন্য দলের প্রতিনিধি অপেক্ষা লীগের প্রতিনিধিই বেশী লইয়া শাসন পরিষদ গঠন করিতে হইবে। লীগের সে দাবী মাঠে মারা যায়। ইহার পর ভুলাভাই-লিয়াকৎ চুক্তিতে কংগ্রেসকে না জানাইয়া ভুলাভাই দেশাই কেন্দ্রী শাসন পরিষদে কংগ্রেস-লীগ প্যারিটিতে সম্মত হন। ইহার জন্য অবশ্য দেশাইকে লজ্জিত হইতে হইয়াছিল! সাপ্রু-রিপোর্টে কেন্দ্রী পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে বর্ণহিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যা-সাম্যের প্রস্তাব করা হয়। এ প্রস্তাবের সর্ত্ত ছিল যে, মুসলমানরা পাকিস্থানের পরিকল্পনা পরিহার করিয়া ঐক্যবদ্ধ ভারতের অংশ বলিয়া আপনাদিগকে মনে করিবে। আরও সর্ত্ত যে, মুসলমানদিগকে যুক্ত নির্ব্বাচক-মণ্ডলে সম্মত হইতে হইবে। গত বৎসর সিমলা বৈঠকে লর্ড ওয়াভেলও কেন্দ্রী সরকারের পুনর্গঠনের জন্য বর্ণহিন্দু ও মুসলমান সংখ্যা-সাম্যের প্রস্তাব করেন, মিঃ জিন্না এ প্রস্তাবকে নস্যাৎ করিতে চাহেন বলিয়া প্রস্তাব আর কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই।

মধ্যবর্ত্তী সরকার গঠনের নয়া প্রস্তাব

কেন্দ্রে ওয়াভেল যে মধ্যবর্ত্তী মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন তাহার নীতি কংগ্রেস দল যখন মানিয়া লইতে অসম্মত হন, তখন মন্ত্রী মিশন প্যারিটি বা লীগের সহিত সংখ্যা-সাম্য নীতি বর্জ্জন (!) করিয়া ৯ জন অমুসলমান ও ৫ জন মুসলমান লইয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের প্রস্তাব করেন। নতুন প্রস্তাবে কংগ্রেস ও কংগ্রেস-সমর্থিত সদস্য রহিলেন—(১) পণ্ডিত জওহরলাল, (২) সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল, (৩) ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, (৪) শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাতাব, (৫) সর্দ্দার বলদেব সিং, (৬) ডাঃ জন মাথাই, (৭) শ্রীযুত জগজীবন রাম।

মসলেম লীগের	৫ জন।
অন্য দলের	২ জন।

কংগ্রেস দল হইতে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু, রাজকুমারী অমৃত কাউর, ডাঃ জাকির হোসেনের নাম ছিল। মিশনে শরৎ বাবুর নাম বাদ দিয়া উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ মহাতাবের নাম প্রস্তাব করায় কংগ্রেস-মহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ বলিতেছেন, কংগ্রেস নূতন প্রস্তাবে গদি লইতে সম্মত হইলেই (সম্ভবতঃ হইবেন) শরৎ বাবুকে লইবার পক্ষে কোন বাধা থাকিবে না। শুনা যাইতেছে, বৃটিশ প্ল্যান সার্থক করিবার জন্য লর্ড প্যাথিক লরেন্সের আমন্ত্রণে চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী নয়া ফরমূলা লইয়া মাদ্রাজ হইতে দিল্লী গিয়াছিলেন, কংগ্রেসের আমন্ত্রণে নহে। মসলেম লীগের এই প্রস্তাবে অমত আছে বলিয়া মনে হইতেছে না। গান্ধীজী এবার সাবধানে উভয় কূল রক্ষা করিয়া মত দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—নয়া প্রস্তাবে ভালও আছে মন্দও আছে। ডুড়ও আছে টামাকও আছে।

ভারতীয় সৈনিকদের দাবী

ভারতীয় সৈন্যদল ভারতীয় নৌ-বাহিনী ও ভারতীয় বিমান-বাহিনীর তরুণ সৈনিকরা মন্ত্রী মিশনের নিকট এক স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়া দাবী করিয়াছে—

১। অবিলম্বে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে হইবে এবং তাহার আন্তরিকতার প্রমাণস্বরূপ অবিলম্বে শতকরা ৭৫ জন বৃটিশ সৈন্য স্বাধীনতা ঘোষণার তিন মাসের মধ্যে অপসারিত করিতে হইবে।

২। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ শেষ হইবার পূর্ব্বে যাহাতে সম্পূর্ণ বৃটিশ সৈন্য সরাইয়া লওয়া হয় তৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা অবিলম্বে করিতে হইবে।

৩। বৃটিশ সৈন্য অপসারণের পর দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলার সুবন্দোবস্ত না করা পর্য্যন্ত ভারতীয় সৈন্য দল ভাঙ্গিবার আয়োজন বন্ধ রাখিতে হইবে।

৪। বৃটেনে আটক ভারতের ষ্টার্লিং-ব্যালেন্স শোধ করিতে হইবে—স্বর্ণমানে এবং রেলওয়ে, বৃটিশ ফ্যাক্টরী প্রভৃতি নবগঠিত জাতীয় সরকারের হস্তে অর্পণ করিয়া।

৫। বৃটিশ সরকারের সহিত ভারতের দেশীয় রাজাদের যে সকল সন্ধি পূর্ব্ব হইতে আছে, তাহা নিষ্ক্রিয় বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। ভারতের জাতীয় সরকার বিভিন্ন সামন্ত রাজ্যের গণ-প্রতিনিধির সহিত পরামর্শ করিয়া বিভিন্ন রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র-মর্য্যাদা নির্ণয় করিবেন।

৬। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সকল বন্দী সৈনিক, সকল রাজনৈতিক বন্দী এবং ফেব্রুয়ারীর আর-আই-এন ধর্ম্মঘটের ফলে জঙ্গী আদালতের বিচারে যাঁহারা দণ্ডিত, তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিতে হইবে অবিলম্বে।

৭। মসলেম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে প্যারিটির উপর ভিত্তি করিয়া মধ্যবর্ত্তী জাতীয় সরকার স্থাপন করিতে হইবে। এই সরকারে লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়দের যথোপযুক্ত প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে হইবে।

তরুণ সৈনিকরা সুস্পষ্ট ভাবে ক্যাবিনেট মিশনের আন্তরিকতায় সন্দেহ করিয়া বলিয়াছে যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদের সুযোগ লইয়া উঁহারা ঘৃণিত ক্রিপস কূপল্যাও পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে চাহে। ইহা দ্বারা তাহারা আরও এক শত বছর ভারতের সামরিক ও অর্থনৈতিক দাসত্ব কায়েম করিতে চাহে।

এই স্মারকলিপিতে দেশপ্রাণ সৈনিকরা বলিয়াছে—"The brave Indian soldiers, sailors and airmen played a prominent part against the Axis domination of the world···But when we return to our country, it is still under British domination."—ভারতের বীর সৈনিক, নাবিক ও বৈমানিকরা পৃথিবীর উপর অক্ষশক্তির প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিশেষ অংশ

গ্রহণ করে, কিন্তু আমরা স্বদেশে ফিরিয়া দেখিলাম, জন্মভূমি এখনও বৃটেনের পদতলে। মুসলমান সৈনিকরা তাঁহাদের স্মারকলিপিতে মিঃ জিন্নার উপর আস্থা জ্ঞাপন করিলেও জানাইয়াছে—"আমরা এ কথা বলি না যে, মুসলমান সৈনিকরা হিন্দু ও শিখ সৈনিক ভাইদের সহিত যুদ্ধ করিবে···তাহারা হিন্দু ও মুসলমান সকলেরই সম-শত্রু ও সম-নিপীড়ক বৃটেনের সহিত সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধ করিতে চাহে।"

স্মারক-পত্রে এ কথাও জানান হইয়াছে—"বোম্বাই, করাচি ও কলিকাতায় ধর্ম্মঘটের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা নিঃসংশয় হইয়াছি যে, জনসাধারণ, কৃষাণ, শ্রমিক, ছাত্র ও স্বাধীনতাপ্রিয় সকল নরনারী ভারত হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ উৎখাতের এই সংগ্রাম সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিবে।" সৈনিকরা জানাইয়াছেন—"We are determined to prove by our vigilant action that we are not mercenaries but a patriotic army determined to fight with vigour and enthusiasm against the hated British Imperialists and liberate our country from foreign subjugation."

আরব লীগ ও মিশর পাকিস্থানবিরোধী

আরব লীগের সেক্রেটারী জেনারল আজ্জাম পাশা এবং মিশরের ওয়াফ্দ্ দলের সাব্রি আবু আলম পাশা সম্প্রতি এক সাংবাদিককে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা একতাবদ্ধ ভারতের অখণ্ড স্বাধীনতার পক্ষপাতী। তাঁহাদের মাত্র প্রশ্ন ইহাই—ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসানের দিন কি সমাগত? ভারতের বাহিরে মুসলিম ব্রাদারহুড বলিয়া যে দল আছে, তাহাদের নীতির মূল কথা প্যান-ইসলাম বা অখিল মুসলমানবাদ হইলেও, এই দল, ভূমধ্যসাগরের তটবর্ত্তী এবং পশ্চিম-এশিয়ার মুসলমান রাজ্যগুলির রাষ্ট্রনৈতিক গতি ও পরিণতি লইয়াই ব্যস্ত। জিন্নার কার্য্য লইয়া মাথা ঘামাইবার অবসর তাহাদের নাই। তাহারা পাকিস্থান পরিকল্পনাকে কখনও উৎসাহিত করে নাই।

পাক-পন্থীদের গুপ্ত আয়োজন

পাকিস্থান-পন্থী মুসলমানগণ কি ভাবে আপনাদের কার্য্য পরিচালন করিবে তৎসম্বন্ধে টাইপ করা এক গুপ্ত সার্কুলার প্রচার করা হইয়াছে বলিয়া মীরাট হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সার্কুলারে হিন্দু ও বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে। মুসলমানের শত্রুদের (?) কি ভাবে পীড়ন, বিপর্য্যস্ত ও পরাজিত করা যায় তাহার উপায় ও পদ্ধতির কথা ("The ways and means of coercing, harassing, routing our enemies") ইহাতে বলা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, মিঃ জিন্না মুসলমানদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মাত্র ইঙ্গিত দিতে পারেন, প্রত্যেকটি মুসলমানের কাছে গিয়া হিন্দু ও ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে তিনি বলিতে পারেন না। সার্কুলারের কয়েকটি উপদেশ এই—"Hold secret meetings, enrol Mujahids, develop strong communal feelings, instruct the people to adopt the ways and means to overawe the Hindu public, for example, settings fire, spreading false rumours, etc. Give lessons to people in sabotaging." গুপ্ত সভার আয়োজন কর, মুজাহিদ সভ্য সংগ্রহ কর, (পাকিস্থান কায়েম করিবার জন্য বল-প্রয়োগ করাই মুজাহিদ গুপ্ত সমিতির উদ্দেশ্য), তীব্র সাম্প্রদায়িক গণবুদ্ধি গড়িয়া তোল—অগ্নিদান, মিথ্যা জনরব প্রচার প্রভৃতি দ্বারা হিন্দু জনসাধারণকে শঙ্কিত করিবার উপায় অবলম্বন কর। এই ইস্তাহারে আরও পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে যে, পুলিশের থানায় যদি কোন বেতার যন্ত্র থাকে সেগুলি ধ্বংস কর। সার্কুলারের পরিশিষ্টে বলা হইয়াছে—গুণ্ডা ও যুদ্ধ-ভাবাপন্ন লোকগুলিকে উৎসাহ দিয়া নিযুক্ত কর ("Goondas and the war-like people must be encouraged and engaged.")

পাটনায় জয়প্রকাশ নারায়ণের অভ্যর্থনার জন্য যে কমিটী গঠন করা হয় তাহাতে বিহার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সৈয়দ মবারক আলি স্বেচ্ছায় যোগদান করিলে লীগ-সভাপতি তাঁহার কৈফিয়ৎ তলব করিয়া নির্দ্দেশ দেন যে—'No Muslim Leaguer should accept to serve on any committee which gives felicitation to Congress leaders'—কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সমর্থন করে, এরূপ কোন কমিটীতে মসলেম লীগপন্থী কেহ যেন সদস্যপদ গ্রহণ না করেন। উত্তরে মবারক আলি লীগ-সদস্য পদ ত্যাগ করিয়া মিঃ জিন্নাকে লিখিয়াছেন—আমি আমার সাম্প্রদায়িক মনোভাব সঙ্কীর্ণ করিতে পারি না—'You can make fool of all person for some time, of some persons for all times, but not of all persons for all times"—মবারকের সঙ্গে বিহারের আরও কয়েক জন লীগপন্থী লীগের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিতে পারেন।

মসনদ না পাইতেই বাদশাহ জিন্না ও তাঁহার বান্দারা যে প্রকারের জঙ্গী মনোভাব প্রকাশ করিতেছে, তাহা হইতে মনে হয় যে, অমুসলমান ভারত অত্যন্ত ক্লীব, তাহারা পশ্চাদ্ভাগের আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইয়া কোঁচা ও কাছা খুলিয়া আক্রমণ খাঁ সাজিবে। ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম যাহারা করিয়াছে, তাহারা তাহা করিয়াছে—ফাঁকী দিয়া নহে, চরম বলি দিয়া। তাহারা যে দুই একটা জিন্না বা নূনের আওয়াজী অপপ্রচেষ্টাও স্তব্ধ করিতে পারে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হওয়া অস্বাভাবিক।

রেলওয়ে ধর্ম্মঘট

ভারতের রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা কর্ত্তৃপক্ষকে নোটিশ দিয়াছে যে, ২৭শে জুন মধ্যরাত্রি হইতে তাহারা ধর্ম্মঘট করিবে। যেখানে ভারতের খাদ্য-সঙ্কট ভয়ঙ্কর, সেখানে তাহার সুযোগ লইয়া এই ধর্ম্মঘট জাতির স্বার্থসম্মত কি না তাহা জনসাধারণ বিচার করিবে। কেন্দ্রী সরকারের ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটী রেলওয়ে শ্রমিকদের দাবী সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। কিন্তু ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এ সকল দাবী পূরণ করিতে হইলে হয় ট্রেণের ভাড়া ও মাশুল বর্দ্ধিত করিতে হইবে, বিশেষতঃ তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া, এবং ডিপ্রিসিয়েশন ফণ্ডের রিজার্ভ কতকটা ভাঙ্গিতে হইবে। রেলওয়ে শ্রমিক ও

কর্মচারীরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অপেক্ষা ধনী, অন্তবিধ ভাবেও তাহারা যে অর্থ অর্জন করে, সে অবৈধ অর্থ সংগ্রহ বেতনবৃদ্ধিতে বন্ধ হইবে না। সুতরাং তাহাদিগের অধিকতর চাহিদা মিটাইবার জন্য তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে শোষণ যদি করিতে হয়, তাহা হইলে অন্যায়।

'৪২এর আগষ্ট আন্দোলনের প্রথম সপ্তাহে এক জন মার্কিণ সমর-সাংবাদিক মন্তব্য করেন—"You can bring down the Viceroy to his knees within 48 hours, you can even do it nonviolently and peacefully, without harming a single soul. No trains to run on a given date; or just remove the rails off by a given date, that would entail no loss of life, provided due notice were given.' আগষ্ট অন্দোলনের সময় এই সাংবাদিকের পরামর্শ পালন করা হয় নাই। কিন্তু যাহারা সে সময় আগষ্ট আন্দোলনের বিরোধিতা মাত্র নহে, সে আন্দোলন পণ্ড করিবার জন্য সরকারকে সাহায্য করিয়াছে, যাহারা স্বদেশের মুক্তির জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করে নাই, তাহারাই এই পরামর্শ পালন করিবার চেষ্টা করিবে বলিয়া মনে হইতেছে। আজ যে কমুনিষ্টরা ভারতব্যাপী ধর্মঘট পাকাইয়া তুলিবার জন্য ইন্ধন জোগাইতেছে, মানবেন্দ্র-পন্থীরাও তাহাতে পোঁ ধরিয়াছে। 'Forum' পত্র ইহাদিগকে প্রশ্ন করিয়াছেন—"Where were the communists then who are now intriguing for a general strike? Where were the Royists then? They joined the war which was not then ours. The communists were in the pay of two foreign governments, and Royists in the pay of at least one single foreign government, and it is these very people who now want to precipitate a general railway strike when the national leaders are engaged in historic parleys which by the end of this week may transfer power into the hands of India."

'কাশ্মীর ছোড় দো'

জম্মু ও কাশ্মীর জাতীয় সম্মিলনের সভাপতি শেখ আব্দুল্লাকে কাশ্মীরের মহারাজা রাজদ্রোহকর কতকগুলি বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। গত ১৫ই মে শেখ আব্দুল্লা এক বক্তৃতায় বলেন,—"বিপ্লব জারদের বিতরিত করিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবও করিয়াছে তাহাই। বাণী আসিয়াছে। অমৃতসর সন্ধিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া কাশ্মীর ছাড়িয়া চলিয়া যাও। ভারত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে। চন্দ্রভাগার উভয় তট এই সংগ্রামের ধ্বনিতে আজ মুখরিত। তাহার পর উত্থিত হইবে ধ্বনি—ছাড় ভারত।"

দেশীয় রাজ্যের আন্দোলন পরিচালন সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলালের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য আব্দুল্লা রাওয়ালপিণ্ডি হইয়া নয়াদিল্লীতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনগরে জঙ্গীফৌজের তাণ্ডব চলিতেছে. জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া দাবী করিতেছে, যে অমৃতসর সন্ধি দ্বারা কাশ্মীর বর্তমান রাজবংশের হাতে অর্পণ করা হইয়াছে, তাহা বাতিল কর। চণ্ডনীতি তুচ্ছ করিয়া জনসাধারণ ধ্বনি তুলিয়াছে. 'কাশ্মীরকো ছোড় দো'—'বাইনামা অমৃতসর তোড় দো।' জাতীয় সম্মিলনের সম্পাদক আত্মসমর্পণ করেন নাই। মনে হইতেছে, জাতীয়তাবাদী নেতারা আত্মগোপন করিয়াছেন। মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্থানে প্রাচীরপত্রে ঘোষণা করা হইতেছে, জনসাধারণ যেন আন্দোলন সজীব রাখে, তাহারা যেন স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিত্যাগ না করে।

কিন্তু কেহ কেহ—বিশেষতঃ কাশ্মীরের হিন্দু মহারাজার সমর্থক হিন্দু মহাসভা,—ইহাও মনে করেন যে, আব্দুল্লার এই বিপ্লব কাশ্মীরে এক ইসলামী রাজত্ব স্থাপনের চেষ্টা। তাহা না হইলে রিয়াসৎ প্রজামণ্ডলের সহকারী সভাপতি আব্দুল্লা ভারতের সকল সামন্তরাজ্যে সমভাবে আন্দোলন চালাইতেন। পণ্ডিত নেহরু না কি কাশ্মীরের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব উপলব্ধি না করিয়াই আব্দুল্লাকে সমর্থন করিতেছেন। আব্দুল্লার বিদ্রোহ কাশ্মীর পাকিস্থানের সহিত বহিঃশক্তির ষড়যন্ত্রে পরিণত হইবে।

আব্দুল্লা আন্দোলন

কাশ্মীরকে কোন দিনই ইংরেজ সুনজরে দেখে নাই। রুশ জারদের আমলে তাহারা রুশ আপদ বা Russian menaceএর ভয় করিত। আজ বিজয়ী সোভিয়েট রুশিয়াকেও তাহারা ভয় করিতেছে। ইংরেজ কূটনৈতিক গোয়েন্দারা আশঙ্কা করিতেছে যে, সোভিয়েট বিমান-বাহিনী যে কোন সময় কাশ্মীর দিয়া ভারত আক্রমণ করিতে পারে। অনেকে মনে করিতেছেন যে, বৃটিশ মন্ত্রী মিশনের সহসা কাশ্মীর পরিদর্শনের উদ্দেশ্যই ছিল, এই আশঙ্কা কত দূর সত্য তৎসম্বন্ধে সরেজমিনে তদন্ত করা। কাশ্মীরের ইংরেজদের করধৃত সামন্তরাজ বরাবরই ইংরেজ-নিযুক্ত দ্বারবানের কাজ করিয়া আসিতেছে। কাজেই তাহারা জাতীয় আন্দোলন কিছুমাত্র বরদাস্ত করিতে পারে না জনসাধারণ অত্যন্ত দরিদ্র, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। 'বেগার' প্রথার অত্যধিক চলনের ফলে এই সকল দরিদ্র ক্রীতদাসে পরিণত হইয়াছে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ভারতের আইন অমান্য আন্দোলনের প্রভাবে কাশ্মীরের নিপীড়িত জনসাধারণ চঞ্চল হইয়া উঠে। এ সময় যুবক সেখ আব্দুল্লার নেতৃত্বে গণ-আন্দোলন আরম্ভ হয়। কাশ্মীর দরবার আন্দোলন দমন করিবার জন্য গুলী চালান, হাজার হাজার লোককে প্রকাশ্য স্থানে চাবুক মারা হয়, বহু শত লোক কারাবদ্ধ হয়।

আপাত-দৃষ্টিতে মুসলমান-প্রধান কাশ্মীরের আন্দোলন সাম্প্রদায়িক হইলেও উহা ঠিক সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন ছিল না। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে শেখ আব্দুল্লার সভাপতিত্বে কাশ্মীরে মুসলিম সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা হয়। এ সময় আব্দুল্লা এক বক্তৃতায় বলেন—'আমাদের এ আন্দোলন সাম্প্রদায়িক নহে, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেও এ আন্দোলন নহে। আমার হিন্দু ও শিখ ভাইদের আমি আশ্বাস দিতেছি যে, আমরা মুসলমানদের জন্য যাহা করিতেছি, তাহাদের দুঃখ ও দুর্দশা দূর করিবার জন্যও সমভাবেই তাহা করিব।' পরবর্তী বৎসর শেখ আব্দুল্লা প্রস্তাব করেন যে, তিনি ইংরেজের সামন্ত কাশ্মীর-রাজের বিরুদ্ধে সমবেত ভাবে দণ্ডায়মান হইবার জন্য শিখ ও হিন্দুদের

সাহায্য চাহেন। কিন্তু তাঁহার এ চেষ্টা দরবার ব্যর্থ করেন। দরবার ব্যাপক ভাবে জুলুম চালাইতে থাকেন। কিন্তু মুসলিম সম্মিলনের শক্তি তাহাতে বৃদ্ধি পায়। '৩৪ খৃঃ আব্দুল্লা প্রতিনিধিমূলক শাসন-তন্ত্রের দাবী করেন। সরকার অসম্মত হইয়া আবার জুলুম চালাইল। আবার গুলী চলিল, চাবুক চলিল, পাইকারী ট্যাক্স আদায় হইতে লাগিল। জনসাধারণ সে অত্যাচার আর সহ্য করিতে পারিল না। আব্দুল্লা আন্দোলন প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন। ১৯৩৫ খৃঃ তিনি সকল সম্প্রদায়কে এক করিতে চেষ্টা করিলেন। এ সময় লাহোরের এক সাংবাদিক-বৈঠকে তিনি বলিলেন—"পঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপন্থী নেতাদের অপপ্রচারের ফলেই সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হইয়াছে। সকল বাধা তুচ্ছ করিয়া আমার দেশ হইতে আমি এই সাম্প্রদায়িকতার বিষ নষ্ট করিব।" পণ্ডিত জওহরলাল ও খাঁন আব্দুল গফুর খাঁনের প্রভাবে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে মুসলিম সম্মিলনের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া হয় "জাতীয় সম্মিলন।" মহম্মদ আলি জিন্না কাশ্মীরী মুসলমানদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়া আব্দুল্লার উত্তর পান—"We shall decide to join or not to join Pakistan. Our links are with Hindusthan"—আমরা পাকিস্থানে যোগ দিব কি না দিব তাহা পরে বিবেচ্য···বর্ত্তমানে হিন্দুস্থানের সঙ্গেই আমাদের সকল সম্পর্ক বিদ্যমান। আব্দুল্লা সামন্ত রাজ্যের ১ কোটি প্রজার অন্যতম মুখপাত্র ও সৈনিক। গ্রেপ্তারের কয় দিন পূর্ব্বে তিনি বলেন—"Rulers of Indian states possess one-fourth of Indian and they have always played traitors to the cause of freedom. When we raise the slogan quit Kashmir', we naturally visualise that the Princes and Nawabs should quit all states, I am sure this demand applies similarly to states like Hyderabad, where people will, I am sure raise their voice 'Quit Hyderabad.'—ভারতের সিকি অংশ ভারতীয় সামন্ত রাজাদের দখলে। তাহারা সর্ব্বদাই ভারতের স্বাধীনতার প্রচেষ্টায় বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। আমরা যখন 'কাশ্মীর ছাড়' ধ্বনি করি তখন স্বভাবতঃ আমাদের কামনা, নবাব আর রাজারা সমস্ত করদ রাজ্য ছাড়িয়া যাক। হায়দ্রাবাদের মত রাজ্য সম্বন্ধেও যে এ দাবী প্রযোজ্য। এ বিষয় আমি নিঃসংশয়, সেখানেও জনসাধারণ নিশ্চয় ধ্বনি তুলিবে—'ছাড় হায়দ্রাবাদ।' গান্ধীজী যখন কাশ্মীর যান, তিনি জাতীয় সম্মিলনের অতিথি হইতে রাজি হন। কিন্তু যখন দরবারের আতিথ্য গ্রহণ করিতে তিনি সম্মত হন, আব্দুল্লা ক্রুদ্ধ হন। গান্ধীজীকে সেবার ভূস্বর্গ দর্শনেচ্ছা পরিহার করিতে হয়। ফলে আব্দুল্লাকে পণ্ডিত নেহেরুর প্রশংসা করিতে দেখিয়া এক দিকে কাশ্মীর দরবার ক্রুদ্ধ, অন্য দিকে মিঃ জিন্না ক্ষিপ্ত। দরবারপন্থী 'কাশ্মীর ক্রনিকল' ২২শে মের সংখ্যায় অবান্তর ভাবে কাশ্মীর আন্দোলনের সমর্থক পণ্ডিত নেহরুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'প্রত্যেক বিদেশী লেখক লিখিয়াছে কাশ্মীরীরা মিথ্যাবাদী। পণ্ডিত নেহেরু কাশ্মীরী। সুতরাং তাঁহার রক্তে মিথ্যা বলিবার প্রবৃত্তি বিদ্যমান।' জিন্নার ক্রোধের উত্তরে বন্দী আব্দুল্লা কিন্তু স্পষ্ট জবাব দিয়াছেন—"নেহেরুও কাশ্মীরী, আমিও। আমাদের দুই জনের শিরায় একই শোণিত সঞ্চারিত। তুমি কে?" ("Nehru and I are Kashmiris. Common blood flows in our viens. Who are you")। কাশ্মীর দরবার কাজে কাজেই পণ্ডিত জওহরলালকে কাশ্মীরে প্রবেশ করিতে দিতে সম্মত হইতেছেন না। তাঁহারা বলিয়াছেন, "পণ্ডিত নেহরু এ কথা স্পষ্ট জানিয়া রাখুন যে, কাশ্মীর ফরিদকোট নহে। বলপ্রয়োগের হুমকী আমরা সহ্য করিব না।"

——

এখনও হুঁসিয়ার

বাংলার মাথার উপর মৃত্যুর কাল ছায়া যেন ঘনাইয়া আসিতেছে। জিলা-সমূহে চাউলের মূল্য বাড়িয়া চলিয়াছে। মজুদ শস্য খুব বেশী নাই। জ্যৈষ্ঠের বর্ষায় বহু স্থানের আশু ধান্যের চারাগুলি নষ্ট হইয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গে আশু ধান্য বুনিতেই পারা যায় নাই। এখন হইতেই বড় বড় সহরে, বিশেষতঃ কলিকাতায় নিঃাশ্রয় নিরন্নগণ দলে দলে আসিয়া জুটিতেছে। রবিশস্য আশানুরূপ হয় নাই। বাংলার নর-নারীর জন্য প্রতি বৎসর প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ টন ধান্যের আবশ্যক—এ ধান্য বাংলায় নাই। অন্য প্রদেশেরও দিবার সামর্থ্য নাই। ভারতের অন্য প্রদেশগুলিরও অবস্থা শঙ্কাজনক। যে দলের মন্ত্রিমণ্ডল '৫০-এর মন্বন্তরের জন্য দায়ী, সেই দলের মন্ত্রিমণ্ডলই এবারও বাংলা শাসনের ভার পাইয়াছে। তাহারা ইস্তাহারের স্তোকবাক্য দ্বারা আশ্বাস দিতেছে। কিন্তু চিপিটক বলিয়া একটি পদার্থ আছে যাহা সিক্ত করিতে হইলে বাক্য দধির স্থান অধিকার করে না। গত জানুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত সময়ে বাংলা সরকার এ কথা কোথাও বলেন নাই, এ দেশে খাদ্যের অভাব হইবে। অথচ মে মাসে ঘোষণা করিয়াছেন, শতকরা ৭.৮ ভাগ খাদ্য কম আছে। বাংলা কংগ্রেস এই প্রাণরক্ষার ব্যাপারে সুরাবর্দ্দী সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু কংগ্রেসকে সুযোগ লীগ-পন্থী জিন্না দিবেন কি না এবং অবাঙ্গালী সুরাবর্দ্দী এ সুযোগ গ্রহণ করিবেন কি না সন্দেহ। গত মন্বন্তরেও দেখা গিয়াছে যে, খাদ্য-বণ্টনের বিশৃঙ্খলার জন্য বহু লোক অকালে প্রাণ হারাইয়াছে। রাজনীতিক বা সাম্প্রদায়িক দলের অস্তিত্ব রক্ষা করাই যেন এখন পর্য্যন্ত বাংলা সরকারের প্রথম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হইতেছে। তাহা না হইলে যুক্তপ্রাদেশিক কংগ্রেসী সরকার যেমন সরকারী ও বেসরকারী সর্ব্বপ্রকারের মজুদ শস্য রাষ্ট্রগত করিয়া জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলির হস্তে এক একটি মণ্ডলের বণ্টন-ভার প্রদান করিয়াছেন, বাংলা সরকারও সে পদ্ধতি এখন হইতেই অবলম্বন করিতেন। অবশ্য ইহাতে লীগ দলের সমর্থিত ঠিকাদারদের অসুবিধা হইবে। কিন্তু দুই-এক জন অবাঙ্গালী ইসপাহানীর উদর বৃদ্ধি অপেক্ষা বাংলার লক্ষ লক্ষ নিরন্ন নরনারীকে অন্ততঃ ১ বেলার ভর-পেট ভাত দেওয়া ঢের বেশী প্রয়োজন। নিরন্ন উৎপাদকদের ভিটা-বেচা কড়ি কাড়িয়া যাহারা আপনাদের মনসবদারী কায়েম রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর, তাহারা হয়ত এবার বহাল তবিয়তে গদীতে বসিতে পারিবে না। '৫০-এ উহারা বিনা প্রতিবাদে ভগবানের উপর বকলমা দিয়া মরিয়াছে, '৫৩-এ তাহাদের শিথিল পেশী হয়ত বেপরোয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়া প্রমাণ করিবে, অন্নস্থান ও পাকিস্থানের মধ্যে অন্নকে বড় করিতে যাহারা অসম্মত, তাহাদের স্থান এখানে নহে।

স্মৃতিপূজা

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের স্বত্বাধিকারী মাসিক বসুমতীর সম্পাদক দৈনিক ও সাপ্তাহিক বসুমতীর স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় মৃত্যু-বার্ষিকী ১৮ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে উদ্‌যাপিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করেন এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

অভিভাষণ-প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলেন,—"সতীশচন্দ্র যে আদর্শে



সতীশচন্দ্র

অনুপ্রাণিত হইয়া ৫৩ বৎসর কাল সাহিত্য-সাধনা করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য যে প্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্য দিয়া দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের চাক্ষুষ পরিচয় হয় ইহাই আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা। সতীশচন্দ্রের স্মৃতিবাসরে এই কথাই সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিতে হইবে যে, বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব আজ খর্ব্ব হইতে চলিয়াছে। নিজেদের দোষ-ত্রুটি স্বীকার করিয়া লইয়া আমাদের লক্ষ্য হইবে যে, বাঙ্গালী বড় ছিল—বড়ই থাকিবে। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে যখনই আমি উপস্থিত হই, তখনই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই কামনা করি যে, বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান বড় হউক।"

রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলেন,—"সতীশচন্দ্রের উদারতা, অমায়িক সৌজন্য—চেহারার মধ্যে এমন সৌম্য, শান্ত স্নিগ্ধ ও কমনীয় ভাব ছিল যে, সে আকর্ষণ উপেক্ষা করা কাহারও সাধ্য ছিল না। তিনি বরেণ্য। তিনি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সমাধান না করিয়া নিরস্ত হন নাই। বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি বাঙ্গালায় যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন, জ্ঞান-বিকিরণের ক্ষেত্রে তাঁহার সেই দান অতুলীয়।"

শ্রীযুক্ত ভবতোষ ঘটক তাঁহার ভাষণে বলেন,—"জাতীয়তার যে প্রেরণায় স্বদেশী যুগে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছিল, সেই জাতীয়তার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বসুমতী সাহিত্য মন্দির তৎকালীন বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধ-বনিতার গৃহে অকুতোভয়ে জাতীয়তার অগ্নিমন্ত্র পরিবেশন করিয়া আসিয়াছে। এদিক দিয়া উপেন্দ্রনাথ ও সতীশচন্দ্র বাঙ্গালার প্রাথমিক জাতীয়তার পতাকাধারীদের সমগোত্রীয়।"

শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,—"বাঙ্গালার বর্ত্তমান সংস্কৃতি বাঙ্গালীর প্রতি ঘরে ঘরে পৌছাইয়া দিবার যে আয়োজন সতীশচন্দ্র করিয়াছিলেন—রাষ্ট্রীয় সাধনা যখন সম্পন্ন হইবে তখনই তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত হইবে। সতীশচন্দ্রের সর্ব্বোত্তম কীর্ত্তি হইল সুলভে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আধুনিক প্রাচীন সাহিত্যের ধারাকে পৌছাইয়া দেওয়া। বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী বহু বাঙ্গালীকে সাহিত্যিক হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছে। এই জন্যই সতীশচন্দ্র প্রণম্য ও শ্রদ্ধার পাত্র।"

সভায় নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, বিধুভূষণ সেনগুপ্ত, মেজর পি বর্দ্ধন, শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী, ডাঃ অঘোরনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনোজ বসু, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর, কামাক্ষিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুধাময় বসু, শান্তি পাল, সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়, বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারুতোষ ঘটক।

প্রেসিডেণ্ট কালিনিন

মাইকেল আইভানোভিচ কালিনিন ১৮৭৫ সালের ২০শে নভেম্বর টেভার গুবার্ণিয়াতে (বর্ত্তমানে কালিনিন অঞ্চল বলা হয়) জন্ম গ্রহণ করেন। ১৪ বছর বয়সে সেণ্টপিটার্সবুর্গে কাজ করিতে যান। ১৮৯৩ সালে তিনি "পুরাতন অস্ত্রশস্ত্রে"র কারখানায় শিক্ষানবিশী করিতেন এবং সন্ধ্যাকালীন পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিতেন। ১৮৯৬ সালে তিনি পুটিলভ কারখানায় কাজ করিবার সময় লেনিন-প্রতিষ্ঠিত শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্ঘে একজন দক্ষ সদস্য ছিলেন। ১৮৯৮ সালে তিনি রুশীয় সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক লেবার পার্টির সদস্য হন। বৈপ্লবিক কাজ করিবার অপরাধে তাঁকে কয়েক বার জেলে ও দ্বীপান্তরে যাইতে হয়। ১৯০৪ সালে তিনি আলোনেটস্ গুবার্নিয়া হইতে নির্ব্বাসনের পর সেণ্টপিটার্সবুর্গে পুটিলভ কারখানায় আবার কাজ নেন। বলশেভিক পার্টির নার্ভা জেলা কমিটির সদস্য হন, এবং ১৯০৫ সালের প্রথম রুশ-বিপ্লবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯০৮ হইতে ১৯১০ সালে তিনি মস্কোতে পার্টির গুপ্ত আন্দোলনে কাজ করেন। ১৯১১—১৭ সালে তিনি সেণ্টপিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের বৈপ্লবিক আন্দোলন চালান এবং বলশেভিক সংবাদপত্র 'প্রাভদা'তে কাজ করেন। এখান হইতে তিনি ষ্টালিনের সঙ্গে সংযোগ রাখিতেন এবং লেনিনের সঙ্গে পত্রাদি লেন-দেন করেন। অক্টোবরের সমাজতান্ত্রিক সশস্ত্র বিপ্লবের অভ্যুত্থানের দিনে মঃ কালিনিন অত্যন্ত সক্রিয় নেতাদের একজন ছিলেন। রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির (বলশেভিক) অষ্টম কংগ্রেস (১৯১৯) হইতে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য ছিলেন। সেই বছরে—স্বার্ভলভের মৃত্যুর পর লেনিনের সুপারিশে কালিনিন কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। লাল ফৌজকে শক্তিশালী করা এবং সামরিক কাজে ভাল ভাবে সাহায্য করার জন্য তাঁহাকে দুইবার লাল পতাকার সম্মান (অর্ডার অফ দি রেড ব্যানার) দেওয়া হয়। ১৯২৬ সালে রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির চতুর্দ্দশ কংগ্রেসের পর তাঁহাকে "পলিট ব্যুরোর" সভ্য করা হয়। ১৯১৯ সাল হইতে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ পরিষদের শীর্ষে থাকিয়া দৃঢ় ও

আপোষহীন মনোভাব লইয়া সোভিয়েট-প্রথাকে শক্তিশালী করিবার সংগ্রাম চালাইয়াছেন। লেনিন ষ্ট্যালিনের নির্ভুল নীতি অনুসরণ করিয়াছেন। ১৯৩৫ সালে তাঁকে "অর্ডার অফ লেনিন" দেওয়া হয়। ১৯৪৪ সালের ৩০শে মার্চ্চ তারিখে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ পরিষদের শীর্ষে ২৫ বৎসর অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি সোভিয়েট রাষ্ট্র গঠন ও শক্তিশালী করিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েটের সভাপতি-মণ্ডলী তাঁহাকে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকদের বীর সম্মানে ভূষিত করেন—হিরো অফ দি সোশ্যালিষ্ট লেবার। তাঁহার মৃত্যুতে বিশ্বের সর্ব্বহারা মানবগোষ্ঠী একজন শ্রেষ্ঠ বন্ধু হারাইল।

সুধীন্দ্রনাথ বসু

আমেরিকা-প্রবাসী বাঙ্গালী সাংবাদিক সুধীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদে ভারতবাসী মাত্রেই ব্যথিত হইবেন। বহির্বিশ্বে ভারতের জ্ঞান সংস্কৃতি প্রচার এবং ভারতবাসীর রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁহারা আজীবন সংগ্রাম করিয়াছেন, সুধীন্দ্রনাথ তাঁহাদেরই একজন। মার্কিণ মুল্লুকে প্রথম বিশিষ্ট সংস্কৃতি-দূত গিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। পরবর্ত্তী কালে স্বর্গীয় ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাসের সঙ্গে সুধীন্দ্র বসুও এই মহৎ কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। দরিদ্র পরিবারে জন্মিয়া তরুণ বয়সেই সুধীন্দ্রনাথ ভাগ্যপরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বদেশ ও স্বজনবর্গকে পিছনে ফেলিয়া সুদূর মার্কিণ দেশে পাড়ি দিয়াছিলেন। স্বকীয় অধ্যবসায় ও কৃতিত্বের গুণে তিনি উচ্চতম শিক্ষালাভ করেন। অধ্যাপক, সাংবাদিক ও গ্রন্থকাররূপে প্রভূত যশ, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেন। মনে-প্রাণে তিনি খাঁটি ভারতীয় ছিলেন। ভারতীয় ঐতিহ্যের সাম্প্রতিক দুর্দ্দশার কথা তিনি ভুলেন নাই, সারা জীবনের সাধনা দিয়া তিনি একের প্রচার ও অন্যের প্রতিকার কামনা করিয়াছেন। তাঁহার এই কীর্ত্তি চির-স্মরণীয় থাকিবে। তাঁহার মার্কিণী পত্নী ও ঢাকায় অবস্থিত আত্মীয়বর্গকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

সরোজসুন্দরী দেবী

গত ২০শে বৈশাখ সন্ধ্যা আটটার সময় চোরবাগানের বিখ্যাত চট্টোপাধ্যায়-বংশের স্বর্গীয় সুশীলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা পত্নী সরোজসুন্দরী পরলোক গমন করেন। আজিকার দিনে তাঁহার মত ধর্ম্মপরায়ণা দানশীলা রমণী বিরল। দিনের প্রায় সমস্ত সময়ই তিনি ধর্ম্মচর্চ্চা, বিগ্রহপূজা ও সেবা এবং হরিনাম সংকীর্ত্তন শ্রবণে অতিবাহিত করিতেন। বৈষয়িক আয় হইতে তিনি যে মাসিক বৃত্তি পাইতেন, তাহার শতকরা এক টাকাও নিজের ব্যবহারের জন্য খরচ করিতেন কি না সন্দেহ। প্রায় সমস্ত অর্থই তিনি শ্রীভগবানের পূজা হোম অথবা দুঃস্থ দরিদ্রের সেবা প্রভৃতি যে কোন সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন। তিনি নিজ অর্থব্যয়ে বৈদ্যনাথধামে শিবগঙ্গার দক্ষিণ তীরে একটি হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। বর্দ্ধমান জেলার গোপাল-



দাসপুর গ্রামে শ্রীশ্রী৺রাখালরাজজী দেবের মন্দির বহু অর্থব্যয়ে সংস্কার করাইয়াছেন। এইরূপ বহু দান তিনি করিয়াছিলেন যাহা লোকে জানে। কিন্তু গোপনে যে কত দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য করিয়াছেন সে কথা কেহই জানে না। আমরা এই পুণ্যশ্লোকা নারীর আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

আলোকচিত্রের নিয়মাবলী

প্রত্যেক মাসে এই বিভাগটিতে একমাত্র সৌখীন (এ্যামেচার) আলোকচিত্র-শিল্পীদেরই ছবি গৃহীত হইবে।

ছবির আকার ৬" × ৮" ইঞ্চি হইলেই আমাদের সুবিধা হয় এবং যত দূর সম্ভব ছবি সম্বন্ধে বিবরণ থাকাও বাঞ্ছনীয়। যথা, ক্যামেরা ফিল্ম, এক্স-পোজার, এ্যাপারচার, সময় ইত্যাদি।

যে কোন বিষয়ের ছবিই লওয়া হইবে। অমনো-নীত ছবি ফেরৎ লওয়ার জন্য উপযুক্ত ডাক-টিকিট সঙ্গে দেওয়া চাই। ছবি হারাইলে বা নষ্ট হইলে আমাদের দায়ী করা চলিবে না, সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। খামের উপর "আলোকচিত্র" বিভাগের এবং ছবির পিছনে নাম ও ঠিকানার উল্লেখ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

প্রথম পুরস্কার দশ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার আট টাকা, তৃতীয় পুরস্কার পাঁচ টাকা এবং অন্যান্য বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হইবে।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



জলকে চল

শিল্পী—শ্রীমণিভূষণ গুপ্ত



দাও ফিরে সেই অরণ্য—

মাসিক বসুমতী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত



২৫শ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৫৩ প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা

"ধুতি, চাদর কেন, কন্থা কৌপীন যাহা বল, পরিতে রাজী আছি, কেবল সাহেবগুলাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিতে পারিলে হয়।"

● ● ● ●

"বন্ধুগণ! আমার বৈদেশিক পরিচ্ছদের জন্য, আপনাদিগকে দুঃখিত হইতে হইবে না; আমার কোট, বুট যদি, কোন দিন, সাহেব হইয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়, তবে একবার একখানি দর্পণের দিকে চাহিলেই আমার সে ভ্রম দূর হইবে; আমার বর্ণই আমার জাতি স্মরণ করাইয়া দিবে।"

-শ্রীমধুসূদন

খেলাওয়ালী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'খোস-পাচড়া দাদ-চুলকানি হাজা-থুজলি—' বাদিয়ানীর দল ঝাঁকবাঁধা পাখির মত কলকলিয়ে উঠল : 'বাঁজা আর মড়াছেঁয়ে, বেরামী আর হামিঙ্গা। কই গো মা-জানরা। দেশ-বিদেশে কত নাম তোমাদের। নাম শুনেই এসেছি তোমাদের দুয়ারে—'

ভুঁইয়া-সাহেবের বাড়ি। খাস জমিই প্রায় দু'শো কানি। তার পর পত্তন-পাট্টায় কত বলতে হলে ফর্দ লাগে। পঞ্চাশের আকালে ধান বেচে মোটা হয়েছে। কিন্তু সেই হাড়-কিপ্পিন। গায়ে নিমা, কাঁধে গামছা, পরনে খাটো লুঙ্গি, পায়ে দেশী মুচির বাদামী চটি। মাথায় তালের আঁশের তৈরি গোল টুপি, মাথার তেলে আর্দ্ধেকটাই কালো। এত টাকায়ও দরাজ হয়নি তার মন-দিল।

'কই গো মা-জানরা, একটু পান-গুপারি শাদা তামাক দাও। খালের ফাঁড়ির মুখে নৌকো আমাদের। রোদ্দুরে আসছি অনেক হেঁটে-হুঁটে—'

ফাল্গুন মাস। ধান-চাল উঠে গেছে ঘরে-ঘরে। বেচা-বিক্রি সুরু হয়ে গেছে। কাঠ-কুটা জোগাড় হয়েছে গৃহস্থের। মেয়েরা নাইয়র এসেছে, কর্তারা গলায় চাদর ঝুলিয়ে চলেছে বেয়াই-বাড়ি। পথে-ঘাটে জল-কাদা নেই। গ্রামের হালট খটখট করছে। হাটে-বন্দরে বেড়ে গেছে চলাচল। সেই সঙ্গে দিকে-দিকে বেরিয়ে পড়েছে ফেরিওয়ালা, মুদিওয়ালা, মনোহারীওয়ালা, বেরিয়ে পড়েছে বেবাজিয়া বাদিয়ানীর দল।

'কই গো চাচীজান ভাবীজানরা। পান-তামুক না দিলে খেলা দেখাব কী তোমাদের! গান ধরব কোন্ গলায়!'

দেশদেশী লোক নয়, বেজানা সুরে কথা কয়, ঝুড়ি-চুপড়ির মধ্যে সাপ নিয়ে এসেছে বুঝি, ভুঁইয়া বাড়ির উঠোন ভরে গেল মেয়ে-পুরুষে।

একটা বুড়ি আর দুটো মেয়ে। কাঞ্চনী আর তরী! একটা ফল পাকাস্ত, অন্যটা ডাঁসা।

মাথার ঝাঁকা নামিয়ে বসল তারা উঠোনে। বুড়ি তার থলের ভিতর থেকে হর-জিনিস বের করতে লাগল : ছোট-ছোট কাঠের খেলনা, দাবার বোড়ে, গেঁটে কড়ি, ফলের আঁটি, পাখির ঠোঁট, গরুর শিং, মানুষের হাড়। বিছিয়ে রাখল একটা পুরোনো ময়লা ন্যাকড়ার উপর। বললে, 'নে, আগে গান ধর।'

হাতের উপর গাল কাৎ করে তরী গান ধরল :

রে বিধির কি হইল!
আইস আইস কামার ভাই রে খাও রে বাটার পান,
ভাল কইরা গইড়া দিও লোহার বাসরখান।
সোনার থালে পান ওরে রুপার থালে চুন,
মাইয়া-লোকের প্রথম যৌবন, ও যে জ্বলন্ত আগুন।
রে বিধির কি হইল!

বাড়ি-ঘর ভেঙে বেরিয়ে এল সাহেবানীরা। বেরিয়ে এল বাড়ির ধারের পড়শী। সবাই বললে, মিশশিকারী এসেছে। চল, চল, সাপ নাচাবে, বেউলা-লখাইর গান গাইবে, ব্যারাম নামাবে শিঙা টেনে।

কার কি ব্যামো-পীড়া? কোমরে বাত? তলপেটে ব্যথা? অবিয়ন্ত আছে না কি কেউ বউরা? আমাদের ঠেঙে কোনো সরম নেই। আমরা মালবদ্যি। বিষ নামাই। ভূত ঝাড়ি। মন্তর তন্তর জানি। ভোজবাজি দেখাই। ফকিরালি করি। বাঁজা ডাঙ্গায় ফসল ফলাই। বিষবদ্যি আমরা।

ছোট একটা লোহার শলা বুড়ি তার ডান চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বাঁ চোখের কোণ থেকে বার করে ফেলল। ভাঙ্গা কাচ চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেল্লে গুপুরির মত। ছোট একটা কাপড়ের থলের মধ্যে রাখলে তিনটে দাবার বোড়ে, একটা পাওয়া গেল বড় বিবির কোলের মধ্যে, দ্বিতীয়টা পাওয়া গেল মেজ বিবির আঁচলে বাঁধা, তৃতীয়টা ছোট বিবির খোঁপায় গোঁজা।

ভুঁইয়া-সাহেবের তিন বিবি। বড় বিবির কোমরে দরদ, মেজ বিবির সন্তান টেঁকে না, ছোট বিবির উপরে দেও-ভূতের দৃষ্টি পড়েছে, এরি মধ্যেই ভুঁইয়া-সাহেবের মন প্রায় চল-বিচল হবার জোগাড়।

'সব বাতাস। বাতাসের কারবার।' বুড়ি বললে ঘাড় দোলাতে দোলাতে, 'সব নিষ্পত্তি করে দিচ্ছি। কই পান আনো, তামুক আনো, মন্তর-পড়ার চাল আনো।'

ডালায় করে পান এল, এল কলকি-বোঝাই তামুক। তিনটে শাদা পাতা। তিন মাংসা চাল।

পুরুষ-পোলা কেউ নেই বাড়িতে ?

বা, ইয়াসিনই তো আছে। ভুঁইয়া-সাহেবের বড় ছেলে। বয়েস কুড়ি-বাইশ। বাংলা-মত লেখাপড়া জানে কিছু। গাঁচ না হয়ে খাড়া খাড়া লেখা হলে পড়তে পারে থেমে থেমে। দু-দুটো বিয়ে দিয়েছে বাপ। দু-দুটোকে ছাড়ান দিয়েছে। একটার না কি চলন-ফিরন ভাল নয়, আরেকটা না কি কাজ-কর্ম জানে না। দুটোই রোগা কাঠি, গোলগাল চেহারা হল না কিছুতেই। পাশ-গাঁয়ে ভুঁইয়া-সাহেব গিয়েছে ছেলের জন্যে তেসরা বউয়ের তালাস করতে।

'আর আপনার বুঝি মাথাধরা ?' বুড়ি এক নজর তাকিয়ে বললে, 'ও আমি চোখ-মুখের চেহারা দেখে বলে দিতে পারি। আর এ মাথাধরা ঝাড়তে তিন শিকড় লাগবে। তাও নায়ে বসে। নায়ের দিব্য-কোঠায়। আর দিন তিনেক আমরা আছি।' পরে আপন মনে ঝাপসা গলায় বললে, 'বড় কঠিন ব্যামো। ব্যামোর মধ্যে ছিনে জোঁক।'

'আমার মাথাধরা ঝাড়তে হবে না।' বিরক্ত মুখে বললে ইয়াসিন ; 'গান ধরতো শুনি।'

তরী গান ধরল :

বিয়া কইরা যান লখাই লোহার বাসর ঘরে,
পিদ্দিমেরি সইলুতাখানার বুক থরথর করে।
সোনার খাটে শুইছেন লখাই রুপার খাটে পা,
পাঙ্খা হাতে বাতাস করেন উদাস বেহুলা।
রে বিধির কি হইল !

যেন কোকিলা গাইছে। ইয়াসিন তাকাল তরীর দিকে, তাকাল ভরা চোখে। এক থালা জলের মত যৌবন তার সারা গায়ে যেন টল টল করছে, কাঁধার ছাপিয়ে পড়বে বুঝি উপচে। গায়ে আঁট একটা আঙিয়া, শাড়ীটাতেও টান পড়েছে। দুটোই জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। ছেঁড়াগুলো চোখ চেয়ে আছে নিরাশ্রয় অসহায়ের মত।

'ওকে আর দেখছ কি ? নামাজ-টামাজ পড়তে শিখছে, কিন্তু একখানা ওর সাফ কাপড় নেই। পরদা-পসিদা মত থাকতে পারে না। সব সময়ে মুখ কালো করে থাকে। চাল ডাল তো তবু সময়ে পাওয়া যায়। কিন্তু শাড়ী-জামা পাই কোথা ? দাও না কিছু ঘরের জিনিষ। সাত পুরুষে গা ঢাকবে তোমাদের।'

'হাসছিস্ কেন ?' শাসনের সুরে কাঞ্চনী হিস-হিস করে উঠে।

'সরম লাগে।' দু' হাঁটুর মধ্যে তরী মুখ লুকোয়। 'নইলে কাপড়-জামা হবে না। নে, উঠে দাঁড়া। উঠে দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে গান ধরলেই সরম-ভরম চলে যাবে।'

তরী গলা ছেড়ে গান ধরল :

আমার বড় খিদা পাইছে বেহুলা সুন্দরী,
পার কিছু আইন্যা দেও ক্ষুধা-তৃষ্ণা হরি।
এত রাতে কি আনিমু বেউলা বইস্যা কাঁদে,
শেষকালেতে বরণ-কুলার চাউলে ভাত রাঁধে।
রে বিধির কি হইল !

বড় বিবির কোমরে শিং লাগিয়ে ফুঁ দিয়ে ব্যথা নামানো হল। কাটা-সুতা এনে শিকড় বেটে খেতে দিল মেজ বিবিকে। তাগা বাঁধা হল ছোট গিন্নির বাজুতে।

'এনার সাদি হয়নি ?'

'হয়েছিল দু নম্বর। মনজাইমত হয়নি। বিয়ে ছুটে গেছে। দাও না ওকে একটা তাবিজ-কবজ। যাতে মিল-মানান ঠিক থাকে। উলফৎ থাকে চিরকাল।'

তরীর সঙ্গে ইয়াসিনের চোখোচোখি হয়।

'যাবেন আমাদের নায়ে।' বুড়ি মন্তর-পড়া গলায় বললে. 'ফাঁড়ির মুখে অশথ গাছের তলায় আমাদের বহর বাঁধা। খাঁটি পলার জ্যান্ত কবজ দেব। এবার এমন বিয়ে দেব অসতন্তর হয়ে থাকতে হবে না। হাঁড়ির মুখে সরার মত লেগে থাকবে।'

তরীর দিকে চেয়ে কাঞ্চনী চোখের কালোতে সাপের মণির ঝিলিক মারে। তরীর যেন বুঝজ্ঞান নেই, সারা গায়ে ঝিমকিনি লাগে। দেহের সরোবরে যৌবনের জল থমথম করে। এইবার বসে বসেই গান ধরে তরী :

কি অন্ন খাওয়াইলা বেউলা।
কি অপূর্ব লাগে,
এমন অন্ন খাইনি কভু
মাতৃঘরে আগে।
এই যে অন্ন শেষ অন্ন
অন্তে কেবা জানে,
ভাত খাইয়া তাকায় লখাই
রাত-উপাসার পানে।
রে বিধির কি হইল!

বড় বিবি পাঁচ টাকা বকশিস দিল। দিল সাত সের চাল, তিনটে ঝুনো নারকেল, এক সাজি শুপুরি। এক গোছা শাদা পাতা। এক গোল্লা মাখা তামাক।

কাঞ্চনী কেঠো গলায় বললে, 'কিছু কাঠ দাও না গো—'

'এ বাড়ির মুরগিগুলি তো বেশ তাজা।' তরী বললে গোলালো গলায়: 'পেট ভরে ধান-চাল খায় বুঝি। তাই একটা চেয়ে নাও না বুবু।'

'কেন, তুই চাইতে পারিস না বড় মিয়ার কাছে?' কাঞ্চনী ঝামটা দিয়ে উঠে।



ইয়াসিন তাকাল তরীর দিকে, তাকাল ভরা চোখে।
এক থালা জলের মত যৌবন তার সারা গায়ে
যেন টল টল করছে—

ঝুড়ি-চুপড়ি নিয়ে উঠে পড়ে বাদিয়ানীর দল এত জিনিস বয়ে নেবে কি করে? তরী বললে, 'আমি নিচ্ছি কাঠের বোঝা।'

'না, না, তা কি হয়? নয়া বয়সের ভারই তুমি বইতে পার না, তুমি হবে কাঠের বোঝারি!' ইয়াসিন সেকেন্দরকে ডাকলে। সেকেন্দর বাড়ির চালিয়া, মাস-ঠিকায় কাজ করে। তার মাথায় চাপিয়ে দিলে কাঠ, চালের ঝুড়ি, হাতে ঝুলিয়ে দিলে পা-বাঁধা মুরগি এক জোড়া। 'তাড়াতাড়ি করে দিয়ে আয় পৌছে। মুনিব বাড়ি ফেরার পথে যদি দেখতে পায় এই কাণ্ড, তার খেসারৎ তুলতে গিয়ে আগেই তোকে খুন করবে।'

হংসগমনে চলেছে তরী। দেমাকে ঠমক দিয়ে। তার পিছু ধরেছে ইয়াসিন। হাতে তার একটা কাপড়ের বোঁচকা।

বললে, 'কাপড়-জামা আছে এর মধ্যে। কাঁচুলি আর সায়া।'

তরী চোখ বড় করে রইল। বললে, 'আপনার বিবিজানেরটা বুঝি?'

বিবি কই? সে সব কবে ঝুট হয়ে গেছে। ঝুটা জরি ছেড়ে এখন আসল জহরতের তালাস করছি।'

কাঞ্চনী তরীর কানে বললে ফিসফিসিয়ে, 'নৌকোতে আসতে বলিস সাঁজের বেলা।'

'নৌকোয় আসবেন। কাঁড়ির মুখে বহর বাঁধা আমাদের।'



ইয়াসিন হাঁত-উতি চাইল। উসি-পিসি করতে লাগল। চলে এল বাড়ি ফিরে। বললে না, নৌকোয় কেন? চল আমার বাড়িতে। আমার শানবাঁধানো টিনের ঘরের বাসিন্দা হয়ে।

কত রাজ্যের জল ঠেলে-ঠেলে ভাসছে তারা—বাদিয়ানীরা। বাড়ি-ঘর নেই, জায়গা-জমি নেই, সীমানা-সরহদ্দ নেই। কেবল অফুরন্ত জল। নৌকোয়ই তাদের ঘর-সংসার, বিয়ে-সাদি, ইষ্ট-কুটুম। নৌকোই তাদের সমাজ। ওটা মামার বাড়ী, ওটা শ্বশুর বাড়ি, ওটা বান্ধবের বাড়ি। শুধু মরবার পর সাড়ে তিন হাত মাটির দরকার। মাটির সঙ্গে শুধু এইটুকু তাদের কায়েমী সম্পর্ক। আমল-দখল নেই, স্বত্ব-স্বামিত্ব নেই। নেই স্থান-স্থিতি। তারা সব দেশেই বিদেশী। তারা ভবঘুরে।

এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে যায়। একেকটা বছর। একেকটা জামাত। একেক মরশুমে একেক এলেকা। সাপ ধরে, দাওয়াই দেয়, খেলা দেখায়, গান বাঁধে, লোক ঠকায়। হাত-সাফাই করে। জলে আঁক কাটে। জল দিয়ে মুছে দেয় জলের দাগ।

না. জল আর ভাল লাগে না তরীর। তার ইচ্ছে করে বেড়া-ঘেরা ঘরে গৃহস্থ হয়ে স্থিত হয়ে যায়। মাঠ-মাটির

কাজ করে। ধান ভানে, চাল কাড়ে, ঢেঁকিতে পাড় দেয়। গোবর দিয়ে উঠোন লেপে। উঠোন-ভরতি ধান রোদে শুকায়। তার উপরে হেঁটে-হেঁটে পা দিয়ে ওলটায়-পালটায়।

ইচ্ছে করে মাটিতে একটা বীজ পোঁতে নিজের হাতে। দেখে, কেমন করে জলজ্যান্ত গাছ হয়ে ওঠে একটা।

মাটির জন্যে এত মন পোড়ে তরীর। হাসিল-পতিত, ভিটা-বাস্তু, দীঘি-পুকুর, বাগ-বাগান, ইট-ইমারত, বৃক্ষ-লতা, পাখি-পাখালি। জলে আর সুখ নেই।

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে ইয়াসিন চলে আসে নৌ-বহরের সীমানায়। নৌকো ঢেকে তাঁবুর মত ছই, ছইর উপর বসে কাঞ্চনী আর তরী বড়শি ফেলে মাছ ধরছে।

'বড় মিয়া এসেছে।' তরী বললে ডগমগ হয়ে।

'আসতে দে।' কাঞ্চনী বললে ভারিক্কি গলায়।

প্রথমে দিশ পায়নি ইয়াসিন। কুড়ি-বাইশখানা নৌকা গায়ে গা লাগিয়ে বাঁধা। খালের পারে জাল বিছানো, ঝাঁকি জাল, লেটে জাল, ধর্মজাল। কাঠ রয়েছে ভূপ করা। মুরগি বোঝাই খাঁচা। তিন ইটের উনুন। হাঁড়িকুঁড়ি। পোড়া আর আপোড়া।

অনেক কণ্ঠের কলকল।

সাধারণ শাড়ি-জামা পরা বলে তরীকে প্রথমে ঠাহর হয়নি। যেন অষ্টপ্রহরের গৃহস্থ-বৌ মনে হচ্ছে।

'প্রথমে চিনতে পারিনি। আমার দেওয়া সেই জামা-কাপড় পরনি কেন?'

'ও বাবা! অত ভাল জিনিস কি আমরা পরতে পারি?' কাঞ্চনী ভুরু টান করে বললে, 'ও আমরা তুলে রেখেছি প্যাঁটরায়। আটপৌরে যা আছে তাই পরে আছি কোনোমতে।'

আটপৌরেও তা হলে আছে দু'-একখানা। বেশ আস্ত-মস্তই আছে। যেগুলো ছেঁড়া-খোঁড়া সেগুলোই বুঝি পোশাকী। খেলা-দেখানোর সাজ।

'কি, মাথা ঝাড়াবেন না?'

'তাই তো এসেছি। বুড়ি কোথায়?'

'আমাদের মা? সে গেছে বন্দরে। বাজার করতে।'

বাজার করতে মানে কাপড়-জামা বিক্রি করতে। চাল নারকেল বিক্রি করতে। আর যদি পারে কিছু চুরি করতে হাতের কায়দায়।

নৌকোর মধ্যে মাথা গলিয়ে ঢুকে পড়ল ইয়াসিন। নৌকোর মধ্যে ছোটখাট একখানা সংসার সাজানো। রান্না-ঘর। শোবার ঘর। বাসন-কোসন, বিছানা-বালিশ, চুলা-লণ্ঠন, সব কিছু সরঞ্জাম।

'তোমাদের মা আসা পর্য্যন্ত বসতে হবে?' ভয়ে ভয়ে বললে ইয়াসিন।

'কেন, তা কেন? আমরা কি আর মন্তর-তন্তর শিখিনি কিছু? যা তরী, দিব্যির কোঠায় নিয়ে যা। আমি শিকড় নিয়ে আসি।'

'দিব্যির কোঠায়?'

'হ্যাঁ, দিব্যির কোঠায়।' কঠিন গলায় বললে কাঞ্চনী।

গলুইয়ের দিকে ছোট্ট একটা কোঠা। হ্যাঁ, এটাই দিব্যির ঘর। আর-সব ঘর সংসারী ঘর। সে সব ঘরে শোয়া-বসা, খাওয়া-দাওয়া, সাধারণ জীবনযাত্রা। দিব্যির ঘরটা দুর্গের মত, দেবালয়ের মত। নৌকোপথ বড় বিপদের পথ। লুঠেরা-ডাকাত তো আছেই, ঘরের পুরুষই তো কত অত্যাচার করতে চায়। কত মারপিট, কত খুনজখম। তখন অবলা মেয়ে এই দিব্যির ঘরে এসে আশ্রয় নেয়। এখানে একবার ঢুকলে গায়ে আর হাত তোলা যায় না, মেয়েমানুষ তখন চলে যায় একেবারে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

লম্বা একটা জংলা ঘাস নিয়ে এল কাঞ্চনী। দাঁত দিয়ে খুঁটে শাদা শাঁস বের করে দিলে তা তরীর হাতে। পাঁচ টাকা মজুরি নিয়ে চলে গেল।

সেই দিব্যির কোঠায় জড়সড় হয়ে শোয় ইয়াসিন। আলগোছে তার শিয়রে বসে তরী তার কপালে সেই ঘাসের শাঁস বুলিয়ে দেয়। আল্লা-রসুলের নাম করে। নাম করে মেহের-কালির, কামরূপ-কামাখ্যার। ফাঁকে-ফাঁকে বলে তার দুঃখের কথা। এই একঘেয়ে জল আর ভাল লাগে না। ঘর বেঁধে সংসারী করতে সাধ যায়।

'নায়ে তোমাদের পুরুষ কই?' জিগগেস করে ইয়াসিন।

'মেনাজদ্দি ছিল অনেক দিন। জঙ্গলে সেবার বেকায়দায় সাপ ধরতে গিয়ে ঘা খেল কাঁধের উপর। সেই থেকে কাঞ্চনীর ঘর খালি।'

'নৌকা বায় কে ?'

'আমরাই দু বোন। দাঁড় টানি, মাছ ধরি, কাঠ কাটি। যাকে বলি পুরুষ না পাও চাকর রাখ এক জন। মা বলে, যে পুরুষ সেই চাকর। এবার তোকে বিয়ে দিয়েই পুরুষ আনব নৌকোয়। মানিক সাইকে ডাকি, কোথায় কে। আমার মন আর বসে না বড় মিয়া, ভেসে-ভেসে বেড়ায়।'

ধরা-ছোঁয়া যাবে না, কিন্তু গান শুনতে দোষ কি।

'গলা শুনতে পেলে কাঞ্চনী আরো টাকা চাইবে।'

'দেব টাকা।'

'আমাকে কিছু দেবে না উপরি ? ও সব তো ওরা নেবে। আমি তবে কী পেলাম !'

'দেব। না যদি দিই তোমাকে, আমিই বা তবে পাব কী!'

তরী গান ধরল :

খনে জাগা খনে নেবা বাতি টিপটিপ করে,
গহীর রাতে ঘুমের ভারে বেউলা ঢইল্যা পড়ে।
খাট ছাইড়া কেশের বোঝা মাটির উপর লোটে,
শেষ রাতে কালনাগিনী কেশ বাহিয়া ওঠে।
রে বিধির কি হইল!

ইয়াসিনের মনে হল যেন নৌকো ছেড়ে দিয়েছে। খাল ছেড়ে চলে এসেছে গাঙের ভরা জোয়ারে। এ মুলুক ছেড়ে চলেছে অন্য কোন বেনামী মুলুকে। সারি-সারি নৌকো। সে আর ক্ষেতের মানুষ নয়, নৌকোর মানুষ। যেন সে আর দিব্যির কোঠায় শুয়ে নেই। চলে এসেছে সংসারী কোঠায়। জলের উপর সংসার। সমস্ত সংসার-সৃষ্টিই জল।

লখিন্দর আর বেহুলা। জুলেখা আর ইউছুফ।

বুড়ি ফিরেছে বাজার থেকে। জিগগেস করলে, 'এসেছিল ভুঁইয়ার পো ?'

'এসেছিল। পনরো টাকা আদায় করেছি।' কাঞ্চনী বললে।

'মোটে ?'

'মাথাঝাড়া পাঁচ, গান পাঁচ, আর আমার দারোয়ানি পাঁচ। আবার আসবে বলেছে। মাথাব্যথা এক দিনে সারবার নয়।'

'না, আরো বেশি করে আদায় করা দরকার। ঘড়া-ঘড়া টাকা ওই ভুঁইয়ার, শুনে এলাম পাকাপাকি। কী ছাই খেলা দেখাতে পারলি তবে ?' বুড়ি দাঁড়িয়ে উঠল : 'কি, দিব্যির ঘরে ছিল তো ?'

'দিব্যির ঘর না হলে টিপে-টিপে বের করতে পারব কেন ?' হাসতে-হাসতে বলল এবার তরী : 'এই দেখ আরো দশ টাকা। লুকিয়ে আদায় করে নিয়েছি বকশিস।' হাতের মুঠ খুলে তরী টাকা দেখাল।

আহ্লাদে উথলে উঠল বুড়ি। বললে, 'এই তো আমার আসল খেলাওয়ালী।' টাকা পঁচিশটা প্যাটরার মধ্যে রাখতে-রাখতে বললে, 'কালকে আরো বেশি চাই। পঞ্চাশ টাকা।'

তরী মার জন্যে তামাক সাজে আর গুন্‌গুনিয়ে গান গায় :

কালনাগিনী সাক্ষী রাখে দেব দানব সব,
কি দোষে দংশিব আমি এমন মানব।
এখানে ওখানে কালি ঘুরে ঘুরে দেখে,
দোষ না দেখিয়া কালি বিড় পাকাইয়া থাকে।
রে বিধির কি হইল!

মাছশিকারী বাদিয়ানীকে সাদি করবে এমন প্রস্তাবে রাজি হবে না ভুঁইয়া সাহেব। কোথাকার কে এক খলিফার মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করে এনেছে। সেইখানেই রাজি হবে ইয়াসিন ? কখনো না। কিন্তু মুখ ফুটে বলে এমন সাধ্য কি। দরকার নেই বলে-কয়ে নৌকোয় সে ভেসে পড়বে। নোট বোঝাই করে কলসী পুঁতেছে সে শান খুঁড়ে। শান খুঁড়েই বের করবে সে একটা।

তাই পরদিন মাথা ঝাড়াবার সময় ইয়াসিন মিনতি করল : 'চল আজ সংসারী ঘরে।'

ঘাসের ডগা বুলুতে বুলুতে তরী বললে, 'আমাকে নিয়ে চল তোমাদের ঘরে। সেই আমার সংসারী ঘর। নৌকোয় কি ঘর হয় ? ছইকে কি কেউ ছাদ বলে ?'

নতুন জোয়ারের কুলকুল শুনতে-শুনতে তরী গান ধরল :

পিরদিমখানা নিবু নিবু মিটমিটিয়া জ্বলে,
বেউলা বাড়ায় সইলতাটিরে কনিষ্ঠ অঙ্গুলে।
সেই যে তৈল মোছে বেউলা সিঁথির উপরে,
কালনাগিনী বলে এবার দোষ পেয়েছি ওরে।
রে বিধির কি হইল!

গান শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি ইয়াসিন। ঘাসের শাঁস ফেলে তরী ইয়াসিনের মুখে-কপালে আঙুল বুলুতে লাগল। চোখের পাতায়, চুলের মধ্যে।

এই হচ্ছে দ্বিতীয় কৌশল। দিব্যির কোঠায় ছোঁয়াছুঁয়ি হচ্ছে এই বলে শাঁৎকে উঠবে তরী আর দারোয়ানী কাঞ্চনী ছোঁ মেরে আদায় করে নেবে জরিমানা। ব্যামো সারাতে এসে এ-সব কী কেলেংকারী। দিব্যির ঘরকে অশুদ্ধ করে তোলা!

কিন্তু, কই, তরী আজ আর শব্দ করে না কেন?

ইয়াসিনের মাথাটা তরী অতি নিঃশব্দে তার কোলের মধ্যে তুলে নিল। প্রায় তার নিশ্বাসের কাছাকাছি।

তন্দ্রা ভেঙে গিয়েছে ইয়াসিনের। এ কি জল না মাটি! ঢেউ না পাহাড়!

'এ কোথায় আমরা, তরী? এ দিব্যির ঘর নয়?'

'চুপ। চুপ।' তরী নিশ্বাস বন্ধ করে আবছা গলায় বললে।

'দিব্যির ঘর, তবু তুমি আমাকে ছুঁয়ে রয়েছ, ধরে রয়েছ।' ইয়াসিনের গলায় বিবর্ণ ভয়।

মরা-গলায়, পাথুরে গলায় তরী শুধু বলছে, 'চুপ, চুপ।'

কাঞ্চনীর কানকে ফাঁকি দেয়া গেল না। সে শুনে ফেলেছে, নিজের চোখে দেখে ফেলেছে।

'আমি নয়, তরী—' বলতে যাচ্ছিল ইয়াসিন। তরীর মুখে এক শব্দ : 'চুপ, চুপ।'

ইয়াসিন বেরিয়ে গেল চোরের মত। কাঞ্চনীর হাতে পঞ্চাশ টাকা গুণাগার দিলে।

কিন্তু কাল কি আর ইয়াসিন আসবে?

পরদিন ছইয়ে বসে মাছ ধরল না বঁড়শিতে, ডাঙা-পথে তরী ঘোরাঘুরি করতে লাগল। হাওয়ায় ঝরা-পাতা উড়ছে, বলছে, চুপ-চুপ। চুপ-চুপ বলছে ঐ পাখিটা। পারের কাছেকার জলের গুরুনি।

নিশ্চুপ আজ নৌকোর অন্ধকার।

ইয়াসিন আসবে না, কিন্তু থানা থেকে দারোগা আসবে তদন্তে। কে একটা মিশশিকারী মেয়ে ভুঁইয়া সাহেবের ছেলেকে গুণ করেছে, ঐ মেয়েকে ছাড়া আর কাউকে সে সাদি করবে না, তার থেকে টাকা খসিয়েছে না কি অনেকগুলো। গুণ থাকলেই গুণ করে। হাতসাফাই জানলেই টাকা খসানো যায়। কিন্তু তা হলে কি, দারোগা সাহেবও টাকা খেয়েছে ভারি হাতে। এ অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দেবে তাদের।

সকাল বেলার জোয়ারে বহর ছেড়ে দিল। তরী আর কাঞ্চনী হাল-দাঁড় নিয়ে বসল। পারে দাঁড়িয়ে ইয়াসিন। জলে নামবে না হাত ধরে তরীকে ডাঙায় তুলে নিয়ে আসবে, যেন দেহ-মনে দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

তরী গান ধরল :

কোথায় তুমি প্রাণপতি কোথায় তুমি স্বামী,
বিয়ার রাতে কাঞ্চা চুলে রাঁড়ী হইলাম আমি।
অফুরন্ত নদী-নালা এই ধারে ওই ধার,
চোখের পানি সাঁতারিয়া যাইব পরপার।
রে বিধির কি হইল!

বুড়িকে কে তামাক সেজে দিচ্ছে। ঠাহর করে চেয়ে দেখল, তাদের সেই হালিয়া। সেকেন্দর।

'সে কি? তুই যাচ্ছিস্ কোথা?' ইয়াসিন চমকে উঠল।

'আমি চলেছি নৌকার মানুষ হয়ে নয়, সাধারণ চাকর হয়ে। দাঁড় টানব, মাছ ধরব, কাট কাটব। মন্তর শিখব। বাদিয়া হয়ে যাব। আসবেন আপনি?'

'চুপ! চুপ!' চোক পাকিয়ে তরী ধমক দিয়ে উঠল সেকেন্দরকে।

আধুনিক সাহিত্য

গোপাল হালদার

আধুনিক সাহিত্য সংবন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে গোড়াতেই প্রশ্ন ওঠে—'আধুনিক সাহিত্য' বলতে সত্যাই কিছু আছে কি? তা কি পুরনো সাহিত্য থেকে স্বতন্ত্র? কি অর্থে স্বতন্ত্র?

আলোচনায় অগ্রসর হবার আগেই বোধ হয় দু'একটা কথা বুঝে নেওয়া ভালো। প্রথমত, সাহিত্য অনেকাংশেই মানুষের মনের সৃষ্টি, মানস-ক্রিয়া; অবশ্য কোনো মানস-ক্রিয়াই একমাত্র মানস-জাত নয়, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মনের ফসল বলেই সাহিত্যের এমন মাপকাঠি পাওয়া শক্ত যা সবাই মেনে নেবে। বহির্জগতের জিনিসপত্রের দাম ঠিক করা অপেক্ষাকৃত সহজ। তারও বাজার অবশ্য ওঠে নামে, তবু মোটের উপর তা নিয়ে আমাদের কেনাবেচা করতে হয়, আমরা তার একটা ব্যবহারিক হিসাব পাই। কিন্তু যে জিনিস প্রধানত মনের সৃষ্টি তার সংবন্ধে তেমন মাপকাঠি আমাদের হাতে নেই। এমন কি, সাহিত্যের কোনো ব্যবহারিক মূল্য আছে কি না তাও প্রত্যক্ষ বোঝা যায় না। কারণ, সাহিত্যের মূল্য হচ্ছে মনের কাছে; অন্তরাবেগের কাছেই মুখ্য ভাবে, বুদ্ধি বা যুক্তির কাছেও গৌণ ভাবে। এই সব জটিল কারণে সাহিত্যের সর্বস্বীকৃত মানদণ্ড বড় নেই। নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড অবশ্য বারে বারে গড়ে উঠে, কিন্তু কালে কালে তা বদলায়। তাই এক-এক সমাজে, এক-এক শ্রেণীতে সাহিত্য-বিচার এক-এক রূপ। এমন কি, যাঁরা মোটামুটি একই দৃষ্টিক্ষেত্র থেকে সাহিত্য আলোচনা করেন, একই জীবন-দর্শন যাঁদের জীবনের অবলম্বন, অনেক সময়ে দেখি, তাঁরাও সাহিত্যক্ষেত্রে এক মাপকাঠিতে বিচার করতে পারছেন না। তাই সাহিত্যের বিচারে যাঁদের মনের মিল আছে তাঁদেরও দেখা যায় বিশেষ-বিশেষ সৃষ্টির মূল্য সংবন্ধে মতের মিল ঘটছে না। তা ছাড়া, সাহিত্যেও বাজার-দর তো সর্বদাই ওঠে নামে। যা তবু সব বাজার-দরের ব্যাপারেও মনে রাখা দরকার তা এই: প্রথমত, ব্যবহার্য্য পণ্যের বাজার-দরের সঙ্গে তার মূল্যের সাধারণত একটা সম্পর্ক থাকে,—দর জিনিসটা সব সময়েই একেবারে খামখেয়ালি নয়। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক মানুষের মনের মূল্যবোধ আমাদের দশ জনের আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়েই, দশটি মনের আদান-প্রদানের ফলে আবার প্রত্যেকের নিজের নিকট স্থির হয়ে ওঠে।

গোড়ার কথাটা তাই এই: সাহিত্য সংবন্ধে আমাদের আলোচনায় ব্যক্তিমনের গুণাগুণের ছাপ লেগে যেতে পারে; তাই এখনো কোনো বিচার চরম বিচার বলে গণ্য নয়। আসলে "চরম বিচার" বলে কিছু নেইও, আছে একটা আপেক্ষিক মূল্য-নির্ধারণ। আর এই আপেক্ষিক মূল্যও গড়ে ওঠে, স্থির হয়ে আসে এমনি নানা মনের নানা ধারার বিচার-বিশ্লেষণের ফলে।

আলোচনার দৃষ্টিক্ষেত্র

দ্বিতীয় কথাটি এই: সাহিত্য সংবন্ধে আলোচনা নানা দিক থেকে চলে। এক-এক কালে এক-এক দিকে তার রেওয়াজ বেড়ে যায়; যে কালের যেমন জীবনাদর্শ সে কালের বিচারও হয় সে ধারায়। কিন্তু কাল বদল হয়, জীবনাদর্শ বদলে যায়, ফলে সাহিত্যাদর্শও তেমনি বদলে যায়। আমাদের দেশে দশ বৎসর আগে পর্য্যন্ত যে বিচার একচ্ছত্র ছিল সে হল 'রসের বিচার' অথবা 'আর্টের হিসাব।' আজ সে বিচারকে একান্ত করে হয়ত অনেকে মানতে চায় না। অনেকে 'ঐতিহাসিক বিচারের' পক্ষপাতী। কিন্তু 'ঐতিহাসিক বিচার' বলতে সবাই আমরা এক কথা বুঝি তাও নয়। ঐতিহাসিক কথাটির অর্থ এ ক্ষেত্রে অনেকেই ধরেন "কালানুক্রমিক", অনেকেই বলেন "বাস্তব"। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচার শুধু জড় বস্তুর কালানুক্রমিক হিসাব নয় তাও আমরা অনেকেই মানি। ইতিহাসের মধ্যে আমরা দেখছি চেতনাচেতনের সংঘাত, বিকাশ, জীবনের অভিযান। এ চক্ষে মানুষের সৃষ্টিকে দেখে অনেকেই আমরা আজ সাহিত্যের বিচার করি জীবন-বাণী হিসাবে। এ অর্থে আমরা সাহিত্যকে 'জীবনের শুধু মুকুর' হিসাবেও দেখি না। জীবন সাহিত্যের মধ্যে মুকুরিত তো হয়ই, নিঃসন্দেহ; কিন্তু সাহিত্যের থেকে জীবন সংগ্রহ করে উপজীব্য, পরিণতির প্রেরণা, বিকাশের আভাস। সত্যই তাই বড় রকমের ব্যবহারিক মূল্য আছে সাহিত্যের। Lifeই literatureকে create করে, আর এই শেষের অর্থে literature create করে lifeকে—অন্তত great literature তাই করে।

কাজেই সাহিত্যকে আমরা নানা দৃষ্টিক্ষেত্র থেকে দেখি বলে আলোচনা এত ভিন্নমুখী হয়। সব ক্ষেত্র থেকেই হয়ত তার একটা মুখ দেখা যায়। কিন্তু যা তার দক্ষিণ মুখ—যে মুখে তার জীবনের বাণী উচ্চারিত হয়—সে মুখ থেকে দেখলেই আমরা পাই পরিত্রাণ। মোটামুটি এ কালে আমরা সে মুখই সাহিত্যের দেখতে চাই, সাহিত্যকে বুঝতে চাই জীবন-দর্শন হিসাবে ও সৃষ্টি হিসাবে।

আধুনিক সাহিত্য এই আধুনিক কালের সৃষ্টি, এ কালের জীবন-দর্শন; আবার নতুন কালের সৃষ্টিরও প্রেরণা, তার জীবন-দর্শনেরও প্রস্তাবনা।

আধুনিক সাহিত্য অবশ্য কাল হিসাবে আধুনিক। কিন্তু এ কথা

বললে সে কথার কোনো মানে হয় না। 'অধুনা' বলব কোন্ কালকে? কখন থেকে তার শুরু? কি তার জীবন-ক্ষেত্র, কি তার জন্ম-লক্ষণ, আর কি-ই-বা তার জীবন-লক্ষণ? আর সে কাল কি একেবারে স্থির অচল হয়ে আছে?—এ সব প্রশ্নও মনে উঠবেই।

জন্ম-দাগ

তবু মোটের উপর কাল হিসাবে আধুনিক ও পুরাতন সাহিত্যের ভাগ একেবারে মিথ্যা নয়। আমরা মধ্যযুগের যে-কোনো সাহিত্য হাতে নিলেই বুঝি তা এ কালের নয়। আর সত্যই আধুনিক কোনো সাহিত্য হাতে নিলেও বুঝি পূর্ব যুগে তা লেখা হতে পারত না। ধরুন ভারতচন্দ্র—মাত্র সেদিনকার লোক তিনি আমাদের দেশে; আর খুব বেশি রকমের কলাকুশল কবি, তাই—তাঁকে নিচ্ছি। আমরা বেশ বুঝতে পারি—যত লিপিকুশলতা থাক্ তাঁর লেখায় এ আধুনিক কবিতা নয়। অন্য দিকে নিই আজকের কবিদের—ধরুন নজরুল, বুঝতে পারি এ কবিতা এদেশে মাইকেল রবীন্দ্রনাথের পূর্বে লেখা হতে পারত না। অথবা ধরুন—সংস্কৃত মহাভারতের আখ্যায়িকা, কাশীদাসের লেখা সেই কাহিনী, আর আমাদের একালের "কর্ণ কুন্তী সংবাদ"। একই গল্প, কিন্তু পড়েই আমরা বুঝি এই শেষ কবিতা রবীন্দ্রনাথের পূর্বে লেখা হতে পারে না—এমন কি, রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আর কেউ তা লিখতে পারেন না। অথচ গল্প তা সেই একই।

কি ভাবে তা আমরা বুঝতে পারি, তাই ভেবে দেখবার মত। অনেক ছোটখাটো "জন্মদাগ" থাকে প্রত্যেক লেখার গায়ে, তা দিয়ে তাদের কাল ঠিক পাওয়া যায়। সে সবকে মিলিয়ে আমরা বলতে পারি—তাই "যুগধর্ম।" বোধ হয় তার থেকে আরও যথার্থ নাম হয় পরিবেশের ধর্ম, মানে দেশ-কালের যৌগিক ছাপ, শুধু যুগের একান্ত ছাপ নয় পারিপার্শ্বিকেরও ছাপ—পরিবারের এবং পরিবেশের গুণাগুণ। প্রত্যেক লেখাতেই এ সব কম-বেশি থাকে। যাকে বলি কবির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, তারও দু'টা দিক্ আছে—এক দিকে তা কাল থেকে কবির সংগ্রহ, আর দিকে তা কালকে কবির যোগানো।

বিষয়বস্তু ও রূপ

এই "ছাপ" জিনিসটিকে বিশ্লেষণ করলে মোটের উপর তার দু'টি দিক্ দেখতে পাই। এক—বিষয়-বস্তুর বা Contentএর দিক্, দুই—প্রকাশের বা রূপায়ণের বা Formএর দিক্। এ দু'টি বিচ্ছিন্ন দিক্ নয়, বিষয়বস্তু আর প্রকাশ-কলা দু'য়ে মিলে সাহিত্য একটি অখণ্ড সৃষ্টি হয়ে ওঠে বলেই সাহিত্য গ্রাহ্য হয়। খুব একটা মোটা তুলনা দিলে বলা যায়, দেহ আর মন দু'য়ে মিলেই যেমন মানুষ, এও তেমনি একটা আরটার থেকে বিচ্ছিন্ন তো নয়ই, এমন কি, দু'য়ের সমন্বয় না হলে সাহিত্যে কোনাটারই কোনো মূল্য থাকে না। যে রচনায় এ দু'য়ের সুসঙ্গতি ঘটে তা অখণ্ড হয়, যাতে এ সঙ্গতি যত কম তা সৃষ্টি হিসাবে তত কম সার্থক। আমরা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেই শুধু এদের স্বতন্ত্র করে নিতে পারি—সৃষ্টির মধ্যে বিষয়-বস্তু আর প্রকাশ-কলার তেমন দ্বৈত অস্তিত্ব থাকা নিয়ম নয়।

অবশ্য বলা বাহুল্য, বিশ্লেষণের দিক্ থেকেও এ হল খুব মোটা রকমের ভাগ। কারণ, বিষয়বস্তুকেও আবার অন্তত দু' দিক্ থেকে দেখা যেতে পারে: এক, কথা-বস্তু হিসাবে, দুই, ভাব-বস্তু হিসাবে। তাজমহলের কথা-বস্তু তো তাজমহল; কিন্তু ভাববস্তু হয়ে উঠল বিচিত্র আর মহৎ—তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি মহৎ, জীবনের রথ তোমাকে নিয়ে ছুটল লোক-লোকান্তরে। শকুন্তলার বিষয়-বস্তু মহাভারতে আছে; তাই কালিদাসের গল্পাংশ; কিন্তু মহাভারতের ও সে নাটকের ভাববস্তুতে কি তফাৎ ঘটেনি? কালিদাসের আর ব্যাসের বিষয়বস্তু তার পরে কি আর এক বলা সম্ভব? উপনিষদ্, বৌদ্ধ-কাহিনী থেকে শিখ গুরুদের কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন। তাঁর প্রকাশ-কলা যে একবারে স্বতন্ত্র তা বলাই বাহুল্য, কিন্তু তাঁর ভাববস্তু কি আর সম্পূর্ণ পূর্ব্ববৎ আছে? আবার, কথাবস্তু স্বতন্ত্র হলেও ভাববস্তু যে মোটের উপর একরূপ হতে পারে তাও আমরা জানি—আসলে এই ভাববস্তুই হল আইডিয়ার দিক্, বাণীর দিক্, messageএর দিক্। আর যেখানে সৃষ্টিতে তা রূপান্বিত হয় না, সেখানে এ ভাববস্তু তত্ত্বই থেকে যায়, সত্য হয়ে ওঠে না। সত্য হয় প্রকাশে রূপায়ণে, মানে লাভ করলে। তাতেই লেখার আসল মূল্য—তার significance বা তাৎপর্য।

এ জন্যই আবার প্রকাশের বা রূপের দিক্ থেকে বিশ্লেষণ করলে কেউ কেউ সাহিত্যকে শুধু 'আর্ট' বলে সিদ্ধান্ত করেন; বলেন রূপকলা বা প্রকাশকলাই হল সৃষ্টির আসল রহস্য। এই রূপকলাকে আবার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আরও নানা দিক্ আছে—রীতি বা ষ্টাইল, আঙ্গিক (টেকনিক্) অলঙ্কারভঙ্গি—নানা কলাকৌশলের দিকে ক্রমে দৃষ্টি পড়ে। ও-সব জিনিসে পাঠকের দৃষ্টি বরং সহজেই পড়ে,—আর দৃষ্টি-বিভ্রমও তাতে ঘটে। সংস্কৃতের সাহিত্য শাস্ত্রীরা রসশাস্ত্র নিয়ে মেতে যেমন ভাববস্তুর নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করেছেন, অন্য দিকে আবার অলঙ্কারশাস্ত্র নিয়েও তেমনি বাড়াবাড়ি করেছেন। সে সবে বুদ্ধির প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। এবং শুধু বিশ্লেষণে যে সাহিত্যের সত্য টুকরো টুকরো হয়ে যায় সাহিত্যের মূল সত্যও ধরা পড়ে না, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আসলে যা মনে রাখবার মত কথা তা এই: 'শারীরতত্ত্ব জানা থাকলে মানুষকে বুঝতে সুবিধা হয় বটে, কিন্তু শুধু সে সব তত্ত্ব মিলিয়ে মানুষের শরীর গঠন করা যায় না, প্রাণ তো যায়ই না, মনও ফাঁকি দেয়। দেহ-মনের বিচিত্র লীলাতেই জীবন; তাই সাহিত্যের বস্তু, তাতেই সৌন্দর্য—সে জীবন মানে অলঙ্কার নয়, 'শুধু দেহ নয়, শুধু মনও নয়।' তবু সেই জীবন-রহস্যকে আরও ভালো করে চিনবার জন্যই দেহের কথা, মনের কথা বোঝা চাই।

পরিবর্তিত মূল্যবোধ

কিন্তু কথা এই—এই বিষয়বস্তু ও রূপ দুই-ই আবার কাল থেকে কালে বদলায়। এবং আধুনিক সাহিত্যের ও পুরাতন সাহিত্যের মধ্যে যে আমরা যে বিশেষ ছাপ দেখি তা এ দুই দিকেও বিশেষ বিশেষ রূপ দেখা যায়। সাহিত্যের বিষয়বস্তু বদলেছে আর রূপায়ণের পদ্ধতিও বদলেছে। আধুনিক সাহিত্যের বিষয়বস্তু কত বিচিত্র তার ঠিক-ঠিকানা নেই—সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের প্রসার বেড়ে গিয়েছে। আর, আধুনিক সাহিত্যের নানা বিভাগগুলোর দিকেই তাকালে বোঝা যাবে যে, আধুনিক সাহিত্যে এই সহস্রমুখী জীবনকে প্রকাশ করবার জন্য কত বিচিত্র পথের আশ্রয় নিয়েছে—সেকালের মহাকাব্য, খণ্ডকাব্যের জায়গায় এসেছে গদ্য ও পদ্যের কত বিচিত্র ধারা, আর তারও পরে কত অদ্ভুত

নিত্য নূতন ছন্দ, রীতি, টেক্‌নিক্‌, তার সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি। অবশ্য পুরনো যা তা বাতিল হয়ে গিয়েছে, এমন কথা বলা ঠিক নয়। তবে তো অনেকাংশেই আজ আর চলতে পারে না। মানুষ এখনো দেব-দেবীকে মানে, কিন্তু তাই বলে চণ্ডীমঙ্গল আর তেমন করে সে লিখ্‌বে না। কালকেতুর কাহিনীর ভাববস্তু অচল এখনো হয়নি—মানুষের দুঃখ বেদনা নিয়তি এখনো লেখা হচ্ছে গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, কিন্তু কবিতায় আর তা লেখা হয় না। সেই কথাবস্তু একেবারে বদ্‌লেছে, সেই প্রকাশ-পদ্ধতিও একেবারে বদ্‌লেছে—যদিও ভাববস্তু বদ্‌লেছে সে তুলনায় কম।

মানুষের মূল্য

সাহিত্যের ভাববস্তুও তবু যে নিতান্ত কম বদ্‌লেছে তা নয়। আমাদের দেশের দৃষ্টান্তই ধরা যাক্‌। দেশে দুর্ভিক্ষ হচ্ছে, অকালে মানুষ মরছে; প্রজারঞ্জক রাজা রামচন্দ্র বুঝছেন, তার কারণ শূদ্র বেদপাঠ করছে। অতএব, শম্বুকের শিরশ্ছেদ হল। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে শূদ্রের বেদপাঠের সম্পর্ক আজ আমরা মানি না—কারণ, মানুষের মর্যাদা খানিকটা আজ আমরা বুঝি। উত্তর-বিহারের ভূমিকম্পের কারণ হিন্দুদের হরিজনদের প্রতি অবজ্ঞা এ-কথা, বললেও আমরা কুণ্ঠিত হই:—এ-রকম 'পাপে' ও-রকম 'দণ্ড' হয় তা আমরা মান্‌তে পারি না। তবু পুরনো দিনে হয়ত মানুষ তাই মানত। ধূমকেতু উঠলে রাষ্ট্রবিপ্লব হবে, এ তারা মানত;—এখনো আমরাই কি 'চেতাবনী' মানি না? যাই হোক্‌, কথাটা এই: একদিন শম্বুকের শিরশ্ছেদে সাহিত্যিক দেখেছেন রাজার সুবিচারের চমৎকার প্রমাণ। একশ' বছর আগেও আমাদের বৃদ্ধপ্রপিতামহ নিশ্চয় এ চক্ষেই দেখ্‌তেন সে কাহিনী। কিন্তু আজ আমরা তাতে দেখছি রাজশক্তির এবং উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের একটা মূঢ় অবিচারের প্রমাণ। কারণ, মোটামুটি man's man for that.

মানুষের মর্যাদা, এ কথাটা আজ অনেক ক্ষেত্রে আমাদের নিকট প্রায় স্বতঃসিদ্ধ—তবু তা 'একান্ত' বা 'চরম' সত্য হয়নি তা বলাই বাহুল্য। সর্বক্ষেত্রে সর্বরূপে মানুষকে আমরা এখনো মানুষ বলে মর্যাদা দিই না—এখনো সাত কোটি অচ্ছুত রয়েছে। আর অচ্ছুত ছাড়াও প্রায় সব দেশেই এখনো চাষ-মজুরের সমাজ আর ভদ্রলোকের সমাজ স্বতন্ত্র। তা ছাড়া, কথাটা সরল ভাবে বলা হলেও আজকের সমাজের এটা মোক্ষম কথা—মুটে-মজুর, চাকর-পিয়াদা ওদের পনের টাকা মাইনে ও পিঁপড়ের আহারই যথেষ্ট, আর মন্ত্রী উজীর এঁদের পনের শ' টাকা আর হাতীর খোরাক না হলে চল্‌বে কেন? এ কথার মানে, সব মানুষ মানুষ নয়, কেউ পিঁপড়ে-জাতের মানুষ, কেউ হাতী-জাতের মানুষ। তবু মোটের উপর বেদ-পাঠক শূদ্রদের জন্য শিরশ্ছেদ বা তপ্ত শলাকার ব্যবস্থা করলে আমরা অনেকেই তা সইব না। কারণ, হাজার হোক, মানুষ মানুষ, এ-ও আমরা আজ মানি।

অর্থাৎ এদিকে আমাদের মূল্যবোধ আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মূল্য-বোধ থেকে বেশ স্বতন্ত্র। পুরনো মূল্যবোধ বদ্‌লে গিয়েছে। আর এদিকের এই বিশেষ পরিবর্তন একটু মৌলিক—শুধু সামান্য আচারগত, বা আচরণগত পরিবর্তন নয়। দয়া-মায়ার এক-আধটু উনিশ-বিশ নয়। এই মৌলিক পরিবর্তনের ফলে দেব-দেবী ও আগেকার ধর্মাধর্মের বোধ সাহিত্যে গৌণ হয়েছে—সাহিত্যে প্রধান হয়েছে মানুষ—পৃথিবী আর জীবন।

আধুনিক সাহিত্য মানুষের সাহিত্য—এই হল আধুনিক সাহিত্যের সংবন্ধে প্রধান কথা।

ব্যক্তিত্বের মূল্য

মানুষের সংবন্ধে আমাদের মূল্যবোধ ক্রমশঃ আধুনিক যুগে গভীর ও নিগূঢ় হচ্ছে। এমনি আর একটি দৃষ্টান্ত নিই। আদর্শ রাজা শ্রীরামচন্দ্র। কিন্তু আশ্চর্য্য তাঁর পত্নী-প্রেম। পিতা যাঁর সাড়ে সাত শত বিবাহ করেছিলেন সেই রাজা এক পত্নীর বেশি বিবাহ করলেন না; এমন কি, তাঁকে বনবাস দিতে হলে স্বর্ণ-সীতা নিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন—তবু দ্বিতীয় মহিষী গ্রহণ করবেন না। বলতে হবে, এরূপ একনিষ্ঠ প্রেম সে যুগে অসাধারণ। কেমন করে, সে কালের কবির চক্ষে এ আদর্শ স্পষ্ট হয়েছিল, কে জানে। কিন্তু এ আদর্শের থেকেও সেই রামচন্দ্রের পক্ষে আরও বড় আদর্শ ছিল—বিনা দোষেও তিনি সীতাকে বনবাস দিলেন প্রজানুরঞ্জনের জন্য। রাজার উপযুক্ত কাজ হয়েছে, এ দেশের সবাই বলবে। কিন্তু আজ আমরা কেউ কেউ নিজেদের সংশয় প্রকাশ করতে পারি তাতেও—মানুষের উপযুক্ত কাজ করেছিলেন কি রামচন্দ্র? নিজের প্রেম, সীতার প্রেম এ সব কি রাজার রাজত্বে বা কর্ত্তব্যের থেকে তুচ্ছ? অন্তরের ভালবাসাকে বাইরের সমাজের (অযৌক্তিক) দাবীর কাছে বলি দেওয়াই কি সত্যনীতি? রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রর সমস্ত লেখায় সমস্ত ভাবটা এরূপ ক্ষেত্রে কোন্‌ দিকে পড়ছে, তা আমরা জানি। আজ রামচন্দ্রের এ প্রজারঞ্জনে আমাদের আর তত অবিচলিত আস্থা নেই। আমরা ব্যক্তির অধিকারও আজ মানি; রাজত্বের থেকে ভালোবাসা কম নয় বলে জানি। তাই ডিউক অব্‌ উইণ্ডসরের অন্যপূর্বা-রমণীর জন্য সিংহাসন ত্যাগকেও নিতান্ত তুচ্ছ বলে মনে করি না। আজ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে ব্যক্তির অধিকার আমাদের নিকট শ্রদ্ধার বস্তু হয়ে পড়েছে। আমরা কি সুস্থির ভাবে আজ বল্‌তে পারি—কে বেশি সমর্থনযোগ্য,—পত্নীত্যাগী রামচন্দ্র, না সিংহাসন-ত্যাগী উইণ্ডসর? অবশ্য একটা কথা,—আজই সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিকট ব্যক্তির দাবীর সীমাটাও আবার প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে—সমাজ প্রগতির অনুযায়ী হয়ে না উঠ্‌লে ব্যক্তির দাবী আবার আমাদের চোখে সংশয়ের বস্তু হয়ে পড়ছে—আমরা মানছি "প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।" অর্থাৎ এই বিংশ শতকে এসে আমরা ক্রমেই আবার নূতন ধারায় সমাজ-সচেতনও হয়ে উঠ্‌ছি। কাজেই ব্যক্তির 'অন্তরের দাবীকে' তেমন সব ক্ষেত্রে এক তর্ফা ডিক্রী আর দিতে পারছি না। এ বোধ হয় অনেক সমাজেই এখনো ঝাপ্‌সা; ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনাই প্রচলিত বাজারে 'তেজী' চল্‌ছে। মোটের উপর আমরা বুঝ্‌ছি ব্যক্তির মর্যাদা, ব্যক্তি-স্বরূপের দাবী একটা বড় সত্য—ব্যক্তির আত্ম-বিলোপ চরম কিছু নয়।

পুরনো সাহিত্যের তুলনায় আজ এদিকে আমাদের আধুনিক সাহিত্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত প্রেম-ভালোবাসার মূল্য অনেক বেশি। এ মূল্য-পরিবর্তনও কেবল একই আদর্শের উনিশ-বিশে ওঠা-নামা নয়। এত বড় পরিমাণগত এই পরিবর্তন যে একেও মূল্যবোধের পরিবর্তন এবং মৌলিক পরিবর্তন বলে মান্‌তেই হবে।

"বিপ্লবী-নিয়তির" স্বীকৃতি

এমনি আরও নতুন মূল্যবোধও আধুনিক সাহিত্যে উঁকি-ঝুঁকি মারছে—হয়ত এখনো তা দানা বেঁধে উঠ্‌তে পারেনি।

মানুষের মূল্যও এবং ব্যক্তিত্বের মূল্যের মত সে-মূল্য সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্বীকার্য হয়ে ওঠেনি। যেমন, পুরনো সাহিত্যে দেখি, মানুষ যত বড়ই হোক সে ভাগ্যের দাস। বিশ্বকর্ম্মা নতুন পৃথিবী গড়বার স্পর্ধা করে, এটা মানুষের নিকট সে-দিন ঠেকেছিল ভয়ঙ্কর ও হাস্যকর। তবু, একমাত্র দেবদেবীর খেয়াল-খুশীর উপর অবশ্য মানুষের ক্রমেই অনাস্থা এসে গেছল। অপ্রাকৃতে অবিশ্বাস আসছিল; কিন্তু নিজের শক্তিতে আস্থা পুরোপুরি আসছিল না। এখনো কি তা এসেছে? জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন দানে নিজের উপর মানুষের বিশ্বাস জাগছে বটে, কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ দেখে মানব-ভাগ্য সংবন্ধে আরও নিরাশা আমাদের চেপে ধরছে—এটোম বোমা দেখে আজ আমাদের ভীতি ও নিরাশা বেড়ে গেছে। কিন্তু পুরনো কালের স্বর্গ, পরকাল, বিধিলিপি প্রকৃতির নীতি, "নিয়তি-নিয়ম" প্রভৃতি ধারণার জায়গায় ক্রমেই এসেছে ইহজগৎ ও নর-জীবনের প্রতি আস্থা, "প্রাকৃতিক নির্বাচনের" "বিশ্বলীলা" "বিশ্বরহস্যের" ধারণা। অর্থাৎ বুঝেছি মানুষ নিষ্ক্রিয় নেই, সক্রিয়ই, তবে সেই খেলার নিয়মন তার সাধ্যাতীত।

এই ছিল এত দিনকার পরিচিত চিন্তা "মানব- ভাগ্য" সংবন্ধে। কিন্তু আজ আর একটা চিন্তাও এরই সঙ্গে সঙ্গে উঁকি মারছে—মানুষ তারভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সে প্রকৃতির নিয়মকে যত বুঝছে তত প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্তি পাচ্ছে। মানব-প্রকৃতিকেও সে করতে পারে পরিবর্তিত, বিকশিত আর প্রকাশিত। মানুষের এই "বিপ্লবী-নিয়তি" হচ্ছে মানুষের আধুনিকতম আবিষ্কার। ক্রমশই মানুষ বুঝছে সে সৃষ্টির অধিকারী, নতুন নতুন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির দুয়ার সে খুলে দিচ্ছে চিরকাল। এই যে মানুষের অফুরন্ত সৃষ্টিশক্তিতে বিশ্বাস, প্রকৃতির মহারাজ্যে মানুষের অভাবনীয় সম্ভাব্যতায় আস্থা, আর মানুষের এই বিপ্লবী ভূমিকায় গুরুত্ব আরোপ—নিজের সংবন্ধে এই মূল্যবোধ আজও মানুষের ইতিহাসে নতুন,—তবু এইটিও আধুনিক সাহিত্যে, আমরা দেখছি, এখন ফুটে উঠছে।

কিন্তু পুরনো সাহিত্যে কি এ সবের কোনো চিহ্ন পাই? আমরা গ্রীক্ নাটকেরও সেক্সপীয়রের লেখা—What a piece of work is man থেকে, আরও এখানকার ওখানকার কথা থেকে তুলে দেখাতে পারি—মানুষ নিজের মহিমা আগেও উপলব্ধি করতে পারছিল। সে সব কথার তাৎপর্য পরে দেখব। কিন্তু এখানে যা আমাদের লক্ষণীয় তা এই—নিজেকে স্রষ্টারূপে, জগতে, জীবনে এক বিপ্লবী শক্তির বাহকরূপে এই বিংশ শতাব্দীর পূর্ব মানুষ এমন স্পষ্ট করে ভাবতে সাহস করত না। সেরূপ ভাবনা ছিল তার তখনকার বিবেচনায় মূঢ়তা বা বিকৃত দম্ভ—বিশ্বকর্মার বা ফাউষ্টের দুর্বুদ্ধির কাহিনীই তার প্রমাণ। প্রথম এল রিনাইসন্স—জগৎ ও জীবন সংবন্ধে বিস্ময়। তার পরে এল ফরাসী-বিপ্লবের শেষে "প্রোমিথিউস্ অনবাউণ্ডের" স্বপ্নযুগ আর স্বপ্ন-ভঙ্গেরও যুগ; এল টেনিসন-আর্ণল্ডদের যুগ; আর ওদিকে হুইটম্যান এদিকে ব্রাউনিং এর নতুন আশাবাদ—সেটা উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প-বিজ্ঞানের বিজয়োৎসবের দিন। তার শেষে এল সন্ধ্যা, শেষে নিশীথ রাত্রি, ওয়েষ্ট-ল্যাণ্ডের বিলাপ—প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যেই তার প্রারম্ভ, আজও তার শেষ হয়নি। কিন্তু এরই মধ্যে আবার মানুষের বিজয়ে নতুন আস্থা তার বিপ্লবী শক্তির নতুন স্বীকৃতিও এসেছে—এই বিংশ শতাব্দীর এই দ্বিতীয় পাদে।

মানবতাবাদ

আধুনিক সাহিত্য যে আধুনিক তা এইরূপে বুঝা যায় তার মূল্য-বোধ থেকে। সেই সাহিত্যের বিষয় বা বক্তব্যের দিকে লক্ষ্য করেই আমরা এতক্ষণ দেখছি; বুঝছি, তার মূল্যবোধ বদলাচ্ছে। অন্ততঃ তিনটি প্রধান দিকে সে মূল্যবোধ নতুন—যেমন প্রথমত, মানুষের মর্যাদাবোধ; দ্বিতীয়, ব্যক্তি-সত্তার মুক্তি; আর মানুষের বিপ্লবী নিয়তিতে বিশ্বাস। অবশ্য এ তিনটি ছাড়া আরও অনেক নতুন বক্তব্য আমরা উল্লেখ করতে পারি। যেমন নতুন সমাজ-সত্তা বা নতুন সঙ্ঘচেতনা (social egoতে বিশ্বাস), এমন কি নতুন বিশ্ব-মানবতা-বাদ (internationalism), তেমনি নতুন 'জাতীয় আত্মা-বাদ' (national self), ইত্যাদি। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখব, কম বেশি এ সবই এক না এক দিকে পূর্বকথিত ঐ তিনটি মূল সুরের বাদী-প্রতিবাদী সুর। অবশ্য আর একটি কথাও এদিকে লক্ষণীয়। আসলে ইতিহাসের একটি কথাই এখানে পাই:—মূলত সিংক্সের প্রশ্নের যা উত্তর এ সাহিত্যেরও উত্তর তা জীবন-রহস্যের সামনে—"মানুষ।" অত্যন্ত পুরাতন এই কথা—কিন্তু আধুনিক সাহিত্যেরও প্রধান কথা এই "মানবতা-বাদ"।

প্রাচীন মানবতা-বোধ

কথা হবে, এ তো অতি পুরাতন কথা। আমরা কি প্রাচীন সাহিত্যে এই মানবতা-বাদ পাই না? পশ্চিম দেশের কথা ভাবলে গ্রীকদের সাহিত্যেও শিল্পের কথা এখানে আমরা স্মরণ করব— স্মরণ করব প্রাচীন লাতিন ও ইতালীয়দের অনেকের কথা, তার পর বোকাচিয়ো প্রভৃতি লেখকদের কথা পরে মার্লো আর সেক্সপীয়র। পূর্বদেশে অন্যদের কথা ভালো জানি না, কিন্তু নিশ্চয়ই চীনা শিল্প ও সাহিত্য এ সম্পর্কে আমাদের মনে রাখা উচিত, তাতে সুরটা বেশ পার্থিব এবং সামাজিক ও পারিবারিক। শেষে অবশ্য স্মরণ করব আমাদের নিজেদের শিল্প-সাহিত্যের কথা। আমরা বলি, আমরা কি মানুষের মর্যাদা কম করেছি; দেবতাকে পর্যন্ত আমরা মানুষ করে তুলিছি। আমাদের অবতার শ্রীরামচন্দ্র; তিনি পুত্রের রূপে, অগ্রজের রূপে, স্বামীর রূপে, রাজার রূপেও মানুষ হয়ে আমাদের মধ্যে গ্রাহ্য হলেন। আমাদের দেবতা শ্রীকৃষ্ণ; তিনিও শত সত্ত্বেও মানুষের সম্পর্ক নিয়ে মানুষ হয়ে আমাদের কল্পনায় আবির্ভূত হয়েছেন। শুধু বৈকুণ্ঠের দেবতা তিনি নন, শুধু বৈকুণ্ঠের তরে 'বৈষ্ণবের গান'ও নয়। বরং আমাদের মধ্যযুগের প্রাচীনতম শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবির মুখেই প্রথম শুনেছি এই আশ্চর্য বাণী।

"শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।"

যত দূর জানি, পৃথিবীর অন্য কোনো সাহিত্যে এ সত্য এমন ভাবে আর বাণীরূপ লাভ করেনি—এ যুগেও লাভ করতে পারেনি। তাই প্রশ্ন হবে—তা হলে মানবতাবাদকে আধুনিক সাহিত্যের বিশেষ বাণী বলি কোন্ যুক্তিতে? আর আধুনিক ও প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যেই বা তফাৎ দেখি কিসের?

দ্বিতীয় প্রশ্নটিরই প্রথম উত্তর বুঝে নিই। দেখেছি আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য তার বাণীতে আর তার রূপ-রচনায়। কিন্তু যা সেই সঙ্গে স্মরণীয়তা তা এই: অসংখ্য দৃষ্টান্ত মিলবে যা কাল হিসাবে

আধুনিক হয়েও এই দুই দিকেই আধুনিক নয়, এমন অনেক পুঁথি পাঁচালি এখনো রচিত হয় যাতে এই বৈশিষ্ট্য নেই, থাকলেও তা অপেক্ষাকৃত গৌণ। যেমন, বাট্‌ সত্তর বছর আগেকার এক এক জন আধুনিক কবিও আমাদের দেশে পুরনো চালে কবিতা লিখতেন 'কে তুমি হে বলো পাখী'। এ রকম লাইন শুনলেই মনে হবে এ কবিতা আধুনিক নয়, তারও বাট্‌ বছর আগেকার কীট্‌সের নাইটেঙ্গেলের তুলনায় তা কত সেকেলে—ভাবে এবং রূপে। অথচ যদি বলি "বেঁচে থাক' মুখুজ্জের পো। একটি চালে করলে বাজি মাৎ", তা হলে একালেরও অনেকের পক্ষে বলা শক্ত হবে এ কোনো জীবিত কবির রচনা, না মৃত কবির রচনা। এই কবিতাংশ শুনেই মনে হয় 'আধুনিক'। কেন তা মনে হল? কবিতাটি ভাবে ও ভাষায় অখণ্ড; কাজেই সর্ব কালেই সার্থক। কিন্তু তার 'আধুনিকতা' এ জন্ম যে, প্রথমত, এর ভাববস্তু ও কথাবস্তু জীবন্ত।—মানুষের কথা, মানুষী ভাষায়। দ্বিতীয়ত, এর ছন্দ হচ্ছে ছড়ার ছন্দ—আশ্চর্য রকমের যা একালের ছন্দ। অর্থাৎ এ কবিতার প্রাণ হচ্ছে দেবদেবীর মাহাত্ম্য নয়, জীবন্ত সমাজের কথা, সাধারণ মানুষের ভাব ও ভাষা। হেমচন্দ্র তাঁর বিদ্রূপের কবিতায় যত 'আধুনিক' বৃত্রসংহারের কবি এমন কি ভারতভিক্ষার কবি হিসাবেও ততটা 'আধুনিক' নন। তেমনি যত বড় কবি হোন হেম-নবীন আজ আমাদের চক্ষে মনে হয় 'মহিলা' কাব্যের কবি বা সারদামঙ্গলের কবি তাঁদের অপেক্ষাও বেশি আধুনিক। ঐ হিসাবেই মাইকেল বিষয়-বস্তুতে ও রূপায়ণে বিপ্লব আনেন; এবং আর এক দিকে বঙ্কিমে আধুনিকতার প্রারম্ভ। নভেল প্রায় বরাবর মানুষের কথা। মানুষের চরিত্র আর ঘটনা নভেলের প্রধান বস্তু, জন্মেছেও নভেল আধুনিক কালে যখন থেকে মানুষ ব্যক্তি হিসাবে গণ্য বিশিষ্ট হয়ে উঠল। বঙ্কিম থেকে আমাদের সেই নভেল শুরু হল। বুঝতে পারি—ইংরেজী শিক্ষার গুণ আধুনিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য বঙ্কিমের কালে সর্বগ্রাহ্য হয়েছে। ঠিক এই কারণেই মুকুন্দরামের অঙ্কিত মানুষগুলোকে দেখেও আমরা তৃপ্ত হই—বুঝি এ হচ্ছে চসার বোকাচিয়োর সগোত্র কবি, যাঁরা ছন্দে লিখছেন কথাসাহিত্য, সৃষ্টি করছেন চরিত্র, বুঝছেন মানুষের বৈচিত্র্য। এমনি আধুনিকতার স্বাক্ষর পাই আরও প্রাচীন সাহিত্যে, বিশেষ করে গ্রীক সাহিত্যে আর লাতিন সাহিত্যে। যে পরিমাণে সে সব লেখা এই মানবীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ সে পরিমাণেই মনে হয় এ সব লেখা আমাদের স্বকালের, আধুনিক যুগের।

'সহজ মানুষ' ও মানবতাবাদ

কথা না বাড়িয়ে এই সূত্রেই আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর বলতে পারি: সত্য বটে, মানুষ যখন থেকে নিজেকে প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র বলে জেনেছে তখন থেকেই তার সৃষ্টিতে এই মানব-চেতনার সাক্ষ্য মিলবে। তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই প্রাচীন যুগে মানুষ নিজের শক্তির বা মর্যাদার খবর বুঝে উঠতে প্রায়ই পারেনি। তাই সে নিজেকে প্রায়ই দেখেছে দেবতার ক্রীড়নক হিসাবে; জীবনের মানে তার কাছে অনেকাংশে গোচর হয়েছে দেবতার লীলা বলে। মোটামুটি আমাদের দেশের, এবং অন্য অধিকাংশ দেশেরও প্রাচীন সাহিত্যে তাই মানুষের কথা কীর্তিত হয়নি, হয়েছে দেবদেবীর কথা, ধর্মের কথা, পরলোকের কথা, অতি-প্রাকৃত শক্তির কথা; অবশেষে মানুষের নামেও কীর্তিত হয়েছে দেবতার মাহাত্ম্য। এইটাই সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ।—এখনো তার জের সমস্ত সাহিত্য থেকে লুপ্ত হয়নি। মঙ্গলকাব্যে এ জিনিসই প্রচণ্ড রকমে দেখি—ভাগ্য-তাড়িত মানুষ দেবতার মুখ চেয়ে আছে। রামায়ণ মহাভারতেও এই দেবলীলাকে মানব-ভাগ্যের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা দেখি। আর আমাদের মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যে দেখি—সেই অস্ফুট মানবতা-বোধের আরও সুস্পষ্টতর প্রকাশ। তবু বোঝা উচিত, চণ্ডীদাস বা সহজিয়াদের "মানুষ" সবার উপরে সত্য বটে, কিন্তু কি হিসাবে সে সত্য? সমস্ত সুখদুঃখের অতীত মানুষ হিসাবে, সমাজ-সম্পর্কের অতীত সত্তা হিসাবে, মানে, পরমাত্মার স্বাক্ষর-স্বরূপ মানবাত্মা বলে—নির্গুণ নির্বিশেষ শুদ্ধসত্ত্ব আত্মা হিসাবে। কিন্তু আধুনিক মানবতাবাদ এমন "আধ্যাত্মিক" মানবতাবোধ নয়—আধুনিক মানুষের চোখে মানুষ সত্য মানুষ হিসাবে, আত্মার প্রতীক হিসাবে নয়। মানবীয় সম্পর্কের অতীত হয়ে আধুনিক মানুষ সত্য নয়, মানবীয় সম্পর্কের জন্যই বরং সত্য—সত্য হাসির জন্য, কান্নার জন্য; সমাজ সম্পর্কের সমস্ত বাঁধন নিয়ে সমস্ত বাঁধন মেনে—আর সমস্ত বাঁধন ছিঁড়েও, কিন্তু বন্ধনমুক্ত বলে নয়। আধুনিক মানুষ সত্য secular জীবন নিয়ে, social মানুষ হিসাবে; আর চণ্ডীদাস বা মধ্যযুগের চোখে মানুষ সত্য—spiritual সত্তা হিসাবে, divinityর প্রতীক হিসাবে। আজ এ যুগে মানুষের মহিমা যখন আমরা উপলব্ধি করছি, তখন তাই নতুন করে ব্যাখ্যা করছি চণ্ডীদাসের সহজ মানুষকে। লক্ষ্য করা দরকার—ত্রিশ বছর আগেও বাঙলা দেশের সাহিত্যিকরা এই চণ্ডীদাসের এই বাণী নিয়ে বাড়াবাড়ি করেননি, এরূপ ভাবে নতুন করে ব্যাখ্যা করার কথাও তাঁরা ভাবেননি। কারণ, তখনো মানুষ বাঙালীর চোখে এক সত্য হয়ে ওঠেনি।

গ্রীক মানবতাবাদ

আসলে কথাটা এই, প্রাচীন সাহিত্যে একটা মানবতাবোধ ছিল, এমন মানবতাবাদ ছিল না। তবে প্রাচীন কালের সেই মানবতা-বোধ ক্রমশ পরিস্ফুট হয়েছে মানবতাবাদে; ইতিহাসের এক এক স্তরে তা এক এক ভাবনায় প্রভাবিত হয়ে এ ভাবে ক্রমশঃই স্পষ্টতর হয়েছে। সব চেয়ে আগে সম্ভবত গ্রীস দেশেই তা অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর হয়েছিল। সে জন্যই গ্রীক সাহিত্যকে মনে হয় এত আধুনিক। তার কারণ, প্রাচীন গ্রীসের জীবন-যাত্রা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ অনেকটা বেশি উন্নত হয়েছিল। সেখানে দাস-পরিশ্রমের উপর বনিয়াদ করে ছোট ছোট শহরে পৌর-সভ্যতা, বহির্বাণিজ্য, গণতন্ত্র এমন কি, কাঞ্চন-কৌলীন্য বা money economy'রও প্রায় প্রতিষ্ঠা হতে চলেছিল। অ্যাথেনস্ তো প্রায় একটা সাম্রাজ্যও স্থাপন করে ফেলেছিল। অর্থাৎ এক দিক থেকে দেখলে সেই গ্রীস-সভ্যতার সামাজিক বনিয়াদ ছিল আধুনিক সভ্যতার "অনুরূপ" (শুধু অনুরূপ নয়)। পরবর্তী মধ্যযুগে ইউরোপে তা মুছে গেছল, অন্য অনেক দেশে এরূপ সামাজিক বনিয়াদ স্থাপিতও হয়নি। সে জন্যই গ্রীক্-চিন্তায় আধুনিকতার বেশি আভাস দেখি। আসলে সেই আভাসই পুনঃ প্রস্ফুট হল ইউরোপে রিনাইসেন্সের সময়—যখন গ্রীক-চিন্তা-জগৎ নতুন করে আবিষ্কৃত হল, আর মধ্যযুগের সভ্যতার ভূমিদাস-ভিত্তি কাটাবার জন্য স্থাপিত হচ্ছিল আধুনিক বণিক্ ধনিক যুগের বনিয়াদ—ইতালির

শহরে বন্দরে। এবার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বনিয়াদ আরও দৃঢ়তর রূপে স্থাপিত হল, আর সেই সুস্থির সামাজিক বনিয়াদি এবার লুপ্ত হল না, কারণ বিজ্ঞানের আবিষ্কার এসে তাকে পাকা করলে, এমন কি দেশ-বিদেশেও তারই নতুন সম্ভাবনা বিজ্ঞান এবার সুস্থির করে দিলে, এবং আরম্ভ হল 'আধুনিক কাল' রিনাইসেন্সের জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে। রিনাইসেন্সকে এ হিসাবেই বলি আধুনিক কালের প্রথম সোপান। নইলে চীন দেশে কনফুসীয় যুগ থেকে সুস্থ ঐহিক দৃষ্টিও সমাজবোধ স্থান পেয়েছিল। কিন্তু প্রধানত চীনা সমাজ ছিল পরিবার-কেন্দ্র—অনেক প্রাচীন সমাজ অনেকাংশে তাই থাকে। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার (যেমন, বারুদ আর কাগজ সব চেয়ে বড় বিপ্লব ঘটায় যা ইউরোপের ইতিহাসে) চীনের সমাজে বেশি দূর গড়াল না, সমাজে পুরনো কাঠামো ওমান্দারিন (schdasfic) ঐতিহ্য এত অনড় হয়ে রইল যে, মানুষের মূল্য, ব্যক্তিত্বের ও গণতন্ত্রের স্ফুরণ তাতে হল না। চীনা সাহিত্যে তাই রইল সুদূর নৈর্ব্যক্তিকতায় আবদ্ধ। সবে তার সেই বাঁধ ভাঙতে আরম্ভ করেছে গত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরে, লু হ্‌শুন্‌-এর সঙ্গে—নতুন চীনের জন্মে।

রিনাইসেন্সের কাল থেকে যে মানবতাবাদ সমুত্থিত হল তা প্রাচীন যুগের মানবতা-বোধেরই ঐতিহাসিক পরিণতি; তবু তার সঙ্গে প্রাচীন মানবতাবোধের পার্থক্যও শুধু কালে, আয়তে, আর পরিমাণে নয়। বলতে হবে, সব শুদ্ধ এ পার্থক্য গুণগত। তখন থেকে মানুষ ও পৃথিবী হয়ে উঠল মানুষের সব চেয়ে প্রধান বিষয়।

How beauteous mankind is !
O brave new world ;
That has such people in't !

আধ্যাত্মিকতার দিন ফুরোতে লাগল। তার পর আমেরিকার ইউরোপে ঐতিহাসিক গতি এই মানবতাবাদকে আরও নতুন রূপ দিল সমাজে রাষ্ট্রে "মানুষের অধিকার" ঘোষণা করে। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব হল তার সর্বজন-স্বীকৃত ঘোষণা—যদিও এই বাণী আগেই রূপ নিচ্ছিল ইংলণ্ডে আমেরিকায়। ১৭৮৯এর পর থেকেই ব্যক্তিসত্তার দাবী স্বীকৃত হতে লাগল, স্বীকৃত হল গণতন্ত্রে'ও দাবী। আধুনিক সাহিত্যেও তখন তার এই দ্বিতীয় সত্যকে আবিষ্কার করল, ব্যক্তিহিসাবে কত বিশিষ্ট আর বিচিত্র মানুষ, এবং Man's man for a' that। কিন্তু সেই মানবতাবাদ, সেই গণতন্ত্র আর ব্যক্তিসত্তাবোধও প্রশস্ত হয়ে হয়ে আবার ইতিহাসের নতুনতর বিকাশে আজ আর-এক নতুন সত্য ও চেতনাকেও মানুষের কাছে ক্রমশঃই স্পষ্ট করে তুলেছে—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও গণতন্ত্রের জন্য চাই শোষণতন্ত্রের অবসান। ইতিহাসে এই বাণী রূপলাভ করেছে ১৯১৭-এর সোভিয়েট-বিপ্লবে। তাতে করে আবিষ্কৃত হয়েছে তার আর্থিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে এই নতুনতর সত্য—মানুষ বিপ্লবী শক্তির অধিকারী, কারণ মানুষ সৃষ্টিধর্মী, সে গড়তে পারে আপনার জীবনকে আপনার প্রযত্নে।

আধুনিক বাঙলা সাহিত্য

আধুনিক কালের এই মানবতার বাণী একই কালে সব দেশে সমভাবে স্ফূর্তিলাভ করেনি, তা স্পষ্ট। এখনো যে এ সব বাণীকে আমাদের দেশে আমরা কতটা ঘোলাটে চোখে দেখি গোড়াতেই তা আমরা একটু বুঝে নিয়েছি। কিন্তু মানবতাবাদের বিকাশ যে কি কারণে সব সাহিত্যে ও সমাজে সমান ভাবে হয়নি তা স্পষ্ট তা এই—সব দেশে ইতিহাস সমভাবে সমতালে বিকাশ লাভ করেনি। এই তো দেখছি আজ যখন সোভিয়েট দেশে মানুষ আপনার বিপ্লবী নিয়তি সংবন্ধে সচেতন, ইংলণ্ড আমেরিকায়ও তখন পর্যন্ত মানুষ ভাবছে নিজেকে অনেকটা অসহায় বলে, অভিশপ্ত বলে; আর আমাদের দেশে আমরাও ভাবছি তাই। সমাজ বিকাশের এক স্তর নিচে দাঁড়িয়ে ইংলণ্ড ও আমেরিকা, ধনিকতন্ত্রী সংকটে তাদের চেতনা দ্বিধাগ্রস্ত। আর আমরা আরও নিয়ে আরও জটিলতর এক অবস্থায়। সাম্রাজ্যবাদী আওতায় একই কালে প্রাচীন সামন্ততন্ত্রের বোঝায়, ধনিকতন্ত্রী আশা ও চেষ্টার তাড়নায়, আর সমাজতন্ত্রী চিন্তা ও চেতনার স্বপ্নে আমরা আকুল। তাই কখনো এই নানা তরঙ্গে ভেসে আমরা খাপছাড়া ভাবে উল্লসিত হচ্ছি, কখনো হচ্ছি উৎকট নিরাশায় উদ্‌ভ্রান্ত। এই অস্বাভাবিক কারণে আমাদের সাহিত্যে আধুনিকতার সুরও এসেছে প্রাচীন সাহিত্যের সুরকে ছাপিয়ে এক অসাধারণ তীব্র আবেগে। তা প্রথম দেখা দিল যখন মধুসূদন-বঙ্কিম আমাদের সাহিত্যের নতুন দ্বার খুলে দিলেন। অমনি আমাদের চেতনায় তা তীব্র আবেগে দুকূল ছাপিয়ে ব'য়ে গেল—অথচ আমাদের জীবনে আমরা এখনো তার অনুরূপ সুস্থ বনিয়াদ রচনা করতে পারিনি—সাম্রাজ্যবাদের তাড়না আমাদের সে সুস্থির অবকাশ দেয়নি। কাজেই একটা সুস্থ স্থির বিকাশের দিকে আমাদের সাহিত্য এগোতে পারছে না।

১৮৬০ থেকে ১৯৪০, এই আশী বৎসরের মধ্যে আমরা বাঙলা সাহিত্যে অদ্ভুত তীব্রগতিতে উত্তীর্ণ হতে চয়েছি প্রায় চারশ' বৎসরের 'আধুনিক যুগের' ইউরোপীয় সাহিত্যের নানা স্তরকে। অথচ জীবনে আমরা এখনো বাঁধা নানা পুরনো ব্যবস্থার ও আধুনিক অব্যবস্থার যূপকাষ্ঠে। আমাদের এ চেষ্টা যত তালহারা হোক, তা বিস্ময়াবহ। মানুষের মূল্য ও ব্যক্তিত্বের মূল্য আমরা যেমন তীব্র বাণীতে বলতে পেরেছি আমাদের এই আধুনিক আশী বছরের সাহিত্যে, তা কেউ স্বীকার না করে পারবে না।

মানুষের "বিপ্লবী নিয়তি" আমাদের সাহিত্যে এখনো বাণীরূপ গ্রহণ করেনি, তা সত্য। কিন্তু ইউরোপেরও বহু সাহিত্যে তার স্বাক্ষর এখনো ঝাপসা। তার সুস্পষ্ট চেতনা শুধু সোভিয়েট জীবনেই এখনো ফুটেছে; এবং ফুটেছে তাই সোভিয়েট সাহিত্যে। কিন্তু ইউরোপের অনেক জাতির থেকেও (যেমন, ইংরেজ) বিপ্লবী ব্যাকুলতা আমাদের জীবনে বেশি উগ্র ও উত্তাল হবার সম্ভাবনা—তাই, এ কথা অসম্ভব নয়,—আমাদের সাহিত্যে একই কালে মানব-সাম্যের ও মানুষের বিপ্লবী নিয়তির বাণী প্রস্ফুট হয়ে উঠতে পারে—মানব-প্রগতির সমস্ত পথটিই আলোকিত হয়ে চিহ্নিত হয়ে যেতে পারে অদূর ভবিষ্যতে—হয়ত এক বিপ্লবী জাগরণে।

কিন্তু যা'ই হোক্ ভবিষ্যৎ, এ কথা আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারি—আধুনিক সাহিত্যের "আধুনিকতার" অর্থ কি, কি তার মূল বাণী। ইতিহাসের তিনটি বড় রকমের সমুত্থানের মধ্য দিয়ে আধুনিকতার এই ক্রম বিকাশকেও আমরা চিহ্নিত করতে পারি:—রিনাইসেন্সে ঘটেছে মানুষের মহিমার বোধ, ফরাসী বিপ্লবে ঘটেছে "মানুষের অধিকারের" ব্যক্তিগত ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা; আর সোভিয়েট বিপ্লবে ঘটেছে মানুষের বিপ্লবী যাত্রার সূচনা। মানব-প্রগতির পথও এ-ই, আর সাহিত্যও এই প্রগতিরই সাক্ষী ও বাণী।

ঝড় ও ঝরা পাতা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৪ই ফেব্রুয়ারী)

নেবুর মা শান্তি নেবুকে গর্ভে ধরার জন্ম প্রথমটা কপালে চড় মেরেছে। চড়ের পর চড়। শুধু একা নেবুকে গর্ভে ধরার জন্মই নয়—সকল সন্তানগুলোকে গর্ভে ধরার জন্ম প্রচণ্ডতম আক্ষেপে কপালে করাঘাত করেছে, নিজের গর্ভের উপর আঘাত করেছে, সবগুলোর মৃত্যু কামনা করেছে, স্বামীর মৃত্যু কামনা করেছে। কয়েক বার গলির মোড় পর্য্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল, ইচ্ছে হয়েছিল ছুটে গঙ্গার তীরে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে এক মুহূর্ত্তে। কিন্তু ফিরেছে। নেবু দেবু টেবু আর তার স্বামীর সংবাদ না পেয়ে মরতে যেতে পারে নাই। মরে শান্তি পাবে না সে।

একটা দুটো তিনটে চারটে লাশ একে একে আসুক—সবগুলোর মুখে আগুন দিয়ে—তার পর সকলের আগে আসুক নেবুটার লাশ। সে লজ্জার হাত থেকে রেহাই পাক। তের-চৌদ্দ বছরের মেয়ে—দেহে 'মেয়ে-লক্ষণ' ফুটতে আরম্ভ করেছে—সে এই দুর্য্যোগের কলকাতায়—এই মন্বন্তরের কলকাতায়—এই রাক্ষুসে কলকাতার পথে বেরিয়েছে সন্ধ্যের পর রাত্রিকালে। গহন অরণ্যে আর রাত্রের কলকাতায় কোন তফাৎ নাই। তাদের পিছনে ওই ঝিয়েদের বস্তী, তারও পিছনে বেশ্যাদের বস্তীর সরু গলিপথে যে সব মানুষ চলে-ফেরে—তাদের চোখের চাউনি আর জানোয়ারের চোখের চাউনির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। বড় রাস্তায় পুলিশ বেরিয়েছে—পল্টন বেরিয়েছে—লালমুখো গোরার দল—আফ্রিকার দলবদ্ধ সিংহের মত। হারামজাদী নেবুই একখানা বই এনেছিল ও-বাড়ীর কানুর কাছ থেকে—'বনে জঙ্গলে' নাম বইখানার, তাতেই শান্তি পড়েছে সিংহ যের হয় দল বেঁধে। সে নিজে দেখতে গিয়েছিল দেবা আর ট্যাবাকে অনেক দূর পর্য্যন্ত। বাগবাজারের মোড় থেকে নিউ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট ধরে সেন্ট্রাল এ্যাভিন্যুর খানিকটা দূর অবধি সে গিয়েছিল। কোথায় দেবা—কোথায় ট্যাবা? তবে অন্য লোকের অনেক দেবা ট্যাবাকে দেখে এসেছে। খুদে শয়তানের দলের কোন দিকে দৃক্‌পাত নাই, মরণ-বাঁচন জ্ঞানগম্যি নাই, কারও কথায় কর্ণপাত করে না—এই নিয়েই মত্ত। জয় হিন্দ! নেতাজী সুভাষচন্দ্র কী জয়! বন্দে মাতরম্! ইনকিলাব জিন্দাবাদ! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক! চেঁচাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে! বার দুই-তিন শান্তি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিল—দুটি ছেলেকে জান? নাম দেবা আর ট্যাবা। বাগবাজার বাড়ী। ছোট ছেলেটা ট্যাবা বাঁ হাতে ঢেলা ছোঁড়ে। কথায় উত্তর না দিয়ে তারা চেঁচিয়ে উঠেছিল—আসছে! আসছে! এই—এই—এই! এই মেয়েলোক! কে গো তুমি—হটো—ভাগো—মিলিটারী আসছে!

মুহূর্ত্তের মধ্যে দৈত্য-দানার বাচ্ছার মত সব অদৃশ্য হয়ে গেল যেন। জাল দিয়ে মোড়া লরী চলে গেল, গলির মুখটা পার হবার সময় ঢেলার যেন শিলাবৃষ্টি হয়ে গেল। লরীর উপর থেকে এল বন্দুকের গুলী। শান্তি ভয়ে বসে পড়েছিল। শান্তির কপাল, একটা গুলী তাকে লাগল না। আর তার যেতে সাহস হ'ল না। ফিরল সে। নেবু এবং ছোট দুটোর জন্যও ভাবনা হচ্ছিল! সে ভাবনা তার অহেতুক নয়। ফিরে দেখলে—ছোট ছেলে দুটো ঘরের মধ্যে চীৎকার করছে, নেবু নাই। বুকটা তার ছ্যাঁৎ করে উঠল। নেবুকে সে জানে। ছ মাস আগে গোপেনের অসুখ করেছিল—কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছিল, নেবু রাত্রে গিয়ে দারোয়ানদের কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছে একা। এ বছরের বর্ষায় বাগবাজারের ঘাট থেকে রাত্রি ন'টায় খদ্দেরের ভিড় কমে গেলে সস্তায় গঙ্গার ইলিশ কিনে এনেছে। এক একদিন সস্তা মাছের খোঁজে গঙ্গার ধারের ওই অন্ধকার পথে আহিরীটোলার ঘাট পর্য্যন্ত গিয়েছে! সেই নেবু! ঘরের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখে তার আর সন্দেহ রইল না। রান্নার হাঁড়ি কড়াইগুলি উপরে তুলে রাখা হয়েছে, বঁটিটাও তুলে রেখেছে, যে জিনিষগুলি ভাঙতে পারে—তাও সযত্নে সামলে রেখেছে। তার পর আর তার সন্দেহ রইল না। সে ডাকিনী এই খেপে-ওঠা কলকাতার রাস্তায় এই রাত্রিকালে বেরিয়েছে দেবা আর ট্যাবার সন্ধানে। সন্ধানেও বটে—আবার এই হানাহানি-খুনোখুনি দেখবার নেশাতেও বটে। শান্তি বেরিয়ে এসে—পথের উপর কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল তার পর বসে পড়ল ওই দাওয়ার উপর।

রাত্রি দশটায় ফিরল—দেবা আর ট্যাবা। দুজনের কাঁধে দুটো পুঁটলী। এই দুরন্ত শীতের দিনে খালি গা, গায়ের জামা খুলে তাই দিয়ে পুঁটলী বেঁধে কি নিয়ে এসেছে। ছেলে দুটো এসে মাকে দাওয়ায় বসে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়াল। শয়তান, প্রেত, অপগণ্ড, হতভাগাদের ভয় হয়েছে এবার। ফিস-ফিস ক'রে দুজনে কি বলাবলি করছে। শান্তির মনে দুর্দ্দান্ত রাগ—ক্ষোভ জলন্ত-প্রায় কয়লার উনোনের উত্তপ্ত ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। ইচ্ছে হচ্ছে—ওদের দুটোকে মাটিতে ফেলে দুজনের গলায় দুটো পা দিয়ে নূতন সন্তানঘাতিনী একাদশ মহাবিদ্যার রূপ প্রকট করে। তার পর বের হয় নাচতে নাচতে। সৃষ্টি ধ্বংস করে ফেলতে। নখ দিয়ে চিরে, দাঁত দিয়ে টুঁটী ছিঁড়ে ফেলে সমস্ত সৃষ্টিটাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিতে। মধ্যপথে গুলী এসে লাগে তার বুকে—বাস্, সব যন্ত্রণার অবসান হয়ে যায়। সে উঠল:

—আয়—আয়—এদিকে আয়! শোন!

পিছিয়ে গেল ছেলে দুটো। ওরা বুঝতে পেরেছে—শান্তির বুকের আগুনের আঁচ পেয়েছে। চোখ দিয়ে আগুনের শিখা বোধ হয় উঁকি মারছে। এগিয়ে গেল শান্তি, দেবা ট্যাবা ছুটে পালিয়ে

গেল খানিকটা। গাঢ় অন্ধকার একটা গলির মোড়ে গিয়ে দাঁড়াল। শান্তি আরও এগিয়ে এলে তারা ওই গলির মধ্যে ঢুকবে। ঝিয়েদের বস্তীর গলি। বড় হয়ে তো ওইখানেই ওরা ঢুকবে, ঠেলা মেরে শান্তি গোপেনকে যে ভদ্রপল্লীর পাকা-বাড়ী থেকে ভাগের পাকা-বাড়ী, সেখান থেকে টিনের কোটা-বাড়ী সেখান থেকে ঝিয়েদের বস্তীর সামনের এই বস্তীতে এনে ঢুকিয়েছে—সেই ওই দেবা ট্যাবা হাবা সবাকে ওই ঝিয়ের বস্তীতে ঠেলবে—তারা ওই ঝিয়েদের সঙ্গে সংসার পাতবে। তার পর ওখান থেকে পিছু হটে যাবে ওই পিছনের বস্তীতে—বেশ্যাপল্লীতে, গলিতে দাঁড়িয়ে থাকবে ছুরী হাতে, অথবা ব্লেড কি কাঁইচি হাতে। রাহাজানি কি খুন কি পকেটমার হবে: নেবুও যাবে বোধ হয় ওইখানে। তা ছাড়া আর কোথায় নেবুর গতি? আজ এই মুহূর্ত্তে শান্তির চোখে কোন রঙ নাই, অন্ধকারের মধ্যে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ভবিষ্যৎ। সাধারণ সময়ে সে নেবুর বিয়ের কল্পনা করে। পাড়ার ছেলেদের কেউ নেবুকে ভালবেসে বিয়ে করবে। ওই বড় বড় বাড়ীর ছেলেদের কেউ নেবুকে ভালবেসে ফেলবে না—কে বলতে পারে? অসম্ভব কিসে? এই তো সিনেমায় সে দেখেছে—বস্তীর মেয়ের সঙ্গে লক্ষপতির ছেলের বিয়ে হচ্ছে। লক্ষপতির মেয়ে বস্তীর বাউণ্ডুলেকে বিয়ে করছে। আবার কল্পনা করে—নেবু গান শিখছে—কোন মতে রেডিয়োতে গান গাইবার সুযোগ পাবে নেবু, তার মিষ্টি গলার গান শুনে কেউ হয়তো নেবুকে চিঠি লিখে বিয়ে করে ফেলবে। আবারও কল্পনা করে, নেবু সাহসী মেয়ে—দেখতেও তার শ্রী আছে—চটক আছে—পথে-ঘাটে ঘুরতে-ফিরতে গিয়ে কোন ছেলের সঙ্গে আলাপ হবে, বাড়ীতে আসবে-যাবে—তার পর বিয়ে হবে। আজ আর তার সে সব কোন কল্পনার ঘোর নাই। সে স্পষ্ট দেখছে নেবুর ভবিষ্যৎ। নেবুর বয়স বাড়বে—বিয়ে হবে না, অকস্মাৎ এক দিন প্রকাশ পাবে নেবুর সর্ব্বাঙ্গে মাতৃত্বের আভাস। নয় তো হঠাৎ এক দিন দেখা যাবে—নেবু নিরুদ্দেশ। তার পর নেবুকে একদা দেখা যাবে ওই পল্লীতে। সময়ে সময়ে শান্তি কল্পনা করে নেবু সিনেমায় যাবে। কত ভদ্রঘরের মেয়ে সিনেমায় নামছে; উপার্জ্জন করছে; দেওয়ালে-দেওয়ালে তাদের ছবি, হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন, বাড়ী-গাড়ী, গহনা-শাড়ী, কিছুরই অভাব নাই তাদের; লোকের মুখে-মুখে তাদের নাম। অমনি হবে নেবু। আজ মনে হল—সিনেমাতেও যদিই স্থান পায় নেবু—হবে সে স্থান পাবে—সিনেমায় যারা ঝি সাজে, বস্তীর মেয়ে সাজে—তাদের মধ্যে; ওই যে কদর্য্য পল্লীটা, ওর সামনে মধ্যে মধ্যে সিনেমার গাড়ী এসে দাঁড়ায়, ওখান থেকে মেয়েদের বেছে-বেছে নিয়ে যায়; সেখানে চা খায়—জল-খাবার খায়—দু টাকা করে মজুরী পায়—গাড়ী চড়ে যায়—গাড়ী চড়ে ফেরে।

ভাবতে ভাবতে শান্তির রাগ-ক্ষোভ হতাশায় পরিণত হয়ে এল। কালবৈশাখীর ঝড়-মেঘ-বজ্র ক্রমে যেমন আষাঢ়ে মন-উদাস-করা বর্ষার মেঘে রূপান্তরিত হয়—দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্য্যন্ত নীরন্ধ্র মেঘে ঢেকে যায়—ঝর ঝর করে অবিরল কান্নার মত বৃষ্টি নামে—তেমনি ভাবে বুক-জোড়া বেদনার মেঘে রূপান্তরিত হল শান্তির ক্রোধ-ক্ষোভ; চোখ জলে ভরে উঠল—চোখ ছাপিয়ে দুটি ধারায় ক্রমে সে জল নেমে এল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে কেঁদে—সে কোন মতে আত্মসম্বরণ ক'রে—ধরা-গলায় কাতর ভাবে ডাকলে—ওরে আয়—বাড়ী আয়—আর দুঃখ দিস নে। ওরে দেবা—ওরে ট্যাবা—! শেষের ডাক দুটির মধ্যে কান্নার সুর স্পষ্ট হয়ে উঠল। চোখ দিয়ে আবার জল গড়িয়ে পড়ল।

দেবা ট্যাবা উঁকি মারলে গলি থেকে।

—ফিরে আয়—আমার মাথা খা।

দুই ভাই এবার রাস্তার উপর এসে দাঁড়াল।

—আয় রে, কিছু বলব না—আয়। আর কেলেঙ্কারী বাড়াস নে।

কেলেঙ্কারী বই কি! এমন ছেলে—আর ভদ্রলোকের মেয়ে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে এই ভাবে ডাকা—কেলেঙ্কারী বই কি? ভাগ্য শান্তির—সামনের দোকানগুলো বন্ধ! রাস্তায় আজ নারীদেহ-লোলুপ মানুষের ভিড় নাই বললেই চলে—নইলে—তেরচা চোখে চেয়ে চলতে চলতে কেউ হয়তো—সশব্দে গলা পরিষ্কার করে ইঙ্গিত করত, কেউ হয়তো সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলত—কি গো—! খুনোখুনি—হাঙ্গামার মধ্যে কলকাতার মানুষের মতি ফিরেছে। মানুষের ভাগ্য না—হোক—শান্তির কাছে সেটা আজ ভাগ্যের কথা!

দেবা ট্যাবা এগিয়ে আসছে এক পা—এক পা করে।

* * * *

শান্তি ওদের মারলে না। মারতে ইচ্ছা হ'ল না। নেবুর মৃত্যুশোক বুকের মধ্যে চেপে হতাশার অবসাদে অবসন্ন হয়ে সেই দাওয়ার উপর বসে পড়ল। দেবা ট্যাবা সাহস পেয়ে দেখালে—তাদের পুঁটুলীর জিনিষ। পোড়ানো লরীর পার্টস। লরীতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে—।

—জানো মা—প্রথমেই গাড়ী থেকে খানিকটা পেট্রোল বার করে নিয়ে—টায়ারের উপর ঢেলে দিচ্ছে। বাস তার পরই দেশলাই। পেট্রোলে আগুন লেগে—হু হু করে জ্বলছে—টায়ারের রবার গলে যাচ্ছে—তখন সেই থেকে আগুন জ্বলছে। তখন সট্ সট্ করে—লরীর ঘড়ি মিটার ব্যাটারী খুলে নিচ্ছে। তার পর ট্যাঙ্ক ফেটে পেট্রোল ছড়িয়ে পড়ে—খুব আগুন জ্বলছে।

ওরা দু ভাইয়ে দুটো ঘড়ি নিয়ে এসেছে। ট্যাবা বললে—হাঙ্গামা মিটলে বিক্রী করে দোব।

শান্তির এতে খুসী হবার কথা। এর আগে মূল্য আনতে পারে এমন জিনিষ আনলে সে খুসীই হয়েছে। ওই ট্যাবাটা মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজের প্রেস-রুমে ঢুকে কতকগুলো ব্লক চুরি ক'রে এনেছিল। গোপেন সেগুলোকে বিক্রী করে কিছু মূল্য ঘরে এনেছিল। শান্তি মধ্যে মধ্যে ট্যাবাকে বলে—এক দিনে বেশী আনবি নে, একটা দুটো—তার বেশী না। নইলে ধরে ফেলবে। পাড়ায় খাওয়ান-দাওয়ান থাকলে দেবা ট্যাবা দুজনেই যায়—সুযোগ মত জুতো নিয়ে আসে। সেটা ওদের শিখিয়েছিল—নেবু।

হতভাগী নেবু।

এই সময় ফিরল গোপেন। একখানা সেলুন বডি মোটর এসে দাঁড়াল। সেই গাড়ী থেকে একটি লম্বা দেখতে জোয়ান ছেলে আর একটি হাল-ফ্যাশানী মেয়ে তাকে পৌঁছে দিয়ে গেল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে দাওয়ায় এসে বসে বললে—এই আমার বাড়ী। বাস্ বলে ধপ ক'রে দাওয়ার উপর বসে পড়ে হাসতে হাসতে বললে—জয় হিন্দ!

মেয়েটি হেসে বসে বললে—জয় হিন্দ! কিন্তু কাল যেন আর বাড়ী থেকে বার হবেন না।

—ও কিছু না! বলে গোপেন বাঁ পায়ের কাপড়টা সরালে—পায়ের ডিমেটায় একটা ব্যাণ্ডেজ।

—কিছু না নয়, কাল বুঝতে পারবেন। বিশ্রাম নিন কাল। জ্বর-টর হলে ডাক্তার দেখাবেন। পারি তো আমরা কেউ আসব ডাক্তার নিয়ে।

তারা চলে গেল।

স্তব্ধ হয়ে বসেছিল শান্তি মাটির মূর্ত্তির মত। তার মুখের ভাবের মধ্যে এমন কিছু ছিল—যা দেখে গোপেন তাকে একটু তোষামোদ না করে পারলে না। হেসে বললে—পায়ের ডিমেতে রিভলভারের গুলী লেগেছে।

শান্তি কোন উত্তর দিলে না। গোপেন এবার ঘরের ভিতরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকলে—নেবু, নেবু রে!

শান্তি এবার বলে উঠল, পাগলের মত—নেবু, নেবু, নেবু! নেবু নাই—নেবু মরেছে।

*　　　　*　　　　*

শেষ রাত্রে শান্তি ঘুমিয়ে পড়ল। বাইরের এই হাতখানেক চওড়া রোয়াকটায় বসে—ছিটে বেড়ার দেওয়ালের ঠাণ্ডা মাটীতে ঠেস দিয়ে—নেবুর চিন্তার উদ্বেগ বুকে নিয়ে তার ঘুম আসাটা আশ্চর্য্য। কিন্তু তবু ঘুম এল; বসে থাকতে থাকতে কখন আপনিই চোখের পাতা দুটো বন্ধ হয়ে এল। সজ্ঞানে যে সব রোগী মরে, বাঁচবার ব্যগ্রতায় অহরহ পাশের আত্মীয়-স্বজনদের দিকে তাকিয়ে থাকে—তারা যেমন ধীরে ধীরে ক্ষয়িতশক্তি হয়ে আপনার অজ্ঞাতসারে বিনা আক্ষেপে এক সময় চরম অবসাদে চোখ বন্ধ ক'রে, তেল ফুরানো প্রদীপের শিখার নিবে-যাওয়ার মত চেতনা হারিয়ে যায়, শান্তির ঘুম আসাটা ঠিক তেমনি ধরণের। ক্রমশঃ মাথার ভিতরটা ঝিমিয়ে এল—ঝিম ঝিম করতে আরম্ভ করলে—হাত-পায়ের পেশীগুলো নরম হয়ে এল—নিজের দেহটা ভারী বোধ হতে লাগল, বুকের ভিতরে উদ্বেগের অসহনীয় পীড়ন কম অনুভব করতে লাগল, নেবুকে যেন ভুলে যেতে লাগল ক্ষণে ক্ষণে, পথের দিকে যে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে বসেছিল—সে দৃষ্টি ক্রমে নিস্পৃহতায় বাস্তবস্তু-প্রতিবিম্বিত-করার চিহ্ন হারিয়ে ভাবলেশহীন হয়ে এল, পাতা দুটো নেমে এল। তবু বার কয়েক জোর করে—সে চোখ মেলবার চেষ্টা করলে, বার কয়েক চোখের পাতা খুললে, তার পর আর সে শক্তি রইল না—দৃষ্টি আর খুললে না। নাকের নিশ্বাস তখন ভারী হয়ে এসেছে।

গোপেনের ঘুম কিন্তু এল না। পায়ে গুলী লেগেছে সেই যন্ত্রণা তাকে জেগে থাকতে সাহায্য করছে। ক্রমাগত বিড়ি টানছে আর বসে আছে পথের দিকে তাকিয়ে। নেবুর অন্তর্দ্ধান সম্পর্কে ক্রমশঃ তার অন্য রকম ধারণা হচ্ছে। শান্তি বলেছে—নেবু, দেবা ট্যাবাকে খুঁজতে বেরিয়ে ফেরেনি। গোপেনের মনে হচ্ছে—নেবু নিশ্চয় কারও সঙ্গে ঘর থেকে চলে গিয়েছে। সন্দেহ হয়েছিল এ-বাড়ীর কানুটার উপর। কিন্তু কানুটা ফিরে এল। তার সাজ-পোষাক-চেহারা দেখে গোপেন বুঝতে পারলে—নেবুকে নিয়ে বিলাস-ব্যভিচার করতে যাওয়ার মত পোষাকও তার নয়—চেহারাও তার নয়। কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্য্যন্ত আজ দু দিন সে ঘুরছে—আজ সে দেখলেই বুঝতে পারছে—এর বুকে এই মাতন লেগেছে কি না? গাজনের ভক্তদের রুক্ষ চুল, শুকনো মুখ, গলার উত্তরী, হাতের বেত, গেরুয়া কাপড় কপালে রক্তচন্দনের ছাপ দেখে যেমন চিনতে ভুল হয় না—তেমনি কানুর সর্ব্বাঙ্গেও সে এই গাজনের ভক্তসাজের ছাপ দেখতে পেয়েছে। তবে? মনে হল—নেবু হয় তো দেবা ট্যাবাকেই দেখতে বেরিয়েছিল—অন্ধকার জনবিরল পথে দুষ্ট লোকের দল কিশোরী মেয়ে দেখে ধরে নিয়ে গিয়েছে। বুকের ভিতরটা তার হু হু করছে। পায়ের যন্ত্রণায় সর্ব্বাঙ্গের স্নায়ু-শিরায় বেদনা সঞ্চারিত হচ্ছে। অসহনীয় ক্ষোভে-আক্রোশে মাঝে মাঝে জানোয়ারের মত চীৎকার করে উঠছে সে—আ—। সুদীর্ঘ উচ্চারণে আক্ষেপ-আক্রোশ-ভরা—আ—অথবা—হা—, ঠিক বুঝা যায় না। তার পর ফেলছে সে একটা সশব্দে দীর্ঘনিশ্বাস—হু—। কাল সে বার হবে আবার—একটা ছোরা চাই। প্রচণ্ড অনুশোচনা হয় সঙ্গে সঙ্গে। রিভলভারটা হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়ে এল সে।

মনে পড়ে যায় মেয়েটিকে আর ছেলেটিকে। নেবু চলে যাওয়ার লজ্জাজনক এবং ক্ষোভজনক স্মৃতির মতই ওই মেয়েটি এবং ছেলেটির স্মৃতি তার কাছে অবিস্মরণীয়। অদ্ভুত মেয়ে—অদ্ভুত ছেলে। গল্পের ছেলে-মেয়ে যেন। অথচ মনে হচ্ছে চেনা মুখ, অত্যন্ত চেনা মুখ। কোথায় দেখেছে ঠিক করতে পারছে না, কিন্তু নিশ্চয় দেখেছে বহুবার দেখেছে। সিনেমার সামনে কি এসপ্ল্যানেডে কি গোলদীঘির ধারে সিনেট হাউসের সিঁড়িতে বা সামনে কি কফি হাউসের দরজায় কি ট্রামে বা বাসে এক সিটে পাশাপাশি এদের দেখেছে। ছেলেটির মুখে সিগারেট, চকচকে ব্যাকব্রাশ করা চুল, পরনে শান্তিপুরে ধুতি—পাঞ্জাবী অথবা পেন্টালুন হাফসার্ট কাবলী স্যাণ্ডেল অথবা পাজামা কামিজ জহর-কোট ছিল; মেয়েটির পরনে দামী রঙীন অথবা সাদা তাঁতের শাড়ী—রেশমী ব্লাউস—হিলতোলা জুতো ছিল—সামনেটা ফাঁপিয়ে চুলের পারিপাট্য, পিঠের দিকে বেণী অথবা ঢলঢলে আলগা খোঁপা কি এলো খোঁপা; মুখে পাউডার, কাঁধে ঝুলানো চামড়ার ব্যাগ, দু-এক সময় বেঁটে ছাতাও যেন থাকে। হাসিতে কৌতুকে ফেটে পড়তে দেখেছে কি গল্পগুজবে মত্ত দেখেছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ার, শ্রদ্ধানন্দ পার্ক দেশবন্ধু পার্কের মিটিংয়েও এদের দেখেছে। উস্কোখুস্কো চুল—আধময়লা পোষাক—হাতে ঝাণ্ডা। হঠাৎ মনে হ'ল, ডকের মজদুরদের মধ্যেও এদের ঘুরতে দেখেছে। ঠিক ঠাওর হচ্ছে না—কিন্তু বহুবার সে এদের দেখেছে। হঠাৎ মনে হ'ল—খিদিরপুর থেকে কালীঘাট হয়ে আসবার সময় বড় জেলখানাটার ফটকের ধারে এদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে; ফুলের মালা হাতে নিয়ে কারুর জন্যে দাঁড়িয়েছিল কি ওরাই ফুলের মালা গলায় দিয়ে দাঁড়িয়েছিল—ঠিক মনে পড়ছে না তার। অত্যন্ত তিক্ত মনোভাব পোষণ করতো সে এতদিন এদের সম্পর্কে; ছেলেটিকে বলত—নটবর, মেয়েটিকে বলত—বিরহিণী। আজ কিন্তু সব ধারণা পাল্টে গেল তার। যাদের মনে করত ছাই—তাদের ছুঁয়ে বুঝতে পেরেছে—ছাইয়ের তলায় গনগনে আগুন ধ্বক-ধ্বক করছে।

ভবানীপুরে জগুবাজারে ওদের সঙ্গে দেখা।

আজ সকালে পাড়ায় লোকের হায় হায় শব্দ শুনে ঘুম ভেঙ্গে উঠেছিল গোপেন, বাড়ীতে ছোট বাচ্ছা দুটো ছাড়া কেউ ছিল না। ঘরে ছিল শেকল লাগানো। খুলে দিলে এক জন পড়শী। তারই কাছেই শুনলে শ্যামবাজারের পাঁচমাথায় গুলী চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে দিতে দিতেই বেরিয়ে পড়েছিল।

শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট। মঙ্গলবার রাত্রে সে কালীঘাটের ট্রাম-ডিপোর আগুন দেখে মাথায় ঢেলা খেয়ে বাড়ী ফিরেছিল। সেই থেকে কালীঘাট তাকে টানছিল। ভবানীপুরে জগুবাজারে এসে সে থমকে দাঁড়াল। রাস্তায় ব্যারিকেড। ফুটপাথে একটা রাস্তার জংশনে চার মাথায় মানুষ জমেছে। থমকে দাঁড়াল গোপেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই চোখে পড়ল এখানে-ওখানে শিখের দল। বাচ্চার দল। ঢেলা হাতে তৈরী। একখানা লরী পুড়ে গিয়েছে—এখনও অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে; গুর্খা-পুলিশ কয়েক বার কাঁদুনে গ্যাস ছেড়ে গিয়েছে। একবার লাঠিও চালিয়েছে। গোপেন মনে মনে খুসী হয়ে উঠল। আর না এগিয়ে এইখানেই ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। সর্ব্বপ্রথম সে সংগ্রহ করে নিলে একটা পোড়া লরী ভাঙ্গা লোহার মজবুত ডাণ্ডা। এরই মধ্যে গোপেন ছেলেটিকে দেখলে। এক সময় গোপেন চীৎকার করছিল পাগলের মত। হঠাৎ তার পাশে এসে দাঁড়াল ছেলেটি, বললে—এ রকম চীৎকার করে না। ডিসিপ্লিন না হলে কাজ হয় না। স্থির হয়ে থাকুন।

মুখের দিকে চেয়ে দেখলে গোপেন, বিরক্তি ছিল না ছেলেটির মুখে, হাসিমুখেই কথাগুলি বললে সে।

দুটোর পর আসর জমে উঠল। লোক জমল বেশী। শীতের দিনে শীত কেটে গরম হয়ে উঠেছে আবহাওয়া। ঝাঁকে ঝাঁকে ইট পড়তে লাগল। পুলিশের লরী আসে কিন্তু ঐ ইটের মধ্যে দাঁড়াতে পারে না, দ্রুত ফিরে যায়। গুলী চলল একবার। লাগল দু জনকে। আঘাত সামান্য। তাদের উঠিয়ে নিয়ে গেল আম্বুলেন্স। আবার খানিকটা যেন ঠাণ্ডা পড়ে গেল। আর পুলিশ মিলিটারীর লরী আসছে না। গোপেন চঞ্চল হয়ে পড়ল এবার। গোপেনের পেট জ্বলছে। সকাল থেকে পেটে দানা পড়ে নাই, পকেটে মাত্র দু আনা পয়সা। লোহার ডাণ্ডাটা হাতে নিয়ে গোপেন গলি-গলি খানিকটা গিয়ে ভিতরের দিকের কোন রাস্তার ধারের চায়ের দোকান খুঁজছিল। আর খুঁজছিল চানার দোকান অথবা তেলেভাজার দোকান। দেশী চপ দেশী কাটলেট আলুর বড়া আর বেগুনী। হঠাৎ নজরে পড়ল একটা সরু গলির মোড়ে ছেলেটি কথা বলছে মেয়েটির সঙ্গে। একটা কিছু গভীর আলোচনা চলছে, কৌতুক নয়—হাসি নয়। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় গোপেন সম্ভ্রম প্রকাশ না করে পারলে না। হঠাৎ মেয়েটি ওকে ডেকে বললে—শুনুন।

—আমাকে বলছেন? গোপেন চমকে উঠে ফিরে দাঁড়াল।

—হ্যাঁ। মাথায় আপনার রক্ত পড়ছে, কিসে লাগল? ঢেলা?

সলজ্জ ভাবে হেসে গোপেন বললে—ওটা কাল লেগেছে ট্রামডিপো পোড়ানোর সময়। ব্যাণ্ডেজটা খুলে গিয়েছে। কারও হাতের কনুয়ের ধাক্কা লেগে গেল এখুনি।

—না—না। ওটা বেঁধে ফেলা উচিত। এক কাজ করুন আপনি—

হঠাৎ রসারোডের উপর থেকে ভেসে এল জনতার চাপা গর্জ্জন। লরীর শব্দ, পিস্তলের গুলীর আওয়াজ। জনতা সরে আসছে—গলির ভিতর লুকিয়ে পড়ছে। ছুটে এল একটা ছেলে।

—একজন পড়ে গেছে গুলী খেয়ে। সার্জ্জেণ্টরা নেমেছে রাস্তায়।

ছেলেটি দ্রুতপদে এগিয়ে চলে গেল—রাস্তার দিকে।

মেয়েটি পিছন থেকে বললে—একটু কেয়ারফুলি!

ছেলেটি এবার একবার পিছন ফিরে একটু হাসলে শুধু। বললে—তুমি এস না কিন্তু। ওগুলোর ব্যবস্থা করে ফেল গিয়ে।

তবু মেয়েটি দু-চার পা এগিয়ে গেল, তার পর দাঁড়াল। গোপেনও বড় রাস্তার দিকে ফিরল। মেয়েটি বারণ করলে—না। যাবেন না এখন। দেখছেন না—লোকে পিছিয়ে গলির মধ্যে ঢুকছে? তা ছাড়া আপনার মাথায় জামায় রক্তের দাগ দেখলে এখুনি গুলী করবে! এ কি? তার কথাকে ঢেকে দিয়ে তাদের চকিত করে তুলে একটা পিস্তলের আওয়াজ উঠল; মেয়েটি বললে—এ কি?

ঠিক এই মুহূর্ত্তটিতে—একটু আগে—অত্যন্ত কাছে গুলীর শব্দ। বাঁ পাশের একটা ছোট রাস্তা থেকে বিদ্যুদ্বেগে ছুটে মোড় ফিরল একটা বারো-চৌদ্দ বছরের ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে কঠিন শব্দ তুলে একটা গুলী গিয়ে লাগল রাস্তাটার ওপারের একটা বাড়ীর দেওয়ালে—খানিকটা চূণ-বালি-ইট খসে গেল। ভারী জুতোর দৌড়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে। খুব বেঁচে গিয়েছে ছেলেটা। মেয়েটি গোপেনকে বললে—লুকিয়ে পড়ুন। ছেলেটাকে ডাকলে—আমার পিছনে বাঁ পাশের গলিতে।

গোপেন ঢুকে পড়ল সরু গলিটার মধ্যে; বাঁ পাশে দুটো বাড়ীর মধ্যে একফালি অন্ধকার জায়গা—সেইখানে সে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে রইল। মুহূর্ত্তে গলির ভিতর ঢুকে গেল পলাতক ছেলেটা। তার পিছনে পিছনে ধীর-পদক্ষেপে এসে দাঁড়াল মেয়েটি। গলির সামনে দ্রুত এগিয়ে এল ভারী বুটের আওয়াজ। এবার মেয়েটি ঢুকল গলির ভিতর। বুটের আওয়াজের মালিককে এবার দেখতে পেলে গোপেন। একজন সার্জ্জেণ্ট—হাতে রিভলভার। মেয়েটি গোপেনকে অতিক্রম করে গলির ভিতরে চলে যাচ্ছে—তেমনি মন্থর পদক্ষেপে, পিছন ফিরেও তাকাচ্ছে না। বুঝতে পারলে গোপেন—ছেলেটাকে পিছনের রিভলভারের নলের মুখ থেকে আড়াল করে চলেছে ও। অদ্ভুত বুদ্ধি—অদ্ভুত সাহস! বিস্মিত হয়ে গেল গোপেন। মেয়েদেরও ওরা যে রেয়াৎ করছে না—গোপেন আজই চোখে দেখে এসেছে পথে। আসবার সময় কলকাতা মেডিকেল ইস্কুলের হাসপাতালে ব্যাটনের আঘাতে আহত একটি ষোল-সতের বছরের মেয়েকে নিয়ে আসতে দেখেছে। এই এমনি ধরণের মেয়ে—এই জাত। তার নাম উষারাণী বসু! তাকে ভর্ত্তি করবার সমস্ত সময়টা সে সেইখানে ছিল। নামটা সে শুনেছে—মুখস্থ করে ফেলেছে। এ মেয়েটিও নিশ্চয় তা জানে। তবু পিঠের কাছে রিভলভারের নল নিয়ে—ছেলেটাকে বাঁচিয়ে চলেছে নিভয়ে। একবার ফিরেও তাকাচ্ছে না।

—ষ্টপ। Stop—এবার চীৎকার করে উঠল সার্জ্জেণ্টটা।

মেয়েটি কিন্তু দাঁড়াল না।

—ইউ আর আণ্ডার এ্যারেষ্ট, ইউ—ষ্টপ—। আই সে—

মেয়েটি তবু দাঁড়াল না। কথা যেন কানেই যাচ্ছে না ওর।

—এবার আমি তোমাকে গুলী করব—নইলে দাঁড়াও। চীৎকার করে উঠল সার্জ্জেণ্টটা। এবার গোপেনের রক্ত টগবগ ক'রে ফুটে উঠল। সে আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না, লোহার ডাণ্ডাটা শক্ত মুঠোয় ধরে সে গর্জ্জন করে বেরিয়ে এল আড়াল থেকে, ঠিক সার্জ্জেণ্টটার পিছনে। চকিত হয়ে সার্জ্জেণ্টটা গোপেনের দিকে

ফিরতে চেষ্টা করতেই সে তার ওই ডান কাঁধেই বসিয়ে দিল লোহার ডাণ্ডার আঘাত। অত্যন্ত শক্ত আঘাত। লোকটা পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে হাতের রিভলভারটাও হাত থেকে খসে মাটিতে ঠুকে পড়ে গেল গলির উপর। মুহূর্ত্তে আওয়াজ হয়ে গেল, গুলীটা গোপেনের পায়ের ডিমের অল্প একটু মাংস ভেদ করে চলে গেল। গোপেনের সর্ব্বাঙ্গে একটা যন্ত্রণার বিদ্যুৎ-প্রবাহ বয়ে গেল। অদ্ভুত মেয়ে, সে গোপেনের হাত ধরে টেনে গলির মধ্যে ঢুকে—এঁকে-বেঁকে বেরিয়ে গেল আর একটা রাস্তায়। আবার গলি-গলি আর একটা রাস্তায়। তার পর একটা বাড়ীতে। সম্ভবতঃ এদের সেটা আড্ডা। আরও কয়েক জন সেখানে বসেছিল, তারাই ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলে। কিছুক্ষণ পর সেখানে এল ছেলেটি। খবর নিয়ে এল—একজন গুলী খেয়েছে,—বরেন্দ্রকুমার দত্ত তার নাম। বাইশ বছরের জোয়ান ছেলে। সেইখানেই সে শুনলে—গত কাল সার্কুলার রোডের মোড়ে একটি বারো-চৌদ্দ বছরের ছেলে গুলী খেয়েছিল—বেয়নেটের খোঁচা খেয়েছিল; কালই মারা গেছে হাসপাতালে; নাম দেবব্রত। মরবার আগে সে এক গ্লাস জল চেয়েছিল। হাসপাতালের নার্স তার অবস্থা দেখে চোখের জল সম্বরণ করতে পারে নাই, কাঁদতে কাঁদতে সে জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়েছিল। ছেলেটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—কাঁদছ কেন? আমি দেশের স্বাধীনতার জন্য মরছি। এ মরণ তো ভাগ্যের মরণ! আমার দেশ—আমার দেশ স্বাধীন হোক!

গোপেন বার বার সেই কাহিনী স্মরণ করছে।

নেবু যেন গুলী খেয়ে মরে গিয়ে থাকে। গোপেনের মত বাপের ঘরের দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি নিতে সে যেন দেশের জন্য মরে—দেশের পথের উপর পড়ে থাকে।

সকাল হয়ে আসছে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি বার। গোপেন উঠে দাঁড়াল। মরা নেবুর সন্ধানে যেতে হবে। কিন্তু এ কি—মাটী টলছে—সব ঘুরছে যে! গোপেন আকড়ে ধরবার চেষ্টা করল দেওয়ালটা কিন্তু কই, কোথায় দেওয়াল? সে পড়ে গেল উপুড় হয়ে।

* * * *

কানু সেই দরজার মুখে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। শীতের শেষ রাত্রির ঠাণ্ডায় পথের কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে একটা কাতর সরীসৃপের মত পড়েছিল। গাঢ় ঘুম নয়, অবসন্নতার তন্দ্রাচ্ছন্নতা, তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যেও নেবুর জন্য চিন্তা তার মস্তিষ্কের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল; বুকের মধ্যে উদ্বেগও তাকে পীড়িত করছিল—অবসন্ন তন্দ্রাচ্ছন্ন রোগীর রোগযন্ত্রণার মত। ভোর বেলাতেই তার তন্দ্রা ভেঙে গেল; ঠিকের ঝি পাড়াতে অতি নিকটেই থাকে, কাজের বাড়ীর কাজ তারা সর্ব্বাগ্রে সেরে দিয়ে যায়; সেই ঠিকের ঝিয়ের চীৎকারে তার তন্দ্রা ভেঙে গেল। এমনি ভাবে দরজার গোড়ায় কানুকে পড়ে থাকতে দেখে সে আঁতকে চীৎকার করে উঠেছিল। কলকাতা শহর—এখানে মানুষের প্রাণের চেয়ে আর সস্তা কি? তার উপর এই খুনোখুনির দিনের কলকাতা—১৯৪৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী। গত তিন দিনে মানুষ মরেছে—গুলী খেয়ে জখম হয়েছে—এ ছাড়া খবর নাই। রকমারি গুজবে কলকাতার আকাশ-বাতাস ভরে রয়েছে। কানুকে এই ভাবে পড়ে থাকতে দেখে ঝি বেচারী ভেবেছিল—কেউ হয়তো কানুকে খুন করে গিয়েছে; হয়তো রাস্তাতেই গুলী খেয়ে মরেছিল ছেলেটা,—লোকজনে রাত্রে লাসটা এনে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। চীৎকার ক'রে কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে। চীৎকারে তন্দ্রাচ্ছন্ন কানু চমকে উঠল—নারীকণ্ঠের চীৎকার—মুহূর্ত্তে তন্দ্রাচ্ছন্ন মস্তিষ্কের মধ্যে অর্দ্ধসুপ্ত নেবুর কণ্ঠস্বরের স্মৃতিকে জাগ্রত করে দিলে। মস্তিষ্কের স্নায়ুজালের মধ্যে উত্তেজনার শিহরণ ব'য়ে গেল; শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ দ্রুতগতিতে বইতে আরম্ভ করলে। নেবু! নেবু! বিদ্যুৎ-প্রবাহ-সঞ্চারিতের মত সে উঠে বসল।

বাড়ীর ভিতর থেকে কানুর মা সাড়া দিলেন—কে গো? কি? তিনিও উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছেন কানুর জন্য। তবে কানু এমন অনেক দিন অনুপস্থিত থাকে রাত্রে। বারোয়ারী পূজোয় সে ভলেন্টিয়ারী করে—রাত্রে ফেরে না। সরস্বতী পূজোর তো কথাই নাই। কয়েক দিন ধরেই তার দেখা মেলে না। শিব-চতুর্দ্দশীতে সারারাত্রিব্যাপী সিনেমা শোতে আটটায় গিয়ে সকালে ফেরে। মধ্যে মধ্যে পিকনিকে যায়—সকালে গিয়ে ফেরে রাত্রি বারোটায়—কখনও কখনও ফেরে তার পরদিন। আবার কখনও রোগীর সেবা করতেও যায়। সারা রাত্রি জেগে সকালে ক্লান্ত দেহে বাড়ী ফিরে। বলে—কি করব? সেবা করবার লোক নেই। পথে শুনলাম দেখতে গিয়ে আর ফেরা হ'ল না। মোট কথা, কানু যদি রাত্রে না ফেরে তবে ভাবনা-চিন্তা না করাটাই কানুর মায়ের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। ফিরতে দেরী হলে খাবার ঢাকা দিয়ে তাঁরা শুয়ে পড়েন, কানুর ডাক শুনবার জন্য উৎকণ্ঠা পোষণ না ক'রেই ঘুমোন, ডাকলে দরজা খুলে দেন, না-ডাকলে ঘুম ভাঙে যথানিয়মে সকালে, তখন মনে মনে কঠিন তিরস্কার করবার সংকল্প করেন, কঠিন কথাও অনেক ভেবে রাখেন মনে মনে কিন্তু কানু ফিরলে আর কোন কথাই ওঠে না; সহজ ভাবেই তাকে গ্রহণ করেন। এ সব সত্ত্বেও গত রাত্রে কানুর মা উৎকণ্ঠিত না হয়ে পারেন নাই। কয়েক বারই তাঁর ঘুম ভেঙেছে। আজ ভোরে তাই ঘুম ভাঙতে কয়েক মিনিট বিলম্ব হয়েছিল। ঝিয়ের চীৎকারে—ঘুম ভেঙে কানুর মা প্রশ্ন করলে—কি গো? কি?

—আমি মা। দাদাবাবু দোর-গোড়ায় শুয়ে রয়েছে। আমি মা—ভয়ে বাঁচি না।

—কে কানু?

—হ্যাঁ গো। ঝগড়া হয়েছে বুঝি? ওই—ওই—ও দাদাবাবু—চললে কোথা গো?

কানুর মা দ্রুতপদে এসে—দরজা খুলে বেরিয়ে এসে ডাকলেন—কানু—কানু! আবার যাচ্ছিস্ কোথায়?

—আসছি! রূঢ় কঠিন কণ্ঠস্বরে উত্তর দিয়ে কানু বেরিয়ে চলে গেল।

নেবুর সন্ধান করতেই হবে।

রাস্তার মোড়ে রাইফেল নিয়ে ঘুরছে বৃটিশ টমি। সিগারেট ফুঁকছে। বড় বাড়ীটার বারান্দায় বুক দিয়ে ঝুঁকে—দশ-বারো জন চেয়ে রয়েছে রাস্তার দিকে। কানুর মনে হল—ঘৃণা-ভরা আক্রোশ ফুটে রয়েছে ওদের নীলাভ চোখে। এইবার সে দাঁড়ালে—তার পর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে আবার চলতে আরম্ভ করলে। বিমল—নরেন এদের ডাকতে হবে। সকলে যাবে। পাতি-পাতি ক'রে খুঁজে যেখান থেকে হোক বার করবে নেবুকে।

পাঁচ-মাথার মোড়ে গোলাকৃতি জায়গায় গুর্খা-পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। কানুর মাথার ভিতরটা ক্ষোভে রাগে কেমন হয়ে উঠল। নির্য্যাতিত ঘোড়া যেমন অকস্মাৎ বিদ্রোহে রাশ-যুতি টান মেরে ছিঁড়ে গাড়ীর সঙ্গে সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে লাফ দিয়ে উন্মত্ত বেগে ছুটে চলে সামনের সকল কিছুকে মাড়িয়ে—ধাক্কা দিয়ে—তেমনি বিদ্রোহ জেগে উঠছে যেন ওর উত্তপ্ত মস্তিষ্কের মধ্যে উদ্বেগ-পীড়িত মনের মধ্যে।—শালা! থমকে দাঁড়াল কানু! বিড়-বিড় ক'রে গাল দিচ্ছে আপনার মনে।

সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ হয়ে—নিউ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট ধরে একখানা গাড়ী এল। কংগ্রেস-লীগ ঝাণ্ডা পাশাপাশি বাঁধা। মাইক্রোফোন এবং লাউডস্পীকার লাগানো। ঘোষণার শব্দ অনেকটা দূর থেকেই শোনা গেল। কানু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। গাড়ীতে দুজন লোক—এক জন হিন্দু এক জন মুসলমান—সামনে ড্রাইভার এবং আর এক জন। শহরে ১৪৪ ধারা জারী হয়েছে। চার জনের বেশী একসঙ্গে থাকলে বে-আইনী হবে। এগিয়ে এল গাড়ীখানা।

"কংগ্রেস এবং লীগের কর্ত্তৃপক্ষ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছেন—আপনারা এই ধরণের উন্মত্ততা থেকে ক্ষান্ত হোন। এতে আমাদের ভাবী বৃহত্তর সংগ্রামের পক্ষে ক্ষতিই হচ্ছে। বৃহত্তর সংগ্রাম আসছে। আপনারা রাস্তার ধারে সমবেত হয়ে জনতার সৃষ্টি করবেন না। কোন প্রকার হিংসাত্মক কাজ করবেন না, কাউকে করতে দেখলে তাকে বারণ করবেন—নিবৃত্ত করবেন তাকে।"

গাড়ী চলে গেল।

কানু ব'সে পড়ল একটা দোকানের সিঁড়ির উপর। হতাশার অবসাদে সে যেন এক মুহূর্ত্তে ভেঙে পড়ল। চারি পাশে ফুটপাথ আজ প্রায় জনশূন্য। হঠাৎ সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সামনে প্রশস্ত রাজপথে আজ কয়েক দিন ঝাড়ু পড়ে নাই—ধুলোয় আবর্জ্জনায় পথটা সমাকীর্ণ হয়ে রয়েছে। শীতের সকালে উত্তরের বাতাসে খড়-কুটো ঝরাপাতাগুলো থরথর করে কাঁপছে, ধুলো উড়ছে মধ্যে মধ্যে।

হঠাৎ এক দল লরী এসে পড়ল গর্জ্জন করে। এক সারি মিলিটারী লরী। আর্মার্ড কার। ইস্পাতের ঘরের মত গাড়ীর বডির ছাদে একটা গোল গর্ত্ত থেকে এক এক জন ইংরেজ সৈনিক টমিগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম গাড়ীখানার ড্রাইভারের পাশে এক জন বড় একখানা শহরের ম্যাপ খুলে বসে আছে। তারই নির্দ্দেশ মত গাড়ীর সারি চলছে। মোড়ের মাথায় এসে তিন ভাগ হয়ে গেল গাড়ীর সারি। এক ভাগ চলে গেল সার্কুলার রোড ধরে, এক ভাগ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হয়ে গ্রে ষ্ট্রীট হয়ে গিয়ে পড়বে সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউয়ে। এক ভাগ চলে গেল নিউ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট ধরে। ধীর-মন্থর গতিতে চলেছে। চারি দিকে সতর্ক সদর্প দৃষ্টিতে চেয়ে চলেছে।

কানুর দৃষ্টিতেও দেখতে দেখতে ভয়ের অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। পা দুটো যেন কাঁপছে। অনেকক্ষণ সে চুপ ক'রে বসে রইল। তার পর ধীরে ধীরে উঠল। বাড়ী ফিরতেই ইচ্ছে হচ্ছিল—কিন্তু তা সে পারলে না। নেবু! নেবুর খোঁজ তাকে করতেই হবে। চলল সে মাণিকতলার দিকে।

* * * *

কই নেবু? কোথায় নেবু!

রাত্রের অন্ধকারে দেখা—তবু চিনতে পারলে কানু। হ্যাঁ সেই। কানুর মতই অস্থির হয়ে ফিরছে। ভয়—নিষেধ তার জীবনের গতিবেগের পথে অবরোধের সৃষ্টি করেছে—সেখানে ধাক্কা খেয়ে চারি পাশে ঘুরে ঘুরে—গতিবেগকে ক্লান্ত ক'রে নিচ্ছে। ঠিক চিনলে কানু। কাল রাত্রে নেবুকেই এই ছোকরা বলেছিল—"লালবাজারমে হিন্দু-মুসলীম এক হো গেয়া পাইজী।" কানু তার হাত ধরলে।—'কাল রাত্রে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে ঢেলা ছুড়েছি আমি, চিনতে পারছ?'

চমকে উঠল ছোকরা,—কে তুমি?—চোখের দৃষ্টিতে চকিতে পর পর ফুটে উঠল—ভয়—অবিশ্বাস—হিংস্র আক্রমণোদ্যোগ। কিন্তু কানুর হাতের স্পর্শের মধ্যে চেপে ধরে আয়ত্ত করবার চেষ্টা ছিল না—বরং ছিল শিথিল ভঙ্গির মধ্যে মিনতির স্পষ্ট প্রকাশ। নইলে হয়তো কিছু ঘটে যেত।

কানু বললে—আমার সঙ্গে সেই শিখের ছেলেটি ছিল। যাকে তুমি বললে—পাইজী, লালবাজারমে হিন্দু-মুসলীম এক হো গেয়া।

সে স্থিরদৃষ্টিতে কানুর দিকে চেয়ে বললে—ঝুট বাত! শিখের ছেলে?

—শিখের ছেলে নয়, সে মেয়েছেলে। বল সে কোথায়? কাল রাত্রে এখান থেকেই আর তাকে পাইনি। বল—!

—নাম কি তোমার?

—কানু। কানাইলাল বোস।

একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে সে বললে—তোমার নাম করেছিল সে। একবার হেসে হয়েছিল। মরবার ঘণ্টা খানেক আগে?

— নবু—? নেবু নাই? ম'রে গিয়েছে?

—পেটে গুলী লেগেছিল।

—কিন্তু—মরা-নেবু কই? কোথায়?

—দেখবে। কিন্তু সে এখন নয়। সন্ধ্যের পর।

রাত্রি দশটারও পর ইসমাইল তাকে দেখাতে নিয়ে গেল নেবুর মৃত-দেহ। দশটার পর কানুকে সঙ্গে নিয়ে খালের ধারের দিকে চলল। সমস্তটা দিন কানু ইসমাইলের সঙ্গ ছাড়লে না, ইসমাইলই তাকে খাওয়ালে। অন্ধকার খালের ধারে একটা নির্জ্জন স্থানে এসে—দেখে—ঠাওর ক'রে একটা গাছের তলায় দাঁড়াল। বললে—দোস্ত, বিশ্বাস করো আমার কথা—খোদাতায়লার নাম নিয়ে আল্লা রসুলের নাম নিয়ে তোমাকে বলছি—সে ঠিক এই গাছটার সামনে বরাবর খালের জলের মাঝখানে আছে।

কানু তার হাত ধ'রে বললে—কি বলছ তুমি? ওইখানে ফেলে দিয়েছ?

—হ্যাঁ। কি করব? অজানা অচেনা তার উপর মেয়েছেলে। কবর দিতে গেলে—সেখানে ডাক্তারের সার্টিফিট চাই সনাক্ত চাই—নাম লেখাতে হবে। একা তোমাদেরই ওই মেয়ে নয়—আমাদেরও এক জনকে ওখানে দিতে হয়েছে। ফেরারী আসামী ছিল সে।

কানু তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। অন্ধকারের মধ্যেও ইসমাইল অনুভব করলে সে কথা। সে বললে—সমঝ করো ভাই। আমার বাত বিশ্বাস করো।

কানু হঠাৎ নামতে লাগল—খালের পাড় ভেঙে জলের দিকে অগ্রসর হল। ইসমাইল তার হাত চেপে ধরলে—বললে—না।

—ছাড়। আমি দেখব।

—না। আমিও দিনের বেলা ভেবেছিলাম—আমিই জলে নেমে তুলে তোমাকে দেখাব। কিন্তু সে হয় না। খালে ছোট ষ্টিমার চলে—কত জল জানি না। সে হয় না। আমি ঝুট বলি নাই তোমাকে। আমার ইমানদারিতে তুমি বিশ্বাস করো। এস, ফিরে এসো।

কানু হঠাৎ ইসলামের মুখের উপর হাত দিলে। গরম জলের স্পর্শ লাগল তার এই শীতের রাত্রের কনকনে হাওয়ায় ঠাণ্ডা আঙুলের ডগায়। কিছুক্ষণ দুজনেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তার পর হঠাৎ কানু বললে—চল।

কলকাতার প্রান্তসীমায় খালের ধারের ধূলায় আচ্ছন্ন পথ, মাথার উপরে দু'পাশে বড় বড় গাছের আচ্ছাদন,—গ্যাস-লাইটগুলোর অধিকাংশই জ্বলছে না; ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের উন্মত্ত কলকাতার পথে, বিশেষ ক'রে এই জনবিরল পথে আলো জ্বালবার জন্য কর্পোরেশনের উড়িয়া শ্রমিকেরা আসে নাই; বিদ্রোহের উত্তাপ তাদের বুকেও লেগেছে—সেই উত্তাপে তাদের মনও আজ দৈনন্দিন কর্ম্মের দিকে নাই; বিদ্রোহের উত্তাপের সঙ্গে ভয়ও আছে—এই দুই বিপরীতধর্ম্মী ভাব মিশ্রণের ফলে তারা মাত্র খালের উপর ব্রিজগুলির ধারে আলো জ্বেলে দিয়ে এ পথে আর অগ্রসর হয় নাই—আপন-আপন আড্ডায় ফিরে গিয়ে এই হত্যাকাণ্ডের উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা করছে। এতক্ষণ হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। বড় বড় গাছে ছাওয়া আলোক-হীন অন্ধকার পথ। তারই মধ্যে দিয়ে দুটি অল্পবয়সী চলে চলেছে। ধূলার অনেক নীচে পাথরে বাঁধানো রাস্তার অস্তিত্ব—সেই পথের উপরের তাদের পায়ের শব্দ তারা শুনতে পাচ্ছে। রাস্তায় জনমানব নাই। ব্রিজের মোড়ে মোড়ে যে পুলিশ পাহারা থাকে—তাও নাই। আজ তিন দিন বিদ্রোহী কলকাতার শক্তির কাছে পুলিশ-শক্তি পরাভব মেনে পিছু হটেছে। অনেকে বিজ্ঞাপনে সন্দেহ করেন—দেশীয় পুলিশের মনও আজ বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহানুভূতি-সম্পন্ন। কেন হবে না? তারাও তো এই দেশেরই মানুষ। সেই জন্যেই তাদের সরিয়ে কর্তৃপক্ষ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জ্জেণ্ট, গুর্খা-পুলিশ এবং গোরা পল্টনের হাতে ছেড়ে দিয়েছে বিদ্রোহ-দমনে শক্তি প্রয়োগের অধিকার। তাদেরও কিন্তু এই অন্ধকার জনহীন খালের ধারের দিকে আসবার সাহস নাই। বড় রাস্তা ছাড়া কোন গলির মধ্যে তারা ঢোকে না। পিস্তল হাতে নিয়েও না; মানুষ আজ যেখানে মরতে ভয় পায় না, সেখানে পিস্তলের দাম কমে গিয়েছে এবং মানুষ সংবদ্ধ হওয়ায় তাদের শক্তির মূল্য বেড়েছে। যেখানেই অস্ত্রের অহঙ্কারে পুলিশ গলির মধ্যে ঢুকেছে সেখানেই অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে, হয় পালিয়ে আসতে হয়েছে অথবা নির্য্যাতিত হতে হয়েছে। মার খেয়েছে—টুপি কেড়ে নিয়েছে—পোষাক ছিঁড়ে দিয়েছে। একটি সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে যে লেক অঞ্চলে টহল দিতে গিয়ে দুজন সার্জ্জেণ্ট ফিরে আসে নাই;—এক দল পুলিশ তাদের অনুসন্ধান করেও কোন সন্ধান পায় নাই এখনও পর্য্যন্ত। সাতাশী জন পুলিশ আহত হয়েছে এই তিন দিনে। আলোকোজ্জ্বল উৎসব-মুখর কলকাতা অন্ধকার শঙ্কায় ক্ষোভে থম-থম করছে। নিজের মনের প্রতিফলনে স্তব্ধ কলকাতার বস্তী থেকে আরম্ভ করে রুদ্ধদ্বার বড় প্রাসাদগুলি অবরুদ্ধ শোকার্ত্ততায় নিষ্ফল ক্ষোভে বিষণ্ণ এবং বাক্যহারা হয়ে ঊর্দ্ধমুখে শূন্যলোকের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজছে বলে মনে হ'ল ইসমাইল এবং কানুর।

বরেণ্য দেশনায়কের সতর্ক বাণী—নিষেধাজ্ঞায়, নিরস্ত্রের উপর আগ্নেয়াস্ত্রের শাসনে মানুষ বল হারিয়ে ফেলছে, অভিভূত হয়ে শিথিল-পক্ষী হয়ে পড়েছে বিদ্রোহ। যে কলকাতা উন্মত্তের মত বিকৃত মুখে রক্ত চক্ষে উদ্ধত মস্তকে শিকল ছিঁড়তে উঠে দাঁড়িয়েছিল, সে এই নিষেধাজ্ঞায়—শাসনের নির্ম্মমতায় নতজানু হয়ে আবার বসে পড়েছে—মাথা নীচু করছে। যে মাথা নীচু সে করেছে মাটির দিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি সে মুখের ছবি স্পষ্ট যেন ভেসে উঠছে কানুর মনে। অন্ধকারের মধ্যে ইসমাইলের মুখে হাত দিয়ে যেমন অনুভব করেছিল উষ্ণ অশ্রুধারার স্পর্শ—তেমনি স্পর্শ কলকাতার নতমুখে হাত দিলেই পাওয়া যাবে।

ইসমাইল হঠাৎ দাঁড়াল —মৎ যাও ভাই। দাঁড়াও।

কানু চকিত হয়ে ইসমাইলের মুখের দিকে চাইলে।

ইসমাইল আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—মোড় পর মিলিটারী। নও জোয়ান দেখনেসেই গোলী চালায়েগা, নেহিতো এ্যারেষ্ট করেগা।

মাণিকতলার মোড়ে গুর্খা-পুলিস এবং কয়েক জন ইংরেজ সৈনিক পাহারা দিচ্ছে। সাধারণের দিক থেকে আক্রমণ আজ আর হয় নাই। আক্রমণোদ্যোগ শিথিল হয়ে পড়েছে।

ঠিক কথা। ইসমাইল ঠিক বলেছে। কানু বললে—আমি গলি-গলি চলে যাচ্ছি।

—আজ এখানেই রহে যাও না ভাই।

—না ভাই। সমস্ত দিনই তো রয়েছি তোমার সঙ্গে। বাড়ীতে ভেবে সারা হয়ে যাবে।

হঠাৎ কানুর মনে পড়ে গেল মায়ের মুখ। দ্রুতপদে সে গলি-পথ ধরবে।

* * *

পনেরোই ফেব্রুয়ারী।

গোপেন উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে বসেছিল বাইরের সেই কালি দেওয়ালটার উপর। গত কাল এক বেলা পুরো সে অজ্ঞান হয়েছিল। দুপুরের পর চেতনা হয়েছে। চেতনা হলেও সে উঠতে পারে নাই, ডাক্তার তাকে উঠতে দেয় নাই। চেষ্টা করবারও অবকাশ হয় নাই তার। বাকী সমস্ত দিনটা এবং রাত্রিটা তার অঘোর ঘুমের মধ্যে কেটে গিয়েছে। গোপেনের অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার শব্দেই শান্তির ঘুম ভেঙেছিল।

নিষ্ঠুর অদৃষ্ট তার দুর্ভাগ্যের—দুর্ভোগের আর অন্ত নাই; হে ভগবান! কিন্তু ভগবানকে ডাকারও সময় ছিল না তার। গোপেনকে ধ'রে তুলতে হবে। সেও কি তার সাধ্য? দেবা ট্যাবাকে ডেকে তাদের সাহায্যেও সম্ভবপর হয় নাই। দুজন ঝি যাচ্ছিল তাদের ডেকে ধরাধরি করে ঘরে তুলে এনেছিল। মুখে-চোখে-মাথায় জল দিয়েও চেতনা হয় নাই। অবশেষে ডাক্তার ডেকেছিল। নেবু খুলে রেখে গিয়েছিল তার কানের দুটো মরা সোনার টাপ, আর রূপোর চুড়ি চার গাছা—তাই বন্ধক দিয়েছে ওই ঝিয়ের বস্তীর জগো মাসীর কাছে। জগো মাসী শোকে অভিভূত

হয়ে কাঁদছিল। তার কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ-করা মেয়ে, গুলী খেয়ে মরেছে কাল। গণেশ টকীর কাছে বাড়ী তাদের—তিন তলার উপরে জানলায় দাঁড়িয়ে চোদ্দ বছরের মেয়েটি কৌতূহলী হয়ে দেখছিল এই সংঘর্ষ। সম্ভবতঃ লক্ষ্যভ্রষ্ট রাইফেলের গুলী গিয়ে লেগেছে তাকে। জগোর ধারণা কিন্তু ইচ্ছে করেই গুলী করেছে। তবু সে শান্তির মুখ দেখে—তার ব্যাকুলতা দেখে টাকা দিয়েছে। টাকা দিয়ে বলেছিল—আর যদি দরকার হয় তবে নেবুকে পাঠিয়ে দিয়ো। জিনিষ না হলেও দোষ।

শান্তির বুক ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হয়েছিল—ওরে নেবু রে! আমার সোনার নেবু রে! কিন্তু নিজেকে সে সংযত করেছিল। কলঙ্ক—দুঃস্বপনের কলঙ্কে দেশ ছেয়ে যাবে। নেবু ফিরে এলে ঘরে তার ঠাঁই হবে না। কথা প্রকাশ পেলে—আফিস পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছিলে—গোপেনের চাকরী যাবে। জগোর কথার কোন উত্তর না দিয়েই সে এক রকম ছুটে পালিয়ে এসেছিল। ডাক্তারের কাছেও সে সত্য কথা বলে নাই। মাথার ঢেলার আঘাত—পায়ে গুলীর ক্ষত দেখে ডাক্তার প্রশ্ন করেছিলেন—কি ক'রে হ'ল? হাঙ্গামার মেতেছিল বুঝি?

—না।

—তবে?

মুহূর্ত্তে শান্তির মাথায় এসে গেল মিথ্যা কথা। সে বললে—খিদিরপুর থেকে ফিরছিলেন—হাঙ্গামার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। এদের ঢেলায় মাথা ফেটেছে, ওদের গুলী পায়ে লেগেছে।

অবিশ্বাসের কিছু নাই। ডাক্তার আর প্রশ্ন করেন নাই। তিনি দয়া করে ভিজিটও নেন নাই। ওষুদের দাম নিয়ে বলে গিয়েছেন—উঠতে দেবে না আজ। উঠতেও পারবে না, তা ছাড়া ঘুমের ওযুদ দিলাম।

জ্ঞান হওয়ার পর—গোপেন জিজ্ঞাসা করেছিল—নেবু?

মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জানিয়েছিল শান্তি—না।

—ফেরেনি?

আবার মাথা নেড়েছিল শান্তি।

স্তব্ধ হয়ে শুয়ে ঘরের খাপরার চালের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে গোপেন ঘুমিয়ে পড়েছিল, নিরতিশয় ক্লান্তিতে অবসাদে, ওযুদের প্রভাবে।

শান্তি উদ্বেগ-আকুল চিত্তে ঘরের দরজাটায় ঠেস দিয়ে বসে সমস্ত দিন কাটিয়েছে। এ-পাশে ঘরের মধ্যে ঘুমন্ত অসুস্থ গোপেন—ও-পাশে পথ, এখান থেকে প্রায় মোড়টা পর্য্যন্ত দেখা যায়।

দেবা আর ট্যাবা বাপের ওই অবস্থা দেখে এবং মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আজ আর মাতনে মত্ত হ'তে যায় নাই। বাইরেও আজ উৎসাহ নাই যেন। দেবা ট্যাবা বার-দুয়েক তবু ঘুরে এসেছে বড় রাস্তার মোড় থেকে। দুপুরেই গিয়েছিল দুবার। একবার একটায় একবার তিনটের। দুপুরে পরিশ্রান্ত শান্তিও ঘুমিয়ে পড়েছিল—গোপেনের অসুখ, নেবুর শোক তাকে জাগিয়ে রাখতে পারেনি। স্নান করে দুটো ভাত মুখে দিতেই সে যেন ঢলে পড়ল ঘুমে।

নেবুর কথা তারা জিজ্ঞাসা করেছিল শান্তিকে। শান্তি তাদেরও সত্য কথা বলে নাই। বলেছে—কাল আমার বাবা এসেছিল দেশ থেকে—নেবুকে তিনি নিয়ে গিয়েছেন সঙ্গে। বর ঠিক করেছেন—বিয়ে দেবেন নেবুর।

—তোমার বাবা? দাদামশায়?

—হ্যাঁ।

দাদামশায় তাদের আছেন বটে। মধ্যে মধ্যে দাদামশায় আছেন এ কথা তারা শোনে। কোন জেলায় কি গাঁয়ে যেন দাদামশায়ের বাড়ী; নদীর ধার, টিনের দেওয়াল, টিনের চাল, সুপুরী-নারকেলের বন সেখানে; কি যেন নাম দাদামশায়ের। হ্যাঁ—হ্যাঁ—নবকৃষ্ণ মিত্র। মহাজনের গদিতে খাতা লেখে।

বিকেল বেলা প্রতিবেশীরা খোঁজ নিয়েছিল নেবুর।

—কেমন আছে তোমার স্বামী? কই নেবুকে দেখছি না?

তাদেরও শান্তি ওই কথা বলেছে। হঠাৎ পাত্র ঠিক করে এসেছেন। কি করব? উনি বাড়ী নেই, দেবা ট্যাবা বাইরে, এক ঘণ্টার বেশী ট্রেনের সময় নাই, নেবুকেই শুধু পাঠিয়ে দিলাম। এর পর আমরা যাব।

তার পর ঘরে খিল দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদেছে। তাও কি নিশ্চিন্তে কেঁদে বুক হাল্কা করার উপায় আছে? গোপেন অঘোরে ঘুমাতে ঘুমাতে মধ্যে মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখেছিল;—শান্তি চোখ মুছে তাকে নাড়া দিয়ে কপালে জল দিয়ে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিয়েছে।

ভোর রাত্রে ঘুম ভেঙেছিল গোপেনের। শান্তি তখন ঘুমুচ্ছিল।

সকালে উঠে গোপেন বলেছিল—পুলিশে খবর দিই, কি বল?

শান্তি বলেছিল—তার পর? তোমার কাণ্ড যখন বেরুবে, দেবা ট্যাবার কাণ্ড যখন বেরুবে—তখন? চাকরী যাবে—হাতে দড়ি পড়বে—তা ছাড়া মেয়েরই যে কি কাণ্ড বার হবে তাই বা কে জানে?

চুপ করে বসে রইল গোপেন—এর কোন জবাব দিতে পারলে না।

শান্তি বললে—আমি পাড়ায় বলেছি, আমার বাবা এসে নেবুকে নিয়ে গিয়েছেন। দেবা ট্যাবাও তাই জানে।

* * *

সেই অবধি স্তব্ধ হয়ে বসে আছে গোপেন। মধ্যে মধ্যে বিড়ি খাচ্ছে। শরীরে এতটুকু শক্তি নাই—বুকের মধ্যে সে উন্মত্ততাও নাই। দেহে আঘাতের জর্জ্জরতা—বুকে নেবুর অবরুদ্ধ শোকের হতাশা। পথে মানুষের জটলার মধ্যেও নিরুৎসাহের প্রভাব।

দেবা ট্যাবা মধ্যে মধ্যে বাইরে যাচ্ছে আবার ফিরে আসছে। ঘরের মধ্যে শান্তি আজ ভগবানকে ডাকছে।—হে ভগবান! এই করলে শেষে তুমি?

বার কয়েক শুনে গোপেন আর সহ্য করতে পারলে না, শান্তির ওই কাতর ভাবে ভগবানকে ডাকার মধ্যে যেন তারই প্রতি মর্ম্মান্তিক তিরস্কার প্রচ্ছন্ন রয়েছে বলে মনে হল—স্পষ্ট ভাবে না হলেও অস্পষ্ট ভাবে সেটা সে অনুভব করলে। তাই সে বলে উঠল—আঃ, ছি-ছি-ছি! চুপ কর, তোমার পায়ে ধরছি আমি।

দেবা ট্যাবাও ক্রমে এই শোকাচ্ছন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কারণ না-জেনেও তারা অভিভূত হয়ে পড়ল স্তব্ধ বিষণ্ণতার মধ্যে।

দিনে খেয়ে-দেয়ে গোপেন একটু সুস্থ হল। নানা উপায় সে ভাবতে লাগল। আঃ, সেই মেয়েটি আর ছেলেটির সঙ্গে যদি আর একবার দেখা হ'ত? তারা কি আসবে? কলকাতার এত ছেলে-মেয়ের মধ্যেই কি সে আর তাদের খুঁজে বার করতে পারবে?

তবে আবার যদি হাঙ্গামা বাধে—তবে হাঙ্গামার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেই তাদের দেখা পাবে এ বিষয়ে গোপেনের কোন সন্দেহ নাই। গোপেন ভুল করবে না—নেবুর শোক তার বুকে গাঁথা রইল।

আঃ, একটা মানুষ নাই যে ছুটো কথা বলে। গলির মোড় পর্য্যন্ত গেলে হয়। হঠাৎ তার নজরে পড়ল, কানু এসে দাঁড়িয়েছে নিজেদের বাড়ীর সামনে, গলিটার ভিতরের দিকে। সে ডাকলে—কানু!

কানু ধীরে ধীরে এগিয়ে এল।

—আজকের খবর কিছু জান?

মুখের উপর কোঁচার ডগাটা চেপে ধরেছে কানু, সম্ভবতঃ এখুনি সিগারেট খেয়েছে। মাথা নেড়ে কানু ইঙ্গিতে উত্তর দিলে—না।

—খবরের কাগজ নাও না তোমরা?

কানু নীরবেই চলে গেল, বাড়ী থেকে কাগজখানা এনে গোপেনের পাশে নামিয়ে দিলে।

অনেক খবর। সহরতলী অঞ্চলে হাঙ্গামার বিস্তার। বুধবারে কাঁকিনাড়া ও নৈহাটীতে চারখানা ট্রেণ ভস্মীভূত করে দিয়েছে উন্মত্ত জনতা। কাঁকিনাড়া ষ্টেশন পুড়িয়ে দিয়েছে। লাইনের উপর শুয়ে ট্রেণ-চলাচল বন্ধ করবার চেষ্টা করেছে। কাঁকিনাড়ায় গুলীতে মরেছে চার জন, চৌদ্দ জন আহত হয়েছে। হাওড়ায় শালিমারে শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করেছে। বুধবারে উন্মত্ত জনতা কলকাতায় একটি গির্জ্জায় আগুন দিয়ে কাগজ-পত্র আসবাব-পত্র নষ্ট করেছে। কাল বৃহস্পতিবারে দমদমে গুলী চলেছে, এক জন নিহত, আট জন জখম হয়েছে। হুগলী-হাওড়া-বজবজ ব্যারাকপুরের সমস্ত মিল বন্ধ ছিল। কলকাতা অপেক্ষাকৃত শান্ত। শুধু জগুবাজারে একখানা লরী পুড়েছে। মিলিটারী এসে গুলী চালায়; কেউ অবশ্য আহত হয় নাই। জগুবাজারে মিলিটারী পিকেট বসেছে।

মুহূর্ত্তে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে একটি ছেলে একটি মেয়ের ছবি। দীপ্তি ফুটে ওঠে তার চোখে। তার পর আবার দীর্ঘনিশ্বাসও ফেলে। কাগজখানা পাশে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

কানু জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় যাবেন?

—এই একটু—একটু দেখে আসি।

কানুও তার সঙ্গে সঙ্গে চলল।

দোকান-পাট বন্ধ। রাস্তা খাঁ-খাঁ করছে। দু-চার জন মানুষ যারা চলছে—তারা মাথা নীচু করে চলছে। শ্যামবাজার বাগবাজারের সংযোগ-স্থলে লাইট-পোষ্টে একটা পোষ্টার ঝুলানো রয়েছে। সাদা কাগজের উপর সবুজ কালীতে হাতে লেখা পোষ্টার—"জন সাধারণের প্রতি নিবেদন"—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু আবেদন জানিয়েছেন—"কলিকাতার অধিবাসীদের আমি কয়েকটি কথা বলিতে চাই। উত্তেজনার কারণ ঘটিলেও শান্ত থাকিতে এবং গভর্ণমেণ্টের সশস্ত্র বাহিনীর সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত না হইতে অনুরোধ করিতেছি।"

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত নিবেদন করেছেন—"হিংসার পথে কোন মর্ম্মান্তিক এবং ব্যর্থ পরিণতিতে অবশ্যম্ভাবিরূপে পৌঁছিতে হয়—কলিকাতার অধিবাসীদের কাছে এ সত্য কয়েক দিনের মধ্যে পরিষ্কার এবং স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আগুনের আক্রমণ আগুন জ্বালিয়া রোধ করা যায় না, আগুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে জল ঢালিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিরোধের একমাত্র উপায় অহিংস প্রতিরোধ।···অনর্থক খণ্ড আন্দোলনে শক্তি ক্ষয়ে মূল স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি ব্যাহত হইবে।"

আর পড়তে পারলে না গোপেন। সে সরে এসে দাঁড়াল ফুটপাথের উপর। হে ভগবান্! তার সামনে দিয়ে সশব্দে চলে গেল মিলিটারী লরী।

—বাড়ী যান আপনি।

—কে?—পিছন ফেরে গোপেন।

কানু বললে—আমি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস আপনি বেরিয়ে এল গোপেনের বুক থেকে। কানুর সঙ্গে নেবুর একটা প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। মধ্যে মধ্যে ইদানীং গোপেনের সন্দেহ হ'ত—অহেতুক সন্দেহ নয়—তির্য্যক্ কটাক্ষ কানুর দিকে চেয়ে নেবুকে সে হাসতে দেখেছে। কানুর উপর রাগ হ'ত তার। কাল রাত্রে একবার সন্দেহও হয়েছিল কানুর উপর।

—তুমি? তুমি কোথায় যাবে?

—ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দিতে যাব। উণ্ডেডদের জন্য অনেক রক্ত দরকার।

—চল, আমিও যাব।

—না। আপনি নিজেই জখম হয়েছেন। তা ছাড়া কালই ট্রাম-বাস খুলবে বোধ হয়। আপিস যেতে হবে তো।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গোপেন। কালই ট্রাম-বাস খুলবে। আপিস যেতে হবে। হবে বই কি। না গেলে? না গেলে চাকরী চলে যাবে। কেমন যেন ফ্যাকাসে মড়ার মত চেহারা হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর। মাথা হেঁট করে সে ফিরে এল। পথে দোকানে চা খাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু চায়ের দোকানও বন্ধ সব। কলকাতায় দুধ আসছে না আজ দু দিন ধ'রে। বাড়ী ফিরে দাওয়ায় বসে সে আবার বিড়ি খেতে লাগল।

দেবা আর ট্যাবা ভাম হয়ে বসে আছে। ওদের জীবনের তার খুব টেনে বেঁধেছিল ওরা, হঠাৎ সেটা আবার আলগা হয়ে গিয়েছে। কিছু আর ভাল লাগছে না তাদের। সে-দিনটা তাদের কি আনন্দেই গিয়েছে। এমন অপার অসীম আনন্দ তারা জীবনে কখনও পায় নাই। ১৯৪৬ সালের বাঙলা দেশের বালক তারা—তারা জয়হিন্দ জানে—বন্দে মাতরম জানে—নেতাজি জানে—মহাত্মাজী জানে—স্বাধীনতা জানে! সে জানা অবশ্য স্পষ্ট নয়, শুধু একটা অস্পষ্ট গুরুত্ব, পবিত্রতা, মাহাত্ম্য, উত্তেজনা তারা মনে-প্রাণে অনুভব করে। সে দিন তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছে, সে পরিচয়ের আনন্দের সঙ্গে আরও একটা আনন্দ তারা অনুভব করেছিল। মাটীর উপরে অকারণ লাঠীর আঘাত করে যে আনন্দ তারা পায়, কচুগাছ কেটে যে আনন্দ পায়, আবর্জ্জনায় আগুন লাগিয়ে যে আনন্দ পায়, সেই আনন্দ অপরিমিত পরিমাণে তারা অনুভব করেছিল। অকস্মাৎ আলাদিনের প্রদীপের ঐশ্বর্য্য এসে গিয়েছিল যেন জীবনে। সে প্রদীপ আবার হারিয়ে গেল। তারা যেন অত্যন্ত গরীব হয়ে গিয়েছে। চুপ-চাপ স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

শান্তি এখনও মধ্যে মধ্যে অবসর পেলে কাঁদছে। মধ্যে মধ্যে ডাক ছেড়ে সেই একটি কথাই বলছে—ভগবান, শেষে এই করলে?

গোপেন বসে থাকে চুপ করে, দাঁতে দাঁত টিপে। বিরক্তি প্রকাশ করতে পারে না, সান্ত্বনাও খুঁজে পায় না। শান্তি চুপ

করলে সে ভাবে—কাল আপিসে গিয়ে কি কৈফিয়ৎ দেবে। কৈফিয়ৎ হয়তো লাগবে না; কিন্তু যদিই লাগে—তবে?

তার মনে ধরেছে শাস্তির আবিষ্কৃত কৈফিয়ৎটি। ডাক্তারকে শান্তি বলেছিল—কাজে বেরিয়ে পথে হাঙ্গামার মধ্যে পড়েছিল। হাঙ্গামাকারীরা ঢেলা ছুঁড়ছিল, সেই ঢেলা লেগেছে মাথায়—পুলিশ গুলী চালিয়েছিল সেই গুলী লেগেছে পায়ে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সকালে-সকালে খেয়ে শুয়ে পড়াই ভাল। শরীরটা সুস্থ হবে কাল সকালে। কাল আপিস যেতে হবে। ট্রাম বাস খুলবে।

১৬ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার। আজ সত্য সত্যই ট্রাম-বাস চলাচল সুরু হয়েছে।

খবরের কাগজে হেড লাইন ছাপা হয়েছে—ঝড়ের পর শান্ত কলিকাতা।

ঝড় বই কি! এ ঝড় নূতন নয়। মানুষের সমাজ গঠনের প্রারম্ভ থেকে এ ঝড় উঠছে। কখনও বড়—কখনও ছোট। শাসকের শাসন—বঞ্চকের বঞ্চনা—উৎপীড়কের উৎপীড়নে শৃঙ্খলিত বঞ্চিত উৎপীড়িত মানুষের চোখে যখন অশ্রু ঝ'রে পড়ে, তখন বুকের মধ্যে সঞ্চিত হয় যত বিন্দু অশ্রু তত বিন্দু ক্ষোভ। উত্তাপ বাড়তে থাকে মাত্রায়-মাত্রায়। তার পর এক দিন অকস্মাৎ জাগে ঝড়। অতীত কালেও বার বার জেগেছে—এ কালেও জাগছে। শৃঙ্খলিত মানব সমাজের বন্ধন-শৃঙ্খলে তাতে ফাট ধরছে কি না—কে জানে! মানুষ কিন্তু বিশ্বাস করে তাই, সে বিশ্বাস করে বন্ধনের গ্রন্থি একটার পর একটা কাটছে। সে বিশ্বাস যদি তার মিথ্যাও হয় তবুও তার এইই একমাত্র সান্ত্বনা। যুগব্যাপী দুঃখের পর এই পরম দুর্য্যোগের মধ্যেই পায় সে পরমানন্দের আস্বাদ। ব্যর্থ হয়ে ব্যর্থতার মধ্যেও সে প্রত্যাশা করে থাকে—এর পর আসবে আবার বড় দুর্য্যোগ। তাই প্রলয়ের মধ্যে বৈষম্য অন্যায় অধর্ম্ম-পীড়িত পৃথিবীর শেষ এবং সত্যের ভিত্তিতে সুখ-শান্তি-ভরা নূতন সৃষ্টির পরিকল্পনাই তার আদিম শ্রেষ্ঠ এবং সার্ব্বজনীন পরিকল্পনা। সেই আশ্বাসে বুক বেঁধে গোপেন বার হল।

আপিসে তার মাথায় ও পায়ে ব্যাণ্ডেজ দেখে সাহেব ডেকেছিলেন। গোপেন সেই শান্তির রচনা করা মিথ্যা কৈফিয়ৎই দিলে। তা ছাড়া আর কি বলবে। অদ্ভুত ভাগ্য গোপেনের। তাকে সাহেব এক সপ্তাহের ছুটী দিলেন। আর দিলেন নিজে থেকে কুড়ি টাকা চিকিৎসার জন্য সাহায্য।

গোপেন আপিস থেকে বেরিয়ে মাঠে গিয়ে বসে রইল সারা দিন। উদাস দৃষ্টিতে দূরে কলকাতার মাথার উপরে যেখানে ইডেন গার্ডেনের গাছের মাথার কোলে—বড় বড় বাড়ীর আলসের কিনারায় আকাশ এসে নেমেছে—সেই দিকে চেয়ে বসে রইল। শীতের শেষ গাছ থেকে পাতা খসে পড়েছে—কতগুলো ঝরা পাতার উপরেই সে বসেছিল। মাথার উপরের গাছটার ডালে নূতন কচি পাতা দেখা দিয়েছে স্তবকে স্তবকে।

হঠাৎ এক সময় তার চোখে পড়ল একখানা বাসের মধ্যে যাচ্ছে সেই মেয়েটি। সেই রহস্যময়ী মেয়েটি। হ্যাঁ, সেই! ভর্ত্তি দুপুরের বাস, লোকজন বিশেষ নাই, সামনের সিটে বসে আছে সেই—সেই মেয়ে। তার পাশে ও কে? কানু? হ্যাঁ—কানুই তো! কানু জুটল কি ক'রে? দুজনে কথা বলতে বলতে চলেছে। কানুর মুখের চেহারাটা পর্য্যন্ত পাল্টে গিয়েছে যেন—মেয়েটির মুখের দীপ্তির আভা পড়েছে মনে হচ্ছে। ওঃ, বুঝতে পেরেছে গোপেন। কানু ওদের দলে ভিড়ে গিয়েছে—কোন রকমে। হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। তার জীবনে আর হল না, সময় নাই। বুড়ো বয়সে তার আর সময় নাই। এক মুঠো ঝরা পাতা মড় মড় করে ভেঙে ফেললে সে। হঠাৎ মনে হল, সে এই ছেঁড়া ঝরা পাতার মতই পড়ে রইল। হে ভগবান!

নাঃ। দুঃখ সে করবে না। নতুন কচি কানুর দল—তোদের বেষ্টনীর মধ্যে ফুল ফুটুক, ফল ধরুক। সে ঝরা পাতা! গলে পচে সার হয়ে তোদের পুষ্টি জোগাতে যেন পারে এইটুকু ভাগ্য ছাড়া আর ভগবানের কাছে তার আর কিছুই চাইবার নাই। আর কি চাইবে সে? অনেকক্ষণ আরও বসে রইল, তার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠল সে। কুড়িটা টাকা পকেটে আছে। দেবা ট্যাবা যে ঘড়ি দুটো এনেছে—সে দুটোকেও বেচে ফেলবে আজ। তাতেও কিছু হবে। এই তার নেবুর দাম। হঠাৎ তার মন তাকে ছি-ছি করে উঠল—কাপুরুষ—মিথ্যাবাদী। সে মাথা নেড়ে উঠল সজোরে—না—না—না।

মিথ্যাবাদী সে হয়েছে—কিন্তু না—কাপুরুষ সে নয়। কখনও নয়। না—না—না। যদি আবার কখনও দিন পায় তো সে তা প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করবে।

লম্বা-লম্বা পা ফেলে সে চলতে লাগল। নেবুর একটা শ্রাদ্ধ করতে হবে। গোপনে—অত্যন্ত গোপনে। কালীঘাটে গিয়ে ক'রে আসবে। তার আত্মার শান্তি চাই—সদ্গতি চাই।

—আঃ, নেবু! নেবু রে! মা!

চেতনা-লিখন

জীবনানন্দ দাশ

শতাব্দীর এই ধূসর পথে এরা ওরা যে যার
প্রতিহারী।
আলো অন্ধকারের ক্ষণে যে যার মনে সময়সাগরের
ক্লান্তিবিহীন শব্দ শোনে ;—
অথবা তা' নাড়ীর রক্তস্রোতের মতন ধ্বনি ঃ
না শুনে শোনা যায়।

সময় গতির শব্দময়তাকে তবু ধীরে ধীরে যথাস্থানে
রেখে
ট্রামের রোলে আরেক ভোরের সাড়া পেয়ে কেউ
বা এখন শিশু,
কেউ বা যুবা, নটী, নাগর, দক্ষ-কন্যা, অজের মুণ্ড,
অথল পোলিটিশ্যান্।
এদের হাতেই দিনের আলো নিজের সার্থকতা
খুঁজে বেড়ায়।

চারদিকেতে শিশুরা সব অন্ধ এঁদো গলির অপার
পরকলাকে আজ
জগৎ-শিশুর প্রাণের আকাশ ভেবে
জানে না কবে নীলিমাকে হারিয়ে ফেলেছে।
শিশু-অমঙ্গলের সকল জনিতারা এই পৃথিবীর সকল
নগরীর
আবছায়াতে ক্লান্তি-কলকাকলীময় প্রেতের পরিভাষা
ছড়িয়ে কবে ফুরিয়ে আবার সহজ মানব-কণ্ঠে
কথা ক'বে ?
আকাশমর্ত্যে মহাজাতক সূর্য্য-গ্রহণ ছাড়া
কোথাও কোনো তিলেক বেশি আলো
রয়েছে জানে না কি ?

তবুও সবাই তারা
অন্ধকারের ভিতর থেকে ক্রমে ক্রমে বার হয়ে কি
আসছে আরো
বিশাল আলোতে ?

কোথায় ট্রাম উধাও হয়ে চ'লেছে আলোকে।
কয়লা গ্যাসের নিরেস ঘ্রাণ ছড়িয়ে আলোকে
কোথায় এত বিমূঢ় প্রাণজন্তু নিয়ে অনন্ত বাস্, কার্
এমন দ্রুত আবেগে চ'লেছে !

কোথাও দূরে দেবতাত্মা পাহাড় র'য়েছে কি ?
ইতিহাসের ধারণাতীত সাগর নীলিমা ?
চেনা জানা সকল আলোর আকাশ ছেড়ে
সহজ সূর্য্য আছে।
নব নবীন নগর বেশিন প্রাণের বন্দর—
জলের বীথি আকাশী নীল রৌদ্রকণ্ঠী পাখি ?
সেখানে প্রেমের বিচারসহ চোখের আলোয়
গোলকধাঁধাঁর থেকে
মুক্ত মানুষ নতুন সূর্য্য তারার পথের জ্যোতির্লি-
ধূসর হাসি দেখে
কি দীন, সহৃদয় ?
জ্ঞান সেখানে অফুরন্ত প্যারাগ্রাফে ক্লান্তিহীন
শব্দ-যোজনায়
কিছুই নেই প্রমাণ ক'রে শূন্যতাকে কুড়ায় নাক তবে ?

পরস্পরের দাবির কাছে
অন্তরঙ্গ আত্মনিবেদনে
নবীন ক'রে পরিচিত হওয়ার পরে নতুন পৃথিবী
র'য়েছে জেনে আজকে ওরা চলার পথে
ইতিহাসের চরম চেতনা ;—
মানব নামের কঠিন হিসাব হয়তো মেলাতেছে
কী এক নতুন জ্যোতির্দেশী সমাজ সময় শান্তি
গড়ার নীল সাগরের তীরে !
চোখে যাদের চ'লতে দেখি তারা অনেক দেরি করে
অনাথ মরু সাগর ঘুরে চলে ;
মনের প্রয়াণ মোড় ঘুরে কি দেখেছে সরণি—
সাহস আলো প্রাণ যেখানে সবার তরে শুভ—
এই পৃথিবী ঘরণী।

কৌপীন থেকে কৃপাণ

"সহকর্মী"

ভারতের বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে অহিংস গান্ধী আন্দোলনের সম্পর্ক যে যথেষ্টই আছে—বিদেশী দরদীদের এ ধারণা অমূলক নয়। 'নিউইয়র্ক টাইমসে'র প্রতিনিধি মার্কিণ সাংবাদিক তাঁর "Bombs in Bengal"এ এই কথাই বলেছিলেন—"Terrorism and Gandhi's campaign—unrelated logically, but undoubtedly connected in the strange logic of history." বাংলায় অন্তত: অহিংস বা সহিংস সব রকম রাজনীতিক প্রচেষ্টার সাফল্য নির্ভর করেছে বৈপ্লবিক নেতা ও কর্মী-দলগুলোর উপর। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এদের থামিয়ে রাখলেও বাংলা কংগ্রেসের ইতিহাসকে নন-কো বা নয়-কো যুগে বিপ্লবী দলগুলোর সংগঠনের ইতিহাস বলা যেতে পারে।

সুভাষচন্দ্র, অনিলবরণ রায় আর সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ছিলেন বিপ্লবী আর কংগ্রেসী দলের মধ্যবর্ত্তী। '২৪ সালে ইংরেজের ভারতরক্ষার চেষ্টায় এঁরা ছাড়া আরও যাঁরা বন্দী হয়েছিলেন, তাঁদের সংগঠন-শক্তি, দেশপ্রাণতা ও ত্যাগ এঁদের চাইতে কম ত ছিলই না, বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশী ছিল। কিন্তু যখন ইংরেজ নতুন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা পণ্ড করবার জন্য এঁদের ধরে নিয়ে আটক করল, তখন ভারতময় কংগ্রেসী ও অন্যান্য দলের ও মতের নেতারা মনে করলেন, দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের নিয়মতান্ত্রিক আক্রমণ-প্রচেষ্টা পণ্ড করবার জন্যই ইংরেজ উঠে-পড়ে লেগেছে।

বাংলার বিপ্লবীদের বাংলার চৌহদ্দীর মধ্যে ওরা রাখা সমীচীন বলে মনে করেনি। পাকা পাকা বিপ্লবী নেতাদের ওরা বর্ম্মায়, মাদ্রাজে, মধ্যপ্রদেশে আর যুক্তপ্রদেশের জেলে নির্ব্বাসিত করেছিল। প্রতুল গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন গুপ্ত, পূর্ণ দাসকে এ সময় রাখা হয়েছিল ত্রিচিন-পল্লীতে; ভূপতি মজুমদার, রবীন্দ্রমোহন সেন, অমৃত সরকারকে কানানোরে; আশু কাহেলী, জিতেশ লাহিড়ীকে ডামো জেলে; পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী, প্রতুল ভট্টাচার্য্যকে বেতুল জেলে, বৃদ্ধ বিপ্লবী জ্যোতিষ ঘোষ, ভূপেন্দ্র দত্তকে বর্ম্মার ইনশিন জেলে।

এই রকম সুভাষচন্দ্র, সত্যেন্দ্রচন্দ্র আর অনিলবরণ রায়কে ওরা নির্ব্বাসিত করেছিল মান্দালয় জেলে; সেখানে তার পূর্ব্বেই চালান দেওয়া হয়েছিল বিক্রমপুরের জীবন চাটুজ্জে, সুরেন ঘোষ, অশ্বিনী গাঙ্গুলী, অমরনাথ ঘোষ, মদনমোহন ভৌমিক প্রভৃতিকে।

সুভাষচন্দ্র এবং মান্দালয়ে আবদ্ধ বন্দীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানী, বিস্ফোরক প্রস্তুত, পুলিশ কর্ম্মচারী হত্যার ষড়যন্ত্র।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর স্বরাজ্য দলের সহিত জড়িত সুভাষচন্দ্র, সত্যেন্দ্রচন্দ্র ও অনিলবরণের কথাই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করে দেশবাসীকে জানালেন—"সরকার ও কোন কোন স্বার্থবান ব্যক্তি স্বরাজ্য দলের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব সইতে পারছে না। বিশেষ স্বার্থবান্‌রা কলকাতা কর্পোরেশনের উপর আমাদের কর্ত্তৃত্বের বিরোধী। কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারে কলকাতাবাসীকে অপমান করা হয়েছে। কলকাতাবাসীর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরাই তাঁকে ঐ পদে নিযুক্ত করেছিলেন। আমি আমার সহযোগীদের সরকারের চেয়ে ভাল করে জানি। সুভাষচন্দ্র বিশেষ প্রশংসার সহিত কাজ করছিলেন। অনিলবরণ রায় কংগ্রেসের সম্পাদক, বাংলার পশ্চিম অঞ্চলের জেলাগুলোয় তাঁর অসীম প্রভাব। সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র স্বরাজ্য দলের সম্পাদক, বাংলার পূর্ব্ব অঞ্চলের জেলাগুলোয় তাঁর বিশেষ প্রভাব। এঁরা যে বিপ্লব বা রাজদ্রোহের সঙ্গে কোনরূপে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারেন, এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।"

মেয়র চিত্তরঞ্জন বললেন—"বিপ্লবীরা আছে, এ কথা সত্য। আমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করছি ওরা আছে। এদের শান্ত করবার কি আর কোন উপায় নেই? উপায় কি মাত্র চণ্ডনীতি? কিন্তু আমি বলে রাখছি, ভয় দেখিয়ে বিপ্লব দমন হয় নাই, হবে না। যারা চায় স্বাধীনতা, কোন রকমের বাধা তারা মানে না। আমি কাজে বিপ্লবী নই, কিন্তু বিপ্লবীদের কথা আমি বুঝি। এখানে দাঁড়িয়ে আমি ঘোষণা করছি—যদি স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বলি দিতে প্রয়োজন হয়, আমি প্রস্তুত। আমি বেশ জানি যে বিপ্লব-সন্ত্রাসবাদ সফল হবে না, তাই ওদের সঙ্গে যোগ দেইনি। কিন্তু যে স্বাধীনতার জন্য তারা করছে চেষ্টা, আমি চাই তাই-ই—সেই স্বাধীনতা।...সুভাষ আমার চাইতে বড় বিপ্লবী নয়: সরকার আমায় কেন গ্রেপ্তার করছে না—তাই আমি জানতে চাই।"

সরকার কিন্তু ওদের কথা জানত, ইংরেজও জানত—দেশবন্ধু আর অন্য নেতারাও জানতেন। বিপ্লবীদের কাছে ইস্তাহার ছাড়বার মুশাবিদাও তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে করিয়েছিলেন, বিপ্লবীরা সর্ব্বদাই তাঁকে ঘিরে ছিল। তবু সে সময় টাউন হলের বিরাট সভায় সভাপতি সার নীলরতন নিঃসংকোচে বলেছিলেন—সুভাষ বাবুকে ব্যক্তিগত ভাবে আমি যেটুকু জানি তাতে বলতে পারি যে, তিনি সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেন না।...বাংলায় কোন রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্র নাই।"

এ সব কথায় বিপ্লবীরা ভরদম হেসে নিয়েছিল। ইংরেজও ও-সব কথায় কান দেয়নি। বাংলায় সন্ত্রাসবাদের প্রথম প্রচারক বিপিন পাল সে দিন সোজা কথাই শুনিয়েছিলেন—

"পর-পদদলিত জাতের মধ্যে—যখন একবার রাজদ্রোহরূপ দেশপ্রেমের বীজ উপ্ত হয়, তখন কোন স্বেচ্ছাচারী রাজনীতিক শক্তি তা নষ্ট করতে পারে না। তা মাটীর মধ্যেই থেকে যায়। আবার যখন সুবিধে পায়, তখন ঐ বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। তাই গত ৪ বছরের আন্দোলনের ফলে দেশে যে সেই রাজদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত হয়নি, তা বলা যায় না। আমি পরে বিপ্লববাদে বিশ্বাস করেছি, বিপ্লবী দল যে আছে এ সম্বন্ধে সরকারের সঙ্গে আমি একমত।...কোন দেশে চণ্ডনীতি দ্বারা বিপ্লববাদ নষ্ট করা যায়নি। আয়র্ল্যাণ্ড বা রুশিয়ার ইতিহাস সবাই জানে। এই ভারতেই, ১৮০৬ খৃষ্টাব্দ থেকে সরকার ভীষণ চণ্ডনীতি চালিয়ে বাংলার বিপ্লববাদ নষ্ট করতে পারেনি। সে সময় সরকারের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীকেও হতাশ হয়ে বসে পড়তে হয়েছিল।"

বিপ্লবীরাও জানত যে তারা আছে। তারা থাকবে, ব্রিষ্ট ভারতের নিরবচ্ছিন্ন চাপা কান্না তাদের সব সুখ হরণ করেছে। ব্যথাতুর ডাকে, মৃত্যুবিপন্ন করে আর্ত্তনাদ—সেই আহ্বান ও আর্ত্তনাদের মহামন্ত্রে তাদের শিরার শোণিত উত্তপ্ত হয়। সেই

আহ্বান ও আর্তনাদ তাদের সহস্রার মাতৃরূপে আবির্ভূত হয়ে তাদের চালিত করে। এ উচ্ছ্বাস নয়, সত্য। গোপীনাথের অন্তরে এমনই মায়ের আবির্ভাব যে হয়েছিল তা সে কলকাতা হাইকোর্টের দায়রা বিচারপতি মিঃ পিয়ার্সনের এজলাসে বলেছিল। গোপীনাথের কৌঁসলী বলেছিল—ওর মাথা খারাপ। গোপীনাথ তা স্বীকার করেনি—সে বলেছিল—

'আজ আমার বড় শুভ দিন। মা তাঁর বুকে চিরদিনের তরে বিশ্রাম লাভের জন্য আমাকে ডাকছেন। তাই আমি যেতে চাই। আমি মায়ের কাজে ভক্তি-নম্র চিত্তে আত্মনিয়োগ করব বলেই মায়ের ডাকে বাড়ী ছেড়েছিলাম। আমি মায়ের কাজে বাংলার বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেছি। আমি আমাদের স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলাম। যখনই চিন্তা করতাম তখনই মাথা গরম হয়ে উঠ্‌ত! ক্রমে আহার-নিদ্রা বন্ধ হ'ল। রাতে আমি ছাদে ঘুরে বেড়াতাম। ঘুমাতে পারতাম না। যখন এই অবস্থা, তখন মায়ের ডাক শুনতে পেলাম। মা যেন বলছেন, টেগার্টের অনুসরণ কর্।··· ঘরের মধ্যে থাকতে পারতাম না। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ছিল না। মনে হত আমার ঘরের চার দিকেই আগুন, তাই দৌড়িয়ে ছাদে যেতাম, সেখানে ঘুরে বেড়াতাম।'

সরকারের দলন-নীতির প্রতিবাদে অতি বৃহৎ নেতা থেকে অতি ক্ষুদ্র কর্ম্মী পর্য্যন্ত প্রতি সভায় ও প্রতি সংবাদপত্রে বিপ্লবীদের পক্ষ সমর্থন করে সরকারের নীতির প্রতিবাদ করলেও, সে কথা যে সত্যি নয় এ অস্বীকার করবার উপায় নেই। তবে সে সময় সংবাদপত্র ও জনসাধারণ একটু স্পষ্ট কথা বলতে পারত। যেমন 'প্রজামিত্র' বলেছিলেন। প্রজামিত্রের মত বলা উচিত ছিল বা অনেকে বলেছিলও —"চণ্ডনীতি দিয়ে বাংলার চরমপন্থীদের জাতীয় সাধনা দমন করবে বলে যদি গবর্ণমেণ্ট ধারণা করে থাকে, তবে তা ভুল। অতীত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাঙ্গালী দমন-নীতিতে পেছ-পা হবার পাত্র নয়, তারা এতে ভয় করে না একটুও।"

বাংলার বিপ্লবীদের উপর এ সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে যখন বিশ্বব্যাপী আন্দোলন ও প্রচারকার্য্য চলেছিল, মনে আছে, শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র নাগের সম্পাদনায় দু হপ্তায় 'ফরোয়ার্ড' প্রেস থেকে 'Lawless Laws' নামে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর অত্যাচারের কাহিনী-সম্বলিত একখানা বেশ বড় বই ছাপিয়ে ইউরোপ, আমেরিকার বিশিষ্টদিগের মধ্যে প্রচার করা হয়েছিল। বাংলার ও কেন্দ্রের ব্যবস্থা পরিষদে পীড়ন-বিধি উঠিয়ে দেবার জন্য প্রবল বচন-সংগ্রাম চলেছিল। ৩ আইন উঠিয়ে দেবার জন্য এক বিল উত্থাপন করা হলে বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে মিঃ ডোনাভন বলেছিলেন—"প্রায় দশ বছর নানা স্থানে তাঁবু খাটিয়ে বাস করে বাংলা দেশের আমি সব জেনে ফেলেছি। বাংলা সরকার এই আইন উঠিয়ে দিলে বাংলার জনসাধারণ তার নিন্দা করবে। কোন মুসলমান এই বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেয়নি।"

লালা লাজপত রায় তখন ডোনাভনকে দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। বিপিন পাল বলেছিলেন—"বিপ্লব সত্যি এসেছে। কি করে এল? সরকারের পীড়ন-নীতিই বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। আধ্যাত্মিক শক্তির সঙ্গে পাশব-শক্তির সংঘর্ষের ফলেই উৎপন্ন হয়েছে বিপ্লব। 'বন্দে মাতরম' বলে চীৎকার করা অপরাধ কে বলেছিল? ("কুলার করলে হুকুমজারী, মা বলে যে ডাকবে তার শাস্তি হবে ভারী"···গ্রাম্যসংগীত) বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সময় জুতো না পরে ছাত্ররা স্কুলে যেত, কে তাদের শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করেছিল? লোকে বোমার কথা কখনও জানত না। দেশভক্তি চাপা দেবার চেষ্টা থেকেই বোমা উৎপন্ন হয়েছিল। সরকারই সৃষ্টি করেছে এ বোমা, এখন ঠিক করতে পারছে না কোন্ দাওয়াই দিলে এ রোগ আরোগ্য হবে।···ডোনাভন ১০ বছর বাংলা দেশকে দেখছেন, আর আমি আজ ৬০ বছর দেখছি। আগে লোকে সরকারের সদাশয়তায় বিশ্বাস করত, এখন আর করে না। জনসমাজের মধ্যে অসন্তোষের ফলে স্বরাজ্য দলের সৃষ্টি হয়েছে।"

কারাগারে বিপ্লবী বন্দীদের উপর এ সময় অকথ্য নির্য্যাতন চলছিল। এ অত্যাচারে সরকার যে লিপ্ত, তা প্রমাণ করবার জন্য স্বরাজ্য দল এক গুপ্ত দলীল জনসাধারণে প্রচার করলেন। জেল কমিটির কাছে বিপ্লবী বন্দীদের সম্বন্ধে লেফটেনাণ্ট কর্ণেল মুলভেনি যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, সরকার তা চেপে রেখেছিলেন। বিপ্লবীদের মুখপত্র 'ফরোয়ার্ড' তা অদ্ভুত কৌশলে সংগ্রহ করে এ সময় যখন প্রকাশ করলেন, তখন ভারতময় একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কেন্দ্রী পরিষদে এ সম্বন্ধে মুলতবী প্রস্তাবে সরকার পরাজিত হয়েছিলেন। মুলভেনি বলেছিলেন—"সকলেই জানেন যে কয় বছর সর্ব্বদাই রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি কুব্যবহারের অভিযোগ নিয়ে সরকারকে যত বিব্রত হতে হয়েছে, তত আর কোন ব্যাপারেই হয়নি। এও সকলেই জানেন যে, সরকার সরকারী বিবরণ থেকে প্রমাণ করতে পেরেছেন যে, অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন। কিন্তু আমার মতে অভিযোগের বিশেষ কারণ ছিল।"

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনে বন্দীদের সম্বন্ধে মাঝে মাঝে রিপোর্ট সরকারকে পাঠাতে হ'ত। মুলভেনী ২ জন বন্দী সম্বন্ধে রিপোর্টে লিখেন—"তাদের যে ভাবে আবদ্ধ করে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে তাতে তাদের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা। জেল আইনে ও জেলের নিয়মে নির্জ্জন কারাদণ্ডের যে ব্যবস্থা আছে তাদের দণ্ড তার চাইতেও কঠোর। জেলের আইনে ও নিয়মে একসঙ্গে লোককে ৭ দিনের বেশী নির্জ্জন কারাবাসে রাখা যায় না।"

এ রিপোর্ট ইনস্পেক্টার জেনারেল অব প্রিজনের মনঃপূত হয়নি। তিনি মুলভনিকে লিখেছিলেন—"অবরোধের মাত্রা সম্বন্ধে পুলিশই আদেশ দেবে,···আমার মনে হয় আপনি এ পর্য্যন্ত ও এ ভাবের কথা লিখতে পারেন যে বন্দীদের নির্জ্জন কারাবাসে রাখা হয়েছে, তাদের প্রতিদিন ব্যায়াম করতে দেওয়া হয়, তারা প্রফুল্ল আছে এবং কারও স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হয়নি।"

কিন্তু এ সময় জানা গেল, বাংলার বিপ্লবীদের উপর কি ভীষণ পীড়ন শুরু করা হয়েছে। ইনশিন জেলে বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকুমার দত্তকে নির্জ্জন জেলে তালা-চাবী দিয়ে রাখা হয়েছিল। বৈশাখের প্রখর গ্রীষ্মে তাঁকে এক ফোঁটা জলও দেওয়া হত না বলে কত কথাই আমরা শুনেছি। মান্দালয়ে জীবন চাটুজ্জে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন। সত্যেন্দ্রনাথ চক্ষু রোগে কষ্ট পান। কারাগারের দুর্ব্ব্যবহারের ফলে বন্দীদের ১৫ দিন প্রায়োপবেশন করতে হয়।

মান্দালয় জেলেই সম্ভবতঃ সুভাষচন্দ্রকে চরম বিপ্লববাদের দীক্ষা

দেয়।" মান্দালয়ের পাষাণ প্রাচীর থেকে লোকমান্য তিলকের মুক্ত আত্মা সুভাষকে প্রেরণা দিয়েছিলেন।

সুভাষ বলেছিলেন—"লোকমান্য তিলকের উন্নত চরিত্র ও তাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার নাগাল পেতে আমি বার বার চেষ্টা করেছি। তাঁর অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের উৎস কোথায় তার সন্ধান করতে আমি প্রায়ই চেষ্টা করেছি। সন্ধান পাইনি। তার পর মান্দালয় জেলের শিলা-প্রাচীরের মধ্যে যখন ওরা আমায় ফেলে দিল, তখন এই মহাপুরুষের অসীম মহত্বের রহস্য আমার কাছে উদ্ঘাটিত হ'ল। প্রায় ছয় বছর ওরা লোকমান্য তিলককে মান্দালয়ের নিঃস্তন পিঞ্জরে বন্দী করে রেখেছিল। পাকা বাড়ী নয়, একটা কাঠের খাঁচা। তারই কাছে দু'বছর বাস করবার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। কি পীড়াদায়ক আবহাওয়ায়, কি নির্ম্মম অবস্থায় লোকমান্যকে এই বন্দি-দশায় কাল কাটাতে হয়েছে, মান্দালয় জেলে কিছু দিন না থাকলে তা কেউ বুঝতে পারবে না। মান্দালয় জেলের ক্ষুধিত পাষাণ ভেদ করে যে মহাপুরুষের বিজয়ী অন্তরাত্মা বেরিয়ে এসেছিল সুষমামণ্ডিত ঐশ্বর্য্যে, সে অন্তর যে কত বড়, তা প্রকাশ করা সম্ভব নয় ভাষায়। চারি পাশের নৈরাশ্যময় অবস্থার অতি উর্দ্ধে উঠে তমসাচ্ছন্ন, প্রাণহীন দিনগুলোকে যে তিনি সুদীর্ঘ তপঃক্ষণে রূপান্তরিত করেছিলেন তা মাত্র লোকমান্যের পক্ষেই সম্ভবপর হয়েছিল।"

এই মান্দালয়-পিঞ্জরে আর এক বিপ্লবী নেতার সাধন-স্থান ছিল লালা লাজপত রায়ের কথা বলছি—পঞ্জাবকেশরী লালাজী। কর্ণেল ক্রফোর্ড কেন্দ্রী পরিষদের এক আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"তিন আইনে লালা লাজপত রায় যখন মান্দালয় জেলে আটক ছিলেন, তখন আমি এক জন অধস্তন কর্ম্মচারিরূপে সেখানে ছিলাম। সে সময় আমি লালাজীকে বাঘের মত ভয় করতাম।" মান্দালয়ের শিলা-কক্ষে সুভাষ যেন এই দুই মহা বিপ্লবীর অন্তরাত্মার বিচরণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন—তাঁরা তাঁকে যেন শক্তি সঞ্চার করে আপনাদের অসমাপ্ত ব্রত উদ্‌যাপনের ভার তাঁর হাতে দিয়ে গেছলেন। এ কারা-প্রাঙ্গণে তিনি বাংলার চির-বিপ্লবী সহ-বন্দীদের সঙ্গলাভেরও সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। আত্মস্থ সুভাষচন্দ্রের চিত্তে স্বাধীনতার পন্থা সম্বন্ধে যে দোলাচল সংশয় ছিল, মনে হয়, মান্দালয়-পিঞ্জরে তা দূর হয়েছিল। তিনি এখানেই পথ বেছে নিয়েছিলেন।

রাজনীতিক সংগ্রামে তাঁর কর্ণধার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনেরও বিদেহী আত্মা মান্দালয়ের পাষাণ-কারা ভেদ করে গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছিলেন কি না জানি না। কিন্তু এ কথা জানি, নব পন্থা গ্রহণের পূর্ব্বে দেশবন্ধুর এই "Young old man"এর অন্তরে একটা অসীম বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়েছিল। 'দেশ চীৎকার' করেছে, চীৎকার করে দাবী করেছে তাঁর মুক্তি—তাঁর নেতা সুভাষকে ফিরিয়ে আনবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করে চলে গেছেন কি জানি কোথায়—তবু সুভাষ মুক্তি চাননি—তিনি বলেছেন—"Let no one grieve that the chances of my release are few and far between. After all, please console my dear parents, for theirs is the hardest lot, and all those who love me. We have got to suffer a lot, both individually and collectively, before the priceless treasure of freedom can be secured."

সুভাষ তাঁর দাদাকে লিখলেন—"আমরা জাতের অতীতের পাপের জন্য আমার ক্ষুদ্র উপায়ে আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি। এতেই আমি সন্তুষ্ট। আমাদের অন্তর অমর। জাতের স্মৃতিপট থেকে আমাদের এ ভাবধারা মুছে যাবে না। আমাদের বড় আশার স্বপ্নগুলোর অধিকারী হবে ভবিষ্যৎ পুরুষরা। আমার এই দুঃখে, আমার এই পরীক্ষায়—এই সান্ত্বনাই আমায় সজীব করে রাখবে—নিত্য নিত্য —চিরকাল।"

সুভাষকে এবং আরও কয়েক জন ঝুনো বিপ্লবীকে আটক রেখে যখন সরকার দুই-চার জন করে বন্দীকে মুক্তিদান করতে লাগল ২ বছর পর, তখন দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলে ভাঙ্গন ধরেছে, বিপ্লবী নেতাদের অভাবে বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় চর্ক্কা-ত্রাণপন্থার প্রবর্ত্তন হয়েছে, কোন কোন কংগ্রেস আফিসে রীতিমত ভাগবত পাঠ আর হরিনাম কেত্তন হচ্ছে। পিঞ্জর থেকে ফিরে এই সব বিপ্লবী নেতারা জানিয়েছিলেন যে, বোমা-বন্দুকে তাদের ঘোরতর অরুচি। পিঞ্জরের বাইরেও অনেক নেতা ইংরেজের তড়পানি দেখে সুভাষচন্দ্র আর অন্যান্য বিপ্লবীর কর্ম ও ও উদ্দেশ্যের নিন্দা করেছিলেন।

'২৬ সালে ৪ঠা মার্চ্চ সুভাষচন্দ্রের অন্যতম সমর্থক ও পরামর্শদাতা বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ মুক্তি পেলেন। সর্ত্ত—

(১) অনাচার-মূলক কাজে যে সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যোগ দেয় তাদের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ; (২) ১৮৭৮এর অস্ত্র-আইন অথবা ১৯০৮এর বিস্ফোরক আইন অমান্য না করা, ইত্যাদি। উপেন্দ্রনাথও ফিরে এসে, কৃপাণ ছেড়ে কৌপীনের দিকে নজর দিলেন, তাঁর বাল্যবন্ধু ও তেজস্বী বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দৈত্য-বিপ্লবী সুরেশচন্দ্র দাস আর দেশবন্ধু তথা সুভাষের কর্ম্মনীতির বিদ্বেষী সুতো-কাটা সুরেশ মজুমদারের সঙ্গে করলেন Common cause। যাঁরা কোন দিনই "শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে স্বরাজ লাভের" ক্রীডকে বিশ্বাস করতেন না, তাঁরা বললেন, 'উহাই আমাদের ক্রীড'। ওঁরা বললেন—লক্ষ্ণৌ ও বেঙ্গল উভয় প্যাক্টেই তাঁরা আস্থাবান্ নন। ওঁরা যে সাবুর বাটী এগিয়ে দেওয়া আর কচুরী-পানা উঠানকে পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য বলে বরাবর মনে করে এসেছিলেন, আর দেশের এক generation যুব-সমাজকে মূলগত কণ্টক উৎপাটনের জন্য মনে-প্রাণে বলেছিলেন—"যদি এ অসি কলঙ্কে মলিন তোমারই পাশ নাশিবে, এবার সেই পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য, পল্লী-সংগঠন ও কৃষি-শিল্প-শ্রমিক গঠনকার্য্যকে অবিলম্বে আরম্ভ করবার উপদেশই ছড়ালেন। কংগ্রেসের নেতাদের বিরুদ্ধে ওঁরা অভিযোগ করলেন—"কয়েক বৎসর যাবৎ কংগ্রেস নেতৃগণ যে গঠনমূলক কার্য্যে অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই গঠনমূলক কার্য্যের উন্নতি সাধনের জন্য সমুদয় কংগ্রেসকর্ম্মীকে পুনর্ম্মিলিত করিবার চেষ্টার সময় আসিয়াছে।"

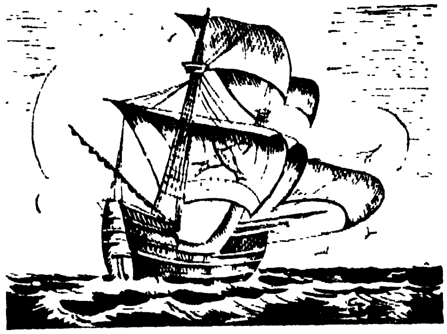
বিপ্লবী সুভাষের গ্রেপ্তারের সঙ্গে যে বিপ্লবী অনিলবরণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বলে দেশবন্ধু স্বর্গ-মর্ত্ত্য আলোড়ন করেছিলেন, তিনিও ফিরে এসে বললেন—"আমি না কি সুভাষ বোস, সত্যেন্দ্র মিত্র, সুরেন ঘোষ, অশ্বিনী গাঙ্গুলী, অমর ঘোষ, মদন ভৌমিক প্রভৃতির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে উচ্ছেদ করতে চেষ্টা করছিলাম, আমি না কি

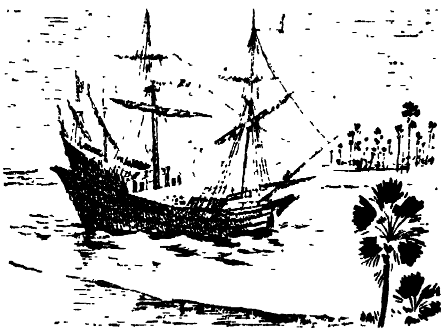
পণ্যতরী

শান্তা রায়চৌধুরী

John Masefieldএর "Cargoes"
কবিতা অবলম্বনে

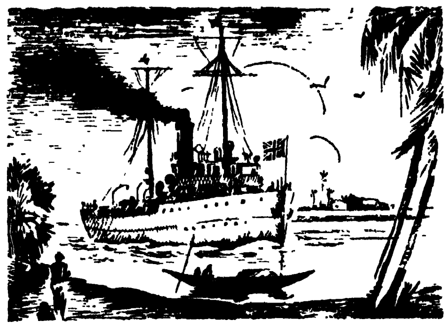
মীনাক্ষীকেতন তরী দূর কাঞ্চী হ'তে
ভেসে যায় জুডিয়ায় রৌদ্রবিধুর,
বহি ল'য়ে গজদন্ত,
ময়ূর ও মর্কট
চন্দন, দেবদারু, সুরা সুমধুর।





চলে হিস্পানিয়া পানে ধীর মন্দগতি
বিষুবরেখার পথে তালী-শ্যাম-তীরে,
রত্নগর্ভা তরী—হীরকে,
জামিরা, পান্নায়,
পীতমণি, দারুচিনি, সোনার দিনারে।

আসে ব্রিটিশের পণ্য-তরী ধূম্রমলিন
কাটি' পথ গঙ্গাবক্ষে উর্মির কল্লোলে,
আনে সাথে দিয়াশালাই,
লোহা-লক্কড় যত
রঙীণ খেলনা তত সুলভ হিল্লোলে।



অস্ত্র-শস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য আমদানী করছিলাম আর সরকারী কর্ম্মচারীদের হত্যা করবার জন্য মতলব পাকাচ্ছিলাম। এই অপরাধে আমাকে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আমার বিরুদ্ধে এ সব অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।" তাই ইনিও ফিরে এসে—রাজনীতির আওয়াজ আর দিলেন না। তিনিও বললেন, "আমাদের জাতির প্রাণ পল্লী-কুটীরে—পল্লী সংস্কার করতে না পারলে স্বরাজ বহু দূরে পড়ে রইবে।"

ইংরেজের হাত থেকে গ্রামগুলাকে রক্ষা করবার নীতিই ছিল বিপ্লবীদের। অনিলবরণ বললেন—ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, মামলা, মোকদ্দমা, দ্বেষ, হিংসা, দ্বন্দ্ব, কোলাহলের হাত থেকে পল্লীকে রক্ষা করতে হবে আর এ জন্য চাই স্বার্থত্যাগী শত শত যুবক কর্ম্মী। দলে দলে পল্লী যুবককে পল্লীগ্রামে গিয়ে পল্লী সংস্কারে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

সত্যেন্দ্র মিত্রকে ছেড়ে দেওয়া না হলেও মান্দালয় জেল থেকেই তিনি যে সব বাণী পাঠাচ্ছিলেন, তাতে মনে হয়, ছাড়া পেলেই তিনি বিপ্লব-পন্থা ছেড়ে হিন্দু সংগঠনে মন দেবেন। তিনি লিখেছিলেন—"১ কোটি মুসলমান আর ৪০ লক্ষ খৃষ্টান হিন্দুর আচার ব্যবহার পালন করে। ঐ সব নামে মাত্র মুসলমান ও খৃষ্টানকে আবার হিন্দুধর্ম্মে আন:তে হবে···যদি নোয়াখালী জেলার মুসলমানরা আবার হিন্দু সমাজের আশ্রয় নিতে চায়, তবে কি আপনারা তাদের সাদরে বক্ষে ধারণ করতে প্রস্তুত?"

কিন্তু বাংলার কৃপাণে তখনও মরচে ধরেনি। মান্দালয় জেলে বিপ্লবী বন্দীদের প্রায়োপবেশন। মৌলানা সৌকৎ আলির বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। বাংলার মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দৌরাত্ম্য—সংবাদ-পত্রের উপর সংবাদপত্র দলন—বাংলার যুব-চিত্ত যেন আর সইতে পারছিল না। হঠাৎ একদিন শোনা গেল, রাজনীতিক বন্দীরা গোয়েন্দা পুলিশের রায় বাহাদুর ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে জেলের মধ্যে পেয়ে সাবল মেরেই খুন করেছে। যারা মেরেছে তারা দক্ষিণেশ্বর বোমা আর শোভাবাজার অস্ত্র আইনের মামলার আসামী—বয়স ১৯ থেকে ২২। তাদের দণ্ড হল, দণ্ডের আদেশ পেয়ে ওরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে নিল। তার পর জেলের গাড়ীতে চক্র-চীৎকারের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ওরা সমস্বরে গেয়ে গেল শেষ গান—

এবার বিদায় দাও মা, ফিরে আসি!

দৃ ষ্টি পা ত

যাযাবর

বারো

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই বোধ হয় কতগুলি দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত আসে যখন সে মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয় দ্বারা বেশী চালিত হয়। সে-মুহূর্ত্তগুলি অতর্কিতে দমকা হাওয়ার মতো এসে অতি সাবধানী লোকদেরও স্থৈর্য্যের বন্ধন ছিন্নভিন্ন করে দেয়। সংযমী যোগী পুরুষেরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন, হিসেবী মহাজন গরমিল করেন জমা-খরচের খাতায়, এবং স্বভাবতঃ চাপা প্রকৃতির হিতৈষী ব্যক্তিরা মনের কথা ব্যক্ত করেন অন্য লোকের কাছে। এমনি এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আধারকারের পূর্ব্ব-ইতিহাস উদ্ঘাটিত হলো একান্ত অপ্রত্যাশিতরূপে। ক্লান্ত সমাহিত নয়ন এবং নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের অন্তরালবর্ত্তী রহস্য শোনা গেল তাঁরই নিজ বর্ণনায়।

অপরাহ্ণ বেলায় ঈশান কোণে মেঘ দেখা দিয়েছিল। বৃষ্টি প্রত্যাশা করছিলাম গ্রীষ্মপীড়িত হতভাগ্যের দল। বৃষ্টি এলো না, এলো আঁধি। ধূলির ঝড়। না দেখলে কল্পনা করা শক্ত এর রূপ। বাংলা দেশে কোন কালে দেখা যায় না এ জিনিষ। আকাশ-ভুবন আঁধার করে প্রবল বেগে কোথা থেকে আসে এত বিপুল ধূলিরাশি তা ধারণাতীত। মেঘের চাইতে ঘন তার আচ্ছাদন সূর্য্যকে আবৃত করে। ঘরের মধ্যে আলো জ্বালতে হয় দিনের বেলায়। দোর-জানালা নিশ্ছিদ্ররূপে বন্ধ করলেও কিছু ধূলা প্রবেশ করে নাকে, মুখে, চোখে, এমন কি বন্ধ বাক্স-পেটারার মধ্যস্থিত জামা-কাপড়ে। বৃষ্টির ফোঁটা মাত্র নেই; শুধু শুষ্ক ধূলির ঝড়। কিন্তু এই আঁধির ফলেই উত্তাপ হ্রাস পায় অভাবনীয় ভাবে, ধরণী হয় শীতল। উত্তর-ভারতের এক বিস্ময়কর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এই আঁধি।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসেছি দুজনে মুখোমুখি। শোঁ-শোঁ শব্দে বাইরে বইছে আঁধির ঝড়ো হাওয়া, আলোড়িত হচ্ছে ধূলির পাহাড়। ধীরে ধীরে অনুচ্চ কণ্ঠে বিবৃত করলেন আধারকার আপন জীবন-ইতিহাস।

আধারকারের কুলগত পেশা যুদ্ধ। তাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা লড়েছে মোগলের সঙ্গে, লড়েছে যশোবন্ত সিংহের বিরুদ্ধে। তাঁর প্রপিতামহ বিষ্ণু দত্ত পেশোয়া বাজিরাওয়ের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। আসাইর যুদ্ধে পেশোয়ার দক্ষিণ পার্শ্বে থেকে শত্রু নিপাত করেছেন অমিতবিক্রমে, নিহত হয়েছেন বুকে গুলীর আঘাতে। আধারকার বালক বয়সে দেখেছেন তাঁর রুধিরাক্ত লৌহবর্ম্ম, পরিবারের গৌরবময় উত্তরাধিকার। বীরের রক্ত আছে তাঁর ধমনীতে।

পরিবারে বিত্ত ছিল প্রচুর, বীর্য্য ছিল বিখ্যাত, কিন্তু বিদ্যা ছিল না আধুনিক। আধারকার পিতার একমাত্র সন্তান। শিক্ষা লাভ করেন পুণার ইংরেজী স্কুলে। উইলসন কলেজ থেকে পাশ করে গেলেন ম্যাঞ্চেষ্টারে। বয়ন-বিদ্যা-বিশেষজ্ঞ হয়ে যখন ফিরলেন স্বদেশে য়ুরোপের প্রথম মহাযুদ্ধ তখন সবে ক্ষান্ত হয়েছে। বোম্বেতে স্থাপন করলেন এক কাপড়ের কল। অসুরের মতো খাটতে লাগলেন তাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে।

বছর পাঁচেক পরের কথা। এক সন্ধ্যায় এক বন্ধুর আগমন-সম্ভাবনায় এসেছেন দাদর ষ্টেশনে। বন্ধু এলেন না, ফিরে আসছেন এমন সময় কানে এলো এক নারীকণ্ঠ। সে তো কণ্ঠ নয়, সে সুর। ভাষা বুঝলেন না, পিছনে তাকিয়ে দেখলেন প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে একটি তরুণী, সঙ্গে একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। সামনে স্যুটকেশ, হোল্ডঅল, বেতের ঝুড়ি ইত্যাদি মালপত্র। উভয়ের মুখে উদ্বেগের ছাপ সুস্পষ্ট। বোম্বেতে তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাণ্ডব চলেছে সাংঘাতিক। ষ্টেশনের ভিতরে কুলীর অভাব, বাইরে যান-বাহনের। সন্ধ্যার পরে ঘরের বাইরে যাওয়া নিরাপদ নয়।

আধারকার ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কি বোম্বেতে এই প্রথম এলেন?"

ভদ্রলোক বললেন, "হ্যাঁ, আমার এক আত্মীয় থাকেন এখানে। তাঁকে টেলিগ্রাম করেছিলাম ষ্টেশনে হাজির থাকতে। আসেননি দেখছি। বোধ হয়, টেলিগ্রাম পাননি।"

"পেলেও আসা কঠিন। সহরে দাঙ্গা বেধেছে, খুন-খারাপী চলছে বেপরোয়া। আপনারা কোথায় উঠবেন?"

"তাই তো ভাবছি। কাছাকাছি কোন হোটেলের সন্ধান দিতে পারেন?"

"তা পারি। কিন্তু জায়গা পাবেন না সেখানে। বেশীর ভাগ হোটেলের চাকর, বেয়ারা, রাঁধুনী পালিয়েছে প্রাণের ভয়ে, সেখানে বাসিন্দা যারা আছে, তাদেরই অন্ন-জলের অভাব, নতুন লোক নেয় না আর।"

"তবে তো বড়ই মুস্কিল," বলে ভদ্রলোক সঙ্গিনীর দিকে তাকালেন। ভয়ার্ত্ত ভাব সঞ্চারিত হলো তরুণীর মুখমণ্ডলে। ষ্টেশনের রিটায়ারিং রুমে চেষ্টা করে ফল হলো না। সব আগেভাগেই দখল হয়ে আছে দূরগামী যাত্রীতে। পরম অসহায় দৃষ্টিতে তাকালেন মহিলা তাঁর স্বামীর দিকে।

আধারকার প্রস্তাব করলেন, "যদি আপত্তি না থাকে চলুন আমার ফ্ল্যাটে, কাল প্রাতে খোঁজ করা যাবে আপনাদের আত্মীয়ের। আমার সঙ্গে গাড়ী আছে।"

ভদ্রলোক তাকালেন স্ত্রীর পানে। তিনি একটু সঙ্কুচিত হয়ে ইংরেজীতে বললেন স্বামীকে যদিও উক্তির লক্ষ্য যে আধারকার তাতে সন্দেহ নেই। "রাত্রিবেলা হঠাৎ বিনা খবরে আমরা গিয়ে উঠলে ওঁর স্ত্রীকে তো খুব বিব্রত করা হবে।"

আবার সেই সুর। বোধ করি, এ সুর ছিল ভীমসিংহপত্নী পদ্মিনীর, যা দিয়ে তিনি সমস্ত রাজপুত যুবককে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন যুদ্ধে প্রাণ দিতে, হয় তো ছিল হেলেন অব ট্রয়ের, যাঁর জন্যে সহস্র রণতরী রওনা হয়েছিল যুদ্ধে।

আধারকার বললেন, "এক রাত্রির জন্য নিরুপায় অতিথিদের গৃহে

আতিথ্য দিলে স্ত্রীকে বিব্রত করা হয় কি না জানি না, হয় তো হয়। কিন্তু আপনারা নিশ্চিন্ত হোন। আমার স্ত্রী বিব্রত হবেন না, কারণ আমার স্ত্রী নেই।"

"স্ত্রী নেই ? ওঃ তা হলে…" বলতে বলতে থেমে গেলেন মহিলা।

আধারকার বললেন, "তা' হলে কী ?"

"আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা কোন রকম করে রাতটা প্ল্যাটফরমেই কাটিয়ে দেবো।"

"ওঃ, ব্যাচিলরের বাড়ীতে অতিথি হওয়াটা সামাজিকতায় বাধে বুঝি ? মনে ছিল না। বেশ, প্লাটফরমেই থাকবেন। ভয় নেই। গোয়ানিজ কুলীগুলি দেখছি নে বটে এখন, তবে আছে কাছাকাছিই। জড়োয়া গয়না আছে গায়ে, সুটকেশগুলির ভিতরেই বা না কোন শ' কয়েক টাকার জিনিষপত্র হবে। আশা করি, তাদের আসতে বিলম্ব হবে না। কাল মৃতদেহ সনাক্ত করার দরকার হলে খবর দেবেন। আচ্ছা, চলি, গুড্‌ নাইট" বলে দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হলেন আধারকার। স্বরে তাঁর অপমানিতের ক্ষোভ এবং উষ্মা।

কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরেই আবার দেখা গেল আধারকারকে ফিরে আসতে। বললেন, "দেখুন একটা উপায় মাথায় এলো। আমার ফ্ল্যাটেই চলুন। আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আমি কাছাকাছি আমার কেরাণীর বাড়ীতে গিয়ে বরং শোব। তা'হলে বাড়ীর দোষ থাকবে না ব্যাচিলরত্বের। ভিতর থেকে আগল এঁটে দেবেন ভালো করে, আর যাই হোক, প্ল্যাটফরমের চাইতে আশা করি সেটা নিরাপদ হবে।"

গোয়ানিজ কুলীর নামে মহিলাটির মনে তখন যথেষ্ট ভয় ধরেছে। স্বামীটিরও প্ল্যাটফরমে রাত-কাটানোর কল্পনাটা খুব প্রীতিপ্রদ মনে হচ্ছিল না। সুতরাং আধারকারের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। কুলীর সন্ধান পাওয়া গেল না। আধারকার নিজে দু'হাতে অবলীলাক্রমে দুটো বড় সুটকেশ বয়ে নিয়ে গেলেন গাড়ীতে।

ছোট ফ্লাট, একটি মাত্র শয়ন-কক্ষ। আহারাদির পর আধারকার প্রস্থানোদ্যোগ করতেই মহিলাটি পরিষ্কার ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলেন, "ও কি, কোথায় যাচ্ছেন ?"

"আমার কেরাণীর বাড়ীতে।"

"কেরাণীর বাড়ীতে ? সে কত দূর ?"

"মাইল পাঁচেক হবে।"

"এত রাত্রিতে সেখানে ? কোন বিশেষ দরকার আছে কি ?"

"দরকার রাত্রিটা কাটানো।"

"কেন এ বাড়ী দোষ করল কি ?"

আধারকার এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বললেন, "দোষ নয়, মানে আপনাদের অসুবিধা…।"

বাধা দিয়ে মহিলাটি অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, "আমাদের অসুবিধার কথা আপনাকে কে বলেছে ? আর যদি হয়ই অসুবিধা। আপনি দয়া করে আশ্রয় দিয়েছেন, আর আপনাকেই এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার রাত্রিতে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে নিজেদের সুবিধা করবো, আমাদের এতখানি জংলী ঠাওরালেন কেন ? তার চেয়ে বলুন আমরা আবার সেই ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমেই ফিরে যাচ্ছি।"

স্বামী ভদ্রলোকও জোর দিয়ে বললেন, "ক্ষেপেছেন মশাই, এই রাত্রিতে যাবেন বাইরে !"

কিন্তু আর এক দফা তর্ক দেখা দিল, শয়ন-ব্যবস্থা নিয়ে। একটি মাত্র খাট। আধারকার চান সেটি দখল করবেন অতিথিরা, তিনি ড্রয়িং-রুমের মেজেতে ঘুমোবেন। অতিথিদের ইচ্ছা ঠিক তার বিপরীত। কিন্তু এবারেও মহিলাই জয়লাভ করলেন। নিজের ঘরে শুতে যেতে যেতে আধারকার বললেন, "এ ভারি অন্যায় হলো। মনে মনে নিশ্চয় ভাবছেন, লোকটা সুবিধার নয়। নিজে আরাম করে খাটে নিদ্রা দিচ্ছে, আর অতিথিদের ভূমিশয্যা।"

মৃদু হাস্যে মহিলা বললেন, "লোকটি আপনি সুবিধের নন, তা' টের পেয়েছি। অত্যন্ত ঝগড়াটে।"

"ঝগড়াটে ? বাঃ, কখন ঝগড়া করলেম ?"

"করলেন না ? সেই যে প্ল্যাটফরমে কী বলেছি, তা নিয়ে কত কথা শোনালেন, কেরাণীর বাড়ী শুতে যেতে চাইলেন। যান, আর কথা নয়। অনেক রাত হয়েছে। এখন, লক্ষ্মী হয়ে শুয়ে পড়ুন গে।"

পরদিন আধারকারের ঘুম ভাঙলো অনেক বিলম্বে, ভৃত্যের ডাকাডাকিতে। ঘড়িতে তখন প্রায় আটটা। তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্তন করে এসে দেখেন টেবিলে প্রাতরাশ প্রস্তুত। সুপ্রভাত জ্ঞাপন করতেই মহিলাটি হেসে বললেন—"কাল রাত্তিরে শুতে যাবার সময় বললেন, আমাদের ভূমিশয্যার কথা মনে করে খাটে শুয়ে ভালো ঘুম হবে না আপনার। কনসান্সে খোঁচা মারবে। এই আপনার ঘুম না হওয়ার নমুনা ? কনসান্সের খোঁচা নিয়েই বেলা আটটা !"

আধারকার লজ্জিত হয়ে বললেন, "দেখতে পাচ্ছি, আমি ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কনসান্সটাও ঘুমে বেহুশ হয়েছিল।"

উচ্চ হাস্য উত্থিত হলো টেবিলে। স্বামী ও গৃহস্বামীর অট্টহাস্যের সঙ্গে মিশলো নারীকণ্ঠের উচ্ছ্বসিত হাস্যধ্বনি। মহিলা বললেন, "তাই নাকের ডাকে পাশের ঘরে চোখের দু'পাতা এক করা দায়।"

"নাকের ডাক ? নাক ডাকে না কি আমার ? কৈ, আমি তো টের পাইনি কখনও।"

"ঐ তো মজা। যখন টের পাওয়ার অবস্থা হয়, নাক তখন আর ডাকে না।" আবার সেই পুরুষ ও নারীকণ্ঠের সম্মিলিত হাস্যোচ্ছ্বাস।

সন্ধ্যার কিছু আগে অতিথিরা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন তাঁদের আত্মীয়ের গৃহে। তাঁরা অনুরোধ জানিয়ে গেলেন অবসরমতো সেখানে একদিন যাওয়ার। আধারকার তখুনি তাঁদের সঙ্গে গাড়ীতে চেপে বসতে প্রস্তুত ছিলেন, শুধু সেটা শোভন হবে কি না ঠিক করতে না পেরেই নিরস্ত হলেন।

তাঁদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে আধারকার এসে বসলেন বারান্দায়। পড়তে চেষ্টা করলেন অন্য দিনের মতো ইংরেজী উপন্যাস। এগুতে পারলেন না বেশী দূর। মন বারম্বার উন্মনা হতে লাগলো। প্রত্যহ সন্ধ্যা বেলা বিলিয়ার্ড খেলতে যান জিমখানা ক্লাবে। সেদিন কিছুমাত্র উৎসাহ রইলো না তার।

সুনন্দা ব্যানার্জীরা দিন দশেক রইলো বোম্বেতে। প্রত্যহ অপরাহ্নে অপিস থেকে আধারকার সোজা এসে হাজির হতেন ব্যানার্জীদের আত্মীয়-গৃহে। দল বেঁধে যেতেন কোন দিন সিনেমায়,

কোন দিন এপোলো বন্দর, কোন দিন মহালক্ষ্মী মন্দির, কোন দিন বা এলিফেণ্টার কেভস্।

বোম্বে ত্যাগ করে স্বস্থান লাহোরে প্রত্যাবর্তন করলেন ব্যানার্জী-দম্পতি। আধারকার রইলেন বোম্বেতে; ফিরে গেলেন আপন রূপহীন, রসহীন, বৈচিত্র্যবর্জ্জিত জীবনের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির মধ্যে। প্রভাত আর আনে না কোন প্রত্যাশা, সন্ধ্যায় ঘটে না কোন প্রার্থিত সান্নিধ্য, রাত্রিতে থাকে না পরবর্তী দিবসের প্রগাঢ় প্রতীক্ষা। সুনন্দা-বিরহিত নগরীর কুত্রাপি নেই কোন আকর্ষণ, কোনখানে নেই মধু, নেই স্বাদ।

কিন্তু বিচ্ছেদ মানেই নয় ছেদ, যতির অর্থ নয় ইতি। অদর্শনের সান্ত্বনা থাকে পত্রে, বাচনের বিকল্প লেখনে। লাহোরে পৌঁছে সুনন্দা ব্যানার্জী লিখলেন, মিঃ আধারকার, নিরুপায় নিশীথে অপরিচিত আগন্তুকদের আপনি আশ্রয় দিয়েছিলেন, আতিথ্য দিয়েছিলেন অকৃপণ ঔদার্য্যে;—সে-জন্য ধন্যবাদ। আপনার সৌজন্য স্মরণে রাখবো চিরকাল।

জবাবে আধারকার লিখলেন, এক রাত্রির অবস্থিতি দিয়ে ব্যাচিলরের গুহাকে আপনি দিয়েছেন সম্মান, গৃহস্বামীকে দিয়েছেন দুর্জ্জয় মর্য্যাদা। কৃতজ্ঞতা তো জানাবো আমি। সৌজন্যের প্রকাশ কর্ম্মে, সেটা সহজসাধ্য। প্রীতির প্রবেশ মর্ম্মে, তা' দুষ্প্রাপ্য লভ্য। মিসেস ব্যানার্জী, আপনার অনুগ্রহ বচনাতীত!

ত্বরিত উত্তর এলো পত্রের। "দেখছি, আপনার কুশলতা শুধু আতিথেয়তায় নয়, পত্র-রচনায়ও বটে। মশাই, আপনি তো চারুদত্ত নন, আপনি চারু-বাক্।"

এমনি করে চিঠি লেখালেখির খেলা চলে দুই পক্ষে। সে চিঠিতে উক্তের চাইতে অনুক্তের ভাগ বেশী; শব্দের চাইতে অর্থ।

অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটলো আধারকারের জীবনে। তার জীবনের প্রারম্ভ থেকে এ পর্য্যন্ত কেটেছে পুঁথি-পত্র আর মিল নিয়ে। পরীক্ষায় পাশ আর অর্থোপার্জ্জন। সোনার কাঠি ছোঁয়ানো রূপকথার রাজকন্যার মতো অকস্মাৎ জেগে উঠে আজ নিজেকে তিনি প্রথম আবিষ্কার করলেন। অধীত বিদ্যার শুষ্ক পাণ্ডিত্যের মধ্যে নয়, নয় অর্জ্জিত অর্থের বিরাট সঞ্চয়-স্ফীতিতে। আবিষ্কার করলেন নিজেকে আপন উপবাসী হৃদয়ের অন্তহীন শূন্যতার মধ্যে।

কর্ম্মহীন সন্ধ্যায় নির্জ্জন গৃহকোণে ভাবতে ভালো লাগে যে স্মৃতি, সে সুনন্দার। সুষুপ্ত রাত্রির তিমির স্তব্ধ প্রহরে অকস্মাৎ ঘুম ভেঙ্গে মনে পড়ে যে প্রসঙ্গ, সে সুনন্দার। প্রভাতে প্রথম জাগরণে স্মরণে আসে যে মুখ, সে সুনন্দার। এ কী বিস্ময়, এ কী রহস্য! আনন্দ-বেদনা-বিজড়িত এ কী অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি!

নিজের হৃদয় যতই উদ্ঘাটিত হয় নিজের কাছে, লজ্জিত হন, অনুতপ্ত হন আধারকার। শাসন করেন দুর্ব্বল চিত্ত। পাছে কোন দিন, কোন অসাবধান মুহূর্ত্তে সুনন্দার কাছে ইঙ্গিত মাত্রে প্রকাশ পায় মনোভাব, সে দুর্ভাবনায় শঙ্কিত হন।

"তোমাকে আর একটু জিন এণ্ড লাইম দেবে মিনি সাহেব?" হঠাৎ থেমে প্রশ্ন করলেন আধারকার।

গ্লাসে তখনও অর্দ্ধেকের বেশী ছিল। তুলে ধরে বললেম, "অলমতি বিস্তরেণ।"

মিনিট খানেক চুপ করে থেকে আধারকার বললেন, "আমাকে নিশ্চয় একটা ভিলিয়ন মনে হচ্ছে।"

জবাবে বললেম, "আপনি আপনার কাহিনী শেষ করুন, আমি রিপোর্টার, রিফর্ম্মার নই। মিনি-সংহিতায় বিধান নেই কোন প্রায়শ্চিত্তের।"

স্বল্প বিরতির পর খণ্ডিত আখ্যানের অনুবৃত্তি সুরু করলেন আধারকার।

মাস তিনেক পরে মিল-সংক্রান্ত প্রয়োজনে আসতে হলো লাহোরে। বলা বাহুল্য অতিথি হলেন ব্যানার্জী-ভবনে।

অতিথিকে ভারতীয়েরা সেবা করেন পুণ্য কামনায়, তাঁকে যত্ন করেন ভদ্রতার খাতিরে। কিন্তু অতিথিকে আপন করা যায় একমাত্র হৃদ্যতার জোরে। সে হৃদ্যতার প্রাচুর্য্য ছিল সুনন্দার। লাহোরে আধারকারের কাজ সমাপ্ত হলো তিন দিনে, কিন্তু বিনা কাজের গ্রন্থি মোচন করে একাধিক বার বার্থ রিজার্ভ ও কেনসেলেশানের পর বোম্বেতে প্রত্যাবৃত্ত হলেন তিন চারে বারো দিন কাটিয়ে। কিন্তু যে আধারকার বোম্বে থেকে গিয়েছিলেন এবং যে আধারকার লাহোর থেকে ফিরলেন তারা এক ব্যক্তি নয়; ইতিমধ্যে তার জন্মান্তর ঘটেছে।

লাহোরে সেদিন অপরাহ্ণ বেলায় আধারকার গিয়েছিলেন এক পরিচিত বন্ধু-সন্দর্শনে—সহর থেকে অনেকটা দূরে। আশা ছিল সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রত্যাবর্ত্তনের। কিন্তু এড়াতে পারলেন না অনুরোধ, নৈশ ভোজন সমাধা করতে হলো সেখানে। ফেরার পথে নামলো বৃষ্টি। তার উপরে বাহন হলো বিকল। টাঙ্গার অশ্ব ও আসন দুই-ই প্রাচীনত্বে সমান, চলতে চলতে হঠাৎ একটি চাকা স্থানচ্যুত হয়ে ভেঙ্গে গড়িয়ে পড়ল পথপার্শ্বে; আরোহী সবলে নিক্ষিপ্ত হলেন কর্দ্দমাক্ত পথে। উত্তর-ভারতে শীতকালের বর্ষণ, বর্ষার প্রবল বারিপাতকেও হার মানায়। জনহীন পথপ্রান্তে সিক্ত হলেন দীর্ঘকাল, ব্যানার্জ্জী-গৃহে যখন এসে পৌঁছলেন রাত তখন প্রায় ৪টা।

মৃদু আঘাত করতেই দ্বার খুলে দিলেন যিনি তিনি স্বয়ং সুনন্দা।

"কোথায় ছিলে এই ঝড়-বাদলার মধ্যে? সারা রাত ধরে আমরা উৎকণ্ঠায় মরছি।" বলতে বলতে কণ্ঠ রুদ্ধ হলো বাষ্পে। ঝর ঝর ধারায় অবাধ্য অশ্রু গড়িয়ে পড়ল দুই গণ্ডে। আত্মসম্বরণ করতে ত্বরিত অন্তর্হিতা হলেন পাশের কক্ষে।

দোর খোলার শব্দে গৃহস্বামীর নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছিল। তিনিও দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী ব্যাপার? কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? আমরা ভেবে ভেবে মরি। বিদেশে বিভূঁয়ে এই দুর্য্যোগের রাত্রিতে কোথায় কি হয়। সুনন্দা তো এক মিনিটের জন্য বিছানায় যায়নি, কেবল বারান্দায় এদিক ওদিক করেছে। একটু শব্দ হলেই টাঙ্গা এলো ভেবে ছুটে নীচে যায়।"

আধারকার বাহন-বিভ্রাট বিবৃত করলেন সবিস্তারে, ক্ষমা প্রার্থনা করলেন নিজ বিলম্বের জন্য। সুনন্দা বেরিয়ে এসে গম্ভীর কণ্ঠে বাধা দিয়ে বললেন, "ভিজে জামা-কাপড়গুলি ছাড়া হবে কি? টাঙ্গার চাকা ক'ইঞ্চি ভেঙ্গেচে, ঘোড়া ক'গজ লাফিয়েছে সে-সব কাহিনী কাল সকালে ব্যাখ্যান করলে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। মাথা

[ইহার পর ৩৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]



নি কখনও পশ্চাদপসরণ করিতে শিখি নাই।"

—জওহরলাল





নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে

ফটো—নীরোদ রায়

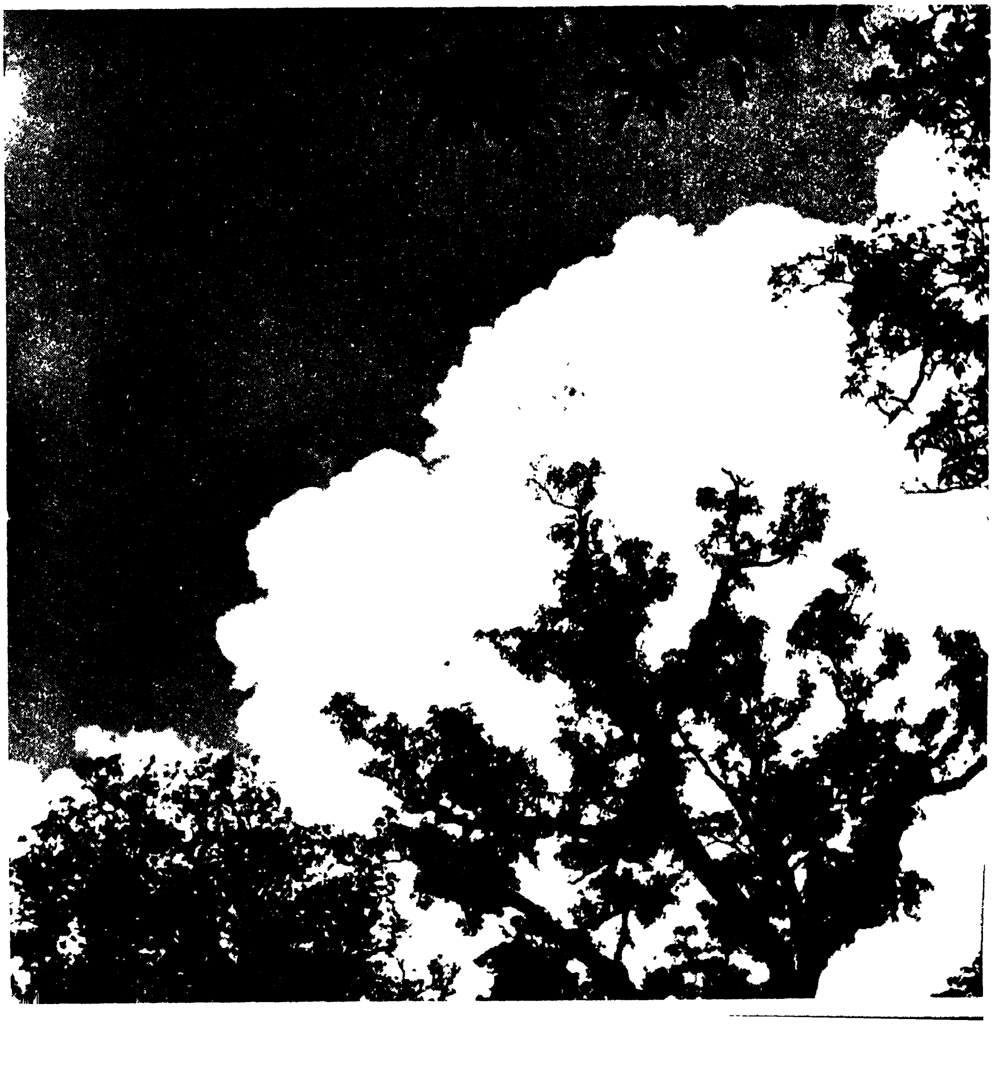


এমন ঘন ঘোর বরিষায়

ফটো—শৈলেন দে

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে—

ফটো—নীরোদ রায়



দার্জ্জিলিঙ









ফটো—বিমলশঙ্কর মিত্র



দ্রষ্টব্য—আগামী শ্রাবণ হইতে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করা হইতেছে

আরণ্যক

ফটো—নীলিমা সেন





যার বাটলেট হয়

অজর যৌবন

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

বসন্ত, শরৎ এসে গুঞ্জরিয়া যায় রাঙা গীত,
তুমি বল মোর দেহে বাসা বাঁধে উপবাসী শীত ?
জীবন-দিনান্তে মোর ছুঁইবে না সোনালী প্রভাত ?
মরুর মতন আমি ? হারিয়েছি সবুজের প্রীত ?

যৌবনের মন্ত্র বাজে পিয়ানোর ছন্দ-হিন্দোলায়,
রূপের নূপুর বাজে স্বপ্নময় পূর্ণ-চন্দ্রমায়,
সখা-সখী মুখোমুখী—ওষ্ঠাধর চুম্বন-আস্পদ,
ধরা দেবে নাকো তারা জরাতুর কষ্ট-কল্পনায় ?

তা নহে, তা নহে বন্ধু ! এ-জীবন রহস্য-আধার !
অতি-বৃদ্ধ বনস্পতি—স্কন্ধে কত শতাব্দীর ভার,
তারি কোলে খেলা করে নবাগতা ফুলদার লতা,
তারি প্রাণে শোনা যায় প্রণয়-সঙ্গীত পাপিয়ার !

প্রাচীন কোকিল পায় বাসন্তীর উচ্ছল উচ্ছ্বাস,
কলকণ্ঠে কুহরিত উষসীর উৎসব-উল্লাস।
মন যে সিন্ধুর মত, কোন দিন হয় নাকো বুড়ো,
জরতীর ঘরে খোঁজে যুবতীর নয়ন-উদ্ভাস !

ডাকে শোনো—ডাকে শোনো মানুষের চিরশ্যাম মন,
জরতীর ঘরে গিয়ে গাহে শোনো অজর যৌবন !
শুভ্রকেশ পৌষ সেথা হোরী খেলে ফাল্গুনের সাথে—
কুহেলিকা-পটে আঁকে আলো-ছবি ভাস্বর তপন।

চির-কিশোরের মত চেয়ে থাকি ধরণীর পানে,
পুরাতন তনুতটে ছোটে মন নূতনের টানে।
হাসে কত কচি মুখ, নাচে বুকে কাঁচা ভালোবাসা,
হব না স্থবির কভু অতীতের স্মৃতির শ্মশানে।

নিক্রমণ

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(দিলীপ-কে)

ঘন কুয়াশায় আলোর বৃত্ত দেখেছ ?
তা হলে বুঝবে ঝাপসা মনের কথা।
মেঘের ধোঁয়ায় ইন্দ্রধনু কি এঁকেছ ?
তা হলে জেনেছ পীড়িত স্নায়ুর ব্যথা।

বুঝবে তো জানি রমণী-রচিত কর্ম্ম।
ঢালু পাহাড়ের গড়ানো গভীর খাদে
ঘন বনানীর বিস-বাষ্পের মর্ম্ম
কিছু বুঝবেই পাথর-নিথর চাঁদে।

পাহাড়িয়া হাটে মনের বেসাতি জমে না,
ভঙ্গুর মন জীর্ণ শরীরে বাঁধা ;
দিনান্তে দেখি পুঁজি তো কিছুই কমে না,
দিগন্ত-স্মৃতি যাযাবর সুরে সাধা।

অকারণ হাসি, উচ্ছল প্রাণ-সোহাগে
নিকটে এসেছ, হয় তো বুঝেছি ভুল।
নির্জ্জন অনুভূতির জাগানো রাগে
রাঙিয়েছি এক তরাই-য়ের বুনো ফুল।

সে ফুলের নীচে ভাসে যে বৃন্ত-জাল
কোথায় তাহার শিকড়—কে-ই বা জানে !
হয় তো বা নেই মূলের অন্তরাল
শুধু রহস্য রঙের বাহার টানে।

তুমি থাকো ওই অধীর ব্যস্ততায়,
আমি চলে যাবো যেখানে সৌর রথে
ঘুরছে জীবন নূতন প্রতীক্ষায়
আলো-ঝলমল অনাবিষ্কৃত পথে।

ফেলে দিয়ে যাবো ভেসে-আসা কুয়াশার
লঘু অস্বচ্ছ ভাবনা-মেঘের জাল।
হয় তো থাকবে হঠাৎ কাছে আসার
একটি গভীর উজ্জ্বল ক্ষণকাল।

ঘুমের পাহাড়-শিয়রে সুনীলাকাশ,
নীচে দেখা যায় অস্ফুট দীপমালা।
শোনা যায় ক্ষীণ হাসির কলোচ্ছ্বাস,
ঊর্দ্ধে গগন-তোরণে জীবন-ডালা।

খুড়ো ঠাকুর

শিল্পী—শৈল চক্রবর্ত্তী



প্রথম পালা

এক নম্বর দৃশ্য

সময় শীতের দেরী হওয়া সকাল—

বালীগঞ্জের বুকে অনেকখানি বাগান নিয়ে আধুনিক কায়দার ছিমছাম সুন্দর একখানি বাড়ি। বাগানের দুই প্রান্তে দুটি লোহার ফটক, মোটরগুলো যাতে এক দিক দিয়ে ঢুকে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে সেই জন্য করা। ফটক দুটির পাশে খাড়া হওয়া থামগুলো ফুল সমেত লতার ভারে প্রায় চাপা পড়ার দাখিল।

বাড়ির হাঁ-করে-থাকা মুখবিবরের মত বিরাট গাড়ীবারান্দা যার দাঁতের মত ঘর কাটা কাটা ফাঁকে নানা রকম ফার্ণগাছ কোথাও পিতলের কোথাও বা চীনেমাটির টবে সাজানো। সেই গাড়ীবারান্দা থেকে চার-পাঁচটা সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে লম্বা এপার ওপার টানা বারান্দা। একটা প্রকাণ্ড গ্রেট ডেন্ শিকলি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় গাড়ীবারান্দাটার রকে শুয়ে আছে। এমন সময় একটা লম্বা সরু স্পোর্ট্স্ গাড়ী গেটের কাছে এসে ইলেক্ট্রিক হর্ণ দিতেই মালী গেটটা খুলে দিল। গাড়ীটা হুস্ করে কাঁকর-বেছানো ঘোরানো পথটা মুহূর্ত্তে পেরিয়ে হাজির হল ঠিক গাড়ীবারান্দার তলায়। ঘুরে গেটের কাছে গাড়ীটা দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই কুকুরটাও গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দেখছিল! তার পর গাড়ীটা সামনে হাজির হওয়া মাত্র লাফিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে সুরু করবে, তাতে ভিতরের ঘরে ঝাড়-পোঁছে ব্যস্ত ঝাড়ন হাতে একটি বেয়ারা বেরিয়ে এসে গাড়ীর দরজা খুলে আরোহিনীকে সেলাম দিল।

হাল্কা আসমানী রঙের শাড়ীপরা সকাল বেলার বাহুল্য-বর্জ্জিত সাদাসিদে আলতো ভাবে সাজা আধুনিকা একটি মেয়ে। ঠোঁটে তার অস্পষ্ট লিপষ্টিকের একটু আভাস, সোলজারদের টুপিতে গোঁজা বেঁকানো পালকের মত, একথোকা হাসুনাহেনার হেলানো মঞ্জরী খোঁপাতে বেঁকিয়ে গুঁজে রাখা—যা একটু বেরিয়ে ঝুলে আছে, যেন সবুজ রেশমের তৈরী একটি থোপনা।

মেয়েটির নাম বাব্‌লী।

(বেয়ারাকে উদ্দেশ করে)

বাব্‌লী। এই, তোর সাহেব কোথায় ওরে?

বেয়ারা। ওঠেনি সাহেব, খায়নি এখনো চা।

বাব্‌লী। বলিস্ কি রে? ঘুমিয়ে রয়েছে এত বেলা কোরে?
জাগিয়ে দিবি তো যা—

(মেমসাহেবের হুকুম অনুযায়ী সাহেবকে জাগিয়ে দিতে বেয়ারা প্রস্থানোদ্যত এমন সময় বাব্‌লী আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে বাধা দিয়ে বলল)



বাব্‌লী। না না থাক, দরকার নেই
বিকেলেতে ফের দেখা হবে সেই
ঘুম ভেঙে জানি উঠে আস্‌লেই
বিরক্ত হবে বা

(বেয়ারা চলে যেতে যেতে ওর কথায় ঘুরে দাঁড়িয়ে বলবে)

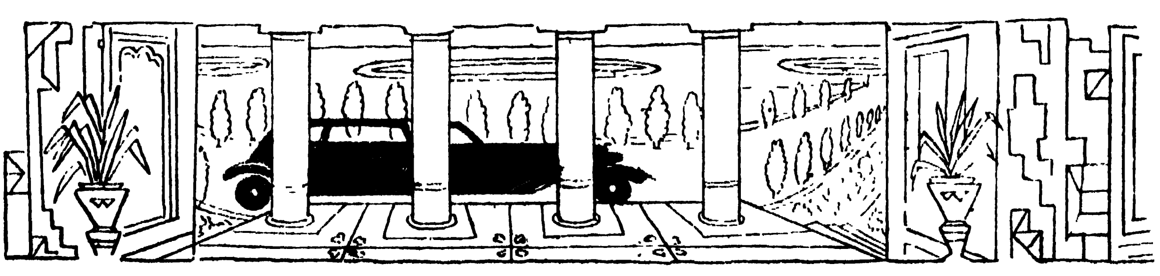
বেয়ারা। তা কি হয় মেমসাব
হুকুম রয়েছে সে যে—
'আসে যদি কেউ খবর দেবার'

(পাশের বড় গ্রাণ্ডফাদার ক্লকটার দিকে চেয়ে)

গিয়েছে আট্‌টা বেজে।

(তার পর পাশের টেব্‌ল থেকে সকালের খবরের কাগজটা মেয়েটির সামনে বেতের টেব্‌লে রেখে বলবে)

দিতেছি খবর এক্‌খুনি গিয়ে
কাগজটা একটু দেখুন না নিয়ে
চা টোষ্ট আমি যাচ্ছি যে দিয়ে



(ঝাড়নটা খুঁজতে খুঁজতে)

আঃ, ঝাড়নটা আবার
রাখল কোথায় কে যে ?

(এর পর বেয়ারা উপর দিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাবে। মেয়েটি তখন বেতের চেয়ার টেনে বসবে)

দু'নম্বর দৃশ্য

দোতলার শোবার ঘর।

অতি আধুনিক কায়দার একটি খাট ও অন্যান্য শোবার ঘরের অনুযায়ী আধুনিক কায়দার আসবাব-পত্র। এক পাশে একটা দামী ড্রেসিং টেব্‌ল, তাতে নানা রকমের খুঁটিনাটি পুরুষোচিত প্রসাধনের জিনিষ।

পুবের একটা খোলা জানলা টপকে খাটে শুয়ে থাকা ছেলেটির মুখে বেশ খানিকটা রদ্দুরের ঝলক এসে পড়ায় ছেলেটি আলিস্যি ভেঙে এবার উঠে বসবে। তার পর নরম শোবার ঘরের চটিটা পায়ে গলিয়ে ড্রেসিং গাউনটা গায়ে দিতে দিতে আস্তে আস্তে সেই খোলা জানলার ধারটিতে এসে হাজির হবে। তার পর নিজের মনে বলবে—ছেলেটির নাম টুটুল।

টুটুল। বাঃ রোদ্দুর, মিষ্টি রোদ্দুর
চারি ধারে ঝলমল,
আলোয় আলোয় ভরপুর হয়ে
করে যেন টলমল !

(পরক্ষণেই টুটুল জানলার কাছ থেকে ড্রেসিং টেব্‌লের কাছে আসবে। তার পর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্রাসটা দিয়ে চুলটা ঠিক করতে করতে চেঁচিয়ে)

টুটুল। গরম পানি লে আও বেয়ারা
চাকরগুলো বিষম বেয়াড়া—
হায়রান হনু দিতে গিয়ে তাড়া
ইস্, উধাও ভৃত্যদল।

(খাস-কামরার খানসামা বেড টি'র ট্রে সমেত ঢুকবে)

টুটুল। কোথায় গেছিলি ? চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে
ভেঙে গেছে মোর গলা
দেরী যদি হয় এবারে আবার,
দেব জোরে কানমলা।

খানসামা। মাফ্ করা হোক কসুর এবার,
হবে না দেরী যে আর।

টুটুল। সেভিং-এর পানি নিয়ায় তাহলে,
বকাস নে বার বার।

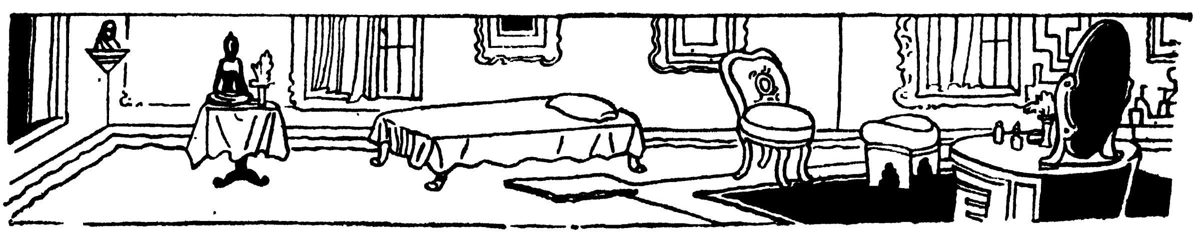


(খানসামা চলে যাবে। ড্রেসিং টেব্‌লের নীচু টুলটাকে চায়ের টেব্‌লের কাছে টেনে এনে টি-পট থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে টুটুল গুঞ্জরণ করবে।)

একাকী, একাকী—
কভু মিলিবে তোমার
দেখা কি ?
এখন থাকলে কাছেতে মেয়ে
হয়ত আমার পানেতে চেয়ে
গুন্ গুন্ গান গেয়ে
ঠোঁটেতে হাসিয় লেখা কি ?
চুড়িতে চুড়িতে টুং টাং কত
ভাঙা কুন্তল কপালে আনত
বিদ্যুতভরা অঙ্গুলি যত
খোঁপাখানি পিঠে মেলা কি ?
ঢেলে দিতে দিতে চা
হয়ত বলিতে বা
চায়ে চিনি আর দিতে হবে না
মিষ্টিতে মোরে চিনির চাইতে
কমতি লাগিছে না কি ?

(এমন সময় নীচের সেই বেয়ারাটি ঢুকলো। তার পর সেলাম দিয়ে)

বেয়ারা। মেমসাব এক হুজুরের সাথে
মোলাকাৎ আশে আসিয়াছে প্রাতে
বসবার ঘরে রহিয়াছে বোসে
এখনো অপেক্ষাতে।



টুটুল। উধার হাম্‌রা লে যাও খানা
উন্‌কা হাম্‌রা সেলাম দেয়ানা
আতা হায় 'হাম আভ্‌ভি' ক'হানা
একসাথ খানা খাতে।

তিন নম্বর দৃশ্য

নীচের বারান্দায় বেতের ছোট ছোট টেব্‌ল জোড়া লাগিয়ে একটা বড় টেব্‌ল করা হয়েছে, তাতে সকাল বেলার উপোস ভাঙা অর্থাৎ ব্রেকফাষ্টের নানা উপাদান ফল, জ্যাম্‌ টোষ্ট, চা ইত্যাদি সাজানো। এমন সময় গ্রে ব্যাগ্‌স আঁটা কোটটা কাঁধে ফেলা অবস্থায় সিগ্রেটের টিন হাতে উপরের সিঁড়ি দিয়ে টুটুলকে নামতে দেখা যাবে।



টুটুলকে দেখতে পেয়ে ব্রেকফাষ্ট টেব্‌লের সামনে বসে থাকা বাব্‌লী চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আগ্রহের সঙ্গে উতলা হয়ে বলবে

বাব্‌লী। এই যে টুটুল, সকালে এসে—
বিরক্ত তোমায় করছি শেষে।

টুটুল তখন বারান্দায় নেমে এসেছে, তার পর বাব্‌লীর কথায় আশ্চর্য্য হয়ে

টুটুল। কিন্তু ব্যাপরাটা কি সে তব?
বাব্‌লী। তোমারে হেরিনু স্বপ্নেতে সে কী—
ধাক্কা লেগেছে মোটরেতে দেখি!

(শিউরে উঠে বাব্‌লী)

কি আর তোমারে কব।
ওঃ, ধড়ে বুঝি প্রাণ আসে
আপাততঃ তুমি দেখিয়া পাশে,

(একটা নিশ্চিন্ততার ভঙ্গিতে নিশ্বাস ফেলে)

যাক্‌ এখন এবারে
ভাবনা-বিহীন হব।

(টুটুল বাব্‌লীর ঘুমে ঢুলে আসা চোখ দেখে)

টুটুল। রাত্রিতে বুঝি হয় নাই ঘুম?
বাব্‌লী। কি বলছ তুমি—ঘু-উ-ম?
সারারাত জেগে সে কি মহা ধুম
যেন হার্টফেল্‌ হব হব।

(টুটুল বাব্‌লীর কাছে ঘনিষ্ঠ ভাবে সরে এসে আলতো আদরে ওকে উপ্‌ছে তুলে)

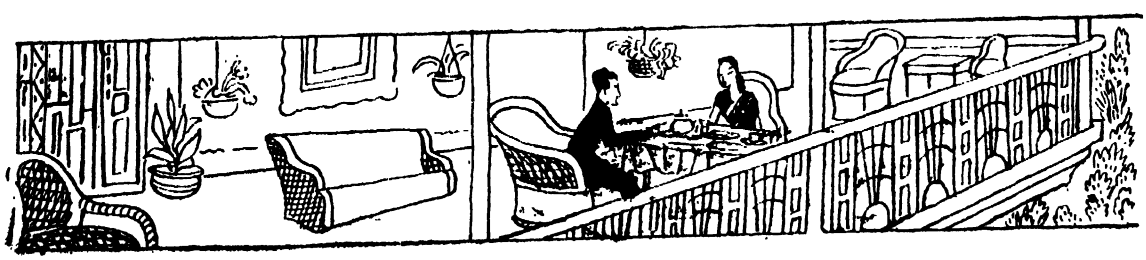
টুটুল। বেচারা বাব্‌লু! আহা কি মিষ্টি
ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়িছে দৃষ্টি
এত নিদারুণ ভালবাসা তব
জানিতাম আমি কিবা!

(বাব্‌লী একটু খুকীদের মত আহ্লাদিপনা করে বলবে)

বাব্‌লী। যাও, যাও খালি চালাকী সবেতে
ঠাণ্ডা চা-টাই হবে দেখি খেতে

(এবার ব্রেকফাষ্ট টেবলে দুজনে পাশাপাশি দুটি চেয়ারে কাছাকাছি হয়ে বোসে)

টুটুল। কথাতে তোমার গেছিলাম মেতে
তাতে, হোলো দোষ কিছু কিবা?
বাব্‌লী। ভালবাসি বলে সুবিধা পেলেই
খালি, রাগিবে সুযোগ নিয়া।
টুটুল। আবার দুষিছ শুধু শুধু মোরে
হে মোর রাগিনি প্রিয়া।
বাব্‌লী। দোষ দেব কেন ছি ছি ছি ছি ছি
ঝগড়া করিছ কেন মিছিমিছি?
ছুতো করে চল একটি সে 'কিছি'
দেবে পৌছতে গিয়া।
টুটুল। হায় রে কপাল, ফাটা সে কপাল।
তিন-তিনটে নিমন্ত্রণ।
এখুনি বেরিয়ে যেতে হবে হায়—
রেগো না লক্ষ্মী ধন।
বাব্‌লী। রইল মনেতে, রাখলে না কথা।
আড়ি আড়ি আড়ি আড়ি।
টুটুল। ঝুটমুট কেন ঝগড়া করিছ,
চল ওঠা যাক্‌ গাড়ী।



(টুটুল পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বেয়ারার দিকে হুকুমের সুরে বলে)

টুটুল। নিয়েছে সোফার গেরাজের চাবী
উস্‌কা বোলাও জলদি সে আভি,
নিকালনে বোলো টু-সিটারখানা
এক্‌খুনি তাড়াতাড়ি।

(এবার ঘুরে বাব্‌লির দিকে চেয়ে টুটুল বলে)

টুটুল। পরশু বিকেলে
পাব কি গো গেলে
দর্শন তব ?

বাব্‌লী। শত কাজ থাকে
তবু তারি ফাঁকে
আশায় নব
যদি দেখা পাই
তাই পথ চাই
তাকায়ে রব।

(সোফার গাড়ী ড্রাইভ করে বাব্‌লীর গাড়ীর পিছনে গাড়ী-বারান্দার তলায় গাড়ীখানা বন্ধ করে গাড়ীর চাবি হাতে বারান্দায় উঠে এসে সেলাম দিয়ে বললে)

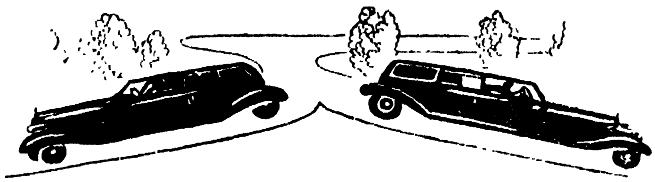
সোফার। হাজির হুজুর, হয়েছে গাড়ী যে।

বাব্‌লী। তাড়াতাড়ি ওঠো চলি গো বাড়ি যে।

টুটুল। চল, বার হই একসাথে।
দিয়েছি কি ব্যথা কি জানি জানিনি
অভিমান কোন কোর না মানিনী
জানি আজ মোর
বেদনা-বিভোর
তাই ভেবে ঘুম নাই রাতে।

(টুটুল আর বাব্‌লী নিজের নিজের গাড়ীতে একসঙ্গে বের হবে তার পর ফটক পেরিয়ে দুজনে দুপথে চলে যাবে।)

(শুভো ঠাকুরের এই 'অপেরাটি' শীঘ্রই সিনেমায় সুরু হবে।)



মুখ

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

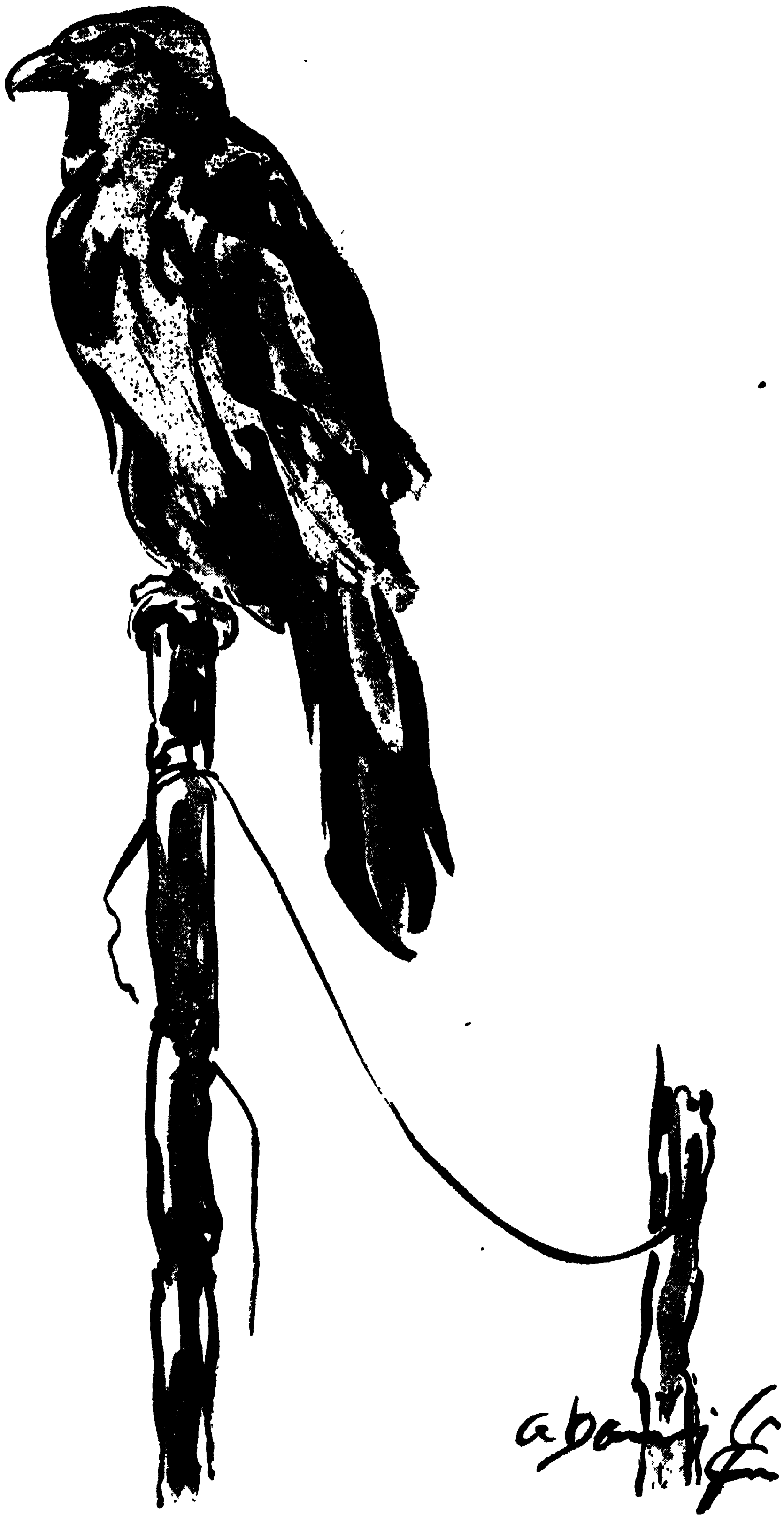
তোমার মুখের মতো আর কোনো মুখ দেখিনি তো
তোমার চোখের মতো অন্ধকার গভীর অতল,
তোমাকেই তাই আজ প্রশ্ন করি অনেক দিনের
কপালের সেই লেখা সে কি আজ হয়েছে সফল ?

বৈশাখের আম্রকুঞ্জে মঞ্জরীর সফল শুভ্রতা।
বাতাস মন্থর হোলো, মন আজ উড়ে যায় কোথা ?
সমুদ্রের স্বাদ পেয়ে সে কি আজ দুরন্ত হয়েছে ?
কোনো ঝাউ-বন তার বাঁকা-পথে ছায়া ফেলে গেছে

এ-সব আমার কথা, তাই দিয়ে তোমাকেই চিনি
তোমার মুখের মতো কোনো মুখ কোথাও দেখিনি।



শিল্পী—গোপাল ঘোষ



শিল্পী—অবনী সেন

দমকা হাওয়া

বিমলচন্দ্র ঘোষ

ক্লাইভের আমলের পুরোনো বাড়ীটার হাড়-পাঁজরা খসিয়ে
আচম্‌কা এল একটা দম্‌কা হাওয়া
এমন হাওয়া আর কখনো আসেনি।
ঝরে গেল বালির পলেস্তারা, আল্‌গা শুরকি, ঘেঁসের গাঁথ্‌নির দেয়াল,
মচ্‌মচ্‌ ক'রে উঠ্‌লো জান্‌লার ছিটকিনী, খড়খড়ি কব্জাগুলো,
বাড়ীটা যে কোনো মুহূর্ত্তে পড়ে যাবে।
জমিদারীর চৌহদ্দী-আঁকা মানচিত্রখানা
দম্‌কা হাওয়ায় উড়ে গেল—
বাজে-তাড়া পায়রার মত।
উড়ে গেল বহু কালের জমানো ধুলো
পোকায় কাটা পাঁজীর জীর্ণ হলদে পাতা
পরচা দাখিলা ঠিকুজী কোষ্ঠী
দেয়ালে টাঙানো বংশ-পরিচয়ের তালিকা
সেই দম্‌কা হাওয়ায়—
এমন হাওয়া আর কখনো আসেনি।
জং-ধরা হুক্‌ উপড়ে চুরমার হ'ল ফ্রেমে বাঁধা ছবি
চোগা চাপকান সাম্‌লা আঁটা প্রপিতামহের
কোম্পানীর আমলের হোমরা-চোমরা দেওয়ান বাহাদুর
হুমড়ি খেয়ে পড়লেন দম্‌কা হাওয়ায়।
কী দুর্দ্দান্ত সেই ওলোট-পালোট করা হাওয়া।

খোওয়া ওঠা মেঝেয় আছড়ে পড়া ঝাড়-লণ্ঠনের আওয়াজে
ঝন্‌ ঝন্‌ করে উঠলো দু'শ বছরের ইতিহাস
অবিশ্বাস্য ভূতুড়ে গল্পের মত সেই দমকা হাওয়ায়
বাম দিকের আকাশ জুড়ে এল সেই দুরন্ত হাওয়া।
উথ্‌লে ওঠা প্রাণ-সমুদ্দুরে
লাফিয়ে চললো তুমুল ঢেউ সংসারের কূলে কূলে,
দক্ষিণ পাড়ার আটচালা ভাসিয়ে
আঁৎকে ওঠা তাঁত ঘরের কাদার পাঁচিল ধ্বসিয়ে
হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়া চণ্ডীমণ্ডপের তলায়
চাপা পড়লো রামনামের মাহাত্ম্য।
চরকায় কাটা সুতোর পাঁজে জটপাকানো আধ্যাত্মিকতা
ভাসিয়ে নিয়ে চললো সেই দম্‌কা হাওয়া।

আচম্‌কা এল সেই দমকা হাওয়া
বাঁ দিক থেকে ডাইনে:
পুরোনো গাছ-পালার শেকড় উপড়ে
পরশ্রমজীবীদের দালান কোঠার ভিত টলিয়ে
দুর্গ প্রাসাদ জেলখানার লৌহ কঙ্কাল—
বেজে উঠলো ভয়ঙ্কর শব্দে।
চরম পরীক্ষার কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল
মরুচারী অশ্বারোহী দস্যুর মত
বিদ্যুতের বল্লম হাতে ঝড়েরা
শাঁ শাঁ শব্দে ছুটে এল:
আকাশ চিরে শিষ্‌ দিয়ে ওঠা উড়ন্ত বোমার মত সেই হাওয়া।

দুটি দিন

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই এক বর্ষার দিন,
সারা দিন ঝিম ঝিম ঝিম
ঝরেছিল জল—
সেই এক বর্ষার স্তিমিত আকাশ
পাগল বাতাস
গ্রামে গ্রামে তুলেছিল ঝোড়ো কোলাহল
আর
সারা দিন রিম ঝিম ঝিম ঝরেছিল জল।
সেদিন অনেক লোক—বহু অগণন
শস্যের সোনার স্বপন
একেবারে ভেঙে
সারা গ্রাম খালি করে শহরে এসে
ভিখ মেঙে মেঙে
জীবনকে চেয়েছিল রাখতে বেঁধে
সেই এক বর্ষার দিন
বিরহিণী গ্রাম সারা হয়েছে কেঁদে।

এই এক রৌদ্রের দিন
কুয়াশায় আকুল সকাল—আধ বিমলিন।
কাঁচা রোদে পাকা ধানে অদ্ভুত মিল
আকাশের নীল
নিবিড় স্নেহের মত হয়েছে গাঢ়।
ফলন্ত ফসলের হাতছানিতে
ব্যস্ত সবাই নেই সময় কারো।
একদা যে প্রান্তরে সবুজ স্বপন
উঠেছে জ্বলে
সে স্বপন আজ দেখি সোনার মতন
উঠেছে ফলে।
সারা মাঠ উন্মাদ কাজের ঝড়ে
ধান হয়ে ফলেছিল মাঠের পরে
প্রাণ হয়ে জ্বলে ওঠে প্রতিটি ঘরে
সারা মন সে-ধানের রঙেতে রঙিন
এই এক রৌদ্রের দিন।

বিবাহপ্রথার উৎপত্তি

শ্রীমতী বিভাবতী বসু

বিবাহ করাই স্বাভাবিক, না করাটাই অস্বাভাবিক। যাঁরা আজীবন অবিবাহিত থাকেন, তাঁরা বিশেষ কোন কারণের জন্যই থাকেন। বিবাহ হয়ে উঠেছে মানব-মানবীর স্বভাবধর্ম্ম। এমন এক দিন ছিল যখন বিবাহ বলে কোন কিছু পৃথিবীতে ছিল না। সে হল বর্ব্বর যুগ (primitive age)। মানুষ ছিল সেদিন যাযাবর উচ্ছৃঙ্খল; সেদিন তারা প্রায় পশুর মতই ছিল! যৌন আকাঙ্ক্ষা, আর তার পরিতৃপ্তি (passing away the desires) নিয়ে তাদের চলাফেরা ছিল। মানুষের বিবেচনা-শক্তি, সদা এগিয়ে চলার স্পৃহা, সৃষ্টি করবার আকাঙ্ক্ষা, অবস্থাকে উন্নত হতে উন্নততর করতে লাগল। মানুষ তার স্বাভাবিক নিয়মে চলতে গিয়ে, স্বভাবধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ করতে গিয়ে বিবাহ-প্রথা সৃষ্টি করেছে। অভিব্যক্তি অনুযায়ী চলার ফলে নব নব রূপের ও নব নব বস্তুর আবির্ভাব ঘটে। বিবাহ-প্রথাও তেমনি এসেছে। বিবাহ-প্রথার স্রষ্টা মানুষ নিজে।

বর্ব্বর যুগে মানুষের কোন রাজনীতি-জ্ঞান ছিল না, প্রত্যেকে সে যার প্রভু ছিল। বিবাহ-প্রথা ছিল না; সম্মিলন ছিল একমাত্র কামনা চরিতার্থ করা। কোন বাধা-নিষেধ, আইন-কানুন ছিল না। পরের যুগে মানুষ বাঁচবার জন্য বড় বড় জন্তুর হাত হতে, প্রাণের টানে বিচ্ছিন্ন মানুষ আত্ম-বশ্যতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সঙ্ঘ হয়ে বাস করতে লাগল। মনের নিঃসঙ্গতা ঘুচাবার জন্য (to cease his solitary life) এবং মনের অনির্ব্বাণ ক্ষুধায় বিচ্ছিন্ন মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে লাগল। কিন্তু ঐ সমস্ত দলগুলির মধ্যে ভালবাসার বন্ধন ছিল না, federation ছিল না। এক দলের সাথে অপর দলের ঝগড়া-বিবাদ লেগেই ছিল,—ঐতিহাসিকগণ ইহার জন্য বলেন—"Stage and strife was the order of that day." ডারউইনের থিওরী অনুযায়ী Survival of the fittest—ঐ সমস্ত দলের মধ্যে কোন কোন দল সংখ্যায় গরিষ্ঠতার জন্য, দলের নিজেদের মধ্যে একতার জন্য অন্যান্য দলের চেয়ে বেশী শক্তিশালী ছিল; সেই হেতু দুর্ব্বল দলের সাথে চলতে চাইল না। হীনমন্যতার (complexity) উৎপত্তি এখান হতেই। হীনমন্যতার জন্যই যৌন সম্মেলনে আত্ম-কেন্দ্রিকতা দেখা গেল—ফলে সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান বংশধর উৎপত্তি হল, সংখ্যার দিক দিয়েও বেশী হতে লাগল। (They freely indulged in promiscuous sexual relations) এর মধ্যে নর-নারী উভয়ে সর্ব্বপ্রথম ভালবাসার স্বাদ পেল। মানুষের হৃদয়ের ও আত্মার স্বভাবজাত আবেগ ও পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়া বিবাহের ও ধর্ম্মের উৎপত্তি। এই অবস্থার মধ্যে নর-নারীর সঙ্গে অপরের ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, ভালবাসতে পারার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হল—এই প্রয়োজনীয়তা বোধ হতে বিবাহের উৎপত্তি। প্রয়োজনীয়তা বোধ অর্থাৎ অভাব এবং অর্জ্জনের আশা ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা।

শক্তিহীন দলগুলি বিবাহ-প্রথার সুন্দর ফল দেখে বিবাহ-প্রথা মেনে চলতে লাগল। একটা কথা ত আছেই অসাধারণ নিয়ম আনে আর সাধারণ তা মেনে চলে।

কিন্তু সেই সময় শক্তিশালী দল দুর্ব্বলের উপর সদাই আক্রমণ করত এবং দুর্ব্বলদের পরাজিত করে তাদের যথা-সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে আনত। লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে নারীও পড়ত। শক্তিমান দলের লোকেরা লুণ্ঠিত দ্রব্য ভোগ করত—নারী হয়ে উঠল পুরুষের দাসী (servitude), নারী হয়ে উঠল "spoils"।

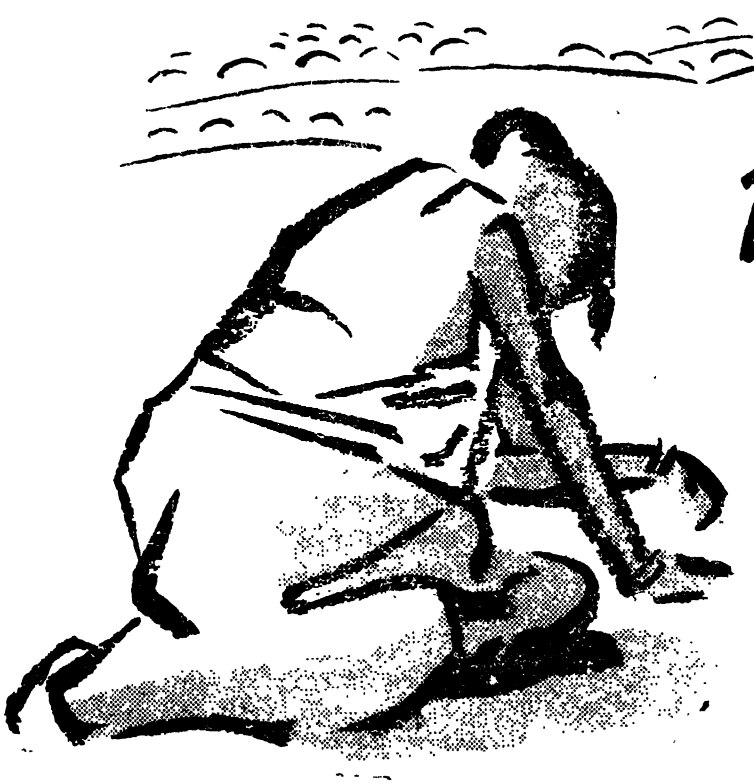
কালের কপোল তলে তরবারি যুগ বন্ধ হয়ে গেল, বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল একত্রীভূত হল—federation সৃষ্টি হল—ফলে শান্তি এল, তার সাথে আইন-কানুন সৃষ্টি হল। একের প্রতি অন্যের সহকর্ম্মিতার স্পৃহা জাগল। প্রেমের উপর বিবাহের ভিত্তি হল। ভালবেসে, কাছে বসে, দুজনে এক হয়ে মিশে যেত। যোগ্যতা ও গুণের উপর নির্ব্বাচন হত। এর পরের যুগে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। বিবাহ ধর্ম্মের অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হতে লাগল। বিবাহ সমাজের চেয়ে ধর্ম্মের জন্য প্রয়োজনীয় বলে লোকে মানতে লাগল। সমাজের চেয়ে, অর্থাৎ মানুষের চেয়ে বড় হয়ে উঠল ধর্ম্ম। বিবাহিত দম্পতির চলা-ফেরার উপর ধর্ম্ম অহেতুক বাধা-নিষেধ আরোপ করতে লাগল।—ফলে সেই পুরানো মনোবৃত্তি নারী দাসী আবার জাগ্রত হল! ধর্ম্মের অনুশাসনে নারীর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হল স্বামীকে সেবা করা, এবং পতি হল তার পরম গুরু।

তার পর হতে ক্রমাগত বিবাহ-প্রথা চলে এসেছে। যত প্রকার বিবাহ-প্রথা চলে এসেছে তা বলতে গেলে আট প্রকার—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস, পৈশাচ। রাক্ষস প্রথায় বর কনেকে জোর করে বিবাহ করে। নারী দাসী এই মনোবৃত্তির উপর এর ভিত্তি। আসুর প্রথায় কনে কেনা হয়—প্রায় রাক্ষস প্রথার মতই মনোবৃত্তি। একে অপরকে ভালবাসার মধ্য দিয়ে যে বন্ধন আসত, পাত্র-পাত্রী একে অপরকে নির্ব্বাচন করার মধ্য দিয়ে যে বিবাহ হ'ত তাকে গান্ধর্ব্ব প্রথা বলে। পৈশাচ প্রথায় নিয়ম-কানুন না থাকার জন্য যে স্বেচ্ছাচার উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায় (conflict of union and political confusion। আর যে বাকী চার প্রথা আছে তার প্রভাবও সময় সময় দেখা যেত।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

চা-বাগানে

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী



শাল আর মহুয়া-বনের ছায়াবীথি দিয়ে নির্জন মধ্যাহ্ন বেলায় কাঁঠালপাড়ার দিকে যাচ্ছিলুম। চারি দিকে ছায়াচ্ছন্ন নিবিড় বনানী। তার পিছনে অটল গাম্ভীর্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ধূসর পর্বতশ্রেণী। এই পাহাড়েই কিছু দূরে পাথর কাটার কাজ হচ্ছে। উন্মাদিনী পদ্মাকে শাসন করার জন্ম দুঃসাহসী মানব-সন্তান এই দুর্গম পর্বত কেটে সংগ্রহ করছে পাথর। এই পাথর পদ্মার বুকে চাপা দিয়ে তার উচ্ছৃঙ্খল চঞ্চলতা শান্ত করা হবে। অসংখ্য কুলি-কামিন কাজ করছে পাঞ্জাবী কন্ট্রাক্টারের অধীনে। বনের মধ্যে দিয়ে সর্পিল গতিতে রেল-লাইন একেবারে উঠে গেছে পাহাড়ের গায়ে গায়ে বেশ উঁচুতে। তাইতে গাড়ী-বোঝাই পাথর নিয়ে মালগাড়ী যাওয়া-আসা করে। গুরু-গম্ভীর হুইশিল দিয়ে যখন সেই মালগাড়ী বনপথ অতিক্রম করে যায়, তখন মনে হয় প্রকৃতির উপর যেন নিদারুণ প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে। অরণ্যের সেই স্নিগ্ধ প্রশান্তির মধ্যে যন্ত্র-দানবের আগ্নেয় গর্জন নেহাৎই বেমানান লাগে আমার কাছে।

সকাল থেকেই দিনটা মেঘলা করেছিল। আমি নানা কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছিলেম আমার বন্ধুনীর বাড়ীর দিকে। দু'ধারে সাঁওতাল কুলিদের বস্তি। পাথর কাটার জন্ম এদের গ্রামান্তর হতে এনে এখানে বস্তী পেতে বসানো হয়েছে। ব্যাঁকারীর বেড়া দেওয়া ছোট ছোট মাটীর ঘর। সামনে এক ফালি করে দাওয়া। চারি দিকে অপরিষ্কৃত খোলা জমি। ফসলের ক্ষেত। সেখানে উলঙ্গ শিশু, মুরগী, ছাগল একসঙ্গে খেলা করছে। বস্তীর প্রান্তসীমায় এসে হঠাৎ আমার কানে ভেসে এল একটি করুণ নারীকণ্ঠের আত্মবিলাপের ধ্বনি। আমি চমকে উঠলুম। এমন অসময়ে কে এখানে কাঁদে? হায়, হায়, এই বনের মধ্যে কোন্ অভাগিনীর না জানি কি বিপদ ঘটল। সামনে দিয়ে যখন যাচ্ছি, তখন একবার দেখেই যাই ব্যাপারটা কি। আমার কিশোর ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে উঠানের মধ্যে প্রবেশ করলুম। শব্দ লক্ষ্য করে কুটীরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। গবাক্ষহীন অন্ধকার গৃহের মধ্যে বাইরে থেকে কিছুই দৃষ্টিগোচর হবার উপায় নেই। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবছিলুম ঘরের মধ্যে যাবো কি, যাবো না? এমন সময় সেই অন্ধ কারার মধ্যে থেকে আলুথালু চুল, শ্লথ-বেশা এক ক্রন্দনময়ী নারীমূর্তি বেরিয়ে এসে আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। আমি তাকে চিনি! সে হচ্ছে পার্বতী। গাঙ্গু মাঝির আদরিণী স্ত্রী। এ-বস্তীর প্রায় সব মেয়েই পাহাড়ে কাজ করতে যায়। কিন্তু গাঙ্গু কোনও দিন পার্বতীকে পাহাড়ে ঝুড়ি বোঝাইর কাজ করতে যেতে দেয়নি। সে এত দিন আমার বাড়ীতে আমার মেয়েকে রাখত। কিন্তু কিছু দিন থেকে মাতৃত্বের আহ্বানের জন্ম সে আমার কাজ বন্ধ রেখেছিল। পার্বতীকে আমি বড় ভালোবাসতুম, তার পাশে বসে জিগ্যেস করলুম, "হ্যাঁ রে পার্বতী, তোর কি হয়েছে? এমন করে কাঁদছিস কেন, আমায় বল।"

পার্বতী তার রক্তবর্ণ চোখ দুটো আমার পানে তুলে ধরে আর্ত্ত কণ্ঠে বললে, "মাইজী গাঙ্গুকে ওরা নিয়ে গেছে।" পার্বতী আর কিছু বলতে পারে না। শুধু কাটা পাঁঠার মত যন্ত্রণায় ছটফট করে, আর হু হু করে কাঁদে। আমি বললুম, "পার্বতী শান্ত হ। গাঙ্গু কোথায় গেছে বল। আমি যেমন করে পারি, তাকে তোর কাছে এনে দোব। তুই চুপ কর।"

আমার কথায় পার্বতী একটু শান্ত হোল। তার পর বললে, "গত পরশু দিন, পাহাড়ে পাথর কাটতে গিয়ে গাঙ্গুর মাথায় একটা বিরাট পথেরের চাই ভেঙ্গে পড়ে। তাইতে মাথা ফেটে গিয়ে সে অজ্ঞান হয়ে যায়। তার পর আজ ভোরে সে মরে গেছে মাইজী। আমায় ছেড়ে সে কিছুতেই মরতে চায়নি। মরার সময় সে বলল, 'ভিটে ছেড়ে চলে আসার পাপ তাকে লেগেছিল।' তার ছেলের জন্ম সে আমায় মরতে বারণ করে গেছে। তা না হলে এখনই মরে এ যন্ত্রণা শেষ করে দিতে পারি আমি।"

উঃ! কি নিদারুণ ব্যাপার! আমার চোখে জল এসে গেল। কি বলে এই দুর্ভাগিনীকে সান্ত্বনা দেব আমি! বুকের মধ্যে আমার যেন জ্বলে যাচ্ছিল। ধনীর প্রয়োজনে, কত দরিদ্রের সুখের জীবন যে প্রতি পলে পলে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে তা কি কেউ দেখবে না? তার বিচার কি কেউ করবে না? তাই কি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :—



স্নানার্থী

শিল্পী—শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

"আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে ;
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে"—

শেষে অনেক বুঝিয়ে পার্বতীকে আমার বাড়ী নিয়ে যেতে যেই রাজী করেছি ঠিক সেই সময় সেখানে কতকগুলি লোক এসে দাঁড়াল। পার্বতীকে বলল, "কোম্পানীর সাহেব তোকে ডাকছেন পার্বতী।"—তাদের দেখে পার্বতী উদ্ধত ফণিনীর মত ফুঁসে উঠল। দৃষ্টিতে অগ্নি হেনে সে বললে, "চল তোদের সাহেবকে দেখে নিচ্ছি একবার। কি রকম মরদ।" সে তাদের দিকে এগিয়ে গেল। আমি তার হাত চেপে ধরে বললুম, "কোথায় যাচ্ছিস্ পার্বতী? এদের চিনিস্ তুই?"

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পার্বতী চিৎকার করে উঠল, "আমায় ছেড়ে দাও মাইজী। আমি যাবো। ওই কোম্পানীর সাহেবকে আমি জেল খাটাবো"—উন্মাদিনীর মত সে ছুটতে ছুটতে চলে গেল। লোকগুলি তার পিছু নিল। আমি ভাবলুম, সাহেব যখন ডেকেছে তখন নিশ্চয় ওকে কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে ওর মুখ বন্ধ করে দেবে। আমি অনুচ্চ কণ্ঠে বললুম, "পার্বতী ফিরে আমার বাড়ী যাস কিন্তু।" সে কি বলল, আমি শুনতে পেলুম না। শুধু একটা তীব্র আত্মবিলাপ কানে হু হু করে ভেসে এল।

সেদিন আমার আর কাঁঠালপাড়ায় যাওয়া হোল না। ভারাক্রান্ত মনে বাড়ী ফিরে এলুম। স্বামী বাড়ী ফিরে বললেন, "জান শীলা, আমাদের পার্বতীকে চা-বাগানের লোকেরা ধরে নিয়ে গেল। ষ্টেশনে গাড়ী ছাড়ার আগে একটা বিকট গোলমাল শুনে আমি অফিস্ থেকে বেরিয়ে দেখলুম, দু'টো গাড়ী-ভর্ত্তি কুলিরা সেখানে গোলমাল করছে। তার মধ্যে পার্বতীও ছিল। সে আমায় দেখে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। আমি তার কাছে যেতে যেতে গাড়ী ছেড়ে দিল। হায় হায় বুদ্ধি করে তখন যদি গাড়ীটা একটু থামাতুম, তাহলে হয়ত পার্বতীকে রক্ষা করতে পারতুম।" আমার মাথার মধ্যে তখন ঝিম-ঝিম করছিল। যা শুনছি কিছুই যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। স্বামীকে বললুম, "পার্বতীকে কোথায় নিয়ে গেল?" স্বামী বললেন, "চা-বাগানে।"

শেফালির ব্যথা

বিভা সরকার

ভোর না হতে বৃন্ত টুটি ধরার বুকে পড়লি লুটি
ও শেফালি! শেফালি গো
কিসের অভিমান?
ঘুমিয়ে যবে জগৎ-হিয়া কে ডাকিল কি বলিয়া
এ কোন্ গোপন পূজার লাগি
জীবন বলিদান!
সুপ্ত রাতে জীবন জাগে তুষার তনু সোহাগ মাগে
ওগো রাতের সুন্দরী গো
গন্ধে গরীয়ান্।
আঁধারে কি জ্যোৎস্না রাতে হৃদয় তোমার আপনি মাতে
দৃষ্টি রবির সইতে ব্যাকুল
তাই কি ম্রিয়মাণ?
কার আভাসে সন্ধ্যা রাতে গন্ধ ঢালো অবাধ স্রোতে
রহস্যময় এ কোন্ প্রেমের
দিচ্ছ প্রতিদান।
শ্রাবণ-ধারার সঙ্গে ঝরি দূর্ব্বাদলে তৃপ্ত করি
একটি রাতের স্বপ্নে বিভোল
আপনি মর্ত্যবান্।
উষার যবে নয়ন ফোটে তোমার কেন জীবন টোটে
কিসের লাগি এদের সাথে
তোমার অভিমান?
স জাতে কার পূজার থালি দিচ্ছ আপন জীবন ডালি
রহস্যময় এ কোন্ প্রেমের
নিত্য প্রতিদান?

রূপসাধনার সুরুতে

বন্দনা দাশগুপ্ত

সৌন্দর্য্যের পূজারী মানুষ। সেই জন্ম কী পুরুষ কী নারী প্রত্যেকেরই অন্তরলোকে রয়েছে রূপের প্রতি এক প্রবল আসক্তি। এই আসক্তিই মানুষের মনের গভীরে তাই সৃষ্টি করতে থাকে এক একটি অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি যার লাবণ্য গোলাপের মাধুর্য্যকেও হার মানায়, যার চঞ্চল উচ্ছল প্রাণবেগ স্বপ্নলোকেও শিহরণ জাগায়।

কিন্তু মনোজগতের বাইরে এই স্বপনচারিণী মানসসুন্দরীর দেখা মেলে না—বুঝি রূঢ় বাস্তবের কঠিন ছোঁয়া তার সয় না।

এই অপরূপার মত রূপ নিয়ে কেউ জন্মায় না এ কথা সত্যি, কিন্তু তা বলে কী বাস্তবে কোনো সুন্দরী নেই? না সুন্দরী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা অন্যায়?

রূঢ় বাস্তবে সব-কিছুই চেষ্টা ও অধ্যবসায় দিয়ে আয়ত্ত করতে হয়। তাই মনোজগতের কল্পনাময়ী রূপসী না হলেও দৈনন্দিন জীবনে নিয়মিত যত্ন ও চর্চ্চার দ্বারা সুপ্ত সৌন্দর্য্যকে যে কোনো মেয়ে নিজের মধ্যে বিকশিত করতে পারে।

রূপ মানুষের জীবনে এক মস্ত-বড় দান—বিশেষ করে মেয়েদের জীবনে। নারীর দেহ ও মনের সাথে রূপ জিনিষটা অবিচ্ছিন্ন ভাবে এমনই জড়িত যে রূপকে তারা বিশেষ মূল্য না দিয়ে পারে না। সৌন্দর্য্য লাভের মোহ ও রূপের প্রতি আসক্তি তাদের মধ্যে তাই বেশী মাত্রায় প্রবল। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে নানা পরিবর্ত্তন হলেও—রূপচর্চ্চায় মেয়েদের সাধনায় তাই কোনো রকম ব্যতিক্রম ঘটেনি, বরং দিনের পর দিন তাদের প্রসাধন-সামগ্রী বেড়ে চলেছে। রূপচর্চ্চার বদল যেটুকু হয়েছে সেটা প্রসাধনের রীতিনীতিতে—তাই নিমের দাঁতনের বদলে 'টুথব্রাশ' ও টুথপেষ্ট' দেখতে পাই, আর মা-দিদিমাদের আমলের সর-ময়দার পরিবর্ত্তে Elizabeth Arden, Coty beauty aids প্রভৃতির আমদানী বেড়ে চলেছে।

অনেকের ধারণা যে, পাশ্চাত্য আধুনিকতার ঢেউ লেগেই আমাদের দেশে এ যুগের মেয়েরা বেশভূষা সম্বন্ধে অত্যধিক সচেতন হয়েছে এবং স্নো, ক্রীম, পাউডার মেখে তাদের নিজেদের শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টাটা নেহাৎই হালফ্যাসানি এক বিলাসিতা। কিন্তু পুরোনো ইতিহাস, কাব্য ও সাহিত্য আলোচনা করলে জানা যায় যে—সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান ও নৈপুণ্য সেই সুদূর প্রাচীন কালেও আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। সেকালের প্রসাধন-বর্ণনায় তাই কবি বলেছেন—

> "অলক সাজতো কুন্দ ফুলে,
> শিরীষ পরতো কর্ণমূলে,
> মেখলাতে দুলিয়ে দিত
> নব নীপের মালা—
> ধারা-যন্ত্রে স্নানের শেষে
> ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে
> লোধ্র ফুলের শুভ্র রেণু
> মাখতো মুখে বালা।"

রূপচর্চ্চার উদ্ভবই যে প্রাচ্যে, একথা আধুনিক পাশ্চাত্য সৌন্দর্য্য-বিশারদেরাও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন না। পাশ্চাত্য মেয়েরা যখন প্রথম প্রসাধন-সামগ্রীর ব্যবহার শিখল, তখন তাদের প্রসাধনের মাল-মশলা মিশর, আরব ও ভারত থেকেই রপ্তানী হ'ত।

কিন্তু যুগের হাওয়া গেছে বদলে, তাই বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রচুর পরিমাণে প্রসাধন-সামগ্রী উৎপাদন করতে সক্ষম হওয়ায় পাশ্চাত্য প্রসাধন-সামগ্রীই আজ সারা প্রাচ্যে ছড়িয়ে গিয়েছে। তাই সেদিনের প্রসাধনের প্রাচীন রীতিনীতি ভেসে গিয়ে সেখানে এসেছে রূপ-সাধনায় প্রতীচ্যের রূপ-বিশারদদের নিত্যনতুন মত ও মনোহরণকারী নানা প্রসাধন। আর আমাদের দেশের মেয়েরাও সহজ ও সুলভ উপায়ে সুন্দর হওয়ার লোভ ছাড়তে না পেরে পাশ্চাত্যের আমদানী এই সব প্রসাধনের প্রতিই আকুল আগ্রহে ঝুঁকে পড়েছে।

সৌন্দর্য্যের যখন মস্ত-বড় মূল্য আছে তখন তার সাধনায় প্রসাধনের নিশ্চয়ই প্রয়োজন। কিন্তু প্রসাধন দেশী হবে কী বিদেশী হবে তা নিয়ে প্রশ্ন নয়—প্রশ্ন হচ্ছে, সুন্দরী হবার অখণ্ড ইচ্ছা নিয়ে। প্রচুর অর্থ, সময় ও অধ্যবসায় এই শ্রী-সাধনায় খরচ করা সত্ত্বেও যখন তাদের সাজে-পোষাকে শ্রী ও রুচির হীনতারই পরিচয় পাই, তখনই আপত্তি।

মূল কথা, যখন সুন্দর হওয়ার চেষ্টা, তখন এমন ভাবে পোষাক পরিচ্ছদ ও প্রসাধন করা উচিত যা নিজের চোখকেও তৃপ্তি দেয়, অপর পাঁচ জনকেও আনন্দ দেয়। যেহেতু পাশ্চাত্য মেয়েদের "লিপষ্টিক" মাখলে ভাল লাগে, যেহেতু তারা চুল ছোট করে কাটে—তা ব'লে যে আমাদেরও তাই করতে হবে এবং করলে ভাল দেখাবে এর কোনো মানে নেই। সব সময়ই একটা কথা মনে রাখা উচিত যে, পাত্রভেদে একই জিনিষ এক জনের পক্ষে ভাল, অন্যের কাছে তা ভাল নাও হ'তে পারে। আমাদের প্রাচ্যের মজ্জাগত ভাবধারাকে বজায় রেখে যদি তার মধ্যেই নিজেদের সুন্দর করবার চেষ্টা করি, তাহ'লেই সব দিক থেকে ভাল। তার জন্যে আমাদের যদি কিছু প্রাচীন ভাবধারাকে বজায় রাখা প্রয়োজন হয় তা রাখতে হবে, আর প্রাচ্য-প্রতীচ্যনির্ব্বিশেষে অপ্রয়োজনীয় উপকরণকে বাদ দিতে হবে।

আজ-কাল আমাদের দেশের অনেক মেয়েই 'লিপষ্টিক' 'রুজ' 'পাউডার' প্রভৃতি প্রসাধনী ব্যবহার করেন, কিন্তু ঠিক উপযোগিতা বুঝে সবাই সব কিছু বেছে নিতে পারেন না। রূঢ় হ'লেও এ কথা সত্যি যে, এর মূলে রয়েছে অন্ধ অনুকরণ-বৃত্তি ও সুরুচির একান্ত অভাব। কোন্‌টা তাদের মানাবে, কোন্‌টা মানাবে না, সে বিষয়ে তাদের যেমন দৃষ্টিও নেই, তেমনি জ্ঞানও নেই। কাজেই বেশীর ভাগ সাজ-পোষাকই চোখকে পীড়া দেয়। অবশ্য এজন্য আমাদের দেশের মেয়েদের খুব দোষ দেওয়াও চলে না। কারণ, পাশ্চাত্য দেশের মত আমাদের দেশের মাসিক, সাপ্তাহিক, বা দৈনিক কোনো পত্রিকাই সুরুচি শিক্ষা দেবার ভার নেয়নি। তাই আমাদের দেশের মেয়েদের রূপরুচি সুপথে চালিত হয় না ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে জ্ঞানও প্রসারতা লাভ করতে পারে না।

পাশ্চাত্য দেশে ফ্যাসান ব্যাপারটা বুদ্ধি ও রুচির এমন পর্য্যায়ে এসেছে যে, এখন আর এটা শুধু মেয়েদের খেয়াল-তুষ্টির মধ্যেই আবদ্ধ নেই। দেশের বড় বড় ব্যবসায়ীরা এই ফ্যাসানের অদল-বদলের সংগে জড়িত। প্যারিসের হাজার হাজার লোক এই ফ্যাসান বজায় রাখার মাল-মশলা সরবরাহ ক'রেই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ও-দেশের সৌন্দর্য্য ও ফ্যাসান-বিশারদেরা তাদের মেয়েদের জন্য সাঁতার দেবার পোষাক থেকে চাপাটি, নৈশভোজন, বিবাহ ইত্যাদি সব রকম

পোষাকেরই রঙ, ছাঁট-কাট সারা বছরের মত নির্দেশ ক'রে দেয়। প্রতি বছর এই ফ্যাসান বদলে যায় এবং ও-দেশের মেয়েদের পোষাক ও পরিচ্ছদে নিত্যনতুন যুগান্তর ঘটায় এই সব বিশারদেরা। শুধু এই-ই নয়, এমন কি 'লিপষ্টিক' 'পাউডার' প্রভৃতি কী কী রঙের হবে তাও তাদের নির্দেশ ক'রে দিতে হয়। কাজেই পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের স্বতন্ত্র কোনো রকম রুচি না থাকলেও তাদের পোষাক-পরিচ্ছদে সুরুচির অভাব চোখে পড়ে না।

কিন্তু আমাদের দেশে যা নেই তার জন্ম দুঃখ কিংবা আফশোষ ক'রে কোনো লাভ নেই বরং যতটুকু সুযোগ-সুবিধা আছে তার মাঝখান থেকেই আমাদের সুরুচি শিক্ষা করবার জন্ম সচেষ্ট হ'তে হবে।

ওদের কাছ থেকে শুধু রূপচর্চার ইচ্ছাকে যদি আমরা গ্রহণ করি তাহ'লে ক্ষতি নেই; কিন্তু সেটা হুবহু প্রসাধন দ্রব্যগুলির না হ'য়ে ওদের সুরুচির অনুকরণ হ'লেই আমাদের পক্ষে মংগল। এ সম্বন্ধে একটা অতি সহজ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

পাশ্চাত্য দেশীয় মেয়েরা যে পাউডার মাখে তা রঙ ফর্সা করবার উদ্দেশ্যে নয়, মুখের তৈলাক্ত ভাব দূর ক'রে চামড়াটা মসৃণ রাখবার জন্ম। আর আমরা পাউডার মাখি রঙ ফর্সা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে, কাজেই কোনো কিছু না ভেবে সাদা বা গোলাপী রঙের পাউডারের একটা গাঢ় প্রলেপ নিশ্চিন্ত মনে মুখের উপরে দিই ও তার জন্ম কোনো রকম কুণ্ঠাবোধ করি না। কিন্তু এতে সত্যিই গায়ের আসল রঙ ঢাকা পড়ে না উপরন্তু গায়ের কাল রঙের সাথে সাদা বা গোলাপী রঙ মিশে অদ্ভুত লাগে দেখতে। সেই জন্ম যা ওদের সুন্দর করে, সেই একই জিনিষ আমাদের বিশ্রী করে শুধুমাত্র না জানার জন্যে। সৌন্দর্য্যবিশারদেরা সাধারণতঃ বলেন যে, গায়ের রঙের চেয়ে এক শেড্ গাঢ় রঙের পাউডার ব্যবহার করা উচিত, তাতে পাউডারের কৃত্রিম প্রলেপটাও নজরে পড়ে না, উপরন্তু মুখশ্রীকে উজ্জ্বল ও কোমল মসৃণতা দান করে। আমাদের পক্ষে অবশ্য এ নিয়ম মেনে চলা কঠিন, কারণ আমাদের দেশের বেশীর ভাগ মেয়েদের গায়ের রঙের চেয়ে গাঢ় রঙের পাউডারই পাওয়া যায় না। বিদেশী প্রসাধন-ব্যবসায়ীরা পাউডারের রঙ তাদের দেশের মেয়েদের গায়ের রঙ মিলিয়ে তৈরী ক'রে থাকেন, আর আমাদের স্বদেশী প্রসাধন-ব্যবসায়ীরা তাদের নকল ক'রেই খুসী থাকেন—তাই আমাদের প্রয়োজনমত আমাদের রঙ খুঁজে পাই না। যাই হোক্, দোষারোপ ক'রে লাভ নেই যখন, তখন নিজেদের সুবিধার জন্ম ঐ সমস্ত রঙের ভিতর থেকেই গাঢ় রঙ বেছে নিতে হবে। যেমন "ডার্ক সান্‌ট্যান", "ওকার রোজি" "রেচেল" ইত্যাদি। "রেচেল" রঙটা গাঢ় না হ'লেও, এ রঙটা আমাদের দেশের ফর্সা মেয়েদের পক্ষে ভাল। কারণ, তাদের হলদে রঙে এর হলদে আভার সংমিশ্রণ দেখতে সুশ্রী করে।

ও-দেশের মেয়েদের রঙ যেমন সাদা ধব্‌ধবে হয় সেই তুলনায় সাধারণতঃ ওদের ঠোঁট লাল হয় না, কী রকম এক ফ্যাকাশে মত হয়, তাই অমন সাদা রঙের সঙ্গে মিলিয়ে টুক্‌টুকে লাল লিপষ্টিক ওরা মাখে এবং তাতে ওদের স্বাভাবিক ও সুন্দরই দেখায়।

আমাদের দেশের মেয়েদের রঙে বাদামী ভাবটাই বেশী। তবে তাদের মধ্যে যারা খুব ফর্সা, তাদের রঙেও মেমেদের মত সাদা বা গোলাপী আভা দেখা যায় না। এদের রঙে হলদে আভাটাই প্রবল। কিন্তু রঙ ফর্সার দাবী ও অহঙ্কার নিয়ে অনেক সময় তাঁরা টুক্‌টুকে লাল "লিপষ্টিক", সাদা বা গোলাপী পাউডার ব্যবহার করেন ও মনে মনে নিজের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করেন। কিন্তু সত্যি করেই এ ধরণের প্রসাধন যে দেখতে কত বিশ্রী হয় তা তাদের ধারণার বাইরে। এঁরা ভুলে যান যে, রঙ ফর্সা হ'লেও তার মাঝে রকমভেদ আছে। কাজেই সব কিছুই রঙ ফর্সা হ'লে ব্যবহার করাও যায় না ও উচিতও হয় না। দেশীয় মেয়েরা যাঁরা "লিপষ্টিক" ব্যবহার করেন তাঁদের 'লিপষ্টিক'এর রঙ এমন বেছে নেওয়া উচিত, যাতে পান-খাওয়া ঠোঁটের মতই লাল রঙটা মুখের সঙ্গে স্বাভাবিক ও সুন্দর ভাবে মানিয়ে যায়। গায়ের রঙ যার যে রকম গাঢ়, 'লিপষ্টিক'এর রঙটা সেই রকম গাঢ় হ'লেই ভাল।

সত্যি কথা বলতে কী, লিপষ্টিক পদার্থটা আমাদের দেশের মেয়েদের ঠোঁটে সে রকম মোটেই মানায় না, বিশেষ বাঙ্গালী মেয়েদের। বাঙ্গালী মেয়েদের স্নিগ্ধ শান্তশ্রী ফুটিয়ে তুলবার জন্ম উপকরণের বাহুল্যের প্রয়োজন হয় না—সে আপনাতে আপনিই পরিব্যাপ্ত। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে তাদের প্রসাধন যত অনাড়ম্বর, সাদাসিধে ও স্বাভাবিক হবে, ততই রুচির পরিচায়ক ও সাফল্যমণ্ডিত হবে সন্দেহ নেই। কাজেই প্রসাধনে যাবতীয় বাহুল্যকে বাদ দিয়ে রুচিপূর্ণ সাদাসিধে ও স্বাভাবিক প্রসাধন করা উচিত—তাতে আমাদের জাতীয় ভাবধারাটাও বজায় থাকে ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আসতেও বাধা পায় না।

প্রসাধন কী ও সুরুচি নিয়ে প্রসাধন করতে গেলে কী কী করতে হবে, সে সম্বন্ধে এ তো গেল মোটামুটি কথা। কিন্তু সম্পূর্ণ সুন্দর হ'তে গেলে আরও কিছু জানা চাই। সেটা হচ্ছে প্রসাধন ব্যবহার করার কতগুলো সাধারণ ও মূল কথা। অনেক সময় দেখা যায় যে, সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান ও সুরুচি যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও অনেকে সুন্দর ও সম্পূর্ণ ক'রে প্রসাধন ক'রতে পারেন না, তার মূল কারণ, ব্যবহার করার সাধারণ নিয়মগুলি তাঁরা জানেন না।

বেহুলা

অনুপমা সরকার

বেহুলা গো জাগো আজি মৃত্যু-নীল দেখ লখিন্দর,
সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ ধরি কালসর্প হেনেছে দংশন,
হিন্তালের লাঠি হাতে দ্বারে জাগে চাঁদ সদাগর,
লৌহগৃহে প্রিয় তব মহা ঘুমে রহে অচেতন।
মৃত্যুর চক্রান্ত যত প্রেমে তব করি' পরাজিত,
মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপ্রাণ জাগাবে না মর্ত্ত্য মৃত্তিকায় ?
পত্তির গলিত দেহে বুলাবে না স্বর্গের অমৃত,
অভিশপ্ত প্রিয় তারে বাঁচাবে না প্রেম-সাধনায় ?
ভাগ্যের কুটিল চক্রে ভেঙ্গে গেছে সোনার সংসার।
পুণ্য-প্রদীপ জ্বালো, ওগো সতী, দুঃখের আঁধারে
মর্ত্ত্যের মুক্তির লাগি স্বর্গলোকে তব অভিসার
মানুষের মাঝে আনো দেবতার দীপ্ত মহিমারে।
প্রেয়সীর পানে চাহি প্রিয় আজ মাগিছে জীবন,
বেহুলা বাঁচাও তাঁরে, দূর করি' মুহূর্ত-মরণ ॥

জল-তরঙ্গ

শান্তি দেবী



জীবনের জল-তরঙ্গে কোন দিন সুর লাগেনি বলেই মনে হয়। তবু লম্বা কালো আর পুরুষালি গড়নের মেয়েটির নাম শোনা যায় তরঙ্গিণী।

ছুটো রাস্তা এসে যেখানে মিশেছে, তারি ঠিক কোণের ঘরখানায় তরঙ্গিণী থাকে। তার ঘরের কান ঘেঁসেই কর্পোরেশানের উপরি জলের টিউবওয়েল, আগে এখানে রামেশ্বর উড়ের তেলেভাজার দোকান ছিল, এখন হয়েছে তরঙ্গিণীর সংসার।

সুর যে লাগেনি সেটা আমরা, যারা বাইরে থেকে দেখি তারাই দেখি, তারাই বলি। কিন্তু বুষকাঠেও যে রসসঞ্চার হয় তা বোঝা যায় তরঙ্গিণী যখন যুগলের জন্যে বেলা ছুটোয় ভাত নিয়ে ফিরে আসে।

ভাতের থালাটা নামিয়ে রেখে তরঙ্গিণী ঘুমন্ত যুগলের দিকে চেয়ে একটু থমকে দাঁড়ায়। তার পর যুগলের গায়ে আস্তে ঠেলা দিয়ে বলে, "বলি সারা দিনই তো ঘুমোচ্ছো, এ-দিকে মুখখানা তো শুকিয়ে আম্‌সি হয়েছে। উঠে কিছু মুখে দাও;" তরঙ্গিণীর গলায় শত মিনতির সুর, যেন বেলা করে ভাত নিয়ে ফেরায় সেই অপরাধী।

যুগল আড়ামোড়া ভেঙে উঠে বসে, তার পর তরঙ্গিণীকে কোন কথা না বলেই মাথায় তেল ঘষতে ঘষতে টিউবওয়েলের দিকে চলে যায়।

স্নান করতে যুগলের সময় লাগে। টেরি বাগাতে আরো বেশী, সে সব দিকে যুগলের দৃষ্টি রাস্তায় দাঁড়ান মেয়েকেও হার মানায়। এর মধ্যে তরঙ্গিণী ঘরখানাকে পরিপাটী করে গুছিয়ে ফেলে। তরঙ্গিণী ঘর নোংরা মোটে দেখতে পারে না। যুগলের সারা দিন ঘর নোংরা করাই কাজ। বিছানা পরিষ্কার তরঙ্গিণীর বাতিক, কিন্তু যুগল ঘরে ঢুকে বস্‌তেই পারে না, চিৎপাত হয়ে বিছানায় পড়ে যায়, তরঙ্গিণীর সাধের তক্তপোষের বিছানা তাই প্রায়ই হয়ে থাকে লণ্ড-ভণ্ড। প্রথম প্রথম তরঙ্গিণী রাগতো, এখন আর রাগে না, সময় পেলেই পরিষ্কার করে। সব শেষ করে তরঙ্গিণী যুগলের জন্যে বাবুদের বাড়ী থেকে লুকিয়ে-আনা সেই ফুলকাটা আসনখানা পাতে, তার পর ঘটিতে জল গড়িয়ে অপেক্ষা করে। অবিশ্যি তরঙ্গিণী হাত তেমন করে বাড়ায় না নইলে—আর হাতই বা কেন? তার মনিব বুড়ো রায় বাহাদুরের আদিখ্যেতাটুকু কি আর তার নজরে পড়েনি? একটু আসকারা দিলেই তো রাণীর হালে সংসার চালাতে পারে সে। কি করে যে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে হয় তা তরঙ্গিণীই জানে। "মুখপোড়া বুড়ো হয়ে মরতে চল্লো তাব রকম দেখ না। গিন্নী পুণ্যিবন্তী তাই মরে খালাস পেয়েছে।" তরঙ্গিণী ভাবে, তবু যে এইটুকু তাকে করতে হয় সেও যুগলের জন্যে, এক জনের রোজগারে দুজনের খরচ চালান যায় আজ-কাল? অথচ যুগলকে কিছু করতে বল্লেই সে রেগে যাবে। বাঁকা করে বলবে, "বল্লেই তো পারিস্ চলে যাই। কে তোর ভাত খেতে চায় শুনি?" কিন্তু তরঙ্গিণী যুগলকে চলে যেতে বলতে পারে না। তার চেয়ে সে যেমন খাটছে তেমনি খাটবে। নয় দুটে-একটা ছোট জিনিষ সরাবার পাপ তার হবে, তা বাবুদের অমন কত দেব্যই তো নষ্ট হয়ে যায়. নিলই বা তরঙ্গিণী তার দু-একটা টুক্‌রো, কি আর এমন কমে যাবে তাতে বাবুদের ভাণ্ডার! কিন্তু তরঙ্গিণীর দুঃখ এইটুকু যে তবু যুগলের মন পায় না। এই তো সেদিন যুগল যখন বল্‌ল, "দেখ তরি, এক জোড়া জুতো নইলে রাস্তায় চলা যায় না, ভাবছি সেই গাড়ীর কাজটাই আবার নেব, হলোই বা বেশী খাটুনি, তবে দিনের বেলাতেও খাবার সময় মেলে না, যেটুকু ছুটি তাতে এতদূর এসে খাওয়া চলে না আবার ওদিকে ট্যাকও গড়ের মাঠ।" সেই রাত্তিরেই না তরঙ্গিণী বাবুর মেজ ছেলের সেই পুরানো কাব্‌লি জুতোটা নিয়ে এসেছিল। পাঁচ জোড়া জুতোর মধ্যে সে জোড়ার আর খোঁজ পড়েনি। খোঁজ যখন পড়লো তরঙ্গিণী তখন নাগালের বাইরে। বাড়ীতে তো আর সেই একটি ঝি নয়?

যুগলকে তরঙ্গিণী বাবুদের মতো করে সাজিয়ে রাখতে চায়, সাজলে মানায়ও যুগলকে—ভদ্রলোক হলেই তো আর চেহারা ভাল হয় না, পোষাকের জৌলুষে আর কায়দা-দুরস্ত চলা-ফেরায় তাদের দেখায় ভাল। নইলে ঘষা-মাজা চেহারা আর বিনুনীর মতো কথার নীচে যে মন তা আর তরঙ্গিণীর দেখতে বাকী নেই। এই তো সেদিন বাবুর সেই ক্যাটকেটে বড় বৌটা বলেছিল তরঙ্গিণীকে, "একটু পরিষ্কার থাক্‌তে পারিস্ না তরি, চেহারা দেখলে তো ঘেন্না করে।"

"পারি বই কি বৌদি। তরঙ্গিণী একটু চিমটি কেটে বলেছিল, "কিন্তু তেমন বেশী কাপড় কোথায়? দুখানি কাপড় আর কত পরিষ্কার রাখি বল, তাছাড়া কাজও হলো চব্বিশ ঘণ্টা। তাইতো বলি বৌদি, তোমাদের ঘরে যদি একটি কালো কুচ্ছিতও হয় তোমরা তাকে ঘষে-মেজে ফর্সা জামা-কাপড় পরিয়ে কেমন মেম-সায়েব করে তোল আর আমাদের ঘরে ফর্সা রং নিয়ে জন্মালেও রাখবার গুণে দেখায় যেন সেওড়া-গাছের পেত্নী। সবই বরাত কি না।"

ধমক দিয়ে বড়বৌ বলেছিল "দেখ তরি, তোর আজকাল বড় বেশী মুখ হয়েছে, একটু সামলে কথা বলিস্।" চুপ করে গিয়েছিল তরঙ্গিণী। অবশ্য মুখ তাকে সবখানেই সাম্‌লাতে হয়। নিজের ঘরে যুগলের কাছেও আবার এবাড়ীর খুদে কর্ত্তা থেকে খোদ কর্ত্তা বুড়ো রায় বাহাদুরের কাছেও। নইলে মাঝে মাঝে খুব কড়া কথা বলতে ইচ্ছে করে তরঙ্গিণীর বুড়োকে; আবার বুড়োর জন্যে তরঙ্গিণীর মায়াও হয়। এই বয়সে বৌ মরা সত্যি দুর্ভাগ্যের কথা। কতক্ষণে তরঙ্গিণী যাবে তবে বেচারার একটু তেল মালিস হবে, ঘরখানা বিছানাটা পরিষ্কার হবে। পিকদানীটা একগলা হয়ে গেলেও বাড়ীর কারো একবার বদল করে দেবার সময় নেই। নাতি-নাতনীরা স্কুল-কলেজে পড়ে, বৌরা সংসার নিয়েই ব্যস্ত। তাছাড়া আরো পাঁচটা কাজও তাদের আছে। তরঙ্গিণীকে তো বুড়ো বাবুর কাজের জন্যেই তারা রেখেছে। তবে বুড়ো বাবুর কাজের জন্যে রাখলেও তরঙ্গিণীর মন যোগাতে হয় বাড়ীর সবারই। এমন কি ঠাকুর-চাকরেরও। নইলে ভাত-তরকারী এটা-সেটা পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও বাড়ী থেকে বের করে নেওয়া যায় না।

যুগল স্নান করে এসে বেড়ায় টাঙানো আরসিখানার কাছে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে লাগলো। খালি গায়ে তার কোমল চেহারায় বেশ একটা শান্ত শ্রী ফুটে উঠেছে। সদ্যস্নাত দেহে যেন একটা পবিত্রতা নেমে এসেছে। তরঙ্গিণী মুগ্ধ হয়ে যুগলের দিকে চেয়ে রইল, যেন যুগলকে সে এই প্রথম দেখলো, যেন যুগল তার বলিষ্ঠ বুকের প্রথম শিশু।

ফিরে দাঁড়িয়ে যুগল বলে, "তুই তো দেখছি চান-টান করে দিব্যি ফর্সা শাড়ী পরেছিস্। বাঃ, বেশ সাড়ীটা তো, কে দিলে?"

মুখখানা তরঙ্গিণীর নীচু হয়ে পড়ে, তবু যুগল বলেনি যে, "তোকে বেশ দেখাচ্ছে।"

জোরে হেসে ফেললো যুগল,—"আচ্ছা হাত পাকিয়েছিস দেখছি, কিন্তু এতো আর খুচরো জিনিষ নয় ধরা পড়ে যাবি যে—"

মুখ তুললো তরঙ্গিণী, "এটা এক জন দিয়েছে।"

তেমনি হেসেই যুগল বলে, "দিয়েছে? সাবাস দয়াল তো? কে রে লোকটা?"

তেমনি ঘাড় বেঁকিয়েই তরঙ্গিণী বলে, "বাবুর ছোট বৌমা, ক'দিন এখানে এসেছে, ছোট ছেলে পশ্চিমে চাকরী করে—সেখানেই থাকে।"

"ওঃ" বলে যুগল খেতে বসল। যুগলের খাবার মাঝখানে তরঙ্গিণী একবার বললো, "দেখ, বাবুর মেজ ছেলের আপিসে একটা কাজ আছে করবে?"

তোলা ভাতের গ্রাসটা হাতে করেই যুগল বললো, "আপিসের কাজ? তুই ক্ষেপলি না কি? আমি কি লেখাপড়া জানি? বরং গাড়ীর কাজ দোকানের কাজ হলেও পারতুম।"

"সে লেখা-পড়ার কাজ নয়।" তরঙ্গিণী বলে, "এই কাগজ-পত্র এগিয়ে দেয়া, চা-জলটা নে আসা এই রকম।" তার পর একটু ঢোক গিলে বলে, 'তাছাড়া ও-বাড়ীতে আমি আর কাজ করবো না ভাবছি।"

ঘটীর জলটা শেষ করে সেটা টং করে নামিয়ে রেখে যুগল বলে, "কেন?"

তরঙ্গিণী মেঝের দিকে চেয়ে মাটীতে দাগ কাটতে কাটতে বলে, "বুড়ো বাবুর রকম সকম আমার কেন যেন ভাল লাগে না।"

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো যুগল, "আমি বলি ছেলেরা কেউ নিদেন চাকর ঠাকুর,—তা নয় বুড়ো বাবু। তোর মাথায় কি হয়েছে বল দিনি? আরে বুড়ো বাবু তো দেবতুল্য লোক, দুবেলা আশ্রমেই বসে থাকেন। না, তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। তার পর বাঁ হাত দিয়ে তরঙ্গিণীর গালটা টিপে বলে, "আমি রয়েছি কি করতে—খুন করে ফেলবো না?"

সুখ তরঙ্গিণীর যুগলের সামান্য আদরেই উপচে পড়ে। সত্যিই তো যুগল রয়েছে না? না হয় সে একটু কুঁড়ে আর নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তা সব পুরুষই তো অমন কম-বেশী একটু স্বার্থপর হয়! তা বলে তরঙ্গিণীর ওপর যুগলের কি এতটুকু মায়া, এতটুকু দরদ নেই? অন্ততঃ এতটুকু সম্পত্তি বোধ! নিশ্চিন্ত হয়ে তরঙ্গিণী যুগলের পাতের ভাত কটার সঙ্গে বাসি দুখানা আটার রুটী দিয়ে পেট ভরিয়ে উঠলো। এখুনি তাকে বাবুর বাড়ী যেতে হবে, কলে জল আসবার সময় হয়ে এলো।

যুগল কোথায় বেরুচ্ছে ফিটফাট হয়ে, তরঙ্গিণী জিজ্ঞাসা করে, "বেরুচ্ছ?"

যুগল তাড়াতাড়ি বলে, "হ্যাঁ, নবনে বলছিল কোথায় না কি একটা কাজ আছে তাই যাব একবার তার সঙ্গে।"

মনে মনে খুসী হয়ে বলে তরঙ্গিণী, "দাঁড়াও, আমিও বেরুবো এখুনি।"

দু'জনে একসঙ্গে রাস্তায় নেমে দরজায় তালা লাগিয়ে একটা চাবি যুগলের হাতে দিয়ে তরঙ্গিণী মনিব বাড়ীর দিকে রওনা হলো। গিয়ে দেখে বাড়ীশুদ্ধ কোথায় বিয়ের নেমন্তন্নে গেছে। শুধু বুড়োবাবুর শরীর ভাল নয় বলে তিনি আর যাননি। নীচের কাজ সেরে ঠাকুরকে বলে ভাতটা পরে নিয়ে আসবার বন্দোবস্ত করে তরঙ্গিণী ওপরে গেল বুড়ো বাবুর ঘরে। ঘর-দোর পরিষ্কার করে সব গুছিয়ে রেখে তরঙ্গিণী দরজার পাল্লাটা ধরে দাঁড়াল।—"তবে আমি এখন একবার ঘরে যাই বাবু, কাজকর্ম্ম তো এখন কিছু নেই।"

এতক্ষণ বুড়ো বাবু একদৃষ্টে তরঙ্গিণীর হাতের কাজ দেখছিলেন আর গড়গড়ার নলটা মুখে দিয়ে মাঝে মাঝে কাসছিলেন। সেটা বোধ হয় বুড়ো বয়সের কাসি, কথা বলবার প্রস্তুতি বলে অন্ততঃ তরঙ্গিণী বুঝতে পারেনি। এইবার একটু নড়ে বসে হাতের নলটা রেখে বললেন, "এখুনি যাবে তরঙ্গ, বসো না একটু, দু'টো যে কথা কইব তা এমন একটা এ সংসারে নেই।" বুড়ো বাবুর গলায় স্বরে কেমন একটা নির্ভর করবার প্রয়াস। তরঙ্গিণী ভারি অস্বস্তি বোধ কচ্ছিল, কোন উত্তর না দিয়ে সে তাই আঁচলের খুঁটটা পাকাতে লাগলো। বুড়ো বাবু বলে চললেন, "তোমার ঘরখানা ওই—গলির মুখে টিউবওয়েলটার ধারে নয়?" তরঙ্গিণী মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ। বুড়ো বাবু অপেক্ষাকৃত নীচু গলায় বললেন, "তা তোমার গিয়ে ওই যে—সে লোকটা কাজকর্ম্ম করে না?" তরঙ্গিণী আবার মাথা নেড়ে জানালো, সে কাজ করে। "কাজ করে? কিসের কাজ, কখন ফেরে বাড়ীতে?" বুড়ো বাবু জিজ্ঞাসু মুখে তাকালেন তরঙ্গিণীর দিকে। এইবার তরঙ্গিণী কথা বললো। "সেই রাতে ফেরে।" যুগলকে সে খাটো করতে পারে না, যুগল কাজ করে এইটাই জানুক সবাই। তার পর বুড়ো বাবু একটু দম নিয়ে মাথা নেড়ে হাসি-হাসি মুখে বলেন, "যেতে-আসতে দেখি বটে—বেশ ঘরখানি তোমার তরঙ্গ, দিব্যি পরিচ্ছন্ন।"

তরঙ্গিণী চঞ্চল হয়ে উঠলো, "তবে আমি আসি বাবু।" বলে আর উত্তরের অপেক্ষা না করেই এক নিশ্বাসে নীচে নেমে তরঙ্গিণী সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। পেছন ফিরে দরজা দেবার কথা বলতে গিয়ে দেখে ঠাকুর-চাকর মুখ টিপে হাসছে; তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে তরঙ্গিণী ঘরে এসে দাঁড়াল।

যুগল ঘরে নেই, আগে জানলে তরঙ্গিণী তাকে একটু সকালেই ফিরে আসতে বলতো। কিন্তু আগে কি ছাই একটুও জানতে পেরেছে সে। পাছে সে দেরী করে যায় তাই সকালে কথাটা ভাঙেনি কেউ, নইলে আজ স কাজেই যেতো না, লজ্জা-সরমও নেই বুড়োর!

দরজাটা আলতো করে ভেজিয়ে দিয়ে বেড়ার আরসিটার সামনে দাঁড়াল তরঙ্গিণী। চুলটা আঁচড়ে মুখখানা মুছে সে একটা কালো টিপ

পরলো কপালে। তার পর আঁচল থেকে একটা সাজা পান মুখে দিয়ে কাপড়খানা গুছিয়ে পরলো। অকারণেই আরসিতে নিজের মুখখানা দেখে একটু ফিক্ করে হাসলো। তার পর তক্তোপোষের তলা থেকে তোরঙ্গটা বের করে গুছতে বসলো। তোরঙ্গ গুছতে গুছতে তরঙ্গিণী ভাব্‌ছিল যুগলের কথা, যদি যুগল কাজটা পায়—তবে সে বেঁচে যায়, ও-বাড়ীতে আর সে কাজ কচ্ছে না।

দরজায় খুট করে একটা শব্দ হলো, তরঙ্গিণীর মনে কেমন যেন একটা পুলক এলো। ভাবলো, আসুক না যুগল, সে তাকাবে না। কেমন অবাক হয়েছে সে তাই তো কথা বলছে না—সমস্ত শরীর আর মন যেন কিসের একটা আশায় তার উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো। গলাটা বেষ্টন করে একখানা চামড়া-কুঁচকান লোমশ হাত তার মুখ চেপে ধরলো। "চেঁচামেচি করো না তরঙ্গ, আমি তোমাকে রাণীর হালে রাখবো।" দুই চোখ-ভরা আগুন নিয়ে তরঙ্গিণী তাকাল তার মনিবের মুখের দিকে। তার পর এক ঝটকায় হাতখানা সরিয়ে দিয়ে একটু পিছিয়ে দরজাটা আড়াল করে দাঁড়াল তরঙ্গিণী। রায় বাহাদুরও দু'পা এগিয়ে এলেন তার দিকে, মুখে তার অনুনয়ের একটা বেপরোয়া স্বীকৃতি। অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় ঘুরে দাঁড়িয়ে তরঙ্গিণী বাইরে এসেই শিকল তুলে দিল দরজায়। উত্তেজনায় সর্ব্ব শরীর তার কাঁপছে, মুখখানা দেখাচ্ছে যেন ক্রুদ্ধ সর্পিণীর মত। দুই-তিন সেকেণ্ডের মধ্যেই তরঙ্গিণী বিকট চীৎকার করে উঠলো আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে তার ছুটতে লাগলো অজস্র পরিমাণে অশ্রাব্য গালাগালির তুবড়ী।

মজা দেখবার জন্যে আশে-পাশের অনেক লোক এলো ভিড় করে, কিন্তু রায় বাহাদুরের নাম শুনে অনেকেই তার মধ্যে সরে পড়লো—পরের ব্যাপারে মাথা-ঘামানোর দায় পরের ওপর ফেলে দিয়েই। যাঁরা অসহায় মেয়ের ওপর নিদারুণ অত্যাচার মনে করে মুখে খুব তড়পাতে লাগলেন, তাঁরাও ঘরের দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে এসে শিকল খুলবার সাহস পেলেন না, দূরে দাঁড়িয়ে টীকা-টিপ্পনী আর শ্লীল-অশ্লীল মন্তব্যের বৃষ্টি-ধারায় তরঙ্গিণীকে সিক্ত করবার প্রয়াস পেলেন। এর মধ্যে যুগল এলো নব্‌নের সঙ্গে সেখানে; ব্যাপার কি বোঝবার আগেই তরঙ্গিণী দৌড়ে এসে তার হাত ধরে হিড়-হিড় করে টেনে একেবারে দরজার সামনে এনে ধড়াস করে দরজার শিকলটা খুলে ফেললো; তার পর যুগলের মুখের দিকে চেয়ে বেশ তেজের সঙ্গে বললো, "হাঁ করে দেখছ কি অ্যাঁ! ঘাড় ধরে বের করে দাও না মড়া-খেকোটাকে?"

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই এতক্ষণ যারা ব্যাপারটাকে রসিয়ে উপভোগ কচ্ছিল, তারা দু'-একটা ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিপাত করতে লাগল। আর যুগল দাঁড়িয়ে রইল কাঠের পুতুলের মত। সে না পারলো এগিয়ে যেতে, না পারলো সেখান থেকে সরে যেতে। শুধু অজ্ঞাতসারেই হাতখানা তার মাথার চুলে আশ্রয় খুঁজতে লাগলো।

ছাড়া পেয়ে রায় বাহাদুর নিজেই এগিয়ে এলেন দরজার দিকে লাঠিখানা হাতে নিয়ে। সামনা-সামনি হতেই যুগল শশব্যস্তে সরে দাঁড়াল। মুখখানা যথাসম্ভব নীচু করে লাঠিতে ভর দিয়ে ঠক্-ঠক্ করতে করতে বেশ ধীরে ধীরেই রাস্তাটা পার হয়ে গেলেন রায় বাহাদুর। দিনের আলো যদি আবছা হয়ে না আসতো তবে দেখা যেত, রায় বাহাদুরের ধবধবে সাদা টাকের পেছন পর্য্যন্ত লাল হয়ে উঠেছে।

খুঁজে পাওয়া

শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

কাল্‌কে যখন
অনেক রাতেতে অস্ত গিয়েছে চাঁদ
ভাঙা মন্দির-পাশে,
আমার মনের শত বাতায়নে
বয়েছিল হাওয়া—গভীর রাতের হাওয়া,
স্তব্ধ-শীতল তোমার হাতের মত।
ঝড় উঠেছিল নন্দন দেশে
সবুজের দেশে তুমি আর আমি;
অনেক গভীর রাতে
অজানা স্রোতের উজানে আমরা—
আমরা যে ভেসেছিনু
কালকের রাত-শেষে।
সপ্ত ডিঙ্গার পালে লেগেছিল হাওয়া,
তখন আমরা জীবন-স্মৃতির ছিন্ন পাতায়
লিখ্‌তেছিলেম মহা পৃথিবীর শতেক কাহিনী;
সাগর-তীরের নীল সৈকতে বসে—
ঢেউ গোণা শেষ হোল!
মহা পৃথিবীর সৈকতে—
তুমি আর আমি চিরদিন ধরে
মহাসাগরের ঢেউগুলো শুধু গুণবো
শুধু গুণবো আমরা
মহা পৃথিবীর নায়ক-নায়িকা আমরা।

যুগলের দিকে এক-নজর তাকাল তরঙ্গিণী, চোখের কোণে তার নিশ্চিন্ত নির্ভরতা আহত হয়ে ধুঁকছে সারা মুখে নিদারুণ অপমানের দৈন্য। এক মুহূর্ত্ত মাত্র—তার পর মেঝের ওপর মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়লো এমন ভাবে যেন পারলে সে এখনই 'ধরিত্রী দ্বিধা হও' বলে মাটীর কোলে আশ্রয় নিত। সদ্য তীর-বেঁধা কোন বলিষ্ঠ জানোয়ারের মত দেহটা তার থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগলো অসহ্য যন্ত্রণায়।

যুগল ঘরে এলো পা টিপে টিপে, কুলুঙ্গির কৌটা থেকে দু'টো টাকা পকেটে ফেলে, গলার স্বর যতটা সম্ভব মোলায়েম করে বললো, "দেখ দিকিনি ছেলেমানুষী, তুই-ই তো তাকে যা শিক্ষে দেবার দিয়েছিস্, আবার আমি কি করবো বল?" কোন উত্তর না পেয়ে আবার বলে, "আমি কিছু করলে মিথ্যে আমায় নিয়ে থানা-পুলিশ হতো সেটা কি ভাল হতো বলিস?" তাতেও কোন সাড়া না পেয়ে পকেটটা চেপে ধরে যুগল বেরিয়ে গেল ঘর থেকে তেমনি আস্তে আস্তেই।

দূরে দাঁড়িয়ে নব্‌নে উস্‌খুস্ কচ্ছিল, চোখের ইসারায় জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপার কি? বিরক্ত হয়ে যুগল বলল, "দুত্তোর নিকুচি করেছে। শালীর আবদার দেখ না, যেন বিয়ে-করা ইস্তিরী!" তার পর একটা বিড়ি ধরিয়ে নব্‌নেকে একটা দিয়ে বলে, "পা চালিয়ে চ নব্‌নে, ছবিখানা হয়ত এতক্ষণ অর্দ্ধেক হয়ে এল।"

হীনমন্যতা

চিত্রগুপ্ত

(৮)

যৌন-ব্যাপার ও যৌন-জীবনের সঙ্গে হীনমন্যতার সম্পর্ক নিয়ে গতবারে যে আলোচনা আরম্ভ করা হয়েছিল, তাতে দেখানো হয়েছে অন্তরের হীনমন্যতার অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ নিজের হীনমন্যতার হাত থেকে মুক্তি চাইতে গিয়ে কী ভাবে সোজা রাস্তা হিসেবে জীবনের ভারী ভারী সমস্যাগুলোকে এড়িয়ে যৌনচর্চ্চার নিভৃত কন্দরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

এর ফলে তারা একান্ত ভাবে যৌনচর্চ্চাতেই লিপ্ত থেকে জীবনের আর সব সমস্যাকে ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করে। তাই এমনিতে তাদের দেখলে প্রবল যৌনশক্তিসম্পন্ন ঘোরতর ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোক ব'লে মনে হ'তে পারে। কিন্তু তবুও আসলে তারা তা নয়। তাদের ও রকম আচরণের আসল কারণটা যৌনশক্তির প্রাবল্য নয়, তাদের চরিত্রের ওপর তাদের হীনমন্যতারই আধিপত্য।

ছোটো ছেলেদের মধ্যে তাই এই ঝোঁকটা প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। যে-সব ছেলেমেয়ে নিজেদের হীনমন্যতার পরিপূরক হিসেবে অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়, সাধারণতঃ তাদেরই মধ্যে এই ব্যাপারটা খুব প্রকট হয়ে ওঠে। তারা হীনমন্যতার পরিপূরক হিসেবে জীবনের অকেজো দিক্‌টায় পালিয়ে গিয়ে সেইখানে জীবনের সার্থকতা খোঁজে। তারা মাতা-পিতা ও শিক্ষককে জ্বালিয়ে মেরে তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে ও ক্রমাগত তাঁদের কাছে নানা রকম উৎপাত ক'রে ক'রে তাঁদের মনোযোগকে অহর্নিশি নিজের দিকে টেনে ধ'রে রাখে।

এ-রকম ছেলেরা পরবর্ত্তী জীবনেও অন্য লোককে এই ভাবেই দখলে রাখতে চাইবে এবং এই ভাবেই তাদের শ্রেষ্ঠতা (?) লাভের আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করতে চেষ্টা ক'রবে। এভাবে যে শ্রেষ্ঠ হওয়া যায় না এটা যে আসলে সার্থকতা লাভের রাস্তাই নয়—এটা তাদের বিকৃত বিচারবুদ্ধির কাছে ধরাই পড়বে না।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ ধরণের ছেলেদের অন্যকে জয় করে তাদের ওপর বড়ো হবার অর্থাৎ অন্যের ওপর প্রভুত্ব ক'রে জীবনে সার্থকতা লাভ করবার যে বাসনা, সেটা তাদের যৌন-প্রবৃত্তির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে 'তাল গোল' পাকিয়ে যায়। অর্থাৎ অন্যকে জয় করবার বাসনার সঙ্গে নিজের যৌন-কামনাকে মিশিয়ে ফেলে একটা 'খিচুড়ি পাকিয়ে যাওয়া' বাসনার জটিলতা নিয়ে এ-সব ছেলেমেয়ে বেড়ে ওঠে।

অনেক সময় নিজের জীবনের যা-কিছু সম্ভাবনা ও যা-কিছু জটিলতা তার অনেকখানিকে বাদ দিতে ব'সে হয়তো এরা ছেলে হ'লে গোটা স্ত্রী-জাতিটাকে বা মেয়ে হ'লে গোটা পুরুষ-জাতিটাকেই বাদ দিয়ে বসে এবং তার ফলে সমকামিতার (homosexuality) শিক্ষায় নিজেকে শিক্ষিত ক'রে তোলে। আর লোকে অতো মারপ্যাঁচ না বুঝে এদের এই অস্বাভাবিক রুচিবিকার দেখে হয় বিস্মিত হয় আর নয় তো এদের ঘৃণার চক্ষে দেখে। আসল কারণটা কিন্তু সাধারণ লোকের কাছে গোপনই থেকে যায়। এমন কি আসল কারণটির খবর এরা নিজেরাও রাখে না।

যৌন-জীবনে বিকৃত-রুচি (perverted) লোকদের মধ্যে যে যৌন-ব্যাপারে তাদের সেই বিকৃত রুচিটির অতি-চর্চ্চার একটা ঝোঁক দেখা যায়, তারও বিশেষ কারণ আছে। আসলে নিজেদের রুচিকে বিকৃত ক'রে তোলবার ঝোঁকটাকেই তারা বেশী করে বাড়িয়ে ফেলে এবং এই ভাবে তারা যে-সব স্বাভাবিক যৌন-জীবনের সমস্যাকে জীবনে এড়িয়ে চলতে চায়, সেগুলির হাত থেকে আত্মরক্ষা করে।

যে দৃষ্টিভঙ্গীতে এরা নিজেদের জীবনকে দেখে সেটি ধ'রতে পারলেই এর কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। সংসারে এমন মানুষ অসংখ্য দেখা যায়, যারা চায় যে লোকে তাদের প্রতি মনোযোগী হোক অথচ তবুও তাদের মনের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল থাকে যে আসলে বিপরীত জাতীয় মানুষদের (সে মেয়ে হ'লে পুরুষের আর পুরুষ হ'লে মেয়েদের) মনোযোগকে যথেষ্ট পরিমাণে আকর্ষণ করবার কোনো যোগ্যতাই তাদের নেই। এই রকম ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে বিপরীত লিঙ্গীয় মানুষদের সম্পর্কে এদের মনে একটা হীনমন্যতা বাসা বেঁধে আছে। অনুসন্ধানে হয়তো প্রকাশ পাবে যে এ হীনমন্যতা তাদের মনে বাসা বেঁধেছে অতি শৈশব কালেই।

দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে যে, এই ধরণের ছেলেরা যদি ছোট বেলায় এই রকম মনে করতে শিখে থাকে যে, তাদের নিজেদের চেয়ে (অর্থাৎ বাড়ীর বেটাছেলেদের চেয়ে) বাড়ীর অন্যান্য মেয়ে এবং তাদের মায়ের আকার-প্রকার আচার-ব্যবহার বেশী সুন্দর তা'হলে তাদের মনে এই ধারণাই হয়ে থাক্‌বে যে তারা জীবনে কখনো মেয়েদের আকর্ষণ করতে পারবে না।

সে রকম ক্ষেত্রে বিপরীত লিঙ্গের মানুষদের সে এমন পূজো করতে আরম্ভ করবে, যার ফলে সর্ব্ব রকমে তাদেরই সে অনুকরণ ক'রতে চেষ্টা করবে। বেশ-বাস, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, ধরণ-ধারণ প্রভৃতি সব দিক দিয়েই অনেক পুরুষকে প্রাণপণে মেয়েদের মতন হবার এবং অনেক মেয়েকে প্রাণপণে পুরুষদের মতন হবার যে সাধনা ক'রতে দেখা যায় তার কারণই এই।

মানুষের চরিত্রে এই রকমের প্রবণতা গ'ড়ে ওঠার একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত হিসেবে এ্যাড্‌লার একটি লোকের কথা ব'লেছেন যে লোকটি যৌন-প্রবৃত্তি সম্পর্কিত নিষ্ঠুরতা এবং শিশুর সম্পর্কে যৌন-অনাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলো। তার যৌন প্রবৃত্তির এই রকম পরিণতির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল যে লোকটির মায়ের প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত প্রভুত্ব-পরায়ণ এবং কঠোর সমালোচনাশীল। এ সত্ত্বেও ছোট বেলায় ছেলেটি স্কুলে সুশীল এবং মেধাবী ছাত্র হিসেবে নাম করেছিলো। কিন্তু ছাত্র হিসেবে তার এতটা সাফল্যও কোন দিনই তার মাকে খুসী করতে পারেনি। এই কারণেই তার মন মায়ের ওপর এমনই তিক্ত হ'য়ে উঠেছিলো যে বাড়ীর স্নেহ-সম্পর্কিত মানুষগুলির তালিকা থেকে সে মনে মনে মাকে একেবারেই বাদ দিয়েছিলো। সেখানে সে মাকে জীবন থেকে একেবারেই বাদ দিয়ে তার অন্তরের যা-কিছু কোমল ভাব তা' বাপের ওপরই ন্যস্ত করেছিলো। স্ত্রী-জাত সম্পর্কে ঐ বদ্ধমূল আক্রোশই তাকে উত্তর-জীবনে স্ত্রী-পুরুষের যৌন-ব্যাপারকে সহজ স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে দেয়নি—তাকে যৌন সম্পর্কিত ব্যাপার মাত্রেই অমন নিষ্ঠুর এবং বিকৃতাচারী ক'রে তুলেছিলো।

ছেলেবেলায় যা'কে এই রকম অভিজ্ঞতা পেতে হয়েছে সে ছেলের মনে যে ধারণা হবে যে মেয়ে জাতটারই প্রকৃতি হ'চ্ছে এই রকম অতি কঠোর এবং নিষ্ঠুর সমালোচনাশীল তা'তে আর আশ্চর্য্য কি?

কাজেই সে বুঝে নিয়েছিলো, এমন জাত যে-নারী, তার কাছে একেবারে অত্যন্ত প্রয়োজনের গরজ ছাড়া কোন রকম কোমলতা-সুলভ আনন্দ-সম্পর্ক রাখা চলতেই পারে না। মাধুর্য্য সম্পর্ক নিয়ে ওদের ধারে-কাছেও ঘেঁসা চলে না! এই ভাবে সে মেয়ে জাতকেই জীবনের ভালো যা-কিছু তার সংস্রব থেকে এড়িয়ে চলতে অভ্যেস করেছিলো।

তা'ছাড়া এই ছেলেটির আর একটি বিশেষত্ব ছিল। এ ছিল সেই জাতীয় ছেলে ভয় পেলেই যাদের যৌন-সম্পর্কিত অস্বস্তির উদ্রেক হয়। কাজেই উদ্বেগ এবং এই যৌন অস্বস্তির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে এরা এমন পরিবেশ খোঁজে যেখানে তাদের ভয় পাবার মত কোন কারণ ঘটবে না। পরবর্ত্তী জীবনে এরা নিজেদেরকে শাস্তি দিতে বা কঠোর ভাবে উৎপীড়িত করতে চায়, ছোটো ছেলেদের উৎপীড়িত দেখ্‌তে চায়, এমন কি নিজেকে বা অন্য কাউকে উৎপীড়িত অবস্থায় কল্পনা ক'রেও তৃপ্তি পায়। আর এদের বিশেষ ধরণের মানসিক গঠনের মধ্যেই এই ধরণের সত্য বা কল্পিত উৎপীড়নের অবস্থা প্রত্যক্ষ ক'রে যৌন-কতৃপ্তি ও যৌন-তৃপ্তি লাভ করে।

ভুল শিক্ষায় অভ্যস্ত হওয়ার জন্তেই লোকটির এই রকমে পরিণতি হয়েছিলো। লোকটি কখনও তার এই সব অভ্যাসের পারম্পরিক জটিল সম্বন্ধের কথা জানতে পারেনি। বেশী বয়েসে এ কথা জানলেও অবশ্য বিশেষ লাভ হোতো না। কারণ ২৫।৩০ বছর বয়েসে মানুষের মনঃপ্রকৃতির পক্ষে আর নতুন শিক্ষা গ্রহণ অসম্ভব ব্যাপার। এ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের আসল সময়ই হচ্চে একেবারে শৈশব কাল।

শৈশব কালে বাপ-মার সঙ্গে শিশুর মনের সম্বন্ধের জটিলতার জন্তেই 'পরিস্থিতি' বেশ জটিল থাকে। মা-বাপের সঙ্গে ছেলেমেয়ের মানসিক বিরোধের (psychological conflict) ফলে যৌন-ব্যাপার সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের ধারণা কি রকম বিগ্‌ড়ে যেতে পারে তা দেখ্‌লে বিস্মিত হতে হয়। কিশোর বয়সের বিদ্রোহী ছেলে (বা মেয়ে)। বাপ-মাকে নিছক আঘাত দেবার উদ্দেশ্যেই অনেক সময়ে যৌন-ব্যাপারে (বা যৌন-অনাচারে) লিপ্ত হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই বাপ-মায়ের সঙ্গে খুব একচোট ঝগড়া হয়ে যাবার ঠিক পরেই ছেলেমেয়েদের যৌন-ক্রিয়ায় লিপ্ত হ'তে দেখা গেছে। বাপ-মায়ের উপর শোধ নেবার এ এক বিচিত্র উপায় ছেলেমেয়েরা অবলম্বন করে। বিশেষ করে তাদের যে ক্ষেত্রে ভালো করেই জানা থাকে যে, এই ব্যাপারটা মা-বাপ তাদের সম্পর্কে আদৌ পছন্দ করেন না এবং তারা এ রকম আচরণ করলে মা-বাপ মনে মনে দারুণ আঘাত পান। একগুঁয়ে ধরণের বিদ্রোহী ছেলেমেয়েরা মা-বাপের সঙ্গে কলহে সুবিধা করতে না পারলে তখন তাঁদের এই দিক থেকে আক্রমণ করবেই।

কথা উঠতে পারে যে, তাদের এ-রকম আচরণের মানেটা কি? এতে বাপ-মায়ের উপরে শোধটা কোথায় তোলা হোলো? এ প্রশ্নের জবাব এই যে, এরা বাপ-মায়ের ওপর যতই রেগে থাক্‌, তখনও কিন্তু তারা মনে মনে জানে যে মা-বাপ তবুও তাদের মনে মনে ভালই বাসেন এবং ভালোই চান। আর এ-ও জানে যে যাদের ঐ বয়সে যৌনব্যাপারে লিপ্ত হওয়াটা খারাপ, তাতে তাদের ক্ষতি হতে পারে। তাই তারা মা-বাপের 'ক্ষতি' করচে মনে ক'রেই নিজের ওপর এই 'ক্ষতি' করতে চেষ্টা করে। তারা এটাকে নিজের ক্ষতি বলে মনে না ক'রে আসলে বাপ-মায়েরই ক্ষতি বলে মনে করে বলেই এই ভাবে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গের আয়োজন করে।

এ রকম পরিস্থিতির উদ্ভব যাতে না হয় তা' করতে চাইলে ছেলে-বেলা থেকেই ছেলে-মেয়েদের এমন ভাবে মানুষ করতে হয় যাতে তাদের ধারণা জন্মায় যে তাদের নিজেদের ভালো-মন্দের জন্যে তারা নিজেরাই দায়ী। অর্থাৎ তাদের ভালো-মন্দের জন্তে তাদের নিজেদেরই 'মাথা ব্যথা' থাকা উচিত। তাদের চেয়ে বেশী 'মাথা ব্যথা' তাদের মা-বাপের থাকতে যাবে কেন? দেখতে হবে, তাদের জীবনের কোন অবস্থাতেই এ-ধারণা যেন তাদের মাথায় কিছুতে না ঢোকে যে তারা কোনো বিসদৃশ আচরণ করলে তার ফলে শুধু বাপ-মাই জব্দ হবে। বিসদৃশ আচরণ করলে তাদের নিজেদের ক্ষতিটাই আসল এইটাই তাদের মাথায় ছোটো বেলা থেকেই ভালো করে ঢুকিয়ে দেওয়া উচিত।

শৈশবকালীন পরিবেশের প্রভাব ছাড়া, দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রভাবও মানুষের যৌন-চেতনা ও যৌন-আচরণকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করে। রুশ-জাপান যুদ্ধ ও রাশ্যার প্রথম বিপ্লবায়োজনের ব্যর্থতার পর রাশ্যার লোকেদের মনে যখন আশা বা আশ্বাসের কিছুই আর বাকি রইলো না তখন Saninism নামে যে যৌন-অনাচারের আন্দোলনে দেশ ছেয়ে গেছলো, এ্যাড্‌লার এ সম্পর্কে সেই অবস্থার কথার উল্লেখ করেচেন। সে সময়ে তখনকার সমস্ত তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতী এই আন্দোলনের কবলে পড়েছিলো। রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় দেশে যৌন-অনাচারের প্রাবল্য দেখা দেবেই। যুদ্ধের সময়েও জীবনের মূল্য মানুষের কাছে অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে ওঠে ব'লে সর্ব্বত্র মানুষের নৈতিক চরিত্র যৌন-অনাচারের প্রতি একান্ত ভাবে ঝুঁকে প'ড়ে।

যৌন-প্রবৃত্তির রাশ ছেড়ে দিয়ে মানুষ কী ভাবে তাদের 'মনের চাপকে' মুক্তি দিতে চেষ্টা করে পুলিশ বিভাগের লোকদের সে কথা খুব ভালো ক'রেই জানা আছে। সেই জন্যই দুর্বৃত্তদের আচরিত কোন অপরাধমূলক ঘটনার খবর পেলে পুলিশ অপরাধীর সন্ধান করবার জন্য আগেই ছুটে যায় গণিকালয়গুলিতে। সেখানে গিয়ে প্রায়ই তারা খুনী বা অন্য গুরুতর অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে।

অপরাধ অনুষ্ঠানের পর অপরাধীদের গণিকালয়ে পাওয়া যায় কেন? কারণ, অপরাধের অনুষ্ঠান করতে তাদের স্নায়ুমণ্ডলীতে যে প্রবল চাপ পড়ে অনুষ্ঠানের শেষে সেই প্রবল চাপকে তাদের মুক্তি দেওয়ার দরকার হয়। এই চাপকে তখন তারা কী ভাবে মুক্তি দেবে? নিজের শক্তিকে জাহির ক'রে। তারা যে 'হেয়' নয় অপরাধ অনুষ্ঠানের পরও তাদের শক্তি যে অক্ষুণ্ণ আছে—এইটা জাহির করা এবং নিজেও অন্তরে অন্তরে অনুভব ক'রে তৃপ্তিলাভ করা তখন তাদের পক্ষে অপরিহার্য্য হ'য়ে পড়ে। তাই তার সহজতম ক্ষেত্র হিসেবে গণিকালয়ে গিয়ে হাজির হওয়া ছাড়া তাদের আর উপায়ান্তর থাকে না।

এই সব দেখেই বুঝতে পারা যায় যে, আর সব দিক বিবেচনা না ক'রে কেবলমাত্র একটা দিক দেখেই কোনো মানুষকে অন্য লোকদের তুলনায় বেশী মাত্রায় 'যৌনশক্তিসম্পন্ন' বা প্রকৃতির বিশেষ পক্ষপাতের দরুণ বেশী মাত্রায় 'কামুক' ব'লে মনে করাটা ঠিক যুক্তি-সঙ্গত নয়।

জনৈক ফরাসী মনীষী ব'লেছেন, মানুষই হ'চ্ছে একমাত্র জীব যে ক্ষুধা না পেলেও আহার করে, তৃষ্ণা না পেলেও পান করে এবং সকল

সময়েই মৈথুনে রত হয়। বস্তুতঃ অত্যন্ত ক্ষুধাকে 'আস্কারা' দেওয়ার সঙ্গে যৌন-ক্ষুধাকে আস্কারা দেওয়ার মধ্যে তফাৎ বড় একটা কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। মানুষের যে কোনো ক্ষুধাকেই যদি বেশী 'আস্কারা' দেওয়া হয় কিম্বা জীবনে কোনো একটা ব্যাপারের চর্চ্চাই যদি অত্যধিক পরিমাণে করা যায় তা হলেই স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার মধ্যে ছন্দ-পতন অনিবার্য্য হয়ে ওঠে।

কোনো একটা ক্ষুধা বা কোনো একটা বিষয়ের প্রতি ঝোঁককে অতিরিক্ত 'নাই' দিলে সেটা অবশেষে কী ভাবে লোকের ঘাড়ে চ'ড়ে বসে, মানুষ কী ভাবে তার ক্রীতদাস হয়ে পড়ে তার স্বপক্ষে মনোবিজ্ঞানীদের দপ্তরে বহু রকমের নজীর আছে। কৃপণদের কথাই ধরা যাক্। কৃপণের অর্থসংগ্রহের ঝোঁকটা বাড়তে বাড়তে অবশেষে সেটা মানুষকে সমাজের চোখে কী-রকম হাস্যাস্পদ ক'রে তোলে সে কথা সর্ব্বজনবিদিত।

এ সত্যতা শুধু যে অর্থসংগ্রহের ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়। পরিচ্ছন্নতার মত একটা ভালো জিনিষের প্রতিও অতিরিক্ত পক্ষপাত যে অবশেষে বাড়াবাড়ির ফলে মানুষকে শুচিবায়ুগ্রস্ত ক'রে তুলে তাকে লোক-সমাজে কী ভাবে হেয় করে সে কথাও কারো অজানা নেই। এই শুচিবায়ুর প্রভাবে অবশেষে মানুষ সূর্য্যোদয় থেকে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত অবিরত স্নানাদি ক'রেও নিজেকে কিছুতে 'ঠিকমত' শুচি বলে মনে করতে পারে না—এমন দৃষ্টান্ত আজো কলকাতার মতন শহরের অতি ধনী একাধিক পরিবারের মধ্যেও বর্ত্তমান।

তার পর আহার। আহার-ক্রিয়া এবং সুস্বাদু আহার্য্য বস্তুকেই জীবনের সকল দরকারী জিনিষের মধ্যে সব চেয়ে প্রাধান্য দেওয়ার অদ্ভুত অথচ অতি সাধারণ দৃষ্টান্তও পৃথিবীর কোনো সমাজেই বিরল নয়। আহার এবং আহার্য্য বস্তুর প্রতি অতিরিক্ত 'পক্ষপাত বায়ু'র (Bulimia) প্রভাবে অভিভূত ব্যক্তিরা দিনরাত কেবলই খেতে চায় এবং খায়ও। আহার এবং আহার্য্যই এদের দিবারাত্রির একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। তাই দিনরাতই এরা খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতে, রাঁধতে, খেতে, খাওয়াতে এবং আহার্য্য ও আহারের গল্প করতে ভালোবাসে। এদের মুখে ঐ একটি জিনিষ ছাড়া অন্য কথা বড় একটা শুনতে পাওয়া যায় না।

সুতরাং যৌন-বৃত্তি চর্চ্চার বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রেই বা অন্য রকম মনে করার কী হেতু থাকতে পারে? তার বেলাতেই বা 'যৌন-চর্চ্চায় অতিরিক্ত মাত্রায় রত ব্যক্তিদের' মূলে প্রকৃতির হাতের আলাদা রকম 'মাল-মশলা' দিয়ে তৈরী ভিন্ন শ্রেণীর জীব বলে মনে ক'রতে হবে কেন? কথাটা প্রকৃত পক্ষে তো তা নয়। আসল কথা হ'চ্ছে 'এই বেড়ালই বনে গেলে বন-বেড়াল হয়।' এই যুক্তিতেই এ্যাড্লার মানুষের 'জন্মগত' বা পূর্ব্বপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া অনন্যসাধারণ কোন বিশেষ রকমের শক্তি, প্রবৃত্তি বা বৈশিষ্ট্যমূলক মতবাদে বিশ্বাসী নন। তিনি বলতে চান মানুষের মধ্যেকার যা'-কিছু বৈশিষ্ট্য তা' মানুষ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পরই অর্জ্জন করে বা সে-বিষয়ে শিক্ষা বা পারদর্শিতা (?) লাভ করে। আর তার বীজ উপ্ত হয় তার অতি শৈশবের দু'-তিনটে বছরের মধ্যে।

এ্যাড্লারের এই মতবাদ যে অনেক নিরাশ মানুষের হৃদয়ে আশা সঞ্চার করবার পক্ষে খুব উপযোগী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর মতটা অনেকটা কর্ম্মফল-বাদেরই মতন। তিনি ব'লতে চান যে মানুষ যা'-কিছু ভালো ফলভোগ করে বা যা'-কিছু মন্দ ফল থেকে ভোগে তার জন্যে প্রকৃতি বা ভগবান দায়ী নন—দায়ী আসলে প্রত্যক্ষ ভাবেই হোক আর পরোক্ষ ভাবেই হোক—হয় সে নিজে আর না হয় তার শৈশবের অভিভাবক এবং তার তখনকার জীবনের পরিবেশ। তা' হলেই দাঁড়াচ্ছে এই যে—ভালো হওয়া বা মন্দ হওয়া, সুখী হওয়া বা অসুখী হওয়া এই পৃথিবীর মানুষদেরই হাতে; অন্য-লোকবাসী অদৃষ্ট কোনো বিরাট পুরুষ বা প্রকৃতির 'পক্ষপাত-দুষ্ট' মুঠোর মধ্যে আবদ্ধ নয়। অর্থাৎ অদৃষ্টটা আসলে অদৃষ্টই নয়। শিশুর শৈশবের অভিভাবকদের এবং তার পরিবেশেরই কর্ম্মফল মাত্র।

যৌন-প্রবৃত্তির অতিরিক্ত চর্চ্চার ফলে মানুষের জীবনের অন্তর্বিধ কাজকর্ম্ম প্রভৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়। কাজেই তখন মানুষের ঝোঁকটা জীবনের অকেজো দিকটায় হেলে পড়ে। ঠিকমত শিক্ষার গুণে মানুষের যৌন-প্রবৃত্তির মুখে 'লাগাম ক'ষে' সেই কামশক্তিজাত উৎসাহটাকে জীবনের ও সমাজের পক্ষে হিতকর একটা 'কেজো' লক্ষ্যের দিকে চালিত করা উচিত। এর দ্বারাই মানুষের সমগ্র জীবনের সম্যক বিকাশ লাভ সম্ভব! জীবনের লক্ষ্য যদি ঠিক ভাবে বেছে নেওয়া যায় এবং সে লক্ষ্যকে যদি ঠিক রাখা যায় তাহলে যৌন-প্রবৃত্তিই হোক বা জীবনীশক্তির আর যে কোনো রকমের প্রকাশই হোক্, সেটার প্রকাশ আর কিছুতে বাড়াবাড়ির রূপ নিতে পারে না।

কিন্তু তাই ব'লে 'সংযম' বলতে কেউ যাতে 'সম্যক নিরোধ'কে না বোঝেন তাই এ্যাড্লার সে কথারও উল্লেখ ক'রে সে বিষয়ে সকলকে সাবধান হবার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আহারের ব্যাপারে যেমন সংযম দরকার হ'লেও পরিমিত হিতকর আহার্য্যের নিয়মিত গ্রহণকে বাদ দেওয়া চলে না, ক্ষুধার বেলাতেও তেমনি। আহারে 'সংযম' করতে গিয়ে কেউ যদি ক্রমাগত বাড়াবাড়ি রকমের উপবাস ক'রতে থাকে তাহলে কৃশ হ'তে হ'তে আহারের অভাবে একদিন তার দেহযন্ত্র এবং মনও বিকল হ'য়ে যাবে, সেই রকম যৌন-ক্ষুধার ব্যাপারে অতিরিক্ত সংযমের নামে 'অবদমনে'র আশ্রয় নিলে মানুষের পক্ষে অনুরূপ ক্ষতিকর হবে।

তিনি বলতে চান, মানুষের জীবনযাত্রার 'ভঙ্গি' স্বাভাবিক হওয়া চাই এবং তার মধ্যে যৌন-ব্যাপারের প্রকাশভঙ্গিও স্বাভাবিক ভাবেই পরিমিত ও হিতকর হওয়া দরকার। তবে যৌন-প্রবৃত্তিকে অবাধ ভাবে প্রকাশিত হ'তে দিলেই মানুষের 'নিউরোসিস্—যা তার ভারসাম্যহীন জীবন-যাত্রারই চিহ্ন—সেটা সেরে যাবে'—এ রকম কথা এ্যাড্লার মানেন না। তাঁর মতে অবদমিত যৌন-প্রবৃত্তিই যে 'নিউরোসিস্'এর কারণ এ বিশ্বাসটা আজ বহুল প্রচলিত হ'য়ে পড়লেও আসলে এটা একেবারেই একটা ভুল বিশ্বাস। তিনি বলেন, কথাটাকে বরং উলটে যদি এই ভাবে বলা যায় যে, নিউরোটিক্ লোকদের যৌন-প্রবৃত্তি ঠিক মত প্রকাশের সুযোগ পায় না—তা হ'লেই সেটা সত্যি হয়।

অনেক নিউরোসিস্-এর রোগীকে, তাদের যৌন-প্রবৃত্তিকে আর একটু বেশী পরিমাণে প্রকাশিত হবার সুযোগ দেবার উপদেশ অনেক ক্ষেত্রে দেওয়া হয়। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে রোগী ওই ধরণের উপদেশ পালন ক'রতে গিয়ে দেখেছে যে তাতে ভালোর বদলে তাদের রোগের অবস্থাটা আরও মন্দ হ'য়েই দাঁড়ায়।

ইওরোপের উদ্দেশে

সুকান্ত ভট্টাচার্য

ওখানে এখন মে-মাস তুষার-গলানো দিন,
এখানে অগ্নি-ঝরা বৈশাখ নিদ্রাহীন ;
হয়তো ওখানে শুরু-মন্থর দক্ষিণ হাওয়া,
এখানে বোশেখি ঝড়ের ঝাপ্টা পশ্চাৎ ধাওয়া ;
এখানে সেখানে ফুল ফোটে আজ তোমাদের দেশে,
কত রঙ, কত বিচিত্র নিশি দেখা দেয় এসে।
ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে প'ড়েছে কত ছেলে-মেয়ে,
নব বসন্ত : কত উৎসব কত গান গেয়ে।
এখানে তো ফুল শুকানো, ধূসর রঙের ধুলোয়
খাঁ-খাঁ করে সারা দেশটা, শান্তি গিয়েছে চুলোয় ,
কঠিন রোদের ভয়ে ছেলে-মেয়ে বন্ধ ঘরে,
সব চুপচাপ : জাগবে হয়তো বোশেখি ঝড়ে।
অনেক খাটুনী অনেক লড়াই করার শেষে,
চারি দিকে শুধু ফুলের বাগান তোমাদের দেশে,
এদেশে যুদ্ধ, মহামারী, ভুখা, জ্বলে হাড়ে হাড়ে ;
অগ্নিবর্ষী গ্রীষ্মের ময়দানে ঘুম কাড়ে
বেপরোয়া প্রাণ ; জমে দিকে দিকে আজ লাখে লাখ,
তোমাদের দেশে মে-মাস ; এখানে ঝ'ড়ো বৈশাখ।

খবর ঃ সাইবেরিয়াতে

আলেকজান্দার পুস্কিন

সাইবেরিয়ার গহন খনির গহ্বরে
ধৈর্য্য তোমার গর্বে রহুক উন্নত ;
তিক্ত শ্রমের শেষ নহে ভীরু ব্যর্থতা—
বিদ্রোহী মন করে না কখনো মাথা নত।

বোবা অসহায় চাপা-আঁধারেই মুখ রেখে
দুর্ভাগ্যের ভগিনী সে আশা, নন্দিতা
হৃদয়ে তোমার সাহস দীপ্ত হানে কথা—
শোনো লো বন্ধু ; আসছে সে দিন বাঞ্ছিত।

স্বাধীন আমার সংগীত আর, উচ্ছ্বাসে—
স্পর্শ উছল ভালোবাসা তার, মিতালী যার !
অতিক্রান্ত অন্ধকারের সব দুয়ার—
ছুঁয়েছে সে প্রেমে শয্যা তোমার লাঞ্ছিত !

ভারি শৃঙ্খল ঝুলেছে উচ্চে, ছিঁড়বে সে—
ফুৎকারে হবে সকল দেয়াল কম্পিত ;
প্রভাতে মুক্তি ক'রবে ও অভিনন্দিত—
ভ্রাতা ফিরে দেবে তরবারি তব, দগ্ধ দীপ্ত হে সুহৃ !

অনুবাদক—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ফল এ-রকম মন্দ হওয়ার কারণ হ'চ্ছে এই যে, এই ধরণের নিউরোটিক লোকেরা তাদের যৌন-জীবনকে সংযত ক'রে ঠিক মত একটা কেজো পথে চালিত ক'রতে পারে না। তা' যদি পারতো তাহ'লেই তাদের নিউরোসিস্‌ও সেরে যেতো। যৌন-প্রবৃত্তির প্রকাশের মধ্যে দিয়ে নিউরোসিস্ সারতে পারে না এই জন্যে যে, এ রোগটার মূল থাকে মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালীর মধ্যে—বলতে গেলে তার জীবনের আদর্শের মধ্যে। তাই এ ক্ষেত্রে রোগীর জীবনের আদর্শকে বদলে দিতে না পারলে তার রোগ সারানো যাবে কী করে ?

সেই জন্যে Individual psychology অনুসারে যৌন-ব্যাপার সম্পর্কে যাবতীয় জটিলতা ও সমস্যার সমাধান, একমাত্র সুনির্ব্বাচিত বরকন্যার মধ্যে আদর্শ-বিবাহের (happy marriage) দ্বারাই সম্ভব। 'নিউরোটিক' রোগী কিন্তু এ-ধরণের সমাধান চাইবে না। কারণ আসলে সে কাপুরুষ—সে সমাজের সহজ স্বাভাবিক অবস্থাকে পছন্দ করে না।

যে-সব লোক নিজেদের কামশক্তি বা কাম-ক্ষুধার আধিক্যের বড়াই করে কিম্বা তার সপক্ষে সাফাই গায়, যারা যৌন-ব্যাপারে বহু নারীভোগ-লিপ্সার সমর্থন করে, companionate বা trial marriage-এর যারা পক্ষপাতী, তারা আসলে যৌন সমস্যার সমাজ-সম্মত সমাধানের হাত এড়িয়ে পালিয়ে বেড়ানোর পক্ষপাতী। স্বামি-স্ত্রীর পারস্পারিক সহায়তায় পরস্পরের 'সমাজে-খাপ-খাইয়ে-চল্‌বার' পথের ত্রুটিগুলি সংশোধন ক'রে নেবার মতন ধৈর্য্য তাদের নেই। তাই এ পথ একেবারে পরিহার ক'রে উল্টো নানা রকম 'বিপথ'কেই ঠিক পথ মনে ক'রে সেই দিকে চলবার দিকেই তাদের আগ্রহ।

আধুনিক অসমীয়া গল্প

শ্রীমৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

শিশুরাম এইমাত্র মাঠ থেকে ফিরে এসে লাঙল রেখে কাক-স্নান সেরে ছেঁড়া কাপড়টা বদলে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গেলো। ভাদারী, তার স্ত্রী, দুপুরের খাবার তৈরী করছে। তখনো ভাত হয়নি, তরকারী হয়নি দেখেই শিশুরাম জ্বলে উঠলো তেলে-বেগুনে। সে দেখলো শাক কোটা হয়নি, ছুরী পড়ে আছে কলাপাতের ওপর ময়ূরের মতো, ছাইমাখা কৈ-মাছ গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝের ওপর গাঁজায় দম দেওয়া সন্ন্যাসীর মতো! আর অন্য দিকে ভাদারী ধোঁয়ায় অন্ধ হয়ে কেবল বাতাস করছে আগুন ধরাবার জন্তে। কিছুই হয়নি দেখে তো শিশুরাম রাগে ফেটে পড়লো! সকাল থেকেই আজ তার মন-মেজাজ ভালো নেই। নানান্ কারণে তার রাগ উঠেছে সপ্তমে। আজ কৃষ্ণা একাদশীর জন্তে চাষ বন্ধ ছিলো, তার ওপর বলদ ছুটোও কি কম জ্বালিয়েছে তাকে। তা ছাড়া পড়শী বাহুয়ার সংগেও একচোট ঝগড়া হয়ে গেছে খুব। কথা কাটাকাটি থেকে মাথা ফাটাফাটি হবার আগেই বাহুয়া পালিয়ে বাঁচলো, আর সেই গুপ্ত রাগ প্রকাশ হয়ে পড়লো ভাদারীর ওপর, স্ত্রীর ওপর বীরত্ব দেখানোই নিরাপদ! হলোও তাই, বাহুয়ার প্রাপ্য শাস্তিটা শিশুরাম দিয়ে দিলো সুদে-আসলে ভাদারীকে, গরুদের খেতে দিতে এতো দেরী হলো কেন এই অজুহাতে।

ভাদারীর অভ্যেস ছিলো মা বসুমতীর মতো সব অত্যাচার মুখ বুঁজে সহ্য করে যাওয়া। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো স্বামীর একটু-আধটু মার-ধোর বিবাহিত জীবনে খাওয়া শোওয়ার মতোই সহ্য করে যেতে হয়। শিশুরামকে ভক্তি করে সে মুক্তি খুঁজতো।

কিন্তু সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে। এমন কি মা বসুন্ধরাও সময় সময় ভূমিকম্প দিয়ে তাঁর অসহ্যতা বুঝিয়ে দেন। তাই বলছি বেচারী ভাদারী যদি বিদ্রোহ করে এই অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তবে কি একটা অসম্ভব কিছু হবে?

ভাদারী বৃথা আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। শিশুরাম দূর থেকে চেঁচিয়ে অভিশাপ দেওয়ার ভংগীতে বলে উঠলো, "নবাবজাদী কেন, এখনো খাবার তৈরী হলো না কেন? বেলাটা কতো হলো হুঁস্ আছে?" তার চোখ-মুখ রাগে রক্তবর্ণ।

মুখ ঘুরিয়ে ভাদারীও শুষ্ককণ্ঠে বললো,: "আমি কি মাথা দিয়ে বাঁধবো না কি? ঘরে এক টুকরো কাঠ নেই, ভিজে কাঠ জ্বালাতে হায়রান হয়ে গেলাম। না বুজে-সুজে রাগ করো কেন?" তার ক্লান্ত চোখ-ভেঙে জলের ধারা গড়িয়ে পড়লো।

—"কি বললি হারামজাদী? শুয়ার কী বাচ্ছা?"—হুঙ্কার দিয়ে কলাপাতা থেকে ছুরীখানা তুলে নিয়ে ভাদারীর কাঁধে বসিয়ে দিলো। শব্দ শুনে কেনারাম, শিশুরামের ভাই, ছুটে এসে তাকে ধরে জোর করে বাইরে টেনে নিয়ে গেলো। আর হতভাগী ভাদারী রক্তাক্ত দেহে মেঝেতে রইলো পড়ে।

পরে ভাদারীকে হাসপাতালে পাঠানো হলো। দুদিন বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকার পর তৃতীয় দিনে জ্ঞান হলো। জ্ঞান ফিরে পেয়েই সে যেন কাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে লাগলো, সে আশা করে-ছিলো কেউ নিশ্চয়ই তার বিছানার পাশে আকুল প্রতীক্ষায় থাকবে। ওয়ার্ডার কাছে আসতে সে জিজ্ঞেস করলো—"সে কোথায়?"

—"কার কথা বলছো?" রক্ষক বুঝতে পারে না। একটু চুপ করে সে ফের বললো,—"আমার স্বামী?"

—"ওঃ সেই বদমাইসটা? সে তো এখন হাজতে।"

—"তাঁকে এখানে আনান্ ডাক্তার বাবু"—ভাদারীর গলায় অজস্র আকুতি।

"কেমন করে হবে? সে যে হাজতে। তার কথা ভেব না, তোমার ক্ষতি হবে তাতে।"

ভাদারীর চোখ বুঁজে এলো, একটু পরে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লো। ডাক্তার এলেন, সমস্ত কথা শুনে তিনি পরামর্শ দিলেন শিশুরামকে কাছে আনতে। সব ব্যবস্থা হলো, শিশুরাম ভাদারীর বিছানার পাশে এলো যেন জ্ঞান হলেই তাকে দেখতে পায়।

পরদিন সকালে জ্ঞান ফিরে এলে ভাদারী দেখলো স্বামী তার চুল নিয়ে বিলি কাটছে। দেখে অনেক শান্তি পেলো। মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলো:" কেমন আছো? খাবার পাচ্ছো তো ঠিক সময়ে? নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে? ভয় নেই আর দু চারদিনের মধ্যেই আমি ভালো হয়ে যাবো। কবে নিয়ে যাচ্ছো আমাকে এখান থেকে? একটা দিন ঠিক করো বাপু, আর ভালো লাগছে না এখানে আমার। তোমার কাজ করে বাঁচি।" দু-ফোঁটা তপ্ত অশ্রু শিশুরামের গাল বেয়ে ঝরে পড়লো নীচে। ডাক্তার এলে ভাদারী অনুনয় করে বললো: "বাবা ও নিরপরাধ, ওকে ছেড়ে দিন। আমিই ছুরী দিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম।" চোখ তার জলে ভেসে যেতে লাগলো।

এ-কথা শুনে সবাই অবাক্! শিশুরাম আর দুঃখ চেপে রাখতে পারলো না। সে শিশুর মতোই কেঁদে উঠলো।

"ও সব কথা ওর মোটেই সত্যি নয় বাবু! আমিই ওকে ছুরী মেরেছি, আমাকে শাস্তি দিন। আমাকে ফাঁসি দিন। আমি দোষী আমি ছুরী মেরেছি ওকে"—উত্তেজনায় আবোল তাবোল অনেক কিছু বকে গেলো।

কয়েক সপ্তাহ পরে ভাদারী হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ী এসেছে ফিরে। যদিও সে শিশুরামকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টাই করেছিলো, কিন্তু সে ফলবতী হয়নি। আইন তাকে ছেড়ে দেয়নি, তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে শিশুরামের। শিশুরামও হাসিমুখে জেলে গেছে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে।

কিন্তু ভাদারীর মনে হচ্ছে সেই যেন এই সব অনাসৃষ্টির মূল। তাই নিজেকে সে যতো গঞ্জনা দিয়েছে আর কেউ তেমন দেয়নি।*

---

* লক্ষ্মীনাথ বেজ বড়ুয়ার গল্পের অনুবাদ। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক।

* স্বপ্ন কি এবং আমরা স্বপ্ন দেখি কেন ?

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস

সব দেশের, সব সমাজের মানুষই স্বপ্ন দেখেছে দেখে থাকে এবং ভবিষ্যতেও দেখবে। শুধু মানুষ কেন জীব-জন্তুও স্বপ্ন দেখে হাত-পা ও মুখ নাড়ে, ঘুমের মাঝে চিৎকার করে ওঠে এবং সময় সময় লাফিয়েও ওঠে। বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন কালের পণ্ডিতরা নানা ভাবে স্বপ্ন-বিচার করেছেন। তাঁদের বিচিত্র ব্যাখ্যা অবলম্বন করে নানা দেশে এ সম্বন্ধে নানা রকম ভ্রান্ত ধারণা জনপ্রবাদ গড়ে উঠেছে। সে যুগের বড় বড় গ্রীক্ পণ্ডিত মনীষী য়্যারিস্টটল, প্লেটো, টলেমী থেকে স্বরু করে আজকের আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা পর্য্যন্ত চলেছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে। ইতঃপূর্ব্বে এ নিয়ে বহু আলোচনা হলেও প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এ সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা স্বরু করেন জার্মান্ মনো-বৈজ্ঞানিক মনীষী ফ্রয়িড্।

ফ্রয়িড এক সময় উন্মাদ-রোগ সম্বন্ধীয় বইয়ের সমালোচনার কাজ করতেন; তার পর তিনি মনো-বিকার নিয়ে গবেষণা স্বরু করলেন। এই গবেষণা থেকেই তিনি চেতন ও অবচেতন মনের ক্রিয়ার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা টানতে সমর্থ হন। চেতন ও অবচেতন মন নিয়ে গবেষণা করতে করতেই তিনি একদিন আবিষ্কার করলেন,—আমরা স্বপ্ন দেখি অবচেতন মনের ক্রিয়ার ফলে। ফ্রয়িড বলেছেন, স্বপ্নের ভেতর দিয়েই আমরা অবচেতন মনের ক্রিয়া জানতে পারি।*

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যা ঘটে, স্বপ্ন সেই অভিজ্ঞতারই অংশবিশেষ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চেতন মনের সাহায্য নিয়ে আমরা যে সব কাজ করি, আমাদের অবচেতন মনের ওপর পড়ে তার একটা ছাপ। এই ছাপ এলো-মেলো, অসংলগ্ন, বা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে না; চেতন মনের স্পষ্ট, বাস্তব স্মৃতির মত অবচেতন মনের পরতে সুশৃঙ্খল ভাবে সাজান থাকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনা ও অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট ছাপ। আমাদের এ আলোচনায় ফ্রয়িড কি ভাবে মনের কার্য্য-কলাপ বিশ্লেষণ করে স্বপ্নের সৃষ্টি-রহস্য উদ্ঘাটন করেন, এখানে তারই আলোচনা করা হচ্ছে। সুদীর্ঘ কাল গবেষণার পর ফ্রয়িড মনো-বিশ্লেষণের যে রীতি উদ্ভাবন করেন তিনি তার নাম দেন "সাইকো য়্যানালিসিস্ (Psycho-analysis); আমাদের ভাষায় এর প্রতিশব্দ হয়েছে "মনীক্ষণ"।† এখন দেখা যাক, ফ্রয়িডের মনঃ-সমীক্ষণের উপায়টা কি?

ধরুন, চেতন অবস্থায় কোন লোকের তীব্র মানসিক অভিজ্ঞতার মত কোন কারণ ঘটল; ধরুন, হঠাৎ কোন কারণে মনে আঘাত লাগল; বা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটায় কোন লোক ভীষণ ভয় পেল। যদি এই লোকটি "নার্ভাস"-প্রকৃতির হয়; তাহলে এতে তার মানসিক বিপর্য্যয় ঘটবে। এ ক্ষেত্রে বাস্তব ঘটনার কোন কোন অংশের স্মৃতি ভুল হয়ে যেতে পারে। ধরা যাক, তাই ঘটেছে। এর পর আবিষ্কার করা গেল, ঐ বিশেষ ঘটনার পর লোকটি কোন অতি সাধারণ ঘটনা—যার সঙ্গে ভয় বা মানসিক আঘাতের কিছুমাত্র সংস্রব নেই—তার সংস্পর্শে এলেই ভীষণ ভয় খেয়ে যায় বা বিচলিত হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে ফ্রয়িড দেখেছেন, এমন কোন আকস্মিক ঘটনার পর ঐ রকম ভীরু প্রকৃতির কোন কোন লোক জনতা দেখলে, বাড়ীর দরজা বন্ধ দেখলে বা কোন জীবজন্তু দেখলে ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। এদের অনেক সময় তিনি ভয়ে একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলতে দেখেছেন। এই অবস্থায় এদের প্রশ্ন করলে—ভয়ের কারণ কি, কেন ভয় পায় এরা এর সঠিক কোন উত্তরই দিতে পারে না। এদের অনেকেই সারা জীবন ধরে,—বদ্ধ দরজার-ভয় বা ক্লসট্রোফোবিয়া (claus-trophobia), জনতার-ভয় বা য়্যাগোরাফোবিয়া (Agoraphobia) অমূলক ভয়ের মানসিক উৎকণ্ঠা ভোগ করে থাকে। এদের এই সব অমূলক ভয়ের মূলে থাকে সেই বিশেষ মানসিক ঘটনা, যার পর থেকেই ঐ বিচিত্র ভয়ের অনুভূতির উদ্ভব হয়েছে। ফ্রয়িডের, মতে খুব গভীর না হলেও অল্প-বিস্তর এমন অমূলক ভয় প্রায় প্রত্যেক লোকেরই মনে থাকে। এ ক্ষেত্রে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই মূল ভীতির বা আতঙ্কের বিস্তারিত ঘটনার ছাপটি (Intellectual details) মন থেকে লুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু অবচেতন মনে কেবল তার "এমোস্যানের" একটি গভীর ছায়া বদ্ধমূল হয়ে থাকে। এই মূল বা আদি "এমোস্যান"টি বিশেষ কোন বস্তু, স্থান বা ঘটনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং পরে সেই বস্তু, স্থান বা ঘটনার সংস্পর্শে এলেই লোকটির আতঙ্ক বা ভয় দেখা দেয়। অনেক সময় অতীতের সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাওয়া ঘটনা হঠাৎ আমাদের মনে সুস্পষ্টরূপে জেগে ওঠে। এর মূলেও আছে অবচেতন মনের ঠিক অমনি ক্রিয়া। অনেক সময় দেখা যায়, কেউ কোন কথা বললে অতীতের একেবারে ভুলে-যাওয়া অনেক কথা স্পষ্ট মনে পড়ে, অনেক অমূলক ভয়, উৎকণ্ঠা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। মনঃ-সমীক্ষক নানা রকম সুসজ্জিত প্রশ্নের ভেতর দিয়ে, নানা রকম অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে অনেক সময়ই মনো-বিকারগ্রস্তের অমূলক ভীতির কারণ নির্দ্ধারণ করতে সমর্থ হন। তাঁরা সুকৌশলে অতীতের অবলুপ্ত ঘটনার ছবি চেতন মনের সামনে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। নানা রকম দ্যোতনা (suggestion), প্রশ্ন ও উত্তরের ভেতর দিয়ে এমন একাধিক অবলুপ্ত ঘটনার কথা আবিষ্কার করার পর সেগুলি বিশ্লেষণ করে তাদের পরস্পরের সম্বন্ধ আবিষ্কার করেন ও পরস্পরকে একত্রে গ্রথিত করে অসংবদ্ধ ঘটনাগুলি একত্রে যোগ করে একটি সুসংবদ্ধ ধারার সৃষ্টি করেন, এবং পরিশেষে যে কারণে রোগীর ভয় বা আতঙ্কের সঞ্চার হয়, সমূলে তা নাশ করেন। এই হলো মনঃ-সমীক্ষণের উপায়। এর মূলে আছে কি? আমাদের দৈনন্দিন জীবনের "মানসিক-অভিজ্ঞতা" বা "কমপ্লেক্সের" ছাপ আমাদের মনের তলদেশে পড়ে যায় (submerged), কিম্বা অবদমিত হয়ে যায় (suppressed)। ফ্রয়িডের মতে, আমাদের চেতন মন যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা সর্ব্বদাই অবদমন করে রাখবার চেষ্টা করে।* অনেক সময় মানুষ চেতন অবস্থাতেই

---

* "The interpretation of dreams,"—says Professor Freud in one place, "is the royal road to a knowledge of the part the unconscious plays in the mental life."

† ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসু প্রথম "Psycho-analysis"এর বাংলা প্রতিশব্দ করেন মন-সমীক্ষণ" সম্প্রতি হয়েছে "মনীক্ষণ"।

* Freud maintains that there is a fundamental

আনন্দদায়ক পরিবেশে প্রবেশ করে বা আনন্দ পাওয়া যায় এমন কাজে নিজেকে লিপ্ত করে যন্ত্রণার কথা ভুলতে চেষ্টা করে, কালক্রমে সেই কষ্টদায়ক অনুভূতি ভুলেও যায়; যেমন আত্মীয়-পরিজনের মৃত্যুতে অনেকে শোকে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। নানা রকম আনন্দদায়ক চিত্তবিনোদনের উপকরণের মাঝে এদের শোকভার প্রথমে লঘু হয়ে আসে, তার পর শোকের পীড়াদায়ক গভীরতা কমে যায়, অবশেষে কিছু দিন গেলে সে শোকই একেবারে ভুলে যায়। বাহ্য-দৃষ্টিতে শোকের কষ্টদায়ক অংশটা লুপ্ত হলেও এ অভিজ্ঞতার ছাপ মন থেকে একেবারে যায় না। এই পীড়াদায়ক বিশেষ অভিজ্ঞতা সুপ্ত অবস্থায় অবচেতন মনে সঞ্চিত থাকে,—"It may lie dormant, or it may work subconsciously, and throw up the emotional bubbles that continue, without a known reason, to excite the ordinary consciousness." এই স্মৃতি অবচেতন মনে থেকে সময় সময় চেতন মনকে নানা ভাবে প্রভাবান্বিত করে। এমন "কমপ্লেক্স" গভীর হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের আয়ত্তের একেবারে বাইরে চলে যায় না। গভীর মনোনিবেশের (concentration) সাহায্যে, "Free-associations"এর সাহায্যে, নানা রকম ধারণার ভেতর দিয়ে 'খেই' (clues) পেয়ে অবচেতন মনের এমন সুপ্ত complex এর প্রত্যেক খুঁটি-নাটি অংশ পর্য্যন্ত আবার ফিরিয়ে এনে চেতন মনের সামনে প্রকট করে তোলা যায়। এই হচ্ছে মোটামুটি মনঃসমীক্ষণ বা মনো-বিশ্লেষণের উপায়। হিষ্টেরিয়াস্ (Hysterias), অবসেস্যান্ (Obsession) ফটোবায়াস্ (Photobias) প্রভৃতি জটিল মানসিক রোগে (Neurosis) কেবল যোজনার সাহায্যে মনীক্ষক নানা রকম সুনির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন করে এই সব জটিল মনোবিকারে কারণ নির্ণয় এবং নিরাময় করেন। এমন সব রোগে মনঃসমীক্ষক অনেক সময় রোগীর কাছ থেকে অতি বিস্ময়কর, অপ্রীতিকর, যন্ত্রণাদায়ক ঘটনার কথা আবিষ্কার করেন।

এবার আমরা আলোচনার ভেতর দিয়ে স্বপ্নরাজ্যে এসে গেছি এবং স্বপ্ন কি, সেই কথা বলছি। স্বপ্ন হচ্ছে মনের মধ্যের সুপ্ত স্মৃতির জাগরণ। মনো-বৈজ্ঞানিকরা এই রকম সুপ্ত স্মৃতির একটি বিশেষ নাম দিয়েছেন, তাঁরা একে বলেছেন কম্‌প্লেকস (Complex)। তাহলে তাঁদের ভাষায় স্বপ্ন হচ্ছে "Awaking of dormant complexes" মনের বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ ভাবাবেশে (Emotion) অবচেতন মনে সঞ্চিত সুপ্ত স্মৃতিগুলি জেগে উঠে স্বপ্নাবিষ্টের কল্প-রাজ্যে রহস্যময় ছবি ফুটিয়ে তোলে। খণ্ড খণ্ড স্মৃতির ছবিগুলি পর পর গ্রথিত হয়ে ছায়াচিত্রের ঘটনা-বহুল ছবির দীর্ঘ ফিল্মের মত কল্পনার সামনে দিয়ে ভেসে যায়। মনের বিশেষ অবস্থায় বিশেষ সুপ্ত স্মৃতি জেগে ওঠে। সব সময় সব স্মৃতি জাগে না। কোন ক্ষেত্রে জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নদ্রষ্টা হয়ত বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে চোখে-দেখা এক আকস্মিক-দুর্ঘটনায় কোন লোক মারা যাওয়ার এক গল্প করল; ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখলো তারই কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হয়েছে বিশেষ আকস্মিক ভাবে। এ স্বপ্নে লোকটির জাগ্রত অবস্থার ঐ গল্পের যোগাযোগ আছে। স্বপ্ন রহস্যময়, উদ্ভট, এমন মনে হলেও তার সৃষ্টির মূলে আছে সুশৃঙ্খল নিয়ম। এখানে এ কথা মনে রাখতে হবে, স্বপ্ন অবচেতন মনের সঞ্চিত সুপ্ত স্মৃতির সমষ্টি হলেও সেটি ফুটে ওঠে চেতন মনে, যার জন্যে স্বপ্ন দেখে দ্রষ্টা ভয় পায়, আতঙ্কে শিউরে ওঠে এবং জেগে উঠেও স্বপ্নে কি দেখেছে তা অনেক ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করতে পারে।

মনীষী ফ্রয়িডের মতে স্বপ্নের সৃষ্টি হচ্ছে সুপ্ত অভিজ্ঞতা থেকে; বিশেষ করে অপূর্ণ বা অবদমিত আকাঙ্ক্ষা থেকেই উদ্ভব হয় অধিকাংশ স্বপ্নের। এবার আমরা "আকাঙ্ক্ষা" (desire) বলে নতুন যে কথাটির সংস্পর্শে এলুম,—এর আবার নানা শ্রেণী-বিভাগ আছে। পুস্তকাগারে বই যেমন সুশৃঙ্খল ভাবে সারি দিয়ে "র‍্যাকে" সাজান থাকে, বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত ভাবে মনের মধ্যে ঠিক তেমনি সুপ্ত থাকে। আকাঙ্ক্ষাগুলি আবার জীবন্ত গাছ-পালার মত। শৈশবের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা কালক্রমে বহু শাখা-প্রশাখা মেলে এক জটিল আকার পরিগ্রহ করে বসতে পারে। সেই জন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুদের স্বপ্ন এবং বয়স্ক লোকদের স্বপ্নে দেখা যায় যথেষ্ট পার্থক্য। শিশুদের স্বপ্নের চেয়ে বয়স্ক লোকের স্বপ্নে যথেষ্ট বৈচিত্র্য এবং জটিলতা থাকে।

স্বপ্ন নানা রকমের: কোন কোন স্বপ্ন দেখার পর জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই স্বপ্নদ্রষ্টা সব ভুলে যায়; অনেক কষ্টে স্বপ্নের দু'-চারটি অসংলগ্ন বিবরণের বেশী বর্ণনা করতে পারে না; অধিকাংশ স্বপ্নই এমনি; তবে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বপ্নদ্রষ্টা হুবহু স্বপ্ন বর্ণনা করতে পারে, এবং অনেক কাল তার স্মৃতিও মনে থাকে। স্বপ্নের যে অংশ মনে থাকে, সেই অংশ হতে মনীক্ষকরা স্বপ্ন-বিশ্লেষণের অনেক ইঙ্গিত বা "খেই" (clue) পান। ফ্রয়িড এ ক্ষেত্রে বলেছেন,—Take a remembered element of a dream, track it back and back by free association or other method, and you will find that, at one or two removes, the remembered element stirs up forgotten elements, and ultimately brings coherence out of incohencene."

মনীষী ফ্রয়িডের প্রকৃত মনীষার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর স্বপ্ন-বিশ্লেষণের অদ্ভুত প্রক্রিয়ায়। যে দিন তিনি তাঁর এ বিচিত্র আবিষ্কার পৃথিবীর সুধী-সমাজের সামনে প্রকাশ করলেন, সে দিন সমগ্র বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মহলে পড়ে গেল সাড়া। মানুষের মনের নানা দিক্ নিয়ে সুদীর্ঘ কাল গবেষণা করার পর ফ্রয়িড এ বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের বিরাট স্তূপ থেকে স্বপ্ন সম্বন্ধে যে নানা রকম নিয়ম আবিষ্কার করেন, সেগুলি বাস্তবিকই মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে অমূল্য সম্পদ। স্বপ্ন-দ্রষ্টার কাছে স্বপ্ন যা প্রতীয়মান হয়, তিনি তার নাম দিয়েছেন "Manifest dream ideas," কিন্তু স্বপ্ন প্রকৃতপক্ষে যা প্রকাশ করে তিনি তার নাম রেখেছেন "Latent dream ideas", মনের সুপ্ত স্মৃতিগুলি জেগে উঠে দৃশ্যমান স্বপ্ন সৃষ্টি করার কাজটার নাম দিয়েছেন তিনি "Dream work" ফ্রেয়িডের মতে

---

tendency in the mind to suppress every experience, that is associated with painful emotion.

প্রত্যেক স্বপ্নের মূলে অতীতের কোন না কোন ঘটনার যোগাযোগ থাকে। কোন সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করেও স্বপ্নের সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু এই দৃশ্যমান স্বপ্নের মূল যে কোথায় আছে তা নিরূপণ করা অনেক সময়ই বিশেষ কঠিন। ব্যাপারটি যেন সেই জীবজন্তুর পেটের সুদীর্ঘ 'টেপ-ওয়ার্মে'র' মত। টেপ্-ওয়ার্মের মাথাটি থাকে এক জায়গায়, কিন্তু শেষপ্রান্ত পাকাতে পাকাতে কোথায় গিয়ে যে শেষ হয়েছে তা আবিষ্কার করা দস্তুর মতই কষ্টকর। কোন অশীতিপর বৃদ্ধ আজ দেখলো একটি স্বপ্ন কিন্তু তার মূলে হয়ত রয়েছে তার চার বছর বয়সের বিশেষ এক দিনের এক তীব্র অভিজ্ঞতা। এই সুদীর্ঘ আশী বছরের মনের অজস্র অলি-গলি পেরিয়ে স্বপ্নের সুদীর্ঘ ফিল্ম (Film) ছুটে এসে সেই আশী বছর আগের শিশুমনের সেই বিশেষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে করছে তার যোগসূত্র স্থাপন। এ সূত্র ব্যক্তিবিশেষের জীবনের যে কোন অংশে গিয়ে হানা দিতে পারে; কিন্তু শৈশবের জ্ঞানোদয় হবার পূর্ব্বের ঘটনার সঙ্গেও এর যোগাযোগ থাকতে পারে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা এবং বৃহত্তর জীবনের অভিজ্ঞতা সমস্ত চলে এক পথ দিয়ে। স্বপ্নে যে সমস্ত প্রতিচ্ছায়া আমরা দেখি এগুলি হচ্ছে ছোট-বড় নানা রকম অভিজ্ঞতার পরিস্ফুট প্রতীক (Symbol) বিশেষ। ছোট-বড় বর্ত্তমান ও অতীতের ঘটনার নানা রকম পার্‌মুটেস্থান্-কম্‌বিনেস্থানে (Permutation and combination) বা সংমিশ্রণে স্বপ্নের উদ্ভব হয়। স্বপ্নে অতীত, বর্ত্তমান, ছোট অভিজ্ঞতা, বড় অভিজ্ঞতা, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, তৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত যেন একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে এসে জড় হয়।

আমরা নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখি কেন? আমাদের চেতন মন সর্ব্বদা সতর্ক প্রহরীর মত মনের সিংহদ্বার আগ্‌লে দাঁড়িয়ে থাকে। কোন কথা মনের চৌকাঠ পেরোবার আগেই সেই প্রহরী তার মনের বাইরে যাওয়ার সার্থকতা আছে কি না, সেটি ঠিক ক্ষেত্রবিশেষে প্রযুজ্য কি না, সমস্ত দেখে-শুনে তবে সে তাকে আত্মপ্রকাশ করার 'পারমিট্' বা ছাড়পত্র দেয়। এই কারণেই স্বাভাবিক মনের লোকের প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক ভাব সুসমঞ্জস, তাতে কোথাও একটু অসংলগ্নতা দেখা যায় না। চেতন মন জাগ্রত অবস্থায় প্রতিনিয়ত পাহারাদারী করার জন্যই এমন হয়। যখনই চেতন মন শিথিল হয়ে পড়ে যখনই আমরা কথায়, আচরণে অসংলগ্নতা দেখি, তখনই আমরা বলে বসি লোকটার মাথার দোষ হয়েছে। নিদ্রায় কম্ম-মুখর চিন্তাজটিল জীবনের ওপর নেমে আসে বিশ্রামের ছায়া। জাগ্রত অবস্থায় আমাদের দেহ ও মন চেতন মনের যে কঠোর শাসনাধীন থাকে, নিদ্রিত অবস্থায় সে শাসন দূরীভূত হয়। কর্ম্মলিপ্ত জীবনে পরিবেশ থেকে নানা রকম উত্তেজনা (Stimulation) আসে; নিদ্রায় কিন্তু এ সমস্ত বাহ্যিক উপদ্রব থাকে না। দিনের কঠোর জীবনের সামাজিক পরিস্থিতি বজায় রেখে নানা রকম বুদ্ধির কাজে যেমন সচেতন ভাবে মস্তিষ্ক চালনা করতে হয়, নিদ্রায় তা করতে হয় না। এ অবস্থায় "censor" হয় একেবারে ঘুমিয়ে পড়ে, নয় তন্দ্রালস হয়ে থাকে। এমন অবস্থায় বাবার অবর্ত্তমানে বাবার বৈঠকখানায় যেমন ছেলের অবাধ উপদ্রব সুরু হয়, লোকে চলিত কথায় যেমন বলে "খালি ঘরে ভূতের নাচন," এ ক্ষেত্রেও ঘটে ঠিক তাই। চেতন মনের তন্দ্রালস অবস্থায় অবচেতন মনের সুপ্ত ঘটনাগুলি জেগে উঠে নিজেদের নির্দ্দিষ্ট আকারে ফুটিয়ে তোলে, নির্দ্দিষ্ট আকার পরিগ্রহ করে অভিনয় করতে সুরু করে। নানা রকম জটিল ধরণের স্বপ্ন আছে। ফ্রয়িড মোটামুটি সেই বিরাট, জটিল স্বপ্নের ছোট ছোট নাম দিয়ে সেগুলির শ্রেণী বিভাগ করেছেন, যেমন "Displacement," "Condensation" "Dramatisation"; কোন স্বপ্ন অতিশয় শোভনীয়, কোন স্বপ্ন আবার Alice in the wonder landএর মত কল্পনাদৃপ্ত, কোন ক্ষেত্রে আবার অতি তীব্র ভীতিপ্রদ, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বপ্ন বাস্তবের কাছাকাছি থাকে, বাস্তবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করতে বহু কথা ব্যবহার করে থাকি। প্রত্যেক কথা একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে থাকে। প্রত্যেক লিখিত বা কথিত কথা একটি করে প্রতীক বা "symbol", ঠিক এমনি স্বপ্নের প্রত্যেকটি চিত্র একটি প্রতীক বা "symbol"; প্রত্যেক কথার অর্থ বুঝলে যেমন সমস্ত বাক্যটির অর্থবোধ হয়, ঠিক তেমনি স্বপ্নের প্রত্যেক প্রতীকের (symbol) অর্থ আবিষ্কার করতে পারলে স্বপ্নের একটি সম্পূর্ণ অর্থ আবিষ্কার করা যায়। যেমন ভাষাবিদের ভাষা-শাস্ত্র অতি বিরাট, স্বপ্নতত্ত্ববিদের এই ক্ষেত্রও তেমনি অতি বিরাট ও জটিল। ভাষার অভিধান হয়েছে কিন্তু স্বপ্নের প্রতীকের বা symbolএর অভিধান এখনও অসম্পূর্ণ। এ অভিধান রচিত হয়ে তার থেকে প্রত্যেক "সিম্‌বলের" অর্থ খুঁজে স্বপ্নের সম্পূর্ণ অনুবাদ করতে মনো-বৈজ্ঞানিকদের অনেক সময় লাগবে, হয়ত কয়েক শত বছরই লেগে যাবে। আধুনিক মনীষীরা মনঃসমীক্ষণ বা মনো-বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে এই তথ্য সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ অভিধান গড়ে তোলবার চেষ্টা করছেন।

যৌন-বিষয়ক ব্যাপার থেকে যে সমস্ত ভাবোদয় হয়, অর্থাৎ "Sex-emotions" আমাদের অবচেতন মনের মধ্যে বিশেষ গভীর ভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায়, সেই সমস্ত যৌন-বিষয়ক "এমোস্থান" আমাদের স্বপ্ন রচনার বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। নরনারীর জ্ঞানোদয় হবার পর থেকেই মনে নানা ভাবে নানা রকম ঘটনার ভেতর দিয়ে যৌন-আবেদন যৌন-সচেতনতা যৌন-বাসনা জেগে ওঠে। তাই অধিকাংশ স্বপ্নের পেছনেই প্রায় যৌন এমোস্থানের" অল্প-বিস্তর প্রভাব থাকে। মনীষী ফ্রয়িড এদিক থেকে বিশেষ ভাবে আলোকপাত করেছেন। প্রথম যৌবনে নানা কারণে পরিবেশের বৈচিত্র্যে এক এক জনের যৌন-বাসনা এক এক দিকে চালিত হয়। পরিবেশের অবস্থা-ভেদে অনেক সময় অনেক নর-নারীর যৌন-বাসনা অবদমিত হয়ে হয়ে অবশেষে বিকৃত হয়ে আসে, কারণ "Sex-emotion" অবদমন করার চেয়ে কঠিন ব্যাপার আর কিছু নেই।* মনের সঙ্গে অহরহঃ যুদ্ধ করে করে অবদমিত "কম্‌প্লেক্স" গুলি নানা রকম বিচিত্র গতি অবলম্বন করে। সংযমের জন্যে প্রয়োজন হয় অবদমনের; অবদমন থেকে মানুষ অসামাজিক হয়ে পড়ে; এর থেকে তার জীবনের দৈনন্দিন কাজে আসে নানা রকম বিশৃঙ্খলা। জাগ্রত অবস্থায় এমন মানুষ

* "Sex-emotions are the most difficult to control and have demanded the greatest amount of restraint"—W. Leslie Mackenzie.

নার্সিসাস্

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

আমার জীবন-ব্রহ্মপুত্রের তীরে কে খুঁজিছ' আশ্রয় ?
আমি যে পেয়েছি টের।
ফিরে যাও, ফিরে যাও।
স্রোতের মুকুরে ছায়া যে প'ড়েছে ঝলোমলো দ্যুতিময়—
ফিরে চাও, ফিরে চাও :
মোর সৈকতে আশা নাই কোনো নির্ভর নোঙরের।

এ' প্রাণের ঢেউ উতল, উতল
কোথাও মানে না বাধা :
বুকের গহনে মিলে, মিশে আছে কত হাসি, কত কাঁদা
—কত জীবনের উচ্ছল কোলাহল :
কত পিছু ডাক, মন্থর হাসি, নীল নয়নের জল।
রাঙা স্বপনের কত-না রঙীন দেশ :
এ' বিষ বুকের তুফানে, তুফানে ক্ষ'য়ে হ'লো নিঃশেষ !
তবুও সুদক্ষিণ—
হা-হা হেসে হেসে ছুটে ত' চ'লেছি দুরন্ত বেদুইন।

যারা দিলে শুধু দোষ :
তারা ত' জানো না এ' বুকেও বাজে কী-ভীষণ আপশোষ !
শুধু কি স্রোতেরই দায় !
অথবা বিধাতা যে মিশালো বিষ উৎসের আত্মায় ?
বারেক করুণা করো :
নার্সিসাসের-ও হৃদয়-পদ্ম কাঁপে ব্যথা-থরোথরো !

আমি ত' চেয়েছি সবার ভবন ছবি হ'য়ে আঁকা থাক :
সবার আকাশে জেগে থাক চির-রামধনু নির্বাক্।
গ'লুক জ্যোৎস্না, গ'লুক রোদ :
অঙ্গনে তরু, নভো-কোণে তারা—আর দু'টি প্রাণ নির্বিরোধ।
শুধু, এ' তীর ছাড়িয়া দূরে—
যেখানে আমার দুস্তর বাঁক কখনো যাবে না ঘুরে।

তবু যারা শুনিলে না :
প্রমুগ্ধ হ'লে দেখে দেখে শুধু শুভ্র বুকের ফেনা—
দুর্বার বেগে উল্কার মত ঝাঁপায়ে পড়িলে এসে :
আঘা'তে, আঘাতে খান্ খান্ হ'য়ে, অভিশাপ দিলে শেষে—
আমি কি করিব তার ?
যদি পতঙ্গ বরেই কঠিন বহ্নি-নমস্কার : সে' কাহার অপরাধ ?
ব্রহ্মপুত্র চিরকালই সে ত' প্রখ্যাত প্রতিবাদ। একটু করুণা করো :
নার্সিসাসের-ও হৃদয়-পদ্ম কাঁপে ব্যথা-থরোথরো।

কে নবীনা ইকো : আবার আমার কূলেতে দাঁড়ালে আসি।
মিনতি আমার—কাণ পেতে শোনো বারেক স্রোতের বাঁশী :
এ' নিশ্বাসের অবিশ্বাসের তীব্র বিষের সুর :
'নেইক, নেইক' এখানে সে কোনো স্বর্গ-অন্তঃপুর'—
বন্ধুর গান শোনো, শোনো বন্ধু-র : ফিরে যাও, ফিরে দাও—
ব্রহ্মপুত্রে বহ্নি-সূত্রে অনন্তে যেতে দাও
বহুর লোহু-র বিদ্রোহ-রাঙা সমুদ্র-মোহনায়—
সকল গরল যেখানেতে গিয়ে সুধা হ'য়ে গ'লে যায়।

সংযমের কঠোর পীড়নে মনের বলগা দৃঢ় ভাবে ধরে চলে, কিন্তু এরা নিদ্রিত হবামাত্রই মনের বল্গা যায় শিথিল হয়ে, মনের সিংহদ্বারের কঠোর প্রহরী পড়ে ঘুমিয়ে, তখন অবদমিত বাসনাগুলি একে একে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বিচিত্র স্বপ্ন-জাল রচনা করে' স্বপ্নদ্রষ্টাকে পীড়া দিতে থাকে। অধিকাংশ "হিষ্টিরিয়া" রোগীর পীড়াদায়ক স্বপ্ন এবং ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখে "হিষ্টিরিয়া" হওয়ার মূলেও থাকে এমনি অবদমিত যৌন-বাসনা। প্রেমে যে সব নরনারী প্রত্যাখ্যান, ঘৃণা বা ঐ জাতীয় দুর্ব্যবহার পায় তারাও ক্রমে ক্রমে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়ে ; স্বপ্নে নানা রকম যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতির নিপীড়নে এরা বিশেষ মনঃকষ্ট পায়। অনেক সময় দেখা গেছে, সমীক্ষকের নির্দ্দেশ মত এই সব লোক নিজের পছন্দ মত বিয়ে করে, মনোমত প্রেমিক বা প্রেমিকার সান্নিধ্য পেয়ে বা অবদমিত যৌন-বাসনা প্রস্ফুরণের অপর উপায় পেয়ে যন্ত্রণাদায়ক স্বপ্নানুভূতির হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে, অনির্দ্দিষ্ট ভয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে।

স্বপ্নকে কেন্দ্র করে যুগে যুগে নানা উপকথা, নানা জন-প্রবাদ গড়ে উঠেছে। আজ এই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে অবশ্য সে সমস্ত বিভিন্ন মত এক মনস্তত্ত্বের সীমার মধ্যে এসে জড় হয়েছে। সে যুগের অনেক আদিম জাতির ধারণা ছিল, নিদ্রাকালে নানা রকম আত্মা মানুষের দেহ অধিকার করে বসে, তাই ঘুমন্ত মানুষ স্বপ্ন দেখে, তারই প্রভাবে নিদ্রোত্থিত মানুষ হয় মিত্র-ভাবাপন্ন, নয় শত্রু-ভাবাপন্ন হয়। তাদের বিশ্বাস ছিল দানা-দৈত্যের আত্মা মানুষের দেহ অধিকার করলে জেগে উঠে স্বপ্নদ্রষ্টা হয় শত্রুভাবাপন্ন, আর দেবতা পরী প্রভৃতির আত্মা তার দেহ অধিকার করলে সে হয় মিত্রভাবাপন্ন। সব দেশেই এ সম্বন্ধে এমন নানা রকম ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ মাত্রেই স্বীকার করেন যে, স্বপ্ন স্বপ্ন-দ্রষ্টারই নিজের জীবনের নানা রকম বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির পুনঃ পরিস্ফুটন। কিন্তু মনস্তত্ত্বের প্রথম যুগে অধিকাংশ ডাক্তারই এ মত স্বীকার করে নিতে রাজী হননি। আজও অনেক শরীরতত্ত্ববিদ্ এ মত মানেন না। তাঁরা বলেন, মনের সঙ্গে স্বপ্নের আদৌ কোন যোগাযোগ নেই। "ষ্টিমুলাই-জনিত দেহের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি থেকেই হয় স্বপ্নের সৃষ্টি। এই সব ষ্টিমুলাই বা উত্তেজনা বাহ্যিক জগৎ থেকে আসতে পারে, কিম্বা স্বপ্নদ্রষ্টার দেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতির সাময়িক বৈকল্য হতে এদের সৃষ্টি হতে পারে। স্নায়ুতত্ত্ববিদ্‌রা মন আছে বলে স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, মস্তিষ্কের সকলের ওপরের স্তরে হলো বুদ্ধির আসন। ঐ স্তরের ক্রিয়াকলাপের ব্যাঘাত ঘটলে নিদ্রাকালে স্বপ্নের সৃষ্টি হয়। কিন্তু যে মতই আমরা অবলম্বন করি না কেন, স্বপ্ন অলীক বা তার মূলে কোন সত্যই নেই, বা সাহিত্যিকরা যেমন বলেন "Dreams are but sea foam !" এমন মত আজ ভ্রান্ত বলেই প্রমাণিত হয়েছে। মনীক্ষকরা আজ হাতে-কলমে প্রমাণ করেছেন, প্রত্যেক স্বপ্নেরই অর্থ আছে। স্বপ্নের ভেতর দিয়ে মানুষের মনের অতীতের ইতিহাস আবিষ্কার করা সম্ভব। কোন ক্ষেত্রে স্বপ্ন অতীত কিম্বা বর্ত্তমানের ঘটনার ছবি আঁকে আবার কোথাও কোথাও তারা একেবারে সুদূর ভবিষ্যতের আভাস দেয়। স্বপ্নের ঘটনা বাক্যের মত পর পর একে একে ঠিকমত সংস্থাপন করতে পারলে তার সমস্ত অর্থই স্পষ্ট হরফে ছাপা বিবরণের মত পাঠ করা যায়। আজকালকার মনীক্ষকরা সারা পৃথিবীময় এমন সহস্র সহস্র স্বপ্নেরই পাঠোদ্ধার এবং অর্থ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন।

কেতকী

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

(কথা-চিত্র)

১২

পীতাম্বরের বাড়ীতে তিনটি সংসার পৃথক্ ভাবেই চলেছে। মেয়ের বিয়ের জন্তে পণের টাকা জমানো দূরের কথা, প্রতিমা গড়ে ইদানীং যে উপার্জ্জন করেন পীতাম্বর, তাতে কোন রকমে পিতা-পুত্রীর জীবিকা-নির্বাহই হয়। পল্লী অঞ্চলে শীতকালটাই অল্প বা অনির্দিষ্ট উপায়ীদের অবস্থাকে অতিশয় জটিল ও বেদনাদায়ক করে তোলে। ছোট-বড় প্রায় প্রত্যেকেরই ভদ্রাসনের লাগোয়া ক্ষেত-খামার ও পুকুর থাকায় আহার্য্যের ব্যবস্থাটা কোন রকমে চলে গেলেও শীতের সংগে বোঝা-পড়াটাই কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। শীত পড়তেই শীত-বস্ত্রের অভাব বিশেষ করে পীতাম্বরকে পীড়া দিয়েছে। গায়ের একটি মাত্র ফ্লানেলের জামাটি গত বছরও কোন রকমে গায়ে চড়িয়ে শীত কাটিয়েছিলেন, কিন্তু এ বছরে একেবারে ব্যবহারের বাহিরে গেছে, পাটে-পাটে সুতাগুলি এমনি এলিয়ে পড়েছিল যে, গায়ে চড়াতে না চড়াতেই ফেঁসে পড়ে। জামাটির অবস্থা দেখে পীতাম্বর জোরে একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন: জামাটা এ্যাদ্দিনে দেহ রাখলে রে মায়া!

ধরা গলায় মায়া বলল: ওতে আর কি পদার্থ কিছু আছে বাবা, তুমি খুব সাবধানী—তাই গেল বছরটাও কোন রকমে গায়ে দিয়েছ! এখন তোমার গরম জামা একটা না হলেই যে নয় বাবা!

মেয়ের মুখের পানে চেয়ে পীতাম্বর বললেন: তোর গায়ের দোলাইখানাও ত ছিঁড়ে ধুলধুলে হয়ে গেছে, আগে তোর গায়ের চাদরের ব্যবস্থা একটা করি, তার পরে—

বাধা দিয়ে মায়া জানাল: আমার আঁচোল আছে বাবা, এতেই এ-বছরের শীত কাটিয়ে দোব, কিন্তু তুমি বুড়ো হয়েছ—রক্তের জোর কমে গেছে, তোমার গায়ের জামা আগে দরকার যে!

মেয়ের মুখে দরদের কথা শুনে পীতাম্বরের আয়ত দু'টি চোখ জলে ভরে এলো; অমনি উপযুক্ত দুই ছেলের কথা মনে পড়ে গেল—কৈ, এ দরদ ত তাদের প্রাণে আসে না—তারা ত কোন খবরই নেয় না বুড়ো বাপের কি হাল হোয়েছে!

মন্দার মরশুমে অন্ত কিছু কাজের সন্ধানে বেরুবার জন্তেই জামা নিয়ে পড়েছিলেন পীতাম্বর। হতাশ হয়ে বললেন: নাঃ, বেরুনো আর হোল না দেখছি—এ হালে বাইরে ভদ্র-সমাজে কি করে যাই বল্ ত মা?

ফ্লানেলের এই নরম জামাটি যে বাপের কত প্রিয়, মায়ার তা অজানা নয়; ইতিমধ্যেই জামাটি নিয়ে সে নিপুণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল, রিপু-কর্ম্মের দ্বারা কোন রকমে ব্যবহারে আনা যায় কি না! সোৎসাহে বলল: এ-বেলা না বেরুলেই কি নয় বাবা, রান্না-বান্না খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলে আমি সুচ নিয়ে বসবো, অন্ততঃ দু' চার দিন যাতে গায়ে দিতে পারা যায় সে ব্যবস্থা করে দোব।

পীতাম্বর প্রসন্ন মনে বললেন: পারবি মা, তাহলে তাই করিস্—এ-বলা আর নাই বা গেলাম, বিকেলের দিকেই বেরুবো।

হঠাৎ বাইরে থেকে পরিচিত স্বর ঘরের দু'টি প্রাণীকে বুঝি চমৎকৃত করল: কোথায় গো অধিকারী, বাড়ী আছ না কি?

বিজয়োল্লাসে মায়া বলে উঠল: কাকাবাবু এসেছেন বাবা—কি ভাগ্যি!

পীতাম্বরের মুখখানাও হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠেছে, উচ্ছ্বসিত স্বর যত দূর সম্ভব চেপে বললেন: তোকে বলতে ভুলে গিয়েছিনু রে, কাল বিকেলে বাজারের পথে যাদব রায়ের সাথে দেখা, একেবারে মুখোমুখি যাকে বলে আর কি! তোর মুখ চেয়ে সব অভিমান ভুলে গেলাম—জানিস্ মা, তার হাত ধরে বললুম—যা হবার হয়ে গেছে, ক্ষ্যামা-ঘেন্না করে ঝগড়াটা মিটিয়ে ফেল ভায়া—এ হচ্ছে তারই ফল, মা মহামায়া মুখ তুলে চেয়েছেন দেখছি!

পুনরায় স্বর শোনা গেল: কই গো অধিকারী, সাড়া পাচ্ছি নে যে!

দ্বারের দিকে এগিয়ে গিয়ে জোর-গলায় পীতাম্বর সাড়া দিলেন: যাচ্ছি ভায়া যাচ্ছি,—বোস, বোস—শুনতে পেয়েছি, সত্যিই আমার পরম ভাগ্যি!

বলতে বলতে ব্যস্ত ভাবে ছুটলেন এবং এরই মধ্যে মুখখানা ফিরিয়ে কন্তাকে জানালেন: শীগ্‌গির তামাকটা সেজে, অমনি হুঁকোর জলটা বদলে নিয়ে আয় মা চণ্ডীমণ্ডপে।

ঘরের দেওয়ালে কালীর ছবিটির উদ্দেশ্যে হাত দু'টি যোড় করে মায়া প্রণতি জানালে, সেই সঙ্গে কি প্রার্থনা করলে সেই জানে!

বাইরের চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় একখানি মাদুরে দুই প্রবীণ পাশাপাশি বসেছেন। অনেক দিন পরে আবার দু'জনের অন্তর-দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, সুখ-দুঃখের কত কথাই চলেছে।

যাদব রায় বলেন তাঁর সংসারের কথা—এক পাল পোষ্য, কি খরচটাই না করতে হয়; ওদিকে পাওনা-গণ্ডা আদায় হয় না—প্রত্যেকেই হয় আকাল নয় ত অসুখ-বিসুখের ওজর দেখিয়ে যেন মাথা কিনতে চায়। পীতাম্বর মন্তব্য করেন সবই মহামায়ার ইচ্ছা ভায়া, কপালে যা লেখা আছে তার খণ্ডন নেই নৈলে উপযুক্ত দু'-দু'টো ছেলে থাকতে অ'জ আমাকে উপায়ের সন্ধানে ছুটোছুটি করতে হবেই বা কেন, আর এত বড় আইবুড়ো মেয়েকে দু'শো টাকা পণের জন্তে ফেলে রাখতে হবে কেন? তবে, এও সার বুঝি—যা কিছু করেন উনি সবই মঙ্গলের জন্তেই! তাই আর ভাবি নে।

এই সময় মায়া তামাক সেজে হুঁকার মাথায় বসিয়ে কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে বাইরের ঘরে এল। হুঁকাটি বাপের হাতে দিয়ে হেঁট হয়ে গড় করল যাদব রায়ের পায়ে; অনেক দিন পরে দেখা, শ্রদ্ধা-নিবেদন না করলে ভাল দেখায় না। তার পর বাপকেও গড় করে মুখখানা নিচু করে দাঁড়ালো।

যাদব রায় সহাস্যে আশীর্ব্বাদ করলেন: চিরসুখী হও মা, কবে যে আমার সংসার আলো করবে সে আশায় আমি দিন গণছি যে!

মুখখানা আরক্ত করে চলে গেল মায়া। মনে পড়ল তার মাস দুই আগে এমনি এক সকালে এই শ্রদ্ধাভাজনটির মুখ দিয়েই কি নিষ্ঠুর কথাগুলি বেরিয়েছিল তাকে লক্ষ্য করে।

যাদব রায় বললেন: জানো অধিকারী, আমাদের এই মন-কষাকষির ব্যাপারে একটা নির্ঘাত সত্যি কিন্তু খোলসা হয়ে গেছে।

পীতাম্বর বললেন : কি শুনি ?

যাদব রায় : আমার কি ধারণা ছিল জান, গিন্নী বুঝি মৃগকে মোটেই দেখতে পারে না, আর এ বিয়েতে তার মোটেই মত নেই। কিন্তু সে ধারণা পালটে গিয়েছে।

পীতাম্বর : কিসে ?

যাদব রায় : সেদিন চটাচটি হবার পর আমি ত একবারে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসি—তোমার ঘরে কাজ কিছুতেই করব না। কিন্তু গিন্নী শুনে কি বললে জানো ভায়া ? বললে—অধিকারীকে আমি চিনি, মানুষটি রগচটা হলে কি হয়, মনটি ওঁর গঙ্গাজলের মতর শুদ্ধ। তাঁর সঙ্গে কাজ করলে তোমার মনও শুদ্ধ হয়ে যাবে !

পীতাম্বর : তিনি বাড়িয়ে বলেছেন ভায়া, হ্যাঁ—তবে যে রাগের চোটে নিজের পায়েই আমি কুড়ুলের কোপ বসাতেও দৃকপাত করি নে, সে কথা তিনি ঠিকই বলেছেন।

যাদব রায় : আরো কি বলেছেন শোন না বলি হে ! ঝাঁঝিয়ে বললে আমাকে—ছেলেকে তুমি শুধু ভালবাসতেই শিখেছ, কিন্তু তার মনটিকে চিনতে পারোনি, চেষ্টাও করোনি। তার এই কথা থেকেই বুঝিছি ভায়া, সত্যিই সে মৃগকে ভালবাসে আর সে ভালবাসা লোক-দেখানো নয়—আঁতের ! এখন মনে ভরসাও পাওয়া গেছে আমার বাড়ীতে গেলে তোমার মেয়ের অযতন হবে না।

পীতাম্বর : সে আমি ভাল করেই জানি ভায়া ! আর আমিও নিশ্চিন্তি হয়ে বসে নেই, আসছে মাঘেই যাতে দু' হাত ওদের এক হয় সেই চেষ্টাতেই আছি।

তুমি যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকনি সে আমি জানি। আমারো ইচ্ছে আসছে মাঘেই কাজ হয়ে যায়।—এই ভাবে ইচ্ছাটি ব্যক্ত করে যাদব রায় সে-দিনের মত বিদায় নিলেন। পীতাম্বর আপন মনে বললেন : মা ইচ্ছাময়ী, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে !

১৩

পীতাম্বরের বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাদব রায় বাজারের দিকে চললেন। উদ্দেশ্য, একটু বেলায় বাজারে গেলে জিনিষপত্রগুলো অপেক্ষাকৃত সুবিধায় মেলে। এমন কয় জন খাতক আছে গা-ঢাকা দিয়ে বেড়ানো যাদের অভ্যাস—বাজারে তাদের ঠিক ধরা যায়।

বাজারের পথেই হঠাৎ গোকুলের সঙ্গে দেখা। তার গায়ে গরম জামা, ডান হাতে এক চ্যাংড়া খাবার, বাঁ হাতে মস্ত এক শোল মাছ। যাদব রায় গোকুলকে বললেন : বেশ আছ বাবাজী, তোমার বাপের হাল দেখে এলুম, তোমারও দেখচি। বেশ, বেশ।

মুখ ও চোখের এমন এক অদ্ভুত ভঙ্গি করে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কথা-গুলো তিনি বললেন যে গোকুল নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতে শুধু চেয়েই রইল তাঁর পানে। ভেবে স্থির করতে পারল না সে হঠাৎ তার বৃদ্ধ বাপের প্রতি যাদব রায় এত দরদী হলেন কেন ? বাড়ীতে এসে চালা-ঘরে উঁকি দিয়ে বাপকে দেখেই গোকুল যাদব রায়ের কথাটা বুঝলো। বাপের গায়ে ছেঁড়া একটা গেঞ্জি, মায়ার গায়ে জামাও নেই—আঁচল সম্বল। স্ত্রীকে ডেকে গোকুল বললো : মাছটা কেটে তিন ভাগ কর, তিন ঘরের জন্যে। চ্যাংড়ায় মোয়া আছে ১২টা, ৪টে করে ভাগে পড়বে !

এ ঘরে মায়া বাপকে বলছিল : বড়দা মস্ত একটা শোল মাছ নিয়ে এল বাবা, এত বড় মাছ কখনো দেখিনি।

পীতাম্বর গম্ভীর হয়ে বলেন : গোকলো যে শোল মাছের ডানলা বড্ডো ভালবাসে।

এমন সময় গোকুল এল বাপের ঘরে। গায়ের জামাটা খুলে ভাঁজ করে এনে বলল : এটা গায়ে দিয়ে দেখ ত ঠিক হয় কি না। ও-ঘরে যা ত মায়া, নতুন গুড়ের মোয়া এনেছি, বাবার জন্যে আর তোর জন্যে রাখা আছে নিয়ে আয়। তোর বৌদি মাছ কুটছে হাত জোড়া।

পীতাম্বর তামাক খাচ্ছিলেন, গোকুল হাত থেকে হুঁকোটি নিয়ে রেখে নিজেই জামাটি বাপের গায়ে পরিয়ে দিলে। জামা গায়ে দিয়ে বৃদ্ধ তৃপ্তির সুরে বললেন : আঃ, চড়াতেই গাটা যেন গরম হল রে !

বাপের তৃপ্তিতে পরম তৃপ্তি পেয়ে গোকুল চলে গেল।

মোয়া নিয়ে মায়া এলো। পীতাম্বরকে দিতে গেলে তিনি বললেন : থাব'খন মা,—দেখ দেখিনি কেমন মানিয়েছে। ছেলে না হলে বাপের কষ্ট বোঝে এমন করে—কেমন হয়েছে রে ?

মায়া বলল : একটু ঢিলে হয়েছে বাবা !

ঠিক বলেছিস্ রে—ঢিলেই একটু হয়েছে ! দাঁড়া, ঠিক করে আনছি। বলেই পীতাম্বর জামাটি নিয়ে চলে গেলেন।

১৪

অতুলের ঘরে তখন মনসা-মঙ্গলের আখড়া বসেছে—পীতাম্বরকে ঘরে ঢুকতে দেখে সবাই অবাক। পীতাম্বর বললেন : এই তোর গান, আগাগোড়াই বেসুরো। কথায় আছে না—'যত সব নাড়াবুনে সবাই হ'ল কীর্ত্তনে, কাস্তে ভেঙে গড়ালে করতাল।' তোদেরও হয়েছে তাই। দিন-রাত বেসুরো গান আর বাজনা শুনে শুনে কান যেন ঝালাপালা ! বেরো সব—

বেগতিক দেখে দলের সকলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, যেন পালাতে পারলে বাঁচে।

অতুল পীতাম্বরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে গায়ের রাগ গায়েই মেখে বলল : বড়দার গায়ের জামা দেখছি যে ! তোমাকে দিয়েছে বুঝি, তাই বুঝি অত ঝাঁঝ ? তবু যদি গায়ে ঠিক হোত—

পীতাম্বর : একটু ঢিলে হয়েছে নয় রে ? হ'ত না, ভাবনায় চিন্তায় আধখানা হয়ে গেছি যে ! তোর ত আর ভাবনা-চিন্তা নেই ! দেখ ত, তোর গায়ে এটা ঠিক লাগে কি না—

মুখখানা ভার করে অতুল বলল : আমার দরকার নেই।

পীতাম্বর বললেন : দরকার আছে কি না সে আমি বুঝি রে, আমি যে বাপ। আমার ত একটা ছেঁড়া গেঞ্জি আছে, তোর যে তাও নেই। এই নে, গায়ে চড়া—দেখি তোর গায়ে ঠিক বসে কি না—

এক রকম জোর করেই অতুলের গায়ে কোটটা পরিয়ে দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে পীতাম্বর বলেন : বা, খাসা গায়ে বসেছে !

অতুল বলল : সত্যি, ঠিক যেন গায়ের মাপ নিয়ে তৈরী করেছে। যাক্ হোল তো···

পীতাম্বর : ও কি, খুলছিস্ যে ?

অতুল : খুলব না ? তোমাকে দিয়েছে দাদা, তুমি ত গায়ে দেবে !

পীতাম্বর : না, না, তুই গায়ে দে—

অতুল : সে কি, তোমাকে দিলে—

পীতাম্বর: আমি আবার তোকে দিলুম। নিজে গায়ে দিয়ে যেটুকু আরাম পেয়েছিলুম, এখন তোর গায়ে দেখে তার চেয়ে কত বেশী আরাম যে পাচ্ছি, সে বলবার নয় যে বলবার নয়। আগে ছেলে হোক, তখন বুঝবি—

বলতে বলতে ঘর থেকে চলে গেলেন পীতাম্বর।

১৫

গায়ে একখানি আলোয়ান জড়িয়ে মায়া বাপের জন্তে মোয়া দু'টি একখানি রেকাবিতে রেখে, নিজের ভাগের দু'টি নিয়ে মনে মনে কি ভাবছে, এমন সময় জানালার গরাদের ওপর মুখ রেখে মৃগেন চাপা-গলায় টু দিল।

মায়া বলল: ছেলের যে আজ ভারি ফূর্তি।

মৃগেন উত্তর দিল: বাবা যে শাসন তুলে নিয়েছে তা বুঝি জান না, এই মাত্র পথে দেখা, ডেকে বললেন—ওদের সঙ্গে ঝগড়া মিটে গেছে, রাগের মাথায় অনেক কিছু বলেছিলুম কিছু মনে করিস্‌নি বাবা! তা, গায়ে কার চাদর জড়িয়েছ আজ? তোমার ফূর্তি ত কম নয়—

হাসিমুখে মায়া বলল: তা বুঝি জান না, বড়দা আজ যেন দাতাকর্ণ হয়েছেন! নতুন দামী জামাটা বাবাকে দিলেন, আর এই র‍্যাপারখানা গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললেন—তুই এটা গায়ে দিস্ বোন্।

বাইরে থেকে পীতাম্বর ডাকলেন: মায়া ওরে মায়া,—

মৃগেন অদৃশ্য হোল। পীতাম্বরকে দেখেই মায়া বলে উঠল: খালি গায়ে যে বাবা, জামা কি করলে?

পীতাম্বর: বল দিকিনি কি করলুম?

মায়া: বড়দাকে ফিরিয়ে দিয়ে এলে ত?

পীতাম্বর: এই ত নয়—

মায়া: দর্জির দোকানে দিয়ে এলে বুঝি?

পীতাম্বর: দূর পাগলি।

বাবা বাবা! অতুল এল ছুটে, তার হাতে ফ্লানেলের একটি কামিজ, ঘরে ঢুকেই সে বলল: দেখ দিকিন দাদার কি কাণ্ড! এই ফ্লানেলের জামাটা আমার জন্তে দিয়েছে! আমি দেখলুম, তোমার গায়েই এটা ঠিক হবে, যেমন হাল্কা তেমনি গরম। এসো পরিয়ে দিই—

অতুলের গায়ে বড়দার দেওয়া কোটটি দেখেই মায়া বলে উঠল: তাই বলো জামাটা ছুটে ছোড়দাকে দিতে গিয়েছিলে?

পীতাম্বর: তাতেই ত শীত ভেঙে গেছে মা?

অতুল জামাটা পীতাম্বরের গায়ে পরিয়ে দিয়ে বলল: দেখ দিকি কেমন মানিয়েছে?

সোল্লাসে মায়াও বলে উঠল: আর আমার দিকে চেয়ে দেখ ছোড়দা!

অতুল বলল: তাই ত রে, র‍্যাপারখানা গায়ে দিয়ে দিব্যি তোকে মানিয়েছে ত! এখন তাহলে বলি—সেদিন কানাই বলছিল, আমার সাধ করে মায়ার তরে একখানা গায়ের চাদর কিনে এনে দিই—

পীতাম্বরের রক্ত আবার গরম হয়ে উঠল কথাটা শুনেই। ধমক দিয়ে বললেন: কি, কি, আর তুই তাই শুনলি হারামজাদা?

অতুল: কেন, দোষটা কি হোল?

পীতাম্বর: দোষটা কি হোল? ন্যাকা! বুঝতে পারনি! পরের ছেলে সে—আমার ঘরের মেয়েকে গায়ের কাপড় দেবে সে কোন্ হিসেবে? সে হারামজাদা অতি পাজি, অতি ইতর, অতি নচ্ছার—

অতুল: খবরদার বলছি বাবা! কানাইকে কিছু বললে আমি সইতে পারব না—সে ছিল বলেই বেঁচে আছি।

পীতাম্বর: ও বাঁচার চেয়ে মরাই তোর ভাল ছিল—বেরো তুই আমার ঘর থেকে, তোর আমি মুখদর্শনও করতে চাইনি—বেরো বলছি—বেরো এখুনি।

অতুল: বেশ এই চললুম—আমিও তোমার মুখ দেখতে চাইনে। বলেই সে সদর্পে পা ফেলে চলে গেল।

পীতাম্বর: হারামজাদা—পাজী—ইতর—বেহায়া—

মায়া: থাম না বাবা, কেন মিছামিছি মাথা গরম করছ—বস এখানে, ঠাণ্ডা হও। একটু কিছু হলেই তুমি যেন আগুন হয়ে ওঠো—

পীতাম্বর: ঠিক বলেছিস্ রে, এটা আমার ব্যাধি। ইজ্জতে ঘা কেউ দিলে সইতে পারি নে। নাঃ, এখন থেকে আর রাগবো না, মাথা গরম করবো না।

মায়া এই সময় রেকাবিতে রাখা মোয়া ক'টি পীতাম্বরের সামনে এগিয়ে দিতেই তিনি বললেন: ও কি রে?

মায়া: বড়দা মোয়া দিয়েছে বললুম না, দু'টো খাও না বাবা!

[পীতাম্বর: তোর কই?

মায়া যেন চঞ্চল করছিল। ইতিমধ্যেই জানালার গরাদে প্রতীক্ষমাণ মৃগেনের মুখখানা কয়েক বার তার দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করেছে। সে দিকে মনটাও পড়েছিল তার। নিজের ভাগের মোয়া দু'টি পীতাম্বরকে দেখিয়ে সে বলল: এই যে বাবা! রান্নাঘরে যাচ্ছি, সেখানে বসে খাবো, তুমি খেয়ে নাও—এই জল রইল।

১৬

প্রসাদী অতুলকে মুখ-ঝাপটা দিয়ে বলল: কেমন গোল ত, আহ্লাদে আটখানা হয়ে বাপের কাছে গিয়েছিলে, বাপ মুখের মতন জুতো দিলে ত—

অতুল বলল: আর ও-মুখো হচ্ছি নে, কারুর কথায় থাকছি নে।

এর পর কানাই আসে, মন্ত্রণা বসে! সেই দিনই কানাই নতুন জামা কিনে এনে অতুলকে দেয়। গোকুলের জামা ফিরিয়ে দিয়ে আসে প্রসাদী।

এর পর গোকুলের ঘর থেকে কোন কিছু দিতে গেলেই প্রসাদী ফিরিয়ে দেয়।

পীতাম্বর বলেন: এই কানাই আর ছোট বউ অতলার মাথা খাচ্ছে—সর্বনাশ না করে ছাড়বে না।

পীতাম্বর ঠিক করলেন তাঁর যে দু' বিঘে লাখরাজ আছে তাই বন্ধক দিয়ে মায়ার বিয়ে দেবে মৃগেনের সঙ্গে। কথাটা প্রসাদী আড়াল থেকে শোনে। অতুলের ঘরে পরামর্শ বসে।

কানাই বিধবা মায়ের আদুরে ছেলে। মায়ের নাম সারদা। স্বভাবটি যেন মিছরির ছুরি—মুখে মধু পেটে বিষ।

কানাই আবদার ধরেছে মায়াকে না পেলে বিবাগী হবে। সারদাও পণ করে বসেছে—মায়াকে বউ করবেই তা সে যেমন করেই হোক। শেষে সারদার দূর-সম্পর্কের এক ভাইয়ের হাত দিয়ে তাকে মহাজন সাজিয়ে দু' বিঘে জমি আর ভদ্রাসন বন্ধক দেওয়ালে তলে তলে সারদা। টাকা সারদাই দিলে, কিন্তু অতুল প্রসাদী কানাই ছাড়া মূল ব্যাপারটি আর কেউ জানলে না।

এদিকে সারদা প্রসাদীকে টিপে দিলে। রাতারাতি পীতাম্বরের ঘর থেকে সে টাকা চুরি হয়ে গেল। বাড়ীতে হুলস্থূল পড়ে গেল। গোকুল এ সময় মনিবের কাজে বাইরে গিয়েছিলো দিন কতকের জন্যে, সেই ফাঁকেই বন্ধকী ব্যাপারটা হয়ে যায়। বাড়ীতে হট্টগোল পড়েছে, পীতাম্বর মাথা চাপড়াচ্ছেন, সেই সময়—ক'দিন পরে বাড়ী ফিরল গোকুল। বাপের মুখে সব শুনে মুখখানা চুণ করে সে বলল: আমাকে ছাপিয়ে এ কাজ কেন করলে বাবা! মায়ার বিয়ে কি আমার দায় নয়, আমি কি চুপ করে আছি? যাক্, টাকার শোক কোর না, জমি আমি ছাড়িয়ে দেব, বিয়েও আটকাবে না।

কিন্তু সেই দিনই গোকুল অসুখে পড়লো। যে অঞ্চলে গিয়েছিলো সেখান থেকেই সাংঘাতিক ম্যালেরিয়ার বিষ ভরে এনেছিল দেহে। একটি মাস ধরে যেন যমে মানুষে টানাটানি চললো। করুণার গায়ের গয়না সব বাঁধা পড়লো, পুঁজি-পাটা সব শেষ হয়ে গেল।··· এমন বিপদে অতুল একবারে নির্বিকার, উঁকি দিয়েও খবর নেয় না। বরং গোকুলের ব্যামোকে এদের সংকল্পসিদ্ধির সুলক্ষণ ভেবে খুসি হয়ে ওঠে। এই সময় মৃগেন যথাসাধ্য করে···ফলটা-আসটা আনে, ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা করে। যাদব রায়ের পয়সা থাকলে কি হবে, মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া একটি পয়সাও উপুড়হস্ত করে না: বাপকে লুকিয়ে মৃগেন যা কিছু করবার করে। মৃগেনের সেবাতেই সেরে ওঠে গোকুল।

পীতাম্বরও এখন বেকার। হাতে কোন কাজ নেই—সরস্বতী পুজোর মরশুম এখনো পড়েনি। এ সময় গোকুলের জন্যে কিছু না করতে পেরে তাঁর কষ্টের অন্ত নেই। বিপদের সময় এদের দু'টি সংসার এক হয়ে গিয়েছিল।

ঠিক এই সময় পীতাম্বরের কর্ম-জীবনে আর এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হোল। এক দালাল এসে পীতাম্বরের সঙ্গে প্রতিমা গড়ার এক চুক্তি করল। বিদেশে গিয়ে সরস্বতী প্রতিমা গড়তে হবে এখন থেকে। দালালটি শতাধিক প্রতিমার অর্ডার পেয়েছে। প্রতিমা গড়া এখন থেকে সুরু করলে সময়মত সব হয়ে যাবে। খরচ-খরচা বাদ যে লাভ হবে—দু'জনে ভাগ করে নেবে। পীতাম্বর হিসেব করে দেখলে, তার দেনা শোধ করে মায়ার বিয়ে হয়ে যাবে এ টাকায়। দালাল পীতাম্বরকে কিছু টাকা আগামও দিলে। গোকুলের ইচ্ছা নয় এ বয়সে বাবা বাইরে যায়। কিন্তু নিজের অবস্থা বুঝে বাধা দিতেও পারে না। বিশেষতঃ দালালটির দেওয়া আগাম ক'টি টাকা অভাবের সংসারের যে সুধাবিন্দুর মতই পড়েছে।—পীতাম্বর বিদায় নিয়ে—সাবধানে থাকতে বলে বেরিয়ে পড়ল এক দিন দালালের সঙ্গে।

গোকুল সেরে উঠে পথ্য পেল, উঠে বেড়াতেও সমর্থ হল, কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, জমিদার-সরকারে যে কাজ করতো, অসুখের পর সেটি গেল। চুপ করে বসে না থেকে কাজের সন্ধানে সে বেরুতে থাকে; দুর্বল শরীর ভেঙ্গে পড়ে যেন।···অতুলদের ঘরে মনসা-মঙ্গলের দল এখন খুব জেঁকে উঠেছে। প্রায়ই খাই-দাই চলে। কিন্তু এদিকে কারুর লক্ষ্য নেই। অতুলের মন এক একবার টন-টন করে ওঠে, প্রসাদীর ভয়ে কিছু করতে পারে না। সে এখন প্রসাদী ও সারদার হাতের যেন পুতুল।

হঠাৎ এক দিন সারদা এ-ঘরে এসে উপস্থিত। গোকুলের অবস্থা ও সংসারের অভাবে সমবেদনা জানিয়ে গেল। জানালো—আমার দু'-দু'টো গাই বিইয়েছে, আধ সের করে দুধ দেব গোকুল ছেলের জন্যে। বাছাকে সারিয়ে তোলা দরকার, যে চেহারা হয়েছে। সারদা খবর রেখেছিল—টাকা না পেয়ে গয়লা দুধের যোগান বন্ধ করেছে। অথচ ডাক্তারে বলেছে দুধ খাওয়া চাই-ই। করুণা দ্বিধায় পড়েছে বুঝে সারদা আশ্বাস জানিয়ে বলে—বেশ ত, দেওয়া ত পালাচ্ছে না, সময় হলে না হয় দাম বলে যা ইচ্ছা হয় দিও, এখন ত ছেলে বাঁচুক। এ অবস্থায় করুণা আর না বলতে পারে না। ফলে, রোজ সকালে সারদার বাড়ী থেকে দুধ আসে। কানাই নিজেই দুধ বয়ে আনে। এই সূত্রে ঘনিষ্ঠতাও একটু ঘন হয়ে ওঠে। দুধের সঙ্গে অভাবের সংসারে আরো অনেক কিছু আসে—মাছটা, ফলটা, ঘরের তৈরী ক্ষীরের ছাঁচ, নারকেল নাড়ু। কানাই এগুলো এনে এমন দরদের সঙ্গে এক-একটা কাহিনী শুনিয়ে দেয় যে, করুণাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিতে হয়।···আমাদের খিড়কির কালবোস মাছ ভারি মিষ্টি, মা পাঠিয়ে দিয়েছেন গোকুলদার জন্য,··· গাছপাকা পেঁপে এটা, মা কাক-পক্ষীর মুখ থেকে কত করে যে বাঁচিয়ে একে পাকিয়েছেন কি বলবো! আজ এটা সার্থক হোল।···এমনি এক একটা ইতিহাস শুনিয়ে জিনিসটি যখন উপহার দেয় কানাই মায়ের নাম করে—নিতে মন না সরলেও ভবিষ্যৎ ভেবে মুখবুজিয়েই ঘরে তুলতে হয় করুণাকে, আর গোকুলের কাছে ব্যাপারটা চেপেই রাখে···দুধটা রোজের, ফল-পাকুরও ওর সামিল।···এমনি করে ঠাড়ে-ঠাড়ে জানিয়ে দু'দিক বাঁচায় বুদ্ধি খেলিয়ে কথার প্যাঁচে। এমনি করে দিন পনেরর ভিতরেই কানাই ছোকরা এ-বাড়ীতেও তার একটা স্থান করে নিল।

মৃগেন বেচারী ক্রমে ক্রমে যেন তফাতে সরে যাচ্ছিল, আর কানাই যেন সব তাতেই ওপর-পড়া হয়ে চালাকী চালবাজী আর মুখের তোড়ে মৃগেনের মতন ভালমানুষ লাজুক আর মুখচোরা ছেলেকে সরিয়ে দিচ্ছিল। জানালার কাছেও এখন সব দিন মায়াকে দেখা যায় না—কানায়ের চোখ দুটো সর্বদা সে দিকে পড়ে থাকে। যখনই এ-বাড়ীতে আসে মৃগেন—দেখতে পায় করুণার ঘরে কানাই এসে জুটেছে, দিব্যি গল্প জমিয়েছে। পাশের ঘরে মায়ার সন্ধানে গিয়েও মায়ার সাথে নিশ্চিন্ত হয়ে কথা বলবার ফুরসদ পায় না—একটা না একটা বাধা এসে পড়েই। অমনি যেন একটা ইসারা হয়ে যায়, প্রসাদী হোক, অতুল হোক, কানাই হোক, কেউ না কেউ কোন না কোন ছুতো ধরে পায়ে পায়ে আসে—যতক্ষণ মৃগেন থাকবে নড়বার নাম-গন্ধও করে না। এই ভাবে এদের দু'টির সংযোগ ভেঙ্গে যায়।

মৃগেন এক দিন মায়াকে একা পেয়ে মৃদু হেসে বলল: কানাই যে দেখছি দানসাগর সুরু করেছে?

মুচকি হেসে মায়া উত্তর করল: যে রকম বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে কানাইদা, শেষে আমাকে চীলের মতন ছোঁ মেরেই না নিয়ে যায়।

সেদিন একটা পাকা তাল পায় মৃগেন—অসময়ের ফল। পেয়েই সেটি মায়াকে দিয়ে গেল—গোকুলদার অরুচির মুখে লাগবে ভালো।

করুণা এসে বলল: কাল বিকেলে তালের বড়া করবো মৃগেন, এসে ভাই, লক্ষীটি।…

কিন্তু পরদিন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কানাই এসে হাজির, হাতে এক বাটি ক্ষীর আর এক ছড়া পাকা কলা! বললো: অসময়ে তালের বড়া হচ্ছে শুনলুম, তাই বাড়ীর তৈরী ক্ষীরটুকু এনিছি বড় বৌদি, গোকুলদাকে দিও—বড়া ডুবিয়ে খাবে।

এ ক্ষেত্রে কানাইকে বড়া না খাইয়ে ছেড়ে দেওয়া যায় না। কাজেই মায়াকে ডেকে করুণা বলল: পীড়িখানা পেতে দে মায়া, কানাই গোটাকতক বড়া খেয়ে যাক্।

অপ্রসন্ন মনে মায়াকে আসন পেতে দিয়ে কানাইকে বড়া পরিবেশন করতে হোল বটে, কিন্তু মনটা তার উসখুস করছিল মৃগেনের জন্যে। আগে মৃগেনের জন্যে এক বাটি বড়া তুলে রেখে—কানায়ের সামনে বড়ার রেকাবীখানি রাখলো মায়া।

মৃগেন এদিন কি ভেবে একেবারে বাড়ীর ভিতরে না এসে জানালার দিকে এসে দাঁড়িয়েছিল মায়ার সঙ্গে চোখাচোখি হবার আশায়।

মৃগেনের আসাটা কানাই লক্ষ্য করছিল। তাই যেমন সে অভ্যাস মত জানালার গরাদের ওপর মুখখানা তুলেছে—কানাই অমনি খপ করে দু'টো গরম বড়া তুলে নিয়ে তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারলে আর মুখ ভেংচে বললে: আমার চলেছে রাজভোগ, আর তোর বরাতে নবডঙ্কা—এই দু'টো নিয়েই পালা!

করুণার কথায় মায়া তখন আরও কতকগুলো বড়া নিয়ে আসছিল রান্নাঘর থেকে—দরজার কাছে আসতেই এই বিশ্রী দৃশ্যটা তার চোখে পড়লো, করুণাও লক্ষ্য করেছিল—সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল: ঠাট্টা করছে ভাই তোমাকে, ভেতরে এসো।

অপমানাহত মৃগেন লক্ষ্য করল যে মায়াই বড়া পরিবেশন করতে আসছে কানাইকে—চোখোচোখি হতেই মুখখানা লাল করে জানালা থেকে নেমে তীরের বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল সে—মায়াও তখনি হাতের বড়াশুদ্ধ পাত্রটি মেঝের ওপর আছড়ে ফেলে ঘর থেকে ছুটে চলে গেল খীড়কির পথ ধরে।

কানাই হকচকিয়ে বলল—হোল কি?…

করুণা মুখখানা শক্ত করে উত্তর দিল—আর কি হবে, তোমারি মনস্কামনা সিদ্ধ হোল! কিন্তু কাজটা কি ভালো করলে ভাই?

খিড়কির রাস্তায় এসে মায়া দেখলো, মৃগেন ছুটে বড় রাস্তায় পড়েছে। মায়া হাত নেড়ে ডাকলো—চেঁচাতে লাগলো: মৃগদা ফিরে এসো, মৃগদা চলে যেও না, ফেরো—কিন্তু মৃগেন আর ফিরলো না।

প্রবাসে

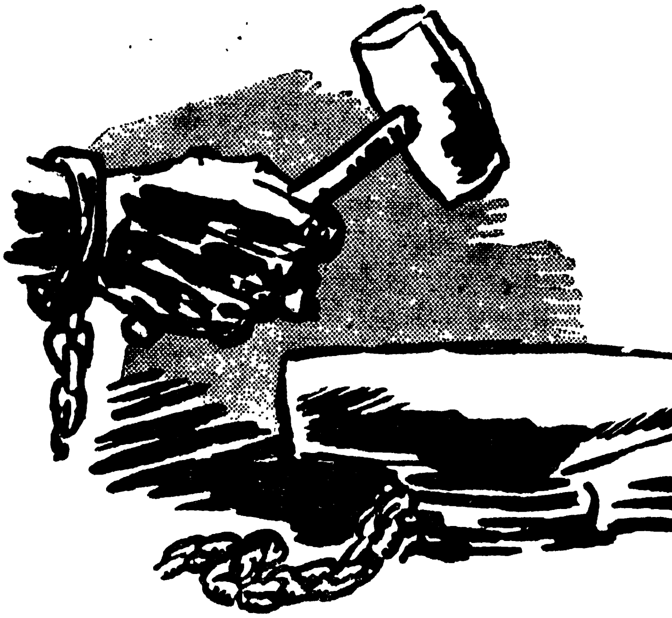
শ্রীকরুণাময় বসু

জলের আখরে মিছামিছি লিখে মরি
পরাণের ধন পরাণে রয়েছে ভরি;
'ভালোবাসি', এই মুকুলিত কথা
কালিতে লিখিয়া কী হ'বে?
সোনায় জড়ানো মনের কবিতা,
খুলে খুলে পড়ি নীরবে।
চাঁদ উঠেছিল, ছিল বাতায়ন,
মোর আঁখি' পরে তোমার নয়ন
করেছিল জানি সুধা বরিষণ,
সেই শুভখন লগনে,
বউ কথা কও, ডেকেছিল পাখী,
চাঁদ উঠেছিল গগনে।

চিঠি দিও বলে আঁখি দুটি করি নীচু,
দুয়ার অবধি এসেছিলে পিছু পিছু,
মুখ তুলিতেই মুখটি লুকালে
প্রদীপ-ছায়ার আড়ালে,
চোখের সলিল করিতে গোপন,
এক পাশে সরে দাঁড়ালে।
কতো কথা ছিল হৃদয়ে বলিতে,
গন্ধ যেমন কুসুম-কলিতে
জাগিয়া আপনি কানন নিভৃতে
কাঁদে অরণ্য-বাতাসে;
ভাষাহীন মোর বুকের বেদনা
গুমরে তেমনি হতাশে।

তুমি ছিলে মোর মর্ম-মুকুর 'পরে,
চির জনমের আলেখ্য ছায়া পড়ে;
যতো দূর যাই, তবু ফিরে পাই
বেদনা-আঁচড়ে রাঙানো
কিশোর বেলার রাঙা ইতিহাস,—
কাহিনী-পালকে ছড়ানো।
নীল দিগন্তে অরুণ আভাস,
প্রভাতী কুসুমে তাহার প্রকাশ;
তুমি ছিলে চাঁদ, আমি মহাকাশ
মায়া-কেন্দ্রেতে জড়ানো;
যতো দূর যাই, ভাবি তুমি নাই,—
স্মৃতি মায়াজাল ছড়ানো।

আকাশ নেমেছে শ্যাম তৃণদল ছুঁয়ে,
নদী-জল দেখে মুখখানি নুয়ে নুয়ে;
কাঁদে দিশা দিশা পূর্ণিমা নিশা
কুঞ্জ লতার বিজনে,
ভুলে গেছ আজ সেদিনের কথা,
নিশি যাপিব যে দুজনে।
গগন-কিনারে অলস খেলায়
চলে তারা-পরী মেঘের ভেলায়;
নিশীথের চাঁদ ধীরে ডুবে যায়
সুদূর প্রান্ত গগনে;
'বউ কথা পাখী', ডেকে মরে পাখী
করুণ রাতের লগনে।



একরোখা

বিজন ভট্টাচার্য্য

৪র্থ দৃশ্য

মিঃ সেনের অফিস ঘর। মিঃ সেন অফিসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আর কতিপয় আইনজ্ঞ উপদেষ্টা পরিবৃত হয়ে বসে আছেন। ইতি-পূর্ব্বে যে জোর একটা মন্ত্রণা-সভা বসেছিল তা বেশ বোঝা যায়। ম্যানেজার রেবতীবাবু ও মিঃ মুখার্জ্জিও সভায় উপস্থিত আছেন।

জনৈক ব্যারিষ্টার। That's the only way you can safely manage Mr. Sen. দরকার কি মিছিমিছি হাঙ্গামায়। আপনি কি মনে করেন Mr. Shome।

মিঃ সোম। No that's all right Mr. Sen. আপনি অনর্থক ভাবছেন। ঐ করুন, আপনাকে কোন ঝুকি নিতে হবে না। ···আর আমরা তো আছি, না নেই।

মিঃ সেন। (হেসে) উঁ, you finally suggest it then. All right.···রেবতীবাবু কি মনে করেন।

রেবতীবাবু। না, যখন এত ক'রে বলছেন ওঁরা, আমি কি আর বেশী বুঝবো।

মিঃ সেন। দেখুন সে। শেষকালে আবার ব'লবেন না ঐ রকমটি করলে হতো···

রেবতীবাবু। না, এতে করে ঐ রকম আর সেই রকম কি। ছেড়ে যখন দেওয়া নয়ই, তখন সরিয়ে দেওয়াই ভাল। আর ক'টা দিনের তো ব্যাপার।

জনৈক ব্যারিষ্টার। হাঁা, আর ground যখন রয়েছে—গবর্ণ-মেণ্টের contract···Everything for victory. আর এমনই গোলমাল করে তো বড় জোর একটা inquiry launch ক'রতে পারে—Which by no stretch of imagination I can believe, কে ক'রছে কে মশাই অত হাঙ্গামা, রেখে দিন। তবু ধরুন যদি একান্ত করেই তো ক'টা দিন, এ দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

রেবতীবাবু। হাঁা, Barely একটা fortnighte তো নেই।

জনৈক ব্যারিষ্টার। কিছু না', কিছু না। এখানেও রেখে দিতে পারতেন আটকে, কেউ বলতো না। তবে যখন উঠেছে কথাটা, তখন to be sure and safe—সরিয়ে দেওয়াই ভাল, this much, নইলে—আ রে মশাই কত কি ঘটছে এই বাজারে আর এ তো, নিন···

মিঃ সেন। তা হলে ঐ করা যাক, আর অনর্থক···(মিঃ সেন উঠে দাঁড়াতেই সকলে উঠে দাঁড়ালেন মিটিং ভেঙ্গে। তারপর যথারীতি করমর্দ্দন করে প্রস্থান করলেন। দোর গোড়া পর্য্যন্ত আপ্যায়িতের হাসি হাসতে হাসতে মিঃ মুখার্জ্জি ফিরে এলেন রেবতীবাবুর কাছে।

[রেবতীবাবু ও মিঃ মুখার্জ্জি বাদে অন্যান্য সকলের প্রস্থান।

মিঃ মুখার্জ্জি। কি কাণ্ড বলুন।···এইবার দেখুন কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। হুঃ!

রেবতীবাবু। তা সে তো আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম, এতটা বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না। শুনলেন কই আপনারা!

মিঃ মুখার্জ্জি। কি শুনলেন কৈ, আমি বলিনি! বলিছি কি না বলুন আমি আপনাকে।···তা আপনি তখন একটা কথাও বললেন না, স্রেফ হুঁ দিয়ে গেলেন সাহেবের কথায়। এখন সামলান তাল, ম্যানেজার হ'য়েছেন!

রেবতীবাবু। কি, আমি এর ভেতরে নেই। সে বুঝবেন আপনি [আর সাহেব।

মিঃ মুখার্জ্জি। ওঃ খুব যে বলে নিচ্ছেন আড়ালে! হাঙ্গামাটা বাধুক না একবার দেখি।···আরে মশাই হাজার হ'লেও এখন যুগের হাওয়া পালটে গেছে; ঝট করে সাত আট-জন কুলীর সর্দ্দারকে বেমালুম গুম করে রাখা কি চাড্ডিখানি কথা! আগে হতো, সে দেখিছি দাদামশাই'এর আমলে জমিদারীতে···এখন প্রতিপত্তি কতো ছোটলোকের।

রেবতীবাবু। কি বলবো বলুন! ম্যানেজারী যা করছি তা তো জানতেই পারছি।

মিঃ মুখার্জ্জি। কেন টাকা তো ভালই পাচ্ছেন!

রেবতীবাবু। হাঁা, টাকা পাচ্ছি বটে কিন্তু তাই বা কৈ! ছ'-সাত শো টাকা কি আবার টাকা নাকি এই বাজারে। এক এই ক'লকাতার সংসারের খরচ যোগাতেই আমার চার-পাঁচ শো টাকা বেরিয়ে যায়। তার ওপর আবার দেশের সংসার আছে, নিজের

পকেট-খরচা বাবদও কিছু টাকার দরকার হয়···পোষায় কি করে বলুন ?

মিঃ মুখার্জ্জি। কেন সাত শো টাকা তো আপনার এলাওয়েন্স টেলাওয়েন্স ধরে মাইনের মধ্যেই পড়লো। কিন্তু তার ওপর কমিশনটা যোগ করুন।

রেবতীবাবু। কি whole saleএর ওপর। সেটা পেলে তো চুকেই যেতো ল্যাঠা। কিন্তু দিচ্ছে কে।

মিঃ মুখার্জি। কেন, এইবার হয়ে যাবে।

রেবতী বাবু। হ্যাঁ হচ্ছে! আজ না কাল ক'রতে ক'রতে হচ্ছে তো আজ এক বছর ধরে।···আপনিও তো পাবেন।

মিঃ মুখার্জ্জি। আশা তো রাখি। এখন···আচ্ছা দিচ্ছে না কেন বলুন তো এখনও।

রেবতীবাবু। হাড় কেপ্পন, দেখছেন কি। টাকা কি সহজে ছাড়তে চায়। দিতে একেবারে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওর ক'লজে ফেটে যাচ্ছে।

মিঃ মুখার্জ্জি। দেবে দেবে, এইবার দিয়ে দেবে। এই তো সে দিনও নানান কথা হচ্ছিল সাহেবের সঙ্গে···

রেবতীবাবু। তাই নাকি ?

মিঃ মুখার্জ্জি। হ্যাঁ, তা সে এ সব কথা না, ওদিকে খুব হুঁসিয়ার, হুঁ: ; কথা হচ্ছিল এমনিই সব ব্যক্তিগত জীবনের নানান সমস্যা নিয়ে···মন্দ বলছিল না···বেশ বোধ আছে লোকটার।

রেবতীবাবু। তা আছে, এমনিতে যাই বলি না কেন, লোকটার··· দেখিছি তো !

মিঃ মুখার্জ্জি। আচ্ছা রেবতীবাবু!

রেবতীবাবু। উঁ।

মিঃ মুখার্জ্জি। আচ্ছা একটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞসা করবো মনে করছিলাম···

রেবতীবাবু। কি ?

মিঃ মুখার্জ্জি। আচ্ছা সাহেবের পারিবারিক জীবনটা কি রকম! কথায়-বার্ত্তায় বেশ মনে হলো সেদিন যেন কোথায় একটা কাঁটার মত বিঁধে আছে। ঠিক বুঝতে পারলুম না।

রেবতীবাবু। কেন জানেন না।···ওর স্ত্রী তো শুনি পাগল!

মিঃ মুখার্জ্জি। পাগল! আপনি ঠিক জানেন ?

রেবতীবাবু। ঠিক মানে···

মিঃ মুখার্জ্জি। আমার কিন্তু মনে হয় ওটা ঠিক নয়।

রেবতীবাবু। তা হলে আপনিও ধরেছেন ব্যাপারটা।

মিঃ মুখার্জ্জি। না, ধরিছি মানে···এই তো সেদিনও দেখলুম মশাই বউটাকে বিশ্বকর্ম্মা পূজোর দিন। বেশ ধীর স্থির, পাগল বলে তো ঘুণাক্ষরেও মনে হ'লো না।

রেবতীবাবু। ঠিকই ধরেছেন। বউটি পাগল একেবারেই নয়, সাহেবই ওকে পাগল সাজিয়ে রেখেছে। ঐ যে কে এক সাবিত্রী দেবী আছেন না, কবিপত্নী···হচ পচ ব্যাপার মশাই সব বড় লোকের আর বলবো কি! অমন সুন্দর বউ থাকতে···হুঃ

মিঃ মুখার্জ্জি। কবি-বন্ধুটি খুব একসপ্লইট করছে, না ?

রেবতীবাবু। এখন কে যে কাকে একসপ্লইট করছে বলা মুস্কিল। কবিই সাহেবকে ঠকাচ্ছে না সাহেবই কবির মাথায় হাত বুলোচ্ছে···any way ব্যাপারটা খুব unholy লাগে আমার কাছে।

(নকড়ির প্রবেশ)

নকড়ি। তারপর গেলেন কোথায় সাহেব ?

মিঃ মুখার্জ্জি। একটু বেরিয়েছেন। হয় তো লাঞ্চ সেরে আসবেন।

রেবতীবাবু। তা গিয়েছেনও তো অনেক ক্ষণ হলো।

নকড়ি। অনেক ক্ষণ! কত ক্ষণ, আধ ঘণ্টা ?

মিঃ মুখার্জ্জি। হ্যাঁ তা হবে, আধঘণ্টার বেশীই হবে।

নকড়ি। অ, তা হ'লে এক্ষুনি এসে পড়বেন।

রেবতীবাবু। হ্যাঁ, এই এলেন বলে আর কি। তা তাড়া কিসের এত, ব'সো না।

নকড়ি। না তাড়া মানে—আপনি না তাড়ালেই বসি।

রেবতীবাবু। ব'সো ব'সো। তোমায় তাড়াবো আমি! কোম্পানীর লক্ষ্মী-পেঁচা হ'য়ে ব'সে আছ তুমি···নাও সিগারেট খাও।

(কেস খুলে ধরেন)

(মিঃ সেনের প্রবেশ)

মিঃ সেন। বসো নকড়ি, ব'সো।···(কোট খুলে র‍্যাকে রেখে) রেবতীবাবু, আপনিও বসুন একটু।···এখন ওদের remove করবার কি বন্দোবস্ত করা যায়। ট্রেন···

নকড়ি। কেন, ট্রাক তো রয়েছে আপনার।

মিঃ সেন। হ্যাঁ তা আছে, কিন্তু ট্রাক ফ্রাক'এ ক'রে কি সুবিধে হবে ? I thought something like packing them off. ভেবে দেখুন সবাই।···আর শুনুন, এখানে আমি আরও একটু কায়দা করতে চাই। কথাটা অবিশ্যি আলোচনা করে নিলেই ভাল হ'তো আগে, যা হোক—ধরুন ওদের এখানে নিয়ে এলুম।

রেবতীবাবু। এখানে মানে ?

মিঃ সেন। অফিসে, এই ঘরে।

রেবতীবাবু। অ।

মিঃ সেন। তারপর শুনুন, আট জনাকেই নিয়ে এসে একটা warning দিয়ে বলে দেই যে আজ থেকে তোমাদের সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। ছেড়ে দেওয়া হ'লো on condition যে ফিরে গিয়ে তোমরা আর সেখানে একদম গণ্ডগোল করতে পারবে না। আর শুনুন, রেবতীবাবু!

রেবতীবাবু। হ্যাঁ বলুন, ঠিক শুনছি।

মিঃ সেন। আর গোলমাল যে তোমরা কর'বে না তার গ্যারাণ্টি হিসেবে আমাদের অন্য যে কোন একটা কাজের জায়গায়—ধরুন বেলুটিতেই—অন্তত: পনোরোটা দিন তোমরা ভাল ভাবে কাজ করে দেখাবে। অবিশ্যি এর জন্যে ন্যায্য মজুরী যা তা তোমাদের নিশ্চয়ই দেওয়া হবে। বুঝতে পারলেন।···ব্যস্, এতে ক'রে বাকী পনোরোটা দিন ওখানে ওদের এক রকম আটকে রাখা গেল, আর তার সঙ্গে এটাও automatically suggested হ'লো, of course if question arises, তবেই—যে আটকে তাদের কোন দিনই রাখা হয়নি, শুধু কাজের খাতিরে centre change করিয়ে দেওয়া

হ'য়েছে মাত্র এবং সেখানে তারা স্বাধীন ভাবে কাজ-কর্ম্মও ক'রেছে। And surely they will testify to it. ক'রবে না! মুখুজ্জ্যে কি বলো? রেবতীবাবু, moveটা ভাল হয় না।

রেবতীবাবু। তা মন্দ কি। In any case remove আমরা করছিই! এখন for tactics sake এইটুকু human consideration দেখানোর ফলে পরে যদি গণ্ডগোল একান্তই হয়ই তো তখন ব্যাপারটা manage করা খানিকটা সুবিধে হবে।

মিঃ সেন। That's it, মুখুজ্জ্যে ধরতে পারলে? নকড়ি?

নকড়ি। উঁ।

মিঃ সেন। কি?

নকড়ি। জব্বর প্যাঁচ হয়েছে।

রেবতীবাবু। না ভাল হবে। আর···

মিঃ মুখার্জ্জি। নতুন করে risk তো কিছুই নেওয়া হচ্ছে না, সুতরাং···

মিঃ সেন। কিছু না, risk কি?

মিঃ মুখার্জ্জি। না, আমিও তাই বলছি। ভালই হবে gestureটা।

মিঃ সেন। আচ্ছা তা হলে এ সম্বন্ধে আর consultationএর কোন প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করেন নাকি রেবতীবাবু!

রেবতীবাবু। না, এতে ক'রে আর···

নকড়ি। কিছু না, কোন দরকারই নেই; বরং হাঙ্গামা না ক'রে আমি বলি এখন remove করার চটপট একটা বন্দোবস্ত ক'রে ফেলুন—কোথায় ট্রাক, কে যাবে···আর নিয়ে আসতে হয় তো তাহ'লে ওদের সব এখানে একবার! কেমন তাই বললেন না?

মিঃ সেন। হ্যাঁ, একটা general amnesty declare ক'রে দি, কি বলো মুখুজ্জ্যে?

মিঃ মুখার্জ্জি। হ্যাঁ।

মিঃ সেন। নকড়ি, তুমি তা হ'লে একবার মঙ্গল মিস্ত্রীকে খবর দাও। আর তোমাকেই সঙ্গে যেতে হয় দেখছি বেলুটি পর্য্যন্ত। আর তে···

নকড়ি। তা যেতে বলেন যাব।

মিঃ সেন। হ্যাঁ তাই যাও, কি বলেন রেবতীবাবু, নকড়িই যাক। সব বুঝিয়ে শুনিয়ে দিয়ে আসতে পারবে। সেখানকার যোগেন-বাবু আবার যেমন সোজা বুঝের লোক···চিঠি অবিশ্যি আপনি একখানা দিয়ে দিন যোগেনবাবুর নামে! কিন্তু নকড়ি, তুমি সব বুঝিয়ে বলবে তাঁকে ব্যাপারটা—গোলমাল না হয়।

নকড়ি। আচ্ছা, আমি সে ঠিক দেখে নেব'খন, তাতে আটকাবে না। এখন ওদের কি একবারটি এখানে নিয়ে আসতে বলবো বলছেন?

মিঃ সেন। হ্যাঁ, নিয়ে আসতে বলো। আর মুখুজ্জ্যে, তুমি চট ক'রে একখানা ট্রাক রেডী ক'রতে বলো।···ড্রাইভার কাকে দেবে। শ্রীশ?

মিঃ মুখার্জ্জি। শ্রীশই তো ভাল হবে।

মিঃ সেন। তা হলে শ্রীশকে ডেকে তুমি নিজে একবারটি বলে দাও। ···মোটামুটি jobটা তার কি, সেইটুকুই একটু ভাল ক'রে সমঝে দিও। ব্যস!···নকড়ি, তুমি তাহ'লে যাও, you are to start within half an hour—নইলে পৌঁছুতে পৌঁছুতে তোমার ওদিকে একেবারে রাত্তির হ'য়ে যাবে।

নকড়ি। না আমি উঠি, দেরী করে লাভ কি। দুর্গা দুর্গা!

[নকড়ি ও মুখুজ্জ্যের প্রস্থান।

মিঃ সেন। রেবতীবাবু, আপনি একটু বসুন—এখন yesterdayএর কথা বলছি, কালকে after the announcement আমরা তো চলে গেলুম···তারপর কারখানায় শুনলুম গণ্ডগোল হয়েছিল! আপনি খবর রাখেন?

রেবতীবাবু। আমিও অবিশ্যি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চ'লে গিছলাম, তবে ব্যাপারটা খানিকটা জানি।

মিঃ সেন। কি সেটা বলুন আমায়! এ যে দেখছি যাই করো কিছুতেই নিস্তার পাবার যো নেই। বেটাছেলেদের কৃতজ্ঞতা বলে কি কোন বোধ নেই, দু'মাসের Bonus declare ক'রলুম! হুঁ; ব্যাপারটা কি শুনি।

রেবতীবাবু। ব্যাপার মানে পণ্ডিতদের যে একটা পাল্টা দল আছে, সে তো আপনি জানেনই। এখন ওদের ইচ্ছে ছিল যে বোনাস বাদেও,···কিছু দিন আগে ওরা যে কতকগুলো দাবী-দাওয়া করেছিল না···

মিঃ সেন। দাবী-দাওয়া দেখুন আমি সব ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি এবারে। হ্যাঁ, তারপর···

রেবতীবাবু। ভেবেছিল তা যে এই সঙ্গে তার কিছুটা অন্ততঃ বুঝে নেয়। কিন্তু মঙ্গল মিস্ত্রীর দল নাকি সে কথায় রাজী হয়নি··· এই আর কি গণ্ডগোল। ওরা বলে ধর্ম্মঘট ক'রতে হবে, আর এরা বলে তা হয় না। শেষ পর্য্যন্ত শুনলুম বেশীর ভাগ মজুরই ধর্ম্মঘটের পক্ষপাতী নয় বলে আপাততঃ ধর্ম্মঘটের ব্যাপারটা ইউনিয়ন বাতিল ক'রেছে। এই···হাঙ্গামা যা হ'য়েছে এইটুকুই।

মিঃ সেন। না, শুনলুম লাঠি-সোঁটা চলেছে।

রেবতীবাবু। লাঠি হয় তো এনেছিল কেউ কিন্তু খুন-জখম তো জানি কেউই হয়নি। আর বেটাদের কথা বলবার ধরণটাই এই রকম যেন সব সময় যুদ্ধ ক'রছে মনে হয়। সাম্য ভাব তো কখনই দেখলুম না।

মিঃ সেন। তা হ'লে ধর্ম্মঘটের ব্যাপারটা যে ইউনিয়ন বাতিল ক'রছে, এটা পাকা খবর তো?

রেবতীবাবু। আমি তো যত দূর জানি পাকা খবর ব'লেই জানি, এখন··আজকে অবিশ্যি আরও খবর পাব।

মিঃ সেন। যা হোক নিজেদের সুবুদ্ধিতে যদি বাতিল করে তবেই ভাল। নইলে ধর্ম্মঘটের হুমকি কিন্তু আমি কিছুতেই সহ্য ক'রবো না এবার, এ আমি বলে দিচ্ছি।···আপনি দেখুন, ব্যাপারটা কি! Any sort of action which hampers the cause of the company must be ruthlessly dealt with. Of course, unnecessary provocation যেন কোন ক্ষেত্রেই দেওয়া না হয়। মুখুজ্জ্যেকে

এ বিষয়ে আপনি একটু সাবধান ক'রে দেবেন। Threatening always must be the means to an end—এটা ভুললে চলবে না। যান, আপনি দেখুন।

(নকড়ির প্রবেশ)

নকড়ি। ওদের সব নিয়ে এয়েছি, ভেতরে আসবে ?

মি: সেন। হাঁা ভেতরেই আসতে বলো, আর মুখুজ্জ্যেকে এখানে আসতে বারণ করে দাও। They may be somewhat prejudiced by his presence. ভাবতে পারে আবার হয় তো মারবে ধরবে ? যাবগে নিয়ে এসো। রেবতীবাবু একটু বসে যান।

[নকড়ির প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ ; সঙ্গে আট জন ময়লা কাপড়ে মাথা ঢাকা সন্ত্রস্ত মজুর।]

নকড়ি। এই যে, আও, ভিতর আও। উধার, উধার যাকে ঠার। বাবু তোমসে বাত-চিত করে গা।···যাও, উধার যাকে বৈঠ, হুঁ, যাও, উধার একদম উধার···

জনৈক শ্রমিক। হাঁ বাবা।

মি: সেন। (বসে) তুমহারা সর্দ্দার কোন্ হ্যায় ?

নকড়ি। বলো, পুছতা হ্যায়। বাত করো।

জনৈক বৃদ্ধ শ্রমিক। সর্দ্দার তো কৈ নেই হ্যায় সরকার। হাম লোগ তো এসেহি···

মি: সেন। তুমহারা নাম কেয়া হ্যায় ?

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী।

মি: সেন। নাম কেয়া হ্যায় তুমহারা ?

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী হামারা নাম রামখেলন।

মি: সেন। রামখেলন !

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী হাঁ।

মি: সেন। ঘর কাঁহা ?

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী দারভাঙ্গা।

মি: সেন। দারভাঙ্গা জিলা, কাঁহা ?

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী চিকড়িঘাট।

মি: সেন। চিকড়িঘাট, নয়া সড়কসে কেত্তি দূর ?

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী পঁচিশ মাইল।

মি: সেন। পঁচিশ মাইল !

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী হাঁ।

মি: সেন। নয়া সড়কসে পশ্চিম তরফ ?

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী হাঁ পশ্চিম তরফ, (সঙ্গীদের প্রতি) সরকার তো সব জান্তেহি হ্যায়। (ক্ষীণ হেসে সায় দেয় সব)

মি: সেন। ঔর, ইন লোগোঁকা···

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী সরকার কৈ কো জিলা দারভাঙ্গা হো ঔর কৈ কো ছাপরা জিলা—

মি: সেন। সব বিহার কা আদমী হ্যায় ?

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী সরকার, বিহার।

মি: সেন। উ···আচ্ছা আব তুমহারা কেয়া কাম করনেকা মতলব হ্যায় ইয়া নেহি ?

বৃদ্ধ শ্রমিক ও আর দু-একজন। আপহি কা কৃপা হ্যায় জী সরকার।

মি: সেন। কৃপা হো তো কাম করোগে তো ?

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী হাঁ সরকার, কামকে লিয়ে হাম সব তো তৈয়ার হ্যায় লেকিন···

মি: সেন। লেকিন কেয়া, হাম তুম লোগোঁকো ফির কাম দেগা। খিলানেওয়ালা তো চাহাতা মগর ছিনলেনেওয়ালেকে সাথ তো অলগ ব্যবহার করনা পড়তা হ্যায়। ঠিক হ্যায় তো ?

বৃদ্ধ শ্রমিক। হাঁ জী সরকার, ঠিকই বাত হ্যায়।

মি: সেন। দেখো, হিঁয়া য্যাসে বৈঠে রহনেসে হামকো তো কুচ লাভ হোতাহি নেই, ঔর তুম লোগোঁকা ভি কুচ ফয়দা নেই হোতা। যা হুয়া সো গয়া, আব···

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী হাঁ সরকার, আপহি কা কৃপা ঔর হামারা নসিব। ঠিকই বাত।

মি: সেন। মেরা মতলব ইয়ে হ্যায় কি হাম তুম সব লোগোঁকো ছোড় দেনে চাহাতা, কেঁও কি হামকো বহুৎ লোকসান হোতা হ্যায়। এ্যায়সে কৈ রাজা ভি বৈঠে বৈঠে খিলানে নেহি সকতা। তো মায়নে সোচা হ্যায় কি তোম লোগোঁকো ছোড় দুঁ। আব তুম লোগ যাও, আপনা আপনা কাম করো। ঔর যদি তুম লোগোঁকো সুবিধা হো তো ময় ইস্‌বখত কুচ কামভি দে সকতা হুঁ। ঔর ইস কামকে লিয়ে তুম লোগোঁকো ঠিক ঠিক মজদুরী ভি মিলেগী। মগর এক বাত ময় কহে দেতা হুঁ কি আগর গোলমাল করোগে তো ঠিক নেহি হোগা, হাঁ।

বৃদ্ধ শ্রমিক। নেহি নেহি সরকার, গোলমাল কোন্ করেগা। হাম তো নাচার হ্যায়।

মি: সেন। নেহি ম্যঁয় ফির সাফ সাফ কহে দেতাহুঁ কি যদি কাম করোগে তো কাম মিলেগা, সব কুচ মিল যায়েগা। লেকিন কৈ হল্লা ঔর গোলমাল করেগা তো ঠিক নেহি হোগা, সিধী বাত। ঔর এক বাত ইয়ে হ্যায় কি আব তুম লোগ কাঁহা জানা চাহাতে হো। আগে যাঁহা পর কাম করতেথে উঁহা আব কিসিকি জরুরত নেহি হ্যায়। লেকিন এক দেড় মাহিনেকে বাদ উঁহাপর কমসে কম শও দেড়শ'ও আদমীয়োঁকি জরুরৎ পড়েগী, আভি নেহি। হামারা কহনা ইয়ে হ্যায় কি আব তুম লোগ সব বেলুটি'ম যাঁহা হামারা কনট্রাকটকা কাম হোতা হ্যায়, উঁহি কাম করো, মগর এক মাহিনে বাদ সব লোগোঁকো আবতগ যাঁহা কাম করতেথে উঁহা ভেজ দেঙ্গে। কেঁও কি ইয়ে কাম উসবখত তক্ খতম হো যায়েগা। সমঝে কি নেহি ?

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী হাঁ সরকার বিলকুল সমঝ গিয়া।

মি: সেন। দেখো।

নকড়ি। দেখো ক্যায়সা দয়াবান সরকার হ্যায়, ঔর তুম লোগ কিসকে উপর জুলুম কিয়া হ্যায় ; ছি ছি ছি ছি !

বৃদ্ধ শ্রমিক। নেহি সরকার, যো ভুল হো গয়ি উস্কা তো কুচ···কেয়া বোলেগা সরকার হাম লোগোকো এত্তাই নসিব খারাপ হ্যায়।

মি: সেন। নসিবকী কোঈ বাত নেহি হ্যায়। কেঁওকি যেইসা যিস্কো ভজন হ্যায় ঐসাহি উস্কো মিলতা হ্যায়। নসিব কেয়া। ঔর কিসিকা লোকসান করোগে তো তুমহারা কেয়া ফয়দা হো সেকতা হ্যায় ? কভি নেহি, কভি নেহি হোতা।

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী হাঁ সরকার, বহুৎ ঠিক বাত হ্যায়। হাম সব বিলকুল সমঝ গয়ে।

মিঃ সেন। আব দেখো, মন ঠিক কর লেও। হামরে ইহা কাম করো তো করো, ঔর নেই তো দুসরি জাগা পর কাম খোঁজ।··· হাম তুম লোগোঁকো এস্যাহি বৈঠে বৈঠে খিলানে নেহি সকতে।

বৃদ্ধ শ্রমিক। নেহি ও তো ঠিকই বাত হ্যায় জী সরকার। হামকো কুচভি কাম দিজিয়ে কৃপা করকে, উ তো করনাই হোগা। ঔর দুসরি জাগাপর হামকো কোন্ কাম দেগা সরকার?

মিঃ সেন। তো যাও কর। দেখো গোলমালওয়ালা আদমী হাম নেহি হ্যায়। মগর হল্লামচানেওয়ালেকে সাথ হামারা কভি নেহি আপোষ হো সকতা।

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী সরকার।

মিঃ সেন। তো যাও, শান্ত হোকে আপনা আপনা কাম করো। সব কুচ, আচ্ছা হো যায়েগা···(নকড়িকে দেখিয়ে) ইয়ে বাবুকো সাথ যাও, সব কুচ বন্দবস্ত, কর দেগা।

নকড়ি। মন ঠিক করকে কাম করেগা, আঁ। ইয়ে সরকার, ইন্ সরকারকি কৃপাসে কমসে কম লাখো আদমীয়োঁকে রোজ ভর পেট খানা মিলতা হ্যায়, ঔর তুম লোগ, কেয়া বোলেগা বাবা তুম তো সব বুদ্ধু আদমী হ্যায়,···তো চল, চল।

[গড্ডালিকা প্রবাহে প্রস্থান করে।

মিঃ সেন। (রেবতীবাবুকে লক্ষ্য ক'রে) বেটারা একেবারে বেপরোয়া ভাবে ভূত। এদের আবার ইউনিয়ন, এদের আবার দাবী··· silly ideas.

(হঠাৎ নেপথ্যে ভীষণ গণ্ডগোল শোনা যায়।)

(খানিকক্ষণ কান তারিয়ে শুনে) খুব একটা গণ্ডগোল চলছে বলে মনে হচ্ছে না, রেবতীবাবু?

রেবতীবাবু। হাঁ, ব্যাপার কি? (উঠে দাঁড়ান। মিঃ সেনও জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ান) কারখানা'র বাইরে হল্লা হ'চ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

(মুখুজ্যের প্রবেশ)

মিঃ সেন। What's the trouble, মুখুজ্যে!

মিঃ মুখার্জ্জি। কি, আপনি এখন বেরুচ্ছেন নাকি?

মিঃ সেন। হ্যাঁ কেন?

মিঃ মুখার্জ্জি। একটু ব'সে যান, গণ্ডগোলটা থামুক।

মিঃ সেন। গণ্ডগোল থামবে? কেন কি, ব্যাপার কি?

মিঃ মুখার্জ্জি। নিজেদের মধ্যেই মারপিট ক'রছে ব্যাটারা। মঙ্গল মিস্ত্রীর যেমন সব ব্যাপারেই আগ বাড়িয়ে গিয়ে কথা বলা অভ্যেস্—দিয়েছে আচ্ছা করে মার।

রেবতীবাবু। কে, মারলো কারা, পণ্ডিতের দল নাকি?

মুখার্জ্জি। আরে না মশাই, ওর নিজের দলের লোকেরাই ধরে পিটে দিয়েছে। অত খবরদারী সইবে কেন? আরে দল সামলাবি তা কি ঐ ক'রে সামলাতে হয় নাকি—ও বেটা নিজের দলের লোকগুলোকে ধরে পিটবে, মারবে, গালাগালি দেবে, চাকরী বাতিল করবার হুমকি দেখাবে—অতটা কখনও সহ্য করে।

মিঃ সেন। রেবতীবাবু, এই মাত্তর আমি বলছিলাম না যে unnecessary provocationএর ফল বড্ড খারাপ হবে। হুঁ, আচ্ছা মঙ্গল মিস্ত্রীর এতটা সাহস আসে কোত্থেকে—সাধারণ মজুরদের ওপর এই রকম হামলা করতে তো কেউই তাকে বলেনি। আসল কথা হচ্ছে you want to wash your hand clean of these bothering responsibilities and hope to get it done by some other hand like Mangal Mistry's and why—you ought to have interferred in such matters. Jobটা কি আপনার, বলুন!

মিঃ মুখার্জ্জি। যা বলছেন তাই করছি।

মিঃ সেন। ও, যা বলছি তাই করছো! But I ask you why don't you know your own job. যা ব'লছেন তাই ক'রছি।—ধন্য হ'য়ে গেলুম আর কি! নিজের কোন initiative নেই। দেখছেন চারি দিক থেকে কারখানায় এখন নানা রকম হাঙ্গামা হ'চ্ছে···But you,—you are always waiting for orders to come. You have no right to spoil your soul. At least I did not teach you this lesson. This is very unfortunate Mukherjee, very unfortunate.

[মিঃ সেনের প্রস্থান।

(অন্ধকারে পটক্ষেপ)

[ক্রমশঃ।



স্বর্গাদপি গরীয়সী



শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৬

বেলেতেজপুর ছাড়িতে খুব কষ্ট হইল,—জন্মভূমি—আর কখনও দেখিতে পাইবেন কি না কে জানে? তবে সেই সঙ্গে এটাও ঠিক যে শিবপুরে আসিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। প্রথমত শোকের পরিমণ্ডল থেকে মুক্তি, দ্বিতীয়ত সবই নূতন—অতবড় একটা শোকের পর নূতনত্বটা যেন মনটাকে আরও ধুইয়া দিল। ভাইয়েরা খুব এক-চোট ঘুরাইয়াও আনিলেন— কলিকাতার যত দ্রষ্টব্য স্থান—চিড়িয়াখানা, আজব ঘর, পরেশনাথের মন্দির, কালীঘাট;—পথে পড়িল হাওড়ার পুল, বড়বাজার, চৌরঙ্গী, গড়ের মাঠ···অফুরন্ত বিস্ময়ে চাহিয়া চাহিয়া চোখ দুইটা যেন টনটন করিতে থাকে, অথচ এদিকে পলক ফেলাও যায় না। চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের গৃহিণী গিরিবালা, বিস্ময়ের আকুলতা প্রকাশ করিবার বয়স নাই, তবু দ্বিতীয় দিন সব দেখিয়া-শুনিয়া আসিয়া গল্প-গুজবের মধ্যেই একবার অহেতুক ভাবেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন! ভাইয়েরা প্রশ্ন করিতে বলিলেন—"তোরা হাসবি, কিন্তু তবু না বলে থাকতে পারলাম না—তোদের কাছে তো দুলারমনের গল্প করেছিলাম সে বার—সেই তার বরের কলকাতায় পালিয়ে আসবার কথা?—এইবারে ভাবছিলাম তোদের বলব একটু খোঁজ করতে···ভাগ্যিস্ বলিনি!"

আবার হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"তা দোষ দিবি কি করে বল?—দ্বারভাঙ্গায় থাকি, রাজার সহর—কলকাতা বড়লাটের সহর না হয় তার চা'র গুণই হবে; বাবাঃ, এ কী কাণ্ড রে!"

সামনের দু'-এক বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে পরিচয়ও হইল, ক্রমে আলাপ গাঢ় হইয়া উঠিল। শিবপুরের একটা মস্ত-বড় সুবিধা কলিকাতার পাশে থাকিয়াও সেটা একটা মফঃস্বল সহরেরই মতো,—বেশি ভাগ রাস্তাই অপরিসর—প্রায় গলির মতো, দোকান-পাট কি গাড়ি-ঘোড়ার বালাই নাই তত। সাঁতরার ধরণেরই, শুধু, বাড়িগুলা একেবারে গায়ে গায়ে লাগা! বেশ লাগে, দুপুরবেলা জেঠাইমার সঙ্গে পাশের বাড়ি, সামনের বাড়ি, তাহার পর আবার তাদের সংযোগে কাছের বা অল্প দূরের অন্য সব বাড়ি ঘুরিয়া বেড়ানো। কাছেই চৌধুরীদের বড় পুকুর, কাক-চক্ষুর মতো জল, মেয়েদের জন্য আলাদা ঘাট; ওদের শিবমন্দিরের পাশ দিয়া—দূর্বা ঘাসে ঢাকা মাঠের উপর দিয়া নিত্যই পাঁচ-ছয় জন মিলিয়া স্নান করিতে যান, ফিরিবার সময় মন্দিরের উঁচু চাতালে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে সমস্ত শরীরটি এমন একটি মধুর শুচিতায় ভরিয়া যায় যে, এক একদিন চোখের পাতা আর্দ্র হইয়া ওঠে।···কেমন যেন নিজের ঘর, নিজের দেশের পদ্ধতি; এখানকার জীবনের সমস্ত খুটিনাটিগুলা হইয়া ওঠে নূতন করিয়া সরস, নূতন ভাবে অর্থবান।···গঙ্গাস্নান করিবার বাসনা হইলেও বেশ সঙ্গিনী জোটে, বাজারের ভিড়ের মধ্যে দিয়া লঘুগতিতে চলিয়া যান সবাই, জেটির পাশে স্নানের ঘাটটিতে একটু গড়িমসিও করেন—উন্মুক্ত স্থান, প্রশস্ত নদী,—মনটা একটু তরল হইয়া ওঠে, মনে হয় সত্যই যেন মায়ের বুকের কাছটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। এক এক দিন সঙ্গিনীদের কাহারও কাহারও পরিচয়ের জের ধরিয়া আরও নূতন পরিচয় হয়—সাঁতরার গঙ্গার ঘাটের মতোই। ফিরিবার পথে রাস্তার ধারেই কালীতলায় প্রণাম করিয়া পূজা দেন; প্রণাম করিবার সময় বুকটা ভরিয়া ওঠে—মা কেন এমন ভাবে গেলেন?—অহি কোথায়?—দ্বারভাঙ্গায় সবাইকে তুমিই দেখো মা,—তোমার ভরসাতেই সবাইকে ফেলে এসেছি···আরও সব কত কি কথা, ভালো মত বোঝা যায় না; শুধু একটা অসীম নির্ভরতার সঙ্গে মনটা থমথম করিতে থাকে।···আনন্দেরই তো উপকরণ, কিন্তু তবুও যে মনটা কেন আর কি করিয়া বিষাদে গড়াইয়া পড়ে, গিরিবালা আশ্চর্য হইয়া যেন কূল পান না।

বাড়িতে যতক্ষণ থাকেন বাপের কাছেই কাটান, সেবা করিয়া গল্প-গুজব করিয়া; অবশ্য রসিকলাল যদি থাকেন বাড়িতে। রসিক-লালের জীবনটা আবার একটু বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে; গিরিবালার অনুরোধ-অভিমানে এখন তবুও অনেকটা নিয়মাধীন হইয়াছেন, নচেৎ নাওয়া-খাওয়ার একেবারেই ঠিক থাকে না—হয়তো কোন মঠে গিয়া সমস্ত দিনটাই কাটাইয়া দিলেন, নয়তো কোন নূতন সাধু দর্শন, কি, কোথায় কথকতা হইতেছে, কালী-কীর্ত্তন হইতেছে; এক একদিন গঙ্গার ধারে কোনও নির্জন জায়গায় বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেন, যখন বাড়ি ফিরিবেন তখন হয়তো প্রহর দুয়েক রাত্রি অতিক্রান্ত হইয়া গেছে। গিরিবালা থাকিতেও কয়েক দিন এই রকম হইয়া গেল। এক একদিন সকালবেলায় গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া ফিরিলেন সন্ধ্যার একটু প্রাক্কালে। পূর্ব হইতেই বৌয়েদের উপর শপথ দেওয়া, বসন্তকুমারী আর গিরিবালা ভাত আগলাইয়া উপোস করিয়া রহিলেন।···গিরিবালা একটু বেশি অভিমানেই অশ্রুমুখী হইয়া

বলিলেন—"তুমি এমন করে আর বাঁচবে না বাবা; তুমিও যাবে আর জেঠাইমাও যাবেন।"

বসন্তকুমারী বলিলেন—"জেঠাইমার থাকবার ভারি সাধ!... কিন্তু ওঁর শরীর তো পাত হচ্ছে এই করে করে?"

রসিকলাল আসনে বসিতে বসিতে হাসিয়া বলিলেন—"যত বাঁচবার দায় আমার, না?"

বসন্তকুমারী মুখ ভ'র করিয়া গিরিবালাকে বলিলেন—"ঐ শোন্, সমস্ত দিনের পর ভাতের আসনে বসতে বসতে কথার ছিরি শুনলি তো? কিছু আর বলি না।...হ্যাঁরে গিরি, এই তিনটে অপোগণ্ডকে সংসারে বসিয়েছ এখন একটু..."

অন্নের গ্রাস তুলিতে তুলিতে রসিকলাল থামিয়া গেলেন, হাসিয়া বলিলেন—"সংসার পেতে দিলাম, দেখে-শুনে করুক সব,—সেই গল্পের বুড়ির মতো আমায় আবার ফুলগাছ আগলে বসে থাকতে হবে নাকি?...সে বরং তুমি করো—চুলগুলো শণের নুড়ির মত হয়েছেও—"

অট্টহাস্যই করিয়া উঠিলেন।

এঁরা দুজনেও না হাসিয়া পারিলেন না। বেগটা থামিলে রসিকলাল গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"তা নয় গিরি, শোন্—আমি হয়েছি গুরুমশাই-মরা পাঠশালের পোড়ো, আমায় এখন পায় কে? না বিশ্বাস হয় এখনও ঐ সাক্ষী রয়েছে তোর জেঠাইমা—আমি চিরকালটাই এই রকমটা ছিলাম না নিজের খেয়াল নিয়ে? বন-বাদাড় নদীর চর, চষা মাঠ, এ-গ্রাম, সে-গ্রাম...কে আমার ফাঁদে ফেলে..."

গলাটা ধরিয়া আসিল, পরিষ্কার করিয়া লইয়া আবেগটাকে যেন ঠেলিয়া রাখিবার জন্যই এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়া লইলেন; একটু অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টা করিয়া আবার বলিলেন—"কেন, কাঁদে পড়বার পরও তোয়াক্কা রাখিনি—অনেক দিন পর্য্যন্ত, থাকতেন পণ্ডিতমশাই, ভজিয়ে দিতাম।...তারপর ফাঁদে কষে কষে আমায় একেবারে জখম করে নিজে কমন টপ করে পড়লেন সরে!"

আবার বুকে যেন কি ঠেলিয়া উঠিল, একটু গলা-খাঁকারি দিয়া সেটাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল—"আমি গুরুমশাই-মরা পাঠশালের পোড়ো...আমায় আর এখন..."

আর রোখা গেল না, বাঁ হাত দিয়া চোখ দুইটা মুছিয়া লইলেন। এঁদের দুজনের চোখেও অশ্রু, বসন্তকুমারী অঞ্চল সরাইয়া বলিলেন—"আর খেতে বসে চোখের জল ফেলতে হবে না।...পূজা-অর্চা, সাধুসঙ্গ এই সব নিয়েই তো রয়েছ, মানা করতে যাব কেন? তবে যত দিন গিরিটা রয়েছে, অন্তত খাবার সময়টুকু ঠিক রেখো একটু—এই রকম উপোস করে থাকবে ভাত কোলে করে?"

আরও এক দিন এই রকম একটু অনিয়মের ব্যাপারে প্রসঙ্গটা উঠিল, তবে এবার আর রসিকলালের সামনে নয়। আলোচনার শেষে বসন্তকুমারী বলিলেন—"তাই বলি গিরি—ছোট-বৌ বেশ গেল, আমি যে কী দেখবার জন্যে রইলাম পড়ে...ভয় হয় এক-একবার ভাবতে গিয়ে।"

সেদিন আর সব কথা বাদ দিয়া মায়ের যাওয়া লইয়াই গিরিবালার মনটা পড়িয়া রহিল। সত্যই কি মা গেছেন ভালো?...গিরিবালার মনটা সমস্ত সংসারটির উপর দিয়া যেন একবার ঘুরিয়া আসিল।—দুই ভাইয়ে ভালো কাজ করিতেছে, কিশোরও শীঘ্র একটি পাইবে। বাড়ি আলো-করা দুটি-বৌ। সবচেয়ে বড় কথা—সংসারের আগের ঠাটটি বজায় আছে, বরং এদের সংসারের বাঁধুনি বোধ হয় আরও বেশি,—তাঁহারা ছিলেন দুই সহোদর ভাই, এঁরা হইয়াও অভেদ।...কিন্তু মা বরাবর অনটনের ভাবটাই দেখিয়া গেলেন। যখন নূতন গাছে কচি পাতা দেখা দিল, ফুল ফুটিবে, ফল ধরিবে, তিনি সরিয়া পড়িলেন।...ব্যথিত কণ্ঠে গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"এই মার যাওয়ার সময় হোল জেঠাইমা?"

বসন্তকুমারী বলিলেন—"হ্যাঁ, গিরি, বুঝছিস না তুই, এই তো যাওয়ার উপযুক্ত সময়। ছোট-বৌ ড্যাংডেঙিয়ে চলে গেল।"

মাঘের শেষ। পশ্চিমে থাকিয়া এখানকার শীত আর গায়ে লাগে না, তবে ক'দিন থেকে একটু মেঘ বৃষ্টি হইয়া ঠাণ্ডাটা একটু পড়িয়াছে। সেদিন আবার আকাশ একটু বেশি ঘোরালো, মনটা বাইরে থেকে যেন ক্রমাগত নিজের মধ্যে গুটাইয়া আসিতেছে। সন্ধ্যা হইয়াছে। একাদশী, জেঠাইমা সকাল সকাল শুইয়া পড়িলেন। দুই বৌয়ে রান্নাঘরে, বাবা বাইরের ঘরে, একতারায় একঘেয়ে আওয়াজের সঙ্গে গুন্-গুন্ করিয়া একটি রামপ্রসাদী গাহিতেছেন, ভাইয়েরা ক্লাবে গেছে। ছেলেরা রান্নাঘরে,—ভাত-ডাল যে হইয়া উঠিল, চোখের সামনে এই প্রমাণের সান্ত্বনা রাখিয়া মামিরা গল্প বলিতেছে।

কোলের মেয়েটিকে লইয়া গিরিবালা বিছানায় গিয়া শুইলেন। আজ কি হইয়াছে, মায়ের যাওয়ার কথাটা ক্রমাগত মনে যাওয়া-আসা করিতেছে—কত বিচিত্র অর্থের সাজ পরিয়া।...মনটি গিয়া পড়িয়াছে ছায়ভাঙ্গায়, অনেক দিন চিঠি পান নাই...জোর করিয়াই জেঠাইমার কথাটা মানিয়া লইতেছেন গিরিবালা—তা'তো বটেই, ভালো যাওয়া তো এই—তবু কি একটা বিষাদে মনটা পূর্ণ হইয়া ওঠে—এই দারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দু'জনের একটি মাত্র আশা—শশাঙ্ক, শৈলেন, হরেন বড় হইয়া উঠিতেছে, দুঃখ ঘুচিবেই,—সবই বলিতেছে, সুত্রপাতও আরম্ভ হইয়াছে—শশাঙ্ক তো দিয়া আসিল পরীক্ষা, ফিরিয়াছে—পাস করিবই।...গিরিবালার মনটা সার্থকতার এই কঠিন সূত্র ধরিয়া আগাইয়া চলে,—তিন জনে একটার পর একটা করিয়া পাস দিয়া চলিয়াছে—পিছনে আসিতেছে এরা চার ভাই...ধীরে ধীরে বধূতে, সম্পদে ঘর পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে...নবনীর মতো নাতি-নাতনিরা সংসারের প্রাঙ্গণে নূতন পা ফেলিল।...এই সময় মায়ের মতো না বলা না কওয়া, ঝপ্ করিয়া একদিন চলিয়া যাইতে হইবে...একটু আগে হইলে বোধ হয় আরও ভালো।

তা না হইলে...ভাবিতেও শিহরিয়া উঠিতে হয়...এই তো অহি গেল! কাহার মনে কি আছে কে জানে?...মা যেন উপর থেকে আশীর্বাদ করেন।

গিরিবালা খুকির মাথা থেকে বাঁ হাতটা সরাইয়া লন, দুইটি হাত একত্র করিয়া বার বার কপালে ঠেকান।—আশীর্বাদ করো মা, আশীর্বাদ করো, যেন তোমার মতন সব বজায় রেখে যেতে পারি।

এক এক সময় কী যে হয়, চারি দিক্ দিয়া একই ধরণের ভাবের স্রোত আসিয়া পড়ে। হঠাৎ কিশোরের গলা কানে গেল—"বড় বৌদি আমাকে শীগ্‌গির ভাত দাও। এক হ্যাঙ্গাম হয়েছে।"

প্রশ্ন হইল—"কি হোল গা ঠাকুরপো?"

"চাটুজ্জেদের ছেলেটা মারা গেল, এক্ষুনি নিয়ে যেতে হবে।"

গিরিবালার বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, ধড়মড়িয়া উঠিয়া বাহিরে

আসিলেন, ভীত দৃষ্টিতে প্রশ্ন করিলেন—"কত বড় ছেলে রে কিশোর? কেন?—কি হয়েছিল রে?…"

কিশোর দিদিকে হঠাৎ এত ব্যাকুল দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন, তাহার পর কতকটা নির্লিপ্ত ভাবে বলিলেন—"তাদের তুমি জানো না, অনেক দিন থেকেই ছেলেটি নানান থানায় ভুগছিল।…এই দুর্যোগে ভোগান্তি দেখো না!"

গিরিবালা সেই রকম ব্যাকুল ভাবেই বলিলেন-"নানান থানায় ভুগছিল,…কিন্তু ছেলেই তো?"

কিশোরের উত্তরে সম্বিৎ হইল সে কথাটা একটু বেখাপ্পা হইয়াছে; কিশোর জামা খুলিতে ঘরে গিয়াছিলেন, সেখান থেকেই একটু হাসিয়া নির্লিপ্ত ভাবে বলিলেন—"কিন্তু চিত্রগুপ্ত সে কথা শুনবে কেন দিদি?…কৈ গো, ভাত বাড়লে বৌদি?"

কিন্তু কথার ভুলটা বুঝিলেও গিরিবালার মনটা বড় তোলাপাড়া করিয়া উঠিল। ছেলে লইয়া এই রকম চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই কেন এই রকম একটা উৎকট খবর আসিয়া পড়িল? খানিকক্ষণ ছটফট করিয়া ঘর-বারান্দায় পায়চারি করিলেন। কিশোর খাইতে গিয়াছেন, একবার দোরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ভয় হইতেছে—আবার এমন কিছু অসংলগ্ন বলিয়া ফেলিবেন না তো যাহাতে মনের চাঞ্চল্যটা ধরা পড়ে। অথচ যেন কিছু বলা দরকার; নিজেই বুঝিতেছেন মুখটা শুকাইয়া গেছে। বলিলেন—"ছেলেগুলো এখনও খায়নি বৌ, ওদের সকাল সকাল ঘুমোনার অব্যেস।"

অত্যন্ত কর্কশ লাগিল নিজের কানেই, কি করিয়া যে কথাটা মুখ দিয়া বাহির হইল!—আর কেনই বা যে!

দু'টি বৌই যেন একটু কাঠ মারিয়া গেলেন। বড়বৌ সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—"এই হোল দিদি, ঠাকুরপো উঠলেই…"

গিরিবালা ততক্ষণ চলিয়া গেছেন।…ছেলেদের কথা ভাবিবার সঙ্গে সঙ্গে এ কী দুঃসংবাদ!—এমন হওয়া খুব খারাপ নাকি? কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করা যায়? কি ভাবেই বা তোলা যায় প্রশ্নটা?…জেঠাইমার পায়ের কাছে বসিয়া পা দুইটা কোলে টানিয়া লইলেন, কয়েক বার টিপিয়া প্রশ্ন করিলেন—"জেঠাইমা জেগে?"

একটা ক্ষীণ উত্তর হইল, আজ উপোসটা লাগিয়াছে বেশি, কয়েক বারই বলিয়াছেন। গিরিবালা আর জাগাইলেন না। চুপ করিয়া বসিয়া খানিকক্ষণ পা দুইটা টিপিয়া দিলেন। মাঝে মাঝে হাত থামিয়া যাইতেছে।…এ রকম ভাবনার সঙ্গে একটা খারাপ খবর মিলিয়া যাওয়া কুলক্ষণ নয় তো?…নিজেই প্রবোধ লইতেছেন—না, তা কেন হতে যাবে? তা কি হয়? ভাবনায় লোকের মনে অমন কত রকম ওঠে…

"দিদি, আসি গো; দোরটা দিয়ে যাও কেউ একজন"—বলিয়া কিশোর চলিয়া গেলেন। গিরিবালার বুকটা আবার ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সদরের দুয়ারটা বন্ধ করিয়া বাহিরের ঘরে গিয়া বসিলেন। রসিকলাল গানে একটা যতি দিয়া বলিলেন—"বোস্ গিরি। খেলে ছেলেগুলো?"

"বসেছে বোধ হয় বাবা। রান্নাঘর আগলে না থেকে বড় দুটোও যদি তোমার কাছে একটু বসে…"

রসিকলাল হাসিয়া বলিলেন—"রান্নাঘরের কাছে দাদামশাই! …আসে বই কি, আমার কাছেই তো থাকে সারাক্ষণ।"

পিন্-পিন্ করিয়া একতারার আওয়াজ উঠিল, এখনই গান শুরু হইবে। গিরিবালা খুব সহজ ভাব ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"চাটুজ্জেদের ছেলেটা মারা গেল বাবা।"

বাপের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন এবং বুঝিলেন নিজের মুখে সহজ ভাব একেবারেই নাই।

রসিকলাল আঙুল থামাইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কোন্ চাটুজ্জে?"

জানা নাই। জানা নাই অথচ এত দুশ্চিন্তা। গিরিবালা বাপের মুখের পানে একটু ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া বলিলেন—"ঐ যে গো, ছেলেটি ভুগছিল অনেক দিন থেকে…"

"তোর গর্ভধারিণী বেশ গেল গিরি।"—বলিয়া মন থেকে একটা ক্রমবর্ধমান আবর্জনাকে যেন ঠেলিয়া রাখিয়া রসিকলাল বলিলেন—"থাক্ ও-সব কথা গিরি, শোন্, একটা নতুন গান বেঁধেছি।"

একটু হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"গানের কথায় হঠাৎ মনে পড়ে গেল;—ছেলেবেলায় তোকে সেই বর্ষার সকালে ঘটা ক'রে পদ্ম শোনাবার কথা মনে পড়ে গিরি?—ছোটবৌ সেই রান্নাঘর থেকে ভিজতে ভিজতে এসে…"

হাসিটা যেন ভুল পথে আসিয়াছে বুঝিয়া সঙ্গে সঙ্গেই গা ঢাকা দিল। রসিকলাল তাড়াতাড়ি তানপুরায় আঙুলের টান দিয়া গাহিয়া উঠিলেন—

খেলা আমার শেষ হোল মা,
এবার অমানিশার ভোরে,
নাও মা ডেকে মুছিয়ে মলা,
নাও মা তুলে কোলে ক'রে…

৭

এই সময় আর একটি ব্যাপার ঘটিল।

সন্ধ্যা হইতে একটু বাকি আছে। কলে জল নাই; একটা রেকাবি ধোওয়ার প্রয়োজন ছিল, গিরিবালা খিড়কির পুকুরের দিকে গেছেন। দুইটা ধাপ নামিয়াছেন, দেখেন ডান দিকে পুকুরের ধার দিয়া একটি মেয়েছেলে ধীরে ধীরে এদিক্ পানে চলিয়া আসিতেছে। পরনে একটা মলিন, খাটো ডুরে শাড়ি, আঁচলের দিকটা বাঁ হাতে করিয়া বুকের মাঝখানটি জড়ো করা, গায়ে আর কিছু নাই। মেয়েটির রং আধময়লা, বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের মধ্যে।

জেলেরা পুকুরে মাছের চারা ছাড়িয়াছে, কখন কখন মেয়ে হোক, পুরুষ হোক, কেহ কেহ আসে তদারকে—চাবি দিকেই বাড়ি, মাছ চুরি যায়।…গিরিবালা তাদেরই এক জন ভাবিয়া প্রথমটা গা করেন নাই, তাহার পর ভাবগতিক দেখিয়া তাঁহাকে দাঁড়াইয়া যাইতে হইল।

খুব সন্তর্পণে আর খুব আস্তে আস্তে বেশ একটু লম্বা লম্বা পা ফেলিয়াই মেয়েটি অগ্রসর হইতেছে। দু'-এক ধাপের পরই দাঁড়াইয়া, মাথাটা নিচু করিয়া গভীর অভিনিবেশে জলের মধ্যে কি যেন দেখিতেছে, আবার আগাইয়া আসিতেছে। তখনও বোধ হয় অতটা কিছু ভাবেন নাই, তাহার পর হঠাৎ একবার মুখটা তুলিয়া গিরিবালার পানে চাহিল—অদ্ভুত এক শূন্যদৃষ্টি! সেকেণ্ড কয়েক চাহিয়াই আবার মুখ নিচু করিয়া সেই তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান—একটা মানুষ যে সামনে আছে কোন খেয়ালই নাই যেন।

আরও দুই ধাপ অগ্রসর হইলে গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"কে বাছা তুমি?"

মেয়েটি এইবার সোজা হইয়া দাঁড়াইল; স্থিরদৃষ্টিতে গিরিবালার পানে এমন ভাবে চাহিয়া রহিল যেন প্রশ্নের মানেটা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু পারিয়া উঠিতেছে না।

গিরিবালা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি করছ তুমি এখানে? কে তুমি?"

এবার কতকটা যেন অর্থটুকু বোধগম্য হইয়াছে এই ভাবে বলিল—খুঁজছি"

"কি খুঁজছ?"

আবার সেই রকম অবুঝ, অপলক দৃষ্টি।

গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় বাড়ি তোমার?" সন্ধ্যে হয়ে এলো, এ-রকম করে…"

মেয়েটি এ কথাগুলো যেন একবর্ণও বুঝিল না, পূর্ব-প্রশ্নের উত্তর দিল—"ছেলে।"

গিরিবালার ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, প্রশ্ন করিলেন—"ছেলে?—এখানে…"

"কে গা দিদি? কার সঙ্গে কথা কইছ?"—বলিতে বলিতে বড়-বৌ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মেজবধূও আসিয়া পিছনে দাঁড়াইলেন। দুইটা নূতন লোক যে আসিয়া দাঁড়াইল, মেয়েটির সে বিষয়ের কোন চৈতন্যই নাই, গিরিবালার মুখের উপর হইতে দৃষ্টি না সরাইয়া উত্তর করিল—"দু'বার হারালো কি না—একবার জলে, একবার আগুনে।"

মেজবৌ কতকটা স্বগত ভাবে বলিলেন—"পাগল।"

মেয়েটি এবার যেন একটু ব্যস্ত-দৃষ্টিতে তাঁহার পানে ঘুরিয়া চাহিল, বলিল—"না না, পাগল নয়, ছিল—ছিল যে…"

একবার যেন নিরুপায় ভাবে চারি দিকে চাহিল, যেন কি প্রমাণ দিয়া বিশ্বাস করাইবে বুঝিতে পারিতেছে না তাহার পর আবার মেজবধূর মুখের উপর দৃষ্টি ফেলিয়া বিশ্বাস করাইবার জন্য কাতর অনুনয়ের স্বরে বলিল—"হ্যাঁ, ছিল গো…"

বাহিরে কোথা হইতে কিশোর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। "তোমাদের কিসের জটলা গা?"—বলিতে বলিতে খিড়কির দিকে আসিয়াই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, দুই দিকেই প্রশ্ন করিলেন—"এ কোথা থেকে এলো?…তুমি এখানে কি করছ?"

অচঞ্চল চক্ষু দুটি তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল; বুদ্ধিহীন একটা অদ্ভুত দীপ্তি ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। কিশোর আর একটা কি প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলেন,—"যাই' দেরি হয়ে যাচ্ছে।"—বলিয়া থামিয়া গেল, তাহার পর যেন সময় নাই এই ভাবে এবার একটু দ্রুত ভাবেই সেই রকম খুঁজিতে খুঁজিতে পুকুরের অন্য দিক দিয়া ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আর পুকুরে নামিতে গিরিবালার কি রকম একটা সঙ্কোচ আসিয়া পড়িল, দোরটা দিয়া সকলে ভিতরে চলিয়া আসিতে কিশোর বলিলেন—"এ মেয়েটার কথা তোমাদের বলিনি, না?"

গিরিবালা বলিলেন—"না, কৈ বলিস্‌নি তো; পাগলই বোধ হচ্ছে।"

বারান্দার জানালার খাঁজে আধ-বসা হইয়া কিশোর বলিলেন, —"পাগল তো বটেই, সেদিনে কিন্তু বড্ড ভয় লাগিয়ে দিয়েছিল। …বোস না দিদি চৌকিটার ওপর, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার…"

বড়বৌ বলিলেন—"ছেলে মরে গিয়ে ঐ রকম হয়ে গিয়েছে আর কি।"

কিশোর শুরু করিতেই যাইতেছিলেন, হঠাৎ কি ভাবিয়া চুপ করিয়া গিয়া বলিলেন—"না। থাক্, কাজ নেই শুনে।" তাহার পর গিরিবালার জিদেই আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"সে-দিনে চাটুজ্জেদের ছেলেটাকে দাহ করতে গেলাম-না?… বেশই খানিকটা রাত হয়ে গেল, ঘাটে যখন পৌঁছিলাম তখন একটার ওপর হয়ে গেছে। চিতা-টিতা সাজিয়ে আগুন দিতে প্রায় দুটো হয়ে গেল। তেমনি শীত সেদিন, ওদিকে আকাশে মেঘ করে আছে, হাওয়াও দিচ্ছে; পাঠক মশাইকে শ'য়ের কাছে রেখে আমরা সবাই ঘরের ভেতর গিয়ে দোর দিয়ে বসলাম। ওদের বোতল আছে, গাঁজার ছিলিম আছে, কম পক্ষে বিড়িটা তো আছেই পকেটে, গরম হয়ে গল্প জুড়ে দিলে। সব ভুতুড়ে গল্প, দাহ করতে গিয়ে কবে কে কি দেখেছে না দেখেছে—সেই সব কথা। আবার সাঙেল জুটেছে, খুব জমে উঠল গল্প। আমি এক কোণে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে শুনতে শুনতে কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছি, অনুকূলের ডাকাডাকিতে ঘুমটা গেল ভেঙে। প্রথমেই তো মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল—এ আবার কোথায় বসে আছি।…তার পরেই সব মনে পড়ে গেল, জিগ্যেস করলাম—'কি বলছিস?' অনুকূল বললে—'যা, এবার তোর পালা, আগুনটা ঠিক জ্বলছে কি না দেখে আয় একবার।' বললাম—'একলা?'…'একলা নয় তো দোকলা কোথায় পাবি? দেখছিস্ তো বোতল খালি করে সব ফ্ল্যাট হয়েছে। পাঠক মশাই সুদ্ধ্য। আমি আর সদানন্দ শুধু জেগে আছি দুজনে পালা করে দেখে এলাম এবার তোর পালা।' …সদানন্দ উড়ে, পাঠকের হোটেলে কাজ করে, একটু দূরে গাঁজা সাজছিল, আমি তারই ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করলাম, বললাম—'আমি ভয়কাতুরে মানুষ সদানন্দ, তায় এই রকম রাত…' 'সে আমিও ভয়…' বলে সদানন্দ কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ থেমে গিয়ে 'আমি পারব না' বলে ঘাড়ের ওপর হাতটা নেড়ে ঘুরে বসে কলকে সাজতে বসল। অনুকূল বললে—'তুই-ই যা, আর প্রায় ভোর হয়ে এল, ভয়ের কি আছে? আর তুই তো সমানে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিলি, গল্পগুলোও শুনিসনি সে কথা। যতে সাঙেল যা একখানি হাঁকড়েছিল শুনলে আর…কি বলো সদানন্দ?'

আর একটু চেষ্টা করে শেষে আমাকেই উঠতে হোল। দোরটা একটু খুলে রাখতে বললাম, অনুকূল বললে—'দোরের ফাঁক দিয়ে যা হাওয়া ঢোকে তা আরও সাংঘাতিক; তুই যা না, একটু ঝেড়ে-ঝুড়ে দিয়ে চলে আসবি, এই তো রয়েছি আমরা।'

শেষ রাত্তিরের অমন ঘুমটা ভাঙিয়ে দিয়েছে, আমি চোখ কচলাতে কচলাতেই বেরিয়ে গেলাম, ওরা দোরটা বন্ধ করে দিলে।

শ'য়ের কাছে এসেই আমার সমস্ত শরীরটা যেন হিম হয়ে গেল। প্রথমটা ভাবলাম বুঝি চোখ রগড়েছি তাই এই রকম হোল, আবার একবার ভালো করে মুছে নিয়ে দেখি—না, ঠিক,—একটা আধ-বয়সী মেয়ে হাঁটুর ওপর দুটো হাতের ভর দিয়ে একেবারে ঝুঁকে শ'য়ের মাথার দিক্‌টায় একঠায় চেয়ে আছে। চুল একেবারে এলো আর ভিজে, পরনে গাছকোমর বাঁধা একটা খাটো শাড়ী, আর দ্বিতীয়

কিছু গায়ে নেই। সব থেকে ভয়ঙ্কর চেয়ে থাকাটা—কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, ঠায় শিয়রের দিক্‌টায় চেয়ে আছে। অন্ধকার, থমথমে মেঘ, শ্মশান, সামনে গন্‌গনে চিতা জলছে, আর ঐ মূর্তি!—অবস্থাটা বুঝতেই পার। চেঁচাতে গিয়ে যেন গলা বেধে গেল, পালাতেও যেন পা উঠছে না, মনে হোল পেছন ফিরলেই একটা কিছু ঘটবে। তার পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এক ধরণের সাহস এসে গেল কোথা থেকে। মানে, ভূতের ভয়টা রইল না, তখন অন্য ভয় এসে জুটল,—পিচাশ-সিদ্ধ নয় তো? হয় তো শবদেহ খাবার জন্যে এই রকম ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথমটা ভাবলাম যা হয় করুক, আমি সরে পড়ি, আর আছেই বা কি যে খাবে? তার পর মনে হোল, না, এটা খুবই অন্যায় হয়। আমি আর কিছু না ভেবে—'অনুকূল!' বলে একটা হাঁক দিলাম। একে হাওয়া, তায় গলাটা হঠাৎ এমন খাটো হয়ে গেল যে ভেতরে কেউ শুনতেই পেলে না। কিন্তু এদিকে এক ব্যাপার হোল, ডাকটা শুনেই মেয়েটা একেবারে সিদে হয়ে আমার দিকে চাইলে। সে যে কী মূর্তি, দিদি, এখনও যেন আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে,—ঠোঁট দুটো চাপা, কটমট করছে চাউনি, তার মধ্যে চিতের আগুনের শিখাগুলো কাঁপছে, এলো চুলগুলো হাওয়ায় উড়ে উড়ে গায়ে পড়ছে, সমস্ত শরীরেও চিতের একটা আলো পড়েছে···সকলের ওপরে সেই চাউনি—বাপ ···কিছু একটা গেল এই—ঠিক এই ভাবে আমি যে কি করে দাঁড়িয়ে আছি, আমিই জানি! তার পর ওরই মধ্যে কোথা থেকে একটু বুদ্ধি ফিরে এল। আর কাউকে না ডেকে, ওকেই মরিয়া হয়ে খুব নরম গলায় জিগ্যেস্ করলাম—"কে মা তুমি? কি দরকার এখানে তোমার?"

চাউনি আর মুখ থেকে ফেরে না, তবে আস্তে আস্তে যেন একটু নরম হয়ে এল, আমি আবার জিগ্যেস করলাম—'বলো মা, তুমি কে, কি চাও?'

বললে—'খুঁজছি।'

'কাকে খুঁজছ?'

'ছেলেকে। একবার জলে হারালাম, একবার আগুনে। নেই এখানে? দেখো না।'

তখন গা'টা বেশ ছম-ছম করছে, কিন্তু লোক ডাকবার একটা সুবিধে পেলাম, বললাম—'তুমি দাঁড়াও আমি ডেকে আনছি সবাইকে, তার পর দেখব খুঁজে।'—বলে, মাঝে মাঝে পেছন দিকে চাইতে চাইতে ঘরের দিকে চলে গেলাম।

অনুকূল পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে, দোর খোলাতে, তার পর ওদের বুঝিয়ে বিশ্বাস করাতে খানিকটা সময় গেল। সবাই অবশ্য উঠলও না। যখন বাইরে এলাম—কেউ নেই। তখন আমায় নিয়ে সবাই পড়ল; হাজার বলি, বিশ্বাস করতে চায় না; যত্তে নিজে অমন গল্প করে, সে পর্যন্ত নয়, বললে—'ধন্যি বাবা বিশ্বনাথের মাহাত্ম্য, গাঁজা খেলাম কারা, আর নেশা হোল কার!'

আমার তখন কেমন জিদ চেপে গেল। এরা সবাই জেগেছে, ভোর ভোরও হয়ে এসেছে, আমি খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম। ঐ শ্মশানঘাটের বাড়িটুকু, তার পরেই মাঠ, ওদিকে গঙ্গা—কোনখানে কিন্তু আর তাকে পেলাম না। একবার কি মনে হোল চেঁচিয়ে উঠলাম—'কোথায় গেলে গো বাছা?' এই পেয়েছি, দেখোসে।'···কার উত্তর দিতে বয়ে গেছে?

ফিরছি, দেখি গোপাল ব্রহ্মচারী ঘাটের ওপর বসে, যেমনি কেন শীত হোক্‌, ওর চারটের সময় চাই কি না নাওয়া। জিগ্যেস করলাম—'ঠাকুরদা', একটি মেয়েকে শ্মশানের দিক্‌ থেকে এসে এদিকে যেতে···'

হঠাৎ চুপ করে গেলেন কিশোর, গিরিবালার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত যেন নামিয়া গেছে; যন্ত্রচালিতের মতো প্রশ্ন করিলেন—"কি বললেন তিনি?"

এমন অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছে, কিশোর কোন মতেই উত্তরটা আর চাপিতে পারিলেন না। যন্ত্রচালিতের মতোই কেমন একটু অপ্রতিভ ভাবে সবটুকু বলিয়া গেলেন। বলিলেন—"ব্রহ্মচারী বললে—পাগলি-টার কথা বলছ?—সে আবার গঙ্গার ধারে ধারে খুঁজতে খুঁজতে ঐদিকে চলে গেল; আগুনে পেলে না তো?···"

তান্ত্রিকের কড়া প্রাণ, বলে একটু হাসলেও।"

একটু চুপ করিলেন কিশোর। কিন্তু ভুল বা অন্যায়ের একটা সম্মোহন শক্তি আছে; অনুচিত জানিয়াও তিনি নিজের মন্তব্যটুকু পর্য্যন্ত দিয়া সমস্ত কাহিনীটুকু পূর্ণ করিয়া দিলেন, বলিলেন—'হয়েছে কি বুঝলে না? ছেলেটা আগে জলে ডুবে মারা যায়, তার পর তাকে নিয়ে গেছে দাহ করতে।···সেই মেয়েটাই এসেছিল, তাই জিগ্যেস করলাম না?···"

মনের উপর একটা অসহ্য চাপ গিরিবালা যেন আর সহ্য করিয়া উঠিতে পারিলেন না, মাথায় একটু ঝাঁকুনি দিয়া অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"উঃ, বাবাঃ!"

ভুল যে হইয়াছে এটা বুঝিতে বেশি বিলম্ব হইল না। রাত্রিটা গিরিবালা বড় বিমর্ষ এবং অন্যমনস্ক রহিলেন। পরদিবসও ভাবটা সেই রকমই রহিল, বাড়তির মধ্যে বাড়ি থেকে অনেক দিন কোন খবর না পাওয়ার কথা কয়েক বার বলিলেন, এবং আরও যাহা করিলেন, তাহা কতকটা অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই অহির উল্লেখ করা। অহির প্রসঙ্গটা গিরিবালা এক রকম তোলেনই না—কারণটা বলা যায় না, হয় তো স্বামীর শপথ দেওয়া আছে, হয় তো জীবনের যা সব চেয়ে নিবিড় বেদনা মানুষ তাহাকে লোক-সমক্ষে আনিতে চায় না; অন্য কোন কারণও হইতে পারে, তবে এ-দিনে গিরিবালা যেন ঘুরিয়া ফিরিয়া অহির স্মৃতিতে ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন।

শেষে আশঙ্কাটা তৃতীয় দিনে ফলিলই। মায়ের মৃত্যুর কথা চিন্তা করিতে করিতে মনে অহেতুক ভাবেই যে একটা আতঙ্ক জমিয়া উঠিয়াছিল, চাটুজ্জেদের ছেলের মৃত্যু-সংবাদ সেটাকে নিতান্ত অহেতুক ভাবেই পুষ্ট করিল, খিড়কিতে পাগলির সাক্ষাৎ সেটাকে প্রায় চরমের কাছাকাছি ঠেলিয়া তুলিয়াছিল। তাহার পরই আসিল কিশোরের এই উগ্র কাহিনী—পুত্রশোকের একটা নিদারুণ চিত্র চিতার আলোকেই যেন নিজের উৎকট ভীষণতায় স্পষ্ট হইয়া উঠিল। মনের উপর এতটা চাপ সহিল না। গিরিবালা তৃতীয় দিনের সকাল হইতেই একেবারে এক শত তিন ডিগ্রি টেম্পারেচার লইয়া জ্বরে পড়িলেন; শীঘ্রই সেটা আরও বাড়িয়া ভুল বকা আরম্ভ হইয়া গেল। শুধু অহির কথা—'আমায় বেরিয়ে খুঁজতে দিচ্ছ না কেন তোমরা?—আমি তাকে বের করবই···আসছি অহি—বাবা আমার, কেঁদো না··· দুধ,নাকে-চাচি, এই দুটো টাকা—আরও দোব, এখন হাতে নেই—

মহামুনি শ্রীভরত-কৃত

নাট্যশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

চতুর্থ অধ্যায়

২

মূল :—[বর্দ্ধমানক-যোগসমূহে ও আসারিত গীত-সমূহে] ও মহাগীত-সমূহে (এই সকল) বিষয় সম্যগ্‌রূপে অভিনয় করিবে। ১৪-১৫।

সঙ্কেত :—[ব্র্যাকেট মধ্যস্থিত অংশ কোন কোন পুঁথিতে নাই—এ কারণে বরোদা-সংস্করণে উহা চতুষ্কোণ বন্ধনীর মধ্যে মুদ্রাপিত হইয়াছে।] বর্দ্ধমানক, আসারিত—ভরত-নাট্যশাস্ত্রের একত্রিংশ অধ্যায়ে (কাশী সংস্করণ) ইহাদিগের স্বরূপ উপবর্ণিত হইয়াছে। আসারিত—গীত-বিশেষ—মুখ, প্রতিমুখ, দেহ ও সংহরণ (সংহার) —এই চারিটি ইহার অঙ্গ। সকল প্রকার আসারিতের ত্রিবিধ ভেদ—জ্যেষ্ঠ, মধ্যম, কনিষ্ঠ। আসারিত—বর্ণ-তাল-অক্ষর-সংযোগ। বর্দ্ধমানক—আসারিত-সমূহের সংযোগ বর্দ্ধমানক'। বর্দ্ধমানক পিণ্ডীবন্ধ-সমূহ-দ্বারা ভূষিত হইয়া থাকে। বর্দ্ধমানক ও আসারিত—পরস্পর কার্য্য-কারণ-ভাব-বদ্ধ—"বর্দ্ধমানশরীরস্থ ভবেদাসারিতস্য চ। কার্য্যকারণভাবেন পরস্পরবিকল্পনা"। (নাঃ শাঃ, ৩১।২৬৪-কাশী সং)। কাশী সংস্করণে পাঠ—আসাদিত—উহা মুদ্রাকর-প্রমাদ—আসারিত হইবে—আর একত্রিংশ অধ্যায়ে 'আসারিত' এই পাঠই মুদ্রাপিত হইয়াছে। মহাগীত—গীতবিশেষ—অভিনয়, অঙ্গহার ও পিণ্ডীবন্ধ সমূহ ইহাতে যথাযোগ্যরূপে মিশ্রিত—ইহা তাণ্ডবলক্ষণের অনুবাদকর্ত্তার অভিমত। পক্ষান্তরে, অভিনব গুপ্তাচার্য্যের মতে—মহাগীত গীতক-বর্দ্ধমানাদিরূপ। তাহাতে ও বাক্যার্থাভিনয়ে যথাযোগ্যরূপে অঙ্গহার-পিণ্ডীবন্ধাদি যোগ করিয়া অভিনয় করিবে—ইহাই শ্লোকটির তাৎপর্য্য। অর্থাৎ অঙ্গহার-পিণ্ডীবন্ধাদির যোগ মহাগীতে ও অভিনয়ে উভয়ত্রই করা যায় অঙ্গহার-পিণ্ডীবন্ধাদির যোগ হইলে তবে অভিনয় করা সম্ভব। অভিনয় করিবে অর্থাৎ অভিনয় করিতে সমর্থ হইবে। মহাগীতাদিতে অঙ্গহার পিণ্ডীবন্ধাদি যোগ করিলে তবে অভিনয় করিতে পারিবে—ইহাই তাৎপর্য্য।

পঞ্চম অধ্যায়ে পাওয়া যায়—পূর্ব্বরঙ্গের উনবিংশতিটি অঙ্গ—(১) উহাদিগের প্রথম নয়টি অঙ্গ অন্তর্যবনিকাসংস্থ অর্থাৎ যবনিকার অন্তরালে অনুষ্ঠেয়—দর্শকগণের দর্শনযোগ্য নহে। এই নয়টি অঙ্গের অন্তিম অঙ্গ 'আসারিত'—"কলাপাতবিভাগার্থং ভবেদাসারিতক্রিয়া" (নাঃ শাঃ ৫।২১—বরোদা সং)। দশম হইতে অঙ্গগুলি যবনিকার বাহিরে প্রযোজ্য—দর্শকগণের দর্শনযোগ্য—দশম অঙ্গটি—গীতক। অঙ্গগুলি যথা—(১) প্রত্যাহার, (২) অবতরণ, (৩) আরম্ভ, (৪) আশ্রাবণা, (৫) বক্ত্রপাণি, (৬) পরিঘট্টনা, (৭) সংঘোটনা, (৮) মার্গাসারিত, (৯) আসারিত—এই নয়টি অঙ্গ অন্তর্যবনিকা-সংস্থ। (১০) গীতক, (১১) উত্থাপন, (১২) পরিবর্ত্তন, (১৩) নান্দী, (১৪) শুষ্কাবকৃষ্টা, (১৫) রঙ্গদ্বার, (১৬) চারী, (১৭) মহাচারী, (১৮) ত্রিগত ও (১৯) প্ররোচনা—এই দশটি অঙ্গ বহির্যবনিকাসংস্থ।

অভিনবগুপ্ত এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতেছে। এই যে পূর্ব্বরঙ্গের উনবিংশতিটি অঙ্গ—তাহাদিগের দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয়বিধ প্রয়োজন আছে। দৃষ্ট প্রয়োজন—দর্শকগণের চিত্তরঞ্জন। আর অদৃষ্ট প্রয়োজন—পুণ্য-সঞ্চয়াদি। ভরতমুনি দেবাধিদেবের সম্মুখে নাট্যপ্রয়োগকালে যে পূর্ব্বরঙ্গের প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার অন্তর্গত প্রত্যাহারাদি প্রথম নয়টি অন্তর্যবনিকাসংস্থ অঙ্গ—এমন কি দশম অঙ্গ যে গীতক (যাহা দর্শকগণের সম্মুখে প্রযোজ্য বহির্যবনিকাসংস্থ)—এগুলি নৃত্যবিহীন ভাবে কেবল কর্ত্তব্যমাত্ররূপে প্রযুক্ত হইয়াছিল—অর্থাৎ এই সকল অঙ্গ-প্রদর্শনের নিয়ম শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে বলিয়াই কেবল প্রত্যবায়ের পরিহারার্থই যেন ঐ অঙ্গগুলি প্রদর্শিত হইয়াছিল। উহাতে অবশ্য বিধি-পালন-হেতু যে অদৃষ্ট প্রয়োজন (পুণ্যলাভাদি) তাহা সিদ্ধ হইয়াছিল—একথা সত্য; কিন্তু কেবল অদৃষ্ট ব্যতীত নাট্যের দৃষ্টপ্রয়োজনও ত আছে। অন্তর্যবনিকাসংস্থ অঙ্গগুলি না হউক বহির্যবনিকাসংস্থ অঙ্গগুলিতেও ত অন্ততঃ এই দৃষ্ট-প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। এই দৃষ্টপ্রয়োজন দর্শকগণের চিত্তবিনোদন। কিন্তু ভরত যে ভাবে এই অঙ্গগুলির প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহাতে দৃষ্ট-প্রয়োজন সিদ্ধ হয় নাই অর্থাৎ দর্শকগণের চিত্তরঞ্জন উহাতে হয় নাই। আর চিত্তরঞ্জনের অভাব ঘটার একমাত্র হেতু—ঐ অঙ্গগুলিতে নৃত্যের অভাব। গীত নৃত্যযুক্ত হইলে যেরূপ চিত্তরঞ্জক হয়, কেবল গীত গতানুগতিক ভাবে প্রযুক্ত হইলে কখনই সেরূপ রঞ্জক হইতে পারে না।

দেবাধিদেব পিতামহকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই—'কেবল নিয়মরক্ষার উদ্দেশ্যে ভরত যে পূর্ব্বরঙ্গের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা শুষ্ক অর্থাৎ বৈচিত্র্য-রহিত ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। যথাযথ নৃত্তের সহিত মিশ্রিত হইলে তবে উহাতে বৈচিত্র্য আসিতে

বড়মঠাকুরের চালাটা সারিয়ে দিয়ে বল্ তিনি যেন অহিকে শীগ্‌গির নীরোগ করে দেন—বলিস্ তুথ্‌নাকে-চাচি···"

একটা যেন ওলট-পালট হইয়া গেল। বিপিনবিহারীকে তার করিতে হইল, তিনি যেন অন্ততঃ শশাঙ্ককে লইয়া পরের গাড়িতে চলিয়া আসেন।

অহির মৃত্যুর পর প্রায় আট বৎসর কাটিয়া গেছে। অনেকেই ভুলিয়াছে, বোধ হয় কম-বেশ করিয়া সবাই। সকলে ভাবিল ঐ সবাইয়ের মধ্যে বোধ হয় মা-ও আছে—আট-আটটা বছর—একটা যুগের কাছাকাছি যে!

এই একটি মাত্র মানুষ যে শুভঙ্করীর সব মাপ-জোখের বাইরে সেটা সব সময় সবার স্মরণে থাকে না।

[ক্রমশঃ

পারে; আর বৈচিত্র্যযুক্ত হইলে উহা আর 'শুদ্ধ' নামে অভিহিত হইবে না—'চিত্র' নামে আখ্যাত হইবে।' পরবর্ত্তী শ্লোকে ইহাই স্পষ্টাক্ষরে বলা হইতেছে।

মূল :—আর এই যে পূর্ব্বরঙ্গ তৎকর্ত্তৃক শুদ্ধরূপে প্রযোজিত হইয়াছে, ইহার সহিত মিশ্রিত হইলে উহা চিত্র-নামক হইবে। ১৫-১৬।

সঙ্কেত :—নৃত্ত বিহীন বলিয়া বৈচিত্র্য-রহিত পূর্ব্বরঙ্গ 'শুদ্ধ' নামে কথিত হয়; আর নৃত্ত-মিশ্রিত অতএব বৈচিত্র্যযুক্ত পূর্ব্বরঙ্গের নাম 'চিত্র'। পূর্ব্বরঙ্গ—রঙ্গে অর্থাৎ নাট্যপ্রয়োগে যাহা পূর্ব্বভাগ—ঊনবিংশতি অঙ্গবিশিষ্ট। নাট্যশাস্ত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যাইবে।

মূল :—মহেশ্বরের বাক্য শুনিয়া স্বয়ম্ভূ-কর্ত্তৃক প্রত্যুক্ত হইয়াছিল—'হে সুরসত্তম, অঙ্গহার-সমূহের প্রয়োগ বলুন'। ১৬-১৭।

মূল :—অতঃপর তণ্ডুকে আহ্বানপূর্ব্বক ভুবনেশ্বর বলিয়াছিলেন—'অঙ্গহার-সমূহের প্রয়োগ ভরতকে বল'। ১৭-১৮।

সঙ্কেত :—ইহা হইতে সূচিত হইতেছে যে ভরতের নাট্যশাস্ত্রোক্ত নৃত্তকলা পরমেশ্বরের প্রসাদলব্ধ—ইহা মুনির স্বকল্পিত নহে—কিন্তু দেবোপদিষ্ট অনাদি-সম্প্রদায়-সিদ্ধ।

মূল :—তাহার পর মহাত্মা তণ্ডু-কর্ত্তৃক যে সকল অঙ্গহার কথিত হইয়াছিল, নানাকরণ-সংযুক্ত ও সরেচক (সেই সকল অঙ্গহার) ব্যাখ্যা করিব। ১৮-১৯।

সঙ্কেত :—বরোদার পাঠ—"ততো যে তণ্ডুনা প্রোক্তাস্ত্বঙ্গহারা মহাত্মনা। নানাকরণসংযুক্তান্ ব্যাখ্যাস্যামি সরেচকান্"।—ইহাতে অন্বয়শুদ্ধির জন্য একটি 'তান্' পদ উহ্য করিতে হয়। কাশীর পাঠ—"ততো বৈ তণ্ডুনা প্রোক্তাংস্ত্বঙ্গহারান্ মহাত্মনা। নানাকরণসংযুক্তান্ ব্যাখ্যাস্যামি সরেচকান্—ইহাতে কোন অধ্যাহার করিতে হয় না। রেচক শব্দের অর্থ ভ্রামণ। পাদরেচক, কটিরেচক কররেচক ও গ্রীবারেচক—এই চতুর্ব্বিধ ভেদ রেচকের [৪র্থ অধ্যায়, ২৫০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।]

মূল :—স্থিরহস্ত অঙ্গহার, আর পর্য্যস্তক স্মৃত হয়। সূচীবিদ্ধ আর অপবিদ্ধ। আক্ষিপ্তকও বিজ্ঞেয়, আর উদ্‌ঘট্টিতও স্মৃত হইয়া থাকে। ১৯-২০।

সঙ্কেত :—পাঠান্তর—পর্য্যস্তহস্তক। সূপবিদ্ধঃ (কাশী); অপবিদ্ধঃ (ব)। উদ্‌ঘটিত (কা); উদ্‌ঘট্টিত (ব)।

মূল :—আর বিক্ষিপ্তও সম্যগ্‌রূপে প্রোক্ত হইয়াছে, আর অপরাজিত। আর বিষ্কম্ভাপসৃত মত্তাক্রীড়। ২১।

সঙ্কেত :—বিষ্কম্ভাপসৃত (কা); বিষ্কম্ভাঙ্গসৃত (পাঠান্তর, কাশী)।

মূল :—স্বস্তিক ও রেচিত, আর পার্শ্বস্বস্তিক। বৃশ্চিকও কথিত হইয়াছে ও অপরটি ভ্রমর। ২২।

সঙ্কেত :—তাণ্ডবলক্ষণকার উল্লেখ করিয়াছেন—মূলে 'স্বস্তিকো রেচিতশ্চৈব' এরূপ পাঠ থাকায় মনে হয় যেন স্বস্তিক পৃথক্ অঙ্গহার ও রেচিত পৃথক্। কিন্তু টীকায় 'স্বস্তিকরেচিত' একটি অঙ্গহাররূপেই উল্লিখিত হইয়াছে। দুইটিকে অঙ্গহার ধরিলে অঙ্গহারের সংখ্যাও বত্রিশটির পরিবর্ত্তে তেত্রিশটি হইয়া পড়ে। উহাও মূলের পূর্ব্বোক্তির সহিত খাপ খায় না।

মূল :—আর মত্তস্খলিতক ও মদাস্খলিত। অতঃপর গতিমণ্ডল বিজ্ঞেয় ও পরিচ্ছিন্ন। ২৩।

সঙ্কেত :—পাঠান্তর—সমস্খলিতক—টীকায় 'মত্তস্খলিতক' পাঠই আছে। 'মদাস্খলিত' স্থলে টীকায় পাঠ—'মদবিলসিত।' পাঠান্তর—পদাস্খলিত।

মূল :—পরিবৃত্তরেচিত ও বৈশাখরেচিত। অনন্তর বিজ্ঞেয়—পরাবৃত্ত, ও অলাতক। ২৪।

সঙ্কেত :—পাঠান্তর—পরিক্ষিপ্তরেচিত ও কেবল 'বৈশাখ'।

মূল :—অনন্তর কথিত হইয়াছে—পার্শ্বচ্ছেদ ও বিদ্যুদ্‌ভ্রান্ত। আর উদ্বৃত্ত ও আলীঢ়। ২৫।

সঙ্কেত :—পাঠান্তর—বিদ্যুদ্ভ্রান্ত। পাঠান্তর—উদ্বৃত্তক। অভিনব এই পাঠটিই গ্রহণ করিয়াছেন।

মূল :—আর বিজ্ঞেয় রেচিতও, আর আচ্ছুরিত স্মৃত হইয়াছে। আর আক্ষিপ্তরেচিত, ও অপরটি সম্ভ্রান্ত। ২৬।

মূল :—অপসর্পও বিজ্ঞেয়, আর অর্দ্ধ নিকুট্টক।—এই বত্রিশটি অঙ্গহার নাম-দ্বারা সম্যগ্‌রূপে কথিত হইল। ইহাদিগের করণাশ্রিত প্রয়োগ (যথাস্থানে) বলিব। ২৭-২৮।

সঙ্কেত :—পাঠান্তর—অসপিত; অর্দ্ধবিকুট্টক। অঙ্গহারগুলির লক্ষণ ১৭৫-২৪৯ শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে।

টীকাকার বলিয়াছেন—অঙ্গহার ত অঙ্গবিক্ষেপ—অতএব উহা অসংখ্য প্রকার হইতে পারে। তবে এই বত্রিশটি অতি প্রসিদ্ধ ও দেখিতে মনোরম—এই কারণে ইহাদিগেরই লক্ষণ মূলে প্রদত্ত হইয়াছে। বত্রিশটি অঙ্গহারের নাম নিম্নে পর পর প্রদত্ত হইল—১। স্থিরহস্ত। ২। পর্য্যস্তক। ৩। সূচীবিদ্ধ। ৪। অপবিদ্ধ। ৫। আক্ষিপ্তক। ৬। উদ্‌ঘট্টিত। ৭। বিক্ষিপ্ত। ৮। অপরাজিত। ৯। বিষ্কম্ভাপসৃত। ১০। মত্তাক্রীড়। ১১। স্বস্তিক-রেচিত। ১২। পার্শ্বস্বস্তিক। ১৩। বৃশ্চিক। ১৪। ভ্রমর। ১৫। মত্তস্খলিতক। ১৬। মদবিলসিত। ১৭। গতিমণ্ডল ১৮। পরিচ্ছিন্ন। ১৯। পরিবৃত্তরেচিত। ২০। বৈশাখরেচিত। ২১। পরাবৃত্ত। ২২। অলাতক। ২৩। পার্শ্বচ্ছেদ। ২৪। বিদ্যুদ্‌ভ্রান্ত। ২৫। উদ্বৃত্তক। ২৬। আলীঢ়। ২৭। রেচিত। ২৮। আচ্ছুরিত। ২৯। আক্ষিপ্তরেচিত। ৩০। সম্ভ্রান্ত। ৩১। অপসর্প, ও ৩২। অর্দ্ধনিকুট্টক।

অঙ্গহারগুলির নাম প্রদত্ত হইল। অতঃপর করণগুলির নাম ও লক্ষণাদি প্রদত্ত হইবে।

বাঙলার কৌলীন্যের রাজনৈতিক ভিত্তি

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বাঙলার কুলীনত্ব প্রথার প্রচলন অস্বীকার করিবার উপায় নাই ; ধ্বংসোন্মুখ হইলেও এখনো সে প্রথা বর্ত্তমান, সে প্রথার কবে সূচনা ও কি ভাবে পরিবর্ত্তন বিভিন্ন কালে হইয়াছিল, তাহার ধারাবাহিক বৃত্তান্ত কয়েক জন কুলাচার্য্য বা ঘটক প্রণীত কুলশাস্ত্রেই পাওয়া যায়। রমাপ্রসাদ চন্দ ও রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাঙলার ইতিহাসের প্রথম রচয়িতা ; তাঁহাদের মতে অধুনাবিষ্কৃত তাম্রশাসন ও শিলালিপির আলোকে কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক দীপ্তি স্তিমিত প্রায়। নগেন্দ্র প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের কুলশাস্ত্রের ভিত্তি করিয়া বাঙলার জাতীয় ইতিহাস গঠনের প্রয়াস বিফল হইয়াছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ও ডাঃ রমেশ মজুমদার কর্ত্তৃক সম্পাদিত একখানি পূর্ণাঙ্গ বাঙলার ইতিহাস বাহির হইয়াছে। ইহাতেও কুলশাস্ত্রের ও তদুল্লিখিত আদিশূর-রাজের বঙ্গে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনয়ন ও কুলীনত্ব প্রথার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে বিস্তৃত ও নিরপেক্ষ আলোচনা হইয়াছে। আমি এই প্রবন্ধে উপরোক্ত ইতিহাস ও কুলশাস্ত্রগত উপাদানের বিশ্লেষণ করিয়া কুলীনত্ব বিষয়ের প্রকৃত সত্যে উপনীত হইবার প্রয়াস পাইয়াছি।

ডাঃ মজুমদার তাঁহার ইতিহাসের ১৫ অধ্যায়ের ৬২৮ পৃষ্ঠায় বহুখ্যাত কুলশাস্ত্রের একটি তালিকা দিয়াছেন ; তাহাদের সংখ্যা চৌদ্দ। ঐগুলি ছাড়া আরও অনেক গ্রন্থ আছে যাহা উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। ইহাদের মধ্যে ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশাবলী বা মিশ্রগ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, সম্ভবতঃ পঞ্চদশ খৃঃ অব্দে রচিত। ইংরাজীতে মুদ্রিত হইয়াছে। নুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা ও বাচস্পতির কুলরক্ষা ষষ্ঠ বা সপ্তদশ খৃঃ অব্দে রচিত। এ সকল গ্রন্থের আসল পুঁথি দুর্লভ ; যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার ভিতর অন্যায়-রূপে অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া পুরাতন লেখকের নামে চালান হইয়াছে, সকল পুঁথিই হাতের লেখা কাজেই সুলভ নয়। রাখাল বাবু তাঁহার বাঙলার ইতিহাসের ১ম ভাগের (৩য় সংস্করণ) পৃঃ ২৭৪ লিখিয়াছেন—"এখন যে সমস্ত কুলগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে দুই-একখানি ব্যতীত অপর সমস্তই গত দুই শতাব্দীর মধ্যে রচিত। যে দুই-একখানি অতি প্রাচীন বলিয়া পরিচিত তাহারও কোনও পুরাতন পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।" অতএব, রাখাল বাবুর সহিত ডাঃ মজুমদারের কোনও বিশেষ মত পার্থক্য দেখা যায় না। হরি মিশ্রের ও এড়ু মিশ্রের কারিকাদ্বয় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের নিকট ছিল, কিন্তু অনুরোধ সত্ত্বেও ডাঃ মজুমদার প্রভৃতির পরীক্ষার জন্য দেন নাই। এইখানে "দেন নাই" অর্থাৎ তাঁহার দিবার সাহস হয় নাই ; দিলেই, কুলগ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মর্য্যাদা নষ্ট হইত। এইরূপে অনেক কৃত্রিম কুলগ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল এবং বহু শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তি যাঁহাদের কুলীনত্বের প্রতি অন্ধ অনুরাগ ছিল, তাঁহারা তাদৃশ পুঁথি অযথা মূল্যে কিনিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই ত গেল বাহ্য প্রমাণের কথা, এখন অন্তঃপ্রমাণ অর্থাৎ যে সমস্ত ঘটনা বা ব্যক্তির বর্ণনা আছে তাহার সহিত বর্ত্তমান ইতিহাসের সহিত মিল কতটা তাহার বিচার করা উচিত।

বঙ্গীয় কুলশাস্ত্রে আদিশূর রাজাকেই বেদবিহিত ব্রাহ্মণ্যের প্রবর্ত্তকরূপে ধরা হইয়াছে ; কিন্তু তাঁহার রাজত্বকাল ও বঙ্গে ব্রাহ্মণ আগমনের সময় সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকার মতে ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃঃ অব্দে আদিশূর গৌড়ে ব্রাহ্মণ আনেন ; রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীর মতে ৭৩২ খৃঃ অব্দে তিনি রাজা হন ও ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে সাগ্নিক বিপ্রগণকে গৌড়ে আনেন। 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' রচয়িতার মতে ১০৩২ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণ আনা হয় ; ক্ষিতীশ বংশাবলীকার লিখিয়াছেন, ৯৯৯ শকে= ১০৭৭ খৃঃ অঃ। তাহা হইলে প্রথম মতে আদিশূর বর্ত্তমান ছিলেন খৃঃ ৮ম শতাব্দীর ২য় পাদে ও অপর মতে ১১·শতাব্দীর ২য় বা ৩য় পাদে। ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধানের ফলে কোনও আদিশূর বা ঐ নামের পঞ্চ গৌড়েশ্বরের অর্থাৎ সারস্বত কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকলের সার্ব্বভৌম রাজার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই। রাখাল বাবু তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম ভাগের (৩য় সংস্করণ) ১৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "খৃঃ ১ ম শতাব্দীর পূর্ব্বে গৌড়ে, মগধে বা বঙ্গে শূরবংশীয় রাজগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনই বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ নাই।" প্রায় তদনুরূপ ভাবে ডাঃ মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ইতিহাসের ৬৩০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "No positive evidence has yet been obtained of his (Adisura) existence but we have undoubted references to a 'sura' family, ruling in West Bengal in the eleventh century." এখনকার ইতিহাসে পালবংশীয় ১ম গোপালের রাজ্যকাল, রাখাল বাবুর মতে ৭৯০—৭৯৫ খৃঃ অঃ ও ডাঃ মজুমদারের মতে আন্দাজ ৭৫০—৭৭০ খৃঃ অঃ। ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড় মগধ বঙ্গের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে রাখাল বাবুর ইতিহাসের ১৫৩ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই "বিদেশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক বারংবার আক্রান্ত হইয়া গৌড়ীয় প্রজাবৃন্দ অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, এতদ্ব্যতীত মগধের গুপ্তবংশীয় ২য় জীবিতগুপ্তের মৃত্যুর পরে কোন রাজা বোধ হয় গৌড় মগধ বঙ্গে স্বীয় অধিকার দৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপন করিতে পারেন নাই, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুস্বামিগণ সতত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন। ফলে, খৃঃ ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তরাপথের প্রাচ্যখণ্ডে ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। * * প্রকৃতিপুঞ্জ মাৎস্যন্যায় (অরাজকতা) দূর করিবার জন্য * * * গোপালদেব (১ম)কে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল।" পুনশ্চ ১৩১ পৃষ্ঠায় "অনুমান হয় ৮ম শতাব্দীর ১ম পাদে, গৌড় ওড্র, কলিঙ্গ ও কোশল কামরূপ রাজগণের হস্তগত হইয়াছিল, * * * যশোবর্ম্মা দেব (কান্যকুব্জরাজ) কর্ত্তৃক পরাজিত মগধনাথ ও গুপ্ত-বংশীয় রাজা ২য় জীবিতগুপ্ত একই ব্যক্তি। এই সময়ে বঙ্গদেশ যে কোন্ রাজার অধিকারভুক্ত ছিল তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।" অতএব, উক্ত ঐতিহাসিকগণের বিবরণ অনুসারে, ৭৩২ খৃঃ অঃ আদিশূর নামীয় সার্ব্বভৌম রাজা না হউক একজন ক্ষুদ্র রাজার অবস্থান একেবারে অসম্ভব নহে।

তাঁহাদের স্বীকৃতি ২য় মতের অর্থাৎ ১১শ খৃঃ অব্দের সমর্থন করে। রাখাল বাবুর ইতিহাসের ২৮০ পৃষ্ঠায় আছে, "কেহই আদিশূরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এই মত সমর্থন করিয়াছেন। আদিশূর নামক কোন রাজার রাজ্যকালে বঙ্গে ব্রাহ্মণের আগমন ঘটিয়াছিল, এই প্রবাদের

উপর নির্ভর করিয়া কুলাচার্য্যগণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই প্রবাদের মূলে সত্য নিহিত আছে বলিয়াই বোধ হয়; কারণ, শ্যামল বর্ম্মার প্রসঙ্গে দৃষ্ট হইয়াছিল যে, কুলশাস্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় সত্যের উপর স্থাপিত " আবার ডাঃ মজুমদার তাঁহার ইতিহাসের ৫৮১ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন, "In the light of the epigraphic, it is difficult to believe that there was a death of veda-throwing Brahmanas in Bengal in the time of Adisura, even if we accept the earliest date, viz. 732 A. D." স্যার যদুনাথ সরকার তাঁহার "India through the ages" পুস্তকের ২৬—৭ পৃঃ লিখিয়াছেন যে, খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর অর্থাৎ শক হুন প্রভৃতি বর্ব্বর যাযাবর জাতির ভারত অভিযানের পরে, ভারতীয়রা এক অভিনব ভাবে সমাজবদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই সামাজিক প্রথা অল্পবিস্তর এখনও বজায় আছে। আমরা জানি না কোন মহান্ সমাজনেতা বা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ (ইতিহাসের বক্ষেও তাহার কোন চিহ্ন নাই) এই বিশাল ভারতবাসীকে একই ছাঁচে ঢালিয়া চিরকালের মত এক দৃঢ় সমাজ গড়িয়াছিলেন। "But we get a few glimpses from the identical tradition preserved in places as far apart as Gujrat, Assam, Lower Bengal & Orissa about king Adisur of Bengal tradition in Imperial Gazetteer of India 3rd ed. II. 307 ; Bom. Gazetteer of Ist. ed. P7 (ix pt), In each of these provinces there is a universally accepted belief that an ancien king wanted to perform a Vedic sacrifie but found local Brahmans ignorant of the scriptures and unclean in their lives so that he had to induce five pure Brahmans from Kanouj to come and settle in his kingdom and from these five immigrants the best local Brahman families of later times trace their descent. This huge reconstruction of Hindu society stretches with its ebb and flow, from the 6th to the 10th century A. D." এই সকল উক্তি হইতে মনে হয় যে, ঐতিহাসিকেরা বঙ্গে ব্রাহ্মণ আনয়ন সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। এমন কি, রামমোহন রায়ের সময়েও তাঁহার বেদাভ্যাসের জন্য কাশী যাইতে হইয়াছিল। কারণ, এ দেশে মোটেই বেদের চর্চ্চা ছিল না। গুপ্তরাজ্যের পর, হর্ষবর্দ্ধন ও তাহার পরেই অরাজকতা এবং সেই গোলযোগের সুযোগেই অজ্ঞাতকুলশীল ১ম গোপালের দ্বারা পালরাজ্যের গোড়া পত্তন হয়। এই পালরাজ্য প্রায় চারি শত বর্ষের উপর বাঙলা অধিকার করিয়াছিল, এবং পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। এমন সময় উপস্থিত হইত, যখন বেদপারগ ব্রাহ্মণের বা বৈদিক নিয়মে যজ্ঞাদি করিবার ব্রাহ্মণের অভাব হওয়া বিচিত্র নয়; আজও বাঙলায় শুদ্ধ ভাবে বেদ উচ্চারণ করিতে পারে এরূপ ব্রাহ্মণ বিরল। গুপ্ত-যুগে অনেক বেদবিৎ ব্রাহ্মণ আনা হইয়াছিল ও তাহার পূর্ব্বেও হয়ত ছিল, কিন্তু গুপ্ত-যুগ ছাড়া তাহার পূর্ব্বে বা পরে বেদ-বিহিত ক্রিয়াকলাপের প্রাচুর্য্য ত ছিলই না বরং খুব কমই হইত। যদি কোনও সম্ভ্রান্ত ধনী বা রাজা বিশেষ কোনও কারণে কোন বৈদিক ক্রিয়া পুরা বৈদিক নিয়মে করাইতে চাহিতেন, নিশ্চয়ই তাঁহাকে উত্তর বা মধ্য-ভারতের ব্রাহ্মণ আনাইতে হইত। রাজা শশাঙ্কর শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ও শ্যামল বর্ম্মার বৈদিক ব্রাহ্মণ আনা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গৃহীত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের এরূপ ভাবে ব্রাহ্মণ আনয়ন এ-দেশের চিরাচরিত প্রথা এবং ইহা প্রবাদের মত আদিশূরকে কেন্দ্র করিয়া পল্লবিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় কথা, ব্রাহ্মণগণ আসিলেন কান্যকুব্জ হইতে এবং ইহাই যে সাধারণের বিশ্বাস তাহা পূর্ব্বে স্যর যদুনাথের পুস্তক হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। কোন কোন কুলশাস্ত্রে কান্যকুব্জের স্থলে কোলাঞ্চ শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব পর্য্যন্ত দেখাইতে পারেন নাই যে, কোলাঞ্চ ও কান্যকুব্জ সমানার্থক। কুলতত্ত্বার্ণবে কোলাঞ্চ শব্দ একবার মাত্র সর্ব্বত্রই ব্যবহার করা হইয়াছে; স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কোলাঞ্চ কান্যকুব্জের অপর একটি নামমাত্র। উচ্চারণ-বিভ্রাটেও বঙ্গদেশে এই দুটি কথার এরূপ ব্যবহারও আশ্চর্য্য নয়। অবশ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, শাস্ত্রগুলি প্রচলিত প্রবাদের ভিত্তিতেই রচিত এবং রচয়িতার ও লেখকের খেয়াল ও ভুলের দ্বারা সীমাবদ্ধ।

কুলতত্ত্বার্ণবের মতে আদিশূরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ভূশূর মগধপতি ধর্ম্মপাল দ্বারা গৌড় হইতে তাড়িত হইয়া রাঢ়দেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন এবং তথাকার রাজা থাকা অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তৎপুত্র ক্ষিতিশূর তাঁহার পিতা যে সকল পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন তাঁহাদের ৫৬ জনকে ৫৬টি গ্রাম দান করিয়াছিলেন; তাঁহারাই ৫৬ গাঁঞী বা গ্রামীণ ব্রাহ্মণ বলিয়া এখনও খ্যাত। উক্ত গাঁঞী-গুলির মধ্যে রাঢ়ের আদি ব্রাহ্মণ সপ্তশতীদের নাম পাওয়া যায়। অতএব ব্রাহ্মণ বেদপারগ, উত্তর বা মধ্য-ভারতীয় ব্রাহ্মণের সহিত কালক্রমে বাঙলার প্রচলিত অবৈদিক ধর্ম্মের যাজকগণের সংমিশ্রণ হইয়াছিল; যেমন মহারাষ্ট্র দেশের আদিম ধর্ম্মযাজক গুরব সম্প্রদায় জনাগর ও চিৎপাবনের ব্রাহ্মণরূপে গণ্য হইয়াছে। ক্ষিতিশূর, মহীশূর ও পৃথ্বীশূর রাজগণের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ধরাশূর উক্ত ব্রাহ্মণ বা তাঁহাদের সন্ততিগণের মধ্যে ২২ গ্রামী ব্রাহ্মণকে কুলাচল ও অবশিষ্ট ৩৪ গ্রামীকে সংশ্রোত্রিয় পর্য্যায়ভুক্ত করিলেন। এ দুই বিভাগের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বা ইহাদের সংজ্ঞা কি সে বিষয় কুলগ্রন্থে কোনও উল্লেখ নাই এবং উভয়ের বৈবাহিক আদান-প্রদান সম্বন্ধে কোনও বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তিত হয় নাই। শেষ শূরগাঙ্গ তৎপুত্র সোমের মৃত্যু হইলে বল্লালসেন রাজা হন। সমস্ত কুলগ্রন্থে এই বল্লালসেন বাঙলায় কুলীনত্বের প্রবর্ত্তক বলিয়া লিখিত। ইঁহার পিতা বিজয়সেন পালবংশীয় মদনপালকে পরাজিত করিয়া রাঢ়-বঙ্গ ও দক্ষিণ-বরেন্দ্রী অধিকার করিয়াছিলেন; এই বল্লাল উক্ত শূর-বংশের দৌহিত্র, কিন্তু তাঁহার মাতামহের নাম এখনও অজ্ঞাত। তাঁহার জাতি ও রাজত্বকাল সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। রাখাল বাবুর ইতিহাসের ৩২৪ পৃষ্ঠায় আছে "সমস্ত খোদিত লিপিতেই দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারা (সেনবংশীয়েরা) কর্ণাট দেশবাসী, ক্ষত্রিয় ছিলেন ও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কোন্ সময়ে বাঙলা দেশে আসিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

তাম্রশাসন শিলালিপি সমূহে সর্ব্বপ্রথমে সামন্তসেনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়"। ডাঃ ভাণ্ডারকর সেন-বংশকে কর্ণাটের ব্রহ্মক্ষত্রী জাতীয় বলেন; ইঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য না করিয়া যুদ্ধব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়ার জন্য ক্ষত্রিয়রূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। অনেক বিদেশবাসী পাল-রাজাদের কর্ম্মচারী ছিলেন; যথা—মালব, খস, কুলিক কর্ণাট প্রভৃতি। ডাঃ মজুমদারের ইতিহাসের ২০৮ পৃষ্ঠায় আছে, 'It is not impossible that some Carnat officials acquired sufficient power to set up an independent kingdom when central authority became weak as supported in Naihati plate that Senas were settled in Rarh for a long time before Samanta Sen" কুলশাস্ত্রকারদিগের মধ্যে কেহ বল্লালকে বৈদ্যবংশীয় বলিয়া উল্লেখ করিলেও অপরে তাঁহাকে আদিশূরের দৌহিত্র-বংশোদ্ভব বলিয়াছেন; কিন্তু বিজয়সেনের তাম্রশাসনানুসারে তিনি নিজেই শূর-বংশের দৌহিত্র। রাখাল বাবুর মতে বল্লাল রাজা হন আন্দাজ ১২শ খৃঃ অঃ প্রারম্ভে ও তাঁহার মৃত্যু হয় ১১১৮ বা ১৯ সালে। কিন্তু ডাঃ মজুমদারের মতে রাজা হন ১১৫৮ ও মৃত্যু হয় ১১৬৯ সালে (খৃঃ অঃ)। রাখাল বাবুর ইতিহাসের ৩৩১-২ পৃষ্ঠায় দেখি, "বল্লালসেনের রাজ্যকালের কোন ঘটনাই অদ্যাবধি নির্দ্ধারিত হয় নাই। কুলশাস্ত্র সমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বল্লালসেন কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি স্বয়ং তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন এবং পৌত্র কেশবসেন ও বিশ্বরূপ সেন তাঁহাদিগের তাম্রশাসন সমূহে নব প্রচলিত আভিজাত্য বিধির কোনই উল্লেখ করেন নাই এবং শাসনগ্রহীতা ব্রাহ্মণগণের নামোল্লেখ কালেও তাঁহাদের নূতন পদমর্য্যাদা উল্লিখিত হয় নাই। এই কারণে কৌলীন্য প্রথা বল্লালসেন কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মে, ডাঃ মজুমদারও রাখাল বাবুর মত সমর্থন করিয়াছেন ও তাঁহার ইতিহাসের ৫৮১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে, বল্লাল তাঁহার নিজের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট ও লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধের ন্যায় শিক্ষিত ও মাননীয় ব্যক্তিরা কুলীন নামে অভিহিত হন নাই।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব তাঁহার রাজন্যকাণ্ডের পৃঃ ১১২তে লিখিয়াছেন, "আদিশূরের সভায় ব্রাহ্মণগণসহ কায়স্থগণের আগমনের কথা কোন কোন (কুল) গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু হরি মিশ্র, বাচস্পতি ও মহেশ মিশ্র, শ্যামলচতুরানন প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ সমূহে কোথাও এ কথা লিখিত হয় নাই, সর্বানন্দ মিশ্রের "কুলতত্ত্বার্ণবে"-ও কায়স্থ আসার কথা নাই, শুধু এই মাত্র উল্লেখ আছে "পঞ্চকক্ষৈঃ সঃ"। তাহাদের নাম বা জাতি ইত্যাদির কোনও বর্ণনা নাই। অতএব কান্যকুব্জ হইতে আগত ব্রাহ্মণ-পঞ্চের সহিত পঞ্চ ক্ষত্রিয়ের আগমন-বার্ত্তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং কতকগুলি ধনী ও রাজানুগৃহীত কায়স্থগণের সামাজিক মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য রচিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কোন কুলগ্রন্থ লিখিত হয় নাই এবং তাহারও ঠিক সেই বা তৎসমীপবর্ত্তী সময়ের কোন পুরাতন পুঁথি পাওয়া যায় নাই। অতএব ইহা স্থির নিশ্চিত যে, মুসলমানের রাজত্বকালে সকল কুলগ্রন্থই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং কুলীনত্ব প্রথার গৌরব বৃদ্ধির জন্যই হিন্দুরাজা বল্লালের নাম যোজনা করা হইয়াছে; অথবা বল্লালের সময়ে কুলীননামা কোন সম্প্রদায় ছিল, কিন্তু তাহাদের শ্রোত্রিয়াপেক্ষা মর্য্যাদা অধিক ছিল না। সেই কারণেই কুলীন পদবীর যোজনা দেখিতে পাওয়া যায় না। বাণভট্টের হর্ষ-চরিতে কুলপুত্র কথার ব্যবহার আছে এবং তাহার অর্থ অভিজাত বংশজাত।

বল্লালের মৃত্যুর পর লক্ষ্মণসেন, কুলতত্ত্বার্ণবের মতে, কুলবিধি চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া ১ম ও ২য় সমীকরণ করেন অর্থাৎ বল্লালকৃত কতকগুলি পৃথক্ মর্য্যাদা-সম্পন্ন কুলীনকে সমান মর্য্যাদা দেন। লক্ষ্মণের মৃত্যুর পর তৎপুত্র কেশব যবন কর্ত্তৃক গৌড়দেশ হইতে তাড়িত হইলেন। যবন ঐতিহাসিক মিনহাজের ১৭ জন মুসলমান দ্বারা নদীয়া জয়ের সমর্থন নাই। রাখাল বাবু ও ডাঃ মজুমদার নদীয়া জয় ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। রাখাল বাবুর মত যে এমন কি লক্ষ্মণসেনের জীবিতাবস্থায় মুসলমান বাঙলা বা ইহার কোন অংশ অধিকার করিতে পারে নাই; তাঁহার মৃত্যুর পর আংশিক ভাবে ক্রমশঃ আরম্ভ হইয়াছিল। কুলতত্ত্বার্ণবে তাহারই সমর্থন পাই। কেশবসেনের পর দনৌজামাধব গৌড়-ভূপ হইয়াছিলেন (কুলতত্ত্বার্ণব-৩৫৫ শ্লোক); তিনি কুলাচার্য্য এড়ুমিশ্র ও কেশবসেনের সহিত চারি বার সমীকরণ করিয়া ২৪ জন ব্রাহ্মণকে কুলীন, আবৃত্তিহীন সংকুলীনকে বংশজ এবং গুণ ও দোষমিশ্রিত ব্রাহ্মণকে সৎ ও কষ্ট-শ্রোত্রিয় প্রভৃতি বিভাগ করিলেন। কুলীন এড়ুমিশ্র সর্ব্বপ্রথম রাঢ়ীয় ঘটক। দনৌমাধব আন্দাজ রাজত্ব করিয়াছিলেন ১২৬০ হইতে ১২৮৯ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত; ডাঃ মজুমদারের মতে তিনিই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী চন্দ্রবংশীয় পুরুষোত্তমদেবের বংশধর ও কীর্ত্তিমান দশরথদেব ও গৌড়পতি নামে খ্যাত; তাঁহার অধিকারে পূর্ব্ববঙ্গ ছিলই, অধিকন্তু উত্তর বা পশ্চিম-বঙ্গের অন্ততঃ আংশিক ভাবে থাকাই সম্ভব। তিনি সেনবংশীয়ের নিকট হইতে বিক্রমপুর জয় করিয়াছিলেন সম্ভবতঃ ১২৪৫ হইতে ১২৬০ খৃঃ অব্দের মধ্যে। তাঁহার শতবর্ষাতিরিক্তকম্ (৩৮৪ শ্লোক) অর্থাৎ শতবর্ষের উপর রাজা কংসনারায়ণের সময় প্রায় ১৪০৯ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ যবনদের অধীনে ব্রাহ্মণের শ্রেণী ও কুলা-কুল বিচার না করিয়া বারেন্দ্র, রাঢ়ীয় ও সপ্তশতী প্রভৃতি পরস্পর আদান-প্রদান করিতে লাগিলেন। কংসনারায়ণই সম্ভবতঃ প্রকৃত নাম, কারণ S.uart's History of Bengalএ কানিসের বঙ্গসিংহাসন জয় করা ও তাঁহার পুত্রের (যত্নর) মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক জালালুদ্দিন নাম লইয়া রাজা হইবার কথা লিপিবদ্ধ আছে। এই কংসনারায়ণকে গণেশ নামে কেহ কেহ অভিহিত করেন। রাখাল বাবুর বাঙলার ইতিহাসে (২য় ভাগে) তাঁহার রাজত্বকাল ১৪০৯—১৪ খৃঃ অঃ এবং ষ্টুয়ার্টের মতে ১৩৮৫—৯২ খৃঃ অঃ। রাজা কংসের মন্ত্রী দণ্ডখোসের নিকট বলা হয় যে তাঁহার পূর্ব্বে ঘটকেরা আন্দাজ নাসিরুদ্দিনের আগমন হইতে ২য় সামসুদ্দিন পর্য্যন্ত (অর্থাৎ প্রায় ১২৯৫—১৪০৯ খৃঃ অঃ) শতাধিক বর্ষের মধ্যে ৭ম—৫৫ পর্য্যন্ত ৪৯ বার উপরোক্ত অবস্থাধীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তথাকথিত কুলীনরূপে সমীকরণ করিয়াছিলেন; আরও বলা হয় যে, কুল কুলাচার্য্যগত অর্থাৎ কুলাচার্য্য বা ঘটকরা যাঁহাকে কুলীন বলিবেন, তিনিই কুলীন হন, নবধা কুললক্ষণ হিসাবে বিচার করা হয় না, এই ভাবে কাঁট দিয়া গ্রামীণ দাশরথির বংশজাত ঈশান বলিলেন ও নবধা লক্ষণযুক্ত বল্লাল-প্রদর্শিত নিয়মে ৫৬ গ্রামবাসী ব্রাহ্মণদের কুলবন্ধন করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহাতে অনেকের অসম্মতি জানিয়া দণ্ডখাস মাত্র আট জন ব্রাহ্মণকে কুলীন করিলেন, তখন ৪০ জন

২২ গ্রামী ব্রাহ্মণ প্রথমে সভা ও পরে রাঢ় ত্যাগ করিয়া রাঢ় ও বঙ্গদেশের মধ্য স্থানে বাস করিলেন এবং তদবধি মধ্যদেশে বাস হেতু মধ্য শ্রেণী বলিয়া বিখ্যাত হইলেন, কিন্তু ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশাবলীতে দণ্ডধাদকৃত উপরোক্ত ৮ জন কুলীনের নাম নাই। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে সকল ব্রাহ্মণ মুসলমান নবাবদিগের পরস্পর দ্বন্দ্ব সময়ে জয়ী পক্ষে যোগ দিয়া রাজমর্য্যাদা পাইয়াছিল, তাহারাই ঘটক সহায়ে শ্রেষ্ঠ কুলীন পর্য্যায়ে উঠিয়াছিল। ঐ সময়ে (১৪০৩ খৃঃ অঃ ১৩২৫ শকে) ব্রাহ্মণদের অনুমোদনে প্রতি বংশজ শোভাকরকে শ্রীদণ্ডোখাদ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কুলাচার্য্য বা ঘটক নিযুক্ত করিলেন; কংসের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র যদু রাজা হইবার পর জালালুদ্দিন নামে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। জালালুদ্দিন হইতে বরবকসাহ পর্য্যন্ত (১৪৩১—১৪৭৭ খৃঃ অঃ) প্রায় ৫০ বৎসর কাল যবনদিগের উপদ্রবে অনেক ব্রাহ্মণ জাতি, ধর্ম্ম ও কুল হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন ও অনেক কুলগ্রন্থও যবনেরা ভস্মীভূত করিয়াছিল। ১৪৭৮ খৃঃ অঃ ইউসুফ সাহ গৌড়ের নবাব হন, ষ্টুয়াটের বাঙলার ইতিহাসের ১২৪ পৃষ্ঠায় আছে, "He informed them (Judges and Officers) that the laws were to be administered with impartiality to the poor and to the rich to the weak and to the powerful; and if he discovered any of them swayed in their decisions either by interest or affection, he would punish them most severely." এই ন্যায়পরায়ণ নবাব ব্রাহ্মণদের প্রার্থনায় বন্দ্যোকুলোদ্ভব দেবীবরকে কুলাচার্য্য নিযুক্ত করিলেন। দেবীবর উক্তরূপে অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় কোন কুলগ্রন্থ পাইলেন না এবং যবনের অত্যাচারে ব্রাহ্মণদিগের কুলে বহুতর দোষ ঘটিয়াছিল, অতএব কুলবন্ধনের উপায় দুরূহ দেখিয়া তিনি কামরূপে গিয়া কামাখ্যা দেবীকে ত্রিপক্ষ কাল আরাধনা করিলেন। দেবী প্রসন্না হইয়া বর দিলেন—"দেবীবর! তুমি ব্রাহ্মণদের কুলবন্ধন বিষয়ে ত্রিকালজ্ঞ হও।" তদ্বরপ্রভাবে তিনি ১৪৮০ খৃঃ অব্দে ব্রাহ্মণদিগের দোষ-গুণের তারতম্য নির্দ্ধারণ করিয়া মেলবন্ধন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বোক্ত ২২ গ্রামী ৪০ জন মধ্যদেশবাসী ব্রাহ্মণগণ দেবীবরের মেলবন্ধন অনুমোদন করেন নাই। বহুতর কুল-দোষের একত্র মেলন হইয়াছিল বলিয়া মেল নামে অভিহিত হয়। প্রকৃতি, তদ্‌গ্রাম, প্রকৃত্যুপাধি ও তদ্দোষ ইত্যাদি নামে ৩৬ প্রকার মেল আছে। এইরূপে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের কুলবন্ধন করিয়া দেবীবর পরলোকগত হইলে, কুলতত্ত্বার্ণবকারের পিতা ধ্রুবানন্দ ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে কুলাচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

যে কৌলীন্যের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায় ও যে কৌলীন্যের বিষে বাঙলার ব্রাহ্মণের সামাজিক জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা প্রকৃত পক্ষে দেবীবরকৃত অদ্ভুত ও অপরিণামদর্শী তথাকথিত কুলীনদিগের মেলবন্ধনের ন্যায়ানুগ পরিণাম। আমার এই বর্ণনার যাথার্থ্য বিচার করিবার জন্য কুলীনত্ব প্রথার বিবর্ত্তন কুলশাস্ত্রানুসারে কি ভাবে হইয়াছে এবং ঐতিহাসিক মূল্য কতটা সংক্ষেপে হইলেও কোনও প্রয়োজনীয় অংশ বাদ না দিয়া ক্রমপর্য্যায় সন্নিবেশিত করিয়াছি. উপরোক্ত এবং নবাবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সমূহ আলোচনা করিয়া ঐ প্রথার পশ্চাতে যে রাষ্ট্রনৈতিক তাৎপর্য্য অপ্রকাশ্য রহিয়াছে, তাহাই ব্যক্ত করা এ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বাঙলার ধর্ম্ম ও সমাজের পর্য্যালোচনা করিলেই কুলীনত্বের মূল কোথায় তাহা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী হইতে নিশ্চয় এবং পূর্ব্বেও হইতে পাবে, বাঙলার বৈদিক জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তার হইয়াছিল এবং সেই সময়েই নন্দবংশের স্থাপয়িতা সমস্ত ভারত ক্ষত্রিয়রাজশূন্য করিয়া নিজের অর্থাৎ শূদ্রের অধীন করিয়াছিল। এই তিন প্রকার ধর্ম্মমতই বাঙলার বাহির হইতে আসিয়াছিল; তা ছাড়া এখানের আদিম ধর্ম্ম-বিশ্বাস যথা animism (বৃক্ষ ও জীব পূজা) প্রভৃতি বর্ত্তমান ছিল ও এখনও প্রচলিত রূপকথায়, কুসংস্কারাপন্ন আচার, পূজা ও পার্ব্বণে মিশিয়া আছে। ইহার প্রকৃত রূপ বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। গুপ্তরাজদের অর্থাৎ ৪র্থ খৃঃ অব্দের পর হইতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের গোচরে আসিয়াছে। খৃষ্টীয় ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে বহু ভরদ্বাজ, কাণ্ব, ভার্গব, কাশ্যপ, বাৎস্য, ও কৌণ্ডিল্য গোত্রীয় ঋগ, যজু ও সামবেদী বাঙলায় ছিলেন ও নিয়মিত অগ্নিহোত্র, পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রভৃতি বৈদিক ক্রিয়া করিতেন। মধ্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণগণ বাঙলায় আসিতেন ও বাঙলা হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বসবাসের যথেষ্ট নিদর্শন আছে। এই যাতায়াত খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছিল এবং আরও তিনটি কারণে যাহা স্যর যদুনাথ তাঁহার India through the ages-এর ৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"These were (1) pilgrim students (2) Soldiers of fortune—যুদ্ধ ব্যবসায়ী সৈনিকরা চাকুরীর জন্য দেশ দেশান্তরে যাইত—(3) Imperial Conqueror—দিগ্বিজয়ী রাজা বহুদেশ জয় করিয়া এক শাসনীভূত করিত (4) The son-in-law imported from the centres of blue blood such as Kanaunj or Proyag for Brahman and Mewar and Merwar in the case of kshatriyas for the purpose of hypergamy or raising the social status of a rich man settled among lower castes in a far off province"

বৌদ্ধধর্ম্ম রাজা অশোকের সময় অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতেও উন্নতাবস্থায় ছিল; নাগার্জ্জুনী খণ্ডলিপিতে (খৃষ্টীয় ২।৩ শতাব্দীর) বঙ্গের নাম ও সেখানের লোকের বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার কথা উল্লিখিত আছে। পালরাজ্যে এই ধর্ম্ম বজ্রায়ণ ও তন্ত্রায়ণ নামে খুব প্রসার লাভ করিয়াছিল; এই মতবাদীর শ্রেষ্ঠ স্থানীয়রা সিদ্ধাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ ও তাঁহাদের সংখ্যা ছিল ৮৪। অনেক সিদ্ধাচার্য্য বৌদ্ধমঠ বিক্রমশিলায় থাকিয়া পুরাতন বাঙলায় বজ্রায়ণ, সহজায়ন ও কালচক্রায়ণ প্রভৃতি শীর্ষক আধ্যাত্মিক কবিতা লিখিয়াছিলেন যাহা চর্য্যাপাদ নামে খ্যাত এবং যাহা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন। এই বজ্রায়ণে লিখিত মন্ত্র, মুদ্রা ও মণ্ডল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে প্রজ্ঞা ও শক্তিবাদে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই সাধনা গুরুমুখী এবং এই গুরুই শিষ্যের কুল নির্ণয় করেন; এই কুল পাঁচ প্রকার; যথা ডোমি, নটী, রজকী, চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণী এবং ইহারাই প্রজ্ঞার পঞ্চরূপ বা অংশ। যোগাচার দ্বারা এ সকল গোপনীয় সাধনা করিবার নিয়ম, এইরূপে মাধ্যমিক বৌদ্ধধর্ম্ম সমস্ত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ বাদ দিয়া পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র অনুসরণ করিয়া ক্রমে ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্রে পরিণত হইল। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ও বৌদ্ধধর্ম্ম উভয়ে মিশিয়া গেল; এই মিশ্রণ-কার্য্য পালরাজ্য ধ্বংসের পূর্ব্বে সূচিত হইয়া সম্পূর্ণ হয় খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর আগেই।

সিদ্ধাচার্য্যগণ এই কার্য্যের উত্তরসাধক। এই নব ধর্ম্মের ভিত্তি হঠযোগের উপর। মীননাথের প্রবর্ত্তিত এক নূতন শক্তিবাদ বৌদ্ধ যোগতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত হইল; ঐ মতবাদ সম্বন্ধীয় পুস্তকের নাম কুলাগম বা কুলশাস্ত্র এবং শক্তিবাদীরা কৌল, কুলপুত্র বা কুলীন নামে খ্যাত হইল। ঐ সকল পুস্তক নেপাল হইতে আবিষ্কার করা হইয়াছে। শক্তির অপর নাম কুল; মীননাথের যোগিনী কুল বা কৌলবাদ কামরূপের সহিত সংশ্লিষ্ট। অনেকেই জানেন যে কামরূপে ডাকিনী-বিদ্যার প্রভাবে গাছ-চালা ও মারণ-উচাটন প্রভৃতি শক্তির কথা বাঙলায় বিশেষ প্রচলিত। এই কৌলপদ্ধতি ক্রমে ব্রাহ্মণ্য শক্তিবাদ বা তন্ত্রের সহিত মিশিয়া গেল অর্থাৎ কতক কৌলাচারী গৃহী বা সন্ন্যাসিগণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিল এবং কেহ বা যথা—নাথপন্থী অবধূত, সহজিয়া, বাউল হিসাবে জাতিভেদ না মানিয়া চলিল। কিন্তু খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর ভিতর ইহারা প্রায় সকলেই কৌলাচারী থাকিলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বর্ণাশ্রম মানিয়া নবগঠিত হিন্দু সমাজভুক্ত হইয়া গেল।

উপরোক্ত বিবরণ ডাঃ মজুমদারের ইতিহাসের ১৩শ অধ্যায় হইতে গৃহীত, উহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পালরাজ্যের উত্থান ও পতনকাল চারি শত বৎসরে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক দল বেদপাঠ ও ক্রিয়াসক্ত এবং আর এক দল কৌলাচারী বা কুলীন ছিল। পালরাজারা বৌদ্ধ হইলেও উভয় সম্প্রদায়ের তুল্য সম্মান করিতেন; কিন্তু ঐ কৌলাচার রাজপ্রিয় ও আচরিত বলিয়া কুলীনদের অন্ততঃ পরোক্ষভাবে রাজার অধিকতর অনুগ্রহ-ভাজন হওয়াই সম্ভব। সেন-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, কৌলাচারীর আদর নিশ্চয়ই হ্রাস হইয়াছিল। বিশেষতঃ বল্লালের রাজত্বকালে পালরাজাদের কুটুম্ব ধনী ও ব্যবসায়ী সুবর্ণ বণিক জাতির সহিত কলহ ও তাহাদের অনাচরণীয় করা এবং কৈবর্ত্ত জাতি যাহারা পালরাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য অনাচরণীয় হইয়াছিল তাহাদিগকে আচরণীয় করায় ইহাই সূচিত হয় যে, সে রাজ্যে একটা বিদ্রোহের বহ্নি নিঃশব্দে ধূমায়িত হইতেছিল এবং তাহার ইন্ধন যোগাইতে লাগিল পালদের কুটুম্ব ও বন্ধুরা, যাহারা ছিল সেনরাজার প্রজা। বল্লাল যখন গৌড়-বঙ্গ প্রভৃতির অধীশ্বর, গোবিন্দপাল তখন মগধ অধিকারে রাখিয়াছিল এবং তথা হইতে বিদ্রোহকে সজীব রাখা অসম্ভব ছিল না। আনন্দ ভট্টের বল্লাল-চরিতে এই সকল ঘটনা বিশেষ ভাবে লেখা আছে; মতভেদ সত্ত্বেও ডাঃ মজুমদারের বিশ্বাস যে, এ পুস্তকখানি অকৃত্রিম ও প্রামাণিক। বিদ্রোহীদের মধ্যে ভেদসৃষ্টির জন্য বল্লাল হয়ত কৌলাচারী বা কুলীন ব্রাহ্মণকে কুলীন বা সদ্বংশজাত বলিয়া মৌখিক সম্মান দেখাইয়াছিলেন যাহাতে তাঁহারা ধনী, প্রভাবশালী ও পালরাজকুটুম্ব সুবর্ণ-বণিক জাতিকে সমাজে পতিত করিয়া রাখিতে সাহায্য করেন। এই রাজনৈতিক সুবিধার জন্য সাময়িক মর্য্যাদা দানই বোধ হয় বল্লালের কৌলীন্য সৃষ্টি বলিয়া কিম্বদন্তী প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি বা তাঁহার বংশধরেরা কোনও প্রকার কৌলীন্য রাজকীয় শাসনে বিধিবদ্ধ করেন নাই।

খৃষ্টীয় ১৩শ হইতে সার্দ্ধ ১৪শ শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র বাঙলা মুসলমানের পদানত হয়। এই কুলীনত্ব প্রথার প্রচার বা প্রসার অসম্ভব ছিল; কারণ ব্রাহ্মণগণকে যবনের অত্যাচার ভয়ে দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। যেদিন বাঙলার নবাবেরা দিল্লীশ্বরের অধীনতা ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন সেদিন হইতে তাঁহারা বাঙালীর সহিত বন্ধুত্ব কামনা করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে ব্রাহ্মণই জাতির নেতা এবং তাঁহাদিগকে হস্তগত করিতে চেষ্টা পাইলেন। মুসলমান শাসনকর্ত্তারা অধিকাংশই ভাগ্যান্বেষী সৈনিক ও মাত্র কিরূপে যুদ্ধ করিতে হয় জানিত; দেশ অধিকার হইল বটে কিন্তু বরাবর অধিকারে রাখিতে অর্থের প্রয়োজন। তারা রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া রাজস্ব আদায় করিতে জানিত না, এ বিষয়ে ছিল নিপুণ কায়স্থরা। ব্রাহ্মণের পরই তাহাদের (কায়স্থদের) সাহায্য লইতে হইল। প্রাগুক্ত বিষয় হইতে দেখা যায়, নবাব ইউসুফ শার (১৪৭৮—৮২ খৃঃ অঃ) রাজত্বে তাঁহারই নিয়োজিত দেবীবর কুলাচার্য্য দ্বারা মেল বন্ধন প্রথম হয়। তখনও কোনও কুলগ্রন্থ রচিত হয় নাই। ইহাও পাওয়া যায় যে, দেবীবর কামাখ্যা দেবীর বরে কুলজ্ঞানে সম্পন্ন হইলেন। অতএব, দেবীবর নিজে যে এক জন কৌলাচারী বা কুলীন এবং নিজের সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্থাপন করিবেন ইহাতে বিচিত্র কি আছে। ইউসুফশা'র পূর্ব্বে ফখরউদ্দীন ও সামসুদ্দীন প্রভৃতি স্বাধীন নবাব হইয়াছিলেন ও ব্রাহ্মণের প্রীতিকামী হইয়া, তাহাদের সহিত একত্র আহার-বিহার আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদবিহিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পালন করিতেন তাঁহারা যবন-সংসর্গ ত্যাগ করিয়া চলিতেন কিন্তু যাঁহারা কৌলাচারী বা কুলীন তাঁহাদের কোন বিধি-নিষেধ ছিল না, কৌলাচার সম্বন্ধে কৌলমার্গ-রহস্যের ১০১১ পৃষ্ঠায় বিশদ ভাবে লিখিত হইয়াছে; দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম মাত্র এবং তাহাতেই পূর্ণ আভাস পাওয়া যাইবে। "দিক্‌কালনিয়মো নাস্তি স্থিত্যাদিনিয়মপ্রিয়ে। নিয়মো নাস্তি দেবেশি মহামন্ত্রস্য সাধনে।" অতএব কৌলাচারের দোহাই দিয়া, শ্রোত্রিয়াচরিত প্রথার অবহেলা ও যবন সহবাস করিবার যুগপৎ সুযোগ ঘটিল। কুলীনেরা নবাবের আনুগত্য স্বীকার করিয়া মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে দুর্য্যোধন চট্ট "বঙ্গভূষণ", চক্রপাণি পুতিতুণ্ড "রাজজয়ী" বিকর্ত্তন চট্ট "রাজা" প্রভৃতি উপাধি লাভ ও প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছিলেন। শ্রোত্রিয়গণ যবন সহবাস ভয়ে মুসলমানের চাকরী স্বীকার না করায় ক্রমে দরিদ্র হইয়া পড়িতে লাগিল বা ঐ সকল কুলীনের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া উহাদের যজনকার্য্য বা কোন চাকরী করিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিল। মেল বন্ধনে মুসলিম নামও পাওয়া যায়, যথা—রাঢ়ীয় শুভরাজ। শতানন্দ ও মালাধরখানী ও বারেন্দ্র অদল ও কুতলখানি এবং জোনালি নামে পটী আছে। ব্রাহ্মণের দেখাদেখি কায়স্থের মধ্যে কৌলীন্য-প্রথা চালান হইল এবং পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে প্রামাণিক কুলগ্রন্থে কায়স্থের আগমন সম্বন্ধে কিছু নাই। ইহাই নিশ্চয় যে ব্রাহ্মণের ভিতর কুলীনত্ব প্রথা চলিবার পর যে সব কায়স্থ ক্রমে নবাব সরকারে চাকরী করিয়া প্রতিপত্তি ও অর্থলাভ করিল, তাহাদেরই ইচ্ছানুযায়ী কুলগ্রন্থ রচনা করা হইয়াছে। মোটের উপর, কুলীনত্ব প্রথা চালাইবার প্রথম কারণ হইল মানবের চিরন্তন প্রবৃত্তি (hypergraous instinct) আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অভিজাতবংশীয় বলিয়া প্রচার করা। এখনও আমেরিকার কোটিপতিরা বিলাতের লর্ড-পরিবারে বা ইউরোপের কোন রাজ-পরিবারে পুত্র-কন্যার বিবাহ দিবার জন্য ব্যগ্র। দ্বিতীয় কারণ যে, মুসলমানেরা স্বীয় রাজ্যের সুবিধার জন্য বাঙলায় তাঁহাদের অনুগত একটি শ্রেষ্ঠ অভিজাত সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিল। পৃথিবীর



শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

১

তুমি গেলে শূন্য হবে এ মহানগরী।
অমৃতনিস্যাদে ভরা সোনার গাগরী
উলটি পড়িবে যেন! হায়, সখী কেন
এক জন চলে' গেলে শূন্য হয় হেন
জনতার মধুচক্র? এক জন এলে
হৃদয়-বর্ত্তিকা দেয় লক্ষ শিখা জ্বেলে
কি অপূর্ব্ব উৎসবেতে! শত প্রতিচ্ছায়া
চারিদিকে কম্পমান্; সহস্রের মায়া
চিত্ত ঘিরি রচি দেয়। যায় যবে সেই
সমস্ত নির্জ্জন হায়, এক মুহূর্ত্তেই।
এক সত্য, বহু মিথ্যা, সেই সত্য তুমি;
তুমি না আসিলে সখী মোর মর্ত্ত্যভূমি
নাহি মেলে সৌন্দর্য্যের কলাপ-নিচয়।
তুমি চলে গেলে তাই সব শূন্যময়॥

২

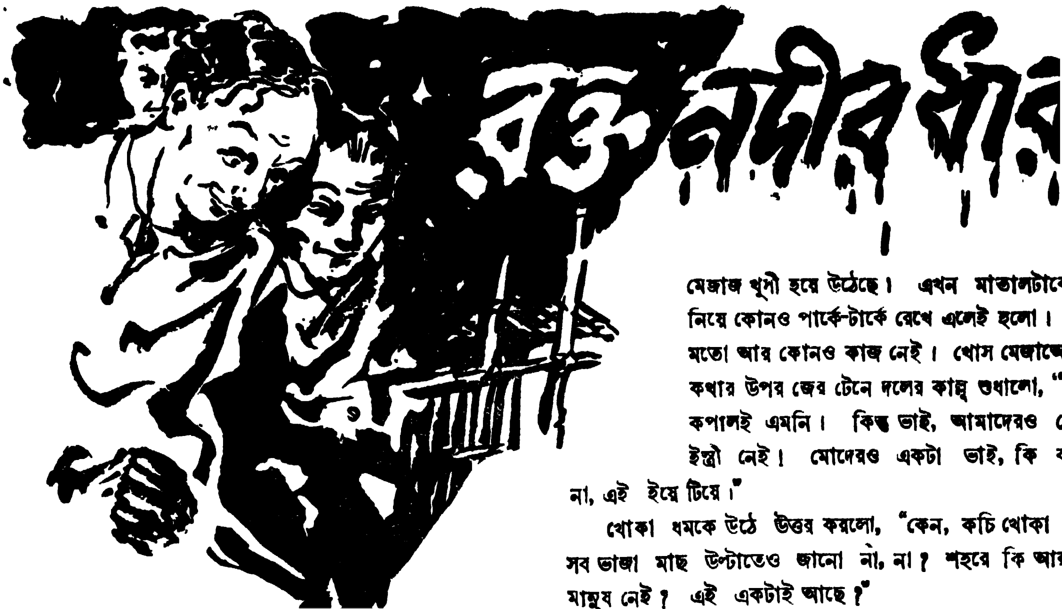
গঙ্গার স্তিমিত নেত্র এসেছে মুদিয়া;
একটি আলোকরশ্মি দীর্ঘ রেখাপাতে
অন্তরের স্বপ্ন তার দেয় প্রকাশিয়া;
অদূরে আরতি-ধ্বনি; ওপারে ছায়াতে
নারিকেল তরু আর সুদীর্ঘ মাস্তুল
একাকার, যেন কোন্ জন্মান্তের স্মৃতি;
তাবকিত উচ্চাকাশ; দুই উপকূল
ঘনতর তুলি-টানা তমিস্রার বীথি।

হেন লগ্ন এ জীবনে আসিবে কি আর?
তোমারে পার্শ্বেতে রাখি সন্ধ্যা তারকায়
হেরিব কম্পিত ছায়া; তোমার অঞ্চল
পরশিবে অঙ্গ মোর, তোমার কুন্তল
অপূর্ব্ব উন্মাদনায় দিবে চিত্ত ভরি।
আর কভু আসিবে কি এমন শর্ব্বরী?

সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে রাজা বা রাজশক্তিকে কেন্দ্র করিয়া কালে কালে অভিজাত সম্প্রদায় এইরূপ কৃত্রিম ভাবেই গড়িয়া উঠে। বাঙলায়ও সেই ঐতিহাসিক সত্যের পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল। ইংরাজী আমলের প্রথমে যে সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মুসলমান রাজত্বে প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিল তাহারা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিতগণের আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়, শিক্ষার দ্বার সর্ব্বসাধারণের নিকট জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে খুলিয়া যায়। কাজেই পূর্ব্বের ব্রাহ্মণ কায়স্থ অভিজাত সম্প্রদায় কালক্রমে ধ্বংস হইয়া ইংরেজের অনুগ্রহ-পুষ্ট ও খেতাবপ্রাপ্ত এক সর্ব্বজাতীয় আভিজাত্য গঠিত হইয়াছে ও এইরূপে কৌলীন্য প্রথা আশ্রয়হীন হওয়ায় এক্ষণে প্রায় ধ্বংসোন্মুখ। আশা হয়, স্বাধীন বাঙলায় এই প্রথার সম্পূর্ণ অবসান ঘটিয়া, কেবলমাত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠার শোভাবর্দ্ধন করিবে।

প্রামাণ্য পুস্তকের তালিকা :—

১। রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের বাঙলার ইতিহাস।
২। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত ও ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত বাঙলার ইতিহাস।
৩। সর্ব্বানন্দ মিশ্র প্রণীত মেদিনীপুর ব্রাহ্মণ সভা হইতে প্রকাশিত কুলতত্ত্বার্ণব।
৪। স্যর যদুনাথ সরকারের India through ages.
৫। লালমোহন বিদ্যানিধির সম্বন্ধ-নির্ণয়।
৬। Stuart s History of Bengal (বঙ্গবাসী সংস্করণ)।
৭। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত কৌলমার্গরহস্য।
৮। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (২য় ভাগ)।
৯। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের জাতীয় ইতিহাস।



পঞ্চানন ঘোষাল

৪

উজ্জ্বলার গৃহে খোকারা এসেছিল ভয় দেখিয়ে অর্থ অপহরণ করতে. খুন তো দূরের কথা, বিনা প্রয়োজনে এইরূপ অবস্থায় কাউকে তারা আঘাতও হানে না। সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত প্রতুলকে নিয়ে খোকা একটু মজা করছিল মাত্র। উজ্জ্বলা কিন্তু ভাবল, সত্যই বুঝি খুনেটা প্রতুলকে মেরে বসে। নিরুপায় হয়ে উজ্জ্বলা খোকার কাছে সরে এলো। তার পর গলার মুক্তার "কলার" ও হাতের সোনার চুড়ী কয়টা খুলতে খুলতে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উজ্জ্বলা বলল, "ওর কাছে কিছু নেই, বিশ্বাস করুন আপনারা। আমার কাছে যা আছে সবই দিয়ে দিচ্ছি। এই নিন সব। আর কিছু নেই আমাদের—"

এতখানি অনুভূতি রূপজীবিনীদের মধ্যে খোকা কোনও দিনই দেখেনি। দেখবার অবকাশ বা সুযোগও তার ছিল না। উজ্জ্বলার মনের এই বিশেষ দিকটা খোকার খুব ভাল লাগলো। অন্ততঃ এই রকম একটা মেয়েকে বিশ্বাস করা যেতে পারে। খোকার মনে হলো, মেয়েটা আর পাঁচ জনের মত নয়, আর সকলের চেয়ে অনেক ভালো। প্রতুলের উপর তার এই ভালোবাসার মোড় ঘুরিয়ে সে যদি তার নিজের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারে, আপদে বিপদে অনেক সুবিধে। নিজের ক্ষমতার উপর খোকার আরো বিশ্বাস ছিল। সে চট্ করে একটা মতলব এঁটে নিল, তার পর প্রতুলের মাথায় একটা চাঁটি কসিয়ে উত্তর করল, "আচ্ছা, তা হলে যা তুই এখন। কিন্তু কাল আসবি, তবলা বাজাবি, বুঝলি? কাল ঠিক আটটায় আমি আসব।"

পুরান শেয়নাদের রাত্রিবাসের জন্ত কোনও নির্দ্ধারিত স্থান নেই, যে কোনও একটা গৃহ বেছে নিলেই হলো। তা ছাড়া খোকার এই নূতন মতলবটা সমঝে নিতে কারুর বাকি থাকেনি। সাকরেদদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে নিয়ে গোপী খোকাকে জিজ্ঞেস করল, "তা হলে আমরা ভাই, যাই, আমাদের এই নূতন বৌদিটিকে হালাম করে বিদেয় নিই। ওঁকে আর বিরক্ত-টিরক্ত না-ই বা আর করলুম। কি বলিস রে তোরা। এই—"

এত সহজে কয়েক শত টাকা অপহরণ করতে পেরে সকলেরই মেজাজ খুশী হয়ে উঠেছে। এখন মাতালটাকে তুলে নিয়ে কোনও পার্কে-টার্কে রেখে এলেই হলো। রাত্রের মতো আর কোনও কাজ নেই। খোস মেজাজে গোপীর কথার উপর জের টেনে দলের কাল্লু শুধালো, "ওস্তাদের কপালই এমনি। কিন্তু ভাই, আমাদেরও তো আর ইস্ত্রী নেই। মোদেরও একটা ভাই, কি বলে কি না, এই ইয়ে টিয়ে।"

খোকা ধমকে উঠে উত্তর করলো, "কেন, কচি খোকা না কি? সব ভাজা মাছ উল্টাতেও জানো না, না? শহরে কি আর মেয়েমানুষ নেই? এই একটাই আছে?"

হৃতসর্ব্বস্ব ছোকরাটি তখনও মাটির উপর পড়ে আছে। খোকা ছোকরাটির দিকে আঙুল দেখিয়ে আদেশ জানালো, "যা এটাকে ট্যাক্সি করে গঙ্গার ধারে ছেড়ে দিয়ে আয়। দেখিস্ চেঁচায় না যেন। কাল দেখা হবে। হ্যাঁ, আর শোন, গোটা দুই টাকা ওর পকেটে গুঁজে দিস্, জ্ঞান হ'লে যাতে করে একটা ট্যাক্সি করে ও নিজেই বাড়ী যেতে পারে। পারিস তো একটা ট্যাক্সিতেই তুলে দিস, বুঝলি।"

প্রতুল ইতিপূর্ব্বেই সরে পড়েছে। এখন মাতালটাকে নিয়ে গোপীর দলও চলে গেল। ঘরে রইল শুধু উজ্জ্বলা আর খোকা।



খোকাকে থেকে যেতে দেখে উজ্জ্বলা মুক্তার কলার আর চুড়ী ক'গাছা তার হাতে তুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল। সে মনে করেছিল, এইগুলো না নিয়ে খোকা বুঝি যাবে না। উজ্জ্বলার ব্যবহারে খোকা একটু হাসলো। তার পর ধীরে ধীরে সে উজ্জ্বলার মুক্তার কলার ও চুড়ী ক'গাছা নিজের হাতে তাকে পরিয়ে দিল। এর পর সে পকেট থেকে পাঁচশো টাকার নোটের একটা বাণ্ডিল বার করে উজ্জ্বলার হাতে সেটা গুঁজে দিয়ে জিজ্ঞেস্ করল, "কি রে? ভয় করছে। আমিও মানুষ, বুঝলি। ভালবাসতে আমিও জানি।"

খোকা ডান হাত দিয়ে আলতো ভাবে উজ্জ্বলার গালটা স্পর্শ করলো, তুলতুলে

গাল। ইচ্ছামত গাল দুটোতে বার কতক আদর করে খোকা বাম হাতে উজ্জ্বলার গলাটা জড়িয়ে ধরল। উজ্জ্বলা নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়িয়ে রহিল. বাধাও দিল না. এলিয়েও পড়ল না, সে যেন সকল অনুভূতির বাইরে। খোকার একবার মনে হলো, উজ্জ্বলার গলাটা টিপে ধরে ; পরে সে নিজের মনের কথায় নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ে। সম্পূর্ণ করায়ত্ত উজ্জ্বলাকে মনে হয় তার আশ্রিতা রক্ষণীয়া।

কিছুক্ষণ এইরূপ অন্তর্দ্বন্দ্বের পর নিজেকে সহজ করে নিয়ে খোকা উজ্জ্বলার মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "হ্যাঁ রে, এখনো ভয় কচ্ছে তোর ?"

হাতের মুঠিতে ধরে রাখা নোটের তাড়াটির দিকে একবার চেয়ে দেখে উজ্জ্বলা বললো, "না।" একটি মাত্র শব্দ দ্বারা উজ্জ্বলা বুঝিয়ে দিল, তার ভয় কচ্ছে না।

উজ্জ্বলাকে কোলের উপর তুলে একটা সোফার উপর বসে পড়ে খোকা জিজ্ঞেস্ করল, "সত্যি !" উত্তরে উজ্জ্বলা জানাল, হ্যাঁ সত্যি।

রাত্রি এগারটা বেজে গেছে। রূপজীবিনীদের মহলে মহলে বিরাজ করছে নিঝুম নিস্তব্ধতা। স্বভাব-সুলভ হট্টগোল বিদূরিত হয়ে পুরীর মধ্যে বিরাজ করছে একটা শান্ত অবসাদ। রোয়াকের এবং অলিন্দার বিজলী আলোকগুলি একে একে নির্ব্বাপিত করে দিয়ে মহল্লার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা ফিরে এসেছেন যে যার শান্তি নীড়ে। আশ্রিতা রূপজীবিনীরা তাদের শেষ সারথিদের নিয়ে যে যার ঘরে ফিরে অর্গল বন্ধ করেছেন।

উজ্জ্বলার বাড়ীতে মাত্র উজ্জ্বলার ঘরটি তখনও রুদ্ধ হয়নি ! সাজ-গোজ শেষ করে সবে মাত্র সে আরসির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তার রূপটা আর একবার দেখে নেবার জন্যে। হঠাৎ তার ঘরের একটা পর্দা নড়ে উঠলো, আর সঙ্গে সঙ্গে আরসির উপর পড়লো কার একটা ছায়া। চমকে উঠে উজ্জ্বলা বলে উঠলো, "কে রে। কে ?"

অন্য কেউ আসেনি, এসেছিল প্রতুল। ধীর পদবিক্ষেপে প্রতুল এগিয়ে এলো, হাতে তার একটা মদের বোতল। অর্দ্ধেকের উপর সেটা সে শেষ করে এনেছে। বাম হাতে তার অবিন্যস্ত চুলগুলো বার দুই উপরে তুলে প্রতুল উত্তর করলো, "আমি। আর কে ? আমি!"

মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ প্রতুলকে দেখে উজ্জ্বলা চমকে উঠেছিল। এই সময়ে যে সে আসবে তা সে একেবারেই আশা করেনি। ভীতাবিহ্বল হয়ে শ্বাসরুদ্ধ ভাবে উজ্জ্বলা প্রতুলকে শুধালো, "এখন কেন এলে তুমি ? এক্ষুনি যে সে এসে পড়বে। আজ যে তার আসবার দিন।"

উজ্জ্বলার কথায় প্রতুল আর স্থির থাকতে পারলো না। উন্মত্ত মাতাল সে তখন। প্রতুল চীৎকার করে বলে উঠলো, "তা আসুক সে। আজই তার সঙ্গে আমি একটা বোঝা পড়া করবো। বেটা গুণ্ডা খুনে। যাকে কি না আমি তিন বছর ধরে গান-বাজনা শিখিয়ে মানুষ করলাম, যার যা কিছু নাম-ডাক কি না আমারই জন্যে, তাকে কি না আমি দেব তাকে। কিছুতেই আমি তা দেব না। দেব শালাকে বোতলের এক বাড়িতে ঠিক করে।"

শান্ত প্রকৃতিরই মানুষ ছিল এই প্রতুল, তার এই বিসদৃশ আচরণে উজ্জ্বলা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ উজ্জ্বলার নজর পড়লো প্রতুলের হাতের বোতলের দিকে। এর আগে তাকে সে কখনও মদ খেতে দেখেনি। বিস্মিত হয়ে উজ্জ্বলা জিজ্ঞেস করলো, "এ কি ? তুমি মদ খাচ্ছো—"

পাগলের মত হো হো করে প্রতুল হেসে উঠল। তার পর একটু এগিয়ে এসে রুক্ষ মেজাজে উত্তর করলো, "হ্যাঁ রে, শালী হ্যাঁ, খাচ্ছি।"

প্রতুলের সেই অট্টহাসি ইষ্টক-প্রাচীর ভেদ করে বাড়িওয়ালীর ঘর পর্য্যন্ত পৌঁছেছিল। তন্দ্রাজড়িত স্বরে বাড়িওয়ালী চেঁচিয়ে উঠলো, "উজির ঘরে বুঝি ? আর পারি না, বাপু, যাব না কি লা ?"

বেশ্যা-বাড়ির প্রাথমিক শান্তিরক্ষার ভার থাকে প্রধানতঃ এই বাড়িওয়ালীদের উপর। রাত-বেরাতে পানোন্মত্ত মাতাল ও বদমায়েসদের হাত হ'তে অসহায় ভাড়াটিয়াদের এই বাড়িওয়ালীরাই রক্ষা করে। বাড়িওয়ালীর গলার আওয়াজে উজ্জ্বলা তাড়াতাড়ি দরজাটা ভেজিয়ে দিতে দিতে উত্তর করল, "না মাসী, ও কিছু না। তুমি ঘুমোও—"

উজ্জ্বলা রূপজীবিনী হলেও নারী ; তাই রূপজীবিনীরাও কাউকে কাউকে ভালবেসে ফেলে। ব্যবসার শেষে রাত্রি বারোটার পর প্রতুলের সঙ্গে তার প্রতিদিনই মিলন ঘটত। প্রথম রাত্রের যা কিছু গ্লানি বা লজ্জা তা বাকি রাতটুকু ফেলতো মুছে। কিন্তু গোল বাধালো এই খোকা। রাত্রি বারোটার পরই তার আসবার সময়, তা ছাড়া আর কাউকে বরদাস্ত করতেও সে রাজী নয়। প্রতি মাসে তিন শত করে কড়কড়ে টাকা গুণে খোকা উজ্জ্বলার সবটুকু সময়ই কিনে নিয়েছে।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বন্ধ দরজার উপর ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বলা প্রতুলের উপর স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করে, অনুরোধ জানিয়ে বললো, "তুমি ভাই বড়ো অবুঝ। নাই বা এলে ক'টা দিন। দুই-এক দিন পরেই তো ও আবার বিশ কি পঁচিশ দিনের জন্যে উধাও হবে। তখন তো এলেই পারবে। বোতল রেখে দাও, ছিঃ ! ও সব বিষ, খেতে নেই।"

উজ্জ্বলার এই অনুযোগে প্রতুল গোঁ হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে মেঝের উপর দাঁড়িয়ে রইলো। তার পর ধীরে ধীরে চোখ তুলে ঘরের নূতন আসবাব-পত্রগুলো একবার দেখে নিলো। অনেক দাম দিয়ে কিনে এনে খোকা সেগুলো তাকে উপহার দিয়েছে।

প্রতুলকে নির্ব্বাক্ দেখে উজ্জ্বলা এগিয়ে এসে প্রতুলের ডান হাতখানা সস্নেহে নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলো, এবং তার পর অনুযোগের সঙ্গে জিজ্ঞেস্ করলো, "রাগ করলে ভাই ? বা রে-এ। আচ্ছা, এসো—"

কথা কয়টা শেষ করে উজ্জ্বলা তার মুখটা উপরের দিকে তুলে ধরে কিসের একটা প্রতীক্ষায় প্রতুলের গা ঘেঁসে দাঁড়ালো।

ততক্ষণে প্রতুল একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছে। একবার তার ইচ্ছা হলো, উজ্জ্বলার আশা সে পূরণ করে, কিন্তু পরে কি ভেবে সে পিছিয়ে এলো। উজ্জ্বলার হাতে, গলায় ও মণিবন্ধে খোকার দেওয়া হীরক অলঙ্কারগুলির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে বললো, "নাঃ, থাক্—"

উত্তরে উজ্জ্বলা বলে উঠলো "নাঃ, না বললেই না।" তার পর প্রতুলের জন্যে আর অপেক্ষা না করে, নিজেই তার সুকোমল বাহুলতা দিয়ে প্রতুলের গলা বেষ্টন করে তার ঠোঁটের উপর একটা চুম্বন এঁকে দিচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই মেঝের উপর একটা পতনের আওয়াজ হলো—"ধুপ্‌,স," সভয়ে প্রতুল ও উজ্জ্বলা চেয়ে দেখলো,—"খোকা" দরজা বন্ধ দেখে সে ঘুরে রাস্তার দিককার জানালা গ'লে ঘরে এসেছে। অকাজ কুকাজ এবং আহারাদি শেষ করে রাত্রি দুইটার পর

সাধারণতঃ খোকা উজ্জ্বলার ঘরে আসত। এই-ই ছিল তার দৈনন্দিন নিয়ম। কখনও রাত্রি চারটাও হয়েছে। ঘুমন্ত উজ্জ্বলাকে কিছুক্ষণ আদর করে ভোরের আগেই খোকা সরে পড়েছে, অনেক সময় উজ্জ্বলা তা জানতেও পারেনি। নিয়মের এই ব্যতিক্রম উজ্জ্বলা আশঙ্কা করেনি। স্তব্ধ হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইলো। খোকা বাইরের দরজাটা খুলে দিয়ে হেঁকে উঠলো, "এই গোপী, আয় তো রে একবার, শালাকে আমি—"

খোকার প্রিয় সাকরেদ কেষ্ট এবং গোপী বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। খোকার হাঁকে ঘরে ঢুকতেই খোকা তার ছুরীখানা এক টানে তার হাতার নীচে থেকে বার করে নিয়ে হুকুম করলো, "এই, ধর ওকে। একে আমি টাপ করবো।"

খোকা সেদিন উজ্জ্বলার ওখানে থাক্‌তে আসেনি। বিশেষ একটা অপকর্ম্মের উদ্দেশ্যে তারা বেরিয়েছে। তাদের বরাত ছিল রাত্রের শেষের দিকে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাত্রের প্রথম দিকটার উজ্জ্বলার ঘরে কাটিয়ে নেওয়া। একটা কাজ করতে বেরিয়ে অপর একটা কাজে জড়িয়ে পড়তে স্বভাবতঃই তারা নারাজ। সামনের চেয়ারখানার উপর বসে পড়ে বিরক্ত হয়ে গোপী উত্তর করলো, "আরে দূর। এ তো জানা কথা। দাওয়াই দিয়ে বিদেয় করে দে। কাজের সময় ঝামেলা-টামেলা ভালো লাগে না, মাইরী—"

জীবনের যে মুহূর্ত্তটি মানুষ অবহেলা করে সেই মুহূর্ত্তেই তা সে হারিয়ে ফেলে। খোকা ছিল জীবনধর্ম্মী। তাই এই সত্যটি সে কখনও অস্বীকার করেনি। এই সম্বন্ধে সে সর্ব্বদাই সচেতন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত পরিপূর্ণরূপে ভোগ করতে খোকা বদ্ধপরিকর। খামকা রাগ করে ঝগড়াঝাটি বাধান মানে তখনকার মূল্যবান সময়টুকু নষ্ট করা। সত্যি কথা বলতে কি, উজ্জ্বলা পূর্ব্বে কোনও দিন সতী ছিল না, পরেও সে তা থাকবে না—এর মধ্যে মহামারী ব্যাপারেরই বা কি আছে? গোপীর কথায় আশ্বস্ত হয়ে খোকা উত্তর করলো, "তা সত্যি।" এর পর সে প্রতুলের চুল ধরে বার-কতক ঝাঁকুনি দিয়ে গালে ঠাস করে একটা চড় কসিয়ে বললো, "যাঃ, শালা। ফের এদিকে এসেছিস্ তো—"

খোকার থাপ্পড় খেয়ে প্রতুল ছিটকে বাইরে এসে পড়লো। খোকার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তার নেশা কেটে গিয়েছে। বিনা বাক্যব্যয়ে সে বেরিয়ে গেলো।

পকেটের ভিতর থেকে বিলাতী মদের বোতলটা বার করে, বোতলের কর্কটা কর্কস্ক্রু দিয়ে খুলতে খুলতে খোকা উজ্জ্বলার দিকে চেয়ে একবার হাসলো। এই হাসির প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তাকে অভয় জানানো। কারণ, খোকা ভাল করেই জানতো 'ধরে বেঁধে আর যা করানো যাক্, প্রেম করানো যায় না।'

উজ্জ্বলা এতক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল; প্রতুল ক্রমশঃ দৃষ্টির বহির্ভূত হয়ে গেলে, সে জানালার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলো, তাকে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখে খোকা বললো, "কি? বন্ধু গেলো?" মুচকি হেসে উজ্জ্বলা জানালো, "না, বন্ধু এলো।"

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে উজ্জ্বলা ঘাড় বাঁকিয়ে চাইল। ভাবটা যেন কিছুই ঘটেনি। তার পর আলমারী থেকে গোটা দুই-তিন কাচের গেলাস ও সোডার বোতল মেঝের উপর সাজিয়ে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করলো, "ওনারাও খাবেন তো।"

প্রতুলের প্রতি উজ্জ্বলার গভীর ভালোবাসার কথা কারোও অজানা ছিল না। তাই তার এই ভাবান্তরে বিস্মিত হয়ে সকলে চেয়ে দেখলো—উজ্জ্বলার বিষাদ-কাতর মুখখানা ইতিমধ্যে হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

উজ্জ্বলার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে, বেশ খানিকটা সুরা গলাধঃকরণ করে খোকা বললো, "বাঃ, ভাবি সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে, মাইরী।" এবং তার পর সাকরেদদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, "একটু একটু খেয়ে নে সব, নইলে পারবি কেন? তিনটের আগেই তো ওর নাইট-ডিউটী শেষ হবে। আর সময়ও বেশী নেই। নে চট্‌পট্ সেরে নে। এক্ষুনিই বেরুতে হবে। এই—"

মদের বাকি গেলাস কয়টাও তৎক্ষণে ভর্ত্তি করা হয়েছে। উজ্জ্বলা খোকার বন্ধুদের আপ্যায়িত করে চলছিল, যেমন করে স্ত্রী স্বামীর বন্ধুদের যত্ন-আয়ত্তি করে। তা না হলে নিন্দে হতে পারে।

দলের কানু ওরফে কালু বাবু মদের একটা গেলাসে সোডা ঢালবার আগেই সরিয়ে এনে তার ভিতরের তরল পদার্থ টুকু নিঃশেষ করে খোকার কথার উত্তর দিলো, "ভালো করে খেতে দে। মানুষ জখম করা কি এতই সহজ, সাদা চোখে হয়?" উত্তরে খোকা বললো, "না না, বেশী খায় না। শেষে বেসামাল হয়ে একেবারে সাবড়ে দিবি? একটুতেই মাতাল হোস্ তুই। থাক্, আর এক দিন হবে।"

উত্তরে কানু জানালো, "দু গেলাসেই? আমি মেয়েমানুষ না কি?" চমকে উঠে খোকা বললো, "চুপ কর। যা বলবো তাই শুনবি।"

এমনি বাক্-বিতণ্ডা, ঠাট্টা-তামাসা আরও কিছুক্ষণ চললো, এবং তার পর যেমন হট্টগোল করতে করতে খোকার দল এসেছিল, তেমনি হট্টগোল করতে করতেই তারা চলে গেল। উজ্জ্বলার রূপসজ্জা এবং যৌবনের দিকে ফিরে তাকাবারও তাদের অবকাশ নেই। দূরে—যে পথটাতে মার খেয়ে প্রতুল চলে গিয়েছে সেই পথটার দিকে চেয়ে উজ্জ্বলা তার সাজসজ্জা খুলে ফেলতে থাকে। উজ্জ্বলা ভাবে প্রতুলের কথা, উজ্জ্বলা ভাবে খোকার কথা, আরও অনেকের কথা তার মনে পড়ে। উজ্জ্বলা এমন অনেক লোক দেখেছে, যারা কি না তার ঘরে আসবার জন্যে চুরি করেও অর্থ সংগ্রহ করেছে। তার ঘটনা-বহুল জীবনের বহু কাহিনীই তার মনে পড়ে। পূর্ব্বাপর ঘটনাগুলি বিবেচনা করে সে বুঝতে পারে খোকার চরিত্রের অন্তর্নিহিত রহস্য। খোকা চোর ডাকাত, খোকা সাধারণ মানুষ নয়। সাধারণ লোকেরা চুরি ক'রে অর্থ সংগ্রহ করে নারী-সম্ভোগের জন্যে এবং পরে ধীরে ধীরে তাদের কেউ কেউ চোরও হয়ে উঠে। কিন্তু আসল বা প্রকৃত চোরেরা নারী-সম্ভোগ এবং মদ্যপান করে চুরি প্রভৃতি অপকর্ম্মের কারণে। এদের সাহায্যে উত্তেজনা এনে তারা তাদের দেহ ও মনকে অপকর্ম্মের জন্য চাঙ্গা করে নেয়। তা না হলে তাদের মধ্যে এসে পড়ে অবসাদ ও অলসতা। এই ভাবে তাদের অন্তর্নিহিত কর্ম্মালসতা ও অবসাদ দূর করতে না পারলে তারা অপকর্ম্মে অক্ষম তো থাকেই, এমন কি তাদের জীবন ধারণ পর্য্যন্ত অসম্ভব হয়ে ওঠে। উজ্জ্বলা বুঝতে পারে না, খোকা তাকে ভালবাসে কি না, কিন্তু সে কথা বুঝে যে, খোকা তাকে বিশ্বাস করে না। আরও সে বুঝতে পারে, খোকার কাছে তার প্রয়োজন ঠিক মদের প্রয়োজনেরই মত, তার বেশীও নয়, কমও নয়।

রাত্রি তখন প্রায় চারটে হবে। সারা রাত্রি হাড়ভাঙ্গা খাটুনি

খেটে সুধীর মিল থেকে বেরিয়ে এলো। শীতের রাত্রি, কুয়াসা দিয়ে ঢাকা। ছেঁড়া চাদরটার সাহায্যে কোনও রকমে মাথাটা ঢেকে নিয়ে সুধীর পথ চলছিল এক রকম কাঁপতে কাঁপতেই। অন্তমনস্ক ভাবে সে পথ চলতে থাকে, আর ভাবতে থাকে বরুণার কথা। হয়তো সে বাড়ী ফিরে দেখবে বরুণা তখনও পর্য্যন্ত ঘুমায়নি, সে দিনকার মতো আজও হয়তো সে সুধীরের অপেক্ষায় বসে রয়েছে। এমনি নানা চিন্তার মধ্যে কখন যে সে নয়া সড়কের মোড়ে এসেছে তা সে নিজেই টের পায় নেই। চৌমাথা পার হয়ে সুধীর গলির নির্জ্জন পথটা ধরেছে মাত্র এমন সময় হঠাৎ একটি কঠিন বস্তু গড়িয়ে এসে তার পায়ের উপরে পড়ল। সুধীর চমকে উঠে চেয়ে দেখলো সেটা কোনও দ্রব্য নয়, মানুষ। মানুষটা তার পায়ের উপর পড়ে গোঙরাতে সুরু করেছে।

দুই পা পিছিয়ে এসে সুধীর বলে উঠলো, "কে রে বাবা, মাতাল না কি?"

লোকটা তেমনি ভাবেই শুয়ে থেকে দুই হাত দিয়ে সুধীরের পা দুইটা জড়িয়ে ধরে ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠে উত্তর করলো, "না বাবা। আমি ভদ্রলোক। তবে একটু বেশী খেয়েছি। দয়া করে যদি একটা রিক্সা ডেকে দেন। মাইরী বাবা—"

মানুষটাকে দেখলে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়; শুধু তাই নয়, ধনী লোকও বটে। সোনার বোতাম ও রিষ্টওয়াচ তো আছেই, তা-ছাড়া হীরের একটা আংটীও তার আঙ্গুলে ঝক ঝক্ করছে। এইরূপ অবস্থায় লোকটাকে ফেলে গেলে তার বিপদ ঘটতেও পারে। লোকটার এইরূপ দুরবস্থা দেখে সুধীরের দয়া হলো। কিছুক্ষণ চিন্তা করে সুধীর লোকটাকে জিজ্ঞেস্ করলো, "বাড়ী কোথায় আপনার, কদ্দূর এখান থেকে? শান্ত ভাবে আসেন তো পৌছে দিতে পারি।"

ঠিক এই সময় টুঙ টুঙ করে আওয়াজ করতে করতে একটা রিক্সাকেও সেই দিকে আসতে দেখা গেল। এই রিক্সাওয়ালাটা ছাড়া আশে পাশে আর কোনও লোক দেখা যায় না। কাছ বরাবর এসে রিক্সাওয়ালা রিক্সাসমেত থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কেয়া বাবু সাব, ঘর পৌছায়?" উত্তরে লোকটা বলে উঠে, "হাঁ বাবা, এই ৬ নম্বর কাঁকুড়গাছি, ও মশাই, ধরুন না, একটু ভাই"—এই পর্য্যন্ত বলে মাতালটা আবার সুধীরের পায়ের উপর আছড়ে পড়ে।

সুধীর মাতালটাকে জোর করে রিক্সাতে বসিয়ে দিলো, কিন্তু মাতালটা সুধীরকে কিছুতেই ছাড়ে না। ইতিমধ্যে আরও দুই-এক জন লোক সেইখানে জড় হয়েছে। দেখলে তাদের গঙ্গাস্নানার্থী বলে মনে হয়। তা না হলে এত ভোরে কাপড় ও গামছা হাতে কে-ই বা পথে বেরোয়। তাদের মধ্যে এক জন বলে উঠল, "দিন না মশাই একটু পৌছিয়ে, দেখছেন না, হাতে হীরের আংটী, রিক্সাওয়ালাটা শেষে সব খুলে নেবে? কতক্ষণই বা আর লাগবে। যান যান, যান না, একটু সঙ্গে।"

সুধীর এতগুলো লোকের অনুরোধ এড়াতে পারলো না। জোর করে মাতালটাকে তুলে রিক্সায় বসিয়ে নিজেও তার পাশে উঠে বসলো। ঘন ঘন ঘণ্টা বাজিয়ে উদ্দাম গতিতে রিক্সাটা ছুটে চলে। মাতালটা কিন্তু কিছুতেই শান্ত হয়ে বসতে চায় না। কখনও ঠেলে দাঁড়িয়ে উঠে, কখনও পা নেতিয়ে পড়ে, কখনও আবার দুই হাতে সে সুধীরকে জড়িয়ে ধরে। এমন বিপদে সুধীর জীবনেও পড়েনি।

কাঁকুড়গাছির মোড়ের উপর এসে কিন্তু লোকটা হঠাৎ শান্ত হয়ে উঠল। একটা হাই তুলে উঠে বসে লোকটা বলে উঠলো, "বাঃ, বেশ হাওয়া বইছে তো। আরে কে? সতীশ বাবু না কি? আরে, সতীশ বাবু তো নন। কে আপনি? এই রিক্সা! এই! রোকো।"

লোকটার চোখে-মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠে। বেশ বোঝা যায় লোকটার নেশা কেটে গেছে। লোকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছে বুঝে সুধীর উত্তর দিলো, "আজ্ঞে। আপনাকে অসহায় ভাবে পড়ে থাকতে দেখে, আপনাকে বাড়ী পৌছে দিচ্ছিলাম। আমিও এই দিকেই থাকি।"

এতক্ষণে রিক্সাটাও দাঁড়িয়ে গেছে। রিক্সা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে লোকটা বলে উঠল, "ধন্তবাদ" এবং তার পর পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে সুধীরের হাতে সেটা গুঁজে দিতে চাইলো। সুধীর টাকা ক'টা তো নিলই না বরং মাফ করবেন বলে সে সরে দাঁড়ালো। লোকটা সুধীরের দিকে আর না তাকিয়ে অভদ্রের মতো শিষ দিতে দিতে সামনের একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লো, রিক্সার ভাড়া না চুকিয়েই। প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। মাতালটার পিছু পিছু আর ধাওয়া না করে, সুধীর রিক্সা ভাড়াটা চুকিয়ে দিতে মনস্থ করলো। কিন্তু হাত উঠাতেই সে লক্ষ্য করলো তার বুক-পকেটটা কাটা। সেই দিনই সন্ধ্যায় সে মাইনে পেয়েছে। মাহিনার ত্রিশটি টাকা তার পকেটেই রাখা ছিল। দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্ত হয়ে চায়ের দোকানটা লক্ষ্য করে ছুটতে ছুটতে চেঁচিয়ে উঠলো, "চোর চোর, মশাই চোর, ধরুন লোকটাকে, কোট গায়ে ঐ লোকটা, পকেট মেরেছে আমার, ত্রিশ টাকা, ব্যাগ সমেত।"

সুধীর দৌড়িয়ে গিয়ে লোকটাকে জাপটে ধরলো। মাতালটা একবার বলে উঠলো, "ভালো করে দেখুন মশাই, কাকে ধরছেন। আমি কেন চোর হবো," তার পর হঠাৎ 'দুৎ তেরি,' বলে এক ঝাটকানিতে সুধীরকে ফেলে দিয়ে দৌড় দিয়ে সামনের গলিটাতে ঢুকে পড়লো।

এক জন জাঁদরেল গোছের স্থূলকায় মোচওয়ালা লোক দোকানের একটা কোণে বসে চা খাচ্ছিল। সুধীরকে লোকটার পিছন পিছন বেরিয়ে যেতে দেখে, তাড়াতাড়ি উঠে এসে তিনি সুধীরকে ধরে ফেলে বললেন, "দাঁড়ান মশাই, একা যাবেন না। লোকটাকে চিনি আমি। ঐ গলিটাতেই থাকে, মস্ত বড় একটা গ্যাঙ্গের মেম্বার। আসুন, আমার সঙ্গে আসুন। টাকা আপনার আদায় করে দিচ্ছি।"

টাকা কয়টা উদ্ধার করতে না পারলে সারা মাস সস্ত্রীক উপবাস থাকতে হবে। কথাটা ভেবে সুধীর শিউরে ওঠে। এই লোকটাকে তার মনে হয় সব চেয়ে বড়ো উপকারী বন্ধু। মন্ত্রমুগ্ধের ন্তায় সুধীর লোকটাকে অনুসরণ করে গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে। গলির পথে একটু এগিয়েই সুধীর দেখতে পায় পকেটমারটা সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে, যেন তাদেরই অপেক্ষায়। "এই সেই চোর," ব'লে এগিয়ে আসা মাত্র পকেটমারটা ঠাঁই করে সুধীরের নাকের উপর মারলো একটা ঘুসি। সঙ্গে সঙ্গে কে এক জন পিছন থেকে তাকে সজোরে মারলো হাঁটুর গুঁতা ইতিমধ্যে কারা আবার দুই পাশ থেকে ছুটে এসে সুধীরের মুখটা চেপে ধরলো, চোখও। অপর আর এক জন কি একটা গন্ধ-মাখা রুমাল সুধীরের নাকের উপর সজোরে চেপে ধরে হেঁকে উঠলো, "চেঁচাবি তো খুন হবি, বুঝলি।"

রুমালের সেই তীব্র গন্ধ সুধীর বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারলো না

ট্র্যাজেডী না কমেডি ?

শ্রীসমর সরকার

মাধুরীর সহিত প্রেমে পড়িয়াছিলাম। সে আজ বিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন আমার বয়স ছিল আঠার বৎসর এবং মাধুরীর বয়স পনের বৎসর। বয়স কম ছিল বলিয়া প্রেমের গভীরতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন না, কারণ সেই প্রেম আমার উপর এমন চিরস্থায়ী দাগ কাটিয়া দিয়াছিল যে, বহু কাল পর্য্যন্ত আমি অবিবাহিত ছিলাম। বুঝিতেই পারিতেছেন সকল ক্ষেত্রের মত এ-ক্ষেত্রেও মাধুরীর সহিত আমার প্রেম বিবাহে পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই।

কথাটা একটু খুলিয়া বলা প্রয়োজন। আমি যখন আই-এ পড়ি তখন মাধুরীরা আমাদের পাশের বাড়ীতে ভাড়া আসে। মাধুরীদের ছোট সংসার: মাধুরীর বাবা, মা, মাধুরী ও একটি ছোট বোন! আমাদেরও সংসার ছিল ছোট: আমার কাকা, বিধবা পিসীমা ও আমি। আমি ছোটবেলায় মা ও বাবাকে হারাইয়াছিলাম। আমার কাকা ছিলেন বিপত্নীক। যাহাই হউক, প্রতিবেশী হিসাবে আমার ও মাধুরীর আলাপ সুরু হইয়া ক্রমে ঘনিষ্ঠতার পর্য্যায়ে আসিয়া প্রেমে বিকাশ লাভ করিল। আমাদের প্রেম যখন চূড়ান্তে পৌঁছিয়াছে তখন হঠাৎ এক দিন মাধুরীরা উঠিয়া গেল এবং তাহার পরেই শুনিলাম কোন্ এক অখ্যাত ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টারের সহিত মাধুরীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সংবাদ শুনিয়া আমি মর্ম্মাহত হইলাম এবং সেই আঘাত আমার উপর কত দূর প্রভাব বিস্তার করিল তাহা প্রথমেই বলিয়াছি। মাধুরীর মনের কথা জানি না, তবে নূতন সঙ্গী পাইয়া ক্রমে ক্রমে আমাকে তাহার ভুলিবারই কথা।



মাধুরীর সহিত আমার প্রেমের স্মৃতি আমার হৃদয়ের [illegible] সযত্নে রাখিলাম বটে, কিন্তু মাধুরীর কোন সংবাদ রাখিলাম না— কতকটা সংবাদ পাই নাই বলিয়া, এবং কতকটা সংবাদ রাখিয়া কোন লাভ নাই বলিয়া।

তাহার পর সুদীর্ঘ বিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। পরিবর্ত্তনশীল জগতের কতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমার কাকা মারা গিয়াছেন এবং আমার পিসীমার সমস্ত চুলই সাদা হইয়া গিয়াছে। আমি

ধীরে ধীরে সে নেতিয়ে পড়লো। একবার মাত্র তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—বস্—। এবং তার পর সে জ্ঞানহারা হয়ে মাটীর উপর লুটিয়ে পড়লো। এর পর ভীড় ঠেলে যে লোকটা সর্ব্বপ্রথম এগিয়ে এলো, সে খোকা নিজে! খোকার পিছন পিছন আসতে দেখা গেলো খোকার সুযোগ্য সাকরেদ গোপী, কেষ্ট ও কাল্লুকে। এত সহজে শিকার করায়ত্ত হবে তা খোকা আশা করেনি। আনন্দের আতিশয্যে আত্মহারা হয়ে একে একে সকলেরই পিঠ চাপড়ে খোকা বলে উঠলো, "সাব্বাস্ ভাই সব। খুব খুসী হয়েছি আমি। ভালো ভালো বক্‌সিস্ দোবো সকলকে। অভিনয়টা খুব ভালোই করেছিস্। এখন শেষটা সামলে দে ভাই লক্ষীটি—'

সামনের দেওয়ালের উপরই একটা গ্যাসের আলো ছিল। খোকা বিজয়-গর্ব্বে আলোর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলো। এবং সাকরেদরা ছেনি, ছুরী এবং কাঁচির সাহায্যে ফিতা দিয়ে ইঞ্চি মেপে মেপে খোকার নির্দ্দেশমত সুধীরের কপালে, ভ্রূর উপর, ঠোঁটে, হাঁটুতে, এবং দেহের অন্যান্য অংশে আঘাত হেনে চিহ্ন আঁকতে লাগলো, ঠিক খোকার দেহের উপরকার অনুরূপ চিহ্নগুলির মতো করে।

খোকা কয়েক জন উকিল মাইনে করে রেখেছে, কয়েক জন ডাক্তারও: ডাক্তারদের এক জন খোকার আদেশ মত ভীড়ের মধ্যে হাজির ছিল। কার্য্যসমাধার পর খোকা ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলো, "কি ডাক্তার সাহেব, ঠিক আছে তো?" ডাক্তার বাবু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে, খোকা বলে ওঠে, "এইবার একে আপনার বাড়ীর সামনে রকের উপর রেখে দেব। ভোরের দিকে একে এই ভাবে দেখে ভীড় জমবে। আপনিও তাক্ মাফিক্ বেরিয়ে এসে, সাহায্যে সাক্ষীদের হৈ-হল্লা করে একে ঘরের ভিতর এনে ফাষ্ট এইড দেবেন এবং ঠোঁটটা সেলাই করে দেবেন—ঠিক যেমন আমার ঠোঁটটা সেলাই করা আছে, বুঝলেন? তার পর আপনি যথারীতি পুলিশে খবর দিন বা একে হাসপাতালে পাঠান যা খুসী করুন আমাদের তাতে কোনও আপত্তি নেই, বুঝলেন?"

ক্লোরোফর্ম্মের শিশিটা নাকের কাছ থেকে সরিয়ে নিতে বলে ডাক্তার বাবু সুধীরের নাড়ীটা একবার পরীক্ষা করে খোকাকে বললেন, "আর কিন্তু দেরী করবেন না, আমি বাড়ী গিয়ে অপেক্ষা করছি। কিন্তু আজকের ফি-টা একটু বেশী হওয়া চাই, সেদিনকার সেই বিষ-বড়িটারও দাম বাকি আছে। আজকের ফ্যাসাদটাও তো কম নয়? পুলিশ এসে ওর বয়ান নেবে তো? যাক্, কপালে যা আছে তা হবেই।"

একশো টাকার একটা নোট ডাক্তার বাবুর হাতে গুঁজে দিয়ে খোকা বললে, "আপাততঃ এইটে তো রাখুন, ভড়কান কেন আপনি? জ্ঞান হওয়ার পর পুলিশের কাছে ও সত্যি কথাই বলুক না। সব কথা শুনে পুলিশ বুঝবে এটা আগাগোড়া পকেটমারদের ব্যাপার। খুনে-গুণ্ডারা পকেট মারে না, এই কথা পুলিশ ভালরূপেই জানে। পুলিশ আমাদের সন্দেহই করবে না। কিছু দিন তো তারা পকেট-মারদের পিছন পিছন ঘুরুক" সাকরেদদের যথারীতি উপদেশ জানিয়ে খোকা তার শেষ আদেশ জানালো, "চল চল, যা যা বললাম করবি চল। সেরে ওঠার পর ওকে দলে টানবার ভার আমার উপর ছেড়ে দিয়ে তোরা নিজের নিজের কাজ করে যাবি বুঝলি। ডুপ্লিকেট হিটলারের মতো একটা ডুপ্লিকেট খোকা না রাখলে কি কাজ চলে?"

[ক্রমশঃ

চামড়ার ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছি। কিন্তু বিবাহ করি নাই। আত্মীয়-পরিজন আমার নাই বলিলেই চলে—যাঁহারা আছেন তাঁহারা এবং বন্ধু-বান্ধবেরা আমার বয়সকালে আমার বিবাহের জন্ত যথেষ্ট ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের সমবেত প্রচেষ্টাকে এত দিন ঠেকাইয়া রাখিয়া আটত্রিশ বৎসর বয়সে আমি বিবাহে মত দিলাম। আমার জীবন হইতে রোমান্স বহু কাল হইল বাষ্পাকারে সংসার-গগনে মিলাইয়া গিয়াছে। এখন বিবাহ করা আর না-করার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। উঠিতে-বসিতে, চলিতে-ফিরিতে, খাইতে-শুইতে বধূহীন গৃহের জন্ত পিসীমার খেদোক্তি আমার সহনশীলতার বর্মে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া এক প্রকার থামিয়াই গিয়াছিল, কিন্তু কিছু দিন ধরিয়া পিসীমা যেন নূতন উৎসাহ লইয়া পুনরায় রণক্ষেত্রে নামিলেন, এবং শিখণ্ডীর মত সর্বদাই অশ্রুকে পুরোভাগে রাখিলেন। তাঁহার সেনাপতি-হিসাবে আমার এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় তাঁহার সহিত যোগ দিলেন, কারণ তাঁহার হাতে একটি বিবাহযোগ্যা 'ডাগর' মেয়ে ছিল। আমার সহিত না কি মানাইবে চমৎকার। বাংলা দেশে চমৎকার মানানসই ডাগর মেয়ের অভাব নাই, বরং 'অ-ডাগর' মেয়েরই অভাব, সুতরাং 'ডাগর' মেয়ের লোভ আমাকে লোভাতুর করিতে পারে নাই। আমি আমার চির-বিশ্বাসী বর্ম দিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার পিসীমা নূতন সেনাপতির সাহায্যে আমাকে কিছু দিন বাদে আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য করিলেন। 'ডাগর' ভিন্ন মেয়েটির অন্ত আরও গুণ ছিল—সুন্দরী, ধীর, গৃহকর্মে নিপুণা এবং গরীব। বছর কয়েক হইল পিতার মৃত্যু হওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিবাহের জন্ত কোনরূপ ছাপ লইতে পারে নাই, তবে মোটামুটি লেখা-পড়া জানে। যে-বয়সে বিবাহ করিতে যাইতেছি, তাহাতে বিবাহের সখ বা মাদকতা না থাকাতে আমি বিবাহের সমস্ত ভার স-সেনাপতি পিসীমার উপর ছাড়িয়া দিলাম। এমন কি শত উপরোধ-অনুরোধ সত্বে মেয়ে দেখিতে পর্যন্ত রাজী হইলাম না। বলিলাম, শুভদৃষ্টির সময়ে চারি চক্ষুর মিলন হইবে, তখনই দেখা ভাল। পিসীমা আমাকে এ-বিষয়ে আর পীড়াপীড়ি করিলেন না, তিনি অকালে বসন্তের দেখা পাইয়া মনের হরষে কাকলী করিতে লাগিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে বর সাজিয়া বাহির হইলাম। মনে মনে ভীষণ লজ্জা করিতেছিল। বর সাজিলেই লজ্জা করে বটে, তবে চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর বয়সে যে সৌভাগ্যজনিত লজ্জা আসে, আটত্রিশ বৎসর বয়সে সে-লজ্জা আসে নাই—আমার লজ্জা, আটত্রিশ বৎসর বয়সে কি না শেষে টোপর মাথায় বর সাজিতে হইল, ছিঃ!

বিবাহ-বাড়ীতে আড়ম্বরের কোন বাহুল্য ছিল না। প্রচলিত অনুষ্ঠানের পর যথারীতি আমাকে ছাঁদনাতলায় লইয়া যাওয়া হইল। এইবার শুভদৃষ্টি। শুনিয়াছি এই শুভ মুহূর্ত্তে যে দৃষ্টি-বিনিময় হয় তাহাতে কোনরূপ গলদ থাকিলে সারা জীবনে সেই গলদ রহিয়া যায়। বিবাহ করিবার সাধ না থাকিলেও জীবনে গলদের প্রতিষ্ঠা করিবার সাধ ছিল না। সুতরাং এই বিনিময় কার্য্যটি যেন শুভ হয় তাহার জন্ত আমি সতর্ক রহিলাম, অর্থাৎ সেই শুভ মুহূর্ত্তে আমার বয়সোচিত গাম্ভীর্য দেখিয়া নববধূ যেন প্রথম হইতেই আশাহত না হয় তাই মুখে একটু হাসির আড়াল দিয়া রাখিলাম। শুভদৃষ্টির সময়ে বধূ মুখ হইতে পানের পাতার ঢাকা সরাইতে আমি চমকাইয়া উঠিলাম। এ কি! এ যে মাধুরী! সেই মুখ, সেই চোখ, সেই নাক! নিমেষের মধ্যে আমার মনটা বিশ বৎসর পূর্ব্বের খানিকটা সময়ে ঘুরিয়া আসিল।

বাসর-ঘরে পারিপার্শ্বিক রসঘন আবেষ্টনীর মধ্যে বসিয়া আমার অনবরত মনে হইতে লাগিল, এ কেমন করিয়া হইল? আমার অবচেতন মনে মাধুরীর যে ছবি রাখা ছিল তাহা আমার দৃষ্টিশক্তিকে এমনি করিয়া আচ্ছন্ন করিল? আমি মনে মনে ফ্রয়েডের শরণ লইলাম। বাসর-ঘরের রসিকতাগুলি ফ্রয়েডের সহিত প্রতিযোগিতা চালাইতে লাগিল।

পরের দিন বর-বধূ বিদায়ের পালা। এই দিনে পূর্ব্বদিনের আনন্দময় আবেষ্টনী যেন ইন্দ্রজালের প্রভাবে এক দিনের মধ্যেই বিয়োগ-ব্যথায় বিষাদময় হইয়া উঠে। বধূর আত্মীয়-পরিজনের সহাস মুখে একটু যেন বিরহ ব্যথার আভাস দেখা যায়। বধূর কাজল চক্ষুপল্লব অশ্রুতে ভিজিয়াও গণ্ড দুইটি ঈষৎ রক্তাভ হইয়া বরের মনকে রীতিমত চঞ্চল করিয়া তুলে।

বিদায়ের ক্ষণে গুরুজনেরা আমাদের দু'জনকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলেন। পুরুষেরা গম্ভীর মুখে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহার পর আসিলেন মহিলারা। তাঁহারা সকলেই চক্ষু মুছিয়া উদগত অশ্রু রোধ করিয়া আশীর্ব্বাদ সারিয়া আবার চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। এই অস্বস্তিকর আবহাওয়ার মধ্যে আমি মাথা নীচু করিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলাম ও কলের পুতুলের ন্যায় বয়স-নির্বিশেষে সকলের পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলাম। সর্ব্বশেষে আসিলেন আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী। তিনি তখনও রুদ্ধ ক্রন্দনে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছেন; বিধবা একমাত্র কন্তাকে পরের ঘরে পাঠাইতেছেন, কাঁদিবারই কথা। তাঁহার মনে কত কথা আজ জাগিতেছে কে জানে? আশীর্ব্বাদের শেষে আমি তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া হাত সরাইয়া লইতেছি, হঠাৎ তাঁহার মুখের প্রতি নজর পড়িয়া গেল; দেখি মাধুরী! হ্যাঁ, মাধুরী। বিশ বৎসর কাটিয়া গেলেও চিনিতে কোন কষ্ট হইল না, কারণ তাহার দৈহিক বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, শুধু হিন্দু-ঘরের সাধারণ বিধবাদের মত চেহারাটা একটু পাকাইয়াছে মাত্র।

মুখে অঞ্চল চাপা দিয়া মাধুরী ত্রস্তপদে পার্শ্বের ঘরে চলিয়া গেল।



ভারতীয় সঙ্গীত

(শ্রুতি প্রসঙ্গে)

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে কোন কিছু জানতে হ'লে শ্রুতির আলোচনা অপরিহার্য্য। এই শ্রুতি কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্বন্ধে অমরকোষ প্রভৃতি প্রাচীন অভিধানে যা কিছু লিখিত আছে, সঙ্গীত-শাস্ত্রের শ্রুতিকে বোঝবার পক্ষে সেটুকু যথেষ্ট নয়। পৃথিবীর আদি-গ্রন্থ বেদকে শ্রুতিরূপে অভিহিত করা হয় যে অর্থে, সঙ্গীত-শাস্ত্রের শ্রুতি সম্বন্ধে সে অর্থ আদৌ প্রযুজ্য নয়,—যদিও উভয় বিদ্যাই সম্পূর্ণ ভাবে গুরুমুখী বিদ্যা,—অর্থাৎ গুরুর মুখ থেকে শুনে শুনে স্মৃতির সাহায্যে আয়ত্ত করতে হয়। তবুও, সঙ্গীত-শাস্ত্রের শ্রুতি সম্বন্ধে সামান্য কিছু জানতে হ'লেও প্রয়োজন সঙ্গীত-শাস্ত্র অনুশীলনেরই; কোন আভিধানিক ব্যাখ্যার সাহায্যে এ সম্বন্ধে মতবাদ গঠন করার বিপদ আছে।

সঙ্গীত-শাস্ত্রের গোড়ার কথাটা হ'চ্ছে নাদ। এই ধ্বনি সাধারণ মানুষের শ্রবণযোগ্য ধ্বনি নয়; অনুভূতির বস্তু। তাই শাস্ত্রকারগণ এই নাদকেই ব্রহ্ম বলে গিয়েছিলেন। শ্রুতি হ'চ্ছে ওই নাদ-ব্রহ্মেরই,—একাধারে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক স্বরূপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। কিন্তু, শ্রুতি শ্রবণযোগ্য ধ্বনি।

ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রুতি সম্বন্ধে—মূল বেদের বহুবিধ শাখা-প্রশাখার মধ্যে—বহুল উল্লেখ বর্ত্তমান। কিন্তু প্রামাণ্য ও প্রাচীনতার দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে লিখিত গ্রন্থাদির মধ্যে এ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম আলোচনা করেছেন—সম্ভবতঃ ভরত ঋষি। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, ইনি খৃঃপূঃ চতুর্থ শতাব্দীর লোক। কিন্তু এঁর স্থিতিকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। স্বদেশী শাস্ত্রবিশ্বাসী পণ্ডিতেরা বলেন,—ইনি আরও প্রাচীন যুগের লোক।

ভরত ঋষির নাট্যশাস্ত্র আজও বর্ত্তমান। কিন্তু যে গ্রন্থটির মধ্যে তিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা করে গিয়েছিলেন, সেখানি বহু কাল পূর্ব্বেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। প্রাচীন প্রস্থানভেদ নামক গ্রন্থে দেখা যায়,—মধুসূদন সরস্বতী বলছেন।

গান্ধর্ব্ববেদশাস্ত্রং ভবতা ভরতেন প্রণীতম্।
তত্র গীতবাদ্যনৃত্যভেদেন বহুবিধোঽর্থঃ॥

অর্থাৎ, গীত-বাদ্য-নৃত্যসম্বন্ধীয় বহু তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ, গান্ধর্ব্ব-বেদশাস্ত্রটি ভরতকর্ত্তৃক প্রণীত হয়েছিল।

গান্ধর্ব্ব-বেদ অধুনা লুপ্ত। তাছাড়া সঙ্গীত-রত্নাকর গ্রন্থ থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায়, গ্রন্থকার শার্ঙ্গদেব ভরতের সাঙ্গীতিক অভিমত সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে যে গ্রন্থটিকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন, সেটি ভরত-প্রণীত অন্য কোন সঙ্গীত-গ্রন্থ, নাট্যশাস্ত্র নয়। কারণ, নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে সঙ্গীতের শ্রুতি-মূর্চ্ছনাদি প্রসঙ্গে যা কিছু লেখা আছে, সেটা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর,—নাট্যকলার প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু মাত্র, তার দ্বারা শার্ঙ্গদেবের মতো কোন সঙ্গীত-বিশ্লেষণকারী অবশ্যই কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারতেন না।

শ্রুতি সম্বন্ধে ভরত মুনি বলছেন:

দ্বিক্ ত্রিক চতুষ্কাস্তু জ্ঞেয়া বংশগতাঃ স্বরাঃ।
কম্পমানার্ধ মুক্তাশ্চ ব্যক্তমুক্তাঙ্গুলি স্বরাঃ॥
ইতি তাবন্ময়া প্রোক্তাঃ সমীচ্যঃ শ্রুতয়ো নব।

অর্থাৎ, কম্পমান, অর্দ্ধমুক্তাঙ্গুলি ও ব্যক্তমুক্তাঙ্গুলি ভেদে বাঁশী-ধ্বনি দুই, তিন ও চার শ্রুতিবিশিষ্ট (২ + ৩ + ৪ = ৯) সুতরাং শ্রুতির সংখ্যা নয়।

কম্পমান, অর্দ্ধমুক্তাঙ্গুলি ও ব্যক্তমুক্তাঙ্গুলি,—এই কথা তিনটির সম্যক্ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা আজিকার দিনে অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর না হ'লেও, যাঁরা অধুনা-প্রচলিত ছয় বা সাত ছিদ্রযুক্ত বাঁশের বাঁশীর সঙ্গে হাতে-কলমে পরিচিত, তাঁদের পক্ষে এ সম্বন্ধে একটা ইঙ্গিত পাওয়া বা আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কম্পমান কথাটার অর্থ স্বরের কম্পন। একই স্বরের মুক্ত ও কম্পনযুক্ত অভিব্যক্তির মধ্যে যে ঈষৎ আওয়াজের পার্থক্য ঘটে, এ কথা সঙ্গীত-রসিক মাত্রেই জানেন।

অর্দ্ধমুক্তাঙ্গুলি কথাটার অর্থ,—বাঁশীর ছিদ্রের ওপর থেকে সম্পূর্ণ ভাবে আঙুল সরিয়ে না নিয়ে, আংশিক ভাবে ছিদ্র-দ্বার উন্মুক্ত করা। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা কড়ি-কোমল জাতিয় স্বর নির্গত হয়ে থাকে এবং এই বিকৃত স্বরগুলি সাঙ্গীতিক শ্রুতিরই অন্তর্গত বস্তু।

ব্যক্তমুক্তাঙ্গুলি কথাটার অর্থ,—বাঁশীর ছিদ্রের ওপর থেকে সম্পূর্ণ ভাবে আঙুল সরিয়ে নিয়ে কোন একটি শুদ্ধ স্বরকে পূর্ণ ভাবে ব্যক্ত করা। বলা বাহুল্য, শুদ্ধ স্বরের সঙ্গে বিকৃত স্বরের পার্থক্য নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে—শ্রুতি।

ভরত-বিবৃত শ্রুতিসংখ্যার সঙ্গে আরও অনেক সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের বিবৃতির সামঞ্জস্য দেখা যায়। অতি প্রাচীন বেণু প্রভৃতি ঋষিগণও বলে গেছেন:

দ্বিশ্রুতিস্ত্রিশ্রুতিশ্চৈব চতুঃশ্রুতিক এব চ।
স্বরপ্রয়োগঃ কর্ত্তব্যো বংশছিদ্রগতো বুধৈঃ॥

অর্থাৎ, পণ্ডিতগণ বাঁশীর ছিদ্রগত স্বর সমূহ দ্বিশ্রুতি, ত্রিশ্রুতি ও চতুঃশ্রুতিরূপ নয়টি শ্রুতির দ্বারাই প্রয়োগ করে থাকেন।

প্রাচীনতার দিক্ দিয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে ভরতের পরই অনেকে মতঙ্গ মুনি (৩০০ খৃ-অঃ?) বিরচিত বৃহদ্দেশী গ্রন্থটির উল্লেখ করে থাকেন। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, গ্রন্থখানি চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে রচিত। কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তাছাড়া গ্রন্থখানি সত্যই মতঙ্গ মুনি কর্ত্তৃক লিখিত কি না সে সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। কারণ মূল পুঁথিখানির নকলরূপে যে গ্রন্থখানি আজও বর্ত্তমান রয়েছে, ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের মতে তার ভাষা এবং বক্তব্য এমনই বিকৃত ও প্রক্ষিপ্ত অর্থযুক্ত যে, গ্রন্থখানিকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করতে সন্দেহ জাগে! যাই হোক, মতঙ্গমুনির মতে:

সা চ একা অনেকা বা একৈব শ্রুতিরিতি।

অর্থাৎ যেহেতু শ্রুতির উপাদান নাদ্—সেই জন্ত শ্রুতিও একটি মাত্র।

বিশ্বাবসু বলেন:

শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাৎ ধ্বনিরেব দ্বিধা ভবেৎ।
সা চৈকা দ্বিবিধা জ্ঞেয়া স্বরান্তর-বিভাগতঃ।

অর্থাৎ, যে স্বর আমরা কানে শুনতে পাই তাকেই শ্রুতি বলে। এই স্বর দুই প্রকার,—শুদ্ধ ও বিকৃত (অন্তর)। সুতরাং শ্রুতিও দুই প্রকার।

এই আমলের অনেক সঙ্গীতজ্ঞ আবার তিন প্রকার শ্রুতিরও উল্লেখ করেছেন।

কেউ বলেছেন,—হৃদয়, কণ্ঠ ও মস্তক, এই তিন স্থান থেকে উৎপন্ন তিন শ্রেণীর স্বরভেদে শ্রুতিও তিন প্রকার। এখানে হৃদয়, কণ্ঠ ও মস্তক থেকে উৎপন্ন স্বরের অর্থ—মন্দ্র, মধ্য ও তার স্বর। অর্থাৎ আজকাল যাকে উদারা, মুদারা ও তারা স্বর বলে।

আবার কেউ বলেছেন,—মানুষের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি অনুযায়ী, শ্রুতিও তিন প্রকার। যথা: সহজ, দোষজ ও অভিঘাতজ। অর্থাৎ যিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির, তাঁর স্বরের শ্রুতি সহজ। যাঁর অন্তরে রজোগুণ প্রবল, তাঁর স্বরের শ্রুতি দোষজ এবং দধি অম্বল প্রভৃতি অম্লরস সেবনের ফলে যাঁর আসল কণ্ঠস্বর সম্যক্ পরিস্ফুট হয় না, তাঁর স্বর অভিঘাতজ শ্রুতির অন্তর্গত। এইরূপ বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সান্নিপাতজ কণ্ঠস্বর ভেদে চারি প্রকার শ্রুতির কথাও প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে। তুম্বুরু বলেন:

উচ্চৈস্তরো ধ্বনিরুক্ষো বিজ্ঞেয়ো বাতজো বুধৈঃ।
গম্ভীরো ঘনলীনস্তু জ্ঞেয়োহসৌ পিত্তজো বুধৈঃ।
স্নিগ্ধশ্চ সুকুমারশ্চ মধুরঃ কফজো ধ্বনিঃ।
ত্রয়াণাং গুণসংযুক্তো বিজ্ঞেয়ঃ সন্নিপাতজঃ।

অর্থাৎ, যাঁর কণ্ঠস্বর উচ্চ, কর্কশ ও রুক্ষ, তিনি বাত্-ব্যাধিগ্রস্ত। যে স্বর মেঘ-গর্জ্জনের মতো গম্ভীর অথচ মিষ্ট সেটা পিত্তজ ধ্বনি। যে স্বরের মাধুর্য্য অতীব স্নিগ্ধ—সুকুমার সেটা কফজধ্বনি। এবং যে স্বরের মধ্যে উপরোক্ত তিন প্রকার ধ্বনি অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে সেটা সন্নিপাতজ ধ্বনি।

শ্রুতি সম্বন্ধে উপস্থিত আমরা মাত্র ছয় রকম মন্তব্যের উল্লেখ করলাম। প্রমাণ পাওয়া যায়, এ সম্বন্ধে সে যুগে আরও অনেক সঙ্গীতজ্ঞ আরও অনেক রকমের অভিমত পোষণ করতেন। কিন্তু এই অভিমতগুলিকে শার্ঙ্গদেব একেবারেই মেনে নিতে পারেননি। এ সম্বন্ধে সঙ্গীত-রত্নাকর গ্রন্থের অন্যতম টীকাকার মল্লিনাথ বলছেন:

এতানি ষড়্‌মতানি স্বরশ্রুত্যোরভেদমঙ্গীকৃত্য
প্রবর্তিতানীতি মন্তব্যম্।
তানি তু অভিব্যঙ্গ্যাভিব্যঞ্জকত্বাভ্যাং সাক্ষাদ্
ভিন্নরূপয়োঃ স্বরশ্রুত্যোর্ভেদাপহ্নবান্ন সমীচীনানি।
অত্র কেচিৎ মীমাংসা মাংসলিতধিয়ো ধীরা
দ্বাবিংশতিং শ্রুতীর্মন্যন্তে।
কেচন পুনঃ ষট্‌ষষ্টিভেদভিন্নাঃ শ্রুতয় ইতি বদন্তি।
অন্যে পুনরানন্ত্যং বর্ণয়ন্তি শ্রুতীনাম্।

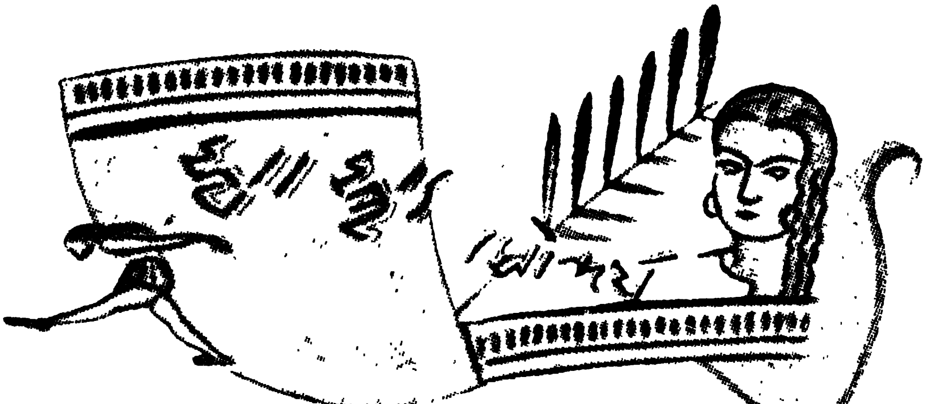
তথাচাহ কোহল:—

দ্বাবিংশতিং কেচিদুদাহরন্তি
শ্রুতীঃ শ্রুতিজ্ঞান বিচারদক্ষাঃ।
ষট্‌ষষ্টিভিন্নাঃ খলু কেচিদাসা-
মানন্ত্যমেব প্রতিপাদয়ন্তি।

এই উক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এ স্থলে আমরা উল্লেখ ক'রব লেখকের অন্যতম গুরুদেব শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের ব্যাখ্যা। উপরোক্ত সূত্রের মর্ম্মার্থ বিশ্লেষণ করে তিনি লিখেছিলেন:

"পূর্ব্বোক্ত ছয়টি মতে স্বর ও শ্রুতি অভিন্ন; কিন্তু অভিব্যঙ্গ্য ও অভিব্যঞ্জকরূপে স্বর ও শ্রুতি বিভিন্ন পদার্থ। যাহা অভিব্যক্ত হইবার যোগ্য তাহা অভিব্যঙ্গ্য,—যেমন গৃহস্থিত বস্তুসমূহ; আর যাহা দ্বারা এই বস্তুসমূহ অভিব্যক্ত হয় তাহা অভিব্যঞ্জক,—যেমন প্রদীপ। প্রদীপ ও গৃহস্থিত বস্তু যেমন পরস্পর ভিন্ন, সেইরূপ শ্রুতি ও স্বর পরস্পর ভিন্ন। পূর্ব্বকথিত মতে ছয়টিতে এই ভেদের অপলাপ করা হইয়াছে, সুতরাং এই মতগুলি সমীচীন নহে। মীমাংসানিপুণবুদ্ধি শার্ঙ্গদেব-প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী মনে করেন, শ্রুতি বাইশটি। কেহ কেহ হৃদয়, কণ্ঠ ও মস্তক,—প্রতি স্থানেই বাইশটি করিয়া শ্রুতি উৎপন্ন হয় বলিয়া শ্রুতি ছয়ষট্টিটি বলিয়াছেন। আবার কেহ কেহ শ্রুতি অনন্ত বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শেষোক্তগণ বলেন, আকাশকুহরে ধ্বনি অনন্ত উত্তাল। পবনচালিত সাগরের তরঙ্গপরম্পরার যেমন ইয়ত্তা নির্দ্দেশ করা যায় না, সেইরূপ আকাশবক্ষে ধ্বনিরও সংখ্যা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। সুতরাং শ্রুতি অসংখ্য। এই মতে রণন ও অনুরণনরূপে শ্রুতি ও স্বরের ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু রণন ও চরম অনুরণনের পূর্ব্ববর্ত্তী অনুরণনসমূহের সূক্ষ্ম ভাগ ধরিয়া শ্রুতি অনন্ত বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাও সমীচীন নহে। যদিও রণন ও অনুরণনস্বরূপ উভয় ধ্বনিই স্থূল এবং স্থূলত্ব হেতু ইহাদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর ভাগের অনুমানও অমূলক নহে, তথাপি এই সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর অনুরণনগুলি এক দিকে যেমন শ্রবণগম্য নহে, অপর দিকে উহারা স্বরের অভিব্যঞ্জকও নহে। সুতরাং উহারা শ্রুতি নামের অযোগ্য। যাঁহারা বলেন, শ্রুতি ছয়ষট্টিটি তাঁহাদের মতও যুক্তিসহ নহে; কারণ মন্দ্রস্থানে যে বাইশটি শ্রুতি উদ্ভূত হইয়া থাকে তাহারাই আবার দ্বিগুণ ও চতুর্গুণ প্রযত্নে উচ্চারিত হইয়া মধ্য ও তার স্থানের স্বরসমূহ অভিব্যক্ত করিয়া থাকে। সুতরাং স্থানের ভেদ নিবন্ধন ভেদ হইতেছে প্রযত্নের, বাইশটি শ্রুতির নহে। আর এইরূপ প্রযত্নভেদে শ্রুতিরও ভেদ কল্পনা করিতে হইলে ষড়্‌জাদি স্বরও তিন স্থানে বিভিন্ন কল্পনা করিয়া একুশটি স্বর স্বীকার করিতে হয়। ইহা কেহই করে না, সকলেই সাতটি স্বরই মাত্র স্বীকার করিয়া থাকেন।"

ঘুমের কথা



শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়

গত ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত নিদ্রার তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে চিকিৎসক-মণ্ডল বিশেষ কিছু অবগত ছিলেন না। ইতিপূর্ব্বে ডাঃ এরিক গাটম্যান কিছু Manic-depressive রোগীদের চিকিৎসায় লক্ষ্য না করে পারলেন না যে মানসিক অসুস্থদের নিদ্রাকালে প্রবল শারীরিক অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকে। তাঁর তৎকালীন প্রসিদ্ধ প্রবন্ধে উন্মাদের অস্থির-নিদ্রার বিবরণ দিয়ে পরিশেষে অপরীক্ষিত আনুমানিক যুক্তির দ্বারা এই নির্দ্ধারণ করেন যে, মানসিক ও শারীরিক সুস্থ ও সবল লোকেদের পাথরের মত নিস্পন্দ ও নিরুদ্বেগ নিদ্রা হওয়াই স্বাভাবিক। এ পর্য্যন্ত সাধারণ চিকিৎসকেরা এই নির্দ্ধারণে নির্ভর করে অকুতোভয়ে চিকিৎসা-কার্য্য চালিয়ে আসছিলেন।

ইতিমধ্যে ১৯৩০-৩২ মাত্র এই দুই বৎসরে শুধু আমেরিকায় ৪৫০০০ পাউণ্ড মূল্যের একটি মাত্র নিদ্রার ঔষধ—Phenobarbital বিক্রয় হয়ে গেল। এইটুকু অনুমান করায় অত্যুক্তি হয় না যে, ঔষধটার পরিমাণ সমস্ত দেশটাকে এক রাত্রির মতো ঘুম পাড়িয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। অবশ্য বলা বাহুল্য যে, প্রাচীন ও অন্য রকম আরো নানা ঘুমের ঔষধও ঐ সময়ে ঐ দেশে অপ্রচলিত ছিল না। সারা ইউরোপে নিদ্রার জন্য ঔষধ-ব্যবহারের প্রচলন প্রায় অত্যাবশ্যক হয়ে উঠলো। এই সম্বন্ধে বার্ণার্ড শ' ও বার্টাণ্ড রাসেল-প্রমুখ মনীষীদের প্রবন্ধে উল্লেখ দেখা যায়। ১৯৩৪-৩৫ সাল হতে আমাদের দেশেও ঘুমের ঔষধের প্রচলন দেখা যায়। অবশ্য পরিমাণের দিক্ দিয়ে সেটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। মনে হয়, পৃথিবীর কর্ম্মশালা হতে দূরে আমরা বস্তিবাসী তাই বৃহৎ ব্যাপারের সুফল ও কুফল আস্বাদনে আমাদের কিছু দেরী ঘটে থাকে। সে যাই হোক, দেশ ছেড়ে—বিশেষ করে সভ্য দেশ ছেড়ে এই ঘুম পালানোর ইতিহাস প্রায় সমস্যায় এসে ঠেকেছে। অনেকে গত মহাযুদ্ধোত্তর মানবের স্নায়বিক সংস্থানের উত্তেজক পরিস্থিতিকে এই সমস্যার জন্য দায়ী করে থাকেন। এবার যাঁরা মহত্তর যুদ্ধের সাক্ষী হয়ে জীবিত থাকবেন আশঙ্কা হয় তাঁরা সদাজাগ্রত মহাপুরুষে না পরিণত হন! অনিদ্রা সম্বন্ধে দার্শনিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক কারণগুলি বিশেষজ্ঞদের আলোচনার বিষয়। এই বিষয়ে মাত্র চিকিৎসকদের মতামত ও আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মানসিক ও শারীরিক সুস্থ লোকে কর্ম্মশ্রমজনিত স্নায়বিক ক্ষতিপূরণকল্পে অকাতর নিস্পন্দ নিদ্রা যায় এবং তাই উচিত ও স্বাভাবিক। ডাঃ গাটম্যানের এই সিদ্ধান্ত যখন চূড়ান্ত বলে চিকিৎসকেরা এক রকম নিশ্চিন্ত হলেন এমন সময় ১৯২৭ সালে আমেরিকায় জালমন, জি, সিমন্স নামে এক মাদুরওয়ালা অনিদ্রা রোগে আক্রান্ত হয়। Ohio State Universityর ডাঃ হ্যারি, এম. জনসন উক্ত মাদুরওয়ালাকে দিয়ে স্বীয় পরিকল্পনানুযায়ী বিশেষ এক রকম শয্যা প্রস্তুত করান। শয্যায় এমন সব ব্যবস্থা রহিল যাতে শায়িত ব্যক্তির সামান্য অঙ্গ-সঞ্চালনও রেখা-লিপিবদ্ধ হতে পারে।—An automatic recording machine mechanically connected with the springs to chart every move. তা ছাড়া সাইন-ক্যামেরা দ্বারা নিদ্রিতের নানা অদ্ভুত শয়ন-ভঙ্গীর ছবি তোলার ব্যবস্থা হয়। ছয় বৎসরে প্রায় ১৬০ জন নিদ্রিতের ২৫০০,০০০ রকম মাপজোক ও রেখা-চিত্র আর ২০,০০০ রকম ফটোর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানসিক ও শারীরিক সাধারণ সুস্থ সবল লোকের নিদ্রাবস্থা শান্ত, স্থির বা নিস্পন্দ একেবারেই নয়। ৮ ঘণ্টা নিদ্রায় প্রায় ৩৫ বার নিদ্রিতকে তার শয়নাবস্থার পরিবর্ত্তন করতে হয়। ১০ মিনিটের বেশী এক অবস্থায় শয়ন করা সম্ভব নয়। এই অজ্ঞাত নৈশ ভ্রমণ-বিলাসের নামকরণ করেন—'Motility'। সাধারণ ও স্বাভাবিক নিদ্রার অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে Motility অতঃপর গণ্য হতে থাকে। এই অস্থিরতার কারণ পাওয়া যায় এই যে, মানব অঙ্গের মাংস-পেশী সংস্থান এমন যে কোন-এক অবস্থায় এককালীন সমস্ত মাংস-পেশীর বিশ্রাম লাভ সম্ভব নয়। কিছুক্ষণ এক অবস্থায় থাকায় যখন সেই অঙ্গ ক্লান্ত হয় তখন অবস্থান্তর অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। একমাত্র বিশেষ এক-রকম মূর্চ্ছা ছাড়া সজ্ঞান-সংস্থানে একেবারে নিস্পন্দাবস্থা সম্ভব নয়।

রক্তের চাপ, তাপমান, নাড়ীর গতি যেমন প্রতি লোকের স্বতন্ত্র তেমনি Motility রেখার গতিও প্রতি লোকের পৃথক্ হতে বাধ্য। ৮ ঘণ্টাব্যাপী সুনিদ্রায় ২০ হতে ৬০ বার নড়াচড়া সম্ভব। দৈহিক যন্ত্রণা, উত্তেজনা, ক্ষুধা, জ্বর বা পেটের গোলমালে নিদ্রায় প্রবল আক্ষেপ দেখা যায়; তবে আংশিক বিশ্রাম পাওয়া তত অসম্ভব নয়; কিন্তু অপরিসীম ক্লান্তি ও অবসাদে এবং শয্যা ও গাত্রাচ্ছাদনের অনভ্যাস ও অব্যবস্থায় বিশ্রাম বাধাপ্রাপ্ত হয়। শিশুদের নিদ্রায় প্রবল আক্ষেপ থাকে আর সামান্য বাধায় তাদের নিদ্রাভঙ্গ হয়। অপর পক্ষে বৃদ্ধের

নিদ্রা অপেক্ষাকৃত শান্ত তবে অনেকটা সময় একবারে ঘুমানো চলে না। শ্রমজীবীরা মস্তিষ্কোপজীবীদের চেয়ে বেশী সময় নিদ্রা যায়। পুরুষ অপেক্ষা নারী প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ বেশী নিদ্রা দেয়। অপরিসর শয্যা বা এক শয্যায় একাধিকের শয়নে Motility বাধাপ্রাপ্ত হয়; কাজেই পরিপূর্ণ বিশ্রাম আশা করা যায় না। শয্যা খুব কোমল বা খুব কঠিন হওয়া উচিত নয়। জনসনের এই গবেষণাকে মূল ভিত্তি করে উক্ত মাদুরওয়ালাকে নিয়ে সিমন্স সাহেব ১৯৩১ সালে তাঁর অধুনা-প্রসিদ্ধ Vitalizing Rest Campaign সুরু করেন।

ডাঃ জনসনের এই গবেষণা নিদ্রা সম্বন্ধে বহুবিধ প্রশ্ন ও সমস্যার উদ্ভবে সাহায্য করে। ফলে জর্জিয়া প্রদেশের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক গ্লেভিল গিডিংস ডাঃ জনসনের নির্দ্দিষ্ট পথেই পরীক্ষা-কার্য্য আরম্ভ করেন। এটলাণ্টার কাছে পাহাড়ের উপর Tallulah Falls Industrial School এর ছাত্রদের মধ্যে ১২টি ছেলে ও ১২টি মেয়েকে দুটি নার্সের তত্ত্বাবধানে রেখে পরীক্ষা চলে। ডাঃ গিডিংসের প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে, অনিদ্রা নিবারণের নানা প্রচলিত ব্যবস্থা নিছক কুসংস্কার মাত্র। প্রচলিত ধারণা যে, বিশ্রামের অব্যবহিত পূর্ব্বে কায়িক শ্রম, কসরৎ ইত্যাদি, গরম বা ঠাণ্ডা জলে স্নান, গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন এবং কতগুলি গরম বা ঠাণ্ডা পানীয় সুনিদ্রায় সাহায্য করে। ১৭০০ ঘণ্টার অভিজ্ঞতায় ডাঃ গিডিংস এতদ্দ্বারা Motility রেখালিপিতে কখন কোন রকম ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেন নাই। তবে অত্যধিক গ্রীষ্ম বোধ, শয়নের প্রাক্কালে ভূরি ভোজন, মানসিক উত্তেজনা ও শারীরিক বেদনা-বোধ নিদ্রায় আক্ষেপের পরিমাণ বা প্রবলতা বৃদ্ধি করে। সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা বহু লোক আক্রান্ত হওয়ার বহু পূর্ব্বে Motility রেখালিপির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে আগত ব্যাধি সম্পর্কে ডাঃ গিডিংস ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। নিদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে, নিদ্রাকালে আমাদের চেতনা একেবারে লুপ্ত হয় না। কারণ:—

(ক) ক্লান্ত মাংসপেশীগুলিকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্ম উপযুক্ত অঙ্গ-সংস্থান প্রয়োজন আর সেই উদ্দেশ্যে সুপ্তাবস্থায় প্রয়োজনানুযায়ী হাত-পা নাড়া অবশ্যম্ভাবী।

(খ) এই ভ্রাম্যমান অবস্থায় পতন বা আঘাত হতে আত্মরক্ষার জন্ম সক্রিয় চেষ্টা দেখা যায়।

(গ) শীতাতপ বোধানুযায়ী নিদ্রিত আচ্ছাদন ও অনাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে, এমন কি আবরণের আশে-পাশে বায়ু-চলাচলের উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখে। নিদ্রা যে চেতনাহীন অবস্থা তাই প্রচলিত ধারণা। ডাঃ গিডিংস নিদ্রিতের উক্তরূপ শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলিকে বুদ্ধিগ্রাহ্য বলে মনে করেন। এখন প্রশ্ন এই যে, নিদ্রাবস্থায় যদি বুদ্ধিগত মানসিক বা শারীরিক প্রতিক্রিয়া বর্ত্তমান দেখা যায় তবে জাগরণ ও নিদ্রায় সামান্য মাত্রাভেদ ছাড়া একেবারে বিরুদ্ধ একটা অবস্থান্তর বলা চলে কি? তিনি বলেন—An observer can not tell accurately whether a person is awake or asleep at any given instance. Such terms as 'awake' and 'asleep' are unsatisfactory from a scientific standpoint. সাময়িক ভাবে অত্যন্ত নিকট পারিপার্শ্বিক পরিবেশ হতে বিশেষ রকম অমনোযোগকে নিদ্রা বলা যায়। ক্রমাগত সজাগ মনোযোগের দ্বারা শারীরিক মানসিক শক্তির যে অপচয় ঘটতে থাকে, নিদ্রা বিরতি বা ছেদের দ্বারা সেই ক্ষতিপূরণ ও শক্তি সঞ্চয়ে সাহায্য করে। নানা হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার, চিকিৎসালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা, গবেষণা ও আলোচনায় এই তথ্যগুলি সংগৃহীত হয়েছে:—

১। নিদ্রিত তার অতি নিকট পরিবেশ হতে সাময়িক ভাবে অমনোযোগী হয়, তাতে করে চেতনার কিছু মাত্রাগত বৈষম্য ঘটে।

২। চক্ষু-গোলক বহির্মুখী অবস্থায় উপরের দিকে গড়িয়ে উঠে ও চক্ষু মণি সঙ্কুচিত অবস্থায় প্রায় বন্ধ হয়।

৩। অশ্রু-গ্রন্থির ক্ষরণাভাবে চক্ষু শুষ্ক, ভারী এবং বন্ধ হয়।

৪। মাংস-পেশীর স্বতঃপ্রণোদিত সংকোচন, প্রসারণ ও আন্দোলনাদি একেবারে বন্ধ থাকে।

৫। শ্বাস-প্রশ্বাসে উদর অপেক্ষা হৃদ্‌যন্ত্রই ক্রিয়াশীল হয় বেশী।

৬। রক্তের চাপ বেশ কমে যায়, ফলে হৃদ্‌যন্ত্র ধীরে ও ছন্দবদ্ধ ভাবে কাজ করে।

৭। অনেকগুলি গ্রন্থি-ক্ষরণ একেবারে হয় না; যেমন—মূত্র-গ্রন্থি, অশ্রু-গ্রন্থি, কফ্-গ্রন্থি ইত্যাদি।

৮। সাময়িক ভাবে রক্ত অপেক্ষাকৃত কম ক্ষার-যুক্ত হয়।

যদিও এই সব তথ্যগুলির ইঙ্গিত এই যে, ক্রিয়াশীল শরীরের নানা অপচয়ের সংশোধনে নিদ্রা বিশেষ সাহায্য করে, তবুও এই প্রশ্ন থাকে যে, প্রায় ১৬ ঘণ্টা জাগরণের পর নিদ্রা এত অবশ্যম্ভাবী কেন? শ্রম-জনিত অপচয় নিদ্রার কারণ নয়। দেখা গেছে, এতদবস্থায় নিদ্রা আসে না এবং যদিও বা সামান্য নিদ্রা হয় তবে Motility রেখ-লিপিতে অত্যন্ত প্রবল ও অস্বাভাবিক রেখাপাত দেখা যায়। তাই এখনও নিদ্রাকে অভ্যাসগত একটি প্রতিক্রিয়া হিসাবে গণ্য করা হয়। নিয়মিত ভাবে বহু যুগ হতে প্রচলিত এই অভ্যাস মানুষকে দাস করেছে এবং যুগব্যাপী উৎকর্ষতায় দেহযন্ত্রের সংস্থান এই অভ্যাসের অনুকূল হয়েছে। জন্তু-জগতে বা বর্ব্বর সমাজে এখনও ভিন্ন রকম নিদ্রার প্রচলন দেখা যায়। সভ্য সমাজে আমরা যে নিদ্রার সঙ্গে পরিচিত তা প্রায় অখণ্ড এবং সময় ও অভ্যাসের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট। এই নির্দ্দেশ পালনের ব্যতিক্রমে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি।

'জীবনের এক-তৃতীয়াংশ কেবল নিদ্রা দিয়ে কেটে গেল' হিসাবী লোকের এই পরিতাপ সত্ত্বেও বলতে হয় নিদ্রাকে বাদ দিয়ে বাঁচা সম্ভব নয়। খবরের কাগজে বহু দিনব্যাপী যে সব অনিদ্রার গল্প পড়া যায়, বৈজ্ঞানিক তার তথ্য-গত সত্যতা সম্বন্ধে খুবই সন্দিহান। গবেষণাগারের বৈজ্ঞানিক পরিবেশে এখন পর্য্যন্ত ২৩১ ঘণ্টা অর্থাৎ ৯ দিন ১৫ ঘণ্টা-ব্যাপী এককালীন অখণ্ড অনিদ্রার সংবাদ পাওয়া গেছে। ইতিহাসে সদা-জাগ্রত মহাপুরুষরূপে যাঁরা খ্যাতিমান্ যেমন—John Wesley, Edison, Bonaparte—তাঁরা যখন তখন, যথা তথা, বহু বার বহু বিরুদ্ধ অবস্থায় খণ্ডিত স্বল্প-সময় নিদ্রা দ্বারা যথারীতি ৭।৮ ঘণ্টা পুষিয়ে নিয়েছেন। Wesley অশ্বারোহণাবস্থায়, Edison গবেষণাগারের কেদারায় আর Bonaparte যুদ্ধক্ষেত্রে কামানের নীচে বসেই নিদ্রা দিতে পারতেন।

নানা কারণে অনিদ্রা হওয়া সম্ভব, তবে অনিদ্রা নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যাধি নয়।

ছোটদের আসর

[illegible]

কুমারী মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায়

ছোট্ট মেয়ে বলে সবাই ছোট্ট আমি কিসে ?
গোবরা সে তো বন্ধু আমার নিবারণের পিসে।
একলা পথে যেতে মানা যদিও আমার রাস্তা জানা!
মেলার মধ্যে হারাই না পথ ভীড়ের সঙ্গে মিশে !

বোনের মেয়ের মাসী আমি ভায়ের পোয়ের পিসী
তফাৎ আমি দিব্যি বুঝি ধান, জিরে, আর তিসি।
তবু কভু রাঁধতে গেলে কিম্বা আনাজ কাটতে গেলে
কিম্বা হলুদ বাটতে গেলে ধমক দিবা-নিশি।

দাদু হাঁকেন—"ওরে রামা—তামাক দিয়ে যা!"
বাবার হুকুম—"এই রেমো জলদী নে আয় চা!"
কম্ম-বাড়ী! পুতুল-বিয়ে রামা যাবে তত্ত্ব নিয়ে
ডাকাডাকির সময় কি কেউ কিচ্ছু বোঝে না।

দাদু বলেন গিন্নী আমায় বাবার আমি মা।
আদর এ সব আসলেতে কিচ্ছু সত্যি না।
ভীষণ রেগে চক্ষু পাকাই হুকুম করলে হাসে সবাই
মান্য কিম্বা খাতির কি নাই ? সবাই বলে যা' তা'।

আমি নাকি ছোট্ট তাই বুদ্ধি নাইকো ঘটে !
শুধাই যদি, বকলে কেন ? সবাই তখন চটে।
ধমক-ঠাসা নিষেধ বারণ বুঝি না যে কি যে কারণ।
'বড়াই বুড়ী' নাম-করণ কিসের জন্য বটে ?

আলবার্ট আইনষ্টাইন

সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

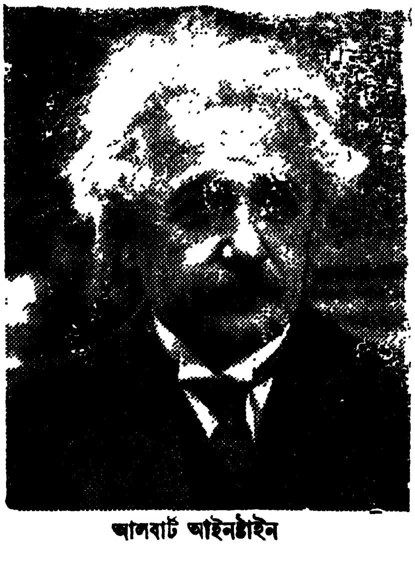
তোমরা আইনষ্টাইনের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। এ যুগের তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। তাঁকে আজ সকলে আপেক্ষিক তত্ত্বের জন্যই চেনেন। এই আবিষ্কারে তিনি পৃথিবীর রূপ ও ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন করে দিয়েছেন। তাঁরই জীবনের ছোট ছোট কয়েকটি ঘটনা তোমাদের শোনাতে চাই।

একবার বেলজিয়ামের সম্রাজ্ঞীর নিমন্ত্রণে তিনি ব্রসেলসে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ধারণাও করতে পারেননি যে তাঁর জন্য ষ্টেশনে অনেক লোক অপেক্ষা করবে, তাই ষ্টেশনে অপেক্ষারত রাজ-অনুচরদের লক্ষ্য না করেই এক হাতে একটা সুটকেশ ও অন্য হাতে একটা বেহালা নিয়ে তিনি তো সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে দেখা করতে রাস্তায় নেমে হাঁটতে সুরু করলেন। ওই ধরণের একটি লোক যে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হতে পারেন, তা রাজ-অনুচরেরা ধারণাও করতে পারেননি। তাই তাঁরা ষ্টেশনে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে তাঁদের ধারণামত কাউকে না দেখতে পেয়ে রাজ-প্রাসাদে ফিরে এসে সম্রাজ্ঞীকে জানালেন যে, আইনষ্টাইন নিশ্চয়ই তাঁর মত বদলিয়ে ফেলেছেন, নয় ত তাঁকে ষ্টেশনে দেখা যেত। বিরক্ত হয়ে সম্রাজ্ঞী দেখলেন রাস্তা দিয়ে এক ক্যাবলা-মত গেঁয়ো লোক এক হাতে সুটকেশ ও আর এক হাতে বেহালা নিয়ে শিষ দিতে দিতে আসছে। সে এসে সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ায় তিনি তো তাকে তাড়িয়ে দিতেই হুকুম দিলেন।

হঠাৎ সম্রাজ্ঞী সেই গেঁয়ো ভূতটিকে ভাল করে দেখতে পেয়েই চমকে উঠলেন। বিরক্তির থেকে বিস্ময়, বিস্ময় থেকে আনন্দ; তিনি অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বলে উঠলেন—"য়্যাঁ, ডক্টর আইনষ্টাইন! আপনাকে দেখে কি যে আনন্দ হলো! কিন্তু আপনার জন্য যে গাড়ী পাঠিয়েছিলাম তাতে করে এলেন না কেন?"

আইনষ্টাইন ক্ষীণ হেসে উত্তর দিলেন, "আমি তো ধারণাই করতে পারিনি যে আমার জন্য গাড়ী পাঠানো হতে পারে। ট্রেণ থেকে নেমে আমি সোজা হেঁটেই আসছি। এই হাঁটাটুকু বেশ লাগল।"

আইনষ্টাইন ইচ্ছা করলেই খুব অল্প সময়েই ধনী হতে পারতেন। যদি তিনি বক্তৃতা দিয়ে, প্রবন্ধ লিখে বেড়াতেন তবে তাঁর মত ধনীও খুব কম দেখা যেত। কিন্তু তাঁর কাছে কাচের পাত্রও যা রূপোর পাত্রও তাই—মিছিমিছি টাকার প্রয়োজন কি? তাঁর বন্ধুদের মধ্যে অনেকে এ কথা স্বীকার না করে বলতেন যে, টাকা থাকলে জগতের অনেক উপকার করা যায়। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীতে কোনও ঐশ্বর্য্যই মানবতাকে এগিয়ে দিতে পারে না। মহৎ লোকের দৃষ্টান্তই মহৎ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। মোজেস্, যিশু এবং গান্ধীকে কি কার্ণেগীর টাকার তোড়ায় শক্তিমান্ বলতে চাও?"



আলবার্ট আইনষ্টাইন

তিনি শুধু মুখেই এই কথা বলতেন না, কাজেও তিনি এই রকম ছিলেন। তাঁর প্রয়োজনের বেশী অর্থে তিনি আগ্রহ দেখাননি। কোনও এক জার্মান প্রকাশক তাঁর কোনও এক বিখ্যাত বক্তৃতা প্রকাশ করবার জন্য এক হাজার মার্ক তাঁকে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রথমে প্রকাশ করতে দিতে রাজি হননি। শেষটা দিতে তিনি রাজি হলেন, কিন্তু বললেন, হাজার মার্ক ওর দাম হওয়া উচিত নয়—তিনি ছয়শো মার্ক পেলেই খুশি হবেন!

আর একবার এক প্রকাশক তাঁকে প্রচুর টাকা পাঠিয়ে জানালেন যে, আইনষ্টাইন যে কোনও বিষয়ে যেন একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠান। এই কথায় তিনি প্রায় কেঁদে ফেললেন, স্ত্রীকে জানালেন যে তাঁকে অপমান করা হয়েছে। "আমাকে কি তারা সিনেমার 'তারকা' পেয়েছে?"

প্রফেসার আইনষ্টাইন ট্যাক্সীতে কোনও কালে চড়েননি। তাঁর ধারণ, ট্যাক্সীতে চড়লে তাঁর অধিকাংশ দেশবাসীর থেকে তিনি আলাদা হয়ে যাবেন, কারণ অধিকাংশ লোকের ট্যাক্সীতে চড়বার সামর্থ্য নেই বলে ট্রামে-বাসে চড়ে। ট্রেণে যেতে হলে তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে চড়তেন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে অনেক দিন তর্কের পর এখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে চড়তে স্বীকৃত হয়েছেন।

তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা অনেকেই দেখা করতে আসেন এবং তাঁদের সঙ্গে গল্প করতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করতে তাঁর সব চেয়ে বেশী আগ্রহ—প্লেটো, হিউম, স্পিনোজা, সোপেন-হাওয়ার তাঁর কণ্ঠস্থ। টলষ্টয়, ডষ্টয়েভস্কী, বার্ণাড শ', আনাতোলে ফ্রাঁসের তিনি অত্যন্ত ভক্ত। বার্ণাড শ' একবার বলেছিলেন যে, তাঁর 'জোয়ান অব আর্ক' বইটির সব চেয়ে ভাল সমালোচনা পেয়েছিলেন আইনষ্টাইনের চিঠিতে। গেরহার্ট হাউপ্টমানের কবিতা পড়ে তিনি এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা দু'জন অত্যন্ত বন্ধু হন। আর সঙ্গীত তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। বাক্, মোৎসার্ট বা বিটোফেনের আলোচনায় তিনি সব সময়ে অগ্রণী।

তাঁর মত এমন আপন-ভোলা লোক খুব কম দেখা যায়। স্নানাহার থেকে শোয়া পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত কাজেই তাঁর ভুল শোধরাতে শোধরাতে তাঁর স্ত্রী গলদ্ঘর্ম্ম হয়ে পড়েন। স্নানের সময় বাথরুমের দরজা পর্য্যন্ত বন্ধ করতে তাঁর মনে থাকে না। তাঁর এই আপন-ভোলা স্বভাবের চমৎকার একটা গল্প আছে।

একবার তিনি প্যারিতে গিয়ে একটা মস্ত হোটেলে উঠেছেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো, একটা চিঠি ডাক-ঘরে ফেলতে হবে। চাকরকে না ডেকে তিনি স্ত্রীর অলক্ষ্যে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে ডাকবাক্সে চিঠিটা ফেললেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো যে, যে হোটেলে তিনি উঠেছেন তার নামও জানেন না এবং সেটা কোথায় তাও ভুলে

চাইছেন। অনেকক্ষণ তিনি এ-পাশ ও-পাশ তাকাতে লাগলেন, তার পর এক পুলিশকে ডেকে তিনি সব কথা বললেন। সে আইনষ্টাইনের কথা শুনে থানায় খবর নিয়ে জানলো যে তিনি কোন্ হোটেলে উঠেছেন। কিন্তু হোটেলের নাম শুনে সে অবাক! ঠিক সামনের হোটেলেই আইনষ্টাইন উঠেছেন অথচ ঘণ্টার পর ঘণ্টা আইনষ্টাইন সেই হোটেলের দিকে তাকিয়েছিলেন। হোটেলে ফিরে দেখেন, তাঁর স্ত্রী তাঁকে না দেখতে পেয়ে পুলিশ ডেকেছেন।

ছোট ছেলে-মেয়েদের তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন। ছোটদের সঙ্গে তিনি খেলেন, তবে প্রতিটি খেলার মধ্যে থাকে বুদ্ধির প্রশ্ন। ধরো, তিনি কয়েক জন ছেলে-মেয়ে নিয়ে বসে বললেন—"আমাকে আমেরিকার এক আবিষ্কারক একটা চিঠি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে—একটা এরোপ্লেনে করে আকাশে উঠে থাকবেন, তার পর পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে নীচে যেই প্যারি দেখা যাবে তিনি সেখানে নেমে পড়বেন। তাতে তেমন পয়সা-খরচ নেই, আটলাণ্টিক সাগরও পার হতে হবে না। তোমাদের কি প্রস্তাবটা খুব ভালো লাগলো না?"

"না।"

"কেন?"

"কারণ,···এরোপ্লেনটা খুব ভারী, আকাশে বেশীক্ষণ ভাসতে পারবে না। (আইনষ্টাইনের মুখে মৃদু হাসি দেখে এবারে তার সাহস বেড়ে গেছে)·· আকাশ মানেই বাতাসও তো পৃথিবীর সঙ্গে ঘুরছে, তাই এরোপ্লেন তো ঠিক এক জায়গায় থাকতে পারবে না, তাকেও তো ঘুরতে হবে।"

আইনষ্টাইন খুশি হয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিলেন।

আর একটা গল্প দিয়ে শেষ করি।

আমেরিকায় এক মা দেখেন যে তাঁর ছোট মেয়ে রোজ বিকেলে হন্তদন্ত হয়ে আইনষ্টাইনের বাড়ীতে যায় এবং হাসিমুখে ফিরে আসে। মা'র তো ভয়ঙ্কর ভয় হলো। মেয়ে ওখানে কি করতে যায়? এত বড় বৈজ্ঞানিক কি মনে করবেন? মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে কোনও উত্তর পান না। শেষে তিনি অনেক কষ্ট করে একবার আইনষ্টাইনের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা, আমার ছোট মেয়ে রোজ বিকেলে এখানে কেন আসে বলতে পারেন?"

আইনষ্টাইন উত্তর দিলেন—"তেমন কোনও কাজে নয়। মেয়েটি আমাকে রোজ চকোলেট খাওয়ায়, আর আমি ওর ইস্কুলের অঙ্কগুলো কষে দিই।"

জয় হিন্দ্

?র বসু

জয় হিন্দ্। এগিয়ে চলো বিশ্ব মোরা করবো জয়।
"মুক্তি" লাগি চলবো ছুটি নাইকো মোদের মৃত্যু-ভয়।
দিল্লী-পথে চলবো মোরা বুক ফুলিয়ে সাহস করে
নাইকো শক্তি পৃথিবীতে মোদের গতি রুখতে পারে।
লড়তে হলে লড়বো মোরা মৃত্যুরে ভয় করবো না
মরণ এলে মরবো মোরা ভীরুর মত হঠবো না।
স্বাধীনতা আনতে মোরা তুচ্ছ জীবন করবো দান।
জীবন দিয়েও পূজবো মোরা দেশমাতারই চরণ-খান্।
জীবন দিয়ে জীবন নেব রক্ত মোরা করবো দান
মোদের রক্তে ধন্য হবে মোদের এ দেশ "হিন্দুস্থান"।

এক মিনিটের গল্প

খাঁটি লোক

মনোজিৎ বসু

সে অনেক দিন আগেকার কথা। কলকাতার হেয়ার স্কুলে তখন হেড-মাষ্টার ছিলেন অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়। শিক্ষক হিসাবে এক দিকে তাঁর যেমন খ্যাতি ছিল, লোক হিসাবেও তেমনি তাঁর ছিল সুনাম। সেই জন্যই তিনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। সেই সময়কার শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর স্যার আলফ্রেড্ ক্রফ্‌টও তাঁর ভূয়সী প্রশংসা ক'রে গেছেন।

আজকালকার মানুষ ক্রমেই যেন মিথ্যার জালে নিজেকে প্রতি পদে পদে জড়িয়ে ফেলতে চায়। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মানুষ হ'তে চায় বড়। তাই খাঁটি লোক এ-যুগে মেলা ভার। কিন্তু অক্ষয়কুমার ছিলেন সত্যিকারের মানুষ, তাঁর মধ্যে কোন অসত্যের মিশ্রণ ছিল না। একটি ছোট ঘটনাই তার সাক্ষ্য দেয়।

এক দিন এক জন লাইফ্-ইনসিওরেন্সের দালাল এলেন অক্ষয়বাবুর কাছে। এসেই যথারীতি তাঁকে জীবন-বীমা করবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলেন। জীবন-বীমা মানুষের কতখানি উপকার করেছে, সে সম্বন্ধেও ভদ্রলোকটি অক্ষয়বাবুর কাছে বিরাট এক বক্তৃতা দিতে ছাড়লেন না। তার পর জীবন-বীমার নিয়ম-কানুন সব কিছুই তিনি দেখালেন ছাপানো কাগজ-পত্র খুলে।

সব শুনে অক্ষয়বাবু বললেন—"কিন্তু আমার যে অসুখ আছে। আপনাদের কোম্পানী আমার জীবন-বীমা করতে রাজী হবেন কেন? বহু দিন থেকে আমি মূত্রাশয়ের পীড়াতে ভুগছি। এ অবস্থায় কি করে জীবন-বীমা করা চলে বলুন?"

ইন্‌সিওরেন্সের দালালটি সহজ ভাবে জবাব দিলেন—"ওঃ, সে জন্য আপনি ভাববেন না। আমি সব ঠিক ক'রে দেব। আমাদের কোম্পানীর ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা ক'রে তাঁকে দিয়ে একটা সার্টিফিকেট লিখিয়ে দেব যে আপনার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ, কোন রকম অসুখই আপনার নেই। আপনি আর ও-নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। কাগজটায় সই ক'রে ফেলুন।"

এই কথায় অক্ষয়বাবু যেন একটু বিরক্ত হলেন। ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে তিনি উত্তর দিলেন—"না, তা হয় না। আমি জানি যে আমার এই রোগ আছে। ডাক্তারের একটা মিথ্যা সার্টিফিকেটেই কি সে রোগ সেরে যাবে? ও-রকম মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আপনাদের কোম্পানী বীমা করতে রাজী হলেও আমি তাতে রাজী হব না। আপনি আসতে পারেন।"

অক্ষয়বাবুর সেই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ অটল জবাব শুনে জীবন-বীমা কোম্পানীর দালালটি তাড়াতাড়ি তাঁকে নমস্কার জানিয়ে স'রে পড়লেন।

এ-যুগে অক্ষয়বাবুর মত খাঁটি লোক ক'টা আছে, বলতে পার?



শিল্পী—শ্রীমান রথীন মিত্র

১৮

চাণক্য ভেবেছিলেন যে, নন্দবংশের মূল বুড়ো রাজা মহাপদ্ম নন্দ সর্ব্বার্থসিদ্ধিকে পর্য্যন্ত এ পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিতে পারলে রাক্ষস যখন দেখতে পাবেন যে, তাঁর প্রভুবংশের এমন কেউ কোথাও নেই যাঁকে আশ্রয় ক'রে তিনি প্রজাদের মন ফিরিয়ে তাদের চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করতে পারেন, তখন হতাশ হ'য়ে হয় তিনি চ'লে যাবেন—আর নয়ত চাণক্যের কাছে এসে ধরা দেবেন—কারণ যতই দূর সম্পর্ক হোক্ না কেন চন্দ্রগুপ্ত বুড়ো মহাপদ্ম নন্দের নাতি ত বটেন! কিন্তু এই একটি জায়গায় চাণক্যের বোঝবার ভুল হ'ল! শূদ্রা মুরার নাতিকে প্রভুর বংশ বলে কোন দিনই স্বীকার করেননি রাক্ষস—বরাবর মুরার ছেলে মৌর্য্য আর তার ছেলেদের 'দাসীপুত্র' বলে ঘৃণা করতেন। তার পর নবনন্দ এক রকম রাক্ষসের হাতেই প্রাণ পেয়েছিলেন—একটা মাংসের ডেলা থেকে ন'টি ছেলের জন্ম কিছুতেই হ'ত না যদি না রাক্ষস বুদ্ধি ক'রে ঐ মাংসের ডেলাটার তদ্বির করতেন। তাই নবনন্দের উপর রাক্ষসের ছিল পুত্রস্নেহ। নবনন্দ চাণক্যের কৌশলে পশুর মত মারা পড়লেন—মায় বুড়ো রাজা যিনি বহু দিন কোন রাজকার্য্যের ধার ধারতেন না, তিনি পর্য্যন্ত নিষ্ঠুর চাণক্যের হাতে রক্ষা পেলেন না—এতে রাক্ষসের মনে এক-সঙ্গে যেন পুত্রশোক আর পিতৃশোক জেগে উঠেছিল। সব চেয়ে বেশী হয়েছিল তাঁর চাণক্যের উপর বিজাতীয় ঘৃণ—তাই তিনি প্রতি-হিংসা নেবার জন্তে প্রায় পাগলের মত হ'য়ে উঠলেন। তপস্থা করতে বনে যাওয়া বা আত্মসমর্পণ করার মত হতাশ ভাব তাঁর মনের কোণেও ঠাই পেলে না।

ক্রমশঃ সুযোগও জুটে গেল। রাক্ষস শুন্‌লেন যে, মহা সমারোহে শীগ্‌গিরই চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক হবে—তাই নানা দেশের সামন্ত রাজারা নানা রকম পোষাক-গয়না-ধন-রত্ন-হাতী-ঘোড়া-রথ-দাস-দাসী ইত্যাদি উপহার পাঠাচ্ছেন। রাক্ষস এই সুযোগ ছাড়লেন না—চন্দ্রগুপ্তকে নিপাত করবার জন্তে পাঠালেন এক বিষকন্থা। অপরূপা সুন্দরী সে মেয়েটি। তার জন্মের পর থেকেই মাই-হুধের সঙ্গে অল্প অল্প বিষ খাওয়ান অভ্যাস করা হয়েছিল। ক্রমশঃ যতই সে বাড়তে লাগ্‌ল, ততই বিষের মাত্রাও বাড়ান হ'তে লাগ্‌ল। অবশ্য মেয়েটি কিছুই জান্‌ত না এ সব কথা। বিষের তেজে তার শরীরে রূপ ঝল্‌মল ক'রে উঠ্‌তে লাগল বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে। সে রূপে চোখ ঝল্‌সে যেত—যেমন নিখুঁত গড়ন—তেমনই উজ্জ্বল গৌর বর্ণ। তার পর তাকে চৌষট্টি ললিত কলার শিক্ষা এমন ভাবে দেওয়া হয়েছিল যে, তার রূপ-গুণ দেখ্‌লে মনে হত বুঝি সাক্ষাৎ বাগ্‌দেবী এসে মর্ত্তে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু তার শরীর ছিল কালকূটের খনি—তার গায়ের ঘাম—চোখের জল, মুখের লালা হলা-হলের কাজ করত—অথচ সে নিজে জান্‌ত না যে, সে এমন গরলের আধার। রাক্ষস ষোলটি বছর ধ'রে এই মেয়েটিকে বিষকন্থা তৈরী করেছিলেন। এইবার মেয়েটি তাঁর কাজে লাগ্‌বে বুঝে তিনি মনে মনে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লেন। যথাসময়ে এক জন চরের সঙ্গে তিনি মেয়েটিকে পাঠালেন চন্দ্রগুপ্তের সভায়। এক জন কাল্পনিক সামন্তের



শ্রীমান সৌমেন অধিকারী (কাজল দিয়ে আঁকা)

নাম সই দিয়ে একখানা চিঠিও সঙ্গে পাঠালেন। তাতে লেখা ছিল, অমুক সামন্ত মেয়েটিকে পাঠাচ্ছেন, মহারাজ কৃপা ক'রে মেয়েটিকে তাঁর তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী নিযুক্ত করলে অনুগত সেবক কৃতার্থ হবে ইত্যাদি।

* * * *

যথাসময়ে অনুচরটি সঙ্গে নিয়ে মেয়েটি এসে দাঁড়াল চন্দ্রগুপ্তের সভায়। মনে হ'ল যে বিজলী চমকে উঠ্‌ল মেঘের কোণে। মহারাজকে প্রণাম ক'রে জোড়হাতে মুখ নীচু ক'রে দাঁড়াল মেয়েটি। অনুচর দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রে এক জন মন্ত্রীর হাতে রাক্ষসের জাল চিঠিখানা দিলে। চন্দ্রগুপ্তের ত চোখ দু'টি মেয়েটির দিক্ থেকে ফিরতেই চাইছে না। ওদিকে ম্লেচ্ছরাজ পর্ব্বতক ত এমন ভাবে তাকাচ্ছেন যেন মেয়েটিকে গিলে ফেল্‌লে তবে তাঁর আশা মেটে! সভায় মন্ত্রী, সেনাপতি, মাতব্বর প্রজারা, মায় মেয়ে-মহল পর্য্যন্ত সকলে একদৃষ্টে সে অপরূপ রূপলাবণ্য দেখ্‌ছেন! এমন সময় চাণক্য হাত বাড়িয়ে রাক্ষসের চিঠিখানি নিলেন দেখ্‌তে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে জাগ্‌ল সন্দেহ—এ নামের কোন সামন্ত রাজা আছেন বলে জানা ছিল না! পাশে শকটাল্ বসে। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'অমুক দেশে এই নামের কোন সামন্ত রাজা আছেন'? শকটাল্ বল্‌লেন—'না। কিন্তু—কেন'? চাণক্য গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন—'পরে বল্‌ব'। তার পর ইন্দুশর্ম্মার দিকে তাকিয়ে তিনি চুপি-চুপি বল্‌লেন—'সখা! মেয়েটির লক্ষণ পরীক্ষা কর ত'। ইন্দুশর্ম্মা এ সব বিষয়ে পাকা লোক—একবার তার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সারা শরীরে চোখ বুলিয়েই চাণক্যের কাণে কাণে বল্‌লেন—'সখা! এ ত বিষকন্যা ব'লে মনে হচ্ছে—পরীক্ষা করব না কি'? চাণক্য—'নিশ্চয়'। এর পরই চাণক্য সভাভঙ্গ করবার আদেশ দিলেন। মেয়েটির সম্বন্ধে ব্যবস্থা হ'ল—এ-বেলা সে চাণক্যের জিম্মায় থাক্‌বে—ও-বেলা তার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য ঠিক করা যাবে।

* * * *

দুপুরে মেয়েটির খাওয়া হ'য়ে যাবার পর তার পাতের এঁটো খাবারগুলি রাস্তায় ফেলা হ'ল। খানিক বাদে একটা রাস্তার কুকুর এসে সেই খাবারগুলো খেলে। চাণক্য আর ইন্দুশর্ম্মা তখন রাস্তায় পায়চারি কর্‌ছিলেন। খাবার পর বোধ হয় আধ দণ্ডও গেল না—কুকুরটা পথের ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে চিৎকার করতে আরম্ভ করলে—দেখতে দেখতে তার প্রাণ দেহ ছেড়ে গেল। ইন্দুশর্ম্মা বলে উঠ্‌লেন—'দেখেছ, কি ভয়ানক! এখন এ মেয়েকে তুমি কোথায় পাঠাবে'? চাণক্য গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন—'কেন? ম্লেচ্ছরাজ পর্ব্বতকের শিবিরে। তিনি অর্দ্ধেক রাজ্য পাবার জন্য বড়ই উৎপাত লাগিয়েছেন! তা রাজ্য পাবার আগে আজ বৈকালে এই রাজকন্যাটিকে পাটরাণী করুন। তার পর কাল সকালে যদি বেঁচে থাকেন, তখন কালনেমির লঙ্কা-ভাগের ব্যবস্থা করতে আস্‌বেন'। ইন্দুশর্ম্মা হেসে বল্‌লেন—'সখা! তোমার এত ভক্ত ত আমি এই কারণেই'! দুই বন্ধু নীরবে

বিষ্ণুগুপ্ত

শ্রীরবিনর্ত্তক

ঘরে ফিরে গেলেন—আর কেউ এ ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জানলে না।

* * * *

বিকালে রাজসভায় গিয়েই প্রথমে চাণক্য ঘোষণা করলেন যে, সকালের সেই পরমা সুন্দরী মেয়েটিকে তিনি মিত্র-রাজা পর্ব্বতকের তাম্বুল-করঙ্ক-বাহিনীরূপে উপহার দিতে ইচ্ছা করেছেন। সভায় তখনও কেউ-ই প্রায় এসে উপস্থিত হননি—কাজেই অনেকের কাছে এ খবরটা অজানা রয়ে গেল। কিন্তু পর্ব্বতক এতে খুবই খুসী! তিনি ত তখনই উঠে চাণক্যের পায়ের ধূলো নিয়ে বললেন—'আচার্য্য-দেব! আপনার আমার উপর অশেষ দয়া'! চাণক্য মুখ মচকে সেই কুটিল হাসি হাসলেন মাত্র—কোন কথা বললেন না। পর্ব্বতক আবার জোড় হাতে জিজ্ঞাসা করলেন—'প্রভু! আমার রাজ্যভাগ দেবার ব্যবস্থা কবে হবে'? চাণক্য গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন—'দু'-এক দিনের মধ্যেই'। পর্ব্বতক ত মহা আনন্দিত। মুখে শুধু বললেন—'এই জন্তেই ত আমি গুরুদেবের এত ভক্ত'!

এদিকে ঈর্ষ্যায় চন্দ্রগুপ্তের মুখ কাল হয়ে উঠছে দেখে চাণক্য তাঁর সিংহাসনের পাশে উঁচু পাথরের বেদীতে কুশাসনে ব'সে বললেন—'বৃষল! ধৈর্য্য হারিও না। তুমি একটু বাদেই সভাভঙ্গ ক'রে দিও—তখন সব কথা বলব'।

সভা ভাঙতেই চন্দ্রগুপ্ত নির্জ্জনে চাণক্যের সামনে হাঁটু গেড়ে ব'সে বললেন—'গুরুদেব! আমি কি কোন কারণে আপনার কোপ-নয়নে পড়েছি যে, পর্ব্বতককে আপনি অর্দ্ধেক রাজ্য—রাজকন্যা সব বিলিয়ে দিচ্ছেন'? চাণক্য আবার হাসলেন সেই কুটিল হাসি। চন্দ্রগুপ্তের বুকের ভিতর পর্য্যন্ত যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠল! ভয় পেয়ে তিনি জোড়হাতে স'রে দাঁড়ালেন। চাণক্য এবার বললেন—'বৎস! একান্তই শুনতে চাও সব কথা'! চন্দ্রগুপ্ত মাথা নেড়ে সায় দিলেন—কথা বেরুল না মুখে। চাণক্য গম্ভীর—কথা বেরুল যেন হাঁড়ীর ভিতর থেকে—'বৃষল! শপথ কর—কাউকে বলবে না'। চন্দ্রগুপ্ত আবার হাঁটু গেড়ে চাণক্যের পা ছুঁয়ে শপথ করলেন। তখন চাণক্য বললেন—'বৃষল! ও মেয়েটির রূপ দেখে ভুলো না—ও বিষকন্যা'! চন্দ্রগুপ্ত সবিস্ময়ে বললেন—'বিষকন্যা! সে আবার কি প্রভু'? চাণক্য—'ওকে মাতৃস্তন্যের সঙ্গে বিষ দিতে আরম্ভ ক'রে বিষকন্যা ক'রে গ'ড়ে তুলেছেন রাক্ষস। তোমার প্রাণ নেবার জন্তে ওকে পাঠান হয়েছিল। ওর নিশ্বাসে বিষ—ওর হাতের এক খিলি পান—এক গণ্ডূষ জল—ওর স্পর্শ তোমায় পরপারে পাঠাতে পারে'। শুনে ত চন্দ্রগুপ্তের মুখ ভয়ে-বিস্ময়ে ফেঁকাসে হয়ে গিয়েছে—শুধু ঢোক গিলে বললেন—'কি ক'রে জানলেন'? চাণক্য—'পরীক্ষা হ'য়ে গেছে—ওর এঁটো খেয়ে একটা কুকুর সত্ত মারা গেছে'। চন্দ্রগুপ্ত—'মন্ত্রিবর রাক্ষসকে এর মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন'? চাণক্য হেসে বললেন—'যে সামন্ত মেয়েটিকে পাঠিয়ে চিঠি লিখেছেন, আসলে সে নামের কোন সামন্তই নেই—কাজেই এ রাক্ষসের কারসাজি—এ বুঝতে কি আর বাকী থাকে'? চন্দ্রগুপ্ত—'তবে জেনে-শুনে আপনি ম্লেচ্ছরাজের শিবিরে মেয়েটিকে পাঠালেন যে! চাণক্য এবার মিষ্টি হাসি হেসে বললেন—'বৎস! তুমি এখনও ছেলেমানুষ! আজ ম্লেচ্ছরাজ পর্ব্বতক বিষকন্যার হাতের সাজা পান খেয়ে রাত্তিরে যে ঘুম দেবেন, তাই হবে তাঁর ইহ জীবনের শেষ ঘুম। কাল সকালে আর তিনি উঠবেন না—তোমার কাছে রাজ্যভাগও চাইতে আসবেন না। বুঝেছ বৃষল'? চন্দ্রগুপ্ত—'কিন্তু লোকে যখন জানবে সব কথা, তখন অখ্যাতি রটবে—যে আমরা বন্ধুকে মেরেছি যড় ক'রে'! চাণক্য—'এই জন্তেই ত আজ সকাল সকাল সভায় এসে সব আগে বিলি-ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছি। তখন ত বাইরের কেউ ছিল না'। চন্দ্রগুপ্ত—'আমরা চার জন ছিলুম আপনি, পর্ব্বতক, আমি আর ম্লেচ্ছরাজের ছেলে মলয়কেতু। সে ত বুঝবে সব।' চাণক্য—'আবে! তাকে ত সব বোঝাতেই হবে—নইলে সে যে তার বাপের বদলে অর্দ্ধেক রাজ্য চাইতে আসবে তোমার কাছে।' চন্দ্রগুপ্ত—'সব খুলে বলুন, প্রভু'। তখন চাণক্য বলতে লাগলেন—'দেখ বৃষল! আজ রাতে বিষকন্যার হাতে সাজা প্রথম পানটি খেলেই পর্ব্বতক ঢ'লে পড়বেন বিছানায়। তাই দেখে ভয় পেয়ে বিষকন্যা চেঁচিয়ে উঠবে—কারণ সে নিজেও জানে না যে তার স্পর্শে বিষ ঢেলে দেয়। পর্ব্বতকের শিবিরের দোরে যে রক্ষী থাকবে আজ রাতে সে আমারই অনুচর—ভাগুরায়ণ। সে বিষকন্যার চিৎকার শুনেই শিবিরে ঢুকে সব দেখবার ভাণ ক'রে বিষকন্যাকে ভয় দেখাবে। তার পর তাকে গোপনে এক তপোবনে পাঠিয়ে দিয়ে মলয়কেতুর শিবিরে ঢুকে পর্ব্বতকের মৃত্যুর খবর দিয়ে তাকেও ভয় দেখাবে—তার ফলে মলয়কেতুও আজ রাতেই এ দেশ ছেড়ে পালাবে। কাল সকালে লোকে জানবে রাক্ষসের চর পর্ব্বতকের প্রাণ নষ্ট করেছে। এই হ'ল আমার ফন্দী'। চন্দ্রগুপ্ত—'অদ্ভুত আপনার ফন্দী! তবে রাক্ষস ত এই সুযোগে মলয়কেতুর দলে মিশে যেতে পারে'। চাণক্য—'তা পারে বটে, তবে তারও ব্যবস্থা আমি ক'রে রেখেছি'। সেদিনকার গুরু-শিষ্যের কথা-বার্ত্তা ঐখানেই শেষ হ'ল।

গভীর রাতে পর্ব্বতকের শিবিরে একটি মেয়েলি কণ্ঠে কান্নার ধ্বনি উঠল। দোরে ছিলেন রক্ষীর বেশে চাণক্যের প্রধান অনুচর ভাগুরায়ণ। তিনি ছুটে গিয়ে দেখেন—পর্ব্বতক তাঁর বিছানায় চিৎ হ'য়ে পড়ে আছেন—দেহে প্রাণ নেই—সর্ব্বাঙ্গ নীল হ'য়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তলোয়ার খুলে বিষকন্যার সামনে এসে বললেন—'এ নিশ্চয়ই তোমার কাজ! তুমি রাক্ষসের চর কি না—বল—নইলে রক্ষা নেই'। বিষকন্যা এ বিপদে হকচকিয়ে গিয়েছিল—সে ব'লে ফেললে—'হঁ, রাক্ষসই আমায় পাঠিয়েছেন'। ভাগুরায়ণ—'দেখ বাছা, আমি স্ত্রীহত্যা করতে চাই না। কিন্তু লোকে জানলে বলবে তুমি রাক্ষসের চর—বিষ দিয়ে ম্লেচ্ছরাজকে মেরেছ—তারা তোমাকে কেটে ফেলতে একটুও ইতস্ততঃ করবে না। তাই বলি কি, বাছা, তুমি লোক-জানাজানি হবার আগে তোমার দামী কাপড়-গয়না সব খুলে রেখে এই গেরুয়াখানি প'রে পালাও—আমি সঙ্গে লোক দিচ্ছি এখন ছাই মেখে গেরুয়া প'রে সন্ন্যাসিনী সেজে এক তপোবনে থাকো গিয়ে—সব হাঙ্গাম চুকে গেলে যেখানে খুসী যেও'। বিষকন্যা ত ভয়ে কাঁপছিল—ভাগুরায়ণের কথায় কোন প্রতিবাদ না ক'রে সন্ন্যাসিনীর বেশে বেড়িয়ে পড়ল—চাণক্যের এক চরের সঙ্গে। যে তাপাবনে সে গেল—সেখানে সে নজরবন্দী রইল—চাণক্যের চরেদের কাছে।

তার পর ভাগুরায়ণ হন্ত-দন্ত হ'য়ে ঢুকলেন মলয়কেতুর শিবিরে—ঘুম ভাঙিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন—'সর্ব্বনাশ হয়েছে কুমার! পাপিষ্ঠ চাণক্য বিষ দিয়ে আপনার বাবাকে এই মাত্র মেরেছে—

প্রাণিজগতের বিস্ময়

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ঘোষ

প্রাণিজগতের মধ্যে লুকিয়ে আছে নানান বিচিত্র খবর। এই সব বিস্ময়কর খবরগুলির কয়েকটি আজ শোনাব তোমাদের, শোন তবে এখন।

চীন ও জাপানে Raccoon dog নামে এক জাতের কুকুর দেখতে পাওয়া যায়। এদের শরীর লিকলিকে, কান দু'টো লম্বা আর মুখ সরু। এরা ইঁদুর ইত্যাদি মেরে খায়। কিন্তু শীতকালে এদের মুস্কিলে পড়তে হয়। খাবার পাওয়া এদের পক্ষে দুর্ঘট হয় তখন। বরফের চাপ ভেঙে যাওয়ায় যে দুই-চারটা মাছ এরা পায় তাতেই খুশী থাকতে হয় তখন এদের। কেউ কেউ বা এ সব হাঙ্গামা পছন্দ করে না। এক ঘুমেই তারা সারা শীতকাল কাটিয়ে দেয়।

লা ভারি নামে এক নামজাদা এনথপলজিষ্ট 'বেলবার্ড' নামক এক জাতের পাখীর খবর জানিয়েছেন। এই 'বেলবার্ড' বাস করে নিউ-গুয়েনায় গভীর জঙ্গলে। এদের ডাক শুনলে মনে হয় যেন ঘণ্টা বাজছে।

এবার বলি পিঁপড়ের কথা। পিঁপড়েদের শুধু নিরীহ পরিশ্রমী প্রাণী ভাবলে ভুল হবে। গভীর জঙ্গলে 'ড্রাইভার এ্যাণ্ট' নামে এক জাতের পিঁপড়ে থাকে। এরা দলবদ্ধ ভাবে বাস করে। মাঝে মাঝে এরা শিকারের খোঁজে বার হয়। তখন এদের সামনে সিংহ বা হাতী কিংবা গণ্ডার—যত বড় হিংস্র, শক্তিশালী বা বুদ্ধিমান জন্তুই পড়ুক না কেন, তার পক্ষে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। বিখ্যাত শিকারী ডেভিড লিভিংষ্টোন এই 'ড্রাইভার এ্যাণ্টে'র কবলে পড়েই প্রাণত্যাগ করেছিলেন। কেবল এক জাতের মাছি এদের কিছু অনিষ্টসাধন করে। তারা এদের ডিম নষ্ট করে ফেলে। কিন্তু 'ড্রাইভার এ্যাণ্ট' তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

গভীর জঙ্গলের মধ্যে এমন অনেক সাপ দেখতে পাওয়া যায় যাদের দেহের বর্ণ বিচিত্র। এর কারণ কি তা তোমরা জান কি? গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া সূর্য্য-কিরণ ঢুকতে পারে না; পাতার ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু সূর্য্যকিরণ ভিতরে ঢোকে তা এদের দেহের উপর পড়ে এদের বর্ণ করে তোলে বিচিত্র।

ব্যাঙকে আমরা নিরীহ এবং সাপদের শিকার বলেই জানি। কিন্তু এই ব্যাঙদের মধ্যেও বিস্ময় লুকিয়ে আছে। ব্রেজিলের 'সেরাটফ্রিস্' এবং পানামার 'পানামা ফ্রগ' নামের দুই জাতের ব্যাঙ আছে। সাপ এদের খাদ্য। এদের নাকের উপর খড়্গ আছে এবং এদের ডাক শুনলে মনে হয় কুকুর ডাকছে।

প্রাণি-জগতের এই সকল বিচিত্র আর বিস্ময়কর খবর শুনতে অবাক্ হয়ে যেতে হয় না কি?

এই বার আপনার পালা। আপনি এখুনি পালান—আমি ঘোড়া সাজিয়ে রেখেছি। একেবারে সোজা আপনার রাজ্যে চ'লে যান। যাবার সময় আপনার সেনাপতিকে ব'লে যান যেন সে কালই ছাউনী তুলে নিয়ে ফিরে যায় আপনার রাজ্যে। আপনার সঙ্গে দেহরক্ষী দিচ্ছি—দশ জন।' মলয়কেতু এ অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে এমনই হতভম্ব হ'য়ে পড়েছিলেন যে তাঁর মুখে আর কথা সরল না। কলের পুতুলের মত তাঁর বাপের শিবিরে ঢু'কে একবার দেখলেন তাঁর সেই বিধাক্ত বীভৎস দেহ। চোখের কোণে জল আসছিল; কিন্তু বুঝলেন এ শোকের সময় নয়, তাই অশ্রু চেপে তিনি তখনই ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। [ক্রমশঃ।

বিষ্টি পড়ে

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

বিষ্টি পড়ে টুপুর টাপুর নদীর কিনারে,
বিষ্টি পড়ে খড়ের ঘরে, কুতুব মিনারে।
কাজল-কালো মেঘে মেঘে আকাশ ঢেকেচে,
নীল সায়রে দোয়াত কে সব উল্টে রেখেচে!
বিজলী নাচে কড়-কড়াকড় বাজের আওয়াজে
ছুটচে বেগে আগল-ছাড়া পাগল হাওয়া যে।
ভেকের চলে মকমকানি আজকে বাদরে—
মাছ-রাঙা আর শঙ্খচিলের পুলক না ধরে।
ঝমঝমাঝম্ বিষ্টি পড়ে আকাশ পাতালে,
বাংলা দেশের বর্ষা আমার পরাণ মাতালে।
বেশ লাগে এই দেখতে দূরে জানলা পথে হে
বুধো কাহার ভিজচে কেমন 'গরুর রথে' হে।
ভাঙা ছাতায় মণ্টু ভিজে আলগা কাপড়ে
আনতে গিয়ে পাঁপর সে আজ পড়লো কাঁপরে।
একটা কুকুর পিছলে পড়ে কাদার ঢেলাতে,
সূয্যি মামা ডুব দিল ভাই দিনের বেলাতে।
দেখছি এবং ভাবচি শুধু উদাস ধরণে
যে সব কথা ভুলছি—সে সব আসচে স্মরণে।

গল্প হলেও সত্যি

শ্রীহারাধন দে

ইলিনোয়ার কোর্টে বিচার হচ্ছে।

এক তরুণ ব্যবহারাজীব একই দিনে একই বিচারকের সম্মুখে দুটো মামলা পরিচালনা করছেন। ব্যবহারাজীব ভদ্রলোকটি তরুণ হলেও বুদ্ধিমান এবং অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে তাঁর কর্তব্য পালন করছেন। তাঁর বাচনভঙ্গী, আইনের জ্ঞান ও আকর্ষণ করার ক্ষমতা অদ্ভুত।

কিন্তু মামলা দুটোর বিশেষত্ব এই যে, দুটো মামলাতে একই আইন প্রযোজ্য। এদিকে আইনজীবী ভদ্রলোকটি প্রথম মামলায় বাদী এবং দ্বিতীয় মামলায় প্রতিবাদীর পক্ষ নিয়েছেন।

তিনি কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। প্রথম মামলাটি তিনি অত্যন্ত নিপুণ ভাবে পরিচালনা করেছেন। তিনি জানতেন তিনিই জয়ী হবেন। আর হলোও তাই। অত্যন্ত সহজ ভাবে তিনি তাঁর জয় মেনে নিলেন।

তার পর বিকেল বেলা দ্বিতীয় মামলা শুরু হোল। তিনি প্রতিবাদীর পক্ষ নিলেন। প্রথম মামলার সমস্ত গুণগুলি দ্বিতীয় মামলায় রইল। সেই উদ্যোগ, সেই তর্ক, সেই সহজ সাবলীল ভঙ্গী। বিচারক অবাক হলেন। তিনি তাঁর পদমর্যাদাসূচক হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কাউনসেলর, আপনার হঠাৎ মত-পরিবর্তনের কারণ কী!

"ইওর অনর," আইনজীবী ভদ্রলোকটি বললেন, "সকাল বেলায় হয়তো আমি ভুল করেছিলুম. কিন্তু এখন আমি জানি আমি ঠিকই করছি।"

ভদ্রলোকটি কে জান?—

ক্রীতদাসের দরদী বন্ধু আব্রাহাম লিঙ্কন।



দুষ্টু ছেলের ডায়েরী

দীপেন্দ্র সান্যাল

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

সেই দিনই শেষ রাত্তিরের দিকে এই প্রাসাদের মত পুরোন বাড়ী থেকে ছায়ার মত কাকে যেন বেরিয়ে যেতে দেখা গেলো। চিনতে তাকে ভুল হবার কিছু নেই, সেই দুষ্টু ছেলেটিই সাগর।

একটু বোধ হয় দেরীই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জোরে হাঁটবার উপায় নেই। হাতে একটা ব্যাগ আছে—বেশ ভারী সেটা। চলতে বরং একটু কষ্টই হচ্ছিল। ষ্টেশনটা মাত্র কয়েক পা এগিয়ে, এই যা রক্ষে!

কাক-জ্যোৎস্নার পথ দিনে—আলোয় যেমন দেখা যায় তেমনি স্পষ্ট। সমস্ত পল্লীটায় কোথাও আওয়াজ নেই। মাঝে মাঝে গা ছম্-ছম করে, সাগরের জীবনে এ রকম উত্তেজনা এই প্রথম। শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে থেকে থেকে, পাখীর গলাও যে পাওয়া যাচ্ছে না তা নয়। রাতের জ্যোৎস্নার এই অদ্ভুত আলোয়, দিন বলে ভুল করেছে ওরা। বাড়ী থেকে বেরুবার আগে যে কথাটা মনে ওঠেনি একদম—এখন সেই কথাটাই পেয়ে বসল সাগরকে। যাচ্ছে ত কোলকাতায়, সেখানে গিয়ে উঠবে কোথায়, খাবে কি, চলবে কি কোরে? না, এ সব কথা ত মনেই হয়নি আগে। যতই এসব কথা মনে কোরতে চেষ্টা করে, ততই সাগরের যাবার উৎসাহ কমে আসতে লাগল। দস্তুরমত ভয় কোরতে লাগল তার। দূর:, গিয়ে কাজ নেই—এক একবার সাগরের মনে হয় হঠাৎ।

না, ফেরা আর যায় না কোন রকমেই। ওই বাড়ীতে আবার! সাগর আবার ফুলে উঠতে লাগল। কিছুতেই নয়। কোলকাতায় সে যাবেই, যেমন কোরেই হোক। এত লোকের সেখানে দিন চলছে আর তার চলবে না? এখনকার মত সে গিয়ে, উঠবে কোন হোটেলে, তার পর—তার পর কাজ কি আর জোটে না কারুর? কিন্তু তাকে দিয়ে কি কাজ হতে পারে? ম্যাট্রিকটা পর্য্যন্ত পাশ করেনি যে সে। আবার একটু ম্লান দেখায় না কি সাগরের মুখ? না, ম্লান হলে তার চলবে কেন?

ভাবতে ভাবতে সে এসে পড়েছে ষ্টেশনের মধ্যে, কিন্তু-এ কি? ট্রেণ যে ছেড়ে যাচ্ছে—ছাড়বার ঘণ্টাই ত দিচ্ছে না? হ্যাঁ, ওই ত গার্ডের হাতে ফ্ল্যাগ দেখা গেলো। সাগর দৌড়ে এল একেবারে সামনে যে গাড়ীখানা পড়ল, এক ভদ্রলোক দরজাটা খুলে তার ব্যাগটা হাত থেকে নিয়ে গাড়ীতে তুলে নিলেন। সাগর গাড়ীতে উঠতেই ট্রেণ চলতে সুরু কোরে দিল।

২

ভোরের আলো তখন আকাশে এসে গেছে। এতক্ষণে সাগরের চোখ পড়ল সেই ভদ্রলোকের দিকে, সুন্দর মুখে অল্প অল্প হাসি। খদ্দরের পাঞ্জাবী আর ধুতি পরেছেন আর পায়ে দিয়েছেন একটা সাধারণ মাদ্রাজী চটি। তাঁকে দেখেই সাগরের মনে হোল এ চেহারা যেন তার পরিচিত। কিন্তু কোথায় সে এই ভদ্রলোককে দেখেছে তা কিছুতেই মনে কোরতে পারল না সাগর।

এবারে অন্য দিকে চোখ ফেরালে সাগর। থার্ড ক্লাস কামরা। আরো জনা-তিনেক লোক ঘুমিয়ে। ছোট গাড়ী—কিন্তু প্রায় সবটাই ফাঁকা। সাগর গিয়ে বসল ভদ্রলোক যেখানে বসেছিলেন, তার উল্টো দিকে এক বেঞ্চে। এইবার সমস্ত ভেবে দেখবার চেষ্টা কোরল সে। টিকিট কেনা হয়নি—তার মানে একটা হাঙ্গামা বাধবে আর কি! মনে মনে একটু ভয়ই পেল সাগর। কে জানে কত বেশী দিতে হবে এর জন্তে। আর তাও জন্তেও নয়। এই সূত্রে যদি তার আসল পরিচয় বেরিয়ে যায়। ব্যস, তা হলেই ত হয়েছে আর কি! ভাবতেও সাগর শিউরে উঠলো। উত্তেজনা অস্বস্তিতে সাগর ভালো করে বসতে পর্য্যন্ত পারছে না। ট্রেণে সে যখনই কোথাও গেছে—জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখার মধ্যে কি আশ্চর্য্য একটা মোহ ছিল। কিন্তু সেদিন ছোট ছিল বলে মা জানলার ধারে বসতে দেয়নি। আর আজ জানলার ধারে বসেই—যখন কেউ কিছু বলবার নেই, সেই দুর্লভ মুহূর্ত্তেই বাইরের দিকে তাকাবার মত মনের অবস্থাও নেই।

একে টিকিট নেই, তায় যাচ্ছে অজানা কোলকাতায়, একদম একা—সেখানে থাকবার ঠিক নেই—নেই খাবারের ঠিক। সমস্ত ভাবনাগুলো মিলিয়ে সাগরকে কি রকম অবসন্ন কোরে দিল।

এক একবার ভাবে—বলবে না কি সব কথা এই ভদ্রলোককে। ওঁকে দেখলেই কি রকম একটা শ্রদ্ধা হয়, ভারী চেনা লোকের মত মনে হয়। না থাক, আবার পরমুহূর্ত্তেই মনে হয় সাগরের—কি দরকার, যদি সব বেরিয়ে পড়ে? নানা রকম ভাবনার দোলায় দুলতে থাকে সাগর।

এমন সময় জেগে উঠলেন আর তিন জন যাত্রী। তাঁদের যতটা অবাক হবার কথা সাগরকে দেখে তার চেয়ে ঢের বেশী অবাক হয়েছেন বলে মনে হোল। বোধ হয় সাগরের মত একটা ছেলেকে একলা এ রকম যেতে দেখলে আশ্চর্য্য হবারই কথা এ দেশে। এই বয়সে যে কত লোক দিগ্বিজয় কোরে বেরিয়েছে আমরা যেন হঠাৎ সেটা বিশ্বাস কোরতে পারিনি। বইয়ের পাতার গল্প ছাড়া ওর আর কি মূল্য আছে আমাদের জীবনে? সাগর একটু অপ্রস্তুত হোলেও আশ্চর্য্য হোল না। তার মন তখন অন্য চিন্তায় ব্যস্ত।

তখন বেলা হয়েছে বেশ। বেশীক্ষণ তাঁরা আর সাগরের দিকে মন দিতে পারলেন না। এর পরের ষ্টেশনেই তাঁদের নেমে যেতে হবে। জিনিষপত্র-বিছানা বাঁধতেই বাকী সময়টা যাবে। সাগরও দু'-একবারের বেশী তাঁদের দিকে তাকায়নি। সাগর চেয়েছিল সেই ভদ্রলোকটির দিকে। প্রশান্ত হাসিতে উদ্ভাসিত ওই সৌম্যমূর্ত্তি লোকটিকে এদের পাশে কেমন যেন খাপছাড়া ঠেকে সাগরের। জংশনে

গাড়ী এসে লাগতেই বাকী তিন জন যাত্রী কথা বলতে বলতে পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে তাঁরা একে একে নেমে গেলেন সবাই।

সাগর যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আর একবার সে তাকাল সেই ভদ্রলোকের দিকে—তিনি ডুবে গেছেন একটা বইয়ের মধ্যে।

আরও দু'টো ষ্টেশান পেরোবার পর একজন ফিরিঙ্গি টিকিট-চেকার উঠলো গাড়ীতে। সাগরের মুখ সাদা হয়ে গেলো এক মুহূর্ত্তে মধ্যে। ভদ্রলোকের টিকিট চেক করান কখন হয়ে গেছে, সাগর জানে না। এমন সময় হঠাৎ কানে এলো :—'Ticket please.'

সাগরের কান দু'টা লাল হয়ে উঠলো। দু'-একটা কথা বলতে গিয়ে জিভে সব যেন জড়িয়ে যেতে লাগল। আবার চেকার হাঁকলো —'Hury up, please, hury up.'

ইংরেজীতে সাগর তাকে কি বলতে গেলো—কিন্তু ফিরিঙ্গি সাহেব কিছুই বোঝে না। সে আবার চেঁচালো—'What ?'

এইবার উঠে এলেন সেই ভদ্রলোক। ব্যাপারটা আঁচ করতে তাঁর দেরী হয়নি বেশী। তিনি সাগরকে প্রথমে জিজ্ঞেস কোরলেন, 'কি হয়েছে তোমার ?'

সাগর কোন রকমে বললে—'দেরী হয়ে গিয়েছিল তাই…'

বাকীটা শোনার আগেই টিকিট-চেকারটাকে তিনি বললেন —'এর কোন দোষ নেই। আমি নিজে দেখছি ও শেষ মুহূর্ত্তে ষ্টেশনে এসেছে—কাজেই ভাড়াটা নিয়ে ছেড়ে দাও, আর যদি কিছু বেশী লাগে তাও না হয়'…

টিকিট-চেকারটা তাঁকে বলল—'না, এ সব ছেলে ভয়ানক বদমাস বিনা পয়সায় ট্রেণে চড়াই এদের ব্যবসা।' টিকিট-চেকারটার মতলব ছিল ভয় দখিয়ে সাগরের কাছ থেকে বেশী কিছু যদি আদায় হয়—তবে সেটা তারই লাভ।

ভদ্রলোক এবার বললেন—'এ ছেলেটি বদমাস কি ভাল—সে কথা তোমার কাছ থেকে শোনবার জন্য আমি ব্যস্ত নই। এখন কত দিতে হবে তাই বল ?'

দাঁও ফস্কায় দেখে চেকার এবার গরম হয়ে বললে—'তোমারই বা অত মাথা-ব্যথা কিসের ?'

এবার ভদ্রলোকের উত্তর আরও কড়া।

অবশেষে ক্ষেপে গিয়ে চেকার বললে—'তুমি আমায় অপমান কোরেছ—তোমাকেও আমি সহজে ছাড়ছি না। একে এবং তোমাকে কি কোরতে পারি দেখছি।'

ভদ্রলোক শুধু হাসলেন—কিছু বল্লেন না।

ট্রেণ ষ্টেশনে থামতেই সে নেমে গেলো।

সাগর বিস্ময়ের বেগ সামলাতে সময় নিলো অনেক। তার পর ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে এসে বলল—টাকা যা লাগে আমার কাছে আছে।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও, দরকার হলেই নেব। দেখি কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!'

পরের ষ্টেশনে টিকিট-চেকারটা একেবারে গার্ডকে নিয়ে এসে উঠলো।

গার্ড ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়েই হাত বাড়িয়ে দিলেন—'হ্যালো, মিঃ রায়, তাই বলুন। আপনার সঙ্গেই গোলমাল ?

এক নিমেষে যেন ভোজবাজি ঘটে গেলো। টিকিট-চেকারটাকেও সব ব্যাপার শুনে গার্ড যখন তাঁর পরিচয় দিল—তখন টিকিট চেকারটাও হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে—'Excuse me.'

একটু পরে গার্ডকে সেই ভদ্রলোক বললেন—'তা হলেও আপনি যা লাগে তাই নিন, কোম্পানীর নিয়ম ত আর আপনারা ভঙ্গ করতে পারেন না ?'

গার্ড বললেন—'হাঁ, সে কথা ত ঠিকই। তবে excess কিছু দিতে হবে না। সে আমি ঠিক কোরে দেব।'

ভদ্রলোক নিজের পকেট থেকে টাকা বার করে দিলেন।

গার্ড টাকা নিয়ে রিসিট দিয়ে নেমে গেলেন।

গাড়ী হাওড়া ষ্টেশানে ঢুকতেই সাগর ভদ্রলোককে প্রণাম কোরতে যেই নীচু হয়েছে অমনি তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তিনি বললেন—'থাক, থাক, প্রণাম কোরতে হবে না, এমনিই তোমায় আশীর্ব্বাদ কোরছি ভাই।'

গাড়ী তখনও থামেনি ভালো কোরে,—সাগর চমকে গেলো—পুলিশ এবং সঙ্গে কোন পুলিশের অফিসার হবে—দরজায় দাঁড়িয়ে। মুখ সাদা হয়ে গেলো সাগরের।

হাসছেন ভদ্রলোক। পুলিশ অফিসারটি এসে ওয়ারেন্ট মেলে ধরলো।

ভদ্রলোক হেসে বললেন—'Yes, I am ready—তৈরীই আছি—চলুন।'

সাগর ঝুঁকে পড়ে কাগজটা দেখল :—সত্যব্রত রায়।

এই সেই সত্যব্রত রায়—বিখ্যাত সত্যাগ্রহী!

ততক্ষণে ওঁরা বাইরে বেরিয়ে পড়েছেন।

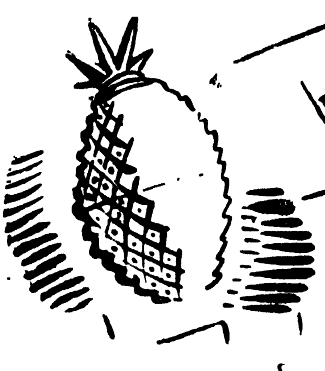
বিস্ময়ে হতবাক্ সাগর দেশনেতার উদ্দেশ্যে আরেক বার প্রণাম জানালো!

[ক্রমশঃ।

সত্যি কথা

অনুপম গুপ্ত

ছোট ছোট ছেলে মেয়ে হরদম লাফাবে
হুড়োহুড়ি দিন রাত হাসবে ও হাসাবে।
বুড়ো দাদু বলে যদি গোলমাল থামা না,
রেগে তারা চলে যাবে শুনবে না সে মানা।
ভাঙা চোরা করলেই এ তাদের ধর্ম্ম,
জোর করে থামাস যে জানে না এ মর্ম্ম।
নাচি ছেলে নাহি খেলে চুপ করে বসবে,
চঞ্চল ভাব নেই শুধু আঁক কষবে,
বাপ-মা'রা চান বটে ছেলে হোক শান্ত,
বাকি পোষাতে হায় হ'ল যে প্রাণান্ত।
তাদের জানাতে চাই হবে তাও একদিন,
ইঁচড়ে পাকাতে গেলে শক্তিটা হবে ক্ষীণ।
ছোটদের জোর করে বুড়িয়ে দিলে পরে,
সুঠাম স্বর্ণাভ হবে অকালেই যাবে ঝরে।



সোনার আনারস

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ষষ্ঠ

"ডোল্! ডোল্!"

জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্ত দেখলে, তার বুকের উপরে ঝুঁকে রয়েছে একখানা উদ্বিগ্ন মুখ। সে মুখ সুন্দর বাবুর।

সুন্দর বাবু উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, "হুম্, বাঁচলুম! জয়ন্তের জ্ঞান হয়েছে!"

জয়ন্ত শ্রান্ত স্বরে বললে, "আমার কি হয়েছে সুন্দর বাবু? চোখে কেন ঝাপ্‌সা দেখছি—মাথার ভিতরে বিষম যন্ত্রণা, নিশ্বাস টানতেও কষ্ট হচ্ছে!"

সুন্দর বাবু বললেন, "তোমরা কোথায় গিয়েছিলে তা কি মনে পড়ছে না?"

—"কোথায়?"

—"প্রতাপ চৌধুরীর বাড়ীতে!"

ধাঁ ক'রে জয়ন্তের মনের পটে ফুটে উঠল যেন একখানা বিদ্যুতে-আঁকা চলচ্চিত্র! দৃশ্যের পর দৃশ্য পরিবর্ত্তন! নিশীথ রাত্রি, মাণিকচাঁদের আবির্ভাব, প্রতাপ চৌধুরীর বাড়ী, শত্রুদের আক্রমণ, অন্ধকার ঘর, ভুষো পাগ্‌লার অট্টহাসি—তার পর বিষাক্ত বোমার বিস্ফোরণ!

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি উঠে বসবার চেষ্টা করতেই সুন্দর বাবু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "না জয়ন্ত, না! ডাক্তার বাবু ব'লে গিয়েছেন, এখনো দু-তিন দিন তোমাকে বিছানাতেই শুয়ে থাকতে হবে।"

—"মাণিক কোথায় মাণিক?"

ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে ক্ষীণ স্বরে জবাব এল, "জয়, এই যে আমি! তোমার আগেই আমার জ্ঞান হয়েছে। কিন্তু শরীরে যেন আর পদার্থ নেই!"

—"ভগবানকে ধন্যবাদ, মাণিকও আমার সঙ্গে আছে! ভুষো পাগলার খবর কি?"

সুন্দর বাবু বললেন, "তাকেও এনেছি, তার জ্ঞান হয়েছে সকলের আগে।"

—"কোথায় সে?"

—"এই বাড়ীরই অন্য একটা ঘরে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে।"

জয়ন্ত অল্পক্ষণ চুপ ক'রে ভাবতে লাগল। তার পর বললে, "সুন্দর বাবু, ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। কালকের নাট্যাভিনয়ে আপনার আবির্ভাব হ'ল কোন্ ভূমিকায়, কখন্ আর কোথায়?"

সুন্দর বাবু বললেন, "জয়ন্ত, তুমি বড় বেশী বকাবকি করছ। আগে আর-একটু সুস্থ হও, তার পর কাল সব শুনো।"

সত্য কথা। জয়ন্তের মাথার ভিতরটা তখনও রীতিমত ধোঁয়াটে আর ঘোলাটে হয়েছিল এবং থেকে থেকে তার দমও যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। কিন্তু নিজের সমস্ত দুর্ব্বলতাকে প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা দমন ক'রে সে বললে, "সুন্দর বাবু, সব কথা না শুনলে মন আমার শান্ত হবে না।"

সুন্দর বাবু বললেন, "তা আবার আমি জানি না? ও মন আবার শান্ত হবে? হুম! ও মন যে দুর্দ্দান্ত মন! সব জানি, সব জানি!"

জয়ন্ত হাসবার চেষ্টা করে বললে, "জানেন তো কষ্ট দিচ্ছেন কেন? এই আমি দুই চোখ বন্ধ ক'রে খুলে রাখলুম দুই কাণ। এখন খুলুন আপনার মুখ!"

ওদিক্‌কার বিছানা থেকে মাণিক তেমনি ক্ষীণ স্বরেই বললে, "কিন্তু সাবধান সুন্দর বাবু সাবধান!"

সুন্দর বাবু চম্‌কে উঠে ঘরের এদিকে-ওদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "সাবধান হ'তে বলছ কেন মাণিক?"

—"ম্যালেরিয়ার মশা কামড়ালেই ম্যালেরিয়া হয়।"

—"হোক্ গে, তাতে আমার কি?"

—"এখানে ম্যালেরিয়ার মশা আছে।"

—"এই বিশ্রী পাড়াগাঁয়ে যে লাখো লাখো ম্যালেরিয়ার মশা আছে, তা কি আমি জানি না? কিন্তু আচম্‌কা তুমি ধান ভান্‌তে শিবের গান গাইছ কেন?"

—"জয়ন্ত আপনাকে মুখ খুলতে বলছে। কিন্তু যে মশারা বাইরে থেকে কুটুস্ ক'রে কামড়ালেই ম্যালেরিয়ায় ধরে, মুখ খোলা পেয়ে সেই মশারা যদি দল বেঁধে আপনার বিপুল ভুঁড়ির অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহ'লে আপনি তাদের হজম করতে পারবেন কি? তারা হুল ফুটিয়ে দেবে আপনার পিলে, লিভার আর হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির উপরে! তখন? তখন কি হবে? এই সব ভেবে-চিন্তেই আমি আপনাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি! এখানে মুখ খোলা নিরাপদ নয় সুন্দর বাবু! আমি আপনার বন্ধু, আপনার হাঁপরের মতন মস্ত উদর যে ম্যালেরিয়ার আস্তানায় পরিণত হয়, এটা আমি ইচ্ছা করি না। সাবধান!"

সুন্দর বাবু রেগে তিড়-বিড় করতে করতে বললেন, "মাণিক! তুমি হচ্ছ ঝাল ধানী-লঙ্কার মত অসহনীয়! প্রায় মরতে বসেছ, তবু জোঁকের মত আমার পিছনে লাগতে ছাড়বে না?"

মাণিক ঠোঁট টিপে চাপা হাসি হাসতে হাসতে বললে, "আপনাকে যে বড্ড ভালোবাসি সুন্দর বাবু! আপনাকে কি ছাড়তে পারি?" এই ব'লেই সে বিছানার উপরে টপ্ করে উঠে ব'সে দুই বাহু বিস্তার ক'রে বললে, "আমি আপনাকে ছাড়ব? আমি এখনি শয্যা ছেড়ে আপনাকে পরম শ্রদ্ধাভরে আলিঙ্গন করব!"

সুন্দর বাবু এক লাফে তার কাছে গিয়ে প'ড়ে চীৎকার ক'রে বললেন, "মাণিক! আমি নিষেধ করছি—তুমি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না! ডাক্তার বলেছেন, তাহ'লে তোমার অসুখ বাড়বে। শুয়ে পড়, এখনি শুয়ে পড়!"

মাণিক খাট ছেড়ে নামবার চেষ্টা ক'রে মাথা নেড়ে বললে, "না, আমি আপনাকে ছাড়ব না! আমি আপনাকে আলিঙ্গন করব!"

সুন্দর বাবু তাড়াতাড়ি তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন এবং তার পর তাকে ধীরে ধীরে আবার বিছানার উপরে শুইয়ে দিয়ে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, "মাণিক, অকারণে বাক্য-বিষ ছড়িয়ে কেন আমায় জ্বালাও বল দেখি? কেন তুমি খালি খালি আমাকে রাগিয়ে দাও? তুমি কি জানো না, জয়ন্ত আর তোমাকে আমি কত ভালোবাসি? হুম!"

জয়ন্ত বিরক্ত স্বরে বললে, "মাণিক, তোমার এই অসাময়িক প্রহসনের অভিনয় আজ আমার ভালো লাগছে না! যেখানে জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর যুদ্ধ সেখানে প্রহসন আমি পছন্দ করি না। আসুন সুন্দর বাবু, বলুন আপনার কথা।"

মাণিক খিল্-খিল্ ক'রে হেসে উঠে বললে, "ভাই জয়, জীবন আর মৃত্যু নিয়ে সখের খেলাই হচ্ছে যে আমাদের ব্যবসা! প্রহসনের অভিনয় তো এখানেই সাজে!"

—"হাত জোড় করি ভাই মাণিক! তোমার দার্শনিকতার লেক্‌চার থামাও, সুন্দর বাবুর কথা শুনতে দাও।"

সুন্দর বাবু বললেন, "আমার কথা বলব কি ভাই জয়ন্ত, সব কথা আমি নিজেই এখনো ভালো ক'রে বুঝতে পারিনি।

"রাত্রি বেলায় তুমি আর মাণিক তো প্রতাপ চৌধুরীর বাড়ীর দিকে যাত্রা করলে, আমি একলা ঘরে ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলুম কত রকম দুর্ভাবনা! ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, শেষ রাতের অন্ধকার ঠেলে ফুটল সকালের আলো, তবু তোমাদের দেখা নেই!

"ভেবে ভেবে আমি পাগলের মতন হয়ে উঠলুম। বুঝলুম নিশ্চয়ই তোমরা কোন বিপদে পড়েছ। হয়তো তোমরা আর বেঁচে নেই, এমন সন্দেহও হল। সুব্রত বাবুও বললেন, মানুষ খুন করতে নাকি প্রতাপ চৌধুরীর একটুও বাধে না।

"হাজার হোক আমি পুলিসের লোক তো, এই কাজে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছি—হুম্, ভেবে সারা হ'লেও বুদ্ধি হারিয়ে ফেলি না! দুশ্চিন্তার কালো মেঘের মধ্যে হঠাৎ আবিষ্কার করলুম একটুখানি আশার আলো!

সুব্রত বাবুকে নিয়ে ছুটলুম এখানকার থানায়। নিজের আর তোমাদের পরিচয় দিয়ে দারোগা বাবুর কাছে সব কথা খুলে বললুম। তিনি তখনি কয়েক জন চৌকীদার নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তোমাদের খোঁজে সকলে মিলে ছুটলুম প্রতাপ চৌধুরীর বাড়ীর দিকে।

"বাড়ীর সদর দরজায় তখন আর বাহির থেকে তালা দেওয়া ছিল না। পাল্লা দু'খানা বন্ধ ছিল ভিতর দিক থেকেই। কিন্তু যখন ডাকাডাকির পরেও কারুর সাড়া পাওয়া গেল না, তখন দরজা ভেঙেই আমরা বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলুম। তার পর দেখলুম, উঠানের উপরে প'ড়ে রয়েছে তোমাদের তিন জনের অচেতন দেহ। তার পর—"

জয়ন্ত বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আমাদের দেহ ছিল কোথায়?"

—"বাড়ীর একতলার উঠানের উপরে।"

মাণিক বললে, "কিন্তু বিষাক্ত গ্যাসের বোমায় আমরা জ্ঞান হারিয়েছিলুম দোতলার একখানা ঘরের ভিতরে।"

জয়ন্ত বললে, "বোঝা যাচ্ছে শত্রুরা আমাদের দেহগুলোকে একতলায় নামিয়ে এনেছিল।"

—"কিন্তু কেন?"

—"খুব সম্ভব তারা চেয়েছিল আমাদের দেহগুলোকে স্থানান্তরে সরিয়ে ফেলতে! কিন্তু যথাসময়ে সদলবলে সুন্দর বাবুর আবির্ভাব হয়েছিল তাই রক্ষা, নইলে আমাদের কি দুর্দশা হ'ত কে জানে!"

—"জয়ন্ত, তুমি 'শত্রু শত্রু' কর বটে, আমরা কিন্তু সারা বাড়ী তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন শত্রুর একগাছা টিকি পর্য্যন্ত আবিষ্কার করতে পারিনি।"

—"তারা আপনাদের দেখে চম্পট দিয়েছিল।"

—"তাও সম্ভবপর নয়। পাছে তারা পালায় তাই আমরা চারি দিক থেকে বাড়ীখানাকে ঘিরে অগ্রসর হয়েছিলুম।"

—"তাহ'লে তারা পালালো কেমন করে?"

—"সেইটেই তো সমস্যা! আর একটা কথাও মনে রেখো। বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ ছিল ভিতর দিক্ থেকে।"

জয়ন্ত গম্ভীর ভাবে বললে, "হ্যাঁ, এটা একটা ভাববার কথা বটে। ও-বাড়ীর সদরে বাহিরে তালা দেওয়া থাকলেও ভিতরে বাস করে মানুষ। আবার ও-বাড়ীর সদর ভিতর থেকে বন্ধ থাকলেও ভিতরে ঢুকে মানুষের খোঁজ পাওয়া যায় না। এ এক অদ্ভুত রহস্য!"

ঠিক সেই সময়ে একটি নতুন লোক ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন।

সুন্দর বাবু বললেন, "নমস্কার দারোগা বাবু। নতুন কোন খবর আছে?"

—"আছে।"

—"কি?"

প্রতাপ চৌধুরীর বাড়ীতে আমার এক চৌকিদারকে পাহারায় রেখে এসেছিলুম জানেন তো? আজ সে মারা পড়েছে।"

—"কেন?"

—"কে তাকে খুন করেছে।"

—"খুন!"

—হ্যাঁ। আমরা যখন ঘটনাস্থলে যাই তখনও সে বেঁচেছিল বটে তবে সেটা না-বাঁচারই সামিল। কারণ দু'চার বার অস্ফুট স্বরে 'ডোল্ ডোল্' ব'লেই সে মারা পড়ে। তার বুকে আর মুখে ছোরা মারার চিহ্ন।"

জয়ন্ত বললে, "ডোল্ মানে?"

—"চৌকিদার ঠিক কি বলতে চেয়েছিল আমিও তা বুঝতে পারিনি! তবে এটা দেখেছি, প্রতাপ চৌধুরীর বাড়ীর একতলায় সিঁড়ির খিলানের তলায় একটা চৌবাচ্চার মতন বড় লোহার ডোল্ বা জলাধার আছে। চৌকীদারের দেহ পাওয়া যায় ঠিক তার পাশেই। কিন্তু তার সঙ্গে চৌকীদারের মৃত্যুর কি সম্পর্ক থাকতে পারে?"

সুন্দর বাবু বললেন, "বোধ হয় মরবার সময়ে লোকটা প্রলাপ বকছিল।"

—"আমারও তাই বিশ্বাস।"

জয়ন্ত বললে, "আমার বিশ্বাস অন্য রকম।"

—"কি রকম?"

—"আপনারা খুব সহজেই ব্যাপারটাকে হাল্‌কা করে ফেলতে চাইছেন। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই হাল্‌কা নয়।"

—"কেন ?"

—"চৌকীদার যে প্রলাপ বকছিল তার কোন প্রমাণ আছে ?"

—"প্রলাপ বলে অর্থহীন কথাকেই।"

—"কে বললে চৌকীদারের কথা অর্থহীন ? আপনারা তার মুখে শুনেছেন 'ডোল্' শব্দটি। আপনারা কি 'ডোল্' বা জলাধার খুঁজে পাননি ?"

"কিন্তু খুঁজে পেয়েও আমাদের কোন্ সমস্যার সমাধান হয়েছে ?"

"সেইটেই বিবেচ্য। অন্তিম কালে চৌকীদারের কথা বলবার শক্তি প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছিল। সে-সময়েও সে যখন কোন রকমে 'ডোল্' শব্দটি উচ্চারণ ক'রে ঐদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল, তখন তার কথার ভিতরে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ অর্থ আছে। এই বিশেষ অর্থটি ধরতে পারলেই হত্যা-রহস্যের কিনারা হ'তে দেরি লাগবে না।"

দারোগা বাবু বললেন, "ডোলটি আমি পরীক্ষা করেছি। তার তলায় প'ড়ে আছে ইঞ্চি-পাঁচেক অতি ময়লা পোকা-ভরা জল—ব্যাস্, আর কিছু নেই।"

—"অতি ময়লা পোকা-ভরা জল ? তার মানে সে জল কেউ ব্যবহার করত না !"

—"তাই তো মনে হয়।"

—"তাহ'লে খানিকটা অব্যবহার্য্য জল ভ'রে ওখানে অত-বড় একটা ডোল্ বসিয়ে রাখবার কারণ কি ?"

—"কেমন ক'রে বলব ?"

জয়ন্ত হঠাৎ প্রশ্ন করলে, "দারোগা বাবু, এখানে পাল্‌কি পাওয়া যায় ?"

—"যায়। কিন্তু কেন ?"

—"আমি এখনি ঘটনাস্থলে একবার যেতে চাই।"

সুন্দর বাবু হাঁ হাঁ ক'রে উঠে বললেন, "তোমার দেহের এই অবস্থায় ? অসম্ভব, অসম্ভব !"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "খুব সম্ভব, খুব সম্ভব ! আমি তো পায়ে হেঁটে যাচ্ছি না ! আমি জানতুম আপনি আপত্তি করবেন, তাই তো পালকিতে চ'ড়ে যাব রুগীর মত।"

মাণিক বললে, "আর আমি ?"

—"আপাততঃ তুমি শয্যাগত হয়েই থাকো। এক-সঙ্গে দু'-দু'টো রুগীকে সুন্দর বাবু সামলাতে পারবেন কেন ?"

আবার প্রতাপ চৌধুরীর বাড়ী। তার চারি দিকে কড়া পুলিস-পাহারা।

উঠানের উপরে দাঁড়িয়ে দারোগা বাবু বললেন, "সিঁড়ির খিলানের তলায় ঐ দেখুন সেই ডোলটা। ওরই পাশে চৌকীদারের দেহ পাওয়া যায়।"

জয়ন্ত ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। একটা গোলাকার লোহার জলাধার। উচ্চতায় আড়াই হাত এবং চওড়ায় তিন হাত। তলার দিকে পড়ে রয়েছে খানিকটা ঘোলা জল।

দারোগা বাবু কৌতুকপূর্ণ হাসি হেসে বললেন, "এর ভিতর থেকে আপনি কোন বিশেষ অর্থ আবিষ্কার করতে পারলেন কি ?"

—"কৈ, এখনো তো কিছুই আবিষ্কার করতে পারিনি।"

—"পরেও পারবেন না মশাই, পরেও পারবেন না ! আমাদের হচ্ছে পেশাদার শিকারীর চোখ, যা দেখবার তা আমরা এক-দৃষ্টিতে দেখে নি !"

—"তা আর বলতে ? আপনাদের সঙ্গে আবার আমার তুলনা ? কিন্তু দারোগা বাবু, আপনার কাছে আমার একটি আরজি আছে।"

—"বলুন।"

—"ডোল্‌টার ভিতরে জল আছে অল্পই, ওটা বোধ হয় বেশী ভারি নয়। অনুগ্রহ ক'রে আপনার চৌকীদারদের হুকুম দিন, অন্ধকার খিলানের তলা থেকে ডোল্‌টাকে উঠানের মাঝখানে টেনে আনতে আমি ওটাকে আরো ভালো ক'রে দেখতে চাই।"

—"খুব ভালো ক'রে দেখুন, ভালো ক'রে প্রাণ ভ'রে নয়ন ভ'রে দেখুন, আমার একটুও আপত্তি নেই। ওরে, তোরা ডোল্‌টাকে উঠানের মাঝখানে টেনে আন্ তো ! আমাদের সখের গোয়েন্দা মশাই ওটাকে ভালো ক'রে দেখতে চান !"

দারোগা বাবু গলা চড়িয়ে হাসতে লাগলেন, কিন্তু সুন্দর বাবু হাসবার চেষ্টা করলেন না। জয়ন্তকে তিনি চিনতেন। আগে আগে তাঁকেও বারংবার হেসে ঠকতে হয়েছে। জয়ন্ত অকারণে কিছু বলে না, দারোগার হাসি বন্ধ হতে আর দেরি নেই বোধ হয়; জয়ন্তের কথাবার্ত্তায় পাওয়া যাচ্ছে যেন কি এক সম্ভাবনার ইঙ্গিত !

চৌকীদাররা ডোল্‌টাকে সশব্দে টানতে টানতে উঠানের মাঝখানে নিয়ে এল। জয়ন্ত সেদিকে ফিরেও তাকালে না।

দারোগা বাবু বললেন, "ও মশাই, বলি আপনার হ'ল কি ? ডোল্‌টাকে ভালো ক'রে দেখবেন বললেন না ? তবে ওদিকে মুখ ফিরিয়ে কি দেখছেন ? ডোল্ তো আর ওখানে নেই।······আরে, আরে, ও আবার কি !" তাঁর দুই চক্ষু ছানাবড়ার মত হয়ে উঠল চরম বিস্ময়ে !

সুন্দর বাবু দুই পদ অগ্রসর হয়ে কেবলমাত্র বললেন, "হুম্, হুম্ !"

ঠোঁট টিপে মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে জয়ন্ত বললে, "দারোগা বাবু, সিঁড়ির তলায় এটা কি দেখছেন তো ?"

হাঁদারামের মতন মুখ ক'রে দারোগা বললেন, "একটা বড় গর্ত্ত !"

—"খালি গর্ত্ত নয় গর্ত্তের ভিতর দিকে নেমে গিয়েছে এক সার সিঁড়ি।"

সুন্দর বাবু বললেন, "গুপ্ত পথ !"

—"হ্যাঁ। যখনি দেখলুম সদর দরজা ভিতর বা বাহির থেকে বন্ধ থাকলেও বাড়ীর লোকরা বাড়ীর ভিতরে বা বাহিরে আনাগোনা করতে পারে, তখনি আন্দাজ করলুম, এ-বাড়ীর কোথাও-না-কোথাও গুপ্ত পথের অস্তিত্ব আছে। তার পর শুনলুম চৌকীদারের অন্তিম উক্তি—'ডোল্ ! ডোল্ !' এও শোনা গেল, চৌকীদারের যেখানে মৃত্যু হয় তার পাশেই পাওয়া যায় একটা মস্ত ডোল্। অবশ্য গুপ্ত পথ পাওয়া যাবে যে ডোলের তলাতেই, তখনো পর্য্যন্ত সেটা আমি আন্দাজ করতে পারিনি। কিন্তু এটুকু আমি নিশ্চিতরূপেই বুঝেছিলুম যে, এই ডোল্‌টাকে অবহেলা ক'রে উড়িয়ে না দিলে কোন-না-কোন্ মূল্যবান তথ্য প্রকাশ পাবেই। আমার ধারণা যে ভুল নয়, এটা কি এখন আপনি স্বীকার করেন দারোগা বাবু ?"



প্রভাত বসু

রামধন পাল নেছে পুলিশেতে চাকরী
কারো যদি চুরি যায় নেকলেস্, মাকৃড়ি
কিংবা ছাগলছানা', গল্পের বই
বাক্স, লাটাই-ঘুড়ি, হাঁড়িভরা দই
তক্ষুনি ফোন্ করে রামধনে ডাকো
হারা-মণি ফিরে পাবে পস্তাবে নাকো!
আই-ঢাই গরমেতে শুয়েছিনু ছাতে
মনিব্যাগ চুরি গেল ঠিক সেই রাতে।
খোঁজ করে দেখি কি যে "পাঁচকড়ি" নেই
নতুন চাকর ব্যাটা, পালিয়েছে সেই।
রামধন শুনে বলে: এত কেন ভাবো?
'হারানো সে মনিব্যাগ আজকেই পাবো!'

সারা দিন কেটে গেল, মনিব্যাগ কোথা?
হল কি চালাক-রাম শেষটায় ভোঁতা?
তখন গভীর রাত, কড়া নেড়ে জোর
রামধন হেঁকে বলে 'ধরেছি যে চোর।'
তাড়াতাড়ি নেমে দেখি কোথা পাঁচকড়ি!
ছোট-ছোট দু'টি চোর, হেসে আমি মরি।
রামধন বলে, 'ভুল হয়নি নিশ্চয়—
তিনকড়ি-দু'কড়ি মিল হল কত হয়?
হিসেবের জ্ঞান দেখে আমি ত অবাক্।
সেই থেকে বেড়ে গেল তার নাম-ডাক।

কিন্তু দারোগার অবস্থা তখন অত্যন্ত কাহিল, তিনি করুণ চোখে জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন নীরবে।

—"আরো একটা কথা আন্দাজ করতে পারছি। চৌকীদারের দেহ কেন এইখানে পাওয়া গিয়েছে। চোখের সামনে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, একটা 'ট্রাজেডি'র শেষ দৃশ্য! বাড়ীর পলাতক লোকগুলো বোধ হয় জানত না, এখানে কোন চৌকীদার মোতায়েন করা হয়েছে। কিংবা জেনেও, বিশেষ কোন প্রয়োজনে বাধ্য হয়েই তারা আবার এই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করেছিল গুপ্ত দ্বার দিয়ে। চৌকীদার তাদের দেখতে পায়। তারা পলায়ন করে। চৌকীদার তাদের পিছনে পিছনে এখান পর্যন্ত ছুটে আসে। পাছে সমস্ত গুপ্ত কথা ব্যক্ত হয়ে যায় সেই ভয়ে তারা তখন চৌকীদারকে করে মারাত্মক আক্রমণ! তার পর গুপ্ত পথে নেমে ডোলটকে আবার যথাস্থানে বসিয়ে স'রে পড়ে সকলে মিলে। আর একটা বিষয় লক্ষ্য করুন। অত বড় ডোলে জল আছে মাত্র ইঞ্চি পাঁচেক। অতটুকু জল না রাখলেই চলত, তবু রাখা হয়েছে কেবল দু'টি কারণে। প্রথমতঃ জল থাকলে বাইরের কোন অতি-কৌতূহলী লোক সন্দেহ করতে পারবে না যে, ডোলটা জলাধার ছাড়া অন্য কোন কারণে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়তঃ, অল্প জল না রাখলে ডোলটাকে নীচে থেকে ঠেলে সরাতে বা টেনে গর্তের মুখে আনতে বিশেষ বেগ পেতে হ'ত। কিন্তু অতি-চালাক লোকরা অতি-বোকা হয় প্রায়ই। অত-বড় ডোলে অত-কম জল—তাও পচা, পোকায় ভরা আর অব্যবহার্য, এ-কথা শুনেই আমার মন জাগ্রত হয়ে উঠেছিল এই সন্দেহে যে, ঐ ডোলে জল রাখা হচ্ছে একটা লোক-দেখানো কাণ্ড। খুব সূক্ষ্ম সন্দেহ, না দারোগা বাবু? এ-রকম সন্দেহের নিশ্চয়ই কোন মানে হয় না, কি বলেন?"

দারোগা দুই হাত জোড় ক'রে বিনীত ভাবে বললেন, "আমাকে আর লজ্জা দেবেন না জয়ন্ত বাবু। আমি মাপ চাইছি।"

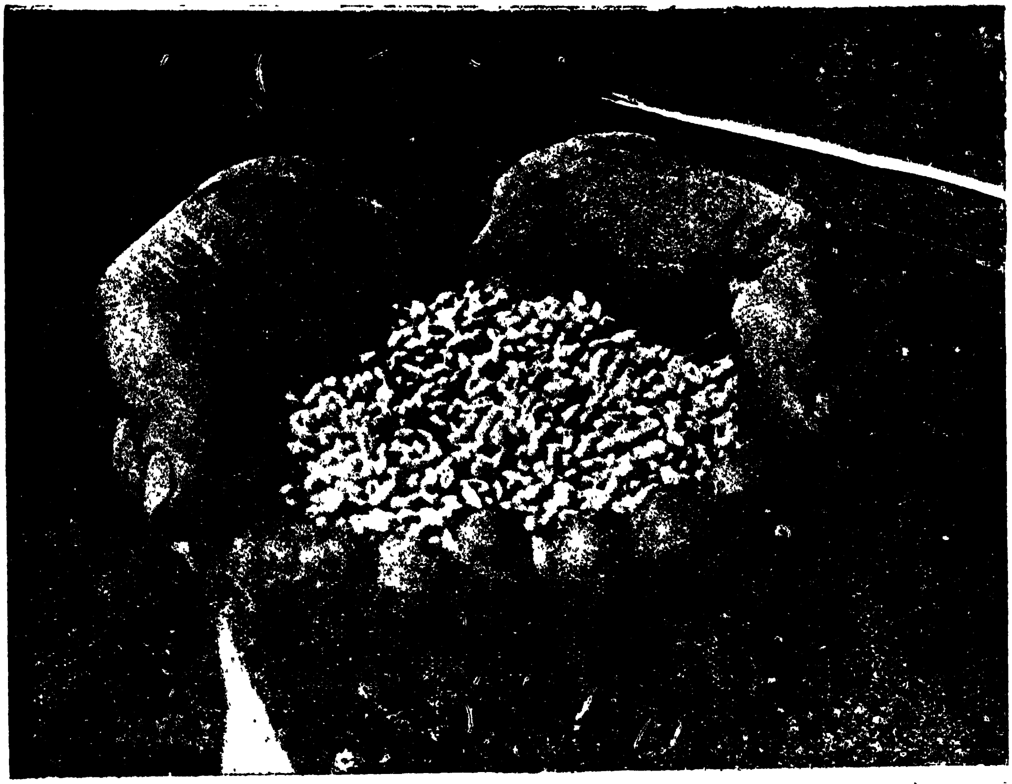
সুন্দর বাবু বললেন, "হুম্! জয়ন্তের কাছে যে শেষটা আপনাকে মাপ চাইতে হবে, এ আমি আগেই জানতুম। কিন্তু যাক্ সে কথা। এখন এই গুপ্ত পথ নিয়ে কী করা যেতে পারে? হয়তো এই গুপ্ত পথের ভিতরে গেলে আশে-পাশে আমরা দেখতে পাব গুপ্ত গৃহও, কি বল জয়ন্ত?"

—"তা আমি জানি না।"

—"হয়তো কোন গুপ্ত গৃহের ভিতরে আমরা দেখতে পাব অপরাধীর দলকে। এখন আমাদের কি করা উচিত? সদল-বলে গর্তের ভিতরে গিয়ে নামব না কি?"

দারোগা বললেন, "সেইটেই উচিত ব'লে মনে হচ্ছে। আমরা সশস্ত্র, দলেও ভারী। অপরাধীদের গ্রেপ্তার করবার এমন সুযোগ হয়তো আর পাব না। আপনার মত কি জয়ন্ত বাবু?"

জয়ন্ত বিভলবার বার ক'রে বললে "সুড়ঙ্গের ভিতরে যে আমাদের নামাই উচিত, এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু সবাই প্রস্তুত রাখুন নিজের নিজের অস্ত্রকে!" [ক্রমশঃ।



দি গুড্ আর্থ

শিশির সেনগুপ্ত

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

১১

এমনি সময়ে যদি ওয়াঙের জমি থেকে জল সরে যেত, যদি আর্দ্র মাটী রৌদ্রের সামনে বাষ্পিত হতে পারত তাহলে মাঠে লাঙল দিয়ে বীজ বুনতে ব্যস্ত হতে পারত ওয়াঙ। সহরের বড় চায়ের দোকানে আর সে কোন দিনই যেত না। যদি তার কোন ছেলেমেয়ে অসুস্থ হোত, যদি বৃদ্ধ বাপের শেষ দিন আসন্ন হয়ে আসত, ওয়াঙ সেই নতুন পরিস্থিতিতে নিজেকে ব্যাপ্ত করতে পারত। চায়ের দোকানের চিত্রপটের সেই বেতস-তন্বী সূচীমুখ মেয়েটির কথা হয়ত ওয়াঙ ভুলেই যেত।

সন্ধ্যা বেলা সামান্য আতপ্ত বাতাস ওঠে। মাঠের জল শান্ত হয়ে শুয়ে থাকে। বৃদ্ধ বসে বসে ঝিমোন। ভোরে উঠে ছেলে দুটি পাঠশালায় যায়, ফেরে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ করে। সুতরাং সারা দিন অশান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় ওয়াঙ। এখানে সেখানে করে ঘোরে, চা খেতে ভুলে যায়, জ্বলন্ত পাইপ অনাদরে নিবে আসে। বেদনার্ত চোখে ওলান স্বামীর এই অস্থিরতা দেখে আর ওয়াঙ সেই চোখ দুটিকে এড়িয়ে থাকতে চায়। সপ্তম মাসে এক দিন, এত দিনের ধৈর্যচ্যুতির ফলে দীর্ঘতম কোন এক দিনে ওয়াঙ বাড়ীর দরজা থেকে শরীর বাঁকিয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসে। নতুন কোট আর ওলানের তৈরী উৎসবের জামা কালো চকচকে কোটটি গায়ে দিয়ে কাউকে কোন কথা না বলে সে মাঠে নেমে পড়ে। জলের ধার দিয়ে দিয়ে সরু সড়ক ধরে অন্ধকার নগর-দ্বারে এসে পৌঁছোয়। তার পর সহরের পথ বেয়ে এসে উপস্থিত হয় নতুন সেরা চায়ের দোকানে।

সমুদ্রতীরের বিদেশী সহর থেকে কিনে আনা তেলের দীপ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ঘরের ভিতর। অতিথিরা গায়ের পোষাক খুলে ফেলে বাইরের ঠাণ্ডাটুকু ভোগ করতে করতে গল্প করে—পান করে। তাদের কলরব সংগীতের মত পথের উপর ভেসে ভেসে আসে। নিজের মাঠে পরিশ্রম করে যে আনন্দবোধ কখনো পায়নি ওয়াঙ, এখানে মানুষ যেন তার চেয়েও বেশী আনন্দ পায়। যেখানে কাজ নেই শুধু অবসর যাপন।

খোলা দরজার উজ্জ্বল আলোর নীচে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করে ওয়াঙ। রক্তের ভরা জোয়ার শরীরের শিরা-উপশিরাকে দীর্ণ করে ফেলতে চায় তবু মনের ভীরুতাকে জয় করতে পারে না সে। হয়ত ফিরেই যেত ওয়াঙ, যদি না সেই সময় ছায়াচ্ছন্ন কোণ থেকে কোকিলার চোখ পড়ত তার উপর। প্রতিটি নতুন আগন্তুককে এ পানশালার প্রেয়সীদের সম্বন্ধে অবহিত করাই তার কাজ। সুতরাং নতুন মানুষ দেখে কোকিলা এগিয়ে এল, কিন্তু ওয়াঙকে দেখেই সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললে—'দূর, চাষা এসেছে এক জন।'

মেয়েটির কণ্ঠের পরিহাস ওয়াঙকে যেন বৃশ্চিক দংশন করল। একটা দুরন্ত রাগের ঝোঁকে ওয়াঙ সাহস করে বললে—'কেন, এ বাড়ীতে আমি কি ঢুকতে পারি না? পারি না ইচ্ছামত কাজ করতে?'

তেমনি নিরুদ্বেগে কাঁধ দুলিয়ে মেয়েটি বললে—'ট্যাকের জোর থাকে, কর না কেন?'

নিজের খুশীমত যা-কিছু করবার সামর্থ্য যে তার আছে, এ বড়-মানুষী দেখানোর জন্য ওয়াঙ কটি-বেষ্টনী থেকে এক মুঠো রূপো বার করে মেয়েটিকে বললে—'দেখ ত, হবে, না হবে না?'

রূপোগুলোর দিকে লোলুপ হয়ে তাকাল মেয়েটি, তার পর দ্রুত কণ্ঠে বললে—'এসো, যেটিকে পছন্দ হয় বল।'

কি বলছে তার অর্থ না বুঝেই ওয়াঙ বললে—'সে ভাল। কিন্তু কি চাই আমার তাই ত আমি জানি না। বলা মাত্রই মনের ভেতর সেই লোভটা জাগল। ওয়াঙ বললে—'সেই ছোট্ট মেয়েটি। সরু মুখ, সাদা আর লাল ফুলের মত মুখ যে মেয়েটির—যার হাতে পদ্মকুঁড়ি।'

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে ওয়াঙকে অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করলে। টেবিল চেয়ারের বিশৃঙ্খলতার ভিতর দিয়ে সে পথ করে এগোতে লাগল। একটা ভদ্র দূরত্ব রেখে ওয়াঙ চলল পিছনে। মনে হোল বটে ওয়াঙের যে, অনেকে হয়ত তার দিকে চেয়ে দেখছে—কিন্তু সাহস করে তাকিয়ে সে বুঝল যে, দু'-এক জন ছাড়া আর কেউ-ই সেদিকে নজর দিচ্ছে না। এক জন যেন বললে—'ওপরে ঘরে বসবার দেরী হচ্ছে না কি?' আর এক জন মন্তব্য করলে—'লোকটার মেজাজ উঠেছে। এখুনি চলল সুরু করতে।'

ততক্ষণে ওয়াঙ সরু সিঁড়ি ভাঙছে। জীবনে এই প্রথম সে বিতলে ওঠার কষ্ট পাচ্ছে। যখন উপরে উঠে এল সে দেখলে যে, মাটীর কোলের বাগান মতই এটি দেখতে, শুধু একটি জানলার বাইরে তাকিয়ে সে আকাশ দেখে অনুভব করল যে, এ ওঠার মধ্যে কতখানি বলিষ্ঠতা। অন্ধকার হল পার হতে হতে মেয়েটি চীৎকার করতে সুরু করল—'আজ রাত্রের প্রথম মানুষ এসেছে।'

হলের দুই পাশের দরজা ঝপাঝপ খুলে গেল। টুকরো-টুকরো আলোয় ঘরের দরজার মুখে মুখে মেয়েদের মাথাগুলি বেরিয়ে এল। যেন ফুলের আলোয় উঁকি মারল অনেক সদ্যফোটা কুঁড়ি। কোকিলা রূঢ় কণ্ঠে বললে—'তুমি নও। তুমিও নও। তোমাদের কেউ চায়নি। সুচাওয়ের রাঙা-মুখী বামনের জন্যে এসেছে ওটি—ঐ যে পদ্মর জন্যে।'

সারা হলে যেন ঝরণা লঘু কৌতুকে নেচে গেল। পরিহাসের একটা অস্বচ্ছ আলোড়ন উঠল। মোটা একটি মেয়ে শুধু বললে—'পদ্মর পক্ষে লোকটা ভালই। মুখে রসুনের গন্ধ—মোটা লোকটা তার পক্ষেই ভাল।'

পাঁজরের ভিতর ছোরার মত ঢুকে গেলেও, মেয়েটির কথার জবাব দিলে না ওয়াঙ ঘৃণায়। সত্যিই ত, পোষাক যা তার গায়ে রয়েছে তা চাষারই। তবু কোমর-বন্ধনীর রূপোগুলোর কথা স্মরণ করে ওয়াঙ বলিষ্ঠ পায়ে এগিয়ে গেল। অবশেষে কোকিলা তার চওড়া করতল দিয়ে একটা বন্ধ দরজায় ঘা দিয়ে, উত্তরের অপেক্ষা না করেই ভিতরে প্রবেশ করল। ঘরের ভিতর লাল ফুল-কাটা তোষকের উপর একটি তন্বী মেয়ে বসে আরাম করছিল।

কোন মানুষের যে এমন ছোট হাত থাকতে পারে, শুনলে কখনো বিশ্বাস করত না ওয়াঙ। ছোট করতল, অস্থিগুলি কৃশ, পদ্মকুঁড়ির রক্তিম আভায় রাঙানো নখর, এমন তীক্ষ্ণমুখ আঙুল। টুকটুকে লাল সাটিনের জুতায় বন্দী চারু পা, মানুষের মাঝের আঙুলের মত ছোট, মেয়েটি বিছানার প্রান্তে কৌতুকে দোলাচ্ছে, দেখে যেন বিশ্বাসই হয় না ওয়াঙের।

মেয়েটির পাশে আড়ষ্ট ভাবে বসল সে। নীচের ছবির সঙ্গে এমন আশ্চর্য সাদৃশ্য মেয়েটির যে দেখলেই চিনে নিতে পারত ওয়াঙ। তার দিকে সে চেয়ে বসে রইল। আশ্চর্য সুন্দর মেয়েটির হাত, সুবঙ্কিম, সুঠাম, দুগ্ধশুভ্র অঙ্কিত। সিল্কের পোষাকের উপর মেয়েটি হাত দুটি পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে কোলের উপর রেখেছে। ঐ হাত দুটি স্পর্শ করবার কথা যেন স্বপ্নেও মনে করা যায় না।

উপর অঙ্গে পরেছে মেয়েটি আঁট ছোট জামা। যেন বেতস লতার মতই দেখাচ্ছে তাকে। চেয়ে থাকলে মনে হয় যেন ছবির দিকে তাকিয়ে আছি। উঁচু কলার-তোলা জামার সাদা ফারের দিগন্তে মেয়েটির ছোট্ট সরু মুখের সৌন্দর্য চেয়ে দেখে ওয়াঙ। খুবানী ফলের মত গোল দুটি চোখ। গল্প-কথকরা পুরানো দিনের গল্পে সুন্দরীদের চোখের বর্ণনায় কেন খুবানী ফলের উল্লেখ করত, এত দিনে যেন তা বুঝল ওয়াঙ।

এই মেয়েটি ওয়াঙের চোখে রক্ত-মাংসের রমণী নয়, এ চিত্রপটে দেখা তার মানসী।

মেয়েটি তার মৃণাল বঙ্কিম করপুট ওয়াঙের কাঁধে রাখল। অতি ধীরগতিতে নামিয়ে আনল ওয়াঙের বাহুর উপর দিয়ে। এত কোমল, এত লঘু স্পর্শ কোন দিন পায়নি ওয়াঙ। চোখ দিয়ে দেখছে, তা নাহলে সে হয়ত বিশ্বাস করত না যে কোন মানুষের হাত তার বাহুর উপর দিয়ে নেমে আসছে। ছোট হাতখানির দিকে চেয়ে থাকে ওয়াঙ আর তার পোষাকের অন্তরালে রক্তে মাংসে আগুন জ্বলতে থাকে। অনেক নীচে নেমে অশান্ত শিরার সঙ্গে হাতখানি ওয়াঙের মণিবন্ধে থমকে থামে, তার পর তার কঠিন প্রশান্ত করতলের মধ্যে আশ্রয় নেয়। সারা শরীর কাঁপতে থাকে ওয়াঙের, কেমন করে এ উপসর্পণ গ্রহণ করবে ভেবেই পায় না সে।

ওয়াঙের চেতনা ভেদ করে উঠল হাসি। সে হাসি চপল, লঘু। বাতাসে দোল-খাওয়া পাতলা রূপার ঘণ্টাগুলির মত তার ব্যঞ্জনা। ছোট হাসির মধ্যেই মেয়েটি বললে—'এমন বোকার মত বসে আছ কেন, মন্দ পুরুষ। তোমার ঐ চেয়ে থাকা নিয়ে সারা রাত বসে থাকব না কি?'

এ কথায় ওয়াঙ মেয়েটির হাত নিজের মুঠির মধ্যে ধরে নিলে সাগ্রহে। সে হাতখানি শুষ্ক ভঙ্গুর পাতার মত। অনুনয় করে বললে ওয়াঙ—'আমি কিছুই জানি না—আমায় শিখিয়ে দাও।' কি যে বললে ওয়াঙ তা সে নিজেই বুঝলে না।

মেয়েটি তাকে শিক্ষা দিল।

মানুষের জীবনে যে অসুস্থতা সব রোগের চেয়ে কঠিন তাই পেয়ে বসল ওয়াঙকে। তপ্ত সূর্যের নীচে পরিশ্রমের কষ্ট পেয়েছে সে, নির্দয় মরুভূমির শুষ্ক তুষার-তীক্ষ্ণ বাতাসের চাবুক খেয়েছে। নিষ্ফলা জমির কার্পণ্যে অনশনে মাথা কুটেছে—দক্ষিণ দেশের সহরের পথে পথে আশাহীন পরিশ্রমে হতাশায় মরেছে। কিন্তু একটুকুন মেয়ের ছোট্ট মুঠির আবেষ্টনীতে সে সব চেয়ে দুরন্ত বেদনায় আর্ত দিন কাটাতে লাগল।

চায়ের দোকানে আজকাল সে রোজই যায়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তারই প্রতীক্ষা করে সে, প্রতিটি রাত কাটে তার সঙ্গে। রাতের পর রাত সেই এক অভিনয়। গাঁয়ের একটি চাষী প্রণয়িনীর ঘরের

দ্বারপথে দাঁড়িয়ে মূঢ়ের মত কাঁপে—আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে বসে তার পাশে। মেয়েটির কৌতুক হাসি তার সারা শরীরে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়—সর্বাঙ্গে একটা অসুস্থ কামনা দপ্‌দপ্‌ করে। নির্দেশ শোনে আর ক্রীতদাসের মত তা পালন করে যায়। মেয়েটি ধাপে ধাপে খসিয়ে দেয় সর্বাঙ্গের আবরণ। তার পর আসে চরম মুহূর্ত। সমর্পণের চরম নিবেদন নিয়ে ফুল যেমন উন্মুখ হয়ে থাকে, তেমনি আকুতি নিয়ে মেয়েটি চায় পুরুষের বাহুর মধ্যে সব হারাতে।

সব দিলেও ওয়াং সব নিতে পারে না। তাই তার তৃষ্ণাও মেটে না। যেদিন ওলান এসেছিল তার ঘরে, সুস্থ পশুর মত ওয়াং তাকে জাপটে ধরেছিল যৌবনের লুব্ধতায়। ওলানের সঙ্গে যৌন-জীবনে তাই সুখ হোত। চরম আনন্দের পর ওয়াং তাকে ভুলে যেত—খুসী মনে কাজ করত সারা দিন। কিন্তু এই মেয়েটিকে ভালবেসে যেন তৃপ্তি নেই, তার স্বাস্থ্যের তাগিদ মেটে না একে দিয়ে। রাত্রে মেয়েটি যখন আর নিতে পারে না, তার ছোট ছোট হাত দুটি ওয়াংএর কাঁধে যেন রুক্ষ ঠেকে। বুকের ভেতর ওয়াংএর রূপো নিয়ে সে তাকে দরজা দিয়ে ঠেলে দেয়। আর তৃষ্ণা নিয়ে ওয়াং ফেরে। সাগরের ঘোলা জল খেলে যেমন তৃষ্ণার্ত মানুষের রক্ত শুকিয়ে ওঠে, আরো তৃষ্ণা পায়, তেমনি অবস্থা হয় ওয়াংএর। তৃষ্ণা আর লোণা জল এই দুটিতে অবশেষে সে মাতাল হয়—নিজের মত্ততায় মরে। প্রতিদিন সে মেয়েটির ঘরে যায়—ইচ্ছাটুকু মিটিয়ে দেয় আর প্রতিদিন নিজের যৌবনের অতৃপ্তি নিয়ে ফেরে।

সারা গ্রীষ্ম সেই মেয়েটিকে ভালবেসে চলে ওয়াং। কে সে, কোথা থেকে সে এসেছে কিছুই সে জানে না। যতক্ষণ তার সঙ্গে থাকে ওয়াং, সবশুদ্ধ কুড়িটি কথার বেশী সে কয় না। শুধু শিশুর কাকলির মত মেয়েটির অবিশ্রান্ত, হাস্য-চকিত কথা শুনে যায়। ওয়াং শুধু চেয়ে দেখে মেয়েটিকে। চেয়ে দেখে তার হাত, তার পা, তার দেহের ভঙ্গী; চেয়ে দেখে তার প্রত্যাশী চোখের স্নিগ্ধ চাহনি। কোন দিনই প্রাণ ভরে মেয়েটিকে ভোগ করতে পারে না সে। প্রতিদিন ভোরে কেমন মূঢ়ের মত অতৃপ্তি নিয়ে সে ঘরে ফেরে।

দিবালোক যেন আর শেষ হয় না। বিছানার উপর আর শোয় না সে। গরমের ছল করে বাঁশ বাগানের ধারে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে থাকে। ছ্যাঁত করে ঘুম ভেঙে যায়, বাঁশ-পাতার তীক্ষ্ণমুখ ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকে ওয়াং। বুকের ভেতর কেমন একটা ভালো লাগা কষ্ট হয়। তার কারণ বুঝতে পারে না সে।

কেউ যদি তাকে বিরক্ত করে, হয়ত স্ত্রী, হয়ত ছেলেমেয়েরা, কিংবা চীং এসে যদি তাকে বলে—'জল সরে যাচ্ছে—বীজ বোনার কি ব্যবস্থা হবে বল ত?' অমনি ওয়াং রুক্ষ কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে—'আমায় জ্বালাচ্ছ কেন?'

এই মেয়েটিকে ভোগ করে সে তৃপ্তি পাচ্ছে না ভাবলেই যেন বুক ফেটে যায়।

এমনি করে দিন কাটে। হেলায় দিন কাটায় সন্ধ্যার প্রত্যাশায়। ওলানের অখুসী মুখের দিকে তাকায় না, তার উপস্থিতিতে খেলায় মত্ত ছেলে-মেয়েদের গম্ভীর মুখের দিকে চায় না। বৃদ্ধ বাপ তার দিকে চেয়ে যখন প্রশ্ন করেন—'কি অসুখ হোল তোমার যে এমন রুক্ষ মেজাজ হচ্ছে, গায়ের রং হচ্ছে মেটো হলদে?'

তখনও ওয়াং চোখের দিকে তাকায় না, মুখ খোলে না। দিন গড়িয়ে রাত আসে। কমলিনী তাকে নিয়ে নিজের খুসী মত ব্যবহার করে। ওয়াংএর বেণী নিয়ে সে পরিহাস করে, যে বেণী সুন্দর করবার জন্য ওয়াং দিনমানের অনেকখানি সময় কাটায়। মেয়েটি বলে—'দক্ষিণ দেশের মানুষরা ত অমন বাঁদরের ল্যাজ রাখে না।' সেই দিনই ওয়াং নাপিতের কাছে গিয়ে বেণী কেটে আসে। কত দিনের কত পরিহাস কত ঘৃণা তাকে যা করতে নিবৃত্ত করতে পারেনি ওয়াং কমলিনীর জন্যে তাই করে এল।

স্বামীর দিকে তাকিয়ে ওলান ভয়ে ডুকরে উঠল—'তোমার জান কেটে ফেলেছ?'

ওয়াং তাকে জবাব দেয়—'চিরকাল কি গেঁয়ো ভূত থাকব? সহরের সব ছোকরারা চুল ছোট রাখে।'

কিন্তু নিজের বুকের ভেতর আতংক থেকে যায় ওয়াংএর। মেয়ে মানুষের শরীরে যতখানি রূপ হতে পারে, ওয়াংএর কল্পনায় কমলিনীর সব আছে। তাই তার নির্দেশে—তার খুসীতে ওয়াং নিজের জীবনকেই বরবাদ করতে পারে।

সারা দিনের পরিশ্রমে কত বার স্বেদে ভিজে গেছে সর্বাঙ্গ। ওয়াং ভাবত, এই ভাবেই শরীরের ময়লা পরিষ্কার হচ্ছে। বলিষ্ঠ বাদামী শরীর আগে সে কদাচিৎ পরিষ্কার করত, কিন্তু আজকাল নিজের দেহকে সে ক্ষণে ক্ষণে পরীক্ষা করে অন্য লোকের মনে করে। প্রতিদিন সে আজকাল গা ধোয়। ওলানের বুকে কষ্ট হয়, সে বলে—'এত গা ধুলে তোমার যে অসুখ করবে গো।'

দোকান থেকে মিষ্টিগন্ধ সাবান এনেছে ওয়াং? বিদেশী লাল রঙের গন্ধদ্রব্য এনেছে। সারা শরীরে তাই ঘসে সে। যে রশুন খেতে আগে সে কত ভালবাসত, আজকাল তার একটি টুকরোও সে মুখে দেয় না, পাছে মেয়েটির নাকে তা খারাপ লাগে।

এই সব বস্তু দিয়ে কি হয় তার পরিবারের কেউ তা খোঁজ রাখে না।

পোষাকের জন্যে নতুন নতুন কাপড় সিল্ক আনে ওয়াং। আগে ওলানই তার জামা তৈরী করে দিত। শরীরের চেয়ে ঢলঢলে করে, দুদিকে শক্ত সেলাই দিয়ে ওলান সেগুলি মজবুত করে তৈরী করত। কিন্তু ওয়াং আজকাল সে সব সেলাইকে ঘেন্না করে। সহরের দর্জির কাছে নিয়ে যায় ওয়াং গায়ের মাপে মাপে তৈরী করিয়ে নেয় হাল্কা রঙের ধূসর জামা, কালো সাটিনের তৈরী বড় আস্তীনহীন কোট। জীবনে সেই প্রথম ঘরের মা বৌয়ের তৈরী করা নয় জুতা সে কিনল। বড়-বাড়ীর কর্তার পায়ে যেমন ছিল তেমনি গোড়ালির কাছে ঝলঝলে কালো ভেলভেটের জুতা।

কিন্তু বৌ-ছেলেদের সামনে ঐ সব পোষাকে বেরোতে তার লজ্জা হোতে লাগল। বাদামী ওয়েল পেপারে মুড়ে ওয়াং পোষাকগুলি দোকানের একজন ছোকরা কেরাণীর কাছে জিম্মা রেখে দিল। সামান্য কিছু পয়সার বিনিময়ে ছোকরা তাকে উপরে যাবার আগে ছোট একটা ঘরে গোপনে সেগুলি পরে নিতে সুযোগ দিত। তা ভিন্ন সোনার জল দেওয়া একটা রূপার আংটি সে কিনে নিল নিজের জন্যে। কপালের উপরে যেখানে সে আগে ক্ষুর বোলাত, সেখানে চুল গজালে সে তাকে সুগন্ধি করার জন্য পুরো এক রূপো দিয়ে বিদেশী গন্ধ তেল কিনে নিল।

স্বামীর দিকে শুধু চেয়ে দেখে ওলান, ভেবেই পায় না কি তার

করা উচিত। এক দিন দুপুরে খেতে বসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে করে শেষে ওলান গম্ভীর হয়ে বললে—'তোমাকে দেখে আজকাল বড়ো-বাড়ীর কর্তাদের এক জনের কথা মনে পড়ে।'

ওয়াঙ উচ্চ কণ্ঠে হেসে জবাব দিলে—'দু'মুঠো পয়সা যখন খরচ করার সামর্থ্য হয়েছে, তখন জন্তুর মত থাকি কেন?'

ওলানের কথায় ওয়াঙ গম্ভীর ভাবে খুসী হোল। কত দিন পরে স্ত্রীর সঙ্গে সেদিন সে সহৃদয় ব্যবহার করলে।

কত পরিশ্রমের ফল তার এই রূপো জলের মত ওয়াঙের আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যেতে লাগল। শুধু যে মেয়েটির সঙ্গে নিশিযাপনের খরচ তা নয়, তার ছোট ছোট দাবী আর বাসনা মেটাতেও খরচ হতে লাগল। যখনই কোন ইচ্ছা হচ্ছে মনে অমনি মেয়েটি বুক-ফাটা স্বরে আকুল হয়ে বলে—'আঃ, আমার কপাল!'

আজকাল ওয়াঙ তার সামনে কথা কইতে শিখেছে। ফিসফিস করে সে বলে—'কি হোল, বল না?' মেয়েটি জবাব দেয়—'আজ তোমায় নিয়ে আমার ভাল লাগছে না। হলের ও-পাশের ঐ কালোমণিটার ঘরে যে লোকটা আসে সে তাকে চুলের জন্যে সোনার পিন কিনে দিয়েছে। অথচ আমার সেই কত দিনের পুরোনো রূপোর জিনিষ!

ফিসফিস করে বলে ওয়াঙ তার গোপন কথা। কাঁধের পাশে ঢেউ-তোলা চুলের আড়াল পড়ে গেছে। তা সরিয়ে মেয়েটির টানা চোখের দিকে চেয়ে ওয়াঙ বলে—'আমার সোনার চুলের জন্যে আমিও সোনার পিন কিনে দেবো।'

ভালবাসার এই সব নাম কমলিনী তাকে শিখিয়েছে। ছোট ছেলের মত তাকে প্রতিদিন পড়িয়েছে। তবু যতই বলতে চেষ্টা করুক না কেন, বুকের ভেতর বলার তাগিদ থাকলেও ওয়াঙের কেমন জিভ জড়িয়ে আসে। সারা জীবন সে ত শুধু ফসল, বীজ আর রোদ-বর্ষার কথাই কয়েছে।

রূপো বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে। দেয়ালের ভিতর লুকোনো রূপো, খলের ভিতর জমানো রূপো! পুরানো দিন হলে বৌ তাকে সহজেই বলত—'দেয়াল থেকে রূপো নিচ্ছ কেন?' কিন্তু আজকাল সে কিছুই বলে না, শুধু গভীর দুঃখে চেয়ে থাকে। শুধু মনে মনে অনুভব করে যে তার স্বামীর জীবন তার থেকে ভিন্ন খাতে চলে গেছে, চলে গেছে তার নিজের জমির থেকে অন্য দিকে। তবে সে জীবনের ধারা বুঝতে পারে না ওলান।

কিন্তু যেদিন থেকে ওলান বুঝেছে যে স্বামী তার চুল, তার পা এবং তার সর্বাঙ্গের রূপের দিকে নতুন করে তাকাচ্ছেন, সেদিন থেকেই সে ত্রস্ত জীবন যাপন করছে। স্বামীকে কিছু প্রশ্ন করলে কেবলমাত্র উষ্ণ উত্তর পাবে এই ভয়ে সে নির্বাক্ থাকে।

এক দিন মাঠের উপর দিয়ে ওয়াঙ বাড়ী ফিরছিল। পুকুরে ওলান স্বামীর পোষাক কেচে তুলছিল। দেখে ওয়াঙ কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। নিজের গভীর লজ্জাকে চাপা দেবার জন্যে সে কর্কশ কণ্ঠে ওলানকে বললে—'তোমার মণিগুলো কোথায়?'

পুকুরের ধার থেকে ভিজে পোষাকের দিক থেকে ভীরু চোখ তুলে ওলান বললে—'মণি? আমার কাছে আছে।'

বৌয়ের ভিজে রুক্ষ হাতের দিকে চেয়ে, স্বামী বললেন—'মিছি-মিছি মণিগুলো রেখে লাভ কি?'

অবশেষ

লোকনাথ ভট্টাচার্য

কিছু তো থাকে না—সব যায়,
কিছু না-পাওয়ার দুঃখও যায়!
এ-সরল কথা, এ-শেখা পরম;
চিরন্তনীতে এই তো চরম!
যত র'চেছি নিশীথে কাজল হাওয়ায় অদেখা-বাণীর অন্তরাল,
তারা মাথা ঠুকে আজ কাঁপাতে যায় না স্মরণ-কোঠার কোনো দেয়াল।
কার চোখের ফেনিলে তমাল-সুনীলে যে চির-তরল-স্রোত বয়—
কত ভেসে গেছি সেই অঘোর-জোয়ারে অচেতন-তনু-তন্ময়।
সেই ফেনিল-সুনীল-কম্প্র-নেশায় আজ্‌কে মাতাল টলে না—
এই বিবাগী-দেউলে মরা নগরীর কোনো জ্যোতি আর জ্বলে না।
সে-আকাশ নেই—শেষ হ'য়ে গেছে
নিবিড় নীলিমা আঁধারে ঢেকেছে।
বন্ধ ঘরের বন্দী বায়ু
কালের কঠিনে খোয়ায় আয়ু।
সমুখ-দুঃখ কতটুকু মারে, কতটুকু তার থাকে লেশ—
সময় আসলে আড়ালের ছুরি সকল যাতনা করে শেষ।
জল-কালি দিয়ে নাম-স্বাক্ষরে তোমার আমার—কার কী?
ভ্রাম্যমাণের ডায়েরীর পাতা ভ'রে দেয়া শুধু—আর কী?
শুধু অণুভার ক্ষণ-ঝলকানি; আজকের কথা কাল ভুলি—
কিছুই থাকে না—ধুলোয় মিশোয়—ধুলোর জগতে সব ধুলি।
পিছনের পথে তবু যদি চাই
চলার চিহ্ন কোথাও না পাই—
যে-পথে এসেছি, সে-পথের ধুলো উড়িয়ে দেয়,
উদ্ধত তৃণ বর্বর ভূমে জন্ম নেয়।

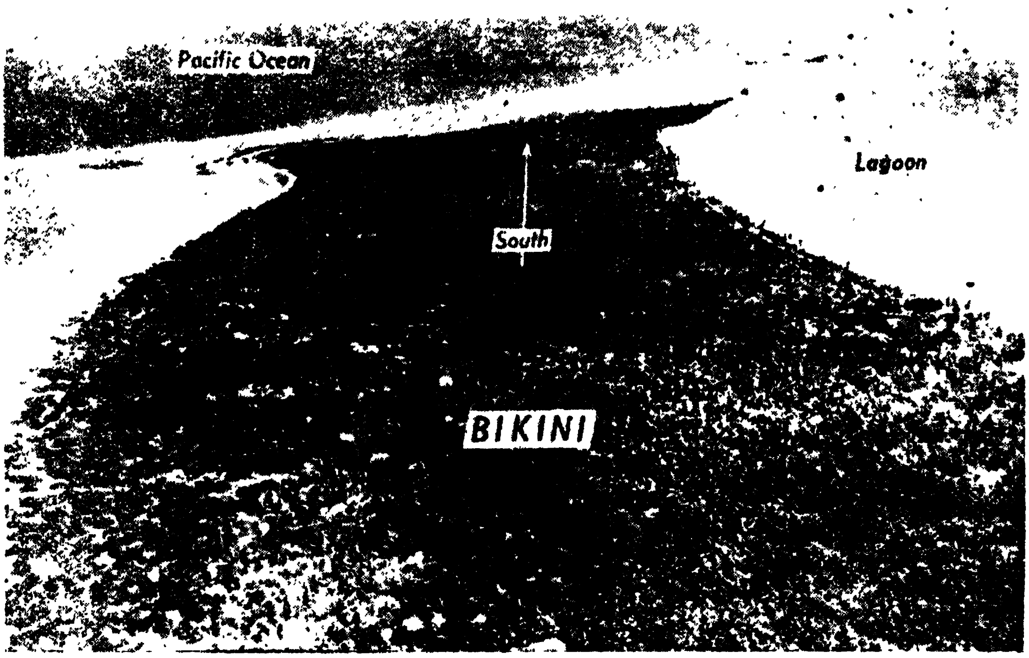
তখন ওলান জবাব দিলে, 'ইচ্ছে আছে একদিন ইয়াররিংএ বসিয়ে নেবো সে দুটি।' তার পর স্বামীর পরিহাস ভয় করে আবার বললে—'ছোট মেয়েটির বিয়ে হবে যখন তখন তাকে দিয়ে দেবো।'

আরো নির্দয় হয়ে চীৎকার করে ওয়াঙ বললে—মাটির মত কালো রঙ যার, তার আর মুক্তো পরতে হবে না। মুক্তো হলো সুন্দরী মেয়েদের জন্যে।' একটু ক্ষণ চুপ করে বললে—'ওগুলো আমায় দিয়ে দাও! আমার দরকার আছে।'

ভিজে রুক্ষ হাত বুকের ভেতর দিয়ে ওলান নিঃশব্দে ছোট মোড়কটি বার করে সেটি স্বামীর হাতে দিলে। তার পর তাকিয়ে রইল স্বামীর দিকে। খুলে ফেলেছেন মোড়কটি, হাতের তালুর উপর মুক্তা দুটি সূর্যের রোদ শুষে ঝকঝক করছে। সেই দিকে তাকিয়ে ওয়াঙ হাসছিল।

ওলান আবার কাপড় কাচতে নেমে গেল পুকুরের ধারে। চোখ দিয়ে যখন বড় বড় ফোঁটা পড়তে লাগল, হাত তুলে সেগুলি মুছে নেবার চেষ্টা করল না সে। শুধু পাথরের উপর বিছিয়ে দেওয়া পোষাক-গুলিকে আরো কঠিন হাতে সে পিটোতে লাগল কাঠের হাতা দিয়ে।

[ক্রমশঃ।



আণবিক বে

আণবিক শক্তি আজিকার নূতন আবিষ্কার নহে, এ শক্তি চিরদিনের। বেদেও এই শক্তির কথা আছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে এই শক্তির নিয়ন্ত্রণে। সূর্য্য, নক্ষত্র অগ্নিময় এই শক্তিরই কৃপায়। অসীম অনন্ত এই শক্তিধারা আছে অতি ক্ষুদ্র একটি অণুর মধ্যে।

অণু যেন একটি সৌরজগৎ। মধ্যে আণুবীক্ষণিক সূর্য্য আর তাহার চারি ধারে ঘুরিতেছে গ্রহগুলি। প্রত্যেকের গতিপথ নির্দ্দিষ্ট। এই গতির মধ্যেই লুক্কায়িত রহিয়াছে অণুর শক্তি। যদি কোন মতে একটি অণুকে ভাঙ্গা যায় অর্থাৎ কোন একটি বা ততোধিক গ্রহ গতি-পথ ত্যাগ করে, তখনই এই লুক্কায়িত শক্তি ছাড়া পায়। বিশ্বের অনন্ত শক্তি ছাড়া পাইয়া তাণ্ডব লীলা আরম্ভ করিয়া দেয়। ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম ইত্যাদি কয়েকটি মৌলিক দ্রব্যের অণু এই ভাবে ভাঙ্গা যায়।

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে মার্কিণ আণবিক বোমায় জাপানের দুইটি জনবহুল সহর হিরোশিমা এবং নাগাসাকি বিধ্বস্ত হয়। উক্ত দুইটি সহরে বোমায় ধ্বংসলীলা সম্পর্কে তদন্তের যা ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ কিছু মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। উন্নতিশীল জনাকীর্ণ সহর মুহূর্ত্তের মধ্যে আদিম যুগের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। বোমা বর্ষণের ফলে যে বাত্যা-বিক্ষোভ, তাপ বিকিরণ এবং রেডিও অ্যাকটিভিটি সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার ফলে গৃহাদি ধ্বংস এবং লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

বিস্ফোরণের স্থল হইতে দেড় মাইল পর্য্যন্ত সমস্ত বিধ্বস্ত হইয়াছে। এক মাইলের মধ্যে অবস্থা মেরামতের বাহিরে। উত্তাপ এত প্রবল হইয়াছিল যে, দেড় হাজার গজের মধ্যে লোকজন কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল।

রেডিও অ্যাকটিভ ক্রিয়ার ফলে যে রশ্মিতরঙ্গ সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার নাম 'গামা রশ্মি'। এই রশ্মি চর্ম্মের ভিতর দিয়া যখন প্রবেশ করে তখন কিছুই টের পাওয়া যায় না এবং আহত হওয়ারও কোন লক্ষণ ২৪ ঘণ্টার ভিতর দেখা যায় না। হাড়ের ভিতর যে মজ্জা থাকে, 'গামা রশ্মি' তাহা ধ্বংস করিয়া দেয়। লাল রক্ত-কণিকাও ধ্বংস হয়। ফলে রক্তহীনতা জন্মে। শ্বেত রক্ত-কণিকা উপযুক্ত পরিমাণে সৃষ্ট না হওয়ায় দেহের প্রতিরোধ শক্তি বিলুপ্ত হয়। ফলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। বিস্ফোরণের স্থান হইতে অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে। তিন পোয়া মাইলের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকের মৃত্যু অবধারিত। প্রায় তিন পোয়া মাইলের ভিতরে পুরুষের প্রজনন শক্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

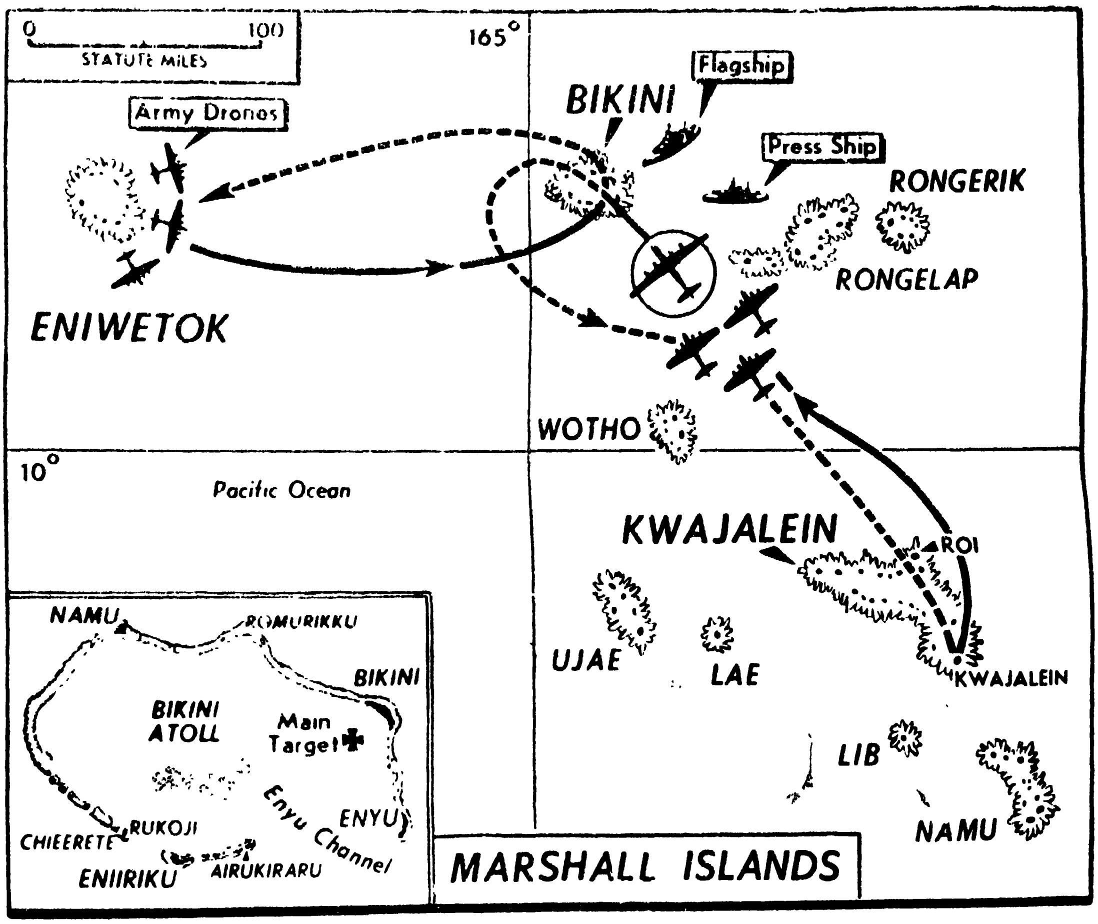
১৫ই আষাঢ় রাত্রি ৮-৩১ মিনিটে প্রশান্ত মহাসাগরে বিকিনি অ্যাটলে শক্তি-পরীক্ষার জন্য আণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয় এবং দুই মিনিট পরে বিস্ফোরণ হয়। অগ্নিশিখা এবং ধোঁয়া ৫০

হাজার ফিট উঁচু উঠে এবং যে ৮০খানি জাহাজের উপর বোমা বর্ষণ করা হয়, তাহা অদৃশ্য হইয়া যায়। বিস্ফোরণের যেরূপ বিকট শব্দ আশা করা গিয়াছিল সেরূপ হয় নাই। ৬ ইঞ্চি নৌ-কামানের গর্জ্জনের মত শব্দ হইয়াছিল মাত্র। বিস্ফোরণের সময় কোন প্রকার অনুভূতি পাওয়া যায় নাই এবং প্রবল জলোচ্ছ্বাসও পরিলক্ষিত হয় নাই। এই পরীক্ষা-কার্য্যে যে ৩৪ হাজার লোক নিযুক্ত ছিল তাহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া যায় নাই। নাগাসাকিতে বিস্ফোরণের ধূমজাল যত দূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবারে তাহার অর্দ্ধেক মাত্র।

এই পরীক্ষার জন্য খরচ হইয়াছে ২১ কোটি টাকা। এবং তাহা জলে পড়িয়াছে। (কারণ বোমা জলে ফেলা হইয়াছে।) এত টাকা প্রশান্ত মহাসাগরের অতল গর্ভে নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্য কি? 'মাথুর মাসা' আর্টির চূড়ান্ত।

যে গবাদি পশুকে এই আর্টের বলিরূপে জাহাজ বোঝাই করিয়া রাখা হইয়াছিল তাহারা নিজেদের পরিণতির কথা কিছুই জানিত না। কিন্তু বলির খাঁড়া কাঁধে পড়িবার পরও যে তাহারা নির্ব্বিকার চিত্তে ঘাস খাইবে ইহাও কিন্তু কর্ত্তাদের জানা ছিল না। তাঁহারা একটু বিস্মিত হইয়াছেন। পশুগুলি মরিল না দেখিয়া দুঃখিতও কম হন নাই। কারণ ইহাদের না মরায় পরীক্ষাটি মার খাইয়া গেল। দুঃখের কথা সন্দেহ নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, গলদ কোথায়? এই বোমা কি জাপানে ফেলা বোমা-গোষ্ঠীর কেহ নয়? যদি তাহারই আত্মীয় হয় তবে এত নিরীহ কেন? আর যদি অন্য কিছু হয় তবে এত অর্থব্যয়ে বিশ্ববাসীকে বেকুব বানাইবার কি প্রয়োজন ছিল? কোন্‌টা সত্য আমরা জানি না। ভবিষ্যতে জানিতে পারিব বলিয়া আশাও রাখি না।



আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি!

শ্রীতারানাথ রায়

বৃটিশ রাজতন্ত্র ও মিঃ ওয়েলস্

সম্প্রতি বৃটেনের মন্ত্র সভায় এ কথা প্রকাশ পেয়েছে যে, মুসোলিনীর সরকার বৃটিশ ফ্যাসিষ্ট-নেতা সার অসওয়াল্ড মোজলেকে যুদ্ধের পূর্ব্বে ৫ লক্ষ লায়ার প্রদান করেন। সাপ্তাহিক 'সোস্যালিষ্ট লীডার' পত্রিকার বিশ্বপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক মিঃ এইচ জি ওয়েল্‌স সে দিন (৫ই জুলাই) জিজ্ঞেস করেছেন যে—এই অর্থ লেনদেন ব্যাপারের সঙ্গে বৃটিশ রাজবংশ জড়িত ছিলেন কি না? যদি থাকেন তাহলে—"There is every reason why the House of Hanover should not follow the House of Savoy into the shadows of exile and leave England free to return to its old and persistent republican tradition."—তা হ'লে ইটালীর রাজবংশের মত বৃটেনের রাজবংশকেও নির্ব্বাসনে যেতে হয়। মিঃ ওয়েলস্ প্রস্তাব করেছেন যে, আমেরিকা বা আর কোথাও, নির্ব্বাসিত রাজারাণীদের একটা উপনিবেশ থাকা দরকার! তিনি বলেছেন—সব কথা বেরিয়ে আসচে, আর বেরিয়ে আসতেই হবে। এখনও যদি এ সব কলঙ্কী লোক বুদ্ধিমানের মত দেশপ্রাণতার পরিচয় দেন, তাহলে এখনও হয়ত ওদের সম্বন্ধে লোকে সদয় বিবেচনা করবে। এর পরে ওদের বরখাস্তের ব্যাপারটা হয়ত বড় কড়া হয়ে যাবে—"Why cannot these tainted people do the sane and patriotic thing while they may still be treated with consideration? Now they can be bought out and set apart with the sort of dignity and honours they value. Later on, their dismissal may have to be ruder."

ইউরোপে সঙ্কট

ট্রিস্তে বন্দর নিয়ে দুনিয়ার তিন পেয়ান জাতির মধ্যে বিবাদ আসন্ন হয়ে উঠেছে। বন্দরের ধার দিয়ে বৃটিশ ও মার্কিণ রণতরীগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে। সোভিয়েট লাল ফৌজও দলে দলে যুগোশ্লাভিয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। বন্দর-সহরে দাঙ্গা বেধেই আছে। দাঙ্গাকারীরা বেপরোয়া হাত-বোমাও ছুড়ছে, গুলীও চালাচ্ছে। মার্কিণ আর বৃটিশ পুলিশ গিয়ে দাঙ্গা থামাতে চেষ্টা করছে।

ওদিকে তুর্কী বৃটিশ স্পিটফায়ার বিমান ভর দম নিয়ে প্রস্তুত! এসব বিমানের বৈমানিকরা ইংরেজ বৈমানিকদেরই সাকরেদ। প্রসিদ্ধ মার্কিণ বেতার সমালোচক ওয়াল্টার উইনচেল সে দিন তাই দুনিয়াকে হুঁসিয়ার করে দিয়ে বলেছেন—"Three and three make six. Europe's critical moment is expected late in August or September. Every indication points to the terrific diplomatic crisis. Six and six make twelve."

ইথিওপিয় সমস্যা

ইথিওপিয়ার ইংরেজভক্ত সম্রাট্ (?) হাইলে সেলাসী ইঙ্গ-মার্কিণ প্রভুদের না চটাতে চাইলেও 'নিজ বাস-ভূমে পরবাসী' হয়ে থাকতে বেশী দিন রাজী হবেন বলে মনে হচ্ছে না। রুশ-প্রভাব এ পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছেচে। মার্শাল টিমোশেঙ্কোর মতন প্রসিদ্ধ কূট রণসিদ্ধকে নগণ্য এই দেশে রুশ-প্রতিনিধি করে পাঠান হয়েছে দেখে সবাই একটু শঙ্কিত হয়েছে। পাশেই ইরিট্রিয়া। ইটালীর এই উপনিবেশ প্রকৃত পক্ষে ইংরেজরাই শাসন করছে। ইরিট্রিয়ার উপর রুশিয়ার নজর সম্ভবতঃ আছে। টিমোশেঙ্কো আবিসিনিয়া থেকে ইরিট্রিয়ার কল-কাঠি নাড়বেন কি না তা বুঝতে আর বেশী দিন অপেক্ষা করতে হবে না। আফ্রিকার এই উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চল থেকে চীন সমুদ্র পর্য্যন্ত বৃটেনের কারসাজির বিরুদ্ধে যেখানে সবাই মাথা তুলেছে, সেখানে, ভারত ও পূর্ব্ব-এসিয়ার প্রবেশের লোহিত সাগরীয় এই পথে সজাগ পাহারা দিবার আয়োজনই বোধ হয় রুশিয়া করছে।

মুমুক্ষু প্রাচ্য

বৃটেনের পররাষ্ট্র-সচিব আর্নেষ্ট বেভিন তথা বৃটিশ মন্ত্রিসভা সদিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন—"We must transfer our support from Pashas to People."—পাশাদের আমরা এত দিন সমর্থন করে এসেছি—এবার জনসাধারণকে করব।

এক দল বুদ্ধিমান ইংরেজ মিশর থেকে সাংহাই পর্য্যন্ত প্রাচ্য-খণ্ডে আপনাদের স্বার্থানুকূল পন্থার অনুবর্ত্তন করে আফ্রিকা, আরব, এশিয়া মাইনর, ভারত প্রভৃতি স্থানে কূটচক্রী কতকগুলো ক্লাইভ আর লরেন্সের চেষ্টায় সাম্রাজ্য আঁট করতে পেরেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিভিন্ন প্রাচ্যদেশে জাতীয়তা-বোধের প্রসার হওয়ায় এই আঁট যেমন শিথিল হয়ে গেছল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটেনের এই ঝুটা অধিকারের অহমিকা তেমনি আজ চূর্ণ হতে চলেছে। মিশর দেখেছে, মার্শাল রোমেল আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ৬০ মাইলের মধ্যে পৌঁছে কি সর্ব্বনাশটাই তার না করেছিল; ব্রহ্ম দেখেছে, ইংরেজের বাহ্বাস্ফোট তাকে জাপানের কবল থেকে রক্ষা করতে পারেনি; ভারত হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছে, অকারণ যুদ্ধে তারই

শোণিত শোষণ ক'রে, লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর অনশন ও মৃত্যু উপেক্ষা ক'রে ওরা আপনার লড়াই ফতে করবার জন্য তার 'ভুখে'র দানা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে। এ সব দেশ আজ ইংরেজ আর তার সাঙ্গাৎদের বিশ্বাস করতে পারছে না।

প্রাচ্যের অপ্রতিরোধ্য গণ দাবী ওরা উপেক্ষা করতে পারছে না বলেই সে দাবী মেটাবার জন্য বৃটেনের শ্রমিক সরকার ভাঁওতা দিচ্ছেন—ওরা জনসাধারণের সঙ্গেই এবার থেকে ভাব করবে। কিন্তু এ-ও ওরা বলছে—"For Britain to withdraw from the Middle East···would be terribly disastrous. In the first place it would be bad for Britain, since it would be a surrender of essential strategic and economic interest. Secondly, it would be bad for the Middle Eastern States, since they would almost certainly come under some other influence far less mild and tolerant than Britain. And thirdly, it would be bad for the world, since it is hardly possible to imagine so vital a transfer of power occuring peacefully. It is therefore essential to re-emphasize the essential pillars of British policy···Those essential pillars are that there shall be no other potentially hostile Great Power in the Persian Gulf on the Suez Canal or on the approaches to it, at either end."

ফিলিপাইন স্বাধীনতা

৪৫ বছর পরাধীন রেখে আমেরিকা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের স্বাধীনতা দিয়েছে (৪ঠা জুলাই, ১৯৪৬)। দ্বীপপুঞ্জের জনসংখ্যা—

দেশীয়—১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬৪১

(সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৭০ জন)

চীনা	—	১১৭৪৮৭
জাপানী	—	২৯০৫৭
মার্কিণ	—	৮৭০৯
স্পেনীয়	—	৪৬২৭
ইংরেজ	—	১০৫৪
জার্মাণ	—	১১৫১
ফরাসী	—	১৯৭
রুশ	—	২৩৭
ওলন্দাজ	—	১৬২

রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের পূর্ব্ববর্ত্তী রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ফিলিপিনদের স্বাধীনতা দেওয়া হবে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বেসামরিক শাসনাধিকার দেশীয় লোকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি উডরো উইলসনের সময় মার্কিণ-নীতি হয়—'The Phillippines for the Phillippinose." জোন্‌স্ ল—যাঁকে ফিলিপাইন অটোনমি আইন বলা হয়—যাতে দ্বীপপুঞ্জের শাসনতন্ত্রের একটা কাঠামো গড়া হয়। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ্চ টাইডিংস্ ম্যাক ডাফি আইনে স্থির হয় যে, ১৯৪৬ সালের ৪ঠা জুলাই দ্বীপের স্বাধীনতা ঘোষণা করে মার্কিণ সার্ব্বভৌম অধিকার প্রত্যাহার করা হবে।

প্যালেষ্টাইন

প্যালেষ্টাইনের আরব হাইয়ার কমিটী আরব জাতির কাছে এক ইস্তাহারে ঘোষণা করেছেন (২৬শে জুন), ইহুদীদের কাছে আরবদের জমি বিক্রী করলে জাতীয় অপরাধ ও মহাদ্রোহের দণ্ড পেতে হবে।

প্যালেষ্টাইনে ইহুদীরা এক গুপ্ত সামরিক দল গড়ে তুলেছে। দলের নাম—'ইরগুন জ্‌ভাই লিউমি'। সে দিন (২৭শে জুন) ৩১ জন বিপ্লবী সৈনিকের বিচার হয় জেরুজালেমে। আদালতে এক জন আসামী চীৎকার করে বলে—নিপীড়ক এক জাতের বিরুদ্ধে এক দাস-জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম করছে ইহুদী গুপ্ত ফৌজ। যদি ইহুদী-শোণিতের মর্য্যাদা রক্ষা করা না হয়, তা হ'লে ইংরেজের রক্তের মর্য্যাদাও রইবে না।

১১ বছরের এক শ্রমিক বালক আদালতে হিব্রুতে এক বক্তৃতা করে বলে—"ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীসে গুপ্ত ফৌজের বৈধতা নাৎসীরাও মেনে নিয়েছিল। ইহুদী জাতীয় ফৌজের এক দলকে সাধারণ কয়েদীর মত অভিযুক্ত করা সমর-বিধির বিরুদ্ধ। তোমরা বলছ আমরা টেররিষ্ট। এতে স্বাধীনতার সংগ্রামের বীরদের তোমরা অপমান করছ। আমরা স্বাধীনতার জন্য ন্যায়সঙ্গত লড়াই করছি। প্যালেষ্টাইনের মাত্র ৬ লক্ষ ইহুদী আমাদের সমর্থন করছে না, পৃথিবীর সহস্র সহস্র ইহুদী নর-নারীর সমর্থন আমরা পেয়েছি।"

এই ইহুদী বিপ্লবী দল প্যালেষ্টাইনে ইংরেজ সরকারের উচ্ছেদের জন্য অস্থায়ী সরকার ও ইজরাইলের নর-নারীর জন্য সুপ্রীম ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠনের আয়োজন করছে।

ইংরেজ প্রমাণ পেয়েছে—প্যালেষ্টাইনে ইহুদীরা যে সন্ত্রাস-পন্থা অবলম্বন করেছে, তার ফলে ৪০ লক্ষ পাউণ্ড দামের সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে। এ সব কাজের মূলে আছে—"a highly developed military organisation with wide spread ramification throughout the country."

মালয়

মালয় "দ্বিতীয় প্যালেষ্টাইনে" পরিণত হতে পারে বলে সে দিন বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য মিঃ এল ডি গাম্মান্‌স্ রয়েল এম্পায়ার সোসাইটীতে বলেছেন। এ ভদ্রলোকটি মালয় থেকে ঘুরে গিয়ে বলেছেন—বৃটিশ সরকার এমন ভাবে মালয়বাসীদের উত্তেজিত করেছেন যে, শীগ গির একটা আপোষ না হ'লে সেখানে ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন সুরু হবে। লর্ড নর্থ মার্কিণ উপনিবেশগুলোকে সন্ত্রাসিত ও বাধ্য ক'রে অধীন করে, আর ডাঃ জেমসন ট্রান্সভালে আক্রমণ চালিয়ে যে সাম্রাজ্যবাদের ভুল করেছিলেন তার পরেও তারা সেই ভ্রমেরই পুনরভিনয় করতে চাচ্ছেন মালয়ে। ফলে এখানে এমন একটা নিয়মতান্ত্রিক সঙ্কটের উদ্ভব হবে যা পৃথিবীর ইতিহাসে বড় বেশী আর হয়নি।

দীক্ষা

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

তোমাদের হাতে আজ হাত রাখিলাম।
যে জীবন জর্জরিত নিত্য নব বেদনার বাণে
তাহারি মুমূর্ষু শয্যা পানে
নতনেত্রে আমি চাহিলাম
সহস্র শায়কবিদ্ধ দেহ দেখিলাম।
সে জীবন নীলকণ্ঠ অবিরত বেদনার বিষে
চোখে তার সেই জল হেমন্তের শীতরাতে শীষে।

তবু তার অভিযোগ যেন কারো পানে
নিঃশব্দিত সুর বেঁধে দিতে চায় জীবনের গানে
মরুর রৌদ্রের মতো অন্যায়ের তাপে
যে জীবনে বোধ নেই, সাড়া নেই, কেন চায়? কার অভিশাপে?
রাত্রির তমিস্র পানে প্রশ্ন করিলাম
বিকীর্ণ তরংগ তার কোনখানে লভিল বিরাম।
উত্তর দিল না কেহ
পৌষের রাত্রি ভরা আত্মার বিদেহ
খল খল সর্বনাশা হাসি হেসে মহানন্দে দেয় করতালি
লাম্পট্যের অভিসারে বাধা পেলে হিংস্র চোখে করে গালাগালি।

রজনীর অন্ধকারে অপবিত্র হোলো কতো কুমারীর দেহ
তবু তার লালাসিক্ত লোভ দেখে
প্রতিবাদ করিল না কেহ।
—সেই জোর কার?
যদি মাঝে বিচরিত যৌবন যাহার
তার বুকে সেই বুক, মনে সেই মন এতোটুকু
বিধানের ব্রত নিয়ে তারা দেখি দাঁড়াতে বিমুখ।
উত্তর কে দেবে
শরবিদ্ধ দেহ তার পড়ে আছে ভূমে
উত্তর যাহার কণ্ঠে সেই বীর মজে আছে কুহকের ঘুমে।

আমি কাঁদিলাম
যে জীবন পরাজিত পড়ে আছে বারে বারে তারে দেখিলাম
অন্ধকারে আজ দেখি, মৃতপ্রায় প্রদীপের রেখা
গুটিসুটি কারা আসে ললাটেতে জীবনের লেখা
তাহাদের স্মিত চোখে নেই ভয়, নেই পরাজয়
প্রসারিত হাতে দেখি প্রসন্ন অভয়।—
তারে চিনিলাম
আমার শীতল হাত তোমাদের প্রসারিত হাতে রাখিলাম।

ভারত স্বাধীন হবে

বিশ্ববিখ্যাত মার্কিণ লেখক লুই ফিশারের দৃঢ় বিশ্বাস যে, শীগ্‌গিরই ভারত স্বাধীন হবে। তিনি জোর করেই বলেছেন—I say, that India is going to get Independence very soon. Nothing can stop it, not even Indians can stop it. তাঁর ধারণা, বিশ্ব-পরিস্থিতিতে বৃটেনের এমন অবস্থা হয়েছে যে, তাকে বাধ্য হয়ে তার সাম্রাজ্য ত্যাগ করতে হচ্ছে। পৃথিবীতে আরও তিন শক্তি। আমেরিকা সব চাইতে শক্তিমান্, তার পর রুশিয়া, তার পর বৃটেন। রুশিয়া আজ দুনিয়ার কাছে এক সমস্যা। নানা কারণে রুশিয়ার প্রভাব প্রসার লাভ করছে। ইংরেজরা বুঝছে যে, ৪।৫ বছর তারা যদি ভাবতে থাকে, তা হ'লে রুশিয়া ভারতও আক্রমণ করতে পারে। এ হ'লে ইংরেজের আর কিছু রইবে না। এতে ভীত হয়ে আমেরিকাও বৃটেনকে সমর্থন করছে। আমেরিকার আবার চেষ্টা বৃটেনের বাজার হাত করা। ইংরেজ আমেরিকার অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখে টিকতে পারবে না। লুই ফিশার জানিয়েছেন যে, ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য চিয়াং কাইশেক রুজভেল্টকে অনুরোধ করেন, আর রুজভেল্টের চাপ না পড়লে সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ভারতে আসতেন না।

এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপের সুযোগ মিশরের মত ভারতের বামপন্থীরা যদি না নেয়, তাহলে দক্ষিণাবর্ত্তে পড়ে ভারত আরো কিছু কাল গেরে যাবে।—

"পর লৌহ-বিনির্ম্মিত হায় বুকে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

দৃষ্টিপাত

[২৭৬ পৃষ্ঠার পর]

থেকে তো এখনও জল ঝরছে, নিমোনিয়া না বাধালে বোধ হয় বাহাদুরীটা পূরা হবে না।"

বোঝা গেল, শাসনকর্ত্রী নেপথ্যেই ছিলেন, টাঙ্গা-দুর্ঘটনার বিবরণ শুনেছেন স্বকর্ণে।

আপন শয়ন-কক্ষে এসে নিদ্রার চেষ্টা করলেন আধারকার। ঘুম এলো না চক্ষে! মুদ্রিত কমল-কলিকার পার্শ্বে গুঞ্জনরত লুব্ধ ভ্রমরের মত মন বারম্বার কেবলই প্রদক্ষিণ করে ফিরতে লাগলো একটি কক্ষপথে। অতিথির বিলম্বে গৃহস্বামিনীর এই ব্যাকুল উৎকণ্ঠা, বিনিদ্র নয়নে এই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা, সকোপন অভিমান-স্ফুরিত এই শাসন এবং সর্ব্বোপরি এই অশ্রুধারা-প্লাবিত আননের সুস্পষ্ট উদ্বেগ-চিহ্নের মধ্য দিয়ে নারী-হৃদয়ের কোন্ গোপন রহস্য আজ অকস্মাৎ উদ্ঘাটিত হলো? শয্যা ত্যাগ করে আধারকার বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

রাত্রি বিগতপ্রায়। তারকাহীন নভস্তল মেঘমালায় আবৃত এবং দিগন্তবর্ত্তী তরুশ্রেণী বিলীয়মান রজনীর কালিমাঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আসন্ন প্রভাতের প্রতিক্ষারতা ধরণীর এই প্রশান্ত-গম্ভীর মূর্ত্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আধারকার যেন আজ তাঁর জীবন-দেবতার প্রসন্ন কল্যাণ করস্পর্শ প্রথম অনুভব করলেন আপন ললাটে। দুই হাত যুক্ত করে প্রণাম করলেন কাকে তা' তিনি নিজেই জানেন না। "আমি ধন্য, আমি ধন্য" শুধু এই বাক্য তার উদ্বেলিত অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে উত্থিত একটি মহান সঙ্গীতের মতো বিশ্বলোকের বীণাতন্ত্রীতে অনাহত ধ্বনিতে হতে লাগলো।

আধারকার থাকেন বোম্বেতে, সুনন্দা থাকেন লাহোরে। প্রায় এক হাজার মাইলের ব্যবধান। কিন্তু যোজন গণনা করে নয় দূরত্ব, নৈকট্যের নির্দ্দেশ হৃদয়ে। হৃদয়ের সেই অদৃশ্য যোগাযোগের নিবিড় বন্ধনে বহু দূরবর্ত্তী এই দুটি নরনারী পরস্পরের কাছে রইলেন নিকটতম! সুনন্দা একদিন কথাচ্ছলে বলেছিল,—চারু, ইংরেজীতে কথা কয়ে সুখ নেই। আমি যদি মারাঠি বলতে পারতেম তবে বেশ হতো। আধারকার বললেন,—পর্ব্বত যদি মহম্মদের কাছে না আসতে পারে, মহম্মদ যাবে পর্ব্বতসকাশে! অসাধ্য সাধন করলেন আধারকার। ছ মাসে শিখলেন বাংলা, বৎসর কালে কণ্ঠস্থ করলেন রবীন্দ্রনাথের কাব্য, দু'বছরে সাঙ্গ করলেন পঠনযোগ্য সমুদয় বাংলা সাহিত্য।

আধারকারের পরিজনেরা পরলোকগত। এক বোন স্বামী পুত্র নিয়ে আছে কনখলে। তার সঙ্গেও যোগাযোগ সুদৃঢ় নয়। এত কাল বৃন্তহীন পুষ্পের মতো আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ছিলেন আধারকার। কর্ম্মে, চিন্তায়, জীবন যাপনে ছিলেন স্বাধীন! এবার সে-স্বনিয়ন্ত্রিত জীবনের ধারা হলো বদল। বোম্বে থেকে চিঠি লেখেন লাহোরে,—নন্দা, বাড়ীর বেয়ারা ছুটি চাইছে তিন মাসের আগাম মাইনে সমেত, দেব কি না লিখো। কিম্বা লেখেন—মালাবার হিলসে ওয়ালকেশ্বর রোডে একটা বাড়ী বিক্রী হচ্ছে সস্তায়। কিনবো কি? নিজের ভালো-মন্দের সমস্ত দায়িত্ব, সমস্ত ভাবনার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন এক দূরবর্ত্তিনী নিঃসম্পর্কীয়া অভিভাবিকার হস্তে,—কিছু দিন মাত্র আগেও যিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অপরিচিতা। আত্মসমর্পণে যে এত সুখ, নির্ভরতায় যে এত প্রশান্তি, তা কখনও জানেননি এর আগে।

আগামী বারে সমাপ্য।

(এম, ডি, ডি)

লীগ-প্রতিযোগিতার আসন্ন-প্রায় অবসান :—

কলিকাতায় ফুটবল লীগ-প্রতিযোগিতা প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। কয়েকটি দলের এখনও কতকগুলি খেলা বাকী থাকিলেও প্রথম ডিভিসনের লীগ চ্যাম্পিয়ন-শিপের পালা শেষ হইয়াছে। জয়-গৌরবে লীগ অভিযান শেষ করিয়া ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব উপর্য্যুপরি দুই বৎসর লীগ-বিজয়ের গৌরবের অধিকারী হইয়াছে। আমরা তাহাদের অভিনন্দিত করিতেছি। লীগ-শীর্ষে তাহাদের অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এইরূপ :—

খে	জ	ড্র	প	স্ব	বি	পয়েণ্ট
২৪	২০	৩	১	৬৫	১১	৪৩

ইষ্টবেঙ্গলের প্রতিবেশী প্রতিদ্বন্দ্বী দলের এখনও দুইটি খেলা বাকী আছে, কিন্তু সেই খেলা দুইটিতে জয়ী হইলেও তাহারা ইষ্টবেঙ্গল অপেক্ষা এক পয়েণ্টে পশ্চাৎপদ থাকিবে। প্রথমার্দ্ধে বরাবর লীগ-শীর্ষে থাকিয়াও মোহনবাগান নিজেদের স্থান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই। এরিয়ান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় খেলায় 'ড্র' করাতেই তাহাদের অদৃষ্ট-বিপর্য্যয়ের সূত্রপাত হয়। লীগের খেলায় তাহারা এখনও অপরাজিত থাকিয়া গিয়াছে, এই মাত্র তাহাদের সান্ত্বনা। স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও এরিয়ান্সের সহিত একটি খেলায় ইষ্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিংএর বিরুদ্ধে দুই দফার খেলাতেই তাহারা একটি করিয়া পয়েণ্ট নষ্ট করে। বহু নামজাদা ও বাছাই খেলোয়াড় লইয়াও ভবানীপুর ক্লাব লীগে মোটেই আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নাই। বি, এ, রেলওয়ের অবস্থাও তথৈবচ। ঠিক মত সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া খেলিতে পারিলে লীগ-তালিকায় রেল-দলের স্থান আরও উপরে থাকিত। লীগ-প্রতিযোগিতায় ইউরোপীয় দলগুলির দুর্দশার একশেষ হইয়াছে। বহু কৃতিত্বের অধিকারী ক্যালকাটা ক্লাবের অতীত গৌরবের কণামাত্র নাই। রেঞ্জার্স ও ডালহৌসীর অবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক বা আশাপ্রদ নহে। পুলিশ ও কাষ্টমসের মধ্যে প্রথম ডিভিসন হইতে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিবে। পুলিশের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল; কারণ, তাহারা কাষ্টমস্ অপেক্ষা দুই পয়েণ্ট অগ্রগামী আছে। খেলার গতি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ সমালোচনা করিতে গেলে নিতান্ত আশাবাদীও বলিবে যে বাঙলার ফুলবলের অবস্থা দ্রুত অবনতির পথে চলিয়াছে। খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রকৃত খেলোয়াড়ী মনোভাব ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে।

সম্প্রতি ভবানীপুর বনাম মহামেডান স্পোর্টিংএর দুইটি খেলাতে এবং মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলের দ্বিতীয়ার্দ্ধের গুরুত্বপূর্ণ খেলাতে উন্মত্ত জনতা যে তাণ্ডবলীলা চালাইয়াছে তাহা বোধ হয় জগতের খেলার ইতিহাসে বিরল। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিজনিত বিপর্য্যয়ে পর্য্যুদস্ত আমরা খেলার মাঠে যে জাতীয় মনোভাবের অবতারণা করিতেছি, এখনও অবহিত হইতে না পারিলে

এই খেলার মাঠের সামান্যতম বৈষম্য যে ভবিষ্যতে বিরাট দাবাগ্নির সৃষ্টি করিবে না তাহা কে বলিতে পারে?

ভারতীয় ক্রিকেট পর্য্যটক দল :—

আলোচ্য মাসে ভারতীয় ক্রিকেট দল আরও নয়টি খেলায় যোগদান করিয়াছে। তাহার মধ্যে চারটি খেলার শেষ মীমাংসা হয় নাই এবং একটি খেলা বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছে। ভারতীয় দল ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে আট উইকেটে এবং ডার্বিশায়ারের বিরুদ্ধে ১১৮ রাণে জয়ী হয়। প্রথম টেষ্টে লর্ডস মাঠে ভারতীয় দল দশ উইকেটে ও ইয়র্কশায়ারের সহিত প্রথম দফার খেলায় এক ইনিংস ও ৮২ রাণে পরাজিত হয়। ইতিমধ্যে ভারতীয় পক্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান মার্চেণ্ট নিজস্ব সহস্রাধিক রাণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

ল্যাঙ্কাশায়ারের সহিত দ্বিতীয় খেলায় মার্চেণ্ট ২৪২ রাণ করিয়াও নট আউট থাকেন। ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে হার্ডষ্টাফ ২০৫, টিমস ১০৭, ওয়াসব্রুক ১০৮ ও ঈকীন ১০১ রাণ করার কৃতিত্ব দাবী করেন ভারতীয় বোলারগণের মধ্যে মানকড়, অমরনাথ, হাজারী ও সিন্ধে প্রশংসনীয় ভাবে বোলিং করিতেছেন। বিলাতী বিভিন্ন কাউন্টির পক্ষে স্মেলস্, বেডসার, কোলার্ড, বুথ, ঈকীন ও রোডসের নাম উল্লেখযোগ্য।

রাণ-সংখ্যা

দশম খেলা :—

ভারতীয় একাদশ—১ম ইনিংস—৬ উইকেটে ৩৭৬ (অমরনাথ নট্ আউট ১০৪, মানকড় ৮৬, হাজারী ৭১ ও মার্চেণ্ট ৫২)।

গ্লামোর্গ্যান—১ম ইনিংস—১৪১ (ডাইসন ৩৫, মানকড় ৬৮ রাণে ৪টি ও সর্ব্বাতে ৩০ রাণে ৫টি)।

২য় ইনিংস—৭ উইকেটে ৭৩ (উলার ২৪, মানকড় ৩১ রাণে ৩টি)। খেলা অমীমাংসিত থাকে।

একাদশ খেলা—

সম্মিলিত সামরিক দল :—

১ম ইনিংস—৪ উইকেটে ২৪১ (ডেওয়ার্স নট্ আউট—১১)

২য় ইনিংস—১৩৫ (ডেভিস ১৩৪, হাজারী ৬৬ রাণে ৭টি ও মানকড় ৭ রাণে ২টি)।

ভারতীয় একাদশ—১ম ইনিংস—১৫১ (হাজারী নট্ আউট ৬১, ডেভিস ৩৭ রাণে ৪টি)

২য় ইনিংস—৫ উইকেটে ১১৬। খেলা অমীমাংসিত।

দ্বাদশ খেলা :—

ভারতীয় একাদশ—১ম ইনিংস—৫ উইকেটে ৩৪৫ (পাতৌদী নট্ আউট ১০১, মার্চেণ্ট ৮৬, হাজারী ৪১, বাট্‌লার ৭২ রাণে ২টি ও জেপসন ৫৮ রাণে ২টি)।

নটিংহ্যামশায়ার—১ম ইনিংস—১ উইকেটে ২৪। বৃষ্টির জন্য খেলা পরিত্যক্ত।

ত্রয়োদশ খেলা :—প্রথম টেষ্ট :—

ভারতীয় একাদশ :—১ম ইনিংস—২০০ (মুদী নট্ আউট ৫৭, হাফিজ ৪৩, বেডসার ৪১ রাণে ৭টি)।

২য় ইনিংস—২৭৫ (মানকড় ৬৩, অমরনাথ ৫০, বেডসার ৯৬ রাণে ৪টি, স্মেলস ৪৪ রাণে ৩টি ও রাইট্ ৬৮ রাণে ২টি)।

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস—৪২৮ (হার্ডষ্টাফ নট্ আউট ২০৫, গিব্ ৬০, অমরনাথ ১১৮ রাণে ৫টি)।

২য় ইনিংস—কেহ আউট না হইয়া ৪৮। ইংলণ্ড দশ উইকেটে জয়ী হয়।

চতুর্দ্দশ খেলা :—

ভারতীয় একাদশ—১ম ইনিংস ৩২৮ (মার্চেণ্ট ১১০, মুদী ৬৩, অমরনাথ ৫২, ক্লার্ক ৬৩ রাণে ৩টি, মেরিট ১০১ রাণে ৩টি)।

২য় ইনিংস—১ উইকেটে ১১১ (মার্চেণ্ট নট্ আউট ৭২, অমরনাথ নট আউট ৮২)।

নর্দ্দাম্পটনশায়ার—১ম ইনিংস—৩৬২ (ব্রুকস্ ৮২, টিমস্ ১০৭, ব্যারণ ৬৪, মানকড় ৯১ রাণে ৫টি ও সিন্ধে ৪৮ রাণে ৩টি) খেলা অমীমাংসিত থাকে।

পঞ্চদশ খেলা ;—

ল্যাঙ্কাশায়ার—১ম ইনিংস—১৪০ (ওয়াসব্রুক ৫৮, ব্যানার্জী ৩২ রাণে ৫টি ও অমরনাথ ৪৮ রাণে ৩টি)।

২য় ইনিংস—১৮৫ (ওয়াসব্রুক ৪৮, ঈকীন ৫৫; মানকড় ১৭ রাণে ৩টি, ব্যানার্জী ২৭ রাণে ২টি ও সর্ব্বাতে ৩৮ রাণে ২টি)।

ভারতীয় একাদশ—১ম ইনিংস—১২৬ (পাতৌদী ৩৫; পোলার্ড ৪১ রাণে ৭টি)।

২য় ইনিংস—২ উইকেটে ২০০ (মার্চেণ্ট নট্ আউট ১০; পাতৌদী নট আউট ৮০)। ভারতীয় দল ৮ উইকেটে জয়ী হয়।

ষোড়শ খেলা :—

ভারতীয় দল—১ম ইনিংস—১৫৮ (হাজারী ২১, নাইডু ২১; বুথ ৩৩ রাণে ৬টি ও স্মেলস ২৭ রাণে ২টি)।

২য় ইনিংস—১২৪ (নাইডু ২৮, পাতৌদী ২০, বুথ ৫৮ রাণে ৪টি ও রবিন্সন ৪০ রাণে ৪টি)।

ইয়র্কশায়ার—১ ইনিংস—১ উইকেটে ৩৪৪ (হাটন নট আউট ১৮৩, উইলসন ৭৪, স্মেলস ৩৫, নাইডু ২৭ রাণে ৫টি)।

ইয়র্কশায়ার ১ম ইনিংস ও ৮২ রাণে জয়ী হয়।

সপ্তদশ খেলা :—

ল্যাঙ্কাশায়ার—১ম ইনিংস—৪০৬ (ওয়াসব্রুক ১০৮, ঈকীন ১৩১, হাটন ৭৩, সোহনী ৮২ রাণে ৫টি ও মানকড় ১৩৪ রাণে ৪টি)।

২য় ইনিংস—১৭২ (প্লেস ৩৭, মানকড় ৬২ রাণে ৫টি ও হাজারী ৩৩ রাণে ৩টি)। খেলা অমীমাংসিত।

ভারতীয় দল—১ম ইনিংস—৮ উইকেটে ৪৫৬ (মার্চেণ্ট নট্ আউট্ ২৪২, সোহনী ৪৪, ঈকীন ১২০ রাণে ৩টি)।

অষ্টাদশ খেলা :—

ভারতীয় দল—১ম ইনিংস—৩৮০ (পাতৌদী ১১৩, মুদী ৯১, গুলমহম্মদ ৬২, রোডস ৪৪ রাণে ৫টি ও কপসন ২১ রাণে ২টি)।

২য় ইনিংস—৩১৩ (অমরনাথ ৮১, মুদী ৬৮, পোপ ৮০ রাণে ৩টি)।

ডার্বিশায়ার—১ম ইনিংস—৩৬৬ (মার্স ৮৬, ইলিয়ট ৬১, সিন্ধে ১৯ রাণে ৪টি ও মানকড় ৬১ রাণে ৪টি)।

২য় ইনিংস—২০৯ (ইলিয়ট ৪৪, রেভিল ৪০)।

ভারতীয় দল ১১৮ রাণে জয়ী।

সাময়িক প্রসঙ্গ

মন্ত্রীমিশন ব্যর্থ

ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের সহিত বৃটিশ মন্ত্রী-মিশনের এক শ' দিনের আলোচনা দুই শ' বৎসরের পরাধীনতার বনিয়াদ টলাইতে পারে নাই। আলোচনার প্রধান ফল—কংগ্রেস কর্তৃক মধ্যবর্ত্তী সরকার গঠনের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান, তবে স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র গঠনের দীর্ঘমিয়াদী প্রস্তাব গ্রহণ; মসলেম লীগ কর্তৃক মিশনের প্রস্তাবগুলি বেমালুম হজম; পরিশেষে কংগ্রেস-বর্জ্জিত মধ্যবর্ত্তী সরকার গঠনের পরিকল্পনা পরিত্যাগ; নূতন মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের লইয়া কেয়ার-টেকার বা অস্থি-সরকার গঠন এবং অবিলম্বে কন্‌ষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলী বা শাসনতন্ত্র-নির্ণয়-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা।

মিশনের দূতিয়ালীর এই ব্যর্থতায় গণ-প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠিত হইতে পারিল না বলিয়া কংগ্রেস দুঃখিত আর মসলেম লীগ ক্ষিপ্ত। কারণ কংগ্রেসকে বাদ দিয়া সরকার গঠিত হইল না। লীগের মুখপত্র 'ডন' বিষোদ্গার করিয়া বলিলেন—"মিশনের এই ব্যর্থতা অত্যন্ত দুষ্ট, অত্যন্ত অপমানকর, মসলেম ভারতের প্রতি ইহাতে অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করা হইয়াছে।"

বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরা বলিতেছেন, মধ্যবর্ত্তী সরকারে যোগদান করিতে কংগ্রেস যে অসম্মত হইয়াছেন, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতের মুক্তিকাম জনসাধারণ এই কৃপা ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কিন্তু কংগ্রেসকে দীর্ঘমিয়াদী সরকার গঠনের পরিকল্পনা মানিয়া লইতে দেখিয়া মনে হইতেছে কংগ্রেসের নেতৃত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কংগ্রেসের এই পরোক্ষ সম্মতিতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ভারত ছাড়'-নীতি ও আগষ্ট-প্রস্তাবকে উপহাস করা হইয়াছে, ভারতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক নেতৃত্ব অটুট রাখিতে হইলে, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তই প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে।

প্রতিকার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম

অনেকে মনে করিলেও, পণ্ডিত জওহরলালের মত দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস-নেতারা বামপন্থীদের মনোভাবকে নির্ব্বীর্য্য আস্ফালন বলিয়া মনে করেন না। বামপন্থীরা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ন্যায় গান্ধীজীকে ভারতবাসীর রাজনৈতিক মহাগুরু বলিয়া গণ্য করিলেও, তাঁহারা মনে করেন যে, গান্ধীজী ভারতীয় জনগণের চিত্তে বৈপ্লবিক প্রেরণা ও আগ্রহের সৃষ্টি করিলেও বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তাঁহার সংগ্রাম-কৌশল তাঁহারা মানিয়া লইতে সম্মত নহেন। তাই সেদিন উনাওয়ের এক সভায় বোম্বাই ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপতি বলিয়াছেন যে, নেতাজীর মহা-প্রেরণায় ভারত নব শক্তির স্পন্দনে স্পন্দিত। এই শক্তি প্রদমিত করা ইংরেজের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এ সময় আপোষের কথা উঠিলে ইংরেজের সুবিধা হইবে আর ভারতও তাহার কাঁধ হইতে বৈদেশিক শাসনের বোঝা কোন দিনই নামাইতে পারিবে না। বামপন্থীরা প্রকৃতপক্ষে নেতাজীর আদর্শের অনুসরণ করিতে চাহে। তাহারা দেখিতেছে, সৈন্যদল দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, জনগণকে ক্ষিপ্ত করিয়া সংগ্রামের জন্য পরিচালিত করা শক্ত নয়। শত্রু ইংরেজের বিরুদ্ধে রুশিয়া ও আমেরিকা আয়োজন করিতেছে। ইংরেজের ভরসা মাত্র ভারতবাসীর কৃপা। তাই মন্ত্রীমিশনের মিঠি বুলি, তাই বচন-চাতুর্য্যের চালাকী! বামপন্থীদের স্পষ্ট কথা—"The bullying tactics of English diplomats encouraged by fifth columnists of India must be wrecked once for all by masterly strokes of straight-forward and direct action."

বাদশাহ জিন্না ক্ষিপ্ত

মধ্যবর্ত্তী সরকার গঠনে বড়লাট অন্যায় ভাবে মসলেম লীগকে 'ভিটো' দিবার ক্ষমতা যে দিয়াছিলেন তাহা কংগ্রেসের সভাপতির ২৩শে জুন তারিখের পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। মাত্র তাহাই নহে, প্রস্তাবিত সরকারের অধিকাংশ মুসলমান মন্ত্রীকে যে কোন প্রস্তাব সম্বন্ধে বাধা প্রদানের সুযোগ দিতেও বড়লাট অরাজি ছিলেন না।

মিশনের শেষ বিবৃতির পর এক জন বিশিষ্ট এংলো-ইণ্ডিয়ান নেতা মন্তব্য করিয়াছেন—"The Cabinet Delegation all along flirted with the League, but at the end gave a parting kick."

জিন্নার আব্দার—বড়লাটের নিকট হইতে যে 'কোটা' তিনি আদায় করিয়াছেন, তাহার উপর তিনি পূর্ণ কর্তৃত্ব করিবেন। কংগ্রেস যে 'কোটা' পাইয়াছেন তাহার মধ্য হইতে হিন্দু প্রতিনিধিদের সংখ্যা কমাইয়াও যদি কংগ্রেস এক জন মুসলমান প্রতিনিধি মনোনয়নের দাবী করেন, তাহা জিন্না মঞ্জুর করিতে নারাজ। লীগের শক্তি বর্দ্ধিত করিবার জন্য ইহা এক প্রকারের 'বয়কট' নীতি। কোন মুসলমান লীগের বাহিরে থাকেন ইহা নিবারণ করিবার জন্যই জিন্না ইংরেজের সাহায্য চাহেন।

জিন্নার এ আব্দারের যৌক্তিকতা নিশ্চয় আছে। মন্ত্রীমিশন ভারতে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি লর্ড ওয়াভেলের নিকট হইতে প্যারিটি বা সংখ্যা-সাম্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু বিশেষ সুযোগের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিলেন। তাহার পর ১১শে জুনের পত্রে লর্ড ওয়াভেল আরও যে সব আব্দার পূরণ করেন, তাহার মধ্যে প্রধান—(১) দুই প্রধান দলের সম্মতি ব্যতীত ১৬ই জুনের বিবৃতির কোন অদল-বদল হইবে না; (২) দুই প্রধান দলের সর্ব্বসম্মত সম্মতি ব্যতীত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের (সম্প্রদায় কথার উপর জোর) সদস্য-সংখ্যার হার পরিবর্ত্তিত হইবে না; (৩) প্রধান দলগুলির অধিকাংশ সদস্য বিরোধী হইলে মধ্যবর্ত্তী সরকার কোন গুরু সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন না।

এই সব বড় বড় সুবিধার হাতিয়ারে সজ্জিত হইয়া জিন্না মধ্যবর্ত্তী সরকারে বিশেষ শক্তি লাভ করিবার আশা করিয়াছিলেন—তা কংগ্রেস সে সরকারে যোগদান করুক, চাই না করুক। কিন্তু কংগ্রেস জিন্নার মত কূটনীতি-বিদের সকল মতলব ব্যর্থ করিয়াছেন মধ্যবর্ত্তী সরকারে যোগদান করিতে অস্বীকার করিয়া। যে সরকারে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়, তথা সংখ্যা-বলিষ্ঠ রাজনৈতিক দল লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় ও দলে পরিণত, যে সরকারকে ব্যবস্থা পরিষদের নিকট আপন কার্য্যের জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে না, সে সরকার মসলেম লীগের মত একটা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় ও দলের 'ভিটো' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে উহা সমগ্র জাতি ও দেশের সম্পূর্ণ স্বার্থ-বিরোধী হইবে। কাজেই বাদশাহ জিন্নার খেয়ালে সম্মত হইতে কংগ্রেস অসম্মত হইয়াছেন।

মুসলমান জাতীয়তাবাদী নয় কেন?

কংগ্রেস যে মধ্যবর্ত্তী সরকারে যোগদান করিলেন না তাহার অন্যতম হেতু, বড়লাট মন্ত্রি-সভায় জাতীয়তাবাদী কোন মুসলমানকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। কংগ্রেস অবশ্য দাবী করেন যে, তাঁহারা ভারতের সর্ব্বজনীন জাতীয় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ইহা সত্য যে, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানভুক্ত মুসলমান প্রার্থীদের, যে কারণেই হউক, নির্ব্বাচকগণ মানিয়া লইতে সম্মত হন নাই। অর্থাৎ মুসলমানেরা আপনাদের স্বার্থ সম্পর্কে কংগ্রেসকে মানিতে চাহে নাই। কেন? দোষ কংগ্রেস গঠন-ব্যবস্থার। ভারতীয় জনসাধারণের অন্তরে জাতীয়তা বোধ জাগ্রত করিবার যে চেষ্টা কংগ্রেস করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা প্রত্যক্ষ ভাবে মুসলমানদের নিকট উপস্থিত হন নাই। হয় খিলাফতের মারফত বা কংগ্রেসের ভিতরের কোন মুসলমান দলের মারফতই তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন। ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত খিলাফৎ কমিটিগুলি জাতীয়তাবাদের কোন উপকারে আসে নাই, বরং সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিই বর্দ্ধিত করিয়াছে। জাতীয় বুদ্ধি জাগ্রত করিবার জন্য কংগ্রেস যখন সর্ব্বজনীন চেষ্টার সহিত মুসলমান স্বার্থ জড়িত করিলেন না, তখন সেই পার্থক্য বুদ্ধির সুযোগ লইলেন মিঃ জিন্না আলি-ভাইদের স্বদলভুক্ত করিয়া। গত নির্ব্বাচনে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মুসলমান জনসাধারণের নিকট এ পর্য্যন্ত অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কোন কর্ম্ম-তালিকা লইয়া কংগ্রেস কোন কাজ করে নাই। নিরপেক্ষ মুসলমান কংগ্রেসকে যেমন শ্রদ্ধা করে, লীগকেও তেমনই সম্মান করে তাহাদের সুস্পষ্ট আদর্শের জন্য। তাহারা জাতীয়তাবাদ বলিতে কংগ্রেস বুঝে, এবং মুসলমান বলিতে লীগ বুঝে; কিন্তু দুইয়ের মিশ্রণে জাতীয়তাবাদী মুসলমান যে কি, তাহা বুঝিতে পারে না। মিঃ ফজলুল হক বা মোঃ নৌসের আলি যখন লীগপন্থী হইয়া জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিরোধ করেন, তখন তাহা বুঝা যায়। কিন্তু সেই মিঃ হক ও মোঃ নৌশের আলি যখন কংগ্রেসে প্রবেশ না করিয়া জাতীয়তা-বাদীর তকমা আঁটিয়া কোন পীরের সার্টিফিকেট লইয়া মুসলমানদের দ্বারস্থ হন, তখন মুসলমান জনসাধারণ ব্যক্তির শ্রদ্ধা করিলেও তাঁহাদের আদর্শের শ্রদ্ধা করিতে পারে না। জাতীয়তাবাদী মুসলমান প্রার্থীরা এ কথাই বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, লীগপন্থীদের অপেক্ষা তাঁহারা পাকা মুসলমান, অনেকে পাকিস্থানও কায়েম রাখিবার কথাও তোলেন, অনেকে ইহাও বলেন যে, আখেরে ভারতে ইসলামের জয়কেতন উড়াইবারই সুসঙ্কল্প তাঁহাদের বর্ত্তমান। তাঁহারা যেন বুঝাইতে চাহেন—"The way for Islamic dominance lay in co-operating with others in infiltrating, rather than in complete separation of Muslim majority areas"—অর্থাৎ লীগের সহিত জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের আদর্শগত কোন ভেদ নাই। তাঁহাদের বক্তব্য মাত্র এই যে, এই আদর্শ কার্য্যকরী করিবার জন্য জিন্নার দল ভালও নয় সাধুও নহে,—ভাল ও সাধু তাঁহারা।

পবিত্র ইসলাম ও হিন্দু-সাধারণ

মসলেম লীগের সভাপতি মহম্মদ আলি জিন্নার-বৃটেনের সংস্করণ—আলি মহম্মদ খান। ইনি হন মসলেম লীগের গ্রেট বৃটেন শাখার সভাপতি। সম্প্রতি ইনি ডাঃ আম্বেদকরকে পরামর্শ দিয়াছেন—"হিন্দু-অত্যাচার হইতে মুক্তির একমাত্র উপায় ইসলাম ধর্ম্ম অবলম্বন করা। কাজেই তোমরা পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর।"

বিদেশীর তরবারির খোঁচা খাইয়া ভারতের বর্ত্তমান মুসলমানদের যে পূর্ব্বপুরুষরা পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাও কোন অত্যাচার হইতে আজিও মুক্তি পায় নাই। কাজেই, তাহাদের এই উস্কানীতে উত্তেজিত হইয়া আম্বেদকার পর্য্যন্ত যে কলমা পড়িবেন না, ইহা ধ্রুব সত্য।

ভারতের তথাকথিত লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়রা ভাল ভাবেই বুঝিয়াছে যে, তাহাদের প্রতি জিন্না সম্প্রদায়ের সাময়িক প্রেম, ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীদের 'সীতাপতি-বিহঙ্গ' পুষিবার রসনা-পুলক মাত্র। তাহারা বুঝিয়াছে জাতীয়তাবাদী ভারত—প্রহার, কারাক্লেশ, অনশন, ফাঁসীমঞ্চে মৃত্যুবরণ করিয়া শত বৎসর যে সংগ্রাম করিয়াছে, সে সংগ্রামের ফল লীগের মাতব্বর জিন্না বচনের মুন্সীয়ানায় আপনার ও আপনার দলের প্রয়োজনে প্রয়োগ করিতে চাহে। তাহারা জানে—মাত্র তাহারা নহে—ভারতের অধিকাংশ মুসলমান জানে, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জিন্নার কিছুমাত্র ত্যাগ নাই। 'রসীদ আলি দিবসে' মসলেম লীগের স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। শিখ, খৃষ্টান, পারসী এমন কি এংলো-ইণ্ডিয়ানরা পর্য্যন্ত আজ কংগ্রেসের সহিত সম্মিলিত হইতে চাহিতেছেন। খৃষ্টান প্রতিনিধিরাও মন্ত্রী মিশনকে স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলীতে তাঁহারা কংগ্রেসের সহিত একত্রে কাজ করিবেন। অবশ্য এ কথা শুনিয়া বড়লাট ওয়াভেল চমকিয়া গিয়াছেন। এংলো-ইণ্ডিয়ানরাও অগ্নি উদ্গিরণ করিয়াছে। এবার মসলেম লীগ ভারতের কোন সম্প্রদায়কে পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার স্পর্দ্ধা রাখে, তৎপ্রতি মাত্র হিন্দুরা নহে—লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি ব্যক্তি, এমন কি মুসলমানরা পর্য্যন্ত লক্ষ্য রাখিবে।

এংলো-ইণ্ডিয়ানদের ক্রোধ

প্রস্তাবিত মধ্যবর্ত্তী সরকারে এংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়কে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই "ভয়ঙ্কর অন্যায়ের" প্রতিবাদস্বরূপ এংলো-ইণ্ডিয়ান নেতা মিঃ ফ্রাঙ্ক এণ্টনী "আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন" প্রত্যেক এংলো-ইণ্ডিয়ানকে অক্জিলিয়ারী ফোর্স হইতে পদত্যাগ

করিতে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এ দেশের জনসাধারণের বিরুদ্ধে এই অক্সিলারী ফৌজকে প্রয়োগ করা হইয়াছিল। মিঃ এণ্টনী বলিয়াছেন যে, এংলো-ইণ্ডিয়ানরা ভারতীয় সম্প্রদায়, তাহাদের সম্বন্ধে সামরিক কর্ত্তব্য বাধ্যতামূলক করিবার কোন অধিকার ভারত সরকারের নাই।" স্তক্ক কমিটা মধ্যবর্ত্তী সরকারে এ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করেন নাই, কংগ্রেসও নহে। কিন্তু এই 'ভয়ঙ্কর অন্যায়' প্রত্যক্ষ করিয়া ফেরঙ্গ সমাজের যথাসময়ে চৈতন্ত হওয়া উচিত ছিল। আজ এংলো-ইণ্ডিয়ান নেতা বলিতেছেন তাঁহার সমাজবে—"refuse to do any more dirty work for the bureaucracy"—আমলাতন্ত্রের হইয়া আর কোন কুকাজ কখনও করিও না। কিন্তু গত অর্দ্ধ শতাব্দী এই সমাজ ভারতের রাজনৈতিক সর্ব্ব প্রচেষ্টা পণ্ড করিবার জন্ত বরাবর রাজার জাতের গৌরবের দাবীই করিয়া ভারতীয় শোণিতের যে অবমাননা করিয়াছে, তাহা ক্ষমা করিয়া ভুলিয়া যাওয়া বেদনাদায়ক।

প্রবাসী ইউরোপীয়দের সুমতি

ইউরোপীয়ান এসোসিয়েসনের মাদ্রাজ শাখার সভাপতি তাঁহার এসোসিয়েসনের বার্ষিক সভায় বলিয়াছেন—"যত দিন বেসরকারী ইউরোপীয়দের ভারতে থাকিতে হইবে, তত দিন রাজনৈতিক কার্য্য-কলাপ হইতে দূরে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। এ দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্ত আমরা কি করিতে পারি, তাহা নির্ভর করিতেছে ভারতীয় জনসাধারণের সদিচ্ছার উপর। আমাদের সম্প্রদায়ের জন্ত বৃটিশ সরকারের ব্যবস্থায় কতকগুলি রক্ষাকবচের উপর উহা নির্ভর করে না। কিন্তু এত দিন এই জলৌকা সমাজ ভারতের যে শোণিত শোষণ করিয়া আসিয়াছে—এবং এ সমাজের প্রত্যেকটি শ্বেতাঙ্গ আমাদের মত কালা নিগারদের যে অপমান করিয়া আসিয়াছে, ফাটা গাঁহা লইয়া আজ এই মিঠে কথায় আমরা উহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারিব কি?

কমুনিষ্ট দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ

অধ্যাপক বাটলিওয়ালা পূর্ব্বে ভারতীয় কমুনিষ্ট দলে ছিলেন। তিনি সে দিন কানপুরে এক সাংবাদিক বৈঠকে সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন—আমি আবার ভারতীয় কমুনিষ্ট দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছি যে, তাহারা আজাদ হিন্দ ফৌজের ও ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী কর্মীদের সহিত লড়িবার জন্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ম্যাক্সওয়েল ও সামরিক কর্তৃপক্ষের এজেন্টরূপে কার্য্য করে।

"I once again repeat my charge against them that they acted directly and indirctly as the agents of Maxwell and the Army G.H.Q. to fight the Azad Hind Fauz and the Nationalist workers of the movement of August, 1942, and that their alliance went to the length of working hand-in-glove with the intelligence department of the Civil and Military branch of Delhi."

অধ্যাপক বাটলিওয়ালার আরও প্রত্যক্ষ অভিযোগ এই যে—পি সি যোশী এণ্ড কোম্পানী দলের সদস্তদের মাত্র রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ নিয়ন্ত্রিত করিবার দাবী করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তাঁহারা তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনও নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন। তাঁহারা দাবী করেন যে, দলের সদস্তদের বিবাহ ব্যাপার মাত্র তাঁহাদেরই অনুমোদন-সাপেক্ষ। তাঁহারাই বর কনে স্থির করিবেন! মাত্র তাহাই নহে, তাঁহাদেরই নির্দ্দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ হইবে অথবা স্বামী স্ত্রী বাধ্য হইয়া একত্রে থাকিতে হইবে! অধ্যাপক বাটলিওয়ালার আরও অভিযোগ—"They go further and claim and exercise, the right of abortion."

এ সব অভিযোগ গুরুতর। বাংলার কমুনিষ্ট দলে অনেক চরিত্রবান্ শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী আছেন, শক্তি থাকে তাঁহারা বাটলিওয়ালার এ সব অভিযোগের হয় সমর্থন করুন, না হয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া প্রকাশ্যে তাহার প্রতিবাদ করুন।

দাঙ্গা আর দাঙ্গা

প্রাদেশিক পরিষদগুলির গত নির্ব্বাচন এবং মন্ত্রীমিশনের নিকট মসলেম লীগের জোর আব্দারের কলরব কতকটা মন্দীভূত হইলেও ভারতের বিভিন্ন স্থানে তুচ্ছ তুচ্ছ ব্যাপারের অছিলায় স্বার্থবান্‌রা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় চাঞ্চল্য জিয়াইয়া রাখিয়াছে। ভারতে না কি ছত্রিশ সম্প্রদায়। তবু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলিতে মুসলমানরা হিন্দুরই বুকে ছোরা মারে, হিন্দুরাও তাহার পাল্টা জবাব দিতে ছাড়ে না। উচ্চ স্তরের হিন্দুদের টিকিও কাটিতে মুসলমানরা পারে না। কারণ তাহারা অর্থে, সম্পদে ও প্রভাবে শক্তিশালী। কারণ, তাহারা লাঠি উদ্যত হইবার পূর্ব্বেই লাঠিয়াল ভাড়া করিতে পারে। দাঙ্গা হয় সাধারণতঃ দরিদ্র হিন্দুর সহিত দরিদ্র মুসলমানের। মসলেম লীগ যে দলিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্ত ঘটি ঘটি অশ্রু শিকায় তুলিয়া রাখিয়াছে, দাঙ্গার সময় মুসলমানরা তাহাদেরই ঘর-বাড়ী জ্বালাইয়া দেয়, এই শ্রেণীর পথচারী-দেরই উপর ছুরি চালায়।

গত রথযাত্রার দিন আমেদাবাদেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। সাম্প্রদায়িক বর্ব্বরদের ভাড়াটিয়া গুণ্ডারা ঘর-বাড়ী জ্বালাইয়াছে, দোকান-পাট লুটিয়াছে, পশ্চাৎ হইতে ছোরা মারিয়া বহু শত ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে। সহস্র সহস্র নরনারী কংগ্রেস-ভবনে আশ্রয় লয়। বোম্বাই হইতে স্বরাষ্ট্র-সচিব শ্রীযুত মোরারজি দেশাই আমেদাবাদে গিয়াই স্থানীয় মসলেম লীগের পাণ্ডাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন; ইহা হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে, দাঙ্গার মূলে কাহারা। শ্রীযুক্ত মোরারজিকে গান্ধীজী বলিয়া দিয়াছিলেন—"যাও—পুলিশ বা ফৌজের সাহায্য না লইয়া, মাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীর মত আগুনে প্রবেশ কর। এরূপ বেশী কর্ম্মী যদি পাওয়া যায় তাহা হইলেই এ ব্যাপার চিরদিনের মত শান্ত হইবে।" গান্ধীজী দাঙ্গা নিবারণের জন্ত দাঙ্গাকারীদের সাজা না দিয়াও, না মারিয়া মরিবার কৌশল শিখিতে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"৪০ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে এক কোটিও যদি মরিবার মত মরিতে জানে তাহা হইলে কর্ম্মভূমি ভারত স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইবে।" প্রেম-ধর্ম্ম দিয়া গান্ধীজী পশু ও গুণ্ডাদের মতি ফিরাইবার উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার জীবিত-কালে এরূপে অসংখ্য দাঙ্গা হইয়াছে, কিন্তু কোন দাঙ্গাতেই তিনি বা তাঁহার সাক্ষাৎ সত্যাগ্রহী শিষ্যরা গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীর ফরমূলা কাজে পরিণত করিতে পারেন নাই। মৌলানা মহম্মদ আলির গৃহদ্বারে তাঁহার

অনশনেও পশুদের চৈতন্য হয় নাই। মুসলমান-নিপীড়িতা বহু হিন্দু নারী গান্ধীজীর নিকট আপনাদের সতীত্ব রক্ষার আবেদন জানাইলেও নারীর মর্য্যাদা আজিও লজ্জিত হইতেছে। পশুরা ভয় করে পশুকে। আমাদের মনে হয়, যত দিন না দাঙ্গাকারী বা তাহাদের মন্ত্রদাতারা বুঝিতেছে, প্রতি হিন্দু পুরুষ ও নারীর পশ্চাতে মাত্র এক দুর্জ্জয় মানসিক শক্তি নহে, অপরাজের এমন এক দৈহিক শক্তি সদা জাগ্রত ও উদ্যত রহিয়াছে, যে শক্তি আঘাতের বিনিময়ে মাত্র আঘাত নহে, আরও বেশী কিছু দিতে পারে, মাত্র তখনই তাহাদের চৈতন্য হইবে। পশুকে যে পরাজিত করিয়া পোষ মানাইতে হয়, ইহা গান্ধীজী উত্তমরূপেই অবগত। কোন আলি-ভাইকে তিনি যেমন পোষ মানাইতে পারেন নাই, তেমনই আলি-ভাইদের স্বলাভিষিক্ত গণও পোষ মানিতে অসম্মত। এ সকল অশান্তকে শান্ত ও সংযত করিবার জন্য সদৃশ সৈনিকের নিয়োগ অপরিহার্য্য।

আবার বন্যা

বাংলা, বিহার ও আসাম আবার বন্যা-বিপন্ন। চট্টগ্রামের হালদা ও কর্ণফুলি, প্রলয়ঙ্করী পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও কপিলা, বর্দ্ধমানের দুর্জ্জয় নদ দামোদর, বিহারের কুশী আবার ক্ষিপ্ত। চট্টগ্রামের প্রায় ৬ শত বর্গ-মাইলের প্রায় ৫ লক্ষ লোক বিপন্ন ও নিরাশ্রয়। আসামের ডিব্রুগড়, নওগাঁও, শিলচর, শিবসাগর, জোড়হাট, কামরূপের বিস্তৃত অঞ্চল বন্যা-বিধৌত। রণ-রাক্ষসদের কারসাজিতে জনসাধারণ একেই নিরাশ্রয় ও নিরন্ন, একেই তাহারা আপদ-প্রতিরোধের শক্তিহীন, তাহার উপর এই দৈব-নিগ্রহ। দৈব নহে—বিদেশীর অর্থনৈতিক চক্রান্তে বাংলা, বিহার ও আসামের উৎপাদকদের অন্ন ও সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য স্বাভাবিক জলনিকাশের ব্যবস্থা নষ্ট করিয়া বুকের উপর যে রেলওয়ে বাঁধ বসিয়াছে, তাহারই ফলে এই বন্যা-নিগ্রহ। বারম্বার, প্রতি বৎসর মানুষ মরে, তাহাতে উহাদের কিছুই আসিয়া যায় না। নেতারা বুঝেন এ সব কথা, তবু আশ্বাস দেন, এবার ঝুলিয়া পড়, স্বাধীন ভারত আসিলে তোমাদের খালাস করিব। সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক লুব্ধ তস্করদের লুণ্ঠনের ফলে দুর্ভিক্ষেও যেমন দেশ ফৌৎ হইয়া যাইতেছে, তাহাদের হৃদয়হীন কারসাজির ফলে প্রতি বর্ষায় পোকা-মাকড়ের মত বন্যাতেও তেমনই নিরাশ্রয় দরিদ্ররা ভাসিয়া যাইতেছে। ঘুণ মারিয়া কেহ স্বাধীনতার সংগ্রাম করে, পতাকা-বিলাসের কৃত্রিম অহমিকায় 'কোম ঝাণ্ডার' জন্য কেহ সংগ্রাম করে, বচন-চাতুর্য্যে সস্তায় রাষ্ট্রনৈতিক মাতব্বর সাজিবার জন্য কেহ সংগ্রাম করে, বিদেশীর অর্থ ও উস্কানীতে কেহ বা পাকিস্থানের জন্য জিগির ছাড়ে; কিন্তু মহাবার্য্যে অর্থনৈতিক-বিপন্ন নর-নারীর অগ্রে দাঁড়াইয়া অবিলম্ব-প্রতিকার প্রতিরোধের জন্য উহাদিগকে কেহ পরিচালিত করে না। বন্যার জন্য যদি বাঁধই দায়ী হয়, নিঃসংশয় হও এবং এই পাপ চিরতরে দূর করিবার অন্য উপায় না থাকিলে বাঁধ বিলোপের জন্য বেপরোয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চালাও। তাহা না পার ভিক্ষা কর, চাঁদার খাতা পূর্ণ কর, বন্যাত্রাণ সমিতি গঠন কর, সাবুর বাটি যত দূর পার নিরন্নদের মুখে তুলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ কর; তার পর উদ্বৃত্ত অর্থ লইয়া খাদির ব্যবসা কর, না হয় দলের জন্য সংবাদপত্রের আফিস খুলিয়া বস। নির্ব্বীর্য্যের দৌড় ত ঐ পর্য্যন্ত।

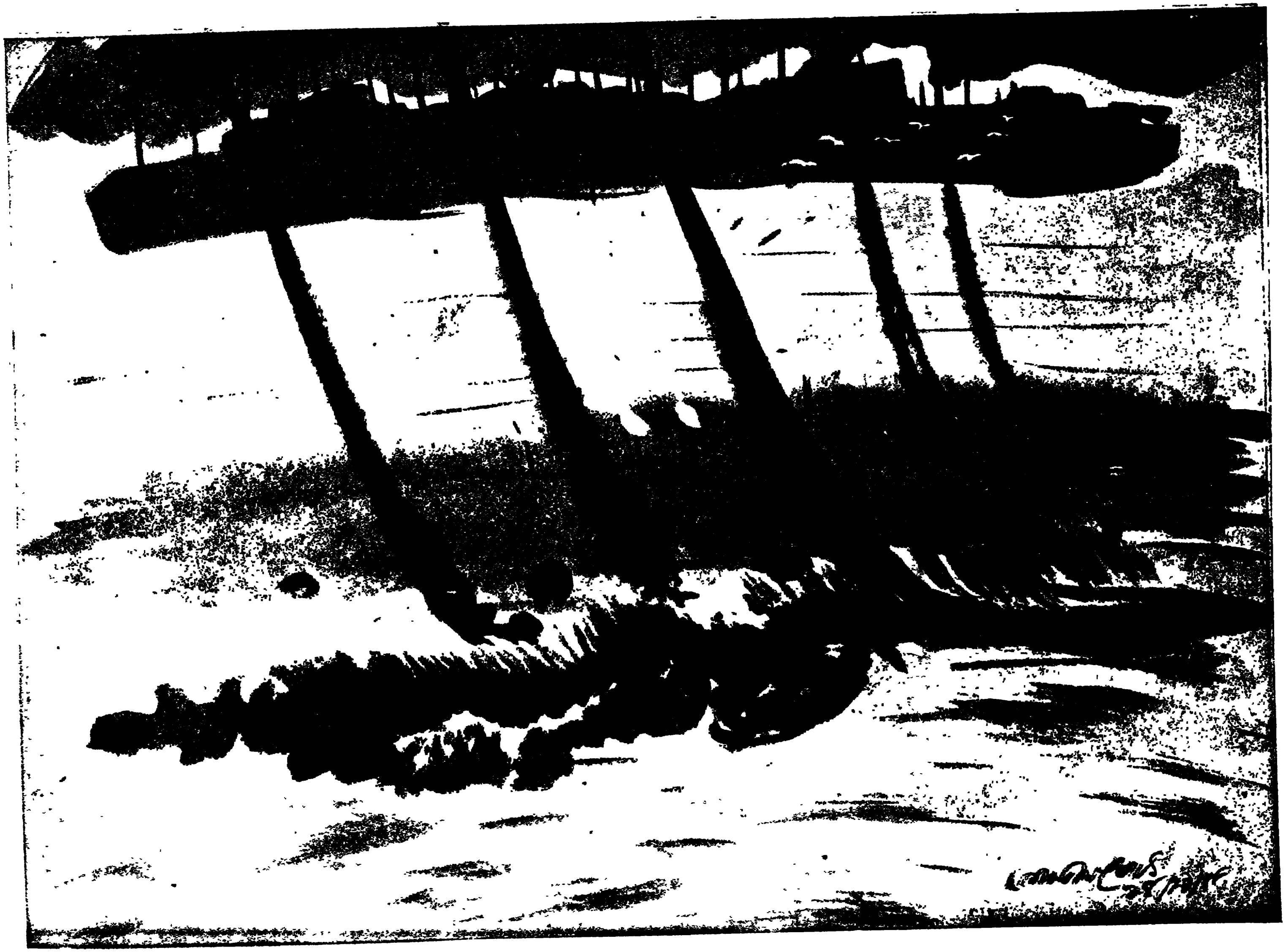
পোষ্টাল কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট

ডাক বিভাগের কর্ম্মচারীরা ভারতের সর্ব্বত্র ধর্ম্মঘট করিয়াছে। কর্তৃপক্ষ হুমকী দিয়াছেন। বলিয়াছেন, উহাদিগকে সসপেণ্ড করা হইবে। কেন তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করা হইবে না তজ্জন্য তাহাদের কৈফিয়ৎ লওয়া হইবে। কিন্তু কোনো হুমকীতেই ফল হয় নাই। দাবী না মিটা পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘটকারীরা মাথা নত করিবে না বলিয়া সংকল্পবদ্ধ হইয়াছে। অনেক স্থলে ধর্ম্মঘট নিরুপদ্রব নয়। পাটনায় বিভিন্ন অঞ্চলের ডাকবিনে চেক, ড্রাফট প্রভৃতি এবং অন্যান্য শত শত চিঠি-পত্র পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। সৈন্যদিগকে সরকার ডাক বাছাই ও বিলির কাজ করিতে আহ্বান করিলে তাহারা তাহাতে সম্মত হয় নাই। রেলওয়ে ডাক ও টেলিগ্রাফ সভ্য জগতের শোণিত-শিরা। এগুলি অচল করিয়া নিরুপদ্রব ভাবে রাজনৈতিক কাম্য লাভ কঠিন নয়। জানি না, ডাক বিভাগের কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘটের পিছনে এরূপ কোন উদ্দেশ্য আছে কি না। যদি থাকে তবে জনসাধারণকে সহস্র অসুবিধা ভোগ করিয়াও কর্ম্মচারীদের সমর্থন করিতে হইবে।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ

দক্ষিণ-আফ্রিকা বা ফ্যাসিষ্ট স্মাট্সল্যাণ্ডে ভারতবাসীরা ভারতীয় বিরোধী বিলের প্রতিরোধের জন্য যে সত্যাগ্রহ পরিচালিত করিতেছে, তাহা পুরা দমে চলিতেছে। এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ভারতবাসী এশিয়ার প্রত্যেক নিগৃহীত জাতির সহানুভূতি লাভ করিয়াছে। ধনী ইহুদীদের এশিয়াবাসীর পর্য্যায়ভুক্ত না করা হইলেও বর্ত্তমানে ইংরেজ-বিরোধী ইহুদীরা ভারতবাসীদের প্রতি সহানুভূতি জানাইতেছে। ডার্ব্বানের ম্যাজিষ্ট্রেট ইহুদী নেতা মিঃ বেনি সিশচিকে সত্যাগ্রহের জন্য ১৫ পাউণ্ড জরিমানা করিলে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন,—"তোমাদের এই আইন সমগ্র এশিয়াবাসীর পক্ষে অপমানকর। এ অপমান তোমারও আমারও—" The act is an insult to all Asiatic peoples and it includes you and me, Sir, as members of the Jewish community, although the Act expressly excludes the Jewish people from being regarded in the Asiatic group." ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য ভারতের চৌহদ্দীর চারি দিক হইতে প্রবাসী ভারতবাসীদের সম-স্বাধীনতার সংগ্রাম অপরিহার্য্য। পূর্ব্ব-আফ্রিকায়, সিংহলে, আন্দামানে ও মালয়ে ভারতবাসীদের এরূপ সক্রিয় আন্দোলন যদি আরম্ভ হয় এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সহিত আপনাদের স্বাধীনতা—সংগ্রামকে একাঙ্গভুক্ত করিবার জন্য যাহাদের চেষ্টা, সেই ব্রহ্ম, সেই ইন্দোনেশিয়া, যদি সেই সংগ্রামের সহিত যুগপৎ সংগ্রাম আরম্ভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অভ্যন্তরে যদি আপোষহীন সংগ্রাম আরম্ভ হয়, তাহা হইলে স্বদেশে ও প্রবাসে ভারতবাসীর স্বাধীনতা লাভের বিলম্ব হইবে না।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত
১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



● শিল্পী—গোপাল ঘোষ



দীনের কর-স্পর্শ বিনা
লক্ষ্মী তব শক্তিহীনা

শিল্পী—শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

মাসিক বসুমতী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত



২৫শ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৫৩

প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা ?
স্বর্গ কি হবে না কেনা ?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ?
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?

—রবীন্দ্রনাথ

করেঙ্গে! ইয়া মরেঙ্গে!

বীর মহাদেবাপ্পা

ওরা রক্ত দিয়ে সেদিনের কাহিনীর এক পৃষ্ঠা লিখেছিল। মায়লার মহাদেবাপ্পা কর্ণাটের বীর। দেশের জন্য বুকে যাদের অনির্ব্বাণ বহ্নির জ্বালা, মহাদেবাপ্পা তাদেরই এক জন। ৩৩ বছর আগে ধারওয়ার জিলার ক্ষুদ্র গ্রাম মোটেবেন্নূরে ওর জন্ম। ছাত্র অবস্থা থেকেই গান্ধীজীর ভক্ত। এ ভক্তি বেড়ে ওঠে। ক্লাশের বই ফেলে সে ছোটে সবরমতী আশ্রমে। গান্ধীজী তাঁকে নিজ হাতে বেছে নিলেন ডাণ্ডি-অভিযানে। এ অভিযানে সে কর্ণাটকের একমাত্র তরুণ প্রতিনিধি।

সয়েছে অসহ্য অশেষ কষ্ট—সয়েছে হাসি-মুখে। গান্ধীজী যখনই ডেকেছেন, তখনই সে ছুটে গেছে সব কাজ ফেলে বীর সৈনিকের মত। '৩২, ৪০ তাকে শেকলে বেঁধেছিল। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় সে জন-সাধারণের মধ্যে জাগরণ এনেছিল। তার আহ্বানে চাষীরা দলে দলে এসেছিল কর্ণাটক খাজানা বন্ধ আন্দোলনে। মহাদেবাপ্পার অদ্ভুত পরিচালনায় মুগ্ধ হয়ে সর্দার বল্লভভাই তার দিকে বিস্ময়ে চেয়েছিলেন।

সবরমতী থেকে ফিরে—ধারওয়ারের এক গ্রামেই সে বাঁধে আশ্রম। আশ্রমের কর্ম্মীরা গঠন কাজ চালাত আর গণ-উত্থানের আয়োজন করত। তার স্ত্রী শ্রীমতী সিদ্দাম্মা হরিজনের সেবায় মাততেন—তিনি স্বামীর বুকে দিতেন দ্বিগুণ জোর।

আগষ্ট বিপ্লবের বান যখন এল—মহাদেবাপ্পা কি করে বসে রইবে? ওকে ওরা গ্রেপ্তার করে কয় মাস আটক করল—তার পর ছেড়ে দিল। আবার ডাকে শৃঙ্খলিতা জননী। বীর হাঁকে—"করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।" আবার দেয় ঝাঁপ।

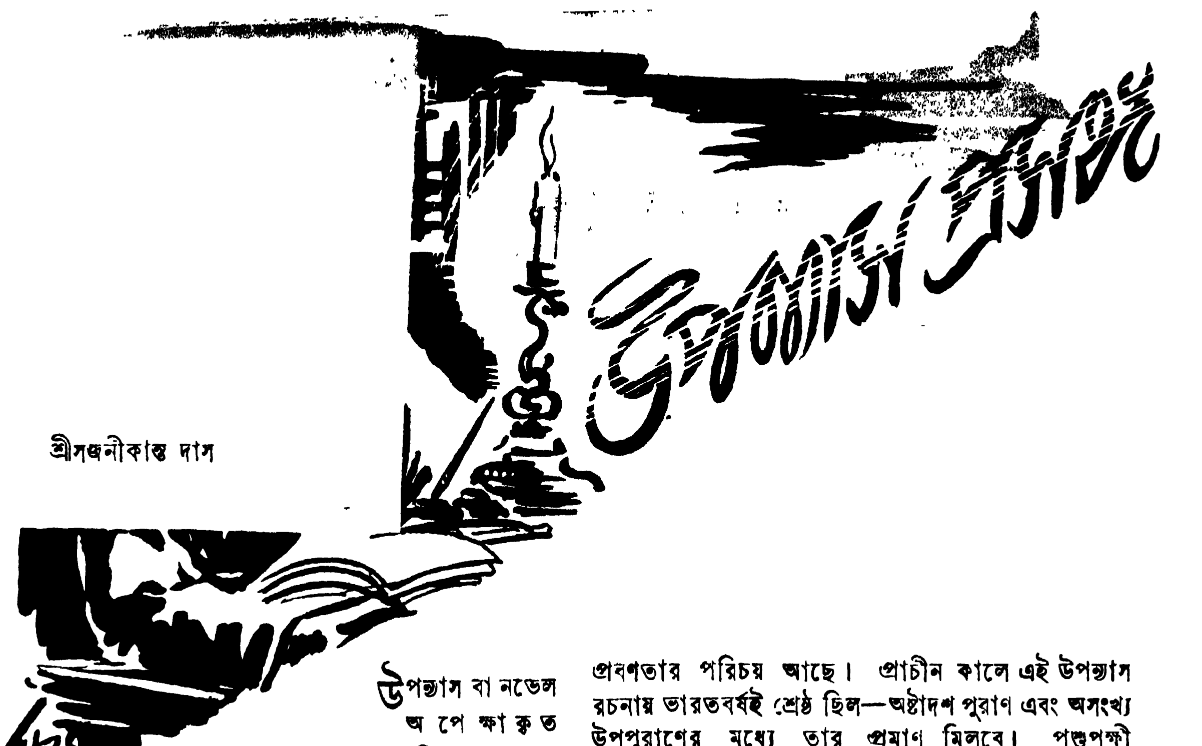
১লা এপ্রিল '৪৩, হাতে জাতীয় পতাকা, সঙ্গে সহকর্ম্মী থিরুকাপ্পা আর এক জন। হিসাবিডি গ্রামে এগিয়ে চলে। পুলিস করে বেয়নেট চার্জ্জ, ওদের কিরিচের খোঁচায় খুঁচিয়ে মারে তিন বীরকে। ওরা ছাড়ে না ঝাণ্ডা—মরে তবু মুখে হাঁকে—মরেঙ্গে! মরেঙ্গে! করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে! তিন-রঙ্গা পতাকা ত ওরা তিন বীরের তিন মুঠি থেকে কেড়ে নিতে পারেনি! সে পতাকা বুকে জড়িয়ে সর্ব্বাঙ্গে রক্তগৈরিক মেখে জন্মভূমির বুকে মুখ দিয়ে মরে তিন বীর।

দিকে দিকে সংবাদ যায়—ক্ষিপ্ত হয় জন-সাধারণ— ওরা কাঁদে—ওরা চেঁচায় "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।" মহাত্মাজীর কাছে যায় তার। কর্ণাটক শোকে হয় মুহ্যমান।



ধর্ম্মঘটনা।

শিল্পী—শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী



শ্রীসজনীকান্ত দাস

উপন্যাস বা নভেল অপেক্ষাকৃত আধুনিক বস্তু, বাংলা দেশে একশ বছর আগেও এর জন্ম হয় নি। ইংলণ্ডীয়েরা দাবি করেন যে, ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে John Lyly লিখিত Euphues নামক পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে উপন্যাসের পত্তন হয়। উৎপত্তি বা গোড়ার কথা যাই হোক, সাফল্যের দিক থেকে বিচার করতে গেলে বলতে হবে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই উনবিংশ শতাব্দীতেই উপন্যাসের আসল রূপ প্রকাশ পেয়েছে এবং সে দিন থেকে আজো পর্য্যন্ত সেই রূপ নানা ভাবে বিকাশ ও বিস্তার লাভ করতে করতে সাহিত্যের বিশিষ্টতম অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপন্যাস বস্তুটিকে কোনো একটি নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞার মধ্যে ফেলা এখন অসম্ভব; এর বহুধা রূপ, বিচিত্র গঠন; বিভিন্ন শক্তিশালী লেখকের হাতে প'ড়ে একই ধরনের উপন্যাস নানা স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য লাভ করেছে।

কুলজি-কুষ্ঠির হিসাব পুরাপুরি দাখিল না করলেও স্বীকার করতে হবে, মানুষের গল্প শোনার প্রবৃত্তি থেকেই উপন্যাসের জন্ম। আদিমতম মানব-মাতারা তাঁদের শিশুদের কি ধরনের রূপকথা শুনিয়ে ভুলিয়ে রাখতেন, আজ তা আমরা জানি না; কিন্তু যেখান থেকে ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে সেখান থেকেই আমরা দেখতে পাই, গুরু শিষ্যকে, শিক্ষক ছাত্রকে নানা গল্পচ্ছলে নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা দিচ্ছেন। বেদে উপনিষদে আরণ্যকে ব্রাহ্মণে, বুদ্ধদেব-কথিত জাতক গল্পগুলিতে, কনফুসিয়াস ও লাওৎসের উপদেশে, যীশুর প্যারাবেলগুলিতে এবং কথাসরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র ও ঈশপের গল্পে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমরা পাই। রামায়ণ মহাভারত ইলিয়াড ওডিসি প্রভৃতি মহাকাব্যেও সমগ্র জাতির গল্প বা উপন্যাস প্রবণতার পরিচয় আছে। প্রাচীন কালে এই উপন্যাস রচনায় ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ ছিল—অষ্টাদশ পুরাণ এবং অসংখ্য উপপুরাণের মধ্যে তার প্রমাণ মিলবে। পশুপক্ষী প্রভৃতি মনুষ্যেতর জীবকে নায়ক-নায়িকা ক'রে তাদের মুখে ভাষা দিয়ে যে বিচিত্র উপন্যাসের সৃষ্টি করেছিল ভারতবর্ষ, ঈশপের গল্প তারই পরিণতি। একাধিক সহস্র রজনী বা আরব্য উপন্যাসের কাহিনী সমগ্র নিকট-প্রাচ্যের উপন্যাসদক্ষতার সাক্ষ্য হয়ে বিরাজ করছে। যক্ষ রক্ষ পরী দানা ভূত ব্রহ্মদৈত্য পেত্নী শাঁখচুন্নী প্রভৃতির উপকথা বা ফেয়ারি-টেল্‌সও বহু কাল থেকেই মানব-শিশুদের চিত্তবিনোদন ক'রে আসছে; বিবিধ জড়বস্তুর মুখে ভাষা দিয়েও অনেক কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। এই সব গল্প উপকথা রূপকথারই আধুনিকতম বিবর্ত্তন হচ্ছে উপন্যাস, এবং এই উপন্যাসও শেষ পর্য্যন্ত ব্যস্তবাগীশ মানুষের পাল্লায় প'ড়ে ছোট গল্প আকারে দেখা দিয়েছে।

এই বিবর্ত্তনের ধারা ধরলে দেখা যাবে, গোড়ায় জন্ম নিয়েছে রোমান্স, যাকে বাংলায় রোমাঞ্চকর কাহিনী বলা যেতে পারে। নভেল বা উপন্যাসের সঙ্গে রোমান্সের পার্থক্য প্রধানত এই যে, রোমান্স—ঠিক বাস্তবজীবনের কাহিনী নয়; অবাস্তব, অসাধারণ এবং যাকে ইংরেজীতে বলে, এক্‌স্‌ট্রাভেগাণ্ট কার্য্যকলাপ এবং অভিযান, তাই রোমান্সের বিষয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ডন্ কুইক্‌জোটের উল্লেখ করতে পারি। অলৌকিক অত্যাশ্চর্য্য অপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশকেও রোমান্স বলা হয়, আলাদিনের প্রদীপ, হাতেম তাই এবং রবার্ট লুই ষ্টিভেনসনের ডক্টর জেকিল ও মিঃ হাইডের অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী এই পর্য্যায়ে পড়ে। অন্য পক্ষে উপন্যাস বা নভেল হচ্ছে সেই গল্পরচনা, যা সম্পূর্ণ কল্পনা-প্রসূত হ'লেও বাস্তবজীবনের একাংশ বা কিয়দংশ বিবৃত করাই যার লক্ষ্য, যার মধ্যে ঘটনা-সংস্থান বা প্লটের মারপ্যাঁচ আছে; যার পাত্রপাত্রী, দৃশ্যসংস্থান,

ঘটনা-পরম্পরা, আচার-ব্যবহার, বেশভূষা ও কথাবার্ত্তায় সামঞ্জস্য থাকবে উপন্যাসবর্ণিত স্থান ও কালের সঙ্গে। জেন অষ্টেনের 'প্রাইড অ্যাণ্ড প্রেজুডিস' অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতিতে উপন্যাসের এই সব ধর্ম্ম যথাযথ মিলবে। উপন্যাসকে অনেকে কাল্পনিক কাহিনীর তৃতীয় স্তর ব'লে উল্লেখ করেন, তাঁরা বলেন—প্রথম স্তর হচ্ছে মহাকাব্য বা পুরাণ, এবং দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে রোমান্স।

আমাদের বাংলাদেশে বিগত-প্রায় আটশ বছর থেকে এক শ্রেণীর কাহিনীকাব্য চ'লে আসছে, যাকে উপন্যাসের পূর্ব্বাভাষ বলা যেতে পারে, এগুলি এক কথায় মঙ্গল-কাব্য নামে প্রচলিত। ধর্ম্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, কালিকা-মঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি পালাগানের আকারে পল্লীর আসরে আসরে গীত হ'ত; দেবতার সঙ্গে দেবতাবিরোধী কোন শক্তিমান্ মানুষের সংঘর্ষ এবং শেষ পর্য্যন্ত তার লাঞ্ছনা অথবা দেবতার কৃপায় ভক্তের সুখসমৃদ্ধি—সচরাচর এই হ'ল মঙ্গলকাব্যের বিষয়। এর অনেকগুলির মধ্যে উপন্যাসের চমৎকার উপাদান আছে। এগুলির অধিকাংশই মৌলিক বাংলা গল্প। অনুবাদশাখায় কৃত্তিবাস কাশীরাম দাস প্রভৃতি সংস্কৃত মহাকাব্যগুলিরই রূপান্তর ঘটিয়েছেন বাংলায় এবং পরে চৈতন্যের জীবনী নিয়ে অনেকগুলি কাব্যকাহিনী রচিত হয়েছে। উপন্যাসের বীজ এগুলির মধ্যে নিহিত আছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কল্যাণে বাংলা গদ্যের যখন সাহিত্যিক নবজন্ম হ'ল, তখন প্রথমটা বাঙালী লেখকেরা মৌলিক গল্প রচনায় মোটেই তৎপর হন নি, সংস্কৃত হিন্দী ও ইংরেজী থেকে তর্জ্জমা ক'রে ক'রে তাঁরা দেশের পাঠকসম্প্রদায়ের গল্পশোনার ক্ষিদে মিটিয়েছেন। সত্যি-কারের মৌলিক বাস্তবজীবনাশ্রিত কাহিনী বাংলাদেশে সর্ব্বপ্রথম শোনালেন টেকচাঁদ ঠাকুর অর্থাৎ প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 'মাসিক পত্রিকা' নামক মাসিক-পত্রে তিনি প্রথম বাংলা উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশ করতে লাগলেন, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সেটি বই আকারে বের হ'ল। অনুকরণ থেকে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে বাঙালী লেখকদের বিবর্ত্তনের কথা বঙ্কিমচন্দ্র এই ভাবে বিবৃত করেছেন—

"ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় আরও একটি গুরুতর বিপদ ঘটিয়াছিল। সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরেজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরেজি গ্রন্থের সারসঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালাসাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইংরেজি হইতে এবং বেতাল-পঞ্চবিংশতি হিন্দী হইতে সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরেজি একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী এবং অনুবর্ত্তী। বাঙ্গালী লেখকেরা গতানুগতিকের বাহিরে হস্তপ্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া, সকলেই ইংরেজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর বিপদ আর কিছুই নাই।...এই দুইটি গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালার বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরেজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী লেখকদের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন।...[প্যারীচাঁদ মিত্রের] অক্ষয় কীর্ত্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে। তাহার জন্য ইংরেজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমন সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যেমন সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালাদেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালাদেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে।"

এর পরই শুরু হ'ল বাঙালীর ঘরের কথা নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি, বিজয়বসন্ত, হাতেম তাই, গোলেবকাওলির কাল হ'ল অবসান, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এলেন দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী নিয়ে। তিনি বাংলাদেশে আধুনিক উপন্যাসের শুধু গোড়াপত্তন করলেন না, একেবারে তার সফল প্রতিষ্ঠা ক'রে দিয়ে গেলেন। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে রমেশচন্দ্র এলেন, সঞ্জীবচন্দ্র এলেন, শিবনাথ এলেন, তারকনাথ এলেন; তার পর রবীন্দ্রনাথ এসে মোড় ফেরালেন, তাঁর নষ্টনীড় নামক বড় গল্পে। অবজেকটিভকে তিনি করলেন সাবজেকটিভ, আমরা পেলাম চোখের বালি, ঘরে বাইরে। শরৎচন্দ্র ঘটালেন সাবজেকটিভ-অবজেকটিভের মিলন, ভাবপ্রবণ বাঙালী-সমাজে তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থানে উঠলেন। সুখের বিষয় শরৎচন্দ্রের সঙ্গেই বাংলা উপন্যাসের গতি থেমে যায় নি, আধুনিক ঔপন্যাসিকরা বহু বিচিত্র উপকরণ-সম্ভার নিয়ে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যকে পৃথিবীর উপন্যাস-সাহিত্যে প্রভূত মর্য্যাদা দিয়েছেন। মোট কথা, বাংলা উপন্যাস খুব পিছিয়ে নেই।

এই গেল উপন্যাস সম্বন্ধে সামান্য ভূমিকা। আদর্শ সমালোচনার দিক থেকে উপন্যাসের প্রকৃতি ও রূপ অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগের একটা চেষ্টা করা যেতে পারে। তার পূর্ব্বে উপন্যাসের গঠন-বিচার প্রয়োজন। উপন্যাসে প্রধানত থাকা প্রয়োজন: (১) চরিত্র (২) ঘটনাসমাবেশ (৩) গল্পাংশ বা প্লট (৪) স্থান ও কাল (৫) পরিণতি বা উদ্দেশ্য ও (৬) প্রতিপাদ্য জীবন-দর্শন।

(১) পৃথিবীতে উপন্যাস রচনায় যাঁরা শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন, তাঁদের সৃষ্টিতে চরিত্র বা পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। সমাজের সকল স্তর থেকে তাঁরা চরিত্র সংগ্রহ ক'রে থাকেন এবং বাস্তবজীবনের সঙ্গে এঁদের অঙ্কিত চরিত্রের সামঞ্জস্য এত বেশী যে, মনে হয়, কার্য্যকারণ বিচারে চরিত্রগুলির মানসিক দ্বন্দ্ব ও ঘাত-প্রতিঘাত বাস্তবানুগ হয়েছে। ডিকেন্স, বালজাক, টলষ্টয়, হুগো প্রভৃতির চরিত্রসৃষ্টির কৃতিত্ব অতুলনীয়। আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়েছেন। এঁদের সৃষ্টি বস্তুত এপিক বা মহাকাব্যধর্ম্মী। নাটকীয় নির্লিপ্ততাও এঁদের একটা বড় গুণ। চরিত্রের মুখনিঃসৃত বাক্যাংশমাত্র শুনলেও ব'লে দেওয়া যায় কোন্ চরিত্র কথা বলছে।

(২) ভাল উপন্যাসে ঘটনা থাকবে বিবিধ ও বিচিত্র এবং কোনও ঘটনাই মূল গল্পের পক্ষে এবং নায়ক-নায়িকার চরিত্রবিকাশের পক্ষে অবান্তর হবে না। ঘটনা-প্রবাহ শিথিল হ'লেও চলবে না, সেগুলি হবে পরস্পর গাঢ়বদ্ধ এবং পাঠকের মনোযোগকে কদাপি চঞ্চল হতে দেবে না। অতি-আধুনিক মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসে চরিত্র ও ঘটনার বিরল সমাবেশ অনেক সময় পাঠকের মস্তিষ্ক ও মনের পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে।

(৩) গল্পাংশ মজবুত হওয়া একান্ত প্রয়োজন অর্থাৎ ঘটনাপ্রবাহ একটা শক্ত বাঁধনে বাঁধা হওয়া চাই। ভাল গল্পের একটি লক্ষণ হচ্ছে এই যে, পরিণতি আসবে অনিবার্য্যভাবে, গায়ের জোরে জোড়াতাড়া দিয়ে গল্পকে ঠেলে নিয়ে যাওয়াটা প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টার লক্ষণ নয়। থ্যাকারের এই দোষ আছে, ডিকেন্সের কোনো কোনো উপন্যাসে এই শিথিলতা দেখা যায়। ডষ্টয়ভস্কি অন্যত্র মহৎ ব'লে এই দোষে অপাঠ্য হন নি। এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র আশ্চর্য্য দক্ষতা দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে গল্পাংশ কোনো কোনো স্থলে ভঙ্গুর।

(৪) চরিত্র এবং ঘটনা যেমন বাস্তবানুসারী হওয়া দরকার, স্থান ও কালের যাথার্থ্য সম্বন্ধেও তেমনি সজাগ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। যে স্থানে এবং যে কালে উপন্যাসের ঘটনা ঘটছে, পরিবেশ বা পরিপ্রেক্ষিত ঠিক তদনুযায়ী হওয়া চাই। সাহারা মরুভূমিতে ঠাণ্ডা বাতাস বইলে চলবে না, অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে নায়ক-নায়িকা মোটরকারে হাওয়া খেতে না বের হ'লেই সঙ্গত হবে। চুলচেরা বিচার ক'রে দেখতে গেলে অনেকের লেখা উপন্যাসেই এই ধরনের অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং হাকিম হয়েও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' আইনের ভুল করেছিলেন।

(৫) প্রত্যেক উপন্যাসেরই একটা উদ্দেশ্য বা পরিণতি থাকে। 'আর্ট ফর আর্টস সেক' এই যাঁদের বুলি তাঁরা উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টির পক্ষে ওকালতি করলেও নৈর্ব্যক্তিক ও উদ্দেশ্যহীন আর্ট এখন পর্য্যন্ত কেউ সৃষ্টি করতে পারেন নি। অন্তত পক্ষে একটা কৌতুকাবহ কাহিনী শুনিয়ে দশ জনের মনোরঞ্জন করার উদ্দেশ্যও লেখকের থাকবে। দেশ জাতি ও সমাজের কোনো না কোনো উৎকর্ষ বা অপকর্ষের আলোচনা বা সমালোচনা প্রত্যক্ষভাবে না আসুক, পরোক্ষভাবে এসে পড়বেই। লেখকের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কতখানি সিদ্ধ হয়েছে তাই দিয়েই উপন্যাসের সাফল্যের বিচার হয়। 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী' এই সফলতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

(৬) শেষ কথা হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক উপন্যাসেই, আমরা ধরতে পারি আর না পারি, স্রষ্টার জীবনদর্শন ওতপ্রোত হয়ে থাকবেই। উপন্যাসের প্রধান ধর্ম্ম হচ্ছে, মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও ব্যবহারের, মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের, মানুষের সঙ্গে তার দেশের সমাজের জাতির ও ধর্ম্মের যথার্থ সম্পর্কের আদর্শনির্দ্দেশ; এক কথায় বলা যেতে পারে, জগৎ ও জীবনের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ-নির্ণয়। লেখকের মানসিকতার রঙে তাঁর সৃষ্টি রঙীন হতে বাধ্য, তার জীবনদর্শন নায়ক-নায়িকার জীবন ও পরিণাম প্রভাবিত করবেই। এই জীবনদর্শন সত্যশিবসুন্দরের উপর যত অধিক প্রতিষ্ঠিত হবে, উপন্যাসের স্থায়িত্ব ততই সুদূর-প্রসারী হবে। কিন্তু ঔপন্যাসিকের পাদরি প্রচারক বা প্রোপাগাণ্ডিষ্ট হ'লে চলবে না। শুধু এই প্রচারের উৎসাহ-দোষে পৃথিবীর অনেক ভাল উপন্যাস ব্যর্থ হয়েছে।

এবার শ্রেণীবিভাগের কথা। বিভিন্ন স্রষ্টার হাতে উপন্যাস এত বিচিত্র রূপ নিয়েছে যে, শ্রেণীবিভাগ এক রকম অসম্ভব বললেই হয়। তবে মোটামুটি এই কয় ভাগে উপন্যাসকে ভাগ করা যেতে পারে—(১) রীতি-নীতিমূলক বা সামাজিক (২) ঐতিহাসিক (৩) উদ্দেশ্য-মূলক (৪) রোমাঞ্চকর বা অ্যাডভেঞ্চারের গল্প (৫) মনস্তত্ত্বমূলক।

এ যুগে অনেক উপন্যাস রচিত হচ্ছে, যেগুলিকে কোনো শ্রেণীতেই ফেলা যায় না। জেমস্ জয়েসের 'ফিনিগ্যান্স্ ওয়েক' অথবা 'ইউলিসিসে'র শ্রেণীবিভাগ অসম্ভব।

দোস্ত্ তাদের জাগাও

যুবনাশ্ব

বেয়াল্লিশ ইঞ্চি ছাতির তলায়
বেয়াল্লিশ হাজার জানোয়ার,—
ঘুমোয় তারা মরণ-কাঠির ছোঁয়াচ লেগে
দোস্ত্
তাদের জাগাও।
দিকে দিকে আজ পড়লো খুলে মুখোস
যতো তৈমুর তাতারী, আর শয়তান শাইলকদের।
আর তাদের,
যারা মিঠে কথা কয়, হাতে হাত ঘষে,
আর মুখ লুকিয়ে হাসে,—
জাতকে জাত যারা বেইমান,—
যারা ওঁৎ পেতে রয়েচে কেবল
জুৎ পেলে ধরবে টুঁটি চেপে।
ডালকুত্তাদের কলজেতে দাও ঘা,
মিঠে কথার বোরখা ছেঁড়ো, টেনে।
ভাঙাও ঘুম ভাঙাও, ইয়ার,
কুহক কাহিল মৃত্যু থেকে সেই জানোয়ারদের,
বেয়াল্লিশ হাজার জানোয়ারদের।
ঝলুক তাদের চোখে তাজা ইস্পাতের নীল ঝলক,
শিউরে উঠুক বর্ব্বর অত্যাচার।
জিয়ন-কাঠি বুলোও তাদের চোখে
সেই বেয়াল্লিশ হাজার জানোয়ারদের।
জাগুক তারা, আত্মঘাতের রাত্রিশেষে
আত্মপ্রত্যয়ের পূর্ব্বাশায়।

একটি কথা ব'লে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি। পাশ্চাত্য দেশে, বিশেষ ক'রে রুশিয়া, জার্ম্মানি, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে বহু ঔপন্যাসিক অতি বৃহৎ এবং দুঃসাহসিক পটভূমিকায় উপন্যাস রচনা করেছেন, একটা গোটা জাতিকে নিয়ে, একটা গোটা দেশকে নিয়ে, একটা গোটা সমাজ অথবা সাত পুরুষের একটা পরিবারকে নিয়ে বহু শতাব্দীর পরিবেশে উপন্যাস রচনা সে সব দেশে অসম্ভব হয় নি। কিন্তু বাংলাদেশে আমরা ক্ষীণপ্রাণ ব'লে অর্থাৎ আমাদের দম কম ব'লে অতি ক্ষুদ্র বিস্তারের মধ্যেই আমরা কথা-সাহিত্য রচনা করতে অভ্যস্ত। এক বঙ্কিমচন্দ্রকে বাদ দিলে আমাদের অধিকাংশ উপন্যাসই মনস্তত্ত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই পাক খাচ্ছে দেখতে পাই। এটা অতিশয় দুর্লক্ষণ। আশা করি, বাংলাদেশের সাহিত্যশিল্পীরা এই সঙ্কীর্ণতা কাটিয়ে উঠবেন।



এই সেদিনের কথা

প্রাণতোষ ঘটক

কোথায় যে ঐ প্রেরণা আর উৎসাহের উৎস তা ঠিক হদিস করতে পারছে না কেউ। ওদের ঐ সুস্মিত চাঞ্চল্য ও দুর্বোধ্য কলগুঞ্জন—কান পেতে শুনতে হয় শুধু। অলীক স্বপ্নের মত জীবন যাদের ব্যর্থ হয়ে গেছে তাদের প্রাণেও আশা জাগে ওদের ঐ সদানন্দ উৎসব দেখে; পুনরায় বাঁচতে ইচ্ছা করে। অর্গানের সুর-তরঙ্গ আর টুকরো হাসির ঝঙ্কার ঐ সর্বজনীন ম্যানসনের একটি অংশকে সদাক্ষণ মাতিয়ে রেখে দিয়েছে। কখনও হয়ত শুধুই গীটারের টুং-টাং, কোন হিন্দী ছায়াছবির সুর নিয়ে খেলা শুরু হয়। এবং মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কণ্ঠ যাচাই, যে যা জানে।

ওদের জীবন-দর্শনে সন্দিহান এমন অনেকের জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি ঐ পর্দানশিন জানালাগুলোয় ধাক্কা খেয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। কানে আসে সুরধ্বনি, দেখা যায় ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে পাখা ঘুরছে, কিন্তু আসল রহস্যটা যে কি তার সন্ধান কেউ জানতে বা বুঝতে পারছে না।

বিরাট ম্যানসনের ঐ বিভাগটি নির্বিকারে হাসছে সর্ব্বদা আর—

আর দক্ষিণের ফ্লাটে তখন বসন্ত চৌধুরীর স্ত্রী অশোকা আগুনের মত তপ্ত নিশ্বাস ফেলছে, কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। আশে-পাশে তার নিজেরই অপোগণ্ডরা ঘিরে বসেছে তাকে, সান্ত্বনার ভাষা জানে না তাই তাকিয়ে আছে অসহায়ের মত।

—তোরা সব খা আমায়। কান্নার সঙ্গে বললে অশোকা,—আমায় খেয়ে তোরা আশ মেটা, হাড় জুড়োই আমি।

একান্ত বাচ্চা যেটা, একেবারে সব শেষের ছেলেটা আবদারে এগিয়ে আসছে, কোলে উঠতে চাইছে। প্রতিবারের চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে অশোকার অবহেলায়।—মরণদশা ছেলের! কথার শেষে হাতের ঝাপটায় ঠেলে দিচ্ছে ছেলেটাকে। ছিটকে পড়ছে। কেঁদে উঠছে ককিয়ে। নির্লিপ্ত অশোকার চোখে শিখায়িত বিষের ধোঁয়া, একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে দু' হাঁটুতে মুখ গুঁজে রেখে।

—বাবা কখন আসবে মা? ভয়ে ভয়ে বললে বড় ছেলে।—মা কাঁদ্ছ কেন তুমি?

হঠাৎ যেন ফেটে পড়ল অশোকা।—ছাখ বিমান, আমায় আর জ্বালাস্‌নি বলছি; বিদেয় হ এখান থেকে, বেরো নচ্ছাড়া হ।

কথা শুনে চমকে ওঠে বিমান। লজ্জা ও অপমানে করুণ চোখে দাঁতে নখ কাটতে থাকে।

সুরের একটা ঢেউ এসে কানের কাছে ভাসতে থাকে মশার মত। অর্গান বাজিয়ে গান ধরেছে মিসেস সেনের মেয়ে ইন্দ্রাণী,—কেন পান্থ এ চঞ্চলতা—আ—

পশ্চিম দিকের বাড়ীগুলোর পেছনে সূর্য্য ঢলে পড়েছে। কাক-চিল-চড়াই বাসার দিকে সব। কলকাতার শহর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এতক্ষণে।

—কেমন গান শুনলে বল'? মেয়ের কণ্ঠ-গর্ব্বে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না মিসেস সেন। একটা কৌচে নিজেকে সঁপে দিতে দিতে বললেন,—গান কেমন শুনলে তাই আগে বল'।

—সত্যিই অদ্ভুত, রিয়েলি। পাইপে তামাক টিপতে টিপতে কথাগুলি শেষ করলে সুনীলমাধব। তার ব্যগ্র দৃষ্টি কি যেন খুঁজে বেড়ায়, কাকে যেন খুঁজছে সে দরজার ঝুলন্ত পর্দার আড়ালে।

—তবুও চর্চ্চা নেই মোটেই, শুনে শুনে শেখা। চোখের তারা বড় হয়ে ওঠে মিসেস সেনের। হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায় ভাল করে বসেন।—একটু চা আনতে বলি, কেমন?

খচ্ করে লাইটার জ্বালল সুনীলমাধব। মুখের কাছে নিয়ে একটু অপেক্ষা করে কি যেন ভাবল।—তা, তা মন্দ কি! আপত্তি নেই।

উল্লাসের অধৈর্য্যে ডাক ছাড়লেন মিসেস সেন,—ওরে

শঙ্ক—রী, ওরে ও করুণা—আ ; প্লাগটা লাগিয়ে দে না মা। চায়ের জল চাপা সুনীলমাধবের জন্যে।

গান গেয়ে কাহিল হয়ে পড়েছে, ছোট মেয়ে ইন্দ্রাণী তখনও বসেছিল সেখানে, এক পাশে ছোট্ট একটি টুলে। তার আড়-চোখের লক্ষ্য সুনীলমাধবের গলার টাইটা, কালো সিল্কের ওপর কেমন সাদা সাদা কলকা।

মার কথায় সেই উঠছিল, নিষেধ করলেন মিসেস সেন,—না ইন্দু তুমি উঠ' না। আর একটা বরণ গান শোনাও তোমার দাদাকে।

সহানুভূতির সুর সুনীলমাধবের।—আহা, ওর হয়ত প্রয়োজন আছে কিছু। হয়ত টায়ার্ড হয়ে পড়েছে।

—না না, কোন প্রয়োজন নাই। কথা বলতে পেয়ে লজ্জায় কুঁকড়ে যায় ইন্দ্রাণী, নতমুখী হয়ে কোলের আঁচল পাকাতে শুরু করে দেয়।

কথার জের টানেন মিসেস সেন।—টায়ার হয়ে পড়বে কেন, নাও ওঠ ইন্দু, লক্ষ্মী মেয়ে।

খানিক বাজিয়ে মাথাটি এক পাশে হেলিয়ে দিল ইন্দ্রাণী। তার পর চোখ বুজে ধরল,—আমার বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে—এ—

রবি ঠাকুরের গানের ওপর দিয়ে বোলার চলতে শুরু করল।

* * *

কানের কাছে বাঘ ডাকলে বা ঢাক বাজলেও পাঠে বিঘ্ন হয় না—মহাজনদের উক্তি, তবুও বই বন্ধ করে আরাম-কেদারায় এলিয়ে পড়ল অনিলেন্দু। কপালে কয়েকটা রেখা ফুটে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। অনিলেন্দুর ইচ্ছে হচ্ছে—এখনই গিয়ে গলা টিপে শেষ করে দিয়ে আসে, জন্মের মত মিটে যায় ওদের এই অলজ্জ বাঙ্গালীপনা। পড়ায় ব্যাঘাত হলে আঘাতের মতই লাগে অনিলেন্দুর, সারা শরীর রি-রি করতে থাকে যেন। নিজের মনেই অস্ফুটে বলে ফেললে আশ্চর্য্য!

—কি বকছ' গো বিড় বিড় করে? চুলে চিরুণী চালাতে চালাতে ঘরে ঢুকল মীনাক্ষী। একটা উগ্র ফুলেল তেলের গন্ধে ঘর ভরে গেল। বললে,—কবিতা আবিত্তি কচ্ছিলে বুঝি! ওগো বল' না কি কবিতা?

কপালের রেখা তখনও তেমনি রয়েছে অনিলেন্দুর। মাথা নেড়ে অসম্মতির ইঙ্গিত করলে।

খাটে হেলান দিয়ে দাঁড়াল মীনাক্ষী। মিনতির সুরে বললে আবার,—ওগো বল' না কি কবিতা?

ফিরে তাকাল অনিলেন্দু,—বলছি না আবৃত্তি করিনি! শোন না কেন?

আর কিছু বললে না মীনাক্ষী! কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা, সূক্ষ্ম অভিমানের প্রকাশ। চিরুণী কামড়ে দাঁড়িয়ে রইল এক ভাবে।

এক পরাজয়ের দুঃখে সদাই অভিভূত মীনাক্ষী। পদে পদে হার হয়েছে তার, কখনও কখনও নিজের



মনে অনুভব করেছে সে নিজের অজ্ঞতা। কিছু না জানার দুঃখে আর অনিলেন্দুকে মন থেকে না পাওয়ার ব্যথায় বহু অলস সময়ে হাউহাউ করে কেঁদেছে। মুখ ফুটে বলে ফেলেছে কখনও কখনও—আমায় তুমি লেখাপড়া শেখাবে না? তোমার বৌ হয়ে আমি মুখ্যু হয়ে থাকব?

হাসতে হাসতে বলেছে অনিলেন্দু,—বেশ ত' পড় না। বিবেকানন্দের ভারতীয় নারী পড়, বঙ্কিমের উপন্যাস পড়েছো এবার প্রবন্ধগুলো পড়, কংগ্রেসের হিষ্ট্রি পড়, রামায়ণ মহাভারত পড়। যা মন চায় পড় না তুমি।

—আমি যে বুঝতে পারি না কিছু! তুমি পড়ে বুঝিয়ে দাও। নিজের দোষ স্পষ্ট বলছে মীনাক্ষী।—আমি যা বুঝতে পারব না তুমি তা বুঝিয়ে দেবে না?

—এক কাপ চা করে দেবে গা? হঠাৎ কথা বললে অনিলেন্দু। বই থেকে মুখ ফেরাল।

কি যেন ভাবছিল মীনাক্ষী। অজ্ঞানতার অতল অন্ধকারে ডুবে গিয়ে ভাবছিল হয় ত নিজের কথা। খাটের ওপর চিরুণী রেখে বললে ভারী গলায়,—এইত এক ঘণ্টা হয়নি চা খেয়েছো! আবার চা খাবে?

অনিলেন্দু।—বড্ড যে মাথাটা টিপ-টিপ করছে গো।

আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মীনাক্ষী, ছায়ার মত সরে গেল যেন। কোলের বই তুলে ধরল অনিলেন্দু। পাতার মাথা থেকে নতুন করে পড়তে শুরু করল।

"...কিছু কাল পরে নীল-দর্পণের ইংরাজী অনুবাদক লঙ সাহেব কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। বাঙলার প্রতি ঘরে ঘরে ছড়ার দুইটি পঙক্তি গানের মত গীত হইতে আরম্ভ হইল—

নীল বানরে সোনার বাঙলা করল এবার ছারেখার।
অসময়ে হরিশ ম'ল লঙের হল কারাগার॥

সমাজ-সংস্কারে, সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠায়, সভা-সমিতি স্থাপনে এই সময়ে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা দেশে এক নব যুগের আলোড়ন শুরু হইল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে রঙ্গলাল লিখিলেন—

"স্বাধীনতা হীনতায়—

ভুরু দু'টো ধনুকের মত আবার বেঁকে গেল অনিলেন্দুর। বাতাসে তখনও ইন্দ্রাণীর সুরতরঙ্গ।—তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে—এ—

* * *

বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে, সত্যিই দিনান্তের ছায়া পড়েছে, কৃষ্ণের রঙ ধরেছে আকাশ। দূরের রাস্তায় ট্রামের তারের আলো দেখা যাচ্ছে। ভুঁয়ে যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

তিনের ফ্লাটের বাবা গেছেন পার্কে, চক্র মেরে ঘাম ঝরাতে, রাতের ঘুম আনতে। সঙ্গে গেছে হুলো বেড়ালের মত বুড়ো চাকর উন্নত,—কর্ত্তার লাঠি বইবে, তাঁকে গার্ড করবে।

এখন পোয়া বারো অন্ততঃ আটটা পর্য্যন্ত। মাও কিচেনে আছেন তাই রক্ষে;—কর্ত্তার শব্জী সিদ্ধ করছেন, কচি পাঁটার জুস তৈরী করছেন।

কি বলে না বলে অতনু, সে-কথায় কান নেই টুটুর। অন্য কথা বলে সে অত্যন্ত দুঃখের সুরে।—জন্মে কেন মরে যাইনি আমি!

চমকে ওঠে অতনু।—তার মানে?

খানিক নীরবে বসে থাকে টুটু। ক্ষোভের সঙ্গে বলে হঠাৎ,—আমি কেন গান গাইতে পারি না ওদের মত?

ধড়ে প্রাণ আসে অতনুর।—ওফ, তাই বল'। কাদের মত?

টুটু।—ঐ শঙ্করীদি, ইন্দুদির মত!

—সবাই বুঝি সবার মত হতে পারে? কলেজী প্যাঁচে আশ্বাস দেয় অতনু।—তুমি যা তুমি তাই, ওরা যা ওরা তাই। এই যে তোমার মত চোখ, আছে?

—থাক্ ঢের হয়েছে! আক্ষেপের নিশ্বাস ফেলে টুটু।—ওদের মতন হতে পাল্লে আর ভাবনা ছিল না। খিদিরপুরের মুকুজ্যেরা এই জন্যেইত' খুঁৎ গাড়লে! বললে, মেয়ে গান জানে না।

—তাই বুঝি! অবুঝের মত সায় দেয় অতনু।

—ওখানে বিয়ে হলে আজ আমি—। কথার মাঝপথে থেমে যায় টুটু, আরেক কথা পাড়ে।—আমার বই আনলে না কেন তুমি?—কি পড়ব আমি আজ!

কাছে ঘেঁসে যায় অতনু, গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে। ভয়ে ভয়ে বলে,—কাল আপিস যাবার সময় ঠি—ক দে যাব। মাইরী—

ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে থাকে টুটু। বাঙ্গলা জয় আর ইংরিজী 'জয়'এর হাসি, ভয় পাইয়ে নার্ভাস করে দেওয়ার হাসি।

অতনুও হাসল, পরমানন্দের হাসি।—চাগরীটা পাকা হয়ে গেল আজ।

টুটু।—কোথায়?

আর বলতে পারছে না অতনু। ফুর্ত্তিতে বোবা মেরে গেছে যেন। টুটুও অধৈর্য্য।—কোথায় হল তাই বল না! ধ্যেৎ—

—আয়রণ ষ্টীল কন্‌ট্রোলে। জ্যাকসনের হাতেই তুলে দিলেন মামা। বললেন—এবার ভবিষ্যৎ গড়ে নাও নিজের।

অর্থাৎ করে খাও। আর করে না খেতে পারলে টুটুর বাবাও অপারক। বাত্‌টাবে ভাসিয়ে রাখা চলে, জলে ত' ভাসিয়ে দিতে পারেন না মেয়েকে।

—কি খাওয়াবে আমায়? জিজ্ঞেস করল টুটু। এতক্ষণে নরম হল যেন।

অতনু।—যা খাওয়াব তাই খাবে ত'? বল।

যাচ্ছেতাই একটা কিন্তু খাওয়াতে চাইছে অতনু, টুটু তা বুঝতে পেরেছে।

—ওরে উন্—নত ধর্ আমায়। ওপরে ওঠা। সিঁড়িতে বাবার কণ্ঠস্বর।

—ওগো বাবা আসছেন। ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল টুটু। অতনুও উঠল। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বললে,—কি বই আনব বল কাল? শশধরের?

—না, ঐ বইটা পড়াতে হবে আমায়। আঙুল নেড়ে বললে টুটু।—না আনলে আর কথা থাকবে না তোমার সঙ্গে।

অতনু শুধোয়,—কি বই?

—অচিন্ত্য সেনগুপ্তর আঁকাবাঁকা। কদ্দিন থেকে বলছি তোমায়।—ব্যস্ত হয়ে উঠল টুটু। ওগো এবার যাও। এলেন বলে বাবা। ওগো যাও না গো—

—তাড়িয়ে দিচ্ছ ত! অভিমান হয় অতনুর, মেয়ে-মানুষের মত।

ঘর থেকে বেরিয়ে, এদিক সেদিক তাকিয়ে ওপরে উঠে গেল অতনু, একেবারে তাদের নিজেদের ফ্লাটে।

টুটুর বাবা আসছেন, তাঁর নিশ্বাসের ঘন ঘন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সায়া কাপড় নিয়ে বাতরুমে ঢুকে পড়ল টুটু। ছিটকিনি তুলে কলটা খুলে দিয়ে গান ধরল,—বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে—এ—

*   *   *   *

ধোঁকা দিয়েছেন বসন্ত চৌধুরী এতক্ষণে মালুম হ'ল অশোকার। কাঁদছে আর গা চুলকোচ্ছে, বাচ্চাগুলোর দুর্দ্দশার অন্ত নেই। ক্ষুধায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে, কাঁদছে আর গা চুলকোচ্ছে। ঘা হয়েছে গায়ে, হাতে, পায়ে। গরল হয়েছে যেন। চালের পোকা খেয়ে কি হয়েছে কে জানে।

—মলমের বাটিটা পেড়ে দাও ত বিমান। অশোকার রুক্ষ কণ্ঠ।—হারু, পটু, ভুজু সরে এসো তোমরা।

বিমান উঠছিল, সীমার কথা শুনে বসে পড়ল।—মলম ত' ফুইরে গেছে, বাটি একেবারে চাঁচাপোছা। কাল লাগ্যে দিলুম যে পটুকে। এট্যুখানি যে ছেল।

হারু আর থাকতে পারছে না।—বড্ড যে ক্ষিধে পেয়েছে!

অশোকা।—বড্ড যে নোলা তোমার! কোলেরটা পর্য্যন্ত না খেয়ে আছে, ওঁর বড্ড ক্ষিধে পাচ্ছে!

মার কথায় গায়ে বিষ ছড়িয়ে দেয় ওদের। বসে বসে চুলকোতে থাকে—হাঁটু কনুই হাত, পা, পাছা। কারও কারও বা রক্ত ঝরতে থাকে।

অশোকার ঝাঁজালো কথা।—চুলকে মরছ কেন?

বসন্ত চৌধুরী তখন ম্যানসনের আরেক ফ্ল্যাটে, দালাল নিবারণের পায়ে।—পাঁচটা টাকা দিন আজগে, কোন্ শালা শূয়োরের বাচ্ছা না পয়লায় সব মিটিয়ে দেয়!

পা সরিয়ে নেয় নিবারণ। বিড়ি টানতে টানতে বলে,—তা হয় না। এর আগেও বলেছিলেন এক বাত্ এক বাপ। তেরো টাকা ক'আনা আজ পর্য্যন্ত পেলুম না। না, কেন মিছে ঝামেলা করছেন!

বসন্তর কান্না পাচ্ছে। পায়ে মাথা খুঁড়তে ইচ্ছা করছে।—ছেলেপিলেগুলো সকাল থেকে খায়নি কিছু। গেলে আমাকেই খেয়ে ফেলবে নিবারণ বাবু, একটু অনুগ্র করুন—

—মেয়েমানুষ টেয়েমানুষ পুষেছেন কি না বলুন দেখি!—নিবারণের ব্যাকুল প্রশ্ন।

বসন্তর ধরা গলা,—কি বলছেন আপনি!

—যা বলছি ঠিক তাই। মেয়েমানুষের পেছনে না হলে এত খরচ হয় মানুষের? এই ত সেদিন টাকা নে গেলেন এর মধ্যেই ফুঁকে দিলেন! হবে না, হবে না, হবে না, আমার কাছে কিস্সু হবে না, পষ্ট কথা। কথা বলতে বলতে হাঁফিয়ে ওঠে নিবারণ। একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে বসে পড়ে একটা হাতল-ভাঙ্গা চেয়ারে। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হয় চেয়ারটার।

—এ আপনার মিথ্যে অনুমান নিবারণ বাবু। কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে বসন্ত,—এই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি—

ঘরের ভেতরের একটি দরজা খুলে গেল সশব্দে। পা থেকে হাত সরিয়ে উঠে পড়ল বসন্ত। দরজা খুলে বেরিয়ে এল যেন এক প্রৌঢ়া রাধিকা, ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালো।—খাওয়ান-দাওয়ান আজ আর করবি না ভাবতিছ?

বসন্ত সামলে নেয় নিজেকে। এক-পা এক-পা করে একপাশে সরে গিয়ে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে থাকে জানোয়ারের মত।

—তুমি আবার এখানে কেন মুক্তো? বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল নিবারণ।—ইস্ দেখ দিকিন, তুমি আবার কেন!

মুক্তকেশীর মুক্তকণ্ঠ।—হাড়ি নিয়ে বসে থাকুম না, তার লেগেই আইসি।

তাগা চুড়ি আর গলার বিছে-হার বিজলী আলোয় ঝলমল করছে। রঙ ঠিকরোচ্ছে অপেল পাথরের নাকছাবিটায়। দোক্তা-খাওয়া দাঁতগুলো মুক্তোর, সোনার পাতে মোড়া একটা ছুঁটো, তাই ঠোঁট চেপে চেপে হাসছে সে। আর কোন আশা নেই আস্তে আস্তে খসে পড়ল বসন্ত। দরজার বাইরে এসে ভারী ভারী দীর্ঘশ্বাস ফেলল কয়েকটা। ম্যানসনের লম্বা দালানে পর পর জ্বলন্ত ও ঝুলন্ত আলোর লাইন। তবুও চোখে অন্ধকার দেখছে বসন্ত। অবশ্য বাইরে তখন অন্ধকার ঘন হয়েছে বেশ।

* * * *

অন্ধকারের কলকাতা হয়েছে এতক্ষণে।

মুখে ক্রীম ঘসতে ঘষতে দুলতে দুলতে ঘরে ঢুকলেন মিসেস সেন। ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে বললেন,—শঙ্করী করুণা ইন্দ্রাণী উঠে পড় শীগ্রি। না না আর নয়, এবার ওঠ তোমরা। ঘড়ির দিকে দেখেছো একবার?

ফিচলেমি করবার বাসনা জাগে করুণার। মাকে একটু ক্ষেপাবার। হতাশার সুরে বললে,—কি করে আর দেখব বল ঘড়ি!

মিসেস সেন।—তার মানে?

প্রত্যুত্তর দিতে দেরী করে সে, কিছুক্ষণ পরে বলে,—ঘরের আলোগুলো পট পট করে নিবিয়ে তুমি যদি বল এখন ঘড়ি দেখতে!

গলার খাঁজে ক্রীম ঘষতে ঘষতে থেমে গেলেন মিসেস সেন।—আমার সঙ্গে মস্করা হচ্ছে!

কৌচ থেকে সটাং উঠে পড়ল করুণা। শঙ্করী আর হাসি চাপতে পারছে না, সেও উঠল। ইন্দ্রাণী শুধু ঘরের এক কোণে বসে রইল নির্লিপ্তের মত, একটা ইজি-চেয়ার দখল করে। ঘর অন্ধকার, বাহিরও তাই—রিক্ততায় উদাস অন্তঃকরণে তার প্রশ্নের বাতি জ্বলে উঠছে একেকটি। কত জটিল প্রশ্নের ভিড়ে জর্জ্জরিত হয়ে উঠছে ইন্দ্রাণী। মা, দিদি, মেজদি—সকলেই যেন এক ধাতুতে সৃষ্টি। কোন কিছু চিন্তা করবার ফুরসৎ নেই ওদের, নিজেকে যেন ভাসিয়ে দিয়েছে ওরা, গা ঢেলে দিয়েছে পুলকের বন্যায়।

শেষবারের মত মুখ ঘষে নিতে নিতে মিসেস সেন বললেন,—না ইন্দ্রাণী কবিত্ব করবার ঢের সময় পাবে, পোষাক আষাক বদলে নাও এখন। ঠিক ন'টায় আসবে সুনীলমাধব।

ইন্দ্রাণীর যেন জ্বর হয়েছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে টলতে টলতে সেও চলল পাশের ঘরে। শঙ্করী আর করুণা যেখানে প্রায় বিবসনা হয়ে বসে আছে, ব্রাইডাল বোকে ব্লুম মাখছে সর্ব্বাঙ্গে।

বাতরুমের দিকে পা বাড়িয়ে খানিক দাঁড়িয়ে রইলেন মিসেস সেন। নীল আলোর সুইচ টিপে ঘরের আপাদ-মস্তক দেখলেন লক্ষ্য করে, কোথাও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে কি না। টিপয়টি যথাস্থানে বসিয়ে দিতে দিতে গুন্ গুন্ করে গান ধরলেন কি একটা।

করুণা আর শঙ্করী হেসে ফেলল পাশের ঘরে, মায়ের গান শুনে। গুন্ গুন্ করতে করতে বাতরুমের দিকে পা বাড়ালেন মিসেস সেন।

কোথায় কার ঘরে ঘড়িতে বাজল সশব্দে একটা ছুটো তিনটে—আটটায় এসে থেমে গেল।

* * * *

ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অশোকা। চায়ের পেয়ালা পড়ে আছে যথাপূর্ব্বং, ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে হয়ত।

—চা খেলে না তুমি? অনিলেন্দুর চেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল মীনাক্ষী।—চা ভাল হয়নি বুঝি!

অজ্ঞান হয়ে ছিল যেন অনিলেন্দু। মীনাক্ষীর কথায় বই থেকে মুখ তুলল।—না না, বড্ড গরম ছিল। চায়ের পেয়ালা এক নিশ্বাসে নিঃশেষ করে তুলে ধরল মীনাক্ষীর সামনে।—কি করছিলে? কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

শূন্য পেয়ালা হাতে নিয়ে আরেক হাতে শাড়ীর আঁচলে চিবুক মুছতে থাকে মীনাক্ষী। রান্নাঘরে কিছুক্ষণ থেকেই পালিয়ে এসেছে, ব্লাউজের পেছনটা ঘামে ভিজে সপ-সপ করছে। অনিলেন্দুর কথার উত্তর নয়, আপন মনেই বলে মীনাক্ষী,—উঃফ্, বাবার বয়েসে এমন গরম দেখিনি কখনও! রান্নাঘর নয়ত অন্ধ কূ—প যেন!

শেষের কথাগুলি শুনে হাসল অনিলেন্দু, চাপা আনন্দের হাসি। একটা সিগারেট ধরিয়ে মনে মনে হাসল আরও অনেকক্ষণ। মীনাক্ষীর হাতের ক'টা আঙুল নিজের হাতে নিয়ে বললে সহাস্যে,—সে কলঙ্ক কিন্তু মোচন হয়ে গেছে আমাদের।

মীনাক্ষী।—কি আবার কলঙ্ক হ'ল আমাদের! যাট্, কলঙ্ক হতে যাবে কেন!

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে অনিলেন্দু,—ঐ যে আমাদের অন্ধকূপের কলঙ্ক! নবাব সিরাজদ্দৌলার কলঙ্ক।

মীনাক্ষী বুঝতে পারে অনিলেন্দুর মন এখানে আর নেই, অনেক দূর এগিয়ে গেছে, যার হদিস পাবে না সে।

কথা বলতে গিয়ে থেমে যায় অনিলেন্দু আরেক জনের কথায়।

—মীনাক্ষী আছে!

দরজায় এক ভিখারিণী, সর্ব্বহারার চাউনি তার চোখে। চেনা-চেনা যেন মুখটি তার, ঠিক যেন ঠাহর করতে পারছে না অনিলেন্দু! কোথায় যেন দেখেছে

ওকে! দেখেছে সে কলকাতার শহরেই। সেনেট হলের সিঁড়িতে না কারেন্সীর ফটকে তা ঠিক আন্দাজ করতে পারছে না। বোধ হয় দ্বারিক ঘোষের দোকানের সামনেই, ঠিক এই বেশে। রুক্ষ চুলের রাশি তার মাথাতেও ছিল মনে হচ্ছে, তার চোখেও এর মতই বিষ দৃষ্টি—

—ওমা অশোকাদি, তাই বল। দরজার কাছে এগিয়ে গেল মীনাক্ষী। ব্যাকুলতার ভাণ না করে বললে,—কি ব্যাপার, হঠাৎ এমন অসময়ে?

—একটু চিনি দিবি ভাই? অশোকার চাপা কথা।—এমন মুস্কিলে পড়েছি!

বারান্দায় নিয়ে গিয়ে ফিস-ফিস করল মীনাক্ষী। —কেন, কি হ'ল?

—ত্থাখ না ভাই, এখনও ফিরলেন না। আর ঘরে এমন একটু কিছু নেই যে বাচ্চাটার কান্না থামাই!

মীনাক্ষী।—আ-হা-হা সে কি!

—সেই সকালে বেরিয়েছেন, এখনও ফেরবার নাম নেই। চোখের কোল হু'টো চিক চিক করে উঠল অশোকার।

রোমাঞ্চ রহস্যে আবার ডুবে যায় অনিলেন্দু। বাইরের ফিসফিস গুঞ্জন কানে যায় না তার। দীনেন রায়ের সিরিজ পড়ছে না কি!

…"মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক-জয়ন্তীর দিন বাইশে জুন। বোম্বাইয়ে সেই রাত্রে এক বীভৎস কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। তখন গভীর রাত্রিকাল। গভর্ণরের গৃহ হইতে র‍্যাণ্ড্ লুইস এবং সপত্নী লেফ্টেনাণ্ট আয়ারষ্ট্ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। মিষ্টার র‍্যাণ্ডকে পিছন হইতে কে গুলী করিল। লুইস ও আয়ারষ্টকেও গুলী করা হইল, র‍্যাণ্ড তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। আয়ারষ্ট্ও হাসপাতালে যাইয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই……

…"এই আতঙ্কে সমগ্র পুণা শহর শিহরিয়া উঠিল। ইহার অনতিবিলম্বেই ধৃত হইলেন তিলক, একুশে জুলাই।"

* * * *

সিঁড়িতে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল বসন্ত। শালার নিবারণ টাকা দিলে না, তার পর? এবার কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে তাই ভাবছে সে। মাসের শেষের আকাশ ঐ সিঁড়ির জানালায়, ঐ দিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে আছে সে। ক্ষুধার অনল তার জঠরেও জলছে দপ-দপ করে, তবুও সে আকাশ দেখছে এখন। কেরাণী বসন্তর চোখে মাইনাস পাওয়ারের চশমা তবুও ঐ কালো ভেলভেট আকাশের মতই অন্ধকার দেখছে চোখে।

পাগলের মত হাসছে কেন বসন্ত! মুঠো করা হাতের ভেতর পরশমণির সন্ধান পেয়েছে সে। হঠাৎ উল্লাসে হাসতে হাসতে ধাপে ধাপে নীচে নেমে গেল তরতরিয়ে। এক পরম হাসির জলাঞ্জলি দিতে চলল কোথায়।

'এ' লেখা একটা আঙটি ছিল হাতে, মিনে করা, চটে যাওয়া, তোবড়ানো। মিলনের আদি মুহূর্ত্তে পরিয়ে দিয়েছিল অশোকা, নিজের নামের আদ্যক্ষর।

রাস্তায় পা দিয়ে মনটা একটু দমে যায়, মেজাজ নষ্ট হয়ে যায়। তেরোশো চল্লিশ সালের বিশে শ্রাবণের এমনি একটি রাত্রি। সে-আকাশে এত অন্ধকার ছিল না কিন্তু, বুড়ো আঙুলের নখের মত এক ফালি চাঁদ ছিল আকাশে। তাইতেই ভোর হয়ে গিয়েছিল সে রাতটা।

একটা মিলিটারী লরীর আলো দেখে ফুটপাতে উঠে পড়ল বসন্ত। যাক্, আলোর ধূমকেতু মিলিয়ে যাক্ আগে।

আবহাওয়া কেমন গুমোট হয়ে আছে, বাতাস পালিয়ে গেছে কোন্ অজানা দেশান্তরে। বারান্দার ঝুলন্ত কাপড়গুলো পর্য্যন্ত কাঁপছে না একটু। ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ, খুলতে হলে ঘরের আলো নিবিয়ে দিতে হয়, অন্ধকারে থাকতে হয়। আর তা নয়ত' পঞ্চাশ টাকার ধাক্কা সামলাতে হয়। উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম চাপা ফ্লাটের নন্দিতা হাঁস-ফাঁস করছে গরমে, ঝলসে যাচ্ছে যেন।

—রাজায় রাজায় যুদ্ধ আর উলু খাগড়ার প্রাণ নিয়ে টানাটানি! জানলাগুলো পর্য্যন্ত খুলতে পাব না, মরে যাই না তার চেয়ে!

—না না নন্দিতা তা হয় না, বড্ড কড়াকড়ি করেছে এখন, যেধার দিয়ে পারছে টাকা শুষে নিচ্ছে। এই পরশুও ফাইন হয়েছে একজনের, সদানন্দ রোডে।

—তাই বলে পচে মরতে হবে নাকি! রক্ষে কর', আমার দ্বারা পোষাবে না। উঃফ্—! একটা টেবিল-ফ্যানও ভাড়া করতে পার না!

—আমি যখন পারিনি তোমার বড়লোক বাবাকেই বল' না। জামাই তাঁর গরীব তিনি ত' জানেন, আর তুমিও জান!

—দেখ, এই তোমায় বলে দিচ্ছি, কথায় কথায় বাপ তুলো না, হ্যাঁ। দম নেয় নন্দিতা,—কেন তিনি কিনে দেবেন, বয়ে গেছে তাঁর দিতে!

—আহা চটে যাও কেন! তার চেয়ে যাও বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াও। হাওয়া খাও আর গান শোন। সত্যিই এমন গলা কখনও শুনিনি, মাইরী—

—শোননি ত যাও না ওদের কাছে! কে বারণ করেছে?

—পছন্দ হবে না যে আমায়, তা না হলে কি আর না যেতাম? যাও যাও গান শোনগে। বড় মিঠেকড়া ধরেছে গো।

সত্যিই গান গাইছে ওরা। সেজে-গুজে প্রস্তুত হয়ে ঘর আলো করে বসেছে। শঙ্করী অর্গানে বসেছে, গানের খেই ধরিয়ে দিচ্ছে। ওরা গাইছে,—

এসেছো কি তুমি হেথা
পথ ভ—ব ভুলিয়া—আ—আ—

ফুটপাথের অপর তীরের বিড়ির দোকানে মোহন-বাগানকে গাল দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। রসুল মিঞা কান পেতে বসে আছে, জানলায় চোখ রেখে শুনছে।

—কি মিঞা বিভোর হয়ে গেলে যে! দাও সিগ্রেট দাও দুটো।

রসুল থতমত খায়। পান-খাওয়া দাঁতগুলো বের করে হাসতে হাসতে বলে,—নেহি বাবু। শালীলোগ্ বহুৎ ভালা গাইছে কিন্তুক—

পথ ভুল করবার বান্দা সুনীলমাধব নয়।

বাসায় ফিরে অফিসের ধড়া-চুড়া বদলাতে যেটুকু সময় লেগেছে, শিস দিতে দিতে বেরিয়ে পড়েছে আর এক মুহূর্ত্ত অপব্যয় না করেই। রাস্তায় পা দিয়ে জামার বোতাম এঁটেছে। এলোপাতাড়ি পা চালিয়ে নিজেকে ছুঁড়ে দিয়েছে বাসের দোতলায়। সিঁড়ি ভাঙতে পা হয়ত মাড়িয়ে দিয়েছে কেউ, ভিড় ঠেলতে গিয়ে টলে পড়বার উপক্রম হয়েছে, তবুও সময়ের এদিক ওদিক করতে পারেনি। টাইম দেওয়া আছে তাই ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করেনি। লয়েড জর্জ্জ আর উইনষ্টন চার্চিল এই ডিসি-প্লিনের জোরেই দাঁড়িয়ে আছে না!

পিছু ডেকেছিল স্ত্রী, মহামায়া।—ওগো এরি মধ্যে হুড়তে পুড়তে বেরুচ্ছো আবার! একটু ব'সো।

মা বললেন,—দু'খানা গরম রুটি খেয়ে যা, ছেঁচকিও হয়ে এল বলে—

পথ রোধ করলেন বৌদি, দু'হাত তুলে।—যেতে নাহি দিব। কোথায় চল্লে আবার শুনি? বড্ড যে বিজ্‌নেসম্যান হয়ে উঠেছো!

এই জায়গাটিতে কেমন নরম হয়ে যায় সুনীল-মাধব।—মাইরি বৌদি, বড্ড দরকার। সাপ্লায়ের ক'জন অফিসারের সঙ্গে টাইম দেওয়া আছে।

ঠোঁট উলটে বলেছেন বৌদি,—ইস্, আমার আলামোহন দাস রে!

একতলার সিঁড়ির শেষে অদৃশ্য হয়ে উত্তর দিয়েছিল সুনীলমাধব,—আসতে দেরী হবে, বল' মায়াকে।

অন্ধকার, তা সে যতই কালো হোক পথ ঠিক চিনেছে সুনীলমাধব। রাস্তা থেকেই দেখতে পেয়েছে মিসেস সেনের জানলা, ঘষা কাচের আড়ালে রঙীন আলো জ্বলছে ধ'রে। দূর থেকে মনে হয়েছে এক টুকরো জ্যোৎস্না, এক কৃষ্ণকায়ে একটুখানি শ্বেতকুষ্ঠের মত।

পথ ভুল করবার বান্দা সুনীলমাধব নয়।

* * *

একটুও বাতাস নেই, গুমোট আবহাওয়া।

কয়লার খনির মত স্তরে স্তরে কালো অন্ধকার,—রাত্রি গভীরতর হচ্ছে কলকাতার শহরে। ধূলিমলিন সর্পিল আঁকা-বাঁকা পিচের রাস্তা। অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন একেবারে। শুধু এখানে সেখানে ছাড়াছাড়ি হয়ে ছটকে ছিটকে ভাসছে ক্ষীণ আলোর বিন্দু কয়েকটি। বোরখা-ঢাকা রমণীর চোখের মত ঠুলী-পরা গ্যাসের আলো দেখা যাচ্ছে। মুমূর্ষুর প্রাণের মত ধুক-ধুক করছে যেন, নিভে যেতে পারে যে কোন মুহূর্ত্তেই। প্রথম রাত্রির স্তব্ধ উদাসতা মাইকের কথায় হঠাৎ কাঁপতে থাকে।

—কলকাতা বেতার কেন্দ্র। গানের অনুষ্ঠান আজকের মত এখানেই শেষ হয়ে গেল। এবার আমাদের দৈনন্দিন অনুষ্ঠান, জাপানীদের বর্ব্বরতা আর নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে। জাপানীরা যে কি ভীষণ তারই কিছু প্রমাণ দিচ্ছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক,—

কণ্ঠরোধ হয়ে যায় রেডিওর, চাবি ঘুরিয়ে দেয় অনিলেন্দু। মীনাক্ষী বললে খাট থেকে,—বন্ধ করে দিলে কেন গো?

অনিলেন্দু।—এমনি। ভাল্ লাগছে না আর। গান ত' শেষ হয়ে গেল।

পাশ ফিরে শোয় মীনাক্ষী। বলে—তা বটে।

অনিলেন্দু জিজ্ঞেস করে,—বড্ড ঘুম পাচ্ছে বুঝি!

মীনাক্ষীর আক্ষেপের সুর,—তা আর পাবে না! কখন উঠেছি বল ত'? সে—ই রাত থাকতে উঠে পড়া করেছি তোমার। হাতের লেখা করেছি এক পাতা সংস্কৃত আর এক পাতা বাঙলা। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে রচনা লিখেছি একটা। তার পর—

—আচ্ছা আচ্ছা ঘুমোও তুমি।—হাসতে হাসতে বললে অনিলেন্দু, ব্যথার ব্যথীর মত।

কোথায় কয়েকটা কুকুর ডাকছে অবিরাম। দূরে, বহু দূরে ডাকছে তারা আকাশের দিকে মুখ তুলে। মাছের কাঁটা বা মাংসের হাড় কোন কিছুর

অবশেষ নেই ডাষ্টবিনে। তারই অভিযোগ জানাচ্ছে কুকুরগুলো।

বালিগঞ্জ ষ্টেশনের আশপাশে গাছে গাছে পাখীদের ঘুম ভেঙ্গে যায়; পাখা ঝাপটে চমকে ওঠে চরম বিরক্তিতে, ইঞ্জিনের সান্টিঙে। রাত্রির শুব্ধতায় দিগঞ্চলে প্রতিধ্বনি শোনা যায়। আর ক্লান্তির অবসন্নতায় ঘুমিয়ে পড়ে মীনাক্ষী, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মধ্যে মধ্যে।

তাজা একটা চুরুট ধরায় অনিলেন্দু। ইজি চেয়ারে বসে। চোখ বুজে মাথা এলিয়ে নীরবে বসে থাকে। টিমটিমে আলোয় ঘরের সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায় না। এখানে সেখানে বই আর খবরের কাগজের স্তূপ, কাপড় চাদর ওয়াড় জঞ্জালের মত জমে আছে আলনাটায়। ছবিগুলোতে ঝুল হয়েছে, ধূলো পড়েছে। মহাত্মাজীর ছবিতে শুকনো একটা মালা, গত বছরে কি একটা স্মরণীয় স্বদেশী দিনে পরিয়েছিল অনিলেন্দু। একটা টিকটিকি নিঃসাড়ে বসে আছে স্বামীজীর ছবির ওপর, একেবারে পাগড়ীতে। কি দুঃসাহস!

গোঙানির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে যেন। যন্ত্রণা-কাতর কেউ কোথাও মরে যাচ্ছে নাকি! গলা টিপে মারছে নাকি কারও!

না, যান্ত্রিক পাখী ডাকছে আকাশে, এরোপ্লেন উড়ছে। বিছানায় উঠে বসছে কেউ কেউ— সাইরেনও বাজতে পারে হয়ত। খিদিরপুরের ওদিকে এক-আধটা গুম-গুম শব্দ!

ভারী ভারী বুট সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে যেন। জুতোর নালের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সুস্থির হয়ে বসল অনিলেন্দু। কান পেতে রইল ভুরু কুঁচকে।

চামচিকের লোভে কয়েকটা প্যাঁচা উড়ে এসে জুড়ে বসল ম্যানসনের ছাতে। ডাক শুরু করল প্যালা গাওয়ার মত। ঘন অন্ধকার পাক খেতে লাগল।

পলে পলে সময় এগিয়ে চলেছে; সৈনিকের মত ভবিষ্যতের সঙ্গে তরোয়াল কষতে কষতে। দেখতে দেখতে একটা বাজল ঘড়িতে। না, দেড়টা বোধহয়! চুরুট-মুখে উঠে দাঁড়াল অনিলেন্দু। বারান্দায় বেরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কোমরে হাত দিয়ে।

গীটার বাজে নাকি এত রাত্রে! খুব আস্তে আস্তে অত্যন্ত সন্তর্পণে টুং-টাং ভেসে আসছে বারান্দায় অপর প্রান্ত থেকে।

নেংটি ইদুর একটা পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল। পাথরের মূর্ত্তির মত তবুও নিশ্চল অনিলেন্দু। কোথায় যে ঐ প্রেরণা আর উৎসাহের উৎস আজ তার হদিস করতে হবে, অন্ধকারকে যেন চ্যালেঞ্জ করে বসল অনিলেন্দু।

দামী সিগারেটের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সহাস্য কথার বুদ্‌-বুদ্‌ ফাটছে একেকটি। ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় সে। শব্দহীন পদক্ষেপে।

পর্দা সরিয়ে দরজার ঝিলিমিলিতে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে যেন, পা দু'টো কাঁপছে ঠক-ঠক করে। এ কি দেখছে অনিলেন্দু! ইতিহাসের পাতা না থিয়েটার দেখছে, কি দেখছে সে নিজেই ভাবতে পারছে না। দেখছে—

কাশিমবাজার ইংরেজদের কুঠি। প্রকাণ্ড হল ঘর। হলের মধ্যস্থলে একটি আসরে নাচের ব্যবস্থা হয়েছে। মঞ্চের সম্মুখে মিষ্টার ওয়াটস, ডাক্তার ফোর্থ, মীরজাফর, জগৎশেঠ, পাদরী লং, আমীরচাঁদ, রাজবল্লভ প্রভৃতি বসে আছেন।

আলেয়া নাচতে নাচতে গাইছে—

—ম্যয় প্রেম নগরকো জাউঙ্গী।

আলেয়াদের সন্ধান পেয়েছে অনিলেন্দু। জগৎশেঠটাকে বাঙালী মনে হচ্ছে যেন। আর দেখতে পাওয়া য'চ্ছে আরেক জনকে, মীরজাফরকে!

অন্ধকারে পা বাড়ায় অনিলেন্দু, নিজের ঘরের দিকে। সারারাত ঘুম হবে না আজ। মীনাক্ষীকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে তুলতে হবে, নয়ত' সারারাত একা একা অন্ধকার দেখতে হবে,—তমসাচ্ছন্ন কলকাতা।

মালতী

কানাই সামন্ত

মালতী-লতায় ফুল ধরিয়াছে কেমনে ভুলি ?
আজি এ প্রভাতে বাদল-বাতাসে
পুন যে পরাণ উঠিল দুলি।
ভেবেছিনু প্রীতি-গীতি-উৎসব
নয়নের জলে সারা হল সব ;
চিতসঞ্চিত বিত্ত-বিভব
হল সে ধূলি।
মালতী-লতায় ফুল ফুটিবে যে
হায় সে কথা কি ছিলেম ভুলি ?

ওরা কি জানে না যারে কৈশোরে বেসেছি ভালো
তাহারে ছাড়িয়া বিনা মেঘে মোর
ম্লান হয়ে গেছে দিনের আলো।
ফুরায়েছে মোর আশা-সম্বল,
স্বপন-কুসুমে ঝরে গেছে দল,
অমা-যামিনীর আঁধা এ কেবল
হতাশা কালো।
ওরা কি জানে না সেই সখা নেই
যারে কৈশোরে বেসেছি ভালো ?

বরষে বরষে ওরা ফুটে ওঠে নবীন সুখে
শুভ্র খুসির পসরা মেলিয়া
কাননে কাননে ফুল্ল মুখে।
আশা শোচনার সব দায় ভুলে
পূবালি পবনে ওঠে দুলে দুলে ;
স্রোতে ভেসে লাগে বিরহের কূলে
বিজন বুকে।
নূতন করিয়া বিহ্বল করে
চির পুরাতন সুখে কি দুখে।

মালতী-লতায় ফুল ধরিয়াছে কেমনে ভুলি ?
ওরি তালে তালে বাদল বাতাসে
পুন যে পরাণ উঠিল দুলি।
কথা ভুলিয়াছি, আছে তবু সুর—
চরণ-চিহ্ন সুচির বঁধুর—
পরাণের পূলে রয়েছে মধুর
মধুর বুলি।
মালতী-লতায় ফুল ফুটে বলে :
তুমি ভুলিলেও মোরা কি ভুলি ?

মায়ামৃগ

সুভো ঠাকুর

শিল্পী—শৈল চক্রবর্ত্তী



দুই নম্বর দৃশ্য

বাবলির বাড়ির পিছন দিককার প্রকাণ্ড বাগান। কোলকাতা সহরের মধ্যে যে বাগানটি নানা ফুলের গাছ ও ফলের গাছের জন্যে দস্তুর মত দর্প অনুভব করতে পারে।

একটা বড় গোছের গাছের ডালে ঝোলানো দোলনায় দুলতে দুলতে বিরহ-বিধুর বাবলি আপন মনে গান গাইছিলো।

টুটুল্ টুলটুলু টুল্ টুল্
মিষ্টি আমার!
তুমি এলে না, এলে না,
মনের মতন মিষ্টি—
তোমার মতন
মেলে না, মেলে না,



দোদুল্ দুল্ দুলু, দুল্ দুল্,
বিকেল বৃথায় বহে যায়—
হায় হায়!
মোরে নিয়ে গেলে না,
গেলে না সিনেমায়—
আ মরি মোর, বুকেরই বুল্ বুল্!

ডাডা ডাডা ডা ডারলিং!
ঢেউয়ের মতন চুল,
কুচকুচে কালো কারলিং!
বিকেলে বেড়াতে যাওয়া
আজ হোলো ভুল, ভুল ভুল্—
টুটুল্ টুলটুলু টুল টুল।



খানসামা সেলাম দিয়ে বাবলির কাছে বাগানে এসে বললে।

খানসামা। হুজুর সেলাম।

বাবলি। কি রে কি চাই রে?

খানসামা। রাতের খাবার কি খাবেন বাইরে?

খানসামা খাবারের কথা জিজ্ঞেস করায় বাবলি বিরক্ত হয়ে ওঠে। তার পর নিজের মনে বলে।

বাবলি। আটুকু এক—
মন নাকি ছাই।
খালি জ্বালাতন।
(খানসামার দিকে ফিরে)
থোড়া পিছে আও—
(আবার নিজের মনে)
জানোয়ার কি যে খালি খাও খাও



(খানসামার দিকে ফিরে)

এই তো খেলাম।

(খানসামা বাব্‌লির মেজাজ ভালো নেই অনুমান কোরে আবার সেলাম দিয়ে চলে যাবে)

খানসামা। হুজুর, সেলাম।

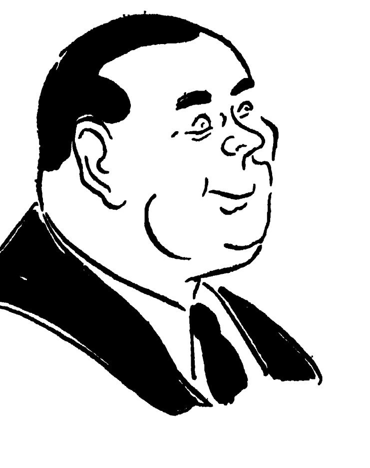
খানসামা চলে যাবার পর বাব্‌লির খাস কামরার আয়া, যে বাব্‌লির কাপড়-চোপড় খাওয়া-দাওয়া থেকে ঘুমপাড়ানো অব্দি সব কাজ কোরে থাকে, সে ওভাল্‌টিনের কাপ ইত্যাদি সমেত ট্রে হাতে হাজির।

বাব্‌লি। তোর, আবার কি তোর ?
মেজাজ বিগড়ে রয়েছে যে জোর !

আয়া। বাজার গেছেন বড়া মাইজি—
সাহেব যান যে বেরিয়ে•••

বাব্‌লি। এই গাড়িটাকে থামা—
জলদিসে চালো,
থামতে বল—

(বাব্‌লি দোলনা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে আয়াকে বলে)



বাব্‌লি। চটাপট নয়া শাড়ি নিকালো
চল তাড়াতাড়ি
চল চল্ চল্
আমিও আসব বেড়িয়ে।

তিন নম্বর দৃশ্য

চৌরঙ্গির নিভৃত নির্জন একটি গৌরব-মণ্ডিত অঞ্চলে শ্রীমতী মায়া দেবীর উপর-তলার ফ্ল্যাট, আর তার লাগাও বেশ একটু খোলা ছাত। ছাতে টেরাস গার্ডেনিং তৈরি করার একটা অপপ্রচেষ্টাও আছে যার মাঝে মাঝে বেতের নানা রকমের চেয়ার টেবল্‌গুলো নানা ভাবে ছড়ানো, কোথাও কোথাও বা উঁচু উঁচু কাঠের ষ্ট্যাণ্ডের থেকে ঝোলানো শেডের অর্ধেক ঘোমটার আড়াল থেকে বিজলি বাতিগুলো রমণীয় রহস্যময়ী নারীর মৃদু হাসির মত বিচিত্র রোশনাই বিতরণে ব্যস্ত।

মায়া দেবীর বয়েস পঁয়ত্রিশের বেড়া ডিঙোলেও যৌবনকে মুঠোর মধ্যে দম আটকে আটকানোর অদ্ভুত কৌশল যেন তাঁর করায়ত্ত করা। নানা বয়সী ছেলে-মেয়েদের নানা কথাবার্তায় কলহাস্যে বড়



ঘরটি তখন মুখরিত। তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে কেউ কেউ বাহিরে বেরিয়ে আসছেন ছাতে, কেউ বা বসছেন বেতের চেয়ারে, কেউ বা আবার ঘরের ভিতরের কোনো উত্তেজক আলাপ শুনে যোগদান করতে ব্যস্ত-সমস্ত ভিতরে ঢুকছেন। ঘরের ভিতরটি দিশী-বিলিতি রূপসজ্জায় একটা অদ্ভুত গোধূলি-দশা বিস্তার কোরেছে। পিয়ানো থেকে সেতার এসরাজ, নিকেলকরা লোহার নলের কৌচ-কেদারা থেকে উত্তরায়নি-ওড়না-চাপা ফরাস-তাকিয়া কিছুই বাদ পড়েনি।

আদতে, এই শেষ-সন্ধ্যার বিরাট চায়ের আসর কর্তাবিহীন শ্রীমতী মায়া দেবীর কর্তৃত্বে তখন বেশ জমজমাট। মোটাসোটা গোলগাল গ্রামপুডিং টাইপের চেহারা বকু বোসের, যার চেহারা দেখার সঙ্গে সঙ্গে হাসি পায়। সুযোগ পেলেই স্মার্ট ছেলেরা এবং বিশেষ কোরে মেয়েরা তার পা টেনে আছাড় খাওয়াতে চায় অর্থাৎ ইংরিজিতে যাকে বলে লেগপুল, বিশুদ্ধভাবে সবাই ওর উপর তাই প্রয়োগ করার জন্য সব সময় যেন প্রস্তুত।

বঙ্কু বোস। নিতা ।
এ জীবনে সব বৃথা।
চাই ভালবাসা
শুধু ভালবাসা।

মায়া দেবী। থাসা—
হাঃ হাঃ হাঃ হাসালে!

(বীণা রায় ছাত থেকে হাসি শুনে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে)

বীণা রায়। কি এতো যে হাসি

(বঙ্কু বোসের কউচটার হাণ্ডেলে বোসে এলা গুপ্তা)

এলা গুপ্তা। বলো না বঙ্কু
মোরা বেশ করি ভালবাসি।

(রাজীব সোম বঙ্কুর পাশে বসা এলা গুপ্তার 'মোরা ভালবাসি' এই কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে)

রাজীব সোম। অ্যাঁ, বলো কী?

(তার পর চলমান বীণা রায়ের দিকে চেয়ে)

আরে আরে চল কি?
দেখি, সকলেরে তুমি ত্রাসালে।

(রাজীব সোমের উপর কর্তৃত্বের সুরে)

বীণা রায়। দেখ, মুখে চাবি!

(এই বলে নিজের ঠোঁটের উপর একটা আঙুল রাখবে)

ভুলু ঘোষ। ওঃ, তোমার কথায়
ও' যেন খায় খাবি!

মায়া দেবী। দেখো দেখো দেখো,
ওদিকে দেখেছো—
নজর কোথায় তোমরা রেখেছো?
বুকুকে এলা যে জোর কোরে ভালবাসালে!

(লিলি, মিলি আর বেলাকে হাত ধরে চৌকি থেকে টেনে তুলে বলবে)

লিলি। ওরা ঘরে মেতে রঙ্গ কথাতে
কানামাছি খেলা
চলো খেলি ছাতে।

(ওদিক থেকে বঙ্কু বোস চিৎকার কোরে)

বঙ্কু বোস। আমি খেলবো আমাকে নাও,
কানামাছি হোতে আমাকে দাও।

বেলা। এদিকে এসো, রুমালটা কৈ?

(ট্রাউজারের কোটের নানা পকেট হাতড়ে রুমাল না পেয়ে জিভ বের কোরে বঙ্কু বোস বলবে)

বঙ্কু বোস। ডলির বাড়িতে এসেছি ফেলে
য়্যা, যাঃ ঐ।

(প্রশান্তর দিকে চেঁচিয়ে মিলি বলবে)

মিলি। প্রশান্ত, এই, রুমালটা দাও—

প্রশান্ত। ছুঁড়ে দিচ্ছি সে,
এই লুফে নাও।

(বঙ্কুকে লিলি মিলি বেলা হাত ধরে, কেউ টাই ধরে চোখে রুমাল বাঁধা অবস্থায় ছাতে টেনে এনে ছেড়ে দেবে)



লিলি। ভালই হোলো বঙ্কুকে পেয়ে
ঘুরবে কেবল চাটি গো খেয়ে।

(মেয়েরা তখন কেউ ওকে চাটি মারছে, কেউ চিমটি কাটছে, ও' একটা টেবিলে লেগে হোচোট খেলো, একবার একটা চৌকি উল্টে চিৎপটাং হয়ে পড়লো, তার পর দাঁড়িয়ে কাপড়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলবে)

বঙ্কু বোস। উঃ, এতো জোরে জোরে
মারছো কেন?
মাথাটা আমার জামীন যেন!
কোটটা আমার হোলো যে মাটি—
চাদা কোরে খালি মারছো চাটি?

সবাই মিলে হাততালি দিয়ে নাচতে নাচতে
—কানা মাছি ভোঁ ভোঁ
বঙ্কু বোস হো হো।

বঙ্কু বোস। গেলুম লিলি—
রামচিমটি কেটো না মিলি
চিমটি কাটে অমন কোরে?
বিছের কামড় জ্বলছে সারা শরীর ভোরে।



মিলি। বোকারাম করছো যে ভুল
আমাদের চাঁপার আঙুল
চিমটি কভু কাটতে পারে ?

বকু বোস। এবার ফেলবো খুলে রুমালটায়
কালসিটে যে পড়লো গায়
বেওয়ারিশ মাল আরে আরে
মারছো কেন বারে বারে ?
গেলুম গেলুম ওরে বাবা রে !

(সবাই মিলে বকু বোসের রকম দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ে নাচতে নাচতে হাততালি দিয়ে)

মেয়েরা সবাই। কানা মাছি ভোঁ ভোঁ
বকু বোস হো হো

(ছাতে রেলিং-এর ধার ঘেঁসে এক কোণে দাঁড়িয়ে শিলা আর সঞ্জয় তখন কথা বলাবলি করছে। ছাতের উপর থেকে অদূরে তখন অজগরের মত এঁকে বেঁকে পড়ে থাকা চৌরঙ্গির পথগুলি, ময়দান আর দূরান্তের শীতের চন্দ্রালোকিত শহর যেন ওদের পটভূমিকার কাজ কোরছে)

(অল্প অভিমানের সুরে)

শিলা। তুমি তো আমায় বাস না ভালো
কেন মিছে শুধু কথা কও।

(শিলার ঠোঁটে চাবি বোলাবার ভঙ্গিতে আঙুলটা বুলিয়ে)

সঞ্জয়। দেখো রাগিও না মিছে
হবে না ভালো
চাবি দেব ঠোঁটে চোপরাও।
(ঠোঁট উল্টে ভুরু কুঁচকে)

শিলা। ভারি তো,
যেন ভয়ে মরি মরি তুমি শাসালে।

(এমন সময় পাশের সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের এক পাশের লম্বা টানা জানলা মারফৎ টুটুলকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসতে দেখে একটা কটে কথোপকথনরতা লিলি আর নিতা চোখে চোখে ইসারা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাতের আড়াল দিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ ইসারা মিশিয়ে নিতা মিলিকে বলবে)

নিতা। দেখো, দেখো,
হাজির, সেই যে

(টুটুলকে আসতে দেখে আনন্দে আটখানা হয়ে চৌকি ছেড়ে লাফিয়ে উঠে প্রশান্ত সিংহ বললে)

প্রশান্ত সিংহ। আরে রে এই যে—
টুটুল হাজির !

(প্রেমতোষ মায়া দেবীর সামনে হাজির হোয়ে হাত পেতে কতকটা নাটকীয় ভঙ্গিতে)

প্রেমতোষ। দাও গো এবার টাকাটা বাজীর !
কে—ম—ন—
হেরেছো এ—খ—ন— ?

(মায়া দেবী টুটুলের উপর মালিকানা ষোলো আনা জাহির কোরে)

মায়া দেবী। ওর না এসে উপায়
ছিল কি কিছু ?
পেত্নির মত পায় পায় ওর
নিতাম পিছু।
যদি মরতাম !
জেনো, ভূত হোয়ে গিয়ে
ধরতাম।

(বুকের উপর ডান হাতটার বুড়ো আঙুল বের করা অবস্থায় মুষ্টিবদ্ধ ভাবে রেখে নিজেকে দেখিয়ে)

মায়া দেবী। এই, এর কাছে জেনো
মরলেও জেনো ছাড়ান নেই।

(সাধারণত অন্য দিনের মত টুটুল মায়া দেবীর কথার পটাপট পাল্টা জবাব আজ না দেওয়ায় একটু হতাশার সুরে লিলি বললে)

লিলি। আচ্ছা টুটুল,
চুপ কোরে কেন ?

বীণা রায়। আজকে কি জানি গুম খেয়ে গেল

(এই কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টুটুলের টোল খাওয়া গালে টোকনা মারার ভঙ্গিতে আদর করতে করতে মায়া দেবী বললে)

মায়া দেবী। লক্ষ্মিটি,
আমার প্রাণের পক্ষিটি
কও, কথা কও—
এই, মেরিজান এই !

(এমন সময় মণ্টু রায়কে ঘরের সেই জানালাটা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে দেখা যাবে, তার পর ঘরে ঢুকে মণ্টু রায় মায়া দেবীকে নমস্কার কোরে জিজ্ঞেস করবে)

মণ্টু রায়। টুটুল এসেছে ?

(মায়া দেবী মণ্টু রায়ের কথার উত্তর না দিয়ে বলবে)

মায়া দেবী। কিন্তু আসবে না তুমি
সবাই ভেবেছে।

(একটু চেঁচিয়ে ঘরের আর এক প্রান্ত থেকে শিলা বলবে)

শিলা। ম—ন—টু—উ—উ
বকু বোস। কু—উ—উ—উ
শিলা। ওধারে কোথায় ?
এদিকে এদিকে।
লিলি। এসো এইখানে টুটুল যেদিকে।

(টুটুলের কাছে মণ্টু হাজির হওয়ার পর টুটুল বলবে)

টুটুল। এতো যে দেরী ?

(মণ্টু নিজের রিষ্ট-ওয়াচটার দিকে তাকিয়ে)

মণ্টু রায়। তাই তো দেখি
টুটুল। কেন দেরী হলো, এরা যে
করতে চাইছে জেরা যে।

(ভুলু ঘোষ মণ্টু রায়কে বলবে)

ভুলু ঘোষ। দেরী দেখে ওরা বলছে সবাই
কোকোর কো করবে জবাই।

প্রশান্ত সিংহ। তোমার উপরে বেজায় ক্ষেপেছে।

মন্টু রায়। নতুন কথা কি আছে তাতে?
আমরা সবাই
নিত্য জবাই
চলছি হয়ে ওঁদের হাতে॥

টুটুল। হোলো দেরী কিসে?

মন্টু রায়। আপিসে।
গেলুম আটকে
যায় কি করা।

ভুলু ঘোষ। তা বটে, তোমাকে ধরা—

নিতা। বললুম না আর
যে যাবে ধরতে
কি বলো নিতা
কে চায় মরতে

(বীণা রায় একটু দুষ্টুমির সঙ্গে)

বীণা রায়। জানি, জানি
শেষকালে সে যে নিজেই ফেঁসেছে
তো তো হো— বলেছে বেশ।

(মায়া দেবী মন্টুর দিকে চেয়ে)

মায়া দেবী। যাই হোক তুমি এসে শেষ মেস
রেখেছে মুখ।

(নিজের বুকের ছাতিটা নিশ্বাস টেনে বাড়িয়ে দু'হাত দিয়ে তা দেখিয়ে সঞ্জয় বলবে)

সঞ্জয় সোম। দেখো দেখো ফুলে
উঠেছে বুক

মায়া দেবী। স্পর্ধা, আমার ডাকে
কে আছে এমন আটকে পথে?

(টুটুল মায়া দেবীকে ঠাট্টা কোরে)

টুটুল। জানে না তো লোকে
তোমার ও-চোখে
রয়েছে বিষ!

মায়া দেবী। সাহস তো দেখি
হয়েছে ইস্!
এ কি,
দেখি, ভয় ডর কারো নাহিকো লেশ।

বকু বোস। ওহে বড় বড় তোমরা চোমরা!
আর কেউ ভয় পেয়েছো তোমরা?

(ভয়ের ভান কোরে)

বকু বোস। আমি নিশ্চিত পেয়েছি ভয়
পেয়েছি ভয়

(মায়া দেবীর গা ঘেঁসে এসে বোসে)

বকু বোস। তোমার কাছেতে ঘেঁসে এসে বসা
সুবিধার বড় মোটেই নয়।

(মন্টু রায় টুটুলকে বলবে)

মন্টু রায়। হয়েছে কথা, চলো যাই নেমে।

ভুলু ঘোষ। এই শীতে দেখি গিয়েছো যে ঘেমে।

সঞ্জয় সোম। ঘরটা বেজায় গরম যেন।

প্রশান্ত সিংহ। ঠাণ্ডা হাওয়ায় চলো ময়দানে।

রাজীব। পায়চারি কোরে আসি না কেন?

মায়া দেবী। মায়া দেবী করছে জাহির
হবে না কেহই ঘরের বাহির।

প্রেমতোষ। সত্যি সত্যি যেন মনে হয়
আবহাওয়া ঘরে উত্তাপময়।

ভুলু ঘোষ। বাক্য-বহ্নি বোমার মতন
ফেটে পোড়ে অসে দাউ দাউ।

বকু বোস। খিদে পেয়েছে যে চিনে কোতেলেত
খেয়ে আসি চলো চাউ চাউ

(টুটুল লিলির হাত ধরে বলবে)

টুটুল। তার চেয়ে এসো
লিলি তুমি এসো

ভুলু ঘোষ। মাঝে মাঝে খালি মুচকিয়ে হেসো

টুটুল। আনো তোমার ঐ এসরাজখানা
মাঝে লীলা ভরে ছড়ের টানা।
এসো তো এদিকে নিয়ে
তোলো ঝড় সুর দিয়ে।

(উষাকে ডেকে)

এই, এই দিকে উষা।

(উষা কৌচ থেকে উঠলে ওর কাপড় পরার নতুন কায়দা দেখে)

দেখি দেখি, বাঃ!

মন্টু রায়। তোফা হয়েছে তো বেশ ভূষা।

টুটুল। নি' এসো সেতারটারে
হানো তান তারে তারে
মেঘ-মল্লারে তোলো তোলো ঝঙ্কার।

লিলি। বোলছ কি তুমি?
এই শীতে মল্লার।

টুটুল। হ্যাঁ, উত্তাপ যত হুঙ্কার মত
শেষ হোক হল্লার।

(এলার হাত ধরে টেনে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে)

এসো, এসো এলা।

ভুলু ঘোষ। তোমার কাছেতে
প্যাভলোভা আর মেনকা নাচেতে
ছোঃ, করে যেন ছেলেখেলা।

টুটুল। নূপুর বাঁধিয়া একবার দেখি
মার চোখে টঙ্কার।

এলা। নাচব নাচের কোনটা?

মন্টু রায়। যা' খুশী তাই।

টুটুল। হুকুম করার
কেহই নাই।

(নাচ আরম্ভ কোরবে এলা; মায়া দেবী খানসামাকে ডেকে বলবে)

মায়া দেবী। আওর এক দফে
ঘুম্‌কেও ট্রে।
(সকলের দিকে ফিরে বলবে)
বলেছি চা দিতে।

বীণা রায়। দেখি হোয়ে গেল দেরী
হোলো কি গাড়ির

মায়া দেবী। এখনো যে বড় এলো না নিতে।

(প্যাটি, পেস্ট্রি, স্যাণ্ডউইচের ট্রেগুলো নিঃশব্দে বেয়ারাদের হাতে হাতে আর এক দফা ঘুরে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে যে যার ইচ্ছামত চায়ের পেয়ালা আর কিছু কিছু খাবার উঠিয়ে নিয়েছে নিজের নিজের প্লেটে। এলার নাচও বেশ তখন জমে উঠেছে। তার পর সকলের করতালির মিলিয়ে আসা ধ্বনির সঙ্গে এলার নাচও মিলিয়ে এসে শেষ হোলো।)

টুটুল। ঘড়িটায় দেখি
হয়েছে অনেক রাত।

মায়া দেবী। তাতে কি হয়েছে?

লিলি। বিয়ে না হলেও বাসরের মত

মিলি। রাতের আসর হোক পরিণত

এলা। সারা রাত জেগে সবার উপর
করা যাক্ বাজিমাৎ।

মণ্টু। চলুক 'ফ্লাস' কিম্বা 'পোকার'

বীণা। কেন, বকু বোস আছে জ্যান্ত জোকার

লিলি। কিন্তু ঘরের মধ্যে বন্দি হয়ে
লাভ কি বলো?

শিপ্রা। মোটর রয়েছে, তার চেয়ে লেকে
চলো গো চলো।

মায়া দেবী। আজ নয় কাল
যাওয়া যাবে চলো।

প্রশান্ত। রয়েছে যে পূর্ণিমা

ভুলু ঘোষ। চাঁদের আলোয়
আহত হয়ে যে
ঘুর ঘুর ঘুর্ণিমা।

মণ্টু। এখন হাঁচি
না পাঠালে বাঁচি।

সঞ্জয়। যাত্রার আগে শুভ কামনায়
হ্যাঁচচো দিলাম হাঁচি।

প্রশান্ত। আজকের চেয়ে
কালকেই ভালো।
কি বলো হে কি বলো।

লিলি ও মিলি। সবাই মিলে লেকে গিয়ে কাল
সাঁতার কাটবো চলো।

বীণা। সখ থাকে কারো
এই শীতে লেকে
সাঁতার কাটিও রাতে।

মায়া দেবী। পড়ে যদি কেউ নিউমোনিয়ায়
দোষ নেই মোর তাতে।

টুটুল। সুইটসারল্যাণ্ড লেক লুসানে
কেটেছি সাঁতার।

মিলি। কোলকাতার এই শীত তার কাছে
ভাবিতো ছাতার।

লিলি। ডিসেম্বরেতে কাশ্মীরে আমি
ঘুরেছি কত।

শিপ্রা। লেকের জলের শীত তার কাছে
মশার মত।

(বকু বোস হাত-পা তুলে কচি খোকার ভঙ্গিতে)

বকু বোস। আমিও যাবো আমিও যাবো
আর একটা কেক প্যাটিও একটা
একটু খাবো।

(বীণা রায় পাশে রেখে দেওয়া প্যাটির প্লেটটা তুলে বকুর কাছে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বকু প্লেটটা এক হাতে নিয়ে আর এক হাতে বীণা রায়ের আঙুলগুলো ধরে গদগদ ভঙ্গিতে)

বাঃ, আংটিটাতো বেশ
কিন্তু হীরেটা বাজে
অনুমতি হলে প্রেজেন্ট একটা
বলিনি লাজে
আঙুলগুলো কি অপরূপ
আহা মানাতো বেশ।

(হাতটা টেনে বকুর হাত থেকে ছিনিয়ে)

বীণা। বাজে বক বক কোরো না বকু,
ন্যাকামি সহ্য হয় না লেশ।

(সঞ্জয় দূর থেকে বীণা রায়ের হাত ধরে বকুকে হ্যাংলাপনা কোরতে দেখে)

সঞ্জয়। আবার তুমি এখানে এসেছো
দাও বার কোবে ফের যে হেসেছো।
(বকুকে বীণা রায় একটু ঠেলে)

বীণা। যাও না ওখানে ঐ তো এলা
(চিৎকার কোরে বকু বোস কান্নার সুরে)

বকু। ওগো বন্ধুরা দেখো দেখো ওবে
বীণা রায় মোরে মেরেছে ঠেলা।

(লিলি বকুর কাছে এসে পিঠে হাত রেখে)

লিলি। বল কি বকু কালকে পার্টিতে
থাকতে তুমি হবে কি হাটিতে?

(বকু এবার হেসে ফেলে আনন্দে আটখানা হয়ে)

বকু। তোমার হুকুমে
জেগে কিবা ঘুমে
স্বপ্ন দেখি যে
(বকুকে ঠেলা মেরে মণ্টু)

মণ্টু। বল না হে কি যে

বকু। রাত হয়ে যাবে ভোর
বরাত সে যেন চিচিংফাঁক
খুলেছে দোর

সঞ্জয়। কি হবে তা'পর বল না হে কেন

বকু। শিস দেবে শুধু সাথে নিয়ে যেন
চলি ট্যাক্সির সারি।

লিলি। সুইমিং পুলে সাঁতারের পর
মনে থা'ক যেন—
নতুন শাড়ি!

বকু। দেব আমি দেব উপহার।

(পা'টা উঁচু ক'রে বকুকে দেখিয়ে মিলি বোলবে)

বীণা। আরে জুতোর ফিতেটা গিয়েছে খুলে

(বকু বোস বীণার জুতোর ফিতেটা বেঁধে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করবে)

বকু। যা হবে খরচ সব তো আমার

(এলা ইচ্ছে কোরে রুমালটা মাটিতে ফেলে)

এলা। রুমালটা বকু দাওতো তুলে।

(বকু বোস আবার রুমালটা তুলে দিতে দিতে বলবে)

বকু। মালপত্তর বয়ে আনবার

মায়া দেবী। সেটাও তোমার
আর কি চাই?

বকু। ফুরিয়ে গেল যে এরি মধ্যে
কিছুই কি নাই?

(আর এক প্রান্তে বসে থাকা টুটুল দাঁড়িয়ে উঠে একটু চেঁচিয়ে সকলকে বলবে)

টুটুল। আজকে আমি যে
উঠলাম তাড়াতাড়ি
ইলার সঙ্গে দেখা করা চাই
ধারে থেকে হবে গাড়ি।

(সকলে কৌতূহল আর হিংসে মেশানো সুরে বলবে)

সকলে। ইলা ইলা ইলা, কোন ইলা?

মিলি। কেন মিথ্যে করছে অছিলা

মায়া দেবী। কাগজেতে জানি
বেরিয়েছে ছবি যার।

শিলা। কাজের মধ্যে আছে যার শুধু
চাঁদা আর লেকচার।

এলা। তা ভালো তা ভালো বেশ

বীণা। ঐ মেয়ে শেষ মেশ

বকু। হা হাঃ হা হাঃ হবে
চালাও চানাচুরবে।

মায়া দেবী। দেশের উপর দরদ এক্কোটা
টুটুলের মত লোক

শিলা। বাঃ উন্নতি হয়েছে

এলা। আরো হোক আরো হোক।

মায়া দেবী। চিয়ার ইউ টুটুল।

টুটুল। দেখি একূল ওকূল ভাঙলো দুকূল

সঞ্জয়। তবু তো চলেছে হাসি

টুটুল। হাসবো তখনো ললাটে যখনো
লটকানো দেখা ফাঁসি।

মিলি। ঝগড়া হলেও মনে থাকে যেন
কাল যেন দেখা পাই!

এলা। পূর্ণিমা রাত পার্টিতে তোমারে
মনে রেখো চাই-ই চাই।

(অভিমানে অপমানে আহত মায়া দেবীর সম্মুখে নত মস্তকে)

টুটুল। রানি,
তথাস্তু হবে তাই হোক স্থির
দিলাম অভয় বাণী

(সকলে [illegible]কে ঘিরে)

বললুম সবে
চললুম তবে
চিয়ার ইউ, চিয়ার ইউ।

বকু। দিল্লির থেকে বিল্লির মত
আমি কাঁদি মিউ মিউ!

মায়া দেবী। চুপ করো বকু চুপ।

বকু। চুপ কোরে এই কোণে পড়ি আমি ধুপ।

আগামী সংখ্যা হইতে

নূতন উপন্যাস

জীবন-জল-তরঙ্গ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

মানস কুয়াশা

বিমলচন্দ্র ঘোষ

অযুত গ্রহের দ্যুতি-শিহরণে স্তম্ভিত মহাকাশ
রুদ্রের জপমালায় অনাদি সৃষ্টির অভিলাষ
কত সুর কত মোহ,
ইন্দ্র চন্দ্র যমাগ্নি বায়ু মৃত্যুর সমারোহ;
প্রণবে আণব চিৎ-কণিকায় আমার এ ক্ষণ-সত্তা
বিপুল প্রাণের সমুদ্রে হায় বিফল বুদ্ধিমত্তা!
তুমি আমি নেই নিরবধি কাল
রহস্যময় সন্ধ্যা সকাল
তুমি আমি নেই কক্ষে কক্ষে বাউল-বিশ্ব উদাসীন
অবিনশ্বর বিবাগী সুরের তীব্র নিখাদে বাজে বীণ্।

কাব্যের এই দুর্লভ মায়া-লোকে
কী যে সুখ শুধু চুপ কোরে থাকা অজানা নেশার ঝোঁকে!
কত সুর কত গান কত প্রাণ
ক্ষণ-চেতনার ক্ষণ-ভগবান
কাব্যের এই বিস্ময়লোকে কী যে অপরূপ মোহ
মহাকাব্যের নেই কোনো সমারোহ!

এ ছোট আকাশে বাজে নাকো ভেরী তুরী
তর্ক তত্ত্ব সমস্যা ভূরি-ভূরি
এ আকাশে নেই পশ্বাচারের পাপ-পঙ্কিল ত্রিযামা
কুশ্রী মনের অতি বাস্তব বৃষভ কণ্ঠে দামামা।
শশ-বিষাণের ভ্রান্তি
নেই লেশ, শুধু কাব্যের সংক্রান্তি।

আধো কুয়াশায় রূপালী সরীসৃপ
অর্দ্ধ-চেতন সমুদ্রতলে দ্রষ্টার মায়াদ্বীপ
কত ফুল কত পাতা
রোমাঞ্চকর কত না ছবির খাতা
চিন্ময় ছান্দিক
রঙের আঁচড়ে আঁকা যেন স্বাপ্নিক।

সোনা-ঝুরু ঝুরু প্রবালী মেঘের মায়া,
কী গভীর প্রেমে দিগন্ত জোড়া অলস রৌদ্র ছায়া!
নিভৃত মনের ছোট আকাশের নেশা
সুরেলা মনের লঘু ইঙ্গিত মদির ছন্দে মেশা,
আধো প্রতীকের ধ্যানের কমল গন্ধ
পাপড়ী ঝরানো অস্ফুট গান কম্পিত মৃদু-মন্দ
তমসার পারে আদিত্যলোকে কেঁপে কেঁপে মিশে যায়
রিপু সংহারে মুক্তির মোহনায়।

ব্যাকুল হৃদয়ে ওঠে গান জাগে প্রাণ
মনোবাসনার বেদনার অবদান;
শিখারূপিণী এ প্রেম-রাগিণীর কম্পিত তনু জুড়ে,
অতি সচেতন সূক্ষ্ম বেদন ধ্যানের স্বর্ণচূড়ে
জ্বলে শ্বেত নীহারিকা
জ্যোতির্বাষ্পমণ্ডলে সুর-শিখা
অদ্ভুত মায়ালোক
শিশিরে সৌর-কিরণোজ্জ্বল ছন্দিত বীতশোক।

পলায়নী নয়, অতি বাস্তব কাহিনী,
বিচিত্র এই খেয়ালের ভাষা অমেয় স্বপ্ন-বাহিনী
অনাসক্তির নিভৃত কাব্যলোকে
পরমা গতির লোভে নয় শুধু আস্বাদনের ঝোঁকে!



শিল্পী—সুনীল পাল

রাশিয়ার বিদ্রোহী কবি

(মাইকেল লারমনটভ্‌ঃ ১৮১৪—১৮৪১)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এক

জার-শাসিত রাশিয়ায় একই সাথে সমাজ, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণায় যে সব কবি নিজেদের নাম স্বাক্ষর করে গেছেন, তাঁদের ভেতর মাইকেল লারমনটভ্‌ অন্যতম। পুস্কীন রাশিয়ার সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য কবি এবং আজ পর্য্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং সমাজের সাধারণ ব্যথা-বেদনা ও আকাঙ্ক্ষার সাথে তাঁর লেখনীর যোগাযোগ স্বাভাবিক। রাষ্ট্রীয় ব্যভিচারের প্রতি পুস্কীনের বিজাতীয় ঘৃণা বহুবার ঘোষিত হ'য়েছে; কিন্তু এই সাথে সমসাময়িক নির্য্যাতিত সমাজের অক্ষম বীর্য্যহীনতাকে নিষ্করুণ বিদ্রূপ ক'রতে তিনি পারেননি। এই অক্ষমতা অবশ্যই তাঁর বৃহত্তর কবি-মনের পরিচয়, যা একমাত্র পরম সহানুভূতিশীল মানবতাকে অবলম্বন ক'রেই এগিয়ে চলে এবং যার জন্য এখনো তিনিই রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।

পুস্কীনের পরেই সমসাময়িক রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ কবির আসন পেলেন মাইকেল লারমনটভ্‌; কিন্তু আচারে, ব্যবহারে, চারিত্রিক সংগঠনে পূর্ববর্তী কবির সাথে কোথাও তাঁর মিল পাওয়া গেল না। কোথাও কারো জন্য লেশমাত্র সমবেদনা নেই···পারিপার্শ্বিক সব কিছুর প্রতিই প্রকাশ্য তাঁর বিদ্রূপ; আর এই বিদ্রূপ রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্ম,—কোনো প্রচলিত ব্যবস্থাকেই বাদ দিয়ে চলেনি। লারমনটভের জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে—অতি অল্প বয়সে, যখন তাঁর বয়েস মাত্র তিন বছর, তিনি মাতৃহীন হন। দরিদ্র পিতা আর প্রভূত অর্থশালিনী মাতামহীর পরস্পর-বিরোধী খেয়াল পূরণের দোটানার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে তাঁকে বেঁচে থাকতে হয়। সম্ভবতঃ এই কারণেই সুদৃঢ় কোনো স্বাভাবিক ভিত্তির ওপরে তাঁর চারিত্রিক সংগঠন হ'তে পারেনি—সমস্ত জীবন সামঞ্জস্যবিহীন কোনো 'abnormal' প্রবৃত্তির তাড়নাতেই তাঁকে প্রচলিত সাধারণ পথ ছেড়ে অন্যত্র ছুটে যেতে হয়েছে।

দিদিমা'র আদরে লারমনটভ্‌ দিন দিনই অতি অনায়াসে উচ্ছন্নে যেতে লাগলেন। অতি সহজে খুব ছোট বয়েস থেকেই কাব্য আর প্রেমে তিনি নিত্য নতুন অকাল-পরিপক্কতার পরিচয় দিয়ে প্রসিদ্ধ লাভ করতে লাগলেন। চৌদ্দ বছর থেকে আঠারো বছরের ভেতর অল্প ক'রেও তিনশো গীতি-কবিতার স্রষ্টিকর্তা তিনি! এর সাথে পনেরোটি সুদীর্ঘ কবিতা, আর তিনটি নাটক! সেণ্ট্‌পীটার্সবুর্গের সৈনিক-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন তিনি গ্রাজুয়েট উপাধি নিয়ে এলেন, তখনো তাঁকে অল্প বয়সের কোনো বালক বললেই চলে। ইতিমধ্যেই তিনি দু'বছর মস্কো ইউনিভার্সিটী'তে কাব্যচর্চ্চায় ও সুরাচর্চ্চায় রীতিমত ডুবেছিলেন। এই সম্বন্ধে কোনো সমালোচকের মন্তব্য এখানে তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না:—"His technique as a heart-breaker was ouly excelled by his power as a poet, and that inspite of a repellent exterior."

পুস্কীনের মৃত্যুর পর কবিতা লিখে অতিক্রুত তিনি প্রসিদ্ধ হ'য়ে পড়লেন। আর এই কারণেই তাঁকে ককেশাসে নির্বাসন দেওয়া হ'লো। "Although he revolted not against the Czar of all the Russians, but against the God of heaven and earth."—সম্ভবতঃ এই কারণেই। সমালোচকের কথায় তাঁর প্রসিদ্ধির মূল কারণ—"This region was to the poets of Russia what Italy has been to those of England. The Romantic glamour of the enchanted land suffused Lermontov's work. One of his flames called him a Prometheus chained to the rocks of the Caucasus, but he was more like a pendulum swinging between them and the *beau monde* of St. Petursburg. He induldged inordinately in the Sadism of sarcasm, and was as well hated by men as he was loved by the women." লারমনটভের শেষ জীবনের বর্ণনা আরও সংক্ষিপ্ত। ককেশাসের পার্বত্য অধিবাসীদের 'বুলেটে'র হাত থেকে কোনো রকমে রক্ষা পেয়েও 'ডুয়েল' খেলায় ক্ষিপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে জন কীটসের চেয়ে মাত্র এক বছর বেশী বেঁচে থেকে পৃথিবীর সাথে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে অন্য কোনো লোকে তিনি রওনা হ'লেন। তার বাঞ্ছিত মৃত্যু অবশেষে তাঁকে "বাসের অযোগ্য এই ঘৃণ্য পৃথিবী থেকে" চিরদিনের জন্য কাছে টেনে নিলো। তবু তাঁর অদ্ভুত প্রতিভার কাছে আজ পর্য্যন্ত তাঁর জন্মভূমি কিছুটা ঋণী রয়েই গেছে। সমালোচকের কথায়—"Yet this brilliant bully and egoistic rake was after his fashion, a knight of the grail and poetic genius such as rarely graces any language." পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ প্রতিভার জীবনী ও সাহিত্যচর্চ্চার এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

দুই

কি করে পুস্কীনের রাজচ্ছত্র লারমনটভে এসে পৌঁছালো তার ইতিহাসও সংক্ষিপ্ত। পুস্কীন রাশিয়ার প্রথম কবি আর জাতীয় কবি হিসাবেও আজ পর্য্যন্ত তিনিই প্রথম। সমালোচকেরা তাঁকে স্থান দিয়েছেন বিশ্ব-সাহিত্যে Dante, Shakespeare আর Goetheর সাথে। এ বিষয়ে তাঁদের মন্তব্য: "...true, he lacks the universal significance of his elder peers, but he occupies their central position as the supreme embodiment of a nation's mind"—সুতরাং পুস্কীনের পরবর্তী রুশীয় সাহিত্যিকদের সমান খ্যাতি নিয়ে সাহিত্যিক জগতে বিচরণ করা সম্ভব হ'লো না। এ ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের সাহিত্য-ইতিহাসে সেক্সপীয়ারের মৃত্যুর পর যা ঘটেছিলো রাশিয়ারও অনেকটা তারই পুনরাবৃত্তি হ'লো। Shakespeareএর পরে ইংল্যাণ্ডে প্রধান কবির আসন অলঙ্কৃত ক'রলেন satirist কবি Dryden, রাশিয়ায় পুস্কীনের মৃত্যুর পরে প্রথমেই কবি-খ্যাতির পুনরুদ্ধার ক'রলেন লারমনটভ্। পুস্কীন ও সেক্সপীয়র দু'জনেই হৃদয়বান ভাবুক কবি ছিলেন, সুতরাং ঐ পথ ধ'রেই যাঁরা কাব্যের পথে এগুলেন—তাঁদের ব্যক্তিত্ব কোনো কিছুতেই ফুটে উঠ্‌তে পারলো না। লারমনটভ্ ধরলেন একেবারে বিপরীত পথ। সুতরাং তিনি যা রুশ-সাহিত্যে দিলেন তাতে পুস্কীনের প্রভাব সংক্রামিত হ'লো না। সম্পূর্ণ নিজস্বতায় লারমনটভ্ জনপ্রিয়তা অর্জন ক'রলেন।

সমালোচকের মুখেই শুনুন:—

"He was an ego-centric creature with a romantic nostalgia for the supersensuous. His verse, which has a highly musical quality, is informed with a graceful demonism and a proud pessimism which naturally endear him to a youthful audience. His rebel spirit was filled with contempt for the human herd. The growing civic bias made it possible to put a social interpretation on the disquietude that pervades Lermontov's work, although he revolted not against the Czar of all the Russians, but against the God of heaven and earth."...মোটামুটি, তিনি তৎকালীন যুবকদের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত দিয়েছেন—যেহেতু তাদের বিদ্রোহী সামাজিক চেতনার সাথে কোনো একখানে লারমনটভের কবিতার মিল ছিলো। কিন্তু যাঁর "rebel spirit was filled with contempt for the human herd."—চিরদিনই কি দেশের যুবকশক্তি তাকে বাহবা দিয়ে যাবে?

এ প্রশ্নের উত্তর তাঁর শেষ জীবনেই সোভিয়েট রাশিয়ার গদ্য-সাহিত্যে মিললো। লারমনটভ্‌কে নিয়ে যুবকদের মাতামাতি অনেকটা কমলো—যে হেতু রাশিয়ার সাহিত্যে তখন বাস্তবতার ছোঁয়া এসে পৌঁচেছে; প্রধানতঃ রুশ-সাহিত্যের অতুলনীয় কথা-সাহিত্যিক গোগোলের আবির্ভাব। ১৮৪২ সালে লারমনটভের মৃত্যুর এক বছর পরে গোগোলের 'Dead Souls' রুশ-গদ্যসাহিত্যে যুগান্তর নিয়ে এলো; এই সাথে পদ্য-সাহিত্যের আকর্ষণও খ্যাতি রুশীয় পাঠকদের কাছে কমে আসতে লাগলো। শেষ জীবনে কিন্তু লারমনটভ্ তাঁর লেখার দিক্ ঘুরিয়েছিলেন, তাঁর সে সময়কার গীতি-কবিতাগুলিতে বাস্তবতার প্রতি আনুগত্যের খোঁজ পাওয়া যায়।

অবশেষে লারমনটভেরই একটি কবিতা পাঠকদের উপহার দিয়ে আমাদের প্রবন্ধ শেষ করবো। মূল কবিতার ইংরাজি অনুবাদকে অবলম্বন ক'রেই বর্তমান বঙ্গানুবাদটি রচিত হ'য়েছে। কবিতাটি পড়লে মনে হয়, এটি লারমনটভের শেষ জীবনের কোনো শ্রেষ্ঠ রচনা—যে হেতু, এতে আত্মরতি থাকলেও বিদ্রূপ নেই...আর রয়েছে জীবনের ব্যথা ও বেদনার সাথে একান্ত হ'য়ে যাওয়ার পরিচিতি:—

জীবনের পানপাত্রটিতে আমরা চুম্বন জানাই
তৃষ্ণার্ত্ত ঠোঁট দুটি মেলে,...আমাদের চোখ ভয়ে ভয়ে অতিক্রুত বন্ধ হয়ে আসে।
সোনার পাত্রটিকে ঘিরে ফোঁটা ফোঁটা জমা হয়
আমাদের পরিশ্রান্ত রক্ত, আর চোখের জল!
কিন্তু যখন শেষের দ্রুত মুহূর্তগুলি আসে ঘনিয়ে,
আর—
বহু কালের লুকানো আলোক অকস্মাৎ জলে ওঠে...
বাঁধানো চোখ দু'টি থেকে সমস্ত উৎসব যায় মুছে,
দুঃখ আর কষ্টকে বরণ ক'রেই অবশেষে আমরা স্তিমিত হয়ে পড়ি!
সোনার উদ্ভাসিত পাত্রটিকে চিরদিনের মতো ধ'রে রাখার
কোনো শক্তিই আজ পর্য্যন্ত আমাদের এলো না—
শুধু দেখলাম, অন্তরে তার মূল্যহীন অপার শূন্যতা:
কোনো দিন কোনো কিছুতেই আমরা জানাইনি চুম্বন;—শুধু স্বপ্ন দেখেছি
অর্থহীন অবাস্তব!

দৃষ্টিপাত

যাযাবর

তেরো

ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আধারকারকে যেতে হলো বিলাতে। লাহোর থেকে সপত্নীক ব্যানার্জ্জী-সাহেব এসে জাহাজে তুলে দিয়ে গেলেন ব্যালার্ড পীয়ারে।

দিন গেল, মাস বিগত, বৎসরও অতীত-প্রায়। বিরহ-বেদনা-পীড়িত যে দিনগুলি অন্তহীন মনে হয় প্রথমে, তারও একদিন শেষ আছে। আধারকার প্রত্যাবৃত্ত হ'লেন স্বদেশে। অবিলম্বে গেলেন লাহোরে।

অঘ্রাণের প্রভাত। ট্রেণের কামরায় ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে আধারকার বাইরে তাকিয়ে দেখলেন, নির্মেঘ আকাশে সূর্য্যোদয়ের স্বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত। পথপার্শ্বে শাল তরুর কোমল শ্যামল পল্লবদল শিশিরার্দ্র বাতাসে মৃদুকম্পিত। টেলিগ্রাফের তারের উপর উপবিষ্ট এক জোড়া খঞ্জনী পক্ষিশাবক ঘন ঘন পুচ্ছ আন্দোলনরত। অকারণ খুসীতে ভরে উঠল তাঁর মন।

অপরাহ্ণে লাহোর ষ্টেশানে পৌঁছে দেখলেন একা ব্যানার্জ্জী-সাহেব এসেছেন অভ্যর্থনায়। বাড়ী পৌঁছে বেয়ারার হাতে পেলেন চিঠি। অতি পরিচিত অক্ষরে অনুপস্থিতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা।—এক বিশেষ জরুরী কাজে একটি মহিলাকে নিয়ে যেতে হলো এক জায়গায়. চায়ের ব্যবস্থা রইল বেয়ারার কাছে, আধারকার যেন চা খেয়ে নেন! সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরবেন তিনি। শুধু চায়ের ব্যবস্থা নয়, স্নানের ঘরে বাথ-টাবে ধরা আছে জল, টাওয়েল-র‍্যাকে ধবধবে তোয়ালে, সোপ-কেসে আছে আনকোরা সুগন্ধ সাবান। শয়নকক্ষে পরিপাটি বিছানা, খাটের পাশে ছোট টিপাইর উপরে সুদৃশ্য টেবিল-ল্যাম্প ও খান-কয়েক সদ্য-প্রকাশিত ইংরেজী উপন্যাস, মার জয়পুরী ফুলদানীতে সযত্নবিন্যস্ত আধারকারের প্রিয় শ্বেত করবীগুচ্ছ।

অতিথির পরিচর্য্যায়, আদর-আপ্যায়নে লেশমাত্র ত্রুটি নেই কোনখানে। তবুও কেন যে মনের দিগন্তে অকারণ বেদনার ছায়া ঘনালো আধারকার নিজেই তা' জানেন না। প্রবাসে কত দিন নিদ্রাহীন রজনীতে কল্পনা করেছেন আজকের এই মুহূর্ত্তটি; কী করবেন, কী বলবেন, তা' নিয়ে মনে মনে পর্য্যালোচনা করছেন কত বার। দীর্ঘ বারো মাসের পুঞ্জীভূত কথার মধ্যে কোন্‌টি বলবেন সর্ব্বাগ্রে, কোন্ প্রশ্ন, কোন্ সংবাদ দেবেন ও নেবেন তাই নিয়ে অবসরক্ষণে ভেবেছেন কত দিন। দেখা হলে যে কথা ভেবে রেখে-ছিলেন, তা' হয়তো যেতো হারিয়ে, অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য রইত চাপা, হয়তো শুধু উচ্চারণ করতেন ছোট্ট একটি সাধারণ প্রশ্ন, "কেমন আছ" তার কিছুই হলো না। খচ্ খচ্ করতে লাগলো আধারকারের মন। হেমন্তের দিনটি যে অপরিসীম আনন্দের অর্ঘ্য নিয়ে সুরু হয়েছিল, সে আনন্দ নিয়ে যেন শেষ হলো না।

আধারকার সাত দিন রইলেন লাহোরে। সুনন্দার সেবা, যত্নে ও আত্মীয়তায় রন্ধ্র_মাত্র রইলো না কোথাও। কিন্তু তবুও যেন আগেকার সে সুর বাজলো না আধারকারের মর্ম্মে, রস সঞ্চারিত হলো না অতিথির মনে। কোথায় রইলো ফাঁক, কোন্‌খানে ঘটলো ব্যত্যয় তার নিশানা পাওয়া গেল না, শুধু ব্যথা জেগে রইল হৃদয়ের নিভৃততম গহ্বরে। যে অভাব চোখে দেখা যায় না অথচ বুকে বোঝা যায় তার বেদনা দূর করার উপায় কী?

সুনন্দা কি বদলেছে? কই, বোঝা তো যায় না। কিন্তু মন বলে, কি যেন নেই। অতি সামান্য বিষয় কাঁটার মতো বিঁধে আধারকারের মনে। কুশের অঙ্কুরসম ক্ষুদ্র, দৃষ্টি-অগোচর, তবু তীক্ষ্ণতম। কিন্তু সেগুলি এমনই অকিঞ্চিৎকর যে তা' নিয়ে নালিশ করতে গেলে হাস্যকর ঠেকে। আধারকারের কোটের যে একটা বোতাম ছিঁড়েছে তা' যদি একদিন সুনন্দার চোখে না পড়ে থাকে তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। একটা সংসারের সমস্ত পরিচালনভার যে গৃহিণীর মাথায়, তাঁর পক্ষে সেটা অস্বাভাবিক নয়। এটা যুক্তির কথা। কিন্তু মানুষের মন তো ইনডাকটিভ লজিকের পাঠ্য কেতাব নয়। সে ফস্ করে পাল্টা প্রশ্ন করে বসে, কই, আগে তো এমন চোখে না পড়তে দেখিনি কখনও।

লাহোর ত্যাগের দিন আধারকার বিদায় সম্ভাষণ জানাতে গেলেন ব্যানার্জ্জীদের এক বন্ধু-পরিবারে। সে গৃহে আধারকারের সম্প্রীতি জন্মেছিল সুনন্দাদেরই বন্ধুতা-সূত্রে। গৃহস্বামীর কন্যা বললেন, 'আজই যাচ্ছেন কী রকম? এলেন তো এই সেদিন।"

"সেদিন আর কোথায়? দিন দশেক তো প্রায় হলো!"

'দশ দিন কখনো নয়, আমি বলছি, অনেক কম। সাত দিন। আচ্ছা বাজী রাখুন; আপনি এসেছেন গেল শনিবারে, সেই যেদিন সুনন্দাদি, রাণু মাসিমা আমরা সব সিনেমায় গেলাম।"

"সিনেমায় গেলে?"

"হ্যাঁ, রাণু মাসিমা এসেছিলেন এখানে বেড়াতে। তিনি সেন্ট এণ্ড্রুজে সুনন্দাদির সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তেন তো, তিনি ধরলেন সিনেমায় যেতে হবে। টিকিট কেনা হয়ে গেলে পর খবর এলো আপনি আসছেন ঐ দিনই বিকালে। সুনন্দাদি তাই যেতে চাইছিলেন না। কিন্তু রাণু মাসিমাও চলে যাবেন পরদিন সকালে। কাজেই শেষটায় অনেক বলাতে রাজী হলেন, কই আপনি শুনছেন না তো, কি ভাবছেন? বাজী হেরেছেন কিন্তু।"

আধারকারের মুখ-চোখে যে বেদনার ছাপ সুস্পষ্ট হলো, তাকে বাজীতে হেরে যাওয়ার শোক মাত্র বলে গণ্য করা কঠিন। কিন্তু বাড়ি ফিরে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন না একটুকুও।

আধারকারকে ট্রেনে তুলে দিতে সেদিন সন্ধ্যায় যথারীতি ষ্টেশানে এসেছিলেন স্বামি-স্ত্রী। ওয়েটিং-রুমের একান্তে সুনন্দা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাকে আজ সারাদিন এত আনমনা দেখাচ্ছে কেন? কী এত ভাবছ বল তো।"

আধারকার চমকে উঠে তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করে বললেন, "কই না তো।"

ট্রেন ছাড়লো, প্ল্যাটফরমের উপর রুমাল সঞ্চালনরত বান্ধব-বান্ধবীদের মূর্ত্তি দূর হতে দূরতর, ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ডিসট্যান্ট সিগন্যালের লাল আলোটা ধীরে ধীরে চলে গেল দৃষ্টির অন্তরালে। বার্থে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে আধারকার ভাবতে লাগলেন সেই একই কথা যা আজ সকাল বেলা থেকে কিছুতে তাড়াতে পারছেন না মন থেকে। কেমন করে সম্ভব হলো তার আগমন দিনে সুনন্দার পক্ষে বান্ধবীসঙ্গ? প্রিয় সান্নিধ্যের চাইতে বড় হলো সিনেমা? টিকিট কেনা ছিল? কত লক্ষ টাকা দাম সে টিকিটের? কথা দেওয়া হয়েছিল বান্ধবীকে? কথা কি ভাঙা যায় না কিছুর জন্যই? কই আধারকার তো কল্পনা করতে

পারে না এমন কোন এনগেজমেণ্ট বা সুনন্দার অভ্যর্থনার জন্য সে অগ্রাহ্য করতে পারে অবহেলে। এক বছর পরে সুনন্দা যদি আসতো লণ্ডন থেকে পুনায়, কিম্বা ধরো লাহোর থেকে বোম্বেতে, আধারকার কি তার নিকটতম বন্ধুর অনুরোধ এড়াতো না, মাথা-ধরা বা শরীর খারাপের কল্পিত অজুহাত দেখিয়ে? প্রিয়জনের জন্যে মিথ্যা ভাষণেও কি নেই সুখ?

বেশ তো', না-হয় ধরে নেওয়া গেল, বাল্যবন্ধুর কাছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা সম্ভব ছিল না। আগে ভাগে টিকিট কেনা ছিল, যেতে হয়েছে সিনেমায়। এতে দোষের কিছুই নেই। কিন্তু তার জন্য গোপনীয়তার আবশ্যক ছিল না, ছিল না জরুরী কাজের দোহাই দিয়ে এই মিথ্যা ছলনার।

বোম্বেতে মন বসলো না কাজে, তিষ্ঠিতে পারলেন না দীর্ঘকাল। আবার গেলেন লাহোরে। কিন্তু খণ্ডিতলয় খেয়াল গানের মতো কিছুতে পৌঁছুতে পারলেন না আর 'সমে'। বেতালা বেসুরো বাজতে লাগলো জীবনের রাগিণী। ভার-কেন্দ্র থেকে যেন চ্যুত হয়ে পড়ল এই দু'টি অনাত্মীয় নর-নারীর তিন বছর ধরে পলে পলে গড়া হৃদয়সৌধ। ফিরে গেলেন বোম্বেতে। এমনি করে বারম্বার যাওয়া-আসা করলেন বোম্বে থেকে লাহোর, লাহোর থেকে বোম্বেতে।

অবশেষে এই অস্থির ব্যাকুলতার একদিন ঘটলো অবসান। সুনন্দা-পর্ব্বের উপরে চির বিচ্ছেদের যবনিকা নামলো অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রতায়।

আধারকার আবার লাহোরে। সংশয়-বেদনায় বিচলিত। অথচ প্রকাশ্য অভিযোগের নেই উপলক্ষ্য। কারণ সুনন্দার প্রতি আধারকারের দাবী তো অধিকারের নয়, অনুভূতির। দাবী হৃদয়ের। সে হৃদয় যুক্তি-জ্ঞানহীন শিশুর মতো বারম্বার কেবলই অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

দুপুরে আপিসের কাজে বের হওয়ার কালে সেদিন সুনন্দা কাছে এসে দাঁড়ালেন না; আগের মতো এগিয়ে দিলেন না রুমাল, ফাউণ্টেন পেন, হাতের ঘড়ি ও পকেটের পার্স। ঝি বললে, "মেমসাব রসুইমে আলু বানাতে হী।" পরদিন সন্ধ্যা বেলা আপিস-প্রত্যাগত আধারকার কাউকে প্রতীক্ষমাণা দেখলেন না দোতলার বারান্দায়। শুনলেন, ধোবার কাপড় মিলিয়ে নিতে ব্যস্ত আছেন মেমসাব। রাগ করার কিছুই নেই এতে। কিন্তু অভিমানাহত মন বলে, কই ইতিপূর্ব্বে কখনও তো ঘটেনি এমন দুর্ঘটনা। আধারকারের নির্গমন-আগমনক্ষণে কোন দিন দেখা যায়নি রন্ধনশালায় আলু কর্ত্তনের প্রতি গৃহিণীর এই অপ্রতিরোধনীয় মনোযোগ এবং রজকের অপহরণ-প্রবণতার বিরুদ্ধে এই সতর্ক পাহারা।

ব্যানার্জ্জীর আপিসে কাজের চাপ ছিল বেশী, প্রত্যাগমনে ঘটবে বিলম্ব। সন্ধ্যায় প্রাক্কালে আধারকার প্রস্তাব করলেন, "চলো বেড়িয়ে আসি সাহ্‌দারা গার্ডেনস্।"

সুনন্দা বললেন, "না।"

"কেন চল না।"

"না, একা তোমার সঙ্গে দেখলে লোকে কী বলবে?"

বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে রইলেন আধারকার। সুদূর অতীতের কথা নয়, স্মৃতিকে করতে হবে না মন্থন। এই তো বিলাতে যাওয়ার আগেও কত দিন দু'জনে গেছেন সালিমার বাগে, সিনেমায়, জুহুর সমুদ্রতীরে, বোম্বের রেস্তোরাঁয়। সুনন্দা নিজে উদ্যোগ করে নিয়ে গেছেন অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির দর্শনে, ব্যানার্জ্জী রয়েছে লাহোরে। সেদিন কোথায় ছিল লোকেরা, কোথায় ছিল তাদের মন্তব্যের প্রতি সহচারিণীর এই অসাধারণ শ্রদ্ধা?

লোকে দেখলে কি বলবে! হায় রে, এ প্রশ্ন যে আধারকারই আগে তুলেছিলেন এক দিন অতীতে।

বোম্বেতে সেবার শীতের শেষে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হলো মহামারিরূপে। আধারকারের গায়ে বেরুল গুটিকা। কি জানি কেমন করে খবর পৌঁছল লাহোরে। পরদিন সন্ধ্যা বেলায় সুনন্দা এসে হাজির হলেন আধারকারের ফ্ল্যাটে। আধারকার বিস্মিত হয়ে বললেন, "তুমি?"

শঙ্কা স্নেহ ও অভিমান-জড়িত কণ্ঠে উত্তর শুনলেন, "তা ছাড়া আর দুর্ভোগ আছে কার? ক'দিন হয়েছে?"

"দিন চারেক, কিন্তু আমি তো খবর দেব না বলেই ঠিক করেছিলুম।"

"তা' করবে না? তা না হলে আর আমাকে ভাবিয়ে মারবে কেমন করে?"

আধারকার উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন, "এই ছোঁয়াচে রোগ, এর মধ্যে আসবার মন্ত্রণা দিল কে তোমাকে?"

ক্রুদ্ধ হয়ে সুনন্দা বললেন, "দেখ, আমাকে রাগিও না বলছি। মন্ত্রণা দিয়েছে কে? মন্ত্রণা দিয়েছে আমার অদৃষ্ট।" খানিক থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, "চাকর-বাকর হতভাগাগুলো গেছে কোন্ চুলোয়?"

"বাবুর্চ্চী আর বেয়ারাটা পালিয়েছে ভয়ে, মাদ্রাজী ড্রাইভারটা আছে, সেই অষুধপত্র আনে।"

"খাসা ব্যবস্থা, শুধু খবরের কাগজে শোক-সংবাদ ছাপাটুকুই বা বাকী।" বলে সুনন্দা গেলেন ড্রাইভারের সন্ধানে। তাকে নিয়ে ট্যাক্সি থেকে মালপত্র আনলেন উপরে। ঘর-দোর করলেন আবর্জ্জনা-মুক্ত, ধূলিহীন। বিছানা ঝেড়ে-মুছে রচনা করলেন স্বহস্তে, রোগীর পথ্য তৈরী করলেন পরম নৈপুণ্যে।

আধারকার জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যানার্জ্জীকে দেখছি না যে?"

"তিনি তো আসেননি।"

"আসেননি? তুমি এসেছ কার সঙ্গে?"

"কারো সঙ্গে নয়, একা।"

"মানে?"

"মানে, উনি গেছেন টুরে; ফিরতে দেরী হবে দিন পাঁচেক। তোমার লাহোরের এজেণ্টের সঙ্গে পরশু সকালে দেখা হয়েছিল এক দোকানে। তার কাছে খবর পেলাম অসুখের। বাড়ীতে তালা এঁটে দুপুর সাড়ে এগারটার ট্রেন ধরেছি ছুটতে ছুটতে। ওঁকে টেলিগ্রাম করে দিয়ে এসেছি এখানে রওনা হতে।"

বিস্ময়ে অভিভূত আধারকার বললেন, "ব্যানার্জ্জী রাগ করবে না?"

"হয় তো করবে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আধারকার বললেন, "লোকেই বা বলবে কী? ব্যানার্জ্জী ফিরে না আসা পর্য্যন্ত করলে না কেন অপেক্ষা? একা চলে এলে কেন?"

বিরক্ত কণ্ঠে সুনন্দা বললেন, "এসেছি আমার ইচ্ছে। লোকের ভাবনা ভেবে তোমায় মাথা গরম করতে হবে না, তুমি চুপ করে ঘুমাও তো এখন।" বলে শয্যাপার্শ্বের চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ঘরের মধ্যে আলো বেশী ছিল না, রোগীর ক্লান্ত দৃষ্টি থেকে আড়াল করার জন্য টেবিল-ল্যাম্পের একটা দিক্ খবরের কাগজ দিয়ে ঢাকা। পশ্চাৎ থেকে সুনন্দার মুখের অংশ মাত্র দেখা যায়।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সুনন্দা স্নান করেছেন। আর্দ্র কুন্তলদল পিঠের উপরে অযত্নবিস্রস্ত। পরিধানে দেশী তাঁতের একটি শাড়ী, বাম স্কন্ধের উপর তার অবিন্যস্ত বঙ্কিম অঞ্চলপ্রান্তের অন্তরাল থেকে নিটোল সুকুমার বাহুটি অনবদ্য ভঙ্গীতে লম্বিত। উন্নত গ্রীবার নিকটে সূক্ষ্ম একটি স্বর্ণহারের একটুখানি মাত্র আভাস। মৃদু দীপালোকিত কক্ষে বাতায়নবর্ত্তিনীর এই মৌন মূর্ত্তিটি রোগশয্যাশায়িত আধারকারের কাছে একটি পরম নিশ্চিত আশ্বাসের মতো প্রতীয়মান হলো। দু'জনের কেউ আর কোন কথা বললেন না। শুধু উভয়ের উদ্বেল হৃদয়ের গভীর ভাবাবেগ সমাজ, সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্রতা, কলঙ্কের উর্দ্ধে দেবমন্দিরের অনির্ব্বাণ পবিত্র হোমাগ্নির মতো যেন জ্বলতে লাগল একটি অদৃশ্য শিখায়।

পরের দিন ব্যানার্জ্জীও এসে পৌছলেন। আধারকারের বসন্ত আসল নয়, চিকেন। কিন্তু রোগমুক্ত হতেই সুনন্দা জোর করে নিয়ে গেলেন লাহোরে এবং পক্ষাধিক কাল পূর্ব্বে আধারকার ছাড়া পেলেন না বেড়াতে ফিরতে।

সেদিনের সুনন্দার দৃষ্টি ছিল না বাইরে, গ্রাহ্য ছিল না লোকাপবাদের, মন ছিল ইতরজনের নিন্দা-প্রশংসার অতীত। সংসারে ছিল না আসক্তি, গৃহকর্ম্মে ছিল না আকর্ষণ, স্বামীতে ছিল না মনোযোগ। কত দিন আধারকার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সুনন্দাকে, "এই, ব্যানার্জ্জী এসেছে আপিস থেকে। যাও, দেখগে তার কী চাই।" সুনন্দা বলেছে, "আচ্ছা, হয়েছে, হয়েছে। তোমাকে আর গিন্নীপনা শেখাতে হবে না, তুমি ব্যানার্জ্জীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কি না?" সেদিনের সুনন্দা কারো স্ত্রী নয়, গৃহিণী নয়, সে শুধু প্রণয়িনী। নহে মাতা, নহে কন্যা, নহে বধূ। সে তো সুনন্দা ব্যানার্জ্জী নয়,—সে সুনন্দা প্রিয়দর্শিনী।

সুনন্দারা হিন্দু নয়, খৃষ্টান। বহুবর্ষ পূর্ব্বে তার পিতামহ এসে স্থায়ী আবাস গড়েছিলেন লাহোরে। সুনন্দা মানুষ হয়েছেন ইউরোপীয় আবেষ্টনে, বিদ্যাভ্যাস করেছেন শ্বেতাঙ্গদের কনভেন্টে, পরিণীতা হয়েছেন খৃষ্টীয় প্রথায়। তাঁদের সমাজে তরুণীরা অবগুণ্ঠনবতী নয়, স্ত্রীরা নন অন্তঃপুরিকা। পুরুষের অবাধ সাহচর্য্য সেখানে নিন্দনীয় নয়, বাইরে বন্ধু-সঙ্গ নয় নিষিদ্ধ। এমন কি বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং পুনর্বিবাহেও সামাজিক অন্তরায় ছিল না সুনন্দার।

কঠোর তিক্ত সত্য হৃদয়ঙ্গম করলেন আধারকার। মোহভঙ্গ হয়েছে সুনন্দার। সুধার পাত্র হয়েছে রিক্ত। মন্থন করলে আর উঠবে না মধু, উঠবে হলাহল।

সেদিন অপরাহ্ণে বাড়ী ফিরবার উৎসাহ ছিল না আধারকারের। টেলীফোন করে জানিয়ে দিলেন ফিরতে বিলম্ব হবে তার। বহুক্ষণ লক্ষ্যহীন ভাবে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে অবশেষে উপস্থিত হলেন ম্যালের পাশে সিনেমা হলের সম্মুখে। কী যেন কী খেয়াল হলো, টিকিট কিনে প্রবেশ করলেন ভিতরে। ছবি তখন শুরু হয়ে গেছে। অন্ধকার ঘরে টিকিটচেকার বসিয়ে দিয়ে গেল একটি আসনে। নির্ব্বাক্ চিত্র। কিড়্‌কিড়্ শব্দে প্রজেক্টারের আওয়াজ শোনা যায় স্পষ্ট। দর্শকদের আলাপ আলোচনা মন্তব্যেরও বাধা থাকে না।

হঠাৎ নিজের নাম কানে আসতে চমকে উঠলেন আধারকার। সামনের সারিতে কারা বসেছেন অন্ধকারে তা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর নয়, কিন্তু তাঁরা যে পুরুষ নন সে বিষয়েও সন্দেহ থাকে না। আধারকার উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন।

"যাই বলিস ভাই, এডমায়ারের সংখ্যা আর বাড়াসনে। আধারকার বেচারা তো মরেছে তোর হাতে, আর কেন"—চাপা কণ্ঠে বললেন একটি মহিলা।

উত্তর হলো, "হ্যাঁ, বলেছে এসে তোর কানে কানে।"

আধারকার আসন থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন মাটিতে। ভুল করার সাধ্য কি ও কণ্ঠ! এ কণ্ঠ যে তার জীবন-ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে অচ্ছেদ্য বন্ধনে। প্রথম শুনেছিলেন তিন বছর পূর্ব্বে দাদড় ষ্টেশানে।

সখীদ্বয়ের পরিহাস পরিবাদ চলতে লাগল মৃদু কণ্ঠে, কিন্তু আধারকারের শ্রুতির অগোচর রইল না এক বর্ণও।

প্রশ্নকর্ত্রী বললেন, "কানে কানে বলতে হবে কেন? আমাদের কি চোখ নেই? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আর কোন আশা নেই লোকটার।"

"ইস্, বড় যে দরদ দেখছি। ওগো করুণাময়ী, তবে তুমিই ত্রাণ কর না কেন তাকে।"

"বলিস্ কি? সইতে পারবি? তা'হলে যে তোর মুখচন্দ্রমা অমাবস্যার অন্ধকারে ছেয়ে যাবে, বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটবে আমার।"

"একটুও না। দিব্যি করে বলছি, আমার তাতে কী আসে যায়? বরং ছাড়া পেলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।" কণ্ঠ পরিহাস-তরল নয় এবার।

প্রশ্নকর্ত্রী নিজেও বোধ হয় কিছুটা বিস্মিত হলেন। কৌতুক পরিহার করে বললেন, "কেন ভাই, আধারকারকে তো বেশ ভালো লোকই মনে হয়। ভদ্র, শিক্ষিত, অথচ স্নব নয়,—বেশ সিম্পল।"

"সিম্পল্ নয়, বল্ সিম্পলটন্। কাণ্ডজ্ঞান নেই একটুকু। সব জিনিষই অত্যন্ত সিরিয়স ভাবে নেবে। কবে কখন্ fun করে কি বলেছি, কি করেছি, সেটাকেই মনে করে বসেছে, আমি ওর প্রেমে পড়েছি। ইডিয়ট! সত্যি বলছি তোকে, আমি ক্রমশঃ যেন টায়ার্ড হয়ে উঠছি।"

হঠাৎ ছবির স্পুল ছিঁড়ে গিয়ে ছবি হলো বন্ধ, আলো জ্বলে উঠলো প্রেক্ষাগৃহের। সে আলোতে দেখা গেল আলাপ আলোচনারতা বান্ধবীদ্বয়কে অদূরবর্ত্তী আসনে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে জোড়া দেওয়া ফিল্ম আবার শুরু হলো, অডিটরিয়ামের বাতি দেওয়া হল নিবিয়ে। পুনরায় চিত্র প্রদর্শন শুরু হলো।

ছবির আখ্যান-ভাগ এক তরুণী শ্রেষ্ঠিকন্যার প্রণয়-কাহিনী। তাঁর দরিদ্র প্রেমাস্পদ চলে যাচ্ছেন দূরদেশে জীবিকার প্রয়োজনে। সন্ধ্যা বেলায় পরিজনের অলক্ষিতে উদ্যান-বাটিকায় তরুণী সাক্ষাৎ করলেন তাঁর সঙ্গে। পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে সঙ্গিনী হতে চাইলেন দয়িতের। কিন্তু তরুণ চায় না ধনি-কন্যাকে দারিদ্র্যের মধ্যে টেনে

জানতে। বলে, আমাকে ভুলে যেও। মনে করো,—এক সন্ধ্যায় অপ্রত্যাশিতরূপে দু'জনে দেখা হয়েছিল পথপার্শ্বের এক পান্থশালায়, রাত্রি প্রভাতে যাত্রীরা চলে গেছে নিজ নিজ বিভিন্ন পথে। আর দেখা হবে না কোনো দিন।

শ্রেষ্ঠিকন্যার প্রেম গভীর। ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্ন তাঁর কাছে তুচ্ছ, দৃষ্টি নেই মণি, মুক্তা, বিলাসোপকরণ বা ঐশ্বর্য্য-সম্ভারে। যাঁকে প্রাণ সমর্পণ করেছেন, তাঁর বিহনে প্রাণ ধারণ করবেন কেমন করে? হে নিষ্ঠুর, যদি ফেলে চলে যাও এই অভাগিনীকে, পায়ে দলে যাও কোমল হৃদয়, তবে জেনো মৃত্যু তাঁর অবধারিত!

দর্শকগণ রুদ্ধশ্বাস-প্রতীক্ষায় সম্মুখের পর্দায় নিবদ্ধ-দৃষ্টি। প্রণয়ব্যাকুলা রমণীর এই আত্মসমর্পণে কী করবে তরুণ নায়ক? নায়িকার প্রচুর পাউডার-প্রলিপ্ত গণ্ডদেশে ঠাস্ করে একটি সবল চপেটাঘাত করলে আধারকার সব চেয়ে খুসী হতেন। কিন্তু তা' কেমন করে হবে? ছবিতে দেখা গেল, আকাশে উঠেছে পূর্ণিমার চাঁদ, মাধবীলতায় ফুটেছে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল, পরস্পরের চঞ্চুতাড়না দ্বারা প্রণয় নিবেদন করছে তরু-শাখে উপবিষ্ট ক্রৌঞ্চ মিথুন এবং উদ্যানের সরোবরে দু'টি প্রস্ফুটিত পদ্ম হঠাৎ দু'দিক থেকে ভাসতে ভাসতে এসে মিলল একসঙ্গে। ছায়াচিত্রের এই চিরপরিচিত পারিপার্শ্বিকে যা' করা স্বাভাবিক, তাই করল তরুণ। বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করল নায়িকাকে। দু'জনে হাত ধরা-ধরি করে রওনা হলো। কোথায় তা অবশ্য একমাত্র নাট্যকার ছাড়া আর কেউ জানে না। দর্শকবৃন্দের সঘন করতালি-ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল প্রেক্ষাগার। শেষ হলো নাটিকার।

সকলের অলক্ষিতে আধারকার নিষ্ক্রান্ত হলেন প্রেক্ষাগৃহ থেকে। মনে মনে বললেন, একমাত্র নাটকের মধ্যেই সম্ভব এই অবাস্তব কাহিনীর অবতারণা। সেখানে তো সত্যিকার রক্ত-মাংসের মানুষের মুখোমুখি হওয়ার দায় নেই। তাই তার কল্পিত নায়িকার পক্ষে কোনো অসম্ভব আচরণ বা কোনো অস্বাভাবিক উক্তি করতেই বাধা নেই। তা' শুনে আমরা বিমুগ্ধ, দর্শকেরাও 'এঙ্কোর' 'এঙ্কোর' বলে চেঁচিয়ে উঠি। আমরা তো জানিনে, শ্রেষ্ঠিকন্যার যে প্রণয় নিবেদন দৃশ্য দেখে আমাদের চক্ষু অশ্রু-সজল হয়ে ওঠে, তার ষোল আনাই ষ্টেজ-ম্যানেজড, ষোল আনাই ফান্। সমস্তই ফাঁকি। হতভাগ্য নায়ক সে তথ্য জানতে পারে দু'দিন পরে। কিন্তু সে তো দর্শকের দেখার উপায় নেই। রচিত কাব্যের বহির্দেশে, অভিনীত নাটকের নেপথ্যে সে থাকে চিরকাল লোক-লোচনের অন্তরালে। নাটকের যেখানে শেষ, জীবনের সেখানেই তো সুরু!

সেই রাত্রেই লাহোর পরিত্যাগ করলেন আধারকার।

রাত বারোটায় ট্রেন। খোয়া-বাঁধানো পথের উপর দিয়ে মন্থর গতিতে চলেছে টাঙ্গা। এ পথে কতবার আসা-যাওয়া করেছেন আধারকার। কিন্তু আজকের এই যাত্রা তো অন্য আর বারের মতো নয়। তখন যাওয়ার মধ্যে থাকতো অদূরবর্তী পুনরাগমনের আশ্বাস, থাকতো পুনর্মিলনের সতৃষ্ণ প্রতীক্ষা। আজ সে আশা রইলো না একটুকুও। যে গৃহদ্বার এইমাত্র অতিক্রম করলেন, যে পথ রাখলেন পশ্চাতে, কদাচ তা' পুনশ্চরণের আর সম্ভাবনা রইল না।

যুদ্ধ-ক্ষেত্রে দেখা যায়, বোমার আঘাতে আহতের একটি বাহু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে অদূরে, অথচ তার সংজ্ঞা হয়নি বিলুপ্ত। এ্যাম্বুলেন্স-বাহিত সে আহত স্পষ্ট দেখতে পায় ফেলে রেখে যাচ্ছে সে আপন খণ্ডিত বাহু। আধারকার অনুভব করলেন সেই অনুভূতি। আপন চক্ষে দেখতে পেলেন পশ্চাতে ফেলে রেখে যাচ্ছেন,—বাহু নয়, শতধাবিদীর্ণ হৃদয়।

ফানুই বটে। স্নেহ নয়, প্রীতি নয়, শোভা-গন্ধ-বিমণ্ডিত প্রেমের বাষ্প মাত্র নয়, শুধু কৌতুক। নিষ্ফল প্রণয়েরও উপশম আছে করুণায়; কিন্তু উপহসিতের নেই সান্ত্বনা। তার লজ্জা দুঃসহ।

এই হৃদয়হীন নারীর ছলনাকেই সত্য কল্পনা করে একদিন বিভ্রান্ত হয়েছিলেন আধারকার এ কথা ভেবে নিজের উপরেই গভীর বিতৃষ্ণা জন্মাল তাঁর। কত দিন প্রমত্ত প্রগল্‌ভতায় হৃদয়ের কত দুর্ব্বলতা ব্যক্ত করেছেন তাঁর কাছে, কত স্বপ্ন গড়েছেন তাঁকে কেন্দ্র করে সে-সব স্মরণ করে বারম্বার নিজকে ধিক্কার দিলেন।

গভীর বেদনা ও অপরিসীম লজ্জা নিয়ে আধারকার ফিরে চললেন স্বস্থানে। অনন্ত আকাশে লক্ষ কোটি যোজন দূরের যে অগণিত তারকাশ্রেণী অনিমেষ নয়নে এই বিপুলা ধরিত্রীর পানে তাকিয়ে আছে তারা সাক্ষী রইলো, আর একটি সকরুণ কাহিনীর। যুগ-যুগান্ত ধরে এমন কত শত অশ্রুসজল বেদনাবিধুর নাট্য অভিনীত হয়েছে তাদের পলকহীন নয়নের অকম্পিত দৃষ্টির সম্মুখে। কত খেলা গেছে ভেঙে, কত ফুল ঝরেছে ধুলায়, কত বাঁশরী হয়েছে নীরব।

এই স্বল্প-পরিসর জীবনের প্রায় সমুদয় অংশ আধারকার কাটিয়েছেন একা। এই তো সেদিন পর্য্যন্ত চাকর-বেয়ারা মাত্র সম্বল ফ্ল্যাটে আপনাকে নিয়ে আপনি ছিলেন মগ্ন। আজও আবার সেই নিঃসঙ্গ একাকিত্বের মধ্যেই প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। অথচ এ দু'য়ের মধ্যে কী অপরিসীম প্রভেদ। আকাশ আজ নিঃশেষে শূন্য, বাতাস আজ নিরর্থক, এই জনাকীর্ণ পৃথিবীর সমাজ ও সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম বিস্বাদ ও ক্লান্তিকর।

নিজের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখলেন আধারকার। একটা বিরাট মরুভূমির মতো সর্ব্বত্র ঊষর। কোনখানে নেই একটু ছায়া, একটু শ্যামলিমা, একটু আলোক-আঁধার-বিজড়িত স্নিগ্ধতার চিহ্ন-লেশ।

আধারকার মূর্খই বটে। কাঁচকে ভেবেছিলেন হীরা, সদ্য টাঁকশাল থেকে নির্গত তাম্রখণ্ডকে ভ্রম করেছিলেন গিনি বলে। গান্ধীজীর একটি লেখা চোখে পড়ল একদিন, আধুনিকাদের সম্পর্কে। তারা না কি প্রত্যেকেই নিজকে ভাবে এক একটি জুলিয়েট,—একসঙ্গে আধ ডজন 'রোমিও'র প্রণয়িনী! আধারকারের মনে হয়, বুঝি এত দিনে বুঝলেন অর্থ। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারেন না। পরক্ষণেই আবার সংশয় জাগে মনে। একাধিক 'রোমিও'র এর জন্য কি দুর্য্যোগের রাত্রিতে উৎকণ্ঠায় বিনিদ্র রজনী যাপন করা যায়? সম্ভব হয় তাদের অসুখের সংবাদে স্বামী, সংসার ফেলে একাকী এক হাজার মাইল ছুটে যাওয়া?

বোম্বেতে ফিরে মাস কয়েক বিপুল উদ্যমে চেষ্টা করলেন আপনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করতে কর্ম্মের মধ্যে। মিলের কাজে খাটতে লাগলেন সকাল থেকে সন্ধ্যা। ভুলতে প্রয়াস করলেন বিগত তিন বৎসরের স্বল্পায়ু স্বপ্নলোক। করতে চাইলেন নতুন করে জীবনারম্ভ। কিন্তু মন তো শিশুদের আঁক কষার শ্লেট নয় যে ইচ্ছা-মতো পেন্সিলের আঁচড় মুছে নতুন করে সংখ্যাপাত করা যাবে। নিজের সঙ্গে দিনের

পর দিন অবিরাম যুদ্ধ করে ক্ষতবিক্ষত হলেন আধারকার। তার পর জলের দামে একদিন মিল দিলেন বিক্রী করে। অন্তর্হিত হলেন বোম্বে থেকে।

গেলেন মালয়, রবারের বাগানে হলেন ম্যানেজার। ভালো লাগলো না বেশী দিন। গেলেন সিলোন, কফি কোম্পানীর কর্ত্তা-রূপে; টিঁকতে পারলেন না দু'বছর। বুয়েনস এয়ার্সে কাজ করলেন মদের কারখানায়; সেখানে বিরক্তি ধরলো পাঁচ বছর না পুরতে। পরিব্রাজক হয়ে দীর্ঘকাল পরিক্রমণ করলেন দেশ-দেশান্তর। নানকিং, ক্যানবারা, টরেন্টো, ওয়াশিংটন, লীপজীগ, ব্রাসেলস। তবু ভুলিল না চিত্ত।

নিউ ক্যাসেলের এক সাহেব কোম্পানী থেকে এককালে নিজের মিলের জন্য আধারকার কিনেছিলেন কিছু সাজ-সরঞ্জাম। তাদের ভারতীয় শাখায় ম্যানেজাররূপে অবশেষে আধারকার আসলেন দিল্লীতে। আছেন আজ এগারো বছর। যে মিল তিনি বিক্রী করে দিয়েছেন কুড়ি বছর আগে, তার ম্যানেজিং ডিরেক্টার আজ কোটিপতি। সেখানে এক ডজন কর্ম্মচারী আছে যারা এখন আধারকারের চাইতে বেশী মাইনে পায়।

বছরের পর বছর হয়েছে গত। জীবনের আজ অপরাহ্ণ বেলায় এসে পৌঁছেছেন আধারকার। দেহে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে বার্দ্ধক্যের আক্রমণ আভাস। হৃদয়াবেগের যে তীব্রতা যৌবনের লক্ষণ, আজ তা স্তিমিততেজ।

যে-সুনন্দাকে আধারকার ভালোবেসেছিলেন সে তো শুধু ঐ রক্তে-মাংসের মানুষটি নয়। প্রেম আপন গভীরতায় নিজের মধ্যেই একটি মোহাবেশ রচনা করে। সেই মোহের দ্বারা যাকে ভালোবাসি তাকে আমরা নিজের মনে মনে মনোমতো করে গঠন করি। যে সৌন্দর্য্য তার নেই, সে সৌন্দর্য্য তাতে আরোপ করি। যে গুণ তার অভাব, সে গুণ তার কল্পনা করি। সে তো শুধু বিধাতার সৃষ্ট একটি পুরুষ বা নারীমাত্র নয়, সে আমাদের নিজ মানসোদ্ভূত এক নতুন সৃষ্টি। তাই কুরূপা নারীর জন্য রূপবান, বিত্তবান পুরুষেরা যখন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে, অপর লোকেরা অবাক্ হয়ে ভাবে, "আছে কী ঐ মেয়েতে, কী দেখে ভুলল?" যা' আছে সে তো ঐ মেয়েতে নয়, যে ভুলেছে তার বিমুগ্ধ মনের সৃজনধর্ম্মী কল্পনায়। আছে তাঁর প্রণয়াঞ্জনলিপ্ত নয়নের দৃষ্টিতে। সে তো আপন মনের মাধুরী মিশায়ে করেছে তাহারে রচনা।

আধারকারের দৃষ্টি থেকে সে-অঞ্জন আজ বিলুপ্ত, মন থেকে সে-মোহাবেশ অপসৃত। একদিন জগতের সমস্ত কবিকুলের কল্পলোক থেকে আহৃত যে-সৌন্দর্য্য, যে-সুষমা, যে-বর্ণসম্ভার দ্বারা সুনন্দাকে তিনি রচনা করেছিলেন তিলে তিলে, আজ তার লেশমাত্র নেই। প্রবঞ্চিত আধারকারের কাছে সুনন্দা আজ এক জন অতি সামান্য রমণী মাত্র। কোনখানে তার আর লেশমাত্র অনির্ব্বচনীয়তা বা বিশেষত্ব অবশিষ্ট নেই।

আধারকারের কাহিনী শেষ হলো। বাক্যহীন নিস্তব্ধতায় বসে রইলেন খানিকক্ষণ।

"হুজুর টাঙ্গা ল্যানে পড়েগা?" চমকে চেয়ে দেখি আধারকারের ভৃত্য। কখন আধারকার উঠে চলে গেছেন নিঃশব্দে টের পাইনি একটুকুও। আপন জীবনের নিগূঢ় গোপন কাহিনী ব্যক্ত করেছেন আজ এক অতি অল্প দিনের পরিচিত অসমবয়সী বন্ধুর কাছে। যখন বলে গেছেন, তখন অবগাহন করেছেন স্মৃতির গহনে। কাহিনী সাঙ্গ হতে সেই মোহাবেষ্টন ছিন্ন হয়েছে, নেমে এসেছেন বাস্তবের প্রত্যক্ষ ভূমিতে। সঙ্কোচ দেখা দিয়েছে সেই মুহূর্ত্তে। তাই অদৃশ্য হয়েছেন নিঃশব্দে। সুতরাং বিদায় নেওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত হলেম। ভৃত্যকে টাঙ্গা আনতে করলেম বারণ। পদব্রজে নিষ্ক্রান্ত হলেম পথে।

শুক্লপক্ষের অষ্টমীর চাঁদ উঠেছে মেঘশূন্য আকাশে, তার জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে দু'পাশের বাংলোগুলির বিস্তীর্ণ অঙ্গনে। পথ জনশূন্য, ধ্বনিবিরল। কাছাকাছি কোথায় যেন হাসনুহানার ঝাড়ে ফুটেছে ফুল। তার তীব্র মদির সুবাসে বাতাস হয়েছে উতলা-আকুল, রজনী হয়েছে গন্ধ-বিহ্বল।

চলতে চলতে ভাবছিলেম আধারকারের কথা। কানে বাজতে লাগলো সকরুণ স্বীকারোক্তি—"মিনি সাহেব আমি ইডিয়টই বটে, পরিহাসকে মনে করেছি প্রেম; খেলাকে ভেবেছি সত্য। কিন্তু আমি তো একা নই। জগতে আমার মতো মূর্খেরাই তো জীবনকে করেছে বিচিত্র। সুখ-দুঃখ অনন্ত, মিশ্রিত। যুগে যুগে এই নির্ব্বোধ হতভাগ্যের দল ভুল করেছে, ভালোবেসেছে, তার পর সারা জীবনভোর কেঁদেছে। হৃদয় নিংড়ানো অশ্রুধারায় সংসারকে করেছে রসঘন, পৃথিবীকে করেছে লোভনীয়। এদের ভুল-ত্রুটি- বুদ্ধিহীনতা নিয়ে কবি রচনা করেছেন কাব্য, সাধক বেঁধেছেন গান, শিল্পী অঙ্কন করেছেন চিত্র, ভাস্কর পাষাণখণ্ডে উৎকীর্ণ করেছেন অপূর্ব্ব সুষমা। জগতে বুদ্ধিমানেরা করবে চাকরী, বিবাহ, ব্যাঙ্কে জমাবে টাকা, স্যাকরার দোকানে গড়াবে গয়না, স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, কন্যা নিয়ে নির্ব্বিঘ্ন জীবন যাপন করবে স্বচ্ছন্দ স্বচ্ছলতায়। তবুও আমরা মেধাহীনের দল এ কথা কোন দিন মানবো না যে, সংসারে যে বঞ্চনা করলো, হৃদয় নিয়ে করলো ব্যঙ্গ, দুধ বলে দিল পিটুলী,—তারই হলো জিত। আর ঠকলো কেবল সে, যে উপহাসের পরিবর্ত্তে দিল প্রেম।"

অতি দুর্ব্বল সান্ত্বনা। বুদ্ধি দিয়ে, কল্পনা দিয়ে, রবি ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করে বলা সহজ—'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা, ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা।' কিন্তু জীবন তো একটা রক্ত-মাংসের সম্পর্কহীন শুষ্ক তর্ক মাত্র নয়। শুধু কথা গেঁথে গেঁথে ছন্দ রচনা করা যায়, জীবনধারণ করা যায় না।

আধারকার হচ্ছেন সেই শ্রেণীর পুরুষ, যারা কিছুই হাতে রাখতে জানে না। এদের কপালে দুঃখ অনিবার্য্য। পলিটিক্সের মতো মানুষের জীবনও হচ্ছে এ্যাড্‌জাষ্টমেণ্ট আর কম্প্রমাইজ। এ দারুণ ইনফ্লেশানের বাজারেও সংসারে শুধু হৃদয়ের দাম খুব বেশী নয়।

সুনন্দার পক্ষে সম্ভব ছিল না আধারকারের গতিতে তাল রেখে চলা। সে নারী, প্রেম তার পক্ষে একটা ঘটনা মাত্র, আবিষ্কার নয়, যেমন পুরুষের কাছে। মেয়েরা স্বভাবতঃ সাবধানী, তাই প্রেমে প'ড়ে তারা ঘর বাঁধে। ছেলেরা স্বভাবতঃই বেপরোয়া, তাই প্রেমে পড়ে তারা ঘর ভাঙ্গে। প্রেম মেয়েদের পক্ষে জীবনের প্রয়োজন, সেটা আটপৌরে শাড়ীর মতো নিতান্তই সাধারণ। ছেলেদের পক্ষে প্রেম জীবনের বিস্তার, বেনারসী শাড়ীর মতো ঐশ্বর্য্যময়। কাব্য ক'রে বলা যায়, মেয়েদের প্রেম গ্রামের ক্ষুদ্র জলাশয়ের মতো তাতে

কাঁটা বন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তীক্ষ্ণ মোরা—বিষমোড়া
কণ্টকের এই পল্লীতে—
আলাপ করে কাঁটার ফুল আর—
নির্ভয়ে বন-মল্লীতে।
ময়না থাকে তরুর শিরে—
আমরা থাকি তাকেই ঘিরে,
কল্‌সী কাঁখে সাঁওতালীরা
কচিৎ আসে জল নিতে।

জলে পাণিফলের কাঁটা,
ডাঙ্গায় মোদের ছাউনিটা,
কণ্টকিত করতে পারি
আমরা চাঁদের চাউনিটা।
আরাম করে কেউটে থাকে,
কেউ করে না ত্যক্ত তাকে,
শশক-শিশু—ধরবে কেহ ?
এত সহজ পাওনি তা !

রসিক পথিক হেসেই বলে—
থাক্‌ বাঁধিয়া থাক গ্রহ
শজারুর ওই উপনিবেশ
ঢুক্‌তে নাহি আগ্রহ।
এখানেতে কাঁটার ভিড়ে
যায় ভ্রমরের পাখ্‌না ছিঁড়ে—
বন-বরাহ দূরেই থাকে,
ঘেঁষে নাকো ব্যাঘ্রও।

পাখীও গায় ফুলও ফোটে
জীবন মোদের মন্দ না।
ভীমরুল এবং ফড়িং থাকে
টুনটুনি ও চন্দনা।
তীরন্দাজের এই যে মাটী,
ভয় করে লোক ফেল্‌তে পাটি,
মোদের শুধু শরই আছে—
করতে গুরুর বন্দনা।

তরঙ্গোৎক্ষেপ নেই। পুরুষের প্রেম মহাসমুদ্র, তার উচ্ছ্বাস প্রচণ্ড, বেগ বিপুল, বিস্তার বিশাল। তাই প্রেমে প'ড়ে একমাত্র পুরুষেরাই করতে পারে দুরূহ ত্যাগ এবং দুঃসাধ্য সাধন।

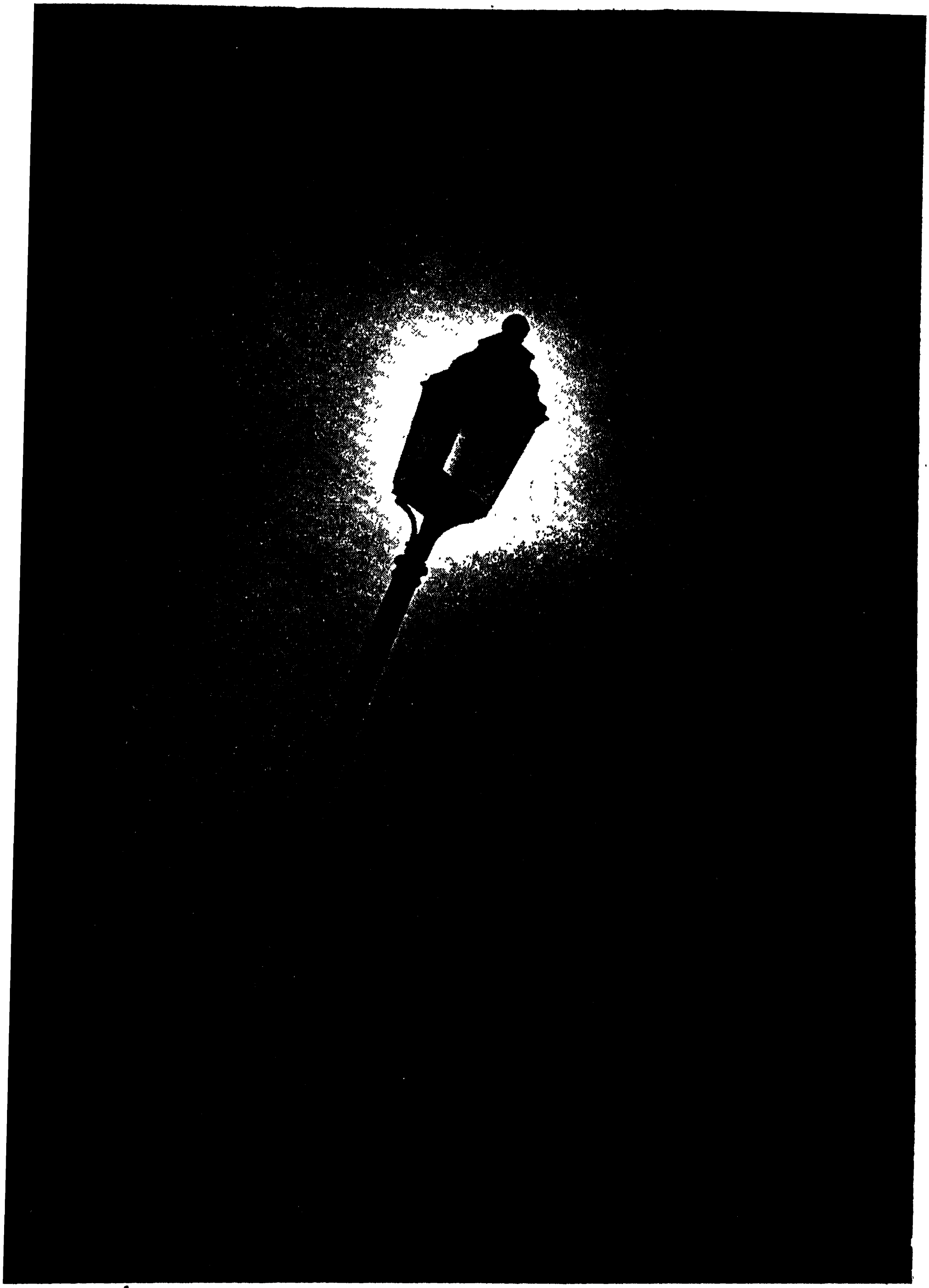
আধারকার নিজেই একদিন বলেছিলেন,—"মিনি সাহেব, জগতে যুগে যুগে কিং এডওয়ার্ডেরাই করেছে মিসেস সিম্পসনের জন্য রাজ্য বর্জ্জন, প্রিন্সেস এলিজাবেথরা করেনি কোন জন, স্মিথ বা ম্যাকেঞ্জির জন্য সামান্য ধনত্যাগ। বিবাহিতা নারীকে ভালোবেসে সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে আজীবন নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছে আধারকারের মতো একাধিক পুরুষ, পরের স্বামীর প্রেমে প'ড়ে কোনো দিন কোনো নারী রয়নি চিরকুমারী।"

কোমল হৃদয় বলে আমার খ্যাতি নেই। কিন্তু আধারকারের জন্য সত্যিকার বেদনা বোধ করলেম হৃদয়ে। সুনন্দা ব্যানার্জ্জী আজ কোথায় আছেন জানিনে। অনুমান করছি, এত দিনে তাঁর যৌবন হয়েছে গত, দেহ হয়েছে বিগতশ্রী; দৃষ্টি বিদ্যুৎহীন এবং কপোলের রেখাগুলি প্রচুর প্রসাধন-প্রলেপের দ্বারাও আজ আর কোনো মতেই গোপনসাধ্য নয়। কোনো দিন কোনো অবকাশ-মুহূর্ত্তে বহু বর্ষ আগেকার এক মারাঠী ব্রাহ্মণের চরম নির্ব্বুদ্ধিতার কথা স্মরণ করে ক্ষণেকের জন্যও তাঁর মন উন্মনা হয় কি না সে-কথা আজ আর জানার উপায় নেই। অথচ তাঁরই জন্য আধারকার দিলেন চরম মূল্য: নিজকে বঞ্চিত করলেন সাফল্য থেকে, খ্যাতি থেকে, ঐহিকের সর্ব্ববিধ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে। সব চেয়ে বড় কথা, বঞ্চিত করলেন নিজকে সম্ভবপর উত্তরপুরুষ থেকে, বংশের ধারাকে করলেন বিলুপ্ত।

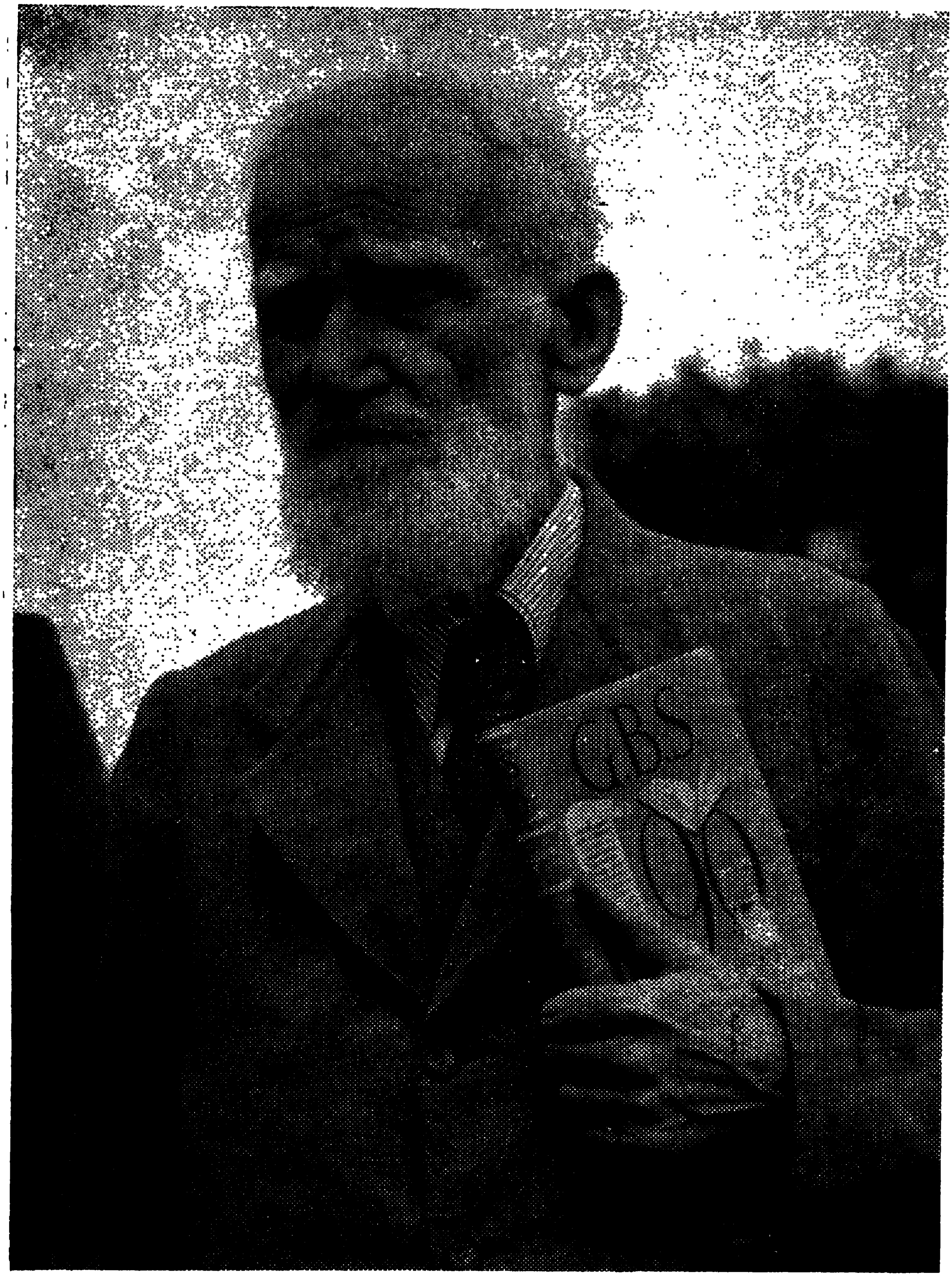
কোনো দিন সন্ধ্যা বেলায় তার কুশল কামনা করে তুলসীমঞ্চে কেউ জ্বালবে না দীপ, সীমন্তে ধরবে না তার কল্যাণ কামনায় সিন্দূর-চিহ্ন, প্রবাসে অদর্শন বেদনায় কোনো চিত্ত হবে না উদাস-উতল। রোগশয্যায় ললাটে ঘটবে না কারো উদ্বেগ-কাতর হস্তের সুখস্পর্শ, কোনো কপোল থেকে গড়িয়ে পড়বে না নয়নের উদ্বেলিত অশ্রুবিন্দু। সংসার থেকে যেদিন হবেন অপসৃত, কোনো পীড়িত হৃদয়ে বাজবে না এতটুকু ব্যথা, কোনো মনে রইবে না ক্ষীণতম স্মৃতি।

প্রেম জীবনকে দেয় ঐশ্বর্য্য, মৃত্যুকে দেয় মহিমা। কিন্তু প্রবঞ্চিতকে দেয় কী? তাকে দেয় দাহ। যে আগুন আলো দেয় না অথচ দহন করে, সেই দীপ্তিহীন অগ্নির নির্দ্দয় দাহনে পলে পলে দগ্ধ হলেন কাণ্ডজ্ঞানহীন হতভাগ্য চারুদত্ত আধারকার।

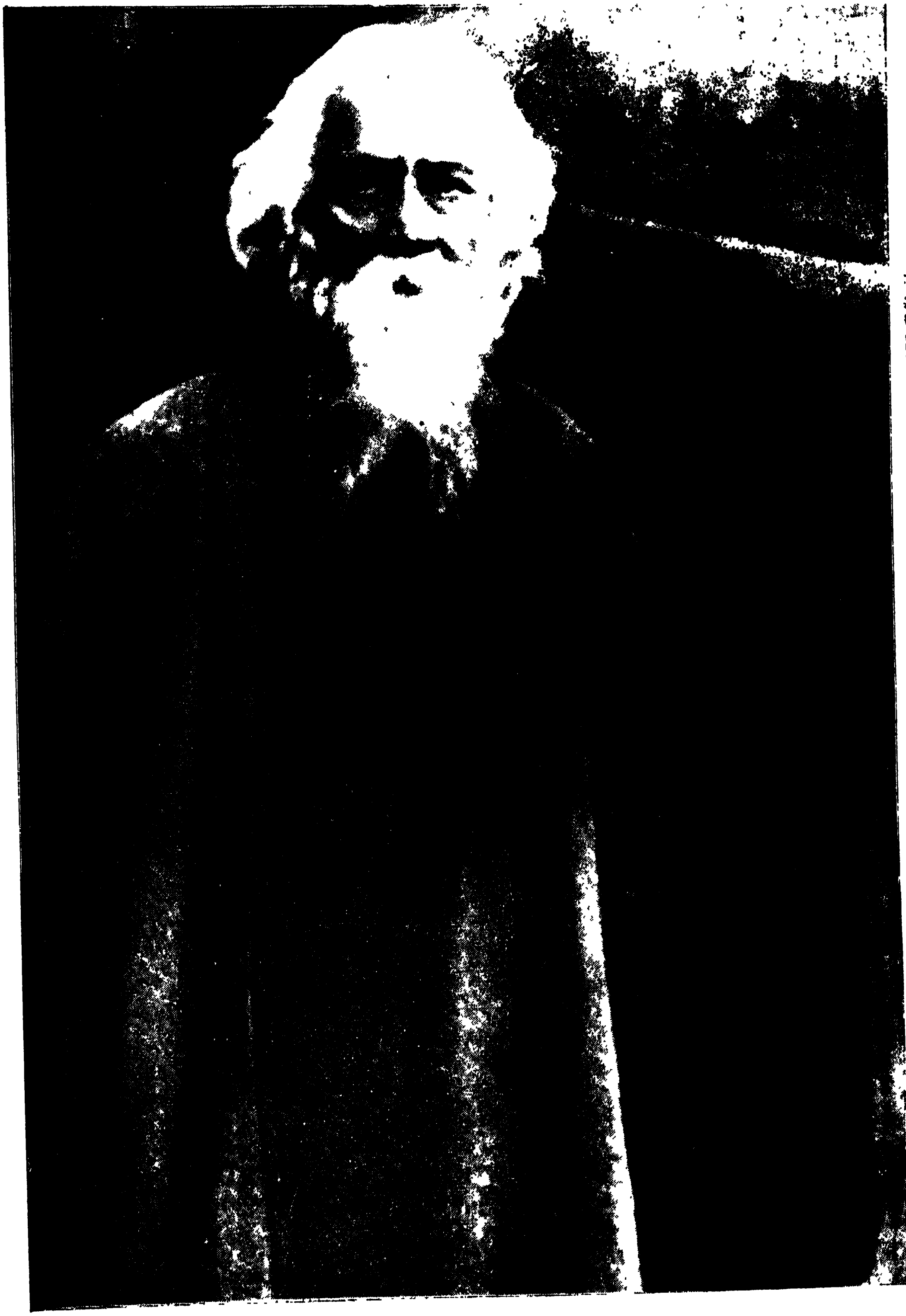
সমাপ্ত



আকাশ পিদ্দিম নয় —পাসোণ দাস



নব্বুই বছরের তরুণ



২২শে শ্রাবণে

প্রাণতোষ ঘটকের সৌজন্যে



(প্রথম পুরস্কার) দুর্ভিক্ষের ছায়া জয়ন্তকুমার চৌধুরী



(দ্বিতীয় পুরস্কার) পুণ্য-বাহিনী নয়, পণ্য-বাহিনী ! প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়



খুশির ফসল
(তৃতীয় পুরস্কার)

রামকিঙ্কর সিংহ

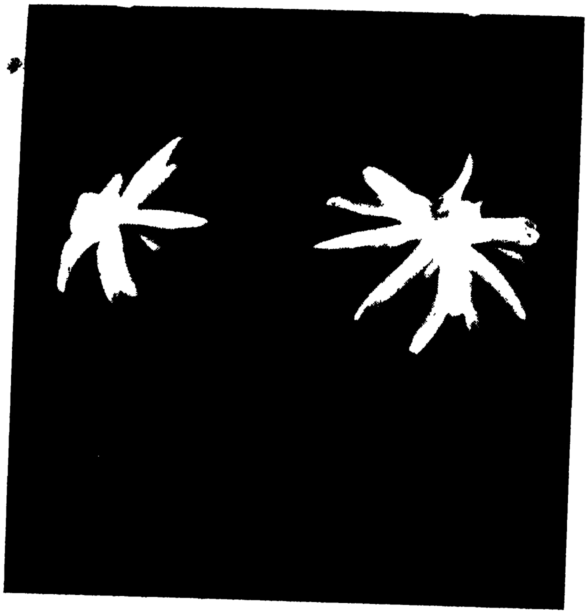
নিয়মাবলী

প্রত্যেক মাসে এই বিভাগটিতে একমাত্র সৌখীন (এ্যামেচার) আলোকচিত্র-শিল্পীদেরই ছবি গৃহীত হইবে।

ছবির আকার ৬" × ৮" ইঞ্চি হইলেই আমাদের সুবিধা হয় এবং যত দূর সম্ভব ছবি সম্বন্ধে বিবরণ থাকাও বাঞ্ছনীয়। যথা, ক্যামেরা, ফিল্ম, এক্সপোজার, এ্যাপারচার, সময় ইত্যাদি।

যে কোন বিষয়ের ছবি লওয়া হইবে। অমনোনীত ছবি ফেরৎ লওয়ার জন্য উপযুক্ত ডাক-টিকিট সঙ্গে দেওয়া চাই। ছবি হারাইলে বা নষ্ট হইলে আমাদের দায়ী করা চলিবে না, সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। খামের উপর "আলোক-চিত্র" বিভাগের এবং ছবির পিছনে নাম ও ঠিকানার উল্লেখ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

প্রথম পুরস্কার দশ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার আট টাকা, তৃতীয় পুরস্কার পাঁচ টাকা এবং অন্যান্য বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হইবে।



যুঁই-দম্পতি ভারতী চৌধুরী

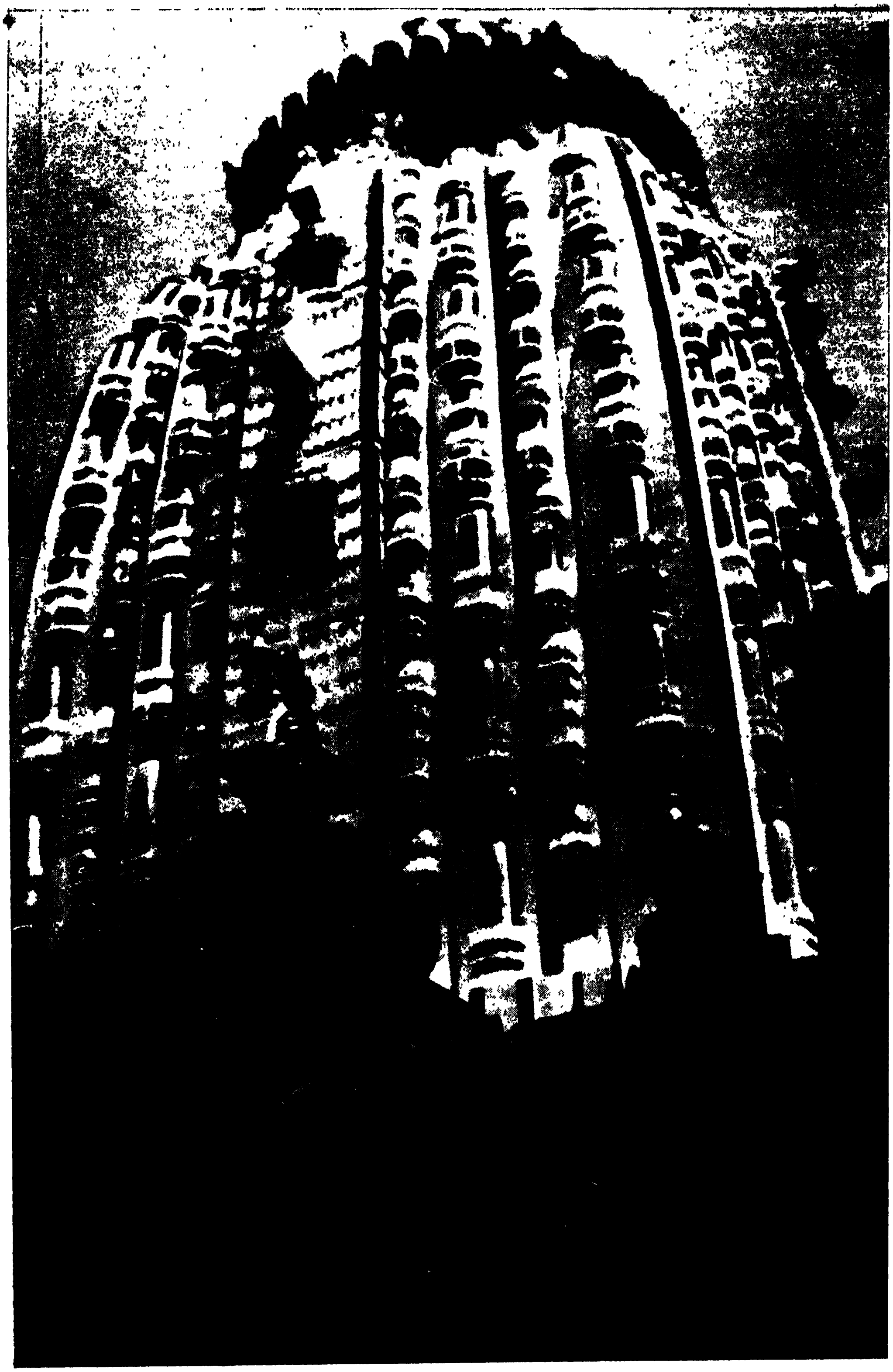


কুসুমে কীট মনোবীণা রায়



বিম

"যে প্রেম সম্মুখ পানে—"



রূপায়িত পাষাণ

গৌরাঙ্গ মুখোপাধ্যায়

কৌপীন থেকে কৃপাণ

"সহকর্মী"

বিদায় তাদের নিতেই হয়েছিল। যুব-বিপ্লবীদের কথা বলছি। দেশবন্ধু তাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের থামিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর বর্ত্তমানেই পরিচালক-যুবনেতাদের তাদের নাগালের বাইরের কারা-পিঞ্জরে যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হ'ল, তখন বিপ্লবের দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবে এসে পড়ল বাংলার ১৬ থেকে ৩০-দের উপর। তারা ত আর বসে থাকতে পারে না। ইংরেজ কিন্তু তাদেরও রেহাই দেয়নি। তার পর দেশবন্ধুর যখন তিরোধান হ'ল, যখন বাংলার কর্ম্মপাগল ছেলেদের নয়া কংগ্রেসের আপাতরম্য কর্ম্ম-তালিকা তুষ্ট করতে পারল না, তখন একটা যেমন প্রতিক্রিয়া এল, তেমনি সে প্রতিক্রিয়ায় ইন্ধন যোগাতে লাগলেন বিপ্লবী দলেরই কয়েক জন তথাকথিত নামজাদা নেতা। '২১-২২এ ভারতব্যাপী যে ঐক্য দেশে গড়ে উঠেছিল, বৈপ্লবিক মনোভাব না থাকবার জন্য, গান্ধীজীর 'হিমালয়ান ব্লাণ্ডার'গুলোর কৃপায় সে ঐক্য রাষ্ট্রবিপ্লবের সহায়ক হতে পারেনি।

এ দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়েছে ইংরেজ। '২৪ থেকে '২৬ সাল পর্য্যন্ত মুসলমানদের উত্তেজিত করে দেখান হয়েছে যে, অমুসলমান ভারতকে তারা ছুরি মেরে শায়েস্তা করবেই, ইংরেজ মুনিবদের নিয়োগ ও নিমকের মান রক্ষা করবে,—আর সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের মর্য্যাদা ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লাজপত, মদনমোহন প্রভৃতি বিশিষ্ট নেতারা কংগ্রেস ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে জাতীয়তা ছেড়ে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক দল গড়ে তুলবে। এমন কি বিপ্লববাদ যারা এ দেশে প্রবর্ত্তন করলেন তাঁরা স্বাধীনতা বলতে হিন্দু-স্বাধীনতারই কল্পনা ক'রে এ সময় স্বামী বিবেকানন্দের 'Islamic Vedantism' প্রচার ক'রে বলতে লাগলেন—"মুসলমান সমাজ শুধু গায়ের জোরে ভারতবর্ষে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে নাই। মুসলমানদিগের মধ্যে যে একপ্রাণতা আছে, তাহা যত দিন না হিন্দু সমাজের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, হিন্দু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড-সমাজগুলি মিশিয়া যত দিন না একটা বিরাট প্রাণবন্ত সমাজে পরিণত হয়, তত দিন হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষা করিবার সামর্থ্য গজাইবে না। রাজনীতি চর্চ্চার যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাহাও সফল হইবে না। যে পরাধীন সমাজের আত্মরক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই, সেখানে রকম-বেরকমের রাজনৈতিক প্রোগ্রাম লইয়া খেলা বা আত্ম-প্রবঞ্চনা চলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে দেশের স্বাধীনতা লাভ হয় না।...যে সমাজ আপনাকে বিদেশীয় সমাজের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে না, তাহার পক্ষে আত্মরক্ষা করিবার শক্তি সঞ্চয়ই একমাত্র রাজনীতি। বাকি সবই ছেলে খেলা।"

অর্থাৎ চার বছর ধরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মুসলমানের ছুরিতে ক্ষত-বিক্ষত স্বজাতিদের দিকে চেয়ে এ সব বিপ্লবী এবার সর্ব্বজনীন স্বাধীনতার কথা ছেড়ে দিয়ে হিন্দু সংগঠন বা হিন্দুর আত্মরক্ষার আন্দোলনে মাতলেন।

১৯২৬এর মে মাসে বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীতে সভাপতি বললেন—"দ্বিতীয় দল বলেন, ইংরাজকে বুঝাইয়া বলিয়া কোন লাভ নাই, উহারা ধর্ম্মের কাহিনী শুনিবে না, অতএব উহাদের কোন রকমে জব্দ কর। কিন্তু জব্দ করিবার ইচ্ছা থাকিলেই সামর্থ্য থাকে না। আর সামর্থ্য—যে নাই তাহা এত দিনের রাজনৈতিক আন্দোলনে বেশ প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা বিপ্লবপন্থী বলিয়া নিজেদের মনে করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা খাটে। তাঁহাদের শুধু আপাততঃ এই কথাই বলিব যে, বিপ্লব ঘটাইবার ইচ্ছা আর বিপ্লব ঘটাইবার সামর্থ্য এক জিনিষ নয়; আর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হত্যা বা ডাকাইতি করার নামও বিপ্লব নয়।"

একই দিনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ শাসমলও একই সুরে নৈতিক, মানসিক ও দৈহিক শক্তির সংগঠন দ্বারা বিপ্লবের কথা বললেন।—কিন্তু তৎকালীন বিপ্লবীদের সম্বন্ধে বীরেন্দ্রনাথ কদর্য্য মিথ্যা চিত্র এঁকে এক দিকে যেমন ইংরেজের কাছে বাহবা পেয়েছিলেন, অন্য দিকে তেমনি বিভিন্ন কারাপিঞ্জরে ও বাইরে বাংলার সর্ব্বত্যাগী বিপ্লবীরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। পুরোনো বিপ্লবী দের মনোভাব তখন কি দাঁড়িয়েছিল আর বিপ্লবপন্থা সম্বন্ধে কি রকমের অপপ্রচার করে নেতারা দুনিয়ার মুখ হাসাচ্ছিলেন তার পরিচয় শাসমলের কথায়—"দ্বিতীয়তঃ ভীতি প্রদর্শন বা বিপ্লবের ষড়যন্ত্রের নিকট আমরা কিছু আশা করিতে পারি কি না, তাহাও দেখাইতেছি। ইহার ভিত্তিও স্বাবলম্বনের উপর প্রতিষ্ঠিত বটে, কিন্তু ইহা নীতিবিরুদ্ধ ও কুফলপ্রদ। ইহার উপাসক যাহারা তাহাদের অধিকাংশই শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-নীতি ও চরিত্রে কাপুরুষ হইয়া যায়। ইহার মূলমন্ত্র—গোপনে কার্য্যসিদ্ধি করা বিধায়, ইহারা মিথ্যা কথা বলিতে অভ্যাস করে এবং সর্ব্বদাই ধরা না পড়িয়া পাশ কাটাইয়া দেশ উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হয়। ইহাদের সংখ্যা কোন দিন কোন দেশে মুষ্টিমেয়ের অধিক হয় নাই, এ দেশেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে বলিয়া আমি জানি না। সংখ্যায় কম হওয়ায় ইহাদের প্রবৃত্তি সদাসর্ব্বদা সহজ উপায় খুঁজিয়া না পাইলে কিম্বা নিজেদের আবিষ্কৃত কোনও সহজ উপায়ে বিফল-মনোরথ হইলে, ইহাদের অনেকে অল্প দিন পরে গৃহধর্ম্মে ফিরিয়া যায় এবং চুরি ডাকাতি ইত্যাদি সকল প্রকারের কদাচার অনুষ্ঠানে ইহারা সমাজকে পর্য্যন্ত কলুষিত করে। প্রকাশ্য পন্থায় নিশ্চিত মৃত্যুর যে নির্ভীকতা ও অমিত বিক্রম, তাহা গোপন পন্থার অনিশ্চিত মৃত্যুর স্বাভাবিক দুর্ব্বলতায় ইহারা এমন ভাবে নষ্ট করিয়া ফেলে যে, কিছু দিন পরে ইহারা ব্যক্তিগত ভাবে নাগরিক পদবাচ্যেরও উপযুক্ত থাকে না। ইহাদের স্বভাব ক্রমান্বয়ে এমনই হইয়া দাঁড়ায় যে, ইহারা যত বেশী দেশের কথা ভুলিতে থাকে এবং নিজের ভাবনায় ভাবিত হয়, তত বেশী ইহারা দেশের নেতৃবর্গের নিকট ইহাদের গোপন অজানিত ত্যাগের জন্য পুরস্কার প্রার্থনা করে এবং কোন নেতা বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যদি তাহাতে অসম্মত হয়েন, তবে তাঁহার নিকট ডাকযোগে পিস্তলের গুলী পাঠাইতে বা তাঁহার নামে সর্ব্বৈব মিথ্যা দুর্নাম রটাইতে ইহারা বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করে না। কোন উপায়ই অন্যায় নহে—যাহাদের আদর্শ, তাহাদের নিকট ইহার বেশী আশা করাই অন্যায়। ইহারা দেশ উদ্ধারের নামে নিজ সহোদরের বাড়ীতে যেমন ডাকাইতি করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তেমনি আবার ধরা পড়িলে অন্য এক সহোদরের বাড়ীতে পুনরায় ডাকাইতি করিয়া আপন পক্ষ সমর্থনের জন্য কৌঁশুলী নিযুক্ত করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ গবর্ণমেণ্টের মাস-মাহিনার গোয়েন্দাগিরি করে বা করিয়াছে বলিয়াও শুনিতে পাই—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

'২৪ সালে বাংলার বিপ্লবীদের প্রতি নির্য্যাতনের প্রতিবাদ করে সমগ্র ভারতে যে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়, '২৭ সালে বাংলা দেশেরই বিপ্লবী নামধেয় নাম-করা নেতারা সেই বিপ্লবীদের কদর্য্য চিত্র এঁকে জনসাধারণের মন কলুষিত করতে লজ্জাবোধ করেনি। অথচ বোধ হয় নিজেদের অপপ্রচারের সাধুতা প্রতিপন্ন করবার জন্য এরা—সোদর-প্রতিম সুভাষচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রচন্দ্রের জন্য মায়া-কান্না কেঁদেছিলেন।

সেদিন এ নিয়ে তুমুল কাণ্ড হয়েছিল। শাসমলকে এর পর আর কংগ্রেসে মাথা গলাতে হয়নি! বাংলা দেশ শাসমলকে ক্ষমা করতে পারেনি। শাসমল দাবী করেছিলেন—"যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, এখনি violence কথা উচিত, তাঁহাদের কংগ্রেসের কার্য্য-নির্ব্বাহক প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে একেবারে সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। যাঁহারা ইতিমধ্যে যে কারণে হোক মার্কামারা হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও এই সকল কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিবেন।"

এ সব নেতা তখনও কল্পনা করতে পারেনি যে—ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী, নরেন সেন, প্রফুল্ল গাঙ্গুলী, সুরেন ঘোষ, মদন ভৌমিক, জীবন চাটুজ্জে, জ্যোতিষ ঘোষ, বিপিন গাঙ্গুলী, যতীন রায়, রবী সেন, ভূপেন দত্ত, পূর্ণ দাশ, কিরণ মুখুজ্জে, সতীশ পাকড়াশী, প্রভাস লাহিড়ী, অরুণ গুহ, গণেশ ঘোষ, অতীন রায়, যদুগোপাল মুখুয্যে, সতীশ চক্রবর্ত্তী, ভূপতি মজুমদার, নরেন বাঁড়ুজ্জে, অশ্বিনী গাঙ্গুলী প্রভৃতি ছোট-বড় অসংখ্য বিপ্লবী যারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বাংলার দুই পুরুষ তরুণকে তৈরী করল, তাদের বাদ দিয়ে কোন জেলায় কোন রকমে কোন কাজ করা চলে না। এ সব তাঁরা জানতেন, তবু এদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে দেখলে মনে হয় কাদের যেন কৌশল-পরোক্ষ-প্রেরণায় মুগ্ধ হয়ে এরা বাংলার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ভেতর ও বাইরে থেকে পণ্ড করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন।

বাংলার প্রায় সব যুবনেতা যখন দূরে দূরে বন্ধন-নিপীড়ন সহ্য করছেন, তাঁদের তৈরী বাংলার তাঁদের সর্ব্ব প্রচেষ্টা পণ্ড করবার জন্য এক দিকে যেমন নয়কোবাদের হাটুরে আন্দোলন যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, অন্য দিকে তেমনি কার বা যেন ইঙ্গিতে পরিচালিত নেতৃপদ-বাচ্যরা জাতির যুব-জগন্নাথের বিষ্ণুপঞ্জর চূর্ণ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এতে অত্যন্ত দুঃখ পেয়ে সে-দিনে কৃষ্ণনগর সম্মিলনের বৈঠকে বলেছিলেন—"আজ এই মতভেদ ও বিবাদের ফলে আমাদেরই সামনে বাংলা এমন ভাবে ভেঙ্গে যাবে যে, তার সব যশ লুপ্ত হবে।" উত্তরে অতি-ভাবপ্রবণ পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী বলেছেন—"আমি শ্রীমতী নাইডুকে অভয় দিচ্ছি। আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও আমরা যেমন লর্ড মরলের গড়া জিনিষ ভাঙ্গতে পেরেছিলাম, তেমনই এই অস্থায়ী ভেদ সত্ত্বেও আবার আমরা এক হব।"

এক হতে দেরী হয়েছিল ঢের। দেশবন্ধুর হিন্দু-মুসলমান প্যাক্টের সুযোগে যেমন কংগ্রেস ভেঙ্গে হিন্দুসভা গড়েছিল, এই প্যাক্ট কৃষ্ণনগরে বাতিল হবার ফলে তেমনি মুসলমানরা কংগ্রেস বর্জ্জন করেছিল। স্বরাজ্য দলের স্বয়ম্ভু অছি—'বিগ ফাইভ' দলের স্রষ্টা বিপ্লবীদের সম্পর্ক ও প্রভাব-পূত হয়েও যেমন তার ভাঙ্গন রোধ করতে পারছিলেন না, তেমন সেই ভঙ্গুর দলের ছিদ্রপথে 'রেসপনসিভ কো-অপারেশনিষ্ট দল (যে দলের পরের রূপ ন্যাশানালিষ্ট পার্টি ও হিন্দু মহাসভা) অতি কৌশলে বাংলার অসাম্প্রদায়িক বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ বৈঠকী হিন্দু প্রচেষ্টায় পরিণত করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। দেশবন্ধু বেঁচে থাকতেই এদের লীলা আরম্ভ হয়েছিল। ফরিদপুর কনফারেন্সে এদেরই আঘাত পেয়ে চির আশাবাদী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন—'এবার মলেই বাঁচি!' রেসপনসিভ কো-অপারেশন দলের সহ-সম্পাদক সুরেশ ভট্টচাজ সে সময় কংগ্রেসে ঢুকেছিল কোন্ উদ্দেশ্যে, বাংলা কংগ্রেসে তারই কয়েক জন বন্ধু জয়াকর, কেলকার, মুঞ্জেরও সঙ্গে ভাব করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন কি জন্য, তা আজ অনুমান করা শক্ত নয়।

সাম্প্রদায়িক এবং অন্যবিধ ভেদ-ঝঞ্ঝার পর ১৯২৬ এপ্রিলের শেষ ভাগে ভারতে সর্ব্বত্র একটা মিলনের চেষ্টা হয়েছিল। সবরমতী সত্যাগ্রহ আশ্রমে স্বরাজ্য দল ও সুতো-কাটা দলে প্রেম হয়েছিল। গান্ধী-মালবীয় বিবৃতিতে রেসপনসিভ কো-অপারেশনের উপর ভিত্তি করে কাউন্সিল-প্রবেশ নীতি মেনে নেওয়া হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য গান্ধীজী বলেছিলেন—"আমি যদি সম্রাট হ'তাম"—সম্রাট হ'লে কি করতেন?—"হিন্দু ও মুসলমান বড় বড় নেতাদের ডাকিয়ে এনে তাদের কাছ থেকে খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের একটা ঘরে পুরতাম। যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদ নিষ্পত্তি হয়েছে বলে প্রকাশ না করত ততক্ষণ তাদের ছেড়ে দিতাম না। আরও কত কি করতাম—কিন্তু যখন সম্রাট হবার সুযোগ নেই তখন…"

বাংলার দেশপ্রিয় যতীন সেনগুপ্তের সঙ্গে বীরেন শাসমলের মিলন হয়েছিল! কিন্তু রেসপনসিভি দল যজ্ঞ-পণ্ড সমাপ্ত করেছে বলে মনে করে প্রাদেশিক হিন্দুসভা বাঁধল পীযুষকান্তি ঘোষের সঙ্গে। সে-দলে প্রকাশ্য যোগ দিলেন কংগ্রেসী মদন বর্ম্মন, ডাঃ যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত, বড়বাজারের পুরুষোত্তম রায়, জে এস ব্যানার্জ্জী—এই সব।

বাংলার পরিস্থিতি নখদন্তহীন হয়েছে মনে করে সরকার বিপ্লবীদের এক এক করে মুক্তি দিতে লাগলেন। কিন্তু কড়া বিপ্লবী যাঁরা—বিভিন্ন জিলার পরিচালক বিপ্লবী নেতা যাঁরা, তাঁরা তখনও নির্জ্জন পিঞ্জরে দুঃখ ভোগ করছেন। সুদূর ইনসিন ও মান্দালয়ে রাজবন্দী ও বন্দিরাজদের দুঃখের অন্ত নেই। সুভাষের ওজন ১৮৫ পাউণ্ড থেকে কমে ১৪৪। প্রতি মাসেই হ্রাস। কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতির ওষুধে কোন ফল হচ্ছে না। অত্যাচার চরমে দাঁড়াল। মান্দালয়ের বন্দীরা করল অনশন। তারা দেশকে জানাল—

"আমাদের কষ্টের সম্ভাবনায় বিচলিত হয়ে নেতৃবৃন্দ দেশ ও ভগবানের প্রতি তাঁদের কর্ত্তব্য পথ থেকে ভ্রষ্ট হতে চলেছেন। আমাদের অনশন ত্যাগের অনুরোধ করে তাঁরা ভুল করছেন। স্বাধীনতার জন্য কয়েকটি প্রাণীর প্রাণবলি যে স্বদেশের কল্যাণের জন্য আবশ্যক, সে কথা তাঁরা ভুলে গেছেন।…আমাদের কর্ত্তব্য পালনে যদি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হয়, আমরা প্রস্তুত। জগদীশ্বর আমাদের সহায় হৌন। বন্দে মাতরম্।"

সই করলেন—সুভাষচন্দ্র বসু, ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী, মদনমোহন ভৌমিক, সতীশ চক্রবর্ত্তী, জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, বিপিন গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

২৬শে নভেম্বর উত্তর-কলকাতায় পৌরজন সুভাষচন্দ্রকে বঙ্গীয়

ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত করে নেওয়ায় ভাবলেন এবার হয়ত তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে। কিন্তু ইংরেজ তাঁকে মুক্তি দিতে চাইল না। তাঁকে রেঙ্গুনে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারী পরীক্ষা করান হল। সরকারী ডাক্তার বলে,—মাত্র অজীর্ণ; সুভাষের ছোট দাদা বললেন,—টি-বি,—সুইজারল্যাণ্ড পাঠাবার ব্যবস্থা দিলেন। সরকার বললে—"It will be seen that at the moment Mr. Subhas Chandra Bose is not seriously ill and certainly not incapacitated." সুভাষ জেল থেকে জিজ্ঞেস করলেন—"…at what stage Government would regard me as either incapacitated or seriously ill? Is it when doctors will declare me as past cure and my death as a question of a few months or days?"

বাংলা সরকার চাইল '৩০ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত সুভাষ ভারতে ঢুকতে পাবে না। সুভাষ জানালেন—"I have not been able to persuade myself that a permanent exile from the land of my birth would be better than life in a jail leading to the sepulchre. I do not quail before this cheerless prospect…"

কিন্তু মান্দালয় জেলের রোগশয্যায় পড়ে সুভাষ কেঁদে কাটান নি। তিনি তৈরী হচ্ছিলেন। তাঁর গৌরতনু আবার বরণ করেছিল গৈরিক বহির্ব্বাস আর গৈরিক কৌপীন। সে মেতে গেছল যোগ-সাধনায়। ওতে না কি অসম্ভব সম্ভব হয়!

তবু রোগ বৃদ্ধি পায়। ১৯২৭, শ্রীযুত শরৎ বসু দার্জ্জিলিং থেকে তার পেলেন—"বাংলা সরকার সুভাষকে ছেড়ে দেবার হুকুম দিয়েছে। তার ভার নিন"। সে দিন রবিবার (১৫ই মে) আউটরাম ঘাট—লোকে লোকারণ্য। বর্ম্মা মেল-বোট 'আরোন্দা' মাঝ-নদীতে গিয়ে থামল। গবর্ণরের ষ্টীমলঞ্চ 'কুইন মেরী' তার গায়ে গিয়ে ভিড়ল। সিডান চেয়ারে গৈরিক সজ্জায় তরুণ সন্ন্যাসী সুভাষ। প্রত্যেকটি মানুষ আজ কৃপাণধান সুভাষকে দেখে যেমন মেতেছে, সে দিনের কৌপীনবন্ত সুভাষকে দেখে তেমনি কেঁদেছিল। নব মন্ত্রে দীক্ষিত সুভাষ মাতৃভূমিতে পদার্পণ করেই দেশবাসীকে জানালেন—

"ঘরে ফিরেছি। আবার কাজে নামব। প্রথম কর্ত্তব্য স্বাস্থ্য ফিরে আনা। এত দিন জেলে ছিলাম, আমার সহ-বন্দী—আমার সম-দুঃখী,—সম-নিপীড়িত বন্দীদের স্মৃতি দিন-রাত আমার মনের দ্বারে হানা দেবে।"

সে ফিরল। সহর মাতল। মন্দিরে মন্দিরে পড়ল পূজা। নতুন যুগের অরুণালোক বাংলার দিক-চক্রবালে ফুটে উঠল।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ

প্রদ্যোৎ গুহ

সম্প্রতি বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধি এম, এ, ডাঙ্গে মস্কো হইতে ফিরিয়া আসিয়া জানাইয়াছেন—তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর শুধু একটা সম্ভাবনা মাত্র নহে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। কবে আরম্ভ হইবে ইহাই প্রশ্ন। স্বভাবতঃই তৃতীয় মহাযুদ্ধের জল্পনা-কল্পনায় আবার সকলেই মুখর হইয়া উঠিয়াছেন।

অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা উঠিয়াছিল। উঠিয়াছিল সাম্রাজ্যবাদী-ধুরন্ধর রয়টারের মারফতে, ইংগ-মার্কিণ বেতনভোগী সাংবাদিকদের কল্যাণে আর চার্চিল সাহেবের ফুলটন বক্তৃতায়। প্রসঙ্গটি তাই নূতন নহে। তাই কিছু অতীত ঘটনার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

ইংগ-মার্কিণ চক্রান্ত

যুদ্ধের প্রয়োজনে মিত্রশক্তিকে মোটামুটি এক সাথে চলিতে হইয়াছিল—যদিও যুদ্ধরত কোন শক্তিই নিজ মতবাদ পরিত্যাগ করে নাই। কিন্তু যুদ্ধের শেষ দিকে দেখা গেল গণশক্তির জাগরণ—বল্কানে, ফ্রান্সে, ইতালীতে জাগ্রত গণশক্তি আগাইয়া আসিল ক্ষমতা গ্রহণ করিতে। বৃটিশ-পৃষ্ঠপোষিত লণ্ডনবাসী পোল সরকারের ক্ষমতা লাভের চক্রান্ত ধূলি-বিলীন হইল। সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছিষ্টভোজী মাহাইলোভিচের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইল না—সাম্রাজ্যবাদী ধুরন্ধরেরা প্রমাদ গণিলেন। ইতিহাসের ডাষ্টবীন হইতে "লাল সাম্রাজ্যবাদের" ছেঁড়া কাগজ আবার আমদানী করা হইল, মুখর হইয়া উঠিল 'রয়টার'। শুধু মিথ্যার জাল নয়—অস্ত্রের ঝনঝনানিও শোনা গেল। চার্চিল সাহেবের ভাড়াটেরা চড়াও হইল গ্রীসে। ইতিমধ্যে আসিল আণবিক শক্তি।

আণবিক শক্তি না আণবিক ধাঁওতা?

ইংগ-মার্কিণ শক্তি সভ্য জগতের 'জীয়ন-কাঠি মরণ-কাঠি' হিসাবে এই শক্তিকে নিজেদের আয়ত্তে রাখিবার কথা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করিয়াছেন। আসলে ইহাই হইল সোভিয়েট রাষ্ট্রসংঘের বিরুদ্ধে তাহাদের প্রকাশ্য 'আলটিমেটাম'। তাই ত্রিশক্তি-ঐক্যের জন্ত তাঁহাদের আর গরজ নাই। "আণবিক বোমার" হুমকিতে তাঁহারা ফিরিয়া পাইতে চাহেন হস্তচ্যুত সাম্রাজ্য। ইহাই আসল কথা। তাই আণবিক বোমার গোপন তথ্য প্রকাশ করিতে তাঁহারা রাজী নহেন। সম্মিলিত জাতিসংঘের হাতে আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের ভার তখনি তাঁহারা ছাড়িয়া দিতে রাজি যখন জাতিসংঘে তাঁহারা সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করিবেন। এবং কূটনৈতিক চাল হিসাবে এই পথই শ্রেয়:—কারণ এই পথেই যুদ্ধের দায়িত্ব সোভিয়েটের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া যায়। তাই নিজ তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলিকে জাতি-সংঘে আসন দিবার জন্ত ইংগ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের এই 'গণতান্ত্রিক' আগ্রহ।

দ্বিতীয়ত, শান্তিরক্ষার জন্ত ইংগ-মার্কিণ রাষ্ট্রনেতাদের যদি এতই আগ্রহ, তবে বিকিনিতে আণবিক বোমার নতুন পরীক্ষারই বা অর্থ কি?

'ভেলভেট পর্দার অন্তরালে'

তাহা ছাড়া যখন শান্তি-পর্বের সূচনা হইয়াছে, সোভিয়েট রাষ্ট্র-সংঘে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের নূতন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, তখন বৃটেনে পুনর্গঠনের কাজে লোকাভাব সত্ত্বেও 'ডিমবিলাইজেশনে' টাল-বাহানা করা হইতেছে কেন? ১৪ই ফেব্রুয়ারী 'ডিমবিলাইজেশনের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, প্রতি সপ্তাহে ডিমবিলাইজেশনের হার ১০০,০০০ হইতে কমাইয়া ৭৫,০০০ করা হইয়াছে—(Labour Monthly, April 1946)।

রয়টার এবং বেতনভোগী সাংবাদিকেরা তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন—সোভিয়েটই না কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ডাকিয়া আনিতেছে। লৌহ-যবনিকার অন্তরালে সোভিয়েটে না কি যুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতেছে। সোভিয়েট সম্পর্কে আলোচনা পরে করা যাইবে, বর্তমানে ডলারের দেশের উপর হইতে ভেলভেট পর্দা সরাইয়া দেখা যাউক।

মার্কিণী অর্থ ও সৈন্য দিয়া চীনে গৃহযুদ্ধ বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে কেন? চীনকে সোভিয়েট-বিরোধী যুদ্ধকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্যই কি? ম্যাপের দিকে তাকাইলেই দেখা যাইবে, ইংগ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা পরস্পরের মধ্যে কাজ ভাগ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে সোভিয়েট রাষ্ট্রসংঘকে ঘিরিয়া ফেলিবার চক্রান্ত করিয়াছে।

দুই কোটি টাকা ব্যয় করিয়া সৌদি আরবে একটি নূতন বিমান-ঘাঁটিই বা স্থাপন করা হইল কেন? যুক্তরাষ্ট্র হইতে সৌদি আরবের দূরত্ব ৭০০০ মাইল আর সোভিয়েট ইউনিয়ান হইতে দূরত্ব মাত্র ১০০০ মাইল। কিংবা ধরা যাউক দার্দানেলিশের কথা। সোভিয়েট ইউনিয়ান হইতে দার্দানেলিশের দূরত্ব মাত্র ৫০০ মাইল আর দার্দানেলিশ হইতে যুক্তরাষ্ট্রের নিকটতম বন্দরের দূরত্ব ১,৫০০ মাইল, আর বৃটেনের নিকটতম বন্দর হইতে ইহার দূরত্ব ১,০০০ মাইল। তবু ইংগ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ দার্দানেলিশে খবরদারী করিতে পারিবেন, সোভিয়েট অধিকার দাবী করিলেই হইবে সাম্রাজ্যবাদী। কিংবা ধরা যাউক কিয়েল ক্যানেলের কথা। সোভিয়েট হইতে কিয়েলের দূরত্ব মাত্র ৩৫০ মাইল—অথচ ইহার খবরদারী ইংলণ্ডের হাতে। এক দিকে মিথ্যা প্রচার, অন্য দিকে সোভিয়েট ইউনিয়ানের চতুর্দিকে ঘাঁটি স্থাপন—ইহার অর্থ পরিষ্কার। অর্থ তৃতীয় যুদ্ধের প্রস্তুতি। বিকিনিতে আণবিক বোমার নবতম পরীক্ষাও এই কথাই ঘোষণা করে। আর তাই জাপানে, ইতালীতে, জার্মাণীতে, স্পেনে চলে ফ্যাসিস্তোষণ। আর তাই যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি দিতে এই টাল বাহানা। আর তাই কাশ্মীরের গণ-আন্দোলনের পিছনেও আবিষ্কারের চেষ্টা হয় সোভিয়েট-ইংগিত।

সোভিয়েট নীতি

অন্য দিকে সোভিয়েট নীতিও পরিষ্কার। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী মলোটভ পরিষ্কার ঘোষণা করিয়াছেন—

...We need a lengthy period of peace and ensured security of our country. The peace loving policy of the Soviet Union is not some transient phenomenon, it follows from the fundamental interests and needs of our people.

ব্যক্তিগত

জগন্নাথ বিশ্বাস

পৃথিবীর মূঢ়তায় আজ আর স্তব্ধ নই আমি,
অনেক পেয়েছি বাধা, অনেক জেনেছি এ অবধি,
আরো শিখিবার আর জানিবার আরো আছে জানি,
আজ উপেক্ষার স্তূপ জড়ো হয়ে ওঠে নিরবধি।

তুমি তো আঘাত-সহ। মেনেছ এ পৃথিবীর গতি,
অভিন্ন-হৃদয়ে আজ আমিও তোমার সাথী হবো,
বিস্তীর্ণ জীবন আর যৌবনের সিন্ধুজলে দুরন্ত জাহাজে
ক্ষুদ্র ফেনা উপেক্ষিয়া অকম্পিত, অচঞ্চল রবো।

সুখান্বেষ। সুখ যদি নাও থাকে সমুদ্রের বুকে,
সে সুখ নীরবে সেই নিস্তরংগ ক্ষুদ্র হ্রদ-নীরে,
আমরা সমুদ্র-স্রোতে অকারণ করুণার্থী নহি,
বিনয় যদিও রবে সাহস-বিস্তৃত বুক ঘিরে।

আকাশ দেখেছ তুমি। আকাশের নীলিমা দেখেছ,
পৃথিবীরও রূপ আছে, রস আছে, গন্ধ আছে বুকে,
তাহার গ্রহীতা হবো। পৃথিবীর কঠিন বাতাসে
ভাঙাচোরা নিত্য আছে, লাভ নেই বাঁচা ধুঁকে ধুঁকে।

—(Quoted from 'Labour Monthly', April, 1946)

অবশ্য মুখে শান্তির কথা অনেকেই বলিয়াছেন। উক্তি অপেক্ষা তথ্য অনেক বেশী প্রামাণ্য—তাই তথ্যেরই আশ্রয় গ্রহণ করা যাউক।

উপরোক্ত ঘোষণার কয়েক সপ্তাহ পরের খবরে জানা যায়, ট্যাংক তৈয়ারীর কারখানাগুলি যান-বাহন বিভাগের হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে। অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণের দপ্তর উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রাস্তা-ঘাট, বাড়ী-ঘর নির্মাণের জন্য নূতন নূতন দপ্তর স্থাপন করা হইয়াছে। সর্ব দিকে চলিতেছে শান্তি-কালীন অর্থনীতি প্রবর্তনের আয়োজন। যুদ্ধের উদ্যোগকে সে তাই অংকুরেই বিনষ্ট করিতে চায়—ধ্বংস করিতে চায় সেই সমস্ত দুষ্কৃতিকারীকে, যুগে যুগে যাহারা যুদ্ধ ডাকিয়া আনে। জার্মাণীকে সে তাই নূতন করিয়া গড়িতে চায়—দেশে দেশে স্বাধীনতার আন্দোলনকে সে তাই সমর্থন করে।

আগামী যুদ্ধের দায়িত্ব

ইংগ-মার্কিণ ও সোভিয়েট নীতির তুলনামূলক আলোচনা হইতে এই কথাই স্পষ্ট হইয়া উঠে—তৃতীয় মহাযুদ্ধ যদি বাধে, তবে সে যুদ্ধের দায়িত্ব ইংগ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের। ইন্দোনেশীয়া, ইন্দো-চায়না, চীনে, গ্রীসে তাঁহারা যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন—সেই নীতিই যুদ্ধ ডাকিয়া আনিতেছে। তাই এবারকার যুদ্ধের শক্তি-সমাবেশও হইবে অন্য রকম। এক দিকে থাকিবে ইংগ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ আর তাহার প্রতিক্রিয়াশীল তাঁবেদার রাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্টগুলি আর অন্য দিকে থাকিবে সোভিয়েট ইউনিয়ানের নেতৃত্বে সমস্ত দেশের স্বাধীনতাকামী প্রগতিশীল জনসাধারণ। আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষণ করিলে আজ এই কথাই স্পষ্ট হইয়া উঠে।

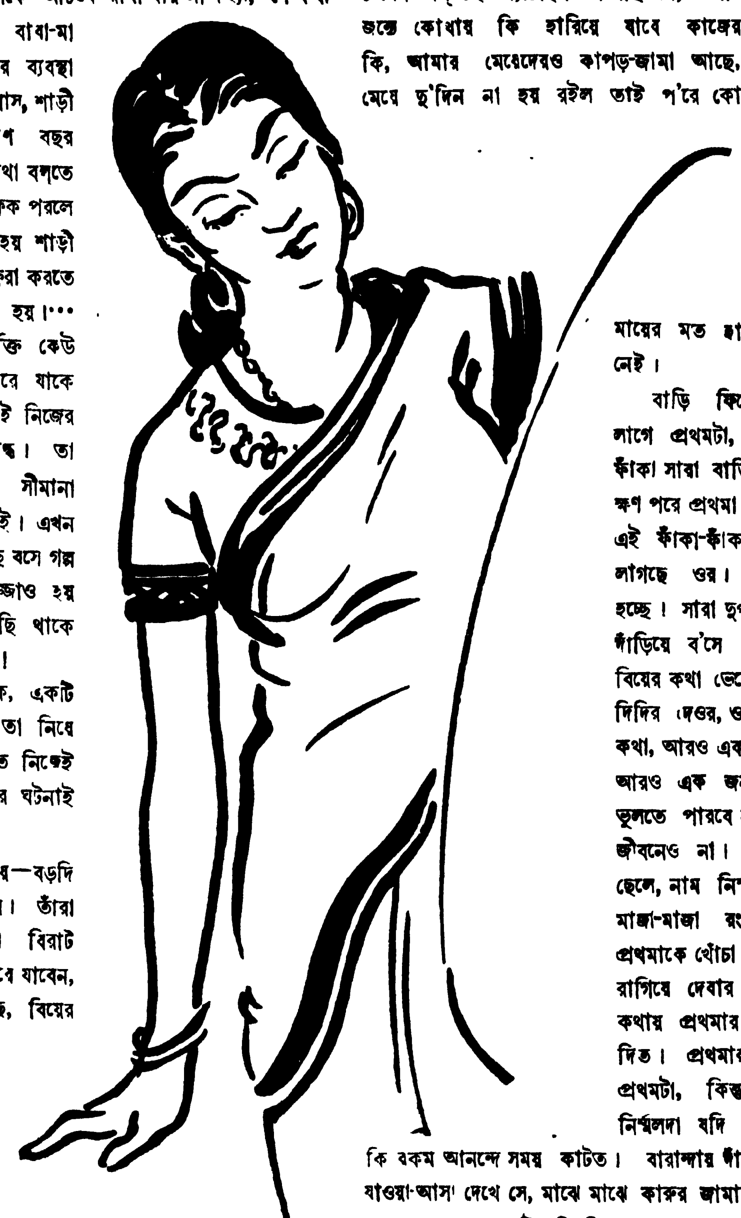


শিল্পী—গোপাল ঘোষ

বয়ঃসন্ধি

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

এমন কিছু রূপসী মেয়ে সে নয়, তার চেয়ে বড় কথা—বয়সও খুবই অল্প। হয়ত অনেকে বলবে বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত ফ্রক পরিয়ে রাখলেই ত আর বয়সকে আটকে রাখা যায় না। হ্যাঁ, সে কথা খানিকটা সত্যি, প্রথমার বাবা-মা এখনও মেয়ের জন্য শাড়ীর ব্যবস্থা করেননি, তার বাবার বিশ্বাস, শাড়ী পরলেই মেয়েদের বয়স দশ বছর এগিয়ে যায়, পাকা পাকা কথা বলতে শেখে। আর মোটের ওপর ফ্রক পরলে মেয়েদের মানুষ ব'লে মনে হয় শাড়ী পরিয়েছ পুতুলের মত চলাফেরা করতে রীতিমত আয়োজন করতে হয়।··· কিন্তু প্রথমার বাবার এ যুক্তি কেউ মানতে চায় না, বিশেষ করে যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই প্রথমাই নিজের সাজ-পোষাকের ওপর বীতশ্রদ্ধ। তা ছাড়া তার মন ফ্রকের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে অনেক দিনই। এখন ছেলেদের দেখলে তার কাছে বসে গল্প করতে ইচ্ছে করে আর লজ্জাও হয় এত যে পুরুষদের কাছাকাছি থাকে না, ভালো লাগে, তবুও না।



এত কথায় কাজ কি, একটি মেয়ে ফ্রক পরল কি না তা নিয়ে বেশি কথা বলতে গেলে হয়ত নিজেই ধরা দিয়ে বসব। সেদিনের ঘটনাই বলি।

প্রথমার বড়দি'র বিয়ে—বড়দি মানে জ্যাঠামশায়ের বড় মেয়ে। তাঁরা থাকেন বাহিরমির্জ্জাপুরে। বিরাট বাড়ি জ্যাঠামশায়ের। মা পরে যাবেন, প্রথমা আগেই চলে এসেছে, বিয়ের ক'দিন আগে—অর্থাৎ পাকা-দেখার সময় এসে আর সে ফিরল না, এঁরা কেউ ছাড়লেন না।··· কলমের এক খোঁচায় বিয়ের পর্ব্বটা শেষ ক'রে দেওয়া যাক—বিয়ে হ'ল, খুব সুন্দর বর, বরকে দেখে প্রথমার খুব ভালো লেগেছে। কথায় কথায় এ মনোভাব প্রকাশ পাওয়ায় তাকে নিয়ে সবাই ঠাট্টা-তামাসাও করেছে।

যেমন শুধু হাতে গিয়েছিল তেমনি শুধু হাতে ফিরল না কিন্তু প্রথমা। তার সঙ্গে ননদ-পুঁটুলীর একটা স্যুটকেস্, তার চেয়েও বড় কথা এর মধ্যে খুব ভালো একখানা শাড়ী আছে। বড়দি'দের বাড়ি ছেড়ে প্রথমার আসতে ইচ্ছে করে না, ওখানে সবাই খুব ভালো। এত ভালো যে খোঁজ পর্য্যন্ত করে না কেউ কারো। এ ত গেল স্বাধীনতার কথা। তা ছাড়া প্রথমা সেখানে আরও আনন্দে ছিল; তার শাড়ী পরবার সুযোগ—দিন-রাত একটার পর একটা পরো কেউ বারণ করবে না। তার মা বাড়ি থেকে জামা-কাপড় পাঠিয়ে দেবেন বলতেই জ্যাঠাইমা বলেছিলেন,—'না ভাই, এই ক'দিনের জন্যে কোথায় কি হারিয়ে যাবে কাজের বাড়িতে, দরকার কি, আমার মেয়েদেরও কাপড়-জামা আছে, তোমার মেমসাহেব মেয়ে দু'দিন না হয় রইল তাই প'রে কোনো রকমে।'

জ্যাঠাইমাকে প্রথমার খুব ভালো লাগে। কেমন সবারই সঙ্গে অনেক কথা বলেন তিনি, মায়ের মত হাসি-গল্পে তাঁর কার্পণ্য নেই।

বাড়ি ফিরে তার ভারি বিশ্রী লাগে প্রথমটা, কি রকম ফাঁকা-ফাঁকা সারা বাড়িখানা। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে প্রথমা আবিষ্কার করলে যে, এই ফাঁকা-ফাঁকা ভাবটা খুব ভালো লাগছে ওর। অকারণেই আনন্দ হচ্ছে! সারা দুপুর ঘর আর বারান্দায় দাঁড়িয়ে ব'সে নানা ভাবে বড়দি'র বিয়ের কথা ভেবেছে ও—জামাই বাবু, দিদির দেওর, ওর জেঠতুতো ভায়েদের কথা, আরও এক জনের কথা। এই আরও এক জনটিকে সে কিছুতেই ভুলতে পারবে না। বোধ হয় সারা জীবনেও না। বড়দি'দের পাড়ারই ছেলে, নাম নির্ম্মল, ছিপছিপে চেহারা মাজা-মাজা রং—এই ছেলেটি সর্ব্বদা প্রথমাকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে কথা ব'লে রাগিয়ে দেবার চেষ্টা করত, কথায় কথায় প্রথমার খুঁত ধরে টিট্‌কারি দিত। প্রথমার ভারি বিশ্রী লেগেছিল প্রথমটা, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, নির্ম্মলদা যদি থাকত তবে এতক্ষণ কি রকম আনন্দে সময় কাটত। বারান্দায় দাঁড়িয়ে পথের লোক-জন যাওয়া-আসা দেখে সে, মাঝে মাঝে কারুর জামার পিছন দিকটা দেখে ওর সন্দেহ হয়, ওই বুঝি নির্ম্মলদা চলেছে। আচ্ছা, হয়ত নির্ম্মলদা এদিকে কোনো কাজে আসতেও পারে, আর কাজ না থাকলে এমনিও ত বেড়াতে আসে মানুষ। ওই দূরের নিমগাছের ছায়াতে দাঁড়িয়ে বরফওয়ালা সরবৎ বিক্রী করছে, তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে স্কুলের ছেলেরা ভিড় জমিয়েছে, আজ প্রথমার স্কুলে যাওয়া নেই, এমন বাড়ি বসে কামাই সে এর আগে কখনও করেনি। এক-এক বার ভাবনা হয় স্কুলের পড়া এই ক'দিনে কত এগিয়ে গেছে। সব চেয়ে ওর ভয় অঙ্কের জন্য!

এমনি করে বেলা বিকেল গড়িয়ে গেল। আজ অনেক ভেবে প্রথমা ঠিক করেছে বিকেল বেলায় নতুন শাড়ী পরবে। নতুন শাড়ী পরার জন্ম তাকে অনেক আয়োজন করতে হয়। প্রথমতঃ ফাঁস দিয়ে শাড়ীর বাঁধন ঠিক রাখা তার আসে না, কেবলই মনে হয় কখন বুঝি কাপড় ঢিলে হয়ে খুলে যাবে। সে জন্ম জ্যাঠাইমাদের ওখানে থাকতে ফালি দিয়ে বেঁধে শাড়ী পরত ও। আজ অবশ্য গেরো দিয়ে পরল। এগারো হাত প্রমাণ শাড়ী—ওর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের সঙ্গে ধূপছায়া রঙের শাড়ী বেশ মানিয়েছে। হঠাৎ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমা নিজেকে দেখে অবাক্ হয়ে যায়। এ যেন অন্য মানুষ, প্রথমে সলজ্জ ভাবে নিজের দিকেও চাইলে, তার পর পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আয়নার দিকে। এবারে বিশ্বাস হচ্ছে যেন বড়দি'র মতই মেয়েলি ধরণের চেহারা ওর। সত্যি নিজের দিকে তাকিয়ে ও অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখল অনেকক্ষণ। আর সব বড় মেয়েদের মতই তার দেহের সুসমঞ্জস শ্রী ও ছন্দ ফুটে উঠেছে! ফ্রক-পরা সেই মেয়েটির সঙ্গে এ মেয়েটির মোটেই মিল নেই।

একবার মনে হয় নির্ম্মলদা'র কথা। ওর এলোমেলো শাড়ী পরার ধরণ দেখে প্রথম দিন নির্ম্মলদা বলেছিল—মালকোঁচা ক'রে ধুতি পরলেই হয়!

আজ যদি নির্ম্মলদা সামনে থাকতো কিছুতেই নিন্দা করতে পারত না, প্রথমা ভাবে। গাছকোমর বেঁধে অথবা মালকোঁচা ক'রে শাড়ী পরার চেয়ে কুঁচিয়ে পরাটা অনেক শোভন বই কি! মালকোঁচা ক'রে শাড়ী পরতে দেখেছে ও মাদ্রাজী মেয়েদের,—ওর মোটেই পছন্দ হয় না ও-রকম কাপড় পরা।

বাবার ফেরবার সময় যত কাছিয়ে আসছে প্রথমা মনে মনে ততই সংশয়াপন্ন হয়ে উঠছে। এক-এক বার মনে হয়, বুঝি বাবার কাছে খুব বকুনি খেতে হবে, কি জানি কি মনে করবেন তিনি। তার আগেই যদি শাড়ী খুলে ফেলে ও। পোশাক বদ্‌লে ফেলাই ভালো!···কিন্তু প্রথমার মন কিছুতেই সায় দেয় না। বাবাকে তার নতুন বেশ একবার দেখাবে। কি জানি কেন ওর ধারণা হয়েছে যে, বাবা দেখলে খুশি হবেন! খুশি না হবার কি আছে,—শাড়ী পরে সত্যিই প্রথমাকে ভালো মানিয়েছে। না, থাকগে, যেমন আছে তেমনি থাক, কিছু বল্‌বেন না বাবা।

বিকেলে পথে লোক চলাচল বাড়ে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সঙ্কুচিত ভাবে ও চেয়ে থাকে রাস্তার দিকে। বিশেষ কোনো কাউকে দেখবার জন্ম নয়, জনস্রোতের প্রবাহের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে প্রথমা। থেকে থেকে এক-একটা কটাক্ষে সে যেন কি রকম অস্বস্তি বোধ করে। মনে হয় বারান্দা থেকে এখনই স'রে দাঁড়াতে হবে ওকে, কিন্তু তবুও ঠিক স'রে যেতে মন সরে না। ও বুঝতে পারে না মনস্তত্ত্বটুকুর ষোলো আনা রহস্য—।···এই ত সেদিনও এই বারান্দায় অসঙ্কোচে সারা বিকেল কাটিয়েছে কিন্তু এ-রকম অস্বস্তি হ'ত না। লোকেরা পথ দিয়ে যায়,—ওই ভদ্রলোক রোজ ছাতা বগলে ক'রে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে যান, আরও কত লোক নিয়মিত এই পথ দিয়ে যায়, এদের অনেককেই ত সে চেনে। কিন্তু আজ সেই সব চেনা বা অচেনা মানুষেরা যেন নতুন হয়ে গেছে, একদম বদ্‌লে গেছে। এই বদ্‌লে যাওয়ার ভাবটা খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে প্রথমার চোখে। পৃথিবীটাই কি বদ্‌লে গেল!

কাপড় কেচে ওপরে উঠে মেয়েকে ব'সে থাকতে দেখে প্রথমার মা বল্‌লেন—আয় কপালে একটা টিপ পরিয়ে দিই। মেয়েকে টিপ পরানো তখনও শেষ হয়নি এমন সময় জুতোর শব্দ পাওয়া গেল—হরনাথ বাবুর জুতোর আওয়াজ।

—কি রে লিলি এসিছিস? বলে তিনি সিঁড়ি থেকেই হাঁক দিলেন। প্রথমা তাড়াতাড়ি মায়ের কাছ থেকে ছুটে চলে যায়। ওর যেন কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেছে। মুখে কিছু না ব'লে সোজা গিয়ে বাবাকে প্রণাম করলে। প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াতেই, হাসিতে হরনাথ বাবুর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আনন্দে তাঁর সারা দিনের কর্ম্মক্লান্ত চোখ দুটি সহসা উজ্জ্বল দীপ্তিতে সজীব হয়ে উঠল।

মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করবার লোভ অতিকষ্টে সংবরণ করলেন তিনি। এই ক'দিনের অদর্শনের পর আজ মেয়েকে যে কেন আদর করলেন না, সে কথা বুঝিয়ে বল্‌তে পারবেন না তিনি। হঠাৎ যেন মেয়েকে হাত ধরে কাছে টেনে নেবার কথা মনে হতেই কিসের সংকোচ এসে পথরোধ করে দাঁড়াল। হরনাথ বাবু মেয়ের হাতে ছাতাটা দিয়ে প্রশ্ন করলেন—কখন ফিরলে?

প্রথমা জবাব দিলে—সাড়ে দশটা হ'য়ে গেল এখানে পৌঁছাতে।

আরাম-কেদারায় বসে তিনি মেয়ের দিকে আবার ভালো ক'রে তাকালেন, প্রথমা তখন অন্য দিকে চেয়েছিল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে আপনার অজ্ঞাতেই বলেন—হুঁম্!

প্রথমা বাবার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে—আমায় কিছু বলছ বাবা!

কপালের টিপটুকু পর্য্যন্ত নির্খুত—সেই সেকালে এই ছোট্ট গোল টিপটাই অগ্নিশিখার মত উজ্জ্বল ভাস্বর হয়ে জেগে থাকত। এ চেহারা এত পরিচিত হরনাথ বাবুর,—সে-কথা মনে পড়ে।

—হ্যাঁ! ইয়ে, তোমার মাকে বল আজ চায়ে একটু আদার রস দিয়ে করে যেন, শরীরটা ঠিক ভালো বোধ হচ্ছে না।

—মাথা ধরেছে বাবা? টিপে দেবো একটু? উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রথমা পিতার পানে চাইল।

পুনরায় হরনাথ বাবু মেয়ের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যান। প্রথমার প্রশ্নের উত্তর দেবার কথা একেবারেই ভুলে গিয়ে অন্য কথা ভাবেন তিনি।···এমনি এক কোন্ সুদূর অতীত যুগে এক দিন হয়েছিল দেখা এমনি একটি মেয়ের সঙ্গে, তার চোখেও তিনি দেখেছিলেন অবিকল এই প্রাণময় সজীবতা, উদ্বেগে উচ্ছ্বাসে কোথাও কি এতটুকু গরমিল নেই! আনন্দ-বেদনা-মুখর স্বপ্ন-কল্পনাখচিত সেই সুদূর অতীত যেন আজ এক মুহূর্ত্তের জন্ম সংশয়-সঙ্কুচিত পদক্ষেপে চকিত দর্শন দিয়ে গেল। এ কী সেই মেয়েটি! মনোরমার সেই সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছল যৌবনতরঙ্গ সেই যুগের এক যুবকের মনোতটে যে আলোড়ন তুলত সে-কথা আজ কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল কিন্তু—।

হঠাৎ মাথায় একটা ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব ক'রে হরনাথ বাবুর যেন খুব ভালো লাগে। তিনি বলেন—কে মনোরমা? পরক্ষণে পিছন ফিরে কন্যাকে দেখে তাঁর সারা দেহ কেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়।

প্রথমা তাঁর কথার উত্তরে কি বলেছে তা যেন শুনেও শুনতে পান না হরনাথ বাবু।

কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক জোর দিয়ে হরনাথ বাবু বলেন—হ্যাঁ মা লিলি, এ কাপড় কে দিল, জ্যাঠাইমা বুঝি? রংটি ত সুন্দর।

—না বাবা, বড়দি'র শ্বশুরবাড়ি থেকে ননদ্‌খামীতে দিয়েছে।

মনোরমা এলেন চায়ের কাপ হাতে ক'রে,—হাঁ গো, তোমার শরীর খারাপ ক'রেছে তা শোও না মাথাটা টিপে দিই।

হরনাথ বাবু চোখ বুজেই বলেন—না থাক, লিলিও অবিশ্যি বলছিল —। এমন কিছু নয়, সর্দ্দিটা ঝাম্‌রেছে কি না, ও একটু আদা-চা খেলেই সেরে যাবে।

হরনাথ বাবু ক্ষণেকের জন্য কন্যার দিকে তাকিয়ে একবার গৃহিণীর দিকে চাইলেন।

চায়ের কাপটা অনভিপ্রেত অতিথির মতই অনাদৃত অবস্থায় পড়ে রইল, তিনি চোখ বুজে অবসন্ন দেহটাকে মেলে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকেন। কি একটা কাজে প্রথমা চলে গেল, মনোরমা দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরে মনোরমা একবার বললেন—চা জুড়িয়ে গেল যে গো।

—ও। বলে হরনাথ বাবু গৃহিণীর দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। মনোরমা হাতটা ধ'রে বেদনাতুর দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে বলেন—দ্যাখো, একটা কথা বলবো ?

—বলো।

—এবারে তুমি অবসর নাও, চাকরী করবার আর দরকার কি ?

—তাই ভাবছি। কিছু না ভেবেই বলেন হরনাথ বাবু।

—আর কতকগুলো খেটেই বা কি হবে ? টাকাটাই ত সব নয়, আমাদের জীবন এতেই কেটে যাবে, মেয়ের জন্যেও ভাবনা নেই, সাতটা নয় পাঁচটা নয়, ওই একটিই ত!

—ঠিক কথা।

এবারে মনোরমা স্বামীর অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে বলেন— তোমার ওই এক কথা। দেখচো মেয়েটা বড় হয়ে উঠেছে ?

এ কথার প্রতিবাদ করতে মন সায় দেয় না, তবু হরনাথ বাবু জোর করে বলেন—আজ তোমার ওপর আমি বিরক্ত হয়েছি।

কি দরকার ছিল শুনি—কেন ? মনোরমা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।

—মিছেমিছি লিলিকে এক টাউন শাড়ী পরিয়ে মিথ্যে জবরজঙ্গ ক'রে তুলেছ ওকে।

মনোরমা রীতিমত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে—জবরজঙ্গ ? কি যে বলো তুমি—দিন দিন তোমার ভীমরতি হচ্ছে যেন। শাড়ীখানা প'রে কি চমৎকার দেখাচ্ছে ওকে, আমি চেয়ে চেয়ে চোখ ফেরাতে পারি না। ঠিক কি মনে হচ্ছিল জানো ? বিয়ের পর আমিও ওই রকমই দেখতে ছিলুম, না গো ? আজ বিকেলে হঠাৎ ওকে শাড়ী পরা দেখে আমার মনে হ'ল কপালে একটা টিপ পরিয়ে দিলে তুমি অবাক্ হয়ে যাবে।

মনোরমা আশা করেছিলেন স্বামীর মুখেই মেয়ের প্রশংসা শুনবেন। তাঁর মনের প্রায় অজ্ঞাত লোকে একটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের শাণিত অস্ত্র হয়ত বা অপেক্ষা করছিল এই টিপ পরিয়ে দেওয়ার আড়ালে। হয়ত বা মনে হয়েছিল সেই অগ্নির কিছু অবশিষ্ট আছে কি না একবার পরীক্ষা ক'রে দেখবার। হয়ত বা মনে হয়নি কিছুই, শুধু ভালো লেগেছিল বলেই তিনি মেয়ের কপালে সেই অগ্নিশিখার মত টিপ এঁকে দিয়েছিলেন।

হরনাথ বাবু মনে মনে বলেন,—'বিয়ের পর ওই রকমই ছিলে তুমি দেখতে ! হ্যাঁ তা হবে।' ইচ্ছে হয় বলেন— 'না, এর চেয়ে বোধ হয় দেখতে ভালই ছিলে।' কিন্তু স্তাবকতা করতে মন সরে না।

মনোরমা নিজেই সত্য কথাটি বলে দিলেন—যাই বলো, লিলি কিন্তু আমার চেয়ে দেখতে সুশ্রী হয়েছে।

এ কথারও জবাব দিতে হরনাথ বাবুর কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হয়, সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ানো মেয়েটির ছবি তাঁর চোখের সামনে ভেসে যায়, সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় তাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে তাঁর বেধেছিল।

তিনি এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলেন—থাকগে চা আর খাবো না, ঠাণ্ডাতে—।

মনোরমা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন—কেন আমি কি মরে গেছি, এক কাপ চা-ও করে দিতে পারব না ? বলেই তিনি হাঁক দিলেন,—লিলি,—

—যাই মা। বলে সাড়া দিলে প্রথমা।

সেই সন্ধ্যারাগের ঘনায়মান অন্ধকারে কোন্ সুদূর পল্লীতে ঘোড়ার গাড়িতে ক'রে এক দিন গিয়েছিলেন হরনাথ বাবু সেই কথা মনে পড়ল।

প্রথমা কাছে এসে দাঁড়াতে তিনি নিজেই বললেন—আজ দেখি তুই কেমন চা করতে পারিস্।

মনোরমা বাধা দিয়ে বলেন—থাক, এক কাপ ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল, এবারে অখাদ্য খেয়ে আর কাজ নেই, ও তুমি মুখে তুলতে পারবে না।

প্রথমা বাবার কথা শুনে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল, মায়ের বক্রোক্তিতে সে মোটেই দমল না, বললে—ভাখো না মা, অমনি করে আমার কাজ শেখা হয় না।

হরনাথ বাবু গৃহিণীকে চেয়ারের হাতলের উপর জোর ক'রে বসিয়ে বলেন,—আজকাল যেন তোমার ওই কাজ ছাড়া আর কিছু নেই, কেন একটু বিশ্রাম নিলে কি হয় ?

হরনাথ বাবু মনে মনে স্থির করে ফেললেন প্রথমাকে শাড়ী পরতে বারণ করবেন, আগে যেমন সে ফ্রক পরত তেমনই পরুক। হ্যাঁ এখনই বারণ করা দরকার।

তিনি ডাকলেন মেয়েকে—লিলি শোনো।

প্রথমা এসে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে নব জীবনের প্রভাত-দীপ্তিকে কোনো আঘাতেই ম্লান করে দিতে মন সরে না হরনাথ বাবুর।

মনোরমা চুপ করে বসেছিলেন এতক্ষণ, একটা কথা মনে হয়ে গেল, তিনি বললেন—হ্যাঁ রে, নতুন শাড়ী প'রে খুব ত ফুরফুরিয়ে বেড়াচ্ছিস, বাপ-মাকে নমো করতে হয় তা বুঝি মনে নেই ?

প্রথমা মুখে বলে না যে সে পিতাকে সর্ব্বাগ্রে প্রণাম করেছে সোজা গিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে চুম্বন করলে মাকে। কোন দিন সে মাকে প্রণাম করেনি, করতে তার ভালো লাগে না, জিজ্ঞাসা করলে বলে ও—তোমার প্রণাম করতে গেলেই ভয় হয় তুমি বুঝি মা ম'রে যাবে।

হরনাথ বাবু সেই দিন থেকে প্রথমার শাড়ী পরা মেনে নিয়েছেন, ফ্রক সে আর পরে না।



শ্রাবণ
শিল্পী—চিত্তরঞ্জন দাস



এবারেরং

বিজন ভট্টাচার্য্য

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মিঃ সেনের বাড়ীর সুসজ্জিত ড্রইংরুম। বন্ধু-বান্ধব ও বহু সম্মানিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে কবি, সাবিত্রী দেবী ও সুচিত্রা দেবীও উপস্থিত আছেন। কিন্তু সবার মুখেই কেমন যেন একটা hush hush ভাব—অন্তরের উচ্ছ্বাস স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগে যেন কিছুতেই ফেটে প'ড়তে পারছে না। সকলকেই চা পানে আপ্যায়িত করা হ'চ্ছে। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে সকলেই সংযত ভাবে চুটকী রসিকতা আর টুকিটাকি মন্তব্যের ভেতর দিয়ে আনন্দবাসর উদ্‌যাপন ক'রছেন।

জনৈক সাহেবী পোষাকপরা বন্ধু। You could have easily postponed the function Mr. Sen. কেউ তাতে কিছু মনে করতো না, বরং gladly accept করতো।

জনৈক স্থুলাঙ্গিনী। সত্যি মনটা এমন খারাপ লাগছে মিঃ সেন।

মিঃ সেন। না মানে postpone অবিশ্যি করা যেত, কিন্তু আমি তো থাকতে পাচ্ছি না কিনা! আমাকে যেতেই হচ্ছে।··· আর সময়ই বা পেলাম কোথায়···accident'এর ব্যাপার।

স্থুলাঙ্গিনী ভুরু তুলে ঘাড় নেড়ে সায় দেন!

(সরকারের প্রবেশ)

মিঃ সেন। Hallo, so late, তোমার জন্যে সব ব'সে ব'সে একেবারে···এস এস। Introduce ক'রে দি তোমাকে সবার সঙ্গে।

মিঃ সরকার। Wait my dear friend, wait, দাঁড়াও আগে মুখগুলো সব দেখে নিই ভাল করে।···(কৌতূহলী দৃষ্টিতে চারদিকে দেখে) I see—মিঃ শর্মাও দেখি একেবারে শর্মিণীকে নিয়ে সমুপস্থিত। (কাকে যেন প্রত্যভিবাদন জানাল হাত তুলে) O. K,···no, perhaps I need no introduction here Mr. Sen শুধু Barrister Mr. Shome'এর পাশে মোটা মত ভদ্রলোককে চিনতে পারলাম না।

মিঃ সেন। কে, Mr. false colour—bulky one!

মিঃ সরকার। Yes, yes.

মিঃ সেন। Oh, he is one of the Barashahebs of my firm. A mine expert.

সরকার। I see—mine-expert. What a mine!

মিঃ সেন। He says that he has been much reduced now-a-days because of the rationing.

সরকার। (চোখ বড় বড় ক'রে লম্বা শিষ টেনে ও'ঠ) God bless him.

মিঃ সেন। ব'সো।

সরকার। হ্যাঁ বসি, তার পর বাড়ীর সামনে রাস্তার ওপর অত খড় বিছিয়ে রেখেছো কেন হে! ব্যাপার কি!

মিঃ সেন। To be or not to be has been the question with Rai Bahadur since yesternight. running very high pressure.

সরকার। এখন কেমন আছেন!

মিঃ সেন। Not good.

সরকার। উঁ···so everything is dull.

মিঃ সেন। Yes, everybody is putting up a very bad show. you can see even Mr. Tomato pulling up a long face and is very much concerned about his old revered friend.

সরকার। Of course.

মিঃ সেন। মুস্কিল,···এদিকে আমার তো চ'লে যেতেই হ'চ্ছে।

সরকার। কোথায়?

মিঃ সেন। দিল্লী।

সরকার। ও সেই যে বলছিলে, right right—কিন্তু···

(কয়েক জন প্রস্থান করবার উত্তোগ করে এগিয়ে আসেন)

মিঃ কাপুর। (হ্যাণ্ড সেক্ করে) Many thanks Mr Sen, you must be very much disturbed to-day.

মিঃ সেন। Oh no. Thank you. Couldn't entertain you properly.

মিঃ কাপুর। No that's all right, don't worry.

মিসেস্ কাপুর। Hallo. (সেনের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক্ করল)
মিঃ কাপুর। (সরকারকে) Hallo.
সরকার। Hallo. (shake hand)
মিঃ কাপুর। (সরকারকে) How do you do.
সরকার। So so. (Shrugged shoulder)
(মিসেস্ কাপুর সরকারের সঙ্গেও হাস্যমুখে হ্যাণ্ডসেক ক'রলেন)
মিঃ কাপুর। Good night Mr. Sirkar.
মিঃ সেন। Good night.
মিসেস কাপুর। Good night everybody.
সরকার। Good night. Good night.

(মিঃ ও মিসেস কাপুরের প্রস্থান)

মিঃ সেন। (সরকারকে) দাঁড়াও পালিও না যেন। কথা আছে।
সরকার। That's all right. You just look to your guests.

(সিগারেট ধরিয়ে কবির পাশে গিয়ে ব'সলো)

(মিঃ সেন অন্যান্য অভ্যাগতদের বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। সকলে যথাসম্ভব সংযত ভাবে নিঃশব্দে হেসে দু'-চারটে কথা বলে নৈশ অভিবাদন জানিয়ে কেটে পড়তে লাগলেন। রইলেন সাবিত্রী দেবী, কবি, মিঃ সরকার ও সুচিত্রা দেবী। সরকার ও কবি ব'সে ব'সে খুব মদ খেতে লাগলো)

কবি। বাপস্, What a rowdism, হাঁপিয়ে গেছি একেবারে।
সরকার। Rowdism, বল কি হে! দিন দিন তুমি যেন কেমন lifeless হ'য়ে প'ড়ছো কবি। কেমন যেন সব সময়ই একটা কোণ মেরে ব'সতে চেষ্টা করো, আগেকার মত জোর দিয়ে হাসতে পার না——these are bad signs undoubtedly. You must not allow yourself to be so very cautious and calculative like, whom should I name—যাকগে আর বদনাম কিনতে চাই না ব'লে —আসল কথা মানায় না যা তা তুমি করবে কেন!···তুমি হাস, আবৃত্তি করো, গান গাও—যা তোমাকে মানায়। কি একটা ···খাও সিগারেট খাও। জোর জোর কটা টান মেরে বেশ খানিকটা ধোঁয়া বার কর দেখি।
কবি। খুব যে মেজাজ দেখছি আজ, ব্যাপার কি?
সরকার। ব্যাপার নতুন কিছুই নয় ভাই। The world is old and round, and I am ever a square peg trying to fit myself in it.
কবি। আগেকার সুরের সঙ্গে এটা তো ঠিক harmonise করছে না, কি রকম যেন একটু আপশোসের মত শোনালো।
সরকার। ভুল ক'রলে, একটু discordant তো শোনাবেই— square peg যে···বুঝতে পারলে না!
কবি। না, ঠিক ধরতে···
সরকার। All right, European theory of Harmonyটা আমি একদিন তোমায় ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেবো। Harmonyর মত জিনিষ আছে পৃথিবীতে!
কবি। বেশ আছো।
সরকার। Always, always, উপায় কি বলো? কারণ আমি যদি নিজেকে বেশ না থাকাই তা হলে···আরে কদর যা দিলে জগৎ তা তো আমি জানি।
কবি। কি রকম, you seem to be very much interesting gradually মিঃ সরকার।
সরকার। কেন, অন্যায় কিছু বলিছি!
কবি। আরে না না, তার পর শুনি দেখি কি রকম কদর দিলে জগৎ···you go on.
সরকার। কি কদর।
কবি। কেন।
সরকার। যাগগে ছেড়ে দাও ভাই, বলিছিই তো—a square peg.
কবি। আবার কি হলো!
সরকার। কিচ্ছু না।
কবি। সে কি।
সরকার। ছেড়ে দাও না ভাই, ও আমার ব্যাপার আমাতেই থাক।
কবি। তো থাক···

(এতক্ষণ ধ'রে বিদায় সম্বর্দ্ধনা সেরে সুচিত্রা দেবীর সঙ্গে কি যেন কথা বলছিলেন একান্তে মিঃ সেন, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন)

মিঃ সেন। থাক্ থাক্ আর থাক্। আরে থাকতে কি আমিই বারণ করিছি। খালি থাক, ছাথ dont get on my nerves সুচিত্রা।
সরকার। (হন্তদন্ত ভাবে) আরে কি হ'লো, কি থাক, সবাই থাক্ থাক্ করছে (মিঃ সেনকে) কি হে থাকবেটা কি!
মিঃ সেন। আশ্চর্য্য!
কবি। কি হলো, সুচিত্রা দেবী? কোথায় কে থাকবে?
মিঃ সেন। থাকবে আমার গুষ্টির পিণ্ডি আর মাথা!

(সুচিত্রা হাসি চাপতে চেষ্টা করে)

যাওয়া, আমার যাওয়া, দিল্লী যাওয়া। আমার দিল্লী যাওয়া থাক। পঞ্চাশ বার ধ'রে কানের কাছে কেবল ঐ এক কথা আওড়াচ্ছে আজ সকাল বেলা থেকে। আরে যেতে কি আমারই খুব ভাল লাগছে!
সরকার। তাই বলো, আমি ভাবলাম বলি—
সুচিত্রা। কি বলছেন আপনি? যেতে বলছেন?
সরকার। কে?
সুচিত্রা। আপনি?
সরকার। কক্ষনও না। আমি যেতেও বলছি না, থাকতেও বলছি না। আরে আমার কি বক্তব্য থাকতে পারে এর মধ্যে। আমি একটা square peg—কি বলো কবি?

(সুচিত্রার প্রস্থান)

কবি। Excuse me please.
মিঃ সেন। আর খেয়ো না কবি। করছো কি!
কবি। করছো কি! আরে আমিও তো তাই বলি, করলুম কি। প্রশ্নটা তো আমারই আছে, এখন উত্তরটি দাও দিকিন—করলুম কি, বুঝি!

মিঃ সেন। ক'রলে যা তা ভালই করলে।

কবি। হ্যাঁ তা ভালই করলুম। ঠিক করলুম না, হ'য়ে পড়লো। অবিশ্যি হ্যাঁ, ঠেকাতে চেষ্টা করিনি, এটা বলা যায়। কিন্তু তাই বা করবো কেন! লাভ! জোর করে, জুলুম করে—I hate the process.

মিঃ সেন। Stop him Sirkar, Dont allow him to take more pegs.

কবি। কেন মিঃ সেন, wine তো আর wife নয়—one feels better when it gets on one's nerves, দাও, আর একটু দাও square peg.

মিঃ সেন। No no.

কবি। বেশ দিও না, চাই না। না দিলে চাইব কেন। অমন লাখ টাকার সম্পত্তিই ছেড়ে দিলাম দিলে না ব'লে, তার… বেশ দিও না, দিতে না চাও দিও না, কেড়ে আমি নোবো না…

(পাশের একটা সোফায় শুয়ে পড়ে)

(সুচিত্রার প্রবেশ)

সুচিত্রা। ঘুমোচ্ছেন ?

মিঃ সেন। ঘুমোচ্ছেন!

সুচিত্রা (সরকারকে দেখে হেসে) আপনি এসেছেন অনেকক্ষণ তা জানি, কিন্তু দেখুন না, এই সাত-তালে কথা বলবারই ফুরসুৎ পাচ্ছি না।

সরকার। No that's all right, that's all right. এই স্বীকৃতিটাই যথেষ্ট ; অনেকে আবার দেখেও ছাখে না কি না!

সুচিত্রা। কি জানি…

সরকার। No, how can you know that সুচিত্রা দেবী ; you are made of different stuff.…আর না জানলেনই বা, কিছু ক্ষতি হবে না।

সুচিত্রা। না ক্ষতি মানে, জানলে পরে তাল রেখে চলবার একটু সুবিধে হয় আর কি!

সরকার। হ্যাঁ তা হয় বটে, কিন্তু আপনার তাতে প্রয়োজন নেই।… কিছু লোক এই জানাজানির বাইরে থাকা ভালো—একেবারে তফাৎ—একটু relieving হয়। আমাদের মত লোক অন্ততঃ তাদের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে শান্তি পেতে পারি।

সুচিত্রা। খুব সম্মান দিচ্ছেন কিন্তু আমায় মিঃ সরকার।

সরকার। No, this is due to you—ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য। আমি বাড়িয়ে অন্ততঃ আপনার নামে ব'লতে যাবো না।

সুচিত্রা। আপনি কিন্তু অনেক ব'দলে গেছেন মিঃ সরকার, কথায় বার্ত্তায়…

সরকার। মনে হচ্ছে ?

সুচিত্রা। হ্যাঁ, কেন আপনার কি মনে হয় আপনি ঠিক তেমনটিই আছেন ?

সরকার। মুস্কিল বলা আমার পক্ষে।…এখন দূর থেকে নিজেকে দেখি এক আয়নায়, তাতে করে পরিবর্ত্তন তেমন একটা কিছু ঘ'টেছে ব'লে তো মনে করিনি, অবিশ্যি সেটা বাহ্যিক। আর ভেতরের হের-ফেরএর কথা যদি বলেন, তার খবর তো শুনি দেবার ন জানছি, আমি তো…সুতরাং ঠিক বলতে পারলাম না।

সুচিত্রা। বেশ তো কথা বলেন আপনি।

(সরকার ও মিঃ সেন একসঙ্গেই যেন কি একটা কথা বলতে চান)

সরকার। হ্যাঁ তা…

মিঃ সেন। ভেতরে…

সরকার। শুনুন মিঃ সেন যেন কি বলতে চাইছেন।

মিঃ সেন। No no, you finish first.

সরকার। কি বলছিলাম…সুতো ছিঁড়ে গেছে, আর হবে না।

মিঃ সেন। (হেসে) সুতো ছেঁড়া-ছিঁড়ির আবার কি ঘটল! (সুচিত্রাকে) যা হোক, বলছিলাম ভেতরে কেমন দেখলে ?

সুচিত্রা। কাকে! বাবাকে! বললুম না ঘুমুচ্ছেন!

মিঃ সেন। ও…কিন্তু ছাখ আমায় কিন্তু যেতেই হচ্ছে সুচিত্রা, উপায় নেই।

সুচিত্রা। ছাখ।

মিঃ সেন। Competitionএর বাজার, বোঝ না! War market তো নয় যে মোটামুটি একটা fair tender পাঠালেই contract পাওয়া যাবে! এখন যেতে হবে, ধরাধরি করতে হবে, বেশ মোটা রকমের ভেট দিতে হবে, বহু ঝামেলা—পরে গেলে আর সে chanceও থাকবে না।

সুচিত্রা। বোঝ, আমার আপত্তি কি! তুমি ছেলে হ'য়ে যদি যেতে পার এই সময়ে, আর বউ হয়ে সেটা কি আমি সইতেই পারবো না…ভাল বোঝ যাও। তবে আমি যাচ্ছি না।

(সাবিত্রীর প্রবেশ)

মিঃ সেন। তোমায় যেতে হবে না, সে আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি। বসুন সাবিত্রী দেবী।…আমি সাবিত্রী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

সুচিত্রা। কে ?

মিঃ সেন। সাবিত্রী দেবী।

সুচিত্রা। তাই না কি! তা বেশ তো।

সরকার। তাই ভাল, একজন থেকে যান।

মিঃ সেন। হ্যাঁ তো ঐ থাকবে, যেটুকু প্রয়োজন বাবার তা তো ওকে দিয়েই হয়। আমার সঙ্গে এমনিতেই তো দেখা হয় ন'মাস ছ'মাস অন্তর ঘটনাচক্রে।

সুচিত্রা। চক্রটা ঘোরেও আবার অদ্ভুত ভাবে কি না! ইচ্ছে ক'রলে তুমি কি আর দেখা করতে পারো না। আসলে you don't feel it.

মিঃ সেন। যাকগে, সে feel করি কি না করি, সে আমি বুঝবো, you need not instruct me that.

সুচিত্রা। আমি তো কিছু বলছি না।

মিঃ সেন। হ্যাঁ।

সরকার। No it is natural Mr. Sen that she will deviate sentimentally কিন্তু তাই বলে you can't…

মিঃ সেন। আহা কি বলিছি কি আমি!

সরকার। No, you shouldn't, souldn't, After all she is a woman.

সাবিত্রী। না ভাবনা সত্যি অমন হয় মিঃ সেন আপনি বোঝেন না। মেয়েদের মন···

মিঃ সেন। আহা সেই জন্তেই তো আমি ওকে রেখে যাচ্ছি, নইলে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবার তো কথা ছিল; বুঝি না কেমন!

সাবিত্রী। না তাই বলছি।

সরকার। হ্যাঁ তাই যাও, তাই যাও। তুমি নিজেই, না কাকে যেন সঙ্গে নেবে বললে, ব্যস—নিয়ে কেটে পড়। এ সব business-এর ব্যাপার—কত রকম eminergency হয়—সব কথা খুলে বলবারই বা তোমার দরকার কি! Rai Bahadurএর অসুখ, তুমি জান। That he is running high blood pressure, which of course God forbid, may prove fatal to him. You know it fully well Inspite of that if you really think that the situation demands your immediate presence in Delhi—well go then. এর ভেতরে আর তো কোন কথা ওঠে না।

সাবিত্রী। হ্যাঁ সেই জন্তেই তো···

সরকার। আপনাকে না, বলুন মিঃ সেন ঠিক বলিছি কি না!

মিঃ সেন। No, you are right, আরে সেই কারণেই তো অনেক করে ব'লে ক'য়ে সাবিত্রী দেবীকে শেষ পর্যন্ত যেতে রাজী করিয়েছি। এখন···বোঝো তো, সবাই সেখানে আসবে···

সরকার। আরে বুঝি বুঝি।···তা বেশ তো, সাবিত্রী দেবী যখন সঙ্গে যাচ্ছেন,···

সাবিত্রী। সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছিলাম, তা আপনি আর শুনলেন কৈ!

সরকার। কেন, এই তো শুনলাম। যাচ্ছেন, ভাল তো। ঘুরে আসুন দিল্লী।···গিয়েছেন এর আগে!

সাবিত্রী। ছোট বেলায় একবার গিয়েছিলাম বাবার সঙ্গে।

সরকার। ও, তা বেশ তো আবার না হয় একবার ঘুরে আসুন। ···আর সুচিত্রা দেবী সেখানে ঠিক তাল রেখে চলতেও পারবেন না। Society-তে মেলামেশা করার তো আর ও'র তেমন অভ্যাস নেই কোন দিন! গেলে বরং উনি হয় তো বিব্রতই বোধ করবেন।···গোল গোল রাস্তা···গোল গোল বাড়ী, গোল হয়ে নাচতে হবে···সে এক অদ্ভুত গোল-মেলে ব্যাপার। আমার তো মনে হয় সুচিত্রা দেবী সে আবহাওয়া সহ্য করতেই পারবেন না।

মিঃ সেন। তা যা বলেছো। এমনিতেই সুচিত্রা যা shy আর stiff.

সরকার। না সে তুমি তাই ব'লে অভিযোগ করতে পারো না মিঃ সেন। সুচিত্রা দেবী shyই হোন্ আর stiffই হোন, if she can't help you in securing contract from Delhi—আমি তো কিছু খারাপ দেখি নে। বরং এতে help করতে পারবেন তোমায় সাবিত্রী দেবী, and she will do it very neatly I believe.

সাবিত্রী দেবী। How do you talk Mr, Sircar!

সরকার। Why, am I wrong in saying so? really I don't think that Suchitra can help him in this matter.

সাবিত্রী দেবী। May be doesn't matter—কিন্তু আমার নামে যে আপনি বলছেন, সাবিত্রী দেবী will help you and that she will do it very neatly—explain? What's your idea?

সরকার। Oh that's not my concern—Mr. Sen will explain that to you.

সাবিত্রী। Expain that to you—don't be silly Mr. Sircar.

সরকার। (shrugged) Well···

সাবিত্রী। I know, I know. Stop it now···mr. Sen!···

মিঃ সেন। Oh don't be shcuting madam, you know Rai Bahadur is seriously ill.

সাবিত্রী। I will leave this house at once.

(ছুটে বেরিয়ে যেতে চায়)

মিঃ সেন। (বাধা দেয়) No no, I can't let you go now. already আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন madam, and I have arranged it accordingly,···(নরম গলায়) yon can't lay me down.

(দাঁত চিপে ভুরু তুলে নিঃশব্দে হাসলো সরকার শেষটায়)

সাবিত্রী। No, Enough, enough of it, চ'লে আমাকে যেতেই হ'বে—এক্ষুনি—এই মুহূর্তে।

মিঃ সেন। আমি—আপনাকে—যেতে—দিতে—পারি—না। I won't.

সাবিত্রী। You won't?

মিঃ সেন। No.

সাবিত্রী। দেবেন না আপনি আমাকে যেতে?

মিঃ সেন। না।

সাবিত্রী। (বসলো ছুটে গিয়ে আবার সোফায়) Well then get into a contract for contract's sake. Come, write and sign. You can't cheat me both ways. Come, write and sign, you coward.

মিঃ সেন। (ছুটে আসে) Yes, for how much, how much money you want, how much···come out you dirty witch.

সাবিত্রী। Fifty thousand.

মিঃ সেন। How much?

সাবিত্রী। Fifty thousand.

মিঃ সেন। O. K. fifty thousand. I could give you more,···all right fifty thousand.

কবি। Fifty thousand! Fifty thousand does not fetch you even fifteen gallons of wine, pooh, ···চাইলে তো অত কম করে চাইলে কেন সাবিত্রী!

সাবিত্রী। You shut up blinking idiot (সেনকে) Now you sign that.

মিঃ সেন। Yes I will sign.

কবি। বল্‌ম, কথাটা শুনলে না, বেশ শুনো না। শুনতে ইচ্ছে না হয়, শুনো না। জোর করে আমি তোমায় শোনাতে যাবো না। কক্ষণ না। I hate the process, জোর করে আমি তোমায়··· (প্রস্থান)

সাবিত্রী। Sign that Mr. Sen.

(হঠাৎ সুচিত্রা ছুটে গিয়ে সেন সাহেবের হাত থেকে কাগজখানা ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে)

সুচিত্রা। সব কিছুরই একটা সীমা আছে।

মিঃ সেন। সুচিত্রা। তুমি এখান থেকে···

সুচিত্রা। চুপ করো তুমি। কথা বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না।

সাবিত্রী। মিঃ সেন, আমি আশা করি আপনি contract sign করবেন।

সুচিত্রা। যেতে হয় আমি যাবো দিল্লী, I will travel even in hell with my husband, but with this vile crooked wretch of a woman···ওঃ, চ'লে এসো তুমি।

(সুচিত্রা স্বামীর হাত ধরে টেনে নিয়ে প্রস্থান করে)

সাবিত্রী। মিঃ সেন।···Coward···coward (থুথু ছিটোয়) coward,

মিঃ সরকার। (হঠাৎ সাবিত্রীর পক্ষ নিয়ে) Coward, away with the contract. Coward···away with the contract, coward.

সাবিত্রী। (কেঁদে ফেলে) Cheat কোথাকার। আমার একেবারে সর্ব্বনাশ করে ছেড়েছে।

মিঃ সরকার। (পেছন থেকে পিঠে হাত বুলিয়ে) চুপ করুন, চুপ করুন সাবিত্রী দেবী। জগৎটাই এই রকম ungrateful, ছিঃ, চুপ করুন।

সাবিত্রী। কে।

মিঃ সরকার। আমি···A son of a bitch—if your remembrance does not fail. I will help you সাবিত্রী দেবী, I will help you.

সাবিত্রী। (আর্ত্তস্বরে) মিঃ সরকার···ও হোঃ মিঃ সরকার, Do help me if you be so kind, do help me.

মিঃ সরকার। কিছু ভাববেন না সাবিত্রী দেবী, শান্ত হোন।

সাবিত্রী। এতটুকু শান্তি নেই, আর আমি শান্ত হবো···আমার মনে যে কি জ্বালা মিঃ সরকার।

মিঃ সরকার। চুপ করুন। চলুন আমরা এখান থেকে চ'লে যাই।

সাবিত্রী। তাই চলুন মিঃ সরকার। মানুষের সমাজ, মানুষের সংসার থেকে আমাকে দূরে, অনেক দূরে নিয়ে চলুন। অনেক দূরে নিয়ে চলুন। (অন্ধকারে পটক্ষেপ)

[দূরত্বটা বোঝাবার জন্ত কয়েকটা পরিবর্ত্তনের ভেতর দিয়ে ষ্টেজের সমস্ত আলোটা একটা ফোকাসে গুটিয়ে নিয়ে মিঃ সরকার ও সাবিত্রীর যাবার পথে অফ্‌ করলে কেমন হয়।] [ক্রমশঃ

জাগ্রত ভারত

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

জেগেছে ভারত উদ্দাম নর্ত্তনে
মুক্তি আনিতে চূর্ণিয়া বন্ধনে।
বন্ধন শত বন্ধন হোক ক্ষয়,
প্রবলের আর দম্ভীর পরাজয়।
জয় আজি শুধু পদ-দলিতের জয়।
জয় আজি শুধু বিপ্লবীদের জয়।
জয় জয় আজ প্রলয়ের হোক জয়।
ভীত ও রিক্ত হোক আজি নির্ভয়।
নির্ভয় হোক কৃষক, শ্রমিক দীন।
দৃপ্ত হউক ক্ষুধায় যাহারা ক্ষীণ।
বস্ত্রবিহীন লজ্জা দলিয়া পায়
(যেন) ভৈরব সম তাণ্ডবে মেতে যায়।

লেগেছে আগুন প্রাণে-মনে সবাকার—
তেজের আগুনে আজি জ্বলে চাবি ধার।
জ্বলে শিশু-প্রাণ তরুণ-তরুণী-প্রাণ,
প্রৌঢ় বৃদ্ধ বৃদ্ধারা জ্বলমান।
বণিক নাবিক সৈনিক জ্বলজ্বল,
কবি ও কর্ম্মী আজি জয়-বিহ্বল।
এ সারা ভারতে এসেছে বন্যা-জল
উদ্দাম ভীম দুর্দ্দম উচ্ছল।
জলতরঙ্গে মত্ত ভারত-জন
ভাঙে বাঁধ, ভাঙে দাসত্ব-বন্ধন।
বোমা, বন্দুক, বিমান আক্রমণ
তুচ্ছ করিয়া জাগে কোটি জনগণ।
এক হ'য়ে যায় রচিত বিভেদ সব—
হিন্দু-মুসলমানের মিলিত রব।
একই বায়ু আর অন্ন একই জল
পায় যারা তারা কেন রবে দুই দল?
গান্ধী শিখায় মিলন-মৈত্রী-গান।
সুভাষ গড়িল মুক্ত দৃপ্ত প্রাণ।
যুক্ত মিলিত ভারতের কোটি লোক
আজি দুর্ব্বার আজি নির্ভয় হোক।
ভয় নাই ওরে ভয় নাই, ভয় নাই।
জাগ্রত প্রাণে কে পারে করিতে ছাই?
ছাই হবে সেই যে তারে হানিবে তীর।
মনে যারা বীর তারা অক্ষয় বীর।
জাগো বীর জাগো, ভারতে জাগাও আজ।
ছিঁড়িতে বাঁধন পরো পরো রণ সাজ।

বৈদিক সভ্যতা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, পৃথিবীতে প্রাচীন কালে যে সকল সভ্যতা বিকশিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি সভ্যতা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন মিশর, বাবিলনিয়া, এসিরিয়া, ক্যাল্ডিয়া, ফিনিশিয়া, কার্থেজ, গ্রীস ও রোমে যে সকল সভ্যতা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, এক্ষণে সে সকল সভ্যতা কোথায়?(১) ঐ সকল প্রাচীন জাতির ধর্ম এখন কোথায়? ঐ সকল স্থানে যে সকল দেবতার পূজা হইত এক্ষণে সে সকল দেবতার পূজা কেহই করে না। অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের ভাষা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছে। সেই সকল স্থানে যে সকল শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, আধুনিক বিদ্বান্‌গণ বহু পরিশ্রম করিয়া সেই সকল শিলালিপির পাঠ এবং অর্থ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহা হইতে দেখা যায় যে, তাহাদের রাজ্য কত বিশাল ছিল, তাহারা কত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল এবং শিল্প ভাস্কর্য্য প্রভৃতি বিষয়ে তাহারা কত দূর উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

বিবিধ প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিয়া বিদ্বান্‌গণ স্থির করিয়াছেন যে, যেমন মানবের জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যু হয় সেইরূপ সভ্যতারও বৃদ্ধি ও মৃত্যু হয়। অনেক মনীষী এরূপ আশঙ্কা করিতেছেন যে পৃথিবীর অনেক প্রাচীন সভ্যতা যেরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতাও কি সেইরূপ বিলুপ্ত হইবে? বৈজ্ঞানিক উন্নত প্রণালীর অস্ত্রশস্ত্রে যেরূপ অজস্র মানব, অট্টালিকা, নগর প্রভৃতির ধ্বংস হইতেছে, আধুনিক সুসভ্য জাতির মধ্যে যেরূপ প্রবল শত্রুতা দেখা যায়, বার বার বিশ্বব্যাপী সংগ্রামে যে ভাবে আধুনিক সভ্যতা বিধ্বস্ত হইয়াছে, পরমাণু-বোমার দ্বারা যেরূপ ভীষণ হত্যালীলার সম্ভাবনা হইয়াছে, এই সকল ব্যাপার আলোচনা করিয়া অনেকেই ভাবিতেছেন বুঝি আধুনিক সভ্যতার অন্তিম সময় উপস্থিত হইয়াছে। এমন এক সময় ছিল, যখন বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার সকলের ফলে পাশ্চাত্য জাতিগণ ভাবিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞানের কৃপাতেই মানব জাতির উদ্ধার হইবে এবং পাশ্চাত্য জাতির অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তি বিজ্ঞানের একান্ত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু যে বিজ্ঞানকে এক সময়ে মানব জাতির উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া উপাসনা করা হইয়াছিল, সেই বিজ্ঞানই এক্ষণে মানব জাতির ধ্বংসকর্ত্তারূপে আবির্ভূত হইয়াছে। বিজ্ঞানের চর্চ্চা যে মন্দ তাহা বলা যায় না। বিজ্ঞান ভাল ভাবেও ব্যবহার করা যায়, মন্দ ভাবেও ব্যবহার করা যায়। ভোগের আকাঙ্ক্ষা এবং প্রভুত্ব করিবার প্রবৃত্তি মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। সেই প্রবৃত্তি সংযত রাখিতে না পারিলে মানব বিজ্ঞানের সাহায্যে বিলাসের উপকরণ এবং মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিবে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সকল সংযত রাখা হয় নাই। এ জন্য পাশ্চাত্য জগতে বিজ্ঞানের অপব্যবহার হইয়াছে। তাহার ফল এত ভয়ঙ্কর হইয়াছে যে, রোমাঁ রোলাঁ বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য জগৎ একটি আগ্নেয়গিরির গহ্বরের মুখের নিকট বসিয়া আছে, এবং সেই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত আসন্নপ্রায়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, অন্য সভ্যতার তুলনায় বৈদিক সভ্যতা আশ্চর্য্য জীবনীশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছে। ৺বালগঙ্গাধর তিলক এবং জেকোবি (Jacobi) নামক পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্বতন্ত্র ভাবে জ্যোতিষিক গণনার দ্বারা বেদের তারিখ খৃঃ পূঃ ৬০০০ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঋক্‌বেদের মন্ত্রে তারকা সকলের এরূপ সন্নিবেশের উল্লেখ আছে যাহা খৃঃ পূঃ ৬০০০ সালে হইয়াছিল, তাহার পরে আর হয় নাই। ইহা হইতে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ বৈদিক মন্ত্র খৃঃ পূঃ ৬০০০ সালে রচিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে তারকা সকলের ঐরূপ সন্নিবেশ প্রতি ২৬০০০ বৎসরে একবার করিয়া হয়(২) এবং খৃঃ পূঃ ৬০০০ বৎসরের পরে ঐরূপ সন্নিবেশ না হইলেও পূর্ব্বে বহু বার হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ (৬০০০+২৬০০০) অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৩২০০০ সালে ঐরূপ সন্নিবেশ হইয়াছিল, খৃঃ পূঃ (৬০০০+২× ২৬০০০) বা খৃঃ পূঃ ৫৮০০০ সালেও হইয়াছিল। সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত যে, ঐ বৈদিক মন্ত্র খৃঃ পূঃ ৬০০০এর পরে রচিত হয় নাই, পূর্ব্বে হইতে পারে। অর্থাৎ বৈদিক সভ্যতা অন্ততঃ ৮০০০ বৎসর প্রাচীন। সুতরাং বৈদিক সভ্যতা পৃথিবীর অন্য সভ্যতা হইতে প্রাচীন। অন্য সকল সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার পরে উৎপন্ন হইয়াও বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বৈদিক সভ্যতা এখনও জীবিত। এখনও হিন্দুরা বেদ আবৃত্তি করে, পাঠ করে, ব্যাখ্যা করে, প্রতিদিন সন্ধ্যা উপাসনার সময় বেদমন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। মন্দিরে দেবতার উপাসনার সময়, জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুসংক্রান্ত ধর্মকার্য্যে বেদমন্ত্র ব্যবহার হয়। বস্তুতঃ, এখনও সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুর বেদই ভিত্তি।

কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, এক্ষণে ভারতে পৌরাণিক ধর্মই প্রচলিত, বৈদিক ধর্ম নহে। তাঁহারা মনে করেন যে, বৈদিক ধর্ম ও পৌরাণিক ধর্ম এক নহে। ইহা কিন্তু তাঁহাদের বুঝিবার ভুল। বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মের বাহ্য অভিব্যক্তিতে কিছু কিছু প্রভেদ দেখিয়া তাঁহারা ভ্রান্ত হইয়াছেন, উভয়ের মধ্যে মূলগত ঐক্য তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই। বৈদিক তত্ত্ব সকল সর্বসাধারণের মধ্যে সহজ ভাবে প্রচার করিবার জন্যই বেদজ্ঞ ঋষিগণের দ্বারা পুরাণ, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এ জন্য মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, বেদের অর্থ নিশ্চয় ভাবে বুঝিবার জন্য রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ সকল পাঠ করা উচিত(৩)। ভাগবত বলিয়াছেন যে, স্ত্রীগণ, শূদ্রগণ এবং যাঁহারা দ্বিজাতি হইয়াও বেদপাঠ করেন নাই, তাঁহাদের প্রতি কৃপা বশতঃ বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, কারণ মহাভারত পাঠ করিয়া তাঁহারা বেদের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন(৪)। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ পাঠ করিয়া

---

(১) "Chaldea, Persia, Egypt, Greece and Rome have perished, mighty as once they were, far reaching in empire, splendid in achievement. India which was their contemporary has out lived them all."—Dr. Annie Besant.

(২) The pole of the Equator completes a circle about the pole of the Ecliptic once in 26,000 years.

(৩) ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদার্থমুপবৃংহয়েৎ।

(৪) স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতং॥

—ভাগবত ১।৪।২৫

বেদের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায়, এ জন্ম এই গ্রন্থগুলিকে পঞ্চম বেদ বলা হয় (৫)। প্রত্যেক পুরাণেই বেদের শ্রেষ্ঠ-প্রমাণত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, বৈদিক যজ্ঞকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বৈদিক নীতি সকল উল্লেখ ও সমর্থন করা হইয়াছে। বৃক্ষ ও বীজের মধ্যে যে সম্বন্ধ, পুরাণ ও বেদের মধ্যে সেই সম্বন্ধ। বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, বীজ ও বৃক্ষ দুইটি বিভিন্ন বস্তু, কিন্তু যিনি সূক্ষ্মদ্রষ্টা তিনি জানেন যে উহাদের মধ্যে প্রভেদ নাই—বীজের মধ্যেই বৃক্ষ লুক্কায়িত আছে। সেইরূপ বাহ্যমূর্ত্তিতে অভিনিবিষ্ট পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করিতে পারেন যে, বেদ ও পুরাণ বিভিন্ন ধর্ম প্রতিপাদন করিতেছে, কিন্তু যাঁহারা ধর্মের অন্তর্নিহিত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে বৈদিক ধর্ম হইতেই পৌরাণিক ধর্ম বিকশিত হইয়াছে। যে ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব বেদে বীজ আকারে বিদ্যমান আছে তাহাই পুরাণে পত্র-পুষ্প-ফল আকারে শোভা পাইতেছে। ব্যাস ও বাল্মীকি, শঙ্কর ও রামানুজ, চৈতন্য ও তুলসীদাস প্রভৃতি মহাত্মাগণের ইহাই মত।

বৈদিক সভ্যতা যে এখনও জীবিত আছে, এ বিষয়ে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিলে তাহার উত্তরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেই যথেষ্ট হইবে। রামকৃষ্ণ প্রায় নিরক্ষর ছিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাঁহার পিতামাতা ও আত্মীয়গণের নিকট, সাধু-সন্ন্যাসিগণের নিকট এবং যাত্রা গান ও কথকতা হইতে। ভারতীয় সভ্যতা ভিন্ন অন্য কোনও সভ্যতার প্রভাব তাঁহার উপর পড়ে নাই। তিনি পৌরাণিক মতে কালীমাতার উপাসনা করিয়াছিলেন এবং বৈদিক মতে উপনিষদের অদ্বৈত-তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার উভয় চেষ্টাই সম্পূর্ণ ভাবে সার্থক হইয়াছিল। তিনি যে সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন ইহা কেবল তাঁহার স্বদেশবাসী হিন্দুর উক্তি নহে, বিদেশবাসী পণ্ডিত ও দার্শনিকগণও ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ভারতে আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তির রামকৃষ্ণই একমাত্র নিদর্শন নহেন। তাঁহার কিছু পূর্বে রামপ্রসাদ সেনের আবির্ভাব হইয়াছিল, যে রামপ্রসাদের নিকট হইতে রামকৃষ্ণ তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ মা কালীকে আহ্বান করিয়া প্রায়ই বলিতেন, "মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়াছিলি, আমাকে দেখা দিবি না কেন?" কাশীর তৈলঙ্গ স্বামী ও ভাস্করানন্দ, বৃন্দাবনের রামদাস কাঠিয়া বাবা, বাঙ্গলার বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বামা ক্ষেপা ও পাগল হরনাথ দক্ষিণ-ভারতের রমণ মহর্ষি—সকলেই রামকৃষ্ণের সমকালে বা কিছু পরেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে রামকৃষ্ণের ন্যায় খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই তাহার প্রধান কারণ এই যে বিবেকানন্দের ন্যায় মনীষাসম্পন্ন শিষ্য তাঁহাদের ছিল না। পূর্বোল্লিখিত সাধু-মহাত্মা ভিন্ন আরও অনেক তত্ত্বদর্শী সাধু ছিলেন, যাঁহাদের সম্বন্ধে জগৎ কিছু জানিতে পারে নাই, কারণ, তাঁহারা লোকচক্ষুর অগোচরে কোনও অরণ্য বা পর্বতে থাকিয়া সাধনা করিয়াছিলেন।

এরূপ মনে করা ভুল হইবে যে আধুনিক যুগে বৈদিক সভ্যতা কেবল ধর্ম-জগতেই পৃথিবী-বিখ্যাত ব্যক্তি সকল প্রসব করিতে সমর্থ হইয়াছে। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, জে সি বোস পি সি রায় ও সি ভি রমণ নেতারূপে, কবিরূপে ও বৈজ্ঞানিকরূপে আধুনিক জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলে অমিশ্র বৈদিক সভ্যতার সমর্থক না হইতে পারেন, কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহারা যে প্রতিভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা বৈদিক সভ্যতারই অবদান; কারণ, তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ বহু শতাব্দী ধরিয়া বৈদিক সভ্যতার মধ্যেই জীবন যাপন করিয়াছিলেন এবং বিবাহ ও আচারে বর্ণাশ্রম-ধর্মের নিয়ম সকলই পালন করিয়াছিলেন। ইহাও সত্য নহে যে, বৈদিক সভ্যতার ফলে কয়েক জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আবির্ভাব হইলেও ইহা জনসাধারণের মানসিক উন্নতি বিধানে সমর্থ হয় নাই। এ বিষয়ে গান্ধীজীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যায়। তিনি বলিয়াছেন—"স্যর টমাস মনরোর সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, এবং আমি সেই সাক্ষ্য সমর্থন করিতেছি যে ভারতের জনসাধারণ পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের জনসাধারণ অপেক্ষা সংস্কৃতি হিসাবে উন্নততর"—(৮।৪।২১ তারিখে মাদ্রাজে সমুদ্রতটে প্রদত্ত বক্তৃতা)। রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছেন—"দেশের বিভিন্ন অংশের সকল অবস্থার লোকচরিত্র যত্নপূর্বক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমার এইরূপ বিশ্বাস হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ নগর এবং আইন আদালত হইতে দূরে বাস করে তাহাদের চরিত্র যেরূপ নির্দোষ ও সংযত, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের লোক-চরিত্র সেরূপ নহে"—(Mr. P. N. Bose প্রণীত National Education and Modern Progress নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত)। কোনও সভ্যতার উৎকর্ষ তাহার বৈজ্ঞানিক বা সাহিত্যিক কীর্ত্তির উপর নির্ভর করে না, ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের দ্রব্য দ্বারা তাহার পরিমাণ করা যায় না। জনসাধারণ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে কত দূর উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে প্রধানতঃ তাহার দ্বারাই সভ্যতার উৎকর্ষ নির্দ্ধারিত হয়। ভারতের নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যেও ধর্মভাব যেরূপ বিস্তৃত, নৈতিক আদর্শ যেরূপ উন্নত, পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও সেরূপ দেখা যায় না। এবং এ জন্যই বৈদিক সভ্যতা যেরূপ দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়াছে পৃথিবীর অন্য কোনও সভ্যতা সেরূপ দীর্ঘকালস্থায়ী নহে।

---

(৫) ইতিহাসপুরাণং চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে।
—ভাগবত ১।৪।২০

এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন,—
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝনে না যায়।
পুরাণবাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয়॥
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৬ পরিচ্ছেদ

চণ্ডীদাসের নির্গুণ কানু

শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী

পৃথিবীর কোলাহল হইতে দূরে বসিয়া বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক কবি চণ্ডীদাস যে স্থানে বসিয়া রাধাকৃষ্ণের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যে স্থানের প্রতি ধূলিকণায় চণ্ডীদাসের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত, যে স্থানে চণ্ডীদাসের প্রাণের নিবিড় ব্যথার সুর চিরতরে গাঁথা রহিয়াছে সমস্ত বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে, সেই স্থানের নাম নান্নুর। এবং এই সিদ্ধপল্লী নান্নুর বাঙ্গালীর চির আদরের বস্তু। চণ্ডীদাস এক জন খাঁটা বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তিনি যে ভাবে ভাবিত হইয়াছেন, সে সকলের ভিতরেই যেন বাঙ্গালার মূর্ত্তিটি পূর্ণ ভাবে ভাসিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালার জল-বায়ু, বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস তরু-লতা, পুকুর-ঘাট, তাহার স্নেহময় শ্যামাঞ্চল এই সকলই একটি বিশেষ রূপ। চণ্ডীদাসকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, তাঁহার ভাবের পশ্চাতে যে উপনিষদের এক বিস্তৃত বিরাট নির্গুণ সাধনার ইতিহাস আছে তাহার আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখা দরকার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চণ্ডীদাস এক জন খাঁটা বাঙ্গালী কবি ছিলেন। বাঙ্গালী তাঁহাকে কবি বলিয়াই জানে, কিন্তু তাঁহার রাগাত্মিক পদগুলি বিচার করিলে দেখা যায়, তিনি দার্শনিক এবং যোগীও ছিলেন ; এইরূপ একাধারে এই তিন বিষয়ে পারদর্শিতা প্রায় দেখা যায় না। বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাসকে চিনিলেও দার্শনিক বা যোগী চণ্ডীদাসকে অতি অল্প ব্যক্তিই জানেন। যোগী চণ্ডীদাসের বিষয় (১৩৫০ মাঘ) মাসিক বসুমতী পত্রিকায় সহজ সাধন প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি, এক্ষণে দার্শনিক চণ্ডীদাসের বেদান্ত-সাধনার চরমাদর্শ নির্গুণ কানু বা ব্রহ্মবাদের বিষয় আলোচনা করিতেছি।

চণ্ডীদাসের নির্গুণ কানু যে বেদান্তের ব্রহ্ম, তাহা তাঁহার রাগাত্মিক পদগুলির ভিতরে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়! বাঙ্গালা দেশের সাধক-সম্প্রদায়ে উপাসনায় দার্শনিক-তত্ত্বের বিশ্লেষণ অপেক্ষা অনুষ্ঠানের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার ভাবই বেশী দেখা যায়। বাঙ্গালী সাধক-সম্প্রদায় মনে করেন, উপাসনা-ক্রিয়ায় অনুষ্ঠানের অনুশীলন হইতেই ক্রমশঃ দার্শনিক-তত্ত্বের উচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিয়া সাধনার অন্তর্নিহিত অপরোক্ষ অনুভূতি গুরুতত্ত্ব লাভ করিতে পারা যায়। এই জন্য তাঁহারা তর্ক-যুক্তির দিকে অগ্রসর না হইয়া সাধন-ভজনের অনুষ্ঠান দ্বারাই দার্শনিক-তত্ত্বের চরম সীমা নির্গুণ ব্রহ্মবাদে পৌছিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস বাঙ্গালার কান্তভাবকে লইয়া তাঁহার কাব্যের শেষ পরিণতি সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় পৌছিলেও নির্গুণ ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে বিশেষ জোর দিয়াছেন। বেদান্ত সাহিত্য ও সাধনা চণ্ডীদাসের প্রতিভার বিশিষ্ট দান। নির্গুণ ব্রহ্মবাদ যে বাঙ্গালী-প্রতিভার বিরোধী নয় তাহা তাঁহার পদগুলি আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায়। চণ্ডীদাসের সময় হইতেই বাঙ্গালায় অদ্বৈত-বেদান্ত মত বিশেষ ভাবে প্রচারিত হয়।

চণ্ডীদাসের কানু যে নির্গুণ এবং নিরাকার তত্ত্ববস্তু তাহা তাঁহার রচিত পদে পাওয়া যায়। যথা—

প্রশ্ন :— শুন সহচরি না কর চাতুরী
সহজে দেহ উত্তর।
কি জাতি মূরতি কানুর পীরিতি
কোথায় তাহার ঘর॥
চলে কি বাহনে টিকে কোন্ স্থানে
সৈন্যগণ কেবা সঙ্গে।
কোন্ অস্ত্র ধরে পারাপার করে
কেমনে প্রবেশে অঙ্গে।
পাইয়া সন্ধান হব সাবধান
না লব তাহার বা।
নয়নে শ্রবণে বচনে ত্যজিব
সোঙরি তাহার পা॥

উত্তর :—
সখী কহে সার দেখি নিরাকার
স্বরূপ কহিবে কে।
অনুরাগ-ছুরি বৈসে মনোপরি
জাতির বাহির সে॥
মন তার বাহন রক্ষক মদন
ভাবগণ তার সঙ্গী।
সুজন পাইলে না দেয় ছাড়িয়ে
পীরিতি অদ্ভুত রঙ্গী॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী-আদেশে
ছাড়িতে কি কর আশ।
পীরিতি-নগরে বসতি করেছ
পরেছ পীরিতি-বাস॥

উপরোক্ত পদে কানুর পীরিতি যে নিরাকার এবং নির্গুণ, ভাবের দ্বারা যে তাঁহাকে পাওয়া যায় তাহা বলা হইয়াছে। অপর একটি পদেও আছে :—

দোসর ধাতা পীরিতি হইল সেই বিধি মোরে এতেক কইল
চণ্ডীদাস বলে সে ভাল বিধি এই অনুরাগে সকল সিধি।

উক্ত পদে চণ্ডীদাস তাঁহার দোসর অর্থাৎ নিত্যসঙ্গী ধাতা অর্থাৎ পরমাত্মাকেই পীরিতি বলিতেছেন। আর তাঁর প্রতি অনুরাগ হইলে সিধি অর্থাৎ সমস্তই সিদ্ধ হইয়া থাকে। পরন্তু এই নির্গুণ কানু কিরূপে লাভ হয় তাহার উপায়ও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার একটি পদে আছে—

মনের সহিত— যে করে পীরিতি
তারে প্রেম কৃপা হয়।
সেই যে রসিক— অটল রূপের
ভাগ্যে দরশন পায়॥

মনের সাধনা যিনি করেন তাঁহারই সচ্চিদানন্দস্বরূপ প্রেমপ্রাপ্তি ঘটে। এবং সেই রসিক সাধকই পরিণামে অটল অর্থাৎ স্থির, নিত্য কূটস্থ তত্ত্ববস্তুর দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করেন। চণ্ডীদাসের একটি পদে আরও দেখিতে পাই—

মনের সহিত পীরিতি করিয়া থাকিবে স্বরূপ আশে।
স্বরূপ হইতে অরূপ পাইব কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

মনের সাধনায় স্বরূপতত্ত্ব লাভ হয় আর এই সগুণ স্বরূপতত্ত্বে সাধক মনের লয় করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিজ অটল অর্থাৎ স্থির, নিত্য কূটস্থ নির্গুণ অরূপতত্ত্বে উপনীত হন। চণ্ডীদাসের অন্য পদেও আছে—

১। এ মতি করিয়া সুমতি হইয়া রহিব স্বরূপ আশে
স্বরূপ প্রভাবে সে রূপ মিলিবে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে।
২। স্বরূপ বিহনে রূপের জনম কখন নাহিক হয়।

প্রকৃতি হইতেছে সেই নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ শক্তি, এবং তাঁর এই স্বরূপ শক্তি হইতেই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় কাণ্ড ঘটিতেছে। আর রূপের জন্মও এই স্বরূপ শক্তি দ্বারাই সংঘটিত হয়। সাধক যদি এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি অর্থাৎ স্বরূপ শক্তি কুণ্ডলিনীতে মনের লয় করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি পরম ব্রহ্ম নিরাকার স্বরূপের দর্শন করিয়া ধন্য হন। উক্ত পদের ইহাই তাৎপর্য্য। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে দুই প্রকার ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে। যথা :—

ধ্যানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং স্বরূপারূপভেদতঃ।
অরূপং তত্র যদ্ধ্যানমবাঙ্মনসগোচরম্।
অব্যক্তং সর্ব্বতো ব্যাপ্তমিদমিত্থং-বিবর্জ্জিতম্।
অগম্যং যোগিভির্গম্যং কৃচ্ছ্রৈর্বহুসমাধিভিঃ॥

স্বরূপ ও অরূপ ভেদে ধ্যান দ্বিবিধ। স্বরূপ ধ্যান সবিকল্প এবং অরূপ ধ্যান নির্ব্বিকল্প সমাধির নামান্তর মাত্র। এই অরূপ ধ্যানই চণ্ডীদাস-কথিত অটল রূপ। নির্ব্বিকল্প অরূপ ধ্যানেতেই (অবাঙ্মনস-গোচরং) পরম তত্ত্ব লাভ হয়। যোগী ব্যক্তি বহু কষ্টে বহু সমাধি প্রয়োগ করিয়া এই অব্যক্ত অটল অরূপ বা নিরাকার তত্ত্বে উপনীত হয়েন। এই তত্ত্ব সম্বন্ধে বেদে যেমন বলা হইয়াছে (যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ) অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব। সেইরূপ চণ্ডীদাসও এই তত্ত্বকে অনির্ব্বচনীয় বলিতেছেন। যথা—

যে বা জন জানে—কহিতে না পারে গুমরে গুমরে সেহ।
সে আপনার গুণে—তরিল আপনে তাহারে তরাবে কেহ॥

যেমন সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মের নির্গুণত্বকে প্রধান করিয়া বলা হইয়াছে—তৎ সদাসীৎ—অস্থূল—অ-অণু অর্থাৎ ব্রহ্ম সং স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, তিনি নির্গুণ, সেইরূপ চণ্ডীদাসও বলিয়াছেন। যথা—

আর এক শুন—পরম নির্গুণ
তিনের উপরে তিন
অটল পরেতে এই পদগুরু মর্ম্ম—
চণ্ডীদাস লেখে ব্যক্ত আপনার ধর্ম্ম॥

উপরোক্ত পদে চণ্ডীদাস যাহা বলিয়াছেন তাহাতে মনে হয় তাঁহার সাধনার ধন তত্ত্ববস্তু নির্গুণ ও অটল। এই নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বই চণ্ডীদাসের পীরিতির স্বরূপ। যিনি এই নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন, চণ্ডীদাস তাঁহাকে রসিক বলিতেছেন। চণ্ডীদাস যে তাঁহার নির্গুণ কানু বা ব্রহ্মেরই উপাসনা করিতেন তাহা তাঁহার নিম্নোক্ত পদে সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন। চণ্ডীদাস বলিতেছেন যথা—

সত্ত্ব রজ তম না থাকে যাতে
চণ্ডীদাসের মন হরল তাতে।

যাহাতে সত্ত্ব রজ তম গুণ নাই সেই ত্রিগুণাতীত নির্গুণ কানু বা ব্রহ্মই চণ্ডীদাসের মনকে হরণ করিয়াছে। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে যে ত্রিগুণাতীত নিরাকার পরম ব্রহ্মতত্ত্বের অনুভূতি হয়, সে সম্বন্ধেও চণ্ডীদাস যাহা বলিয়াছেন তাহা বেদান্তেরই অনুরূপ। বেদান্তে যে ব্রহ্মকে অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্ বলা হইয়াছে, সেইরূপ চণ্ডীদাসের পদেও দেখিতে পাই। চণ্ডীদাস বলিতেছেন, যথা—

সখী কহে সার—দেখি নিরাকার স্বরূপ কহিবে কে
অনুরাগ-ভূমি—বসে মনোপরি জাতির বাহিরে সে।

চণ্ডীদাসের এই নিরাকার নির্গুণ কানু জাতির বাহির। জাতি শব্দের অর্থ করিতে গিয়া শব্দশাস্ত্রে বলা হইয়াছে (আকৃতি গ্রহণাৎ জাতিঃ) যাহার আকৃতি আছে তাহারই জাতি আছে,—যেমন গরু আকৃতি-বিশিষ্ট গো-জাতি, মানব আকৃতি-বিশিষ্ট মানুষ জাতি, কিন্তু নির্গুণ কানু বা ব্রহ্ম জাতির বাহির; বিশেষতঃ তাঁহার কোন আকার নাই, নিরাকারই তাঁহার স্বরূপ। বেদান্তশাস্ত্রাদিতে যেমন বলা হইয়াছে, সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন, সেইরূপ চণ্ডীদাসও বলিতেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া—আছয়ে যে জন কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পীরিতি—যে জন জানয়ে সেই সে পাইতে পারে॥

নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তিবিষয়ে বেদান্তশাস্ত্রে কয়েক প্রকার অধিকারীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে উত্তম অধিকারীই ব্রহ্মের চৈতন্যময় স্বরূপের উপলব্ধি করিয়া বাঁচিয়া থাকিতেই জীবন্মুক্ত দশা প্রাপ্ত হন: সেইরূপ চণ্ডীদাসও নির্গুণ কানু প্রাপ্তি-বিষয়ে উত্তম অধিকারীর কথা বলিয়াছেন। যথা—

নৈষ্ঠিক হইয়া ভজন করিলে
পদ্ধতি সাধক কয়।
পদ্ধতি হইয়া— রস আস্বাদিয়া
নৈষ্ঠিকে প্রবৃত্ত হয়।
তাহার চরণ— হৃদয়ে ধরিয়া
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥

শাস্ত্রে দুই প্রকার ব্রহ্মচারীর বিষয় উক্ত হইয়াছে। এক, উপকুর্ব্বাণ, দ্বিতীয়, নৈষ্ঠিক। যাঁহারা বিবাহাদি করিয়াও নিয়ত ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদিগকে উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী কহে, আর যাঁহারা বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগের অভ্যাস করেন তাঁহাদিগকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে। এই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীই ব্রহ্মজ্ঞান লাভে উত্তম অধিকারী; উপরোক্ত পদের ইহাই তাৎপর্য্য।

যে ব্যক্তি উত্তম অধিকারী নয় তাহার সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করা কর্ত্তব্য, ইহা শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্য স্বামী বলেন, না, সকলেরই নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। যদি বলি নির্গুণ ব্রহ্ম ত বাক্য এবং মনের অগোচর, তাহার উপাসনা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তাহা হইলে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার অনুভবও সম্ভবপর নয়। যদি তাঁহাকে জানা যায় ইহা সম্ভবপর হয়, তাঁহার উপাসনা কেন সম্ভবপর হইবে না? যেহেতু নির্গুণ ব্রহ্মকে জানা যায়, ইহা উপনিষদাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বিদ্যারণ্য স্বামীর এই কথার উপর নির্ভর করিয়া চণ্ডীদাসের নির্গুণ কানু বা ব্রহ্মের উপাসনার স্বীকৃতি পাওয়া যাইতেছে। আর উত্তরতাপনীয় উপনিষদ, প্রশ্নোপনিষদ, কঠোপনিষদ, ছান্দোগ্যোপনিষদ, মাণ্ডুক্যোপনিষদাদি বহু শ্রুতিতেই নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার কথা আছে। চণ্ডীদাস যেমন নির্গুণ ব্রহ্মকে কানু বলিয়া ডাকিয়াছেন। সেইরূপ জৈন সাধক চিদানন্দ এবং আনন্দঘনও নিজের উপাস্য নির্গুণ ব্রহ্মকে শ্যাম, শ্যামসুন্দর, কনহিয়া প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন। এমন কি, মধ্যযুগীয় সাধকদের পদাবলীতে দেখা যায়, নির্গুণ পরমাত্মার উপর সম্বোধনসূচক বহু শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব চণ্ডীদাস যে নির্গুণ কানু বা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক ছিলেন ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।



২০

দি গুড্ আর্থ

শিশির সেনগুপ্ত

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

যত দিন না সমস্ত রূপো নিঃশেষিত হোত তত দিন হয়ত এই ভাবেই চলত। এমন সময় কোথায় ছিলেন, কি করতেন না জানিয়ে হঠাৎ এক দিন ওয়াঙের খুড়ো এসে উপস্থিত। যেন আকাশ থেকে পড়েছেন এমনি ভাবে এসে তিনি দাঁড়ালেন দোর-গোড়ায়। গায়ে চিরদিনের মতই ছেঁড়া, বোতাম-খোলা, ঢল্‌ঢলে জামা। আগের মতই মুখের চামড়া কুঞ্চিত, তবে আগের চেয়ে রোদে-জলে আরো বেশী রুক্ষ হয়ে উঠেছে। সবাই তখন প্রাতরাশের জন্য একটি টেবিলের চারি পাশে গোল হয়ে বসেছে। খুড়ো দাঁত বের করে তাকালেন তাদের দিকে। ওয়াঙ হাঁ করে বসে রইল। সে ভুলেই গিয়েছিল যে তার কাকা এখনও বেঁচে আছেন। যেন এক জন মৃত ব্যক্তি ফিরে এসেছে তাকে দেখতে। তার বুড়ো বাপ চোখ পিটপিট করতে লাগলেন। যতক্ষণ না খুড়ো মুখ খুললেন ততক্ষণ তিনি চিনতেই পারলেন না, কে সে।

—'এই যে আমার ভাই, ভাইপো, নাতি-নাতনীরা আর বৌমা।'

ওয়াঙ উঠে দাঁড়াল। অন্তরে অন্তরে অসন্তুষ্ট হলেও মুখে আর ভাষায় সৌজন্য দেখাল।

—'আপনি খেয়েছেন?'

—'না'—সহজ কণ্ঠে উত্তর দিলেন তিনি—'কিন্তু আজ তোমাদের সঙ্গে খাব।'

তার পর তিনিও বসে গেলেন—একটা বাটি, ভাতের কাঠি টেনে নিয়ে বিনা দ্বিধায় খেতে লাগলেন ভাত, শুকনো নুণ-মাখান মাছ, গাজর আর কড়াইশুঁটি। অভ্যস্ত বুভুক্ষুর মত খেতে লাগলেন তিনি। যতক্ষণ না তিন বাটি পাতলা ভাতের মণ্ড সাবাড় করলেন সশব্দে, মাছের কাঁটা আর মটরদানা চটপট চিবিয়ে উদরসাৎ করলেন, ততক্ষণ কেউ কোন প্রশ্নই করলে না তাঁকে। খাওয়া শেষ হলে ও তিনি বললেন যেন এ তার পাওনা—

—'এবার চাই ঘুম। তিন রাত্রি ঘুমোয়নি'।

হতবুদ্ধি ওয়াঙ কি যে করবে ভেবে না পেয়ে খুড়োকে নিয়ে গেল তার বাপের বিছানায়। তিনি লেপ তুলে তার দামী কাপড় আর টাটকা তুলা পরীক্ষা করলেন, দেখলেন চেয়ে চেয়ে কাঠের খাট, ভাল টেবিল আর বড় চেয়ারটা—যেটাকে ওয়াঙ কিনেছে তার বাপের জন্য। তার পর বললেন—'তোমার টাকার কথা শুনেছি আমি। কিন্তু যে এত টাকা হয়েছে ভাবিনি।' এই বলে বিছানার উপর সটান শুয়ে বুক অবধি লেপটাকে টেনে দিলেন যদিও তখন গরম কাল। তিনি এমনি ভাবে ব্যবহার করতে লাগলেন যেন প্রত্যেকটি জিনিষ নিজের। আর বাক্যব্যয় না করে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

বিষম আতঙ্কে ওয়াঙ ফিরে এল মাঝের ঘরে। কারণ সে ভাল করেই জানে যে, খুড়োকে আর কোন মতেই তাড়িয়ে দেওয়া যাবে না যখন তিনি বুঝেছেন তাকে খাওয়ানর মত সংগতি আছে এদের। এ সব কথার সঙ্গে খুড়ীমার কথাও মনে পড়ে যায় ওয়াঙের। তারাও সব শুদ্ধ আসবেন এখানে—কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

যা সে ভয় করেছিল ঘটলও তাই। দুপুর গড়িয়ে যাওয়া অবধি খুড়ো ঘুমোলেন। তার পর তিন বার সশব্দে হাই তুলে জামা-কাপড়

ঠিক করে, গা' মোড়াতে মোড়াতে বাইরে এলেন। ওয়াঙকে ডেকে বললেন—'এবার বৌকে আর ছেলেকে আনব। মাত্র তিনটি হাঁ ভরাতে হবে। তোমার এই বিশাল বাড়ীতে যত খারাপই খাই, যত খারাপই পরি না কেন তার অভাব হ'বে না নিশ্চয়ই।'

শুধু বিমর্ষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা ছাড়া ওয়াঙের আর করবার কিছুই নেই। ঘরে যখন খাবার বাড়তি তখন বাপের নিজের ভাই আর তার বৌ-ছেলেকে বাড়ী থেকে তাড়ান অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। ওয়াঙ জানে, সে যদি এ কাজ করে সারা গ্রামে টী-টী পড়ে যাবে। টাকার জন্ত গ্রামেতে এখন তার খুব হাঁক ডাক। কাজেই সে এমন কথা বলতে পারে না মুখ ফুটে। গেটের কাছের সবগুলি ঘর খালি করে দিয়ে মজুরদের সে পুরানো বাড়ীতে চলে আসার হুকুম দিল। এবং সেই দিনই সন্ধ্যায় সেই ঘরগুলিতে খুড়ো এলেন তার বৌ-ছেলেকে নিয়ে। ওয়াঙ মনে মনে ভয়ংকর চটে গেল। ওর আরো রাগ হোল এই জন্ত যে সব বুকের ভিতর চেপে রেখে হাসিমুখে কথা বলতে হ'বে—স্বাগতম্ জানাতে হ'বে আত্মীয়দের। যখন সে কাকীর তেল-চুকচুক গোলালো মুখ দেখল তখনই ক্রোধে ফেটে পড়ার কথা। আর যখন নচ্ছার ছেলেটার উদ্ধত মুখ দেখল তখন ত তার গালে এক চড় বসিয়ে দেবার লোভ কিছুতেই সংবরণ করতে পারলে না সে। মনের রাগে ওয়াঙ তিন দিন সহরে গেল না।

ধীরে ধীরে সবই আবার সয়ে গেল। ওলান বোঝাতে লাগল—'রাগ করে লাভ কি। এ সইতেই হবে।' ওয়াঙ যখন দেখলে খুড়োখুড়ী আর তার ছেলে আহার আশ্রয়ের জন্ত কৃতজ্ঞ থাকতে বাধ্য তখন তার মন কমলিনীর জন্ত আরো বেশী আকুলিত হয়ে উঠল। সে মনে মনে ভাবলে—'বাড়ী যখন বুনো কুকুরে ভরে ওঠে তখন অন্তত্র শান্তি খুঁজতেই হবে।'

আবার সেই পুরানো আকুতি আর জ্বালায় পুড়তে থাকে ওয়াঙের মন। প্রেমের তিয়াষ আর মেটে না।

কিন্তু সরল ওলান যা দেখতে পায়নি, স্বল্পদৃষ্টি বৃদ্ধ বাপ যা' ঠাহর করতে পারেননি, অথবা বন্ধুত্বের নিবিড়তায় যা' চিয়ায়েরও চোখে পড়েনি—ওয়াঙের কাকীর চোখে কিন্তু তা' ধরা পড়তে একটুও বিলম্ব হোল না। এক দিন চোখের কোণে বাঁকা, হাসির ঝিলিক মেরে বললেন তিনি—'ওয়াঙ অন্ত কোথায় ফুলের খোঁজে ফিরছে। কিছু না বুঝে ওলান যখন নির্বোধ চোখে তাকাল তার দিকে, তিনি হেসে বললেন—'তরমুজের ভেতরের বীচি দেখতে হলে তরমুজটাকে আগে কাটিয়ে ছ'ফাঁক করতে হ'বে। বুঝেছ? সোজা করেই বলি শোন মানুষটি তোমার অন্ত কোথাও মজেছে।'

এক দিন সকালে ক্লান্ত ওয়াঙ যখন ঘরে শুয়ে শুয়ে ঝিমুচ্ছিল তখন তার কাকী ওলানকে কী বলছে কানে এল। ওয়াঙের মন তখন প্রেমের নেশায় শ্রান্ত। কথা কানে যেতেই ঘুমের ঝটকা কেটে গেল; আরো শোনবার জন্ত সে উৎকর্ণ হয়ে রইল। কাকীর চোখের তীক্ষ্ণতা তাকে ভীতি-বিহ্বল করে তুলল। তেল-গড়ানর মত তার মোটা গলা থেকে ভারী স্বর গড় গড় করে বেড়িয়ে আসছে যেন।

—'লোক আমার অনেক দেখা আছে। পুরুষ যখন চুল আঁচড়ায় নতুন জামাকাপড় কেনে, হঠাৎ এক দিন ভেলভেটের জুতা পায়ে পরে, তখন বুঝতে হবে সে সবের পিছনে কোন বাইরের মেয়েমানুষ আছে। এ একেবারে খাঁটি কথা।'

ওলানের গলায় একটা ভাঙা আওয়াজ হোল। কী বললে সে ওয়াঙ ধরতে পারলে না। কিন্তু তার কাকীর গলা আবার শোনা গেল—'আরে বোকা, পুরুষের পক্ষে ঘরের মেয়েমানুষই যথেষ্ট নয়। আর যেটি আছে সেটি যদি সারা দিন কাজে ক্লান্ত হয়, খেটে-খেটে গায়ের মাংস শীর্ণ করে ফেলে ত কথাই নেই। তার নজর আরো বেশী অন্তত্র যেতে বাধ্য। পুরুষদের মন মজাবার রূপ তোমার কোন দিনই নেই। হালের গরুর চেয়ে অবশ্য বেশী তুমি। হাতে যখন টাকা আছে তখন কেন সে তোমার জন্ত উপোসী থাকবে বল ত! আরো একটিকে সে কিনে আনবে ঘরে। পুরুষদের স্বভাবই তাই। আমার বুড়ো অকর্ম্মাটিও তাই করত। কিন্তু হতভাগা নিজের খাবার মত রূপোর মুখই দেখতে পেল না সারা জীবনে।'

এ রকম আরো কি কি তিনি বললেন। ওয়াঙ বিছানা থেকে বেশী কিছু শুনতে পেল না। খুড়ীর কথায় ওর মনোযোগ থমকে গেল। যে মেয়েটিকে ও ভালবাসে তাকে ভোগ করার ক্ষুধা কি ভাবে নিবৃত্তি করা যায় হঠাৎ সে তার একটা উপায় খুঁজে পেল। মেয়েটিকে কিনে সে বাড়ী নিয়ে আসবে। নিজের ঘরে পাবে তাকে। তাহলে অন্ত কেউ আর তার কাছে আসতে পারবে না। তাহলেই সে খুশী মনে খেতে পরতে পারবে তৃপ্তির সঙ্গে। সে তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে বাইরে এল। কাকীকে গোপনে ইসারায় ডেকে এনে গেটের বাইরে খেজুর গাছের নীচে, যেখানে কেউ শুনতে পাবে না তাদের কথা—বললে তাঁকে—'আপনি উঠোনে যা যা বলেছেন শুনেছি আমি। সব সত্যি। আরো একটিকে আমার চাই-ই। যখন সবার পেট ভরাবার মত জমা-জমি আছে আমার, তখন কেন চাইব না বলুন ত?'

কাকীও খর-খর করে আগ্রহের সঙ্গে উত্তর দিল—কেন নয়। সত্যিই ত? বড়লোকরা সবাই এ রকম করেছে। এক পেয়ালা থেকে সারাজন্ম চুমুক দেবে গরীবেরা।'

ওয়াঙ কি বলবে আঁচ করে নিয়েই তিনি কথা কইলেন। খুড়ীর হিসেব মতই ওয়াঙ তাঁকে বললে—'কিন্তু কে আমার হয়ে মধ্যস্থতা করবে? পুরুষমানুষ ত আর মেয়েদের কাছে গিয়ে বলতে পারে না—চল আমার বাড়ী।' এ কথার জবাবে খুড়ীমা বললেন—'সে সব আমার হাতে ছেড়ে দাও। আমায় শুধু বল কোন্ মেয়েটি—তার পর যা' করবার আমি করব।'

তখন ওয়াঙ ভয়ে ভয়ে অনিচ্ছার সঙ্গে খুলে বলল সব কথা। কারণ এর আগে কারুর সামনে সে তার নামও উল্লেখ করেনি।

—'যে মেয়েটির নাম কমলিনী।'

ওয়াঙের মনে হোল প্রত্যেকের জানা উচিত—প্রত্যেকে নিশ্চয়ই শুনেছে তার নাম। অথচ এক মাস আগেও সে নিজেই জানত না, কোথায় থাকে মেয়েটি—এ কথা সে ভুলে গেল। খুড়ী যখন আরো খবরাখবর জানতে চাইলে তার সম্বন্ধে ওয়াঙ রীতিমত অধৈর্য হয়ে উঠল।

—'মেয়েটির বাড়ী কোথায়?'

—'কোথায় আবার?' রূঢ় কণ্ঠে জবাব দিল ওয়াঙ—'সহরের বড় রাস্তার বড় চায়ের দোকান ছাড়া কোথায় আবার!'

—'ও, ঐ যেটার নাম ফুলের বাসা?'

—'আবার কোন্টা হবে?

নীচের ঠোঁটে আঙুল রেখে খানিকক্ষণ কী ভাবলেন খুড়ী।

তার পর বললেন—আমি ত সেখানকার কাউকে চিনি না। একটা উপায় খুঁজে বার করতেই হবে। কার কাছে আছে মেয়েটা?'

ওয়াঙ যখন সেই বিরাট প্রাসাদের দাসী কোকিলার নাম করল, তিনি হেসে বললেন—'ওঃ, সেই? ওরই বিছানায় শুয়ে বড়ো বাড়ীর কর্তা মারা গেলেন। সে বুঝি আজকাল এই সব করছে। বেশ বেশ! তা ছাড়া আর সে কি করবে?'

হে-হে করে হাসিতে ভাঙতে লাগলেন তিনি। তার পর হাসি থামিয়ে সহজ কণ্ঠে বললেন—'তাহলে ত ব্যাপার খুব সহজ। জলের মত সহজ। সেই মেয়েটি? হাতে টাকা পেলে সে নিজেই গোড়া থেকে সব করে দেবে। দরকার হলে পাহাড়ও খাড়া করে দিতে পারবে।

এ কথা শুনে হঠাৎ ওয়াঙের গলা যেন শুকিয়ে গেল। ফ্যাকাশে হোল মুখ। ফিসফিসানির মত বেরিয়ে এল গলার স্বর—'রূপো! রূপো আর সোণা! যা লাগে—এমন কি আমার জমির দামেও।'

ভালবাসার লালসা ওয়াঙের বুকে বিপরীত ঢেউয়ে ভাঙতে লাগল। যত দিন না একটা কিছু ব্যবস্থা হোল তত দিন ওয়াঙ আর কিছুতেই সে দোকান মাড়াল না। নিজেকে সে বোঝাল—'যদি না সে আমার বাড়ী আসে—একান্ত আমার হ'য়ে তাহলে নিজের গলা কেটে ফেললেও আর কিছুতেই আমি তার কাছে যাব না।'

—'যদি না সে আসে'—এ কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে তার হৃৎস্পন্দন ভয়ে প্রায় স্তব্ধ হয়ে এল। সে বার-বার খুড়ীর কাছে ছুটে গিয়ে বলতে লাগল—'টাকার অভাবে দরজা যেন বন্ধ হয়ে না যায়।' ফিরে গিয়ে আবার সে বললে—'কোকিলাকে বলেছেন কি যত রূপেয়া চাই অভাব হ'বে না আমার। তাকে বলবেন, এখানে তাকে গৃহস্থালীর কোন কাজ করতে হবে না। শুধু সিল্ক পরে থাকবে—ইচ্ছা হলে রোজ খাবে হাংগরের পাখ্‌না।

শেষে খুড়ী চটে গিয়ে চোখের তারা নাচাতে নাচাতে চেঁচিয়ে বললেন—'ঢের হয়েছে! আমি কি এতই বোকা, না এই প্রথম আমি মেয়েমানুষ যোগাড় করে দিচ্ছি। সব ভার আমার উপর ছেড়ে দাও। আর কত বার বলব।'

এর পর নিজের আঙুল কামড়ান ছাড়া আর কিছুই করবার নেই ওয়াঙের। কমলিনীকে এখনি দেখানর জন্য ঘর-দোর পরিচ্ছন্ন করতে ব্যস্ত হোল সে। টুকটাক কাজ, ঝাড়-পোঁচ, টেবিল-চেয়ার সরান প্রভৃতি নিয়ে এমন ব্যতিব্যস্ত করে তুলল ওলানকে যে বেচারী ক্রমশঃ আতঙ্কে কুঁকড়ে যেতে লাগল। স্বামী কিছু না বললেও ওলানও মনে মনে জানে তার কপালে কি ঘটতে যাচ্ছে।

ওয়াঙ আর এখন ওলানের সঙ্গে এক বিছানা বরদাস্ত করতে পারে না। বাড়ীতে দু'জন স্ত্রীলোকের পক্ষে আরো ঘর দরকার, আর একটি দরদালান আর একটি স্বতন্ত্র মহল, যেখানে সে তার প্রিয়াকে নিয়ে নিভৃতে কূজন করতে পারবে। খুড়ী এক দিকে প্রস্তুত করছেন বটে তবু অপর দিকে সে চাকর বাকরদের ডেকে মাঝের ঘরের পিছনের বাড়ীতে আর একটা চত্বর তৈরী করবার আদেশ দিল—চত্বরের চারি ধারে থাকবে তিনটে ঘর। একটা বড় ঘর আর দু'পাশে দু'টো ছোট ছোট ঘর। চাকর-বাকরেরা এ কথা শুনে হাঁ করে তাকিয়ে রইল তার দিকে, কিন্তু কারুরই কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হোল না। ওয়াঙও তাদের বললে না কিছু—নিজে উপস্থিত থেকে সমস্ত তদারক করল। এতে চীংয়ের সঙ্গে কোন প্রকার আলোচনারও দরকার হোল না। মজুরেরা জমি থেকে মাটি কেটে এনে দেয়াল তৈরী করল, মাটি গুঁড়োল। সহর থেকে ছাদের জন্য টালিও কিনে আনা হোল।

ঘরগুলো তৈরী হ'লে এবং মেঝের জন্য মাটি মসৃণ ভাবে গুঁড়ান হ'লে ওয়াঙ ইট কিনে আনল। মজুরেরা সেই ইট একটির পর আর একটি বসিয়ে চুণ দিয়ে জমিয়ে দিল। আগন্তুকের জন্য তৈরী তিনটি ঘরেই চমৎকার ইটের মেঝে ঝকঝক করতে লাগল। দরজা জানলায় ঝোলাবার জন্য লাল পর্দা এল। একটা নতুন টেবিল আর তার দু'পাশে দু'টো খোদাই করা চেয়ার, টেবিলের পিছনে দেয়ালে টাঙানোর জন্য পাহাড় আর নদীর ছবি আঁকা দু'টো স্ক্রল কেনা হোল। আর এল লাল লাক্ষার বার্ণিশ-করা ঢাকনা দেওয়া একটা ডিশ এবং তাতে তিলকুটো আর শূয়োরের চর্বি-মাখান মিষ্টি ভরে রেখে দেওয়া হোল টেবিলের উপর। তার পর ছোট ঘরের পক্ষে প্রকাণ্ড একটা খাট এবং খাটের চারি ধারে ঝুলানোর ফুলকাটা মশারিও কিনে আনাল ওয়াঙ। কিন্তু এই সব ব্যাপারে ওলানকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করতে ওর লজ্জা হোতে লাগল। কাজেই সন্ধ্যার দিকে খুড়ী এসে মশারি খাটিয়ে খুচরা কাজ কিছু করে দিলেন।

প্রস্তুতি শেষ হ'ল। করবার আর কিছু বাকী রইল না। কিন্তু একটি শুক্লপক্ষ কেটে গেল বন্ধ্যা হয়ে। নতুন নারীর জন্য নির্মিত নতুন ওয়াঙ আলস্যে কাল কাটাতে লাগল। চত্বরের মাঝখানে একটা ছোট্ট জলাধার তৈরী করার কথা ভাবলে ওয়াঙ। সুতরাং মজুর এল। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে তিন ফিট একটি দীর্ঘিকা কেটে টালি দিয়ে বাঁধান হোল। ওয়াঙ সহরে গিয়ে পাঁচটা সোনালী মাছ কিনে আনল। এর পর আর কিছু করার কথা ত ওয়াঙের মাথায় আসে না। আবার উত্তেজনায় অধীরতায় দিন কাটে ওয়াঙের।

এই দিনগুলিতে ওয়াঙ কারুর সঙ্গে কোন কথা বলেনি। শুধু ছেলেদের নাকে শিকনি দেখলে বকেছে অথবা ওলানের উপর তর্জন-গর্জন করেছে যে, সে তিন দিন ধরে চুল পর্য্যন্ত আঁচড়ায়নি। শেষে এক দিন এমন হোল যে, ওলানের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়ল। সে এমন হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল যে ওয়াঙ তাকে এমন ভাবে কাঁদতে কখনও দেখেনি। অনাহারের দিনগুলিতেও না। কাজেই সে কটু কণ্ঠে বলল—'কি হয়েছে? তোমার ঘোড়ার লেজের মত চুল আঁচড়ানর কথাও বলতে পারব না, আর বললেই কান্না?'

ওলান কোন কিছু উত্তর না দিয়ে শুধু ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল—'তোমার ছেলে-মেয়ে আমি পেটে ধরেছি—আমার পেটে—'

অস্বস্তিতে ওয়াঙ চুপ করে থাকে। ওলানের সামনে আসতে তার লজ্জা বোধ হয়। ওলানকে সে নিজের মতই থাকতে দিল। আইনের চোখে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ থাকতে পারে না। ওয়াঙের তিনটি ছেলের সে মা—ছেলে তিনটি সুস্থ হয়ে বেঁচেও আছে। নিজের লালসা ছাড়া আর এই কাজের কোন কৈফিয়ৎ নেই তার নিজের।

এই ভাবে দিন কাটে। শেষে এক দিন তার খুড়ী এসে বললে তাকে—'সব ঠিক ঠাক। চায়ের দোকানের মালিকের হয়ে যে মেয়েটি কর্তা, সে নগদ একশ'টি রূপোর বিনিময়ে রাজী হয়েছে। আর সে-মেয়েটিও পাথর-বসান দুল আর আংটি, একটা

সোনার আংটি, দু'প্রস্থ সাটিনের পোষাক, দু'টো সিল্কের স্যুট, বারো জোড়া জুতা, দু'টো সিল্কের লেপের লোভে তবে আসতে রাজী হয়েছে।'

এত সব ফিরিস্তির মধ্যে শুধু দু'টো কথা ওয়াঙের কানে গেল—'ব্যবস্থা সব ঠিক-ঠাক'। সে চেঁচিয়ে বলে উঠল—'বেশ তাই হোক—তাই হোক—' এই বলে সে দৌড়ে অন্দরে ছুটে গেল—রূপো বের করে নিয়ে এসে ঢেলে দিল খুড়ীর হাতে কিন্তু খুব গোপনে। কারণ এত বছর পরিশ্রমের সুফল এই ভাবে গলে যেতে কেউ দেখবে এ তার মনঃপূত নয়।

খুড়ীকে সে বললে—'তুমিও নাও নিজের জন্য দশটা।'

তিনি প্রতিবাদের একটা অভিনয় করলেন—স্থূল বপুকে টেনে মাথাটাকে এ-দিক ও-দিক ঘুরিয়ে ফিস-ফিস করে বললেন—'না, না। আমি নেব না। আমরা কি আর তোমার থেকে পর। তুমিও ত আমার ছেলে। আমি তোমার মা'র মত। এ আমি তোমারই জন্য করেছি—টাকার জন্য নয়।'

কিন্তু ওয়াঙ দেখল তিনি মুখে অনিচ্ছার ভান করলেও হাত বাড়িয়েছেন ঠিক। সে-ও ঢেলে দিল মুদ্রাগুলো। এবার ওর মনে হোল সুকাজেই ব্যয়িত হোল টাকা।

ওয়াঙ তখন শুয়োর আর গরুর মাংস কিনে আনল, ম্যানডারিন মাছ, বাঁশের কুঁড়ি, বাদাম—ঝোল রাঁধার জন্য দক্ষিণ থেকে আনা একটা পাখীর বাসাও কিনল আর কিনল শুকান হাংগরের পাখনা আর তার জানা যত প্রকার সুখাদ্য। তার পর প্রতীক্ষা করতে লাগল—যদি মনের জ্বলুনি আর অস্থির অধীরতাকে বলা চলে প্রতীক্ষা।

গ্রীষ্মের শেষে শুক্লা অষ্টমীর রৌদ্র-ঝলকিত একটি উজ্জ্বল দিনে কমলিনী এল বাড়ীতে। দূর থেকে ওয়াঙ দেখল সে আসছে। একটি সীডেন চেয়ারে বেহারারা তাকে কাঁধে বহে নিয়ে আসছে। দেখতে পেলে—ক্ষেতের সরু সংকীর্ণ আল-পথে সীডেন চেয়ারটি এ-পাশ ও-পাশ দোল খেতে খেতে এগিয়ে আসছে। এবং তাদের পিছনে পিছনে চলেছে কোকিলা। হঠাৎ ওয়াঙ কেমন শংকিত হয়ে উঠল মনে মনে—'বাড়ীতে এ কাকে আমি নিয়ে আসছি।'

কী করছে না বুঝে ওয়াঙ দৌড়ে গেল যে-ঘরে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে কাটিয়েছে এত বছর। দরজা বন্ধ করে দিয়ে সে হতবুদ্ধির মত অপেক্ষা করতে লাগল যতক্ষণ না বাইরে আসার জন্য খুড়ীর তীব্র চীৎকার কানে এল। বাড়ীর গেটে পৌছে গেছে এক জন।

লজ্জিত আরক্ত মুখে—যেন এর আগে কোন দিন মেয়েটিকে চোখেই দেখেনি—এমনি ভাবে ওয়াঙ ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। নিজের সুশ্রী বেশের দিকে মাথাটি নামিয়ে সামনের দিকে না তাকিয়ে সে এগিয়ে এল। কোকিলা স'নন্দ অভিনন্দন জানাল তাকে—বাঃ, তোমার সংগে যে এমন ব্যবসা আমাকে করতে হবে ভাবতেই পারিনি।'

কোকিলা তখন নামিয়ে রাখা চেয়ারটির কাছে গিয়ে মশারি তুলে ধরল। তার জিভ দিয়ে একটা শব্দ করে বলল—'বেরিয়ে এস আমার পদ্ম-কুঁড়ি। এই যে তোমার বাড়ী—তোমার প্রভু।'

বেহারারা দাঁত বের করে হাসছে দেখে ওয়াঙের মন ব্যথায় টন-টন করে উঠল। মনে মনে ও ভাবল—'সহরের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়—এরা অকর্মার দল।' ওয়াঙ রীতিমত চটে গেল—মুখ হয়ে উঠল তপ্ত লাল। কাজেই সে মুখ ফুটে কিছু চেঁচিয়ে বললে না।

ঘেরাটপ তোলা হোল। কি করছে বুঝবার আগেই ওয়াঙ ভিতরে দৃষ্টি মেলে ধরল। চেয়ারের ছায়াঘন নিভৃতে বসে আছে কমলিনী—সুচিত্রিত, পদ্মের মতই স্নিগ্ধ। মুহূর্তে সব ভুলে গেল ওয়াঙ—এমন কি সহরের দাঁত বের-করা লোকগুলির বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ ভাব জমা হয়েছিল তাও বিস্মৃত হোল। সব ভুলে গেল সে। এই মেয়েটিকে সে কিনেছে—চিরদিনের জন্য এসেছে সে তার ঘরে। ওয়াঙ দাঁড়িয়ে রইল।

বায়ু-কম্পিত পুষ্পের মত লীলায়িত ছন্দে মেয়েটি উঠে দাঁড়াল, চেয়ে দেখল সে। দেখে দেখে সে চোখ ফেরাতে পারে না। আনত মাথা, আনত নয়নে মেয়েটি কোকিলার হাত ধরে বেরিয়ে এসে কোকিলার কাঁধে ভর দিয়ে চলতে লাগল। প্রতি পদক্ষেপে ছোট্ট চরণ দু'টি দুলতে, কাঁপতে থাকে। ওয়াঙের পাশ দিয়ে যাবার সময় একটি কথাও বললে না সে। শুধু মিহি-গলায় ফিস-ফিস করে সুধাল কোকিলাকে—'কোথায় আমার ঘর?'

এই সময় খুড়ী সামনে এগিয়ে এসে তার আর এক পাশে দাঁড়ালেন। তার পর তাদের দু'জনের মাঝে মেয়েটিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল তার জন্য নতুন তৈরী ঘর আর চত্বরে। বাড়ীতে ঢোকবার সময় বাড়ীর আর কারুর সঙ্গেই দেখা হোল না। চীং আর মজুরদের ওয়াঙ দূর মাঠে কাজের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। ওলান যে কোথায় কাজে গিয়েছে কেউ জানে না। সে সাথে করে নিয়ে গেছে তার শিশু দু'টিকে। বড় ছেলেরা স্কুলে। বাপ দেয়ালে হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছেন। শব্দ কানে গেল তার কিন্তু চোখে কিছুই দেখতে পেলেন না। আর দুর্ভাগা বোবা মেয়েটি কে আসে যায় দেখেও না এবং একমাত্র মা-বাবার মুখ ছাড়া আর কাউকে চেনেও না সে। মেয়েটি ভিতরে ঢুকলে কোকিলা তার পিছনে পর্দা টেনে দিল।

কিছুক্ষণ পরে ওয়াঙের খুড়ী বেরিয়ে এলেন হাসতে হাসতে—একটু ঈর্ষার সঙ্গেই হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন—'মেয়েটার গা দিয়ে সুগন্ধ আর রংয়ের যেন ভাপ উঠছে। বাজারের মেয়ে মানুষদের মতই গায়ের গন্ধ মেয়েটার।' তার পর যেন আরো গভীর ঈর্ষার সঙ্গে বললেন—'যত কচি দেখায় তত ঠিক নয় এ আমি স্পষ্ট কথাই বলব বাপু, মেয়েটির যদি বয়স এমন ঢলে না আসত যে আর কিছু দিনের মধ্যেই কোন পুরুষ আর তার দিকে চাইতও না তাহলে শুধু কানে পাথরের দুল হাতে সোনার আংটি, সিল্ক আর সাটিনের লোভেই সে এক জন চাষার ঘরে এসে উঠত কি না সন্দেহ। তা সে বাপু যত ধনীই হোক না কেন।' এই স্পষ্ট ভাষণে ওয়াঙের মুখ রাগে কেমন হচ্ছে দেখে তিনি তাড়াতাড়ি জুড়ে দিলেন—'কিন্তু সুন্দরী বটে মেয়েটা। আমার চোখে ত এর চেয়ে সুন্দর আর পড়েনি। হোয়াং-প্রাসাদের মোটা হাড় দাসীর সঙ্গে এত বছর কাটান'র পর এখন এ'কে ঠেকবে যেন পোলাওর মত।'

কিন্তু ওয়াঙ উত্তরে কিছু বললে না। সে শুধু বাড়ীর এখানে-ওখানে ছুটাছুটি করে বেড়াতে লাগল। শুনতে লাগল লোকজনদের কথা। স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছে না সে। শেষে অনেক সাহস করে পর্দা তুলে কমলিনীর নবনির্মিত চত্বর ডিঙিয়ে,

আঁধার-ঘন কক্ষে যেখানে মেয়েটি বসে আছে সেখানে গিয়ে ঢুকল, তার পর রাত অবধি রইল তার সাথে।

এতক্ষণ ওলান বাড়ীর নিকটেই আসেনি। ভোর বেলা দেয়ালে হেলান দেওয়া একটা কোদাল নিয়ে শিশু দু'টিকে সঙ্গে করে বাঁধা-কপির পাতায় সামান্য ঠাণ্ডা খাবার বেঁধে কোথায় গিয়েছিল। সারা দিন আর ফেরেনি। দিন গড়িয়ে রাত হলে সে ঘরমুখো হোল। সারা গায়ে মাটি, ক্লান্তিতে নিবে যাওয়া নির্বাক্ শিশুগুলিও তার পিছন পিছন এল নিঃশব্দে। কাউকে কোন কথা না বলে ওলান রান্না-ঘরে গিয়ে খাবার তৈরী করল। রোজকার মত টেবিলে খাবার পরিবেশন করে বুড়ো শ্বশুরকে ডেকে তার হাতে গুঁজে দিল ভাতের কাঠি। নির্বোধ বোবা মেয়েটিকে খাওয়ালে—তার পর নিজেও কিছু খেলে শিশুদের নিয়ে। শিশুরা ঘুমিয়ে পড়ল। ওয়াঙ এখনও টেবিলে স্বপ্নে বিভোর হয়ে বসে আছে। ওলান শুতে যাবার জন্য গা ধুল। অবশেষে সে তার চিরাচরিত ঘরে চলে গেল—একাকী ঘুমাল নিজের শয্যায়।

এবার ওয়াঙ খেল। দিন-রাত সে প্রেমে বিভোর হয়ে থাকে। দিনের পর দিন সে নূতন প্রণয়িনীর ঘরে কাটায়। নিরবচ্ছিন্ন আলস্যে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাটে মেয়েটির দিন। ওয়াঙ এসে বসে তার পাশে —লক্ষ্য করে তার টুকিটাকি কাজ। গ্রীষ্মের প্রথম দিককার তপ্ত দিনগুলিতে মেয়েটি একবারও ঘরের বার হয় না। ঘরেই শুয়ে থাকে। কোকিলা কবোষ্ণ জলে স্নান করিয়ে দেয় তাকে। অঙ্গে মার্জনা করে দেয় তেল আর সুগন্ধি দিয়ে—কেশে মাখিয়ে দেয় সুরভিত কেশতৈল। মেয়েটি জিদ ধরেছিল কোকিলাকেও থাকতে হবে তার দাসী হয়ে। তার জন্যেও প্রচুর কবুলও করেছে সে। বহুর চেয়ে এবের মনো তোষণ সহজ তাই রাজী গেল কোকিলা। কোকিলা আর তার নতুন কর্ত্রী সবার থেকে পৃথক্ হয়ে নতুন বাড়ীতে বাস করে।

সারা দিন মেয়েটি ঘরের ছায়াঘন শীতলতায় শুয়ে থাকে। মিষ্টি আর ফলের টুকরো ভেঙ্গে খায়। গায়ে থাকে গ্রীষ্মের সবুজ পাতলা সিল্ক, কোমরে হালকা কটিবন্ধনী—তার নীচে ট্রাউজার। ওয়াঙ যখনই আসে এমনি বেশেই পায় তাকে। সে আকণ্ঠ পান করে প্রেম-সুধা। তার পর সূর্য ডুবে গেলে মেয়েটি চপল রুষ্টতায় সরিয়ে দেয় ওয়াঙকে। কোকিলা এসে স্নান করিয়ে দেয় তাকে—অঙ্গে মাখিয়ে দেয় সুগন্ধি—নতুন বেশ পরিবর্তন করিয়ে দেয়—পরিয়ে দেয় নরম শাদা সিল্ক, ওয়াঙ যে সিল্ক কিনে দিয়েছে—পায়ে দিয়ে দেয় এমব্রয়ডারী-করা ছোট্ট জুতো। বনলিনী তখন মন্থর পায়ে এসে দাঁড়ায় চত্বরে। চেয়ে থাকে ছোট্ট দীঘির জলে—পাঁচটি সোনালী মাছ খেলা করে সেখানে। ওয়াঙ অবাক-বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখে তার ঐশ্বর্য। ছোট্ট ছন্দময় পায়ে ঘুরে বেড়ায় মেয়েটি আর তার সুবঙ্কিম চরণ আর লীলায়িত আশ্রয় আতুর হাত দু'টি দেখে ওয়াঙের মনে হয় পৃথিবীতে এমন সৌন্দর্য বুঝি আর কোথাও নেই।

এই ভাবে সে উপভোগ করে মেয়েটির প্রেম। একাকী আকণ্ঠ পান করে তার সৌন্দর্য। খুসীতে ভরপুর হয়ে থাকে মন।

[ক্রমশঃ

★



আণবিক শক্তি

শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন প্রমাণ করিলেন যে, জড়ের নাশে শক্তির উৎপত্তি। এক পাউণ্ড পরিমাণ যে কোন বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে তেজে রূপান্তরিত করিলে যে পরিমাণ তেজ পাওয়া যাইবে প্রায় নব্বই লক্ষ টন কয়লা পোড়াইয়া সেই পরিমাণ তেজ পাওয়া যায়। এখানে বলা আবশ্যক যে, যখন কয়লা পোড়াইয়া তাপ উৎপন্ন করা হয় তখন কয়লার অতি নগণ্য এক অংশ তাপে পরিণত হয় এবং বাকীটা ভস্ম ধোঁয়া, বাষ্প ইত্যাদিতে পরিবর্ত্তিত হয়। যদি এক পাউণ্ড কয়লা এমন ভাবে পোড়ান সম্ভব হইত যে বাষ্প, ধোঁয়া, ভস্ম কিছুই অবশিষ্ট রহিবে না—সম্পূর্ণ কয়লা শুদ্ধ মাত্র তাপে পরিণত হইবে, তাহা হইলে এখন নব্বই লক্ষ টন কয়লা হইতে যে তেজ পাওয়া যায়, এক পাউণ্ড পরিমাণ কয়লা বা যে কোন পদার্থ হইতে সেই তেজ পাওয়া সম্ভব। আইনষ্টাইনের এই মতবাদ বিজ্ঞান-জগতে একটা বিপ্লব ঘটাইয়া দিল। এত দিন পর্য্যন্ত জড়কে শক্তি হইতে সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া দেখা হইত। এখন প্রমাণিত হইল যে, জড় ও শক্তি প্রকৃত পক্ষে অভেদ। এক কথায় জড়কে ঘনীভূত শক্তি (congealed energy) বলা চলে। সূর্য্য এবং নক্ষত্রমণ্ডলীর প্রচণ্ড তেজের মূলেও এই কারণ বিদ্যমান। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া সূর্য্য তেজ বিকিরণ করিতেছে। এরূপ প্রচণ্ড তেজ উদ্ভূত হওয়া সম্ভব নহে যদি না ধরিয়া লওয়া হয় যে, সূর্য্য এবং নক্ষত্রের অভ্যন্তরস্থ পদার্থসমূহ তেজে রূপান্তরিত হইতেছে। হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, সূর্য্য হইতে যে তাপ ও আলোক নির্গত হয়, তাহাতে সূর্য্যের ওজন প্রতি সেকেণ্ডে চল্লিশ লক্ষ টন কমিয়া যায়।

বহু দিন পর্য্যন্ত আইনষ্টাইনের এই মতবাদকে বিজ্ঞানীরা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন কিন্তু তাঁহার যুক্তি এতই প্রবল যে, ইহাকে অস্বীকার করাও চলে না। পরমাণুর গঠন এবং ভর (mass) লইয়া পরীক্ষা করিতে গিয়া আইনষ্টাইনের মতবাদের সত্যতা প্রমাণিত হইল। অধ্যাপক রাদারফোর্ড সর্ব্বপ্রথম পরমাণুর গঠন নির্ণয় করেন। তাঁহার মতানুসারে হাইড্রোজেন পরমাণুর কোষ বা কেন্দ্রক একটি ভারী ধনতড়িৎসম্পন্ন কণিকা দ্বারা গঠিত এবং এই কেন্দ্রকের বাহিরে একটি ঋণতড়িৎসম্পন্ন কণিকা কেন্দ্রককে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ভারী কণিকাকে বলা হয় প্রোটন এবং অপরটিকে বলা হয় ইলেকট্রন। প্রোটনের তুলনায় ইলেকট্রন ভরশূন্য অর্থাৎ প্রোটন ইলেকট্রন অপেক্ষা প্রায় দুই সহস্র গুণ ভারী বলিয়া ইলেকট্রনের ওজন নাই বলিয়া ধরা হয়। বিভিন্ন সংখ্যক প্রোটন ও ইলেকট্রন লইয়া বিভিন্ন পরমাণু গঠিত হইয়াছে। রেডিয়ম ধাতু হইতে নির্গত আলফা-কণা দ্বারা হাইড্রোজেন, হিলিয়ম, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন

প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের পরমাণু চূর্ণ করিয়া রাদারফোর্ড পরমাণুর গঠনপ্রণালীর সন্ধান পান। কিন্তু পরমাণুর অভ্যন্তরে আরও এক প্রকার কণিকার অস্তিত্ব তিনি জানিতে পারেন নাই। ১৯৩২ সালে বিজ্ঞানী জেমস্ চ্যাডউইক্ নিউট্রন নামে একটি মৌলিক কণিকা আবিষ্কার করেন। ইহার ভর প্রোটনের সমান কিন্তু ইহা বিদ্যুৎশূন্য। এখন পরমাণুর গঠন আলোচনা করিলে আণবিক শক্তি কি প্রকারে নির্গত হইবে তাহা বুঝা যাইবে।

হাইড্রোজেন সর্ব্বাপেক্ষা হালকা পদার্থ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—ইহার পরমাণুর কেন্দ্রক একটি প্রোটন এবং প্রোটনকে বেষ্টন করিয়া একটি ইলেকট্রন আবর্ত্তিত হইতেছে। সেই জন্য ইহার ভর ধরা হয় এক এবং ইহা বিদ্যুৎশূন্য; কারণ প্রোটনের ধনাত্মক বিদ্যুৎ ও ইলেকট্রনের ঋণাত্মক বিদ্যুৎ পরিমাণে সমান। হিলিয়ম পরবর্ত্তী ভারী পদার্থ। ইহার পরমাণুর কেন্দ্রক দুইটি প্রোটন ও দুইটি নিউট্রন দ্বারা গঠিত। সেই জন্য ইহার ভর চার। দুইটি ইলেকট্রন কেন্দ্রকের চারি দিকে আবর্ত্তিত হইতেছে। দুইটি প্রোটন ও দুইটি ইলেকট্রনের বিদ্যুতের পরিমাণ সমান কিন্তু বিপরীতধর্ম্মী বলিয়া মোটের উপর পরমাণুটি বিদ্যুৎশূন্য। এইরূপে প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন লইয়া বিভিন্ন পরমাণু গঠিত হইয়াছে।

হিলিয়ম পরমাণুর গঠন আলোচনা করিয়া সর্ব্বপ্রথম আইনষ্টাইনের মতবাদ প্রমাণিত হইল। হিলিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রকে দুইটি প্রোটন ও দুইটি নিউট্রন রহিয়াছে। ইহাদের মোট ভর চার হওয়া উচিত; প্রকৃত পক্ষে পরমাণুটির ভর চার অপেক্ষা কিছু কম। দুইটি প্রোটন ও দুইটি নিউটন একত্রিত হইয়া যখন হিলিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রক গঠিত হয় তখন ইহাদের মিলিত ভর মোটের উপর সাঁইত্রিশ ভাগের এক ভাগ কমিয়া যায়। তাহা হইলে এই এক ভাগ জড় পদার্থ গেল কোথায়? বিজ্ঞানী উত্তর দিলেন যে, প্রোটন ও নিউট্রন সংযোগে পরমাণু গঠিত হইবার কালে কিছুটা পরিমাণ শক্তি বা তেজ নির্গত হয়। যেমন কয়লা পোড়াইলে তেজ উৎপন্ন হয়। কিন্তু দুইটির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। চার গ্রাম কয়লা পোড়াইয়া যে পরিমাণ তেজ পাওয়া যায়, দুই গ্রাম প্রোটন ও দুই গ্রাম নিউট্রন দ্বারা হিলিয়ম পরমাণু গঠন করিলে তাহা অপেক্ষা ষাল শত লক্ষ গুণ অধিক তেজ পাওয়া যাইবে। প্রায় সমস্ত পরমাণু হইতে এই প্রকারে আণবিক শক্তি নির্গত করা যাইতে পারে। কতটা জড় কতটা শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে এই বিষয় আইনষ্টাইনের ফরমূলা যেরূপ নির্দ্দেশ দেয়, প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা পরমাণু গঠন করিলে ভর যে পরিমাণে হ্রাস পায় এবং শক্তি যে পরিমাণে নির্গত হয় তাহা আইনষ্টাইনের ফরমুলার সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। সুতরাং বোঝা গেল, এক একটি পরমাণু প্রভূত তেজের আধার।

প্রশ্ন এই যে, কি উপায়ে এই শক্তিকে ব্যবহারোপযোগী করা যায়। প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা পরমাণু গঠন করিয়া শক্তি উৎপাদন করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা সব ক্ষেত্রে সম্ভব নহে কারণ লক্ষ লক্ষ প্রোটন ও নিউট্রন একত্র করিলেই যে পরমাণু গঠিত হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অপর পক্ষে পরমাণু ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিলেও শক্তি নির্গত হইতে পারে। রাদারফোর্ড এই প্রণালীতে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। রেডিয়ম নির্গত আলফা-কণা দ্বারা তিনি নাইট্রোজেন, অক্সিজেন পরমাণু ভাঙ্গিয়াছিলেন বটে কিন্তু এখানে একটা প্রকাণ্ড অসুবিধা রহিয়াছে। একটি মটরদানার আয়তনের পরিমাণে অক্সিজেন গ্যাসে কতগুলি অক্সিজেন পরমাণু রহিয়াছে তাহার একটা হিসাব দেওয়া হইল। ধরা যাক, এক একটি পৃষ্ঠায় এক হাজার অক্ষর আছে, এরূপ হাজার পৃষ্ঠার এক একখানা বই। একটি লাইব্রেরীতে যদি এরূপ এক লক্ষ বই থাকে তবে এরূপ আশী লক্ষ লাইব্রেরীতে মোট যতগুলি অক্ষর থাকিবে একটি মটরদানার সম আয়তনের অক্সিজেন গ্যাসে ততগুলি অক্সিজেন পরমাণু আছে। গণিতের সাহায্যে বিজ্ঞানী এই গণনা করিয়াছেন। এক জন পদার্থবিদ্ বলিয়াছেন যে, নিউ ইয়র্ক সহরের লোকসংখ্যা সঠিক বলা কঠিন, কিন্তু নিউ ইয়র্ক সহরে মোট কতগুলি প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রন আছে তাহা বলিয়া দেওয়া এবং নির্ভুল ভাবে বলিয়া দেওয়া অনেক সোজা। এডিংটন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মোট কত ইলেকট্রন আছে তাহারও হিসাব দিয়াছেন। মোট ইলেকট্রনের সংখ্যা ১০৭৯। ইহাও গণিতের সাহায্যে করা হইয়াছে। ডালটন যখন পরমাণুবাদ প্রচার করেন তখন বিজ্ঞানী দেখিয়াছিলেন যে, যেমন ইষ্টকের পর ইষ্টক সাজাইয়া প্রাসাদ নির্ম্মিত হয় তেমনি পরমাণুর পর পরমাণু সাজাইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা এই বিশ্ব রচনা করিয়াছেন। তখনকার বিজ্ঞানী সমাজ সৃষ্টিকর্ত্তাকে এক জন বড় ইঞ্জিনিয়ার বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগে বোঝা গেল যে, গণিতের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রকৃতির রহস্য সমুদ্রের কিনারা করা যায় না। বিজ্ঞানী সমাজ তখন বলিয়া উঠিলেন—ভগবান্ নিশ্চয়ই এক জন গণিতশাস্ত্রবিদ্। আরও প্রায় ত্রিশ বৎসর পর বিজ্ঞানী দেখিলেন যে, গণিত সাহায্যে কিছু দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া যায়—তাহার পর কিছুটা রহস্যাবৃত থাকিয়া যায়—গণিত বিশ্বরহস্যকে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না। সেই জন্য বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানী সমাজ ভগবান্‌কে দার্শনিক বলিয়া কল্পনা করিতে চাহেন। ভবিষ্যতে ভগবান্ আর কি হইবেন তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে রহিল।

রেডিয়ম হইতে প্রতি মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ আলফা-কণিকা নির্গত হইতেছে এবং এই কণিকা সমূহ প্রতি মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ নাইট্রোজেন বা অক্সিজেন পরমাণু চূর্ণ করিতে পারে কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে হয়ত বা দু'-একটি পরমাণু চূর্ণ হইয়াছে; অধিকাংশ আলফা কণা পরমাণুর পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। যদি সমস্ত পরমাণুগুলিকে আঘাত করা যাইত তবে প্রচণ্ড তেজ নির্গত হইত সন্দেহ নাই। সুতরাং এই উপায়ে পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যবহারোপযোগী করা চলে না।

১৯৩৪ সালে ইটালী দেশীয় বিজ্ঞানী ফার্মির মনোযোগ এই দিকে আকৃষ্ট হইল। নিউট্রন আবিষ্কৃত হইবার পর দেখা গেল যে, পরমাণুকে নিউট্রন দ্বারা অপেক্ষাকৃত সহজে ভাঙ্গা চলে। ফার্মি য়ুরেনিয়ম পরমাণুকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করিয়া দেখিলেন যে, এমন এক পরমাণু সৃজিত হইয়াছে যাহা তেজস্ক্রিয় (radio active) এবং য়ুরেনিয়ম হইতেও ভারী। বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে ইহার জন্ম; প্রকৃতিতে ইহার অস্তিত্ব নাই। কিন্তু পরমাণুটি ক্ষণস্থায়ী; —সৃষ্টি হইবার ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে ইহা তেজ বিকিরণ করিয়া প্লুটোনিয়ম নামে এক মৌলিক পদার্থে পরিবর্ত্তিত হয়।

১৯৩৯ সালে বিজ্ঞানীর স্বপ্ন সফল হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল।

জার্মাণ বিজ্ঞানী অটো হ্যান পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করিলেন যে, য়ুরেনিয়ম পরমাণুকে তীব্র বেগবিশিষ্ট নিউট্রন দ্বারা আঘাত করিলে পরমাণু দুইটি টুকরায় বিভক্ত হইয়া যায় এবং প্রচণ্ড তেজ নির্গত করে। একটি টুকরা ক্রীপটন পরমাণু এবং অপরটি বেরিয়ম পরমাণু। এই টুকরা দুইটির ভর য়ুরেনিয়ম পরমাণুর অপেক্ষা কিছু কম। সুতরাং য়ুরেনিয়ম পরমাণুর এক অংশ হইতে দুইটি পরমাণু সৃষ্ট হইয়াছে এবং বাকী অংশ তেজে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই প্রক্রিয়াকে য়ুরেনিয়ম বিভাজন বলে। আইনষ্টাইনের ফরমুলা অনুসারে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, বিভাজন দ্বারা এক পাউণ্ড য়ুরেনিয়ম হইতে যে পরিমাণ তাপ নির্গত হয় হাজার টন কয়লা পোড়াইলে সেই তাপ পাওয়া যায়।

মোটামুটি দুই প্রকার য়ুরেনিয়ম দ্বারা মূল য়ুরেনিয়ম গঠিত। একটি সাধারণ য়ুরেনিয়ম—ইহার আণবিক ওজন ২৩৮ এবং অপরটি একটিনো য়ুরেনিয়ম—আণবিক ওজন ২৩৫। অধ্যাপক নীল বর্ প্রমাণ করিলেন যে, একটিনো য়ুরেনিয়মকে একটি স্বল্প বেগবিশিষ্ট নিউট্রন দ্বারা আঘাত করিলে ইহার পরমাণু দুইটি টুকরায় বিভক্ত হয় এবং বিভাজনের সময় দুইটি নিউট্রন ছাড়িয়া দেয়। সেই নিউট্রন দুইটি আবার দুইটি পরমাণুর বিভাজন ঘটায়। ফলে চারটি নিউট্রন নির্গত হয় এবং এইরূপে একবার নিউট্রন দ্বারা আঘাত করিলে বিভাজন-ক্রিয়া আপনা হইতে চলিতে থাকে। সাধারণ য়ুরেনিয়ম হইতে একটিনো য়ুরেনিয়মের তেজ-নির্গমন ক্ষমতা হাজার গুণ অধিক। এ্যাটম বোমাতে একটিনো য়ুরেনিয়ম ব্যবহার করা হইয়াছে। একটা অসুবিধা এই যে, সাধারণ য়ুরেনিয়মের এক শত চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হইতেছে এই একটিনো য়ুরেনিয়ম এবং য়ুরেনিয়ম হইতে ইহাকে পৃথক্ করা অত্যন্ত কঠিন ও ব্যয়সাপেক্ষ। সেজন্য একটিনো য়ুরেনিয়মকে বিভাজন দ্বারা আণবিক শক্তি নির্গত করিতে পারিলেও দৈনন্দিন প্রয়োজনে এই শক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব নহে। বিজ্ঞানী নূতন একটি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন যাহা হইতে আণবিক শক্তি নির্গত করিয়া ভবিষ্যতে যন্ত্রপাতি চালনা করা সম্ভব হইবে। এই পদার্থটির নাম প্লুটোনিয়ম।

সাধারণ য়ুরেনিয়মকে এক বিশিষ্ট বেগসম্পন্ন নিউট্রন দ্বারা আঘাত করিলে য়ুরেনিয়ম দুইটি টুকরায় ভাঙ্গিয়া যায় না। ইহা প্রথমে স্বল্পকালস্থায়ী পদার্থ নেপচুনিয়ম এবং পরে প্লুটোনিয়মে পরিণত হয়, প্লুটোনিয়ম স্থায়ী পদার্থ এবং পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে প্লুটোনিয়মকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করিলে তেজ নির্গত হয়। এই তেজ নির্গমন নিয়মিত করা সম্ভব এবং প্লুটোনিয়মের কার্য্যকারিতা প্রায় একটিনো য়ুরেনিয়মের সমান।

যুক্তরাষ্ট্রে আণবিক শক্তিকে কার্য্যকরী করিবার নিমিত্ত এক যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে। ইহাকে Atomic pile বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের হ্যানফোর্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ এরূপ একটি pile নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই pileএ য়ুরেনিয়ম হইতে প্লুটোনিয়ম প্রস্তুত করা হয়। ইহার গঠন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ বিশেষ কারণে এখনও প্রকাশিত হয় নাই; যত দূর জানা গিয়াছে তাহা এই:—বিশুদ্ধ কয়লা দ্বারা নির্ম্মিত প্রকাণ্ড একটি চৌকোণা বাক্সের মত একটি পদার্থের মধ্যে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কতগুলি গোলাকার ছিদ্র রহিয়াছে। এলুমিনিয়মের নলের মধ্যে য়ুরেনিয়ম পুরিয়া নলগুলি এই সমস্ত ছিদ্রের মধ্যে রাখা হয় এবং নিউট্রন দ্বারা এই য়ুরেনিয়মকে ভাঙ্গা হয়। ফলে য়ুরেনিয়ম প্লুটোনিয়মে রূপান্তরিত হয়—অনেকটা কাঁচা কয়লা পোড়াইয়া কোক তৈয়ারী করিবার মত। ফলে ভীষণ তাপের সৃষ্টি হয়। Pileটিকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য ছিদ্রের মধ্য দিয়া কলরেডো নদীর এক অংশকে বিশেষ বন্দোবস্ত দ্বারা pileএর মধ্য দিয়া তীব্রবেগে প্রবাহিত করা হইয়াছিল। জল এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ে pileএর এক প্রান্তে প্রবেশ করিয়া অন্য প্রান্ত দিয়া বাহির হইয়া আসিলেও যখন এই জল পুনরায় নদীতে পড়িতে লাগিল তখন নদীর জল উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। এই জন্য pileএর নিকট কৃত্রিম জলাধার প্রস্তুত করিয়া উত্তপ্ত জল ঠাণ্ডা করিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং পরে ঐ ঠাণ্ডা জল নদীতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহা হইতে বুঝা যায়—কী প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়! এখন যদি ঐ জলকে ধীর গতিতে প্রবাহিত করা যায় তবে য়ুরেনিয়ম-নির্গত তাপে জল বাষ্পীভূত হইবে এবং ইহার দ্বারা ষ্টীম ইঞ্জিন চালনা করিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন করা চলিবে। এই গেল এক দিক্। আবার যে প্লুটোনিয়ম উৎপন্ন হইবে নিউট্রনের আঘাতে তাহা হইতে তাপ উৎপন্ন করা যাইবে এবং এই তাপে জল বাষ্পীভূত করিয়া যন্ত্রচালনা সম্ভব। ইহাই হইল আণবিক শক্তিতে কার্য্যকরী করিবার উপায়।

অধ্যাপক কম্পটন বলিয়াছেন যে, যদিও হাজার টন কয়লা হইতে উৎপন্ন তেজ এক পাউণ্ড য়ুরেনিয়ম হইতে পাওয়া যায় তথাপি আণবিক শক্তি দ্বারা রান্না-ঘরের কাজ চলিবে না। রান্না-ঘর কেন—মোটর কার, মোটর সাইকেল এমন কি সাধারণ এরোপ্লেনেও আণবিক শক্তি ব্যবহার করা আপাততঃ চলে না। কারণ atomic pile প্রথমতঃ আকারে বৃহৎ, দ্বিতীয়তঃ খুব পুরু ইস্পাতের প্রাচীর দিয়া ইহাকে আচ্ছাদিত করিয়া না রাখিলে নির্গত তেজে প্রাণহানির সম্ভাবনা, তৃতীয়তঃ আণবিক শক্তির কাজ হইতেছে জলকে বাষ্পে পরিণত করা এবং তাহা দ্বারা ইঞ্জিন চালান। ষ্টীম ইঞ্জিন সাধারণ তৈল-চালিত ইঞ্জিন অপেক্ষা ভারী। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা যায় যে, এক একটি pileএর ওজন অন্ততঃ ৫০ টনের কম নহে। সমুদ্রগামী জাহাজ বা সাবমেরিণে ইহার ব্যবহার খুবই উপযোগী হইবে এবং সেই চেষ্টা চলিতেছে। অবশ্য বর্ত্তমানে য়ুরেনিয়ম ব্যবহার করা অপেক্ষা কয়লা বা তৈল ব্যবহার করতে ব্যয় কম। তবে আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে আণবিক শক্তি সহজলভ্য হইবে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও আণবিক শক্তি প্রয়োগ করা হইতেছে। বিভিন্ন প্রকার ব্যাধি—যেমন ক্যান্সার, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে খুব স্বল্প মাত্রায় আণবিক তেজ প্রয়োগ করিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সোডিয়ম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি ধাতুকে আণবিক তেজের সাহায্যে তেজস্ক্রিয় করিয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। শরীরের যে স্থানেই এই তেজস্ক্রিয় সোডিয়ম থাকুক না কেন, যন্ত্র সাহায্যে তাহার অস্তিত্ব ধরা পড়ে এবং শরীরের উপর তাহার ক্রিয়া বুঝা যায়। শারীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য এই উপায়ে জানা যাইতেছে। সর্ব্বপ্রকার রোগে আণবিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া ফলাফল পরীক্ষা করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ভবিষ্যতের

চিকিৎসা-প্রণালী আণবিক শক্তি সাহায্যে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

আর একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক। এ্যাটম বোমা আবিষ্কারের পর হইতেই আণবিক শক্তির দিকে লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। একথা প্রায়ই শোনা যায় যে, ছোট এক টুকরা কয়লা দ্বারা একটা রেল-গাড়ীকে হাজার মাইল টানিয়া লওয়া যাইবে। এই কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইবে। এক টুকরা কয়লাকে যদি পরিপূর্ণরূপে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তবে সেই শক্তি দ্বারা বোম্বে মেলকে হাওড়া হইতে বোম্বে পর্য্যন্ত চালান সম্ভব। কিন্তু atomic pileএ য়ুরেনিয়ম বা প্লুটোনিয়ম হইতে যে শক্তি নির্গত হয় তাহা সম্পূর্ণ য়ুরেনিয়ম বা প্লুটোনিয়ম নিঃশেষিত হইয়া শক্তিতে রূপান্তরিত হইলে যত শক্তি পাওয়া যাইত তাহার হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত করিবার উপায় এখনও মিলে নাই; চেষ্টা চলিতেছে। সুতরাং এক টুকরা কয়লাকে বিভাজন প্রক্রিয়ায় যদিও বা শক্তি-নির্গমনের উপায় আবিষ্কৃত হয় তাহা দ্বারা বোম্বে মেল অত দূর চলিবে না। আণবিক শক্তির কথা শুনিয়া লোকে ভবিষ্যতের পৃথিবীর নানা প্রকার চিত্র আঁকিতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহার পর আণবিক শক্তির বড়ি বাজারে কিনিতে পাওয়া যাইবে। কয়েকটা বড়ি রেল-গাড়ীতে জুড়িয়া দিলেই গাড়ী চলিতে থাকিবে। ইঞ্জিনের প্রয়োজন নাই। এইরূপে মোটরও চলিবে। হয়ত বা কয়েকটা বড়ির সাহায্যে বড় বড় মিলও চলিতে পারে—শ্রমিকেরা বেকার হইয়া পড়িবে। দু'-একটা বড়ি বাড়ীতে রাখিলে রান্না-বান্না, বাসন-মাজা, ঘর-গৃহস্থালীর কাজকর্ম চলিয়া যাইবে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, সে সম্ভাবনা আদপেই নাই। তাঁহারা খুব জোর দিয়া বলিতেছেন যে আণবিক শক্তির কাজ আর কয়লার কাজ একই—তাপ উৎপন্ন করা মাত্র। এই তাপ দ্বারা জলকে বাষ্পীভূত করিয়া ইঞ্জিন চালাইতে হইবে। কাজেই ইঞ্জিনের প্রয়োজন। সাধারণ বাষ্প-চালিত ইঞ্জিন অপেক্ষা এই জাতীয় ইঞ্জিন অনেক বড়, ভারী এবং জটিল হইবে বটে, তবে বহু লক্ষ গুণ শক্তিশালী হইবে। অবশ্য যদি জড়কে সম্পূর্ণরূপে তেজে রূপান্তরিত করা যায়, তবে ইঞ্জিন আকারে অনেকটা ছোট করা চলিবে।

আণবিক শক্তি দ্বারা কি পরিমাণ কাজ পাওয়া যাইতে পারে তাহার একটা হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) এক পাউণ্ড জলের পরমাণু সমূহকে চূর্ণ করিয়া শক্তি নির্গত করিলে তাহা দ্বারা দুই শত লক্ষ টন জলকে বাষ্পীভূত করা চলিবে।

(২) একবার নিশ্বাস গ্রহণ করিবার সময়ে প্রত্যেক লোক যে পরিমাণ বাতাস টানিয়া লয়, সেই বাতাসকে তেজে পরিবর্ত্তিত করিলে তাহা দ্বারা একটি বড় এরোপ্লেনকে এক বৎসর ধরিয়া উড়ান চলে।

(৩) পেষ্টবোর্ডের একখানা সাধারণ রেলের টিকিটের সমস্ত পরমাণু হইতে যে শক্তি পাওয়া যাইতে পারে তাহা দ্বারা একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেণ কয়েক বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারে।

(৪) আট আউন্স পরিমাণ কেরাসিন তৈল হইতে এরূপ পরিমাণে শক্তি নির্গত করা যাইতে পারে যাহা দ্বারা কলিকাতা সহরে এক বৎসর ধরিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ করা চলে।

সুতরাং আণবিক শক্তিকে কাজে লাগাইবার উপায় আয়ত্তাধীন হইলে কয়লা, তৈল বা হাইড্রো-ইলেকট্রিক শক্তি অচল হইয়া পড়িবে।

এ্যাটম বোমা মানুষের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে। ইহার ধ্বংসকারিতা দেখিয়া প্রত্যেক শক্তিশালী জাতি আণবিক শক্তির একচেটিয়া অধিকার লাভ করিতে প্রয়াস পাইতেছে এবং শক্তিমদে মত্ত জাতি সমূহের মধ্যে এই জন্য রেষারেষির অন্ত নাই। কেহ কাহাকে বিশ্বাস করে না। বিজ্ঞানী এখন ইহার অন্য দিক্‌টাও জগতের সামনে মেলিয়া দিল। ইহা দ্বারা যে মানুষের কল্যাণও সম্ভব সেই দৃষ্টিভঙ্গি আনা প্রয়োজন। পৃথিবী হইতে যুদ্ধবিগ্রহ লুপ্ত করিতে হইলে প্রত্যেক জাতিকে এই রহস্যের চাবিকাটি দিতে হইবে। এই কথা উল্লেখ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক আর্ভিং ল্যাঙ্‌মায়ার U. S. A. Senate Committee on Atomic Energyর এক অধিবেশনে বলিয়াছিলেন,—"You cannot go to a nation and say, 'We hold atomic bombs in a sacred trust and we want them to stay permanently that way; you have got to trust us but we don't trust you."

বিজ্ঞান যেন আর বিজ্ঞানীর হাতে নাই। কূটনৈতিক চালবাজিতে বিজ্ঞানী দৃষ্টির স্বচ্ছতা হারাইয়াছেন। এখন বিজ্ঞানী দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ সকলের সমবেত চেষ্টায় পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি সম্ভব। মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে কিন্তু শান্তি কোথায়? উত্তর বোধ হয় এই—'Peace is a war casualty.' আবার দিগন্তে যুদ্ধের আভাস ঘনাইয়া আসিতেছে। আণবিক শক্তি আমাদের ইহাই বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিতেছে যে, মানুষ কি প্রকারে পরস্পরের সহ-যোগিতায় বাঁচিয়া থাকিতে পারে তাহা শিখিতে হইবে নচেৎ আণবিক শক্তি দ্বারা পৃথিবী ধ্বংস করিয়া দেওয়া চলে। পৃথিবীর সকল দেশের মনীষিগণ এ বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন এবং আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যে-দিন পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ থাকিবে না—মানুষ মানুষকে প্রীতির ডোরে আপনার করিয়া লইবে। মানুষের অন্তরে শান্তি আসিলেই পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা হইবে।

শেষ লাইন

টাইপ-রাইটারের একটা লাইন শেষ হয়ে গেলেই টুং করে ঘণ্টা বেজে উঠে। টাইপিষ্ট অমনি সাবধান হয়ে যায়। বুঝতে পারে সে



লাইনে বড় জোর আর দু'-চারটে হরফ চলতে পারে। কিন্তু পাতা শেষ হয়ে এল কি না তা সে বুঝতে পারে না। দিব্য টাইপ করে যাচ্ছে লাইনের পর লাইন, আর রোলার ঘুরোচ্ছে। হঠাৎ দেখা গেল পাতা শেষ হয়ে গেছে। এতে ভারি অসুবিধা হয়। নতুন মেশিনে ডান দিকে হাতের কাছে একটা আয়না লাগানো থাকে। কাগজের তলাটা সেই আয়নায় প্রতিফলিত হয়। টাইপিষ্ট পাতা শেষ হচ্ছে কি না সহজেই বুঝতে পারে। ব্যাপারটা সহজ কিন্তু বেশ কাজের।

আধুনিক যুগে

আজ-কাল বেশীর ভাগ গৃহস্থালী অথবা সৌখীন জিনিষ প্ল্যাষ্টিকে তৈরী করা হচ্ছে।

চামড়ার অথবা কাপড়ের ঘড়ির ষ্ট্র্যাপ ঘামে এবং বৃষ্টির জলে

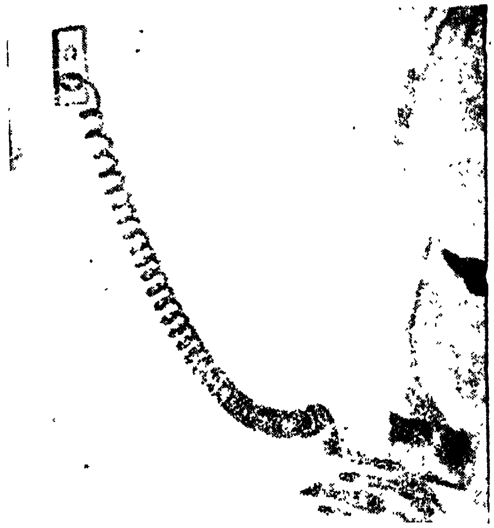


ভিজে পচে যায়। ধাতব ষ্ট্র্যাপে হাতে দাগ পড়ে। প্ল্যাষ্টিক ষ্ট্র্যাপ দেখতে ভালো, মজবুত অথচ পচে না, হাতে দাগও পড়ে না। তাই আজ-কাল সৌখীন সমাজে এর খুব প্রচলন।



বাসন মাজার জন্য ছাই অথবা সাবান প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে নুড়ো ও ন্যাতা দরকার। নোংরা বলে সকলেরই অপছন্দ। আজ-কাল প্ল্যাষ্টিকের নুড়ো বার হয়েছে। খুব ছোট ছোট প্ল্যাষ্টিকের দানা সুতো দিয়ে বেঁধে ঝাড়নের মত করা। বাসনও তাতে খুব পরিষ্কার হয়।

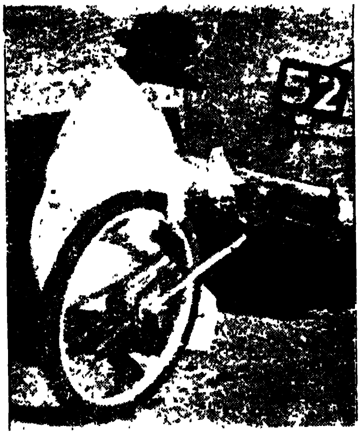
ইলেক্‌ট্রিক ইস্ত্রী, টেবিল ল্যাম্প, হীটার ইত্যাদির তার গুটিয়ে রাখতে হয়। লম্বা তার ক্রমাগত খোলা আর গুটোনার জন্য প্রায়



লীক করে। অসুবিধাও বিস্তর। আজ-কাল হয়েছে প্ল্যাষ্টিকের নমনীয় কয়েল করা তার। দরকার মত লম্বা করে প্লাগে লাগিয়ে দিলে। কাজ হয়ে গেলে প্লাগ খুলে দিলেই আবার তার আপনি গুটিয়ে গেল। এতে সময় বাঁচল, তারও বাঁচল। সুবিধা বই কি! সাবমেরিন অথবা বম্বারের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য এই তার প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল। যুদ্ধের আবিষ্কার, কিন্তু শান্তিতেও কাজে লাগবে।

পঞ্চম চক্র

কোন মোটর গাড়ী অথবা ট্রাক বাজারে ছাড়বার আগে প্রত্যেক অংশ খুব ভাল ভাবে পরীক্ষা করে নেওয়া হয়। এই পরীক্ষায় স্পীডোমীটার এবং মাইলোমীটার এই দুইটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ। কম করে ৫০০ মাইল না চালালে গাড়ী সম্বন্ধে কিছু বলা চলে না। একে বলে রানিং ডিসটেন্স। কতটা গেল তার মাপ পাওয়া যায় মাইলোমীটারে। আর গাড়ীর গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ এও একটা খুব বড় জিনিষ। ফাঁকা জায়গায় যত জোরে গাড়ী চালান সম্ভব চালিয়ে গাড়ীর ব্যালেন্স, ইঞ্জিনের শক্তি এবং টেক-আপ, বডির মজবুতী এই সব পরীক্ষা চলে। এর জন্য স্পীডোমীটারের প্রয়োজন। আবার স্পীডোমীটারের পরীক্ষাও দরকার। সেটা ভুল হলে সবই মাটি। গাড়ীর পেছনে এক আলাদা চাকা লাগিয়ে তার সঙ্গে স্পীডোমীটার



ফিট করে দেওয়া হয়। এই চাকার গতি দিয়ে স্পীডোমীটারের পরীক্ষা চলে।

বিশ্বচক্র

শ্রীগিরিজাভূষণ মিত্র

বিশ্ব স্থান আর কাল-সমন্বিত। গণিতের ভাষায় ঘটনা কালের ফাংশন মাত্র। তাই কালের পরিবর্তনে ঘটনার প্রভবন স্বয়ম্প্রভ। শুধু ঘটনা কালের সংযোগকারী সূত্রটিকে ঠিক-মত জানতে পারা চাই। বিখ্যাত গণিতিক ফুরিয়ার দেখিয়েছেন যে, যে কোন বস্তু যা অপর একটি বস্তুর উপর নির্ভরশীলতা অপর অনেকগুলি বস্তুর যোগফল। দ্বিতীয় বস্তুটি যদি পরিবর্তিত হয় তবে শেষোক্ত বস্তুগুলির সবগুলিই পরিবর্তিত হবেই হবে—কিন্তু এই পরিবর্তন হবে চাক্রিক; দ্বিতীয় বস্তুটির মান হয়তো বেড়েই যাচ্ছে, কিন্তু এর উপর নির্ভরশীল শেষোক্ত বস্তুগুলির মান প্রথমে বাড়বে, তার পর সর্বোচ্চ একটা মান প্রাপ্ত হবার পর ধীরে ধীরে কমবে—আবার কমার শেষ সীমায় পৌঁছে ফের বাড়তে থাকবে। ফুরিয়ারের সূত্র অনুযায়ী ঘটনাকে যদি বিশ্লেষণ করতে পারা যায় তবেই হয়তো কালের ফাংশন হিসেবে ভবিষ্যৎকে জানতে পারা যাবে।

শাস্ত্রে বলে—'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি সুখানি চ'। শুধু দুঃখ আর সুখ নয়, ক্যানাডার জঙ্গলে কতগুলি বনবিড়ালী ঘুরে বেড়াবে তার সংখ্যাও চক্রবৎ পরিবর্তনশীল। সমদূরবর্তী কালে ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটনা, আর কালের ফুরিয়ার বিশ্লেষণী সূত্রের সহজ সংস্করণ মাত্র।

কিন্তু বুঝবো কি করে এই পুনরাবৃত্তি 'অভাবনীয়ের ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত' কি না? উপায় সহজ। লক্ষ্য করতে হবে সূক্ষ্ম ভাবে এই পুনরাবৃত্তি যথেষ্ট পরিমাণে নিয়মিত কি না—বহুধা সংঘটিত কি না।

আপনি ভাবছেন—'এতই কি সহজ হবে?' আচ্ছা দেখুন। কর্ণেলের অধ্যাপক উইলিয়ম হ্যামিণ্টন দেখিয়েছেন, কয়েক দশক ধরে নিউইয়র্ক ষ্টেটের ইঁদুরের সংখ্যা চার বছর অন্তর ভীষণ ভাবে বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৩৭ সালে তিনি কৃষিজীবীদের সাবধান করে দিয়েছিলেন ১৯৩৯ সালে ইঁদুরদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যাবে অনন্তর—১৯৪৩ সালে আর একবার এই দুর্দৈব দেখা দেবে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে।

জীবনের এই চক্র পরিবর্তনে অবাক্ হবার কি আছে? চক্রনিয়ম আপনিই কি মানেন না? প্রত্যেক শ্রাবণ মাসে আকাশব্যাপী বৃষ্টি, প্রত্যেক মাঘ মাসে কনকনে শীত। এই তো বিশ্বচক্রের অপরূপ রূপ।

১৯৩০ সালের বিশ্ববাণিজ্যিক বিপর্যয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে অনেকে আরম্ভ করেন বাণিজ্যচক্র পর্য্যবেক্ষণ করতে। একচল্লিশ মাসের হপকিন্স চক্রের কথা আপনিও তো জানেন। আপনি যদি কোন বাণিজ্য সংগঠনে নিযুক্ত থাকেন তো এই জ্ঞান আপনাকে সাহায্য করবে আপনার সংঘকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। ১৯৩৫ সালে ওয়েষ্টিংহাউস ইলেক্ট্রিক এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী এই চক্রনিয়ম অনুযায়ী গ্রাফ অঙ্কন করে দেখল ১৯৩৭ সালে তাদের মন্দা যাবে। তাই তারা আর ব্যবসা সম্প্রসারণের প্রয়াস করল না। ১৯৩৭ সালের বিশ্বপ্লাবী বাণিজ্য-বিপর্য্যয় তাদের খুব বেশী ক্ষতি করতে পারল না। তারা প্রস্তুত ছিল বিপর্য্যয়ের জন্য। আবার ১৯৩৮ সালে গ্রাফে দেখা গেল তরঙ্গের সর্ব্বনিম্ন স্তর অতিক্রান্ত হয়েছে। তারা সাহসে ভর করে এক কোটি ডলারের যন্ত্রপাতি বসাল। তাদের লাভ হল অসম্ভব।

ব্যবসায়-জগতে আর একটি চক্র আছে। এর স্পন্দন-সময় আঠার বছর চার মাস। ১৯৭২ সালে এই চক্রের সর্ব্বনিম্ন বিন্দু কার্য্যকর হবে। নয় বৎসর স্পন্দন সময়ের আর একটি চক্র আছে। ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত এই চক্রনিয়মে উঠতির কাল যাবে। তার পর ১৯৫০ সালে আসবে বিপর্য্যয়।

আমাদের অন্তর-জগৎও চক্রপরিবর্তনের বিহার-স্থল। আমাদের অন্তরে আবেগের প্লাবন আসে নিয়মিত ভাবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর। পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রেক্স হার্সী পনের বছর ধরে গবেষণা চালাচ্ছেন বিভিন্ন ধরণের মানুষের মেজাজ নিয়ে। কেরাণী, রেলকর্মচারী, শিল্পী, বিক্রেতা সকলেই ছিল তাঁর গবেষণার গণ্ডীর ভিতর। দেখা গিয়েছে সকলেই উদ্দীপনা আর অবসাদের মধ্যে দোদুল্যমান আমাদের ভাবপ্রবণতার স্পন্দন সময় কয়েক সপ্তাহ মাত্র। পুরুষদের বেলায় সাধারণতঃ চার থেকে পাঁচ সপ্তাহ স্পন্দন-সময়। পনের দিন থাকে উদ্দীপনার সময় আর প্রায় পনের দিন অবসাদের। মেয়েদের আবেগের স্পন্দন-সময় যে চার সপ্তাহ তা তো অনেক দিনেরই জানা কথা!

রোগেরাও ঘুরে ঘুরে আসে চক্রাকারে। বসন্তের মলয়ানিল সঙ্গে করে নিয়ে আসে মারীগুটিকা। কালবোশেখীর উগ্র হাসি আকাশে ছড়িয়ে দেয় ওলাউঠার বীজ। নিউইয়র্কের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রদত্ত বিবরণী থেকে জানা যায়, অন্ততঃ ঐ সহরে রোগের প্রাদুর্ভাবে আর অন্তর্ধানে আছে নিয়মিত ছন্দ। প্রতি ছয় বছর অন্তর ডিপথিরিয়া আর দু'বছর অন্তর হাম মারাত্মক আকার ধারণ করে।

রোগের চক্র-পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তন আসে প্রাণি-জগতে। উত্তর-আফ্রিকার জঙ্গলে নেকড়ে, বনবিড়ালী আর ধাড়ী ইঁদুরদের সংখ্যা প্রতি দশ বছর অন্তর আকস্মিক বৃদ্ধি পায়। এই জ্ঞান যে শুধু শিকারীদের পক্ষেই প্রয়োজনীয় তা নয়—আপনি যদি একটা ফার-কোট কিনতে চান তাহলে এই জ্ঞানে আপনিও উপকৃত হবেন। বনবিড়ালীর কথাই ধরুন। "ভাল" বছরে বনবিড়ালীর জন্মসংখ্যা "খারাপ" বছরের চেয়ে বিশ গুণ বেশী।

চক্রনিয়মের কথা জানবার আগে হাডসন বে কম্পানী বুঝতে পারত না কখন কি করতে হবে—কখন বা দাম চড়বে আর কখন নামবে। এখন তারা খালি "ভাল" সময়েই কেনে আর সব সময়ই অল্প দরে ভাল ফার-কোট বিক্রী করে।

মানুষের জনসংখ্যায় আছে একটা বাৎসরিক ছন্দ। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ এলস্‌ওয়ার্থ হাণ্টিংডন লক্ষ লক্ষ জন্মমৃত্যুর তালিকা অধ্যয়ন করেছেন। তিনি তাঁর "Seasons of Birth" নামক পুস্তকে দেখিয়েছেন এই বাৎসরিক ছন্দ বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। প্রাচীন কালে খুব অল্প শিশুই বাঁচত এই শ্রেষ্ঠ সময়ে না জন্মালে। এখন অবশ্য জন্মমৃত্যু হারের উচ্চ বেগ অনেকটা কমে এসেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে প্রজননের শ্রেষ্ঠ সময় হল মে আর জুন মাস আর ভূমিষ্ঠ হবার শ্রেষ্ঠ সময় ফেব্রুয়ারী মার্চ।

আবার দেখা গিয়েছে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ধরণের প্রতিভা জন্মগ্রহণ করে। Encyclopaedia Britannica'তে উক্ত সমস্ত মহাপুরুষদের জন্মসময় পর্য্যালোচনা করে অধ্যাপক হাণ্টিংডন দেখিয়েছেন যে আমেরিকার চিন্তাবীর, লেখক, শিক্ষাব্রতী সব জন্মগ্রহণ করেছেন ফেব্রুয়ারী, মার্চ আর এপ্রিলে। চিত্রশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী, অভিনেতারা জন্মেছেন অক্টোবর আর নভেম্বরে। কর্ম্মবীর, রাজনৈতিক, সমরজ্ঞরা ভূমিষ্ঠ হয়েছেন অক্টোবর থেকে জানুয়ারীর মধ্যে। কিন্তু জুন আর জুলাই মাসে প্রায় কোন প্রতিভাই জন্মগ্রহণ করেননি

চক্রনিয়ম ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিকরা একটি জটিল সমস্যার সমাধান করতে পেরেছেন। কয়েক বৎসর বাদে আবহাওয়ার অবস্থা কি রকম যাবে তার ভবিষ্যদ্বাণী করা এক রকম প্রায় অসম্ভবই ছিল। প্রায় দুই শতাব্দী ধরে বৈজ্ঞানিকদের সকল প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছিল। চক্রনিয়ম এর একটা সহজ সমাধান দিয়েছে। ওয়াশিংটনে স্মিথসোনিয়ন ইনষ্টিটিউসনের অধ্যক্ষ ডাঃ সি, জি, এ্যাবট লক্ষ্য করেছেন যে, প্রায় সর্ব্বত্রই আবহাওয়া হয় তেইশ বছর আগেকার আবহাওয়ার পুনরাবৃত্তি। আবার যদি তেইশের দ্বিগুণ বা ছেচল্লিশ বছর আগেকার আবহাওয়ার সাথে মিলিয়ে দেখি তো এই সাদৃশ্য আরও পরিস্ফুট হয়।

অধ্যাপক ই, এল, মোসলে আবার দেখিয়েছেন যে, প্রায় ৯০ বৎসর পর পর আবহাওয়ার মধ্যে আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য আছে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই সময় ২৩শের প্রায় চার গুণ। এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে তিনি ১৯৩৯ সালে ১৮৫২ সালের আবহাওয়ার সাথে মিলিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন ১৯৪২ সালে বিরাট প্লাবন হবে। ঐ বছর ওহিও নদীর প্লাবন আর দামোদরের মত ধ্বংসলীলা তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীকে মর্ম্মভেদিরূপে সত্য বলে প্রমাণ করে।

বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করেন যে, আবহাওয়া বিশ্ব-ইতিহাসের উপর চরম প্রভাব বিস্তার করেছে। কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে আবহাওয়া আর ইতিহাসের বিরাট তুলনামূলক আলোচনা চলছে। বিগত ষোল শতাব্দীর সভ্যতার ইতিহাসে যতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে তাদের সবগুলিকে প্রণালীবদ্ধ করে সহস্র সহস্র বিবরণীতে পূর্ণ ঘটনা-তালিকা তৈরী করেছেন ডঃ রেমণ্ড হুইলার। হুইলার দেখিয়েছেন যে মানুষের প্রতিটি বস্তুপ্রচেষ্টায় আদর্শবাদী আর স্বার্থপর মুহূর্ত্তগুলো ঘুরে ঘুরে আসে। এই চক্র-পরিবর্ত্তনের স্পন্দন সময় সমসাময়িক আবহচক্রের স্পন্দন-সময়ের সাথে সর্ব্বসম। ইতিহাস চক্র বহু দিনপ্রসারী আবহ চক্রের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। এই চক্রের স্পন্দন সময় ৪৫, ৯০ আর ৫১০ বছর।

আবহাওয়া যখনই শৈত্য বর্জ্জন করে উষ্ণতর হয়ে উঠেছে তখনই দেখা দিয়াছে ইতিহাসের আদর্শবাদী স্বপ্ন। সকল স্বর্ণযুগ এমনিতরো সময়েই দেখা দিয়েছে। ইতালীর রেনেশাঁ আন্দোলন একটা উদাহরণস্থল। আবার যখন উষ্ণতা স্থান ছেড়ে দিয়েছে শৈত্যকে, তখনই প্রকট হয়েছে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ, কলহ, দ্বেষ, অত্যাচারী একাধিনায়করা মাথা তুলেছে, জন্মহার কমে গিয়েছে।

শান্ত হোন, আমি বুঝতে পারছি আপনারা জানতে চাইছেন আমাদের ভবিষ্যতে কি আছে। ডঃ হুইলারের গণনা অনুযায়ী সব কয়টি আবহচক্রের নিম্নতম বিন্দুতে আছে ১৯৮০ সাল। প্রতি বছর শীত বেড়ে গিয়ে ঐ বছর দেখা দেবে প্রচণ্ডতম শীত। রাষ্ট্রের আর জাতির ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলতে থাকবে—বিপ্লব আর যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে থাকবে পৃথিবীর বক্ষে, রক্তের স্রোত বয়ে যাবে। কিন্তু ১৯৬০ সালে হবে এ সবের চরম পরিণতি, বিশ্বের ভয়ালতম যুদ্ধে রাষ্ট্রের পর রাষ্ট্র চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবীর বর্ত্তমান রূপ। আমরা ধরে নিতে পারি ১৯৫৭ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করবে খুব সম্ভব, কিন্তু অন্তর্বিপ্লব আর গৃহযুদ্ধ লেগেই থাকবে।

এই বিপুল বেদনার মধ্য দিয়ে নবজন্ম হবে নূতন বিশ্বের। গণতন্ত্রের নবজন্ম হবে। স্বাভাবিকতার প্রতি মানুষের দৃষ্টি ফিরে যাবে। ছন্দিত সুরের প্রতি—কঠোর চারিত্রিক পবিত্রতার প্রতি মানুষের অনুরাগ ফিরে আসবে। জনসাধারণ অনেক বেশী শিক্ষিত, অনেক বেশী বুদ্ধিমান্ হবে। আন্তর্জ্জাতিক সহিষ্ণুতা আর বুদ্ধিগত আদান-প্রদান অনেক বেশী বর্দ্ধিত হবে। তার পর ২০০০ খৃষ্টাব্দে আবহাওয়া উষ্ণতর হবে, নূতন স্বর্ণযুগ দেখা দেবে।

রাত্রির তপস্যা

[উপন্যাস]

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

২৫

কল্যাণীর কাছে কথাটা পাড়া একটু কঠিন বৈ কি! তবু শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে সব জানাইতেই হয়। বেচারী কল্যাণী—চোখের জল কিছুতেই সাম্‌লাইতে পারে না সে, বহু চেষ্টা করিয়াও। নিজের যে সৌভাগ্য এক দিন প্রত্যক্ষ করিয়াও বিশ্বাস করিতে পারে নাই—এই দীর্ঘ দিন পরে সবে সেটা সে অনুভব করিতে শুরু করিয়াছিল। এখানকার চাকরী যাওয়া মানে অন্যত্র চাকরী লওয়া—অর্থাৎ বিচ্ছেদ! অন্ধ বাবা, বৃদ্ধা পিসীমা ও ছোট ছোট ভাইদের ফেলিয়া যাওয়া সম্ভব নয় কিছুতে। তা ছাড়া নূতন বাসা করিয়া তাহাকে লইয়া যাইতে পারে সে সঙ্গতিই বা কই ভূপেনের! স্বামীকে কত দিনের জন্য ছাড়িয়া থাকিতে হইবে তার কোন ঠিক নাই, হয়ত বা দীর্ঘকালের জন্যই। তাহার শরীর ভাল নয়, স্বামীর ভালবাসার প্রত্যক্ষ যে নিদর্শন তাহার দেহের মধ্য হইতে দেহ গঠন করিয়া আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় আছে, তাহারই বা কি হইবে কে জানে! এ অভিজ্ঞতা নূতন—কোন ধারণাই নাই তাহার এসব ব্যাপারে—কত কী বিপদ ঘটিতে পারে, অনেক রকম বিপদ অনেকের ঘটিয়াছে, এম্‌নিই একটা ভাসা ভাসা কথা সে শুনিয়াছে। যদি সে রকম কিছু হয়, সে সময়ে তাহার একমাত্র অবলম্বন স্বামী কাছে থাকিবেন না—একথা মনে হইলেও শিহরিয়া ওঠে।···তার চেয়েও বড় ভয় বোধ হয় একটা আছে, যে কথা সে ভাবিতে পারে না, ভাবিতে সাহস করে না, তবু মনে উঁকি-ঝুঁকি মারে—ভূপেন যদি কলিকাতাতেই থাকে, সন্ধ্যাও থাকিবে,—সন্ধ্যার রূপ আছে, সন্ধ্যার গুণ আছে। সন্ধ্যা ভূপেনের হৃদয়ে যে স্তরে অবস্থিত সেখানে কল্যাণী কোন দিন পৌছিতে পারিবে না। যদি অভাগী কল্যাণীর কথা তিনি ভুলিয়াই যান!

তবু কল্যাণী বাধা দিতে পারে না, বাধা দিবার উপায়ই বা কি! সে শুধু স্বামীর বোঝা, তাহার দিক হইতে, তাহার আত্মীয়দের দিক হইতে যখন কোন সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন কোন্ অধিকারে সে কথা কহিবে? স্বামীর দুর্দ্দিনে বোঝা লাঘব করিতে না পারিলেও আর বাড়াইবে না সে এটা ঠিকই। কল্যাণী চিরকালই চুপ করিয়া থাকিয়াছে, আজও রহিল।

ভূপেন তাহার ব্যথা ও আশঙ্কা দুই-ই বোধ হয় বোঝে—তাই যাত্রার আগের দিনগুলি কল্যাণীর মনে পরিপূর্ণ সুধায় ভরাইয়া দিতে চায়। কল্যাণীর এ যেন নূতন অভিজ্ঞতা—এত আদর, এত মাধুর্য্যে সে বিহ্বল হইয়া পড়ে, নিজেকে যেন হারাইয়া ফেলে। ভূপেন যে কলিকাতায় গেলেই মাষ্টারী পাইবে তাহার ঠিক নাই—তবু ভূপেন বোঝে যে এবারের বিচ্ছেদ দীর্ঘকালেরই হইবে। অন্ততঃ সে তিন চারটা টুইশন্ করিয়াও যদি নিজের খরচ চালাইতে পারে তাহা হইলে আর মহেশ বাবুকে বিব্রত করিবে না। সেই চেষ্টাই সে করিবে—প্রাণপণে।···

ভূপেন কলিকাতায় গিয়া কোথায় উঠিবে সে প্রশ্ন একটা ছিল। আপাততঃ বিশুর বাড়ীতে গিয়াই ওঠা চলিবে কিন্তু প্রায় কুড়ি দিন জুড়িয়া পরীক্ষা, এত দিন তাহার কাছে থাকা সঙ্গত হইবে না হয়ত। তখন মেস খুঁজিতে হইবে, সে জন্যও কিছু টাকা চাই। তাছাড়া যদি চাকরীর চেষ্টা করিতে হয়—। নানা রকম চিন্তায় সে হাঁফাইয়া ওঠে—কোথাও কোন দিশা খুঁজিয়া পায় না।

কিন্তু ইহারই মধ্যে এক দিন পরীক্ষার দিন ঘনাইয়া আসে। পোষ্ট অফিস হইতেই কয়েকটি টাকা লইয়া তাহাকে যাত্রা করিতে হয়। কল্যাণীদের কিছু দিনের মত ব্যবস্থা সে করিয়া দিয়াছে; ছুটি পাইয়াছে মাহিনা সুদ্ধই, সুতরাং আগামী মাসেও ভাবনা নাই। অন্য ব্যবস্থা কিছুই করা হইল না।—তবে প্রসবের এখনও দেরী আছে। যদি ইতিমধ্যেই কিছু হয়, রাখুকে সে মহেশ বাবুরই শরণাপন্ন হইতে বলিয়াছে।

দীর্ঘকাল পরে কলিকাতা! সেখানে তাহার বাপ-মা আছেন, সেখানে তাহার সন্ধ্যা আছে। তবু কোথাও যেন তাহার কোন আশ্রয় নাই। সে যেন বিদেশী, তাহার এই জন্মভূমিতে আজ যেন সে অপরিচিত, সর্ব্বপ্রকার সম্পর্কহীন। সব চেয়ে এত কাছে আসিয়াও মাকে দেখিতে পাইবে না—সন্ধ্যাকেও দেখিতে পাইবে না, সেই দুঃখই যেন বেশী পীড়া দিতেছে। সন্ধ্যার সহিত দেখা করার অন্য কোন বাধা নাই কিন্তু তাহার মনে একটা বাধা আছে। প্রলোভন হইতে দূরে থাকাই ভাল। সে ওখান হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াই আসিয়াছে, কিছুতে এ-কাজ করিবে না।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা করে মানুষই, তাহার শক্তির উপরে আর একটা অদৃশ্য শক্তি আছে, যাহার কাছে মানুষের সব-কিছু এক দিন চূরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়—প্রতিজ্ঞা রাখা সম্ভব হয় না। বিশুর বাড়ীতে পৌছিয়াই সে সন্ধ্যার একখানা চিঠি পাইল, সন্ধ্যার হাতের লেখা। সে যে বিশুর বাড়ীতে উঠিবে একথা সন্ধ্যার জানিবার কথা নয়, শুধুই অনুমান। আশ্চর্য্য, ভূপেনের সম্বন্ধে তাহার অনুমানও ব্যর্থ হয় না!

অদ্ভুত একটা আবেগ-নিশ্রিত মন লইয়া সে চিঠিখানা খুলিল। ছোট চিঠি। সন্ধ্যা লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু—

পরীক্ষার আর দেরি নেই, বুঝতে পারছি না আপনি কোথায় এখন আছেন। তাই ওখানেও একটা চিঠি দিয়েছি, এখানেও দিলুম। দাদুর অসুখ খুব বাড়াবাড়ি, চিঠি পেয়েই, যদি সময় থাকে ত একবার চলে আসবেন। আর কিছু লিখতে পারছি না, ভাবতেও পারছি না। প্রণাম। ইতি—

এ-চিঠির পর আর অপেক্ষা করা চলে না। কোন মতে স্নান ও সামান্য-কিছু জলযোগ সারিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। বিশুর মাকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানাইয়া গেল—যদি ফিরিতে রাত হয়ত তাঁহারা যেন অপেক্ষা না করেন।

সন্ধ্যাদের বাড়ী যখন ভূপেন পৌছিল তখন সারা বাড়ীটা থম্‌থম্ করিতেছে। দাসী-চাকরদের মুখ ভার, চক্ষু আরক্ত। সকলেই পুরানো লোক—মোহিত বাবুর সহিত বহু কালের স্নেহের সম্পর্ক তাহাদের। অর্থাৎ এবারে বিপদ খুব আসন্ন, হয়ত আর তাঁহাকে রক্ষা করা যাইবে না।

বুড়া দারোয়ান তাহাকে দেখিয়াই অভ্যাস মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিল কিন্তু কোন কুশল-প্রশ্ন করিতে পারিল না। বরং চোখো-চোখি হইতেই তাহার চোখের কোল বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। ভূপেনও প্রশ্ন করিল না, সোজা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

সিঁড়ির মুখেই প্রায় অন্ধকারের সহিত মিশিয়া সন্ধ্যা দাঁড়াইয়া ছিল, ভূপেন উপরে উঠিতে কাছে আসিয়া প্রণাম করিল, কোন কথা কহিতে পারিল না। তাহার রোদনারক্ত চক্ষু ও অপরিসীম শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া ভূপেনের মুখেও সহসা কোন কথা জোগাইল না, মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া কোন মতে প্রশ্ন করিল, এখন কী অবস্থা?

সন্ধ্যা শান্ত-কণ্ঠেই উত্তর দিল। কহিল, কাল যতটা খারাপ গিয়েছিল আজ ততটা নয়, তবু আশা আর নেই। সর্ব্বাঙ্গই প্রায় পড়ে গিয়েছে, কাল সারা দিন অজ্ঞান হয়ে ছিলেন, আজ মাঝে মাঝে জ্ঞান হচ্ছে দু-চার মিনিটের জন্য। এখনও আচ্ছন্ন ভাবেই পড়ে আছেন, হার্টের অবস্থাও খুব খারাপ। চলুন না।

ঘরের মধ্যে এক জন ডাক্তার বসিয়াই ছিলেন। ঔষধ ও চিকিৎসার নানা আয়োজন ঘরের চারি দিকে ছড়ানো। তাহারই মধ্যে মোহিত বাবুর শীর্ণ দেহ বিছানার উপর নিথর নিস্পন্দ অবস্থায় পড়িয়া আছে। সেদিকে চাহিলে এই কথাটাই সর্ব্বাগে মনে আসে যে, আশা আর নাই, এখন শুধু আর কতক্ষণ এই অপেক্ষা।

ভূপেনও বসিয়া রহিল নিঃশব্দে। সন্ধ্যাকে কোন সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করাও বৃথা, সে প্রয়োজনও নাই। সাধারণ মেয়ের মত সে মানুষ হয় নাই, মামুলী সান্ত্বনার ঊর্দ্ধে সে। করিবারও কিছু নাই, শুধু যদি ইতিমধ্যে আর একবার সম্বিৎ ফিরিয়া আসে—শেষ দেখাটা যদি হয়।

অনেকক্ষণ পরে রোগীর দেহে আর একবার প্রাণ-স্পন্দন দেখা গেল, ওষ্ঠ দুইটি বার-কতক কাঁপিবার পর এক সময়ে তিনি চোখও খুলিলেন। শূন্যদৃষ্টি কয়েক মুহূর্ত্ত ছাদের কড়িকাঠে ঘুরিয়া অবশেষে এক সময়ে সন্ধ্যার অবনত মুখের উপর পড়িয়া অকস্মাৎ পরিচয়ের জ্যোতি খুঁজিয়া পাইল।

কাছে যাওয়া উচিত কি না বুঝিতে না পারিয়া ভূপেন ইতস্ততঃ করিতেছিল। ডাক্তার বাবু ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন যে তাহাতে এমন কিছু বেশী বিপদের সম্ভাবনা নাই। তখন সে-ও কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল। মোহিত বাবু কিছুক্ষণ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া থাকিবার পর বোধ করি তাহাকে চিনিতে পারিলেন, তাঁহার দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কী একটা বলিবার চেষ্টা করিতেছেন বুঝিয়া ভূপেন তাহার মাথাটা মোহিত বাবুর মুখের আরও কাছে লইয়া আসিল। বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়া শুনিল, তিনি বলিতেছেন, সত্য পথে অবিচল থেকো এই আশীর্ব্বাদ করি। কিন্তু সত্যটা বিচার করে নিও, আমার মত একটা সংস্কারকে সত্য বলে আঁকড়ে থেকো না। পুঁথির সত্য আর জীবনের সত্য এক নয়—চলার পথে সত্য তাঁর নিজের মহিমায় আপনি প্রকট হন্। তাঁকে চিনতে পারার মত শক্তি আর সাহস যেন থাকে।

বলিতে বলিতেই তিনি সহসা থামিয়া গেলেন। আবার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া আসিল—তেমনি নিঝুম হইয়া পড়িলেন।

আর তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল না। শেষ রাত্রে, প্রথম উষার আভাস জাগার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মারা গেলেন।

পরীক্ষার আর একটি দিন মাত্র বাকী, অথচ এধারে এই বিপদ। মোহিত বাবুর উইল অনুসারে ভূপেনই এখন সন্ধ্যা এবং তাহার বিপুল সম্পত্তির অভিভাবক। আইনের নানা রকম গোলমাল আছে, হিসাব-নিকাশের ব্যাপার আছে, শ্রাদ্ধের আয়োজন আছে, আবার তাহারই মধ্যে পরীক্ষা। সকাল বেলাই এখানে আসিতে হয়, তার পর কোন মতে স্নানাহার সারিয়া পরীক্ষা দিতে ছোটে। আবার সন্ধ্যা বেলা এখানে আসিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত থাকিতে হয়। সন্ধ্যা একবার অত্যন্ত সসঙ্কোচে এই বাড়ীতেই তাহাকে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিল কিন্তু ভূপেন রাজী হয় নাই। তাহার এই অনিয়মিত যাওয়া-আসায় বিশুদের অসুবিধা হইতেছে বুঝিয়াও না। যত দিন সন্ধ্যা সম্বন্ধে তাহার এবং তাহার সম্বন্ধে সন্ধ্যার মনোভাব বুঝিতে পারে নাই তত দিন এক রকম ছিল—এখন আর এত কাছাকাছি থাকা উচিত নয়। শুধু দেহে নয়, মনেও সে কল্যাণীর প্রতি অবিচার করিতে পারিবে না।

মোটামুটি পরীক্ষাগুলা শেষ হইয়া গেল পনের-ষোল দিনের মধ্যেই। ইতিমধ্যে ভূপেন নিজের ব্যাপারটার দিকে মনোযোগ দিবার অবসর মাত্র পায় নাই। শ্রাদ্ধের বেশী দেরী নাই, মোহিত বাবুর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া কে এক ভ্রাতুষ্পুত্র শোকার্ত্ত ভাবে আসিয়া হাজির হইল, সে-ই শ্রাদ্ধ করিতে চায়—তাহার বিশ্বাস ছিল শ্রাদ্ধকর্ত্তারা বিষয়ের ভাগ পায়। তাহাকে যখন বুঝাইয়া দেওয়া হইল যে, মৃত ব্যক্তির উইলের নির্দেশ অনুসারে সন্ধ্যাই শ্রাদ্ধ করিবে এবং সমস্ত বিষয় পাইবে, শ্রাদ্ধকারী নয়, তখন ভাইপোটি যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া গেল। শ্রাদ্ধ সম্পর্কে কোন কথাই আর উল্লেখ করিল না। এই শ্রেণীর আত্মীয় ও অভিভাবক আরও অনেকে আসিতে সুরু করিল। ভূপেনকে ছেলেমানুষ দেখিয়া অনেকেই তাহাকে উড়াইয়া দেওয়া সহজ হইবে ভাবিয়াছিল। কিন্তু এত রকমের অসুবিধার মধ্যেও ভূপেন ধীর ভাবে সব দিকই সামলাইয়া উঠিল। অবশ্য মোহিত বাবুর সরকার এবং তাঁহার অংশীদার ভদ্রলোকটি তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছিলেন, এ ছাড়া তাঁহার দুই-এক জন বন্ধুও তাহাদের বিপদে বুক দিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এ সবই করে ভূপেন কিন্তু মনে মনে যেন ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়ে। বিরাট একটা সংসারের দায়িত্ব তাহার মাথার উপর, অথচ এক পয়সার সংস্থান নাই। একটা পঞ্চাশ টাকা মাহিনার চাকরী ছিল তাহাও গিয়াছে। বলিতে গেলে সে শূন্যেই ভাসিতেছে, কোথাও এমন একটা আশ্রয় নাই, যেখানে সে দাঁড়াইতে পারে। কাজ পাওয়া সহজ নয়, বিশেষতঃ মাষ্টারী। অথচ খোঁজাখুঁজি করিবে সে রকম একটু সময়ও সে করিতে পারিতেছে না। বিশুর বাড়ী এমন করিয়া থাকা অন্যায়—যদিচ বিশুর মা যথেষ্ট আগ্রহের সহিতই তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। তবু হয়ত এত দিনে মেস একটা খুঁজিয়া লওয়া উচিত ছিল কিন্তু সেটায় সে মনের অবচেতনে তহবিলের দিকে চাহিয়াই বোধ হয় এতটা গড়িমসি করিতেছে। এখানে আসিয়াই সে কল্যাণীকে মোহিত বাবুর খবর দিয়া চিঠি দিয়াছিল, তার পর আর তাহাকে চিঠি দিতে পারে নাই। কী লিখিবে তাহাকে? সে বেচারার যে কী উদ্বেগে দিন কাটিতেছে তাহা ত সে বোঝে কল্যাণী তাহাকে একটি প্রশ্নও করে নাই বটে বরং যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া, সেখানে যে কোন অসুবিধা নাই বোঝাইবার চেষ্টা করিয়া দুই-তিনখানা চিঠি দিয়াছে, তাহাকে মিছামিছি বেশী ভাবিতে নিষেধ করিয়াছে বার বার, কোথাও কোন আশঙ্কা প্রকাশ করে নাই, এমন কি সন্ধ্যাকেও সান্ত্বনা দিয়া খুব মিষ্ট দুই-তিনখানা চিঠি দিয়াছে, তবু ভূপেন কল্যাণীর কাছে নিজেকে অপরাধী বলিয়া

মনে করে। এক একবার মনে হয়, তাহার যেটা বৃহত্তর কর্ত্তব্য সেটা অবহেলা করিয়া সন্ধ্যার প্রতি কর্ত্তব্যটা মধুরতর বলিয়াই বাছিয়া লইয়াছে।

এমনি ভাবে মনে মনে নিদারুণ ক্লান্তি ও অশান্তি ভোগ করিতে করিতে এক দিন কথাটা সে সন্ধ্যার কাছে বলিয়াই ফেলিল। তাহার যে ওখানকার চাকরী গিয়াছে এ সংবাদটা এত দিন সন্ধ্যা শোনে নাই, কল্পনাও করিতে পারে নাই। ভূপেন যে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করিয়া তাহার ব্যাপারে এমন ভাবে দিন-রাত নিজেকে জড়াইয়া রাখিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিয়া সন্ধ্যার বেদনা ও অনুতাপের সীমা রহিল না। বহুক্ষণ শুব্ধ ভাবে বিবর্ণমুখে বসিয়া থাকিবার পর সে কহিল, তবে কি কলকাতাতেই মাষ্টারী করার ইচ্ছা আপনার?

ভূপেন জবাব দিল, ইচ্ছা যে কী ছিল, আর কি নেই তা ভুলেই গেছি। এখন পৃথিবীর কোথাও একটা জীবিকার সন্ধান পেলে বাঁচি।

তাহার বিপুল বিত্ত যাহাকে নিবেদন করিতে পারিলে সার্থক হইত তাহারই এই অসহায় কথাগুলি সন্ধ্যার বুকে কাঁটার মত বিঁধিল অথচ কিছুই করিবার নাই, দাদু বাঁচিয়া থাকিলে যদি বা কিছু সম্ভব হইত, এখন এ অর্থের এক কপর্দ্দকও যে ভূপেন স্পর্শ করিবে না তাহা সন্ধ্যার চেয়ে বেশী কে জানে!

অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়া সে প্রাণপণে উদ্গত অশ্রু দমন করিল। প্রায় মিনিট-পাঁচেক পরে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিল, দাদুর বন্ধু ঐ যে পূর্ণেন্দু বাবু ডাক্তার আসেন, উনি শুনছি কোন্ এক বড় ইস্কুলের প্রেসিডেণ্ট! ওঁকে একবার বললে কি অন্যায় হবে?

অন্যায় কেন হবে সন্ধ্যা; আমি ত বরং বেঁচে যাই। যদি তোমার সম্মান ক্ষুণ্ণ না হয়, তুমি অনায়াসে বলতে পারো। উনি ত কিছু মনে করবেন না?

না! না! আমাকে ছোট বেলা থেকেই উনি দেখছেন, তা ছাড়া আপনার কথাও দাদুর মুখ থেকে অনেক বার শুনেছেন। উনি অন্ততঃ ভুল বুঝবেন না।

ভূপেন নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তা কি আর হবে! ভাবতেও সাহসে কুলোয় না আমার!

সেই দিনই অপরাহ্নে ডাক্তার বাবুর কাছে সন্ধ্যা কথাটা পাড়িল। তিনি খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া চিন্তিত মুখে কহিলেন, তাই ত দিদি, বড় অসময়ে কথাটা বললে, লোক আমাদের এক জন চাই কিন্তু সেক্রেটারীর একটি মামাতো-শালা বেকার আছে অনেক দিন, তার জন্য তিনি খুব ঘোরাঘুরি করছেন মেম্বারদের কাছে, এমন কি আমিও এক রকম কথা দিয়ে দিয়েছি—এখন আবার নতুন লোকের জন্যে চেষ্টা করা কি—। তবে একটা কথা, সে ছোকরা একবার ফেল ক'রে গত বছর কোন মতে বি-এ টা পাশ করেছে, আর ভূপেন ত অনার্স পাওয়া ছেলে। তা ছাড়া তোমার দাদুর মুখে যা শুনেছি ওর পড়াশুনোও খুব। দেখি, এক জন মেম্বার আছেন বটে তাঁর সঙ্গে সেক্রেটারীর অহি-নকুল সম্পর্ক, তাঁকে দিয়ে যদি কথাটা তোলাতে পারি। ওকে কালই একটা দরখাস্ত দিয়ে দিতে বলো। পরশু মিটিং—সেই দিনই যাকে হোক্ বহাল করা হবে—

পূর্ণেন্দু বাবু থাকিতে থাকিতেই ভূপেন আসিয়া পড়িল। তিনি তাহাকে সংক্ষেপে কথা কয়টা বুঝাইয়া দিয়া কহিলেন, তুমি ভাই কালই ইস্কুলে গিয়ে হেড্-মাষ্টারের হাতে দরখাস্তটা দিয়ে এসো। মাইনে খুবই কম, ষাট টাকায় সুরু। তবে আমাদের ইস্কুলে বড়-লোকের ছেলে বিস্তর, টুইশ্যন জোটে মোটা মোটা। কোচিং-এর ব্যবস্থাও আছে।

ষাট টাকা! আশা করিতেও ভয় হয় ভূপেনের। অবশ্য কলিকাতার মেসে থাকিতে হইলে ঐ বাড়তি দশ টাকার উপরও আর কিছু লাগিবে তাহার কিন্তু তা হউক, তবু ত সকলকে উপবাস করিতে হইবে না।

ইহার পরের দুইটা দিন ভূপেন এক রকম কণ্টক-শয্যাতেই কাটাইল। আশা করিতেও পারে না—অথচ নিরাশ হইতেও সাহসে কুলায় না এমনি একটা অবস্থা। অবশেষে রবিবার অপরাহ্নেই খবর পাওয়া গেল যে পূর্ণেন্দু বাবু অসম্ভবই সম্ভব করিয়াছেন। মামাতো-শালাটির একবার শুধু নয়—ইহার পূর্ব্বেও ইণ্টারমিডিয়েট এবং ম্যাট্রি-কুলেশনের সময় কয়েক বার ফেল হওয়ার ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া এমন ভাবেই তিনি কথাটা মেম্বারদের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন যে সেক্রেটারীর কোন চেষ্টাই ধোপে টিকিল না। শালাটি নাকি লক্ষ্ণৌ হইতে গান শিখিয়াছে, তা ছাড়া সে কোন্ এক বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের ভাইপো! এমনি সব প্রশংসা-পত্রও শেষ পর্য্যন্ত দিতে সুরু করিয়াছিলেন, তবুও জুৎ করিতে পারেন নাই। শেষের দিকে সেক্রেটারী প্রায় ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন—অতি কষ্টে তাঁহাকে শান্ত করিয়া মেম্বাররা এক রকম প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, পরের ভেকান্সিটি নিশ্চয়ই তাঁহার ঐ বিখ্যাত শালাকে দেওয়া হইবে।

সব কথাই গল্প করিয়া পূর্ণেন্দু বাবু হাসিয়া বলিলেন, দেখো হে সাবধান, সেক্রেটারী কিন্তু তোমার শত্রু হয়ে রইলেন। কমিটি মিটিং-এর এত কথা বললুম শুধু এই জন্যই যে তুমি মানুষটিকে খানিকটা চিনে রাখতে পারবে! পরন্তু তোমার ইণ্টারভিউ, তাও সেক্রেটারীই নেবেন. তবে সে দিকে তত ভয় নেই, কারণ আমিও সময় ক'রে সেই সময়টা উপস্থিত থাকব'খন। উনি অবিশ্যি জানেন না যে, তুমি আমার ক্যাণ্ডিডেট, তবু আমি আর হেড্-মাষ্টার উপস্থিত থাকলে উনি অতটা শয়তানী করতে পারবেন না। আর একটা কথা বলে রাখি, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড্-মাষ্টার হলেন সেক্রেটারীর চর—খুব সাবধান হয়ে কথাবার্ত্তা বলবে ওর সামনে—ইস্কুলে যা কিছু হয় উনি রোজ গিয়ে লাগিয়ে আসেন সন্ধ্যের সময়ে। আচ্ছা···আসি তাহ'লে।

ইহার পরেও দুইটা দিন ভূপেনের কম অশান্তিতে কাটিল না। সেক্রেটারীই ইণ্টারভিউ লইবেন অথচ তিনিই রহিলেন বিরূপ হইয়া। এ-চাকরী যে হইবে সে ভরসা কিছুতেই যেন হয় না। এই দুঃসময়ে এত সহজে এবং এত অল্প সময়ে অত বড় ইস্কুলে মাষ্টারীটা জুটিয়া যাইবে তাহা বিশ্বাস করা সত্যই কঠিন। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত ইণ্টারভিউটা ভালয় ভালয় কাটিয়া গেল। সেক্রেটারী সাধারণ গ্র্যাজুয়েট জানিয়াই তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন. সে সব প্রশ্নে ভূপেনের হাসি পায়। তাহার মনে হইতে লাগিল যে সালেক কি পদনকে এ সব প্রশ্ন করিলে তাহারাও উত্তর দিতে পারিত। পূর্ণেন্দু বাবু ভূপেনের লেখাপড়ার খ্যাতি ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন তবু তিনিও বিস্মিত না হইয়া পারিলেন না। সেক্রেটারীকেও স্বীকার করিতে হইল যে প্রার্থীর বিপক্ষে কিছুই বলিবার নাই। শুধু বয়সটা কম এই যা. তা কী আর করা যাইবে!

অর্থাৎ ভূপেন আরও একটা আশ্রয় পাইল।

মাঝি

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রান্তরে যেথা
কুটীরের গান শেষ,
যেথা মুছে গেছে ভালোবাসা,
অশ্রু হয়েছে বাষ্পের বর্ণা
কিশলয়ে জাগে কান্নার ঢেউ শুধু,—
আমি তো সেখানে যাত্রী—
তুমি বলেছিলে
জয়তু হে অভিযাত্রী,
আমি তো সেখানে
মৃক-ছায়া সম চঞ্চল।

এখানে এসেছ তুমি উজ্জ্বল ভালোবাসা
বয়ে এসো আরো স্রোতে,—
আপন তপস্যায়
আমি হব চিরজয়ী ;
গুণ্ঠন খোলা ভেসে আসে বাণী
তোমার উজানে আমার নৌকা
এনেছে আশীর্ব্বাদ।

এখানে যে ঝড়ে কতো
স্মরণের পাখা খসে গেছে শত শত
জীবনের পাখি কতো
নিষ্প্রভ মরে যায়,
ধনানীর যেথা জীবনের হুতাশনে
মিশে গেছে আজ মাটীর উর্বরতায়,-
আমি তো সেখানে যাত্রী
আমি তো সেখানে প্রেমের উজানে
বয়ে চলি খেয়া করে চলি নদী-পার,
জীবনের নব জাগরণে
চিরজয়ী সাধনায়।

পরের মাসের পয়লা হইতে নূতন ইস্কুলে কাজ শুরু করার কথা। তখনও মাস-কাবার হইতে চার-পাঁচ দিন বাকী, অর্থাৎ ইতিমধ্যে অনায়াসে কল্যাণীর কাছ হইতে ঘুরিয়া আসা চলিত কিন্তু খরচের কথা ভাবিয়া সে ইচ্ছা মনেই চাপিয়া রাখিতে হইল। চিঠি লিখিয়াই সে তাহাকে সুসংবাদটা দিল আর মহেশ বাবুর কাছেও পদত্যাগ-পত্রের সহিত একখানা দীর্ঘ চিঠি লিখিয়া সব কথা জানাইল এবং অনুরোধ করিল যে প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের যে কটা টাকা তাহার পাওনা হয় তাহার মধ্য হইতে নিজের ঋণ শোধ করিয়া তিনি যেন বাকী টাকাটা তাঁহার কাছেই রাখিয়া দেন এবং কল্যাণীর আসন্ন বিপদে একটু তত্ত্বাবধান করেন। সে যতীন এবং রাধাকমল বাবুর কাছেও দেখা-শোনা করার অনুরোধ জানাইয়া দুইখানা চিঠি দিল।

এম্‌নি করিয়া অতি সহজেই ওখানকার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হইয়া গেল। সম্পর্কটা কত ক্ষণস্থায়ী তাহার অবস্থানই বা ক'টা দিনের, তবু তাহারই মধ্যে আর একটা বৃহত্তর সম্পর্ক শুধু শুধু তাহার ঘাড়ে চাপিল চিরকালের মত। ফলাফল যাহাই হউক না কেন, স্বাধীনতা বলিতে আর তাহার কিছু রহিল না, কোন দিন ফিরিয়া পাওয়াও সম্ভব হইবে না জীবনে। বোঝা ও বন্ধন এখন বাড়িতেই থাকিবে দিন দিন—এই বয়সেই সে যেন পঙ্গু হইয়া পড়িল। [ক্রমশঃ

বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে দু'-একটি কথা

বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী

বাঙলা দেশে বর্ত্তমান কালে সাহিত্যের প্রসার ঘটেছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। শুধু লেখক-গোষ্ঠীর কথা ভেবে বলছি না, পাঠকদেরও ধরেই বলছি। সাহিত্য বস্তুটি শুধু লেখক দিয়েই সম্পূর্ণ হয় না, পাঠকও তার আবশ্যিক অঙ্গ। বিশেষতঃ সাহিত্যের একটা প্রধান কাজ হচ্ছে, শোনবার লোকের আসন বড় করে তোলা। যে-সমাজে সমঝদার শ্রোতার সংখ্যা অল্প সে-সমাজে সাহিত্যের বাঁচবার এবং বড় হবার ক্ষেত্র সংকীর্ণ। সমঝদার পাঠকের সংখ্যাবহুল সমাজে লেখবার শক্তি অনেক লেখকের মধ্যে আপনিই দেখা দেয়। বাঙলা দেশে লোকোত্তর প্রতিভাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টা আজ নেই সত্য, কিন্তু একথা ভেবে খুশী হওয়া চলে যে, সাহিত্যের ক্ষেত্র এবং উৎসাহী শ্রোতার আসন বাঙলা দেশে আজ বিস্তারলাভ করেছে। শুধু সাহিত্য-বিষয়ক একাধিক কাগজকে বাঙলা দেশ আজ বাঁচিয়ে রেখেছে; স্বল্প প্রতিভা-সম্পন্ন আধুনিক কবির কবিতার বই অনেক ক্ষেত্রেই আজ আর পোকায় কাটছে না, বাজারে কাটছে। কলকাতায় প্রায় পাড়ায় পাড়ায় সাহিত্য সভা এবং মফঃস্বলেও সাহিত্য সম্মিলনের অভাব নাই। উৎসাহের এটা বাজে খরচ মনে করা ভুল, কেন না প্রাণের প্রাচুর্য্য যেমন সমস্ত অঙ্গে সাড়া জাগায় তেমনি জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি জাতির সমস্ত প্রকার কর্ম্মের ক্ষেত্র স্পর্শ করে। রাজনীতির মত সাহিত্যও যে আজ গুটিকয়েক অ-সাধারণ থেকে বহু এবং বিপুল সর্ব্ব-সাধারণের দিকে এগিয়ে চলেছে এটাকে জাতীয় শক্তিবৃদ্ধির লক্ষণ বলে মনে করাই সঙ্গত।

উন্নত-নাসিক সমালোচক হয়ত বলবেন, 'তার মানে সাহিত্যের আদর্শ নেমে এসেছে, সর্ব্বসাধারণের আয়ত্তের সীমায় পৌঁছাতে গিয়ে তার চরিত্র খর্ব্ব হয়েছে, তার মূল্য কমেছে। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলবেন, 'তাঁদের সমসাময়িক পাঠকের সংখ্যা বর্ত্তমান পাঠকের সংখ্যার চেয়ে কম ছিল, কেন না তাঁদের কাব্য ছিল এত উচ্চাঙ্গের যে তা সাধারণ পাঠকের ক্ষমতা অতিক্রম করে যেত।' এ যুক্তি সম্পূর্ণ সত্য নয়। তাঁদের সাহিত্য উচ্চাঙ্গের ছিল এ কথা সত্য, উচ্চাঙ্গের ছিল বলেই ত জাতির একটা বিস্তীর্ণ অংশকে শিক্ষিত করে তুলেছে, সমঝদার করে তুলেছে। সাহিত্যের যে-প্রসারের কথা বলেছি সে তো তাঁদেরই দান। তাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন এ কথার অর্থ এই বুঝি যে, তাঁরা শুধু সাহিত্যরস সৃষ্টি করেননি, সাহিত্যরস উপভোগ করবার মত সমঝদার পাঠকেরও সৃষ্টি করেছেন। এই ব্যাপক অর্থেই তাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টি সার্থক হয়েছে; শোনবার লোকের আসন আগেকার মত আজ আর সঙ্কীর্ণ নয়, আজ বাঙলা দেশে সাহিত্যরসাস্বাদীর সংখ্যা ছড়িয়ে পড়েছে তাঁদেরই কীর্ত্তির ফলে। এ জন্য তাঁদের সাহিত্যকে নামতে হয়নি, বাঙলা দেশকে উঠতে হয়েছে। বর্ত্তমান লেখকদের কাছে আমাদের দাবী বেড়ে গেছে, কেন না, আমরা একবার অমৃতের সঙ্গ লাভ করেছি, এখন স্বল্পে আমরা আর তুষ্ট নই। এই দাবীর ঐকান্তিকতার জোরেই বাঙলা সাহিত্য নূতন শক্তি লাভ করবে।

সাহিত্যে শক্তি বৃদ্ধির আরও একটা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এই যে, তাকে অবলম্বন করে আজ বাক্যের ঝড় উঠছে এবং তর্কের ধূলি আকাশ স্পর্শ করেছে। মানুষকে নিয়েই সাহিত্যের কারবার, আর মানুষের মত এমন অদ্ভুত, বিচিত্র, বিরুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন প্রাণী দুনিয়ায় আর দ্বিতীয় আছে কি না জানি না। শুধু জন্তুর সঙ্গে নয় নিজের সঙ্গেও মানুষ অহরহঃ লড়াই করে টিঁকে আছে। তার জীবনের এই দ্বন্দ্ব নিয়ে সে সাহিত্যকেও আবর্ত্তিত করেছে। বাঙলা দেশের মানুষও প্রমাণ করেছে দেশের সাহিত্যকে সে জীবন লক্ষণাক্রান্ত করেছে। এই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই প্রগতি চলেছে, মানুষ সত্য থেকে সত্যতরে পৌঁছাচ্ছে। দুই বিরুদ্ধ শক্তির সমন্বয়ে দ্বন্দ্বের শেষ এবং নূতন দ্বন্দ্বের আরম্ভ—জার্ম্মাণ দার্শনিকের এই সিদ্ধান্ত সাধারণ জ্ঞানের বাইরে নয়। ইতিহাসে দেখেছি, আদর্শের দ্বন্দ্বের শেষ কোনটিরই সম্পূর্ণ জয় বা সম্পূর্ণ বিলয়ে নয়। দ্বন্দ্ব শেষে যে সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হল তাতে দেখা যায় যারা ছিল বিরোধী, পরস্পর-বিপরীত, তাদের মধ্যেও ঐক্যের বীজ সঙ্গোপনে অবস্থান করেছিল। বাঙলা সাহিত্যে ২০ বছর আগে আদর্শের একটা লড়াই সুরু হয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সে দ্বন্দ্বে যোগ দিয়েছিলেন এবং অন্য পক্ষে অবতীর্ণ হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র এবং নরেশ সেনগুপ্ত মহাশয়। বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্য, এমন কি রবীন্দ্রনাথেরও শেষ দিকের কোন কোন লেখা বিচার করলে দেখা যাবে, সাহিত্য ঐ দুই দৃশ্যতঃ বিরোধী ভাবেরই সমন্বয় সাধন করেছে। উভয় পক্ষেরই উগ্রতা এবং উষ্মা বাদ দিলে যা থাকে তার মধ্যে একটা সঙ্গতি বর্ত্তমান ছিল, তার একটা বিশেষ অংশ সম্পূর্ণ ত্যাজ্য ছিল না। পরবর্ত্তী সাহিত্য তা প্রমাণ করেছে। দেখা গিয়েছে যে-পুরাতন ঐতিহ্য নূতনের অর্ব্বাচীন অভিনবত্বকে অবজ্ঞা করতে চেয়েছে সেই ঐতিহ্যই অবশেষে ঐ অভিনবকে আত্মস্থ করে নিজেকে শক্তিশালী করেছে এবং যে-নূতন প্রাণশক্তির জোরে একদা সমস্ত পুরাতনকে বোঝা মনে করে ত্যাগ করতে চেষ্টা করেছে, সেই নূতনই আবার যুগ-সঞ্চিত ঐতিহ্যের শিকড়ে নিজেকে যুক্ত করে রসগ্রহণে পুষ্ট হয়েছে। সে দিন বাঙলা সাহিত্যে যে তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল 'সাহিত্য-ধর্ম্ম' নিয়ে তা অবশেষে বাঙলা সাহিত্যের সুস্থতা এবং শক্তিমত্তাই প্রমাণ করেছে এবং তার থেকে কল্যাণ সাধনই হয়েছে। কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বর্ত্তমানে বাঙলা সাহিত্য আবার একটা বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছে, যার ফলে কেউ কেউ সম্প্রতি বলছেন যে, বর্ত্তমান সাহিত্যকে সার্থক হতে হলে তাকে হতে হবে গণসাহিত্য, এবং এই গণসাহিত্যই প্রগতিশীল সাহিত্য।

রবীন্দ্রনাথ একবার একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, সাহিত্যে থার্ড ক্লাস বলে কোন জিনিষ নেই, সাহিত্য সব সময়েই ফার্ষ্ট ক্লাসে চলে। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, যে কোন বিষয়ই হোক না কেন, তাতে একবার আর্টের ছাপ পড়লে সে একেবারে অনির্ব্বচনীয়ের দলে পড়ে যায়, তখন তার একটি মাত্র শ্রেণী সম্ভব, সেটা সুন্দরের শ্রেণী, এবং সুন্দরের স্থান বরাবরই ফার্ষ্ট ক্লাসে। কবিগুরুর এই উক্তির সত্যতা অস্বীকার করা চলে না। নালিশ চলতে পারে—কাব্যে, ইতিহাসে সমাজের তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর ছবি পাই, কিন্তু তথাকথিত নিম্ন শ্রেণী সাহিত্যে অবজ্ঞাত কেন? যে-সাহিত্যে সমাজের বড় অংশের বিচিত্রতর জীবনের চিহ্ন নাই, সে সাহিত্যের পরিধি সঙ্কীর্ণ হতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথ এ তথ্য অস্বীকার না করেও বলতে চেয়েছিলেন, 'তুমি অখ্যাত অংশের অবজ্ঞাত কাহিনীকে সাহিত্যে স্থান দিতে চাও ভাল কথা, কিন্তু তাকে যদি রসোত্তীর্ণ না করতে পার তবে সমাজবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিপ্লবের দোহাই দিয়ে কোন বিশেষ অ-সাহিত্যিক আদর্শের জোরে তাকে সাহিত্য-সৃষ্টির স্তরে পৌঁছাতে পারবে না। অর্থাৎ গণজীবনকে যদি সাহিত্যে স্থান পেতে হয় তবে তা গণনায় ভারী হলেই চলবে না.

তাকে সাহিত্যের পদে উঠতে হবে। এখানে পদস্খলন হলে শুধু জন-গণেশের গৌরবে গণসাহিত্য গড়ে উঠবে না।

বস্তুতঃ, এই আশঙ্কার হেতু আছে। মানুষের জীবনে যেমন, সাহিত্যেও তেমনি ফ্যাসান বলে একটা জিনিষ আছে। কিছু কাল আগে বছর বছর আষাঢ়, শ্রাবণ সংখ্যা মাসিক কাগজ খুললেই চোখে পড়ত বর্ষার কবিতা। অর্থাৎ কবিযশঃপ্রার্থী মাত্রেই এই দুই মাস বর্ষার কবিতা লিখতেন, এই ছিল তখনকার ফ্যাসান। যা ছিল প্রেরণার বিষয় তা হয়ে গিয়েছিল অভ্যাসের বস্তু, কেন না তাই ছিল ফ্যাসান। প্রত্যেক যুগেই একটা না একটা ফ্যাসান সাহিত্যসৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মায়। বর্তমানেও একটা ফ্যাসান হয়েছে গল্পে-উপন্যাসে-কাব্যে যাদের আমরা রিক্ত, সর্ব্বহারা বলি তাদের কথা বলা। এক কালে রাজা-রাজড়ার কথা ছাড়া সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব ছিল না, আজকাল শুধু রাজনীতি ক্ষেত্রে নয় সাহিত্যেও কিষাণ-মজদুর শ্রেণী রাজা-রাজড়ার স্থান কেড়ে নিচ্ছে। সাহিত্যশিল্পীর সৃষ্টির ক্ষেত্রের এই প্রসারে আনন্দিত হওয়াই উচিত, কিন্তু আশঙ্কার কথা এই যে, এই প্রসার অনেক ক্ষেত্রে প্রাণের তাগিদে বা সৃষ্টির নিয়মে নয়, ফ্যাসানের তাড়নায়। দেশে গণজাগরণের সাড়া পড়ে গেছে, অতএব সাহিত্যেও যদি গণজীবনের ছাপ না থাকে তবে সে সাহিত্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে কেন—এই যুক্তি অনুযায়ী যাঁরা গণসাহিত্য রচনা করতে চাইবেন তাঁদের সৃষ্টি সাহিত্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। বাস্তবিক সমাজের রিক্ত শ্রেণীর ইতিহাস সাহিত্যের প্রয়োজনে মোটেই রিক্ত নয়। অনুভূতির ব্যাকুলতায় নিষ্ঠা এবং সহানুভূতির ঐকান্তিকতায়, সৃষ্টির তাগিদে এবং প্রতিভার বিপুলতায় যে-সাহিত্যস্রষ্টা সাহিত্যে এদের ফুটিয়ে তুলতে পারবেন তিনি জাতির নমস্য। আজ কিষাণ-মজদুরের দ্বারা দেশে বিপ্লব সম্ভব করবার চেষ্টা চলেছে বটে, কিন্তু সেই চেষ্টার অঙ্গ হিসাবে যদি গুটিকয় সাহিত্যশিল্পীকে ফরমাস দিয়ে বিপ্লবি-সাহিত্য লেখানো যায় তবে তা বিপ্লবী হবে কি না জানি না, সাহিত্য যে হবে না তা বলতে পারি। কেন না, সাহিত্য ফরমাস বা ফ্যাসানের বস্তু নয়, আমার বিশ্বাস বিপ্লবও তাই নয়। যিনি আজ কিষাণ-মজদুর-বিপ্লবের জয়গান সাহিত্যে করবেন, কিষাণ-মজদুরের জীবন সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞান, চিত্তে বিরাট সহ-অনুভূতি এবং সৃষ্টির অদম্য প্রেরণা তাঁর থাকা চাই, যাতে সত্যিকার সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে, তেমন সাহিত্য-শিল্পীর দেখা পাওয়া আজও যে সম্ভব হয়নি তা তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যখন দেখছি বাঙলা সাহিত্যেও গণসাহিত্য সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও মরবার আগে তাঁর কবিতায় দুঃখ করে গেছেন,

"কৃষাণের জীবনের সরিক যে জন,
কর্ম্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জ্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।
সেটা সত্য হোক
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয় ভালো নয় নকল সে সৌখীন মজদুরী।"

নকল সৌখীন মজদুরী দিয়ে গণসাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। লেনিন একবার বলেছিলেন, মজদুর শ্রেণীর লোক না হলে মজদুর-বিপ্লব সম্বন্ধে প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করা অত্যন্ত শক্ত, প্রায় অসম্ভব। 'বাবু' শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী মজদুর শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অনেক তফাৎ। আমরা যারা জীবনের অতি ক্ষুদ্র অংশে, সম্মানের চির নির্ব্বাসনে, সমাজের উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করে সংকীর্ণ বাতায়নপথে চাষী-তাঁতী-জেলের বিচিত্র কর্ম্মরত ক্লিষ্ট জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করেছি, ভিতরে প্রবেশ করিনি, তাদের জীবনের সঙ্গে নিজেদের জীবন যোগ করতে পারিনি—সেই আমরাই যখন তাদের দিয়ে তাদেরই ভালোর জন্যে বিপ্লব গড়ে তুলতে চাই এবং তাদের সাহিত্য সৃষ্টি করবার চেষ্টা করি তখন ফল খুব আশাপ্রদ হয় না। সাহিত্য উপলব্ধির বস্তু, উপলব্ধি না হলে ব্যক্ত হয় না, সাহিত্য হয় না। হয়ত—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই এক দিন এই গণশক্তিই তাদের নিজেদের সাহিত্য নিজেরাই সৃষ্টি করবে। তাদের মুখে ভাষা দেওয়া, তাদের সচেতন করে তোলাই হবে গণসাহিত্য সৃষ্টির গোড়া-পত্তন করা। গণবিপ্লবের সত্যিকার সাহিত্য রচনা করবে গণশক্তিই যখন তারা বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে, যখন তারা তা উপলব্ধি করবে এবং ভাষায় ব্যক্ত করতে চাইবে। যত দিন তা না হবে তত দিন এখানে ওখানে একটি দুটি 'ভদ্রলোক'-সাহিত্যিক হয়ত আপন অসাধারণ শক্তিবলে এদের সম্বন্ধে অতি নিবিড় জ্ঞানের এবং মমত্ববোধের সাহায্যে প্রেরণা লাভ করে গণসাহিত্য রচনা করতে পারেন, কিন্তু সেটা হবে নিয়মের ব্যতিক্রম। এদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে এদের এক জন না হলে এদের সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। যা সম্ভব তা হচ্ছে নকল, সৌখীন মজদুরী; তাতে ফ্যাসান বাঁচতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের দাবী মেটে না।

বাঙলা সাহিত্যে যে দিন গণসাহিত্য রচনা হবে সে দিন তার সম্পদের সীমা থাকবে না। বাস্তবিক সত্যিকার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের গভীরতা যেমন অতলস্পর্শী, ব্যাপ্তিও তার তেমনি বিশাল। ধরুন, মহাভারত। একটা জাতির জীবনের বিচিত্র ধারার, তার আশা, আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা, চেষ্টার এমন ব্যাপক, গভীর রসঘন ইতিহাস অন্য কোথাও সচরাচর মিলে না বলেই তো সাহিত্য-জগতে মহাভারতের এমন অনন্যসাধারণ স্থান। তার পাঠকগোষ্ঠীও তো একটা ক্ষুদ্র শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ নয়। শোনবার লোকের আসন এত-বড় আর কোন সাহিত্যেরই নয়; সর্ব্বজনমনকে এবং গণমনকেও যুগে যুগে এই সাহিত্য পুষ্ট করেছে। গোড়াতে বলেছি সাহিত্যের একটা বড় কাজ পাঠক তৈরী করা যে-পাঠক সাহিত্যের মর্য্যাদা বুঝবে। মহাভারত যুগে যুগে পাঠক তৈরী করেছে, তার আবেদন বহুজনমন স্বীকার করেছে। মহাভারত ভারতে শিক্ষা বিস্তার করেছে সংকীর্ণ অর্থে নয়। যে আনন্দ জীবনের মূলে, সেই আনন্দ বিতরণ করতে করতে শিক্ষা দান করেছে, এই শিক্ষা সেই আনন্দেরই অঙ্গ, কাজেই এতে গুরুমশায়ের ইস্কুলের ছাপ নাই। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মানবচিত্তকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে, উত্তোলন করে, নিজে কখনও পাঠকের দিকে নেমে আসে না। যে-সাহিত্য popular তা-ই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নয়, কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মাত্রেই popular হতে বাধ্য; হয়ত অনেক ক্ষেত্রে popular হতে তার খানিকটা সময় লাগে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে অনেক লোকের কানে কথা কয়, অনেক চিত্তকে রসগ্রাহী করে তোলে। এই জন্যই সুস্থ জীবনের মত সাহিত্য প্রসারধর্ম্মী, সঙ্কোচধর্ম্মী নয়।

সাহিত্যের বিভিন্ন তর্কের উল্লেখ করেছি. আর একটি তর্কের উল্লেখ করব। এ তর্ক উঠেছে সংবাদ-সাহিত্য নিয়ে। সংবাদ-সাহিত্য কি সত্যিকার সাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়ে? জীবন-সমুদ্রের বেলাভূমে চঞ্চল, ভাসমান. ভ্রাম্যমাণ টুকরো মেঘের পলাতক ছায়ার কি মূল্য? ছায়া-আলোকের এই চিরচঞ্চল খেলা তো মিথ্যা. কিন্তু শুধুই কি মিথ্যা? জীবনের কোন্ স্থায়ী সত্য অনিত্যের পটে প্রতিফলিত না হয়ে প্রকাশ হতে পেরেছে? যে-কুরুক্ষেত্র ঘিরিয়া মহাভারতের সৃষ্টি, যে রামচরিত্রকে রামায়ণ অমর করেছে তা-ও কি এক দিন সাময়িক, অনিত্য ছিল না? আজ যে ছায়া-আলোকের লুকোচুরি পলকে দেখা দিয়ে পলকে মিলিয়ে যাচ্ছে মানুষের চিত্তপটে সুন্দর তাকেই তো চিরস্থায়ী করে তোলে, সাহিত্য তাকেই তো চিরসত্য করে ধরে রাখল। আসল কথা, যা সাময়িক তার মধ্যেও সময়াতীত সঙ্গোপনে বিরাজ করে, তাকে প্রকাশ করে ধরে রাখবার ক্ষমতা আছে শুধু শিল্পের এবং সাহিত্যের। যা দৃশ্যতঃ অংশ যার স্থিতি স্থান এবং কালে সীমাবদ্ধ তাকেই তো সাহিত্য সমগ্র করে স্থানাতীত কালাতীত করে গড়ে তুলে, তাকেই তো বলি সৃষ্টি। সংবাদ-সাহিত্য প্রতিদিনের টুকরো সংবাদের উপর গড়ে উঠছে বলে তাকে সাহিত্য বলব না এ কথা স্বীকার্য্য নয়। এক জন ইংরেজ সমালোচক বলেছেন, 'Journalism that lasts is literature' অর্থাৎ স্থায়ী সাংবাদিকতা সাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়ে। বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে বলেছেন, 'সাহিত্য মাত্রেই সংবাদ-সাহিত্য।' তাঁর বক্তব্য যা বুঝেছি তা এই যে সাহিত্যের জন্মই সমসাময়িকের ভূমিতে, দেশকালকে স্বীকার করেই সে দেশকালাতীতে পৌছাতে পারে, অস্বীকার করে নয়। সাময়িকতার ভিত্তিতেই মানুষের জীবন, তার সৃষ্টির মাল-মসলা অনিত্য জগৎ এবং চলমান কাল হতেই সে আহরণ করবে, কাজেই দেশকালের ছাপ তাতে থাকবেই, তবে সাহিত্য-পর্য্যায়ে পৌছাতে হলে তাকে সেই সোনার কাঠি স্পর্শ করাতে হবে যা, অনিত্যকে নিত্য করে, যা সাময়িককে চিরন্তন করে তোলে।

সাহিত্যে তার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। স্মরণ রাখতে হবে, আমাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা অনেকেই সাংবাদিক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের জয়ধ্বজা তুলেছিলেন 'বঙ্গদর্শন' পত্রে। তাঁর সাহিত্যের প্রেরণা এসেছিল তাঁর দেশ এবং কালের ঘটনা থেকে। তাঁর সমসাময়িক পাঠকগোষ্ঠীর জন্য যা তিনি লিখেছিলেন তা তাদের কাছে মাসের পর মাসে সীমাবদ্ধ ছিল। আজ সে সমস্ত লেখা আমাদের কাছে তার দেশকালের পরিবেশকে ছাড়িয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রবন্ধ একেবারে সাময়িক প্রয়োজনে সাংবাদিকের লেখা. কিন্তু তা সাময়িকের সীমা অতিক্রম করেছে। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র এবং অনেকাংশে রবীন্দ্রনাথের যুগ মাসিকের যুগ। তখন মানুষের চিত্ত বাহিরের ঘটনার দ্বারা সঞ্জীবিত হত, অভিভূত হত না। এট দৈনিকের যুগ; আজ চারি দিকে প্রত্যহ এত ঘটনা ঘটছে যে তার চাপে মানুষের চিত্ত বিশ্রাম পাচ্ছে না, রয়ে-বসে, ধীরে-সুস্থে সাহিত্য রচনায় তার ব্যাঘাত জন্মেছে। তাই সাহিত্যসৃষ্টির বহু প্রচেষ্টা আজ আর বিলম্বিত পদ্ধতি আশ্রয় করে না, রচনার দৈর্ঘ্য কমে আসতে হয়েছে; কেন না পাঠকের সময়াভাব এবং লেখকেরও ফুরসুৎ কম। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বল্প পরিসরে রচনার তীব্রতা এবং তীক্ষ্ণতা যেমন বেড়েছে গভীরতাও তেমনি খানিকটা কমেছে। এটা সাহিত্যের উপর জীবনের প্রভাবের ফল। একে অস্বীকার করা চলবে না, এর জন্য হাহাকার করাও সঙ্গত হবে না, কেন না জীবনের দিকে পিছন ফিরে সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়; সে চেষ্টা যে সাহিত্যের ইতিহাসে হয়নি তা নয়, কিন্তু তার ফল কখনও শুভ হয়নি।

সমগ্র সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, সাহিত্যের এই আধুনিক রূপ তার প্রসারের দিকে কতটা কার্য্যকরী হচ্ছে। বাঙলা দেশের অধিকাংশ সাহিত্যস্রষ্টা আজ সাংবাদিক, এটা সমাজে সাহিত্যবোধ ছড়িয়ে পড়বার পক্ষে একটা আশীর্ব্বাদ বলে গণ্য হওয়া উচিত। আভ্যন্তরীণ নিত্যস্বরূপ বজায় রেখে বিভিন্ন পরিবেশের প্রভাবে সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ হতে বাধ্য। সংবাদপত্রের প্রভাবে বাঙলা সাহিত্য আজ যে রূপ ধারণ করেছে তা প্রসারতায় সাহায্যই করছে। আজ বাঙলা সাহিত্যে বনস্পতির অভাব হয়েছে সত্য কিন্তু ক্ষেত্র অনুর্ব্বর নয় বলে আবাদ চলছে এবং চলনসই রকমের সবুজ গাছের অভাব নাই। বিগত যুগগুলি বেশীর ভাগই এক একটি বিরাট মহীরুহের গৌরব বহন করেছে মাত্র। সাহিত্যরচনা আজ আর পূর্ব্বের মত একটা দুর্লভ সামগ্রী নয়। সংবাদ-সাহিত্য সম্বন্ধে অভিজাত সমালোচক অনেক নালিশ করতে পারেন যা অন্যায় নয়। কিন্তু সাহিত্যের প্রসারে তার দান স্বীকার না করে উপায় নাই।

বাঙলা সাহিত্যে যুগান্তকারী প্রতিভা আবার কবে দেখা দেবে তা নিয়ে আজ গবেষণা চলতে পারে। প্রতিভা অনেক সময় ইতিহাস মানে না. কিন্তু একেবারে মানে না তা-ও নয়। প্রতিভাও ভূমির উর্ব্বরতার অপেক্ষা রাখে। বর্ত্তমান সাহিত্যিকদের এইটিই দায়, তাদের ভূমি উর্ব্বর রাখতে হবে। সমাজের প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সহিত্যবোধ জন্মাতে হবে ক্ষেত্র যাতে প্রস্তুত থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে; যাতে বাঙলা-সাহিত্যের ভাগ্যবিধাতা স্থান অনুপযোগী দেখে ফিরে না যান। অনুকূল ক্ষেত্রই এক দিন তাঁকে টেনে আনবে, অনাগত প্রতিভা অবতীর্ণ হবেন, বঙ্গসাহিত্য-অঙ্গন ফলে-ফুলে সৌন্দর্য্যে শক্তিতে পরিপূর্ণ করে আবার আনন্দলোক বিচরণ করবেন। এই আশা-আকাঙ্ক্ষা লালন করে বাঙালী সাহিত্যিক যথাশক্তি তাঁর কর্ত্তব্য করে যান, তাঁর কাছে জাতির এইটেই দাবী।



শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৮

অসুস্থতা সমেত এই ঘটনাটুকু গিরিবালার দ্বারভাঙ্গায় ফিরিয়া যাওয়া আরও মাস দুয়েক পিছাইয়া দিল। নিস্তারিণী দেবী বধূর মন চেনেন, ছেলে লইয়াই চরম রকমের কিছু একটা হইয়াছে, টেলিগ্রামের ধরণে এই রকম গোছের একটা আন্দাজ করিয়া শশাঙ্কর সঙ্গে হরেনকেও পাঠাইয়া দিলেন। প্রায় সবগুলিকেই কাছে পাইয়া গিরিবালার শরীর এবং মন বেশ দ্রুতই আবার ঠিক হইয়া উঠিল। তাহার পর বিপিনবিহারী ওদের লইয়া চলিয়া গেলেন।

বিদায়ের বেদনার কথা আলাদা, কিন্তু গিরিবালা নিজে যখন শিবপুর ছাড়িলেন তখন তাঁহার মনটা প্রফুল্লই। অমন একটা আঘাত পাওয়ার পর তাঁহাকে সর্বদা প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টার মধ্যে দিয়া বাড়িটাতে যেন একটা নূতন শ্রী ফুটিয়াছে। পাশের বাড়ির একটি বৃদ্ধা নিতান্ত অকারণেই কেমন করিয়া গিরিবালাকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়া ফেলিয়াছিলেন, বেশি আনাগোনায় জেঠাইমা বসন্তকুমারীর সঙ্গে তাঁহার একটি নিবিড় সখ্য আসিয়া পড়িল। জেঠাইমার মধ্যে যে একটি বিষাদের সুর ক্রমে ঘনাইয়া উঠিতেছিল সেটি গেছে; বেশ লাগে এখন দুটি বৃদ্ধাকে একসঙ্গে দেখিতে—মা-ই যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। প্রফুল্লতার সব চেয়ে বড় কারণ পিতার মধ্যে অনেকটা পরিবর্তন দেখিয়া যাইতেছেন গিরিবালা; তাঁহারই মনে কোন রকম উদ্বেগ দুশ্চিন্তা না আসে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে রাখিতে রসিকলালের মধ্যে অনেকখানিটাই নিয়মানুবর্তিতা আসিয়া পড়িয়াছে। শরীরও ফিরিয়াছে। বৃদ্ধের কাছে বার্দ্ধক্য নিশ্চয় ভালো নয়, কিন্তু তাহার সন্তানের কাছে সেইটিই সব চেয়ে আকাঙ্ক্ষার জিনিষ—নানা কারণেই।...গিরিবালা অন্তরাল হইতে পিতাকে কখনও কখনও দেখেন—অল্প নত, দীর্ঘচ্ছন্দ সুগৌর দেহ, গায়ে সর্বদাই একটি রেশমের নামাবলি, মুখে গোলাপি রঙের আভা, তার চারি দিকে—সেই আভারই রশ্মিপুঞ্জের মধ্যে শুভ্র কেশের রাশি। গিরিবালার মনটা কিসে যেন ভরিয়া ওঠে—মুনি-ঋষি তাহা হইলে এই না কি?—এর চেয়ে আর বেশি কি হওয়া সম্ভবই বা?

যাইবার সময় গিরিবালা বলিলেন—"বাবা, তুমি নিজের দিকে একটু চেয়ো, তোমার আর বয়েস নেই অমন করে ঘুরে বেড়াবার; মস্ত বড় দোষ দাঁড়িয়েছে তোমার..."

রসিকলাল হাসিয়া কন্যার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—"তুই যে একেবারে উল্টো বললি মা, আমার আর বয়েসই নেই নিজের দিকে চাইবার; যে-টুকু চাই সে-টুকুই বরং মস্ত বড় দোষ..."

ম্লান হোক, তবু অশ্রুর মধ্যেই একটু হাসি সবার মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

দ্বারভাঙ্গার জীবন আবার শুরু হইল। কয়েক দিন একটু কষ্টই হইল,—ভাইয়েদের সংসারে স্বচ্ছলতার পরেই এখানকার অভাবটা যেন আরও স্পষ্ট। ঠিক এভাবটা হয়তো রহিল না, তবু যাহা রহিল তাহাও যেন অসহনীয় হইয়া ওঠে। বর্ষার মেঘের মতোই এর যেন আর অন্ত নাই। যখন অভাব-দুঃখ, তখন মানুষ একটি একটি করিয়া দিন গুণিয়া সময়ের হিসাব করে—যেন ভারি গরুর গাড়ির চাকা, প্রত্যেক মাটির কণাটি মাড়াইয়া চলিতেছে।—এই একটি দিনের পর একটি দিন গাঁথিয়া দীর্ঘ তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। একঘেয়ে দুঃখের নয়, সুখও আসিয়াছে, তবে সে বিদ্যুদ্‌ঝলকের পর অন্ধকারের মতো দুঃখকেই আরও নিবিড় করিয়াছে। যেমন, শশাঙ্ক পাশ দিল,—এক অদ্ভুত উল্লাস মনের। আর, একটা গর্ব—ছেলে পাশ দিল, মনের কেমন একটা আভিজাত্য আসিয়া গেছে, প্রতি দিকের ক্ষুদ্র অভাব-অভিযোগ মনটাকে যেন স্পর্শই করিতে পারিতেছে না। কেমন করিয়া, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর নাই, তবে মনে হইতেছে—শশাঙ্ক পাশ দিয়াছে, এবার তো এরা চলিল, যে-কটা দিন দিতে পারে কষ্ট দিয়া যাক্ না।

কি যেন একটা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। সে বারে ননী ঠাকুরঝির ভাই পাশ দিল, পাড়াশুদ্ধ সকলকে লইয়া একটা প্রীতিভোজ দিলেন। ঐ রকম একটা কিছু করা যাইত!—অতটা না-ই হইল, ননী ঠাকুরঝির বাড়ি, ও-বাড়ি, রাস্তার ওধারে নূতন ভাড়াটিয়াদের বধূর সঙ্গে নূতন 'আতর' পাতাইয়াছেন—সেই 'আতর'এর বাড়িটুকু, আর এদিক ওদিক ছুটকো দু'-চার জন—কতই বা লাগিবে? আর লাগিলেও উচিত করা—এ দিনটি তো জীবনে রোজ আসে না।

চিন্তার মধ্যেই পাশ-করা ছেলের মা, আর অভাবগ্রস্ত সংসারের গৃহিণী আলাদা হইয়া গেল। স্বামী বাহিরে গেছেন, আসিলেই বলিতে হইবে। না রাজি হইতেও পারেন এটুকু ভাবিতেও স্বামীর

ওপর রাগ হইল—তাঁহার যেন হিসাবের বাড়াবাড়িটা একটু বেশি, অন্ত করিলে চলে কখনও ? না, এই রকম অবস্থাই থাকিবে চিরদিন ? এই তো শশাঙ্ক পাশ দিয়াছে।—আর তাহার দিকটাও দেখা চাই তো বাপ-মা হইয়া,—একটা সাধ-আহ্লাদ নাই তাহার ?

কিছু চাই বরং, নিজেকে বড় বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে,—পাশ-করা ছেলের মা।···

গিরিবালা বিকাশ দাদাকে একটা চিঠি লিখিলেন—বেশ বানাইয়া বানাইয়া অনেকখানি—তাঁহারই আশীর্ব্বাদ—যত কষ্টে যে শুধু তাঁদেরই কথা সব মনে করিয়া শশাঙ্ককে মানুষ করিয়াছেন।—আজ মনে হইল সব সফল হইয়াছে—এবারও তাঁহার উপদেশ আর আশীর্বাদ নূতন করিয়া দরকার—একটা কথা জানেন বিকাশ দাদা ?—শশাঙ্ক এই বংশের মধ্যে প্রথম ছেলে যে পাশ দিল।···

মনের আবেগ অনেকটা কমিল, কিন্তু আশ মিটিতেছে না ; বিশেষ করিয়া মনে জাঁকিয়া বসিয়াছে খাওয়ানোর কথাটা—কোন মতেই ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিতেছেন না। আজ যদি পাণ্ডুদ থাকিত, শ্বশুর বাঁচিয়া থাকিতেন···

কেমন এক ধরণের অভিমান আর রাগ হইতেছে গিরিবালার ; স্বামীকে বলিলে তিনি শুনিবেন না, কোন মতেই শুনিবেন না—কেমন একটা হিসাব-হিসাব বাই দাঁড়াইয়া গেছে—সব সময় হিসাব লইয়া থাকিলে চলে ?···আর ধরিবেই যে লোকেরা, এড়ানো চলিবে ?

সংসারে দায়িত্বে আজ নিজেকে অনেকখানিই বড় বলিয়া মনে হইতেছে :···এর পর গিরিবালা এমন একটা কাজ করিয়া বসিলেন যাহা ইতিপূর্ব্বে তিনি কখনও করেন নাই। খাটের গদির নিচে বিপিনবিহারীর নিজের ক্যাশবাক্সর চাবি থাকে ; বাক্সটিও খাটের সঙ্গে গাঁথা একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখা। গিরিবালা উঠিয়া চাবিটা বাহির করিয়া খাটের বাক্সটা খুলিলেন। এমন কিছু লুকাচুরি ব্যাপার নয়,—স্বামীকে খাওয়ানর কথাটা বলিবেন, তাহার পর স্বামী সেই অর্থাভাবের কথাটা তুলিবেন, গিরিবালা বলিবেন—"এমনই কি অভাব ?—তোমার বাক্সে তো রয়েছে কিছু, আমি দেখলাম যে চুরি করে ;—এত টাকা, এত আনা, এত পাই ; ঠকিয়ে ভোলাবে সেই পাত্রী কি না আমি !—দেখেছি চুরি করে।"···চুরির কথায় একটা বোধ হয় হাসিও পড়িয়া যাইতে পারে।

খাটের বাক্সটা খুলিয়া ক্যাশবাক্সটা বাহির করিয়া চাবি লাগাইয়াছেন, বিপিনবিহারী আসিয়া প্রবেশ করিলেন, একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি করছ ?"

গিরিবালা একেবারে প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নিশ্চল হইয়া গেলেন। হাতটা চাবিতে, দৃষ্টি স্বামীর মুখের ওপর, তাহাতে কী যে লজ্জা, কী যে অপরাধের গ্লানি আসিয়া জড়ো হইয়াছে ! মুখে রা নাই, হালকা হাসির ভরসাতেই হাত দিয়াছিলেন এ-কাজে, কিন্তু মনে হইতেছে যেন এ-জন্মে আর এ-মুখে হাসি ফিরিয়া আসিবে না।

দৃশ্যটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত, স্ত্রী ক্যাশবাক্স খুলিতেছেন, তাহাও তাঁহার অবর্ত্তমানের সুযোগে,—বিপিনবিহারী একেবারে নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন একটু, তাহার পর একটু যেন রূঢ় ভাবেই প্রশ্ন করিলেন—"ও কি করছ ?"

সঙ্গে সঙ্গে হুঁস হইল প্রশ্নটার বিকৃত রূপে, কিন্তু সেই সঙ্গে কণ্ঠস্বরও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিলেন—মনে ভাবো, টাকা আছে তবু সংসারের দুর্দ্দশা দেখে বের করে দিচ্ছি না ? এই দেখো তাহলে···"

গিরিবালা বুক দিয়া বাক্সটা চাপিয়া ধরিলেন, ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন—"না, থাক্।"

বিপিনবিহারী একটা কঠিন শপথ দিয়া বসিলেন, গিরিবালাকে সরিয়া দাঁড়াইতে হইল। ডালা খুলিয়া বিপিনবিহারী বলিলেন—"ঐ পড়ে আছে, দেখো ; আজ মাসের কুল্যে আট তারিখ।"

গিরিবালা স্বামীর মুখ হইতে দৃষ্টিটা বাক্সর দিকে একটুও বাঁকাইলেন না, প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলেন—"আমি সে ভেবে খুলতে যাইনি।"

এ আসরে কি ভোজের কথা তোলা চলে ? গিরিবালা আবার নিস্পন্দ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন।

বিপিনবিহারী একটু অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। তাহার পর —"নাও, বন্ধ করে দাও।" বলিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, এবার গিরিবালাই শপথ দিলেন—"আমার মাথা খাও, তুমিই বন্ধ করে দাও।"—বলিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন।

তুহিনের মতো শীতল দারিদ্র্যের বাতাস, আনন্দের অঙ্কুরও সে পারে না সহ্য করিতে।···আর কেহই জানে না, স্বামীও আর কিছু বলিলেন না, তবু সমস্ত বাড়ির বাতাসটা যেন গ্লানিতে বিষাক্ত হইয়া রহিল। বিকাশ দাদাকে লেখা উচ্ছ্বাসময় চিঠিটা যেন অদৃশ্য-কাহার বিদ্রূপের নিকট হইতেই লুকাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া রাখিলেন, তাহার পর অন্ধকার একটু ঘন হইয়া আসিতে যেন একটা আশ্রয় পাইয়া নিজের ঘরের জানালাটির কাছে দাঁড়াইলেন। হু-হু করিয়া চোখে বন্যা নামিল—যত বার মোছেন, স্রোতের মুখ যেন আরও খুলিয়া যায়, অস্ফুট স্বরে কয়েক বারই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—"কেন আসে এরা পেটে ?—কিসের আশায় আসে ?···"

বিপিনবিহারী এ-সময়টা বেড়াইতে যান। আজ মনটা বড়ই ভার হইয়া আছে, তিনিও আজ বাহির হন নাই। কি মনে করিয়া একবার ভিতরে আসিয়া দেখেন তাঁহার ঘরে আলো জ্বালা হয় নাই। তাহার পরই একটা টানা শব্দ কানে গেল—অনেকখানি কান্নার পর কে যেন ক্লান্ত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখেন গিরিবালা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রশ্ন করিলেন —"কাঁদছিলে তুমি ?"

গিরিবালা আর একটি কান্নার বেগকে মাঝপথে রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিপিনবিহারী একটু অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিলেন —"কেন যে বাক্স খুলতে যাচ্ছিলে তুমি বোধ হয় আমায় কখনও বলবে না, তবে আমি কতকটা আন্দাজ করেছি···"

বোধ হয় গিরিবালা বলিতে পারেন এই আশায় একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—"আন্দাজটা আমার এই যে তুমি শশাঙ্কর পাশের জন্য কিছু মানৎ-টানৎ করেছিলে, দেখছিলে কিছু আছে কি না বাক্সয়—তাহলে চাইতে। আমার কি মনে হয়

জান ?—ভগবানের সব চেয়ে বড় পরীক্ষা, যারা আমার মতন অবস্থায় তাদের মনে বড় একটা আশা সাঁদ করিয়ে দেওয়া,—দিয়ে দেখা সেটা ধরে রাখতে পারি কি না। বাবার আশীর্ব্বাদের জোরে আমি কোন পরীক্ষাতেই এ-পর্যন্ত হারিনি, এতেও হারব না। শুধু তাই নয়, আমি আরও বড় দুঃখের মধ্যে এই পরীক্ষা দোব তুমি যদি না মুশড়ে পড়…"

গিরিবালা একটু থামিয়া বলিলেন—"মুশড়ে পড়তে হয় ওদের দেখেই, নিজের কথা কি ভাবি ?"

উত্তরটা বিপিনবিহারীর কানে গেল না ঠিক মতো; বোধ হয় উত্তর কোন আশাও করেন নাই। স্ত্রীকে ভালো রকমেই চেনেন, জানেন তাঁহার অন্য রকম উত্তর নাই। আবেগের ঘোরে এক দিকে চাহিয়াছিলেন, বলিলেন—"কি মানৎ করেছ জানি না, তবে আমি মানৎ মানে বুঝি তাঁর দেওয়া আশাকে পুষ্ট করা, জীবনে ফলিয়ে তোলা; তিনি যা দিয়েছেন সেইটেকে সার্থক করা,—এই তো তাঁর পূজা। তোমার মানৎ কি জানি না, তবে পাশের খবর পাওয়ার পর থেকে আমি তো সবই মানৎ করে বসেছি।"

গিরিবালা বিস্মিত কৌতূহলে মুখ ফিরাইয়া চাহিতে বলিলেন—"পাতুলের ক্ষেতটুকু তো আছে—মোটা ভাতটা জুটে যাচ্ছে—"

গিরিবালা কতকটা ভীত দৃষ্টিতেই প্রশ্ন করিলেন—"বেচে দেবে ?"

বিপিনবিহারী একটু হাসিয়া বলিলেন—"এই তো, শুনেই মুশড়ে গেলে তুমি, যা ভয় করছিলাম।"

গিরিবালা তখনকার উত্তরটাই আবার হাজির করিলেন, বলিলেন—"নিজের জন্যেই কি বলছি ? এক মুঠো ভাতের সংস্থানও গেলে ওরা যাবে কোথায় ?'

"ঠিক এই কথাটির উত্তর আপাততঃ আমার কাছে নেই। সব কিছু না পারি, অনেক কিছুই তো ভগবানের উপর ছাড়তে হয় !—এটুকুও তাঁর হাতেই রইল। নিজের জন্যে তুমি মুশড়ে পড়বে একথা বলছি না, গা হাত খালি হয়ে এসেছে কি করে তার ইতিহাস তো জানি। তবে, ওদের মুখ চেয়েই ওদের কষ্টের কথা ভুলতে হবে—বাপ-মায়ের পক্ষে সেইটেই তো বেশি শক্ত।"

গিরিবালা যেন স্বামীর কথাগুলা অনুধাবন করিতে পারিতেছেন না, আগেকার মতো ব্যাকুল কণ্ঠেই বলিলেন—"কিন্তু যদি দু'বেলার ভাতের ব্যবস্থাটুকুও নষ্ট হয় ! সাধ-আহ্লাদ তো ওদের জীবনে নেই-ই কিছু।"

বিপিনবিহারী একটু যেন নিরাশ হইলেন। তাঁহার আশা আকাঙ্ক্ষা চিন্তা যে-স্তরের তাহার তুলনায় এ যেন অনেক নিচু স্তরের মনোভাব। তাঁহার বরাবর একটা বিশ্বাস ছিল—অনেকবার তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন—যে স্ত্রীর মনের খুব একটা প্রসার আছে, তিনি যত উঁচু কথাই ভাবুন, বরাবরই এই মনের সাহচর্য পাইবেন। আজ এই প্রথম নিরাশ হইলেন—হইলেও যখন সব চেয়ে বেশি দরকার সে সাহচর্যের; বলিলেন—"দেখো ভেবে, আজই যে করছি বিক্রি এমন নয়।"

ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

নিস্তারিণী দেবী বাড়িতে ছিলেন না, ননীবালাদের বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছিলেন; গিরিবালা অনেকক্ষণ পর্যন্ত জানালার ধারটিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। একটি চলচ্চিত্রের মতো সমস্ত দিকের ঘটনাগুলি চোখের সামনে দিয়ে চলিয়া গেল।…সকাল বেলা শশাঙ্ক পাশের খবর দিল—মুখে কী দীপ্ত শ্রী ! কখনও দেখেন নাই এমন। সমস্ত বাড়িতে যেন আলো ছড়াইয়া পড়িল—সম্পূর্ণ এক নূতন ধরণেরই আলো…খোকাকে খাওয়াইতেছিলেন শশাঙ্ক আসিয়া প্রণাম করিল।…"আমার এঁটো হাত, দাঁড়া।"…"হ্যাঁ, মার আবার এঁটো হাত।"…ঠাকুরমা কোথায় ?"…পূজোর ঘরের দিকে চলিয়া গেল। হরেন, পূর্ণেন্দুও আসিয়া একটা আনন্দের তরঙ্গ তুলিল।…স্বামীর আনন্দটা চাপা—চিরকালই ঐ রকম—শুধু মুখটা রাঙা হইয়া ওঠে—আজ যেন আরও অদ্ভুত ভাবে রাঙা। গিরিবালাই খবর দিলেন—"শুনেছ ?—শশাঙ্ক পাশ করেছে।" অনুচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন—"তোমার সন্দেহ ছিল বলে মনে হচ্ছে।"…গিরিবালা হাসিয়া উত্তর করিলেন—"সন্দেহ না থাকলেও শুনে খুশী হতে নেই ?…তোমার যেন সব বাহাদুরি !"

এই রকম ভাবেই গেছে ওদিকটা—হালকা ভাবে অনেক জল্পনা-কল্পনাও। তাহার পর সেই চিত্রেরই সন্ধ্যায় এই রূপ ! শুধু অভাবের ছায়াতেই সব বর্ণ বিকৃত। আবার এই অভাবকেই স্বামী বাড়াইয়া তুলিতে চান ! কেন—এ কী সর্বনাশা জিদ ? ধরো, চাল সংগ্রহ হয় নাই বলিয়া সময়ে ভাত হয় নাই, টিফিনের সময় আসিয়া ছেলেরা খাইতে বসিল; চার জনেই বা উহাদের মধ্যে কেহ এক জন বলিল—"আজ বেশি ক্ষিদে মা, দেরিতে খেতে বসেছি…"

— শ্বশুর যেমন একদিন তাঁহার মা, গিরিবালার দিদিশাশুড়িকে বলিয়াছিলেন—"আর দুটি ভাত আছে মা ?—আজ ক্ষিদেটা বেশি পেয়েছে।"…দিদিশাশুড়ির মুখের সেই নিদারুণ লজ্জা কত বৎসরের পথ বাহিয়া আসিয়া আজ গিরিবালার মনটাকেও আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, এইখানেই গিরিবালার চিন্তার মোড় ফিরিল,—দারিদ্রের মধ্যে সেই প্রসন্ন লক্ষ্মী-রূপ। সন্তানদের খাওয়াইয়া যেদিন কিছু থাকিত না, পানে মুখটি রাঙা করিয়া প্রতিবেশিনীদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। শ্বশুর গল্প-প্রসঙ্গে বলিতেন—"মা ছিলেন পাড়ার মধ্যে সব চেয়ে আমুদে; লক্ষ্মী যদি দরিদ্র হতেন তো যেমন হোতেন আর কি…"

একটা অদ্ভুত ধরণের শক্তি আসে গিরিবালার মনে; মনে হয়, স্বামী তো ভুল বলেন নাই; এই বংশের এই তো শ্রেষ্ঠ আদর্শ,—ছেলে বড় হইবে, বিদ্যায়, চরিত্রে, তার জন্য মাকে খালি পেটে, মুখে শুধু পানের প্রবঞ্চনা সাজাইয়া হাসিমুখে দিনের পর দিন কাটাইতে হইবে। গিরিবালা অবশ্য স্বামীকে নিজের কষ্টের কথা বলেন নাই, তবে দিদিশাশুড়ির এ-রূপের কথাও তাঁহার মনে পড়ে নাই তখন। এখন পরম আশীর্বাদের মতো এই স্মৃতিই যেন তাঁহাকে নূতন ব্রতের জন্য উন্মুখ করিয়া তুলিল।

ছেলেদের কষ্টের কথা ?—সেখানেও দিদিশাশুড়ির স্মৃতি আজ নূতন আলোকে নূতন শক্তি সঞ্চার করিয়া দেখা দিল। দিনের পর দিন তিনি দুটি পুত্রের মলিন মুখ দেখিয়া গেছেন,—যাহা কল্পনা করিতেও গিরিবালার বুক কাঁপিয়া ওঠে; কেন ? না, একদিন তাহারা মানুষ হইবে। বিপিনবিহারী তো মিথ্যা বলেন নাই,—

মায়ের পক্ষে এই তো সব চেয়ে কঠিন ব্রত। ওদের মুখ চাহিয়াই ওদের কথা ভুলিতে হইবে, আবছা-আবছা মনে পড়ে বিকাশ দাদার কাছে শোনা কত মায়ের কাহিনী। ভাবিতে ভাবিতেই গিরিবালার মনে একটা শক্তি আসিল—মায়ের এ সখের ব্রত নয়,—এ অনিবার্য, ছেলের কল্যাণের জন্যই একে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। মায়ের এই অদৃষ্টলিপি।

সেদিন আর কিছু বলিলেন না। ভালো করিয়া ভাবিবার জন্য সেই রাত্রি আর পরের সমস্ত দিনটা লইলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত গিরিবালা মনস্থির করিয়া ফেলিলেন।

স্বামীকে ডাকিয়া পাঠাইবেন, এমন সময় তিনি নিজেই একটু ইন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন, বাড়ির অপর দিকটায় একবার চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া একটু চাপা গলায়ই প্রশ্ন করিলেন—"তোমার ননী ঠাকুরঝি এসেছে?"

"না তো।"

"আসবে,—এক্ষুনি বা একটু পরে। এই টাকা ক'টা রাখো।"

পনেরটি টাকা। অতিশয় বিমূঢ় ভাবে হাতে লইয়া গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"কি হবে? এলো কোথা থেকে?"

বিপিনবিহারী একটু ত্বরিত ভাবেই বলিলেন—"ননীবালা শশাঙ্কর পাশের জন্যে মিষ্টি খেতে চাইলে এই থেকে কিছু আনিয়ে দিও। বাকি টাকাটা থাক হাতে, আরও যদি কেউ চায়। তা ভিন্ন তোমার মানৎ…"

গিরিবালা শুধু প্রশ্ন করিলেন—"হঠাৎ?"

"বিকেলে ওদের বাড়ি গেছলাম, ওর দাদার কাছে। দোরের আড়াল থেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে—শশাঙ্কর পাশের মিষ্টি চাই। শশাঙ্ককে ভালবেসে যে ছোট বোনের মতন আমার কাছে এ আবদারটা করলে, তার মুখ রাখতেই হবে, তাই…"

গিরিবালার হঠাৎ স্বামীর অনামিকায় দৃষ্টি পড়িল, শঙ্কিত ভাবে প্রশ্ন করিলেন—'তোমার আংটি?"

বাহিরে নহরের পুলের ওদিকে কণ্ঠ শোনা গেল—'আমরা সবাই এলাম গো পাশ-করা ছেলের মা।"

বিপিনবিহারী অন্য দিক দিয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন—"শশাঙ্ক হীরের আংটি গড়িয়ে দেবে।"

৯

সুখের দিনে গিরিবালা এই সব দুঃখের ব্যাপারগুলা একটি প্রীতিমণ্ডিত কৌতুকের দৃষ্টিতেই দেখিতেন, ছেলেদের কাছে গল্প করিতে হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেন না। বলিতেন—"ঐ যে ঠিক করলাম অভাবে কষ্টে তোদের মুখ চুণ হলেও মনকে কড়া করে রাখব, তার পর আমার যেন একটা বাই দাঁড়িয়ে গেল কেবলই লক্ষ্য করা তোদের মুখ চুণ হোল কি না। তোরা টের পেতিস না, তবে আমি কেবলই আড়-চোখে তোদের মুখের পানে চাইতাম। শুধু কি তাই? এমন রোগ দাঁড়াল যে বারান্দায় তোদের খেতে দিয়ে, আমি রান্নাঘরের দরজার জোড়ের কাছে চোখ দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম তোদের মুখের ভাব কিছু বদলাল কি না। শেষ পর্যন্ত এমন হোল, মনমরা হোতে না দেখে,—তোদের ফুর্তি, তোদের মুখের হাসি দেখেই আমার মুখ যেন শুকিয়ে যেতে লাগল; ভাবি, নিশ্চয় ভেতরে ভেতরে কষ্ট হচ্ছে বলে এরা ওপরে ওপরে মুখটা হাসি-হাসি করে রাখে। সে আরও জ্বালা, মন বড়া করব কি, সর্বদাই প্রাণটা যেন আইঢাই করতে থাকে। শেষে হরেনকে ডেকে একদিন চুপি চুপি বললাম—'হ্যাঁ রে হরু, একটা কথা জিগেস্ করব, লুকুবি নি?"

'না।'

'গা ছুঁয়ে আছিস্।'

'বলচি তো লুকুব না।'

'হ্যাঁ রে, সত্যি বলবি, শশাঙ্ক কলেজে পড়ছে, তোদের বড় কষ্ট হচ্ছে, না?"

গিরিবালা জোরে হাসিয়া ওঠেন, বলেন—"ভেতরে ভেতরে ভয়ে সন্দেহে মনটা এমন হয়ে রয়েছে যে কি করে সে গুছিয়ে বলব সে হুঁসও নেই। হরু ঠিক ধরেছে, মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে বললে—বা রে কথা তোমার!—দাদা কলেজে পড়চে তাই কষ্ট হবে আমার!—শত্রু না কি?"

এ আবার এক উলট উৎপত্তি? বললাম—'সে কষ্ট নয় রে, খাওয়া-পরার কষ্ট,—শশাঙ্ককে মাসে মাসে টাকা পাঠাতে হচ্ছে তো?'

ও তো আরও এ-সব ব্যাপার গ্রাহ্য করত না কথাগুলোও একটু কাঠখোট্টা গোছের ছিল, আর তেমনি ছিল চঞ্চল,—'বা রে, বন্ধ করে দিলে তার কষ্ট হবে না'—বলে খেলতে না কোথায় যাচ্ছিল, হন-হন করে বেরিয়ে গেল।

গিরিবালা আবার হাসিতে থাকেন—"মুখ চুণ না দেখতে পেয়ে সন্দেহের ওপর সে যে কী সব দিনই কেটেছিল! অমন বিপরীত কাণ্ড কেউ কখনও দেখেনি, উঃ!"

এ-সব স্মৃতির কথা। সুখ উদার, তাই সুখের দিনে অতীতের দুঃখের ছবি প্রসন্ন অনুকম্পার দৃষ্টিতে যায় দেখা, কিন্তু সত্যই দুঃখ যখন ছিল, সেটা নিদারুণ হইয়াই ছিল।

অন্ধকারটা চারি দিক দিয়াই যেন ঘনাইয়া আসিতেছে। অদৃষ্টের পরিহাস যে এই অন্ধকারকে আরও নিবিড় করিয়া তুলিবার জন্যই গোড়ার কয়েকটা দিন হঠাৎ আলোয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।—শশাঙ্ক পাশ করিল, ক্ষেত বিক্রয় করিয়া হাতে একটা মোটা টাকা আসিল। হাতে টাকা থাকিলে যা হয়,—হাজার টানিয়া খরচ করিলেও খানিকটা স্বচ্ছলতা আসিয়া যায়ই সংসারে, একটু শ্রী ফিরিল; তাহার পর আরও একটু শুভ যোগাযোগ হইল, একটি বাঙালী ভদ্রলোক কয়লার ব্যবসায় করিতেন, তাঁহার পরামর্শে এবং আনুকূল্যে বিপিনবিহারী টাকাটা ফেলিয়া না রাখিয়া একটা মোটা অংশ কয়লার কারবারে খাটাইলেন। বেশ আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইল; অনেক বছর পরে একটা উপার্জনের পথ আবিষ্কার হওয়ায় গৃহস্থালীর মধ্যে একটি সাহসের হাওয়া বহিল, স্বস্তির নিশ্বাস পড়িল, স্বামি-স্ত্রীর অনেক দিনের ছোট-খাট সাধ-আহ্লাদও মিটাইয়া লইলেন দুই জনে—ছেলেদের কিছু পোষাকী জামা-কাপড়, দু'-একখানা আসবাব—সংয়ে এ-বাড়ীতে সে-বাড়ীতে দেখিয়া সাধ যায় মনে; আর দু'-এক মাস দেখিয়া গিরিবালার একখানা নূতন গহনার কল্পনাও উঠিল স্বামীর মনে, স্ত্রীকে বলিলেনও।

নিস্তারিণী দেবীকেও বলিলেন—'এবার শীতটা পড়লে তুমি কাছে-পিঠে দু'-একটা তীর্থ সেরে এসো না মা, ক্রমেই অথর্ব হয়ে পড়ছ তো? চণ্ডীকে লিখব পাশের জন্যে, শুধু এদিক্কার খরচটুকু তো?"

আরও আলো আনিল নিতান্ত দৈবাধীনই একটি ব্যাপার। এই সময় শশাঙ্করা সাতটি ভাই। পুত্রবান দম্পতির কন্যা-মুখ দর্শনের একটি নিবিড় আকুতি থাকে, ভগবান সেটিও পূর্ণ করিলেন। এর সঙ্গে নিশ্চয় সমৃদ্ধির কোন সম্বন্ধ নাই, তবু কেমন মনে হইল—এ একটা শুভ লক্ষণ—সব চেয়ে বড় শুভ লক্ষণ; বিধাতা নিশ্চয় মুখ তুলিলেন। দুঃখের দিনে কেবলই লক্ষণ মিলাইয়া আশায় আশায় থাকা একটা অভ্যাস হইয়া পড়ে যে।

বিধাতা দয়াবান কি নির্দয়—এ-প্রশ্নের এখনও মীমাংসা হয় নাই, তবে একটা কথা ঠিক, তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী; সুখকে কোটান্ দুঃখের পাশে রাখিয়া, যখন দুঃখকেই নিবিড় করা হয় প্রয়োজন, তাহার আগে, যেন সুখের একটি উজ্জ্বল রেখা টানিয়া।

শীতের ক'টা মাস এই করিয়া কাটিল।

তাহার পর আশা যখন চরমের পাশে ঠেলিয়া উঠিতেছে, হঠাৎ সব ওলট-পালট হইয়া গেল। শীতের শেষে দেখা দিল প্লেগ। দু'-এক বৎসর হইতে এই সময়টা হইতেছে একটু আধটু,—দূরে দূরে, যে দিকটা বেশি ঘিঞ্জি। কিছু ইঁদুর পড়ে, লোকও মরে দু'-এক জন, তাহার পর আবার তাতটা পড়িতেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়। এবারে যেন একেবারে একটা বিপর্যয় ঘটাইয়া দিল। রোগটার চিকিৎসা নাই, যদি বাঁচিতে চাও তো বাড়ি ছাড়িয়া পালাও। দেখিতে দেখিতে মৃত্যুতে গৃহ-ত্যাগে সমস্ত সহরটা খাঁ-খাঁ করিতে লাগিল।

এদিকে করাল হইলেও অসুখটার ধর্মজ্ঞান আছে,—পূরাপূরি আসিয়া পড়িবার আগে একটা নোটিস্ দেয়, ঘরে ইঁদুর মরে—স্ফীত, গায়ের রোঁয়াগুলা খাড়া হইয়া গেছে—দেখিলেই বোঝা যায় এ মৃত্যু-দূতের বিশিষ্টতা আছে।

শীতের শেষে আসে, একটু গরম পড়িলেই চলিয়া যায়। এবার কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা দিল।

শীত গেল, ক্রমে পশ্চিমা হাওয়াটা অল্পে অল্পে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কষ্টকর, কিন্তু নীরোগ, সবাই আশা লইয়া এরই দিকে থাকে চাহিয়া। বসন্তে সে সব কণ্ঠ থাকে আতঙ্কে রুদ্ধ, 'চৈতী'র সুরে পায় মুক্তি, মানুষ আবার নিশ্চিন্ত দৃষ্টিতে জীবনের পানে চায়। এবার কিন্তু গরম যতই বাড়িতে লাগিল, রোগ যেন ততই হিংস্র মূর্তিতে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, মনে হইল যেন মরণের দূত তাহার প্রবল শত্রুটাকে বশে আনিয়া তাহারই স্কন্ধে চড়িয়া বিজয়ের দুর্বার অভিযানে ছুটিয়া চলিয়াছে। ধূলায় আকাশ আরক্তিম হইয়া ওঠে, দিগন্ত যায় ডুবিয়া, সহরের জনহীন পথে ছোটে চৈতালী ঘূর্ণির স্তম্ভ—সেই সঙ্গে এ-পথ ও-পথ দিয়া কচিৎ শ্মশানযাত্রীর দল—স্তব্ধ, নিরুপায়, শঙ্কিত।···এর পরে কার পালা কে জানে!···হঠাৎ বাজারের দিকে কোথায় হাহাকার উঠিল—যেন মনে হয় এই আর্ত কণ্ঠস্বরই পশ্চিমা হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়া কাহার অট্টহাস হইয়া উঠিয়াছে···

কী অসহায় অবস্থা! একটি অস্থির শোকেই অতো, আর এ যে সব হারাইতে বসা! ছেলেরা কেহ পড়ে, কেহ ঘুমায়, কেহ খেলা করে, মুখ দেখিলে মনে হয়, তাঁহারই উপরে সব দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়া তাহারা সবাই নিশ্চিন্ত আছে। সবার উপর চক্ষু বুলাইয়া গিরিবালা জানালার কাছে গিয়া রুদ্র মধ্যাহ্নের দিকে চাহিয়া থাকেন—কি হবে!—কি হবে!—কাকে বলি!—এ নতুন রোগের কে দেবতা তুমি, চিনি না: যেই হও, রক্ষে করো—ওরা কিছু জানে না—সব অপরাধ আমার···

বুক আই-ঢাই করে, শাশুড়ির কাছে যান, কোলে একটি পা তুলিয়া লন, হাত বুলান, প্রশ্ন করেন—"মা ঘুমুলে?"

"কি বৌমা?"

"কি হবে মা?"

শাশুড়ি ভালো ভাবেই জাগিয়া ওঠেন।

"ছিঃ অত ব্যাকুল হ'লে চলে মা? ভগবান রয়েছেন।"

কোথায় তিনি? গিরিবালা যেন আরও দেখিতে পান না তাঁহাকে আজকাল। আগে অন্ততঃ পূজার সময়টা একটু আনন্দ থাকিত, এক একবার মনে হইত অন্তরে যেন ক্ষণিক বিকাশে কাহাকে পাওয়া গেল। আজকাল সব অবস্থায়, সব সময় একটি মাত্র চেতনা—ভয়। সব যেন অন্ধকার করিয়া রাখে।

যেন ভগবানকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলিবার চেষ্টা করেন—"হ্যাঁ, তিনিই তো ভরসা গরীবদের।"

তাহার পর আবার সেই ভয়।—

"আজ মা এই একটু জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম—তুমি বারণ করেছ, আর দাঁড়াই-ই না—তা ঐটুকুর মধ্যে চার-চারটেকে নিয়ে গেল, আমার তো···"

শাশুড়ি একটু ধমকের সুরে বলেন—"আবার তুমি দাঁড়িয়েছিলে—বৌমা? না বাছা···এবার শুনলে আমি সত্যিই রাগ করব বাপু! কি করবে—হাত-পা আছড়ে কোন ফল আছে? শুধু মা শেতলাকে ডাকো···"

শাশুড়ি এক সময় আবার তন্দ্রালস হইয়া পড়েন, হয়তো কোথাও একটা অটল বিশ্বাস আছে, না হয় বার্ধক্যের শিথিলতায় ভয়-উৎকণ্ঠার বেগটাও আসিয়াছে কমিয়া।···গিরিবালা আস্তে আস্তে পা নামাইয়া নিজের ঘরে চলিয়া আসেন। বিপিনবিহারী নিদ্রা হইতে জাগিয়া নিজের বিছানাতেই শুইয়া আছেন, হাতে একটা হিসাবের খাতা। গিরিবালা প্রয়োজন না থাকিলেও আলনা হইতে একটা কাপড় লইয়া ভালো করিয়া কোঁচাইতে লাগিলেন। স্বামীর দিকে মুখ না ফিরাইয়াই যেন নিজের মনে বলিলেন—"ক'দিন যে আর চলবে এ রকম করে।"

এমন অর্ধোচ্চারণে বলিলেন, বিপিনবিহারীকে প্রশ্ন করিতেই হইল—"আমায় কিছু বললে?"

"না, তোমায় নয়···বলছিলাম, আর কত দিন ভয়ে-ভয়ে এ-রকম ভাবে থাকতে হবে? ঘরে গরম, খেয়ে-দেয়ে জানালার কাছে গিয়ে একটু দাঁড়িয়েছিলাম, ওর মধ্যেই চার-চারটে···"

"এ দিকটা ভালো আছে।"

"যখন তুললেই কথাটা বাপু, ভালো থাকতে থাকতেই সরে যাওয়া ঠিক; না, তুমি করো একটা ব্যবস্থা; এ যেন সর্বদা ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকা—কখন্ কি হয়, কখন কি হয়···"

বিপিনবিহারী হিসাবের খাতাটা রাখিয়া দিলেন। একটু রুষ্ট ভাবেই বলিলেন—"একটু ভগবানের ওপর না ছেড়ে দিলে চলে? কত বারই তো তোমায় বুঝিয়ে বলেছি—এখন বাড়ি ছেড়ে গেলে সব তছ-নছ হয়ে যাবে। প্রথমত খড়ের ঘর করতে এক-কাঁড়ি খরচ—কোথা থেকে আসবে? খড় একেবারে অগ্নিমূল্য—তা ভিন্ন জায়গার

ভাড়া আছে। এর ওপর আলাদা করে নতুন সংসার পাতবার খরচ আছে। সব চেয়ে বড় বিপদ—নতুন কাজটার যে একটু গোড়াপত্তন হচ্ছে, যার ওপর ভবিষ্যৎ, সেটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে, সমস্ত টাকা যাবে ডুবে। আর এ অবস্থায় এ সম্বলটুকু গেলে কী যে হবে বোধ হয় বুঝতেই পাচ্ছ—শশাঙ্কটা পড়ছে, শৈলেনও আসছে বছর স্কুল ছেড়ে বেরুবে—ক্ষেত নেই আর যে···পড়ানো দূরের কথা, অন্ন জোটানোই ভার হবে—তার জন্যেই বোধ হয় বাড়িটির ওপর হাত পড়বে।···ভেবে বলো···"

হাতে গড়গড়ার নল ছিল, কয়েক বার টান দিয়া অপেক্ষাকৃত নরম কণ্ঠেই বলিলেন—"তা বলে বলছি না ছেলেদের প্রাণের কাছে এ-সব কিছু···। ভগবানের একটু দয়া আছে বৈ কি, অস্বীকার করলে পাপের ভাগী হতে হবে। প্রথমত দেখো, এমন একটি জায়গা পেয়েছি যা সহরের মধ্যে হয়েও সহরের বাইরে। অনেকখানিই নিশ্চিন্দি আছি তো? ক'বছর থেকে ব্যারামটা হচ্ছে, একটা ইঁদুর পর্য্যন্ত পড়েনি বাড়িতে—দয়া আছে বলেই তো তাঁর?···রোগটার সব খারাপ, শুধু এইটুকু ভালো, বাড়ি খারাপ হলে আগে ইঁদুর মরবেই···"

বাহিরে ডাক-পিয়ন আসিয়া হাঁকিল—"চিট্‌ঠি হায়।"

শৈলেন একটা খাম আনিয়া বিপিনবিহারীর হাতে দিল। বিপিনবিহারী এইটারই প্রত্যাশায় ছিলেন, ব্যগ্র হস্তে ছিঁড়িয়া একটি হলদে কাগজ বাহির করিলেন, মুখটা দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, বলিলেন—"দু'গাড়ি কয়লার" রেলওয়ে চালানিটাও এসে গেল। কত বড় একটা সুবিধে—প্রায় সমস্ত ব্যবসাদারই সহর ছেড়ে পালিয়েছে; এ সময় যদি শুধু ভয়ে বাড়ি ছেড়ে···"

শশাঙ্ক, শৈলেন ভিতরের এ-প্রান্তটায় পড়িতেছিল, উর্দ্ধশ্বাসে জড়াজড়ি করিয়া ছুটিয়া আসিল। এই কয়েক পা আসিতেই কি রকম হইয়া গেছে, মুখ শুকনো, ভয়ে চোখ দুইটা ঠেলিয়া আসিয়াছে, জড়াজড়ি করিয়া বলিল—ইঁদুর!!—ঠাকুরমার ঘরের সামনে! শীগ্‌গির এসো!!···'

দুই জনে তাড়াতাড়ি গিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন; তাড়াতাড়ি কিন্তু সমস্ত শরীর যেন ঝিম-ঝিম করিতেছে। বিপিনবিহারী ভীতি-কর্কশ স্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন—"মা, খাট থেকে নেমো না, ইঁদুর পড়েছে! খবরদার নেমো না!"

অতি সামান্যই একটা ইঁদুর, নিতান্তই ঘরোয়া, কিন্তু কী বিকৃত দৃশ্য! ফুলিয়া প্রায় দেড়া হইয়া গেছে, রোঁয়াগুলা সব সজারুর কাঁটার মতো খাড়া। একটা বৃত্ত লইয়া ক্রমাগত ঘুরিতেছে—নীরব যন্ত্রণা—সামনে স্পষ্ট দেখা যায় মৃত্যুর আবর্ত।···একটা নৌকা যেন নিতান্ত অসহায় ভাবেই দয়ের কেন্দ্রের চারি দিকে পাক দিতেছে—ডুবিবেই, কোন উপায় নাই।···ক্রমে বৃত্তটা আরও ছোট হইয়া আসিল—আরও ছোট, গতিও মন্থর হইয়া আসিল ইঁদুরটার, তাহার পর কয়েকটা দ্রুত আক্ষেপের পরই সব শেষ।

প্লেগের ধর্মজ্ঞান আছে, গৃহস্থকে নোটিস দিল!

১০

আরও দুইটা বৎসর কাটিল। "এই ভাবে" বলা ভুল হইবে, কেন না অন্ধকার আরও নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। সেই যে প্লেগের ছত্রভঙ্গ—তাহার পর কারবারটা যে কোথা দিয়ে কি হইল যেন হিসাবেই পাওয়া গেল না। ঠিক যাহা ভয় করিয়াছিলেন বিপিনবিহারী।···দুঃখের দিনে শুভ লক্ষণগুলো ফলে না, ভয় কিন্তু ফলে অক্ষরে অক্ষরে।···সামলাইতে সামলাইতেও প্রায় বারো আনা গেল ডুবিয়া। বাকি যে চার আনা তাহারই উপর রহিল সব—সংসারের ষোল আনা,—শশাঙ্কর কলেজের খরচ, সংসার, শৈলেনদের স্কুলের খরচ।

অন্ধকারকে আরও নিবিড় করিবার জন্যই বিধাতা আর একটি আলোর রেখ দিলেন টানিয়া। পরবৎসর শৈলেনও পাশ করিয়া স্কুল ছাড়িল।

আবার আশা জাগে, উদ্যম জাগে। বিপিনবিহারী শৈলেনকে পড়ানোর প্রস্তাব তোলেন, গিরিবালা সাহসে বুক বাঁধেন, নূতন করিয়া দিদিশাশুড়িকে স্মরণ করেন, আশীর্বাদ চান।

শশাঙ্ক যে সাধ বাড়াইতেছে। এবার সামনের যা জীবন তা তো ওদের লইয়াই, ক্রমে আরও বেশি করিয়া। বাপ-মা সন্তানদের আনে জগতে, তাহার পর ওদের মধ্যেই যায় মিলাইয়া, ওদের মধ্যে দিয়া এক নূতন জগৎকে দেখে।···শশাঙ্ক যখন ছুটি-ছাটাতে আসে, একটি নতুন জগৎকে সঙ্গে করিয়া আনে। কলেজের গল্প—কত জায়গায় কত রকম ছেলে—প্রফেসারদের গল্প—কাহার কি রকম অভ্যাস, কি মুদ্রাদোষ সেটুকু পর্য্যন্ত—রাজধানী সহর, সেখানে কত কী যে হয়···

শশাঙ্ককে দেখিতেও হইয়াছে আরও সুন্দর। নূতন বয়স, তাহার উপর পড়িয়াছে বড় সহরের চাকচিক্য। মনে হয় এই যে একটা বৃহত্তর পরিমণ্ডল, শশাঙ্ক যেন চারি দিক দিয়াই তাহার উপযোগী হইয়া উঠিতেছে। গৌরবে মন পূর্ণ হইয়া ওঠে গিরিবালার, এক একবার একটা অদ্ভুত ধরণের অনুভূতি আসে, শশাঙ্ক গল্প করিতেছে—কখনও হাসিতে কখনও বা আবেগে মুখটা রাঙা হইয়া উঠিতেছে—গিরিবালার কাছে আর সবই মুছিয়া যায়, মনে হয় যেন নিজেই সন্তানে রূপান্তরিত হইয়া গেছি, নূতন জগতে নিয়াছি জন্ম। এত অদ্ভুত আর মিষ্ট যে বেশিক্ষণ থাকিতেই পারে না অনুভূতিটা।—যখন ও আর সামনে থাকে না, মনের অলি-গলিতে সেটাকে খুঁজিয়া ফেরেন গিরিবালা—কি যেন চমৎকার একটা পেয়েছিলাম—জিনিষটা কি? কোথায় গেল?—আর মনে আসছে না কেন? আরও একটা নূতন জগৎ আনিবে শশাঙ্ক, জীবনের পূর্ণতার একটা নূতন দিক, তাহারও সূচনা আরম্ভ হইয়াছে। একটি নূতন পথ সন্তানকে অতিক্রম করিয়াও তাহার দূরত্ব যায় দেখা।—বধূ, পৌত্র, পৌত্রী—নিজের জীবনটাই যেন কত দূর—প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে—কত যুগ পর্য্যন্ত যেন নিজের বুকেরই স্পন্দন শোনা যায়···

না, শৈলেনও যাক কলেজ। এই রকম সোনা হইয়া ফিরুক। আর দুই-তিনটা বৎসর চোখ-কান বুঝিয়া চালান, তাহার পরই শশাঙ্ক কলেজ ছাড়িয়া বাহির হইবে।···দিদিশাশুড়ির ঠোঁটের তাম্বুল-রেখা অক্ষয়, অপরাজেয় হইয়া থাক। গিরিবালাও পারিবেন সহিতে।

আশ্বিন মাস, পূজার ছুটিতে দুই ভাই দুই দিক্ হইতে আসিল।

শৈলেনের বেশ মনে পড়ে দিনটি। দুপুরের গাড়িতে আসিল। সর্বকনিষ্ঠ ভাই 'খোকার' জন্ম হইয়াছে। মা তাহাকে পাশে একটি

পিঁড়িতে শোওয়াইয়া উঠানে একটি মলিন মাদুরে পা ছড়াইয়া রোদ পোহাইতেছেন। পরিধানের বস্ত্রখানি পরিষ্কার, কিন্তু কয়েক জায়গায় ছিন্ন। শৈলেন প্রবেশ করতে বলিলেন—"শৈলেন এলি?—আয়।"

বেশ মনে পড়ে ছবিটি। মাকে এ মূর্তিতে অনেক বারই দেখিয়াছে। কিন্তু সদিনকার ছবিটি যেন মনে দাগ কাটিয়া বসিয়া গেছে। পায়ের গোছের কাছে কাপড়ে একটি গ্রন্থি ছিল, সেটুকু পর্যন্ত আছে মনে। আসল কথা ছেলেবেলার সেই সাঁতরায় বছর দুয়েক পর এই ছিল মা হইতে শৈলেনের প্রথম বিচ্ছেদ, মনটা ব্যাকুল হইয়া ছিলই, তাহার উপর যখন তাঁকে দেখিল তখন একেবারে পূর্ণ মাতৃত্বের মূর্তিতেই দেখিল। কী যে অপূর্ব লাগিয়াছিল, এখন ভাবিয়া কুল পায় না শৈলেন। মা শীর্ণ হইয়া গেছেন, ক্লান্ত, মলিন; এদিকে ছিন্নবাস, দীন শয্যা—যেন চারি দিক দিয়াই নিঃস্ব; অথচ যাহার জন্য নিঃস্ব সে ঐ নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় পাশে সুপ্তিমগ্ন।···কিন্তু এই সমস্ত নিঃস্বতার মধ্যেও কত বিরাট। মাতৃ-মূর্তির অনেকই তো ছবি দেখিল শৈলেন, মনে হয় শিল্পী মাকে আধ্যাত্মিক স্তর পর্যান্ত তুলিয়া ধরিয়াছেন; কিন্তু এ ছবি কোথায়?—এই সর্বংসহা, সর্ব-রিক্তা মানবী মায়ের?"

শৈলেন প্রণাম করিবার জন্য নত হইতেই ব্যস্ত ভাবে পা দুইটি একটু টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন—"আমায় ছুঁসনি, আমি এখনও শুদ্ধ হইনি, দেখছিস কাপড়-বিছানার অবস্থা!···"

শৈলেন পায়ের ধুলা লইয়া হাসিয়া বলিল—"বাড়ি ঢুকলাম, প্রণাম করবার জন্যে আমি এখন শুদ্ধ মা কোথায় খুঁজে বেড়াই?"

এ চিত্রটি এইখানেই শেষ হইল।

কয়েক দিন পরে শশাঙ্ক আসিল। এবার তাহার পরীক্ষা; সমস্ত ছুটিটা আর এখানে ছিল না, মাত্র শেষের কয়টা দিন কাটাইবে। মা তখনও ঘরে ওঠেন নাই। প্রণাম লইতে ঐ আপত্তিই করিলেন।

ঠাকুরমা দাওয়ায় ছিলেন, তাঁহাকে আগেই প্রণাম করিয়াছে শশাঙ্ক। মায়ের আপত্তিতে সে-ও হাসিয়া পায়ের ধুলা মাথায় দিয়া বলিল—"বেশ তো, এই আমি শুদ্ধ হলাম, আমায় ছুঁয়ে তুমিও হয়ে গেছ শুদ্ধ।"

গিরিবালা শাশুড়িকে সাক্ষী মানিলেন—"শুনলে কথা মা?—ঘর-দোর সব ছোঁবে তো?"

নিস্তারিণী দেবী অল্প হাসিয়াই বলিলেন—"কথাটা মোটেই মিথ্যে বলেনি, মা-ধনই তো? তবে চিরকাল লোকে একটা মেনে আসছে···একটু না হয় মাথায় গঙ্গাজল দিয়ে নিক্।"

শশাঙ্ক অতিমাত্র ভয়ের অভিনয় করিয়া বলিয়া উঠিল—"সে কি—মার পায়ের ধুলো আছে সে মাথায়!"

দুই মানেই হয় কথাটার, তাহার বলিবার ঢঙে সকলেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

যে বড় হয় তাহাকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি দিয়াই পাঠান ভগবান। এর পর হইতেই কিন্তু শশাঙ্কর হাসি সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল। মুখটি সর্বদাই একটু বিমর্ষ। হাসিতে গল্পে যোগ দেয়, কিন্তু সে যেন ওই ভাবটাকে ঢাকিবার জন্যই। ঠাকুরমা, বাবা, মা,—তিন জনেই কারণটা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাই আবার প্রশ্ন করিলেন—"পরীক্ষার ভাবনা?"

শশাঙ্ক বলিল—"হ্যাঁ।"

উঁহারা জবাবদিহিটা মানিয়া লইলেন। বলিলেন—"তাই এত মন-মরা হয়ে থাকতে হবে? এখনও তো ঢের দেরি।"

একদিন শৈলেনকে একান্তে ডাকিয়া শশাঙ্ক বলিল—"মার শরীরটা দেখছিস এবার?"

যাহার মন ভাবের দিক্‌টায় আবদ্ধ থাকে, সে বাস্তবকে ঠিক মতো দেখিতে পায় না। দাদার কথাতেই যেন শৈলেনের চৈতন্য হইল বলিল—"একটু বেশি কাহিল, না?"

"এত কাহিল হননি কখনও মা। মন্টু, অবু, খুকির বেলা তো দেখেছি।"

একটু থামিয়া বলিল—"লক্ষ্য করেছিস্ মা আই-মা, অর্থাৎ ঠাকুরদাদার মার গল্প করতে বড় ভালোবাসেন?"

শৈলেন একটু অবুঝ ভাবেই মাথা নাড়িল। শশাঙ্ক বলিল—"ঐ হয়েছে কাল্; মা আমাদের জন্যে নিজেকে মেরে ফেলছেন। খাওয়া দেখেছিস তো ওঁর?—এখন এই রকম খেলে বাঁচবেন? একটা পুষ্টিকর কিছু পাতে থাকে না।"

দুই ভাইয়ে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল কিছুক্ষণ। তাহার পর শশাঙ্কই কথা কহিল, বলিল—"আমি আরও সব কথা শুনেছি শৈল, সে-সব কিন্তু এখন থাক্। এটাও তোকে বলতাম না, বললাম শুধু এই জন্যে যে দেখিস, প্রথম বাণেই যেন পাশটা করে যাস্।"

ছুটি ফুরাইতে দুই জনে আবার নিজের নিজের কলেজে ফিরিয়া গেল।

তাহার পর আরও একটা মাস কাটিয়া গেল।

অবস্থাটা দ্রুত চরমের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ডুবন্ত কারবারের গহ্বর থেকে যে সামান্য কিছু টাকা বাঁচানো গিয়াছিল, সেটা গিয়াও আরও কিছু ঋণ হইয়াছে। ঋণের টাকাও আসিয়াছে ফুরাইয়া, আর এবার অবস্থা এমন যে ঋণ পাইবার যা সম্বল- এক-আধখানি গহনা, তাহাও আর নাই বলিলেই হয়।

এবার আবার সব চেয়ে বিপদ, গিরিবালার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ভগবানের একটা দয়া ছিল, কাহারও স্বাস্থ্য লইয়া কখনও ভাবিতে হয় নাই। খোকা হওয়ার পর সেই যে শরীর ভাঙিয়াছে আর সারিতে চাহিতেছে না। নিস্তারিণী দেবী চিন্তিত থাকেন। অভাবের সংসারে দুশ্চিন্তা—কোন উপায় নাই। চিরকাল ধর্মের সেবা করিয়া আসিয়াছেন—দুর্দিনে তাঁহাকেই ধরেন জড়াইয়া।—জলপড়া, মাদুলি, মানৎ; কিন্তু কিছু হয় না। তিনিও যেন কি-রকম হইয়া গেছেন আজকাল। অনেক দিন কোন তীর্থ করিতে পান নাই—উপায়ও নাই। মাঝে মাঝে এক চণ্ডীচরণকে দেখা ছাড়া অন্য কোন সন্তানকেই বহু দিন দেখেন নাই—উপায়ও নাই। বোধ হয় বধূকেও হারাইতে হয়,—এরও যেন উপায় নাই। মনটা এখন শুধু অতীতের স্মৃতি লইয়া খেলা করে, ভিতরে ভিতরে একটু তিক্তও হইয়া উঠিয়াছে।

বিপিনবিহারী মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেন গিরিবালাকে। গিরিবালা উত্তর দেন—"সেরে আর উঠছি না? তুমি সর্বদাই দেখছ তাই বুঝতে পারছ না। এই তো ঠাকুরপো এসেছিলেন, শরীর খারাপ দেখলে তাঁর নজরে পড়ত না?"

"চণ্ডী তোমায় বলেনি, বোধ হয় ভয় পেয়ে যাবে বলে, আমায় তো বলছিল।"

গিরিবালা বেশ ভালো ভাবেই তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া ওঠেন, বলেন—"তাই-ই তো, চোখের দৃষ্টি আর কত তফাৎ হবে?"

স্বামীর মনে হয়, হয়তো সত্যও বা। আসলে মনটা তো ওদিকে বেশি নাই, মন রহিয়াছে শশাঙ্কের দিকে—মানুষ করিতে হইবে। কাহার সঙ্গে যেন যুদ্ধ চলিতেছে, ক্রমেই জিদটা যাইতেছে বাড়িয়া।

এক মাস পরের কথা। গিরিবালা খোকাকে লইয়া বারান্দায় মাদুরের উপর কাঁথা পাতিয়া শুইয়া আছেন। শরীরটা কয়েক দিন থেকে বেশি খারাপ, বিছানায় যাইতে ভালো লাগে না, দুপুরের রোদটুকু বড় মিষ্ট লাগে।

আজ শত কষ্টের মধ্যে গিরিবালার মনে একটা নূতন ধরণের আনন্দ জাগিয়া উঠিতেছে। আজ দিদিশাশুড়ির দেওয়া ব্রত তিনি উদ্‌যাপন করিতে বসিয়াছেন। আজ গিরিবালার মুখে তাঁর সেই দিদিশাশুড়ির পান; প্রবঞ্চনা। ঠিক যে অন্নের অতটা অভাব হইয়াছে তাহা নয়; পেটের এক দিকে যে বেদনাটা ছিল, সেটা আজ অসহ্য হইয়া উঠিতেছে মাঝে মাঝে। আজ আহার করিতে পারিলেন না। কেহ ছিল না সামনে, ভাতটা সরাইয়া ফেলিলেন।

কিন্তু অসুখ জানিতে দেওয়া হইবে না তো। এ-সংসারে চিকিৎসার হাঙ্গাম আনিয়া ফেলিলেই যে শশাঙ্ক-শৈলেনের পড়া যাইবে বন্ধ হইয়া। শেষ পর্যন্ত কি হইতে পারে?—তা ভগবানই জানেন, আজ তো থাক অজানা।

খুব ঘটা করিয়া একটি পান সাজিয়া শীর্ণ ওষ্ঠাধর ভালো করিয়া রাঙাইয়া গিরিবালা খোকাকে লইয়া বারান্দায় শুইয়া রহিলেন।

স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কেমন একটু ছমছমে ভাব। প্রশ্ন করিলেন—"খেয়েছ তুমি?"

গিরিবালা মুখটা তাঁহার দিকে ঘুরাইয়া উত্তর করিলেন—"হ্যাঁ, কেন?"

"না, এমনি···"

তাহার পরের বক্তব্যটা বিপিনবিহারী একটু তাড়াতাড়িই বলিয়া গেলেন, যেন এক নিশ্বাসে।—"ইয়ে, একটা কথা তোমায় জিগ্যেস করতে এসেছি—আমাদের মত ঠিক হয়ে গেলে মাকে বলব···জিগ্যেস করা মানে—ঠিকই করে ফেলেছি, আর কোন উপায় তো নেই। মানে, শশাঙ্ক শৈলেনদের পড়াতে গেলে—মানুষ করতে গেলে—ওদিকে হরেন-পূর্ণেন্দুও তো এগিয়ে এসেছে—তাই এই ঠিক করে ফেললাম—উপায়ও তো নেই।···বাড়িটা বন্ধক রাখছি। ···তাই জিগ্যেস করছিলাম তুমি কি বল। মানে, লেখাপড়া সব ঠিক হয়ে গেছে,···এইবার লোকটাকে নিয়ে বেরুব কোর্টে রেজেষ্টারি করতে···তুমি অমন করে শুয়ে রয়েছ, শরীরটা খারাপ না কি?"

"কৈ, না তো।"

যন্ত্রণাটা উঠিয়াছিল, এই মাত্র উপশম হইয়াছে। মুখটা বেশ ভালো ভাবেই স্বামীর পানে ঘুরাইয়া রহিলেন গিরিবালা, একটু হাসিলেনও।···স্বামী দেখুন না, যাহার শক্ত অসুখ সে কখনও খাইয়া পান চিবায়, কখনও হাসিতে পারে?

বলিলেন—"বন্ধক রাখছ, কিন্তু বাড়িটাও গেলে···"

তাহার পরই যেন অমানুষিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া বলিলেন—"তা রাখো—রাখো—ভালো করে মানুষ হোক ওরা।"

বিপিনবিহারী চলিয়া যাইবার পর প্রায় মিনিট দশ-বারো হইয়াছে অবু ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল—"মা কে আসছে বলো তো? —বড়দা।"

শশাঙ্ক আসিয়া প্রণাম করিয়া একটু ব্যগ্র-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"বাবা চলে গেছেন মা?"

গিরিবালার তখন বেদনাটা উঠিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিতে পারিলেন না, সেটাকে চাপিয়া একটু হ্রস্ব শব্দ করিয়া বলিলেন—"হঠাৎ এলি যে?"

শশাঙ্ক শঙ্কিত-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"ও কি?"

"ও কিছু নয়, একটা ব্যথা, খাবার পরেই উঠল, আজ এই প্রথম। এক্ষুনি সেরে যাবে।···হঠাৎ এলি যে?"

শশাঙ্ক যে মাকে এত খারাপ অবস্থায় দেখিবে ভাবিতে পারে নাই, বলিল—"বাবা চলে গেছেন—রেজেষ্টারি করতে?"

বিস্মিত প্রশ্ন হইল—"তুই কি করে টের পেলি?"

শশাঙ্ক পূর্ণেন্দুর পানে চাহিয়া বলিল—"তুই শীগগির যা, গাড়ির এখনও মিনিট-কুড়ি দেরি আছে, বলবি—বলবি—মার শরীরটা বড় খারাপ···না, থাক্, বলবি দাদা পাটনা থেকে এসেছেন—খুবই একটা দরকারী কাজ—তিনি যেন এক্ষুনি ফিরে আসেন।···যা, যদি না আসেন, পা জড়িয়ে ধরবি, পারবি?"

গিরিবালা হতভম্ব হইয়া গেছেন, বলিলেন—"কথার উত্তর দিলিনি—হঠাৎ এলি যে? আর টের পেলি কি করে, যে?···

"পড়া ছেড়ে দিয়ে এলাম মা।"

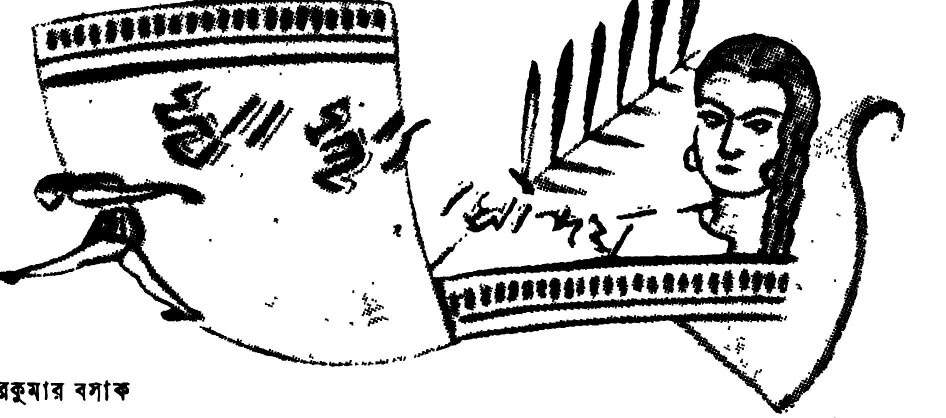
গিরিবালার সমস্ত শরীর যেন শিথিল হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে বলিলেন—"ছেড়ে দিলি?—কি সর্বনাশ করলি শশাঙ্ক!—কেন?"

মনের আবেগ চাপিবার চেষ্টায় শশাঙ্ক একটু অন্য দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পরই ভাঙ্গিয়া পড়িল—"আমাদের সর্বনাশ বলে কিছু থাকতে নেই মা? তোমরা পথে দাঁড়াতে চলেছ—আর দিদিশাশুড়ির ব্রত নিয়ে তিল তিল করে তুমি নিজেকে মেরে ফেলছ—আমাদের সর্বনাশ বলে কিছু থাকতে নেই?···তুমি আজ খাওনি—তোমার মুখের ও পান মিথ্যে—আমাকেও ঠকাবে? বলো, মিথ্যে নয়—বলো না···"

মায়ের বুকে মুখ ঢাকিয়া শশাঙ্ক হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

[ক্রমশঃ

হিন্দু চিকিৎসা-বিজ্ঞান



শ্রীশিশিরকুমার বসাক

পূর্ণকালে হিন্দুরা যে সমস্ত বিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিল তন্মধ্যে চিকিৎসা-বিদ্যাতেই তাহারা বিশেষ পারদর্শী ও সিদ্ধহস্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, সর্ব্ব প্রকার রোগ নিরাময় করিবার একমাত্র কর্ত্তা পরমপিতা স্বয়ং ভগবান্। বেদেও এইরূপ উল্লেখ আছে। হিন্দু সমাজের চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্বপ্রথম আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। রোগ নিরূপণ করিবার উপায় হইতে আরম্ভ করিয়া নানা প্রকার ঔষধ ও পথ্যের দ্বারা রোগ নিরাময় করিবার ব্যবস্থা, এমন কি দীর্ঘ-জীবন লাভের উপায়-সম্বলিত বিধি-ব্যবস্থা পর্য্যন্ত উহাতে সুবিস্তারিত লিপিবদ্ধ ছিল। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ব্রহ্মা হইতে এই বিদ্যা হাতে-কলমে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। রোগ নিরাময়ের জন্য তাঁহারা বিখ্যাত। স্বর্গের চিকিৎসক বলিয়া চারি দিকেই তাঁহাদের সুনাম। এতদ্ব্যতীত রুদ্র, ইন্দ্র, ধন্বন্তরি প্রভৃতি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বলা বাহুল্য, ঋক্‌বেদের অনেক স্তোত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে রোগ নিরাময় করিবার উপযুক্ত ঔষধ ও অস্ত্র-চিকিৎসার কতখানি উন্নতি হইয়াছিল নিম্নলিখিত বিবরণী হইতেই উহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসা-বিদ্যায় এইরূপ পারদর্শী ছিলেন যে দেবাসুর যুদ্ধে আহত সৈন্যদের আরোগ্য করিয়াছিলেন। ইন্দ্র দধীচি মুনির মস্তক কাটিয়া ফেলিলে তাঁহারা উহা জোড়া দিয়া তাঁহাকে বাঁচাইয়াছিলেন। বামদেবকে মাতৃকুক্ষি হইতে প্রসব করাইয়াছিলেন। একটি রোগীর মধ্যে কুমারদ্বয়ের চক্ষু-অস্ত্রোপচারের সাফল্য এবং আর একটি রোগীর মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে দন্তোদ্‌গম প্রভৃতি হইতেই তখনকার অস্ত্র-চিকিৎসা বিদ্যার আশ্চর্য্য কৌশল অবগত হওয়া যায়। ঋক্‌বেদ ও পুরাণাদি হইতে এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কথিত আছে, সুকন্যা বৃদ্ধ চ্যবন মুনিকে বিবাহ করিলে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় চ্যবনপ্রাশ নামক রসায়ন প্রদানে মুনির যৌবন ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। রুদ্রকে বৈদ্যনাথ বলা হইত, কারণ তিনি হিন্দু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জন্মদাতা। ধন্বন্তরি চিকিৎসা-তত্ত্ব-বিজ্ঞান প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 'অমৃত' নামক এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত করিয়া তিনি মানুষকে অকাল-মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

চরক যদি প্রাচীন ভারতে হিন্দুদের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কথা লিপিবদ্ধ না করিতেন তাহা হইলে সেকালের চিকিৎসা-প্রণালীর ইতিহাস আমাদের কাছে অসম্পূর্ণ থাকিত। তাঁহাকে সহস্র ফণাযুক্ত শেষ নাগের অবতার বলা হয়, কারণ, সমস্ত বিজ্ঞানের মধ্যে বিশেষ ভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের রক্ষক তিনি।

হিন্দুদের চিকিৎসা-প্রণালীর সাথে সুশ্রুতের নামও একান্ত ভাবে জড়িত। অস্ত্র-চিকিৎসক হিসাবে দেশ-বিদেশে তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। তিনি সর্ব্বপ্রথম অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে লিখেন এবং চরকের মত তাঁহাকেও দেবতাদের মধ্যে এক অবতার বলা হয়। অষ্টম শতাব্দী সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে আরবী ভাষায় তাঁহার লেখার অনুবাদ হইয়াছিল এবং পরে উহা ল্যাটিন ও জার্ম্মাণ ভাষায় অনূদিত হয়। সুশ্রুত ঔষধ প্রস্তুতকরণে, শরীর-ব্যবচ্ছেদ ও অস্ত্র-চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মনুষ্য-শরীরে কতগুলি শিরা, অস্থি ও মাংসপেশী আছে তিনি বিস্তারিত ভাবে উহার সঠিক বিবরণ দিয়াছেন। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে ডবলিউ হারভি (W. Harvey) মনুষ্য-শরীরে রক্ত চলাচলের থিওরি (theory) আবিষ্কার করেন, কিন্তু সুশ্রুত উহা অনেক পূর্ব্বেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে শরীর অভ্যন্তরস্থ ১৭৫টি শিরা রক্ত-চলাচলের সহায়তা করে। এই সমস্ত শিরা, প্লীহা ও যকৃৎ হইতে উঠিয়া সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুশ্রুত দিবোদাসের নিকট অস্ত্র-চিকিৎসার বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। দিবোদাস খৃষ্টজন্মের ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বারাণসীর রাজা ছিলেন। অস্ত্র-চিকিৎসায় তিনি ছিলেন এক জন সুপণ্ডিত। সুশ্রুত-সংহিতায় কাটা, ছেঁড়া, সেলাই, শরীর হইতে দূষিত রক্ত ফেলিয়া দেওয়া, শরীর-অভ্যন্তরস্থ প্রস্তরাদি বাহির করিয়া দেওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে যে বিধি-ব্যবস্থা এবং ১২১ রকমের অস্ত্র (Surgical Instrument) ও ১৪ রকম Bandage বা পটী-বন্ধনের উল্লেখ আছে ; উহা হইতে সহজেই বুঝা যায়, সেকালের চিকিৎসা-বিদ্যা বর্ত্তমান পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের তুলনায় কোন অংশে হীন ছিল না। বর্ত্তমানে চিকিৎসা-বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য আমাদের দেশের অনেকে যেমন ইংলণ্ড, ভিয়েনা প্রভৃতি দেশে গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ তৎকালেও চিকিৎসা-বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য ভারতের পুণ্য তীর্থ তক্ষশিলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথিবীর বহু দূর দেশ হইতে ছাত্র আসিত। কারণ, তখন তক্ষশিলা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিখ্যাত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।

মহাত্মা অশোকের সময় পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে চিকিৎসকের স্থান

অত্যন্ত সম্মানের ছিল। অশোক স্বয়ং এই বিভায় তাঁহাদের উৎসাহ দিয়াছেন। মেগাস্থিনিসের ভারত পরিদর্শনের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তৎকালে চিকিৎসকেরা মুনি ঋষির মত সম্মান পাইতেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে তাঁহাদের ঔষধ প্রস্তুত করিবার বিবিধ প্রণালী জানা থাকায় তৎকালে স্ত্রী-পুরুষের বিবাহিত জীবন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। কারণ, কিরূপ প্রকৃতির স্ত্রী-পুরুষ সন্তান উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে, তাঁহারা পূর্ব্বেই উহা স্থির করিতে পারিতেন। চিকিৎসার প্রথমেই তাঁহারা ঔষধের প্রয়োগ না করিয়া পথ্যের দ্বারা রোগ অপসারণের চেষ্টা করিতেন; নিম্নোক্ত শ্লোক হইতেই উহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়—

"বিনা তু ভেষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
ন তু পথ্যবিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি।"

ইহা ছাড়াও তাঁহারা বাহ্যিক মলম ও নানারূপ প্রলেপের ব্যবস্থা দিতেন।

অকেজো, রুগ্ন ছাগল ও মহিষাদি প্রভৃতি জন্তু দ্বারা তৎকালে শরীর-ব্যবচ্ছেদ বিভা (the science of anatomy) শিখান হইত। অতঃপর বৌদ্ধ রাজারা এ বিষয়ে উৎসাহ দিবার জন্য পশুচিকিৎসার উপযোগী ঔষধ ও অস্ত্রচিকিৎসা বিভায় বিশেষজ্ঞ করিবার জন্য স্থানে স্থানে পশু-চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। অশোকের শিলালিপি হইতে এইরূপ জানা গিয়াছে যে, তৎকালে মনুষ্য ও পশু-চিকিৎসার জন্য পৃথক্ পৃথক চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল এবং ভৈষজ্য-উদ্যান স্থাপনা করিয়া নানা দেশের দুষ্প্রাপ্য ওষধি সকল একত্র করিয়া সযত্নে রোপিত হইত।

খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম দিক্ দিয়া কয়েক শতাব্দীতে হিন্দু চিকিৎসা-বিভার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ দিকে তাহারা কঠোর গবেষণা করিতে লাগিল। কিন্তু মুসলমানদের এ দেশে আগমনের সাথে সাথে আর্য্য চিকিৎসা-প্রণালীর অবনতি দেখা দিল। সময়ের ঘাত-প্রতিঘাতে হিন্দু চিকিৎসকেরা একেবারে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। ফলে ভারতে মুসলমান রাজ্য দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে হাকিমেরা বৈদ্যদের স্থান অধিকার করিল। তাহারও আবার গ্রীক্ চিকিৎসা-প্রণালীর অনুসরণ করিল—যাহাকে আমরা ইউনানি চিকিৎসা বলিয়া থাকি। তাই বলিয়া বৈদ্য-শ্রেণী যে একেবারে লুপ্ত হইল তাহা নয়, প্রতিযোগী হিসাবে তাঁহাদের স্থান কোন অংশে কম ছিল না। বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসকেরা যেখানে হাত গুটাইয়া বসিত সেখানেও তাঁহারা অনেক কঠিন রোগ আরোগ্যে করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। তৎকালের হিন্দু বৈদ্যরা প্রধানতঃ শরীর-অভ্যন্তরস্থিত বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিন বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করিতেন। তাঁহাদের মতে উপরি-উক্ত তিনটি ধাতুর সাম্য হইলে উহা পূর্ণ স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইত।

হিন্দু চিকিৎসকেরা বিশেষ ভাবে ঋতু-পরিবর্ত্তন, একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা প্রভৃতি তিথি-নক্ষত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উপযুক্ত সময়ে ওষধি সংগ্রহ করিতেন। তাহাদের চিকিৎসার আরও একটা বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক রোগীর পিতৃপুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া রোগীর ব্যক্তিগত ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে জানিয়া যথাসময়ে এবং যথোপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন। তজ্জন্যই আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ আশু ফলদায়ক ও রোগমূলনাশক।

আয়ুর্ব্বেদ অষ্টাঙ্গে বিভক্ত যথা—শল্য (শস্ত্রচিকিৎসা), শালক্য (শিরোরোগ চিকিৎসা), কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমার-ভৃত্য (শিশুচিকিৎসা), অগদতন্ত্র (বিষচিকিৎসা), রসায়ন (শরীরে তারুণ্য আনয়নের বিধি) এবং বাজীকরণ (ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য বৃদ্ধি)।

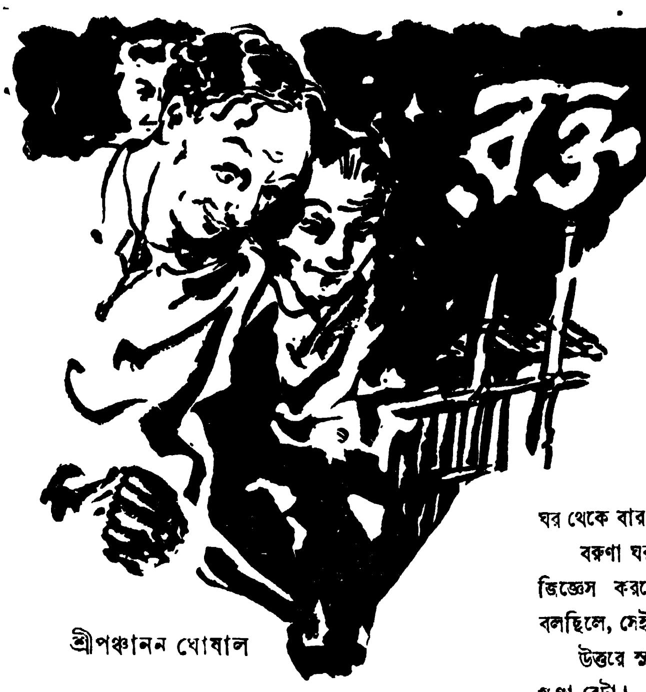
সেকালে দুই উপায়ে রোগের চিকিৎসা চলিত। মন্ত্র, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন ও কবচধারণাদি এবং ঔষধপ্রয়োগ। এই দুই প্রকারের চিকিৎসা এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। ইহা ছাড়াও অতি প্রাচীন কাল হইতেই হঠযোগ ও নেতি ধৌতি, বস্তি ও আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি দ্বারা এবং সম্মোহন বিদ্যা (Hypnotism) দ্বারাও যে রোগ আরোগ্য হইতে পারে তাহাও লোকের জানা ছিল।

মহাবগ্গে লিখিত আছে যে, আকাশ গোত্ত যখন একটি বৌদ্ধ ভিক্ষুর ভগন্দর স্থানে শস্ত্র-প্রয়োগ করিয়া তাহার একটি বিরাট মুখ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া বুদ্ধদেব অত্যন্ত বীভৎস ভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং মনুষ্যদেহে এইরূপ শস্ত্র প্রয়োগ করিতে নিষেধ করিলেন। আয়ুর্ব্বেদ শল্যশাস্ত্রের অবনতি সম্ভবতঃ বুদ্ধের পরবর্ত্তী কাল হইতেই আরম্ভ হয়।

স্বাস্থ্যলাভের উপযোগী পথ্যের কিরূপ বন্দোবস্ত ছিল উহা বলিয়াই আমি আমার প্রবন্ধ শেষ করিব। তৎকালে সকালে ও সন্ধ্যায় দুই বার আহারের ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসকগণের মতে আধপেট খাওয়া উচিত; এবং এক-চতুর্থাংশ জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া বাকী অংশ শূন্য রাখা উচিত। প্রতিদিন দন্ত-মার্জ্জন স্বাস্থ্যবিধির মধ্যে পরিগণিত ছিল। খাবার পরই ভাল করিয়া মুখ ধুইবার ব্যবস্থা ছিল। পাশ্চাত্যের মতে রাত্রে আহারের পর এক মাইল হাঁটা বিধেয়, কিন্তু হিন্দু চিকিৎসকদের মতে খাবার পর একটু হাঁটা উচিত এবং হাঁটার পর বামপার্শ্বে শুইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা দরকার। তাঁহাদের মতে গাত্রমার্জ্জন (massage) প্রভৃতি উপায়েও অনেক পীড়ার উপশম হয়। হিন্দু চিকিৎসকদের মতে সূর্য্যোদয়ে জলপান করা স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। সুতরাং জীবনকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইলে মহর্ষি মনুর মতে নিয়মিত স্নানাহার, ব্যায়াম ও বিশ্রাম এবং উপযুক্ত বস্ত্রাদি ধারণ ও আত্মশুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন।

ইংরেজ রাজত্ব আরম্ভ হওয়ার পর আমাদের দেশে এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-প্রণালী প্রবেশ লাভ করে এবং তখন হইতে বিদেশীয় মতে ও বিদেশীয় ঔষধ ব্যবহার করিয়া চিকিৎসার সূত্রপাত হয়। আমাদের দেশে এলোপ্যাথি চিকিৎসাই এখন সরকারের পৃষ্ঠ-পোষিত; তাই উহার এত উন্নতি ও বিস্তার সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা বাস্তবিক প্রশংসার পাত্র। যে দেশে সমুজ্জ্বল ঋতু-বৈচিত্র্য বিদ্যমান, ভেষজ-সম্পদ সুপ্রচুর, ঔষধ-বিজ্ঞানে পারদর্শী লোকেরও অভাব নাই, সেই দেশের জাতীয় ঔষধ-বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রসার একমাত্র স্বাধীন ভারতেই সহজসাধ্য হইতে পারে। সেই সুপ্রভাতের জন্য আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে।

রক্তনদীর ধারা



শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

৫

বিষাদ-ক্লান্ত ভাবে বরুণা স্বামীর শুশ্রূষা করছিল। সুধীর অর্দ্ধ-চেতন অবস্থায় ভাঙা চৌকির উপর শুয়ে আছে। কপালে ও মাথায় তার ব্যাণ্ডেজ। থুতনিটাও কাপড় দিয়ে বাঁধা। ধীরে ধীরে বাতাস করতে করতে বরুণা লক্ষ্য করলো, রাত্রের কালো ছায়ায় সমস্ত ঘরখানা ঢেকে দিচ্ছে। অদূরে রক্ষিত ঔষধের শিশিগুলো পর্য্যন্ত আর ভালোরূপে দেখা যায় না। বরুণা উঠে এসে শিয়রের জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে আবার বাতাস সুরু করলো।

মেঝেয় একটা ছোট চৌকির উপর বসে সুরমা কীর্ত্তনী একটা ছেঁড়া সেমিজ সেলাই করছিল। এইবার উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "নেমে আয় বরু, চুলটা বেঁধে দি, আয়!"

বরুণা আপন মনে এতক্ষণ সুধীরকে বাতাস করে যাচ্ছিল। সুরমার কথায় এইবার অঝোরে কেঁদে ফেলে সে উত্তর করলো, "সুরো দি, ও-ওষুধ? ওষুধ দেবে না?"

ঔষধ কয়টা সুরমা নিজের পয়সা দিয়ে কিনিয়ে আনিয়েছিল। সব কয়টা শিশিই ডাক্তারের প্রেসকৃপশন মত, সুরমার নির্দেশে লক্ষ্মীকান্ত কিনে এনেছে, তবে একটি শিশি বাদে। সেই শিশিটাতে ছিল ক্রিয়াশীল মন্থর বিষ। তাদের ইচ্ছা ছিল—সত্যকার ঔষধের সঙ্গে মন্থর বিষ মিশিয়ে দিয়ে তাদের পথের কাঁটা সুধীরকে সরিয়ে দেওয়া। বরুণার কথায় সুরমা একবার ঔষধগুলোর প্রতি ও আর একবার সুধীরের দিকে চেয়ে দেখলো। তার পর লক্ষ্মীকান্তকে ডাক দিয়ে বললো, "লক্ষ্মীদা, ও, লক্ষ্মীদা! ওষুধটা দেখে দাও না ভাই। কি সব ইংরিজী, ছাই পড়তেও পারি না সব। একটু দেখে দাও না।"

লক্ষ্মীকান্ত বাইরেই বসেছিল। সুরমার হাঁক-ডাকে ভিতরে এসে জিজ্ঞেস করলো, "কি? ব্যাপার কি? চেঁচাস কেন এতো?"

লক্ষ্মীকান্ত ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বরুণা মাথার ঘোমটাটা যথাসম্ভব বেশী করে টেনে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বরুণার দিকে একবার আড় চোখে চেয়ে দেখে সুরমা লক্ষ্মীকান্তকে চোখের একটা ইসারা করে বলে উঠলো, "একটুখানি সই—সেই ঔষধটা মিশিয়ে। খাইয়ে দে না টপ করে। এই—"

ওষুধ-টষুধ বা ডাক্তারাদি সম্বন্ধে বরুণা বুঝত খুব কম। তার পর খরচ-পত্র যা কিছু সুরমাই করছিল। তাই চিকিৎসার সবটাই সে সুরমার বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়েছে। সে কোনও উত্তর না করে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বার হয়ে গেল, বোধ হয় সন্ধ্যাকৃত্য সমাপনের জন্য।

বরুণা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে, অনেকটা নিশ্চিন্ত ভাবে লক্ষ্মীকান্ত জিজ্ঞেস করলো, "কিন্তু তোমার সেই খোকা না কে—সেই যার কথা বলছিলে, সেই খুনে গুণ্ডাটা। যদি টের পায় সে, তা হলে—"

উত্তরে সুরমা বললো, "বয়ে গেল। পাবে না টের। জেল-খারিজ গুণ্ডা বেটা। দেব বেটাকে ধরিয়ে। বেটা কি না আমার গায়ে হাত তোলে। বেটা খুনে—"

মন্থর বিষটুকু খাওয়ার ওষুধের সঙ্গে একটু একটু করে মেশাতে মেশাতে লক্ষ্মীকান্তের কি জানি কেন, যেন একটু ভাবান্তর উপস্থিত হলো। এই কায তার জীবনে এই প্রথম নয়। তবুও সে একটু ইতস্ততঃ করে বলে উঠলো, "কিন্তু—কিন্তু সুরো, এর কি কোনও দরকার ছিল?"

কিছুমাত্র বিক্ষুব্ধ না হয়ে সুরমা উত্তর করলো, "নিশ্চয়ই ছিলো।"

নিজের সুঠাম চেহারার দিকে একবার হেঁট হয়ে সগর্ব্বে তাকিয়ে নিয়ে লক্ষ্মীকান্ত বললো, "না, কক্ষনো না—"

বরুণা যে কত বড় সতী ও শক্ত মেয়ে তা লক্ষ্মীকান্ত না বুঝুক, সুরমা বুঝেছিল। সুধীরকে সরিয়ে না দিতে পারলে বরুণাকে পাওয়া অসম্ভব। পরপুরুষের রূপ দেখে ভোলবার মেয়ে বরুণা নয়। তবে এত দিন নিবিড় ভাবে আলাপ থাকা সত্ত্বেও তাকে সে চিরাচরিত নিয়ম বা প্রথা-মত সরিয়ে দিতে পারেনি, তা শুধু কতকটা খোকার ভয়ে ও কতকটা উপযুক্ত সুযোগের অভাবে। নীরোগ সুধীরকে ঔষধ সেবন করানর কোনও



সুযোগই সে এত দিন পায়নি। কিন্তু আর খোকাকে ভয় করলে চলে না। খোকার দৌলতেই সে এ সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু, হ্যাঁ, তাতেই বা কি? খোকার উপর টেক্কা দেবার ক্ষমতা সেও রাখে। পরে খোকাকে যা-তা একটা বুঝিয়ে দিয়ে বরুণাকে নিয়ে সরে পড়লেই হলো। এমনি সাত-পাঁচ অনেক কিছু মনে মনে এঁটে নিয়ে সুরমা মাত্র দুইটি কথায় লক্ষ্মীকান্তের প্রশ্নের উত্তর দিলো, "বকিসূনি, যা—"

সুরমার বুদ্ধিমত্তার উপর লক্ষ্মীকান্তের অগাধ বিশ্বাস ছিল। সে বিনা বাক্যব্যয়ে ঔষধের মিশ্রণকার্য্য শেষ করে সুরমাকে সুধীর সম্বন্ধে তার শেষ সিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ বরুণা বাইরের কায ফেলে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে সভয়ে সুরমাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো, "কারা ওরা, দিদি? ঐ দেখো—"

বরুণার ব্যবহারে সুরমা হকচকিয়ে গিয়েছিল। এই কয় মাসে এ বাড়ীর ব্যাপারে বরুণার অন্তর অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এই ভাবে ভয় পাবার তার কি-ই বা কারণ থাকতে পারে? কৌতূহলী হয়ে সুরমা বাইরে উঁকি দিয়ে দেখলো পুলিশ। থানার ইনেসপেক্টার প্রণব বাবুর পিছনে উর্দ্দিপরা সিপাই ও জমাদার। তাদের ঘরের দিকেই তারা আসছে।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বিশেষ বিনয়ের সঙ্গে সুরমা ইনেসপেক্টার প্রণব বাবুর উদ্দেশ্যে বললো, "আসুন বাবু, আসুন।" তার পর সুধীরের দিকে চেয়ে বলে উঠলো, "আমারই ভাই।"

ডাক্তারী কানুন মত সুধীরকে চিকিৎসা করে খোকারই ডাক্তার পুলিশে খবর পাঠিয়েছিল। জখমী কেস্ দেখে ডাক্তারদের প্রথম কর্ত্তব্য পুলিশে খবর দেওয়া আর পুলিশের কর্ত্তব্য জখম সম্বন্ধে যথাসম্ভব সত্বর তদারক করা। তার পর জখম ছিল অসামান্য। তাই খবর পাওয়া মাত্র ইনেসপেক্টার প্রণব নিজেই চলে এসেছেন।

ঘরে ঢুকেই প্রণবের প্রথম নজর পড়লো সুরমার উপর। সুরমার পেশা প্রণব বাবুর অজ্ঞাত ছিল না। তার পর সুরমার অযাচিত কৈফিয়ৎ এবং বরুণার উপস্থিতি তাঁকে সন্দিহান করে তুললো। একটু ইতস্ততঃ করে প্রণব বরুণার দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইনি! ইনি তোমার কে?"

সুরমা প্রণবকে বিশেষ ভয় করত। দু'-দু'বার এই সব ব্যাপারেই তাকে প্রণব চালান দিয়েছে। কিন্তু ভাগ্যচক্রে প্রমাণের অভাবে সুরমা ছাড়া পায়। একটু আমতা আমতা করে সুরমা উত্তর দিলে, "আজ্ঞে বৌদি। এই দাদারই বৌ।"

সুরমার উত্তরে প্রণবের সন্দেহ বাড়লো বই কমলো না। তিনি এইবার সোজাসুজি বরুণাকেই জিজ্ঞাসা করলেন, "এ কথা সত্যি; যা বলছে এ।"

পুলিশের সান্নিধ্য বরুণাকে ভীত করে তুলেছিল। অজ্ঞ স্ত্রীলোক সে, কিছুই বোঝে না। স্বামী তার তখনও অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে। কেবল মাত্র প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বিষয়টা এড়িয়ে যাবার জন্যেই ঘোমটার ভিতর থেকে মাথা নেড়ে সে সম্মতি জানালো।

এর পরে আর কোনও কথা বলা চলে না। প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করে প্রণব ঘরের ভিতরকার ঔষধের শিশিগুলো ভাল করে একবার পরীক্ষা করে নিলেন; তার পর বরুণার দিকে আর একবার তাকিয়ে দেখে প্রণব সুরমাকে বললেন, "হুঁ, সাবধান! রোগী যদি মরে তো লাস আমি ময়নায় পাঠাবই। বিশ্বাস নেই তোমাকে, তুমি সবই পারো। হুঁ, সাবধান! আর জ্ঞান হলেই খবর দেবে, বুঝলে?"

সুরমা বেশী কথা না বলে শুধু ঘাড় নেড়ে তার সম্মতি জানালো। তার পর প্রণব সদলে চলে গেলে, গেলাসের মিশ্র ঔষধটুকু নীচের একটা পিতলের ডাবার মধ্যে ঢেলে ফেলতে ফেলতে লক্ষ্মীকান্তর দিকে চেয়ে বললো, "থাকগে যাক্। দরকার নেই।"

লক্ষ্মীকান্ত স্বভাবতঃই একটু ভীতু লোক। মেয়ে পটানো ছাড়া আর সব কাজেই তার যেন কেমন ভয়-ভয় করে। এতক্ষণ সে পুলিশের ভয়ে জড়সড় হয়ে দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল। এইবার যেন সে সচেতন হয়ে উত্তর করলো, "তাই ভালো, আর কিছু কাজ আছে?"

সুরমা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে উত্তর করলো, "হ্যাঁ, আছে। তুই যা দিকি একবার খোকার কাছে। ডাক্তারের ফি-এর টাকা ক'টা আর ওষুধের দামটা চেয়ে আনবি। ওর হবে উপকার আর আমি করবো খরচ? কক্ষনো নয়।"

ঘটনাটার পরই খোকার দল কিছু দিনের জন্য তাদের ঘরে তালা বন্ধ করে তাদের ডেরা অন্যত্র উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে। কারণ তারা জানতো, ডাক্তারের রিপোর্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশের পদার্পণের সম্ভাবনা আছে। আইন-কানুন সম্বন্ধে খোকা অজ্ঞও নয়।

লক্ষ্মীকান্ত সুরমার পিছু পিছু দাওয়ার উপর বেরিয়ে এসে উত্তর করলো, "আরে, ঘাবড়াস্ কেন? দেখছিস্ না, লক্ষ্মীদা লক্ষ্মীদা করে এখোন থেকেই অজ্ঞান। দু'দিনেই বাগিয়ে নেব। দেখ না তুই। কি করি আমি—"

অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে বাহিরের দুয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে বিরক্তির সহিত সুরমা বললো। "বকিসূনি, যা, যা বললাম তাই কর।"

[ক্রমশঃ

বিপ্লব

অরুণকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার আমার প্রেমে পূর্ণ মাদকতা,
শিথিল স্নায়ুতে মোর শিরায় শিরায়
ঢালে যে উদগ্র মদ, নেশার জৌলসে
মন্দগতি ধমনীর দ্রুত-সঞ্চালন।
তৃপ্তির পাত্র যে তবু অপূর্ণই রয়।
তবু তুমি কামনা আমার, যৌবনের
অখণ্ড শপথ, রেখে যাবে জীবনের
স্বাক্ষর।

যুগান্তের পদাতিক
ফিরে ফিরে আসে। ধরণীর পঙ্কতটে
পদাঙ্ক-রেখারা প্রেরণার উৎস মোর।
রুদ্ধ-প্রাণে ঝঙ্কারিল নিবিড় দীপক,—
অগ্নির অত্যন্ত স্পর্শে জ্বলে' ওঠে শিরা
উপশিরা।
পদাতিক চলে মৃত্যু বরি'
উত্তপ্ত মিলনে আজ পোহাবে শর্ব্বরী।

বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার

(গোরক্ষনাথ)

শ্রীকামিনীকুমার রায়

গোরুর রোগ-মুক্তি, কান্তি পুষ্টি ও বংশ-বৃদ্ধি কামনা করিয়া বাংলার বিভিন্ন স্থানে নানা দেবতার পূজা-ব্রত, পীরের শিরণী এবং অন্য বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। এই সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার 'গোরক্ষনাথের সেবা' অন্যতম। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যেমন মানুষের রোগ-বিঘ্ন-নাশকারী রক্ষাকর্ত্তা দেবতা আছে তেমনি গোরুরও আছে। গোরুর মালিক হইতে হইলে ইঁহাদের কৃপার উপর নির্ভর করিতে হয়, নতুবা গোরু বাঁচে না,—রোগে মহামারীতে 'গোয়াল' শূন্য হইয়া যায়।

মানুষ তাহার সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারিয়াছিল, গোরুর মত উপকারী জন্তু আর নাই, জীবন ধারণের ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজন অপরিহার্য্য। তাই প্রায় সকল দেশের মানুষের মধ্যেই অতি প্রাচীন কাল হইতে গো-পালন-ক্রিয়া চলিয়া আসিতেছে। সভ্য জগতের আদি-পুরুষেরা পশু-পালন, বিশেষতঃ গো পালন এবং কৃষিকার্য্য করিয়াই জীবিকার্জ্জন করিতেন; এখনো অনেক জাতির মধ্যে এই দুই কার্য্যই প্রধান রহিয়া গিয়াছে। ইতিহাসে পুরাণে আমরা কি দেখিতে পাই?—রাজা মহারাজা হইতে আরম্ভ করিয়া অতি দীন হীন প্রজা কেহই তখন গো-পালনে দ্বিধাগ্রস্ত বা সঙ্কুচিত হইত না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বনে বনে গোরু চরাইতেন; এব্রাহাম গোরুর জন্য সমৃদ্ধ ছিলেন; বিরাট রাজার গো-গৃহ ভারত-বিশ্রুত। মুনি ঋষিরা সংসার-বাসনা পরিত্যাগ করিয়াও গো-পালনের বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন নাই; রাজা কার্ত্তবীর্য্য জমদগ্নি ঋষির একটি গাভীর নিকট আপনার অতুল রাজৈশ্বর্য্য তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে গোরুকে মানুষ প্রধান সম্পত্তিরূপেই গণ্য করিত; ইহা ছিল তাহার ধন; মুদ্রা-প্রচলনের পূর্ব্বে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইহা ছিল তাহার বিনিময়ের অন্যতম বাহন। বিবাহে অন্যান্য সামগ্রীর সহিত গোরুও যৌতুকস্বরূপ দেওয়া হইত; যুদ্ধের সন্ধি হইত গোরুর আদান-প্রদানে। তখন গো-দানই ছিল শ্রেষ্ঠ দান; তখন না কি মানুষের ঐশ্বর্য্যের পরিমাপ করা হইত তাহার গোরুর স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও সংখ্যা দেখিয়া। শুধু জীবনে মর্ত্ত্যের পথেই নয়, মরণে স্বর্গের পথেও গোরুর প্রয়োজনীয়তা মানুষ স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।—তাই হিন্দুরা এখনো পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতে তাহার আত্মার সদ্গতি কামনায় শ্রাদ্ধে সবৎসা গাভী, বৃষ, 'বৈতরণী' প্রভৃতি উৎসর্গ করে।

মানুষের সংসারে যাহার এতখানি স্থান, এতখানি প্রয়োজন, তাহার রক্ষা, বংশবৃদ্ধি ও বিঘ্ননাশ কামনা করিয়া দুর্ব্বল-চিত্ত মানুষ যে প্রবল দৈবশক্তির কাছে মাথা নোয়াইবে, নানা পূজা ব্রত, আচার-অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করিবে, তাহা তো অতি স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক প্রেরণা হইতেই বাংলা দেশে গাজিপীর, হাজিপীর, মাণিক-পীর, ত্রিনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি পীর-দেবতা স্তুতি ভক্তি লাভ করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে আজ আমি গোরক্ষনাথের কথাই বলিব।

গোরক্ষনাথের ভক্তগণ গোরক্ষনাথ বা 'গুরুখনাথ'কে গোরুর মঙ্গলকারী দেবতাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মনে করেন। পূর্ব্ব-বাংলার এক বিস্তৃত অঞ্চলে—ঢাকা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরায় ইঁহার প্রভাব আজও অক্ষুণ্ণ। গোরক্ষনাথের পূজার্চ্চনাকে সাধারণ লোক 'গোরক্ষনাথের সেবা' বা 'গুরুখনাথের সেবা' বলিয়া থাকে। এই 'সেবা'কালে আমি বহুবার বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া নিজে সকল বিষয় দেখিয়াছি, মন্ত্র পাঠ শুনিয়াছি। আমাদের বাড়ীতেও 'গুরুখনাথের সেবা' হইয়া থাকে। বিভিন্ন স্থানের আচার-পদ্ধতিতে এবং মন্ত্র বা পাঁচালিতে অল্প-বিস্তর পার্থক্য আছে। একই বিষয় নানা জনে নানা ভাবে বলিয়া থাকে, একই অনুষ্ঠান দেশ কাল-পাত্র ভেদে নানা রূপ ধারণ করিয়াছে। কথান্তর এবং মতান্তরগুলি যত দূর জানিতে পারিয়াছি, যথাস্থানে দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

অশৌচ তোলা ও নাহান্

গোরক্ষনাথের সেবার নিয়ম-কানুন বিবৃত করিবার পূর্ব্বে প্রসঙ্গ-ক্রমে সদ্যঃপ্রসবা গাভী সম্পর্কীয় আর দুই-একটি অনুষ্ঠানের কথা বলিব। পূর্ব্ব-ময়মনসিংহে গাভী প্রসব করিলে পর হিন্দুসম্প্রদায় মধ্যে সাধারণতঃ পঞ্চম, সপ্তম, নবম কিংবা অন্য কোনও বিজোড় দিনে প্রথম দুধ দোহন করা হয়। অনেকে এই দিন 'গাইয়ের অশৌচ তোলা' বলিয়া এক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। ইহা না করিলে না কি গুরু-পুরোহিতকে কিংবা কোনও ক্রিয়াকাণ্ডে তাহার দুধ দেওয়া যায় না, উহা অশুদ্ধ থাকিয়া যায়।

প্রথমে গাই বাছুরটিকে বেশ করিয়া স্নান করান হয়। তার পর উঠানে কতক জায়গা লেপিয়া পুছিয়া কলার একটা আগ-পাতায় সেই গাইয়ের গোবর রাখা হয় এবং তাহাতে আঙ্গুলের চাপে পাঁচটি, সাতটি কি নয়টি গর্ত্ত করিয়া, গর্ত্তে গর্ত্তে দুধ ও দুর্ব্বা দিয়া মাঝখানে একটি নোড়া[১] সূর্য্যমুখী করিয়া বসাইয়া দিতে হয়। এই সময়ে বাছুরটিকে মাথা হইতে লেজের ডগা পর্য্যন্ত তিন বার দুধ দিয়া মুছিয়া দেওয়া হয়; ইহার নাম 'নাওয়ান।' অতঃপর উলুধ্বনি করিয়া গাই ও বাছুরকে এক সঙ্গে সেই নোড়া-গোবরের চার দিকে আড়াই পাক ঘুরাইতে হয়। ঘুরাইবার সময় নোড়াটি গাইয়ের পা লাগিয়া স্থানচ্যুত হওয়া চাই। তার পর কোন স্ত্রীলোক নোড়াটি হাতে লইয়া তাহার উপর দুধ ঢালিতে ঢালিতে গোবরের পাতাটি লইয়া ঘর পর্য্যন্ত যান এবং পাড়ার ছেলেমেয়েদের ডাকিয়া একটু একটু দুধ খাইতে দেন। লোকের বিশ্বাস এই যে, যদি ছেলেকে আগে দেওয়া হয়, তবে পর-বৎসর ষাঁড়[২] বাছুর এবং মেয়েকে আগে দিলে বকনা[৩] বাছুর হয়। অনুষ্ঠান শেষে গোবরের পাতাটি উঠাইয়া গোয়ালের বেড়ায় গাইয়ের ঠিক পিছনে চাপ দিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়।

১। পূর্ব্ব-ময়মনসিংহে 'নোড়া'কে 'শিল' এবং 'শিল'কে 'পাটা' বলা হয়। কোথাও 'নোড়া'র নাম 'পোতা।' ২। প্রাদেশিক 'ডেকা'। ৩। বোকনা; নৈবাছুর।

কোথাও 'অশৌচ তোলা'র এত সব আড়ম্বর নাই। সেখানে প্রথম দোহনের দুধ দিয়া বাছুরটিকে শুধু নাওয়ান হয় এবং সেই অনুষ্ঠানকে 'নাহান্' বলে। বিক্রমপুরে ইহাই একটি পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান, পক্ষান্তরে, পূর্ব্ব-ময়মনসিংহে ইহা 'অশৌচ তোলার' একটি অঙ্গ মাত্র।

কোথাও কোথাও আবার এইরূপ 'অশৌচ তোলা' বা 'নাহানের' নিয়ম একেবারেই নাই; সে সব অঞ্চলে বরং ইহা নিন্দিতই হইয়া থাকে। সেদিকে বলে, মানুষের জাতকাশৌচ আছে এবং প্রসূতিকে নির্দ্দিষ্ট দিন অন্তে নানা আচার অনুষ্ঠানের (অশৌচান্তের ব্রত, সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান ইত্যাদি) ভিতর দিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। কিন্তু গোরু তো আর মানুষ নয় যে তাহারও অশৌচান্ত সূর্য্যার্ঘ দ্বারা হইবে ?

'অশৌচ তোলা' বা 'নাহান' অনুষ্ঠানের পর, কিংবা ঐরূপ অনুষ্ঠান না করিয়াও অনেকে নিজেরা দুধ খাইবার পূর্ব্বে প্রথম দোহনের দুধ নিকটস্থ কোনও দেবালয়ে বা দরগায় বা উভয় স্থানে দিয়া থাকেন। কেহ বা মানত মতো মাণিকপীর, পাঁচপীর প্রভৃতি পীরদের উদ্দেশে শিরণী দেন; কখনো বা কোন মুসলমান এই শিরণী গোয়ালঘরে আসিয়া রাঁধেন, কখনো বা শিরণীর উপকরণ—চাল, দুধ, মিষ্টি নিজের বাড়ীতে লইয়া যান। ময়মনসিংহের মদনপুরে (নেত্রকোণা মহকুমায়) শাহ সুলতানের এক দরগাহ্ আছে; অনেকে তাঁহার নামে গোরুর কুশলার্থ চাল পয়সা তুলিয়া রাখেন এবং সেই দরগার ফকির আসিলে তাহার হাতে দিয়া দেন। অনেকে আবার এই সব না করিয়া শুধু 'নারায়ণ সেবা' করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন।

গোরক্ষনাথের সেবার নিয়ম

গাই প্রসব করিলেই যে প্রত্যেকে 'গোরক্ষনাথের সেবা' দেন তাহা নয়। অনেকে উপরি-উক্ত অনুষ্ঠানগুলি (অশৌচ তোলা, নাহান্, পীরের শিরণী, কি নারায়ণ সেবা) শেষ করিয়াই দুধ খাইতে আরম্ভ করেন। আর যাঁহারা গোরক্ষ-সেবা দিতে মনস্থ করেন, তাঁহারা কিংবা তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ প্রধান এক জন সেই সেবা না হওয়া পর্য্যন্ত নূতন গাইয়ের দুধ খান না। সাধারণতঃ গাই প্রসবের ২১ দিনের মধ্যেই এই সেবা হইয়া থাকে। গোয়ালে অন্য গাই গাভীন৪ থাকিলে, তাহার বাছুর না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় এবং পরে সব কয়টির মঙ্গলার্থ 'সেবা' একসঙ্গে হয়। ইহা হয়তো ব্যয়-সংক্ষেপ করিবার জন্যই,—কেন না সকলে এই আপেক্ষিক নিয়ম মানেন না। যে কোনও মাসের রবি কিংবা বৃহস্পতিবার রাত্রিতে গোশালার সম্মুখে, কি তুলসীতলায়, কি উঠানে গোরক্ষনাথের সেবা হইয়া থাকে। কিন্তু উত্তর-ময়মনসিংহে এবং বাংলার অন্য কোন কোন স্থানে শুধু বৈশাখ মাসেই এই অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায়। পুরুষ বিশেষতঃ বালকেরা ইহাতে প্রধান অংশ গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কোনও প্রয়োজন হয় না, যিনি মন্ত্রপাঠ করেন (রানা গায়ক) তিনিই পুরোহিত। খৈ, দৈ, নাড়ু, পানসুপারি সেবার প্রধান উপকরণ। একটি নূতন পাতিলে৫ কয়েক দিনের দুধ (কাঁচা) ঢালিয়া দৈ করা হয় এবং যেদিন 'সেবা', সেই দিনের দুধ দিয়া নাড়ু করা হয়। যেখানে সেবা হইবে, সেখানে একটি মাটির বেদী বাঁধিয়া তাহাতে পাঁচটি, সাতটি কি নয়টি ইকর৬ ও রাখালের পাঁচনবাড়ি পুঁতিয়া দেওয়া হয়। ইকরের পাতাগুলি দুই-তিন জনে মিলিয়া দুই-তিন ভাগে বেণীর মতো করিয়া বাঁধিয়া দেয়; ইহাকে 'গাই বান্ধা' বলে। প্রসাদ গ্রহণের শেষে মন্ত্র পড়িয়া আবার এগুলি খুলিয়া দিতে হয়, নতুবা গাই বাঁঝা (বান্ঝা) থাকে, এইরূপ বিশ্বাস। কলার আগপাতায় 'গুরুথ ঠাকুরের' উদ্দেশে খৈ, দৈ ও নাড়ুর ভোগ বেদীর সম্মুখে রাখা হয়। সেবার শেষে এই ভোগ প্রসাদরূপে রাখালেই মাত্র পাইয়া থাকে; রাখাল না থাকিলে সকলে বাঁটিয়া খায়। নিমন্ত্রিতের সংখ্যানুযায়ী ঐ সকল উপকরণের পৃথক বেশ বরাদ্দ থাকে।

গোরক্ষ-সেবায় দেবতার কোনও মূর্ত্তি স্থাপন করা হয় না। ধূপ, দীপ, পান-সুপারি, জলঘট যথারীতি দেওয়া হইলে বালকেরা বেদীর চার দিক্ ঘেরিয়া হাত-ধরাধরি করিয়া দাঁড়ায় এবং মন্ত্রপাঠক (রানা গায়ক) মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করেন, তিনিও বালকদের সঙ্গেই দাঁড়ান।

কোথাও কোথাও (যেমন পশ্চিম-ময়মনসিংহে) মাটির বেদী বাঁধার এবং ইকর দিবার প্রচলন নাই। সে সব স্থানে মাঠ হইতে পাঁচ-সাতটি মাটির শুক্‌না ঢেলা আনিয়া একটি স্তূপের মতো করা হয় এবং তাহাতে বরই৭ গাছের একটি ডাল ও বিন্না৮ গাছ পুঁতিয়া দেওয়া হয়। ইকর না দেওয়ায় 'গাইবান্ধা'র কোন প্রশ্ন সেখানে উঠে না, কিন্তু তৎসম্পর্কীয় মন্ত্রটি বলা হয়।

বিক্রমপুরের মিস্ত্রি সম্প্রদায়ের মধ্যে উপরি-উক্ত ইকর বা বরই ও বিন্না গাছ পুঁতিবার দুইটি নিয়মের কোনটিই নাই। সেখানে খৈ, দৈ, নাড়ুর দুইটি ভোগ (একটি রাখালের ও একটি গোরক্ষনাথের) এবং জলচৌকী কি পিঁড়ির উপর দেবতার একটি আসন ও জলঘট মাত্র দেওয়া হয়। আর বালকেরা ময়মনসিংহের ন্যায় বৃত্তাকারে না দাঁড়াইয়া আসন ও ভোগের এক পার্শ্বে সারি দিয়া দাঁড়ায় এবং মন্ত্রপাঠক (ভাট বামুন) তাহাদের সাম্‌না-সামনি অপর পার্শ্বে একটি পাঁচনবাড়ি হাতে দাঁড়ান।

ময়মনসিংহের কোথাও কোথাও গোরক্ষনাথের মন্ত্র, ছড়া বা পাঁচালিকে 'রানা' এবং যাঁহারা ইহা বলেন বা পাঠ করেন তাঁহাদিগকে 'রানাগায়ক' বলা হয়; বিক্রমপুরে এই 'রানাগায়ক' 'ভাট বামুন' নামে পরিচিত। অন্য পূজা বা ব্রতের ব্রতকথা, পাঁচালী প্রভৃতি যেমন এক জনে বসিয়া আগাগোড়া বলিয়া বা পাঠ করিয়া যায়, আর উপস্থিত সকলে নীরবে নিবিষ্টচিত্তে শুনে, গোরক্ষনাথের পাঁচালী, ছড়া বা রানা সে ভাবে বলা কি পাঠ করা এবং শুনা হয় না। গোরক্ষনাথের সেবায় মন্ত্রপাঠক (রানাগায়ক, ভাট বামুন) মন্ত্রের বা ছড়ার এক এক চরণ উচ্চারণ করিয়া থামেন, আর সমস্ত বালক একসঙ্গে "হাচ্চো" বা "হাচ্চো হাচ্চো" বলিয়া উঠে। এই শব্দটি নানা স্থানে বিভিন্নরূপে উচ্চারিত হয়,—'হাচ্চই', 'হাচ্চইল', 'হাস্তো'। কোথাও এইগুলির পরিবর্ত্তে বালকেরা "হো হো" করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সাড়া দেয়। গোরক্ষনাথের পাঁচালিতে বা ছড়ায় প্রধান কয়েকটি পরিচ্ছেদ আছে। ইহাদের এক একটি শেষ করিয়া 'রানা-গায়ক' বলেন 'খুব' বা 'খুব খুব'। বালকেরাও তখন আর

৪ গর্ভিণী। ৫ হাঁড়ি-বিশেষ।

৬ বাতা; কাশ জাতীয় দীর্ঘ তৃণ-বিশেষ। ৭ কুলগাছ। ৮ ছোন জাতীয় শক্ত ঘাস।

কিছু না বলিয়া ঐ কথাই প্রতিধ্বনি করে। বিক্রমপুর অঞ্চলে 'থুব'র স্থানে এবং পাঁচালি আরম্ভ করিবার কালেও 'বল রে ভাই শ্যামসুমার' বলা হয়। 'হাচ্চো', 'থুব', 'শ্যামসুমার' প্রভৃতি কথার তাৎপর্য কি কাহারও জানা নাই। পাঁচালির মধ্যে আমরা এইরূপ আরও অনেক শব্দ কি উক্তি পাইব, যাহার প্রকৃত অর্থ বক্তা বা শ্রোতা কেহই বলিতে পারে না; দেবতার কথা বলিয়া কেহ বাদ দিতেও সাহসী হয় না; হয়তো সেগুলি প্রথমে সহজবোধ্যই ছিল, ক্রমে লোকের মুখে মুখে বিকৃত ও দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রবন্ধে প্রথমে ময়মনসিংহের এবং পরে বিক্রমপুরের গোরক্ষনাথের সেবার প্রায় সম্পূর্ণ মন্ত্র বা পাঁচালি উদ্ধৃত হইল। এই উদ্ধারকার্য্যে বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন লোকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কারণ মন্ত্রের সবখানি জানেন, এরূপ লোক খুব কম পাওয়া যায়; যিনি যতখানি জানেন ততখানি বলিয়াই 'সেবা' উদ্‌যাপন করেন। মন্ত্রের কোনও উক্তির পর কোনও সংখ্যা এবং 'ক' বা (ক) থাকিলে বুঝিতে হইবে পাদটীকায় কথান্তর দেওয়া হইয়াছে।

গোরক্ষনাথের সেবার মন্ত্র বা পাঁচালি

(ময়মনসিংহ)

রানা-গায়ক। গোরক্ষনাথ দেবাদি শুন দিয়া মন,—বালকগণ সমস্বরে
(মন্ত্রপাঠক)   হাচ্চো ১(ক)

প্রথমে বন্দিয়া গাবর২(ক) সৃষ্টি পত্তন— „
অনাক্ষেতে৩ জন্মিলেন অনাদ্য পুরুষ „
তৎপর জন্মিলেন চান৪ আর সুরুজ৫ „
তৎপর জন্মিল জল আর আগ্ন „
তৎক্ষণাৎ হইল পৃথ্বীর পরশর৬(ক) খানি „
তৎপর জন্মিলেন ভোলা মহেশ্বর „
ধেনু করে সৃজিলেন বিষ্ণু দেববর „
বিষ্ণুর পাঞ্জর ধেনু রাখতে রাখাল নাই৭ক „
ডাক দিয়া বলিলেন গোরক্ষের ঠাই৮ „
গোরক্ষনাথ আসিলেন ধেনু রাখিবারে „
কি মতে রাখিব ধেনু বুদ্ধি বল মোরে৯ক „
সোনার যষ্ঠি পাইল, পাইল সোনার টুপি „
ধলছত্র ঘোড়া পাইল ঠাকুর গোপী১০ক „

১(ক) 'হাচ্চই', 'হাচ্চইল', 'হো হো।' কোথাও 'হাচ্চো হাচ্চো', 'হাচ্চই হাচ্চই', 'হাচ্চইল হাচ্চইল'।

২(ক) 'বন্দুম্'।

৩ গর্ভজাত নহে; যাহা আপনা হইতে জন্মিয়াছে।

৪ চাঁদ, ৫ সূর্য্য, ৬(ক) 'পরশ' —পরশর= প্রসার (?)

৭(ক) 'ধেনু সৃজিয়া দেখেন রাখাল কেহ নাই।' ৮ ঠাঁই; স্থানে।

৯(ক) 'জিজ্ঞাসা করে'

১০ক 'রূপার পাঞ্জুরী পাইলেন, সোনার পাইলেন টোপ,
দলছত্র ঘোড়া পাইলেন ঠাকুর গুরুথ।'

সাত দিন সাত রাইৎ১১ খাওয়াইলেন ঘাসপানি হাচ্চো
ঘরে আনিতে ধরিল ছুতিপাত খানি১২ „
রাগ করিয়া গোরক্ষনাথ মারিলেন এক ইটা১৩ক „
আধ পেট১৪ক ভরুক তর আধ পেট শুটা১৫ „
ডাক দিয়া বলিলেন ছয়ত্রিশ জাইতের১৬ ঠাই „
ছয়ত্রিশ জাইত নারে ছয়ত্রিশ রাখাল „
তারা যায় ধেনু রাখিবারে— „
কি মতে রাখিব ধেনু বুদ্ধি জিজ্ঞাসা করে, „
চৈতে খরাণ,১৭ আষাঢ়েতে ঢল১৮ „
কি মতে বঞ্চিব১৯ মোরা রাখাল সকল „
বাঁশের পাঞ্জুরী২০ পাইল, নলের পাইল মাৎলা২১ „
উলির২২ পাইল তুপা২৩ „
ধলছত্র২৪ক ঘোড়া পাইল, রাখাল হইল শোভা „
থুব থুব

মন্ত্রের এই অংশে গোরক্ষনাথ-প্রমুখ দেবতাকে বন্দনা করিয়া সৃষ্টি-তত্ত্ব, বিষ্ণু কর্ত্তৃক গোরক্ষনাথকে গোরুর প্রথম রাখালরূপে নিয়োগ, গোরক্ষনাথের গোচারণ এবং গোরুর প্রতি তাঁহার ক্রোধ ও অভিশাপ, তৎকর্ত্তৃক ছয়ত্রিশ জাতির রাখালের উপর গোচারণের ভার অর্পণ—এই কয়টি বিষয় বলা হইয়াছে।

রানাগায়ক। রাখালে রাখালে পিক২৫ পারি তুলিল মাটি—
বালকগণ। হাচ্চো

তাতে বসাইল গোয়ালহাটি২৬ „
'শুন রে ভাই গোয়াল আমার বচন „
আমার গুরুথের যোগাবে২৭ দধি আর মাখন' „
'তোমার গুরুথ কেমনে চিনি?' „
'হাতে লাঠি, মাথে টুপি২৮(ক) „
সেই সে আমার ঠাকুর গোপী।'২৯ক „
বুড়৩০ দিয়া তুলিল মাটি „
তাতে পাইল লুয়াই হাটি „
লুয়াই৩১ বলে 'ধর্ম্মের ভাই, „
আমার গুরুথের দৈ যোগাই' „
বুড় দিয়া তুলিল মাটি, „
তাতে পাইল বারই হাটি; „

১১ রাত্রি। ১২ এঁঠো পাতাখানি।

১৩ক 'লাথি গোটা'—পুরাদস্তুর এক লাথি। ইটা= মাটির ঢেলা, ঢিল।

১৪ক 'এক পেট'। ১৫ খালি, উনা। ১৬ জাতির।

১৭ রৌদ্রের প্রখর উত্তাপ; অনাবৃষ্টিজনিত শুষ্কতা। ১৮ প্রবল বৃষ্টিধারা। ১৯ দিন অতিবাহিত করিব। ২০ পাচনবাড়ি। ২১ বাঁশের শলা এবং পাতার ছাউনি দিয়া তৈয়ারী ছাতা-বিশেষ; কথান্তর—'পাতলা।' ২২ উলু। ২৩ স্তূপ। ২৪ক দলছত্র' (?) ২৫ সুর তুলিয়া সমস্বরে চীৎকার। ২৬ গোয়ালাদের বাসস্থান (?) হাটি—বাসস্থান (?) আড্ডাস্থান (?) ২৭ সরবরাহ করিবে। ২৮(ক) 'টোপ'—টোপর। ২৯(ক) 'ঠাকুর গুরুথ'। ৩০ ডুব। ৩১ দৈ ব্যবসায়ী।

বারুই৩২ বলে 'ধর্ম্মের ভাই,	হাচ্চো
আমার গুরখের পান যোগাই।'	"
বুড় দিয়া তুলিল মাটি,	"
তাতে পাইল গাছল হাটি;	"
গাছল৩৩ বলে, 'ধর্ম্মের ভাই,	"
আমার গুরখের সুপারি যোগাই।'	"
বুড় দিয়া তুলিল মাটি,	"
তাতে পাইল পাল হাটি;	"
পাল বলে, 'ধর্ম্মের ভাই,	"
আমার গুরখের চিনি যোগাই'	"
বুড় দিয়া তুলিল মাটি,	"
তাতে পাইল কুমার হাটি;	"
কুমার বলে, 'ধর্ম্মের ভাই,	"
আমার গুরখের পাতিল যোগাই।'	"
থুব	থুব।

উপরি-উক্ত অংশে দেখা যায়, রাখালেরা দল বাঁধিয়া জলে নামিয়াছে, চীৎকার করিতেছে, ডুব দিতেছে আর মাটি তুলিতেছে। সেই মাটিতে গোয়ালা, লুয়াই, বারুই, গাছল, পাল, কুমার প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বাসস্থান; রাখালেরা ইহাদের নিকট গোরক্ষনাথের স্বরূপ বর্ণনা করিল এবং তাঁহার সেবার জন্য এক এক সম্প্রদায়কে এক একটি উপকরণ—দৈ, খৈ, পান, সুপারি, চিনি, পাতিল—সরবরাহ করিতে নির্দ্দেশ দিল। সকলে সেই নির্দ্দেশ মানিয়া গোরক্ষনাথের সেবার উপকরণ সকল যোগাইল।

রানাগায়ক।	কাল বাজলী লাল ধবলী,— বালকগণ।	হাচ্চো
	ঘাস খায় পানি খায়	"
	আইল-বাতর৩৪ জুড়িয়া যায়	"
	আইল-বাতর জুড়িয়া মহাদেব পূজিয়া	"
	মহাদেব দেবের কড়ি নন বুড়ি ৩৫	"
	গাই কিনিয়া আনিলাম কপিলা করি৩৬	"
	গাইয়ের নাম কবুলেশ্বরী৩৭	"
	দুধ দেয় আঠার পসারি৩৮	"
	রাজায় খায়, প্রজায় খায়	"
	আরো দুধে গড়াগড়ি যায়	"
	দীঘাইল৩৯ নদীর পাথাইল ৪০খেওয়া	"
	বৎসরে বৎসরে গুরখের সেবা	"
	রানা৪১ গাইলাম, পানচুন খাইলাম	"
	রাখালে রাখালে বাঁটিয়া খাইলাম	"
	না হইল পানে, না হইল চুনে	হাচ্চো
	রানা গাইলাম গুরখের পুণ্যে৪২	"
	থুব।	থুব।

উপরে গৃহস্থের বিভিন্ন গাভীর কান্তিপুষ্টি, দুধের বৃদ্ধি প্রভৃতি কামনা করা হইয়াছে। মহাদেবকে পূজা করিয়া মহাদেবেরই ন বুড়ি কড়ি দিয়া কপিলা গাভী কিনিয়া আনা হইয়াছে;—ইহার নাম কবুলেশ্বরী (কপিলেশ্বরী), অর্থাৎ কপিলা গাভীদের মধ্যে ইহাই সর্ব্বোত্তম; ইহা আঠার পসুরি দুধ দেয়। মহাদেবের কৃপায় এবং তাঁহার অর্থে প্রাপ্ত কোন গাভীর যেমন রোগবিঘ্ন থাকিতে পারে না, গৃহস্থের গাভীটিও তেমনি চিরদিন সুস্থকায় থাকুক এবং কপিলেশ্বরী হউক—এখানে পরোক্ষভাবে ইহাই যেন প্রার্থনা করা হইতেছে।

রানাগায়ক।	থুব রানা থুব বাজে,— বালকগণ।	হাচ্চো
	কাইচ কড়িটি৪৩ ঝুমুর বাজে	"
	বাজে ঝুমুর বাজে তাল	"
	আমার গুরুখ জগৎমাল	"
	জগৎমাল নিমি ঝিমি৪৪	"
	সোনার. বাঙ্কুম৪৫(ক) পাঁচ টিমি৪৬(ক)	"
	ও পড়ায় ডাক গুয়া৪৭	"
	আমার গুরখে খায় গুয়া	"
	গুয়া খাওয়া বড় গুণ	"
	পান্তা ভাতে ঢাল লুণ	"
	পান্তা ভাতে ছল্ ছলায়৪৮	"
	আমার গুরখে খেইল খেলায়	"
	খেইল খেলাইতে লাগ্‌লো জোর	"
	কে কে যাইবা বিক্রমপুর৪৯(ক)	"
	বিক্রমপুরিয়া৫০ কালাপানি৫১	"
	বাপ থইয়া তার পুত হানি৫২	"
	বাপ মরিল তার আলে ঝালে	"
	পুত মরিল তার মরিচের ঝালে	"
	মরিচ৫৩ গাছটি আউল ঝাউল৫৪	"
	তার মধ্যে গুরুখ বাউল৫৫(ক)	"
	গোরক্ষ বাড়ী বাদ্যি৫৬ বাজে	"
	তা শুনিয়া হাসায়৫৭ সাজে	"
	ও হাসা বড় মনিষা৫৮	"
	ভাই ছিল তর৫৯ দেড় মনিষা	"

৩২। বারুই।

৩৩। যাহারা বৃক্ষাদি হইতে ফল পাড়িয়া জীবিকার্জ্জন করে।

৩৪। আইল এবং বাতর একার্থ বোধক। ৩৫। পাঁচ গণ্ডায় এক বুড়ি। নন বুড়ি—নয় বুড়ি (?)। ৩৬। কামধেনু জাতীয়া।

৩৭ কপিলা + ঈশ্বরী অপভ্রংশে কবুলেশ্বরী। ৩৮ পসুরি। ৩৯ দীর্ঘ। ৪০ পাশাপাশি। ৪১ গোরক্ষনাথের মন্ত্র বা পাঁচালিকে 'রানা' বলা হয়।

৪২ গোরক্ষনাথের অনুগ্রহে। ৪৩ কাঁচ কড়ি। ৪৪ নিস্তেজ, দুর্ব্বল। ৪৫(ক) 'বাঙ্কিমু'। ৪৬(ক) 'পাঁচ টিমি' (?)। ৪৭ (?)। ৪৮ পান্তা ভাত বাড়িতে হাঁড়ির জলে ছল-ছল শব্দ করে।

৪৯(ক) 'আর যাইব না বিক্রমপুর।' ৫০ বিক্রমপুরের। ৫১ সাগর। ৫২ নাশ; পিতার পূর্ব্বে পুত্রের মৃত্যু—এইরূপ অর্থবোধক।

৫৩ লঙ্কাগাছ। ৫৪ এলোমেলো। ৫৫(ক) 'গুরুখ মাউল'; মনে হয় 'মাউল' শব্দটি মালের অপভ্রংশ। ৫৬ বাদ্য: ৫৭ হয়তো কোন লোকের নাম? ৫৮ বড় পণ্ডিত (?)। ৫৯ তোর।

ভাই মরিয়া আছ সুখে — হাচ্চো
আর যাইও না দক্ষিণ মুখে „
দক্ষিণ মুখ পাইকপাড়া „
তিন শত আঠার ঘোড়া „
ঘোড়ায় ঘোড়ায় জুড়িয়া রইছে „
বারিয়া৬০ বলদ ছিড়িয়া রইছে৬১ „
বারিয়া বলদ পিতলের কাটি „
বিয়া করলাম মাধবের বেটি৬২(ক) „
মাধব বর দেও „
সোনার লাঙ্গল জুড়িয়া দেও „
সোনার লাঙ্গল রূপার ফাল „
ঘর জামাইয়ে জুড়ছে হাল „
হাল চায হইলে পরে „
গোরু রাখিয়া দিল গোয়াল ঘরে „
কাটিয়া আন মানের পাত „
বাড়িয়া লও আম্বল ভাত৬৩(ক) „
আম্বল ভাত আলুনি „
সতাই গো সতাই একটু লুণ „
সতাইয়ে না দিলো লুণ „
সতাইর বাপের মুখ'৬৪ কালি আর চুণ „
থুবু। থুবু।

মন্ত্র বা পাঁচালির এই অংশটি অনেকখানি ছড়াধর্মী। ইহার মধ্যে ভাবের পরস্পর সম্বন্ধ নাই, আছে কেবলই এক প্রসঙ্গ হইতে অকস্মাৎ অন্য প্রসঙ্গে যাত্রা, গোরক্ষনাথের সেবায় এ যাত্রা অনেক সময়ই অর্থহীন মনে হয়।

প্রথমে দেখিতে পাই, গোরক্ষনাথ বাঁচ কড়ি পায় দিয়া ঝুমুরের তালে নাচিতেছেন, তাঁহার ভক্তেরা চার দিকে বসিয়া তাঁহাকে 'জগৎমাল' বলিয়া বাহাবা দিতেছে; কিন্তু তিনি যেন একটু নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন, তাই কেহ সোনার পাঁচটি টিমি বা ঢিমি বাঁধিয়া দিয়া তাঁহার শক্তি এবং সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া দিবে বলিতেছে। হঠাৎ ও-পাড়ার কি এক 'ডাক গুয়া'র কথা আসিয়া পড়িল, আর গোরক্ষনাথ সুপারি (গুয়া) খাইতে আরম্ভ করিলেন। সুপারি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নাচের মজলিস পরিত্যাগ করিয়া একেবারে গৃহস্থের রান্নাঘরে ঢুকিলেন,—হয়তো নুণ দিয়া পান্তা খাইবেন; পান্তা ভাত বাড়া হইতেছে, হাঁড়ি হইতে জলের বেশ একটা ছল্ ছল্ শব্দ উঠিতেছে, তাহা শুনিয়া গোরক্ষনাথের আনন্দ-উল্লাসের সীমা নাই। অকস্মাৎ এই দৃশ্য আচ্ছন্ন করিয়া বক্তার মানস-পটে বিক্রমপুর এবং বিক্রমপুরের 'কালাপানি' আসিয়া উপস্থিত হইল, সেখানকার কোন পিতাপুত্রের শোচনীয় মৃত্যুর কথাও মনে পড়িল; পুত্রটি মরিল আগে, পিতা মরিলেন পাছে,—তাহার শোকে। 'কালাপানি'র বালুচরে সতেজ মরিচের বাগান, হঠাৎ দেখা গেল, কোথা হইতে 'গুরুথ বাউল' আসিয়া সেই বাগানে বসিয়া আছেন! ওদিকে গোরক্ষবাড়ীতে ঢাক-ঢোল বাজিতেছে। কিসের এ-বাজনা, বলা হয় নাই। সেই বাজনা শুনিয়া 'হাসা' সাজগোজ করিতেছে। এজন্য কেহ তাহাকে গালি দিয়া উঠিল—ভাই মরিয়া সে কি সুখে আছে যে এত আনন্দ? দক্ষিণ দিকে পাইকপাড়ায় যাইতে তাহাকে স্পষ্টই বারণ করিয়া দেওয়া হইল; সেখানে গোরু-ঘোড়ার ছড়াছড়ি। কোন কথাবার্ত্তা নাই, আয়োজন উদ্যোগেরও কিছু দেখা যাইতেছে না; বক্তা অকস্মাৎ মহাদেবের বা মাধবের বেটাকে (মেয়েকে) বিবাহ করিয়া একেবারে ঘরজামাই হইয়া বসিলেন। মাধবের বেটা (ছেলে) জয়দেব সোনার লাঙ্গল গড়িয়া বা জুড়িয়া দিল, ক্ষেত চাষ হইল। 'ঘর-জামাই' তখন গোয়াল ঘরে গোরু বাঁধিয়া হাত-পা ধুইয়া খাইতে আসিল। ঘরজামাইয়ের তো আর তত আদর নাই—তাই হুকুম হইল—'আম্বল ভাত বাড়িয়া লও বা ঢালিয়া লও।' জামাই অগত্যা তাহাই করিল. কিন্তু গ্রাস মুখে দিয়া দেখে—তাহা আলুনি! ঘরে সৎমা বা সৎ-শাশুড়ী, লবণ তিনি চাওয়া সত্ত্বেও দিলেন না। ভোক্তা ক্রোধে ক্ষোভে এমন সৎমায়ের বাপের মুখ উদ্দেশ করিয়া যে চুণ-কালি ছড়াইয়া দিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কে জানে এই কথাগুলির মধ্যে কত কালের কত বিস্মৃত ইতিহাসের টুকরা ধরা পড়িয়াছে এবং নিতান্ত অসহায় ভাবে আত্মরক্ষা করিতেছে!

বানাগায়ক। হর-গৌরী, হর-গৌরী মোর কথা শুন, ৬৫ক —হাচ্চো
প্রথম বৈশাখে নালিতা বুন৬৬ „
নালিতা বুনিলে হইবো৬৭ বড় „
নিড়ানি৬৮ দিয়া ভাঙ্গিবাম জড়৬৯ „
আগ কাটিবাম, গোড়৭০ কাটিবাম „
মধ্যখানি সায়র৭১ ভাসাইবাম „
সায়র ভাসাইলে হইবো কুইয়া৭২ „
তারপর৭৩(ক) লইবাম ধইয়া „
ধইয়া লইয়া দিবাম রৈদ'৭৪ „
পাট হইবো মুড়া চৈদ্দ৭৫(ক) „
পাট বলে, মুই৭৬ বড় বীর „
হাতী বান্ধিলে হাতী স্থির „

---

৬০ যে গোরুর লেজ ছোট। ৬১ দড়ি ছিঁড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে।

৬২(ক) 'আইলাগো মাধবের বেটি
মাধবের বেটা জয়দেব
সোনার লাঙ্গল গড়িয়া দেও'

কথান্তর—'বিয়া করলাম মহাদেবের বেটী
মহাদেব বর দেও
সোনার লাঙ্গল জুড়িয়া দেও'

৬৩(ক) 'হাল চয় না ফাল চয়,
বাড়ীর পাছে পাও হাত ধয়
বাড়ীর পাছে মানের পাত
ঢালিয়া লও আম্বল ভাত'।

এখানে 'চয়' অর্থ চাষ করে। ধয়—ধৌত করে। ৬৪ মুখে।

৬৫ক 'মাগী বলে, মিনসে মোর কথা শুন।' ৬৬ বপন কর। ৬৭ হইবে। ৬৮ নিড়ানের যন্ত্র। ৬৯ ঘন গাছগুলি ফাঁক ফাঁক করিয়া দিব। ৭০ গোড়া ৭১ সাগর; সাগরের মতো বৃহৎ জলাশয়। ৭২ পচা। ৭৩(ক) 'ছায়পোয়ায়'। ৭৪ রৌদ্রে। ৭৫(ক) 'মণ চৌদ্দ'; মুড়া—মুচড়াইয়া বাঁধা পাটের ছোট বাণ্ডিল। ৭৬ আমি। 'মুই' কথাটি লক্ষ্য করিবার, কারণ এই কথাটির প্রচলন ময়মনসিংহে নাই।

পাট বলে, মুই বড় বীর	হাচ্চো
ঘোড়া বান্ধিলে ঘোড়া স্থির	"
পাট বলে, মুই বড় বীর	"
গোরু বান্ধিলে গোরু স্থির	"
পাট বলে, মুই বড় বীর	"
যত জীবজন্তু বান্ধি সবই স্থির	"
থুব।	থুব।

আপাত-দৃষ্টিতে গোরক্ষনাথের সেবার মন্ত্রে পাটের এই বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। গোরক্ষনাথ গরুর দেবতা এবং গোরুর সাহায্যেই চাষ আবাদ হয়, পাট ধান ইত্যাদি জন্মে। তাই হয়তো পাটের প্রসঙ্গ যোগ করা হইয়াছে। পাটের চাষ, বীজ বপন প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বিবিধ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া তাহার উৎপাদন ও আহরণ এবং পরিশেষে কার্য্যে প্রয়োগ,—সমস্ত বিষয় এখানে এবং বিক্রমপুরের সঙ্কলিত মন্ত্রে অতি সহজ ভাবে এবং সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। বর্ত্তমানে দেশ-বিদেশে পাটের চাহিদা ও প্রয়োজনের সীমা নাই। কিন্তু এই মন্ত্র দেখিতেছি তখন কেবল গোরু ঘোড়া হাতী এবং অন্য জীবজন্তু বাঁধিবার কাজেই পাট ব্যবহৃত হইত, এবং লোকেও পাট-চাষ কম করিত।

রানাগায়ক। গোরক্ষনাথ গেল বানিয়া বাড়ী৭৭, বালকগণ।	হাচ্চো
গড়িয়া আনল সোনার দড়ি,	"
সোনার দড়ি পরিল গুণে৭৮,	"
গোরু ছাড়িয়া দিলাম গুরথের পুণ্যে৭৯,	"
থুব।	থুব
ধান কাটিয়া করিলাম নাড়া৮০	হাচ্চো
গোরু ছাড়িলাম পূর্ব্ব পাড়া ;	"
ধান কাটিয়া করিলাম নাড়া	"
গোরু ছাড়িলাম উত্তর পাড়া ;	"
ধান কাটিয়া করিলাম নাড়া	"
গোরু ছাড়িলাম পশ্চিম পাড়া ;	"
ধান কাটিয়া করিলাম নাড়া	"
গোরু ছাড়িলাম দক্ষিণ পাড়া ;	"
ধান কাটিয়া করিলাম নাড়া	"
যত জীবজন্তু সবই ছাড়া।	"
থুব।	থুব।

যে সকল স্থানে গোরক্ষনাথের সেবায় 'ইকর' বা 'বাতা' গাছ পুঁতিয়া, তাহাদের পাতাগুলি বেণীর মতো করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয় (যাহাকে 'গাইবান্ধা' অনুষ্ঠান বলে), সে সকল স্থানে গোরু ছাড়িবার এইরূপ মন্ত্র এখানে না বলিয়া প্রসাদ গ্রহণের পর সেই বাঁধ খুলিবার সময় বলা হয়। কিন্তু যাঁহারা 'ইকর' বা বাতা' না দিয়া 'বরই'এর ডাল ও 'বিন্না' গাছ দেন, তাঁহাদিগকে গোরু ছাড়িবার প্রত্যক্ষ কোন অনুষ্ঠান করিতে হয় না, তবু তাঁহারা তৎসম্পর্কীয় মন্ত্রগুলি বলেন এবং তাহা প্রসাদ গ্রহণের পূর্ব্বেই অন্যান্য মন্ত্রের সঙ্গে একবারে বলিয়া ফেলেন।

সাধারণ মানুষ পাটের দড়ি দিয়াই গোরু বাছুর বাঁধে; কিন্তু গোরক্ষনাথ দেবতা, তাই তিনি সেকরার বাড়ী হইতে সোনার দড়ি তৈয়ার করিয়া আনিয়াছেন। 'সোনার দড়ি পরিল গুণে'— উক্তিটির অর্থ বুঝা যাইতেছে না।

ধানের ফসল যখন উঠিয়া যায় এবং মাঠে মাঠে কেবল 'নাড়া' পড়িয়া থাকে, তখন গৃহস্থেরা গোরুগুলিকে কিছু দিনের জন্য ছাড়িয়া দেয় এবং তাহারা ইচ্ছামত এখানে-সেখানে চরিয়া খাইবার সুযোগ পায়। উপরি-উক্ত মন্ত্রটিতে তাহারই যেন ছায়া পড়িয়াছে।

রানাগায়ক। আসিলেন গোরক্ষনাথ বসিলেন খাটে, বালকগণ।	হাচ্চো
হাতে হাতে প্রসাদ বাঁটে	"
থুব থুব।	থুব থুব।

অতঃপর সকলে গিয়া বসে এবং দুধের নাড়ু, খৈ, দৈ, চিনি প্রসাদ-স্বরূপ সকলকে দেওয়া হয়। কোথাও খৈ, দৈ, চিনি একত্রে মাখিয়া প্রসাদ করা হয়, কোথাও ঐ সকল উপকরণ পৃথক্ পৃথক্ থাকে।

প্রসাদ গ্রহণের পর যে সব অঞ্চলে (এ বিষয়ে পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে) 'গাই ছাড়া' ও 'পাতিল ভাঙ্গা' অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, সে সব স্থানে রানাগায়ক দধির শূন্য ভাণ্ডটি হাতে লইয়া আবার সকলের সহিত বৃত্তাকারে দাঁড়ান এবং 'গাই ছাড়া'-বিষয়ক মন্ত্রের এক এক চরণ বলেন, আর সকলে 'হাচ্চো' 'হাচ্চো' করে। এই সময়ে ইকরের পাতার গিঁটগুলি খুলিয়া দেওয়া হয়।

রানাগায়ক। গাঙ্গের পারে পারে ফিরেরে টিয়া, বালকগণ।	হাচ্চো
সোনার মুকুট মাথাৎ৮১ দিয়া,	"
সোনার মুকুট বিন্ধিল গুণে,	"
গাই ছাড়লাম গুরথের পুণ্যে।	"
থুব	থুব
গাঙ্গের পারে পারে ফিরেরে টিয়া,	হাচ্চো
সোনার মুকুট মাথাৎ দিয়া,—	"
সোনার মুকুট বিন্ধিল গুণে	"
পাতিল ভাঙলাম গুরথের পুণ্যে	"
থুব থুব	থুব থুব।

এই মন্ত্র কয়টি তিনবার বলার সঙ্গে সঙ্গেই পাতিলটি আছাড় দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় এবং ভগ্ন টুকরাগুলি সকলে কাড়াকাড়ি করিয়া কুড়াইয়া লয় ও এদিকে ওদিকে সজোরে ঢিল ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে বাড়ী চলিয়া যায়। এইরূপে গোরক্ষনাথের সেবা শেষ হয়।

যেখানে এই 'গাই ছাড়া' ও 'পাতিল ভাঙ্গা' অনুষ্ঠানের প্রচলন নাই, সেখানে প্রসাদ খাওয়ার পর গোরক্ষনাথের বেদীর শুকনা মাটির ঢেলাগুলি লইয়া ঢিল ছোড়াছুড়ি হয় এবং উল্লাস-ধ্বনি করিতে করিতে সকলে বাড়ী চলিয়া যায়। [ক্রমশঃ

অথচ মন্ত্রে বরাবর বলা হইয়া থাকে। ৭৭ সেক্‌রার বাড়ী; বানিয়া—সেকরা। ৭৮ গুণে (?)। ৭৯ গোরক্ষনাথের সেবা করিয়া যে পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছি তাহারই উপর ভরসা করিয়া—এইরূপ ভাব।

৮০ ধান পাকিলে কোথাও কোথাও এবং কখনো কখনো ধান গাছের একেবারে গোড়ায় না কাটিয়া মাঝামাঝি কাটা হয়, এই কাটার নীচের অংশকে 'নাড়া' বা 'ডেঙ্গা' এবং উপরের অংশকে ধান ছাড়াইয়া লওয়ার পর 'খেড়' বলা হয়। ৮১ মাথায়।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

দাও সাকী পেয়ালায়

ওমর-খৈয়াম

দাও সাকী পেয়ালায় !
অবসাদ কেন ভাবি—"সময় যে যায়" ।
"আগামী"—সে অনাগত
"বিগত"—হয়েছে গত
আনন্দ লও খুঁজি আজি মদিরায় ।
এই পিয়ালায় !

নদী-কিনারায়

ওমর খৈয়াম

গোলাপ যখন কাঁপে
নদী-কিনারায়,
এই পেয়ালায়
মন ছুটে যায় ।
দেবদূত সাকী হাতে
ডাকে ইশারায়,—
"নদী-কিনারায়
আয় চলে আয় !"
তখন তাহারে তুমি
দিয়ো না বিদায় ।

অনুবাদক—রাধারাণী দাশগুপ্তা



[শিল্পী—সিদ্ধেশ্বর মিত্র

মা আনন্দময়ী

অভয়

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী তাঁর অদ্ভুত জীবন নিয়ে আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমাদের এই ধূলি-মলিন দুনিয়ায় এমন একটি মানুষ যে দেখা দিতে পারে, এমন একটি চরিত্র যে আত্ম-প্রকাশ করতে পারে ভাবলে আশ্চর্য জাগে। এই হাজারো সংঘাতের, অন্তহীন অশান্তির মধ্য দিয়েই মায়ের জীবন-লীলা আপন গতিতে চলেছে, অজস্র তরঙ্গে তরঙ্গায়িত অমৃত-স্রোতস্বিনীর মত। কত তার বিলাস, কত তার ছন্দ।

কিন্তু এ সবের মধ্যে মায়ের জীবন-ভোর একটি সুরই বাজছে। জীবকে তিনি ডাকছেন। ক্ষুদ্রতার ঘের ছেড়ে নিজের স্বরূপ বুঝে নেবার জন্যই এ মঙ্গলময় আহ্বান। সকলের সঙ্গে তাঁহার একটা চিরকালের নিঃসঙ্কোচ, অনাবিল সম্বন্ধ আছে তাঁর এ অলৌকিক জীবনে এ কথাটা বার বার ধ্বনিত হয়।

এ' দুনিয়ায় আছেন বটে, কিন্তু মায়ের ভিতরটায় এক সীমাহীন, অতীন্দ্রিয় বাস্তবতার রাজ্য। মায়ের জীবনের শুরু হ'তে গোটাকত কথা বলি। তাঁহার জন্ম হয় বাংলা দেশে ত্রিপুরা জেলার এক অখ্যাত-নামা গ্রামে। বাবা, মা খুবই গরীব ছিলেন। শিশুকালেই মা একটি আকর্ষণের বস্তু ছিলেন। মাকে লোকে ভালোবাসত।

একটি বিচিত্র কথা এই যে মা এখন যেমন অন্তরের স্থিতির দিক দিয়ে, তখনও তেমনই ছিলেন। এ কথা মা নিজেই প্রকাশ করেছেন। এখন যে বোধে অবস্থান করছেন তখনও সেই বোধেই। কিন্তু তখন মা গোপনে ছিলেন অথবা নিজকে গোপনে রাখতেন।

মা যখন বালিকা, অতীন্দ্রিয় কত ব্যাপার ঘটত কিন্তু মাকে প্রায় কেহ কিছু বুঝত না। তবে ব্যবহারে তাঁহার মধ্যে কেমন একটা অসাধারণতা পরিলক্ষিত হ'ত। কখনও একটা অন্যমনস্ক ভাব, কখনও কার সঙ্গে কথা বলছেন, কখনও হাসছেন অথচ নিকটে কেহ নেই। কিন্তু লোকে বলত ট্যালা, হাবা।

বিবাহের পর গৃহকর্মে মা আপনাকে সঁপে দিলেন। চার বছর ভাশুরের ঘরে কাটাতে হয়েছিল। স্বামীর রোজগার ছিল না। পরে স্বামীর কাছে আসেন। স্বামীর কাছে এসে স্বামি-সেবায় আপনাকে নিয়োগ করেন।

মায়ের চরিত্রে প্রতি গুণের আদর্শ পরিস্ফুট হয়েছে। তাই সেবার দিক দিয়েও, নিঃস্বার্থ কর্মের দিক দিয়েও মা নিখুঁত। নিজের সুখ-সুবিধা আরামের দিকে লক্ষ্য নেই, মা সেবা করে যেতেন।

স্বামীর কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে একটি অপূর্ব সাধন-জীবন গড়ে উঠল। সে এক অদ্ভুত ইতিহাস। প্রথমে ভগবানের নাম জপ শুরু করলেন। তার পরে কত অবস্থা একের পর এক এসেছে। কত ভাব-তরঙ্গ। ভিতরে বীজমন্ত্রের স্ফুরণ হ'ল। একের পর এক দেবতার পূজা চলল কয়েক মাস ধরে। সে সাধারণ পূজা নয়। বাইরের উপচার কিছু ছিল না। মা নিজের দেহে প্রথমে দেবতার পূজা করতেন। তার পরে দেবতার সে চেতনাময়ী মূর্তি বাইরে স্থাপনা ক'রে পূজা করতেন। আবার নিজের দেহে মিলিয়ে দিতেন। মন্ত্র এবং অন্যান্য সব উপকরণ মায়ের ভিতর হ'তেই প্রকট হ'ত। পূজার পর যোগের সব ক্রিয়া আপনা আপনি ফুটে উঠল। আসন, প্রাণায়াম, বন্ধ, মুদ্রা ইত্যাদি কত কি। কত জ্যোতির্দর্শন, বাণীশ্রবণ, কত অনুভূতি, কত যোগৈশ্বর্য প্রকাশ পেল। পূর্ণ জ্ঞানের এক বিরাট উপলব্ধি জেগে উঠল।

একটা কথা ব'লে নেব। মায়ের দেহকে অবলম্বন ক'রে এই যে সাধনা এ' মায়ের খেলা। মা যা' তাই আছেন সকল সময়ে। মায়ের নিজের প্রয়োজনে, সাধনা হয়নি। মায়ের সাধনার প্রয়োজনই ছিল না। মায়েরই কথা হ'তে এ কথা বোঝা গেছে। মায়ের বৈচিত্র্যময় সাধনা এবং পরমার্থ-পথের সকল অবস্থার প্রকাশ এ কথার সমর্থন করে দেখতে পাই।

একটি বিকাশযুক্ত দীর্ঘ ক্রমিক সাধনার পর ক্রমহীন নানা অবস্থা এবং ভাবের বিকাশ আরম্ভ হয়। আহার সংযমের অতি কঠোর নিয়ম সকল বছরের পর বছর চলতে থাকে। সংকীর্তনে যে অদ্ভুত ভাব-বিলাস মায়ের দেহে অভিব্যক্ত হ'ত তাহা লোকোত্তর।

ক্রমে সাধনার অবস্থাগুলির বিচিত্রতাময় প্রকাশ মায়ের মধ্যে লুকাল, বিশ্বজননীর এক মধুর, স্নিগ্ধ মূর্তি মায়ের মধ্যে ফুটে উঠল। এখন মাকে দেখি মা অলৌকিক কিন্তু লৌকিকও বটে। মা যেমন বুদ্ধির অগোচর, নাগালের বাইরে তেমন আবার আমাদের মধ্যে আমাদেরই মত হয়ে আছেন। মা যেমন নির্লিপ্ত, দ্বন্দ্ব-বিনির্মুক্ত তেমন আবার দয়াময়ী, প্রেমময়ী। মা যেমন অসাধারণ তেমন আবার সাধারণ হ'তেও সাধারণ। সংসারাসক্ত সাধারণ জীবও মায়ের সহিত মিশবার সুযোগ পায়, মায়ের মধুর ভালোবাসা পেয়ে মাকে প্রাণ ভ'রে ভালোবাসে, ধন্য হয়।

মায়ের নিজস্ব কিছুই নেই, অপর ভাষায় বলতে গেলে যা কিছু সবই মায়ের নিজস্ব। জীবের জীবনের যা উদ্দেশ্য সেই পরম-কল্যাণের মূর্তি মা আপনাকে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছেন। কত ব্যথিত, তাপিত প্রাণী তাঁহার স্নেহ-পীযূষ কণা পেয়ে ধন্য হচ্ছে।

মা কোনও সম্প্রদায়ে বদ্ধ ন'ন। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ক্রীশ্চান যে কোনও ধর্মাবলম্বীর জন্য, যে কোনও পথের পথিকের জন্য— মায়ের দরজা খোলা। মায়ের আসন যেখানে পাতা সেখানে অনন্তের উদারতা, নিখিলের প্রেম। নিজের মহিমায় নিজে বিরাজ করছেন সেখানে।

মা সব সময়ে যে এক জায়গায় থাকেন তা নয়। বাংলা, গুজরাত, যুক্ত-প্রদেশ, পার্বত্য অঞ্চল প্রভৃতি কত স্থানে মায়ের আগমন হয়। নানা দেশীয় অজস্র ভক্ত মায়ের।

ভক্তেরা, সন্তানেরা মা-য়ের নামে আশ্রম গড়ে তুলেছে ভারতের নানা স্থানে। কোথাও আনন্দময়ী বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয়েছে, কোনওখানে মেয়েদের জন্য কন্যাপীঠ। মায়ের জীবন-কথা কিংবা উপদেশ নিয়ে বহু গ্রন্থ বেরিয়েছে। ইংরাজী, হিন্দী, গুজরাতী এমন কি ফ্রেঞ্চ ভাষাতেও বেরিয়েছে বই।

নারীর কর্ত্তব্য

নন্দিতা দাশগুপ্তা

নারীর জীবন শুধু কর্ত্তব্যেরই সমষ্টি। নারীত্বে উপনীত হবার পূর্ব্বেই বালিকা কন্যার শিক্ষার বিষয়—কেমন করে সে সকলের প্রিয়পাত্রী হয়ে শ্বশুরালয়ে আদর্শ বধূ বলে আখ্যা পাবে। কিন্তু নারীর পক্ষে সেই সুনাম পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ, বধূ গৃহে আসবার আগেই শাশুড়ী ভেবে রাখেন যে, এইবার তিনি বধূর হাতে সংসারের ভার দিয়ে বিশ্রাম নেবেন, ননদিনীরা আশা করেন, ভ্রাতৃজায়া তাঁদের আদর-যত্ন করে পরিতৃপ্ত করবেন, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীও স্ত্রীর কাছ থেকে আদর-যত্ন আশা করে থাকেন।

কুমারী অবস্থায় নারী যতটা কর্ম্মপটু থাকে একটি সন্তানের জননী হবার পরে তার সেই কর্ম্মপটুতা যায় অনেকটা কমে। এখন দেখা যাক্, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বধূরা শ্বশুরালয়ে সুনাম পায় না কেন ?

একটি কোনও বিশেষ লোককে যদি সকলের প্রতি মনোযোগী হ'তে হয় তাহলে তার কর্ত্তব্যের ত্রুটি ঘটবেই। মনে করুন, রান্না ইত্যাদি সেরে, শাশুড়ীর খাওয়ার তত্ত্বাবধান করে, রাত্রে শয়ন-কক্ষে যেতে যখন বধূর দেরী হয় তখন নববিবাহিত যুবকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবার সম্ভাবনা জেগে ওঠে। স্বামীকে পরিতুষ্ট করতে কর্ম্মক্লান্ত শরীরে বহুক্ষণ জেগে থাকতে হয়, স্বামী হয়তো সকাল বেলা ঘুমিয়ে সেই ক্লান্তি দূর করেন, কিন্তু স্ত্রী যদি ভোর থেকে গৃহকর্ম্মে রত না হয় তখনই সে হয় গৃহের সকলের বিরক্তির কারণ।

এই অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে যখন সেই বধূ হয় একটি সন্তানের মা। সমস্ত রাতও যদি তার শিশুর পরিচর্য্যায় কেটে যায় বা কেটে যায় শিশুর দৌরাত্ম্য সামলাতে, তাহলেও সকালে তাকে নীরবে সংসারের কাজে লেগে যেতে হ'বে।

দিনের পর দিন এই একই বাঁধা-ধরা নিয়মে, শ্রান্ত শরীরটাকে খাড়া করে কাজ করতে করতে তার নানা কাজেই হয়তো ত্রুটি থেকে যায়। তখন থেকেই বাঙালীর সংসার অশান্তির আকর হয়ে ওঠে।

এবং এই সমস্ত কারণেই বধূরা অনেক সময় একা সংসার করবার পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন। তখনও হয়তো সংসারের কাজ একা হাতেই করতে হয় কিন্তু তাহলেও এইটুকু স্বাধীনতা থাকে যে নিজের ইচ্ছামত সকালে হয়তো দেরী করে শয্যা ত্যাগ করতে পারেন এবং নিজের সাংসারিক কাজের অবসরে একটু বিশ্রাম নিতে পারেন।

নানা কারণে জাতীয় স্বাস্থ্যভঙ্গের সাথে সাথে নারীর স্বাস্থ্যেরও অবনতি ঘটছে, আমাদের দিদিমারা যতটা স্বাস্থ্য-সম্পদের অধিকারিণী ছিলেন আমাদের তা নেই ; কাজেই আমাদের কর্ম্মপটুতাও কমে যাচ্ছে। কিন্তু তার জন্য অযথা অশান্তিতে সংসার ও মনকে পীড়িত না করে পরস্পরের মাঝে একটা মধ্য-পথের সৃষ্টি করা দরকার, যাতে উভয় পক্ষের স্বার্থই কিছুটা রক্ষিত হয়।



ভিক্ষা — শিল্পা—শীলা সরকার

আরব নারী-প্রগতি

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

আরবযুগ ঃ—

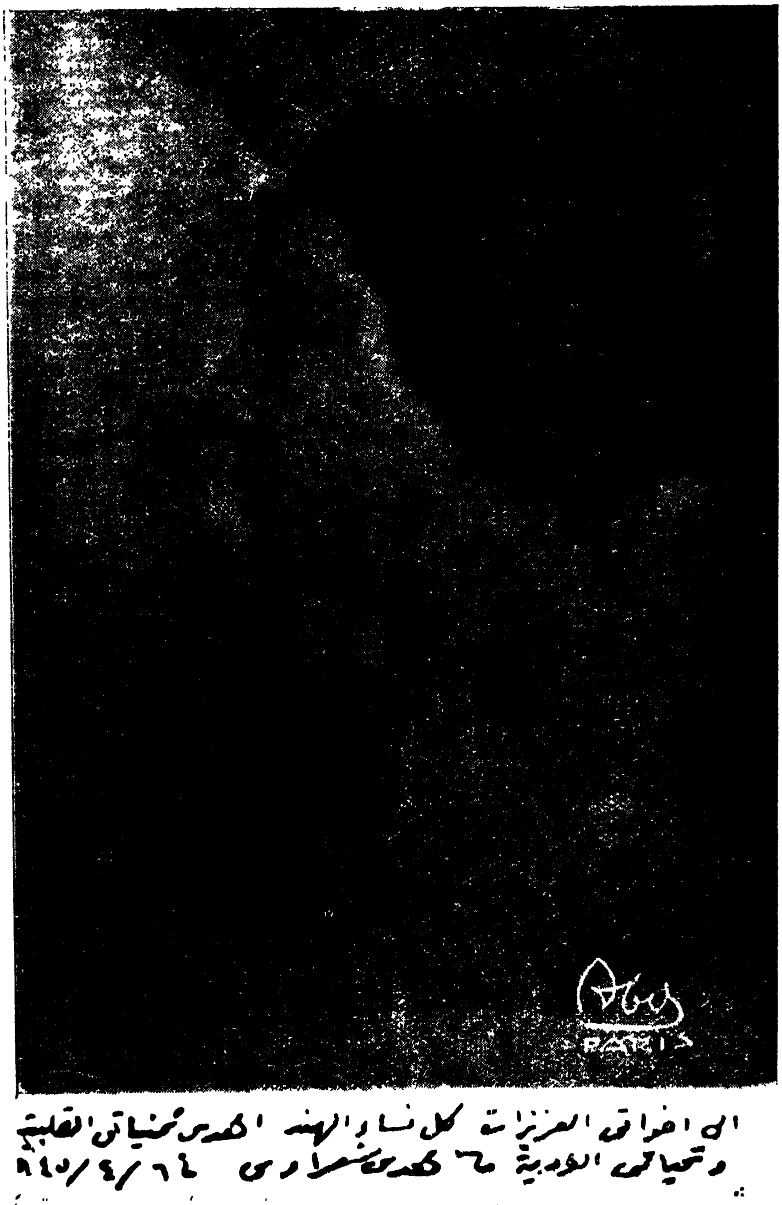
ফাতিমাবংশীয় সুলতান আল-হাকাম আম্র ইল্লা (৯৯৬—১০২১ খৃঃ অব্দ) হুকুম দিলেন:—নারী হারিমে অবরুদ্ধা; তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নাই; নারী পাদুকা ব্যবহার করতে পারে না; কোন-যান-বাহনে আরোহণ করতে পারে না; দিনের আলোয় পথ চলতে পারে না; সব সময় নারী থাকবে বোরখা-পরিহিতা। যে নারী এই নিয়ম ভঙ্গ করবে তার প্রাণদণ্ড। ফলে সাত বৎসর মিশরের রাজপথ নারী-বিবর্জিত। মিশরকুমারীরা মিশরের জাতীয় জীবনে অতি অল্প পরিসর স্থানে আশ্রয় নিল। মিশরের নারী আজও সেই দুর্দিনের কথা স্মরণ করে শিহরে উঠছে।

তুর্কযুগ ঃ—

মহম্মদ আলি পাশা (১৮০৬—১৮৪৮ খৃঃ অব্দ) প্রায় এক সহস্র বৎসরের ব্যবধান। সুলতান স্বয়ং নারীশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। চিকিৎসা বিভাগের জন্য নারী সেবিকার প্রয়োজন। ছাত্রী চাই, কিন্তু কোন ভদ্র তথা অভদ্র-বংশীয়া নারীই এই বিদ্যালয়ে যোগ দিলেন না। মহম্মদ আলি এক শত দাসী ক্রয় করে নার্সিং শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন।

এই যুগে বহু ফরাসী-বিদ্রোহী দেশত্যাগ করে মিশরে মহম্মদ আলির অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করলেন। অনেকেই সস্ত্রীক মিশরে এসে স্থায়িভাবে বসবাস করলেন। মিশরের যুবকগণ শিক্ষার জন্য ফ্রান্সে ও ইতালীতে গিয়েছিলেন। তাঁদের অনেকেই ইউরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করে মিশরে এনেছিলেন, তাঁরা ফ্রাঙ্কো-মিশরীয় সমাজ গড়ে তুললেন, কিন্তু সে সমাজকে সাধারণ আরব-মুসলিম-মিশরীয় ভদ্রজনগণ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেননি। ১৮৬৯ সালে খেদিব ইসমাইল রয়েল অপেরা হাউস নির্ম্মাণ ক'রে যখন মহিলাদিগকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন, তখন "ইসলাম বিপন্ন" ধ্বনি উঠেছিল, কিন্তু সুলতানা ইসমাইল স্বয়ং অভিজাত মহিলাদের শিক্ষার্থ বিদ্যালয় স্থাপন করলেন, রাজান্তঃপুরিকাদের জন্য নৃত্যগীত শিক্ষার ব্যবস্থা হল। ক্রমশঃ তিনটি নারী-বিদ্যালয় কায়রো শহরে স্থাপিত হল।

তার পরের যুগে শেখ জামালউদ্দিন আল্ আফ্‌গনি, কাজি কাশিম আমিন, মালেকা হেফনি নাসিফ স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন



মাদাম হুদা হানুম্ সারাউই
নেত্রী, আরব নারী-সম্মেলন
—কায়রো

করলেন, মালেকা হেফনি নাসিফ ভারতবর্ষে— ভূপালে এসেছিলেন। ১৯০৮ সালে তাঁর চেষ্টায় নারীশিক্ষার ব্যবস্থা হ'ল কিন্তু অবরোধ-প্রথা, বোরখা, অবগুণ্ঠন যথাপূর্ব্বং তথা পরম্।

১৯১৯ সাল—মিশরের জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মিশরে স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ হ'ল, এই সংগ্রামে যুবক-সম্প্রদায় নির্ম্মম ভাবে অত্যাচারিত হ'ল। মিশরের তরুণীগণ এই আন্দোলনে যোগ দিলেন, মিশরের বহু ভদ্র অভিজাতবংশীয় অবগুণ্ঠনবতী মহিলা প্রকাশ্য রাজপথে তরুণ দলের সঙ্গে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন, কারাবরণ করেছেন, সামরিক ও পুলিশ-বাহিনীর আক্রমণ সহ্য করেছেন। শিশু-সন্তান বুকে করে শত্রুর গুলী গ্রহণ করতেও দ্বিধা করেননি। এই বিদ্রোহের পরে মিশরের জনসাধারণের মধ্যে নারীদের প্রতি একটু শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত হল। সমস্ত সংবাদপত্রে নারীদের কারাবরণের কাহিনী প্রচারিত হল। এই দলের অধিনায়িকা মাদাম হুদা হান্নুম সারাউই। তার পর ১০ বৎসরের মধ্যে মিশরে নারী-প্রগতি চলল অপ্রতিহত গতিতে।

মাদাম হুদার নেতৃত্বে মিশরে আজ মহিলাগণ বহু দূর অগ্রসর হয়েছেন। তাঁরা আজ বোরখা পরিত্যাগ করেছেন। প্রকাশ্য রাজপথে একাকী ভ্রমণ করেন, হাই হিল পাদুকা পরিধান করেন, মুক্তবাহু, আজানু স্কার্ট প'রে ভানিটি ব্যাগ নিয়ে পথ চলেন, পুরুষের সঙ্গে একই সেলুনে, ট্রামে, ট্রেণে নিঃসঙ্কোচে ভ্রমণ করেন। একই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন,—মেডিকেল কলেজে, বিজ্ঞানের গবেষণাগারে তাঁরা পুরুষের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করেন। মিশরের নারীরা সিনেমা, নৃত্যমঞ্চ, ক্যাবারে, সঙ্গীত প্রভৃতিতে পুরুষের সঙ্গে সহযাত্রী, প্রতিযোগিতাকামী। মিশরীয় মহিলাদের উদ্যোগে নিখিল আরব মহিলা সম্মেলন স্থাপিত হয়েছে। তাঁরা আন্তর্জাতিক মহিলা-সম্মেলনে যোগদান করেন, পুরুষের নির্দ্দেশের জন্য আরব নারী অপেক্ষা করে বসে থাকেন না, নারীর অগ্রগতির আদর্শ তাঁরাই স্থির করেন, কার্য্যক্রম নির্দ্ধারণ করেন। যুদ্ধের সময় পুরুষের সমান কার্য্যভার গ্রহণ করতে প্রস্তুত এবং অনেক স্থলে সমান কাজ করেছেন। তাঁরা নিজেদের বিদ্যালয় পরিচালনা করেন, চিকিৎসালয়ে সেবা বিভাগে তাঁদের একচ্ছত্র অধিকার, শিশুবিদ্যালয়ে শিক্ষার ভার পুরুষ-নারীনির্বিশেষে তারা গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

১৯৪৫ সালে নিখিল আরব মহিলা আন্দোলনের অধিবেশনে আমি উপস্থিত ছিলাম। দামেস্কাস, বেরুথ, হাইফা, জেরুজালেম, মদিনা, বাগদাদ, কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি স্থান থেকে বহু নারী প্রতিনিধি এসেছিলেন, তাঁরা দাবী করেছেন—

শিশু বিচার বিভাগের কর্ত্তৃত্ব,
রাষ্ট্রসভায় প্রবেশাধিকার,
কৃষি বিভাগে প্রবেশাধিকার,
যুদ্ধের অংশ গ্রহণ অধিকার,
বিবাহ বিচ্যুতিতে নারী পুরুষের সমান অধিকার।

আমি মধ্য প্রাচ্য ভ্রমণের সময় বহু অভিজাতবংশীয়া, শিক্ষিতা মহিলার সঙ্গে আলাপ করেছি। তাঁরা ইউরোপকে এত বেশী অনুকরণ করেছেন, পূর্ব্বে পরিচয় না জানা থাকলে তাঁদের কখনো প্রাচ্য-দেশীয়া বলে ধারণা করা যায় না। বর্ণে, ভাষায়, পরিচ্ছদে, স্বাস্থ্যে, স্বচ্ছন্দগতিতে, সাবলীল জীবনধারায় তাঁরা সম্পূর্ণ প্রতীচ্য।

হুদা হান্নুম সাররাউই (নিখিল আরব আন্দোলনের সভানেত্রী), মিসেস আমিনা সাইদ (জার্ণালিষ্ট), মিসেস নাজলা এল হাকিম (শিক্ষা বিভাগের কর্ত্রী), মাদাম হাসনাইন (রাজা ফারুকের চেম্বারলেন আহম্মদ হাসনাইনের ভগ্নী), বিখ্যাত পণ্ডিত সালে-উদ্দিনের কন্যা নওয়ারা, দামাস্কাসের এবন্ আজিজিয়া এল আজম, বেরুথের মাদাম মুস্তাফা বে নাস্‌লি, জবলে দনজের প্রাক্তন রাণী মাদাম আলিয়া অত্রাস প্রভৃতি মনীষী মহিলার সঙ্গে বহু আলোচনা করেছি। তাঁদের সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রগতিশীল মনের সন্ধান পেয়েছি। কয়েকটি আলোচনা এখানে লিখব। বাঙ্গালী পাঠকদের সঙ্গে তাঁদের কয়েক জনের পরিচয় করিয়ে দেব।

মাদাম হুদা হান্নুম্ সাররাউই জাতিতে সার্কেশীয়ান আরব। নাতিদীর্ঘ, কমনীয় এবং এই সুন্দরের দেশেও অতি সুন্দরী ব'লে বিখ্যাত। তাঁর বয়স ষাটের উপরে, কিন্তু দেহ অত্যন্ত সুপুষ্ট। নাসিকা এবং গ্রীবা গ্রীক্-রক্তের সংমিশ্রণের পরিচয় দেয়। কেশদাম সোনালি ধূসর—একটিও কেশ পক্ক নয়। মুখমণ্ডলে বার্দ্ধক্যের একটি রেখাও পড়েনি, তবে সাম্প্রতিক অসুস্থতায় একটু রক্তহীন দেখাচ্ছিল। তিনি বিধবা, তাঁর স্বামী আলি সাররাউই মিশরের রাজ-পরিবারের সম্পর্কিত। ১৯২৫ সালে একটি পুত্র ও কন্যা এবং বিরাট সম্পত্তি রেখে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। মাদাম হুদা স্বামীর মৃত্যুর পর আর বিবাহ করেননি। কাইসার এল্ আইনি সৈন্যাবাসের অপর পার্শ্বে এক বিরাট রাজপ্রাসাদে তিনি অবস্থান করেন; প্রাসাদের মর্ম্মরনির্ম্মিত শিলাতল, মর্ম্মর স্তম্ভ, চিত্রিত ছাদ, মখমলের গালিচা এবং প্রবেশ-পথের বিভিন্ন অংশে সুবিশাল মুকুর। তিনি আমাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন; আমরা প্রবেশ করা মাত্রই সুবেশধারী দুই জন হাবসী ভৃত্য আমাদের অভ্যর্থনা-কক্ষে নিয়ে গেল। এই কক্ষটি আরব-কক্ষ নামে পরিচিত। এর সমস্ত পরিকল্পনা, আসন, আসবাব, দীপ, গালিচা, প্রাচীরচিত্র, চিত্রিত ছবি—সমস্ত কিছুই আরব-শিল্প। তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করে বললেন,—হে ভারতবাসি, তোমার ভিতর দিয়ে আমি সমস্ত ভারতবর্ষকে আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। সত্যই মনে হ'ল, তিনি অত্যন্ত বিনীত ভাবে এই শ্রদ্ধাটুকু অন্তরের বার্ত্তা বলেই নিবেদন করলেন। তিনি সাধারণতঃ কারও সঙ্গে দেখা করেন না এবং দেখা করলেও তাঁর দূরত্ব অত্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষা করেন। আমাকে যে সম্মান প্রদর্শন করলেন, এটা মিশরীয়দের দৃষ্টিতে অতি অসাধারণ ব্যাপার।

তার পর আমাদের প্রথম আলোচনা আরম্ভ হ'ল তাঁর গৃহের বিলাস-ব্যবস্থা নিয়ে। তাঁর এই প্রাসাদটি ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী স্থাপত্যের অনুকরণে নির্ম্মিত। কিন্তু বিগত ২০ বৎসর ধরে তিনি এই ফরাসী স্থাপত্যকে যথাসম্ভব প্রাচ্য স্থাপত্যে পরিবর্ত্তন করেছেন। তাঁর এই অভ্যর্থনা-কক্ষের প্রাচীরের প্রায় এক-চতুর্থাংশ অলিভ কাঠ দিয়ে ঢাকা, তার উপরে অঙ্কিত রয়েছে দামাস্কাসের বিখ্যাত শিল্পীর অঙ্কিত কাষ্ঠচিত্র। গৃহের দরজার উপরিভাগে খোদিত ওমর খাইয়ামের কবিতার মূর্ত্ত চিত্র। প্রত্যেক চিত্রের নিম্নে সেই কবিতাটি গজদন্তের অক্ষরে লিখিত। বিভিন্ন স্থানে পারস্যদেশীয় শিল্পীর অঙ্কিত বহু মূল্যবান্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবিও র'য়েছে। কোথাও বা মিশরীয় চিত্রকরের অঙ্কিত ছবি পাশাপাশি রাখা হয়েছিল

তার পরে গ্রন্থাগারে গিয়ে দেখলাম, আবলুস কাঠের আলমারীতে মরক্কো চামড়ায় বাঁধান সোনার জলে নামাঙ্কিত বহু পুস্তক। পড়বার ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা, কাগজ, কলম—প্রত্যেকটি জিনিষ এমন ভাবে সাজান যে মনে হ'য়েছিল বস্তু-বিশেষের সামান্য স্থান-পরিবর্ত্তন করলেও অশোভন হ'বে।

পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে দুর্ল্লভ জিনিষের সমাবেশ। ১৭১১ খৃঃ অব্দে ফরাসী সম্রাট্ পঞ্চদশ লুইএর অভ্যর্থনা-কক্ষের অনুকরণে সজ্জিত এই প্রকোষ্ঠ। তার ভিতরে একটি 'ব্যুরো' অর্দ্ধেক সুবর্ণমণ্ডিত, অর্দ্ধেক কাষ্ঠমণ্ডিত, নানা বর্ণের মণিমুক্তাখচিত। এই জিনিষটির সাতটি অনুকরণ পৃথিবীতে র'য়েছে, তা'র মধ্যে মাদাম্ হুদার গৃহে এই একটি। ইহা চোখে না দেখলে লিখিত বিবরণ দিয়ে বুঝান অসম্ভব। প্রাসাদের উত্তর প্রান্তে একটি প্রাচীন তুর্ক সম্রাটের অন্তঃপুরের অনুকরণে পরিকল্পিত অভ্যর্থনা-কক্ষ দেখলাম। কক্ষের মধ্যস্থলে একটি শ্বেত মর্ম্মর-নির্ম্মিত উৎস, জল নিক্ষেপণের ব্যবস্থা অতি অপরূপ। এই গৃহটির সমস্ত প্রাচীরের নিম্নাংশ পুরু মখমল্ দিয়ে ঢাকা। প্রাচীরের শেষ প্রান্তে মধ্য-প্রাচ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে সংগৃহীত নানা প্রকার দুষ্প্রাপ্য কাষ্ঠখণ্ডের সমাবেশ। সমস্ত গৃহটি দেখে আমার ফরাসী বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্ব্বে মাদাম রোলাণ্ডের প্রাসাদের কথা মনে হয়েছিল—এই বিরাট ব্যয় কেন?—এর পশ্চাতে কি মনোবৃত্তি রয়েছে?—শিল্প-প্রীতি, আভিজাত্যের স্ফীতি, প্রতীচ্যের প্রতি কটাক্ষ, প্রাচ্য-প্রেম, কিংবা রুদ্ধ বাসনার মানসিক তৃপ্তি? আমি মাদাম হুদাকে মিশরের মাদাম রোলাণ্ড ব'লে অভিনন্দিত ক'রলাম। অধ্যাপক নাসিফ এবং মিঃ সালেহ্ উদ্দিন এই অভিনন্দনে যোগ দিয়ে ব'ললেন, এ অভিনন্দন যথাস্থানেই প্রয়োগ করা হ'য়েছে। মাদাম হুদা আমাকে দামাস্কাসের স্থাপত্য সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন এবং তিনি খুব আনন্দ পাচ্ছিলেন যে আমি দামাস্কাসে আরব স্থাপত্য দেখে এসেছি, সুতরাং তাঁর কথাগুলি সাধারণ শ্রোতা অপেক্ষা ভাল ভাবে বুঝ্তে পারছিলাম। তাঁর ধারণা, ভারতের লোক বেশ গুণগ্রাহী। তিনি দুঃখ করলেন, ইউরোপীয় শ্রোতা এবং দর্শকগণ আরব স্থাপত্য ও সভ্যতা সম্বন্ধে খুব বেশী উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না।

আমরা নারী আন্দোলন নিয়ে আলোচনা ক'রলাম। তাঁর আরবী ভাষা খুবই অলঙ্কারবহুল, সে জন্য মিঃ সালেহ্ উদ্দিন এবং অধ্যাপক নাসিফ স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা ক'রে দিচ্ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম,—আপনি মধ্য-প্রাচ্যের নারী-আন্দোলনের নেত্রী, আপনার মতে বর্ত্তমান সমাজে নারীর স্থান কোথায়?

মাদাম হুদা বললেন,—নারী পুরুষের সহযাত্রী। প্রাচীন মিশরে এবং মধ্যযুগে মিশরীয় নারীরা সমসাময়িক ইউরোপীয় নারীর তুলনায় অধিকতর সম্মান পেয়েছিলেন। ক্রুসেডের পর অবস্থার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হ'ল। ইউরোপীয় রেনেসাঁ যুগে মিশরীয় নারী তথা মুসলিম নারীর অবস্থা শোচনীয় হ'তে আরম্ভ হয়। ফরাসী বিদ্রোহের সময় থেকে ইউরোপীয় নারী যতটা অগ্রসর হ'য়েছে, মুসলিম নারী ততটা পশ্চাতে সরে গেছে। বর্ত্তমানে আমরা নূতন আগ্রহ এবং উৎসাহ নিয়ে আমাদের পূর্ব্বতন অধিকার দাবী করছি।

আমি বললাম,—পুরুষের সমকক্ষতা আর দাবী ব'লতে আপনি কি বোঝেন? আপনি কি মনে করেন যে, সৈন্য বিভাগ, যন্ত্রাগার এবং গবেষণাগারে প্রবেশ ক'রে নারী পুরুষকে স্থানচ্যুত ক'রবে না এবং এর ফলে বর্ত্তমান যুগের তিক্ত প্রতিযোগিতা কি আরও তিক্ততর হ'বে না?

মাদাম হুদা বললেন,—আমরা পুরুষের সঙ্গে কাজ ক'রতে চাই এবং তা'দের মতই কাজ চাই। বর্ত্তমান যুদ্ধে অবস্থার বিবর্ত্তনে এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে নারীরা এমন কয়েকটি কর্ম্মক্ষেত্রে এসেছে, যেটি তা'দের ইচ্ছা-প্রণোদিত নয়। আপনি জানেন, কিছু দিন পূর্ব্বে কানাডীয় নারীগণ তা'দের একটি নিখিল কানাডীয়ন নারী-সম্মেলনে যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ ক'রেছিল। নারীদের হাতে যদি রাষ্ট্র-পরিচালনার ভার থাকৃত, তবে হয়ত এই যুদ্ধ সংঘটিত হ'ত না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থাকে গ্রহণ ক'রে যুদ্ধে যে সমস্ত ক্ষতি হ'য়েছে তা' পূরণের জন্য নারীকে অগ্রসর হ'তে হয়েছে। পুরুষ যখন জাতির কল্যাণে যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত বিপদ বরণ ক'রতে এগিয়ে গেছে, নারী পুরুষের অনুপস্থিতিতে তা'র অনেক স্থান অধিকার ক'রেছে। তা' না হ'লে সমাজ এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অচল হ'য়ে পড়ত, সুতরাং আজকের এই সমস্যা নারীর সৃষ্ট নয়।

আমি বললাম,—যদি নারী রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষের তুল্য অধিকার দাবী করে তবে তা'কে পুরুষের সমান দুঃখ-কষ্ট বরণ ক'রে নিতে হ'বে। আপনি বর্ত্তমান অবস্থার অন্তরালে একমাত্র সুবিধা-গুলিই খুঁজে নেবেন, আর অসুবিধাগুলি এড়িয়ে যাবেন, তা' কি-করে সম্ভব হ'বে?

মাদাম বললেন,—না, আমরা অসুবিধা এড়িয়ে যেতে চাই না এবং দুঃখ-কষ্টের অংশ গ্রহণ করতেই প্রস্তুত।

আমি বললাম—তা' হ'লে আপনি কি চান যে Y. W. C. A. অথবা A. T. S.এর নারীদের মতন যুদ্ধকার্য্যে নারীরা এগিয়ে যাবে? তারা তা'দের গৃহ ত্যাগ ক'রে কন্যা, ভগিনী, মাতার আসন পরিত্যাগ ক'রে শুধু মাত্র পুরুষের সঙ্গিরূপে চ'লবে? অন্য দিকে পুরুষ ও নারীদের একটি মোটরের আসন কিংবা রেলগাড়ীর কক্ষরূপেই বিবেচনা ক'রবে?

তিনি বললেন,—আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। মাতৃত্বই নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ। আমরা প্রাচ্য নারীরা কখনও মাতৃত্বকে বর্জ্জন ক'রে নারীকে অভিনন্দিত করি না। প্রতীচ্য নারীর আদর্শ আমাদের কাম্য নয়

আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—যদি তাই আপনাদের আদর্শ হয়, তা'হলে আপনি কি প্রাচ্য নারীকে নির্দ্দেশ দিতে পারেন যে, এই পর্য্যন্ত তোমার গতি, তা'র পর সমস্ত পথ রুদ্ধ? যদি আপনি নারীদের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং পুরুষের সহযাত্রার অধিকার দেন, তবে তা'র পরিণতি কোথায়? আপনি প্রকৃতির আবেদনকে চক্ষু বুজে উপদেশ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে পারেন না। তখন শিশুর জন্ম হ'বে নর্ম্ম উদ্যানে, প্রসূত হ'বে চিকিৎসালয়ে, প্রতিপালিত হ'বে সেবাসদনে। শিশুর উপর তা'র পিতামাতা এবং পরিবারের কোন প্রভাবই থাকবে না। নারী হ'বে সন্তান-উৎপাদনের ক্ষেত্র, জৈব লালসার পাত্র। দায়িত্বহীন মাতার মাতৃত্ব আদর্শের পরিপন্থী; মাতৃত্ব ব'লতে প্রাচ্য নারীরা যে আদর্শ গ্রহণ ক'রেছিল, আপনি কি মনে করেন যে বর্ত্তমান যুগে নারীদের সে আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকবে?

মাদাম হুদা কিছুক্ষণ নীরব থেকে হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে বললেন,—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। একটু তিক্ত ঔষধের প্রয়োজন আছে, বহু কালের জীর্ণতার প্রতিষেধক অত্যন্ত সুপের হওয়ার আশা করা,

বৃথা। আমরা কোথাও কোথাও বহু দূর এগিয়ে যাব, তার পর আমরা ফিরে আসব। অবশ্য ফিরে আসব, এটা যথার্থ। প্রাচ্য নারীর মনোবৃত্তি বহু কাল প্রতীচ্যের জীবনধারা নিয়ে তৃপ্ত থাকৃতে পারে না।

আমি উত্তর দিলাম—আমি কিন্তু ব'লব যে এই মানব-সমাজ একটি যৌথ সম্পত্তি। এর কোন ব্যক্তিগত অধিকারীই নেই, সমাজে প্রত্যেক মানবেরই বিভিন্ন স্থান এবং অংশ র'য়েছে। ব্যক্তিগত ভাবে মানবের যেমন হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি প্রত্যেকটি অঙ্গেরই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য রয়েছে, তেমনি সমস্ত মানুষেরই সমাজের প্রতি একটি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য রয়েছে। আজকে হাত যদি বলে আমি হাঁটব, কান যদি বলে আমি দেখব, নাক যদি বলে আমি খাব,—তা'হলে মানব-দেহ বিকল হ'য়ে যাবে। তেমনি প্রকৃতির ব্যবস্থায় নারীকে তা'র শরীরধর্ম্ম অনুসারে কতকগুলি কার্য্যের ভার নিতে হবে, সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর ছল চাতুরী কিছুই সাহায্য করবে না। যে কথাটি ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য সেটি সমাজ কিংবা জাতির পক্ষেও প্রযোজ্য। কারণ, ব্যক্তি সমাজের বাইরে নয়, এবং সমাজও ব্যক্তির বাইরে নয়।

মাদাম হুদা বললেন,—যথার্থ ই। কিন্তু মানুষের র'য়েছে দু'টি হাত, দু'টি পা, দু'টি চক্ষু—তারা পরস্পর সাহায্য করে। প্রকৃতিও সৃষ্টি করেছেন দু'টি প্রাণী,—একটি পুরুষ, অপরটি নারী। পুরুষ এবং নারী, তা'রা পরস্পর পরিপূরক, যেমন দেহের অঙ্গগুলি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, প্রাচীনতম সমাজ-ব্যবস্থা মাতৃকেন্দ্রীয় ছিল, ক্রমশঃ পুরুষ নারীকে স্থানচ্যুত ক'রেছে। ফলে, সমাজ দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছে। বর্ত্তমানে নারী তা'র পূর্ব্ব অধিকার ফিরে পেতে চায়।

আমি বললাম,—আপনি কি মনে করেন, বর্ত্তমান যুগে নতুন ক'রে আবার মানুষ সমাজকে মাতৃকেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনৃতে পারবে? ভারতবাসী ধারণা করে, পরিশ্রান্ত মানবের আনন্দ উৎস নারী; শ্রান্ত হ'য়ে কর্ম্মক্লান্ত মানুষ যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে, সে আশা করে নারী তা'কে সেবা দ্বারা তা'র সমস্ত শ্রান্তি দূর করে দেবে। নারীর স্পর্শে তার শ্রান্ত দেহ সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠবে; নারী হ'বে পুরুষের গচ্ছিত সন্তানের অধিকারিণী, নারী তা'র গৃহের সম্রাজ্ঞী। আর প্রতীচ্যের মতন যদি আপনারা আশা করেন যে, প্রাতরাশের পরে নারী যা'বে গবেষণাগারে, পুরুষ যা'বে যন্ত্রাগারে, তার পর দ্বিপ্রহরে দু'জন নগরের বিভিন্ন ভোজনালয়ে ভোজন ক'রে, দু'জনে বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে সিনেমা থিয়েটার দেখে রাত্রিতে ভোজনাগারে অথবা শয়নকক্ষে তা'রা পরস্পরের সান্নিধ্য পাবে, তা' হ'লে সহযোগিতা এবং সহকর্ম্মিতার প্রচ্ছদপটে যুগল মানব-জীবন কি ক'রে গড়ে উঠ্‌বে? পুরুষ ও নারী পরস্পর নির্ভরশীল না হ'লে তা'দের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি কি ক'রে প্রকাশ পাবে? বর্ত্তমান যুগে জীবনযাত্রার প্রতিযোগিতায় আপনারা নারীর জন্ম এমন স্থান নির্দ্দেশ ক'রছেন, যেখানে সে পরিপূর্ণ ভাবে নিজের সত্তা উপলব্ধি ক'রতে পারবে না। নারীর সেই একক জীবনই কি আপনাদের কাম্য?

এই শ্লেষপূর্ণ মন্তব্যে মাদাম উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। অধ্যাপক নাসিফ আমাকে বললেন,—আজকের আলোচনা এখানেই সমাপ্ত হো'ক। মাদাম হুদা ক্লান্ত। অন্য দিন এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হ'বে।

তার পর আমরা বিদায়ের জন্ম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ক'রতে তিনি বললেন,—মিসেস্ আবদুল কাদির সেদিন ভারতবর্ষ থেকে নিখিল আরব নারী-সম্মেলনের সাফল্য জ্ঞাপন ক'রে একখানি তার পাঠিয়েছেন এবং মাদাম তাঁকে একজন ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরণ ক'রতে অনুরোধ করেছেন। মাদাম সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন। আমাকে ভারতের হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধের বিষয় জিজ্ঞাসা ক'রলেন। মিঃ সালেহ্ উদ্দিন আমার হ'য়ে উত্তর দিলেন,—বিদেশে হিন্দু-মুসলমানের বিষয় যে সব প্রচারকার্য্য হ'চ্ছে তার অনেকটাই কাল্পনিক। ভারতে মুসলমান এবং হিন্দু পরস্পর দেখা হ'লেই যে একে অন্যের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করে, তা' সত্যি নয়।

প্রতীক্ষা

শ্রীগৌরী রায়

কবে কোন্ বসন্তের মাধবী মঞ্জরী
বিচিত্রিতা ধরণীর শ্যামাঙ্গন ভরি'
নৈবেদ্য সাজায়ে তুলি অতি নিরুপম
সৌধশীর্ষে তপনের শেষ রশ্মি সম,
আহ্বানিবে মোরে।
উদাস পূরবী ছন্দে বৈকালীর একতারা সুরে॥

কবে কোন্ আষাঢ়ের ছায়া-ঘেরা স্নিগ্ধ মায়াতলে
অজানার অন্ধকারে গোধূলির অস্ফুট আলোকে
রসঘন অন্তরের নিবিড় প্রণতি
দৃষ্টিতলে ধরি এক প্রশান্ত মূরতি।—
আশ্বাসিবে ধীরে।
ব্যথাহরা মধুক্ষরা হর্ষস্মিত স্বরে॥

কবে কোন্ হেমন্তের শ্রান্ত নিশি-শেষে
বিনম্রা অপরাজিতা সম নত বেশে,
প্রতীক্ষিব স্থিরচিত্তে প্রদোষের শুকতারা সম
জীবনের শুভ্র-সত্যখানি নিষ্কলুষ শ্রেয়ঃ মনোরম
ক্লেদ-দগ্ধ ধরণীর নিবিড় কালিমা।
ত্যক্ত বস্ত্র সম ছাড়ি যাবে দেহপ্রান্ত সীমা॥
কবে কোন্ পুণ্য-বেদীমূলে কণ্ঠে জাগি ভাষা,
নিবিড় আকুতি-ভরা মরমের অতৃপ্ত পিপাসা।
বন্দনা রচিবে নাথ মুগ্ধ দীপ্ত স্বরে।
উদাত্ত গম্ভীর মন্ত্রে জীবনের প্রতি রন্ধ্র-পুরে॥

কবে কোন্ শুভক্ষণে পূর্ব্বাশার দ্বারে!
নবোদিত ভাস্করের পুণ্য জ্যোতি ভ'রে
প্রকাশিবে দেব তুমি, হে বিশ্ব বাঞ্ছিত
ভূলোক দ্যুলোক করি বিস্ময়ে স্তম্ভিত॥

(তার পর) মোহমুক্ত অন্তরের সমাহিত ধ্যানে
প্রস্ফুটিত পদ্মসম সুরভিত প্রাণে
মুক্তধারারূপে ঝরি তব আশীর্ব্বাণী
পূর্ণতায় ভরি চিত্ত শান্তি দিবে আনি॥

নেতাজীর সঙ্গে কয়েক দিন

লেফ্টেন্যাণ্ট জানকী দেভর

(ঝান্সীর রাণী বাহিনী)

[এই প্রবন্ধের রচয়িত্রী ঝান্সীর রাণী বাহিনীর লেফ্টেন্যাণ্ট জানকী দেভর ১৯৪৪ সালে মালয় হইতে বর্মা অভিযাত্রী ঐ বাহিনীর প্রথম দলের নেত্রী ছিলেন। ৮ মাসেরও উপর তিনি বর্মা রণাঙ্গনে ছিলেন। ইঁহার পিতা মালয়ের অন্তর্গত কুয়ালালামপুরের ভারতীয়দের মধ্যে এক জন প্রাচীন ও খ্যাতনামা ব্যবসায়ী। ইঁহার আর এক বোন—তপতী দেভরও ঝান্সীর রাণী বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলেন।

১৯৪৫ সালে এপ্রিল মাসে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টের হেড্-কোয়ার্টার্স ব্রহ্মদেশ হইতে স্থানান্তরিত করা হয়। সেই সময় রেঙ্গুন হইতে মৌলমিন যাইবার পথে ঝান্সীর রাণী বাহিনীর সভ্যারা কয়েক দিন নেতাজীর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিল। এই প্রবন্ধে লেঃ দেভর সেই কয়েক দিনের অভিজ্ঞতার কথাই বর্ণনা করিয়াছেন।]

১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাস। বর্মার যুদ্ধ-পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপের দিকে যাইতেছিল। বর্মী গরিলাদের সাহায্যে বৃটিশ বাহিনী বহু দিক্ দিয়া বর্মায় প্রবেশ করায় আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষে পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল। বৃটিশেরা বিমান আক্রমণের উপরই বিশেষ জোর দিয়াছিল এবং রাজকীয় বিমান-বহরের বিমানগুলি প্রায় প্রত্যহই বরং সময় সময় দিনে দুই বার বা তিন বার করিয়াও রেঙ্গুনে আসিতে লাগিল। রেঙ্গুনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হওয়ায় হেড্কোয়ার্টার্স পরিত্যাগ করিতে হইবে—এই চিন্তাই আমাদের সকলের মনে উদিত হইয়াছিল।

এপ্রিল মাসের শেষাশেষি এক দিন আজাদ হিন্দ ফৌজের শিবির প্রত্যক্ষ ভাবে আক্রান্ত হইল! আমাদের সৈন্যদের মধ্যে বেশীর ভাগই বাহিরে থাকায় হতাহতের সংখ্যা অতি অল্পই হইয়াছিল। ইহার পর সকলেই আলোচনা করিতে লাগিল যে, ঝান্সীর রাণী বাহিনীর সভ্যাদের কোন নিরাপদতর স্থানে অতি শীঘ্রই স্থানান্তরিত করা উচিত। একথা অবশ্য সকলেই জানিত যে, আমাদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা আমরা মানিয়া লইব না; তাই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া নেতাজী নিজে আমাদের নিকট আসিয়া আমাদের বুঝাইলেন যে, এরূপ অবস্থায় ওখানে থাকা মোটেই সুবিবেচনার পরিচায়ক হইবে না। নেতাজীর উপদেশ ও আদেশ আমরা মানিয়া লইলাম।

স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বে আমাদের বাহিনীটিকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইল। তার মধ্যে একটি দলের ভার আমার উপর ছিল। এপ্রিল মাসের এই ঘটনাবহুল দিনগুলিতে নেতাজী প্রায় প্রতি ঘণ্টায়ই সংবাদ-সরবরাহকারীদের নিকট হইতে যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ পাইতেন এবং তিনি জানিতেন যে, রেঙ্গুনের উপর শত্রুপক্ষের যুক্ত আক্রমণ আসন্ন, তাই ২৪শে এপ্রিল বর্মায় ভারতবর্ষ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারের ভার কয়েক জন বিশ্বস্ত অনুচরের উপর অর্পণ করিয়া এবং সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়া নেতাজী সদল-বলে রেঙ্গুন ত্যাগ করিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ আমার দলটি তাঁহার সঙ্গেই ছিল।

আমরা শুনিয়াছিলাম যে, নেতাজীর রেঙ্গুনে থাকারই ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাঁহার কয়েক জন মন্ত্রী তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া রেঙ্গুন পরিত্যাগ করিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, জাপানীরা আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষকে কিছু না জানাইয়াই রেঙ্গুণ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

আমরা মাত্র কয়েক মাইল অগ্রসর হইয়াছি, ইতিমধ্যেই মাথার উপরে শত্রুবিমানের গর্জন শোনা গেল এবং আমরা তৎক্ষণাৎ আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ইহার পরেই ঝাঁকের পর ঝাঁক বিমান আসিতে লাগিল, কিন্তু এরূপ জীবনের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বেই অর্জন করায়, আমরা সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলাম, সেজন্য আমাদের মধ্যে কেহই আহত হয় নাই। পুনরায় আমরা যাত্রা শুরু করিলাম এবং সমস্ত রাত্রি পথ চলিয়া প্রভাতে একটি জঙ্গলে পৌঁছিলাম। শত্রুপক্ষের বিমানগুলি আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল এবং আমাদের লরীগুলির উপর মেসিন গান হইতে গোলাবর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

এইরূপ ক্ষেত্রে নেতাজী কিরূপ আচরণ করিতেন তাহা জানিবার আগ্রহ স্বাভাবিক। এরূপ সময়ে তিনি কেবল মাত্র একটি দলের নেতাই ছিলেন না, তিনি একটি পরিবারের পিতা বা কর্তার মতই ব্যবহার করিতেন। দলের প্রত্যেকেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে কি না সে বিষয়ে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন এবং কেহ আশ্রয় গ্রহণ না করিলে তাহাকে ডাকিয়া আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিতেন। তিনি নিজে অবশ্য খুব কমই আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। এদিকে তাঁহার জন্য আমাদের ছিল বিশেষ চিন্তা। তিনি নিজের জন্য মোটেই চিন্তিত ছিলেন না। শত্রুপক্ষের বিমান হইতে যখন গোলাবর্ষণ হইতেছে এ রকম সময় বহু ক্ষেত্রেই আমি নেতাজীকে চিঠিপত্র বা ঐরূপ কিছু লিখিতে দেখিয়াছি: নিতান্ত ভাগ্যের জোরেই ঐ সব ক্ষেত্রে তিনি বাঁচিয়া গিয়াছেন।

এই সব মুহূর্তে অবশ্য চিঠিপত্রাদি লেখা তাঁহার পক্ষে খুব আশ্চর্যের বিষয় ছিল না, কারণ তিনি ছিলেন এক বিপ্লবী বাহিনীর নেতা, স্বাধীন গভর্ণমেন্টের প্রধান মন্ত্রী, ইহার পররাষ্ট্র-সচিব, যুদ্ধ-সচিব, সরবরাহ-সচিব এবং তিনি কি না ছিলেন? তাই তাঁহার পক্ষে দিনে কুড়ি ঘণ্টা কাজ করাও মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নহে। কোন কোন সময় তাঁহার কর্মরত দিন ও রাত্রিগুলির মধ্যে কোন ব্যবধানই থাকিত না।

দুই বছরের কম সময়ের মধ্যে তিনি যে অদ্ভুত কার্যকারিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার কথা চিন্তা করুন। এই দুই বছরের ইতিহাস কত ঘটনাতেই না পূর্ণ এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহিরের কত বিরুদ্ধ অবস্থার সহিতই না তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। নতুন কোন গ্রন্থিবন্ধনের পূর্বে তাঁহাকে কত না পুরাতন গ্রন্থির বন্ধনই খুলিয়া ফেলিতে হইয়াছে। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কথাও চিন্তা করুন।

আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, তিনি পৃথিবীর সর্বদেশের ও সর্বকালের এক জন শ্রেষ্ঠ মানুষ।

এইরূপ এক জন নেতার সহিত প্রায় সাত দিন মেলামেশা করার এবং তাঁহাকে জানিবার সৌভাগ্য আমি লাভ করিয়াছিলাম। পূর্বে আমি তাঁহাকে বক্তৃতা-মঞ্চ হইতে বিভিন্ন ভাষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা দিতে দেখিয়াছিলাম; চলন্ত জনসমুদ্রের মধ্যে তাঁহাকে আমি দেখিয়াছি। তাঁহার আদেশে সৈন্তদের হাসিমুখে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে আমি দেখিয়াছি। তাঁহাকে হাসপাতাল পরিভ্রমণ করিতে এবং রোগীদের উৎসাহ ও সান্ত্বনা দিতে, বিভিন্ন শিবির পরিদর্শন করিয়া সৈন্তদের অবস্থার কথা সাগ্রহে অনুসন্ধান করিতেও তাঁহাকে দেখিয়াছি। কিন্তু এবারের অভিজ্ঞতা নূতনতর; কারণ, এই সময়ে তিনি জঙ্গল-যুদ্ধের সকল বিপদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাদের প্রত্যেকের ভাগ্যেরই অংশ গ্রহণ করিতেছিলেন।

যাহা হউক্, দুই দিন পরে ২৬শে তারিখে আমরা পেগুতে পৌঁছিলাম। জাপানীরা অপসরণের সময় সেতুগুলি নষ্ট করিয়া দেওয়ার ফলে আমাদের লরীগুলি আর অগ্রসর হইতে পারিল না। অথচ এদিকে শত্রুরা আমাদের পশ্চাতেই থাকার জন্য কোন রকম আলোচনা করার বা যান-বাহনের অন্য ব্যবস্থার জন্য অপেক্ষা করিবার সময় আমাদের ছিল না। তাই নেতাজী এবং আমরা সকলে নিজ নিজ সাজ-সরঞ্জাম, রাইফেল এবং আমাদের জরুরী রেশন পিঠে করিয়া হাঁটিতে শুরু করিলাম। আমাদের দুর্ভোগের মাত্রা বাড়াইবার জন্য ভীষণ জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রধান রাস্তাগুলি এবং রেল-লাইনের পথ বিমান আক্রমণের পক্ষে উন্মুক্ত বলিয়া আমরা জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। জমি কর্দমাক্ত হওয়ায় আমাদের মিলিটারী বুটগুলিও বিশেষ কাজে লাগিতেছিল না। বৃষ্টিতে আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ ভিজিয়া গিয়াছিল এবং পিঠের বোঝাগুলি আরও ভারী হইয়া উঠিয়াছিল। পুরুষ এবং নারীতে কোন পার্থক্যই ছিল না এবং 'রাণীরা' (ঝান্সীর রাণী বাহিনীর সভ্যারা) এইরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হইবার জন্য ভাল ভাবেই প্রস্তুত ছিল। এরূপ ভাবে পথ চলা খুব কষ্টসাধ্য হইলেও আমাদের মধ্যে স্বয়ং নেতাজীর উপস্থিতিই আমাদের যথেষ্ট উৎসাহ ও আনন্দ দিতেছিল। তাঁহার চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণী শক্তি যে কিরূপ ছিল, তাহা শুধু তাহারাই অনুভব করিতে পারে যাহারা একবারও তাঁহার নিকটে যাইবার সুযোগ পাইয়াছে। ভগবান যদি আবার সুযোগ দেন, তাহা হইলে আমরা নেতাজীর জন্য স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে ও সানন্দে শতবার এইরূপ দুঃখ-কষ্ট বরণ করিব।

ইতিমধ্যে মেশিন গান হইতে গোলাবর্ষণের ফলে আমাদের সঙ্গের রেশন সব নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাই সেদিন আর আমাদের কিছু খাওয়া হইল না। নেতাজী আমাদের মধ্যে থাকিয়া আমাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিলে আমরা বিনা খাদ্যেও চালাইতে পারি। আমরা ভাবিয়াছিলাম, নেতাজী যদি লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর জন্য এত দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে বরণ করিতে পারেন, আমাদের তাহা হইলে ইহার শত গুণ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে পারা উচিত। আমরা যে মেয়ে—এ চিন্তাই আমাদের কাহারও মাথায় ছিল না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের আমরা স্বেচ্ছাকর্মী, তাই আমরা যে এরূপ অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছিলাম, ইহাতে আমরা আনন্দিতই হইয়াছিলাম। দুই দিন পথ চলার পর আমরা 'উয়ো' (Woh) নামক স্থানে পৌঁছিলাম। এত দিন জঙ্গল, শত্রু, অন্ধকার, বৃষ্টি এবং ক্ষুধার বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল; কিন্তু এখানে আর একটি বাধা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল। পথের মধ্যে ছিল একটি নদী। আমাদের মধ্যে যাহারা সাঁতার কাটিতে পারিত তাহারা ঐ নদী পার হইতে অপরদের সাহায্য করিয়াছিল। একসঙ্গে সাধারণ বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট ভোগের মধ্য দিয়া পরস্পরের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয়। আমাদের বিপদ-আপদের সময় আমরা পরস্পরের মধ্যে সখ্যতা ও প্রীতির দৃঢ় বন্ধনের যথেষ্ট পরিচয় পাইতাম।

যদিও আমরা ঠাণ্ডায় কাঁপিতেছিলাম, ক্ষুধার্ত হইয়াছিলাম এবং আমাদের প্রতি পদক্ষেপেই আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম, তবুও আমরা অন্তরে কেমন একটা আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। কারণ, আমরা কখনও কাহারও সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করি নাই, আমরা কাহাকেও দমন করিতে চাহি নাই এবং আমরা কোনও দল বা ব্যক্তিবিশেষকে ঠকাইতেও চাহি নাই। আমাদের উদ্দেশ্য খুবই সহজ ও সাধারণ। আমরা আমাদের জন্মভূমির মুক্তি চাহিয়াছিলাম—যে মুক্তি আসিলে দেশজননী নিজেই তাঁহার ভাগ্য পরিচালনা করিতে এবং মানবতার ক্রমোন্নতির পথে সহায়ক হইতে পারিতেন। পথ যতই বিঘ্নসঙ্কুল এবং সংগ্রাম যতই সুদীর্ঘ হোক্ না কেন, আমরা এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার সঙ্কল্পই গ্রহণ



লেঃ জানকী দেভর লেঃ তপতী দেভর

করিয়াছিলাম। পেগু হইতে মৌলমিন যাত্রাকালে আমাদের যে দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল আজও তাহা অটুট আছে।

কি বলিতে কি বলিতেছি। আমরা যখন নদীর অপর পারে পৌঁছিলাম তখন আমাদের অবশিষ্ট পোষাক-পরিচ্ছদগুলিও জলে ভিজিয়া গিয়াছে। অল্প আগুন জ্বালাইয়া আমরা নিজেদের শরীর একটু গরম করিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম। আমরা অত্যন্ত সাবধান ও সতর্ক ছিলাম; কারণ শত্রুর দ্বারা আমাদের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং নেতাজীও সেই সময় আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নেতাজী একটি বাড়ী ঠিক করিয়া সকলকে সেখানে যাইতে বলিলেন। ঝান্সীর রাণী বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবিকাদের জন্ম নেতাজীর বিশেষ আগ্রহের কথা উল্লেখ না করিয়া পারি না। আমরা পছন্দ না করিলেও নেতাজী সর্ব্বদাই আমাদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিতেন। আমাদের প্রতি সাধারণ ব্যবহার আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বেচ্ছাসেবকদের অপেক্ষা ভাল ছিল। এখানে একটি কথা বলা বোধ হয় আমার পক্ষে অন্যায় হইবে না যে, আমাদের প্রতি নেতাজীর এইরূপ ব্যবহার কোন কোন মহলে ঈর্ষার উদ্রেক করিয়াছিল। কিন্তু নেতাজী ছিলেন এক জন 'জাত নেতা' (born leader) এবং এরূপ পরিস্থিতির উপযুক্ত ব্যবহার করিতে তিনি ভালই জানিতেন।

অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া আমরা পরিধানের ভিজা পরিচ্ছদ ও বুট শুদ্ধই ঘুমাইতে গেলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, হঠাৎ মেসিন গান হইতে প্রবল গোলাবর্ষণের শব্দে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমাদের আশ্রয়-গৃহটির ভিত্, শুদ্ধ যেন কাঁপিয়া উঠিল এবং আমরা ভাবিলাম, বোধ হয় আমাদের 'ডুমস্ ডে' উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের চারি দিকেই শত্রুপক্ষের গোলা পড়িতেছিল। নিতান্তই সৌভাগ্য বশত আমাদের মধ্যে কেহ আহত হয় নাই।

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আবার জঙ্গলের পথ ধরিলাম। আমরা আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদগুলি একটু শুকাইয়া লইতেও চেষ্টা করিলাম না, কারণ তাহা হইলে শত্রুর পক্ষে আমাদের অবস্থান নির্দ্ধারিত করিতে পারার সম্ভাবনা ছিল। আমরা ঐ দিন অল্প কিছু খাদ্যদ্রব্য পাইয়াছিলাম। প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, এ রকম সময়ে আমরা আবার পথ চলা সুরু করিলাম।

এইখানে আবার আমাদের দলটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং সৌভাগ্যবশত আমি নেতাজীর দলটিতেই ছিলাম। রক্তাক্ত পায়ে সমস্ত রাত্রি চলার পর পরদিন সকাল নয়টার সময় আমরা একটি ধানক্ষেতে পৌঁছিলাম। নানা প্রকার চিন্তা আমার মনে উদিত হইতে লাগিল। একবার নিজেকেই প্রশ্ন করিলাম—নেতাজী কেন এত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতেছেন? তিনি তো সহজেই একটি গাড়ীতে কয়েক দিনের মধ্যেই ব্যাঙ্ককে পৌঁছিতে পারিতেন? নিজের মনেই ইহার উত্তর পাইলাম—আমরা হলাম মুরগীছানা মুরগী-মাতা বা পালক আমাদের নিরাপত্তার জন্ম নিজেকে দায়ী মনে করে। নিরাপত্তার জন্ম স্থানান্তরিত করিতে আমাদের সকলকে যদি লরীতে পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে যে পরিমাণ গাড়ী বা লরী প্রয়োজন, আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট তখনই তাহা দিতে পারে নাই। তাই নেতাজী স্বয়ং হাঁটিয়া আমাদের সঙ্গে যাওয়া এবং আমাদের ভাগ্যের সমান অংশ গ্রহণ করাই স্থির করিয়াছিলেন! সম্ভবতঃ যে গুরু দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিতেছিলেন তাহার সচেতনতাই তাঁহার নিজের উপর এই শাস্তির বিধান দিয়াছিল।

পুনরায় আমাদের অবস্থিতির সন্ধান পাইয়া শত্রুপক্ষের বিমান হইতে গোলাবর্ষণ করা হয়; এবং এবারও আমরা অক্ষত অবস্থায় বাঁচিয়া গেলাম। বেলা ১২টার সময় আমরা একটি ছোট গ্রামে গিয়া পৌঁছিলাম। রেঙ্গুন পরিত্যাগ করার পর এখানে আমরা প্রথম পরিতৃপ্তির সহিত আহার গ্রহণ করিলাম। আমাদের সংবাদ-সংগ্রহকারী নেতাজীকে সংবাদ দিল যে, স্থানটি বিপজ্জনক এবং যত শীঘ্র আমরা ঐ স্থান ত্যাগ করিতে পারি ততই মঙ্গল। সুতরাং গভীর রাত্রে আমরা রওনা হইলাম এবং একটি নদী পার হইয়া 'সিটাং' নামক স্থানে আজাদ হিন্দ ফৌজের শিবিরে পৌঁছিলাম। আমরা এখানে গোছগাছ করিয়া বসিতে না বসিতেই বিমান হইতে গোলাবর্ষণ সুরু হইল। গোলাবর্ষণের ফলে এত ধুলা উড়িতে লাগিল যে, আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম। কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া বোমা বর্ষণ চলিতে লাগিল এবং আমাদের এক জন লোক আহত হইয়াছিল। তৎক্ষণাৎ তাহাকে চিকিৎসা করা হইল বটে, কিন্তু এক সপ্তাহ পরে সে মারা গেল। রাত্রে পথ চলিয়া এবং দিনের বেলা জঙ্গলে অবস্থান করিয়া আমরা ১লা মে তারিখে মার্তাবানে পৌঁছিলাম। পরদিন ফেরীতে পার হইয়া আমরা মৌলমিন গেলাম এবং সেখানে একটি ছোট কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কিন্তু ঐ অঞ্চলটিতে ভীষণ ভাবে বোমা বর্ষিত হওয়ার জন্ম আমরা একটি ধর্ম্মশালায় উঠিয়া গেলাম। ৭ই মে পর্য্যন্ত আমরা এই ধর্ম্মশালায় ছিলাম। এইখানে অবস্থান কালে এক দিন সকালে নেতাজী আমাদের যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমার স্পষ্টই মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন যে, দিল্লী যাইবার অনেকগুলি পথ আছে। যদি ইম্ফলের পথে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হন তবে তিনি অন্য একটি পথ ধরিবেন এবং দিল্লীতে গিয়া পৌঁছিবেনই।

নেতাজী মৌলমিনে থাকিলেন। আমরা আমাদের নেতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ৭ই মে তারিখে ট্রেণে ব্যাঙ্কক রওনা হইলাম। নেতাজীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ কালে আমাদের মনে কতই না ভয়-ভাবনার উদয় হইয়াছিল। তাঁহার মধ্যে আমরা কেবল আমাদের আশাই দেখি নাই; তাঁহার মধ্যে আমরা দেখিয়াছিলাম নবীন ভারতের এবং উন্নতির পথে এগিয়ে-চলা পৃথিবীর আশা ও ভরসা। নেতাজী আমাদের নিকট নিজেদের জীবন অপেক্ষাও বেশী প্রিয় ছিলেন, এবং আমাদের মধ্যে এমন এক জনও ছিল না যে, নেতাজীর জন্ম নিজের জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল না।

ষ্টেশনে যাওয়ার পথে লরীতে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলাম—কি অদ্ভুত মানুষ নেতাজী! আমাদের সকলেরই মনের উপর কি অপরিসীম প্রভাবই না তিনি বিস্তার করিয়াছিলেন। মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে পূর্ব-এশিয়ায় শুধু ভারতীয়দের মধ্যেই নহে, সকল সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যেই তিনি এক গভীর পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছিলেন।

মৌলমিনে আমি যখন তাঁহাকে আমাদের সঙ্গে আসার জন্ম অনুরোধ জানাইয়াছিলাম, তখন তিনি আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন এখনও তাহা আমার কানে বাজে। গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে

তিনি বলিয়াছিলেন,—"লেফ্‌টেন্যান্ট দেভর, চিন্তা কোর না। শত্রুরা কোন দিন আমাকে জীবন্ত বা মৃত কোন অবস্থাতেই নিতে পারবে না।" কথাগুলি ভবিষ্যদ্বাণীর মতই তিনি বলিয়াছিলেন।

কিন্তু মেষ-পালক কি আবার তাঁহার বিক্ষিপ্ত মেষদের একত্রিত করিবেন না?

জয় হিন্দ!

(শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বাংলায় অনূদিত)

রূপসাধনা

বন্দনা দাসগুপ্ত

সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয় মুখে—তাই রূপ-চর্চ্চায় মুখের শ্রীবৃদ্ধি করার কথা সব চেয়ে আগে মনে পড়ে। প্রসাধনের প্রথম কাজ হচ্ছে প্রসাধনের বেস্ বা ভিত্তি তৈরী করা। বাজারে তৈলাক্ত ও জলীয় দু'রকম বেস্ই কিনতে পাওয়া যায়। কখন কখন একই কোম্পানীর জলীয় ও তৈলজাতীয় উভয় রকম বেস্ই পাওয়া যায়। বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী উভয়ই ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। এই দুই জাতীয় বেসের মধ্যে জলীয় বেস্ই ভাল, বিশেষ করে কালো মেয়েদের পক্ষে। কারণ জলীয় বেস্ অনেকক্ষণ মুখের প্রসাধনকে অটুট ভাবে বজায় রাখতে সাহায্য করে; তা ছাড়া বাইরের হাওয়া কিংবা রোদে জলীয় বেস্ সহজে তৈলাক্ত হয় না।

সব সময় সকলের পক্ষে এই সব প্রসাধনী কিনে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না বা পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে সামান্য ২।৪ পয়সার সাদা রঙ যে কোনো কেমিষ্টের দোকান থেকে কিনে জলের সংগে মিশিয়ে বেস্ তৈরী করে ব্যবহার করা চলতে পারে।

সর্ব্বপ্রথম সাবান দিয়ে মুখ ও গলা ভাল ক'রে ধুতে হবে—যাতে কোনো রকম ময়লা ও তৈলাক্ত ভাব মুখে না থাকে। তার পর এক টুকরো স্পঞ্জ বা তুলো (দরকার হ'লে নরম পুরানো কাপড়েও চলে) দিয়ে জলীয় বেস্ গলা থেকে চুল পর্য্যন্ত, রঙের তুলির টানের মত টেনে দিতে হবে। ২ ১ মিনিটের মধ্যে ঐ বেসের জলীয় ভাব শুকিয়ে গেলে তার উপর একটু বেশী পাউডারের প্রলেপ ভাল ভাবে দিতে হবে, তার ২।১ মিনিট পর খুব নরম ব্রাশ দিয়ে মুখের ঐ পাউডার ঝেড়ে ফেলতে হবে। এতে পাউডার সর্ব্বত্র সমান হ'য়ে মিশে যাবে ও অতিরিক্ত পাউডারের অংশ ব্রাশের সঙ্গে চলে আসবে, এ ছাড়া পাউডারের কৃত্রিম রেখাও আর দেখা যাবে না।

প্রসাধনের দ্বিতীয় কাজ হ'ল গালে রঙ লাগানো। যাঁরা গালে রঙ লাগান, তাঁদের এই পাউডার মাখার পরই গালে রঙ লাগাতে হবে।

গালের রঙের পক্ষে শুক্‌নো রঙই (রুজ) ভাল ও সুবিধাজনক, বিশেষতঃ জলীয় বেসের উপর। কারণ জলীয় বেসে শুক্‌নো জিনিষটা চট্ ক'রে ধরে ও অনেকক্ষণ মুখে থাকে। প্যাডের চেয়ে ব্রাশে ক'রে লাগানোই ভাল। পাউডার ও রুজের জন্য পৃথক্ পৃথক্ দু'টি ব্রাশ রাখা উচিত। কারণ, ব্রাশে একবার লাল রঙ লাগলে সে রঙ আর ছাড়ানো যাবে না। রুজ লাগাতে হবে এমন পরিমাণে যাতে গাল অস্বাভাবিক লাল না হ'য়ে যায়। গালের রঙ বেশী হ'লে যে শুধু অস্বাভাবিক হবে তাই নয়, আলোর তারতম্যে কালো দেখাবে। স্বাস্থ্য প্রকাশ পায় গোলাপী আভায়, তাই রুজটা কম লাগানোই উচিত।

মুখের কাঠামোর উপর নির্ভর করে—রুজ কোথায় কী রকম ভাবে লাগাতে হবে। গোল মুখে রুজ লাগাতে হয় নাকের কাছাকাছি, তাতে মুখটা অপেক্ষাকৃত রোগা ও লম্বা দেখায়—আর লম্বা রোগা মুখে অল্প পরিমাণে রুজ—নাকের কাছ থেকে আঙুল ২ ৩ বাদ দিয়ে চোখের নীচে দিয়ে গালের অনেকটায় লাগালে, মুখটা পূরন্ত ও ঢল-ঢলে দেখায়। শুধু এই নয়, যাদের গোল মুখ বা গাল ফোলা, তাদের রুজের প্রলেপের টান একটু তেরছা ভাবে নীচের থেকে উপর দিকে হওয়া উচিত; এতে মুখ লম্বা ও সুশ্রী লাগে। আর রোগা লম্বা মুখে রুজের প্রলেপের টান—চোখের নীচ থেকে কিছুটা নীচ থেকে উপরে হবে ও গালের উপর থেকে নীচে ক্রমশঃ হাল্কা ক'রে টেনে এনে মিলিয়ে দিতে হবে, এতে মুখের শীর্ণতা দূর হবে ও আলগা এক শ্রী আসবে। সব শেষে রুজকে ঘষে গালের পাউডারের সংগে এমন ভাবে মিলিয়ে দিতে হবে, যাতে রুজের লাল গোল দাগ কোনো মতেই না দেখা যায়।

এর পর আসবে ঠোঁটের প্রসাধন। ঠোঁটের গঠন যেমনই হোক না কেন, 'লিপষ্টিক' দিয়ে ঠিক মানানসই ক'রে নেওয়া যায়। যদি উপর কিংবা নীচ, যে কোনো ঠোঁট অপরটার চেয়ে বেশী পুরু হয়, তা হ'লে অপেক্ষাকৃত পাতলা ঠোঁটে রঙ দিয়ে মোটা ক'রে সমতা রক্ষা করা যায়। অস্বাভাবিক ছোট মুখের হাঁ-কে স্বাভাবিক ও সুন্দর করতে হ'লে ঠোঁটের দু'ধারে একটু বেশী ক'রে 'লিপষ্টিক' দিয়ে হাঁ বড় ক'রে দেওয়া যায়, আবার হাঁ যদি বড় হয় তবে যতখানি দরকার ততটায় 'লিপষ্টিক' লাগিয়ে বাকীটাতে সাদা রঙ দিয়ে বড় হাঁ-কে ছোট ও সুন্দর করা চলে। ঠোঁটের দুই কোণে রঙ দিয়ে একটু উপর দিকে তুলে দিলে অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখেও হাসির ভাব ফোটানো যায়।

কিন্তু এত খুঁটিনাটি হিসেব করে 'লিপষ্টিক' ব্যবহার সাধারণতঃ কেউই করে না। আর তাছাড়া দিনের আলো ত 'লিপষ্টিক'এর এত কারুকার্য্য তত ভালও দেখায় না। রাতের সজ্জায় বা রংগমঞ্চের প্রসাধনের পক্ষেই এ ধরণের 'মেকাপ' শোভা পায়।

মুখে পাউডার ও রুজ মাখার পরই ঠোঁটের প্রসাধন ব্যবহার করা উচিত। কারণ মুখে পাউডার মাখার সময় ঠোঁটে পাউডার লেগে যায় বা লেগে যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা। এতে ঠোঁট শুষ্ক ও রুক্ষ দেখায়, তাই পাউডারের এই চিহ্ন দূর করার জন্য পরে 'লিপষ্টিক' মাখা উচিত, তাহ'লে ঠোঁটের শুষ্কতাও দূর হয় এবং পাউডারের রুক্ষ অংশও চ'লে যায়। 'লিপষ্টিক' মাখার সময় আর একটা জিনিষের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে এই রঙকে স্বাভাবিক দেখাবার জন্য কতটুকু রঙ ব্যবহার করতে হবে তার পরিমাণ। 'লিপষ্টিক' খুব ঘোর ক'রে মাখা উচিত নয়। অনেকে খুব হালকা রঙের 'লিপষ্টিক' কিনে ঘোর ক'রে ঠোঁটে লাগান; এ রকম না করে বরং ঘোর রঙের 'লিপষ্টিক' ব্যবহার করা উচিত—তবুও গাঢ় ক'রে ঠোঁটে রঙ দেওয়া উচিত নয়। হাল্কা ক'রে 'লিপষ্টিক' মাখলে রঙ মাখার কৃত্রিমতা অনেকাংশে দূর হয়।

এ ছাড়া আলোর প্রতি দৃষ্টি রেখে 'লিপষ্টিক' ব্যবহার করা উচিত; কারণ আলো দিনেই হোক্ কি রাত্রেই হোক্ উপর থেকে এসে

পড়ে, ফলে নীচের ঠোঁটে আলো বেশী পড়ে আর উপরের ঠোঁট সেই তুলনায় অন্ধকার থেকে যায়। সেই জন্য উপরের ঠোঁটের রঙ নীচের ঠোঁটের থেকে কাল দেখায় ও অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করে। কাজেই সমতা রক্ষার জন্য উপরের ঠোঁটের চেয়ে নীচের ঠোঁট একটু বেশী ক'রে রঙ লাগানো উচিত।

বাস্তবিকই এই 'রুজ' ও 'লিপষ্টিক'এর চলন আমাদের ভারতীয়দের মধ্যে যত কম হয় ততই ভাল। কারণ তাদের রঙ ও পরিপার্শ্বের সাথে এ দু'টো জিনিষের কোনোটাই সহজ ও সুন্দর ভাবে খাপ খায় না।

পাউডার মাখার পর ঠোঁটের রুক্ষতা ও শুষ্কতা দূর করবার সহজ ও সুন্দর উপায় হচ্ছে ঠোঁটের উপর 'ক্রীম'এর একটি প্রলেপ দেওয়া। এ শুধু বাইরের রোদ-হাওয়ার বিরুদ্ধেই ঠোঁটকে কোমল রাখে না, উপরন্তু ভারতীয়দের স্বাভাবিক লালচে ঠোঁটের সাথে এর সংমিশ্রণ এক নমনীয় কমনীয়তার সৃষ্টি করে ও সুন্দর স্বাভাবিকতা দেয়।

উপায় কি ?

করুণা দত্ত

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'বসুমতী'তে শিপ্রা দত্ত লিখিত "মেয়েদের লেখা-পেশা" প্রবন্ধটি পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। তিনি যে এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে অজস্র ধন্যবাদ।

তিনি বলিয়াছেন, "মেয়েদের লেখা-পেশা" পুরুষের অপেক্ষা উপযোগী ও সম্ভব। ইহা আংশিক ভাবে সত্য, কিন্তু এমন কয়েকটি বাধা আছে যাহাতে অনেক মেয়েদের সাহিত্য-চর্চ্চা ধারাবাহিক ভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে না। সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য।

মেয়েরা আজ-কাল পুরুষযাচিত বহুবিধ কর্ম্মে লিপ্তা হইতেছেন এবং প্রশংসার সহিত সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেছেন। সাংবাদিক, কেরাণী, লেখিকা, কবি হিসাবেও অনেক মহিলা প্রশংসা ও সম্মান লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা লোকচক্ষুর অন্তরালে নিরালা গৃহকোণে নীরবে বাণীর সেবা করিয়া থাকেন তাঁদের সম্বন্ধেই আমার বক্তব্য।

অনেক মেয়ে দেখা যায় স্কুল কিংবা কলেজে ছাত্রী অবস্থায় থাকা-কালীন চমৎকার লিখিতে পারিত—কবিতা লেখা, প্রবন্ধ কিংবা গল্প রচনা সব বিষয়েই তাহাদের সমান পারদর্শিতা ছিল। তাহার পর তাহাদের কুমারী-জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এ সকলের সমাপ্তি হইয়া যায়। বিবাহিত জীবনের নানাবিধ অবশ্য কর্ত্তব্যগুলি ভিড় করিয়া আসিয়া তাহাদের সাহিত্য-চর্চ্চার পথ বন্ধ করিয়া দেয়।

আজ মেয়েদের এই উচ্চশিক্ষার যুগে—মেয়েদের লিখিবার শক্তি সত্যই আদরণীয় এবং সেকালের ন্যায় শ্বশুরগৃহে এ সকল চর্চ্চা করিবার জন্য নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয় না ইহাও সত্য। কিন্তু মধ্য-বিত্ত পরিবারে মেয়েদের এ সব চর্চ্চা রাখিবার সাহায্য কে করিবে? শুধু লিখিয়া যাইলেই হয় না—তাহারা যাহা লিখিতেছে, যাহা রচনা করিতেছে তাহা উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট হইতেছে—কে বিচার করিবে? কে তাহা সংশোধন করিবে? এ-সকল সাহায্য ব্যতীত সাহিত্য সাধনা কোন রকমেই অগ্রসর হইতে পারে না।

বিবাহের কিছু দিন পর—সাংসারিক কার্য্য বুঝিয়া লইবার পর কিছু কিছু অবকাশ পাওয়া যায়। সেই অবসরটুকু সাহিত্যচর্চ্চায় অতিবাহিত করা যায়। যে সকল মেয়েদের এ বিষয়ে উৎসাহ দিবার লোক আছেন তাঁহারা উৎসাহ পাইয়া এ চর্চ্চা বজায় রাখিতে পারিবেন। কিন্তু যাঁহাদের তাহা নাই তাঁহারা কি করিবেন?

আমি জানি, এমন অনেকে আছেন যাঁহারা নীরবে সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া যান, তাঁহাদের সে চর্চ্চায় উৎসাহ দিবার কেহ না থাকাতে সে সকল রচনা চিরদিনই অন্ধকারে রহিয়া যায় অথবা মুকুলেই ঝরিয়া পড়ে। বাঙালী মেয়েদের স্বামীরা এ বিষয়ে কিছু উৎসাহ দিতে পারেন কিন্তু তাঁহাদেরও সে সময় আর্থিক উন্নতি করিবার সময়—ভবিষ্যৎ জীবনে স্ত্রী-পুত্রকে সুখে রাখিবার চেষ্টায় নিজেকে কায়মনোবাক্যে নিয়োজিত করেন। কোথায় পত্নী সাহিত্যচর্চ্চা করিতেছে তাহা ভাবিবার অবসর কোথায়? এমন হইতে পারে, তিনি যখন অবসর গ্রহণ করিয়া বেদান্তের ভাষ্যের উপর টীকা করিতে ব্যস্ত থাকিবেন তখন তাঁহার মনে পড়িয়া যাইবে পূর্ব্বের কথা। এই অবসরগ্রহণ-কালীন সাহিত্য-সাধনার ফাঁকে ফাঁকে মনে করিবেন গৃহিণী এক কালে সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন এবং তাহা লইয়া তাঁহার যৌবনের কর্ম্মব্যস্ত দিনগুলিকে ত্যক্ত করিতেন। তাহাতে কি লাভ? তখন যথেষ্ট দেরী হইয়া গিয়াছে। গৃহিণী তখন পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা, কন্যার শ্বশুরগৃহ লইয়া ব্যস্ত। কবে কোন্ দিন চাঁদিনী রাতে অথবা মেঘমেদুর দিনে তিনি উতলা হইয়া তাঁহার মনের ভাব ছন্দে গাঁথিয়াছিলেন—কোন্ দিন কোন্ সুচিন্তিত বিষয় লইয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন অথবা সাংসারিক নানা বৈচিত্র্য হইতে চমৎকার গল্প সংগ্রহ করিতেন তাহা বিস্মরণ হইয়াছেন—তাহা অঙ্কুরেই বিনাশ পাইয়াছে শুধু সামান্য উৎসাহবারি সেচনের অভাবে। অবশ্য যাঁহারা স্বামীর নিকট উৎসাহ পাইয়া থাকেন তাঁহাদের কথা বলিতেছি না।

এইরূপ কত মেয়ে আমাদের ঘরে ঘরে নীরবে সাহিত্য-সেবা করিয়া যাইতেছেন তাহার খোঁজ রাখে কে? শ্রীমতী দত্ত এ বিষয় উত্থাপন করিয়া যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের সমস্যা অন্য রকম। অন্দরে উৎসাহের অভাব—বাহিরেও তাহা নাই। মাসিক পত্রিকাগুলির 'দোর-গোড়ায়' পরিচিত কাহারো পরিচয়-পত্র ব্যতিরেকে যাইবার উপায় নাই—লিখিবার শত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও। মাসিক পত্রিকাগুলি যদি এ বিষয়ে পক্ষপাতিত্বশূন্য হইয়া সাহায্য করিতে পারিত, তাহা হইলে আমরা অনেক সুযোগ ও সুবিধা পাইয়া উপকৃতা হইতে পারিতাম। মহিলাদের একান্ত ভাবে স্বতন্ত্র কতকগুলি মাসিক পত্রিকা থাকিলে হয়তো সুবিধা হইত। কিন্তু যে কয়েকটি আরম্ভ হইয়াছিল তাহাও প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্ব্বেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

'মেয়েদের লেখা-পেশা'টি তাঁহাদের 'শরীর ও মনের উপযোগী'ও বটে এবং গৃহস্থালীর মধ্যে সুখ-দুঃখের এত বৈচিত্র্য রহিয়াছে যে তাহা সাহিত্যচর্চ্চার বিশেষ সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু শুধু তো চর্চ্চা রাখিলেই হয় না, তাহার পুষ্টি সাধন হওয়া চাই,—তাহা মার্জ্জিত হওয়া চাই, তাহা হইলে সে সকল বাণীর পূজার যোগ্য হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে যে সকল সুযোগ ও সুবিধা পাওয়া উচিত তাহা অন্তঃপুরিকারা কোথায় পাইবেন?



ছোটদের আসর

মানুষের বন্ধু এক্সরে

শ্রীঅতুলচন্দ্র সরকার

মস্ত বড় সংসার। বাড়ীতে যেন একটা ছোট-খাট ছেলে-পিলের হাট। দৌড়-ঝাঁপ লাফালাফি এ তো লেগেই আছে সর্ব্বক্ষণ। 'চোর পুলিশ' খেলার সময় চুণী তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে হোঁচট খেয়ে গড়াতে গড়াতে গিয়ে পড়ল একেবারে নীচ-তলায়, আর পড়েই অজ্ঞান। বাড়ীময় হুলুস্থুল। পাখা, জল, ডাক্তার, বরফ···। ছোটকর্ত্তা বাতের রুগী তিনি তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে এলেন। চুণীর মাথায় জল ঢালা হল! কিছুক্ষণ কেটে গেল। এইবার চুণী চোখ মেলে চাইল। "উঃ, বুকে কি অসহ্য যন্ত্রণা"—বলেই আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ল! ডাক্তার এলো কিন্তু কোন ফল হল না, কারণ নানা পরীক্ষা করেও বেদনার কারণ ধরতে পারল না। অবশেষে ডাক্তার চুণীকে মেডিকাল কলেজে নিয়ে যেতে উপদেশ দিল। সেখানে চুণীর বুকের এক্সরে ফটো তুলে দেখা গেল যে তার পাঁজরার দুটো হাড় মচকে গেছে! চিকিৎসা চলতে লাগল ভাল ভাবেই, কারণ, চুণীদের তো আর অর্থের অভাব নাই। ভাল চিকিৎসার ফলে কিছু দিনের মধ্যেই সে সুস্থ হয়ে উঠল। মৃত্যুর হাত এড়িয়ে সে আবার এসে দাঁড়াল তার বাপ-মায়ের মাঝে। এই যে তার বেঁচে ওঠা—এটা কার বাহাদুরী? ডাক্তারের? —না ডাক্তারের নয়। এ বাহাদুরী হচ্ছে এক্সরে ফটোগ্রাফীর। যদি এক্সরে ফটো নিয়ে চুণীর পাঁজরার হাড়গুলি পরীক্ষা করা না হ'ত তবে তার বুকের ব্যথার কারণ ধরা যেত না এবং সে বেঁচেও উঠত না। এমনি ধারা চুণীর মতন অনেক জীবনই এক্সরের দৌলতে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসে! এইবার মানব সমাজের এই পরমোপকারী বন্ধুটির জন্ম এবং বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব।

এক শতাব্দী পূর্ব্বের ঘটনা। উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক গিসলার বায়ুহীন কাচের নলের মধ্যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ চালিয়ে নানা প্রকার পরীক্ষা করতে করতে 'গিসলার টিউব' আবিষ্কার করলেন। কোলকাতার রাস্তায় বড় বড় দোকানে এবং মেট্রো প্রভৃতি সিনেমা হলে যে সমস্ত আলোর অক্ষরে লেখা বিজ্ঞাপন বা নিয়ন (Neon) দেখা যায় এগুলি এই 'গিসলার টিউবের' উন্নত রূপ।

বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক স্যার উইলিয়ম ক্রুক 'গিসলার টিউবকে' আরও উন্নত করলেন এবং এই টিউবের নাম দিলেন "ক্রুকস টিউব'। এই ক্রুকস টিউবে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালালে উজ্জ্বল সবুজ রংয়ের আলো নির্গত হ'ত এবং এই আলোকরশ্মি সরল রেখায় চলাচল করত। এই বিশেষ গুণযুক্ত আলোকরশ্মির নাম দেওয়া হল 'ক্যাথোড রশ্মি'। পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকেরা এই 'ক্রুকস টিউব'-নির্গত ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে গবেষণা করতে লাগলেন! বিখ্যাত হাঙ্গেরীয়ান পদার্থবিদ্ ফিলিপ লেনার্ড এই ক্রুকস টিউবকে একটা অ্যালুমিনিয়ামের পাত দিয়ে মুড়ে দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ক্যাথোড রশ্মি অনায়াসে অ্যালুমিনিয়ামের পাত ভেদ করে চলতে লাগল।

জার্ম্মাণীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর উইলিয়াম কনরাড রণ্টজেন ক্রুকস টিউব নিয়েই প্রথম প্রথম পরীক্ষা করছিলেন। কিছু কাল পরে তিনি এই টিউবের আকারের একটু পরিবর্ত্তন করেন। নিতান্ত খেয়ালের বশেই এক দিন তাঁর এই নূতন টিউবটাকে তিনি কালো ক্যানভাসের ব্যাগের মধ্যে আবদ্ধ করে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন যে, অদূরে রক্ষিত 'বেরিয়াম প্লাটিনো সায়েনাইড' নামক রাসায়নিক পদার্থ মাখান একটা লোহার পাত হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ করে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাতটাও আর উজ্জ্বল রইল না। এইবার রনজেন (Rontgen) বুঝতে পারলেন যে টিউব-নির্গত কোন আলোকরশ্মি অদৃশ্য ভাবে গিয়ে ঐ পাতে প্রতিফলিত হচ্ছে। তিনি টিউবের আলোক-নির্গমন বন্ধ করার জন্য নিজের হাত দিয়ে টিউবটা ঢেকে ধরলেন। কি আশ্চর্য্য! তাঁর হাতের চামড়া, দাস্তানা, মাংস ভেদ করে আলোকরশ্মি চলতে লাগল কিন্তু হাড়গুলি ভেদ করতে পারল না। আলোকরশ্মির এই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে তিনি বিস্মিত হলেন এবং এই অদ্ভুত রশ্মির নাম দিলেন X'Ray (X—অজ্ঞাত, Ray—রশ্মি)। কিন্তু তাঁর নাম অনুসারে কেহ কেহ এই রশ্মিকে রঞ্জন-রশ্মি বা Rontgen Rayও বলে থাকেন।

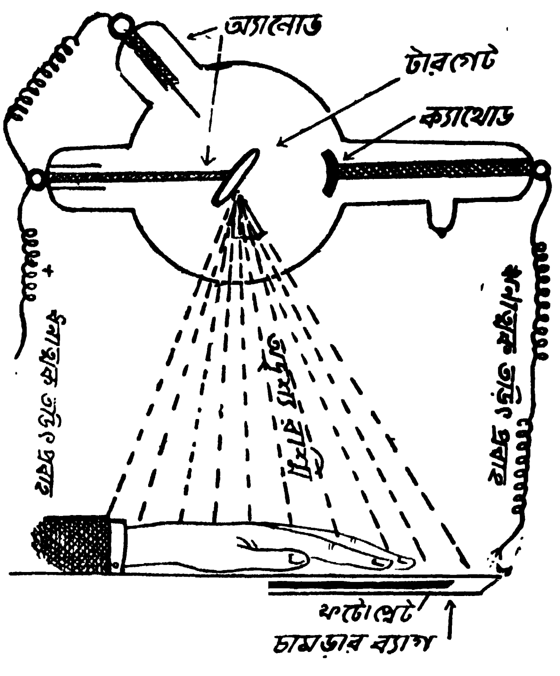
যে টেবিলের উপর রনজেন এই সমস্ত পরীক্ষা করেছিলেন সেই টেবিলের দেরাজে ছিল কতকগুলি 'ফটো-প্লেট'। দেরাজ খুলে তিনি দেখলেন যে, কাঠ ভেদ করে অজ্ঞাত রশ্মি প্লেটগুলিকে নষ্ট করে দিয়েছে।

এক্সরে-বাল্ব এবং তার গঠন প্রভৃতি নিয়ে এইবার কিছু ব'লে আমার কথা শেষ করব।

এক্সরে-বাল্ব দেখতে ঠিক সাধারণ বাল্বের মতনই গোল কিন্তু তার তিনটা মুখ থাকে। মুখগুলি নলের আকারে বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকে। তাদের মধ্যে একটা মুখের নল একটু লম্বা। এই

নলের মধ্যে একটা ধাতুর দণ্ড ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই ধাতুর দণ্ডটার মাথায় একটা, সামান্ত বাঁকা অ্যালুমিনিয়ামের গোল চাকতি লাগান থাকে। এই দণ্ডটাকে 'ক্যাথোড' বলা হয়। অন্ত মুখের নলের মধ্যেও অন্ত একটি ধাতুর দণ্ড আছে এবং এই দণ্ডটা প্রথম দণ্ডটার ঠিক সামনেই অবস্থিত এবং এর শেষ প্রান্তেও ঠিক প্রথম চাকতির মুখোমুখি অন্ত একটা ধাতুর চাকতি লাগান আছে। এই চাকতিটাকে টারগেট (Target) বলা হয়। তৃতীয় মুখের নলটা অপেক্ষাকৃত ছোট এবং এর নলের মধ্যে প্লাটিনাম (Platinum) টাঙ্গষ্টেন (Tungsten) বা অন্ত কোন ভারী ধাতুর একটা দণ্ড প্রবেশ করান হয়—এই দণ্ডের নাম 'অ্যানোড'। এইবার বাইরে থেকে যাতে বাল্বের ভিতর বায়ু ঢুকতে না পারে সেই ভাবে মুখগুলিকে বন্ধ করে দিয়ে বাল্বের ভিতর থেকে বাতাস বার করে দেওয়া হয়। এইবার প্রথম দণ্ড অথবা ক্যাথোডের সঙ্গে ঋণাত্মক বিদ্যুতের তার সংযুক্ত করা হয় এবং ২য় ও ৩য় দণ্ড—টারগেট ও অ্যানোডের সঙ্গে ধনাত্মক তার সংযুক্ত করা হয়। এই তো গেল মোটামুটি এক্সরে বাল্বের গঠনের কথা। এখন মনে কর, তোমার হাতের হাড়ের ছবি তুলতে হবে। এইবার একটা চামড়ার খামের মধ্যে ফটোগ্রাফের প্লেট নিয়ে তার উপরে হাতটা পেতে রাখ, তার পর হাতের ঠিক কিছুটা উপরে এক্সরে-বাল্বটা কিছুক্ষণের জন্য জ্বালিয়ে রাখ। এনভেলাপ থেকে প্লেটটা বাইরে নিয়ে ডেভেলপ করলেই তোমার নিজের হাতের হাড়গুলির ছবি দেখতে পাবে। এই রকম করে ফটো তোলাকে বলে 'রেডিওগ্রাফি' বা সোজাসুজি এক্সরে ফটোগ্রাফী।

ফটোগ্রাফ ছাড়া অন্ত অনেক কাজেও এক্সরে ব্যবহার করা হয়। মধ্যে মধ্যে শরীরে এই আলোক লাগালে না কি ক্যান্সার রোগ দূর হয়; কিন্তু এই আলোক শরীরে বেশী লাগালে হিত ছাড়া অহিতই বেশী হয়। কোন ধাতুর পাতের মধ্যে কোন ফাটল আছে



কি না তাও এক্সরে-ফটো তুললে ধরা পড়ে। গোয়েন্দা বিভাগে এক্স'রের আদর খুব বেশী। কোন সন্দেহজনক বাক্স বা পার্শেল তারা এক্সরে-ফটো তুলে পরীক্ষা করে থাকেন। একবার কোন এক সম্ভ্রান্ত ইংরেজের হাতের একটি দামী আংটী তার ঘর থেকে অদৃশ্য হয়। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই সে ঘরের মধ্যে সেই আংটিটি খুলে রেখেছিল। চাকরের উপরে সন্দেহ হওয়ায় গোয়েন্দা-কর্ম্মচারী চাকরের কাপড়-চোপড় প্রভৃতি তল্লাস করল কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। অবশেষে এক্সরে-ফটো তুলে চাকরের পেটের মধ্যে আংটাটা দেখতে পাওয়া গেল। এমনি করেই অনেক অপরাধীকেও এক্সরের সাহায্যে ধরা হয়। তাহলে এখন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এক্সরে আমাদের কত উপকারী বন্ধু।

ইলশে গুঁড়ি

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

হঠাৎ সকাল বেলা বৃষ্টি এলো :
নরম আবছা ভিজে ইলশে গুঁড়ি—
পূবের হাওয়ায় উড়ে জানলা দিয়ে,
হঠাৎ ভুরুর পরে স্পর্শ রাখে।

যেমন সকালে ঘাসে শিশির জমে,
তেমনি আলতো ভাবে ময়ূর মনে
পশমী রেণুর মত হাওয়ায় ভেসে
নরম মেঘের গুঁড়ো পড়ছে ঝরে;
কুহকী আকাশ থেকে ময়ূর মনে।

ফড়িঙ ফুলের ধুলো দু'পায়ে লেপে
যেমন সোনার রঙ পশমী করে,
চাতক চাতকী ঠিক তেম্‌নি ভাবে—
ইলশে গুঁড়ির রস পাখায় মেখে
টুকরো মাণিক যেন জ্বালিয়ে রাখে :
রঙীন রোমের পরে লাগায় মোম।

হঠাৎ শিশির যেন সকাল ভুলে—
ইলশে গুঁড়ির রূপে ইতস্তত:
রোদের গন্ধ মুছে হাওয়ায় ঝরে,—
তিসির ক্ষেতের ধারে, নদীর তীরে,
কিংবা সানের সিঁড়ি পুকুর-পাড়ে,
নরম হরিৎ ঘাসে, গাছের ডালে,
কনকচাঁপার বনে মুক্তো রেখে—
বন্দী মনের জ্বালা ধুইয়ে দিয়ে—
ইলশে গুঁড়ির সুরু হয়েছে ধরায়।

নরম আবছা ভিজে ইলশে গুঁড়ি—
পরম আবেশ ভরে স্বপ্ন ছিঁড়ে,
মেঘের ঝরাণো রঙে মাণিক গড়ে'—
হঠাৎ ময়ূর মনে আসন পাতে।

এক মিনিটের গল্প

ভাগ ক'রে খাওয়া

মনোজিৎ বসু

অনেক দিন আগেকার কথা।

এই বাঙলা দেশেরই এক ভদ্রলোক। নাম—প্রাণকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়। কে তাঁর নাম জানে, ক'জনাই বা খোঁজ রাখে। কিন্তু মানুষ হিসাবে তাঁর মতো লোক এ সংসারে ক'জনাই বা আছে? এ-যুগের মানুষ চায় আলাদা হয়ে থাকতে, আত্মীয়-স্বজনের দায় মুক্ত হয়ে একক বাস করতে। নিজের ভাগে অন্যে এসে ভাগ বসাক, এ-যুগের লোকেরা তা চায় না। তাই পারিবারিক জীবনে আগের যুগের মতো মিলনের আন্তরিকতা নেই, সেখানে দেখা দিয়েছে শুধু স্বার্থপরতা।

প্রাণকৃষ্ণ বাবুদের প্রচুর ঐশ্বর্য্য না থাকলেও, সংসারে খাওয়া-পরার কোনো অভাব ছিল না। তাই বাড়ির লোকজন ছাড়াও, প্রাণকৃষ্ণ বাবু পাড়ার কয়েক জন দরিদ্র ভদ্রলোককে নিয়মিত তাঁর বাড়িতে এনে খাওয়াতেন। তাঁদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে রোজ খেতে বসা—এটা ছিল প্রাণকৃষ্ণ বাবুর বহু দিনের অভ্যাস। তার মধ্যে তিনি কেমন যেন একটা আনন্দ অনুভব করতেন। তাঁর বড় ভালো লাগতো।

প্রাণকৃষ্ণ বাবু নিজে রোজগার করতেন, তা ছাড়া তার ছেলেও দু'পয়সা ঘরে আনতো। তাই, বাড়িতে রোজই খাওয়া-দাওয়ার পর্ব্বটা বেশ আনন্দের সঙ্গেই সমাধা হ'তো। অবশ্যি পোলাও, কালিয়া, মাংস না থাকলেও ডাল, তরকারী, মাছ, ভাত দিয়ে তাঁরা বেশ আনন্দের সঙ্গেই মিলে-মিশে খাওয়া-দাওয়া করতেন।

পাড়ার যে কয়েক জন লোক প্রাণকৃষ্ণ বাবুদের বাড়ীতে রোজ খেতে আসতেন—এক দিন যদি তাঁদের মধ্যে কেউ বাদ যেতেন, তা' হলে প্রাণকৃষ্ণ বাবুর মনটা সে দিন আর ততখানি খুসী থাকতো না। জায়গা খালি দেখলে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তো এই ভেবে যে, সে দিন সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে খাওয়া হ'লো না!

ইতিমধ্যে রোগে ভুগে প্রাণকৃষ্ণ বাবুর ছেলেটি এক দিন মারা গেল। প্রাণকৃষ্ণ বাবু দারুণ আঘাত পেলেন। সংসারে অভাব শুরু হ'লো ধীরে ধীরে। পাড়ার সেই ভদ্রলোকেরা আর খেতে আসেন না। গোপনে তাঁরা তাঁদের সাধ্যমতো প্রাণকৃষ্ণ বাবুকে সাহায্য করতে লাগলেন।

তিনি এক দিন তা টের পেলেন এবং দুঃখও পেলেন খুব। এক দিকে ছেলে নেই, অন্য দিকে আত্মীয়ের মতো পাড়ার সেই বন্ধুরাও আর খেতে আসেন না। এ দু'টোই তাঁকে বড় আঘাত দিল। তিনি তখন পাড়ার সেই ভদ্রলোকদের ডেকে বললেন—"দেখ ভাই, তোমরা আমাকে এ ভাবে তোমাদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করো না। আমার পক্ষে এই দুঃখের সময় তা সহ্য করা আরও কঠিন হবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভাঁড়ার একেবারে খালি না হয়ে যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা সেই আগের মতো ক্ষুদ-কুঁড়ো যা জোটে তাই সবাই একসঙ্গে ব'সে ভাগ ক'রে খাব।"

বল তো, এ-যুগে ক'জনা এমন পারে?



কেমনে যাই শ্বশুরবাড়ী?

মনোমোহন ঘোষ

ভাড়া ক'রে মড়ুঞ্চে এক গোরুর গাড়ী
নন্দগোপাল যাচ্ছিল তার শ্বশুর-বাড়ী
আগড়পাড়ার নিত্যানন্দ বসুর বাড়ী
আহ্লাদেতে বাহির ক'রে দাঁতের মাড়ী
খাবে ব'লে পক্ষী এবং পশুর কারী।
এমন সময় মুখে নিয়ে লম্বা দাড়ি—
মাথার ওপর বক্র ছুটো শৃঙ্গ নাড়ি'
ধেয়ে এলো ঘাড় গুঁজে এক দুম্বা ধাড়ী।
ঘাবড়ে গিয়ে নন্দ বাবুর ছাড়লো নাড়ী
ভাবলো, 'আমার পেট্‌টা বুঝি ফেললো ফাড়ি।'
গাড়ী ছেড়ে পড়্‌লো নেমে তাড়াতাড়ি
আগে ভাগে চারখানি পা'য় পড়লো তারি।
নন্দ বলে, 'বৌএর তরে কিনমু শাড়ী
আর নিয়েছি জয়নগরের মোয়ার হাঁড়ি
পেট্ ফাঁসালে কেমনে যাই শ্বশুরবাড়ী?'
দুম্বা বলে, 'সেথায় খাবি মসুর-কারী
এই প্রতিজ্ঞা করিস্ যদি, দেবো ছাড়ি!
তা'না হ'লে খাস যদি তুই পশুর কারী—
ঢুঁ মেরে তোর পেট্ ফাঁসিয়ে ফেল্‌বো মারি'।'
নন্দ বলে, 'এ কাজ তো নয় শক্ত ভারী
মসুর কেন? বলো তো খাই পাঁচন-জাড়ী।
দিলুম কথা—এবারে দাও দিতে পাড়ি।'
দুম্বা শুনে মাপ ক'রে দেয় কসুর তা'রি।
নন্দগোপাল আহ্লাদে যায় শ্বশুরবাড়ী॥





ছড়ার গল্প

(বুদের বৌ)

শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী

মনে করো, তোমাদের এই শান্তিনিকেতনের কাছেই ভুবনডাঙা গাঁয়ে এক চাষী গৃহস্থ ছিল। তার নাম বুদে ওরফে বুদ্ধীশ্বর। অবস্থা বেশ ভালো, খেয়ে-দেয়ে দিব্যি সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকে। বুদের ছিল বৌ। কোনো ছেলে-পিলে ছিল না। তাই বুদের বৌএর ব্রত-পার্বণ-উপবাসের খুব ধুম। ব্রত-পার্বণের জন্যে বৌ ঘন ঘন উপোষ করে, আর তারই গল্প পাড়ায় পাড়ায় ঘটা করে প্রচার করে বেড়ায় যেন সে খুবই ধার্মিক। আসলে সে ছিল ভয়ানক পেটুক। খাবার জিনিষ দেখ্‌লে তার জিভ লক্‌-লক্‌ করতো। স্বামীকে লুকিয়ে বৌ নানা রকম পিঠে-পরমান্ন তৈরী করে খেতো। কাউকে দিতো না, বুদেকেও না। বুদে ব্যাচারী অমন পরম ধার্মিক বৌএর হুকুম বে-ওজরে তালিম ক'রত আর ভোগের ঘি-ময়দা, চিনি, নারকেল, গুড় ইত্যাদি কিনে দিতো আর পুরুৎ ডেকে ডাক্‌তে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে পড়তো। আমাদের এ বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ে হিঁদুর বাড়ীতে ছোট-বড় ব্রত-পার্বণ তো লেগেই আছে. আর সেগুলো পালন করতে বুদের বৌএর ফুল তোলা, চন্দন ঘসা, নৈবিদ্দি সাজানো, বিশেষ করে থরে থরে ভোগ রাঁধা সমানে চল্‌তো।

পাড়ার লোকেরা কিন্তু বুদের বৌএর ব্রত আর আচার-বিচারের জাঁক দেখে ক্রমে সন্দেহ করতে লাগলো। যে বৌ মাসে-মাসে চাঁদে-চাঁদে এত ব্রত উপবাস করে, তার দেহখানা হাতীর মত নাদুস্‌-নুদুস্‌ জাঁদরেল হয় কেমন করে! তারা বুদেকে বল্‌তো—"তোর বৌএর বেরতো-উপবাস সব ভড়ং, ওগুলো তার পেট-পূজোর একটা অছিলা মাত্র। সরলপ্রাণ বুদে তা বিশ্বাসই করতো না—কিছুতেই না।

পাড়াতেই বুদের এক চালাক বন্ধু বল্‌লো—"তোমার বৌএর গুণ একদিন পরীক্ষা ক'রে দ্যাখই না লুকিয়ে লুকিয়ে। চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করেই নাও না।" বুদে রাজী হ'ল।

দু'-তিন দিন পরে বৌ বুদেকে বল্‌লো—"আজ আমার কুলোই পূজো। সারাটা দিন উপোষ ক'রতে হবে। তুমি বাজার থেকে ভোগের দেব্বো-সামগ্রী এনে দিয়ে মাঠে যাবার সময় পুরুৎ ঠাকুরকে ডেকে দিও। পূজো না সেরে তো জলস্পর্শ করতে পারবো না।" বুদে রাজী হ'ল।

জিনিষপত্র এনে দিয়ে বুদে মাঠে না গিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঘরের দাওয়ায় এক ধানের ডোলের মধ্যে লুকিয়ে থাক্‌লো বৌএর কীর্ত্তি দেখবার জন্য। চালাকী ক'রে পুরুৎ ডাক্‌তেও গেল না।

এদিকে বুদের বৌ আগের দিন রাত্রে লুকিয়ে বেশ পরিপাটী ক'রে সরের দই পেতেছিল। বাড়ীতে পান্তা ভাত তো থাকেই বুদের জন্য। বুদে মাঠে চলে গেছে মনে করে নিশ্চিন্দি হ'য়ে বৌ করলো কি—সেই সরের দই দিয়ে এক গামলা পান্তা ভাত—পূজোর পাকা কলা দিয়ে কলার পাতায় মেখে বেশ মজা ক'রে পেট ভ'রে সপাসপ্‌ মেরে দিল। তার পরে ঘরের দাওয়ায় আঁচল পেতে শুয়ে পাড়া-পড়সীদের শুনিয়ে শুনিয়ে কোঁকাতে লাগ্‌লো, যেন উপোস লেগে ভিরমী লেগেছে!

খানিক পরে এক মেছুনী এসে বল্‌লো—"মাছ নেবে গো বৌ? বড় বড় ভালো তাজা কৈ মাছ আছে।" মেছুনী বল্‌লো।

"তা দাও! আর, আমার তো আজ উপোস" বলে কোঁকাতে কোঁকাতে বৌ এক বাইস্‌ কৈ মাছ কিন্‌লো। মেছুনী চলে গেলে উঠোনের মাচা থেকে একটা কালো কুচ্‌কুচ জালি লাউ পেড়ে নিয়ে কুটে তাই দিয়ে দিব্যি করে চড়া নুণ-ঝালে সেই কৈ মাছ রেঁধে সেঁটে নিয়ে দাওয়ায় শুয়ে আবার সবাইকে শুনিয়ে কোঁকাতে লাগ্‌লো।

আর একটু বেলা বাড়লে গাঁয়ের কৃষ্ণ জেলে উঠোনে এসে হাঁক্‌লো—"মাঠাকরুণ, বড় ভালো টাটকা এলং মাছ এনেছি—একেবারে টাট্‌কা—"

"ওমা, ওমা, আজ আমার উপোস, আজ আমার বেরতো। দাও, কয়েক গণ্ডা কিনে রাখি, কত্তা এসে খাবে"—মিহি গলাটা কাঁপিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে কয়েক গণ্ডা মাছ কিনে নিলো। মাছ দেখে বৌএর জিভ লক্‌-লক্‌, পেটের খিদে ছক্‌ ছক্‌। ঘরের ভিতর গিয়ে বেশ করে নুণে-ঝালে 'খরো খরো' ক'রে এলং মাছ সাৎটা রেঁধে বৌ গণ্ডে-পিণ্ডে খেয়ে তৃতীয় বার উপোস সেরে নিলো।

উপোস এখনো শেষ হয়নি। বেলা প্রায় তিন প্রহর, পুরুৎ আসেননি এখনো। বৌ চারি দিক তাকিয়ে দেখে রান্না-ঘরের মধ্যে গেল। উনুনের উপর এক কড়া পুরু সরপড়া দুধ ছিল। একটা বড় বাটিতে সেই সরশুদ্ধ ঘন দুধ নিয়ে বাতাসা দিয়ে ঢক্‌-ঢক্‌ করে খেয়ে নিয়ে বৌ চার বারের বার উপোস সেরে চারি দিকে চেয়ে দেখে আবার দাওয়ায় শুয়ে "পুরুৎ এলো না—এত বেলা হল। বড্ড উপোস লেগেছে—আঃ আঃ" বলে কোঁকাতে লাগ্‌লো।

ব্যাপার-স্যাপার চোখের উপর দেখে বুদের আর সহ্য হল না। সে নিজেকে সাম্‌লিয়ে চুপি-চুপি ধানের ডোল থেকে বেরিয়ে সদর দরজা দিয়ে বাড়ীতে ঢুকে বললো—"তোমার কত দূর? ত্যাখো, পুরুৎ ঠাকুর আস্‌তে পারলেন না। তাঁর রেমোনিয়ার হয়েছে। তাই তিনি সব মন্তর আমায় লিখে দিয়েছেন। বেলা ঢের হয়েছে। তুমি পূজোয় বোসো। আমি মন্তর সব ব'লে দিচ্ছি—পড়ো।"

বৌ তাই ক'রল। উঠোনে ধুপ-ধুনো নৈবিদ্দি সাজিয়ে ঘোমটা দিয়ে ভক্তিতে গদগদ হয়ে গলায় কাপড় জড়িয়ে পূজোর ব'স্‌লো।

বুদে বলল—"এইবার আমি বলছি—মন্তর পড়ো।"—

"কান মুচ্‌ড়ে কলার পাত,
সবের দই আর পান্তা ভাত,
ও বৌ সাপুড়-সুপুড়!
এই তো কথা বটে?
দে ফুল-জল ঘটে॥

মন্তর শুনে পূজারিণীর চক্ষু চড়োক্ গাছ। কি আর করে! বুদের মন্তর চললো—

একবেশে কোই আলাঝাল',
গাছের লাউ ফালা-ফালা,
ও বৌ সাপুড়-সুপুড়!
এই তো কথা বটে?
দে ফুল-জল ঘটে॥
সাত এসংএর ঝোল
ও বৌ সাপুড় সুপুড় তোল
এই তো কথা বটে?
দে ফুল-জল ঘটে॥

মন্তর আরো চল্‌লো—

দুধ হ'ল সুধে,
ধানের ডোল মুড়ি দিয়ে বুদে,
ও বৌ হাপুস্-হুপুস্।
এই তো কথা বটে?
দে ফুল-জল ঘটে॥

বৌ পূজোয় ব'সে ভয়ে ঠক্-ঠক্ কাঁপ্‌ছে। বুদের মন্তর চল্‌লো—

সমস্ত দিন মাথায় ডোল।
মাথা মুড়ে তোর ঢালবো ঘোল॥
দুধ দই আর মাছের ঝোল।



বৃষ্টির জল

দিলীপ দে চৌধুরী

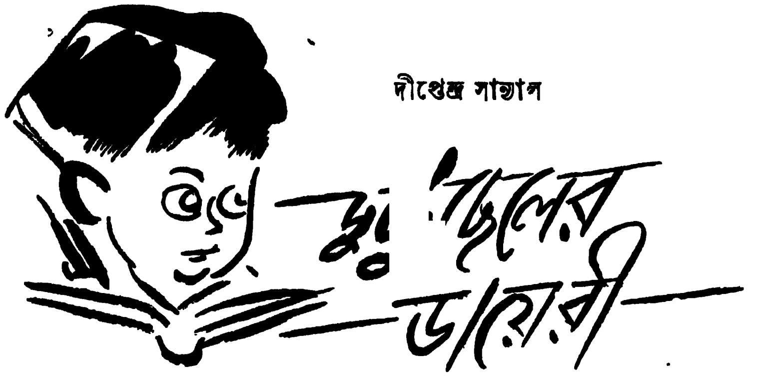
এলো—এলো—জল এলো—বৃষ্টির জল
ঝম্ ঝম্—ঝর্, ঝর্ ঝরে অবিরল—
বৃষ্টির জল!
এলো চেপে—
এলো ঝেঁপে—
এলো ক্ষেপে—
জল—
ধারা এ উতল!
বৃষ্টির জল।
বৃষ্টির জল—
খালি পায়ে খানিকটা ঘুরে আসি চল!
ওই দূরে—
খুব দূরে—
আসি ঘুরে—
চল—
কাঁপে টল মল
যেখানে ঝিলের বুকে বৃষ্টির জল!
আজকের বরষার বৃষ্টির জল।
নোতুন পাতায় আজ জল পড়ে ওই—
এখন ভালো কি লাগে পড়বার বই?
বই খুলে—
সব ভুলে—
দুলে দুলে—
তাই—
জল-ঝরা শব্দের গান শুনি ভাই!
খুব জোরে—
খুব তোড়ে
ছোটে কল-কল—
রাস্তার ড্রেনে আজ বৃষ্টির জল!
দেখে শুনে চুপ-চাপ থাকা যায় বল?
বৃষ্টির জল—
আজকের বর্ষার বৃষ্টির জল!

ও বৌ সাপুড় সুপুড় তোল॥
বুদের বৌএর বেরতো বটে।
দে ফুল-জল ঘটে॥

এই বলে মন্তর আউড়ে বৌএর পিঠে মারলো এক কিল—বিরাশী সিক্কা ওজনে। "এই তোর উপোস,—এই তোর বেরতোর ঘটা? পেটুক বৌ, তোমার হাড়ে-হাড়ে এত দুষ্টুমী? সারা দিন পেট ঢাক ক'রে খেয়ে উপোসের জাঁক দেখিয়ে বেড়াও!"

বুদের প্রহারের চোটে বৌএর উপোস ও ব্রত উদ্‌যাপন হ'য়ে গেল।

বুদের বৌ আর উপোস করে না, বেরতোও করে না।



দীপ্তেন্দ্র সান্যাল

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

শেয়ালদা ষ্টেশনের বিচিত্র কলরব মুহূর্ত্তে বিহ্বল কোরে দিল সাগরকে।

অবাক্ হয়ে সে চেয়ে-চেয়ে দেখছিল খানিকক্ষণ। এক জন কুলী এসে তার হাত থেকে ব্যাগটা কেড়ে নেয় আর কি? ব্যাগ সে নিজেই বয়ে নিয়ে যেতে পারবে। আবার এই একটা ব্যাগ নিয়ে যেতে কুলীভাড়া দেবে না কি সাগর? তাহলে তার চলবে কেমন করে? কোলকাতায় তাকে হুঁসিয়ার হয়ে চালাতে হবে। কোন রকমে নেমে পড়ে, সে ভীড় ঠেলে এগুবার চেষ্টা কোরতে লাগল।

আরও কয়েকখানা ট্রেণ দাঁড়িয়ে। গোলমালে সারা ষ্টেশনটা সাগরকে তাদের গাঁয়ের যাত্রার আসরকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু সেও এর কাছে কিছু নয়। তার পক্ষে এ ভীড় কল্পনা করা আগে অসম্ভব ছিল। গেটে গার্ডের লেখা সেই কাগজটা দিতেই ছেড়ে দিল তাকে।

কিন্তু আসল বিপদ দেখা দিল বাইরে আসার পর। এখন কোথায় যাওয়া যেতে পারে। ক্ষিদে পেয়েছিল সাগরের দুর্দ্দান্ত, কিন্তু খাবার চিন্তাই তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল বেশী। বাইরে এসে সাগর এদিক্-ওদিক্ তাকাচ্ছে—ভাবছে কি করা যায়, এমন সময় এক গাড়োয়ান তাকে বললে—'গাড়ী চায় কি না।'

সাগর তাকে জিজ্ঞেস করলে—'কাছাকাছি সস্তায় কোন হোটেল পাওয়া যেতে পারে, যেখানে থাকা এবং খাওয়া চলতে পারে কিছু দিন?'

গাড়োয়ানটা জবাব দিলে,—'হোটেল ত বাবু বলতে পারব না, তবে এ রকম মেসে নিয়ে যেতে পারি, খুব সস্তা আর যত দিন খুসী খাওয়া, থাকা চলতে পারে।'

সাগর বললে—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা হলেই হবে।' বলে সাগর তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছিল গাড়ীতে, কিন্তু কি ভেবে থেমে পড়ে জিজ্ঞেস কোরল—'কত ভাড়া দিতে হবে—তোমার গাড়ীর?'

গাড়োয়ানটা এবার হেসে ফেললে, তার পর হাসতে হাসতেই বললে, 'উঠুন না আপনি, আপনার কাছে কি আর নেব? আপনি ত খোকাবাবু আছেন এখনও।'

বৃদ্ধ গাড়োয়ানটার মুখের দিকে সাগর তাকাল একবার আগুন হয়ে, তার পর গাড়ীতে উঠে বসল। গাড়ী ছেড়ে দিয়ে গাড়োয়ান হাসতে লাগল আরো জোরে—আর সে হাসিতে আরো চটতে লাগল সাগর। এইবার খানিকটা সুস্থ হয়ে বসল সাগর। আগাগোড়া ব্যাপারটা যেন কেমন ম্যাজিকের মত মনে হোল তার। এই ত কাল এতক্ষণ কোথায় ছিল—আর আজ কোথায়? ভোজবাজির মত উবে গেল মহনাপুরের দীঘি, মাঠ, বাড়ী, ইস্কুল—আর দেখা দিলো, কোলকাতার বাড়ী, গাড়ী, রাজপথ।

এতক্ষণ মা'রা কি কোরছে—সাগর ভাববার চেষ্টা কোরল একবার। এতক্ষণে হৈ-হৈ পড়ে গেছে নিশ্চয়ই তাদের বাড়ীতে—হৈ-হৈ পড়ে গেছে সারা গাঁয়ে। ছেলেরা নিশ্চয়ই বলাবলি কোরছে তার কথা—কোথায় গেলো সাগর? দাদার কথা ভাবলো সাগর—'সারা বাড়ী বোধ হয় তোলপাড় করে ফেলছেন, ভাবছেন কোথায় যেতে পারে? বৃদ্ধ ম্যানেজার হারাণ বাবুর অবস্থাটা কল্পনা করল। সে চুল উস্কো-খুস্ক ভদ্রলোক বোধ হয় একবার ওপর একবার নীচ করছে আর মুখে সেই বুলি—'হায় ভগবান, এই ছিল তোমার মনে। জোড়া পাঁঠা দেব মা—ফিরিয়ে দাও ওকে।'

নায়েব মশাই বোধ হয় দাদাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, 'কিছু ভয় নেই, ও আজই ফিরে আসবে। কাছাকাছি কোথাও গেছে—ওই-টুকু ছেলে ও আবার কোথায় যাবে, আপনিও যেমন, বকেছেন তাই চলে গেছে—আবার রাগ পড়লেই ফিরে আসবে। আর ফিরে না এসে যাবে কোথায়? ও-রকম ত আমরাও কোরেছি কত বার, তাই বলে কি সত্যি সত্যিই চলে গেছি, আপনিও যেমন।'

সমস্ত অবস্থাটা কল্পনা কোরতে সাগরের ভারী মজা লাগল। মনে মনে খুসী যে হোল না একটু তাও নয়। কিন্তু মা আর ঝুণুর কথা ভাবতেই সাগরের চোখে জল এসে গেলো প্রায়। মা বোধ হয় না খেয়ে না দেয়ে কান্নাকাটি করছে কেবল। তাকে বোঝাতে যাওয়াই মিথ্যে। কালই ত মা তাকে নিজে হাতে খাইয়ে দিয়েছে।

আর ঝুণু! ঝুণু যে তার দাদাকে বড্ড ভালবাসে। কালও তার সঙ্গে সে ঝগড়া করেছে—আর আজ সকালে উঠেই সে যখন জিজ্ঞেস কোরবে, 'দাদা কোথায় গেলো মা'—তখন? বিষণ্ণ হয়ে উঠলো তার মন।

একটা কথা ভেবে সাগর আবার একটু ভয় পেলো। কোলকাতায় কেউ আসবে না ত তাকে খোঁজাখুঁজি করতে? কাগজে আবার ছবি বেরুবে না ত তার? তা হলেই ত মুস্কিল, না সাগরের কোন ভয় নেই। সে মনে মনে ভাবে। কোলকাতার এই এত লোকের মধ্যে কে আর তার খোঁজ নিতে যাচ্ছে। তাছাড়া এখানে সে অন্য পরিচয়ই ত দেবে সবাইকে। কেউ যদি ওখান থেকে আসেই এখানে, সেই বা টের পাবে কেমন করে? না, ধরা পড়বার ভয় নেই কোন। নিজেকে সান্ত্বনা দিতে থাকে সে।

হ্যাঁ, ভালো কথা, এখানে তার আসল নামটা কাউকে জানতে দেওয়া হবে না। অন্য কোন একটা নাম দিলেই চলবে। আর সাবধান হয়ে থাকতে হবে খুব, ভুল কোরে যেন নিজের নামটা না বেরিয়ে যায়। তাহলে ত সব শেষ।

এইবার টাকার কথা মনে পড়ল তার। হিসেব কোরে দেখল, সঙ্গে আছে দশ টাকার দু'খানা, পাঁচ টাকার একখানা নোট আর তিন-চারটে খুচরো টাকা। এতে কি এখনকার মত চলবে না? কত লাগতে পারে—খুব বেশী হলে ২০ টাকা—তা এক মাস ত চলুক,

তার পর দেখা যাবে। তার মধ্যে একটা কাজ কি আর সাগরের জুটে যাবে না? এত লোক কোলকাতায় কাজ করছে—আর সে পারবে না?

কিন্তু মেসে যখন তাকে জিজ্ঞেস কোরবে—সে এসেছে কিসের জন্যে? তখন—তখন সাগর কি বলবে তাদের? কেন, তাদের বললেই ত হবে যে সে কাজের খোঁজে এসেছে কোলকাতায়, তার কেউ নেই, হয়ত তাদেরই কেউ জুটিয়ে দিতে পারে কোন কাজ। সে দিক্ দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে সে।

একটা ছোট গলির মধ্যে এসে গাড়ী থামল। শীতের সন্ধ্যে। গ্যাসের বাতিগুলো একটা-দু'টো করে জ্বলে উঠছে। রাস্তায় ভীষণ ধুঁয়ো—ধুঁয়ো আর ধুলো কেবল। সাগরের যেন দম আটকে আসতে লাগল। গাড়োয়ানকে সে দু'টো টাকা বাড়িয়ে দিল—তার পর মেসের পুরানো দরজার কড়া ধরে নাড়তে সুরু কোরে দিল ভীষণ জোরে।

২

ভেতর থেকে কে এক জন বল্লো,—'সোজা চলে আসুন।'

দরজাটা জোরে ঠেলতেই খুলে গেল, সাগর ভেতরে ঢুকে পড়ল। একটা অন্ধকার ঘরের বাইরে একটা ভাঙ্গা বোর্ডের ওপর 'office' কথাটা মুছে অস্পষ্ট হয়ে গেছে প্রায়। সাগর যেতেই—ভদ্রলোক খানিকক্ষণ কি যেন লক্ষ্য করতে লাগলেন, তার পর ভারী গলায় জিজ্ঞেস করলেন,—'কি চাই?'

সাগরও তাঁকে দেখতে লাগল। ভদ্রলোকের বেশ বয়স হয়েছে। টাক-মাথা, খোঁচা খোঁচা দাড়ী, বিপুল ভুঁড়ি—সব মিলিয়ে চেহারাটি মনে থাকবার মত।

সাগর বল্লো—এখানে থাকবার মত ঘর আছে?'

'খুব আছে'—ভদ্রলোক অসম্ভব জোর দেন গলায়,—'থাকবার জায়গা আছে, খাবার ব্যবস্থা আছে, সব রকম সুবিধে আছে—কি চান?' একটু অস্বোয়াস্তি বোধ করেন তিনি সাগরকে আপনি বলতে,—তবু এখানে থাকতে এসেছে, তাবেই।

কিন্তু সাগর তাকে এর হাত থেকে রেহাই দিল। 'আমায় আবার আপনি কেন?'—লজ্জিত হয় সে। গাড়োয়ানের মুখে 'খোকাবাবু' শোনার রাগ তার জল হয়ে যায়।

'তা ত' বটেই, তা ত' বটেই—তবে কি না, তা তুমি ত আমার ছেলের মতই।—তা তোমার বাবা কি করেন?'

সাগর কোন জবাব দেয় না।

'তোমার বাবা কি বেঁচে নেই?—একটু যেন সহানুভূতির সুরই শোনা যায় মেস-ম্যানেজারের গলায়।

সাগর বলে—'না।'

'আহা' বলে থেমে যান ভদ্রলোক। কিন্তু হুঁসিয়ার আছেন তিনি—নিজের কাজ ভুললে তাঁর চলে না। একটু হেসে বলেন—'ভাড়াটা এক মাসের কিন্তু আমরা বাবা এখানে আগেই নি। যেখানকার যা নিয়ম বুঝলে কি না?'

'কত দিতে হবে আমায়?'—সাগর জিজ্ঞেস করে।

'বেশী নয়—দশটি টাকা মাত্র—তার তুলনায় রাজার হালে থাকবে বাবা।'

'বাঃ, খুব সস্তা ত'—মনে মনে ভাবে সাগর।—দশটি টাকা সে পকেট থেকে বার করে তাঁর হাতে দেয়।

টাকাটা দেখে নিয়ে একটা লম্বা খাতা বার করেন তিনি, তার পর প্রশ্ন করেন—'তা তোমার নামটি কি বাবা?'

ঢোঁক গিলে সাগর বলে—'রঞ্জন'—'রঞ্জন বসু।'

'বাঃ বাঃ, বেশ নামটি তোমার'—খাতা বন্ধ করে ম্যানেজার বলেন। দশটি টাকার সদ্য প্রাপ্তিতে খুসী তাঁর ধরছে না।

একটা চাকর আসছিল লণ্ঠন নিয়ে—তাকে ভদ্রলোক বলে দিলেন, 'উত্তর দিকের ঘরটায় ওকে নিয়ে যা। আর ঠাকুরকে বলে দে—আজ থেকে আর এক জন বেশী লোক হবে।' তার পর সাগরের দিকে ফিরে বলেন,—'তোমাকে খুব ভালো একটা ঘরে দিলাম। হাওয়া আর আলো যা পাবে। তোমারই মত আরেকটি ছেলে থাকে ওই ঘরে। বড় ভালো ছেলে আমাদের ডাকাত—হ্যাঁ ভয় পেও না,, ওর ডাক-নাম ডাকাত, ওকে আমরা ডাকাত বলেই ডাকি।'—বলে হাসতে লাগলেন তিনি।

সাগর সবে মাত্র এগিয়েছে, এমন সময় আবার ডাকলেন ম্যানেজার মশাই। 'তা এখানে কি তুমি কাজের আশায় এসেছ?'

বিনীত কণ্ঠে সাগর জবাব দিলে—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

তা' কাজ কি আর কিছু পাওয়া যাচ্ছে। বি-এ, এম-এ ঘুরে বেড়াচ্ছে বেকার। তা তুমি কত দূর পড়েছ?'

সাগর বললে—'ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়তে পড়তেই...'

'আহা'—তিনি একটু নরম গলায় বলেন—'তা দেখ চেষ্টায় কি না হয়, চেষ্টা করে দেখ। ডাকাতও ত খেটে খায়—তোমারই বয়সী হবে। তাই বলি ডাকাতের মত ছেলে হয় না।—সোনার ছেলে আমাদের ডাকাত।'

এইবার সাগর মুক্তি পায়। হাঁফ ছেড়ে বাঁচে সে। বাব্বাঃ, ওই অন্ধকার বদ্ধ-ঘরে তার দম আটকে আসছিল আর একটু হলে। কি করে ওই ঘরে মানুষ থাকে? সাগর ভেবেই পায় না। তার থাকবার ঘরও যদি ওই রকম হয়—তাহলেই ত হয়েছে! তবে ভাড়াটা নেহাৎই সস্তা বলতে হবে। মেসের আর সব লোকেরা এক একবার চোখ ফেলছিল সাগরের ওপর। সাগরও দেখছিল তাদের। এ রকম জীবন যেন কি রকম অদ্ভুত লাগে তার কাছে। লাগবেই ত। তার ময়নাপুর গাঁয়ে আকাশ উজড়-করা আলো আর উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হাওয়া—তার কাছে এ ত খাঁচার মত। খাপছাড়া আর কি? এইটুকু জায়গায় এমনি করে কেউ বাঁচতে পারে? কিন্তু উপায় নেই—সাগর ভাবে উপায় নেই।

মেসের চাকরটা যখন তাকে তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল,—ডাকাত তখন সবে মাত্র ফিরে এসেছে তার ঘরে।

ক্রমশঃ।

বিষ্ণুগুপ্ত

শ্রীরবিনৰ্ত্তক

১৯

পরের দিন ভোর বেলা ঢেঁড়া পেটানোর শব্দে রাজধানীর লোক হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বিছানায় শুয়ে শুয়েই শুনলে—'হে পুরবাসী সব, শোনো! মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত জানাচ্ছেন—মন্ত্রী রাক্ষস চর পাঠিয়ে বিষ দিয়ে আমাদের পরম উপকারী বন্ধু ম্লেচ্ছরাজ পর্ব্বতকের মৃত্যু ঘটিয়েছেন কাল রাতে। তাইতে ভয় পেয়ে তাঁর ছেলে কুমার মলয়কেতু রাতারাতি তাঁর ছাউনী উঠিয়ে নিয়ে নিজের রাজ্যে পালিয়ে গেছেন। ম্লেচ্ছরাজের শবদেহ আমরা সংকারের জন্যে সসম্মানে তাঁর ছেলের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনারা মৃতের প্রতি সম্মান দেখাতে রাজপ্রাসাদের সামনে এসে জমা হোন'।

ছায়াবাজির মতই পরের পর ঘটনা সব ঘটে গেল। কেউ কোন কথা তুললে না। কারণ, ম্লেচ্ছরাজকে কেই বা চিনত! তাঁর মরণে সাধারণ প্রজার কি আসে যায়! সকলেই ভাবলে হবেও বা, প্রতিহিংসা নেবার জন্যে রাক্ষস প্রথমে পর্ব্বতককেই মেরেছেন—এর আর আশ্চর্য্য কি! পর্ব্বতকও ত শত্রু বটে! তাকে মারায় রাক্ষসের নিশ্চয়ই স্বার্থ আছে! এই ভাবে পর্ব্বতককে মারার দোষ আর চাণক্য-চন্দ্রগুপ্তের উপর এসে পড়ল না। বরং মলয়কেতুকে না মারায় তাঁদের যে এ ব্যাপারে কোন হাত নেই, তাই সব লোকে বুঝল। মলয়কেতুকেও সে রাত্রে যদি চাণক্য মারতেন, তা হ'লে লোকের সন্দেহ হ'তে পারত। কিন্তু কুমার সদৈন্যে চ'লে যাওয়ায় লোকে ভাবলে সত্যিই গুপ্তচরের ভয়ে আর পিতৃ-শোকে কাতর হ'য়ে ম্লেচ্ছরাজ-কুমার অনেকটা নিরাপদ্ ভেবে নিজের পাহাড়ী রাজ্যে চ'লে গেছেন।

এই ভাবে চন্দ্রগুপ্তের দ্বিতীয় পর্ব্ব শত্রুনাশ হ'ল। পর্ব্বতক বাইরে মিত্র হ'লেও আসলে ত শত্রু—কারণ, সে যে রাজ্যের ভাগ দাবী ক'রে বসেছিল। এখন বাকী কেবল রাক্ষস। তাকে মারা চাণক্যের অভিপ্রায় নয়, জোর ক'রে বন্দী করাও তাঁর ইচ্ছা ছিল না। ইচ্ছা থাকলে তিনি মহাপদ্ম নন্দের তপোবনেই রাক্ষসকে নির্জ্জনে একলা শোকাকুল অবস্থায় পেয়ে অনায়াসেই প্রাণবধ বা বন্দী করতে পারতেন। কিন্তু তা চাণক্য করেননি। তাঁর ইচ্ছা ছিল বুদ্ধির যুদ্ধে হার মেনে রাক্ষস নিরুপায় হ'য়ে আত্মসমর্পণ করুন। তখন তাঁরই হাতে রাজ্যভার দিয়ে তিনি, ইন্দুশর্ম্মা ও শকটালকে নিয়ে তপস্যায় যাবেন বনে। যত দিন রাক্ষস হতাশ হ'য়ে নিজের ইচ্ছায় ধরা না দেন, তত দিন তিনি রাক্ষসের সঙ্গে বুদ্ধির যুদ্ধ চালাতে কোমর বেঁধে লেগেছিলেন। তার প্রথম দফা লড়াইয়ে চাণক্যেরই জিত হ'ল।

● ● ● ●

নন্দবংশের মূল পর্য্যন্ত উপড়ে ফেলে দিয়েছেন চাণক্য—কুশের মূল উপড়ে ফেলার মত। ম্লেচ্ছরাজ মরেছেন—রাক্ষসের বিষকন্যার হাতে —যাঁড়ের শত্রু বাঘে মেরেছে। ম্লেচ্ছরাজকুমার মলয়কেতু পলাতক চাণক্যের ভয়ে। আর বিষকন্যাটিকেও বেমালুম লুকিয়ে ফেলা হয়েছে —পাছে সে কোন অনিষ্ট করে ফেলে নিজের অজান্তে—কিংবা পাছে লোকে তার সন্ধান পেয়ে সব রহস্য বুঝে ফেলে—এই কারণে তাকে লুকিয়ে রাখার দরকার। এবার চাণক্য চার দিকে গুপ্তচরের জাল ফেল্লেন—জীবন্ত রাক্ষসকে সেই জালে জড়িয়ে টেনে আনতে।

চাণক্য জানতেন যে, রাক্ষস নিজে পালালেও তাঁর পরিবারবর্গকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেননি—তাঁরা সকলে রাজধানীতেই আছেন। কিন্তু কোথায় আছেন এত জানা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই তিনি রাজধানীতে প্রজাদের ঘরে ঘরে নানা ছদ্মবেশে চর পাঠিয়েছিলেন রাক্ষসের পরিবারদের খোঁজে। এক দিন সকালে এক জন চর যমপট নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হ'ল চাণক্যের কুটীরের দোরে। এখানে ব'লে রাখা ভাল যে চাণক্য রাজপ্রাসাদে থাকতেন না—কোন প্রকাণ্ড অট্টালিকাতেও তিনি বাস করতে রাজি হননি। নিজের শিষ্যদের নিয়ে রাজধানীর এক নির্জ্জন প্রান্তে পাতার কুটীর বেঁধে সেখানেই বাস করতেন। সেই কুটীরেই তিনি রাজা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য চালনার উপকার যাতে হয় এমন একখানি রাজনীতির বই লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। এই বইখানিই আজ-কাল কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' নামে পণ্ডিতদের কাছে বিখ্যাত হ'য়ে উঠেছে। ভারতীয় রাজনীতির এ রকম বই আর একখানিও নেই—অতি আধুনিক বিদেশী রাজনীতিকরা পর্য্যন্ত এখন এ বইএর ইংরেজী তর্জ্জমা পড়ে 'ধন্য ধন্য' করছেন। চাণক্য যখন এই বই লিখতেন, তখন এক জন ক'রে শিষ্য বাইরের দোরে পাহারায় থাকতেন—যাতে বাইরের আজে-বাজে লোক ঢুকে বিষ্ণুগুপ্তকে বৃথা বিরক্ত না করে—তাঁকে বই লেখার কাজে অন্যমনস্ক ক'রে না দিতে পারে!

যে দিন সকালে নিপুণক চর যমপট নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সেই কুটীরের দোরে এসে উপস্থিত হল, সেদিন যে শিষ্য দোরে পাহারায় ছিলেন, তিনি ত প্রথমেই তেড়ে গেলেন নিপুণককে মারতে। তিনি ত আর জানতেন না যে—লোকটি তাঁর গুরুর চর। চাণক্যের এমনই কৌশল ছিল যে, তাঁর শিষ্যগণ, বন্ধুরা, চরেরা কেউ কাউকে চিনত না, বা জানত না—আসলে কার কি মতলব। এর ফলে এক জন বিশ্বাসঘাতকতা করলে আর এক জনের কাছে ধরা পড়ে যেত—পরস্পর জানা-শোনা থাকলে ষড়যন্ত্র করার যে সুবিধা হয় তা তাদের ছিল না। কাজেই চাণক্যের শিষ্য যমপট হাতে নিপুণককে যে বাজে লোক ভেবে তেড়ে গেলেন—এতে তাঁর দোষ দেওয়া চলে না। নিপুণক তখন হেঁকে চলেছিল—'যমকে প্রণাম কর সকলে; এই দেখ—এই পটে আঁকা আছে কি পাপ করলে কোন্ নরকে গিয়ে কি রকম শাস্তি ভোগ করতে হয়, এ সব বুঝে পাপের পথ ছাড় সকলে'। শিষ্য তার কাছে গিয়ে সজোরে ধমক দিলেন— 'বা বেটা, এখানে গোলমাল করিসনি। প্রভু এখন কাজে ব্যস্ত আছেন'। নিপুণক নেকামির ভাণ ক'রে জিজ্ঞাসা করলে—'কে তোমার প্রভু? কার কুটীর এটা'? শিষ্য—'আহা, তাও জানিস্ না—নিরেট কোথাকার! এ যে আমাদের প্রভু কৌটিল্যের আশ্রম'। নিপুণক হেসে বলল—'তবে ত আমার ধর্ম্মভাইএর ঘর এটা। এখন পথ ছাড়ুন ত মশাই, ভিতরে গিয়ে আপনার প্রভুকে এই যমপট দেখিয়ে একটু উপদেশ দিয়ে আসি'। এ কথায় ত শিষ্য একেবারে অগ্নিশর্ম্মা—নিপুণককে এই মারেন ত এই মারেন—'কি বেটা! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমাদের আচার্য্যকে উপদেশ দিতে চাস্ এত বড় আস্পর্দ্ধা'! নিপুণক আবার নেকার মত ব'লে উঠল— 'তাতে কি? সকলেই ত সব কিছু জানে না'। শিষ্য আবার

রেগে উঠলেন—'কি! আবার ঐ কথা! আমাদের প্রভু সর্ব্বজ্ঞ—তুই তা জানিস্ না, না কি'! এবার নিপুণক হেসে বল্‌লে—'ওহে ঠাকুর মশায়! যদি আপনার প্রভু সর্ব্বজ্ঞই হন, তবে বলুন ত তিনি চাঁদকে কে দেখতে চায় না'। শিষ্য অবজ্ঞা ভরে উত্তর দিলেন—'হুঁ! এ আবার একটা জান্‌বার জিনিস! এ জানলেই বা কি, আর না জানলেই বা কি'!

দু'জনে এই রকম কথা-বার্ত্তা হচ্ছে, কুটীরের ভিতর থেকে চাণক্য তা শুনছিলেন। যেই তিনি শুনলেন—'চাঁদকে কে দেখতে চায় না', অম্‌নি বুঝলেন—তাঁর কোন চর চন্দ্রগুপ্তের শত্রুর খবর এনেছে।

নিপুণক তখন বলছিল—'যদি কেউ সমজদার থাকে তবে আমার প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইবে।' শিষ্য—'হুঁ, অসম্বদ্ধ প্রলাপ বক্‌ছিস্—তার আবার সমজদার'!

এই সময় কুটীরের ভিতর হইতে কৌটিল্যের গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল—'ওহে বাপু! যমপটওয়ালা! ভিতরে এস—সমজদার মিলবে তোমার'। শিষ্য আর কি করেন! ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পথ ছেড়ে দিলে। নিপুণক ভিতরে ঢুকল।

ভিতরে গিয়ে নিপুণক চাণক্যকে প্রণাম করে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে চাণক্য পুঁথি লেখা বন্ধ ক'রে বললেন—'কে নিপুণক! ভাল ত? এস, বস'। নিপুণক সসম্ভ্রমে মাটীর উপর বসল। চাণক্য জিজ্ঞাসা করলেন—'এবার খবর কি, বল'। নিপুণক বলতে আরম্ভ করলে—'প্রভু! দাস আপনার কথামত নগরের ঘরে ঘরে খোঁজ ক'রে জেনেছে—প্রায় সব প্রজাই মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের অনুরাগী—কেবল তিনটি লোককে শত্রু ব'লে সন্দেহ হয়'। চাণক্য—এ তিন জনের মরণ ঘনিয়ে এসেছে দেখছি! কে কে তিন জন?' নিপুণক—'প্রথম হচ্ছে ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী রাক্ষসের প্রধান বন্ধু ক্ষপণক জীবসিদ্ধি—শুনেছি, প্রভু! ইনিই না কি রাক্ষসের পাঠান বিষকন্যাকে পর্ব্বতেশ্বরের সঙ্গে জুটিয়ে দিয়ে তাঁর প্রাণনাশ করেছেন'। চাণক্যের কঠিন মুখভাব একটু নরম হ'য়ে এল—অধরে ক্ষীণ হাসিও ফুটল—তবে নিপুণকের নজরে তা পড়ল না—কারণ সে ভয়ে ভয়ে মুখ নীচু ক'রে কথা বলছিল। চাণক্য বুঝলেন জীবসিদ্ধি আসলে তাঁরই পরম বন্ধু ইন্দুশর্ম্মা—যিনি নগ্ন জৈন সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে রাক্ষসের বন্ধু ব'লে নিজেকে পরিচিত করেছিলেন—কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রাক্ষসের সঙ্গে মিশে তাঁর উদ্দেশ্য জানা। তাই জীবসিদ্ধির কথায় চাণক্য চঞ্চল হলেন না এবং মনে আনন্দ পেলেন এই ভেবে যে বন্ধু ইন্দুশর্ম্মা বেশ খেলা খেলছেন। তাই তিনি বললেন—'আচ্ছা এ ত গেল এক। দুই, তিন কে কে'? চর বললে—'দুই হচ্ছে—এও রাক্ষসের বন্ধু কায়স্থ শকটদাস'। চাণক্য—'কায়স্থ! তার এত দুঃসাহস! যাক্—ছোট হ'লেও তাকে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। তার পর তিন—কে'? চর—'এই কুসুমপুরে আছেন মণিকার শ্রেষ্ঠী চন্দনদাস—তাঁকে অমাত্য রাক্ষসের দ্বিতীয় হৃদয় বলা যায়। এঁরই ঘরে নিজের পরিবারবর্গ রেখে রাক্ষস গা ঢাকা দিয়েছেন'। চাণক্য গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন—'তুমি তা জানলে কি ক'রে? প্রমাণ'? নিপুণক তাড়াতাড়ি তার গায়ের কাপড়ের ভিতর থেকে একটা আঙটি বার ক'রে চাণক্যের হাতে দিয়ে বললে—'এই যে প্রমাণ, প্রভু'। অতি স্থির চাণক্যও সে আঙটি হাতে নিয়ে যেন ঈষৎ চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। আঙটিতে সত্যিই ত রাক্ষসের নাম খোদা রয়েছে। কিন্তু মনের চাঞ্চল্য চেপে তিনি আগের মতই স্থির ভাবে প্রশ্ন করলেন—'অমাত্য রাক্ষসের এ মুদ্রা তোমার হাতে এসে পড়ল কি করে নিপুণক'? নিপুণক তখন বললে—'শুনুন, প্রভু! আমি ত এই যমপট নিয়ে লোকের দোরে দোরে ঘুরছি, ক'দিন থেকে। আমার ছড়া শুনলেই বাড়ীর মেয়েরা আমায় ভিতরে ডাকিয়ে নিয়ে যায় যমপট দেখতে। কাল বিকেলে মণিকার চন্দনদাসের বাড়ীর দোরে গিয়ে যমপট খুলে সবে ছড়া কাটতে সুরু করেছি—এমন সময় অন্তঃপুর থেকে বছর পাঁচেকের একটি ছোট ফুটফুটে ছেলে ছুটে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করলে। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে মেয়েদের গলার গোলমাল উঠল—'ঐ গেল—যাঃ! কি হবে'! তার পর একটি মেয়ে দরজার ভিতর দিকেই তার শরীরটা লুকিয়ে রেখে খপ্ ক'রে ছুটন্ত ছেলেটির একখানা হাত ধ'রে তাকে হিঁচড়ে টেনে নিলে ভিতর-বাড়ীতে। ছেলেটা খুব চেঁচাতে লাগল—মেয়েটাও তাকে বকতে লাগল! কিন্তু ছেলেটাকে ধরবার সময় তাড়াতাড়ি হাতের ঝাঁকুনিতে মেয়েটির হাত থেকে ঐ আঙটিটা ছিট্‌কে পড়ল বার-বাড়ীতে ঠিক একেবারে আমার পায়ের কাছে। ছেলেটাকে ধরতে ব্যস্ত থাকায় মেয়েটির বোধ হয় খেয়ালই হয়নি যে তার হাতের আঙটি খুলে পড়ে গেছে। আমিও প্রথমে আঙটিটাকে গ্রাহ্য করিনি। কিন্তু ওতে একটা নাম লেখা দেখে নিতে ইচ্ছে হ'ল। এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে যখন বুঝলুম যে কেউ আমায় দেখছে না—টুপ করে আংটিটা কুড়িয়ে নিয়ে কাপড়ের ভিতর লুকিয়ে ফেললুম। তার পর যেমন ছড়া কাটছিলুম, তেমনই ছড়া কাটতে কাটতে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলুম—কেউ জানতেও পারলে না কিছু—সন্দেহও করলে না। তার পর রাস্তায় বেরিয়ে দেখি—এ অমাত্য রাক্ষসের আঙটি! সাবধানে রেখে দিলুম। কাল অনেক রাত পর্য্যন্ত আপনি রাজবাড়ীতে ছিলেন—আপনার দেখা পাইনি, আজ সকাল হ'তে এসেছি আপনার শ্রীচরণে—নিবেদন করতে'।

চাণক্য হাসিমুখে বললেন—'নিপুণক, তোমার কাজে খুব খুসী হয়েছি। কাল সন্ধ্যায় রাজবাড়ীতে যেও—বকসিসের ব্যবস্থা করব। এর মধ্যে তোমার কোন কাজ নেই—ছুটি। যদি দরকার হয়, কাল আবার কাজের ভার দোব। এখন তুমি আসতে পার'।

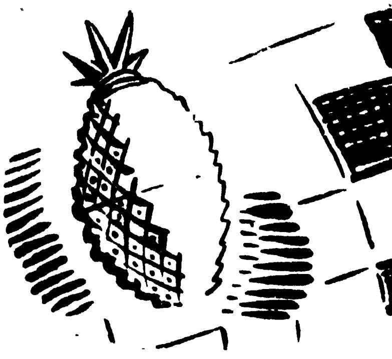
নিপুণক যমপট গুটিয়ে নিয়ে চাণক্যকে দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রে হাসিমুখে বেরিয়ে গেল।

[ক্রমশঃ।

ডর্‌বো নাকো

কুমারী মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়

ঝঞ্ঝা আসুক, বজ্র আসুক, আসুক বৃষ্টি-বাদল-ধারা,
দুঃখ আসুক, দৈন্য আসুক আসুক ব্যথা পাগল-পারা;
ডর্‌বো নাকো তাহে, পুলক-সুখে বুকটি পেতে নির্ভয়ে—
হাসিমুখে চুপ্‌টি ক'রে সদা আমি রইবো ওগো চেয়ে।
হাসুক সবে, করুক হেলা, করুক ঘৃণা সবাই মোরে,
মারুক মোরে, ত্যজুক সবে, আঁটুক কুলুপ দোরে-দোরে;
শঙ্কা তাহে নেই কো কিছু মোর, পথিক আমি ক্লান্তিহীন—
চলার নেশায় চলার পথে চলবো একা রাত্রি-দিন!



সোনার আনারস

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

সপ্তম

সুড়ঙ্গ

সকলে সুড়ঙ্গ-পথের সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে নামতে লাগলেন। সর্ব্বাগ্রে দারোগা বাবু।

কয়েকটা ধাপের পরেই সোজা পথ—অন্ধকার ও স্যাঁৎসেতে।

'টর্চে'র আলোতে অন্ধকার তাড়িয়ে প্রত্যেকেই যে-কোন মুহূর্ত্তে রিভলভারের ঘোড়া টেপ্‌বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইল।

কেবল তাদের জুতোর শব্দগুলোই পাতালের স্তব্ধতা ভেঙে দিতে লাগল, তা ছাড়া অন্য কোন রকম সন্দেহজনক শব্দ নেই।

এক জায়গায় একটা কুঠুরীর মত ঠাঁই পাওয়া গেল। তার তিন দিকে দেওয়াল, এক দিক্ খোলা। দরজা-টরজা কিছুই নেই এবং সেখানেও নেই জনপ্রাণীর চিহ্ন।

আরো খানিক এগুবার পর সুড়ঙ্গ-পথ শেষ হ'ল। সেখানেও কয়েকটা ধাপ উঠে গিয়েছে উপর দিকে।

জয়ন্ত বললে, "বোঝা যাচ্ছে এই সুড়ঙ্গটা কেবল লুকিয়ে আনাগোনার জন্যেই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সুড়ঙ্গের এই মুখটা ওরা বাইরের চোখের আড়ালে রেখেছে কেমন ক'রে, সেইটেই এখন দ্রষ্টব্য।"

সে ধাপ দিয়ে উঠে গিয়ে উপর দিকে দুই হাত বাড়ালে। হাতে ঠেকল ঠাণ্ডা ধাতুর স্পর্শ। কি এ? লোহার দরজা?

একটু জোর ক'রে ঠেলা দিতেই গঙ্গাজলের 'সিষ্টার্ণে'র ডালার মত একটা গোলাকার ভারি জিনিষ উল্টে বাইরের দিকে গিয়ে পড়ল এবং সুড়ঙ্গের ভিতরে নেমে এল মুক্ত পৃথিবীর আলো।

সকলে সুড়ঙ্গ ছেড়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

হাত পনেরো-ষোল চওড়া এবং হাত পঁচিশ-ছাব্বিশ লম্বা ঘাস-জমি, জঙ্গল ও কাঁটা-ঝোপে ঘেরা।

জয়ন্ত এক-মনে কিছুক্ষণ লোহার ঢাক্‌নাখানা পরীক্ষা ক'রে বললে, "চিত্তাকর্ষক বটে।"

সুন্দর বাবু বললেন, "কি?"

—"এই ঢাক্‌নাখানা। দেখুন, এটা একটা বড় পাত্রের মত। এর ভিতরে মাটি ভ'রে ঘাস পুঁতে দেওয়া হয়েছে। এইবারে দেখুন।" সে ঢাক্‌নাখানা আবার উল্টে সুড়ঙ্গের মুখে স্থাপন করলে।

দারোগা বাবু বললেন, "বাঃ, আশ-পাশের ঘাস জমির সঙ্গে সুড়ঙ্গের মুখটা একেবারে মিলিয়ে গেল যে! একে তো চারি দিকের কাঁটা-ঝোপের ভয়ে এখানে বাইরের কারুর আনাগোনা নেই—তার উপরে চোখে ধূলো দেবার এই সহজ, কিন্তু চমৎকার ফন্দী! কেউ এখানে এলেও কিছুই সন্দেহ করতে পারবে না। আমরাও পারতুম না—যদি সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে না আসতুম।"

সুন্দর বাবু বললেন, "হুম্।"

জয়ন্ত বললে, "সুড়ঙ্গের এক মুখে জলের ডোল, আর এক মুখে ঘাস মাটি ভরা ঢাক্‌না। দুই-ই আছে প্রকাশ্য স্থানে, অথচ আসল রহস্য প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা কত অল্প!"

সুন্দর বাবু বললেন, "এত অনায়াসে যে চোখ ঠকাতে পারে, আমি তাকে মস্ত বড় ওস্তাদ ব'লে মানতে রাজি আছি। কিন্তু কথা হচ্ছে, কে সে?"

জয়ন্ত বললে, "নিশ্চয়ই প্রতাপ চৌধুরী!"

দারোগা বাবু বললেন, "কিন্তু তার আর নাগাল পাওয়া সহজ নয়। আপনাদেরই মুখে শুনলুম, মাণিকচাঁদের কাছে বাড়ী বেচে সে এখান থেকে চলে গিয়েছে।"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, "মাণিকচাঁদের কথা তখনো আমি বিশ্বাস করিনি, আর এখন বিশ্বাস না করবার মত একটা বড় সূত্রও পেয়েছি।"

—"সূত্র? কি সূত্র?"

—"সূত্রটা নতুন নয়, পুরানো। সেই ৭৭৭ ষ্টেট এক্সপ্রেস সিগারেট!"

—"মানে?"

—"ঐ দেখুন। সৌখীন প্রতাপ চৌধুরী যে সিগারেট খায়, তারই একটি আধ-পোড়া নমুনা এখানকার ঘাস-জমিকেও অলঙ্কৃত করেছে। সিগারেটটা যদিও এখন নিবে গিয়েছে, কিন্তু ভালো ক'রে দেখলেই বোঝা যায়, ওটা টাট্‌কা। খুব সম্ভব কাল রাত্রেই ওটা শোভা পেয়েছিল প্রতাপ চৌধুরীর মুখে। ওটা যদি বেশী দিন রোদে আর খোলা হাওয়ায় পড়ে থাকত তাহলে ওর কাগজের উপরে পড়ত দাগ আর সোনালী অংশটারও রং যেত জ্বলে। হায় প্রতাপ চৌধুরী, তুমি এত-বড় ধূর্ত্ত, কিন্তু তুচ্ছ একটা সিগারেট কি না বার বার তোমাকে ধরিয়ে দিচ্ছে? অবশ্য তোমার পক্ষেও বলবার কথা আছে। তুমি বলতে পারো,—'তোরা যে এত সহজে আমার এত সাধের সুড়ঙ্গ-রহস্য আবিষ্কার করে ফেলবি, সেটা স্বপ্নেও জানলে আমি কি এখানে দাঁড়িয়ে মনের সুখে সিগারেট টানবার চেষ্টা করতুম?' কিন্তু ঐ তো মুস্কিল প্রতাপ চৌধুরী, ঐখানেই তো মুস্কিল! অতি-ধূর্ত্তরা সেয়ানাপনায় নিজেদের অদ্বিতীয় ব'লে মনে করে, আর শেষ পর্য্যন্ত সেই নির্ব্বুদ্ধিতাই তাদের পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়! নয় কি দারোগা বাবু? আমি আপনার কাছে শিক্ষানবিশ মাত্র, কিন্তু আমি কি ভুল বলছি?"

দারোগা লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, "নিজেকে শিক্ষানবিশ ব'লে জাহির ক'রে আর আমাকে আক্রমণ করবেন না জয়ন্ত বাবু! আপনি যদি শিক্ষানবিশ হন, আমাকে তাহ'লে মানতে হয় যে আমি এখনো গোয়েন্দাগিরির অ-আ পর্য্যন্ত শিখিনি। যে ছোট্ট বক্তৃতাটি দিলেন তা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ; আর আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তিও আশ্চর্য্য! আপনি হয়তো আকাশের শূন্যতার ভিতর থেকেও আসামী আবিষ্কার করতে পারেন!"

জয়ন্ত হেসে ফেলে বললে, "না, অতটা পারি না। আমার ডানা নেই, আকাশের খবর রাখব কেমন ক'রে?"

—"কিন্তু জয়ন্ত বাবু, তবে মাণিকচাঁদ কেন বলেছে যে, প্রতাপ চৌধুরী এই বাড়ী বিক্রী ক'রে স্থানান্তরে গিয়েছে?"

—"মাণিকচাঁদ হচ্ছে প্রতাপের প্রধান সাকরেদ অন্ততঃ আমার তাই বিশ্বাস। প্রতাপ নিজে আড়ালে থেকে সুতো টেনে মাণিকচাঁদের দলকে পুতুলোবাজির পুতুলের মত অভিনয় করাতে চায়। যদি দৈবগতিকে প্রতাপের সব ওস্তাদি ভেস্তে যায়, তাহ'লে ধরা পড়বে মাণিকচাঁদ অ্যাণ্ড কোম্পানী, কিন্তু সে নিজে থাকবে একেবারে নিরাপদ ব্যবধানে!"

হঠাৎ সুন্দর বাবুর বিপুল ভুঁড়ি উঠল চমকে এবং তাঁর চক্ষে জাগল ত্রস্ততা। তিনি তাড়াতাড়ি জয়ন্তের পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার কাণে কাণে বললেন, "জয়ন্ত, দেখ, দেখ!"

জয়ন্ত সহজ ভাবেই বললে, "দেখেছি সুন্দর বাবু! এই শত্রুপুরীতে এসে আমার চোখ ঘুরছে চতুর্দ্দিকেই! দারোগা বাবু, খানিক তফাতেই একটা ঝোপ কি-রকম দুলছে দেখুন! বড়ই সন্দেহজনক। বাতাসের জোর নেই, ঝোপ কেন দোলে?"

দারোগা বাবু সেই দিকে তাকালেন, ঝোপটা দুলতে দুলতে আবার স্থির হয়ে এল। বললেন, "মনে হচ্ছে, ঐ ঝোপের ভিতরে লুকিয়ে কেউ যেন আমাদের লক্ষ্য করছে!"

জয়ন্ত সায় দিয়ে বললে, "আমারও সেই সন্দেহ হচ্ছে!"

—"এখন কি করা উচিত?"

—"দারোগা বাবু, আপনারা হচ্ছেন সরকারের দুলাল, আইন আপনাদের হাত-ধরা। আমারও কাছে রিভলভার আছে বটে, কিন্তু সহসা গুলীবৃষ্টি করলে হয়তো সরকারের আইন এই সখের গোয়েন্দাকে ক্ষমা করবে না। আপনার উচিত ঐ সন্দেহজনক ঝোপটাকে লক্ষ্য ক'রে গুলী চালানো। তার পর নরহত্যা হ'লেও একটা ওজর দেখিয়ে আপনি হয় তো আইনের নাগপাশকে ফাঁকি দিতে পারবেন অনায়াসেই!"

দারোগা বাবু বললেন, "ব্যাপারটা অত সহজ নয় মশাই? আর কি সে দিন আছে? একটু এদিক্-ওদিক্ হ'লেই সারা দেশ জুড়ে খবরের কাগজওয়ালারা শেয়ালের মত এক-স্বরে কি-রকম 'ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া' ক'রে চ্যাচাতে থাকে, তা কি আপনি জানেন না?"

জয়ন্ত হেসে বললে, "সব জানি। কিন্তু এটা কি আপনি বুঝছেন না, ঐ ঝোপের আড়ালে যে আছে সে হয় তো এখন নিস্পন্দ হয়ে আমাদেরই পানে বন্দুক তুলে লক্ষ্য স্থির করছে?"

সুন্দর বাবু চমকে উঠে পায়ে পায়ে পিছিয়ে আবার সুড়ঙ্গের মধ্যে অদৃশ্য হবার চেষ্টা করলেন। যত দূর সম্ভব চুপি-চুপি বললেন, "পালিয়ে এস জয়ন্ত, তুমিও পালিয়ে এস!"

দারোগা বাবু ম্রিয়মাণের মত বাধো-বাধো গলায় বললেন, "তাহ'লে রিভলভার ছুঁড়ব না কি?"

জয়ন্ত বললে, "নিশ্চয়! আপনি বাঁচলে বাপের নাম—জানেন না?"

সেই বিশেষ ঝোপটির দিকে লক্ষ্য ক'রে দারোগা বাবু রিভলভার তুলে ঘোড়া টিপে দিলেন।

রিভলভার গর্জ্জন করতেই ঝোপের ভিতর থেকে লাফ মেরে বেরিয়ে এল মানুষ নয়, একটা শূকর! পরমুহূর্ত্তেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে সে আর একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে চোখের আড়ালে স'রে পড়ল।

জয়ন্ত সকৌতুকে হাসতে হাসতে বললে, "মাভৈঃ, মাভৈঃ! শুওরটা যখন ঐ ঝোপের ভেতর ঢোকে তখনি তাকে আমি দেখতে পেয়েছিলুম। আমি জানতুম, ওখানে মনুষ্য-জাতীয় কোন শত্রুই নেই!"

দারোগা বাবু খাপের ভিতরে রিভলভার পুরতে পুরতে অপ্রসন্ন স্বরে বললেন, "তাহ'লে আমাদের মিছে ভয় দেখাবার জন্যে আপনি এতক্ষণ মস্করা করছিলেন?"

সুন্দর বাবু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "হুম্! জয়ন্তও মাণিকের দলে ভিড়ল? আমাদের নিয়ে তামাসা? নাঃ, এ অসহনীয়!"

জয়ন্ত আরো জোরে হেসে উঠে বললে, "মাণিক যে আজ আমার সঙ্গে নেই সুন্দর বাবু! তাই আমি তারই অভাব পূরণের জন্যে মাণিকের ভূমিকায় অভিনয় করবার চেষ্টা করছি! কিন্তু যাক্ সে কথা। এখানে আর দেরি ক'রে লাভ নেই। প্রতাপ চৌধুরী আর তার দলবল আজ বোধ করি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবে না। চলুন, আমরাও যবনিকার অন্তরালে প্রস্থান করি।···হ্যাঁ, ভালো কথা। দারোগা বাবু, সুড়ঙ্গের দুই মুখ যেমন ছিল ঠিক সেই ভাবেই বন্ধ ক'রে যেতে ভুলবেন না যেন।"

"কেন?"

—"শত্রুরা যেন সন্দেহ করতে না পারে যে, আমরা তাদের সব গুপ্তকথা জানতে পেরেছি।"

—"আপনি কি মনে করেন নর-হত্যার পরেও তারা আবার এখানে আসতে সাহস করবে?"

"না করাই তো উচিত। তবু সাবধানের মার নেই।"

* * * *

রাস্তায় বেরিয়ে জয়ন্ত বললে, "দেখুন সুন্দর বাবু, ঐ প্রতাপ চৌধুরীর কথা ভুলে গিয়ে আমাদের এখন কাজ করতে হবে ভুবো পাগলাকে নিয়ে।"

দারোগা বাবু বললেন, "বিলক্ষণ! এত বড় একটা খুনের মামলা ভুলে যাব? যা তা খুন নয়, পুলিস খুন!"

জয়ন্ত বললে, "খুনের মামলা নিয়ে মস্তক ঘর্ম্মাক্ত করতে হবে আপনাকেই। কোন খুনের মামলা তদারক করবার জন্যে আমরা এ গ্রামে আসিনি।"

দারোগা বাবু বিষণ্ন মুখে বললেন, তাহ'লে আপনারা আমাকে আর সাহায্য করবেন না?"

জয়ন্ত হেসে বললে, "নিশ্চয়ই করব! আগে আমার সব কথা শুনুন। আমরা এখানে এসেছি সুব্রত বাবুর অনুরোধে। তিনি আমাদের ঘাড়ে চাপিয়েছেন এক রহস্যময় মামলা। তাঁর কথা এখানে বলবার দরকার নেই, তবে এইটুকু জেনে রাখুন, তাঁর সঙ্গেও জড়িত আছে ঐ প্রতাপ চৌধুরী। সুতরাং আসলে প্রতাপ চৌধুরীকে আমরা ছাড়ব না, আর সে-ও বোধ হয় আমাদের ছাড়বে না—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

সুন্দর বাবু বললেন, "তুমি ভুবো পাগলার কথা কি বলছিলে জয়ন্ত?"

—"এইবারে ভুবো-পাগলাকেই আমাদের দরকার।"

—"একটা বাজে পাগলার জন্মে তোমার হঠাৎ টনক নড়ল কেন?"

—"এ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন।"

—"কি?"

—"ভুবো পাগলা বরাবরই সোনার আনারসের ছড়া চেঁচিয়ে আবৃত্তি করতে করতে এখানকার হাটে-বাটে-মাঠে ঘুরে বেড়ায়! এত দিন কেউ তাকে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনেনি। কিন্তু প্রতাপ চৌধুরী আজ হঠাৎ তাকে বন্দী করতে চায় কেন?"

সুন্দর বাবু কোন জবাব না দিয়ে কেবল মাথার টাক চুলকোতে লাগলেন।

জয়ন্ত বললে, "কেন, তা বুঝতে পারছেন না? প্রতাপের সন্দেহ হয়েছে যে, ভুবো সোনার আনারসের গুপ্তকথা কিছু-কিছু জানে!"

—"প্রতাপ তো এখানকারই লোক। এত দিন তার এ সন্দেহ হয়নি কেন?"

—"এত দিন সে সোনার আনারস নিয়ে মাথা ঘামাবার চেষ্টাও করেনি। এ-সম্বন্ধে সে হঠাৎ সজাগ হয়েই আগে দিয়েছে সুব্রত বাবুর উপরে হানা। তার পরেই তার দৃষ্টি পড়েছে ভুবো-পাগলার উপরে। বুঝছেন?"

—"হুম্। জয়ন্ত, তোমার অনুমানই সঙ্গত ব'লে মনে হচ্ছে।"

—"তাই আমাদেরও ঐ ভুবো পাগলাকে ছাড়লে চলবে না। তার সঙ্গে কথা ক'য়ে আমার এই বিশ্বাসই দৃঢ় হয়ে উঠেছে যে, সোনার আনারসের অনেক গুপ্তকথাই সে জানে। সৌভাগ্যক্রমে সে আছে এখন আমাদেরই হাতে। তার সঙ্গে ভালো ক'রে আলাপ ক'রে দেখা যাক, আমার সন্দেহ সত্য কি না।"

বাসায় ফিরে এসে দেখা গেল, মাণিক বিছানার উপরে ব'সে সুব্রতের সঙ্গে গল্প করছে।

জয়ন্ত বললে, "কি হে মাণিক, এখন কেমন আছ?"

মাণিক মুখ ভার ক'রে বললে, "যাও যাও!"

জয়ন্ত হেসে তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, "সঙ্গে নিয়ে যাইনি ব'লে অভিমান হয়েছে? তোমার শরীরের অবস্থা দেখেই নিয়ে যাইনি ভাই, আমার উপরে অবিচার কোরো না।"

সুন্দর বাবু বললেন, "হুম্! তুমি সঙ্গে ছিলে না, বেঁচেছিলুম! অন্ততঃ খানিকক্ষণ তোমার বাক্য-যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলুম!"

মাণিক ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে বললে, "তাহ'লে বাক্য-যন্ত্রণা আবার সুরু হবে না কি?"

জয়ন্ত বললে, "না মাণিক, আজকের মত সুন্দর বাবুকে ক্ষমা কর। সুব্রত বাবু, ভুবো পাগলা কেমন আছে?"

মাণিক বললে, "নিশ্চয়ই ভালো আছে। এই তো পাঁচ মিনিট আগেও সে চীৎকার ক'রে সোনার আনারসের ছড়া আউড়ে কাণ ঝালাফালা ক'রে দিচ্ছিল।"

জয়ন্ত একখানা চেয়ারের উপরে ব'সে প'ড়ে বললে, "সুব্রত বাবু, দয়া ক'রে ভুবোকে একবার এখানে নিয়ে আসতে পারবেন কি?"

"যাচ্ছি" ব'লে সুব্রত ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিট পাঁচেক পরে সুব্রত ফিরে এসে বললে, "ভুবোকে দেখতে পেলুম না!"

জয়ন্ত চমকে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "মানে?"

—"ভুবো ঘরেও নেই, এই বাড়ীর ভিতরে কোথাও নেই। কেবল তার ঘরের দেওয়ালে কাঠ-কয়লা দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—'সোনার আনারস! সোনার আনারস! আমি চললুম সেই সোনার আনারসের সন্ধানে'!"

[ক্রমশঃ।



শিল্পী—মাখন দত্তগুপ্ত



(এম, ভি, ভি)

ফুটবল

আই, এফ, এ, শীল্ড প্রতিযোগিতা

ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও প্রধানতম ফুটবল-প্রতিযোগিতা আই, এফ, এ, শীল্ডে এ বৎসর মোট ৪৭টি দল যোগদান করিয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় এ-বৎসর অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক দল যে শুধু যোগদান করিয়াছে তাহা নহে, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাপন্ন দলের অভাবে এই শ্রেষ্ঠতম ফুটবল-প্রতিযোগিতার সৌষ্ঠব অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রের বিশিষ্ট সামরিক দলের যোগদানে আই, এফ, এ, শীল্ড তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা-বহুল ও উদ্দীপনাপূর্ণ প্রতিযোগিতা ছিল। সম্প্রতি কয়েক বৎসর যুদ্ধজনিত পরিস্থিতির ফলে সামরিকগণ অন্যত্র ব্যস্ত থাকায় সেনা-দলের অসহযোগের কারণ ঘটে। ইউরোপীয় দলগুলির অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়ে। ফলে, আই, এফ, এ, শীল্ডের পূর্ব্ব-গরিমার কণামাত্র অবশিষ্ট থাকে নাই। এবারে কোন সামরিক দল শীল্ডে খেলিতেছে না। বে-সামরিক ইউরোপীয় দলগুলি ক্যালকাটা সহ সদল বলে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। বহিরাগত দলের মধ্যে বাঙলার বাহিরের মোট আটটি দল যোগদান করে। গয়ার আনন্দ স্পোর্টিং ও ভিজাগাপতমের আই, ই, এম, ই, দল প্রথম আত্মপ্রকাশে ব্যর্থতার আভাস দেয়। বেরিলী হইতে সামসী হিরোজ আসিয়া উঠিতে পারে নাই। আজমীরের লীগজয়ী খাজানা ক্লাব এরিয়ান্সের দর্প চূর্ণ করিয়াও শীল্ডবিজয়ী ইষ্ট-বেঙ্গলের বিরুদ্ধে চারিটী খেলায় তৃতীয় রাউণ্ডে একমাত্র গোলে পরাজিত হয়। বোম্বায়ের ট্রেডস ইণ্ডিয়া দল এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। তাহাদের সুবিধার জন্য আই, এফ, এ, ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত তাহাদের খেলা স্থগিত রাখার ব্যবস্থা করিয়াছে। দিল্লীর মোগল ক্লাবের প্রথম দিনের খেলায় খুব বেশী আশান্বিত হওয়ার কোন খোরাক পাওয়া যায় নাই। তাহারা না কি নিখিল ভারত দরবার কাপের বিজয়ী। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে মনে হয় যে, আই, এফ, এ, শীল্ডের চরম পর্য্যায়ে এবারেও স্থানীয় প্রধান দলগুলিকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে দেখা যাইবে।

ক্রিকেট

বিলাতে ভারতীয় দলের ক্রমিক পরিচয়

উনবিংশতি খেলা :—

ইয়র্কসায়ার—১ম ইনিংস :—৬ উইকেটে ৩০০ (গিব ৭১, ওয়াটসন ৫৫, হ্যালিডে ৫১, মানকড় ৫৬ রাণে ৩টি ও হাজারী ৭২ রাণে ২টি)

২য় ইনিংস—কেহ আউট না হইয়া ৬

ভারতীয় একাদশ—১ম ইনিংস—৫ উইকেটে ৪১০ (হাজারী নট আউট ২৪৪, মানকড় ১৩১, পাতৌদী নট আউট ৫১, এস্‌পিন্নাল ১১৮ রাণে ২টি ও কক্সন ১১৫ রাণে ২টি) আলোচ্য খেলাটি বৃষ্টির জন্য তৃতীয় দিনে মাত্র ১০ মিনিট খেলার পরে পরিত্যক্ত হওয়ায় ভারতীয় দল জয়লাভে বঞ্চিত হয় ও খেলা অমীমাংসিত থাকে। হাজারী অনবদ্য ব্যাটিং সহযোগে আউট না হইয়া ২৪৪ রাণ করে এবং চতুর্থ উইকেটে মানকড়ের সাহচর্য্যে মাত্র সাড়ে ৪ ঘণ্টায় ৩২২ রাণ করিয়া ভারতীয় দলের এই সফরে শেষ জুটীতে ব্যানার্জ্জী ও সর্ব্বাতে জুটীর ২৩১ রাণের রেকর্ড এই খেলায় ভঙ্গ হয়। কিন্তু ইয়র্কসায়ারের বিরুদ্ধে ১৮৯৯ সালে সারে পক্ষের এবেল ও হেউড্‌ একযোগে ৪৪৮ রাণ করিয়া যে রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করে, তাহা এখনও অজেয় রহিয়া গিয়াছে।

বিংশতি খেলা :—

ভারতীয় একাদশ—১ম ইনিংস—৫ উইকেটে ১৪১ (মার্চেণ্ট ৬৪, হাজারী নট আউট ৪০)

ডারহাম—১ম ইনিংস—৫ উইকেটে ১৩৮ (টাউনসেণ্ড ২৬, কণারডেল ৩২)। ডারহাম-অধিনায়ক টাউনসেণ্ড টসে জিতিয়াও মাঠের দুরবস্থার সুযোগ সম্পূর্ণ ভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টায় ভারতীয় দলকে ব্যাট করিতে দেয়। প্রথম দিনে মাঠের অবস্থা খেলার অনুপযুক্ত থাকায় দ্বিতীয় দিনে খেলার চরম নিষ্পত্তি সম্ভব হয় নাই।

একবিংশতি খেলা :—দ্বিতীয় টেষ্ট :—

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস—২৯৪ (হাটন ৬৭, ওয়াসব্রুক ৫২, কম্পটন্ ৫১, হ্যামণ্ড ৬৯; অমরনাথ ১৬ রাণে ৫টি ও মানকড় ১০১ রাণে ৫টি)

২য় ইনিংস—৫ উইকেটে ১৫৩ (কম্পটন নট্ আউট ৭১, অমরনাথ ৭১ রাণে ৩টি)

ভারতীয় একাদশ—১ম ইনিংস—১৭০ (মার্চেণ্ট ৭৮, মুস্তাক আলী ৪৬; বেডসার ৪১ রাণে ৪টি ও পোলার্ড ২৪ রাণে ৫টি)

২য় ইনিংস—১ উইকেটে ১৫২ (হাজারী ৪৪, হাফিজ ৩৫, মুদী ৩০, বেডসার ৫২ রাণে ৭টি ও পোলার্ড ৬৩ রাণে ২টি)

খেলাটি অমীমাংসিত থাকে। টসে বিজয়ী ইংলণ্ড দল প্রথম দিনে ৪ উইকেটে ২৩৬ রাণ করিয়াও দ্বিতীয় দিনে মাত্র ৫৮ রাণে ইংলণ্ড পক্ষের ছয় জন খেলোয়াড় আউট হইয়া যায়। মানকড় ও অমরনাথের বোলিং খুব কার্য্যকরী হয়। প্রত্যুত্তরে ভারতীয় দলের প্রথম জুটীতে মার্চেণ্ট ও মুস্তাক ১২৪ রাণ সংগ্রহ করায় সকলের মনে আশার সঞ্চার হয়। এইরূপ উদ্বোধনে ভারতীয় খেলোয়াড়গণের আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস ও মনোবল সুদৃঢ় হওয়ার পরিবর্ত্তে তাহারা শোচনীয় দুর্ব্বলতার পরাকাষ্ঠা দেখায়। মাত্র ১৭০ রাণ অর্থাৎ বাকী আট জনে ৪৬ রাণ সংগৃহীত হয়। দ্বিতীয় দফায় উভয় দলের ব্যাটিং বিপর্য্যয় ঘটে। ইংলণ্ড ৫ উইকেটে ১৫৩ রাণ করিয়া ইনিংস ঘোষণা করে, কিন্তু ভারতীয় পক্ষে হাজারী ও মুদী দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া অশুভ সূচনায় বাধা দেয়। শেষ জুটীতে সোহনী ও হিন্দেলকার প্রায় ১০ মিনিট নির্ভুল ভাবে আত্মরক্ষা করিয়া ভারতকে অব্যর্থ পরাজয়ের গ্লানি হইতে অব্যাহতি দেয়। বেডসার উভয় ইনিংসে যথাক্রমে ৪১ রাণে ৪টি ও ৫২ রাণে ৭টি উইকেট দখল করিয়া ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী বোলার বলিয়া নিজেকে প্রতিপন্ন করে। বিলাতী ক্রিকেট-সমালোচকগণের মধ্যে অনেকে হ্যামণ্ডের আরও সময় হাতে রাখিয়া ইনিংস ঘোষণার পক্ষে যুক্তির অবতারণা করেন। তাঁহাদের মতে তাহা হইলে ভারতবর্ষ অবশ্যই পরাজিত হইত। ভারতীয়

সমালোচক ও বিলাতী ক্রীড়ামোদিগণ ব্যানার্জীকে দলভুক্ত না করায় বিস্ময় ও বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। সোহনীকে তাহার স্থানে দলে আনায় ও অতীতের আচরণ হইতে মনে হয় যে, ভারতের খেলোয়াড় নির্ব্বাচন-প্রহসন পক্ষপাত-দোষের সংক্রামণা এড়াইতে পারিতেছে না।

দ্বাবিংশতি খেলা :—

ভারতীয় একাদশ—৫ উইকেটে ২৮১ (মার্চেণ্ট নট আউট ১৪১, মুস্তাক আলী ৫০, সোহনী ৫০)

ক্লাব ক্রিকেট কনফারেন্স—৪ উইকেটে ২২৩

গিল্ডফোর্ডে এক দিনের প্রীতি অনুষ্ঠানে ভারতীয় পক্ষের আলোচ্য খেলার অধিনায়ক মার্চেণ্ট ১৪১ রাণ করিয়া নট আউট থাকে। এবারের বিলাতী সফরে ইহা মার্চেণ্টের পঞ্চম সেঞ্চুরী। মুস্তাক আলী তীব্র মার সহযোগে ৫০ মিনিটে ৫০ রাণ করে। সোহনীর খেলায় দুইটি ওভার বাউণ্ডারী হয়। শেষ পর্য্যন্ত লণ্ডনের বিভিন্ন দল হইতে বাছাই খেলোয়াড়ে গঠিত ক্লাব ক্রিকেট কনফারেন্সের সহিত খেলা অমীমাংসিত থাকে।

ত্রয়োবিংশতি খেলা :—

ভারতীয় একাদশ—১ম ইনিংস—৫৩৩ (মার্চেণ্ট ২০৫, মানকড় ১০৫, পাতৌদী ১১০ ও অমরনাথ ১০৬)

২য় ইনিংস—২ উইকেটে ১১৮

সাসেক্স—১ম ইনিংস—২৫৩ (ট্রেটন ৭২, পার্কস, ৫৬, মানকড় ৪৪ রাণে ৩টি ও সিন্ধে ৬০ রাণে ৪টি)

২য় ইনিংস—৪২১ (কক্স নট আউট ২৩৪, জেমস ল্যাংগ্রীজ ৭১, মানকড় ১৪০ রাণে ৫টি)

অমরকীর্ত্তি রঞ্জী ও যোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র দলীপ সিং-এর ক্লাব সাসেক্সের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল ৯ উইকেটে জয়ী হইয়াছে। এই খেলায় সাসেক্স মাঠের বা বিলাতী ক্রিকেটে নূতন রেকর্ড না হইলেও ভারতীয় দল তাহাদের সফরে অভিনবত্বের পরিচয় দেয়। প্রথম চার জন খেলোয়াড় প্রত্যেকে শতাধিক রাণ করার অপূর্ব্ব গৌরব অর্জন করে। মার্চেণ্ট নিজস্ব দুই বার দুই শতাধিক রাণ করায় ও ভারতীয় পক্ষে এই সফরে তৃতীয় বার এই গৌরবের দাবী করে। সাসেক্স দল ফলো অন করিবার পর উদীয়মান খেলোয়াড় শেষ পর্য্যন্ত নট আউট থাকিয়া ২৩৪ রাণ করে ও স্বীয় দলকে শোচনীয় বিপর্য্যয় হইতে বাঁচায়। ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে এই দ্বিতীয় ডবল সেঞ্চুরী।

চতুর্বিংশতি খেলা :—

ভারতীয় একাদশ—১ম ইনিংস ৬৪ (এণ্ড্রুজ ৩৬ রাণে ৫টি ও বুস ২৭ রাণে ৫টি)

২য় ইনিংস—৪৩১ (মার্চেণ্ট ৮১, পাতৌদী ৭৬, অমরনাথ ৪৮, সর্ব্বশেষে নট আউট ৬৬)

সোমারসেট—১ম ইনিংস—৬ উইকেটে ৫০৬ (লী ৭৬, গিম্বলেট ১০২, ওয়ালফোর্ড নট আউট ১৪১, লংরীগ ৭৪)

সোমারসেটের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল সর্ব্বসমেত ১ম ইনিংসে ৬৪ রাণ করে। এই সফরের আত্মপ্রকাশে ইহাই তাহাদের চরমতম ব্যর্থতার পরিচয়। দ্বিতীয় ইনিংসে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও ভারতীয় দল শেষ পর্য্যন্ত এক ইনিংস ও ১১ রাণে পরাজিত হয়।

অষ্ট্রেলিয়াগামী ইংলণ্ড ক্রিকেট দল—

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পরে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে ক্রিকেট খেলার আদান-প্রদান সুরু হইবে বলিয়া উভয় দেশে সাজ-সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। এবার ইংলণ্ডের অষ্ট্রেলিয়া সফরের পালা। বিলাতী নির্ব্বাচকগণ এবার ওয়ালী হ্যামণ্ডের নেতৃত্বে নিম্নলিখিত ১২ জন খেলোয়াড়গণকে ইংলণ্ড পক্ষে এম, সি, সি দলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মনোনীত করিয়াছেন।

হ্যামণ্ড (গ্লষ্টারসায়ার) অধিনায়ক, ইয়ার্ডলী (ইয়র্কসায়ার), সিব (ইয়র্কসায়ার), হাটন (ইয়র্কসায়ার) ওয়াসব্রুক (ল্যাঙ্কাসায়ার), ইকীন (ল্যাঙ্কাসায়ার), হার্ডষ্টাফ (নটিংহাম), ভোস (নটিংহাম), কম্পটন (মিডলসেক্স), রাইট (কেণ্ট), ইভান্স (কেণ্ট) ও বেডসার (সারে)। আরও চার-পাঁচ জন খেলোয়াড় যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে নির্ব্বাচিত হইবে। ভোস এখনও সামরিক সম্প্রদায়ভুক্ত আছে কিন্তু সময়মত তাহাকে সেনাদল হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে।

অষ্ট্রেলিয়াতে দল গঠন ব্যাপার প্রায় দুরূহ সমস্যা হইয়া পড়িতেছে। বিশ্বশ্রুত ডন ব্র্যাডম্যান পুনরায় বাত-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় হয়ত তাহার পক্ষে যোগদানে অন্তরায় ঘটিতে পারে। ওরিলী বিলাতী সংবাদপত্রের সংবাদ-সরবরাহ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় অষ্ট্রেলিয়ার হইয়া খেলিতে পারিবে না। ষ্টান ম্যাককেব পায়ের ব্যথায় কাতর। পেপার ও পেটাফোর্ড ল্যাঙ্কাসায়ার লীগ অন্তর্ভুক্ত দলে যোগদান করায় বিলাতে তাহাদের খেলিতে হইবে। হ্যাসেট ও কিথ মিলারের সম্বন্ধেও উক্ত লীগে যোগদানের কথা শুনা যায়। সে কথা সত্য হইলে অষ্ট্রেলিয়া তাহাদের সহায়তা লাভে বঞ্চিত হইবে। তবে, ক্রিকেটের তীর্থক্ষেত্রে নবীন ও উদীয়মান প্রতিভার অভাব কোন দিন হইবে বলিয়া মনে হয় না।

অনেকেই আমাদের দেশের জনসাধারণের বুদ্ধি-বৃত্তিকে বড়ই ছোট—বেজায় সামান্য বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন। এই ভ্রান্ত ধারণা হেতু বাঙ্গালায় সৎ-সাহিত্যের পুষ্টি হইতেছে না। অনেকেই মনে করিয়া বসিয়া আছেন যে, বাঙ্গালার জনসাধারণের জন্য যে পুস্তক রচিত হইবে, তাহাতে কেবল ছেলে-ভুলান গল্প থাকিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে।......আমার বিশ্বাস, যাঁহারা বাঙ্গালী পাঠককে বোকা সাজাইয়া পুস্তক রচনা করেন, তাঁহাদের পুস্তক সাধারণ বাঙ্গালীতে পড়ে না।

—বঙ্কিমচন্দ্র

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি!

শ্রীতারানাথ রায়

ইউরোপের তপ্ত কটাহ—

প্রথম মহাযুদ্ধের ভার্সাই সন্ধির পর ইউরোপের বিজয়ী মিত্র-পক্ষের অনেকে মনে করেছিলেন যে, নখদন্তহীন হৃতসর্ব্বস্ব জার্ম্মাণী দুনিয়ায় আর মাথা তুলতে পারবে না। কিন্তু জার্ম্মাণ রাজনীতিক নেতারা নিরাশ হননি। মিত্রপক্ষের ছিদ্র তাঁরা খুঁজতে লাগলেন। সোভিয়েট রুশিয়াকে মিত্রপক্ষ তখন বিশ্বাস করত না। পরাজিত জার্ম্মাণীকে তাই রুশিয়ার সঙ্গে ভাব করতে হয়েছিল। '২১ খৃষ্টাব্দে রুশ-জার্ম্মাণ মৈত্রী-সন্ধি হয়ে গেছল। ওদের বিশ্ব-জাতিসঙ্ঘে পরাজিত জার্ম্মাণী ও প্যারেয়া রুশিয়া ঢুকতেও পায়নি, বরং রুশিয়ায় ঘরোয়া ভেদ বাধিয়ে দিয়ে ওরা সোভিয়েট সরকার ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিল। ঘরের লড়াই আর বাইরের বিরোধ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য প্রতিবেশী জার্ম্মাণী যাতে নিরপেক্ষ থাকে তার আয়োজন রুশ-নেতাদের করতে হয়েছিল! ধন-সাম্যবাদ আর ধনিকবাদের আদর্শগত বিরোধ তাদের ভুলে যেতে হয়েছিল। কমুনিষ্ট রুশিয়া ক্যাপিটালিষ্ট জার্ম্মাণীকে তখন কাঁচা মালও যেমন সরবরাহ করেছিল, তেমনি জার্ম্মাণ পণ্যের সঙ্গে জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক ও জঙ্গী-বিশেষজ্ঞরা রুশিয়ায় শ্রমশিল্প ও রণযন্ত্র গড়ে তুলেছিল। এদিক্ দিয়ে দেখতে গেলে জার্ম্মাণ ধনিকরাই বর্ত্তমান রুশিয়ার স্রষ্টা।

কিন্তু জার্ম্মাণী রুশিয়ার মিতালী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। চিরশত্রু প্রতিবেশী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রক্ত-জ্ঞাতি বৃটেনকে সমর্থন করে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিসঙ্ঘকে ভাঙ্গতে চেষ্টা সে করেছিল। ইউরোপের পণ্য-বাজার চীন, ভারত, আরব-দুনিয়া ও মিশরে তার পণ্য-প্রসার করবার জন্য এর পর জার্ম্মাণীকে জাপান আর ইটালীর সঙ্গেও ভাব করতে হয়েছিল।

তার পর হিটলারী আমলে কি হয়েছে, কি করে ইংরেজের নীতিই দাঁড়িয়েছিল বৃটিশ স্বার্থরক্ষার জন্য জার্ম্মাণীর সমর্থন সংগ্রহ করা, তা মিউনিক চুক্তিই প্রমাণ করেছে। রুশিয়াও যখন বুঝল যে, বৃটেনের নেতৃত্বে আর ইউরোপের পশ্চিমে দেশগুলোর সমর্থনে জার্ম্মাণী রুশিয়ায় অভিযান করবার জন্য তৈরী হচ্ছে, তখন ষ্ট্যালিনকে হিটলারের সঙ্গে মিতালী করে রুশ জাতীয়-স্বার্থ রক্ষা করতে হয়েছিল। এই ভাবে ভার্সাই সন্ধির ১৫ বছরের মধ্যে পরাজিত জার্ম্মাণী আবার আত্মশক্তি ফিরে পেয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও জার্ম্মাণী হেরেছে। এবার তাকে সবাই টুকরো করে ছিঁড়ে খাচ্ছে। তার অত বড় সমৃদ্ধ শ্রম-শিল্প আর যন্ত্রপাতি রুশিয়া আর অন্য দেশগুলো ভাগ করে তুলে নিয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ জার্ম্মাণ আজ রুশিয়ার বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলো নতুন করে তৈরী করবার জন্য কুলীর কাজ করছে। রুশ-অধিকৃত অঞ্চল থেকে লক্ষ লক্ষ জার্ম্মাণকে বিতাড়িত করতে দেখে ইংরাজেরা, বিশেষতঃ চার্চ্চিল চীৎকার জুড়ে দিয়েছেন। আমেরিকার জঙ্গী-কর্ত্তৃপক্ষ বলছে যে, অধিকৃত জার্ম্মাণীর চার পৃথক্ মণ্ডল চার বিজয়ী জাতের সম্মিলিত জঙ্গী-পরিচালনে রাখা হোক। রুশ-অধিকৃত মণ্ডলে বড় বড় জার্ম্মাণ জমিদারীগুলো জনসাধারণের মধ্যে বেঁটে দিয়ে সেখানে একটা অখণ্ড রুশ-সমর্থক সমাজতন্ত্রী দল গঠন করবার আয়োজন হয়েছে। মার্কিণ আর বৃটিশ অধিকার-মণ্ডলে সম্প্রতি যে নির্ব্বাচন হয়ে গেল তাতে কমুনিষ্টরা রুশ-পন্থী নীতির বিরোধী দলগুলোকে (যথা, কৃশ্চান ডিমোক্রাট প্রভৃতি) বিষম পরাজিত করেছে। জার্ম্মাণ জনসাধারণের সমর্থন কে পাবে—রুশিয়া না, ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিধরেরা, এই নিয়ে মিত্রদের মধ্যে অমিত্রতার সূত্রপাত হয়েছে। লড়াইয়ের গুপ্ত হাতিয়ার সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্য এ সব রাষ্ট্র জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক আর বিশেষজ্ঞদের খোসামোদ করতে লেগেছে। রুশিয়ায় আর বৃটেনে জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকদের সাহায্যে এটম বোমা প্রভৃতি সম্বন্ধে জোর পরীক্ষা চলছে।

সেদিন প্যারিতে যে ৪ বিজয়ী দেশের পররাষ্ট্র-সচিবদের বৈঠক হয়ে গেল তাতে জার্ম্মাণীকে সম্পূর্ণ নখ-দন্তহীন করবার জন্য যে ২৫ বছরের মিতালীর প্রস্তাব হয় রুশিয়া তার তীব্র বিরোধিতা করেছে। বৃটেনও যেন এ রকম কিছু চায় না। বৃটেন আর রুশিয়া দুই রাজ্যই জার্ম্মাণদের সমর্থন চায়। এই সমর্থনপুষ্ট হয়ে বিশ্ব-পরিস্থিতিতে এরা আপন আপন প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করবে বলে আশা করছে।

আত্মকৃতি আরোগ্যে স্বভাবতঃ সিদ্ধ বুদ্ধিমান জার্ম্মাণ জাত হয়ত এই আন্তর্জ্জাতিক বাঁও-কষাকষির সুযোগ নেবে। যে রাষ্ট্র তাদের সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করতে চাইবে না, যে রাষ্ট্র বিশ্বের পণ্যশালায় জার্ম্মাণীকে অর্থনীতিক পুনঃসমৃদ্ধির সুযোগ দিবে, জার্ম্মাণরা বোধ হয় তাকে সমর্থন করবে। রুশিয়া অখণ্ড-জার্ম্মাণ অস্তিত্ব চায় না, বল্কান রাজ্যগুলোতে রুশ-প্রভাব গতিরোধ করবার জন্য ডেনিউব নদের তটবর্ত্তী রাজ্যগুলো জার্ম্মাণীর পুনঃশক্তি আহরণে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিকে সমর্থন করতে চাইছে। মার্কিণ বেতার বক্তা মিঃ হিল বলেছেন, বৃটেন গ্রীসকে তার সাম্রাজ্যের ঘাঁটিরূপে পরিণত করেছে। গ্রীসের বর্ত্তমান সরকার ফ্যাসিষ্ট পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে বুলগেরিয়া ও এলবেনিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে চায় বৃটেনের সমর্থনে। এর প্রতিরোধের জন্য একটা শক্তিশালী জার্ম্মাণ কমুনিষ্ট ব্লক গঠন করবার চেষ্টা করছে। এতে জার্ম্মাণীতে ঘরোয়া যুদ্ধ অনিবার্য্য। সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণদের সমর্থনপুষ্ট ফ্যাসিষ্ট ইঙ্গ-মার্কিণ আর পশ্চিম-য়ুরোপের সঙ্গে রুশ ও রুশ-সমর্থিত স্বাধীন ও পরাধীন রাষ্ট্র এবং

দেশগুলোর যে প্রচণ্ড সংগ্রাম বাধবে, তাতে সাম্রাজ্যবাদীরা টিকবে কি টুটবে তা ভবিতব্যই জানে।

আরব-ইহুদী মিল হয় না ?—

প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে ভারতের সহানুভূতি বরাবর আরবদের উপর। ইহুদীদের উপর কম। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে ইংরেজ তুর্কীর বিরুদ্ধে ইহুদী আর আরব দুই দলের সহানুভূতি পাবার জন্য দুই দলকেই পরস্পরবিরুদ্ধ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ওরা বলেছিল, প্যালেষ্টাইনে আরবরা স্বাধীন হবে। ওরা বলেছিল, প্যালেষ্টাইন ইহুদীদের জাতীয় ভূমি হবে। অর্থাৎ ভারতে হিন্দু-মুসলমান ভেদের মত পশ্চিম-এশিয়ায় এই দুই জাতের ভেদ জীয়িয়ে রেখে বৃটেন কিস্তিমাৎ করতে চায়। কিন্তু ক্ষুদ্র ইহুদী জাত আপনাদের স্বার্থরক্ষা করেও আরবদের সঙ্গে আপোষ করতে পারে বৃটেনের কারসাজির বিরুদ্ধে। পশ্চিম-এশিয়ায় আরব রাষ্ট্রসঙ্ঘের গতিরোধ কেউ করতে পারবে না। ইংরেজ আজ এই সঙ্ঘকে কখন তোয়াজ করে, কখনও একের বিরুদ্ধে অন্যকে লেলিয়ে দিয়ে আপনার স্বার্থসিদ্ধি করতে চাচ্ছে। ইহুদীরা যদি আরবদের রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রতিবন্ধক না হয়, তা হ'লে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যেমন শিউরে উঠবে, তেমনি আরব-জগৎ তুষ্ট হয়ে ইহুদী বন্ধুদের ন্যায্য দাবীর প্রতিরোধ হয়ত করবে না।

বর্ম্মায় কমুনিজম বনাম আউং সান দল—

বর্ম্মার থাকিন সোয়ের নেতৃত্বে কমুনিষ্ট দলকে বেআইনী দল বলে সেখানকার ইংরেজ গভর্ণর ঘোষণা করেছেন। আউং সানের য়্যান্টি-ফ্যাসিষ্ট ফ্রিডম লীগের সঙ্গে এ দলের কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। সেখানে থান তুনের নেতৃত্বে আর এক কমুনিষ্ট দল আছে। জাপান যখন বর্ম্মা দখল করে তখন বর্ম্মী কমুনিষ্টরা দুই দল হয়েছিল। থান তুনের দল আউং সানের সঙ্গে যোগ দেয়। আর থাকিন সোয়ের দল আত্মগোপন করে। আজও থাকিন দল গুপ্ত ভাবে কাজ করছে।

আউং সানের দল য়্যান্টি-ফ্যাসিষ্ট পিপল্স ফ্রিডম লীগ ঠিক একটা রাজনীতিক দল নয়। বরং এ দল সর্ব্বদলের সমন্বয়-ক্ষেত্র। এতে যুব-সঙ্ঘ, মহিলা-সঙ্ঘ, কৃষাণ ও শ্রমিক য়ুনিয়ন, উপজাতিদের সংগঠন সবই আছে। আজ সব মিলে এক হতে চেষ্টা করলেও কমুনিষ্ট কর্ম্ম-কাণ্ডের সঙ্গে এদের কোন মিল নাই। সত্যি কথা বলতে গেলে আউং সানই (৩১) আজ বর্ম্মার সব চাইতে শক্তিশালী নেতা। চরিত্রবান, অসীম তেজস্বী এই যুবক রেঙ্গুণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস ও বার্ত্তা-বিজ্ঞানের পাঠ নিলেও তিনি ভাল ছেলে কখনও ছিলেন না। '৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্ম্মী ছাত্রদের সংগঠিত করেন, ভারতের দেখাদেখি। ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম তাঁকে দেয় প্রেরণা। '৪০ খৃষ্টাব্দে থাকিন দলের এই যুবক সম্পাদক যখন রামগড় কংগ্রেসে এসে যোগ দেন তখন মোটামুটি কি প্রেরণা তিনি নিয়ে গেছলেন তা বুঝা যায় না। গান্ধীজীর খুবই প্রশংসা তিনি করেন। তবু তাঁর ধারণা, এত দিনের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের ভাব জন-সাধারণের অন্তরে এখনও বদ্ধমূল হয়নি। তিনি ভারতের আন্দোলন দেখে বিদ্রূপ না করলেও হেসে বলেছিলেন, বর্ম্মার পক্ষে অহিংস প্রথা চলবে না, "যার একটু বুদ্ধি আছে, সে রক্তারক্তি চায় না। কিন্তু সত্যাগ্রহ কি কার্য্যকরী হাতিয়ার ? মাত্র গান্ধীজীর কাছে ওটা একটা ধর্ম্মমন্ত্র হতে পারে, অন্য কংগ্রেসীর পক্ষে ওটা কৌশল।" তবু অহিংসা ভারতের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক হলেও, যারা বস্তুতান্ত্রিক তাদের ওতে মন সরে না।

আউং সান বলছেন—বর্ম্মাকে কেউ আমলই দিচ্ছে না। দুনিয়ার হট্টগোলে আমাদের চীৎকার ডুবে যাচ্ছে। আমাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ থেকে খারাপ।

আউং সান পিপল্স ভলান্টিয়ার্স অর্গানিজেসন গড়ে তুলেছেন। ইংরেজ বলছে, যত খেলনার হাতিয়ার নিয়েই হোক না, জঙ্গী কুচকাওয়াজ চলবে না।

দরিদ্র এই নেতা আজ নীরবে বর্ম্মাকে সংগ্রামের জন্য তৈরী করছেন। নিরপেক্ষ ইংরেজরা বলেন, "He is no party boss, but a combination of Gandhi and Subhas Bose." নিরপেক্ষ বিদেশীরা বলছে, ৩০ বছরের নীচে প্রত্যেক বর্ম্মী তরুণ আজ তাঁর পেছনে আছে। আউং সান আর কার সমর্থনে ভবিষ্যৎ স্বাধীন বর্ম্মা গড়ে তুলবেন তা এখন বলা চলে না।

ইংরেজ বাঁচতে চায়—

বৃটিশ সাম্রাজ্যের মর্ম্মস্থলগুলো বিপন্ন হয়েছে বলে ইংরেজরা মাত্র নয়, তাদের মিত্র আমেরিকানরাও মনে করছে। বৃটিশ সেনাপতি লর্ড মন্টগোমেরী বিশ্ব পরিক্রমণ করে তাই দেখতে বেরিয়েছিলেন।

জিব্রাল্টার প্রকৃত পক্ষে রক্ষা করছে ফাসিস্ত স্পেনের জেনারল ফ্রাঙ্কো। রুশিয়া ফ্রাঙ্কো সম্বন্ধে আপত্তি করেছেন আর ভেতরে ভেতরে স্পেনে কমুনিষ্টরা আবার সংগঠিত হয়ে উঠ্‌ছে।

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বতটে ত্রিস্তে, দার্দানেলিস পথে প্রত্যক্ষ ভাবে আর গ্রীসের পথে পরোক্ষ ভাবে রুশিয়া সমুদ্রের দিকে এগিয়ে এসে ঘাঁটি বাঁধতে চাচ্ছে। ইথিওপিয়ায় বসে রুশ-বিচক্ষণ মিশরে আর সুয়েজ খালের দুই পাশের দেশগুলোয় কি কলকাঠি নাড়ছেন তা বুঝা শক্ত। বোধ হয় মিশরে ইংরেজ জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে ভাব করতে বসেছে। প্যালেষ্টাইনে আরবদের সঙ্গে ভাব করে কয়েকটা ঘাঁটি সংগ্রহ করা যায় কি না ইংরেজ দেখছে, কিন্তু হয়ত বা সোভিয়েট-উস্কানীতে ইহুদীরা চরম সন্ত্রাসবাদী হয়ে তাতে বাধা দিচ্ছে। ইরাকও এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ছে না। ইরাণে কমুনিষ্ট-মিত্ররা বেশ অসুবিধার সৃষ্টি করেছে।

আর ভারতের কথা ? এই ভারতই বৃটেনের ভরসা। লীগের ওস্তাদরা যতই রুশিয়ার কথা বলে শাসাতে থাকুন না, আর কমুনিষ্টরা ভারতের জাতীয় পতাকার দিকে থোড়া নজর দিয়ে, রুশ-পতাকা যতই কোল ও কলঙ্কেয় জড়িয়ে ধরুন না, ভারতের মুমুক্ষুরা ইংরেজের কাছেও যেমন মাথা নীচু করবে না, তেমনি রুশিয়ার কাছেও করবে না। তবে বেগোচে পড়ে ইংরেজরা বেশ বুঝতে পারছে যে, তার ভারতের সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে আপোষ না করলে আর উপায় নাই। সবুরে বৃটেনের নসীবে আর মেওয়া ফলবে না বরং ফল বিপরীতই হবে।

হয়ত রুশিয়া গোঁফে তেল দিচ্ছে। ভাবছে, ইংরেজ ভারত ছাড়ল। আফগান-বঁধুরা অমনি ছুটে এসে তাঁর কণ্ঠলগ্ন হ'ল। বাঁয়ে চীনা কমুনিষ্ট দল লড়ছে। সামনে মার্শাল পি সি. যোশী ভারতীয় সোভিয়েট-তন্ত্রের ডিমে তা দেবার জন্য বসেছেন। দক্ষিণে ইরানী তুদে দল এংলো-ইরানী তৈলখনিতে বিপ্লব বাধিয়েছে। ওদিকে প্যালেষ্টাইন, প্যালেষ্টাইন পেরিয়ে মিশর মাত্র নয়, সম্ভবতঃ মরক্কো পর্য্যন্ত নখদন্তহীন স্থবির বৃটিশসিংহকে ধমকিয়ে চমকে দেবার জন্য প্রস্তুত। ইংরেজ কাঁপে, নাড়ী দুর্ব্বল, তবু বাঁচতে সে চায়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

৯ই আগষ্ট

৯ই আগষ্ট। গণ-নারায়ণের উত্থান দিবস। জগন্নাথের জয়যাত্রার ভারতের পুণ্যাহ মহাপুণ্য দিবস। তপ্ত শোণিতের খর-প্রবাহে মহাভারতের বিদ্যুৎ সঞ্চার—এই দিন। সংগ্রামক্লান্ত পুরাতনের, নূতনের সবল হস্তে কর্ণধার সমর্পণ, আর সঙ্গে সঙ্গে নব নব দিক হইতে দধীচিদের অস্থিদানের প্রতিযোগিতা—"কে বা আগে প্রাণ করিবেক দান তার লাগি কাড়াকাড়ি।" মহাকালের আশীর্ব্বাদ ৩০শে আশ্বিন। মহারুদ্রের আশীর্ব্বাদ ৯ই আগষ্ট। ৩০শে আশ্বিনের বিপ্লববীজ উপ্ত হইয়াছিল "বাংলার মাটী বাংলার জলে"—৪০ বৎসর সে বিপ্লব-প্রভাব ভারতের প্রতি কোণে সঞ্চারিত হইয়া জাতিকে জাগ্রত করিয়াছিল। ৯ই আগষ্ট সেই জাগ্রত ভারতীয় মহাজাতির জয়যাত্রার দিন—তাহার সত্যকালের সূত্রপাত-দিবস। এই রথ—রথের রথী, আর এই মহারথীর মহা যাত্রাকে প্রণাম। জয় হিন্দ!

—

কেন্দ্রে কংগ্রেসী শাসন

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ১৪ জনকে লইয়া কেন্দ্রী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে।

২রা সেপ্টেম্বর হইতে এই মধ্যবর্ত্তী সরকার ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিবেন। মন্ত্রিসভায় আছেন—

১। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল
ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ
শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু
শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারি
ডাঃ জন মাথাই (কৃশ্চান)
৭ সর্দ্দার বলদেব সিং (শিখ)
৮ শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম (হরিজন)
৯ মিঃ কুভারজি হোরমুসজি ভাবা (পার্সি)
১০ মিঃ আসফ আলি
১১ মিঃ সৈয়দ আলি জাহির
১২ সার শাফাৎ আহমদ খান
১৩, ১৪ মুসলমান সদস্য (নাম প্রকাশিত হয় নাই)।

এ সম্বন্ধে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহাতে মিঃ জিন্নার অধীন মুসলমান দলকে পুনরায় মন্ত্রিমণ্ডলে যোগদান করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে। মিঃ জিন্না তাঁহার নিকট লর্ড ওয়াভেলের লিখিত নূতন নূতন পত্র প্রকাশ করিয়া বলিতে চাহিয়াছেন যে, অনেক সুবিধার লোভই তখন ইংরেজরা লীগকে দেখাইয়াছিল বলিয়া লীগ ইংরেজকে সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আজ উহারা বুকে 'চাকু মাইরা চইলা গেল'। মিঃ জিন্না ডুকরিয়া কাঁদিয়াছেন—

আমারই বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমারই আঙ্গিনা দিয়া।
সই কেমনে ধরিব হিয়া!

হিয়া ধরিতে 'চাকু বান'রাও পারিতেছে না। কেন্দ্রী মন্ত্রিমণ্ডল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যতম মন্ত্রী সার শাফাৎ আহমদ খানকে নির্ম্মম ভাবে হত্যা করিবার চেষ্টা তাহারা করিয়াছিল কাপুরুষের মত। কলিকাতার ন্যায় তাহারা ভারতের রাজধানী দিল্লীতেও দাঙ্গা বাধাইতে চেষ্টা করিয়াছিল।

ইংরেজের শক্ত কাঠকে সেলাম করিয়া লীগের সূত্রধরগণ হিন্দুর নরম কাঠগুলির উপর এই ভাবে যে নখদন্ত প্রয়োগ করিতেছে ও সে আক্রমণ আশঙ্কায় অমুসলমানরা যে আক্রমণ প্রতিরোধ ও পাশবিকতার প্রতিযোগিতা করিতেছে তাহা গত মহাযুদ্ধেরই বীভৎসতাকেও হয়ত পরাজিত করিবে। লীগ যখন ভারত ভূমিকে মাতৃভূমি বলিয়া মনে করে না, ভারত ভূমি হইতে ইংরেজের কৃপায় খানিকটা জমি তুলিয়া লইয়া পাকিস্থান গণতন্ত্র স্থাপন করিতে চায়, তখন কেন্দ্রের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার সহিত তাহার সম্পর্ক না থাকিবারই কথা। মিঃ জিন্না সম্ভবতঃ নয়া শাসনতন্ত্রের সুযোগ লইবেন না, এবং তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে যে কোন উপায়ে উহা হইতে বঞ্চিত করিবেন। তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতির গতি ও পরিণতি কি হইবে তাহা এখন হইতে কল্পনা করা যায় না।

—

শাসনতন্ত্র-নির্ণয় পরিষদ

মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র-নির্ণয় পরিষদ বা কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলীর নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। নির্ব্বাচনের ফলাফল এইরূপ—

কংগ্রেস	২০১
মসলেম লীগ	৭৩
স্বতন্ত্র সাধারণ	৯
স্বতন্ত্র মুসলমান	৩

সাধারণ নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর মোট ২১৬ আসনের মধ্যে ৯টি আসন কংগ্রেস লাভ করেন নাই। এই ৯টির মধ্যে ৪টি আসন লাভ করিয়াছেন কেন্দ্রী সরকারের ভূতপূর্ব্ব শ্রমিক-সদস্য ডাঃ আম্বেদকার, কেন্দ্রী সরকারের ভূতপূর্ব্ব খাদ্য-সদস্য মিঃ জে পি শ্রীবাস্তব, শ্রীযুত পদমপৎ সিংহনিয়া এবং দ্বারবঙ্গের মহারাজা। মুসলমানদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ৭৮ আসনের মধ্যে লীগ ৫টি আসন লাভ করিতে পারেন নাই। এই ৫টি আসনের মধ্যে ৩টি লাভ করিয়াছেন কংগ্রেসের মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, খান আবদুল গফুর খান, মিঃ রফি আহমেদ কিদওয়াই এবং একটি আসন লাভ করিয়াছেন বর্ত্তমানে কংগ্রেস-সমর্থক মিঃ ফজলুল হক। লীগ "খ" প্রাদেশিক মণ্ডলে সর্ব্বদল-নিরপেক্ষ সংখ্যাধিক্য এবং 'গ' মণ্ডলে মোটামুটি সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়াছেন।

'ক' মণ্ডলে—

কংগ্রেস প্রতিনিধি	১৬৪
মসলেম লীগ	১১
স্বতন্ত্র	৭

'খ' মণ্ডলে—

মসলেম লীগ	১১
কংগ্রেস	১১
বেলুচিস্থানের প্রতিনিধি	১
কোয়ালিশানিষ্ট	১

'গ' মণ্ডলে—

মসলেম লীগ	৩৫
কংগ্রেস	৩২

মি: ফজলুল হক কংগ্রেসের সহিত ভোট দিতে পারেন। ডা: আম্বেদকার মসলেম লীগের সহিত ভোট দিবেন।

হিন্দু মহাসভার সভাপতি ডা: শ্যামাপ্রসাদ যে কংগ্রেসের মনোনীত হইয়া কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলীতে গিয়াছেন, ইহাতে কয়েকটি প্রাদেশিক হিন্দুসভ চটিয়া গিয়াছেন। পাঞ্জাবের প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা তাহাকে তার করিয়া না কি জানাইয়াছেন, "পাঞ্জাবের হিন্দুরা আপনাকে কংগ্রেসের মনোনীত হইতে দেখিয়া 'শক' (shock) পাইয়াছে। তাঁহারা আশা করেন, আপনি সদস্য পদ ছাড়িয়া দিয়া হিন্দু মহাসভার মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।"

জিন্না-ওয়াভেল গোপন চুক্তি

১ই জুন লর্ড ওয়াভেল মসলেম লীগের সভাপতি মি: জিন্নার নিকট 'ব্যক্তিগত ও গোপনীয়' যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা বড়লাটই ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। পত্রে লিখা ছিল—"১৬ই মে তারিখের মন্ত্রী মিশনের বিবৃতির পরিকল্পনা যদি এক দল মানিয়া লন এবং অপর দল অগ্রাহ্য করেন, গত কল্য আপনি আমার নিকট তৎসম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছিলেন। মন্ত্রী মিশনের পক্ষ হইতে আমি ব্যক্তিগত ভাবে এই প্রতিশ্রুতি আপনাকে দিতে পারি যে, কোন দল সম্বন্ধে আমরা বাছ-বিচার করিব না, দুই দলের এক দল যদি সম্মত হন, তাহা হইলে অবস্থানুযায়ী আমরা পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে চেষ্টা করিয়া যাইব। এই প্রতিশ্রুতির অস্তিত্বের কথা আপনি জনসাধারণে প্রচার না করিলে বাধিত হইব।"

কংগ্রেস বা শিখদল এই গোপন চুক্তির কথা জানিতেন না বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। কংগ্রেসকে এড়াইয়া যাইবার তোফা ফন্দী হইয়াছিল। এই গোপন চুক্তিতে আটখানা হইয়া জিন্না মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা বেমালুম গিলিতে সম্মত হইয়াছিলেন এবং আশা করিয়াছিলেন যে, জানাজানি হইবার পূর্ব্বেই কেন্দ্রে পাকিস্থানী বাদশাহী প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু কংগ্রেস ভিতরের কথা কৌশলে অবগত হইয়া শেষ রাত্রিতে যে চাল চালিলেন তাহাতেই কিস্তি মাৎ হইয়া গেল। জিন্না বা ওয়াভেল যেন ভুলিয়া না যান যে, কংগ্রেস জিন্নাপন্থী বা ইংরেজপন্থীদের মধ্যেও আপনাদের সংবাদদাতা নিযুক্ত । কাজেই তাঁহাদের এই অদৃশ্য নেত্রকে প্রতারিত করা

লীগ ও কমুনিষ্ট

লীগ ১৬ই আগষ্ট কংগ্রেসের অনুকরণে যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করিবে বলিয়া শাসাইয়াছিলেন, লীগের সহিত কমুনিষ্টরাও বলিতেছেন, তাহা এক দল মুসলমানের সাধারণ ধর্ম্মঘট। এ ধর্ম্মঘটে যোগদান করিবার জন্য কমুনিষ্ট দল হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রমিককে আহ্বান করিয়াছিলেন। কমুনিষ্ট দল এবং লীগ তাঁহাদের জন্মভূমিকে খণ্ডিত করিয়া ভারতে অভিনব সুডেটানল্যাণ্ড গড়িবার নীতির সমর্থন বরাবরই করিয়াছেন, সম্ভবত: একই প্রেরণায়। কাজেই প্রত্যেক উত্তেজনার সুযোগ তাঁহারা লইবেনই। কিন্তু জনসাধারণের নিকট বচন ও জিগির দ্বারা নহে, কার্য্য দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে, লীগ ও তাহার মিত্র কমুনিষ্টরা অখণ্ড ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকামী এবং সকল স্বাধীনতাকামী ব্যক্তি ও দলের কার্য্য পণ্ড তাঁহারা করেন নাই ও করিতে দেন নাই। তাহার পর তৃতীয় পক্ষের প্রেরণা-পুষ্ট না হইয়া তাঁহারা এ দেশের জনসাধারণকে যেন উপদেশ দিতে আসেন। ধনিকের অর্থে ভাড়াটিয়া হুজুগেদের তড়পানিতে একটা ঝাণ্ডা-জলুষ সংগঠন করা চলে, কিন্তু কার্য্যকালে দেখা যায়, মজা দেখা শেষ হইলে শ্রমিকরা সকল দলকে বঞ্চিত করিয়া নির্ব্বাচন ও অন্য সংগ্রামে সমর্থন করে কংগ্রেসকে। লীগের সোজা মারের পরিকল্পনায় সায় দিলে বিপদ আছে বুঝিয়াই বোধ হয় কমুনিষ্ট দলপতি যোশী মহাশয় লীগ-পন্থায় চলিতে অসম্মত হইয়াছেন।

আম্বেদকারী সত্যাগ্রহ

তপশীলভুক্ত জাতিসঙ্ঘের নেতা ডা: আম্বেদকার কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ নীতিতে আস্থাবান না হইলেও, আজ অহিংস ডিরেক্ট এক্সন চালাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। হেতু, বৃটিশ মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবগুলিতে না কি তাঁহাদের প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে কংগ্রেসেরই ষড়যন্ত্রে। ইঁহাদের ধ্বনি—"বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বরবাদ," "কংগ্রেস জাহান্নমে যাউক," "পুণা-চুক্তি বাতিল কর।" ইহাতেই না কি তাহাদের স্বাধীনতার সংগ্রামের সূত্রপাত। পুণা এবং অন্যান্য স্থানে 'কালা ঝাণ্ডা' পকেটে করিয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়, কয়েক জন গ্রেপ্তারও হয়।

আম্বেদকারী ঝুটা গণপতিরা লীগের সহিত হাত-ধরাধরি করিয়া যদি উদর-পেশীর নর্ত্তন-কৌশল প্রদর্শন করেন, তাহা উপভোগ করিবার মত হইবে। কলিকাতায় ইতিমধ্যে তাঁহারা নিরীহ অবাঙ্গালী হরিজনদের লুব্ধ করিয়া যে জৌলুষ বাহির করিয়া পথে পথে শিঙ্গা-নিনাদ করিয়াছিলেন, শুনা যাইতেছে, তাহাতে ডা: আম্বেদকারের না হউক, হয়ত অপর কাহারও কয়েক সহস্র ব্যয় হইয়াছে।

লীগের গণপ্রীতির নমুনা

যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেস সরকার জমীদারী প্রথা তুলিয়া দিবার জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে মসলেম লীগের নেতাদেরও যেমন গণপ্রীতি ধরা পড়িয়াছে, ইংরেজ-ঘেঁসা অপর জমিদারদেরও স্বরূপ তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌএ পাকিস্থানী আর হিন্দুস্থানী ধনীদের অপূর্ব্ব আলিঙ্গন ও গণ্ডলেহনের সভা হইয়া

গিয়াছে। চমকদার রাজবেশ-সজ্জিত নবাব ও জমিদাররা সেদিন চীৎকার করিয়াছিলেন। কেহ চার্চ্চিলের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছিলেন—"হাতিয়ার দিয়া পাইয়াছি জমিদারী, হাতিয়ার দিয়াই রক্ষা করিব।" সীতাপুরের এক হিন্দু জমিদার বলিয়াছিলেন—"কংগ্রেসী তোমরা আজ ইংরেজকে বয়কট করিতে বলিতেছ, কিন্তু গত দেড়শ' বৎসরের ইংরেজ শাসনে আমার পরিবারের এক জনও ম্লেচ্ছ ইংরেজী ভাষা উচ্চারণ করিয়া চিত্ত কলঙ্কিত করে নাই। আমরা ইংরেজি শিখিও নাই, ইংরেজও দেখিও নাই।" তবু জমিদারী টিকিবে না?

কয়েক জন শিক্ষিত হিন্দু জমিদার অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, প্রজাকে প্রতারিত তাঁহারা অবশ্য করিয়াছেন. কিন্তু আর হইবে না, কসুর মাফ কিজিয়ে। এবার সুসন্তান হইব। কিন্তু মসলেম লীগের নবাব মহম্মদ ইউসুফ, যিনি এই জমিদার সভার সভাপতি হইয়াছিলেন, তিনি তারস্বরে বলিয়াছেন—"কাঁছনির পক্ষপাতী আমি নহি।" তাল ঠুকিয়া তিনি বলিয়াছেন—"Zamindari can not be abolished under the Atlantic Chartar." আটলান্টিক সনদ দিয়া জমিদারী বাতিল করা চলে না। তাঁহার বক্তব্য বোধ হয় পাকিস্থানী বেহেস্তের রোসনাই উপভোগ করিবার মত দিল নিপীড়িত মুসলমান প্রজাদের নাই, থাকিলে প্রত্যহ ডাল আর ভাতের জন্য না মরিয়া জিন্না-ব্র্যাণ্ড আখরোট আর পেস্তা খাইয়া পাকিস্থানী গুল-বাগিচার বুলবুলের সঙ্গে দোস্তি করিবার লোভে তাহারা লীগের নওয়াব আর বাদশাহদের পয়জারই লেহন করিয়া যাইত।

—

ডাক ও তার বিভাগের ধর্ম্মঘট

ডাক, তার ও টেলিফোন বিভাগের ধর্ম্মঘট হইল ও মিটিল। আয়োজন বেশ সুশৃঙ্খল ভাবেই হইয়াছিল। ভারতের সকল রাজনীতিক ও সম্প্রদায় এই সুযোগে রাজনীতিক দাবীর ক্ষেত্রেও সাধারণ ধর্ম্মঘট করিতে পারে কি না, তাহার পরীক্ষাও করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মঘটের পরিচালক তথাকথিত নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতায় এত বড় আয়োজন পণ্ড যেমন হইয়াছে, তেমনই ধর্ম্মঘটকারীরা অথবা জনসাধারণের অশেষ ক্ষতি সাধন করিয়া সকলের বিরক্তিভাজন হইয়াছেন। এই ধর্ম্মঘট দেখাইয়া দিয়াছে যে, সুসংগঠিত সরকারী কর্ম্মচারীরা ভয় দেখাইয়া এক সম্প্রদায় শ্রমিককে বাধ্য করিতে পারে। এই ধর্ম্মঘট প্রমাণ করিয়াছে যে আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শ্রমিকদের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে তথাকথিত শ্রমিক নেতারা পরাঙ্মুখ নহে।

লোকে বলিতেছে যে, পে-কমিশনের সদস্য পদে মিঃ দালভিকে নিযুক্ত করিলেই ডাক ধর্ম্মঘট আর ঘটিত না। এ বৎসর ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চে সরকারের সহিত কথাবার্ত্তায় ডাক ও তার ইউনিয়নগুলির সহিত ডাকবিভাগের তদানীন্তন সেক্রেটারী সার গুরুনাথ বেউড়ের চুক্তি হইয়া গিয়াছিল। সার গুরুনাথের পরবর্ত্তী সেক্রেটারী এই চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা না করায় মিঃ দালভী ধর্ম্মঘটের প্রেরণা দেন। মিঃ দালভীর এই দুর্ব্বলতার কথা প্রকাশ করা হইলেও ডাক কর্ম্মচারীদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা কৃত্রিম নহে। যখন ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে অস্বাভাবিক ভাবে, তখন তাহাদের দাবী সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত, দালভীর দুর্ব্বলতা থাকিলেও শ্রমিকদের দাবী দুর্ব্বল মোটেই নহে।

—

ধর্ম্মঘট অর্থনীতিক নহে—রাজনীতিক

শ্রমিকদের বিক্ষোভ এবং সাধারণ ধর্ম্মঘটের দিনে সর্ব্বদল ও সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহানুভূতি যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, ডাক, তার ও টেলিফোন ধর্ম্মঘট মাত্র কোন চাকুরিয়া দলবিশেষের অর্থনীতিক ধর্ম্মঘট নহে। সকলেই উপলব্ধি করিয়াছে যে ধর্ম্মঘটের মূলে আছে রাজনীতি। এই ধর্ম্মঘটের উপর সর্ব্বদল ও সম্প্রদায়ের সক্রিয় সহানুভূতি হইতে আভাস পাওয়া গিয়াছে যে, সঙ্কীর্ণ স্বার্থের উপর ভিত্তি করিয়া এই ধর্ম্মঘটের আয়োজন হইলেও উহা ভবিষ্যৎ রাজনীতিক সর্ব্বজনীন ধর্ম্মঘটের মহড়া মাত্র। এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত ধর্ম্মঘটে ইংরেজ কতকটা উপলব্ধি করিয়াছে যে, সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যেও যে অর্থনীতিক অশান্তির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা ভারতের ব্যাপক রাজনীতিক চরম সংগ্রামের জয়-পরাজয়ের পূর্ব্বে নিবৃত্ত হইবে না। বাহিরে ও ভিতরে দুই দিক হইতে এই ভাবে আক্রান্ত হইলে বর্ত্তমান অবস্থায় ইংরেজ লড়াই করিতে পারিবে না, তাহাদিগকে হাল ছাড়িয়া দিতেই হইবে।

—

প্রতিকার—জাতীয় সরকার

কিন্তু ভারতের কমবেশী ৩০ লক্ষ সরকারী কর্ম্মচারীর অর্থসম্বন্ধীয় আব্দার, জিদ ও প্রয়োজন পূরণ করিলেও ইংরেজ সমগ্র ভারতবাসীর অর্থনীতিক মুক্তিসংগ্রাম ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে গণ-প্রতিনিধিমূলক স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকার। গণ-প্রতিনিধিরাই জনসাধারণের অর্থনীতিক প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রকৃত সহানুভূতিপূর্ণ প্রতিবিধান ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের ন্যায্য অভাব পূরণ করিয়া অন্যায় আব্দার দমন করিতে পারেন। দরিদ্র দেশের অভাবের কড়ি যে মাত্র মোটা মাহিনার কর্ম্মচারীদিগের মোটর ও প্রাসাদ-সৃষ্টির জন্য নহে, ইহা জাতীয় সরকার বুঝাইতে পারিবেন জাতির অর্থনীতিক ক্ষমতার অনুপাতে গণ ভৃত্যদের পারিশ্রমিক বাঁধিয়া দিয়া। দেশের জনসাধারণ যেখানে দেশের বিত্ত-সম্পদের স্রষ্টা, তখন তাহারাই অর্থনীতির নিয়ন্তা। তাহারা দরিদ্র অভাবগ্রস্ত থাকিয়া এক বেলা খাইয়া আর রোগে ভুগিয়া মরিবে অর্থের অভাবে, আর তাহাদের শোণিত শোষণ করিয়া সরকারী নোকররা রাজা সাজিবে, ইহা হইতে পারে না। স্বাধীন ভারতের জনসাধারণ তাহা হইতেও দিবে না। কাজেই এ সকল ধর্ম্মঘটকে রাজনীতিক মুক্তি আকাঙ্ক্ষার স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তি মনে না করিলে ভুল হইবে।

—

বেতার-কেন্দ্রে ধর্ম্মঘট

বাংলার বেতার-শিল্পীরাও ধর্ম্মঘট করিয়াছিলেন। বাংলার বিশিষ্ট অভিনেতাগণ ও বেতার-শিল্পীরা অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা-কেন্দ্রে পিকেটিং করিয়াছিলেন। শিল্পীদের দাবী ছিল—(১) ২৯শে জুলাই নিখিল ভারত ধর্ম্মঘটের দিন স্বেচ্ছাসেবিকাদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিকার (২) ষ্টেশন-ডিরেক্টার মিঃ বিব, সহকারী ষ্টেশন-ডিরেক্টার

শ্রীপ্রভাত মুখার্জি, এস, কে, বসু ও কয়্জীর অপসারণ। শিল্পীদের এই বিক্ষোভের মোটামুটি হেতু কর্তৃপক্ষের অশিষ্ট ও অশোভন ব্যবহার এবং সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি।

বেতার-শিল্পীরা যে সকল অভিযোগ করেন তাহা বেতার-শ্রোতা ও জনসাধারণকে স্মরণ রাখিতে হইবে। অভিযোগগুলি এই—

১। ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে 'ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা' এবং 'জনগণ-মন-অধিনায়ক হে' রেকর্ড বাজাইবার অপরাধে শ্রীসুনীল দাশগুপ্ত কর্মচ্যুত হন। মিঃ জামান ও শ্রীপ্রভাত মুখার্জি ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের রেকর্ড পদদলিত করেন।

২। গভর্ণর যে দিন ষ্টুডিও পরিদর্শন করেন সে দিন ধুতি-চাদর-পরিহিত শিল্পীদের এক ঘরে আটক রাখা হয়।

৩। ভারতীয় শিল্পীদের বেতনের অপেক্ষা ইউরোপীয় শিল্পীদের বেতন চার গুণ বেশী।

৪। ছাত্রী পিকেটারদের উপর বেতার কর্তৃপক্ষ নৃশংস অত্যাচার করিয়াছে ও তাহাদের সম্বন্ধে কুৎসিত মন্তব্য করিয়াছে।

—

লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম

সম্প্রতি মুসলেম লীগের নূতন ধ্বনি হইয়াছিল—'হামারা এটম বোম কাইদ-ই-আজম!' ইহার উপর মন্তব্য করিয়া মার্কিণ সাপ্তাহিক পত্র 'টাইম' লিখিয়াছিলেন—"But the fuse was a little slow, the bomb had not gone off, and it looked atlast as if India might achieve independence without civil war"—কিন্তু এ বোমার সলিতায় আগুন ধীরে পুড়িতেছে, বোমা ফাটে নাই। মনে হইতেছে গৃহযুদ্ধ বিনাই ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবে।

কিন্তু তাহা হইবার নহে। 'হামারা এটম বোম কাইদ-ই-আজম'—এক দল মুসলমানের এ ধ্বনি, লীগকে সার্থক করিতে হইয়াছে। পদ্ধতি 'ডিরেক্ট এক্সন'—এই এক্সনের মহড়া হইয়া গিয়াছে শ্রাবণ শেষে, কলিকাতা মহানগরীতে।

মসলেম লীগের সভাপতি মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' আরম্ভ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আরম্ভে অসহযোগী কংগ্রেস যেমন নানাবিধ বর্জ্জন-পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, লীগের কয়েক জন উপাধিধারী তেমনই কংগ্রেসের পদাঙ্ক অনুস[illegible] [illegible]রিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া খেতাব বর্জ্জন করিয়াছি[illegible] [illegible]র কি সংগ্রাম আরম্ভ করিবেন তাহা তথনও [illegible]

লীগের ডিঃ [illegible] [illegible]খ্যা করিয়া খাজা নাজিমুদ্দীন বলেন—'একশ'-এক [illegible] [illegible]া অসুবিধার সৃষ্টি করিতে পারি, বিশেষতঃ আমা[illegible] [illegible]সায় সীমাবদ্ধ নহি। 'সোজা মার' বলিতে কি বুঝায় তাহা [illegible] মুসলমানরা ভাল করিয়াই জানে, সুতরাং বাংলার মুসলমানকে নির্দ্দেশ দিবার হাঙ্গামার আমাদের দরকার হইবে না।"

ইহার উত্তরে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর অন্যতম সদস্য পটবর্দ্ধন [illegible]ন—"১৯৪২এ যে কংগ্রেস বিহার ও অপরাপর স্থানে [illegible] ও বন্দুকের সম্মুখীন হইয়াছিল, সেই কংগ্রেস কথনও লীগের সত্যাগ্রহ বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অথবা ছোরার আক্রমণকে ভয় করিবে না।" লীগকে তিনি স্মরণ রাখিতে বলিয়াছেন যে, "চার্চ্চিলের দমন-নীতিতেও কংগ্রেস ধ্বংস হয় নাই। শত শত শহীদের লাঞ্ছনা ও আত্মবলির ফলে কংগ্রেস '৪২ খৃষ্টাব্দে জয়যুক্ত হইয়াছে।"

কলিকাতায় 'পাকিস্থানী লড়াই'

১৬ই আগষ্ট, ৩১শে শ্রাবণ বাংলার লীগ-মন্ত্রিসভা তথা পূর্ব্ব-পাকিস্থানের 'স্বাধীন' অধিবাসী মসলেম লীগের ভ্রাতৃবৃন্দ যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহার শেষ কোথায় তাহা কে বলিতে পারে? সংগ্রামের প্রকার সম্বন্ধে ৩০শে শ্রাবণেই কাহারও কোন সংশয় ছিল না। কলিকাতার মুসলমান মহল্লাগুলির সাজসজ্জা, 'কোলের ভাই'কে সঙ্গে লইয়া সংগ্রামে যোগদানের নির্দ্দেশ, লীগ নেতাদের গরম গরম ফাতোয়া, পূর্ব্ব-পাকিস্থানের মুখপত্রের প্রচারকার্য্য—এ সকল সফল হইলে কলিকাতাবাসীর বিপদ আসন্ন বলিয়াই সকলে মনে করিয়াছিলেন। 'ষ্টেটসম্যান' পূর্ব্ব হইতেই সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন—'বাংলার লীগ-মন্ত্রীরা মনে করেন যে, মিঃ সুরাবর্দ্দী যে শোভাযাত্রা বাহির করিবেন তাহার ফলে রাস্তায় মারামারি হইতে পারে।' এ জন্য 'ষ্টেটসম্যান' আপনাদের কার্য্যালয়ও বন্ধ রাখিয়াছিলেন। পাকিস্থানী মুখপত্রগুলি ১৬ই আগষ্ট হইতে ২২শে আগষ্ট পর্য্যন্ত সময় লইয়াছিলেন তাঁহাদের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' পরিপূর্ণ করিবার জন্য। বাংলার মুসলমান সরকার সকল প্রতিবাদ তুচ্ছ করিয়া এই দিনকে সরকারী ছুটির দিন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

অবশ্য ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ সুরাবর্দ্দী বলিয়াছিলেন—"Direct Action is not directed against the Hindus"—প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হিন্দুদের বিরুদ্ধে নহে, তবে পাকিস্থানে যাহারা বাধা দিবে সেই ইংরেজ, কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার বিরুদ্ধে। তিনি এ আভাসও দিয়াছিলেন যে, "in the present political atmosphere it is bound to give rise to communal conflict"—রাজনীতিক আবহাওয়া যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সাম্প্রদায়িক বিরোধ হইতে বাধ্য।

হত্যা ও লুণ্ঠন

যে বিরোধ এই 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা কেবল কলিকাতায় মাত্র নহে ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এংলো-ইণ্ডিয়ান মুখপত্র এ সংগ্রামের নাম দিয়াছেন—The Great Calcutta Killing—কলিকাতার মহা হত্যা-তাণ্ডব। এ তাণ্ডবে কলিকাতার ৪০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশ হিন্দু মহল্লায় মুসলমানগণ যেমন প্রকৃতপক্ষে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, তেমনই মুসলমান মহল্লাগুলিতে হিন্দুর নির্ম্মম হত্যা, লুণ্ঠন চেঙ্গিস খানকেও পরাজিত করিয়াছে। ১৬ই আগষ্ট হইতে তিন দিন কলিকাতা মহানগরীতে যে মৃত্যুর লীলা চলিয়াছে তাহাতে নিহত, আহত ও নিরাশ্রয় হইয়াছে প্রায় তিন লক্ষ দরিদ্র। রাজপথের পার্শ্বে আবর্জ্জনা-স্তূপের সহিত গলিত হিন্দু-মুসলমানের শব এবং লুণ্ঠিত ও দগ্ধীভূত বিপণিগুলি দেখিয়া বিদেশীরা পর্য্যন্ত মনে করিয়াছে যে গত মহাযুদ্ধে কোথাও এরূপ বীভৎস পাশবিকতা প্রকটিত হয় নাই। কত জন হিন্দু আপনার মান, সম্পদ, স্বজন ও গৃহরক্ষার জন্য আত্মবলি দিয়াছে, কত জন হিন্দু আপনাদের নিরাপত্তার

দিকে নজর না দিয়া ভিন্নধর্ম্মীদের রক্ষা করিতে গিয়া তাহাদেরই ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিয়াছে, তাহার হিসাব হয়ত কেহ লইবে না, বা কখনও হইবে না। অপর জাতির নিহত, আহত, নিরাপরাধ আশ্রয়হীন হৃতসর্ব্বস্বদের জন্য সম্পূর্ণ সহানুভূতি হিন্দু জাতির সর্ব্বদাই আছে ও থাকিবে, বচন আস্ফালনে আমাদের সে সংস্কৃতি কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হইবে না। তবে অকারণে প্রহৃত ও হৃতসর্ব্বস্ব স্বজাতির বেদনায় আমরা অভিভূত। এই বেদনা বিশ্বপ্রেমের পলস্তারায় ভুলিতে পারিব না। আমরা হিন্দু যুবকদিগকে তাহাদের জন্মভূমির এ সকল পাপের প্রতিরোধের জন্য শক্তি সংগ্রহ ও শক্তি প্রয়োগ করিতে বলি যাহারা হিন্দুর সহিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুখ-দুঃখ ও স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া এক ভারতীয় মহাজাতি গঠনের জন্য বদ্ধপরিকর, তাহাদিগকে কলিকাতার এই হত্যা-তাণ্ডব হইতে বাস্তব পাঠ লইতে আমরা বলি।

লীগ-সাঙ্গাতদের নিগ্রহ

লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সমর্থন করিয়াছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়। কলিকাতা জিলা মসলেম লীগের সেক্রেটারীও এ সময় নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন—"হতভাগ্য ও তফ্‌শিলী, অনুন্নত ও আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপনের জন্য আমি মুছলমানদের নিকট আবেদন জানাইতেছি।"

এই সকল হতভাগ্যেরই ঘর জ্বলিয়াছে, শিশু মরিয়াছে, নারী ও সম্পদ লুণ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের সভাপতি লীগের লেহন-পুলকিত শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল হিসাব লইলেই বুঝিবেন, তাঁহার সাঙ্গাতদের যেমন সবুজ পতাকা-লাঞ্ছিত গৃহ ও বিপণিগুলিকে রক্ষা করিয়াছে সযত্নে, তেমনই সযত্নে রক্ষা করে নাই দরিদ্র ও অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পদ ও বস্তিগুলি। লীগপন্থীদের উন্মত্ত পাশবিকতায় তাহারাই অধিক নিগৃহীত ও নিহত, আর সে পাশবিকতা প্রতিরোধ করিবার জন্য তাহাদিগকেই বজ্রহস্ত উদ্যত করিতে হইয়াছে।

মুসলমানের পক্ষেও নিহত ও নিরাশ্রয় হইয়াছে দরিদ্ররাই অধিক। জনৈক ইংরেজ দর্শকের ভাষায়—"Most of victims had no political knowledge or ambition whatever; yet the claims of the Muslim League to represent all (100 million) Muslims in India led to the destruction of men, women and children for no other reason than their religion."—অধিকাংশ হতাহত ও আক্রান্ত মুসলমানের কোন রাজনৈতিক বুদ্ধি বা আকাঙ্ক্ষা নাই, তবু ভারতে মুসলিমের একচ্ছত্র প্রতিনিধিত্বের যে দাবী মুসলিম লীগ করিয়াছেন, সেই দাবীর ফলেই, মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী মাত্র এই কারণে, নরনারী ও শিশুগুলির সর্ব্বনাশ হইল।

এ দাঙ্গায় নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, একাধিক অঞ্চলে জীবন বিপন্ন করিয়া যেমন হিন্দু যুবকরা হিন্দুদের শরণাপন্ন মুসলমান ভাই-বোনদের রক্ষা করিয়াছে, তেমনই মুসলমান যুবকরাও বহু বিপন্ন হিন্দু নরনারী শিশুকে আশ্রয় দিয়াছে। সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ মুসলমানের মধ্যে কিছুমাত্র রেশারেশি নাই। এ সকল শান্তিপ্রিয় জনসাধারণ, এ দুর্দিনে অন্নই যাহাদের বড় সমস্যা, তাহাদের জানে প্রাণে মারিয়াছে স্বার্থবানদের প্রেরণাপুষ্ট যণ্ড ও অর্থ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত রাজনৈতিক খেলোয়াড়দের সৃষ্ট কৃত্রিম সমস্যা ও আন্দোলন। সে সমস্যা ও আন্দোলন পাকাইবার জন্যই পূর্ব্ব হইতে লাঠি ও লাঠিয়ালের জোগাড় রাখিয়া 'সোজা মারে'র সংগঠন। শ্রাবণ শেষে কলিকাতায় মুসলমানদের ডাণ্ডা-সংগ্রামের সংবাদ পাইয়া কায়েদ-ই-আজম তাঁহার সুরক্ষিত মসনদ হইতে মৃতদের পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া বাণী পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর সে খুন-খারাপী যখন চরমে উঠিয়া মহানগরী আর্ত্তনাদ-মুখর হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তিনি উচ্চবাচ্য করেন নাই, বরং তাঁহার বাংলার পার্ষদেরা মুসলিম বীরত্বের প্রশংসা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিলেন।

আত্মরক্ষার কয়েকটি কথা

জাতির বশিষ্ঠ শাস্ত্রীবর্গকে আমরা কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হইতে বলি—

১। যে যে এলাকায় আমরা বাস করি তাহার ভৌগোলিক অবস্থানাদি নখদর্পণে থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন এলাকার লীগ-পরিপন্থীদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা অপরিহার্য্য।

আমাদের প্রত্যেক বাসভূমিকে প্রত্যক্ষ দুর্গে পরিণত করা প্রয়োজন—এই দুর্গের প্রত্যেকটি নরনারী ও শিশুর যেন আত্মরক্ষা ব্যবস্থায় অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্য সুনির্দ্দিষ্ট থাকে।

২। আমাদের নগরীর উপর অতর্কিত ব্যাপক বা চোরাগোপ্তা আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য প্রতি মহল্লায় রক্ষী-ফৌজ গঠন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৩। ব্যাপক আক্রমণ যখন শাসন কর্ত্তৃপক্ষের শিথিলতা ও ঔদাসীন্যে হইবেই—তখন আমাদের বাঁচিতে হইলে সর্ব্ব প্রকারের সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে।

৪। জাতীয়তাবাদী হিন্দু বা অহিন্দুর স্বার্থরক্ষায় আত্মরক্ষিক সংগঠন যদি কেহ করিতে চায় করুক, কিন্তু যেখানে হিন্দুই লীগপন্থী মুসলমানদের মুখ্য শিকার সেখানে হিন্দুকেই তাহাদের পক্ষে কঠোর দুষ্পাচ্য হইতে হইবে।

—

কুমারী লীলা রায়



স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ছাত্রী বিভাগের ব্যায়াম-পরিচালিকা কুমারী লীলা রায় বি-এ, বি-টি বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বৈদেশিক বৃত্তি পাইয়া মেয়েদের ব্যায়াম ও স্বাস্থ্য-চর্চ্চা সম্পর্কে উচ্চশিক্ষার্থে দুই বৎসরের জন্য বিদেশ যাইতেছেন। তিনি সম্প্রতি উইমেনস ইণ্টার-কলেজিয়েট এথলেটিক ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারী নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন।

—

এইচ, জি, ওয়েল্‌স

বিখ্যাত বৃটিশ সাহিত্যিক মিঃ এইচ জি ওয়েল্‌সের পরলোকগমনে আধুনিক বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষীর তিরোধান ঘটিল। শুধু

সাহিত্যিক হিসাবেই যে মিঃ ওয়েলস বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তাহাই নয়, দুঃখ-দুর্গতি-সমস্যা-প্রপীড়িত বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পণ্ডিতমহলে যথেষ্ট সমাদৃত হইয়াছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক জ্ঞান-ভাণ্ডারের এমন কোন দিক বোধ করি ছিল না যাহা তাঁহার সুচিন্তিত আলোচনার দানে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই। তিনি বিশ্বাস



এইচ জি ওয়েল্‌স

করিতেন, এক দিন বর্ত্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অযৌক্তিকতা মানুষ বুঝিতে পারিবে এবং সে দিন নূতন করিয়া পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নূতন বিশ্ব-সমাজ গঠনের জন্ম সে অগ্রসর হইয়া আসিবে। সে শুভ দিন কবে আসিবে কে জানে, আপাততঃ দেখিতেছি "হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী" আর একটি নূতন ধ্বংসযজ্ঞের আয়োজনে আত্মনিয়োগেই ব্যস্ত। তথাপি আজিকার এই ধ্বংস-তাণ্ডবের মধ্যে দাঁড়াইয়াও যিনি আগামী দিনের উৎকৃষ্টতর জগতের পদধ্বনি শুনিতে পাইয়াছেন, সেই পরলোকগত মনীষীর প্রতি আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

ভাওয়ালের মেজকুমার

বিশ্ববিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার নায়ক ভাওয়ালের মেজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় ১৮ই শ্রাবণ শনিবার রাত্রে তাঁহার কলিকাতাস্থিত ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন।

ভাওয়াল মামলা কুড়ি বৎসরের উপর চলিয়াছিল। ১৪ই শ্রাবণ বিলাতের প্রিভি-কাউন্সিল মেজকুমারের স্বপক্ষে রায় দেন ও এই সন্ন্যাসীই যে ভাওয়ালের মেজকুমার তাহা স্বীকার করেন।

—

গোষ্ঠবিহারী দে

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এবং ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেডের প্রধান পরিচালক ও উপদেষ্টা গোষ্ঠবিহারী দে ১২ই শ্রাবণ ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত বহু পুস্তকের মধ্যে "প্রিণ্টার্স গাইড" বইখানি সুধী-সমাজে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হইয়াছে। অল্প দিন হইল যুবকবৃন্দকে সহজে ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে মুদ্রণ-কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় ইষ্টার্ণ স্কুল অফ প্রিণ্টিং নামে একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার পত্নী, তিন পুত্র, দুই কন্যা এবং বহু পৌত্র-পৌত্রী ও দৌহিত্র-দৌহিত্রী রাখিয়া গিয়াছেন।

—

শ্রীমতী সুষমা দেবী

চন্দননগর গোন্দলপাড়া নিবাসী জমিদার পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ শ্রীমতী সুষমা দেবী ১৯১৩ সালে কলিকাতায় বহুবাজারের বিখ্যাত মতিলাল বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ সেতারিয়া ও সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুত ননীগোপাল মতিলাল মহাশয়ের কন্যা ছিলেন। পিতার আদর্শে তিনি অতি অল্প বয়সেই যন্ত্র-সঙ্গীতে বিশেষ

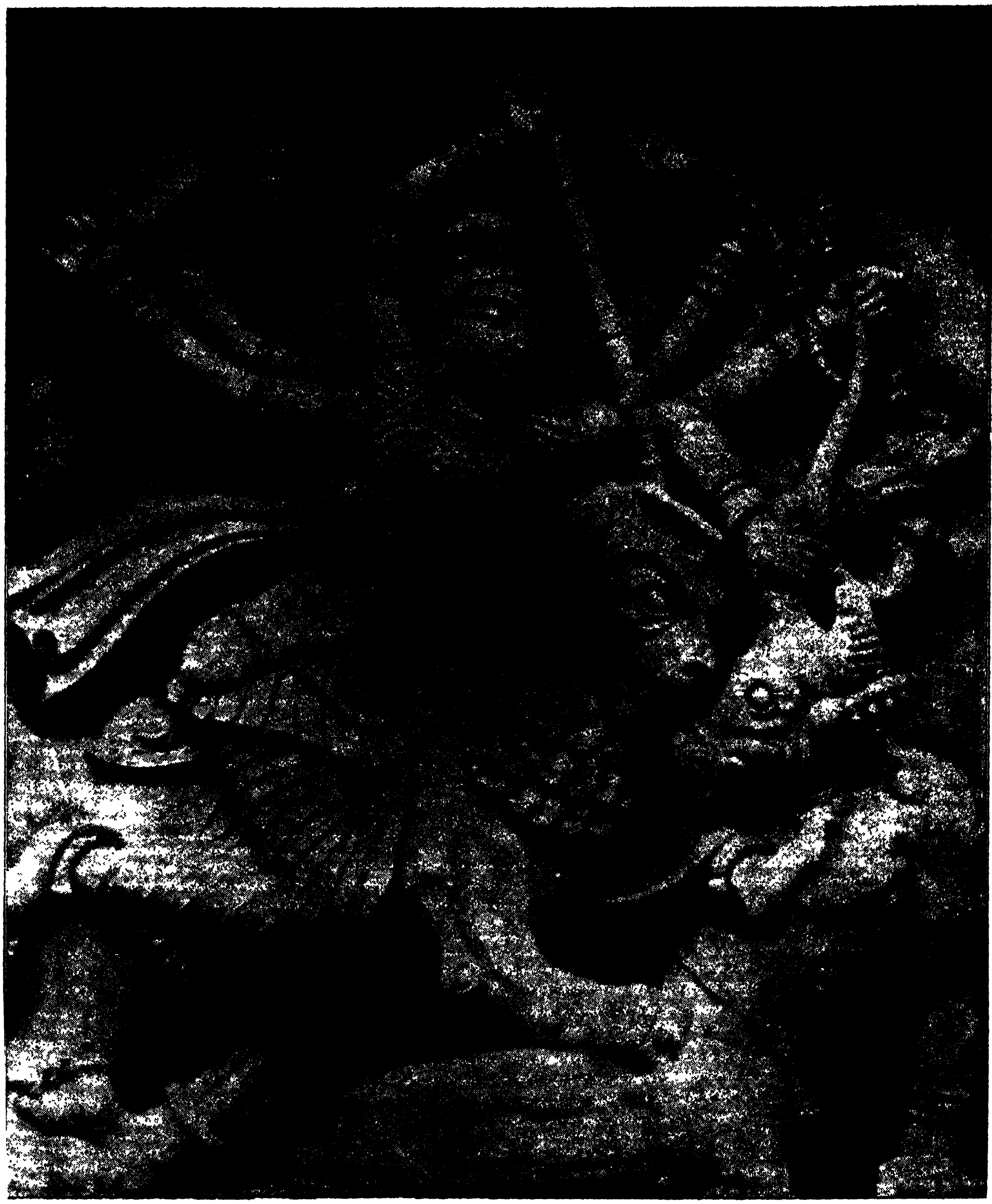


শ্রীমতী সুষমা দেবী

খ্যাতিলাভ করেন ও মাত্র ১২ বৎসর বয়সেই তিনি প্রাদেশিক যন্ত্র-সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় সেতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে স্বামী, ৫ পুত্র ও ৪ কন্যা রাখিয়া গত ৮ই শ্রাবণ পরলোক গমন করিয়াছেন।

কলিকাতার অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য শ্রাবণ সংখ্যা মাসিক বসুমতী প্রকাশে বিলম্ব হইল। কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিবরণ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। আমরা আশা করি, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা এই অনিবার্য্য বিলম্বের জন্য আমাদের ক্ষমা করিবেন।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত
১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি, দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥
অসুরাসৃগ্‌বসাপঙ্ক-চর্চ্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্‌॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী

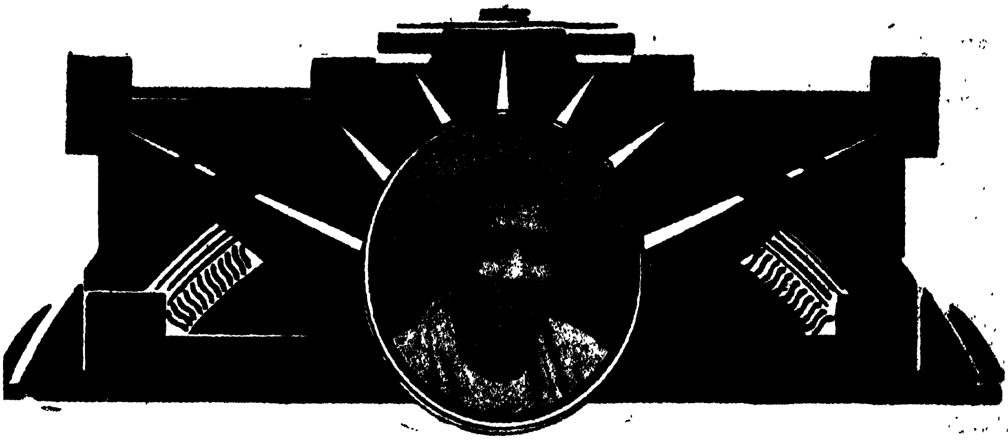
শিল্পী—সুনীল পাল



শিল্পী—সুধীর খাস্তগীর

মাসিক বসুমতী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত



২৫শ বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৫৩] [প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা

যুগবাণী

চারিদিকে বিবাদ বিদ্বেষ

মনে হয় নাই তার শেষ।

চিত্তে যদি ক্ষমা রাখো তবে

শান্তিলাভ হবে॥

১৩৪৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের এই অপ্রকাশিত কবিতাটি ডাঃ অমিয় চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

এইচ জি ওয়েলস্

অমিয় চক্রবর্তী

প্রাত্যহিক দারুণতার যুগেও একটি জীবনাস্তের ছায়া অগণিত মৃত্যু অতিক্রম ক'রে আমাদের চেতনায় এসে পৌঁছল। এইচ জি ওয়েলস্-এর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে একটি যুগাবসানের স্পষ্টতর লক্ষণ আমরা দেখতে পেলাম। তিনি যে সভ্যতার প্রতীকরূপে সমগ্র মানব-সমাজে প্রখ্যাত ছিলেন তার শেষের একটি দীপ নিবল। বাকি আছেন বর্ণার্ড শ'। একথা সত্য যে, যুদ্ধ-গৃহযুদ্ধে জর্জর মারী-বিধ্বস্ত পুরানো এই পৃথিবী আজো সম্পূর্ণ অন্ধকারে নিমগ্ন হয়নি, এখনও আকাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তারাগুচ্ছের মতো মহামানবের বাণী প্রদীপ্ত হয়ে আছে—বিশেষ ক'রে একটি অপ্রমত্ত ধ্রুবতারা আজো আমাদের মধ্যে বেঁচে থেকে সমগ্র মানব জাতিকে কর্মের পথ দেখাচ্ছেন—কিন্তু যে-দিনটি এইচ জি ওয়েলস্, প্রমথ চৌধুরী রোমাঁ রলাঁ, পল ভ্যালেরি, ডব্লিউ বি য়েট্‌স্, বৈজ্ঞানিক ধ্যানী জগদীশচন্দ্র, এডিংটনকে নিয়ে অস্তমিত হল তার উজ্জ্বলতা সাহিত্যে এবং জ্ঞান-লোকে বড়োই আশ্চর্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। এঁদের এক জনও প্রাচীনপন্থী ছিলেন না, অটুট বিশ্বাস এবং নিঃস্ব আভিযানী ছিল এঁদের প্রতিভা, এঁরা শেষ পর্যন্ত নূতন পৃথিবী গড়বার কাজে আত্মোৎসর্গ ক'রে গেছেন কিন্তু তাঁদের ধারণা ভাবনার মধ্যে একটি সহজাত প্রতীতি ছিল যা আধুনিক যুগে লুপ্তপ্রায়। সেই হিসাবে ওয়েলস্ বিগত যুগের মানুষ। তিনি ছিলেন অদম্য উৎসাহী এবং বিদ্রোহী, অথচ বিশ্বপ্রত্যয়ীদের এক জন। সভ্যতার আধি-ব্যাধি তাঁকে উত্যক্ত করত কিন্তু স্পষ্ট চিন্তা ও কল্পনায় উপলব্ধ কোনো বিশেষ উপায় দ্বারা সমাজ-দেহকে শীঘ্রই সুস্থ করা যাবে এই বিশ্বাসই ছিল তাঁর সৃজনশীল জীবনের ভিত্তি। ভিক্টোরীয় যুগের বিশ্বাসের মধ্যে উত্তরোত্তর সুখবৃদ্ধির অচেষ্টিত বিধিদত্ত আয়াস এবং জাতীয় অহঙ্কারের ঔদ্ধত্য যে-ভাবে প্রাধান্য লাভ করেছিল ওয়েলস্-প্রমুখ লেখকেরা তার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু মানুষের দার্শনিক শক্তি সম্বন্ধে তাঁরা কোনো দিনই বিশ্বাস হারাননি। ওয়েলস্-এর শেষতম দুটি ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থে তিনি এই যুদ্ধের বীভৎসতায় অভিভূত হয়ে ভবিষ্যতে এই আত্মহন্তারক মানব সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্য প্রকাশ ক'রে গিয়েছেন কিন্তু সেখানেও তাঁর বক্তব্যের মূল কথা এই যে, বাঁচবার পথ এখনও খোলা আছে—সমগ্র মানব জাতির একত্র বাঁচবার সেই পথ না নিলে একত্র মরবার পথে সকলেরই বিনাশ অনিবার্য্য। বস্তুত ওয়েলস্ মানব-সভ্যতাকে বাঁচাবার নিত্য নব ধন্বন্তরি আবিষ্কার ক'রে বিবিধ গ্রন্থে তাঁর উদ্ভাবনশীল মনের পরিচয় দিয়েছেন—এ বিষয়ে তাঁর কোনো কোনো গ্রন্থের চঞ্চল বালসুলভ অতিবিশ্বাস বিজ্ঞের হাস্যোদ্রেক করেছে, কিন্তু এই রকম উজ্জ্বল উক্তির মধ্যে যে হৃদ্যতা, যে অপরিসীম মানবিকতা প্রকাশ পেয়েছে তা মহার্ঘ্য। বিশেষ একটি ছাপানো পুঁথিতে নানা ধর্ম ও চিন্তাধারার সারমর্ম সংগ্রহ করে সভ্যতার নূতন বাইবেল চতুর্দিকে সুলভ মূল্যে বিতরণ করলে এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ে তা পড়ানো হলে মানব-মৈত্রী সকল জাতির মধ্যেই কয়েক বৎসরের মধ্যে দৃঢ় হয়ে যাবে, এই ধারণা তাঁকে কিছু দিন পেয়ে বসেছিল। কোনো বার তাঁর মনে হয়েছে বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীদের সংঘবদ্ধ করে তাদের কাছে থেকে অজস্র অর্থ সংগ্রহ করতে পারলে আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠ তুল্য প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে চতুর্দিকে গড়ে উঠবে, ব্যবসা বাণিজ্যেও পৃথিবী জুড়ে সহযোগিতা দেখা দেবে, যন্ত্রযুগের প্রসাদ শক্ত শক্ত নূতন কল-কারখানার মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে য়ুটোপিয়ায় পরিণত করবে—এই নিয়েও তিনি চমকপ্রদ ভাষায় সুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর প্রিয় ধন্বন্তরি ছিল নূতনতর শিক্ষাপ্রণালীর সর্বদেশ সর্বজনপ্রয়োজ্য বিশেষ একটি প্রণালী—এ নিয়ে তিনি সাহিত্য সঙ্গীত জ্ঞানে বিজ্ঞানে মিলিয়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার একমাত্র উপায় প্রচার করেছেন। বলা বাহুল্য, এই সকল বইয়ের মধ্যে অতিশয়োক্তি এবং সিদ্ধির সহজ উপায় নির্দেশজাত অগভীর মনন বার বার দেখা দিয়েছে—তাঁর চিন্তা এবং ধারণার কেন্দ্রও বরাবরই ছিল য়ুরোপ, যদিও এশিয়ার প্রতিও তিনি উপর থেকে প্রীতির চক্ষেই দৃষ্টিপাত করেছিলেন—কিন্তু চিন্তার জগতে ওয়েলস্-এর দানও সামান্য নয়। তাঁর উৎসাহ সংক্রামক তাঁর বিশ্বাসের সর্বজয়ী ভাব দুর্দিনে দৈন্যে আমাদের সঞ্জীবিত করেছে, বিশেষ করে শিক্ষার উন্নতির মধ্য দিয়ে নূতন যুগের মানুষকে উন্নীত করা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান-গর্ভ সূক্ষ্ম বিচার বহু বৎসর ধ'রে য়ুরোপে এবং আমেরিকায়—এবং পূর্বদেশেরও মনোলোকে—শিক্ষার নব দৃষ্টি এনে দিয়েছে। সেই কারণে তাঁর রচিত পৃথিবীর ইতিহাস দেশে শ্রেষ্ঠ সমাদর ও বহুমান লাভ করেছে—উৎকর্ষবান এমন ভাষা নেই যাতে তাঁর ঐ গ্রন্থখানি অনূদিত হয়নি। Outline of History এবং অন্যান্য সহযোগীর সহিত রচিত তাঁর Outline of Science এ যুগের মনোধারা বদ্‌লিয়ে দিয়েছে, মানবিক ঐক্যবোধের জ্ঞানময় ভিত্তি দৃঢ় করেছে। মানব-সভ্যতার ইতিহাস গ্রন্থটিতে তিনি য়ুরোপীয় শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে অতিক্রম করে ভগবান বুদ্ধের সম্বন্ধে, সম্রাট অশোক এবং আকবর সম্বন্ধে যথার্থ প্রসারিত চৈতন্যের পরিচয় দিয়েছেন, চীনদেশ সম্বন্ধেও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জানিয়ে নবযুগের দৃষ্টি অবারিত করেছেন।

ওয়েলস্-এর দুর্লভ মণিকার তুল্য অতি ছোটো গল্পগুলির কথা উল্লেখ করতে চাই। তা ছাড়া তাঁর অবাক কল্পনায় গাঁথা চন্দ্রভ্রমণ কাহিনী বায়ুতরীবাহী সংগ্রামের উপাখ্যান, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি দিয়ে রচিত অ্যাটম বম্ব, বিষয়ে রূপকথা ঐ জাতীয় কল্পসাহিত্যে অতুলনীয়। উপন্যাসের জগতে তাঁর গুটি-কয়েক নভেল এরি মধ্যে শাশ্বত ইংরেজি সাহিত্যে স্থান পেয়েছে—Kipps, Ann Veronica, Marriage এই কয়েকটি নভেলকে দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যেতে পারে। কিন্তু হাল্কা উপন্যাসের পর্য্যায়ভুক্ত The Wheels of Chance, The History of Mr. Polly প্রভৃতি অনতিদীর্ঘ গল্পগুলির বহুকাল ধ'রে সর্বদেশের পাঠকদের মনোহরণ করবে। বিশদ ভাবে তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যের আলোচনা অল্প পরিসরে সম্ভব নয়, কিন্তু ওয়েলস্-এর ছোট গল্প উপন্যাস ইতিহাস বিবিধ অজস্র প্রবন্ধাবলীর মধ্যে নিয়ত নবীন অক্লান্ত মানবিকতার উৎসাহ একটি চিন্ময়সূত্রের মতো অনুসরণ করা চলে।

আজকের যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইংরেজ লেখকদের মতোন বিশ্বাসের অমন কাননভরা পুষ্পপল্লববিকাশ দেখা যাবে না। যদিও এ কথা বলা যেতে পারে অলডস্ হাক্সলি প্রমুখ দু'-চার জনের কলমে দু'টি-চারটি পূর্ণ বিকশিত ভাবনার কলবীথিকা লক্ষ্য করা যায়। যা ছিল পূর্বযুগের চমকপ্রদ কল্পনা আজ তা মানবিক সত্যের সঙ্গে দৃঢ়তর বহুধা সম্বন্ধে যুক্ত-প্রযুক্ত হয়ে শ্রেষ্ঠতর রূপ গ্রহণ করছে। কিন্তু সাহিত্যের রসলোকে একটি অমরাবতী আছে যেখানে ফুলে ফলে পাতায় ভেদ নেই, যেখানে পরিণতির কথা ওঠে না প্রকাশের আশ্চর্যতাই নিত্য সম্পদ্। সেই চিরন্তন নবীন রচনার জগতে ওয়েল্‌স্-এর ঝলমলে মনের কল্পনার—আনন্দে যেখানে দুটি-চারটি ছোটো গল্প, The Shape of Things-এর মতো চলচ্চিত্র, তাঁর বিভিন্ন পর্য্যায়ের উপন্যাস ও আলোচনায় উজ্জ্বল গদ্যাংশ অক্ষয় হয়ে রইল।

মনে পড়ছে জেনিভায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওয়েল্‌স্-এর সাক্ষাতের কথা, এখন থেকে সতেরো বছর আগে। তাঁরা পূর্বেই পরস্পরকে জানতেন; রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাবার সময় সর্বপ্রথম গুণগ্রাহীর মধ্যে ওয়েল্‌স্ ছিলেন এক জন। জেনিভা হ্রদের কাছে ওয়েল্‌স্-এর হোটেলে যেতেই তিনি বললেন, স্কুল বয়ের মতো উত্তেজিত হয়ে আছি, অনেকগুলো প্রশ্ন নিয়ে টাগোরের কাছে যাব, তাঁর কাছে শুনতে চাই। রবীন্দ্রনাথকে সেই কথা বলায় তিনি বললেন, দেখো তো, অত বড়ো মনীষী আগে থেকে প্রশ্ন ঠিক ক'রে আসবেন, আমি হঠাৎ সব উত্তর দিই কেমন ক'রে? কিন্তু তাঁদের সেদিন খুব জমেছিল, দু'ঘণ্টা ধ'রে গল্প চল্‌ল। যা লিখে নিয়েছিলাম তার থেকে দু'-একটা অংশ এইখানে নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করি।

রবীন্দ্রনাথ: হাঁ, তা অনেক গান আমি রচনা করেছি, সুর বসিয়েছি। কিন্তু এই সঙ্গীত পশ্চিমের কাছে, অবরুদ্ধ থেকে যাবে। কেন না আপনাদের স্বরলিপিতে ভারতীয় সুরকে ঠিকমতো বাঁধবার উপায় নেই। হয়তো স্বরলিপিতে আমার গান অনুলিখিত হলেও তা য়ুরোপীয়ের মনোগম্য হত না।

ওয়েলস্: ধীরে ধীরে হয়তো তারা ঐ সঙ্গীত বুঝতে শিখবে।

রবীন্দ্রনাথ: এমন অনেক সুর আছে যা আমাদের অত্যন্ত নিবিড় আনন্দ দেয় কিন্তু পশ্চিমদেশের শ্রোতার তাতে ধাঁধা লাগে। কিন্তু আপনি যা বল্‌লেন তাই হয়তো ঠিক—শুনতে শুনতে আমাদের সঙ্গীত য়ুরোপের কাছে সমাদৃত হবে।

ওয়েলস্: ভবিষ্যতে শিল্পের প্রকাশ সম্ভবতঃ একেবারে নূতন রূপ নেবে—পৃথিবীর সর্বত্রই প্রত্যেক শিল্পের বহিঃপ্রকাশ একই রকম এবং সর্বজনবোধ্য হওয়ার কথা। ধরুন, এই রেডিয়ো যা আজ সমস্ত পৃথিবীকে একযোগে বেঁধেছে; হয়তো ভবিষ্যতে প্রাদেশিক ও জাতীয় নানা ভাষা আর বেতারে ব্যবহার হবে না। বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা এমন একটি বলবার ভাষা খুঁজে পাব যার দ্বারা সকলেই পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে পারি—সেই ভাষা বিজ্ঞান পৃথিবীতে স্বপ্নাতীত হয়ে আছে।

* * *

রবীন্দ্রনাথ: বদলানো চাই মনোভাবকে—চাই এই নূতন যুগের উপযোগী চিত্তবৃত্তি। বর্তমান সভ্যতার নূতন দাবি ও নব পরিবেশের সঙ্গে জীবন মেলাবার জন্যে মনকে অনেকখানি মানিয়ে নিতে হবে।

ওয়েলস্: মানিয়ে নেওয়া—খুব কঠিন চেষ্টার মধ্যে দিয়ে মানিয়ে নেওয়া।

রবীন্দ্রনাথ: আপনার কি মনে হয় বিভিন্ন মানব-সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতি-বর্ণের কোনো ভিত্তিতে বিরুদ্ধতা আছে?

ওয়েলস্: না। নূতন জাতি বারে বারে উঠছে, নামছে, তৈরি হয়ে চলেছে, নিরন্তর চলেছে দেওয়া নেওয়া। জাতীয় সংমিশ্রণ ইতিহাসের আদিতম কাল থেকে চলে আসছে—ভারতবর্ষ হল তার চরমতম দৃষ্টান্ত। এই ধরুন, বাংলাদেশে আশ্চর্য্য রকম জাতীয় বৈচিত্র্যধারা একত্রে মিশেছে যদিও জাতি-বিচার ও অন্যান্য বাধা যথেষ্ট ছিল।

রবীন্দ্রনাথ: জাতীয় দর্প—এ বিষয়ে অনেক ভাববার আছে। পশ্চিমদেশে কি ঠিক এরকম করে পূর্বদেশকে স্বীকার করতে শিখেছে। যদি তাদের মধ্যে পরস্পরের মেলামেশা সম্ভবপর না হয় তাহলে যে-সব দেশ অন্যদের প্রত্যাখ্যান করে তাদের সম্বন্ধে আমি একান্ত দুঃখ অনুভব করব। বই পড়ে মিলনধর্মের শিক্ষা যথেষ্ট হয় না—মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ সহজ পরিচয় চাই। দেখছি ডক্টর হাস্ এবং মাটীস্ তাঁরা ভাবেন যে পূর্বদেশের মানুষ জাতি পূর্ব-ভূখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে—তাতেই দুই ভাগে বিভক্ত মানুষের ভালো হবে।

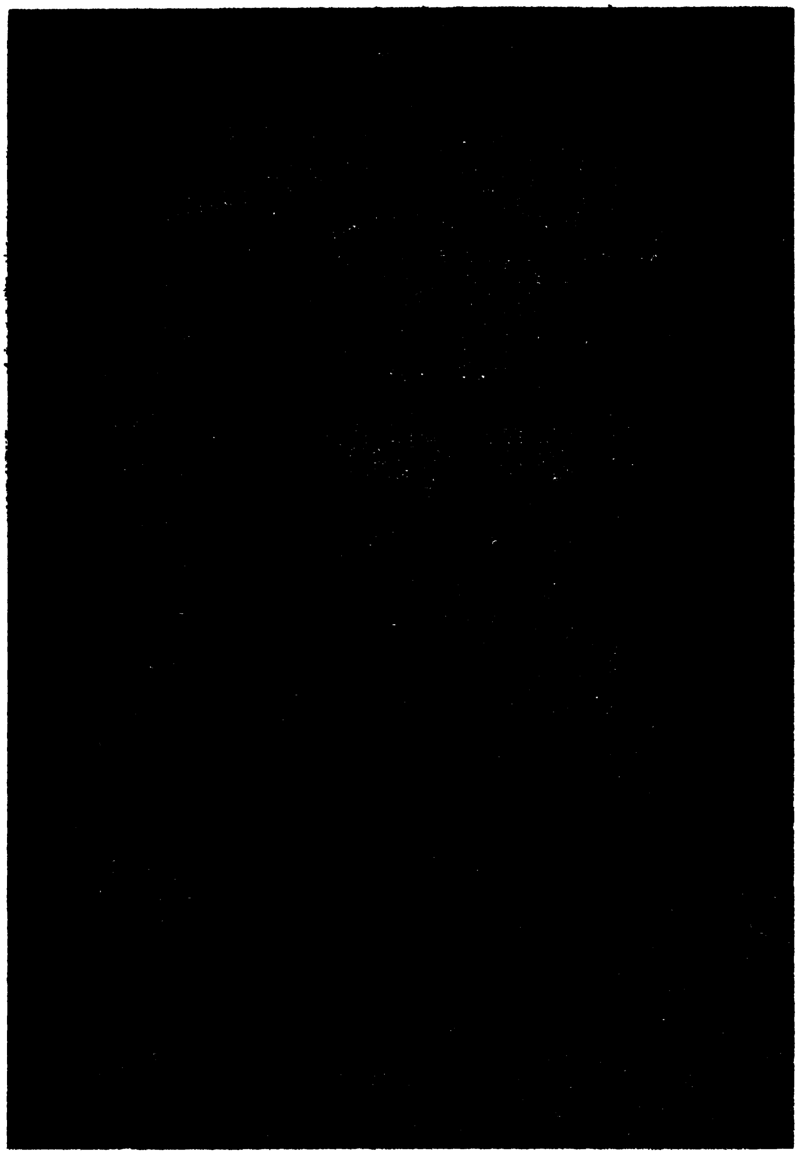
ওয়েলস্: নিশ্চয়ই আপনি সম্পূর্ণভাবে এই তত্ত্ব অস্বীকার করেন। আমিও করি।

রবীন্দ্রনাথ: এটা দুঃখের কথা যে, কোনো কোনো জাতি বা রাষ্ট্র-বিধাতার পক্ষপাতিত্ব দাবি করে আর ধ'রে নেয় যে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে তারাই হল সব চেয়ে উপরে!

ওয়েলস্: পশ্চিমের প্রভুত্ব কেবল শেষ এক শ' বছরের ব্যাপার।···এলিজাবেথের সমকালীন লেখকেরা এমন কি তাদের বহু পরবর্তী দল পূর্বদেশের ধন এবং জীবনযাত্রার শ্রেষ্ঠতর ব্যবস্থা দেখেই আশ্চর্য হয়েছিলেন। পশ্চিমদেশীয় প্রভুত্বের ইতিহাস অতি অল্প কালের কথা।

রবীন্দ্রনাথ: উনবিংশ শতাব্দীর বস্তু-বিজ্ঞান হয়তো পশ্চিমে এই জাতীয় উচ্চতার ভাব এনে দিয়েছে। যখন পূর্বদেশ এই বস্তু-বিজ্ঞানকে আয়ত্ত ক'রে নেবে তখন স্রোত ফিরবে এবং হয়তো পরস্পর মানব সম্বন্ধের একটা স্বাভাবিক গতি হবে।

ওয়েলস: আধুনিক বিজ্ঞানকে ঠিক য়ুরোপীয়

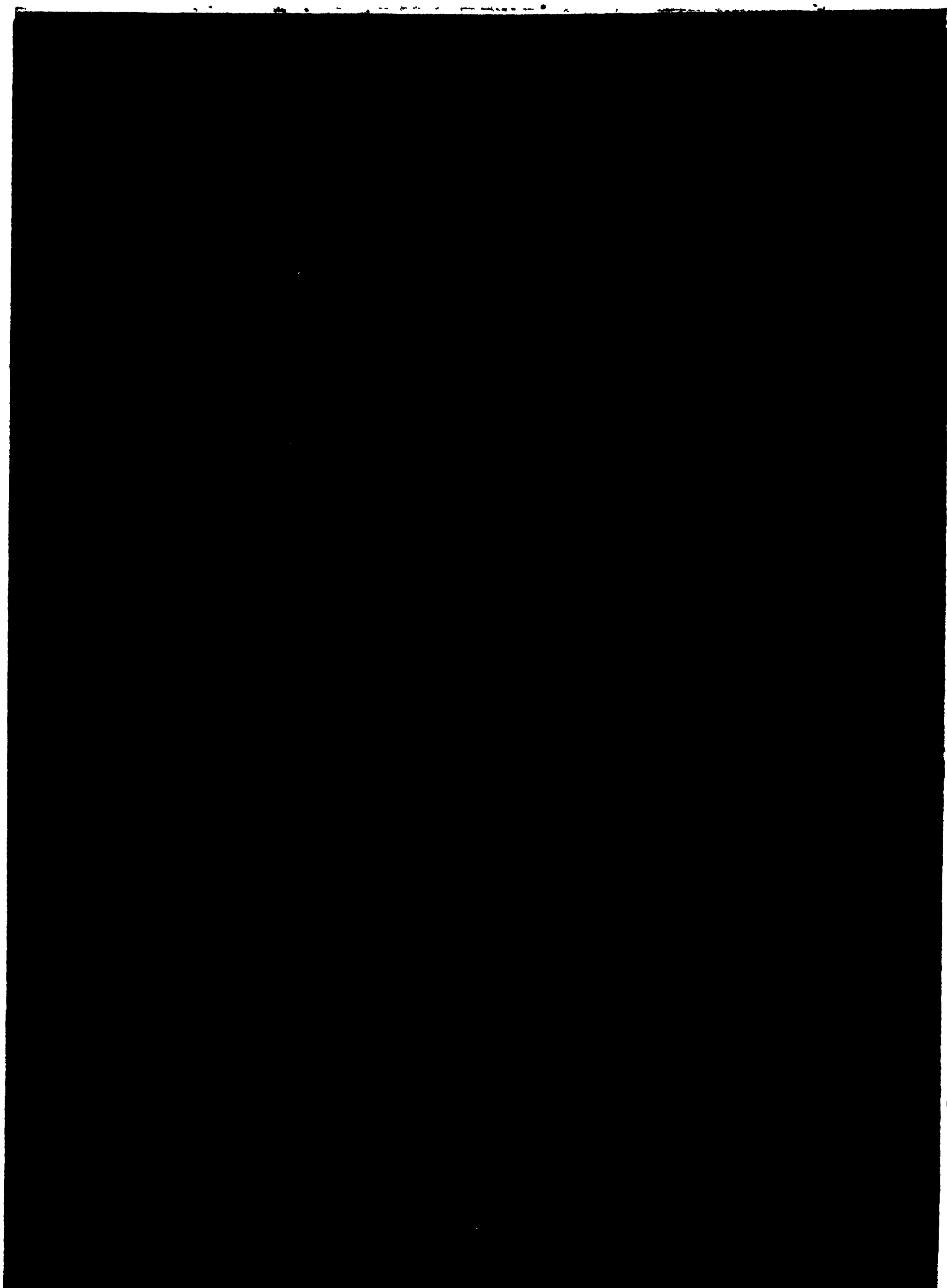


বলা চলে না। পর পর কতকগুলি ঘটনা ও বিশেষ অবস্থানের ফলে এশিয়ার কোনো কোনো দেশ পৃথিবীর অন্তদেশীয় মানবকর্মীর আবিষ্কৃত বিজ্ঞানকে প্রয়োগ ক'রে দেখবার সুযোগ পায়নি। এশিয়ার এই সব দেশগুলিই একদিন বিজ্ঞানের অনেক বিভাগের সৃষ্টিকর্তা, পরে য়ুরোপ সেই সব বিজ্ঞানকে আরো উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। আজকের দিনে জাপানী, চীন এবং ভারতীয় অনেক বৈজ্ঞানিকের নাম সমস্ত পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক-জগতে সমাদৃত হচ্ছে।

*   *   *

ওয়েল্‌স্‌-এর মৃত্যু উপলক্ষে সেদিন তাঁর বন্ধু অগ্রজ বর্ণার্ড শ' বলেছেন, "এইচ্‌ জি ছিলেন খাঁটি লোক, অপ্রমত্ত ছিল তাঁর স্বভাব, অক্লান্তকর্মী ছিলেন তিনি—সব সময়ে প্রতিভাবান্‌ পুরুষের এই সব গুণ থাকে না। ছোটো ছেলেমেয়েদের জড় করে তিনি নূতন খেলা বানাতেন আর তাদের সঙ্গে খেলতেন,—হুইসিল হাতে নিয়ে পুরানো খেলায় তাদের রেফেরি সাজতেন…। শ্রেষ্ঠ কথা-বলিয়ের যুগে…তিনিও ছিলেন সঙ্গীদের অন্যতম, অথচ একটুও এমন ধরণ ছিল না যে বিশেষ কিছু বলছেন বা করছেন। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে কেউ কখনো অসুখী হয়নি।"

মানববন্ধু এই উদারপ্রাণ শিল্পীর উদ্দেশে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।



পণ্ডিতজী

সে এক দেশ অনেক আগের শিশুলোকের থেকে
সাগরগামী নদীর মত স্বরে
আমার মনের ঘুঘুমরালভ্রংসী ঝাউয়ের বনে
আধো আলোছায়াচ্ছন্ন ভাবে মনে পড়ে
টিউটনের গল্পে ছড়ায় সাগায় সূর্য্যালোকে
থেকে থেকে আভাস দিয়ে যেত ;—
গ্রিমের থেকে হীগেল শিলার সামুদ্র দানবীয়
গ্যেটের সে দেশ সূর্য্য অনিকেত ?

মাঝে মাঝে আমার দেশের শিপ্রা, পদ্মা, রেবা,
ঝিলম, জলশ্রীকে আমি
সর্পীবোনের মতন কোথাও পাহাড় অবধি
অথবা নীল ভূকল্লোলে সাগর সুভাষিত
ক'রতে গিয়ে শুনেছিলাম রাইনের মত নদী
কি এক গভীর হ্বাইমারী মেঘ সূর্য বাতাস নিয়ে
নর-নারী নগর গ্রামীনতায় ব্যাপ্ত রীতি
লক্ষ্য ক'রেই সবিতাসাধ জানিয়েছিল ;—
তিন দশকের পরে
এ সব স্বপ্নমিশেল কি এক শূন্য অনুমিতি।

যদিও আমি আজো বেশি সূর্য্য ভালোবাসি
তবুও যারা মনের নীহারিকার পথে ঠাণ্ডা অমল দিন
জাগিয়ে সূর্য্যপ্রতিম আকাশ সমাজ নিয়ে যাত্রা ক'রেছিল
সে সব হৃদয়গ্রাহী টোলার রিল্‌কে হোল্ডার্‌লিন্
সবংশে কি হারিয়ে গেছে রাইখ্‌শরীরের থেকে ?—
ব্যক্তি স্বাধীনতায় ঘুরে অনাথ মানবতার লেন্ দেন্
শুধতে ভুলে গিয়ে কি ভয় রক্ত গ্লানি রিরংসা ফুঁপারে
রেখে গেছে অমোঘ বর্ব্বরতার বেল্‌জেন্ ?

বর্ব্বরতা কোথায় তবু নেই ?—তবু এই প্রশ্ন-আতুর মনে
গভীরতর হৃদয়ব্যাধির ঈষৎ সমাধান
আজকে ভীষণ নিরুদ্দেশের অন্ধকারে রয়েছে টিউটন ?
রোন্‌কে চিনি,—ইউরোপের হৃদয়ে রাইনযান্
সহোদরার মতন রৌদ্র আকাশ মাটি যব গোধুমের পাশে
যুগে যুগে উত্তরণের লক্ষ্যে প্রবেশ ক'রে
এনেছিল কাণ্ট কাথিড্রাল দৈবতদের
উষাপ্রদোষ অখল ভাগ্‌নেরের
অভিনিবেশ-বলয়িত গ্যেটের সূর্য্যকরে।

জার্ম্মাণীর রাত্রিপথে : ১৯৪৫

জীবনানন্দ দাশ

যদিও তা' ব্যক্তিকতার মায়ার মৃগতৃষ্ণাতীত,—তবু
চমৎকৃত হয়েছিল ইউরোপের ভাবনাধূসর মন ;
সৌরকরভ্রমে উনবিংশ শতকীয়া
হয়তো তাকে ঘরের বহিরাশ্রয়িত দিব্য বাতায়ন—
বাতায়নের বাইরে মেঘের সূর্য্য ভেবেছিল ;
আমরা আজো অনেক জেনে এর বেশি কি ভাবি ?
ইতিহাসের ভূমায় সীমাস্বল্পতাকে যাচাই করার রীতি
গ্যেটের ছিল ;—তবুও সীমার কী
ভয়ঙ্কর বৈনাশিকী দাবী !

সেই তো পায়ের নিচে রাখে
পরমপ্রসাদগভীর তনিমাকে
সময়পুরুষ বলে : 'তুমি নিজের কালের ভার
ব'য়েছিলে লীলায়িত সৌরতেজে ;—
এ যুগ তবু অন্য সকলের ;
আরেক রকম ব্যতিক্রমের,—হে কবি, হ্বাইমার।'
সময় এখন জ্যোতির্ম্ময়ী অমেয়তার প্রবাস থেকে ফিরে
নিরিখ পেয়ে গেছে নিজের নিঃশ্রেয়সের পথে ;
সেইখানে কাল লোকাতীত হতে গিয়ে
কোথাও থেমে যায়—
ক্লান্তি-আলোর বয়স বেড়ে গেলে কঠিন রীতির জগতে

নবজাতক অর্থনীতি সমাজনীতি কলের
কণ্ঠে কি প্রাণকাকলী ?
এই পৃথিবীর আদিগন্ত ব্যক্তিশবের শেষে
দেখা দেবে হয়তো নতুন সুপরিসর নাগর সভ্যতায়
মানবতার নামে নবীন ব্যক্তিহীনতাকে ভালোবেসে ;
হয়তো নগর রাষ্ট্র সফল হয়ে গেলে নাগরিকের মন
হৃদয়প্রেমিক হয়ে যাবে সবার তরে—উচিত অনুপাতে ;
জড়-রীতির—অর্থনীতির সনির্ব্বচন
মেশিন ভেনে এসব যদি হয়
তা হ'লে তা' অমিয় হোক্ আন্তরিকতাতে।

★

প্রমথ চৌধুরী

বাঙ্গালা দেশটার উপর বোধ করি স্বয়ং বিধাতা অপ্রসন্ন। প্রকৃতির দুর্য্যোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়াই আছে। ফলে বাঙ্গালীর জীবন ও সম্পদ সর্ব্বদাই বিপন্ন। বিধাতা শুধু ইহাতেই ক্ষান্ত হন নাই। বাঙ্গালার সাহিত্য-গগনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করাজি একে একে যেন তাঁহারই ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটিতে কক্ষচ্যুত হইয়া খসিয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে এবং সাহিত্যের উপর যেন কোন অদৃশ্য হস্ত ধীরে ধীরে ঘন-কৃষ্ণ যবনিকা টানিয়া দিতেছে।

কয়েক বৎসরের মধ্যে আমরা হারাইলাম প্রথমে শরৎচন্দ্রকে, তাহার পর রবীন্দ্রনাথকে। বর্ত্তমানে হারাইলাম বাঙ্গালা সাহিত্যের 'বীরবল' প্রমথ চৌধুরীকে। যাঁহাদের রচনায় বাঙ্গালা সাহিত্য পুষ্ট, যাঁহাদের সাধনায় বাঙ্গলা সাহিত্য আজ উন্নতির গরিমায় উজ্জ্বল, যাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিশ্বসাহিত্যে বাঙ্গালা সাহিত্য এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী—সেই সব দিকপালেরা একে একে আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। বঙ্গবাণীর স্বর্ণমন্দিরের উজ্জ্বল প্রদীপগুলি একে একে নিবিয়া যাইতেছে।

'বীরবল'—এই নামের সহিত প্রত্যেক সাহিত্যরসিকই পরিচিত। তাঁহার রচনাভঙ্গী সম্পূর্ণ নিজস্ব। সেই ব্যক্তিত্ব প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সহজ, সরল ভাষা, সংক্ষিপ্ত প্রকাশভঙ্গী অথচ সারবান ভাবে ভরা, সুতীক্ষ্ণ সুমার্জিত ব্যঙ্গ, এ তাঁহারই বিশেষত্ব। সে ভাষা, সে ভঙ্গী তাঁহারই আবিষ্কৃত এবং বোধ করি অননুকরণীয়। আকবরের সভার বীরবলের মতই বাঙ্গালা সাহিত্য-সভায় বীরবল একটি উজ্জ্বল রত্ন। তেমনই রসিক মন, তেমনই শ্যেন দৃষ্টি। তাই রচনাও হইয়াছে রসে-ভরা অথচ সুতীক্ষ্ণ। প্রমথ বাবুর এই ছদ্ম নাম গ্রহণ সর্ব্বতোভাবে সার্থক। সুগার কোটের কুইনাইন পিলের সঙ্গে বীরবলের সাহিত্যের তুলনা করা চলে। কুইনাইন যেমন তিক্ত অথচ উপকারী এবং তাহার উপরে সুগার কোটিং দিয়া যেমন তাহার তিক্ততা মিষ্ট করা যায়, তেমনই বীরবলের সাহিত্য সুতীক্ষ্ণ অথচ সারবান আর সেই তীক্ষ্ণতা মোলায়েম করা হইয়াছে মধুর সরল ভাষায়।

রবীন্দ্র যুগের সাহিত্যিক, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়াইয়া নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছেন, এমন সাহিত্যিক অতি বিরল। প্রমথ চৌধুরী তাঁহার সমালোচনায়, কবিতায়, গল্প ও প্রবন্ধ রচনায় এক স্বতন্ত্র এবং অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছেন। ইহা তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং সৃজনী-প্রতিভার পরিচায়ক।

'সবুজ পত্র' সে যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-রস পরিবেশন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে এক নূতন যুগ আনে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রমথ বাবুর সম্পাদনায় এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ তৎকালীন শ্রেষ্ঠ লেখকগোষ্ঠীর সকলেই নিজ নিজ শ্রেষ্ঠ রচনায় পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করেন। 'সবুজপত্রে'র বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তাহাতে কোন বিজ্ঞাপন ছাপা হইত না। একান্ত ভাবে বাণীর সেবাই ছিল তাহার ধর্ম্ম। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য, কিছু কাল পরেই এই পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়।

প্রমথ চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে যশোহর সহরে। তাঁহার পৈত্রিক নিবাস হরিপুর গ্রাম, পাবনা জেলা। তাঁহার পিতা দুর্গাদাস চৌধুরী মহাশয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কর্ম্মস্থল ছিল কৃষ্ণনগরে। প্রমথ বাবু কৃষ্ণনগর হইতে এন্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়িয়া কলিকাতায় হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেণ্ট জেভিয়ার্স হইতে এফ এ, এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এম-এ পাশ করিয়া তিনি বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে যান। সেখানে তিনি ফরাসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকায় তাঁহার অনূদিত কয়েকটি ফরাসী গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। প্রমথ চৌধুরীর রচনাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—'চার ইয়ারী কথা,' 'নীল-লোহিতের আদি কথা' 'ঘোষালের ত্রিকথা,' 'বীরবলের হালখাতা,' 'তেল, নুণ, লকড়ি,' ইত্যাদি। বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী।

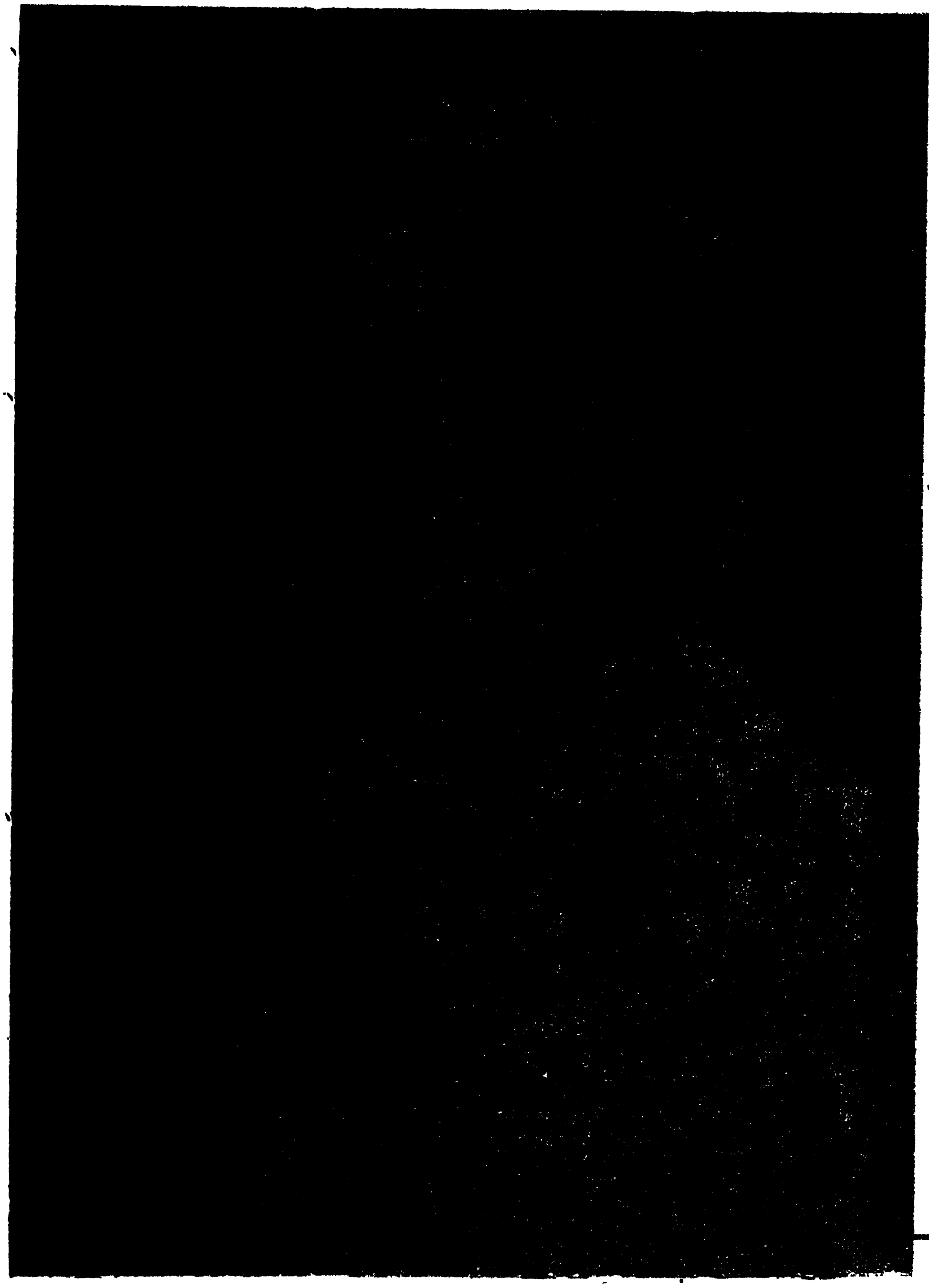
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে জগত্তারিণী পদকে ভূষিত করিয়া গুণ-গ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে সাহিত্য রচনায় বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন। তা ছাড়া স্নেহও করিতেন বিলক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। তবু রোগ ও বার্দ্ধক্য-প্রায় স্থবির অবস্থাতেই তিনি রবীন্দ্রনাথের অতি সাধের পত্রিকা 'বিশ্বভারতী'র সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ইহাতেই তাঁহার বিশ্বকবির প্রতি অসামান্য শ্রদ্ধা ও বিশেষ কৃতজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বহু দিন হইতেই তিনি রোগে ভুগিতেছিলেন। শেষের দিকে একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। ২রা সেপ্টেম্বর সোমবার রাত্রিতে তিনি পরলোক গমন করেন; মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৮ বৎসর হইয়াছিল।

প্রমথ চৌধুরী ছিলেন বাঙ্গালা সাহিত্যের পুরাতন এবং নবীনপন্থীদের মধ্যে যোগসূত্র। বয়সে প্রাচীন হইলেও তাঁহার সাহিত্য চিরনবীন। পুরাতন যুগকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে, নতুন ভাষার পোষাকে তিনি নবীনদের উপহার দিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোধানে সেই যোগসূত্রটি ছিন্ন হইয়া গেল। ইহা যে কত বড় ক্ষতি তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। দুই দলের মধ্যে এক বিরাট ফাঁক রহিয়া গেল, যাহার পূরণ করিবার মত সাহিত্যিক বাঙ্গালায় আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সে এক দেশ অনেক আগের শি[illegible]



শিল্পী—মাখন দত্তগুপ্ত

বিদ্যাপতির খেয়াল

অধ্যাপক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

কবিরা চিরদিন কল্পনা-বিলাসী। তাঁহারা কল্পনার স্বপ্ন-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কত সোনার সূক্ষ্ম সূতা কাটিয়া তাহাতে মানুষের চিত্তরূপ মক্ষিকা ধরিবার জন্য জাল বুনিয়া থাকেন। মাকড়সার জালে মক্ষিকা পতিত হইলে, সে চায় জাল হইতে মুক্ত হইতে, আর আমাদের চিত্ত-মধুপ চায় আরও জড়াইতে।

বিদ্যাপতির কল্পনার একটি উদাহরণ মনে হইতেছে। তাঁহার চিরমধুর পদাবলী যে ভাগবতের অনুসারিণী, তাহা সকলেই জানে। কিন্তু নূতন নূতন কল্পনা-বিলাস সৃষ্টি করিয়া বিদ্যাপতি আমাদিগকে বিস্মিত করিতেও ত্রুটি করেন নাই। তিনি একটি পদে লক্ষ্মী ও ভবানীর মধ্যে হোলি-খেলার প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। 'হোলি' কথাটি তিনি ব্যবহার না করিলেও হোলি-লীলাই যে তাঁহার অভিপ্রেত, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

খেলে লখমী ভবানী রিতু বসন্ত।
গৌরী ভ্রূকুটিল করে অনন্ত॥

বসন্ত কালে হোলি-লীলাই প্রসিদ্ধ। বিদ্যাপতির এই পদটি হরগৌরী পদের অন্তর্গত। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ পদে হোলিলীলার কোনও পদ পাওয়া যায় না। বিদ্যাপতির সমস্ত পদই যে আমরা পাইয়াছি তাহা বলা যায় না। পঞ্চদশ শতাব্দীর এই কবি যে সকল পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কতক কতক যোড়শ শতাব্দীতেই লোপ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। গোবিন্দ কবিরাজ যোড়শ শতাব্দীর কবি; তিনি বিদ্যাপতির কতকগুলি অর্ধলুপ্ত পদ উদ্ধার করিয়া বিদ্যাপতির নামের সহিত নিজ-নামের ভণিতা দিয়াছেন:

বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রসপূর।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাধামোহন ঠাকুরও বিদ্যাপতির রাসের একটি পদ পূর্ণ করিয়াছিলেন:

বর্ণিত রাস বিদ্যাপতি সূর।
রাধামোহন দাস রসপূর॥

বিদ্যাপতির রাসের পদ বেশি নাই। কিন্তু ছিল কি না, তাহা বলিবার উপায় নাই। ভাগবতের দশম স্কন্ধে রাসলীলার বিস্তৃত বিবরণ আছে। কাজেই বিদ্যাপতি অমন সুন্দর পরিকল্পিত লীলা লইয়া যে দুই একটি পদের অধিক রচনা করেন নাই, ইহা মনে করিবার কারণ নাই। হয়ত তিনি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সে পদগুলি কালের গর্ভে তলাইয়া গিয়াছে।

হোলি-লীলার উল্লেখ ভাগবতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বিদ্যাপতি এই বসন্তলীলা এবং ফাগ খেলার চিত্র যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে হোলি-লীলা তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। প্রচলিত হোলি-লীলা বসন্তলীলারই অন্তর্গত। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সমকালে শ্রীসনাতন গোস্বামী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন:

ভদ্রালম্বিত- শৈব্যোদীরিত
রক্ত রজোভরধারী।
পশ্য সনাতন- মূর্তিরয়ং ঘনং
বৃন্দাবন-রুচিকারী॥

ভদ্রা সখীর সঙ্গে মিলিত হইয়া শৈব্যা নাম্নী যুবতী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে লোহিত ফল্গুচূর্ণ নিক্ষেপ করিতেছেন—বসন্ত কালে এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে লীলা করিতেছেন।

মধুরিপুরত্র বসন্তে।
খেলতি গোকুল যুবতিভিরুজ্জ্বল
পুষ্পসুগন্ধি দিগন্তে॥

এই ফাগু খেলার অনুষ্ঠান লইয়া জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস প্রভৃতি বহু পদ রচনা করিয়াছেন। আরও পরবর্তী কালে শিবরাম, গোবর্দ্ধন এবং উদ্ধবদাস প্রভৃতিও সুন্দর সুন্দর পদ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতিও যে এই লীলার বিষয় অবগত ছিলেন, এবং এক অভিনব পরিস্থিতির মধ্যে ইহার অবতারণা করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতেই হয়।

হোলি-লীলায় ফাগ এবং পিচকারীর সঙ্গে উভয় দলের মধ্যে গালাগালি ও কৃত্রিম (?) কলহ হয়। এখনও হিন্দুস্থানীদের মধ্যে যখন হোলির উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তখন কোনও কোনও ক্ষেত্রে মেয়ে-পুরুষের দুই দলে যে গালাগালি বর্ষিত হয় তাহাতে কান পাতে কাহার সাধ্য? বৈষ্ণব পদাবলীতেও আমরা এই রীতির উল্লেখ দেখিতে পাই। এক দিকে শ্রীরাধারাণীর দল, তাহার সেনাপতি ললিতা ও বিশাখা; অপর দিকে শ্রীকৃষ্ণের দল, তাহার সেনাপতি সুবল ও মধুমঙ্গল।

যূথহি যূথ প্রবন্ধ হোবল সবে
ললিতা বিশাখা আগে করি।
সমুখা সমুখি দুহু ছুটে পিচকারি মুহু
রঙ্গ গোলাল বহু ভরি॥
বটু সুবল সহ খেলত আগে কঁহি
নটবর নাগর রায়।

* * *

এই ভাবে খেলা হইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে রসপূর্ণ গালি বর্ষিত হইতেছে:

ব্রজবনিতা যত রিঝি রিঝায়ত
রসগারি মুগ্ধভাবা। উদ্ধব দাস

বিদ্যাপতির খেয়াল অপরূপ, তিনি লক্ষ্মী ও গৌরীর মধ্যে বসন্ত ঋতুতে এই লীলার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। পিচকারীর কথা নাই বটে, কিন্তু গালাগালির রীতিটি সুস্পষ্ট ভাবেই আছে।

খেলে লখমী ভবানী রিতু বসন্ত।
গৌরী ভ্রূকুটিল দেবী করে অনন্ত॥
ইসর নাম ধরু কোন অজ্ঞান।
ছাড়ি তুরগ বসহা পলান॥
জটা ভুজঙ্গম অঙ্গ চাহ।
এহন উমত গৌরা তোহর নাহ॥

ওহে গৌরী ! তোমার স্বামীকে কোন্ মূর্খ ঈশ্বর বলে ? তিনি ত অশ্ব ছাড়িয়া বলদে চড়িয়া বেড়ান। চন্দন কুঙ্কুম ত্যাগ করিয়া অঙ্গে জটা-ভস্ম এই সব ধারণ করিতে ভালবাসেন। এমনি পাগল তোমার স্বামী।

তখন গৌরী উত্তর দিতেছেন :

কি ? আমার স্বামী পাগল ? আঃ তোমার স্বামীটি কি ?

মছ কছ বাধা বরাহ।
বামন কুবড়া তোহর নাহ ॥
দছিনা জাচথি বলিক থান।
তব ন বরজনহ অপন কান ॥

তোমার স্বামী ত কখনও মৎস্য, কখনও কূর্ম্ম, কখনও ব্যাধ, কখনও বরাহ, বামন, কুব্জ। বলির কাছে দক্ষিণা প্রার্থনা করেন, তথাপি তুমি তোমার কৃষ্ণকে বর্জন করিলে না ?

অর্থাৎ দান গ্রহণ করিলে পতিত হইতে হয়, ইহা শাস্ত্রে বলে। এবং শাস্ত্রে ইহাও বলে যে, যে-স্বামী পতিত তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়। পতিত পতিকে ত্যাগ করিয়া অন্য পতি গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা আছে।

একটু আঘাত লাগিল, কাজেই প্রত্যুত্তরকে একটু তীব্র করিয়া তুলিতে হইল। লক্ষ্মী বলিতেছেন : তুমি আমার স্বামীকে পতিত বলিলে, কিন্তু তোমার স্বামী ত অজ্ঞাতকুলশীল সন্ন্যাসী। এমন স্বামীর সঙ্গলোভে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াও। দেবতা ও ঋষিগণকেও তোমার লজ্জা করে না ? স্বামী নাচাইয়া নাচাইয়া বেড়াও, এমন কাজও করে !

এবারে গৌরীও কিছু উগ্র হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, লক্ষ্মী, তুমি না সমুদ্র-সম্ভবা ? এত বড় পিতার কন্যা হইয়াও তুমি গোয়ালার ছেলে কৃষ্ণকে খুঁজিয়া বিবাহ করিলে। তা-ও যদি তোমার প্রতি অনুরক্ত থাকিতেন, তাহা হইলেও কথা ছিল না। কিন্তু তোমার স্বামী এমন গুণধর যে সদা সর্ব্বদা যমুনার তীরে বসিয়া থাকেন, এবং সুযোগ পাইলেই পরযুবতীর বস্ত্রহরণ করেন।

উদধিতনয়া হক তোহর জ্ঞান।
খোজি বিয়হলহ অহির কান ॥
সদা বসথি জমুনা তীর।
পরযুবতীকের হরথি চীর ॥

গৌরী ও লক্ষ্মীর মধ্যে যখন এইরূপ মধুর কলহ হইতেছে, তখন শিব ও নারায়ণ অন্তরে থাকিয়া তাহা উপভোগ করিতেছেন :

হস শিবশঙ্কর ও মুরারি।
দুহুজনিকে ভল তোইছ রারি ॥

রারি অর্থ—কলহ, বিবাদ।

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, আমি হরি ও হর উভয়ের দাস। উভয়ে আমার মনোরথ পূর্ণ করুন :

ভন জয়দেব হরি হরক দাস।
নীলকণ্ঠ হরি পুরথু আস ॥

যাঁহারা বিদ্যাপতিকে শৈব প্রমাণ না করিয়া ছাড়িবেন না, তাঁহাদের পক্ষে এই অমূল্য পদটির সন্ধান রাখা আবশ্যক মনে করি। নব জয়দেব উপাধি বিদ্যাপতি মিথিলার রাজা শিবসিংহের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন ইহা বলা বাহুল্য। ফাগ খেলা সম্বন্ধে বিদ্যাপতির আর একটি কৌতুককর পদ আছে। এক দিন শিবের ফাগু খেলিবার সাধ হইল। কাঞ্চন ঝুলিতে সিন্দুর ভরা হইল এবং থলি ভস্মে ভর্ত্তি করা হইল। বৃষভ, সিংহ, ময়ূর ও ইন্দুরে চড়িয়া সকলে আসিলেন।

বসহা কেসরি ময়ুর মুসা
চারিহু পলু পলান ॥
তখন ডিমিকি ডিমিকি ডামরু বাজই
ইসর খেলই ফাগু।
ভসমে সিন্দুরে দুয়ও খেড়া
একহি দিবস লাগু ॥

একই দিবসে সিন্দুর ও ভস্ম দুইয়ের ফাগু-খেলা আরম্ভ হইল। গৌরী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী সিন্দুর উড়াইলেন, আর শিব উড়াইলেন ভস্ম— আর কোথায় কি পাইবেন ? এই বিচিত্র খেলায়

ইসর ভসমে ভরু নরায়ন
পীতবসন বোরি ॥

শিব নারায়ণকে ভস্মে ভরিয়া দিলেন, আর তাঁহার পীত-বসন ভস্মে ডুবাইলেন। নারায়ণ কিছু সৌখীন লোক, তাঁহার সুন্দর বহুমূল্য পীত-বাস যখন ভস্মে ভরিয়া গেল তখন তিনি গরুড়ে চড়িয়া পিঠটান দিলেন। কারণ, অপর পক্ষকে প্রতিশোধ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। কেন না, শিব দিগম্বর—কৌপীনধারী (ন্যাংটা)। নারায়ণ পলায়নপর হইলে শিবও পশ্চাৎ পশ্চাৎ বলদে চড়িয়া বাহির হইলেন।

গরুড় বাহন দেব নরায়ণ
বসহা চঢ়ু মহেস।
ভনই বিদ্যাপতি কৌতুক গাওল
সঙ্গ হি ফিরলু দেস।

সেকেলে গল্প

"ভাস্কর"

কাশী বাঙালীটোলার একটি হোটেলে দুইটি যুবক কিছু দিন হইল বাস করিতেছে। দুই জনেরই অতি সাদাসিধে পরিচ্ছদ ও চাল-চলন। নাম সদানন্দ ও তিনকড়ি।

তিনকড়ির আকৃতি-প্রকৃতি দেখিলে কষ্ট হয়। প্রায় ময়লা কাপড়-জামা, চুল রুক্ষ, বহু দিন দাড়ী-গোঁফ কামান হয় নাই। সকলেই অনুমান করে, হয় শোক, না হয় বিরহ। সদানন্দ ছাড়া আর কেহ কিছু জানে না, কেহ বিশেষ একটা জিজ্ঞাসাবাদও করে না। কেহ কিছু একটা অনুমান করিয়া লয়। কেহ কিছুই ভাবে না।

সকালে বৈকালে ইহারা বেড়াইতে বাহির হয়। এদিকে সেদিকে পথে পথে ঘোরে, কোন দিন মণিকর্ণিকা ঘাটে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে, কখনও দশাশ্বমেধ ঘাটে বসিয়া নির্নিমেষ নয়নে জলের দিকে চাহিয়া থাকে। ঘাটে-পথে কত লোক আসে যায়, কথা বলে, স্নান করে, দোকানে জিনিষ কেনে, গল্প করে. কোন দিকেই বা কোন বিষয়েই এদের মন নেই। তিনকড়ির চোখে সর্ব্বদা একটা উদাস দৃষ্টি, মনে নীরব অশান্তি, দেহে অবসাদ ও ক্লান্তি। সদানন্দ ঠিক অতটা না হইলেও বন্ধুর সহিত সমবেদনায় খুবই কাতর।

একে তো হোটেলের খাওয়া, তার পর এই মানসিক অবস্থা। তিনকড়ির মুখে অন্ন উঠে না। সদানন্দ কত বুঝায়, কত সান্ত্বনা দেয়, কিন্তু বুঝিবার বা সান্ত্বনা পাইবার মত কিছু তো তিনকড়ির নাই। আছে শুধু মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস। অনাহারে অনিদ্রায় তিনকড়ি যেন শুকাইতেছে, সদানন্দ দেখিতেছে, কিন্তু কিছুই করিতে পারিতেছে না। দিন যায়, রাত্রি আসে। আবার রাত্রি যায়, দিন আসে। সদানন্দ বলে, এবার বাড়ী চল, তিনকড়ি।

বাড়ী! হুঁঃ।

এমন করে শরীর-মন খারাপ করলে যে পাগল হ'য়ে যাবি।

পাগল! হুঁঃ।

সত্যি, তুই এবার বাড়ী চল। এখানে আর থেকে কি হবে? আমারও তো এবার ফেরা দরকার।

তা, যা না তুই চলে।

আর তুই? এমনি করে একা-একা ক'দিন কোথায় থাকবি?

অত ভাবার শক্তি আমার নেই।

কিন্তু একটু শান্ত না হ'লে তোকে ফেলে আমি যাই কি করে?

তবে যাস্ নে। কিন্তু—

কিন্তু কি?

না, কিছু না। বলছিলুম কি, আমাকে তোরা বাদ দিয়ে দে।

মানে?

মানে, মনে কর, আমি নেই।

কি যা-তা বলিস্। চল, ওঠ, একটু বেড়িয়ে আসি।

তাহারা হোটেল হইতে বাহির হইয়া বিশ্বনাথের মন্দিরে যায়। মাটিতে মাথা ঠুকিয়া প্রণাম করে, মনে মনে হয়তো কত কাতর প্রার্থনা জানায়। বিশ্বনাথের পাষাণ কায়া সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করে কি না কে জানে?

সেখান হইতে বাহির হইয়া হয়তো পথে, বাজারে এমনি ঘুরে বেড়ায়। শিশু, বৃদ্ধ, সধবা, বিধবা, যুবতী, কিশোরী, কত নরনারী কত কাজে পথ বাহিয়া চলিয়াছে, কথা কহিতেছে, হাসিতেছে, তর্ক করিতেছে, হয়তো কলহও করিতেছে। তাহাদেরও মনে সুখ আছে, দুঃখ আছে, চিন্তা আছে, উদ্বেগ আছে, কিন্তু তিনকড়ির মত মনের অবস্থা কি কারো আছে? কেহ কি অমনি তৈল না মাখিয়া দাড়ি না কামাইয়া, কাপড়-জামা পরিষ্কার না করিয়া, কখনো খাইয়া, কখনো না খাইয়া, কখনো হোটেলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, কখনো পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়?

হয়তো বেড়ায় না। কিন্তু তিনকড়ির কি আসে-যায়! অন্যে কি করে, না করে, তাহাতে তিনকড়ির কিছুমাত্র আসে যায় না। কাহাকেও দেখিয়া, কাহারও কথা শুনিয়া, কাহারও উপদেশ লইয়া, কাহারও পরামর্শ লইয়া তিনকড়ির কোন লাভ নাই। মানুষের



সমাজে সে খাপছাড়া হইয়া পড়িয়াছে। কোন দিকেই কারো সঙ্গে সে কোন সম্বন্ধ, খুঁজিয়া পাইতেছে না। কাহাকেও দিয়া তাহার কোন

দরকার নাই। তাহাকেও কাহারো কোন দরকার না থাকিলেই সে বাঁচে।

আরো কয়েক দিন পরের কথা। সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। দশাশ্বমেধ ঘাটে লোকের ভীড় কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। সিঁড়ির একটি ধাপের এক-পাশে বসিয়া সদানন্দ ও তিনকড়ি। তিনকড়ি আজ অসম্ভব গম্ভীর। রাত্রির অন্ধকার যখন ঘনাইয়া আসিতেছে, তখন তিনকড়ি বলিল, তুই এবার হোটেলে ফিরে যা। আমি একটু বসি, পরে যাব।

তিনকড়ির কথাগুলি সদানন্দের মনঃপূত হইল না। আজ সারা দিনই সে লক্ষ্য করিয়াছে, তিনকড়ি কি-যেন একটা সঙ্কল্প করিয়াছে, অথচ তাহাকে বলিতেছে না। সে ভয়ে ভয়ে বলিল, আচ্ছা, আমিও না হয় একটু বসি। একা-একা হোটেলে ফিরে গিয়েই বা কি করবো?

তিনকড়ি বলিল, না, তুমি আর বসো না। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

সদানন্দের সন্দেহ এবার ভয়ে পরিণত হইল। সে বলিল, তুমি একাই থাক। মনে কর, আমি এখানে নেই।

দুই জনেই চুপ-চাপ বসিয়া আছে। অন্ধকার ক্রমে যেন জমাট হইতেছে। ঘাটের লোকসংখ্যা ক্রমশঃই কমিতেছে।

হঠাৎ জলের ধারে এক স্থানে একটা হৈ-হৈ শব্দ উঠিল। দুই তিন জন লোক ঝপাং করিয়া জলে নামিয়া পড়িল। ঘাটের নিকটে যেখানে যে ছিল, দৌড়াইয়া আসিয়া সেই এক স্থানে জড় হইল। একটু পরে দুই জন লোক একটি মেয়েকে ধরিয়া টানিয়া তীরে উঠাইল। মেয়েটির শরীর নিস্পন্দ। জল খাইয়া পেট যেন একটু ফুলিয়া উঠিয়াছে। পরিধেয় শাড়ীখানি অবিন্যস্ত ভাবে কোন মতে শরীরটিকে জড়াইয়া আছে।

তিনকড়ি ও সদানন্দও দৌড়িয়া সেখানে গিয়াছে। ভীড় ঠেলিয়া নিকটে গিয়া অচেতন মেয়েটিকে দেখিল বটে, কিন্তু কি করা উচিত কিছুই স্থির করিতে পারিল না। ভীড়ের মধ্য হইতে এক জন বলিলেন, কেউ গিয়ে শিগ্‌গির একটা ডাক্তার ডাকুন। কাছেই শ্রীপতি ডাক্তার আছে বাঙালীটোলায়—চট্‌ করে খবর দিন গিয়ে।

আমি এখুনি যাচ্ছি—বলিয়া একটি যুবক ঘাট বাহিয়া উপরে ছুটিল, ডাক্তার ডাকিতে।

ইতিমধ্যে এক জন মেয়েটির দুই হাঁটু উপরের দিকে ভাঙিয়া পেটে চাপ দিয়া খানিকটা জল মুখ দিয়া বাহির করিয়া দিলেন। কিন্তু নাকের কাছে হাত দিয়া দেখা গেল, তখনও নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে না।

এই আকস্মিক ব্যাপারে তিনকড়ি নিজের অবস্থা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। ভুলিয়াছে তাহার রুক্ষ কেশ, মলিন বেশ, ভুলিয়াছে তাহার ভীষণ খোঁচা খোঁচা দাড়ী আর গোঁফ। মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে বঙ্কিম-বর্ণিত পুকুর পাড়ে গোবিন্দলাল আর রোহিণীর কথা। সে তৎক্ষণাৎ নীচু হইয়া গোবিন্দ-রোহিণী প্রক্রিয়া দ্বারা ফুস্‌ফুসে বায়ুসঞ্চালন করিতেই একটু একটু করিয়া শ্বাস বহিতে লাগিল। ক্রমশঃ আর একটু জ্ঞান ফিরিয়া আসিতেই মেয়েটি উঠিয়া বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মাথা নীচু করিয়া ফেলিল।

ভাল করিয়া মুখ দেখা না গেলেও, তিনকড়ি সহসা প্রায় চীৎকার করিয়াই বলিয়া উঠিল, এ কি! তুমি! তুমি! দুর্গা!

কে? তুমি?

হ্যাঁ, আমি। চিন্‌তে পারছো?

আসল কথা, দুর্গা এই অসুস্থ শরীরে, এই অন্ধকারে, ভীষণ গোঁফ-দাড়ীময় স্বামীর মুখ চিনিতে পারে নাই। কিন্তু তিনকড়ি ভুল করে নাই।

সদানন্দ অন্যান্য লোকদিগকে বলিল, আপনারা অনুগ্রহ করে একটু সরে যান। অনেক দিন পরে বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় এমন ভাবে যে স্বামি-স্ত্রীতে আবার সাক্ষাৎ হবে, তা আমরা কেউ ভাবিনি।

আস্তে আস্তে ভীড় কমিয়া গেল।

এই ব্যাপারের আগের একটু খবর আছে। কিছু দিন পূর্বে সদানন্দ, তিনকড়ি এবং তিনকড়ির স্ত্রী দুর্গারাণী কলিকাতা হইতে প্রয়াগে গিয়াছিল কুম্ভমেলায়। সেখানে এক দিন ভীড়ের মধ্যে দুর্গারাণী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ভীত ও উদ্বিগ্ন দুর্গারাণীর সাক্ষাৎ হয় কাশীনিবাসী শ্রীযুক্ত গদাধর শর্মার সঙ্গে। তিনি সব শুনিয়া তাহাকে আশ্বাস দেন যে তিনি কাশী ফিরিয়া গিয়াই তাহাকে তাহার নিজ আলয়ে ফিরিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

আশ্বস্ত মনে দুর্গা কাশীতে আসিয়া গদাধর বাবুর বাড়ীতে ওঠে। এক দিনের মধ্যেই কিন্তু সে বুঝিতে পারে, সে গদাধর বাবুর বাড়ীতে বন্দিনী। তাহাকে বাড়ীর বাহিরে তো যাইতে দেওয়াই হয় না, কাহারও সহিত আলাপ করিতে বা কোথাও পত্র লিখিতেও দেওয়া হয় না।

কয়েক দিন এইরূপে চলিল। তাহার যত্ন, আপ্যায়ন, আহারাদি প্রভৃতি কোন বিষয়েই কোন ত্রুটি নাই, বরং সব ব্যবস্থাই বেশ সন্তোষজনক। কিন্তু তাহার স্বামীর সন্ধান বা স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না।

দুর্গা বেশ বুঝিল, সম্মান থাকিতে স্বামিলাভের আশা নাই। এক দিন রাত্রে মনে ভীষণ তর্ক ও চিন্তা উপস্থিত হইল—স্বামী না সম্মান? অনেক চিন্তার পর স্থির করিয়া ফেলিল, সম্মান।

পরদিন সে গদাধর বাবুর সঙ্গে একটু হাসিয়াই কথা বলিল। বলিল, এত দিন কাশীতে এসেছি। একটু বাহিরেও গেলাম না, বিশ্বনাথের দর্শনও পেলাম না, গঙ্গাস্নানও করতে পেলাম না।

তোমার একটু ইচ্ছে হ'লে সবই হতে পারে।

বেশ তো, দিন না ব্যবস্থা করে। তা, আমি কিন্তু দিনে বেরুবো না। পথে চেনাশুনো কেউ যদি দেখে-টেখে ফেলে।

বেশ তো, বেশ তো।

হ্যাঁ, তাই ব্যবস্থা করে দিন। সন্ধ্যার পর কারো সঙ্গে একবার বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করে, একেবারে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসব।

বেশ তো, সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এত দিন মুখ ফুটে কোন কথা বলনি কেন আমায়?

সন্ধ্যার পর দুইটি বিশ্বস্ত কাশীবাসী দরওয়ানের সঙ্গে দুর্গারাণী দুর্গা-নাম জপ করিতে করিতে বিশ্বনাথের মন্দিরে যায়, সেখানে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া মনে মনে তিনকড়িকে তাহার মনের ব্যথা জানায়, তার পর আস্তে আস্তে সেখান হইতে বাহির হইয়া সর্ব্বাঙ্গে কাপড় জড়াইয়া গঙ্গার ঘাটে যায়। চিরশুদ্ধ গঙ্গানীরে আপনার কমনীয় দেহখানিকে বিসর্জ্জন দিয়া পরজন্মে তিনকড়িকে পুনরায় পাইবার আশায় দুর্গা জলে নামিয়াছিল, কিন্তু—

এর পরের কথা তো আগেই বলা হইয়াছে।

জীবন-জল-তরঙ্গ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১

ছাব্বিশে জানুয়ারি।

আকাশে মেঘ নাই—উত্তর থেকে বাতাস বইছে একটানা। বাংলা দেশের শীতে জলীয় অংশ বেশি; কিন্তু এবার শীতে পশ্চিমা প্রভাবটা বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে। লোকে বলছে—পালা-পড়া শীত। বেগুনের গাছে তেমন ফলন নাই। শীতের সঙ্গী বলে—লোকে বেগুনের জন্তেই আক্ষেপ করছে। তা ছাড়া অন্যান্য ফসলও শিশির না পেয়ে কেমন শ্রীহীন হ'য়ে গেছে। লাউ, সিম, কড়াইশুঁটি সবেতেই শীতের প্রতাপ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ। আর শীত জর্জ্জরিত করে তুলেছে—ফুলগাছগুলিকে। গাঁদার কুঁড়ি কুঁকড়ে ছোট হয়েছে, জুঁই, গন্ধরাজ, টগর, জবা—এ সব তো ফোটেই না—গোলাপও কেমন ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়েছে। শুধু গাছ আলো করে আছে—কুঁদ ফুল। প্রকাণ্ড—গোলাকার ঝাড়ে হাজার হাজার কুঁড়ি আর ফুল—হাজার-ডাল বাতির মতই বাগানের উত্তর দিকটা আলো করে আছে। গন্ধ নেই—শুধু সৌন্দর্য্যে শীতের শুভ্র উত্তরীয় ভরিয়ে রেখেছে। কুঁদ ফুল না থাকলে দেবতাকে কি দিয়ে তুষ্ট করতেন পূজারী—আর মালীরাই বা কি করে জীবন ধারণ করতো।

পূর্ব্বমুখী দাওয়ায় বসে দক্ষিণের ফুল বাগানের এই পুষ্প-সৌন্দর্য্যে পুরন্দর অবশ্য মগ্ন হয়নি। পূজার জন্ত ফুলের যোগান দেন—পুরন্দরের পিসিমা—,বাগানের পাট করে তার ছোট ভাই ও জ্ঞাতি সম্পর্কীয় এক কাকা—বাগান নিয়ে তাঁদেরই মমতা, আনন্দ বা খেদ প্রতিদিন চলে।—আর ফুলের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হবার অবসরই বা পুরন্দরের কোথায়? তার কাছে আজকের দিনটাই সব চেয়ে বড়। ভারতের ইতিহাসে—এই দিনটির তুলনা নেই। আজ সকালের শীতে শিশিরের সম্পর্ক যেমন নেই—উত্তরের বাতাস যেমন বইছে একটানা—আকাশে শাদা মেঘের স্তূপে নীল যেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে—আর পূবের সূর্য্য অত্যন্ত কোমল একটি রোদের আশীর্ব্বাদ আর গাছের ফাঁক দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে পুরন্দরের দাওয়ায় প্রান্তে—তেমনি কোন অভাবিত প্রত্যাশায় মন উঠেছে কানায় কানায় ভরে। বেদনা-আনন্দ-আশা ভরা কি সে প্রত্যাশা পুরন্দর জানে না, তবু মগ্ন হয়ে গেছে তারই মধ্যে।

আম-গাছের ডালে একটি কাক এসে বসলো নিঃশব্দে। ঠোঁটটা বারকতক ডালে ঘষে নিয়ে—কা কা করে ডাকলে। তার পর ডানা ঝাপ্‌টে উড়ে গেল।

চমক ভাঙলো পুরন্দরের।

কাকই ডাকলে—আর কিছু নয়। এই গ্রামে আর কিছু ডাকের প্রত্যাশা করাই বুঝি অন্যায়। এত বড় গ্রাম—এক কালের শিল্প-সমৃদ্ধিতে বাংলার শীর্ষস্থানে উঠেছিল—অথচ আজ সে পিছিয়ে আছে সবার থেকে। এর মাটিতে সাড়ে বারশো বছর আগে জ্বলেছিল যে বিদ্রোহ-বহ্নি—সারা ভারত তা আত্মসাৎ করে ভিন্নরূপে ঐক্য এনে দিয়েছে জাতির জীবনে—অথচ এ মাটি রইলো পবিত্র হয়ে—পাষাণ-বিগ্রহে যে পবিত্রতা আরোপ করে গ্রামবাসী নিশ্চিন্ত হয়ে আছে! জীবন এর নিঃশেষিত। নিঃশেষিত বলেই কি পবিত্র।

পুরন্দর সোজা হয়ে বসলো।—এই গ্রামে সে জন্মেছে। এর নাড়ী-নক্ষত্রের সঙ্গে তার অন্তরের যোগ—তবু একে সে চিনতে পারছে না। এর অতীতের গৌরব ইতিহাসের পৃষ্ঠা আশ্রয় করে আছে—ধীরে ধীরে লুপ্ত হচ্ছে প্রত্নতত্ত্বের গহ্বরে। মানুষ কেন দেখছে না চেয়ে—কেন টেনে তুলবার চেষ্টা করছে না তাকে বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে! ছাব্বিশে জানুয়ারি—এই গ্রামেরও নয় কি?

উঠে একটু দ্রুত-পদেই সে ঘরের মধ্যে এলো। উঁচু দাওয়া-যুক্ত মাটির ঘর—চালা খড়ের। পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন। ঘরের একধারে একখানা তক্তাপোষ পাতা—তার ওপর মাদুর বিছানো—বিছানাটা গুটানো রয়েছে এক ধারে। অন্য ধারে দেওয়াল ঘেঁষে একটা বড় কাঠের সিন্দুক। পালিশওয়ালা না হোক—নক্সা-কাটা বটে। আলিপনা ও লাল সিঁদুরের ফোঁটা এর অঙ্গে মাঙ্গলিক চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। দেয়ালে ক'খানা মাঝারি গোছের পটজাতীয় ছবি আছে। সবে সকাল আর ঘরের জানালাগুলো বন্ধ আছে বলে ছবির বিষয় বস্তু স্পষ্ট নয়। পুরন্দর জানালা না খুলেই সিন্দুকের কাছে এলো। হাত দিয়ে টেনে তুললে ভারি ডালাটা। সিন্দুকের ভিতর থেকে বার করলে একটা ছোট হাত-বাক্স—কাঠের। সেটার চাবি ছিল ওর ফতুয়ার পকেটে। ঘরের বাইরে এসে—বাক্সটা নামালে দাওয়ায়—যেখানে পুরু চটের আসনে ও বসেছিল। বাক্স খুলে বার করলে—এক তাড়া চিঠি। বার করলে একটি তিন রঙা ছোট ব্যাজ খদ্দরের পাঞ্জাবীতে এঁটে—এমনি দিনে সে গেল বার কলকাতার কলেজ ষ্ট্রীট থেকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সভায় কয়েক জন বন্ধুর সঙ্গে পায়ে হেঁটে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে যোগদান করেছিল। একটা সাদা টুপিও বেরুলো।

টুপিটা সে মাথায় পরলে না—কিংবা ব্যাজটা ফতুয়ার গায়ে আঁটলে না—দু'টোই একবার মাথায় ঠেকিয়ে যথাস্থানে রেখে দিলে। ···ভাল হ'য়ে বসে—সে একখানা ভারি লেফাফা উঠিয়ে নিলে।··· পুরু নীল খামের মধ্যে থেকে বেরুলো একতাড়া কাগজ—গল্পের পাণ্ডুলিপিও বলা যায়। এটা কিন্তু পাণ্ডুলিপিই—। এবং গল্পেরও। এই গ্রামেরই গল্প। এক জন ভিন্ন জেলার লোক কার্য্যোপলক্ষে এসে—এই গ্রামের যে ছবি দেখে গিয়েছিলেন—চিঠিতে তারই বর্ণনা। চিঠিগুলি অনেক বার পড়েছে পুরন্দর। অন্যের দৃষ্টিতে ও মন্তব্যে নিজেকে বা নিজের গ্রামকে বার বার জানতে কার না ইচ্ছা হয়? যখনই মনে উত্তেজনা আসে—কিংবা কর্ম্মপ্রেরণায় চঞ্চল হয়ে ওঠে দেহ—অথবা কিছুই ভাল লাগছে না এমন মুহূর্ত্তেও—চিঠিগুলি নিয়ে সে বসে। বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এই গ্রাম—, সত্তা ঘুরে বেড়ায় সেই অপরিচিত পরিমণ্ডলে। সারা দিন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে পুরন্দর।

যেমন ধরা যাক প্রথম বর্ণনা কিন্তু বর্ণনার আগে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে রাখা ভাল।···নাম তার ইন্দ্রজিৎ বসু। কলকাতা তার কর্ম্মস্থান হ'লেও জন্মস্থান নয়। আরও পূর্ব্বে—বরিশাল কিংবা ঢাকা জেলার কোন গ্রামে তাঁর বাস। যে সূত্রে মোটা মাইনের চাকরি ছেড়ে নেমেছিলেন স্বদেশসেবায়—সে তথ্য পুরন্দর জানে না, কিন্তু একথা জানে তার কাকা সত্যসুন্দরের সঙ্গে কলকাতায় একদা তাঁর আলাপ হয়,বন্ধুত্ব ঘটে—এবং তারই অনুরোধে তিনি বার কয়েক এসেছিলেন এই গ্রামে। সে-ও অনেক দিন হ'লো।

মহাত্মা গান্ধী যেবার উনিশশো একুশ সালে প্রথম অসহযোগ আন্দোলন করেন—সেইবার। সেইখানেই পুরন্দরের জন্ম। আর ইন্দ্রজিৎ বসু না কি রহস্যচ্ছলে নব-জাতকের নামকরণ করেছিলেন পুরন্দর। সে নামের অর্থ তিনিই জানতেন—ভিন্ন ভাবে—বাড়ীর লোক বা গ্রামের লোক জানে—পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত মিলিয়ে। যাই হোক,—পুরন্দরও আজকাল বোঝে—নামের অর্থ-ধারণ করার মধ্যে নয়—হয়ে ওঠার মধ্যে। নাম তো লক্ষ লক্ষ লোকের আছে এক রকমের। জাতিতে বর্ণে গোত্রে এক-একটা স্বতন্ত্র চিহ্ন ও ধারা থাকে প্রত্যেকের—তবু অনন্ত কাল-সমুদ্রের তীরে তুচ্ছ বালুকণার মতই তারা নাম-গোত্রহীন—অপরিচিত কেন? জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয় না কর্ম? আর তাতেই বুঝি নামের ফুল ফোটে না—ইতিহাসের পাতায়।

ইন্দ্রজিৎ বসুকে আজ পৃথিবীর লোক জানে। ভারতবরেণ্য তিনি। তাই মনের বিচলিত অবস্থায় তাঁর পত্রগুলি পুরন্দর বার বার পড়ে।

…চিঠিতে লেখা আছে :—

আশ্চর্য্য ভাবে বদলে গেল মন—অথচ তখনও আমরা রেলগাড়ি থেকে নামিনি। ছোট গাড়ির দোলা ও শব্দ বেশি—কিন্তু যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাঝখান দিয়ে সে ছুটে চলেছে তা যেন অত্যন্ত অশোভন। দু'ধারে আম-বাগানের সারি—ফাল্গুনের অল্প গরমে—বউল ফুটে গন্ধে মাতাল করেছে বনভূমিকে। অনেক নাম-না-জানা পাখী ঝঙ্কার তুলছে। একটা ঝুরি-নামা শাখা-বিস্তৃত বটগাছ পাশ কাটিয়ে গেল—সামনে পড়লো দক্ষিণমুখী একটা নদীর খাত—বনের মধ্যে দাওয়া সমেত কয়েকটা চালা—আর মাঠের দিগন্তে ঝুঁকে পড়েছে আকাশ অগাধ আলস্যে। কি জানি কেন—অকস্মাৎ মন ছুটে গেল সেই মুক্তি-সন্ধানী ধরণী-চুম্বি আকাশ-সীমান্তে। মুহূর্ত্তে উদ্দাম হ'য়ে উঠল চিত্ত। সাড়ে চারশো বছর আগে—এই মাটিতে যে বিপ্লব-বহ্নি একদিন জ্বলে উঠেছিল—নয়া জ্ঞানের শিখা তাকে আত্মসাৎ করে নিয়েছে। সেই মন-ভোলানো মৃদঙ্গের সুর, একতারা আর করতালের আশ্রয়ে নবান্ন ভোজনের গুণকীর্ত্তন করছে। সাত্ত্বিকতার নামে তামসিকতার ভড়ং—মেরেছ কলসীর কাণা তা বলে কি প্রেম দেব না—এই মন্ত্রকেই সার করেছে। ধ্বনিতে—বাণীর প্রকাশ আছে—বাণীর অন্তর্নিহিত তেজ নাই। যাক সে কথা—ষ্টেশনে বসে পড়লাম।

চোখে পড়লো—দেশের রাজপথ—তার যান-বাহন। তোমরা হয়তো বলবে এ দুটো দেশের পরিচয়,—সত্যকার পরিচয় বহন করে না। কিন্তু বাংলার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরেছি আমি। তার ইতিহাস না জানি—ঐতিহ্য কিছু জানি। আর পথ দেখে বুঝতে পারি তাদেরও—যারা যে পথে চলে। তার যান-বাহনে বুঝতে পারি—সে দেশের চেহারাটা কেমন। নদীয়ার এই সপ্তগ্রামের রাজপথ কেমন জান? শতাব্দী-সঞ্চিত ধুলো তার বুকে জমে আছে। অমরাবতীতে রাস্তায় উঠছে খোয়া—নয়নজুলি এসেছে ভরাট হয়ে। ধুলোয় ধুলোয় বিবর্ণ হয়েছে গাছপালা। নীল আকাশে ধুলো লাগে না তাই রক্ষা! কিন্তু কেমন সে ধুলো জান? গাটাকলে অর্থাৎ গৈরিক। যে রঙের জোয়ার পাগুতকে করেছিল সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী দেখেছিলেন স্বপ্ন—তাঁরই বিরাট প্রেমবন্যার সব ক্লেদ-মালিন্য ভাসিয়ে নেবার—সেই রঙ লেগে আছে পথের ধুলোয়—গাছের পাতায়। আর যান-বাহনকে দেখলাম এই ধুলোয় মাখামাখি। রুগ্ন ঘোড়া—ঝর-ঝরে গাড়ি—চলতে গেলে চাকায় চাকায় ওঠে আর্ত্তনাদ, কাঠে-লোহায় বাধে সংঘর্ষ। নিজেকে কোন মতে যে কোন অবস্থায় মানিয়ে নেবার চেষ্টাটা আরও প্রকট।

গাঁয়ের মধ্যেও দেখলাম সেই পথ। পথের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দু'ধারের বাড়ি—আর বাড়িতে যারা বাস করে ও পথে চলে সেই ধরণের বহু মানুষ। এদেরও মানুষ বলবো? কেন বলবো না? এদের নিয়েই তো ত্রিশ কোটি।

দেখলাম—দু'ধারে ভাল ভাল বড় মসজিদ—অসংখ্য দরগা—শিবের মন্দির—সিদ্ধেশ্বরীর দেউল। অশ্বত্থ গাছতলায় ষষ্ঠীর শিলা—সিন্দুর মাখানো ঘট ও সিজ গাছে মা মনসার অস্তিত্ব। গাঁয়ে লোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছেন দেবতারা। এখনকার বাড়ির কোন প্ল্যান নেই। ঘর নীচু—ছাদ ন্যাড়া—উঠোনের এ প্রান্তে একখানা ঘর—অন্য প্রান্তে আর একখানা। বাড়ির মধ্যে গাছের ছায়া আলোকে দিয়েছে তাড়িয়ে। শীতে কাঁপছে বাড়িগুলো। এটি পাড়াগাঁ বটে—তার স্নিগ্ধ শ্রী উদার মাঠ থেকে বঞ্চিত। লতাগুল্ম তাও প্রচুর নয়। আকাশ দেখবার সময় নেই কারো। অধিকাংশই ব্যবসায়ী। ব্যবসায় বলতে যে বিরাট পৃথিবীটা তোমার চোখে ভেসে উঠছে—তা ডুবিয়ে দাও মনের অতলে। ছোট মুদিখানার দোকান—পান-বিড়ির দোকান—হাঁড়ি-কলসির দোকান—ময়রার দোকান—লাট্‌ মার্কা বিলাতী কাপড়ের দোকান—মণিহারী দোকান—চায়ের দোকান—ঝুড়ি-পেতে-ধামার দোকান—এমন কি দেনো মদের দোকান—এই সব আছে। আর আছে একটা জিনিষ—সেইটাই প্রধান। তার জন্যই এই গ্রাম-শিল্প খ্যাতিতে বিদেশে নাম কিনেছে। এখানকার ধুতি আর শাড়ী। জরি পাড়—নকশা পাড়—একশো দেড়শো দুশো ভাঙ্গিয়—একশো ত্রিশ চল্লিশ নম্বরের সুতোয় তৈরী অত্যন্ত মিহি ধুতি আর শাড়ী। তবে তাঁতিরা এখন নিজেদের আঙুল নিজেরা কাটতে সুরু করেছে। কাপড়ের মুখপাতে আর মাঝারে সামঞ্জস্য নেই। সুতোরও আছে গোঁজামিল। কি করবে—পেটে অন্ন জুটলেও বসনের দৌলতে ব্যসনটায় তাদের বংশগত দাবী। অবস্থা স্বচ্ছল হ'লে মদ তারা খাবেই—বড় মাছ একটা কিনবেই—আর পড়সীকে গাল দিয়ে ঘরে এসে বউকে ঠেঙাবে। যা করেছে অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহরা—তা ঠাকুরদার কাছে গল্প শুনেছে বাবা—বাপের কাছে ছেলে। আর সেই গল্পে পেয়েছে পৌরুষের খোরাক।—একটা যুগ আর একটা যুগের বুকে জগদ্দল পাথর হ'য়ে চেপে বসেছে।…

একখানা চিঠি শেষ হ'লো। পুরন্দর মাথা তুলে সামনে চাইলে। সূর্য্য খানিকটা উপরে উঠেছে—আমগাছেরও পিঠটা রোদে করছে ঝলমল। এ পিঠে নামছে ঘন ছায়া। বাইশ বছর আগেকার এই যে বর্ণনা—এর আজও পরিবর্ত্তন ঘটেনি। পুরনো মানুষরা বলে গেছে—এসেছে কত নতুন মানুষ কিন্তু বংশধরদের তারা শুনিয়ে গেছে গল্প। পাল পার্ব্বণে উৎসবে লোকে সেকালে যে নিয়ম ও রীতি ছিল বলবৎ—এ কালেও তা অব্যাহত আছে। বেড়া দেওয়া যে ফুল-বাগানটা পুরন্দর জন্মে পর্য্যন্ত দেখছে—ওর মতই অপরিবর্ত্তনীয়। জবা, টগর, কুঁদঝাড়, জুঁই, মল্লিকা বা গোলাপ পূর্ব থেকে দক্ষিণে হেলেনি

একটুও। রাংচিতা আর বাখারির বেড়াটা বহু বার দেহ বদলেছে—রূপ বদলায়নি। যেন জীবনস্রোতে মৃত্যু দোলা দিয়েছে বার বার—স্রোতের গতি হয়নি ভিন্নমুখী। আর একখানা চিঠি লেফাফা থেকে বার করলে পুরন্দর। ইন্দ্রজিৎ বসু লিখছেন:

সত্যসুন্দরের ইচ্ছা—অসহযোগ আন্দোলনের প্রকৃত মর্ম্মকথাটি ব্যাখ্যা করে গ্রামবাসীদের সামনে একটা বক্তৃতা দিই। সত্যি বলতে কি—সে ইচ্ছা আমারও। আমার মুখ্য উদ্দেশ্যও তাই।

প্রথমে ঠিক হলো—ইস্কুলের মাঠে সভাটা হবে। তিন দিকে বাড়ির মধ্যে সভা জমবে ভাল। কিন্তু ইস্কুল-কর্ত্তৃপক্ষ অনুমতি দিলেন না। জানালেন, ও সম্বন্ধে উপরওয়ালার নির্দ্দেশ আছে। কলকাতায় ছেলেরা ইস্কুল ছাড়ছে দলে দলে। বলছে—গোলামখানায় পড়ে আর গোলাম তৈরী হবে না। এ গ্রামের ছেলেদের মধ্যে সে বিষ ঢুকলেই তো মুশকিল। লেখাপড়া না শিখলে চাকরি জুটবে কি করে? দু'দিনের হুজুগ তো দু'দিনেই মিটবে—মাঝে হতে ছেলেগুলোর আখের হবে নষ্ট।

একটা বারোয়ারি তলায় অবশেষে সভার স্থান ঠিক করা গেল। ঢোল পিটিয়ে সভার কথা প্রচার করা হলো। আর প্রচার করা হলো কলকাতা থেকে বড় বড় লোকেরা এসেছেন বক্তৃতা করতে।

সত্যসুন্দরকে বললাম, এ কথা বলার উদ্দেশ্য?

সে বললে, না হলে লোক জমবে না। কলকাতার নামে একটা মোহ আছে।

বললাম, মোহ সঞ্চার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং বলতে পার মোহ ভাঙতেই—

হেসে বললে সত্যসুন্দর, সে তো ভাঙবেই সভাস্থলে। যত বড় লোকই আসুন—আর যত ভাল বক্তৃতাই করুন—এখানকার লোক মোহগ্রস্ত হবে না কোন দিন।

অবাক হয়ে বললাম, মানে?

সেটা প্রত্যক্ষ করো।

প্রত্যক্ষই করলাম। বিজ্ঞাপিত সময়ের বহু পরে লোক আসতে লাগলো। সামনে খালি বেঞ্চ রয়েছে, কেউ সেখানে বসলে না—দূরে দাঁড়িয়ে রইলো সসঙ্কোচে। কারো হাতে ছোট পুটুলি, কারো হাতে লণ্ঠন ও লাঠি, কেউ চিবুচ্ছেন পান, কারো গায়ে কোঁচার খুঁট, কারো মাথায় কানঢাকা টুপি। সভায় আসবো বলে তারা জমেনি। পথ চলতে চলতে দৈববশে এসে পড়েছে এই পথে। চেয়ার টেবিল পাতা রয়েছে দেখে মনে উঠেছে কৌতূহল—এবং কি ব্যাপার হয় দেখবার কৌতুকে খালি দাঁড়িয়েছে। ভাল লাগে তো বসবে তবে বেঞ্চে—না লাগে চলে যাবে। বেঞ্চে বসলে বক্তৃতা শুনবার বাধ্য-বাধকতা কাঁধে চাপতেও পারে। কাজ কি অত হাঙ্গামায়!

সামনের চেয়ারে এসে বসলেন কয়েক জন প্রবীণ। এঁরা গ্রামের মধ্যে মাতব্বর। সত্যসুন্দরের মুখে শুনলাম ঢপ, বাইনাচ, যাত্রা, কথকতার আসর থেকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিদায়-সম্বর্দ্ধনা, বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভা পর্য্যন্ত এঁদের হাজিরা নিয়মিত। এঁদের গলাবন্ধ কোট—শীতে কন্থা বসানো কাশ্মিরী শাল আর গ্রীষ্মে জরিপাড় চাদর—পায়ে ফিতে দেওয়া জুতো—পরনে শান্তিপুরী মিহি ধুতি আর হাতে সৌখীন লাঠি—আভিজাত্যের পরিচয় বহন করে সভায়।

এঁরা বসতেই পিছনের বেঞ্চেও লোক-সমাগম হতে আরম্ভ হলো। যা হোক, কতকটা ভর্ত্তি হলো সভা।

সত্যসুন্দর সভার উদ্দেশ্য বিবৃত করলে। স্থানীয় লোকেরা কেউ কিছু বললেন না। আমিই আরম্ভ করলাম।

বক্তৃতা করতে করতে আবেগ এসেছিল—এবং দীর্ঘ হয়েছিল বক্তৃতা। বুঝলাম শ্রোতাদের ধৈর্য্যে আঘাত করছি। কিন্তু মাঝ-পথে ফিরতে পারলুম না। ফলে এই হ'লো—ঐ মাতব্বর ক'জন ছাড়া আর কেউ রইলেন না। সত্যসুন্দরের অনুরোধে তাঁদেরই এক জন উঠে—বক্তাকে ধন্যবাদ জানালেন। ধন্যবাদ প্রসঙ্গে বললেন, —এ গ্রাম চৈতন্য-পদরেণু-পূত। এখানে যা জন্মায় তা ভক্তি ও প্রেমকে আশ্রয় করে। এসব দু'দিনের আন্দোলন—দু'দিনেই শেষ হবে। এখানকার অনন্ত শান্তিকে নষ্ট করতে পারবে না।

কিন্তু আমায় জিজ্ঞাসা হচ্ছে—ভক্তির তাৎপর্য্য কি? প্রেম কাকে বলে? দেবতা কি দেশ-ছাড়া? তবে দেশকে যদি ভালবাসি—সেই কি দেবতা হয়ে উঠবে না? ভক্তি যদি মানুষকে করি—প্রেম যদি তার প্রতিই জাগে—যে দেবতা বৈকুণ্ঠে বাস করেন তিনি কি কুণ্ঠা ভরে আমার দিক থেকে হাত গুটিয়ে নেবেন? আমার বিশ্বাস কি জান—পরাধীন দেশের দেবতা নেই—। যে মানুষ নিজের প্রতি কর্ত্তব্যে সচেতন নয়—জাতিকে চিনলে না—দেশকে মনে করলে অচেতন জড় মাটি মাত্র—তার মুক্তি—তেত্রিশ কোটি দেবতারও সাধ্য নয় জেন। মুক্তির একটি অর্থই আমি বুঝি। তা হ'চ্ছে কর্ম্ম। তোমরা কর্ম্ম করবে না অথচ মুখে বলবে দেশের চেয়ে বড় দেবতা—এ জীবনের প্রতি অবহেলা করবে পরজীবনের আশ্বাসে—এ তামসিকতার ভড়ং কেন?

চোখের জলে ঝাপসা হলো লেখাগুলো—পুরন্দর স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। বাইশ বছর আগেকার তামসিকতা আজও অটুট আছে। এই আম গাছটার এ-পিঠে তার চালা ঘরখানি যেন তার গ্রাম—আর ও-পিঠে সূর্য্য-আলোকিত প্রান্তরটা বাইরের পৃথিবী। কিন্তু তার পরেই কি লিখছেন ইন্দ্রজিৎ বসু:

দু'দিন রইলাম গ্রামে। প্রত্যক্ষ করলাম ভক্তিটা। সন্ধ্যায় মন্দিরে মন্দিরে হরিনামের কীর্ত্তন হয়—প্রাতঃস্নানে বহু যাত্রী যায় এক ক্রোশ দূরের গঙ্গায় সংসারের গল্প করতে করতে। এক দিন গিয়েছিলাম। বেশ ভাল লাগলো।…বড্ড বেশি শান্ত প্রকৃতি—রজঃ প্রকৃতিকে ইসারায় আশ্বাসে সত্ত্বে পরিণত করতে চায়। কিন্তু সাত্ত্বিকতার পিঠে পিঠ দিয়ে আছে তামসিকতা। গঙ্গার নিজস্ব সুর আছে—সে সুরে সূর্য্যাস্তের বন্দনা জমে ভাল। তলতলে নরম মাটি। মনে হলো কি জান—এ'টা গঙ্গাই—নদীও বিত্ত—পৌরাণিক যুগের নদী। আস্ফালন নেই—ভ্রূকুটি নেই—গর্জ্জন নেই, অত্যন্ত পবিত্র শান্ত নদী। ওঁর শক্তিটা শাখা-পথে পদ্মা নিয়েছে আত্মসাৎ করে—পবিত্রতাটুকু নিয়ে গঙ্গা মিশেছেন সাগরে। তুমি বলতে পার—পদ্মার রুদ্র সংহারিণী মূর্ত্তির সঙ্গে আবাল্য-পরিচিত বলে—গঙ্গা আমার ভাল লাগেনি। না—এ কথা সত্য নয়। এমন সুন্দর নদী আমি দেখিনি জীবনে। তবুও মনে হলো—একদা যে দেশে এ নদী মানাতো—সে দেশ—সেই স্বাধীন আর্য্যাবর্ত্ত কোথায়? পদ্মা আমাদের পথের সংকেত করে বলেই ওকে ভাল লাগে—, গঙ্গা তো রয়েছে পথের শেষে।

চমৎকার—চমৎকার কথা। পুরন্দর দু'বার তিন বার করে পড়লে জায়গাটা। আজ পথই আমাদের প্রয়োজন—আমরা যাত্রী। মনে মনে অস্ফুট স্বরে সে উচ্চারণ করলে। [ক্রমশঃ।

ঐকতান

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এ-জীবন ছায়াময়। বৃষ্টি-ঝরা বিনম্র সন্ধ্যায়
বাসে-ফেরা কেরাণীর ক্লান্ত স্তব্ধতায়
চৌরঙ্গির পশ্চিম আকাশে
মেঘে লাল আকাশের অন্য এক সঙ্গিহীন পাশে
সময় রয়েছে শুয়ে।
আলস্য-জড়ানো তন্দ্রা তার ক্ষীণ দেহখানি ছুঁয়ে।

সেইখানে যদি ফের দেখা হয়ে যায়
মনের অরণ্যখানি ফের যদি অব্যক্ত কথায়
রোমাঞ্চিত হয়ে আঁকে আগামী দিনের
বসন্ত উৎসব শেষে সুনীল স্বপ্নের
সমুদ্রের ঐকতান মৃত্যুর শিখায়—
এ-জীবন শেষ কথা উড়াবে হাওয়ায়।

অনেক চাওয়ার মাঝে কোনো পাওয়া এতোটুকু নেই
রাত্রির আকাশ-ভরা তারার কামনা শুধু পায়
মৃত্যুকেই।

মৃত্যুর শিখার সঙ্গে সমুদ্রের ঐকতান বাজে।
আমার হাজার কাজে
হানা দেয় অসংখ্য মিছিল—
রঙ তার জানা নেই। রঙ এই মনে নেই। যে-চিল
উড়েছে অদৃশ্যলোকে
ডানা মেলে পাখার ঝাপটে, যে আবির সন্ধ্যার
বিধুর চোখে
শূন্যতাকে আঁকে যত্ন করে—
মৃত্যুর শিখার সঙ্গে তারি এক প্রশান্ত ঝঙ্কার
শুনেছি অন্তরে।

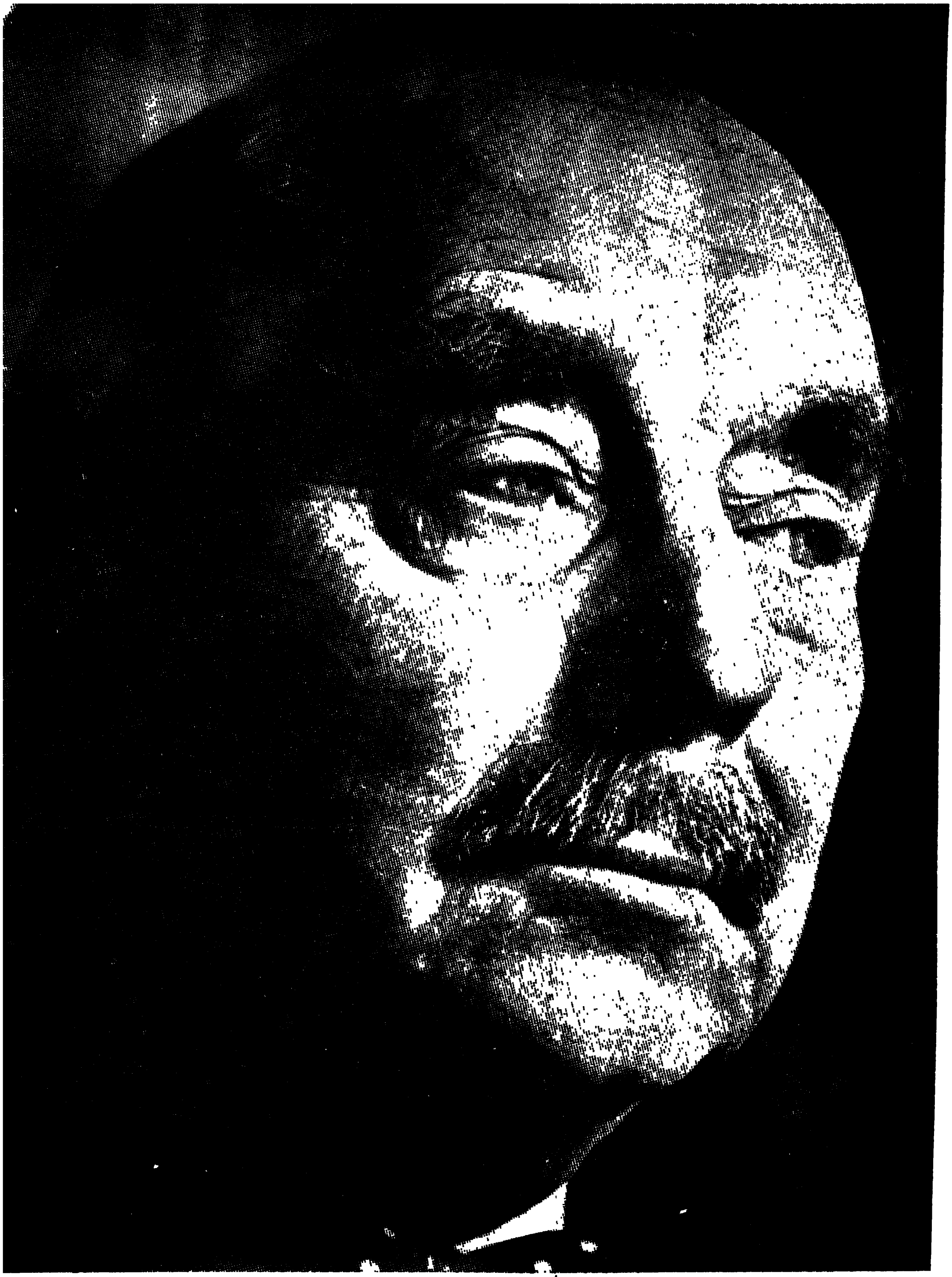
এ-জীবন নিয়েছো কি কেড়ে?
সাড়া নেই তারালোকে। অন্ধকার দুই হাতে ছিঁড়ে
ভাষাহীন ক্লান্ত সুরে ফিরে আসে মনের দেয়ালে
ফিরে আসে মাটির সবুজে আর ভাঙা-ভাঙা আলে।

তোমার কপালে কবে রক্তরেখা আঁকা হয়েছিলো।
বোলো আজ দূরাগত প্রতিধ্বনি প্রাণ ভরে
বেসে থাকে ভালো
অন্য এক দেহহীন সুরহীন প্রতিধ্বনিখানি:
অরণ্য-মর্মর আর সমুদ্রের শূন্যস্বর জানি।

?

(১) কুকুর শোবার আগে ঘোরে কেন?
(২) গরিলারা বুক চাপড়ায় কেন?
(৩) কোন্ মাছ পাখী খায়?
(৪) সাপের হৃদ্‌যন্ত্র কোথায়?
(৫) ঘোড়া দাঁড়িয়ে ঘুমোয় কি করে?
(৬) দু'টো হৃদ্‌যন্ত্র কার?
(৭) হাতীর ছেলে কি শুঁড় দিয়ে দুধ খায়?
(৮) জলের তলায় কোন্ পাখী ওড়ে?

উত্তর ৫৯০ পৃষ্ঠায় দেখুন



ওয়েলস্



সম্ভবামি যুগে যুগে

(প্রথম পুরস্কার)

অরুণপ্রসাদ লালা



অবগাহন
রণজিৎ রায়চৌধুরী

দ্বিতীয় পুরস্কার)



তৃষ্ণা
রামকিঙ্কর সিংহ



"দিগন্তে ঐ আকাশ নামে—"
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

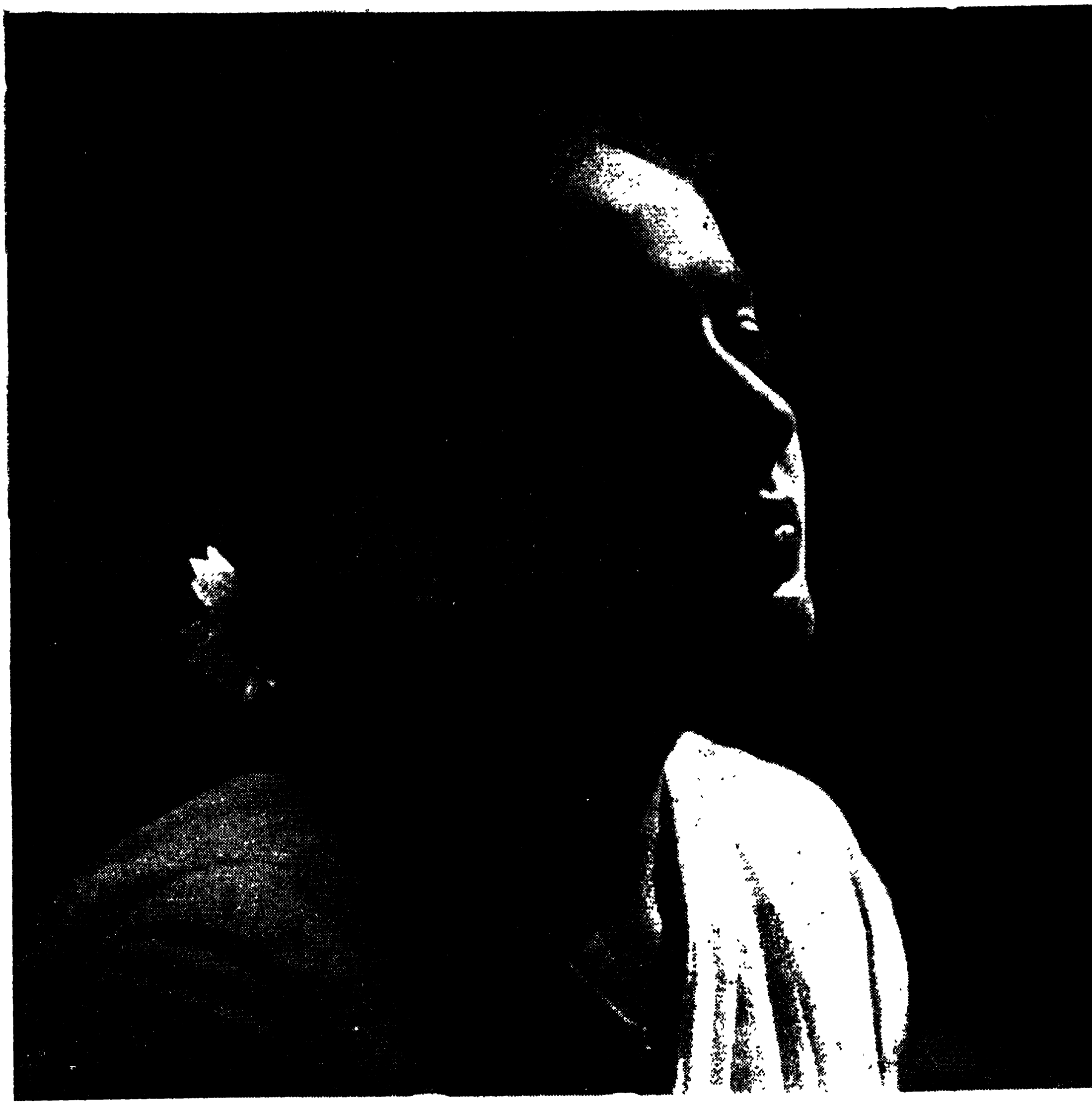
নিয়মাবলী

প্রত্যেক মাসে এই বিভাগটিতে একমাত্র সৌখীন (এ্যামেচার) আলোকচিত্র-শিল্পীদের ছবি গৃহীত হইবে।

ছবির আকার ৬" × ৮" ইঞ্চি হইলেই আমাদের সুবিধা হয় এবং যত দূর সম্ভব ছবি সম্বন্ধে বিবরণ থাকাও বাঞ্ছনীয়। যথা, ক্যামেরা, ফিল্ম, এক্সপোজার, এ্যাপারচার, সময় ইত্যাদি।

যে কোন বিষয়ের ছবি লওয়া হইবে। অমনোনীত ছবি ফেরৎ লওয়ার জন্য উপযুক্ত ডাক-টিকিট সঙ্গে দেওয়া চাই। ছবি হারাইলে বা নষ্ট হইলে আমাদের দায়ী করা চলিবে না, সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। খামের উপর "আলোক-চিত্র" বিভাগের এবং ছবির পিছনে নাম ও ঠিকানার উল্লেখ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

প্রথম পুরস্কার দশ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার আট টাকা, তৃতীয় পুরস্কার পাঁচ টাকা এবং অন্যান্য বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হইবে।





ফ্র্যাঙ্কেন্‌ষ্টাইন
রণেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার
(তৃতীয় পুরস্কার)



চাটি
জয়ন্তকুমার
চৌধুরী



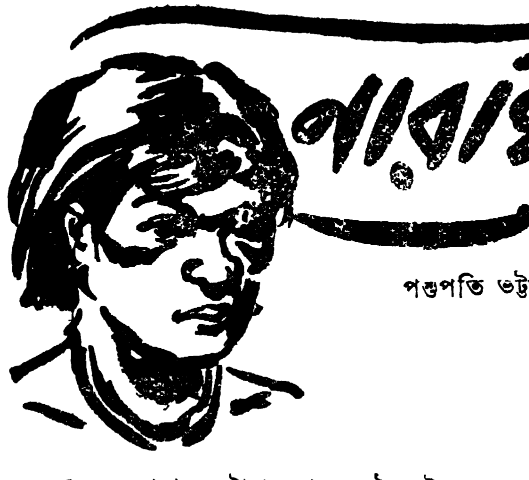
ছোট বড়
রমলা রায়



রেডি ?
কল্যাণকুমার সেনগুপ্ত
(বিশেষ পুরস্কার)



সুস্বাগতম্ ?
কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়



পশুপতি ভট্টাচার্য্য

ছেলেবেলাকার একটা গল্প এখনো স্পষ্ট করেই মনে পড়ে।

খুব যে বড়লোকের ছেলে ছিলুম তা নয়, কিন্তু তখনকার দিনটাই ছিল সৌখীন। বনিয়াদী চাল দেখানো ছিল তখনকার দস্তুর, নইলে যেন ভদ্র আর সম্ভ্রান্ত বলে পরিচয় দেওয়া হয় না। এই চাল দেখাবার সহজ উপায় ছিল বাজে বেমক্কা কতকগুলো বাহুল্য খরচ করা। খুব যে বেশী অর্থব্যয় করতে হতো তাও নয়, সস্তাতেই তখন প্রচুর রকমের সখের জিনিষ পাওয়া যেতো, অল্প তনখায় প্রচুর জন-পরিজন রাখা যেতো, অল্প খরচেই পোলাও পরমান্ন খাওয়া যেতো। চাল ছিল খুব সস্তা, কাজেই চাল দেখানোও ছিল সস্তা। অল্প আয়াসেই অনেক উপার্জন হতো, সংসার-নির্বাহের জন্যে খরচ করেও তার অনেকখানি উদ্বৃত্ত থাকতো। কাজেই বাড়ির মেয়েরা পরতো বুটিদার জামদানি, আর কর্তারা গায়ে চড়াতো দোরোখা জামিয়ার। এগুলো না হ'লে তখন প্রমাণই হতো না যে আমরা বিশিষ্ট ভদ্রলোক। মনে আছে আমার দাদামশায়ের ছিল কাশ্মীরের কারিকরদের হাতের কল্‌কাতোলা ছয় জোড়া আসল কাশ্মীরি আলোয়ান। পরবর্তী কালে তেমন জমকালো জিনিষ ব্যবহার করতেই আমাদের লজ্জাবোধ হতো, তোরঙ্গে রেখে রেখে ক্রমশঃ সেগুলো পোকায় কেটে নষ্ট হয়ে গেল।

সেই দাদামশায়ের আমলের কথাই বলছি। আমার জন্যে ছিল একটি ছোটো টাট্টু ঘোড়া, তাইতে চড়ে আমি রোজ স্কুলে যেতাম। আমাদের বাড়ি থেকে স্কুলটা ছিল অনেকখানি দূরে, অতটা হেঁটে যেতে কষ্ট হবে আর ভালোও দেখাবে না, কাজেই আমার বিদ্যাশিক্ষার জন্যে দাদামশাই এই ব্যবস্থা করেছিলেন। অনেক দেখে-শুনে তিনি এমন একটি ঘোড়া কিনেছিলেন যে হাজার চাবুক খেলেও শির্‌পা তুলে লাফাবে না, কদম চাল ছেড়ে কিছুতে জোড়-পায়ে ছুটবে না, তার পিঠে থেকে পড়ে গিয়ে আমার ধরাশায়ী হবার কোনোই সম্ভাবনা থাকবে না।

ঘোড়াটি ছাড়াও আমার জন্যে এক জন স্বতন্ত্র অনুচর রাখা হয়েছিল, তাকে সহিসের কাজ আর আমার রক্ষণাবেক্ষণ, দুই-ই করতে হতো। আমি যখন ঘোড়ায় চড়ে যেতুম তখন বইখাতাগুলো বগলে নিয়ে সে আমার পিছু পিছু ছুটতো। তার পর যতক্ষণ না আমার ছুটি হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ঘোড়ার মুখের বাগডোর খুলে দিয়ে তাকে স্কুলের মাঠে ঘাস খাওয়াতো। আমি বাড়ি ফিরে এলে জিনের সাজগুলো খুলে তাকে খানিকটা টহল দিয়ে এনে ঘাম শুকিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দলাই-মলাই করে দানা খাইয়ে তবে তাঁর হতো ছুটি। পাছে দানা চুরি যায়, পাছে ঘোড়ার কম খাওয়া হয়, তাই উঠনের কাছে সকলের চোখের সামনে রোজ তাকে দানা খাওয়াতে হতো।

এই লোকটির নাম ছিল নারঙ্গি। লোটন কবুতরের মতো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলি তার ছুটতে গেলেই ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠতো, মুখ ঘুরিয়ে এক-একটা সজোর ঝাঁকানি দিয়ে সেগুলোকে সে মুখের কাছ থেকে সরিয়ে দিতো। পরিপূর্ণ প্রাণবন্ত দৃপ্ত-যৌবন পাট্টা জোয়ানের মতো সুঠাম চেহারাটি, চৌচাপট ছাতিখানার ওপর থোকা থোকা হয়ে ফুলে ওঠে নৃত্যোৎক্ষিপ্ত মাংসপেশী। সকল কাজেই অক্লান্ত উৎসাহ, কাল চোখ দুটিতে সদাই সজাগ এক রকমের বিস্ময়োজ্জ্বল দৃষ্টি, আর তার ওপর হিন্দি উচ্চারণগুলো ছিল তার শুনতে ভারি মিষ্টি। মালকোচা মেরে খাটো একখানি কাপড় পরতো, গায়ে চড়াতো কালো ছিটের বগলকাটা টাইট্‌ মের্জাই, কণ্ঠার গহ্বরে কালো কার দিয়ে ঝুলতো একটি পিতলের ধুকধুকি। চাকর-শ্রেণীরই হোক কিংবা নিম্নশ্রেণীরই হোক, তখনকার বয়সে এরই আমি প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। ঘোড়াটিকে পছন্দ না হলেও এই পরিচারকটিকে আমার খুবই পছন্দ হয়ে গেল।

প্রেম-ভালোবাসা কাকে বলে তা অবশ্য তখন কিছুই জানি না, কিন্তু ভালো-লাগা কী জিনিষ তা সেই বয়সেই বিলক্ষণ জেনেছি।



তখনই বেশ বুঝতে পারতাম, মাকে আমার আগে যতটা ভালো লাগতো, এখন আর তেমন লাগে না। মাকে ভালো লাগুক গে আমার অন্য ভাইয়েদের আর ঐ সব চেয়ে ছোটো ভাইটার, যে এখনো মাই খায়, যাকে নিয়ে মা অষ্টপ্রহরই ব্যস্ত হয়ে আছে। এমন কি বাইরের থেকে ঘরে এসে দৈবাৎ ভুলে ভুলে আদর খাবার আশায় পিঠের ওপর একবার একটু ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলেই অমনি মা বিরক্ত হয়ে বলে—যাও যাও, বুড়ো ছেলে হয়ে আর জ্বালাতন করতে এসো না, দেখছো না আমি ছোটো খোকাকে ঘুম পাড়াচ্ছি। তখনই সামলে যাই, মনে হয় ঠিক কথাই তো, এখন যে আমি অনেক বড়ো হয়ে গেছি। এখন ঘরের মাকে ছেড়ে বাইরের অন্য যাকে আমি দেখবো ভালো, যার ব্যবহার পাবো ভালো, যার কাছে আমার মনের মতন কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকবে, তাকেই আমার লাগবে ভালো। যেমন ধরো ঐ নারঙ্গি! পাড়ার লোকদের বাড়িতে যখন যাই, তাদের মেয়েরা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে—হাঁ গো বড় খোকাবাবু, তুমি সব চেয়ে বেশি কাকে ভালোবাসো? আমার আগেই মনে হয় মা'র কথা বলি, কিন্তু বলতে গিয়ে মুখে বেধে যায়। তখন মা'র বদলে আগেই বলি দাদামশায়ের কথা,—আশ্রয়ই বলো আর প্রশ্রয়ই বলো, তাঁর কাছেই তো সব চেয়ে বেশি পাই। তার নিচেই কাকে ভালোবাসো? তখন আর কাউকে খুঁজে না পেয়ে বলে ফেলি—নারঙ্গিকে। মেয়েরা তাই শুনে মুচকে মুচকে হাসে। তারা নানা রকম প্রশ্নে এর কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করে, কিন্তু আমি আর কোনো জবাব না দিয়ে ছুটে পালাই।

বলবার মতো ভাষাটা যদি তখন আয়ত্ত করা থাকতো তাহলে হয়তো বলতুম—ও যে দেখতে ভালো, ওকে যখনই দেখি তখনই খুব ভালো লাগে, তাই। ও আমার মন বুঝে আমাকে খুশি করতে জানে, তাই। ও আমার সব রকমের কান্নাই ভুলিয়ে দিতে পারে, তাই। ও আমাকে অনেক রকমের জিনিষ দেয়, অনেক মজার গল্প বলে, তাই। ও আমার আপন কেউ না হলেও কোথা থেকে এসে আপনের চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা জমিয়েছে, তাই। কিন্তু এত কথা গুছিয়ে বলা আমার পক্ষে সে বয়সে সম্ভব নয়, আর বলতে লজ্জাও হয়। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলবার মতোই নয়।

ঐ বারো-তেরো বছরের বয়সটা ছেলেদের পক্ষে খুব মারাত্মক। লোকে বলে ছেলে স্কুলে যাচ্ছে, ভাত-ডাল খাচ্ছে, আবার কী চাই? লোকে হয়তো জানে না, কিন্তু এই সময়টাতেই ভাত-ডাল ছাড়াও ছেলের পক্ষে কিছু ভালোবাসার ভিটামিন বিশেষ দরকার। নইলে সে পেট ভরে খেতে পেয়েও ক্রমশঃ শুকিয়ে যেতে থাকে। চোখ-ফোটা মনটি তখন সবে নতুন করে যতই ডাঁসিয়ে উঠছে, চারিদিক থেকে খিঁচুনি আর ধমকানির ধাক্কা খেয়ে ততই সে ব্যথায় টাটিয়ে উঠছে। মায়ের আঁচলের আশ্রয় থেকে সে তখন বঞ্চিত, এদিকে বাপের ও বড়োদের শাসনের চোটে সদাই সশঙ্কিত। কার কাছে গিয়ে সে দাঁড়ায়, মন খুলে হেসে কার সঙ্গে দুটো ছেলেমানুষির কথা বলে? লোকে সেদিক দিয়ে গ্রাহ্য না করলেও ঐটুকুই তখন বিশেষ দরকার, মনের যতটুকু নজর ফুটেছে সেটুকুর কথা শোনবার জন্য এক জন সমঝদার কাউকে চাই, ঐ ভাবে ভালোবাসবার জন্যে এক জন দরদী কাউকে চাই। কিশোর বালক তখন তাকেই খুঁজে বেড়ায়—আত্মীয়দের ভিতর না পেলে অনাত্মীয়দের মধ্যে, ভদ্রজনদের ভিতর না পেলে নিম্নশ্রেণীর চাকর-বাকরদের মধ্যে।

সে সময় আমার যেমন অবস্থা ঘটেছিল, নারঙ্গিরও হয়তো তাই। সম্ভবতঃ বিদেশে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেও টিকতে পারছিল না, উপস্থিত ভালোবাসবার মতো একটি পাত্র খুঁজছিল। কিংবা হয়তো ও বুঝেছিল যে এই খোকাবাবুটিকে খুশি রাখতে পারলেই ওর চাকরিটা পাকা হয়ে থাকবে, তাই অগত্যা খানিকটা আগ্রহ দেখাতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু যে জন্যেই হোক, ওর ব্যবহারটি আমার ভালো লেগেছিল। যথেষ্টই খাতির করতো আমাকে। মনে আছে, যখন সন্ধ্যা হয়ে আসতো, যখন পড়তে বসবার সময় আগতপ্রায়, তখন চুপি চুপি পালিয়ে প্রায়ই যেতুম নারঙ্গির আস্তানায়। আস্তাবলের পাশে ছোটো একটি কুঠরির মধ্যে কাঠিকুটি দিয়ে উনন জেলে সে তখন ভাত চড়িয়েছে। আমাকে দেখেই সে তাড়াতাড়ি একটা প্যাকিং বাক্সের তক্তা পেতে দিয়ে বলতো—বসো বাবু বসো, আজ বুঝি কিতাব খুলতে মন লাগছে না?—ও তখন শুরু করতো ওদের দেশের এক বিদ্যাবিশারদের কাহিনী, যে প্রকাণ্ড একটা লাঠির মতো কলম বেঁধে নিয়ে প্রচার করে বেড়াতো, যার যতো বড়ো কলম তার তত বড়োই ইলম। তার পর কেমন করে সে রাজার নজরে পড়লো, কেমন করে সে রাজার রাজ্যটিকে নিজেই অধিকার করে নিলে, ইত্যাদি। অবশ্য বলতো সে হিন্দিতেই, আর হিন্দি ভাষাটা আমি ভালোই রপ্ত করে নিয়েছিলাম।

গল্প বলতে বলতে তার ভাত-রান্না হয়ে যেতো, থালায় ফ্যান-সমেত ঢেলে ফেলে আলু-বেগুনের ভর্তা দিয়ে সেই ভাত যখন সে খেতে বসতো, তখন আমি চেয়ে চেয়ে দেখতুম। নারঙ্গি অমনি সেই এঁটো হাতেই কতকগুলো খোসা সুদ্ধ কাঁচা বুট কিংবা আস্ত একটা ভুট্টা নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে তেলনুন মাখিয়ে আমাকে খেতে দিতো। আমি তাই নিয়ে অম্লানবদনে টুকতে থাকতুম, আর সে খেতো ভাত।

এক দিন এই নিষিদ্ধ ব্যাপারে রত থাকতে থাকতেই মায়ের কাছে ধরা পড়ে গেলাম। রাত হয়ে যাচ্ছে তবু আমি পড়তে বসিনি দেখে মা খোঁজ করতে আস্তাবলে গিয়ে হাজির হয়েছিল। ভুট্টাটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে ফেলে দিয়ে মা বললে—ও-মা, ছ্যা ছ্যা, এত বড়ো ধিঙ্গী হয়ে উঠলি, তোর কি ঘেন্না-পিত্তি কিছু নেই রে? অম্লান বদনে ঐ ধাঙড়ের এঁটোগুলো খাচ্ছিস্? তোর যেমন কপাল, শেষ পর্যন্ত অমনি ঘোড়ার সহিসই হবি আর কি!—সেদিন আমাকে প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ গোবর খেতে হয়েছিল, ঘৃণার উদ্রেক হওয়া সত্ত্বেও তা প্রকাশ করবার উপায় ছিল না।

সুতরাং নারঙ্গির সাহচর্য পাবার জন্যে লুকিয়েই আমাকে তার সুযোগ গ্রহণ করতে হতো। এর সব চেয়ে প্রশস্ত অবসর ছিল স্কুল থেকে ফিরবার মুখে। তখন ঘণ্টাখানেক পথে দেরী করে বাড়ি ফিরে গেলেও কেউ কিছু টের পাবে না, মনে করবে ঐ সময়েই স্কুলের ছুটি হয়েছে। আমরা তাই করতুম, ফিরবার সময় যতক্ষণ পারা যায় পথেই কাটিয়ে আসতুম।

দিনগুলো আমার আনন্দেই কাটছিল। স্কুলে গিয়ে প্রত্যহই উন্মুখ হয়ে থাকতুম, কখন ছুটি হবে, কখন পথের ধারে নলির পুলের কাছে গিয়ে উপস্থিত হবো। ভাবতুম যে চিরকাল বুঝি আমার এমনি আনন্দেই কাটবে। কিন্তু কিছু কাল পরে সব গণ্ডগোল হয়ে গেল।

সেবার গরমের ছুটির পরে প্রথম যেদিন স্কুলে যাই সেদিন থেকেই দেখি রথতলার মাঠে এক দল বেদে এসে রীতিমত আস্তানা গেড়েছে, তাদের ছেঁড়া চটের তাঁবুতে আর হরেক রকমের সরঞ্জামে সারা মাঠটা ভরে গেছে। ছেলে-মেয়ে-বুড়ো বিস্তর লোক তাদের দলে। বেদেদের সম্বন্ধে আগেই কিছু শুনেছিলাম, কিন্তু এমন একটা দল চোখে কক্ষনো দেখিনি। কৌতূহল হলো জানবার জন্যে যে ওরা কী করে। ক্রমে ক্রমে জানতে পারলুম ওরা পয়সা রোজগারের অনেক রকম কৌশল জানে। তবে এটা লক্ষ্য করে দেখতুম যে ওদের মধ্যে পুরুষগুলো তেমন কাজের নয়, আর সংখ্যাতেও তারা বেশি নয়, মেয়েরাই সংখ্যায় বেশি আর ওরাই রোজগেরে, যত কিছু আশ্চর্য রকমের বিদ্যাগুলো ওরাই শিখে নিয়েছে। ওরা বাত ভালো করতে জানে, দাঁতের পোকা বের করতে জানে, সময়বিশেষে হাত দেখতেও জানে, আবার মানুষ বশীকরণের ওষুধও জানে। এমন অদ্ভুত বন-মানুষের হাড় ওদের কাছে মেলে যা ধারণ করলে পঙ্গুবাতও সেরে যায়। এমন একটা আসল স্ফটিক ওরা দিতে পারে যা আংটি করে হাতে পরলে মকদ্দমায় নিশ্চিত জিৎ হয়। পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ এমন এক একটা ওরা ঝুলির ভতর থেকে খুঁজে খুঁজে বের করে যাতে পৈতের দাগটি পর্যন্ত দেওয়া আছে, যা লাখের মধ্যে একটা মেলে না। আর বাঘের নখ, কিংবা সাপের খোলস, কিংবা গোসাপের চামড়া, কিংবা তক্ষকের বিষ, এসব তো আছেই। এ ছাড়া কারুকার্য করা ছোরা আর ছড়ির মতো গুপ্তি ওদের কাছে কিনতে পাওয়া যায়, হরেক রকম কাঁচের মালা আর পাথরের আংটিও কত পাওয়া যায়। ওরাই সাপ খেলায়, ছাগলের পিঠে বাঁদর নাচ দেখায়, আবার কত রকমের ভোজবাজিও দেখাতে জানে।

আবার ওদের মধ্যে কতকগুলো আছে বাছা-বাছা তরুণী, তারা কেবল নাচতে গাইতে জানে। এরাই হয়ত সবচেয়ে বেশি রোজগার করে, তাই এদের গুমোর সবার চাইতে বেশি। এরা এক-একটা টেরিকাটা রোগা পটকা ছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে জোড়ে জোড়ে ঘুরে বেড়ায়। এদের পায়ে থাকে ঘুঙুর বাঁধা, সেই ঘুঙুর বাজিয়ে ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ করতে করতে এরা বাজারের রাস্তা দিয়ে চলে। সুযোগমত জায়গা পেলে রাস্তার ধারেই কোনো দোকানের সমুখে দাঁড়িয়ে এরা গান গাইতে শুরু করে দেয় আর সঙ্গে সঙ্গেই নাচ। সঙ্গী ছোকরাটির গলায় চাদর পাকিয়ে বাঁধা একটা ঢাকনিবিহীন দাঁত বের করা হার্মোনিয়ায় ঝুলতে থাকে। প্রাণপণে তাতে হাপর করতে করতে ম্রিয়মাণ মলিন মুখে সে তার থেকে চ্যাচ্চেড়ে তীব্র আওয়াজের একটা গজল সুরের চলতি গৎ খুব জলদ করে বাজিয়ে যায়, আর হার্মোনিয়মের সেই চাবিগুলোর ওপরেই আঙুলের টোকা মেরে ঠকাঠক করে নাচের তাল দিতে থাকে। কিন্তু নাচওয়ালির সাধা গলা সেই বাজনার চড়া আওয়াজকেও ছাপিয়ে ওঠে, তার গলার স্বর যেমন সুরেলা তেমনি মিষ্টি। সুতরাং লোকের ভিড় করে না দাঁড়িয়ে কোনো উপায় থাকে না। তার পর সেই গানের সঙ্গে আবার মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসি আর হাততালি দিতে দিতে ঘাঘরা ঘুরিয়ে ঘুঙুর পায়ের নাচ। সুতরাং সে যখন যার কাছে এগিয়ে হাতটি পেতে দাঁড়ায়, তখন আর তার সিকিটা দোয়ানিটা বের করে না দিয়েও কোনো উপায় থাকে না।

কবে কেমন করে যে ঘটলো তা আমি জানি না, কিন্তু হঠাৎ দেখতে পেলুম যে এমনি একজন তরুণী নাচওয়ালীর সঙ্গে নারঙ্গির পরিচয় হয়ে গেছে। কেবল মুখের পরিচয় নয়, রীতিমত এক রকমের অন্তরঙ্গতাও কবে এর মধ্যে হয়ে গেছে। সেই অন্তরঙ্গতার ভাবটা এমনই গভীর যে দেখলে মনে হয় যেন অনেক কাল আগের থেকেই ওদের আলাপ ছিল। দূর থেকে দেখতে পেলেই পরস্পরের মধ্যে হাসাহাসি হয়, তৎক্ষণাৎ ওরা কাছাকাছি হয়, তার পর দুজনে হাত-ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে কতই যেন জরুরি কথা বলতে শুরু করে দেয়। নলির পুলের ওপারে নাগেশ্বর চাঁপার বনের ধারে যেখানে ঘোড়া থেকে নেমে আমরা বিশ্রাম করি, সেখান পর্যন্ত গিয়ে মেয়েটা প্রায়ই অপেক্ষা করতে থাকে, আমরা কখন যে সেখানে উপস্থিত হবো তার সন্ধানটি সে কেমন করে আগের থেকেই জানে। দু'জনের মধ্যে ভারী ভাব, এমন কি মেয়েটা যেচে যেচে আমার সঙ্গে পর্যন্ত আলাপ করতে আসে, নানা উপায়ে আমাকে খুশি করতে আসে। মেয়েটার ভাবগতিক দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। একদিন নারঙ্গিকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুই কি ওকে আগের থেকে চিনতিস? নারঙ্গি একটু হেসে বললে—না খোকাবাবু, এমনিই চেনা হয়ে গেল, মেয়েটা খুব ভালো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—ওর নাম জানিস? নারঙ্গি আবার হেসে বললে—নামটা বড়ো চটকদার আছে বাবু, ওর নাম চুমকিজান। শুনতে অবশ্য একটু নতুন লাগল বটে, কিন্তু চেহারাতে তার কোনো চটকদারিত্বই দেখলাম না। ময়লা রংএর একটা রোগা মেয়ে, চুড়িদার পায়জামার ওপর শতেক তালি দেওয়া একটা ঘাঘরা পরেছে, তার রংটা ছিল হয়তো সবুজ, কিন্তু ধুলোয় ময়লায় এখন সবটাই কালো হয়ে গেছে। গায়ে একটা লাল কাপড়ের ছোটো জামা, তাতে পেটের সবটা ঢাকা পড়ে না, আর বোতামের জায়গায় ন্যাকড়ার ফালি দিয়ে ফাঁস করে এমন টেনে টেনে বাঁধা যে তাতে বুকের মাংসগুলো জায়গায় জায়গায় তাল পাকিয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসে। মাথার চুল বেজায় রুক্ষু, পিঠের দিকে তেমনি রুক্ষু একটা বিক্ষিপ্ত বিনুনি ঝুলছে। গায়ের ওপর একটা ফিন্‌ফিনে পাতলা ময়লা চাদরের ওড়না জড়িয়ে মাথার খানিকটা পর্যন্ত ঢাকা দেয়, কিন্তু তার আবার অনেক জায়গারই বুনুনি ফেঁসে ফেঁসে গেছে, ফাঁক দিয়ে সব কিছুই দেখা যায়। হাতের আর পায়ের নখগুলো মেহেদি পাতা দিয়ে রঙানো। হাতে পরেছে গোছাখানেক কালো কালো কাচের চুড়ি। কপালে একটা প্রকাণ্ড কালো টিপ। পান খেয়ে খেয়ে ঠোঁট দুটো লালের চেয়ে কালোই বেশি দেখায়, আর মুখখানা দেখলেই মনে হয় যেন মিথ্যে কথায় ঠাসা, সত্যি কথা চেষ্টা করলেও ওর মুখ দিয়ে বেরোবে না। কথা বলতে গেলেই চোখটা এমন করে মনে হয় যেন এবার ভেঙ্কি খেলবে।

মেয়েটা আমাকেও যথেষ্ট আপ্যায়িত করতে শুরু করলে। প্রায়ই একটা টাটকা বনফুলের মালা এনে আমার গলায় পরিয়ে দিতো, ভারী মিষ্টি তার সুগন্ধ। একদিন একটা চেন বাঁধা খুদে সাইজের সৌখীন নখকাটা ছুরি আমাকে এনে দিলে। কিন্তু এ-সমস্ত কিছুই আমার ভালো লাগতো না, কিছুই যেন ওর কাছে নিতে ইচ্ছে করতো না। একটা না একটা কিছু আমাকে দিয়েই ওরা বলতো,—তুমি এখানে একটু চুপটি করে বসে থাক বাবু, আমরা তোমার জন্যে ঐ বাগান থেকে গোলাপজাম

আর পেয়ারা পেড়ে আনি। এই বলে দুজনে মিলে বনের মধ্যে কোথায় ঢুকে চলে যেতো, অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর ফিরতো না। আমি বসে বসে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতুম, মাঝে মাঝে আমার কান্না পেয়ে যেতো। গাছের ডালে লাগাম বাঁধানো ঘোড়াটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, অনেকবারই মনে হতো ওর পিঠে উঠে বাড়ি চলে যাই, কিন্তু কেউ একজন রেকাব ধরে সাহায্য না করলে ঘোড়ার পিঠে উঠতে পারি না, আর জিনটা এমন আলগা করে লাগানো থাকে যে চড়বার চেষ্টা করতে গেলেই ঘুরে যায়। অগত্যা আমি চুপ করে বসে থাকি অনেকক্ষণ বাদে ওরা ফিরে আসে। কোনো দিন বা কিছু আনে, কোনো দিন কিছুই না, বলে যে আজ আর কিছু মিললো না।

তবু ভালো লাগার মোহটা নাকি এমনি জিনিষ যে হাজার রকমে প্রতারিত হলেও তখন আর কিছু করবার উপায় নেই। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে যেমন ভালো-লাগাতে একদিন আমাকে পেয়েছিল, তেমনি ভালো-লাগাতে এখন ওদের দুজনকে পেয়েছে। আমি যেমন বাড়ির লোকদের ফাঁকি দিয়ে নারঙ্গির সাহচর্যে খানিকটা আনন্দ পেয়ে নিচ্ছিলাম, ওরাও এখন তেমনি আমাকেই ফাঁকি দিয়ে পরস্পরের সাহচর্যে আনন্দ পেয়ে নিচ্ছে। কেমন করে এটা বুঝতে পারলাম তা জানি না, কিন্তু স্পষ্টই দেখলাম যে ঐ মেয়েটা জিউলির আঠার মতো নারঙ্গির সঙ্গে লেপ্‌টে রয়ে গেল, কিছুতেই আর ওকে ছাড়ানো যাবে না। আমরা এত কাল দুজনে মিলে বেশ আনন্দেই কাটাচ্ছিলুম, এর মধ্যে এমন করে একটা মেয়েমানুষ এনে ফেলা নারঙ্গির মোটেই উচিত হয়নি। আমাদের যা সম্পর্ক তা কেবল আমাদেরই ছিল, এর মধ্যে আবার মেয়েমানুষ কেন? কী এমন দরকার ঐ স্ত্রীজাতীয় জীবগুলোকে? নলির পুলের ধারের ঐ আবেষ্টনটুকুর সুযোগ পাই তো মাত্র এক ঘণ্টার জন্যে, তারই মধ্যে কি ওকে না এনে ফেললে চলতো না? থাক গে, নারঙ্গির যখন তাই-ই ভালো লাগছে, তখন না হয় দয়া করে ওকে প্রশ্রয় দেওয়াই যাক। আমার তখন প্রশ্রয় দেওয়া আর সহ্য করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

কিন্তু প্রশ্রয় দেওয়া মানে শুধুই যে চোখ বুজে থাকা তা নয়, তা ছাড়াও আরো অনেক ব্যাপার। একটু আস্কারা পেয়েছি দেখলেই লোকে আরো বেশি পেতে চায়। নারঙ্গির এখন ঘন ঘন অর্থের প্রয়োজন হতে লাগলো, আর আমার উপরেই সে নানা ভাবে জুলুম করতে লাগলো। ফুল পাড়বার অছিলায় সে ইচ্ছা করেই হাতটা পাটা আঁচড়ে আসতো, কাজেই তার নিত্য তাড়ি খাবার প্রয়োজন হতো। তখন আবার তাড়ির দাম নাকি ডবল হয়ে গেছে, তিন আনার জায়গায় ছ'আনা চাই। কোনো দিন বা ওর একটিও পয়সা হাতে নেই, চাল কিনবার জন্যে দুটো টাকা ধার চাই, ওমাসে মাইনে পেলেই শোধ দেবে। কোনো দিন বা ঐ মেয়েটাই খেতে পাচ্ছে না, তাকে দুটো টাকা দিতে হবে, নেহাৎ একটা টাকা দেওয়া ভালো দেখায় না। আরো কত রকমের বায়না নিত্য লেগেই রইল।

বারে বারে এত পয়সা জোটানো একটা পরমুখাপেক্ষী বালকের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যেমন করেই হোক তা জোটাতে হবে, নইলে যেন সেটা আমার পক্ষেই সর্বনাশ। পয়সা দিতে পারলে ঐ নারঙ্গি তবু কতকটা আমার বাধ্য হয়ে থাকবে, নইলে একেবারেই হাতছাড়া হয়ে যাবে। আগে জানতুম যে আমরা পরস্পর পরস্পরের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু এখন তো চোখের ওপরেই দেখতে পাচ্ছি যে আমি আপাতত আর ওর পক্ষে যথেষ্ট নয়, আমাকে বাদ দিলেও ওর আনন্দের কিছু কমতি হয় না। কেবল একটা যায়গাতেই ওর এখন ঠেকে গেছে, সে ঐ পয়সা। বেশ তবে পয়সা দিয়েই ওকে আমার অনুগত করে রাখতে হবে, তাতেই আমার আপশোষের কতক শান্তি হবে। ওকে দেবার জন্যে তাই কিছু কিছু করে পয়সা সংগ্রহ করতে লাগলাম। মাকে নানাবিধ উপায়ে জ্বালাতন করে টাকাটা সিকেটা প্রায়ই আদায় করতাম। তা ছাড়া আরো এক উপায় আবিষ্কার করলাম। দাদামশাইকে এক দিন চুপি চুপি বললাম যে স্কুলে টিফিনের সময় আমার ভারী খিদে পায়, এক গ্লাস দুধ খেয়ে আমার মোটে পেট ভরে না। স্কুলের টিফিন ঘরে রামচরণের কাছে সবাই খাবার কিনে খায়, আমিও তাই খাবো, কিন্তু বাবাকে কিংবা মাকে সে কথা জানালে চলবে না। দাদামশাই তৎক্ষণাৎ বললেন, বেশ তোমার যা খুশি তাই খেও, মাসকাবারে কত হলো বললেই আমি একসঙ্গে দিয়ে দেবো। এতে আমার সুবিধাই হয়ে গেল, জলখাবার কিছুই না খেয়ে মাসের শেষে আন্দাজ করে দশ পনেরো টাকা যা বলতাম, দাদামশাই তখনই তাই দিয়ে দিতেন। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। আর একথা তো ঠিকই যে তাঁকে একবার নারঙ্গির ব্যাপারটা জানিয়ে দিলে তার সব কিছুই ঘুচে যেতো। কিন্তু আমার তখন বিলক্ষণ ভয় ছিল যে তাহলে সে মরিয়া হয়ে চাকরিটাই হয়ত ছেড়ে দেবে। নারঙ্গির যেমনই ভাবান্তর ঘটে থাক, তবু সে যে আমার কাছে কাছে রয়েছে এটুকুও সান্ত্বনা, তাই প্রাণান্তেও কাউকে কিছু বলতে পারতাম না।

পয়সা ঘুষ দিয়ে তাকে খুবই বাধ্য করে রাখলাম বটে, কিন্তু আমার মনের মধ্যে একটা জ্বালা ধরে গিয়েছিল। ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই মনে পড়ে যেতো নারঙ্গির আগেকার দিনের ব্যবহারটার কথা। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অন্তরটা আমার জ্বালা করে উঠতো। আমার মতো এমন ভদ্রলোকের ছেলের চেয়ে ওর কাছে আজ বড়ো হলো কি না ঐ একটা ছোটলোক বেদের মেয়ে? আচ্ছা দেখা যাক, কত দিনে ওর এই ভুলটা ভাঙে। আমি নিজে কিছু বলবো না—কারো কাছে এই নিয়ে নালিশও কিছু করবো না—চুপচাপ শুধু দেখে যাই কত দূর পর্যন্ত ওর দৌড়। একদিন নিশ্চয় মেয়েটা ওকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে তখন ওর ভুল ভাঙবে, তখন আবার আমাকে চিনতে পারবে। সেই হবে উপযুক্ত প্রতিশোধ।

মনের নির্যাতন ছাড়া শরীরের নির্যাতনও আমার বড়ো কম হয়নি। মনে আছে একদিন বৈশাখ মাসে টিপ্‌-টিপ্‌ করে বৃষ্টি পড়ছিল, আমাকে সেই নলির পুলের ধারে একটা ফাঁকা পিলপের ওপর ছাতা মাথায় দিয়ে একলা বসিয়ে রেখে ওরা দুজনে বনের মধ্যে কোথায় চলে গেল। কিছুক্ষণ পর থেকেই বৃষ্টিটা খুব জোরে জোরে পড়তে লাগলো। চারিদিক সব ঝাপ্‌সা হয়ে গেল, ত্রিসীমানার মধ্যে কোনো জনপ্রাণী নেই, গাছতলায় কেবল ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে ভিজছে, আর আমি হাত-পাগুলোকে যথাসাধ্য গুটিয়ে নিয়ে ভয়ে অসাড় হয়ে সেই ছাতাটির আড়ালে বসে আছি। বাতাসের জোরে ছাতা ধরে রাখা যায় না, আর মাথায় বৃষ্টি না পড়লেও ছাতা দিয়ে তার ছাঁট এড়ানো যায় না, একটু একটু করে

আমার সমস্ত কাপড়-জামা ভিজে জল গড়াতে লাগলো। বৃষ্টিটা যখন থামলো তখন ওরা ফিরে এলো। হাসতে হাসতে বললে—তোমার তো ছাতা ছিল, আমরা গাছতলাতেই আটকে পড়েছিলাম, বৃষ্টিটা না ছাড়লে কেমন করে আসি ?

আর একদিনের ঘটনা। নারঙ্গি সেই বেদেনি মেয়েটাকে সখ করে আমার ঘোড়াতে চড়িয়েছিল। তার পা লম্বা বলে রেকাব দুটোকেও সে খুলে লম্বা করে দিয়েছিল। কিন্তু ঘোড়া কিছুতেই তাকে নিয়ে ছুটলো না, কেবল এদিক ওদিক ঘুরপাক খেতে লাগলো আর চাঁট ছুড়তে লাগলো। বাধ্য হয়ে মেয়েটাকে নেমে পড়তে হলো। কিন্তু তখন নারঙ্গির বেজায় রাগ হয়ে গেছে। রেকাবটা আবার আমার পায়ের মাপের মতো ছোটো করে এঁটে নেবার কথা তার মনেই হলো না। সেই অবস্থাতেই আমাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে দিয়ে সে খুব জোরে ছড়ির বাড়ি তার পাছায় ঘা দুই-তিন পিটিয়ে দিলে। মার খেয়ে ঘোড়া হঠাৎ জোরে ছুটতে শুরু করলে। রেকাবে সুবিধা মত পায়ের জোর না দিতে পারায় আমি সেই বেগটা সামলাতে পারলাম না, কাৎ হয়ে পায়ে রেকাব বেধে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলাম। সেদিন খুবই আমার চোট লাগতে পারতো, খুর দিয়ে ঘোড়া আমাকে মাড়িয়ে দিতে পারতো, কিংবা হিঁচড়ে আমাকে খানিকটা টেনে নিয়ে যেতেও পারতো। কিন্তু আমি কাৎ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধিমান ঘোড়া তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে গেল, মাটিতে পড়ে যেতে গলা বাড়িয়ে দিয়ে আমার মুখটা শুঁকতে লাগলো, আমার কাছের দিকের পা-টা উঁচু করেই দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু মুখ থুবড়ে পড়াতে বুকের কাছে খানিকটা চামড়া কেটে গিয়ে রক্তও ঝরতে লাগলো। কিন্তু তবু আমি কিছুই কাউকে জানতে দিলাম না। নারঙ্গি ছুটে এসে আমাকে ধরে তোলবার আগে আমি নিজেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম, কিছু যেন হয়নি এমনি ভাবে হাসিমুখে বললাম—রেকাবটা ছোটো করে দে! তখনই আবার ঘোড়ায় উঠে বসলাম।

সেই ঘা শুকোতে আমার প্রায় তিন মাস সময় লেগেছিল। কাউকে জানতে দিতুম না, কৃষ্ণ ডাক্তারের কাছ থেকে শুকে পটি চেয়ে এনে তাই নিজে নিজে লাগাতুম। সে ঘায়ের কোনো যত্নও হতো না, কোনো ওষুধও পড়তো না। এমন কি পাছে কেউ দেখে বলে আমি প্রাণান্তে গায়ের জামা খুলতুম না, স্নানের ঘরে গিয়ে দিনান্তে একবার মাত্র খুলতুম।

আমার মতো আরো যে এক জনের এমনি জ্বালা ধরেছিল, তার কথা এ পর্য্যন্ত বলা হয়নি। সে ঐ ঘাড়ে ছুলিওয়ালা ঝোঁটনদার ঢ্যাঙা ছোকরাটি, যে ওর সঙ্গে সঙ্গে নাচের সময় হার্মোনিয়ম বাজিয়ে বেড়াতো, লোকে বলতো নাচওয়ালির পোঁ-ধরা ভেড়ুয়া। আমি আগে মনে করতুম ওর ভাই-টাই কেউ হবে, কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম তা নয়, এ-ও একটা অন্য কোনো রকমের ভালো-লাগার সম্পর্ক। রকম-সকম দেখেই এটা বুঝতে পারতুম। লোকে যেমন ছোকরা বলতো, আমিও তাই বলছি, কিন্তু তাই বলে সে মোটেই ছোকরা নয়, আমার চেয়ে অনেক বড়ো, নারঙ্গির প্রায় সমান সমান। যৌবন তার অন্য কোনো দিকে তেমন স্ফূর্তি পায়নি, কেবল শরীরটাকেই বেজায় লম্বা করে দিয়েছে। একটু কেমন মেয়েলি ধরণের হাবভাব, পা জড়িয়ে জড়িয়ে চলতো, হাত দুখানা অনবরত গায়ের ওপর কোথাও লাগিয়ে রাখতো, তাতেও স্থির থাকতে না পেরে আঙুলগুলো নেড়ে নেড়ে নিজের গায়ের ওপরে যেন তবলা বাজাতো। এদিকে আবার ঘাড় কামানো, সুমুখে ঝোঁটন করা চুলের বাহার আছে, আর গায়ে সর্বদাই দেখতুম একটা রামধনু রঙের চুড়িদার পাঞ্জাবি, তা কখনো খোলাও হয় না কাচাও হয় না। মুখখানা চব্বিশ ঘণ্টাই ম্লান, যেন শরীর-ভালো-নেই গোছের ভাব, কোনো একটা কথা বলতে গেলেই ইতস্ততঃ করতে থাকে। কিন্তু তাহলেও নজরটি আছে সব দিকে। কেমন করে সে জানতে পেরেছিল যে ঐ মেয়েটার নারঙ্গির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, আর সে পুল পার হয়ে এসে রোজ আমাদের জন্যেই সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। বোধ হয় তাই তক্কে তক্কে থাকতো, আমরা যখন সেখানে উপস্থিত হতুম ঠিক সেই সময়টিতে সেও কোথা থেকে এসে জুটে যেতো, এমনিই যেন কত পায়চারি করছে সেই ভাবে তফাতে তফাতে ঘুরে বেড়াতো। কিন্তু তাকে দেখলেই মেয়েটা ভীষণ রেগে উঠতো, কাছে গিয়ে তাকে চোখ রাঙাতো, বকে ধমকে ঠেলতে ঠেলতে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতো। বেচারা মুখটি চুণ করে সেখান থেকে সরে যেতো।

কিন্তু তবু সেখানে যাওয়াটি সে কিছুতেই ছাড়তো না। ওদের লুকিয়ে খানিকটা দেরী করে যেতো, কিংবা আড়াল থেকে ওদের লক্ষ্য করতো। এক একদিন দেরীতে এসে ওদের দেখতে না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করতো—সেই মেয়েটি কোন্ দিকে গেল বাবু? তারা যে বনের মধ্যে ফল পাড়তে কি ফুল আনতে চলে যায়, এটুকু সে জানতো না। আমি হয়তো বলতুম জানি না, কিংবা একটা অন্য দিকে আঙুল দেখিয়ে দিতুম। ও সেই দিকেই ব্যস্ত হয় ছুটতো। একদিন কী মনে হল জানি না, ওরা যে পথ দিয়ে বনের মধ্যে চলে গেছে সেই পথটাই ওকে দেখিয়ে দিলাম। ও তৎক্ষণাৎ সেই দিক দিয়ে বনে ঢুকলো। তার পর অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল, কারোই দেখা নেই। আমার তখন কেমন একটা সন্দেহ হলো, আমিও সেই পথ ধরে ওদের খুঁজতে বনের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেলাম।

এ সেই নাগেশ্বর চাঁপার বন, যেখানে দিনের মধ্যেও অন্ধকার করে থাকে, যেখানে চারি দিকে কাঁটার ঝোপ, বিষাক্ত কেউটে সাপেরা যেখানে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়, হয়তো আরো কত কী জানোয়ার ওৎ পেতে লুকিয়ে থাকে। ভূতের কথাও বলা যায় না, তারাও যে গাছের আড়ালে আবডালে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে না পারে এমন নয়। বনে ঢুকে হারিয়ে যাওয়ার গল্প আমি অনেক শুনেছি, আগেকার দিনে মা বলতো যে বনে ঢুকলেই নাকি তাড়কা রাক্ষসীরা পথ ভুলিয়ে কোথায় ডেকে নিয়ে যায়। আমার ভয় করতে লাগলো, গা ছম্‌ছম্ করতে লাগলো। ফিরে যাবো কি না ভাবছি, এমন সময় একটা চীৎকারের আওয়াজ শুনতে পেলাম। মনে হলো কে যেন কিছু বিপদে পড়েছে, রক্ষা করো রক্ষা করো বলে চেঁচাচ্ছে। আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই শব্দ লক্ষ্য করে ছুটলাম।

কাছে গিয়ে দেখি, তা নয় একেবারে অন্য রকমের কাণ্ড! রক্ষা করো বলে কেউ চেঁচাচ্ছে না, অশ্লীল ভাষায় গাল পাড়ছে সেই হার্মোনিয়ম-বাজিয়ে ছোকরাটা। তবে অবস্থাটা তার শোচনীয়। তার পরনের কাপড় খুলে নিয়ে নারঙ্গি তাকে একটা গাছের সঙ্গে পিঠমোড়া করে বেঁধেছে, আর বাঁটা গাছের ডাল ভেঙে তাই দিয়ে তাকে এলোধাবাড়ি সপাং সপাং করে মারছে। কিন্তু অত মার

খেয়েও সেই লোকটার যেন কিছুমাত্র ব্যথা লাগছে না, একটু কাতরোক্তি করছে না, একবারও ছেড়ে দিতে বলছে না। যত জোরে মার খাচ্ছে ততই জোরে সে চেঁচিয়ে গালাগালি দিচ্ছে, আর রাগের চোটে থেকে থেকে গোঁ-গোঁ করে গজরাচ্ছে। সে তার কী প্রচণ্ড মূর্তি! হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কোনো ক্ষমতাই তার নেই, তবু সে ক্ষেপে-ওঠা গোখরো সাপের মতো গলা বাড়িয়ে যেন শূন্যের ওপরেই ছোবল মারছে, দাঁত কিড়ি-মিড়ি করছে, থু থু করে নারঙ্গির মুখের ওপর থুতু ফেলছে, নিষ্ফল আক্রোশে ফোঁস্-ফোঁস্ করে উঠছে, আর ছাতিটা তার হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে। রাগের ধমকে গালাগালিটাও তার মুখ দিয়ে সোজা হয়ে বেরুচ্ছে না, তোৎলার মতো কথাগুলো আটকে আটকে যাচ্ছে। নারঙ্গি নির্মম ভাবে তাকে মেরেই চলেছে, মুখে তার একটা বিজাতীয় রকমের তীব্র বিজয়োল্লাসের হাসি। আর সেই বেদেনী মেয়েটা স্বচ্ছন্দে তার পাশেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সমস্ত দেখছে, লোকটা এত মার খাচ্ছে দেখে তার একটু মমতাও হচ্ছে না, বরং সে যেন খুশি হয়ে এটাকে সমর্থনই করছে।

আমাকে দেখবামাত্রই ঐ সব থেমে গেল। অপ্রস্তুত হয়ে নারঙ্গি তাড়াতাড়ি তার বাঁধনটা খুলে দিলে, সেই লোকটা কাপড় পরে নিয়ে তখন ফোঁস-ফোঁস করতে করতে আর চোখ দিয়ে অগ্নি-বর্ষণ করতে করতে মেয়েটার হাতখানা ধরতে গেল। মেয়েটা এক ঝাঁকানিতে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তার দিকে ছুটলো, ছোকরাটাও অমনি তার পিছু-পিছু ছুটলো। নারঙ্গি নেহাৎ ভালো মানুষটির মতো ওদের ছেড়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলল। কেন যে অমন করে লোকটাকে মারছিল তা আমিও তাকে জিজ্ঞাসা করলাম না, আর সে-ও কিছু বললে না।

কিন্তু এত অপমানের পরেও লোকটার এই ছোঁক্-ছোঁক্ করে ওদের পিছু নেবার স্বভাবটি ঘুচলো না। তেমনিই গোপনে গোপনে ও আবার আসতো, আবার আমার কাছে ব্যাকুল হয়ে সন্ধান জানতে চাইতো যে ওরা কোন্ দিকে কোথায় গেল। আমি যদিও আর কখনো তাকে ঠিক সন্ধান দিতুম না, কিন্তু ওর সেই ব্যাকুলতা দেখে আমার বড়ো মায়া হতো। বুঝতে পারতুম যে, ওর জ্বালা কিছুমাত্র জুড়ায়নি, বরং আরো বেড়ে গেছে। বুঝতে পারতুম যে, ওর মনের গ্লানিটা আমার চেয়েও অনেক বেশি মারাত্মক রকমের।

ক্রমে রথের সময় এসে পড়লো। বাধ্য হয়ে বেদের দলকে তখন ডেরা-ডাণ্ডা গুটিয়ে নিয়ে মাঠ পরিত্যাগ করে চলে যেতে হলো। রথতলার সেই মাঠটা আগেকার মতো আবার ফাঁকা হয়ে গেল, ওরা যে গরুর গাড়ি বোঝাই করে তল্পিতল্পা সমেত আবার কোন্ দেশে গিয়ে উঠলো তার কোনো সন্ধানই কেউ রাখলে না। আমাদের কাছাকাছি অঞ্চলের মধ্যে ওদের কাউকেই আর দেখা গেল না। আমি আশ্বস্ত হয়ে ভাবলাম থাক্ গে, এইবার বুঝি আমার অশান্তির কারণ ঘুচলো, এখন থেকে আবার আমার দিনগুলো তেমনি আনন্দেই কাটবে।

কিন্তু কিছু দিন পরেই দেখলাম, তা মোটেই নয়। বেদেরা সবাই চলে গেলেও সেই মেয়েটা তাদের সঙ্গে যায়নি, সে আমাদের ঐ অঞ্চলেই ঘোরাফেরা করছে। এক দিন দেখি, সে কোথা থেকে একটা ঘুঙুর-বাঁধা খঞ্জনি জুটিয়েছে, তাই বাজিয়ে বাজিয়ে একাই গঞ্জের মধ্যে একটা আড়তের সামনে দাঁড়িয়ে খুব নাচতে গাইতে লেগে গেছে, সঙ্গে হার্মোনিয়ম বাজাবার দোসর কেউ নেই। কিন্তু তাতে নাচ-গানের কোনোই অঙ্গহানি হয়নি, বরং ফাঁকা গলায় ওর গানটা আরো মিষ্টি শোনাচ্ছে, তাই শুনতে চারি দিকে শ্রোতা জুটে গেছে বিস্তর, পয়সা উপার্জ্জন হচ্ছে অনেক। নারঙ্গিকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, ও দল ছেড়ে দিয়ে এখন এইখানেই থাকে, গঞ্জের কাছে কোথায় একটা বাসা নিয়েছে।

ক্রমশঃ আরো জানতে পারলাম যে, ও রীতিমত একটা ঘর ভাড়া নিয়ে রয়েছে, আর নারঙ্গিও সেখানে রীতিমতই যাতায়াত করে। শুধু তাই নয়, নারঙ্গিকে ও আজ-কাল কত ভালো ভালো জিনিষ খাওয়ায়। এটা আমি নিজের চোখেই এক দিন আবিষ্কার করলাম। টিফিনের ছুটির সময় স্কুলের মাঠে বেরিয়ে গিয়ে ইদানীং প্রায়ই দেখতুম যে, সেই বটগাছ তলাটায় আমার ঘোড়াও বাঁধা নেই, আর নারঙ্গিরও কোনো পাত্তা নেই। ভাবতুম, বুঝি অন্য কোথাও চরাতে নিয়ে গেছে। যেখানেই যাক্, ছুটির সময় ঠিকই ফিরে আসতো। এক দিন সকাল সকাল ছুটি হয়ে গেল, সেদিন দেখলাম তখনও পর্যন্ত এসে হাজির হয়নি। খুঁজে দেখবার জন্যে গঞ্জের ভিতর দিয়ে এদিক ওদিক অনেক ঘুরে বেড়ালাম। শেষে এক জন চেনা পানওয়ালার দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার ঘোড়াটাকে এদিক্ দিয়ে কোথাও যেতে দেখেছো? সে বললে—হাঁ, তোমার ঘোড়া তো রোজই দুপুর বেলা এখানে আসে। ঐ যে সরু গলিটা দেখা যাচ্ছে, ঐটা ধরে কিছু দূর চলে গেলেই দেখতে পাবে ঘোড়া একটা ঘরের কাছে বাঁধা আছে, তোমাদের ঘোড়ার লোকটিকেও সেই ঘরের মধ্যে দেখতে পাবে। এই বলেই পানওয়ালা একটু মুচকে মুচকে হাসলে।

সত্যিই তাই। সেই এঁদো গলিটা ধরে কিছু দূর গিয়েই দেখি আমার ঘোড়াটা বাগডোরের দড়ি দিয়ে একটা ঘরের কাছে খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে। সেই ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দেখলাম, নারঙ্গি একটা মস্ত থালিতে করে মাংস আর পুরি নিয়ে খেতে বসেছে, সেই নাচওয়ালি মেয়েটা হাসতে হাসতে তার কাছে বসে খাওয়াচ্ছে, আর বক্-বক্ করে অনর্গল কত কী বকছে। আমাকে দেখতে পেয়েই ওরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো, নারঙ্গি খাওয়া ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো।

বুঝতে পারলাম অনেক কিছুই, অতি বিশ্রীও লাগলো ব্যাপারটা। কিন্তু তখনই ভেবে নিলাম, যাক্ গে মরুক গে, কোন জাতের হাতের রান্না ও খেলে তাতে আমার কি-ই বা এমন আসে-যায়? আমার মা যদি দেখতে পেতো তাহলে ওকেও হয়তো আজ গোবর খাইয়ে ছাড়তো, কিন্তু মা তো আর এখানে দেখতে আসছে না! হয়তো মেয়েটা এখন একটু বড়লোক হয়েছে, খাবার জন্যে ওকে রোজ আসতে বলে, তবেই তো ও আসে।

কিন্তু ক্রমে চারি দিকে এই খবরটা জানাজানি হতে লাগলো। চাকর-বাকরদের সমাজে সবাই কিছু কিছু টের পেয়ে গেল। কিছু দিন পরে দেখি নারঙ্গির এক শালা দেশ থেকে এসে হাজির হয়েছে, অনেক দিন দেশে যায়নি তাই ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। আমার অসুবিধা হবে বলে দাদামহাশয়ের তাতে আপত্তি ছিল, তবু অনেক ধরাকাঁদা করাতে তিনি পনেরো দিনের ছুটি দিয়ে দিলেন। কিন্তু নারঙ্গি নিজেই কিছুতে গেল না, বললে যে খোকাবাবুকে কষ্ট দিয়ে

আমি এখন চলে যেতে পারি না, একটা ভালো লোক দেখে বদলি দিয়ে পরে যাবো। অগত্যা ওর শালাকে ক্ষুণ্ণমনে ফিরে যেতে হলো।

কিছু দিন পরে সেই শালা দেশ থেকে নারঙ্গির বৌকেই সঙ্গে এনে হাজির করলে। দাদামশাই আর আমার মা খুশি হয়ে তার থাকবার জন্যে আস্তাবলের পাশে আরো একটা ঘর ছেড়ে দিলে। বেশ ক্ষুদে গুড়্‌গুড়ে বৌটি, নাদুস নুদুস গড়ন, মোটা-মোটা বেড়ির মতো মল পায়ে পরে, পৈঁছে আঁটা হাত দিয়ে ঘোমটা ফাঁক করে আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। নিতান্ত ভালোমানুষের মতো মেয়েটি, দেখলেই দুটো কথা বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আমার সঙ্গে কোনো কথাই সে মুখ ফুটে বলতে পারে না। শুধু ড্যাব-ড্যাব করে চেয়েই থাকে।

মাস কতক বেশ কাটলো। নারঙ্গির খাসিলতটা পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হলো। চোখের দৃষ্টিটা বেশ নরম, মেজাজটাও আগেকার চেয়ে ঠাণ্ডা। তবে এইটুকু দেখলাম যে আগেকার চেয়েও এখন বেশি বেশি তাড়ি খেতে শুরু করেছে, প্রায় প্রত্যহই খেতো। ভাবলাম তা থাকগে, এটা ওদের জাতের রীতি। তাড়ি খেয়ে সে শুম্‌ হয়েই থাকতো, আগেকার মতো মাতলামি-গোছের বড়ো একটা কিছু করতো না।

আবার একদিন তেমনি সকাল সকাল স্কুলের ছুটি হয়ে গেছে। বাইরে বেরিয়ে দেখি ঘোড়াটা বটগাছ তলাতে বাঁধা আছে, কিন্তু নারঙ্গি নেই। নিশ্চয় সেই গাঙের মধ্যের গলিতে সে গেছে ভেবে ক্লাসের ছেলের সাহায্য নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়লাম। ঘোড়ায় চড়েই সেই গলিতে গেলাম। সেখানে গিয়ে দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি, মেয়েটা মাঁথা পেতে একটা ছেলে কোলে করে শুয়ে রয়েছে। ছেলেটাকে সে মাই দিচ্ছে, আর ছেলেটা কিলবিল করে হাত পা নাড়ছে। সেখানে আর অন্য কেউ নেই।

আমাকে দেখেই মেয়েটা ছেলে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। আমাকে বললে—তুমি একলাই এসেছো বাবু, নারঙ্গি আসেনি কেন? তার বুঝি অসুখ করেছে?

আমি বললাম—কৈ না তো? সকালে সে আমার সঙ্গেই এসেছিল, যেমন রোজ আসে, এখন তাহলে কোথায় গেল?

মেয়েটা হতাশ ভাবে আমার দিকে চেয়ে বললে—রোজ আসে? কোথায় গেল তা জানি না তো বাবু, এখানে কিন্তু অনেক দিনই সে আসেনি।

আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। মেয়েটার কী চেহারা হয়ে গেছে! আমি কোন কথা না বলে তাড়াতাড়ি চলে এলাম।

ইদানীং লক্ষ্য করতুম যে ক্ষুদে বৌটিকে এখন নারঙ্গির খুব ভালো লাগছে, দিনরাত তার কাছে কাছে থাকে। আমি ভাবতুম এ বরং ভালো, মেয়েটি বড়ো নিরীহ। নারঙ্গি সেই বৌয়ের কাছে কোনো চাকর-বাকরকেও যেতে দিতো না। একদিন সন্ধ্যার সময় আমার মনে হলো যেন সেই নাচওয়ালি মেয়েটা ওদের ঘরের কাছে উঁকি মারছে। নারঙ্গি একবার ঘর থেকে বেরোতেই সে তাড়াতাড়ি কোথায় লুকিয়ে পড়লো, আর তাকে দেখা গেল না। নারঙ্গি তাকে হয়তো মোটে দেখতেই পায়নি, সে খুব হো-হো করে হাসছিল।

কিছু দিন পরে আবার একদিন তাড়াতাড়ি স্কুলের ছুটি হয়ে গেছে। বাইরে বেরিয়ে দেখি ঘোঁড়া বাঁধা রয়েছে, কিন্তু নারঙ্গি নেই। ভাবলাম সেই গলিতে গিয়ে একবার দেখে আসি সেখানে গেছে কি না। অন্যমনস্ক হয়ে কী একটা ভাবতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সেই ঘরের দরজার কাছে যাবার আগেই দূর থেকে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

নারঙ্গি তখন টলতে টলতে সেই দরজা দিয়ে ঢুকছে। নিশ্চয় খুব তাড়ি খেয়েছে। পিছু-পিছু গিয়ে দেখতে পেলাম নারঙ্গি ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে জড়িতকণ্ঠে কী বলতে লাগলো, আর নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করতে লাগলো। মেয়েটা অত্যন্ত ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নারঙ্গি ওর দিকে দুই হাত বাড়িয়ে কী যেন ধরতে গেল। মেয়েটা একটু সরে গেল। নারঙ্গি আবার তার দিকে অগ্রসর হয়ে হাত ধরলে। তখন সে হাত ছাড়িয়ে ক্ষেপের মতো বেঁকে দাঁড়ালো। কোমরে গোঁজা কাপড়ের ভিতর সে একটা প্রকাণ্ড চক্‌চকে ছুরি বের করলে। তীব্রকণ্ঠে সে চীৎকার করে বলে উঠলো—উও ঔর নেহি মিলেগি। অব এই লেও! এই লেও! এই লেও! বলতে বলতেই সে ছুরিটা নারঙ্গির কাঁধের উপর সজোরে একবার বসিয়ে দিলে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো। নারঙ্গি তৎক্ষণাৎ মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। মেয়েটা সেই অবস্থায় ওর বুকের ওপর চেপে বসলো, আবার একবার মারবার জন্যে রক্তমাখা ছুরি সমেত হাতখানা বাগিয়ে তুললে।

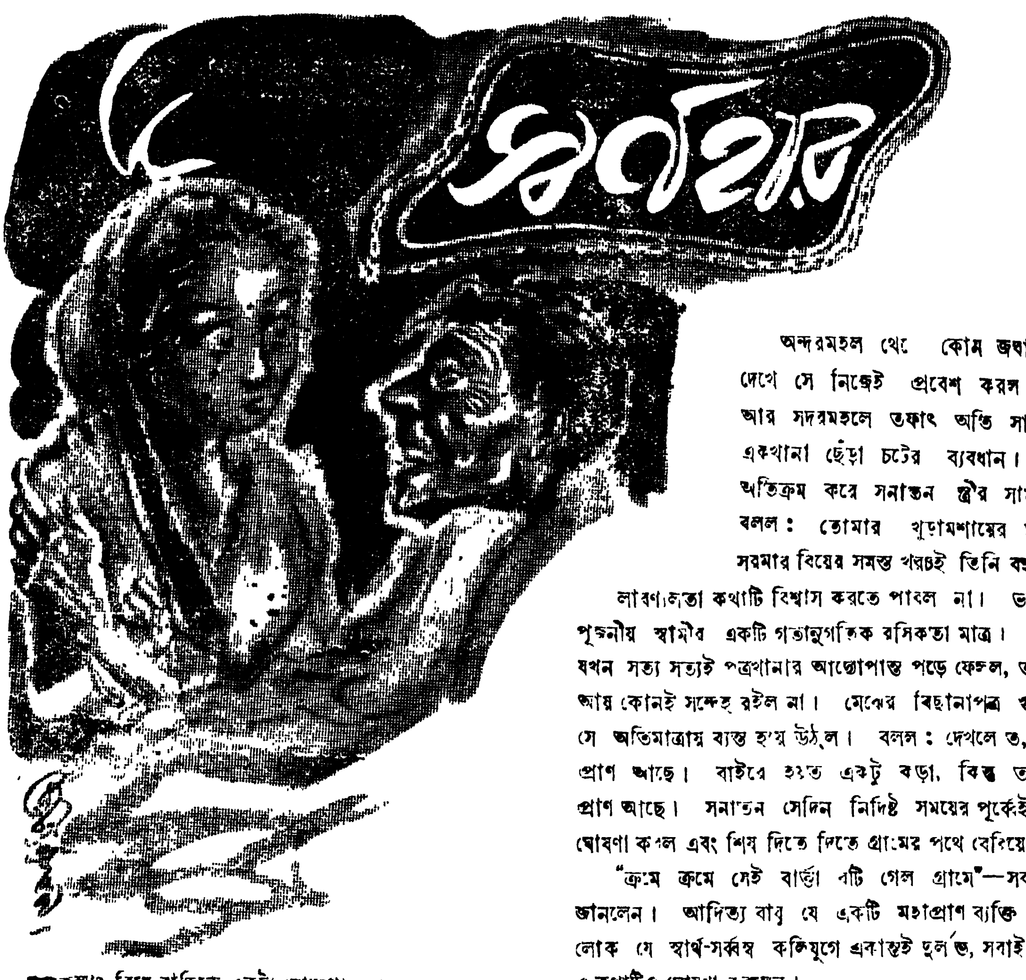
এতক্ষণ পর্যন্ত আমি স্তব্ধ হয়ে দেখছিলাম, কিন্তু এইবার আমি প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলাম! মেয়েটা চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলে। আমাকে দেখেই সে ছুরি ফেলে দিয়ে পাশ কাটিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে কোথায় পালিয়ে গেল। ছুরিটা সেখানেই পড়ে রইল, শিশুটাও পড়ে রইল, নারঙ্গিও তেমনি অবস্থায় অচৈতন্যের মতো পড়ে রইল।

তারপর নারঙ্গিকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। মেয়েটার সন্ধান মেলেনি। শিশুটার গতি কী হলো তা আমি জানি না। সেরে উঠেই নারঙ্গি বৌ নিয়ে দেশে চলে গেল।

* * * *

এ অনেক দিন আগের কথা। তার পর যখন বড়ো হয়ে উঠলাম তখন অবশ্য স্পষ্ট করেই বুঝলাম যে আমরা বাল্য থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত কেন মেয়েমানুষের ভালোবাসাটাই এমন করে চাই। কিন্তু সে কথা যাক।

নারঙ্গিকে আজকাল মাঝে-মাঝে দেখতে পাই। সে এখন এক জন বড়লোকের গাড়ির কোচম্যানি করছে। তার মাথার কদমছাঁটা চুল আর খোঁচা-খোঁচা দাড়ি সবগুলোই এখন পেকে গেছে। মস্ত একটা তেজী ঘোড়াকে গাড়িতে জুতে সে চালায়, প্রাণপণ শক্তিতে রাস টেনে ধরে থাকতে হয়। ঘোড়াটা ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে গর্বভরে ছুটতে থাকে। নারঙ্গিকে দেখলেই আমার মনে পড়ে ওর কাঁধের সেই ক্ষতটার কথা, আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে ছেলে-বেলাকার সব কাহিনী।



ভট্টাচার্য্য

অকস্মাৎ বিয়ে-বাড়িতে একটা সোরগোল পড়ে গেল। কনের গলা থেকে হার চুরি হয়েছে। এদিকে ওদিকে সন্ধান আরম্ভ হ'ল, অহেতুক আর্ত্তনাদ, বিলাপ ও চিৎকারের অন্ত রইল না। সে চিৎকারে রোগশয্যা থেকে সনাতন উঠে বসল। জানতে চাইল ব্যাপার কি ?

লাবণ্যলতা কেঁপে উঠ্‌ল। চোখ মুছতে মুছতে বলল, আর ব্যাপার কি ? মেয়ের গলা থেকে আমার কাকাবাবুর দেওয়া হার-ছড়া চুরি হয়ে গেল।

ব্যাপারটি অভাবনীয় ও কল্পনাতীত। তবু ধীরে ধীরে সবাই শান্ত হয়ে উঠল এবং পুরোহিতের অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য মন্ত্র শোনা গেল।

এ ধরণের ব্যাপার যে কাজ-কর্ম্মের বাড়িতে মাঝে মাঝে ঘটে থাকে, ইত্যাদি বহু সত্য-মিথ্যা কাহিনী উল্লেখ করে সবাই লাবণ্যলতাকে সান্ত্বনা দিল।

২

এ বিয়ের একটা ইতিহাস আছে। দু'হপ্তা রোগভোগের পর আজই মাত্র ভাত-পথ্য করে সনাতন বারান্দায় চাটাই বিছিয়ে ছাত্রদের নিয়ে বসেছে। হঠাৎ খুড়শ্বশুর আদিত্য মুখুয্যের পত্র আসল। তাতে তিনি লিখেছেন, সরমার বিয়েতে সমস্ত ব্যয়ই তিনি বহন করবেন। নিজের যদি একটি নাতনী থাকত, তবে কি তা তিনি বহন করতেন না ? সনাতন চট্ করে পত্রখানার কয়েক লাইন পড়ে অন্দরমহলের দিকে ডেকে বলল : ওগো শুনছ, তোমার খুড়ামশায় কি লিখেছেন ?

অন্দরমহল থেকে কোন জবাব আসল না দেখে সে নিজেই প্রবেশ করল। অন্দরমহল আর সদরমহলে তফাৎ অতি সামান্য। মাঝে একখানা ছেঁড়া চটের ব্যবধান। সে ব্যবধান অতিক্রম করে সনাতন স্ত্রীর সামনে দাঁড়াল। বলল : তোমার খুড়ামশায়ের চিঠি দেখেছ ? সরমার বিয়ের সমস্ত খরচই তিনি বহন করবেন।

লাবণ্যলতা কথাটি বিশ্বাস করতে পারল না। ভাবল, এ তার পূজনীয় স্বামীর একটি গতানুগতিক রসিকতা মাত্র। কিন্তু সনাতন যখন সত্য সত্যই পত্রখানার আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলল, তখন তার মনে আর কোনই সন্দেহ রইল না। মেঝের বিছানাপত্র গুছিয়ে রাখতে সে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল। বলল : দেখলে ত, খুড়োমশায়ের প্রাণ আছে। বাইরে হয়ত একটু কড়া, কিন্তু তা ব'লে কি ? প্রাণ আছে। সনাতন সেদিন নির্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই ছাত্রদের ছুটি ঘোষণা করল এবং শিস দিতে দিতে গ্রামের পথে বেরিয়ে পড়ল।

"ক্রমে ক্রমে সেই বার্ত্তা রটি গেল গ্রামে"—সকলেই কথাটি জানলেন। আদিত্য বাবু যে একটি মহাপ্রাণ ব্যক্তি এবং তাঁর মত লোক যে স্বার্থ-সর্ব্বস্ব কলিযুগে একান্তই দুর্লভ, সবাই সমবেত কণ্ঠে এ-কথাটিও ঘোষণা করলেন।

দিন কয়েক পর পাঁচখানা গরুর গাড়ীতে জিনিষপত্র বোঝাই করে আদিত্য বাবু আসলেন। পাড়া-ময় হৈ-চৈ পড়ে গেল—বিপুল অর্থের গুঞ্জনে সকল-বয়সী লোকই এসে জমা হ'ল সনাতন-মাষ্টারের বারান্দায়। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বাড়িটির চেহারা বদলে গেল, উঠানটি তক্-তক্ করছে। ঘরে বিচিত্র বর্ণের একটি পরদা ঝুলছে পনর বৎসরের পুরাতন চটের পরদা আজ আর নাই। ঘরে নূতন জানালা বসাবেন বলে আদিত্য বাবু ফিতা হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

কিন্তু সনাতন এই উৎসবের মধ্যে কোথাও নাই। আজ তিন দিন হল সে যে বিছানা নিয়েছে, এর মধ্যে জ্বর আর একবারও থামে নাই। সরমা তার শিয়রে রাত্রি-দিন বসে আছে। তার একটি মুহূর্ত্তও বিশ্রাম নাই।

ও-পাশের ঘরে সরমার দুই ভাই, কার্ত্তিক ও গণেশ, আদিত্য বাবুর নূতন জুতা-জোড়া নিয়ে এক মহা সমস্যায় পড়েছে। দু'পাটি জুতা দুজনে নাকের কাছে তুলে গন্ধটা বেশ উপভোগ করছে এবং ক্রমশঃই বিস্মিত হয়ে উঠ্‌ছে। এ গন্ধটা কিসের কিছুতেই তা তারা ঠাহর করতে পারল না। এ অবস্থায় শঙ্খ ও শানাই বেজে উঠ্‌ল। লোকে জানল, বর এসেছে। নব-বধূর বেশে সরমা সেজে উঠ্‌ল। সলজ্জা, সঙ্কুচিতা, কল্যাণী-মূর্ত্তির দিকে সনাতন একবার তাকাল।

আগুন

বিমলচন্দ্র ঘোষ

হাস্যকর মনে হয় প্রলয়ের দাম্ভিক ঘোষণা
অন্ধকারে প্রদীপের অগণিত নম্র পীত শিখা
নিবেছে তো বার বার ঝড়ের সঙ্কেতে,
আগুন নেবেনি তবু
জমে আছে পুঞ্জ পুঞ্জ অশরীরী মহাকাল পটে
মাটিতে পাথরে কাঠে রসায়নে মেঘের পাঁজরে
নেবেনি আগুন আজো
আগুন অদৃশ্য অনির্ব্বাণ।

অণুতে অণুতে রুদ্ধ কালাগ্নির শিখা
ঊর্দ্ধমুখী বাসনার শিখরে শিখরে
তরঙ্গিত বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যতে
লক্ষ কোটি দীর্ঘশ্বাসে মৃত্যুঞ্জয় দেব বৈশ্বানর।
মৃত্যুর কঙ্কালে তাই লাথি মারে নির্ভিক জীবন
আগুন অমৃত অনির্ব্বাণ!

তবু যারা স্পর্দ্ধা ভরে আগুনকে করে অস্বীকার
ফুৎকারে নিবাতে চায় রক্তবর্ণ প্রাণাগ্নির শিখা
অগণিত সর্ব্বহারা ক্ষুধিত চিতার
শিখান্বিত সাধনাকে মনে করে ক্ষণ-মরীচিকা
অবিশ্বাসী মূর্খ তা'রা ভীত স্বার্থপর।

ক্ষমা করো দেব বৈশ্বানর
ক্ষমা করো ক্লীবের ক্রন্দন
অগ্নিগর্ভ যজ্ঞকুণ্ডে হবি হোক সর্ব্ব দুর্ব্বলতা
মুক্তিমন্ত্রে জ্বলে ওঠো হে অনল দীপ্ত বহ্নিমান্
আলোয় উজ্জ্বল করো তমসায় নিষ্প্রভ শ্মশান।

•

স্বামী নিশ্চিন্তে গভীর নিদ্রায় মগ্ন আছেন দেখে সরমা বিছানা ছেড়ে উঠ্‌ল। ধীরে ধীরে গেল বাবার ঘরে। সেখানে গিয়ে আলো জ্বালাল। ডাকল: বাবা ঘুমিয়েছেন?

বাবার কপালে হাত দিল সরমা। সনাতন বুঝতে পারল। নরম ও কচি হাতখানা যেন কত কালের সান্ত্বনা ও শান্তির বার্ত্তা নিয়ে এসে জীবনের এই নিভৃত মুহূর্ত্তটিকে অতুল ঐশ্বর্য্যে ভ'রে দিল।

সরমা ধীরে ধীরে বাবার হাতে হারছড়া গুঁজে দিয়ে বলল: কাউকে বলো না, বাবা।

সনাতন বিস্মিত হ'ল। সে কিছুই বুঝতে পারল না। প্রশ্ন করল: কোথায় খুঁজে পেলে এ হার?

—খুঁজতে হয় নাই। আমার কাছেই লুকিয়ে রেখেছিলাম। কাউকে তুমি বলো না বাবা।

—কিন্তু হার ছাড়া তোমাকে অত্যন্ত হতচ্ছাড়া দেখাবে; এ তুমি কেন দিতে এসেছ?

যেন এ অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার, যেন এ ভাবে চুরি করে সে কিছু মাত্র অপরাধ করে নাই, এমনই ভাবে সাদা গলায় সরমা বলল: সে চিন্তা তুমি ক'রো না, বাবা। আমি আরও কত গয়না-গাঁটি তৈরী করে নিতে পারব—ওঁরা খু-উ-ব বড়লোক।

রোগশীর্ণ সনাতন কি একটা জবাব দিবার চেষ্টা করল। কিন্তু সরমা এতক্ষণে স্বামীর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়েছে।

পরদিন গ্রামের ধূলি-সমাকীর্ণ পথে নব-বধূ সরমাকে নিয়ে গরুর গাড়ি অদৃশ্য হ'ল। সে দিকে তাকিয়ে সনাতনের দৃষ্টি কাঁপতে লাগল। এই পথে কত মানুষ চলে গেছে যুগ-যুগান্তরে, সুখ-দুঃখ, ক্ষুদ্রতা ও মহত্ত্বের সীমারেখা উত্তীর্ণ হয়ে···। সনাতন একটু সময় বারান্দায় দাঁড়াল।

আদিত্য বাবু আসলেন। বললেন: আমিও রওনা হ'ব লাবণ্য। বিয়ে থা ত হয়েই গেল, এবার তোমাদের সবাইকে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে আমি রওনা হতে চাই।

আদিত্য বাবু চলে গেলেন। দরজার পরদা, বারান্দার ফুলের টব, ইজি-চেয়ার, ইত্যাদি একে একে গরুর গাড়িতে তোলা হ'ল।

অপার দৈন্যের প্রতীক একখানা কুঁড়ে ঘর—চিরদিনের মত আজও সন্ধ্যার অন্ধকারে এক প্রেত-জগতের নির্জ্জনতায় নিঃশব্দে ডুবে রইল।

লাবণ্য আসল এ-ঘরে। এত দিন সে একটি বারও স্বামীর খোঁজ নিতে পারে নাই। কিন্তু আজ সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে এক জীর্ণ-জর্জ্জর গৃহকোণে মৃৎ-প্রদীপের কৃপণ আলোতে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে লাবণ্য ভয়ে ও আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌ল।

সনাতন অকস্মাৎ এক রকম জোর করেই উঠে বসল এবং এক হাতে লাবণ্যকে বেষ্টন করে আর হাতে হার-ছড়া গুঁজে দিয়ে চোরের মতই ভীত কণ্ঠে বলল:—নাও, তোমাকেই দিলাম; কোন দিন ত কিছুই দিতে পারি নাই।

ঘৃণায় লজ্জায় এবং স্বামীর এই অমার্জ্জনীয় স্বার্থপরতায় লাবণ্য সঙ্কুচিত হয়ে উঠ্‌ল। এক পাশে সরে গিয়ে বলল: এ তুমি করেছ কি? মেয়ের গলার হার চুরি করেছ? সনাতনের মুখে মৃত্যুর হাসি। বলল: এমন কি-ই বা অপরাধ হ'ল? কোন দিন তোমাকে ত কিছুই দিতে পারি নাই—তুমি হার-ছড়া পরে লক্ষ্মীটির মত বসো আমার সামনে। সত্যি, কি সুন্দরই না মানাবে তোমাকে!

সনাতন আর কিছুই বলতে পারল না, হয়ত সে অনেক কিছুই বলতে চেয়েছিল। লাবণ্যলতাও পাষাণ হয়ে গেছে। পাষাণের চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল নেমে আসল ধীরে ধীরে। ধীরে ধীরে আবার তা শুকিয়েও গেল।

ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের এক বৎসর

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

গত ৫ই আগষ্ট মাদ্রাজে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অংশীদারদের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় ডিরেক্টার বোর্ড ১৯৪৬ সনের ৩০শে জুন যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে বার্ষিক বিবরণী পেশ করিয়াছেন, তাহাতে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও আলোচ্য বৎসরে ভারতের আর্থিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ১৯৪৫ সালের মে মাসে ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে এবং আগষ্ট মাসে শেষ হইয়াছে জাপানের সহিত যুদ্ধ। সুতরাং যুদ্ধ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরবর্ত্তী এক বৎসরে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের গতি-প্রকৃতির পরিচয় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই বার্ষিক বিবরণীতে পাওয়া যায়। যুদ্ধোত্তর প্রথম বৎসরে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের গতি-প্রকৃতিকে বুঝিবার সুবিধার জন্য যুদ্ধকালীন ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক।

ব্যাঙ্ক পতনের ফলে ১৯২২-২৩ সালে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে যে সঙ্কট দেখা দেয়, তাহার ফলে ব্যাঙ্কসমূহে আমানতের পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং দশ বৎসরের কমে এই সঙ্কটের ধাক্কা সামলাইয়া উঠা সম্ভব হয় নাই। অত্যন্ত ধীরে ধীরে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসা এই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইতে থাকে এবং ১৯২১ সালে ব্যাঙ্কসমূহে আমানতের পরিমাণ যাহা ছিল ১৯৩৩ সালের পূর্ব্বে আর ঐ পরিমাণ আমানত ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহে হয় নাই। ১৯৩৩ সালের পর হইতে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অগ্রগতি দ্রুততর হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলি অর্থনৈতিক সঙ্কটের দ্বারা যে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল ১৯৪১ সাল পর্য্যন্তও তাহার ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। এস্থলে বোধ হয় ইহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, কৃষকদিগকে ঋণদানের জন্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলিই প্রধান প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনে একটা ভীতির সঞ্চার হয় এবং অনেকে ব্যাঙ্ক হইতে আমানতী টাকা তুলিয়া লইতে আরম্ভ করেন। এই অবস্থা অল্প দিন মাত্রই স্থায়ী হইয়াছিল। লোকের মনে বিশ্বাস ফিরিয়া আসায় ১৯৪০ সালের প্রথম হইতেই ব্যাঙ্ক-সমূহে আমানতের পরিমাণ আবার বাড়িতে আরম্ভ করে। কিন্তু ১৯৪০ সনের জুন মাসে ফ্রান্সের পতনের পর ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিবার আবার একটা হিড়িক পড়িয়া যায়। এই অবস্থাও অল্প দিন মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল এবং ১৯৪০ সনের নবেম্বর হইতে আবার আমানতের পরিমাণ বাড়িতে থাকে। আমরা উপরে যাহা উল্লেখ করিলাম তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিতে আমানতের হ্রাস-বৃদ্ধির নিম্নলিখিত হিসাবে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

১। তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহে আমানত

(কোটি টাকায়)

তারিখ	স্থায়ী আমানত	চলতি আমানত
১।৯।৩৯	১০২·২৪	৩৪·৩৬
১৫।১২।৩৯	৯৮·৮৬	১৩৯·১২
১৯৪০ সনের মে মাস	১১৩·০০	১৪৭·০০
জুন মাসের শেষে	১০৭·০০	১৪৪·০০
নভেম্বরের শেষে	১০০·০০	১৭৫·০০

১৯৪০ সালের নবেম্বর হইতে ব্যাঙ্ক সমূহে আমানতের পরিমাণ পুনরায় বর্দ্ধিত হওয়া আরম্ভ হইয়া জাপ আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। জাপান আক্রমণ আরম্ভ করায় অনেক আমানতকারী ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইয়াছিলেন। এই অবস্থা ১৯৪২ সালের মে মাস পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। অতঃপর আবার লোকের মনে দৃঢ়তা ফিরিয়া আসে, এমন কি ১৯৪২ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় জাপানী বিমান হানা দেওয়া সত্ত্বেও আমানতকারীরা আতঙ্কগ্রস্ত হন নাই। নিম্নলিখিত তালিকায় ১৯৪২ সনের প্রথম পাঁচ মাসে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহে আমানতের অবস্থা প্রদর্শিত হইল।

২। তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহে আমানত

(কোটি টাকার হিসাবে)

১৯৪২ সাল	স্থায়ী আমানত	চলতি আমানত
২রা জানুয়ারী	১০৭·০৫	২২০·০২
জানুয়ারী	১০৬·৭৮	২১৭·০২
ফেব্রুয়ারী	১০৩·৪৮	২১৮·৮৫
মার্চ্চ	৯০০·৩৮	২৩১·৭৮
এপ্রিল	৯৬·৫৮	২২৮·১১
মে	৯৪·৬৬	২৪১·০২

অতঃপর ১৯৪২ সালের জুন মাস হইতে স্থায়ী ও চলতি আমানতের বৃদ্ধি অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে এবং কার্য্যতঃ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই বৃদ্ধি অব্যাহত রহিয়াছে। ১৯৪২ সাল অপেক্ষা ১৯৪৩ সালে বৃদ্ধির গতি আরও দ্রুততর হয়। কিন্তু স্থায়ী আমানত বৃদ্ধির হারের তুলনায় ১৯৪৫ সালের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত অনেক কম ছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা বুঝিবার জন্য নিম্নে একটি তুলনামূলক তালিকা প্রদত্ত হইল। এই তালিকায় ১৯৪৫সনের ২৯শে জুন এবং উক্ত তারিখের এক বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯৪৪সালের ৩০শে জুন এবং যুদ্ধ আরম্ভ হইবার তিন দিন পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯৩৯সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিতে আমানতী টাকা, নগদ ও ব্যাঙ্কে জমা, মোট দাদন ও বিল ভাঙ্গান এবং নিয়োজিত অর্থের তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

(কোটি টাকায়)

	২৯শে জুন ১৯৪৫	৩০শে জুন ১৯৪৪	১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯
মোট আমানত	৮৬৮·৫৮	৭৪৭·৪৩	২৩৬·৬০
নগদ ও ব্যাঙ্কে জমা	১১৫·৭৩	১২৬·৭১	৩১·৮৭
দাদন ও বিল ভাঙ্গান	২৯৩·৩৬	২১৯·৯০	১০৫·০৯
অবশিষ্ট নিয়োজিত অর্থ	৪৫৯·৪৯	৪০০·৮২	৯৯·৬৪

উল্লিখিত হিসাব হইতে দেখা যায়, ১৯৪৪ সনের ৩০শে জুন আমানতী টাকার পরিমাণ যাহা ছিল এক বৎসর পরে ১৯৪৫ সনের ২৯শে জুন তাহা অপেক্ষা আমানতী টাকার পরিমাণ ১২১·১৫ কোটি টাকা বাড়িয়াছে এবং প্রাক্‌যুদ্ধ কালীন আমানত অপেক্ষা বাড়িয়াছে ৬৩১·৯৮ কোটি টাকা। নগদ তহবিল ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আমানতের

পরিমাণও যথেষ্ট বাড়িয়াছে। কিন্তু দাদন ও বিল ভাঙ্গানের পরিমাণের সহিত অবশিষ্ট নিয়োজিত অর্থের পরিমাণের পার্থক্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অবশিষ্ট নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ দাদন ও বিল ভাঙ্গানের পরিমাণ অপেক্ষা ৫'৪৫ কোটি টাকা কম ছিল। ১৯৪৪ সনের ৩০শে জুন দাদন ও বিল ভাঙ্গানের পরিমাণ বাড়িয়াছে ১১৪'৮১ কোটি টাকা, কিন্তু অবশিষ্ট নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ৩০১'১৮ কোটি টাকা বাড়িয়াছে। ১৯৪৪ সালের ৩০শে জুন তারিখে দাদন ও বিল ভাঙ্গানের পরিমাণ অপেক্ষা অবশিষ্ট নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ১৮০'১২ কোটি টাকা বেশী হইয়াছে। ১৯৪৪ সালের ৩০শে জুন তারিখের তুলনায় ১৯৪৫ সালের ২৯শে জুন মোট আমানতের পরিমাণ ১২১'১৫ কোটি টাকা বাড়িয়াছে, দাদন ও বিল ভাঙ্গানের পরিমাণ বাড়িয়াছে ৭৩'৪৬ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ৫৮'৬৭ কোটি টাকা বাড়িয়াছে। দাদন ও বিল ভাঙ্গানের পরিমাণ অপেক্ষা অবশিষ্ট নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ১৬৯ কোটি টাকা বেশী।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। যুদ্ধের সময় তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহে আমানতের পরিমাণ অভূতপূর্ব্বরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু চলতি আমানত মোট আমানতের তুলনায় যে হারে বাড়িয়াছে স্থায়ী আমানতের বৃদ্ধি তাহা অপেক্ষা অনেক কম হারে হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার তিন দিন পূর্ব্বে ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে মোট আমানতের শতকরা ৫৬'৭৯ ভাগ ছিল চলতি আমানত এবং স্থায়ী আমানতের ছিল শতকরা ৪৩'২১ ভাগ। ১৯৪৩ সালের ২৯শে ডিসেম্বর চলতি আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট আমানতের শতকরা ৭৫'২২ ভাগ এবং সেই স্থলে স্থায়ী আমানতের পরিমাণ হয় শতকরা ২৪'৭৮ ভাগ। অর্থাৎ মোট আমানতের মধ্যে চলতি আমানত খুব বেশী বাড়িয়াছে এবং স্থায়ী আমানত প্রাক্‌যুদ্ধকালীন অনুপাতের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে। অতঃপর মোট আমানতের মধ্যে স্থায়ী আমানতের হার কিছু কিছু বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে বটে, কিন্তু অনুপাতের হার এখনও প্রাক্‌যুদ্ধ যুগের স্তরে পৌঁছিতে পারে নাই। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, যুদ্ধের মধ্যে মোট আমানত বাড়িলেও দাদন ও বিল ভাঙ্গানর হার হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর দাদন ও বিল ভাঙ্গানর পরিমাণ ছিল মোট আমানতের শতকরা ৪৮'৪২ ভাগ। ১৯৪৪ সালের ২৯শে ডিসেম্বর ঐ অনুপাতের পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা ৩০'৪৩ ভাগ। অতঃপর দাদন ও বিল ভাঙ্গানীর পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিলেও অনুপাতের হার প্রাক্‌যুদ্ধ যুগের স্তরে পৌঁছিতে এখনও অনেক বাকী।

যুদ্ধের সময়ে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক এবং উহাদের শাখা অফিসের সংখ্যাবৃদ্ধিও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৫৫টি। ১৯৪৪ সালের ৩০শে জুন উহাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৬টি এবং মোট অফিসাদির সংখ্যা ২১৪১টিতে আসিয়া দাঁড়ায়। ১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরে ১০টি নূতন ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হওয়ায় তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৬টি এবং সমস্ত তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের হেড অফিস ও শাখা অফিস লইয়া মোট অফিসের সংখ্যা ২৭১৫টি হইয়াছে।

যুদ্ধকালীন ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পটভূমিকায় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আলোচ্য বার্ষিক বিবরণী হইতে ১৯৪৫ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের গতিপ্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই এক বৎসরে তপশীল ভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৮৬টি হইতে বাড়িয়া ৯৩টি হইয়াছে। চলতি আমানতের পরিমাণ ৭১'৪১ কোটি টাকা বাড়িয়া ৭০৮'৮৫ কোটি টাকা হইয়াছে এবং স্থায়ী আমানত ৭২'৩৫ কোটা টাকা বাড়িয়া হইয়াছে ৩১১'১৮ কোটি টাকা। নগদ তহবিলের পরিমাণ ১০'৫৬ কোটি টাকা বাড়িয়া ৪৭'৪৩ কোটি টাকা হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ২৪'৭১ কোটি টাকা, দাদনের পরিমাণ ৭৪'৭৫ কোটি টাকা বিল ভাঙ্গানের পরিমাণ ৬'২২ কোটি টাকা বাড়িয়াছে। এই মোটামুটি বিবরণ হইতে ভারতের যুদ্ধোত্তর ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে গতিপ্রকৃতিতে যে পরিবর্ত্তন সূচিত হওয়ার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বিশেষ ভাবেই প্রণিধানযোগ্য। প্রথমে আমানতের কথাই ধরা যাউক। ১৯৪৫ সালের ২৯শে জুন তারিখে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহে মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৮৬৮'৫৮ কোটি টাকা। যুদ্ধোত্তর এক বৎসরে উহার পরিমাণ বাড়িয়া ১৯৪৬ সালের ২৮শে জুন তারিখে হইয়াছে ১০২০'৩৩ কোটি টাকা। মোট বৃদ্ধির পরিমাণ ১৫২'৭৫ কোটি টাকা। পূর্ব্ব বৎসর এই বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১২১'১৫ কোটি টাকা। যুদ্ধের শেষ বৎসরের তুলনায় যুদ্ধোত্তর প্রথম বৎসরে এই আমানত বৃদ্ধি কি সূচনা করে তাহা বিবেচনা করা উপেক্ষার বিষয় নহে। যুদ্ধ শেষ হওয়া সত্ত্বেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চলতি নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। ১৯৪৫ সনের ২৯ শে জুন চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১৩৬'৯৭ কোটি টাকা, ১৯৪৬ সনের ২৮শে জুন উহার পরিমাণ বাড়িয়া ১২৩৭'৮৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। চলতি নোটের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যই ব্যাঙ্কে আমানত বৃদ্ধিও বাড়িয়া চলিয়াছে। তবে ব্যাঙ্কে আমানত বৃদ্ধির মধ্যে একটি শুভলক্ষণ এই যে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হইতে স্থায়ী আমানতের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৫ সনের মার্চ্চ মাস হইতেই অবশ্য চলতি আমানতের হার বৃদ্ধি অপেক্ষা স্থায়ী আমানতের হার বাড়িতে আরম্ভ করে। মোট আমানতির শতকরা কত ভাগ স্থায়ী আমানত এবং শতকরা কত ভাগ চলতি আমানত তাহার একটি তুলনামূলক তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

(কোটি টাকা)

	২৮শে জুন ১৯৪৬	২৯শে জুন ১৯৪৫	২৯শে ডিসেম্বর ১৯৪৪
মোট আমানত	১০২০'৩৩	৮৬৮'৫৮	৮১১'০১
চলতি আমানত	৭০৮'৮৫	৬২৯'৪৪	৬১৬'০৯
মোট আমানতের শতকরা অংশ	৬৯'৫১%	৭২'৪৭%	৭৫'২২%
স্থায়ী আমানত	৩১১'৪৮	২৩৯'১৩	২০২'৯২
মোট আমানতের শতকরা অংশ	৩০'৫১%	২৭'৫৩%	২৪'৭৮%

উল্লিখিত তালিকায় দেখা যায়, ১৯৪৪ সনের ২৯শে ডিসেম্বর স্থায়ী আমানতের পরিমাণ মোট আমানতের শতকরা ২৪'৭৮ ভাগ

মাত্র ছিল। এক বৎসর পূর্ব্বে উহা বাড়িয়া মোট আমানতের শতকরা ২৭·৫৩ ভাগ হয়। গত একবৎসরে স্থায়ী আমানতের পরিমাণ আরও বাড়িয়া গত ২৮শে জুন তারিখে মোট আমানতের শতকরা ৩০·৫১ ভাগ হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে লোকের মনে অবিশ্বাস সৃষ্টি হওয়া খুব সাধারণ ব্যাপার। এই জন্যই আমানতকারীরা যুদ্ধের সময়ে দীর্ঘদিনের মেয়াদে ব্যাঙ্কে টাকা না রাখিয়া চলতি হিসাবেই টাকা রাখা নিরাপদ মনে করেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ায় আবার লোকের মনে বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে। ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানতের পরিমাণও আবার বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু প্রাক্-যুদ্ধ যুগে মোট আমানতের শতকরা যত অংশ স্থায়ী আমানত ছিল যুদ্ধোত্তর যুগে স্থায়ী আমানতের হার এখনও সেই স্তরে পৌঁছে নাই।

দাদন ও বিল ভাঙ্গানীর পরিমাণ বৃদ্ধি যুদ্ধোত্তর প্রথম বৎসরে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন। ১৯৪৫ সনের প্রথম ভাগ হইতেই দাদনের পরিমাণ বাড়িতে আরম্ভ করে। ১৯৪৪ সালের ২২শে ডিসেম্বর দাদন ও বিল ভাঙ্গানীর পরিমাণ ছিল ২৪১·২১ কোটি টাকা। ১৯৪৫ সনের ৬ঠা জানুয়ারী তারিখে উহার পরিমাণ ২২৫ ১৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ২১শে জুন তারিখে উহার পরিমাণ ২৯৩·৩৬ কোটি টাকা হয়। ১৯৪৬ সনের ২৮শে জুন তারিখে দাদন ও বিল ভাঙ্গানীর মোট পরিমাণ ৩৭৪·৩৪ কোটি টাকা হইয়াছে। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রাক্‌যুদ্ধ যুগে মোট আমানতের শতকরা যত অংশ দাদন ও বিল ভাঙ্গানীতে নিয়োজিত হইত যুদ্ধোত্তর এক বৎসরে উহা মোট আমানতের শতকরা তত অংশ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই। মোট আমানতের শতকরা কত অংশ দাদন ও বিল ভাঙ্গানীতে নিয়োজিত হইয়াছে তাহার একটা তুলনা মূলক তালিকা এখানে দেওয়া গেল।

	মোট আমানত (কোটি টাকায়)	শতকরা কত অংশ দাদন ও বিল ভাঙ্গানীতে নিয়োজিত
২৮শে জুন ১৯৪৬	১০২০·৩৩	৩৬·৭%
২১শে জুন ১৯৪৫	৮৬৮·৫৮	৩৩·৭৭%
২৯শে ডিসেম্বর ১৯৪৪	৮১৯·০১	৩০·৪৩%
১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯	২৩৬·৬০	৪৪·৪২%

উল্লিখিত তালিকায় দেখা যায়, যুদ্ধের পূর্ব্বে মোট আমানতের শতকরা ৪৪·৪২ ভাগ দাদন ও বিল ভাঙ্গানীতে নিয়োজিত হইত। যুদ্ধোত্তর এক বৎসরে দাদনের পরিমাণ বাড়িলেও মোট আমানতের শতকরা ৩৬·৭ ভাগের বেশী হয় নাই। যুদ্ধের সময় যুদ্ধসংক্রান্ত কন্ট্রাক্টারদিগকে গবর্ণমেণ্টই অগ্রিম অর্থ জোগাইতেন এবং কাঁচা মাল ইত্যাদি যাহা কিনিতে হইত তাহাও ক্রয় করিয়া দিতেন গবর্ণমেণ্ট। কাজেই যুদ্ধের মধ্যে ব্যাঙ্কসমূহের নিকট ধার করিবার কোন প্রয়োজন হয় নাই। যুদ্ধের শেষে যুদ্ধজনিত কন্ট্রাক্ট আর নাই, গবর্ণমেণ্টও আর কাঁচা মাল ইত্যাদি ক্রয় করিতেছেন না। এই অবস্থায় ব্যাঙ্কসমূহের নিকট ধারের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইবে ইহা আশা করা খুবই স্বাভাবিক। যুদ্ধের জন্য অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানই নূতন কলকব্জা ইত্যাদি ক্রয় করিতে পারে নাই, পুরাতন যন্ত্রপাতির উপর চাপ বেশী পড়ায় সেগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। যুদ্ধের পরে এই সকল পুরাতন যন্ত্রপাতি বদলান, প্রয়োজনীয় নূতন যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় ইত্যাদি বাবদ ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে প্রচুর ধার করিবার প্রয়োজন হইবে বলিয়া যুদ্ধের সময়ই অনেকে মনে করিয়াছেন। ব্যাঙ্কসমূহে যেরূপ প্রচুর অর্থ সঞ্চিত রহিয়াছে তাহাতে ব্যাঙ্কগুলির পক্ষেও এইরূপ ধার দিতে আগ্রহও থাকা স্বাভাবিক। দাদন ও বিল ভাঙ্গানী প্রভৃতিই খাঁটি ব্যাঙ্ক ব্যবসা এবং ব্যাঙ্কসমূহ যে এই লাভজনক উপায়ে আমানতী টাকা নিয়োগ করিতে আগ্রহশীল হইবে, এইরূপ আশা করা মোটেই অসঙ্গত নহে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর প্রথম বৎসরে এই আশা পূরণ হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। দাদন ও বিল ভাঙ্গানীর পরিমাণ অবশ্য প্রাক্‌যুদ্ধ যুগের তুলনায় বাড়িয়াছে। কিন্তু মোট আমানতের দিক হইতে দেখিলে, প্রাক্‌যুদ্ধ যুগে মোট আমানতের শতকরা যত অংশ দাদন ও বিল ভাঙ্গানীতে নিয়োজিত হইত শতকরা তত অংশ পর্য্যন্ত এখনও উঠে নাই। ইহার কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। যুদ্ধের সময়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের তহবিলে এমন কতগুলি অর্থ আমানত হইয়াছে যেগুলি যুদ্ধের পর ভারত গবর্ণমেণ্টকে ফেরৎ দিতে হইবে। অতিরিক্ত আয়করের বাধ্যতামূলক ও স্বেচ্ছামূলক আমানতী অংশ, অতিরিক্ত আয়করের এণ্টিসিপেটারী আমানত, অতিরিক্ত আয়করের জন্য আমানত যাহা করদাতাকে ফেরৎ দিতে হইবে, অতিরিক্ত আয়কর আমানতের সুদ, করদাতার সুবিধার জন্য রক্ষিত কেন্দ্রীয় সারচার্জ্জের আমানতকৃত অংশ, দেশরক্ষা সঞ্চয়, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, ডিফেন্স সেভিং ব্যাঙ্ক আমানত প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য আমানত। উহার পরিমাণ বোধ হয় দেড় শত কোটি টাকার কম হইবে না। এই সকল টাকা এক সময়ে এবং এক সঙ্গে ফেরৎ দিতে হইবে না বটে, কিন্তু উহা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধার করিবার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস না করিয়া পারে না।

১৯৪৫ সনের ১লা জুলাই হইতে ১৯৪৬ সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরে মোট আমানত, নগদ ও ব্যাঙ্ক জমা, দাদন ও বিলভাঙ্গানী এবং অবশিষ্ট নিয়োজিত অর্থের তুলনামূলক হিসাব নিম্ন তালিকায় প্রদত্ত হইল।

(কোটি টাকায়)

	২৮শে জুন ১৯৪৬	২১শে জুন ১৯৪৫
মোট আমানত	১০২০·৩৩	৮৬৮·৫৮
নগদ ও ব্যাঙ্কে জমা	৯৫১·০৮	১১৫·৭৩
দাদন ও বিল ভাঙ্গানী	৩৭৪·৩৪	২৯৩·৩৬
অবশিষ্ট নিয়োজিত অর্থ	৪৯৪·৯১	৪৫৯·৪৯

উল্লিখিত হিসাবে দেখা যায়, যুদ্ধোত্তর এক বৎসরে নগদ ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ৩৫·৩৫ কোটি টাকা বাড়িয়াছে, দাদন ও বিল ভাঙ্গানীর পরিমাণ বাড়িয়াছে ৮০·৯৮ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট নিয়োজিত অর্থ (Surplus invested) ৩৫·৫০ কোটি বাড়িয়াছে। ১৯৪৫ সালের ২১শে জুন মোট আমানতের শতকরা ৩৩·৭৭ ভাগ ছিল দাদন ও বিল ভাঙ্গানীর পরিমাণ। ১৯৪৬ সালের ২৮শে জুন উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট আমানতের শতকরা ৩৬·৭ ভাগ। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

আইনের বিধান অনুসারে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে তাহাদের চলতি আমানতের শতকরা ৫৲ টাকা এবং স্থায়ী আমানতের শতকরা ২॥০ টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখিতে হয়। এই বিধান অনুযায়ী ১৯৪৬ সালের ২৮শে জুন মোট ৪৩, ২২, ১৭, ১০০৲ টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকিলেই চলিত। কিন্তু তৎস্থলে ৬০'৪২ কোটি টাকা অধিক গচ্ছিত রাখা হইয়াছে!

আলোচ্য বৎসরের তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহের শাখা-আফিসের সংখ্যাও যথেষ্ট বাড়িয়াছে। ১৯৪৫ সনের ৩০শে জুন তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের মোট সংখ্যা ছিল ৮৬টি এবং হেড অফিস, শাখা অফিস ও পে-অফিস সহ মোট অফিসের সংখ্যা ছিল ২৭১৫টি একবৎসর পরে ১৯৪৬ সালের ২৮শে জুন তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৯৩টি এবং হেড অফিস সহ শাখা-অফিস ও পে-অফিসের সংখ্যা ৩১০৬টি হইয়াছে। তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের অথবা মূলধন ও মজুত তহবিল ৫০ হাজার টাকার উপর এরূপ কোন তালিকা-বহির্ভূত ব্যাঙ্কের শাখা ছিল না, এইরূপ ১৩টি স্থানে তপশীল ভুক্ত ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপিত হইয়াছে। নিম্নে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক এবং তাহাদের শাখা-অফিসাদির একটা তুলনা মূলক হিসাব দেওয়া গেল।

	তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা	তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক-সমূহের অফিসের সংখ্যা
৩০শে জুন ১৯৪৩	৬৪	১৬০৭
৩০শে জুন ১৯৪৪	৭৬	২১৪১
২৯শে জুন ১৯৪৫	৮৬	২৭১৫
২৮শে জুন ১৯৪৬	৯৩	৩১০৬

তালিকা-বহির্ভূত (Non-scheduled) যে সকল ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট নিয়মিত ভাবে রিপোর্ট দাখিল করিয়া থাকেন এক বৎসরে তাহাদের উন্নতিও মন্দ হয় নাই। এইরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১৯৪৪ সনের ১লা জানুয়ারী ছিল ৫৩০টি। বৎসরের শেষে সংখ্যা দাঁড়ায় ৬১৩টি। ১৯৪৫ সালের শেষ সংখ্যা বাড়িয়া ৬৩১টি হইয়াছে। ১৯৪৪ সালের শেষে ৬১৩টি তালিকা-বহির্ভূত ব্যাঙ্কে মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৫৩'১৩ কোটি টাকা এবং ১৯৪৫ সালের শেষে ৬৩১টি তালিকা-বহির্ভূত ব্যাঙ্কে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৭'৩১ কোটি টাকা।

যুদ্ধকাল হইতে ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহ শক্তিশালী হইয়াই বাহির হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর এক বৎসরে ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমূহের আরও যে উন্নতি হইয়াছে উল্লিখিত আলোচনা হইতে তাহাও আমরা বুঝিতে পারি। অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ব্যাঙ্কসমূহ হইতে অনেক টাকা উঠাইয়া লওয়া হইবে এবং ফলে আমানতের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। এই আশঙ্কা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। যুদ্ধোত্তর এক বৎসরে ব্যাঙ্কসমূহের আমানতের পরিমাণ বরং বাড়িয়াছে এবং আরও একটা ভাল লক্ষণ এই যে স্থায়ী আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। চলতি আমানতের টাকা ব্যাঙ্ক সমূহ তেমন লাভজনক উপায়ে নিয়োজিত করিতে পারে না। এই দিক হইতে স্থায়ী আমানতের বৃদ্ধি ব্যাঙ্ক সমূহের শক্তি বৃদ্ধির সহায় হইবে। ব্যাঙ্ক সমূহের আমানতের মধ্যে কতক দেশবাসীর আয় বৃদ্ধি, তাঁহাদের সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখার অভ্যাস প্রতিফলিত হইয়েছে। গবর্ণমেণ্টে সস্তা টাকার নীতির জন্যই আমানতকারীরা সঞ্চিত অর্থ স্থায়ী আমানত রাখিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যুদ্ধোত্তর প্রথম বৎসরে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের মধ্যে ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনের যে স্রোতোধারা এবং অন্তঃস্রোত ধারার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা সত্যই আশাপ্রদ।

তৃষিত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বিদগ্ধ মরু—দিগ্বলয়েতে বিস্তৃত বালুকণা
শ্রান্ত পথিক! ওয়েসিস্ সেথা আছে
কূপ হোতে তোলে পিপাসার জল বেদুইন সুন্দরী
জানু পেতে ভূমে মেগে লও তার কাছে,

সুষমা-জড়িত ও দু'টি নয়ন ভীরু কপোতীর সম
আনত বয়ানে বোরখা গিয়েছে সরে—'
অঞ্জলিপুট আবদ্ধ করি মিটাও তোমার তৃষা
আকণ্ঠ তৃষা—মিটাও দু'চোখ ভ'রে, ।

অবনত সেই ভরা পাত্রের শীতল পানীয়-ধারা
হাল্কা কোমল কালো কাজলের ছায়া।
আঁখি-তারকার নীলিমায় বুঝি আসমানী ইঙ্গিত
মহাসাগরের অতলান্তিক মায়া;

ফিরে চলে যাও আবার যেখানে শুষ্ক বালুর স্তর
জমাট বেঁধেছে মরীচিকা-ভরা পথে,
পত্রবীথির শ্যামল স্বপ্নে ধূ ধূ চিতাগ্নি জ্বলে—
তবু চলে যাওয়া—পথ চলা কোন মতে।

অজস্র রোদে মরণ-যজ্ঞে অগ্নিকুণ্ড জ্বলে
অযুত শক্তি বিদ্যুৎ সমাবেশ
শিরায় শিরায় পাথর হোয়েছে লাল রক্তের স্রোত
উষ্ণ ধারার স্পন্দন হোলো শেষ

তোমার দু'চোখে নেমেছে এখন মৃত্যুর আবছায়া
অতি দূরে চাওয়া তব পিপাসার বারি
দগ্ধ মরুর বালুকার তলে মরণ-স্বপ্ন জাগে
সুশীতল জল—আর বেদুইন নারী।



"দাও ফিরে সে অরণ্য—"

শিল্পী—গোপাল ঘোষ

দুর্য্যোগ যাত্রী

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তখন, তখন ওরা কোথা ছিল পরিচয়হীন
দুর্য্যোগ আসন্ন দেখি ওরা ত ছাড়েনি গৃহদ্বার
আহ্বানে দেয়নি সাড়া—দূর হ'তে করেছে বিদ্রূপ,
উন্মত্ত বলিয়া তারে উপেক্ষায় করি' পরিহাস
ওরা ত বিজ্ঞের মত এত দিন ছিল দূরে দূরে।
দুর্য্যোগ কাটিয়া গেছে আলোকে পুলক জাগিয়াছে
আজিকে নিকটে আসি তাই ওরা সেজেছে আত্মীয়।
কোথা সে শ্রাবণ-রাত্রি ? কোথায় নিরন্ধ্র অন্ধকার ?
পথের সঙ্কট নাই, দূর আজ হয়েছে নিকট
নৃশংস দস্যুর মনে জাগিয়াছে সম্প্রীতি কামনা।
তাই আজ দলে দলে ওরা আজ জানায় হৃদ্যতা
আপন জনেরা দূরে দাঁড়াইয়া দেখে প্রহসন।

ওরা ত জানে না কত দুঃখ ছিল সে দূর যাত্রায়
কত ব্যথা বাজিয়াছে পুষ্প সম কোমল হৃদয়ে
কোন সে যাতনা তারে করেছিল এমনি পাগল
আপনার বক্ষ পাতি কেন সে সয়েছে অস্ত্রাঘাত—
ওরা ত জানে না তার ললাটের সে রক্ত-তিলকে
অঙ্কিত হইয়া আছে সহীদের সহস্র সংগ্রাম।
তাই শুধু ভাবি মনে—এ উৎসবে উহারা কাহারা
কার আমন্ত্রণে আজি উৎসবের এ সভা উজ্জ্বল ?

ওদের চিনি না আমি,
এ উৎসবে নবাগত ওরা।
ওরা ত জানে না কোথা কোন দিন-কাল বৈশাখাতে
যাত্রা হয়েছিল সুরু দুর্গম বন্ধুর পথ বাহি'।
অবলুপ্ত দিবালোকে, বিষণ্ণ প্রদোষ-অন্ধকারে
কোলাহল জেগেছিল—উন্মত্ত অশান্ত কোলাহল
নিষ্ঠুর দস্যুর দলে ; অতর্কিতে নির্ম্মম আঘাত
সে দিন প্রশস্ত বক্ষে রেখে গেল শোণিতের লেখা
সঙ্কটে বিহ্বল যাত্রী হঠাৎ থামিয়া গেল পথে
সে পথের দুই ধারে বন হ'তে বনান্ত অবধি
ওরা কি শোনেনি সেই অস্ফুট কাতর আর্ত্তস্বর ?

ওরা ত আসেনি কাছে, দূর হ'তে দেয়নিক' সাড়া
বিলম্বিত প্রতীক্ষায় বুঝিয়াছি নিষ্ফল কামনা
তখন কোথায় ওরা ? নিশ্চিন্ত আরাম-কুঞ্জ-মাঝে
ওরা বুঝি বেঁধেছিল ছায়া-সুপ্ত সুখময় নীড় ;
বিশ্রব্ধ আলাপে মগ্ন কূজনে গুঞ্জনে আত্মহারা
ওরা ত শোনেনি কানে সে রাত্রির ব্যর্থ হাহাকার।
যে রাত্রির অন্ধকার কালো হোল জমাট পাথরে
সে রাত্রির দীর্ঘশ্বাস উড়ে গেল ঝড়ের পাখায়
দিগন্তে প্রান্তর-পথে, কাহারো ত পায়নি সন্ধান।
তার পর শ্রাবণের মধ্য রাত্রে ঘনাল দুর্য্যোগ
কেবল ঝড়ের শব্দে মাঝে মাঝে ত্রস্ত লোকালয়
যখন বৃষ্টির ধারা নেমে এল প্রচণ্ড প্রতাপে
বিদীর্ণ মেঘের বুকে ত্বরান্বিত আগ্নেয় বিদ্যুৎ,
পথহারা পথিকের চোখে দিয়ে আশার অঞ্জন
সে অঞ্জনও মুছে দেয় কালো মেঘে রাত্রি ভয়ঙ্করী ;
বেদনা-বিহ্বল মনে তখনও সে চলে অবিরাম
নির্জ্জন নিঃসঙ্গ পথ নিঃশঙ্ক সে চঞ্চল পথিক,—
ডাক দিয়ে বলে যায়—আহ্বান এসেছে দেবতার
যেতে হ'বে বহু দূরে—আঁধারের বক্ষ বিদারিয়া
দৃষ্টির প্রত্যন্ত দেশে আলোকের হ'বে আবির্ভাব।



ছোটদের আসর

মণ্টু আর তার আট বছরের ক্ষুদে গিন্নি রাণু সেদিন তাদের খেলাঘরে বসে খুব গল্প করছে। ওদের শোবার ঘরে যেখানে মস্ত বড় জোড়া খাট পাতা, তারই কোণের দিক্‌টাতে মেঝের উপর তাদের রংবেরংএর খেলনা-পুতুল সাজানো। পুতুলের কাপড়, জামা, আয়না, চেয়ার, টেবিল, খাট—সে যে কত ঐশ্বর্য্য তা না দেখলে কেমন করে বুঝবে? তবে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আন্দাজ করতে পারবে এই জন্য যে, তোমাদেরও কারুর না কারুর এই ঐশ্বর্য্যের কিছুটা আছে।

মণ্টু রাণুকে বললে: জানিস্ দিদি! কালকে রাতে যখন আমি খেতে বসে মোটেই খেতে পারছিলাম না, তুই কেবলই জিজ্ঞাসা করছিলি কেন খেতে পারছি না—কি হয়েছিল জানিস্ না তো?

রাণু ব্যগ্র হয়ে বললে: কি হয়েছিল রে মণ্টু? তুই তো বললি, আমার খিদে নেই ঘুম পাচ্ছে, ফুটবল খেলে পা ব্যথা করছে—এমনি কত কি।

রাণুর কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে খুব আস্তে আস্তে মণ্টু বললে: তুই যদি জানতিস্ দিদি—ইস্, বলবো কি আমার জিভে জল আসছে।

চোখ বড় বড় করে রাণু জিজ্ঞাসা করলে: জিভে জল আসছে? কেন বল তো? আচার চুরি করে খেয়েছিলি? কখন করলি? কই আমি তো কিছু জানি না, ছাদের ঘরের শিকল খুলে দিলে কে তোকে?

মণ্টু দিদির পাশে আর একটু ঘেঁষে বসলো, বললে: না, না ও-সব নয়, সে আমি বলতে পারছি না—বুঝলি? এই বলে মণ্টু জিভ দিয়ে মুখে শব্দ করলে।

রাণু ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো—এবার সে সত্যি রেগেছে: কি বলবি বল না, মুখ চোখাচ্ছিস্ কেন? মাকে ডাকবো? মা···ও্‌মে—মা—মণ্টু···।

রাণুর মুখে হাত চাপা দিয়ে মণ্টু বললে: চুপ, চুপ, শীগ্‌গির চুপ কর ভাই দিদি, নাহলে কিছু বলবো না তা বলে দিচ্ছি।

রাণু মণ্টুর হাতটা সরিয়ে দিয়ে রাগে গরগরিয়ে উঠলো: বলবি তো বল না, অত ঘোরাচ্ছিস কেন? এখ্‌খুনি মাকে ডাকবো বলে দিচ্ছি।

—তুই বড় রেগে যাস্, শোন না বলছি, কিছু বুঝিস্ না কেবল রাগ করিস্।

—না বললে বুঝবো কি করে? কেবল বলছিস্ জিভে জল···

—আচ্ছা, আচ্ছা শোন, মাকে বলিসনি যেন—ঐ আমাদের সঙ্গে যে খেলা করে, ঐ যে কে মোহন, কাল সেই মোহনদের বাড়ী খেলতে গিয়েছিলাম। যখন ফিরছি তখন ওর মা ওকে ভিতরে ডেকে নিয়ে যেতে এসে আমায় বল্লে—তোমার নাম মণ্টু না? মোহনের কাছে তোমার গল্প খুব শুনেছি—এসো এসো বাড়ীর ভেতর। আমি তো কিছুতেই যাব না আর ওর মা-ও শুনবে না। শেষে অনেক বলতে তার পর গেলাম—কি জন্য ডাকছিল জানিস্?

—কি কোরে জানবো বল—কেন ডাকছিল? আচার খেতে?

জোর দিয়ে মণ্টু বলে উঠলো: আরে না, না, না—খাবার—খাবার।

রাণু ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো: তা কি বলবি বল না, খাবার তা হয়েছে কি?

মণ্টু বললে: তোকে বলবার আগেই তো চটে যাচ্ছিস—সে কি রকমী খাবার রে ভাই, অত নামও জানি না, তোর জন্য এত মন-কেমন করছিল।

থাক থাক খুব হয়েছে, মন-কেমন করছিল, পরের বাড়ী পেট পুরে খেতে লজ্জা হলো না, আহ্লাদ দেখে বাঁচি না। তা কাল বলিসনি কেন?

বা রে এসেই তো পড়তে বসে গেলুম, তোর সঙ্গে দেখা হলো সেই খাবার সময়, মার সামনে বলে বকুনী খাই আর কি!

—তাই আজ বলতে এসেছিস দিদি তোর জন্য মন কেমন করছিল। পরের বাড়ী খুব করে খেয়ে—

বাধা দিয়ে রাণুর একটা হাত ধরে মণ্টু বললো: দিদি, তুই সত্যি করে বল তুই পেলে ছাড়তিস্? ওর মা নাকি ঘরে তৈরী করেছিল, কত জিনিস, আমি নামও জানি না।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রাণু বললে: থাক আর শুনতে চাই না, বেশী হ্যাংলামী করলে মাকে বলে দেবো কিন্তু।

মণ্টু এবার বিনয়ে নত হয়ে পড়লো: এই দিদি, না ভাই লক্ষ্মীটি তোকে নগদ চার পয়সার আলুকাবলী খাওয়াবো, আমি টিফিন না খেয়ে জমিয়ে রেখেছি—সত্যি বলছি।

এমন সময় বাইরে থেকে হরি চাকরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল: মণ্টু দাদাবাবু, দিদিমণি, মাষ্টার মশাই এসেছেন।

রাণুর মেজাজ তখন ভারী খারাপ হয়ে গেছে, বিরক্ত হয়ে বললে: মণ্টু, মাষ্টার মশাইকে বলে দে, আমি পড়বো না আজ, মাথা ধরেছে।

—আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি, কিন্তু দিদি তুই মাকে বলিসনি ভাই, আলুকাবলীর কথা মনে রাখিস্। তুই যদি রাজী থাকিস একটা আইসক্রিম আর দু'পয়সার ফুচকাও খাওয়াতে পারি। মনে রাখিস ভাই—।

এইবার মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—মণ্টু, রাণু—শুনছো না, মাষ্টার মশাই এসেছেন।

মণ্টু চীৎকার করে জবাব দিল : যাই—ই মা। এই দিদি! মনে থাকে যেন—আলুকাবলী, ফুচকা।

মণ্টু পড়তে চলে গেল, আর রাণু গাল ফুলিয়ে বসে ভাবতে লাগলো : উঃ, মণ্টুটা কি পাজী, বললে কি না অত খাবার খেয়ে এসেছে, আবার নামও জানে না। আচ্ছা সত্যি কথা তো? তা মিথ্যাই বা হবে কেন? মোহনের মা খাইয়েছে, কিন্তু কি দুষ্টু ছেলে, কাল কিন্তু বলেনি—না বলুক গে আমার কি? ইস্ আবার চার পয়সার আলুকাবলীর লোভ দেখান হচ্ছে, দরকার হলে একটা আইসক্রিম আর দু'পয়সার ফুচকা। এক রাশ ভালো খাবার খেয়ে এসে তেঁতুলগোলা জলের লোভ দেখানো। উঃ, মনে হলে আমার মাথা ঝিমঝিম করছে।

রাণুর মেজাজটা সত্যি খারাপ হয়ে গেল। পুতুল খেলনাগুলো সরিয়ে রাণু খাটের পায়াতে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে ভাবতে লাগলো!

রাণু ভাবছে···। ভাবনার পোকাগুলো মাথায় কিলবিল করে উঠে বলছে, ইস্ অত খাবার!

দূর থেকে মণ্টুর পড়ার আওয়াজ আসছে।···বাংলা দেশে আটাশটি জেলা,···তন্মধ্যে···জেলাটি বড়।···নবদ্বীপের পর হইতে ভাগীরথীর অপর নাম হুগলী···।

—এই রাণু, নাও আমায় তুলে নাও, কি ভাবছো?

রাণু চমকে বললে : ওমা এ কি, পুতুল কথা বলছে?

পুতুল তখনও বলছে : দেখছ কি আমি আর সেলুলয়েডের পুতুল নেই, আগাগোড়া ক্ষীরের পুতুল হয়ে গেছি, নাও দেখো, পছন্দ হচ্ছে না? একটা কামড় দাও, খু—উ—ব মিষ্টি লাগবে।

সত্যি তো, ক্ষীরেরই হয়েছে, চোখগুলো তো সব বাদাম-পেস্তার, কেমন করে হোল? খেলনাগুলো কোথায় গেল—কিছু হয়নি তো?

—এই তো আমরা, একেবারে আগাগোড়া সন্দেশের তৈরী হয়ে গেছি। খেলা করে আর কি হবে, নাও, নাও চেখে নাও একটু।

এবার আর এক জন এগিয়ে এলো, হলদে মুখ বাড়িয়ে বললে : আমায় চেনো? আমার নাম জিলিপী সুন্দরী। আমার মত সুন্দর রঙ তোমাদের স্কুলের একটা মেয়েরও আছে?

—আর আমি কম কিসে? সেদিনের মেয়ের কথা শোনো, তোর রঙ তো হলদে ক্যাটকেটে, সরু সরু হাত-পা। চেহারা দেখ আমার, নামে কাজে এক। বুঝলে রাণু, এমন আর দেখনি তুমি—আমার নাম হচ্ছে রাজভোগ! ঐ, ঐ দেখ, আমার ছোট ভাই রসগোল্লা আসছে। তোমার ছোট মুখে যদি আমায় না ধরে ওকে নিতে পারো, এ জাতই আলাদা।

রাণুর মুখ দিয়ে আর কথা সরে না। এ সব এরা কি আরম্ভ করেছে? মণ্টুটাই বা এ সময় কোথায় গেল? আর···।

—কী রাণু, চুপ করে আছ যে? এতক্ষণ ওদের যা দেখছিলে সবই এক রঙ, আমার দিকে চেয়ে দেখো, আমি হচ্ছি তিন রঙা সন্দেশ, আমার নাম 'জয় হিন্দ'। আমাকে কি তোমার সবচেয়ে পছন্দ হচ্ছে না?

—নিজেকে সুন্দর বলে একেবারে পতাকা ওড়াচ্ছ? নিজের কথা এত জোর করে বলা যায়? আচ্ছা রাণু, তুমি বল তো আমার মত কেউ আছে? আমার পরতে পরতে সৌন্দর্য্য, আমায় দেখে লোকে বলে ফুল ফুটেছে। আমার নাম 'খাজা সুন্দরী'।

—কিন্তু রাণু, তুমি ভাই ওদের উপর দেখেই বিচার করবে? আমার দিকে চাও, ভিতর বার সবই সুন্দর। আমার নাম 'রসপুরিয়া'। সেবার কৃষ্ণনগর থেকে আমার ভাইকে যখন তোমার বাবা এনেছিলেন, তাকে নিয়ে মণ্টুর সঙ্গে তুমি কি রকম মারামারি করেছিলে মনে আছে? আজ আমি নিজেই এসেছি। দাঁত দিয়ে কেটে দেখো আমার ভিতরেও কত জিনিষ।

রাণু এবার হতভম্ব হয়ে গেছে। এরা একযোগে আরম্ভ করেছে কি? এত খাবার! জীবনে সে নামও শোনেনি। কাল কেবল মণ্টু বলছিল অ—নে—ক খাবার সে মোহনদের বাড়ী খেয়ে এসেছে।

রাণুর চিন্তায় বাধা দিয়ে অপেক্ষাকৃত মোটা গলায় কে বললে : ওঃ বুঝেছি, ওদের কাউকে তোমার পছন্দ হয়নি, যা সাদা ভ্যাদভেদে, যেন রক্তহীনতায় ভুগছে। হ্যাঁ, চেহারা বলতে হয় তো আমার। দেখো কেমন মোটা মোটা, একটু বেঁটে—এই যা; এমন ঘোর রঙ একটা খাবারেরও আছে? আবার গা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রস ঝরছে। আমাকেই তোমার পছন্দ হয়েছে বুঝেছি। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা দোকানে এসেই গামলার দিকে আঙুল দেখিয়ে আমাকেই চায়। পানতুয়া মহারাজকে না পেলে কোনো বাড়ীর কাজ ঠিক মত হয় না।

রাণু দেখলো পানতুয়া মহারাজ তো তার দিকে এগিয়ে আসছে। রাণু দু'পা পেছিয়ে যেতেই পায়ের কাছে কিসে আঘাত পেলো। ভালো করে চেয়ে দেখে এক থালা হাঁসের ডিম।

—আর হাঁসের ডিমগুলো আবার এখানে কে আনলে? বিরক্ত হয়ে রাণু বলে উঠলো।

থালার ডিমগুলো একসঙ্গে জোরে হেসে উঠলো। রাণু চমকে গেল দেখে ডিমগুলো খিল-খিল করে হাসছে। এ আবার কী?

একটা ডিম এগিয়ে এসে বললে : তুমি ভেবেছ আমরা হাঁসের ডিম? আমরা হচ্ছি হাঁসের ডিম-সন্দেশ, গায়ে হাত দাও—কেমন নরম দেখো, ইচ্ছা করলে ভিতরটা দেখতে পাবো সিদ্ধ হাঁসের ডিমের মতই, কিন্তু মুখে দিয়ে দেখো কোথাও মিল নেই, একেবারে আলাদা—কাউকেই তো তুমি নিলে না, নাও না আমাদের এক জনকে, খুব ভালো লাগবে।

—আহা-হা রাণু, ওকে না, ওকে না—আমার গায়ে হাত দাও



শ্রীইন্দিরা দেবী

ঝিম রাতে

অমল ঘোষ

জনপ্রাণীর নেইকো সাড়া ঘুমায় পাড়া রাত দুপুর
ঝিম্ ঝিমিয়ে বাজছে শুধু ঝিঁঝির পায়ের ঝিম্-নূপুর !
কি যেন ভয় নিঃসাড়ে রয় ছম্ ছমিয়ে উঠছে গা, -
হিম-বাতাসে একলা ভাসে মেঘ-সাগরে চাঁদের না' ।
স্বপ্ন-ঘুমায় সবাই ঘুমায় আমার চোখেই নেইকো ঘুম
মাথার মাঝে বাদ্যি বাজে চিন্তা-ঢুলীর টাঢুম্ ঢুম্ ।

টাঢুম টাঢুম ঢুম ।
আয় নেমে আয় ঘুম আয় রে ,
নীল স্বপনেতে বোনা
কত ছবি কত সোনা
মনের গোপনে চম্কায় রে ।

মায়াপুরীর রাজকন্যে পান-টুক্-টুক্ মুখে
স্বপ্ন-ঝাঁপির খুলছে ডালা একান্ত কৌতুকে
বেরিয়ে আসে দত্যিছানা আজব কোটাবাড়ী
আস্ত সহর নৌকাবহর রঙ্ বেরঙের গাড়ী
বেরিয়ে আসে রাজার ছেলে পক্ষিরাজের পিঠে
তেপান্তরের মাঠখানা আর বাঁশীর আওয়াজ মিঠে ।
রামধনু রঙ্ রক্তচরণ ঘুমন্ত রাজবালা
গলায় দোলে মেঘের কোলে শ্বেত-বলাকার মালা ।

বেরিয়ে আসে চিত্র কত মনের মত রূপ ধরে
ঘুমিয়ে সারা হচ্ছে যারা দেখছে শুধু চুপ কোরে ।
আমার চোখে নেইকো ঘুম্
চিন্তা-ঢুলীর টাঢুম্ টাঢুম্
স্বপ্ন আমার নিংড়ে ওকি—
তোমার চোখে লাগলো ঘুম



কি রকম ঠাণ্ডা দেখবে। মণ্টু তোমায় আইস্ক্রিম খাওয়াবে বলেছে না ?

রাণু রেগে গেছে এইবার—তা তুমি কি আইসক্রিম না কি ? বোকা পেয়েছ আমায় ?

এক-মুখ হেসে সে বললে : কাছাকাছি, আমি হচ্ছি আইসক্রিম সন্দেশ, বুঝলে ?

রাণু মুখ ভেংচে বললে : আইস্ক্রিম সন্দেশ ! যাও যাও, তোমরা আমায় জালিও না। মণ্টু যে কোথায় গেল এই সময় থাকলে এদের সব দুষ্টুমী ভেঙ্গে দিতো ।

—কিছু যদি না জানো চুপ করে থাক, দোকানে কি আছে না আছে তা যদি জানতে চাও, বাবার সঙ্গে এক দিন সব খাবারের দোকান ঘুরে এসো। তবে তোমার মত সুবিধে কেউ পায় না, তোমার ঘরে আমরা নিজেরাই এসেছি—একসঙ্গে এক ঝাঁক কথা বলে উঠলো দরবেশ !

—মা গো, এ আবার কে ? ওর গায়ে বুটি বুটি কেন ? নিশ্চয় বসন্ত হয়েছে। হলদে লাল মিশোনো—এ আবার কি চেহারা ?

—কি ভাবছো ? আমায়ও পছন্দ হলো না ? তুমি তো আচ্ছা মেয়ে, ভাবো বুঝি খুব সুন্দরী ?

দরবেশকে সরিয়ে দিয়ে নতুন গলায় কে বলে উঠলো : তাই-ই ভাবে নিশ্চয়। বলি, সুন্দরী তো না হয় খুব হলে, কিন্তু পৃথিবীতে কি কেউ আর সুন্দর থাকবে না ? তবে কি জানো, এ পর্যন্ত তোমার কাছে যারা এলো তারা সবাই কেবল চেহারার বড়াই করলো। কিন্তু আমার যে শুধু চেহারাই ভালো তাই নয়, আর একটা কাজও পাবে, আমি হচ্ছি অমৃতি-জিলিপী—খেতে ইচ্ছা হলে খেতেও পারো আবার ধারণ করে হাতেও পড়তে পারো—বুঝলে ?

অমৃতি-জিলিপীর মস্ত বক্তৃতা শুনে এবার রাণু তার সাহস হারিয়ে ফেলেছে। কাঁদ-কাঁদ হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে ভীত-গলায় ডাকলো—মণ্টু। ও ম ন-টু, শীগ্গির আয়।

—মণ্টু তো এখন পড়ছে। পরের খাবারে আর হিংসা করবে ? লোভ করবে ? অপরকে বঞ্চিত করে কোনো কিছু নেওয়ার কথা আর ভাববে ?

—না, না, না—বলছি তো।

—অন্যের যা কিছু ভালো হবে তা দেখে খুসী হবে। নিজের ছোট হাত দু'খানায় দিয়ে যতটুকু পারা যায় অন্যের সেবা সাহায্য করবে, বঞ্চিতকে তার প্রাপ্য দেবার চেষ্টা সব সময় মনে রাখবে। শুধু মণ্টু নয়—দেশের সব ছেলেমেয়ে তোমার ভাই-বোন—এদের কথা কখনও ভুলবে না বলো—

—দিদি অ—দিদি ! খাবে এসো, পড়া হয়ে গেছে, মণ্টুর চীৎকারে রাণু চোখ মেলে দেখে কোলের কাছে সেলুলয়েডের পুতুলটা তেমনি পড়ে আছে, খেলনাগুলো ছড়ানো।



যুদ্ধের একপৃষ্ঠা

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

১

নবাগত রেজিমেন্টাল্ ডাক্তার ক্যাঃ সুহাস চ্যাটার্জীকে দেখে সি, ও, কর্ণেল স্মিথ, যে সন্তুষ্ট হ'তে পারেনি, সেটা তাঁর চোখে-মুখেই স্পষ্ট ফুটে উঠ্‌লো। এর আগের যে ডাক্তারটি ছিল, তাকেও কর্ণেলের বিশেষ পছন্দ হয়নি বলেই এ, ডি, এম, এস্‌কে বলেছিল : একজন ভাল আর, এম, ও দেওয়ার জন্য।

এ, ডি, এম্, এস্ আগের ডাক্তারটিকে বদলী করে ক্যাঃ চ্যাটার্জীকে এই ইউনিটে পোষ্টিং করে পাঠিয়েছে, চ্যাটার্জীর দিকে চেয়ে কর্ণেলের মনে এলো : এর চাইতে বুঝি আগের ডাক্তার ক্যাঃ সুন্দরম্‌ই ভাল ছিল। কিন্তু বার বার এ নিয়ে এ, ডি, এম, এস্‌কে বিরক্ত করা যায় না।

লম্বায় ক্যাঃ চ্যাটার্জী পাঁচ ফুটের বেশী হবে না।

সাধারণ দোহারা চেহারা। বেঁটে-খাটো অনেকটা মেয়েলী ধরণের। গায়ের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। নাকটা একটু চ্যাপ্‌টা! চোখ দুটো গোল গোল : চোখের চাউনী ভাসা-ভাসা। সর্বদাই বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে। মনে হয় সর্বদাই বুঝি অন্যমনস্ক!

কিছু বললেই ফিক্ করে একটু খানি হাসে।

কর্ণেল লোকটি স্কটল্যাণ্ড দেশীয়। দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় ফুটের উপর। পেশল বলিষ্ঠ চেহারা; দেহের প্রতিটি মাংসপেশী সজাগ ও কঠিন। ভয় বলে কোন বস্তু তার প্রাণে নেই। দীর্ঘ আঠার বছর ভারতীয় সৈনিক বিভাগে সে কাজ করছে।

সুহাস যখন ইউনিটে এসে জয়েন করলো; ইউনিট হতে মাত্র মাইল-খানেক দূরে মরুভূমির মধ্যে তখন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলেছে। অগ্রগামী জার্মাণ সৈন্য, দুর্দ্ধর্ষ সেনানায়ক জেনারেল রোমেলের নেতৃত্বাধীনে ব্রিটিশ বাহিনীকে নানা ভাবে পর্যুদস্ত করছে, প্রত্যহ এ পক্ষের অসংখ্য সৈন্য জার্মাণ সৈন্যর হাতে প্রাণ দিচ্ছে।

ছোট সহরটার অধিবাসীরা অনেক দিন আগেই সহর হ'তে এ্যাভাকুয়েট্ করে চলে গেছে। প্রত্যহ দিনে ও রাত্রে পাঁচ-সাত বার করে জার্মাণ লাইন হতে বোমারু বিমান এসে এদের ওপর নির্দয় ভাবে বোমা বর্ষণ করে যাচ্ছে। সহরের ঘর-বাড়ী ভেঙে-চুরে তচ্-নচ্ হয়ে যাচ্ছে। সহরের এক পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে চলেছে! নদীর কিনারে সহরটি ছিল ছবির মতই সাজান। অবিশ্রান্ত বোমা বর্ষণের ফলে এখন হয়ে উঠেছে বীভৎস।

একটা পুরাতন একতলা বাড়ীতে ইউনিটের আড্ডা।

আগামী কাল এই ইউনিটের একটা প্লেটুন ফ্রন্ট্ লাইনে যুদ্ধে যাবে; তারই কন্‌ফারেন্স বসেছে আজ গভীর রাত্রে।

ছোট একটা কাঠের টেবিলের চার পাশে অফিসাররা বসে। টেবিলের মাঝখানে; জ্বলছে একটা মোমবাতী।

সকলের মুখেই একটা গভীর দুশ্চিন্তার ছায়া। মোমবাতীর আলোয় উপবিষ্ট অফিসারদের দীর্ঘ ছায়াগুলি ঘরের দেওয়ালে ছড়িয়ে পড়েছে যেন ভৌতিক বিভীষিকায়।

সুহাসও কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত।

'রোমেলের দুর্দ্ধর্ষ ২৫ ডিভিসনের বাহিনী এখান হতে প্রায় এক মাইল দূরে খর্জুর-বিথীর ধারে যে নালাটা আছে সেইখানে এসে জড়ো হয়েছে। একটু আগে সিগ্‌ন্যালে সেই সংবাদ এসেছে ব্রিগেড্ হেড্-কোয়াটারে। ব্রিগেডিয়ার 'ম্যাসেজ্' পাঠিয়েছে ৩৬ ব্রিগেডির ফ্রন্ট্ইয়ার ফোর্স ও গুর্খা রেজিমেন্টের দুটো প্লেটুন্ ও উলস্‌রের একটা প্লেটুন কাল ওদের ওপর তিন দিক হ'তে আক্রমণ চালাবে। যেমন করেই হোক ওদের ঐ নালার ধার হ'তে হটিয়ে দিতে হবে। না হলে 'ষ্ট্রেটেজির' দিক দিয়ে আমাদের সমূহ বিপদ। আমি মেজর বোনস্, ক্যাঃ লাল এ্যাড্‌ভান্স পার্টীতে একটা কম্পানী নিয়ে যাবো। রিয়ার পার্টীতে লেঃ চালর্স ও ক্যাঃ মনসুর খান যাবে। কর্ণেল ধীরে ধীরে কথাগুলো বললে। তার পর সুহাসের দিকে ফিরে কর্ণেল বললে : ডক্ ইউ মাষ্ট বি রেডি অল্ দি টাইম্।...মে আই হোপ, ইফ্ ওন্ট সাটন্ ব্যাক্ ইফ্ ন্যাচ্যরল উই নিড্ ইওর হেল্প্?...

সহসা কর্ণেলের কথায় সুহাসের সুন্দর মুখখানা যেন লাল হয়ে উঠে। কিন্তু সে কোন জবাব দেয় না।

ভারতীয় অফিসার বিশেষ করে বাঙালীদের ওপরে কর্ণেলের একটা অহৈতুক অবজ্ঞা আছে, সেটা সুহাস এখানে আসবার পরের

দিনই ব্রেক্‌ফাষ্ট টেবিলে বসে টের পেয়েছিল কর্ণেলের হাবে-ভাবে ও দু'-চারটে টনটিং রিমার্কসে। ওর আগের ডাক্তার ক্যাঃ সুন্দরম্ না কি ভয়ের চোটে কোন সময়ই তার এম্, আই রুম্ ছেড়ে বের হ'তো না। বোমারু বিমান বা বম্বিংয়ের শব্দ শুনলেই ট্রেঞ্চে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকত। শুধু তাই নয়, কর্ণেলের ধারণা, ভারতীয়রা অত্যন্ত ভীতু! বিশেষ ক'রে মাদ্রাজী ও বাঙালী অফিসারেরা। তার এ ধরণের মনোবিকারের কি যে সত্যিকারের কারণ থাকতে পারে তা অবিশ্যি সুহাস জানে না এবং জানবার চেষ্টাও করেনি কোন দিন। সুহাস চিরদিনই একটু নীরব প্রকৃতির, কথা যেমন সে বেশী বলে না, তেমনি অন্যের কথা শুনতেও সে এতটুকু ভালবাসে না। নিজের কাজের সময়টুকু ছাড়া তার নানা রকম বই পড়েই কেটে যায়।

২

পরের দিন।

সন্ধ্যার অন্ধকার একটু একটু করে ঘনিয়ে আসছে মরু-প্রান্তরে। শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া উন্মুক্ত মরুপ্রান্তর হ'তে গায়ে এসে যেন ছুঁচের মতই বিঁধছে।

সারাটা দিন ধরে সুহাস একটু ফুরসুৎও পায়নি; এক জনের পর একজন জখমী ফ্রন্ট্ লাইন থেকে আসছেই।

কারো মাথা ফাটা, কারো পা ভেঙেছে; কারো বুকের মধ্য দিয়ে গেছে গুলী চলে, বীভৎস রক্তাক্ত দৃশ্য!...

জখমীদের ফার্ষ্ট এইড্ দিয়ে এ্যাম্বুলেন্স কারে করে সুহাস পিছনের C. C. S.এ চালান দিচ্ছে।

এমন সময় ফ্রন্ট্ লাইন হ'তে সংবাদ এলো: কর্ণেল স্মিথ্ গুরুতর রূপে আহত। এখুনি তার ফার্ষ্ট এইডের প্রয়োজন। সুহাসকে যেতে হবে।

সুহাস এক জনের পায়ে পটি বাঁধছিল, সেটা শেষ করে উঠে দাঁড়াল। সংগে যাবে ষ্ট্রেচার নিয়ে দেলোয়ার সিং ও হামিদ খান্। সুহাস কোমরের ঝুলন রিভলভারটা বের করে দেখে নিল: ছয়টা গুলীই ঠিক আছে, লোডেড্।

সন্ধ্যার অন্ধকার ভুতুড়ে ছায়ার মত যেন মরুভূমিকে গ্রাস করেছে। দূর আকাশের পশ্চিম প্রান্তে মাঝে মাঝে দূরের ফ্রন্ট্ লাইনের উৎক্ষিপ্ত শেলের অগ্নির আভাস! মরু-প্রান্তরের নিঃস্তব্ধতা ভংগ করে মাঝে মাঝে আর্টিলারীর আওয়াজ চারি দিককার মহাশূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে! মাথার ষ্টীল হেলমেট্টা চাপিয়ে ও পিঠে আবশ্যকীয় ঔষধপত্রে ভরা ছোট 'হাভার স্যাক্'টা ঝুলিয়ে তিন জনেম অগ্রসর হলো।

প্রপেলারের গোঁ গোঁ গর্জন জাগিয়ে জার্মান্ বমার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। অন্ধকার আকাশে একরাশ তারা; যেন মহাশূন্যের অসংখ্য পলকহারা দৃষ্টি! মরুভূমিতে জলের ব্যবস্থার জন্য ছোট একটা নালা মত—হাঁটু পর্য্যন্ত জল।

নালাটা গিয়ে নদীর সঙ্গে মিশেছে।

ঐ নালা ধরেই অগ্রসর হ'তে হবে।

ডান দিক্ হ'তে গুলী আসছে, সোঁ সোঁ করে।

নীচু হ'য়ে হাঁটু দুমড়ে কোন মতে তিন জনে জলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

প্রচণ্ড শীতে হাড়ের মধ্যে পর্য্যন্ত কাঁপ্‌নী জাগায়!

আগে চলেছে দেলোয়ার সিং, মধ্যখানে সুহাস, পশ্চাতে হামিদ খান্, হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকার ক'রে অগ্রবর্তী দেলোয়ার লুটিয়ে পড়ে। অন্ধকারে কিছু দেখবারও উপায় নেই!

জায়গাটায় জল একেবারেই নেই, শুক্‌নো খট্‌খটে বালী।

সহসা রকেটের আলোয় আকাশটা লাল হ'য়ে উঠে মুহূর্তের জন্য। সেই ক্ষণিক আলোতেই যে দৃশ্য সুহাসের চোখে পড়ে, সেটা বীভৎস!

দেলোয়ারের বুকে গুলী লেগেছে: লাল রক্তে সেখানকার বালী রাঙা হয়ে উঠেছে: ক্ষতস্থান দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত বের হচ্ছে। টুক্‌টুকে লাল তাজা রক্ত!



মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক গুলী সাঁ সাঁ করে চলে গেল।

সুহাস দেলোয়ারের পালস্ দেখলে, নেই, হার্ট-বিট্ও থেমে গেছে।

দাঁড়ালে চলবে না ; ফ্রন্ট্ লাইনে কর্ণেল আহত।

সুহাস হামিদ্ খানের দিকে ফিরে চেয়ে বললে : চল্।

'হাম্ উধার নেই যায়গা ডাকটার সাব্।

কথা বলবারও সময় নেই : কিউ ?

'নেহি সাব্ ! এইসা জান্ নেহি দেংগে হাম্ !

'হামারা হুকুম্। জানেহি পড়েগা।

'নেহি সাব।

খট্ করে অন্ধকারে সুহাস লোডেড্ পিস্তলটা টেনে বের করে। কঠিন স্বরে বলে : চলো ! নেহি ত তোমরা জান্ লেলুংগা পিস্তলসে !

পাঠান হামিদ কি যেন ভাবতে লাগলো, কোন জবাব দিল না।

পাঠান হোকর সরম্ নেই লাগ্তা হায় তুমকো ! আও, হামারা সাথ্ সাথ্ আও। ম্যায় আগাড়ী চলতা হুঁ !

শক্ত করে পিস্তলটা চেপে ধরে সুহাস এগিয়ে চলে, পাঠান হামিদ খান্ পিছু পিছু চলে একপা দু'পা করে।

* * *

ডক্, ইউ হ্যাভ্ কাম্ ?

'ইয়েস্ স্যার !

কর্ণেলের কোমরে ও ডান উরুতে গুলী লেগেছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

একটুখানি ব্রাণ্ডি খাইয়ে দিয়ে, চট্পট ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে সুহাস কর্ণেলকে ষ্ট্রেচারের ওপরে শুইয়ে দিল। সামনেই একটা শেল্ বিস্ফোরণের কর্ণবিদারী শব্দ হলো। চারি দিকে অসংখ্য মৃতদেহ।

ধোঁয়া বারুদের গন্ধ ! নাক জ্বালা করে।

৩

অন্ধকারে কোন মতে ষ্ট্রেচারে বহন করে কর্ণেলকে নিয়ে ওরা যখন ইউনিটে এসে পৌঁছাল, ইউনিটের বাড়ীটার দরজাটা তখন বন্ধ।

ওদিকে দুর্দ্ধর্ষ জার্মাণ বাহিনী আরো এগিয়ে এসেছে। প্রচণ্ড গুলী-গোলা চলেছে।

মাঝে মাঝে এক একটা দূরপাল্লা গুলী বাড়ীটার দেয়ালে এসে ঠক্ ঠক্ করে লাগছে।

সুহাস দরজার গায়ে ধাক্কা দেয়।

ভিতর হতে রাইফেলধারী প্রহরী শুনেও শোনে না। সুহাস দরজার গায়ে ধাক্কা দিতে সুরু করে।

'কোন্ হায় ?

'ডক্টর সাব ! জলদি কেয়ারী খোল ! দুষমন্ আগিয়া !…

'পাস্ ওয়ার্ড।

সর্বনাশ ! যাওয়ার আগে তাড়াতাড়িতে সুহাস ঐ দিনকার পাস্ ওয়ার্ডটা জেনে নিতে ভুলে গেছিল।

সুহাস চিৎকার করে বলে : কর্ণেল সাব হামারা সাথ হ্যায়, দরোয়াজা খোলো !…বকোয়াস্ মাৎ করো ! খোলো দরোয়াজা !…

প্রায় পনের মিনিট ঠেলাঠেলি চেঁচামেঁচির পর কোন মতে ওরা প্রবেশাধিকার পায় এক জন অফিসার এসে আইডেণ্টিফাই করবার পর। ইউনিটে তখন সকলেরই মুখ গম্ভীর।

জার্মাণ বাহিনী দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসছে। ইতিমধ্যে ২।৪ বার বাড়ীটার আশে-পাশে বমিং করে গেছে।

কোন মতে এখন পালাতে পারলেই সবাই বাঁচে। তারই জোর কনফারেন্স বসেছে নীচের কক্ষে।

সুহাস উপরের তলায় গিয়ে কর্ণেলকে এনে তার ক্যাম্প খাটে শুইয়ে দিল এবং কম্বলে ঢেকে দিল ওর সর্ব্বাংগ।

ডু ইউ লাইক্ টু হ্যাভ সাম্ কফি স্যার !

'ইয়েস্ প্লিজ !…

সুহাস নিজেই এম আই রুম থেকে একটা টিনের মগে করে কফি এনে দিল। তার পর একটা 'মর্ফিয়া' ও 'এ্যান্টি টিটেনাস্' ইনজেকশন দিয়ে বললে, নাউ ট্রাই টু স্লিপ স্যার !…আই মাষ্ট এ্যাটেণ্ড দি আদার্স।

* * *

রাত্রি তখন অনেক !

সুহাস ক্লান্ত হয়ে এম্ আই রুমের মধ্যেই একটা প্যানিচারের গায়ে হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছিল।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সঙ্গে ওর তন্দ্রাটা ভেংগে গেল।

একটা বীভৎস গোলমাল চিৎকার !…

সৈন্যদের ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি বাইরে পালাবার জন্য।

প্রথমটা ঘটনার আকস্মিকতায় সুহাস চম্কে উঠেছিল, পরক্ষণেই ও উঠে বসে।

বাড়ীটার ওপরে ডাইরেকট্ হিট্ হয়েছে : আগুন ধরে গেছে বাড়ীটায়। দাউ-দাউ করে অগ্নির লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ছে চারি দিকে।

সুহাসও পাগলের মত দরজা দিয়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করলে ; হঠাৎ একটা করুণ চিৎকার ওর কানে এল। কে যেন প্রাণভয়ে চেঁচাচ্ছে save ! save !…আগুনের শিখায় চারি দিক লাল হ'য়ে উঠেছে।

সুহাস থমকে দাঁড়ায়। বিশ্রী ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসে।

মনে পড়ল উপরের ঘরে অসহায় কর্ণেল, একা পড়ে আছে। এ তারই চিৎকার। উন্ডেড্ নড়বারও শক্তি নেই। উপরে উঠবার সিঁড়িটাতেও আগুনের স্পর্শ লেগেছে এতক্ষণে।

ক্যাঃ স্কুট্ পাশ দিয়ে ছুটে পালাচ্ছিল, সুহাসকে দেখে বললে : কি করছো এখানে ডক্ ! হারি আপ ! মরবে না কি ! দেখছো না চারি দিকে আগুন ধরে গেছে !

'কর্ণেল উপরে আছে।

'লেট্ দি রাসকেল ডাই !…ক্যাঃ স্কুট্ ছুটে চলে গেল।

ইউনিটের কোন অফিসারই কর্ণেলকে দেখতে পারত না।

তখনও কর্ণেল চিৎকার করছে, সেভ্ মি! সেভ মি!

সুহাস ছুটলো প্রজ্বলিত সিঁড়ি বেয়ে উপরের তলায়। বিশ্রী ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে গেছে। দম বন্ধ হয়ে আসে! প্রচণ্ড আগুনের তাপে গা যেন ঝলসে যায়। সুহাস দু'হাতে কর্ণেলকে পিঠের পরে তুলে নিল। কোন মতে প্রজ্বলিত আগুনের মধ্য দিয়ে ছুটে ও বাইরে বেরিয়ে এল।

ওর জামা-কাপড়ে তখন আগুন ধরে গেছে।

সামনেই একটা এ্যাম্বুলেন্সে জখমীদের তখন তোলা হয়েছে, তাতেই ও কর্ণেলকে তুলে দিল। এবং তুলে দেবার পরই অজ্ঞান হয়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়ল। দু'টো নার্সিং সেপাই ডাক্তার সাহেবকে ও-ভাবে লুটিয়ে পড়তে দেখে ছুটে এল। তখনও তার পোষাকের আগুন নেভেনি! দু'-এক জায়গায় জ্বলছে।

আহত কর্ণেল ও সেই সংগে জ্ঞানহীন সুহাসকে অদূরবর্ত্তী ময়দানী হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো, কিন্তু সুহাসকে বাঁচান গেল না।

সেকেণ্ডারী-শকেই সে মারা গেল শেষ রাত্রের দিকে। গায়ে তার এমন একটু জায়গা ছিল না, আগুনে পোড়েনি!

পরের দিন সকাল!

সিষ্টার কর্ণেলকে ঔষধ খাওয়াতে এল।

'হাউ ইজ্ মাই ডক্ ক্যাঃ চ্যাটার্জী!···

সিষ্টার মৃদু ভাবে মাথা নাড়লে। ডায়েড্ দিস্ মরণিং!

সংবাদটা শুনে কর্ণেল যেন সহসা পাথর হয়ে গেল। চোখের পাতা দুটোতে জল এসে গেল: ব্রেভ্ বেংগলী! সিষ্টার, হি সেভড্ মাই লাইফ্, এট্ দি কষ্ট্ অফ্ হিজ ওন!···আমি তাকে চিনতে পারিনি!···আমি তাকে চিনতে পারিনি! হি ইজ এ হিরো! হি ডায়েড্ লাইক এ হিরো!···

* * * *

মাস-খানেক পরের কথা।

কর্ণেল এখনও হাসপাতালে: হঠাৎ সংবাদ শোনা গেল: সাধারণ বীরত্ব ও সাহসের জন্ম মৃত ক্যাঃ সুহাস চ্যাটার্জীকে ইংলণ্ডের রাজা ভিক্টোরিয়া ক্রস্ দিলেন। কর্ণেলের চোখের পাতা দুটো জলে ভরে উঠে। মৃদুকণ্ঠে সে বলে: চ্যাটার্জী এস্‌কিউস্ মি!··· এক্সকিউজ মি!···ব্রেভ্ বেংগলী!···ব্রেভ্ ইন্‌ডিয়ান্!···আমি তোমাকে—তোমাদের ভারতীয়দের চিন্‌তে পারিনি!···টেক্ মাই স্যালুট!···

আগামী সংখ্যায়

লিখছেন

হিরণ্ময় ঘোষাল

সুনির্ম্মল বসু

বিশু মুখোপাধ্যায়

খুকু আর ছোড়দি

শ্রীধীরেন বল

খেলাঘরের বাক্স খুলে' নতুন পাওয়া পুতুলটিকে
ছোট্ট খুকু পরায় সাড়ী—ভ্রূক্ষেপ নেই অন্য দিকে।
ও বাড়ীর ওই টেঁপির ছেলে নটবরের সঙ্গে হবে
খুকুর মেয়ে মায়ার বিয়ে,—ব্যাপারটা কি ভাবোই তবে!



ছোড়্‌দি এসে বললে—"খুকু, হেথায় তোমার হচ্ছে কি এ?
তিনটে লাছি ডি-এম-সি লাল আনতে যে হয় দৌড়ে গিয়ে।
এদিকে সব দেখ্‌ছি আমি, তুই ছুটে' যা তাড়াতাড়ি,
হাল ফ্যাশানে মেয়েকে তোর দেখ্‌না কেমন পরাই সাড়ী!"
সুতো নিয়ে ফিরলো খুকু, অবাক হ'য়ে দেখ্‌লো চেয়ে—
দিদির হাতে সেজে-গুজে দেখাচ্ছে বাঃ বেশ তো মেয়ে!



সেদিন খুকু মেয়ের জামা সেলাই নিয়ে ব্যস্ত ভারী,
সময় ত নেই—আজ বিকেলেই যাচ্ছে মেয়ে শ্বশুরবাড়ী!

ছোড়্‌দি বলে—"এই চিঠিটা দৌড়ে দিয়ে আয় তো ডাকে,
জামাটা দে'—আমিই বসে' সেলাই করি এই না ফাঁকে।"
ফিরে' এসেই অবাক খুকু—এ-জামা ঠিক আস্ত কেনা,
একেবারে নতুন কাটিং—তৈরী বলে' যায় না চেনা!



আরেক দিনে হোথায় খুকু রান্না নিয়ে ব্যস্ত দেখি—
মেয়ে-জামাই ফির্‌ছে যে তার, তাই তো কাজে ফুর্ত্তি সে কী!
ছোড়্‌দি এসে বল্‌লে তারে—"লক্ষ্মী খুকু, দৌড়ে যা'না—
পাশের বাড়ীর বেলাদি'কে আয় ত দিয়ে এ বইখানা।
খুকুর যতো রান্নার ভার ছোড়্‌দি নিলে আপন হাতে,
খুকু জানে কাজগুলি তার পরিপাটি হবেই তাতে।

ছোড়্‌দি করে নিখুঁত যেমন—খুকুর কি আর সাধ্যি আছে?
সব কিছু কাজ চট্‌পট্‌ আর ফিট্‌ফাট্‌, হয় দিদির কাছে!

ফিরে এসে দেখ্‌লো খুকু—কাদার ঝোলে, মাটীর ভাতে,
চর্চ্চড়ী আর শুক্ত, ভাজায় সব কিছু শেষ নিপুণ হাতে!

পূজোর ছুটী—সহর থেকে এবার বাড়ী ছোড়্‌দা এলো,
খুকুর খেলাঘরটি তাতেই হলো কেমন এলোমেলো।
দুইটি বেলা এখন তাকে পড়্‌তে যে হয় দাদার ঘরে,
ফুরসুৎ তার মেলেই না আর বইয়ের পড়া তৈরী করে'।

সকাল থেকেই আবদ্ধ সে—পড়া যে আজ হয়নি মোটে,
বাইরে বারেক পায়নি যেতে, তাই না খুকু হাঁপিয়ে ওঠে।
ছোড়্‌দিকে সে হঠাৎ দেখে ইসারাতেই ডাক্‌লে পাশে,
সব কিছু কাজ হয় যে সহজ ছোড়্‌দি যদি এগিয়ে আসে।



শুধোয় খুকু ছোট্ট করে'—"ছোড়্‌দি, কিছু কাজ কি আছে?
বাজার, দোকান, ডাকবাক্সে—নয় তো বেলাদিদির কাছে?
বলো না ভাই, য'চ্ছি ছুটে—দিচ্ছি করে' কাজ যা থাকে,
পড়াটা মোর তৈরী করে' দাও দিদিভাই, এই না ফাঁকে!"

শেয়াল বনাম ভালুক



অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বনের মধ্যে এক যে শেয়াল ছিল সুচতুর,
লাল ভালুকের আবির্ভাবে চালাকি ফতুর।
বৃদ্ধ গাধা ছাগল ডেকে তাই সভা চলে:
লাল ভালুকের প্রতাপ বনে দমাবে কি ছলে!
খবর পেয়ে শত্রু তাদের গুড়ি মেরে এসে—
দাঁড়িয়ে উঠে থুতু ছিটোয় থাবা তোলে শেষে।

দাপটখানা দেখে সবাই হলো হতভম্ব,
বুদ্ধি কোথা শেয়াল রাজার? যতো বাজে দম্ভ!
বাঘ সিংহ হাতী হরিণ যার চাপে মাৎ,
তাকেই লাল ভালুক বুঝি করে কুপোকাৎ!



শুধু তিন কম

মনোজিৎ বসু

বোসেদের ছোট ছেলে ভ'লটি
বই নিয়ে ইস্কুলে ছুটছে,—
মনে নেই পায়ে চটি পরতে
পথ-মাঝে তাই কাঁটা ফুটছে।

মিছি মিছি দেরি হ'লো হায় রে
কাঁটা নিয়ে সেই কাঁটা তুলতে,—
যেতে যেতে দেখে চেয়ে উচ্চে
লিচু-গাছে কাকে যেন ঝুলতে।

'আরে আরে এ যে দেখি লাড্‌ডু
দে না ভাই পাকা লিচু কয়টা,
অত বড় গাছে তুই উঠ্‌লি'
প্রাণে বুঝি নেই তোর ভয়টা ?'

খেতে খেতে শোনা গেল বাজ্‌ছে
ইস্কুলে ঢং ঢং ঘণ্টা,
ছুটে যায় লিচু ফেলে ভ'লটি
টিপ্‌ টিপ্‌ করে তার মনটা।

পরীক্ষা শুরু হ'লো কাল্‌কে
দিতে হবে সময়েতে হাজিরা,—
কেউ কথা কইবে না কাউকে
ইস্কুলে আছে যত পাজিরা !

ছুটে যেতে লেগে তার ধাক্কা
কুমোরের হাঁড়ি কত ফাট্‌লো,
নেই তাতে দৃক্‌পাত ভ'লটির
পায়ে তার কাচ লেগে কাট্‌লো।

ঘেমে চুমে ইস্কুলে পৌঁছে
দেখে সতু, হারু, বিশু, পট্‌লা—
প্রশ্নে কি আসবে কি এসেছে
তাই নিয়ে করে তারা জট্‌লা।

অবশেষে হরিহর নন্দী
ক্লাসে এসে অঙ্ক যা ধরলো,
মুখে মুখে দিতে গিয়ে উত্তর
অনেকেই হাঁড়ি-মুখ করলো।

শুধু বলে চট্‌পট্‌ ভ'লটি
মুখে তার বিজয়ের গর্ব্ব
'ভাবখানা—'জিতে গেছি নির্ঘাৎ
সকলের মান হ'লো খর্ব্ব!'

তার পর, ব'সে সব বাড়িতে—
ভ'লটি সে ফেরে ঠিক বিকেলে,
বাবা তার বলে—'কও বাপু হে
অঙ্কেতে তুমি আজ কি পেলে ?'

শুনে কয় ভ'লটি যে হাসিয়া
'মেজদার চেয়ে তিন মাত্র
কম পাই নম্বর আমি যে
ভেব'নাকো ঠকিবার পাত্র !'

'মেজদা সে কত পেলে' বল না
আগ্রহে কাটে মোর দিনটি'—
মৃদু হেসে ভ'লটি সে বল্‌লো
'দাদা পায় নম্বর তিনটি।'



মোহমুক্তি

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অতি-রঞ্জিত করে সাজিয়ে বলার মত এমন কিছু নয়। তবু, ওরি মধ্যে শেষের দিকে একটু নতুনত্বের ছোঁয়াচ্ আছে বৈ কি! নইলে ব্যাপার অতি সাধারণ—যা হামেশাই ঘটে থাকে দাম্পত্যজীবনে। কি একটা তুচ্ছ কথা নিয়ে তর্ক, তার পর গরম-গরম জবাব আর পাল্টা জবাব। পাছে অপ্রীতিকর কিছু হয়, এই ভেবে আশু তর্কের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বলে—"সুযোগ পেয়ে দু'-চার কথা বেশ শুনিয়ে দিলে যা হোক!"

দীপ্তি ফোঁস করে ওঠে—"কি এমন বলেছি! আর তুমি যে খুব শান্ত হয়ে এত কথা শোনালে—অন্য মেয়ে হলে…"

"দেখিয়ে দিত একবার! তুমিও না হয় দেখিয়ে দাও

গ্রীবা বাঁকিয়ে দীপ্তি বললে—"তোমার কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। আমার আর ইচ্ছে হয় না…"

"যে তোমার সঙ্গে ঘর করি—"

"তাই বলেছি আমি?"

"উহ্য ছিল—পাদপূরণ করে দিলুম। কিন্তু রাগ হয় কেন, শুনি? আমার কথায় না তেড়ে ঝগড়া করা যাচ্ছে না বলে?"

"জানি না—"

"তা জানবে কেন? রান্নার কথা কোনো দিনই আর তুলব না"



"ও কথা বলছ কেন? এ বাড়ী এসে অবধি আমায় রাঁধতে হয় না তাই, নইলে আমি কি…?"

"থাক্ ও-সব কথা। গরীবের ঘরেই না হয় পড়েছ। কিন্তু তাই বলে হাঁড়ি-বেড়ি ঠেলার জন্যে তো তোমায় আনিনি!"

"তোমরা কি ভাবো বল দিকি আমাদের! আজ-কালকার মেয়েরা কি কিছুই জানে না, সাইড্ ডিশ তৈরী করা ছাড়া! যে পড়ে, সে কি রাঁধে না?"

"হয় তো রাঁধে, কিন্তু চুল বাঁধে না। যদি বাঁধে, তো রাত এগারোটায়। যখন ক্লান্ত প্রতীক্ষায় স্বামীর চোখ জড়িয়ে আসে। তবে একটা জিনিষ মেয়েরা পরিপাটি রাঁধতে জানে, সেটা মানতেই হবে—"

দীপ্তি একটু নরম হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কী?"

"আমাদের মুড়ি-ঘণ্ট।"

"তোমার ভাষার ছিরি বাড়ছে দিন দিন। কিন্তু তুমিও কি কোনো দিন আমায় রাঁধতে অনুরোধ করেছ? কখনো বলেছ সখ্ করে 'এইটে তৈরি করো?' ওই জন্যেই তো কিছুতে আর হাত দিই না…"

"বেশ, কালই করো। পরশু তো আমায় বেরুতে হবে। যাবার আগে খেয়ে যাবো তোমার হাতে-তৈরি মাংসের কচুরি, পটলের দোর্মা, ক্ষীরপুলী, চিঁড়ের পোলাও…আর তো মনে পড়ে না।"

দীপ্তি হেসে ফেলে, বলে—"একসঙ্গে এতো অর্ডার?"

"হুঃ—সব খাবো। আর যদি রান্না ভালো হয়, কি নেবে তুমি?"

"কি আবার নেব?"

"বাঃ—তা কি হয়?"

নিকটে সরে এসে দীপ্তিকে একটু কাছে টেনে নিয়ে আশু বলে—"আচ্ছা, এমন একটা জিনিষ দেবো, যা কখনো তুমি ভাবতে পারো নি, পারবে না—"

ঘনিষ্ঠ হয়ে দীপ্তি জিজ্ঞাসা করলে—"বলো না গো কি?"

"বলব কেন এখন? তবে এটুকু শুনে রাখো যে এমন জিনিষ পাঠাবো তোমায়—যা তোমার বহু দিনের আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নও বলতে পারো—"

"বাব্বাঃ, এতো ঘুরিয়েও কথা বলতে পারো…"

"যা তোমার ভাগ্যে কোনো দিন হল না বলে একটা বড় রকমের ক্ষোভ রয়ে গেছে। যেদিন সে জিনিষ তোমার হাতে এসে পৌঁছুবে—সেদিন তুমি কি করবে, তাই ভেবে মন এখনই আমার ভ'রে উঠছে।"

আশুর কাঁধে মাথা রেখে দীপ্তি আবেশ-জড়িত কণ্ঠে বললে—"কবি মানুষ তুমি—তোমার হেঁয়ালি ধরি কি করে ?"

সুরভিত কেশে ওষ্ঠ স্পর্শ করে আশু বললে—"কিন্তু তোমার মনের নাগাল পাওয়াও তো সোজা নয়—দীপ্ !"

"কেন—আমিও কি হেঁয়ালি ?"

"হ্যাঁ—সেই জন্যেই তো তোমায় এতো আদর করতে ইচ্ছে করে !"

"তাই না কি—?"

লঘু পায়ে, রোমাঞ্চ দেহ নিয়ে দীপ্তি ঘর থেকে পালায়।

পরের দিন ছুটির বারে ভূরিভোজের পালা। আশুকে নানা আহার্য্য তৈরি করে খাইয়ে-দাইয়ে দীপ্তি আন্তরিক খুসি হল, বললে—"আমারও কি সখ হয় না ? তুমি খালি ইয়ার্কি করো আর কথা এড়িয়ে যাও। আজ বুঝলুম, তুমি মাংস এত ভালোবাসো—আচ্ছা, কোন্ মাংস বেশি পছন্দ কর ?"

"দেখো—টেবিল ছাড়া সব চতুষ্পদই খাওয়া যায় আর ঘুঁড়ি ছাড়া যে কোনও আকাশচারী প্রাণীই আমার কাছে সুখাদ্য। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, তুমি যে রকম সুন্দর করে আমায় খাওয়াচ্ছিলে, পরিবেশন করছিলে, দীপ—যে মনে হচ্ছিল যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।"

"বেশ তো—এবারে শিব ঠাকুরের বর দেবার পালা আসুক।"

"আসবে নিশ্চয়ই—ঠিক্ সময়ে।"

কি একটা কাজে আশুকে কলকাতার বাইরে যেতে হ'ল দু-তিন দিনের জন্য। তাই ভোরে উঠে দীপ্তি সমস্ত আয়োজন করলে নিখুঁত ভাবে। বিদায়-ক্ষণের অন্তরঙ্গতায় আশু খালি একটা বিমর্ষ হাসি টেনে বললে—"তোমায় দেখে মনে হচ্ছে—দীপ্—যেন তুমি ভয়ানক অচেনা, অনেক দূরের মানুষ। 'সত্যি কি তুমি সাঁঝে সিন্দুর পরো ?' যাক্ গে, ও-সব কাব্যের কথা। তবে মনে মনে তোমার এই ছবিটাই এঁকে নিয়ে যাচ্ছি। যদ্দিন না ফিরি, মাঝে-মাঝে একটু স্মরণ করো, বুঝলে ?"

দীপ্তি মাথা নীচু করে হঠাৎ প্রণাম করে বসল। এই তার আশুকে প্রথম প্রণাম। আগে, বিজয়ার দিনেও কখনো সে পায়ের ধুলো নেয়নি। মনে হত অনাবশ্যক লৌকিকতা।

সন্ধ্যা। রাস্তায় আলো জ্বালা হয়েছে। যাই-যাই করে দীপ্তি তখনো বাথ-রুমে যায়নি। সদ্য-ভাঁজ-করা তোয়ালে, ধবধবে শাড়ী আর ব্লাউজ পড়ে আছে বিছানার ওপরে। দীপ্তি জানে—কোন্ বিশেষ জামা-কাপড় এমনিতর ঈষৎ ম্লান ও নিরাভ সন্ধ্যার সঙ্গে মানায়। কিন্তু তার চেয়ে বোধ করি বেশিই জানে আশু। পায়ের প্রান্তে লুটিয়ে-পড়া আঁচলের কোণটা নিয়ে দীপ্তির দীঘল, মোলায়েম আঙুলগুলো খেলা করছে। হঠাৎ যেন দেখতে পেল—আশুর স্মিত, মুগ্ধ, অপলক দৃষ্টি। সেই নিবিড় স্বচ্ছ চোখে কতো প্রশংসমান চাউনি। সেই অশরীরী স্পর্শ আর অদৃশ্য স্তুতি যেন ধীরে ধীরে সারা অঙ্গ আচ্ছন্ন করে ফেলছে। আচ্ছা—ঠিক্ এই সময়টিতে আশু কি করছে ? তার কথা ভাবছে ? নিশ্চয়ই। তার ভালোবাসা কি গভীর ? খু-উ-ব। তবে প্রায়ই এত ঝগড়া করে কেন ? স্বভাব—কিছুটা ছেলেমানুষি। অফুরন্ত প্রাণশক্তি যার, তার প্রকাশ নানা ভাবেই হয়—ভালোবাসায়, কলহে আবার মিটিয়ে ফেলার জরুরী তাগিদে। মনস্তাত্বিকরা না কি বলেন—মধ্যে মধ্যে ঝগড়া করা দরকার। নইলে মনে যে ক্লেদ জমে ওঠে—সেটা বেরুতে পায় না। আর চাই মাঝে-মাঝে তফাৎ থাকা। সাময়িক বিচ্ছেদ না থাকলে প্রেমের গাঢ়ত্ব জমতে পায় না। প্রেম—সে তো আকস্মিক, জীবনে আসে অপ্রত্যাশিত ভাবেই। কিন্তু সে দৈব-লব্ধ পরম বস্তুটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে চাই কৌশল, জীবনের শিল্প। তাই মাঝে মাঝে একটু ছাড়াছাড়ি ভালো। নইলে খামের গায়ে ডাক-টিকিটের মত এঁটে বসলে ঘরণী হওয়া যায়, রমণী থাকা চলে না।

কি যেন হয়েছে দীপ্তির ! চমক তার ভাঙল আটটার ঘণ্টা শুনে। বড্ড দেরী হয়ে গেছে,—দীপ্তি তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে ঢোকে।

সে রাত্রে দীপ্তির ঘুম ভালোই হয়েছিল বলতে হবে—এক টানা স্বপ্নের ঘুম। খালি উষ্ণ মধুর স্বপ্নের মাঝে-মাঝে একটা অজানা ভয়, একটা অহেতুক অস্বস্তি এসে সমস্ত মনকেও নাড়া দিচ্ছিল। হঠাৎ শেষ রাত্রিতে ঘুম ভাঙল দীপ্তির। বিছানায় শুয়ে রইল অলস হয়ে বেশ খানিকক্ষণ। তার পর এলো-চুলটা মাথায় জড়িয়ে নিয়ে উঠে পড়ল। দাঁড়াল জানলার ধারে। শার্সির মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে শীতের শহরের ভোরবেলাকার অস্ফুট চেহারা। জানলাটা খুলে দিতেই এক ঝলক্ ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল তার মুখে। দূরে ডাস্টবিনের পাশে একটা কুকুর কি যেন খুঁজছিল। হঠাৎ শব্দ শুনে নিঃশব্দে সরে পড়ল।

এই আধো-আলো, ছায়া-ফিকে শীতের শেষ রাত্রি। ভালো লাগে না দীপ্তির। মনে পড়ে যায়—ছেলেবেলায় পশ্চিমে বেড়াতে যাওয়ার একটি উত্তেজনাময় দৃশ্য। শীতের ভোরবেলা—মনে হয় যেন পৃথিবী নিঃস্পন্দ, মূর্চ্ছিত। এ সময়ে বিদায় নেওয়া মানেই মরে যাওয়া। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় আছে কঠিন স্পর্শ, তীক্ষ্ণ ধাতব পদার্থের ঘর্মাক্ত স্পর্শ। যেন ঘুমন্ত স্মৃতি, অর্দ্ধজাগ্রত চেতনা আলোড়িত করে একটা মস্ত ছায়া বেরিয়ে আসে—আবার প্রাগৈতিহাসিক জীবের মত কোন এক বিস্মৃত গুহায় আত্মগোপন করে। হৃদয়ের স্পন্দন এত ধীর, নীরক্ত যে বোঝাই যায় না—আছে কি না। ঘরে বাতি জ্বালা, এদিকে টেবিলে ধূমায়িত গরম চা, ওদিকে ষ্টোভের শব্দ, ফটকে গাড়ীর আওয়াজ, দরজার গোড়ায় প্যাক্ করা স্তূপাকার মাল-পত্র, একটা যেন ব্যস্ত ভাব অথচ নিষ্প্রাণ। এই হ'ল শীতের ভোরের সত্যি চেহারা। জীবনেরও নয় কি ? বিদায়ের মুহূর্ত্ত আসন্ন, কিন্তু মনে কোনো রঙ্ ধরে না। অন্ধ একটি লগ্ন—শ্লথ অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপে জীবনটাকে যেন মাড়িয়ে চলে। মন-প্রাণ চায় একটু শিথিল ভাবে বসতে, আরেকটু কোমল আরামের আমেজ। কিন্তু—না, কথা বলারও অবকাশ হয় না। বাতি কেঁপে কেঁপে উঠছে। শেষ একবার চেয়ে নাও—সব ঠিক্ তো। দু'-চারটে খাপছাড়া টুকরো কথা। মন বাইরেও নেই, ঘরেও নেই। যাবার আনন্দ ও উত্তেজনাটুকু ঘুমের ঘোর কাটিয়ে এই আলো-আঁধারের পটভূমিতে ভালো করে ফুটতেই পারছে না। একটু মন-খারাপ;

স্বপ্ন

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

দিগন্তে ইশারা খুঁজে মরি।
তোমার মুখের দিকে চেয়ে
অতিক্রান্ত দীর্ঘ বিভাবরী।

আদিম অনেক স্বপ্ন এখনো কি চোখে?
দ্যুলোকে ভূলোকে
হারানো অনেক স্বর ঘুরে ফিরে আসে।
ব্যতিব্যস্ত সারাক্ষণ,
তবু তারি ফাঁকে
সচকিত কোনো ক্লান্ত ক্ষণে
চঞ্চলতা পথের বাতাসে।

স্বপ্ন নেই, শুধু কাজ, প্রত্যেক নিমেষ
গুরুভার পাষাণের মতো
প্রত্যহের প্রয়োজনে ভারী;
সংসারের রৌদ্র ঝড়ে
ভিজেছি পুড়েছি বারংবার
সদা ব্যস্ত আমরা সংসারী।

দিগন্তে ইশারা তবু খুঁজি।
অর্দ্ধ রাতে এক এক সময়
সহসা চাঁদের আলো পড়ে বাতায়নে;
স্বপনের পরীরা কি ঘোরে বনে বনে?
পৃথিবীকে সুপ্ত এক দৈত্য মনে হয়।

স্বপ্নকে খুঁজে খুঁজে
নিদ্রাহীন সঙ্গীহীন বহু স্তব্ধ রাতে
আমাদের চোখ আসে বুজে।
রজনীর ছায়া পড়ে প্রাসাদে, গম্বুজে।
সচকিত পড়ে মনে—কাল দশটায়
চিরন্তন আপিসের তাড়া।
এখানে তো স্বপ্ন নেই—এখানের আকাশের মেঘ
আপন আতঙ্কে আত্মহারা॥

স্পষ্টতার অভাবে কি যেন বলা হল না, চেয়ে দেখা হল না। তার পর বাইরের অন্ধকারে ভিজে ভিজে হাওয়ায় অতি-পরিচিত অথচ কিছুটা রহস্যময় পথ দিয়ে নূতন উদ্দেশের যাত্রা। এই বাল্য-স্মৃতিটা বহু বার অকারণেই দীপ্তির মনে পড়ে যায়। জানলার ধারে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেহটা যেন ভারী ও বিবশ হয়ে আসে। বহু দিন পূর্ব্বেকার এই খণ্ড চিত্রটি তাকে কি পৃথক্ ভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছে—এক অজ্ঞাত জীবনের অনির্দ্দিষ্ট ইঙ্গিতে? মঙ্গলের, না অমঙ্গলের?

সারাটা দিন কাটল নানা কাজে ও অকাজে। আজ যেন আশুর অনুপস্থিতি তার মনকে বেশি করে চেপে ধরেছে। খালি থেকে থেকে মনে পড়ছে ছোট-খাট কথা, দৃশ্য এবং বেশির ভাগই অতীতের। কী হ'ল আজ দীপ্তির? এমন স্বামী-ন্যাওটা হওয়া আধুনিকার সাজে না—দীপ্তি নিজেরই দুর্ব্বলতায় ম্লান হাসি হাসে আয়নার দিকে তাকিয়ে!

সন্ধ্যায় এল একখানা চিঠি। আশুর। অপ্রত্যাশিতই বটে। চিঠিখানা যখন দীপ্তি প্রথম খুলল, উত্তেজনায় আর আনন্দে তার হাত-পা কাঁপছে। বিয়ের পরে এই তার প্রথম চিঠি পাওয়া স্বামীর কাছ থেকে। এর মূল্য তার কাছে কতখানি—একমাত্র আশুই জানে। ওঃ—তাই সে বলেছিল, শিবঠাকুরের প্রসন্ন বরদানে দীপ্তিকে একেবারে অবাক্ করে দেবে। এই চিঠি কত যত্ন করে কত আন্তরিকতায় সে লিখেছে। তা'হলে ভোলেনি তার কথা, তার মন, তার নিটোল সৌন্দর্য্য। প্রতিটি ছত্রে কামনা আর নিষ্কলুষ স্নেহ কি আশ্চর্য্য ভাবে মিশে আছে। আশুর বুদ্ধি-দীপ্ত লেখার ছটায় অকৃত্রিম প্রকাশভঙ্গীতে দীপ্তির জীবনের সামান্যতম গ্লানি-ত্রুটি নিঃশেষে মুছে যায়।

কিন্তু চিঠির তো শেষ নেই! এ কি! আবার ভালো করে পড়ে দীপ্তি। শেষ দিকে হাতের লেখা যেন অন্য রকম বাঁকা-চোরা। কেন এ রকম হ'ল? উত্তপ্ত মস্তিষ্ক দপ্ করে ওঠে—একটি লাইন আবিষ্কার করে ঘনায়মান অন্ধকারে ক্ষীণ আলোয়। সমস্ত নিষ্প্রভ আলোটুকু যেন এইখানে এসে থমকে দাঁড়ায়:—

"তোমার কাছে আমি ঋণী—কতো ঋণী, তা তুমিও জানো না, দীপ্, আমিও না। কখনো তোমায় চিঠি লিখিনি। হয়ে ওঠে নি। আর তোমার আকাঙ্ক্ষাও মেটেনি কোনো দিন। এই বার সাধ মিটল তো? তুমি আমার কাছে কিছুই চাও না। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর তোমার কোনো মমতা নেই, কিন্তু একখানা চিঠির ওপর তোমার আছে অদ্ভুত মোহ, পাবার জন্যে লোলুপতা। চিঠিই বোধ হয় বড়—মানুষের চেয়ে। হয় তো সত্য। তাই মরে-মরেও শেষ করতে চাই, পাঠিয়ে দেবো তোমাকে যে করেই হোক্। আজ সকাল থেকে আমার হঠাৎ কলেরা—খবর দিয়ে তোমাকে আনাবার সময় তো আর নেই···"

শেষের একটাই লাইন। আর সেই রূঢ় সত্য কথাটা বড়—আরো বড় হয়ে ভয়াবহ আকার নিয়ে দীপ্তির মুখের কাছে এগিয়ে আসতে থাকে, মগজে ঢোকে না, অথচ ভীষণ ভয় হয়, চৈতন্য হয় লুপ্ত।

শীতের সন্ধ্যা তো কাটেই, রাতও আসে! আবার সেই ভোর হয়। সেই বিশ্রী, বিষণ্ণ শীতের মুমূর্ষু শেষ রাত্রি—ফ্যাকাশে শাদা চেহারায় মিষ্ট-মধুর স্মৃতির শব বহন করে আসে অর্দ্ধ-জাগ্রত চেতনায়; ব্যথায়, উত্তেজনায়, বিনিদ্র মুসাফিরের পীড়িত চোখের তীব্র জ্বালায়···সংজ্ঞাহ ছায়াচ্ছন্ন আলোয় চোখ মেলে হতবুদ্ধি দীপ্তি দেখে, শিয়রে আশু—আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলুচ্ছে। একটু ঝুঁকে পড়ে আশু সস্নেহ গলায় বলে—"এত ভয় পেয়েছিলে? কিন্তু নীলকণ্ঠের পরিহাস কি পার্ব্বতীরা বুঝতেও পারেন না!"

নিশিবৌ

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

পথে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পাবেন শ্যামবাজার বা শিয়ালদার মোড়ে বৌটি এক-গলা ঘোমটা দিয়ে বসে থাকে। সামনে একটি রোগা ছেলে শোয়া, গায়ে কিছু পাঁচড়া, মুখে লালা আর পাশে ছড়িয়ে আছে কয়েকটা বল্টুর মত ঠুনকো ফুটো পয়সা।

কথা বলে না। ফ্যাকাসে রোগা হাতখানা বাড়িয়ে থাকে সামনে। কেউ পয়সা ছোড়ে কেউ বা ছোড়ে বিদ্রূপ টিটকিরি। হয়ত কলেজের ছেলে তিন-চারটি খাতা হাতে দোলাতে দোলাতে দাঁড়িয়ে পড়ে। কেউ বলে—ছাখ কি সাংঘাতিক এক্সপ্লয়টেসন। ঘোমটা দিয়ে সতী সেজেছেন বোকা মানুষের সেণ্টিমেণ্টে যাতে ঘা' পড়ে। রাতে খেমটা নাচবেন। মোষ্ট ডিসরালাইসৃড. হ'য়ে—।



খদ্দরের জামা-পরা একটি ছেলে তাকে টানে,—চলে চল। ওদিকে নীলিমা দেবী ওয়েট করচেন। আজ ষ্ট্রাইক করতেই হবে।

নিশি বৌ নির্বিকার হ'য়ে বসে থাকে তেমনি হাত পেতে।

কোন নব-বিবাহিতা স্বামি-স্ত্রী সিনেমা চলেছে। বৌটি বলে,—আহা গো ছেলেটা শুকে গেচে। দাও না ওকে দুটো পয়সা।

—তোমার যত ব্যাগরা। বিরক্ত হয়ে স্বামী দুটো পয়সা ছুঁড়ে দেয়।

নিশি বৌ বসে থাকে তেমনি।

রাত ন'টায় আসবে নীরদগোপাল। ওকে বাড়ী নিয়ে যাবে।

আড্ডা হচ্ছিল রোয়াকে। মোহনবাগান জিতবে কি হারবে। এক অতি-বৃদ্ধ ভদ্রলোক তালি-দেয়া একটা পাঞ্জাবী গায়ে, পায়ে ছেঁড়া চটি—হাত পাতলো।

—প্লিজ গিভ্ মি টু পাইস্! বড়ই বিপদে পড়েছি বাবা। বুড়ো হয়েছি, খেতে পাই না। কাজ করবার ক্ষমতা নেই বাবা। দু'-দুটো ছেলে কোথায় যে গেল। ভগবান! কাজ আমিও এক দিন করেছি। আই এ্যাম্ এ্যান আণ্ডার-গ্রাজুয়েট। মাই সন ওয়াজ গ্রাজুয়েট। প্লিস্ হেল্প মি!

একটু চমকে যায় ছেলেরা ভিখিরির মুখে ইংরিজি শুনে। কিন্তু এক মুহূর্ত্ত। তার পরই—মাপ করুন, কিছু হবে না।

একটি ছেলে বলে বসে,—আপনাকে ত' সিদিনে কলুটোলায় দেখনু। আপনি কি সব জায়গায় ঘোরেন?

—কি করব বাবা! প্লিজ হেল্প মি!

ছেলেটি দুটো পয়সা দিয়ে তাকে কৃতার্থ করে, তার পর তড়পে বলে,—যান। ডোণ্ট কাম এগেন। তাপ্পর বল্ বুঁচী কি রকম খেললে আগের ম্যাচে।

বৃদ্ধ চলে যায়। রাত প্রায় ন'টা হয়ে এল। আর একটু ঘুরে যেতে হবে শ্যামবাজারের মোড়ে। নিশি বৌ বসে আছে তার অপেক্ষায়।

পাড়ার লোকে বললে, নিশি বৌ অলক্ষুণে। বিয়ের ছ'মাস যেতে না যেতে স্বামী জেলে গেল। তাও বোমার মামলার আসামী হয়ে! আগেও জেলে একবার গিছল বটে, সে মোটে ছ'মাসের জন্যে। এবার ঠুকে পাঁচ বছর। ছি ছি, বৌ নয়ত রাক্ষসী!

জেলে গেল ননীগোপাল, রাত দুপুরে ফিরত ননীগোপাল, সায়েব মারবার ষড়যন্ত্র করেছিল ননীগোপাল—এ সবই কি নিশি বৌয়ের দোষ?

যে দিন ভোরে ননীগোপালকে ঘেরাও করে নিয়ে গেল লাল-পাগড়ী পুলিশ আর সাদা টুপীওলা সাব-ইনস্পেক্টর। নিশি বৌ তাকিয়ে রইল বোকার মত ফ্যালফেলিয়ে। কিছুই বুঝল না ভাল করে। আতঙ্ক ওর একটা হয়েছিল।

মাঝে অনেক রাতে

ফিরত ননীগোপাল, ওকে বলত কখন-সখন—কেন মিছিমিছি জেগে থাক আমার জন্যে।

তার পর জড়িয়ে ধরে হয়ত বলত ফিস্-ফিস্ করে,—বেশী ভালবেসো না আমাকে। কতবার বারণ করেচি তোমায়। জান আমি যে কোন দিন মরে যেতে পারি।

কেঁপে উঠত নিশি বৌ। ওর ঠোঁট চেপে ধরত দু'হাতে। মুখখানি গুঁজে দিত ওর বুকের ভেতর। কিছুক্ষণ পরে যখন ওর মুখ জোর করে তুলে ধরত ননীগোপাল, দেখত ফুলো গাল দুটি ভিজে গেছে আর কপালের কিছু খুচরো চুল।

—বড় ছিঁচকাঁদুনে তুমি!—এর পর হয়ত একটু আদর করত।

তাই নিশি বৌয়ের আতঙ্ক হোল। এই যে পুলিশগুলো ধরে নিয়ে গেল ওর স্বামীকে, মেরে ফেলবে না ত' ওকে বা ঝুলিয়ে দেবে না ত' ফাঁসীকাঠের দড়িতে!

সমস্ত দিন ঠায় বসে রইল নিশি বৌ। পড়সীরা এল, স্বজনরাও এল, বলে গেল এক বাক্যে, অলক্ষুণে বৌ—ডাইনী। আসতে না আসতেই ভাঙন ধরালে সংসারে।

বললে না কিছু বৃদ্ধ নীরদগোপাল। ছাতি হাতে অফিস যাবার আগে তাকালো একবার নিশির দিকে। অস্ফুটে বললে,—কেঁদো না বৌমা. ও আবার ফিরে আসবে। আমি সকাল সকাল ফিরব অপিস থেকে। পাঁচু এলে বোলো আজ যেন বাড়ী থাকে।

পাঁচুগোপাল ছোট ছেলে। সেই ভোরে বেরিয়েছে কোন্ চায়ের দোকানে বা সিনেমার টিকিট কাটতে। এখনও ফেরেনি। ফিরবে হয়ত' বারোটায় কিংবা তিনটেয়।

পাশের দোতলা বাড়ীর চপলা আসে ছেলে কাঁখে খোঁজ নিতে—কি লো বৌ, খপর সত্যি?

নিশি বৌ বসেছিল জানলার ধারে, একান্ত ঘেঁসে সামনে রোগা একটা পেয়ারা গাছের ন্যাড়া ডালের দিকে তাকিয়ে। সাদা বলসানো আকাশের গায় মেঘের নরম প্রলেপ এখানে-সেখানে। নিশি বৌ তাকিয়েছিল একদৃষ্টে। চপলার প্রশ্নে সজাগ হয়ে ঘুরে বসল।

—কাঁদছিস্ কেন লা? আবার ফিরে আসবে।

নিশি বৌ কেঁদেছিল খানিক আগে, চোখের জল মুছতে ভুলে গিয়েছিল। এবার চোখ মুছে চপলার কাছে এগিয়ে এসে বসে।

চপলা ছেলে বুকে নিয়ে ফিস্-ফিস্ করে বলে,—এ বাড়ী থেকে উঠে যা বৌ। শ্বশুরকে বল, এমন সর্ব্বনেশে হানা বাড়ী—যে ভাড়া এসেচে তারই ক্ষেতি হয়েচে কিছু-না-কিছু। তোদের আগে মল্লিকরা ছিল। তাদের জোড়া ছেলে রক্ত উঠে ম'ল কাটা পাঁঠার মত। তারও আগে ছিল ভগবতীর মা। ভগবতীর পেটের ছেলে পেটেই গেল, ভূমিষ্ঠ হোলনি।

কে না জানে উই প্যায়রা গাছে দেবতা বাসা নিয়েচে। একটা বৌ মরেছিল গলায় দড়ি ঝুলিয়ে উই হোথা। সেই থেকেই উনি ভর করে আছেন ওই গাছে।

নইলে নোতুন বৌ হয়েচে; কোথায় আমোদ-আহ্লাদ, কোথায় বা সুখ-সোনা, হুট বলতে পুলিশ এসে বাড়ী ঘেরাও করলে গা!

আরও অনেক উপদেশ আর সান্ত্বনা দিলে চপলা।

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে রইল নিশি বৌ। চপলা উঠল। ছেলের গায়ে তিন বার থুতু ছিটিয়ে ফুঁ দিলে। বলা যায় না হয়ত' কোন খারাপ বাতাস লাগতে পারে ওর গায়। চলে গেল তার পর। নিশি বৌ উঠল; চোখ পড়ল জানলাটার দিকে। পেয়ারা গাছের ন্যাড়া ডালটা একটা কালো ছায়ার মত লেপটে আছে সাদা আকাশের গায়। তাড়াতাড়ি জানলাটা বন্ধ করে দিলে। ধীরে ধীরে এসে বসল যেখানে বসেছিল আগে।

এরা সব কি সত্যি বলে যায়? কেউ বলে সে নিজে না কি পোড়াকপালী, তার নিশ্বাসে না কি ডাইনীর ছাঁট আছে, কেউ বা বলে বাড়টাই হানা। বাড়ীর বাতাসে সর্ব্বনাশ ডেকে আনে, এ কি সত্যি হতে পারে?

—বৌদি!—পাঁচুগোপাল বাড়ী ফিরেছে।

নিশি বৌ উঠে বসল, ভাত দিতে হবে। চান করে এক মিনিট দাঁড়াবে না। খাবার দিতে দেরী হলে থালা ছুঁড়ে ফেলে দেবে উঠোনে।

নিশি বৌ উঠল।

পাঁচুগোপাল গুন্-গুন্ করচে তখন, "প্রেমের পূজায় এই ত' লভিলি ফল—"

—তেল দাও, গামছা দাও, সাবান দাও।

নিশি বৌ তেল-গামছা দিলে,—সাবান ত' নেই ঠাকুরপো!

—কেন, আনাওনি কেন? বাবার ঠেঙে পয়স চাওনি?

—কি করে চাইব!—নিশি বৌ মুখ নীচু করে বলে।

—গম্ভীর ভাবে চাইবে, মুখ খুলে চাইবে, হাত পেতে চাইবে। কি করে চাইব মানে?

—তোমার দাদাকে যে আজ ধরে নিয়ে গেল!—অনেক কষ্টে বলতে পারল নিশি বৌ।

—কে ধরে নেবে? ছেলেধরা? আমার দাদাকে ধরে নেবে কোন্ শালা—!

পাঁচুগোপালের মাথায় তখন সিনেমার টিকিট আর কোন সুন্দরী তারকার ভিজে ঠোঁটের লালসা। কথাটা একটু তলিয়ে দেখবার মত গভীরতা ছিল না।

শুনলে যখন ধরে নিয়ে গেছে পুলিশে। মনের তলায় ডুবে গেল কথাটা, ওপরে ভেসে রইল স্পষ্ট হয়ে সেই ঠোঁটের লালসা।

বললে একটু থেমে,—অ! পুলিশে! আবার ছাড়া পাবে তবে। আগের দানেও নিয়ে গেছল, সে বার ত' দেখিছি!—তুমি ভাত বাড় দিনি। চট করে ভাত বাড়।

একটা বিড়ি ঠোঁটে চেপে কলতলায় চলে গেল পাঁচুগোপাল।

মাস আষ্টেক পরের কথা। একটা শুধু খবর পাওয়া গিয়েছিল ননীগোপাল জেলে কাসির অসুখে ভুগছে। তারও কিছু দিন পর আর একটা খবর এল বাংলা সরকারের দপ্তরী-কাগজে ননীগোপাল মারা গেছে যক্ষায়, অনেক চেষ্টাতেও তাকে বাঁচান যায়নি। খবরটা এতই আকস্মিক যে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে; তবু হাজার মিথ্যার তীর্থস্থান থেকে সে ছাপমারা চিঠি মৃত্যুর খবর নিয়ে এসেচে; সেটা মিথ্যে নয় বলেই সকলে জানে।

ননী মারা গেছে!—বৃদ্ধ নীরদগোপালের দুর্বল স্নায়ুতে গিয়ে বিঁধে গেল কথাটা।

ঘাড় বেঁকে পড়ে গেল নীরদগোপাল, উঠতে পারল না তিন দিন তিন রাত্রি।

চঞ্চল কিচ্.কে পাঁচু কথাটা শুনে যেন স্থবির হয়ে গেল। বেরুল না চায়ের দোকানে বা সিনেমার ধারে। বন্ধুরা এসে ডেকে ফিরে গেল অনেক বার। শীষ দিয়ে দিয়ে মুখ ব্যথা হয়ে গেল তাদের।

পাঁচু কাঁদল—অনেক কাঁদল, বৌদিকে লুকিয়ে বাবার আড়ালে বড়ুয়া-হাতা পাঞ্জাবীর খুঁটে মুখ লুকিয়ে। বৌদির সামনে বেরুতে গিয়ে কেঁপে উঠল। তার সাদা কাপড় রুক্ষ চুল পাঁচুর মনের তলায় গিয়ে পাক খেয়ে উঠল, সেই সঙ্গে উঠল মনের তলায় জমা অনেক কালের অনেক কথা।

চপলারা এসেছিল নিশি বৌয়ের শাঁখা ভাঙতে, গঙ্গায় নিয়ে যেতে আর চোখের কোণ আঁচলে মুছে সান্ত্বনা জানাতে। সবাই ই বললে বাইরে গিয়ে,—বৌ নয় ত' পাষাণী বাঘিনী; একটুকু কাঁদলে না গা!

না। নিশি বৌ কাঁদেনি। নিজের হাতে নিশ্বাস ফেলে দেখছে হাতটা পুড়ে যায় কি না, বা তার নিশ্বাসে আগুন আছে কি না, সর্ব্বনাশ আসে কি না!

সন্ধ্যের পর যাচ্ছে পেয়ারা তলায় তিন-চার বার অন্ধকারে একা। দেখবে সেই গলায় দড়ি-দেয়া বৌটাকে যার বাতাসে ঘাড় মটকে মরে যেতে পারে তার এক মুহূর্ত্তে বা তার পেটের যেটা আছে সেটা যদি যায় ভগবতীর মায়ের মত। আর এক মাস পরেই হয়ত ভূমিষ্ঠ হবে সেটা তার মায়ের সমস্ত সর্বনাশের তিলক কপালে নিয়ে। তার চেয়ে পেটে যাওয়াই ভাল।

এর ভেতর বলাবলি করেছে কয়েক জন,—পেটে আছে যেটা সেটাও রাক্ষস; নয় ত' হতে না হতে বাপকে খেলে! একটু কাঁদবার সময় পায় না যেন নিশি বৌ। সমস্তক্ষণ কি যে ভাবে! রাত্রে পাতা পড়ে না চোখের। সোজা তাকিয়ে থাকে জানলা দিয়ে বাইরে যেখানে পেয়ারা গাছের মরা ডালটার পেছনে চাঁদ নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে।

দিনগুলো কেটে যাচ্ছে ক্রমাগত, তবু নীরদগোপাল উঠতে পারে না আর। সেই যে কাঁথার ওপর পড়েছে, উঠতে গেলেই বুক ধড়-ফড় করে, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়— পা কাঁপে থর-থর করে।

ডাক্তার দেখান হোল। কথাটা পাড়লে পাঁচু—বললে নিশি বৌকে—বাবাকে একবার ডাক্তার দেখাতে হয় বৌদি!

নিশি বৌ তাকিয়ে থাকে পাঁচুর দিকে, কি বলতে চায় বুঝতে চেষ্টা করে। তার পর মন্থর পায়ে ঘর থেকে নিয়ে আসে দু'গাছা সোনার রুলি;—এইটে বিক্রি করে দেখাও ঠাকুরপো!

পাঁচু চমকে উঠে,—না, না। যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাব বৌদি—আবার যদি আমায় ও-সব বলবে।

নিশি বৌ ধাঁধায় পড়ে।

বুঝিয়ে বলতে চায় পাঁচু—যদ্দিন আমি আছি; ট্যাকার ভাবনা ভাবব আমি। তোমাকে মাথা ঘামাতে কে বলেচে।

নিশি বৌ বিড়-বিড় করে বলতে চেষ্টা করে,—কোত্থেকে চালাবে। বাবার ত' চাকরী গেল!

—ভগবান চালে দেবে।—পাঁচু আশ্বাস দেয়।

অবশেষে ডাক্তার পাঁচুই আনলে। ডাক্তার বলে গেল বড্ড শক খেয়েচে। হার্টটা ড্যামেজড্। কমপ্লিট রেষ্ট চাই বেশ কিছু দিনের। শিশুর মত চুপ করে রইল নীরদগোপাল। বৃদ্ধ নীরদগোপাল যেন পাঁচ বছরের শিশু হয়ে গেছে হঠাৎ। দুধ দিতে একটু দেরী হলে বা বার্লিতে জল বেশী থাকলে হয়ত' কেঁদেই ফেলে,—আমায় দেখলে না কেউ। সবাই মেরে ফেলতে চায় আমায়।

চেঁচামেচি করতে থাকে। তার পরই বুক ধড়ফড় করে অস্থির হয়ে পড়ে হয়ত'।

চপলারা দেখতে আসে মাঝে-মাঝে, বলে যায় নিশি বৌকে,—বুড়োর মাথার দোষ হয়ে গেছে।

আহা তা' আর হবেনি? অমন পুরো পাঁচ হাত ছেলে—চোখের আড়'লে মরলে গা!

নিশি বৌ বুঝতে পারে না মাথার দোষটা কার—চপলাদের, না নীরদগোপালের?

পাঁচুগোপাল মাঝে-মাঝেই বাড়ী ফেরে রাত দুটোয় তিনটেয়। নিশি বৌ ঝিমোতে ঝিমোতে চমকে ওঠে,—এত রাত হোল ঠাকুরপো!

—তুমি কেন জেগে আছ মিছিমিছি। আমার ভাত ঢেকে রেখে শুলেই পারো। নাও টাকাগুলো তুলে রাখ।

পকেট থেকে খান-চারেক নোট বার করে নিশি বৌয়ের হাতে দেয়।

—কোত্থেকে পেলে ঠাকুরপো?

—চুরী করে—ডাকাতি করে! তোমার কি দরকার শুধোবার?—বিনা কারণে রেগে ওঠে পাঁচুগোপাল।

নিশি বৌ ভাত দেয় সামনে।

খেতে খেতে পাঁচু নরম গলায় হয়ত শুধোয়,—তুমি কি খেলে?

নিশি বৌ জবাব দেয় না।

—পয়সা ছিল না বুঝি? কাল হাঁসের সাবু এনে দেব। সাবু ভিজিয়ে খেও রাতে।

নিশি বৌ ভাবতে থাকে পাঁচুগোপাল কি করে! কালই হয় ত' সন্ধ্যে বেলায় বেরিয়ে যাবে কুড়িটা টাকা নিয়ে, হয়ত' ফিরে আসবে রাত দুটায় মুখ শুকিয়ে শুধু হাতে, হয়ত' রাত তিনটায় আরও তিন ডবল টাকা নিয়ে।

কে জানে কি করে পাঁচু! পেয়ারার আগে কালো ডালটা বাতাসে দুলছে বাইরে—যেন শাসাচ্ছে সেই গলায় দড়ি-দেয়া বউটা! নিশি বৌ সরে বসে দু'হাত পাছে, পাঁচুর গায়ে তার নিশ্বাস লাগে।

কিছু দিন ধরে প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। পাঁচু যা' এনেছিল নিয়ে গেছে। রোজই রাত দুটো-তিনটের ফেরে মুখ কালো করে, পকেটে একটা পয়সাও থাকে না। মুখ নীচু করে কিছু খেয়ে শুয়ে পড়ে।

নিশি বৌ আজকাল জেগে থাকতেও পারে না। পেটে মাঝে-মাঝে যন্ত্রণা হয় অসহ্য। হয়ত' আর কয়েক দিনের ভেতরই হাসপাতালে যেতে হবে। পাঁচু বলেছে হাসপাতালে দেবে তাকে।

সে রাত্রে একটু সকাল সকাল ফিরেছে পাঁচুগোপাল। এসে ঘরে দেখেনি বৌদিকে, ডেকেছে দু'-চার বার, সাড়া পায়নি।

নীরদগোপাল বারান্দায় উবু হয়ে বসে ধুঁকছিলো, বললে,—বৌমা রান্নাঘরে আমার বোল করছে। ভাখ ত' কদ্দূর হোল। বড্ড ক্ষিদে পায় বাবা।

শেষ সূর্য্য

প্রসাদ মিত্র

কত বার এই সূর্য্য নেমেছে অস্তাচলে,
গোধূলি বেলার ক্ষীণ রশ্মিতে পীত আভায়
কত দিন ধরে রক্ত আবীর আকাশ কোণে
মৃত্যু-শীতল পাণ্ডুর চাঁদে ঢেকেছে হায়!

সে চাঁদ আনেনি নিবিড় তিমিরে আলোক-রেখা
মূক রাত্রির মুখে ত ফোটেনি মুখর ভাষা
ঝিকমিক করে বিদ্রূপ ভরা তারার হাসি
বুভুক্ষু মন, মাথা কুটে মরে ব্যর্থ আশা।

প্রহরে প্রহরে কেটে গেল দিন অর্থহীন
বনস্পতির ছায়া নেমে আসে দীর্ঘতর
ধ্রুবতারকার মৃদু জ্যোতিতে কোথায় দিশা
হে বিশ্বদেব সময়ের পুঁথি রিক্ত কর।

আমার পিছনে কঠিন মাটিতে পড়েনি ছাপ
জমাট হাওয়ায় লোনা সমুদ্রে চিহ্ন নেই
অস্তিত্বের শূন্য গুহায় জমেছে ফাঁকি
ভেসে চলা শুধু দিনান্ত হতে দিনান্তেই।

দূর পশ্চিমে বৃদ্ধ সূর্য্য নির্ব্বিকার
অতন্দ্র চোখে প্রতীক্ষা করি এবার কবে
দৈনন্দিন ধূলিমলিন এ পথের শেষে
জড় জীবনের শেষ সূর্য্যের উদয় হবে।

বাপের কণ্ঠে এমন কোন আবেদনের সুর হয়ত' ছিল। পাঁচু দাঁড়িয়ে পড়ল থমকে।—আজ-কাল কেমন বাবা!

স্থবির নীরদগোপাল যেন ভেঙে পড়ে,—এক ফোঁটা দুধ খেতে পাইনি আজ ক'দিন! খেতে খেতে বেলা বারোটা বেজে যায়, তাও মাছ নেই। বৌমাই বা কি করে! পেট-ব্যথায় কোঁকায় মেঝেয় পড়ে। এবার আর আমি বাঁচব না পাঁচু! ঠিক মরে যাব।

—না, না, মরবে কেন? আমি আসচি।

পাঁচু যেন পালিয়ে যায়। উঠোন পার হতে গিয়ে অন্ধকার কালো আকাশের দিকে মুখ তুলে বিড়-বিড় করে।

রান্নাঘরে গিয়ে দৌড়ে ঢোকে।

নিশি বৌ রাঁধছিল। পাঁচুগোপালের পায়ের শব্দে পেছন ফিরে তাকাল।

পাঁচুগোপাল দেখল বৌদির পরনে একটা পাজামা, তারই পাজামা। গায়ে দাদার পুরোনো একটা ছেঁড়া গেঞ্জি।

অদ্ভুত দৃশ্য! তার বৌদি নিশি বৌয়ের এ বেশ শুধু চোখে লাগে না, চোখের স্নায়ুতে আগুন ধরায়।

পালাতে হবে। তবু পাঁচুগোপালের পা আঠার মত লেপটে আছে মেঝেয়। বলতে পারচে না; সাড়ী নেই বুঝি বা ভাত বাড়ন্ত!

পালাতে হবে। প্রদীপের আলোয় নিশি বৌয়ের মুখ নিদারুণ লজ্জায় ক্রমশঃ কালো হয়ে যাচ্ছে যেন।

পালাতে হবেই। জোর করে ছুটে বেরিয়ে আসে পাঁচুগোপাল, একেবারে রাস্তায়। নিকষ কালো গম্ভীর আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে নিশ্বাস নেয় ও। আর নয়! ওকে যেতে হবেই। আলকাতরার মত জমে আছে ওর মনে চূড়ান্ত অপমান। ও জানে এমন অনেক নিশি বৌ তিলে তিলে মরছে আর মরছে ননীগোপালরা জেলে মুখে রক্ত উঠে। ও যাবেই এবার। যাবে তাদের কাছে যাবা এদের বাঁচাতে প্রাণ প্রতিজ্ঞা করেছে।

এখনও পথে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পাবেন শ্যামবাজার বা শিয়ালদা'র মোড়ে এক গলা ঘোমটা দিয়ে বসে আছে নিশি বৌ। সামনে পেটের সেই ছেলেটা রোগা—কিছু পাঁচড়া আর মুখে লালা।

নিশি বৌয়ের মুখ দেখা যায় না। কথা বলে না। ক্যাঁকাসে রোগা হাতখানা বাড়িয়ে থাকে সামনে।

অথবা—

কোন রোয়াকের আড্ডায় বা সিনেমা-ভাঙা ভীড়ের সামনে দাঁড়িয়ে নীরদগোপাল হাত পেতে বলচে ক্রমাগত,—প্লিজ হেল্প মি! বুড়ো হয়েচি, খেতে পাই না। আই এ্যাম এ্যান আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট। বড়ই বিপদে পড়েছি স্যার। প্লিজ হেল্প মি।

দিন যায়। সন্ধ্যে যায়, রাত বাড়ে। নিশি বৌ বসে আছে অপেক্ষায়, রাত নটায় আসবে নীরদগোপাল। ওকে নিয়ে যাবে।



শিল্পী—মাখন দত্তগুপ্ত

বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার

[গোরক্ষনাথ]

পূর্ব-প্রকাশিতের পর

শ্রীকামিনীকুমার রায়

গোরক্ষনাথের সেবার মন্ত্র বা পাঁচালি*

(বিক্রমপুরের মিস্ত্রি সম্প্রদায়ের নিকট হইতে সংগৃহীত)

ভাটবামুন । (পাঁচালি গায়ক)	বালকগণ সমস্বরে ।
বলরে ভাই শ্যামসুমার,—	বলরে ভাই শ্যামসুমার
রনা রনা রনা বুড়ি—	হাচ্চো
তাই দিয়া কিনিলাম গাই কবুরেশ্বরী	"
কি ঘাস খায় মরিচে চরি	"
কি নেদ ১ নেদায় হলুদের গুঁড়ি ২	"
কি চনায় ৩ চন চনানি	"
মামায় দোয়ায় ৪ গাই আষাঢ় মাসে	"
ভাইগ্নায় ৫ দোয়াইলে হাঁড়ি ভরা বেভোর আসে ৬	"
বলরে ভাই শ্যামসুমার ।	বলরে ভাই শ্যামসুমার ।
কাচা ৭ কাইটা তুললাম মাটি—	হাচ্চো
তাতে বসাইলাম গোয়াল হাটি—	"
ওরে ওরে গোয়াল ভায়া	"
আমার গুরুদেবের দুধ যোগাবা ।	"
তোমার গুরুথ চিনি কেম্‌তে ৮ ?	"
হাতে নড়ি ৯ মাথায় টিক ১০	"
গাঙ্গের কূলে পাবেন শিক ১১	"
সেই সে আমার গুরুথপীর ১২	"
কাচা কাইটা তুললাম মাটি	"
তাতে বসাইলাম কুমার হাটি	"
ওরে ওরে কুমার ভায়া	"
আমার গুরুদেবের পাতিল যোগাবা	"
তোমার গুরুথ চিনি কেমতে ?	"
হাতে নড়ি, মাথায় টিক	"
গাঙ্গের কূলে পাবেন শিক	"
সেই সে আমার গুরুথপীর ।	"

এইরূপে পাল, বারুই গন্ধস প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকদের বসবাস সম্বন্ধেও বলা হয় এবং তাহাদিগকেও গোরক্ষনাথের পরিচয় দিয়া তাঁহার সেবার উপকরণ যোগাইবার জন্য অনুরোধ করা হয়. শেষে আবার ভাটবামুন ও বালকগণ পর পর বলিয়া ওঠে—

"বলরে ভাই শ্যামসুমার—" "বলরে ভাই শ্যামসুমার ।"

ভাটবামুন ।	বালকগণ ।
জইটা বগা ১৩ তুই আমার ভাই—	হাচ্চো
ওপার যেতে ঠাই নি ১৪ পাই ?	"
নাইমা ১৫ দেখ' কতফুটি ১৬ জল	"
নাইমা দেখছি গিরা ১৭ জল	"
জইটা বগা তুই আমার ভাই	"
ওপার যেতে ঠাই নি পাই ?	"
নাইমা দেখ কতফুটি জল	"
নাইমা দেখছি মাজা জল	"
জইটা বগা তুই আমার ভাই	"
ওপার যেতে ঠাই নি পাই ?	"
নাইমা দেখ কতফুটি জল	"
নাইমা দেখছি বুক জল	"
জইটা বগা তুই আমার ভাই	"
ওপার যেতে ঠাই নি পাই ?	"
নাইমা দেখ কতফুটি জল	"
নাইমা দেখছি অথই ১৯ জল	"
বলরে ভাই শ্যামসুমার ।	বলরে ভাই শ্যামসুমার ।

এই অংশে দেখা যাইতেছে গোরক্ষনাথ (?) নদী বা জলাভূমি পার হইয়া গৃহস্থের বাড়ীতে (?) সেবাস্থানে আসিতেছেন। ঘাটের খবর তাঁহার জানা নাই তাই 'জইটা বকের' নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কোন্ স্থানের গভীরতা কত। বকের নির্দেশক্রমে প্রশ্নকর্তা নিজেই জলে নামিয়া দেখিতেছেন, কোথাও 'গিরা' জল, কোথাও কোমর, কোথাও বুক, কোথাও বা অথই জল।

ভাটবামুন ।	বালকগণ ।
এই বাড়ীখানের পূব ঘাটা ২০—	হাচ্চো
তাতে আছে বেথই ২১ কাঁটা	"
আসলো গুরুথ হাতে দায় ২২	"
কাটা কাইটা ২৩ ঘাটা বানায় ২৪	"

---

* বিক্রমপুরে প্রচলিত। সেবার নিয়ম-কানুন প্রবন্ধের প্রথমাংশে দ্রষ্টব্য।

১ গোরু ঘোড়ার বিষ্ঠা ২ গোবর যেন হলুদের গুঁড়া ৩ মূত্র ত্যাগ করে; চনা পশুর মূত্র। ৪ দোহন করে ৫ ভাগিনা ৬ অর্থ ঠিক বুঝা যাইতেছে না,—হাঁড়ি হইতে দুধ উপচাইয়া পড়ে এই হয়তো তাৎপর্য। ৭ নালা-বিশেষ ৮ কিমতে ৯ পাচনবাড়ি, ছোট লাঠি ১০ (?) ১১ শিস্ ১২ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে গোরক্ষনাথকে এখানে 'গুরুথপীর' বলা হইয়াছে; সত্যনারায়ণ যে ভাবে 'সত্যপীর' হইয়াছেন, গুরুথ ঠাকুরও হয়তো সেই ভাবেই গুরুথপীর নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

১৩ বক; জইটা—ঝুটিযুক্ত (?) ১৪ পার হইবার মতো থৈ পাইতে পারি কি ? ১৫ নামিয়া, ১৬ কতটুকু; ফুটি—কোঁটা (?) ১৭ গিট: এখানে পায়ের গিট (ankle)। ১৮ কোমর ১৯ অথই, যেখানে মাথা পর্যন্ত ডুবিয়া যায়। ২০ নদী ইত্যাদি পার হইবার বা নদ্যাদিতে নামিবার স্থান; মনে হয় গৃহস্থের বাড়িটির চারি দিকেই জল এবং কাঁটা গাছের বেড়া, বর্ষাকালে বিক্রমপুরের অধিকাংশ বাড়ীর দৃশ্যই এইরূপ দাঁড়ায়। ২১ বেত গাছ ২২ দা ২৩ কাটিয়া ২৪ তৈয়ার করে।

এই বাড়ীখানের পশ্চিম ঘাটা — হাচ্চো
তাতে আছে শিমুল কাঁটা — "
আসলো গুরুথ হাতে দায় — "
কাঁটা কাইটা ঘাটা বানায় — "
এই বাড়ীখানের দক্ষিণ ঘাটা — "
তাতে আছে মান্দার কাঁটা — "
আসলো গুরুথ হাতে দায় — "
কাঁটা কাইটা ঘাটা বানায় — "
এই বাড়ীখানের উত্তর ঘাটা — "
তাতে আছে বরই ২৫ কাঁটা — "
আসলো গুরুথ হাতে দায় — "
কাঁটা কাইটা ঘাটা বানায় — "
বলরে ভাই শ্যামসুমার। বলরে ভাই শ্যামসুমার।

গৃহস্থের বাড়ীটি জলে এবং নানা জাতীয় কাঁটা গাছে ঘেরা। গোরক্ষনাথ সেই জলা পার হইয়া 'দা' হাতে করিয়া আসিয়াছেন এবং সেই সব কাঁটা গাছ কাটিয়া 'ঘাটা' প্রস্তুত করিতেছেন। দেবতা হইয়াও গোরক্ষনাথের এত পরিশ্রম কেন, ঠিক বুঝা যাইতেছে না। গৃহস্থ তাঁহার সেবার উদ্যোগ করিয়াছে, তাঁহাকে সেবাস্থানে আসিতেই হইবে। ঐরূপে কাঁটা জঙ্গল পরিষ্কার না করিয়া তাঁহার আসিবার অন্য উপায় কি ?

ভাট বামুন। এস গিরি ২৬ মাগ বর, ধনে জনে ভরুক্ ঘর—

বালকগণ। হাচ্চো

এস গিরি মাগ বর, গোরু বাছুরে ভরুক ঘর, — "
এস গিরি মাগ বর, সুখে সম্পদে ভরুক ঘর, — "
বলরে ভাই শ্যামসুমার। বলরে ভাই শ্যামসুমার।

গোরক্ষনাথ যেন পূজার বেদীমূলে আসিয়াছেন, তাই ভাটবামুন এখানে গৃহস্থকে তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করিতে বলিতেছেন।

ভাটবামুন। দক্ষিণ রাজ্যে নারিকেলের আগ,—

বালকগণ। হাচ্চো।

গোরুর বিঘ্নি ২৭ তফাৎ ২৮ যাউক — "
পূব রাজ্যে সুপারির আগ,— — "
গোরুর বিঘ্নি তফাৎ যাউক — "
পশ্চিম রাজ্যে তালের আগ — "
গোরুর বিঘ্নি তফাৎ যাউক — "
উত্তর রাজ্যে বাঁশের আগ — "
গোরুর বিঘ্নি তফাৎ যাউক — "
বলরে ভাই শ্যামসুমার। বলরে ভাই শ্যামসুমার।

এইরূপে গোরুর বিঘ্ন-নাশ কামনা করিয়া পাটের চাষ-আবাদ সম্বন্ধে বলা হয়। উহা ময়মনসিংহের কথার প্রায় অনুরূপ।

ভাটবামুন। পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ — বালকগণ। হাচ্চো
পাটের জন্ম চৈত্রমাস — "

বারখান চাষ, তেরখান মই ২৯ — হাচ্চো
পাটের জমি হইলো সই ৩০ — "
ঘরে আছে ঘর যুবতী — "
আনি দিল পাটের বীচি — "
পাটের বুনলাম হালি, নিড়িয়ে দিলাম কালি ৩১ — "
সে পাট হইলো বাত্তি ৩২ — "
আসলো গুরুথ হাতে দায় — "
পাট কাটলাম কোবের ঘায় ৩৩ — "
আগ ফালাইয়া গোড় ফালাইয়া — "
মধ্য খণ্ড জাগে ৩৪ দিয়া — "
সে পাট হইলো কুইয়া ৩৫ — "
ছায়পোয়ায় ৩৬ লইলাম ধুইয়া — "
উত্তর থাইকা আইলো ঘোড়া — "
বাইন্ধা ফালাস্ত পাটের মুড়া ৩৭ — "
পাট বান্ধিয়া ফালাইলাম চালে — "
কত দেবলোক কেঁপে উঠে — "
পাট বলে আমি বড় বীর — "
হাতী বান্ধিলে হাতী স্থির — "
পাট বলে আমি বড় বীর — "
ঘোড়া বান্ধিলে ঘোড়া স্থির — "
পাট বলে আমি বড় বীর — "
গোরু বান্ধিলে গোরু স্থির — "
পাট বলে আমি বড় বীর — "
যা কিছু বান্ধি সকলি স্থির — "
বলরে ভাই শ্যামসুমার। বলরে ভাই শ্যামসুমার।

মন্ত্রের এই অংশে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গোরক্ষনাথ মানুষের সহকর্মিরূপে 'দা' হাতে পাট কাটিতে আসিয়াছেন। পূর্ব্ববর্তী এক অংশেও দেখিয়াছি তিনি কাঁটাগাছ কাটিয়া 'ঘাটা' তৈয়ার করিতেছেন; আবার পরবর্ত্তী অংশেও দেখিব তিনি ছয় হালুয়ার (চাষী) সঙ্গে সোনার পাচনবাড়ি হাতে হালচাষে যোগ দিয়াছেন। উপাস্য দেবতাকে এই যে মানুষের মতো করিয়া ভাবা, দেখা,—তাঁহাকে আত্মীয়, বন্ধু, সহকর্মিরূপে সংসার-সমাজের গণ্ডীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা,—ইহা লোক-ধর্ম্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'বনদুর্গা'র ব্রতেও আমরা দেখিয়াছি 'দেবী বনদুর্গা' ব্রতিনীর প্রাণপ্রিয়া সখী।

---

২৫ কুলগাছ ২৬ বাড়ীর কর্ত্তা (?)
২৭ বিঘ্ন ২৮ দূর।

২৯ পাটের চাষ ধানের চাষের চেয়ে কষ্টকর, ইহার জন্য জমি অনেকবার চাষ করিতে এবং মই দিতে হয়; এখানে বারটি চাষ ও তেরটি মই-এর কথা বলা হইয়াছে।

৩০ ঠিক বীজ বুনিবার উপযুক্ত।

৩১ যন্ত্র সাহায্যে পাটের জমি হইতে আগাছা ফেলিবার কথা বলা হইতেছে; কালি—এক কালি জমি ?

৩২ পুষ্ট ৩৩ দা দিয়া; কোব—দা-এর কোপ। ৩৪ পচাইবার উদ্দেশ্যে জলে ডুবানো পাটগাছের সারিবাঁধা আটি সকল ৩৫ পচা ৩৬ ছেলেপিলেতে মিলিয়া ৩৭ মুচড়াইয়া বিশেষ ধরণে বাঁধা পাটের বাণ্ডিল।

ভাটবামুন। ওরে ওরে রাখাল ভাই,— বালকগণ। হাচ্চো
চল মোরা স্বর্গে যাই ,,
স্বর্গে যাইয়া ডেফল৩৮ খাই ,,
ডেফল খেয়ে ফেল্লাম বীচি ,,
তাতে হইলো বাঁশ গাছটি ,,
বাঁশে হইলো লম্বা আঁশ ,,
বাঁশের জন্ম বৈশাখ মাস ,,
সে বাঁশ হইলো বাড়ি ,,
আস্‌লো গুরুথ হাতে দায় ,,
বাঁশ কাটলাম কোবের ঘায় ,,
ছয় হালুয়ার৩৯ ছয় নড়ি৪০ ,,
গুরুথনাথের সোনার নড়ি ,,
সোনার নড়ি বিনলো৪১ গুণে ,,
যত কিছু বান্‌ছিলাম৪২ সব ছাড়লাম গুরুথের পুণ্যে ,,
বলরে ভাই শ্যামসুন্দর। বলরে ভাই শ্যামসুন্দর।
সোনার ঘোড়া রূপার ঝিল৪৩ হাচ্চো
আসিল গুরুথ পূবের ঝিল ,,
আসিল গুরুথ বসিল খাটে ,,
নাড়ু বিলাইলো হাতে হাতে ,,
বলরে ভাই শ্যামসুন্দর বলরে ভাই শ্যামসুন্দর।

অতঃপর সকলে গোরক্ষনাথের সেবার নাড়ু ও অন্যান্য প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং বালকেরা এঁটো পাতাগুলি গোয়াল ঘরে নিয়া গোরুকে খাইতে দেয়। তখন 'ভাটবামুন' জলঘটটি হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করেন—"গোয়াল ভরছে?" বালকেরা উত্তর দেয়, "হা ভর্‌ছে।" ভাটবামুন আবার বলেন, "সমুদ্রে যত জল, অত গোরুর দুধ হউক—"বালকেরা বলে "হউক, হউক।" ভাটবামুন আবার "সমুদ্রে যত বালু তত গোরুর পরমায়ু হউক্‌" বালকগণ "হউক, হউক।"

ইহার পর ভাটবামুন জলঘট হইতে সকলের শরীরে জল ছিটাইয়া দেন এবং বালকেরা উচ্চৈঃস্বরে "ঘর ভরা গোরু, শরা ভরা নাড়ু" বলিতে বলিতে চলিয়া যায়।

ইনি কি সিদ্ধা গোরক্ষনাথ?

বাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত গোরক্ষনাথের সেবার নিয়ম-কানুন এবং মন্ত্র, ছড়া বা পাঁচালির ভিতর দিয়া আমরা তাঁহার যেটুকু পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে আমাদের মনে স্বভাবতঃই কয়েকটি প্রশ্ন জাগে,—এই গোরক্ষনাথ কে? ইনি সিদ্ধা গোরক্ষনাথ, না শ্রীকৃষ্ণ, না তাঁহাদের রূপান্তর, না অন্য কেহ?

আমরা 'গোরক্ষ-বিজয় বা মীন-চেতন' 'ময়নামতীর গান' এবং নাথ সম্প্রদায়ের অন্য পুঁথি পুস্তকে গোরক্ষনাথের যে বিবরণ পাঠ করিয়া থাকি, তাহার সঙ্গে আমাদের এই গোরক্ষনাথ ও উঁহার 'সেবা'র কোনও সম্পর্ক আছে কি না প্রথমেই দেখা যাক্‌। ঐ সকল পুস্তক-বর্ণিত গোরক্ষনাথ মীননাথের শিষ্য, তিনি নাথ সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা এবং একাদশ শতাব্দীর (?) লোক; পঞ্জাবের জলন্ধর নামক স্থানে তাঁহার জন্ম। গোবিন্দচন্দ্রের মাতা ময়নামতীকে তিনি 'মহাজ্ঞান' শিক্ষা দিয়াছিলেন; চরিত্র-মাহাত্ম্যে সকল সিদ্ধার উপরে তাঁহার স্থান ছিল; ভারতের বহু স্থানে তিনি বিচরণ করিয়াছিলেন; অসংখ্য লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের এক বিস্তৃত অঞ্চল ছিল তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র।

একাদশ শতাব্দীর (?) সেই মহাজ্ঞানের গুরু যোগিশ্রেষ্ঠ গোরক্ষনাথের সঙ্গে বাংলার গোরুর দেবতা গোরক্ষনাথের একটি প্রধান সাদৃশ্য হইতেছে নামের। এতদ্ব্যতীত ময়মনসিংহের 'সেবার' মন্ত্রে এক স্থানে আছে 'গুরুথ বাউল', আর এক স্থানে আছে 'ঠাকুর গোপী'। ময়নামতীর স্বামিরাজ এবং গোরক্ষনাথের কর্ম্মক্ষেত্র বিক্রমপুরেরও উল্লেখ দেখা যায় এবং সেখানে কোনও পিতাপুত্র উভয়ের অনেক দুঃখকষ্ট পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবার কথাও আছে। আমরা জানি, সিদ্ধারা বর্ত্তমান যুগে ক্বচিৎ-দৃষ্ট বাউলদের সাধন-পথাবলম্বী কতকটা ছিলেন। কাজেই সিদ্ধা গোরক্ষনাথকে 'গুরুথ বাউল' অভিহিত করা তেমন কিছু নয়। আবার অনেক কালের ব্যবধানে তিনিই সাধারণ লোকের নিকট তাঁহার শিষ্য-পুত্র গোপীচাঁদের সহিত অস্পষ্টী-কৃত হইয়া 'ঠাকুর গোপী' নাম ধারণ করিয়াছেন, ইহাও আশ্চর্য্য নয়। আর বিক্রমপুরের যে পিতাপুত্রের মৃত্যুর কথা বলা হইল, তাঁহারা মাণিকচাঁদ এবং গোপীচাঁদও হইতে পারেন। নামের সাদৃশ্য এবং গুরুথ বাউল, ঠাকুর গোপী বিক্রমপুর, প্রভৃতি উক্তিগুলি আমাদের মনে কম আবর্ত্তের সৃষ্টি করে না। Max Muller প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে "Mythology is a disease of language,—a result of misunderstood phrases and of the gender-terminations of words."

কাজেই ইহাও বিচিত্র নয় যে, সিদ্ধা গোরক্ষনাথের আবির্ভাবের বহু যুগ পরে এক শ্রেণীর লোক তাঁহার কথা-কাজের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রায় ভুলিয়া যাইয়া গোরক্ষনাথকে গোরুর রক্ষাকর্ত্তারূপেই শুধু বুঝিয়া লইয়াছে এবং তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া আসিতেছে। কে জানে গো-জাতির সর্ব্ববিধ চিকিৎসায়ও তাঁহার অলৌকিক শক্তি ছিল কি না এবং সেই শক্তিই তাঁহাকে উত্তরকালে গোরুর দেবতার আসনে স্থান দান করিয়াছে। দেবের দেব মহাদেব যে ভাবে সাধারণ লোকের নিকট কৃষির দেবতারূপে পূজা পাইয়াছেন, শস্যক্ষেত্রের জোঁক পোক তাড়াইয়াছেন, তন্ত্রের গুরুরূপে বশীকরণের মন্ত্র শিখাইয়াছেন, কোচদের পাড়ায় যাইয়া হাস্য-পরিহাস করিয়াছেন,—সেইরূপে 'মহাজ্ঞানের' গুরু সিদ্ধাশ্রেষ্ঠ গোরক্ষনাথেরও রাখাল বেশ ধারণ এবং গোরুর রক্ষাকর্ত্তা দেবতার পদে উন্নয়ন বিচিত্র নহে। তবে কি না একই নামে দেবতা এবং সিদ্ধা দুই জনও হইতে পারেন।

ইনি কি শ্রীকৃষ্ণ?

সিদ্ধা গোরক্ষনাথের সহিত আমাদের এই আলোচ্য গোরক্ষনাথের সাদৃশ্য কোথায় এবং সেই সাদৃশ্যের ধারা বাহিয়া আমরা কোথায় পৌঁছাইতে পারি, তাহা মোটামুটি দেখিলাম। এক্ষণে উভয়ের পার্থক্য ধরিয়া গোরুর দেবতা গোরক্ষনাথের স্বরূপ নির্ণয়ের কিঞ্চিৎ

৩৮ টক ফলবিশেষ। এই ফলের বীচি হইতে বাঁশ জন্মিতে পারে না, তবু মন্ত্রে জানি না কেন বলা হইয়াছে। ৩৯ চাষী, ৪০ লড়ি, লাঠি, পাচনবাড়ি, ৪১ বিঁধিল, ৪২ বাঁধিয়াছিলাম, ৪৩ জলা, বৃহৎ জলাশয়, এখানে মনে হয় গোরক্ষনাথ পূর্ব্ব দিকের 'জলা' পার হইয়া আসিয়াছেন।

চেষ্টা করিব। গোরক্ষনাথের মন্ত্র বা ছড়া এবং তাঁহার 'সেবার' বিধি-ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিলে গোরক্ষনাথকে অনেক সময় রাখালবেশী শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াও ভ্রম হয়। মন্ত্রের প্রথমেই বলা হইতেছে :—

"গোরক্ষনাথ দেবাদি শুন দিয়া মন
প্রথমে বন্দিয়া গাব সৃষ্টি পত্তন।"

গোরক্ষনাথকে এখানে প্রথমেই দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং বন্দনীয়দের পুরোভাগে তিনি স্থান পাইয়াছেন। মন্ত্রে তার পর দেখিতে পাই, বিষ্ণু কর্তৃক তিনি গোরুর প্রথম রাখালরূপে নিযুক্ত হইতেছেন। এই গোরু আবার সামান্য নয়—স্বয়ং বিষ্ণুর পাঁজর দিয়া গড়া, বলিতে কি তাঁহার পাঁজরেরই তুল্য। গোরক্ষনাথ রাখাল হইলেও দেবতা, বিষ্ণু তাঁহাকে যথোচিত বেশে সাজাইয়া দিলেন,—

"সোনার যষ্টি পাইল, পাইল সোনার টুপি,
ধলছত্র ঘোড়া পাইল ঠাকুর গোপী।"

লক্ষ্য করিবার বিষয় এখানে গোরক্ষনাথ 'ঠাকুর গোপী'র সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছেন। সাত দিন সাত রাত্রি গোরক্ষনাথ অনন্যমনে মাঠে মাঠে ধেনু চরাইলেন, কত যত্ন, কত পরিচর্য্যা! ঘাস জলে উহার তৃপ্তির সীমা রহিল না। কিন্তু এত যে তৃপ্তি, তৎসত্ত্বেও গোশালায় আনিবার পথে বেনুটি উচ্ছিষ্ট পত্রে (এঁঠো কলাপাতায়) মুখ দিয়া বসিল! ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া গোরক্ষনাথ উহার কুক্ষিদেশে ভীষণ এক আঘাত করিলেন এবং অভিশাপ দিলেন—

'আধ পেট ভরুক তোর আধ পেট শুটা।'

—তোর যেন কোন দিনই পেট ভর্ত্তি হয় না, চিরদিনই আধ পেট যেন খালি থাকে।

অতঃপর গোরক্ষনাথ ছয়ত্রিশ জাতির (বা) ছয়ত্রিশ রাখালের উপর গোচারণের ভার দিয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। রাখালেরা সে ভার গ্রহণ করিয়া গোরক্ষনাথকে একেবারে দেবতার আসনে বসাইল; খৈ, দৈ, নাড়ু, পান, সুপারি প্রভৃতি উপকরণে তাঁহার সেবার (পূজার) ব্যবস্থা করিল।

ময়মনসিংহের রাখালেরা ইহার পরিচয় দিতে গিয়া বলিল,

"হাতে লাঠি, মাথে (মাথায়) টুপী,
সেই সে আমার ঠাকুর গোপী।"

অথবা

"হাতে লাঠি, মাথায় টোপ
সেই সে আমার ঠাকুর গুরুখ।"

আর বিক্রমপুরবাসীরা বলিল,—

"হাতে নড়ি, মাথায় টিক
গাঙ্গের কূলে পাবেন শিক
সেই সে আমার গুরুখপীর।"

গোরক্ষনাথের এই পরিচয় আমাদিগকে গোষ্ঠবিহারী বালক শ্রীকৃষ্ণের কথাই বেশি স্মরণ করাইয়া দেয়। গোরক্ষনাথ এবং শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই দেবতা। শাস্ত্রমতে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং নারায়ণ বা বিষ্ণু; গোরক্ষনাথ তাহা না হইলেও বিষ্ণুর অতি প্রিয়পাত্র এবং তৎকর্তৃক গোরুর প্রথম রাখালরূপে নিযুক্ত। দেবতা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ যেমন বনে বনে গোরু চরাইতেন, গোরক্ষনাথও তেমনি চরাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন গোপীশ্বর, গোরক্ষনাথও 'ঠাকুর গোপী।' শ্রীকৃষ্ণ রাখাল-রাজা, তাহাদের দেবতাও বটেন; গোরক্ষনাথও তাই। প্রবাদ আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ এবং আঘাতের ফলেই গোরুর কুক্ষিদেশের এক অংশ (দক্ষিণ) কখনো পূর্ণ হয় না। পাহাড়িয়া খাসিয়াদের মধ্যে প্রচলিত আখ্যানও ইহা সমর্থন করে; তাহারা বলে, ভগবানের ক্রোধেই গোরুর উপরের মাড়ী দাঁতশূন্য এবং দক্ষিণ উদর ক্ষীণ। এখানে গোরক্ষমন্ত্রেও গোরুর কুক্ষির এক দিক নীচু থাকার কারণ গোরক্ষনাথের ক্রোধ ও আঘাত। কৃষ্ণের হাতে বাঁশী, মাথায় ময়ূরপুচ্ছ; গোরক্ষনাথের হাতে বাঁশী না থাকিলেও লাঠি (পাচন-বাড়ি) এবং মাথায় টুপি বা টোপর আছে; তিনি বাঁশী বাজান না বটে, কিন্তু নদীর তীরে তীরে শিস্ দিয়া ফিরেন।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোরক্ষনাথের সাদৃশ্য আরও স্পষ্টতর হইয়া উঠে, যখন ছড়ার মধ্যে তাঁহার আরও লীলাখেলার বর্ণনাগুলি অনুধাবন করি। ছড়ার এক স্থানে আছে :—

"খুব রানা খুব বাজে
কাইচ কড়িটি ঝুমুর বাজে
বাজে ঝুমুর বাজে তাল,
আমার গুরুখ জগৎমাল
জগৎমাল নিমি ঝোম
সোনায় বান্ধিমু পাচ টিমি···"

গোরক্ষনাথের পূজার বেদীর চারি দিকে সকলে যখন হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়ায় এবং মন্ত্রপাঠকের উচ্চারিত মন্ত্রের প্রত্যেক চরণের শেষে—বিরতিকালে 'হো হো' বা 'হাচ্চো হাচ্চো' শব্দে চিৎকার করিতে থাকে, তখন মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে, গোষ্ঠবিহারী শ্রীকৃষ্ণ নাচিতেছেন, তাহার পায়ে নূপুর, তালে তালে ঝুমুর বাজিতেছে, আর চারি দিকে শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতি রাখালেরা আনন্দধ্বনি করিতেছে।

ব্রজপুরে দধিদুগ্ধের অভাব ছিল না, তাই গোষ্ঠবিহারীর পক্ষে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া মাখন খাওয়া সহজ ছিল, কিন্তু বাংলার ঘরে সে প্রাচুর্য্য নাই; এখানকার রাখালেরা 'পান্তা' খাইয়াই গোরু চরাইতে যায়; গোরক্ষনাথকেও পান্তা ভাত বাড়িবার কালে জলের ছল্ ছল্ শব্দে উল্লসিত হইতে দেখি।—

'পান্তা ভাতে ছল ছলায়
আমার গুরখে খেইল খেলায়'

গোরক্ষনাথের নিয়মেও দেখা যায়, কোথাও কোথাও গোশালার সম্মুখে বেদী না বাঁধিয়া তুলসীতলায় বেদী বাঁধা হয় এবং গোরক্ষনাথের সেবার সঙ্গে হরি-সংকীর্ত্তনও দেওয়া হয়। এই সকল অনুষ্ঠান হইতেও বিষ্ণুর সহিত গোরক্ষনাথের সম্পর্ক স্পষ্ট হইয়া উঠে।

আমরা এই নিবন্ধের প্রথম ভাগে যে সকল সূত্র ধরিয়া গোরুর দেবতা গোরক্ষনাথকে সিদ্ধ গোরক্ষনাথরূপে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছি, সেই সকল সূত্র কোথাও ছিন্ন করিয়াও দিতে পারি। ময়মনসিংহের প্রচলিত গোরক্ষ-মন্ত্রে বা ছড়ায় বিক্রমপুরের এবং কোনও পিতাপুত্রের অনেক দুঃখকষ্টে মৃত্যুবরণের কথা থাকিলেও, বিক্রমপুরের প্রচলিত কথায় সে সব নাই।

অনতিক্রম্য

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঘুমাও এখন ঘুমাও কবি,
অনেক আজ এঁকেছ ছবি।

দূর আকাশের অস্তাচলে
যে আলোকের রশ্মি ঝলে,
চমক্ দিয়ে সাগর-জলে
থম্‌কে রবে কৌতূহলে।
যাবে না সে, যাবার আগে
বিদায় নেবে তোমায় বলে।
ঘুমাও তুমি, ঘুমাও কবি,
অনেক আজ এঁকেছ ছবি।

হাস্নুহানার ডালে ডালে
পুষ্পকলি গন্ধ ঢালে।
গন্ধরাজ আর জুঁই চামেলী—
তারাও এলো পসরা মেলি।
সাঁঝের বাতাস অন্ধকারে
এলিয়ে পড়ে গন্ধভারে।
সবাই রবে তোমার লাগি'
তারার মত রাত্রি জাগি';
যাবে না কেউ সময় হ'লে
জানিয়ে তোমায় যাবে চলে।
তুমি এখন ঘুমাও কবি,
অনেক আজ এঁকেছ ছবি।

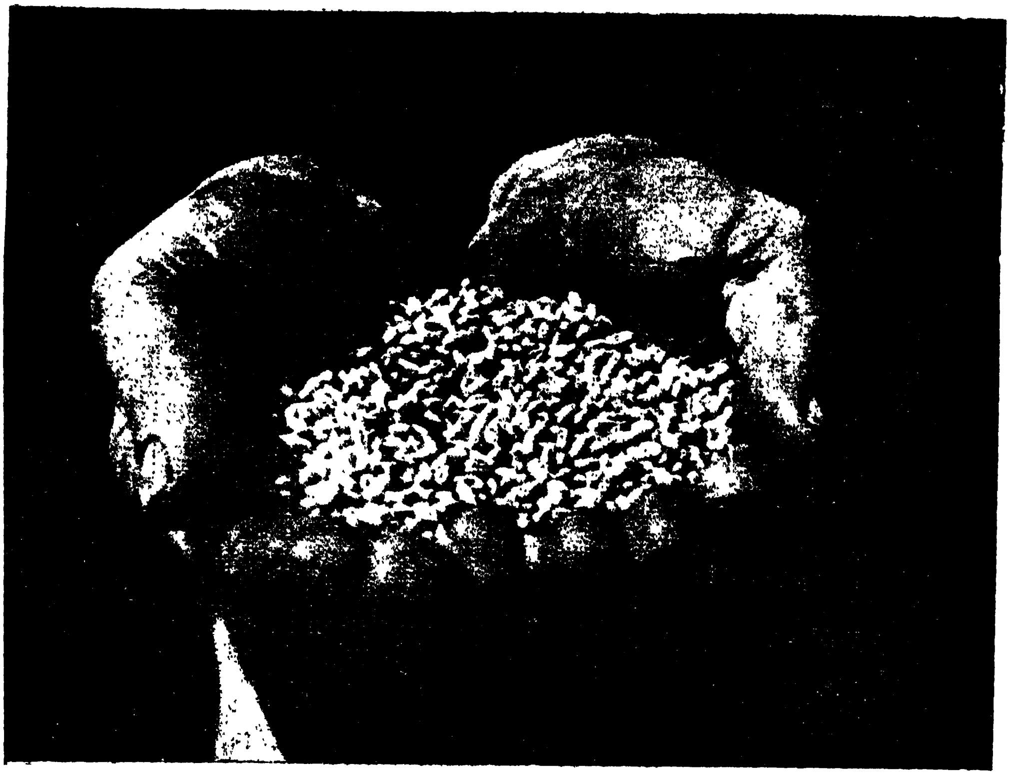
ভোরের হাওয়া ঘাসের আগায়
শিশির-ভেজা শিউলি ঝরায়।
বেদন বরণ-বৃন্ত 'পরে
শ্বেত দলের অঙ্গ-ধরে
বিশ্বদেবের চরণতলে
অঞ্জলি দেয় নয়ন-জলে।
এখনো সে শিউলি-তলে
যায়নি চলে, যাবার আগে
বিদায় নেবে তোমায় বলে।

ঘুমাও এখন ঘুমাও কবি,
নিদ্রাহারা চক্ষে বসে'
প্রিয়া তোমার, তোমার পাশে:
তার অনুরাগে নয়ন দুটি
কমল সম আছে ফুটি'।
একটুখানি ঘুমাও কবি,
যাবে না কেউ, সবাই রবে,
মনের কথা তোমায় কবে।
ঘুমাও তবে ঘুমাও কবি
অনেক আজ এঁকেছ ছবি।

"আর যাইব না বিক্রমপুর।
বিক্রমপুরিয়া কালাপানি,
বাপ থইয়া তার পুত হানি।
বাপ মরিল তার আলে ঝালে
পুত মরিল তার মরিচের ঝালে
মরিচ গাছটি আউল ঝাউল,
তার মধ্যে গুরুথ বাউল।"

মন্ত্রোক্ত এই বিক্রমপুরের মধ্যে ময়নামতী ও সিদ্ধা গোরক্ষনাথকে টানিয়া না আনিয়া এবং পিতাপুত্রকে মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদ বলিয়া কল্পনা না করিয়া সাধারণ ভাবেও ইহার অর্থ করা যাইতে পারে। বিক্রমপুর যে এক সময়ে কালাপানি অর্থাৎ সমুদ্রের মধ্যে বা তীরে ছিল, তাহা তো ঐতিহাসিক সত্য। সেখানকার লোক হয়তো খুব লঙ্কা (মরিচ) খাইত, এজন্য প্রতিবেশী ময়মনসিংহবাসীরা ঠাট্টা করিতেছে। বিক্রমপুরের মন্ত্রেও আমরা দেখিতেছি 'গোরক্ষ সেবার' 'ভাটবামূন' (মন্ত্রপাঠক) গৃহস্থের জন্য প্রার্থনা করিতেছে—'সমুদ্রে যত জল, অত গোরুর দুধ হউক" 'সমুদ্রে যত বালু, অত গোরুর পরমায়ু হউক।'—যেন সমুদ্র একেবারে চোখের সামনে রহিয়াছে। ময়মনসিংহের মন্ত্রে কিন্তু এরূপ প্রার্থনা নাই। এক সময় সমুদ্র যাহারা সর্ব্বদা দেখিত, সমুদ্রের বালুচরে খেলাধূলা করিত, তাহাদের পক্ষেই এরূপ প্রার্থনা সম্ভবে। এই অর্থ গ্রহণ করিলে গোরুর দেবতা গোরক্ষনাথের উৎপত্তি আমরা সিদ্ধা গোরক্ষনাথের যুগের বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে লইয়া যাইতে পারি। কারণ সিদ্ধা গোরক্ষনাথের আবির্ভাব কালে বিক্রমপুর সমুদ্রের তীরে ছিল না, সমুদ্র তখন বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে।

আর 'ঠাকুর গোপী' গোপীচাঁদের অপভ্রংশকৃত সংস্করণ না হইয়া গোপীশ্বর শ্রীকৃষ্ণও যে হইতে পারেন তাহা আমরা বলিয়াছি। 'গুরুথ বাউল' শব্দটির স্থলে কেহ কেহ 'গুরুথ মাউল'ও বলিয়া থাকেন। 'মাউল' শব্দ মাল শব্দেরই বিকৃতি হইতে পারে।



দি গুড্ আর্থ

শিশির সেনগুপ্ত

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

২১

কমলিনী ও তার দাসী কোকিলার ওয়াঙের সংসারে আসায় যে কোন শান্তিভঙ্গ হবে না বা বিরোধ ঘনিয়ে উঠবে না এ আশা করাই অন্যায়, কেন না এক ছাতের নীচে দু'জন মেয়েমানুষ কোন দিনই শান্তি নিরঙ্কুশ রাখতে পারে না। কিন্তু ওয়াঙ এ সম্ভাবনাকে পূর্বে অনুভব করতে পারেনি। ওলানের বিরস চাউনি আর কোকিলার কর্কশতার ফলে সে বুঝেছিল যে কোথাও কিছু বিচ্যুতি ঘটেছে কিন্তু সেদিকে সে নজর দিল না। নিজের কামনার তীব্রতা যত দিন রইল তত দিন সে কিছুকেই আমল দিল না।

দিন গড়িয়ে রাত্রি নামে। প্রভাতের আলোয় রাত্রিও খান-খান হয়ে যায়। সূর্য ওঠে, ওয়াঙ চেয়ে দেখে তার কমলিনী তার কাছেই আছে। চাঁদের রাত আসে, হাত বাড়ালেই ওয়াঙ তার প্রিয়তমাকে পায়। দিনে দিনে ওয়াঙের মোহ কমে আসে। যা এত দিন চোখে পড়েনি, ধীরে ধীরে দৃষ্টিতে সে সব স্বচ্ছ হয়ে ধরা পড়তে লাগল।

ওলান আর কোকিলার মধ্যে যে সুরু থেকেই বিরোধ বেধেছে এ দেখতে পায় ওয়াঙ। এতে আশ্চর্য হয় সে। ওলান যে কমলিনীকে ঘৃণা করতে পারে এ স্বাভাবিক। ওয়াঙ অনেক শুনেছে যে, স্বামী বাইরের স্ত্রীলোক ঘরে এনে ঢোকালে বৌরা কড়িকাঠের সঙ্গে দড়ি বেঁধে আত্মঘাতী হয়, কেউ কেউ স্বামীকে গঞ্জনা দেয়, নয়ত স্বামী যা করেছেন তার শাস্তিস্বরূপ তার জীবনকে জ্বালিয়ে দিতে নানা পথ খোঁজে। নিঃশব্দচারিণী ওলান যে তাকে কোন কথায় গঞ্জনা দেবে না এই আশায় অন্ততঃ নিশ্চিন্ত ছিল ওয়াঙ। কিন্তু সে একটু ভুল করেছিল, কমলিনী সম্বন্ধে ওলান নিঃশব্দ হতে পারে কিন্তু কোকিলার বিরুদ্ধে সে বিষোদ্গার করতে ছাড়বে না।

কমলিনী অনুনয় করে বলেছিল ওয়াঙকে, 'একে আমার দাসী করে নিয়ে যেতে দাও। হাঁটতে শেখবার আগেই আমার মা-বাবা মারা গেছলেন, সংসারে আমি একা পড়েছিলাম। এমনি ধারা করবার জৌলুষ আসতেই শরীরে, কাকা আমায় বেচে দিয়েছিলেন। আমার নিজের বলতে কেউ কোথাও নেই'।

অশ্রুজল অজস্র ধারায় ঝরে পড়ার জন্য সর্বদাই তৈরী থাকে কমলিনীর। কথাগুলি বলতে বলতেই এবারও তার স্নিগ্ধ চোখের কোণ থেকে অশ্রু টলে পড়তে লাগল। সেই অশ্রুভেজা চোখ তুলে তাকানো দেখলে ওয়াঙ তার নতুন প্রিয়াকে কিছু দিতে না করতে পারে না। বিশেষতঃ তার কোনো দাসী নেই। তার সংসারে মেয়েটি যে কত একা হবে সে কথা ভাবলে ওয়াঙ। ওলান যে স্বামীর এই স্ত্রীলোকটিকে সেবা করবে এ আশা করে না ওয়াঙ, হয়ত ওলান তার সঙ্গে কথাই কইবে না, সে যে বাড়িতে আছে তা হয়ত চোখ তুলে দেখবেও না। কমলিনীর কাকা আছেন অবশ্য, কিন্তু সে যে কমলিনীর আশে-পাশে ঘুরে তারই সম্বন্ধে আলোচনা করবে এ ওয়াঙের মেজাজের বাইরে। অন্য কোন এমন মেয়েমানুষের কথা ওয়াঙ জানে না, যে কমলিনীর দাসী হতে পারবে। সুতরাং কোকিলাকেই তার ভাল মনে হোল।

কোকিলাকে দেখে ওলানের ভিতর যে এমন আক্রোশ গর্জে উঠবে এ ভাবতে পারেনি ওয়াঙ। ভাবতে পারেনি যে ওলানের

শরীরে এত রাগ ছিল। কোকিলা বরং ওলানের সখী হতে চাইলে। সে জানে তার মাইনে দেবে ওয়াঙ, তাছাড়া কোকিলা ভুলতে পারলে না যে, বড়-বাড়ীতে সে থাকত কর্তাদের খাস-কামরায় আর ওলান ছিল রান্নাঘরের দাসী, বহুর মধ্যের এক।

ওলানকে দেখতে পেয়েই কোকিলা তাকে ডেকে বললে—'পুরানো দোস্ত, আবার এক বাসায় আমাদের মিল হোল। এবার তুমি বাড়ীর গিন্নী, তুমিই প্রথম রাণী, আমার গিন্নী-মা। দুনিয়ার হাল কত বদলেছে।'

ওলান এই মেয়েটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার পর এ সংসারে তার নিজের জায়গাটির কথা মনে পড়াতে সে জলের ঘড়া নামিয়ে মেয়েটিকে কোন জবাব না দিয়ে সোজা মাঝের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। নতুন প্রেমের অবকাশ-মুহূর্তগুলি এই ঘরে ওয়াঙ কাটায়। স্বামীকে গিয়ে বললে ওলান—'এই বাঁদীটা বাড়ীতে কি করছে শুনি।'

ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে দেখলে ওয়াঙ। মনিবের মত রূঢ় গলায় তার চীৎকার করতে ইচ্ছে হোল—'আমার বাড়ীতে যাকে আসতে বলব সেই আসবে। ও যদি থাকে তোমার কথা কইবার কি আছে?' কিন্তু, ওলানের সাক্ষাতে সে কথা বলতে তার লজ্জা হোল আর সেই লজ্জায় রাগও হোল মনে। যার খরচ করার পয়সা আছে সে যা করে তার চেয়ে বেশী কিছু সে ত করেনি, সুতরাং মনে মনে বিচার করে লজ্জার কোন কারণ খুঁজে পেলে না ওয়াঙ।

সুতরাং কথা না কয়ে এদিক্ সেদিক্ চেয়ে ওয়াঙ এমন ভাব দেখালে যেন সে পোষাকের ভেতর তার পাইপটি হারিয়ে ফেলে খুঁজছে। কিন্তু ওলান নড়ে দাঁড়াল না, অপেক্ষা করতে লাগল। যখন দেখলে স্বামী কথা কইছেন না, তখন আবার সোজা বললে—'বাঁদীটা এ বাড়ীতে কি করছে শুনি না।'

জবাব না নিয়ে বৌ নড়বে না দেখে ওয়াঙ নরম গলায় বললে—'তাতে তোমার কি?'

ওলান বললে—'বড়-বাড়ীতে ঐ বাঁদীটার দম্ভের চাউনি আমি অনেক সয়েছি। দিনের মধ্যে বিশ বার সে রান্নাঘরে ছুটে ছুটে আসত, চেঁচিয়ে মরত—'এবার কর্তার চা', 'এবার কর্তার খাবার'। তা ছাড়া এটা বড় গরম, ওটা বরফ ঠাণ্ডা, সেটার রান্না মোটেই ভাল নয়। আমি ত ছিলাম কুচ্ছিৎ, কুঁড়ে আরও কত কি···।'

কি জবাব দেবে না বুঝে ওয়াঙ চুপ করে রইল।

স্বামীর মুখের জবাব না পেয়ে ওলানের দু'টি চোখে তপ্ত অশ্রু ভরে উঠতে লাগল। কান্না সামলাতে চোখ দু'টি পিট-পিট করে শেষে নীচে ঝোলা জামার খুঁট তুলে চোখ মুছে ওলান বললে—'নিজের বাড়ীতে এ রকম হলে সংসার বড় তেতো হয়ে যায়। মাও নেই যে তার কাছে চলে যাব।'

স্বামী বসে পড়ে আবার পাইপ ধরালেন, কথা কইলেন না একটিও দেখে ওলান স্বামীর দিকে বিষণ্ন চোখে চাইলে। পশু-চোখের বোবা দৃষ্টি দিয়ে স্বামীকে দেখলে ওলান। অশ্রুজলে রুদ্ধদৃষ্টি ওলান হাতড়ে হাতড়ে ঘরে থেকে বেরিয়ে গেল।

বৌ চলে গেল চেয়ে দেখলে ওয়াঙ। নিজেকে একাকী পেয়ে সে খুসীই হোল। তবু নিজের মনে যত লজ্জা হতে লাগল, সেই লজ্জার জন্যে তত রাগও হোল। যেন কার সঙ্গে সে ঝগড়া করছে এমনি অশান্ত হয়ে বক-বক করতে লাগল সে নিজের মনে—'তবু আমি কত ভাল ব্যবহার করি ওর সঙ্গে। কত লোক কত বদমায়েস হয়। ওলানকে এ-সব সহ্য করতেই হবে।'

কিন্তু ওলান সহজে শেষ হতে দিল না। কেবল নিঃশব্দে নিজের কাজ করতে লাগল। রোজকার মত সকালে সে শ্বশুরকে গরম জল দিত, স্বামী ভেতর মহলে না থাকলে তাকে চা দিয়ে আসত। কিন্তু কোকিলা যখন নতুন কর্ত্রীর জন্যে গরম জল নিতে আসত তখন কড়া শূন্য। ওলান তার কোন চড়া কথাতেই সায় দিত না। তখন নিজে আবার জল ফুটিয়ে নেওয়া ছাড়া কোকিলার আর পথ থাকে না। ততক্ষণে ওলান সকালের রান্না চাপিয়েছে; আরো জল ফুটিয়ে নেবার জায়গা নেই কড়ায়। কোকিলা যতই চেঁচায়, ওলান সাড়া না দিয়ে তার রান্না করে যায়।

'সকালে ঘুম ভেঙে উঠে আমাদের চিকন-বৌ বিছানায় শুয়ে এক ফোঁটা জলের জন্যে ছাতি শুকিয়ে থাকবে না কি?'

ওলান এ সব কথা শুনতে পায় না। পুরানো দিনের মিতব্যয়ী কুশলী হাতে সে খড় ঘাস উনুনে ছড়িয়ে দেয়। রান্না হবে যা দিয়ে সেই ঘাসপাতা একটিরও যে দাম অনেক। কোকিলা ওয়াঙের কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে নালিশ জানায়। এই সব সামান্য ব্যাপারে তার ভালবাসায় কাঁটা দেবে, এতে রেগে আগুন হয় ওয়াঙ। ওলানের কাছে গিয়ে তাকে তিরস্কার করে সে বললে—'সকাল বেলা কড়ায় আর একটু বেশী জল দিতে পার না?'

মুখের অপ্রসন্নতার চেয়েও গম্ভীর বিষণ্ণতার সঙ্গে ওলান জবাব দেয়—'এ বাড়ীতে অন্ততঃ আমি কারও বাঁদীর বাঁদী নই।'

রাগ সামলাতে পারে না ওয়াঙ। ওলানের কাঁধে জোরে ঝাঁকানি দিয়ে বলে—'বোকার মত কথা বোলো না। বাঁদীর জন্য নয়, নতুন বৌয়ের জন্যে বুঝলে?'

স্বামীর জুলুম সহ্য করলে ওলান। তার দিকে তাকিয়ে তেমনি সহজ কণ্ঠে বললে—'ওকেই ত আমার মুক্তো দু'টো দিয়েছিলে।'

স্ত্রীর কাঁধ থেকে হাত দু'টি খুলে পড়ল ওয়াঙের, নির্বাক্ হয়ে গেল সে। রাগ নিবে গেল। গভীর লজ্জায় ওয়াঙ সরে গিয়ে কোকিলাকে বললে—'আলাদা উনুন আর রান্নাঘর তৈরী করাব আমি। নতুন বৌয়ের ফুলের মত শরীর ঠিক রাখতে যে সব যত্নের দরকার তা বড় বৌ কিছুই জানে না। তা ছাড়া তোমারও শরীর রাখার জন্যে, তুমি সেখানে যা খুসী রান্না কোরো, জানো।'

নিজেকে বোঝালে ওয়াঙ, যাক্ সব মিটে গেল। এত দিনে মেয়েগুলি স্বস্তি পেলো। তার ভালবাসায় আর বাঁটা রইল না। কমলিনীর সঙ্গে প্রেমের খেলায় তার কোন শ্রান্তি আসবে না এ বোধ আবার নূতন করে হোল ওয়াঙের। ডাগর চোখের পাতা লিলি ফুলের পাপড়ির মত নত করে যখন কমলিনী ঠোঁট ফোলায়, তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে কমলিনীর দু'টি চোখে হাসি যে ভাবে উথল হয়ে ওঠে, তা দেখে আর ক্লান্ত হবে না ওয়াঙ কোন দিন।

কিন্তু এই নতুন রান্নাঘর ওয়াঙের শরীরে কাঁটার মত বিঁধে রইল। কোকিলা বাজারে যায়, দক্ষিণ দেশ থেকে আমদানী করা দামী দামী খাবার জিনিষ কিনে আনে রোজ। কোন দিন যার নাম শোনেনি সেই সব খাদ্যবস্তু আনে। ইচ্ছার অতিরিক্ত পয়সা লাগে এ সব কিনতে। যদিও কোকিলা তাকে বলে যে, এতে তত বেশী

পয়সা লাগে না। 'তোমরা আমার মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছ' এ কথা ওয়াঙ ভয়ে বলতে পারে না, পাছে এতে কোকিলা দুঃখ পায়, পাছে কমলিনী অসুখী হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোমরবন্ধনী থেকে পয়সা বার করে দেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না ওয়াঙের। দিন-রাত্রি এই কাঁটা খচ-খচ করে। এ অসন্তোষ জানাইার লোক না থাকাতে এ কাঁটা দিনে দিনে শরীরের গভীর অন্তর্দেশে বিঁধতে থাকে। কমলিনীর প্রতি তার ভালবাসার তাপ এই কারণে কমে আসে।

এ ছাড়া সুরু থেকেই আরো একটি ছোট কাঁটা তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। ভালো খাবারের লোভে তার খুড়ী খাবার সময় এই মহলে এসে আস্তানা নেন। এখানেই তিনি বেশী স্বাধীন। ওয়াঙ কিছুতেই সুখী হতে পারে না যে তার পরিবারের সকলকে বাদ দিয়ে এই খুড়ীটিকেই কমলিনী তার ভাবের লোক পছন্দ করেছে। মেয়েমানুষ তিনটি অন্দরে খায় ভাল, অবিশ্রান্ত বক-বক করে, ফিস-ফিস করে আর হাসে। খুড়ীর কি একটি জিনিসকে কমলিনী যেন বেশী পছন্দ করে! তিনটিতে সুখে থাকে। সব ব্যাপারটা ওয়াঙ ভাল চোখে দেখে না।

কিন্তু কিছু করা যায় না। বেশ আদর করে ওয়াঙ যখন বলে—'ঐ বুড়ীটার ওপর তোমার অত মধু ঢেলে দিচ্ছ কেন সোনা? তোমার ঐ ভালবাসা আমি যে চাই গো। কি জান আমার খুড়ীটি মস্ত চাতুরীবাজ, অবিশ্বাসী। আমি, চাই না যে ভোর থেকে রাত অবধি ও তোমার সঙ্গে থাকে।'

ওয়াঙের কাছ থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে কমলিনী ঠোঁট ফুলিয়ে রাগ করে জবাব দেয়—এ বাড়ীতে আমার আপনার বলতে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। এ বাড়ীতে আমার একটিও বন্ধু নেই। ছেলেবেলা থেকে হাসি-খুসী বাড়ীতে আমার কেটেছে। আর তোমার বাড়ীতে থাকবার মধ্যে তোমার বড় বৌ, সে ত আমাকে ঘেন্না করে, আর তোমার ছেলে-মেয়েদের দেখলে আমার আতংক হয়। নিজের ছেলে-মেয়ে ত আমার নেই।'

সেই সঙ্গে কমলিনী তার পাশুপত প্রয়োগ করে। সে রাত্রে তার ঘরে ওয়াঙকে আসতে দেয় না, অভিযোগ করে বলে—'তুমি ত আমায় ভালবাস না। যদি বাসতে, আমার যাতে সুখ হয় তাই তুমি করতে।'

ওয়াঙ শুধু যে জিদ ছাড়লে তা নয় সে হার মানলে। আফশোস কণ্ঠে নিয়ে সে বললে—'তাই হবে। তোমার ইচ্ছাই চলবে চিরদিন।'

রাণীর মহিমায় কমলিনী তাকে মার্জনা করলে। এর পর থেকে হয়ত ওয়াঙ যখন এল তখন কমলিনী খুড়ীর সঙ্গে বসে চা খাচ্ছে, অথবা গল্প করছে, ওয়াঙকে সে অপেক্ষা করতে বলে, তার সম্বন্ধে অমনোযোগ দেখায়। রাগে গর-গর করতে করতে চলে আসে ওয়াঙ, বোঝে যে কমলিনী চায় না যে অন্য স্ত্রীলোক কাছে থাকতে ওয়াঙ তার কাছে যায়। নিজে জানতে পারে না বলে কিন্তু ওয়াঙের মনে ভালবাসা ঝিমিয়ে আসতে থাকে।

তার খুড়ী যে কমলিনীর জন্যে আনা ভাল খাবার খেয়ে আগের চেয়ে মোটা আর তৈলাক্ত হচ্ছেন এতে ওয়াঙের রাগ হয়। কিন্তু খুড়ী চালাক মেয়েমানুষ। ওয়াঙকে তিনি মিষ্টি কথা বলে খোসামোদ করেন, ওয়াঙ ঘরে ঢুকলে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে খাতির করেন।

সারা দেহ-মন আচ্ছন্ন করা তার যে গভীর ভালবাসা কমলিনীর প্রতি ছিল আগের মত আর তার চারুতা অখণ্ড রইল না। মনের ছোট ছোট উপায়হীন আক্রোশে সে চারুতা শতচ্ছিদ্র হতে লাগল। রাগ এই কারণে যে ওলানের কাছে গিয়েও সে নিজের দুঃখের কথা জানাতে পারে না। ওলানের সঙ্গে তার যে জীবন তা যেন চিরদিনের মত চুরমার হয়ে গিয়েছে।

এক শিকড় থেকে জন্ম নিয়ে কাঁটার গুল্ম যেমন মাঠের হেথা-সেথা ছড়িয়ে পড়ে তেমনি ভাবে ওয়াঙের মনের শান্তি নষ্ট করবার আরও কারণ ঘটল। বৃদ্ধ বাপ বয়সের ভারে শুধু বসে বসে ঝিমোন, কিছুই দেখেন না মনে হয়, তিনি এক দিন হঠাৎ রোদে বসে ঘুমানো ছেড়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন। সত্তর বছর বয়স হোল যখন ওয়াঙ তাকে ড্রাগনের মাথা বসানো যে লাঠিটা কিনে দিয়েছিল তার উপর ভর দিয়ে তিনি এগিয়ে এলেন যে দিকে কমলিনীর বেড়ানোর উঠোন আর বড় ঘরের মধ্যে দুয়ারে পর্দা ঝোলে। এই দরজাটি আগে কখনো দেখেননি তিনি, জানতেনও না যে এখানে আর একটা উঠোন হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ পুরানো বাড়ীর কোথাও কোন বদল হচ্ছে তাই তিনি জানতেন না। ওয়াঙ তাকে কোন দিন বলেনি—'আমি আর একটি বৌ এনেছি ঘরে।' কারণ বধির বৃদ্ধ নিজের পরিচিত গণ্ডী অথবা নিজের কল্পনার বাইরে কোন নূতন সংবাদ শুনলেও বুঝতে পারেন না।

ঘটনাচক্রে সেদিন এই দরজাটি দেখে সেদিকে এসে পর্দাটা সরিয়ে ফেললেন। সন্ধ্যার সময় তখন ওয়াঙ কমলিনীকে নিয়ে সেখানে বেড়াচ্ছে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কমলিনী দীঘিকায় দেখছিল মাছ আর ওয়াঙ দেখছিল তার প্রিয়াকে। ছেলেকে তন্বী একটি চিত্রিতা স্ত্রীলোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বৃদ্ধ তাঁর ভাঙা নিখাদ স্বরে চীৎকার করে বললেন—'এ বাড়ীতে বেশ্যা'!

পাছে কমলিনী রাগ করে, কারণ এই ছোট্ট প্রাণীটি চীৎকার করে ককিয়ে দু'টি হাত জড়ো করে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে এমন কাণ্ড বাধাবে, এই ভয়ে ওয়াঙ বাপকে বাইরের উঠোনের দিকে নিয়ে যেতে যেতে যত বোঝাতে লাগল,, বাপ কিছুতেই শান্ত হলেন না।

ওয়াঙ বাপকে বোঝায়—'শান্ত হোন বাবা! ও বাইরের মেয়ে মানুষ নয়—ও এ বাড়ীর নতুন বৌ।'

বৃদ্ধ সে কথা শুনলেন কি শুনলেন না তা কেউ জানল না, তিনি শুধু বার বার চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন—'সঙের মেয়েমানুষ ঘরে ঢুকেছে।' হঠাৎ যেন ছেলেকে পাশে দেখে তিনি বললেন—'তোমার বাপ একটি স্ত্রীলোক নিয়ে ঘর করেছে। তামার ঠাকুর্দাও তাই। আমরা চাষ করে খেয়েছি' একটু বিশ্রাম নিয়ে তিনি আবার বললেন—"আমি বলছি ও পথের স্ত্রীলোক।'

বার্দ্ধক্যের সচকিত তন্দ্রা ভেঙে বৃদ্ধ যেন জেগে উঠলেন কমলিনীর উপর একটা নিপুণ ঘৃণা দিয়ে। সেই দরজার ধারে দাঁড়িয়ে তিনি হঠাৎ চেঁচিয়ে বলেন শূন্য—'বেশ্যা।'

অথবা হয়ত পর্দা সরিয়ে তিনি মেঝের ওপর সজোরে থুতু ফেলেন। ছোট ছোট নুড়ি পাথর কুড়িয়ে এনে তিনি উঠোনের মাছের চৌবাচ্চায় ছুঁড়ে মাছগুলিকে সন্ত্রস্ত করতেন। দুষ্টু ছেলের মত এই ভাবে প্রকাশ করেন নিজের অভিযোগ।

ওয়াঙের সংসারে অশান্তি এল এই কারণে। বাপকে ভৎর্সনা

করতে তার লজ্জা হয় অথচ কমলিনীর রাগকে সে ভয় করে। এই সুন্দরী মেয়েটির ভেতর যে হঠাৎ জ্বলে ওঠা রাগ আছে তা সে জানে, আর সেই রাগ হওয়া নিবারণ করতে বাপকে সরিয়ে সরিয়ে রাখার উদ্বেগ তার পক্ষে ক্লান্তিকর আর সেই ক্লান্তিই তার নিশ্চিন্ত প্রেমের পথে অন্তরায় হতে লাগল।

এমনি এক দিন ভিতরের উঠোন থেকে কমলিনীর কণ্ঠের আর্ত চীৎকার শুনে ওয়াঙ ছুটে গিয়ে দেখলে যে তার দু'টি যমজ ছেলে-মেয়ে বড় বোবা মেয়েটিকে সেখানে নিয়ে গিয়েছে। ওয়াঙের চারটি ছেলে-মেয়েই ভেতর-মহলের এই মানুষটির সম্বন্ধে কৌতূহলী। বড় ছেলে দু'টি অবশ্য ব্যাপারটা বোঝে তাই তারা লজ্জাও পায়। এ মেয়েটি কেন এখানে এসেছে, বাপের সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক এ সবই তারা জানে, তাই দুই ভাই নিজেদের মধ্যে গোপনে ফিসফিস করে শুধু। কিন্তু ছোট দু'টির কৌতূহল মেটে না এই ভাবে উঁকি-ঝুঁকি মেরে, অথবা তার গন্ধ-বাষ্পের সুরভি নাকে নিয়ে অথবা তার খাওয়ার পর দাসী যখন বাসন নিয়ে যায় তাতে কচি কচি আঙুল ডুবিয়ে।

বহু বার কমলিনী বলেছে যে ওয়াঙের ছেলেমেয়েগুলি তার কাছে বিষ। তার ইচ্ছে এ-মহলে তাদের আসতে না দেওয়া। কিন্তু ওয়াঙ তাতে রাজী হতে পারেনি। কৌতুক করে ওয়াঙ বলত—

'এই সোনা-মুখ দেখতে তাদের বাপ যত ভালবাসে তা দেখতে ওয়াঙ তত ভালবাসে।'

ছেলেগুলিকে এ-মহলে আসতে বারণ করা ছাড়া আর কিছুই করেনি ওয়াঙ। বাপের সামনে তারা আসেও না কিন্তু বাপের অলক্ষিতে তারা লুকিয়ে এ-মহলে আসা-যাওয়া করে। শুধু বোবা মেয়েটি এ সবের কিছুই খোঁজ রাখে না, সে শুধু বাইরের উঠোনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রোদে বসে পাকানো ত্যাকড়া নিয়ে খেলা করে আর হাসে।

সেদিন বড় ভাই দু'টি স্কুলে গেছে। ছোট যমজ দু'টি নিজেদের মধ্যে ঠিক করে যে এই বোকা মেয়েটারও নতুন মানুষকে দেখা উচিত। সুতরাং তারা তাকে টেনে এনেছে একেবারে কমলিনীর সামনে। সেইখানে দাঁড়িয়ে বোকা মেয়েটি এই মানুষটিকে দেখে। কমলিনীর পরণের উজ্জ্বল সিল্কের কোট আর কানের ঝকঝকে পাথরের দিকে চোখ পড়তেই একটা কি বিচিত্র আনন্দ জাগে সেই বোকা বোবা মেয়েটির মনে। সেই উজ্জ্বল রত্নটি ধরবার জন্যে সে হাত দু'টি বাড়িয়ে দিয়ে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। সে হাসি শুধু ধ্বনি তার কোন বাণী নেই। সে হাসি শুনে কমলিনী ভয়ে চীৎকার করতে সুরু করল। ওয়াঙ যখন ছুটে এল তখন কমলিনী রাগে কাঁপছে আর ছোট ছোট পায়ে লাফাচ্ছে। ওয়াঙকে দেখেই সে ছোট্ট হাসি-মাখা মেয়েটির দিকে আঙুল নাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল—"ও যদি আমার কাছে আসে আমি আর এক দণ্ডও এ বাড়ীতে থাকব না। এই সব হতভাগাদের সইতে হবে কখনো জানতুম না, যদি জানতুম কখনো এ বাড়ীতে আসতাম না। যত সব নচ্ছার ছেলে-মেয়ে তোমার।' বোনটির হাত ধরে ছেলেটি হাঁ করে কাছেই দাঁড়িয়েছিল তাকে ঠেলে দিলে কমলিনী।

এত দিনে ওয়াঙের মনে জাগল সেই সত্যিকার ক্রোধ। ছেলে-মেয়েদের সে ভালবাসে, তাই সে কর্কশ গলায় বললে—'আমার ছেলে-মেয়েদের কেউ গাল-মন্দ করছে সে আমি শুনব না। এই অভাগিনী মেয়েটাকেও নয়। তুমি দেবে গালমন্দ যে তুমি কোন পুরুষের জন্যে কোন দিন পেটে ছেলে ধরবে না, তোমার মুখ থেকে ত নয়ই।' সব ক'টিকে এক করে ওয়াঙ তাদের বললে—'তোরা সব যা এখান থেকে আর কোন দিন এখানে আসিসনি। এই মেয়েটা তোদের ভালবাসে না, আর তোদের ভালবাসে না বলে তোদের বাপকেও ভালবাসে না।' বড় মেয়েটিকে সে আদর করে বললে—"হতভাগী মেয়ে আমার! চ' মা রোদে বসবি।' বাপের কথায় মেয়েটি হাসল। ওয়াঙ তার কচি হাত ধরে নিয়ে গেল

কমলিনী যে তার এই মেয়েটিকে গাল দিতে সাহস করেছে সেই কারণে ওয়াঙ রাগে আগুন হোল। এই অভাগী মেয়েটির প্রতি স্নেহে তার পিতৃ-হৃদয় বেদনায় টন-টন করে উঠল। পুরো আড়াই দিন ওয়াঙ কমলিনীর কাছেও গেল না, ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলা করে কাটালে। সহরে গিয়ে মেয়েটির জন্যে বার্লির মেঠাই এনে দিলে। মিষ্টি চটচটে খাবার পেয়ে মেয়েটির যে ছেলেমানুষী আনন্দ তাই দেখে সান্ত্বনা পেল মনে।

ওয়াঙ যখন আবার কমলিনীর কাছে গেল দু'জনের মধ্যে কেউই গত দু'দিনের কথা বললে না। শুধু কমলিনী তাকে খুসী করার চেষ্টা করতে লাগল। ওয়াঙ যখন হাজির হোল তখন খুড়ী বসে চা খাচ্ছিলেন সেখানে। কমলিনী তাঁকে বললে—'উনি এসেছেন আমার ঘরে। ওঁর ইচ্ছা-মত কাজ করাই ত আমার সুখ।' খুড়ী যতক্ষণ গেলেন ততক্ষণ কমলিনী দাঁড়িয়ে রইল।

ওয়াঙের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার হাত দু'টি কমলিনী তার মুখের উপর নিয়ে সোহাগ জানালে। ওয়াঙ তাকে আবার ভালবাসল, কিন্তু ভালবাসা তত গভীর নয়, যত ভালবাসত তত নয়ই।

তার পর গ্রীষ্ম শেষে একটি দিন এলো। সেদিন ভোর বেলাকার আকাশ ঝকঝকে, সে আকাশের বর্ণ সমুদ্রের মত নীল। শরতের ধূলিহীন বায়ু মাঠের উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। ঘুম থেকে যেন জেগে উঠল ওয়াঙ। বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওয়াঙ তার মাঠের দিকে তাকালে। জল সরে যাবার পর তার জমির মাটী শুয়ে আছে উজ্জ্বল রৌদ্র আর শীতল শুষ্ক বাতাসের স্নেহে।

তার নারীপ্রেমের চেয়েও গভীর কোন ডাক যেন তাকে তার জমির কথা স্মরণ করিয়ে দিলে। জীবনের অন্য সব আহ্বানের চেয়ে বড় এই ডাক ওয়াঙ কান পেতে শুনলে। ঢিলে লম্বা জামা ছিঁড়ে খুলে ফেললে ওয়াঙ, খুলে ফেললে তার ভেলভেটের জুতো আর সাদা মোজা, জানুর উপর অবধি পাৎলুন গুটিয়ে নিয়ে ওয়াঙ বলিষ্ঠতায় ঋজু হয়ে দাঁড়াল। দুরন্ত উৎসাহে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করে বললে—'কোদাল আর লাঙল কোথায়? গম বুনবার বীজ কই? চল চীং, দোস্ত আমার, চলো। লোকজনকে সব খবর দাও—আমি চললাম মাঠে।'

[ক্রমশঃ

বিজ্ঞান জগৎ

উইলিয়াম ম্যাক্‌ডুগালের মনোবিজ্ঞান

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যে সমস্ত গবেষণাকারী ও নেতারা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁদের মধ্যে মার্কিণ অধ্যাপক উইলিয়ম ম্যাক্‌ডুগালের নাম ও তাঁর প্রবর্তিত এষণাবাদী মনোবিজ্ঞান (Hormic Psychology বা Purposivism) সম্ভবতঃ আমাদের সাধারণ জনসমাজে প্রায় অপরিচিত। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো ম্যাক্‌ডুগালের মনোবিজ্ঞানও জন্ম নিয়েছিলো বিদ্রোহের মাঝ দিয়ে। বিশুদ্ধ চেতনা বা সচেতন মনের বিশ্লেষণ ও আলোচনা নিয়ে থাকাই যে মনোবিজ্ঞানের একমাত্র কর্ত্তব্য ও সার্থকতা—গত যুগের এই মতবাদ ম্যাক্‌ডুগাল অস্বীকার করলেন। মানুষ শুধু মাত্র ব্যক্তিগত মানুষ নয়; তার প্রত্যেক আচরণ ইত্যাদির একটি সমষ্টিগত সামাজিক তাৎপর্য বা মূল্য আছে। কাজেই তার সম্বন্ধে যে-কোনো আলোচনাই হোক না কেন, সেই আলোচনাকে পরিচালিত ক'রতে হবে, এই দিক থেকে। মানুষের আচরণ, কর্ম, ব্যবহার ইত্যাদি যা' নাকি গ'ড়ে ওঠে ব্যক্তিগত মানুষ ও সমষ্টিগত সমাজের সংযোগ ও প্রতিক্রিয়ার ফলে, তার মূল-স্বরূপ নির্ণয় করাই হ'লো মনোবিজ্ঞানের কর্ত্তব্য। চেতনার বিশ্লেষণ; আত্মা ও মনের সম্বন্ধ; কাল ও দেশের প্রত্যয় ইত্যাদি নানা প্রকার তত্ত্ব প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান হ'লেও তারা এক অর্থে অর্থহীন; কেন না, সেই বিশুদ্ধ তত্ত্বকে যদি মানুষের বৃহত্তর জীবনে কার্যকরী করা না যায় তবে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ। ম্যাক্‌ডুগাল তাই বলেন যে, বিশুদ্ধ তত্ত্বকে বাদ দিয়ে, তার থেকে সংকলিত যে-সমস্ত নীতি সামাজিক মানুষের পরস্পর সম্বন্ধ আচরণ ব্যবহার ইত্যাদি বুঝতে সাহায্য করবে, এবং যার দ্বারা সমগ্র সমাজ-জীবনকে বিভিন্ন অবস্থার মাঝ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা চলবে, মনোবিজ্ঞানের চর্চায় তাদেরই স্থান হওয়া উচিত সর্বাগ্রে। এর জন্যে আমাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন মানবজীবনে কর্মের মূল উৎস অনুসন্ধান করা। মানুষের সমস্ত দৈহিক ও মানসিক কর্মের প্রেরণা জোগায় ও সমগ্র আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে, মানব-জীবনে এমন কোনো মৌলিক কিছু আছে কি না, এবং থাকলে তা' কি—এই হ'লো ম্যাক্‌ডুগালের মনোবিজ্ঞানের গোড়া'র প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা গেলো যে, মানুষের জীবনে সব কিছুর মূলে র'য়েছে কতকগুলি প্রবণতা (instinct বা tendency) এরা স্বভাবতঃই মৌলিক ও সহজাত (innate) এবং সমস্ত কর্ম আচরণ ইত্যাদির মূল উৎস হ'লো এরাই। এই সহজ ও অকৃত্রিম উৎস থেকে উৎসারিত হ'য়ে এরাই বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের মাঝ দিয়ে ক্রমে ক্রমে জটিলতর বুদ্ধি, চিন্তা ও অন্যান্য উন্নত বৃত্তিসমূহে রূপ নেয়। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের কোন আচরণ, কর্মই অন্ধ উদ্দেশ্যহীন নয়। প্রত্যেক আচরণ, কর্মেরই এক একটি লক্ষ্য (goal) আছে। এই লক্ষ্যকে লাভ করার প্রেরণাই মানব-জীবনের ভিত্তি। অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে 'আচরণ' কথাটির বিশ্লেষণ ক'রে ম্যাক্‌ডুগাল দেখালেন যে, লক্ষ্যমূলক ক্রিয়াই (purposive action) মনোবিজ্ঞানের প্রাথমিক বিষয়। যারা এই জাতীয় উদ্দেশ্যবাদ স্বীকার করতে রাজী নয়, তাদের উদ্দেশ্যে ম্যাক্‌ডুগাল আধুনিক পদার্থবিদ্যা ও প্রাণবিজ্ঞানের উল্লেখ করলেন। গত যুগের বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক ও যান্ত্রিক কার্য-কারণের বাইরে আর কিছুই স্বীকার করতেন না। কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁদের সেই দৃঢ় মনোভাব শিথিল হ'য়ে গেছে। কাজেই মানবজীবনে উদ্দেশ্যমূলক চেতসিক কার্য্য-কারণ (psychical causation)—এর বিরুদ্ধে পুরাতন সংস্কারের পক্ষে সমর্থনযোগ্য কোন যুক্তিই নেই। সুতরাং প্রত্যেক মনোবিজ্ঞানীর উচিত—এই উদ্দেশ্যমূলক চেতসিক কার্যকারণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া।

যে সমস্ত মনোবিজ্ঞানীরা পদার্থবিদ্‌ ও প্রাণবিজ্ঞানীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে চেতসিক ক্রিয়ার কার্যকারণের সার্থকতায় (Causal efficacy of psychical activity) বিশ্বাসী, তাদের মধ্যে দু'টি দল দেখা যায়। সুখবাদী (hedonist) ও এষণাবাদী। সুখবাদীরা মনে করেন যে, মানুষের প্রত্যেক আচরণ কর্ম অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ কোনো অনাগত সুখলাভ ও দুঃখবর্জনের উদ্দেশ্যে। যে-সমস্ত আচরণে দুঃখ ও কষ্ট থাকে তাদের এড়িয়ে, যে সমস্ত আচরণ সুখ ও আনন্দ দেয় তাদেরই আমরা গ্রহণ করি। এই ভাবে দুঃখকে এড়িয়ে সুখ বা আনন্দকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের স্বভাব ও ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। এই মতবাদ নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্যবাদী; কিন্তু ম্যাক্‌ডুগাল একে-ও গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। প্রাণিজগৎ ও মানুষের জীবন থেকে নানা দৃষ্টান্ত উল্লেখ ক'রে এই জাতীয়



উইলিয়াম ম্যাক্‌ডুগাল

উদ্দেশ্যবাদের অসারতা প্রমাণ ক'রে তিনি এষণাবাদী উদ্দেশ্য-বাদের যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থিত ক'রলেন।

এষণাবাদের মূল কথাটি অতি সহজে ব্যক্ত করা যেতে পারে। যদি প্রশ্ন করা যায় যে, "কোনো একটি মানুষ বা নিম্ন-প্রাণী 'অ', 'আ', 'ক', 'খ' ইত্যাদি লক্ষ্যের মাঝ থেকে 'অ', 'আ' ও 'ক'-কে বাদ দিয়ে 'খ'কে বেছে নেয়, তার কারণ কি?" এর সাধারণ উত্তর অবশ্য হবে: "ঐ ওর স্বভাব।" ম্যাকডুগাল বলেন যে, এই সাধারণ উত্তরটি গভীর তাৎপর্য্য-পূর্ণ। কেন না, সত্য সত্যই ঐ বিশেষ লক্ষ্যটির প্রতি আকর্ষণ ঐ লোকটি অথবা নিম্ন-প্রাণীটির সহজাত ধর্ম। মানুষের জন্মগত প্রবণতা হ'লো কতকগুলি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে এগিয়ে চলা। তাদের লাভ করার জন্যে যে প্রেরণা বা এষণা তাকে অবলম্বন করেই মানুষের সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত। এবং মানুষের সমস্ত কর্ম আচরণের মূল উৎস তারাই। মানুষকে জানতে হ'লে তাই তার এই মূল উৎসগুলিকেই প্রথমে জানতে হবে। ম্যাকডুগাল এদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ ক'রেছেন: বিশেষ ও সাধারণ। বিশেষ শ্রেণীভুক্তেরা মুখ্য; এবং তাদের তিনটি বিশিষ্ট গুণ বা ধর্ম আছে:—জ্ঞান (cognition), অনুভূতি (affection), ও প্রচেষ্টা (conation)। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রবণতামূলক কর্মের মধ্যে থাকে কোনো বস্তু বা পদার্থের জ্ঞান; সেই বস্তু বা পদার্থের জ্ঞান থেকে উদ্ভূত এক প্রকার অনুভূতি; এবং সেই দিকে অথবা তার থেকে অন্য দিকে শারীরিক প্রচেষ্টা। এর থেকে বোঝা যাবে যে, ম্যাকডুগালের প্রবণতা শুধু মাত্র অন্ধ-প্রবৃত্তি নয়। অন্ধ-প্রবৃত্তির মধ্যে প্রবণতার এই বৈশিষ্ট্যগুলি নেই। এর সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করতে হ'লে এই কথাটা যেমন জানা দরকার, তেমনি জানা দরকার যে, প্রতিক্ষেপ ক্রিয়ার (reflex action) সঙ্গেও এর যথেষ্ট পার্থক্য আছে। প্রতিক্ষেপ ক্রিয়া হ'লো ইন্দ্রিয়ের উপর উদ্দীপনের (stimulus) প্রভাব পড়লে স্নায়বিক যে উত্তেজনা ও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তারই নাম। এ এক প্রকারের যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া, নিতান্তই স্নায়বিক পদ্ধতির অন্তর্গত। কিন্তু প্রবণতামূলক ক্রিয়া (instinctive action) প্রধানত: মানসিক ব্যাপার। এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রবণতামূলক ক্রিয়াকে 'এষণা' (horme, urge) নামে অভিহিত করা যেতে পারে। তাহ'লে অন্ধ প্রবৃত্তিমূলক ও প্রতিক্ষেপ ক্রিয়া থেকে এর পার্থক্যটুকু সহজেই বোঝা যাবে।

যদিও বলা হ'য়েছে যে, এষণাই সমস্ত আচরণ ও কর্ম্মের মূল উৎস, অর্থাৎ প্রত্যেক আচরণই এক নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য-অভিমুখীন, তবু মানব-জীবনে এরা বহুলাংশে পরিশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হ'য়ে দেখা দেয়। মানবেতর প্রাণী জগতে এষণার আদিম, বিশুদ্ধ, সহজ ও প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু বৃহত্তর মানসিক পরিবেশ, বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা ও কর্মক্ষেত্রের জটিলতায় তারাই হ'য়ে ওঠে জটিলতর। কী ভাবে বিশুদ্ধ ও সহজ এষণা পরিশোধিত হ'য়ে জটিলতা প্রাপ্ত হয়, সে সম্বন্ধে ম্যাকডুগাল চারিটি অবস্থার উল্লেখ করেছেন। (১) পূর্ব প্রত্যক্ষ বস্তুর 'ভাব', অথবা তারই সঙ্গে ভাব-সাহচর্যে যুক্ত এমন কোনো অন্য ভাব থেকে। (২) যে সমস্ত দৈহিক সঞ্চালনার ভেতর দিয়ে এষণা অভিব্যক্ত হয়, তাদের ক্রমান্বয়ে জটিল হওয়া সম্ভব। (৩) মানুষের ভাব ও চিন্তাধারার জটিলতার জন্যে অনেক সময়ে এমন হয় যে, একই সঙ্গে একাধিক কয়েকটি এষণা উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। ফলে তারা সকলে মিলিত হ'য়ে বিশেষ এমন একটি রূপ নেয় যে তার মাঝ থেকে ওদের হঠাৎ চিনে নেওয়া শক্ত হ'য়ে পড়ে। (৪) কোনো একটি বিশেষ 'ভাব' বা বস্তুকে কেন্দ্র করে এষণারা সুশৃংখলার সহিত সংহত হয়। এদের সকলকে আলাদা ভাবে না নিয়ে সাধারণ ভাবে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টিকে পরিষ্কার করা যেতে পারে। মনে করা যাক, 'ভীতি'। ভীতি সর্ব প্রাণীর এক অকৃত্রিম এষণা। নানা কারণে, যেমন আকস্মিক কোনো শব্দে এই এষণাটি উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ কোনো শব্দ-তরঙ্গ এসে কানে ধাক্কা দিলে অন্তর্মুখীন স্নায়ু-প্রবাহ দ্বারা নীত হ'য়ে সেই তরঙ্গ এষণাকে উত্তেজিত করে। যে কোন শব্দ হ'লেই এই ব্যাপারটি ঘটতে পারে। কিন্তু দেখা যায় যে অন্তর্মুখীন স্নায়ু-প্রবাহ সকল শব্দে সাড়া দেয় না; এবং ফলে বিশেষ এষণাটিও সক্রিয় হ'তে পারে না। এর কারণ এই যে, নানা প্রকার অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আসতে আসতে সেই স্নায়ু-প্রবাহ নানা জাতীয় শব্দের মধ্যের পার্থক্যটুকু চিনতে শেখে। যে-সমস্ত শব্দ অনেক বার শুনেছে অথচ কোনো বিপদ বা ভয়ের কারণ ঘটেনি, কিছু দিন পরে সেই সব শব্দে সে আর মন দেয় না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সে নিষ্ক্রিয় থাকার ফলে ভীতির এষণাটিও জাগ্রত হয় না।

অন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। মানুষ-বর্জ্জিত কোনো দ্বীপে মানুষ যখন প্রথম যায় তখন তাকে দেখে সেখানকার পশু-পাখীরা ভয় পায় না! কারণ, ভীতি-এষণার সঙ্গ যুক্ত যে অন্তর্মুখীন স্নায়ুপ্রবাহ, সে এ ক্ষেত্রে এখনও মানুষের ভীতিজনক দিকের সঙ্গে পরিচিত হয়নি। কিন্তু কিছু দিন পরে যখন মানুষ তাদের শিকার করতে আরম্ভ করে তখনই সে ভয় পেতে থাকে। কোনো লোক আসছে, অথবা কাছাকাছি কোনো লোকের অস্তিত্ব বুঝতে পারলেই সে শংকিত হ'য়ে পড়ে ও পালাবার চেষ্টা করে। এই প্রকার ভীতিমূলক আচরণের মূল হ'লো কালিক সান্নিধ্যের ভিত্তিতে গঠিত সাহচর্য-নীতি। উন্নত স্তরের প্রাণীদের মধ্যে এই নীতির যথেষ্ট প্রাচুর্য দেখা যায়। এবং বিশুদ্ধ এষণা অপেক্ষা এই নীতির দ্বারাই তারা তাদের আচরণ ব্যবহারকে বৃহত্তর ও জটিলতর পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। যদিও এখানে শুধুমাত্র ভীতি-এষণার কথা বলা হ'লো তবু এ কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক মুখ্য এষণাই এই ভাবে সংশোধিত হ'য়ে থাকে। এই মুখ্য এষণাগুলিকে ম্যাকডুগাল চৌদ্দটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় ভাগ করেছেন। তারা যথাক্রমে: বিপদ থেকে পলায়ন; বিতৃষ্ণা ও বিরক্তি; কৌতূহল; বিদ্বেষ; বাৎসল্য; খাদ্যান্বেষণ; সঙ্গ-প্রবণতা; আত্ম-প্রতিষ্ঠা; আত্মসমর্পণ; যৌন-সঙ্গম; সংগ্রহ; সংগঠন; হাসি; আর্ত-আবেদন। এ বাদেও ম্যাকডুগাল আরো অনেক নাম করেছেন। তাদের বিস্তৃত উল্লেখ না করে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হ'বে যে, এই এষণাগুলিই মানুষের জীবনের মূল ভিত্তি। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন সমস্তই দাঁড়িয়ে আছে এদেরই ঘাত-প্রতিঘাতে দ্বন্দ্ব ও সম্মিলনের উপর।

একটু আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, কোনো এষণাই মানব-জীবনে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও অবিকৃত থাকে না। নানা প্রকার

পারিপার্শ্বিক ও অভিজ্ঞতার মাঝ দিয়ে আসতে আসতে প্রত্যেকটি এষণা নতুন রূপে দেখা দেয়। 'অনুরাগ' (sentiment), এষণার এই জাতীয় এক উন্নত রূপ। যদিও আমাদের সমস্ত কর্ম আচরণের মূলে র'য়েছে বিশুদ্ধ ও অবিকৃত এষণা, তবু এক দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে মানুষের জীবনে সমস্ত কিছুর মূলে প্রধানতঃ হ'লো অনুরাগ। কোনো বিশেষ বস্তু বা ভাব বা আদর্শের প্রতি মনের যে এক বিশেষ ভঙ্গিমা (attitude) তারই নাম অনুরাগ। প্রত্যেক অনুরাগের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে থাকে বিশেষ ভাবদ্যোতক এক প্রকার আবেগ (emotion)। এবং এই আবেগ থেকে আসে কর্ম ও আচরণ। এই আবেগের দিক্ থেকে অনুরাগকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :—প্রেম, ঘৃণা, ও মর্যাদাবোধ। আবার যে সমস্ত বস্তু বা ভাব বা আদর্শকে কেন্দ্র ক'রে অনুরাগ গ'ড়ে ওঠে সেদিক্ থেকেও তাকে তিন রকম ভাবে বিচার করা যেতে পারে :—বিশেষ নির্দ্দিষ্ট কোনো বস্তুগত, যেমন সন্তানের প্রতি পিতা মাতার অনুরাগ ; সাধারণ বস্তুগত, যেমন শিশুসাধারণের প্রতি অনুরাগ ; এবং ভাবগত, যেমন সততা, ন্যায়, পবিত্রতা ইত্যাদির প্রতি অনুরাগ। মানব-জীবনে এদের আবির্ভাব কখনই আকস্মিক বা হঠাৎ হয় না। নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে পর পর এরা দেখা দেয়। বিশুদ্ধ এষণা থেকে অনুরাগ পর্যন্ত যেমন একটি স্পষ্ট ক্রম-বিকাশ দেখা যায় নিম্নপ্রাণী থেকে মানুষ পর্যন্ত, ঠিক তেমনিই ক্রমবিকাশ আছে মানুষেরই মধ্যে অনুরাগের ক্ষেত্রে। প্রথমে নির্দিষ্ট কোনো বিশেষ বস্তুগত, পরে সাধারণ বস্তুগত, ও তার পরে ভাবগত—মানবজীবনে অনুরাগ আসে এই ভাবে। কোনো একটি বস্তু উদ্দীপনা এসে ভাবাবেগকে উদ্দীপ্ত করে। এই উদ্দীপনা যদি কিছু কাল পর্যন্ত ক্রমাগত আস্‌তে থাকে তাহ'লে সেখানে অনুরাগের লক্ষণ দেখা দেবে। একটি নিষ্ঠুর পিতা হয়তো তাঁর ছেলেকে অত্যন্ত কড়া শাসনে রাখেন ও প্রায়ই মার-ধোর করেন। প্রথম প্রথম ছেলেটি ভীতি অনুভব করে মার খাবার সময়। কিন্তু কিছু দিন বাদে এমন হয় যে, পিতাকে দেখ্‌লেই, এমন কি তার কথা মনে পড়লেই সে রীতিমতো ভীত হ'য়ে ওঠে! এই সময় তার মনের অবস্থা এমন হয় যে, তার পিতা অথবা তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এমন যে-কোনো বস্তু বা চিন্তার প্রতি সে সর্বদাই ভীতি-প্রবণ হ'য়ে থাকে। বাৎসল্য অনুরাগটি বেশ জটিল। সেখানেও ঐ একই জিনিষ দেখা যাবে। ছোটো শিশু তার স্বাভাবিক অসহায়তা ও অক্ষমতার দ্বারা মা'য়ের মনে কোমল ভাবের উদ্রেক করে ; এবং মা তার সন্তানের অব্যক্ত মনোভাবের প্রতি সাড়া দেন। শিশুটি মায়ের এই সহানুভূতি বোঝে, উৎসাহিত ও আনন্দিত হয়। পরস্পরের প্রতি এই সহানুভূতি ও আনন্দের প্রকাশ হ'লো একেবারে গোড়ার দিকের কথা। তার পর ক্রমে ক্রমে এমন সময় আসে—যথা, পিতামাতার পরার্থপরতা (altruism) ও আত্মবোধ (egoism),—এর সঙ্গে জড়িত হ'য়ে পড়ে। সন্তানের সুনাম-প্রশংসা, ও দুর্নাম-নিন্দাতে পিতা-মাতা নিজেরই সুনাম-প্রশংসা, ও দুর্নাম নিন্দা বোধ করেন। এই ভাবে স্নেহ, করুণা ও সহানুভূতির সঙ্গে পরার্থপরতা ও আত্মবোধ জড়িত হ'য়ে বাৎসল্য অনুরাগকে এক জটিলতর রূপ দান করে। অর্থাৎ এই অনুরাগের পরিণত অবস্থায় অনেকগুলি ভাব বা আবেগ মিলিত থাকে। স্বদেশপ্রীতি আর একটি অনুরাগ। নিজের দেশকে কেন্দ্র ক'রে এখানে কতকগুলি এষণা মিলিত হ'য়ে থাকে। দেশের বিপদে আমরা ভয় পাই, বিজাতীয় কর্তৃক সে আক্রান্ত হ'লে আক্রমণকারীর প্রতি আমরা ক্রুদ্ধ হই ; অন্য কোনো দেশের সঙ্গে যখন কোনো বিষয়ে নিজের দেশের প্রতিযোগিতা হয় তখন আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা প্রবল হ'য়ে ওঠে। যখন মনে হয় এই দেশ আমার জন্মভূমি, জননী, তখন দেখা দেয় স্নিগ্ধ প্রেম। এই ভাবে অতি শিশুকাল থেকে নানা বিষয়ের প্রতি—যেমন পিতামাতা, স্কুল, দেশ ধর্ম ইত্যাদি আমাদের মধ্যে অনুরাগ জন্মাতে থাকে। প্রাণি-জগতের নিম্নতম অবস্থা থেকে মানব-জীবন পর্যন্ত এষণার এই ক্রমবিকাশের মধ্যে ম্যাকডুগাল এই কয়টি স্তরের উল্লেখ ক'রেছেন : (১) প্রাণি-জগতের প্রথম হ'লো এ্যামিবা। এষণার বিকাশও তাই এখানেই সব প্রথম। কিন্তু তার সুস্পষ্ট, সুবিভক্ত ও সুনির্দিষ্ট কোনো রূপ এখানে নেই। শুধু মাত্র শিকার অন্বেষণ-প্রচেষ্টার মাঝে সে এখানে নিজেকে প্রকাশ করে। (২) এখানে প্রাণীদের মধ্যে যে এষণা দেখা যায় তা' নির্দিষ্ট লক্ষ্য অবলম্বন ক'রে বহু রূপে বিভক্ত হ'য়ে পড়েছে। (৩) আদি-মানবের এষণা। এখানে লক্ষ্যের রূপ অধিকতর নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট। এইখান থেকে সুরু হলো মানব-জীবন। (৪) মানুষের প্রথম স্তরের আচরণ। এখানকার আচরণ এষণামূলক ও লক্ষ্য-অভিমুখীন। যে-জাতীয় আচরণ ও যে উপায়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারা যায়, তা এখানে নিয়ন্ত্রিত হয় পুরস্কার-শাস্তি নীতি দ্বারা। (৫) মধ্য স্তরের আচরণ। প্রথম স্তরেরই মতো এ-ও এষণামূলক ও লক্ষ্য-অভিমুখীন। কিন্তু এখানে সে নিয়ন্ত্রিত হয় সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে। অর্থাৎ যে পথ সমাজ কর্তৃক সমর্থিত হবার সম্ভাবনা নেই তাকে বাদ দিয়ে সমাজ-সমর্থিত উপায় অবলম্বন করে সে অগ্রসর হয়। (৬) উচ্চ স্তরের আচরণ। এই স্তরে দেখা দেয় নীতি-বোধ। সমগ্র মানব-সমাজের আদর্শস্বরূপ যে-নীতি, তারই আলোকে নিয়ন্ত্রিত হয় এখানকার এষণা।

এ পর্যন্ত যা বলা হলো তা' থেকে বোঝা গেলো যে—(১) মানব-প্রকৃতি ও আচরণ সর্বত্র ও সব সময়েই এষণা-মূলক ও লক্ষ্য-অভিমুখীন। (২) আমাদের মনের ভিত্তি হলো কতকগুলি সহজাত প্রেরণা ; এবং সেই প্রেরণাই আমাদের লক্ষ্য-অভিমুখে চালনা করে। (৩) ফলে আমাদের সমস্ত কর্ম-আচরণের উৎস হলো এই প্রেরণাগুলি। এই হলো ম্যাকডুগালের মনোবিজ্ঞানের সুস্থ মনের বিজ্ঞান, অর্থাৎ সাধারণ মনোবিজ্ঞান। অসুস্থ মনের বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা ও তদন্ত করেও ম্যাক্‌ডুগাল তার এই মতবাদের সমর্থন সেখানে পেয়েছেন। মানব-মন ও আচরণের যে সকল অসুস্থ ও অস্বাভাবিক বিকৃতি দেখা যায়, তার মূল কারণ হলো মানব-মনের আদি প্রেরণা। যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণতিতে বাধা না পায়, ততক্ষণ আমরা সুস্থ ও সুখী থাকি। কিন্তু যখনই তার সেই স্বাভাবিক অগ্রগতিতে বাধা পড়ে, বা তাকে অত্যন্ত কঠিন প্রতিকূল অবস্থার মাঝ দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়, তখনই সে বিকৃত হয়ে পড়ে এবং ফলে দেখা দেয় নানা প্রকার আধি-ব্যাধির লক্ষণ। এই যদি হয় মানসিক বিকার ও রোগের কারণ, তা'হলে অবশ্যই তাদের বাধা দেওয়া যেতে পারে। মূল এষণাগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান, তাদের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা দ্বারা জীবনের সমস্ত

বিকৃতি ও অস্বাভাবিক পরিণতিকে এড়িয়ে সুন্দর সুস্থ জীবন লাভ করা যেতে পারে।

ম্যাক্‌ডুগালের এই এষণাবাদের সঙ্গে ক্রমবিকাশবাদের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। আমরা আগেই দেখেছি যে, এই মতবাদে মনের গঠন ও ক্রিয়া-পদ্ধতির ক্রমবিকাশের বেশ একটি সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ম্যাকডুগাল মনে করেন যে, অন্যান্য মনোবিজ্ঞানে এই জিনিষটি নেই, এবং তাঁর মনোবিজ্ঞানের অন্যতম সার্থকতা এইখানে। প্রাকৃতিক ও মানসিক কোনো রকম কার্যের জন্য ম্যাক্‌ডুগাল যান্ত্রিক পদ্ধতি যোগ্য মনে করেন না। আমাদের অভিজ্ঞতা যে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অংশের সংযোগে গঠিত, এ কথাও তিনি অস্বীকার করেন। প্রত্যেক অভিজ্ঞতা একটি ঐকিক সমগ্র (unitary whole) এই তাঁর সিদ্ধান্ত। এই ঐকিক সমগ্রের মধ্যে অবশ্য বিভিন্ন অংশকে পৃথক্ ভাবে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে, কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ একেবারেই অসম্ভব। ক্ষুদ্র এ্যামিবা থেকে মানুষ পর্যন্ত একই ধারায় চ'লে আসছে জৈবিক ও মানসিক ক্রমবিকাশ। ম্যাকডুগাল মনে করেন যে, একমাত্র তাঁরই মনোবিজ্ঞান দ্বারা এই জৈবিক ও মানসিক রূপান্তরের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। নির্দিষ্ট কতকগুলি এষণা ও তাদের ক্রমবিকাশের উপরই যদি হয় মানব-জীবনের ভিত্তি, তাহ'লে আমাদের দর্শন-শাস্ত্রকেও বিচার করতে হবে সেই অনুসারে। বিশুদ্ধ ও শুষ্ক মননশীলতাকে কিছুটা কমিয়ে এনে দেখতে হবে যে, আমাদের দর্শন-বিচারে জীবনের এই মূল সত্যটি স্বীকৃত হ'য়েছে কি না। অর্থাৎ ম্যাক্‌ডুগাল বলেন যে, দর্শন-শাস্ত্রকে যদি সার্থক করতে হয় তবে তাকে গঠন করতে হবে এই এষণাবাদী মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে। বুদ্ধিধর্মী (intellectual) দর্শন অথবা যান্ত্রিক মনোবিজ্ঞান—কেউই মানব-জীবনের আশা, আদর্শ, সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদির কোনো সঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। তার কারণ তাদের বিচারের গোড়াতেই গলদ র'য়ে গেছে। সমস্ত প্রচেষ্টার উৎস এষণাকে তাঁরা দেখতে পাননি। তাঁর মনোবিজ্ঞান দিয়ে ম্যাক্‌ডুগাল তাঁদের এই গুরুতর ত্রুটির সংশোধন করতে চান। তাঁর দৃষ্টি শুধু মাত্র মানসিক তথ্য—যেমন, সংবেদন (sensation) প্রত্যয় (perception) ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাই তাঁর মনোবিজ্ঞান বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞানের সীমা অতিক্রম ক'রে সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, দর্শন ইত্যাদি পর্যন্ত বিস্তৃত হ'য়ে পড়েছে। এবং সমগ্র মানব-জীবনের মূল ভিত্তি পর্যন্ত পৌঁছে তার সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে তুলেছে। তাই তাঁর মনোবিজ্ঞানকে বলা যায় জীবনধর্মী মনোবিজ্ঞান। ম্যাক্‌ডুগালের মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব ও নতুনত্ব হ'লো এইখানে।

কাঙালিনী

মৃণালকান্তি সেনগুপ্ত

কালো মেয়েটি
পরনে ছাপা শাড়ী,
ক্ষুদ্র 'বাস' থেকে
নামলো তাড়াতাড়ি।

বুকের কাছে
লেপ্‌টানো বইএর পাঁজা
স্তব্ধ হয়ে আছে ;
বুকের এ কী সাজা !

এম্ এ, ক্লাশের ছাত্রী
চোখে-মুখে রুক্ষতা,
মন হয়েছে শুষ্ক
তাই চলনে সূক্ষ্মতা।

সব ফুলই ফোটে
আপন আপন রূপে,
প্রজাপতি কি জোটে—
শুকায় চুপে চুপে।

ওই যে মেয়েটি নাম্‌লো
নিত্য যাওয়া-আসা,
কি যে উহার সুখ—
পেলো না তো ভালবাসা।

খোলা বইএর 'পরে
চোখের জ্যোতি হারায়,
আপনারে দেখ্‌তো সে যে
শিশুর চোখের তারায়।

আজকে তাহার মূল্য
শুধু ডিগ্রি রাখা
হলো না তার স্বর্গ রচা—
প্রেম দিয়ে মাখা।



শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় পর্য্যায়

১

কয়েক বৎসর কাটিয়া গেছে।

গিরিবালার জীবনে অনেক কিছুই ঘটিয়া গেল, অনেক পরিবর্তন, অনেক ভাঙ-গড়া। পিতা মাতা গেলেন, জেঠাইমা বসন্তকুমারীও; শাশুড়ী নিস্তারিণী দেবীও নাই। এদিকে আবার তেমনি নূতনেরা আসিয়া জুটিল। নিজের আর একটি কন্যা, ভগবানের শেষ দান। এখন তাহারই বয়স বারো বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। শেষ কুড়ানো সন্তান, বড় আদরের, আরও আদরের এই জন্য যে গিরিবালার বিশ্বাস ও মাসি কাত্যায়নী। প্রতিশ্রুতি দেন নাই কাত্যায়নী?—"গিরি, তোর মেয়ে হয়ে জন্মাব, তখন এমনি করে আমায় খাওয়াবি, মোছাবি, আদর-যত্ন করবি তো?"···ওর নাম হইল লীনা, বোধ হয় কাত্যায়নী দেবীর মতো অমন করিয়া গিরিবালার মধ্যে আর কেহ লীন হইয়া যায় নাই বলিয়াই।

আরও আসিয়াছে,—পরের মেয়ে নিজের হইয়া। গিরিবালার বেশ মনে পড়ে সেই প্রথম দিনটি। পরের মেয়ে নিজের হইয়া আসা এতো নিত্যই হইতেছে, তবু নিজের জীবনে যখন ঘটিল, গিরিবালার বড় যেন আশ্চর্য বোধ হইল। মনে হইল বধূরূপে এই যে এ আসিল, এ যেন আরও মধুর,—পরের মেয়ে কি অসীম নির্ভরেই না আসিয়া দাঁড়াইল তাঁহার কাছে!···মায়ার সঙ্গে, স্নেহের সঙ্গে একটি কৃতজ্ঞতার ভাব আসে,—ও তাঁহার সন্তানের একটি নূতন রূপ ফুটাইয়াছে। শশাঙ্ককে যেন পূর্ণতর করিয়া আনিয়া দিল।···জীবনে কী সব অপূর্ব অনুভূতি!—কোথায় ছিল এ-সব? এত কষ্ট মা হওয়া, আবার এত আশ্চর্য ভাবে মধুর!

তাহার পর আসিল নব যুগের যাত্রীরা,—গিরিবালার জীবনের ধারা যাহারা ভবিষ্যতের দিকে দিবে প্রসারিত করিয়া,—নাতি-নাতনি। এখন দুইটি সন্তানে তাহারা পাঁচটি।

এক দিকে পুরানো যাহা ছিল তাহা গেল ঝরিয়া, এক দিকে নূতন উঠিতেছে গড়িয়া। এক দিকের বেদনা আর এক দিকের এই নূতন আশা-আনন্দের মধ্যে গিরিবালা আছেন এক নূতন রূপে বিকশিত হইয়া। এই রূপকে আরও অপরূপ করিয়া দিয়াছে দ্বারভাঙ্গায় গোড়ার জীবনের দুঃখ-অভাব।···শৈলেনের ডায়েরির এক স্থানে লেখা আছে—"দুঃখ আর কার কাছে কি জানি না, তবে বাবার জীবনে, মায়ের জীবনে এসেছিল ভগবানের আশীর্বাদরূপে; ওঁরা যেন তপস্যা আর তীর্থস্নানের পর শান্ত বিশ্বাসে, শান্ত তেজে আর শান্ত মর্যাদায় জীবনের নব পর্যায়ে এসে দাঁড়ালেন।"

শশাঙ্কর বিবাহ হইয়া গেল অল্প বয়সেই, কলেজ ছাড়িবার বছর খানেক পরেই ওর বয়স যখন বোধ হয় আঠারও হয় নাই। অনেকগুলা কারণ ছিল, সব চেয়ে বড় কারণ বোধ হয় নিস্তারিণী দেবীর নাতবৌয়ের মুখ দেখিয়া মরিবার সাধ বাঙালী-পরিবারের একটি জরুরী ব্যাপার, যা অনেক ক্ষেত্রেই সংসারের মোড় ফিরাইয়া দেয়। আরও ছিল,—গিরিবালা সংসারে একা পড়িয়া গেছেন। আরও একটা কারণ, ঠিক কারণ না বলিলেও চলে,—এই কারণগুলার পরিপোষক।—

শশাঙ্ক সে শুধু কলেজ ছাড়িয়া আসিয়াছিল এমন নয়, এক রকম চাকরি হাতে করিয়া আসিয়াছিল। সেই যে পূজার ক'টা দিনের জন্য আসিয়াছিল তাহাতেই সে বুঝিয়াছিল তাহার উচ্চ শিক্ষার মানে হয় সংসারের ধ্বংস,—শুধু সঙ্গতির দিক দিয়াই নয়,—বাবার বোধ হয় কঠিন পীড়া হইয়া পড়িবে, আর মাকে যে হারাইতে হইবে সেটা একেবারেই সুনিশ্চিত। ইহার পর এক দিন সে নিতান্ত অতর্কিত ভাবেই বিপিনবিহারীর বাড়ি বন্ধক দেওয়ার কথাটা শুনিয়া ফেলিল। সে সময় যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন পাস দিয়াছে তাহাদেরও অনেক সুবিধা ছিল। তায় সে ভালো ভাবেই পাস দিয়াছে, কয়েকটা আফিসে দরখাস্ত করিয়া দিল। সময়ে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পড়িল। সেই আহ্বানেই সে বাড়ি আসে।

চাকরি হইল, সুতরাং নিস্তারিণী দেবীর সাধ মিটানোর এবং গিরিবালাকে একটি সহায়িকার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ায় কোন বাধা রহিল না।

সব চেয়ে বড়টি নাতনি—বয়স বছর নয়-দশের মধ্যে; ভাইটি বছর ছয়েকের, ছোটটি মেয়ে,—একেবারে কোলের। গিরিবালা বিপিনবিহারী দু'জনেরই এখন অবসর আছে জীবনে আর সেই সঙ্গে আছে জীবনের প্রতি একটা অনুরাগ—আজকের এই স্বচ্ছলতা, এই

স্নিগ্ধতাটুকু সৃষ্টি করিবার জন্যই তো প্রাণপাত করিতে বসিয়াছিলেন দু'জনে, এখন ইচ্ছা করে এর সমস্ত মধুটুকু কণ্ঠ ভরিয়া পান করি। আর এর যত মাধুর্য কি ঘনীভূত হইয়া পড়িয়াছে এই নাতি-নাতনিদের মধ্যে? অবশ্য গিরিবালার অবসর অত বেশি নয়—তবে বিপিনবিহারীর একেবারে পূর্ণ মুক্তি,—সংসারটা ছাড়িয়া দিয়াছেন স্ত্রীর হাতে, নিজেকে ছাড়িয়া দিয়াছেন এদের হাতে।

এত বড় ভার পাইবার জন্যই হোক, বা যে জন্যই হোক, বড় নাতনিটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে একটি পাকা গৃহিণী। সংসার থেকে সমস্তাব টুকরা-টাকরা কথার আমদানি করিয়া ঠাকুরদাদাকে লইয়া তাহার এই নূতন সংসার ভাঙে-গড়ে। চালের দর, ডালের দর, পড়ানোর খরচ, কুটুম্বিতার ভাবনা—ঠাকুরদাদার সঙ্গে খুব জোর আলোচনা হয়। অভিমত যা দেয়, তাহার যেমনি ওজন তেমনি দাম।—"এক সময় যখন টাকায় আট মোণ চাল ছিল, এখন সে জায়গায় আট সের চাল খেয়ে চারি দিক্ সামলানো কম কথা?—বলো দাদু?"

আট মোণ চালের কথা বিপিনবিহারী বোধ হয় নিজের ঠানদিদির মুখেও শোনেন নাই; একটু ঘাঁটাইতে ইচ্ছা করে, হাতে হুঁকা বা গড়গড়ার নল থাকিলে খুব গম্ভীর ভাবে টান দিয়া বলিলেন—"তোমার সেই ছেলেবেলাকার কথা বলছ তো?"

নাতনি একটু আড়-চোখে চায়,—ঠাট্টা নয় তো?…সংসারের দিক্‌টাই ছাড়িয়া দিয়া অন্য কথা পাড়ে,—"আজ আবার দাদু, মেজ কাকা পড়তে ডেকেছিলেন। সময় থাকলে আমি কেনই বা যাব না দাদু?—এইটুকু বোঝেন না। মেজ কাকার সবই ভালো দাদু, শুধু বুদ্ধি স্বাদ্ধ একটু কম। কথায় বলে না ভোঁতা বুদ্ধি?—তাই আর কি।"

"গিয়েছিলে পড়তে তুমি?"

নাতনি একটু বিরক্তির সহিত মুখটা ভার করিয়া বসে,—সবাইকে আক্কেল খোওয়াইতে দাখলে মুখের যেমন অবস্থা হওয়া স্বাভাবিক। একটু পরে ঠোঁট দুইটা ফুলাইয়া মুখের পানে চাহিয়া বলে—"তুমিও বেশ ভেবে-চিন্তে কথা বল না দাদু, খুব সময় দেখছ আমার!"

গিরিবালার অবসর হয় দুপুরে একটু, আর সন্ধ্যার পর। নাতিটিই একটু বেশি প্রিয়, অন্তত বেশি ঘিরিয়া থাকে সে-ই। তাহার দুশ্চিন্তা অন্য রকম,—একটু নিজেকে কেন্দ্র করিয়া। গিরিবালা কোলেরটিকে লইয়া শুইয়াছেন, খোকন আসিয়া উপস্থিত হইল। ওর প্রায় রোজই এক প্রশ্ন;—পাশতলা দিয়া উঠিতে উঠিতে বলিবে—"হ্যাঁ গিন্নি, বৌ এসে মাটিতে পা দেবে?"

গলাটা বয়সের পক্ষে একটু বেশি মোটা, দুর্ভাবনা আর উৎকণ্ঠার ভাবটা একটু বেশি করিয়াই ফুটিয়া ওঠে।

এক দিকে খুকি, অন্য দিক্‌টা সে দখল করিয়া শোয়। ঐ সূত্র ধরিয়াই গল্প আরম্ভ হইয়া যায়—

গিরিবালা বলেন—"সে কি ভাই, অমন কথা মুখে এনো না। নাৎবৌ এসে যদি মাটিতে পা দেয় তো আমাদের দু'জনের বেঁচে ফল কি?—তোমার দাদুর আর আমার কথা বলছি।"

সঙ্গে সঙ্গেই গল্প ওঠে জমিয়া। খোকন "হুঁ" দেয়, অর্থাৎ—চলুক ঠিক শুনছি।

গিরিবালা বলেন—"যেমনি কি না পালকি এসে গেটের সামনে দাঁড়ালো, আমার যত তোলা শাড়ি, তোমার দাদুর যত শাল-আলোয়ান এমুড়ো-ওমুড়ো দেওয়া হবে বিছিয়ে। কি ফলই থেকে যদি নামতে গিয়ে, চলতে গিয়ে নাৎবৌয়েরই পায়ে লাগল ধুলো? তার পর সেই শাল-বেনারসীর ওপর দিয়ে ঝমোর ঝমোর করে মল বাজিয়ে…"

কচি কানের কাছে শব্দটি বড় লোভনীয়, খুকি বলে—"ধমোর—ধমোর—ধমোর—"

দাদা অধৈর্য ভাবে ধমক দেয়—"চুপ কর্, খুকু, কাজের কথা হচ্ছে।"

অধৈর্য প্রশ্ন হয়—"হুঁ, তার পর গিন্নি?"

তার পর অনেক কথা,—নূতন যুগের নূতন বধূ আসিবে, সে গল্পের কি আর শেষ আছে?

বধূ এক এক সময় অনুযোগ করে। হয়তো শ্বশুর-শাশুড়ী দুই জনই আছেন, বলে—"বাঁদরগুলো আপনাদের বড্ডই ঘেরে ফেলেচে। আবার সেজটো আসছে অজুকে নিয়ে। সে শুনছি আর এর মধ্যেই মহা দিগ্‌গজ হয়ে দাঁড়িয়েছে—তার মাসি শিখেছে কি না। ব্যস্, একে তো আমাদের যেন ছেড়েই দিয়েছেন…"

শাশুড়ী বলেন—"ও হিংসে করতে নেই বাছা। আমার ঘর ভরে থাক্…"

বধূ হাসিয়া বলে—"ভবার কথা তো হচ্ছে না মা, এমন দখল করে থাকে যে এক একবার যে একটু স্বচ্ছন্দে দু'টো কথা জিগোস্ করব তার পর্যন্ত উপায় থাকে না। আর বাবাকে তো আরও টেনে নিয়েছে। ঠাকুরপোরা বলেন…"

বিপিনবিহারী হাসিয়া বলেন—"নাঃ, এ যে তোমাদের অন্যায় কথা বৌমা, আমরা এখন নতুন লোক পেয়ে নতুন সংসার পেতেছি; আমাদের ও-বাসি সংসারে টান নেই গেলে আমরা আমল দোব কেন?"

২

পাণ্ডুল এখন প্রায় স্মৃতিমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যত দিন ক্ষেতটা ছিল, লোকের যাওয়া-আসা ছিল, খবরটা-আসটা পাওয়া যাইত। ক্ষেত গেছেও তো অনেক দিন হইল, প্রায় বারো-তেরো বৎসর, এখন নাতি-নাতনির কাছে গল্পের খোরাক জোগায় পাণ্ডুল; দিক্‌বলয়-লগ্ন সূর্যের মতো দূরে রহিয়াছে বলিয়াই পাণ্ডুলকে এখন একটি রাঙা আভায় যেন ঘিরিয়া থাকে,—নাতি-নাতনিদের কাছে রূপকথার রোমান্স খুব জমে।

গিরিবালা বলেন—"আর পাণ্ডুলে ছিল খঞ্জনী, কালো—তা যেমন তেমন কালো নয়, ভাতের হাঁড়ির তলা বলে আমি পরে আছি; তার ওপর সাদা সাদা বড় বড় দাঁত, গোল গোল চোখ, এই গতর; ঘুমলো তো একেবারে কুম্ভকর্ণ, পালের মতন মোটা কাপড় পরে যখন খসখস করে চলত…"

নাতি গুটিসুটি মারিয়া কাছে ঘেঁসিয়া আসে, বলে—"ভয় করছে গিন্নি!"

গিরিবালা হাসিয়া বলেন—"না, ভয় নেই।"

তাহার পর একটু চুপ করিয়া যান, গলাটা কিসের আবেগে স্নিগ্ধ হইয়া আসে, বলেন, "পাহাড় দেখেছিস্ তো? এবার দেশে যেতে রেল থেকে দেখালাম, মনে আছে?"

নাতির বোধ হয় তাড়কা রাক্ষসীর কথা মনে পড়ে, প্রশ্ন করে—"পাহাড়ও উপড়ে ফেলে খঞ্জনী?"

গিরিবালা আবার একটু হাসেন, বলেন—"না, উপড়ে ফেলে না, দেখেছিস তো কি রকম ভয়ঙ্কর দেখতে পাহাড়গুলো? আমি একবার তীর্থে গিয়ে ওর চেয়ে ভয়ঙ্কর একটা পাহাড় দেখেছিলাম—গাছপালার নাম-গন্ধ নেই, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো পাথর, বড় বড় ফাটল যেন হাঁ করে গিলতে আসছে, দেখলেই যেন ভয়ে বুক গুরগুরিয়ে ওঠে। সেই পাহাড়ের মাঝামাঝি উঠে একটা বড় গর্তের মধ্যে দিয়ে খানিকটা ভিতরে গিয়ে পাহাড় কেটেই কী চমৎকার একটা মন্দির! আর তার ঠিক মাঝখানেতে সাদা পাথরের চমৎকার একটা গঙ্গামূর্তি! মন্দিরের একটা ফাটল দিয়ে এক জায়গায় ঝির-ঝির করে জল পড়ে একটা নালি দিয়ে কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছে—বাইরেটা অমন পাহাড়-ফাটা গরম তো?—ভেতরটা ঠাণ্ডা বরফ, মা যেন নিজেই অবতরণ করছেন…"

গিরিবালা একটু চুপ করিয়া যান, কি দুইটি জিনিষ যেন মনে মনে মিলাইয়া দেখিতেছেন। তাহার পর বলেন—"খঞ্জনী ছিল ঠিক এই রকম, বাইরেটা ছিল ঐ পাহাড়ের মতন কালো কুচ্ছিৎ, দেখলে ভয় করে, কিন্তু তার বুকের ভেতরটা যে কী মধু ছিল!—একটি নয় তো?—তোর মেজঠানদি থেকে পূর্ণেন্দু পর্যন্ত সবাইকে কোলে নিয়ে খেলিয়েছে—যেটিকে পেত কী মায়া দিয়ে যে জড়িয়ে থাকত! বোধ হয় মায়েও অতটা পারে না…"

কথাগুলা গিরিবালা যে ঠিক নাতির জন্যই সাজাইয়া বলেন এমন নয়, মনের চিন্তাটা যেন আপনি মুখর হইয়া বাহির হইয়া আসে। নাতির পক্ষে বরং বেশ গুরুপাকই হয়; পাহাড়ের মধ্যে ঠাকুরের মূর্তিটি ভালোই বোঝে—চমৎকার একটি রূপকথার মতো, কিন্তু খঞ্জনীর ভিতর-বাহির লইয়া এর মধ্যে যে রূপকের অংশটুকু সেটা ওর ক্ষুদ্র বুদ্ধিকে এড়াইয়া যায়।

চুপ করিয়া থাকিয়া একবার বলে—"আমিও মা গঙ্গাকে দেখব গিন্নি।"

গিরিবালাও খানিকটা চুপ করিয়া থাকেন।…কোথায় গেল খঞ্জনী? ছুঁড়িটার জন্য বড় মন কেমন করে এক একবার। অদ্ভুত ধরণের মেয়ে!…গিরিবালার মনশ্চক্ষু নিজের সংসারের উপর এক একবার দৃষ্টি বুলাইয়া আসে,—এই তো কাম্য—পুত্রকন্যা, শাখা থেকে ভগবান আজ এই প্রশাখা কয়টি পর্যন্ত দিয়াছেন, দয়া হয় আরও দিবেন, তাহার জন্যই তো সাধনা। অথচ খঞ্জনী এ সব চাহিতই না!

কেন?…বড় আশ্চর্য লাগে গিরিবালার। কাছে থাকিতে অতটা ভাবিতেন না এ দিকটা; এখন সুখের দিনে, পূর্ণতার দিনে, কথাগুলা আপনিই যেন পথ করিয়া আসিয়া দাঁড়ায়। কেমন একটা ছমছমে ভাব জাগে মনে। সে সব দিনে অত মনে পড়িত না, কিন্তু আজ-কাল খঞ্জনীর দু'-একটা কথা প্রায়ই মনে পড়ে, বিশেষ করিয়া যখন সংসারের ভরা-রূপটি চোখের সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। খঞ্জনী অনেকগুলিকে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, কিন্তু এখন মিলাইয়া দেখিয়া মনে হয় স্নেহের অন্তরালে খঞ্জনীর একটা দারুণ অবিশ্বাস ছিল ছেলে-মেয়েদের উপর। প্রায়ই চোখ-মুখ ঘুরাইয়া বলিত—'না গো দুলহীন, এদের বিশ্বাস ক'রো না, এরা বড্ড বেইমান, বড্ড বেইমান এরা, বড্ড বেইমান…'

কেন বলিত খঞ্জনী এ কথা? কাছে থাকিতে ছিল মাত্র দাসী অলক্ষ্যে থাকায় এখন তাহাকে মনে হইতেছে মস্ত এক বিবেকী।…অহি অত মায়া বাড়াইয়া গেল চলিয়া; কী বিশ্বাস এদের?…গিরিবালা নাতিকে বুকে জড়াইয়া চাপিয়া ধরেন, বুকের সমস্ত উত্তাপ দিয়া মনে মনে আশীর্বাদ করেন—বাঁচিয়া থাক।…কিন্তু কীই বা বিশ্বাস?

খঞ্জনী কি এই ভয়ে সংসারের পাশ কাটাইয়া গেল?

গিরিবালার আর একটা কথা মনে পড়িতেছে। খঞ্জনীর একটি ছোট ভাই হইয়া মারা যায়, তাহার পর আর হয় নাই। কথাটা যখন উঠিত, খঞ্জনীর মা দাঁত-মুখ খিচাইয়া মেয়েকে দেখাইয়া বলিত—"হবে কোথা থেকে মাইজী? ওই যে ডাইনি বসে আছে আগলে। নিজের মা আশ্রয় একটা করে দিলাম সেখানেও যাবে না, এখানেও আর কাউকে আসতে দেবে না। নৈলে ছেলেরা যখন মারা গেল, ঝাঁটাখাকি ডাইনি স্বচ্ছন্দে বললে কি না—'মা, আর ভাই-টাই হয়ে কাজ নেই মা; হবে না তো?' নিজের পেটের মেয়ের মুখে এই কথা দুলহীন?—আসতে দেবে ও ডাইনি আর কাউকে?—পেটে থাকতেই খেয়ে ফেলবে…"

কুশ্রী, কদাকার—না, এক এক সময় মনে হয় ভীষণ আকার—খঞ্জনী সম্বন্ধে তখন সব কথাই বলা সহজ ছিল, এমন কি বিশ্বাস করাও। আজ স্থান আর কালের ব্যবধানে কথাগুলি নূতন অর্থে আসিয়া দেখা দিয়াছে। খঞ্জনীর অবিশ্বাস, খঞ্জনীর আতঙ্ক এই লইয়া যে, এরা যখন থাকিবেই না, তখন এদের মিছে আদর করিয়া ডাকিয়া আনা কেন?—যদি নিতান্তই থাকে তাহা হইলেও পদে পদে মায়ায় টান দিয়া, পদে পদে সংসারের বিষধূম সৃষ্টি করিয়া কাঁদানই যখন এদের উদ্দেশ্য…

শাশুড়ী নিস্তারিণী দেবী দু'-একবার বলিয়াছিলেন—'অহি যখন যায়, বৌমাকে কাঁদানোই এক দায় হয়ে উঠেছিল আমি আসার পর উনি যদি তবু কাঁদলেন, খঞ্জনী তো একবারও চোখের জল ফেললে না; তার কথা উঠলেই হাঁ করে চেয়ে থাকত পাগলের মতন।'

আজ গিরিবালার কাছে সব একটি অর্থে অর্থবান;—খঞ্জনী ভাইয়ের মৃত্যুতে, অহির মৃত্যুতে, বোধ হয় এই রকম আরও সব মৃত্যুতে পিছাইয়া গেল। মা-হওয়ার ভয়েই ও আর মা হইতে চাহিল না। গিরিবালা নিজের মাতৃত্বের আকুতি দিয়া সেই কদাকার মৈথিল শূদ্রাণীর মনের গভীরতা মাপিবার চেষ্টা করেন, যেন থৈ পান না।

হঠাৎ কি মনে হয়, গিরিবালা যেন চেষ্টা করিয়া খঞ্জনীর কথা মন থেকে ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহেন। হাসিয়া বলেন—'কিন্তু কি কুচ্ছিতই ছিল, বাবাঃ! তোর দাদু কি বলতেন জানিস্?"

"কি গিন্নি, কি বলতেন?" নাতি উল্লসিত হইয়া ওঠে, ভাবে গল্প বুঝি এবার নূতন পথে মোড় ফিরিল।

গিরিবালা বলেন—"বলতেন মেনকা; মেনকা হোল স্বর্গের পরী কি না…"

বেশ জোরেই হাসিয়া ওঠেন।…যথাসাধ্য চেষ্টা—খঞ্জনীকে মন থেকে সরাইতেই হইবে; কোন দোষ নাই, খুবই ভালো খঞ্জনী, অথচ মনে কি একটা অস্বস্তি জাগায়,—ওর মনের অমঙ্গল আতঙ্কের আঁচ লাগে যেন।

পাণ্ডুলের রূপকথা অন্য দিক্ দিয়া আরম্ভ করেন,—পাণ্ডুলে যখন সুখের দিন, মধুসূদনের প্রতিপত্তি যখন মধ্যাহ্ন-রেখায়, তখনকার কথা সব। খুব ঘটা করিয়া আরম্ভ করেন গিরিবালা—"তাহলে শোন্, তোর বাপের জন্মের কথা থেকেই আরম্ভ করি···"

নাতিও পিতৃ-জন্মকথা খুব ঘটা করিয়া শুনিবার জন্য নড়িয়া-চড়িয়া শোয়, বলে—"হুঁ, বলো। আমার বাবা তো আগে জন্মেছিলেন গিন্নি, না? জুজুর বাবা তো তার পর···"

চমৎকার জমিয়া ওঠে, আর চেষ্টা করিয়া হাসিতে হয় না গিরিবালাকে, আপনা হইতেই খিল-খিল্ করিয়া হাসিয়া বলেন—"শোনো কথা বোম্বেটের! এর মধ্যে বাপের জন্ম নিয়ে হিংসে আরম্ভ হয়ে গেছ ভাইয়ে-ভাইয়ে!···আর তোর বাবা যে এদিকে বলে—আমি বড় না হয়ে সব ছোট হয়ে জন্মালে বাঁচতাম?"

"বাবা ছোট-কাকা হয়ে যেতেন গিন্নি?"

"যেত না? তখন কোথায়ই বা থাকতে? কারই বা হিংসে করতে?"

এ কল্পনাতীত অবস্থা খোকার মাথায় ঢোকে না, আবার ধাঁধায় পড়িয়া একটু চুপ করিয়া থাকে। গিরিবালা বলেন,—"না; ছোট ভাইএর হিংসে করতে নাই। গল্প শোন্: তোর বাবা যখন জন্মাল, সমস্ত পাণ্ডুলে হৈ-হৈ পড়ে গেল, সরকারের প্রথম নাতি হয়েছে, সোজা কথা নয় তো? সামনের অত-বড় বটতলা আর অশথতলা তো একেবারে অষ্টপ্রহর লোকে গিজ্-গিজ্ করছে—সামনে উঠোনটায় প্রকাণ্ড শামিয়ানা পড়েছে—ভাট, নটুয়া, বাজনা-বাদ্যি—একটুকুর জন্য বিরাম নেই। বাড়িতে এদিকে তোর বাবার চিৎকার— বড্ড চেঁচাত কি না, কাক-চিল বসবার জো ছিল না—ওদিকে বাইরে ঐ সব। তোর বাবার যিনি ঠাকুর্দা, আমাদের যিনি বাবা আর কি, তাঁর ভেতরে ভেতরে খুব আমোদ হয়েছে; কিন্তু সে কথা তো মানবেন না, তোর বাবার ঠাকুরমাকে বলছেন—"কী এক তোমার নাতি হয়েছে বাপু, বাড়িতেও টেঁকতে দেবে না, বাইরেও টেঁকতে দেবে না···

বৃদ্ধের এই অসহায় অবস্থায় খোকার মনে কোথায় সুড়সুড়ি লাগে, একেবারে খিল্-খিল করিয়া হাসিয়া ওঠে। তাহার পর প্রতিকারের কথা মনে পড়ে, বলে—"নটুয়াদের কেন তাড়িয়ে দিলেন না গিন্নি? আমি যদি থাকতাম তো···"

গিরিবালা হাসিয়া বলেন—"বটেই তো, বাবা উঠোনে শুয়ে ট্যাঁ-ট্যাঁ করছে, সে সময় তোমার না থাকলে মানাবে কেন? কথায় বলে না···?—বাবা পেটে, মা হাঁটে, আমি তখন বছর আটে।··· নটুয়ারা কি কারুর হুকুমে এসেছে যে তাড়ালেই যাবে চলে? সরকারের নাতি হয়েছে, তারা আমোদ করতে এসেছে, তাদের তাড়ায় কে? গান শোনাবে, বকশিস নেবে, তার পর যাবে।···এদিকে ঐ এর ওপর ঘোড়ার শব্দ, মাঝে মাঝে হাতিও আওয়াজ করে উঠছে···"

"পক্ষিরাজ ঘোড়া গিন্নি?"

গিরিবালা খানিকটা বাড়াইয়া বলিতেছিলেনই, নাতির পক্ষে রুচিকর করিয়া, তবে তাহার কল্পনা যে আবার এতটা উদ্‌বুদ্ধ হইবে ভাবিতে পারেন নাই। হাসিয়া বলেন—"হ্যাঁ, পক্ষিরাজ বৈ কি, তুই কি ভেবেছিস এই ঘোড়া না কি, দূৎ!"

এর পরে আর সুর নামানো যায় না, পাণ্ডুল আপনা-আপনিই রূপকথার রাজ্য হইয়া পড়ে। একে পাণ্ডুল, তায় প্রথম সন্তানের কথা একটি স্বপ্ন-যুগেরই স্মৃতি, গিরিবালার আর একটুও যেন বাধে না। ঘোড়া যেমন পক্ষিরাজ হইয়া যায়, হাতিও তেমনি হইয়া পড়ে ঐরূপ। গল্প চলিতে থাকে: শুভ উপলক্ষে অনেকে অভিনন্দিত করিতে আসিয়াছিল—কেহ পাল্কিতে, কেহ ঘোড়ায়; দূর কুঠি থেকে এক-আধ জন বোধ হয় হাতিতেও,—একের জায়গায় পাঁচ গুণ করিয়া গিরিবালা গল্প চালাইয়া যান। এমনও কত বিচিত্র কাণ্ড সব হয় যাহার মূল মোটেই কিছু নাই।···কচি ছেলের কান্না শুনিয়া কোন্ গ্রাম থেকে অপরূপ সুন্দরীর বেশ ধরিয়া কোন্ এক ডাইন আসিতেছিল, শেষ পর্যন্ত ধরা পড়িয়া কি পরিণামটাই হইল তাহার। আরও সব অনেক কাণ্ড। দুই জনের জগৎ—নাতি আর ঠাকুরমা, তৃতীয় কোন অনধিকারীর প্রবেশ নাই সেখানে, তাই কোন প্রশ্ন নাই, কোন সংশয়ের ছায়া নাই—শুধুই কথার আনন্দ, আর শোনার বিস্ময়—দ্বারভাঙ্গার অস্তিত্বই যেন যায় মিটিয়া।

এক সময় নাতি হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল—"আর পরী এল না গিন্নি?"

গিরিবালা থামিয়া যান, মনে মনে বোধ হয় একটু হাসেন, তবে হারটা একেবারে স্বীকার না করিয়া বলেন—"ওমা, পরী এসেছিল বৈ কি, সে কথা বুঝি তোকে বলিনি এতক্ষণ? তোর বাবার জন্মতে আর পরী আসেনি!"

একটু ভাবিতেই গিরিবালার সমস্ত মনটি আলো করিয়া পরী আসে নামিয়া,—দুলারমন। পাণ্ডুলে তো দু'টি পরীই ছিল,—এক খঞ্জনী, ছদ্মরূপে, আর এক দুলারমন, রূপের ডালি সাজাইয়া।

নাতির সামনে গিরিবালা প্রিয়সখীকে নিখুঁৎ করিয়া আঁকিয়া তোলেন, এমন পট-ভূমিকায় তাহাকে পাইয়া মনটা উল্লসিত হইয়াই ওঠে।

"পরীও এসেছিল। কী তার রং!—সমস্ত পিঠ ছেয়ে কালো চুলের ঢেউ, ভোমরার মতন কালো চোখ, তার ওপর সরু-উ-উ দু'টি ভুরু কে যেন তুলি দিয়ে টেনে দিয়েছে; তিল ফুলের মতন নাক; ঠোঁট বলে এবার আমি রক্তে ফেটে পড়ব। আর সে কি দাঁত।—যেন দু'সারি মুক্তো সাজানো, যখন আসছে, মনে হয়···"

নাতি প্রশ্ন করে—"কে বিয়ে করলে গিন্নি?"

গিরিবালা একেবারেই খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া ওঠেন, বলেন—"কেন, মতলবখানা কি বলো দিকিন শুনি? তাকে মেরে-ধরে কেড়ে নিয়ে আসবে না কি?"

সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু গম্ভীর হইয়া যান, দুলারমনের প্রসঙ্গে মনে যেন কী একটা জোয়ার আসিয়াছে, বাধা মানে না। বলেন—"শোন্ না, তোর বাবাকে পাশে নিয়ে উঠোনে বসে রোদ পোয়াচ্ছি, হঠাৎ যেন সমস্ত উঠোনটা আলো করে পরী এল। কোলের ওপর হাত দু'টি জড়ো করে, দাওয়ায় বসে ঠায় তোর বাবার পানে চেয়ে আছে, মুখে মিটি-মিটি হাসি, কি যেন একটা দুষ্টুমির কথা বলব বলব করছে—সর্বদাই হাসি-ঠাট্টা ভালোবাসত কি না; তার পর হঠাৎ বলে উঠল—'দুলহীন, তুমি একটু চোখ বোজ দিকিন।'

জিজ্ঞেস করলাম—'কেন?"

'খোকাকে নিয়ে আমি পালাব, চমৎকারটি হয়েছে।'

আমি হেসে বললাম—"চোখ বোজবার দরকার কি, তুমি এমনিই নিয়ে যাও না দুলারমন।'

নাতি প্রশ্ন করে—"পরীর নাম ছিল গিন্নি ?"

গিরিবালা বলেন—"নাম ছিল বৈ কি ; সবাই বড় ভালবাসত, তাই নাম হয়েছিল দুলারমন—ওদের ভাষায় দুলার মানে তো আদর করা ?···আমি বল্লাম—'তুমি নিয়েই যাও না, যা কাঁদুনি হয়েছে ! তোমার ঠাণ্ডা ছেলে হলে বরং আমায় দিও। তাই শুনে সে কী···"

নাতি বাধা দিয়া প্রশ্ন করে—"পরীদের ছেলে খুব ঠাণ্ডা হয় গিন্নি ? একটুও কাঁদে না ?"

গিরিবালা বলেন—"এপরী যে নিজে বড্ড ঠাণ্ডা ছিল···"

"একটুও কাঁদত না ?"

"না, দুলারমন-পরীকে যখনই দেখ, শুধু···"

হঠাৎ যেন মনে একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল, গিরিবালা চুপ করিয়া গেলেন। আজ ঠিক করিয়াছিলেন রূপে, রঙ্গপ্রিয়তায় দুলারমনের যে আনন্দ মূর্তি, নাতির কাছে সেইটিই লোভনীয় করিয়া ফুটাইয়া তুলিবেন, ভগবানের আশীর্বাদে তিনি যে সুখটুকুর আজ অধিকারী, প্রিয় সহচরীকে মনে মনে যেন তাহার ভাগ দেওয়া,—নাতিকে লইয়া দুই সখীর কৌতুক। নাতির একটি প্রশ্নে সব ওলট-পালট হইয়া গেল, উত্তরটি মুখে আটকাইয়া গেল।

গিরিবালা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন ; মন হঠাৎ রূপ-কথার পাওুল থেকে বাস্তব পাওুলে নামিয়া আসিয়াছে। একবার নাতির নিকট উৎসুক তাগাদা খাইয়া তাঁহার ঘোরটা ভাঙ্গিল, বলিলেন—"অ্যাঁ, কি বলছিলি—কাঁদতো না ?···না, হাসিই ছিল মুখে লেগে তার···তবে কাঁদতও—কাঁদত বৈ কি···"

রূপকথার নাতি এক জন অথরিটি, ঠাকুরমাকে সাহায্য করে—"না কাঁদলে মাণিক ঝরবে কি করে, না গিন্নি ? পরীদের তো কাঁদলে মাণিক ঝরে, হাসলে মুক্ত ঝরে···"

গিরিবালা যেন কূল পান—"হ্যাঁ, মাণিকই ঝরত, তার কান্নায় মাণিকই ঝরত বটে—"

নাতি নিজের অভিমতে বোধ হয় গর্ব অনুভব করে, একটু গম্ভীর হইয়া বলে—"আর তুমি বলছিলে কাঁদত না !"

"না, কাঁদত—কাঁদত বৈ কি।"—গিরিবালা আবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়েন, কথা হইয়া পড়ে অসংলগ্ন—"কাঁদত, তবে হাসতই বেশি ···রোস্, হয়েছে—এবার মনে পড়েছে—সে হাসি দিয়ে কান্না চেপে রাখত—তাই মুক্তায় মাণিকে জড়াজড়ি হয়ে যেত তার হাসিতে···"

নাতির সব জানা,—এক-এক সময় ঠাকুরমার এই রকম কি হয়, ক্রমাগতই তাঁহাকে সাহায্য করিতে হয়, মনে করাইয়া দিতে হয়, গল্প কিন্তু আর কোন মতেই জমে না।···তবু একটু চেষ্টা চলিল।

তাহার পর এক সময় একটা ছুতা করিয়া সে নামিয়া গেল।

দুলারমনের চিন্তা আসিয়া গিরিবালার সমস্ত মন জুড়িয়া বসিল। ···কোথায় গেল দুলারমন ? শেষ পর্যন্ত হতভাগিনীর জীবনে কি হইল ? পাওুলে নাই, পাওুলের কেহ দিতেও পারে না কোন খবর। কয়েক বৎসর আগে একবার গঙ্গাস্নানের জন্য এই পথ দিয়া মেয়ে-পুরুষের একটি যাত্রীদল যাইতেছিল ; একটি আধ-বুড়ি গোছের স্ত্রীলোক 'ছুলহীন' বলিয়া আসিয়া পরিচয় দিল, সে পাওুলের নিকটবর্তী সাগরপুরের লোক। কিছু কিছু গল্প হইল। তাহার নিকট মাত্র এইটুকু টের পাইয়াছিলেন যে, দুলারমন পাওুলে নাই, ওদের বাড়িতে মাত্র তাহার ভাই ভাজ আর তাহাদের দুইটি ছেলে আছে। মনে হইল বুড়ি দুলারমন সম্বন্ধে আলোচনাটা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেই করিতেছে। তাহার পর দলের লোকেরা হঠাৎ ডেরা তুলিয়া যাত্রা করায় আর কথাটা পরিষ্কার হইল না। আরও কয়েক বৎসর পরের কথা—বিপিনবিহারীর একবার মধুবাণীতে দরকার পড়িয়াছিল ; গিরিবালা একটু খোঁজ লইতে বলিয়া দিয়াছিলেন। বিপিনবিহারী আসিয়া বলিলেন—"ওদের বসত-বাড়িটা কিনিয়া লইয়া কে এক জন একটা কোঠা-বাড়ি তুলিয়াছে। তাও তালা-বন্ধ ; এদিকে গাড়িরও সময় হইয়া গিয়াছিল, তিনি আর বেশি খোঁজ লইতে পারিলেন না।

এই প্রায় কুড়ি বৎসরের মধ্যে দুলারমনের মাত্র এইটুকু সংবাদ পাওয়া গেছে। মাঝে মাঝে এই দুইটি সংবাদ-কণিকার চারি ধারে গিরিবালার মনটা যেন পাক খাইতে থাকে—প্রিয়কে ঘিরিয়া তো থাকে আশঙ্কাই !—গিরিবালার কেবলই মনে হয়, দুলারমনের আলোচনায় সেই বুড়ির মনটা হঠাৎ যে সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছিল কেন ?

নাতি উঠিয়া গেলে গিরিবালা চুপ করিয়া বিছানাতেই শুইয়া রহিলেন, পাশে নাতনীটি ঘুমাইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন রূপে দুলারমন যেন চোখের সামনে মিলাইয়া মিলাইয়া যাইতেছে—প্রথমে সেই হাস্যময়ী নবপরিচিতা কথায় কথায় হাসি, কথায় কথায় রহস্য,—দুলারমন আসিয়াছে, বাড়ির গুমট যেন সঙ্গে সঙ্গেই কাটিয়া গেল। তাহার পর সেই ব্রীড়াময়ী বধূ,—গহনায়, শাড়ি-আরাগায়, নূতন প্রসাধনে জমজম করিতেছে দুলারমন···গিরিবালা শাশুড়ীকে প্রশ্ন করিতেছেন—"মা, সীতাও না কি এই রকম ছিলেন মা ?"·· আরও পরের কথা, গিরিবালা বাপের বাড়ি থেকে ফিরিয়া আসিলেন, দুলারমন পাওুলেই, কিন্তু আসে না। বড় ননদ বিরাজমোহিনী জানাইলেন—ওকে শ্বশুরবাড়িতে আর নেয় না।···অবশেষে অনেক ডাকাডাকির পর এক দিন আসিল দুলারমন। মলিন, ক্লান্ত, অবসন্ন ফুলটিকে যেন ভিতরে ভিতরে পোকায় কাটিয়াছে, এইবার ঝরিয়া পড়িবে। তবু হাসি—জীবনের অসফলতাকে হাসি দিয়া ঢাকিবার সে কী অমানুষিক চেষ্টা ! সেই কথা মনে করিয়াই তো গিরিবালা নাতিকে বলিলেন—"সে হাসি দিয়ে কান্না চেপে রাখত, মুক্তায় মাণিকে জড়াজড়ি হয়ে যেত তার হাসিতে।···তাহার পর আরও মলিন, আরও মলিন, আরও মলিন—যেন আর চাওয়া যায় না দুলারমনের পানে। এই চিত্রপরম্পরার শেষ চিত্রটি এখনও চোখে যেন লাগিয়া আছে,—পাওুল ছাড়িয়া শেষ যাত্রায় চলিয়াছে তাঁহাদের শামপেনি, যতক্ষণ দেখা গেল দুলারমন বাড়ির চৌকাঠে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আঁচলে প্রায় সমস্ত মুখটা ঢাকা, তাহারই উপর দিয়া সামপেনির পানে চাহিয়া আছে—যতক্ষণ দেখা যায়—যত দূর পর্যন্ত।···তাহার সব গেছে, এই বিদেশী পরিবারের দরদ ছিল যেন একটা অবলম্বন, বিধাতা সেটুকুও ঘুচাইলেন।

এর পরে আসিল পাওুল আর মধুবাণীর ঐটুকু করিয়া খবর।

আজ খুব বেশি করিয়া দুলারমনকে রঙে-আলোয় সাজাইতে গিয়া তাহার চারি দিকের অন্ধকার যেন আরও গাঢ় হইয়া গেছে। কেবলই মনে হইতেছে কোথায় গেল দুলারমন, হতভাগিনীর জীবনের শেষ পরিণাম কি ? দুলারমনের আলোচনায় সেই বৃদ্ধা হঠাৎ অমন হইয়া গেল কেন ? আর সহ্য করিতে না পারিয়া দুলারমন কি শেষে···

চিন্তাটাকে গিরিবালা যেন দুই হাত দিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া রাখিতে চান। [ক্রমশঃ

কেতকী

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কথা-চিত্র

১৩

সেদিন অপরাহ্ণে তাগাদা সেরে অত্যন্ত অপ্রসন্ন মনেই যাদব রায় বাড়ী ফিরছিলেন। অনেক দিন হাঁটাহাঁটির পর তাঁর বাকিদার খাতক সত্য বাগ্‌দীকে যদিও তিনি আজ ধরতে পেয়েছিলেন, কিন্তু তার ফলে যে বিরক্তিকর ব্যাপারটি ঘটে যায়, তাতে তার সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভালো ছিল। সত্য তো হস্ত উপুড় করে নাই, উপরন্তু নেশার ঝোঁকে এমন কতকগুলি অশিষ্ট কথা শুনিয়ে দিয়েছে, যাদব রায়ের মত মানী লোকের পক্ষে যেটা নিতান্ত বেদনাদায়ক। কেমন করে এই দুর্বিনীত খাতকটিকে রীতিমত শিক্ষা দিবেন সেই চিন্তা করতে করতে যখন তিনি স্বগ্রামের পথে এসে পড়েছেন, সেই সময় কানাই কোথা থেকে ছুটে এসে একবারে তাঁর সামনের পথটা আটকে উপুড় হয়ে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চটি জুতোর তলায় ডান হাতখানা চালিয়ে দিয়ে পরক্ষণে সেটা মাথায় ঘসে সোচ্ছ্বাসে বললো: আপনার কাছেই যাচ্ছিলুম মেদো মামা, মান-মর্যাদা তো আর থাকে না।

হঠাৎ পথের মাঝে পায়ের ওপর পড়ে কানাইয়ের এই ভাবোচ্ছ্বাসে যাদব রায়ের মতন ঝানু লোকও বুঝি ভড়্‌কে গেলেন। দু' পা পিছিয়ে গিয়ে চোখ দু'টো কপালের দিকে তুলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: ব্যাপার কি বাবাজী, কি হোয়েছে?

গলার স্বর দিব্য গাঢ় করে কানাই বললো, হোয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু—মুখে বলতেও মাথা যেন কেটে যাচ্ছে! আপনার ছেলে পাস করলে কি হবে, ভারি বোকা আর হেংলা; তার ওপর ঠাট্টা বোঝে না।

ছেলের কথা এ ভাবে তুলতে যাদব রায় একটু চটে গেলেন, চোখ দু'টো পাকিয়ে কানাইয়ের পানে চেয়ে বললেন: হোয়েছে কি তাই বল না বাপু, অত ভণিতার কি দরকার!

কানাই একটু গম্ভীর হয়ে বললো: গোকুলদা'র বাড়ীতে আজ বিকেলে বড়া ভাজা হচ্ছিল। গন্ধে গন্ধে মেগো ওদের রান্নাঘরের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তাকে দেখতে পেয়ে গোকুল বাবুর বোন বড়া হাতে করে—আয়, তু তু করে ডাকে। তাতেই আপনার ছেলে চটে চলে আসে। তা'ও বলি, বড়া যদি খাবার ইচ্ছেই তোর হোয়েছিল, বাড়ীতে বললেই তো পারতিস্। এ রকম করে মান খোয়ানো কি ভাল?

মেয়ের বিয়ের কোন ব্যবস্থা না করে পীতাম্বর বিদেশে যাওয়ায় যাদব রায় তাঁর ওপর প্রসন্ন ছিলেন না, এখন ছেলের উপযাচকের মত ও-বাড়ীতে যাওয়া, আর ও-পক্ষের এই নীচ ব্যবহার তাঁর অপ্রসন্ন চিত্তে রীতিমত জ্বালা ধরিয়ে দিলে। কানাইয়ের সামনেই ছেলের উদ্দেশে হুঙ্কার তুলে বলে উঠলেন: বটে, ডুবে ডুবে জল খাওয়া! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা—তোমার বড়া খেতে যাওয়া বা'র করছি—ছেলের নিকুচি করেছে।

যাদব রায়ও মারমুখী হয়ে বাড়ীর দিকে ছুটলেন। কানাই সেখানে দাঁড়িয়ে হাসি চেপে সে দৃশ্যটা উপভোগ করতে লাগলো।

১৪

এ দিনের ব্যাপারে মৃগেন চরম আঘাত পেয়েই বাড়ী ফিরেছিল। ক'দিন ধরেই মন তার ভার হয়ে উঠেছিল। সে জেনেছে, দুনিয়ায় পয়সার মান সবার আগে। পয়সা আছে বলে অপদার্থ হয়েও কানাই ও-বাড়ীতে সবার আদর পেয়েছে, মায়াও তাকে মেনে নিয়েছে। আর পয়সার অভাবেই তার এই লাঞ্ছনা—মায়ার সামনে, সবার সামনে কানাই তার অপমান করে!

নিজের ঘরে বসে যখন সে আকাশ-পাতাল ভাবছে, সেই সময় যাদব রায় এসে দিল মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা! দুই চোখ পাকিয়ে মুখখানা বিকৃত করে বললেন: ভেবেছিস্ কি, মান-ইজ্জত সব খুইয়ে বসেছিস্—কুকুরের মতন ঐ পুতুলগুলোর বাড়ীতে বড়া মেগে খেতে গিয়েছিলি হতভাগা! কেমন অপমান করেছে—বেরো আমার বাড়ী থেকে, এমন ছেলের মুখ দেখতেও চাইনে আমি—

মৃগেনের দুর্ভাগ্য, এ-দিন বাড়ীতে তার বিমাতা ছিলেন না, বাপের বাড়ী গিয়েছেন পীড়িতা মাকে দেখতে। পত্নীর সতর্কবাণী ভুলে যাদব রায় প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে এই প্রথম নিষ্ঠুর ভাবে তাড়না করলেন।

নীরবে সব শুনলো মৃগেন—একটি কথারও প্রতিবাদ করলো না, কিন্তু মনে মনে তখনি তার কর্তব্য স্থির করে নিল। রাতে কিছু খেলে না, খিল দিয়ে শুয়ে পড়লো ঘরে। ক্রুদ্ধ পিতার পক্ষ থেকেও কোন অনুরোধ এল না।

গভীর রাতে বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখলো সে···যেন ছুটে চলেছে কে, একা শুধু একা আর পিছন থেকে ডাকছে তাকে একটি মেয়ে···যাকে কোন দিন দেখেনি সে।···ঘুম ভেঙে যেতেই ধড়মড় করে উঠে বসল সে—দু'হাতে চোখ রগড়ে ভাবতে লাগলো স্বপ্নের কথা···স্বপ্নে দেখা মেয়েটির কথা···ভেবে সে ঠিক করতে পারলো না মায়ার চেহারা অমন পালটে গেল কেন! সঙ্গে সঙ্গে মনে হোল, এটা সুলক্ষণ, তাকে সব ছাড়তে হবে—সব ভুলতে হবে—মায়াকেও।

শোবার আগেই নিজের খাতাপত্র আর স্বল্প কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রেখেছিল সে। জমিদার-বাড়ীর পেটা-ঘড়ি থেকে সেই সময় পর-পর চারটে বাজলো। বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে পুঁটলিটি বগলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো সে বৈরাগের পথে।

ঠিক সেই সময় বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখে মায়াও বিছানায় উঠে বসেছে। উঃ! কি খারাপ স্বপ্ন—যেন তার বিয়ে হচ্ছে; কিন্তু যতই তাকে ক'নে-চন্দন পরাচ্ছে, চোখের জলে মুছে যাচ্ছে সব; আর বাইরের চালা-ঘরে বরাসনে বসে আছে কানাই, আর মৃগাঙ্ক ছুটে চলেছে রাস্তা ধরে—তাকে দেখতে পেয়ে মায়াও ছুটছে তার পিছু-পিছু তাকে ধরবার জন্যে কিন্তু পা তার মোটেই এগুচ্ছে না—কে যেন ধরে রেখেছে!

১৫

ছোট একটি শহর—তবে ছোট হলেও জলপথে অনেকগুলি অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় বড়ো একটা ব্যাপারের জায়গা সেটা।

সেইখানে পরেশ পাল এক প্রতিমা-প্রতিষ্ঠান খুলে নূতন ধরণের ব্যবসার পত্তন করেছে। ছোট মাঝারী বড়—একানে পরীওয়ালা নানা রকমের প্রতিমা গড়ার কাজ চলেছে। আমাদের পীতাম্বর এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিল্পী। তারই নির্দেশমত প্রতিমার কাজ চলেছে। দিবারাত্রি খেটে চলেছে পীতাম্বর—প্রতিমার পর প্রতিমা গড়া হচ্ছে। পরেশ তুখোড় লোক, দিনের বেলায় নিজে আর হাতের নিষ্কর্মা দু'-চার জনকে নিয়ে কাঠামোগুলি বাঁধে, মাটি লাগায়—কিন্তু সব তাতেই পীতাম্বরকে নির্দেশ দিতে হয়। কেন না, দেবী-প্রতিমায় কোন রকম কারসাজী বা ফাঁকি তার কাছে হবার জো নেই। পরেশ বেগার ধরেই কাজ সারতে চায়, চা'টা, তামাকটা, গাঁজাটা-আসটা খাইয়েই তাদের খাটিয়ে নেয়।

সন্ধ্যার পর কর্মশালায় থাকে শুধু পীতাম্বর আর পরেশ। সে তখন গাঁজা টিপতে বসে, পীতাম্বরকে প্রায়ই বলে: চলবে না কি অধিকারী, যাঁর মূর্তি গড়ছো, ওঁর বাপের বড় সখের জিনিষ এই বড় তামাক, খেলে মাথা আরও খুলবে ঠাকুর!

পীতাম্বর তার হুঁকা-কলকে দেখিয়ে বলে: বেঁচে থাক আমার গুড়ুক, এতেই আমার মাথা খুব খোলে পালের পো!

তার পর অনেক কথাও হয়। পরেশ ক্রমাগতই উৎসাহ দেয়—পীতাম্বর তুলি চালাতে চালাতে ভাবে, কাজ উদ্ধার করে যে দিন বাড়ী যাবে সে—মজুরী বা দক্ষিণা মায়ের কৃপায় যা পাবে সব আশাই তার পূর্ণ হবে। আঃ, সে দিন কি সুখেরই হবে! আগেই জমিটা উদ্ধার করবে—না না ধুলো পায়ে গিয়েই ঐ চশমখোর যাদবের হাতে পণের টাকাটা তুলে দিয়েই বলবে—দেখলে ত মায়ের দয়া··· এমনি কত স্বপ্নই দেখে।—

আবার পরেশ গাঁজায় টিপ দিতে দিতে ভাবে, কোন্ প্রতিমা কোন্ খদ্দেরকে ঝাড়বে আর ঐ বুড়ো অধিকারীকে রম্ভা দেখাবে কেমন করে! পরেশ পালকে ত চেনেননি ঠাকুর···আগাম যে ক'টা টাকা দিয়েছি তাতেই বুক টন্‌-টন্ করছে···আবার? আরে এ মেহনতের আবার দাম কি। ওঁকে দোব আধা আধা বখরা! ভাবলেও হাসি আসে। এখনি মনে মনে কত প্যাচই কষতে থাকে।

১৬

এদিকে বৈরাগ্যের পথে বেরিয়ে মৃগেন ঘটনাচক্রে এমন এক গণ্ডগ্রামে এসে পড়লো—যেখানকার বাসিন্দারা কৃষিজীবী আর কারবারী। কারো গৃহে অভাব নেই, গ্রামখানি যেন আনন্দ ও শান্তির আশ্রম। গ্রামের যারা বনেদী মাতব্বর অধিবাসী, তাদের বিদ্যার দৌড় পাঠশালার গণ্ডীতেই আবদ্ধ। বর্তমানে গ্রামে এক পাঠশালা আছে কিন্তু শিক্ষক নেই। মৃগেন একটা পাস করেছে শুনে তারা ত তাকে দেবতার পর্য্যায়ে ফেললো, তার ওপরে সে যখন বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ। ফলে মৃগেনের আর বৈরাগ্য হোল না, গ্রাম্য মাতব্বরদের পীড়াপীড়িতে গ্রামেই তাকে থাকতে হোল পাঠশালাটির ভার নিয়ে।

একটা চণ্ডীমণ্ডপে দিনের বেলায় পাঠশালা বসে, রাতে সেখানে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পড়া হয়। এক জন পড়ে, পাড়াশুদ্ধ সবাই জড় হয়ে শোনে। ক্রমে পড়ার ভার পড়লো মৃগাঙ্কর ওপর। এখানে এসে মৃগেন খুব উৎসাহে তার লেখা পালাটির সংস্কার শুরু করে। মাষ্টার মশাই পালা বাঁধতে পারে—কথাটা জানাজানি হতে সবাই ধরে বসলো, আমরা যাত্রার আসরে বসে পালার গাওনাই শুনি, পালা পড়া ত শুনিনি কোন দিন, শোনাতে হবে মাষ্টার মশাই। মৃগেন ত উৎসাহের সঙ্গে পালা পড়ে শোনায়—কিন্তু সেই সঙ্গে পালার খাতায় যেন ফুটে ওঠে তার আদি শ্রোত্রী মায়ার কৌতূহলোজ্জ্বল মুখখানি।

১৭

এদিকে মৃগেনের আকস্মিক নিরুদ্দেশে গ্রামে হুলস্থূল পড়ে গেছে। যাদব রায় একবারে দমে গেছে—মৃগেনের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে তার পরলোকগতা স্ত্রী লক্ষ্মীর শোক যেন নতুন করে জেগে উঠেছে। নিজেই এ-বাড়ীতে এসে মায়াকে ডেকে বল্লেন: তোমার মৃগকে আমিই বনে পাঠিয়েছি মা—কানাইয়ের মুখে সে দিনের কথা শুনে রাগ সামলাতে পারিনি।

মায়া ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে—স্বপ্নের ছবি ফুটে ওঠে তার মনে।

করুণা এসে আসল কথাটা তখন শুনিয়ে দেয়। যাদব তখন কপালে করাঘাত করে চেঁচিয়ে বলেন: আমার মাথায় তোমরা একখানা থান ইট এনে মারো, আমি নিষ্কৃতি পাই।···

এই সময় কানাই এসে বলে: তার আগেই মেগা তোমার মাথায় থান ইট মেরে গেছে মামা, শুধু তোমার মাথা নয়—গেরামশুদ্ধ সবার মাথায়। আমার বড় মামা এই মাত্তর এলেন কি না, তাঁর মুখে শুনে এলুম—ইষ্টিশানে একটা খেমটাউলি ছুঁড়ির সঙ্গে মেগাকে তিনি দেখে এসেছেন।

মারমুখী হয়ে যাদব বলে ওঠেন: যত নষ্টের গোড়া ত তুই, যা নয় তাই বলে আমার কান ভাঙিয়েছিলি, এখন তার নামে এই কলঙ্ক দিচ্ছিস্ হারামজাদা, আমার মেগা যে গঙ্গাজলের মতন শুদ্ধ, এ কথা গ্রামশুদ্ধ সবাই জানে।

এই সময় আসরে এলেন কানাইয়ের মা সারদা, তিনি ছেলের পক্ষ নিয়ে ছ্যার ছ্যার করে যাদব রায়কে সহস্র কথা শুনিয়ে দিলেন: নিমুক্ চামার কোথাকার—কচি খোকা আর কি! কান-ভাঙানিতে ভোলেন—সংসারের যা সুখ সে ত জানতে বাকি নেই, আর ছেলে লোকের সামনে গোবেচারী, ৎদিকে যে ডুবে ডুবে জল খেত সে খবর তো কেউ রাখেনি! আমার ভাই মিথ্যে বলবার লোক কি না—দশটা যাদব রায়কে কিনতে পারে সে!

এর পর গোকুল আসতে ঝগড়া থামলো, কিন্তু যাদবকে স্তব্ধ করে দিয়ে সারদা যে ভাবে ওকালতি করলো শুনে গোকুলকেও স্তম্ভিত হতে হোল।

মৃগেনের গৃহত্যাগের কিছু দিন পরে ডাকে মায়া একখানি চিঠি পায়—সেই চিঠিখানিই এখন তার চিন্তার অবলম্বন হয়েছে। সবার অলক্ষ্যে চিঠিখানি পড়ে, তার পর একটা টিনের কৌটায় ভরে কুলুঙ্গির মধ্যে লুকিয়ে রাখে। চিঠিখানি খুব সংক্ষিপ্ত, বয়ান এই:—

"মায়া, দেখলুম সংসারে পয়সাই সব চেয়ে বড়ো। পয়সার জোরে কানাই তোমার ঘরে বসে বড়া খায়, আর—পয়সা নেই ব'লে আমাকে ঘরের কানাচ থেকে কুকুরের মতন ফিরে আসতে হয়। পয়সার জন্যেই কানায়ের মুখের মনসামঙ্গল গান কান পেতে সবাই শোনে, পয়সা নেই বলে আমার লেখার কোন কদরই নেই। তাই চলেছি একা একা এমন এক পথে—পয়সার বালাই যেখানে নেই।"

পড়তে পড়তে অশ্রুতে মায়ার চোখ ভরে ওঠে। আপন মনেই বলে—তবুও লোকে তোমার নামে অপবাদ দেয়, কলঙ্ক রটায়। এক একবার মনে হয়, তার চিঠিখানা দেখিয়ে সবার মুখ বন্ধ করে দেয়, কিন্তু সে ইচ্ছা জোর করেই দমন করে আপন মনেই বলে: লোকের যা ইচ্ছা তাই বলুক, আমি ত জানি তুমি আমার খাঁটি সোনা।···

কিন্তু কানাই এক দিন এই গোপন তথ্যটিও আবিষ্কার করে ফেললো; তার পর সুযোগ পেয়ে চুপি চুপি এসে কুলুঙ্গির কৌটাটি থেকে মৃগেনের চিঠিখানি বার করে নিয়ে তার ভিতরে নিজের একখানি চিঠি ভরে রাখলো। মায়ার উদ্দেশে অশুদ্ধ ভাষায় প্রেম-নিবেদন করেছিল সে ঐ পত্রখানিতে।···

সেদিন কৌটা খুলে পুরাতন খামের ভিতর থেকে নতুন পত্রখানি দেখেই শিউরে ওঠে মায়া, তার পর পত্রখানি পড়েই ব্যাপারটি বুঝতে পেরে—কোন গোল না করে চেপে গেল—কৌটাটি নিজের তোরঙ্গের ভিতর লুকিয়ে রাখলো।

১৮

মৃগেন যে গ্রামে জেঁকে বসেছে মাষ্টার এবং পাঠক হয়ে, বার্ষিক বারোয়ারীর ধুম পড়ে গেছে সেখানে। স্থির হয়েছে শহরের সেরা যাত্রা—বীণাপাণির দল তিন রাত্রি তিনটি পালা গাইবে। এই যাত্রা উপলক্ষে মৃগেনের অদৃষ্ট আর এক পথে গতি নিল।

বিখ্যাত দলের গাওনা ভালো হলেও পালার সুখ্যাতি কেউ করল না—আসরেই সবাই বলাবলি করল: এর চেয়ে আমাদের ম্যাষ্টরের পালা অনেক ভালো।

দলের অধ্যক্ষ এই সূত্রে এরই মধ্যে অবসর করে নিয়ে মৃগেনের পালার কিছুটা শুনেই চমকে গেলেন। তার পর ভবিষ্যতের আশা দেখিয়ে মৃগেনকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইলেন মহকুমার সদরে যেখানে দলের মালিকের গদী। মৃগেনকে তিনি বললেন: মালিক নিজে শুনে পালা পছন্দ করেন। পালার জন্যেই তাঁদের দল মার খাচ্ছে। পালা যদি মনে ধরে পছন্দ হয়—বরাত আপনার খুলে যাবে মৃগেন বাবু। তিনি মস্ত ধনী। যাত্রার দল তাঁর আর দশটা ব্যবসার একটা।

মৃগেন রাজি হয়ে সঙ্গে গেল।

১৯

পীতাম্বরের কাজ অনেকটা এগিয়েছে। আটচালা জুড়ে সারি সারি প্রতিমাগুলির গায়ে সাদা রং-এর এক এক কোট পড়ায় চমৎকার বাহার খুলেছে। মুখগুলি এরি মধ্যে যেন হাসছে, এখনো রঙ পড়বে, মুখ-চোখের ওপর সূক্ষ্ম কারুকাজ হবে। তুলি চালাতে চালাতে পীতাম্বর বললে: ম্যাদ্দিন পরে আজ বাড়ীতে চিঠি লিখে দিয়িছি পালের পো!

পরেশ বলল—বটে, তা কি লিখলে?

পীতাম্বর বললেন: লিখলুম, গোটা পঞ্চাশ টাকা আপাতত পাঠাচ্ছি, আর শ্রীপঞ্চমীর আগেই যাতে পাও তার ব্যবস্থা করছি। মায়ের পূজোর পরেই হিসেব-পত্তর আদায় করে যত শীগ্‌গির পারি বাড়ী পৌঁছাচ্ছি! জমিও ছাড়াবো, মায়ার বিয়েও দোব। যাদব রায়কে বলবো যে, কথা আমি ভুলিনি, মরদকা বাত হাতীকা দাঁত—তুমি তাহলে গোটা ৫০ টাকা যোগাড় করে রেখো পালের পো—আসছে শনিবার মণিঅর্ডার করে দেব, তাহলেই শ্রীপঞ্চমীর আগে পৌঁছবে বাড়ীতে।

পরেশ পালের মুখখানা অমনি শক্ত হয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে সে ভাব সামলে বলল: তা বেশ ত, আজই আমি তাগাদা দিচ্ছি। তোমার টাকা ত তোলাই আছে অধিকারী।

[ক্রমশঃ।

—সংশয়—

অশোককুমার দত্ত

চল্‌তি পথে মিল্‌ল দেখা তোমার সাথে
অনেক রাতে।
প্রথম তোমার দৃষ্টিপাতে—
প্রথম কুসুম ফুট্‌ল মনের আঙ্গিনাতে।

নয়ন তোমার স্বপ্ন মাখা আবেশ-ভরা
আকুল করা—
সদ্য যেন বৃন্ত-ঝরা
নিশি-শেষের শিশির-ধোয়া মাধবীটি মনোহরা।

আকাশ-ভরা চাঁদের আলো তোমার পরে
স্নেহের ভরে—
আপনি এসে লুটিয়ে পড়ে;
পরশে তার অঙ্গে তোমার রূপের আবেশ নাহি ধরে।

পথিক আমি ভ্রান্তমনা, তোমায় দেখে
নির্নিমিখে
থাকি চেয়ে। থেকে থেকে—
ভাবি শুধু দেউল তব আমায় কি গো নেবে ডেকে।



রক্তনদীর ধারা

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

৬

এই কয় দিন বরুণা রাতের পর রাত জেগে থেকে সুধীরের সেবা-শুশ্রূষা করেছে। লক্ষ্মীনারায়ণও এই কয় দিন সমানে রাত জেগে বরুণাকে সাহায্য করেছে। সুধীরের শুশ্রূষার কার্য্যে লক্ষ্মীনারায়ণ যা করেছিলো, তা সে পরিকল্পনা অনুযায়ীই করেছিলো। আসলে তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো বরুণার সহিত নিবিড় ভাবে আলাপ জমানো। এ সম্বন্ধে লক্ষ্মীনারায়ণ যে কিছুমাত্র সাফল্য লাভ করেনি, তা'ও নয়। রাত্রির একটা নিজস্ব মাদকতা আছে। তাই রাত্রিকালে নরনারীর সম্মিলন প্রায়ই নিরাপদ হয় না। প্রায়ই দেখা যায়, কয়েক রাত্রির আলাপনের পর ছেলেমেয়েরা প্রায়ই পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এইরূপ আলাপনের অধিক সুযোগ ও সুবিধা হয় রোগীর শয্যাপার্শ্বে, বিশেষ ক'রে গভীর রাত্রিকালে।

সত্য সত্যই ওই কয় দিন ধরে বরুণা লক্ষ্মীদা লক্ষ্মীদা করে অস্থির হয়ে পড়ছিলো, কতকটা শ্রদ্ধায় এবং কতকটা বোধ হয় কৃতজ্ঞতাতে। বৈজ্ঞানিকরা বলে থাকেন, ভালবাসা বোনের উপরই হোক বা স্ত্রীর উপরই হোক আসলে বিষয়-বস্তু থাকে একই, তফাৎ যা থাকে তা পরিমাপের। এইরূপ ভালবাসাকে "সুগার কোটেড" কুইনাইনের সহিত তুলনা করা চলে। অর্থাৎ কি না ভিতরে থাকে কম-বেশী কুইনাইন বা যৌনবোধ এবং উপরে থাকে সুগার বা চিনি যাকে কি না আমরা প্রেম স্নেহ ইত্যাদি বলে থাকি। এই কারণে যে কোনও মুহূর্তে অভ্যাস দ্বারা এই যৌনবোধ সংস্কারের এবং কর্ত্তব্যের বাধা এড়িয়ে বার হয়ে এসে এই সোদরতম প্রীতিকে যৌনপ্রেমে রূপান্তরিত করে দিতে পারে। মানুষের সুযোগ, সুবিধা এবং অভ্যাস এই বিষয়ে তাদের সাহায্য করে থাকে। লক্ষ্মীনারায়ণ মেয়েলোকদের এই দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে বিশেষরূপে অবহিত ছিল, তা ছাড়া কেমন করে মানবীর সুপ্ত যৌনবোধকেও বহুপতির প্রতি আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করা যায়, সেই সম্বন্ধে সে ছিল একেবারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

অপর দিনের মত সেই দিনও সুধীর অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে। রাত্রি তখন প্রায় চারটা হবে। বরুণা সুধীরকে হাওয়া করে যাচ্ছিল। চোখ তার ঘুমে ঢুলে আসছে, কিন্তু তবুও তার হাতের বিরাম নেই। লক্ষ্মীনারায়ণ এই সুযোগে বাম হাত দিয়ে বরুণার পৃষ্ঠদেশ জড়িয়ে ধরে ডান হাতে বরুণার হাত থেকে পাখাটা কেড়ে নিয়ে বলে উঠলো,—"এইবার একটু থামো বরু, আমি হাওয়া করছি। তুমি নয় আমার কোলে মাথা দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও, কেমন লক্ষ্মী দিদি, আমার।"

লক্ষ্মীনারায়ণের এই প্রস্তাবে বরুণা বার বার করে আপত্তি জানালো, কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ তার কোনও আপত্তিই না মেনে, জোর করে তাকে শুইয়ে দিয়ে তার মাথাটা কোলের উপর তুলে নিলো অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে। এর পর আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলো, বরুণা তখনও তার লক্ষ্মীদা'র কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। এক হাত দিয়ে সুধীরকে বাতাস করতে করতে লক্ষ্মীনারায়ণ তার অপর হাতটি বরুণার কেশে, মুখে, ও কপোলদেশে বার বার সঞ্চালন করে তাকে আদরে আদরে অতিষ্ঠ করে তুললো। রাত্রিকালীন অবসাদ বোধ হয় মানুষের স্বাধীন চিন্তা অপহরণ করে নেয়, তাই বিষয়টি দিবাভাগে—বিশেষ করে সর্ব্বসমক্ষে বিসদৃশ ঠেকলেও, রাত্রির নিভৃত অন্ধকারে এইরূপ আদরের মধ্যে বরুণা কোনওরূপ দোষ দেখেনি। বরং বরুণা নিবিড় ভাবে তার দেহটা লক্ষ্মীনারায়ণের কোলের উপর এলিয়ে দিয়ে উত্তর করলো,—"তোমার কিন্তু লক্ষ্মীদা বড্ড কষ্ট হবে। সত্যি, আমাদের জন্যে আপনি কি কষ্টই না করছেন, ছিঃ, আমার কিন্তু বড্ড লজ্জা করে এ জন্যে।"

লক্ষ্মীনারায়ণ বরুণার উপর তার আদরের মাত্রা আরও একটু বাড়িয়ে দিয়ে সোহাগ ভরে উত্তর করলো,—"কি যে বলিস্ তুই। তোকে—তোদের আমি কতো স্নেহ করি তা জানিস। বড্ড বোকা মেয়ে তুই। নে ঘুমো।"

কথা কয়টি শেষ ক'রে লক্ষ্মীনারায়ণ বরুণার কপোলদেশে গভীর ভাবে একটা চুম্বন অঙ্কিত করে দিয়ে সুধীরের দিকে চেয়ে দেখলো, রোগী সত্যই ঘুমাচ্ছে কি না? বরুণা কিন্তু এতেও কোনওরূপ আপত্তি জানালো না, বরং সে লক্ষ্মীনারায়ণের বাম হাতখানি আপন কপালের উপর ন্যস্ত করে—হাতখানিকে দুই হাতে চেপে ধরে বলে উঠলো,—"লক্ষ্মীদা, আমাদের কি হবে লক্ষ্মীদা!"

এই সময় লক্ষ্মীনারায়ণ যদি আর অল্পমাত্র অগ্রসর হতো, তা হলেই সে অপদস্থ হতো—বিপদগ্রস্তও। কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ ছিল পটীয়সী বা মোহিনী বিদ্যায় এক জন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সে ভালোরূপই জানতো, কি করে মেয়েলোকের অন্তর্নিহিত, সুপ্ত ও স্বাভাবিক যৌনস্পৃহাকে শনৈঃ শনৈঃ জাগ্রত করতে হয়। এই দিনের মত এইখানেই ক্ষান্ত দিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ ধীরে ধীরে বরুণার মাথাটা আপন কোল থেকে বিছানার উপর নামিয়ে রাখছিল, এমন

সময় শোনা গেলো একটা ভীষণ হল্লা ও গোলমাল। খোকার দলের লোকেরা লুঠের মাল সহ ভোরের দিকে ঘরে ফিরেছে। বাইরের এই চেঁচামেচি শুনে বরুণা ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে লক্ষ্মীনারায়ণের গা ঘেঁসে বসে সভয়ে জিজ্ঞাসা করলো,—"ও কি লক্ষ্মীদা, এঁ্যা ? মাসী কোথায় লক্ষ্মীদা, ডাকো না তাকে।"

এমন একটা সুবর্ণ-সুযোগ ছাড়া যায় না। সৌভাগ্য ক্রমে রোগী এতো গোলমালেও জেগে উঠেনি। এদিকে এতো দিন পরে হঠাৎ মাতালদের পুনরাগমনে বরুণা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে সুরু করেছে। লক্ষ্মীনারায়ণ বরুণাকে কাছে টেনে এনে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে অভয় দিয়ে বললো—"ভয় কি, দিদি! সেই মাতালগুলো আর কি? কিচ্ছু ভয় নেই, ঘুমো তুই। সকাল হলেই তো উঠবি আবার। এক্ষুনি ওরা ওদের ডেরায় ঢুকে পড়বে।

খোকার দলের লোকেরা পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছে, অধিক হল্লা না করে তাদের নির্দ্দিষ্ট ঘরে তাদের ঢুকে পড়বারই কথা। কিন্তু চাবিটা তাদের জিম্মা রাখা ছিলো সুরমা কীর্ত্তনীর কাছে। এদের অবর্ত্তমানে পুলিশ এসে মাঝে মাঝে চাবি না পাওয়ার জন্যে তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে খানাতল্লাস করে—তারা এদের ঘরে কোনও চোরাই মাল পায় না বটে, কিন্তু খামকা দরজাটা ভেঙে রেখে যায়। চাবিটা পেলে অবশ্য এইরূপ ভাঙাভাঙির কোনও প্রয়োজন হয় না, এই জন্যই খোকা সুরমার কাছে চাবিটা রেখে যায় যাতে করে প্রয়োজন হলে সে খোকার ঘরটা নিজেই খুলে দেখিয়ে দিতে পারে যে সেখানে কোনও প্রকার চোরাই মাল রাখা নই।

খোকার দলের এক জন এই চাবির জন্যে, সুরমার ঘরের দুয়ারে ধাক্কা দিতে দিতে তাকে ডাকতে সুরু করলো,—"ও ও—, এই—। তামাসা পেয়েছিস্, না? বার কর শীগ্‌গির চাবি, নয়তো তোর ঘরটাই খুলে দে।"

দলের অপর এক জন চেঁচিয়ে উঠে বললো,—"না খোলে তো চল ঐ পাশের ঘরটায় ঢুকে পড়ি, মাইরী।"

সেই দিন দলের খোকাবাবু, গোপী ও কেষ্ট অন্যত্র জরুরী কাজে গিয়েছে, তাই এদের সঙ্গে তারা ডেরায় ফেরেনি। ঐ দিন দলের কালু ওরফে কালুবাবুই ছিল দলের সর্দ্দার। অন্য দিন হলে এইরূপ হৈ-হল্লাতে দলের অপর সকলের সঙ্গে সে-ও যোগ দিত। কিন্তু এই দিন ছিল সে নিজেই সর্দ্দার। সর্দ্দার বা দলপতির দায়িত্ব অনেক, তাই কাউকে আর বরুণার ঘরের দিকে এগুতে না দিয়ে সে ধমকে উঠলো,—"এই-ই ফের ঐ দিকে? যা, শীগ্‌গির দাওয়ার উপর উঠ। আমি মাসীর কাছ থেকে চাবি চেয়ে আনছি।"

দস্যুদলের এই সান্নিধ্য বরুণা ও লক্ষ্মীনারায়ণের মধ্যকার সংস্কারগত ব্যবধান বহুল পরিমাণে কমিয়ে আনলো। যে লক্ষ্মীনারায়ণ মাত্র একদিন পূর্ব্বে বরুণার গা ঘেঁসে বসতেও সাহস করেনি, সে-ই এখন তাকে নিবিড় ভাবে কাছে টানতেও সাহসী হয়। অনাত্মীয়ের কাছ হতে আত্মরক্ষা করা যায়, কিন্তু আত্মীয়ের কাছ হতে তা পারা যায় না। শত্রু এখানে এসেছে আত্মীয়ের,—ভ্রাতার রূপ ধরে। সহায়-সম্বলহীনা বরুণা তো দূরের কথা, পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান্ নৃপতিও এইরূপ অবস্থায় আত্মরক্ষা করতে পারেনি।

দূরে—অদূরে পাখীর কাকলি ও ডাক শুনা যায়, রাত্রির অন্ধকার কেটে গিয়ে দেখা যায় ভোরের আলো। আর সেই সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হতে থাকে বরুণার আবাল্য সংস্কার, ব্যক্তিত্ব ও ব্যবহার। কিন্তু এতো সত্ত্বেও ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরুণা লক্ষ্মীনারায়ণের নিকট হ'তে অনেকটা দূরে সরে বসে। বরুণা না পাচ্ছিল সহজ ভাবে তাকাতে লক্ষ্মীনারায়ণের দিকে, না পাচ্ছিল সে তাকাতে তার ঘুমন্ত স্বামীর দিকে। রাত্রে যা সে হারিয়েছিল, দিনে সে তা ফিরে পেয়েছে। বরুণা এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে সুরমা কীর্ত্তনীর ঘরের দুয়ারে এসে ধাক্কা দিতে থাকে। আর্ত্তনাদ করে সে সুরমাকে উদ্দেশ করে ডাকতে থাকলো—"মাসী মাসী, মাসী-ই, ও মাসী!"

সুরমার এই ব্যবহারে হকচকিয়ে গিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ ভাবে,—"দূত, শা। এ আবার কি, সব মাটি না কি? এঁ্যা, মুই—স্কি—ল,—"

লক্ষ্মীনারায়ণ আর স্থির থাকতে পারলো না। উপোসী ব্যাঘ্র যেন রক্তের স্বাদ পেয়েছে। তাই সে-ও বরুণার পিছন পিছন এসে সুরমা কীর্ত্তনীর ঘরে এসে ঢুকলো। সুরমা বরুণার ডাকে ঘরের অর্গল মুক্ত করে দুই হাতে চোখ মুছছিলো। লক্ষ্মীনারায়ণকে ঘরে ঢুকতে দেখে, সুরমা বেরিয়ে যেতে যেতে বলে গেলো,—"চোখ-মুখ ধুয়ে আসি। তোরা ততক্ষণ বোস একটু।"

বরুণাকে নিশ্চল ভাবে মেঝের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লক্ষ্মীনারায়ণ এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো,—"খুব রাগ করেছো আমার উপর, না বরু?"—কথা কয়টা বলে লক্ষ্মীনারায়ণ বরুণার দিকে আরও একটু এগিয়ে এলো।

বরুণা পিছিয়ে এসে চৌকির উপরকার বিছানার উপর বসে পড়ে উত্তর করলো,—"বারে-এ, না না, রাগ করবো কেন? কি করেছেন যে আমি রাগ করবো।

উত্তরে লক্ষ্মীনারায়ণ বললো,—এই রাত্রে এতো আদর করলাম এই জন্যে?

সলজ্জ ভাবে বরুণা উত্তর করলো,—"না দাদা, এ ভালো নয়। বড্ড লজ্জা করে আমার।"

কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় রাত্রের শুভক্ষণে এই প্রশ্নটাই লক্ষ্মীকান্ত বরুণাকে আর একবার করেছিলো। লক্ষ্মীকান্ত এমনি ভাবেই বরুণাকে জিজ্ঞেস করেছিলো—'খুব রাগ করছো না, এই আদর করছি বলে?' আদরের আধিক্য মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেও বরুণা উত্তরে বলেছিলো—'রাগ করবো কেন? দাদা কি বোনকে আদর করে না?' কিন্তু, সকালে বরুণা এ কি বলে? আসলে বরুণা রাত্রে বলেছিলো তার অচেতন মনের কথা, চেতন মনের সাহায্যে কিন্তু প্রত্যুষে সে কথা সে ভুলে গিয়েছে। বিব্রত হয়ে লক্ষ্মীকান্ত উত্তর করলো,—"ও, এই জন্যে? বা, বা, ভাই কি বোনকে আদর করে না?"

বরুণা বোধ হয় লক্ষ্মীকান্তর নিকট হতে এইরূপ উত্তরের প্রত্যাশা করেনি। রাত্রের আত্মপ্রবঞ্চনাকর ঘটনাটি এতোক্ষণে সে উপলব্ধি করতে পেরেছে। চোখ-মুখ রাঙা করে সে লক্ষ্মীকান্তের উত্তরের প্রত্যুত্তর করলো—বা রে, আমি বড়ো হইনি, বুঝি?"

বরুণার এই উত্তরে লক্ষ্মীকান্ত বুঝলো তার আত্মসংবরণের সময় এসেছে। বেশী অধীর হলে কার্য্য উদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে। উত্তরে লক্ষ্মীকান্ত বলে উঠলো,—"আমার কাছে তুই ছোটই থাকবি। তোকে আমি কি মনে করি জানিস, আমি মনে করি তুই একটা ছোট মেয়ে। সত্যি তুই যে

ছোট নোস্ তা আমার মনেই হয় না।" এই ভাবে আলোচনা আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্য দিয়ে সহজ করে নিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ আর কোনও-রূপ উত্তর-প্রত্যুত্তর না করে বেরিয়ে এসে বরুণাদের ঘরে ঢুকে সুধীরের মাথার শিয়রে এসে বসলো। ততক্ষণে সুধীরও জাগ্রত হয়ে উঠে বসেছে। লক্ষ্মীকান্ত সুধীরের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞাসা করলো,—"কেমন আছেন আজ? আমরা ভাই-বোনে সারা রাত জেগে আপনার সেবা করেছি, আপনি জানতেও পারেননি।

ঠিক এই সময় বরুণাও ঘরে ঢুকছিল। লক্ষ্মীকান্তর এই প্রশ্নের উত্তর বরুণাই দিলো। সলজ্জ ভাবে বরুণা উত্তর করলো—"সত্যি, মাসী আর লক্ষ্মীদা না থাকলে কি-ই যে হতো।"

এমনি আরও কিছুক্ষণ আলাপ-আলাপনের পর হঠাৎ লক্ষ্মীকান্ত বলে উঠলো,—"এখোন কিন্তু বোন আমি একটু বেরুবো। এই নাও দশটা টাকা কাছে রাখো।"

কথা কয়টা বলে লক্ষ্মীকান্ত বরুণার হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিলো। এই টাকা কয়টির সত্যই তাদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এর মধ্যে বাড়ীওয়ালার লোক তাগাদা করে গেছে দু'-তু'বার, পাড়ার মুদীও। কিন্তু তবু নোটখানা বরুণার হাতের মুঠার মধ্য হ'তে কেমন করে যেন বিছানার উপর পড়ে গেল। বরুণাকে নোটটি নামিয়ে রাখতে দেখে লক্ষ্মীকান্ত কৃত্রিম অভিমানের সুরে বলে উঠলো,—"বা রে, নেবে না তো! এই বুঝি তুমি বোন! আচ্ছা, তাহলে আর আমি আসব না।"

লক্ষ্মীকান্তর এবংবিধ কথায় বরুণা ধীরে ধীরে চোখ তুলে স্বামীর দিকে চাইলো, বোধ হয় সম্মতির আশায়। এইরূপ অবস্থায় সম্মতি দেওয়া ছাড়া সুধীরের উপায়ই বা আর কি ছিলো। সুধীর অতিকষ্টে গলায় স্বর এনে লক্ষ্মীকান্তকে জানালো। "অসংখ্য ধন্যবাদ, পরে কিন্তু—"

বাধা দিয়ে লক্ষ্মীকান্ত বলে উঠলো,—"না না, তা হবে না। ওতো আমি আমার বোনকে দিয়েছি। হাঁ একটা কথা, ক'দিন খেটে-খেটে বরুর শরীরটা খারাপ হয়ে গেছে। বেচারা কখনও বায়স্কোপ দেখেনি। একটা ট্যাক্সি এনে ওকে একটু বেড়িয়ে আনবো?"

উত্তরে চিঁ চিঁ করে সুধীর জানালো,—"তা নিয়ে যাবেন। সঙ্গে মাসীও যাবে তো? ওর কেই বা আর আছে। যত্ন-আইত্তি করবার ওর কেউ নেই।—কথা বলতে বলতে সুধীরের বাক্‌রুদ্ধ হয়ে এলো। সে এইবার অঝোরে কেঁদে ফেললো। মাথারও আর ঠিক ছিল না। অস্ফুট স্বরে তার মুখ দিয়ে বার হয়ে এলো ছোট্ট একটা কথা—"উঃ, ভগবান।" সে আরও কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু তা আর তার বলা হলো না। তার মুখে স্বর এলো, কিন্তু ভাষা যোগালো না।

"তা'হলে কিন্তু আমি ঠিক সন্ধ্যে সাতটায় গাড়ী নিয়ে আসবো। ঠিক যাবে তো বরু? দেখো গাড়ী নিয়ে এসে যেন ফিরে না যাই।"

বায়স্কোপ বরুণা কখনও দেখেনি, তবে গল্প শুনেছে। ট্যাক্সি সে দেখলেও কখনও সে তা চড়েনি। এছাড়া লক্ষ্মীদা তাকে একটা ভালো সাড়ী কিনে দেবার কথা বলেছে, শহুরে মেয়েদের পায়ের মতো এক জোড়া জুতোও। তার যে লোভ হচ্ছিলো না, তা'ও নয়। সম্মতির আশায় স্বামীর দিকে আর একবার চেয়ে দেখে বরুণা জিজ্ঞাসা করলো,—"কিন্তু, সুরো মাসী যাবে তো? মাসীকেও নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু—।"

—"হাঁ হাঁ, মাসীও যাবে। আমি কি তোকে একলা নিয়ে যাবো। আমার একটুকু বুদ্ধি আছে। বোকা মেয়ে কোথাকার।"

ভৎর্সনার সহিত কথা কয়টি বলে এবং সেই সঙ্গে উহা দ্বারা দুই জনকেই নিশ্চিন্ত করে দিয়ে লক্ষ্মীকান্ত বেরিয়ে গেলো সুরমার কাছে যাবার জন্যে। বেরিয়ে যেতে যেতে লক্ষ্মীকান্ত শুনলো, সুধীর বলছে —"আচ্ছা বরু, লক্ষ্মীদা তোকে মার পেটের বোনের মতই ভালবাসে, নয়? লোকে বলে ঈশ্বর না কি নেই। ঈশ্বর না থাকলে কি এমন এক জন দেবতাকে আমরা পাই।" সুধীরের প্রশ্নে বরুণা একটু হাসলো মাত্র, কিন্তু তা'ও অতি সঙ্কোচের সঙ্গে। এই কয় দিনে বরুণা লক্ষ্মীকান্তকে কিছু কিছু চিনে নিয়েছে। তাই এ সম্বন্ধে বেশী কিছু তার বলবারও নেই, তবে যতটা পারে সে সাবধানেই থাকতে চায়।

লক্ষ্মীকান্ত সুরমার ঘরে ঢুকে পড়ে এক রকম দিশেহারা হয়ে সুরমাকে উদ্দেশ করে বলে উঠলো—"মার দিইস্ কেল্লা, মাইরী সুরো—।"

উত্তরে সুরমা নিম্ন স্বরে বলে উঠলো,—"চুপ কর। দরজার পাশ থেকে শুনেছি সব। ডাইনির হাতে ছেলে সমর্পণ আর কি? তা যাই হোক, বাহাদুর বটে তুই। তবে একটা কথা, এ যা মেয়ে, একে এক দিনে পারবি না। হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে। ওদিকে বল্লভপুরের জমীদারকে কথা দিয়ে এসেছি। দেখিস্ বাবা, শেষে হাতছাড়া বা ঐ যাঃ না হয়ে যায়। মাসখানেক এই রকমই চলুক, বুঝলি। বাড়াবাড়ি করলেই কিন্তু মার খাবি তুই আমার কাছে। যা এখন তবে তুই। আমি একটু সাদা গুঁড়োর (কোকেন) সন্ধান দেখি। পানের সঙ্গে একটু করে না খাওয়ালে, পেরাণ ওর কিছুতেই চাগবে না। দাঁড়া না তুই, অনেক তো দেখেছিস্। এবারেও দেখবি এ গুঁড়োর গুণ কতো, মাইরী।"

[ক্রমশঃ

কূপমণ্ডুক

শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়

কূপের ভিতর হতে এক ফালি দেখি নীলাকাশ,
তাই বুঝি ছানি-পড়া চোখে জাগে সমুদ্র-স্বপন,—
তুহিন-শীতল জলে দোলা দেয় ঝড়ের বাতাস,
এখানেও ছায়া ফেলে অশ্বত্থের বাহুর কাঁপন।
আমার এ পৃথিবীতে রহস্যের নাই বুঝি শেষ,
কোথা হতে ফাঁকে ফাঁকে পড়ে এসে ঝিকি-মিকি আলো,
ওপরে সুগোল নীল—ওই বুঝি তারকার দেশ,
দু' টুকরো ছেঁড়া মেঘ ভেসে আসে সাদা আর কালো।
প্রাণের আবেগে আমি প্রতিক্ষণে করি পারাপার
মলিন সলিল-রাশি,—এই মোর সকল ভুবন,
সেথায় কখন আসে বাহিরের প্রচণ্ড জোয়ার,
লবণাক্ত সমুদ্রের স্বাদ নিতে চাহে মোর মন।
ছায়ায় আভাসে ডাকে তোমাদের পৃথিবী আমারে,
কী করে ছাড়াবো মোর অভ্যাসের বাধা চারি ধারে?

একুশ জন কপিল

চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী

প্রথম কপিল—আদিশরীরী হিরণ্যগর্ভ, ইঁহারও নাম কপিল। যথা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে—

"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ ॥ ৫।২

ইহার অর্থ —"যিনি এক হইয়াও প্রত্যেক স্থানে সমস্ত রূপে এবং সমস্ত উপাদানে (উৎপত্তি কারণে) অধিষ্ঠান করেন, এবং যিনি কল্পের আদিতে উৎপন্ন ঋষি কপিলকে ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং জন্মের পরও দর্শন করিয়াছিলেন [তিনি জীব হইতে পৃথক্]" (মঃ মঃ দুর্গাচরণকৃত অনুবাদ)।

ইহার ভাষ্যে আছে—ঋষিং সর্বজ্ঞম্ ইত্যর্থঃ। কপিলং কপিলবর্ণং প্রসূতং স্বেন এব উৎপাদিতম্। "হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বম্" (বৃঃ উঃ ৩।১১।) ইতি অস্য এব জন্ম শ্রবণাৎ, অন্যস্য চ অশ্রবণাৎ। উত্তরত্র,—

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং, যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ"
—(শ্বেঃ উঃ ৬।১৮)

ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ "কপিলঃ অগ্রজঃ" ইতি পুরাণবচনাৎ কপিলঃ হিরণ্যগর্ভো বা নির্দ্দিশ্যতে।

[হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্তত অগ্রে—শ্বেঃ উঃ ৩।৪]

কপিলর্ষির্ভগবতঃ সর্বভূতস্য বৈ কিল।
বিষ্ণোরংশো জগন্মোহনাশায় সমুপাগতঃ ॥
কৃতে যুগে পরং জ্ঞানং কপিলাদিস্বরূপধৃক্।
দদাতি সর্বভূতাত্মা সর্বস্য জগতো হিতম্ ॥
ত্বং শক্রঃ সর্বদেবানাং ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদামসি।
বায়ুর্বলবতাং দেবো যোগিনাং ত্বং কুমারকঃ ॥
ঋষীণাঞ্চ বশিষ্ঠস্ত্বং ব্যাসো বেদবিদামসি।
সাংখ্যানাং কপিলো দেবো রুদ্রাণামসি শঙ্করঃ ॥"

"ইতি পরমর্ষিঃ প্রসিদ্ধঃ তত্ত্বদর্শীচ ভুবনমস্মিন্ প্রবর্ত্ততে কপিলং কবীনাম্। স ষোড়শাগ্রো পুরুষশ্চ বিষ্ণোর্বিরাজমানং তমসঃ পরস্তাৎ" ইতি শ্রূয়তে, মুণ্ডকোপনিষদি। স এব বা কপিলঃ প্রসিদ্ধঃ অগ্রে সৃষ্টিকালে যো জ্ঞানৈর্ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যৈর্বিভর্ত্তি বভার জায়মানঞ্চ পশ্যেদপশ্যদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ২

স্মৃতি-বিশেষ মধ্যে আছে—

আদৌ যো জায়মানঞ্চ কপিলং জনয়েদৃষিম্।
প্রসূতং বিভৃয়াজ্জ্ঞানৈস্তং পশ্যেৎ পরমেশ্বরম্ ॥

যাহা হউক, এই কপিল হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা।

দ্বিতীয় কপিল—ব্রহ্মার মানসপুত্র। যথা মহাভারতে ৩৪০ অ

সমঃ সনৎসুজাতশ্চ সনকঃ স সনন্দনঃ।
সনৎকুমারঃ কপিলঃ সপ্তমশ্চ সনাতনঃ ॥ ৭২
সপ্তৈতে মানসা পুত্রা ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥

ইনিই আদিবিদ্বান্ কপিল। আদিবিদ্বান্ কপিল সম্বন্ধে ব্যাসভাষ্য মধ্যে আছে।

"আদিবিদ্বান্ নির্ম্মাণচিত্তম্ অধিষ্ঠায় কারুণ্যাৎ ভগবান্ পরমর্ষিঃ আসুরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্রং প্রোবাচ (১।২৫)।

ইনিই সাংখ্যবক্তা। তবে ইনি যে সম্পূর্ণ সর্ব্বজ্ঞ তাহা বলা যায় না। কারণ, গীতায় "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" ইহা বলা থাকিলেও "যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ" ইহাও বলা হইয়াছে। সুতরাং ইঁহার যৌগৈশ্বর্য্য ছিল কিন্তু ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান ছিল কি না বলা যায় না।

তৃতীয় কপিল—অগ্নির অবতার। বাসুদেব ইঁহার নাম। ইনি সগরবংশধ্বংসকর্ত্তা। শাঙ্কর-ভাষ্যে দেখা যায়—

"কপিলম্ ইতি শ্রুতিসামান্যমাত্রত্বাৎ অন্যস্য চ কপিলস্য সগরপুত্রাণাং প্রতপ্তুং বাসুদেবনাম্নঃ স্মরণাৎ"।

ইঁহার কথা রামায়ণে আদিকাণ্ডেও আছে। ইনিও সাংখ্যমতের বক্তা বলিয়া প্রবাদ আছে।

চতুর্থ কপিল—কর্দ্দম ঋষি ও দেবহূতির পুত্র। ইঁহার কথা ভাগবতে আছে। ইনি মাতাকে যে সাংখ্যজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা বেদান্ত হইতে ভিন্ন নহে।

পঞ্চম কপিল—কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভে জাত শত পুত্রের মধ্যে এক জন। ইহা হরিবংশে আছে।

ষষ্ঠ কপিল—ভরতবংশীয় বিতথ নামক নরপতির পঞ্চ পুত্রের মধ্যে অন্যতম। ইহাও হরিবংশে আছে।

সপ্তম কপিল—যদুবংশীয় রাজা বসুদেবের ঔরসে তারার গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি বনে গমন করেন। ইহাও হরিবংশে আছে।

অষ্টম কপিল—কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি নাগ ইহাও হরিবংশে আছে।

নবম কপিল—নারায়ণের পঞ্চম অবতার। ইনি সাংখ্যদর্শনকার। ইহা ভাগবতে আছে।

দশম কপিল—সমুদ্রমন্থনের পর দেবাসুরের যুদ্ধে এক কপিল অসুরপক্ষ গ্রহণ করেন। ইহাও ভাগবতে আছে।

একাদশ কপিল—বরাহকল্পের অষ্টম দ্বাপরে বশিষ্ঠ ব্যাস হন। মহাদেব দধিবামন হন। সেই দধিবামনের পুত্র কপিল আসুরি পঞ্চশিখ ও বাস্কল। ইঁহারা পরম জ্ঞানী ছিলেন। ইহা লিঙ্গপুরাণে আছে।

দ্বাদশ কপিল—ইনি স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র, প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র জ্যোতিষ্মান্ কুশদ্বীপের অধিপতি। তাঁহার পুত্র কপিল। ইনি বর্ষাধিপতি ছিলেন। ইহাও লিঙ্গপুরাণে আছে।

ত্রয়োদশ কপিল—পুরুবংশীয় রাজা উরুক্ষয়ের এক পুত্র কপিল ছিলেন। ইনি ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা বিষ্ণুপুরাণে আছে।

চতুর্দ্দশ কপিল—ইনি জৈগীষব্য ও পঞ্চশিখ মুনিকে যোগ উপদেশ করেন। ইহা কূর্ম্মপুরাণে আছে।

পঞ্চদশ কপিল—ইঁহার পত্নী ধৃতি। ইনি সকলের পূজ্য ছিলেন। ইহা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে।

ষোড়শ কপিল—সাত জন দিক্‌পালের অন্যতম। ইহা মহাভারতে আছে।

সপ্তদশ কপিল—বিশ্বামিত্রের এক পুত্র। ইহাও মহাভারতে আছে।

অষ্টাদশ কপিল—ইনি পুষ্কর তীর্থে এক মহাযক্ষ। দ্বারপালের কর্ম্ম করিতেন এবং দুন্দুভি বাজাইয়া ভ্রমণ করিতেন। ইহা রামায়ণে আছে।

উনবিংশ কপিল—ভরতবংশীয় পৃথুর পুত্র অগ্রাখ। তাঁহার এক পুত্র কপিল। ইঁহার রাজ্য ছিল পাঞ্চাল দেশ। ইহা মৎস্যপুরাণে আছে।

বিংশ কপিল—ভানু অনলের তৃতীয়া পত্নী নিশারোহিণী হইতে অগ্নি ও সোম নামে দুই পুত্র এবং বৈশ্বানর-বিশ্বপতি, সন্নিহিত কপিল ঋষি ও অগ্রণী নামক পঞ্চ পাবকের জন্ম হয়। তন্মধ্যে কপিলের বর্ণ শুক্ল ও কৃষ্ণ ছিল। তিনি অন্যান্য হুতাশনের পুষ্টি বর্দ্ধন করেন। তিনি স্বয়ং নিষ্পাপ। ক্রোধের উদয় হইলে কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান করেন। যতিগণ তাঁহাকে কপিল ঋষি বলিতেন। ইনি সাংখ্য যোগ-প্রবর্ত্তক কপিল নামক অগ্নি। ইহা মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। (সম্ভবতঃ এই সময় হইতে সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে মতভেদ হয়)।

একবিংশ কপিল—রাজর্ষি কপিল প্রভাসতীর্থে তপস্যা করেন এবং কপিলেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।

মহাভারতোক্ত সাংখ্যমতের প্রামাণ্যাধিক্য

এখন এই ২১ জন কপিলের মধ্যে সাংখ্যবক্তা কপিল ২।৩।৪।৯।১২।২০ সংখ্যক কপিলরূপে পাওয়া যাইতেছে। ইহার প্রায় সবই জীবনীকোষ হইতে সংগৃহীত হইল। খুব সম্ভব একই ব্যক্তি কোথাও দুই ব্যক্তিরূপে উক্ত হইয়াছেন। ফলতঃ ইহা অনুসন্ধানের বিষয়। যাহা হউক, ইহা হইতে জানা গেল, সাংখ্যবক্তা কপিল এক জন নহেন। সুতরাং আদিবিদ্বান্ কপিলের মত আমরা এখন আর অবিকৃতরূপে পাই না। আর তজ্জন্য যদি সাংখ্যমত জানিতে হয়, তাহা হইলে যত অধিক প্রাচীন গ্রন্থে তাহা জানা যায় তাহাই তত অধিক অবলম্বনীয় এবং যত অধিক প্রামাণিক পুরুষের নিকট হইতে জানা যায় তাহাই তত অধিক আশ্রয়ণীয়। প্রকৃত স্থলে যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যের এবং তদুক্ত পঞ্চশিখাচার্য্যের কথা হইতে যে সাংখ্যমত পাওয়া যায় তাহা হইতে যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি ব্যাসের মহাভারতোক্ত পঞ্চশিখাচার্য্য প্রভৃতি বহু আচার্য্যবর্গের কথিত সাংখ্যমত যে প্রাচীন এবং প্রামাণিক বলিয়া আশ্রয়ণীয়, তাহাতে আর বক্তব্য কি থাকিতে পারে? এই কারণে মহাভারত ত্যাগ করিয়া ব্যাসভাষ্য দ্বারা সাংখ্যমত পরিষ্কার করিবার চেষ্টা শোভন চেষ্টা বলা যায় না। বস্তুতঃ, ব্রহ্মসূত্রে ২।১ পাদে যে সাংখ্যমত খণ্ডন করা হইয়াছে তাহাতে ভগবান শঙ্করাচার্য্য যে সাংখ্যমতের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা মহাভারতেরই বাক্য। তাহা মহাত্মা ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রভৃতি কাহারও বাক্য নহে। যথা—

"বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মন্ উতাহো এক এব তু" (মহাঃ শাঃ মোঃ ৩৫০।১)
"বহবঃ পুরুষা রাজন্ সাংখ্যযোগবিচারিণাম্" (ঐ—৩৫০।২)
"বহূনাং পুরুষাণাং হি যথৈকা যোনিরুচ্যতে।
তথা তং পুরুষং বিশ্বমাখ্যাস্যামি গুণাধিকম্।" (ঐ—৩৫০।৩)
যথাত্মরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহসংস্থিতাঃ।
সর্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ।(ঐ—৩৫১ ৪-৫)
বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ।
একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরচারী যথাসুখম্।" (ঐ—৩৫১।৫

ইহা হইতে বুঝা যায়, ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্য-কারিকাতে সন্তুষ্ট হন নাই। এজন্য তিনি মহাভারতকেই সাংখ্য-মতের জন্য প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব মহাভারতেই প্রমাণাধিক্য বুঝিতে কোন বাধা হয় না।

মহাভারতে সাংখ্যমতের পরিচয়

এইবার দেখা যাউক, মহাভারতে যে সব সাংখ্যমত বিবৃত হইয়াছে তাহারা কিরূপ। দেখা যায়, মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মপর্বাধ্যায়ে সর্বশুদ্ধ ২১টি অধ্যায়ে ১টি উপাখ্যান দ্বারা সাংখ্যমত বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে আমরা তাহাদের বিশেষত্ব অংশটুকু উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতে বুঝা যাইবে বর্ত্তমান ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্য হইতে এই সব সাংখ্যমতের কত প্রভেদ। এস্থলে সাধারণের সুবিধার জন্য মহাত্মা কালীসিংহের মহাভারতের সাহায্য গ্রহণ করিলাম।

(১) পঞ্চশিখ ও জনদেব-জনকসংবাদ ২১৮ অধ্যায় ১৪৮৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে বেদের প্রামাণ্যই অধিক বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান সাংখ্যে অনুমানকে বেদের সমান প্রমাণ মনে করা হয়। ইহাতে বেদের প্রামাণ্য অধিক স্বীকার করায় অনুমানের প্রাধান্য থাকিল না, সুতরাং বেদান্তের অনুরূপ মতই হইল।

ঐ সংবাদ ২১১ অধ্যায় ১৪৮৬ পৃষ্ঠা। ইহাতে অবিদ্যানাশ জন্য স্বরূপানন্দ প্রাপ্তি হয়, গুণকে আত্মা মনে করাই দুঃখের হেতু. জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম উপাধির শুদ্ধ-আত্মাতে লয় ইত্যাদি কতিপয় বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। বর্ত্তমান সাংখ্যে মোক্ষাবস্থায় আত্মাতে উপাধির লয় ও আনন্দ প্রাপ্তির কথা স্বীকৃত হয় না। এজন্য ইহাতেও বেদান্তের ভাব দৃষ্ট হয়।

(২) ইন্দ্র-প্রহ্লাদ-সংবাদ ২২২ অধ্যায় ১৪৮৮ পৃষ্ঠা। ইহাতে পুরুষ অকর্ত্তা, প্রকৃতি জড়া, কিন্তু লৌহ চুম্বকের ন্যায় পুরুষ সান্নিধ্যে সচেষ্ট হয়। অবিদ্যা প্রভাবে পুরুষের কর্ত্তৃত্বাভিমান। মোক্ষলাভ ও আত্মজ্ঞান প্রকৃতি-সম্ভূত। প্রকৃতির জ্ঞানে মুক্তি হয় বলা হইয়াছে। সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি হইতে তত্ত্বজ্ঞান, আর রজঃপ্রধানা প্রকৃতি হইতে মায়িক জ্ঞান হয় বলা হইয়াছে। ইহাতে সাংখ্যমত ও বেদান্তমত যেন মিলিত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

(৩) গো-কপিল সংবাদে স্যূমরশ্মি কপিল সংবাদ। ২৬৮ অধ্যায় ১৫২৭ পৃষ্ঠা। ইহাতে বেদ পরমেশ্বর-বাক্য বলা হইয়াছে। তথাপি অনুমান দ্বারা ধর্ম্ম নির্ণেয়। বেদ ঋষি-প্রণীত স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত। ইহা সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় সাধারণ ভাবে কথিত হইয়াছে দেখা যায়।

(ক) ঐ সংবাদ ২৬৯ অধ্যায় ১৫২৮ পৃষ্ঠা। ইহাতে জ্ঞানমার্গে পরমাত্মালাভ। সন্ন্যাসপ্রশংসা। ঈশ্বরলাভ। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদজ্ঞান। ন্যায়ানুগত আচারই শাস্ত্র। বেদবাক্যের বিপরীত হইলে অশাস্ত্র। ব্রহ্ম অনন্ত। ইহাতে বেদান্তমত স্পষ্ট ভাবে উক্ত।

(খ) ঐ সংবাদ ২৭০ অধ্যায় ১৫৩০ পৃষ্ঠা। ইহাতে বেদের প্রামাণ্যে সর্ব্বসম্মতি। ধর্ম্মের ফল চিত্তশুদ্ধি। সর্ববস্তুতে ব্রহ্মজ্ঞান। একই আশ্রম সদাচার। ব্রহ্মভাবাপত্তিই জীবন্মুক্তি। ত্যাগ সুখের প্রাধান্য। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার একতা। মোক্ষই ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মবিদ্ ও পরমব্রহ্ম অভিন্ন। বর্ত্তমান সাংখ্যের সহিত এই সকল কথার ঐক্য হয় না। ইহাতে বেদান্তমতই পরিস্ফুট।

(৪) ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরসংবাদ ৩০১ অধ্যায় ১৫৬৩ পৃষ্ঠা। ইহাতে আছে যোগমতে ঈশ্বর মুক্তিলাভের উপায়। সাংখ্যমতে ঈশ্বরে ভক্তি নিষ্প্রয়োজন। যোগ প্রত্যক্ষ প্রমাণপরায়ণ, আর সাংখ্য শাস্ত্র প্রমাণপরায়ণ। উভয়ই সাধুসম্মত, যোগ মোক্ষলাভের

অদ্বিতীয় উপায়। যোগবলে অসংখ্য দেহ ধারণ করা যায়। জীব ও পরমাত্মার ঐক্যে ব্রহ্মপদ লাভ হয়। পরকায় প্রবেশ করা যায়। ঈশ্বরোপাসনার ফল সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব লাভ। এসব কথা বর্ত্তমান সাংখ্যে নাই। ইহা বেদান্তেরই অনুকূল।

(ক) ঐ সংবাদ ৩০২ অধ্যায় ১৫৬৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে সাংখ্য-মতের নির্দ্দোষতা। গুণবিচার দ্বারা মোক্ষলাভ। মোক্ষ নারায়ণের আশ্রয়। গুণ ও দোষবিচার সাংখ্যমতের সাধন। বেদান্তজ্ঞান দীপস্থানীয়। সত্ত্বগুণ হইতে নারায়ণলাভ। নারায়ণ হইতে পরমাত্মার লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্তি। মোক্ষে বিশেষ জ্ঞান থাকে না, অদ্বৈত হয়। সাংখ্য হইতে সর্বশাস্ত্রের উৎপত্তি। পুরাতন সাংখ্যমত এইরূপ। এসব কথা বর্ত্তমান সাংখ্যে নাই।

(৫) বশিষ্ঠ করাল জনকসংবাদ ৩০৩ অধ্যায় ১৫৬৬ পৃষ্ঠা। ইহাতে ২৪ তত্ত্বাতীত সনাতন বিষ্ণুই অক্ষর। প্রকৃতির সহিত একীভাববশে দেহে আত্মাভিমানী জীব হয়; মায়াসম্ভূত বস্তুই ক্ষর, ২৪ তত্ত্বাতীত বস্তুই অক্ষর। তত্ত্বজ্ঞানে তাহার লাভ হয়। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ একথা বর্ত্তমান সাংখ্যে নাই।

(ক) ঐ সংবাদ ৩০৪ অধ্যায় ১৫৬৭ পৃষ্ঠা। জীবাত্মা প্রকৃতি-সঙ্গ বশতঃ অসংখ্যদেহী। প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টি স্থিতি ও লয়। জগদীশ্বর প্রলয়কালে সবই সংহার করিয়া একাকী থাকেন। দেহাত্মভ্রমই জন্মমৃত্যুর কারণ। ত্রিলোক প্রকৃতি কার্য্য। পুরুষ নির্ব্বিকার, প্রকৃতি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তক হইয়া শরীর ধারণ করেন। জগদীশ্বর সৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্ত্তা ইহা বর্ত্তমান সাংখ্যের মত নয়।

(খ) ঐ সংবাদ ৩০৫ অধ্যায় ১৫৬৮ পৃষ্ঠা—লিঙ্গ-শরীর-নাশে মুক্তি। জীবাত্মা ২৪ তত্ত্বাতীত হইয়াও অজ্ঞান বশতঃ অশুদ্ধ জড় ইত্যাদি ভাবাপন্ন। ইহা দেখিলে মনে হয় সাংখ্যের বহু পুরুষ জীবাত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই। একব্রহ্মের কথা সাংখ্যের নহে।

(গ) ঐ সংবাদ ৩০৬ অধ্যায় ১৫৬৮ পৃষ্ঠা—প্রকৃতি-পুরুষের সম্বন্ধ স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ। বেদ, স্মৃতি সনাতন প্রমাণ। সাংখ্য ও যোগ এক। জগৎ ত্রিগুণাত্মক। পরমাত্মা ও জীবাত্মা জগৎ হইতে পৃথক্। প্রকৃতি অনুমেয়। সাংখ্য ও যোগ ২৪ তত্ত্বাতীত পরব্রহ্মকে জানেন। জীব ও পরমাত্মা অভিন্ন। পরমাত্মাই ক্ষর ও অক্ষর। ২৫ তত্ত্বের জ্ঞানের পর ২৬ তত্ত্ব পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদ জ্ঞান হয়। ইহাই যথার্থ দর্শন। ইহাও বেদান্তের অনুকূল।

(ঘ) ঐ সংবাদ ৩০৭ অধ্যায় ১৫৬৯ পৃষ্ঠা—যোগীর ধ্যানই পরম বল। জীবাত্মাকে ২৪ তত্ত্ব হইতে পৃথক্ করিয়া পরমাত্মায় নীত করিবেন। সাংখ্যের সৃষ্টি বর্ণন। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ। পুরুষই ক্ষেত্রজ্ঞ। প্রকৃতিই অব্যক্ত, ক্ষেত্রতত্ত্ব ও ঈশ্বর। প্রকৃতিই জগৎ সৃষ্টির কারণ। ইহাও উভয় মত সাধারণ।

(ঙ) ঐ সংবাদ ৩০৮ অধ্যায় ১৫৭০ পৃষ্ঠা—ইহাতে বিদ্যা ও অবিদ্যার বর্ণনা। জ্ঞান প্রকৃতির কার্য্য। জ্ঞেয় ও বিজ্ঞাতা ২৪ তত্ত্বাতীত। ক্ষর ও অক্ষর প্রকৃতি-পুরুষ। প্রকৃতিই অক্ষর, পুরুষ ২৪ তত্ত্বাতীত। জীবাত্মা প্রকৃতির সহিত মিলিত হইলে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন। আর মিলিত না হইলে অভিন্ন হন। জ্ঞানীর অবস্থা বর্ণন। সাংখ্যমতে অনায়াসে জ্ঞান লাভ হয়। যোগমতে কষ্টে হয়। বেদে যোগের আদর, সাংখ্যের অনাদর। ইহার কারণ সাংখ্য ২৬শ তত্ত্বকে পরম তত্ত্ব বলেন না। কিন্তু ২৫শ তত্ত্বকেই পরম তত্ত্ব বলেন। যোগমতে পরমাত্মা সোপাধিক হইলেই জীব। সাংখ্যমতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই স্বীকার করেন না। কেবল বহু পুরুষই স্বীকার করেন।

(চ) ঐ সংবাদ ৩০৯ অধ্যায় ১৫৭১ পৃষ্ঠা—বুদ্ধ পরমাত্মা, অবুদ্ধ জীবাত্মা। প্রকৃতি জড় কেন? মতান্তরে প্রকৃতির বোধশক্তি পরমাত্মা ২৫ তত্ত্ব হইতে পৃথক্। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন। জীব ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানই মোক্ষ। এই কথা ব্রহ্মা বশিষ্ঠ ও নারদ ক্রমে লব্ধ হইয়াছেন। সাংখ্য প্রাচীন ও নবীন ভেদে দ্বিবিধ, তাহা এই সব দেখিলে বোধ হয়।

(৬) দেবরাত-তনয় জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদ এবং যাজ্ঞবল্ক্য ও বিশ্বাবসুসংবাদ ৩১১ অধ্যায় ১৫৭৩ পৃষ্ঠা—সাংখ্যতত্ত্ব বর্ণন। বিশেষ ও অবিশেষ বর্ণন। ৮ প্রকৃতি, ১৬ বিকৃতি, ১ সৃষ্টি, ২৪ তত্ত্ব বর্ণন।

(ক) ঐ সংবাদ ৩১২ অধ্যায় ১৫৭৩ পৃষ্ঠা—নারায়ণ ও ব্রহ্মার দিবারাত্র। মনই জ্ঞানের কারণ।

(খ) ঐ সংবাদ ৩১৩ অধ্যায় ১৫৭৪ পৃষ্ঠা—প্রলয় বর্ণন।

(গ) ঐ সংবাদ ৩১৪ অধ্যায় ১৫৭৪ পৃষ্ঠা—অধ্যাত্ম অধিভূত ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বর্ণন।

(ঘ) ঐ সংবাদ ৩১৫ অধ্যায় ১৫৭৫ পৃষ্ঠা—প্রকৃতি পরমাত্মার অধিষ্ঠানে সচেতনা হন। এবং সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করেন। পুরুষের একত্ব। ইহাও প্রাচীন সাংখ্যমত।

(ঙ) ঐ সংবাদ ৩১৬ অধ্যায় ১৫৭৫ পৃষ্ঠা—সগুণ নির্গুণ জবাস্ফটিকবৎ। প্রকৃতি অনিত্য ও নানা। মতান্তরে প্রকৃতি এক, এবং পুরুষ বহু। মতান্তরে পুরুষ এক ও অদ্বিতীয়। ইহাও দ্বিবিধ সাংখ্যের প্রমাণ।

(চ) ঐ সংবাদ ৩১৭ অধ্যায় ১৫৭৬ পৃষ্ঠা—যোগ ও সাংখ্য এক ফলপ্রদ। যোগ-সাধন-প্রক্রিয়া বর্ণনা। নিত্যসমাধিস্থ যোগীর লক্ষণ।

(ছ) ঐ সংবাদ ৩১৮ অধ্যায় ১৫৭৬ পৃষ্ঠা—মৃত্যু বর্ণনা, অরিষ্ট লক্ষণ, মৃত্যুকালে কর্ত্তব্য।

(জ) ঐ সংবাদ ৩১৯ অধ্যায় ১৫৭৭ পৃষ্ঠা—যাজ্ঞবল্ক্যের যজুর্বেদ প্রাপ্তি। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অজ ও নিত্য। তর্ক দ্বারা প্রকৃতির নির্ণয়। জীবাত্মাকে বিশুদ্ধরূপে দর্শন করিলে প্রকৃতিকে অতিক্রম করা যায়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদজ্ঞান মূঢ়ের কার্য্য। ইহাও প্রাচীন সাংখ্যের একটি নিদর্শন। যোগী ও সাংখ্য জীব ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানের প্রশংসা করেন। বিশ্বাবসুকে উপদেশ। ২০ জন আচার্য্যের নাম। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। জীবের সর্ব্বজ্ঞতা। সকল বর্ণের বেদপাঠে অধিকার। আত্মাই অদ্বিতীয়। জীবাত্মার পরমাত্মস্বরূপ প্রাপ্তি।

(৭) জনক-পঞ্চশিখ সংবাদে জনক-সুলভা সংবাদ, ৩২০ এবং ৩২১ অধ্যায় ১৫৭৯ পৃষ্ঠা—পঞ্চশিখের শিষ্য ধর্ম্মধ্বজ জনক। জ্ঞান হইতে বৈরাগ্যের উৎপত্তি। বাক্যের ১৮টি দোষ ও ১৮টি গুণ। ৫ অঙ্গ। ৩০টি গুণযুক্ত শরীর। সমস্ত গুণের কারণ কেহ বলেন প্রকৃতি, কেহ বলেন পরমাণু, কেহ বলেন ঈশ্বর ও পরমাণু। কেহ

একটি নিগ্রো কবিতা

অবন্তী সান্যাল

সাদা-চামড়ার উদ্দেশ্যে :

তুমি কি মনে কর বর্ব্বর পৈশাচিক আত্মা আমার নেই ?
তুমি কি মনে কর যদি তুলে ধরি একটা বন্দুক
তাহলে প্রত্যেকটি নিগ্রো যাদের পুড়িয়ে মেরেছো, করেছ খুন—
তাদের একের বদলে দশটা ক'রে সাদাকে
গুলীর মুখে পারি না উড়িয়ে দিতে ?
ভুল ক'র না বন্ধু,
তুমি যা করছ তাকে ফিরিয়ে দিতে পারি কড়ায় গণ্ডায়।
ভুলে গেছ আমি অন্ধকার আফ্রিকার সন্তান ?
যে অন্ধকার মহাদেশে ভয়াবহ কাণ্ডের সংখ্যা নেই
ভুলে গেছ সেই অন্ধকারের ছাপ মারা এই দেহে ?

কিন্তু সেই যে বিশ্ব-বিধাতা
অন্ধকার থেকে তুলে নিয়েছিল আমার আত্মা
ব'লেছিল : তুমিও তো হবে এক দীপ-শিখা,
এই অন্ধকার রাত্রির পৃথিবীতে তুমিও জ্বলবে।
তোমার কালো চামড়া আমিই তো ছড়িয়েছি সাদার জনতায়,
তোমাকেই তো প্রমাণ করতে হবে পরম সার্থকতা।
রাত্রির অন্ধকারে যখন এই পৃথিবী ঢাকবে একেবারে
তার আগে তোমাকেই তো দেখাতে হবে ক্ষুদ্র ওই প্রদীপটুকু :
চলো, চলো, এগিয়ে চলো।

বলেন—ঈশ্বর, মায়া, জীব, ও অবিদ্যা এই চারিটি। আত্মায় আত্মায় অভেদ। সাংখ্যমতে মতভেদের ইহা একটি নিদর্শন।

(৮) জনমেজয়-বৈশম্পায়ন সংবাদ। ৩৫০ অধ্যায় ১৬২১ পৃষ্ঠা—বেদব্যাসের জন্ম। সাংখ্য, যোগ, পাশুপত, বেদ, পঞ্চরাত্র এই পাঁচটি শাস্ত্রপদবাচ্য। কপিল সাংখ্যের, ব্রহ্মা যোগের, অপান্তরতমা বেদের, মহাদেব পাশুপতের এবং নারায়ণ পঞ্চরাত্রের বক্তা।

(৯) ত্র্যম্বক ও ব্রহ্মার সংবাদ। ৩৫১ অধ্যায় ১৬২৩ পৃষ্ঠা—সাংখ্য ও যোগ পুরুষকে বহু বলেন। কিন্তু বৈশম্পায়ন এবং বেদব্যাসের মতে তাহা একই। সমুদায় পুরুষের কারণ পরমাত্মা। ভেদ ঔপাধিক। এখানে সাংখ্য ও বেদান্তের ভেদ স্পষ্ট।

(ক) ঐ সংবাদ। ৩৫২ অধ্যায় ১৬২৩ পৃষ্ঠা—যোগী পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং সাংখ্য জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভিন্ন বলেন। জীবাত্মার দৃষ্টিতে পুরুষের বহুত্ব, কিন্তু বস্তুতঃ পুরুষ এক। পরমাত্মাই জীবাত্মা, বুদ্ধি ও মন হইয়াছেন।

এই অধ্যায়গুলির তাৎপর্য্য অবধারণ করিলে বুঝা যায় (১) সাংখ্যমতের বহু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আর বর্ত্তমানে সর্বপ্রাচীন যে ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা, তাহা সাংখ্যের একটি শাখা মাত্র। সাংখ্যমত বলিলেই যে আমরা ঈশ্বরকৃষ্ণের বাক্য বুঝিয়া থাকি তাহা আমাদের অজ্ঞতা। যাহা হউক, এই সব কারণে সাংখ্যমতের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন যদি আবিষ্কার করিতে হয়, তাহা হইলে মহাভারতই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

স্যাফো

দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রেমের অমর কবি স্যাফোর কাহিনী জগতের রসিকজনের অতি পরিচিত। কাব্য-প্রেরণার এমন অম্লান লাবণ্য, ভাবের অপূর্ব্ব কমনীয়তা ও ভাবকে ছন্দের মধুর বন্ধনে বাঁধিবার দেবদত্ত অধিকার জগতে খুব অল্প কবিই পাইয়াছেন। কিন্তু এ অপূর্ব্ব কাব্য-প্রতিভার নিদর্শন পাই তাঁহার দুইটি পূর্ণ গীতি-কবিতা ও হীরকমুষ্টির মত কতকগুলি চূর্ণিকায়। ইহাদের মাধুর্য্য জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে। তাই তাঁহার অপূর্ব্ব পদাবলীর বিলুপ্তি জগতের একটা আনন্দ-উৎসের বিলুপ্তির মতই। প্রাচীন কবিদের স্যাফো-প্রশস্তি ও নানা কবির কাব্যে গ্রথিত তাঁহার রস-স্নিগ্ধ কাব্যাংশ ইহাই আমাদের উপজীব্য।

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া স্যাফো বিদগ্ধজনের সমাদর পাইয়া আসিতেছেন নারী-কবিদের অগ্রগণ্যা বলিয়া নয়, জগৎ-সভার কবিদলের এক জন শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে। কিন্তু গ্রীক সাহিত্য যাঁহারা আলোচনা করেন নাই তাঁহাদের কাছে এ প্রতিভার যথেষ্ট আদর হয় নাই। তাঁহার সম্বন্ধে কিছু কিছু কাহিনী আছে যাহাতে অধিকাংশই আছে অতিরঞ্জন, অহেতুক নিন্দাবাদ, বাকিটুকু কল্পলোকের কাহিনী মাত্র। জগতের শ্রেষ্ঠ নারী-কবির কাব্যও অদৃশ্য আর তাঁহার জীবন-কাহিনীও জনশ্রুতিতে পর্য্যবসিত। আশ্চর্য্য কবিভাগ্যের পরিহাস!

স্যাফো খৃষ্ট-পূর্ব্ব ছয় শত অব্দে লেসবস দ্বীপে এক সম্ভ্রান্ত মাইটিলীনিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সমসাময়িক কবিদের রচনায় তাঁহার অনন্ত জীবনের কিছুটা কাহিনী মেলে। কাব্য রচনার পদ্ধতি সে সময়ে ছিল দুরূহ, নিয়ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ। মাইটিলীনের মার্টল-কুঞ্জে, মন্দিরে, ঝর্ণার রূপালী ধারায়, নীল সাগরের তীরে হায়াসিন্থের উদ্যানে কাব্যের রাণী যে পদ বাঁধিয়াছিলেন সেই নিগূঢ় নিয়মাবদ্ধ ছন্দোবন্ধনে তাহার বিগলিত মাধুর্য্য যৌবন ও প্রেমের স্বপ্নকে মূর্ত্তি দিয়াছে বলিতে হইবে। এই কাব্যকুঞ্জে স্যাফোই ছিলেন কবিদের নেত্রী; তাঁহার অনুরক্ত ভক্তের একটি রীতিমত দল ছিল। এই ভক্ত অনুরাগী ও প্রেমিকদের মধ্যে স্যাফোর কাব্যে স্থান পাইয়াছে এথস্, গর্গো, ফাওন প্রভৃতি। কবি অ্যালসিউস তাঁহার প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন। সারা গ্রীস জুড়িয়া তাঁহার গৌরব—গ্রীসের যৌবনস্বপ্ন যেন তাঁহার কাব্যে রূপ পরিগ্রহ করিল। নারীর এতখানি গৌরব বহু গুণীর হৃদয়ে বিষ ঢালিয়া দিল। তাঁহারা মনের সাধে স্যাফোর কলঙ্ক প্রচার করিয়া আপনাদের হিংসাকে ভুলিতে চাহিলেন। ইহার ফলেই এক অপূর্ব্ব প্রেমের কাহিনী স্যাফোর নামের সহিত যুক্ত করিয়া তাঁহাকে কল্পলোকবাসিনী করিয়া তুলিল। কাহিনীটি হইল এই—স্যাফো প্রেমে পড়িয়াছিলেন ফাওন নামক এক সুন্দর যুবকের। সে তাঁহাকে ভালবাসে নাই; স্যাফোকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। বিরহবিধুরা স্যাফো লিউকেডিয় পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে সাগরে ঝাঁপ দিয়া প্রাণের জ্বালা জুড়াইলেন। এ কাহিনী লইয়া ওভিড, অ্যাডিসন, পোপ ও সুইনবার্ণ কবিতা লিখিয়াছেন। হতাশ প্রেমের করুণ কাহিনী অতি সহজেই মানুষের হৃদয় হরণ করিয়াছে।

শুনা যায়, এক শাসনকর্ত্তার কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া কবি দ্বীপান্তরিত হন ও সিসিলি চলিয়া যান। বহু সুখ্যাতি ও অখ্যাতি তাঁহার সমসাময়িক বন্ধু ও শত্রুর দল রটনা করেন। তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া স্যাফো কাব্যরসিকদের আনন্দ ও প্রেরণা জোগাইয়াছেন। ইহার মধ্যে কত কবির অভ্যুদয় ও তিরোভাব ঘটিয়াছে, কত না রুচি ও নীতির পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, কাব্যে কত না নূতন পথ ও মতের উত্থান ও পতন ঘটিয়াছে; কিন্তু হাজার বৎসর ধরিয়া রসিকজনকে যিনি আনন্দ দিতে পারেন তাঁহার কাব্যে কালাতীত সৌন্দর্য্য ধরা নিশ্চয় পড়িয়াছিল স্বীকার করিতে হইবে। যুগে যুগে নিখিলের বহু কাব্যরসিক ও প্রেমিক তাঁহার কাব্যে আনন্দের সন্ধান পাইয়াছেন। প্রাণের আবেগকে এমন অপূর্ব্ব ছন্দে রূপ দিবার সাধনায় যে বহু কবি স্যাফোর কাছেই যাইতে পারেন নাই সে কথা যুগের পর যুগ বহু কবিই স্বীকার করিয়াছেন। আজ তাঁহার কাব্য অদৃশ্য হইয়াছে বলিয়াই জগতের কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাস হইতে স্যাফোর নাম মুছিয়া যাইবে না। সৌভাগ্যক্রমে দুইটি অপূর্ব কবিতা ও কতকগুলি ভাঙা ভাঙা পদ পাওয়া গিয়াছে এক প্রাচীন প্যাপিরাসে। বহু স্থানে তাহার চিত্রলিপি সংগৃহীত আছে। কিছু কিছু পদ বা পদাংশ অন্যান্য কবিদের কাব্যে সংরক্ষিত আছে। অথচ স্যাফোর গ্রন্থাবলী ছিল নয়টি ভাগে বিভক্ত। এক হৃদয়হীন শক্তিমান্ অকবি * স্যাফোর কাব্য থাকিতে তাহার কাব্য কেহ পড়িবে না এই আক্রোশে এই অমূল্য কাব্যরাজি নষ্ট করিয়া দিয়াছে। মিল্টনের ভাষায় এমন লোকের অপরাধ হত্যা অপরাধের তুল্য।

স্যাফোর জয়গাথা বহু কবি গাহিয়াছেন। টেনিসনের প্রশংসা ও সুইনবার্ণের অপূর্ব্ব অনুবাদ সাহিত্যে চিরদিন অমর রহিবে। কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে স্যাফোর কাব্যের উল্লেখ করিয়া মনীষী ওয়াটস ডানটন বলিয়াছিলেন,—"Never before these songs were sung, and never since did the human soul, in the grip of a fiery passion, utter a cry like her; and, from the executive point of view in directness in lucidity, in that high imperious verbal economy which only nature can teach the artist, she has no equal, and none worthy to take the place of second" অর্থাৎ এই গানগুলি গীত হইবার পূর্ব্বে ও পরে আর কখনও মানবাত্মা ভাবাবেগে এমন করিয়া সবাক হইয়া উঠে নাই। রচনা-শিল্পের দিক দিয়া ঋজুতায়, সারল্যে, সুকঠিন ভাষার সংযমে যাহা কেবল সরস্বতীই তাঁহার ভক্তকে শিখাইতে পারেন তাঁহার সমতুল্য কবি কেহ নাই ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবার মত কাহাকেও দেখি না।

স্যাফোর কবিতার স্পর্শাতীত মাধুরী কোন কবিই ভাষায় রূপান্তরিত করিতে পারেন নাই। নানা জনে নানা ভাবে কবির মাধুরীকে আপন আপন ভাষায় প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু এরূপ অনুবাদমাত্রেই সেই সৌন্দর্য্য ধরা দেয় নাই; ইহা সম্ভবতঃ নূতন সৃষ্টিই হইয়াছে। ইংরেজীতে Bliss Carman

---

* ইহার নাম Gregory Nazianzen.

স্যাফোর এক শত গীতি-কবিতার ভাবানুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ হইলেও তাহা অতি মধুর লাগিল। ইহাদের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব লঘুতা ও মিষ্টতা আছে যাহা মনকে স্বপ্নাবেশে মুগ্ধ করে। অতি সঙ্কোচের সহিত স্যাফোর কয়েকটি কবিতার ভাবানুবাদ দিলাম। ইহার মধ্যে স্যাফোর কাব্য মাধুর্য্য নাই; তবুও সে মাধুর্য্য খানিকটা ধরিবার প্রয়াস করা গেল।

১

সন্ধ্যা, তারার দল আনো যে কাছে
সূর্য্যালোকে যারা ছড়ায়ে আছে।
মেষের দল ফেরে প্রদোষ বেলা
মায়ের কাছেতে শিশু সারিয়া খেলা।
আমারেও নিয়ে চল তৃপ্তি-সুখে
জগতে কোমলতম বঁধুর বুকে।

২

মরণ হইত যদি ভাল
কেন নাহি মরে দেবগণ?
বেঁচে কেন আজিও অমরে
তিক্ত শুধু যদি এ জীবন?
প্রেম যদি হয় অর্থহীন
ভালবাসে কেন দেবতারা?
প্রেম যদি সর্ব্বস্ব জীবনে
কিবা আছে তবে প্রেম ছাড়া?

৩

মাথা রাখি আমার বাহুতে
তুমি আছ শুয়ে
গোলাপের মত মুখখানি
বর্দ্ধমান কামনায় রাঙা।
গভীর নয়ন দুটি হয় বিস্ফারিত,
শরতের কুহেলির মত
প্রেমের কুহেলি 'পরে ভেসে
আসে চোখে বিস্ময়ের নব জ্ঞানোন্মেষ।
তোমার ও কণ্ঠ হতে ওঠে
পাপিয়ার স্পন্দিত বুকের
সোহাগের সরমের বাণী
অবারিত কোমল গুঞ্জন
প্রণয়ের অস্ফুট কাকলি।
ভাঙা ভাঙা হাসির মাঝেতে
বুদ্‌বুদের মত
ফোটে বাণী তব বক্ষ হতে—
ঝর্ণার জলের চেয়ে আরো মধুভরা—
"হে দেবতা, আমি বড় সুখী"।

৪

আমি বসে আছি কত না দণ্ড গেল
আছি নির্জ্জন দ্বার পানে চেয়ে হায়
দেয়ালেতে ছায়া সরিয়া সরিয়া চলে
কত না পথিক রাজপথ দিয়ে যায়।
এ ভীরু হৃদয়ে কত আশা সন্দেহ
দুলে দুলে উঠে থাকি' থাকি' বারে বারে
কত শত লোক ছুটে চলে গৃহ পানে
তুমি আছ, প্রিয়, কোন যে সাগর-পারে?

৫

হায় লেসবীয় যুবতী, তোমার
দিন কি দীর্ঘ লাগে,
রাত্রি তোমার লাগে কি গো সীমাহীন
মাইটিলীনের নির্জ্জন গৃহমাঝে?
উজ্জ্বল সারা দিন
যতক্ষণ না বন্দর 'পরে
তত'খন ফোটে তারা সন্ধ্যায়
বলো কি কাজে ব্যস্ত তুমি?
সোণালি গোধূলি বেলা।
চলে যেতে যেতে ঝর্ণা-ধারার পাশে
গুহাগত কোন পথিকে দেখিয়া তব
মনে কি পড়ে না তোমার প্রিয়ের কথা?
—পড়ে না সত্য, তবু মনে হয়, হায়
চোখের নিমেষে কাটিবে দীর্ঘ রাত,
মিলনোৎসুক যবে
প্রিয়ের গৃহের দ্বারেতে দাঁড়াব শুনি',
আমার আপন হৃদয়ের উচ্ছ্বাস।

৬

একদা তুমি আমার বুকে
ঘুমাতেছিলে, প্রিয়!
নীলাভ রূপা-আলোক ভরে
জ্যোৎস্না বহে মাঠের পরে
নিখিল ভরি তোমারি প্রেম
অনির্ব্বচনীয়।
চন্দ্র এখন অস্ত গেছে
সপ্তর্ষিও গত।
নিশুতি হয়ে এসেছে রাত্রি
কালের স্রোত চলেছে মাতি'
একাকী জাগি সঙ্গিহারা
হৃদয় ব্যথাহত।



অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

[illegible]

মণিমালা দাশগুপ্ত

বর্ত্তমানে যে জীবন্ত আকাঙ্ক্ষা আমাদের—জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে, তা'র মধ্যে আছে অশিক্ষিত, অপরিচ্ছন্ন, অনভিজ্ঞদের ভাবী জীবনে মানবতার অপূর্ব্ব সঙ্কেত। সারা পৃথিবীর মিলিত মানুষের মৈত্রী ও প্রীতিবন্ধনের স্বপ্ন। আজকের দিনে রাজনীতি নিয়ে সারা পৃথিবীতে যে সমস্যা জেগে উঠেছে, তা'র উদ্দেশ্য কিন্তু কোনো কারণেই ছোটো নয়। রাজনীতিতে বর্ত্তমানে যত বড় কূটনীতিই থাকুক না কেন, এর মূল কথা হ'চ্ছে—মানুষে মানুষে আত্মীয়তা। কিন্তু আজ এ কথা আর কারো মনেই জাগছে না। জীবন্ত চিন্তা ক'রবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোনো কথাই তো আজ শোনা যায় না। আমাদের দেশের জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ যে এই সত্য উপলব্ধির থেকে, এই সুন্দর অনুভূতির থেকে দূরে পড়ে রইলো, তার কারণটা কি? অনেক সময়ই মনে হয় আমাদের নেতারাই এর একমাত্র কারণ। নেতাদের মূল উদ্দেশ্য যত মহৎ-ই হোক্ (অর্থাৎ যে দরদী মনের অভিব্যক্তির উপর তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে), শেষ পর্য্যন্ত তা' শুধু নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় গিয়ে ঠেকে। অন্ততঃ বর্ত্তমান দেশ-শুদ্ধ এই বিরাট জনতার দিকে চাইলে, এ কথা আমাদের মনে না হ'য়ে পারে না। তা' না হ'লে এমন রোগ-বিশীর্ণ, অনশন-ক্লিষ্ট গণতন্ত্রী হ'য়েও আশায় উদ্দীপ্ত, সম্পদে সমৃদ্ধ এক গৌরবোজ্জ্বল দেশের স্বাধীন সুখী মানুষের মিলিত জীবনের কামনা না করে, আমরা সাম্প্রদায়িকতা সংকীর্ণতার বিষবাষ্পে সারাটি দেশ ভরে তুলেছি কেন? নেতাদের পরস্পরবিরোধী কথাবার্ত্তাই যে আমাদের এই আত্মকলহের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, সে কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। প্রতিদিন ভোরে সংবাদপত্রের পাতা ওল্টাতে গিয়ে প্রথমেই আমাদের চোখে পড়বে, জিন্না-আজাদ আলোচনা ব্যর্থ। পণ্ডিতজীর সহিত কংগ্রেসের কথাবার্ত্তার তেমন মিল নেই, সমাজতন্ত্রীদের সহিত ওয়ার্কিং কমিটির মতভেদ, কৃষক-প্রজা পার্টির লীগ সম্বন্ধে মন্তব্য, হিন্দু মহাসভার কংগ্রেসের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে বিদ্রূপ, কম্যুনিষ্টদের সহিত জাতীয়তাবাদীদের মারামারি। অবশেষে অতীতের হিন্দু-সংস্কার ও মুসলিম-সংস্কার নিয়ে বহু তথ্যপূর্ণ আবিষ্কার এবং সর্ব্বশেষে ধ্বনি 'লড়কে লেঙ্গে।' বলতে চাই, কোনো দু'জন নেতার মধ্যে মতের মিল নেই। এ রকম অবস্থায় দেশব্যাপী বিরাট জনতার অবস্থাটা যে কি, তা'তো দেখতেই পাচ্ছি। পাশাপাশি যে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের ক্ষেতের লাউ-কুমড়া ভাগ ক'রে খাচ্ছিলো (যদিও অনেক মুসলমান এবং জন কয়েক হিন্দু একে কল্পিত কথা বলেই রায় দেবেন), তাঁদের মধ্যে আজ প্রায় মুখ-দেখাদেখি বন্ধ।

বহু মুসলমানের মুখে শোনা যাচ্ছে, তাদের যথেষ্ট উন্নত না হ'বার একমাত্র বাধা হিন্দুরাই—হিন্দুরাই দায়ী। কারণ, অতীতে তা'রা আমাদের ঘৃণা করেছিলো। সত্যই ঘৃণা করেছিলো অথবা কেন করেছিলো এ প্রশ্ন বাদ দিলেও তাদের বর্ত্তমান অভিযানের কোনো কারণ খুঁজে পাই না। তোর বাপ এক দিন জল ঘোলা করেছিলো—এ নীতি বর্ত্তমান যুগেও চলে কি না, তা' ভাববার কথা। হিন্দুর রক্তে ভারতবর্ষ ধুয়ে-মুছে নিয়ে পবিত্র স্থানে তাদের নূতন জীবন সুরু হবার কথা শুনলে অগ্রগতির পথের মানুষের মন সংশয়ে ভরে ওঠে। বহু দিন আগে মহাকবি হাফেজ সুফি বলেছেন: "হে হাফেজ! তুমি মুসলমানের সঙ্গে আল্লা আল্লা বল, আর ব্রাহ্মণের সঙ্গে বল রাম রাম।" কিন্তু বর্ত্তমানে এ সব মূল ধর্ম্মের কথা কারও ভালো লাগে না, তাই কোন ধর্ম্ম অতীতে কি করেছিলো, তাই নিয়েই এখন গবেষণা চলছে। সম্প্রদায়নৈতিক মুসলমানদের হিন্দু সম্বন্ধে উক্তির পর 'হিন্দুরাও কি ইতিহাসের নজির দেখাবে: "when the collector of the Dewan asks them (the Hindus) to pay the tax, they should pay it with an humility and submission, and if the collector wishes to spit into their mouths, they should open their mouths without the slightest fear of contamination, so that the collector may do so. The object of such humiliation and

spitting into their mouths is to prove the obedience of the infidel subjects under protection and promote, if possible, the glory of the Islam, the true religion and to shew contempt to false religion." এই ভাবে অগ্রগতি যদি মানুষকে অধোগতিতে নিয়ে যায়, তবে আগামী দিনের মানুষের ইতিহাস কোন্ পথে ? শ্রদ্ধেয় এস্ ওয়াজেদ্ আলি বলেছেন: ইতিহাসের লেখক ও শিক্ষকদের এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, অন্যায় এবং অত্যাচার মুসলমানেরও একচেটিয়া জিনিষ নয়, হিন্দুরও নয়। দু'-এক জন মুসলমান বাদশার যে প্রজাপীড়ন, তা মুসলমান হিসাবে নয়, তাঁরা তাঁদের স্বভাবেরই অনুসরণ করেছেন। মিঃ এস্ ওয়াজেদ আলি আরও বলেছেন: "হিন্দুকে শ্মশান থেকে এবং মুসলমানকে গোরস্থান থেকে বাড়ীতে তুলে আনাই হচ্ছে এখন আমাদের প্রধান কাজ।" কিন্তু আত্মসংযমহীন নেতারা সত্যই এখনও সে শ্মশান-মানসিকতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। যে সাধারণ লোকদের নিয়ে দেশটা গড়ে উঠেছে তাদের সম্বন্ধে একমত হ'বার প্রয়োজনীয়তা নেতাদের মনে জাগছে না; অতএব জনতাকে নিয়ে তাঁরা এক চমৎকার খেলা খেলছেন এ কথা অবশ্যই বলা চলতে পারে।

সার্থকতা যদি সত্যই তাঁদের কাম্য হয়, জনগণের স্বার্থই যদি তাঁদের ঈপ্সিত হয়, তবে জাতি-তত্ত্বের আলোচনার ধুয়ো ধরে জন-সমাজের ক্ষতি না ক'রে প্রকৃত দেশনৈতিক মনোবৃত্তি নিয়েই তাঁ'রা রাজনীতির পথে এগিয়ে যাবেন। আজ আমরা জনসাধারণের নামে সমস্ত জনতা যে ঘোর দুর্দ্দিনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, তা'র ভীষণতা বা কুশ্রীতা সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকেরই চিন্তা করা উচিত। আমরা আমাদের চিন্তাশীল নায়কদের শ্রদ্ধা নিশ্চয়ই ক'রবো এ কথা ঠিক কিন্তু অন্ধ ভাবে সমর্থন ক'রবো না। দেশপ্রীতি, জাতি-প্রীতি সব কিছুর গোড়াতেই মানব-প্রীতি। মানুষকে আমরা ভালোবাসি, মানুষ না হ'লে মানুষের চলতে পারে না। মানুষে মানুষে আন্তরিকতা না থাকলে আমরা বাঁচতে পারি না। দুর্দ্দিনের অভিশাপ মাথায় ক'রেও আজ যে সুদিনের আশীর্ব্বাদ সামনে দেখতে পাচ্ছি, তা'তে নতুন জীবনের পায়ের শব্দ ক্রমেই সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। শ্রেণিবৈষম্য ও শ্রেণি-আভিজাত্যের কথা আজ আমাদের কানে নিতান্ত হাসির ব্যাপার বলেই মনে হয়। আজ সমগ্র ভারতের জনতার সম্মুখে মুক্তির আদর্শ—স্বাধীনতার আদর্শ। আজ নব ভারতের জনতা আপনার স্বাভাবিক চেতনা-বোধ ফিরে পেয়েছে। তারা জানে, নেতাদের নেতৃত্ব ছাড়িয়ে তা'রা আজ একসঙ্গে রোগে ভুগছে, জলে ভিজছে, একসঙ্গেই সমস্ত হিন্দু-মুসলমান জীবন দিয়েছে, একত্রে গৃহহারা হ'য়ে একই ফুটপাতে তা'দের আশ্রয় মিলেছে।—শোষকের অত্যাচারে তা'দের মিলিত রক্ত-স্রোতে যে এ ভারত-ভূমি সারা বিশ্বের কাছে তীর্থ হ'য়ে উঠলো। এ ইঙ্গিত যে কত বড় ইঙ্গিত, সে কথা কি নেতারা কখনও ভাবতে পারেন না? সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ-মুখী আদর্শই আমাদের গ্রহণ করতে হবে আজ। তাই নেতাদের কাছে—আমাদের—জনসাধারণের—এই বিরাট জনতার একমাত্র দাবী—আমরা প্রস্তুত! শুধু তোমরা—নেতারা একবার হাতে হাত মিলিয়ে অগ্রসর হও। তোমাদের মিলিত কণ্ঠের উদাত্ত সুর সমগ্র বিশ্বের পথে পথে ছড়িয়ে পড়ুক; পা বাড়াও!

রূপসাধনা

বন্দনা দাশগুপ্ত

মুখশ্রীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য চোখের অপূর্ব্বতার অন্তরালে। চোখের চাউনি ও চোখের প্রসাধনের উপরই এই সৌন্দর্য্যের ভিত্তি। চোখ যদি পরিষ্কার থাকে, তাহ'লে চোখের স্বাভাবিক স্বচ্ছতা চোখকে ও চাউনিকে আপনা থেকেই সুন্দর করে। চোখ পরিষ্কার রাখতে হ'লে দিনে অন্তত: একবার ডাক্তার-অনুমোদিত ভাল 'লোশন' দিয়ে চোখ পরিষ্কার করা উচিত, তাতে চোখের স্বাভাবিক নীল আভা সুন্দর ভাবে প্রস্ফুটিত হয়। এ গেল চোখের পরিচর্য্যার কথা, তার পর চোখের প্রসাধন। পাউডার মাখার দরুণ চোখের পাতা ও ভুরুতে পাউডারের কণা লেগে থাকে এবং কালোয়-সাদায় মিলে প্রসাধনের পরিচ্ছন্নতাকে ঢেকে ফেলে এক অপরিষ্কার ভাবের সৃষ্টি করে। এই শুষ্ক পাউডার-কণা দূর করতে হ'লে ভেসলিন জাতীয় তৈল-পদার্থ (ক্রীম হলেও চলে) ছোট ব্রাশের সাহায্যে চোখের পাতা ও ভুরু আঁচড়ানো উচিত, এতে শুষ্ক পাউডার-কণা চ'লে গিয়ে চোখের পাতা ও ভুরুকে উজ্জ্বল করে এবং মুখের পটভূমিকায় এই উজ্জ্বলতা সুন্দর শ্রী প্রদান করে।

চোখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য অনেকে কাজল কিংবা সুর্ম্মা চোখের কোলে টেনে দেন। চোখ বড় হলে এতে সৌন্দর্য্য বাড়ায় সন্দেহ নেই, কিন্তু যাদের চোখ ছোট কিংবা কোল-বসা, তাদের কোন মতেই কাজল কিংবা সুর্ম্মা ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ তাতে চোখের গর্ত্তে ও চারি দিকে কালো রঙ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে চোখের চারি দিকে এমন এক অপরিষ্কার, অসুন্দর আবহাওয়ার সৃষ্টি করে যা চোখের দৃষ্টিকে সুন্দর হ'তে বাধা দেয়।

অনেকে যারা রূপসজ্জা সম্পর্কে খুঁতখুতে ও প্রসাধন সম্বন্ধে খুটিনাটি অনেক কিছুই জানেন তাঁরা চোখের ভাবকে আরও সুন্দর করবার জন্য "মাস্কারা" (এক রকম শুকনো কালো রঙ) ব্যবহার ক'রে থাকেন। এই কালো রঙ ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মুখমণ্ডলের পটভূমির উপর চোখের পক্ষচ্ছায়াকে আরও নিবিড় ক'রে রহস্যময় করে তোলা এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত এই ভাবকে স্থায়ী রাখা। কিন্তু সাধারণত: অনেকেই এর ব্যবহার জানেন না এবং যাঁরা জানেন তাঁরাও অনেকেই ঠিক ভাবে এই শ্যাডো তৈরী করতে পারেন না।

চোখের জন্য যে বিশেষ ছোট ব্রাশ পাওয়া যায় সেই ব্রাশ প্রথমে গরম জলে ডুবিয়ে খুব ভাল ক'রে ঝেড়ে নিতে হবে, যাতে ব্রাশে অল্প সামান্য জলও না থাকে। তার পর খুব অল্প পরিমাণে 'মাস্কারা' রঙ ব্রাশের সাহায্যে চোখের পাতার উপর খুব হাল্কা ভাবে টেনে দিতে হবে। এ রকম ভাবে দিনে একবার প্রসাধন করলে সারা দিন চোখকে সতেজ ও উজ্জ্বল রাখা যায়। ঠাণ্ডা জলে কখনও ব্রাশ ভিজাতে হয় না, কারণ এতে ব্রাশের ডগাগুলো নেতিয়ে পড়ে ও রঙ সর্ব্বত্র সমান ভাবে ঠিক মত লাগতে পারে না, ফলে, দেখতেও ভাল লাগে না এবং খুব তাড়াতাড়ি রুমাল কিংবা কাপড়ে ঐ রঙ উঠে আসে। গরম জলে ব্রাশ ডুবিয়ে ঝেড়ে নেওয়াতে ব্রাশের ডগা শক্ত ও ঝরঝরে হয় ও সব জায়গায়

সমান ভাবে রঙ লাগাতে পারা যায়, এছাড়া গরম জল থাকায় ঐ রঙ চট্ ক'রে শুকিয়ে যায়. ফলে রুমাল কিংবা কাপড়ে লাগতেও পারে না ও অনেকক্ষণ স্থায়ী থাকে।

ভুরু—সুন্দর ভুরু মুখের আরেকটি সৌন্দর্য্য। সুন্দর ভুরু মুখের শ্রী বাড়াতে সাহায্য করলেও ভুরুর সাধারণ ত্রুটি, মুখের সৌন্দর্য্যের সে রকম বিশেষ কোনো ক্ষতি করে না (অত্যন্ত খারাপ না হ'লে)। ভুরু কাল এবং লম্বা করবার জন্য অনেকে পেনসিল ব্যবহার করেন। এই পেন্সিল কালো না হ'য়ে ব্রাউন হওয়া উচিত। কালো পেন্সিলে কৃত্রিমতার ছাপ পরিষ্কার ধরা পড়ে। ব্রাউন পেন্সিল খুব সরু ক'রে কেটে ভুরুর উপর টেনে দিয়ে আস্তে আস্তে ঘষে দিলে ভুরুর স্বাভাবিক রঙের সংগে এই রঙ একেবারে মিশে যায় এবং ভুরুর ছোটখাট খুঁত অনেকাংশে ঢাকা যায়।

কিন্তু তবুও সৌন্দর্য্যের মোহ এমনই যে, কোনো খুঁতই মেয়েরা রাখতে রাজী নয়। তাই সুন্দর হবার জন্যে অনেকে ভুরু কামান বা ভুরু তুলে থাকেন।

ভুরু কামানো বা তোলা কোন মতেই উচিত নয়, কারণ এতে ভুরু দেখতে আরও খারাপ হয় ও অল্পকালের মধ্যে ভুরুর চারি দিকে চুল ওঠা সুরু করে যা বন্ধ করা সত্যিই যায় না। মানানসই ভাবে ভুরু তুলে ফেললে অবশ্য সুন্দর দেখতে লাগে সন্দেহ নেই, কিন্তু একবার ভুরু তুললে ভুরুর চুল বিচ্ছিন্ন ভাবে আরও এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ে, কাজেই প্রতিদিন ভুরু না তুললে উপায় থাকে না। সেই জন্য পেন্সিল দিয়ে যতটুকু পারা যায় ততটুকুই ভাল, তার উপর আর যাওয়া উচিত নয়।

মুখের প্রসাধনে মোটামুটি একটা জিনিষের প্রতিই মেয়েদের লক্ষ্য থাকে। কিন্তু এছাড়া অনেকে নাকেরও নানা রকম পরিচর্য্যা ক'রে থাকে।

যাদের নাক চেপ্টা ও মোটা তাদের মধ্যে অনেকে নাকের দু'ধারে চোখের কাছ থেকে নাকের ডগা পর্য্যন্ত কালচে রঙ লাগিয়ে থাকেন। এতে নাকটি সোজা ও টিকলো দেখায়। এ প্রসাধন নিখুঁত ভাবে করা কঠিন, বিশেষ দিনের আলোতে—তাই এ ধরণের প্রসাধন সাধারণতঃ এক রকম দেখা যায় না। যাঁরা এ ধরণের পরিচর্য্যা করেন, তাঁরাও রাত্রি ছাড়া এর ব্যবহার করেন না।

সাধারণতঃ নাকের সে রকম কোনো প্রসাধন নেই বললেই চলে। তবে নাকের উপর অনেক সময় লোমকূপের গর্ত্ত স্ফীত হ'য়ে পড়ে এবং তার মধ্যে ময়লা ঢুকে বিশ্রী কালো দাগের সৃষ্টি করে। রাত্রে শোবার আগে মুখে ক্রীম লাগিয়ে, সকালে ভাল ভাবে মোটা তোয়ালে দিয়ে ঘষলে এই ময়লা উঠে যায়। সচরাচর নাকের প্রসাধনের মধ্যে এটাই চোখে পড়ে এবং প্রয়োজন হ'লে এটা করাও উচিত। অন্তরের আশা ও কল্পনাকে বাস্তবে সত্য ও সাফল্যমণ্ডিত করতে হ'লে মূলে কিছু সত্য থাকা চাই।

কৃষ্টি ও যত্নের দ্বারা সৌন্দর্য্য লাভ করা তখনই যেতে পারে—যদি এর গোড়ায় স্বাস্থ্য অটুট থাকে।

আমরা সুন্দরী হওয়ার জন্ত নানা চেষ্টার ত্রুটি রাখি না; কিন্তু সৌন্দর্য্যের আসল ভিত্তি ও মূলধন যে স্বাস্থ্য তার যত্ন নিতেই আমাদের ভুল হয় ও কুঁড়েমি বোধ করি। স্বাস্থ্যকে সুন্দর ও সতেজ রাখতে হ'লে রীতিমত ব্যায়ামের প্রয়োজন।

সাধারণতঃ হাত, পা, বুক, পেট ইত্যাদি ব্যায়ামের কথাই আমরা জানি, কিন্তু যে মুখ—মনের ও দেহের সৌন্দর্য্যের প্রতীক, তার কোনো ব্যায়ামই যে শুধু আমরা করি না তাই নয়, জানিও না। অথচ এত সহজ ব্যায়াম বোধ হয় আর কিছু নেই। প্রতিদিন নানা প্রসাধনের সংগে যদি মুখের ব্যায়ামের জন্ত অন্ততঃ ১০।১৫ মিনিট বেশী সময় আমরা দিই, তাহ'লে যৌবন ও সৌন্দর্য্য একই সঙ্গে আমরা উপভোগ করতে পারি।

ভাঙ্গা দেয়ালে রঙ মাখালে যেমন তার দৈন্য বেশী ক'রেই প্রকাশ পায়, সেই রকম স্বাস্থ্যবিহীন মুখে নানা রঙ মেখে সুন্দর হতে গেলে সৌন্দর্য্য ও আভিজাত্যের পরিবর্ত্তে মুখের শ্রীহীনতাই প্রকট হ'য়ে দেখা দেয়।

বার্দ্ধক্য মানুষের জীবনে এক দিন আসবেই সন্দেহ নেই, কিন্তু একটু কষ্ট ক'রে ব্যায়াম করলেই যখন এই শত্রুর হাত থেকে অনেক দিনের মত রেহাই পাওয়া যায়, তখন আমাদের প্রত্যেকেরই কী সেই চেষ্টা করা উচিত নয়?

ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের চেহারায় বার্দ্ধক্যের ছাপ বেশী তাড়াতাড়ি পড়ে। তার কারণ সব ছেলেরা নিয়মিত ব্যায়াম না করলেও প্রত্যেক মেয়েদের থেকে তারা বেশী পরিশ্রম করে। তাছাড়া মেয়েদের শরীরের চামড়া স্বভাবতঃই নরম হওয়ার দরুণ ব্যায়ামের অভাবে খুব তাড়াতাড়িই শিথিল হ'য়ে পড়ে ও কুঁচকে যায়।

মুখের উপর বয়সের ছাপকে প্রত্যেক নারীই ভয় করে, তাই সৌন্দর্য্য বজায় রাখবার জন্য তাদের হরেক রকমের প্রসাধনীর আড়ম্বর ও আয়োজনের প্রয়োজন হয়।

মুখের স্বাস্থ্য অটুট রাখা কি ক'রে সম্ভব, সেই নিয়েই কিছু আলোচনা এবার করব। উপায় সহজ, সময়-সাপেক্ষও নয়, শুধু একটু ধৈর্য্যের দরকার।

আড় ভাবে কপালে রেখা-চিহ্নই বার্দ্ধক্যের প্রথম ছাপ। বার্দ্ধক্য আসার বহু আগে যখন যুবতী মেয়েদের কপালেও এই চিহ্ন দেখি, তখন সত্যিই অবাক লাগে। এ রেখা নানা কারণে পড়ে। অত্যধিক চিন্তা অথবা স্বাস্থ্যহানির জন্ত অতি অল্প বয়সেও কপালে গভীর রেখাপাত করে। অনেকের নিজের অজ্ঞাতসারেই বিরক্তিতে কপাল কোঁচকানো বা বিস্ময়ে উপর দিকে ভ্রূ তোলা অভ্যাস। এই বদ অভ্যাসের দরুণই সাধারণতঃ অল্প বয়সের মেয়েদের কপালে এই রেখা চিহ্নিত হয়। সর্ব্বপ্রথম এই বদ অভ্যাস ছাড়তে হবে এবং তার পর পরিচর্য্যা।

রাত্রে শোবার আগে আঙুলে সামান্ত ক্রীম নিয়ে কানের ঠিক উপর থেকে কপালের মাঝখান পর্য্যন্ত উভয় পাশ থেকেই কিছুক্ষণ ঘষতে হবে। তার পর কপালের এক দিকের চামড়া আঙুল দিয়ে টিপে ধরে আর এক হাত দিয়ে অন্য দিকের অনাবৃত কপালের মাঝখান থেকে ক্রমশঃ কানের দিকে ঘষতে হবে। এই ভাবে প্রতিদিন ১০।১৫ বার ঘষলে ২।৩ মাসের মধ্যেই কপাল রেখাহীন ও সুন্দর হবে।

কোন কিছুতেই কপাল কোঁচকানো মেয়েদের যেন একটা মজ্জাগত স্বভাব। সামান্ত বিরক্তি থেকে আরম্ভ ক'রে একটু কিছু ভাবতে হ'লে কপাল না কুঁচকে তারা পারে না। এই অভ্যাসের দরুণই দু'টি ভুরুর মাঝখানে কতকগুলি লম্বালম্বি রেখা পড়ে। অনেক সময় চোখে জোর পড়লেও কপালে এই ধরণের রেখা পড়ে।

প্রথমে আঙ্গুলে ক্রীম নিয়ে বেশ ভাল ক'রে নাকের দু'পাশ থেকে কপাল পর্য্যন্ত ঘষা দরকার। তার পর দুই আঙ্গুল দিয়ে ভুরুর মধ্যে থেকে চোখের নীচ দিয়ে কান পর্য্যন্ত মিনিট ২।৩ ধ'রে নিয়মিত ঘষলে কিছু দিনের মধ্যেই এ দাগ মুছে যায়।

ক্রমাগত রাত্রে ঘুম না হলে কিংবা বেশী রাত পর্য্যন্ত জেগে পড়া-শুনো বা চিন্তাপূর্ণ কাজ করলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই চোখের কোলে বিশ্রী কাল দাগ ও রেখা পড়ে—এ ছাড়া শরীর অসুস্থ থাকলে তো পড়েই। আমাদের প্রসাধন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে না তার প্রধান কারণ যে, কতগুলো ছোট খাট ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি মোটেই সজাগ নয়। আমরা চোখ সুন্দর করবার জন্য কাজল, সুর্ম্মা, আরও কত কী সব ব্যবহার করি, অথচ চোখের কোলে কালি কিংবা রেখা যে কী করলে দূর হয় তা জানিও না বা জানতে সচেষ্টও হই না।

এ ধরণের রেখা দূর করতে হ'লে দিনে অন্ততঃ দুই বার এবং প্রয়োজন হ'লে আরও বেশী বার ভাল লোশন দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলতে হবে। তার পর মধ্যমা দিয়ে চোখের পাতার উপর এবং চারি দিকে ক্রীমের সাহায্যে খুব ধীরে ধীরে বেশ জোরের সঙ্গে ঘষলে অল্প দিনের মধ্যেই সুফল পাওয়া যায়।

এর সঙ্গে যদি দৈনিক শোবার আগে আঙ্গুলের ডগায় বেশ বেশী পরিমাণে ক্রীম নিয়ে চোখের কোলে জোরে জোরে কিছুক্ষণ (২।৩ মিনিট) টোকা দেওয়া যায় তাহ'লে চোখের কালি ও দাগ নিশ্চয়ই যাবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই টোকাতে চোখে বেশ ব্যথা লাগে ব'লে বেশীর ভাগ মেয়েই এই নিয়ম মানে না। তা ছাড়া অনেকে চোখের ব্যাপারে এ ধরণের জোরে আঘাত দেওয়া পছন্দ করেন না; তাঁদের ধারণা এতে চোখের ক্ষতি হয়। কিন্তু চোখের কোলে দিনান্তে কয়েক মিনিট জোরে আঘাত দেওয়াতে চোখের কোনো ক্ষতিই হয় না বরং এতে রক্তসঞ্চালন দ্রুত হয় ও দৃষ্টিশক্তি ভাল করে। অবশ্য এ সব-কিছুর সঙ্গে চাই রাতে ভাল মত ঘুম ও বিশ্রাম।

নাকের ধার থেকে নীচের দিকে চিবুকের পাশে রেখা নেমে এলে বুঝতে হবে বার্দ্ধক্য এসে গেছে। এ দাগ যেতে বেশ কিছু দিন সময় লাগে। তবে চেষ্টা ও অধ্যবসায় থাকলে সবই সম্ভব হয়। প্রত্যেক দিন সকালে ও রাত্রে শোবার আগে মুখে বেশ ক'রে হাওয়া ভরে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ধীরে ধীরে হাওয়াটা ছাড়তে হবে। তার পর মুখে ভাল ক'রে ক্রীম মাখার পর বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চিবুকের তলাটা চেপে ধরে মধ্যকার তিনটে আঙ্গুল ঐ রেখার উপরে জোরে জোরে কয়েক বার টেনে দিতে হবে। শেষে রেখার চার পাশে আঙ্গুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘষতে হবে। নিয়মিত এ রকম অভ্যাসে উপকার পাওয়া যায়।

গলার কাছটা মোটা হলে অনেক সময় দু'টো চিবুকের মত দেখতে লাগে, অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে "ডবল চিন"। এই "ডবল চিনের" খুঁত ঢাকতেও মেয়েদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। চিবুকের কাছ থেকে নীচের দিকে কাল রঙ দিয়ে শ্যাডো তৈরী ক'রে গাঢ় থেকে ক্রমশঃই হাল্কা ক'রে টেনে দিয়ে এ খুঁত ঢাকার চেষ্টা অনেকে করেন, তবে এতে অল্প পরিমাণেই খুঁত ঢাকা যায়। মোটের উপর এ ধরণের প্রসাধন দ্বারা "ডবল চিন" ঢাকতে যাওয়ার চেষ্টাকে এক ব্যর্থ প্রচেষ্টাই বলা যেতে পারে।

"ডবল চিন" দূর করবার একটা সুন্দর ব্যায়াম আছে। ঘুম থেকে উঠে বিছানার উপর জোড় আসন ক'রে বসে মাথাটা পেছন দিকে যত দূর সম্ভব হেলিয়ে দিয়ে মাথা না নেড়ে ক্রমাগত মুখ খোলা আর বন্ধ করতে হবে এবং মুখের হাঁ যেন বেশ বড় হয়। তার পর শোবার আগে মুখে ক্রীম মাখবার সময় চিবুক থেকে কানের দিকে ধাক্কা দেওয়ার ভাবে হাত উপর দিকে টেনে নিয়ে যেতে হবে এবং ক্রমাগত কয়েক বার এ রকম করতে হবে। এতে মেদ এবং স্থূল মাংসপিণ্ডের রক্তসঞ্চালন দ্রুত হয় এবং নিয়মিত ব্যবহারের ফলে "ডবল চিন" অন্তর্হিত হয়। কিন্তু এতে বেশ খাটুনি আছে।

এ তো গেল ব্যাধি হ'লে ব্যাধির উপশম। কিন্তু বক্তব্য হচ্ছে যে, এখনও যাদের মুখে কোন রকম দাগ পড়েনি বা চামড়া কুঁচকে যায়নি তাদেরও নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত ও প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে উপরোক্ত মুখের ব্যায়াম করা উচিত, তা না হ'লে অচিরেই তাদের সুন্দর শ্রী ও কোমল রূপ শ্রীহীনতায় পরিপূর্ণ হবে ও যৌবন না যেতেই বার্দ্ধক্যকে বরণ করতে হবে।

প্রসাধন ও মুখের ব্যায়ামের সাথে প্রতিদিন স্নানের আগে মুখে কয়েক মিনিট গরম জলের ভাপ লাগালে বেশ উপকার পাওয়া যায়। কিছুক্ষণের এই গরম ভাপ মুখের শিরা-উপশিরাকে টান করে এবং মুখের রক্তসঞ্চালনের গতি দ্রুত করে, ফলে শিথিল ও কুঞ্চিত চামড়া সোজা ও টান হয়, এবং রঙ ফর্সা হয়। তবে বেশীক্ষণ এই গরম উত্তাপ লাগানো উচিত নয়। তাতে বিপরীত ফল হয়—৫ মিনিট সময় গরম ভাপ নেবার পক্ষে যথেষ্ট।





গেরস্থ সাবধান!

শিল্পী—গোপাল ঘোষ

শিশু-মৃত্যু কেন হয়?

শ্রীসতীদেবী মুখোপাধ্যায়

শিশু-মৃত্যু কেন হয়, এ নিয়ে ডাক্তারেরা অনেক বড় বড় কথা লিখে নিজেদের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁরা নির্দ্দেশ দেন, গর্ভবতী মাকে প্রচুর পরিমাণে দুধ, মাংস, মেটুলী, ডিম, পেস্তা, বাদাম, খেজুর, কালো জাম, বীট, মটর, পালং শাক ইত্যাদি লোহাযুক্ত খাদ্য খাওয়াতে।

যুদ্ধের আগে গর্ভবতী মাকে যদিও কিছু কিছু লোহাযুক্ত খাদ্য খেতে দেওয়া সম্ভব ছিল, এখন সে কথা মনে আনাও পাগলামী। মুষ্টিমেয় বড়লোকের ঘরে ও দেশের মত শিশু পালন ও গর্ভবতী মাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিনযুক্ত খাদ্য খাওয়ানো সম্ভব কিন্তু দরিদ্র-ঘরে এরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া মানে তাদের বিদ্রূপ করা ভিন্ন আর কিছু নয়। পরাধীন দেশের অধিবাসীদের বেশীর ভাগই দরিদ্র। এই সব দরিদ্র গর্ভবতী মাকে প্রচুর দুধ ফল খাওয়ানো নির্দ্দেশ দেওয়া একমাত্র বাতুলের দ্বারাই সম্ভব নয় কি?

বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের কল্যাণে অনেকের মত ডাক্তারদেরও মুদ্রাস্ফীতি হওয়ায় দরিদ্র দেশের দরিদ্র অধিবাসীদের নিজেদের মত বড়লোক ভেবে বোধ হয় তাঁরা এ বি সি ডি ইত্যাদি যতগুলি ভিটামিনযুক্ত খাদ্য আছে তা খাওয়ার নির্দ্দেশ দেন। সেইগুলি কোথা থেকে আসবে সে বিষয়ে চিন্তা করেন না।

তাই আমার সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, দেশের অকাল মৃত্যু দূর কোরতে হ'লে যাঁদের হাতে জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার আছে, তাঁদের নির্লোভী হয়ে আগে ভেজালীদের দৃঢ় হস্তে দূর করা উচিত। কর্ত্তব্য হিসাবে এই গুরু দায়িত্ব-ভার পালন কোরতে হবে। তবেই দেশের অকাল মৃত্যু দূর হওয়া সম্ভব। তা না হ'লে নিজের নাম প্রচারের জন্তে বড় বড় প্রবন্ধ লিখে কোন লাভ নেই।

ও-দেশের সংগে আমাদের দেশের প্রভেদ অনেক। কথায় কথায় ও-দেশের উদাহরণ না দেওয়াই ভাল। গরীব দেশের গর্ভবতী মাকে কি খেতে দেওয়া উচিত, তাই বরং লেখা দরকার।

সে যুগের নারী

শ্রীনন্দিতা দাশগুপ্তা

আমরা আধুনিকপন্থীরা অনেক সময়ে ভাবি যেন প্রাচীন রক্ষণশীলতা এবং সংস্কার সবটুকুই বর্জ্জনীয় বস্তু। কারণ আমাদের ধারণা, যার পিছনে বিজ্ঞান নেই, সে জিনিষ গ্রহণযোগ্য নয়। আগেকার কালের রমণীরা সাধারণ ভাবে কয়েকটি শিক্ষা পেতেন তা শিক্ষাগুলির মর্য্যাদা আজকালকার বধূ এবং কন্যাদের দিয়ে থাকে না—কিন্তু সেই সব শিক্ষার পিছনে ছিল তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং সাংসারিক বুদ্ধি। আমার আলোচনার উদ্দেশ্য এই নয় যে, সেকালের সব ভালো এবং একালের সবই মন্দ। তবে কয়েকটি জিনিষ আমাদের মাঝ থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে যার উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। কিছু দিন পূর্ব্বেও দিনের বেলা স্বামী সন্দর্শনে যাবার অনুমতি ছিল না। স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ অতি নিকট সন্দেহ নেই, কিন্তু নিরন্তর পরস্পরে কাছে থাকলে পাওয়ার আগ্রহ যায় কমে। দিনের বেলা পত্নীমুখ দর্শন বঞ্চিত থাকতে হতো বলেই যে সময়ে বধূকে নিকটে পাওয়া যেত তার মাধুর্য্য হতো বহু গুণে বেশী এবং তার নতুনত্বও শীঘ্রই ম্লান হয়ে যেত না। দ্বিতীয়তঃ, ঋতুকালে সে কালের নারীরা স্বামিস্পর্শ হতে বঞ্চিত থাকতেন, সেই সময়ে কোনও রকম পরিশ্রমসাধ্য কাজ তাঁরা করতে পেতেন না। এখন সে সব নিয়ম প্রচলিত নেই। ঋতুকালে স্বামিস্পর্শ একান্ত নিষিদ্ধ ছিল এই জন্যই—সেই অবস্থায় কোনও রকম শারীরিক উত্তেজনা উভয়ের পক্ষেই অমঙ্গলজনক। ঋতুকালে পরিশ্রমসাধ্য কাজ করাও স্ত্রী শরীরের পক্ষে হানিকর। আজকাল আমরা এই অবস্থাতেই স্কুলে, কলেজে, অফিসে যেতে বাধ্য হই। তার ফলে জরায়ু-জনিত বহু পীড়া আমাদের আমরণ সাথী হয়ে ওঠে। অতীতের বনিয়াদের উপর রচিত হবে বর্ত্তমানের ইমারত তবেই সে হবে যথার্থ কল্যাণকর। অতীতের মাঝ থেকে আমরা পাই বর্ত্তমান সংস্কৃতির মূল সূত্র, সুতরাং তাকে বর্জ্জন না করে তাকে নূতন যুগের উপযোগী করে বেড়ে তুলতে হবে।

ভবিষ্যৎ জাতি-গঠনে মেয়েদের কর্তব্য

অরুন্ধতী দেবী

বাঙ্গালা দেশে মধ্যবিত্ত সংসারে স্ত্রীশিক্ষা যে বেশ প্রসার লাভ করছে—এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। দেশে বর্তমান পরিস্থিতি মেয়েদের আর কিছুতেই নিশ্চিন্তে ঘরে থাকতে দিচ্ছে না—তাদের বাধ্য করছে বেরিয়ে পড়তে নানা দিকে নানা ভাবে উপার্জ্জনের চেষ্টায় অথবা দেশসেবার কাজে। স্ত্রীশিক্ষার সাথে সাথে এই জিনিষটাও সমান ভাবে বেড়ে চলেছে। স্ত্রীশিক্ষার প্রধান প্রয়োজন হ'লো ভবিষ্যৎ জাতি-গঠনের কাজে—কিন্তু বর্তমানে তার প্রভাব এই কাজটাকেই সব চেয়ে গৌণ করে তুলেছে বলে মনে হয়। আজ-কাল প্রায়ই দেখা যায় কেবলমাত্র পুরুষের উপার্জ্জনের ওপর একটি পরিবার সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে পারে না। সে ক্ষেত্রে বাধ্য হয়েই বাড়ীর মেয়েদের বাইরে যেতে হয় উপার্জ্জনের চেষ্টায়। অনেক সময় মায়েরা তাঁদের শিশুসন্তানগুলিকে একটি অশিক্ষিতা ঝিয়ের হাতে রেখে যান—এ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রায়ই শিশুরা বলিষ্ঠ হয় না—না মনের দিক্ দিয়ে, না শরীরের দিক্ দিয়ে। এ যাবৎ কাল শিশুদের শিক্ষার ভার ছিল অশিক্ষিতা মায়েদের হাতে—এখন তা গিয়ে পড়েছে অশিক্ষিতা এবং অপরিচ্ছন্ন ঝিয়েদের হাতে। এ রকম ক্ষেত্রে মায়েদের শিক্ষার কোন প্রভাব তো শিশুরা পায়ই না, এমন কি, মায়ের সাহচর্য্যের যে একটা সুফল আছে শিশু-চরিত্রে তা থেকে পর্য্যন্ত সে বঞ্চিত হয়; ফলে তার স্বভাব হয় দুর্ব্বল ও ভীরু। মায়ের শিক্ষা শিশুর পক্ষে প্রয়োজন, কিন্তু তার সাহচর্য্যের প্রয়োজন আরও বেশি। অশিক্ষিতা মায়ের হাতে মানুষ হওয়া ছেলে আর অশিক্ষিতা ঝিয়ের হাতে মানুষ হওয়া ছেলে দু'য়ের মধ্যে তফাৎ বিস্তর। এদিক্ দিয়ে বিচার করলে বর্তমান স্ত্রীশিক্ষার প্রভাব ভবিষ্যৎ জাতিকে সবল করছে না দুর্ব্বল করছে বলা শক্ত। এ সব ক্ষেত্রে শিক্ষিতা নার্সের হাতে শিশুদের রেখে যাওয়া অনেকটা নিরাপদ, কিন্তু যে সংসারে মেয়েরা উপার্জ্জন করতে বাইরে যান সে সংসারে শিক্ষিতা নার্স পোষণ করার মত ক্ষমতা না থাকারই কথা। কিন্তু এ ভাবেই যদি ক্রমাগত চলতে থাকে তবে ভবিষ্যৎ জাতি দুর্ব্বল হয়ে পড়বে সন্দেহ নেই। যে সমস্ত দেশে শিশুর মায়েরা বাইরে কাজে যান শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নানা রকম বন্দোবস্ত থাকে। শিক্ষিতা ধাত্রী-পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলিই এ বিষয়ে সবচেয়ে উপযোগী। তাঁদের হাতে মায়েরা নির্ভয়ে শিশুদের রেখে যেতে পারেন। এতে করে অনেকগুলি সুফল হয়। প্রথমত, অশিক্ষা বা অপরিচ্ছন্নতার ভয় থাকে না; দ্বিতীয়ত, শিশুরা পায় বহু সঙ্গী—তাদের মন হয় প্রফুল্ল এবং মায়ের সঙ্গের অভাব এতে অনেকটা ঘোচে। তার ওপর শিশুরা শেখে নিয়মানুবর্ত্তিতা ও শৃঙ্খলা—যেটা তাদের পক্ষে একান্ত ভাবে প্রয়োজন। যে টাকায় একটি ঝি পোষণ করতে হয় তার চেয়ে কম ব্যয়েই বোধ হয় এ সকল প্রতিষ্ঠানে শিশুদের রাখা চলে। শুধু তাই নয়, বার্দ্ধক্যের জন্য যাঁরা বাইরে গিয়ে অন্য কাজ করতে অক্ষম, তাঁরা এ সকল শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ অতি সহজে এবং আনন্দের সাথে করতে পারেন এবং কিছু কিছু উপার্জ্জন করতে পারেন।

এ-রকম বহু প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। একটি আরম্ভ করলেই বোঝা যেতে পারে এর প্রয়োজন কত এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলোই আবার অনেককে কাজ দিতে পারবে।

স্বপ্ন-শেষে

আশা দেবী

আমার মনের বালুবেলা প'রে
যারা বেঁধেছিল বাসা,
অকাল-বাদলে মাতাল বন্যা
ভেঙ্গেছে তাদের আশা।
সুরভিত ধূপ মিলনের বাতি
তাদের জাগর বাসরের রাতি
আজি দুর্দ্দিনে নিয়েছে মুছিয়ে
প্লাবন সর্ব্বনাশা॥

জ্যৈষ্ঠের খর অলস দুপুরে
চোখে ঘুম নাহি আসে,
মন-বনে চলা শ্রান্ত কাহার
ছায়া-ছবি চোখে ভাসে।
সজিনার ফুল ঝরে ঝরে যায়
নিমের শাখায় ঘুঘুরা ঘুমায়
শ্রান্ত পথিক একেলা শায়িত
ভাঙ্গা মন্দির-পাশে॥

যারা মুছে গেল বৈশাখী-বাজে
হারালো বাদল-সাঁঝে,
তাদেরি নিশান গুমরিয়া বাজে
মোর অন্তর-মাঝে।
আমার ব্যথার স্বর্ণ-ফলকে
তারা দেখা দেয় আঁখির পলকে
গ্লানি-দাব-দাহ-বিদীর্ণ হৃদে
তাদের বেদনা বাজে॥

হারানো দিনের মণি-কণাগুলি
খুঁজি আজ ফিরে ফিরে—
স্মৃতির চিতারা ধু-ধু করে জ্বলে
মণিকর্ণিকার তীরে।
অকাল বরষা হাঁকিছে সঘন
ফেনিল প্রবাহে ঘন গর্জ্জন
শ্মশানের হাড়ে জ্বলে কি মুক্তা
আমার অশ্রু-নীরে?



পুতুল খেলা

শিল্পী—মাখন দত্তগুপ্ত



আলপনা (১)

মন্দাক্রান্তা

রেণুকা ঘোষ



আলপনা (২)

দুগ্ধফেননিভ শয্যা'পরে তুমি স্বপ্ন-স্বর্গেতে নিশি কাটাও
হর্ম্ম্য মণিময়, সেবিকা সুন্দরী চিত্ত উন্মন সুখে উধাও
দর্পে টলমল চরণ চঞ্চল গর্ব্বে উন্নত তুলিয়া শির
তোমার ও পদভরে আর্ত্ত মৃত্তিকা আহত তৃণ
ফেলে অশ্রুনীর।

কীর্ণ ধূলিজালে শয্যা যাহাদের তবুও দেখে শুয়ে স্বপ্নসুখ
তাদেরো প্রিয়তমা পার্শ্বে রহে জাগি
দৈন্যে অনাহতা শুভ্রবুক,
আত্ম-মর্য্যাদা তা'দেরো আছে জেনো,
তফাৎ শুধু যে গো অর্থ নাই,
স্বর্ণ নানা ছাঁচে ঢালাই যত করো মূল্য কম বেশী
আছে কি ভাই ?

মানুষ জানি তুমি, মানুষ তাহারাও, তবুও ঘৃণা তব দীনের 'পর
আত্ম-প্রয়োজনে সুবিধা পাও যদি জ্বালায়ে দাও ধূ ধূ খড়ের ঘর
তুমি যে স্তরে আছো সমাজে মাথা উঁচু বাহন বাঁধা ঘরে বাষ্পযান
অভাবে অনটনে তারা যে পথ চলে দুঃখ ব্যথা ক্রম-বর্দ্ধমান।

দুঃখরাশি ক্রমে আকাশে তুলি মাথা স্বপ্ন সুখ রাশি করিছে গ্রাস
অভাগা ছেলেমেয়ে তাদেরি ঘরে আসে মূর্ত্ত যেন তা'রা সর্ব্বনাশ,
তবুও দিন যায় দুঃখে সুখে মেশা তবুও আসে রাতি অন্ধকার
হে ধনী বন্ধু গো, প্রাসাদে নিতি তব তাদের তরে চির রুদ্ধদ্বার।

অন্ধ-অবিচারে যাদের ঘৃণাভরে যতই দূরে রাখো সভ্যতায়
দম্ভভরে নিতি অন্ধ হ'য়ে আছো শক্তি আছে জেনো তাদেরো গা'য়
মানবস্রষ্টা তো ধান্য ধনরাশি বড় ও ছোট ব'লে করেনি ভাগ
একদ বাহুবলে তোমরা বলীয়ান বিশ্বলুঠে করো স্বার্থযাগ।

তোমারি অবিচারে নিত্য হাহাকারে চিত্তহারা যত দীনের দল
অন্ধ আঁখি খুলে কভু কি দেখিয়াছো রক্তে তাহাদের ওঠে গরল ?
সর্ব্বহারা যতো আর্ত্ত মনুজেরা ক্ষুব্ধ মনে চাপি অসন্তোষ
তোমারি ব্যবহারে ঈর্ষা ঘৃণাভরে পোষণ করে বুকে হিংসারোষ।

ঐক্য আসে ক্রমে রিক্ত জনতার, দুঃখ বেদনার ধ্বংস চায়
অযুত গণমন আজিকে দৃপ্তপণ দীপকে জীবনের রাগিণী গায় ;
হে ধনী বন্ধু গো, নিম্নে চেয়ে দেখ, যাদের ঠকাতেছ দীনের দল
তোমারি পদতলে পিষ্ট মানবেরা রক্তে তাহাদের ওঠে গরল।

মাঘের বুকে

নবেন্দু বসু



শীত ঋতু মানুষের হাতে সুবিচার পায়নি। বিদেশের কবি-সম্প্রদায় ওকে দেখেছেন এক বৃদ্ধরূপে, যে কাস্তে-হাতে জীবনের ফসল ধ্বংস করে বেড়ায়। দেশের কবিও বালকদের এক ফাল্গুনী দল গঠন করে শীতবুড়োকে তাড়িয়ে দেশছাড়া করবার ষড়্‌যন্ত্র করেছেন। দেশে-বিদেশে সর্ব্বত্র সে পক্ককেশ শাদা-দাড়ী বৃদ্ধ। সে জরার, জড়তার, স্থবিরতার, ধ্বংসের, মৃত্যুর প্রতীক।

কিন্তু এই কি ঠিক বিচার? শীতে হলদে পাতা ঝরে-পড়া যদি বৃদ্ধের দাঁত পড়াই হয়, তাহলে শীতের সকালে জলের দাঁত ওঠে কেন? শীতে যদি বৃদ্ধের জড়তা আসে, তাহলে শীতে কেন বালক বা যুবকের মতন জোরে জোরে চলি? এই ক্ষিপ্রগতি কি বার্দ্ধক্যের অপটুতার পরিচায়ক, না যৌবনের সামর্থ্যের? জরার না স্বাস্থ্যের? কেন বলি শীতকালে শরীর ভাল থাকে? একসঙ্গে কপি কড়াইশুঁটির ডালনা, ভেটকী মাছের, গলদা চিংড়ীর কালিয়া, ঘন দুধে আমসত্ত্ব আর মর্ত্তমান কলা দিয়ে বা বদলে নতুন গুড়ের পায়েস (যুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগে), রবিবারে প্রায় পড়ন্ত রৌদ্রে, বেলা সাড়ে তিনটার সময় খেয়ে কিঞ্চিৎ নিদ্রা দিয়ে, বাঙ্গালীর ছেলেও যে হজম করতে পারে, সেই যৌবন-সুলভ পরিপাক-শক্তি কি শীতকালের না গ্রীষ্মকালের? এই এক তর্কেই তো মোকর্দ্দমায় জয় হওয়া উচিত। শচীন মজুমদার শরীরতত্ত্ব আর দেশের পালোয়ান ও বলীদের বিষয়ে এত লিখলেন কিন্তু বাঙ্গালীর এ বীরত্বের কথা কোথাও লিখলেন না কেন? সোহং-স্বামী শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আধ সের কাঁচা ঘী একসঙ্গে চুমুক দিয়ে হজম করতে পারতেন; একটি সম্পূর্ণ কুক্কুটের কথা ছেড়ে দি। কিন্তু সে জীর্ণ করবার শক্তি কি ঠাণ্ডা স্থান ভওয়ালীর নয়?

শীতে তাহলে জরা থাক না থাক জোর আছে। শীতের দেশের লোক জোরালো হয়। তারা সোজা হয়ে চলে। নাক তাদের উঁচু হয়। নরতাত্ত্বিক বলেন যে, ও-দেশের হাওয়া ঠাণ্ডা বলে নাকের প্রণালীটা দীর্ঘ হবার আবশ্যক হয় যাতে পাঁজরা পর্য্যন্ত পৌছতে পৌছতে নিশ্বাসটা নাকের তাপে কতকটা গরম হয়ে যেতে পারে। নাক বড় তাই তাদের শীতের আদেশে। শীতের জোরেই তারা নাক উঁচিয়ে চলে। তেমনি আমরা যে থ্যাবড়া নাকে কুঁজো হয়ে চলি তাতে শীতের জড়তা প্রমাণ হয় না। আমরা অমন করে চলি ঋতু নির্ব্বিশেষে। বছরের কোন সময়টাতেই সোজা হয়ে চলি? শীতের জন্যই যদি কুঁজো হয়ে চলতুম তাহলে শীতকালে ওদের মতন ওভারকোট পরেও তো কৈ সোজা হয়ে চলতে পারি না? কাঁধের ওপর, ঘাড়ের কাছে, তবু যেন কেমন শীত-শীত করতে থাকে; কাণ, মাথা, কাঁধ জড়িয়ে একটা তুষ কি মলিদা চাপিয়ে, তার ভারে

আরো কুঁজো হয়ে চলে তবে ভরসা। সাহেব সেজেও খাড়া সাহেব হতে পারি না, কুঁজো মোসাহেব পর্য্যন্ত হয়েই থেমে যাই। হিন্দী ফিল্মের গান মনে পড়ে—"তুম্হে ঝুক ঝুক সলাম, সিপহিয়াজী, ঝুক ঝুক সলাম" (শাহানশাহ বাবর)। না, আমরা বুড়ো বলেই বুড়ো। শীতেই যে বুড়ো তা নয়। অযথা তার কলঙ্ক রটাই।

অনেকে বলবেন এ সবই হল উকীলী তর্ক; কথার মারপ্যাঁচ। অর্থাৎ এতে যুক্তি নেই, শুধু শ্লেষ, যমক, উৎপ্রেক্ষা, বক্রোক্তি ইত্যাদি সাহিত্যিক অলঙ্কারের আশ্রয়ে যুক্তির সাদৃশ্য বা ভ্রম উৎপাদন করে, বিচারকের মন দুর্ব্বল করে, কিম্বা রসিকতায় তাকে প্রসন্ন করে, স্বপক্ষে রায় নেবার কৌশল। স্বকর্ণে শুনেছি আদালতে কোন ব্যবহারাজীবের প্রদর্শিত অতি পুরাতন নজীরের কি force বা বাধ্যতা, বিচারপতি এই প্রশ্ন করাতে ব্যারিষ্টার বলেছিলেন—the force of antiquity, my lord। আদালতে উচ্চহাসি উঠেছিল। এ শ্রেণীর প্রত্যুৎপন্নমতি ওকালতীকে তো আইনসিদ্ধ বলে গ্রাহ্য করে জজিয়তী হারিয়েও মামলা জিতিয়ে দিতে পারি, কিন্তু এ ধরণের সব যুক্তিকে সকলে হয়ত শীতের বৃদ্ধত্ব-খ্যাতির খণ্ডন বলে গ্রহণ করতে তৎপর হবেন না। সকলে এ কথা স্বীকার করবেন না যে, শীতে হন্-হন্ করে চলি বলে, তখনকার মতন অসুস্থ না হয়েও অতিভোজন করতে পারি বলে, শীতের দেশের লোক বৃহৎ বলিষ্ঠ, ক্ষিপ্রগতি বলেই, শীত জরা, মৃত্যু, বার্দ্ধক্যের সঙ্গে তুলনীয় নয়; বিশেষতঃ শীতের দেশের লোকও যখন তাকে কাস্তে-হাতে বৃদ্ধ বলেই কল্পন করেছে।

অর্থাৎ মানুষের অভ্যাস আর ব্যবহার-রীতির সঙ্গে শীতের রূপকল্পের কোন যোগ থাকতে পারলেও বর্ত্তমানে সে রকম কোন সম্বন্ধ নেই। এ যদি হয় তাহলে শীতের বৃদ্ধত্ব-কল্পনার ভিত্তি কোন্ ভাবধর্ম্মে? সে ভাবধর্ম্ম কি, তাই তাহলে সন্ধান করতে হয়।

এখন এখানেও প্রথম কথা এই যে, ভাবভিত্তির দিক্ থেকেও কি সব সময়ে শীতের প্রসঙ্গে প্রবীণত্বেরই অলঙ্কার ব্যবহার করি? শীতে "ওরে বাবা রে" বলে বয়োজ্যেষ্ঠ কাউকে স্মরণ করি বটে, কিন্তু কেউ কেউ "কসে গাও গীত" বলেও তো ব্যবস্থা দিয়েছেন; আর গীত গাওয়া তো মূলতঃ যৌবনেরই ধর্ম্ম—শীতে ভীষ্মদেব। কাজেই শীত কেন বুড়ো; কেন সে কাস্তে-হাতে যম? আবার বুঝি আলঙ্কারিক তর্ক এসে পড়ে।

যাক, ধরে নিলুম যে ও-দেশে শীতে বরফ পড়ে সব শাদা হয়ে যায়। হেমন্তের season of mists and mellow fruitfulness শেষ হয়ে গিয়ে তখন আর ফসল ফলে না, তাই ওখানে শীত শাদা-দাড়ী কাস্তে-হাতে। কিন্তু আমাদের দেশে শীত কেন বুড়ো? এ-দেশে তো নানা বিচিত্র অবস্থায় তাকে তারুণ্যের সংযোগেই পাই। কিছু প্রমাণ দিই।

তারুণ্যের এক লক্ষণ বৈচিত্র্য আর বিচিত্র শীতের সকাল—আকাশ আর মাটীর মধ্যে কোয়াসা-ছাওয়া। তার মণ্ডলটিকে গোলাপী সোণালী আভায় স্নান করিয়ে সূর্য্যের আলো নেমে আসে। সে আলো সুকুমার, কোমল, কিশোর আলো। গ্রীষ্মের মতন প্রথম থেকে তীব্র, প্রখর, পূর্ণতেজ নয়। দেখি সবুজ ঘাস শিশির-ঝলমল; মাটী থেকে খানিকটা ওপর পর্য্যন্ত নীল ধোঁয়ায় ছাওয়া, পথের ওপর দিয়ে যেন সত্যই বয়ে চলেছে—কবি George Russell যেমন বলেছেন—"the blue dusk ran through the streets। ওপরে রৌদ্রের কাঁচা সোণা। নিশ্বাস টানলে বাতাস সুরভি। চলি তো সত্যি জোরেই চলি; মাটীতে ভারি পায়ে গোড়ালী চেপে চেপে পড়ে না; পাঁচ আঙুলের ওপর দিয়ে সমগ্র দেহটাই ঘুরে ঘুরে যায়। হয়ত গুন্ গুন্ করে গীতও গাই। এমন তরুণ সকাল আর কোন্ ঋতুতে হয়? একটি পাঁচ বৎসরের শিশুকে দেখেছিলুম, শীতের ভোরে রেলগাড়ীর বন্ধ কামরায় বসেছিল—বাইরে আলো হতেই শার্সীর ভেতর থেকে দেখতে দেখতে হঠাৎ বলে উঠলো—"সকাল, সকাল"। আর একটি ঐ রকম ছোট মেয়েকে জানি, শীতকালে ভোরে ঘুম ভাঙ্গতেই সে যাকে দেখে তাকেই অনুরোধ করে জানলা খুলে দেবার জন্যে। শীতের রৌদ্রের কাঁচা ভাব কাটতে তো বেলা বারোটা হয়ে যায়। সে আর তাহলে পাকে কখন?

শীতের মাঠে হরিৎ-পীতের কি বৈচিত্র্য! গম, ছোলা, মটর, সর্ষের, ভরা ক্ষেত বাতাসে দুলে সহরবাসীর মনকেও তৃপ্ত করে। একটি যুবক আর তাঁর সঙ্গিনী শীতের সকালেই শস্যভরা ক্ষেতের পাশ দিয়ে দ্বিচক্র চালনা করে পথে বেরিয়ে পড়েছিল—সে আছে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের এক গল্পে। তরুণ প্রেমিক-যুগলের সঙ্গে ছোলা-মটরের সবুজ ক্ষেত জীবন্ত হয়ে ওঠে বয়সের ধর্ম্মে তাদের সঙ্গে বাঁধা পড়ে। শীতের সকালে বর্ণে বিচিত্র খোলা আলো-বাতাসে প্রাকৃতিক পরিবেশেই যৌবন-ধর্ম্মের সন্ধান।

আর শিশুরও। শীতকালে পাকে কুল, আর কুল হল শিশু, বালক আর কিশোরের একমাত্র খাবার সামগ্রী। তাদের পরিণত বয়স্ক প্রবীণ-পাচক বাবা-মা কাশি হবে বলে তাদের কুল খেতে বারণ করে। তারা নিজেরা কুল খায় না—কুলের মাথা হয়ত অনেক সময়ে খায়। ছোট ছেলের কাছে তো ফল বলতে কুল আর কুল বলতে ফল। না, বার্দ্ধক্যের চেয়ে যৌবন আর বাল্যের সঙ্গেই শীতের মাল্যবন্ধন। শীতই ছোট ছেলের কমলালেবু খাবার, সার্কাস দেখবার দিন।

শীতের রাতেই বা কত অতর্কিত সৌন্দর্য্য! কবি সুন্দরীর বর্ণনা করেন she walks in beauty like the night of cloudless climes and starry night। কি উজ্জ্বল তারা-ভরা রাতই শীতকালে হয়। গাছে পাতা থাকে না। বলে শীতকাল বুড়ো বলে নিন্দনীয়? কি মায়া-মূর্চ্ছনা রচনা করে শীতের রাতে চাঁদের আলোয় যখন নেড়া ডালের কাঠিগুলো রেখাজাল-বোনা ছায়া ফেলে পথের ওপর। শীতের রাতে নিজের কম বয়সের কথা জানি—গরম পোষাকে শরীর ঢেকে বন্ধ ঘরে ভদ্রসমাজে ভাল লাগেনি। গাছতলায় যাদের গরীব বলি তারা কাঠের কুচো খড়কুটো জ্বেলে, অন্ধকারের দিকে পিঠ করে, আগুনের দিকে মুখ করে, হাত দুটো তার ওপর ধরে, আর তার শিখার দোলার সঙ্গে সঙ্গে তাপটা বাঁচাবার জন্যে মুখটা একবার এদিক্ একবার ওদিক্ হেলিয়ে হেলিয়ে যেখানে গল্প করতো, সেইখানে চক্রাকারে তাদের দলভুক্ত হতুম তাদের দলে ঘুঙুর বাজানো গ্রাম্য ডাক হরকরার গল্প শুনেছি—শীতের অল্প চাঁদনী রাতে বনের পথে সরু নদী হেঁটে পার হবার কালে তার বিপদ আর এডভেঞ্চারের কথা। বেলগোছিয়ার পোষ্ট আপিসে এখনও ঘুঙুর বাজিয়ে রাণার চিঠির থলি আনে। তার শব্দ এখনও দুপুর বেলায় শুনলেও সেই সেদিনের শীতের রাতটাই ঝম-ঝম করে ওঠে।

শীতের সন্ধ্যা তো অপূর্ব্ব। গোধূলি জানতে পারা যায় শীতের সন্ধ্যাতেই। কারণ, হিমেল হাওয়ায় ওড়া ধূলো তখন উড়ে চলে যায় না; কতকটা উঁচুতে উঠে ছেয়ে থাকে। পাখীর দল তখন নীড় নিয়েছে, শুধু আকাশের কোথাও কোথাও হয়ত এক ঝাঁক চাতক এলোমেলো উড়ছে কিম্বা অস্তশেষের আলো-ছাওয়া কোন তেঁতুল গাছের গোল মাথায় কাকের দল দখলী স্বত্বের শেষ কলহে অল্প স্বল্প ঝটাপটি আর কলরব করছে। এ ছাড়া আশ্চর্য্য নিস্তব্ধতা; দূরের গাছগুলো নিষ্প্রভ আলোয় ক্রমশঃ ধোঁয়ার ছোপের মতন হয়ে আসছে; আরো দূরে, দিগন্তে, ওপর আকাশ ছাই-রঙের হয়ে আছে; মাটীর কিনারা ধূসর কালো; আর দুইয়ের মাঝে অস্তমিত সূর্য্যের আভার একটা মরা লাল পাড় টানা চলে গেছে। সেখান থেকেই যেন ঘরমুখো কোন চাষার গরুতাড়ান শব্দ মাঝে মাঝে ভেসে আসে—তীব্র স্পষ্ট—যেন কাণের কাছ থেকেই আসছে। নিস্তব্ধতা একবার উচ্চকিত হয়ে ওঠে, আবার ঝিঁঝিঁপোকার একটানা ডাক ঝিমিয়ে পড়ে। আখমাড়াইয়ের যন্ত্রের ঈষৎ আর্ত্ত স্বর ভেসে আসে আর তার সঙ্গে গুড় জ্বাল দেওয়ার মৃদু মধুগন্ধে ভারি হাওয়া এসে শীত-সন্ধ্যার আবেশকে ঘন করে তোলে।

আলো থাকতে থাকতেই এগিয়ে চলি। হিম-হাওয়া মুখে লাগে। পাশে সরু দেশী আখের ক্ষেত। আলপথ দিয়ে চলি। পাশে পাশে সরু সরু প্রণালী দিয়ে খল-খল শব্দে সেচের জল চলেছে। স্বচ্ছ জল; নীচেকার মাটী পরিষ্কার দেখা যায়। স্রোত যেখানে একটু ওলট-পালট হচ্ছে সেখানে জলের ওপরের স্তরটা পুঁটি মাছের ওল্টানোর মতন শাদা ঝলক দিয়ে উঠছে; মনে ভাবছি জলটা বুঝি সাদা বরফের মতন কন্‌কনে ঠাণ্ডা হবে। আলুর ক্ষেত মূলোর ক্ষেত সিঞ্চিত হচ্ছে। একগাছা আখ উপড়ে সেই জলে ধুয়ে দাঁতে ছাড়িয়ে খেতে, ঘরে আপিস থেকে ফিরে কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে ফুলকাটা রেকাবীতে টিকলীকাটা আখের চেয়ে বেশী মধুর লাগে। শীতকালের কথাই সব বলছি; ঋতুর নানা বিচিত্র আয়োজন; প্রচুর আর অভিনব; সবেতেই তো নবীনতার আনন্দ আর উৎসাহ।

এত বৈচিত্র্য, এত নতুনত্ব, তবু আমাদের বরফ না-পড়া দেশেও শীত কেন বুড়ো? কারণ অনুমান করতে পারি মাত্র। বৎসর তো ঋতুর চক্র; তার আরম্ভই কোথায়, শেষই বা কোথায়। তবু বসন্তের আগমনকে ধরেছি ঋতু-পর্য্যায়ের আরম্ভ বলে। তারও কারণ হয়ত আছে। বসন্তের পর যখন গ্রীষ্ম আসে, তখন সে ততটা আসে না; বসন্তই যতটা তার বর্ণসম্ভার নিয়ে তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়। বসন্ত অপসরণ করবার পরও নিবোনো গন্ধদীপের স্মৃতিশিখার সিঁদুর শিমুলের মাথায় লেগে থাকে। বিপ্লবী ছেদে পরিবর্ত্তন হয় না। দৃশ্যমঞ্চ থেকে বসন্ত প্রস্থান করে না; গ্রীষ্ম মঞ্চে প্রবেশ করে না। বসন্তের প্রয়াণ হয় আর তারই পথে গ্রীষ্মের ঘটে আবির্ভাব। হাওয়া যখন আগুন হয়ে আসছে, ঝালরের মতন নিম ফুলের গন্ধের দোলা তখনও স্বচ্ছন্দ সলীল। চৈতালীতে ফাল্গুনী লীলাই মদির হল। রুদ্র গ্রীষ্মের অগ্নিবৃষ্টিতে ভস্ম হয়ে সে অগ্নি-পরীক্ষায় শুদ্ধ হয়ে বাসন্তী মদগর্ব্ব সেই আগুনেই শেষে নিজেকে বিলুপ্ত করে; গ্রীষ্মের আগমন অলক্ষ্যে ঘটে যায়। তার আসায় এত বিজ্ঞাপন নেই যে তাকে প্রধান বলে, বৎসরের প্রথম বলে অধিষ্ঠিত করতে পারি। গ্রীষ্মের পর বর্ষার পরিবর্তন স্পষ্ট বটে; লক্ষ্যপথেও পড়ে; কিন্তু আষাঢ়ের প্রথম শাদা-কালোর লুকোচুরি খেলার অন্তে ঘন নীল অঞ্জনের মায়া কেটে গেলে পর শ্রাবণের একঘেয়ে ধূসরতায় চোখ ফিরে ফিরে আসে; নিজেকে ঘিরে-ঘিরে আর পারি না; প্রকৃতির নিমন্ত্রণ হারিয়ে মন হারাই; ক্রমশঃ ভরা বাদরে শূন্য মন্দিরে বিজন বোধ করি; ঋতুরঙ্গে বর্ষা আমাকে কষ্ট দিলে; তাই তাকে প্রথম স্থান দিতে অভিমান বোধ করি। শরৎ আসে শেফালী, রজনীগন্ধা, কাশের, খণ্ড লঘু শাদা মেঘের, কোমল নীল আকাশের সুকুমার লাবণ্যে; অনাড়ম্বরে; সলজ্জ প্রসন্নতায়। সে প্রবল ব্যক্তিত্বে প্রথম স্থান অধিকার করবার দাবী জানায় না; প্রভুত্ব করে না; সখ্য দিয়ে সন্তুষ্ট হয়। তার পর এক দিন শরৎবধূ হেমন্ত-কুহেলীর আধ-স্বচ্ছ আচ্ছাদন-বস্ত্রের আড়ালে কখন্‌ শীতের বুকে ঢলে পড়ে, বিধবা মায়ের বুকে বিধবা মেয়ের মতন। শরৎ নিজেকে জানতেই দিলে না। তাই তারও প্রথম স্থান পাবার কোন আশা রইল না। শরৎ থেকে শীতের পরিণতি ক্রমগতিতেই ঘটে। গ্রীষ্ম যেমন বিরাট প্রতিষ্ঠার বিশ্বাসে অলক্ষ্যে আসর নিয়েছিল, অন্য প্রধান ঋতু শীতও তেমনি ব্যাপক বিস্তৃতিতে নিজের মহিমা-গর্বে ছেয়ে যায়। সে-ও বৃহৎ বলে জোর-গলায় প্রথম আসন দাবী করে না। শীতের পর বসন্ত কিন্তু আসে নিজস্ব তীব্র বর্ণবিলাসের, পলাশ বনের ফুলদোলে, আলোর ঔজ্জ্বল্যে দৃষ্টিকে চমকিত করে, গন্ধসম্ভারে মনকে বিভ্রান্ত করে, সহসা জাগা কূজনে কাণকে উচ্চকিত করে। এই ভাবে চেতনার ওপর অভিনবত্বের প্রথম প্রলেপ দিয়ে, সব ঋতুর চেয়ে প্রবল ভাবে, চঞ্চল করে আসে বলে সে অনায়াসে বৎসরের আসরে ঋতুরাজ উপাধি নিয়ে সম্মানের প্রথম স্থান অধিকার করে। তাকে সূত্র ধরে তাই কাল গুণে আর তাল গুণে শেষ পর্য্যায়ে পৌঁছাই শীতে, আর কাল ক্রমে যা সব শেষে, সেই তো পরিণত, পরিপক্ব, সেই বয়স্ক, বৃদ্ধ। পৌষে পাকা ফসল সঞ্চিত হয়েছে; সোণার ধান কাটা হয়ে গেছে; বসন্তে উদ্‌গত সবুজ পাতা হলদে হয়ে বোঁটা থেকে এখন অপস্রিয়মান; লোকে বলতে লাগে বৃদ্ধ, শীত বৃদ্ধ; মরণের সাথী ও।

কিন্তু এটা যেন মনে রাখি যে, ওর নাম মরণরাজ দিলেও ওই শীতই বসন্তের যুবরাজকে এনে নিজের সিংহাসনে বসাবে, আর যে বৃদ্ধ তরুণকে প্রসন্নতায় আসন ছেড়ে দিতে পারে আর দেয়, সে জড়, পাথর, মরা বৃদ্ধ নয়। কেন না, সে অভ্যাসকে জয় করেছে, লোভ তার নেই; মনের তার নমনীয়তা আছে; অবস্থান্তরে সহজ হতে সে পারবে; তাতে তাই তরুণেরই প্রাণ-প্রচুর সজীবতা। শীত তাই বৃদ্ধ হলেও সে ধরণের বৃদ্ধ নয়—যার কথা বহু কবি বলেছেন—

যহ দুনিয়া অজব সরায়ে ফানী দেখি,
হর তরহ কি আনি-জানি দেখি,
যো যাকর ন আয়ে বহ জওয়ানী দেখি,
যো আকর ন যায় বহ বুঢ়াপা দেখা।

—এ দুনিয়াকে এক আজব সরাইখানা দেখি; নানা ধরণের আসা আর যাওয়া দেখি; গিয়ে যা আসে না সে যৌবন দেখি; এসে যে যায় না সে জরাও দেখেছি।

শীত এ ধরণের মরণের বার্দ্ধক্য নয়। কালের ক্রমে সুস্থ, সবল, পরিণতির যে প্রাচীনত্ব ততটুকুকেই শীতের বার্দ্ধক্য বলি। শীতের সায়াহ্নে গায়ের কাপড় এক প্রস্থ বেশী করে জড়িয়ে জীবন-বোধকে ম্লান-গৈরিক না করে তুলে এই কথাই বলি যে, শীত বলেই শীতের দিবা অবসিত নয় তার অস্তরাগ হিম-তমসার রন্ধ্রহীন নৈরাশ্যের অভেদ্যতায় মাথা খুঁড়ে মরে না। If winter comes, can spring be far behind—এ কথা কবি হয়ত মনে কষ্ট নিয়ে বলেছেন। শীতে বসন্তে তিনি ব্যবধান দেখেছেন। মানুষে তাঁকে আঘাত দিয়েছিল; সমাজে আর ব্যক্তিত্বে তিনি ব্যবধান বোধ করেছিলেন; তাই প্রকৃতির শোভাযাত্রাতেও ঋতুতে ঋতুতে সেই ব্যবধানেরই ভীতিপ্রদ ভাঙন তিনি দেখেছিলেন। অথচ কবি ছিলেন বয়সে তরুণ। আশা দিয়ে কেউ হয়ত তাঁকে নিরাশ করেছিল। বয়সের ধর্ম্ম তাই তিনি ভুলেছিলেন। বয়সে পরিণত যে কবি শীত আর বসন্তে ব্যবধান না দেখে দুইকে অব্যাহত ক্রমে দেখেছিলেন এ মুহূর্ত্তে তিনিই যেন সত্যদ্রষ্টা। তাঁর দৃষ্টির প্রসারে চোখ মিলিয়ে দেখতে পাই—মাঘের বুকে সংকোচকে কে আজি এল। রাজা নিয়ে আসেন হাস্য-মুখর উত্তরাধিকারীকে নিজে হাতে ধরে। তরুণ কবি গাইলেন জরার গান, প্রবীণ কবি নবীন জীবনের। মাঘ ফাগুনের এও এক কৌতুক। এতে প্রমাণ হয় যে ফাগুন মাঘেরই যৌতুক।

কবিতা-লক্ষ্মী

শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

আমার কবিতালক্ষ্মী বহু দিন নির্বাসনে ছিলো
জনতার অপবাদে। তারা বলেছিলো
সে তাদের মনোমত নয়।
তার সাথে বিসর্জ্জিনু আনন্দের অজ্ঞাত সঞ্চয়।

এক দিন শীত-শেষে গাছে গাছে চমকিলো প্রাণ—
দক্ষিণের সমীরণে নিরুদ্দিষ্ট গান
তরুণ বনের রন্ধ্রে বাজাইলো বাঁশি;
সে সুর পথের ভুলে এসেছিলো মোর কক্ষে ভাসি
যেথা আমি জনতার রাজা
বণ্টন করিতেছিনু তুলাদণ্ডে পুরস্কার সাজা—
গুঞ্জরিল কানে কানে, "মহারাজ তারে ফিরে আনো,
জনতার অহংকারে অকরুণ রাজদণ্ড হানো।"

সে আসিল ফিরে,
আসন্ন ঝঞ্ঝার মত, জনতার বাণী ধীরে ধীরে
অস্ফুট গুঞ্জন হতে কলরোলে কহিল, "রাজন্,
পরীক্ষা মোদের দাবী। দৃঢ় করো মন;
আজো কি মহিষী তব বুঝিয়াছে আমাদের কথা?
নিরন্নের ভগ্ন বুকে বিদ্রোহের চির চঞ্চলতা?"

পরীক্ষার আয়োজন চলে…
পীড়িতা সঙ্গীত-লক্ষ্মী অভিমানে গেল অস্তাচলে।

জীবন বিজ্ঞানের আলোয় মানুষ, সমাজ, রাজনীতি

শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়

বৈজ্ঞানিক যুগ—অতএব সমাজনীতি রাজনীতি, অর্থনীতি সব কিছুতেই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার কথা শোনা যায়। অতীত কাল থেকে আজ পর্যন্ত বড় বড় দার্শনিক যাঁরা জন্মেছেন তাঁদের বাণী এবং কর্মপন্থা পর পর বিচার করলে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ক্রমোন্নতির একটা ধারণা করা যেতে পারে।

দর্শনের ধারা

'দর্শন' বলতে কি বুঝি? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তার আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ে উপলব্ধি করা, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ, মানুষের সঙ্গে সমাজের যোগাযোগ, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক, এইগুলো নিয়েই দর্শনের কাজ। আগেকার দিনে দার্শনিকেরা, আদর্শবাদী সেজে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে নানা রকম দার্শনিক যুক্তির আবিষ্কার করতেন। এঁদের আমরা বলি অধ্যাত্মবাদী বা আদর্শবাদী দার্শনিক। কিন্তু আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার নতুন ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কারুশিল্পের যুগে অপরীক্ষিত এবং অবাস্তব দার্শনিক বাণীগুলো তো আর চলে না। কাজে কাজেই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা এবং কর্মপন্থার দরকার হয়ে পড়লো। বস্তু-জগতের আইন-কানুন না জানা থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্য চলবে কি করে,—সিন্দুকে সোনার গাদা হবে কি করে? আজকে সমাজে শিল্পোৎপাদনের পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাহায্য নিয়ে নিত্য নতুন ভাবে বদলে যাচ্ছে; আগেকার দিনের মত স্থাণু ভাবে বসে নেই। ভাল, মন্দ, সুন্দর, অসুন্দর, সুনীতি দুর্নীতি, এ সবগুলোর বাঁধা-ধরা সংজ্ঞা থাকা সম্ভব ছিল সামন্তযুগীয় সমাজে, কারণ বিজ্ঞানের প্রয়োগ তখন ছিল না। দাসশ্রেণী বাঁধা-ধরা নিয়মে সমাজের উৎপাদন-যন্ত্র হিসাবে খেটে যেত। ব্রাহ্মণরা অধ্যাত্ম দর্শন অনুযায়ী সমাজনীতি রচনা করতেন। আজ বাণিজ্য আর শিল্পের কল্যাণে বণিক্ আর শিল্প-পতিদের বাস্তব প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক বেশী বিজ্ঞানের দরকার হয়ে পড়েছে। তাই আজ আমাদের মত পিছিয়ে থাকা দেশেও বিরলা-ল্যাবোরেটরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা

মানুষ তার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্যিক জগতের এক একটি বিষয়কে যে ভাবে অনুভব করে, সেগুলোকে বিজ্ঞানে বলা হয় এক একটি তথ্য (fact)। সাধারণ মানুষ মাত্রেরই পাঁচটি ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়-গুলোর অনুভূতি একই রকম। কান দিয়ে সবাই শোনে, কেউ দেখে না, চোখ দিয়ে সবাই দেখে, কেউ শোনে না। সুতরাং ঘটনাগুলো সম্পর্কে এক জনের সঙ্গে আর এক জনের অমত হবার কোন কারণ নেই। পৃথিবীতে মানুষ-জাতির আবির্ভাবের পর থেকে তারা এই বাহ্যিক ঘটনাগুলো যেমন যেমন উপলব্ধি করেছে, তেমন তেমন মনের মধ্যে জমা করে রেখেছে। প্রথমে এই জমা করার মধ্যে কোন শৃঙ্খলা ছিল না। ক্রমশঃ তারা বিভিন্ন ঘটনা-গুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে শিখল। এই ভাবে মানুষ পশুর উপরে টেক্কা দিল অর্থাৎ তার মস্তিষ্কে যুক্তির জন্ম হোল। বাইরের যে ঘটনাগুলোর মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই বলে আগে তার মনে হোত সেইগুলোর মধ্যেই সে যোগাযোগ আবিষ্কার করলো। রান্না ঘরের মেঝেতে ওপর থেকে সোমবার একটা আপেল পড়ল। সেটার পড়ার বেগ সেকেণ্ডে ৩২ ফিট, হাত থেকে একটা বই রবিবার রাত্রে মাটিতে পড়লো। সেটারও বেগ সেকেণ্ডে ৩২ ফিট। মানুষ অমনি বললে, কঠিন পদার্থ সেকেণ্ডে ৩২ ফিট বেগে মাটিতে পড়ে। পদার্থটি কি পদার্থ, সময়টি কোন্ সময়, জায়গাটি কোন্ জায়গা, এ সব প্রশ্নই উঠলো না। মাধ্যাকর্ষণের আইন মানুষ আবিষ্কার করলে। এই ভাবে বিভিন্ন ঘটনা লক্ষ্য করে সেই ঘটনাগুলোকে মানুষ একটি সাধারণ সূত্রে দিয়ে বেঁধে দিতে লাগল। সেইগুলোই বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা। তাহলে ঘটনাগুলোই নিশ্চয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রাথমিক উপকরণ। সেই উপকরণগুলো থেকে মানুষ যে সাধারণ সূত্র তৈরী করে, সেই সূত্র ধরে মানুষ অতীতকে বিশ্লেষণ করে এবং বিশ্লেষণের শিক্ষা থেকে যে জ্ঞান লাভ করে, সেটিকে ভবিষ্যতে প্রয়োগ করে। এই সূত্রগুলোই প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করার অস্ত্র। কিন্তু প্রকৃতি বহুরূপী; তার রূপ অনবরত বদলাচ্ছে। একটি অস্ত্র বা যন্ত্র যা আজ কাজে লাগছে, কিছু দিন বাদে সেটায় হয়তো মর্চে ধরে যাবে বা সেটা সময়ের পক্ষে অকেজো হয়ে যাবে। তখন সেটাকে ফেলে দিয়ে নতুন যন্ত্র বা অস্ত্র আমরা আবিষ্কার করি এবং ব্যবহার করি। ঠিক সেই রকম পরিবর্তনশীল জগতে ভালো, মন্দ, নীতি, দুর্নীতি, এবং অন্যান্য সব বিষয়েই আজ যে বৈজ্ঞানিক সূত্র বা সংজ্ঞা আমরা ব্যবহার করছি, কাল সেটা অচল হয়ে যাবে। তখন সেটাকে ফেলে দিয়ে নতুন কালোপযোগী সূত্র বা সংজ্ঞা আবিষ্কার করে নিতে হবে। খাঁটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তো নিত্য নতুন তথ্য আবিষ্কারের সঙ্গে পুরানো সূত্র এবং সংজ্ঞা বদলে যাচ্ছে। ডাল্টনের নতুন নীতির ভিত্তিতে পদার্থবিদ্যার নতুন ইমারত মাথা তুলছে। তাই বলছি, বাস্তব জগতকে উপলব্ধি করে কোন একটি বিশেষ সময়ের বাস্তব পরিস্থিতিকে বুদ্ধি এবং যুক্তি দিয়ে বিচার করে, পুরানো মর্চে-ধরা রীতি, নীতি, রুচি ইত্যাদি যন্ত্রপাতিগুলোকে বদলে নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারাটাই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মূলসূত্র।

বিবর্তনবাদের অগ্রগতি

আরিষ্টটলের সময়ে বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতির প্রথম আরম্ভ। বিজ্ঞানের পূজারীরা সেই সময়ে পৃথিবীতে এত রকম বিচিত্র প্রাণী এবং উদ্ভিদের অস্তিত্ব দেখে খেই হারিয়ে ফেলতেন। তার পর এলেন লিনিয়াস। তাঁরই প্রাণী ও উদ্ভিদ্ জগতের শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি আজও আমরা ব্যবহার করি। প্রত্যেক শ্রেণীকে বোঝাবার জন্যে তিনি দু'টি করে নাম দিলেন। মানুষের নাম দিলেন হোমো স্যাপিয়েন্স। বানর ধরণের মানুষের অধুনালুপ্ত পূর্বপুরুষরা হোল হোমো, স্যাপিয়েন্স মানে বুদ্ধিমান বা যুক্তি-বিশিষ্ট। তাই আমরা হলাম যুক্তি-বিশিষ্ট মানুষ বা হোমো স্যাপিয়েন্স্।

লিনিয়াসের যুগে প্রাণতত্ত্ব সম্পর্কে মানুষের বেশী কিছু জানবার সুযোগ ছিল না। তাই তিনি 'প্রাণীরা ঈশ্বরের সৃষ্টি', এই কথাটাই বিশ্বাস করতেন। এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন বাফন, কুভিয়ের এবং বিশেষ করে ল্যামার্ক। ল্যামার্ক ছিলেন চরমপন্থী। তিনি

বললেন,—আলো, তাপ, আর বিদ্যুতের দ্বারা প্রকৃতি জড়বস্তু থেকে নিত্য নতুন প্রাণীর সৃষ্টি করেন এবং তার পর সেই প্রাণীগুলো থেকে প্রকৃতির দরকার মত ক্রমশঃ আকৃতি-প্রকৃতি বদলে নতুন জীব হয়। তাঁর নীতির শেষের অংশটিই প্রাণতত্ত্বে তাঁর অমূল্য দান। ল্যামার্কের মতে যে সব প্রাণীর ডানা, শিং, ল্যাজ বা খুর ছিল না, দরকার পড়ায় প্রকৃতি তাদের দেহে সেগুলো জুড়ে দিয়েছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততিরা উত্তরাধিকারসূত্রে সেগুলো পেয়েছে। যেমন স্থলে জায়গা এবং খাবারের অভাব হওয়ায় এক শ্রেণীর সরীসৃপ গাছে ওঠার চেষ্টা এবং তার থেকে সামনের পা দু'টো নেড়ে আকাশে ওড়বার চেষ্টা করতে করতে তাদের ডানা গজিয়েছিল। তার পর তাদের উত্তরাধিকারীরা পাখী হয়ে গেল। ওদিকে যে জীবের যে অঙ্গটার আর দরকার হোল না (মানুষের ক্ষেত্রে যেমন ল্যাজ) সেটা অব্যবহারের ফলে আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে গেল। উত্তরাধিকারসূত্রে ঐ জাতীয় পরিবর্তনগুলো বাপ-মার থেকে বাচ্চারা পায় কি না সে সম্পর্কে আধুনিক বৈজ্ঞানিক-দের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। লিনিয়াস এবং ল্যামার্কের বৈজ্ঞানিক অবদান অসামান্য। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরাও অপরীক্ষিত আদর্শবাদের মায়া কাটাতে পারেননি। লিনিয়াসের প্রাণীরা "ঈশ্বরের জীব।" ল্যামার্কও প্রাণীদের মধ্যে অদৃশ্য প্রগতি-ধর্মে যে কারিকুরি (Tendencies of progression) কল্পনা করেছিলেন, তাও তাঁর ভাব-জগতের সৃষ্টি, পরীক্ষিত সত্য নয়, বরং আজ প্রমাণিত ভুল। একমাত্র ডারউইনকেই আমরা দেখি যে তিনি প্রকৃতির বিবর্তনের যে সব রহস্য আবিষ্কার করতে পারেননি, সেই ফাঁকগুলোয় আদর্শবাদের বা অধ্যাত্মবাদের তালি লাগাবার চেষ্টা না করে, পরিষ্কার ভাবে সেই অনাবিষ্কৃত সত্যগুলোর কথা স্বীকার করে গিয়েছেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক সততায় বিশেষ কোন ফাঁক চোখে পড়ে না। ভূতত্ত্ব এবং জীবাণুতত্ত্ব (অতীত যুগের লুপ্ত প্রাণীর ভূগর্ভ-প্রোথিত কঙ্কাল সম্পর্কে তত্ত্ব) খুঁটিয়ে পড়ে এবং পরীক্ষা করে তিনি মোটামুটি অতীত যুগের প্রাণি-জগতের সঙ্গে আধুনিক যুগের প্রাণি-জগতের একটি সুশৃঙ্খল বংশপরম্পরা দেখতে পেয়েছিলেন। তার পর ভ্রূণবিদ্যার কল্যাণে তিনি দেখেছিলেন যে বাইরে পাখীর ডানা, তিমির সামনের পাখনা, আর ঘোড়ার সামনের পা'র আকৃতির যতই তফাৎ থাক, ভিতরে সেগুলো প্রায় একই রকম হাড় দিয়ে তৈরী। কাঠামো এক, বাইরেটা আলাদা। তার পর ডারউইন জাহাজে করে সাত সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে বিভিন্ন জীব-জন্তুর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করেন। সেই তথ্যগুলোও তাঁকে বিবর্তনবাদকে পাকা বৈজ্ঞানিক রূপ দিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। দক্ষিণ-আমেরিকার পাশেই গ্যালপ্যাগস্ দ্বীপ। সামান্য কিছু দিন আগে দক্ষিণ-আমেরিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্বীপে পরিণত হয়েছে। ডারউইন গিয়ে দেখালেন যে মহাদেশের ভূখণ্ডের জীবজন্তুগুলোর সঙ্গে দ্বীপটির জীবজন্তুগুলোর মিল রয়েছে খুবই তবে দু'-একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের একটু যেন তফাৎ হয়েছে। তার পর তিনি গেলেন আফ্রিকার কাছে মাডাগাস্কার দ্বীপে। মাডাগাস্কার বহু দিন আগে আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। ডারউইন দেখলেন আফ্রিকার অত কাছে থাকা সত্ত্বেও আফ্রিকার জীবজন্তুর সঙ্গে মাডাগাস্কারের জীবজন্তুর অনেক তফাৎ। সুতরাং ডারউইন বুঝলেন, গ্যালপ্যাগস্ দ্বীপ অল্প দিন আগে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বলে নতুন আবহাওয়ায় দ্বীপের প্রাণীরা সবে বদলাতে সুরু করেছে। তাই দ্বীপের আর মহাদেশের জীবজন্তুগুলোর মধ্যে তখনো মিল রয়েছে বেশী। কিন্তু মাডাগাস্কার অনেক দিন আগে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় নতুন আবহাওয়ায় অনেক দিন থেকে জীবজন্তু-গুলো বদলেছে অনেক বেশী। আগেকার জীব থেকে ক্রমশঃ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নতুন জীবের উৎপত্তি সম্পর্কে ডারউইনের আর কোন সন্দেহ থাকল না। প্রমাণিত তথ্যের সাহায্যে তিনি তাঁর বিবর্তনবাদের প্রতিষ্ঠা করলেন। একেই বলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

ডারউইনের ভুল

ডারউইনের সময়ে বিজ্ঞান তো আর আজকের মত এতটা এগোয়নি। তাই তিনি যখন কল্পনার সাহায্যে বললেন যে, প্রকৃতি উপযুক্ত প্রাণীদের বেছে নেয়, অনুপযুক্তদের অনাদর করে এবং তারই ফলে বেঁচে থাকবার জন্য অর্থাৎ উপযুক্ত হয়ে ওঠার জন্য প্রাণীদের মধ্যে একটা দারুণ প্রতিযোগিতা চলে। প্রকৃতিকে সুখী করবার জন্য এবং সেই প্রতিযোগিতায় যারা জেতে তারা বেঁচে থাকে, অন্যেরা মরে যায়। তখন তাঁর এই কথাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলা চলেনি। কারণ প্রতিযোগিতা কেমন করে চলে, জীবজন্তু কি উপায়ে নিজের আকৃতি প্রকৃতি বদলে নতুন জীব—জাতির সৃষ্টি করে তা তিনি বলতে পারেননি। তখন অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল না বলে ক্রোমোজোম বা জীন বলে যে দু'টি জিনিষ জীবের চরিত্র নির্দ্ধারণ করে, সেগুলো সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতে পারেননি, আজ ক্রোমোজোম এবং জীন সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গিয়েছে এবং দেখা গিয়েছে, ডারউইনের কথামত দরকার হলেই ইচ্ছামত জীবেরা আকৃতি-প্রকৃতি বদলাতে পারে না। পুরুষ-বীজ এবং স্ত্রী-বীজে ক্রোমোজোম বলে যে সাধারণ চোখের দৃষ্টির অতীত সুতোর মত পদার্থ থাকে, তার মধ্যে জীন বলে এক রকম রাসায়নিক অণু থাকে অনেকগুলো। জীবের প্রত্যেকটি চরিত্রগত এবং আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সেই জীনগুলোই তৈরী করে। জীনগুলো সর্ব্বদাই বদলায় এই বদলানোকে বলা হয় মিউটেশান্। এই বদলানো কোন বাঁধা নিয়মে চলে না। বদলানো যে সব সময় ভালর দিকে তা নয়। বাহ্যিক পরিবেশ অনুযায়ী তারা বদলায় না। বদলানোর ফলে জীবটির যে পরিবর্তন হয় তা তার পক্ষে যে ভাল হবে এমন কোন কথা নেই। ক্ষতিকরও হতে পারে। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীন পরিবর্তনের ফল ক্ষতিকরই হয়। যে পরিবর্তনগুলো ভালর দিকে যায় ভ্রূণের মধ্যে সেইগুলো পাকাপকি ভাবে থেকে গিয়ে নতুন পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুন জীবের সৃষ্টি করে। যে জীবে অধিকাংশ জীন খারাপ দিকে গেল সে জীবের ভ্রূণে সেই খারাপ পরিবর্তনগুলো পাত্তা পায় না। ফলে জীবশিশুর তার বাপ-মায়ের মতই থেকে যায় এবং নতুন জাতির সৃষ্টি হয় না। পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরানো জাতিটি লোপ পেয়ে যায়। সুতরাং ভ্রূণের নির্বাচন অনেকটা চালুনীর মত কাজ করে—বাজে জীবগুলোকে ভ্রূণে বেঁচে থাকতে দেয় না। পরিবর্ত্তিত ভাল জীবগুলো বেঁচে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত যদি প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সেগুলো নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে তাহলে নতুন জীব-জাতিটির সৃষ্টি সার্থক হয়।

"জাতি" কথাটির অপপ্রয়োগ

বৈজ্ঞানিক ভাবে "জাতি" (Race) কথাটির কোন সংজ্ঞা নেই, কারণ কথাটি বিজ্ঞানের আবিষ্কার নয়। মানব জাতি, শ্বেতাঙ্গ জাতি, নিগ্রো জাতি, জার্ম্মাণ জাতি, ব্রাহ্মণ জাতি, সবেতেই আমরা জাতি ব্যবহার করি। জাতি কথাটির এই ব্যাপক ব্যবহারের পেছনেও অবশ্য কারণ আছে সে কথা পরে আলোচনা করব। প্রাণিতত্ত্বে জাতি কথাটির ইংরাজী হোল স্পিসিজ্। প্রাণিতাত্ত্বিক জাতির মধ্যেও আবার বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ আছে। যেমন মানুষের মধ্যে ভারতীয়, মঙ্গোলিয়, নিগ্রো, ইত্যাদি নানা উপজাতি আছে। উপজাতির মধ্যেও আবার নানা ভাগ আছে। এই ভাবে শেষ পর্য্যন্ত আমরা দেখি, এমন কোন দু'জন মানুষ নেই যাদের চেহারা এবং গুণ অবিকল এক। লিনিয়াসের মতে জাতি বা স্পিসিজ বলতে এমন কতকগুলো প্রাণীর (বা গাছ) সমষ্টি বোঝাত যাদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, এবং যাদের স্ত্রী-পুরুষের যৌন-মিলনে গর্ভাধান হবে এবং অন্য জাতির জীবের সঙ্গে যৌন-মিলন হয় সম্ভব হবে না, না হয় মিলন সম্ভব হলেও গর্ভাধান হবে না কিম্বা গর্ভাধান হলে যে সন্তান হবে তার জননশক্তি থাকবে না। জাতির এই সংজ্ঞা অবশ্য ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এই জাতির স্ত্রী-পুরুষের মিলনে পুরুষ-বীজ এবং স্ত্রী-বীজ দু'য়েতেই যদি জননশক্তি নষ্ট করার জীব থাকে, তাহলে সন্তানের জননশক্তি হয় না। সোভিয়েট ইউনিয়নে এক উদ্ভিদ্‌বিৎ বাঁধাকপি আর মূলার বীজ মিশিয়ে এক নতুন স্বাভাবিক গাছ তৈরী করেছেন যার জননশক্তি নষ্ট হয়নি।

'রেস' কথার বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ

মর্গ্যান সাহেব প্রজনন-তত্ত্বের এক জন বিশিষ্ট গবেষক, তিনি ওয়ানি পোকা (Drosophila) নিয়ে অন্তর্জননের ফলে কয়েকটি নতুন ধরণের ওয়ানি পোকার সৃষ্টি করেন—যেগুলোর বীজের জীনগুলো পরিবর্ত্তনধর্মী বা মিউট্যান্ট। সেগুলোর ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক হিসাবে তিনি প্রথম 'রেস্' কথাটি ব্যবহার করেন অর্থাৎ তারা হোল পরিবর্ত্তনশীল জাতি। কৃত্রিম উপায়ে পরিবর্ত্তিত চরিত্র-বিশিষ্ট জাতিটিকে তিনি 'রেস্' বলেন। এক একটি জীনের উপর নির্ভর করে এক একটি চরিত্রগত বা আকৃতিগত বিশেষত্বের পরিবর্ত্তন। বিশেষত্বের পরিবর্ত্তনের ওপর নির্ভর করে প্রাণি-জগতের বিবর্ত্তন। জীন হোল বিশেষত্বের একক, বিশেষত্ব হোল বিবর্ত্তনের একক। চরিত্রগত একটি নতুন বিশেষত্ব যে জাতির মধ্যে সৃষ্টি হোল সেই জাতিটিকে বৈজ্ঞানিক অমুক রেস্ বলতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক তুলাদণ্ড

তাহলে এখন বলা চলে, দু'টি প্রাণি জাতির মধ্যে বা একই জাতির দু'টি প্রাণীর মধ্যে তুলনা করতে হলে জীনের সাহায্য ছাড়া বৈজ্ঞানিক তুলনা হতে পারে না। সাধারণ বাহ্যিক আকৃতি বা প্রকৃতি দিয়ে বৈজ্ঞানিক তুলনা হয় না। মানুষের ক্ষেত্রেও প্রজননের আইন কানুন একই রকম। জীন দিয়েই মানুষের সঙ্গে মানুষের তুলনা করতে হবে। জাতি বা রেস্ কথাটিও একই ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। একটি মাত্র বিশেষত্ব দিয়ে এক একটি 'রেস্' হবে যেমন নীল চোখবিশিষ্ট রেস্, কালো চুল-বিশিষ্ট রেস ইত্যাদি। নীল চোখবিশিষ্ট আর কটা চোখবিশিষ্ট দু'টি রেসের দোষ বা গুণ তুলনা একমাত্র নীল চোখ বা কালো চোখের পৃথিবীতে জীবন-সংগ্রামে উপযোগিতার ভিত্তিতেই হবে। এ ছাড়া কোন অন্য ভিত্তিতে ভালো-মন্দ বিচার করা চলবে না। করলে তা বিজ্ঞানসম্মত হবে না।

রেস থিয়োরী খাটে না

একই পূর্বপুরুষের বংশ থেকে জন্মে পরের বংশের লোকেরা নানা রকমের হয়। দু'টি পাঁশুটে রঙের ইঁদুরের যৌন-মিলনে পাঁশুটে এবং কালো দু'রকম সন্তান হয় অর্থাৎ দু'টি রেস্' হয়। নীল চোখ-বিশিষ্ট লোকের ভাই-বোনেদের চোখ কটাও হতে পারে। এক রেসের বাপ-মার ছেলে-মেয়েরা অন্য রেসে পড়তে পারে। সুতরাং পারিবারিক বা বংশগত সম্পর্ক থাকলেই সবাই একই রেসের হয় না।

একটির চেয়ে বেশী বিশেষত্বের ভিত্তিতেও অবশ্য শ্রেণীবিভাগ করা হয়। সে ক্ষেত্রে রেস না বলে বলা হয় ষ্টক্, যেমন নিগ্রো, মঙ্গোলিয়, শ্বেতাঙ্গ, পীতাঙ্গ, এগুলো ষ্টক, কারণ চুলের রং, চোখের রং, গায়ের রং, নাক, মুখ ইত্যাদি নানা বিশেষত্বের ভিত্তিতে এখানে শ্রেণী-বিভাগ করা হচ্ছে। মঙ্গোলিয় বলতে হলদে রং, থ্যাবড়া নাক, ছোট চোখ, বেঁটে চেহারা এগুলো অমনিই মনে ভাসে।

একটি কাচের পাত্রে কয়েকটি বাষ্পের সংমিশ্রণ রাখলে কিছুক্ষণের মধ্যে পাত্রের সীমার মধ্যে বিভিন্ন বাষ্পের অণুগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিশে সমান ভাবে ছড়িয়ে যায়। ঠিক তেমনি একটি ভূভাগের বিভিন্ন ধরণের অধিবাসীদের মধ্যে যৌন-মিলন ঘটতে ঘটতে তাদের বিশেষত্বগুলো সেই ভূভাগের অধিবাসীদের মধ্যে একই রকম ভাবে ফুটে ওঠে—ফলে অধিবাসীদের সাদৃশ্য বেড়ে যায়। সেই ভূভাগের চারি পাশে অন্য ভূভাগে অনবরত যাতায়াতের আদান-প্রদানের, আলাপ পরিচয়ের পথ যদি না থাকে (ধরা যাক বড় পাহাড় বা সমুদ্র দিয়ে ঘেরা) তাহলে সেই ভূভাগের অধিবাসীদের সাধারণ বৈশিষ্টগুলো সেই ভূভাগের বাইরে আর ছড়াতে পারে না, সেখানেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। হিমালয় থাকার দরুণ মঙ্গোলিয়ান আর ভারতীয়ের মধ্যে এত পার্থক্য কিন্তু মঙ্গোলিয়ানদের মধ্যে পরস্পরের সাদৃশ্য অত্যন্ত বেশী। ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলোর মধ্যে হিমালয়ের মত দুর্লংঘ্য বাধা না থাকায় ইউরোপীয়দের মধ্যে এত চেহারার মিল। শ্বেতাঙ্গদের বিশেষত্বগুলো যে সব জীনের উপর নির্ভর করে সেগুলোর জন্যই তারা শ্বেতাঙ্গ। কৃষ্ণকায় ভারতীয়রা জীনের জন্যই কৃষ্ণকায়। শ্বেতাঙ্গরা উঁচু না কৃষ্ণাঙ্গরা উঁচু তার বিচার একমাত্র হতে পারে তাদের বিশেষত্বগুলোর জীবন-সংগ্রাম ক্ষেত্রে উপযোগিতা কতটা তাই দিয়ে রং দিয়েও নয়, চেহারা দিয়েও নয়। সামাজিক প্রথাগত, সংস্কারগত এবং অর্থনৈতিক শ্রেণীগত নানা রকম বাধার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, এবং শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্জনন হয় না এবং তার জন্যও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আকৃতি এবং প্রকৃতির পার্থক্য থেকে যায়।

জার্মান হলেই আর্য হয় না, বাঙালী হলেই মঙ্গোলিয় হয় না

বিভিন্ন রেসের জীনের সংমিশ্রণ এবং পরিবর্ত্তনের ফলে পুরানো রেস লুপ্ত হয়ে যায়, নতুন রেস সৃষ্টি হয়। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ, মেলামেশা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে, ফলে অন্তর্জননের মাত্রা বেড়ে চলেছে। সুতরাং জার্মানিতে যে জন্মালো তার চেহারা মঙ্গোলিয় হতে পারে, বাংলায় যে জন্মাল তার চোখ নীল হতে পারে। তাহলে তো দেখা যাচ্ছে সমাজের দিক্ থেকে প্রাণতত্ত্বসম্মত শ্রেণীবিভাগে কোন লাভ নেই। তাহলে উপায় কি?

জাতি কথার মার্কসবাদী সংজ্ঞা

মার্কসবাদে জাতি বা নেশন্ বা ন্যাশান্যালিটির সংজ্ঞা হচ্ছে—একই ভূখণ্ডে বাস করে, একই ভাবে ব্যবহারিক জীবন যাপন করে, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা, জীবন-যাত্রার ধারা, এবং চিন্তাধারা যাদের এক বা সাধারণ, এই রকম এক-একটি মানুষের দল নিয়ে এক-একটি জাতি বা নেশান্। ধরা যাক মার্কিণ নিগ্রোদের কথা। আফ্রিকা থেকে আমদানী করা বিভিন্ন নিগ্রো গোষ্ঠীর (হাবসি, জুলু, নাইগার) অন্তর্জননে আজকের মার্কিণ নিগ্রো-সম্প্রদায় গড়ে উঠছে। তার পর ক্রমে ক্রমে তাদের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মার্কিণ শ্বেতাঙ্গদের বৈধ বা অবৈধ মিলনও চলে। ফলে নিগ্রোর বৈশিষ্ট্যও তারা ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছে। আমেরিকার ১ কোটি ২০ লক্ষ নিগ্রোর মধ্যে ১ কোটিই এই ভাবে তাদের রেসগত বিশেষত্ব হারাতে বসেছে। সুতরাং তাদের বৈজ্ঞানিক শ্রেণী-বিভাগ করা যাবে কি করে? তার চেয়ে তাদের সামাজিক শ্রেণী-বিভাগ করা অনেক সোজা। মার্কসবাদের সংজ্ঞার সব সর্ত্তগুলোই তাদের পক্ষে খাটে। সুতরাং তাদের নিগ্রো-ন্যাশান্যালিটি বলা অনেক সুবিধা এবং ভুল হয় না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে বাধাহীন ভাবে অন্তর্জনন ঘটেছে বলে তাদের চেহারায় এত মিল। সুতরাং ভূভাগ, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির বিশেষত্বগুলোর আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় কি।

স্বভাব বলতে কি বোঝায়?

মানুষের অনেক কিছু অন্যায় কাজকে মানুষের মজ্জাগত স্বভাবের দোহাই দিয়ে চালানো হয়। যেমন ঈর্ষা? ও তো মানুষ মাত্রেরই থাকবে। লোভ? ও মানুষের মজ্জাগত। কিন্তু সত্যিই কি তাই? মনস্তত্ত্ব বলে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষ বিভিন্ন ভাবে সাড়া দেয়, কাজ করে এবং স্বভাব বলতে তা ছাড়া আর কিছু বোঝায় না। মাংস দেখলে কুকুরের জিভে জল আসবেই। প্রত্যেক বার মাংস দেখানোর সময় যদি একটা ঘণ্টা বাজান হয়, পরে দেখা যাবে যে মাংস না দেখিয়ে শুধু ঘণ্টা বাজালেও কুকুরের জিভে জল আসবে।

স্বভাব নয়—সামাজিক অনুশাসন

এক একটি সমাজে এক এক রকম বিশিষ্ট প্রথা বা ধারা প্রচলিত আছে। সেই সমাজের নিজস্ব পরিস্থিতিতে সেখানকার লোকেরা সেই বিশিষ্ট প্রথা অনুযায়ী চলে। সে সমাজে সেটাই মানুষের স্বভাব। মুসলমান মেয়েদের বোরখা পরা, শুয়ারের মাংস না খাওয়া, হিন্দু বিধবার নিরামিষ খাওয়া, এগুলো সমাজের প্রথা অনুযায়ী। মনে হয় যেন এগুলো বদলানো যায় না। মজ্জাগত স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এগুলো তো তাদের প্রাণের ধর্ম (Biologic law) নয়। এগুলো সামাজিক নীতি, তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সোভিয়েট বিপ্লবের পর অনেক মেয়েকে বোরখা খোলার জন্য তাদের বাবা হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। বোরখা খোলার চেয়ে বেশ্যাবৃত্তি করাও তাদের কাছে কম দোষণীয় ছিল। কিন্তু আজ সম্পূর্ণ অন্য রকম সামাজিক পরিস্থিতিতে সোভিয়েট ইউনিয়নে বোরখা পরার প্রথার অস্তিত্বই নেই। বোখরা না পরাটাই আজ স্বভাব।

পরিস্থিতি অনুযায়ী আচরণ স্বভাব নয়

অনেক বড় বড় দার্শনিকেরা বলেছেন এবং বলেন যে, 'লোভ জিনিষটা মানুষ মাত্রেরই থাকতে বাধ্য এবং এই 'লোভের' জন্যই পৃথিবীতে সাম্যবাদের জয়লাভ সম্ভব নয়। নানা জায়গায় যেখানে অত্যন্ত জলাভাব এবং আলাদা পয়সা দিয়ে জল কিনতে হয়, সেখানে দেখা গেছে গরীব লোকেরা বর্ষার জল জমা করে বিক্রী করার চেষ্টা করে কিম্বা কোথাও একটু জল থাকলে সেটা নেওয়ার জন্য নিজেরা মারামারি পর্য্যন্ত করে। এক দার্শনিক উপরের উদাহরণটি দিয়ে বলেছেন যে পয়সা জমাবার এই যে ইচ্ছা, অধিকার করবার এবং হিংস্র হবার এই যে স্বভাব এটা হোল মানুষের মজ্জাগত। কিন্তু বড় বড় নগরে বাড়ীভাড়া বা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের সঙ্গে যেখানে জলের দামটা ধরে নিয়ে কলের জল দেওয়া হয়, যেখানে জলের জন্য আলাদা পয়সা দিতে হয় না, সেখানে জল মজুত করবার চেষ্টা বা স্বভাব দেখা যায় কি? যায় না। সেখানে যে কোন অচেনা বাড়ীতেও চাইলে জল পাওয়া যায়। আসল কথাটা হচ্ছে, জল-সরবরাহ সম্পর্কে 'নিশ্চিত' থাকলেই জল জমাবার চেষ্টা আর থাকে না। মানুষের আচরণ সম্পূর্ণ নির্ভর করছে বাহ্যিক পরিস্থিতির উপর।

প্রাণশক্তির স্বভাব

মাংস দেখে কুকুরের জিভে জল পড়ার কথা আগেই বলেছি। এটি হচ্ছে দেহের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ প্রাণধর্মের সঙ্গে ব্যাপারটির যোগ আছে। জল পড়াটা স্নায়ুঘটিত ব্যাপার। সুতরাং এ ক্ষেত্রে জল পড়ার বা ক্ষিদে পাওয়ার স্বভাবটা সমাজের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে প্রাণশক্তির প্রয়োজনের উপর। এই ক্ষিদেটাকেও যে কৃত্রিম উপায়ে পাওয়ানো যায় তার প্রমাণ ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে জিভে জল পড়া। যৌন-কামনাটাও ঠিক এই রকমই প্রাণশক্তির আর একটি ধর্ম বা স্বভাব। বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ধরণের বিয়ের ধারা বা প্রথা থাকতে পারে, . যেগুলো পুরোপুরি সামাজিক—হয়তো বাহ্যিক পরিবেশের সঙ্গে সেগুলোর কিছু সম্পর্ক থাকতে পারে। যৌন-কামনা বা বংশবৃদ্ধির প্রেরণা, সেটাই একমাত্র 'মৌলিক স্বভাব' যে প্রাণি-মাত্রেরই আছে। স্বভাবটা সকলেরই এক, তার বাহ্যিক প্রকাশ নানা পরিস্থিতিতে নানা রকম হয়।

স্বভাব মানে প্রাণশক্তির বৃত্তি

ইংরেজীতে যাকে বলে ইন্‌স্টিংক্ট, বাংলায় তাকে বলা যায় বৃত্তি বা জন্মগত প্রকৃতি। এই কথাটি নিয়েও নানা অপব্যবহার

হয়ে থাকে। সাধারণ কুকুর মাত্রেই বেড়াল দেখলে তাড়া করে এবং কামড়ায়, অতএব বেড়ালকে আক্রমণ করা কুকুরের 'জন্মগত প্রকৃতি' বললেন অনেকে। কিন্তু দেখা গেছে, কোন কুকুর-ছানাকে জন্মানোর পরই যদি তার মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ একলা রেখে বড় করে তোলা যায়, সে বেড়াল দেখলে নির্বিকার ভাবে বসে থাকে। আসলে বেরাল দেখলে তাড়া করতে শেখে কুকুরছানা, তাদের মাকে বা অন্য কুকুরকে সেই কাজ করতে দেখে।

মানুষ স্বভাব-বর্বর নয়

মানুষের ক্ষেত্রেও 'স্বভাব', 'ধর্ম', 'জন্মগত প্রকৃতি' ইত্যাদি কথাগুলোর ঠিক এমনি ভাবে অপব্যবহার হয়। সুতরাং কোন লোকের স্বভাব সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে, সেটা বলা ঠিক কি না সেটা বিচার করতে হবে তাকে সমস্ত রকম সামাজিক প্রথা, ধারা, আইন-কানুন ইত্যাদি থেকে সরিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করে। কোন দার্শনিক যদি বলেন, "মানুষ মাত্রেই মানুষের শত্রু, তাই সভ্য সমাজ ভাঙ্গনের মুখে এগিয়ে চলেছে…হিংসাবৃত্তি মানুষের অন্তর্নিহিত এবং সেটাই মানব সংস্কৃতির পথে অসংখ্য বাধা… মানুষ মাত্রেই সংস্কৃতির শত্রু…মানুষের কবল থেকে সংস্কৃতিকে বাঁচাতে হবে,…জোর করে সংস্কৃতি গড়তে হবে" তাহলে দার্শনিকটিকে আমরা কি বলবো ?

সবাই-এর ক্ষমতা সমান নয়—অক্ষমও বেশী নয়

মানুষের প্রকৃতি বা স্বভাবকে মনস্তত্ত্বের ভাষায় আচরণ বলা যায়। লেখাপড়া করার সমান সুবিধা দিয়ে সব দিক্ থেকে একই পরিস্থিতিতে রেখেও দেখা যায়, সব ছেলেই সমান লেখাপড়া শেখে না। তাদের মধ্যে ২।১ জন মাত্র প্রতিভাবান্ হয়। তাহলে বলা যায় যে, কোন একটি বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে সবাই সমান আচরণ করতে পারে না, কারণ আচরণ করার ক্ষমতা সকলের সমান নয়। এই ক্ষমতাও জীনের ওপর নির্ভর করে। সমান ভাবে খেয়ে-পরে থেকেও কেউ লম্বা হয়, কেউ বেঁটে হয়, কারণ উচ্চতাও জীনের ওপর নির্ভর করে। তবে এখানে একটা কথা আছে। শিক্ষার সমান সুযোগ পেয়ে, সবাই প্রতিভাবান্ হয়ে ওঠে না বটে, কিন্তু প্রায় সকলেই মোটামুটি শিক্ষিত হতে পারে, বি-এ, এম-এ পাশ করতে পারে অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মত হতে পারে। হাজার সুবিধা পেয়েও পাশ করতে পারে না, এমন ছেলেও সংখ্যায় খুব কম। তেমনি অত্যধিক লম্বা বা বামনের সংখ্যাও খুব কম। মাঝারি চেহারার লোকই বেশী। তবে মাঝারির মধ্যে আবার বেঁটে, লম্বা লোক আছে। তার কারণ তাদের জীনের যোগাযোগের সঙ্গে তাদের সামাজিক লালনের বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতির কখনো খাপ খায়, কখনো খায় না। সবাই যদি উপযুক্ত পরিবেশে লালিত হবার সুযোগ পায় তাহলে উচ্চতার তারতম্য অনেক কমে যাবে। অবশ্য একেবারে যাবে না, কারণ জীনগত পার্থক্য থেকে যাবেই। সামাজিক পরিবেশের দোষে যে তারতম্য হোত সেটাই চলে যাবে। কিন্তু লম্বা হওয়ার জীনগত ক্ষমতাকে অতিক্রম করতে মানুষ পারবে না। একই কারণে সবাই ৬ ফুট বা সাড়ে ৬ ফুট লম্বা হতে পারবে না। সুতরাং কার বা কোন জাতির কোন একটা বিষয়ে কতটা ক্ষমতা অন্তর্নিহিত আছে, সেটা জানতে হলে আগে সামাজিক পরিবেশগুলকে ইচ্ছামত আয়ত্তে আনতে হবে, যাতে তার বা তাদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশে সামাজিক রীতি, নীতি কোন বাধার সৃষ্টি করতে না পারে।

প্রতিভার স্রষ্টা জীনের যোগাযোগ

শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবানের সংখ্যা অত্যন্ত কম, লক্ষ জনের মধ্যেও এক জন পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ, আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য রমন, এঁদের মত ক্ষণজন্মা পুরুষ কয় জন জন্মান? তার কারণ প্রতিভা সমাজের ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে বিভিন্ন জীবনের এমন ধরনের যোগাযোগের ওপর যা কদাচিৎ ঘটে। সেই ধরণের যোগাযোগ যাঁর মধ্যে ঘটে কোন রকম সামাজিক বাধা-বিপত্তিই তাঁকে রুখতে পারে না। চেষ্টা করলে এবং সুযোগ পেলে অনেকেই লরেল বা হার্ডি হতে পারে, কিন্তু চার্লি চ্যাপলিন হতে পারে না।

সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির মিথ্যাপ্রচার

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো 'রেস' কথাটির বদর্থ করে তাদের নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করে। ১৭ এবং ১৮ শতাব্দীতেই রেস কথাটির জন্ম—সেই সময়েই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের গোড়া পত্তন সুরু হয়। অভিযানী দেশগুলো আক্রান্ত দেশগুলোর লোকদের প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পার্থক্যকে বলতে লাগলো অক্ষমতা ও অসভ্যতা—নিজেদের বলতে লাগলো উচ্চশ্রেণীর সুসভ্য জীব যেন তারা সভ্যতা এবং জ্ঞানের আলো ছড়াবার মহান্ ব্রত নিয়েই এসেছে। তাদের ভাড়াটে লেখকরা সাম্রাজ্যবাদের যত রকম জঘন্য অপকর্মগুলোকে নানা কায়দায় রেস্ থিয়োরীর বিজ্ঞানসম্মত দোহাই দিয়ে গল্পে, পদ্যে, রচনায়, গল্পে সমর্থন করতে লাগল। তাদের মূল কথা হোল সাদা চামড়া হলেই উঁচু এবং সভ্য, কালো চামড়া হলেই নীচু এবং বর্বর। তাঁদের ভাড়াটে মানুষজন্ম তত্ত্ববিৎরা বা ইউজেনিষ্টরা যা প্রচার করতে লাগলেন তার সঙ্গে বিলাতী বড় বড় বণিক শিল্পপতি, দক্ষিণ-আফ্রিকার ন্যাটসীয় ধুরন্ধরবৃন্দ, রোটারী ক্লাবের সভ্য ইত্যাদির বক্তব্যের সঙ্গে কোন তফাৎ নেই। বৈজ্ঞানিকের মত ঢঙে তাঁরা বলতে লাগলেন, কালা আদমিদের সব বদলানো যায় প্রজনন-তত্ত্বের সাহায্যে যায়, মাথার খুলির গড়ন পর্যন্ত কিন্তু চামড়ার রং কিছুতেই বদলানো যায় না এবং চামড়ার রং দিয়েই জাতি-বিভাগ করতে হবে। সাদা চামড়াওয়ালাদের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া শ্রেষ্ঠতার জন্যই ব্রিটিশ, ওলন্দাজ, ফরাসী, পোর্তুগীজ ইত্যাদি সাদা চামড়া-ওয়ালাদের প্রতি শ্রীভগবানের আদেশ—কালো চামড়াওয়ালা অসভ্য বর্বরদের সভ্যতার আলোক দান করতে হবে। তাই তাঁদের মিশনারীরা এবং দাস-ব্যবসায়ীরা এশিয়া, আফ্রিকা ইত্যাদি দূর দেশের গভীর অরণ্যে নানা রোগ হিংস্র জীবজন্তুর ভয় উপেক্ষা করে লোকদের সভ্য করতে এসেছিলেন। হিটলারের আত্মজীবনীর 'রেস এণ্ড নেশন' নামে প্রবন্ধে আছে :—"যে জাতিদের (রেস) পদানত করা হবে তাদের উচ্ছেদ না করে চাষী যেমন ভাবে বলদকে কাজে লাগায় তেমনি ভাবে কাজে লাগাতে হবে।" পেশাদারী বৈজ্ঞানিক আর একটু প্যাঁচ দিয়ে বললেন :—"যারা নীচু জাতি, নিজেদের শাসন করার ক্ষমতা তাদের নেই, তাই সাম্রাজ্যশালীরা তাদের শাসন করবে। বিজ্ঞানের প্রমাণিত সত্যকে চাঁপা দিয়ে হিটলার

আত্মজীবনীতে লিখছেন :—"ছু'টি অসমান শ্রেণীর মিলনে যে সন্তান হবে সে তাদের নিম্নতরের চেয়ে উঁচু এবং উচ্চতরের চেয়ে নীচু অর্থাৎ বাপ-মায়ের মাঝামাঝি গোছের হবে। তাতে নবজাত শিশু যে উচ্চতর বাপ বা মায়ের চেয়েও উঁচু হোল না, সেটাই তো প্রকৃতির ইচ্ছার বিরোধী, কারণ প্রকৃতি—যারা আছে তাদের চেয়ে উঁচু জীব তৈরী করতে চায়, সুতরাং অন্তর্জাত সন্তান (যেমন শ্লাভ্‌জাতি—লেখক) তার বাপের বা মায়ের জাতের সঙ্গে লড়াই করলে হারতে বাধ্য। অতএব বলিষ্ঠতর:কই প্রভুত্ব করতে হবে; সে দুর্ব্বলতরদের সঙ্গে মিশবে না বা মিলবে না।" এই গেল হিটলারী ইউজেনিদের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী। তার পর তাঁরা অবতারণা করেন স্বরাষ্ট্রনীতির। আগেই তাঁরা বলেছেন যে, তাঁদের জাতি কালো জাতির চেয়ে উঁচু, সুতরাং শাসন করবে। এবার তাঁরা বলেন—তাদের সেই মহিমাময় গৌরবান্বিত ঐতিহাসিক খাঁটি রক্তের স্রোত বওয়া জাতির মধ্যেও অধিকাংশ লোক অর্থাৎ তাঁর অধিকাংশ দেশবাসীর বংশ এত নীচু এবং খেলো যে তাদের সন্তান হওয়া মানে স্বদেশের জঞ্জাল বাড়া—অতএব তাদের জননশক্তি নষ্ট করে দেওয়া উচিত!

মেনে যদি নিই যে আমরা নীচু জাত এবং নীচু জাত হলেই তাদের জননশক্তি লোপ করে দেওয়া উচিত, তাহলে এই জাতের বড় বড় শিল্পপতি, মহাজন, রাজা, মহারাজা, সামন্ত নৃপতি এঁদের জননশক্তি নষ্ট করার কথা কেউ বলে না কেন? যত দোষ তাহলে তাঁর নিজের দেশের এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের গরীব লোকদের? ধনী হলেই যদি গুণী হয় তাহলে একমাত্র তাঁরাই জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করে দেশকে কৃতী সন্তান থেকে বঞ্চিত করেন কেন? কোটিপতি এবং রাজা রাণীদের তাহলে বিজ্ঞান বা প্রকৃতি, কাছে ঘেঁষতে পাবেন না নিশ্চয়ই? তাহলে আমি বলি যে, লেনিন ঠিকই বলেছিলেন :—"পুঁজীবাদী শাসনের কবলে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী যত দিন থাকবে তত দিন তাদের নিজের দেশ বলতে কিছুই থাকতে পারে না।" অষ্ট্রেলিয়ার গরুর কাছে মাতৃভূমির গৌরব যেমন অর্থহীন, ব্রিটেনের শ্রমিকের কাছেও 'মাতৃভূমি' কথার কোন তাৎপর্য নেই যত দিন ব্রিটেন সাম্রাজ্যবাদী থাকবে। 'রেস থিওরী'র কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই বলে এক এক দেশে রাজনৈতিক নেতারা এক এক রকম ভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্ম রেস থিয়োরী প্রয়োগ করে থাকেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দেহে এক ফোঁটা নিগ্রো-রক্ত থাকলে তাকে নিগ্রো বলা হয়। দক্ষিণ-আমেরিকায় অর্থাৎ স্পেনীয় ফ্যাসিবাদের উপনিবেশে এক ফোঁটা শ্বেতাঙ্গ-রক্ত (স্পেনীয়) থাকলে তাকে শ্বেতাঙ্গ বলা হয় এবং সে সব রকম বিশেষ সুবিধা ভোগ করার অধিকারী হয় (অবশ্য পয়সা থাকলে) দক্ষিণ-আফ্রিকায়, শতকরা ৮০ জন কালা আদমি। স্মাটস্ সাহেব তাদের দু'ভাগে ভাগ করেছেন, 'দেশীয়' এবং 'ফিরিঙ্গি'। প্রথমটির বংশ কুলীন, দ্বিতীয়টি ভঙ্গ অর্থাৎ সাদা চামড়ার সঙ্গে তাদের অন্তর্জনন হয়েছে আমাদের ফিরিঙ্গিদের মত অনেকটা। ফিরিঙ্গিরা কিছু সুবিধা পায়, ভোটও দিতে পারে, স্কুলে পড়তে পারে। দেশীয় অর্থাৎ নেটিভরা ভোট দিতে বা স্কুলে পড়তে পারে না, সূর্য্যাস্তের পরে রাস্তায় বেরুবার হুকুম নেই, এবং যেদিকে ইচ্ছা যেতেও পারে না—সোজা কথায় তারা দাস। এই দু'টি সম্প্রদায়ের মেলা-মেশা করা নিষিদ্ধ, এবং তারা আলাদা পাড়ায় থাকে ঘেটোর মত। তাদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি লেগেই আছে। মাঝে মাঝে শ্বেতাঙ্গদের পাশবিকতার ফলে যখন কোন দেশীয় মেয়ের সন্তান হয় তার মার কোন অধিকারই নেই শ্বেতাঙ্গ পশুটির বিরুদ্ধে মামলা করার। বেচারী লুকিয়ে চুরিয়ে তার ছেলেকে ফিরিঙ্গি সমাজে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করে যাতে তার চেয়ে তার ছেলে ভাল ভাবে বাঁচতে পারে।

এই ভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতি অনুযায়ী "বৈজ্ঞানিক" রেস থিয়োরী বিভিন্ন জায়গায় পরিস্থিতি অনুযায়ী বহুরূপী হয়ে আছে।

নার্ডিকরা ধনী হয়েছে কেন?

মধ্যযুগে ইতালীর বাণিজ্যিক উন্নতির ফলেই ইতালীয় নগরগুলো ইউরোপের শিল্প ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। তার পর ক্রমশঃ বাণিজ্য-লক্ষ্মী ইতালীর উপর বিরূপ হয়ে যখন হল্যাণ্ড, পোর্তুগাল, ফ্রান্স, ও ইংল্যাণ্ডের গৃহবাসিনী হলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের শিল্প ও সংস্কৃতির এবং বিজ্ঞানের কেন্দ্র ইতালী থেকে ঐ সব দেশে স্থানান্তরিত হোল। কারণ সেটাই—নাভিক জাতির রক্তের গুণের মহিমা কীর্ত্তন করার কোন কারণ নেই; হাজার বছর গ্রীক ও রোমক সভ্যতার সমৃদ্ধ আবহাওয়ায় অধীন ভাবে থাকার সময় তো নার্ডিক জাতের কোন গুণই দেখা যায়নি। তার পর যখন বাণিজ্যের প্রসারের জন্ম বাজার দরকার হয়ে পড়ল তখন শিল্পোন্নতি এবং সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানোন্নতির চেষ্টা দেখা গেল তাদের মধ্যে। এই সব শিল্পোন্নত দেশ যখন প্রাচ্যের সামন্তযুগীয় কৃষিপ্রধান দেশগুলোকে আক্রমণ করলো, এবং তাদের উন্নততর বিজ্ঞান শিল্প, সম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র, এবং সংঘবদ্ধতার জন্ম সহজে জিতে গেল। শিল্পোন্নতি ও বিজ্ঞানোন্নতির ফলে তাদের অস্ত্রবল ছিল অনেক ভাল এবং ব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীভূত. ফলে বিক্ষিপ্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামন্তযুগীয় কৃষক-প্রধান দেশগুলো তাদের সঙ্গে পারবে কি করে? নার্ডিক রক্তের সঙ্গে ভারতবর্ষের পরাজয়ের কোন সম্বন্ধই ছিল না।

স্বার্থ মানে কী?

মানুষ মাত্রই না কি স্বার্থপর। হ্যাঁ, স্বার্থপর বই কি, কারণ প্রাণিমাত্রেরই প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানো হোল ধর্ম। প্রাণী বলতে কি বুঝবো? প্রাণীর সংজ্ঞা হচ্ছে,—প্রাণী হচ্ছে এমন একটি জিনিষ, যার ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি আছে, যার ক্ষিদে পায়, যে সাথীহীন অবস্থায় থাকতে চায় না। আমি বাঁচছি এটা বুঝতে গেলেই আমায় দেখতে হবে আমায় চামড়ায় চিমটি কেটে, আমার ব্যথা লাগছে কি না। না খেয়ে দেখতে হবে ক্ষিদে পাচ্ছে কি না, একলা থেকে দেখতে হবে সাথী চাই কি না। স্বার্থপরতা জীবমাত্রেরই একটি সাধারণ আচরণ যেটার দরকার তার বেঁচে থাকবার জন্মে। নিজের দরকারী চাহিদা মেটাবার বাসনাটাই হোল স্বার্থপরতা। খেতে না পেলে চুরী করা বা ডাকাতি করাটা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মানুষ প্রথমে পশুর মত উপায়েই খাদ্য আর সাথী আহরণ করতো; প্রতিদ্বন্দ্বী কাউকে দেখলে আঁচড়ে, কামড়ে, পিটিয়ে মেরে ফেলতে দ্বিধা করত না। তার পর মানুষ অভিজ্ঞতা দিয়ে শিখল যে প্রত্যেকে শুধু নিজেরটুকু দেখলে অনেক সময় এমন কঠিন প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে পড়তে হয় যে খাবার বা সাথী যোগাড় করা যায় না, এবং হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে বাঁচা যায় না। তাই দলবদ্ধ হয়ে থাকতে মানুষ শিখল। তার পর মানুষের বিভিন্ন দল নিজেদের দলীয় সুবিধার জন্ম

এক এক জায়গায় এক এক রকম আইন-কানুন তৈরী করল। এক দল যাতে অপর দলের দ্বারা আক্রান্ত না হতে পারে, বা এক দল যাতে অন্য দলকে হারাতে পারে, এমনি ভাবে সামাজিক বিধি হতে লাগল। তার পর সমাজে ক্রমশঃ শ্রেণীবিভাগ যেই আরম্ভ হোল, অমনি আইনটা হয়ে পড়ল শাসকশ্রেণীর হাতে শাসিতকে পায়ের তলায় রাখবার অস্ত্র। শ্রেণীর অস্তিত্ব যখন ছিল না, তখন চাহিদা এবং প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইএর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আইন সবাই একসঙ্গে মিলে তৈরী করেছিল ফলে সেটাই ছিল বৈজ্ঞানিক।

বিজ্ঞানসম্মত সভ্য

সমষ্টি, ব্যষ্টির শত্রু নয়, মিত্র। যৌথ সমাজ-ব্যবস্থাই প্রত্যেক মানুষের স্বার্থ মেটাতে পারে। সেই সমাজের মধ্যেই বিভিন্ন ধরণের জীন-যোগাযোগ-বিশিষ্ট লোক থাকবে যাদের মধ্যে কয়েক জন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন লোক থাকবে, অধিকাংশ সাধারণ হবে, এবং কয়েক জন মূর্খ হবে। এই তীক্ষ্ণবুদ্ধিরাই প্রতিভাবান এবং সেই সমাজে যে কোন রকম নতুন কর্ত্তব্য নির্দিষ্ট করা হোক, তাঁদের জীনগত ক্ষমতার জোরে তাঁরা সেই কর্ত্তব্য পালনে দক্ষ হয়ে উঠবেন। এই রকম প্রতিভাবান ছিলেন লেনিন্, রয়েছেন স্তালিন। এঁরা যে কোন বিষয়ের যে কোন সমস্যা বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে এবং সমাধান ক'রতে পারেন। ব্যবহারাজীব লেনিন সেই জন্যই যে কোন জটিল যন্ত্রের কর্মপদ্ধতি দেখলেই বুঝতে পারতেন, এবং তার জন্য তাঁর মেকানিক্‌স্ পড়ার দরকার হোত না। প্রাণবিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, যে কোন দেশের যে কোন মানুষ সমাজের পক্ষে ওপরের নিয়ম খাটে এবং কোন একটি বিশিষ্ট দেশের মানুষদের অন্য দেশের মানুষদের চেয়ে অন্তর্নিহিত শক্তি বা বুদ্ধি বা রক্তের শ্রেষ্ঠতার কথা তাহা মিথ্যা। প্রতিভাবান্, সাধারণ, এবং মূর্খের সংখ্যার গড় সব সভ্য দেশেই নির্দিষ্ট জনসংখ্যার মধ্যে একই হবে, অবশ্য যদি সমাজ-পরিস্থিতি সব দেশে এক হয়।

কোন দেশের লোকদের বা কোন এক জন লোকের পক্ষে চরিত্রগত উত্তরাধিকার নিয়ে গর্ব করাটা মোটেই প্রগতির পরিচয় নয়, কারণ উত্তরাধিকার নির্ভর করে শুধু দু'টি বীজের আকস্মিক মিলনের ঘটনাচক্রের উপর।

কাজের ছোট বড় নেই

সমাজের যারাই কাজ করে তারাই সমাজের কাছে সমান মূল্যবান। বড় চাকরী করলেই কারুর দাম সমাজের কাছে বেশী হয় না। সমাজের চোখে জমাদার, ধাঙড়, মুচি, এদের কার কাজের দাম কম? এম-বি পাশ করা ডাক্তার বা নার্স, আইন-জানা উকীল, ব্যারিষ্টার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট কারুর চেয়ে কি এদের কাজের দাম কম? কে ভাল শিক্ষক হবে, কে নিপুণ মেকানিক হবে, আর কে পাকা রাঁধুনী হবে সেটা তাদের জীনের ওপর নির্ভর করে, কিন্তু দরকার তাদের কাউকেই কম নয়। নির্দ্দিষ্ট জনসংখ্যার মধ্যে গড়ে কত জন কোন্ কাজে পাকা হবে, সেটাও জীনের ওপর নির্ভর করে এবং সে গড়ও এক রকম বাঁধা হয় আদর্শ সমাজে। সুতরাং "অন্তর্নিহিত পার্থক্যের" জন্য কারুর দাম কম হওয়া উচিত নয়—সে সমাজের জন্য কাজ করে কি না সেটাই আসল কথা। কালো এবং ফর্সার ওপর যেমন শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে না এও তেমনি।

প্রত্যেকে খাটবে, দরকার-মত পাবে

"সমাজতন্ত্র আদর্শবাদী কবিকল্পনা", যে নয় এটা প্রমাণিত হয়েছে সোভিয়েট য়ুনিয়নে। আমরা আশা করি, সাম্যবাদও সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে এক দিন, কারণ আদর্শ সমাজে সবাই উন্নতি করার সমান সুযোগ পেলে, প্রকৃতিগত অন্তর্নিহিত পার্থক্য সাম্যবাদের পথে বাধা হবে না। কার্ল মার্কস্ বলেছেন যে সব মানুষের শক্তি সমান নয় কিন্তু সমাজের উন্নতির জন্য যারা কাজ করে, সমাজের কর্ত্তব্য তাদের সকলেরই চাহিদা মেটানো। তাঁর বাণী "প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাধ্যমত খাটবে, এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের দরকার মত পাবে," দার্শনিকের প্রলাপ নয়, সম্পূর্ণ উপলব্ধ সত্য।

সনেট

প্রদ্যোতকুমার রায়

ভাদরের মেঘে আকাশ গিয়েছে ছেয়ে
উদাসী হৃদয় ব্যাকুল হয়েছে আজ
আঁখি খোঁজে শুধু কোথা প্রিয়া মমতাজ
মন চলে' শুধু আশার তরণী বেয়ে।

গগনে গগনে মেঘের অট্ট হাসি
দিক্ হ'তে দিকে ভেসে যায় তার ধ্বনি
আমি শুধু হায় চুপ করে তাই শুনি
ক্লান্ত পবন সান্ত্বনা দেয় আসি।

মেঘের ফাঁকেতে আকাশে জেগেছে চাঁদ
আমি শুধু হায় ঠায় মেলে আছি আঁখি
গান গেয়ে ফেরে নিদ্‌হারা কোন পাখী
উড়ো মেঘ পুনঃ ঢেকে ফেলে ম্লান চাঁদ।

নীরবে বসিয়া আমি এ ভিখারী কবি
আনমনে একা এঁকে যাই তব ছবি।

উত্তর

(১) বৈজ্ঞানিকরা পরখ করে দেখেছেন পূর্ব্বপুরুষদের বিশেষ গুণ সন্তানেরা পায়। নেকড়ে এবং জংলী কুকুর ক্রমোন্নতির দ্বারা গৃহপালিত কুকুর হয়েছে। তাই তাদের অভ্যাস এদের মধ্যে রয়ে গেছে। তারা বনে জঙ্গলে যেখানে সেখানে শোয়। শোবার আগে দশ বারো বার ঘুরে ঘাস পাতা পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে শোবার উপযোগী করে নেয়। সেই অভ্যাস কুকুররা এখনও ছাড়তে পারেনি।

(২) প্রত্যেক জীব-জন্তু রাগলে, ভয় পেলে অথবা উত্তেজিত হলে ভাবভঙ্গী দ্বারা তা প্রকাশ করে। গরিলারা তা প্রকাশ করে বুক চাপড়ে। শত্রু দেখলে প্রথমে মুখ ভেঙচায়, দাঁত কড়মড় করে, তার পর বুকের ওপর ঘুঁসি মারতে মারতে শত্রুর দিকে এগিয়ে আসে। মানুষের পূর্ব্বপুরুষ গরিলা। তাই মানুষেরও এই অভ্যাস আছে। তবে হয়ত' একটু কম।

(৩) য়ুরোপে এক রকম মাছ আছে তার নাম 'সিলিউরাস'। যখন পাখীরা জল খেতে জলে নামে অথবা সাঁতার কাটে সেই সময় সিলিউরাস সোঁ করে ওপরে উঠেই কামড়ে ধরে জলের তলায় নিয়ে যায় আর একেবারে গিলে ফেলে। ছোট ছেলেদের পর্য্যন্ত গিলেছে এমন প্রমাণও আছে। 'লোফিয়াস পিস্কোটারিয়াস' নামে এক রকম মাছ আছে তারা হাঁস, সী-গাল প্রভৃতিকে ধরে ধরে খায়। এই রকম মাংসাশী মাছ মার্কিণ দেশেও আছে।

(৪) পাঁচ ফুট লম্বা সাপের হৃদ্‌যন্ত্র থাকে মাথা থেকে এক ফুট দূরে। হৃদ্‌যন্ত্রটা একটু লম্বাটে ধরণের। তার পরেই থাকে পাকস্থলী।

(৫) মাটিতে শুয়ে ঘুমানোর চেয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমানোই ঘোড়ারা বেশী পছন্দ করে। ওদের পায়ের পেশীগুলি এমন ভাবে তৈরী যে ঘুমিয়ে পড়লেও পা সোজা হয়ে থাকে। ঘুমন্ত অবস্থায় মস্তিষ্ক কাজ করে না। পায়ের, বুকের ও পিঠের পেশীগুলো 'রিফ্লেক্স অ্যাকশান' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রয়োজন হলে মাসের পর মাস দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। না শুয়েই বিশ্রাম নেবার কাজ সেরে নেয়। ঘোড়ারা যখন শুয়ে ঘুমোয়, চোখ সম্পূর্ণ বোজে না। ঘুম খুব সজাগ। সামান্য একটু আওয়াজেই উঠে পড়ে। তা ছাড়া ওজনের জন্য পেশীতে চাপ পড়ে। যে দিকে পাশ ফিরে শোয় সে দিককার ফুস্‌ফুস ভাল ভাবে কাজ করতে পারে না। ক্রমাগত পাশ বদলাতে হয়। তাই দাঁড়িয়ে ঘুমই ওরা বেশী পছন্দ করে।

(৬) 'ঈল' পাঁকাল জাতীয় এক রকম মাছ। হৃদয় তাদের একটাই কিন্তু এ জাতীয় আর একটি থলে থাকে। হৃদ্‌যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে সেটাও ধকধক করে। তাই অনেকে বলে ঈলের দু'টো হৃদ্‌যন্ত্র। প্রত্যেক জীবের শরীরে দু'রকম শিরা আছে। এক ধরণের শিরা দিয়ে ভাল রক্ত হৃদ্‌যন্ত্র থেকে দেহে যায়, আর এক ধরণের শিরা দিয়ে ময়লা রক্ত দেহ থেকে হৃদ্‌যন্ত্রে ফিরে যায় পরিষ্কৃত হতে। ঈল মাছের দ্বিতীয় হৃদ্‌যন্ত্রের মত থলেটি এই ময়লা রক্তকে পাম্প করে আসল হৃদয়ে পাঠিয়ে দেয় সাফ করতে। আসল হৃদ্‌যন্ত্রের মত দ্বিতীয়টিতে আঘাত লাগলেও মাছ মরে যায়।

(৭) হাতী-ছেলে শুঁড় দিয়ে দুধ খায় না, খায় মুখ দিয়ে। দুধ খাবার সময় ছেলে উল্টো দিকে শুঁড় গুটিয়ে রাখে। প্রথম প্রথম শুঁড়ের জন্য বেচারাকে ভয়ানক বেগ পেতে হয়। অনেকের ধারণা, হাতীরা শুঁড় দিয়ে জল খায়। সেটা ভুল। তারা শুঁড় দিয়ে জল টেনে নিয়ে মুখে ঢেলে দেয়।

(৮) 'ডিপাস' জাতীয় এক শ্রেণীর পাখী আছে, যারা ডানা নেড়ে যেমন আকাশে ওড়ে তেমনি জলের তলায়ও ডানা নেড়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে পারে। জলের চেয়ে তারা হাল্কা। কর্কের মত ওপরে ভেসে ওঠে। ডানা নেড়ে জলের তলায় থাকবার চেষ্টা করে। প্রকৃতি তাদের চর্ব্বির আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখে, সেই জন্য ঠাণ্ডা লাগে না।



ক্রিকেট

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দলের ভারত সফর—

সাম্প্রতিক ব্যবস্থার ফলে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অন্যান্য দেশের সহিত ক্রিকেট সফরের আদান-প্রদান করার মর্য্যাদা পাইয়াছে · ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা, ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া প্রভৃতির সঙ্গে ভারতের ক্রিকেট খেলা প্রসঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। আগামী শীত ঋতুতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া ক্রিকেট দল ভারত পর্য্যটনে আসার কথা ছিল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট-জগতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অবদান নগণ্য নহে। বিশ্বের ক্রিকেট-দরবারে তাহাদের স্থানও সুনির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। হেডলীর ন্যায় উদীয়মান খেলোয়াড় বিশ্ববিখ্যাত অনন্য-সাধারণ ক্রিকেট-প্রতিভা ব্র্যাডম্যানের দিগ্বিজয়ী রেকর্ডের সমকক্ষতা করিবার মত কৃতিত্ব দেখাইয়া নিজ দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। এ্যাকং মার্টিণ্ডেল প্রভৃতি বোলারের নাম সারা জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অন্যতম খেলোয়াড় লীয়ারী কনষ্ট্যাণ্টাইনের নাম জগতের সেরা খেলোয়াড়দের তালিকাভুক্ত। তাহার অনবদ্য ফিল্ডিং-চাতুর্য্য সারা বিশ্বের বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে। এই বাঘা খেলোয়াড়ের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া বিলাতী পেশাদার ক্লাব নেলসন কাউণ্টী তাহাকে চুক্তিতে আবদ্ধ করে। বিখ্যাত বিলাতী ক্রিকেট-সমালোচক নেভিল কাডাস্ তাহার সাবলীল ক্রীড়াভঙ্গীর সহজ ভাবের সহিত মাছের জলে সাঁতার কাটার তুলনা করে। বর্ত্তমান বৎসরের ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ভারত-সফরে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব কনষ্ট্যাণ্টাইনের উপর দেওয়ার সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর্থিক অসুবিধার জন্যে ভারতীয় ক্রিকেট-কণ্ট্রোল বোর্ড এই দায়িত্ব-গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের এই বহু প্রতীক্ষিত ও আলোচিত সফর বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বাতিল করা হইয়াছে।

বিলাতী সফরের অবসান—

ভারতীয় দলের বিলাতে তৃতীয় সরকারী ক্রিকেট-অভিযান শেষ হইয়াছে। সফরের প্রাক্কালে যেরূপ উচ্চাশা আমরা পোষণ করিয়াছিলাম, খেলার ক্রমিক গতির সঙ্গে সঙ্গে তাহা প্রায় দুরাকাঙ্ক্ষা বলিয়া প্রতীয়মান ও প্রমাণিত হইলেও মোটের উপর আমরা নৈরাশ্য-জনক কিছু করি নাই। সর্ব্বসমেত ১৩টি খেলায় জয়ী হইলেও প্রথম শ্রেণীর ২৯টি খেলার মধ্যে ভারতীয় দল ১১টিতে জয়ী ও ৪টিতে পরাজিত হইয়াছে। বাকী ১৪টি খেলা অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সফরে আবহাওয়ার চরম প্রতিকূলতায় ভারতীয় দল মাত্র ১৬ দিন রৌদ্রদীপ্ত ও শুষ্ক মাঠে খেলার সুযোগ পায়। এমতাবস্থায় অতীতের সহিত তুলনায় এবার ভারতীয় খেলোয়াড়গণ যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। ১৯৩৬ সালে তাহারা মাত্র ৪টি খেলায় জয়ী এবং ১২টিতে পরাজিত হয়। বাকী ১২টির শেষ নিষ্পত্তি হয় নাই। ১৯৩২ সালে ৯টি খেলাতে ভারতীয়গণ জয়ী হয় ও ১টি অমীমাংসিত থাকে। অবশিষ্ট ৮টি খেলায় তাহারা পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয়। এম. সি. সি মিডলসেক্স ও ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে অনায়াসে জয়ী হইয়াও ভারতীয়গণ টেষ্ট খেলায় সুবিধা করিতে পারে নাই। তাহার মূলগত কারণ, খেলোয়াড়গণের মনোবলের ও আত্ম-নির্ভরতার অভাব। প্রথম টেষ্ট খেলায় জয়ী হইয়া ইংলণ্ড রাবার লাভ করে। দ্বিতীয় টেষ্ট খেলা অমীমাংসিত থাকে ও তৃতীয়টি বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত হয়।

মার্চেণ্ট মোট ২৩৮৫ রাণ সংগ্রহ করে ও তাহার গড়পড়তা রাণ হয় ৭৪.৫৩। বিলাতী খেলোয়াড়দের মধ্যেও হ্যামণ্ডের পরেই ব্যাটিং হারে তাহার নাম। ভারতীয় দলের মোট ২২টি সেঞ্চুরীর মধ্যে মার্চেণ্ট একাই ৮টির অধিকারী এই সফরের অন্যতম সুযোগ্য দিক্‌পাল—ভিনু মানকড়। এই তরুণ কাথিয়াবাড়ী খেলোয়াড় যুগপৎ শত উইকেট লইয়াও সহস্রাধিক রাণ করিয়া ক্রিকেটারদের বাঞ্ছিত ডাবলস সম্পাদন করে ও বিলাতে মানকড় প্রথম ভারতীয় হিসাবে এই গৌরব অর্জ্জন করে। এ বৎসর ও-দেশে হাওয়ার্থ এই কৃতিত্ব দাবী করিয়াছে। ব্যাটিং ও বোলিং উভয় বিভাগে পারদর্শিতা দেখাইয়া হাজারীও বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে ও মানকড়ের পরেই তাহার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে।

পঞ্চবিংশতি খেলা :—

গ্ল্যামোর্গ্যান—১ম ইনিংস—২৩৮ (জেমস নট আউট ৬২, মানকড় ৮১ রাণে ৪টি ও নাইডু ৪৪ রাণে ৩টি)

২য় ইনিংস—৮ উইকেটে ২৩৮ (ঘোষিত) (রবিন্সন ৭১, ডাইসন ৪০, নাইডু ৬৪ রাণে ৩টি ও মানকড় ৭১ রাণে ৩টি)

ভারতীয় দল—১ম ইনিংস—২০৩ (মার্চেণ্ট ৭০, মুদী ৫৬, ক্লে ৭২ রাণে ৭টি)

২য় ইনিংস—৫ উইকেটে ২৭৪ (মুস্তাক আলী ১৩, হাজারী নট আউট ৫১, ম্যাথুজ ৬০ রাণে ৩টি)

ভারতীয় দল পাঁচ উইকেটে জয়লাভ করে। আলোচ্য সফরে ভারতীয় দলের ইহা দশম বিজয়াভিযান। এই খেলার বৈশিষ্ট্য এই যে, মাঠের ও খেলার প্রতিকূল অবস্থার সুযোগ সদ্ব্যবহার করিবার জন্য গ্ল্যামোর্গ্যান উইকেট হাতে থাকিতেও ইনিংস ঘোষণা করিয়া দেয়। মুস্তাক আলীর অনবদ্য ব্যাটিং-চাতুর্য্য সকলকে মোহিত করে। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই নিপুণ ও কুশলী খেলোয়াড় মাত্র ৭ রাণের জন্য শত রাণে বঞ্চিত হয়। এই সফর মুস্তাক আলীর ন্যায় কৃতী খেলোয়াড়ের পক্ষে অশুভের পরিচায়ক হইয়াছে। মনে হয় যেন ভ্রাম্যমাণ অষ্ট্রেলিয়া সামরিক দলের অধিনায়ক হ্যাসেটের 'ugly batsman' এই মন্তব্য যাদুমন্ত্রের ন্যায় তাহার সাবলীল ক্রীড়াভঙ্গীকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছে।

ষড়্‌বিংশতি খেলা :—

ওয়ারউইক—১ম ইনিংস ৩৫—১ উইকেটে ৩৭৫ (সেল ১৫৭, ক্রানমার ৪৮, ডলারী ৪৩, হাজারী ৪৭ রাণে ৪টি ও মানকড় ১২২ রাণে ৪টি)

ভারতীয় দল—১ম ইনিংস—১১৭ (মার্চেণ্ট ১৩ নট্ আউট)

২য় ইনিংস—১ উইকেটে ২১ খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। ওয়ারউইকশায়ারের সেলের চমৎকার সেঞ্চুরী সম্পাদনের ফলে রাণ-সংখ্যা অনায়াসে ৩৭৫ হয়। খ্যাতনামা বোলার হোলিজ

ও প্রিচার্ডের মারাত্মক বোলিং ভারতীয় দলের বিপর্য্যয় ঘটায়। মার্চেন্টের অপূর্ব্ব দৃঢ়তা ও শেষটিতে হিন্দোলকারের সহযোগিতায় আপ্রাণ চেষ্টাতে ভারতীয় দল ফলো অন করিতে বাধ্য হয়। হোলিজ এ বৎসর বিলাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক উইকেট দখল করার কৃতিত্বের অধিকারী।

সপ্তবিংশতি খেলা :—

গ্লষ্টারশায়ার—১ম ইনিংস—৩ উইকেটে ১৩২,

২য় ইনিংস— ১৮৭ (এলেন ৩৮, মানকড় ৭২ রাণে ৫টি ও সর্ব্বাতে ৪৩ রাণে ৪টি)

ভারতীয় দল—১ম ইনিংস—৮ উইকেটে ৩৫ (পাতৌদী রাণ-আউট ৭১, গডার্ড ৮২ রাণে ৭টি)

২য় ইনিংস—১ উইকেটে ১১৭ (হাজারী ৫৬, অমরনাথ ৪৮, গডার্ড ৬৬ রাণে ৪টি ও কুক ৮৩ রাণে ৩টি)।

মাত্র ৭ রাণের জন্ত ভারতীয় দল সময়ের অভাবে জয়লাভে বঞ্চিত হয় ও খেলাটি অমীমাংসিত থাকে। এই খেলায় মাঠের অবস্থায় সদ্ব্যবহার করার জন্ত ইনিংস ঘোষণার ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়ক দুই জনের মধ্যে বুদ্ধি-যুদ্ধের অবতারণা হয়। অন্ততম খ্যাতনামা চৌকষ খেলোয়াড় হাজারী এই খেলায় ব্যক্তিগত সহস্র রাণ পূর্ণ করে।

অষ্টাবিংশতি খেলা :—

ব্যাটস্‌ম্যানদের তীর্থক্ষেত্র 'ওভ্যালে' ইংলণ্ড বনাম ভারতীয় একাদশের তৃতীয় টেষ্ট খেলা বৃষ্টির জন্ত শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়া যায়। ভারতীয় একাদশ সদলে আউট হইয়া প্রথম ইনিংসে ৩৩১ রাণ করিলে প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ড দল ৩ উইকেটে ৯৫ রাণ করিবার পর খেলাটি পরিত্যক্ত হইয়া যায়। এবারেও ভারতীয় দলে বাঙালী বোলার এস ব্যানার্জীকে অন্তর্ভুক্ত না করায় ভারতে ক্রীড়ামোদিগণের কয়েক জনের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বাস্তবিক পক্ষে দুই বার বিলাতী-সফরে গিয়াও ব্যানার্জী টেষ্ট খেলায় অংশ-গ্রহণ করার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। মার্চেন্ট এই খেলাতেও ১২৮ রাণ করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করে।

ঊনত্রিংশৎ খেলা :—

এসেক্স—১ম ইনিংস—৩০৩

২য় ইনিংস—৩ উইকেটে ২০১ (ক্র্যাবট্রী ১১৮)

ভারতীয় দল—১ম ইনিংস—১৩৮

২য় ইনিংস—১ উইকেটে ৩৭০ (মার্চেন্ট ১৮১, মুদী ৬৫, মানকড় ৫২, পিটারস্মিথ ৭টি উইকেটে)

ভারতীয় দল ১ উইকেটে জয়ী হয়।

১ম ইনিংসের ফলে ফলোঅন করাইবার সুযোগ পাইয়াও এসেক্স দল দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করে। ৩৬৬ রাণে পশ্চাৎপদ ভারতীয় দল তৃতীয় দিনে বিপুল উদ্যমে খেলা আরম্ভ করে। জগতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ ও ভারতের শ্রেষ্ঠতম ব্যাটস্‌ম্যান মার্চেন্টের অপূর্ব্ব ব্যাটিং দৃঢ় ভাবে ভারতীয় দল অসাধ্য সাধন করে ও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে জয়ী হয়।

ত্রিংশৎ খেলা :—

কেণ্ট বনাম ভারতীয় দলের এই খেলা বৃষ্টির জন্ত পরিত্যক্ত হয়। কেণ্ট দল তিন উইকেটে ২৪৮ রাণ করিবার পর খেলা বন্ধ হইয়া যায়।

একত্রিংশৎ খেলা :—

ভারতীয় দল—৫ উইকেটে ৪৬১ (হাজারী নট্ আউট ১১৩, মানকড় নট্ আউট ১০১)

মিডলসেক্স—১ম ইনিংস—১২৪ (ব্রাউন ৪৪, মানকড় ৪৮ রাণে ৫টি, ও হাজারী ২৫ রাণে ৪টি)

২য় ইনিংস—৮২ (ব্যানার্জী ২১ রাণে ৪টি, মানকড় ২২ রাণে ৩টি ও হাজারী ২৪ রাণে ৩টি)

ভারতীয় দল এক ইনিংস ও ২৬৩ রাণে জয়লাভ করে। কাউণ্টী প্রতিযোগিতায় অন্ততম শীর্ষস্থানীয় দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবধানে জয়ের গৌরব অর্জন করে। ভারতীয় ব্যাটসম্যানগণকে আউট করার জন্ত মিডলসেক্স অধিনায়ক দশ জন বোলারকে বল করিতে দেয়।

কিন্তু ভারতীয় বোলারত্রয়ের মারাত্মক বোলিংয়ের বিরুদ্ধে তাহারা দুই দফায় মাত্র ২০৬ রাণ করিয়া একই দিনে সকলে আউট হইয়া যায়। ফলে দুই দিনেই খেলার নিষ্পত্তি হইয়া যায়। এই কাউণ্টীর বিশিষ্ট খেলোয়াড় কম্পটন ও রাইট অষ্ট্রেলিয়াগামী ইংলণ্ড দলের সহিত যাত্রা করায় দলগত শক্তির যথেষ্ট অবনতি ঘটে।

দ্বাত্রিংশৎ খেলা—

ভারতীয় দল—১ম ইনিংস—২৪১ (মার্চেন্ট ৮২১ পার্কস ৬৭ রাণে ৫টি)

২য় ইনিংস—৩ উইকেটে ২৫৩ (মুস্তাক আলী ৬৬, গুল-মহম্মদ নট্ আউট ৫৪, হাজারী নট্ আউট ৪২)

ইংলণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলীয় দল :—

১ম ইনিংস—১ উইকেটে ২১৮ (রবার্টসন ৫১, অমরনাথ ৮৭ রাণে ৪টি)

২য় ইনিংস—২৬৬ (কক্স ৮২, এমস, ৫৫, অমরনাথ ১৬ রাণে ৪টি)

ভারতীয় দল ১০ রাণে জয়ী হয়। খেলার শেষাবস্থায় তুমুল উত্তেজনা অনুভূত হয়।

ত্রয়ত্রিংশ খেলা :—

ভারতীয় একাদশ—১ম ইনিংস—১৩১

২য় ইনিংস—তিন উইকেটে ১৫

ল্যাভসন গাওয়ারের একাদশ ১ম ইনিংস—৩৪৫ (হাওয়ার্ড ১১৪, মানকড় ১২৭ রাণে ৪টি ও সোহনী ১৩ রাণে ৩টি)

খেলাটি অমীমাংসিত থাকে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি!

'কমুনিষ্ট মিনেশ'—

প্রাচ্যের সর্ব্বত্র কমুনিষ্ট প্রভাবের প্রসারকে ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা 'কমুনিষ্ট মিনেশ' বলতে শুরু করেছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে এর নামান্তর ছিল "রাশিয়ান মিনেশ।" এই শঙ্কা থেকে আত্মত্রাণের জন্য এংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী আর মালিকরা প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে আর প্রাচ্যখণ্ডে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের প্রবেশ-পথগুলোতে ঘোঁট পাকিয়ে আর বিভিন্ন দলের মধ্যে ভেদ বাধিয়ে আপনাদের স্বার্থ সংগঠন করতে চায়।

রুশিয়া চটেছে—

রুশিয়াকে এংলো-আমেরিকান দুই রাষ্ট্র কখনও সুনজরে দেখেনি। জার্ম্মাণীর চাপে পড়ে ওরা লাল-ফৌজের খোসামোদ করে আত্মরক্ষা করেছে এই আত্মত্রাণের কাজের বেলায় সোভিয়েট-তন্ত্র পরম কাজী বলেও ওরা ঘোষণা করেছে, কিন্তু কাজ যখন ফুরিয়ে গেল তখন সে কাজী পাজিতে রূপান্তরিত হয়েছে তাদের কাছে। ইউনাইটেড নেশনস্ অর্গানাইজেসনের গত প্যারির অধিবেশনে বিভিন্ন শক্তির মধ্যে যে রকম মন-কষাকষির ভাব প্রকাশ পেয়েছে, তাতে লণ্ডন 'ডেলি মেল' পত্রের সংবাদদাতা আভাস দিয়েছেন যে, সম্ভবতঃ রুশিয়া শীগ্‌গিরই ইউ-এন-ওর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বিশ্বময় নিজস্ব 'ইণ্টারন্যাশনাল' গড়তে মন দেবে। ইতিমধ্যে সে প্রতিবেশী দেশগুলোকে রুশ অর্থনীতির সম্পূর্ণ তাঁবেদার করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে। ইউ-এন-ও ত্যাগ করে গিয়ে সোভিয়েট রুশিয়া আপনাকে সর্ব্ব দেশের লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলোর পরিত্রাতা বলে পরিচিত করবে, আর ঘোষণা করবে যে, ইউ-এন-ও'এ ইঙ্গ-মার্কিণ প্রভাব যত দিন থাকবে তত দিন কোন ক্ষুদ্র শক্তি বা কোন দেশের লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সত্যিকার কোন বন্ধু কেউ থাকতে পারবে না। ("Soviet Russia on going into isolation will proclaim herself the protector of all minorities every where, contending that under Anglo-American influence in U. N O there is no real friend of the small powers or minorities in any country.")

বলকানে বৃটিশ বনাম সোভিয়েট—

গ্রীসে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার জন্য রাজপন্থী দল গড়ে তোলা হয়েছে। সিকিউরিটি কাউন্সিলে ইউক্রেনের প্রতিনিধি ডাঃ ডিমিটি ম্যানুইলস্কী প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, ইংরেজ সৈন্যেরা গ্রামের চাষীদের মধ্যে হাতিয়ার বিলিয়েছে "Aarms were distributed by the Fourth Indian Division to selected peasants in certain villages to support the Government") গ্রীসে রিপাবলিকান দল রাজতন্ত্রবিরোধী। গ্রীস রাজতন্ত্র চায় কি প্রজাতন্ত্র চায়, তার সম্বন্ধে গণমত নির্ণয়ের জন্য ভোটাভুটি হয়ে গেল। তাতে দেশ রাজতন্ত্রের সমর্থন করেছে। মোট ১৭৭১১২৪ ভোটারদের মধ্যে ১১৩৫৬৭৫ জন রাজার পক্ষে ভোট দিয়েছে। বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে ৫২১৫৪০ জন। রিপাবলিকানদের বিক্ষোভ থেকে লণ্ডন-ফেরত রাজা জর্জ্জকে রক্ষা করবার জন্য আয়োজন হয়েছে বিপুল।

বুলগেরিয়াও রাজা চায় কি না, তার সম্বন্ধে গণমত নেওয়া হয়েছে। বুলগেরিয়া রাজতন্ত্র চায়নি। এখানে মোট ৪১ লক্ষ ১৩ হাজার ভোটারের মধ্যে শতকরা ৯২ জন ভোট দিয়েছে। আর যারা ভোট দিয়েছে তাদের শতকরা ৯৩ জন চেয়েছে প্রজাতন্ত্র। শুনা যাচ্ছে, বুলগেরিয়ার ৯ বছরের নাবালক রাজা সিমিয়ন আর তার দুই বোন মিশরে—ইটালীর ভূতপূর্ব্ব রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের মত বসবাস করতে যাবে।

তুর্কীর আশঙ্কা—

গ্রীস আর বুলগেরিয়ার উপর তুর্কীর কড়া নজর। ইংরেজরা গ্রীসে রাজতন্ত্র স্থাপনে সাহায্য করেছে দেখে তুর্কী সরকার খুসী। বর্ত্তমান গ্রীস সরকারও তুরস্কের সঙ্গে মিতালী করতে চায়। বুলগেরিয়ায় প্রজাতন্ত্র স্থাপন যুগোশ্লাভ-বুলগার তথা বল্‌কান যুক্তরাষ্ট্র সূচিত করছে। কামাল পাশা এমনই একটা বলকান যুক্তরাষ্ট্রের আশা করেছিলেন। তবে তিনি আশা করেছিলেন যে, এ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলো পূর্ণ স্বাধীন হবে, বৈদেশিক কোন রাষ্ট্রের প্রভাব মোটেই থাকবে না। বর্ত্তমানে যে যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের কথা উঠেছে তাতে সোভিয়েট প্রভাব সম্পূর্ণ থাকবে। কাজেই অনাগত যুক্তরাষ্ট্রকে তুরস্ক অতি সন্দেহের চোখে দেখছে বলে মনে হচ্ছে।

মধ্য-প্রাচীতে ষড়যন্ত্র—

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে এণ্টনী ইডেন আরব লীগকে সমর্থন করেন। ফলে বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রের সঙ্গে ইংরেজের সন্ধি হয়। মিশর, সিরিয়া, ইরাক, ট্রান্সজর্ডন, সাউদী আরব ও লেবানন নিয়ে "মধ্য-প্রাচ্যে" ইংরেজের তাঁবেদার আরব রাষ্ট্রসঙ্ঘ গড়বার যে চেষ্টা ইডেন করেছিলেন, আর্নেষ্ট বেভিন (হালের বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব) তারই সমর্থন না করলে মিত্র-রাষ্ট্রসঙ্ঘে ৫টা আরবী রাষ্ট্র ঠাঁই পেত না, আর মিশরও সিকিউরিটি কাউন্সিলে আসন পেত না। সঙ্ঘের ইকোনমিক ও সোশিয়াল কাউন্সিলে লেবানন স্থান পেয়েছে, এডমিনিষ্ট্রেশন কমিটীতে সিরিয়া প্রতিনিধির বিস্ময়কর সভাপতির আসন পাওয়া আর ট্রাষ্টিশিপ কমিটীতে ইরাকের স্থান পাওয়া সম্ভবপর হয়েছে ইংরেজের কৃপায়।

এই কুপার বিনিময়ে আরব রাষ্ট্রগুলো এংলো-আমেরিকান অয়েল কোম্পানীকে যে তৈল ব্যবসায়ের সুবিধা দিয়েছে—তার অর্থনীতিক গুরুত্ব যেমন, রাজনীতিক গুরুত্বও তেমনি অনেক। এ সব চুক্তি ও চেষ্টার ফলে প্যালেষ্টাইন আজ পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠতম তৈল-বণ্টনকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ প্যালেষ্টাইনে আরবী-ইহুদী কাটাকাটি। আরবী স্বার্থ, সুতরাং আপনাদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্যালেষ্টাইনে ইংরেজেরা সৈন্য রেখেছে সামান্য নয়।

ভারতে মিঃ জিন্না বলছেন—আমেরিকার টাকায় ইহুদীরা ক্ষেপেছে। আবার এ-ও দেখা যাচ্ছে যে, প্রত্যেকটি আরবী রাষ্ট্রে রুশ-প্রভাব সামান্য নয়। রুশ-প্রভাবে ইংরেজের 'মধ্য-প্রাচীর' আরবী রাষ্ট্রে ঘোঁট ভাঙবার চেষ্টা ভাল করেই হচ্ছে। রুশ-কমুনিষ্ট প্রভাবকে ভেঙ্গে দেবার জন্য বৃটিশ কমুনিষ্টরাও প্যালেষ্টাইনে দল খুলেছে ইহুদীদের মধ্যে, আরবীদের মধ্যেও। বৃটিশ-সমর্থিত আরব কমুনিষ্ট দল বলছে—ইহুদী ন্যাশনাল হোম আরব দেশগুলোর স্বাধীনতা অগ্রগতি রুদ্ধ করে একটা প্রাচীর-রাষ্ট্ররূপে দাঁড়িয়ে। আরবী ধনী জমিদার আমিরদের মতের সঙ্গে এদের মত অভিন্ন। বৃটিশ-সমর্থিত ইহুদী কমুনিষ্ট দল বলছে ন্যাশনাল হোম চাই-ই।

ইরাকে ও ইরাণে—

ইরাকেও পাকিস্থানের প্রতিধ্বনি—আরবীস্থান। আরবীস্থান ট্রাইব পার্টির নেতা হলেন শেখ জহর অল ইউলিব। ইরাক সরকার বা আরব লীগের সহযোগিতা এরা চায় রুশরা বলছে, ইংরেজরা তাদের আন্দোলনকে অর্থ আর হাতিয়ার দিয়ে সমর্থন করছে। ওরা নিজেরাও স্বীকার করেছে যে ইংরেজরা তাদের সমর্থন করছে।

দক্ষিণ-ইরাণেও আরবীস্থানের দাবী। ইরাণী দল ইরাকী দলের সঙ্গে যোগ রেখে চলছে। ইরাণী আরবীস্থানী দল সাহায্য নিয়েছে বখতিয়ারী উপজাতিগুলো। বৈদেশিক শক্তির সমর্থনে এরা ইরাণের কেন্দ্রী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়। এদের প্যালন তুদে দলের আড্ডাগুলো ধ্বংস করে, ওদের নেতাদের ফাঁসী দিয়ে আর সরকারী ফৌজকে হটিয়ে দিয়ে তারা ইস্পাহানে স্বাধীন সরকার স্থাপন করতে চায়।

বর্ম্মায় কি হবে ?—

বর্ম্মাতেও গবর্ণর সার হুবার্ট রান্সে নয়া শাসন পরিষদ রচনা করতে চাচ্ছেন বিভিন্ন দলের রাজনীতিক নেতাদের নিয়ে। শুনা যাচ্ছে, এতে থাকবেন জেনারল আউং সানের এন্টি ফ্যাসিষ্ট পিপ্‌লস্ ফ্রীডম লীগের ৫ জন, ডাঃ বা-মর সিন্যেথা উনথান্ত দলের ২ জন, থাকিন দলের ২ জন, ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ইউ-সএর মিয়োচিং দলের ২ জন, ইংরেজের বর্ম্মা ছেড়ে যাবার সময় যারা মন্ত্রী ছিলেন তাঁদের থেকে ২ জন, আর ২ জন ইংরেজ। অবশ্য দেশরক্ষা আর সীমান্ত শাসন পরিচালনের ভার থাকবে এই ইংরেজ দু'জনার হাতে।

কিন্তু রয়টারের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে, বর্ম্মা সম্বন্ধে ইংরেজের নীতির কোন বদল হবে বলে আভাসও পাওয়া যাচ্ছে না। নিম্নতম সরকারী কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘটের ফলে বর্ম্মায় এক বছর ধরে যে রাজনীতিক অচল অবস্থার সৃষ্টি করেছেন জেনারল আউং সানের দল, সে অবস্থা সচল করবার দাবী করা হচ্ছে একটা সর্ব্বদলীয় মন্ত্রি-সভা গঠন করে। এই দাবীর ফলে গভর্ণরকে একটা যা-হোক মন্ত্রি-সভা গড়তেই হবে। রেঙ্গুনে যে ভাবে ধর্ম্মঘটের হিড়িক চলেছে—কংগ্রেসের মধ্যবর্ত্তী সরকার গঠনের আগে যেমন ডাক ধর্ম্মঘট পুলিশ ধর্ম্মঘট প্রভৃতি চলে, রেঙ্গুনেও তেমনই হচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় পুলিসের ধর্ম্মঘটের ফলে ডাকাতি ও অরাজকতা বেড়ে গেছে।

প্যালেষ্টাইন ও ভারত—

আমেরিকার লিবারাল সংবাদপত্র পি-এম কলকাতা দাঙ্গা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, কলকাতার হত্যার সঙ্গে প্যালেষ্টাইনের বিরোধের নিকট-সম্বন্ধ আছে। যে ব্যবস্থায় প্যালেষ্টাইনের উপকূল থেকে রোরুদ্যমান নরনারী সাইপ্রাসের কাঁটা তারের বেড়ার কাছে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হয়, সেই একই ব্যবস্থায় ভারতের শ্রেষ্ঠতম নগরীর পথে পথে হাজার হাজার গলিত শব শোভা পাচ্ছে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, এবার কলকাতায় হত্যালীলা করেছে ইংরেজরা নয়, ভারতবাসীরা।

সিন্ধু প্রাদেশিক মসলেম লীগ সম্প্রতি এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে—"ইহুদীরা আমেরিকানদের সাহায্যে প্যালেষ্টাইনে তাহাদের 'হোম-ল্যাণ্ডের' জন্য যেমন সংগ্রাম করিতেছে, সেরূপ ভারতীয় মুসলমানদের কর্ত্তব্য হইবে সোভিয়েট রুশিয়ার সমর্থন সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সমস্যাকে আন্তর্জাতিক স্তরে লইয়া যাওয়া। এতে ভারতের মসলেম লীগ কাদের দিকে চেয়ে আছে তার কতকটা ইঙ্গিত মিলছে।

লীগ-ডিক্টেটর মিঃ জিন্নাও বলেছেন, ভবিষ্যৎ দেখিতেছি অত্যন্ত অন্ধকার। বৃটেন, আমেরিকা ও রুশিয়ার পরস্পরের সম্পর্ক যদি মন্দ হয়, তখন সঙ্কট মুহূর্ত্তে ভারতের মুসলমানরা কোন্ পথ নেবে তা এখন থেকে বলা যায় না।

"jinnah pointed to Russia as a serious menace if Britain pursues the present policy of completely eleminating the Muslims not only in India, but in the entire Middle East."

নিখিল এশিয়া রাষ্ট্র-সম্মিলন—

আসছে জানুয়ারীতে পণ্ডিত জওহরলাল নিখিল এশিয়া রাষ্ট্র-সম্মিলন আহ্বান করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। সম্মেলনের অধিবেশন নয়া দিল্লীতেই বসবে। সম্ভবতঃ এতে আসবেন বর্ম্মা থেকে ইংরেজ বড়সাহেবদের ত্রাস জেনারেল আউং সাং, ইন্দোনেশিয়া থেকে হয় ডাঃ সোকর্ণ বা শারিয়ার, চীন থেকে কুয়োমিনতাং পক্ষের মার্শাল চিয়াং কাইশেক, আর কমুনিষ্ট পক্ষের চৌয়েন লাই; সম্ভবতঃ সোভিয়েট এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো অঞ্চলেরও কয় জন প্রতিনিধিকে আমরা দেখতে পাব। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পণ্ডিত জওহরলালের এই United Front of Freedom-loving Asiatic peoples সৃষ্টি করবার মূলে আছেন নেতাজী। ভারতে তিনিও নাকি ফিরছেন। যদি ফিরেন, যদি মধ্য-প্রাচীতে ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিসঙ্ঘ গড়ে, নিখিল এশিয়া রাষ্ট্র-সম্মেলন যদি ইংরেজের সৃষ্ট আরব লীগ আর রুশিয়ার সমর্থনপুষ্ট ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়গুলোর আকাঙ্ক্ষা ও কাম্যের সামঞ্জস্য করতে পারে, তাহ'লে পৃথিবীতে নতুন রাষ্ট্রনীতির পত্তন হবে। তা যদি সম্ভবপর হয় তাহ'লে প্রাচ্য-পথের ও প্রাচ্য-খণ্ডের সকল দেশে হয়ত একটা নিশ্চিন্ত ভাবের সৃষ্টি হবে; আর এই নিশ্চিন্ত অবস্থায় সমরোত্তর ঝঞ্ঝাট ও দৈন্য থেকে পরস্পরের সহযোগিতায় এশিয়া বাঁচবে, বাঁচাবে ও পৃথিবীতে পরাজপুষ্ট শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার গতি ফিরিয়ে দেবে।

জেমস্ হপউড জীন্স

স্বনামধন্য জগৎ-বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ সার জেমস্ হপউড জীন্স ৩০শে ভাদ্র সোমবার পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে যে বিরাট ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। সার ওলিভার লজ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—সার জেমস্ জীন্স জগতের শ্রেষ্ঠ ছয় জন বৈজ্ঞানিকের মধ্যে এক জন।

বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের রাজ্যে এক যুগান্তকারী বিপ্লব আনিয়াছে। পুরাতন বহু মত, বহু তথ্য এই নতুন যুগের সাধকদের হাতে পড়িয়া রূপ বদলাইয়াছে, অনেক ক্ষেত্রে ভুল পর্য্যন্ত প্রমাণিত হইয়াছে। হাইজেন বার্গ মাক্স প্লাঙ্ক, মিলিক্যান, আইনষ্টাইন, রাদারফোর্ড, এডিংটন, জেমস্ জীন্স প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত সাধনায় বিজ্ঞান আজ দর্শনে পরিণত হইয়াছে। বিশুদ্ধ গণিত ও পদার্থ-বিজ্ঞান আজ অনির্দেশ্যবাদের পথে চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও দর্শনের তত্ত্বকল্পনা এক হইয়া গিয়াছে। আজ তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন জগতের সকল বস্তুই এক। ইচ্ছামত এক মৌলিক বস্তুকে অপর মৌলিক বস্তুতে রূপান্তরিত করা যায়; প্রাচীন রাসায়নিকদের তামাকে সোনা করিবার প্রচেষ্টা আজ আর অলীক অথবা স্বপ্ন-কথা নয়। এখন তাহা বাস্তব এবং সত্য। আজ বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বাস করিতেছেন যে, সমগ্র সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে অনন্ত শক্তি (energy)। জন্ম, পুষ্টি, ক্ষয় এবং লয় সবই এই শক্তির বিভিন্ন রূপ। এই শক্তিরই তারতম্যে বিভিন্ন প্রকারের সৃষ্টি। এই সত্য ভারতীয় দর্শনে বহু দিন হইতে স্বীকৃত। ঋগ্বেদে এবং পুরাণেও ইহার উল্লেখ আছে। এক সময় ছিল পদার্থ-বিজ্ঞান কেবল পদার্থের বস্তু-ধর্ম্মের মধ্যেই আবদ্ধ, কিন্তু আজ তাহা প্রাণধর্ম্মে পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। সার জেমস্ তাঁহার গবেষণার প্রকৃত বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক মনের পরিচয় দিয়াছেন। অতি বিরাট নক্ষত্র, নীহারিকা, আবার অতি ক্ষুদ্র পরমাণুপুঞ্জ সবই সেই অনন্ত শক্তির বিভিন্ন রূপ ও অংশ, ইহা তিনি বেশ জোরের সহিত বলিয়াছেন। ইহাদের বিচিত্র লীলা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—স্থূলরূপে যাহা বস্তু, দিব্যরূপে তাহাই চেতনা। অপার রহস্যময় চেতনা অনন্তশক্তিরই বিকাশ। বহিরঙ্গ বিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে হইলে অন্তরঙ্গ প্রাণ-রহস্যের বিশ্লেষণ আবশ্যক। তাই বলি তিনি একাধারে বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক।

জ্যোতির্বিদ্যা অথবা পদার্থবিদ্যার গবেষণার কথা বলিলেই তাঁহার মনীষার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। নিগূঢ় এবং দুরূহ বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং তত্ত্বকে সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় গল্প উপন্যাসের অধিক মনোরম করিয়া সাধারণকে শিক্ষিত করিবার যে প্রচেষ্টা তিনি করিয়াছেন, তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। তাঁহার ভাষা এবং লিখনভঙ্গী যে কোন নাম-করা সাহিত্যিকেরও ঈর্ষ্যা উদ্রেক করে। কি রোমাঞ্চকর বর্ণনা, কি বিশদ জ্ঞান। তাঁহার রচিত 'রহস্যময় জগৎ' (The Mysterious Universe) ও 'আমাদের চতুষ্পার্শ্বের পৃথিবী' (The Worlds around us) বিজ্ঞান এবং সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেরই অমূল্য সম্পদ।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে সার জেমস্ জন্মগ্রহণ করেন। কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে তিনি অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে 'র‍্যাঙ্গলার' উপাধি লাভ করেন। কেম্ব্রিজের তিনি দ্বিতীয় র‍্যাঙ্গলার। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত 'স্মিথ প্রাইজ' পান। 'গ্যাসের গতিবিধি-নির্ণয় তত্ত্ব' তাঁহার সর্ব্বপ্রথম গবেষণা এবং সেই গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বৈজ্ঞানিক মহলে গ্যাস সম্পর্কীয় ব্যাপারে অথরিটি বলিয়া স্বীকৃত হন।

জীন্স গবেষণা আরম্ভ করেন সার জর্জ ডারউইনের শিষ্য হিসাবে। গুরু শিষ্য মিলিয়া 'ঘূর্ণায়মান নমনীয় তরল দ্রব্য' এবং গ্রহ ও তারকার গঠন বিষয়ে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনি স্বাধীন ভাবে বর্ত্তুলাকার নীহারিকা সম্বন্ধে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। ইহাতে তিনি বলেন যে, মাধ্যাকর্ষণ পরিবর্ত্তনশীল এবং তদ্দ্বারা আদি নীহারিকার দুই ভাগে বিভক্ত হবার কারণ ব্যাখ্যা করেন।

১৯০৫ হইতে ১৯০৯ অবধি তিনি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত অধ্যাপকের আসন অলংকৃত করেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে 'কসমোলজি ও ষ্টেলার ডিনামিক্স' নামে জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কীয় গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। তাঁহার চিন্তাধারার নূতনত্বে ও তথ্যের গুরুত্বে সুধীজন চমৎকৃত হন। ফলে আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার বিজ্ঞানীর সর্ব্বোচ্চ সম্মান 'অ্যাডামস্ প্রাইজ' লাভ করেন। ভারতের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ এই সম্মানের অধিকারী।

কেবল জ্যোতির্বিদ্যায় অথবা গণিতশাস্ত্রে নহে, পদার্থ-বিজ্ঞানেও তাঁহার দান অসামান্য। বিজ্ঞানের বহু তথ্য তিনি গণিত দ্বারা সুপ্রমাণিত করিয়াছেন।

১৯১৯ হইতে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রয়াল সোসাইটির কর্ম্ম-সচিব ছিলেন এবং ১৯২৫ হইতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রয়াল অ্যাষ্ট্রনমিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি রয়াল ইনষ্টিট্যুশনের জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপনা করেন।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশন কলিকাতায় বিজ্ঞান কলেজে হয়। নির্ব্বাচিত সভাপতি লর্ড রাদারফোর্ডের অকস্মাৎ মৃত্যুতে সার জেমস্ জীন্স কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

বৈজ্ঞানিক-জীবন ছাড়া তাঁর দাম্পত্য-জীবনও অন্য যে-কোনো বিজ্ঞানীর লোভনীয় বলিয়া মনে হইতে পারে। আকাশের পানে যাঁর দৃষ্টি ছিল দীর্ঘকাল স্থিরবদ্ধ, মাটির সংসারের আকর্ষণও তাঁহার কিছু কম ছিল না। তাঁহার প্রথম পক্ষের মার্কিণ স্ত্রী শার্লোট টি ফেণী ১৯৩৪ সালে মারা যান। ১৯৩৫ সালেই তিনি আটার বছর বয়সে আবার বিবাহ করেন ভিয়েনার মেয়ে চব্বিশ বছর বয়সের যুবতী সুসহককে। এই বিবাহের পর দুইটি পুত্র এবং একটি কন্যারত্ন লাভ করেন তিনি।

তাঁহার নির্ব্বাণ লাভে বিজ্ঞানের যে ক্ষতি হইল মৌলিক চিন্তা ও চর্চ্চার দিক হইতে, তাহা অপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইয়াছে, বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ সাহিত্যের এলাকায়!

একটি সন্ধ্যা

শ্রীকরুণাময় বসু

আকাশের পটে বৈকালী মেঘ ম্লান,
মল্লিকা-বনে চৈতালি অবসান ;
পাহাড়তলীতে ঘুমায় তৃতীয়া চাঁদ,
কী যে ভালো লাগে ছায়া-পুঞ্জিত ছাদ।

তুমি আছো তাই ভালোলাগা এই নেশা
বায়ুচঞ্চল মালঞ্চে আছে মেশা ;
কখন রেখেছ ভীরু করতলখানি
পাখীর নরম পালকের মতো আনি।

গোধূলি-প্রান্তে সোণালিয়া মায়া-রাত
হাতছানি দেয়, শৈল-শিখরে চাঁদ ;
সবুজ শাড়ির প্রান্ত-ভঙ্গিমায়
হারানো স্মৃতির সুর বুঝি ছুঁয়ে যায়।

যে-ফুল রেখেছ শিথিল কবরীমূলে,
ভাঙা পল্লব যদি দাও মোরে ভুলে ;
মনের আড়ালে ছিন্ন কুসুম-রাখী
গেঁথে নিয়ে যাব, ভরিবে জীবন বাকী

মাঠের প্রান্তে নদীর শীর্ণধারা
উপলখণ্ডে বাজাইছে একতারা ;
মাণিকের মতো জোনাকির পাখা জ্বলে,
সন্ধ্যা-পরীর নয়নে শিশির গলে।

পথতরুমূলে মালতী কুসুম ঝরে,
ছেলেবেলাকার কতো কথা মনে পড়ে ;
আকাশে মেঘেরা চালায় সোণার রথ,
তুমি আমি আর পাহাড়িয়া বাঁকা পথ।



গাগরী-ভরণে
শিল্পী—সুনীল গুপ্ত



সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতায় দাঙ্গা

মন্ত্রীমিশন যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা পেশ করেন, ভারতীয় কংগ্রেস তাহা কতকগুলি সর্ত্তাধীনে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। মুসলিম লীগ ইহাতে আপত্তি জানান। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মিশনের পূর্ব্ব প্রস্তাবে কংগ্রেস আপত্তি করিলে লীগ তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন। ভাবে মনে হয় কংগ্রেস যাহা করিবেন, লীগ ঠিক তাহার উল্টা করিবেন। মুসলিম লীগের অন্তর্বর্ত্তী সরকার গঠন এবং গণ-পরিষদে যোগদান করিতে অস্বীকার করিবার ফলে, লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেসের হাতেই সম্পূর্ণরূপে এই ভার ছাড়িয়া দেন। লীগের আপত্তির কারণ এই যে, কংগ্রেস দীর্ঘ-মেয়াদী অথবা প্রাদেশিক কোন কল্পনাই পুরোপুরি ভাবে গ্রহণ করেন নাই। তবে কংগ্রেসকে অন্তর্বর্ত্তী সরকার গঠনের ভার দেওয়া হইল কেন? গণ-পরিষদের সার্ব্বভৌম অধিকারও লীগ স্বীকার করিতে রাজী নহেন। ৮ই আগষ্ট কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে এই সকল অভিযোগের উত্তর কংগ্রেস দিয়াছেন। তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, কোন কোন বিষয়ে আপত্তি থাকিলেও মোটের উপর তাঁহারা সমগ্র ভাবেই মিশনের দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে প্রদেশ সমূহের স্বাধীনতাও স্বীকার করা হইয়াছে এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, মণ্ডলীভুক্ত হইবার প্রশ্ন সম্পূর্ণরূপে প্রাদেশিক। গণ-পরিষদের সার্ব্বভৌম অধিকারের অর্থ, বাহিরের কোন শক্তি ভারতের শাসনতন্ত্র-রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

কংগ্রেস শাসনভার গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া লীগকে এবং শিখ-সম্প্রদায়কে গণ-পরিষদে যোগ দিবার আমন্ত্রণ জানান। শিখ-সম্প্রদায় সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিলেন, কিন্তু লীগ অগ্রাহ্য করিলেন। যাহার ফলে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ঘোষণা। পাকিস্থান লাভ করিবার জন্ত ১৬ই আগষ্ট তাঁহারা সংগ্রাম-দিবস নির্দ্ধারণ করিলেন।

১২ই আগষ্ট বৃটিশ সরকারের নির্দ্দেশানুসারে লর্ড ওয়াভেল পণ্ডিত নেহরুকে অন্তর্বর্ত্তী সরকার গঠনের আলোচনার জন্ত নিমন্ত্রণ করেন। পণ্ডিত নেহরু মিঃ জিন্নাকে সহযোগিতার জন্ত আহ্বান করেন, এমন কি, সাক্ষাৎ পর্য্যন্তও করেন, কিন্তু মিষ্টার জিন্না সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন।

পাকিস্থান অর্থে পাক-ই-স্থান অর্থাৎ পবিত্রভূমি বোঝায়। তাহা লাভ করিবার জন্ত 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' যে কত দূর 'পাক' অর্থাৎ পবিত্র ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। সংগ্রাম-দিবস পালন সম্বন্ধে ১৬ই আগষ্টের পূর্ব্বে লীগ-নেতাদের মধ্যে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলে। কেহ বলেন,—এই সংগ্রাম অহিংস। কেহ বলেন,—ইহা বৃটিশের বিরুদ্ধে। কেহ বলেন—ইহা আইন অমান্ত আন্দোলন। তবে যিনি যে ভাবে বলুন না কেন, ইহা যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ এ কথা কেহই স্পষ্টতঃ বলেন নাই। উপরওয়ালারা নির্দ্দেশ দিলেন,—প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে হরতাল পালন করা হইবে। হরতাল পালনে কাহাকেও বাধ্য করা হইবে না। সম্পূর্ণ শান্ত ভাবে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইবে। সকলেই মনে করিল, ৯ই আগষ্ট কংগ্রেস যে ভাবে আইন অমান্ত আন্দোলন চালাইয়াছিলেন ইহাও সেইরূপ। ১৬ই আগষ্ট বুঝি ভবিষ্যতের আর একটি পুণ্যময় দিবস।

৯ই আগষ্ট আর ১৬ই আগষ্ট। ভারতের ইতিহাসে এই দুইটি দিনই স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ৯ই আগষ্ট আমাদের একটি পুণ্যময় স্মৃতি। সেদিন দেশভক্তদের শোণিতে রাজপথ লাল হইয়াছিল, স্বাধীনতার জন্ত, দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচনের জন্য। সেদিন পুরুষ, নারী, বৃদ্ধ, যুবা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের গুলীর সামনে দাঁড়াইয়াছিল, বুক পাতিয়া, মস্তক উন্নত করিয়া। সেদিন ভারতের বীর মান বাঁচাইতে প্রাণ দিয়াছিল। সে দিনের কথা স্মরণ করিলে গর্ব্বে বুক ফুলিয়া উঠে। সে আত্মবলিদান সার্থক হইয়াছে। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের এই অপূর্ব্ব রূপ জগতে দুর্লভ। এ জাতিকে পরাধীন করিয়া রাখা বিশ্বের কলঙ্ক!

আর ১৬ই আগষ্ট। সেদিনের কথা ভাবিলে লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া যায়। ঘৃণায় লেখনী সরে না। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দিবস পালনের আশ্বাসের পিছনে সে কি হীন ষড়যন্ত্র! শুনা গিয়াছিল বিক্ষোভ বৃটিশদের বিরুদ্ধে, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল তাহা কেবল হিন্দুদের বিরুদ্ধে। ৯ই আগষ্ট যে কলিকাতার রাজপথ ধন্ত হইয়াছিল বহু বীরের রক্তে, নিয়মতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনে সেই রাজপথ কলঙ্কিত হইল ১৬ই আগষ্ট, কাপুরুষতাপূর্ণ ছুরিকাঘাতে, নরহত্যায়, লুঠ-তরাজে। যেখানে ক্ষমতা-গর্ব্বিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্ত নিরীহ, নিরস্ত্র, অহিংস জনসাধারণের উপর নির্ব্বিচারে গুলী বর্ষণ করিয়াছিল, সেইখানে ভাই ভাইয়ের বুকে ছুরি মারিল, মায়ের কোল হইতে সন্তান কাড়িয়া হত্যা করিল, ভগিনীকে রাজপথে উলঙ্গ করিল, ধর্ষণ করিল। ইহাই কি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের স্বরূপ? ইহাই কি পাকিস্থানের নমুনা?

দলীয় প্রয়োজনের জন্ত প্রধান মন্ত্রী ১৬ই আগষ্ট সরকারী ছুটি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কোন এক দলের প্রয়োজনে এইরূপ ছুটি ঘোষণা, বোধ হয় সরকারী ইতিহাসে এই প্রথম। এই সম্পর্কে তাঁহার উক্তি উল্লেখযোগ্য—"শান্তিরক্ষার জন্তই এই ছুটি দেওয়া হইয়াছে। দোকানে ইট-পাটকেল ছোড়া, অথবা ট্রাম, বাস ও মোটর গাড়ী হইতে লোকজন বাহির করিয়া আনা এবং ঐ সকলে অগ্নি প্রদান করিয়া অভিপ্রায় পূর্ণ করার সুযোগ দেওয়া অপেক্ষা সংঘর্ষ এড়াইবার জন্ত সরকারী ছুটির ব্যবস্থা ভাল।" শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শনে তিনি এই ধরণের ভয়ের এবং সন্দেহের কথা উল্লেখ করিলেন কেন? কেবল ছুটি ঘোষণা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন—তিনি ঐ দিন

পূর্ণ হরতাল চাহেন। সরকারী চাকুরিয়া হিসাবে হরতালের কথা তিনি বলিতে পারেন না। তাহা ছাড়া তিনি লীগের ভক্ত হইতে পারেন, মুসলমানদের হরতাল করিতে বলিতে পারেন, কিন্তু অ-মুসলমানদের তাহাতে যোগ দিতে বলিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। ইহা তাঁহার সম্পূর্ণরূপে প্রধান মন্ত্রিত্বের ক্ষমতার অপব্যবহার। সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদের হেয় করিবার ঘৃণিত প্রচেষ্টা। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বাঙ্গালার গভর্ণর ইহার অনুমোদন করিলেন। সাম্প্রদায়িক সুবিধার জন্য এই ছুটি তাঁহার নাকচ করিবার পূর্ণ ক্ষমতা ছিল, এবং ইহাই তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। জনসাধারণের মনে যদি তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা অথবা অবিশ্বাস জন্মে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। তিনি নিজেই ইহার জন্য দায়ী।

এই ছুটির প্রতিবাদে ১২ই আগষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে কংগ্রেস দল এক মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাহেন, কিন্তু ডেপুটি স্পীকার তাহাতে সম্মতি দেন না। এমন কি, এই প্রস্তাবের সমর্থনে যে বক্তৃতা দেওয়া হয়, তাহা পর্য্যন্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। কেন? বোধ হয় অকাট্য যুক্তির সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া অসম্ভব বলিয়া।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের স্বরূপ সম্বন্ধে খাজা নাজিমুদ্দীন যাহা বলেন, তাহাও প্রণিধানযোগ্য—"আমরা অহিংস নহি, বাঙ্গালার মুসলমানকে আর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রূপ বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।" ইহাকে শান্তিপূর্ণ বাণী বলিয়া ভুল করিবার কোন অবকাশ নাই। তথাপি ছুটি নাকচ হইল না।

এই সম্পর্কে বাঙ্গালার অন্যতম সচিব মিষ্টার মহম্মদ আলী বলেন যে, "সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ অনিবার্য্য বলিয়াই সরকার ছুটী ঘোষণা করিয়াছেন। মিষ্টার সুরাবর্দ্দী মুসলিম লীগের অনুগত, সেই লীগ হরতাল ঘোষণা করিলে তিনিও হরতাল ঘোষণা করিতে বাধ্য।" সবই ঠিক। কিন্তু সেই জন্য তিনি সরকারী ছুটি ঘোষণা করিবার অথবা লীগ-বহির্ভূত ব্যক্তিদের হরতাল করিতে বাধ্য করিবার অধিকার রাখেন না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দাঙ্গা অনিবার্য্য জানিয়াই ছুটী ঘোষণা করা হইয়াছিল এবং এই হত্যা, লুণ্ঠন প্রভৃতির জন্য বাঙ্গলার সচিবসঙ্ঘ, বিশেষ করিয়া প্রধান সচিব দায়ী।

ব্যবস্থাপক সভায় ১৫ই আগষ্ট এই ছুটি সম্পর্কিত আলোচনায় মিষ্টার সুরাবর্দ্দী বলেন, এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম পাকিস্থানবিরোধী সকলেরই বিরুদ্ধে। য়ুরোপীয় দলের নেতা মিষ্টার মার্গ্যান বলেন যে, তাঁহাদের মতে সরকার এই ছুটি ঘোষণা করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দেন নাই। ইহাতে হাঙ্গামার সম্ভাবনা বাড়াইয়া তোলা হইয়াছে। কিন্তু এই আপত্তি সত্ত্বেও তাঁহাদের সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিতে সাহস হয় নাই। এ কাপুরুষতা অমার্জ্জনীয়। 'মুখে এক মনে আর এক' এই জন্যই য়ুরোপীয়রা ভারতবাসীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস অথবা সৌহৃদ্য আজও অর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

১৬ই আগষ্ট এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। প্রাতঃকাল হইতেই বিভিন্ন অঞ্চলের লীগপন্থী মুসলমানেরা দলে দলে লাঠি, ছোরা, বল্লম, লৌহদণ্ড, সড়কি, সোডার বোতল ইত্যাদি লইয়া 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান' ধ্বনি করিতে করিতে কলিকাতার রাজপথে বাহির হইয়া পড়িল। অক্টারলনি মনুমেণ্টের নিম্নে এক সভা হয় এবং বহু উত্তেজনাপূর্ণ হিন্দু ও কংগ্রেস-বিরোধী বক্তৃতা চলে। ফলে দাঙ্গার সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হইয়া যায়। প্রধান মন্ত্রীও সেই সভায় এক বক্তৃতা দেন লীগের একান্ত অনুগত ভক্ত হিসাবে। ফিরিবার পথে তাহারা পাকিস্থান-বিরোধী হিন্দু-মুসলমানদের দোকান-পাট এক রকম জোর করিয়াই বন্ধ করিয়া দেয় ও হরতাল পালন করিতে বাধ্য করে। আপত্তি করিলেই হত্যা ও লুণ্ঠন চলে। দেখিতে দেখিতে রাজধানী গুণ্ডারাজ্যে পরিণত হয়। পুলিশ সম্পূর্ণ ভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে। কোথায় দর্শক, কোথায় অংশীদার হিসাবে তাহারা ছুটিয়া বেড়ায়। বাধা দিবার জন্য কোন চেষ্টাই করে না। তাহাদের সম্মুখেই বেপরোয়া লুঠতরাজ, নৃশংস নরহত্যা, নির্ম্মম অগ্নিসংযোগ কার্য্য চলিতে থাকে। মির্জ্জাপুর, হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, রাজাবাজার, মাণিকতলা, গড়পার, চিৎপুর, ধর্ম্মতলা, ওয়েলেসলী, ওয়েলিংটন, খিদিরপুর, মেটেবুরুজ ইত্যাদি অঞ্চলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠে। পথে পথে মৃতদেহ, দোকান-ঘর ভস্মীভূত, বুকফাটা আর্ত্তনাদ আর গুণ্ডাদের বীভৎস উল্লাস। সমস্ত প্রকার যান-বাহন এমন কি হাওড়া, শিয়ালদহের লোকাল ট্রেণ চলাচল পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়।

স্বতঃই প্রশ্ন জাগিতে পারে, এই সময় শান্তি ও শৃঙ্খলা-দপ্তরের কর্ত্তা প্রধান সচিব মিষ্টার সুরাবর্দ্দী অথবা নগরের শান্তিরক্ষক পুলিশ কমিশনার কি করিতেছিলেন? প্রকাশ, তিনি লাল বাজারের কণ্ট্রোল রুমে বসিয়াছিলেন, কিন্তু কি কণ্ট্রোল করিতেছিলেন? এক পুলিশের কার্য্যে বাধা দান ছাড়া আর কিছু করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বার বার প্রশ্ন করিয়াও কণ্ট্রোল-রুমে কি কারণে গিয়াছিলেন?—তাহার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নাই। এখন তিনি বলিতেছেন, পুলিশকে সক্রিয় করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু পুলিশ কমিশনর কোনরূপ তৎপরতা দেখান নাই। আমাদের বক্তব্য এই যে, পুলিশ যখন তাঁহার কথা অমান্য করিয়াছে তখন সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার পদত্যাগ করা উচিত ছিল। শান্তি ও শৃঙ্খলা-দপ্তর আগলাইয়া ক্ষমতাহীন প্রধান সচিবের আসন কামড়াইয়া পড়িয়া থাকা উচিত ছিল না। কিন্তু ক্ষমতা ও অর্থের মোহ ত্যাগ করিবার জন্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য যে সৎসাহস ও বীরত্বের প্রয়োজন, মিষ্টার সুরাবর্দ্দীর বোধ হয় তাহা নাই। পুলিশ কমিশনর বলিতেছেন যে, তিনি তখনই প্রধান সচিবকে বলিয়াছিলেন যে, কলিকাতায় দাঙ্গা যে ভীষণ এবং ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে তিনি পুলিশ দ্বারা শান্তি ফিরাইয়া আনিতে অক্ষম। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, পুলিশ সংখ্যায় পর্য্যাপ্ত নহে, অবিলম্বে সামরিক সাহায্য লওয়া প্রয়োজন। কাহার দোষ তাহা বিচার করিতে আমরা বসি নাই। কোন্ পক্ষ প্রথমে আঘাত করিয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবারও চেষ্টা করিতেছি না। আমরা কেবল এইটুকুই বলিতে চাহি যে, প্রধান সচিবের দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য জ্ঞানের অভাবে এবং কর্ত্তব্য পালনে গাফিলতীর জন্য কলিকাতায় এই ভীষণ হত্যালীলা, লুঠতরাজ হইয়াছে।

১৬ই আগষ্ট সমস্ত দিন এই অরাজকতা চলে, যাহাতে প্রাণের ও ধন-সম্পত্তির কোন মূল্যই থাকে না। সেই দিনের মৃত্যু-সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব; তবে জানা যায় যে, ১৬১ জন ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছে। মুসলমান-প্রধান পল্লীতে হিন্দুদের নৃশংস ভাবে হত্যা,

নির্ম্মম ভাবে গৃহ ধ্বংস করা হইতে থাকিলে হিন্দু যুবকেরা বিপন্নদের উদ্ধার করিবার জন্ম দলবদ্ধ হয়। হিন্দুরা স্বপ্নেও ভাবে নাই যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম গুণ্ডামীরই নামান্তর। ফলে প্রথম দিকটায় তাহারা বিস্মিত, স্তম্ভিত এবং কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়ে। লীগের অভিযোগ—হিন্দুদের আত্মরক্ষার চেষ্টা করা উচিত হয় নাই। অবাধ হত্যা ও লুণ্ঠন কার্য্যে বাধা পাইয়া তাহারা ক্ষেপিয়া উঠে ও প্রচার করিতে থাকে, হিন্দুরা মারপিট করিতেছে। দায়িত্ব-জ্ঞানহীন লীগ অনুগত পুলিশের বহু উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী গুণ্ডাদের অভিযোগ স্বীকার করিয়া লন এবং তদনুযায়ী প্রতিকার-প্রচেষ্টাও করেন। আত্মরক্ষা যে পাপ, এবং সেই পাপের জন্ম সাজা পাইতে হয়, অথচ যাহারা আক্রমণ করে তাহারা পাপীও নহে, সুতরাং সাজাও পাইতে পারে না, ইহা এই প্রথম দেখিলাম। বোধ হয় ইহা একমাত্র লীগ-মন্ত্রীদল শাসিত বাঙ্গালা দেশেই সম্ভব।

দ্বিতীয় দিবসেও এই কাণ্ডজ্ঞানহীন হত্যা ও লুঠতরাজ চলিতে থাকে। প্রকাশ যে, সেই দিন হতের সংখ্যা দুই শতাধিক এবং আহতের সংখ্যা দেড় সহস্রাধিক। পুলিশের তৎপরতা পূর্ব্ববৎ শিথিল থাকে। হিন্দুদের আত্মরক্ষার চেষ্টায় মুসলমান নিহত হয় নাই এ কথা বলা যায় না, তবে মুসলমান গুণ্ডাদের মত নৃশংস হত্যা, নিরীহ অধিবাসীদের গৃহে অগ্নিসংযোগ অথবা রমণীদের উপর পাশবিক অত্যাচার সম্ভব নয়। কারণ, আত্মরক্ষা আক্রমণ নহে। তাহা ছাড়া এই বিপর্য্যয়ের জন্ম লীগ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। হিন্দুরা ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানিত না।

শুনা যায়, এই জন্ম বাহির হইতে গুণ্ডা ও অস্ত্রাদি আমদানী করা হইয়াছিল। আলিগড় হইতে প্রেরিত অস্ত্রপূর্ণ বহু বাক্স বিভিন্ন স্থানে ধরা পড়িয়াছে। এই হাঙ্গামার জন্ম বহু দিন হইতে কলিকাতায় তোড়-জোড় চলিতেছিল। লক্ষ লক্ষ গুণ্ডা লরী যোগে আনা হইয়াছিল। ছোরা, লাঠি, বন্দুক, পেট্রল ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখা ছিল। শহরে ১৪৪ ধারা ও সান্ধ্য আইন ১৭ই আগষ্ট জারী করা হয়। কোন কোন স্থানে মিলিটারী পাহারাও বসান হয় কিন্তু সময়োপযোগী সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই। ফলে অরাজকতা পূর্ণমাত্রায় চলিতে থাকে। তৃতীয় দিন রবিবারেও অবস্থা অপরিবর্ত্তিত থাকে, তবে অগ্নিসংযোগ কিছু কম হয়। রবিবারে সামরিক বাহিনী খুব কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করায় অবস্থাটা কিছু পরিমাণ আয়ত্তাধীন হয়। অনেক স্থলে উন্মত্ত জনতার উপর গুলী বর্ষণের ফলে বেশ কিছু লোক প্রাণ হারায়।

মাত্র প্রথম তিন দিনের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় মৃত্যু-সংখ্যা পাঁচ শতেরও অধিক এবং আহতের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন হাজার। এই তিন দিনে ফায়ারব্রিগেড বারো শতেরও অধিক স্থানে অগ্নিনির্ব্বাণের জন্ম যায়। যত 'কল' পাইয়াছিল, তাহার এক-তৃতীয়াংশ স্থানেও তাহারা যাইতে পারে নাই। পোষ্ট আফিস, টেলিফোন, যানবাহন, দোকানপাট সমস্তই বন্ধ থাকে। রেশনের ও দুগ্ধ তরিতরকারীর অভাবে লোকেদের জীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠে। হাসপাতালে রোগী ঔষধ ও পথ্য অভাবে মৃত্যু বরণ করে।

এক এক সময় আমাদের মনে হয়, বোধ হয় ১৬ই আগষ্ট ছুটী ঘোষণা না করিলে ব্যাপারটা এত দূর গড়াইত না। লীগ-গুণ্ডারা দেখিল বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ লীগদলের, এবং সরকারী ছুটি ঘোষণায় মনে করিল, সরকার তাহাদের সহায়। সুতরাং তাহাদের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে তাহারা পারে। ফলে তাহাদের দুঃসাহস অত্যধিক বাড়িয়া গেল। তাহার উপর খাজা সাহেবের বাণী—'মুসলিম লীগ অহিংসক নহে'—ইন্ধনের কার্য্য করিল। তাঁহাদের কার্য্যের যে এই পরিণতি হইবে, সে কথা বুঝিবার ক্ষমতা সচিবসঙ্ঘের নিশ্চয়ই ছিল। তাঁহারা ইহাও জানিতেন যে, সংঘর্ষ অনিবার্য্য। এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মিষ্টার সুরাবর্দ্দী খাদ্য-সচিব থাকিতে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ হয় তাহার প্রভাব বাঙ্গালা আজ পর্য্যন্ত কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। এইবার আইন ও শৃঙ্খলার সচিব হিসাবে এই কলঙ্কময় দাঙ্গা। দুর্ভিক্ষও তাঁর অব্যবস্থার জন্ম, এই দাঙ্গার কারণও তাঁহার অব্যবস্থায়। তাই ভগবানকে জিজ্ঞাসা করি—আর কত দিনে—কত দিনে বাঙ্গালা দেশ এই রাহুমুক্ত হইবে।

শুধু দায়িত্বহীনতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তিনি নিবৃত্ত হন নাই, অপপ্রচারের চূড়ান্ত দেখাইয়াছেন। শুক্রবার সমস্ত দিন ধরিয়া নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও বেপরোয়া লুঠতরাজ চলিতে থাকে। রাত্রিকালে মিষ্টার সুরাবর্দ্দী বলেন—'অবস্থার উন্নতি হইয়াছে।' অথচ বাঙ্গালা সরকারের বিবৃতিতে প্রকাশ—'সে রাত্রে অবস্থার কোন অনুভবযোগ্য উন্নতি সাধিত হয় নাই এবং ১৭ই প্রভাতেই অবস্থা আরও শোচনীয় হয়।' এই ধরণের নির্জ্জলা মিথ্যা ভাষণ বোধ হয় একমাত্র মিষ্টার সুরাবর্দ্দীতেই সম্ভবে।

শুক্রবার হইতে মঙ্গলবার পর্য্যন্ত এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড চলিতে থাকে। রাজপথে শব—শকুন, কাক, কুকুর শবের গলিত মাংস ভক্ষণ করিতেছে। অলিতে গলিতে, ময়লার গাদায়, ড্রেনে, গঙ্গায়, খালে, সর্ব্বত্র মৃতদেহ, বাতাস দুর্গন্ধ-দূষিত। কলিকাতাবাসী স্তম্ভিত আতঙ্কিত। এ বীভৎস দৃশ্য বোধ হয় কোন দেশে কেহ কখনও দেখে নাই। এই ধরণের চূড়ান্ত অরাজকতা জগতে দুর্লভ।

বিলাতের 'টাইমস' পত্রও এই অবস্থার জন্ম মুসলিম লীগ সচিবমণ্ডলীকে দায়ী করিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন যে, হিন্দুরা সরকার এবং পুলিশ হইতে কোনরূপ সাহায্য না পাইয়া বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার কার্য্য নিজেদের হাতে লয়।

লোকের ধন-প্রাণ, এবং দেশের শান্তিরক্ষার চূড়ান্ত অক্ষমতা এবং অযোগ্যতা নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হইবার পরও, এবং বাঙ্গালায় এক মুসলিম লীগ ছাড়া সকল শ্রেণীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও বাঙ্গালার গভর্ণর কেন যে সচিবসঙ্ঘকে সরাইয়া ৯৩ ধারা প্রয়োগ দ্বারা শাসন-ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন না, তাহা বোঝা শক্ত। সরান দূরে থাক তাঁহাদের কোন কার্য্যে বাধা পর্য্যন্ত প্রদান করেন নাই। যাঁহারাই লীগের নির্দ্দেশ না মানিয়া স্বাধীন ও সুষ্ঠুভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন, লীগ সচিবসঙ্ঘ তাঁহাদের তখনই সরাইয়া লীগভক্তদের সেই স্থানে মোতায়েন করিয়াছেন। কলিকাতা পুলিশে উত্তর ও দক্ষিণ উভয় বিভাগেই দুই জন মুসলমান নিয়োগ করার উদ্দেশ্য কি অত্যন্ত সুস্পষ্ট নহে?

অবস্থা চরম সীমায় পৌঁছিবার পরও শান্তিরক্ষার জন্ম সামরিক সাহায্য লওয়া হয় নাই, পুলিশকে প্রস্তুত থাকিতেও বলা হয় নাই। অথচ মিষ্টার সুরাবর্দ্দী ও তাঁহার সমর্থকেরা বলেন যে তিনি লাল বাজারের কন্‌ট্রোল-রুমে বসিয়া তিন দিন ধরিয়া আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কিসে শান্তিরক্ষা হয় তাহার ব্যবস্থা করিতেছিলেন।

অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন যে, তিনি পুলিশকে নিষ্ক্রিয় থাকিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। এমনও শোনা গিয়াছে যে, কেবল মুসলমান পুলিশদের উপরেই শান্তিরক্ষার ভার অর্পণ করা হইয়াছিল। মুসলমান দারোগাদের পক্ষপাতিত্বের কথা কানে আসিয়াছে। কোন এক থানার পাশের বাড়ী হইতে মুসলমানরা গুলী বর্ষণ করিয়া কয়েক জন হিন্দুকে আহত করিয়াছে, কিন্তু দারোগা তাহাদের গ্রেপ্তার করিবার অথবা অস্ত্র কাড়িয়া লইবার কোন চেষ্টাই করেন নাই, এ খবরও পাওয়া গিয়াছে। অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, লীগ-গুণ্ডারা আক্রমণ করিবার পর যখন হিন্দুরা আত্ম-রক্ষার্থ তাহাদের তাড়া করিয়াছে, তখন তাহারা থানায় আশ্রয় লইয়াছে। দারোগা দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের আশ্রয় দিয়াছেন এবং হিন্দুদের গ্রেপ্তার করিয়াছেন। এ দয়া যে তাঁহারা হিন্দুদের উপর কখনও দেখান নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা ঘুরিয়া দেখিয়াছি, অধিকাংশ স্থলেই লুণ্ঠিত দোকান, অথবা ভস্মীভূত গৃহ হিন্দুদের। হিন্দুরা নিশ্চয়ই নিজেরা তাহা করিয়া লীগগুণ্ডাদের নামে দোষারোপ করিতেছে না। পার্ক সার্কাস, ধর্ম্মতলা, চৌরঙ্গী ইত্যাদি বহু স্থানে হিন্দুদের দোকান, গৃহ লুণ্ঠিত, ভস্মীভূত, কিন্তু মুসলমানের দোকানে অথবা গৃহে আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগে নাই। লীগের সভাপতি এবং 'আজাদ'-পত্রের স্বত্বাধিকারী মৌলানা আক্রম খাঁর চোখের সামনে তাঁহার হিন্দু-বন্ধুর গৃহ লুণ্ঠিত হইল, অধিকাংশ অধিবাসীদের নৃশংস-ভাবে হত্যা করা হইল। কিন্তু তিনি বিশেষ কিছু করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায় নাই। অথচ গুণ্ডাদের আক্রমণের পূর্ব্বে তিনি বন্ধুকে আশ্বাস ও অভয় দিয়াছিলেন। উত্তর-কলিকাতায় তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনর মিষ্টার খোন্দকারের পক্ষপাতিত্বের কথা লিখিবার প্রবৃত্তি হয় না।

এক জন লীগ-গুণ্ডার নিকট প্রধান সচিবের স্বাক্ষরযুক্ত পেট্রল কুপন পাওয়া যায়। ইহাও শুনা গিয়াছে যে, মিষ্টার সুরাবর্দ্দী লীগের ব্যবহারের জন্য পেট্রল চাহিলে এক জন রাজকর্ম্মচারী তাহাতে আপত্তি করেন। প্রধান সচিব নিজের ক্ষমতায় হুমকি দেন, তাহাতেও সেই দায়িত্বশীল কর্ম্মচারী এই ধরণের দলীয় কাজের জন্য পেট্রল দিতে অস্বীকার করেন। তখন মিষ্টার সুরাবর্দ্দী 'রিলিফ' কাজের জন্য পেট্রল চান, কর্ম্মচারীটি তাহা 'স্যাংশন' করিতে বাধ্য হ'ন। অবশ্য কোন্ কাজে সেই পেট্রল ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা একমাত্র প্রধান সচিবই বলিতে পারেন।

গত ২৫শে আগষ্ট শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু-প্রমুখ কংগ্রেসী নেতাদের অনুরোধে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল নিজে আসিয়া কলিকাতার পর্য্যুদস্ত স্থানগুলি প্রদর্শন করেন এবং বহু জনের বক্তব্য শোনেন। টেরেটী বাজারের ধ্বংসলীলা দেখিয়া তিনি বলেন যে, লালবাজারের এত সন্নিকটে এই ধরণের কাণ্ড হইতে পারে তাহা তিনি সচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। শরৎ বাবু তাঁহার নিকট বাঙ্গালার গভর্ণরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে তিনি মিষ্টার সুরাবর্দ্দীর সঙ্গে যাইয়া মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা দেখিয়া আসেন, অথচ তাঁহার (শরৎ বাবুর) সহিত কোন স্থানে যাইতে রাজী হন না। গভর্ণরের পক্ষে এ পক্ষপাতিত্ব অমার্জ্জনীয়।

দাঙ্গার পর মাস খানেক কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু অতর্কিতে গোপনে ছুরি মারা এখনও বন্ধ হয় নাই। ২।৪টি করিয়া প্রত্যহই চলিতেছে। ৫ই সেপ্টেম্বর ৩ জন নিহত এবং ২৫ জন আহত হয়। সহরের আতঙ্ক এবং চাঞ্চল্য এখনও দূর হয় নাই। ২৩শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ৯ জন হত এবং ৬২ জন আহত হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে বেপরোয়া মার-পিট এবং যথেচ্ছ ছোরাছুরি চলে। জনতার উপর পুলিশ দুইবার গুলী বর্ষণ করে এবং বহু স্থানে কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করিতে হয়। লালবাজারের সন্নিকটস্থ লাল-দীঘিতে একটি মৃতদেহ ভাসমান অবস্থায় দেখা যায়। ২৪শে সেপ্টেম্বর পার্ক সার্কাস অঞ্চলে ট্রামযাত্রীদের উপর লীগ-গুণ্ডারা আক্রমণ করে। আঘাতের ফলে হাসপাতালে এক জনের মৃত্যু হয়। সহরের বিভিন্ন স্থানে মোট ছুরিকাহতের সংখ্যা ১১ জন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সর্ব্বত্র প্রথম আক্রমণ মুসলমানেরাই করিতেছে। এই দুঃসাহসের কারণ বাঙ্গালার মুসলিম লীগ সচিব-মণ্ডলী এবং তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক বাঙ্গালার গভর্ণর।

বড়লাট কলিকাতার দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্পর্কে এক তদন্ত কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব করেন। কিন্তু বাঙ্গালায় লীগ-মন্ত্রিত্ব বজায় থাকিতে সেই কমিশন কত দূর নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করিতে পারিবেন তাহা বলা শক্ত। যিনি প্রধানত দায়ী তিনিই যদি প্রধান মন্ত্রীর গদীতে আসীন থাকেন, তাহা হইলে নিরপেক্ষ বিচার সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া বোধ করি অন্যায় নয়।

মুসলিম লীগ যে তীব্র হলাহল উদ্‌গিরণ করিয়া সারা ভারতের, বিশেষতঃ বাঙ্গালার দেহ জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছে, তাহার কুফল হইতে বাঙ্গালী হিন্দুকে কেমন করিয়া রক্ষা করা যায়, তাহা লইয়া চারি দিকেই আলোচনা চলিতেছে। বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গালী হিন্দু সংখ্যালঘিষ্ঠ দল মাত্রে পরিণত হইয়া একেবারে অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টে হিন্দুর স্থান নাই। মুসলিম লীগের নেতারা এখানে একাধারে পাকিস্থানী নীতির পাণ্ডা ও সরকারী শান্তিরক্ষক। যাঁহারা সাপ হইয়া কামড়াইতেছেন, তাঁহারাই আবার ওঝার রূপ ধরিয়া বিষ ছাড়াইবার ভাণ করিতেছেন। ফলে দাঙ্গা-হাঙ্গামার আর শেষ নাই। কলিকাতার দূষিত আবহাওয়া মফঃস্বলের ভিন্ন ভিন্ন সহরে ও গ্রামে ছড়াইয়া পড়িতেছে। অচিরে মুসলিম লীগের মনোবৃত্তির যে পরিবর্ত্তন হইবে সে সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। অধিকন্তু বাঙ্গালার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে দুই-চারি জন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা ছিলেন, তাঁহারাও ক্রমশঃ ভয়েই হউক আর ভক্তিতেই হউক লীগের দলে গিয়া যোগ দিতেছেন।

দিন দিন বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে নির্ব্বিঘ্নে জীবনধারণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালায় বৃটিশ শাসনকর্ত্তা বা বৃটিশ জাতিভুক্ত রাজ-কর্ম্মচারীরা যে ভেদনীতির প্রশ্রয় দিয়া আপনাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখিতে ব্যস্ত, এরূপ মনে করিবার অনেক কারণ ঘটিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালার বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে যে দেশে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিবে তাহা মনে করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন, গণ-পরিষদে যখন সারা ভারতের জন্য নূতন শাসন-প্রণালী রচিত হইবে তখন সাম্প্রদায়িক পৃথক্ নির্ব্বাচন-প্রথা, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যবস্থা দ্বারা বাঙ্গালা দেশে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট হিন্দুদের প্রভাব খর্ব্ব করিয়াছেন, সেই সমস্ত ব্যবস্থাগুলি পরিবর্ত্তিত হইবে, এবং বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবৃন্দ সমবেত ভাবে এ দেশের শাসন-কার্য্য পরিচালনা

করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিশ্বাস ও প্রীতি ফিরাইয়া আনিবেন। কিন্তু মুসলিম লীগের বর্ত্তমান মনোভাব যে অদূর ভবিষ্যতে পরিবর্ত্তিত হইবে তাহা মনে করিবার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাইতেছি না। বিশেষতঃ বৃটিশ মন্ত্রীমিশন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে পাকিস্থান গঠনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, নিবিষ্ট-চিত্তে তাহা পাঠ করিলে ভবিষ্যতের সব আশাই লোপ পায়। সেই প্রস্তাব কংগ্রেস মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন; সুতরাং গণ-পরিষদেও বাঙ্গালা ও আসামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান প্রতিনিধিরাই যে এই প্রদেশগুলির শাসন-ব্যবস্থা রচনা করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই পৃথক নির্ব্বাচন-প্রথা ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিবার কোন সম্ভাবনাই গণপরিষদের মধ্যে নিহিত নাই।

বাঙ্গালার মুসলিম লীগ সমগ্র বাঙ্গালা দেশকে পাকিস্থানে পরিণত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প; এবং তাঁহারা যদি কৃতকার্য্য হন তাহা হইলে ভবিষ্যতে যে বাঙ্গালা দেশ হইতে হিন্দু-সংস্কৃতি লোপ পাইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এক্ষেত্রে বাঙ্গালী হিন্দুর সংস্কৃতি বাঁচাইবার উপায় কি?—এ প্রশ্ন অনেকের মনেই উদয় হইয়াছে। সুদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালার রূপ কেমন দাঁড়াইবে সে আলোচনা করিয়া আপাততঃ কোন লাভ নাই। যাহারা শক্তিমান তাহারাই যে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। কাজেই যাঁহারা বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্ম্ম, সাধনা ও সংস্কৃতি মূল্যবান বলিয়া মনে করেন, বর্ত্তমানে কি উপায় অবলম্বন করিলে বাঙ্গালী হিন্দুকে শক্তিমান করিয়া তুলিতে পারা যায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

সুস্থ-মস্তিষ্ক হিন্দু ও মুসলমান নেতারা যদি সম্মিলিত ভাবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের স্বরূপ জনসাধারণের নিকট উদ্ঘাটিত করেন এবং যাহাতে দুই সম্প্রদায় একত্রে শান্তি পূর্ণভাবে জীবন-যাপন করিতে পারে সেই নির্দ্দেশ দেন, তবেই জাতির মঙ্গল। হিন্দুরা মুসলমানদের অথবা মুসলমানরা হিন্দুদের বাদ দিয়া বাঙ্গালা দেশে থাকিতে পারিবে না। পরস্পরের স্বার্থ ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। এই 'Divide and Rule' পলিসি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য, সে কথা ভুলিলে চলিবে না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে আমরা তাহাদের হস্তের ক্রীড়নক হইয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরাই করিতেছি।

অন্তর্বর্ত্তী সরকার

২রা সেপ্টেম্বর ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত জওহরলালের নেতৃত্বে জাতীয় সরকার গঠিত হইয়াছে। এই অন্তর্বর্ত্তী সরকারের সদস্যরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের 'খয়েরখাঁ'দের দল নহেন, তাঁহাদের মনস্তুষ্টি করিয়া এই পদ লাভ করেন নাই। ইঁহারা ভারতের মুক্তিকামী সৈনিক, সাম্রাজ্যবাদের ঘোরতর বিরোধী। অনেকেরই জীবনের অধিকাংশ সময় বৃটিশ সরকারের নিগ্রহ সহ্য করিয়া কারাকক্ষে কাটিয়াছে। কেহই বৃটিশের কৃপাপ্রার্থী নহেন। অনুগ্রহ তাঁহারা ঘৃণা করেন। অধিকার তাঁহারা অর্জ্জন করিয়া লইয়াছেন, অশেষ দুঃখ সহ্য করিয়া, বহুবিধ আত্মত্যাগের দ্বারা। দুই-তিনটি বিশেষ বিভাগ ব্যতীত, সকল বিভাগের শাসন-ভারই এই সরকারের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের লইয়া সরকার গঠিত হইয়াছে—

(১) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু—পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ রিলেসন্স
(২) ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ —কৃষি ও খাদ্য
(৩) সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল —স্বরাষ্ট্র, বেতার ও প্রচার
(৪) মিষ্টার আসফ আলি —যান-বাহন
(৫) শ্রীযুক্ত সি, রাজাগোপালাচারী—শিল্প ও সরবরাহ
(৬) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু —খনি, কারখানা ও বিদ্যুৎ
(৭) সর্দ্দার বলদেব সিংহ —দেশরক্ষা
(৮) ডক্টর জন মাথাই —অর্থ
(৯) স্যার সাফাৎ আমেদ খাঁ —স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও চারুকলা
(১০) সৈয়দ আলি জহীর —আইন, ডাক ও বিমান
(১১) শ্রীযুত জগজীবন রাম —শ্রম
(১২) মিষ্টার সি, এইচ, ভাবা —বাণিজ্য

পরে আরও দুই জন মুসলমান সদস্য গ্রহণ করা হইবে।

কংগ্রেসের অন্তর্বর্ত্তী সরকারের শাসন-ভার গ্রহণে ভারতব্যাপী আনন্দোল্লাস প্রবাহিত হয়। গৃহে গৃহে জাতীয় পতাকা উড্ডীন হয়। কেবল মুসলিম লীগ-অন্তর্গত মুসলমানগণ কৃষ্ণ পতাকা তুলিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। জগতের প্রত্যেক স্থান হইতে আসে শুভেচ্ছার বাণী, কিন্তু নিজ দেশের লীগপন্থীদের নিকট হইতে আসে প্রতিবাদ। যাহার ফলে বোম্বাই শহরে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আরম্ভ হয়।

কেবল শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া ক্ষান্ত হইবার পাত্র মুসলিম লীগ নহে। অন্তর্বর্ত্তী সরকারের সদস্য হিসাবে স্যার সাফাৎ আমেদ খাঁর নাম ঘোষিত হইলে সেই দিনই সন্ধ্যায় তিন জন মুসলমান তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ছুরিকাঘাত করে। কিছু দিন পূর্ব্বে রাজাজীর মোটরে গুলী বর্ষিত হয়। অন্তর্বর্ত্তী সরকারের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিবার কালে রাষ্ট্রপতি বলেন—"ভারতের স্বাধীনতাই আমাদের জীবন-স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্নই আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। আজ সেই স্বাধীনতা আমাদের সমাধিক নিকটবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার এই ব্রত পূর্ণাঙ্গ করিতে আমরা যেন সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হই। অন্তর্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্টের অধিনায়ক-স্বরূপে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ আজ যে কর্ত্তব্য-ভার স্কন্ধে লইলেন, আমরা তাহার গুরুত্ব সম্যক্ ভাবেই উপলব্ধি করিতেছি; বস্তুতঃ ভারতবর্ষ সত্যকার স্বাধীনতা এখনও লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। সম্মুখে অনেক প্রতিকূলতা রহিয়াছে এবং সে প্রতিকূলতা শুধু বাহিরের নয়, ভিতর হইতেও প্রতিকূলতার আশঙ্কা বিশেষ ভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে।" অর্থ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। চার্চিল প্রমুখ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়নক মিষ্টার জিন্না ও মুসলিম লীগ যত রকমে পারিবে ভারতের উন্নতি এবং অগ্রগতির পথে বাধা দান করিবে। তাঁহাদের মধ্যে পত্রালাপ ও চুক্তির কথা আজ সর্ব্বজন-বিদিত। সিন্ধু প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মিষ্টার ইউসুফ আবদুল্লা হারুণ কাশ্মীর মলোটভের কাছে পাকিস্থানের দরবার পেশ করিতে গিয়াছেন। নিজেদের সুবিধার জন্য জাতীয়তা এবং

স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে তাঁহারা মোটেই কুণ্ঠিত নন। ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি বলিয়াছেন,—"কোনরূপ হিংসাত্মক আক্রমণ ও বিদ্বেষের আঘাতে আমরা আমাদের মৌলিক আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইব না। ভারত আজ নূতন পরিবর্ত্তনের পথে চলিয়াছে, কোনরূপ দৌরাত্ম্যই তাহার অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না।"

এই সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে, অন্তর্বর্ত্তী সরকার স্বাধীনতার প্রথম সোপান মাত্র। এক জন ইংরেজ সৈনিকও ভারতে থাকিলে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি মনে করা ভুল হইবে। তাহারা ভারত ত্যাগ করিলেও পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইবে, যদি না ইংরেজদের সৃষ্ট সমস্যাগুলির সমাধান করিতে পারি। তাহাদের শাসনের নামে লুণ্ঠন ও শোষণের পাপের বোঝা আমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইব। তাহার প্রায়শ্চিত্তও আমাদেরই করিতে হইবে।

জিন্না-ওয়াভেল সাক্ষাৎ

মিষ্টার সুরাবর্দ্দী এবং মিষ্টার লিয়াকৎ আলির অনুরোধে লর্ড ওয়াভেল আবার মিষ্টার জিন্নাকে দিল্লীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। প্রথম ১৬ই আগষ্ট এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট ধরিয়া আলোচনা চলে। পরে আরও কয়েক বার তাঁহারা সাক্ষাৎ আলোচনা করেন। এই আলোচনার ভিতরের কথা আমরা জানি না, তবে এইটুকু শুনিয়াছি যে, লীগ অন্তর্বর্ত্তী সরকারে যোগদান করিতে রাজী আছে। তবে কতকগুলি সর্ত্ত আছে। সেই সর্ত্তগুলি কি স্পষ্টতঃ না জানাইলেও অনুমান করিতে কাহারও বিশেষ কষ্ট হইবে না। যত দূর মনে হয় সর্ত্তগুলি এই—প্রথম, লীগ-বহির্ভূত মুসলমান অন্তর্বর্ত্তী সরকারের সদস্য হইতে পারিবে না। দ্বিতীয়, সাম্প্রদায়িক সমস্যা-বিষয়ক প্রশ্নের মীমাংসা মুসলমান সদস্যদের মত লইয়া করিতে হইবে। তৃতীয়, সম্মিলিত দায়িত্বের অবসান। অর্থাৎ কংগ্রেস অগ্রসর হইতে গেলেই লীগ পিছন দিকে টান মারিবে। বৃটিশ-সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির অবসান ঘটাইতে দিবে না।

মিষ্টার জিন্নার অবস্থা এখন অনেকটা উপেক্ষিতা নায়িকার মত। সুর দিব্য কাঁদ-কাঁদ। ভাবটা এই যে, এত করিয়াও নাগরের মন পাইলাম না। সেই দুঃখ জানাইতে তিনি বিলাত পর্য্যন্ত ধাওয়া করিবেন বলিয়া শাসাইতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা যে, তাঁহার মান ভাঙ্গাইবার জন্য কংগ্রেস কতক অধিকার ত্যাগ করুক। কিন্তু তিনি কি ত্যাগ করিবেন সে আভাস মোটেই দেন নাই।

তদন্ত কমিশন

কলিকাতার দাঙ্গা-হাঙ্গামার তদন্তের জন্য এক কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে। এই তদন্ত-কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইয়াছে ভারতের ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার পেট্রিক স্পেন্স, পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মিষ্টার ফজল আলী এবং মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি মিষ্টার বি. সোমায়ার উপর। তদন্তের সুবিধার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি নূতন আইন পাশ করিবার ব্যবস্থা চলিতেছে। এই কমিশনের কার্য্য-সচিব [illegible] হইয়াছেন বাঙ্গালা সরকারের অধীনে চাকুরিয়া মিষ্টার স্যাডলার। তিনি বিজ্ঞাপন দিয়াছেন,—যাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন, তাঁহাদের ২৬শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিবৃতিসহ আপনার নাম, ঠিকানা জাতি প্রভৃতি লিখিয়া কমিশনের দপ্তরে পেশ করিতে হইবে। আইন পাশ করান হইতেছে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ লাভের এবং সাক্ষিগণকে হাজির করিবার সুবিধার জন্য।

লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এই কমিশন বড়লাট নিযুক্ত করেন নাই—কলিকাতার এই দাঙ্গার জন্য যিনি প্রধানতঃ দায়ী সেই মিষ্টার সুরাবর্দ্দীই হলেন কমিশনের নিয়োগকর্ত্তা। তিনি আবার প্রথমেই কমিশনের সভাপতির সহিত সাক্ষাৎও করিয়া আসিয়াছেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ছিল তাঁহারই উপর, এবং কি চমৎকার ভাবে তিনি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাও সকলেই জানেন। তিনি এবং তাঁহার অনুগত দল যতই সাফাই কীর্ত্তন এবং দায়িত্ব অস্বীকার করুন না কেন, জগৎশুদ্ধ লোক জানে কাহারা দোষী। ব্যবস্থা পরিষদে তাঁহার দল সংখ্যাগরিষ্ঠ, অতএব জিত অনিবার্য্য। শ্বেতাঙ্গ বণিক্ সম্প্রদায় স্বার্থসাদ্ধির জন্য লীগ সরকারকেই সমর্থন করিবে কমিউনিষ্টরা তাঁহার দলে। এমন কি, যে তপশীল জাতি লীগ-গুণ্ডাদের হাতে সর্ব্বস্বান্ত হইল, তাহারা লীগের সমর্থক। সুতরাং বাঙ্গালায় তাঁহার মন্ত্রিত্ব এবং লীগের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তাঁহার পরিচালনায় পুলিশ যা তৎপরতা দেখাইয়াছে, তাহাও সর্ব্বজনবিদিত। লুঠের অংশ গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু নরহত্যা বা লুণ্ঠনে বাধাদান করে নাই। পুলিশ কমিশনার দোষ চাপাইয়াছেন প্রধান মন্ত্রীর উপর আর প্রধান মন্ত্রী দোষী করিয়াছেন পুলিশ কমিশনারকে। কিন্তু কমিশনের সম্মুখে চাকুরীর মায়া ত্যাগ করিয়া কমিশনার সাহেব কি মিষ্টার সুরাবর্দ্দীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতে সাহস করিবেন? সুতরাং আসল প্রমাণ কিছুই মিলিবে না। সকলেই এ উহার দোষ ঢাকা দিবে।

মিষ্টার স্যাডলারের পরিচয় নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। তিনি যখন সেক্রেটারী, তখনই কমিশনের স্বরূপ সুপ্রকাশ। ২৬শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তিনি বিবৃতি দাখিল করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু তদন্ত আরম্ভ হইবে প্রায় পক্ষকাল পরে। এই সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া যে বিবৃতির গোপনীয়তা রক্ষা করা হইবে তাহার প্রমাণ কি? সেই বিবৃতির সাহায্য লইয়া যে ডিফেন্সের ব্যবস্থা হইবে না এ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা কি?

লীগ সচিবমণ্ডলী দায়িত্বের যে পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহাতে জনসাধারণের বিশ্বাস এবং আস্থা থাকিবে কি করিয়া? তাহা ছাড়া সরকার পূর্ব্বাহ্ণে সাক্ষীর নাম জানিতে পারিলে লোকের বিপদ হইতে পারে। সন্দেহ অমূলক নহে। বাঙ্গালার সরকারের ব্যবহারেই তা সুস্পষ্ট।

এক মাসের অধিক হইতে চলিল, এখনও সহরে শান্ত অবস্থা ফিরিয়া আসিল না আজও ছুরিকাঘাত লুঠতরাজ চলিতেছে। ১৪৪ ধারা, সান্ধ্য আইন, সামরিক ব্যবস্থা সত্ত্বেও লীগ-গুণ্ডারা এখনও বে-আইনী ভাবে সমবেত হইতেছে। শান্তিরক্ষার নামে বেপরোয়া ভাবে হিন্দুদের গ্রেপ্তার করা হইতেছে। কিন্তু কুখ্যাত গুণ্ডার দলের আড্ডাগুলির উপর পুলিশের তেমন তৎপরতা দেখা যাইতেছে না। লীগকে এখনও যে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইতেছে না কেন, ইহাই আশ্চর্য্য!

অতএব যদি জনসাধারণ মনে করে যে বর্ত্তমান লীগমণ্ডলী অপসারিত না হইলে এ তদন্ত কমিশন প্রহসনে দাঁড়াইবে, তবে তাহাদের আর দোষ কি ?

'শো কজ'

মুসলিম লীগের অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তা রাজা গজনফর আলি খাঁ কলিকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম লক্ষ্য করিয়া লাহোরে ফিরিয়া লীগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পঞ্চবিধ কৌশলের সন্ধান দিয়াছেন। কিন্তু মুস্কিলে পড়িলেন দিল্লীর কাগজওয়ালারা, যাঁহারা এই সন্ধানের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে 'শো কজ' মামলা রুজু করা হইয়াছে। কেন ছাপা হইল এই অপরাধে ? কিন্তু যিনি বলিলেন তাঁহার কোন অপরাধই হইল না। লর্ড ওয়াভেল অথবা অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার এই সম্বন্ধে কি বলেন জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক।

খাদ্য-সমস্যা

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উৎকণ্ঠায় অধিক ক্ষুধার জ্বালা। ভারতে খাদ্য-সমস্যা যে ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার পরিচয় অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের খাদ্য-সচিব রাজেন্দ্রপ্রসাদ সে দিন বেতার বক্তৃতায় জানাইয়াছেন—"দক্ষিণ ও মধ্য-ভারতে ধান ও জোয়ারের উৎপাদন ৩০ লক্ষ টন এবং উত্তর-ভারতে রবিশস্যের উৎপাদন ৪০ লক্ষ টন ক হইয়াছে।" ভারত সরকার গত মার্চ্চ মাসে জানাইয়াছিলেন যে খাদ্যশস্য কম পড়িবে ৬০ লক্ষ টন। এখন তাহা ৭০ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া যুদ্ধের পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ হইতে যে ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য পাওয়া যাইত, তাহাও বন্ধ। সুতরাং মোট ঘাটতি দাঁড়াইবে ৮০ লক্ষ টন। ভারতের বাহির হইতে যদি ৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যও পাওয়া যায় তবুও ৪০ লক্ষ টন কম পড়িবে। তাহার উপায় কি ? এখন অবধি ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টন মাত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে চাউলের পরিমাণ মাত্র ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৪ শত টন।

অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের আন্দোলন ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে চলিতেছে কিন্তু সেই জন্য উৎপাদন যে বৃদ্ধি পাইয়াছে এমন কোন প্রমাণ নাই। এই বৎসর যে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছে, এত কম গত ৫০ বৎসরের ভিতর মাত্র দুই বার ফলিয়াছে। অনাবৃষ্টির জন্যই হউক আর অতিবৃষ্টির জন্যই হউক খাদ্য-সমস্যার পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর। যাভা হইতে ডক্টর শরিয়ার চাউল দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, কিন্তু পাঠাইবার অসুবিধার জন্য আসিতেছে না। সেখান হইতে ৫ লক্ষ টনের মধ্যে মাত্র ১০ হাজার টন পাঠান হইয়াছে। শ্যাম দেশে ১৬ লক্ষ টন চাউল উদ্বৃত্ত কিন্তু তাহাও আনাইবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। আর্জ্জেণ্টিনার নিকট হইতে যে ৩ লক্ষ টন বজরা ক্রয় করা হইয়াছে কোন অজ্ঞাত কারণে তাহাও আটক রাখা হইয়াছে। সুতরাং অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে কেবল বাঙ্গালাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল কিন্তু এইবার সমগ্র ভারতের সমূহ বিপদ সিঙ্গাপুরের সম্মেলনে সেপ্টেম্বরের গোড়ায় ভারতীয় প্রতিনিধি বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালা দেশে এক মাসেরও কম সময়ের উপযোগী চাউল আছে। এক মাস শেষ হইতে চলিল, কিন্তু অবস্থার কিছু উন্নতি হইয়াছে কি ? এদিকে মফঃস্বলে চাউলের দর বাড়িয়াই চলিয়াছে। দিল্লীতে খাদ্য-সম্মেলনে ঘোষণা করা হইয়াছিল রেশনের পরিমাণ হ্রাস করা হইবে না, কিন্তু সে সত্ত্বেও কমাইয়া ১ সের ১২ ছটাক করা হইয়াছে আগামী আমনের ফসল ভাল হইতে পারে, কিন্তু তাহা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে পাওয়া যাইবে না। সুতরাং এই দুই মাসে দেশের অবস্থা যে কি দাঁড়াইবে, তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। যতটুকু বাংলার ভাগ্যে মিলিবে লীগ-সচিবত্বের দৌলতে তাহারও যে সদ্ব্যবহার হইবে সে আশা দুরাশা মাত্র। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং নব দুর্ভিক্ষ, এই দুইয়ের চাপে আমাদের অবস্থা যে কত দূর শোচনীয় হইবে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

মহারাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ

মুর্শিদাবাদ লালগোলার মহারাজা সার যোগেন্দ্রনারায়ণ রাও গত ১লা ভাদ্র পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ১০৫ বৎসর হইয়াছিল। প্রথম জীবন হইতেই তিনি সাহিত্য প্রীতি ও দানশীলতার জন্য সর্ব্বজনের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন। কলিকাতাস্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির তাঁহার দানে নির্ম্মিত ও সমৃদ্ধ।

ভবানীচরণ লাহা

বাঙ্গালার বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ভবানীচরণ লাহা গত ১৭ই ভাদ্র পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৬ বৎসর। কলিকাতার বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটীর 'ফেলো' ও 'রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল'এর সভ্য ছিলেন। অমায়িক ব্যবহার ও শিল্পি-মনের জন্য তিনি সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন।

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতার দাঙ্গায় মুসলমান গুণ্ডার হাত হইতে একটি বালককে রক্ষা করিতে যাইয়া আলিপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, ব্যারিষ্টার মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২শে শ্রাবণ গুণ্ডা-হস্তে নিহত হন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৪ বৎসর হইয়াছিল। তিনি কলিকাতার বিখ্যাত স্ত্রী-চিকিৎসাবিদ্ ডাক্তার বামনদাসের জামাতা। এই ধরণের বীরত্বপূর্ণ আত্মবলিদান আজিকার দিনে দুর্লভ।

ডাঃ হাসান সুরাবর্দ্দী

৩১ ভাদ্র সার হাসান সুরাবর্দ্দী ট্রপিক্যাল মেডিক্যাল স্কুলে পরলোক গমন করেন। তিনি কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং ১৯৩৯—১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারত সচিবের পরামর্শদাতার কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯৩০—১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন।

মনোমোহন সিংহ

২২শে ভাদ্র মেদিনীপুরের বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ী মনোমোহন সিংহ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছিল ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কানুনগো কর্ত্তৃক অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হন।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত
১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।





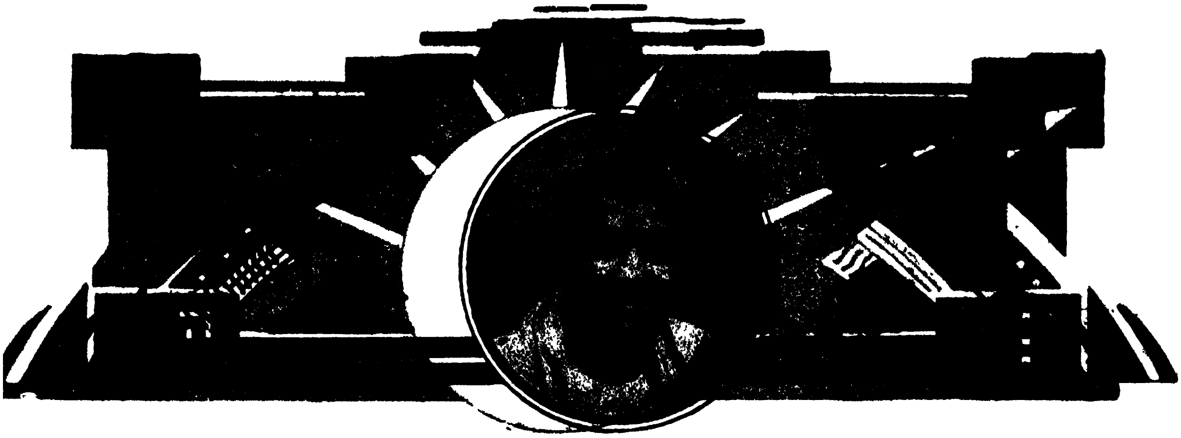
শিল্পী—মোহন দত্তগুপ্ত



নারী
শিল্পী—গোপাল ঘোষ

মাসিক বসুমতী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত



২৫শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩৫৩] [প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা

?

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"কোন একটা কথা বহু লোকে মিলিয়া বহু আস্ফালন করিয়া বলিতে থাকিলেই কেবল বলার জোরেই তাহা সত্য হইয়া উঠে না। অথচ এই সম্মিলিত প্রবল কণ্ঠস্বরের একটা শক্তি আছে এবং মোহও কম নাই। চারিদিক গম গম করিতে থাকে,—এবং এই বাষ্পাচ্ছন্ন আকাশের নীচে দুই কানের মধ্যে যাহা নিরন্তর প্রবেশ করে মানুষ অভিভূতের মত তাহাকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বসে। Propaganda বস্তুত এই-ই। বিগত মহাযুদ্ধের দিন পরস্পরের গলা কাটিয়া বেড়ানোই যে মানুষের একমাত্র ধর্ম ও কর্তব্য, এই অসত্যকে সত্য বলিয়া যে দুই পক্ষের লোকেই মানিয়া লইয়াছিল সে তো কেবল অনেক কলম এবং অনেক গলার সমবেত চীৎকারের ফলেই। যে দুই-একজন প্রতিবাদ করিতে গিয়াছিল, আসল কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের অবধি ছিল না।

কিন্তু আজ আর সেদিন নাই। আজ অপরিসীম বেদনা ও দুঃখভোগের ভিতর দিয়া মানুষের চৈতন্য হইয়াছে যে, সত্য বস্তু সেদিন অনেকের অনেক বলার মধ্যেই ছিল না।

বছর কয়েক পূর্বে, মহাত্মার অহিংস অসহযোগের যুগে এমনি একটা কথা এ দেশে বহু নেতায় মিলিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, হিন্দু-মুসলিম মিলন চাই-ই। চাই শুধু কেবল জিনিষটা ভাল বলিয়া নয়, চাই-ই এই জন্য যে, এ না হইলে স্বরাজ বল, স্বাধীনতা বল, তাহার কল্পনা করাও পাগলামি। কেন পাগলামি একথা যদি কেহ তখন জিজ্ঞাসা করিত, নেতৃবৃন্দেরা কি জবাব দিতেন তাঁহারাই জানেন, কিন্তু লেখায়, বক্তৃতায় ও চীৎকারের বিস্তারে কথাটা এমনি বিপুলায়তন ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য হইয়া গেল যে, এক পাগল ছাড়া আর এত বড় পাগলামি করিবার দুঃসাহস কাহারও রহিল না।

তারপরে এই মিলন ছায়াবাজীর রোশনাই যোগাইতেই হিন্দুর প্রাণান্ত হইল। সময় এবং শক্তি কত যে বিফলে গেল তাহার তো হিসাবও নাই। ইহারই ফলে মহাত্মাজীর খিলাফৎ আন্দোলন, ইহারই ফলে দেশবন্ধুর

প্যাক্ট। অথচ এত বড় ছুটা ভুয়া জিনিসও ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে কম আছে। প্যাক্টের তবু বা কতক অর্থ বুঝা যায়, কারণ, কল্যাণের হোক, অকল্যাণের হোক, সময়মত একটা ছাড় রফা করিয়া কাউন্সিল-ঘরে বাংলা সরকারকে পরাজিত করিবার একটা উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু খিলাফৎ আন্দোলন হিন্দুর পক্ষে শুধু অর্থহীন নয়, অসত্য। কোন মিথ্যাকেই অবলম্বন করিয়া জয়ী হওয়া যায় না। এবং যে মিথ্যার জগদ্দল পাথর গলায় বাঁধিয়া এত বড় অসহযোগ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত রসাতলে গেল, সে এই খিলাফৎ। স্বরাজ চাই, বিদেশীর শাসনপাশ হইতে মুক্তি চাই, ভারতবাসীর এই দাবীর বিরুদ্ধে ইংরাজ হয়তো একটা যুক্তি খাড়া করিতে পারে, কিন্তু বিশ্বের দরবারে তাহা টিকে না। পাই বা না পাই, এই জন্মগত অধিকারের জন্য লড়াই করায় পুণ্য আছে, প্রাণপাত হইলে অন্তে স্বর্গবাস হয়। এই সত্যকে অস্বীকার করিতে পারে জগতে এমন কেহ নাই। কিন্তু খিলাফৎ চাই এ কোন্ কথা? যে দেশের সহিত ভারতের সংস্রব নাই, যে দেশের মানুষে কি খায়, কি পরে, কি রকম তাহাদের চেহারা কিছুই জানি না, সেই দেশ পূর্বে তুর্কির শাসনাধীন ছিল, এখন যদিচ, তুর্কি লড়াইয়ে হারিয়াছে, তথাপি সুলতানকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হউক, কারণ, পরাধীন ভারতীয় মুসলমান-সমাজ আবদার ধরিয়াছে। এ কোন্ সঙ্গত প্রার্থনা? আসলে ইহাও একটা প্যাক্ট। ঘুষের ব্যাপার। যেহেতু আমরা স্বরাজ চাই, এবং তোমরা চাও খিলাফৎ—অতএব এস, একত্র হইয়া আমরা খিলাফতের জন্য মাথা খুঁড়ি এবং তোমরা স্বরাজের জন্য তাল ঠুকিয়া অভিনয় শুরু কর। কিন্তু এদিকে ব্রিটিশ গভমেণ্ট কর্ণপাত করিল না, এবং ওদিকে যাহার জন্য খিলাফৎ সেই খলিফাকেই তুর্কিরা দেশ হইতে বাহির করিয়া দিল। সুতরাং এইরূপে খিলাফৎ আন্দোলন যখন নিতান্তই অসার ও অর্থহীন হইয়া পড়িল, তখন নিজের শূন্যগর্ভতায় সে শুধু নিজেই মরিল না, ভারতের স্বরাজ আন্দোলনেরও প্রাণ বধ করিয়া গেল। বস্তুত এমন ঘুষ দিয়া, প্রলোভন দেখাইয়া, পিঠ চাপড়াইয়া কি স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে লোক ভর্তি করা যায়, না করিলেই বিজয় লাভ হয়? হয় না, এবং কোন দিন হইবে বলিয়াও মনে করি না।

এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি খাটিয়াছিলেন মহাত্মাজী নিজে। এতখানি আশাও বোধ করি কেহ করে নাই, এতবড় প্রতারিতও বোধ করি কেহ হয় নাই। সেকালে বড় বড় মুসলিম পাণ্ডাদের কেহ বা হইয়াছিলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত, কেহ বা বাম হস্ত, কেহ বা চক্ষু কর্ণ, কেহ বা আর কিছু,—হায় রে! এতবড় তামাসার ব্যাপার কি আর কোথাও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পরিশেষে হিন্দু-মুসলমান-মিলনের শেষ চেষ্টা করিলেন তিনি দিল্লীতে—দীর্ঘ একুশ দিন উপবাস করিয়া। ধর্মপ্রাণ সরলচিত্ত সাধু মানুষ তিনি, বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, এতখানি যন্ত্রণা দেখিয়াও কি তাহাদের দয়া হইবে না। সে যাত্রা কোনমতে প্রাণটা তাঁহার টিকিয়া গেল ভ্রাতার অধিক, সর্বাপেক্ষা প্রিয় মিঃ মহম্মদ আলিই বিচলিত হইলেন সবচেয়ে বেশি। তাঁহার চোখের উপরেই সমস্ত ঘটিয়াছিল,—অশ্রুপাত করিয়া কহিলেন, আহা! বড় ভাল লোক এই মহাত্মাজীটি। ইহার সত্যকার উপকার কিছু করাই চাই। অতএব আগে যাই মক্কায়, গিয়া পীরের সিন্নি দিই, পরে ফিরিয়া আসিয়া কল্‌মা পড়াইয়া কাফের ধর্ম ত্যাগ করাইয়া তবে ছাড়িব।

শুনিয়া মহাত্মা কহিলেন, পৃথিবী, দ্বিধা হও।

বস্তুত, মুসলমান যদি কখনও বলে হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।

একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সে দিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুত, অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের পরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোনও সঙ্কোচ মানে নাই।

দেশের রাজা হইয়াও তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই। ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি নামজাদা সম্রাটের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যে আকবর বাদশাহের উদার বলিয়া এত খ্যাতি ছিল, তিনিও কসুর করেন নাই। আজ মনে হয়, এ সংস্কার উহাদের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে। পাবনার বীভৎস ব্যাপারে অনেককেই বলিতে শুনি, পশ্চিম হইতে মুসলমান মোল্লারা আসিয়া নিরীহ ও অশিক্ষিত মুসলমান প্রজাদের উত্তেজিত করিয়া এই দুষ্কার্য করিয়াছে। কিন্তু এমনিই যদি পশ্চিম হইতে হিন্দু পুরোহিতের দল আসিয়া কোন হিন্দুপ্রধান স্থানে এমনি নিরীহ ও নিরক্ষর চাষাভুষাদের এই বলিয়া উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করে যে, নিরপরাধ মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘরে দোরে আগুন ধরাইয়া সম্পত্তি লুঠ করিয়া মেয়েদের অপমান অমর্যাদা করিতে হইবে, তাহা হইলে সেই সব

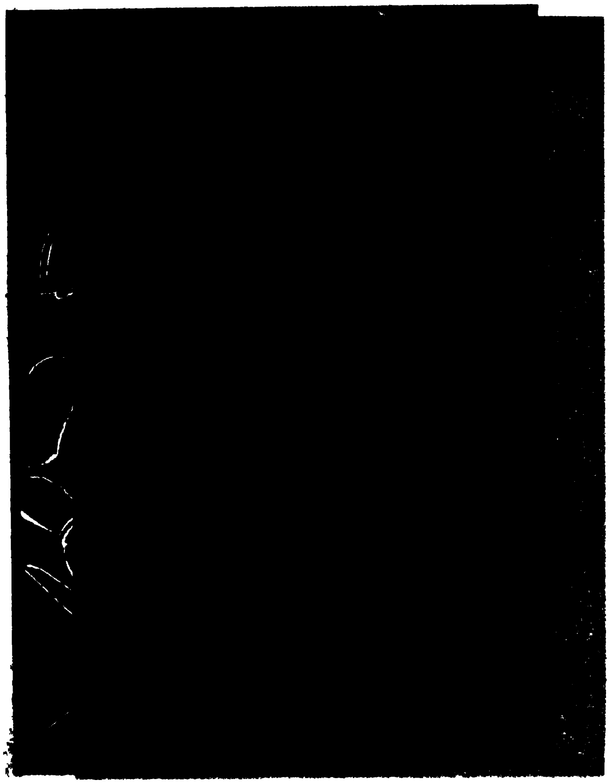
নিরক্ষর হিন্দু কৃষকের দল উহাদের পাগল বলিয়া গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিতে এক মুহূর্তও ইতস্তত করিবে না।

কিন্তু কেন এরূপ হয়? ইহা কি শুধু কেবল অশিক্ষারই ফল? শিক্ষা মানে যদি লেখাপড়া জানা হয়, তাহা হইলে চাষী-মজুরের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের বেশি তারতম্য নাই, কিন্তু শিক্ষার তাৎপর্য যদি অন্তরের প্রসার ও হৃদয়ের কালচার হয় তাহা হইলে বলিতেই হইবে উভয় সম্প্রদায়ে তুলনাই হয় না, হিন্দুনারীহরণ ব্যাপারে সংবাদপত্রওয়ালারা প্রায়ই দেখি প্রশ্ন করেন, মুসলমান নেতারা নীরব কেন? তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যে পুনঃপুনঃ এত বড় অপরাধ করিতেছে, তথাপি প্রতিবাদ করিতেছেন না কিসের জন্য? মুখ বুজিয়া নিঃশব্দে থাকার অর্থ কি? কিন্তু আমার তো মনে হয় অর্থ অতিশয় প্রাঞ্জল। তাঁহারা শুধু অতি বিনয়বশতই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না, বাপু, আপত্তি করব কি; সময় এবং সুযোগ পেলে···

মিলন হয় সমানে সমানে, শিক্ষা সমান করিয়া লইবার আশা আর যেই করুক আমি তো করি না। হাজার বৎসরে কুলায় নাই, আরও হাজার বৎসরে কুলাইবে না, এবং ইহাকেই মূলধন করিয়া যদি ইংরাজ তাড়াইতে হয় তো সে এখন থাক। মানুষের অন্য কাজ আছে, খিলাফৎ করিয়া, প্যাক্ট করিয়া, ডান ও বাঁ—দুই হাতে মুসলমানের পুচ্ছ চুলকাইয়া স্বরাজ-যুদ্ধে নামানো যাইতে পারিবে এ দুরাশা দুই-একজনার হয়তো ছিল, কিন্তু মনে মনে অধিকাংশেরই ছিল না, তাঁহারা ইহাই ভাবিতেন, দুঃখদুর্দ্দশার মত শিক্ষক তো আর নাই, বিদেশী বুরোক্রেসির কাছে নিরন্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া হয়তো তাহাদের চৈতন্য হইবে, হয়তো হিন্দুর সহিত কাঁধ মিলাইয়া স্বরাজ-রথে ঠেলা দিতে সম্মত হইবে। ভাবা অন্যায় নয়, শুধু ইহাই তাঁহারা ভাবিলেন না যে, লাঞ্ছনা-বোধও শিক্ষাসাপেক্ষ, যে লাঞ্ছনার আগুনে স্বর্গীয় দেশবন্ধুর হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইত, আমার গায়ে তাহাতে আঁচটুকুও লাগে না, এবং তাহার চেয়েও বড় কথা এই যে, দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে যাহাদের বাধে না, সবলের পদলেহন করিতেও তাহাদের ঠিক ততখানিই বাধে না। সুতরাং, এ আকাশ-কুসুমের লোভে আত্ম-বঞ্চনা করি আমরা কিসের জন্য? হিন্দু-মুসলমান-মিলন একটা গালভরা শব্দ, যুগে যুগে এমন অনেক গালভরা বাক্যই উদ্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু ওই গাল-ভরানোর অতিরিক্ত সে আর কোন কাজেই আসে নাই। এ মোহ আমাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে। আজ বাংলার মুসলমানকে এ কথা বলিয়া লজ্জা দিবার চেষ্টা বৃথা যে, সাতপুরুষ পূর্ব্বে তোমরা হিন্দু ছিলে, সুতরাং রক্তসম্বন্ধে তোমরা আমাদের জ্ঞাতি, জ্ঞাতিবধে মহাপাপ, অতএব কিঞ্চিৎ করুণা কর। এমন করিয়া দয়া ভিক্ষা ও মিলন প্রয়াসের মত অগৌরবের বস্তু আমি তো আর দেখিতে পাই না। স্বদেশে বিদেশে ক্রীশ্চান বন্ধু আমার অনেক আছেন। কাহারও পিতা, কাহারও বা পিতামহ, কেহ বা স্বয়ং ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু নিজে হইতে তাঁহারা নিজেদের ধর্ম-বিশ্বাসের পরিচয় না দিলে বুঝিবার জো নাই যে, সর্বদিক দিয়া তাঁহারা আজও আমাদের ভাই-বোন নন। একজন মহিলাকে জানি, অল্প বয়সেই তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, এত বড় শ্রদ্ধার পাত্রীও জীবনে আমি কম দেখিয়াছি। আর মুসলমান? আমাদের একজন পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। সে মুসলমানীর প্রেমে মজিয়া ধর্ম ত্যাগ করে। এক বৎসর পরে দেখা। তাহার নাম বদলাইয়াছে, পোশাক বদলাইয়াছে, প্রকৃতি বদলাইয়াছে, ভগবানের দেওয়া যে আকৃতি, সে পর্য্যন্ত এমনি বদলাইয়া গিয়াছে যে আর চিনিবার জো নাই। এবং এইটিই একমাত্র উদাহরণ নয়। বস্তির সহিত যাঁহারই অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠতা আছে,—এ কাজ যেখানে প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে—তাঁহারই অপরিজ্ঞাত নয় যে, এমনিই বটে। উগ্রতায় পর্যন্ত ইহারা বোধ হয় কোহাটের মুসলমানকেও লজ্জা দিতে পারে।

অতএব, হিন্দুর সমস্যা এ নয় যে, কি করিয়া এই অস্বাভাবিক মিলন সংঘটিত হইবে, হিন্দুর সমস্যা এই যে, কি করিয়া তাঁহারা সংঘবদ্ধ হইতে পারিবেন, এবং হিন্দু-ধর্মাবলম্বী যে কোন ব্যক্তিকেই ছোট জাতি বলিয়া অপমান করিবার দুর্মতি তাঁহাদের কেমন করিয়া এবং কবে যাইবে। আর সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হিন্দুর অন্তরের সত্য কেমন করিয়া তাহার প্রতিদিনের প্রকাশ্য আচরণের পুষ্পের মত বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে। যাহা ভাবি তাহা বলি না, যাহা বলি তাহা করি না, যাহা করি তাহা স্বীকার পাই না,—আত্মার এত বড় দুর্গতি অব্যাহত থাকিতে সমাজ-গাত্রের অসংখ্য ছিদ্রপথ ভগবান স্বয়ং আসিয়াও রুদ্ধ করিতে পারিবেন না।

ইহাই সমস্যা এবং ইহাই কর্তব্য। হিন্দু-মুসলমানের মিলন হইল না বলিয়া বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া বেড়ানোই কাজ নয়। নিজেরা কান্না বন্ধ করিলেই তবে অন্য পক্ষ হইতে কাঁদিবার লোক পাওয়া যাইবে।



শিল্পী—সুধীর খাস্তগীর



শিল্পী—মাখন দত্তগুপ্ত



শিল্পী—শীতাংশু ভট্টাচার্য্য

হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে,—এ দেশে চিত্ত তাহার নাই। যাহা নাই, তাহার জন্য আক্ষেপ করিয়াই বা লাভ কি, এবং তাহাদের বিমুখ কর্ণের পিছু পিছু ভারতের জল-বায়ু ও খানিকটা মাটির দোহাই পাড়িয়াই বা কি হইবে! আজ এই কথাটাই একান্ত করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে যে, এ কাজ শুধু হিন্দুর,—আর কাহারও নয়। মুসলমানের সংখ্যা গণনা করিয়া চঞ্চল হইবারও আবশ্যকতা নাই। সংখ্যাটাই সংসারে পরম সত্য নয়। ইহার চেয়েও বড় সত্য রহিয়াছে, যাহা এক দুই তিন করিয়া মাথা গণনার হিসাবটাকে হিসাবের মধ্যেই গণ্য করে না।

হিন্দু মুসলমান সম্পর্কে এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি, তাহা অনেকের কানেই হয়তো তিক্ত ঠেকিবে, কিন্তু সেজন্য চমকাইবারও প্রয়োজন নাই, আমাকে দেশদ্রোহী ভাবিবারও হেতু নাই। আমার বক্তব্য এ নয় যে, এই দুই প্রতিবেশী জাতির মধ্যে একটা সদ্ভাব ও প্রীতির বন্ধন ঘটিলে সে বস্তু আমার মনঃপুত হইবে না। আবার বক্তব্য এই যে, এ জিনিষ যদি নাই-ই হয় এবং হওয়ারও যদি কোন কিনারা আপাতত চোখে না পড়ে তো এ লইয়া অহরহ আর্তনাদ করিয়া কোন সুবিধা হইবে না। আর না হইলেই যে সর্বনাশ হইয়া গেল, এ মনোভাবেরও কোন সার্থকতা নাই। অথচ, উপরে নীচে, ডাহিনে বামে, চারিদিক হইতে একই কথা বারম্বার শুনিয়া ইহাকে এমনই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছি যে, জগতে ইহা ছাড়া যে আমাদের আর কোন গতি আছে তাহা যেন আর ভাবিতেই পারি না। তাই করিতেছি কি? না, অত্যাচার ও অনাচারের বিবরণ সকল স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া এই কথাটাই কেবল বলিতেছি, তুমি এই আমাকে মারিলে, এই আমার দেবতার হাত-পা ভাঙিলে, এই আমার মন্দির ধ্বংস করিলে, এই আমার মহিলাকে হরণ করিলে,—এবং এ সকল তোমার ভারি অন্যায়, ও ইহাতে আমরা যারপরনাই ব্যথিত হইয়া হাহাকার করিতেছি; এ সকল তুমি না থামাইলে আমরা আর তিষ্ঠিতে পারি না। বাস্তবিক ইহার অধিক আমরা কি কিছু বলি, না করি? আমরা নিঃসংশয়ে স্থির করিয়াছি যে, যেমন করিয়াই হোক, মিলন করিবার ভার আমাদের, এবং অত্যাচার নিবারণ করিবার ভার তাহাদের। কিন্তু, বস্তুত, হওয়া উচিত ঠিক বিপরীত। অত্যাচার থামাইবার ভার গ্রহণ করা উচিত নিজেরা এবং হিন্দু-মুসলমান-মিলন বলিয়া যদি কিছু থাকে তো সে সম্পন্ন করিবার ভার দেওয়া উচিত মুসলমানদের 'পরে।

কিন্তু দেশের মুক্তি হইবে কি করিয়া? জিজ্ঞাসা করি, মুক্তি কি হয় গোঁজামিলে? মুক্তি অর্জনের ব্রতে হিন্দু যখন আপনাকে প্রস্তুত করিতে পারিবে, তখন লক্ষ্য করিবারও প্রয়োজন হইবে না, গোটাকয়েক মুসলমান ইহাতে যোগ দিল কি না। ভারতের মুক্তিতে ভারতীয় মুসলমানেরও মুক্তি মিলিতে পারে, এ সত্য তাহারা কোনদিনই অকপটে বিশ্বাস করিতে পারিবে না। পারিবে শুধু তখন, যখন ধর্মের প্রতি মোহ তাহাদের কমিবে; যখন বুঝিবে, যে কোন ধর্মই হোক তাহার গোঁড়ামি লইয়া গর্ব করার মত এমন লজ্জাকর ব্যাপার, এতবড় বর্বরতা মানুষের আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু সে বুঝায় এখনও অনেক বিলম্ব, এবং জগৎসুদ্ধ লোক মিলিয়া মুসলমানের শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে ইহাদের কোন দিন চোখ খুলিবে কি না সন্দেহ। আর, দেশের মুক্তি-সংগ্রামে কি দেশসুদ্ধ লোকেই কোমর বাঁধিয়া লাগে? না, ইহা সম্ভব? না, তাহার প্রয়োজন হয়? আমেরিকা যখন স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিয়াছিল, তখন দেশের অর্ধেকের বেশি লোকে তো ইংরাজের পক্ষেই ছিল? আয়র্লণ্ডের মুক্তিযজ্ঞে কয়জনে যোগ দিয়াছিল? যে বলশেভিক গবর্মেণ্ট আজ রুশিয়ার শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছে, দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে সে তো এখনও শতকে একজনও পৌঁছে নাই। মানুষ তো গরু-ঘোড়া নয়, কেবলমাত্র ভিড়ের পরিমাণ দেখিয়াই তাহার সত্যাসত্য নির্ধারিত হয় না, হয় শুধু তাহার তপস্যার একাগ্রতার বিচার করিয়া। এই একাগ্র তপস্যার ভার রহিয়াছে দেশের ছেলেদের 'পরে। হিন্দু-মুসলমান-মিলনের ফন্দি উদ্ভাবন করাও তাহার কাজ নহে, এবং যে সকল প্রধান রাজনীতিবিদের দল এই ফন্দিটাকেই ভারতের একমাত্র ও অদ্বিতীয় বলিয়া চীৎকার করিয়া ফিরিতেছেন, তাঁহাদের পিছনে জয়ধ্বনি করিয়া সময় নষ্ট করিয়া বেড়ানোও তাহার কাজ নহে। জগতে অনেক বস্তু আছে, যাহাকে ত্যাগ করিয়াই তবে পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান-মিলনও সেই জাতীয় বস্তু। মনে হয়, এ আশা নির্বিশেষে ত্যাগ করিয়া কাজে নামিতে পারিলেই হয়তো একদিন এই একান্ত দুষ্প্রাপ্য নিধির সাক্ষাৎ মিলিবে। কারণ, মিলন তখন শুধু কেবল একার চেষ্টাতেই ঘটিবে না, ঘটিবে উভয়ের আন্তরিক ও সমগ্র বাসনার ফলে।"

বার্ণাড্ শ-য়ের উপদেশ

শ কিছু দিন হল নব্বই বছরে পা দিয়েছেন। কয়েক বছর আগে জনৈক নবীন লেখকের প্রতি তিনি কিছু উপদেশ বর্ষণ করেন। নেহাৎ অকারণে নয়, নবীন লেখকটি শ-কে একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটা এই—

শ্রদ্ধাস্পেদষু,

জি, বি, এস,

এখন সন্ধ্যা ছ'টা—আমি টেম্‌স্ নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে। জোয়ারের জলে বাতাস আরো ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে।···ওভারকোট পরে লোকে এদিক ওদিকে চলেছে আর আমি নদীর দিকে চেয়ে আছি। নদীর কিনারে রেলিঙে ভর দিয়ে আপনাকে আমি এই চিঠি লিখছি।

বেড়াবার একটা ছড়ি নিয়ে আপনি ব্রিজে উঠছেন। আপনার নাক স্বভাবতই লাল আর আপনার বয়েসও বেশ হয়েছে। কিন্তু আপনি এখনও শক্ত আছেন। তাছাড়া জীবনে আপনি সার্থক হয়েছেন। আপনি প্রচুর বুদ্ধি ধরেন এবং টাকাও করেছেন। আর আমার অবস্থা দেখুন। আমি তরুণ, লেখবার বাসনা নিয়ে নদীর কিনারে বেড়ার উপর এখন কাত হয়ে আছি। কন্‌কনে বাতাসে, ক্ষুদে পেন্সিলে, আর অবশ হাতে আমার লেখা মোটেই এগোচ্ছে না।

আপনি এখন ব্রিজের মাঝখানে এসে ব্রিজের বেড়ার উপর ঝুঁকে কি দেখছেন আপনিই জানেন। আপনার পাশ দিয়ে তাড়াহুড়ো করে লোকজন ফিরছে আফিস থেকে। তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছবার জন্য সকলেই ব্যস্ত।

জি, বি, এস্, আমার ভয়ানক শীত করছে আর লেখবার কোন যায়গাও নেই আমার। যেখানে আমি থাকি সে বাড়ির কর্ত্রী বড় চেঁচায়—দিনরাত কেবল কাপড়ের কুপন, চাটনি এবং এমন সব কথা বলে—যাতে আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। 'হোয়াইট হল' কোর্টে আপনার একটা ফ্ল্যাট আছে। ঐ ফ্ল্যাটে বসে আমি আমার লেখার কাজ করতে চাই।

ইতি, বশংবদ, আলফ্রেড্ রিজওয়ে।

উত্তরে জি, বি, এস্, লিখছেন—

সবিনয় নিবেদন,

মিঃ রিজওয়ে,

অপ্রকাশ্য কোন বিশেষ সাংসারিক কারণে আপনার প্রস্তাব কাযে পরিণত করা সম্ভব হবে না। সম্ভব হলেও এই ধরণের প্রস্তাবে আপনার নিজেরই সম্মত হওয়া উচিত নয়, কেন না, কোন গৃহস্থ পরিবারে নেহাৎ পোষ্যপুত্র না হয়ে থাকলে এই ধরণের ব্যবস্থায় অচিরে গোলযোগ সৃষ্টি হতে বাধ্য।

আপনার বয়স কত? ২১এর উপর হলে কোন অসুবিধে নেই। নিজে সই করে আপনি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসে পড়বার জন্য কার্ড পেতে পারেন এবং মিউজিয়ামে পড়বার ঘরটিকে আপনার প্রাত্যহিক আশ্রয়-স্থান করে নিতে পারেন। আমি নিজে বহু বছর তাই করেছি—আর স্যামুয়েল বাটলার এবং কার্ল মার্ক্সের সারা জীবনই এই ভাবে কেটেছে। আপনার মহাকাব্য আপনাকে কালি-কলমেই লিখতে হবে। যদ্দুর জানি—অন্ততঃ আমাদের সময়ে খবরের কাগজের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও টাইপ-রাইটার ব্যবহার বারণ ছিল। পড়বার ঘরে অখণ্ড শান্তি বিরাজ করবারই কথা আর বসবার এবং লেখবার যায়গাও বেশ প্রশস্ত। যদি ওখানে বসে আপনার লেখা না হয় তাহলে অন্য কোন যায়গাতেও হবে না। আমার অনেক লেখা আমি রেলগাড়িতে এবং দোতলা বাসের মাথায় বসে শেষ করেছি।

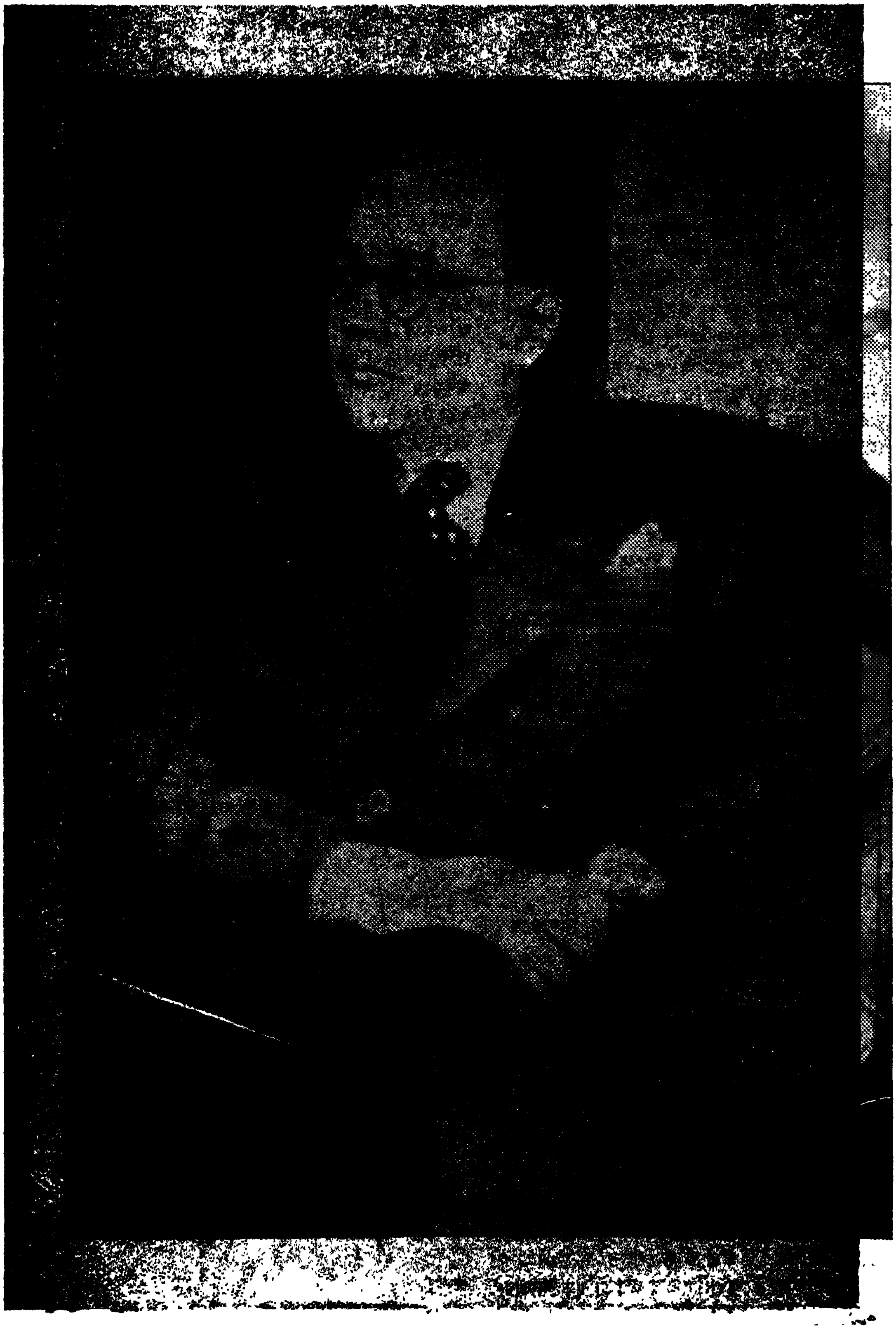
আপনার শর্টহ্যাণ্ড শিখে ফেলা উচিত। রিপোর্টাররা যে শর্টহ্যাণ্ড ব্যবহার করে তা নয়—তা শিখতেই আপনার বছর কেটে যাবে। শ্রুত বা প্রাথমিক শর্টহ্যাণ্ড শিখলেই আপনার চলবে। বেশ ধীরে-সুস্থে স্পষ্ট করে লিখতে পারবেন এবং পরে আমি যেমন করে থাকি, এবং আপনার অবস্থায় কুলোলে সেক্রেটারিকে দিয়ে—অন্য অবস্থায় স্বয়ং টাইপ করে ফেলতেন। রিপোর্টারের কাজের জন্য মিনিটে ১৫০শ শব্দ লেখা প্রয়োজন কিন্তু স্বকীয় রচনা লিখতে হলে—বেশ স্পষ্ট করে লিখতে হলে মিনিটে ১২টি শব্দই যথেষ্ট। ডিকেন্স প্রথম জীবনে রিপোর্টার ছিলেন কিন্তু তাঁর সমস্ত লেখা তিনি লংহ্যাণ্ডে লিখতেন, কেন না, তাঁর শর্টহ্যাণ্ড আর কেউ ত' পড়তে পারতই না, তিনিও লেখবার দু'-তিন দিন পরে আর পড়ে উঠতে পারতেন না। মাত্র কয়েক সপ্তাহে আপনি পিটম্যানের বর্ণমালা এবং সর্বনাম, অব্যয় ইত্যাদির চিহ্নগুলি সহজেই আয়ত্ত করে নিতে পারবেন।

পারলে মিউজিয়ামের কাছেই কোথাও রাত্রের আস্তানা করে নেবেন।

মিউজিয়াম ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থাগারও আছে। গিল্ডহল, ভিক্টোরিয়া, এলবার্ট এবং অন্যান্য আরো অনেক। এবং সেগুলি শুধু যদি আপনার বয়েস ২১এর কম হয়। আর তাই যদি হয় তবে যুদ্ধের কাযে লাগেননি কেন?

ইতি, জি, বার্ণার্ড শ।





সাম্প্রদায়িক ঐক্য সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র

"বর্ত্তমান অবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার বিষ নষ্ট করা ও সর্ব্বব্যাপী জাতীয়তার ভাব পোষণ করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়; কিন্তু যখন আমরা দেশব্যাপী বিপ্লবাত্মক মনোভাব সৃষ্টি করিতে পারিব, তখন এই কাজ কত সহজ হইবে।

"সাম্প্রদায়িক মনোভাব দূর হইলেই সাম্প্রদায়িকতার অবসান হইবে। কাজেই মুসলমান, শিখ, হিন্দু, খৃষ্টান—যাঁহারা সাম্প্রদায়িক মনোভাব হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত জাতীয় মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন—সাম্প্রদায়িকতাকে ধ্বংস করা তাঁহাদেরই কাজ। যে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে, তাহার নিশ্চয়ই প্রকৃত জাতীয়তাবোধ আছে।

"প্রত্যেক যুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে অবস্থিত সৈন্যদের উপরই বিশেষ দায়িত্ব পড়ে। সেইরূপ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিশেষ দায়িত্ব পুরোভাগের যোদ্ধাদের। জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা তাঁহাদেরই কাজ। ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হিন্দু ও মুসলমান, শিখ ও খৃষ্টানদের সাম্প্রদায়িক সমাধানের ভার দিতে হইবে। তাঁহারা যদি এই সমস্যার সমাধান করিয়া সমগ্র দেশকে তাহা জানাইতে পারেন, তাহা হইলে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে এবং সাম্প্রদায়িকতার মৃত্যুর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে। পুরোভাগের যোদ্ধারা পথ দেখাইলে সমগ্র জাতি তাহা অনুসরণ করিবে।

"সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের কংগ্রেস বা মসলেম্ লীগের কর্ত্তৃপক্ষের দিকে তাকাইয়া থাকিলে চলিবে না। স্বাধীনতার প্রকৃত যোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ হইয়া এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। সুতরাং পুরোভাগের যোদ্ধৃগণ, অগ্রসর হউন এবং আপনাদের কর্ত্তব্য পালন করুন।"

—সুভাষচন্দ্র বসু

আই-এন-এর জন্মকথা

জেনারল মোহন সিং

'৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর শেষ রাতে প্রাচ্যে যুদ্ধ আরম্ভ। জাপানীরা বলত, গ্রেটার ইষ্ট এশিয়ার লড়াই। মালয়-শ্যাম সীমান্তে ১১শ ভারতীয় ডিভিশন। আমার ১—১৪শ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট ডিভিশনের পুরোভাগে। হুকুম এল, ১৫ মাইল এগিয়ে গিয়ে শত্রুর অগ্রগতিকে রোধ কর।

৮ই রাতে শত্রুর সঙ্গে দেখা। ১১ই পর্য্যন্ত অবিরাম লড়াই। ওদের ট্যাঙ্কবাহিনী আমাদের উপর এসে পড়ল। আমাদের ট্যাঙ্কও নেই—ওপরের বিমান-সাহায্যও নেই। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আমরা পিছু হটি।

১১ই ডিসেম্বরের রাতে। বাইরে তুমুল লড়াই। আমার বুকেও লড়াই। তুমুল লড়াই। দেখছি মৃত্যু আর জীবনের মাঝখানে কত ক্ষীণ ব্যবধান। আমার দেশবাসী মরছে কাদের জন্ত? ভাবি···

একটা রবার গাছের আড়ালে আমার কমরেডরা—আর আমি। ২০ গজ দূরে জাপানী ট্যাঙ্ক। গুলী এসে বিঁধল গাছে। কমরেড হুঁশিয়ার! আবার গুলী! কয়জন চলে গেল—আমারই কমরেড!

বুকে আলোড়ন। মরছি আমরা, ওরা কোথায়—যাদের জন্ত লড়াই! নওজোয়ান কমরেডরা পাশে মরে রয়েছে, খুনে লালে লাল। জাপানী ট্যাঙ্ক এগিয়ে চলে গেছে। দূরে তাদের কামানের গর্জ্জন। আমার নওজোয়ান! কুকুরের মত মরল সাদা মুনিবদের জন্তে। নিজের জন্তে যদি মরত!

সেই নিশীথের রণাঙ্গন। মৃত কমরেডরা চার পাশে—কামানের খোরাক! মুনিবের হাতিয়ার—শত্রুর খোরাক। এ হাতিয়ার দিয়েই ওরা আমাদের বাঁধে, মারে, মরতে পাঠায়। মৃত কমরেডরা মৃত্যু-নিশ্চল! আর্ত্তনাদ থেমে গেছে চিরতরে।···ভাবি আপনাকে বাঁচাবার জন্ত যদি এরা মরত!···

কর্ত্তব্য স্থির হয়ে গেল সেই নিশীথের রণাঙ্গনে। রেজিমেণ্টের মৃতাবশিষ্টদের নিয়ে ফিরছি। পথে দেখি জাপানীরা কতকগুলো প্যাম্পলেট ছড়িয়ে গেছে। লিখেছে—"আমরা এশিয়াবাসী"—"প্রাচ্য থেকে সাদা শয়তানদের লাথি মেরে তাড়াও"—"আমরা এশিয়াকে এংলো-স্যাক্সন মৃত্যুকবল থেকে মুক্ত করতে এসেছি"—"এশিয়ার কোন লোক আমাদের শত্রু নয়"—ইত্যাদি···

মাথায় ফন্দী! জাপানীদের কাছে যাব? বিবেক বলল—এই সময়! ভারতীয় ফৌজের শতাব্দীর দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচন কর। পশুবলে ওরা আমাদের দাবিয়ে রেখেছে। মাত্র ট্যাঙ্ক আর কামানের ভাষাই ওরা বুঝে। সৈন্যদলে বিপ্লব! এই সময়! হুঁসিয়ার!

জঙ্গলের মাঝ দিয়ে পথ। আমারই ব্যাটালিয়ানের ক্যাপ্টেন মহম্মদ আক্রাম—সঙ্গে ১০ জন পাঠান। ওদের খুলে বলি। আক্রাম ভাবে—১০ জন পাঠান ভাবে। অনেকক্ষণ। তার পর হাত ধরে বললে—রাজি।

বীর আক্রাম—শের আক্রাম! জ্ঞানী আক্রাম! অমন মানুষ দেখিনি। গোঁড়া মুসলমান। এক দিনও নামাজ বাদ পড়েনি। আজ সে বিদায় নিয়েছে। আমার কমরেড, আমার ভাই। আমার কলজে—আমার সিপাহী। আমি তাকে ভুলব না শেষ দিন পর্য্যন্ত।

অনির্বাণ

অমিয় চক্রবর্তী

কত মানুষের ব্যথা পুঞ্জ হয়ে মেঘে
আকাশে ঘনায় উদ্বেগে।
গ্রামান্তের রুদ্ধ বুকে কার কাঁদা,
মর্মান্তিক কোথা মৃত্যু-বাধা,
জনে জনে জলে ঝড়ে ডোবে নৌকা কত,
অনশন-মাঠে আর্ত লক্ষ শত,
——তার পর মেঘ উড়ে যায়,
শ্রাবণ বর্ষণ রাত যেমন পোহায়।
ফিরে রৌদ্র পড়ে মাঠে গ্রামে,
নতুন শিশুর ঘরে নব প্রাণ উন্মত্ত সংগ্রামে ;
কারো ধান হয়,
কারো অতিক্রান্ত শোকে মুছে যায় পুরোনো সময় ;
কর্মের কঠিন দিন ভরে,
আবার জীবন চলে ঘরে ঘরে।
তবু যেই চেয়ে দেখি ক্ষুদ্র খেয়া-ঘাটে
দূরে কে দরিদ্রা মেয়ে, ঘরণী সে, ভাগ্যের ললাটে
একদৃষ্টে কী যে খোঁজে, গাছের গুঁড়িতে হাত রেখে
কে যেন আসবে ফিরে আশাহীনা বৃথা চেয়ে দেখে—
তখন আবার ধীরে চলন্ত এ তরী থেকে ভাবি
চিরন্তন ব্যথা সে তো দীপ জ্বালে অন্ধকারে নাবি।
মহাসূর্য বিশ্বের গগনে
স্রোতে-ভাসা সৃষ্টিলোকে ব্যথিতা কে একাকী লগনে ॥

আই-এন-এ'র সত্যি ইতিহাস যেদিন লেখা হবে, সেদিন এই শহীদ বন্ধুর নাম রইবে সবার আগে।

মালয়ের জন্য আর জঙ্গলের পথ আর ফুরায় না। তিন দিন তিন রাত চলেছি। একটা ছোট্ট গ্রাম। কেদা ষ্টেটের রাজধানী আলোর ষ্টার দু'মাইল দূরে। এক জন ভারতীয়ের সঙ্গে দেখা। বললে, জাপানীরা আলোর দখল করেছে।

জাপানী হেড কোয়ার্টারে চিঠি পাঠালাম। সন্ধ্যায় উত্তর এলো—অত্যন্ত আশাপ্রদ।

১৫ই ডিসেম্বর প্রাতে। জাপ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের মেজর ফুজিয়ারা, ব্যাঙ্ককের সর্দার প্রীতম সিং ৮টায় গ্রামে এলেন।

সর্দার প্রীতম। মালয়-বর্মায় ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের প্রতিষ্ঠাতা। সৈনিক না হলেও সর্বদা পুরোভাগে। একা মালয়ের সর্বত্র ঘরে নানা স্থানে লীগের শাখা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। নেতাজী যে আন্দোলনের নেতা, তার প্রতিষ্ঠা ও গঠনকাজের মূলে প্রীতম। আজ প্রীতমও ছেড়ে গেছেন স্বর্গে। শোচনীয় বিমান দুর্ঘটনায় ভারতের ৪ শ্রেষ্ঠ সন্তান দেহরক্ষা করেছেন—বীর প্রীতম, বিপ্লবী সাধু স্বামী সত্যানন্দ পুরী, কাপ্তেন মহম্মদ আক্রাম আর নীলকণ্ঠ আয়ার।

১৫ই ডিসেম্বর আত্ম-সমর্পণ। ৫৪ জন ভারতীয় সৈনিক পাশে এসে দাঁড়াল। আমার প্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতা। ওরা প্রতিজ্ঞা করল, ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমায় সাহায্য করবে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত। গাড়ীতে ত্রিবর্ণ পতাকা উড়িয়ে দিলাম এই প্রথম। ওড়ে পতাকা—তিনরঙা পতাকা পত্‌ পত্‌। আমার বুকে দোলন লাগে, সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ—প্রাণভরা আনন্দ-নর্তন।

ফুজিয়ারা আশ্বাস দিলেন, জাপান ভারতে রাজ্য চায় না—জাপান ভারতের স্বাধীনতার জন্য সাহায্য করবে। চার দিকে লোক পাঠালাম। আহ্বান করলাম সবাইকে। সন্ধ্যার মধ্যে নানা দল থেকে দু'শর উপর লোক এল। তিন দিনে স্বাধীনতার পতাকার নীচে এসে দাঁড়াল প্রায় এক হাজার।

অনেক জাপানী অফিসার এসে দেখা করল। আলাপ হ'ল খোলাখুলি। পরদিন জাপ প্রধান সেনাপতি জেনারেল য়ামাশিতার কাছে নিয়ে যাওয়া হল। সে বললে, আমায় সমর্থন করবে।

এর পর দশ দিন ধরে জাপানীদের সঙ্গে আলোচনা। ওরা কংগ্রেসকে দেখতে পারে না। জওহরলালকে ঘৃণা করে। গান্ধীজীর অহিংসায় স্বাধীনতা কি করে হবে বুঝতে পারে না। ৫০ ঘণ্টা আলোচনার পর ওরা বুঝলে, ভারতের পক্ষে কংগ্রেসের নীতি ছাড়া গতি নেই ওরা বুঝল যে, কংগ্রেসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইংরেজ তাড়াবার জন্য ভারত আক্রমণ করা চলবে না। আক্রমণ করলে ভারত দ্বিতীয় চীনে পরিণত হবে। ওরা বুঝলে যে, বৃটেনকে পরাজিত করতে হলে ভারতবাসীকে দিয়েই তা করতে হবে—জাপানীরা তাদের সাহায্য করতে পারে মাত্র।

প্রথম দিনের আলোচনার সময় আমি ওদের কাছে প্রস্তাব করেছিলাম—ভারতের জাতীয় মহাসভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সুভাষ-চন্দ্র বসুজীকে আন্দোলন পরিচালনের জন্য প্রাচ্যে আনতে হবে। জাপানীরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। কেন করে, তা এখন প্রকাশ করা চলে না।

স্থির হয়, যুদ্ধে বন্দী সব ভারতবাসীকে ওরা আমার হাতে ছেড়ে দেবে। জাপানীরা ভারতবাসীর প্রাণসম্পদ নষ্ট করবে না। ঐ মাসেই এই মর্মে জেনারেল য়ামাশিতা এক আদেশও জারী করেন।

সিঙ্গাপুরের যেদিন পতন হ'ল, সে দিন আমার নেতৃত্বে ১০ হাজার ভারতবাসী সঙ্ঘবদ্ধ। ১০টি ব্যাটালিয়ন গড়েছি। ১৯৪২, ১৭ই ফেব্রুয়ারী যখন আরও ৪৫ হাজার ভারতীয় সৈন্যকে আমার পরিচালনায় দেওয়া হ'ল, তখন সম্পূর্ণ অবস্থা বদলে গেল।

'৪২-এর সেপ্টেম্বরে প্রকাশ্য ভাবে আই-এন-এ গঠন ঘোষণা করা হল। এইদিনই নতুন পোষাকে ১৭ হাজার সৈনিক কুচকাওয়াজ করল। ২৫ হাজার স্বেচ্ছাসৈনিক অতিরিক্ত রইল। এ ছাড়া মালয়ের সব জায়গা থেকে বেসামরিক রিক্রুটমেণ্ট হতে লাগল।

তার পর ?

আই-এন-এ গঠনের এক হপ্তা মধ্যে ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের ভেদ দূর হয়ে গেল। একই লঙ্গরখানায় সবাই খায়। এক জাত ভারতবাসী—এক আত্মীয়তা ভাই ভাই। যে ১৩ মাস আমি নেতৃত্ব করি, তার একদিনও ধর্ম্ম নিয়ে ঝগড়া হয়নি।

তার পর ?

তার পরের কাহিনী কতক তোমরা জান। বাকী ঐতিহাসিক বলবে।

প্রেমের প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগ

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

সেই সঙ্গে ধাপাপাত্তকেও ধরতে হবে। বলাই বাহুল্য।

'প্রেম করে' হায় পরাণ রাখা দায়!'—প্রাণের এই দাগ—জীবনের দাগাও বলা যায়—একটি গানে লেগেছে। কথাটা মিথ্যে না।

যারা প্রেমে পড়ে তাদের যেমন প্রাণ নিয়ে টানাটানি—যারা প্রেমে না পড়েও প্রেমের মধ্যে গিয়ে পড়ে তাদের প্রাণান্ত তার চেয়ে কিছু কম নয়। দু'টি উত্তাল প্রেমের তরঙ্গভঙ্গের মধ্যে তলিয়ে তাদের গেরো বেশি আরো।

প্রেমিকের তবু কিঞ্চিৎ আনন্দ আছে, প্রাণান্তকর হলেও প্রেমের অক্ষয় স্বর্গ তাদের। কিন্তু মধ্যবর্ত্তীরা হচ্ছে বিসর্গের মতো—দু'-ই খ-য়ের মাঝখানে পড়ে কেবল দুঃখ বাড়ায়। নিজের এবং পরের।

কলকাতামুখো ষ্টীমারটা ঢেউ কাটতে কাটতে চলেছিল। জলের টানাপোড়েনের দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে চলেছি।

এই তো! দিন কয়েক আগে এমনি এক ষ্টীমারে আমার ভাগ্নিকে নিয়ে ডায়মণ্ড হারবারের দিকে চলেছিলাম। প্রিসিলার হঠাৎ, কেন বলা যায় না, সহরের উপর অরুচি ধরে গেল। বাধ্য হয়ে সহর থেকে দূরে কিন্তু খুব বেশি দূরে নয় ডায়মণ্ড হারবারে এক বন্ধুর খালি বাড়ীতে গিয়ে পাড়ি জমাতে হয়েছে। অথচ এর মধ্যেই—



হ্যাঁ, সপ্তাহ না কাটতেই আমরা ফিরছি। ফিরছি আমি, প্রিসিলা এবং——

এই এবংকে নিয়েই এই বিপাক। এর জন্যই অকালে আমাদের ফিরতে হচ্ছে। এবম্প্রকার এই দুর্ঘটনার ইতিকথাই এই গল্প।

অবশ্যি, আমারই দোষ। আমার উপদেশের গলদ্। আমার উপদেশপ্রবণ স্বভাবের অনিবার্য্য বিচ্যুতির ফলেই এই বিচ্ছিরি ব্যাপার—যদি নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করি। এখন নীরপেক্ষ দৃষ্টিতে, জলের দিকে তাকিয়ে ষ্টীমারযাত্রার সমস্ত জলাঞ্জলির সঙ্গে মিলিয়ে সেই সিদ্ধান্তেই আসছিলাম। না, আমার স্বভাবসুলভ এই উপদেশাত্মবোধ ছাড়া আর কাউকেই দায়ী করা যায় না।

আমার মহদ্দোষ আমার স্বভাব। আমার এই পরোপকারী স্বভাব। এই স্বাভাবিক প্রবণতার জন্য, পর-লোকের যতই কল্যাণ হোক্ না, আমার ইহলোকের যা হানি হয়, অপরের হিতচেষ্টায় কতো সময় যে আমার যায়—পরের দিক সামলাতে গিয়ে নিজের কতো দিক যে নষ্ট হয়—তার ইয়ত্তা হয় না। এবং তাতে আমার লাভ? কাঁচকলা। সে সময়টা তাস পিটে কাটালে পিঠ আসে, পিঠে খেয়ে কাটালে পেট ভরে। কিন্তু সে কথা আমায় বলে কে?

বাস্তবিক, এ জীবনে যত লোকের উপকার করেছি তাদের সবাইকে জড়ো করলে এই ষ্টীমারে ধরে কি না সন্দেহ। এর ডেক্, কেবিন সব জড়িয়েও সবার দাঁড়াবার জায়গা হয় না। তাদের আদ্ধেকের বেশি রেলিং ভেঙে জলে গিয়ে পড়ে। এবং বলতে কি, সেইখানেই হচ্ছে তাদের যথার্থ স্থান।

এবং এই এবংটিও সেই বাহুল্যের অন্তর্গত এক জন।



সেদিন এই ষ্টীমারেই প্রিসিলাকে বলেছিলাম, "যাচ্ছিস্ তো বটে, কিন্তু বাইরে তোর মন টিকলে হয়। কলকাতা ছেড়ে সেই অজ পাড়াগাঁয়ে—"

"কলকাতার কথা আর বোলো না মেজ মামা। কলকাতায় আমার ঘেন্না ধরে গেছে। ঢের দেখলাম কলকাতা। এখন নিরিবিলি জায়গায় একটু স্বস্তিতে কাটাতে পারলে বাঁচি।" বাধা দিয়ে সে বলেছে।

সহুরে মেয়ের মুখে সহরের নিন্দা একটু অদ্ভুত বই কি !

"তোর মুখে স্বান্তর প্রশান্ত শুনব আমি আশা করিনি।" আমায় বলতে হয়।

"উঃ। সহরে আমার মাথা ধরে যায়!" প্রিসিলার পুনশ্চ অনুযোগ।

"গোলমাল ?" আমি জিগেস করি। "গোলমালের কথা বলছিস্ ?"

"আরো কতো কী।" প্রিসিলাকে শিউরে উঠতে দেখি।

আরো কতো কী না জেনেই, এবং ওর শিহরণ থেকে তা জানবার নয় জেনেও, স্বভাবতই আমার সহানুভূতি জাগে।

"সুশীলাদির যে চিঠি পেয়েছিলাম তাতে তোর বিয়ের সম্বন্ধের কথা ছিল বলে' যেন মনে হচ্ছে।"

"কক্ষনো না।" ওর প্রবল প্রতিবাদ শোনা যায়: "বিয়ে আমি করবো না মেজ মামা। আমি চাই স্বাধীন জীবন। ছেলেদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।"

নতুন জায়গা মন্দ লাগছিল না। কোলাহলময়ী কলকাতা ছেড়ে এই নিরবচ্ছিন্ন শান্তির ক্রোড়ে এসে প্রথমটা একটু অশান্তি বোধ হলেও অচিরেই সেটা সরে যায়। তার পরে অন্তিম কালের কোমার মতো ক্রমশই ভালো লাগে, অনির্বচনীয় লাগতে থাকে।

কয়েক দিন চমৎকার কাট্‌লো। ইক্‌মিক্ কুকার এবং প্রিসিলা দু'জনে মিলে রাঁধে—আমি আর প্রিসিলা দু'জনে মিলে খাই।

চল্‌ছিল বেশ, কিন্তু চতুর্থ দিনে একটা অঘটন দেখা গেল।

নীচের ঘরটা বৈঠকখানার মতো। সেখানে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে একলা বসে আরাম করছি, প্রাতঃকাল, দরজার বাহিরে মৃদু কড়া-নাড়া শুনলাম। পরক্ষণেই এক যুবককে দরজা ঠেলে আবির্ভূত দেখা গেল।

"প্রিসিলা কি বাড়ী আছে?" থতমত খেয়ে সে বলল। প্রিসিলার স্থলে আমাকে দেখে বেচারী একটু অপ্রস্তত হয়েছে মনে হোলো।

"না। প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছে।" আমি জানালাম।

"আমার নাম রবি।" ছেলেটি নিজের পরিচয়সূত্রে বলে।

"শুনে সুখী হলাম।" আমি বলি।

"আমি কলকাতা থেকে আসছি—প্রিসির সঙ্গে দেখা করতে। ফিরতে কি ওর খুব দেরি হবে? না বোধ হয়?"

"বোসো।" একটু ইতস্ততঃ করে' ওকে একটা চেয়ার দেখালাম।

"আমার কথা প্রিস্ নিশ্চয় আপনাকে বলেছে।" বসবার পর ওর আরো একটু উৎসাহ প্রকাশ পায়: "আমাদের বিয়ের সম্বন্ধের

"বিয়ের সম্বন্ধ?" আমার চমক্ লাগে: "প্রিসি বলছে বিয়ে ওর ধাতে সইবে না। ছেলেদের ও একদম্ পছন্দ করে না।"

"ছেলেমানুষি।" রবি বলল: "প্রিসি ভারী ছেলেমানুষ। মুহূর্তে মুহূর্তে ওর মত বদলায় আমি জানি।"

এবং ঠিক সেই মুহূর্তে প্রিসিলা বেড়িয়ে ফিরল। "জানো মেজ মামা," ওর উচ্ছ্বসিত কলকণ্ঠ শুনলাম, "আজ এখানে হাটবার—" বলতে বলতে ঘরের মধ্যে পা দিয়েই, রবিকে দেখে সে স্তব্ধ হয়ে গেল। দ্রুতপদে কক্ষান্তরে তার অন্তর্ধানের একটু পরেই উপরের তলা থেকে দরজা বন্ধ হওয়ার জোরালো আওয়াজ পেলাম।

নিজের ঘরে ঢুকে খিল্ এঁটে দিয়েছে প্রিসিলা।

"তোমার সঙ্গে ও দেখা করতে চায় না মনে হচ্ছে।" আমি উল্লেখ করি।

রবিকে মেঘাচ্ছন্ন দেখলাম।

"বোধ হয় জামা-কাপড় ছাড়তে গেল।" বলল সে: "আপনি—আপনি ওকে তাড়া দেবেন না।"

"দিচ্ছিও নে।" আমি জানালাম।

তার পর অনেকক্ষণ ধরে রবি নিজের ঘাড় চুলকালো। প্রায় মিনিট দশেক পরে ওর কাশির ধ্বনি পেলাম।

"আমি অপেক্ষা করছি যদি এই কথাটা ওকে গিয়ে জানাতেন—একটু দয়া করে' যদি জানান্—" বেচারা ভেঙে পড়েছে।

"ও তো তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় না। দেখতেই পেলে।" এই রূঢ় সত্যটা যতটা মোলায়েম করে' মধুর স্বরে বলা যায় আমি বলি।

"কিন্তু আমার—আমার যে দেখা না করলেই নয়।"

অগত্যা ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠতে হোলো। গেলাম উপরে আস্তে আস্তে। এবং ফেরৎ এসে ওকে জানালাম—

"প্রিসিলা তোমার সঙ্গে দেখা করবে না।"

"কিন্তু আমার যে দেখা করা চাই-ই।"

"তা তো বুঝলাম, কিন্তু ও যে চাচ্ছে না।" পুনরুক্তি করতে হোলো। "প্রিসি বলছে তুমি যে এখান অবধি ওর পিছু ধাওয়া করে আসবে তা ও স্বপ্নেও ভাবেনি।"

অদ্ভুত একটা উচ্চারণ করল রবি—কোন্ ভাষায় বলা কঠিন। খুব সম্ভব ওকেই অস্ফুট আর্তনাদ বলে থাকে। ওই বক্তব্য শেষ করে' সে উঠল। অধোবদনে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আবার আমি আমার আরাম-চেয়ারে লম্বা হলাম।

একটু পরেই প্রিসিলা নেমে এল—দু'চোখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন নিয়ে।

"চুকে গেছে। চলে গেছে ছেলেটা।" আমি অভয় দিই।

"সত্যি গেছে? আমার বিশ্বাস হয় না।" প্রিসিলা নাস্তিকের মত বলে: "চলে যাবার ছেলে ও নয়। আমাকে সহজে নিস্তার দেবে আমার মনে হয় না।"

"কেন যাবে না? মেয়ের অভাব? বিয়ে করতে চাইলে কতো সুন্দর সুন্দর মেয়ে পাবে।" আমি প্রিসিলাকে ভরসা দিই: "মেয়েরা অমন ছেলে বেওয়ারিশ পেলে অমনি লুফে নেয়।"

প্রিসিলা কিন্তু ঘাড় নাড়ে: "রবির ধারণা ও আমাকে ছাড়া বাঁচবে না। কতো বার এ কথা আমায় বলেছে।"

"ও রকম বলে। তুই দেখিস্। তিন মাস না যেতে যেতে

"বটে!…আমার বড্ডো মাথা ধরেছে।" শাণিত কণ্ঠে এই কথা জানিয়ে প্রিসিলা চলে গেল।

সারা সকালটা আমার একলা একলা কাটে। খাবার সময়েও প্রায় তাই, প্রিসিলার মুখে একটি কথা নেই। তখনো তার মাথা ধরে আছে। চুপ্-চাপ্ খাওয়া সেরে সে নিজের ঘরে গিয়ে খিল্ আঁটল। আমিও আমার শোবার ঘরে গিয়ে খবরের কাগজ পড়ার ছলনায় দিবানিদ্রা লাগিয়েছি।

ঘুমটা বেশ জমে এসেছিল, এমন সময়ে সদর দরজায় কড়া আওয়াজে চটকে গেল। টেলিগ্রাফ পিয়নের মতো বেপরোয়া কড়া-নাড়া।

নীচে নেমে গিয়ে দরজা খুলে দেখি—আর কেউ নয়, রবি।

"ঘুমুচ্ছিলেন? ঘুম ভাঙালুম, কিছু মনে করবেন না। যদি দয়া করে আমার এই চিঠিটা প্রিসিলার হাতে দেন—"

"কিছু মনে করবেন না—তার মানে? চোখের পাতাটি বুজেছি, আর কিছু মনে করবেন না! এর মানে কি?" স্বভাবতই আমার রাগ হয়।

"আজ্ঞে, এই চিঠিখানা! বড্ড জরুরি। আমার জীবণ-মরণ নির্ভর করছে এর উপর—বুঝতেই পারছেন! এই চিঠিটা ওর হাতে না পৌঁছনো পর্য্যন্ত আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। সকাল থেকে আমি কিছু খাইনি।"

"শুনে সুখী হলাম।"

"আপনি যদি দয়া করে' এই চিঠিটা এক্ষুনি ওকে দেন—"

"বিকেল বেলায় দেব—যখন ও চা বানাতে নামবে।" চিঠিখানা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমি বলি: সরে পড়ো এখন।"

রবিকে অন্তোমুখ করে' আমার বিছানায় ফিরলাম। আবার নতুন করে' তোড়-জোড় করে' ঘুম দেবার বৃথা চেষ্টায় রয়েছি—কাগজের বড়ো, মেজ, সেজ, ন, রাঙা এবং শোনা—এই সব খবর শেষ করে বিজ্ঞাপন-দাতাদের ছোটখাট বার্তাগুলি পড়ছি—আধ ঘণ্টাও হয়নি—আবার সদরে করাঘাত শোনা গেল। এবার আওয়াজটা আরো জোরালো।

"ভারী দুঃখিত—" দরজা ফাঁক করা মাত্র ও সুরু করে।

আমার আভ্যন্তরীণ লাভাপ্রবাহ প্রকাশ করার ভাষা পাই না।

"দেখুন, আমি ভেবে দেখলাম…" বলতে গিয়ে ও থামে। ওর চিন্তাধারার আদ্যোপান্ত কিম্বা শেষ সিদ্ধান্ত কোন্‌টা জানাবে সে সম্বন্ধে একটু বোধ হয় ভেবে নেয়। তার পরে বলে—"দেখুন, ইতমধ্যে আমার মত বদলেছে। আমার চিঠিখানা ফেরৎ পাওয়া দরকার। প্রিসিলাকে দেননি তো? দয়া করে' ওটা আমায় ফিরিয়ে দিন্।"

"বলছি—কেটে পড়ো কেটে পড়ো এক্ষুনি—নইলে—" এর বেশি কিছু আমি বলতে পারি না।

"চিঠিখানা আমার চাই।" তবু সে গোঁ ধরে থাকে। "বেজায় বেশি রকম লেখা হয়েছে—বড্ড চূড়ান্ত হয়ে গেছে।"

"এর পরও যদি এখানে দাঁড়িয়ে বক্-বক্ করো তাহলে আরো চূড়ান্ত রকমের পাবে।"

"না। চিঠিখানা আপনি আমায় দিন্। আমার ভবিষ্যৎ—আমার সুখ-শান্তি সব ওই চিঠির উপর নির্ভর করছে।"

এর পর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ক্ষেপে উঠতে বাধ্য হই। এক ছুটে উপরে এসে বালিশের তলা থেকে চিঠিখানা বার করি, এবং আরেক ছুটে নীচে নেমে গিয়ে সেটা ওর হাতে গুঁজে দিয়েই ওর উন্মুখর ধন্যবাদের উপরেই দরজা বন্ধ করে দিই।

ওকে দূরীভূত করে' নিজের ঘরে ফিরছি, প্রিসির ঘরের পাশ দিয়েই আসছি—ওর দরজা খুলে গেল।

"ছেলেরা বড্ডো জ্বালায়।" প্রিসিলা বেরিয়ে এসে মধুর কণ্ঠে বলে: "তুমি কি ওকে বকে দিয়েছ? কিছু বলেছ ওকে?"

"দুয়েক বার কেশেছি।"

"ঠাণ্ডা লেগেছে তোমার। লাগবার কথাই। ঘুমোবার সময়ে বার বার এমনি ওঠা-নামা করতে হলে ঠাণ্ডা না লেগে পারে না। ছেলেগুলোর এই বড়ো দোষ পরের সুবিধা-অসুবিধা একদম্ ওদের চোখে পড়ে না। অপরের সুখ-দুঃখ—এ সব বিষয়ে একেবারে ওদের হুঁস নেই। ভারী বোকা ওরা। রবি খুব রেগে গেছে, না-কি, খুব দুঃখিত—মেজ মামা? কী রকম দেখলে ওকে?"

"ভালো করে' দেখিনি।" আমি বলি: "দেখবার চেষ্টাই করিনি, বলতে কি!"

বিকালে চায়ের টেবিলে আমার রাগটা তখন অনেক জুড়িয়ে এসেছে। জানালার বাইরে রবির মুখ—আবার উদয়োন্মুখ—মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিলো।

"বেচারাকে ভেতরে ডেকে এনে মিটিয়ে ফেল না।" প্রিসিলাকে আমি বলি।

"কক্ষনো না।" প্রিসিলা ঘোরতর হয়ে ওঠে: "একটু আস্কারা পেলেই ওরা কিরকম হয়ে ওঠে তুমি জানো না মেজ মামা।"

"জানতে চাইও না।" আমি জানাই।

নীরবে চা পান সেরে আমি উঠি। পিরাণটা গায়ে চড়াই। "আচ্ছা, আমিই দেখছি। দেখছি ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দেয়া যায় কি না।" এই বলে বেড়াতে বেরুই।

আমার বহির্গতি দেখে রবি একটু সুদূর-পরাহত হয়েছিল। কিছু দূর এগুতেই সে এসে আমার সঙ্গ নিল—"নমস্কার।"

"দেখ বাপু," আমি আরম্ভ করি, "তুমি বড্ডো বাড়াবাড়ি লাগিয়েছ। যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু আর না। আর বরদাস্ত করা যায় না। আচ্ছা, তোমার কি আত্মসম্মান বলে' কিছু নেই?"

"না। প্রিসির ব্যাপারে আমার কোনো মান অপমান নেই।"

"তা তো দেখতেই পাচ্ছি। আর সেইখানেই তোমার গলদ্। যে ছেলের নিজের সম্মানবোধ নেই তাকে আর কোন্ মেয়ে শ্রদ্ধা করবে! প্রিসির রাগের কারণটা কি, সত্যি করে বলো দেখি। তুমি কি অন্য কোনো মেয়ের প্রেমে পড়েছো? আর সেটা ও টের পেয়েছে কিম্বা সেই রকম একটা কিছু ও ভেবে নিয়েছে—তাই কি?"

"ও কথা ও ভাবতেই পারে না।" রবির স্বরে গভীরতা।

"আমিও তাই ভেবেছি। এবং সেইখানেই তোমার আরেক ভুল। তোমার সম্বন্ধে ও একদম্ নিশ্চিন্ত—তুমি যেন ওর হাতের পাঁচ। তোমাকে নিয়ে ওর কোনো ভাবনাই নেই। তোমাকে

আর কী হবে! যাকে আরো সব মেয়েরা পেতে চায় তাকে নিয়েই মেয়েদের দুশ্চিন্তা, এবং মেয়েরা সেই রকম ছেলেকেই পছন্দ করে।" আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি।

রবি এর কোনো জবাব দিতে পারে না। চুপ করে থাকে।

"তা ছাড়া, তারা একটু একগুঁয়ে লোককে ভালোবাসে।" প্রিসিলার মেজ মামা বলতে থাকেন: "বেশ একটু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—এই যাদের গেঁয়ো ভাষায় গোঁয়ার আর সাধু ভাষায় পুরুষসিংহ বলা হয়ে থাকে। ধরো, তুমি না হয়ে যদি অন্য কোনো ছেলে হোতো, সে কি প্রিসির সঙ্গে দেখা না করেই নড়ত মনে করো? সে মরীয়া হয়ে এখানকার মাটি কামড়ে পড়ে থাকতো। নেহাৎ যেতে হলে প্রিসিকে সঙ্গে নিয়েই তবে সে যেত।"

"আমরা সবাই তো এক ছাঁচের তৈরী না।" রবি ক্ষীণ কণ্ঠে বিবৃতি দেয়।

"নই যে, তা সত্যি। এবং সে জন্যে আমি তোমার প্রতি কোনো দোষারোপ করছি নে। বরং, বলতে গেলে, তোমার জন্যে আমি দুঃখিতই। কিন্তু দুঃখিত হয়েই বা কী করছি। ইচ্ছা-শক্তি হচ্ছে দুর্লভ জিনিষ, অনেকটা মানুষের জন্মগত, কেউ কাউকে তা ধার দিতে পারে না।"

"সাধনার দ্বারা হয়তো লাভ করা যায়।" রবি বলে।

"অসম্ভব। যারা জন্মাবার ইচ্ছা-শক্তি নিয়েই জন্মায়, চেষ্টা-চরিত্র দ্বারা কেউ পায় না। গোঁয়ার লোকরা হচ্ছে কবির মতন, সে আর বর্ণ—নেভার মেড। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি অনেকটা প্রতিভার অভিব্যক্তির মতই বিরল। যাক্, ও নিয়ে আলোচনা করে' লাভ নেই। তুমি পছন্দসই দেখে আরেকটি মেয়ে ছাখো। এবং প্রিসি টের পাবার আগেই তাকে বিয়ে করে সুখী হও।"

"আমার জীবনে প্রিস্ ছাড়া আর কোনো মেয়ে নেই।" রবি দীর্ঘ কণ্ঠে ব্যক্ত করে।

"তাহলে আর কী হবে! তাহলে তুমি বাড়ী ফিরে যাও। পৃথিবী বিপুল, যদিও পরমায়ু অল্প কিছু দিনের—তাহলেও এর মধ্যেই, দৈবের দয়া থাকলে, হয়তো তুমি মনের মতো মেয়ে পেয়ে যেতে পারো। অপেক্ষা করা ছাড়া তো উপায় নেই।"

ততক্ষণে আমরা ষ্টীমার-ঘাটে এসে পড়েছি। আমার উপদেশ-গুলির তলায় আণ্ডার লাইন্ করে জোরালো করার উদ্দেশ্যে নিজের পকেট থেকে পয়সা বার করে' কলকাতার একখানা টিকিট কেটে ওকে দিলাম। ষ্টীমার ছাড়বে কাল সকালে—এগারোটায়। তবে ওর ডেকে উঠে এখন থেকেই রাত্রিযাপনের কোনো বাধা নেই।

"আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। অজস্র ধন্যবাদ। এবং টিকিটের জন্যও। চলুন আপনাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।" রবি বল্লো।

আমি বললাম, "কোনো দরকার নেই। একাই ফিরতে পারব!" কিন্তু ও ছাড়ল না।

ফিরতি পথে আরেক প্রস্থ আমার উপদেশ। ভালোবাসার প্রথম ভাগ কাকে বলে, কোথায় তার শেষ, এবং কোন্‌খান থেকে দ্বিতীয় ভাগ সুরু। প্রথম ভাগে প্রেমের বর্ণ-পরিচয় হয় মাত্র, সেখানে সোজাসুজি বড়ো বানান্। জল পড়ে পাতা নড়ে। হাত ধরো বাড়ী চলো। এই সব। অ আ ক খ হ্রস্বদীর্ঘের জ্ঞান—এই নিয়েই প্রথম ভাগ। কিন্তু এইখানেই তো শেষ নয়, এহ বাহ্য, এর পরে আরো আছে। যুক্তাক্ষর-জর্জ্জর যতো কটোমটো শব্দ-সম্পদ নিয়ে প্রেমের দ্বিতীয় ভাগ। এবং অদ্বিতীয় ভাগ্য থাকলেই তবেই তাতে ওৎরানো যায়।

আমার নিজের বিদ্যে প্রথম ভাগের অধিক না হলেও—(গোড়াতেই ধারাপাতের ধাক্কায় পড়ে বেশি দূর এগুতে পারিনি, বলব কি!) নিজের ক্লাসের বা নিজের চেয়ে উঁচু ক্লাসের ছেলেকে পড়া বাত্‌লাতে কোন দিনই আমার কসুর নেই। রবির বেলাও তার অন্যথা হোলো না।

রবি চলছিল নীরবে—কী যেন ভাবতে ভাবতে। ওকে যে ভাবিত দেখব এটা আমার কাছে অভাবিত নয়। উপদেশের ওষুধ ধরেছে মনে হোল।

"যা বললাম মনে রেখো। এখনো সময় আছে।" বাসার কাছাকাছি এসে বলি।

"রাখব।" ও বলে।

"আচ্ছা, তাহলে এসো।" আমি আমার দ্বারদেশে পৌঁছই।—"আশা করি তুমি সুখী হবে।" আমার শুভেচ্ছা জানাতে দ্বিধা করি না।

"দাঁড়ান্।" রবি এক লাফে এগিয়ে আসে। আমার পাশ কাটিয়ে মুক্তদ্বার-পথে প্রবেশলাভ করে। এবং পর-মুহূর্ত্তেই আমার ইজিচেয়ারের উপর ওকে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়।

"এ কি—এ কি—এ কি!" রবির ব্যবহারে আমার তাক্ লাগে!

"আপনার উপদেশ পালন করছি।" বিবর্ণ, কিন্তু দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক মুখে রবি বলে: "প্রিসির সঙ্গে দেখা না করে' কথা না কয়ে এখান থেকে আমি নড়ছি না।"

সর্দ্দি-প্রবণতার মতই উপদেশ-প্রবণতা কারো কারো স্বভাব-সুলভ। এবং হয়তো সর্দ্দির মতই ছোঁয়াচে। যদিও ভেবে দেখলে উপদেশ দেয়াটা অনেকটা চুমু দেয়ার মতই। দিতে কোনোই খরচ নেই, এন্তার দিতে পারো, এবং দিতেও বেশ আরাম। তাছাড়া, চুমুর মতই, দেয়ার সাথে সাথেই সে-দেশ থেকে উপে যায়। কোনোই চিহ্ন রাখে না।

কিন্তু রবির ক্ষেত্রে যে বিপরীত হবে, উপদেশামৃত বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই অঙ্কুরিত হয়ে বিরাট মহীরুহ হয়ে দেখা দেবে তা কে ভেবেছিল?

"তুমি তো ভয়ঙ্কর লোক।" আমার দম আটকে আসে: "তাড়াতাড়ি সরে পড়ো, নইলে ভালো হবে না বলছি।"

"প্রিসির সঙ্গে আগে হেস্ত-নেস্ত না করে' নয়।"

আমার শেখানো বিদ্যা আমাকেই শেখাতে লাগা—এত আমার খারাপ লাগে। কখনো ভাবি নে যে আমার উপদেশ ভেল্‌কিওলার গাছের মত, আঁটি পুঁততে না পুঁততেই অঙ্কুর, অঙ্কুরিত হতে না হতে ফল—চক্ষের পলকে সাফল্য—এমন চাঞ্চল্যকর হয়ে দাঁড়াবে! হায় রে, এরূপ অমোঘ জানলে কতো না অকুস্থলে এবং অকুসময়ে আমি নিজেকেই তো উপদেশ দিতাম!

"ইস্! তুমি ভারী গোঁয়ার তো! দু' মিনিটের মধ্যে না যদি তুমি পিট্‌টান দিয়েছ আমি পুলিস ডাকব। বলে' রাখলাম।"

"ডাকতে চান ডাকুন। কিন্তু তার আগে প্রিসিকে ডাকলে ভালো হয় না?"

না, এই সব গোঁয়ার্তুমি আমার ভালো লাগে না। কোথায় বেড়িয়ে এসে আরাম করে' আমার চেয়ারে কাত হবো—কাত হয়ে নিজের এবং বিশ্বের সুখ-দুঃখে কাতর হয়ে যত রাজ্যের চিন্তাসূত্র এবং কল্পনার জালের টানাপোড়েন বোনা চল্‌বে—তা না,—এই সব উচ্চ্যাংড়াদের নিয়ে এক ক্যাচাং!

থানা কোথায় জানা নেই, তা ছাড়া ভেবে দেখলে পুলিসের চেয়ে প্রিসিলাই এখন কাছাকাছি। তাই আপাতত—

গেলাম তার কাছে, এবং তৎক্ষণাৎ টেনিস বলের মতো ঘুরে এলাম: "অনেক করে' বললাম, কিন্তু সে কিছুতেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হচ্ছে না।"

"বেশ, আমিও থাক্‌লাম তবে। যদ্দিন অপেক্ষা করতে হয় করব।"

"প্রিসিও কম একগুঁয়ে মেয়ে নয়। মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হবে।"

"তাই করব নাহয়।" রবি নির্ব্বিকার।

"তোমার খুসি।" বিরক্ত হয়ে উপরে উঠে এলাম।

গভীর রাত্রে নীচের খুট-খাট ধ্বনি শুনে নাম্‌তে হোলো। নেমে দেখি, রবি আমার ইক্‌মিক্ কুকারে বেশ তোড়জোড় করে' রান্না চাপিয়েছে। এক ডজন ডিমের খোলা ইতস্তত ছড়ানো।

"ডিমের পোলাও রাঁধছি।" সে বলল। "কি করে রাঁধতে হয় জানেন?"

"কাল সকালে উঠেই আমার প্রথম কাজ পুলিস ডাকা।" আমি জানালাম।

"বলে ভালোই করলেন। ভোর না হতেই তাহলে চা-টা খেয়ে নেব। আরো গোটা ছয়েক ডিম আছে এখনো।"

সকালে উঠেই আমার প্রথম কাজের কথা মনে পড়ল। পুলিস ডাকার কাজ। যদিও আমার ধারণায় পুলিসরা ডাকাডাকির যোগ্য নয়, যে ওদের ডাকতে যায় তাকেই ওরা আগে পাকড়ায়, এবং ফাটকে আটক রাখে, অমূলক কি না কে জানে, এই রকমের একটা সন্দেহ অনেক দিন থেকে আমার ছিল। কিন্তু তাহলেও, এ অবস্থায় ইতস্তত করে' লাভ নেই, পুলিসের সৌজন্য না পেলেও, অন্ততঃ গুণ্ডাদের সাহায্য নিতেই হবে। ধরে বেঁধে যে করেই হোক্ এগারোটার ষ্টীমারে রবিকে এখান থেকে রপ্তানি করে' তার পরে আমার চা গ্রহণ!

পায়ে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে নীচে নামি।

"এখনো রয়েছো দেখতে পাচ্ছি।" যতটা পারা যায়, রোষকষায়িত কণ্ঠে বলি।

"আজ্ঞে, এখন থেকে বরাবরই দেখবেন।···মানে, প্রিসিলার দর্শনলাভ না করা পর্য্যন্ত···"

"প্রিসিলা জীবনে তোমার মুখ দেখবে না," আমি জানাই, "এবং দেখা তার উচিতও নয়—"

আমার বাক্য সম্পূর্ণ করার আগেই প্রিসিলাকে আমাদের সম্মুখে দেখলাম। সেও নেমে এসেছে।

"এ সব কী হচ্ছে তোমার?—" রবির উদ্দেশে সে বলে।

"কী হবে? তোমার কাছে আমি অঙ্গীকারে আবদ্ধ। তুমি না মুক্তি দিলে তো কিছু হতে পারে না।" রবি ধীরে ধীরে বলে।

"কিসের মুক্তি? আমি তো তোমায় বেঁধে রাখিনি।—"এখানে থাকতেও বলছি না। তুমি স্বচ্ছন্দে ফিরে যেতে পারো।" প্রিসিলা জানায়।

"এই কথাটাই তোমার নিজের মুখ থেকে জানার আমার দরকার ছিল। এখন তুমিও বাঁচলে, আমিও বাঁচলাম। এবং আরেক জনও বাঁচলো। এখন আমি স্বচ্ছন্দে সেই মেয়েটিকে—"

"সেই মেয়েটি! তুমি তো কোনো মেয়ের কথা আমাকে বলোনি।" প্রিসিলা যেন আকাশ থেকে পড়ে।

"বলিনি—তার কারণ—তোমাকে কিম্বা তাকে- কাকে আমি বেশি ভালোবাসি আগে তো তা বুঝতে পারিনি। এখন বুঝছি।"

"মেয়েটি কে, শুনি একবার।" অপ্রাসঙ্গিক ভাবে প্রিসিলা প্রশ্ন করে।

"বলাই বাহুল্য। তুমি তাকে চিনবে না।"

"দেখতে কি রকম?" প্রিসিলা নিরুৎসুক।

"অদ্ভুত!···এ রকম সুন্দর মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি। অদ্ভুত সুন্দর।"

"বটে!" প্রিসিলা ঠোঁট কামড়ায়।

"তার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করবার আমার ভাষা নেই। তোমার মামা লেখক মানুষ, তিনি দেখলে—কিম্বা দেখেও হয়তো বর্ণনা করতে পারেন।"

"বুঝেছি।" প্রিসিলার দুটি ঠোঁট ঘনবিন্যস্ত দেখা যায়।

"তাছাড়া, তার স্বভাব এমন মিষ্টি। এমন মধুর স্বভাবের মেয়ে আমি দেখিনি। আমার মেজাজের সঙ্গে এমন খাপ খায়। আমার মতে, সুদীর্ঘ জীবনপথের সঙ্গী বেছে নিতে হলে এমনই একটি মেয়েকে—"

"তাকে বিয়ে করে তুমি সুখী হতে পারবে মনে করো?"

"সুখী হওয়া অবশ্যি পরের কথা। আগে তো বিয়ে করি। কিন্তু তোমাকে বিয়ে করবার কথা দিয়েছিলাম বলেই আমার বাধছে। তুমি যদি সেই অঙ্গীকার থেকে আমাকে মুক্তি দাও তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি তাকে বিয়ে করতে পারি। বলতে কি, সেই জন্যেই এত দূরে এত কষ্ট করে আমার আসা। তাহলে, তুমি আমায় প্রসন্ন মনে মুক্তি দিচ্ছো—কেমন?"

"ভেবে দেখি। এ সব ব্যাপারে চট্ করে' কিছু বলা যায় না। কেবল আমার নিজের সুখ-দুঃখের তো প্রশ্ন নয়। ব্যক্তিগত স্বার্থের কথাটাই বড়ো না। কোন্‌টা আমার পক্ষে উচিত হবে না হবে সেটা তোমার দিক্ থেকেও ভেবে দেখা আমার দরকার। তোমার যেমন কাণ্ডজ্ঞান নেই, তুমি হঠ্ করে যা-তা করে' বসতে পারো। কিন্তু আমাকে তোমার ভালো-মন্দ দেখতে হবে। নিজের খেয়ালে ভুল পথে চলে তুমি যে এক বাজে মেয়ের পাল্লায় পড়ে সারা জীবনের সুখ-শান্তি বিসর্জন দেবে তা' আমি কখনই হতে দিতে পারি না।"

"না, প্রিস্। মাভৈঃ। তোমার কোনো ভাবনা নেই। তাকে বিয়ে করলে আমি সুখী হবো আমি বলছি।"

"সুখী হবে না ঢেঁকী! মেয়েদের তো তুমি ছাই বোঝো! সুখ-শান্তির কী জানো তুমি? আমার আর কি, তোমার ভালোর জন্যেই আমার—। নইলে—না, সে-মেয়ের সঙ্গে কিছুতেই তোমার বিয়ে হতে পারে না, আমি বলছি।"

কলকাতার একটি অবাক মুহূর্ত

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কলকাতার পথে যেতে-যেতে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম
সিকি-আধুলি নয়—একটি মুহূর্তকে।
কলকাতার পথে পেয়েছিলাম
যখন শেষ-সন্ধ্যার মেঘগুলোকে
হঠাৎ বল্‌গা-হরিণ বলে মনে হয়েছিলো ;
রাস্তার সবে-জ্বলা আলোগুলোকে মনে হয়েছিলো
চোখের করুণ মিনতির মতো।
কলকাতার পথে হঠাৎ কুড়িয়ে পেয়েছিলাম
সেই অবাক একটি মুহূর্ত।

সেই একটি মুহূর্তে যেন কুড়িয়ে নিলাম সমস্ত জীবন !
মনে হয়েছিলো
গভীর অরণ্যের ভয়ঙ্কর মৌন গান শুনতে পাবো।
মনে হয়েছিলো
রাত্রির কালো সমুদ্র-কল্লোল পাবো শুনতে।
মনে হয়েছিলো
এই মুহূর্তের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে পারবো
এক গভীর স্বচ্ছ চেতনায়
যেখানে জলের দেবতা ধুয়ে দেবে মৃতদেহের স্মৃতি
আলোর দেবতা দেবে নতুন প্রাণ
শেষ-সন্ধ্যার বল্‌গা-হরিণ মেঘের মতো।

কলকাতার পথে যেতে-যেতে
এই অবাক মুহূর্তকে পেয়েছিলাম,
মন্দির-গাত্রে খোদাই-করা মূর্তির মতো এই মুহূর্ত।

সেই মুহূর্ত শুয়েছিলো ভিখিরির মতো
তার শিয়রে টিনের পানপাত্র
তার গায়ে ছেঁড়া চটের আবরণ
তার চোখ ছিলো বোজা, দেহ ময়লা, চুলে জট।
কিন্তু যেই তাকে স্পর্শ করলাম
সে হেসে উঠলো,
সে চাইলো অবাক দৃষ্টিতে
মায়ার মতো মিলিয়ে গেলো তার ছদ্মবেশ।

আশ্চর্য
কী করে তাকে চিনেছিলাম ?
বাড়ি ফেরার পথে কেবলি আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলাম
কী করে চিনেছিলাম সেই অবাক মুহূর্তকে
ছাই-চাপা মণির মতো যে লুকিয়েছিলো !

সেই মুহূর্ত আমাকে দিয়েছে অটল বিশ্বাসের বর
তার পর
আবার হয়তো ছদ্মবেশে শুয়ে আছে
কোনো গলির মোড়ে
কোনো ফুটপাতের কোণে
কোনো গাড়িবারান্দার তলায়।

হয়তো সেই অপেক্ষায় আছে
যখন সমস্ত জনতা তাকে এক দিন কুড়িয়ে নেবে।



ইউনিভার্সাল আর্ট গ্যালারী
কলিকাতা

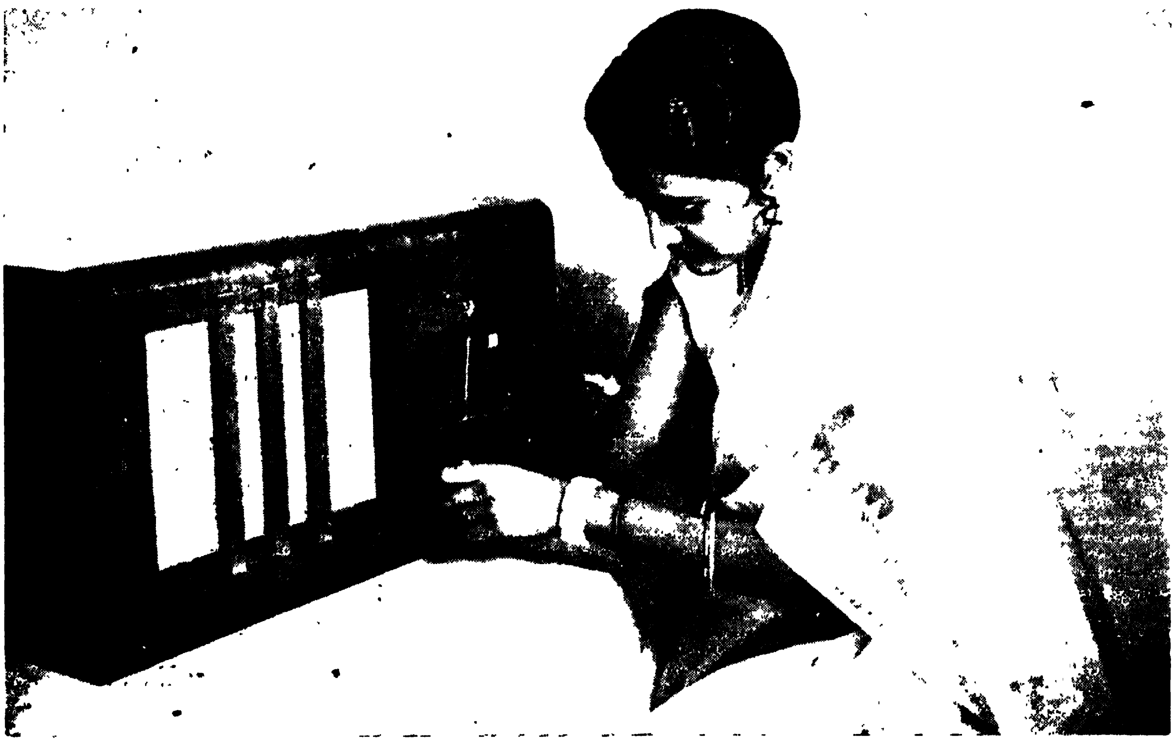
"যৌবনেরি পরশমণি
করাও তবে স্পর্শ;
দীপক-তানে উঠুক্ ধ্বনি,
দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।
নিশার বক্ষ বিদার ক'রে
উদ্বোধনে গগন ভ'রে
অন্ধ দিকে দিগন্তরে
জাগাও না আতঙ্ক।
দুই হাতে আজ তুলবো ধ'রে
তোমার জয়-শঙ্খ॥"

—রবীন্দ্রনাথ



রামকিঙ্কর সিংহ
(দ্বিতীয় পুরস্কার)

—কান পেতে রই—



(প্রথম পুরস্কার)

বীথি সরকার

নিয়মাবলী

প্রত্যেক মাসে এই বিভাগটিতে একমাত্র সৌখীন (এ্যামেচার) আলোকচিত্র-শিল্পীদের ছবি গৃহীত হইবে।

ছবির আকার ৬" × ৮" ইঞ্চি হইলেই আমাদের সুবিধা হয় এবং যত দূর সম্ভব ছবি সম্বন্ধে বিবরণ থাকাও বাঞ্ছনীয়। যথা, ক্যামেরা, ফিল্ম, এক্সপোজার, এ্যাপারচার, সময় ইত্যাদি।

যে কোন বিষয়ের ছবি লওয়া হইবে। অমনোনীত ছবি ফেরৎ লওয়ার জন্ত উপযুক্ত ডাক-টিকিট সঙ্গে দেওয়া চাই। ছবি হারাইলে বা নষ্ট হইলে আমাদের দায়ী করা চলিবে না, সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। খামের উপর "আলোক-চিত্র" বিভাগের এবং ছবির পিছনে নাম ও ঠিকানার উল্লেখ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

প্রথম পুরস্কার দশ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার আট টাকা, তৃতীয় পুরস্কার পাঁচ টাকা এবং অন্যান্য বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হইবে।



রিক্সাওয়ালা — মনোবীণা রায়



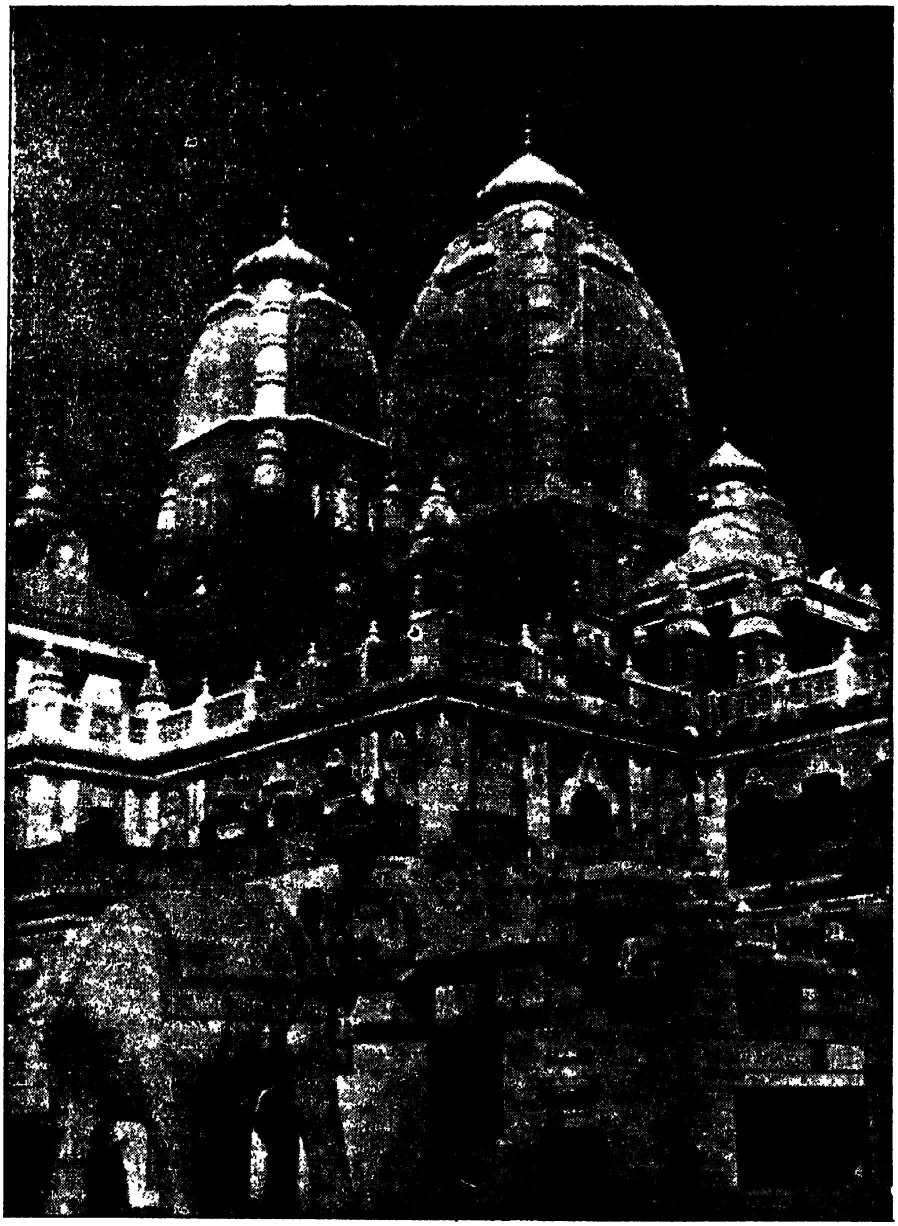
ঘরে—

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়



—বাহিরে

বিমল রায় (নিউ থিয়েটার্স)



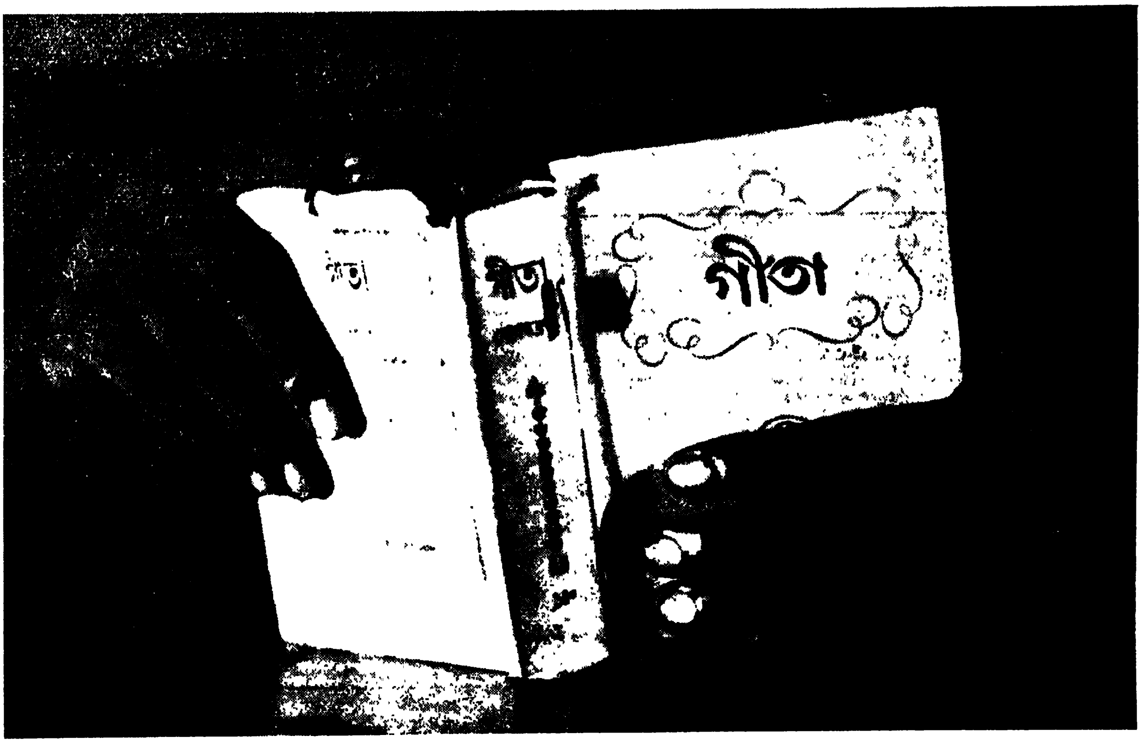
ভারতের—

নীরোদ রায়



আলপনা — কণিকা মুখোপাধ্যায়

—প্রতীক — জয়ন্ত চৌধুরী





সুনীল দত্ত
(তৃতীয় পুরস্কার)

সুস্থির







অস্থির

নীলাদ রায়

লালজী সাহেব

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

ছেলে রাজার, কিন্তু রাজপুত্র নয়, বন্দিনীপুত্র বা বাঁদীপুত্র বালক সুজনসিংহের মৃত্যু হয়েছে।

তার জননী কেশরবাই রাণী নন, বাঁদী থেকে সখি তার পর সহচারিণী, সঙ্গিনী, প্রেয়সীর পদে পৌঁছেছিলেন রাজ-অন্তঃপুরের আরো অনেকের মত। এখন তাঁর পদ 'পাশেয়ান'জীর, খেতাব সুরূপ রায়. সম্মান রাজ-প্রেয়সীত্বের মহিমায় মহারাণীর ও বিবাহিতা রাণীদের পরেই এবং ক্ষমতা প্রতাপ সবার উপরে। অর্থাৎ আসলে মহারাণীই, শুধু সরকারী ভাবে স্বীকৃত নন।

রাজপুত্র নামে অভিহিত না হলেও বালক লালজী সাহেব (মহারাণী ও রাণীদের পুত্র ছাড়া রাজাদের এই রকম সব সন্তানই—পুত্র লালজী সাহেব ও কন্যা বাইজী লাল নামে অভিহিত হয়) অন্যতমা প্রিয়তমা নারীর ও নিজের সন্তান, রাজাও সুরূপ রায়ের সঙ্গে শোকে-দুঃখে আকুল হয়ে উঠ্‌লেন।



নিয়ম নয় তবু রাজ-শোক, প্রকাশ্যেই বেসরকারী ভাবে শোকের দরবার বসল। সম্মানিত পদস্থেরা—সর্দ্দার লোকেরা, ঠাকুর সাহেবরা (জমীদার জায়গীরদার), পদস্থ কর্ম্মচারীরা সাদা কাপড় সাদা প'গড়ী পরে নিস্তব্ধ দরবারগৃহে রাজপুত শোকপ্রকাশের নিয়ম অনুসারে নতশিরে পাঁচ-দশ মিনিট বসে চলে গেলেন।

অন্তঃপুরেও সুরূপ রায়ের মহলে শোক জ্ঞাপন করার হুকুম জায়গীরদার, ঠাকুর সাহেবদের ঘরে ও বড় বড় ঘরে পৌঁছল। ঘেরা-টোপ-পরা রথের পর রথ, অসূর্য্যম্পশ্যা বন্ধগাড়ী ভরে ঘরানা-ঘরের, বড় ঘরের শেঠানী ঠাকুরাণীরা দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে অন্তঃপুরের অচেনা অলি গলি পথ সুড়ঙ্গ প্রধান খোজা ও প্রতিহারিণীদের সঙ্গে অতিক্রম করে এসে বিলাপাকুল শোকগৃহে দশ মিনিটের জন্য বসে গেলেন।

অন্তঃপুরের শোকগৃহ বাইরের মত নিস্তব্ধ নয়। সেখানে আর্ত্তনাদ করে, হা-হুতাশ করে, করাঘাতে বক্ষ তাড়না করে, নানা রকমে শোক প্রকাশ করে কাঁদার জন্য আগন্তুক সখি সেবিকা দাসী ও বহু বাইরের থেকে আনা মেয়েরা উদ্বেল বিলাপে আচ্ছন্ন ও আকুল হয়ে থাকার নিয়ম। যদিও যাঁর শোক তিনিই সেখানে অনুপস্থিত থাকেন চিরাচরিত প্রথায়।

সুজন সিংহের বড় ভাই সমর সিংহ তখন ১০।১১ বছরের বালক। রাজা ব্যাকুল মোহে তাকে কাছছাড়া করতে পারেন না। তার জননীর কাছে সে থাকে খানিকটা, বেশীর ভাগই পিতার কাছে থাকে।

বৃদ্ধ রাজার শোকাচ্ছন্নতার খবর সাদা রাজদূত রেসিডেন্ট সাহেবের কানেও পৌঁছল।

ছেলেও রাজার বটে, শোকও রাজার সত্য, কিন্তু রেসিডেন্টের বড়ই মুস্কিল হল। বিলিতী মতেও এবং সরকারী ও দরবারী ভাবেও এ পুত্র ও এ শোক স্বীকার করে নেওয়ার নিয়ম নেই। অথচ রাজার সন্তান, রাজা শোকার্ত্ত রাজকুমার বলে সসম্মানে স্বীকৃত না হলেও।

বিমনা রেসিডেন্ট সাহেব সৌজন্য করে দেখা করতে এলেন।

প্রবীণ প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে রাজা খাস-কামারায় বসে দেখা দিলেন। বালক সমর সিংহও পাশে বসেছিল।

রেসিডেণ্ট যথারীতি অভিবাদন করমর্দন করলেন রাজা ও মন্ত্রীর সঙ্গে। তার পর কিছু না জানার মত আড়ষ্ট ভাবে শুধু কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। সমবেদনা জ্ঞাপনটা নির্ব্বাক্ দ্বিধার মাঝেই রয়ে গেল।

কিন্তু অভিভূত রাজা ব্যাকুল দুঃখে দুঃসংবাদের কথা জানালেন, আর সমর সিংহকে দেখিয়ে বললেন, এই ছেলেরই ভাই ছিল সে। বালক সমর সিংহ দীপ্ত কৌতূহলী চোখে চেয়েছিল সাহেবের দিকে। সে এইবার প্রধান মন্ত্রীর ইঙ্গিতে সেলাম করলে।

কিন্তু রেসিডেণ্টের কানেও যেন সে পরিচয় গেল না, আর চোখেও সে সেলাম পড়ল না এবং হাতও বাড়িয়ে দিলেন না। তার অস্তিত্বটাও যেন অদৃষ্ট ও অস্বীকৃত রয়ে গেল সাহেবের কাছে।

সপ্রতিভ বালককে শেখানো ছিল সাহেব হাত বাড়ালে তারও হাত বাড়াতে। মুহূর্ত্তের জন্ত সে দক্ষিণ হাতখানি একবার উঁচু করার মত নাড়ল, তখনি প্রধান মন্ত্রীর ইঙ্গিতে অপ্রতিভ বিমূঢ় ভাবে মাথা নীচু করে নিল। সমাজে তার পরিচয় সম্মানিত ভাবে স্বীকৃত নয় বালক সে দিন বুঝতে পেরেছিল কি না জানা নেই, কিন্তু প্রত্যভিবাদিত ও দৃষ্টিগোচর না হওয়া তার জীবনে এই প্রথম। সে তার অস্বীকৃত অস্তিত্ব নিয়ে বিবর্ণ মুখে অসহায় ভাবে বসে রইল তার কাছে অসীম ক্ষমতাশালী স্নেহাতুর রাজপিতা ও মন্ত্রীর পাশে এবং সাহেবের সামনে।

২

তার পর অনেক বছর কেটেছে।

সে রাজার পর আবার নতুন রাজা সিংহাসনে বসেছেন।

অন্তঃপুরের সে রাজার বহু সন্তানের মাঝে বহু আছে—বহু নেই। যারা আছে বাড়ী ও ভাল মুনাফার জায়গীর পেয়েছে তারা। তারা ও বাইজীলালরা বিবাহিত হয়েছে পূর্ব্বপুরুষদের লালজী-সাহেবদের বংশে বহু বিস্তৃত শাখা-প্রশাখায় সম্মানে অসম্মানে, বড়যন্ত্রে দারিদ্র্যে ও ঐশ্বর্য্যে ক্ষুদ্রতায় তারা বিরাট একটি পরিবারের মত থাকে। আজ এর ঘরে ওর বিবাহ হয়। বলে এক ঘর নিঃসন্তান হলে অন্তের ঘর থেকে দত্তক পোষ্য গ্রহণ করে বংশ ও ধনপ্রবাহ বহমান রাখে। সুখ-দুঃখ ভোগ-বিলাস দিনযাপনের ধারা তাদের কত কাল ধরে যেন একই ভাবে চলছে আজো।

একান্ত আদিম তার লীলা। এক দিকে পুত্র-কন্যা-পরিবার, বংশানুক্রমিক ধন-ঐশ্বর্য্য, অপর দিকে রাজ-অন্তঃপুরের মতই বহু চিরবন্দিনী বাঁদী, রূপসী নারী নিয়ে নৃত্য-গীত ও অতি স্থূল ভোগময় জীবনযাত্রা। এবং তাদেরও দাসী সন্তান-সন্ততিতে অন্তঃপুর ভরা। যাদের বিশেষ কোনো পরিচয় বা জাতি নেই। খাঁটি দাস-সম্প্রদায়। শুধু অচিহ্নিত সংজ্ঞা।

লালজী সাহেব সমর সিংহও জায়গীরদার এখন। রাজপিতৃস্নেহ মহিমায় অন্ত ভাইদের চেয়ে কিছু বেশী আয়ের সে জায়গীর। এ জায়গীর মানে খাজনা লাগে না রাজদরবারে। ফেলে ছুড়ে লুটিয়ে বিলিয়ে খেয়ালে খুসীতে ভোগ করে যেতে পারে চিরকাল, পুরুষ ক্রমে। শুধু সে পুরুষানুক্রমটি জ্যেষ্ঠাধিকারী।

তাদের অন্ত সব সন্তানরা? তারা প্রথম পুরুষে 'ছুট-ভাইরা' (ছোট ভাইয়ের দল)। তার পর কাকাসাহেব। তাদের সন্তানরা আস্তে আস্তে প্রকৃতির প্রতিশোধের ভার ঐ দাসীপুত্রদের মত মূঢ় একটা সম্প্রদায় গড়ে অস্তিত্ব রাখে ধনহীন বিত্তহীন অধিকারহীন।

লালজী সাহেবের অনেক সন্তান। পুত্র-কন্যা বহু। জীবনযাত্রার পুরাতন ধারার কঠিন প্রাচীরের আড়ালে বসেও তাঁর মন যেন কেমন ব্যাকুল ও চিন্তিত হয়ে ওঠে।

কোন্ অবমাননা অসম্মানের মাঝে সে ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল ঠিক জানেন-না বা বোঝেন না, কিন্তু নিজের সন্তানদের পানে চেয়ে যেন কি ভাবনা প্রতিকারহীন মূঢ় বেদনায় উদ্বেল করে তোলে থেকে থেকে। অনেক ভাবেন। রাত্রে খেতে বসেন মাঝে মাঝে সকলকে নিয়ে, চার ছেলে—সূর্য্যসিংহ, চন্দ্রসিংহ, তারাসিংহ সমুদ্রসিংহ। অবিবাহিতা বালিকা ছোট মেয়ে দু'টি মাতা-পিতার কাছে আসে যা পারে সামান্ত মুখে দিয়ে দাসীদের কাছে গিয়ে শোয় রাত্রির মত। —মা-বাপকে তারা ঐ এক-আধ বার নৈমিত্তিক প্রথায় দর্শন করে মাত্র।

খাবারের পিঁড়ি পড়ে একটা করে বসবার আর একটিতে থাবার রাখবার —প্রকাণ্ড কাঁসার থালায় করে আসে বহু রকমের ভোজ্য, হয়ত রূপার, নয়ত রূপার কলাই-করা বাটিতে সাজিয়ে। সুমুখে কিছু দূরে নৃত্যগীত করে সুন্দরী বাঁদীরা—মদির পানীয়ও থাকে হুকুম হলে আহার্য্যের সঙ্গে।

লালজী সাহেব বড় ছেলেকে পাশে নিয়ে বসেন।—তারও বিবাহ হয়েছে রাজপুতনারই অন্ত রাজ্যের কোনো দাসীকন্যা বাইজীলালের সঙ্গে। ছেলে-মেয়েও হয়েছে।

অহিফেন, আসব ও বিলাস-ভোগময় দেহ জরায় বার্দ্ধক্যে স্তিমিত ও স্থবির হয়ে আসে লালজী সাহেবের।

লেখাপড়া শেখেননি বেশী, অল্প পরিসর জীবনের ধারা বাইরের কোনো স্রোত কোনো দিন তাতে মেশেনি, বাইরের জ্ঞান অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র নেই বলাই ঠিক; কিন্তু ব্যাকুল মুগ্ধ পিতৃস্নেহ তাঁকে কি কথা কানে কানে বলে যায় ক্ষণে ক্ষণে।

সহসা কোনো দিন আহারের পর—নৃত্যগীত পান শেষ হবে, কাঁসা (খাবার-দেবার নাম কাঁসা পরিবেশন) তুলে নিয়ে যায় দাসীরা। লালজী সাহেব ছেলেদের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবেন। তার পর বড় ছেলেকে বলেন, আমার তো দিন শেষ হয়ে আসছে। আমার এই সব সন্তান, এরা ভাবনায় ফেলেছে আমাকে।

ছেলেরা সবাই উৎসুক হয়ে চেয়ে থাকে। বড় ছেলে বুদ্ধিমান, তিনি সম্ভ্রম-নত শিরে স্মিত মুখে বসে থাকেন। কি বলতে চান পিতা?

দ্বিধাগ্রস্ত মনে ভাষা যোগায় না। পিতা বলেন, আচ্ছা, আমি যদি এদের তিন জনের জন্ত খানিকটা করে সম্পত্তি দিই আর বাড়ী করিয়ে দিই? এই তোমার থেকেই, তোমার তাতে লোকসান হবে না। তোমার তো ছুটভাইদের দেখতে হবেই—।

বড় ছেলে সম্ভ্রমভরে বলেন, আপনার যেমন ইচ্ছা।

লালজী সাহেব আশ্বস্ত হন। হাঁ, তাহলে, কাল থেকে এই বিষয়টা চন্দ্রসিংয়ের আর তারাসিং সমুদ্রসিংয়ের জন্ত ওই জায়গা বা সম্পত্তি ঠিক করে দেবেন।

কিন্তু প্রভাতে উঠে মনে হয় দরকার নেই তার, কিছু অসুবিধা হবে না এবং বড় ছেলে কি মনে করবে। হয়ত দেবে না। এক জনের ভোগাধিকার পুরুষানুক্রমে অন্ত সবাইকে বঞ্চিত করে এসেছে, সে-ও জানে তার সন্তান সকলে পাবে না। কিন্তু আপাত লোভ

নিজের ক্ষমতার ঐশ্বর্য্যের মোহ পিতৃদের অতীতের বঞ্চনাকেও ভাবতে চায় না, মনুষ্যের ভবিষ্যৎ বঞ্চনাকেও ভাবতে চায় না।

আবার কোনো দিন সবাইকে নিয়ে বাগানে বসেন। কি যেন বলতে চান। বড় ছেলের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে ওদের কি কি দেওয়া যায়? কোন মঞ্জিল, কোন্ দিকের ঝরোকাওয়ালা মহল? কতটুকু বাগান, জায়গীরের কতটুকু আর পেতে পারে।

পরামর্শ যেখানে আরম্ভ হয় সেইখানেই ফিরে এসে থেমে যায়। লৌহ নিগড়ে বাঁধা নিয়মকে ডিঙিয়ে, পাশ কাটিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার কোনো রকমের পথই খুঁজে পাওয়া যায় না। সতর্ক বড় ছেলের কাছ থেকেও কোনো অঙ্গীকার বা আশ্বাস পাওয়া যায় না।

একদিন গরমের সন্ধ্যায় তরুণ কনিষ্ঠ পুত্র সমুদ্রসিংহ স্মিত মুখে এসে পিতাকে অভিবাদন করে জানাল, সে ম্যাট্রিক পাশ করেছে।

এই ধরণের বহু বিস্তৃত বংশের নানা শাখা চার দিকে ছড়িয়ে আছে, বালক তরুণ যুবক ছেলে কম নেই। কিন্তু কেউই আজ পর্য্যন্ত পাশ করেনি, ইংরেজী লেখাপড়া শেখেনি। এমন কি লালজী সাহেবের নিজের অন্য ছেলেরাও না। মেলামেশার জন্য বিত্তার কি এমন দরকার? আর আংরেজী? তারা তো চাকরী করবে না। উর্দ্দু হিন্দী? দু'-চারটে বইয়ের বেশী কি বা দরকার? কাজ-কর্ম্ম তো 'কামদার' মুন্সীরাই করবে। এই তাদের মোসাহেবের শিক্ষা এবং ধারণাও এই পুরুষ-পরম্পরা।

পিতা আনন্দে গৌরবে গর্ব্বে খুসী হয়ে পুত্রকে পাশে বসালেন। সেকাল হলে কিছু হয়ত পুরস্কার দিতেন। এখন সে ভাবের রেওয়াজ নেই।

ভাইদের ঈর্ষ্যা ও আনন্দ সমানই হল হয়ত।

কে কবে লেখাপড়া করেছিল তাদের বংশে, যদিও সবাই তারা হিন্দি ও উর্দ্দু জানত। এখনকার দিনে ঠাকুর লোকদের ছেলেদের একটু ইংরেজীর দিকে ও শিক্ষার দিকে লক্ষ্য হয়েছে। সব বাইরের বিদেশের লোকই শিক্ষার গুণে বড় কাজ পাচ্ছে এই জন্য। ইত্যাদি কথা হ'তে লাগল।

সন্ধ্যা শেষ হয়ে গেল। রাত্রি হ'ল। চারি দিকের চাটুকারের দল ও পুত্রেরা একে একে উঠে গেল।

পিতা সমুদ্রসিংহকে বললেন, এবারে তুমি তোমার মাকে খবর দিয়ে এসো। দিয়েছ কি?

সমুদ্র সিংহ বললে, না, যাই। তার পর একটু ইতস্ততঃ করে বললে, শিউগড়ের ঠাকুর সাহেবের সেজ ছেলে, অমরপুরার ঠাকুরের এক ভাইপো, তেজগড়ের রাও সাহেবের দু'টি নাতি সব আমরা একসঙ্গে পাশ করেছি। ওরা সব আজমীরে পড়তে যাচ্ছে। আমাকেও ওখানে পড়ানোর ব্যবস্থা করে দিন।

আরো পড়বে? আর পড়ে কি হবে? সবিস্ময়ে পিতা জিজ্ঞাসা করলেন।

সমুদ্রসিং নত শিরে খানিকক্ষণ বসে রইল, তার পর বললে, আমাদের তো কাজ বা চাকরীই করতে হবে। ওরাও তাই বলছিল। কেন না ওরাও তো কেউ বড় ছেলে নয়। লেখাপড়া শেখা থাকলে কাজ ভাল পাব। এখানে না পেলেও বাইরে পাব।

বিস্মিত লালজী সাহেব আরো আশ্চর্য্য হলেন, ওদের মধ্যে এত আলোচনা হয়েছে জেনে। তারা তো যাবে, অনায়াসেই যেতে পারে। কিন্তু লালজী সাহেবদের বংশের কেউ কি ঠাকুর সাহেবদের ছেলেদের সঙ্গে রাজপুত কলেজে বা অন্য কলেজে আজমীরে কখনও পড়েছে? অর্থাৎ পড়তে পাবে কি?

দীর্ঘ কাল আগের সুজন সিংহের মৃত্যুর পরের সেই ঘটনা মনে পড়ে গেল। তখন যা বুঝতে পারেননি বড় হয়ে অনেক দিন পরে তা বুঝেছিলেন। বৃদ্ধ খুশনজরজীর ছেলে খুদাবক্স তাঁর বন্ধু ছিল। সে বুঝিয়ে দিয়েছিল এক কথায় তিনি বা লালজী সাহেবরা বিবাহিতা রাণীর সন্তান নন। রেসিডেন্ট সাহেব তাই তাঁকে দেখতে পারনি। মহারাণীর চেয়ে আদরিণী প্রতাপান্বিতা তাঁর জননী মাত্র জননীই, মর্য্যাদাহীন বাঁদী। সেদিনও নতমুখে সেই সত্য ও গ্লানি গলাধঃকরণ করেছিলেন।

তিনি স্তব্ধ হয়ে রইলেন। যদি ঠাকুর সাহেবদের ছেলেদের সঙ্গে পড়তে না পায়। যদি কিছু আপত্তি ওঠে। তাঁর যা কষ্ট হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট হবে এদের। যদিও তাঁর কষ্টও কম হয়নি, কিন্তু সন্তানের মনে সেই ধরণের কষ্ট হবে এটা মনে করতে ভাল লাগছিল না।

মুখে তিনি বললেন—আচ্ছা, পোড়ো। দেখি আমি আজমীরের ব্যবস্থা কি করতে পারি।

তার পর দেখতে দেখতে দিন কেটে গেল।

ভর্ত্তি হবার সময় জুলাইয়ের গোড়ায় কখন মুন্সী 'কামদার' গিয়ে রাজার কলেজে টাকা জমা দিয়ে এলো। (কামদার কর্ম্মচারীদের বলে)।

সমুদ্র সিংহ বাপের কাছে আবার জিজ্ঞাসা করতে এসে শুনলেন, তার ভর্ত্তির ব্যবস্থা এখানকার কলেজেই হ'ল। বি-এ পড়বার সময় ওখানে গেলেই তো হবে।

ক্ষুব্ধ মনে সে মাথা নীচু করে বসে রইল, তার চোখে জল আসছিল।

ভাইয়েরা পিতার সাঙ্গোপাঙ্গরা আর পিতা এখানকার কলেজের পড়ার অনেক সুখ-সুবিধার কথা নৈর্ব্যক্তিক ভাবে আলোচনা করতে লাগলেন।

৪

আই-এ পাশ করল সমুদ্র সিং। সবিস্ময়ে পিতা দেখলেন সে আজমীরে পড়ার কথা কিছু বলল না। আশ্বস্ত ভাবে বি-এ পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন স্থানীয় কলেজেই। কি ভয়ে কি যেন শোনার ভয়ে তিনি জিজ্ঞাসাও করলেন না কিছু। সেও কিছু বলল না। সে কি ভুলে গেছে? পিতা ভাবলেন আবার।

সহসা দেখা গেল শুধু তার বাল্যবন্ধুর দল নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এবং আর তার বন্ধু নেই। এখন সমুদ্রসিং সঙ্গিহীন গম্ভীর-প্রকৃতি অল্পভাষী যুবক। এখনকার সহপাঠী আছে কিন্তু সঙ্গী নেই। জ্ঞানবৃক্ষের চমৎকার কোনো ফল কি সে চেখেছিল? বোঝা গেল না।

দু'বছর বাদ বি-এ পাশও করল সমুদ্রসিং। দান পূজায় জলসায় গানে উৎসবে ভোজে লালজী সাহেবের অট্টালিকা মুখর হয়ে উঠ্‌ল। তার গর্ব্বিত পিতার কাছে অন্য রাজ্যের জীবিত

রাজার বন্দিনী তনয়ার সম্বন্ধ আসতে লাগল। আগের রাজাদের লালজীদের সন্তান নয়, একেবারে খাঁটি প্রধান ধারার সম্পর্ক।

লালজী সাহেবের মনের বহু ভাবনা নিতান্ত ছুটভাইয়াদ প্রাপ্তির ভয় অন্ততঃ এ ছেলের জন্য আর ছিল না।

জন্ম মৃত্যু বিয়ে। জন্মের সময় যে জন্মায় তার মতের অপেক্ষা কেউ করে না, মৃত্যুর সময়েও না। শুধু শুধু বিয়ের সময় মত নেওয়াটা এখনকার কালেই হয়েছে—কয়েকটা জায়গায়ই অবশ্য। এখানে তার ঢেউ আসেনি। সুতরাং সমুদ্রসিংয়ের মত না নিয়েই বিয়ের কথাবার্ত্তা চলছিল।

৫

এমন সময়ে এক দিন শীতের সন্ধ্যায় সমুদ্রসিংহ বাপের দরবারে এসে দাঁড়ালো। কনকনে শীতের ঠাণ্ডা, লালজী সাহেব চমৎকার রেশমী বালাপোষে গা ঢেকে মূল্যবান গালিচায় বসে ভাগবত পাঠ শুনছিলেন। পুণ্যলোভী বেশী কেউ ছিল না আশে-পাশে। ওকে দেখে ভাগবত সেদিন সংক্ষেপে সমাপ্ত হ'ল।

রাজপ্রিয়া সুরূপা সুরূপরায়ের পৌত্র সমুদ্রসিং। তাকে দেখলে লালজী সাহেবের জননীর কথাই বেশী মনে পড়ে পিতার চেয়ে। জননীর মতই মুখশ্রী দৃপ্ত ও দীপ্ত, রংও সেই রকম। ঠোঁটের না চোখের কোনখানটা যে তার পিতামহীর মত ঠিক বুঝতে পারা যায় না। এক কথায় সমুদ্রসিংহের চেহারা চমৎকার, দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ সুন্দর মুখশ্রী।

পিতার কাছে এমনি এসে বসে সবাই অনেক সময়। কিন্তু এত রাত্রে একলা এসে বসে না কেউই।

সমুদ্রসিংহ দু-একটা অবান্তর কথা জিজ্ঞাসা করে পিতার শারীরিক কুশলের কথা জিজ্ঞাসা করল। তার পর সহসা বললে, আমি একটা কাজ পেলাম। আপনার অনুমতি আগে নিতে পারিনি, আপনি অসুস্থ ছিলেন। আর কাজটা হবে নাই ভেবেছিলাম।

পিতা শুয়েছিলেন কাত হয়ে। উঠে বসলেন, বললেন, কাজ পেলে? কোথায়? এখানেই তো? কে করে দিলে?

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসর। পুত্র বললে, না, এখানে না, যুদ্ধের চাকরী পেলাম। দরখাস্ত করেছিলাম।

বৃদ্ধ অবাক হয়ে বললেন, লড়াইয়ের চাকরী? সে কি? কি চাকরী? ট্রান্সপোর্ট রসদ সরবরাহ, মজুত সেপাই দেখা-শোনা? সে তো ভালো চাকরী, তা সে তো এখানেও পেতে পারো।

ছেলে বললে না, সে কাজ আমাদের দেয় না। সে বড় বড় রাজপুত সর্দ্দাররা পায় আপনি তো জানেন। আমি ব্রিটিশ-ভারতের যুদ্ধের কাজ নিলাম। ওরা অনেক লোক নিচ্ছে। এখান থেকেও অনেক গেছে। এখন শিখতে পাঠাচ্ছে।

পিতা ভয় পাবেন, না, খুসী হবেন যেন বুঝতে পারলেন না। কি রকম লড়াই তাতে কি ভাবে থাকবে সে, কি পদ, কি দায়িত্ব, কিছুই জানেন না তিনি। বিচলিত ভাবে তবু জিজ্ঞাসা করলেন, কুমেদানজীর মত কাজ?

কুমেদানজী অর্থাৎ 'কমাণ্ডার-ইন-চীফ।' তিনি ছিলেন আগের দিনের ঐ রাজ্যের সৈন্য বিভাগের কর্ত্তা। ঘোড়ায় চড়ে পায়ে হেঁটে প্রকাণ্ড তরোয়াল মস্ত বন্দুক নিয়ে বর্শা নিয়ে যারা লড়াই করত সেকালে। এক সময়ে প্রকাণ্ড জোয়ান লম্বা-চওড়া চেহারা অধুনাবৃদ্ধ নূরুদ্দেহ কুমেদানজীর কাছে আফ্রিকার যুদ্ধের গল্প শোনবার জন্য অনেকেই যেত। লালজী সাহেবের ছেলেরাও কখনো কখনো সমবেত হয়েছে। কমাণ্ডার-ইন-চীফকে সোজা করে নিয়েছিল তার দলের সেপাইরা 'কুমেদানজী' নামে।

পুত্র একটু হাসলে, বললে না, এখন ও পদ খুব উঁচু পদ। এখানেও আর এখন সে রকম সৈন্য আর সে রকম অস্ত্র-শস্ত্র নেই সেকালের মত। সেই কুমেদানজীকে পেনসন দেওয়ার পরই অনেক বদল হয়েছে। আমি ছোট চাকরীই পেয়েছি পদাতিক সৈন্যের দলে।

পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, তা কোন্ দেশে তোমায় যেতে হবে?

এখন তা মাউ ছাটনিতে ওদের একটা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে, সেখানে যেতে হবে। তার পর কি জানি কোথায় দেবে, আসামে বর্ম্মায় কোথায় জানি না।

ভূগোল-জ্ঞানহীন, বাইরের খবর সম্পর্কে অজ্ঞ ও উদাসীন, একান্ত অন্তঃপুরবাসিনী মেয়েদের মত বৃদ্ধ লালজী সাহেব হতবুদ্ধির মত চেয়ে রইলেন। তার পর বললেন, কবে আসবে আবার?

—ছুটী পেলেই আসতে পাব।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বৃদ্ধ বললেন, আমি চেষ্টা করি তুমি এখানে কাজ পাও যাতে, তুমি এখনি কিছু ঠিক কোরো না।

পুত্র এক দিকে চেয়ে বসেছিল অন্য মনে। মোটা গালিচা-পাতা প্রকাণ্ড ঘর, সাদা দেওয়ালে সুন্দর পাতা ফুল লতা পাখীর ছবি আঁকা। ওপরে দেওয়ালে কয়েকটা ছবি গত মহারাজের বর্ত্তমান রাজার, বিলিতী গত রাজার সপরিবার ছবি, এখনকার রাজা-রাণীরও এবং দু'-একখানা বিলিতী প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি টাঙানো। দু'দিকের দেওয়ালে প্রকাণ্ড একটা করে আরসি এবং দু'টা বড় বাজ-ঘড়ি ঠিক সামনা-সামনি। তার পাশে এক দিকে লালজী সাহেবের নিজের কম বয়সের রং ফলানো বড় ছবি একটা। মাথায় যোধপুরী সাফা, (পাগড়ী), ব্রিচেশ ও গলাবন্ধ কোট-পরা, হাতে ঘোড়ার চাবুক—ঠিক শিকারে বেরুবার পোষাক মনে হয়।

ছেলে চোখ ফেরালে, বললে, এখানে হবে না বাবা।

—কেন? আমি চেষ্টা করে দেখি।

ছেলে এবারে বললে, আপনি তো জানেন কেন হবে না। যে জন্য আমার আজমীরে পড়া হতে পারেনি, যে জন্য আমার এখানে বড় কাজ হবে না, সেই জন্যই হবে না।

লালজী সাহেব মাথা নীচু করে চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তার পর বললেন, কেন? তুমি কি কারুকে জিজ্ঞাসা করেছিলে?

সমুদ্রসিং বললে, আমি যখন আজমীরে যেতে পেলাম না, এখানেই ভর্ত্তি হলাম, তখনি আমার এক বন্ধু তেজগড়ের নাতি বলেছিল তোমার পড়া ওখানে হতে পারবেই না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? নিশ্চয় হবে, বাবা বলেছেন। সে তখন চুপ করেই রইল।

সমুদ্রসিও চুপ করে গেল, আর কিছু বললে না।

পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, তার পর? সমুদ্রসিং একটু ভাবলে, তার পর বললে, অনেক দিন পরে সে যখন আজমীর থেকে আই-এ পরীক্ষার পর ছুটীতে এলো, আমি বি-এ, পড়বার খবর নিতে তার কাছে গেলাম। সে চুপ করে রইল, তার পর বললে, তোমার ওখানে

লেনিন

প্রভাত বসু

এখনো সন্ধ্যা নামেনি শহর-পথে
আকাশের তীরে গোধূলির ক্ষীণ রেখা—
সেদিনের সেই তপ্ত হাওয়ায় শেষ নিশ্বাস পড়ে
পাপ-জর্জর, শোষণবিলাসী ক্লিষ্ট প্রেতাত্মার।

অক্টোবরের স্মরণীয় সন্ধ্যায়
কবরশালার মশাল জ্বলিল নিভৃত পেট্রোগ্রাডে;
রুটি-ভিখারীর দল
অতীতের বুকে প্রোথিত করিল রুটি-চোর শাসকেরে।

যুগান্তরের নূতন সূর্য উদিল নূতন ক্ষণে।
লাল দিন এলো,
রাত্রি স্বপন-রাঙা—
'সবাই সমান এ মানব-ভূমে', হাঁকিল বলশেভিক;
দুঃখজয়ীর দল
চাষী-মজুরের শাসনতন্ত্র গড়িল আপন হাতে।

নবজীবনের চিরজয়ী বাণী বহিয়া আনিল কে বা—
গোপন গুহার আড়াল ভাঙিয়া দুর্বার জনস্রোতে
কে ধরিল হাল ৭ই নভেম্বরে?
দুঃসহতম দুখে
জীবন যাহার সোনা হয়ে গেছে সেই সে মহামানব
নির্ভীক, বীর, বিপ্লবী সেনাপতি
অমর লেনিন—চরণে তাঁহার জানাই নমস্কার!

নেগ্রো কবিতা

আমি ও গান গাই, আমেরিকা

—Langston Hughes,

আমি ও গান গাই, আমেরিকা!

আমি কৃষ্ণবরণ ভাই…
যখন সেনাদল আসে,—
ওরা আমায় কিচেনে' পাঠায় খেতে।
আমি হাসি,
আর বেশ পেট ভ'রেই খাই;—
আমাকে হ'তে হবে শক্তিমান্!

আগামী কাল
যখন আবার আসবে সেনাদল
আমি ব'সবো টেবিলের সামনে।
তখন,
কেউ সাহস পাবে না আমাকে নির্দেশ ক'রে ব'লতে,
"ওহে, 'কিচেনে' গিয়ে খাও!"

আরো,
ওরা দেখবে তখন, কত সুন্দর আমি—
আর লজ্জা পাবে।…

যেহেতু আমিও আমেরিকা।

অনুবাদক:—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পড়া হতে পারবে না। আমি এবারে জোর করে জিজ্ঞাসা করলাম, কি জন্ত এ কথা ও বলছে, কেন হবে না?

সে বললে, ওটা খানদানী (সম্ভ্রান্ত) ও খাঁটী পবিত্র রাজপুতদের জন্ত কলেজ। তার পিতামহ বলেছেন, তাতে তাদেরই বাঁদী ও দাসী-পুত্রদের নেওয়া হয় না। বলে অবশ্য যে খুব লজ্জিত হয়েছিল।

লালজী সাহেব চুপ করে রইলেন, কিছুই অনেকক্ষণ বলতে পারলেন না। শুধু মনে পড়ে গেল।

বহু দিন আগের সেই ছোটবেলার কথা। কিন্তু কিছুই বললেন না। তার পর বললেন, আমিও জানতাম তোমার ওখানে পড়া হবে না। খোঁজ নিয়েছিলাম। তোমাকে বলতে পারিনি।

রাত্রি গভীর হয়ে এলো। পিতা-পুত্র চুপ করে কি ভাবতে লাগলেন কে জানে।

অবশেষে ব্যাকুল পিতা বললেন, কিন্তু আমি যে তোমার খুব ভাল বিয়ের সম্বন্ধ পেয়েছি, বহু যৌতুক পাবে। তোমার টাকার অভাব হবে না, হয়ত ভাল কাজও পাবে। তাছাড়া তুমি বিবাহ করেই যেও না হয়। যদি এই পরম লোভ—অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার লোভ ছেলেকে ফেরায়। একবার মাত্র 'হাঁ' বলুক। তার পর সব চিরকালের মত ঠিক হয়ে যাবে।

সমুদ্রসিংহের মুখে একটু হাসির রেখা দেখা গেল, সে বললে, বাঁদী সন্তানের, দারোগাদের (রাজপুতদের দাসী-পুত্র) দুঃখ-লাঞ্ছনা তো আপনি স্বচক্ষে দেখলেন, আর তাদের বংশবিস্তার করে কি হবে? আমি যৌতুক লক্ষ টাকা পেলেও আর কোনো রাজ্যের বাইজীলালকে বিয়ে করলেও আমার ছেলে-মেয়ে বাঁদীর সন্তানই থেকে যাবে। ক্রমে দরিদ্র ছোটভাইদের সন্তান তাদের লোকে দারোগাই বলবে। যদি বা বড়কে লালজী সাহেব বলে।

তার পর ধীরে ধীরে বললে, আমি যদি লেখাপড়া না শিখতাম, তাহলে আমি হয়ত এত কষ্টবোধ করতুম না। আপনি আমাকে মাপ করবেন, আমি বিবাহ করব না।

স্থবির পিতা অবুঝের মত তার দিকে চাইলেন ব্যাকুল ভাবে। কিছু বলতে পারলেন না। যদিও বার বার তাঁর মনে হচ্ছিল এত টাকা যৌতুক, অমন কন্যা, একেবারে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ বন্ধ হওয়া, কাল নিশ্চয়ই সমুদ্রসিংহের মত বদলাবে। কি আর হয়েছে এতে—এতো চিরকালের নিয়ম।

সমুদ্রসিংহ পিতাকে অভিবাদন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাইরে কুয়াসাচ্ছন্ন রাত্রি সাদা ঘোমটা দেওয়া নতমুখী বিধবা বধূর মত নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল অস্পষ্ট পৃথিবীর মাঝে।

জীবন-জল-তরঙ্গ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৩

অভিভূতের মত আর একখানা লেফাফা সে টেনে নিচ্ছিল—পিসিমা এসে দাঁড়ালেন সামনে।

কালো—একটা কাজ করবি বাবা? বউ গেলেন গঙ্গায় চান করতে, সংসারের পাট-ঝাঁট সারি, না মিত্তিরদের বাড়ি ফুল দিয়ে আসি। তুই যদি বাবা চট্ করে এই মোড়কটা মন্দিরের জানালা দিয়ে ভেতরে ফেলে দিয়ে আসস্ আমি নিশ্চিন্তি হই। যা না বাবা।

পুরন্দর মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে।

পিসিমা বললেন, ভাঁড়ার-ঘরের দাওয়ায় ফুল ঠিক করে রেখেছি। হাতে-মুখে জল দিয়ে কাপড়টা ছেড়ে যাস্ বাবা। বলে তাড়াতাড়ি পইঠা দিয়ে উঠোনে নামলেন। কিন্তু তখনই ফিরে এলেন এমনি ভাবে—যেন কি একটা দরকারী কথা মনে পড়েছে।

হাঁ রে, একটা কথা শুনলাম, সত্যি? তুই না কি চাকরি করবি বলে দরখাস্ত পাঠিয়েছিস্ কলকাতায়?

পুরন্দর হেসে বললে, তেমন সৌভাগ্য কি আমার হবে যে চাকরি পাব শহরে!

পিসিমা এ-কথায় খুসী হ'লেন না। বললেন, কি জানি বাপু, চাকরি করে মানুষের ক'টা হাত বেরয়। ঘরে বসে যদি ডাকের সাজ তৈরী করিস্ তো তোর উপার্জ্জনের পয়সা খায় কে! আমাদের ঘরে কে কবে চাকরি করেছে শুনি?

পুরন্দর হেসে বললে, চাকরি না করলে বাবু বলবে কেন লোকে! মা কি বলেন—জান তো?

পিসিমা মুখ ঘুরিয়ে বললেন, বৌয়ের কথা আর বলিস্ নে—সব তাতেই আদিখ্যেতা! সত্যটা চিরকাল কাটালে বিদেশে—কি বড়মানুষ হ'য়েছে শুনি?

কাকার কত নাম জান?

থাক বাবু—আর নামে কাজ নেই। বলি মালি-বাড়ির তোরা রেখেছিস কি? এক টুকরো শোলা নেই ঘরে—চুমকি, জরি, গন্ধবিরজা আছে কোথাও? এই বুড়ি মলে বাগানটাও আর থাকবে না। পিসিমা রাগে গর-গর করতে করতে উঠানে গিয়ে নামেন। যে কথাটা বলতে এসেছিলেন সেটা মনে থাকে না।

কথাটা অনেক বার শুনেছে পুরন্দর—তাই আর একবার শোনবার আগ্রহ হয় না। সংসারে যুবক ছেলে থাকলে প্রৌঢ়াদের সাধ-আহ্লাদ তাকে ঘিরেই অতীত দিনের স্মৃতিকে উজ্জীবিত করতে চায়। কথাটা বলেছিলেন—সত্যসুন্দর।···মায়েদের স্নেহকে তিনি অস্বীকার করেন না, কিন্তু দৃষ্টি তাঁর আবিল নয়। মানুষের দুর্ব্বলতা বা ভাবপ্রবণতা যাই হোক—ভোগের মধ্যে বার বার ফিরে গিয়ে সার্থক হয়। স্নেহ যাকে বলা যায় সে ওই আত্মরতির অনুবর্ত্তন। প্রেমও তাই—ভক্তিও তাই। সত্যসুন্দরকে পিসিমা বলেন ম্লেচ্ছ; মা বলেন বিদ্বান মানুষ। সে কথা যাক্, মায়েদের সাধ-আহ্লাদের বন্যায় পুরন্দর ভাসবে না কোন দিন এই সঙ্কল্প করেছে। কেনই বা ভাসবে।

চিঠিগুলো গুছিয়ে বাক্সটা যথাস্থানে রেখে সে বাইরে এলো। হাঁ—ঠাকুরবাড়ীতে ফুলের যোগান সে-ই দেবে আজ। যদিও সে জানে, পাথরের ঠাকুর মানুষী-বৃত্তিতে কোন দিনই সচেতন হবেন না। বর-টর যা দিয়াছেন সেকালে। তপস্যার জোরে কি সবাই আদায় করেছেন কাম্যফল—গায়ের জোরের নজীরও তো আছে।

চক্রবর্ত্তীদের বাগানের ধার দিয়ে পথ। ওঁরা যাজন-কার্য্যের দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। যজমানেরা কৃতী অর্থাৎ অর্থবান। সুতরাং পুরোহিতদেরও লক্ষ্মীশ্রী আছে। বাগানটা স্বকৃত নয়, পাওনা। কোন ভক্তিমতী নিঃসন্তান বিধবা মৃত্যুকালে এক বিঘা জমি সমেত আমবাগানটা পুরোহিতকে দিয়ে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করেছেন। বিধবার বঞ্চিত আত্মীয়রা বলে অন্য কথা। বলে—পুণ্যের প্রলোভন দেখিয়ে পুরোহিত ভোগা দিয়ে নিয়েছেন বিষয়-সম্পত্তি। পাছে আত্মীয়ের যত্ন-আদরে ভুলে বুড়ি ওদের কিছু দিয়ে ফেলেন সেই ভয়ে ঠাকুর বুড়িকে নিজের বাড়ি এনে রেখেছিলেন। দু'বার তীর্থ ঘুরিয়ে এনে—একবার কালীপূজো আর একবার অন্নপূর্ণা পূজো করিয়ে, রামায়ণ গান দিয়ে কত করে ভিজিয়েছিলেন বুড়ির মন। তবে তো সে লেখাপড়া করে দিয়েছিল তার যথাসর্ব্বস্ব! যেখানকার বিষয় সেইখানেই আছে, পুরোহিত আজ কোথায়? নিজের বলে যা সে নিয়েছিল আত্মসাৎ করে—কিন্তু এই তো মানুষের স্বভাব!

কি রে কালো, যাচ্ছিস্ কোথায়? রোগা মত একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবক চক্রবর্ত্তী-বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়েই প্রশ্ন করলে।

পুরন্দর ওরফে কালো মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলে।

যুবকটি কাছে বসে দাঁড়ালো। পরনে তার খাটো মটকার ধুতি গায়ে নামাবলী। শীত বলে ভেতরে একটা সোয়েটারও পরেছে। এত সকালেও সে স্নান করেছে—পরিপাটি করে চন্দনের ফোঁটা কেটেচে কপালে ও কানে, অপারপুষ্ট শিখায় জড়িয়ে আছে একটা সাদা কুঁদ ফুল। হাতের তালুতে ভাঁজ-করা গামছার ওপর বসানো আছে পিতলের সিংহাসন সমেত শালগ্রাম শিলা। শিলা অনাবৃত নয়—লাল এক টুকরো আচ্ছাদন দিয়ে ঢাকা।

কাছে এসে যুবকটি বললে, ইস্, সকাল বেলায় চলেছিস্ ঠাকুরের ফুল যোগান দিতে। তোর হলো কি রে কালো, দেবতায় এত ভক্তি—

পুরন্দর হেসে বললে, দিন-কাল খারাপ বলেই ওঁদের একটু খুসী রাখবার চেষ্টায় আছি। আচ্ছা শ্যামাদা, ভাল করে হোম-টোম করলে সত্যিই ঠাকুর খুসী হন?

শ্যামাপদ বললে, শাস্ত্র তো তোরা মানবি নে—তোদের বলে লাভ? একটু থেমে বললে, মন্ত্রের দ্বারা হয় না এমন কাজ পৃথিবীতে আছে?

পুরন্দর বললে, আছে বৈ কি।

শ্যামাপদ একটু রাগত গলায় বললে, কি কাজ শুনি?

কেন, তোমাদের ঠাকুরদের বলে ভারত স্বাধীন করে দাও না।

শ্যামাপদ গর্জ্জন করে উঠলো, ঠাকুর-দেবতা নিয়ে ঠাট্টা তামাসা ভাল নয় কালো। এর ফল হাতে-হাতে পাবি।

পুরন্দর হেসে বল্লে, তোমাকে তো ঠাট্টা করিনি শ্যামাদা, তুমি শাপ দিচ্ছ কেন ?

শ্যামাপদ ততক্ষণে জোরে চলতে সুরু করেছে। অনেকগুলি ঠাকুর পূজো করতে হবে।

পুরন্দর তাকে ডাকলে না। ভাবলে সকাল বেলায় ওকে মিছি-মিছি রাগিয়ে লাভ কি। চিরদিন ধরে যা চলে আসছে—প্রথা, আচার, নিয়ম, ভক্তি—তারই বাহক ওরা। ওদের আশ্রয় করে দেবতারা বেঁচে আছেন কি দেবতাদের আশ্রয় করে ওরা নিরুদ্বিগ্ন রয়েছে তা নির্ণয় করেই বা লাভ কি। আর্য্য ভারতে মস্তিষ্ক চালনা করে ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করে যে শ্রেণী দ্বিজত্বে উন্নীত হয়েছিল একদা —এরা তাদের বংশধর। চারিত্র-গৌরব, বিদ্যা-জনিত বিনয় এ সব হ'য়েছে অবাস্তব—শুধু বহু পূর্ব্বের গুণ অনুসারে কর্ম্মের বিভাগটা ভগবানের দেওয়া বলে এরা সমাজের শিরোভূষণ হয়ে থাকতে চায়। নিষ্ঠুর কালের স্রোত কোথায় আঘাত করছে তা এরা জানে না। এরা জানে না কিসে লাভ হয় ব্রহ্মজ্ঞান—বেদের ব্রাহ্মণ বা সুক্তের তত্ত্ব এরা অবগত নয়—যে দিব্যকান্তি জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে বিরাজমান তাঁর ধ্যান-মন্ত্রও এরা সঠিক উচ্চারণ করতে পারে না। অথচ এদের মারফতেই সাধারণ লোকে তুষ্ট করতে চায় দেবতাকে।

মন্দিরের মার্ব্বেল পাথরে পা দিয়ে চিন্তাস্রোত ওর ভিন্ন পথ ধরলে। শ্বেত মর্ম্মরে ক্ষোদিত সুমসৃণ সর্ব্বসিদ্ধিদাতা বিনায়ক মূর্ত্তি। কাশী থেকে মিত্রবাড়ীর মেজ বাবু আনিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রায় পনেরো-ষোল বছর আগে। বালক হলেও সে প্রতিষ্ঠা-উৎসবের কথা আবছা আবছা মনে পড়ে।··· মন্দিরের সামনে একটা চালা দেওয়া যজ্ঞবেদী। তার ওপর হচ্ছিল হোম। গাওয়া ঘিয়ের সুগন্ধে মনে হচ্ছিল ঠাকুর সত্যি সত্যিই এসেছেন মন্দিরে। কাশীর ব্রাহ্মণরা বেদমন্ত্র পাঠ করছিলেন। সে মন্ত্রের অর্থ বাল্যকালে যেমন দুরূহ ছিল আজও তেমনি আছে। তবু সুরছন্দিত সেই উদাত্ত-গম্ভীর নাদধ্বনি বুকের মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। অদ্ভুত একটি অনু ভূতিতে মন উঠছিল ভরে—গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল—আর চোখের কোল বাষ্পে উঠছিল ভরে।

সেই দৃশ্যের পাশে এই মন্দির প্রতিষ্ঠার গল্পটুকুও গাঁথা আছে।

ঐশ্বর্য্যের পাল্লা দেওয়া সব কালেই আছে। মিত্রদের মেজবাবু—আর মেজবাবুই বা কেন মিত্রগোষ্ঠী ছিল বংশ-গৌরবে এ গাঁয়ের আর সব বড়লোকদের ওপরে। ধন-সম্পত্তি যতই কমে আসছিল এই গৌরব ততই অহঙ্কারে ফেঁপে উঠছিল। মেজবাবুর সময়ে ওদের সব সম্পত্তিই প্রায় হস্তচ্যুত হয়েছিল অথচ সেই সময়ে বহু ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেন বিনায়ক দেব। কারণ, প্রতিদ্বন্দ্বী শশীকান্ত প্রামাণিক এর এক বছর আগে তাঁর মায়ের নামে খুলেছিলেন এক দাতব্য চিকিৎসালয়। যশোর জেলার কোটচাঁদপুরে শশীকান্তর ছিল গোটা ছয়েক দেশী চিনির কারখানা। তাঁরা জাতি মোদক—ঐ ব্যবসায়ে উন্নতিও করেছিলেন প্রচুর। তবে জমি-জমা কিনে হাঙ্গামা বাড়ানো ভালবাসতেন না বলে ব্যাঙ্কের খাতায় অঙ্কের পর অঙ্ক বৃদ্ধি হচ্ছিল। জনপ্রবাদ অতিরঞ্জিত হ'লেও কয়েক লাখ টাকা যে তাঁদের ছিল সে বিষয়ে কারও সন্দেহ ছিল না। ইদানীং মিত্রবাড়ির বৈঠকখানায় তেমন লোক জমতো না। সেখানে দা-কাটা শুকনো তামাক টেনে টেনে গল্প জমানো কঠিন বলেই বুঝি শশীকান্তর বৈঠকখানায় সরস চায়ের পেয়ালার ভক্ত হু-হু করে বেড়ে উঠলো। অনেক লোক এলে অনেক পরামর্শ হয়। তাঁদের মধ্যেই এক জন বিজ্ঞগোছের লোক পরামর্শ দিলেন—হাসপাতাল দাও, একটা। তোমার মায়ের নাম অক্ষয় হোক। অনেক টাকার দরকার—প্রায় পঞ্চাশ হাজার। বাড়ির ভেতর দু'-তিন দিন ধরে পরামর্শ করে শশীকান্ত রাজী হলেন। দেশময় ধন্য ধন্য পড়ে গেল। সত্যি কথা বলতে গেলে এ একটা মহৎ দান—যার উপস্বত্বে গ্রামবাসীও পাঁচ-ছ' ক্রোশ দূরের গ্রামও উপকৃত হচ্ছে।

মিত্রদের মেজবাবুর তা সহ্য হ'লো না। কীর্ত্তি-ঐশ্বর্য্যে সেদিনের অখ্যাত শশীকান্ত হয়ে উঠবে জেলার মধ্যে এক জন নামী লোক! এ আঘাত বড়ই কঠিন। তিনি ভেবে-চিন্তে বার করলেন উপায়। ইহলৌকিক ক্রিয়াকলাপে শশীকান্ত যদি টেক্কা দিতে পারে—তিনিও তাকে ছাড়াবেন পারলৌকিক কীর্ত্তিতে। মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। যে সে মন্দির নয়। কালীর, শিবের, রঘুনাথের, নারায়ণের, রাধাকৃষ্ণের —এ সব বিগ্রহ তো এই গ্রামের বহু বাড়িতে আছে। তিনি প্রতিষ্ঠা করবেন নূতন বিগ্রহ—নূতন রীতিতে। ফলে সিদ্ধিদাতা বিনায়ক দেব প্রতিষ্ঠিত হ'লেন। কাশী থেকে এলো বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ; হোম, বেদপাঠ, সমারোহ সবই হলো দেখবার মতো। লোকে ধন্য ধন্য করলে।

শশীকান্তর দাতব্য চিকিৎসালয়ে যাবার পথেই মোড়ের মাথায় সুদৃশ্য মন্দির। রোগীরা এবং রোগীর আত্মীয়-বন্ধুরা দেবতাকে মানত করেই ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। কীর্ত্তিতে কেউ কারও চেয়ে খাটো নয় এ কথা সবাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে।

৪

ফুলের যোগান দিয়ে কালো সোজা চলে এলো উত্তরপাড়ায়। পাড়াটা গ্রামের প্রান্তে—কৈবর্ত্ত, গোয়ালা ও ঘর কয়েক কায়স্থর বাস। গরিব ময়রাও তিন-চার ঘর আছে। গ্রামের মধ্যে বাস করেন অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিরা। এক কালে চোর ডাকাতের উপদ্রব বেশি ছিল বলেই গ্রামের মধ্যে সুবিধাজনক জায়গাগুলো বেছে নিয়ে তাঁরা বসত-বাড়ি উঠিয়েছিলেন। দস্যু-ভীতি ছাড়াও গ্রামের মাঝখানে বাস করায় অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। হাট বাজার দোকান ইস্কুল এগুলির সুবিধাও কম নয়। ধনীদের চার পাশে ঘিরে থাকে যারা তারা প্রজা জাতীয় না হলেও বিনীত ও বাধ্য। বাবুরা হেসে কথা কইলে এরা ধন্য হয়ে যায়। অবশ্য নদীর স্রোত যেমন এক জায়গায় বদ্ধ থাকে না কালের স্রোতও তাই। সমাজের চার পাশে আচার প্রথায় যে পরিবর্ত্তন প্রতি বছর ঘটছে, তরঙ্গের আঘাতে তটভাঙ্গার মত যে অনেক কিছু নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। আজকাল দস্যু-ভীতি যেমন কমেছে তেমনি কমেছে ওদের আনুগত্য। ধনীদের ঘরে উৎসব রূপ বদলেছে—দরিদ্রের বদলেছে মন। এখন শারদীয়ার উৎসবে সারা গাঁ মনে করে না—ও-পূজো আমাদেরই।

এই কৈবর্ত্ত ও গয়লারা চিরদিনই দৈহিক শক্তিতে আস্থাবান্। ওদের মুখের বুলিই ছিল—যার লাঠি তার মাটি। আজ সরকারের

কল্যাণে প্রবাদ-বাক্যের জোর কমেছে—ওদের গায়ের শক্তিও কমেছে, কিন্তু ভেতরের উত্তাপ কমেনি। জমি নিয়ে মারামারি বা মামলা ত গাঁয়ে কমই ঘটে। চাষী-প্রধান গাঁ হ'লে সেটা ঘটতে পারতো, ওখানের বড়লোকেরা সবাই ব্যবসায়ী। জমির চেয়ে নগদ টাকার মূল্যটাই স্বীকার করেন। তবে ওদের মনের উত্তাপটা প্রকাশ পায় কোন উৎসব এলে। নেশা করে বাজনা বাজিয়ে—লাঠি ঘুরিয়ে—সন্ধ্যা থেকে সারা রাত ওরা অশ্লীল ছড়া কেটে নাচতে পারে পথে পথে। প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন পথের স্বত্ব নিয়ে ঝগড়া করে, এক পাড়ার ওপর আর এক পাড়ার আক্রোশ কোন কারণে যদি বছরের মধ্যে জমে থাকে তো বিজয়ার উৎসব দিনে মদের নেশায় ও লাঠির দম্ভে তা পরিশোধ করবার চেষ্টা করে। মাথা ফাটে—রক্তারক্তিও হয়—তা শুধু ঐ একদিনের জন্যই। আবার সকলের আপদে বিপদে এই পাড়াই এগিয়ে আসে সামনে। এদের মধ্যে হুজুগ ছড়াতে বেশি দেরি লাগে না কিন্তু সংযত মহিমায় সেই হুজুগকে আন্দোলনে পরিণত করা দুঃসাধ্য। পুরন্দর কত দিন মনে মনে ভেবেছে, এদেরই ডাক দেবে দেশের কাজের জন্য সাহস হয়নি।

সত্যসুন্দর বলেছিলেন, কালো, ও গাঁয়ে বারুদ যদি কোথাও জমা থাকে তো এই উত্তরপাড়ায়! কিন্তু তাকে কাজে লাগানো যার তার সাধ্য নয়। আগুন—চাকর হিসেবে ভাল, প্রভু হলেই সর্ব্বনাশ। এ ইংরেজি কথাটা মনে রাখবি। স্বদেশী যুগে আমাদের যে এত নির্য্যাতন সইতে হয়েছিল সে শুধু এদেরই জন্য।

তবু পুরন্দরের মনে হয়, এদের যদি এক করা যায়! জলের দুর্ব্বার ধারাকে এক জায়গায় আটকে বিদ্যুৎ তৈরীর উপমাটা তার মনে জাগে। মনে আশা জাগলে—কাজের চাঞ্চল্যে মন উচাটন হ'লে এই পাড়াতেই সে ছুটে আসে।

পাড়ার শেষে বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত মাঠ। আউস ধানের জমি কিছু আছে, রবিশস্যের আবাদও কিছুতে হয়। তবে বেশির ভাগ জমিই পতিত। শেয়াকুল কাঁটা, সেগুন গাছ, আরও নানা জাতীয় আগাছার জঙ্গলে সে সব জমি ভর্ত্তি। জমিগুলির মালিক ঐ কৈবর্ত্ত বা গোয়ালারা। সকালে উঠে তারা মাঠে যায় ফিরে আসে দুপুর বেলায়—আর যায় না। ছেলেরা গরু ও ছাগল নিয়ে, আরও খানিকটা বেলায় পান্তা ভাত খেয়ে ঐ মাঠেই যায়—ফেরে গোধূলিতে। মাঠের কাজ বছরে তিন-চার মাসের বেশি থাকে না বলেই ওরা অন্য কাজের ওপরই নির্ভর করে। মেয়েরাও ধান ভানে, চিঁড়ে কোটে—মুড়ি তৈরী করে, দুধ, দই ও ঘোল বেচে, দরকার হ'লে ঝিয়ের কাজও করে ভদ্রলোকের বাড়িতে। সে জন্য সমাজ তাদের শাসন করে না বরং নির্ব্বিকার থাকে।

পুরন্দর যখন এ পাড়ায় এলো তখন যুবকেরা মাঠে বেরিয়ে গেছে। মুগ-কলাই উঠে গেলেও—ছোলা মসুর ও মটর আছে জমিতে। মটরের শুঁটি ধরেছে মসুরের ফুটেছে ফুল। ছোলা বা খ্যাসারির ফুলও ফুটেছে। মাঘ মাসে শিশির কম তবু নরম ছোলা, খ্যাঁসারি ও মসুর ফুলে জমিকে নরম গালচের মত মনোরম দেখায়।

পুরন্দরকে দেখে তিন-চার জন যুবক ছুটে এলো। বেশ লম্বা দোহারা গড়ন চওড়া বুক—এদিক ওদিক হাত নাড়লে পেশী ফুলে ওঠে ছোট বেলের মত, পায়ের চেটোগুলো জুতোর শাসনে ভদ্রজনোচিত সঙ্কুচিত নয়, বেশ চওড়া, দেহের রং ঘোর কালো। শ্রীহীন কালো নয় মসৃণ কালো।

কি কালোদা, সকাল বেলাই যে—

পুরন্দর বললে, কাল তোমাদের কি বলেছিলাম মনে নেই বলাই।

বলাই বললে, মনে তো আছে কিন্তু শুনেছ তো আজ ম্যাজিষ্টের সায়েব আসবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট! হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমনি ভাবে পুরন্দর বললে, তা এলেই বা, আমাদের কাজ আমরা করবো তা—

আর একটি যুবক বুক ঠুকে বললে, ভারি তো ম্যাজিষ্টর—সে তো আর লাট সাহেব নয়।

পুরন্দর হাসলে, লাট সায়েব হলেই বা কি!

না—তাই বলছি। ঢোক গিলে যুবকটি বললে, জান কালো দা, ওরা বলে, এই যে লাইবেরি না কি, ও না কি ভাল কাজ। তোমার দেশের চেয়েও ভাল কাজ!

পুরন্দর বললে, অনন্ত ঠিকই বলেছিস্, তবে দেশের কথা লোকে কি করে ভাবতে শিখলো জানিস্? ওই লাইব্রেরির বই পড়ে! একটা কাজ ভাল বলে—আর একটা ভাল কাজ বাদ দেওয়া কি ঠিক?

কিন্তু কাকা বলছিল, আজ ম্যাজিষ্টর সায়েব যখন আসছে তখন ওই কাজটাই আজ হোক না।

পুরন্দর বললে, তিনি আসবেন বিকেলে, আমাদের ত কাজ আধ ঘণ্টার মধ্যেই হয়ে যাবে। যা সবাইকে খবর দিগে।

জন দুই যুবক নাচতে নাচতে ছুটে চলে গেল।

বলাই বললে, আচ্ছা কালদা, ইস্কুলের মাঠে নিশেন তুললে হয় না?

দরকার কি। যেখানে নিষেধ আছে সেখানে গেলেই তো হাঙ্গাম বাধবে।

বলাই মাথা নেড়ে বললে, এ তোমার ভয়ের কথা কালদা, আমরা খারাপ কাজ করছি না তো।

সে কথা পুরন্দর যে ভাবেনি তা নয়। তবুও দ্বিধা করছিল এই জন্য যে মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ অনুযায়ী সম্পূর্ণ অহিংস ভাবে কাজটা হবে কি? যারা এই আন্দোলনটা হুজুগ বলে দেখে কি ভয়ের বস্তু মনে করে, জোর করে তাদের এর মধ্যে প্রত্যক্ষে না হোক পরোক্ষে টেনে আনলেও কি মনোমালিন্য বাড়বে না? পুরন্দর ভাবতে লাগলো।

বলাই বললে, তুমি যাই ভাব কালদা, নিশেন আজ সব জায়গাতেই টাঙাবো আমরা। শুধু এক জায়গায় একটা মিটিন করে 'বন্দে মাতরম' করলে আমোদ হয় না।

এটা তোদের কাছে আমোদ তাহলে? পুরন্দর হাসলে।

বাঃ—আমোদ না হলে কেউ হৈ-হৈ করে? বলাই জবাব দিলে।

কিন্তু এ আমোদের জন্য কঠিন মূল্য দিতে হবে বলাই। জান তো, গান্ধীজী বলেছেন মার খাবে তবু জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে হাত তুলবে না—যে মারবে তার গায়ে।

ওরা হো-হো করে হেসে উঠলো বললে, গান্ধীজীর বয়স কত কালদা? বুড়ো মানুষ বুঝি?

পুরন্দর বললে, গায়ের জোরটাই সব নয় রে, তাহলে সাধু-সন্ন্যাসীরা সব বাজে হয়ে যেতেন।

বলাই বললে, সাধু-সন্ন্যাসীরা হলো গিয়ে আলাদা। গান্ধীজী তো তা নন।

হৈ-হৈ করতে করতে অনেকে ফিরে এলো। কথাটা উত্তরপাড়া ছাড়িয়ে অন্য পাড়াতেও ছড়িয়েছে। এখন ফেরা চলে না। উত্তেজনা পুরন্দরের মনেও সঞ্চারিত হয়েছিল। এত আয়োজন করে উৎসবটা একটুখানি জায়গায় আটকে রাখা ওরও ইচ্ছাতে বাধছিল। যে জিনিষ সকলের—সে জিনিষের স্বাদ সবাই সমান ভাবে কেন পাবে না? যে গাঁয়ে মজা পুকুরে ম্যালেরিয়ার মশা জন্মায় সে পুকুরের জল নষ্ট হবে বলে কেউ কি জোর করে কেরোসিন ঢেলে তা সংস্কার করতে পিছু পা হয়? গালি-গালাজ—হাতাহাতি কিছু হয়ই, শেষে দেখা যায় ফল তার খারাপ হয়নি। শেষটাই হলো আসল।

অনেক কাগজের নিশান, কাগজের শিকল তৈরী করেছে এরা সারা রাত ধরে। কাঁচা ধলা আঁকড়ায় শক্ত রলায় জড়িয়েছে তিন রঙা খদ্দরের কাপড়। বেশ নিশান হ'য়েছে। মুচিপাড়ায় খবর পাঠিয়েছে, তারা ঘণ্টা খানেক বাদে ঢাক-ঢোল নিয়ে আসবে। তার সঙ্গে জোগাড় হ'য়েছে দু'টো শাঁক। কিন্তু প্রাণপণে গলা ফুলিয়েও কসজে-ওয়া দমের সাহায্যে তাতে ধ্বনি উঠছে না, চাপা একটা শব্দ উঠছে। জিনিষটা আমাদের মত করেই নিয়েছে সবাই। আর সত্যি বলতে গেলে তা না হলে উৎসাহই বা আসবে কি করে!

দক্ষিণপাড়ায় ওরাও আসবে বলেছে, কাল'দা।

বেশ তো।

বলাই প্রশ্ন করে, মাঝের পাড়ার কেউ আসবে না?

না।

আর এক জন বললে, ওদের ভয় কত! জান কাল'দা, আজ ম্যাজিষ্টের আসবে—শ্রীধর আশের লাইবেরি খুলবে। তাইতেই ওরা মেতেছে।

ভালই তো, লাইব্রেরী হ'লে তোরা মজা করে কত কাগজ পড়তে পাবি।

বলাই বললে, আর কাগজ পড়ে কাজ নেই। হ্যাঁ! একটু থেমে বললে, লাইবেরীর মাথায় একটা নিশেন টাঙিয়ে দেব কিন্তু।

সায়েব কিন্তু রাগ করবে।

ইঃ, রাগ করে ঘরের ভাত চাট্টি বেশি করে খাবে না হয়। দু'-তিন জন তাল ঠুকে উত্তর দিলে।

পুরন্দর হাসলে। ওদের রক্তের মধ্যে পূর্ব্বপুরুষের উচ্ছৃঙ্খল শক্তির জোয়ার এসেছে। খেলায় চরম আমোদ যে মারামারিতে তা অভাবের ও আইনের চাপে পড়েও ওরা ভুলতে পারে না।

ওদের হাতে বন্দুক আছে জানিস্ তো? দেবে ফটাফট গুলী চালিয়ে।

দিক গে! কথাটা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে বললে।

এ নিয়ে বেশী বাদানুবাদ করে লাভ নেই—উৎসবটা যখন ও-বেলায় ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে হচ্ছে না।

পুরন্দর অতঃপর দক্ষিণপাড়ার পথ ধরলে। [ক্রমশঃ



যাত্রী

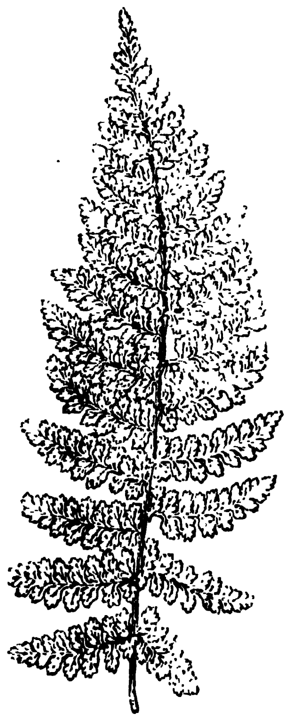
শিল্পী—চিত্তরঞ্জন দাস

প্রসেস্ ফটোগ্রাফী

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ

ছবি ছাপার কারবার আমাদের দেশে দিন দিন যে ভাবে প্রসারতা লাভ ক'রছে এবং অতি আধুনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা সজ্জিত কয়েকটি শিল্পকেন্দ্র সম্প্রতি আমাদের দেশে আধুনিক ও উন্নত ধরণের পদ্ধতিতে ছবি, ক্যালেণ্ডার ইত্যাদি ছাপায় যে ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রেছে তাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে এই শিল্প যে শুধু আরও প্রসারতা লাভ করবে তা নয়, সুদূর প্রাচ্যে অর্থাৎ আমেরিকা, ব্রিটেন, জারমানী ইত্যাদিতে যেমন এর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এখানেও সে তেমনি স্থান পাবে ও সমাদৃত হবে। কিন্তু ছবি ছাপার কারবার সম্পূর্ণরূপে নির্ভর ক'রছে ফটোগ্রাফীর ভিত্তির উপর। যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এর ভিত্তি কাঁচা সে প্রতিষ্ঠানের উন্নতির আশা কম নেই বললেও হয়। আর যে প্রতিষ্ঠানে ফটোগ্রাফীর ভিত্তি পাকা, সুষ্ঠু ও সবল উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সে প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যে অনিবার্য্য। এমন যে শিল্প—যার খ্যাতি সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রছে ফটোগ্রাফীর উপর, সেই শিল্পে লিপ্ত উৎসুক ব্যক্তিদের জন্য আমি "প্রসেস্ ফটোগ্রাফী" শীর্ষক প্রবন্ধে এর সম্বন্ধে আলোচনা ক'রবো।

আমার এ প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয় হবে ফটোগ্রাফী কি ? ও শিল্পজগতে তার মূল্য কতখানি। অবশ্য তার পূর্ব্বে ফটোগ্রাফীর জন্ম-ইতিহাস আমি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ ক'রবো এই জন্য যে, যে শিল্প আজ এত বড় খ্যাতি অর্জ্জন ক'রেছে এবং সভ্যজগতে যার প্রয়োজনীয়তা সব চেয়ে বেশী বললেও অত্যুক্তি হয় না, তার গোড়ার ইতিহাস ও প্রথম যাঁদের গবেষণার ফলে ফটোগ্রাফী জগতে আত্মপ্রকাশ করেছে, তাঁদের সঙ্গে কিছু পরিচয় থাকা প্রয়োজন।

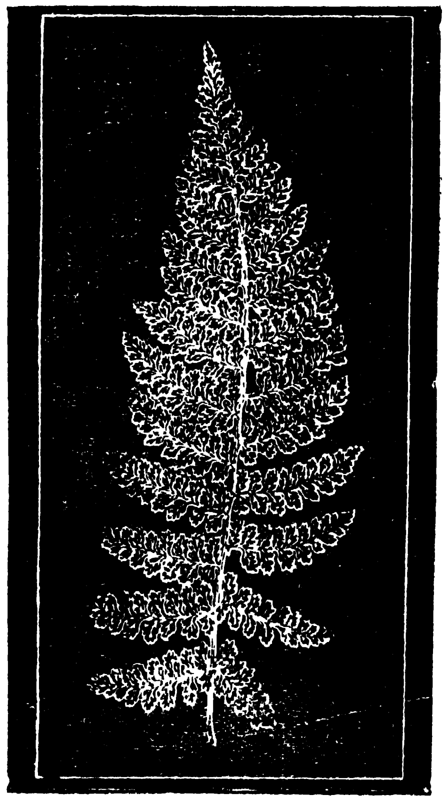


চিত্র ১ নং পসিটিভ্

ফটোগ্রাফী কি ? এক কথায় এর সহজ অর্থ হচ্ছে—"আলোর সাহায্যে লেখা" বা "আলোর সাহায্যে ছবি তোলা" দু'টি গ্রীক্ শব্দ হ'তে এই কথাটি আসে। তার একটি হচ্ছে "আলো" অপরটি "লেখা" গ্রাফো টু রাইট অথবা **producing picture through the agency of light**।

১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে সিলি (Scheele) নামে এক জন বিখ্যাত রাসায়নিক প্রথম গবেষণা করেন যে, সিল্‌ভার কম্পাউণ্ডের উপর আলোর প্রভাব আছে। শুধু তাই নয়, তিনি আরও বলেন যে, ইহার উপর বিভিন্ন আলোকরশ্মির বিশেষ বিশেষ প্রভাব আছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ওয়েজ্‌উড্ এবং ডেভি নামক দুই জন রাসায়নিক এই গবেষণার উপর নির্ভর ক'রে সাদা চামড়া ও সাদা কাগজে সিল্‌ভার মাখিয়ে পরীক্ষা সুরু ক'রলেন। সিল্‌ভার সলিউসন মাখানো বস্তুটির উপর গাছের পাতা চেপে ধ'রে আলোকরশ্মির সম্পাতে দেখা গেল যে, সাদা জায়গাগুলো কালো হ'তে লাগলো এবং পাতাটা সরিয়ে নিতে দেখা গেল, যে, যে জায়গায় আলো প্রবেশ ক'রতে পারেনি সেগুলো সাদাই র'য়ে গেছে, অর্থাৎ কাগজের উপর নেগেটিভ্ * ইমেজ্ প'ড়েছে।

নীচে ছবির দ্বারা দেখানো হ'লো।



চিত্র ২ নং নেগেটিভ্

কিন্তু এ পরীক্ষায় বিশেষ কোন লাভ হ'লো না, কারণ, প্রথমতঃ তাকে স্থায়িভাবে রাখবার মত কোন বস্তু—"ফিক্সিং এজেণ্ট," তখনও আবিষ্কার হয়নি। দ্বিতীয়তঃ, কাগজ বা সাদা চামড়ার উপর প্রতিফলিত হ'তে লাগলো নেগেটিভ্ ইমেজ্। অতএব বৈজ্ঞানিকগণ

---

* নেগেটিভ্ এর বাংলা পরিভাষা "ঋণাত্মক্" আর পসিটিভ্ হ'চ্ছে "ধনাত্মক্"; কিন্তু আমার মনে হয়, কতকগুলি ইংরেজী শব্দ এমন আছে যাদের চলন এত বেশী যে তাদের বাংলা অর্থ অপেক্ষা ইংরাজীতেই তারা বেশী সহজবোধ্য। যেমন উদাহরণস্বরূপ

আর বেশী দূর অগ্রসর হ'তে না পেরে এইখানেই ক্ষান্ত হ'ন। এর পর এম্ নিপ্‌সে নামে আর এক জন এই গবেষণার উপর নির্ভর ক'রে আরও একটু অগ্রসর হলেন, এবং তাঁর গবেষণার ফলে তিনি সন্ধান পেলেন বিচুমেন্ নামে আর একটি খনিজ পদার্থের। তিনি পরীক্ষার দ্বারা দেখলেন, যে, সিল্‌ভার কম্পাউণ্ডের মত ইহাও আলোর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। যদিও বিচুমেন্ পদার্থটি সোজাসুজি ফটো তোলার ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য ক'রলো না, তথাপি বিচুমেন নিপ্‌সের (Niepce) যে একটি বড় আবিষ্কার এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। নিপ্‌সে প্রমাণ ক'রলেন যে, বিচুমেন্ নামে এই খনিজ পদার্থটি কোন মেটাল্ প্লেটে প্রলেপ দেওয়ার পর যে-কোন বস্তু যার ছাপ নেওয়া হবে, সেটা ওই প্লেটটির উপর রেখে বা চেপে ধ'রে তাহার উপর যদি আলো প্রতিফলিত করা হয় তাহ'লে যে সব জায়গা দিয়ে আলো প্রবেশ ক'রবে সেই সকল স্থান রাসায়নিক গুণের জন্ত শক্ত হয়ে যাবে ও যে সকল স্থানে আলো প্রবেশ করতে পারবে না, সে সকল জায়গায় কোনরূপ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটবে না। এই বিচুমেন্ বস্তুটি নিপ্‌সের যে একটি বড় আবিষ্কার এ কথা ব'লছি এই জন্তে যে, যদিও ক্যামেরাতে ছবি তুলতে হ'লে বিচুমেনের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ আলোক প্রভাবে বিচুমেনের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয় খুব ধীরে। তবে এই শিল্পে অন্যান্য কাজে বিচুমেনের স্থান আজও অপ্রতিহত। যেমন Heliozincography, Deep Etch প্রসেস্ ইত্যাদি।

নিপ্‌সের পর ডোগার এ বিষয়ে আরও উন্নত ধরণের গবেষণা সুরু করলেন এবং যেহেতু বিচুমেনের উপর আলোর ক্রিয়া অত্যন্ত ধীরে ও সময়-সাপেক্ষ সেই হেতু তিনি সিলভার কম্পাউণ্ড নিয়েই তাঁর পরীক্ষা সুরু করলেন ও কি করে ছবি স্থায়িভাবে রাখা যায় তারই চেষ্টা ক'রতে লাগলেন। ডোগারের এই পরীক্ষায় আমরা বেশ একটা মজার জিনিষের সন্ধান পাই এবং তাতে বোঝা যায় যে, কোন সদ্ইচ্ছায় আন্তরিক চেষ্টা থাকলে ভাগ্যও সাহায্য করে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে ঠিক দুর্ঘটনার মতই; হঠাৎ যাকে বলে "সৌভাগ্যমূলক বিপর্য্যয়"। বড় বড় আবিষ্কারের পেছনে অনেক ক্ষেত্রেই এই রকম বিপর্য্যয়ই আবিষ্কারকদের জীবন ধন্য ক'রেছে ও তাঁদের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করেছে দেখা যায়। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতেই হবে, যে, সেই চেষ্টার সঙ্গে ছিল একাগ্রতা ও আন্তরিকতা। ডোগারের জীবনে এই fortuuate accidentই তাকে বড় ক'রে তুললো ও তিনি যা আবিষ্কার করলেন তাই ফটোগ্রাফীর মূল সূত্র বলেই ধরে নেওয়া হ'য়েছে।

ডোগার কাচের উপর সিল্‌ভার আয়োডাইডের প্রক্ষেপ দিয়ে নানা রকম পরীক্ষা সুরু করলেন। এক্সপোজ্ করার পর লুক্কায়িত ছবিকে (Latent image) ফুটিয়ে তোলবার উপায় কিছুতেই উদ্ভাবন করতে পারছেন না। এক দিন হঠাৎ কয়েকটি এক্সপোজড প্লেটের মধ্যে থেকে একটি তিনি তুলে একটা আলমারির মধ্যে রেখে দেন। কয়েক ঘণ্টা পরে অন্যান্য খারাপ প্লেটের সঙ্গে সেই প্লেটটিও পরিষ্কার করার জন্য নিতে গিয়ে পুলক-বিস্ময়ে দেখেন যে, একটি সুন্দর ছবি সেই প্লেটটির উপর ফুটে উঠেছে। তিনি বিপুল আগ্রহ ও যত্নের সহিত অনুসন্ধানের ফলে টের পেলেন যে, সেই আলমারিতে ছিল পারদ এবং তারই বাষ্পীয় ক্রিয়ার সাহায্যে লুক্কায়িত ছবি প্লেটের বুকে ফুটে উঠেছে। দৈব দুর্ঘটনা ডোগারের জীবনে সৌভাগ্যের সূচনা করলো, এবং তিনি অবিলম্বে তাঁর এই মূল্যবান আবিষ্কার ব্যবসাক্ষেত্রে কাজে লাগাবার জন্য লেগে গেলেন। অবশ্য এ কথা এখানে স্বীকার করতেই হবে যে, ডোগারের আবিষ্কারকে সম্পূর্ণতা দান করেছে স্যার জন্ হারসেল, যিনি—সোডিয়াম থায়ওসালফেট বা হাইপোসালফাইট দ্রব্যটি সিল্‌ভার সল্টের উপর ফিক্সিং এজেন্টের কাজ করে—এই আবিষ্কারের দ্বারা ফটো-জগতে আজও সকলের ধন্যবাদার্হ হয়ে আছেন।

ডোগার কারবার করার উদ্দেশ্যে একটি কোম্পানীও খুলেছিলেন, কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধে হয়নি। অতএব ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ বৈজ্ঞানিক এম, এ্যারেগোকে তাঁর ছবি দেখান। তিনি এই বিষয়টি প্যারিসের একেডেমি অফ সায়েন্স্‌এ উত্থাপন করেন এবং ফলে তৎক্ষণাৎ ফ্রান্স গভর্ণমেন্ট ৬০০০ ফ্রাঙ্ক পেন্‌সনের ব্যবস্থা দিয়ে ডোগ্যোর আবিষ্কারকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করেন এই সর্ত্তে যে, এই প্রসেসটি জগৎবাসীর হিতার্থে প্রকাশ ক'রতে হবে, তিনি ইহা পেটেন্ট্ ক'রতে পারবেন না। ফটোগ্রাফী যে সভ্য জগতে কত বড় দান এ্যারেগো এক বিপুল জনসভায় তাঁর ওজস্বিনী বক্তৃতার দ্বারা ব'লেছেন—"It is a present to the whole civilised world" সুতরাং ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ হচ্ছে প্রকৃত ফটোগ্রাফীর জন্মদিন। এর পর বহু রাসায়নিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ফটোগ্রাফীতে নব নব পদ্ধতি প্রয়োগ দ্বারা তাকে উন্নত ক'রে তুলেছেন। পুরানো দিনে যা ছিল বিপুল বিস্ময়ের বস্তু, নূতনের আগমনে হয়ত তারা হ'য়েছে আজ ম্লান—মৃতপ্রায়; তবু যাঁরা দিয়েছিলেন প্রথম আলো এই পথে ফটোজগতে তাঁরা চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন চিরদিন।

আলো ও তার প্রকৃতি

আলো হ'চ্ছে ফটোগ্রাফীর প্রাণ। আলো ব্যতিরেকে ফটোগ্রাফী অচল, এ কথা হয়ত সকলেই জানেন। কিন্তু আলোর প্রকৃতি, গতি ও গুণ সম্বন্ধে হয়ত অনেকে না-ও জানতে পারেন। ফটোগ্রাফী জানতে হ'লে সেটা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন।

আলো কি? এক কথায় এর উত্তর—আলো শক্তি (Light is a radiant energy) এবং এই শক্তি পৃথিবীর মধ্যে ঈথার (Ether) নামক যে পদার্থ আছে, তারই সাথে তরঙ্গায়িত হ'চ্ছে ও চতুর্দ্দিকে সরল পথে পরিভ্রমণ ক'রছে। আলোক-তরঙ্গের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল। শুনে হয়ত' অনেকে আশ্চর্য্য হবেন যে, প্রকৃত পক্ষে আলো আমরা দেখতে পাই না তবে যখন আলোক-রশ্মি আমাদের চোখের কয়েকটি বিশেষ নার্ভে আঘাত করে তখনই আমাদের চোখের সামনের সকল বস্তু পরিদৃশ্যমান হ'য়ে ওঠে। আলোকতরঙ্গ দেখা যায় না, কিন্তু যখন ইহারা

বলা যেতে পারে, সলিউশন "দ্রবণ", সল্‌ভেন্ট্ "দ্রাবক", "ফোকাশ" নাভি ইত্যাদি। সেই হেতু যেগুলি বাংলা নাম অপেক্ষা ইংরাজীতে বেশী পরিচিত সেগুলি আমি ইংরাজী শব্দই ব্যবহার করবো।

কোন জিনিষে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখনই সেই বস্তু আমরা দেখতে পাই।

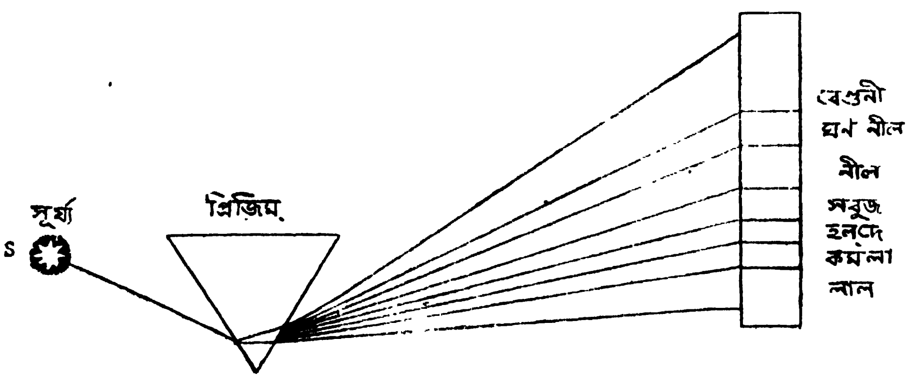
কতকগুলি জিনিষ আছে—যার ভেতর দিয়ে আলোক তরঙ্গ অবাধে চলে যায়। সেগুলিকে স্বচ্ছ (Transparent) বস্তু বলে। কতকগুলির মধ্যে দিয়ে সামান্ত আলো অতিক্রম করে—এগু'লকে ঈষৎ স্বচ্ছ (Translucent) বস্তু বলে, আর কতকগুলির মধ্যে দিয়ে আলোক-তরঙ্গ মোটেই যেতে পারে না সেগুলিকে অস্বচ্ছ (Opaque) বস্তু বলে। একটি খুব চক্‌চকে বস্তুর উপরে আলো পড়লে তার প্রায় সবটাই প্রতিফলিত হয় কিন্তু কোন ঈষৎ স্বচ্ছ বস্তুর উপর যতটা আলো পড়ে তার সবটা প্রতিফলন হয় না; তেমনি আবার কোন অস্বচ্ছ বস্তু আলোর প্রায় সবটুকুই শোষণ করে নেয়, ফিরিয়ে দেয় না কিছুই। পূর্ব্বেই বলেছি, আলোকরশ্মি সরল পথে পরিভ্রমণ করে, এমন কি যখন কোন স্বচ্ছ বস্তুর ভেতর দিয়ে চলে যায় তখনও তার গতিপথ থাকে সরল, তবে সেই গতিপথ সম্পূর্ণ নির্ভর করে বস্তুটির ঘনত্বের উপর। বস্তুর ঘনত্ব সুক্ষ্মত্বের সঙ্গে আলোক-রশ্মির গতিপথও পরিবর্ত্তিত হয়। একে বলে প্রতিসরণ (Refraction)।

আপাত-দৃষ্টিতে আলোর রং আমরা দেখি সাদা, কিন্তু সত্যি তা নয়; বিভিন্ন রংয়ের সমাবেশে এই সাদা রংয়ের সৃষ্টি। তবে মোটামুটি আমাদের সুবিধার জন্ত আমরা সাতটি রংয়ে একে ভাগ ক'রে নিয়েছি, যেমন—লাল, কমলা, হলদে, সবুজ, ঘননীল, নীল ও বেগুনী। সকল রংগুলিকে এক কথায় বলা হয় "ভিইব্‌জ্‌ইওর" (Vibgyor)। শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে সাতটি রংয়ের নামের প্রথম অক্ষর নিয়ে। সূর্য্যরশ্মি হ'তে এই সাতটি রং পৃথক্ ভাবে দেখবার উপায় হচ্ছে, একটি অন্ধকার ঘরের কোন জায়গায় একটি ছোট ছিদ্রপথ দিয়ে সূর্য্যালোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রতে দেওয়া হ'লো, প্রবেশ-পথে রাখা হ'লো একটা প্রিস্‌ম্ এবং যে পথে ঘরে সূর্য্যালোক প্রবেশ ক'রছে তার বিপরীত দিকে একটি কালো পর্দ্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হ'লো, এখন দেখা যাবে যে, যে আলো আমরা আপাত-দৃষ্টিতে সাদা দেখি, সেই সাদা আলো বিভক্ত হ'য়ে সাতটি বিভিন্ন রংএ পর্দ্দার উপর পাশাপাশি প'ড়েছে। একে বলে সূর্য্য-বর্ণালি (Solar Spectrum)। নীচে ৩ নং ছবিতে সূর্য্য-বর্ণালি দেখার উপায় বোঝানো হ'লো।

প্রকৃতির বুকে বিভিন্ন বস্তুর উপর এই যে আমরা রংয়ের লীলা দেখি প্রকৃত পক্ষে এদের নিজস্ব কোন রং নেই। সূর্য্যরশ্মির সব রং শোষণ করার পর শুধু যে রংটিকে শোষণ ক'রতে পারে না, আমরা সেই রংয়েই সেই বস্তুটিকে দেখি মাত্র। যেমন গাছের পাতা সূর্য্যরশ্মির সব রংগুলি শোষণ ক'রে নেয়, শুধু সবুজ রংটি শোষণ ক'রতে পারে না ব'লেই আমরা তাকে সবুজ দেখি। আবার যেমন লাল গোলাপ সূর্য্যরশ্মির সব রংগুলি শোষণ করে কিন্তু লাল রংটিকে শোষণ ক'রতে পারে না বলেই আমরা গোলাপটিকে দেখি লাল। যে বস্তু আলোকরশ্মির সব রংগুলি শোষণ করে নেয় তার রং দেখি আমরা কালো, যে বস্তু কোন রংই শোষণ ক'রতে পারে না তাকে দেখি আমরা সাদা।

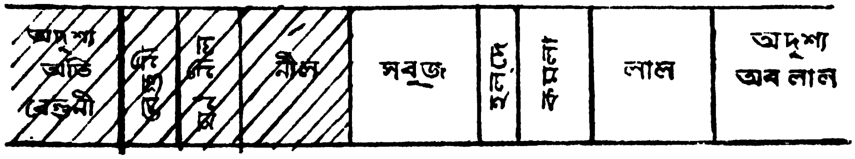
ভিজা প্লেট ফটোগ্রাফীতে আর একটি জিনিষ জেনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন, সে হ'চ্ছে আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যতা। এটা জানা থাকলে ছবির ফলাফল (Negative result) কি রকম দাঁড়াবে ছবির প্রকৃতি বা চরিত্র দেখেই তা বলে দেওয়া যেতে পারে, অবশ্য ফটো নিয়ে সে সম্বন্ধে মতামত দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। আলোক দ্বারা যে সকল তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (wave length) সব সমান নয়। এই সাতটি রংয়ের তরঙ্গের মধ্যে লাল রংয়ের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সব চেয়ে বেশী, আর সব চেয়ে কম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হ'চ্ছে বেগুনী রংএর। আর সব রংএর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এই দু'টোর মাঝামাঝি।

ভিজা কলোডিয়ন প্লেট্ এই আলোক-তরঙ্গের কেবল নীচের রংগুলিই গ্রহণে সমর্থ, (sensitive to the lower end of the spectrum of white light, such as Ultra-violet, Violet, Indigo, Blue) যথা—অতি-বেগুনী, বেগুনী, ঘননীল ও নীল। এবং সাদা আলোর বাকি রংগুলি গ্রহণে অসমর্থ, (insensitive to the remaining portion of the white light) যথা—সবুজ, হলদে, কমলা ও লাল। এক কথায় বলা যেতে পারে, যে, যাহা অতি-বেগুনী (Ultra-violet) বা নীল (Blue) রং প্রতিফলিত করে না সেগুলিই কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ভিজা কলোডিয়ন প্লেট্ কোন্ কোন্ রং গ্রহণে সমর্থ ও



চিত্র ৩ নং

কোন্‌গুলি গ্রহণে অসমর্থ নীচে ছবির দ্বারা দেখানো হ'লো। ৪ নং চিত্রে দেখুন।



চিত্র নং ৪

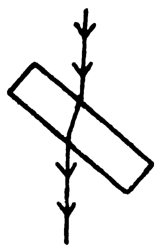
চিত্রে সূর্য্যরশ্মির সাদা আলো দেখানো হ'য়েছে। এই সাদা আলোর যে অংশগুলি শেড্‌ লাইন দেওয়া আছে, ভিজা কলোডিয়ন প্লেট্ কেবল সেই রংগুলিই গ্রহণে সমর্থ।

আলো ও তার প্রকৃতি সম্বন্ধে সহজবোধ্য ও বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়টুকুর একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়া দেওয়া গেল। এবারে প্রসেস্ ফটোগ্রাফীর উপযোগী লেন্স্ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

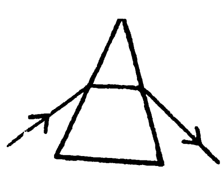
প্রসেস কাজের উপযোগী লেন্স

আলোকরশ্মি কোন স্বচ্ছ মধ্যমের (Transparent medium) মধ্য দিয়া চলিলে উহার গতিপথ পরিবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ প্রতিসরিত (Refracted) হয়। এই প্রতিসরণ কম বেশী নির্ভর করে সেই মধ্যমের (Medium) আকার ও গুরুত্বের উপর যার মধ্যে দিয়ে আলোকরশ্মি যাবে। ৫ নং চিত্রে দেখুন।

আবার আলোকরশ্মি যখন কোন প্রিসমের মধ্য দিয়া চলে তখন উহা প্রিসমের পাদদেশের দিকে ঝুঁইয়া পড়ে, আবার প্রিসম্ থেকে বাইরে অর্থাৎ বাতাসে বেরোবার সময় গতিপথ আবার পরিবর্ত্তিত হয়। ৬ নং চিত্র দেখুন।



চিত্র নং ৫



চিত্র নং ৬

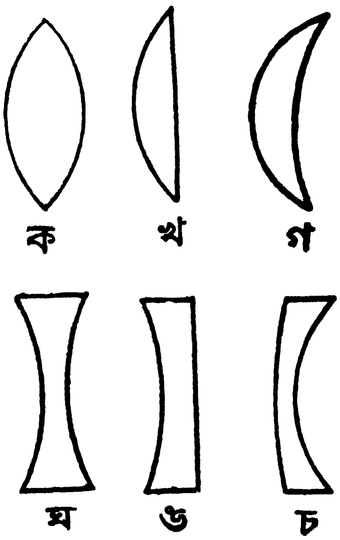
এই যে প্রতিসরণ বা ঝুঁইয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণ করা কম-বেশী সম্ভব হয় ঠিক প্রকারের মধ্যম (Right kind of medium) নির্ব্বাচনে; কারণ, বিভিন্ন রকমের কাচে বিভিন্নরূপ প্রতিসরণ-ক্ষমতা থাকে; অতএব লেন্স্ ও প্রিসম্ প্রস্তুতকারকদের উপর নির্ভর করে এই নির্ব্বাচন-দক্ষতা।

ফটোগ্রাফী লেন্স এমন হওয়া চাই যা সামনের বস্তু বা পদার্থের উপরকার প্রতিফলিত রশ্মি সমস্ত নিজের মধ্যে গ্রহণ ক'রে পেছনকার সমতলে আপতিত প্রতিবিম্বকে উজ্জ্বল রাখতে পারবে। পাশে ৭নং চিত্রে কয়েক প্রকার লেন্স দেখানো হ'লো।

উন্নতোদর (Double Convex) লেন্স বাইরের ছড়ানো আলোক-রশ্মি নিজের মধ্যে গ্রহণ ক'রে পিছনকার সমতল স্থানে অর্থাৎ গ্রাউণ্ড গ্লাসের উপর এক উজ্জ্বল বিন্দুতে পরিণত হয়। ৮নং চিত্র দেখুন।

নতোদর (Double Concave) লেন্স্ বাইরের আলোকরশ্মি নিজের মধ্যে গ্রহণ করে বটে কিন্তু সেগুলি এক জায়গায় মিলিত না হ'য়ে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, মনে হয় যেন আপতিত রশ্মির দিকে একটা বিন্দুর সৃষ্টি হ'য়েছে। ৯নং চিত্র দেখুন। অর্থাৎ এইটে মনে রাখলেই হবে যে, নতোদর লেন্স্ উন্নতোদর লেন্সের ঠিক বিপরীত কার্য্য করে।

ফটোগ্রাফিক্ লেন্স্ পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন:— সিঙ্গল এ্যাক্রোমেটিক্, র‍্যাপিড রেক্‌টিলিনিয়ার, এ্যাপ্লানাটস্, এ্যানাসটিগ্‌ম্যাটস্, এ্যাপোক্রোম্যাটস্।

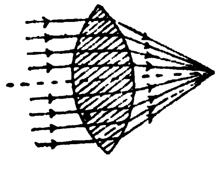


চিত্র নং ৭

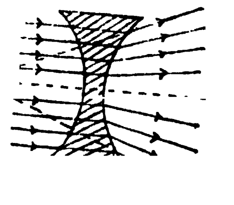
(ক) ডবল্ কন্‌ভেক্স্, (খ) প্লেনো কন্‌ভেক্স্, (গ) কনভেক্স্ মেনিস্‌কাস্ (ঘ) ডবল্ কন্‌কেভ্, (ঙ) প্লেনো কন্‌কেভ্, (চ) কন্‌কেভ্ মেনিস্‌কাস্।

যত কিছু ফটোগ্রাফী লেন্স্ আছে সবই এই কয় প্রকার লেন্সের সমন্বয়ে প্রস্তুত হয়।

এই পাঁচটির মধ্যে শেষের দুইটি প্রসেস্ ফটোগ্রাফীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং সেই হেতু আগের তিনটি অপেক্ষা মূল্যবান। যদিও আগের তিনটি লেন্স্ অপেক্ষা শেষের দু'টি লেন্স্ অনেক বিষয়েই শ্রেষ্ঠ ও দোষমুক্ত, তবুও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নয়। বহু ক্ষেত্রে না হ'লেও কখন কখন দেখা যায় যে, আলোকরশ্মি প্রতিসরণ হওয়ার সময়—বিশেষ ক'রে লেন্সের পাশ দিয়ে যখন প্রতিহত হয়, তখন ভিত রকার

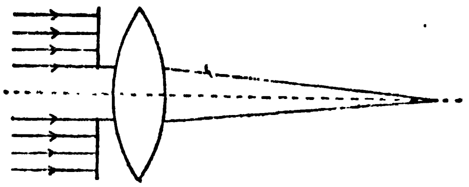


চিত্র নং ৮



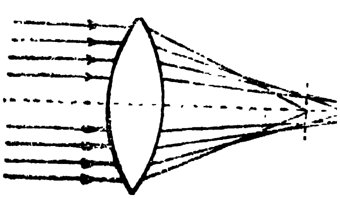
চিত্র নং ৯

সমতল স্থানে একটি উজ্জ্বল বিন্দুতে পরিণত হয় না, ফলে প্রতিবিম্ব হয় ঝাপ্‌সা। ১০ নং চিত্র দেখুন।



চিত্র নং ১০

যদি কোন লেন্সে এই দোষ থাকে আর সেই লেন্সে কাজ নিতে হয়, তা'হলে সেই দোষ অতিক্রম করার একমাত্র উপায় হ'চ্ছে, ফটো নেওয়ার সময় ছোট ষ্টপ্‌ ডায়াফ্রম্‌ বা এ্যাপারচার ব্যবহার করা, যাতে লেন্সের পাশের প্রতিসৃত আলোকরশ্মি (marginal rays) ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। ১১ নং চিত্র দেখুন।



চিত্র নং ১১

লেন্স পরীক্ষা করার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে একটা সাদা কাগজের উপর (কাগজটা গ্রাউণ্ড গ্লাস্‌ অর্থাৎ ক্যামেরার পিছনকার ঘসা কাচ যার উপর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় ঠিক তত বড় হওয়া চাই) চার ধারে এক ইঞ্চি ছেড়ে কাল কালি (প্রসেস্‌ ব্ল্যাক্‌ ইঙ্ক্‌) দিয়ে রুলিং পেন্‌এর সাহায্যে লাইন টান্‌তে হবে। এবং মাঝখানে ও চার কোণে রাখতে হবে ছোট অথচ খুব পরিষ্কার যে কোন লেখা (Type matter)। এখন এই কাগজখানা কপি বোর্ডে সমান ভাবে (উঁচু নীচু না থাকে অর্থাৎ ফ্ল্যাট্‌) এমনি লাগাতে হবে ও গ্রাউণ্ড গ্লাসে বা ফোকাসিং স্ক্রীনে তাকে সমান আকারে আনতে হবে এবং দেখতে হবে যে, মাঝখানের লেখাটি ও সঙ্গে সঙ্গে চার কোণের লেখাগুলিও যেন পরিষ্কার থাকে। যদি কোন দিক্‌ পরিষ্কার (Sharp focus) রাখতে গিয়ে অন্ত কোন দিক অস্পষ্ট বা ঝাপ্‌সা (unsharp) দেখায় তাহ'লে বুঝতে হবে যে, লেন্স্‌ দোষযুক্ত (defective) তবুও যত দূর সম্ভব পরিষ্কার ফোকাশ রেখে একটা নেগেটিভ্‌ করা ও নেগেটিভের উপর দেখা যে লেখা ও লাইনগুলি পরিষ্কার এসেছে কি না, যদি তা না হয় তাহ'লে লেন্স্‌ যে দোষযুক্ত তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এবার চারি দিকের লাইন মেপে দেখতে হবে যে ঠিক্‌ কপির মাপ অনুযায়ী নেগেটিভের উপর সমতুল্য আকারে এসেছে কি না, যদি না আসে, ছোট-বড় হয়, তাহ'লে সে লেন্স যে প্রসেস্‌ ফটোগ্রাফীর উপযোগী মোটেই নয়, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এই পরীক্ষাটি করবার আগে ক্যামেরার সামনের ও পিছনের দু'পাশ নীচে ও উপরে মেপে দেখতে হবে একটি হ'তে আর একটির দূরত্ব যেন সমান থাকে।

প্রসেস্‌ ফটোগ্রাফীতে এক্স্‌পোজারকে নিয়ন্ত্রণ করে যে কয়টি বিষয়, প্রত্যেক অপারেটরের তা জেনে রাখা দরকার নচেৎ ভাল নেগেটিভ্‌ করতে পারা মোটেই সম্ভব নয়, আর যদিও বা হয় অনেক নষ্ট করার পর তা হবে এবং যেটা হবে সেটা একেবারে আন্দাজে। এক্স্‌পোজার নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে কলোডিয়ন ফিল্‌মের বাথের ক্ষমতা যে আলোর সাহায্যে ছবি নেওয়া হবে তার শক্তি (power of the light), ছবির চরিত্র (character of the original) ছবি ছোট, সম-আকার ও বড় (reduction, same size and enlargement) হওয়ার উপর; এর সঙ্গে অবশ্য লেন্স, ষ্টপ বা ডায়াফ্রম বা এ্যাপারচারের উপরও নির্ভর করে তাও মনে রাখতে হবে।

প্রসেস্‌ ফটোগ্রাফীতে সচরাচর তিন রকম আলো ব্যবহার হয়, যথা—বন্ধ আর্ক ল্যাম্প, খোলা আর্ক ল্যাম্প এবং গ্যাস্‌ ফিল্ড ল্যাম্প। এই তিন প্রকারের মধ্যে খোলা আর্ক ল্যাম্পই আজকাল বেশী ব্যবহার হয়। আগে বন্ধ আর্ক ল্যাম্পের প্রচলন ছিল বেশী, এখনও যে নেই তা নয়, তবে আগের চেয়ে অনেক কম।

কাচের গ্লোববিশিষ্ট বন্ধ আর্ক ল্যাম্প যদি ব্যবহার করা হয়, তাহ'লে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তার গ্লোবটি সর্বদা পরিষ্কার থাকে, তা না হ'লে পূরো মাত্রায় আলো পাওয়া যাবে না, তাতে করে এক্সপোজারও বাড়বে ভাল কাজও হবে না। অনেক সময় দেখা যায় যে, কাচের গ্লোবটির মধ্যে তামাটে রং ধরে গেছে ও অনেক মুছলেও তা সহজে যায় না—নাইট্রিক্‌ এসিডের জলে পরিষ্কার করতে হয়। কিন্তু এ কষ্ট করার দরকার হয় না মোটেই যদি প্রথম থেকেই অপারেটর একটু যত্নবান হন। তামাটে রং কাচের মধ্যে পড়ার একমাত্র কারণ আর কিছুই নয় নীচের কারবন্‌টি উপর দিকে বেশী তুলে দেওয়ার দরুণ। কাজ ক'রতে ক'রতে হঠাৎ হয়ত আলোটা নিবে গেল, বা ঠিক মত জ্বলছে না, মাঝে মাঝে আওয়াজ করছে, অপারেটর তখন উপরের কারবনটি যে কত ছোট হয়ে গেছে তা দেখেই হোক্‌ আর না দেখেই হোক্‌ নীচের কারবন্‌টি উপরে ঠেলে দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে ব্যস্ত, ফলে আলোর শিখার স্পর্শে ল্যাম্পের উপরকার লোহার প্লেট হ'তে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহবিন্দু ছিটকাইয়া পড়ে ও কাচের গ্লোবে তামাটে রঙের সৃষ্টি হয়। মনে রাখতে হবে যে, নীচের কারবন্‌ যেন কোন ক্রমেই দুই ইঞ্চির বেশী উপরে না ওঠে। বন্ধ আর্ক ল্যাম্প হ'তে পূরো মাত্রায় আলো পেতে হলে কাচের গ্লোবটিকে পরিষ্কার রাখা চাই ও মাঝে মাঝে প্রতিফলকটিকে সাদা রং করা প্রয়োজন—যাতে একটুও আলো নষ্ট না হয়, যত দূর সম্ভব সব আলোটুকুই যেন প্রতিফলন হতে পারে।

প্রিজম্‌ কি ও তার প্রয়োজন

প্রিজম আর কিছুই নয় একটা স্বচ্ছ ত্রিকোণবিশিষ্ট কাচখণ্ড (যেটি ৪৫ ডিগ্রী হওয়া চাই) একটি ইস্পাত, লোহা, পিত্তল বা বা যে কোন ধাতুনির্ম্মিত কালো আধারের মধ্যে (সেটিও ৪৫ ডিগ্রী হয় যেন) বেশ ভাল ভাবে আঁটা থাকে। প্রিজম্‌ লেন্সের সামনে বা পিছনে দুই দিকেই ব্যবহার করা চলে, তবে

লেন্সের সামনে লাগিয়ে ব্যবহারবিধিই বেশী প্রচলিত। যেখানে ডাইরেক্ট প্রিণ্টিংএর প্রয়োজন অর্থাৎ যেখানে মেটাল প্লেট্ থেকে সোজা কাগজের উপর ছাপ (impression) নেওয়ার দরকার, সেখানে নেগেটিভ্ করার আগে প্রিজম্ ব্যবহার ক'রতে হবে। যেমন ব্লক ছাপবার জন্য ও ডাইরেক্ট মেসিনে লিথো-প্লেট্ ছাপবার জন্য। তবেই কাগজের উপর ছাপার বস্তু হবে সোজা, অর্থাৎ ঠিক অরিজিনালের অনুরূপ। প্রিজম ব্যবহারের ফলে নেগেটিভের উপর প্রতিবিম্ব পড়ে সোজা অর্থাৎ যদি কোন সোজা লেখা প্রিজম্এর সাহায্যে ফটো নেওয়া হয় তা'হলে নেগেটিভের ফিল্মএর দিক থেকে দেখলে সেটা সোজাই দেখাবে বা সোজা পড়া যাবে, কিন্তু লেন্সে প্রিজম্ না লাগিয়ে ফটো নিলে নেগেটিভের ফিল্মএর দিক থেকে দেখলে প্রতিবিম্ব দেখাবে উল্টো অর্থাৎ কোন সোজা লেখা বিনা প্রিজম্এ ফটো নিলে নেগেটিভের ফিল্মএর দিক থেকে সেটা পড়তে হ'লে উল্টো পড়তে হবে। আগেই বলেছি, ডাইরেক্ট মেসিনে লিথো-প্লেট ছাপতে হ'লে ও লেটার প্রেসে ব্লক ছাপবার জন্য যে সব নেগেটিভ্ দরকার সেগুলো প্রিজম্এর সাহায্যেই ক'রতে হবে, যাতে ক'রে নেগেটিভের ফিল্মএর দিকে প্রতিবিম্ব হবে সোজা এবং মেটাল প্লেটে হবে উল্টো, তাহ'লেই কাগজের উপর প্লেট বা ব্লক থেকে ছাপ উঠবে সোজা। কিন্তু অফ্‌সেট মেসিনে ছাপবার জন্যে যে প্লেটের প্রয়োজন তার জন্যে নেগেটিভ ক'রতে হবে বিনা প্রিজমে, কারণ নেগেটিভের ফিল্মএর দিকে তা হওয়া চাই উল্টো ও মেটাল প্লেটের উপর হওয়া চাই সোজা। এখন প্লেটের উপর থেকে সোজা প্রতিকৃতি কাগজের উপর সোজা আসবে কি ক'রে? হয়ত এ প্রশ্ন অনেকের মনে জাগতে পারে ও তা জাগাও স্বাভাবিক। কিন্তু অফসেট মেসিন্ সম্বন্ধে যাঁদের কিছু জানা আছে, তাঁদের মনে এ প্রশ্ন আসবে না। কারণ তাঁরা জানেন যে, অফ্‌সেট্ মেসিনে যে প্লেট ছাপা হয় কাগজের উপর তার ছাপ প্লেট থেকে সরাসরি আসে না। অফসেট্ মেসিনে যে সিলেণ্ডারে প্লেট বাঁধা থাকে ঠিক তার বিপরীত দিকে থাকে আর একটি সিলেণ্ডার যেখানে লাগানো থাকে রবার ব্ল্যাঙ্কেট। প্লেট থেকে প্রথম ছাপ পড়ে এই রবার ব্ল্যাঙ্কেটে এবং এই রবার ব্ল্যাঙ্কেট্ থেকেই কাগজে ছাপ ওঠে। সুতরাং এইটে মনে রাখলেই চলবে যে, ডাইরেক্ট মেসিনের জন্য অর্থাৎ ডাইরেক্ট প্রিণ্টিংএর জন্য নেগেটিভ করতে হবে লেন্সে প্রিজম্ দিয়ে আর অফসেট (offset) মেসিনের জন্য নেগেটিভ করতে হবে বিনা প্রিজমে।

আজকাল অনেক প্রতিষ্ঠান প্রিজম্এর পরিবর্ত্তে দর্পণ বা আয়না ব্যবহার ক'রছেন। সে কোন ধাতুনির্ম্মিত (এ্যালুমিনিয়ামের পাতলা চাদর, Alloy sheet সব চেয়ে ভাল; কারণ তাতে বেশী ভারী হয় না) ত্রিকোণবিশিষ্ট একটি কালো আধারের মধ্যে ৪৫ ডিগ্রীতে একটি আয়না বসানো থাকে, সেইটি লেন্সের সামনে বা পিছনের দিকে লাগিয়ে নিতে হয়। যেখানে ডাইরেক্ট প্রিণ্টিংএর প্রয়োজন অথচ প্রিজম কিংবা মিরার নেই সেখানে আরও কয়েকটি উপায়ে নেগেটিভ করা যেতে পারে যা মেটাল্ প্লেটের উপরে উল্টো ছাপ দেবে। প্রথম উপায় হচ্ছে নেগেটিভ করার সময় অর্থাৎ এক্সপোজড্ নেওয়ার আগে প্লেটের ফিল্মএর দিক লেন্সের দিকে না দিয়ে প্লেটের পিছন দিকটা লেন্সের দিকে দিয়ে এক্সপোজ করলে প্রিজম্এর সাহায্যে নেগেটিভের ফল যা হয় এ ক্ষেত্রেও তাই হবে। আর একটি উপায়—নেগেটিভ করার পর ফিল্মকে তুলে নিয়ে (by stripping film) অন্য একটি পরিষ্কার কাচের প্লেটের উপরে বসানো। আরও একটি উপায় হচ্ছে, নেগেটিভ করার পর ডুপলিকেটিং প্রসেস—যাকে বলে পাউডার প্রসেস বা কারবন্ প্রসেস্—দ্বারা তাকে উল্টো করে নেওয়া অর্থাৎ বিনা প্রিজমে নেগেটিভ্ হবে উল্টো, পাউডার প্রসেসে হবে নেগেটিভ থেকে নেগেটিভ্, সেই হেতু সেটা হবে সোজা। এখন যে কয়টি উপায়ে প্রিজম্ না থাকলেও প্রিজম্এর সাহায্যে তৈরী নেগেটিভের মত ফল পাওয়া যায় তা জানানো হলো। এর মধ্যে উপরে বর্ণিত প্রথম উপায়টিতে কাজ হয় বটে কিন্তু ভাল ফল পাওয়া যায় না, এতে আকার (size) তফাৎ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ও খুব পরিষ্কার (sharp image) প্রতিবিম্ব আসে না।

চলো যাই

পরিমল রায়

চলো যাই দেখে আসি চার্লি-কে
—খুকুকে খেতে দেবে বালি কে?
খুকুকে নিয়ে চলো, দোষটা কী?
—কাঁদলে কিসে বলো দোষ ঢাকি?
কেন সে কাঁদবে মা'র কাছে?
—তা'র চেয়ে চলো যাই সার্কাসে।
সেখানে কী দিয়ে রাখবে চুপ?
—বাঘ দেখে চুপ করে' থাকবে খুব,
বাঘ দেখে ভয় পাবে তা'তো বল না,
যাবে না, তাই বলো, কেন ছলনা?

ফটোগ্রাফীর ইতিহাস

এম, রহমান

আলোকচিত্র-বিদ্যা বা ফটোগ্রাফী আলোক-বিজ্ঞানের একটি চিত্তাকর্ষক এবং বিস্ময়কর ব্যবহার। কিন্তু ফটোগ্রাফী বলতে এই বুঝায় না যে এটা শুধু ক্যামেরা (camera) দিয়ে ফটো তোলা আর সেই ফটোকে সুন্দর ছবিতে পরিণত করার ব্যাপার। প্রথমত: ফটোগ্রাফী হচ্ছে আলোক-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ব্যাপার। আর দ্বিতীয়ত: এটা পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাইবার ব্যাপারে আলোকের কেরামতির পরিচয় যেটা হয়ত আমাদের মধ্যে অনেকেই জানেন না। প্রকৃত পক্ষে মাত্র বিগত আশী বৎসরের মধ্যে ফটোগ্রাফী কার্যকরী হয়েছে। এ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের যতগুলি আশ্চর্য্য আবিষ্কার হয়েছে, যেমন বেতার, এরোপ্লেন বা অন্যান্য কলকারখানা, ফটোগ্রাফী সম্বন্ধীয় আবিষ্কার বা চেষ্টা তার চাইতে কম আশ্চর্য্য নয়। ফটোগ্রাফী আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে গোপন ও পরোক্ষরূপে নানা ভাবে প্রভাবান্বিত করে থাকে। সেটা আমরা বুঝতে পারি তখনই, যখন আমরা কোন ছবির বই দেখে থাকি বা আমাদের নিজেদের ফটো দেখে আনন্দ অনুভব করি।

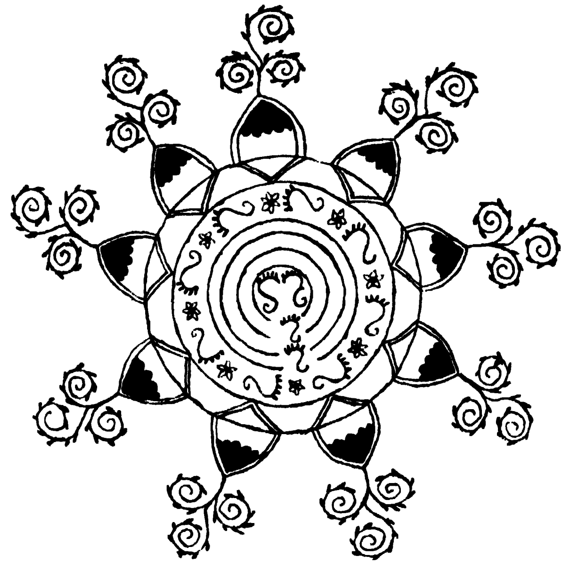
১৭৬১ খৃষ্টাব্দে দেলাপোর্টা নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক Camera obscura (ক্যামেরা অবস্কিউরা) আবিষ্কার করেন। এটা দিয়ে আলোকিত একটা জিনিসের প্রতিবিম্ব একটা Boxএর ভিতরে পাবার উপায় পাওয়া গেছল। কিছু কাল পর আবার জানা গেল যে, লুনা করনিয়াকে (রূপা দিয়ে তৈরী একটা যৌগিক রাসায়নিক পদার্থ) বাইরে সূর্য্যের আলোতে রাখলে তার উজ্জ্বল রং কাল হয়ে যায়। তখনকার দিনে কিন্তু কেউ ভাবতেও পারেননি যে এই দুটো পদার্থের যোগাযোগে উত্তরকালে এক বিচিত্র সম্ভাবনা দেখা দেবে। এর পরে গেল আড়াই শ' বছর—উনবিংশ শতাব্দীতে ফটোগ্রাফীর কার্য্যকরী ব্যবস্থা আরম্ভ হল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্যার হাম্ফ্রী ডেভী এবং টমাস ওয়েজউড নামক দুই জন বৈজ্ঞানিক প্রকৃত পক্ষে সূর্য্যালোকের সাহায্যে ফটো তোলার সম্ভাবনা সূত্র পেলেন। কিন্তু ঐ ছবিকে চিরন্তন কোরে ধোরে রাখবার কোন পদ্ধতি তাঁরা বের করতে পারলেন না বলে তাঁদের পরীক্ষালব্ধ ফলটাতে খুব চমকপ্রদ কিছু ঘটল না।

প্রকৃত আলোকচিত্রবিদ্যার ভিত্তি স্থাপনার সম্মান পেতে পারেন দুই জন ফরাসী বৈজ্ঞানিক নীস (Niecce) এবং লুই দাগের (Louise Daguerre), এদের মধ্যে নীস তার চেষ্টাকে ফলপ্রসূ দেখে যাবার আগেই মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর দাগের তাঁর সহকর্মীর কার্য্যকে সফল কোরে তুললেন। দাগের ছিলেন প্যারী সহরের এক চিত্রকর। তিনি Camera-obscuraর ছবিকে ধরে রাখবার ব্যবস্থা উদ্ভাবনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। এ সম্বন্ধে তিনি নীসের সাক্ষাতের পূর্ব্বেও অনেক পরীক্ষা করেন; তাঁর ব্যবস্থা দেখে লোকে তাকে পাগল বলতো। দৃঢ় সংকল্প ও অধ্যবসায়ের জোরে শেষ পর্য্যন্ত দাগের জগতের অন্যতম বিস্ময়কর আবিষ্কারের হেতু বলে পরিচিত হয়েছেন। বর্ত্তমান ফটো তোলার ব্যবস্থার সংগে তাঁর উদ্ভাবিত প্রণালীর অনেক তফাৎ। দাগেরের প্রণালীতে লোককে ফটো তুলবার জন্য প্রায় বিশ মিনিট ধরে বসে থাকতে হোত। আর যদি আলো কম হোত তাহলে লোকটির মুখে অনেক সময় সাদা রং মেখে নিতে হোত। তার কারণ ঐ সাদা রং-এর দরুণ আলোকের প্রতিফলন ভাল হোত। তিনি ফটো তুলতেন রূপোর প্লেটে আওডিন মাখিয়ে, ঐ ছবি হোত পোজেটিভ অর্থাৎ সাদা সাদাই থাকতো কালো কালই থাকত—এখনকার নেগেটিভের মত নয়। সূর্য্যের আলো রূপা ও আওডিনে যে যৌগিক পদার্থ হয় তার উপর ক্রিয়া করতো। এই আলোর ক্রিয়াকে দৃশ্যমান করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেও যখন তিনি কিছু করতে পারছিলেন না তখন তাঁর লেবরেটরীতে এক দিন একটা আকস্মিক ঘটনা ঘটে এবং তা থেকে এই সমস্যার সমাধান হতে পেরেছে। তিনি ক্যামেরা (camera) থেকে একটা প্লেট তুলে রাসায়নিক পদার্থ রাখবার আলমারিতে রেখে দেন। পরদিন যখন আবার সেই প্লেটটিকে বাইরে আনলেন তখন সেটা দেখে তিনি খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হোলেন, কারণ, তিনি দেখলেন এত দিনে তার সকল পরিশ্রম সফল ও সার্থক হয়েছে। ঐ প্লেটটাতে তিনি যে ছবি তুলেছিলেন সেটা পরিস্ফুট হয়ে ছবিতে পরিণত হয়েছে। তিনি আনন্দে অধীর হয়ে চীৎকার করে উঠলেন, "আমি আলো ধরতে পেরেছি, আমি আলো ধরেছি। এখন থেকে সূর্য্যদেব আমার প্ল ট ছবি এঁকে দেবেন।" তখন তিনি ভাবতে লাগলেন কি করে এটা সম্ভব হলো—ঐ আলমারীর রাসায়নিক পদার্থের কোন একটা নিশ্চয় এই কাজ করেছে। তিনি আর একটা প্লেট নিয়ে ঐ জায়গায় রেখে দিলেন। ঐ প্লেটটাও একটা সম্পূর্ণ ছবি হয়ে গেল। তখন আর তাঁর স্বীয় সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন সংশয় রইল না। তিনি পরীক্ষা দ্বারা একে একে রাসায়নিক পদার্থগুলি বের করে ফেললেন এবং এমনি করে বাদ দিতে দিতে বাকী রইল শুধু একটা যেটা নিশ্চয় ঐ কাজ করেছে। সেটা আর কিছুই নয়—পারদ। আসল ব্যাপার এই—সূর্য্যের আলো যেখানে যে পরিমাণে সিলভার আয়োডাইডকে রূপান্তরিত করেছে পারদের বাষ্প তেমনি অনুপাতে সেখানে লেগে গিয়েছে—যার জন্য ছবিটা ফুটে উঠেছে। এই ভাবে ফটোগ্রাফী সফল হল।

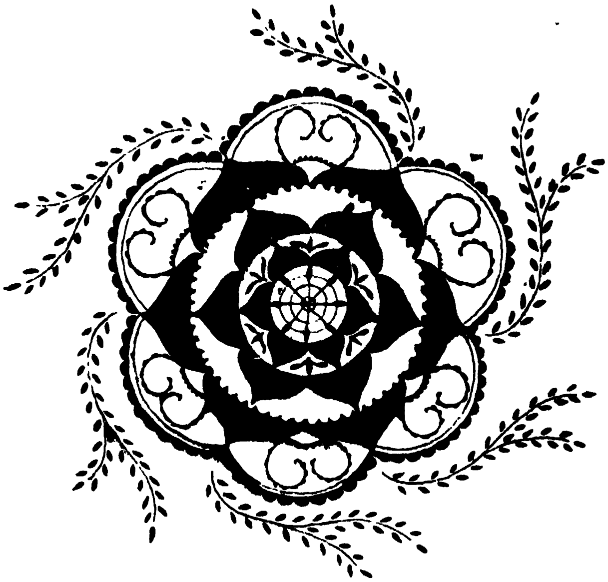
যখন দাগের এই নিয়ে গবেষণা করছিলেন, সেই সময় ফক্স টেলব (Fox Talbot) নামে এক জন ইংরেজ ক্যামেরার প্লেটকে ছবিতে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা করছিলেন। টেলবর সাফল্য দাগের চেয়েও বিস্ময়কর। দাগের ছবি তুলতেন রূপার পাতের উপর, তাতে একটার বেশী ছবি হত না এবং তিনি ঐ একটা কপিই (ঐ প্লেটটা) দিতে পারতেন। কিন্তু টেলব কাগজে সিলভারঘটিত পদার্থ প্রয়োগ করে ব্যবহার করতে লাগলেন। তার পর ফটো উঠাবার পর সেটাতে তেল লাগিয়ে স্বচ্ছ করে নিতেন, এবং ঐ নেগেটিভ কপি থেকে আরও ছাপ দিয়ে অনেক ছবি দিতে পারতেন। বর্ত্তমান কালে কাচের প্লেটে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ লাগিয়ে ফটো তোলা হয় তার আবিষ্কার হয়েছে আরও দশ বৎসর পরে।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ ভাস্কর স্কট আশ্চর্য্য আধুনিক উন্নত ব্যবস্থার প্রবর্ত্তক। আধুনিক ফটোগ্রাফী তাঁরই আবিষ্কারের অনুসরণ করে চলেছে। স্কটের দানেই ফটো-শিল্প এত সমৃদ্ধ হয়েছে, কিন্তু স্কটের ভাগ্যে কোন পুরস্কারই জোটেনি—দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে হয়েছে তাঁর মৃত্যু। নিজের আবিষ্কারকে পেটেন্ট করেন বলে তাঁহার আবিষ্কার গ্রহণ করে বহু লোক সমৃদ্ধ হয়েছে, কিন্তু তিনি কিছুই পাননি।

ফটোগ্রাফীর আবিষ্কারের পর আজ তার কত না উন্নতি হয়েছে। বর্ত্তমান যুগে মাত্র এক শ' বছর আগের কথা মনে করলে আমাদের মনে হয়, সে যুগের লোকের কত না অসুবিধাই ছিল।



—তৃপ্তি মতিলাল

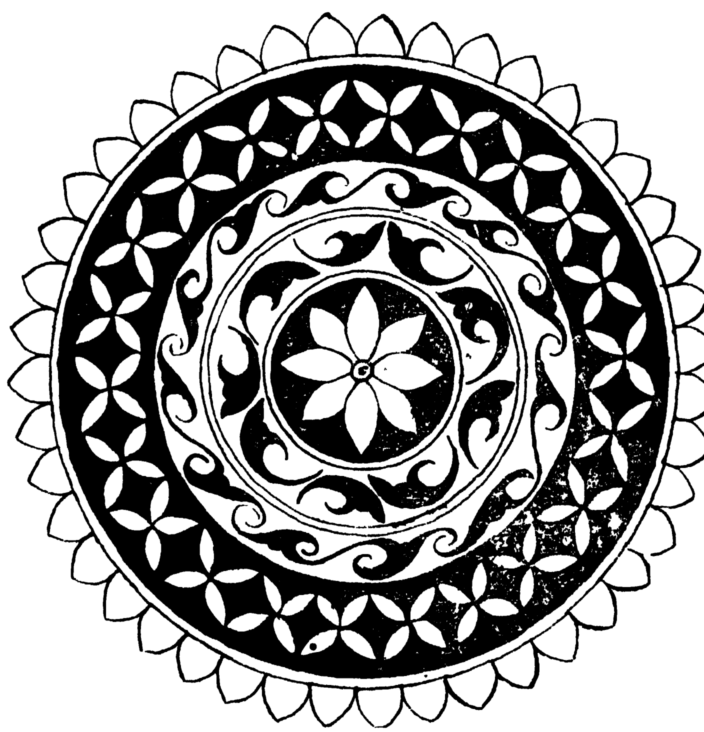


—অরুণা দাস

অঙ্গন

ও

প্রাঙ্গণ



—তপতী সেন



মেজর জেনারাল এ, সি, চাটার্জ্জি

ভারতীয় ভগিনীদের উদ্দেশ্যে

লেফ্‌টেন্যান্ট প্রতিমা পাল

(ঝান্সীর রাণী-বাহিনী)

[কুমারী প্রতিমা পাল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে গঠিত ঝান্সীর রাণী-বাহিনীর এক জন বাঙ্গালী লেফ্‌টেন্যান্ট। ১৯৪৪ সালে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি হেড্‌কোয়ার্টার্স ব্রড্‌কাষ্টিং ষ্টেশন হইতে তিনি ভারতীয় নারীদের উদ্দেশ্যে ইংরেজীতে একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি ঝান্সীর রাণী-বাহিনীর সভ্যাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে ভারতীয় নারীদের স্থান ও কর্তব্য সম্বন্ধেও কিছু নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার এই বক্তৃতাটি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' নামক পূর্ব-এশিয়ার একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকায় ২৩শে জানুয়ারী, ২৬০৪ (১৯৪৪)এর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। নিম্নে উক্ত বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইল]—অনুবাদক।

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে অবস্থিত প্রিয় ভগিনীরা!

আপনারা সকলে নিশ্চয়ই জানেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে এবং অনুপ্রেরণায় ভারতীয় নারীদের একটি বাহিনী গঠিত হইয়াছে। এই বাহিনীর নামকরণ করা হইয়াছে—"ঝান্সীর রাণী-বাহিনী।" আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় নেতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নিকট হইতে এই বাহিনী গঠন সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনারা কিছু শুনিয়া থাকিবেন, এবং গত কয়েক রাত্রে এই বেতার-কেন্দ্র হইতে আমাদের বাহিনীর অন্তর্ভুক্তা আরও কয়েক জন ভগিনী আপনাদের নিকট কিছু বলিয়াছেন। এই বাহিনীর পক্ষ হইতে আমিও আজ আপনাদের নিকট দুই-একটি কথা বলিতে চাই

কয়েক মাস পূর্বে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পূর্ব-এশিয়ার ভূমিতে পদার্পণ করিয়া যখন আমাদের মাতৃভূমির মুক্তির জন্য শেষ সংগ্রামে জাতি, ধর্ম এবং নারী-পুরুষনির্বিশেষে প্রত্যেককে নিজ নিজ অংশ গ্রহণ করিতে আহ্বান জানাইলেন, তখন আমাদের মনে এই চিন্তাই প্রথমে জাগ্রত হইল যে, আমরা আধুনিক ভারতের নারীরা রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের বাহিরে থাকিতেই অভ্যস্ত। এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত ও সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য ইহাতে প্রত্যক্ষ ভাবে অংশগ্রহণ করিবার শক্তি ও সামর্থ্য কি আমাদের আছে?

উইকার সেক্স' (Weaker Sex) কথাটি আমাদের কপালে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আমরা অত্যন্ত ছোটবেলা হইতেই ইহা শুনিতে অভ্যস্ত। কিন্তু সত্যই কি আমাদের মনে এবং আমাদের বাহুতে এমন শক্তি নাই যাহা মাতৃভূমির সেবায় উৎসর্গীকৃত হইবার দাবী করিতে পারে? আমাদের কি কোন পৃথক্ অস্তিত্ব, কর্তব্য ও দায়িত্ব-জ্ঞান নাই? আমাদের প্রায় সব ভারতীয় ভগিনীদের মনকেই পীড়া দেয় এরূপ এবং আরও বহু চিন্তা আমাদের মনে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ আমরা এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছি। সব সন্দেহ, সব সংকোচ আমাদের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে আমরা আমাদের পথের সন্ধান পাইয়াছি। মাতৃভূমির মুক্তি-সংগ্রামে আমরা সকলেই কর্মী। এই সংগ্রামে আমাদের স্থান আমরা জানিয়াছি এবং তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। তাই ভগিনীগণ! আমি এই সম্বন্ধেই কিছু বলিতে চাই।

ঝান্সীর রাণী-বাহিনীর আমি এক জন সাধারণ সৈনিক। তাই বলিয়া আমি এক জন পুতুল-সৈনিক বা শুধু কথাতেই সৈনিক নয়; আমি এক জন সত্যকার সৈনিক। আমি মিলিটারী বুট ও ইউনিফর্ম-পরিহিত এবং ভারতের শত্রুকে মারিবার জন্য আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক জন সৈনিক। কেহ কেহ হয়তো বলিতে পারেন যে, মানব-হৃদয়ের সব কোমল ও সুন্দর বৃত্তি কেবলমাত্র "নারী"তেই প্রকাশিত হয়। তাই, এক জন কঠিন-হৃদয় সৈনিকের বৃত্তিগুলি কি নারীর পক্ষে চর্চা করা সম্ভবপর? আমি অন্তরের সুনিশ্চিত স্বীকৃতির সহিত ঘোষণা করিতেছি যে, ইহা যে কেবল সম্ভব তাহা নহে, ঝান্সীর রাণী-বাহিনীর সংগঠনে ইহা প্রমাণিত ঘটনা।

ভারতবর্ষের স্মরণীয়া সকল মহৎ নারীদের মধ্যে ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈই আমাদের আদর্শ: আমাদের দেশের পক্ষে ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমাদের দেশের, জাতির ও মানব-সভ্যতার শত্রু বৃটিশের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যে যুদ্ধ তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের অসমাপ্ত কার্য্য শেষ করাই আমাদের বাহিনীর প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য: এবং এই কারণেই আমাদের বাহিনীর নামকরণ হইয়াছে—"ঝান্সীর রাণী-বাহিনী।" এই বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় নারীদের লইয়াই গঠিত।

সুদক্ষ শিক্ষকদের (ইন্‌স্ট্রাক্টরদের) নিকট আমরা প্রতিদিন

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিয়মিত ভাবে অস্ত্রচালনা শিক্ষা, দৈহিক শিক্ষা এবং মিলিটারী প্যারেড শিক্ষা করি। এক কথায়, আমরা এক জন সৈনিকের সুনিয়ন্ত্রিত ও কঠোর জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইতেছি। কেহ হয়তো বলিতে পারেন যে, পুরুষকে যে শিক্ষা দওয়া হয়, সেই কষ্টসাধ্য শিক্ষা গ্রহণ করা নারীদের দৈহিক-কষ্ট সহ্যের সীমার মধ্য সম্ভব হইবে না। প্রথমে আমাদের নিজেদেরই এই সন্দেহ হইয়াছিল এবং গোড়ায় আমরা অবশ্য কিছু কিছু অসুবিধাও ভোগ করিয়াছিলাম; কিন্তু কিছু কাল পরে আমরা লক্ষ্য করিলাম যে আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে এবং এখন আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের ভ্রাতাদের সহিত আমরা পাশাপাশি যুদ্ধ করিতে সক্ষম। পূর্বে কখনও অনুভব করি নাই এরূপ এক প্রকার আনন্দ আমরা অনুভব করিতেছি। আমরা এই আনন্দ অনুভব করিতেছি, কারণ আমরা নিজেদের মাতৃভূমির সেবা করিবার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতেছি। কারণ, এই মুক্তি-সংগ্রামে অন্ত বিশেষ কিছু করিবার সুযোগ না পাইলেও আমাদের জীবন উৎসর্গ করিতে পারিব। মাতৃভূমির পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করিতে অন্ততঃ চেষ্টাও করিতে পারিব, ইহার জন্যও আমরা এই আনন্দ অনুভব করি। সম্ভবতঃ আমাদের উদ্দেশ্যের সফলতা নিজেদের চক্ষে দেখিবার পূর্বেই যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের জীবন দান করিতে হইবে; কিন্তু এই দৃঢ় বিশ্বাসেই আমাদের সব চেয়ে আনন্দ যে আমাদের জীবনের আহুতিতে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে তাহা সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভস্মীভূত করিবে।



লেফ্‌টেন্যান্ট প্রতিমা পাল

প্রবাসে আমরা—ভারতীয় নারীরা যখন আমাদের শত্রুকে নিপাত করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছি, তখন ভারতে অবস্থিত আমাদের ভ্রাতা ও ভগিনীগণ কখনই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে পারেন না। ঝান্সীর রাণী-বাহিনীর প্রত্যেক নারী সৈনিকের মনেই এই ধারণা বিশ্বাসে পরিবর্তিত হইয়াছে। আমাদের আত্মোৎসর্গ কখনই বৃথা যাইতে পারে না—এই চিন্তাই আমাদের আনন্দ ও উৎসাহ দেয়। মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্যই সকল কর্তব্যের উপরে। আমরা আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে ইহা অনুভব করিয়াছিলাম বলিয়াই সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়া আমরা এই সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিয়াছিলাম। তাহা না হইলে আপনাদের মত আমাদেরও পিতা-মাতা, স্বামি-সন্তান আছে। এই সব প্রেম ও প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করা সহজসাধ্য নয়, এবং আমরা এই সকল বন্ধন সম্পূর্ণ ভাবে ছিন্নও করি নাই। বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করা খুব কঠিন কাজ নহে। আমরা তাহাই করিয়াছি। ভারতের ৩৮৮ লক্ষ ভ্রাতা ও ভগিনীর জন্য আমরা আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছি আমরা যদি মৃত্যুই বরণ করি তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? আমাদের সন্ততিরা এবং ভবিষ্যৎ বংশধরেরা পরাধীনতার লজ্জা হইতে মুক্তি পাইবে এবং তাহারা স্বাধীন জাতিরূপে পৃথিবীর অন্যান্য সকল জাতির মধ্যে উন্নত মস্তকে দাঁড়াইবে। আমাদের চোখের সম্মুখে আমরা সেই দিনের গৌরবোজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পাই এবং আমরা গর্ব অনুভব করি। ভারতমাতা পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করুক, ইহা মঙ্গলময় ঈশ্বরেরই ইচ্ছা। স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। আমরা যদি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করি তাহা হইলে কখনই আমরা পরাধীনতা হইতে মুক্ত হইতে পারিব না।

ভগিনীগণ! জন্মভূমির মুক্তির জন্য আমাদের মত প্রেম ও প্রীতির সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এই সংগ্রামে ঝাঁপ দিবার জন্য ভারতমাতার এক কন্যা হিসাবে আমি আপনাদের অনুরোধ করিতেছি। আমরা এ কথা নিশ্চয়ই ভুলিব না যে, আমরা প্রত্যেকেই বিশ্ব-প্রকৃতির এক-একটি অংশ। আমরা যদি সংগ্রামে অবতীর্ণ হই তাহা হইলে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা ভারতবর্ষে বৃটিশদের রক্ষা করিতে পারে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত। "করিব অথবা মরিব"—ইহাই আমাদের পণ হোক।*

* শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বাংলায় অনুদিত।



অন্নপূর্ণা গোস্বামী

মহিমারঞ্জন ঠাকুরের স্বপ্ন না দেখে উপায় ছিল না—

গ্রাম্য পুরোহিত মহিমারঞ্জন, বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে, সুশ্রী চেহারা ও ফর্সা। রংটা যেন সাবেকী আমলের আভিজাত্যের মত মেঘের অন্তরালে বিদ্যুতের দীপ্তিতে ঝকমক করে, সম্মুখে দেখা যায় শীর্ণ এক কঙ্কাল মূর্তি, অভাবে দৈন্যে জীর্ণ পঙ্গু এক মানুষ—পেটের কোঁচকানো চামড়া নাড়ি ভুঁড়ির সঙ্গে লেপ্‌টে রয়েছে।

এ হেন মানুষের স্বপ্ন নিশ্চয়ই জীবন-বিলাসের স্বপ্ন নয়। কঠোর বাস্তবের নগ্ন সত্য স্বপ্ন।

বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত সুদূর গ্রামান্তরে নির্জন নিভৃততম এক পল্লী। কে যেন কবে কোন্ যুগ যুগান্ত পূর্বে দস্যু তস্করের দল ঘন অরণ্যভূমির প্রান্তরে বিশাল বনস্পতির অন্তরালে অভীষ্ট সিদ্ধির মানসিক পূজা সম্পাদন করতে কালীমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছিল। কালের আবর্তিত চক্রে বনভূমি মনুষ্য সমাজে বিবর্তিত হয়েছে, দস্যু-তস্কর দলেরও অন্তর্ধান ঘটেছে প্রাচীন বটবৃক্ষের ঝুরির পর ঝুরি নেমে, বারংবার ডাল-পালায় পল্লবিত হয়ে সে কালীমূর্তি আবরিত হয়েছে। বর্তমানে বটের অন্তরালে দেবীকে স্মরণ করে এবং বৃক্ষকে উপলক্ষ করে পূজানুষ্ঠান সম্পাদন হয়ে থাকে।

কবে যেন কোন ভক্ত বটবৃক্ষের সম্মুখে এক পূজা-বেদী—তারই সংলগ্ন পূজার্থীদের প্রয়োজনে টিনের ঘর প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিল। মহিমারঞ্জন পুরুষানুক্রমে এই মন্দিরের সেবাইত।

শঙ্করীর কোনও পীঠ এ পুণ্যভূমিতে পতিত হয়েছিল কি না কারও জানা নেই। সাত জন দস্যু-প্রতিষ্ঠিত—'সাত ভাই কালীমূর্তি' যে জাগ্রত সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই।

এ তো কাহিনী নয়, এ যে সত্য। মহিমারঞ্জনের পিতামহ প্রপিতামহর কাছে শোনা, পিতার আমলে নিজে চোখে দেখা, নিজের জীবনে ঘটেছে কত না আড়ম্বরের সঙ্গে নিত্য দেবীর পূজা সম্পাদন হয়েছে, দলে দলে কত পূজার্থী পূজার্থিনীরা মন্দিরে জমা হত হয়েছে, কত মানসিক পূজা, থরে থরে কত উপচার, কত বলিদান! মনে হয় যেন স্বপ্ন!

আর আজ? দেখতে দেখতে কী ভয়াবহ দিন সম্মুখে এগিয়ে এল! চাতক পক্ষীর মত পূজার্থীর প্রতীক্ষায় রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, প্রত্যহ এক জন যজমান হয় কি না সন্দেহ, যজমানের বাড়ী ডাক্ নেই বললেই চলে। মানুষ যেন দেবদ্বিজ-ভক্তি বিস্মৃত হয়েছে।

অথচ সংসারে উপার্জন করতে তিনি একা। মন্বন্তরের ঘোর দুর্দিনে স্ত্রী বিগত হয়েছে। পোষ্য বড় ছেলের বউ কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে রমলা, চৌদ্দ পনেরো বছরের একটি কিশোর ছেলে, রমলার একটি শিশুপুত্র—এ ছাড়া মহিমারঞ্জনের বধির ও বোবা একটি পঙ্গু ভাই রয়েছে। একমাত্র উপার্জনক্ষম পুত্র তরুণ অশোক মন্দিরের দুরবস্থার দিকে তাকিয়ে মিত্রপক্ষের যুদ্ধে যোগদান করতে সম্মুখ সমরে চলে গেছলো। এর পর শুনতে পেয়েছিলেন—অশোক আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেছে, এখন সে ইংরেজের কারাগারে বন্দী।

মন্দিরের দক্ষিণ দিকে রেল-লাইন খুলনা অভিমুখে চলে গিয়েছে। লাইনের অপর প্রান্তে মহিমারঞ্জনের কুটীর। মন্দিরের সম্মুখে জেলা-বোর্ডের ধূলিবহুল রাস্তা, ঠিক তার অপর প্রান্তে এক হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকের ঔষধালয়—নাম 'শঙ্করশক্তি হোমিও হল।' টিনের ছাদ ও টিনের বেড়ার ঘর, যেন অগ্নিকুণ্ড, তবে ঘরের মধ্যে অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয়নি—আম-কাঠের চেয়ার-টেবিল-আলমারী, আলমারীর থাকে থাকে হোমিওপ্যাথিকের সারি সারি শিশি, টিনের বেড়ায় একটা পিজবোর্ড ঝোলানো তাতে লেখা—"সুবর্ণ সুযোগ। ফ্রী চিকিৎসা। ঔষধের মূল্য বাবদ রোগী-পত্রের সাধ্যমত দান গ্রহণ করা হয়" সত্যই সুবর্ণ সুযোগ। এক দিকে প্রফুল্ল ডাক্তারের, অপর দিকে রোগে জীর্ণ-শীর্ণ গ্রামবাসীদের বেঁচে থাকবার অবলম্বন

এই প্রফুল্ল ডাক্তার মহিমারঞ্জনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। অত্যন্ত রুক্ষ চেহারা, জীর্ণ স্বাস্থ্য, নীচের পাটিতে একটিও দাঁত নেই। মধ্যে মধ্যে মহিমারঞ্জন ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রফুল্ল ডাক্তারকে বলেন, "হিন্দু ধর্মের আর অস্তিত্ব রইল না ভাই, মানুষ যেন ক্রমশঃ নাস্তিক হয়ে পড়ছে, আজ তিন-চার দিন অতিক্রম করলো, মন্দিরে একটাও যাত্রী নেই।"

প্রফুল্ল বলেন, "মানুষের নাস্তিক না হয়ে আর উপায় কী বলো? পেটে যাদের ভাত জুটছে না, দেব-দেবীকে তারা স্মরণ করবে কী করে? হিন্দুর দেব-দেবী ক্রমেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।"

বৃদ্ধ পুরোহিত যেন প্রাচীন ঋষিগণের মত দৃপ্ত ভঙ্গিতে বললেন "কী অত্যাচার, কী অনাচার। ধর্মকে শিক্ত করে শাসন কাজ এগিয়ে যাবে, আর মানুষের সত্য ধর্ম, দেবদেবী-পূজা উপচার নির্মূল হবে, কালের গর্ভে বিলুপ্ত হয়ে যাবে? তুমি দেখ ডাক্তার, ক্রমশঃ এ হিন্দুধর্ম একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব কেউ আর খুঁজে পাবে না।"

প্রফুল্ল বললেন,—"তাইই জন্যে তো বণিক জাত কুকুরের মত লোলুপ হয়ে রয়েছে। অথচ কী দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা যদি হিন্দুকে টানি, আমরা সাম্প্রদায়িক হয়ে যাব—হিন্দুকে হিন্দু ছাড়া কেউ বাঁচাবে না ভাই।"

কয়েক দিন হয়েছে এক জন, দুই জন ছাড়া মন্দিরে পূজার্থী হয় না, যজমানেরও বাড়ী ডাক আসে না। এহেন সময় পূজারী ব্রাহ্মণের স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কিছু উপায় থাকে না। স্বপ্ন আপন মনের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কী বা হতে পারে? তাই নিদ্রাভিভূত বৃদ্ধ পুরোহিত কয়েক দিন উপবাসের পর স্বপ্ন দেখেন, যেন মা কালী রুদ্রমূর্তি ধারণ করে বলছেন—"আমি ক্ষুধার্ত, ষোড়শোপচারে পূজা চাই নচেৎ মহামারীতে গ্রাম ধ্বংস করে দেব" পরদিন গ্রামে সাড়া ওঠে—কিশোর তরুণের দল নানা সাজে সজ্জিত দ্বারে দ্বারে ঘুরে ভিক্ষা সংগ্রহ করে আনে—দেবীর পূজা সম্পাদন হয়। এর পর কিছু দিন গ্রামা সেবাইতের দিন স্বচ্ছন্দে চলে যায়।

মাস কয়েক উত্তীর্ণ হয়েছে, এমনি ঘটা করে পূজা-অনুষ্ঠানাদি হয়ে গিয়েছে। এক দিন মহিমারঞ্জন প্রফুল্ল ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের গাঁয়ের মাধব স্বর্ণকার একখানা কাগজ রাখতো, বন্ধ করে দিয়েছে, তুমি আজাদ হিন্দ ফৌজ সৈন্যদের কোনও খবর পেয়েছ? ছেলেটা না ফিরলে আর তো এমন করে দিন চলে না।"

প্রফুল্ল ডাক্তারের বাড়ী ভিন্ন গ্রামে, চাঁদা করে একখানা কাগজ ভাগে আসে, বললেন, "অশোক কোথায় যে আছে খবর তো পাওয়া যাচ্ছে না, তবে ঝিকরগাছা বন্দিশালায় যারা ছিল, তাদের অন্যত্র পাঠান হয়েছে।"

নৈরাশ্যজনক সংবাদ—সম্মুখে শুধু পুঞ্জীভূত অন্ধকার।

সেদিন এক জনও পূজার্থী আসেনি, শূন্য হাতে ঘরে ফেরা ছাড়া উপায় নেই, সন্ধ্যা প্রায় আসন্ন, তবু অবসন্ন শ্রান্ত মনে মন্দিরের চত্বরে বসে রইলেন। এই সময় পুত্রবধূ রমলা ওর শিশুপুত্রটিকে কোলে নিয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে বললো, "বাবা, অরুককে দিয়ে আপনাকে কত বার ডাকলুম আপনি গেলেন না যাত্রী যদি আজ না হয়, তবে কী উপবাসে থাকবেন? আজ যাত্রী হোল না, কাল হবে।"

পুত্রবধূর মুখের দিকে বৃদ্ধ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তার পর বিকৃত ভগ্ন কণ্ঠে বললেন, "যাত্রী আর হবে না মা। পাপ, পাপ,—কলির পাপ। কত দিন হয়ে গেল, মায়ের একটা বলি পূজা এল না। মা আর নিরামিষ পূজা উপচার চান না—"

শ্বশুরকে সান্ত্বনা দিয়ে রমলা বললো, "আপনার ছেলে ফিরে এলে আমরা জোড়া পাঁঠা বলি দিয়ে মাকে পূজা দোব আপনি এখন চলুন, সেই দুপুরে রাঁধা ভাত।"

এবার হঠাৎ আগুনের মত জ্বলে উঠলেন বৃদ্ধ, বললেন, "আমি এখনও পশু হইনি বউমা। দুধের শিশু যে মায়ের কোলে, তার মুখের গ্রাস কেড়ে খেতে কী আমি বাড়ী ফিরবো? তুমি যাও, ভাত খেয়ে নাও গে। দেখি মা কত নিষ্ঠুর হতে পারেন? আজ হোক্ কাল হোক্, আমি কিছু উপচার না নিয়ে বাড়ী ফিরবো না।"

এর পর কথা চলে না, ম্রিয়মাণ মুখে রমলা ফিরে গেল।

অনেকটা সময় অতিক্রম করলো, তখনও বৃদ্ধ নিশ্চল মূর্তিতে অবসন্ন ভঙ্গিতে উপবিষ্ট। দূরে আকাশে বাঁশ-ঝাড়ের অন্তরালে চাঁদ উঠেছে, জ্যোৎস্না-প্লাবিত মন্দির-প্রাঙ্গণ। মহিমারঞ্জন একদৃষ্টে বটবৃক্ষের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। অসংখ্য বটের ঝুরি নেমেছে, নূতন শিকড় নেমেছে, যারা মানৎ করে যায়, ওই শিকড়ের সঙ্গে একখণ্ড প্রস্তর অথবা নুড়ি বেঁধে দেয়—মনস্কামনা পূর্ণ হলে মাকে পূজা দিয়ে প্রস্তর অথবা নুড়ির বাঁধন খুলে দিয়ে যায়।

অগুণতি প্রস্তর ও নুড়ি গাছের সঙ্গে ঝুলছে, সেই দিকেই বৃদ্ধ পুরোহিত ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। প্রায় দুই বৎসর পূর্ণ হয়ে গেল, রেল-বাবুদের ওভারসীয়ার বাবুর স্ত্রী পুত্রবতী হবে বলে মানসিক করে গেল, কই, তার আকাঙ্ক্ষা তো আজও পূর্ণ হোল না?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ ভাবলেন, বলির শেষে আরও কত অঘটন ঘটবে কে জানে? অথচ কিছু দিন আগেও কত মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে মায়ের বলি চাই, বলি—"

আরও খানিকটা সময় অতিক্রম করেছে, ক্লান্ত মহিমারঞ্জন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ কি যেন গোলমালে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন চতুর্দিকে মধ্যরাত্রির নিথর নিস্তব্ধতা থম্‌থম্‌ করছে, শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ অস্ত গিয়েছে, একটা বিকট অন্ধকার মন্দির-প্রাঙ্গণে পুঞ্জিত হয়ে রয়েছে।

"ঠাকুর মশাই—ও ঠাকুর মশাই—"

চুপি চুপি কারা যেন ডাকছিল। বৈদ্যুতিক বাতির তীব্রতায় পুরোহিত তাকিয়ে দেখলেন—মিলিটারী পোষাক পরিচ্ছদ-পরিহিত জন কয়েক লোক সম্মুখে দাঁড়িয়ে, সঙ্গে তাদের বন্দুক বল্লম বর্শা ছোরা ইত্যাদি অস্ত্র রয়েছে মহিমারঞ্জনের বুঝতে বাকী রইল না যে এরা দস্যু। তবে তিনি দস্যুকে ভয় করেন না; এ কালী মন্দির দস্যু দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত? এবং দস্যুদের অনিষ্ট সাধন করতে পুলিশেও সংবাদ দেন না। শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা পূজা দেবেন নিশ্চয়ই?"

হাঁ ঠাকুর মশাই, আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হয়েছে, উপস্থিত থেকে মায়ের পূজা দেবার উপায় নেই, আপনি দয়া করে ষোড়শোপচারে পূজা দেবেন, তবে বলি আমাদের নিষিদ্ধ। কোন যে কোনও দিন যে সময় হাক আমরা এসে মায়ের আশীর্বাদী নির্মাল্য নিয়ে যাব।"

দস্যুদল অন্তর্হিত হয়েছে, প্রদীপটা জেলে পুরোহিত টাকাগুলো গুনলেন দশ টাকার পাঁচখানা নোট, তা ছাড়া একগাছা শিশু হাতের সোনার বালা, হয় তো বা ধস্তাধস্তি করতে বালাটা বেঁকে তুবড়ে গিয়েছে। প্রফুল্লমুখে উপবাসী পুরোহিত দেবীর উদ্দেশ্যে একটি প্রণাম জানিয়ে গৃহ অভিমুখে হাঁটতে সুরু করলেন।

* * * *

আবার স্বপ্ন!

শুষ্ক মরুভূমির মত দারিদ্র্য যেখানে ধূ-ধূ করছে—দস্যু-লুণ্ঠিত পূজার অর্ঘ্য শোষণ করে নিতে কতই বা সময়ের প্রয়োজন? সুতরাং আবার চাতক পক্ষীর মত মেঘশূন্য আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে হয় চাতকের ব্যাকুলতায় আকাশে মেঘ জমে, কিন্তু বৃদ্ধ পুরোহিতের কাতরতায় মন্দিরে যাত্রী জমে না!

হয়তো বা তাই মায়ের বলি-পূজা হয় না—মা নিরামিষ পূজার অর্ঘ্যে তৃপ্ত হতে পারে না। অথচ এক দিন এই মন্দির-প্রাঙ্গণে কত বলিদান হয়ে গিয়েছে, রক্তরঞ্জিত হয়েছে বেদীমূল। শোনা যায়, পূর্বে নরবলিও হয়েছে, আর আজ?

গ্রাম যেন বলির পশু-শূন্য হয়ে গিয়েছে, যা আছে অত্যন্ত চড়াদরে বিক্রয় হয়, সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে, এ-হেন অবস্থায় মায়ের বলি-পূজার ব্যাকুলতা দুরাশা নয় কী?

রমলা যুক্তকরে দেবীকে প্রণাম জানিয়ে বলে, "মা ওঁকে তুমি ফিরিয়ে দাও, আমি জোড়া পাঁঠা দিয়ে তোমাকে অর্ঘ্য অঞ্জলি দোব—"

মাঝে মাঝে রমলা অত্যন্ত আনমন হয়ে যায়, ওর স্বামী কোথায় কে জানে? সত্যই কী ইংরেজের বন্দি-নিবাসে? এর পর আর রমলা ভাবতে পারে না। মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্তূপীকৃত অন্ধকার পুঞ্জিত হয়ে ওঠে। দৈনন্দিনের পূজার জন্যে মধ্যে মধ্যে বাতাসা কদমা ইত্যাদি বাজার থেকে আসে। খবরের কাগজের ঠোঙ্গায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সংবাদগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করে, টুকরো কাগজের অসম্পূর্ণ সংবাদে হোঁচট খেয়ে ও থেমে যায়।

এক দিন ওর কিশোর দেবর অলক বললো, "বৌদি, আজ রাস্তায় এক জন আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যের সঙ্গে দেখা হোল, এখনও অনেক জন ওরা বারাসত ক্যাম্পে আছে, দাদার কথা জিজ্ঞেস করলুম, কিছু বলতে পারলো না।"

নির্লিপ্ত কণ্ঠে রমলা বললো, "বাঙ্গালীকে ওরা বাঙ্গলা দেশে রাখে না ভাই।"

"আগ্রহের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অলক আরও বলতে লাগলো—"ওরা নেতাজীকে কী ভালোবাসে, ভক্তি করে বউদি! আমাকে জিজ্ঞেস করলো—"তোমার বাবা কী করেন? আমি বললুম, "মা কালীর পূজা করেন—" সে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বললো—"তোমরা নেতাজী ছাড়া অন্য দেবতাকে এখনও পূজা কর?"

রমলা কী উত্তর দেবে? অত্যন্ত বিমনা হয়ে গেছলো, অপলক দৃষ্টিতে অলকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কতকটা সময় অতিক্রম করলো, অলক কখন যেন চলে গিছলো, রমলা কি যেন ভাবছিল কে জানে—দুই চোখ বেয়ে ওর অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছিল। শ্বশুরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে ত্রস্তে আঁচলে চোখ মুছে ফেললো। দিন কয়েক আগে মহিমারঞ্জন আবার স্বপ্ন দেখেছেন —দেবী যেন আবার রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করে বলেছেন—"রক্ত, রক্ত— আরও রক্ত চাই—রক্ত ছাড়া আমার তৃপ্তি নেই, আনন্দ নেই জাতির মুক্তি নেই।" এবার তাই পূজা-উপচারে বলির আয়োজন হয়েছিল।

মহিমারঞ্জন ডাকলেন, "বউমা!"

"কী বলছেন বাবা?"

"পরশু দিন মঙ্গলবার ও অমাবস্যা তিথি পড়েছে—সেই দিন মায়ের পূজার ব্যবস্থা করলুম। চাল দশ সের মত জমা হয়েছে, টাকা দশেক উঠেছে। কালকের দিনটা ছেলেরা বের হবে—যা কিছু ওঠে—"

রমলা বললো, "কিন্তু বাবা, দশ টাকায় তো বলি-পূজা সম্ভব হবে না"?

বৃদ্ধ গালের কুঞ্চিত চামড়ায় উজ্জ্বল হেসে বললেন, "তোমার মনে আছে তো বউমা, ইষ্টিশনের ওভারসীয়ারের বউ মানসিক করেছিল, সন্তান জন্মগ্রহণ করলে বলি-পূজা দেবে—"

আনন্দ প্রকাশ করে রমলা জিজ্ঞেস করলো—"তাঁর কবে ছেলে হয়েছে বাবা? তিনি কবে পূজা দিতে আসবেন?"

মহিমারঞ্জন বললেন, "কবে যে ছেলে হয়েছে মা, সে কথা কিছু বললে না, ছেলেটি বেশ বড়ই দেখলুম, প্রায় বছর খানেকের, আমাকে আশীর্বাদ করতে ডেকেছিলেন, এই মঙ্গলবারেই ভালো দিন, ওঁরা পূজা দিতে আসছেন।"

"আর একদিন মাত্র গ্রামের বালক ও কিশোরের দল পূজা উপচার সংগ্রহ করতে গ্রামান্তরে বের হবে। তখন ওরা শঙ্কর-শক্তি হোমিও হলে বীরবাহু পতনের মহড়া দিচ্ছিল। সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীত-চর্চা করছিল—

"বিরহিণী রাই পিতলের কলস লয়ে যায় যমুনায়;
যমুনার জল দেখতে কাল, পান করতে লাগে ভালো
জলের ছায়ায় ওই যৌবন দেখা যায়—"

পায়ের নূপুর-ধ্বনি, হাতের খঞ্জনির রোলে জলসা রীতিমত জমে উঠেছিল। পরদিন ওরা চার-পাঁচ মাইল ভদ্রা হরিহর ইত্যাদি নদী পার হয়ে গণ্ডগ্রামে অবস্থাপন্ন জমীদারের গৃহে প্রবেশ করেছিল। শ্যামা-সঙ্গীত ও কৃষ্ণ নাম শুনে ভেতর থেকে একটি প্রৌঢ় মহিলা ও তাঁর তরুণী পুত্রবধূ বের হয়ে এল। দু'জনেরই পাণ্ডুর ম্লান মুখশ্রীতে একটি বেদনার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে রয়েছে। অলক কৃষ্ণ সেজেছিল, মাথায় চূড়া হাতে মোহন বাঁশী; কেউ রাধা সেজেছিল, কেউ বীরবাহু, কেউ লক্ষ্মণ; একটি গানের পর প্রৌঢ়া মহিলা বললেন "ঈশ্বরের নাম কীর্তন করছ তোমরা খুব ভালো, চাঁদা তুলে তোমরা কী করবে বাবা? পূজো হবে না কি?"

অলক সংক্ষেপে কালীর অলৌকিক ক্ষমতার কাহিনী বর্ণনা করে মহিমারঞ্জনের স্বপ্নের কথা বললো।

দেবীর উদ্দেশ্যে একটি ভক্তিনত প্রণাম জানিয়ে মহিলাটি বললেন, "দেখ না বাবা আমাদের কী বিপদ ঘটেছে। আমার এই বউমা একমাত্র প্রথম ছেলের অন্নপ্রাশন দিয়ে বাপের বাড়ী থেকে ফিরছিল, রাত্রিবেলা নদী-পথই পাঁচ সাত মাইল অতিক্রম করতে হয়—ছেলের গায়ে এক-গা গহনা ছিল—" প্রৌঢ়া আর বলতে পারলেন না, ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

অলক জিজ্ঞেস করলো—"ডাকাতি হ'য়ে গেছে বুঝি নৌকাতে?"

আঁচলে চোখ মুছে প্রৌঢ়া বললেন, "শুধু ডাকাতি নয় বাবা, ধনে প্রাণে গেল, আমার ছেলের বউকে লাঠির আঘাতে কাবু করে দিয়ে জিনিষ-পত্র-গহনা শুদ্ধ নাতিটা নিয়ে সরে পড়লো—"

কিছুক্ষণ কেউ একটিও বাক্যব্যয় করতে পারলো না, অত্যন্ত বেদনাময় পরিস্থিতি। প্রৌঢ়া ভিতরে চলে গেছলেন, খানিকটা পরে নিজেকে সংযত করে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন, একটি চাল-ডাল সহ সিধা ও দশটি টাকা অলকের হাতে দিয়ে বললেন, "দাদুর নামে পূজা দিও বাবা, মায়ের কাছে বলো দাদুকে যেন ফিরে পাই।' কিছুক্ষণ থেমে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, "দেখ বাবা, ঈশ্বর যদি তাকে নিতেন—কিন্তু তা নয়, কোথায় সে যে রইল, সাপের মুখে কী বাঘের মুখে—"

অলক বললো—"মাসীমা, মায়ের কাছে মানত যদি আপনারা নিজে করেন, যত ফল হয়—আমরা—"

পুত্রহারা বধূটি ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলো "মা, আমি যাব, মায়ের পায়ে ধন্না দিয়ে থেকে আমি খোকনকে ফিরিয়ে আনব।"

শাশুড়ী কি বা উত্তর দেবেন? নীরব চিন্তায় বধূর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। হয়তো বা ভাবছিলেন, কোথায় কত দূর সে কালী-মন্দির? কোথায় সে জাগ্রত দেবী, যাবার উপায় কী

তাঁর চিন্তার সমাধান করে দিয়ে অলক বললো "কাল আমাদের ওখানে বড় পূজা রয়েছে, অনেকে মানসিক পূজা দিতে আসবেন, আমার সঙ্গীরা আজ ফিরে যাক্—আমি কাল ভোর বেলায় আপনাদের নিয়ে যাব।"

করযোড়ে আবার দেবীর উদ্দেশ্যে একটি প্রণাম জানিয়ে শাশুড়ী বললেন, "আমার বাতের অসুখ, যাবার তো উপায় নেই বাবা, তুমি বউমাকে নিয়ে যেও, আমার ছেলেও যাবে—

* * * *

মহিমারঞ্জনের স্বপ্ন-দৃষ্ট পূজা আয়োজন।

আড়ম্বরের সঙ্গে, আনুষ্ঠানিক পূজা উপচারে থরে থরে মন্দির-প্রাঙ্গণ সুসজ্জিত হয়েছিল। প্রাচীন বটবৃক্ষের শাখায়-প্রশাখায় পল্লবে শিকড়ে দেবীমূর্তি আচ্ছাদিত, জনকয়েক পূজার্থী ও পূজার্থিনীরা চত্বরে উপবেশন করেছে। কিছুক্ষণ আগে অলকের সঙ্গে পুত্রহারা বধূটি পৌঁছেচে, নাম অপর্ণা, অপর্ণার মতই দেখতে সুন্দর, এক প্রান্তে মলিন মুখে বসে রয়েছে, ওর স্বামী খানিকটা দূরে পুরুষদের সঙ্গে সমাসীন। সুরভিত ধূপধুনা, ঘৃত-প্রদীপ, পুষ্প-চন্দনের গন্ধে বেদী-মূল আমোদিত। পূজা তখনও সুরু হয়নি।

"রক্ত,—রক্ত চাই।"—মায়ের আদেশ; কিন্তু ভিক্ষা-সংগ্রহের সামান্য নগদ পুঁজিতে বলির আয়োজন সম্ভব হয়নি।

ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে পুরোহিত পুত্রবধূকে জিজ্ঞেস করলেন—"এবারেও একটা মায়ের বলির ব্যবস্থা করতে পারলুম না, তুমি ওভারসীয়ার বাবুর বাড়ী গেছলে, তাঁর স্ত্রী কী বললেন?"

গলার স্বর নিম্ন করে রমলা বললে, "তাঁর তো ছেলে হয়নি, কুড়িয়ে পাওয়া কি না—"

"কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে।"—অপর্ণার হৃৎস্পন্দন তখন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, ও উৎকর্ণ হয়ে রমলার কথা শুনতে লাগলো। রমলা বলছিল,—"ওভারসীয়ারের বউ বলেন, মা হবার সৌভাগ্য হয়নি,—ভাগ্যে সইবে কী না জানি না, হয়তো যার ছেলে দাবী করবে এসে—বছরখানেক যাক্—ফাঁড়াটা কাটুক—তখন মাকে বলি দিয়ে পূজা দোব।"

ইত্যবসরে ওভারসীয়ারের স্ত্রী মন্দির-প্রাঙ্গণে পৌঁছেছিলেন। বয়স্থা মহিলা, কোলে ফুটফুটে সুন্দর কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেটি রয়েছে।

অপর্ণা তৎক্ষণে ওর মাথাটা দুই হাতে চেপে ধরেছিল, ওর আর কোনও সংশয় নেই, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ও শুধু বললে, "ভগবান, তুমি খোকাকে বাঁচিয়ে রাখ, আমাকে শাস্তি দাও ব্যর্থ মাতৃ-জননীর বুক থেকে আমি যেন শিশুকে না ছিনিয়ে নি।" অপর্ণা অন্যের দৃষ্টি থেকে নিজেকে গোপন রাখতে সকলের দৃষ্টির অন্তরালে মন্দির থেকে বের হয়ে পড়লো, দিশেহারা মনটাকে আয়ত্তে আনতে কোন এক দিকে হাঁটতে সুরু করলো।

ততক্ষণে পূজা সুরু হয়ে গিয়েছে—শঙ্খ, ঘণ্টা, পুরোহিতের মন্ত্র-ধ্বনিতে মন্দির-প্রাঙ্গণ মুখরিত। পূজা সমাপনান্তে প্রত্যেকে ভক্তি উদ্বেলিত চিত্তে দেবীকে প্রণাম করছে, ইতিমধ্যে অলক এসে বললো, "কোথায় অপর্ণা বউদি, আসুন, এই বটবৃক্ষের ঝুরির সঙ্গে একটা নুড়ি বেঁধে দিয়ে, আপনি মানসিক করুন নিশ্চয়ই খোকনকে ফিরে পাবেন।"

কিন্তু কোথায় অপর্ণা? ওর সন্ধান সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। ওর স্বামী ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে এসে বললো, "মানসিক কষ্টে একবার ও জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে গেছলো। সে চলে গেল নদীপ্রান্তে, কেউ গেল গ্রামান্তরে, কেউ বা রেল-লাইনের দিকে। ঠিক তখনই শোনা গেল, ইছামতী নদীর পুলের উপর দিয়ে ঘট-ঘটাং শব্দে ট্রেণ যেতে যেতে হঠাৎ থেমে গেল।

রমলার বুকের ভেতরটা অজানা এক আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো—মহিমারঞ্জন দেবীর কাছে প্রার্থনা করতে ধ্যানের আসনে সমাসীন,

তিনিও একটু নড়ে উঠলেন। ব্যাকুল আবেদনে দেবীর উদ্দেশ্যে বললেন, "যদি কোনও অন্যায় হয়ে থাকে, অপরাধ নিও না, মাকে ফিরিয়ে দাও।"

• • • •

মহিমারঞ্জনের অনুমান ভুল হয়নি। অপর্ণা হয়তো বা কিছুক্ষণের জন্যে আত্মগোপন করছে, রেল-লাইন অতিক্রম করে অপর প্রান্তে এগিয়ে যাচ্ছিল; হঠাৎ দৈত্যের মত প্রকাণ্ড এঞ্জিনটা ঝাঁ-ঝাঁ করে এগিয়ে এল, দিক্‌ভ্রান্ত অপর্ণা কোনও ভাবেই আত্মরক্ষা করতে পারলো না। নিষ্ঠুর ট্রেণটা ওকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছে। মন্দির-প্রাঙ্গণে মৃতদেহ এনে রাখা হয়েছে। মস্তক থেঁত্‌লে গিয়েছে, সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, রক্তের নদী বুঝি বয়ে চলেছে—টকটকে লাল রক্ত! যেন দেবীর পূজা উপচারে বলির অর্ঘ্য—রক্ত—রক্ত চাই, পিপাসার্ত জননীর আকুল নিবেদন। ওভারসীয়ারের স্ত্রীর কোলে ছেলেটি অব্যক্ত কণ্ঠে চীৎকার করে কাঁদছে—"মা—মা—ম—" অপর্ণা এবার আর তার শিশুর কাছে আত্মগোপন করতে পারলো না। জননীর দ্বিখণ্ডিত দেহ, বিকৃত মুখ, তবু মাকে চিনতে সন্তানের ভুল হয়নি।

তখন মহিমারঞ্জন সমাধিস্থ হয়েছিলেন, এমন প্রায় তাঁর হয়, মা কালী তাঁর দেহে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকেন, মহিমারঞ্জন থেকে থেকে চীৎকার করে উঠছেন, "রক্ত,—রক্ত চাই,—রক্ত—রক্ত আমার মুক্তি-পথ,—রক্তই একমাত্র সত্য,—আমি রক্তের উপাসিকা, সাধিকা, সেবিকা"—

বৃদ্ধের ভাব-বিহ্বল কণ্ঠস্বর আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছিল।

"বরিখ"

ললিতা সরকার

বরিখ ঝরঝরে শাঙন সরসরে
কাঁপিল থরথরে
নব কিশলয় রে।
আজিকে দশ দিশি আঁধারে গেল মিশি
নিবিড় অমা-নিশি
সঘনে ঘন ঘন গরজিত রে॥
ডাকিছে ডাহুকী , নাচিছে কেতকী
বিরহে ছায় এ কী
আমার প্রিয়-বিরহে রে।
এমন দিনে প্রিয় তোমার মিলন দিও
আমার পরশ নিও
আজিকে উতলা মোর হিয়া রে॥



মুকুন্দ মজুমদার

সোভিয়েট সংবাদপত্র

অনুকা গুপ্ত

সোভিয়েট ইউনিয়নে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রের ১২৫ ধারাতে এই অধিকারের কথা স্বীকার করে বলা হয়েছে :—

সোভিয়েট ইউনিয়নের নাগরিকদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি আইনের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে।

(ক) বক্তৃতার স্বাধীনতা ;
(খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ;
(গ) জনসভা করার অধিকার ;
(ঘ) রাস্তায় শোভাযাত্রা করার অধিকার।

"শ্রমিক জনসাধারণ ও তাদের প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে মুদ্রণযন্ত্র, কাগজ, সভাগৃহ, রাস্তা, যানবাহন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করার সুবিধা দিয়ে এই সমস্ত অধিকার কার্য্যকরী করে তুলবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

এবং সত্যই, সোভিয়েট ইউনিয়নে মুদ্রাযন্ত্র, কাগজের কল, সভা করার জন্য বড় বড় হল-গৃহ ইত্যাদি স্বাধীন মত প্রকাশ করায় ও স্বাধীন ভাবে লেখার সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীই সমগ্র ভাবে শ্রমিক জনসাধারণের দখলে রয়েছে।

১৯১৩ সালে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সন্ধিক্ষণে তখনকার রুশীয় সাম্রাজ্যে মাত্র ৮৫৯টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হোত, এবং তাদের প্রচার-সংখ্যা ছিল ২,৭০০,০০০ কপি।

বড় বড় ব্যাঙ্কের মালিক, শিল্পপতি, জমিদার ইত্যাদি এরাই অধিকাংশ সংবাদপত্রের মালিক ছিল। প্রাক্-বিপ্লব যুগের রাশিয়াতে বড় বড় সংবাদপত্রগুলি "রুশো-এসিয়াটিক" ব্যাঙ্কের নির্দ্দেশ মত পরিচালিত হোত।

বিপ্লবের আগে যে রাশিয়া পশ্চাৎপদ, অশিক্ষিত ছিল, সেই রাশিয়াই এখন সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে এবং এখানে বহু প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, এবং সেগুলিতে জনসাধারণের নিজস্ব মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

সংবাদপত্রের প্রত্যেকটি বিভাগেরই উন্নতি সাধিত হয়েছে। গত যুদ্ধের আগের কয়েক বছরের (১৯১৩) সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে, সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা দশ গুণ বেড়ে গেছে (১৯৫১ সালের ১লা জানুয়ারী এই সংখ্যা ছিল ৮,৫৫০), আর তাদের প্রচার-সংখ্যা বেড়ে গেছে চৌদ্দ গুণ (৪৭,৫২০,০০০ কপি)। ১৯৩৮ সালে সোভিয়েট সংবাদপত্রের সমস্ত বাৎসরিক প্রচার-সংখ্যা ৭০০ কোটির উপরে উঠেছিল।

অগ্রগামী সংবাদপত্রগুলির প্রচার অত্যন্ত বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে। "প্রাভ্দা"র (সত্য) প্রচার-সংখ্যা ২,০০০,০০০ কপিরও বেশী। "ইজভেস্তিয়া" (সংবাদ) প্রকাশিত হয় সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমিক জনসাধারণের প্রতিনিধিদের পক্ষ হতে—এর প্রচার-সংখ্যা হোল ১,৬৬০,০০০ কপি এবং ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের মুখপত্র হোল "ট্রুড"—এর প্রচার-সংখ্যা হ'ল ৪৮০,০০০ কপি!

বিভিন্ন শিল্পের কেন্দ্রীয় মুখপত্রগুলিরও প্রচার-সংখ্যা অনেক, বিভিন্ন শিল্পের ভারপ্রাপ্ত সরকারী দপ্তর ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির

কেন্দ্রীয় কমিটির সহযোগিতায় যুক্ত ভাবে এই সংবাদপত্রগুলি প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলি হ'ল—"ইন্ডাষ্ট্রীয়া" (বৃহৎ শিল্পগুলির সংবাদপত্র), "গুডক" (বাঁশী—রেলওয়ের মুখপত্র), "উচিটেল্স্কাইয়া গেজেটা" (শিক্ষকদের মুখপত্র), এবং জলযান, বিমানশিল্প, লঘুশিল্প, খাদ্যশিল্প, কৃষি ও কাষ্ঠশিল্প ইত্যাদি পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি।

লালফৌজ ও লাল নৌ-বাহিনীর নিজস্ব অনেক সংবাদপত্র আছে। কেন্দ্রীয় মুখপত্র ক্রাসানাইয়া ভেজ্দা (লাল তারকা) ও ভইনো মোর্স্কই ফ্লট (নৌ-বাহিনী) ছাড়া আরও অনেক ফৌজের এবং বিভিন্ন বিভাগ ও ব্রিগেড সেনাদলের মুখপত্র কাগজ আছে,—গৃহযুদ্ধের সময়ে এইগুলির জন্ম হয়েছিল।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন জেলায় ৩,১১৩টি স্থানীয় সংবাদপত্র আছে এবং এদের প্রচার-সংখ্যা হোল সর্ব্বশুদ্ধ ৬ লক্ষ কপি।

বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান, সমবায়-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি নিজেদের কাগজ প্রকাশিত করে। এক দিন পরে পরে কিংবা সপ্তাহে একবার এই কাগজগুলি প্রকাশিত হয়, এবং এদের মধ্যে অনেকগুলির প্রচার-সংখ্যা ২০।২৫ হাজারেরও বেশী। ১৯৩৭ সালে বিভিন্ন কলকারখানা, সরকারী কৃষিফার্ম ও ট্রাক্টর ইত্যাদি কৃষিযন্ত্রের কেন্দ্রগুলিতে এই রকম ৪,৬০৪টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হোত।

ক্ষুদ্রতর শিল্প-প্রতিষ্ঠান, সমবায় কৃষি-প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয়, কারখানা ও বিশ্রাম-গৃহে প্রাচীর-সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় (প্রবন্ধগুলি হাতে লেখা হয় অথবা টাইপ-করা হয়)—এগুলিতে প্রতিষ্ঠানের জীবনধারা নিয়ে এবং উৎপাদন বাড়ানোর জন্য শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক মান বাড়ানো ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখা হয়; উৎপাদনের উন্নতি-বিধানের জন্য গঠনমূলক সমালোচনায় এই পত্রিকাগুলি প্রবৃত্ত থাকে। বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানগুলির প্রত্যেক বিভাগের জন্যও প্রাচীর-পত্র থাকায়, এগুলির সর্ব্বশুদ্ধ সংখ্যা সত্যই অনেক বেশী।

অনেক ভ্রাম্যমান সংবাদপত্রও আছে, গাড়ী করে এগুলি প্রচার করা হয়। বসন্তকালে বীজ বপন করার সময় ও শরৎকালে ফসল তোলার সময়ে রেডিও-সংযুক্ত মোটর গাড়ীর উপর ছোট ছোট ছাপাখানা বসিয়ে মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়,—যেখানে অধিক ফসল ফলাবার অভিযান চালানো হচ্ছে। এগুলি সংবাদপত্রের ভ্রাম্যমান কেন্দ্রীয় অফিস। কৃষিক্ষেত্রে ষ্টাখানোভ আন্দোলনের বিবরণ, ট্রাক্টর-চালক দলগুলির মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার কথা, শস্যকর্ত্তনকারী যন্ত্রের কাজের পরিমাণ ও কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে যৌথ খামারের চাষীরা নিজেদের লেখা সেই দিনই প্রকাশিত হয়, সাথে সাথে বৈদেশিক ও দেশের অন্যান্য খবরও রেডিও সাহায্যে গৃহীত হয়ে এই ভ্রাম্যমান সংবাদপত্রে ছাপা হয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রকাশিত ১,৮৮০টি সাময়িক পত্রিকার সর্ব্বশুদ্ধ বাৎসরিক প্রচার-সংখ্যা হোল ২৫০ কোটি কপি।

রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে লক্ষ লক্ষ সোভিয়েট শ্রমিকের অসীম আগ্রহ এবং রাজনৈতিক শিক্ষালাভ সম্বন্ধে তাদের ব্যগ্রতা থাকার ফলে মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ সম্বন্ধে বহু প্রামাণ্য বই বহুল সংখ্যায় প্রকাশিত করা হয়েছে। ১৯১৭ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল—এই একুশ বছরের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নে মার্ক্স, এঙ্গেলস্, লেনিন ও ষ্টালিনের রচিত ৩১৫,৪০০,০০০ কপি বই প্রকাশিত হয়েছে।

সাহিত্য-বিষয়ক পুস্তকের প্রচার-সংখ্যা ৭ গুণেরও বেশী বেড়ে গেছে (১৯১৩ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৫,১০০,০০০ কপি, আর ১৯৩৭ সালে হয়েছে ১১৭,৮০০,০০০ কপি)। কৃষি সম্বন্ধে প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় আট গুণ বেড়েছে (৩,০০০,০০০ থেকে ২৩,২০০,০০০)। সমাজ-বিজ্ঞান ও রাজনীতি সম্বন্ধে প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা ১৭ গুণ বেড়েছে (১৭,৭০০,০০০ থেকে ৩০৮,৬০০,০০০)। আর শিল্পবিষয়ক প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা বেড়েছে ২৭ গুণ (২,২০০,০০০ থেকে ৫১,৪০০,০০০)।

সাহিত্য-বিষয়ক (মাসিকের) শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের প্রচার-সংখ্যাও বহু গুণে বেড়ে গেছে। ১৯১৭ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে বাল্জাকের বই ১,৪৭৫,০০০ কপি প্রকাশিত হ'য়েছিল, (যেখানে আগের ২০ বছরে এই বই ১০০,০০০ কপি প্রকাশিত হ'য়েছিল)। হাইনের বই ৯৬১,০০০ কপি প্রকাশিত হয়েছে। ভিক্টর হুগোর বই ৩,৩৭৮,০০০ কপি প্রকাশিত হয়েছে, আর ডিকেন্সের বই প্রকাশিত হয়েছে ১১৬২,০০০ কপি। রুশীয় ভাষায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচিত পুস্তকের প্রচার-সংখ্যা আরও বেশী বেড়ে গেছে। সোভিয়েট শাসনের এই কয় বছরে পুস্কিনের লেখা বই প্রকাশিত হয়েছে সর্ব্বশুদ্ধ ২৭,৮৬৪,০০০ কপি (আর ১৮১৭ সাল থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যে এই বই প্রকাশিত হয়েছিল ২,১৬৫০০০ কপি)। সেকভের বই প্রকাশিত হয়েছে ১৪,৩৭০,০০০ কপি, আর গোর্কির বই প্রকাশিত হয়েছে। ৩৮,১২৮,০০০ কপি। রুশিয়ার বিখ্যাত ব্যঙ্গকার সাল্টিকভ্ মেড্রিন্-এর বই প্রকাশিত হয়েছে ৫,৫৮৭,০০০ কপি, অর্থাৎ বিপ্লবের আগে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যার ৮০ গুণ বেশী।

শিশুদের জন্য লিখিত বইয়ের ক্রমবর্দ্ধমান প্রচার-সংখ্যা সমান ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯১৩ সালে শিশুপাঠ্য বইয়ের প্রচার-সংখ্যা ছিল ৬,৫৫০,০০০; ১৯৩৭ সালের মধ্যে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬৬,৩১৬,০০০তে অর্থাৎ দশ গুণ বেশী। বিভিন্ন জাতির নিজস্ব ভাষায় বিশেষ ভাবে শিশুদের জন্য সংবাদপত্র প্রকাশিত করা হয়। ছেলেদের সব চেয়ে জনপ্রিয় সংবাদপত্র হল "পায়োপরস্কায়া প্রাভ্দা" (অগ্রগামীদের সত্য)—এর প্রচার-সংখ্যা হোল ৯০০,০০০।

সোভিয়েট শাসন-ব্যবস্থায় এই বিরাট দেশের সুদূরতম অঞ্চলে পর্য্যন্ত ছাপার অক্ষর প্রচলিত হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের জাতিগুলির বিভিন্ন ৭০টি ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, আর বই প্রকাশিত হয় ১১ ভাষায়। এই জাতিগুলির মধ্যে ৪০টি জাতি মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, অক্টোবর বিপ্লবের পরে লিখিত বর্ণমালার প্রচলন করতে পেরেছিল। সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা ও পুস্তকের দাম সুলভ রাখা হয়—যাতে প্রত্যেক সোভিয়েট নাগরিক এগুলি কিনে পড়তে পারে।

সোভিয়েট সংবাদপত্রগুলির উদ্দেশ্য হোল অগ্রগামী মতবাদগুলি যাতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তার সাহায্য করা, শ্রম, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে সমাজবোধ-সম্পন্ন শ্রমিকদের উৎসাহিত করে তোলা, নূতন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের কোন ক্ষেত্রে যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে তা দেখিয়ে দেওয়া এবং ফ্যাসিষ্টপন্থী দেশাগত গোয়েন্দাদের মুখোস খুলে দেওয়া, আমলাতান্ত্রিক মনোভাবকে বিদ্রূপ করা, ইত্যাদি। সমস্ত কাজের মধ্যেই সোভিয়েট সংবাদ-পত্রের একটি মাত্র

উদ্দেশ্য থাকে,—শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করা—যেখানে শ্রমের শক্তি উৎপাদন এত বেশী হবে যে "প্রত্যেকের কাছ থেকে ক্ষমতা অনুযায়ী নেওয়া, আর প্রত্যেককে প্রয়োজন মত দেওয়া"—এই নীতিটি কার্য্যকরী করা সম্ভবপর হবে—অর্থাৎ সাম্যবাদী সমাজ গঠনে, শ্রেষ্ঠ মানব-মনের স্বপ্ন-কল্পনাকে সফল করা সম্ভব হবে।

জনসাধারণের সঙ্গে সোভিয়েট সংবাদপত্রগুলি ঘনিষ্ঠতম সংযোগ বজায় রাখতে চেষ্টা করে। শিক্ষিত সাংবাদিক-বাহিনী ছাড়াও, সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রকাশিত ৮,৫৫০টি সংবাদপত্র, ৩ লক্ষেরও অধিক ফ্যাক্টরী ও গ্রাম্য সংবাদদাতার কাছ হতে সাহায্য পায়।

কলকারখানা ও গ্রামের সংবাদদাতারা বিশেষ ধরণের সোভিয়েট রিপোর্টার। তাঁরা স্বেচ্ছায় সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখার ভার নেন; যে সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে তাঁরা কাজ করেন, অথবা যে সমস্ত কৃষি-সমবায়-প্রতিষ্ঠানের তাঁরা সভ্য; সেগুলির কাজ, ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে এঁরা সাধারণতঃ প্রবন্ধ লেখেন সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য্য সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তাঁরা সাধারণ আলোচনার উত্থাপন করেন, কোথায় ভাল কাজ হোলে সে সম্বন্ধে জনসাধারণকে জানান, এবং অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে অথবা রাষ্ট্রীয় বিভাগে যেখানে যেখানে কাজে ত্রুটি রয়েছে সেদিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সোভিয়েট সংবাদপত্রের যে কোন সংখ্যায় শ্রমিক, কর্ম্মচারী, শিক্ষক, সমবায়-কৃষক ও অন্যান্য উৎসাহী নাগরিকের স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ ও সংবাদ সমালোচনা দেখা যাবে, সেগুলিতে অর্থ নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের কোন বিভাগের কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতির তাঁরা সমালোচনা করেছেন। আবার কখনও বা দেখা যাবে, কোন ভূতত্ত্ববিদ্ কোন নূতন খনিজ ধাতু আবিষ্কারের কথা লিখেছেন, অথবা কারখানার কোন ইঞ্জিনিয়ার কাজের উন্নতির জন্য আহ্বান জানিয়ে, অথবা নূতন একটি শিল্প-বিভাগের সংগঠনের কথা জানিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন, অথবা একজন উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ নূতন এক ধরণের উদ্ভিদ্ সৃষ্টির কথা জানিয়ে এক চিঠি লিখেছেন।

কারখানার শ্রমিক, কৃষি-সমবায় প্রতিষ্ঠানের কৃষক, ও বুদ্ধিজীবিদের লেখা এই রকম চিঠি, সংবাদ ও প্রবন্ধ হাজার হাজার সোভিয়েট সংবাদপত্রের অফিসে দিনের মধ্যে অনেক বার, এমন কি প্রতি ঘণ্টায়ই এসে পৌঁছায়। সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র "প্রাভদা" পত্রিকার অফিসে প্রতিদিন এই রকম প্রায় ৮০০ চিঠি আসে। বিভিন্ন গণতন্ত্রের মিলিত শিক্ষা-দপ্তর ও শিক্ষকদের ট্রেড ইউনিয়নের মুখপত্র "উচিটেলস্কাইয়া গেজেটা"তে পাঠকগণ মাসে ৪,৫০০ থেকে ৫,০০০ চিঠি পাঠায়। সম্পাদকীয় বিভাগ থেকে এই চিঠিগুলির প্রতি আশু মনোযোগ দেওয়া হয়। অনেক চিঠিই প্রকাশের ব্যবস্থা হয়, কিন্তু স্থানের অভাবে সমস্ত চিঠি প্রকাশিত করা সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রত্যেক চিঠি সম্বন্ধেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়—সে চিঠি প্রকাশিত হোক বা নাই হোক,—ন্যায়সঙ্গত দাবী মেটাবার জন্য ও নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রচলন করার জন্য। সংবাদপত্রের মতামত সম্বন্ধে সোভিয়েট সরকার সর্ব্বদাই সজাগ থাকেন, এবং সংবাদপত্রগুলি থেকে যদি কোন রকম সতর্কবাণী করা হয়, তা হলে তখনই সে সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

সোভিয়েট সংবাদপত্রগুলির মূল নীতিগুলির অন্যতম হোল সমালোচনা, তার পাত্র যে-ই হোক্ না কেন। অর্থাৎ, যে কোন ব্যক্তি, যে কোন পদেই তিনি অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন, তাঁর পদমর্য্যাদা যেমনই হোক না কেন, যে কোন অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য তাঁকে মৌখিক অথবা মুদ্রিত সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে। এই রকম সমালোচনা বলশেভিক পার্টি ও সোভিয়েট সরকারকে অসতর্কতা ও অব্যবস্থাকে সকলের সামনে তুলে ধরতে সাহায্য করে, এবং যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সমস্ত রকম দোষ-ত্রুটি সংশোধন করতেও সাহায্য করে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের নাগরিকরা যে-কোন অর্থ নৈতিক বা রাষ্ট্রীয়-সমস্যা সম্পর্কে স্বাধীন ভাবে তাদের মতামত সংবাদপত্রে ব্যক্ত করতে পারে। প্রয়োজন হোলে কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ কিংবা শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে তারা কৈফিয়ৎ দাবী করতে পারে। যেমন দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলিতে এমন অনেক চিঠি প্রকাশিত করা হয়েছে, যাতে কোন নাগরিক বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পিপলস্ কমিসারকে এমন কি বৈদেশিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পিপলস্ কমিসারকে কোন সমস্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছে। এবং এই সমস্ত চিঠিরই সম্পূর্ণ জবাব এসেছে, সে-ও সংবাদপত্র মারফৎ।

শ্রমিক সংবাদদাতারা আমলাতান্ত্রিক মনোভাব, সমাজতান্ত্রিক শ্রম-শৃঙ্খলা লঙ্ঘন, মজুরী দেওয়া সম্বন্ধে অনিয়মতা এবং উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যান্য বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে অবিরত প্রচণ্ড সংগ্রাম চালিয়ে থাকে।

সোভিয়েট সংবাদপত্র পাঠকদের সঙ্গে নানা ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে। বহুসংখ্যক চিঠিপত্রের মারফৎ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য এবং মতামতের আদান-প্রদানের জন্য পাঠক-গোষ্ঠীর সঙ্গে সাংবাদিকদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। যেমন দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের ভারপ্রাপ্ত বিভাগের মুখপত্র "যন্ত্রোৎপাদন শিল্প" পত্রিকা ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের কারখানার ইঞ্জিনিয়ার ও ষ্টাখানোভপন্থী শ্রমিকদের মধ্যে এক আলোচনা-সভার ব্যবস্থা করে। এই পত্রিকার শত শত পাঠক সম্পাদকমণ্ডলীর সাথে কুইবিশেভের বৃহত্তম যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের কারখানার লব্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করেছিল নতুন যন্ত্রোৎপাদন পদ্ধতি আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে। এই পত্রিকা নতুন যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রচারের জন্য যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল, পাঠকরা সে সম্বন্ধে সম্পাদক-মণ্ডলীকে পরামর্শ দিয়েছিল।

১৯৩৮-৩৯ সালের স্কুলের নতুন বৎসর সুরু হওয়ার পূর্ব্বে শিক্ষা-সংক্রান্ত পত্রিকা 'উচিটেলস্কাইয়া গেজেটা' ইউ, এস, এস, আর-এর সুপ্রিম সোভিয়েটের শিক্ষক সভ্যদের এক বৈঠক আহ্বান করেছিল। এই সভায় অরুশীয় জাতিগুলির গণতন্ত্র থেকে—জর্জিয়া কাজাকস্থান, আর্ম্মেনিয়া থেকে শিক্ষক প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে সম্মিলিত শ্রেষ্ঠ শিক্ষকরা শিক্ষার উন্নতির জন্য বাস্তব পরিকল্পনা গঠন করলেন। এই পত্রিকার সম্পাদকেরা এই বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী পরিকল্পনা কার্য্যকরী করে তুলবার জন্য প্রচার সুরু করেছিলেন।

স্কুলের বৎসরের প্রথম পর্য্যায় কেটে যাওয়ার পর এই পত্রিকা বিভিন্ন স্কুল ও জনশিক্ষার প্রতিষ্ঠান এই সময়ের মধ্যে কিরূপ অগ্রসর

হয়েছে বিচার করবার জন্ত আর এক দল পাঠককে তাদের সম্পাদকীয় অফিসে নিমন্ত্রণ করল, এরা হোলেন গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক। এই সম্পাদক-মণ্ডলী ও পাঠকদের সভায় ইউ, এস, এস, আর-এর সুপ্রিম সোভিয়েটের সভাপতি এম্, আই, কালিনিন যোগ দিয়েছিলেন ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

সংবাদপত্রগুলির প্রধান সম্পাদক ও অন্যান্ত সম্পাদকেরাও প্রত্যহ দর্শনপ্রার্থীদের সাথে আলাপ করেন এবং মনোযোগ সহকারে তাঁদের বক্তব্য শোনেন। এই ভাবে সংবাদপত্রগুলির সাথে জনসাধারণের সম্পর্ক প্রসারিত হয়। প্রাভদা পত্রিকার সম্পাদকীয় অফিসে প্রতি বৎসর ১৭০০০ থেকে ১৮০০০ হাজার পাঠক দেখা করতে আসে। 'ইজভেষ্টিয়া' কাগজে বৎসরে দর্শনপ্রার্থীর সংখ্যা প্রায় ১২০০০।

প্রত্যেক সোভিয়েট সংবাদপত্রই পাঠকদের বৈঠক আহ্বান করেন এবং সেখানে সম্পাদকেরা নিজেদের কাজের বর্ণনা দেন। ১৯৩৮ সালে সরকারী কৃষি-দপ্তরের মুখপত্র "সমাজতান্ত্রিক কৃষি" পত্রিকার আহূত বৈঠকে ৮০০ পাঠক যোগ দিয়েছিলেন। এই বৎসর "মস্কো বলশেভিক" পত্রিকার সম্পাদক ২০০০ পাঠকের কাছে সংবাদপত্রের কাজ সম্বন্ধে বিবরণী দেন।

এই ভাবে সংবাদপত্র ও পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে নিকট-সম্বন্ধ গড়ে উঠে এবং সংবাদপত্রগুলি প্রকৃত ভাবে জনসাধারণের সেবক হিসাবে দাঁড়াতে পারে এবং প্রত্যেক সমস্যা নিয়ে জোরালো ভাবে আন্দোলন করতে পারে।

যে সময় বনেদী ব্যবস্থার রক্ষকদের বিরুদ্ধে পথে পথে লড়াই চলেছিল, সেই যুগে সোভিয়েট সংবাদপত্রগুলির জন্ম হয়। সে সময় সোভিয়েট সংবাদপত্রগুলি চাষী-মজুরদের সোভিয়েট গণতন্ত্রের দেশীয় ও বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বোধিত করে, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্যগুলি জনসাধারণের কাছে প্রচার করে এবং দলত্যাগী, স্বার্থান্বেষী ও মুনাফাখোরদের তীব্র নিন্দাবাদ করে।

গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, সোভিয়েট সংবাদপত্রগুলি অন্যান্ত সমস্যা নিয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা সুরু করে। জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রশ্ন ছাড়াও তারা দেশের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে।

ইউ এস্ এস্ আর-এ লেনিনের নির্দ্দেশানুযায়ী সংবাদপত্রের কাজ হোল মতবাদ প্রচার করা, জনগণকে উদ্বোধিত করা ও সংগঠন করা।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যুগে, ষ্টালিন নতুন শিল্প যন্ত্রপাতি ও নতুন যন্ত্রবিজ্ঞান আয়ত্ত করার জন্ত যে শ্লোগান দিয়েছিলেন, সেগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। সোভিয়েট সংবাদপত্রগুলি সাগ্রহে এই শ্লোগানগুলি প্রচারের ভার নেয়। 'প্রাভদা', 'ইজভেষ্টিয়া' ও 'ইণ্ডাষ্ট্রিয়া' পত্রিকার সংবাদদাতারা দলবদ্ধ ভাবে বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কাজ ক'রে এই শ্লোগানগুলি ফলপ্রসূ ক'রে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

ষ্টাখানোভের উৎপাদন বৃদ্ধি আন্দোলনেও সোভিয়েট সংবাদপত্রগুলি যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

উৎপাদনবৃদ্ধি আন্দোলনের নায়ক বিখ্যাত কয়লাখনির মজুর এলেক্সী ষ্টাখানোভ লিখেছিলেন—"আমার মনে আছে, সংবাদপত্র সমূহে আমার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সংবাদ প্রচারিত হ'তে দেখে আমি আরো অধিক উৎপাদন বর্দ্ধন প্রচেষ্টায় উৎসাহিত হয়েছিলাম। আমার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান অন্যান্ত খনিতে আমার সহকর্মীদের কাছে প্রচার করবার জন্ত সংবাদপত্র সমূহের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এর ফলে ডোনেৎস ভূমির কয়লা খনিগুলিতে দৈনিক উৎপাদন ১৪০-১৫০ হাজার টন থেকে ২০০ হাজার টনে বৃদ্ধি পায়।"

সোভিয়েট নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে সংবাদপত্র অত্যাবশ্যকীয় বস্তু। সর্ব্বত্রই সংবাদপত্রের প্রচার—ককেসাসের গ্রামে, উজবেক পল্লীতে, পামীরের পার্ব্বত্য লোকালয়ে, সুদূর উত্তর মেরু-প্রান্তে। কারখানা, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ, লাল ফৌজের বাহিনী সমূহ, থিয়েটার, খনি, সাবমেরিণ—সকল কেন্দ্র থেকে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পী, অভিনেতা, রুটী প্রস্তুতকার, স্থপতি, ডুবুরী, লেখক, নাবিক, বিমানচালক, ছাপাখানার কর্ম্মী, ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী, কয়লা খনির শ্রমিক—সকলেরই নিয়মিত প্রকাশিত সংবাদপত্র আছে।

পর্ব্বত-ভূমিতে, বালুকাময় মরুভূমিতে, চিরন্তন তুষারময় দেশে, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে—যেখানেই শ্রমিকের কর্ম্মচঞ্চলতা সুরু হয়েছে, সেখানেই গঠনশীল নগরগুলির নাগরিকদের জন্ত চলমান সংবাদপত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

লাল ফৌজের 'প্রথম লাল পতাকা বাহিনী'কে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করার কাজে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল, ১৯৩৮ সালে যখন যুদ্ধ ক'রে তারা জাপানীদের দেশের সীমান্ত থেকে হটিয়ে দিচ্ছিল, সে সময় তাদের মুখপত্র হাসান হ্রদ অঞ্চল থেকে 'আমাদের মাতৃভূমির রক্ষার জন্ত' নামে পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ঠিক যুদ্ধে যাবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে লাল ফৌজের লোকেরা "আক্রমণ" শীর্ষক তাদের দেয়াল-পত্রিকার এক বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করে।

ষ্টালিন বলেছেন—"সংবাদপত্র হচ্ছে একমাত্র অবলম্বন যার সাহায্যে পার্টি প্রত্যহ ও প্রতি ঘণ্টায় শ্রমিকদের কাছে নিজ ভাষায় যোগাযোগ রাখতে পারে।"

কমুনিষ্ট পার্টি ও সোভিয়েট সরকার এই প্রচারযন্ত্রকে দেশের ও নাগরিকদের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। সংবাদপত্রের মারফৎ সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ইউ, এস, এস, আর-এর গঠনতন্ত্রের খসড়া দেশের মধ্যে ব্যাপক আলোচনার জন্ত প্রচারিত করেন সরকারী গঠনতন্ত্র কমিশন সংবাদপত্রের প্রকাশিত নাগরিকদের প্রত্যেকটি সংশোধনী প্রস্তাব অধ্যয়ন করেন। কমিশনের সভাপতিরূপে ষ্টালিন নিখিল রুশীয় সোভিয়েট কংগ্রেসে তাঁর রিপোর্টে এই সংশোধনী প্রস্তাবগুলি আলোচনা করেন। কংগ্রেস এর মধ্যে কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সেগুলিকে ইউ, এস এস, আর-এর গঠনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৩৮ ও ১৯৩৮ সালে দেশব্যাপী উদ্দীপনাময় প্রচার-কার্য্যের মধ্য দিয়ে ইউ, এস্, এস্, আর-এর সুপ্রিম সোভিয়েট ও যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত গণতন্ত্রগুলির সুপ্রিম সোভিয়েটের নির্ব্বাচন হয়েছিল। কমুনিষ্ট পার্টি ও অদলীয় ব্লকের যুক্ত মনোনীত প্রার্থীদের জন্ত প্রচার-কার্য্যে সোভিয়েট সংবাদপত্র সমূহ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিল। সংবাদপত্রগুলিতে সাধারণ নাগরিকদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত প্রার্থীদের জীবনকাহিনী ও কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

'ধাতু-শিল্পের অগ্রণী কর্ম্মী' নামে এক ফ্যাক্টরীর সংবাদপত্রে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম সোভিয়েটের নির্ব্বাচনপ্রার্থী ডাক্তার অধ্যাপক মিথে'র নির্ব্বাচনী বক্তৃতা, ও কমরেড পেট্রাকোভা নামে এক মহিলা—যাঁর জীবন ডাক্তার মিথ একবার রক্ষা করেছিলেন, তাঁর চিঠি এক সাথে পাশাপাশি স্তম্ভে প্রকাশিত হোল। পেট্রাকোভা তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন—অধ্যাপক মিথ তাঁর দেশবাসীকে ভালবাসেন এবং নিজের কর্ত্তব্যকেও তিনি ভালবাসেন আর নিজের কাজ তিনি ভাল ভাবেই জানেন। এক জন প্রার্থীর পক্ষে এর চেয়ে আর বড় সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই।

কাগানোভিচ, বল-বেয়ারিং কারখানার মুখপত্র "সোভিয়েট বল-বেয়ারিং" সেই কারখানার ভূতপূর্ব্ব শ্রমিক যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রিম সোভিয়েটের নির্ব্বাচনপ্রার্থী কমরেড পিচুগিনার সমর্থনে এক কৌতূহলপ্রদ বিবরণী প্রকাশ করেছিল। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে সোভিয়েটের বহু শ্রমিকের মত কমরেড পিচুগিনা দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কারখানা নির্ম্মাণের সময় তিনি শিক্ষানবীশ কারিগর হিসাবে ঢুকেছিলেন, তার পর অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ দক্ষতা অর্জ্জন করেন। তিনিই প্রথম সোভিয়েট বল-বেয়ারিং যোজনা করেন। তিনি নাগরিক হিসাবেও খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন, মস্কোর একটি অঞ্চলের সোভিয়েটের তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। এই প্রকৃত জন-প্রতিনিধি নারীর নির্ব্বাচন সমর্থন করতে গিয়ে সংবাদপত্রটি দেখাল কমরেড পিচুগিনার জীবনের সাথে অন্যান্য বহু প্রতিভাদীপ্ত জীবনের সাদৃশ্য রয়েছে, যারা জারের আমলে অবজ্ঞাত হয়ে পড়েছিল এবং সোভিয়েট-ব্যবস্থায় যাদের প্রতিভা ফলপ্রসূ হয়ে উঠে। সাধারণ শ্রমিক, ফোরম্যান, ইঞ্জিনিয়ার ও গৃহিণীরা—যারা সাধারণের কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর সাথে পরিচিত হয়েছেন এবং তাঁর গ্রামের যৌথ কৃষিকর্ম্মের চাষীরা তাঁর সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ ও ব্যক্তিগত কাহিনী ফ্যাক্টরী পত্রিকাগুলিতে লিখেছিলেন। তাদের লেখা প্রত্যেকটি লাইন সরল ভাবে লেখা, সত্য কাহিনী। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়াও সংবাদপত্রে ব্যাপক ভাবে আলোচিত হয়।

উৎপাদন ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানে বা শিল্পে কোন গুরুত্বপূর্ণ নতুন প্রচেষ্টা হোলেই তা সংবাদপত্রে আলোচিত হয়। উৎপাদনে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী ষ্টাখানোভপন্থী শ্রমিকদের কথা সংবাদপত্রে প্রায়ই প্রকাশিত হয়। তাদের কাজের প্রণালী বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হয়, যাতে অন্যেরা তাদের পথ অনুসরণ করতে পারে।

সংবাদপত্রে সাধারণতঃ কৃষির কাজ, কয়লা উৎপাদন, লোহা, ইস্পাত ও মোটর গাড়ী উৎপাদন ইত্যাদির দৈনিক হিসাব প্রকাশিত হয়। সোভিয়েট পাঠক সম্প্রদায় গভীর আগ্রহের সঙ্গে এই তথ্য অধ্যয়ন করে, কারণ, ইস্পাত, শস্য, কয়লা ও যন্ত্রপাতি —এইগুলিই তাদের জাতীয় ধন এবং তাদের জাতীয় শক্তির উৎস।

সমাজতন্ত্রের দেশে সোভিয়েট সংবাদপত্র আর্থিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক উন্নতির সকল ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে। দেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা সংবাদপত্রেও সাহিত্য-সৃষ্টিতে নিযুক্ত রয়েছেন।

বার্ত্তাজীবীরা ও এই সব মনীষীরা সোভিয়েট পাঠক-সমাজের কাছে শ্রদ্ধা পান। বহু সোভিয়েট সাংবাদিক তাঁর পাঠকদের সাথে চিঠিপত্রে ভাবের আদান-প্রদান করেন। জনসাধারণ তাঁদের জানে, বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে তাঁদের কাছে আসে, তাঁদের পরামর্শ ও সাহায্য চায়। এই ভাবে লেখক ও পাঠকের মধ্যে নিকট-সম্বন্ধ গড়ে উঠে।

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ সাংবাদিকদের কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। কিছু দিন আগে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রিম সোভিয়েটের সভাপতিরা ১১২ জন লেখককে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করেছেন। কয়েক জন শ্রেষ্ঠ লেখক আলেক্সি টলষ্টয়, মিখাইল সোলোকভ সুপ্রিম সোভিয়েটের সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

এই থেকে আমরা বুঝতে পারি, রুশিয়ার জীবনে সংবাদপত্র বিরাট অংশ গ্রহণ করেছে এবং সাংবাদিকরা দেশের জনসাধারণের মধ্যে কিরূপ সমাদর লাভ করেছেন।



বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের অন্তর্ধান বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রকে যে অনেকটা নিষ্প্রভ করেছে সন্দেহ নেই। সাধারণের রসপিপাসা'ও এ ক'টি বছরে কি ভাবে শীর্ণ হয়েছে তাও বার বার লক্ষ্য করতে হয়; কারণ, শরৎচন্দ্রের দানকে যথার্থ ভাবে কেউ সৌন্দর্য্যের যথার্থ কষ্টিপাথরে যাচাই করেছে কি না সন্দেহ। এই ঔপন্যাসিকের সমসাময়িক যুগ বহু প্রলয়ঙ্কর ঘটনায় পরিপূর্ণ ছিল। যা কখনও কেউ চিন্তা করেনি তা এ সময় অবলীলাক্রমে ঘটেছিল—এ সব ছিল অপ্রত্যাশিত এমন কি অভূতপূর্ব্ব। এই পৃষ্ঠপটকে অবহেলা করে' শরৎচন্দ্রের রচনা আলোচনা করতে যাওয়া বৃথা। শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব বাংলার যুগধর্ম্মের সহিত তাল রক্ষা করে' অগ্রসর হয়েছিল। এ কাজে সাহিত্যিকের আরণ্য সরলতা প্রচুর ভাবে সহায় হয়।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে একটা প্রলয়ঙ্কর ঘটনা। শুধু রাজনৈতিক বাদ-প্রতিবাদরূপে এই রাষ্ট্রদাবানল পর্য্যবসিত হয়নি। নেতৃদের প্রত্যক্ষ আঘাত সহ্য করা ইংরাজের অনুচর হতে এবং স্মিতমুখে কারাবরণ একটা নবযুগের সিংহদ্বার খুলে দেয়। এই আন্দোলনের পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আরও গুরুতর ব্যাপার সংঘটিত হয়। বস্তুতঃ যথার্থ স্বাধীনতার আন্দোলন এই সময়েই সূত্রপাত হয়। এই আন্দোলনের ইন্ধন জোগাতে হয় বাংলা সাহিত্যকে। বাংলা সাহিত্য এ ক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌পদ হয়নি—পূর্ব্বতন যুগের সমস্ত ভব্যতা, আয়েস ও রসসাধনাকে ক্ষণিকের জন্য সরে পড়তে হল। এল, রুদ্রসাধনার উন্মুখ স্তর! 'যুগান্তর' কাগজের নির্ভীক বিচার ও তর্ক সমর্থিত হল ত্যাগের জ্বলন্ত আহুতিতে। ভারতের নব্য ইতিহাসে এ সব ছিল অভিনব দৃশ্য। পাড়াগাঁয়ের কবিদেরও জ্বালাপূর্ণ গান সব দিক হতে শোনা গেল। কাব্যগুরু রবীন্দ্রনাথও এ সময় বহু সঙ্গীত রচনা করে' এ সময়কার মুক্তিকামী জনতার জীবনযজ্ঞে প্রেরণা সঞ্চার করেন।

এই যে বিপর্য্যয় সমাজকে একেবারে অজানা ভবিষ্যতের জ্বালামুখী শ্রীতে অভিষিক্ত করল তাতে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রই যে শুধু হিল্লোলিত হল তা' নয়। সমাজ-পাদপের এক দিকের শিকড় উন্মূলিত হলে অন্য দিকে যে অটুট থাকে তা নয়। যখন প্রলয় আসে তখন সমগ্র আত্মার নিবেদনকে অর্ঘ্যরূপে উপস্থিত করতে হয়। ফলে এর প্রভাবে সমাজের বাঁধনও অনেকটা টুটে গেল—পারিবারিক বন্ধনকে ত 'অগ্নয়ে স্বাহা' বলে বহু পূর্ব্বেই ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়। বহু যুবককে মাতৃক্রোড় হ'তে ছিন্ন হয়ে রাজনৈতিক যূপকাষ্ঠের দিকে ছুটে আসতে হয়। ইংরাজের কারাগার শতাব্দী পূর্ব্বের সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে এ রকম ভাবে আদর্শলুব্ধ তরুণদের দ্বারা আর কখনও পূর্ণ হয়নি। এই ছাড়াছাড়ি ও তোলপাড়ে সমাজের কঠিন নানা শৃঙ্খলও নানা ভাবে ও নানা দিকে শিথিল হয়ে পড়ে।

বস্তুতঃ বাংলা দেশ এ সময় একটা ভূমার স্পর্শে মহীয়ান্ হয়ে ওঠে। পূর্ব্বতন যুগের রামমোহন, রাজনারায়ণ ও বঙ্কিমের বিরাট স্বপ্ন যেন শরীরী হয়ে বাংলা দেশকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। সমগ্র এসিয়ার ইতিহাসে বাংলা দেশের এ যুগের এই আগ্নেয় বিস্ফোরণ একটা অবিনশ্বর স্থান লাভ করবে সন্দেহ নেই।

বাংলার এই বিরাট আন্দোলনের পশ্চাতে শতাব্দীব্যাপী বহু সাধনা ও ত্যাগের ইতিহাস খুবই স্পষ্ট। এ ক্ষেত্রে বাংলা দেশের সহায়ক হয়েছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। মাইকেলের অমিল ছন্দ সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রকাশ করেছিল বাঙালী জাতির নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, নূতন উপলব্ধি ও সৃষ্টিস্পৃহা। এমনি করে' প্রতি যুগেই নূতন ভাবের তীরে এসে বাঙালী নিজের প্রসার ও পরিধি বাড়িয়েছে বহু নোঙর ছিঁড়ে। এ পথে বাঙালীর প্রধান আয়ুধ বেগবান সাহিত্য।

কাজেই এ সাহিত্যের ধারাকে লক্ষ্য করতে হয় যুগ-যুগান্তরের বিগলিত কারুতা ও ঐশ্বর্য্যের মাঝে। যে সত্য ও সাধনার বাহন হয়ে এ সাহিত্য আজ গঙ্গোত্রী হ'তে বাঙালীর শঙ্খধ্বনিতে নেবে এসে দুকূলকে উর্ব্বর করে কঠিন মর্ম্মরের বহু বাধা চূর্ণ করতে উৎসাহিত হয়েছে তারও স্বরূপ-নির্ণয় প্রয়োজন।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য আলোচনায় এ সব প্রসঙ্গ মোটেই অবান্তর নয়। শরৎচন্দ্র এ দেশে আকস্মিক ভাবে উল্কাখণ্ডের মত এসে পড়েননি। পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সমসাময়িক অন্যান্য রসসাহিত্যিকদের সহিত অন্তরঙ্গ সংযোগ খুঁজে বের না করে এ সাহিত্যকে ত্রিশঙ্কুর মত বিচার করা একেবারে ভুল। বস্তুতঃ শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-সাহিত্য এসে পড়েছে অনিবার্য্য ভাবে বাংলার বহুমুখী রসসিঞ্চিত ভাবোদ্যানে। বাংলাই একমাত্র দেশ যেখানে কোন কথাকেই ভীরুর মত ঢাকাচাপা দিয়ে কেউ আত্মপ্রসাদ লাভ করতে এ যুগে চায়নি। বাংলা দেশ নানা দিক দিয়ে বহু নিগড় হ'তে মুক্তিলাভ করে একটা নূতন অধিকার পেয়েছিল যা'তে করে' তা ভারতে সব কথা খুলে বলবার সাহস অর্জ্জন করেছে। রাষ্ট্রনীতিতে যা' সম্ভব হয়েছে পারিবারিক ও সামাজিক চন্দ্রাতপতলেও তা' রাহুগ্রস্ত হয়ে দুর্লক্ষ্য হয়ে পড়েনি।

ইউরোপীয় সভ্যতা ভারতে এসে বাঙালীর সঙ্গে বোঝাপড়া করেছে প্রথম। পলাশী প্রাঙ্গণে আন্ত-র্জাতিক সামাজিকতার প্রথম গঙ্গাযমুনা সঙ্গম হয়েছে কামানের গুরুগর্জ্জনের ভিতর। শত্রুভাবে উপাসনা ঘনিষ্ঠতার সব চেয়ে প্রকৃষ্ট পথ। নেতিমূলক মানসিকতা সাহিত্যেও পূর্ব্বতন রসশিল্পীদের সহিত পরবর্ত্তীর বাঁধন শক্ত করে। এমনি ভাবে নেপথ্যে বাংলা দেশ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে স্বাগত বলেছে। হিরাক্লিটাস (Heraclitus) বলেছিলেন, "সঙ্ঘর্ষ জীবনেরই উৎস"। এ তত্ত্বকে Havelock Ellis বলেছেন, "a conception of harmonious conflict মিলনমূলক বিরোধের ভাব। তিনি বলেন, "opposition is not a hindrance to life, it is the necessary condition of the becoming of life as in planetary and vegetable systems"। বাংলা দেশে ইউরোপীয় সভ্যতা নানা সঙ্কল্প নিয়ে এসে এ জাতিকে এক মুহূর্ত্তের জন্য কখনও বিশ্রাম দেয়নি। মিশনারীরা ফিকির করে' বাংলা অক্ষর ঢালাই করে' ভারতীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে লেখনী প্রয়োগ করতে আরম্ভ করে। সে আদিযুগ হ'তে আজ পর্য্যন্ত কেবলই চলেছে সঙ্ঘর্ষ, কারণ, বাংলা দেশেই ইংরাজী

সভ্যতা নিজের লাল বেল্লা রচনা করে। ক্রমশঃ তা' বিপ্লব, সমর, হত্যা ও উপহত্যার কেন্দ্রে পরিণত হয়ে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে—হাজার হাজার লোক কারারুদ্ধ, দ্বীপান্তরিত ও হত হয়। এর ভিতরই এসেছে যমুনদীর মত একটা ঘনিষ্ঠতা—স্বাধীনতাকামীর সঙ্গে স্বাধীনতাসেবীর বোঝাপড়া। ফলে বাংলা দেশকে ছিন্নমস্তা হ'তে হয়েছে এবং তা'কে টুক্‌রো টুক্‌রোও করা হয়েছে। অবনত ও পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের হাতে জের ক'রে এর শাসনভার দেওয়া হয়েছে। যীশু'কে ক্রুশবদ্ধ করে ইহুদীরা সাময়িক জয়লাভ করে মাত্র—যীশুতত্ত্ব তা'তে করে বিশ্বময় ছড়ায়। বাঙালীর জীবনও এমনি করে নিঃশব্দে সারা ভারতকে জাগিয়েছে, সারা পৃথিবীতে শ্রদ্ধা অর্জ্জনের অধিকার লাভ করেছে। বাংলার এই আগ্নেয় আবেষ্টনের ভিতর সাহিত্যক্ষেত্রে অনিবার্য্য ভাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্য এক ঝটিকা উপস্থিত করে। সমগ্র বিশ্বে একেও একটা অকল্পনীয় ব্যাপার বলতে হয়। অন্যত্র ঈশ্বর গুপ্তের মত শরৎচন্দ্রকে 'খাটি ও ক্ষুদ্র' বাঙ্গালীর প্রতিনিধি যারা মনে করে তারা বাংলা দেশকে বোঝে না এবং বাঙালীকেও চেনে না। শরৎচন্দ্রের ভিতর বিরাট বাংলার বহুমুখী প্রলয়বীজ মহীরুহত্ব লাভ করেছিল, না হলে এ যুগে এ রকম সাহিত্যসৃষ্টি কোন ঔপন্যাসিকের পক্ষে সম্ভব হ'ত না।

সাহিত্য জাতীয় জীবনেরই প্রতিফলক। সে জীবন বাংলা দেশে কখনওই শিক্ষকতা বা মাষ্টারীর ঘানি এবং কেরাণীগিরির গোষ্পদে শেষ হয়ে যায়নি কিম্বা একান্ত ভাবে পঙ্গু হয়ে সকল আন্দোলনের বাইরে কোন বদখেয়ালের আড্ডা সৃষ্টিতে নিঃশেষ হয়নি। বাংলার জীবনের প্রত্যেক স্তরকেই বিরাটের সঙ্গে যুক্ত হ'তে অশ্রান্ত ধ্যান করতে হয়।

বাংলায় আবির্ভূত বৈষ্ণব দাসতত্ত্ব এক সময় উত্তরোত্তর পাঠানদের পদদলনে ও কলসীর কাণার আঘাত খেয়ে প্রেমদানে উৎসাহিত হয়। এ রকম মনোবৃত্তি হৃদয়কে নিষ্পিষ্ট করে ক্রন্দনের বহু মূর্চ্ছনা সংক্রামিত করেছে সাহিত্যে ও সঙ্গীতে। সৌভাগ্যক্রমে ইংরাজ আমল এরূপ অবকাশ দেয়নি। এ যুগে মুক্তি ও স্বাধীনতার মধ্যাহ্নে বিনা মেঘেও বার বার বজ্রাঘাত এ রকম পদলেহন সম্ভব করেনি। বাংলার কবিরা একদা বাদসাহী তক্তের দুর্ব্বল অধিকারীদেরও অবতার বলে সম্বোধন করেছিল। সে আবহাওয়ায় শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেননি এ জন্য সামাজিক সেই শৃঙ্খলিত শাসনকে আঘাত পেয়েও প্রেমদান করতে কথাশিল্পীরা ও কবিরা অগ্রসর হ'তে পারেনি। শরৎচন্দ্র নূতন শক্তিতত্ত্বের উষ্ণতার ভিতর বর্দ্ধিত হন—দাক্ষভূত বৈষ্ণবাদর্শের নিঃশেষ সমর্পণতত্ত্বের ভিতর নয়। এ কথা শিল্পীর উপন্যাস- সাহিত্য বার বার প্রমাণ করবে।

জন ষ্টুয়ার্ট মিলের আত্মজীবনী পড়ে Bertrand Russel ঈশ্বরে বিশ্বাস হারান। এ যুগে রুষিয়াও এ প্রতীতি হারিয়েছে অতিমাত্রায় সমর্পণ ও আত্মাহুতির প্ররোচক চাবুকের আঘাতে। অবিশ্বাসকে তারাও মাথা পেতে নিয়েছে যারা শৈশব হ'তে বিশ্বাসের ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হয়েছে। এ প্রেরণা কোথাও বা অতিজ্ঞান এবং কোথাও অজ্ঞান হ'তে জাগে। ইউরোপের আধুনিক তত্ত্ব হচ্ছে বুদ্ধিবাদের প্রতিকূলপন্থী। পদদলিত রুষিয়াও এ তত্ত্ব গ্রহণ করেছে একটা বিরাট বিসুভিয়সের আগ্নেয় লাভা উদ্গারের পর। বাংলাদেশ ইউরোপের সহিত ঘনিষ্ঠ হয়েছে প্রত্যক্ষ ভাবে, পাশ্চাত্য সভ্যতাকে যে এ দেশ কতকটা বরণও করেছে তা' অস্বীকার করা বৃথা। এ সভ্যতা কোন উড়ো বা অপ্রাকৃত তত্ত্বের উপর নিহিত নয়। ভারতের ষড়দর্শনে নেতিমূলক তত্ত্বের যথেষ্ট বিচার বহু পূর্ব্বে হয়েছে। বস্তুতঃ সোপেনহাউয়ারের শক্তিবাদের মূলে এ দেশের আত্মবাদের প্রেরণা আছে। নীটস্‌-এর "will to power" ও সোপেনহাউয়ারের তত্ত্ব হ'তেই উপাদান সংগ্রহ করেছে। স্বাধীন গুপ্তযুগের শাক্তধর্ম্ম তন্ত্রোক্ত শক্তিবাদকে ব্রততীর মত অবলম্বন করেই উপচিত ও পুষ্পিত হয়। কাজেই ইউরোপের আধুনিক শক্তিতত্ত্বে এ দেশের পক্ষে অভিনবত্ব কিছু নেই। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে অমৃতকে বরণ এ দেশের পক্ষে হেঁয়ালী নয়।

এ সব কথা উল্লেখ করতে হচ্ছে এ জন্য যে, শরৎচন্দ্রের ভিতর যে তথাকথিত উচ্ছৃঙ্খলতার আবহাওয়া দেখতে পাওয়া যায় তা' একান্ত ভাবে উদ্ভট জিনিষ নয়। জাতির তপস্যাকে বিধাতা বরদান করে' যেদিন সফল করেন, সেদিন আর জাতির পক্ষে পূর্ব্বতন স্খলিত ও গলিত অবস্থার দোহাই দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিরোধের মত সাহিত্যেও আসে কোন জায়গায় বিরোধের ছন্দ—সেটাকে ছন্দ ভেবেই নিতে হয়। স্ফটিকের বা মর্ম্মরের জালি কাজকে বিচিত্র করতে হ'লে তার ভিতর আশ্লেষ ও আঘাতের ছন্দ ফলিত করতে হয়। ইউরোপের মধ্যযুগের গির্জ্জার ভিতরকার অসংখ্য খিলানগুলিকে দেখলে মনে হয় যেন তার ভিতর একটা প্রবল বিরোধের ঝড় বইছে। একে অন্যকে যেন ঠেকিয়ে রাখছে, আহত করছে—সব যেন চঞ্চল—একটা তাণ্ডব যেন নিঃশব্দে মুখর হয়েছে অশ্রান্ত খিলানের অসিক্রীড়ার ভিতর! সৌন্দর্য্য প্রতিফলনে এ রকমের বৈচিত্র্য রচনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অঙ্কের সাহিত্যকেও এ রকম একটা বিচিত্র নক্সার হিসেবে দেখতে হয়। অজন্তার চিত্র যেমন এক যুগের বা এক শিল্পীর রচনা নয়—অনেকের যাদুস্পর্শে তা যেমন কালের সঙ্কীর্ণ সীমানাকে বিদ্রূপ করে' উড়ন্ত গালিচার মত সকলকে চমকিত করে' তেমনি বাংলা সাহিত্যের এই শেষ অঙ্কের রচনায় এসেছে বহুর নিবেদন। জাতির তপস্যা বহুর রচনায় বিগলিত হয়েছে—কোথাও বা তাতে আছে কিংখাবের সূক্ষ্ম সোনালি শ্রী—কোথাও বা ইচ্ছাকৃত অভূষণতার মশুনপ্রয়াস এবং অন্যত্র সুকুমার মসলিনের সহিত তুলনীয় বায়বীয় উচ্ছ্বাসে তা' পূর্ণ। এক দিক হ'তে এ সব বৈচিত্র্যকে মনে হবে বিরোধী ব্যাপারের সঞ্চয় মাত্র অন্য দিক হ'তে এর ভিতর দেখতে পাওয়া যাবে বৈচিত্র্যের ঐক্য; কারণ একটি জাতির অখণ্ড হৃদয়-যমুনা হতেই সাহিত্যের বহুমুখী তরঙ্গভঙ্গ উৎসারিত হয়েছে।

বস্তুতঃ সাহিত্যকে উত্তরোত্তর বিবর্দ্ধমান বিরোধের দিক থেকে দেখা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুকূল নয় তা' ঐতিহাসিকও নয়। Emile Fauget বলেছিলেন: "I defy all laws of literature except that which says that every literary mode is followed by another which succeeds only because it is the contrary of the first" এটা যে শেষ কথা নয় তা' আধুনিক কোন কোন সাহিত্যিকের মতামতে প্রকাশ পায়। কেউ কেউ বলছেন, বিরোধের বীজ

থাকলেও সমাজবিজ্ঞানের দিক দিয়ে আভিজাত্যের দ্যোতক সাহিত্যে প্রকাশ পায় classicism এবং সদ্যজাগ্রত মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া মনোবৃত্তির প্রকাশক হচ্ছে romanticism। প্রাকৃতবাদ মাথা তুলেছে বিজয়ী নব্য বিজ্ঞানের প্রতিভূরূপে। সাহিত্য চায় এ যুগে রসায়ন ও জড়বিজ্ঞানের মত বহিরঙ্গ দিক হতে দুনিয়াকে পরথ করতে। এ সব দৃষ্টিভঙ্গীরই নানা ক্রম মাত্র। সৃষ্টি কোথাও একটা গাঁড়িতে পর্য্যবসিত নয়—তাকে একটা ধারার দিক দিয়েই বিচার করতে হবে। আবার বুর্জোয়া সাহিত্য অবৈজ্ঞানিক হতে প্রস্তুত নয় এ যুগে। অন্য দিকে প্রোলিটারীয়ট স্তরেই যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আবদ্ধ তা'ও নয়।

শরৎ-সাহিত্যকে এ জন্য নিঃসঙ্গ ভাবে বিচারের কোন মানে হয় না। আবার এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের রচনার শিরশ্ছেদেরও কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। এ কথা ভাবতে হবে, যে এ দেশে শীলতাগত (cultural) সকল স্তরই একসঙ্গে ওতঃপ্রোত এবং সকলকে এখানে এক ছাঁচে ঢালা এখনও সম্ভব হয়নি এখানকার দৃষ্টিভঙ্গী exclusive বর্জ্জনশীল বা (negative) নেতিবাদমূলক নয়। এ জন্য ইউরোপের আদর্শে সাহিত্য আলোচনা সব সময় নিরাপদ নয়। প্রাচ্য জীবন ইউরোপের তালে এখনও ষোল আনা চলছে না।

যাঁরা বলেন শরৎচন্দ্রে নব্য আধুনিকতা কেউটের মত মাথা তুলেছে তাঁদের জানা উচিত শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন আধুনিক নয়। শরৎচন্দ্রের ভাবোৎস নব্যতম যুগে নিহিত নয়। বলতে হয় শরৎচন্দ্রের আধুনিকতার শির পক্ককেশে পরিপূর্ণ। তাঁর সাহিত্যও আন্তর্জাতিক সাহিত্যে আধুনিকতা বললে যা বোঝা যায় তা নয়।—আধুনিক এই যন্ত্রযুগের বিশ্বগ্রাসী ভঙ্গীগুলি খুঁজতে হবে শরৎচন্দ্রে নয়—অন্যত্র। বরং রবীন্দ্রনাথে নব্য আধুনিকতার বহু তিলক দীপ্যমান হয়েছে। এক সময় বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী জীবনের সমুজ্জ্বল দীপশিখাগুলিকে জীবন প্রাঙ্গণ হ'তে চয়ন করে এক দীপালী রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রত্যেকটি চরিত্রই বাঙ্গালীর অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়—কিন্তু সে সবকে তিনি সাহিত্যের প্রেক্ষাগৃহে এমন মঞ্চে স্থাপন করেন যেখানে অতিরিক্ত আলোকের বিচ্ছুরিত স্রোতোভঙ্গ এক বিচিত্রতর বর্ণের বহুমুখী সমারোহ, সে সব চরিত্রগুলিকে এক অনির্ব্বচনীয় অলৌকিকতা দান করে। তারা যেন হয়ে পড়ে একটা অবাস্তব ও অদৃষ্ট পুরীর নায়ক-নায়িকা। শিল্পী যখন সৃষ্টি করতে উৎসাহিত হয় তখন যে জিনিষটা যা' আছে তা' বিবৃত করে' তৃপ্তি পায় না—তা যা' হওয়া উচিত তাই সে উপস্থাপিত করে। যা' অর্দ্ধস্ফুট বা অস্ফুট তাকে বিকশিত করার অধিকার সাহিত্যিকের এবং কবির আছে। এটা অত্যুক্তি নয়—এ ক্ষেত্রে কবি নিরঙ্কুশ। বঙ্কিমচন্দ্র এমনি করে' তার রসজগতে যা উপস্থিত করেছেন তা গলিত, ভগ্ন ও ছিন্ন কিছু নয়—তাতে একটা পরিপূর্ণতা আছে। তিনি তাত্ত্বিক ছিলেন এ জন্য তাঁর সৃষ্টি পূর্ণতার জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়। যারা বঙ্কিমের রচনায় ভাবের ভগ্নস্তূপ বা দেহের গলিত অস্ত্র বা পেশী খুঁজে না পেয়ে তাকে প্রকৃত বলতে উৎসাহিত হয় তাদের হাতে না আছে রসের মানদণ্ড, না আছে রূপের কষ্টিপাথর! বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকদের মত কোথাও কোন সমস্যা বা প্রশ্নের ভঙ্গ তোলেননি—কারণ জগতের সৃষ্টি-পর্য্যায় কোন প্রশ্নের উপর সমাহিত নয়; প্রশ্ন ও সংশয় যেখানে শেষ সেখানেই সৃষ্টি আরম্ভ হয়। অন্য দিকে স্থূল দুনিয়ার বর্ণনাও তাঁর মনঃপূত হয়নি—কারণ বিশ্বামিত্রের মত তিনি নিজেই একটা রস-জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের সুদুর্লভ রসকার রবীন্দ্রনাথকেও কোন রকম প্রশ্ন বা সমস্যার অস্থির নাগরদোলায় দুলতে দেখা যায়নি। তাঁর সমস্যা উপস্থাপনের ভঙ্গীতে সমাধানের শতদল বার বার বিকশিত হয়েছে। উপনিষদের আনন্দবাদে ওতঃপ্রোত, রূপরস ধ্বনির বিচিত্র শিঞ্জিতে বর্দ্ধিত রবীন্দ্রনাথ Emile Zolaর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চায়নি। জীবনকে ডাক্তারের অস্ত্রোপচারের মন্দিরে শায়িত করে টুকরো টুকরো করে কেটে আনন্দ পাওয়ার বীভৎস উৎসাহ তাঁর হয়নি। বরং এ কাজটিকে তিনি পর্দ্দার আড়ালে ঢেকেছেন বা স্থলবিশেষে দুর্লক্ষ্যও করেছেন কুৎসিত আবেষ্টন দূর করতে। এটা বাস্তবতার অস্বীকৃতি নয়—দুঃসহ ইতরতাকে দূর করার চেষ্টা মাত্র। রবীন্দ্রনাথের জীবনীকারেরা কোথাও বলেননি যে রবীন্দ্রনাথ নিজেও অনাবৃত দেহে কখনও কারও নিকট দেখা দেননি। এ রকম ব্যাপারকে প্রাচ্য সভ্যতা ও শীলতার তিলক বলে তিনি মনে করেননি। তিনি "অত্যুক্তি" নামক প্রবন্ধে এক জায়গায় বলেছেন যে আমরা কোথাও বা অতিমাত্রায় আবৃত, অন্যত্র অতিমাত্রায় নগ্ন। এর ভিতর তিনি প্রথম শ্রেণীতে পড়েন। কাজেই দুনিয়ার সব কিছু নগ্ন করার আনন্দ বা উৎসাহ তাঁতে সব সময় পাওয়া যাবে না। তার কল্পনা বা অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে যেসঙ্কীর্ণ তা' নয়। তিনি তাঁর উপন্যাসে এমন ঘটনাও বিশ্লেষণ করেছেন যা' ইঙ্গিতে ও আভাসে বাস্তববাদীর গণ্ডীতে এসে পৌঁছেছে, তবে তিনি যা শোভন বলে মনে করেননি তা' সৃষ্টি করতে যাননি। সৃষ্টির মূলে থাকে কল্পনায় লব্ধ সৌন্দর্য্যের খাতির- দুরন্ত বা উন্মনা খামখেয়াল নয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সাহিত্য ভারতবর্ষকে রাহুর মত গ্রাস করতে সুরু করে। ইংরাজী ভাষায় পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হ'তে ইউরোপীয় সাহিত্য সিন্ধবাদের মত সকলের ঘাড়ে চেপে বসে এ যুগে। তাতে করে' ইংরাজী ভাব ও আদর্শে এ দেশে সাহিত্যসৃষ্টির দিকে সকলে অগ্রসর হয়। এটা কিছু অস্বাভাবিক ছিল না। আমাদের সাহিত্যিকদের ভিতর আমরা আবিষ্কার করি স্কটকে, বাইরণকে ও শেলিকে। ইংরাজী সাহিত্যের নূতন নূতন আন্দোলনের তালে এখানকার সাহিত্য সৃষ্টি করতে কেউ দ্বিধা করেনি কারণ ইংরাজীকে বলা হ'য়েছিল রাজভাষা। ইংরাজী সাহিত্যের ভিতর দিয়ে ইউরোপীয় সভ্যতার বাণী এ দেশে পৌঁছে। পরকে আপন করতে যাওয়া জাগ্রত জীবনেরই ধর্ম্ম। উত্তরোত্তর পাশ্চাত্য সভ্যতার আঘাত এ জাতি জেগে উঠে বার বার। যখন সমগ্র ভারত ঘুমে ঘোর তখন বাঙালী যে জেগেছিল এবং ভারতের নেতৃত্বের বোঝা গ্রহণ করেছিল তা বাংলা সাহিত্যই প্রমাণ করে।

ইংরাজী সাহিত্যে স্কটের যুগ বেশী কাল টেকেনি। ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রলয়ঙ্কর ধারাগুলি ক্রমশঃ দ্বৈপায়ন ইংলণ্ডে প্রবেশ করতে থাকে। Samuel Butler, The way of all fleshএ প্রমাণ করতে চান যে পিতৃত্ব হচ্ছে ছেলের ইচ্ছাশক্তি ধ্বংস করার ফিকির, ধর্ম্মের কাজ হচ্ছে কৌশলে শক্তি সংগ্রহ, শিক্ষা হচ্চে একটা প্রবঞ্চনা সমগ্র জাতিকে তা ভ্রান্তমতে গঠিত করে এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান হচ্ছে ঘৃণ্য কাজে মানুষকে নিযুক্ত করার ফন্দি। বার্ণার্ড শ'ও

এই ভাবে পরিবার ও সমাজ-শরীরের ভিতরকার নানা গলদ আবিষ্কার করতে সুরু করে এ সবের দুর্ব্যাখ্যা সুরু করে। এমনি করে' নীতির বন্ধনকে ছিন্ন করার উৎসাহ এবং যা করতে নেই তা করবার দুরন্ত প্রেরণা জাগল। ফলে ভিক্টোরীয় যুগের শালীনতা ও সংযম উপহাসের বিষয় হল। এ সব সম্ভব হয়েছিল একটা নব্য বাস্তববাদের খাতিরে। এ বাস্তববাদ যা' অবগুণ্ঠিত তাকে নগ্ন করতে উৎসাহিত হল। মনোরাজ্যের হেরফেরের ভিতর লুকোন ভাবগুলোকে অতি মাত্র জোর করে' সকলের সামনে উপস্থিত করার চেষ্টা হল। Emile Zola জগতের কদর্য্য দিক ঘেঁটে ভদ্র-সমাজে বণ্টন করতে সুরু করলেন নানা পূতিগন্ধ—সকল সঙ্কোচ ত্যাগ করে'। ফলে অবগুণ্ঠিত এবং অবজ্ঞাত একটা জগৎ আবিষ্কৃত হল সাহিত্যিকদের অশ্রান্ত উৎসাহে। যা কিছু অকথ্য তা' বলা, যা কিছু অশ্লীল—তাকে দৃষ্টিগম্য করা, যা কিছু ইতর তাকে একটা আসন দেওয়া হল এ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রধান কাজ। এমনি করে Emile Zola অবমানসিক রাজ্যে একটা অভিনব পুরী আবিষ্কার করে। ঔপন্যাসিকের নিপুণ রচনা-কৌশলে এ রাজ্য সাহিত্যে একটা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অন্য দিকে পারিবারিক জগতে নানা সমস্যা আহরণ করতে সুরু করে ইবসেন (Ibsen) ও ইউরোপে ভাবের একটা নূতন বিপ্লবিপ্লবকে উন্মুক্ত করে।

বাংলা দেশে এই সুপ্ত জগতের বার্ত্তা এসে ক্রমশঃ পৌঁছে। অশ্লীল ও কুৎসিত বলে যা' এত কাল পরিচিত ছিল তার এত কদর দেখে গোড়াতে সকলে অবাক্ হয়। ধীরে ধীরে এ জগতের বাজার-দরও চড়তে লাগল। ইউরোপ বিরোধের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে অভ্যস্ত। রাষ্ট্রক্ষেত্রে শ্রমিকরাও Marxএর ভিতর দিয়ে প্রমাণ করলে যে কতগুলি ধনী নিম্নশ্রেণীর উপর ভয়ানক একটা অত্যাচার করছে। সব সম্পত্তির মানে হল চোরাই মাল—কারণ "Property is theft!" এমনি করে ভাবের নূতন বিপর্য্যয় দেখা দিল ইউরোপের সমাজ-জীবনে। এই ভাবক্ষণে যৌনতত্ত্ব ও যৌন-প্রশ্নও বাদ পড়েনি। কবি Kurt Pinthus তাই বর্ব্বর সরলতার সহিত বল্লেন: "Sex throws its last veil in these anthologies

All men are the saviours!"

যৌনতত্ত্বের আবরণ ও হেরফের এই বিপ্লবে ক্রমশঃ আলোচিত হ'তে লাগল সাহিত্যে।

এ দেশেও এই রকমের একটা ঢেউ ক্রমশঃ গভীর ও ব্যাপক হতে থাকে। এক দিকে নব্য সমাজবাদের ডাক অন্য দিকে সমাজের নিম্নস্তরের প্রতি সহানুভূতি ও আকর্ষণ এবং যা কিছু নিন্দনীয় তার শিরেই প্রশংসার মুকুট পরাবার উৎসাহ ক্রমশঃ এ দেশকেও ব্যাকুল করে তোলে। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই এই রকম মনোভঙ্গীর সুপ্রকাশ সাহিত্যে সম্ভব হয়। এখানকার সামাজিক জগতের ভিতরও অনেক ব্যাপার আছে যা ইউরোপীয় ঘটনাগুলি অপেক্ষা অধিক চাঞ্চল্যকর। দেশ উদ্গ্রীব হয়ে উঠে এই শ্রেণীর সাহিত্যের একটা আবির্ভাবের জন্য। বঙ্কিমচন্দ্র এ রকম সৃষ্টি কল্পনা করাও দুঃসহ—রবীন্দ্রনাথ এ কাজে অগ্রসর হ'তে প্রস্তুত ছিলেন না। প্রাচ্য সমাজের ভব্যতা ও সংযম ধ্বংস করার উৎসাহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে সম্ভব হয়নি। অসাধারণ ক্ষমতা সত্ত্বেও এ কাজে তিনি অগ্রসর হননি। এটা তাঁর প্রকৃতির অনুকূল ছিল না।

এ দেশে এ জগৎ উদ্ঘাটনের জন্য লেখক পাওয়া যেতে পারে এক সময় এ ভরসা করাই কঠিন ছিল। ইউরোপে নাগরিক সভ্যতার গলিত ও পূতিগন্ধপূর্ণ অলি-গলির খবর যোগাবার লোকের অভাব কোন কালে ছিল না। এ দেশে পতিত ও উচ্ছৃঙ্খল জগতের দুরন্ত একটা সাহিত্যশ্রী উদ্ঘাটনের সাধনা সহজ ছিল না। শরৎচন্দ্রই এ কাজে হাত দিয়ে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করেছেন! এই ঔপন্যাসিক অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের এই অপূর্ণ ক্ষেত্রকে রস-সমাবেশে পূর্ণ ক'রেছেন। তাতে তাঁকে নিন্দা সহ্য করতে হয়েছে সামান্য নয় এবং তাঁকে কোথাও বা অপাংক্তেয়ও করা হয়েছে। কিন্তু এই রসশিল্পী সহাস্যে এ কাজে কণ্টক-মুকুট বরণ করতেও এক সময় ইতস্ততঃ করেননি।

শরৎচন্দ্রের পিতার বংশ ও কুলমর্য্যাদার কথা জীবনীকারেরা বর্ণনা করেছেন। এ সবকে তুচ্ছ করে' অগ্রসর হওয়া কম সাহসের কাজ হয়নি। উচ্চশিক্ষার ভদ্রজনোচিত বাধা তিনি কখনও অনুভব করেননি। জীবনীকার বলেন, তিনি এফ এ পর্য্যন্ত পাঠ করেন তেজনারায়ণ জুবলী কলেজে। এর ভিতর কোন মার্জ্জিত জ্ঞান পাওয়া সম্ভব ছিল না। তার পর তিনি এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি ক'রছেন এবং কেরাণী-জীবনের স্বাদ গ্রহণ করে তৃপ্তি লাভ করেছেন। এ অবস্থায় অতি সাধারণ স্তরের জীবনযাত্রার সহিত তিনি সহজে পরিচিত হন এবং এ শ্রেণীর জীবনের শতদলে অপূর্ব্ব রসসম্পুট আস্বাদন করেন।

ইংরেজ আমলের আদিযুগের ডেপুটীরা শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন—তাঁরা এজন্য ছিলেন অভিজাত স্তরের। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রের জগৎ বস্তির পুঞ্জীভূত গ্যাস ও বদ্ধমের সহিত পরিচিত হতে চায়নি। রবীন্দ্রনাথ অট্টালিকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গ্রাম্যজীবন যাপন করেছেন শিলাইদহে ও অন্যত্র—কিন্তু নানা কারণে তাঁর সহিত পরিচিত হলেও সমাজের নিম্নস্তরগুলি তাঁর সহিত ইতর ভাবে ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি। সমাজের সমুজ্জ্বল রঙ্গভূমিতে এ দেশে অভিজাত শ্রেণী এবং বুর্জ্জোয়ারাই অভিনয় করেছে বেশী—নিম্নস্তর তাদের আসন ও আঁধার হয়ে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করেছে।

কিন্তু এ জন্য বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথকে সামান্য মনে করা হাস্যজনক। শরৎচন্দ্রকে বাড়িয়ে তুলতে গিয়ে আলোচকেরা নিজেদের ভারকেন্দ্র ঠিক রাখতে পারেনি। সাহিত্যে বা কাব্যে বিষয়বস্তুর মূল্য গৌণ। নিম্নশ্রেণীর উপরকার আবরণগুলিকে দূরে নিক্ষেপ করাই সাহিত্যে সফলতার তিলক নয়—উচ্ছৃঙ্খল জীবনের জয়গান করলেই রসকৃত্য শেষ হয় না। শরৎচন্দ্রের প্রশস্তি সম্ভব হয়েছে অতি সাধারণ জগতের হেরফেরগুলি উদ্ঘাটন করেছেন বলে'। এ সব সুবোধ্য, এর ভিতর জটিল সমারোহ নেই। তিনি জনপ্রিয় কিন্তু এ রকম জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক এ দেশে নেই এ রকম উক্তি তাঁর পক্ষে একটা বড় সার্টিফিকেট নয়। জনপ্রিয়তা সাহিত্যের বা শিল্পের একমাত্র কষ্টিপাথর নয়। শরৎচন্দ্রের দান অন্য ক্ষেত্রে দেখতে হবে। সমগ্র জাতির প্রচ্ছদপটে—বাঙালী জাতির ইতিহাসে এই শিল্পী এমন একটি অন্তরঙ্গ জগৎ আবিষ্কার করেছেন যা শুধু আরব্যরজনীর

আলাদিনের অঙ্গুরীয়ক সাহায্যে করা সম্ভব ছিল। দুর্দ্ধর্ষ, কঠিন দুর্ব্বার শৈলাচ্ছাদিত এ জগৎকে শরৎচন্দ্র 'সিসেম খোল' বলে' হঠাৎ সকলের সাম্নে বের করেছেন। এ জগতের ভাল-মন্দ বিচারে তিনি এগিয়ে যাননি—শিল্পীর মত এর ভিতরও তাঁকে রং ফলাতে হয়েছে অসামান্য, তবেই এই রূপকার সফল হয়েছেন। বলা প্রয়োজন, এ কার্য্যে তিনি যে পথে গেছেন সে পথ দ্বিতীয় ব্যক্তির নয়।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য কীর্ত্তি বিচারে কতকগুলি অদ্ভুত ও অসংলগ্ন মতবাদ প্রতিষ্ঠার উৎসাহ দেখে অবাক হ'তে হয়। কেউ কেউ তাঁকে 'ঋষি'ত্বে অভিষিক্ত করতে অগ্রসর হয়েছে। বঙ্কিমও যখন ঋষি, রবীন্দ্রনাথও ঋষি, তখন শরৎচন্দ্রই বা ঋষি হবেন না কেন? শরৎচন্দ্রের জীবনে ঋষিত্বের কোন রন্ধ্র খুঁজে পাওয়া কঠিন অথচ যে স্তর নিয়ে শরৎচন্দ্র নাড়াচাড়া করেছেন সে স্তরকে মহিমা দিতে হলে কারও মতে তাঁকে ঋষি ত বলতেই হবে। কামিনী-কাঞ্চনে ভরপুর রাজ্যে আনাগোনা করে এবং সে রাজ্যের সকল গবাক্ষ ও ঝরোকা খুলে সব সময় তিনি নিজের ঋষিত্ব বজায় রাখতে পেরেছেন কি না সন্দেহ। কঠিন ত্যাগ তাঁকে করতে হয়েছে এ হলাহল পান করে'ই তিনি নীলকণ্ঠ হয়েছেন সন্দেহ নেই। পতিতাদের অন্তরঙ্গতথ্য উদ্ঘাটনে যে একটা শৌর্য্য আছে তাতে সন্দেহ নেই। ক্ষাত্রধর্ম্মোচিত এ কাজ হয়েছে এ জন্য তাঁকে শূর বা বীর বলা যেতে পারে এবং এ জগতের কল্পনা নিয়ে চলা-ফেরা করেছেন বলে তাঁকে সাহসী রসশিল্পীও বলা যায়। কিন্তু তিনি তাত্ত্বিক কোন কালে ছিলেন না—তাঁর গ্রন্থে কোন সমস্যার সমাধান করার লক্ষ্যও কোন কালে তাঁর ছিল না—এ কথা তিনি নিজে বলে গেছেন। অপর দিকে যা নিন্দিত, গর্হিত ও তুচ্ছ তাকে ইচ্ছা করেই তিনি মাল্যভূষিত করতে যাননি এ আশ্চর্য্য কথাও তিনি বলে গেছেন। তিনি বলেছেন, "মন্দের ওকালতী করতে কোন সাহিত্যিক কোন দিন সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয় না।" দুনিয়ার অধস্তরের সমগ্র পাপ, অবনীতি ও দুষ্কৃতির ছবি এঁকেও তিনি এ কথা বলে গেছেন এটা খুব বিস্ময়জনক। তিনি বলেছেন, "আমি গল্প-লেখক —তা ছাড়া আমি কিছু নই—সমাজ সংস্কারের কোন দুরভিসন্ধি আমার নেই।" অবনত ও গলিত রাজ্যকে সাহিত্যে পাংক্তেয় করে তিনি জনপ্রিয় হয়েছেন সন্দেহ নেই। অথচ ব্রাহ্মণ শরৎচন্দ্র শাস্ত্র ও নীতির নিকট মাথা নত করতে যে কুণ্ঠিত হননি, এটা ত' বীরত্বের দ্যোতক নয়। বিপ্লবীর মনোভাব এ রকম নয়—তাঁকে বিপ্লবী সাহিত্যিক বলা এ দিক্ হতে ভুল। তিনি নৈতিক স্বাধীনতার কোন নূতন তত্ত্ব উপস্থাপিত করেননি—অথচ শরৎ-সাহিত্যের ভক্তেরা তাঁকে এই অরাজক, নীতিহীন রাজ্যের মুকুটহীন রাজা মনে করে আশ্বস্ত হয়। তিনি সমাজদ্রোহী নন, তিনি উপবীত ত্যাগ করেননি—জাতিভেদ বর্জ্জন করেননি—সম্পূর্ণ ভাবে ব্রাহ্মণ্যের শাসনও মেনে চলেছেন। পতিতাদের নষ্টনীড়ের এই তথাকথিত ঋষি কোন নব্য আশ্রম যে স্থাপন করেননি—এ কথাও ঠিক। এ জন্যই ইউরোপীয় সাহিত্যসুলভ দুঃসাহসিক রসসৃষ্টি শরৎ-সাহিত্যে দুর্লভ। ইউরোপের আধুনিক সাহিত্যে আদর্শ, ভাব এমন কি রীতিরও বিপ্লব দেখা যায়। শরৎচন্দ্রে এ রকম বিপ্লব পাওয়া যাবে না। যাকে G. E. M. Joad আধুনিক সাহিত্যের "Lowbrowism" বলেছেন তা এ শ্রেণীর সাহিত্যের ঠিক উপজীব্য নয়। ইউরোপীয় সাহিত্যে Gautiere যাকে দুর্নীতির ফুল বলেছে তাই উদ্ঘাটিত হয়েছে "putrifying" সভ্যতার উদ্গীর্ণ অহিফেন প্রসূনে। ইউরোপীয় সাহিত্যে শিল্পীরা এ জগৎ চিত্রিত করে' নিজেদের দিগ্বিজয়ী মনে করেছে ভীরুতার পরিচয় তাতে নেই। এ জন্য শরৎচন্দ্রের আন্তর্জ্জাতিকতাও একটা উড়ো কথা মাত্র। কেউ বলছেন শরৎচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী সমাজকে চিত্রিত করেছেন—অথচ কেউ বলছেন তিনি আন্তর্জ্জাতিক—এ দু'টি উক্তির মূলেই কোন যথার্থ ভিত্তি নেই। যাঁরা বলছেন ঈশ্বর গুপ্তের মত তিনি খাঁটি বাঙ্গালী নরনারীকে রচনা করেছেন—তাঁরা কি বলতে চান বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথে খাঁটি বাঙ্গালীর চিত্র নেই? বতটা অগ্রসর হ'লে খাঁটি বাঙ্গালীত্ব টুটে যায় তাও দেখছি গবেষণার ব্যাপার হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ধানের ব্যাপার হবে। শরৎচন্দ্র আন্তর্জ্জাতিক সমস্যাগুলির সম্মুখীন হননি। তিনি যে জগৎ ঘেঁটেছেন এবং যাতে সৌন্দর্য্যের বহু অঙ্ক উদ্ঘাটন করেছেন তা' আন্তর্জ্জাতিক সত্য বা তত্ত্ব প্রচারের জন্য নয়। ফ্রয়েডের গবেষণা ইউরোপের নব্য সাহিত্য ও কলাকে নানা ভাবে সমৃদ্ধ করেছে—আইনষ্টাইনের তত্ত্বও দৃষ্টির পরিধি বাড়িয়েছে অফুরন্ত ভাবে। Christopher Isherwood প্রভৃতিতে এর রূপবিম্ব আছে। ইউরোপের ডাডা (Dada) ও অন্তরঙ্গ (Expressionist) সাহিত্য অবমানসিক জগতের বহু নতুন ছায়াচিত্র উপস্থিত করেছে যা শরৎচন্দ্রের যে শুধু অজ্ঞাত তা নয় তাঁর সমালোচকদেরও অজ্ঞাত।

ইউরোপীয় সাহিত্যের আংশিক রূপ বিম্বিত করেছেন বলে শরৎচন্দ্রের রচনাকে বাহবা দেওয়ার মানে তাঁকে যথার্থ বিচার করা নয়। এ দেশে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টিকে আরও গভীর ও ব্যাপক ভাবে দেখতে হবে। বৈষ্ণব সাহিত্য যে পরকীয়াকে রাধার মধ্যে পেয়ে উৎফুল্ল —তুরীয় পাদপীঠ সৃষ্টি না করে' যে দেশ মাটির মানুষ সম্বন্ধে কোন কথা বলতে পারে না—সে দেশে শরৎচন্দ্র অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। শরৎচন্দ্রের পরকীয়া বিনা আয়েসে সহরের বদ্ধমাক্ত গলির মধ্যেও বার বার আবির্ভূত হয়েছে এ অঘটন-ঘটনপটুতা তুলনাহীন। শুধু তাই নয়, শরৎচন্দ্র এমনি করে' বাংলা দেশের দৃষ্টিভঙ্গীরও একটা পট পরিবর্ত্তন করেছেন—যা কারও পক্ষে করা সম্ভব ছিল না।

পূর্ব্বে বলেছি বাংলা দেশের মুসলমান শাসনের অধ্যায় দেশকে যে দাসত্বে দীক্ষিত করে তার ফলে চৈতন্য-যুগে যে বৈষ্ণবীয় মনোভঙ্গী দেখা দেয় তাতে সব চেয়ে প্রভুদাস সম্পর্কই বড় হয়ে পড়ে। পরস্পরকে প্রভু বলে সম্বোধন এবং নিজকে দাস বলে কীর্ত্তন ছিল এর মুখ্য অভিব্যক্তি। পাঠানের পদলেহন করে' এ রকম দাস-মনোভাব মাথা তোলে এবং কলসীর কাণার আঘাত পেলেও প্রেম দেওয়ার উৎসাহ জাগায়। শক্তির দ্বারা জয়লাভ করতে না পারলে হয়ত' সেবা দ্বারা জয়লাভ করা যায়। কতকটা এ রকম জয়লাভ সেকালে হয়ত সম্ভবও হয়েছিল।

ইংরেজ যুগেও এ দেশ নিজের দুর্ব্বলতা, অক্ষমতা ও দাসত্বকে সহনীয় করতে উনবিংশ শতাব্দীতে এক নূতন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে। জগৎ মিথ্যা এবং সব মায়া এ হল সেই নূতন দর্শনের ভিত্তি। বহু শতাব্দী পরে শঙ্করের মায়াবাদ মেনে নিয়ে জাতি যেন বাঁচল। ভাবল দুনিয়ার প্রভুত্ব ও দাসত্ব দু'টিই মিছে—সত্যিকার দুনিয়া রূপ রস ও গন্ধের বাইরে। এমনি করে' বৈরাগ্যবাদ ও সন্ন্যাসবাদের

কসল সমগ্র দেশকে আচ্ছন্ন করল। চণ্ডীর পরিবর্ত্তে গীতার তথাকথিত নিষ্কামবাদের কদর হল উচ্চ-নীচের মাঝে। এখানকার মঠের নব্য সাধুরা কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের বাণী প্রচার আরম্ভ করে সেটাকে বড় রকমের তপস্যা মনে করল। দুনিয়াতে ভারতবর্ষ শুধু যে ধর্ম্ম ও মোক্ষ চেয়েছে তা' নয়—কাম ও অর্থও চেয়েছে। কিন্তু শেষের দু'টিকে তুচ্ছ করার উৎসাহই সকলের মনোহরণ করল।

এ রকমের বৈরাগ্যবাদের ভিতর দিয়ে স্বাদেশিকতা বা রাষ্ট্র সেবা কোন যুগে বা দেশে সম্ভব হয়নি। বসুন্ধরাকে ভোগ করাই হল ক্ষাত্রধর্ম্ম—ত্যাগ করা নয়। কামিনী ও কাঞ্চনকে শক্তিরূপে দেখেছে তন্ত্রবাদ—এ জন্য ভারতের তন্ত্র-প্রবর্ত্তিত শাক্তধর্ম্ম বার বার স্বাধীনতার সূত্রপাত করেছে। অথচ এ যুগে ইংরাজের দাপট ও চাপ এ দেশে এত বেশী হয় যে তা'তে বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস ছাড়া আর কোন মতবাদ মাথা তুলতে পারেনি।

যদি এরকম মতবাদকে একেবারে ভূমিসাৎ কেউ এদেশে করে থাকে তবে তিনি হচ্ছেন শরৎচন্দ্র। তিনি একা এই দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতার ঊর্ণনাভের জাল ছিন্ন করেছেন অবলীলাক্রমে। শরৎচন্দ্রের পরকীয়া দেখা দয়েছে গোলোকের উদ্ধচক্রে নয়—কলিকাতার অলি-গলির পাকচক্রে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে বৈরাগ্যের ভড়ংকে বিনা সঙ্কোচে শ্মশানশায়ী করা হয়েছে। এমনি করে' দেশকে একটা প্রবল ও প্রচণ্ড দৃষ্টিভঙ্গীতে অভ্যস্ত করা হয়েছে কামিনী ও কাঞ্চন দেখে পলায়নে নয়। এ কাজ বক্তৃতা, হিতকথা, বা মথিলিখিত সুসমাচার প্রচারের পথে হয়নি। হয়েছে রসসৃষ্টির বিরাট রাজপথে। প্রথম পথকে উপেক্ষা করা চলে কিন্তু সৌন্দর্য্যের নিবেদনকে রুদ্ধ করা চলে না। ইউরোপের শাক্ত জাতিরা ভোগের ভিতর দিয়ে অসীমের সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হয়েছে যুগের পর যুগ। এই রকম ভোগ ত্যাগের সহিত ওতঃপ্রোত, এ জন্য কুলার্ণবতন্ত্র বলেছিল "ভোগো যোগায়তে সম্যক্"। এ জন্য ইউরোপে ভোগী ত্যাগের অফুরন্ত আত্মাহুতি অসম্ভব হ'য়নি!

এ দেশের দাসত্বপীড়িত মনোরাজ্যে গেরুয়া বস্ত্রের রাজত্ব নিয়ে এসেছে পীড়া, রোগ ও আত্মবঞ্চনা। এক সময় বৌদ্ধধর্ম্ম দলে দলে এই সন্ন্যাসের পথে সকলকে প্রেরণ করে ভারতবর্ষকে করেছিল দুর্ব্বল ও পঙ্গু—যাতে বাইরের শত্রু এসে অবলীলাক্রমে দেশকে শৃঙ্খলিত করে। আবার সে অধ্যায়ের সূত্রপাত হয় এ দেশে, হতাশা ও পরাজয়ের শেষ আঘাতে। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাস-সাহিত্যের ভিতর দিয়ে যা' দিয়েছেন তা একটা বিরাট ব্যাপার সন্দেহ নেই। নীতির দিক হ'তে সে বিচারের কোন মূল্য নেই—কারণ, নীতির মানদণ্ড সাময়িক। যা জানা ছিল না তা' জানান একটা বড় কাজ—দেশের মুক্তির জন্য। কতকগুলো অবাস্তব আলেয়ার পেছনে না ঘুরে' সত্যকে গ্রহণ করতে হয় বলিষ্ঠ ভাবে। সিংহকে আবদ্ধ করতে হয় নিজের গুহায়। শরৎচন্দ্র দেশের হয়ে এ কাজ করেছেন। এ জন্য তাঁকে যে ক্রুশবদ্ধ হ'তে হয়নি এ কথা বলা চলে না যদিও ইদানীং; এ জন্য রক্তহীন প্রশংসার ডমরু কেউ কেউ বাজিয়েছেন অতি সামান্য স্তর হ'তে।

বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ শরৎচন্দ্রের এ ক্ষেত্রে অবতরণই বিস্ময়জনক। তিনি বিপ্লববাদী হওয়া দূরে থাক ব্রাহ্মণ্যের সকল উপাদানই শিরোধার্য্য করে চলেছিলেন। এ দেশে ব্রাহ্মসমাজ সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শ নিয়ে জাতিভেদ বর্জ্জন এবং নারী জাতির স্বাধীনতা বিষয়ে অগ্রসর হয়ে এক প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করে। এর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি মোটেই ছিল না। শরৎচন্দ্রকে ঋষি বলা যেমন ভুল তেমনি সমাজসংস্কারক বলাও ভ্রান্তিমাত্র। এ সব বাহবা তাঁর প্রাপ্য নয়। শরৎচন্দ্রের ভিতর দিয়ে বাংলা সাহিত্য পাশ্চাত্য প্রেরণাক্ষুব্ধ দেশের অনুভূতিকে প্রকট করেছে। বাংলা দেশের তত্ত্ব অতি জটিল—বাংলার ইতিহাসও ব্যাপক। এ যুগে যথার্থ বাংলা-চিত্তকে অনুভব করতে হলে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এই তিন ঔপন্যাসিকের রচনাকে প্রদক্ষিণ করতে হবে। কারও দান সামান্য নয়—আবার কাকেও একাকীত্বের কাঞ্চনজঙ্ঘাশৃঙ্গে সমারূঢ় করে' আনন্দ লাভ করা সম্ভব নয়। গলিত ক্লেদ ঘাঁটা শরৎচন্দ্রের এক মাত্র কৃত্য ছিল না। তিনি সমাজ-অরণ্যের পাতা-ঢাকা পূতিগন্ধের আড়ালে খুঁজেছেন অস্পষ্ট ও অজানা আলো ও ছায়ার রূপ-কুহেলি। সে সব জমাট করে' তিনি রচনা করেছেন এক অনির্ব্বচনীয় ছায়াপথ।

এ পথ রচনার সহায়ক হয়েছে তাঁর রচনারীতি। শরৎচন্দ্রের ভাষা অকুতোভয়ে সারল্যের সকল কৌশল অবলম্বন করে' অতি দুর্গম বিষয়কে রূপদান করে' জীবন্ত করে তুলেছে। ভাষাকে এ রকম plastic বা নমনীয় করার দক্ষতা এই ক্ষমতাশালী ঔপন্যাসিকের যেন স্বভাবসিদ্ধ ছিল। অতি দুঃসাধ্য বর্ণনা ও রসোদ্ঘাটনে এ ভাষা কোথাও পরাজয় স্বীকার করেনি। এ কৃতিত্ব সামান্য নয়। বস্তুতঃ শরৎচন্দ্রের এ বিষয়ে অশিক্ষিত-পটুত্ব ছিল অসাধারণ। বাংলা ভাষা শরৎচন্দ্রের হাতে এক নূতন দিগ্বিজয়ের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এ কাজে সফলতাও শরৎচন্দ্রকে এ জাতির স্মরণীয় করে রাখবে।

শরৎচন্দ্রের ভিতর দিয়ে ইউরোপীয় সাহিত্যে ফলিত সামাজিক বিপ্লব ও পারিবারিক সমস্যা-সমূহগুলি নূতন আকারে এ দেশে আসা স্বাভাবিক ছিল। ইউরোপীয় আমলের সভ্যতার অমৃতপাত্র হ'তে যেমন সকলে মধুপানে ভোর হয়েছিল—তেমনি এ সভ্যতার বিষপাত্রকে তুচ্ছ করাও এদেশে সম্ভব হয়নি। যেখানে ভাবমন্থন হয় সেখানে এ দুটিই ভেসে উঠে। সাহিত্যের মাদকতা এ সব জিনিষের তিক্ততার উপরও একটা সুমিষ্ট আবরণ দিয়ে অগ্রসর হয়। বাস্তববাদের ইতরতা ঘাঁটবার যুগ ইউরোপে সুরু হয় ফ্লোবেয়ারের রচনা হ'তে। Zolaর মতে ইউরোপের নব্য উপন্যাসের প্রবর্ত্তক ছিল এই সাহিত্যশিল্পী। ফ্লোবেয়ারের Madam Bovaryর রচনা-কাল হচ্ছে ১৮৫৭ খৃঃ।

বঙ্কিমযুগে ইবসেন ও Zolaর সাহিত্যিক ধারা এ দেশে পৌছয়নি বঙ্কিমের আনন্দমঠের কাল হচ্ছে ১৮৮২ খৃঃ—দেবীচৌধুরাণী ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের রচনা। এ দেশে তখনও বাস্তবতার ভাল ও মন্দের দিক কিছুই বোঝাপড়া হয়নি। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রের সব রঙ মিলেই সাহিত্যের একটা রামধনু রচিত হয়। এ সব রচনায় বহু সমস্যা প্রচ্ছন্ন ভাবে মাথা তোলে। ইবসেনের "A Doll's house" প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে। এ রচনায় স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করে বাইরের বাস্তব জগৎকে দেখতে উৎসাহিত হয়। ব্যাপারটি ইউরোপের পক্ষেও নূতন ছিল। ইবসেনের Ghostএ এ ফলিত হয়েছে এ চিত্রের অপর দিক্—তা'তে করে পাশ্চাত্য সভ্যতা একটা ধাঁধায় পড়ে যায়।

ইবসেনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই Zolaর অমানুষিক সৃষ্টিগুলি

ইউরোপে দিক্‌দাহ উপস্থিত করে। Zolaর L'Assommoirএর রচনা-কাল হচ্ছে ১৮৭৭ খৃঃ। এতে মদ্যপায়ী ও অলস জীবনযাত্রীর কুহক বিম্বিত হয়েছে। Nanaর রচনা-কাল হচ্ছে ১৮৮০ খৃঃ—পতিতাদের অতিস্থূল চিত্র এর ভিতর আছে। কৃষক-জীবনের অত্যন্ত দুঃসহ বাস্তবতার চিত্র পাওয়া যায় La Terreতে। এ গ্রন্থের রচনাকাল ১৮৮২ খৃঃ। এ রকমের চিন্তার খাণ্ডবদাহ এদেশে অভাবনীয় ছিল। বঙ্কিমেও আংশিক ভাবে বাস্তবতা আছে—কিন্তু সে বাস্তবতা আলঙ্কারিক সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত। কিন্তু পাশ্চাত্যে বাস্তবতা ইচ্ছা করেই নিজকে কর্দ্দমাক্ত করেছে—ব্যসনের রসও ত একটা রস।

রবীন্দ্রনাথের যুগে এ শ্রেণীর সাহিত্য ভারতের উপর বার বার ছায়া ফেলেছে। রবীন্দ্রনাথের "গোরা", "নৌকাডুবি", "ঘরে বাইরে" প্রভৃতিতে বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য রচনার কালো ও রক্তাক্ত ছায়া আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবন স্থূল ও নগ্ন জগৎ ঘাঁটার পক্ষপাতী ছিল না। তাঁর শিক্ষা দীক্ষা তাঁকে করেছিল এক দিকে মসলিনের মত সূক্ষ্ম—অন্য দিকে তরবারির মত ক্ষুরধার। ইউরোপীয় শীলতা তাঁর ভিতর দিয়ে ফলিত হয়ে যা দান করেছে—তা সমগ্র বিশ্বের রসপিপাসা চরিতার্থ করেছে। কাব্যে এবং উপন্যাসে বাংলা-জীবনের তরঙ্গ-ভঙ্গের শীর্ষে ফেনপুঞ্জের লীলার মত এক অনির্ব্বচনীয় রসকদম্ব তিনি উপস্থিত করেছেন। এ জন্যই বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব বিধাতার আশীর্ব্বাদস্থানীয় হয়েছে।

ইউরোপের এ যুগে আর দু'টি সাহিত্যশিল্পী বাংলা চিন্তার ভাব-যমুনায় নিয়ে আসে বিরুদ্ধ স্রোতের লীলাকদম্ব। Hauptmanএ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন ইউরোপে। তাঁর "Before sunrise" পড়ে স্তব্ধ হয়েছে প্রাচ্য দেশ—অকথ্য ব্যাপার প্রকাশের সুতীব্র প্রেরণা ইউরোপে মানসিক ছন্দের যেন ক্রম হয়ে পড়েছে। ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) ও হেভলক এলিস পরে এ ক্ষেত্রে রাজপথ কেটে দেয়। Hauptmanএর "Die waber" ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের রচনা। এ নাটকে সেকেলে নায়ক নেই—এর নায়ক হল জনতা। এমনি করে জনতা ইউরোপে রাজরাজেশ্বরদের মসনদ ক্রমশঃ অধিকার করেছে। আর একটি নাট্যকার ইউরোপের এই মনসিজ জাগরণের ভ্রূকুটিকে উদগ্র করে প্রাচ্য দেশেও কামদেবের ভস্মের মত ছড়িয়েছে নব জাগরণকে বিস্তৃত করতে। ইনি হচ্ছেন Frantz Wedekind (১৮৬৪-১৯১৮)। সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যকে এ রূপকার প্রভাবিত করেছে প্রচুর ভাবে। সাহিত্যের ও শিল্পের বিরাট আন্দোলনগুলি জার্ম্মাণী হ'তেই উপজীব্য পেয়েছে বেশী। এঁর "Spring's Awakening"এ যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিনব নির্দ্দেশ আছে। এঁর Pandora's Boxএও যৌন-জগতের দুঃসহ ব্যাপার উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে। এ সব জিজ্ঞাসা ও সন্ধানের আগ্রহ ক্রমশঃ পূর্ব্বাঞ্চলের দিকেই ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালীর মন সংগ্রাহক কারণ তা আঘাতের পর আঘাতে নিত্য জাগ্রত হয়ে আছে। বাংলা দেশ মাথা পেতে নিয়েছে বিরোধের প্রাথমিক বজ্রকে এবং বাংলা সাহিত্যও নিজের সমগ্র নমনীয় অবয়বকে এগিয়ে দিয়েছিল এ সব নূতন সংস্কারকে বহন করতে—নূতন বাণীর মত।"

শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব হচ্ছে তিনি এ রকম জগৎ উদ্‌ঘাটনে অগ্রণী হয়েছেন। যাঁর পক্ষে অহিফেন সেবন দুঃসাধ্য হয়নি—কপর্দ্দকহীন সর্ব্বহারা হয়ে যিনি বন্দরে বন্দরে ঘুরতে ইতস্ততঃ করেননি তাঁর পক্ষেই এদেশে এ জগতের কথা বলা সম্ভব হয়েছিল। অথচ এ জগৎই বাঙালী জাতির একমাত্র জগৎ নয়। শরৎচন্দ্র নির্ভয়ে সমাজ-অরণ্যের কণ্টকিত আড়ালে খুঁজেছেন এ রাজ্যের আলো ও ছায়ার রূপকুহেলি।

বলা প্রয়োজন, ইউরোপে সাহিত্যের অন্তরালে আর একটি ভাববিপ্লব উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় সকলকে উন্মনা করে। সে হচ্ছে ফরাসী Decadent সাহিত্যের কূলপ্লাবী কুজ্ঝটিকা। এ অভূত-সাহিত্যের পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য, সূক্ষ্মতা ও বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী সমগ্র ইউরোপকে রূপান্তরিত করে। এ সাহিত্যে স্খলনের কোন কলঙ্ক-চিহ্ন নেই—ক্লাসিক্ রোমান্টিক প্রভৃতি সেকেলে সব ধারাই এ রকমের সাগর-সঙ্গমে ডুবে যায়। এ জন্যই Lichtenberger মন্তব্য করেন: "Decadance was neither romantic nor classic"। ইউরোপের অতিরিক্ত ভোগবিলাস, অবসাদ ও ক্লান্তি, দুর্নীতির সহিত আনন্দে ক্রীড়াকৌতুকে উৎসাহ গর্ব করে সমাজে যা নিন্দিত বা দূষিত তাকে মাথায় করে' নৃত্য করার উন্মুখতা, এবং পরিতাপকে শিরোধার্য্য করে' ও রকমের বিষবৃক্ষের পুষ্পচয়ন—এ ছিল Decadent সাহিত্যিকদের কাজ। ফরাসী সাহিত্যে J. K. Huysmanএর A Rebour এবং ইংরেজী সাহিত্যে Oscar Wildeএর "Picture of Dorian Gray," Aubrey Beardsleyর "Under the hill" নব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব্ব রচনা। প্রাচীন সাহিত্যের পিরামিডকে ওলট পালট করা হয় এবং লাটিমের মত তাকে ঘোরবার উৎসাহ হয়—না হয় তাকে উল্টো দিকে দাঁড় করান সম্ভব হয়নি। সাহিত্যের এই নব্যপ্রভাতে নৈশ দীপাবলির ক্লান্ত ঔজ্জ্বল্যই নন্দিত হয় সূর্য্যালোক নয়। শুধু ইবসেনেসীমাবদ্ধ না হয়ে নবীনত্বের এ ধারা এ যুগেও Bernard Shaw ও H. G. Wells পর্য্যন্ত চলেছে মত্ত ভাবে। ভাঙবার উৎসাহ, অসম্ভবকে সম্ভব করা, পাপকে পুণ্যে রূপান্তরিত করার প্রেরণা—এ সব সাহিত্যিকদের ভিতর দিয়ে যেন এক নব বাইবেল রচনা করে এদেশের চিন্তায় সংক্রামিত হয়।

ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসেও এ রকম পট পরিবর্ত্তন অসম্ভব হয়নি। গুপ্তযুগের ঐশ্বর্য্য, আয়েস ও মত্ততার ভিতর বসন্তসেনার আবির্ভাব হয়। শুধু বসন্তসেনা শকার, বিট শর্বিলক ও দর্দ্দুরকের চিত্র ও "মৃচ্ছকটিকে" পাওয়া যায়। সভ্যতার সমগ্র গলিত উপকরণ ও ইতর ঘটা এক সময় এক মদমত্ত ছায়াচিত্র রচনা করেছিল। "রত্নাবলীর" মদনোৎসবের বর্ণনাও সে যুগের নাগরিকদের উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তির সহিত সকলের পরিচয় সাধন করে। সাম্রাজ্যবাদের মূলে থাকে ভোগের প্ররোচনা—ব্যসনের ঘনঘটা। সাহিত্য এ সব আবহাওয়া উপস্থিত করতে কখনও ইতস্ততঃ করেনি কোন কালে।

পাশ্চাত্য সাহিত্য হতে প্রতিফলিত এ রকম সৃষ্টির রূপ-গৌরব শরৎচন্দ্রের মত সর্ব্বহারার পক্ষেই বাংলা সাহিত্য দান করা সম্ভব হয়েছিল। এ জন্য এই ঔপন্যাসিক যদি দেশবাসীর সাদর সম্ভাষণ পেয়ে থাকেন—তবে তা যথাযোগ্যই হয়েছে। শরৎচন্দ্রের দানকে তুচ্ছ না করে' বাংলা সাহিত্য এ যুগে তাকে দু' হাতে গ্রহণ ও বরণ করেছে এটাই ঔপন্যাসিকের পক্ষে যথেষ্ট আত্মশ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নেই। কারণ, বাংলা দেশকেও আজ বিশ্ব-দরবারের সহিত নিজের যোগ রক্ষা করে চলতে হচ্ছে।



স্বর্গাদপি গরীয়সী

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৩

যাহাকে হারানো যায়, ঠিক তাহার জায়গাটি অন্য কেহ পূরণ করিতে পারে না, কেন না, প্রত্যেকেই তো একটি আলাদা জগৎ লইয়া আমাদের জীবনে প্রবেশ করে? তবু গিরিবালার এক এক সময় মনে হয় ননীবালা যেন তাঁহার তুলারমন,—হাস্যময়ী, যেখানে থাকেন, যেখান দিয়া যান, একটি যেন অদৃশ্য আলো বিকিরণ করিতে থাকেন। ওঁর বাপের বাড়ি তো এখানেই, এদিকে আসিয়া স্বামীও এই সহরেই বাড়ি করিলেন, আর তাও গিরিবালাদের বাড়ির কাছেই; মাঝে একটি সরু রাস্তার ব্যবধান, তাহার পর খান দু'য়েক বাড়ি বাদ দিয়াই ননীবালাদের বাড়ি।

বেশ জমে দুই জনে। অবশ্য অনেক দিনের কথা হইয়া গেল, ওঁর বাড়িটিও এখন ছেলে-দৌহিত্র-দৌহিত্রীতে ভরা, তবু নিতান্ত অসম্ভব না হইলে একবার করিয়া আসা চাই-ই। তাহা ভিন্ন কোথায় নূতন কি হইতেছে—থিয়েটার, বাংলা বায়স্কোপ, কি বাংলা দেশ হইতে কথক আসিয়াছে, বা কীর্ত্তনের দল—দ্বারভাঙ্গাতেই হোক বা লাহেরিয়া সরাইয়ে—যাওয়া চাই। শুধু ননদ-জায়ে নয়, বৌয়ে-ঝিয়ে একটি বড় দল করিয়া। একটা কিছুর গুজব উঠিলে গিরিবালার মেয়ে-বৌয়েরাও সপ্তাহখানেক পূর্ব থেকে ননীবালারই দরবার শুরু করিয়া দেয়।

সরস্বতী পূজা উপলক্ষে লাহেরিয়াসরাই বারোয়ারি-তলায় একটু বিশেষ ধুমধাম হয়, দ্বারভাঙ্গায় কালীপূজায় যেমন। থিয়েটার হয়। দ্বারভাঙ্গার সবাই যে যাইতে পারে এমন নয়, অনেকটা দূর; তবে ননীবালার একেবারে বাঁধা। গিরিবালার আপত্তি বিশেষ থাকেও না, থাকিলেও খাটে না। এবারে আবার কাশী থেকে নাচের ছেলে আসিয়াছে, একটু সাড়া পড়িয়া গেছে বেশি। ভিড় হইবে, একটু সকাল সকালই গেছেন।

থিয়েটার আরম্ভ হইবার খানিকটা আগে পর্যন্ত ঘণ্টাখানেক সময় মেয়েদের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়; তাঁহারা দেখিয়া-শুনিয়া, আলাপ-পরিচয় করিয়া বেড়ান, পর্দা সে রকম ঢিলা হওয়া এই সেদিন থেকে আরম্ভ হইয়াছে। তাহা ভিন্ন বিশিষ্ট বেহারী পরিবারের স্ত্রীলোকেরাও আসেন, তাঁহাদের মধ্যে পর্দার কড়াকড়ি একটু বেশিই।...এই ঘণ্টাখানেকের সময় পুরুষেরা একটু সরিয়া থাকে; থিয়েটারের সাজঘরে যা একটু জটলা হয়।

নূতন পরিচয় করার উৎসাহ এবং দক্ষতা দুইটাই কম গিরিবালার। দেবীমণ্ডপের কাছে কয়েক জন পরিচিতার সঙ্গে দেখা হইল, একটু গল্প-গুজব হইল, তার পর মেয়েদের জায়গায় একটু আগের দিকে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ননীবালা হাত-কয়েক দূরে এক জনের সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন, বলিলেন—"তা'হলে আমাদের জন্যেও খানিকটা জায়গা আগলে রেখো বৌদি, নৈলে ঝগড়া হবে..."

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর এক জন মহিলা আসিয়া গিরিবালার পাশে বসিতেছিলেন,—বর্ষীয়সী, প্রায় পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছর বয়স, টকটকে রং, লম্বায় আড়ে দশা'সই চেহারা, হাতে একটা মাঝারি সাইজের পানের বাটা; শরীরের গুরুত্বের জন্যই ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। ননীবালা কথাটা শেষ না করিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"তা বলে বৌদি তুমিও যেন জায়গার জন্যে হুট করে ঝগড়া করতে যেও না কারুর সঙ্গে, নিজের ওজন না বুঝে..."

বর্ষীয়সীর পানে আড়ে চাহিয়া লইয়া হঠাৎ একটু ভয়ের অভিনয় করিয়া বলার ভঙ্গীতে কাছাকাছি সবাই হাসিয়া উঠিল। গিরিবালাও মুখটা ঘুরাইয়া হাসি চাপিবার চেষ্টা করিলেন।

বর্ষীয়সী হাসিয়া একটা হাতের ভরে বসিতে বসিতে বলিলেন—"সে তোমার ভয় নেই বাছা, এবার যা সেপাই বসলাম, তোমার জায়গা রক্ষে..."

ননীবালা ঠোঁটে অল্প একটু হাসি লইয়া আগাইয়া আসিলেন, বলিলেন—"মাপ করবেন, আমার একটু বলা মুখ, রক্ষে করবার জন্যে সেপাই আর আমায় রাখবেন কি? সবটাই তো নিজেই গ্রাস করে..."

সকলেই একেবারে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বর্ষীয়সী একটু রঙ্গপ্রিয়ই—মোটা লোকে প্রায় হয়ই, নিজেও শরীর দুলাইয়া হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন—"না, তুমি যাও। অভয় দিচ্ছি, না কুলোয় ছেড়েই দোব জায়গা, আর কি হবে?"

ননীবালা গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"এর চেয়ে ভয়ের কথা আর কি আছে?"

"কেন গো ?"

"আমার ঐ পানবাটাটির ওপর লোভ ছিল, ভেবেছিলাম জায়গায় যে লোকসানটা গেল, পানবাটার মধ্যে থেকে সেটা সুদে-আসলে উশুল করে নোব, তা গেলে তো আর আপনি ওটা ছেড়ে যাবেন না? আমি আসছি শীগ্‌গির"—বলিয়া হাসির মধ্যে ননীবালা সঙ্গিনীকে লইয়া অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

খানিক পরে; গিরিবালা বর্ষীয়সীর সহিত গল্প-সল্প করিতেছেন, ননীবালা আসিয়া আবার উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে এক জন স্ত্রীলোক, প্রায় এঁদেরই বয়সী, তাহার পিছনটিতে এক পাশে দাঁড়াইয়া একটি সাত-আট বছরের মেয়ে। ননীবালা স্ত্রীলোকটির পানে চাহিয়া গিরিবালাকে দেখাইয়া বলিলেন—"এই ইনি।"

গিরিবালা একবার একটু বিস্মিত ভাবে নবাগতাকে দেখিয়া লইয়া ননীবালার পানে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিলেন, ননীবালা বলিলেন—"উনি পাণ্ডুলের বিপিন বাবুর স্ত্রী গিরিবালার খোঁজ করছিলেন, আমি দ্বারভাঙ্গায় থাকি শুনে; তা তুমিই তো?"

স্ত্রীলোকটি অল্প একটু হাসির সঙ্গে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া লইয়া গিরিবালাকে বলিলেন—"আপনি একবার উঠবেন দয়া করে?"

গিরিবালার চোখের সামনে একটা পর্দা যেন ওঠা-নামা করিতে করিতে ধীরে ধীরে গুটাইয়া আসিতেছে—একবার স্মৃতি, আবার তখনই সন্দেহ—তাহার পর তাঁহার মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, একবার জিভের একটু জড়তা কাটাইয়া বিস্ময় আর আনন্দের অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"দুলারমন না?"

নূতন ধরণের নামে বর্ষীয়সী আর ননীবালা উভয়েই চকিতে একবার স্ত্রীলোকটির মুখের পানে চাহিলেন। কিছু একটা রহস্য আছে সন্দেহ করিয়া ভদ্রতার খাতিরেই ননীবালা বলিলেন—"আমি আসছি বৌদি।—না হয়, উনি যখন ডাকছেন, তুমি ওঠ, আমি জায়গা আগলাই, এবার ভিড়টা এদিকেই ঝুঁকবে।"

হঠাৎ বর্ষীয়সীর পানে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"এবার আপনি তা'হলে আপনার পান বের করতে পারেন।"

বর্ষীয়সী হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"হ্যাঁ, এসো; এতক্ষণ হুকুম না পেয়ে যে কী ছটফটানিটাই ধরেছিল আমার।"

পূজার দালানের পাশে বাহিরের দিকে এক ফালি রক আছে, গিরিবালা আর দুলারমন তাহার এক কোণে একটু নিরিবিলি দেখিয়া দাঁড়াইলেন; বিস্ময়ে গিরিবালার মুখে যেন কথা সরিতেছে না। একটা মানুষের জীবনে চারি দিক দিয়া এত পরিবর্তন কল্পনা করা যায় না; দুলারমনের সাজসজ্জা প্রায় সমস্তই বাঙালী ধরণের—মাথায় বাঙালী ধরণের সাদাসিদে খোঁপা, হাতে একটা করিয়া মৈথিল প্যাটার্ণের হালকা রূপার জশম আর দুই গাছি করিয়া গালার 'লহটি' বাদে গহনা সমস্তই বাঙালী, বাঙালী শাড়ি, পরাও বাঙালী ধরণেই, শুধু সামনেটা এদেশী প্রথায় একটু কুঞ্চিত। এদিকে রূপ যেন ধরিতেছে না। বয়স হইয়াছে—প্রায় গিরিবালারই বয়স তো?—কিন্তু সেই রং যেন আরও চতুর্গুণ উজ্জ্বল হইয়াছে। একটু মোটা হইয়াছেন, তাহাতে ছেলেবেলার সেই ক্ষীণাঙ্গী দুলারমনের চঞ্চলতাটা যেন ঢাকা পড়িয়া গেছে বটে, কিন্তু বয়স হিসাবে মানাইয়াছে ভালো।···সর্বোপরি বেশ বোঝা যায় দুলারমন সুখে আছেন, আদরে আছেন, যত্নে আছেন; গহনা-পরিচ্ছদ বাহুল্যবর্জিত, কিন্তু ওরই মধ্যে দামি, শরীরের বর্দ্ধিত শ্রীও এর সাক্ষ্য দেয়। মেয়েটি দুলারমনেরই কন্যা মনে হইল; সায়েবদের মেয়ের মতো গায়ে ফ্রক, মাথার দুই দিকে দুইটি বেণী দুলিতেছে; আগায় রাঙা ফিতের বো; আজকাল বাঙালী এবং অবস্থাপন্ন বেহারীর ঘরের ছোট মেয়েরা যেমন সাজিয়া থাকে।

ঐটুকু আসিতে আসিতেই গিরিবালা সব দেখিয়া লইলেন। সব চেয়ে আশ্চর্য ঠেকিল দুলারমনের বাংলা কথা; একটু জড়তা নাই, একটু মৈথিল টান নাই। অন্য কোথাও হইলে কেহ পরিচয় দিয়া দিলেও শুধু বাংলা কথার জন্য বিশ্বাস করা শক্ত হইত যে দুলারমন।

মুখোমুখি দাঁড়াইয়া দুলারমন প্রশ্ন করিলেন—"তাহলে পারলে চিনতে দুলহীন? আমি ভেবেছিলাম···"

গিরিবালার বিস্ময়ের ঘোরটা কাটে নাই, বলিলেন—"চিনতে তো পারলাম, কিন্তু বুঝতে পারছি না; আপনার···"

দুলারমন হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন—"আর 'আপনার' থাক্‌, পাণ্ডুলের সম্বন্ধটা আর বদলাবার দরকার নেই, না হয় বয়সই বেড়েছে। আমিও সেই জন্যে 'দুলহীন' বলেই ডাকলাম, আর ডাকবও, তা তুমি যতই গিন্নি-বান্নি হও না কেন।"

হাসিয়া শরীরের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া বলিলেন—আর, হয়েছও দেখতে পাচ্ছি।"

—আর একটু জোরে হাসিয়া উঠিলেন।

গিরিবালার জড়তা কাটে নাই ভালো ভাবে, একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"এক ভাবে কি থাকা যায়?"

দুলারমন কি একটু ভাবিয়া লইয়া বলিলেন—"গেলে কিন্তু মন্দ হোত না; ভেবে দেখো না, পাণ্ডুলের সেই দিনগুলো যদি ধরে রাখা যেত···থাক্‌ ···এই দিন পাঁচেক হোল তোমার নন্দাই এখানে বদলি হয়ে এসেছেন, আর সেই থেকে আমি যে কী ছটফট করছি।···

গিরিবালার দৃষ্টি আরও জিজ্ঞাসু হইয়া উঠিল।

দুলারমন চোখ দুইটা বড় করিয়া বলিলেন—"ও মা, তুমি বুঝি কিছুই জানো না?"

মেয়েটির দিকে চাহিয়া মৈথিলীতে বলিলেন—"তুই ঠাকুর দেখগে যা রামকিশোরী, আমি ডেকে নোব।"

মেয়েটি চলিয়া গেলে বলিলেন—"কিছুই জানো না বুঝি তুমি? —হারাধন যে আবার পাওয়া গেছে।"

গিরিবালা বলিলেন—"তা যেন অনেকটা বুঝতে পারছি, কিন্তু কি করে?"

"হাল ছেড়ে দিয়ে।"—বলিয়া দুলারমন চাপা গলায় খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"জান তো?—যতক্ষণ হা-হুতাশ করবে, ততক্ষণ ওঁরা ধরা দেবার পাত্র নয়। শেষে বিরক্ত হয়ে যেই মনে মনে বললাম—"দুত্তোর, আর ভাববই না, অমনি···"

পাণ্ডুলের সেই রহস্য-কৌতুকমণ্ডিত দিনগুলি ফিরাইয়া আনিতেছেন দুলারমন। নিজের অজ্ঞাতসারেই গিরিবালার মুখে একটি হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে, ওঁর মুখের পানে চাহিয়া আছেন। দুলারমন একটু থামিয়া বলিলেন—"দুলহীনের বিশ্বাস হচ্ছে না; হ্যাঁ গো, ভাবনার পাটই দিচ্ছিলাম উঠিয়ে···"

স্বরটা একটু মলিন হইয়া গেল, গিরিবালার মুখেও একটা আতঙ্কের ছায়া পড়িল, কিন্তু সেটা স্পষ্ট হইবার পূর্বেই, বা তাঁহার উদ্বিগ্ন প্রশ্নটা বাহির হইবার পূর্বেই, দুলারমন কণ্ঠস্বরটা পরিষ্কার

করিয়া লইয়া বলিলেন—"ব্যস্ সঙ্গে সঙ্গে বাবুর খবর এসে হাজির। ঠাকুরমা মারা গেলেন, বাবা মারা গেলেন, আমি তখন মধুবাণীতে তো?—এক দিন হঠাৎ শ্বশুরের নামে একখানি বড় রেজেষ্টারি খাম এল,—একখানি গেজেট, তা'তে লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দেওয়া…"

দুলারমন হঠাৎ থামিয়া গেলেন, বোধ হয় নিজের মুখে নিজের সুখ-সমৃদ্ধির কথা বলা আয়াসসাধ্য হইয়া উঠিতেছে, নিজের ভাব ও ভঙ্গী দুই-ই বদলাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"না, এবার তুমি আন্দাজ করো দুলহীন, দেখি তোমার সেই হেঁয়ালি ধরবার ক্ষমতাটা আছে কি হারিয়েছে।"

গিরিবালারও সহজ ভাবটি ফিরিয়া আসিয়াছে, হাসিয়া বলিলেন—"না, তুমিই বলো; জীবনে অনেকে যেমন হারাধন পান, তেমনি অনেকে আবার পাওয়া-ধন হারায় তো? আমি হারিয়েছি সে ক্ষমতাটা।"

দুলারমন হাসিমুখেই একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গিরিবালার পানে চাহিয়া মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া বলিলেন—"হুঁ,—কিন্তু দুষ্টু বুদ্ধিটুকু তো হারাওনি দুলহীন!"

দু'জনেই হাসিয়া উঠিলেন। দুলারমন একটু চুপ করিয়া রহিলেন। প্রিয় সঙ্গিনীর কাছে সংবাদটি দিতে আনন্দে, গরবে, লজ্জায় তাঁহার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, কি করিয়া প্রকাশ করিবেন সেই লইয়া যেন অস্বস্তিতে পড়িয়া গেছেন, তাহার পর হাত দুইটা পিঠের দিকে করিয়া, ঠাকুরঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়া কতকটা অবহেলার সহিত বলিয়া উঠিলেন—"এমন কিছু নয়,—গেজেটে লাল পেন্সিলে নিজের নামের নিচে দাগ দেওয়া—সাবডেপুটির পদ পেয়েছেন।"

গিরিবালা আনন্দে বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—"সাব ডেপুটি! —সে তো বড় চাকরি ভাই!"

দুলারমনের মুখটা আরও রাঙা হইয়া উঠিল, যেন এদিক্‌কার পার্ট'টা চুকাইয়া দিবার জন্যই বলিলেন—"তেমন আর কি?—তবে হ্যাঁ, আমাদের নাগালের তো বাইরেই বলতে হবে? ওর মধ্যে ডেপুটির পদটা যা একটু…তা, এত দিন পরে সেই পদে এখানে বদলি হয়ে এলেন।"

দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। গিরিবালা দুইটি ছবি মনে মনে মিলাইয়া দেখিতেছেন—সেই দুঃখিনী দুলারমন—কথা কহিতে, হাসিতে বুকে টান ধরিতেছে, মুখটা নীল হইয়া উঠিতেছে; আর এই সুখৈশ্বর্যময়ী!…একটি প্রীতির রসে ওর মন সিক্ত হইয়া আসিয়াছে, কিছু একটা বলা দরকার এই সময়, দুই দিকেই এই চুপ করিয়া থাকার অস্বস্তিটা কাটে তাহা হইলে, কিন্তু মনের আনন্দটিকে প্রকাশ করে এমন কথা জোগাইতেছে না। এ সব অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে দুলারমনই যোগ্য বেশি, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"বাঃ, আসল কথাই তো জিগ্যেস্ করলে না দুলহীন—আমি এমন বাংলা শিখলাম কোথায়!"

যেন নিজেরই তাঁহার আশ্চর্য হইবার কথা, এই ভাবে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন। গিরিবালা বলিলেন—"হ্যাঁ, আমিও তাই আশ্চর্য হচ্ছিলাম।"

"মধুবাণী থেকে একেবারে যে চাইবাসায় টেনে তুললে গো। চাকরিটা সেইখানেই আরম্ভ হোল কি না। তার পর এই প্রায় পনের বছর তো সেই দিকেই কাটল—কোথায় ধানবাদ, কোথায় রঘুনাথপুর, কোথায় পুরুলে—সব তো বাংলা দেশই? তোমার নন্দাই আমায় বলেন—"ঠিক হয়েছে, যেমন বাঙালী-বাঙালী করতে…"

গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"তা, লাগল কেমন?"

দুলারমন কি ভাবিয়া চোখ দুইটা একটু ঘুরাইয়া লইলেন, প্রশ্ন করিলেন—"তোমার এখানে কি রকম লাগছে?"

সেই কথার মারপ্যাঁচ!…গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন—"মন্দ কি? —এখানে তো বাঙ্গালীও অনেক, অভাবটা বোঝা যায় না।"

দুলারমন বলিলেন—"ওদিকেও কয়েক জায়গায় বেশ কিছু-কিছু মৈথিল আছে, তবে তোমার নন্দাইয়ের কথা বলতে গেলে সব জাত খুইয়ে বাঙালী হয়ে গেছে।"

বাঙালীকে ছোট করিয়া দেওয়ায় দুলারমন খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, গিরিবালাও যোগ দিলেন, বিপিনবিহারীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"তোমার ভাইয়ের কাছে বলতে বোল না, সাহস থাকে তো,বাঙালী-মৈথিলের বোঝাপড়াটা ভালো করে হয়ে যাবে'খন।"

"ও মা, ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর নাগাড়ে বাংলায় কাটিয়ে নিজেরই তার জাত আছে না কি?"

বর্ধিত হাসির মধ্যেই গিরিবালা অনুযোগের স্বরে বলিলেন—"তুমি বুঝি আমাদের ছোট করছ ভাই?"

"আমারই জাত আছে না কি?"—বলিয়া দুলারমন আবার খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আসে-পাশে লোকের জন্য হাসিটা চাপা দেওয়ার চেষ্টায় দু'জনেরই শরীর কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

একটু পরে নিজেকে সংবৃত করিয়া লইয়া দুলারমন বলিলেন—"গেরো!…হ্যাঁ, কি কথা হচ্ছিল? হ্যাঁ, আমার তো বেশ ভালোই লাগত ভাই, বেশ মানুষ সব। মানুষ যে ভালো তার নমুনা তো আগেই পেয়েছিলাম—পাণ্ডুলে।"

মুখটা একটু আড় করিয়া লইয়া প্রীতিস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে গিরিবালার পানে চাহিয়া রহিলেন। প্রশংসার অস্বস্তিটা এড়াইবার জন্যই গিরিবালা বলিলেন—"তা তো হোল; কিন্তু চাকরিটা হোল কি করে বললে না তো; বেশ খোঁটার জোর না থাকলে তো হয় না এ সব চাকরি।"

দুলারমন আবার যেন একটু ফাঁকরে পড়িলেন। ঘরছাড়া, নিঃসহায় একটি যুবক নিজের অন্তরের প্রেরণায় সামাজিক কুসংস্কারের গণ্ডী কাটাইয়া শুধু নিজের উদ্যম আর অধ্যবসায়ের জোরে কি করিয়া জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল,—কত ঝড়, কত ঝঞ্ঝা, কত হীনতা, কত নৈরাশ্যের মধ্যে দিয়া এই বিজয় অভিযান—সে ইতিহাস তো শোনাইবারই মতো, বিশেষ করিয়া নিজের মনের মানুষকে; কিন্তু বড় লজ্জা করে। দুলারমন চুপ করিয়া একটু যেন ভাবিলেন, তাহার পর মুখটা তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন—"সে হবে'খন আর এক দিন, দুলারমন খালি বকে যাক, আর উনি শুনে যান, বা রে, কী চালাক!…এবার তোমাদের খবর বলো,—বিপিন ভাইয়া কেমন আছেন, কি ছেলেপুলে…"

"উনি ভালোই আছেন। ছেলেপুলে…"

—বলিয়া গিরিবালা আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন, চুপ করিয়া গেলেন। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল দুলারমনের প্রথম জীবনের কথা, একটু কুণ্ঠিত ভাবে মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, আগে

তোমার কি ছেলেপুলে বলো, অন্য কথা না হয় পরেই শুনব।"
ঐ তো একটি মেয়ে…"

প্রশ্নের উদ্দেশ্যটি বুঝিলেন দুলারমন; এমনি কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সাধারণ ভাবেই জবাব দিতেন, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে পারিলেন না; সেই পুরানো দিনের কথা সব মনে পড়িয়া গেল,—সেই দুঃখে, তাপে, গঞ্জনায়, অত্যাচারে না-পাইতেই হারানোর কথা,—মুখটা যেন কি-রকম হইয়া গেল, গিরিবালার মুখের পানে যেন চাহিতে পারিতেছেন না; শেষে চোখ দুইটি পর্য্যন্ত ছল-ছল করিয়া উঠিল, ধরা-গলায় বলিলেন—"দুলহীন, ছেলেরা বড্ড অভিমানী হয় যে,—একবার এসে আদরের ঘটা দেখে আর…"

মুখটা ঘুরাইয়া চোখ দুইটা মুছিয়া লইলেন।

গিরিবালা অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন, বলিলেন—"চুপ করো ভাই, আমারই ভুল হয়ে গেছে…"

মুস্কিল হইল এর পরেই নিজের সন্তানের প্রসঙ্গটা তোলা,—ভগবানের অসীম দয়া, আর যাই হোক, অন্ততঃ এদিক দিয়া তাঁহাকে যে সমৃদ্ধই করিয়াছেন। অস্বস্তিতে পড়িয়া একটু চুপ করিয়াই থাকিতে হইল, তাহার পর সামলাইয়া লইলেন দুলারমনই।—নিজেকে সংযত করিয়া লইয়াছেন, মুখটা ফিরাইয়া একটু হাসিয়াই বলিলেন—"এত বাজে কথাও মনে পড়ে যায়!…ঠিক কথা, তোমার বড় ছেলের তো বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা দুলহীন? শশাঙ্ক নাম ছিল না?"

গিরিবালা যেন বাঁচিলেন, বলিলেন—"হয়ে গেছে বিয়ে তার।"

দুলারমনের মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিলেন—"সত্যি! বৌকে এনেছ না কি থিয়েটার দেখতে, না, আপনি নাপিয়ে এসেছ?"

"হ্যাঁ, এনেছেন বৈ কি, দেখবেখন, সেজ বৌমাও এসেছেন।"

"সেজ?…দাঁড়াও, হরেন নাম ছিল তো? দেখো, আমার ঠিক মনে আছে, একটু দুরন্ত ছিল বেশি…"

গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, আজকাল ঠাণ্ডা হয়েছে।"

"শোন কথা দুলহীনের! চিরকালটাই না কি এক ভাবে থাকে গা? যে যত দুষ্টু সে আবার তত ঠাণ্ডা হয় পরের কালে…আর মেজ বৌমা?" মেজ ছেলের নাম শৈলেন ছিল না? একটু যেন…"

গিরিবালার মুখের পানে চাহিয়া দুলারমনের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল; মুখটা তাঁহার একেবারেই নিষ্প্রভ হইয়া গেছে। একেবারে চরমতম আশঙ্কার সহিত যেন সম্মোহিত ভাবেই দুলারমন মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

গিরিবালা বলিলেন—"মেজটি বিয়ে করতে চাইলেন না তখন ভাই, সে দুঃখের কথা আর বোল না।"

দুলারমন রুদ্ধশ্বাসটা ধীরে ধীরে মোচন করিয়া দিলেন। ভয়টা একেবারে উগ্রতম হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনটা তাঁহার এত হালকা হইয়া উঠিল যে, এই নৈরাশ্যটুকু গায়েই মাখিলেন না; হাসিয়াই বলিলেন—"চাইলে না তো?—আমি মোটেই আশ্চর্য হইনি মেজ ছেলে যে!—ভোগাবে। আমি অনেক মিলিয়ে দেখেছি যে; তোমাদের নন্দাইও বাপ-মায়ের মেজ ছেলে…নাকের জলে চোখের জলে করবে…"

হাসিয়া আঙুল নাড়িয়া দৈবজ্ঞের মতো বলার ভঙ্গীতে গিরিবালাও হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন—"কিন্তু এই এখন আবার রাজি হয়েছে, সেজ ছেলের, ন' ছেলের হয়ে গেল বিয়ে, পরেরটির কথাবার্তা চলছে, এত দিন পরে এখন বলছে…"

দুলারমন একেবারে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—"ঠিক হয়েছে, ঐ ওষুধ ওদের। একেবারে গা ক'রো না। ইস্, ব্যাটারা আমার সব ভীষ্মদেব হবেন, সংসার আর থেকে কাজ নেই!…এবার ধমকে বলবে—'যা, বিয়ে করবি তো নিজের বৌ দেখে নিগে যা, আমরা আর ও-সবের মধ্যে নেই; দেখো না, কি রকম কেঁচোটি হয়ে—"

মুখে আঁচল দিয়া দু'জনে দুলিয়া-দুলিয়া হাসিতেছেন, ননীবালা আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত গম্ভীর ভাবে চাহিয়া বলিলেন—"ও মা, আর আমি ওদিকে জায়গা রাখবার জন্যে সবার সঙ্গে ঝগড়া করে মরছি!"

গিরিবালা হাসিতে হাসিতেই দুলারমনকে সাক্ষী মানিয়া বলিলেন—"আর আমাদেরও তো এখানে ঝগড়ার কথাই হচ্ছিল, না ভাই?"

দুলারমন ননীবালার গম্ভীর ভাব লক্ষ্য করিয়া উত্তর করিলেন—"হ্যাঁ, এবার গুটি-গুটি চলো, নৈলে কি হয় বলা যায় না; ঝগড়ারই হাওয়া উঠেছে এখানে,—ইনিও যে শান্তির জল ছিটোতে এসেছেন এমন মনে হয় না।"

আর একটা হাসির তরঙ্গ তুলিয়া তিন জনে প্রেক্ষাগৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন।

৪

মনে হইল জীবন যেন পরিপূর্ণ ভাবে সার্থক হইয়া আসিতেছে। দুলারমনকে এত দিন পরে ফিরিয়া পাওয়া, তাও আবার এই রকম অদ্ভুত পরিবর্তনের মধ্যে।—সবটুকু মিলিয়া গিরিবালাকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল। দুলারমনের এই সুখ—এও যেন তাঁহার সুখেরই পূর্ণতা: কোথায় একটু খালি ছিল, ভগবান যেন সেইটুকু পুরাইয়া দিলেন। এই রকমই তো হয় মনে; শুধু নিজের সংসারটুকু লইয়াই তো জীবন নয়; সুখের দিনে মনে হয় যাহাকে যাহাকে জীবনে ভালোবাসিয়াছি, সবাইকেই সুখী দেখি। ঠিক এই সময়টিতে আনন্দকে গ্রহণ করিবার জন্য গিরিবালার মনটা প্রস্তুতও ছিল বেশি করিয়া,—সেজ ছেলে এত দিন পরে বলিয়াছে বিবাহ করিবে, বহু দিনের একটা ভার নামিয়া গিয়া মনটা হাল্কাও ছিল; দুলারমনঘটিত সমস্ত ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত স্নিগ্ধতায় যেন আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

দেরি করিয়া উঠিবার কথা, কিন্তু ঘুমটা ভোরেই ভাঙিয়া গেল। বাড়িতে কিছু একটা উৎসব থাকিলে, কিম্বা কিছু একটা নূতন জিনিস পাইলে যেমন একটা প্রসন্ন চাঞ্চল্য শিশুদের মনটা ভরিয়া থাকে—ঘুমাইতে দেয় না, কতকটা সেইরূপ। আকাশে টুকরা টুকরা মেঘ, সূর্যোদয় হইবে, হাল্কা গাঢ় কত রকম রঙের পূর্বাভাস লাগিয়াছে, আর সবগুলাই ক্রমে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব দিকের জানালার কাছটিতে গিরিবালা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আজ প্রত্যেকটি জিনিসই লাগিতেছে মিষ্ট, অতি সামান্য ঘটনাটুকুও জীবনের মধু নিংড়াইয়া দিতেছে।…কখন এক সময় মনটা দিনের প্রভাত থেকে জীবনের প্রভাতে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই খেলাঘরের দিনগুলি—এক একটা ছবি এখনও বেশ স্পষ্ট—কামিনীতলায় ভাঙা পুতুল লইয়া খেলা, মা ভাত খাইবার জন্য তাগাদা দিতেছেন রান্নাঘর থেকে।…আজ গিরিবালার নাতি-নাতনিরা জীবনের ঐ

পর্যায়ে; বড় আশ্চর্য লাগে।…তাহার পর বিবাহ,—সাঁতরা, পাণ্ডুল আর দ্বারভাঙ্গারও প্রথম জীবন। কত বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়া জীবনের গতি। তাহার মধ্যে পাণ্ডুল আর দ্বারভাঙ্গার নিদারুণ দুঃখের দিনগুলাও আছে। কিন্তু কৈ, তবুও তো জীবনকে মন্দ লাগে না। দুঃখও জীবনকে দেয় পূর্ণতা,—ছেলেদের মধ্যে কে যেন সেদিন কথাটা বলিল। সত্যই তো, অসুখ লুকাইবার জন্য গিরিবালা সুস্থতার ভাণ করিলেন, স্বামী প্রবঞ্চিত হইলেন, কিন্তু শশাঙ্ক তো ঠিক ধরিয়া ফেলিল, মাকে বাঁচাইবার জন্য জীবনের সব উচ্চাশা ছাড়িয়া বাড়ি আসিয়া বসিল। দুঃখের এ দান গিরিবালা কি কখনও ভুলিতে পারিবেন? মা হওয়ার এই গৌরবটুকু পাওয়ার জন্য সে জন্ম জন্ম ধরিয়া দুঃখের সাধনা করা চলে।

প্রভাত আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে. এতক্ষণ শুধু আলোর খেলা ছিল, একটু একটু করিয়া শব্দও জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার পর নূতন জাগিয়া-ওঠা মানুষের কণ্ঠ—গিরিবালার ছোট নাতিটির গলাও শোনা যাইতেছে—মেজ বধূ প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলেন—"সেই রাত তিনটে থেকে উঠে সমস্ত বিছানাটায় দৌরাত্ম্য করে বেড়ায় মা, একটুও যদি চোখ বুজতে দেয়…"

আপনি আপনি গিরিবালার মুখে একটি স্মিত হাস্য ফুটিয়া উঠিল,—ওদের সবই তো এমনি করিয়া হয় দিয়া দিতে,—আপনার বলিয়া কিছু কি রাখিতে দেয় ওরা? তবু সে ওদের চাই-ই। দুলাররমনের আপশোষ তো এত পাইয়াও গেল না,—অভাব শুধু এইটুকুরই তো?

রাস্তার ওধারে আম গাছটির পিছনে ধীরে ধীরে সূর্যোদয় হইল। শাখা-পল্লব-কিশলয়-মুকুলে সমস্ত গাছটিকে মনে হইতেছে যেন একখানি সংসার তাঁহাদের নিজেদের জীবনের সঙ্গে কোথায় একটি বেশ মিল আছে; এই নূতন সূর্যের আলো আসিয়া পড়িল, ওটুকু যেন কেমন করিয়া কোথা দিয়া তাঁহাদের সংসারেও আসিয়া পড়িয়াছে।…বোধ হয় কবি-পিতার উত্তরাধিকারেই খুব দুঃখ কিম্বা খুব সুখের সময় এই রকম গোছের এক একটা অস্পষ্ট অনুভূতি গিরিবালার মনে আসিয়া পড়ে, অনুরূপ শিক্ষার অভাবেই সেটাকে রূপ দিতে পারেন না, স্থিরদৃষ্টিতে শূন্যে চাহিয়া থাকেন।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গিয়া গিরিবালার ভিতরটা যেন হাসিতে উচ্ছল হইয়া উঠিল,—দুলাররমন বেশ বলিয়াছে—"একেবারে গা কোর না দুলহীন, এবার ধমকে বলবে—বিয় করতে হয় তো যা নিজের বৌ খুঁজে নিগে যা, আমরা আর ও সবের মধ্যে নেই…"

আনন্দকে একটু কৌতুক-রসে মিশাইয়া লইলে যেন আরও মজে, মনটা ক্রমাগতই দুলাররমনের কথাগুলা লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে লাগিল, আর ততই বুকে হাসি যেন গুর-গুর করিয়া উঠিতে লাগিল। বিবাহ যখন সুনিশ্চিন্ত, একবার যদি বলা যাইত শৈলেনকে এ-কথাগুলা!…নিজের দ্বারা হইবে না অবশ্য, মায়ের মুখে শুনিলে কি হইতে কি হয়, ঐ তো ছেলে। তবে বলিবার লোক আছে—ননীবালা,—সে আরও একটু অম্লরস মিশাইয়া কথাটিকে এমন সরস করিয়া তুলিবে যে বিয়ের বাড়িতে একটা উপভোগ্য জিনিষ হইয়া থাকিবে।…তাহার পর গিরিবালার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল দুলার-মনের কথা,—ঠিক তো, সে তো আসিবেই, তাহাকেই চটামি করিয়া টিপিয়া দিন না—বলিবার অমন লোক তো আর পাওয়া যাইবে না।…কৌতুকরসে গিরিবালার মনটি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; একটি দৃশ্য হইয়া উঠিতেছে—দুলাররমন আসিয়াছে—শৈলেনকে ডাকিয়া গিরিবালা দুলাররমনকে পরিচিত করিয়া দিলেন—প্রণাম করিয়া শৈলেন সামনেই একটু জবুথবু হইয়া দাঁড়াইয়াছে—যেমন সে দাঁড়ায়—দুলাররমন আশীর্বাদের পর অল্প হাসি মুখে লইয়া বলিতেছে—"উঃ!—এই শৈলেন? সেই এতটুকু দেখেছিলাম পাণ্ডুলে।…শুনলাম তোমার সব ভালো, কিন্তু এ-দুর্মতি কোথা থেকে সেঁদুল মাথায়,—বিয়ে করব না?…আমি বাবা খুব রাগ করেছি—তোমার মাকে বলছিলাম—থাক্, তোমরা আর এর মধ্যে থাকতে যেও না, বেটা আমার সায়েবের জামাই, নিজের ক'নে নিজেই বেছে নিক গে।"

—সঙ্গে সঙ্গে কথার সব গুরুত্ব ছিন্নভিন্ন করিয়া পাণ্ডুলের সেই হাসি…

বড় মেয়ে খুকি আসিয়া একটু যেন কিরকম ভাবে প্রশ্ন করিল—"মা, মেজ দাদার আজ সকালের ট্রেনে কোথাও যাবার কথা ছিল না কি?"

গিরিবালার বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, কিন্তু কি ভাবিয়া নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সহজ কণ্ঠে বলিলেন—"কৈ না…মানে, জানি না তো।"

এর পরেই একটু চুপ করিয়া গেলেন, অর্থাৎ কন্যা কেন এ প্রশ্ন করিল এটা জিজ্ঞাসা করতে সাহস হইতেছে না। বুকের ধুক-ধুকুনিটা হঠাৎ অতিরিক্ত বাড়িয়া গেছে। একটু থামিয়া কণ্ঠস্বর আরও নিশ্চিন্ত করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কেন রে? ও কথা জিগ্যেস করলি যে?"

কন্যা বলিল—"না, খুব ভোরে—অল্প অন্ধকার রয়েছে তখনও—একবার উঠেছিলাম—মনে হোল মেজ দাদার মতন ঐ মোড় ঘুরে ষ্টেশনের রাস্তা ধরে কে যেন চলে গেল—একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাদের বাড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে যেন দেখলেও। মেজ দাদা তো বেড়ানও না সকালে, তাও আবার অত সকালে…"

গিরিবালার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন কানে আসিয়া জড়ো হইয়াছে, প্রতিটি কথার সঙ্গে বুকের ধুকধুকুনি যাইতেছে বাড়িয়া—শব্দটা যেন বাহির হইতে শোনা যায়। তবু প্রাণপণে সহজ ভাবটা ধরিয়া আছেন; তবে মুখে প্রশ্ন আর জোগাইতে না। কন্যা জিজ্ঞাসা করিল—"কাউকে বলব—বাইরের ঘরটা একবার দেখতে?"

গিরিবালা হঠাৎ একটু ধমকের সুরেই বলিলেন—"কেন?"

তাহার পরই আবার খুব সহজ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলিলেন—"কে না কে যাচ্ছিল। রাস্তা দিয়ে লোক চলবে না?…তুই যা, খোকা উঠেছে মনে হচ্ছে।"

কন্যা চলিয়া গেল।

গিরিবালা যেন কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাহিরটা যেমন অচপল, ভিতরটা তেমনই আছাড়ি-পাছাড়ি খাইতেছে: শৈলেন চলিয়া গেছে বাড়ি ছাড়িয়া, নিশ্চয়—অতি নিশ্চয় একেবারে—জননীর অন্তর দিয়া গিরিবালা জানেন ওর ভিতরে একটা বিক্ষোভ আছে; একটা দুরন্ত ঘূর্ণি, যা ওকে কখনই স্থিতু হইতে দিবে না, ঘর বাঁধিতে

দিবে না—সমস্ত আশার পাশে পাশে এ নিত্য আশঙ্কা।···শৈলেন গেছেই বাড়ি ছাড়িয়া, এতটুকু সন্দেহ নাই গিরিবালার—তবু মায়ের প্রাণ, একেবারে নির্ভুল প্রমাণের সামনা-সামনি হইতে পারিতেছে না। সেই প্রভাত আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু একেবারে মলিন। কেমন একটা অদ্ভুত ধরণের ভয় জাগিতেছে মনে—যে প্রমাণগুলাকে, অর্থাৎ নিশ্চিন্তের যে-রূপকে গিরিবালা এড়াইতে চাহিতেছেন, একটু পরেই সবাই জাগিয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেটা ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে।···যে-দিনটাকে এই কয়েক মুহূর্ত আগে পর্যন্ত এত আশ্চর্য রকম মিষ্ট বোধ হইতেছিল, সেটা আতঙ্কের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কোন রকমে পরিত্রাণ নাই এর হাত থেকে? বাড়ির প্রত্যেক মানুষটিকে, এতটুকু ছেলেকে পর্যন্ত ভয় হইতেছে—কে কখন আসিয়া কি ভাবে খবরটা দিবে; আর অবিশ্বাস করিবার, আর সহজ অবহেলার কণ্ঠে উত্তর দিবার কোন উপায়ই থাকিবে না।

গিরিবালা জানালাটির সামনেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, সংসারটা চারি দিক দিয়া জাগিয়া উঠিতে লাগিল—কর্ম্মে-কলরবে। শৈলেন দেরি করিয়া ওঠে, এদিকে খুকি নিজের শিশুকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে নিজেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সংবাদটা আর এক চোট চাপা রহিল কিছুক্ষণ ধরিয়া। তাহার পর বাহিরে হঠাৎ নূতন করিয়া যেন চাঞ্চল্য উঠিল—কতকগুলা উৎসুক প্রশ্ন, কতকগুলা এলো মেলো উত্তর—সবগুলাতেই একটা ভয়ের, উৎকণ্ঠার ছাপ। এক সময় ছোট ছেলে খোকা আসিয়া চোখ বড় বড় করিয়া খবর দিল—"মা, মেজদা সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন!"

—ছেলেমানুষ, যতটা কল্পনায় আসে গুরুত্বপূর্ণ এবং মানানসই করিয়াই দিল খবরটা, নিজেদের বাড়ির এত বড় একটা সংবাদ!

গিরিবালা ঘাড় ফিরাইয়া সহজ অবিশ্বাসের গলায় কি বলিতে যাইতেছিলেন, তাহার আগেই স্বয়ং বিপিনবিহারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন; গম্ভীর, অনাসক্ত; হাতে একটা ছোট চিরকুট, গিরিবালার দিকে বাড়াইয়া বলিলেন—"নাও, বিয়ে—বিয়ে, এই পড়ো ছেলের চিঠি।"

গিরিবালা প্রাণপণে সত্যটাকে ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন—শেষ পর্যন্ত;—"কে?—কি চিঠি?···কার কথা?"

হাতে চিরকুটটা লইয়া স্থিরদৃষ্টিতে সেটার পানে চাহিয়া রহিলেন, অক্ষরগুলায় যেন চোখ বসিতেছে না, তাহার পর এক সময় পড়িলেন। লেখা আছে—"চাকরিটি ছাড়িয়াই যাইতেছি, অতটা অন্যায় সহ্য হইল না। বিবাহের কথাটাও থাক, অযথা সমস্যা বাড়াইয়া ফল কি? চেষ্টা করিয়াছিলাম, তবু কিন্তু তোমাদের কষ্টের কারণ হইয়াও থাকিতে হইল। এই আমার অদৃষ্ট, কি করি?"

গিরিবালা স্বামীর মুখের পানে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। ভাবনা গিয়া আশঙ্কায় দাঁড়াইয়াছে, কি ভাবে ব্যাপারটা গ্রহণ করিবেন তিনি?—অন্য কথা বাদ দিলেও, বিবাহের কথাবার্ত্তা যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গেছে, নিরাশা, লজ্জা, অপরের কাছে সম্ভ্রমহানি, ছেলের অভিশপ্ত জীবনের উপর পিতারও অভিশাপ আসিয়া পড়িবে না তো? যে ভাবে—যে অসহ্য অবস্থার মধ্যে অসীম সহিষ্ণুতায় এদের সবাইকে মানুষ করা, এতটা অকৃতজ্ঞতা কি সহ্য করিতে পারিবেন তিনি?···মায়ের কথা আলাদা, মায়ের সবই সয়।

গিরিবালার দৃষ্টি ধীরে ধীরে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এক সময় বলিলেন—"ছেলেমানুষ—না বুঝে···"

বিপিনবিহারীর মুখের একটি রেখাও কোথাও পরিবর্ত্তন নাই; বলিলেন—"সাতাশ বছর পেরিয়ে গেছে।"

গিরিবালা আরও ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন, অসহায় ভাবে একবার এদিক ওদিক চাহিয়া একটা মস্ত বড় যুক্তির কথা মনে পড়িয়া গেছে এই ভাবে বলিলেন—"সাতাশ হলেই কি বুদ্ধি হয়? বেটাছেলে···"

অদ্ভুত যুক্তিতে বিপিনবিহারীর ওষ্ঠাধর অল্প একটু কুঞ্চিত হইল, বলিলেন—"বাইশ বছরে আমি একটা পূরো সংসার ঘাড়ে করেছিলাম।"

গিরিবালা এবার ভীত হইয়া পড়িলেন। বেশ খানিকক্ষণই ওর মুখে কোন কথাই জোগাইল না; একটা অনিশ্চিত ভয়ে একবার স্বামীর মুখের পানে, একবার নিচে, একবার এদিকে, একবার ওদিকে চাহিলেন। তাহার পর হঠাৎ একটা বিসদৃশ কথা বলিয়া বসিলেন—"ত্যাজ্যপুত্র করবে না তো? না, করো না।"

তর্কে কুলাইল না, এবার ভিক্ষা। সৃষ্টির আদি থেকে সন্তান লইয়া পিতা বিচারক। মাতা করুণার ভিখারিণী। গিরিবালার দৃষ্টিতে ভয়, ব্যাকুলতা, মিনতি সব একসঙ্গে আসিয়া জমা হইয়াছে।

বিপিনবিহারী এবার বেশ স্পষ্ট ভাবেই হাসিলেন, বলিলেন—"বেশ বলেছ, সমস্ত জীবন ধরে মস্ত বড় সম্পত্তি গড়েছি—ত্যাজ্যপুত্র করে তাই থেকে ওকে বঞ্চিত করব!"

একটু চুপ করিয়া বলিলেন—"অনেক আশা করে ভেবেছিলাম—এরাই আমার এক-একটা সম্পত্তি; সে ভুলটা ভাঙল—"

গিরিবালা যেন প্রাণপণে একটা ভাঙনই বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এই ভাবে গভীর মিনতির কণ্ঠে বলিলেন—"আবার ফিরে আসবে। একটা খেয়ালের মাথায় গেছে চলে—ছেলেমানুষ···"

বিপিনবিহারী এ-কথার উপর মন্তব্য করিলেন না, নিজের কথার জের ধরিয়াই কহিলেন—"ভুল মানুষের যত শীগ্‌গির ভাঙে ততই মঙ্গল।"

আর কিছু না বলিয়া, কোন উত্তর না লইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন।

৫

দীর্ঘ একটা বৎসর কাটিয়া গেল।

এমন কিছু অনুর্বর বৎসরও নয়; সেজ ছেলে দূর বিদেশে কাজ লইয়াছিল, ছাড়িয়া-ছুড়িয়া বাড়ি আসিয়া বসিয়াছে। স্বাধীন ভাবে কাজ করিতেছে, উন্নতিও হইতেছে। একটি ছেলে সরকারি চাকরিতে পাকা হইল, একটি ছেলের ভালো চাকরি হইল। এক বৎসরের ফসল হিসাবে মন্দ কি?

কিন্তু সুখের চেয়ে দুঃখই গভীরতর রেখাপাত করে। শৈলেনের অনুপস্থিতির কথাটাই মনে যেন সব চেয়ে বড় হইয়া থাকে অষ্টপ্রহর, বরং যখন একটা আনন্দের কথা হয়, মনের আলোটা উজ্জ্বল হইয়া ওঠে—এই বিষাদের কৃষ্ণ রেখাটি হইয়া ওঠে সব চেয়ে বেশি স্পষ্ট।

একটা বৎসর শৈলেনের দেখা নাই, চিঠি নাই। বিপিনবিহারীর মনটা যেন দিন-দিন সংসার থেকে উঠিয়া যাইতেছে; ঠিক গায়ে মাখিয়া সংসারী হইয়া থাকাটা উঁহার আর ছিলই না এদিকে, কিন্তু

সেটা ছিল অন্য ধরণের ব্যাপার, কৃতজ্ঞ প্রসন্নতায় ধীরে ধীরে নিজেকে আলাদা করিয়া লইয়া এই সমস্ত দানের যিনি দাতা তাঁহার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। ছেলে-বৌয়েরা অনুযোগ করিলে হাসিয়া বলিতেন—"আমি এখন ভগবানের পেনশন ভোগ করছি, সামান্য যে গবর্ণমেণ্ট সে-ও এ অবস্থায় খাটতে দেয় না, আর আমি তাঁর দয়ার অমর্যাদা করব? এখন আমার কাজ মাঝে-মাঝে দাতার দরবারে গিয়ে সেলাম ঠোকা। নৈলে আবার পেনসন বাতিল হবার ভয় আছে তো?"

এখন অন্য রকম ভাব: সে তৃপ্ত ঔদাসীন্য নয়, নৈরাশ্যের বৈরাগ্য, একটা অবিশ্বাস, একটা সুগভীর বিশ্বাস যে এত যত্ন করিয়া গড়া সবই এক মুহূর্তে নিরর্থক হইয়া যাইতে পারে, যতক্ষণ আছে, যেথানে যে ভাবে আছে, থাক্, বুক দিয়া জড়াইয়া ধরিবার দরকার নাই; অনেক আশা করিয়া জড়াইতে গেলেই ফাঁকি,—দেখা যাইবে হাতটা শূন্যকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়াছে।

কিন্তু পুরুষকে যা সংসার থেকে আলাদা করে—বৈরাগ্য আনিয়া, মেয়েদের সেইটাই সংসারে টানে, নিবিড়তর মমতায়। গিরিবালা যেন আরও বুক দিয়া পড়িয়াছেন। সুখেরই দিন, চারটি ভাই একসঙ্গে হইয়া রোজগার করিতেছে—কিন্তু বুক দিয়া সে সুখের মধুটুকু আহরণ করিতেছেন এমন নয়, শুধু একটা আকুলি-বিকুলি—সব বজায় থাক্—কি করিয়া যে সব বজায় থাকিবে!—ঐ যে একটা অশান্তি ওটা বাড়ির কোথাও স্থায়ী অমঙ্গলের সূচনা করিতেছে না তো?—মায়ের ব্যথা বুকে গোপন করিয়া শুধু খুঁজিয়া বেড়ানো মুখে হাসিটুকু বজায় রাখিয়া।···হাসি যে সংসারের আলো,—নিজের মেদ জ্বালাইয়াও তাহাকে সজীব রাখিতে হইবে।

সংসারের বাইরেও এই আলো জ্বালিয়া রাখিতে হয়। ছেলে নিরুদ্দেশ, চিঠি দেয় না, এর লজ্জা যে কত গভীর, যার লজ্জা সেই জানে। অথচ মানের বড়াই করিতে হয়, মা হওয়ার মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখা চাই তো? বাহিরের কেহ সহানুভূতি দেখাইয়া প্রশ্ন করিলে গিরিবালা হাসিয়া বলেন—"বাবার—মানে, ওর ঠাকুরদাদার ধাত পেয়েছে যে, এক জায়গায় পাকা হয়ে না বসে চিঠি দেবে? বাবার কথা চলেই কান পেতে শুনত—ছেলেবেলা থেকেই, তখন কি জানি পেটে-পেটে এই সব মতলব জমছে?"

—যেন নিতান্তই হাসিয়া তর্কটা উড়াইয়া দেবার জিনিষ, প্রয়োজনের চেয়েও বেশি হাসি টানিয়া আনেন, যে-মা অসময়েও এত হাসিবার ক্ষমতা দিয়াছেন, কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাকে স্মরণ করেন।

এদিকে যেখানে নিতান্তই একা সেখানে অবিরাম হাহাকার চলিতেছে—এত অকৃতজ্ঞ—চিঠি পর্যন্ত দিল না! এত অবহেলা!···

গিরিবালা জানালাটির ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন, সেই জানালার ধারে যেখানে গভীরতম দুঃখের দিনের প্রভাতটি আর সব দিনের চেয়ে মোহময় হইয়া বিকশিত হইয়াছিল। অন্ধকারই যেন বাছিয়া—দুঃখে, অভিমানে চক্ষু সজল হইয়া ওঠে, তাড়াতাড়ি মুছিয়া চিন্তার গতি রুদ্ধ করেন—না, এতটুকু অভিমান করা চলিবে না। এতটুকু ক্ষোভ নয়। এই মায়ের অদৃষ্ট, প্রসন্ন মনে সহিয়া যাইতে হইবে, হ্যাঁ, প্রসন্ন মনেই; মুখের হাসি যেন মনের গভীরে পর্যন্ত প্রবেশ করে—মায়ের অভিমানে, মায়ের ক্ষোভে যে বিষ আছে—ছেলে প্রবাসে, আরও বেশি হাসি দিয়া সহিয়া যাইতে হইবে—এই অভিমানের জন্যই মাকে এত আলাদা করিয়া গড়িয়াছেন যে বিধাতা।

স্বামীর অভিমানেও ভয় হয়। নিজের অন্তর দিয়াই তো বোঝেন সেটা কত গভীর। চেষ্টা করেন মাঝে মাঝে। এক দিন বেশ লঘু ভাবই বলিয়াছিলেন—তোমার যেন আবার একটু বাড়াবাড়ি ভাবনা, মেয়েছেলে হয়েও তো আমি কৈ অতটা করি না। স্পষ্ট দেখছি বাবার ধাত পেয়েছে। যেমন গেছে তেমনি হঠাৎ এক দিন···"

মাঝ-পথেই থামিয়া যাইতে হইয়াছিল; বিপিনবিহারী বেশ একটু আপত্তির সহিতই স্ত্রীর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়াছেন—আর যা করো, বাবার সঙ্গে তুলনা করো না, বাবা বীরের মতন সংসারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, কাপুরুষের মতন এড়িয়ে যাননি স্নেহের জন্যে ছেলের মর্যাদা বাড়াতে চাও অন্য ভাবে বাড়াও, বাবার মর্যাদা ছোট করে নয়।"

ঠিক এক বৎসর নয় মাস পরে শৈলেন বাড়ি ফিরিল। হিসাবটা গিরিবালারই; অনেক দিন পরে এক দিন আলোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন—"ঠিক এক বছর ন'মাস পরে তুই এলি, একটা দিন বেশি হয়েছিল।"

শৈলেন একটু অপ্রতিভ হইলই, মাথাটা একটু নুইয়াও পড়িল, তবে সেই সঙ্গে একটু গর্ব যে না হইল, এমন নয়, দুঃখ দিয়াও এই যে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা জানাইয়া রাখা মনে সন্তানের এই যে অধিকার—এ গর্বের বৈ কি। তবুও অপ্রতিভ ভাবটা কাটাইবার জন্য হাসিয়া বলিল—"বাবাঃ, মা যেন পাঁজি হাতে করে বসে দিন গুণছিলেন—কবে ফিরবে, ভালো করে খোঁটা দোব।"

শৈলেনের জীবনের যে ব্যর্থতা, এ কাহিনীর সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অল্পই, অর্থাৎ ততটুকুই, গিরিবালার জীবনে তাহা যে পরিমাণে ব্যর্থতা সঞ্চার করিয়া রাখিল। কে জানে?—হয় তো মায়ের জীবনকে পূর্ণ ভাবে বিকশিত করিতে এটুকুর দরকার ছিল; এই যে নিবিড় বেদনার প্রতিদানে ক্ষমা—এই যে অভিশাপকে আশীর্বাদ—এ অমৃত মায়ের হৃদয় মন্থন না করিয়া ভগবান আর কোথায় তুলিতে পারিতেন?

এক কথায় এই যুগের যা ট্র্যাজেডি শৈলেনের জীবনেও সেই ট্র্যাজেডি, অর্থাৎ প্রতি পদে জীবনকে প্রশ্ন করিয়া করিয়া অগ্রসর হওয়া বা হওয়ার চেষ্টা করা। কিন্তু এত প্রশ্ন জীবন সহ্য করিতে পারে না। তাই যে করে প্রশ্ন তাহাকে দূরে ঠেলিয়াই রাখে; জীবন বলে—আলো-ছায়ায় আমার রূপের পূর্ণতা; আজই নয়, এই আমার যুগ-যুগের ইতিহাস; আমায় গ্রহণ করিবে তো সেই পূর্ণতায় গ্রহণ করো; পূর্ণ সাহসে; নয় তো আমাদের পথ আলাদা—নয় তো আদর্শের আলেয়ার পিছনে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দাও গিয়া।···শৈলেনের জীবনে এই ট্র্যাজেডি। এই প্রায় দুই বৎসরের কাহিনী সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই, শুধু শেষ দিনের কথাটুকু বলিলেই চলিবে।

আলেয়ার পিছনে ঘুরিতে ঘুরিতে সত্যই শৈলেন নিঃশেষিত হইয়া গেল। প্রথমটা চিঠি দিল না বিবাহ ভঙ্গ করিয়া আসিবার জন্যই, গৃহান্তরেও সন্ধান পাইলে নিজের দিকের এঁরা, আবার ওদিক্ থেকে কন্যাপক্ষ আসিয়া কোন রকমে জোয়াল চাপাইয়াই দিবেন ঘাড়ে।

অজ্ঞাত প্রবাসই চলুক। যত দিনে বিবাহের বিপদটা কাটিল, তত দিনে এদিকে অপরাধের গ্লানিটা গেছে বাড়িয়া, তাহার সঙ্গে আসিয়াছে নৈরাশ্যের অবসাদ। পিতামহ মধুসূদনের আদর্শটা সামনে ছিল; আশা ছিল, মানুষের হইয়া, পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়ার অপরাধটা পৌরুষে ক্ষালন করিয়া আবার সংসারে গিয়া দাঁড়াইবে। দুই বৎসরের ঘুরাঘুরিতে কিছুই হইল না। কেন বলা সহজ নহে;—হয় তো পিতামহের সে-যুগ নাই, হয় তো সে-সাহস নাই, হয় তো সে-অদৃষ্টই নয়। দু'-এক জায়গায় চাকরি হইল, কিন্তু বড় আদর্শ ধরিয়া থাকার জন্য তাহার গ্লানিটাই যেন চোখের উপর উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। পৃষ্ঠভঙ্গ। অন্য ভাবেও জীবনকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিল—যেখানে গ্লানি নাই সেখানে নিজেরই অক্ষমতা আছে, সেটা স্বীকার না করিলেও পরিণামে তাই দাঁড়ায়। আবার পৃষ্ঠভঙ্গ। বেশ বোঝা যায় নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে, মানুষের মতো মানুষ হওয়া দূরের কথা, মনুষ্যত্বের যাহা শেষ সম্বল—আশা আর একটু বিশ্বাসের রেশ—সেটুকুও বোধ হয় যায় মুছিয়া।···এক সময়ে মুছিয়া গেলও, শৈলেন সত্যই নিশেষিত হইয়া জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল।

সেই দিনটির কথাই বলা যাক্।—

গঙ্গার একটা পার-ঘাট। শৈলেন ট্রেণে করিয়া আসিয়া পৌছিলে,—ওপারে গিয়া গাড়ি ধরিয়া একটা জায়গায় যাইবে। একটা নূতন আশা পাইয়াছে। তাহারই আলোক লক্ষ্য করিয়া যাত্রা। গাড়িটা বেলা চারিটার সময় পৌছিবার কথা, পৌছিল সাড়ে পাঁচটায়; নামিয়া শুনিল ষ্টীমার ছাড়িয়া দিয়াছে।

আজ-কাল অল্পেই মনের প্রসন্নতা নষ্ট হইয়া যায়, যেটুকু বা আছে। অল্পেই মনে হয় তাহাকে ঘিরিয়া একটা চক্রান্ত চলিয়াছে। শৈলেন প্ল্যাটফরমে একটা বেঞ্চে চুপ করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। এর পরের ষ্টীমার রাত নয়টায়। উল্টা দিক থেকে একটা গাড়ি আসিল, খানিকটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। শৈলেন অসাড় ভাবে চাহিয়া রহিল খানিক; অই আসা-যাওয়া, খোঁজা-পাওয়া, হাঁক-ডাক, ছুটাছুটি, মনে একটা স্পন্দন জাগায় অন্য সময়, আজ যেন কোন অর্থ-গ্রহণই হইতেছে না। গাড়িটা চলিয়া গেল, ষ্টেশনটা আবার শান্ত হইল। গরম পড়িয়াছে, তার আজ নাওয়া-খাওয়ার সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ নাই, একটু হাওয়ায় আশায় শৈলেন প্ল্যাটফরম্ ছাড়িয়া গঙ্গার দিকে চলিয়া গেল। আষাঢ়ের মাঝামাঝি, কয়েকটা বর্ষা হইয়া গেছে, গঙ্গা কোল ছাড়িয়া বেশ খানিকটা উঠিয়া আসিয়াছে, গৈরিক জলস্রোতে কল্লোল জাগিয়াছে।

একটু-একটু হাওয়া আছে, কিন্তু দুইটা ট্রেনের লোক, অসহ্য ভিড়; অত মুক্ত হাওয়ার মধ্যেও যেন হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। শুধু কি ভিড়?—অসম্ভব নোংরামি। গ্লানিতে মনটা আরও তিক্ত হইয়া ওঠে, মনে হয় ঐ গাড়িটার আসা আর এই অপরিচ্ছন্ন জনরাশি ঢালিয়া দেওয়া, এ-ও সেই কূট চক্রান্তের মধ্যে। এ জায়গাটা ছাড়িয়া শৈলেন গাঙ্গার তীর ধরিয়া স্রোতের উল্টা দিকে অগ্রসর হইল। ছোট ঝোঁপ-ঝাড়, ভুট্টা-জানোয়ার মধ্যে দিয়া একটা সরু গুণটানা পথ চলিয়া গিয়াছে, সেইটা ধরিয়া বরাবর চলিল। অপ্রসন্নতাটুকু ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহার জায়গায় ধীরে ধীরে কী যে একটা অদ্ভুত ভাবে মনটা ভরিয়া যাইতেছে, ঠিক যেন ধরা যাইতেছে না। শুধু এইটুকু বোঝা যাইতেছে, সেটা ঠিক প্রসন্নতা নয়, একটা যেন পাঁচমিশালি অনুভূতি, জীবনে এর আগে কখনও এর সন্ধান পাইয়াছে বলিয়া মনে পড়িতেছে না,—একটা অব্যক্ত বিষাদ, খানিকটা ঔদাসীন্য, তাহার সঙ্গে একটা অদ্ভুত শূন্যতা।

পাশেই নিচে বর্ষাস্ফীত গঙ্গার কলতান। সামনে একটা বড় চড়া কিছু আবদ্ধ আছে, মত্ত স্রোত সেটাকে যেন চারি দিক থেকে চাপিয়া ধরিয়াছে। আজ চিন্তার বেশ স্পষ্টতা নাই শৈলেনের, দু'-একটা এই সব দৃশ্য মাঝে-মাঝে আরও অন্যমনস্ক করিয়া দিতেছে। চরের উপর দু'-একটা খড়ের ঘর, তীরে দু'একখানা নৌকা বাঁধা রহিয়াছে, একটু ত্রস্ত-চাঞ্চল্যে কয়েক জন কুটির থেকে কি সব জিনিষ-পত্র আনিয়া তাহাতে তুলিতেছে। সূর্য রাঙা হইয়া আসিয়াছে, চারি দিকে কলমুখর জলরাশি, তাহার মধ্যে এই অভিশপ্ত চরে জীবনের এই স্পন্দনটুকু বড় অদ্ভুত লাগিল; শৈলেন খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিল, বেশ অনেক ক্ষণ, তাহার পর আবার অগ্রসর হইল।···এক-এক জায়গায় তীরের খানিকটা করিয়া ধ্বসিয়া গেছে, একেবারে সিধা, প্রায় দুই তলা নিচে গঙ্গা—ছোট মেয়ের মত পাঁক ঘোলাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে···শৈলেন একবার ফিরিয়া দেখিল, অনেক দূরে ষ্টেশন, মাইল খানেকের উপরই হইবে। সেই ভিড়টা—জীবন যেন জট পাকাইয়া গেছে। একটু দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহার পর বিতৃষ্ণায় মুখটা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—শৈলেন বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল—কেন, এর আগে লোক-সমাগম তো তাহার বরাবর ভালোই লাগিয়া আসিয়াছে! কারণটা ঠিক বোঝা গেল না! শৈলেন আবার আগাইয়া চলিল।···সামনে সূর্য আরও রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। একবার মনে হইল, না ফেরা যাক, অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল ষ্টীমার তো সেই ন'টায়। আগাইয়া চলিল—এক সময় ষ্টেশনের দূরত্ব, ষ্টীমারের বিলম্বের কথাও মন থেকে যেন মুছিয়া গেল, চলাটাই লাগিতেছে ভালো, তাই চলিতে লাগিল—মনে হইল যেন একটা পরিত্রাণ—চারি দিকের শান্তির মধ্যে সে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে—সামনের ছায়া এই শান্তিটিকে যেন একটা স্পষ্ট রূপ দিতেছে অদৃশ্য তুলির টানে।···এক সময় হঠাৎ একটু চমকিত এবং আতঙ্কিত হইয়া শৈলেন দেখিল গুণটানা রাস্তাটা আর নাই। হঠাৎ একটা বিপদের সামনে আসিয়া শৈলেনের সম্বিৎটা ফিরিয়া আসিল, নূতন রাস্তা খুঁজিতে হইবে, এই চিন্তাতেই সুপ্ত বুদ্ধি যেন জাগিয়া উঠিল; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যাহার জন্য জাগা, অর্থাৎ পথ খোঁজা বা নূতন পথ সৃষ্টি করা—সেই দিকেই গেল না বুদ্ধিটা, হঠাৎ এক নূতন পরিস্থিতির সামনে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সামনেই একটা গহ্বর, একটা বেশ বড় পুকুর, পথটা এই বড় গহ্বরের মধ্যে অবলুপ্ত হইয়াছে।···গঙ্গার একটা বড় ধস, এত-বড় ধস বড় একটা চোখে পড়ে না, রাস্তাটা স্বাভাবিক পরিণতিতে শেষ হয় নাই, এই ধসের মধ্যেই কবলিত হইয়াছে।···বড় আশ্চর্য বোধ হইল শৈলেনের—একটা পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল, একটা গতি-গন্তব্যের আগেই আবেগ ফুরাইয়া বসিল!···জীবনও তো পথ, জীবনও তো গতি; এই আকস্মিক বিলোপ তো তাহারও হইতে পারে;—যখন হিসাব চলিতেছে—জীবনের আরও তিন ভাগ বাকি—আরও অর্ধেক, তখন হঠাৎ দেখা গেল—একেবারে শেষ।···

পুকুরটা গঙ্গার একটা ধস্, ধসটা নিজের বিপুল ভারেই একটা দ'য়ে দাঁড়াইয়াছে; শৈলেন সম্মোহিতের মতো স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। মাঝখানে একটা বিরাট চক্র—ত্রস্ত, কুটিল একটা যেন বিকৃত আনন্দে নিজের কেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া আবর্তিত হইতেছে। এ এক বিকৃত আনন্দ—সমস্ত চক্রটাই নিজের সৃষ্ট গহ্বরের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। ছিন্নমস্তার মতো নিজের সৃষ্ট মৃত্যুর সঙ্গে এই উন্মাদ ক্রীড়ার সামনে শৈলেন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উন্মাদের চাপা হাসির মতোই খল-খল করিয়া মাঝে মাঝে একটা অস্ফুট শব্দ হইতেছে।…ঐ ঘূর্ণির রেখাটা—ঐ একটা কুটা—ঐ একটা কিসের ডাল—একটা কি শস্যের গুচ্ছ, প্রাণের পূর্ণতায় সবুজ—একে একে টানের মধ্যে পড়িয়া, গতিবেগ বাড়িয়া বাড়িয়া একেবারে নিরুদ্দেশ। একটা কি সরীসৃপ, বড় গিরগিটি গোছের…পরিত্রাণের কী অসম্ভব চেষ্টা! ঘূর্ণির মুখের কাছে বার দুয়েক উঠিলও ঠেলিয়া, তাহার পর ক্ষুদ্রতম কুটাটির মতোই অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিন্তু কী দরকার এই পরিত্রাণের চেষ্টার? কি-ই বা ক্ষতি এই বিলুপ্তিতে?…শৈলেনের মাথাটা ঝিম-ঝিম করিতেছে, এই আবর্তের মতোই একটা ঘূর্ণি জাগিয়া উঠিতেছে মাথার মধ্যে। দ'থেকে দৃষ্টি সরাইয়া প্রশস্ত গঙ্গার উপর রাখিল। স্রোতকে বলে জীবন, সরীসৃপটা ঐ মৃত্যু থেকে এই জীবনকেই জড়াইয়া ধরিতে চাহিয়াছিল।…কিন্তু এই অমোঘ, অনিশ্চিত স্রোত সত্যই কি জীবন?—খুব বেশী তো বিলম্বিত মৃত্যুই নয় কি?…শৈলেন পিছন ফিরিয়া দেখিল—জনতাকীর্ণ ষ্টেশনটা নিতান্ত অস্পষ্ট, মনে হইল বহু দূরে ছাড়িয়া আসা জীবন যেন। চরটার উপর নজর পড়িল, নৌকা দু'টা পাড়ি দিয়াছে। উষ্ণ মস্তিষ্কের মধ্যে চমৎকার একটা অর্থ ফুটিয়া উঠিতেছে।…খেয়া—একটা অভিশপ্ত জীবন ছাড়িয়া একটা নিরাপদ জীবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা! শৈলেনের মাথায় যেন হঠাৎ উল্লাসের একটা আগুন জ্বলিয়া উঠিল;—বাঃ, বেশ তো—একটা নূতন, নিরাপদ জীবনের জন্য এই তীর ছাড়া!…কী আনন্দ, ছাড়া যাক না খেয়ার নৌকা ঐ আবর্তের পথে! জীবনের নামে এই যে এত বৎসরব্যাপী অভিশাপ, কেন মায়া তাহার জন্য?…সূর্যাস্ত হইতেছে—বেশ চমৎকার লগ্ন, এত চমৎকার লগ্ন জীবনে আর না-ও আসিতে পারে। সমস্ত জীবন ধরিয়া এত সৌন্দর্যের সাধনা করিল কেন শৈলেন, যদি এই বিরাট সৌন্দর্যকেই সে ব্যর্থ হইতে দেয়?…না আর দ্বিধা নয়।

একটু পাশে আরও খানিকটা ফাটল ধরিয়াছে, একটা মাঝারি গাং-ঝাউয়ের গাছ, ঝিরঝিরে বেগুনে ফুলে ভরা, নিজের আয়ুর ইতিহাস জানিয়াও যেন অবিচল ধৈর্যে দাঁড়াইয়া আছে।…না, ঝাঁপ দেওয়া নয়,—বড় গদ্যময় মৃত্যু সে, এই মহেন্দ্র লগ্নের উপযোগী নয়; এমন চমৎকার আবেষ্টনীর যোগ্য নয়, অমন নির্ভয় মৃত্যু-সাথীর অমর্যাদা…

শৈলেন ধীর পদে গিয়া সেই ফাটলধরা জমিটার উপর গিয়া দাঁড়াইল, ফাটলটা আর একটু ফাঁক হইয়া গেল—নোঙ্গরের কাছিতে টান পড়িয়াছে, শৈলেন বন-ঝাউটার আরও কাছে সরিয়া গেল, তাহার পর কি ভাবিয়া ঝাউয়ের একটি পুষ্পিত শাখা ডান হাত দিয়া নিজের বুকে জড়াইয়া ধরিল।…চলো বন্ধু, এবার আমাদের তরী তীর ছাড়ুক…

পৃথিবী যেন অবলুপ্ত হইয়া গেছে। তাহার পরেই একটা নিতান্ত অভাবিত দৃশ্য চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল। একেবারে বিদায়ের শেষ ক্ষণে একেবারে অবলুপ্ত চেতনা থেকে এই রকম এক-একটি ছবি মনের পর্দায় আলোর রঙে ওঠে ফুটিয়া; কবে দেখিয়াছিল, বড় ভাল লাগিয়াছিল, তাহার পর আবার কি করিয়া স্মৃতির অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছিল। মৃত্যুর হিম স্পর্শে আবার ওঠে জাগিয়া।…ছবিটা এমন কিছুই নয়; এই রকম একটি সন্ধ্যায় মা আঁচলে প্রদীপ ঢাকিয়া তুলসী মঞ্চের পানে যাইতেছেন, আলোর আভায় আঁচলের রাঙা পাড় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মুখও উজ্জ্বল, তবে শুধু আলোর প্রভায়ই নয়, আরও যেন একটা কিসের প্রভাব আছে।

সমস্ত পৃথিবী যেন এই একটি ছবিতে রূপান্তরিত হইয়া গেছে।…শৈলেন স্থির নেত্রে শুভ্রবন্ধ ছবিটির পানে চাহিয়া রহিল—বেশ খানিকক্ষণ; দুই বিন্দু অশ্রু চোখের পাতা ঠেলিয়া উঠিয়াছে; তাহার পর মনে পড়িল সে একটা ফাটলের উপর দাঁড়াইয়া আছে, গঙ্গার ধার, বর্ষার গঙ্গা, ফাটলটা ধীরে ধীরে বিস্তীর্ণতর হইতেছে…

সন্তর্পণে পা ফেলিয়া ফাটল ডিঙাইয়া নিরাপদ ডাঙায় আসিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর ষ্টেশনের দিকে পা বাড়াইল। কয়েক পা অগ্রসর হইয়া একটা শব্দে ফিরিয়া চাহিতে দেখিল—পুষ্পিত বন-ঝাউ সমেত ফাট-ধরা জমিটা দ'য়ের মধ্যে নামিয়া যাইতেছে।

শৈলেনের সেদিনকার ডায়েরীতে লেখা আছে; আমি আবার ফিরে এলাম মা। তোমায় চরম আঘাত দিতে গিয়ে আমার হুঁস হোল—তুমি থাকতে আমার যাবার অধিকার নেই, আমার সাধ্যও নেই।

[ক্রমশঃ

★

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া,—কারো মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে' পরের জন্য খেলনা তৈরী করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাঙ্গালা-দেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষি-কাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙ্গা লাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্ম্মের জয়ঢাক,—এই সব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে।

—প্রমথ চৌধুরী

সেকালের বাঙালী

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

আদিযুগ হইতে বাংলার পূর্ণাবয়ব একখানি ইতিহাস লিখবার মত মাল-মশলা আজও পাওয়া যায় নাই। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মার "রাজতরঙ্গ" নামক পুস্তক বাঙালী জাতির বিকৃত ইতিহাসের নিদর্শন। বাংলা ১৩১১ সনে প্রকাশিত ৺রামপ্রকাশ চন্দ প্রণীত "গৌড়রাজমালা" আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে লিখিত প্রথম বাংলার ইতিহাস। বাংলা ১৩২১ সনে প্রকাশিত ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাংলার ইতিহাস" প্রকৃতপক্ষে বাংলা ও মগধের ইতিহাস। ১৩৪১ সালে প্রকাশিত ৺দীনেশচন্দ্র সেনের "বৃহৎ বঙ্গ" মূল্যবান তথ্যসমন্বিত হইলেও বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস বলিয়া গণ্য হয় নাই।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস-চ্যান্সেলর ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলা ভাষায় "বাংলা দেশের ইতিহাস" নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন (১৩৫২)। এই পুস্তকখানিতে বাংলার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক, সামাজিক, জাতিগত ও ব্যবসায়িক ইতিহাসের একটা সুষ্ঠু কাঠামো এতাবৎ প্রাপ্ত মাল-মশলার সাহায্যে খাড়া করা হইয়াছে। এই মূল্যবান পুস্তকখানি হইতে জানা যায়, বাঙালী প্রাক্-আর্য্য যুগ হইতে একটি বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল এবং আজও সেই সভ্যতার ধারা জাতির জীবনধারার সহিত ওতপ্রোত ভাবে বহিয়া চলিয়াছে।

এই পুস্তক হইতে হিন্দু আমলের বাংলা সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব—বাঙালী কি ছিল এবং আজ কি হইয়াছে।

মস্তিষ্কের গঠন-প্রণালী হইতে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাঙালী একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট জাতি। বৈদিক আর্য্যগণ যে যে প্রদেশে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন সেখানকার সকল শ্রেণীর হিন্দুগণ "দীর্ঘ-শির।" কিন্তু বাংলার সকল শ্রেণীর হিন্দুগণই "প্রশস্ত শির"। বাংলা দেশের ব্রাহ্মণের সহিত অপর কোনও প্রদেশের ব্রাহ্মণের অপেক্ষা বাংলার কায়স্থ, সদ্‌গোপ, কৈবর্ত্ত প্রভৃতির সম্বন্ধ অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ।

মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বাংলার রাজা দুর্য্যোধনের পক্ষে লড়িয়া অতুল সাহস ও পরাক্রমের পরিচয় দেয়। রামায়ণেও সমৃদ্ধ জনপদগুলির তালিকায় বঙ্গের উল্লেখ আছে।

খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন। সেই সময়ে বাংলা দেশে একটি পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। গ্রীকগণ ইহাকে গঙ্গরীড়ী জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং একজন গ্রীক্ লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষে বহু জাতির বাস। তন্মধ্যে গঙ্গারাঢ় জাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাদের চারি সহস্র বৃহৎকায় সুসজ্জিত রণহস্তী আছে, এই জন্যই অপর কোন রাজা এই দেশ জয় করিতে পারেন নাই। স্বয়ং আলেকজাণ্ডারও এই সমুদয় হস্তীর বিবরণ শুনিয়া এই জাতিকে পরাস্ত করিবার দুরাশা ত্যাগ করেন।" পেরিপ্লাস নামক গ্রন্থ ও টলেমীর লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাংলায় স্বাধীন গঙ্গারাঢ় রাজ্য বেশ প্রবল ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী গঙ্গাতীরবর্ত্তী গঙ্গে নগরী একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল এবং এখান হইতে মসলিন কাপড় সুদূর পশ্চিম দেশে রপ্তানি হইত।

প্রসিদ্ধ রোমান কবি ভার্জিল এই জাতির শৌর্য্য-বীর্য্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন।

বিভিন্ন তাম্রশাসন হইতে পরবর্ত্তী স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। এই গুলিতে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচার দেব নামে তিন জন রাজার নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শেষোক্ত নৃপতির নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইঁহারা যে প্রবল পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ এই তিন জন রাজা খৃষ্টীয় ৫২৫ হইতে ৫৭৫ অব্দের মধ্যে রাজত্ব করেন।

বাঙালী রাজাদের মধ্যে শশাঙ্কই প্রথম সার্বভৌম নৃপতি। ৬০৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই শশাঙ্ক গৌড়ে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজধানী কর্ণসুবর্ণ (কান সোণা) সম্ভবতঃ মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর সহরের ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রাঙ্গামাটি নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। মগধ, উৎকল, বারাণসী প্রভৃতি জয় করিয়া শশাঙ্ক বাঙ্গালীর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল করেন।

অষ্টম শতাব্দীতে কনৌজের রাজা যশোবর্ম্মা গৌড়রাজকে বধ করিয়া বঙ্গ জয় করেন। কনৌজের রাজকবি বাক পতিরাজ "গৌড়বহো" (বধ) নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন যে, যশোবর্ম্মার নিকট বশ্যতা স্বীকারের সময় বঙ্গবাসীদের মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। কারণ তাহারা এরূপ কার্য্যে অভ্যস্ত নয়।

ইহার পর বাংলায় এক অন্ধকার যুগ আসে। পুকুরে যেমন ছোট মাছগুলিকে বড় মাছে ধরিয়া খায়, সেরূপ দুর্ব্বলের উপর সমাজের সকল স্তরের প্রবলের উদ্ধত অন্যায় ও অত্যাচার বাংলায় ভীষণ অরাজকতা আনে। তৎকালীন দেশের প্রধানগণ স্থির করিলেন, সকল বিবাদ বিসংবাদ ভুলিয়া একজনকে রাজা-পদে নির্ব্বাচিত করিবেন এবং সকলেই স্বেচ্ছায় তাঁহাকে মানিয়া চলিবেন। দেশের জনসাধারণও আনন্দের সহিত এই মতে মত দিল। ফলে গোপাল নামক এক ব্যক্তি বাংলার রাজা নির্ব্বাচিত হইলেন। গোপাল ৭৫০ হইতে ৭৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বাংলার সুখশান্তি ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন এবং বাংলায় গৌরবময় পাল সাম্রাজ্যের সম্রাট্‌গণের পূর্ব্বপুরুষরূপে অতুল কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গোপাল ও তাঁহার বংশধরগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন—কিন্তু তাঁহারা হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন না।

গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল ৭৭০ হইতে ৮১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ধর্ম্মপাল সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত, নেপাল, কাশ্মীর এবং বিন্ধ্য-পর্ব্বতের দক্ষিণে কতক রাজ্য অধিকার করিয়া সার্বভৌম হইয়া "পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালীর নবজীবন প্রভাতের সূচনা হয়। ধর্ম্ম, শিল্প ও সাহিত্যের মধ্য দিয়াই এই জীবনের আত্ম-বিকাশ হয়। পালরাজগণের চারি শত বর্ষব্যাপী রাজত্বকাল বাঙালী জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ।

ধর্ম্মপালের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। ইঁহার বংশধরেরা পুরুষানুক্রমে পালরাজগণের প্রধান মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেকালে রাজার ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের সহিত রাজ্যশাসন ব্যাপারের যে কোন সম্বন্ধ ছিল না, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।

ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপাল (৮১০—৮৫০) পিতৃ-সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কাশ্মীরের সীমান্ত পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

তাঁহার সময় পাল-সাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের বাহিরেও তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়াছিল। যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও মলয় উপদ্বীপের অধিপতি শৈলেন্দ্র-বংশীয় মহারাজা বালপুত্রদেব তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। নালন্দা বিহার তখন সমগ্র এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

ইহার পরে কয়েক পুরুষের মধ্যে পাল-সাম্রাজ্য ছিন্ন-ভিন্ন হয়। খৃষ্টীয় ৯৮৮ অব্দে মহীপাল পূর্বপুরুষগণের রাজ্য উদ্ধার করেন। আজও বাংলায় "ধান ভানতে মহীপালের গীত" নামক প্রবাদ-বাক্য মহীপালের স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছে। মহীপাল প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল রাজত্ব করেন। সারনাথ-লিপিতে শত শত কীর্ত্তিরত্ন নির্ম্মাণ এবং অশোক স্তূপ, ধর্ম্মচক্র ও "অষ্টমহাস্থান" শৈল বিনির্মিত গন্ধকুটি প্রভৃতি বৌদ্ধকীর্ত্তির সংস্কার সাধনের উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত মহীপাল অগ্নিদাহে বিনষ্ট নালন্দা মহাবিহারের জীর্ণোদ্ধার এবং বৌদ্ধগয়ায় দুইটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কাশীধামে নবদুর্গার প্রাচীন মন্দির ও অন্যান্য হিন্দু দেব-দেবীর মন্দিরও সম্ভবতঃ তিনি নির্মাণ করেন। অনেক দীঘিকা ও নগরী এখনও তাঁহার নামের সহিত বিজড়িত হইয়া আছে এবং সম্ভবতঃ তিনিই সেগুলির প্রতিষ্ঠা করেন।

মহীপালের পুত্র নয়পাল (১০৩৮—১০৫৫) ১৫ বৎসর রাজত্ব করেন। প্রসিদ্ধ বাঙালী বৌদ্ধ আচার্য্য অতীশ (দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান) তখন মগধে বাস করিতেছিলেন। নয়পালের সময় হইতে পাল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন পুনরায় আরম্ভ হয়।

পাল-সাম্রাজ্যের অবসান কালে কর্ণাটদেশীয় সেনরাজগণ সমস্ত বাংলা দেশ জয় করেন। ১১৬২ খৃষ্টাব্দে পালরাজ্যের শেষচিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যায়। সেন রাজাগণ কর্ণাট দেশের ক্ষত্রিয় জাতির এক শাখাভুক্ত ছিলেন। সামন্ত সেনই প্রথমেই কর্ণাট দেশ হইতে বঙ্গদেশে ফিরিয়া গঙ্গাতীরে বাস করেন। তাঁহার পুত্র হেমন্ত সেন রাঢ় দেশে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বঙ্গদেশে এক অখণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিজয় সেনের নৌ-বিভাগ গঙ্গা নদীর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। বিজয় সেন খৃষ্টীয় ১১২৫ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন বলিয়া অনুমিত হয়। বহু দিন পরে বাংলায় আবার একটি দৃঢ় রাজ-শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশে সুখ-শান্তি আনয়ন করিয়াছিল।

১১৫৮ খৃষ্টাব্দে বিজয় সেনের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র বল্লাল সেন রাজা হ'ন। বল্লাল সেন মগধ ও মিথিলা জয় করেন। শস্ত্র ও শাস্ত্রবিশারদ রাজর্ষি বল্লাল সেন বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লক্ষ্মণ সেনের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক গঙ্গাতীরে সস্ত্রীক শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

১১৭৯ অব্দে লক্ষ্মণ সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি পিতা ও পিতামহের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রণকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি কৌমারে উদ্ধত গৌড়েশ্বরের শ্রীহরণ ও যৌবনে কলিঙ্গদেশে অভিযান করিয়াছিলেন; তিনি যুদ্ধে কাশিরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং আসামের কামরূপের রাজা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি সমুদ্রতীরে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে, কাশীতে এবং প্রয়াগে যজ্ঞযূপসহ—"সমর জয়স্তম্ভ" স্থাপিত করিয়াছিলেন। আজিও মিথিলায় প্রচলিত লক্ষ্মণাব্দ তাঁহার গৌরব বহন করিতেছে। ধর্ম্মপাল ও দেবপালের পরে বাংলার আর কোন রাজা বাংলার বাহিরে যুদ্ধে এমন সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই।

মহাযোদ্ধা হইয়াও লক্ষ্মণ সেন শাস্ত্র ও ধর্ম্মচর্চ্চায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি নিজে সুকবি ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ধোয়ী, শরণ, জয়দেব, গোবর্দ্ধন এবং উমাপতি ধর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণ তাঁহার রাজসভায় ছিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ও ধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ এক জন ভারতপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

ষাট বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আশী বৎসর বয়সে বৃদ্ধ রাজা পিতার ন্যায় গঙ্গাতীরে বাস করিবার উদ্দেশ্যে নবদ্বীপ ধামে আসেন।

"সপ্তদশ অশ্বারোহী যবনের ডরে" সোণার বাংলা রাজ্য তুর্কী হস্তে অর্পণ করিয়া এই বীর-রাজা নবদ্বীপ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন বলিয়া যে অপবাদ আছে তাহা পরবর্ত্তী অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাসের মতই প্রমাণসহ নয়। মুসলমান ঐতিহাসিক মীনহাজুদ্দিনের সংগৃহীত কতকগুলি গল্প-গুজবের উপর নির্ভর করিয়া এই অপবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু স্বয়ং মীনহাজুদ্দিন লক্ষ্মণ সেনকে "হিন্দুস্থানের রাজগণের পুরুষানুক্রমিক খলিফা স্থানীয়" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহার দানশীলতার সুখ্যাতি ও শাসন রীতির প্রশংসা করিয়াছেন। সেই যুগের সুলতান করিম হাতেমুজ্জমানের সহিত লক্ষ্মণসেনের তুলনা করিয়াছেন।

মীনহাজুদ্দিনের লেখা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, তুর্কীগণ উত্তর-বঙ্গের সমগ্র বা অধিকাংশ অধিকার করিলেও বহু দিন পর্য্যন্ত পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ অধিকার করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন যে, গঙ্গার দুই তীরে রাঢ় ও বারেন্দ্রই, তুর্কীরাজ্য সীমাবদ্ধ ছিল এবং তখনও লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ বঙ্গে রাজত্ব করিতেছেন।

…সমাজের দেনা কিরূপে শোধ দেওয়া যাইতে পারে। তাহার উত্তর এই যে, সমাজের উপকার কর। তোমার নিজের সন্তান-সন্ততির সুন্দররূপে প্রতিপালন কর; তাহাদের উত্তমরূপে শিক্ষা দাও, সমাজের যখন প্রয়োজন হইবে, তখন তাহার জন্য অর্থ, সামর্থ্য ও প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হইও না। যাহাতে সমাজের উপকার হয়, সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা কর; এইরূপেই সমাজের দেনা শোধ হইবে।

—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী



পাহাড়ী

শিল্পী—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

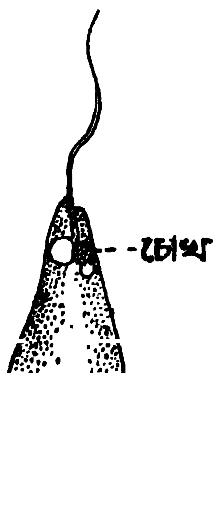
প্রাণীদের দৃষ্টি-রহস্য

হিমাংশু সরকার

রাস্তা দিয়ে চলেছি কথা নেই বার্তা নেই একটা লোক এসে গায়ের ওপর এক ধাক্কা। রেগে লোকটাকে বলতে যাচ্ছিলাম —'কি কানা না কি? দেখতে পাও না।' বলতে গিয়ে থেমে গেলাম—কারণ একটু লক্ষ্য করে বুঝলাম যে সত্যই লোকটা অন্ধ। মনটা লোকটার প্রতি সহানুভূতিতে ভরে গেল। আহা, বেচারা দেখতে পায় না!

চোখ যে আমাদের কত প্রয়োজনীয় বস্তু সেটা বোধ হয় দৃষ্টিহীনরাই ভাল করে বোঝে। যার দৃষ্টি নেই তার কাছে জগতের কিছুই নেই। দৃষ্টিশক্তি বলতে আমরা এই বুঝি যে যার দ্বারা জগতের সব বস্তুর আকৃতি এবং বিভিন্ন রংয়ের পার্থক্য বুঝতে পারা যায়।

প্রাণি-জগতের দৃষ্টিশক্তি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমরা দেখতে পাই যে, প্রাণীদের মধ্যে বহু প্রকারের চোখ দেখতে পাওয়া যায়। এখানে আমরা এই প্রাণীদের বহু প্রকারের চোখ সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করবার চেষ্টা করব।



উগ্লিনা

প্রাণিজগতে শ্রেণী বিভাগে প্রোটোজোয়া-পর্বকে আমরা প্রথম পাই। এই সব প্রাণীরা হচ্ছে এককোষী প্রাণী এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই সব প্রাণীদের দেখতে হলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। এই সব এককোষী প্রাণীদের শরীরে এমন কোন বিশেষ স্থান অথবা অংশ নেই যেটাকে আমরা এদের চোখ বলতে পারি। কিন্তু তবুও পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, এই সব প্রাণীরা খুব জোরাল কোন আলোর কাছ থেকে সব সময়ে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এই প্রাণীদের 'চোখ' বলে কিছু না থাকা সত্ত্বেও এরা আলোর সম্বন্ধে খুবই সচেতন। খুব সম্ভব এদের শরীরের প্রোটোপ্লাজম অংশের মধ্যে এমন কোন বস্তু আছে যার দ্বারা এরা আলোর অস্তিত্ব বুঝতে পারে।

অনেক সময় আবার এই প্রোটোজোয়া-পর্বের মধ্যে এমন প্রাণী পাওয়া যায় যাদের শরীরের একটা বিশেষ অংশের দ্বারা আলোর অস্তিত্ব বুঝতে পারে। শরীরের সেই বিশেষ অংশকে তখন এদের 'চোখ' বললে ভুল হয় না। এই চোখের মধ্যে এক ধরণের রং করা রঙ্গকবিন্দু (pigment spot) থাকে, যেগুলোর সাহায্যে এরা আলোর এবং অন্ধকারের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ উগ্লিনার নাম করা যায়। জলের ভেতর এগুলো বাস করে। এদের শরীরের সামনের দিকে একটা ছোট লাল বিন্দু থাকে—যাকে এদের চোখ বলা হয়।

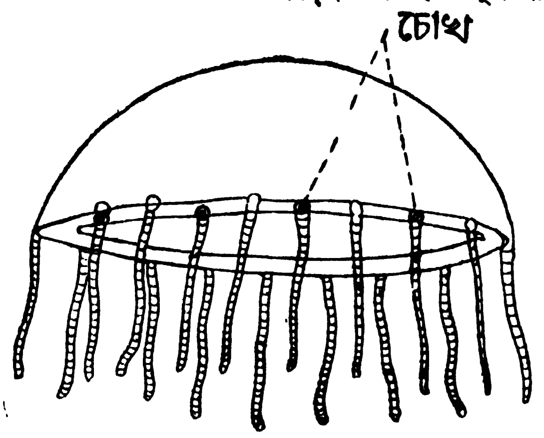
প্রোটোজোয়ার পর আমরা যে সব প্রাণী দেখতে পাই, সকলেরই শরীর একের অধিক কোষ দ্বারা গঠিত। এই বহুসংখ্যক কোষ দ্বারা গঠিত হওয়ার দরুণ শরীরের কতকগুলি কোষ প্রাণীদের দৃষ্টির জন্য বিশেষ ভাবে গঠিত হয়।

এখন বহুকোষী প্রাণীদের মধ্যে প্রথমে সিলেন্টারেটা-পর্বের কথা ধরা যাক্। হাইড্রা এই পর্বের একটি উদাহরণ। জলেই এর বাস। দেখতে লম্বায় এক ইঞ্চির চার ভাগের এক ভাগের মত হয়। জলের ভিতর এদের রং সাদাটে দেখায় এবং দেখতে ছোট হওয়ার দরুণ অনেক সময় এদের অস্তিত্ব বোঝাই যায় না। হাইড্রা সব সময় অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাবার চেষ্টা করে। যদিও এদের শরীরে এমন কোন বিশেষ স্থান অথবা কোষ দেখতে পাওয়া যায় না, যেটাকে আমরা এদের 'চোখ' বলতে পারি। তবুও এদের এই আলোর সম্বন্ধে ঔৎসুক্য দেখে মনে হয় যে নিশ্চয় এদের শরীরের কোন স্থানের কোষের মধ্যে এমন কোন বস্তু আছে যার দ্বারা এরা আলোর অনুভূতি পায়।

এর পর জেলী ফিস্ আর একটি উদাহরণ ধরা যাক্। সমুদ্রের ধারে অনেক সময় ঢেউয়ের সঙ্গে থলথলে ছাতার মত মাংসল বস্তু ভেসে আসতে আমরা অনেকেই দেখেছি। একটু লক্ষ্য করলে ছাতার তলার দিক্ থেকে মোটা সুতার মত জিনিষ ঝুলছে দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো এদের প্রত্যঙ্গ। শরীরের যেখান থেকে এই

প্রত্যঙ্গগুলো বের হয়েছে তার ওপর একটা চক্‌চকে অংশ দেখতে পাওয়া যায়, এগুলো জেলী ফিসের 'চোখে'র কাজ করে।

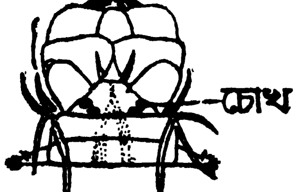
এর পর একিনোডার্‌মেটা (Echinodermeta) পর্ব্বের প্রাণীদের কথা ধরা যাক। ষ্টার ফিস্ (তারা মাছ) সমুদ্রে বাস



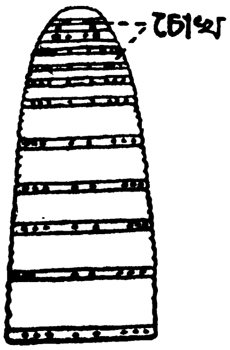
জেলী ফিস্

করে। নামের পেছনে 'মাছ' থাকলেও এরা কিন্তু মৎস্য-শ্রেণীভুক্ত নয়। এদের চেহারা দেখতে ঠিক তারার মত। শরীরের মাঝখান থেকে পাঁচটা লম্বা অংশ মোটা থেকে ক্রমশঃ সরু হয়ে চারি দিকে বের হয়ে গেছে,—অনেকটা তারার ছটার মত। এইগুলো প্রাণীর প্রত্যঙ্গ। এই প্রত্যেক প্রত্যঙ্গের সরু অংশের মাথার দিকে তারা মাছের 'চোখ'গুলো বসান। চোখগুলো পরীক্ষা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, এগুলো ছোট বাটির মত এবং এক জাতীয় লম্বা কোষ দ্বারা গঠিত। লম্বা কোষগুলোর মধ্যে রঙ্গক থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, যদি এই চোখের অংশ তারা মাছে না থাকে তাহলে তারা মাছ আলোর কোন অস্তিত্ব বুঝতে পারে না।

এমিলিডা (Amelida) পর্ব্বের প্রাণীদের চোখ মাথার ওপর দিকে বসান। এদের 'চোখ' বলতে যা বোঝায় তেমন কোন কিছু



নেরিসের মাথার উপর অংশ

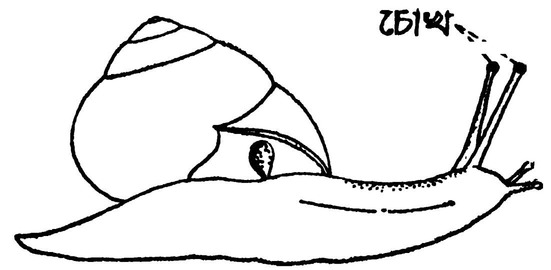


জোঁকের মাথার সামনের দিকের অংশ

নেই। উদাহরণস্বরূপ নেরিসের 'চোখ' মাথার উপর কতকগুলি বিন্দু ছাড়া আর কিছু নয়। জোঁক আমরা সর্ব্বত্রই দেখতে পাই। এদের 'চোখ' নেরিসের মতই মাথার দু'পাশে পাঁচ জোড়া কাল কাল বিন্দু দেখতে পাওয়া যায়, এগুলো এদের চোখের কাজ করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এদের মাথার এই অংশে তীব্র আলোর অনুভূতি খুব বেশী।

এতক্ষণ আমরা যে সব উদাহরণ দিলাম তার মধ্যে কোন প্রাণীর আসল চোখ বলতে যা বোঝায়, তা পাইনি। এর পরে মোলাস্কা (Mollusca) পর্ব্বে কিন্তু আসল ধরণের চোখ অনেক প্রাণীর মধ্যে পাওয়া যায়। এই পর্ব্বের মধ্যে আমরা শামুক, গুগ্‌লি, গেঁড়ি, ঝিনুক, কাটেল ফিস্ জাতীয় প্রাণীদের পাই। এইটে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই পর্ব্বের মধ্যে এমন সব প্রাণী পাওয়া যায় যাদের চোখ বলতে কিছু নেই থেকে আরম্ভ করে জটিল ধরণের চোখও আছে।

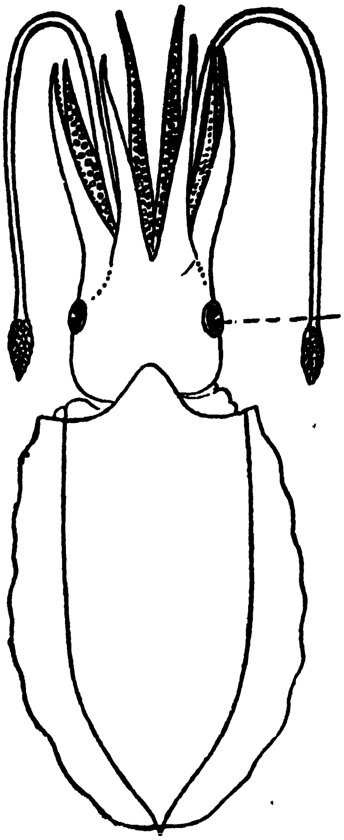
শামুক চলবার সময় তার শরীরের সামনের দিক্ থেকে দু'জোড়া নরম শিংএর মত অংশ বার করে দেয়। এর মধ্যে লম্বা জোড়া শিংয়ের মাথায় দু'টো ছোট কাল বিন্দু দেখতে পাওয়া যায়। এ দু'টো হচ্ছে এদের 'চোখ'। এর মধ্যে আলোক চেনবার রঙ্গক-যুক্ত কোষ এবং ছোট লেন্‌সও থাকে। আর এগুলো স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত থাকে।



শামুক

পুকুর, নদী, ইত্যাদির জলে যে সব ঝিনুক পাওয়া যায়, সেগুলোর শরীরের পেছন দিকে অনেক রঙ্গকযুক্ত চোখ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো আলোক এবং অন্ধকারের তফাৎ ভাল রকম বুঝতে পারে। এই চোখের সংখ্যা ৪০ থেকে প্রায় ৪০০ পর্য্যন্ত হয়। এদিকে কিন্তু আর এক জাতের ঝিনুকের মধ্যে খুব জটিল ধরণের চোখের খোঁজ পাওয়া যায়। এই সব চোখে সুগঠিত লেন্‌স ছাড়াও স্নিগ্ধরযুক্ত অনুভূতি উপলব্ধি করবার মত কোষও পাওয়া যায়।

এর পর কাটেল ফিসের কথা ধরা যাক্। নাম দেখলে মনে হয় বুঝি এগুলো মাছের জাত। কিন্তু তা নয়। আসলে এটা এই পর্ব্বেরই একটা প্রাণী। এগুলোর চেহারা দেখতে একটু অদ্ভুত। সমুদ্র ছাড়া আর কোথাও এদের পাওয়া যায় না। একটা এক দিক বন্ধ মাংসের খোলের ভেতর প্রাণীর শরীরের প্রায় সমস্ত অংশটা থাকে। শরীরের সামনের যে অংশটা খোলের বাইরের দিকে বের হয়ে থাকে সেটা প্রাণীর মাথার দিক। এই অংশটা থেকে দশটা সরু সরু শুঁড়ের মত লম্বা অংশ ঝুলতে থাকে—এগুলো প্রাণীর প্রত্যঙ্গ। এই প্রত্যঙ্গগুলোর উপর ছোট উঁচু উঁচু বোতামের মত জিনিষ বসান থাকে। প্রথমটা দেখলে পুচ্ছ শুদ্ধ ধূমকেতু বলে মনে হয়। এই কাটেল ফিসের মাথার উপরে দু'দিকে দু'টো বড় বড় চোখ দেখতে পাওয়া যায়। চোখ দু'টো ভাল ভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এদের চোখ দু'টো বড় ছাড়াও, চোখের সব জটিল



কাটল্ ফিস

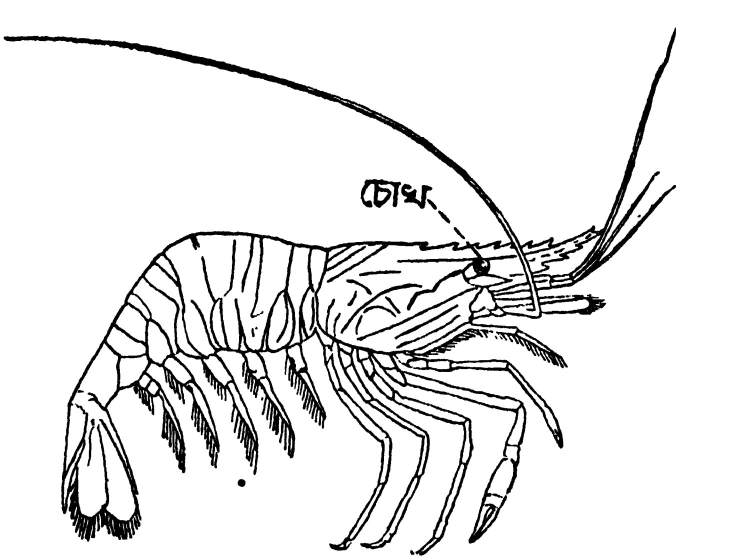
অংশই এতে আছে। খুব সম্ভবতঃ নিকৃষ্ট প্রাণীদের মধ্যে সম্পূর্ণ চোখের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়।

এর পর আমরা আর্থোপডা (Arthropoda) পর্বের মধ্যে চিংড়ি, কীট-পতঙ্গ, মাকড়শা ইত্যাদি পাই। এই পর্বের প্রাণীদের মধ্যে দু'ধরণের চোখ দেখতে পাওয়া যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে একই প্রাণীর মধ্যে এই দু'-ধরণের চোখ দেখতে পাওয়া যায়।—এক ধরণের চোখকে বলা হয় অসিলাস্। এটাকে প্রাথমিক চোখ বলা যায়। অসিলাস ছাড়া আর এক ধরণের চোখ হচ্ছে পুঞ্জাক্ষি (compound eye)।

অসিলাস্ চোখের উদাহরণস্বরূপ সাইক্লপস্ নামক প্রাণীর নাম করা যায়। এই সব ধরণের অসিলাইতে (একের অধিক অসিলাস্) কতকগুলি রঙ্গকযুক্ত কোষ সমষ্টিগত ভাবে এক স্থানে থাকে, আর সেই অংশের ত্বক্ কিছু মাত্রায় মোটা হয়ে গিয়ে লেন্সের মত কাজ করে। এই অসিলাই চোখের দ্বারা প্রাণী দৃষ্টিশক্তির কাজ করে। অনেক কীট-পতঙ্গের পুঞ্জাক্ষির সহিত অসিলাইয়ের অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ মাছি এবং মৌমাছির কথা ধরা যাক্। এদের পুঞ্জাক্ষি ছাড়াও মাথার ওপর দিকে ত্রিভুজের মত তিনটি অসিলাই দেখতে পাওয়া যায়। সব অসিলাইয়ের গঠন এক জাতের। সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে সব ক্ষেত্রেই এই অসিলাইগুলো বাটির মত দেখতে। এর মধ্যে রঙ্গকযুক্ত কোষ এবং ঘন ত্বকের দ্বারা ঘটিত লেন্সের মত থাকে এবং স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত। প্রজাপতির শুককীটের চোখ বলতে আমরা শুধু অসিলাই পাই। কোন কোন পতঙ্গের মাথার প্রত্যেক দিকে প্রায় ২০টা করে এই অসিলাই থাকে।

মাকড়শা দেখলেই আমাদের শরীর শির-শির করে ওঠে, কারণ মাকড়শার চেহারা দেখতে অদ্ভুত। এদের একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে এদের মাথার ওপর ৬টা থেকে ৮টা চোখ দেখতে পাওয়া যায়। চোখগুলো অবশ্য অসিলাই। এগুলো এমন ভাবে সাজান থাকে যেন মনে হয়, মাথার উপর কতকগুলো চক্চকে কাচ বসান আছে। অবশ্য বিভিন্ন মাকড়শার এই চোখগুলো মাথার বিভিন্ন স্থানে সাজান থাকে।

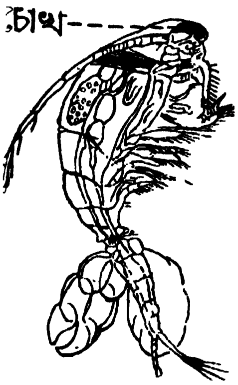
এখন পুঞ্জাক্ষির কথা ধরা যাক্। কোন মাছি বা প্রজাপতি যদি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা যায় তাহলে এদের মাথার দু'পাশে দু'টো বড় বড় উঁচু গোল বস্তু দেখতে পাই। এ দু'টো হচ্ছে এদের পুঞ্জাক্ষি। এই চোখের রং হয় সবজে অথবা বেগুনে। একটা আতসী কাচ নিয়ে যদি এদের কোন চোখ পরীক্ষা করে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে ঐ গোল বস্তুটা অসংখ্য চৌকা অথবা ষড়ভুজ দিয়ে তৈরী কুঠরী—অনেকটা মৌমাছির চাকের মত মনে হয়। প্রত্যেকটা কুঠরী এক একটা লম্বা স্তম্ভের মত দেখতে আর এই স্তম্ভগুলো পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি করে সাজান রয়েছে। প্রত্যেকটি স্তম্ভের মত কুঠরীকে 'ওমাটিডিয়াম' বলা হয়। এক একটা ওমাটিডিয়ামের মধ্যে আবার অনেক জটিল গঠন আছে। প্রত্যেক ওমাটিডিয়াম এক একটা সরল চোখ বা অসিলাসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এক একটা পুঞ্জাক্ষিতে ওমাটিডিয়ামের সংখ্যা বহু হয়।



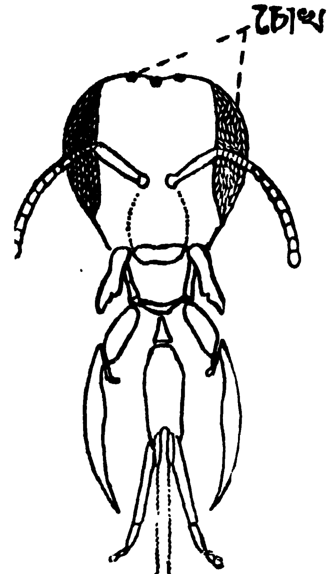
চিংড়ি

যেমন আরশুলার একটা পুঞ্জাক্ষিতে প্রায় ১৮শো, মাছি, মৌমাছির প্রায় ৪ হাজার আর একটা গঙ্গাফড়িংএর প্রায় ২০ হাজার ওমাটিডিয়াম থাকে।

এখন এই পুঞ্জাক্ষির দ্বারা প্রাণীরা কি করে দেখে সেইটে দেখা যাক। প্রত্যেক ওমাটিডিয়ামের দ্বারা প্রাণী কোন বস্তুকে অংশ



সাইক্লপস্



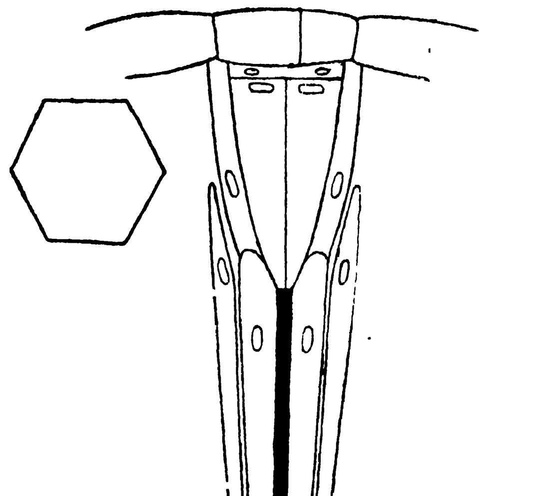
মাথার ওপরে এবং দু'পাশে পুঞ্জাক্ষী

ভাগ ভাগ করে দেখে। যদি প্রাণীটা কোন মানুষকে দেখে তাহলে একটা ওমাটিডিয়ামে প্রথমে মাথার চুল, তার পর আর একটাতে চোখ তার পর নাক, মুখ, মুখের নীচের অংশ এই রকম ভাগ ভাগ করে দেখবে। পরে প্রাণী প্রত্যেকটা ওমাটিডিয়ামের প্রতিচ্ছবির অংশগুলো একসঙ্গে জুড়ে একটা সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি দেখে। অনেকটা বাড়ীতে অথবা বাগানে মোজাইকের মত। মোজাইকে অনেক টুকরো জুড়ে জুড়ে তবে একটা সম্পূর্ণ জিনিষের আকৃতি আমরা দেখতে পাই।

এতক্ষণ আমরা অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের কথা বলছিলাম। এর পর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে আমরা এক ধরণের চোখ দেখতে পাই। এই সব চোখ একক চোখ। একক চোখ হলেও এই সব চোখ খুবই জটিল। উদাহরণস্বরূপ মানুষের চোখই ধরা যাক্। কারণ এই ধরণের চোখই হচ্ছে চোখের পূর্ণ বিকাশ।

এই জাতীয় চোখের আকৃতি গোল এবং চোখ মাথার খুলিতে কোঠরের ভেতর সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে। কতকগুলি পেশীর দ্বারা চোখ কোঠরের ভেতর নড়-চড়া করতে পারে। চোখের সামনের দিকে দুই ভাগে বিভক্ত দু'টো চামড়ার ভাঁজ থাকে—এদের চোখের পাতা বলা হয়। তার পর আমরা চোখের তারা দেখতে পাই। তারা তিনটি স্তর দ্বারা গঠিত। এর নাম 'স্ক্লেরটিস্'। স্ক্লেরটিসের সামনের অংশ স্বচ্ছ এবং এই অংশকে 'করনিয়া' বলা হয়। এর পরের স্তরটি হচ্ছে 'কোরয়ড'—পাতলা এবং কালো রংএর। করনিয়ার ঠিক নীচেই এই স্তরের কোন অংশই থাকে না, শুধু ঝালরের মত ভাঁজ দেখতে পাওয়া যায়। এই ভাঁজকে আইরিস্ বলা হয়। আইরিসের ওপর রঞ্জক থাকে আর এই রঞ্জক অনুযায়ী চোখের রং হয়। চোখের ভেতরে আলো যাবার জন্য ঠিক মাঝখানে একটা ছিদ্র থাকে—যাকে 'পিউপিল্' বলা হয়। আইরিসে পেশী সংযুক্ত থাকার দরুণ পিউপিল্ ইচ্ছামত ছোট বড় করা যায়। আইরিস্ এখানে ডায়াফ্রামের কাজ করে। আলোর কম-বেশীর ওপর এই পিউপিল ছোট-বড় হওয়া নির্ভর করে। তীব্র আলোতে পিউপিলের ছিদ্র ছোট হয় এবং কম আলোতে ছিদ্র বড় হয়। মানুষের বেলা এই পিউপিল ছোট-বড় করা ইচ্ছাধীন নয়। সরীসৃপ এবং পাখীদের বেলা এটা তাদের ইচ্ছাধীন!

আইরিসের পেছনে চোখের লেন্সটি থাকে। এটা কাচের মত সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং দু'দিকই উন্নতোদর। লেন্সটি কোন রকম



একটি ওমাটিডিয়াম

শক্ত বস্তু নয় এবং এটি একটা পাতলা থলির মধ্যে থাকে। থলির পাতলা আবরণ লেন্সের ওপরকার অংশের সঙ্গে প্রায় লেগে থাকে। চোখের ভেতরের স্তরটি হচ্ছে 'রেটিনা'। চোখের ভেতরের অংশটা বলের ভেতরের অংশের মত। আর এই অংশ এক রকম চট্‌চটে পদার্থের দ্বারা ভর্ত্তি থাকে—একে 'ভিট্রিয়াস্ হিউমার' বলে। লেন্স এবং করনিয়ার মাঝখানের অংশ পরিষ্কার তরল পদার্থের দ্বারা ভর্ত্তি

থাকে—একে 'একোয়াস্ হিউমার' বলে। চোখের পিছনে, লেন্সের ঠিক উল্টো দিকে একটা ছেঁদা থাকে, এর মধ্যে দিয়ে চোখের স্নায়ু মস্তিষ্কের ভেতরে চলে গেছে।

এখন দেখা যাক, কি করে মেরুদণ্ডী প্রাণী চোখের সাহায্যে দেখে। চোখকে আমরা ক্যামেরার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। ক্যামেরার সাহায্যে আমরা ছবি তুলতে গেলে, যে বস্তুর ছবি তুলতে চাই সেই দিকে ক্যামেরার লেন্স ঠিক করে পরে সাটার টিপে ছবি তুলে নেই। ক্যামেরার সাটার টেপা মাত্রই লেন্সের পেছনে যে ছিদ্র থাকে তার মধ্যে দিয়ে আলো ক্যামেরার ভেতর প্রবেশ করে, ক্যামেরার পেছনে যে ফিল্ম্ বা প্লেট থাকে তার ওপর বস্তুর প্রতিচ্ছবি অদৃশ্য অবস্থায় রেখে দেয়। পরে এই ফিলিম্ বা প্লেট রাসায়নিক বস্তুর সাহায্যে পরিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য ছবি লোকের কাছে দৃশ্য হয়ে ওঠে। দরকার মত লেন্সের পেছনে আলো প্রবেশ করার ছিদ্র—যাকে 'ডায়াফ্রাম' বলে, সেটাকে ছোট-বড় করে কম-বেশী আলো প্রবেশ করান যায়। এ ছাড়াও লেন্সকে দরকার মত এগোন কিম্বা পেছোন যায় বস্তুর দূরত্ব অথবা নিকটত্ব অনুযায়ী। আমাদের চোখও ঠিক ক্যামেরার মতই। রেটিনা হচ্ছে ক্যামেরার ফিলিম্ বা প্লেট। চোখও ঠিক লেন্সকে এগিয়ে কিম্বা পেছিয়ে ছবিকে সম্পূর্ণরূপে দৃশ্যমান করে নেয়। আলোর কম-বেশী অনুযায়ী পিউপিলও ছোট-বড় হয়।

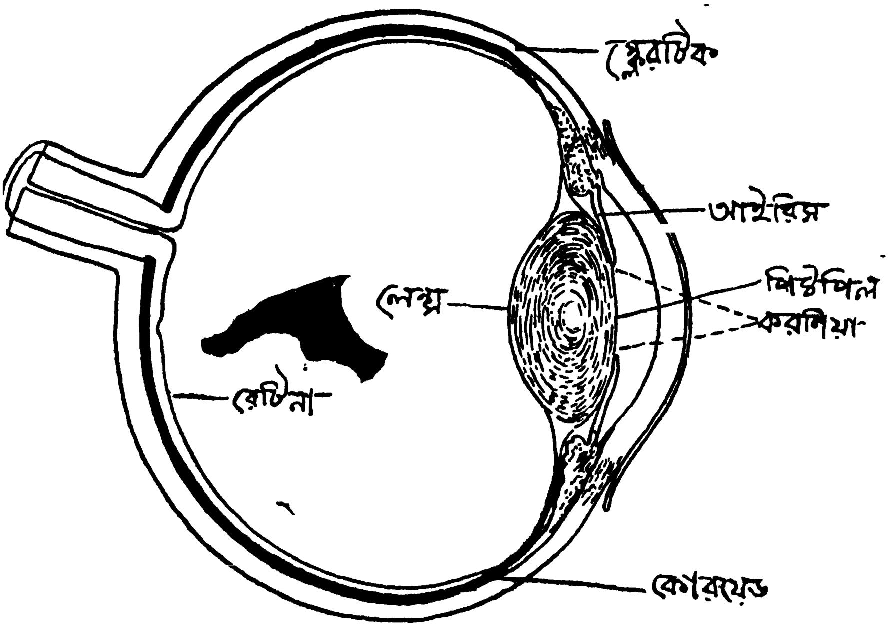
এখন এখানে কতকগুলি মেরুদণ্ডী প্রাণীর চোখের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্।

মাছের কোন চোখের পাতা নেই বলা চলে। এদের চোখের লেন্সের গঠন এমন যে এরা শুধু জলের মধ্যেই দেখতে পায়। কতকগুলো মাছ জলে এবং ডাঙ্গায় দেখতে পায়। অনেক মাছ আবার সম্পূর্ণ অন্ধ অবস্থায় সারা জীবন কাটায়। এ সব মাছেরা জলের নীচে গুহার মধ্যে বাস করে। এদের চোখ না থাকলেও এদের স্পর্শ-ইন্দ্রিয় খুব সতেজ, যার দ্বারা এরা চোখের অভাবটা বুঝতে পারে না, এবং চোখের কাজ এই স্পর্শ-ইন্দ্রিয় দ্বারা চালিয়ে নেয়।

এর পর আমরা সব প্রাণীর মধ্যেই দু'টো পাতা ছাড়া আর একটা স্বচ্ছ পর্দা দেখতে পাই—একে 'নিকটিটেটিং মেমব্রেণ' বলা হয়। উভচর এবং সরীসৃপের এই তৃতীয় চোখের পাতা দরকার মত সম্পূর্ণ ভাবে চোখকে ঢেকে রাখতে পারে। সাপের বেলা সব সময় এই স্বচ্ছ পাতা দিয়ে এদের চোখ ঢাকা থাকে, কিন্তু এদের আর কোন আলাদা দু'টো পাতা নেই।

অনেক সরীসৃপ, পাখী এবং স্তন্যপায়ী জীবদের চোখের পাতার নিচে একটা গন্থি থাকে। যাকে আমরা অশ্রু-গন্থি বলি। এই গন্থির ভেতর তরল পদার্থ থাকে। দরকারের সময় এই গন্থির তরল পদার্থ চোখের ভিতরে এসে চোখকে পরিষ্কার করে। অনেক জলজ সরীসৃপের মধ্যে এই গন্থি থাকে না, যেমন কুমীর। মানুষের বেলা এই গন্থির তরল পদার্থ চোখের ভেতর থেকে বাইরে যখন বের হয়ে আসে তখন আমরা সেটাকে অনেক সময় কান্না বলি।

পাখীদের চোখ খুব পরিষ্কার আর এদের চোখের গঠনে কিছু বৈচিত্র্যও আছে। এই বৈচিত্র্য বেশীর ভাগ চোখের ভেতরে দেখতে পাওয়া যায়। এদের তৃতীয় পর্দা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ নয়—কিছু মাত্রায় স্বচ্ছ। পাখীর চোখের দিকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, একটা অর্দ্ধেক স্বচ্ছ পাতা দিয়ে পাখী তার সমস্ত চোখটা মাঝে মাঝে ঢেকে ফেলছে।



মানুষের চোখ

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের চোখ আর মানুষের চোখ হুবহু এক বলা যায়। অবশ্য কয়েকটা বিষয়ে কিছু কিছু তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। দু'টো চোখের পাতা ছাড়া তৃতীয় পর্দার অস্তিত্ব শুধু চোখের কোণে ছোট অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ চোখের তারার রং বাদামী হয়; কারণ যার থেকে এই তারার অংশ তৈরী হয় তার মধ্যে বাদামী রংয়েরও রঞ্জক কোষ পাওয়া যায়। অনেক সময় চোখের তারার রং সবুজ অথবা ধূসর রংয়েরও দেখা যায়, তার কারণ যে তখন বাদামী রঞ্জকের অভাব বলেই তারার রং অন্য রকম দেখায়।

আমাদের এবং অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণীর চোখের পিউপিল হচ্ছে গোল, কিন্তু বিড়াল জাতীয় ছোট প্রাণীদের এবং যে সব প্রাণীরা চরে খায়—যেমন, গরু, ভেড়া ইত্যাদির চোখের পিউপিল হচ্ছে লম্বাটে ধরণের। বিড়াল জাতীয় বড় প্রাণী—যেমন বাঘ, সিংহ ইত্যাদির চোখের পিউপিল কিন্তু গোল।

কেতকী

(কথা-চিত্র)

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

২০

যাত্রা-দলের অধ্যক্ষ বসন্ত রায় সব দিক্ দিয়েই বিচক্ষণ ও চৌখস লোক। মানুষ চরিয়ে মাথার চুল পাকিয়েছেন তিনি; লোকে বলে, মানুষ চিনতে তাঁর মতন ওস্তাদ আর দু'টি নেই। বিভিন্ন প্রকৃতি ও বিভিন্ন বয়সের মানুষ নিয়ে যে কারবার চালাতে হয়, লোকচরিত্রে অভিজ্ঞতার সংগে লোকের মতি-মর্জ্জিকে মনের মতন করে ঘোরাবার ফেরাবার ক্ষমতা না থাকলে এ কারবার চালানো কঠিন। মানুষ যেখানে পণ্যের সামিল—মানুষের মেধা ও মেজাজ ভাঙ্গিয়ে তহবিল ভরতি করতে হয়, সেখানে চেহারা দেখে আর মুখের কথা শুনে মানুষের ভেতরটা জানবার ক্ষমতা থাকলে তবেই এখানে ম্যানেজারী করা চলে। বিভিন্ন দল চালিয়ে বসন্ত রায় এ ব্যাপারে এমনি ঘুণ হইয়াছেন যে, লোক চিনিতে তাঁকে এতটুকু বেগ পেতে হয় না; দলের প্রত্যেকের ধারণা, তিনি জ্যোতিষ জানেন। এ ক্ষেত্রে অল্প-বয়সী এক নূতন পালা-লিখিয়েকে পালাশুদ্ধ সদরের গদীতে আদর করে নিয়ে আসায় দলের মধ্যে একটা কৌতূহলের ভাব ফুটে উঠলো।

অল্পবয়সী হোলে কি হয়, মৃগেন ছেলেটির পালা বাঁধবার কায়দা আর দৃশ্যগুলি সাজাবার কৌশল দেখে বসন্ত রায় চমকে গিয়েছিলেন। ছেলেটিকে দু'-চারটি কথা জিজ্ঞাসা করে যে জবাব পান তাতে খুসিতে মনটি তাঁর ভরে ওঠে, সেই সংগে তার সুন্দর মুখখানার ভঙ্গি আর বড়ো বড়ো টানা-টানা দু'টো চোখের দৃষ্টিতে মুগ্ধ হয়ে স্নিগ্ধ স্বরে বলেন: ছেলেবেলা থেকে লেখার কসরৎ করে আসছেন, আর মন দিয়ে বড়ো বড়ো দলের পালা শুনেছেন বলেই এ রকম লিখতে পেরেছেন। আমি বলচি, আপনাকে আর মাষ্টারী করতে হবে না, বরাত আপনার খুলে গেছে।

মনের আনন্দ সবলে চেপে মৃগেন জিজ্ঞাসা করে: আচ্ছা, আমার পালা যদি পছন্দ হয়, আমি দক্ষিণা কি পাব?

মুখখানির একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি করে বসন্ত রায় উত্তর দেন: আরে মশাই, পালা যদি মালিকের মনে লাগে, আপনার ত পাথরে পাঁচ কীল—আপনাকে তখন পায় কে?

কৌতূহল দমন করা মৃগেনের পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে, একটু থেমে মুখখানা তুলে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে: তবু জানতে ইচ্ছে করে—পালা-প্রতি ওঁরা কি দেন?

বসন্ত রায় সহজ কণ্ঠে বলেন: নগ্‌দা-নগ্‌দি পালা কেনবার রেওয়াজ ত আমাদের দলে নেই, তাই এখনই দাম বলা যায় না; আমাদের দল খোলা ইস্তক পালা যিনি দলের জন্যে লিখতেন, বছর শালিয়ানা থোক-থাক একটা মোটা টাকা তাঁর জন্যে বরাদ্দ ছিল। তিনি আমাদের দলের বাঁধা 'অথর' ছিলেন কি না?

—তা বছর শালিয়ানা কি তিনি পেতেন?

—শুধু আমাদের দলে পালা দেবেন এই সর্তে যে দিন তিনি বাঁধা 'অথর' হলেন, সেই দিনই ত মালিক তাঁকে হাজার টাকা আগাম দিলেন, তার পর বছর শালিয়ানা দেড় হাজার টাকা বরাদ্দ ত তাঁর ছিলই, উপরন্তু কত রকমে কত টাকাই কামাতেন। তা ছাড়া, গাওনার দিন আসরে এলে 'মান' বলে আমাদের মালিক যা দিতেন—

—মান? সে আবার কি?

—জানেন না বুঝি? যাঁর লেখা পালা খোলা হবে, তিনি যদি গাওনার দিন আসরে এসে বসেন, তাঁর খাতির রাখবার জন্যে একটা নজরানা দেবার রেওয়াজ আছে, একেই আমরা 'মান' বলি। এই মানের দরুণ যে কতো নগদ টাকা, তার ওপর শাল-দোশালা, বেনারসী জোড়, ঘড়ি—এমনি কতো কি পেয়েছেন, তার কথা আর কি বলবো! এ সব ব্যাপারে আমাদের মালিকের নজরও তেমনি উঁচু। আগে যিনি পালা লিখতেন, এঁর দৌলতে ত দেশে তিনি জমিদারী করে গেছেন। আপনার পালা যদি তাঁর মনে ধরে, আর তাঁর নজরে পড়ে যান, বরাত আপনার ফিরে যাবে বলে রাখলুম।

—পালা কি তাহলে তিনি নিজেই শুনে পছন্দ করেন?

—হ্যাঁ। তাঁর সামনেই পালা পড়া হয়, লেখকই পড়েন; আর দলের যাঁরা মাথাওয়ালা—তাঁরা সেখানে হাজির থাকেন। ভালো পালার অভাবে দল মার খাচ্ছে বলে আমাদের মালিকের চোখে ঘুম নেই বললেই চলে। নৈলে এত আদর করে আপনাকে নিয়ে চলেছি মশাই! এখন আপনার বরাত, আর আমার হাত-যশ!

পালা-প্রসঙ্গে পালা-রচয়িতার শুভাদৃষ্টের আভাস পেয়ে মৃগেনের চোখ দুটো চক-চক করে ওঠে; মনে মনে ভাবতে থাকে—মালিকের পছন্দ হলে আমার অদৃষ্টও ত তাহলে···কিন্তু কি যেনো একটা ধাক্কা খেয়ে সে চিন্তা তখনি ভেঙ্গে যায়; সংগে সংগে চমকে ওঠে সে বলে: আচ্ছা, একটা কথা তাহলে জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের দল ত বউরাণীর নামেই চলেছে, তিনিই কি সত্যিকার মালিক, না নামটা···পরের কথাগুলি মৃগেনের মুখে যেনো আটকে যায়।

মৃদু হেসে রায় মশাই বলেন: আপনার কথা বুঝেছি, বউরাণীর নামটা নিয়ে অনেকেই এমনি একটা সন্দেহ করে থাকেন; তাঁদের ধারণা—বউরাণী নামটা ভুয়ো—ও নামের কেউ নেই। কিন্তু আপনি নিজের চোখেই তাঁকে দেখতে পাবেন, আর তাঁর ব্যবহারে সত্যিই মুগ্ধ হবেন।

মৃগেনের কৌতূহল আরো জাগ্রত হয়ে ওঠে, বউরাণীর বৃত্তান্ত জানবার জন্যে মনটা উসখুস্ করে। অনেক দিন থেকেই নামটি শুনে আসছে, বাঙালীর মেয়ে একটা যাত্রার দল চালাচ্ছেন—এ কথা শুনলেই যেনো মনে চমক লাগে, তাই তাঁর সম্বন্ধে লোকে নানা রকম কথা রটিয়ে থাকে, কেউ বলে তিনি খুব বড়োলোকের বউ, স্বামীর সংগে ঝগড়া করে যাত্রার দল করেছেন। কারুর মতে যাত্রাদলের কোন কলাবিদের প্ররোচনায় পড়ে কুলত্যাগ করে তিনি এই দল খুলেচেন। আবার অনেকের অনুমান, নামটা ভুয়ো—এই চটকদার নামটা দিয়ে কোনো তুখড় লোক এই দল চালাচ্ছে। সুতরাং মৃগেনের মনে এই মেয়েটির সঠিক বৃত্তান্ত জানবার আগ্রহ স্বাভাবিক। সে তখন সবিনয়ে বলে ফেলে: দেখুন, ওঁর সম্বন্ধে অনেক রকম কথাই আমরা শুনিছি, তাই জানতে ইচ্ছে হয়—বাঙালী-ঘরের বউ হয়ে যাত্রার দল খোলবার সখ ওঁর কেন হয়েছিল?

রায় মশাই একটু থেমে মনে মনে কি যেনো ভেবে নিয়ে তখন বলতে থাকেন : কথা কি জানেন, বাঙালীর মেয়ে পুরুষালী কোন কার-কারবার করলেই লোকে চমকে যায়, তাঁর সম্বন্ধে নানা রকম কথা রটিয়ে আমোদ পায়। কিন্তু আমাদের বউরাণীমা নিজে সখ করে এ কারবার করেননি—তাঁর স্বামীর কথাতেই এ কারবারে তাঁকে মাথা দিতে হয়েছে। নৈলে, যাত্রার দল খুলে পয়সা উপার্জন করবার কোন প্রয়োজনই তাঁর ছিল না, পয়সার তাঁর অভাব নেই।

মৃগেনের মুখে ও চোখে বিস্ময়ের ভাব ফুটে ওঠে, নির্বাক্ দৃষ্টিতে রায় মশাইয়ের মুখের পানে চেয়ে থাকে সে। রায় মশাই বলে যান : বউরাণীর স্বামী ছিলেন মস্ত বড়োলোক, লোকে তাঁকে রাজাবাবু বলেই জানতো। জেলায় জেলায় তাঁর জমিদারী, পাঁচ-সাতটা কলিয়ারী—দেশ-জোড়া রাজাবাবুর নাম। নানা অঞ্চলের বড় বড় মিল, ব্যাংক, সদাগরী আফিসের অনেক শেয়ার কিনেছিলেন ; স্বনামে বেনামে অনেক কারবারও ফেঁদেছিলেন, তাদের মধ্যে এই যাত্রার দলটিও তাঁর এক কীর্তি। স্ত্রী বউরাণীর নামেই দলটি তিনিই খুলে যান, আর মৃত্যুকালে স্ত্রী বউরাণীকে বলে যান—জমিদারী কলিয়ারী কার-কারবারের সংগে এটিকেও চালানো চাই। আগেরগুলো হচ্ছে অর্থ উপার্জন করবার কল, আর এটি হচ্ছে অর্থকে সার্থক করবার একটা আলাদা ব্যাপার। গুণী কলাবিদ্‌দের গুণের আদর আর সেই সংগে তাদের জীবিকার উপায়ের জন্তেই এটা করেছেন। কর্ত্রী বউরাণী স্বামীর প্রত্যেক কথাই অক্ষরে অক্ষরে মেনে আসছেন। জমিদারী থেকে এই দলটি পর্য্যন্ত যত কিছু ব্যাপার—কোনটিকে খেলো বা খাটো হতে দেননি, বরং বউরাণীর হাতে পড়ে প্রত্যেক ব্যাপারটির বাড়-বাড়ন্তই হয়েছে। তার পর, ওঁর মেজাজ এতো ভালো যে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। দলের এই পালার কথা বললেই বুঝতে পারবেন। দাম বাড়িয়ে দিয়ে নাম-করা যে কোন অথরের পালা নেওয়া যেতে পারে এ তো জানা কথা। কিন্তু নাম-করা পালা-লিখিয়ে যে-ক'জন আছেন—কোন না কোন বড়ো দলের সংগে তাঁরা চুক্তিবদ্ধ ; অবিশ্যি, টাকার জোরে ঐ চুক্তির বাঁধন ছিঁড়ে ফেলা শক্ত নয়, কিন্তু বউরাণী মোটেই তা পছন্দ করেন না। উনি বলেন—এক জনের সাজানো বাগান থেকে গাছ তুলে এনে নিজের বাগানকে জাঁকিয়ে তোলাটা বাহাদুরী নয়—ইতরামি। পরের কারবারের মানুষ ভাঙ্গিয়ে নিজের কারবারকে জাঁকিয়ে তোলা মানে নিজের পায়েই কুড়ুল মারা—এর চেয়ে অন্যায় আর নেই। তাই উনি বলেন, চেষ্টা করুন, লোক খুঁজুন—ঠিক মিলে যাবে। এই দেখুন না কেন—খুঁজে তো আপনাকে পেয়েছি।

সদরের পথে যেতে যেতেই গাড়ীতে বসে এই সব কথা হয়েছিল। আর এই কথা-প্রসংগে মৃগেনের মত উন্নতি-প্রয়াসী আশাবাদীর তরুণ চিত্তটি যে উল্লাসে নাচিয়া উঠিবে, ইহা স্বাভাবিক। তার লেখা পালাটি যদি পছন্দ হয়—বেড়ালের অদৃষ্টে শিকে যদি ছিঁড়ে যায়, তাহলে কি কাণ্ড না সে করে! অর্থ-ভাগ্যের দরজা যদি একটি বার খুলে যায়—তখন কোন বাধাই আর পথ আটকাতে পারে না, এ সত্য সে জেনেছে।

২১

বাংলা দেশের প্রায় প্রত্যেক জেলা ও মহকুমার সদরে বউরাণীর এষ্টেটের এক-একটা 'কুঠি' এই বৃহৎ ও ব্যাপক প্রতিষ্ঠানটির সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়। কুঠির বিভিন্ন বিভাগে যেমন তহশীলদারের কাছারী ও কার-কারবারের কাজ-কর্ম্ম চলে, তেমনি যাত্রাদলের ব্যাপারে একটা করে 'গদী'ও সাজানো থাকে। এখান থেকে দলের প্রচার চালানো এবং বায়না-পত্র সংগ্রহ করা হয়। মরশুমের সময় গাওনার ব্যাপারে দল এসে পড়লে এখানে থাকে ও এখান থেকেই পালার মহলাদি চলে।

নদীয়া জেলার সদর—কৃষ্ণনগরেও এমনি একটি বড়ো রকমের 'কুঠি' এখানকার এষ্টেটের বিভাগগুলিকে বহন করে। কতকগুলি বৈষয়িক প্রয়োজনের তাগিদে সম্প্রতি কর্ত্রী বউরাণীও এখানে এসেছেন। কুঠি-সংলগ্ন একখানি মনোরম দ্বিতল অট্টালিকায় তাঁর বাসের ব্যবস্থা হয়েছে। ম্যানেজার বসন্ত বাবু সদরে এসেই খবর পাঠিয়ে বউরাণীর সংগে দেখা করে মৃগেনের কথা বিস্তারিত ভাবেই জানালেন।

কথাগুলি নিবিষ্ট মনে শুনে বউরাণী বললেন : সীতাও মস্ত এক পণ্ডিত লিখিয়ে যোগাড় করেছে। তিনি না কি ও'দের কলেজের মাষ্টারণীর ভাই—খাসা নাটক লিখেছেন। বড়দিনের ছুটি পরশু থেকেই শুরু হচ্ছে, তাই কাল দুপুরের ট্রেণে সীতা তাঁকে নিয়ে রওনা হবে লিখেছে।

বসন্ত বাবু বললেন : কিন্তু আমি যে এঁকে নিয়ে এলুম...

সস্মিত মুখে বউরাণী জানালেন : তাতে কি হয়েছে, আমাদের ত এখন দু'-তিনখানা বই চাই ; ইনিও থাকুন, তিনিও আসুন ; তার পর দু'জনেরই বই আমরা শুনবো, সীতার সামনেই শোনা হবে। পছন্দ হোলে দু'খানা বই এক সংগেই মহলায় ফেলবো। আপনি তাঁর থাকার, আর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নিজে করুন—ভদ্রলোকের ছেলের কোনো দিক দিয়ে কোনো অসুবিধা না হয়।

মৃগেনের রচনা-শক্তি সম্বন্ধে নিজের প্রচুর আস্থা থাকায় এবং পালার ব্যাপারে তাঁর ওপর কর্ত্রীও যথেষ্ট আস্থা রাখেন জেনেই ম্যানেজার বাবু সদরে এসেই সর্বাগ্রে পালার প্রসংগ নিয়ে মহলে গিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, সব কাজ ফেলে সেই দিনই বউরাণী মৃগেনের পালা শোনার ব্যবস্থা করে ফেলবেন। কিন্তু আই-এ পাশ—তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী—বিদুষী কন্যার চিঠি সে আগ্রহে বাধার সৃষ্টি করেছে জেনে একটু ক্ষুণ্ণ হোয়েই ফিরে এলেন।

তাঁর মুখে খবরটি শুনে মৃগেনকেও দমে যেতে হোল বৈ কি! বউরাণীর যে এমন একটি কলেজে-পড়া বিদুষী মেয়ে আছে, মৃগেন সে কথা আগে শোনেনি। এখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করে জানলো যে তার নাম সীতা। মেয়েটি সব দিক দিয়েই একেবারে যেনো খাঁটি। তার রূপ আর স্বাস্থ্য যেমন দেখবার মত, চাল-চলনও তেমনি চমকপ্রদ। লোক-দেখানো লজ্জা-সংকোচ বা চাল-চলনে গতানুগতিক মামুলী ধারার ধার দিয়েও চলতে মোটেই সে অভ্যস্ত নয়। একবার না কি কি একটা ছুটিতে এখানে এসে সাইকেল চেপে সারা সহরটা ঘুরে বেড়িয়ে কৃষ্ণনগরের বাসীন্দাদের অবাক্ করে দিয়েছিল। যখনই কোন সদরে আসে, সব সেরেস্তাতেই তার দ্বার অবারিত—ম্যানেজার থেকে মুহুরী পর্য্যন্ত প্রত্যেকের সংগে আলাপ জমিয়ে খুঁটি-নাটি সব জেনে নেবে—এই তরুণ বয়সের কোন মেয়ের পক্ষে যেটা বাস্তবিকই বিস্ময়াবহ। বিশেষতঃ যাত্রার দলটির ওপরই তার ঝোঁক সব চেয়ে বেশী, যে ক'দিন থাকে, মহলায় এসে বসবে, মন দিয়ে শুনবে, গানে বা য্যাকটিংএ বেসুরো কিছু হলে তখনি সেটা ধরবে আর তাই নিয়ে

তুমুল তর্ক বাধিয়ে সকলকে অতিষ্ঠ করে তুলবে—যতক্ষণে তার হেস্তনেস্ত না হবে। শেষ পর্যন্ত হয়ত বউরাণীকেই মীমাংসা করে দিতে হয়। কেন না, লেখাপড়া খুব বেশী না জানলেও যাত্রার বই শুনে চলবে কি না সেটা বোঝবার বা কোন শিল্পীর গান বা অভিনয় সম্পর্কে ভালোমন্দ বিচার করবার ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ। কিন্তু সময় সময় মায়ের সংগেও মেয়ের তর্ক বেধে যায় এবং নানা যুক্তি দেখিয়ে মেয়ে নিজের মতটাকেই গ্রাহ্য করবার জন্তে এমনি জেদ ধরবে যে, শেষ পর্যন্ত বউরাণীকে ভোটের ব্যবস্থা করতে হয়।

বাঙালী-মেয়ের এ রকম জেদ ও সাহসের কথা শুনে মৃগেনের সর্বাংগ রোমাঞ্চ হয়ে ওঠে, তার মনে পড়ে মায়ার কথা। ছেলেবেলা থেকে তারও যে-রকম সাহস আর অসংকোচ স্বভাব দেখেছে, তাতে উচ্চশিক্ষা পেলে আর এমনি সুযোগ-সুবিধে ঘটলে পাড়াগেঁয়ে সেই মেয়েটিও এমনি দুঃসাহসিকা হতে পারতো। কিন্তু মৃগেনের উৎসাহ মুশড়ে পড়লো নিজের সুযোগ-সুবিধার পথে এই উচ্চশিক্ষিতা মেয়েটি আসছে জেনে। সে তার পালায় পল্লীজনের উপভোগ্য গভীর ভাব ও করুণ রসটিকে বেশী করে প্রাধান্ত দিয়েছে, কিন্তু কলেজে-পড়া এই মেয়েটি কি তা পছন্দ করবে? তার পর, তারই কলেজের মেয়ে-প্রফেসরের ভাই লিখেছেন পালা, তিনিও নিশ্চয়ই মস্ত বিদ্বান্ ব্যক্তি। তাঁর লেখার কাছে পাড়াগেঁয়ে ইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ-করা লিখিয়ের লেখা কখনো দাঁড়াতে পারে? আরো পালার দরকারই যদি হয়, বিদ্বান্ লেখক যখন পাচ্ছেন—তাঁকে দিয়েই লিখিয়ে নেবেন হয় ত!

এ অবস্থায় ম্যানেজার বসন্ত রায়ের কথাগুলি তাকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিল: আপনি ভাববেন না মৃগেন বাবু, দলের পর দল চালিয়ে মাথার চুল পাকিয়েছি, মানুষও যেমন চিনি, লেখাও তেমনি বুঝি—সুর কানে গেলেই জানতে পারি মানুষের মনের ওপর তার এক্তিয়ার কতখানি। আপনার লেখায় সে সুরের আমেজ পেয়েছিলুম বলেই আদর করে নিয়ে এসেছি, এটা বাজে মনে করবেন না। যে যাই বলুক, আমাদের মালিক অবুঝ নন, আর আমাদেরও ভোট আছে জানবেন।

পরদিন বিকেলের দিকে বউরাণীর কন্যা সীতা প্রফেসর অশোক মল্লিককে নিয়ে কুঠির ফটকের সামনে গাড়ী থেকে নামলো। ম্যানেজার বসন্ত রায় এষ্টেটের গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে গিয়েছিলেন প্রফেসর মল্লিককে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্য। সীতা তাঁকে সংগে করে আনলেও যখন লেখকরূপেই আসছেন তিনি, তখন দলের অধ্যক্ষের উচিত তাঁকে ষ্টেশনেই অভিনন্দন জানানো। পালা-লেখকদের সম্বর্ধনা সম্বন্ধে সকল দলের কর্তৃপক্ষই এরূপ সচেতন থাকেন, তবে বউরাণীর সম্প্রদায়ের কর্তৃপক্ষগণকে এ সম্বন্ধে অতিরিক্ত উৎসাহী দেখা যায়।

দেউড়ী পার হয়ে প্রাঙ্গণের পথে আসতেই সহসা মৃগেনের সংগে সীতার চোখোচোখি হোল। মৃগেন তখন স্বরচিত একটা গান গুন্‌গুন্ করে গাইতে গাইতে প্রাঙ্গণের ফুলবাগানে পায়চারী করছিল।

লাল কংকরের রাস্তা। দু'ধারে দেশী মরশুম ফুলের গাছ—গাঁদা, দোপাটি ও কুন্দের গাছগুলি ফুলময় হোয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সীতা কয়েক পা এগিয়ে এসেছে; অশোক মল্লিক প্রাঙ্গণের পথে পা বাড়িয়েই তন্ময় হোয়ে ফুলের বাহার দেখছে। তাঁর পিছনেই ম্যানেজার বসন্ত রায়। আর, দু'হাতে দু'টো চামড়ার সুট-কেস নিয়ে তকমাধারী চাপরাশী দেউড়ীর ভিতরে ঢুকছে।…ঠিক এই অবস্থায় গানের মিষ্ট সুর এবং গায়কের স্বাস্থ্য-সুন্দর মূর্তি যুগপৎ সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করলো।

সীতার সংগে চোখোচোখি হোতেই যেন একটা ঝাঁকুনি খেয়ে চমকে উঠলো মৃগেন,—তার গলার সুর তো আপনা বন্ধ হোয়ে গেলোই, উপরন্তু মনে হোল—এ মুখের ছাপ যেনো অনেক আগেই তার স্মৃতির পাতায় অস্পষ্ট হোয়েই ছিল, চোখোচোখি হোতেই সেটি যেন গভীর হয়ে উঠলো।

এ অবস্থায় সীতাকে থমকে দাঁড়াতে হোল। অপরিচিত গলার সুর আর অপূর্ব দু'টি চোখের দৃষ্টি তার কৌতূহলী মনে একটু দোলা দিলো বোধ হয়। অন্য সময় হোলে সে হয় ত নিজেই বাগানে ছুটে গিয়ে দলের এই নবাগত ছেলেটির সংগে আলাপ জমিয়ে ফেলতো; কিন্তু এ-দিনের অবস্থা অন্যরূপ, সংগে শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক। সুতরাং মনের কৌতূহল দমন করে ঘাড়টি বেঁকিয়ে পিছনের শ্রদ্ধেয় অতিথির দিকেই মনঃসংযোগ করতে হোল তাকে। অধ্যাপক অশোক মল্লিকও এই সময় তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে একেবারে সীতার কানের কাছে মুখখানা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো: ও ছোকরা কে সীতা?

একটু সরে গিয়ে সীতা ঘাড় নেড়ে তাচ্ছিল্যের সুরে বললো: কে জানে! হয় ত দলের কোন য্যাক্টর হবে!

ইতিমধ্যে ম্যানেজারও এদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কথাটা শুনেই তিনি প্রতিবাদের সুরে বললেন: না, না, উনি দলের কেউ নন; মিষ্টার মল্লিকের মতন উনিও এক জন সম্মানী লেখক। ওঁকেও আনা হয়েছে।

কথাটা শুনেই অশোক মল্লিকের মুখের ভাব যেনো পালটে গেল, চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্ন ভরে সে সীতার মুখের পানে তাকালো। সীতাও খবরটা শুনে প্রসন্ন হতে পারেনি। অদূরবর্তী সম্মানী লেখকটিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে একটিবার দেখে নিয়ে পরক্ষণে সে দৃষ্টি ম্যানেজারের মুখে নিবদ্ধ করে জিজ্ঞাসা করলো: উনিও বুঝি বই লিখেছেন! শোনা হোয়েছে ওঁর বই?

মৃদু হেসে ম্যানেজার জবাব দিলেন: শোনা-শুনি তোমার জন্যেই যে সব মুলতুবি আছে মা!

প্রসন্ন মুখে অশোক মল্লিকের দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে সীতা বললো: আসুন, স্যর!

মৃগেন এতক্ষণ তার অর্ধচেতন মনের পুরোনো পাতাগুলোর প্রতি ছত্রটি তন্ন-তন্ন করে হাতড়াচ্ছিলো। যে মেয়েকে জীবনে কোন দিন সে চোখের সামনে দেখেনি, আজ তার সংগে চোখাচোখি হতেই পরিচিত জেনে কেনো চমকে উঠলো সে! এই ভাবনাটাই এমনি বিহ্বল করে তাকে তুলেছিল যে, অদূরে তারই প্রসংগে তিন ব্যক্তির সংলাপ বুঝি তার কর্ণ স্পর্শও করেনি। একটু পরে পুনরায় তারই পানে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চেয়ে সেই মেয়েটি যখন চলে গেলো, তখন যেনো সেই দৃষ্টির আর একটা ঝাঁকুনি তার আড়ষ্টতা ভেঙ্গে স্মৃতির রহস্যময় রুদ্ধ দরোজাটিও এক ঝটকায় খুলে দিয়ে গেলো। মৃগেনের চোখের সামনে ফুটে উঠলো অমনি—গৃহত্যাগের রাত্রিতে স্বপ্নে-দেখা সেই অপরিচিতা রহস্যময়ী মেয়েটি—আজকের চোখে-দেখা এই মনস্বিনী মেয়েটির মুখের সংগে যার কোনো পার্থক্যই নেই!

[ক্রমশঃ

গাঁয়ের ছেলের স্কুলে পড়া

[আধুনিক চীনা লেখক ও হসিয়াংএর লেখা গল্পের অনুবাদ]

অনুবাদক—গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

দেশে গাঁয়ে আট-ন' বছর বয়সেই ছেলেরা অনেক কাজের হয়ে ওঠে। তাদের দিয়ে আগাছা পরিষ্কার চলে. ফসলের আঁটিও বাঁধতে পারে তারা। ঘর তোলবার সময় তারা যোগান দিতে পারে, আলের মুখ খুলবার-বোজাবার প্রয়োজনেও তারা কাজে আসে। কাজেই এমনিতে তাদের স্কুলে পাঠাতে কে-ই বা চায়! সরকারী ইস্তাহার বেরিয়েছে ছ' বছরের উপরের ছেলেকে স্কুলে না পাঠালে বাড়ির কারুকে সেই জন্য জেলে যেতে হবে। তারই ফলে এই গল্পের ছোট্ট নায়কটি স্কুলে ভর্তি হল।

প্রথম দিন স্কুল থেকে ছেলেটি ফিরল হাতে আটখানা বই নিয়ে। ঠাকুর্দা-ঠাকুরমা, বাবা-মা সবাই তাকে ঘিরে বইয়ের ভিতরের সব ছবি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগল। ঠাকুর্দা বলল, "ধর্ম্মের চারটে বইতে আর পাঁচ পুরাণে কিন্তু এ রকম ছবি নেই।"

"এ ছবির মানুষগুলি কিন্তু চীনে নয়"—বাবা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "দেখ ভাল করে, ওদের জামা-কাপড় পরা আমাদের মত নয়। জুতো দেখ চামড়ার, পোষাক ভিনদেশী, হাতের ছড়িটাও আমাদের মত নয়। যেন সহরের চৌরাস্তার পাদ্রীর কথা মনে করিয়ে দেয়।"

"সুতো কাটছে যে মেয়েলোকটা, ওটাও ভিনদেশী—"ঠাকুরমা বলল, "আমরা সুতো কাটি ডান হাতে, ঐ মেয়েটা কাটছে বাঁ হাতে।"

"ঐ গাড়োয়ান ব্যাটাও তাহলে চীনে নয়। চীনে গাড়োয়ান কখনও গাড়ির এই দিকে দাঁড়ায় না"—ঠাকুর্দাও মত প্রকাশ করল।

"মাষ্টার মশাই বলেছেন এই বইয়ের দাম এক ডলার বিশ সেন্ট"—বইয়ের ছবির উপর টীকা-টিপ্পনী শুনে ভরসা পেয়ে ছেলেটি হঠাৎ বলে ফেলল। বলামাত্র যেন ঘরে বজ্রপাত হল—কারু মুখে কোন কথা নেই।

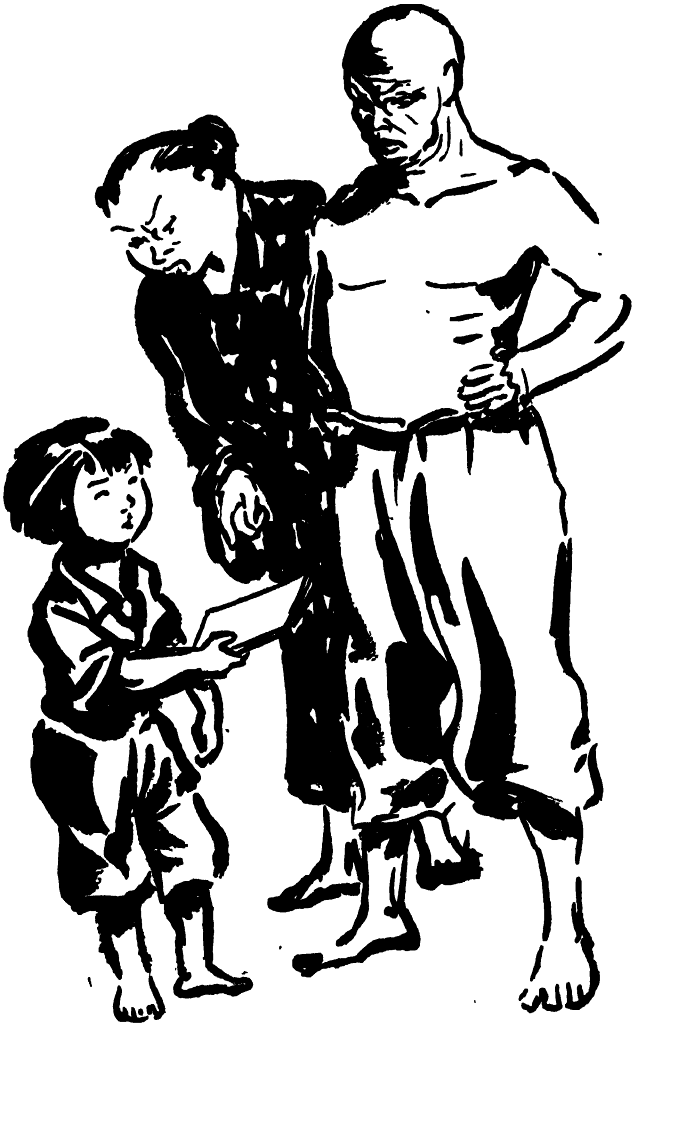
অবশেষে ঠাকুরমা প্রথম কথা বলল, "সাহস ওদের কম নয়! ছেলেটাকে পড়তে দেওয়ার পরও কি ওরা চায় আমরা আবার বইয়ের দাম দেব? এক দিন যেতে না যেতেই এক ডলারের উপর খরচা—এ স্কুলের খরচা চালাবে কে? ছ' মাস ঘরে বাতি না জ্বাললেও এ খরচা তোলা যাবে না—বোলো ধামা গম বেচেও খরচা ওঠে কি না সন্দেহ!"

"এখন ত' একটা বইতেই চলা উচিত। সেটা শেষ হলে আরেকটা কিনে দেওয়া যাবে'খন"—ঠাকুর্দা বলল।

"তা ছাড়া বইয়ের এত দামই বা হবে কেন? মাত্র ত' তিনটে না চারটে কথা এক এক পাতায়—" ঠাকুরমা প্রশ্ন তুলল, "পাঁজীতে ছোট-বড় অক্ষরে পাতায় পাতায় ঠাসা ভর্তি কত লেখা—আর দাম মাত্র পাঁচ সেন্ট। এর দাম এক ডলারের বেশি হয় কি করে?"

মাত্র ক'মিনিট আগে যা দেখে সবাই সপ্রশংস হয়ে উঠেছিল, হঠাৎ সেই বইগুলি বিশেষ বিষাদের কারণ হয়ে দাঁড়াল। খাবার সময় এবং সমস্ত বিকেল ধরে বাড়িতে এই আলোচনাই চলল। অবশেষে এই দুর্দৈব মেনে নিয়ে অন্ততঃ প্রথম বারের জন্য বইয়ের দামটা দিয়ে দেওয়াই স্থির হল। এবং দিতে হল ছেলেটির মাকে—কাণের দু'টো দুল বেচা যে পয়সাটা তার হাতে আছে—তার থেকে। বাপ ছেলেকে একটি বক্তৃতা দিল, "তোমার বয়স এখন নয়, তুমি আর তেমন ছোটটি নও। অবস্থায় না কুললেও তোমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে স্কুলে পাঠাচ্ছি। এখন যদি তুমি মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা না করো তবে তোমার মত অকৃতজ্ঞ পাষণ্ড সংসারে থাকবে না।"

বাপের কথাগুলি ছেলের মনে লাগল এবং পরের দিন ভোর থাকতেই সে স্কুলে গিয়ে হাজির হল। মালী তাকে দেখে কাছে



এসে চুপি চুপি বলল, "ক্লাশ সুরু হয় ন'টায়—এখন মাত্র সাড়ে পাঁচটা। তুমি অনেক আগে এসে পড়েছ। মাষ্টার মশাই এখন ঘুমুচ্ছেন, ক্লাশ-ঘরও এখন খোলা নেই। তুমি এখন বাড়ি যাও।"

ছেলেটি চারি দিকে তাকিয়ে দেখল সে একাই মাত্র হাজির। মাষ্টার মশাইয়ের ঘরের জানলার ধারে দাঁড়িয়ে সে নাক ডাকার আওয়াজ শুনতে পেল। ক্লাশ-ঘরের চতুর্দিক্ ঘুরে দেখল ঘর বন্ধ। বাড়ি ফিরে যাওয়া ছাড়া অন্ত উপায় নেই। যখন সে ফিরে এল তখন তার ঠাকুর্দা উঠোন পরিষ্কার করছিল। হঠাৎ তাকে দেখে ঝাঁটা ফেলে চেঁচিয়ে উঠল, "হালের বলদকে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করে কোন লাভ আছে? এক দিন যেতে না যেতেই স্কুল পালাতে সুরু করেছে।"

ছেলেটি কিছু বুঝিয়ে বলবার আগেই মা এসে তার গালে ঠাস-ঠাস করে দু'টো চড় কসিয়ে তাকে সকালের রান্নার জন্ত উনুন ধরাতে লাগিয়ে দিল। বলা বাহুল্য, চড়ের সঙ্গে বইয়ের দামের কিছু সম্পর্ক ছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর যখন সে আবার স্কুলে পৌঁছুল ততক্ষণে মাষ্টার মশাই প্লাটফর্মে উঠে স্কুলে পৌঁছতে দেরি হওয়ার লেকচার সুরু করেছেন। বক্তব্য পরিস্ফুট করবার জন্ত তিনি এক গল্পের অবতারণা করেছেন। এক পরী এক বস্তা মোহর নিয়ে না কি রাস্তার ধারে অপেক্ষা করে আর যে ছেলে সব চেয়ে আগে ইস্কুলে পৌঁছয়, এক বস্তা মোহর সেই পুরস্কার পায়। গল্প শুনে এবং পরী ও মোহরের বস্তার কথা ভেবে ছেলেটির চোখ বড় হয়ে উঠল কিন্তু সে কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারল না সব চেয়ে আগে মানে কত আগে—মোহর পুরস্কার পাবার জন্ত—তাকে স্কুলে পৌঁছতে হবে।

বিকেলে সাড়ে তিনটেয় যখন ছেলেটি স্কুল থেকে ফিরে এল তখন দিবা-নিদ্রা সেরে বাপ আবার কাজে বেরুচ্ছে। সৌভাগ্য-ক্রমে অন্তান্ত ছেলেদের ফিরতে দেখে এবং মাষ্টার মশাইকেও ছড়ি হাতে ঘুরতে দেখে বাপ বুঝতে পারল ছেলেটি স্কুল পালায়নি। এবং তা বুঝে বিদেশী স্কুল সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ল।

বইয়ের প্রথম পাঠ 'এই আমার মা' রপ্ত করতেই স্কুলের দু'দিন কেটে গেল। ছেলেটিকে ফাঁকিবাজ বলা চলে না। প্রত্যহ স্কুলের পর সন্ধ্যে পর্যন্ত সে তার ঐ এক লাইন পড়া মুখস্থ করে, 'এই আমার মা' 'এই আমার মা।' বাঁ হাতে বই ধরে অন্ত হাতে অক্ষরগুলির উপর আঙুল বুলিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠা, ভক্তি এবং ভয়ের সঙ্গে সে তার পড়া ক্রমাগত আবৃত্তি করতে থাকে, যেন মনো-যোগের একটু অভাব ঘটলেই অক্ষরগুলি তাকে ফাঁকি দিয়ে উড়ে পালাবে।

এদিকে যত বারই সে পড়ে, 'এই আমার মা' তত বারই মায়ের বুকে ধড়ফড়ানি সুরু হয়ে যায়। দু'দিনের দিন আর থাকতে না পেরে ছেলেটির হাত থেকে বই টেনে নিয়ে মা বলল, "দেখি কে তোর মা!" মাও পড়তে চায় ভেবে ছেলেটি আঙুল দিয়ে সঙ্গের ছবি দেখিয়ে বলল, "এই আমার মা' হচ্ছে চামড়ার জুতো পরা, ছোট করে চুল কাটা, লম্বা পোষাক পরা ঐ মেয়েটা—।" ছবিটা একবার দেখামাত্র মা হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। তাকে ভূতে পেয়েছে মনে করে ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, বাপ সবাই ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ল। মা কোন কথা বলে না—কেবল হাউ-হাউ করে কাঁদে। অনেক সাধ্য-সাধনা ও প্রশ্নের পর মা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "ঐ পেত্নীর মত মা খোকা পেল কোত্থেকে?"

কান্নাকাটির আসল কারণ জানতে পেরে বাপ বলল, "ও বোধ হয় মাষ্টারের মা। যা হোক, খোকা কাল মাষ্টারের কাছে জেনে আসবে ও কার মা—"

সারা রাত দুশ্চিন্তায় কাটিয়ে ভোর না হতেই মা ছেলেকে টেনে তুলল। 'এই আমার মা' আসলে কার মা জানবার জন্ত, ছেলেটিকে তক্ষুনি স্কুলে যেতে হবে। স্কুলে পৌঁছে ছেলেটি জানলে সেদিন রবিবার স্কুল বন্ধ। আর আগের রাত্রে পেটে অতিরিক্ত মদ পড়ায় মাষ্টার মশাই গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। ফিরে এসে ব্যাপারটা মাকে বলতেই মা রবিবার দিনটার উপরে ক্ষেপে গেল।

পরদিন সোমবার সব ছেলেদের জড় করে মাষ্টার মশাই বললেন, যারা শিখতে চাও, জানতে চাও কোন কিছু জিজ্ঞাসা করতে কখনও তারা পিছপাও হবে না। যখনই যা জানবার থাকবে স্কুলে মাষ্টার মশায়ের কাছে কিম্বা বাড়িতে বাবা-মার কাছে তখনই তা জেনে নেবে।"

মাষ্টার মশায়ের কথায় ছেলেটি ত' সাহস পেয়ে উঠে দাঁড়াল, "আমার বইয়ে আছে 'এই আমার মা'। আসলে ও কার মা?"

মাষ্টার মশাই বললেন, "যে কেউ ঐ বই পড়তে বসবে—এই ছবি তার মা। বুঝছ?"

ছেলেটি বলল, "না—"

মাষ্টার মশাই বললেন, "বুঝতে পারছ না? কেন, এতে না বোঝবার কি আছে?"

ছেলেটি বলল, "নেড়ুও এই বই পড়ে, ওর মা ত' এই রকম ছবির মত নয়—"

হুসিও সিন বলল, "নেড়ুর মার ত' একটা হাত নুলো আর একটা চোখ কানা—"

আত্মরক্ষার জন্ত নেড়ুও বলে উঠল, "আর তোর যে মা-ই নেই, ক—বে মরে গেছে—"

বাঁধানো ছড়িটা ব্লাকবোর্ডে মেরে মাষ্টার মশাই বললেন, চুপ সবাই—নিজেদের মধ্যে কথা বলবে না তোমরা। এসো আজ অন্ত পড়া দেব। 'এই আমার বাবা'। সবাই দেখো, চশমা পরা সিঁথি কাটা ঐ লোকটা হল 'এই আমার বাবা'।"

ছবিটা কার মা জানবার জন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছিল। কিন্তু যখন ছেলে 'এই আমার বাবা' পড়া নিয়ে ফিরল তখন আর উচ্চবাচ্য করতে সাহস হল না, তার স্বামী তাকেই জিজ্ঞাসা করে বসে ছেলের নতুন বাবা এল কোত্থেকে। মা শুধু অবাক হয়ে ভাবতে লাগল লোকের একটা করে বাপ-মা থাকতেও তাদের নতুন বাপ-মার জন্ত বইয়ের এত গরজ কেন।

দিন কয়েকের মধ্যেই ছেলেটি নতুন পড়া নিয়ে এল—'বলদে উনন ধরায়' 'ঘোড়া পিঠে খায়।' দিনের মধ্যে হাজার বার আউড়েও পড়া ছেলেটির রপ্ত হল না। পড়ার ভিতর কেবলই একটা গোলমাল বোধ হতে লাগল তার। তাদের বাড়িতেই একটা বলদ এবং একটা ঘোড়া রয়েছে। প্রায়ই সে তাদের চরাতে নিয়ে গেছে। কিন্তু কখনও ঘোড়াকে সে পিঠে খেতে দেখেনি। আর বলদ যে উনন ধরায় না এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। কিন্তু তা বলে

বইয়ের কথা মিথ্যে হতে পারে না। সন্দেহ নিরসন করতে না পেরে মাষ্টার মশায়ের উপদেশ মত বাপকেই সে জিজ্ঞাসা করে বসল।

বাপ বলল, "সহরে একবার এক বিলেতি সার্কাসে দেখেছিলাম বটে একটা ঘোড়া ঘণ্টা বাজাচ্ছে আর বন্দুক ছুড়ছে। বইতে বোধ হয় সেই ধরণের কোন বলদের কথা লেখা আছে।"

বাপের কথা শুনে ঠাকুরমা মাথা নাড়ল। ঠাকুরমা বলল, "বলদটা নিশ্চয়ই শয়তানদের রাজা—আর ঘোড়াটা কোন দানব। দেখছিস্ না, ওদের জামা-কাপড় সব মানুষের মত পরা। শুধু মাথা ওদের মানুষের মত হয়নি। পুরোপুরি মানুষ হতে ওদের পাঁচশ' বছর লেগে যায় কি না।" তার পর বুড়ি সুরু করল যত পুরাণের এবং দত্যি-দানোর গল্প—দত্যি-দানো যারা ইচ্ছে করলে বাতাস এবং বৃষ্টি নিয়ে ভেলকি খেলতে পারে। ফলে সেই রাত্রে ছেলেটি স্বপ্ন দেখলে এক পাখাওয়ালা নেকড়ে বাঘ তাকে কামড়ে ধরেছে।

পরের দিন ছেলেটি মাষ্টার মশাইকে জিজ্ঞাসা করল, "'বলদ উনন ধরায়' এই বলদটা কি বিলেতি?"

মাষ্টার মশাই বললেন, "তুমি বড় সোজা ছেলে। এ সব বইতে বানিয়ে লেখা হয়েছে। সত্যি কি আর বলদে উনন ধরাতে পারে না ঘোড়া পিঠে খায়!"

মাষ্টার মশায়ের কথা শুনে একসঙ্গে ছেলেটির মনের অনেক ভার নেমে গেল। তার বইতে 'কেক', 'পার্ক' 'বল' এমন অনেক কিছু সে পড়েছে যা কখনও সে দেখেনি এবং যা নিয়ে অনেক ভেবেছে। মাষ্টার মশায়ের উত্তরে সে আজ বুঝতে পারল বইয়ের লেখা সব বানানো। সত্যি নয়।

এক দিন ছেলেটি এবং তার সহপাঠীরা মিলে ঠিক করলে বইতে যেমন লেখা আছে তা'রা তেমনি করে চায়ের আসর করবে। সবাই বিশ সেণ্ট করে চাঁদা দিয়ে সহরে কমলালেবু, আপেল, চকোলেট ইত্যাদি কিনতে পাঠাবে। ছেলেটি অবিশ্যি নিশ্চিত জানত খাবার কিনবার জন্ম বাড়িতে পয়সা চাওয়া মানে সেধে দুর্ভোগ ডেকে আনা। লেখবার জন্ম যখনই কাগজ কিনতে হত ঠাকুরমা বলত স্কুল তাদের দেউলে করে ছাড়বে। কিন্তু বইয়ের চায়ের আসরের ছবিটা ছেলটিকে এত মোহিত করেছে যে, সে ঠিক করল গয়না বেচে যে টাকাটা কপির বিচি কেনবার জন্ম মা আলাদা করে রেখেছে—তার থেকেই সে কিছু সরিয়ে ফেলবে।

ঠাকুর্দা বহু দিন ধরে কাশিতে ভুগছিল। কে যেন তাকে বলেছে কমলালেবুর খোসায় তার অসুখের উপশম হবে। তাই প্রায়ই ঠাকুর্দা কমলালেবুর খোসা কেমন এবং কোথায় পাওয়া যায় খোঁজ করত। কমলালেবুর ব্যাপারে হয়ত ঠাকুর্দার সহানুভূতি পাওয়া যাবে ভেবে ছেলেটি ঠাকুর্দাকে বলল, "আমরা কমলালেবু আনাচ্ছি—"

"তোরা কমলালেবু আনাচ্ছিস্?"—ঠাকুর্দা জিজ্ঞাসা করল, "কমলালেবু দিয়ে তোরা কি করবি?"

"আমরা চায়ের আসর করছি কি না তাই" ছেলেটি বলল।

"চায়ের আসর আবার কি জিনিষ?"

"চায়ের আসর মানে একসঙ্গে চা ও খাবার খাওয়া"—ছেলেটি বলল, "আমাদের বইতে আছে—"

"যত সব ছাই-ভস্ম বই"—ঠাকুরমা বলল, "কখনও জন্তুতে মানুষের মত কথা বলে, কখনও লোককে খেলতে আর খেতে শেখায়! তাই বলি ছেলেটা স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর এ রকম কুঁড়ে এবং খুঁতখুঁতে হয়েছে কেন?"

"আর বইয়ে-পড়া যত বিলেতি খাবার চাই তার—দেশী খাবার মুখে রোচে না"—ঠাকুর্দা বলল।

"মনে করে তোর ঠাকুর্দার জন্ম একটা কমলালেবু আনিস্ খোকা"—মা বলল।

"কমলালেবু কেনবার পয়সা তোরা পেলি কোথায়?" বাপ জিজ্ঞাসা করল।

"মাষ্টার মশাই…" ছেলেটি একটা গল্প বানিয়ে ওঠবার আগেই পূবের বাড়ির নেড়ুর কান্না শোনা গেল। তার পরই নেড়ুর বাপের চড়া-গলা পাওয়া গেল, "আমরা পারি না নুণের যোগাড় করতে—আর তুই চাস মোরব্বা কেনবার পয়সা"—

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল পশ্চিমের বাড়ির হসিও লিনের খুড়ো চেঁচাচ্ছে, "আমার রক্ত-জল করা পয়সা দিয়ে তোকে বই কিনে দিয়েছি সে তোর ভালোর জন্ম। মণ্ডা কিনে খাবার পয়সা আমি তোকে দিতে পারবো না। যে চায়ের আসর করতে বলেছে—তার কাছে চা গিয়ে পয়সা!"

ব্যাপারটা বোঝা গেল। বাপ লাথি তুললে ছেলেটির দিকে। মাঝখানে টেবিল উল্টে কিছু মাটির বাসন নষ্ট হল। ঠাকুর্দার মতে তক্ষুনি ছেলেকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া উচিত। কিন্তু ওদিকে আবার ঠাকুরমা চায় না তার ছেলে জেলে যায়। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর ঠিক হল আরও কিছু দিন ছেলেকে স্কুলে রেখে দেখা যাক্।

এই দুর্গতির পর ছেলেটি প্রতিজ্ঞা করল, মন দিয়ে পড়াশোনা করে তার উপরে বাড়ির ধারণা সে বদলে ফেলবে। স্কুলের পর প্রত্যেক দিন অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত সে বই মুখে নিয়ে বসে থাকে। বেচারী জানত না তার দুর্ভোগের সূত্রপাত ঐ বই থেকেই।

তার ছেলের বিয়ের পর থেকেই ঠাকুরমার মনে হত তার ছেলে তার কাছে থেকে কেমন সরে গেছে। আর সংসারে প্রতিপত্তিও তার অনেক কমে গেছে। তার পর এক দিন ঠাকুরমা শুনল তার নাতি বই পড়ে খালি বলছে, 'আমাদের বাড়িতে আমার বাবা আছে, আমার মা, আমার ছোট বোন আছে আর আমার ছোট ভাই আছে' এবং তার মধ্যে তার সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই—তখন ঠাকুরমার মেজাজ গেল চড়ে।

"তাহলে এ এখন তোমাদের বাড়ি, আমি এখানে কেউ নই—এখানে আমার কোন অধিকার নেই—" বলতে বলতে ক্ষেপে গেল ঠাকুরমা, বাসন-পত্তর আছড়িয়ে ভাঙতে সুরু করে দিল।

সব শুনে ছেলের বাপ বলল, "তুমি শান্ত হও মা—বরঞ্চ আমি জেলে যাবো—সে-ও ভাল—ছেলেকে আমি এ সব বই পড়তে দেবো না।"

পরের দিন ক্ষেতে গিয়ে বাপ এক জন কামিনকে বরখাস্ত করল আর স্কুলের খাতায় ছেলেটির নামের পাশে ঢেড়া পড়ল।



ছোটদের আসর

মার্শেলের অন্তর্দ্ধান-রহস্য

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

আলটপ্‌কা একটা কন্‌ট্রাক্ট পেয়ে গেলুম। গোড়ার দিকে যখন লোকে লাখ-লাখ টাকা পিটে নিলে তখন কিছু হ'ল না, আর এখন কন্‌ট্রাক্ট! তাছাড়া এ-ভাবে পয়সা রোজগারে আমার কোন ঝোঁকই ছিল না। তবু যখন সাহেব বললে, 'গোবিন্দ, যাবার সময় তোমার জন্তে এটা যখন ঠিক করলুম, তখন নিয়ে নাও, যা হোক কিছু ত' হবে।' তখন সাহেবের কথা ঠেলতে পারলুম না, সম্মতি জানালুম।

অবশ্য এই 'কিছু'র জন্তে আমি কোন দিনই তোয়াক্কা করিনি—ব্যাচিলার লোক, কি-ই বা খরচা আমার,—কেবল যা একটু দেশ-বিদেশ ঘোরার নেশা। সেই নেশাতেই সাহেবের সঙ্গে এক দিন আলাপ হয়ে গিছল আসামের জঙ্গলে—নাগা পাহাড়ের ধারে।

কন্‌ট্রাক্টটা ছিল একটু অদ্ভুত ধরণের। পয়সার চেয়ে এর অন্ত আকর্ষণ ছিল আমার কাছে অনেক বেশি। আমাদের লেখাপড়া হয়ে গেল ক্যাপ্টেন ড্রুমণ্ড প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সব বুঝিয়ে দিলেন। সৈনিকদের সংখ্যা, তাদের নাম, র‍্যাঙ্ক, কোথায় কাদের কবর দেওয়া হয়েছে তার চার্ট, প্ল্যান এমন ভাবে করা ছিল যে, জিনিসটা নখদর্পণে আনতে মোটেই সময় লাগল না, আমি কাজে লেগে গেলুম। ওপরে সাদিয়া ও লিডোর ধার থেকে নিচে আরাকানের খানিকটা পর্য্যন্ত নিয়ে ছিল আমার কর্ম্মস্থান। চার্ট দেখে দেখে কবরস্থান বার করা, তার পর মাটি খুঁড়ে, নাম-ধাম মিলিয়ে, সংখ্যা মিলিয়ে কফিনগুলি সংগ্রহ করতে আমার ভালই লাগছিল।

ইতিমধ্যে আমার কাজের খবর বাড়িতে পৌঁছে গিছল। মা এক দিন চিঠি লিখলেন, 'হ্যাঁ রে খোকা, বামুনের ছেলে হয়ে তুই শেষে মুদ্দোফরাসের কাজ নিলি!' কাজটা অবশ্য ঠিক তা না হ'লেও তারই কাছাকাছি। আসামে পদস্থ আমেরিকান সৈনিকদের যে সব দেহ কবরিত করা হয়েছিল, সেগুলি তুলে সংগ্রহ করে আমেরিকায় পাঠানোর ব্যাপার মার কাছে মুদ্দোফরাসের কাজ ছাড়া আর কি হবে!

পাহাড়-পর্ব্বত, বন-জঙ্গল, নদী-নালা ঘুরে ঘুরে, কবর খুঁড়ে মৃতদের আমি বার করতে লাগলুম। কত দিন তাঁবুর মধ্যে কফিনগুলির সঙ্গেই রাত কেটে গেছে আমার। ছেলেবেলা থেকেই আমি ছিলুম বাড়ির মধ্যে ডানপিটে গোছের, ভবঘুরে—ভয় বলে কিছুই জানতুম না।

কিন্তু সত্যিকার এক দিন ভয় পেলুম, মণিপুরের ভেতর টৌমেঙ্গলঙ্গ-এর কাছাকাছি একটা জায়গায়।

সেদিন বরাক নদীর ধারে আমাদের কাজ হচ্ছিল। ক'দিন ঝড় জলের পর আকাশ পরিষ্কার থাকায় সন্ধ্যার আগেই যখন সব কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমি তাঁবুতে ফিরে এসে বিশ্রাম কচ্ছি, এমন সময় পরিতোষ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে, 'আশ্চর্য্য ব্যাপার, এখানকার একটা কফিন—'

পরিতোষ আমার বন্ধু, বরাবর আমার সঙ্গেই থাকে। এমনি আশ্চর্য্যের কথা আরও দু'-একবার ও আমায় বলেছে, কিন্তু আমি তার মধ্যে কিছুই পাইনি; তাই ওর কথায় বাধা দিয়ে বললুম, 'কি, কোন কফিন পাওয়া যাচ্ছে না ত? তাড়াহুড়ো না ক'রে একটু খোঁজ, নিশ্চয়ই পাবে—এ সব ব্যাপারে মিলিটারীর ভুল হয় না।'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ও বললে, 'আহা, পাওয়া সবই গেছে, তবে—'

'তবে কি?' আমি বিরক্ত হয়েই প্রশ্ন করলুম।

'একটা একেবারে ফক্কা!'

'ফক্কা!—ফক্কা আবার কি?'

'মজুররা একটা কফিন তুলতে গিয়ে দেখে হালকা ফক্‌-ফক্‌ করছে, তখন ওরা আমাকে ডাকে, সন্দেহ করে যে ওটার মধ্যে কিছু নেই, তুলে দেখে আমারও তাই মনে হচ্ছে!' হড়-বড় করে একটানা বলে পরিতোষ হাঁপাতে লাগল।

ব্যাপারটা আশ্চর্য্য হবার মত হলেও, নিজেকে আমি সামলে নিয়ে ওকে বললুম, 'বোকার মত কুলি-মজুরদের কাছে এ-নিয়ে হৈ-চৈ করার কি আছে! যদি ওর মধ্যে কিছু না-ই থাকে, তাহ'লেও তোমার-আমার মাথা-ঘামাবার কিছু নেই। হ্যাঁ, কি নাম লেখা আছে ওটার গায়ে দেখেছিস্?'

মৃত ব্যক্তিদের নাম কফিনগুলির গায়েই লেখা থাকত। পরিতোষের হাতেই মণিপুর এরিয়ার লিষ্ট ছিল, দেখে বললে, 'লেফটনেণ্ট কর্ণেল বি, জি, মার্শেল।'

'কত নম্বর ?'

'একুশ।'

'আচ্ছা এখন ঐ শবাধারটা আলাদা করে আমাদের তাঁবুর মধ্যে এনে রাখো, আর ও-সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করো না, তাহ'লে এই শেষ মুখে সব কাজই আমাদের পণ্ড হয়ে যাবে।'

তিনটে তাঁবু পড়েছিল আমাদের ওখানে। একটার মধ্যে কফিনগুলো রাখা হ'ত, আর একটার মধ্যে থাকত কুলিরা। অপরটার মধ্যে থাকতুম পরিতোষ ও আমি।

সন্ধ্যার পর এক জন কুলি কফিনটাকে এনে আমার তাঁবুর মধ্যে রেখে গেল। মৃতদেহ নিয়ে নাড়া-ঘাঁটা করতে করতে যদিও আমি বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিছলুম, তবুও কফিনটা দেখেই যেন কেমন গা-টা ছমছম করে উঠল। সেদিন রাত্রে কিছুই আমার খেতে ইচ্ছা হল না। পরিতোষ ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়ে দেয়ে। রাত্রি দেড়টা নাগাদ তাকে ডেকে তুললুম। ইতিমধ্যেই ওটাকে খুলব বলে মনে মনে আমি ঠিক করে ফেলেছিলুম। পরিতোষ উঠতেই তাকে সে কথা বললুম। সে কিন্তু আপত্তি ক'রে বললে, 'আবার কেন ও সব ঝঞ্ঝাট বাড়াবে—কি বেরুতে কি বেরিয়ে পড়বে শেষ কালে। মড়া-টড়া নিয়ে নাড়া-ঘাঁটা না করাই ভালো!'

কিন্তু ঔৎসুক্য তখন আমার দারুণ বেড়ে গেছে, তাছাড়া এখন কর্তৃপক্ষকে জানালে যেমন গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে, তেমনি পরে এ ব্যাপার না জানিয়ে ওদের কাছে ধরা পড়লেও কেলেঙ্কারীর শেষ থাকবে না। এমনি সাত-পাঁচ ভেবে ব্যাপারটার একটা কিছু বিহিত করার জন্তে আমি তাকে সম্মত করে ওটা খোলাই ঠিক করলুম।

তাঁবুর মধ্যে পেট্রোম্যাক্সের আলোটা জ্বলছিলই, সেটাকে একটু বাড়িয়ে দিয়ে পরিতোষ, আমি ও আমার হিন্দুস্থানী চাকর ভগলুকে নিয়ে নানান চেষ্টার পর কফিনের ড'লাটা খুলে ফেললুম ডালাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ করে একটা ভাপসা ওযুধের গন্ধ আমাদের নাকে এসে লাগল। ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে পরিতোষ ও আমি কফিনের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিলুম।

ভগ্‌লু বললে, 'ভিতরমে কুছ নেই হ্যায় বাবু!'

শুধু শবের গায়ে-ঢাকা এক টুকরো কাপড় ছাড়া তার মধ্যে আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। পরিতোষ একটা লাঠির খোঁচা দিয়ে কাপড়টাকে সরাতেই তার তলা থেকে একটা ক্রশ ও একখানা রূপোর চাকৃতি বেরিয়ে পড়ল। চাকৃতিটায় রেজিমেন্ট নম্বর ও লেফটেনেন্টের নাম লেখা ছিল কেবল।

'আশ্চর্য্য ব্যাপার! একেবারে ভুতুড়ে কাণ্ড! এমন ক'রে আঁটা কফিনের ভেতর থেকেই বা শব উধাও হবে কি করে!'—পরিতোষ চোখ কপালে তুলে বললে।

সে মুহূর্ত্তে আমি আর বিশেষ কিছু ভাবতে পারছিলুম না; শুধু পরিতোষকে বললুম, 'কারুকে কিছু না বলে যেমন করে হোক আজ রাত্রেই এটার মধ্যে মাটি পুরে অন্তান্ত কফিনগুলোর সঙ্গে চালান করে দাও।'

ক্যাপ্টেন ড্রমণ্ড তখন আমেরিকায় চলে গিছলেন; তা নইলে হয়ত তাঁর কাছেও গোপনে ঘটনাটা বলা চলত, কিন্তু এখন আমেরিকা যাওয়ার পূর্ব্বে এ রহস্যের আর কোন হদিশ যখন হবে না, তখন এ নিয়ে মিথ্যে গোলমাল পাকিয়ে নিজের ক্ষতি ছাড়া আর লাভ কি,—ভেবে ব্যাপারটা একেবারে আমি চেপে গেলুম।

ইতিমধ্যে ছ'-সাত ক্ষেপে প্রায় তিনশো সাড়ে তিনশো কফিন পাঠান হয়ে গিছল। আর এক ক্ষেপ পাঠালেই আমার চুক্তিমত কাজ প্রায় শেষ হয়ে যাবে। শেষ ক্ষেপের সঙ্গে আমারও আমেরিকা যাবার কথা, কনট্রাক্টের কাগজপত্র সমেত। পেমেন্ট নিতে হবে সেখান থেকেই। 'এয়ারে' আমেরিকা যাওয়াটাই ত ছিল আমার সব চেয়ে বড় আকর্ষণ। এখন অবশ্য এর চেয়েও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে মার্শেলের রহস্যময় অন্তর্দ্ধানের ব্যাপারটা। তাড়াতাড়ি এর একটা কিনারা করতে না পারলে আমি যেন কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলুম না।

এই ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যেই আমার যাত্রার দিন স্থির হয়ে গেল।

আমেরিকায় পৌঁছেই আমি ক্যাপ্টেন ড্রমণ্ডের সঙ্গে দেখা করলুম। আমাকে দেখে ক্যাপ্টেন খুব খুশি হলেন। সেদিন রাত্রে তাঁর ওখানেই আমার ডিনারের নিমন্ত্রণ হ'ল। খাওয়া-দাওয়ার পর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আত্মীয়-স্বজন সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে অনেক গল্পগাছি হ'ল আমার। কথা-প্রসঙ্গে ক্রমশঃ আমরা কনট্রাক্টের আলোচনায় এসে পড়লুম। তার পর এ-কথা সে-কথার পর লেফ্‌টনেন্ট কর্ণেল মার্শেল সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন কি না জিজ্ঞাসা করলুম। হঠাৎ আমার মুখে মার্শেলের কথা শুনে তিনি আমার আগ্রহের কারণ জানতে চাইলেন। উত্তরে সমস্ত ঘটনাটা চেপে গিয়ে আমি শুধু বললুম, 'না এমনি শুনেছিলুম যে, তিনি না কি অত্যন্ত সামান্ত সৈনিক থেকে অসাধারণ কৃতিত্বের ফলে বড় হন, তার পর হঠাৎ এক দিন চিন্দুইন নদীর ধারে জাপানীদের অতর্কিত আক্রমণে মারা যান।'

কথাগুলো আমি বানিয়ে বললেও আশ্চর্য্য রকম ভাবে সেগুলো মিলে গেল। ড্রমণ্ড পাইপ খেতে খেতে উত্তর দিলেন, 'তুমি যা বলেছ সবই ঠিক, সামান্ত সৈনিক থেকেই তিনি বড় হয়েছিলেন, তার দুঃসাহসিকতায়। বড়লোকের একমাত্র ছেলে হয়েও অত্যন্ত অল্প বয়সে তিনি সৈনিক বিভাগে যোগ দেন। গত ইউরোপের যুদ্ধে জার্মানদের হাত থেকে দু'-দু'বার তিনি অদ্ভুত ভাবে পলায়ন করেন। কোয়াজালিস দ্বীপে জাপানীদের বিপক্ষে তিনি এমন সব কৌশল দেখিয়েছিলেন, যা যুদ্ধের ইতিহাসে বিরল; লোকে শুনলে ভোজবাজী বলে বিশ্বাস করে না। তার পর সেখান থেকেই তাঁকে ভারতে পাঠান হয়। ভারতে এসে তাঁর একটু মাথার গোলমাল দেখা দেয় বটে, কিন্তু তখন আর তাঁকে হাতছাড়া করার উপায় ছিল না। অবশ্য সেখানেই তিনি চিরতরে আমাদের হাত ছাড়া হয়ে যান। চিন্দুইন নদীর কাছে একটি ইনফেন্টি ডিভিশনের এ্যাড্‌ভান্স বেশে জাপ্‌দের অতর্কিত বোমায়, ডিরেক্ট হিট-এ তিনি মারা যান।—ও: ছাটস্‌ এ ভেরী স্যাড্‌ ডেথ্‌!' বলতে বলতে ড্রমণ্ডের গলার স্বর যেন ভারী হয়ে আসে।

'বাড়িতে তাঁর আর কে আছে?' আমি প্রশ্ন করলুম।

'এখন একমাত্র স্ত্রী আর একটি নাতি ছাড়া আর কেউই নেই।

বড় বড় তিন-তিনটি ছেলেই তাঁর এই যুদ্ধে মারা গেছে। শুনেছিলুম, স্ত্রীটিও না কি কিছু দিন হ'ল আবার অন্ধ হ'য়ে গেছে।'

কথায় কথায় রাত্রি অনেক হয়ে যাচ্ছিল; এক ফাঁকে ড্রুমণ্ডের কাছ থেকে মার্শেলের বাড়ির ঠিকানাটা আমি জেনে নিলুম। তার পর আর খানিকটা এ-কথা সে-কথা ক'য়ে উঠে পড়লুম সেদিনের মত।

সেদিন রবিবার। লাঞ্চের পরই আমি বেরিয়ে পড়লুম বাফেলোর দিকে। সহরতলীর বাইরে সুবার্বে লেফ্‌টনেন্টের বাড়ি। আশে-পাশে ছাড়া ছাড়া খান কয়েক বাড়ি আর কল-কারখানা ছাড়া ও-চত্বরটায় আর বিশেষ কিছু ছিল না। মধ্যে মধ্যে ফল-পাকড়ের বাগান অবশ্য নজরে পড়ছিল দু'-চারটে। পথ চিনে যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমার মত এক জন ভারতীয়কে এ-পথে দেখে অনেকেই অবাক হচ্ছিল। দু'-এক জন আপনা থেকেই আমি কোথায় যাব জানবার জন্য প্রশ্ন করলে।

নির্দ্দিষ্ট স্থানের কাছ বরাবর এসে, এক জনকে মার্শেলের বাড়িটা কোথায় জিজ্ঞাসা করতেই সে খিঁচিয়ে উত্তর দিলে, 'মার্শেল ত মরে গেছে যুদ্ধে, তার কাছে আর যাবে কি ক'রে?'

তার উত্তরে আমি বললুম, 'ভারতবর্ষ থেকে একটা খবর নিয়ে আমি এসেছি, তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্য।'

তখন লোকটা আঙুল দিয়ে বাড়িটা আমাকে দেখিয়ে বললে, 'ঐ যে ঐ ধোঁয়া উঠছে, এসেন্সের কারখানা, ওর আগেই যে লাল পুরোন বাড়িটা।'

সাহসে ভর করে আমি বাড়িটার দিকে এগুচ্ছিলুম বটে, কিন্তু ক্রমশই কেমন যেন একটা ভীতির ভাব আমাকে আশ্রয় কচ্ছিল। এক এক বার ভাবছিলুম: কি দরকার ছিল এই বিদেশ-বিভূঁয়ে এ ঝঞ্ঝাটে—সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে এ-নিয়ে মাথা-ঘামাবার এমন কি প্রয়োজন ছিল আমার! এখন আমি একেবারে বাড়িটার সামনা-সামনি এসে পড়লুম। সেখানটায় বিশেষ কোন আলো ছিল না; দূরে রাস্তার আলোয় যেটুকু দেখা যাচ্ছিল, তাতে বাড়িটা চিনতে মোটেই আমার কষ্ট হয়নি। এসেন্সের কারখানা থেকে মিষ্টি গন্ধ হাওয়ায় ভেসে আসছিল। সেদিন সন্ধ্যার পর থেকেই কুয়াসা করে যেন কেমন একটা আবছায়া সৃষ্টি করেছিল চতুর্দ্দিকে। বাড়িটাও যেন কেমন অদ্ভুত ঠেকল আমার কাছে, পুরোন আমলের গির্জ্জা-টাইপের বাড়ি। একটা সরু গলির ভেতর দিয়ে, দোরের সামনে একটা বোর্ডে 'টু-লেট্' না কি লেখা রয়েছে—যেই পড়তে যাব, এমন সময় পিঠে কার যেন স্পর্শ অনুভব করলুম। ফিরেই গা একেবারে আমার হিম হয়ে গেল! দেখি, ইয়া লম্ব-চওড়া এক প্রৌঢ় আমার সামনে দাঁড়িয়ে। অদ্ভুত তার মুখাকৃতি—পোড়া পোড়া মুখের চামড়া কুঁচকে এঁকে-বেঁকে বিকৃত হয়ে গেছে! পরনে মলিন পোষাক আর মাথায় একটা নাইট ক্যাপ চোখের কাছ পর্য্যন্ত ঢাকা। বিস্ময়কর কোঠরগত তার চোখের ওপর আমার চোখ পড়তেই তিনি অত্যন্ত কর্কশ গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাকে চাই?'

থতমত খেয়ে আমি বললুম, 'এটা কি লেফ্‌টনেন্ট কর্ণেল মার্শেলের বাড়ি? আমি তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।'

মার্শেলের নাম শুনে লোকটি যেন আরও খাপ্পা হয়ে উঠল। মুখ আরও বিকৃত করে—'কোথেকে আসছি, কি প্রয়োজন' প্রশ্ন করলেন, তার পর আমার উত্তর শুনে কি ভেবে বললেন, 'ভেতরে এসো।' গলার স্বরটা তখন তাঁর অপেক্ষাকৃত নরমই মনে হ'ল।

আত্মারাম যদিও তখন আমার প্রায় খাঁচা-ছাড়া হবার উপক্রম হয়েছিল, তবু আমার সাহস আমাকে ভেঙে পড়তে দেয়নি। ফিল্মে ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের ছবি দেখেছিলুম, এ যেন তার জীবন্ত রূপ দেখলুম।

একটা খিড়কির দোর দিয়ে আমি তাঁর অনুগমন করলুম। অনেক ঘর পেরিয়ে, একটা ঘরের মধ্যে তিনি নিয়ে গিয়ে আমায় বসালেন। নিজে আমার সামনে একটা কোচে বসলেন। বাড়িটা জন-মানবশূন্য নিস্তব্ধ—আমরা ছাড়া তৃতীয় কোন মানুষের আর সাড়া-শব্দ পেলুম না সেখানে। চেয়ারে বসেই মার্শেল সম্বন্ধে আমি কি জানি তার সমস্ত সঠিক বিবরণ জানতে চাইলেন। তিনি যেই হোন, এ-অবস্থায় সব খুলে বলাই ভালো ভেবে, আমি আমার কনট্রাক্ট পাওয়া থেকে, কফিনের মধ্যে লাস উধাও হওয়া ও ড্রুমণ্ডের কাছ থেকে যা যা শুনেছি সবই তার কাছে বললুম। ধীর ভাবে সব শোনার পর তিনি আর কোন কথা না বলে হঠাৎ তাঁর পেটের মধ্যে হাত পুরে দিয়ে একটা ওয়ালেট বার করলেন, তার পর সেটার ভেতর থেকে দশখানা হাজার ডলারের জি-নোট আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'এই নাও তোমার সংযমের পুরস্কার—কালবিলম্ব না ক'রে ভারতে ফিরে যাও, আর জীবনে কারুর কাছে এ-কথা প্রকাশ করো না।' সংক্ষিপ্ত কথা ক'টি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেই প্রৌঢ় উঠে পড়লেন। তার পর যে রাস্তা দিয়ে আমরা ভেতরে গিছলুম, সেই রাস্তা দিয়েই তিনি ও আমি আবার বাইরের রাস্তায় এসে পড়লুম। রাস্তায় পড়বার মুখে তিনি বললেন, 'তোমায় চা খাওয়াতে পারলুম না বলে দুঃখিত।'

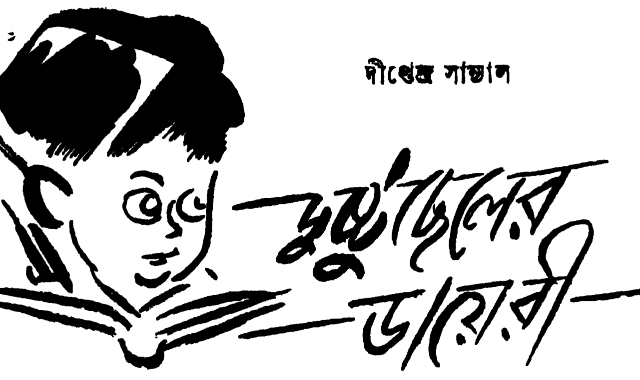
মাথাটা তখন আমার টলছিল, আর সর্ব্বাঙ্গ কেমন যেন ঝিম-ঝিম করছিল। ভাবলুম, আর চা-খেয়ে কাজ নেই—কোন রকমে এখন এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলে বাঁচি! টাকাটা এতক্ষণ হাতের মুঠোতেই ছিল, গুছিয়ে কোটের ইন্‌সাইড পকেটে রেখে আমি বিদায় নিতে যাচ্ছি এমন সময় ভদ্রলোক বিকট হাস্য করে বলে উঠলেন, 'সেক্ হাণ্ড!—আমায় দেখে বুঝি ভয় পাচ্ছো—হা হা হা!'

এর কয়েক দিন পরেই আমেরিকা থেকে কাজ-কর্ম্ম চুকিয়ে আমি ভারতে চলে আসি। আসার সময় শুধু একবার ড্রুমণ্ডকে জিজ্ঞাসা করি, 'আচ্ছা, মার্শেলকে দেখতে কি রকম ছিল?' উত্তরে তিনি যা বলেন, ঐ চেহারার সঙ্গে তার অনেক মিল মনে হয়েছিল আমার—কেবল মুখের ঐ বিকৃত ভাব ছাড়া।

আজও আমি সে হাসির কথা ভুলতে পারিনি, আর সে রহস্যেরও সমাধান করতে পারিনি যে মার্শেল জীবিত না মৃত।*

---

* গল্পের ঘটনা, নাম, সমস্তই কাল্পনিক।



দীপেন্দ্র সান্যাল

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৩

ডাকাতের সঙ্গে আলাপ হতে কারুর দেরী হয় না, আলাপ জমাতে ওস্তাদ সে। ভারী চমৎকার কথা বলতে পারে। আর কারুর সঙ্গে কথা বলতে পেলে থামতে চায় না মোটে। চেহারাটা মস্ত বড়—গায়ের রং অসম্ভব ফর্সা—মুখখানা হাসিতে উচ্ছ্বসিত সব সময়েই। কারণে-অকারণে হেসেই মাত করতে চায় সবাইকে—নিজেও খুন হয় হেসে হেসে।

কাযেই সাগরকে বহু দিনের বন্ধুর মত করে নিতে তার সময় লাগল অণুমাত্র। এবং একবার পরিচয়টা পাকাপাকি বন্ধুর স্তরে নেমে আসার অপেক্ষা শুধু। সারা মেসশুদ্ধ লোক ওদের দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল। যখন খেতে আসবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে দেখা গেলো দু'টি দুরন্ত কিশোরকে—খুসীর হাসিতে সারা বাড়ীটাকে তারা বুঝি ফাটিয়ে ফেলতে চায় এইমাত্র।

শুতে গিয়েও ক্লান্ত সাগরের চোখে ঘুম এলো না আজ।

তাদের কথা কোন দিন ফুরোতে পারে—অফুরন্ত কথা যাদের বাকী! অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে নিজেদের কথায় মেতে উঠলো।

ডাকাতকেও ঘর-পালানো ছেলে বললেই হয়। আট বছর বয়সে কিসের একটা মেলা দেখতে গিয়ে ও ছিটকে যায় ওর বাবার হাত ফসকে। সেই থেকে, ওর বাবার কাছে আর ফিরে যেতে পারেনি। মানুষ করেছে আর এক জন বৃদ্ধ অপরিচিত ভদ্রলোক। তাকে ডাকাত কাকাবাবু বলে ডাকত। পথ থেকে ঘরে তুলে নিয়ে এলেন তিনিই ডাকাতকে। গ্রামের মেলায় হারিয়ে-যাওয়া এই ছেলেটি ওর সব কিছু জড়িয়ে ছিল শেষ দিন পর্যন্ত পরিবারহীন এই অপরিচিত মানুষটির। গ্রাম থেকে কলকাতায় ফিরে এসে—একটু বড় হলে তার কাকাবাবু ডাকাতকে ভর্ত্তি করে দিলেন এক ইস্কুলে। কিন্তু আশ্চর্য্য, কাকাবাবু যে দিন মারা গেলেন—সেদিনই ডাকাতের প্রথম বার বাবার কথা মনে পড়ল। এত দিন বাবার সঙ্গে দেখা না হওয়ার দুঃখ সে ভুলেছিল কাকাবাবুকে পেয়ে। কিন্তু বাবার জন্যে দুঃখ করলে ত তার চলবে না।

কাকাবাবু মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইস্কুল ছাড়তে হলো তাকে। সে এসে ঢুকল কাজে—এক ছাপাখানায়—বিখ্যাত একটি সাপ্তাহিকের প্রেসে কাজ জুটে গেলো তার। প্রথম প্রথম কিছুই করতে হোত না তাকে—এখন সে সব কাজ শিখে ফেলেছে—'ম্যাটার' সাজানো থেকে ছাপার যাবতীয় কাজ। অল্প যা শিখেছিল ইস্কুলে, তার পর নিজেই পড়াশুনোয় এগিয়ে যেতে লাগল সে। এখন তার চলে যায় চমৎকার।

এবার সাগরের গল্প। জগতের সঙ্গে তার জীবনের যেন কোথায় একটা মিল আছে। এবং অদ্ভুত মিল। সাগরও তার বাড়ী ছেড়ে এসেছে। শুধু ডাকাতের বাবা বেঁচে থেকেও তার সঙ্গে দেখা হয় না ডাকাতের—আর সাগরের বাবা তাকে ছেড়ে গেছেন একেবারে। কিন্তু সাগরের এক কাকাবাবু ছিল ডাকাতের কাকাবাবুর মতই। তার যা কিছু আব্দার সব ত কাকাবাবুকে ঘিরেই ছিল, তিনিও বেঁচে নেই আজ।

সাগর কিন্তু একটা জিনিষ গোপন রেখে গেলো ডাকাতের কাছেও। নিজের নাম এবং বাবার নাম, পরিচয়—এগুলো ডাকাতকেও সে জানতে দিল না। মেসের অন্য সবাই তাকে রঞ্জন বলে জানলো—ডাকাতকেও সেই নাম জানিয়ে দিলো সে।

পরের দিন সকালে সাগর যখন ঘুম থেকে উঠল, তখন বেলা অনেক। ডাকাত উঠে মুখ-হাত ধুয়ে বসে আছে একলা। সামনে একটা খবরের কাগজ খোলা।

'বাঃ, আমায় ডেকে দাওনি কেন? এত বেলা হয়ে গেছে'—সাগর বললে।

ডাকাত বললে—'কাল ক্লান্ত ছিলে, তায় ঘুমনো হয়েছে অনেক রাতে, তাই জাগাইনি।'

সাগর এবার রাগ করলে—'আর তুমি বুঝি খুব সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছিলে? তুমি ত সারা দিন খেটে ফিরে তবে শুয়েছ—তুমি ক্লান্ত হওনি বুঝি?'

'আমার কি জানো'—ডাকাত হাসলে, 'আমার রোজই সকালে ওঠা অভ্যাস। ট্রেণে চড়ার ক্লান্তি আর প্রত্যেক দিনের অভ্যস্ত কাজের ক্লান্তি কি এক? যাক, ও-সব কথা থাক। আজ রবিবার, চল তোমায় সহর দেখিয়ে আনি, আজ ত আমার ছুটি।'

সাগর লাফাতে লাগল। হ্যাঁ—দেখতে হবে বই কি, সব দেখতে হবে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, যাদুঘর, জু-গার্ডেন—সব তার দেখা চাই। এ না হলে কলকাতায় এসে লাভ কি?

তৈরী হয়ে নিতে সাগরের যা দেরী। কিন্তু সে একটু বিষণ্ণ হোল যখন ডাকাতের মুখে শুনলে যে, মিউজিয়ম, জু-গার্ডেন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সব অনেক দূরে। এবং সে এক দিন কোন ছুটিতে ঠিক করে বেরিয়ে তবে দেখতে হবে। আরও দুঃখিত হোল যখন শুনল, ডাকাতের না কি এ সব মোটেই ভাল লাগে না। হবেও বা! হয়ত কখন দেখেনি বলে সাগরের এই মোহ, এত আগ্রহ সত্যিই হয়ত অবাক হবার মত কিছু নয়। কিম্বা অবাক হওয়ার মতই শুধু, ভালো লাগার মত নয়।

রাস্তায় বেরিয়েই সাগরের সব কিছু কেমন যেন লাগতে লাগল। মনে মনে এর সঙ্গে তার ময়নাপুরের ছবিটা একবার মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করল সে। একটুও মিল নেই।

ধোঁয়া আর ধুলোয় চার দিকের সব কিছু ধূসর। আর ময়নাপুর—তার চারধারে শুধু মাঠ, বড় বড় মাঠের মাঝখানে গাছগুলো একলা ভূতের মত দাঁড়িয়ে। হাওয়া আর আলো অপর্য্যাপ্ত

ময়নাপুরের সব জায়গায়। কিন্তু এ কি, এ যে সব কিছু বদ্ধ—সব কিছু অস্পষ্ট, সব জায়গাতেই ভীড় এবং ভয়ানক গোলমাল সারাক্ষণই লেগে আছে। সবাই ছোটাছুটি করছে, কারও কারও দিকে তাকাবার সময় নেই,—সময় থাকলেও রুচি নেই বোধ হয়।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে তারা অবশেষে চা খেতে ঢুকলো এক রেস্তোরাঁতে। খেতে খেতে ডাকাত সাগরকে জিজ্ঞেস করল—'কি করবে ঠিক করেছ? করেছ কিছু ঠিক?'

ছবি আঁকার স্বপ্ন নিয়ে কলকাতায় এসেছে শুনলে ডাকাত নিশ্চয়ই হেসে উঠবে, তাই সাগর যেন একটু অপ্রস্তুত হয়েই জবাব দিলে—'কই না, এখনও কিছু ভেবে ঠিক করিনি।'

ডাকাত বললে—'আমাদের ওখানে একটা কাজ খালি আছে, ইচ্ছে করলে তুমি নিতে পার।'

প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে কোন রকমে সামলে নিয়ে সাগর বললে—'কি কাজ? আমি পারব কি? আমি ত কিছুই জানি না।'

ডাকাত বললে—'তাতে কি হয়েছে? ছাপাখানার কাজ খুব শক্ত নয়। আমিও ত গোড়ায় জানতাম না কিছু, ওরাই শিখিয়ে নিয়েছে।'

উল্লসিত সাগর জিজ্ঞেস করলে—'ওরা নেবে কি আমায়?'

ডাকাত বললে—'সে ঠিক হয়ে যাবে,—যিনি প্রেসের মালিক তিনি আমায় ভয়ানক ভালবাসেন, আর লোক ভাল খুব। এখন তুমি রাজী থাক ত বল।'

সানন্দে রাজি হোল সাগর। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে যখন তারা মেসের দরজায় ফিরে এলো—তখন বেলা বারোটা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

সোমবার দিনই সাগরকে নিয়ে ডাকাত হাজির হলো প্রেসের মালিকের ঘরে। চমৎকার মেজাজে ছিলেন ভদ্রলোক। সাগরকে দেখে তিনি খুসী হলেন সত্যিই—বললেন, এই ত চাই, নিজেদের পায় দাঁড়াতে হবে তোমাদের। ঘরের কোণে পচে মরার চেয়ে বাইরে খেটে খাওয়া ভালো। জগতের সমস্ত দেশের ছেলেমেয়েরাই এ বয়েস থেকেই নিজেরাই নিজেদের ভার নিতে পারে—তোমরাই বা পারবে না কেন? জান তোমাদের কবি কি বলেছেন—'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা'—ভদ্রলোক রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন, সাগর লক্ষ্য করল। কিন্তু সাগরও তখন খুসীতে আনন্দে উচ্ছ্বসিত। তারও বুক ফুলে উঠতে লাগল।

তার পর অনেক কথা হোল তাঁর সঙ্গে সাগরের। সব খোঁজ নিলেন সাগরের। সাগর কিন্তু আসল পরিচয় গোপনই রাখল। এমন কি, ছবি আঁকার কথাও বললে না একবারও। ভদ্রলোক নিজের কথাও বললেন অনেক। সাগর বুঝলে এই ছাপাখানাই তাঁর ধ্যান, জ্ঞান সব। ব্যবসায়ী হলেও ভদ্রলোকের মন ভারী খোলা এবং অল্পক্ষণেই আলাপ জমে গেল সাগরের সঙ্গে।

সাগরকে তিনি উৎসাহ দিলেন প্রচুর। শুধু কথায় নয় কাজেও। বললেন,—'তোমার ত হাতে কিছু নেই। আর কেউ নেইও ত তোমার বললে—তা আমার এখানে যখন এসেছ তখন সে কর্ত্তব্য আমারই। এখানে কাজই যখন করবে তখন আগামই নিয়ে যাও এ মাসের মাইনেটা।' —তার পর ফের সাগরকে বললেন—'মন দিয়ে কাজ করো বাবা। ডাকাতই তোমায় তৈরী করে নেবে, কেমন, পারবে না ডাকাত?'

'খুব পারব'—ডাকাত জবাব দিলো।

সাগর কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলেন প্রেসের ম্যানেজার মাণিক বাবু। "স্যার," ঘাড় চুলকে তিনি বললেন মালিকের উদ্দেশেই,—"আমি এসেছিলাম এই বিলটা নিয়ে।"—আড়চোখে তিনি একবার চাইলেন সাগরের দিকে, তার পরে চোখ পড়ল ডাকাতের ওপর। মুখে একটা হাসি এনে মিলিয়ে গেলো যেন।

মাণিক বাবুর সঙ্গে কয়েকটা দরকারী কথা সেরে নিলেন প্রেসের মালিক মিঃ চৌধুরী। তার পর সাগরের দিকে ফিরতেই ম্যানেজার মশাই সুরু করলেন,—'স্যার'—আবার ঘাড় চুলকোতে, দেখা গেলো তাঁকে, 'স্যার'—ফের পুনরুক্তি করেন তিনি মিঃ চৌধুরীকে অন্যমনস্ক দেখে,—'আপনি ওই যে একটি জানা লোক চেয়েছিলেন যদি বলেন—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই মিঃ চৌধুরী জিজ্ঞেস করেন—

'এনেছেন না কি তাকে?'

'না স্যার, বললেই কাল নিয়ে আসি এখানে'—আশ্বাস দেন মাণিক বাবু।

'থাক, আপনার আর কষ্ট করতে হবে না, লোক পেয়ে গেছি আমি—এই যে একে ডাকাত এনেছে—বেশ ছেলে, একে ডাকাতই কাজ শিখিয়ে নিতে পারবে।'—মিঃ চৌধুরী বললেন।

যে ভয় করছিলেন, এতক্ষণে তাই হলো দেখে মাণিক বাবুর মুখ বিরক্তিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠলো—কোন রকমে 'আচ্ছা' বলে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

'তা'হলে তোমরাও কাজ সুরু করে দাও—কেমন'—বলে বেরিয়ে গেলেন মিঃ চৌধুরী।

ডাকাতকে সাগর বললে,—'তোমার ম্যানেজারকে যেন কেমন মনে হলো, খুব খুসী হলেন না বোধ হয়।'

ডাকাত হেসে ফেলল, বললে—'খুসী? এখন থেকেই ও চেষ্টা করবে তোমায় তাড়াতে। ওর নিজের কোন লোক ঢোকাতে চেয়েছিল এখানে।'

সাগর বললে—'তা'হলে?'

'কোন ভয় নেই'—ডাকাত জবাব দিল—'মালিকের বোধ হয় পছন্দ হয়েছে তোমাকে। তা'হলেও খুব হুঁসিয়ার হয়ে কাজ কোর।'

প্রথম জীবনের কাজের এই প্রথম মুহূর্ত্তে সাগরের মনে পড়ল তার মাকে। যাঁর চোখের জলে তার পালিয়ে-বেড়ানো-দিনগুলো দুঃসহ বেদনায় ছিল বিষণ্ণ—আগামী কালে কোন দিন সাগরের জীবনের কোন সার্থক মুহূর্ত্তে তারা কি তাঁর খুসীর হাসির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে?

সাগরের বুক কখন দুরু-দুরু করছে, কখন কখন ফুলে-ফুলে উঠছে।

সন্ধ্যেবেলায় যখন ডাকাতের সঙ্গে সে বাড়ী ফিরে এলো তখন তার মন আবার হাল্কা হয়ে উঠেছে। কাজ তেমন কিছু শক্ত নয়—আর শিখে নিতেও কষ্ট হবার মত নেই কিছু। কিন্তু এখন ভাবছে

হবে—কি কি কেনা চাই তার? কি কি দরকার? এত দিন নানান জিনিষ কেনবার কথা মনে আসছিল সাগরের—কিন্তু আশ্চর্য্য, টাকা হাতে পেয়েই সাগর সে সব জিনিষের নাম কিছুতেই মনে করতে পারলো না।

রাত্তির বেলায় শুয়ে শুয়ে একটা কথা মনে করে সাগর অস্থির হয়ে উঠল। তার ছবি আঁকার কি হবে? এ কাজ নিয়ে কাটালে ত' চলবে না। কিন্তু কোন রকম উপায়ই তার মাথায় এলো না। কি করা যায়? ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল সাগর।

সেদিন রবিবার। সাগরদের ছুটি। ডাকাত সকাল বেলায় বেরিয়ে গেছে কোথায়। সাগর ঘরে বসে একা ছবি আঁকছে। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে—সাগর মুখ ফিরিয়ে দেখে ডাকাত পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে কখন।

ডাকাত সাগরকে জড়িয়ে ধরে বললে—'আমায় বলনি কেন ভাই, তুমি এত সুন্দর ছবি আঁকতে পার?'

সাগর মাথা নীচু করে রইল।

ডাকাতই ফের বললে—'মিঃ চৌধুরী তোমার ছবি দেখলে খুব খুসী হবেন। কাল তাঁকে দেখাব তোমার সমস্ত ছবি?' ডাকাত নিজেও বসে বসে সাগরের সব ছবি দেখল অনেকক্ষণ ধরে।

পরের দিন ডাকাত সাগরের কোন আপত্তি শুনল না, সমস্ত ছবি নিয়ে গেলো মিঃ চৌধুরীর কাছে। ছবি দেখে তিনিও জড়িয়ে ধরলেন সাগরকে—বললেন, 'তুমি এক দিন মস্ত বড় শিল্পী হবে, আমি বলে দিলাম।'

কি বলবে, ভেবে না পেয়ে সাগর কিছু বললে না।

মিঃ চৌধুরী বললেন, 'তোমার ছবি আমি ছাপব আমার কাগজে, দাও আমার কাছে তোমার ছবিগুলো।'

সাগর তাঁর হাতে ছবিগুলো দিয়ে যখন বেরিয়ে এলো তখন তার সমস্ত শরীর কাঁপছে। এতটা সে আশাও করেনি। আশা করবার মত কারণও ছিল না কোন।

মাণিক বাবু আরও চটলেন এ ব্যাপারে। কিন্তু চটে বিশেষ সুবিধে হোল না। রাগটা বেমালুম চেপে যেতে হোল তাঁকে। ডাকাতের চোখ এড়ায়নি, কিন্তু মনে মনে সে হাসলো।

কাগজখানা হাতে করে এনে সাগরকে সেদিন অবাক করে দিলো ডাকাত। সাগর দেখল ছবির তলায় 'শিল্পী'র নাম ছাপা হয়েছে—'সাগরকুমার'—এ কি! এ নাম ডাকাত জানলো কোথা থেকে! তাদের কাছে ত সে রঞ্জন নামেই পরিচিত।

তাকে বিস্মিত হতে দেখে ডাকাত বলল—'ও নামটা আমিই দেখে ফেলি সেদিন সকালে, তোমার ছবির তলায় এক জায়গায় লেখা ছিল। তখনই বুঝলাম রঞ্জন তোমার নাম নয়—কাজেই কাগজ যখন ছাপা হয় তখন তোমায় অন্য কাজে আটকে রেখেছিলাম, যাতে এ ব্যাপার তুমি না জানতে পার।'

এতক্ষণ ব্যাপারটা সাগরের মাথায় ঢুকলো। তার পর সে সব কথা ডাকাতকে বলল, তার পর জিজ্ঞেস করল—'কিন্তু এখন উপায়, এরা যদি আমার নাম জেনে ফেলে ত সবাই জেনে ফেলবে তখন?'

ডাকাত বললে—'আমি কি তোমার মত না কি? এদের কাছে বলেছি যে ও নিজের নামে ছবি ছাপতে চায় না—'সাগর' নাম নিয়ে ও ওর ছবি ছাপতে দিতে পার, কাযেই এরা তোমার নাম রঞ্জনই জানে, সেদিকে কোন ভয় নেই।'

এবার সত্যিই ডাকাতের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সাগর। ডাকাত তাকে বাঁচিয়েছে।

২

ডাকাত অসুখ হয়ে পড়ে আছে মেসে। সাগর এই প্রথম একা একা চলল ছাপাখানায়। আজ যেতে যেতে তার অদ্ভুত একটা ভয়ের মত করতে লাগল, বোধ হয় একা একা যায়নি বলেই কোন দিন—সাগর ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করল এই ভয়কে।

ছাপাখানায় ঢুকেই মিঃ চৌধুরীর ঘরে ঢুকতে যাবে এমন সময় শুনল মাণিক বাবুর গলা। থেমে গেলো সাগর। কার সঙ্গে কথা বলছেন মাণিক বাবু? জানলা দিয়ে উঁকি মারলো সাগর। দেখে সমস্ত গা তার ঠাণ্ডা হয়ে এলো।

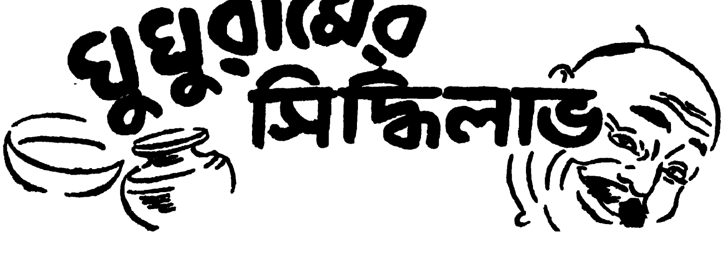
মিঃ চৌধুরীর ঘরে বসে আছেন তাদের জমিদারীর বৃদ্ধ ম্যানেজার হারাণ বাবু—বোধ হয় মিঃ চৌধুরীর অপেক্ষায়। অনেকক্ষণ বসে থেকে একটা লম্বা মোড়া খাম মাণিক বাবুর হাতে দিয়ে তিনি বললেন, "এটা মিঃ চৌধুরীর হাতে দিয়ে দেবেন—আমি আবার ও-বেলা আসব।"—বলে বেরিয়ে গেলেন হারাণ বাবু।

মাণিক বাবু সেটা মিঃ চৌধুরীর টেবিলে চাপা দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে যেতেই—সাগর এসে সেটা খুলে ফেললে। তার মধ্যে সাগরের একটা ছবি—আর মিঃ চৌধুরীর কাছে লেখা তাঁর কোন বন্ধুর চিঠি। চিঠিতে লেখা আছে সাগর দেখল যে, মিঃ চৌধুরীর অফিসে এই চেহারার কোন ছেলে যদি কাজ করে ত তাকে কিম্বা পুলিশে খবর দিতে। তাঁর কাগজে সাগরের নাম দেখে তার দাদা খোঁজ করতে পাঠিয়েছে, এ সেই সাগর কি না?

চিঠিটা আর ছবিটা নিয়ে সাগর বেরিয়ে এলো ঘর ছেড়ে। কি ভাবলে যেন খানিকক্ষণ।

সেই রাত্রিরে মেস থেকে যে ছেলেটি বেরিয়ে এলো পথে—সেই ছেলেটিই এক দিন ময়নাপুরের গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসেছিলো এক দিন। আজ আবার সেই সাগর সেই পথেই এসে দাঁড়াল—পথ থেকে পথে আবার ছোটার দিন সুরু হয়ে গেলো তার।

ঘুঘুরামের সিদ্ধিলাভ



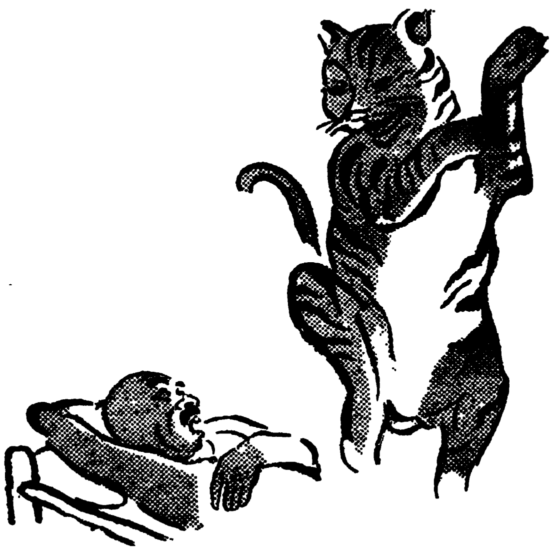
শ্রীসুনির্ম্মল বসু

পালোয়ান ঘুঘুরাম শুয়েছিল দাওয়াতে,
চোখ তার ঢুলুঢুলু ভাং বেটে খাওয়াতে।
হারুদের দারোয়ান, পালোয়ান নিতান্ত-ই,
খাসা তার বপুখান, ভাষা তার দেহাতী।



ভয় পেলে তোতলায়, কথা যায় জড়িয়ে;
একটু সময় পেলে নেয় খালি গড়িয়ে।
কাজ নাই আজ তার, বাবু নাই বাড়ীতে,
চলে গেছে কলিকাতা সন্ধ্যার গাড়ীতে।
ঘুঘুরাম তাই আজ ভাং খেয়ে চুটিয়ে,
শুয়েছে দাওয়ার 'পরে দেহ তার লুটিয়ে।
ঝুরু ঝুরু হাওয়া বয়, খাওয়া ছোলা প্রচুরই,
মোটা মোটা রোটা আর মুচমুচে কচুরি।
মাঝে মাঝে মোচে তার তাও দেয় দু'হাতে,
ভাং খেয়ে, মনে তার রং ধরে উহাতে।
হারুরা বাড়ীতে নেই, বলে গেছে তাহারা,
ঘুঘুরাম একা তাই দেয় বাড়ী পাহারা।
সহসা ঘুমেতে তার চোখ এলো জড়িয়ে,
নাক ডাকে খাটিয়াতে দেহখানা ছড়িয়ে।

নাক ডাকে ঘুঘুরাম, বাঘ ডাকে যেন রে,—
ঘর-দোর কেঁপে ওঠে মনে হয় হেন রে।
সহসা ঘুঘুর পুত ভাবে রাত দু'পরে।
দেখে দুটো ভাঁটা চোখ দাওয়াটার উপরে।
কালো-শাদা দাগ গায়ে পড়ে গেল নজরে,—
'বা-বা-বা-বা বাঘ' বলে তোতলায় সজোরে।
নিঝুম নিথর গ্রাম কেউ নাই জাগিয়া;
ঠকাঠক্ কাঁপে ঘুঘু দাঁতে দাঁত লাগিয়া।
থাবা ঘষে বাঘা বসে', তেজ তার ভারি যে—
গুঁড়ি মেরে কাছে আসে লেজ তার নাড়ি' যে।
কাঁপা গলা চাপা সুরে ঘুঘু বলে কাতরে—
"দো-দো-দো-দোহাই বাঘা, বনে ফিরে যাতো রে—



আই না-মনুষ নই, আমি ঘুঘু পাখী তো,
পিঁজরায় বসে আমি 'ঘু-ঘু-ঘু-ঘু' ডাকি তো—"
কে শোনে ঘুঘুর কথা, রক্ষা কি আছে রে?
গুটি গুটি আসে বাঘা খাটিয়ার পাশে রে।

ঘুঘু চায় মিটি মিটি, কোথা আর পালাবে,
আরো যদি কাছে আসে লাঠি তার চালাবে।
আরে এ কি, বাঘা দেখি ভর দিয়ে তু'পায়ে,—
কাছে এসে অবশেষে নাচে নানা উপায়ে।
খায় কভু ঘুরপাক্ ফঁাচ্ ফঁাচ্ আওয়াজে,
তার পর সুরু হয় ডিগ্‌বাজি খাওয়া যে।
ঘুঘুরাম হেসে ওঠে দেখে কেরামতি রে,
বাঘ বটে তবু সেটা সুরসিক অতি রে।
সারা রাত কেঁদো বাঘ নেচে-কুঁদে-চেঁচায়ে,
এখন ঘুমায় পড়ে লেজখানি পেঁচায়ে।
প্রভাতের ঝিরঝিরে বায়ু গায়ে লাগিয়া,
সিদ্ধির ঘোর কাটে ঘুঘু ওঠে জাগিয়া।
চেয়ে দেখে পাশে তার শুয়ে আছে হুলোটা,
সারা গায়ে লেগে আছে কাদা আর ধুলোটা।
পাশে তার পড়ে আছে সিদ্ধির বাটি যে,
এইবার ঘুঘুজীর মনে পড়ে খাঁটি যে—
বাঘ নয় হুলো ওটা,—সিদ্ধির আমেজে,
বাঘ তারে ভেবে ভয়ে সারা রাত ঘামে যে।



হুলোটাও বাটি চেটে নেশা তার ধরেছে
তারি ঝোঁকে সারা রাত নেচে-কুঁদে মরেছে।
এখন ঘুমায় পড়ে ভুমে মুখ গুঁজিয়া,
হেসে ওঠে ঘুঘুরাম ব্যাপারটা বুঝিয়া।

★

পদ্মবনে পঙ্কোজ

হিরন্ময় ঘোষাল

আমাদের এই টালিগঞ্জের এই দিকটায় কতকগুলো বড় বড় পুকুর জাতীয় জিনিষ দেখতে পাবে। এরা বলে "দ"। হাড়গোড়-ভাঙা "দ"-ও বলতে পারো কারণ সেগুলো সাধারণ পুকুরের মত গোলগাল নয়। বাঁকা-আঁকা ত্রিভঙ্গমুরারি। ম্যাপে এঁকে লক্ষ্য করলে নদীর ভগ্নাংশের মত দেখায়। হিলবিল্ করে ছুটে যাওয়া একটা নদীর ওপর গোটাকয়েক কোপ মেরে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললে যে কতকগুলো দাগা পাওয়া যাবে, এই "দ"গুলো কতকটা সেই রকম। অনুমান মিথ্যে নয়। বলে, আগে না কি এ দিকটা দিয়েই গঙ্গার সমুদ্রে যাবার পথ ছিল। স্বয়ং মা-গঙ্গায় না-ও হতে পারে, তবে তাঁরই কোনো নাতী-নাতনীর, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখন সেই নদীটির গঙ্গাপ্রাপ্তি হলেও, সে যে কী চীজ ছিল, তা তার এই "দ"রূপী দশমিকগুলো দেখলেই দিব্যি মগজে দাখিল হয়।

সত্যি-মিথ্যে জানি না, তু'-একখানা মাস্তলশুদ্ধ জাহাজও না কি এই সব "দ"-এর অতল তলে কাৎ হয়ে কিংবা চিৎ হয়ে চিরনিদ্রা দিচ্ছে। জানোই তো, ও জিনিষটা দিবানিদ্রার মতই আরামের। তাই জাহাজগুলোকে কখনো টেনে তুলে কাজে লাগানো যাবে বলে মনে হয় না। ইতিমধ্যে সেগুলোর ফার্ষ্ট আর সেকেণ্ড ক্লাস কেবিনগুলো কুমীর আর কচ্ছপে ভাগাভাগি করে নিয়ে ঘর-সংসার করছে। খালাসীদের ঘরগুলোকে মোটা মুনাফায় ভাড়া দিয়েছে মাগুর আর মিরগেলগুলোকে। এদের সঙ্গে সিঙ্গী-শোল-বোল-কই-খলসে-বাটা-পুঁটি-ক্যাৎলা-পোনারও একটি প্রকাণ্ড পরিবার পরম সুখে কালাতিপাত করে। পরম সুখে বলছি এই জন্যে যে, একমাত্র কুমীরের বপু বৃদ্ধি করা ছাড়া ঝোল কিংবা কালিয়ার রসে এদের কখনো সাঁৎরাতে হয়নি, অথবা কোফ্‌তা বা ফ্রাই সেজেও ব্রাহ্মণ-সজ্জনের পাতে গড়াগড়ি দিতে হয়নি। কারণ, এই "দ"গুলোর দণ্ডমুণ্ডের মালিক না কি কে এক জন পরম জৈন, যিনি মৎস্য-মুণ্ড তো নিজে স্পর্শ করেনই না, উপরন্তু আমাদের পাতেও যে কখনো-সখনো পড়ে-পাওয়া মুড়োটা-আশ্‌টে পড়তে পারে সে পথও রাখেননি। রেখেছেন এক জন পালোয়ান দরোয়ান যে দিনরাত্তির ঐ "দ"গুলোর দিকে চোখ পাকিয়ে বসে বসে তার কাঁচা-পাকা গোঁফে পাক দিচ্ছে, পাছে কেউ কোনো অসহায়, এলেবেলে বেলে কিংবা সরল পুঁটিদের কাউকে ধাপ্পা দিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে সরে পড়ে।

জায়গায় জায়গায় এই "দ"গুলোর মাঝে মাঝে লম্বা লম্বা ঘাসওয়ালা "ব''-দ্বীপ। সেগুলোর ওপর কতকগুলো বোকা চেহারার বক বাজে বক্‌বক্‌ না করে, চক্ষু মুদে কাজের কথা ভাবছে! তবে বেশীর ভাগ "দ''গুলোই প্রায় মজে এসেছে। এক একটার গায়ে সজারুর পিঠের মত কচুরিপানার কাঁটা বসানো।

আমি যেটার কথা বলছি সেটা আমাদের বাড়ীর খুব কাছেই। সব চেয়ে গভীর সেটা আর সব চেয়ে প্রবঞ্চক। তার মুখ দেখে কে বলবে তার তলে তলে এত? মুখখানি হাসি-হাসি। সারি সারি শ্বেতপদ্মের দন্ত বিকাশ করে এই "দ"টি সারা দিনই দেয়লা করছে। মাঝে মাঝে লম্বা লম্বা ঘাস, কিন্তু তার তলায় দ্বীপটিপ আছে, না সেগুলো একেবারে "দ"এর সেই অতল তল থেকে পদ্মগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে ওপরে উঠে এসেছে তা বলা শক্ত। যদি ঠিক জানতে চাও তো তোমরা সেই ঘাস বেয়ে বেয়ে নীচে নেমে গিয়ে দেখে আসতে পার। আমার বিশ্বাস, মাঝপথে কোথাও দাম আর পচা পানার সঙ্গে ঝাঁক মিশে এক একটি ভাসমান দ্বীপ তৈরী হয়েছে। কতকটা জলীয় বাবিলনিয়ার ঝোল্‌ল্যমান বাগিচার মত। (তর্ক করো না। যদি দোদুল্যমান হতে পারে তো ঝোল্‌ল্যমানও হতে পারে, একশ বার।) দ্বীপগুলোর ওপর লম্বা লম্বা পা ফেলে সারা দিন পায়চারী করে গোটা কতক গাংমোরগ আর পানকৌড়ী। কী উদ্দেশ্যে জানি না। এক এক জনের ঐ রকম অভ্যেস। আমার ছোট মামারও তাই। সারা দিন ঘরময় পায়চারী করেন। বলেন, বেজায় ভুঁড়ি হয়ে যাচ্ছে।

যাই হোক, যা বলছিলাম। আমাদের সেই 'দ'টার কথা। একদিন সন্ধ্যেবেলা আমরা ঐ 'দ'টার দিকে যাচ্ছি বেড়াতে। একটু আগে ঝড় হয়ে গিয়ে আকাশ একেবারে পরিষ্কার তক্‌তক করছে। এক কোণে একটা অতিকায় শ্বেতহস্তীর মত মেঘ দাঁড়িয়েছিল। সেটার ওপর হঠাৎ কে সিঁদুর ছড়িয়ে দিয়েছে। পুব দিকে একটা প্রকাণ্ড জামরুল গাছের মাথার ওপর হাসি-হাসি মুখ করে উঠছে পূর্ণিমার চাঁদ। সাপের হাঁচি যেমন বেদেরা বোঝে, তেমনি আবার চাঁদের হাসি বোঝে পদ্মফুলরা। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয়ই তারার কাশি বুঝতে পারো! আমি একবার বক্তের বাঁশি শুনতে চেষ্টা করেছিলাম। পারিনি। তাই আমি চিরকালই অকবি। এমন কি একটা বিয়ের পদ্যও আমার ভাগ্যে লেখা হয়ে ওঠেনি। যাক্‌, বলছিলাম পদ্মের কথা আর এসে পড়লো কোথা থেকে পদ্য। বাংলা ভাষার দস্তুরই ঐ, পদ্য বাদ দিয়ে এখানে কোনো জিনিষ হবার জো নেই। ঝোলে, ঝালে, অম্বলে, সর্ব্বত্র পদ্য। বলে গেছেন রাম শর্ম্মা!

পদ্ম বিনা পদ্য হয়, গন্দা ছাড়া গন্ধ।

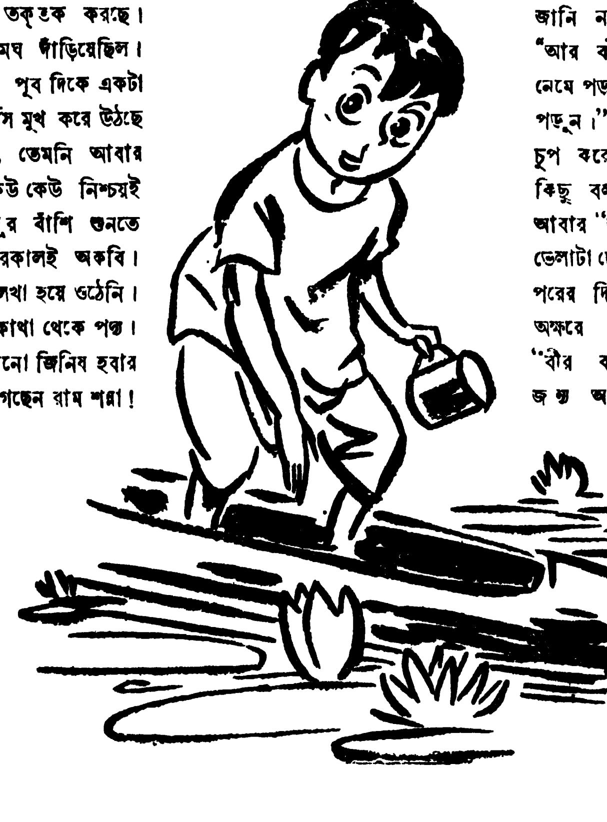
পদ্য বিনা রাঁধতে পারে নাইক হেন মন্দ॥

"চাঁদের হাসি" দেখে পদ্মফুলরা একেবারে লজ্জায় মরে গিয়ে যে যার চোখ বুজে ঢলে পড়েছে। সেই তক্কে এসেছে সেই ছেকরাটি, যার কথা বলছি।

দূর থেকে দেখি পদ্মবনে চরে বেড়াচ্ছে। হাতী নয় সেই ছোকরাটি! একটা কলার ভেলায় চড়ে একটা চান-করা মগ দিয়ে দাঁড় টানতে টানতে হাজির হয়েছে একেবারে "দ"য়ের মাঝামাঝি, যেখানে গিয়ে পড়লে আর "ম্যা" বলতেও নেই "ব্যা" বলতেও নেই! এই কয়েক বছর আগেই ইংরেজদের একটি ছেলে নৌকো থেকে পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারেনি। অথচ সে সাঁতার জানতো খুব ভালো, শুনেছি সাঁতারু ছেলে বলে তার ইস্কুলে নাম-ডাক ছিল। কিন্তু সাঁতার কাটা যায় জলে, আর এই "দ''য়ে জল যত আছে তার চেয়ে বেশী আছে দাম। ছেলেটাকে ঐ "দ''য়ের মাঝখানে দেখে আমি তো একেবারে "থ'' হয়ে গেছি। ছোকরার কিন্তু কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে ঐ লজ্জাবতী লতাগুলোকে সাপটে ধরে ছিঁড়ে তার ভেলা বোঝাই করছে, আর মগটা দিয়ে বাইতে বাইতে ভাটিয়ালী সুরে গান ধরেছে:

"কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে?"

ঠিক এই অবস্থায় তীরে দাঁড়িয়ে ভর্ৎসনা করাও মুস্কিল। "ওহে তোমার বাবাকে ডেকে আনছি" বলে শাসানো আরো বিপজ্জনক। কী জানি, ছেলেটা হয়তো আমার ওপর রাগ করে জলেই নেমে পড়বে। পরের নাক কেটে নিজের যাত্রা-ভঙ্গ, অর্থাৎ আত্মহত্যা করে পাড়া-পড়শীর ওপর শোধ তোলা ওদের একটা ফ্যাশানই দাঁড়িয়েছে। কাজেই ওর সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে হয় যাতে ওর মনে আঘাত না লাগে। অর্থাৎ একেবারে আলতো আলতো। ও যেন একটি ডিমের পুঁটুলি, আর আমি যেন ওকে ট্রামের ভিড় বাঁচিয়ে অতি সন্তর্পণে বাড়ী নিয়ে আসছি! এই রকম ভাবটা করে খুব মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করি: "কী ভাই, পদ্মফুল তোলা হচ্ছে?" সে [illegible] স্যার।" তার পর কেন জানি না, যোগ করে: "আর কী সুমিষ্ট জল! নেমে পড়ুন, স্যার, নেমে পড়ুন।" ওর অবস্থা দেখে চুপ করে থাকতে হয়! কিছু বলতে গেলে যদি আবার "জয় হিন্দ," বলে ভেলাটা ছেড়ে দেয়। তার পরের দিনই এত বড় বড় অক্ষরে কাগজে বেরবে "বীর বালকের দেশের জন্য আত্ম-বলিদান!



আর আমার ওপর যে কালিটা ছিটনো হবে! দোষ পর্য্যন্ত দাঁড়াবে: আমি পুলিশের গুপ্তচর। ছেলেটি কিছু দিন আগে একটা আস্ত লরী জ্বালিয়াছে। আর আমি তাকে ধরতে চেষ্টা করি বলেই সে পদ্মবনে শহীদের মত আত্মবিসর্জন দিয়েছে। বললেই হলো। বলার তো আর মা-বাপ নেই। একবার ইচ্ছে হলো, চলে যাই ওকে ঐ অবস্থায় ফেলে। কিন্তু যাই কী করে? সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। একটু পরেই চাঁদের আলো দিনের আলোর মতই ফুটে উঠবে বটে, কিন্তু ঐ লখীন্দরটি তার পুষ্পক পণ্য সমেত তীরে এসে ভিড়তে পারবে বলে বিশ্বাস হয় না! তাই যথাসত্বর ওকে কী উপায়ে তীরগামী করা যায় সেই পন্থা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করতে হয়। বলি: "ওহে, তোমার মাষ্টার মশাই এসে বসে আছেন অনেকক্ষণ, তা জানো না বুঝি?" সে হো-হো করে হেসে ওঠে, চাঁদের মত ফ্যাক্ ফ্যাক করে নয়। উচ্চৈঃস্বরে। তার পর বলে: "সে সব ঠিক আছে, স্যার। তাঁর দু'হাতে দু'টি পদ্ম বসিয়ে দিলেই হলো। বাবার কানের কাছে গিয়ে শাঁখও বাজাবেন না, আর আমাকেও চক্র কিংবা গদা উঁচিয়ে মারতেও আসবেন না। পদ্মের এমনি গুণ স্যার। পদ্ম দিলে কী না মিলে? গোলকুণ্ডা সাগরের হীরক আকর।' আর যে সহ্য হয় না। ভাবলাম, লাগিয়ে দিই একটা থাবড়া কিংবা চাঁটি, যেটা হাতের কাছে পাওয়া যায়। কিন্তু ও-সব জিনিষ যে দূর থেকে "অগ্নয়ে স্বাহা" বলে ছুড়ে দেওয়া যায় না। একেবারে পৌঁছে দিতে যার প্রাপ্য তার কাছে। ছোকরা সে কথা জানে বলেই তো বাড়িয়েছে। আমাকে চিন্তাকুল দেখে সে বললে: "আপনার যদি কিছু পদ্মমধুর প্রয়োজন থাকে তো বলবেন, স্যার, বোতল-খানেক দিয়ে আসবো। বাসী লুচী দিয়ে পদ্মমধু বেড়ে লাগবে।"

এর পর আর ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া চলে না। পদ্মবনের হাওয়া গায়ে লেগে আর পদ্মফুলের গন্ধে ছোকরার মাথার ঠিক নেই। আমি স্থান ত্যাগ করতে উদ্যত হলাম। এক পা বাড়িয়েছি এমন সময়ে পেছন থেকে শুনলাম: "কী স্যার, রাগ করলেন না কি? একটু দাঁড়ান না। পদ্মের মুড়ী খাওয়াবো। পদ্মমধুতে ভাজা পদ্মমুড়ীর চাক! খুব ভালো ঘুম হবে। সেই ল্যাণ্ড অফ্ দি লোটাস্-ইটার্স সবাই যেমন ঘুমোয় সেই রকম। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে একটু চেখেই না হয় দেখবেন।" আবার ফিরে দাঁড়াতে হয়, এক গাল হেসে। হাসির অর্থ হচ্ছে: "তোমায় একবার ডাঙ্গায় আনতে পারলে হয়! তখন তোমার ঐ কুমীর সেজে কড়া কড়া কথাগুলো কওয়ার কৈফেৎ দিতেই হবে।" কাছেই পাড়ের ওপর বসে আর একটি ছোকরা গান ধরেছে: "বেঁধো না তরীখানি।" সে যে ওরই বন্ধু তা যেন ওর গায়ে লেখা আছে। আচমকা জিজ্ঞেস করলাম: "তোমাদের অঙ্কের মাষ্টারের নাম কী হে?" আমার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে সে হঠাৎ অতর্কিতে বলে ফেললে: "ত্রিলোচন বাবু।" ব্যস্, এইবার পদ্মবনবিহারী বালকটিকে ডাঙায় তোলবার কোঁচটি পাওয়া গেছে। কোমরে হাত দিয়ে সরাসরি বললাম: "ওহে খোকা, খুব তো পদ্ম-ফুল নিয়ে মেতেছো, কিন্তু কালকের কম্পাউণ্ড ইণ্টারেষ্টের টাস্ক্‌গুলো কি করা আছে? ত্রিলোচনদা' বলছিলেন—"কথা শেষ করতে হয় না। ভেলাটা পদ্মপাতার ওপর পিছলে কাৎ হয়ে জলের দিকে কাম্লিক খেয়েছে। একটা নাল ধরে সেটাকে সোজা করে নিয়ে ছোকরা জিজ্ঞেস করলে: "কী বলছিলেন স্যার?" "এই ত্রিলোচন-দা'র কথা বলছিলাম আর কী, আর ঐ কম্পাউণ্ড ইণ্টারেষ্টের টাস্ক্‌-গুলো। আমি টিপু সুলতান ইস্কুলে মাষ্টারী করি কি না। ত্রিলোচন-দা'র মেসেই থাকি। দু'জনেই দু' ইস্কুলে একই রকম অঙ্ক দিই কি না। তাই আর কী। অঙ্কগুলো অবশ্য একটু শক্ত। তবে আমরা ঠিক করেছি, ওগুলো ফার্ষ্ট বেঞ্চী থেকে লাষ্ট বেঞ্চী পর্যন্ত সবাইকে না কষিয়ে নিয়ে কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। এক মাস পরে ইস্কুলে এলেও রেহাই নেই! অবশ্য কাল যারা ইস্কুলে আসবে তাদের একটু দেখিয়ে-শুনিয়ে দেওয়া যেতে পারে। টাস্কগুলো না করে আনলে সে রাইট হোক আর রঙই হোক, কাল যে ক্লাসশুদ্ধ কী অবস্থা হবে তা ত্রিলোচনদা'ই জানেন আর আমিই জানি।" কথাগুলো খুব ঠাণ্ডা একেবারে আইসক্রীমের মত করে বলতে হয়। ছোকরার টনক নড়েছে। দেখি সে আর কোন দিকে না তাকিয়ে সেই চান করবার মগটা দিয়ে প্রাণপণে ভেলা বাইছে।

ভেলা কিন্তু ভোলবার নয়! সে ঐ পদ্মবনে একেবারে "নট্ নড়ন চড়ন নট্ কিচ্ছু" হয়ে জাঁকিয়ে বসেছে। পদ্মবনং পরিত্যাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি। ছেলেটির অবস্থা দেখে আমারই হৃৎপিণ্ড ধুক্‌পুক্ করছে। ঐ "দ"য়ের মাঝখানে খামকা ত্রিলোচন বাবুর কথাটা না তুললেই ভালো হতো। যাই হোক্ ভরসা দিয়ে বলি: "আচ্ছা, আমি ত্রিলোচনদা'কে বলে দেবো এখন। কালকের দিনটা আর। তা ছাড়া পদ্ম তুলতে গিয়ে দেরী হয়ে গেছে, তাতে আর কী হয়েছে?" ফল হলো উল্টো। ছেলেটির আর তর সয় না। যে বুঝি জলের ওপর দিয়েই তর-তর করে হেঁটেই চলে আসে। শঙ্করাচার্য্যের মত। দেখলাম একটা পদ্মপাতার দিকে পা-ও বাড়ালে। কিন্তু বোধ হয়, তার পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মফুল ফুটে উঠবে কি না, এই রকম একটা দ্বিধা মনে জাগায় আবার পা'টা গুটিয়ে নিলে। সুবিধা বুঝে আমি বললাম: "আচ্ছা তা'হলে আমি আসি, কোনো চিন্তা করো না। আমি ত্রিলোচনদা'কে যা বলবার সব বলে দেবো।" ছেলেটি এইবার ডুকরে কেঁদে উঠলো। বললে: "আমায় এই অবস্থায় ফেলে চলে যাবেন না, স্যার।" বলি: "আমি আবার কখন তোমায় ঐ অবস্থায় ফেললাম? ঐ অবস্থায় তুমি তো নিজেকেই ফেলচো।" কোঁপাতে কোঁপাতে সে বললে: "আজ্ঞে, হাঁ। আমায় উদ্ধার করুন স্যার। আমি বাড়ী ফিরবো কী করে?" বললাম: "কেন বাড়ী ফেরবার আর তাড়া কী? ত্রিলোচনদা'কে তো আমি বলে-কয়ে কালকের দিনটা মাফই করিয়ে দেবো বলেচি।" সে পদ্মবন কাঁপিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে বিলাপ করতে লাগলো। ভাবলাম একবার বলি: "কেন ফাজলামি করবার সময় মনে পড়েনি যে তোমায় উদ্ধার করবারও একজন লোক চাই? তোমার ঐ বিলাপ পদ্মারণ্যে রোদন মাত্র! আমি চললাম। আজ রাতটা ঐ ভেলার ওপরেই পদ্মমুড়ীর চাক খেয়ে কাটিয়ে দাও।" কিন্তু সে তখন চোখের জলে "দ"য়ের জল বাড়াচ্ছে, আর অনুনয় করছে: "না স্যার, আপনি ত্রিলোচন বাবুকে বলে দেবেন না, স্যার। আমায় ডাঙায় তুলে দিন স্যার।" বলি: "কেন থাকো না আর একটু। দিব্যি চাঁদ উঠেছে।" সে বলে: "না স্যার, আমার একটুও সময় নেই স্যার, মাষ্টার মশাই এসে অনেকক্ষণ বসে আছেন,

স্যার। যার সেই কম্পাউণ্ড ইণ্টারেষ্টগুলো উক্ ! কে আছো গো, আমায় ডাঙায় তোলো গো।" ভয় হলো, এইবার বুঝি "জয় হিন্দ্" বলে নেবেই পড়বে। ও অবশ্য শহীদের মত মরে পড়বে, কিন্তু দোষটা হবে আমার আর সেই ওদের ত্রিলোচন বাবুর। যাই হোক্ এখন ওকে-ডাঙায় তুলি কী করে ? ডাঙায় হলে, ওকে হাজারবার কোলে করে গাছে তুলে দিতে পারি, গাছ থেকে নামিয়ে নিতে পারি, কাঁধে করে ছুটতে পারি, মাথায় করে নাচতে পারি। কিন্তু ঐ পঁক আর দামের দঙ্গলে ভরা "দ" থেকে তো ওকে কোলে করে তুলে আনা যায় না ! কাছে দড়াদড়ি কিছু নেই যে ঐ দুঃশীল বালকটিকে লাসের মত বেঁধে নিয়ে আসি। ভেবেছিলাম, ছোকরা দস্তুরমত দড়বড়ে, কিন্তু এখন দেখি সে একান্ত দরকচা। "দয়ের" মাঝখানে পদ্মবন আর পাড়ের কাছে ভেলা দেখেই সে সব ভুলে মাঝ-দরিয়ায় পাড়ি দিয়েছে। একটা দাঁড়ও সঙ্গে নেয়নি। ঐ দামোদরের দাম ঠেলে সে যে সাঁতার কেটে আসবে সে দমও তার নেই। তার পর হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এলেই তার দর্পচূর্ণ হবে। সত্যিই ওর ঐ দশা দেখে মনে হলো, ওর এইবার দফা রফা। ঐ দুর্গম পদ্মবনে কি তার না গেলেই চলতো না ? আমি এখন সাহায্য করি কী করে বলো তো ? থানার দারোগাকে খবর দেওয়া উচিত হবে, কি পীরের দরগায় মানত করবো, আকাশ-পাতাল ভেবে কূল-কিনারা পাই না। দণ্ডবৎ অমন ছেলেকে ! ভাবলাম, দরকার নেই, ছোকরা হয়তো আবার অপমান করবে। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে আমার দুর্বল মনে দয়ার উদয় হয়। তাই তো, কী করে ওকে উদ্ধার করি ? দড়িদাড়া, কাছিকাছা কিছু যে কাছে নেই ! উপায় ? সঙ্গে ছিলেন বোন। বললেন। "দাদা, ওকে টেনে তুলতেই হবে। না হলে আমি বড্ড দাগা পাবো।" বললাম ; "তুই না হয় দাগা পেলি, কিন্তু ঐ দাগী দুষ্ট ছেলেটাকে ডাঙায় না তুলতে পারলে আমার কী দশাটা হবে বল্ তো কালকের 'দেশ-দর্পণ—এ ?" বোনের এক সখী সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করেন ঐ "দ"য়েরই একেবারে দোরগোড়ায়। গেলেন সেখানে। ফিরলেন যখন তখন, তাঁর পেছু-পেছু আসছে তাঁদের চাকর আর ঠাকুর একখানা ইয়া লম্বা বাঁশকে চ্যাঙদোলা করে দোলাতে দোলাতে। অত লম্বা বাঁশ আমি দেখিনি এর আগে। সেই বাঁশে চড়ে অনায়াসে স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছনো যায়। "দ"য়ের পাড়ে দাঁড়িয়ে ওরা সেই বাঁশখানাকে এগিয়ে দিলে। আর পদ্মবনের সেই ছোকরাটি তার আগাটা ধরতেই ওরা তাকে ভেলাশুদ্ধ টেনে আনলে চক্ষের নিমেষে। বলে, ওদের সেই কটকে মহানদীতে হাতী-টাতী পড়ে গেলে না কি ওরা অমনি করেই লগী দিয়ে টেনে তোলে। বলে ; "আমো কটককেরে মহানইরে যেবে হাতী পড়ি যায় তেবে আমানে বাংস দেই কিরি তাকু উঠাই।" যাই হোক, ভাবলাম, বুঝি ছোকরাটি ডাঙায় এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে আমায় প্রণাম করবে। কিন্তু কোথায় ? সে দিব্যি পদ্মফুলগুলো একটা নাল দিয়ে গুছিয়ে বেঁধে কাঁধে তুলে নিয়ে বাড়ীর দিকে চললো। অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরে তার নামটা জিজ্ঞেস করি। "আমার নাম স্যার ?" "হ্যাঁ তোমার নাম ত্রিলোচনদা'কে তোমার হয়ে বলতে হবে তো।" এক গাল হেসে সে বলে : "আমার যে অনেক নাম, স্যার।" "তবুও শুনিই না।" "পদ্ম তুলতে এলে আমার নাম হয় শ্রীপঙ্কোজকুমার পুরকায়স্থ।" তার পর জোরে জোরে পা ফেলতে ফেলতে বলে চলে : "আমবাগানে হই শ্রীঅমৃতলাল আঢ্য, জামবাগানে শ্রীজম্বুবান্ জানা, কলাবাগানে শ্রীকদলীভূষণ কর্মকার, কাঁটালতলায় আমায় ডাকে শ্রীপনসপদ পিপলাই, এই সব…"

আচ্ছা ডেঁপো ছোকরা তো ! যাক্ গে, কে আবার ওর সঙ্গে ছোটে ?



শিল্পী—সৌমেন অধিকারী



দি গুড্ আর্থ

শিশির সেনগুপ্ত

ও

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

২২

দক্ষিণের সহর থেকে এক সময় গাঁয়ে ফিরে এসে ওয়াঙ যে চিত্তের সান্ত্বনা পেয়েছিল, ভিন্‌দেশের নানা তিক্ততায় স্বস্তি পেয়েছিল. তেমনি সুস্থ হোল ওয়াঙ তার প্রেমের পীড়া থেকে আর একবার নিজের মাঠের কালো সুফলা মৃত্তিকার স্পর্শ পেয়ে। পায়ের নীচে আর্দ্র মাটির মিষ্টি অনুভূতি—কর্ষিত মাঠের থেকে উদ্গত ভিজে মাটির গন্ধ সে গভীর করে টেনে নিল বুকের মধ্যে। মজুরদের এখানে ওখানে কাজে লাগতে হুকুম দিল সে। সারা দিন দানবিক পরিশ্রমের পর বলদের পিছনে সেই এগিয়ে রইল সবার চেয়ে। মাটির বুক বিদীর্ণ করে লাঙ্গল যখন এগোচ্ছে কি অপূর্ব চক্রাকারে মাটির দানা ঘুরছে। চীংয়ের হাতে দড়ি এগিয়ে দিলে ওয়াঙ। নিজেই কোদাল নিয়ে মাটি ছাড়াতে লাগল। উপরের মাটির অন্তরালে ভেজা কালো মাটি যেন কালো চিনির মত গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। কোন তাগিদে খাটছে না ওয়াঙ, পরিশ্রম করছে সবার আনন্দে। এক সময় শরীর এলিয়ে এলে মাথায় হাত দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ওয়াঙ। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মাটির সুস্থতা গ্রহণ করলে নিজের মেদ-মজ্জায়। মনের সব রোগ তার নিরাময় হোল।

নির্মেঘ আকাশে সূর্য অস্ত গেলে রাত নামল। সারা শরীরে সুখকর বেদনা ও শ্রান্তি নিয়ে জয়ের আনন্দে ওয়াঙ বাড়ী ফিরল। ভিতর মহলের পর্দা ছিঁড়ে ফেলে সে এগিয়ে গেল যেখানে সিল্কের সাজ পরে কমলিনী বেড়াচ্ছিল। তার গায়ে মাটি মাখা দেখে কমলিনী চীৎকার করে উঠল, পিছিয়ে ওয়াঙ যখন তার কাছে ঘেঁসে দাঁড়াল।

কমলিনীর সুডৌল ছোট হাত দু'খানি নিজের অপরিচ্ছন্ন হাতের মধ্যে নিয়ে ওয়াঙ হেসে উঠল। হেসে বললে—'তোমার কর্তা চাষা বৈ আর কিছু নয়। তুমিও চাষার বৌ।'

জেদের সঙ্গে কমলিনী জবাব দিল—'তুমি যাই হও আমি চাষার বৌ নই।'

এ কথায় আবার হাসল ওয়াঙ। সহজেই তাকে ছেড়ে যেতে পারলে।

তেমনি মাটি-মাখা শরীর নিয়ে ওয়াঙ ভাত খেলে। ঘুমোতে যাবার আগে শুধু নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গা ধুয়ে নিলে। গা ধোবার সময় আর একবার সে হাসল এই চিন্তায় তার এই প্রসাধনের পিছনে কোন মেয়ে নেই—হাসল নিজের যুক্তির কথা ভেবে।

মনে হোল কত দিন যেন সে প্রবাসী হয়েছিল—কত কাজ তার এখানে বাকী পড়ে আছে। মাটি চাষের প্রতীক্ষা করছে—কর্ষিত মাটি বীজ বোনার অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। ভালবাসার দিনগুলিতে তার শরীরে যে পাটল রঙ ধরেছিল আবার রৌদ্রের স্নেহে তা ঘন বাদামী হয়ে উঠল। বিনা আরামে হাতের যে কড়াগুলি মসৃণ হয়ে আসছিল, সেগুলি আবার রুক্ষ হয়ে উঠল। হাতের তালুতে আবার দাগ পড়ল লাঙলের।

দুপুরে আর রাত্রে সে খেতে আসে বাড়ীতে। ওলানের তৈরী ভাত কপি আর মটরশুঁটির তরকারী খায় সে।

রশুন-মাখানো সাদা রুটিও বানিয়ে দেয় ওলান। ওয়াঙ গেলেই কমলিনী তার ছোট করতল দিয়ে যখন আড়াল করে রাখে তার নাক, তখন ওয়াঙ হাসে—কোন গ্রাহ্যই করে না। বড় বড় নিশ্বাস ছাড়ে সে। কমলিনীর জানা দরকার যে ওয়াঙ তার ইচ্ছামত খাবার খেতে পারে। এখন সে সুস্থ হয়েছে—স্বাস্থ্য পেয়েছে আবার, কমলিনীর সঙ্গে তার বোঝা-পড়ার দিন এসেছে। মাঠে তার কত কাজ পড়ে আছে, সেদিকে মন দিতে হবে।

সুতরাং দু'টি নারী এ সংসারে বজায় রইল। কমলিনী রইল তার খেলার পুতুল। ওয়াঙের সৌন্দর্য্য-পিপাসা মেটায় সে—লালসার সঙ্গিনী হয় তার যৌন তাগিদে। আর ওলান রইল তার কর্মের সঙ্গিনী—তার ছেলেমেয়ের মা সে। তাকে আর তার বাবাকে আর তার ছেলেমেয়েদের জন্ত সে সংসারের বোঝা বয়। তার অন্দর মহলে যে নারীটি আছে তার সম্বন্ধে গাঁয়ের লোক যখন মাৎসর্য প্রকাশ করে ওয়াঙের গর্ব হয়। সে গর্ব এই চিন্তায় যে, লোকে বুঝুক যে নিছক খাওয়া-পরার প্রয়োজন মিটিয়েও এ লোকটা তার ঘরে দামী মুক্তো সঞ্চয় করেছে। নিজের আনন্দের জন্তেও সে ইচ্ছা করলে যথেষ্ট পয়সা খরচ করতে পারবে।

সারা গাঁয়ের ভেতর যারা তার সমৃদ্ধিতে বাচাল হয়েছে তার মধ্যে ওয়াঙের খুড়ো সব চেয়ে সেরা। অধুনা খুড়ো শুধু কুকুরের মত ওয়াঙের একটুখানি লেকনজরের প্রত্যাশী হয়ে উঠেছেন, তিনি বলেন—'আমরা যা' ভাবতেও পারি না এমন সুন্দরী মেয়েছেলে রাখতে পারে শুধু আমার ভায়ের ছেলেই।' তিনি বলেন—'বড় বাড়ীর মেয়েদের মত সেই মেয়ের গায়েও সিল্কের পোষাক ঝলমল করে। আমি না দেখি আমার পরিবার ত দেখেছে।' তিনি আরও বলেন—'আমার ভাইপো এমন বনেদী সংসার গড়ে তুলছে যে ওর ছেলেপুলেদের আর সারা জীবন খেটে খেতে হবে না।'

সুতরাং গাঁয়ের লোক ওয়াঙকে আর তাদের এক জন ভাবতে পারে না। রীতিমত সম্মান দেয় তাকে। ওয়াঙের কাছে টাকা ধার করতে আসে। নিজেদের ছেলেমেয়ের বিয়ের সম্বন্ধে উপদেশ নেয়। দু'জনের জোত-জমির দখল নিয়ে বিবাদ বাধলে ওয়াঙকেই মধ্যস্থতা করতে ডাকে তারা, তার বিচারই চূড়ান্ত বলে মনে করে।

এক সময় প্রেমে যেমন মত্ত হয়ে থাকত ওয়াঙ, এখন তেমনি অন্ত শত কাজে বিব্রত হয়ে থাকে। বর্ষা এ বছর সময়ে হোল। আকের চারাগুলি মাথা নাড়া দিল। তার পর যখন শীত এল তখন ওয়াঙ তার ফসল ঘরে তুলল। যখন দাম সব থেকে চড়া হোল বড় ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সে বাজারে বেচে দিল গম।

নিজের ছেলে যখন লেখা চেঁচিয়ে পড়তে পারে, যখন কালি-কলম দিয়ে সে এমন লেখা লেখে যা আর পাঁচ জন পড়তে পারে তখন বাপের আনন্দ হয় বৈ কি। ওয়াঙের বুক গর্বে ফুলে ওঠে। আজ-কাল আর বাজারের দোকানের কেরাণীরা তাকে উপহাস করতে পারে না। তারাই যখন বলে—'বাঃ, ছেলেটি চমৎকার লেখে ত।' তখন মনের আনন্দে ওয়াঙ ঋজু হয়ে দাঁড়ায়।

তার ছেলে যে অসাধারণ এমন ধারণা ওয়াঙেরও নেই কিন্তু যখন সেই ছেলে অপরের বানানে ভুল দেখিয়ে দেয়, তখন নিজের গর্বের হাসি গোপন করার জন্ত ওয়াঙ মুখ ঘুরিয়ে কাসে, মাটিতে থুতু ফেলে। কেরাণীরা যখন এই ছেলেটির বিদ্যায় বিস্ময়ের গুঞ্জন তোলে তখন ওয়াঙ শুধু বলে—'বদলে দিন, বদলে দিন। ভুল কিছুতে আমরা সই দেবো না।'

ছেলেটি নিজেই যখন সেই বানান শুধরে দেয় তখন ওয়াঙ গর্বিত বোধ নিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। সওদার কাগজে সই দেওয়া হলে বাপ-ছেলে একত্র বাড়ীর পথে রওনা হয়। ছেলে এখন বড় হয়েছে মনে মনে ভাবে ওয়াঙ, তার নিজের বড় ছেলে। তার ছেলের প্রয়োজনের উপযুক্ত কাজ এখন তার করতেই হবে। ছেলের বিয়ে দিতে হবে—সুতরাং একটি মেয়েকে বাগ্‌দত্তা করে রাখতেই হবে, যাতে না তাকে বাপের মত বড় বাড়ীর অন্দরে গিয়ে অপরের উচ্ছিষ্ট ভিক্ষা করতে হয়। তার ছেলে এমন লোকের ছেলে যে ধনী—যার জমীদারী আছে।

ছেলের জন্তে একটি কুমারী মেয়ে নির্বাচনের কাজে ওয়াঙ মন দিলে। সাধারণ ঘরের সাধারণ মেয়ে সে পছন্দ করবে না, সুতরাং সে কাজও সহজ নয়। এমনি এক দিন মাঝের ঘরে বসে দু'জনে বসন্ত ফসলের প্রয়োজনীয় বীজ ও অন্তান্ত কথা আলোচনার ফাঁকে ওয়াঙ বন্ধু চীংকে সে-কথা বললে। চীং এত সাধারণ লোক যে তার কাছ থেকে ওয়াঙ কোন কিছু আশা করে না, তবু চীংয়ের মত অনুগত লোকের কাছে মনের কথা ব্যক্ত করতে পারলে কত হাল্কা মনে হয় মন।

টেবিলে বসে ওয়াঙ কথা কইছিল, অনুগত ভৃত্যের মত চীং দাঁড়িয়ে শুনছিল। ওয়াঙের শত উপরোধেও চীং কিছুতেই তার সামনে বসে না, কেন না, ওয়াঙ তখন বড়মানুষ হয়েছে—আগের মত তারা ত আর সমান পর্যায়ের মানুষ নয়। গভীর মনোযোগের সঙ্গে সব শুনে চীং অনেক দ্বিধায় ফিস্‌ফিস্ করে বললে—'যদি আমার মেয়েটি এখন থাকত আমি বিনা পণে তাকে তোমার হাতে তুলে দিতাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে। কিন্তু সে যে কোথায় তাই আমি জানি না, হয়ত এত দিনে সে মরেই গিয়েছে।'

ওয়াঙ বন্ধুকে ধন্তবাদ জানাল। কিন্তু সে ত শুধু চীংয়ের মত ভাল মানুষদের মেয়েই চায় না, কারণ, চীং যতই হোক সাধারণ গাঁয়ের চাষী ছাড়া আর কিছুই নয়।

কাজে কাজেই চায়ের দোকানে এখানে ওখানে ওয়াঙ কান পেতে শোনে মেয়েদের কথা। খবর নেয় সহরের সমৃদ্ধ লোকদের, যারা মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। শুধু খুড়ীর কাছে ওয়াঙ কোন কথা ভাঙে না। তিনি শুধু চায়ের দোকান থেকে অমনি ধারা মেয়েই যোগাড় করতে পারেন যেমন ওয়াঙকে করে দিয়েছেন।

তীক্ষ্ণ শীতের মাস আসে তুষারপাত নিয়ে। নববর্ষের উৎসবে ওয়াঙ-পরিবারে পানাহার হয়। এবার শুধু গ্রাম থেকেই নয় সহর থেকেও মানুষ আসে, ওয়াঙকে শুভ কামনা করে বলে—'তোমার ঘরে যা আছে তার বেশী আর কিছু কামনা করি না তোমার। তোমার ঘর-বোঝাই টাকা—জমির মালিকানা আর ছেলে বৌ। খুব ভাল।'

সিল্কের পোষাক পরে দুই পাশে সুবেশ দুই ছেলেকে নিয়ে খাবার টেবিলে মিষ্টি কেক ও অন্তান্ত আহার্য নিয়ে ওয়াঙ বসে থাকে। দ্বারে দ্বারে নববর্ষের লাল কাগজের চাঁদমালা। ওয়াঙ জানতে পারে যে সে ভাগ্যবান্।

বসন্ত আসন্ন হয়, উইলো-শাখায় ফিকে সবুজ রঙ আসে, পীচ

গাছ পাটল হয়; কিন্তু ওয়াঙ তার পুত্রের বধূ নির্বাচন করতে পারে না।

তার পর বসন্তের দীর্ঘ তপ্ত দিনগুলিতে চেরী আর প্লাম মঞ্জুরিত হয়, উইলো পাতাগুলি পূর্ণতা পায়, গাছে সবুজের জোয়ার নামে। ভিজে মাটি থেকে বাষ্প ওঠে মাটি ফসলে আসন্ন হয়। এই পরিবর্ত্তনের মুখে বড় ছেলেটিও এক দিন কিশোর থেকে যুবক হয়ে ওঠে অকস্মাৎ। বইতে সে বিরক্তি দেখায়, আহারে বাদ-বিচার সুরু করে, তার মেজাজও খেয়ালী হয়ে ওঠে।

ছেলেটিকে কোন প্রকারেও নিয়মিত করতে পারে না ওয়াঙ। বাপ যদি সামান্য অপ্রসন্ন কণ্ঠে বলেন—'ভাত মাংস পেট ভরে খাও।'

ছেলে মুখ ভার করে একগুঁয়েমি করে অথবা বাপ যখন রাগ দেখান সে তখনি কান্নায় ভেঙে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েন বাপ। তিনি ছেলের পিছনে গিয়ে তাকে স্নেহের সঙ্গে বলেন—আমি তোর বাপ। আমায় তোর মনের কথা বল।' কিন্তু ছেলেটি শুধু জোরে জোরে কাঁদে আর মাথা নাড়া দেয়।

পুরানো মাষ্টারের প্রতিও তার শ্রদ্ধা কমে আসে। মায়ের মত ভোরে উঠে সে স্কুলে যেতে চায় না; যদি বা বাপ চীৎকার করেন অথবা মেরে তাকে স্কুলে পাঠান সে মুখ গোঁজ করে যায়, কখনো কখনো সারাদিন সহরের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যার পর ছোট ভাই এসে যখন বলে তখনই ওয়াঙ জানতে পারে।

দাদা আজ স্কুলে যায়নি।

তখন বাপ বড় ছেলের উপর রাগে গর-গর করতে থাকেন, চেঁচিয়ে বলেন—'এত কষ্টের টাকা কি আমি জলে ফেলে দেব?'

রাগের ঝোঁকে ওয়াঙ একটা বাঁশ নিয়ে ছেলেকে মারতে সুরু করে। ওলান রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে বাপ আর ছেলের মধ্যে দাঁড়ায়—ওয়াঙ যতই হাত ঘুরিয়ে ছেলেকে মারতে যায় মারের ঘা গিয়ে পড়ে ছেলের মায়ের উপর হঠাৎ কখনো বকুনি খেলে ছেলে যে ভাবে কেঁদে উঠত এখন সে তা কিছুই করলে না, পুতুলের মত ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেলে। দিবারাত্র সে সম্বন্ধে ভেবেও ওয়াঙ এর কোন কারণ খুঁজে পায় না।

রাতের আহারের পর এক দিন ওয়াঙ এই সব ভাবছে এমন সময় ওলান ঘরে এল। নিঃশব্দে এসে সুমুখে দাঁড়াতে দেখে ওয়াঙ বুঝল যে ওলান সেই কথাই বলতে এসেছে। ওয়াঙ বৌকে বললে—'কি বলতে চাও বল।'

ওলান জবাব দিলে—'ও-ভাবে ছেলেকে মেরে কোন ফল হবে না। বড় বাড়ীতে দেখেছি ছোট কর্ত্তারা যখন এই রকম বদ মেজাজী হোত বড়রা তাদের জন্য ক্রীতদাসী দিতেন। আবার সব ঠিক হয়ে যেত।'

তর্কের জন্য ওয়াঙ বললে—'আমার ঘরে তা হতে পারে না। আমি যখন ওর বয়সী ছিলাম আমার কখনো অমন মেজাজ হোত না। কোন ক্রীতদাসীর দরকার হয়নি আমার।'

তেমান ধীর কণ্ঠে জবাব দিল ওলান—'আমার যা কিছু জ্ঞান বড় বাড়ীর। তুমি জমিতে খাটতে কিন্তু তোমার ছেলে বাড়ীতে বেকার বড় বাড়ীর ছোট কর্ত্তাদের মতই তার প্রকৃতি।'

ওলানের কথা বিবেচনা করে ওয়াঙ বিস্মিত হোল। যথার্থই বলেছে ওলান। ঐ বয়সে বদ-মেজাজের অবসর ছিল না তার, বলদের জন্য তাকে ভোরে উঠতে হোত, লাঙল নিয়ে যেতে হোত মাঠে, ফসলের সময় খাটতে হোত মাজা ভেঙে পড়া অবধি। তার কান্না শোনবার মানুষ ছিল না কেউ। ছেলের মত সে স্কুল পালাতে পারত না, কেন না মাঠ থেকে পালিয়ে এলে যে সারা বছরের ফসল হবে না। তাই সে খাটতে বাধ্য। নিজের কথা ভেবে ওয়াঙ নিজের মনেই বললে—'সত্যিই ছেলেতে আমাতে অনেক প্রভেদ। আমার চেয়ে ওর শরীর অনেক সুখী। আমার বাবা ছিলেন গরীব—ওর বাবা ধনী। তা ছাড়া আমার জমিতে অনেক মজুর আছে, ওর মজুরী করার দরকার নেই। তা ভিন্ন অমন শিক্ষিত ছেলেকে কেউ ত আর লাঙল ঠেলতে দিতে পারে না।

ছেলের কথা গর্বের সঙ্গে ভেবে ওয়াঙ বৌকে বললে—'যতই বল না কেন, ছোট কর্ত্তাদের মত তবু ক্রীতদাসী আমি ওকে এনে দেবো না। ওর জন্যে বৌ ঠিক করে আমরা তাড়াতাড়ি ওর বিয়ে দিয়ে দেবো। তাই করতে হবে আমাদের।' এই বলে ওয়াঙ ভিতরে চলে গেল।

২৩

তার কাছে থাকা আর ওয়াঙকে খুশী করে না—তার সৌন্দর্য ছাড়াও অন্য সব চিন্তায় ওয়াঙ বিভোর হয়ে থাকে দেখে এক দিন কমলিনী অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল—'যদি জানতাম একটি বছরেই আমাকে দেখবার আশা মিটে যাবে তোমার, তাহলে আমি ঐ চায়ের দোকানেই থাকতাম।' মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে কমলিনী আড়-চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল ওয়াঙকে।

ওয়াঙ হেসে তার হাতখানি মুখেতে চেপে ধরলে, গন্ধ নিলে হাতের সুরভির। তার পর বললে—'আমার যে মণির চুমকি বসানো আছে সে কথা পুরুষ মানুষ সব সময় মনে রাখতে পারে না, কিন্তু রত্নটি যদি খোয়া যায় সইতেও পারে না তারা। এখন আমার মনে রাত-দিন বড় ছেলেটির জন্য ভাবনা তার রক্তও প্রিয়া-মিলনের জন্য আকুল হয়ে উঠেছে। তাকে বিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তার কনে যে কি করে খুঁজে বের করব ভেবে পাচ্ছি না। আমাদের নামের আদ্যক্ষর 'ওয়াঙ' হলেও আমার ইচ্ছা নয় যে, সে গ্রামের কোন কৃষকের মেয়ে বিয়ে করে। সে উচিতও হবে না। কিন্তু এদিকে সহরেও এমন ভাল চেনা-শোনা নেই যে কাউকে বলতে পারি—'এই আমার ছেলে আর তোমার মেয়ে।' কোন পেশাদারী ঘটকের কাছেও যেতে ঘৃণা হয়। সে হয়ত ভিতরে ভিতরে কোন খোঁড়া বা মূর্খ মেয়ের বাপের সঙ্গে একটা চুক্তি করে বসে আছে।'

নবীন যৌবনে সুঠাম ও কমনীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রটির প্রতি একটু দুর্বলতা সঞ্জাত হয়েছিল কমলিনীর মনে; ওয়াঙের কথায় তার চিন্তায় বাধা পড়ল। একটু ভেবে বলল সে—'বড় চায়ের দোকানে একটি লোক আসত আমার কাছে। প্রায়ই বলত সে তার মেয়ের কথা। সে না কি আমারি মত ছোটটি আর খুব সুন্দরী।' কিন্তু তখন সে কেবল খুকীটি ছিল। সে বলত—'তোমায় আমি ভালবাসি একটা অদ্ভুত অস্বস্তির সঙ্গে মনে হয় তুমি যেন আমার মেয়ে। আমার মেয়েটির মতই তুমি। এমন ভালবাসা দুর্নীতি—সেই জন্যই মনে আমি সুখ পাই না।' এই

জন্তই যদিও সে আমায় খুবই ভালবাসত তবু 'ডালিম' বলে আর একটি বড় রাঙা রঙের মেয়ের কাছে যেত।'

—'সে লোকটি কেমন'—প্রশ্ন করে ওয়াঙ।

—'বেশ ভাল লোকটি। পকেট-ভর্তি রূপো। প্রতিশ্রুতি দিয়ে কখনো বিমুখ করত না। আমরা সবাই তার মঙ্গল প্রার্থনা করতাম। হাত মুঠো ছিল না মানুষটার। যখনই কোন মেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ত, মেয়েটা ঠকিয়েছে বলে সে অন্যদের মত হৈ-চৈ বাধাত না। ঠিক রাজপুত্র অথবা বনেদী ঘরের ছেলের মতন কত ভদ্রতার সঙ্গে বলত—'আচ্ছা, এই নাও, রূপো। একটু জিরেন নাও। আবার প্রেমের ইচ্ছে জোর হবে। কত সুন্দর কথা কইত আমাদের।' এই বলে কমলিনী আবার চিন্তায় বিভোর হয়ে গেল। তখনই ওয়াঙ তাকে চিন্তা-স্বপ্ন থেকে জাগিয়ে তুললে, কারণ ওয়াঙ চায় না যে কমলিনী তার অতীত জীবনের কথা ভাবুক।

—'তার কিসের ব্যবসা যে এত রূপো আসত?'

—'শুনেছি কি একটা ধান-গোলার মালিক সে। তার বেশী আর কিছু জানি না আমি। কোকিলাকে জিজ্ঞাসা কর। সে পুরুষদের আর তাদের টাকার খোঁজ খবর রাখে।'

এই বলে সে হাততালি দিল। সঙ্গে সঙ্গে কোকিলা রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এল। তার হাড়-জাগানো গাল আর নাক আগুনের তাতে লাল হয়ে উঠেছে। কমলিনী সুধাল তাকে—'আচ্ছা, সেই যে মস্ত ধনী ভালমানুষ একটি লোক আমার কাছে আসত, পরে ডালিমের কাছে যেতে সুরু করেছিল—কারণ আমি না কি তার ছোট মেয়েটির মত দেখতে অথচ আমায় ভালবাসত খুব। সে লোকটা কে বল ত?'

কোকিলা তক্ষুনি উত্তর দিল—'ও, সে লিউ। ধান-চালের মস্ত ব্যাপারী। ভারী চমৎকার লোকটি। যখনই আমার সঙ্গে দেখা হোত হাতে রূপো গুঁজে দিত।'

—'কোন্ বাজারের?' অলস কণ্ঠে ওয়াঙ প্রশ্ন করল। কারণ এ মেয়েদের কথা। হয়ত সবই ভুয়ো হবে।

—'পাথরের পুলের রাস্তার'—জবাব দিল কোকিলা।

তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই ওয়াঙ উল্লাসে হাত-তালি দিয়ে বলে উঠল—'তাহলে আমি যেখানে শস্য বেচি সেখানেই। এ ত খুব শুভ লক্ষণ। নিশ্চয়ই একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে।' এই প্রথম তার উৎসাহ উদ্দীপিত হোল। এটা নিশ্চয়ই খুব সৌভাগ্যের কথা হবে, যদি সে ছেলেকে তারই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারে যে কেনে তার মাঠের ফসল।

কাজের কথা উঠতেই ইঁদুরে যেমন মাখনের গন্ধ পায় কোকিলাও তেমনি তার মধ্যে টাকার গন্ধ পেল। সে তাড়াতাড়ি এ্যাপরনে হাত মুছে বলল—'সাহায্য করতে প্রস্তুত আমি।'

ওয়াঙের সন্দেহ হয়। তাই সে তার চতুর দৃষ্টির দিকে তাকাল। কিন্তু কমলিনী সানন্দে বলল,—'তা সত্যি। কোকিলা বরং গিয়ে লিউকে জিজ্ঞাসাবাদ করুক। সে কোকিলাকে ভাল করেই চেনে। আর কোকিলার যা বুদ্ধি ও ঠিক করতে পারবে। সব সুন্দর ভাবে সমাধা করতে পারলে ঘটকালির টাকাটা বরং ওকেই দেওয়া যাবে।'

—'এ ত আমি নিশ্চয়ই পারব।' সে প্রাণ খুলে বলল। ঘটকালির টাকাটা হাতের মুঠোয় এই কল্পনায় হাসি দেখা দিল তার মুখে। কোমর থেকে এ্যাপরনটা খুলে ব্যস্ততার সঙ্গে বলল—'এখনই এই মুহূর্তে আমি যাব। মাংস কয়-টসা সব ঠিক-ঠাক। কেবল রাঁধতে যা বাকি। তরকারীগুলোও ধোয়া হয়ে গেছে।'

কিন্তু ওয়াঙ এখনও বিষয়টা নিয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামায়নি। এত তাড়াতাড়িই এ রকম সিদ্ধান্ত করলে চলবে না। সে ডেকে বললে—'না থাক। এখনও আমি কিছু ঠিক করিনি। কয়েক দিন এ নিয়ে ভাবতে হবে আমায়। তার পর বলব'খন তোমায়।'

নারী দু'জনেই অধৈর্য হয়ে পড়েছে। কোকিলা রূপোর জন্তে আর কমলিনী অধীর হয়ে উঠেছে, কারণ এ একটা নতুন ব্যাপার হবে, নতুন কিছু শুনতে পাবে বলে। কিন্তু ওয়াঙ শুধু বলতে লাগল—'না, এখন নয়। ছেলে আমার। আমি অপেক্ষা করব—'

ওয়াঙ হয়ত এ-কথা সে-কথা ভেবে দীর্ঘ দিন অপেক্ষাই করত যদি না এক দিন প্রত্যূষে বড় ছেলেটি মাতাল অবস্থায় চোখ-মুখ গরম আর রক্তজবা করে বাড়ী ফিরত। তার প্রতিটি নিশ্বাসে বের হচ্ছিল ভুব ভুব করে দুর্গন্ধ। উঠোনে স্খলিত চরণের আওয়াজ পেয়ে ওয়াঙ ছুটে বাইরে দেখতে এল কে সে। অসুস্থ পুত্র তার সামনেই বমি করতে লাগল। বাড়ীতে ভাত গাঁজিয়ে যে ফ্যাকাশে হালকা মদ তৈরী হয় তার চেয়ে কড়া মদ খেতে অভ্যস্ত নয় সে। মাটিতে পড়ে কুকুরের মত নিজের বমিতেই গড়াগড়ি খেতে লাগল ছেলেটি।

ওয়াঙ ভীতার্ত হয়ে ছেলের মাকে ডাকল। তারা দু'জনে তাকে ধরাধরি করে তুলে আনল ঘরে। ওলান তাকে ভাল করে ধুয়ে পুঁছে নিয়ে এনে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিল। সব কাজ শেষ করবার আগেই ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়ল। মৃত্যুর মত ভারী ঘুম। বাপ মা যা প্রশ্ন করল তার কোনটির আর উত্তর দেওয়া হোল না।

ছেলে দুটি যে ঘরে ঘুমায় ওয়াঙ সে ঘরে এল। ছোটটি তখন হাই তুলছে হাত-পা টান-টান করে—স্কুলে নিয়ে যাবার জন্ত একখানা চৌকা কাপড়ে বইগুলো বাঁধছে। ওয়াঙ তাকে জিজ্ঞাসা করল—'তোমার দাদা কি কাল রাতে তোমার সঙ্গে বিছানায় ছিল না?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উত্তর দিল ছেলেটি—'না'।

ছেলেটির চোখে একটা ভয়ার্ত চাহনি। ওয়াঙ তা' লক্ষ্য করে রুক্ষ কণ্ঠে প্রশ্ন করল—'কোথায় গিয়েছিল?' ছেলেটা কোন উত্তর দেয় না দেখে তার ঘাড় ধরে কষে ঝাঁকুনি মেরে গর্জন করে উঠল ওয়াঙ—'বল এবার। কুকুর কোথাকার।'

এতে ছেলেটি ভীতত্রস্ত হয়ে পড়ল। ফোঁস-ফোঁস করে কাঁদতে লাগল। কান্নার ফাঁকে বলল—'দাদা বলেছে তোমায় কিছু না বলতে। বললে গায়ে ছুঁচ ফুটিয়ে দেবে—ছুঁচ গরম করে ছ্যাঁকা দেবে বলেছে। যদি না বলি আমায় পয়সা দেয়—'

এ কথা শুনে ওয়াঙ একেবারে আত্মহারা হয়ে উঠল।—'বল শিগ্গীর। তোর মরাই উচিত।'

ছেলেটি চারি দিকে তাকাতে লাগল। যদি না বলে বাবা ত তাকে গলা টিপে মেরে ফেলে দেবে দেখে মরীয়া হয়ে বললে সে—'প্রায় তিন রাত্তির সে বাড়ী ছিল না। কোথায় যায় আমি জানি না।' তোমার খুড়োর ছেলের সঙ্গে কোথায় যেন যায়।'

ওয়াঙ ছেলের গলা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে তাকে বিছানায়

ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খুড়োর ঘরে ছুটে গেল। খুড়োর ছেলে ঘরেই ছিল। নিজেরটির মত তারও মুখ-চোখ মদে রাঙা আর আগুন। কিন্তু সে একেবারে অপ্রকৃতিস্থ হয়নি। এ কাজে অনেক দিনের পুরোনো কি না—লোকের হালচালে অভ্যস্ত। ওয়াঙ তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল—'আমার ছেলেকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে?'

ছেলেটি নাক সিটকে উত্তর দিল—'তাকে নিয়ে যাওয়ার দরকার হয় না। সে একাই যেতে পারে।'

কিন্তু ওয়াঙ পুনরুক্তি করল তার প্রশ্নকে। মনে মনে ভাবল, আজ খুড়োর এই উদ্ধত বদমায়েস ছেলেটাকে খুনই করে ফেলবে সে। বজ্র কণ্ঠে আবার জানতে চাইলে—'কাল রাত্রে আমার ছেলে কোথায় গিয়েছিল?'

ছেলেটি এই স্বরে ভয় পেয়ে গেল। উদ্ধত চোখ নামিয়ে অনিচ্ছুক ও গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল—'সে গিয়েছিল সেই বেশ্যার কাছে যে থাকে দরদালানে যা এক সময় সেই রাজবাড়ীর ছিল।'

এ কথা শুনে ওয়াঙ আর্তনাদ করে উঠল। এই বারবনিতাকে সবাই চেনে। খুব গরীব আর অতি-সাধারণরা ছাড়া কেউ তার কাছে যায় না। তার সে যৌবন নেই—সামান্য পয়সায় নিজেকে অনেকখানি বিক্রী করতে একটু কুণ্ঠিত নয় সে। খাওয়ার জন্য আর দেরী না করে তখনই সে ছুটল গেট খুলে—ক্ষেত ডিঙিয়ে। এই প্রথম জমিতে কি ফলেছে চেয়ে দেখলে না সে—লক্ষ্য করলে না ক্ষেতের ফসলের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। ছেলের চিন্তা তাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে আছে। ওয়াঙ চলেছে। দৃষ্টি অন্তর্মুখী। নগরের বহির্দেয়াল অতিক্রম করে সে প্রবেশ করল সেই প্রাসাদে যা এক সময় ছিল কত বিরাট বিপুল। সেই ভারী লোহার দরজা খোলা হাট হয়ে পড়ে আছে। কেউ আর তাদের বন্ধ করে পুরু লোহার হুড়কো লাগায় না। এখন যে-কেউ ভিতরে ঢুকতে পারে। ওয়াঙ ঢুকল। চক দালান আর ঘরগুলি সাধারণ লোকে ঠাসা। এক একটা ঘর এক একটি সাধারণ পরিবার ভাড়া নিয়েছে। সে প্রাসাদ এখন হয়ে উঠেছে জঞ্জালপূর্ণ। বুড়ো পাইন গাছটাকে কেটে ফেলা হয়েছে। যেগুলো এখনও দাঁড়িয়ে আছে তারাও মুমূর্ষু। উঠানের জলের দীঘিগুলি তখন ময়লায় ঠাসগাদা।

কিন্তু এ-সব কিছুই ওয়াঙের দৃষ্টি আকর্ষণ করল না। সেই প্রথম প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে সে চীৎকার করে বলল—'ইয়াং বেশ্যা কোথায় থাকে?'

একটি তেপায়া টুলের উপর একটি মেয়েমানুষ জুতার শুকতলা সেলাই করছিল। সে মাথা তুলে পাশের একটি দরজা দেখিয়ে দিল। ভিতরের উঠোনে যাওয়ার পথ। আবার যথাপূর্বং সেলাই করতে লাগল মেয়েমানুষটি। যেন বহু পুরুষকেই সে সে-পথ বাতলে দিয়েছে বহু বার।

এগিয়ে গিয়ে ওয়াঙ দরজায় টোকা দিতেই ভিতর থেকে রুক্ষ কণ্ঠে জবাব এল—"সরে পড়ো এখন। রাতের বেসাতি আমার শেষ হয়ে গেছে। আমাকে ঘুমুতে হবে। সারা রাত আমি জাগি।' কিন্তু ওয়াঙ তবুও দরজায় আঘাত করতে লাগল। তখন আবার প্রশ্ন হোল—'কে তুমি?"

ওয়াঙ উত্তর দেয় না—খালি আঘাত করতে থাকে দরজায়। তাকে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে কি না। অবশেষে ঘসঘসানি শব্দের পর একটি স্ত্রীলোক এসে দরজা খুলে দিল। যৌবনের লেশমাত্র নাই। নুয়ে-পড়া ক্লান্ত চেহারা। পুরু ঠোঁট। কপালে শাদা বিশ্রী রং। গাল ও মুখের লাল রং তখনও ধুয়ে ফেলা হয়নি। তার দিকে চেয়ে স্ত্রীলোকটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল—'রাতের আগে আজ আর পারব না। যদি ইচ্ছে হয় সন্ধ্যার মুখে যত তাড়াতাড়ি পার এস। কিন্তু এখন আমাকে ঘুমোতেই হবে।'

ওয়াঙ তার কথার মাঝেই কটু ভাষায় বাধা দিল। মেয়েটির চেহারা তাকে অসুস্থ করে তুলেছিল। তার ছেলে এখানে আসে এ চিন্তা সহ্য করতে পারে না ওয়াঙ। সে বলল—'আমার জন্য নয়। তোমার মত মেয়ের তাগিদ নেই আমার। আমি এসেছি আমার ছেলের জন্য।' ছেলের কথা বলতেই রুদ্ধ কান্নায় ওয়াঙের গলা আটকে আসতে লাগল।

স্ত্রীলোকটা জিজ্ঞাসা করল—'কে ছেলে'।

ওয়াঙ উত্তর দিল! তার গলার স্বর আবেগে কাঁপছে।—'সে এখানে কাল রাতে এসেছিল?'

—'কাল রাতে বহু লোকের ছেলেই ত এসেছিল। তার মধ্যে কোন্‌টি তোমার কি করে জানব?'

অনুনয় করে বলে ওয়াঙ—'ছোট্ট ছিপছিপে একটি ছেলের কথা মনে করে দেখ দেখি। বয়সের অনুপাতে ঢ্যাঙা কিন্তু এখনও সোমত্ত পুরুষ হয়নি। সে যে মেয়েছেলের ঘরে আনাগোনা করতে পারে তা আমার স্বপ্নের অতীত।'

মনে করে স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল।—'দু'জন ছিল। এক জন হলদে রঙের ছোঁড়া—নাকটা ডগার কাছে ওপরে ওলটান। চোখে সবজান্তার ভাব। মাথার টুপিটা এক দিকে কান পর্যন্ত টানা। সেই কি? আর একটি তুমি যেমন বলছ—বেশ লম্বা ছেলে, পুরুষ হবার বড় আগ্রহ ছেলেটির।'

ওয়াঙ শুনে বলল—'হ্যাঁ-হ্যাঁ সেই। সেই আমার ছেলে।'

—'ছেলে ত কি?'

ওয়াঙ গভীর আগ্রহের সঙ্গে বল্‌ল—'সে যদি আবার আসে তাড়িয়ে দিও তাকে। বোলো, জোয়ান মরদদের চাই—বোলো যা ইচ্ছে হয় তোমার। কিন্তু যত বার তুমি তাকে ফিরিয়ে দেবে তত বার দু'গুণো রুপো ঢেলে দেবো তোমার হাতে।'

স্ত্রীলোকটি হাসল এবার। হাসল উদাসীন ভাবে। তার পর রসিকতা করে বল্‌লে—'কাজ না করে পয়সা পেয়ে কে সে কথা বলবে না, বল? কাজেই আমিও বলব। এটা খুবই সত্যি যে আমি জোয়ান মরদদেরই চাই—ছোট ছেলেরা সামান্যই সে-সুখ দিতে পারে।' বলার সঙ্গে সঙ্গে সে ওয়াঙের দিকে মাথা নাড়ল—চোখ ঠারল। তার কুৎসিত চাউনি ওয়াঙকে অসুস্থ করে তুলতে লাগল।

তাড়াতাড়ি বলল সে—'তাহলে সব ঠিক রইল।'

ওয়াঙ ক্লান্ত ঘর-মুখো হোল। পথে যেতে যেতে এই বারাঙ্গনার চেহারা যত বার মনে পড়তে লাগল তার অমনি গা বমি-বমি রোধ করবার জন্য মাটিতে থুতু ফেলতে লাগল ওয়াঙ।

সেই দিনই সে কোকিলাকে বলল—তুমি যা বলেছিলে তাই হোক। চালের ব্যাপারীর কাছে গিয়ে সব পাকা করে এস। যৌতুক ভাল হওয়া চাই। অবশ্য মেয়েটি উপযুক্ত হলে খুব বেশীরও প্রয়োজন নেই।'

এই কথা জানিয়ে ওয়াঙ ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত ছেলের পাশে বসে ভাবতে লাগল। ছেলেটি ঘুমোচ্ছে আহা, কত সুন্দর—কত তরুণ। চেয়ে দেখতে লাগল ওয়াঙ ছেলের ঘুমন্ত মুখ। যৌবনের স্নেহে কত স্নিগ্ধ কোমল। কিন্তু সেই মুহূর্তে সেই স্ত্রীলোকটির রং-করা ক্লান্ত মুখ, পুরু ঠোঁট মনে পড়ল, তার বুক রাগে আর ঘৃণায় স্ফীত হয়ে উঠল। মনে মনে বিড়-বিড় করে বকতে লাগল ওয়াঙ।

ওয়াঙ বসে থাকতে থাকতেই ওলান ঘরে ঢুকে ছেলেকে বেশ করে দেখল। ছেলেটির সারা দেহ ঘামে ভিজে উঠেছে। পরিচ্ছন্ন, কণা কণা স্বেদ। গরম জলে ভিনিগার মিশিয়ে সে তার গা' মুছে দিল আস্তে আস্তে। বিরাট প্রাসাদে ক্ষুদে প্রভুরা যখন প্রচুর মদ্য পান করতেন তখন যেমন করে মার্জনা করে দিত তাদের দেহ ঠিক তেমনি ভাবে ছেলের দেহ মুছিয়ে দিল ওলান। ছেলেটি এমন অকাতরে ঘুমুচ্ছে যে গাত্র-মার্জনাতেও তার ঘুম ভাঙল না। ওয়াঙ তার ঘুমন্ত পেলব মুখ দেখে উঠে পড়ল। রাগে গর-গর করতে করতে সে খুড়োর ঘরে গেল। খুড়ো যে বাপের ভাই সে-কথা ভুলে গেল সে। তার মনে হতে লাগল, এই লোকটি সেই অলস দুর্বিনীত ছোকরাটির বাপ যে তার নিজের এমন চমৎকার ছেলেকে গোল্লায় নিয়ে যেতে বসেছে।

ওয়াঙ ঘরে ঢুকেই চীৎকার করে উঠল—'বাড়ীতে আমি কতকগুলো বেইমান সাপ পুষেছি। তারা এখন আমাকেই কামড়াতে বসেছে।'

খুড়ো তখন বসে একটি টেবিলের উপর ঝুঁকে প্রাতরাশ খাচ্ছিলেন। দুপুরের আগে তিনি আর ওঠেন না বিছানা থেকে। কারণ করবার ত আর কিছু নেই। এই কথাগুলো শুনে মুখ তুলে অলস কণ্ঠেই তিনি বললেন—'তার মানে?'

ওয়াঙ তখন যা যা ঘটেছে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে সব বলে গেল। কিন্তু খুড়ো শুধু হেসে বললেন—'ছেলে মন্দ হবে এ ঠেকিয়ে রাখা যায় কি? পথে-ফেরা মাদী কুকুরের কাছ থেকে মদ্দা কুকুরকে কি আটকে রাখতে পার?'

খুড়োর এই হাসি শুনে তাদের জন্য যত ক্ষতি সহ্য করেছে সব একে একে এসে ওয়াঙের মনে ভিড় জমাতে লাগল। আগে কত বার ওয়াঙের জমি বিক্রী করিয়ে দেবার জন্য চেষ্টা করেছেন খুড়ো। এই তিনটে অলস অপোগণ্ড বসে বসে তার ভাত ধ্বংসাচ্ছে। খুড়ী কমলিনীর জন্য কোকিলা যে সব দামী খাবার তৈরী করে তাতে ভাগ বসায়। আর এখন খুড়োর ছেলে তারই নিজের অমন চমৎকার ছেলেটিকে নষ্ট করছে! দাঁতে দাঁত চেপে ওয়াঙ বললে—'এবার সকলে মিলে কেটে পড়ুন এ বাড়ী থেকে।' আর কারুরই এখানে এক কণাও অন্ন মিলবে না এই দণ্ড থেকে। আপনাদের আশ্রয় দেওয়ার চেয়ে বাড়ীটা পুড়িয়ে ফেলব, সে-ও ভাল। বসে বসে খেয়েও একটু কৃতজ্ঞতা নেই?'

খুড়ো যেমন বসেছিলেন তেমনি বসে রইলেন। একবার এ-বাটি থেকে একবার ও-বাটি থেকে তেমনি খেতে লাগলেন। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওয়াঙের রক্ত ফুটতে লাগল টগ বগ করে। খুড়ো তার কথায় কর্ণপাত করছেন না দেখে সে হাত তুলে এগিয়ে এল খুড়োর দিকে। তখন খুড়ো বললেন—'পারো, তাড়িয়ে দাও আমায়।'

কিছু না বুঝে ওয়াঙ তোতলাতে লাগল, গর্জাতে লাগল ক্রুদ্ধ স্বরে—'তাকে কি—দেখছ ত।' খুড়ো জামা খুলে ফেলে জামার ধারের সেলাই দেখালেন।

ওয়াঙ আড়ষ্ট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দেখল, লাল চুলের কৃত্রিম দাড়ি আর এক ফালি লাল কাপড়। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ওয়াঙ তাকিয়ে রইল সেগুলির দিকে। সমস্ত রাগ তার জল হয়ে এল। সে কাঁপতে লাগল ঠক-ঠক করে। তার মধ্যে যেন আর শক্তি একটুও অবশিষ্ট নেই।

এই লাল দাড়ি আর লাল ফালি এক দল ডাকাতের পরিচয়-চিহ্ন, যারা লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে গেছে দক্ষিণ-পশ্চিমে। কত বাড়ী-ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে তারা। কত নারীকে হরণ করে নিয়ে গেছে। কত কৃষক-পরিবারকে তাদের নিজের বাড়ীর উঠোনেই বেঁধে রেখে গেছে। লোকেরা পরের দিন এসে তাদের সেই ভাবে বন্দী অবস্থায় পেয়েছে। যারা বেঁচে থাকত পাগল হয়ে যেত। আর যারা মরে যেত সিদ্ধ মাংসের মত দগ্ধ হয়ে কুঁকড়ে পড়ে থাকত। ওয়াঙ সেই দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার চোখ যেন মাথা থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসবার উপক্রম হয়েছে। আর একটিও কথা না বলে সে ফিরে গেল। ফেরার পথে শুনতে পেল ভাতের বাটির উপর ঝুঁকে-পড়া খুড়োর চাপা হাসির গমক।

এমন এক জালে জড়িয়ে পড়েছে ওয়াঙ যা তার স্বপ্নের অতীত। আগের মতই বুড়ো আসেন যান। স্বল্প কেশ শুভ্র শ্মশ্রুর ফাঁকে প্রচ্ছন্ন থাকে একটা অবজ্ঞার হাসি। ছিন্ন জামা-কাপড় তেমনি উদাসীন ভাবেই গায়ে জড়ান খুড়োর তার সঙ্গে দেখা হলে ওয়াঙের দেহ ঠাণ্ডা হিম স্বেদ-সিক্ত হয়ে ওঠে। ভয়ে কোন কথা বের হয় না মুখ দিয়ে। খুড়ো তার যা' অনিষ্ট করতে পারেন সেই ভয়ে মাত্র দু' একটা সম্ভ্রমসূচক কথা বলে। কিন্তু এও ত সত্য যে তার সৌভাগ্যের বছরগুলিতে, বিশেষ করে অজন্মার বছরগুলিতে যখন অন্যেরা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অনশনে দিন কাটিয়েছে তখন একবারও তার গৃহে ক্ষেত-খামারে ডাকাত পড়েনি। অথচ বহু বার সে জানল-দরজা শক্ত করে খিল দিয়ে ভয়ে ভয়ে রাত্রি কাটিয়েছে। প্রীমের প্রেমে পড়ার আগে পর্যন্ত অতি সাবধান ভাবেই থেকেছে, পরেছে সে—ঐশ্বর্যের বহিরাড়ম্বর পরিহার করেছে। গ্রামবাসীদের মুখে যখন সে ডাকাত-দলের অত্যাচারের কাহিনী শুনে বাড়ী ফিরে এসে রাত্রে নিয়মিত ঘুমুতে পারত না—যে কোন শব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকত।

কিন্তু ডাকাতরা কোন দিনই আসেনি তার বাড়ীতে। সে ক্রমশঃ সাহসী নিশ্চিন্ত হয়ে উঠেছিল। ওয়াঙের বিশ্বাস হোল ভগবান রক্ষা করছেন তাকে এ সৌভাগ্য তার ললাট-লিপি। প্রত্যেক বিষয়ে সে হয়ে উঠতে লাগল অনবধান—এমন কি দেবতার ধূপধুনার কথাও ভুলে গেল। কারণ এ-সব ছাড়াই ত তার সৌভাগ্য অটুট আছে। কেবল নিজের স্বার্থ-সুবিধা ক্ষেত-খামার ছাড়া আর কোন কথাই ভাবত না ওয়াঙ। এখন হঠাৎ তার চোখ খুলে গেল কেন সে নিরাপদ আছে। যত দিন সে খুড়োর পরিবারবর্গকে খাওয়াবে তত দিন নিরাপদেই থাকবে সে এ-কথা ভাবতেই তার গায়ে হিমের মত ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দিল। তার খুড়োর বুকের অন্তরালে কি লুকান আছে সে কথাও কাউকে বলতে তার সাহস হোল না।

কিন্তু খুড়োকেও আর কখনও বাড়ী ছেড়ে যেতে বলত না। আর খুড়োর সঙ্গে কথা বলত যত দূর সম্ভব মনের উত্তেজনা সংযত রেখে—'অন্দর মহলে রান্নাবান্না যা হয় খেও। এই নাও হাত-খরচের জন্ত কয়েকটা রূপো।'

খুড়োর ছেলেকে বলল যদিও গলায় আটকে আসছিল—'এই নাও রূপো। ছোকরাদেরও হাত-খরচ আছে ত!'

কিন্তু নিজের ছেলেকে ওয়াঙ নজরে রাখে। সূর্যাস্তের পর কিছুতেই আর বাড়ীর ত্রিসীমানা ডিঙোতে দেয় না। ছেলে রেগে আগুন হয়। দাপাদাপি করে বেড়ায় সে বাড়ীময়। রুক্ষ মেজাজের দরুণ অনর্থক ছোট ভাই-বোনদের চড়-চাপড়টা লাগায়। এই ভাবে ওয়াঙ জড়িয়ে যায়, চারি দিকে নানান জ্বালায়।

প্রথম প্রথম এই সব ঝঞ্ঝাটের কথা ভেবে ওয়াঙ কাজ পর্যন্ত করতে পারত না। এটা ওটা বিপদের কথা ভাবত। 'খুড়োকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নগরের দেওয়ালের অভ্যন্তরে ত চলে যাওয়া যায়। সেখানে পাহারাওয়ালা পাহারা দেয় রাত্রে।' কিন্তু তখনই আবার মনে হোল—প্রতিদিনই ত তাকে মাঠে কাজ করতে আসতে হবে। অরক্ষিত অবস্থায় যখন সে কাজ করবে মাঠে তখন বরাতে কি ঘটবে কে বলতে পারে? তাছাড়া সহরে নিজের বাড়ীতে তালাবন্দী হয়েও কেউ বাস করতে পারে না। জমির সঙ্গে যদি তার বাড়ীর যোগ ছিন্ন হয় সে ত মরে যাবে। এক দিন নিশ্চিত আসবে দুর্বচ্ছর। সহরও রুখতে পারবে না ডাকাতদের। পারেও নি সেদিন—যেদিন ঐ বিরাট প্রাসাদের পতন হয়েছিল।

সে সহরে কোর্টে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়েও বলতে পারে—আমার খুড়ো লাল দাড়ীদের এক জন!'

কিন্তু এ-কথা বললে কে তাকে বিশ্বাস করবে? যে তার বাপের ভায়ের সম্বন্ধে এমন কথা বলে তাকে কি কেউ বিশ্বাস করে? খুড়োর অনিষ্টের পরিবর্তে হয়ত এই কাজের জন্যে আদালত তাকে শাস্তি দেবে। তার পর চিরকাল প্রাণভয়ে কাটাতে হবে। ডাকাত-দল এ-কথা শুনলে তার উপর প্রতিশোধ নেবেই।

বিপদের যেন আর শেষ নেই। কোকিলা ফিরে এল ধান-চালের ব্যাপারীর কাছ থেকে—বিয়ের কথা এগিয়েছে ভালই কিন্তু ব্যাপারী লিউ এখনই মেয়ের বিয়ে দিতে গররাজী। বিয়ের নথিপত্রে সই-সাবুত হোক তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু মেয়েটির এখনও বিয়ের বয়স হয়নি। এই ত সবে চোদ্দ। আরও তিন বছর অপেক্ষা করতে হবে। ওয়াঙ আরো তিনটি বছর ছেলের রাগের কথা, কর্মবিমুখতা, উচাটন চোখের কথা ভেবে মনে মনে ভারী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হোল।

এখনই ত সে দশ দিনের মধ্যে দু'দিনও স্কুলে যায় না। সেদিন রাত্রে খাওয়ার সময় ওয়াঙ ওলানকে ডেকে বলল—'অন্য ছেলেদের যত তাড়াতাড়ি পারি বিয়ে দিতে হবে। যত তাড়াতাড়ি হয় ভাল। উড়ু-উড়ু স্বভাব হবার আগেই চুকিয়ে দিতে হবে সব। বার বার তিন বার এই রকম বাড়ীতে ঘটতে দেব না আমি।'

সে রাত্রে ওয়াঙের ভাল ঘুম হোল না। সে ভাবতে লাগল তার দীর্ঘ আলখাল্লা—লাথি মেরে ফেলে দিল জুতো-জোড়া। চিরকাল যেমন হয়ে থাকে বাড়ীর কোন ব্যাপারে গভীর ভাবে ঘা খেলে যেমন চিরদিন সে বেরিয়ে পড়ে আজও তেমনি কোদাল নিয়ে ওয়াঙ মাঠে গেল। গেল বাইরের উঠোন পেরিয়ে যেখানে তার বড় মেয়েটি হাসিমুখে বসে থাকে—বসে বসে আঙুলের ফাঁকে কাপড়ের ফালি জড়ায়। তাকে আদর করে বিড়-বিড় করে বলল সে—'বাড়ীর সবাই মিলে যতটা শাস্তি না দেয় এই দুর্ভাগা বোবা মেয়েটি আমার তার চেয়ে বেশী শান্তি দেয় আমাকে।'

এই ভাবে দিনের পর দিন সে মাঠে যেতে লাগল।

জমিই তাকে আবার শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিল। রোদে পুড়ে আবার সে সুস্থ হয়ে উঠল। গ্রীষ্মের অতপ্ত বাতাস তাকে মমতাময় শান্তিতে ঘিরে রাখল। এমন কি নিজের বিপদের দুর্ভর চিন্তার শেষ মূল পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করবার জন্য এক দিন আকাশের কোণে একখানি ছোট মেঘ দেখা গেল। প্রথমে দিগন্তের কোল ঘেঁসে পড়েছিল কুয়াশার মত হাল্কা ছোট্ট মেঘের ফালটি। বাতাসের দোলা লাগলে মেঘেরা যেমন এ-দিকে ও-দিকে ছুটতে ছুটতে ভেসে আসে তেমনি ভাবে এল না মেঘের দল। এক স্থানেই নিশ্চল পড়ে রইল তারা—তার পর পাখার মত ক্রমশঃ সারা আকাশ ছেয়ে ফেলতে লাগল।

গাঁয়ের লোকেরা লক্ষ্য করতে লাগল, আলোচনা করতে লাগল নিজেদের মধ্যে। ভয় চেপে বসল তাদের উপর। তাদের ভয়ের কারণ—দক্ষিণ থেকে আসছে পঙ্গপালের দল মাঠের ফসল খেয়ে ফেলতে। ওয়াঙ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। সবাই চেয়ে আছে ফ্যাল-ফ্যাল করে। অবশেষে বাতাসে উড়ে এসে কি যেন পড়ল তাদের পায়ের গোড়ায়। এক জন তাড়াতাড়ি উবু হয়ে তুললে সেটা। মরা পঙ্গপাল।

ওয়াঙ ভুলে গেল তার সকল জ্বালা-যন্ত্রণার কথা। ছেলেমেয়ে-বৌ-খুড়ো—সব বিস্মৃত হোল সে। ভীতচকিত গ্রামবাসিগণের কাছে ছুটে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল তাদের—'আমাদের সোনার ক্ষেতকে বাঁচাতে হবে আকাশের ঐ শত্রুদের কাছ থেকে।'

কিন্তু কেউ কেউ ছিল যারা শুরুতেই হতাশ হয়ে পড়েছে। মাথা নেড়ে বললে তারা—'না, আর লাভ নেই কিছুতেই। এ বছর ক্ষিধে নিয়েই থাকতে হবে। বোধ হয় এই স্বর্গের নির্দেশ। যখন অনশনে থাকতেই হবে তখন কেন বৃথা লড়াই করে শক্তি ক্ষয় করা?'

মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে সহরের দিকে ছুটল ধূপধুনো কিনে এনে পৃথ্বী মায়ের মন্দিরে পোড়ানর জন্ত। কেউ কেউ গেল সহরের বড় মন্দিরে—যেখানে থাকেন স্বর্গের দেবতারা। এই ভাবে চলল আরাধনা মাটির আর স্বর্গের দেবতাদের।

কিন্তু তবুও পঙ্গপালবাহিনী আকাশ-বাতাস ক্ষেত-প্রান্তর ছেয়ে ফেলল।

[ক্রমশঃ।

রক্তনদীর ধারা



পঞ্চানন ঘোষাল

৭

বেলা তখন তিনটে হবে।

সুরমা কীর্ত্তনী তার ট্রাঙ্ক হ'তে বেছে বেছে কয়েকখান সাড়ী ব্লাউজ বার করছিল। নিকটেই একটা টুলের উপর লক্ষ্মীকান্ত বসে আছে। মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে গোপন সলা-পরামর্শ চলছিলো। মুখ হেঁট ক'রে লক্ষ্মীকান্ত সুরমাকে কি-ই একটা কথা বুঝাতে চেষ্টা করছে, এমন সময় বরুণা ঘরে ঢুকে সুরমার কাছে এসে দাঁড়ালো।

বরুণাকে না ডাকলেও, ঠিক এই সময়টাতে তাকে আজকাল প্রায়ই সুরমার ঘরে আসতে দেখা যায়। বরুণাকে দেখে একটু মুচকি হেসে সুরমা বললো, "ও মা, ঐ যা; তোকে তো আজ পান দিতে ভুলে গিয়েছি। এই নে পান নে।"

পানের ডিবে হ'তে একটা পান বার করে সেটি বরুণার হাতে তুলে দিয়ে সুরমা লক্ষ্মীকান্তর দিকে একটি বার অর্থপূর্ণ ভাবে চেয়ে নিলো। সে বিদ্যুৎ-চাহনীর অর্থ লক্ষ্মীকান্ত ভালোরূপেই জানতো, তাই বিনিময়ে সেও একটু হাসলো। বরুণা তাড়াতাড়ি পানটা মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে বলে উঠলো, "বড্ড কড়া পান তোমার মাসী, বুকটা জ্বলে উঠে। ঔষধ খাওয়ানোর পর ওঁকেও একটা খাওয়ালাম, উনিও এই কথা বলছিলেন।"

উত্তরে লক্ষ্মীকান্ত বললো, "টাট্‌কা পান কি না তাই। তার পর, কই, যাবে না? অতোগুলো সাবান গন্ধ-তেল সব কিনে দিলাম, গা ধুয়ে এসে তৈরী হয়ে নাও।"

লক্ষ্মীকান্ত বরুণাকে তেল সাবান—প্রসাধনের সব কিছুই কিনে দিয়েছে, সেই দিনই সকালে। এর কতকগুলোর নাম পর্য্যন্ত বরুণা জানে না। বরুণার ইচ্ছে করছিলো, সেইগুলো মেখে নষ্ট না করে, ঐগুলো ঘরেই সাজিয়ে রাখবে। বরুণা অদূরের ছ্যাঁচা বেড়া দিয়ে ঘেরা কলতলাটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো। তার পর একটু 'কিন্তু কিন্তু,' ক'রে সে লক্ষ্মীকান্তর কথায় উত্তর করলো,—"হ্যাঁ দাদা, এই যাই।"

বরুণা বেরিয়েই যাচ্ছিলো, হঠাৎ লক্ষ্মীকান্ত তার হাতটা খপ করে ধরে ফেলে তাকে ভিতরের দিকে অনেকটা টেনে এনে বললো, "যাই! যাই বললেই যাই কি না? দুষ্টু মেয়ে কোথাকার।" এর পর বরুণাকে জোর ক'রে তক্তপোষের উপর বসিয়ে দিয়ে লক্ষ্মীকান্ত সুরমার দিকে চেয়ে বললো, "হাঁ, মাসী, আজকের মতো ওকে তোমারই একটা সাড়ী ব্লাউজ বার করে দাও। পাঁচ জায়গায় ওকে আমারই বোন বলে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে তো? ওর এই কাপড় দেখলে লোকে ভাববে কি?"

বরুণার হাতে আর একটা কোকেন-দেওয়া পান তুলে দিয়ে সুরমা বললো, "সে কাণ্ডজ্ঞান আমার আছে। এই জন্যেই তো এই সব বার করেছি। আজকের মতো পরুক তো এইগুলো। এই নে বাছা তোর জামা-কাপড়, গা ধুয়ে প'রে আয়। আর ঐ তক্তার তলায় আমার এক জোড়া পুরানো স্লিপার আছে, ও দু'টোও নিয়ে যা। আমি ততক্ষণ আমার সুধীর ছেলের জন্যে দুধটা গরম করে আনি।"

বরুণার স্নায়ুর মধ্যে ততক্ষণে কোকেনের ক্রিয়া সুরু হয়েছে। রঙচঙে সেমিজ ব্লাউজ সে পূর্ব্বে কখনও দেখেনি। পল্লীগ্রামের মেয়ে সে, কতটুকুই বা তার অভিজ্ঞতা। বেরিয়ে আসতে আসতে সে নিজের সেমিজ ও ব্লাউজগুলো তার বুকের মধ্যে চেপে ধরে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করলো। রঙের মধ্যেও যে এমন উত্তাপ আছে তা তার জানা ছিলো না। এইগুলো যেন পরবার জন্যে নয়, এগুলো যেন শুধু উত্তাপ গ্রহণ করবার জন্যে।

নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে বরুণা দেখলো, সুধীর তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এই মসৃণ চকচকে সাড়ী ব্লাউজ বুকের উপর আর একবার চেপে ধরে সে সেইগুলো তক্তপোষের এক কোণে নামিয়ে রেখে সেই দিকে আরও কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো এবং তার পর সাবানের বাক্স থেকে একখানি হলদে রঙের সাবান বার করে ধবধবে নূতন টোয়ালে ও গন্ধের শিশিটা হাতে নিয়ে দর্ম্মা দিয়ে ঘেরা এজমালি কল-ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

বরুণা জামা-কাপড় সাদরে তুলে নিয়ে বের হয়ে গেলে, উৎফুল্ল হয়ে লক্ষ্মীকান্ত সুরমাকে বললো, "হায় রে, কতো যে দেখলাম! সব মেয়েই দেখি সমান।"

লক্ষ্মীকান্তর এইরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদ করে, সুরমা কীর্ত্তনী খেঁকরে উঠে বললো, "থাম থাম, বড়াই করিস্‌নি। ও-সবই ঐ গুঁড়োর গুণ। দেখছিস্ না, ঠিক তিনটার সময় ওকে একটি বার আসতেই হয় এইখানে।"

সত্য সত্যই এই কোকেন বা সাদা গুঁড়োর গুণ অসীম। মানবের অন্তর্নিহিত অপরাধ-স্পৃহা এবং মানবীর নির্ব্বিচার যৌন-স্পৃহা, কৃত্রিম উপায়ে এই কোকেনাদি ঔষধের দ্বারা সহজেই জাগ্রত করা যায়। এই কোকেন এক দিক দিয়ে যেমন মানব-মানবীর সুপ্ত

অপরাধ ও যৌন-স্পৃহাকে জাগ্রত করে দেয়, অপর দিকে তেমনি এই গুঁড়ো ঐ সকল দুর্বৃত্তদের প্রতি তাদের আকৃষ্টও করে তুলে। নেশায় খাইয়েও একবার করে এইজন্ত এরা এদের কাছে এসে থাকে, অনেকের মতে বাধ্য হয়েই। নেশা এমনই এক বস্তু। এই কারণে দুর্বৃত্তদের দলপতিরা দলের জন্ত ছেলে-ছোকরা এবং সংগ্রাহিকারা ব্যবসার জন্তে কন্তা সংগ্রহ করিতে এই কোকেন ব্যবহার করে থাকে। সুরমা কীর্ত্তনীর এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি ভালোরূপেই জানা ছিলো। এই জন্ত সে সুরু হতেই গোপনে পানের সঙ্গে বরুণাকে একটু একটু ক'রে কোকেন খাইয়ে আসছিলো।

উত্তরে লক্ষ্মীকান্ত বললো, "তা-আ, অস্বীকার করি না, আমি কিন্তু, এ ছাড়াও একটা পলিশি আছে, একেবারে ব্রিটিশ পলিশি, মাইরী, এতে এক দিনেই কেল্লা ফতে হবে। আজই দেখামু তোরে, সত্যি-ই। •

লক্ষ্মীকান্তর এই নূতন পলিশিটি সুরমার অজানা ছিল না। তাই ও সম্বন্ধে সে কোনওরূপ আগ্রহ প্রকাশ না করে, কনুই-এর গুঁতোয় লক্ষ্মীকান্তকে সরিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, "খুব হয়েছে, বকতে হবে না আর। এখোন ধুতি-পাঞ্জাবী নিয়ে তো দাওয়ায় যা। আমাকেও তো তৈরী হ'তে হবে, না কি? এঃ, বড়ো আনন্দ না? বদমায়েস কোথাকার।"

সুরমার নির্দ্দেশ মতো ধুতি ও পাঞ্জাবী নিয়ে বার হ'য়ে এসে লক্ষ্মীকান্ত দাওয়ায় এসে দাঁড়ালো। দাওয়ার শেষের দিকে একটা ছোট আলিসা ছিলো। আলিসার অদূরেই চ্যাঁচা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা কল-ঘর। আলিসার উপর উঠে ডিঙি দিয়ে লক্ষ্মীকান্ত দেখলো, বরুণা স্নান করছে। এমন নিটোল সুন্দর দেহ সে বহু দিন দেখেনি। অনিমেষ নয়নে স সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কিছুক্ষণ এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর, হঠাৎ সে লক্ষ্য করলো দরমার দরজাটা নড়ে উঠছে; বরুণা এইবার বে'রিয়ে আসবে। লক্ষ্মীকান্ত তাড়াতাড়ি সরে এসে দাওয়ার এক পাশে এসে দাঁড়ালো। দূর হতে সে লক্ষ্য করলো, ভিজে কাপড়ে মাথা হেঁট করে, তোয়ালে নিঙড়াতে নিঙড়াতে বরুণা ঘরে ঢুকছে। বরুণার প্রতিটি পদ-বিক্ষেপ লক্ষ্মীকান্তর মনের পথে যেন দাগ রেখে যাচ্ছে। এইরূপ এক অনুভূতির সহিত লক্ষ্মীকান্তর পরিচয় ছিল না, নিজের এই অদ্ভুত ভাবান্তরে স নিজেই অবাক হচ্ছিলো। ইতিমধ্যে যে সুরমা কীর্ত্তনী সাজগোছ শেষ ক'রে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, তা সে টেরই পায়নি। সে বিভোর হয়ে বরুণার চলার পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। হঠাৎ একটা কঠিন স্পর্শ অনুভব করে সে পিছন ফিরে চেয়ে দেখলো, সুরমা কীর্ত্তনী তাঁর কাঁধটা দুই হাতে চেপে ধরেছে। লক্ষ্মীকান্ত লজ্জিত ভাবে ফিরে চাইতেই সুরমা তার চোখ হতে এক ঝলক আগুন বর্ষণ করে চাপা-গলায় বলে উঠলো, "খবরদার! সাবধান করে দিচ্ছি, কিন্তু। ফেঁসে যাওয়া-টাওয়া চলবে না। এতো বাড়াবাড়িও ভালো না।"

সুরমার এই ক্রোধের আসল কারণ সম্বন্ধে লক্ষ্মীকান্তর বুঝতে বাকি থাকেনি। হাজার লোককে হাজার বার সে দেহ দিক, তাতে তার আপত্তি নেই, কিন্তু তার মনকে সে আর কাউকেই দিতে দেবে না। সুরমার এই মনোভাব লক্ষ্মীকান্তর অজানা ছিলো না।

লক্ষ্মীকান্ত বিব্রত হয়ে বলে উঠলো, "তোর যতো মাইরী বাজে সন্দেহ। আমি কি সেই মানুষ না কি? এখোন যা তো, বার ক'রে নিয়ে আয় ওকে।"

লক্ষ্মীকান্তর এই কৈফৎ সুরমা কীর্ত্তনীর একেবারেই মনঃপুত হয়নি। সুরমা মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে নিম্ন স্বরে নাক সিঁটকে লক্ষ্মীকান্তর কথার জবাব দিলো,—"ওঃ, ভারী মুরোদ দে-এ! পারিস্ একাই যা না, আমাকে ডাকিস্ কেন? বদমায়েস কোথাকার।"

স্বামি স্ত্রী হ'লে এই ঝগড়া হয়তো এক দিনেও মিটতো না, দুই দিনেও মিটতো কি না সন্দেহ? কিন্তু, সত্যই তো তারা স্বামি-স্ত্রী নয়, তারা সমব্যবসায়ী নর-নারী মাত্র, এমন ভাবে ঝগড়া অধিক ক্ষণ করলে কাজ চলে না। এই জন্তে তাদের মধ্যে অচিরে সন্ধি হতেও দেরী হলো না। লক্ষ্মীকান্তকে আর একবার বরুণা সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দিয়ে সুরমা বললো "খুব হয়েছে, নে, কাপড় প'রে নে, পৃথিবীতে কি ঐ একটা না কি। ও-রকম অনেক পাবি।"

সাজগোজ শেষ ক'রে উভয়ে বরুণার ঘরে ঢুকে দেখলো, বরুণা কাপড়-জামা পরা শেষ ক'রে সুধীরের মাথার শিয়রে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মনে তার একটা 'কিন্তু কিন্তু' ভাব। সে ভাবছিলো, এই ভাবে রোগী স্বামীকে বাড়ীতে একা রেখে তার বেড়াতে যাওয়া ভালো হবে কি না? সুরমা ও লক্ষ্মীকান্তকে ঘরে ঢুকতে দেখে চিঁ চিঁ ক'রে সুধীর বলে উঠলো, "এই দেখো মাসী, বরুণার কাণ্ডো দেখো। ওর না কি না বেরুলেই ভালো হয়। বুঝিয়ে-সুজিয়ে নিয়ে যাও তো, মাসী, ওকে।"

সলজ্জ ভাবে একবার সুরমা ও একবার শয্যা-শায়িত স্বামীর দিকে চেয়ে নিয়ে বরুণা বললো, "কিন্তু, সকাল সকাল ফিরে আসবো, বেশীক্ষণ বাইরে থাকবো না সত্যিই, ভালো লাগে না-আ।"

বরুণার মুখে-চোখে যুগপৎ ফুটে উঠছিলো—লোভ, মোহ, কর্ত্তব্যজ্ঞান ও সঙ্কোচ। বিভিন্ন ভাবের এই অপূর্ব্ব সমাবেশ বহু সৎনারীর মধ্যে লক্ষ্মীকান্ত পূর্ব্বেও দেখেছে। বরুণার এই সঙ্কোচ লক্ষ্য ক'রে সে হতাশ তো হলোই না, বরং সে তা উপভোগই করলো।

দ্বিধা-জড়িত মনে ধীরে ধীরে পা ফেলে বরুণা, লক্ষ্মীকান্ত ও সুরমার সহিত বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে এসে উঠতেই লক্ষ্মীকান্ত হুকুম করলো "চলো, বেঙ্গ ষ্টোর্স। জলদী।"

উদ্দাম গতিতে ট্যাক্সি চললো অলি-গলি পার হয়ে বড় রাস্তার বুকের উপর দিয়ে। চারি দিকে কতো বাড়ী, কতো আলো কতো বিপণির কতো রূপ-সজ্জা। বরুণা অবাক হয়ে চেয়ে দেখে, আর ভুলে যায় নিজেকে, ভুলে যায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে। লক্ষ্মীকান্ত বরুণার পাশেই বসেছিলো, মাসীকে তার অপর পাশে রেখে। হাওয়ার জোরে বরুণার মাথার কাপড় নেমে গেছে, তার অবিন্যস্ত চুলগুলো লক্ষ্মীকান্তর কাঁধে এসে পড়েছে, কিন্তু কোনও দিকেই তার খেয়াল নেই। লক্ষ্মীকান্ত এই সুযোগে তার একটা হাত বরুণার কাঁধে রেখে, অপর হাতটি দিয়ে বরুণার একটি হাত মুঠির মধ্যে তুলে নিয়ে কথোপকথন সুরু করে দিলো। নূতন আবেষ্টনের মধ্যে বরুণার যেন আর কোনও দ্বিধাই নেই। নূতন পরিবেশের মধ্যে পড়লে মানুষ মাত্রেই বদলে যায়। বরুণা তো এক জন পল্লীবালা মাত্র, তার আর অপরাধ কি?

একটি আলোকোজ্জ্বল মিশ্র-দ্রব্যের দোকানের কাছে ট্যাক্সিটি পৌঁছানো মাত্র লক্ষ্মীকান্ত হেঁকে উঠলো, "এই-ই, রোকো, রোকো।"

ট্যাক্সিটি ঐ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়তেই লক্ষ্মীকান্ত

বরুণাকে উদ্দেশ ক'রে বললো, "এসো বরু, নেমে এসো। কতকগুলো জিনিষ কিনি তোমার জন্যে। কতো ভালো ভালো জিনিষ।"

তিন জনে নেমে এসে দোকানে ঢুকতেই দোকানের বহু কর্ম্মচারী এসে তাদের ঘিরে দাঁড়ালো। এক জন বললে, 'কি কিনবেন, সাড়ী ?' অপর এক জন এসে বললো, 'সেন্ট কিনবেন, সেন্ট ?' আর এক জন এসে বললো, 'কি গহনা ? সোনার ? ঐ ষ্টলে যান।'

বরুণা অবাক্ হয়ে চার দিকে তাকিয়ে দেখে, দোকানের রূপ-সজ্জা দেখে সে মুগ্ধ হয়ে উঠে। কতো রঙ-বেরঙের সাড়ী ব্লাউজ, আরো কতো কি। কতো সোণালী রূপালী খেলনা, টৌয়ালেট, ও সেন্টের শিশি। তার মনে হলো সে যেন ইন্দ্রপুরীতে এসে হাজির হয়েছে।

বরুণা থতমত হয়ে চারি দিকে তাকাতে থাকে। অগত্যা সুরমাকেই তার জন্যে দ্রব্যাদি পছন্দ করতে হলো। বেছে বেছে একটা রঙিন সাড়ী ও একটা ব্লাউজ, এক জোড়া সস্তা জুতা কিনে সুরমা সেগুলো বরুণার হাতে তুলে দিলো। এ ছাড়া লক্ষ্মীকান্ত পছন্দ করে এক জোড়া সোণালী রঙের গিল্‌ট-করা রূপার চুড়ও বরুণার জন্যে কিনে নিলো। বরুণার হাসি আর ধরে না। লক্ষ্মীদা'র প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে ওঠে

এইখানেই শেষ নয়, এর পর সিনেমা আছে। দ্রব্যাদি কেনার পর বাঙলা ছবি দেখবার জন্যে তারা একটা সিনেমাতেও ঢুকলো।

এইখানেও বরুণা ও লক্ষ্মীকান্ত পাশাপাশি বসেছে পূর্ব্বের মতই হাতে হাত রেখে সিনেমা মাত্রই বাক-প্রয়োগের (suggestion) কাষ করে, এমন কি সাময়িক ভাবে মানুষের ব্যক্তিত্বও বদলে দেয়। লক্ষ্মীকান্ত স্পষ্ট দেখতে পেলো, বরুণা বহুল পরিমাণে বদলে গেছে: বরুণা বুঝেও বুঝছিলো না যে, সে বাস্তবতা থেকে অনেক দূর সরে এসেছে।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মিথ্যা প্রেমের অভিনয় দেখা শেষ করে সিনেমা-হল হতে বরুণা সিনেমা-নটীর হৃদয় নিয়েই বেরিয়ে এলো। চোখ দিয়ে তখনও তার জল ঝরছিলো, সিনেমা-নটীর ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনী তখনও সে ভুলতে পারেনি।

এই ভাবে সিনেমা দেখা শেষ করে তারা এসে উঠলো পার্ক-সার্কাসের একটা ছোট ফ্ল্যাটে।

ফ্ল্যাটটি এই সংগ্রাহক-দলের বহু দিন হ'তেই ভাড়া করা ছিলো। তিন কামরার ফ্ল্যাট, ভাড়া-করা আসবাব-পত্র দিয়ে সাজানো। খাট, ড্রেসিং-টেবিল, কুশন-চেয়ার, সব কিছুই সেখানে আছে। আর আছে চায়ের ও পানীয়ের সরঞ্জাম, একটি পরিষ্কার শয্যাও। মাঝে মাঝে লক্ষ্মীকান্ত এসে ফ্ল্যাটটি পরিষ্কার রেখে যায়; কারণ, যে কোনও মুহূর্ত্তে ফ্ল্যাটটি তাদের প্রয়োজন হতে পারে। এইখানে বড়ঘরের ছেলেদের ভুলিয়ে এনে উপভোগ্য দ্রব্যাদির দ্বারা তাদের খুসী করা হয় অর্থের বিনিময়ে। জানা-শুনা লোক এলে তাদের কাউকে কাউকে দুই-এক দিনের জন্যে এর দুই-একটি কামরা ভাড়াও দেওয়া হয়েছে। পূর্ব্ব হ'তেই লক্ষ্মীকান্ত প্রয়োজনীয় সকল বন্দোবস্ত ঠিক করে রেখেছিলো। সামনের একটা সোফার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে, বরুণাকে বসবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে লক্ষ্মীকান্ত বললো, "এইটেই বরু, তোর দাদার গরীবখানা। আমি গরীবদের বড্ড ভালবাসি, আর বড়লোকদের দু'চক্ষে দেখতে পারি না, তাই আমি আমার এই গরীব মাসীর বাড়ীই মাঝে মাঝে চলে যাই। বড়মাসীপাসী আমার ভালো লাগে, সত্যি। তা ছাড়া আমার তো আমার বলতে পৃথিবীতে আর কেউ নেইও।"

ঘূর্ণায়মান বৈদ্যুতিক পাখা ও উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর দিকে চেয়ে বরুণা অন্তরে অন্তরে শিউরে উঠছিলো যুগপৎ আনন্দ ও ভয়ে। লক্ষ্মীকান্তদা' তার এতো ধনী লোক। সে অবাক হয়ে লক্ষ্মীকান্তর দিকে তাকালো। এই সুযোগে লক্ষ্মীকান্ত তার জীবনের এক অলীক করুণ কাহিনী বরুণাকে শুনাতে সুরু করলো—এমন এক কাহিনী—যা কি না সিনেমায় দেখা ছবির চেয়েও করুণ ও বেদনাময়। এদিকে সুরমা পাশের ঘরে গেছে খাদ্য ও পানীয়ের যোগাড়ে। কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর হঠাৎ লক্ষ্মীকান্ত আবেগ ভরে বরুণাকে বুকের কাছে টেনে এনে বললো, "সত্যি বরু! আমার কেউ-ই নেই। আমার কাছে তুমি থাকবে? বলো বলো, থাকবে আমার কাছে বরাবর? আমার যা কিছু আছে সব তোমাকেই আমি—"

লোভ ও মোহ মানুষের স্বাধীন চিন্তা অপহরণ করে। বরুণা ধীরে ধীরে আত্মবিস্মৃত হলো, সুরু হলো তার ভিতরে দ্বৈত ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব। উত্তরে বরুণা বললো, "হুঁ-উ, থাকবো। কিন্তু ও—ও-ও থাকবে তো? সত্যি ও' বড্ড ভালবাসে আমাকে। আমায় জন্যে ও কি কষ্টই না করেছে। আমার জন্যে সত্যি ও সব ত্যাগ করেছে। ওকে কিন্তু আমি ছেড়ে থাকতে পারবো না।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই কি আমি বলছি না কি? দু'জনাই তোমরা আমার কাছে থাকবে।"

—কথা কয়টা বলে লক্ষ্মীকান্ত বরুণাকে সজোরে নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো। লক্ষ্মীকান্তর এইরূপ ব্যবহারে বরুণা যে খুব অবাক্ হয়ে গেলো তা নয়, বরং এইরূপ ব্যবহারই তার কাছ থেকে সে প্রত্যাশা করছিলো। তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে সরে বসে বরুণা বললো, "না দাদা, মাপ করবেন আমাকে। এ ভালো নয়।"

"রাগ করলে? বেশ। তা হ'লে আমি আর তোমাদের ওখানে যাবো না। তুমি তা হ'লে যাও—মাসীর সঙ্গে চলে যাও।"

কথা কয়টা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ভাবে বলে লক্ষ্মীকান্ত একটু সরে বসলো। বরুণাও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো, তার পর লক্ষ্মীকান্তর দিকে চোখ তুলে বললো, "না না, যাবেন। কেন যাবেননা? আমি কিন্তু আপনাকে ভাই-এর মতই দেখি।"

"সত্যি, আমারই অন্যায় হয়েছে বরু! যাকে ভালবাসি তাকেই আমি কষ্ট দিই। না, বরু, আমার দূরে সরে থাকাই উচিত। আমি আ—আর যাবো না তোমাদের ওখানে। দূরে থেকে তোমায় আমি ভুলতে চেষ্টা করবো।"

চোখ তুলে বরুণা দেখতে পেলো, লক্ষ্মীকান্তর চোখ সজল হয়ে আসছে। কৃত্রিম উপায়ে হঠাৎ চোখে জল আনা লক্ষ্মীকান্তর পক্ষে অসম্ভব ছিলো না। সত্যই দুই ফোঁটা জলও তার গাল বয়ে গড়িয়ে পড়লো। বরুণা আর সহ্য করতে পারলো না। মনের নেশা তখনও তার কাটেনি। একটু সরে এসে সহানুভূতির সহিত বরুণা বললো, "কেন মন-খারাপ করছেন দাদা। আমি কি বলছি না কি যে আপনাকে ভুলে যাবো? বা রে-এ!"

নারী মাত্রেই স্নেহপ্রবণ—মা, ভগিনী, স্ত্রী, বান্ধবী সকলের মধ্যেই

থাকে মাতৃভাব। তাই কারু দুঃখ দেখলে তার অপত্য স্নেহই উথলে ওঠে। সে তখন ভাবে—"আহা বেচারা, এতে যদি সে একটু আনন্দ পায়, তা পাক।" তবে এ সবই অবচেতন মনের কথা, চেতন মনে এর স্থান নেই, চেতন মনে এলে এদের এই ভাব রূপায়িত হয়ে উঠে নানারূপ বিসদৃশ ব্যবহারে।

বরুণার মনের এই দয়ার্দ্ররূপ দুর্বলতা লক্ষ্মীকান্তকে আশ্বাসিত করে তুললো। সে আর এক বার এগিয়ে এসে বরুণাকে বুকের মধ্যে টেনে এনে বললো, "না না, না বরু! আমি কিছুতেই তোকে পর হতে দেবো না। তোকে আমি আপনার ক'রে নেবই। তা না হ'লে মরে যাবো আমি-ই।"

"না না। কি করছেন আপনি। এক্ষুনি মাসী এসে পড়বে। বাবু, ছাড়ুন। দাঁড়ান, বলে দেবো আমি। ঐ মাসী আসছে।"

হঠাৎ দরজা ঠেলে দুই গেলাস সোডা-পানি সহ সুরমা ঘরে ঢুকলো, পিছনে একটা চাকর দুই থালি খাবারও এনেছে। এই সোডা-পানির সহিত মিশান ছিল যৎকিঞ্চিৎ জিন্-মদ্য। জিন্-মদ্যের রঙ সাদা, গন্ধও কম। বরুণার ধারণা হলো, ঐগুলো সরবৎ ছাড়া আর কিছুই নয়। ঘরে ঢুকে সুরমা বলে উঠলো, "কি রে? চেঁচাচ্ছিলি কেন? দু'টোতে ঝগড়া করছিলি বুঝি?"

উত্তরে সলজ্জ ভাবে বরুণা জানালো, "না না, ঝগড়া করবো কেন।"

সুরমার সান্নিধ্যে বরুণার সহজ ভাব আবার ফিরে এসেছে। নানা কথার মধ্যে এটা-ওটা খেতে খেতে সে জিনের গেলাসেও চুমুক দিলো। হঠাৎ সে অনুভব করলো, তার শিরায় শিরায় আনন্দ-লহরী ছুটছে। থেকে থেকে সে অকারণেই হেসে উঠছিলো। এদিকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সুরমা যে কখন সরে পড়েছে তা সে টেরই পায়নি। এই সুযোগে লক্ষ্মীকান্ত আর এক বার বরুণাকে কাছে টানলো, তাকে আদরে আদরে সে অতিষ্ঠ ক'রে তুললো, কিন্তু বরুণা এতে কোনও বাধাই দিল না। এতক্ষণে তার অন্তর্নিহিত সুপ্ত যৌনস্পৃহা জাগ্রত হয়ে উঠেছে। বরুণাকে নিশ্চেষ্ট থাকতে দেখে লক্ষ্মীকান্ত জিজ্ঞেস করলো, "আমি তখন চলে যেতে চাইলাম, কিন্তু তুমিই তো আমাকে যেতে দিলে না। কেন তুমি আমায় তখন থাকতে বললে?"

আড়ষ্ট হয়ে থেকে তেম'নি ভাবেই লক্ষ্মীকান্তর ক্রোড়ের উপর মাথা রেখে বরুণা উত্তর করলো, "তা হলে যে আবার আমরা কষ্ট পাবো। আমরা খেতে পাবো না। ও'র ওষুধ—"

বরুণার এই কথায় আর কোনও উত্তর না করে লক্ষ্মীকান্ত অনেকগুলি প্রীতি চুম্বন উপর্য্যুপরি বরুণার মুখে কপালে এঁকে দিতে থাকলো।

—"কিন্তু, কিন্তু দাদা, এতে আমাদের পাপ হবে না? বড্ড ভয় করছে আমার।"

বরুণার এই গ্রাম্য সারল্য লক্ষ্মীকান্তকে মুগ্ধ করে তুললো, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যে। অভয় দিয়ে লক্ষ্মীকান্ত বললো, "না না, পাপ হবে না। পাপ হয় তো তা আমার হবে; তোমার হবে না। সত্যি বলছি।"

—"কিন্তু, ও যেন না জানতে পারে।" বরুণা বললে, "ও জানে আমরা ভাই-বোনের মতো। জানতে পারলে বড় কষ্ট পাবে ও।"

"না না না। জানতে পারবে না। কেউ ওকে বলবে না। মাসী? না না, ভয় নেই, ও বলবে না। তোকে আমি কত ভালবাসি, ও কি তা জানে না মনে করেছিস্। ও সবই জানে; বড্ড বোকা মেয়ে তুই।"

বরুণার মন এতক্ষণে সচ্ছল ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। পরের দিন হয়তো পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন এই মন দুইটি পুনরায় যুক্ত হয়ে যাবে, বরুণা নিশ্চয়ই তার পূর্ব্বের মন ফিরে পাবে। কিন্তু আজকে তাকে কে রক্ষা করবে? তার বিচ্ছিন্ন মনের একটি ধীরে ধীরে নেমে গেলো এই প্রথম সে বুঝলো; তার মধ্যে দুইটি ব্যক্তিত্ব আছে—এই দুইটি ব্যক্তিত্বের একটি চায় লক্ষ্মীকান্তকে। বরুণা বাধাও দিলো না, নিজেকে এগিয়েও না তার যেন সব কিছুই গোলমাল হয়ে গেলো। আতঙ্কে শিউরে উঠে সে চোখ বুজলো। তার পর সে অঝোরে কেঁদে ফেললো। যাকে ধরে সে বাঁচতে চেয়েছিলো, সেই তাকে ডুবিয়ে দিয়েছে। তবু তাকে তার স্বামীর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। কিছুতেই বরুণা আর মুখ তুলে চাইতে পারছিলো না, কারুর দিকে না, মাসীর দিকেও না, লক্ষ্মীকান্তর দিকেও না, এমন কি নিজের দিকেও না। এই কি তার কপালে ছিলো? তার অন্তস্তল ভেদ করে মাত্র একটা প্রশ্ন বার বার জেগে উঠছে—"ভগবান! কেন—কেন আমি আজ বার হয়েছিলাম?"

ধীর পদবিক্ষেপে বরুণা, লক্ষ্মীকান্ত ও সুরমার সঙ্গে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে উঠলো। লক্ষ্মীকান্তর একটি কথারও আর উত্তর না দিয়ে বরুণা রাস্তার দিকে মুখ করে বসে রইলো। উদ্দাম গতিতে ট্যাক্সি ছুটে চললো বরুণার সেই বস্তি-বাড়ীর দিকে।

আন্ধ্র-কাব্য

[Peddana-র 'মনুচরিত্রম্' থেকে]

শ্রীমৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

পাহাড়ের চূড়া আর পল্লীছত্রী থেকে মোরগদম্পতী
গ্রীবা নত ক'রে চীৎকার করে ত্রিগুণিত ভাষায়;
ঘোষণা করে জ্বলন্ত স্বরে: "শোন মানুষ-ভাই!
আমার আত্মার বিদগ্ধ ক্রন্দন;
সর্বত্র বিশ্রামের বিস্তৃতি
প্রেমিকের উপক্রমণিকা তার উদ্যোগ উৎসাহের,
ত্রিগুণ ক্ষিপ্রতার আধার, ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ;
সুপর্যাস বৈদিক ভুক্ত-অনুশাসন।"



এম, ডি, ডি

নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন ও সন্তরণ প্রতিযোগিতা—

সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে কলিকাতায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রায় অচল হইয়া পড়িয়াছে। খেলার জগৎ এই অবস্থায় স্তব্ধপ্রায়। আই এফ এ কর্তৃপক্ষ অসমাপ্ত আই এফ এ শীল্ড-প্রতিযোগিতা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান অসম্ভব বলিয়া তাহাও পরিত্যক্ত হইয়াছে। এইরূপে অসময়েই খেলার আসরে ভাঙ্গন ঘটে। বাঙলার ক্রীড়ামোদিগণ এই অস্বাভাবিক অবস্থায় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। নিখিল ভারত ও আন্তঃপ্রাদেশিক ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা এ বৎসরে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। ভারতীয় খেলা-মহলে ব্যাডমিণ্টনে বাঙলার প্রতিষ্ঠা খুব বেশী নয়। এই সুযোগে বাঙলার নবীন ও উদীয়মান খেলোয়াড়গণ বহু কৃতী খেলোয়াড় ও ধুরন্ধরের খেলার কায়দা প্রভৃতি দেখিয়া উৎকর্ষ সাধনের প্রচুর সুযোগ পাইত। কিন্তু "বিধি যদি হয় বাম"। নিরুপায় বাঙলার ব্যাডমিণ্টন কর্তৃপক্ষ তাহাদের আমন্ত্রণ বাতিল করিয়া দিয়াছে। অনেকের মতে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া প্রতিযোগিতা চালাইতে পারা অসম্ভব হইত না। কিন্তু বহিরাগত খেলোয়াড়গণের সম্পূর্ণ নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করিতে না পারিলে এই গুরু দায়িত্ব বাঙলার পক্ষে কলঙ্কের কারণ হইয়া পড়িত। ফলে জব্বলপুরে মিত্রমণ্ডল কোর্টে এ বৎসর এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে।

একই কারণে এ বৎসর কলিকাতায় নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। লাহোরে পাঞ্জাব প্রাদেশিক এসোসিয়েশন এই অনুষ্ঠান পরিচালনার ভার লইতে সম্মত হইয়াও শেষ পর্যন্ত হাঙ্গামার ভয়ে দায়িত্ব অস্বীকার করে। অন্য কোন প্রদেশ অতর্কিতে ও এত অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত বন্দোবস্ত করার অক্ষমতা জানাইলে নিখিল ভারত সন্তরণ ফেডারেশন এই বৎসরের অনুষ্ঠান স্থগিত রাখে।

অষ্ট্রেলিয়ার এম সি সি দল :—

ওয়ালী হ্যামণ্ডের নেতৃত্বে এম সি সি দল অষ্ট্রেলিয়াতে Ashes পুনরুদ্ধারের প্রয়াসে ক্রিকেট অভিযান শুরু করিয়াছে। কম্পটন, হার্ডষ্টাফ, হাটন, হ্যামণ্ড প্রমুখ ব্যাটসম্যান এই দলের ব্যাটিং বিভাগের শক্তির উৎস। হ্যামণ্ড ইতিমধ্যেই দুইটি খেলায় যোগদান করিয়া একটি 'সেঞ্চুরী' ও একটি 'ডবল সেঞ্চুরী' সম্পাদন করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট সমালোচকগণের মধ্যে বহু প্রাক্তন টেষ্ট-খেলোয়াড়, যথা—উডফুল, কিপলটন, ওরিলী ও মেলী ইংলণ্ড দলের ব্যাটিং শক্তির প্রভূত প্রশংসা করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের বোলিং সম্বন্ধে কেহই খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না। ওরিলী ও মেলীর মতে অষ্ট্রেলিয়ার নবীন খেলোয়াড়গণের মধ্যে নূতন প্রতিভার সন্ধান মিলিবে। স্বদেশের বোলিং-শক্তি সম্বন্ধে তাঁহারা খুব আস্থাবান। অষ্ট্রেলিয়ার ক্রীড়ানুরাগীরা এখনও ব্রাডম্যান বলিতে অজ্ঞান। এই যাদুকর খেলোয়াড় অসুস্থতার দায়ে খেলিতে পারিবে কি না সঠিক জানা যায় নাই। মোটের উপর ব্রাডম্যানের খেলার উপরে অষ্ট্রেলিয়ার ভাগ্য বহুলাংশে নির্ভর করিবে। এ যাবৎ এম সি সি তিনটি খেলায় যোগদান করিয়া প্রথম খেলায় অনায়াসে জয়ী হয় ও অপর দুইটি খেলা অমীমাংসিত থাকে। তৃতীয় খেলায় ডবল সেঞ্চুরীর ফলে হ্যামণ্ড মোট ৩৬ বার ডবল সেঞ্চুরী করিয়া ব্র্যাডম্যানের রেকর্ডের সমতা করে।

ফলাফল :—

প্রথম খেলায় নর্দ্দামের বিরুদ্ধে এম সি সি অনায়াসে এক ইনিংস ও ২১৫ রাণে জয়লাভ করে। হ্যামণ্ড ১৩১ রাণ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়া প্রথম খেলায় প্রথম সেঞ্চুরী করিয়া অধিনায়কোচিত সম্ভ্রম অটুট রাখে।

রাণসংখ্যা :—

নর্দ্দাম—১ম ইনিংস—১২৩ (স্মিথ ৫৫ রাণে ৫টি ও ভোস ১১ রাণে ৩টি)।

২য় ইনিংস—৭১ (এডরিচ ২০ রাণে ৬টি ও স্মিথ ১৮ রাণে ৪টি)

এম সি সি—৬ উইকেটে ৪০১ (হ্যামণ্ড ১৩১ কম্পটন ৮৪, হাটন ৫১)।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় খেলা অমীমাংসিত থাকে।

ফ্রিম্যাণ্টলে অনুষ্ঠিত পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া কোণ্টস দলের বিরুদ্ধে এম সি সি মধ্যাহ্নভোজের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত খেলিয়া ৪ উইকেটে ১১৭ রাণ করে ও ইনিংস ঘোষণা করিয়া দেয়। প্রত্যুত্তরে পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া কোণ্টস ৬ উইকেটে ১৩৮ রাণ করিলে পূর্ণ সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। হ্যামণ্ডের অনুপস্থিতিতে এম সি সি দলের নেতৃত্ব করে ইয়ার্ডলী।

রাণসংখ্যা :—

এম সি সি—৪ উইকেটে ১১৭।

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া কোণ্টস—৬ উইকেটে ১৩৮।

পার্থে অনুষ্ঠিত এম সি সি বনাম পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া দলের তিন দিনব্যাপী খেলাটিও অমীমাংসিত ভাবে শেষ হইয়াছে। এম সি সি অধিনায়কের দুই শতাধিক রাণ সংগ্রহ এই খেলায় সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

রাণসংখ্যা :—

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস ৩৬৬ (ওয়াট ৮৫, হার্ব্বার্ট ৫৩, ক্যাসি নট আউট ৪৪, স্মিথ ১৩২ রাণে ৪টি ও রাইট ৫৫ রাণে ৪টি)

এম সি সি—১ম ইনিংস ৪৭৭ (হ্যামণ্ড ২০৮, ইকিন ৬৬, হার্ডষ্টাফ ৫২, স্মিথ ৪৬)।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি!

শ্রীতারানাথ রায়

নাৎসী নেতারা নিশ্চিহ্ন—

প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্ম্মাণ জাতের ভগ্ন মেরুদণ্ড যারা গত বিশ বছরে ঋজু করেছিল—যারা হয়ে পড়েছিল ইউরোপের মৃত্যু মাত্র নয়, পৃথিবীর ত্রাস, তারা আপনাদের অবলম্বিত বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক নরহত্যার যন্ত্র ও ষড়যন্ত্রের সব কূটকৌশল তাদের প্রাক্-সমর সমর্থকদের হাতে সমর্পণ করে মৃত্যু বরণ করেছে। নুরেমবুর্গের আন্তর্জাতিক নয়, সোভিয়েট-ইঙ্গ-মার্কিণ আদালত এদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে। দুর্ব্বল ও শান্ত রাষ্ট্র ও জাতের পক্ষে রাবণের মত এ সব রাক্ষসেরও যেমন পতন ও পরাজয় ও মৃত্যু হয়ে এসেছে, হিটলার গোরিং, হেস, রিবেনট্রপেরও পতন, পরাজয় ও মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। কিন্তু যে আন্তর্জাতিক মারণাস্ত্রে বণিকদের চক্রান্তে নিত্য মৃত্যু পরিবেশিত হচ্ছে, সে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের বিচার ওরা করবে না। পৃথিবী থেকে মুসোলিনী, হিটলার, গোরিং, হেস প্রভৃতি জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যবাদী নিশ্চিহ্ন হ'ল, বাকি রইল ইঙ্গ মার্কিণ-সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদীরা। এদের বিচার কোন্ নুরেমবুর্গ করবে।

রুশ-সাম্রাজ্যবাদ—

জার্ম্মাণ আপদ দূর করে রুশিয়া এ সব ছোটখাট রাষ্ট্রকে কোনটাকে কুক্ষিগত, কোনটাকে আওতায় এনে পূর্ব্ব-ইউরোপে সোভিয়েট কর্ত্তৃত্ব সুদৃঢ় করেছে। এবার তার দক্ষিণের দিকে নজর দেবার পালা। তুর্কীকে তাই নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা। পশ্চিম-এশিয়ায় তাই সোভিয়েট প্রভাব বিস্তার করবার চেষ্টা।

রুশিয়ার এই মনোভাব নতুন নয়। রুশ-রাষ্ট্রসংগঠক পিটার দি গ্রেটও তুর্কীকে মেরে রাষ্ট্রপ্রসার করেছিলেন। রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌রা বলেন যে, কোন রাষ্ট্রে রাজনীতিক আদর্শের পরিবর্ত্তনের সাথে জাতীয় স্বার্থের বদল হয় না। তাই পরম জাতীয়তাবাদী সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রসারনীতির সঙ্গে জার আমলের সাম্রাজ্যবাদী প্রসারনীতির ফারাক দেখতে পাওয়া যায় না। বলশেভিক বিপ্লবের পর যখন গৃহযুদ্ধে রুশিয়া যায়-যায় হয়, আর ইংরেজের সাহায্যপুষ্ট গ্রীকরা কামাল-পাশার তুর্কীকে বিপন্ন করে তোলে, তখন সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে তুর্কীর মিতালী হয়েছিল সম-স্বার্থে। সেকালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় বৃটেন আর ফ্রান্স রুশ-আক্রমণ থেকে তুর্কীকে রক্ষা করতে চেয়েছিল, এবারও তাই চাচ্ছে।

তুরস্কে কম্পন—

দার্দ্দানেলিসের ব্যাপার নিয়ে একটা আন্তর্জাতিক অশান্তি আসন্ন হয়েছে। এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষ স্বার্থ রুশিয়া আর তুর্কীর হ'লেও সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপার থেকে আমেরিকারই টনক নড়েছে বেশী। ইংরেজের ত বটেই। আমেরিকা "বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা শঙ্কিত" দেখে তুর্কীর উপকূলে নওয়ারা মজুদ করেছে।

গত ৭ই আগষ্ট দার্দ্দানেলিসের নিয়ন্ত্রণের জন্যে সোভিয়েট রুশিয়া তুর্কীকে জানায়—

(১) সব দেশের সওদাগরী জাহাজকে প্রণালীর মধ্য দিয়ে আসা-যাওয়া করতে দিতে হবে।

(২) কৃষ্ণোপসাগরে তটবর্ত্তী রাষ্ট্রের রণতরী প্রণালী-পথে যাওয়া-আসা করতে দিতে হবে, কিন্তু কৃষ্ণোপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলো ব্যতীত আর কারও রণতরী এ পথে প্রবেশ করতে দেওয়া চলবে না।

(৩) তুর্কী, সোভিয়েট রুশিয়া এবং কৃষ্ণোপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর যুক্ত নিয়ন্ত্রণে দার্দ্দানেলিস পরিচালিত হবে।

(৪) এতে তুর্কী আর রুশিয়ার স্বার্থ যখন বেশী, তখন তারাই প্রণালীর রক্ষার ব্যবস্থা করবে।

তুর্কী প্রথম দুই দফা মেনে নিলেও শেষের দুই দফা মানতে রাজী হয়নি।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই মন্‌ট্রো কনভেনসনে সই ক'রে বুলগেরিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স, গ্রীস, জাপান, রুমানিয়া, তুর্কী, রুশিয়া ও যুগোস্লাভিয়া দার্দ্দানেলিস তুর্কীর হাতে দিয়েছিল।

আমেরিকা, বৃটেন, আর ফ্রান্স তুর্কীর অস্বীকৃতির সমর্থন করেছে। তুর্কীর অস্বীকৃতিতে কৃষ্ণোপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থ নষ্ট হয়েছে বলে সোভিয়েট রুশিয়া বলছেন।

তুর্কী কি করছে? সে সোভিয়েটের তাঁবেদার হতে চাচ্ছে না। সে প্রস্তুত হচ্ছে। বলছে, আক্রান্ত হ'লে ৫ মিনিটে সে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে পারবে।

ইরাণে চরমে-নরমে—

পারস্য উপসাগরের তটেও ইংরেজ সৈন্য পাঠিয়েছে সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি। কারণ জানা নেই। তবে এ অভিযোগ করছে ইরাণী সরকার, আর সে অভিযোগ সমর্থনও করছে রুশ সংবাদপত্রগুলো যে, পারস্যে ইংরেজ দৌত্যাবাসের দুইটি মূর্ত্তি—এ সি ট্রট ও সি এ গল্‌ট দক্ষিণ-ইরাণে উপজাতিদের বিদ্রোহী হতে উত্তেজিত করছে। কোয়াশকাই আর বকতিয়ারী উপজাতির সঙ্গে না কি এ রকম বন্দোবস্ত ওরা করেছে যে, ইস্পাহান দখল করে এক দল খুজিস্থানের দিকে অগ্রসর হবে আর এক দল ফার্স্ ও কেরমাস প্রদেশ দখল করে দক্ষিণ প্রদেশগুলোর স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। উদ্দেশ্য পারস্যের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যর্থ করা—আর সোভিয়েট-ইরাণ মিত্রতার কাঁটা হওয়া। ইরাণী সমর-বিভাগের কর্ণেল খেদ্‌জ্‌হাবি না কি ইংরেজের পাকা দোস্ত।

বলা হচ্ছে যে, ইরাণে রুশ-তৎপরতা বেড়ে যাচ্ছে বলে বৃটিশ সরকারকে দক্ষিণ-ইরাণ, পারস্যোপসাগর ও ইরাণী তৈলখনি অঞ্চলে

আপনাদের কর্তৃত্ব নিরাপদ করবার জন্ত আয়োজন করতে হয়েছে। উত্তর-ইরাণে তেমনি সোভিয়েট রুশিয়া বিপ্লবীদের সমর্থন করছে।

ইরাণী প্রধান-মন্ত্রী খাভাম ত্রিশঙ্কুর মত মাঝখানে পড়েছেন। তিনি বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের এড়িয়ে জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্ত একটা গণতান্ত্রিক দল গড়তে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। বামপন্থী তুদে দল সাধারণ নির্ব্বাচনের দাবী করছে। তারা আশা করছে, নয়া নির্ব্বাচনে তাদের কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। এ নির্ব্বাচন জিতে তারা ইঙ্গ-মার্কিণ সকল কসরৎ পণ্ড করে দেবে।

প্যালেষ্টাইনে ধামা-চাপা—

ইংরেজ প্যালেষ্টাইনে কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্ত যে বদ্ধপরিকর তার একটা বড় কারণ, তুর্কীর মধ্য দিয়ে রুশিয়ার ককেশাশ অঞ্চলে যেতে হলেই প্যালেষ্টাইনের পথই সব চাইতে সোজা। এক দিকে লণ্ডনে বৈঠক বসিয়ে বৃটেন প্যালেষ্টাইনে ইহুদী-আরব সমস্যার সমাধান করতে চাচ্ছে, অন্ত দিকে নতুন নতুন ইহুদীদের ও-দেশে যেতে দেবে না বলে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বতটে বৃটিশ নওয়ারার পাহারা বসিয়েছে। পাহারা বসাবার কারণ বোধ হয় ইহুদীরা নয়—গ্রীক ও তুর্কীকে সাহায্য করবার জন্ত তুর্কীর উপকূলের যত কাছে থাকা যায় তার ব্যবস্থা করা। ওরা বলছে, রুশরা আরবদের খেপিয়ে তুলে ইরাণের পশ্চিম অঞ্চলগুলোতে ইংরেজের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতে চাচ্ছে। কিন্তু সোভিয়েট প্রচারযন্ত্র মাত্র আরব নয়, ইহুদীদের দিকে টেনেও কথা কইছে।

ওদিকে প্যালেষ্টাইন বৈঠক মুলতুবী রইল ১৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত। আরবী প্রতিনিধিরা প্যালেষ্টাইনে স্বাধীন আরব রাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তাব করেছে। সর্ত্ত—ইহুদীদের নতুন করে আমদানী করা চলবে না। ইহুদীরা তা মানবে না। আরব লীগের সেক্রেটারী জেনারেল আজম পাশা ত হাসিমুখে ফিরেছেন। ইহুদীরা কিন্তু লীগের প্রস্তাব তামাসার ব্যাপার বলে মনে করছে।

হিন্দুস্থান হুঁসিয়ার—

সেদিন প্রসিদ্ধ আন্তর্জ্জাতিক সমালোচক ডা: তারকনাথ দাস মন্তব্য করেছেন—"Indian Statesmen should not be blind to Soviet Russian programme of fomenting Civil War in India by supporting the Moslem League and the Indian Communists against the Indian National Congress"—ভারতের রাজনৈতিক নেতারা এদিকেও যেন একটু দৃষ্টি দেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ার কর্ম্ম তালিকায় এ কথাও আছে যে, ভারতীয় জাতীয় মহাসভার বিরুদ্ধে মসলেম লীগ ও ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের সমর্থন করে ভারতে গৃহভেদের ইন্ধন যোগান। তিনি বলেছেন—সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে তুর্কীর যে মনকষাকষি চলছে তাতে মাত্র বৃটেন নয়, ভারতও জড়িত হয়ে পড়বে। পারস্যোপসাগরে রুশিয়ার নিয়ন্ত্রণ বৃটেন যদি বাধা দিতে না পারে, তা'হলে ইরাণ, তুর্কী এমন কি ভারতও বিপন্ন হবে।

ভারতে গৃহভেদ অবশ্য থেধেছে। কিন্তু ইন্ধন যোগাচ্ছে কে তাতে সন্দেহ আছে। মসলেম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে ঘোষিত হলেও তারা জেহাদ ঘোষণা করেছে বৃটিশবিরোধী এবং রুশমিত্র জাতীয়তাবাদী ভারতের বিরুদ্ধে। ভারতের জাতীয়তাবাদী কেন্দ্রী সরকারের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর দূত শ্রীযুক্ত মেননকে রুশ পররাষ্ট্র-সচিব অভ্যর্থনাই করেছেন, কিন্তু মসলেম লীগের প্রতিনিধি মি: হারুণকে আমলই দেননি।

২০ বছর আগে মি: জিন্না বলেছিলেন ব্যবস্থা পরিষদে (১৯২৫) ফিন্যান্স বিলের আলোচনা-প্রসঙ্গে—"I stand here with a clear conscience and I say that I am a nationalist first, a nationalist second, and a nationalist last. Whether you are a Mussalman or a Hindu, for God's sake do not impart the discussion of communal matters into this house and degrade this Assembly"—"দিল সাফ রেখে এখানে দাঁড়িয়ে আমি বলছি আমি প্রথমে জাতীয়তাবাদী—পরেও জাতীয়তাবাদী—শেষেও জাতীয়তাবাদী। মুসলমানই হও বা হিন্দুই হও, খোদার দোহাই—এই এখানে সাম্প্রদায়িক ব্যাপারের আলোচনা হতে দিয়ে এ পরিষদের অধোগতি করো না।"

কিন্তু আজ তিনি ঘোষণা করেছেন, তিনি মোটেই ভারতবাসী নন। জানি না, এ মত তাঁর বদলাবে কি না, কিন্তু তাঁর কর্ম্মপদ্ধতি দেখে প্যালেষ্টাইনের ইহুদী সন্ত্রাসবাদীদের নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতির পরোক্ষ সমর্থন সম্ভবত: রুশিয়া করছে না। বৃটেনের রক্ষণশীল দল এবং ভারতে এই দলের প্রতিনিধিস্থানীয় য়ুরোপীয় সম্প্রদায় যে করছে এর প্রমাণ সুস্পষ্ট। প্রাচ্য দেশগুলোর সহিংস ও অহিংস জাতীয়তাবাদীদের চাপ দুর্ব্বল বৃটেন সইতে না পেরে খাসা চাল চালছে সর্ব্বত্র—ভারতেও। এখানে জাতীয়তাবাদী নেহরু সরকার গঠন করা হয়েছে, কিন্তু এই সরকারকে Sabotage করবার জন্ত চেষ্টাও কম চলছে না। জিন্নার দলকে গোঁজস্বরূপ কেন্দ্রী সরকারে প্রবেশ করান হয়েছে, এতে "Viceroy will have more chances of using his Veto power". কলকাতার বড় বড় বৃটিশ বণিকরা কলকাঠি নাড়ছে বলেই সবার ধারণা। তারা বাংলার সুরাবর্দ্দী সরকারের সাহায্য সংগ্রহ করেছে—"Some quarters even go so far as to say that the European members of Bengal Assembly did not vote with the opposition on no-confidence motion because they got a definite assurance from Bengal Premier that he would do his best to induce League Fuehrer to revise his decision.' লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন থেকে জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীদের যে ধনপ্রাণ হরণের চেষ্টা চলছে তাতে য়ুরোপীয় দল বাধা দিচ্ছে না। বাংলার য়ুরোপীয় গভর্ণর অপদার্থ মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেওয়া দূরের কথা, কৈফিয়ৎ পর্য্যন্ত তলব করছে না।

এ প্রসঙ্গে গত ১ই জুলাই, সিডনীর 'ট্রিবিউন' পত্র "Operation Asylum" নামে যে গোপন সামরিক পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেছিলেন তা হুবহু উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি—'ট্রিবিউন' বলছেন—

"The introduction to "Operation Asylum," circulated only among trusted senior military officers, states:

"The general internal defence situation throughout India as appreciated by GHQ is one in which there is the possibility of industrial trouble, inter-communal trouble

and anti-Government disturbances which may lead to open insurrection. These may occur singly or in combination.

"Anti-Government disturbances are liable to take place during July to August, 1946. i, e., after Congress have been in power for a few months and have coordinated their plans.

"To meet with the situation envisaged above, a plan is being made, known as 'Operation Asylum'. The plan is based on the formation of a firm base from which plain sailing in India, the Eastern mobile striking forces can operate to keep open vital communications.

Anticipating that the British Cabinet Mission would not find it all well, the Command last December circularised all its regiments as follows:—

"The present period is likely to see a great amount of civil disorder in India. It is envisaged that normal methods of communications will be interrupted or totally destroyed."

The following measures were taken:

Military wireless sets were installed in principal police stations and technical personnel lent to instruct in their used.

All military wireless systems were duplicated and the duplicate transmitters were buried in readiness in case land lines connecting normal transmitters were cut.

Mobile columns were organised to work in conjunction with normal military formations and civil police, and were ready to move to any threatened point.

All officers and senior NCO's were for the time issued with detailed individual instructions, telling them when and where to fire on crowds.

At the hidden camp, somewhere near Nasik special training is being given to one selected officer from each regiment in India on "how to act in the event of a breakdown in the talks".

Two squadrons of 'Liberators' (No. 9 and No. 168), consisting of volunteer personnel who had completed their period of overseas service, were flown out from England to India early this year.

British imperialism cannot rely on white soldiers alone to suppress the Indian Freedom Movement. They are training backward sections among Gurkha soldiers to help do their dirty work.

For the last eight months, soldiers of the 1/10th and 2/10th Gurkha Rifles have been given regular training "in methods to shoot down processions, deal with strikes and disperse mass meetings."

The drill which these regiments perform is as follows:

"Two batches of soldiers fall into line facing each other. The first batch wear dhotis, kurtas and Gandhi caps, and shouts slogans asking the British to quit India. The second batch, uniformed and armed, advance towards them and their captain [illegible] out orders demanding the dispersal of the 'mob'. The 'mob' refuses and continues to advance. Then the order to lathi charge . . . . then fire. . . . ."

And so the death-grim practice continues.

These two Gurkha regiments—the 1/10th and 2/10th—are composed of men from Western Nepal, who are known everywhere as having been deliberately kept most backward by the ruling clique of Nepal.

These men are under strict orders not to mix with other soldiers or civilians on pain of dismissal. They are forbidden to meet even their brother Gurkhas from Darjeeling and other parts of British India.

New recruitment of Gurkhas from Nepal is rapidly taking place. But British Indian Gurkhas are now as strictly taboo as any other Indians, for the rising Gurkha movement centred round Darjeeling (where there is a Communist M.L.A from a Labour seat) has struck terror in the hearts of the White Sahibs.

There is a civilian as well as a military side to "Operation Asylum". A confidential memorandum issued to all District Officers and Police Officers in Bengal by the Chief Secretary of Home Department explains the attitude to be adopted towards strikes, demonstrations and political processions.

উপসংহারে বলা হইয়াছে—

"The Government will give full support to officers who find it necessary to take action in accordance with the foregoing instructions to prevent a serious breakdown of the administration."

এই সামরিক পরিকল্পনার সঙ্গে মসলেম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের যে গুপ্ত কর্ম্মতালিকা দেশে প্রচার করা হয়েছে তা মিলিয়ে দেখলে এক অভূতপূর্ব্ব আন্তর্জ্জাতিক ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যাবে।

এশিয়ার সকল দেশের স্বাতন্ত্র্যের অপরিহার্য্য প্রয়োজনকে ব্যর্থ করবার জন্য সোভিয়েট এংলো-মার্কিণ প্রতিযোগিতার সঙ্গে আন্তর্জ্জাতিক মারণাস্ত্র নির্ম্মাণ ও বিতরণের প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন মুমূর্ষুদেশে গোপন উস্কানির প্রতিযোগিতার অবসান না হলে মানুষ দুনিয়া আদিম পশুত্বে ফিরে যাবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

লীগের অন্তর্বর্ত্তী সরকারে যোগদান

লীগের অন্তর্বর্ত্তী সরকারে যোগ দেওয়ায় অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন। বিস্ময়ের কারণ, তাঁহাদের এই হঠাৎ মত-পরিবর্ত্তন। ৩০শে জুলাই বোম্বাই লীগ কাউন্সিলে কায়দে আজম প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ঘোষণা করিলেন—'আর আপোষ করিবার মত কোন অবকাশ নাই। অগ্রসর হও'

৩০শে আগষ্ট ঈদ উপলক্ষে তিনি বলিলেন—'বর্ত্তমানে বড়লাটের কার্য্যকলাপ বৃটিশ সরকারের ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ঘোষিত নীতির প্রতিশ্রুতি হীনভাবে বিনষ্ট করা ছাড়া আর কিছু করে নাই।'

২রা সেপ্টেম্বর কংগ্রেস অন্তর্বর্ত্তী সরকার গঠন করেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর মিষ্টার জিন্না প্রেস-প্রতিনিধির নিকট বিবৃতি দিলেন—'লীগ অন্তর্বর্ত্তী সরকার বা গণপরিষদে যোগদান করিবে—আমি এইরূপ কোন আশা দেখিতে পাইতেছি না, কারণ তাহা হইলে উহা আমাদের পক্ষে নিছক আত্মসমর্পণ ও অপমানের বিষয় হইয়া উঠিবে।'

এই সকল উক্তি হইতে এই কথা মনে হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়, যে কোনক্রমেই লীগ কংগ্রেসের সহিত একত্র হইয়া অন্তর্বর্ত্তী সরকারে যোগদান করিবে না। একত্র হওয়া অসম্ভব বলিয়াই লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চালাইল যাহার জের আজও মিটিল না। লীগ-গুণ্ডাদের কবলে পড়িয়া বাঙ্গালা দেশ ধ্বংস হইতে চলিল। লীগের উস্কানির ফলে সমগ্র ভারতে সাম্প্রদায়িক দাবাগ্নি জ্বলিল। কত প্রাণ গেল, কত সম্পত্তি বিনষ্ট হইল, কত হিন্দু নারীর সতীত্ব নষ্ট হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস হইল, বলপূর্ব্বক তাহাদের ধর্ম্মান্তরকরণ করা হইল।

২৫শে আগষ্ট অন্তর্বর্ত্তী সরকার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বড়লাট বেতারে বিদ্রোহী মুসলিম লীগকে মাত্রাতিরিক্ত দরদ দেখাইয়া আমন্ত্রণ করিলেন। বলিলেন, তাহাদের জন্য দ্বার সদা উন্মুক্ত থাকিবে। কিন্তু ৪ঠা সেপ্টেম্বর অবধি অভিমানী কায়দে আজম কায়দা দেখাইয়া বলিলেন—অসম্ভব। বেতারে নিমন্ত্রণ তিনি করিলেন অগ্রাহ্য। তাহার পর বোম্বায়ের গভর্ণর বড়লাটকে কি যে সলা-পরামর্শ দিলেন। বড়লাট তৎক্ষণাৎ মিষ্টার জিন্নাকে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইলেন। মিষ্টার জিন্না সেই পত্র পাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ছুটিলেন দিল্লীতে। চলিল জিন্না-ওয়াভেল গোপন আলোচনা। শ্যাম বাঁশীতে কি সুর বাজাইলেন জানি না, কিন্তু মানময়ী রাধা সকল অভিমান পরিত্যাগ করিলেন সেই সুরের স্পর্শে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার 'বদলে গেল মতটা'। মুসলিম লীগ অন্তর্বর্ত্তী সরকারে যোগদান করিতে রাজী হইল।

হঠাৎ কি হইল? কোন গোপন আশ্বাসে অধীর আগ্রহে এই মত-পরিবর্ত্তন? এ রহস্য কে উদ্ঘাটন করিবে, এ প্রশ্নের কে উত্তর দিবে? এ কথা মনে করিলে কি ভুল হইবে যে বড়লাট নিশ্চয়ই গোপনে লীগ দলকে বেশ কিছু সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। প্রকাশ্য ভাবে আমরা কেবল এইটুকুই জানিতে পারিয়াছি যে, কংগ্রেসের আমন্ত্রণ লীগ অগ্রাহ্য করিয়াছিল। কংগ্রেসের সহিত তাহাদের কোনরূপ নীতিগত আপোষ-চুক্তি হয় নাই। ভূপালের নবাবের দৌত্য বিফল হইয়াছে। মিলন-ফর্ম্মুলা সৃজন সম্ভবপর হয় নাই। লীগ অন্তর্বর্ত্তী সরকারে যোগদান করিয়াছে কেবল বড়লাটের আহ্বানের অধিকারে।

২রা সেপ্টেম্বর বড়লাট যখন দেশের শাসন-ভার কংগ্রেসের হস্তে তুলিয়া দিলেন, তখন আমরা ভাবিলাম, জাতীয় সরকার স্থাপিত হইল। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহরু সকলেই বলিলেন যে, আমরা স্বাধীনতার পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি। শুনিয়া, আমরা সকলেই আনন্দিত হইয়া ঘরে ঘরে শাঁখ বাজাইলাম, আলোকমালায় গৃহ সাজাইলাম, ছাদে জাতীয় পতাকা উড়াইলাম। পণ্ডিত নেহরু আরও বলিলেন যে, বড়লাট এই সভার কেবল প্রেসিডেণ্ট মাত্র হইবেন, সরকারের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। আমরা বুঝিলাম, এই অন্তর্বর্ত্তী সরকারের সদস্যরা কেবল বড়লাটের মাহিনা-করা এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলর নহেন, ইঁহারা ভারতের শাসনযন্ত্রের কর্ণধার। জিন্না এবং বড়লাটের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমাদের মনে হইতেছে যে, কংগ্রেস যেটুকু অধিকার অর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেছিলেন, তাহাকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়াই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। এখন মনে হইতেছে যে, কংগ্রেসের এই সদস্যরা বড়লাটের শাসন পরিষদের চাকুরীয়া সদস্য ছাড়া আর কিছুই হইতে পারিবেন না। কিন্তু কংগ্রেস এ অবমাননা সহ্য করিয়া এখনও অন্তর্বর্ত্তী সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন কেন? মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সহিত কোন মীমাংসায় না আসিয়া অন্তর্বর্ত্তী সরকারে যোগদান করায় ইহাই আজ প্রতীয়মান হইতেছে যে, অন্তর্বর্ত্তী সরকারের কংগ্রেসী সদস্যরা স্বাধীন ভাবে ভারতের স্বার্থ-রক্ষার জন্য কোন কাজই করিতে পারিবেন না। পদে পদে লীগ সদস্যরা তাঁহাদের বাধা দিয়া বড়লাটের ভিটোর ক্ষমতাকে আহ্বান করিবে। অতএব বড়লাটের সিদ্ধান্তই অন্তর্বর্ত্তী সরকারের সিদ্ধান্তরূপে কার্য্যকরী হইবে। প্রথমে যখন লীগ অন্তর্বর্ত্তী সরকারে যোগদান করিতে অসম্মত হয় তখন বড়লাট কংগ্রেসের উপরই সেই ভার ন্যস্ত করেন। কংগ্রেস যাহা যাহা চাহিয়াছিল, বড়লাট তাহাতেই রাজী হইয়াছিলেন। লীগকে বাদ দিয়াও অন্তর্বর্ত্তী সরকার গঠিত হইল দেখিয়া লর্ড ওয়াভেল ও মুসলিম লীগ দল উভয়েই দুর্ভাবনায় পড়িলেন। তাহার পর পণ্ডিত নেহরু তাঁহার জন্য অন্তর্বর্ত্তী সরকারে যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, তাহাতে তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার সকল ক্ষমতাই চলিয়া যাইতে বসিয়াছে। রাজী না হইয়াও উপায় নাই অথচ ক্ষমতাই যদি গেল তবে আর লাটাগিরি করিয়া কি সুখ? অতএব ডাক পড়িল মিষ্টার জিন্নার। খুলিয়া দিলেন লীগের জন্য অন্তর্বর্ত্তী সরকারে প্রবেশের দ্বার।

কংগ্রেসকে মাৎ করিবার জন্ত লীগরূপী বড়ের চাল চালিলেন। লীগকে এই তোয়াজ লীগপন্থী মুসলিমদের স্বার্থের জন্ত নহে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের জন্ত।

খান আবদুল গফুর খান ইহা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন। লীগও যে বোঝে নাই তাহা নহে। কিন্তু তাহাদের কাছে স্বাধীনতার চেয়ে ইংরেজ-প্রীতি অধিক কাম্য! তাহাদের আদর্শ কংগ্রেসকে ছোট করিবার চেষ্টা। সে জন্য স্বাধীনতা চুলোয় যায়, যাক্। লীগের এই সর্ত্তগুলি সেই মনোভাবেরই পরিচায়ক।

(১) অন্তর্বর্ত্তী সরকারের সদস্যগণ গভর্ণরের মন্ত্রী না থাকিয়া পূর্ব্ব শাসন পরিষদের সদস্যই থাকিবেন। অর্থাৎ উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া পূর্ব্ব ব্যবস্থায় ফিরিয়া যাইতে হইবে।

(২) সেই ব্যবস্থা পরিষদে কেহ প্রধান থাকিবে না। অর্থাৎ পণ্ডিত নেহরু আর ভাইস-প্রেসিডেণ্ট থাকিবেন না। বড়লাটই পূর্ব্ববৎ প্রাধান্ত করিবেন।

(৩) সদস্যদিগের যৌথ দায়িত্ব থাকিবে না। যে যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবে। কেবল বড়লাট সার্ব্বভৌম ক্ষমতা পরিচালিত করিবেন। অর্থাৎ সম্মিলিত ভাবে দেশের উন্নতি করা এবং স্বার্থ বজায় রাখা আর সম্ভবপর হইবে না। কংগ্রেস এক পা অগ্রসর হইলেই লীগ পিছন দিকে টানিবে। ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথে তাহারা বাধা সৃষ্টি করিবে। তাহাতে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশেরই সুবিধা। কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিতে পারিবে। একান্ত প্রয়োজন হইলে বড়লাট নিজ ক্ষমতা ব্যবহার করিবেন, এবং সে ক্ষমতা যে ভারতের অগ্রগামিত্বের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

এই সর্ত্তগুলি গণ-স্বাধীনতা বিরোধী। স্বাধীনতাকামী কংগ্রেস ইহা কিছুতেই মানিয়া লইতে পারেন না। কিন্তু রক্ষণশীল সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের পক্ষে ইহা অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ, সেই জন্তই লীগের প্রতি বড়লাটের এত দরদ! বড়লাট এই সর্ত্তগুলি স্বীকার করিয়াছেন কি না তাহা প্রকাশ্য ভাবে জানান নাই বটে, কিন্তু লীগের মনোনীত ব্যক্তিদের স্থান করিবার জন্ত অন্তর্বর্ত্তী সরকারের তিন জন কংগ্রেসী সদস্যের পদত্যাগ করায় মনে হয়, তিনি ইহাতে সম্মত হইয়াছেন। পদত্যাগ করিয়াছেন—১। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, ২। স্যার সাফায়েৎ আমেদ খান, ৩। সৈয়দ আলী জহির। দুইটি মুসলিম সীট খালিই ছিল। সেই পাঁচটি সীটের জন্ত লীগের পক্ষ হইতে মনোনীত হইয়াছেন—(১) মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ, (২) মিঃ চুন্দরীগড়, (৩) মিঃ রাব নিস্তার, (৪) মিঃ গজনফর আলি খান, (৫) মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর পদত্যাগে আমরা সকলেই বিস্মিত হইয়াছি। অবশ্য মহাত্মা গান্ধী কিছু দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালার এখন যা অবস্থা, তাহাতে শরৎ বাবুর মত নেতার এখন বাঙ্গালায় থাকাই উচিত। তখন শরৎ বাবু পদত্যাগ করেন নাই। এখন লীগকে স্থান দিবার জন্ত বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। অথচ মাদ্রাজের মিষ্টার সি, রাজাগোপালাচারি—যাঁহাকে মাদ্রাজ স্থান দিতে রাজী হয় নাই, তিনি নিজ পদে বহাল রহিলেন। বাঙ্গালার প্রতি কংগ্রেসের উপেক্ষাই কি ইহাতে প্রতিফলিত হইতেছে না। তাহার উপর 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।' বাঙ্গালা দেশের প্রতিনিধিত্ব করিবেন লীগ-মনোনীত শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। তপশীল জাতির উপর মুসলিম লীগের অত্যাচারের কথা ইহার মধ্যেই তিনি কি করিয়া ভুলিলেন? লীগ-টিকিটে অন্তর্বর্ত্তী সরকারে প্রবেশ করিতে তাঁহার আত্মসম্মানে বাধিল না? না আত্মসম্মান বলিয়া কোন বালাই তাঁহার নাই? আর লীগকে তপশীল জাতিভুক্ত সদস্য মনোনীত করিবার অধিকারই বা কে দিল? সবই যেন গোলমেলে বলিয়া ঠেকিতেছে। আমরা জানিতাম যে, লীগ ভারতের মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র বলিয়াই মিষ্টার জিন্না দাবী করেন। তিনি কি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে মুসলমান বলিয়া ভুল করিলেন?

তপশীল সম্প্রদায় যদি মনে করেন যে, লীগ তাহাদের সাহায্য করিতে ইচ্ছুক বলিয়াই শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে সদস্য খাড়া করিয়াছেন তাহা হইলে তাঁহারা এক বিরাট ভুল করিবেন। 'নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা-ভঙ্গ' বলিয়া যে প্রবাদ-বাক্য আছে, ইহা তাহারই উদাহরণ মাত্র। কংগ্রেসকে হীন প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নহে। জিন্না-ওয়াভেল ষড়যন্ত্রের একটি চাল! মহাত্মাজী পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, লীগের এই যোগদান মোটেই সরল বলিয়া মনে হইতেছে না। তবু ভাল যে, তিনি একটি বার লীগের দোষ দেখিলেন। কিন্তু যদি লীগের চাল কূটবুদ্ধিসম্পন্ন হয়, বৃটিশ টোরী পার্টির প্ররোচনায় যদি দেশের ভবিষ্যৎ তাহারা নষ্ট করিতে চায়, মহাত্মাজী তবুও কি তাহাদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া চলিতে উপদেশ দিবেন।

জাতীয় সৈন্যবাহিনী

২২শে আশ্বিন বেতার বক্তৃতায় অন্তর্বর্ত্তী সরকারের দেশরক্ষা সচিব সর্দ্দার বলদেব সিংহ বলেন—"আমরা এখনও পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি নাই, তবে সেই পথে দীর্ঘ পদক্ষেপ করিয়াছি। ভারতকে বহু সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা দূর, শিল্পের দ্রুত উন্নতি সাধন ও জীবনধারণের মান উন্নত করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও স্থায়িত্বই শেষ পর্য্যন্ত নিরাপত্তার উপর নির্ভর করে। নিজের উপর আস্থা থাকিলেই জাতির নিরাপত্তা আসে। এই সমস্ত নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা দেশের সশস্ত্র বাহিনীই রক্ষা করিতে পারে।

"আমাদের লক্ষ্য কি, তাহা আপনাদের বলি। খাঁটি জাতীয় ভাবে আমরা এক জাতীয় বাহিনী গঠন করিতে চাই। আমাদের সৈন্যদলকে পূর্ণ ভারতীয়করণ করা আমাদের অধিকার এবং ইহা ত্বরান্বিত করিতে হইবে। আমাদের চেষ্টায় উহার শ্রেষ্ঠত্বের মনোন্নয়নই হইবে আমাদের লক্ষ্যণীয় বিষয়। ভারত ও উহার সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদানের পথে কোন সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিতে পারিবে না বলিয়া আমি আশ্বাস দিতে পারি। জনগণ ও সেনাদলের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গঠন করিতেই হইবে। সেনাদল জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না; কারণ, সৈন্যদল তাঁহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। জনগণকেও সেনাদলকে তাঁহাদের নিজস্ব বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং সেনাদলের প্রাপ্য সম্মান ও সুবিবেচনা দেখাইতে হইবে।"

ভারতীয়করণের অর্থ কি, তাহা একেবারেই পরিষ্কার নহে। যদি

বলা হয় যে, ভারতবর্ষে যে বৃটিশ সৈন্য রহিয়াছে তাহার স্থলে ভারতীয়দের লওয়া হইবে তাহা হইলে বেকার বৃটিশ সৈনিকদের অবিলম্বে পাততাড়ি গুটাইতে হয়। কিন্তু সে ব্যবস্থা করা হইবে কি না অথবা সম্ভব কি না সে বিষয় কোনকথাই বক্তৃতায় নাই। বরং উল্টোটার আভাস আছে। তিনি বলিয়াছেন,—"বর্ত্তমানে আমাদের অধীনে বহু বৃটিশ অফিসার আছেন। আমার আশা আছে যে, এখন সৈন্যবাহিনী ভারতীয়করণ রূপ মহান কাজে তাঁহাদের সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া যাইবে।" কমাণ্ডার-ইন চীফের কথায়ও বৃটিশ সৈন্যদের ভারতে থাকিবার আভাসই পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতীয় সরকারকে তাঁহারা বৃটিশ সরকারের মতই মানিয়া চলিবেন। এই সকল কথা হইতে ইহা মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, বৃটিশ সৈন্য ভারতেই থাকিবে। মধ্যবর্ত্তী সরকার যখন কার্য্যভার গ্রহণ করেন সেই সময় মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন যে, যত দিন এক জন বৃটিশ সৈনিক ভারতে থাকিবে তত দিন ভারত স্বাধীন হইয়াছে মনে করা ভুল হইবে। সুতরাং স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে হইলে বৃটিশ সৈন্যদের বিদায় দেওয়া প্রয়োজন। দেশরক্ষা-সচিব এ বিষয়ে কিছুই বলেন নাই।

যদি ভারতীয়করণের উদ্দেশ্য হয় বৃটিশ সৈন্য ছাড়া নিজেদের সৈন্যবাহিনী তৈয়ারী করা, তখন খরচের কথা উঠিবে। বৃটিশ সৈন্যরা ভারতে থাকিবে তাহাদের খরচ ভারতকেই বহন করিতে হইবে এবং সে খরচ বড় কম নয়। অধিকন্তু ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সৃষ্টি করা অর্থ ব্যয়ভার আরও বাড়াইয়া তোলা! সে খরচ আসিবে কোথা হইতে? নিশ্চয় দরিদ্র দেশবাসীদেরই তাহা বহন করিতে হইবে।

প্রত্যেক সৈনিককে একটি প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিতে হয়—রাজ-আনুগত্যের জন্য। এখন যাহারা সৈনিক বিভাগে ভর্ত্তি হইবে তাহারা কাহার অনুগত হইবে? আনুগত্য স্বীকার যদি ইংলণ্ডেশ্বরের নামে করিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে জাতীয় বাহিনী বলা যায় না। যত দিন না ভারত স্বাধীন হয়, তত দিন জাতীয় বাহিনীর সৈনিকেরা কোন্ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিবে? এই কারণেই আজাদ হিন্দ ফৌজ এই ভারতীয়করণে যোগদান করিতে পারে না। স্বাধীনতার পূর্ব্বে জাতীয় বাহিনী গঠন হইতে পারে না।

তার পর বেতনের কথা। এক জন বৃটিশ এবং এক জন ভারতীয় সৈনিকের বেতনে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সেই রকম পার্থক্য বৃটিশ পদের ও ভারতীয় পদের অফিসারদের মধ্যে। তাহা ছাড়া একই পদস্থিত ভারতীয় ও বৃটিশের মধ্যে কত তারতম্য! এই সকল পার্থক্য ও তারতম্য যত দিন ভারত পরাধীন থাকিবে দূর হইতে পারে না। যে যুবকরা সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিবে, শ্বেতাঙ্গদের সহিত ভারতীয়দের সাম্য রক্ষা না করিতে পারিলে তাহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে।

বৃটিশ অফিসারদের দ্বারা ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর শিক্ষার কথাও দেশরক্ষা-সচিব বলিয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও আমাদের একটু বক্তব্য আছে। এই যুদ্ধে নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে কোন বিভাগের ভারতীয় অফিসার বৃটিশ অফিসার হইতে কোন অংশে ম্লান নহে। যুদ্ধ-ফেরত ভারতীয় অফিসারদের মধ্যে বেশীর ভাগেরই সৈনিক বিভাগের চাকুরী গিয়াছে। তাহাদের ষ্টাফ হিসাবে নিয়োজিত করিলে শিক্ষা-কার্য্যের অনেক সুবিধা হয়। ভারতীয় সৈনিকরা সাধারণতঃ বৃটিশ শিক্ষকদের ভাষাও বোঝে না, ব্যবহারও পছন্দ করে না। আমাদের মনে হয়, শুধু সৈনিক নহে অফিসারদেরও ভারতীয়করণের প্রয়োজন আছে।

সামরিক স্কুলের রিপোর্টে দেখা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা, যাঁহারা ট্রেণিং কোরে আছেন, অফিসার হিসাবে বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। শিক্ষাব্রতীদের মত শিক্ষাদান অন্য অফিসাররা কখনই পারিবেন না। তাই মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেণিং কোরের অফিসারদের দ্বারা সামরিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিলে সুফলই ফলিবে।

খাদ্য-সমস্যা

২০শে আশ্বিন কেন্দ্রীয় খাদ্য-দপ্তরের অতিরিক্ত সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বি আর সেন বলেন—"ভারতবর্ষে এ বৎসর যে ভয়াবহ শস্যহানি ঘটিয়াছে তাহা অভূতপূর্ব্ব। আমরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্ব্বনিম্ন ৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানীর দাবী করিয়াছিলাম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে মাত্র ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টন পাওয়া গিয়াছে। আগামী দুই মাস খাদ্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্য দিয়া কাটাইতে হইবে।"

ভারত সরকারের প্রতিনিধি মিঃ কে এল পাঞ্জাবী বলেন যে, আভ্যন্তরীণ যান-বাহনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হইলে প্রতি মাসে দেড় লক্ষ টন ধান চালান হইবে বলিয়া আশা করা যায়। জাভা হইতে মোট ২৫ হাজার টন চাউল পাওয়া গিয়াছে এই চাউলের কিছু পরিমাণ ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং কিছু পরিমাণ জাভার বন্দরগুলিতে জাহাজে উঠিয়েছে। ব্রেজিল ও শ্যাম হইতে চাউল না পাওয়া যাওয়ায় এবং যুক্তরাষ্ট্রে জাহাজী ধর্ম্মঘটের জন্য অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ভারতে খাদ্যের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া যাইবে

এই সকল উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভারতে দুর্ভিক্ষ আসন্ন এবং অবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘাটতি ছাড়া আরও কয়েকটি আশঙ্কা আমাদের মনে জাগে, পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ। সরকারের খাদ্য-সংরক্ষণের ব্যবস্থার (অব্যবস্থার?) ফলে কত খাদ্য যে গত দুর্ভিক্ষে নষ্ট হইয়াছে তাহার হিসাব নাই। ফলে বহু ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছে খাদ্যাভাবে। সরকারের গুদামে খাবার পচিতে থাকিল, এদিকে দেশের লোক না খাইয়া মরিল। অবশ্য বাঙ্গালা দেশের লীগ সচিবের কৃতিত্বই ইহাতে সকলের অধিক পরিস্ফুট হইয়াছিল। এবারেও সে-বারের মত বাঙ্গালা সরকার খাদ্যসঙ্কটের গুরুত্ব অস্বীকার করিতেছেন। ওদিকে মফস্বল হইতে অত্যন্ত উদ্বেগজনক সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। রেশন-বহির্ভূত এলাকায় চাউলের দাম হু-হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, ঢাকা, পাবনা ও রংপুর জেলায় ২৫৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে। কোন কোন স্থানে দর ইহা অপেক্ষাও বেশী।

অন্তর্বর্ত্তী সরকারের শিল্প ও সরবরাহ সচিব শ্রীযুক্ত সি, রাজাগোপালাচারী বলিয়াছেন—"দক্ষিণ-ভারতে উৎকট খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। বাহির হইতে দক্ষিণ-ভারতে এখন কোন প্রকার খাদ্য আমদানীর আশা নাই। দক্ষিণ-ভারতে বিপদ আসন্ন।" খাদ্য-সচিব শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদও ভারতের খাদ্য-সঙ্কট সম্পর্কে বিলক্ষণ

উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। অন্তর্বর্তী সরকারও দুর্ভিক্ষের কথা স্বীকার করিয়াছেন, করেন নাই কেবল বাঙ্গালার সরকার। এই অস্বীকারের মধ্যে কোন অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য নাই তো? 'ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়' ইহাই নিয়ম।

তার পর গণ্ডগোল হয় নিয়ন্ত্রণ লইয়া। অনিয়ন্ত্রণে যদি বা আধপেটা অবস্থায় বাঁচা যায়, লীগ সচিবমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ ফলে মৃত্যু অনিবার্য। 'যাও বা ছিল ঘরে বসে, তাও খোচাল বদ্যি এসে' এই প্রবাদ-বাক্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত বাঙ্গালা সরকার। এই নিয়ন্ত্রণের অব্যবস্থায় 'কালো বাজার' অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রতিকার কোথা?

শান্তিস্থাপন চেষ্টা

শান্তি-স্থাপক হিসাবে মিষ্টার শোভান বিশেষ শোভা পাইতেছেন না। দোষ হয়ত তাঁহার নয়। কিন্তু যে লীগ সচিবমণ্ডলী তাঁহাকে এই কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন তাঁহাদের অপরাধে তিনিও শোভা-হীন হইয়া পড়িয়াছেন। বাঙ্গালা সরকার কি মনে করেন যে, পাড়াতে লাউড স্পীকার লাগাইয়া বক্তৃতা করিলে, বেতার মারফত শান্তি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া চীৎকার করিলে এবং কমিটি ও মিছিলের সংখ্যা স্ফীত করিলেই শান্তি সুড়-সুড় করিয়া আসিয়া পড়িবে? তাঁহারা এত অজ্ঞ, এ কথা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। তবে কি স্বেচ্ছায় এই লোক-দেখান ভড়ং চালাইতেছেন।

শান্তি নষ্ট করা যত সহজ, শান্তি ফিরাইয়া আনা তত সহজ নয়। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হিংসাতে ইন্ধন দিয়া তাঁহারা অতি সহজেই দাঙ্গার মহা দাবাগ্নিতে কলিকাতা ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু ক্ষয়, ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে তাঁহারা কতটুকু করিয়াছেন? তাঁহারা আবেদন করিয়াছেন সত্য কিন্তু শুকনো কথায় চিঁড়ে ভেজে না। গঠনমূলক কার্য্য তাঁহারা এখন পর্য্যন্ত কিছুই করেন নাই।

দাঙ্গার ফলে বহু নরনারী গৃহহীন। কিছু ভাগ কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশই আশ্রয়শূন্য অবস্থায় কলিকাতায় রহিয়াছে। বিভিন্ন আশ্রয়-কেন্দ্রে খোঁজ করিলেই তাহাদের হিসাব পাওয়া যাইবে। অবশ্য ইহার সঙ্গে সেই হতভাগ্যদেরও ধরিতে হইবে যাহারা গাছতলা অথবা রাস্তার ফুটপাত ছাড়া অন্য কোন আশ্রয়ই জোটাইতে পারে নাই। ইহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা না করিলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে না। স্বাভাবিক অবস্থা ব্যতিরেকে শান্তি অসম্ভব।

শান্তি ভঙ্গ করিতে কেবল দৈহিক শক্তির প্রয়োজন, কিন্তু শান্তি স্থাপন করিতে দৈহিক এবং নৈতিক উভয় শক্তিই আবশ্যক। গুণ্ডা-অধ্যুষিত পল্লীতে আশ্রয়হীন নরনারীকে নিজ নিজ গৃহে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং তাহাদের নিরাপত্তার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে হইবে। যাহারা দাঙ্গার জন্য দায়ী তাহারাই আজ পুনর্বসতির বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। শান্তি শক্তিকে ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে হইবে। হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে মুসলমানদের কিছু কিছু দোকান-পাট খুলিয়াছে। কিন্তু মুসলমান অঞ্চলে হিন্দুরা দোকান খুলিতে পারিতেছে না। এমন কি, যাহাতে হিন্দুরা ফিরিয়া আসিতে না পারে সেই চেষ্টাই চলিতেছে। বহু হিন্দুদের পরিত্যক্ত বাড়ীতে মুসলমানেরা বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া বসবাস করিতেছে। পার্ক সার্কাস এবং হগ বাজারে হিন্দুদের অনেক দোকান ইতিমধ্যেই মুসলমানদের দেওয়া হইয়াছে। লীগ সচিবমণ্ডলী যদি এই সকল সমস্যার সমাধান না করেন তবে অনর্থক 'শান্তি, শান্তি' বলিয়া চীৎকার করিয়া লাভ কি? পরস্পরে বিশ্বাস শান্তির গোড়ার কথা। এই বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে সাম্প্রদায়িক ভাব বর্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু সুরাবর্দ্দীর দল কি তাহা পারিবেন? সাম্প্র-দায়িক ভাবদুষ্ট লোকের দ্বারা শান্তি স্থাপন অসম্ভব—অলীক স্বপ্ন মাত্র। এদিকে আইন ও শৃঙ্খলার স্তম্ভস্বরূপ পুলিশ বিভাগটিকেও লীগের অনুকূলে এবং হিন্দু-দমনে খাটানো হইতেছে। এই বিভাগের প্রধান মালিক কে? মিষ্টার সুরাবর্দ্দী না পুলিশ কমিশনার? দাঙ্গার সময় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার জন্য মিষ্টার সুরাবর্দ্দী পুলিশ কমিশনারকেই দোষী করিয়াছেন। পুলিশ কমিশনার তাহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই। পরিষদের বিতর্কে এই ভাবে পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া আইন ও শৃঙ্খলার দপ্তরপ্রাপ্ত প্রধান সচিব নিজের দায়িত্ব এড়াইয়া যাইতে পারেন, কিন্তু জনসাধারণ কোন দিন বিশ্বাস করিবে না যে, তিনি অপরাধী নন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যটি অপরাধের সাক্ষ্য দেয়। দাঙ্গার সময় কোন হিন্দু সাহায্য-প্রার্থীকে পুলিশ সাহায্য করে নাই, হিন্দুরা লাঞ্ছিত অপমানিত, নির্য্যাতিত হইয়াছে লীগ গুণ্ডাদের হাতে—পুলিসের চোখের সম্মুখে। এখনও যদি হিন্দুর পক্ষে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া আগষ্টের নারকীয় হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত মুসলমান গুণ্ডাদের চিনাইয়া দিতে পারিবেন বলিয়া পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তবে সে জন্য কোন তদন্ত পর্য্যন্ত হয় না; আসামীদের বিচারের জন্য প্রেরণ করা তো দূরের কথা। কিন্তু এক জন গুণ্ডা মুসলমানও যদি আগাইয়া আসে, তাহা হইলে সম্ভ্রান্ত হিন্দুরও শ্রীঘরে থাকিবার ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎ হইয়া যায়। এমন হিন্দু পল্লী আছে যেখানে হাঙ্গামার সময় হিন্দুরা অল্পসংখ্যক মুসলমান অধিবাসীদের কোন বিঘ্ন ঘটিতে দেয় নাই; বরঞ্চ তাহাদের সকল রকমে সাহায্য করিয়া নিরাপদে থাকিতে দিয়াছে। কিন্তু পরে সেই উপকৃত মুসলমানেরা পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিয়া উপকারকের কারাবাসের ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ আনিয়াছে, এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে। পুলিশ হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানের সাহায্য করিতেছে; কিন্তু যেখানে হিন্দু অভিযোগকারী সেখানে হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকে। সরকার, সচিব-মণ্ডলী, পুলিশ সবাই যদি সাম্প্রদায়িক দাবাগ্নিতে ইন্ধন জোগাইতে থাকে, তবে কেবল ফাঁকা কথায় শান্তি কি করিয়া আসিবে?

উপেক্ষিত বাঙ্গালা

আমরা শুনিতে পাই, কাগজে দেখি, নূতন দিল্লীতে না কি কংগ্রেসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—জাতীয় স্বাধীনতার প্রথম সোপানস্বরূপ। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, বাঙ্গালায় তার কোন প্রকার প্রভাবই দেখিতে পাই না। পররাষ্ট্র-সচিব পণ্ডিত জওহর-লাল সোজাসুজি বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও দৌত্য বিনিময় করিতেছেন। ভারতের ইতিহাসে ইহা নূতন সন্দেহ নাই। খাদ্য-সচিব, স্বাস্থ্য-সচিব, দেশরক্ষা-সচিব সকলেই

জোরালো ভাষায় ভারতকে পুনর্গঠন করিবার পরিকল্পনা দেশবাসীকে শুনাইয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে তাঁহারা বেহই কিছু বলেন নাই, কোন ভরসাও দেন নাই। কালকাতা লীগপন্থীদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জেরে খুনখুন হইয়া গেল। ঢাকার বুড়িগঙ্গার জল লাল হইয়া উঠিল। নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ইত্যাদি পূর্ব্ব-বাঙ্গালার ঘরে ঘরে লীগ গুণ্ডাদের অত্যাচার। বাঙ্গালায় মানুষে পশুতে কোন ভেদ রহিল না। পিছন হইতে কাপুরুষের মত অতর্কিত ছুরিকাঘাতে কত নিরীহ পথিক মরিল তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রাণের ও ধনের কোন মূল্যই আজ এখানে নাই। অথচ ভারতের নব জাগরণের অগ্রদূত এই বাঙ্গালা দেশ। সুরেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ হইতে চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র সকলেই এই বাঙ্গালারই নেতা, যাঁহাদের আত্মত্যাগ, মনীষা, দেশপ্রেম জগদ্বিখ্যাত। এই দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, যাঁহারা যুগ-প্রবর্ত্তক মহামানব হিসাবে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। এই দেশেই জন্মিয়াছেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, যাঁহাদের সাহিত্য-প্রতিভায় জগদ্বাসী বিস্মিত। এই দেশ সম্পর্কেই মহাত্মা গোখেল বলিয়াছিলেন—"What Bengal thinks today, India will think tomorrow." আজ সেই বাঙ্গালার কি দুরবস্থা!

প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই অবস্থার কারণ কি? বাঙ্গালা দেশে, শুধু বাঙ্গালা দেশে কেন, সমগ্র ভারতে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ কেন? আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে একটিমাত্র উত্তর আসে—সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা। এই কলঙ্কময় বাঁটোয়ারার সৃষ্টি না হইলে হিন্দু-মুসলমান একত্রই থাকিতে পারিত। ইহার পূর্ব্বে ছিলও তাই। আমাদের সকলের উদ্দেশ্য ভারত স্বাধীন হউক। সেই উদ্দেশ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা চলে না। তবে আজ আমাদের রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলমান, তপশীল, শিখ প্রভৃতিদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আসনের সৃষ্টি করা হইল কেন? যিনি এই বিভিন্ন অধিকার ও আসনের জন্মদাতা, তিনিই ভারতের এই দুরবস্থার জন্য প্রকৃত দায়ী। আজ যোগ্যতার কথা আসে না, আসে সম্প্রদায়ের কথা। সেই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বীজ আজ বিষবৃক্ষে রূপান্তরিত। সেই বিষে সমগ্র ভারত জর্জ্জরিত। ভারত আজ ভাগ হইতে বসিয়াছে সেই অধিকার ভাগাভাগির জন্য। শকুনি মামার জন্য কুরুবংশ ধ্বংস হইয়াছে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সৃষ্টির জন্য ভারত ধ্বংস হইতে বসিয়াছে।

বাঙ্গালা প্রদেশই এই সম্প্রদায়িকতার ফল সব চেয়ে বেশী ভোগ করিতেছে। কারণ এখানকার হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। এ সমস্যা অন্য কোন প্রদেশে এরূপ তীব্র রূপ ধারণ করে নাই। লীগ যখন সাম্প্রদায়িক অধিকারের আড়ালে গুণ্ডামী চালায়, তখন আমরা উত্তেজিত হই, কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক অধিকারের দুর্ব্বুদ্ধি তাহাদের মাথায় কে ঢুকাইল, সে কথা চিন্তা করি না। সাম্প্রদায়িক গুণ্ডামী করা দোষের এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু গুণ্ডামী করার সুযোগ যিনি উপস্থিত করিয়া দিয়াছেন তাঁহার দোষও অস্বীকার করা যায় না।

আজ অন্তর্বর্ত্তী সরকারে কংগ্রেস-লীগ কোয়ালিশনের কথা উঠিয়াছে। কিন্তু ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে যখন এই কথা উঠিয়াছিল, তখন কংগ্রেস মহল ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে। সেই প্রতিবাদের ফলে আজ সাম্প্রদায়িক দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে ভারতময়। কে ইহা নির্ব্বাপিত করিবে? দুর্ব্বুদ্ধি দেওয়া সোজা, কিন্তু তাহার প্রতিক্রিয়া রোধ করা অত্যন্ত কঠিন।

বাঙ্গালা দেশের আজ যখন এই অবস্থা, তখন বাঙ্গালীরা মনে করিয়াছিল, নিশ্চয়ই অন্তর্বর্ত্তী সরকারের কোন সচিব আসিয়া দেশ পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, আশার বাণী শুনাইবেন, শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিবেন। কিন্তু সে আশা সফল হয় নাই। বাঙ্গালা দেশ যখন সাম্প্রদায়িক দাবাগ্নিতে পুড়িতেছে, তখন অন্তর্বর্ত্তী সচিবরা কেবল বড় বড় কথাই জগদ্বাসীকে শুনাইয়াছেন। রোম পুড়িবার সময় সম্রাট নীরোও বেহালা বাজাইয়াছিলেন। তবে নীরোর দোষ দিই কেন?

অহিংস মন্ত্রের প্রতীক মহাত্মাজী পরামর্শ দিলেন—অহিংস হও। লীগ গুণ্ডারা যদি এক গালে চড় মারে, আর এক গাল ফিরাইয়া দাও। যদি হত্যা করে করিতে দাও। আত্মত্যাগ ব্যতীত স্বাধীনতা আসে না। হাজার মাইল দূর হইতে এই কথাগুলি বলা সোজা, ছাপার অক্ষরে দেখায়ও ভাল, কিন্তু যাহার মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, ভ্রাতা-ভগিনী লাঞ্ছিত, অপমানিত, সে যদি চুপ করিয়া থাকে তাহা হইলে আমরা তাহাকে কাপুরুষ বলিব অহিংস বলিব না। আজ যদি কলিকাতায় এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত না হইয়া বারদোলীতে হইত, তাহা হইলে কি মহাত্মাজী এই ধরণের বাণী শুনাইয়াই মনে করিতেন তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গেল?

পররাষ্ট্র-সচিব বাহির লইয়া ব্যস্ত। ভিতরের কোন ব্যাপারে তিনি বোধ করি মাথা ঘামাইবার সময় পান না। স্বরাষ্ট্র-সচিব সর্দ্দার প্যাটেল বলিয়াছেন—স্বাধীনতার পথে গৃহবিবাদ হইবার আশঙ্কা থাকে। আমাদের সে জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। গৃহবিবাদ তো লাগিল, কিন্তু তিনি কি করিলেন কিছুই বুঝা গেল না। বাঙ্গালার প্রতি তাঁহার দরদ নাই, তাহা আমরা জানি। তবু আমরা আশা করিয়াছিলাম, অন্ততঃ পদ-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য হয়ত তিনি বাঙ্গালায় আসিবেন। স্বরাষ্ট্র-সচিব হিসাবে দাঙ্গা থামাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

স্বাধীনতার জন্য যখন কংগ্রেস আগষ্ট আন্দোলন আরম্ভ করেন, বৃটিশ সরকার তখন প্রত্যেক নেতাকে জেলে পুরিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় মিষ্টার জিন্না ও তাঁহার লীগপন্থী অনুচরেরা যখন হিংসাত্মক বক্তৃতা দিলেন এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করিলেন, কংগ্রেস অন্তর্বর্ত্তী সরকারের দপ্তর গ্রহণ করিয়াও তাহার কোন প্রতিবিধান করেন নাই। লীগকে তাঁহারা অনায়াসেই অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই, কারণ, লীগকে চটাইবার মত সাহস তাঁহাদের নাই। আজ লীগপন্থী গুণ্ডারা যে এত দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে তাহার প্রধান কারণই হইল অন্তর্বর্ত্তী সরকারের বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে নিস্ক্রিয়তা। তাহারা জানে, বাঙ্গালা দেশের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব কিরূপ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি কংগ্রেসের ব্যবহার বাঙ্গালার অধিবাসীরা কোন দিন ভুলিবে না। আমরা বড় আশা করিয়াছিলাম, কংগ্রেস সরকার স্থাপনে বুঝি সত্যকারের জাতীয়

উন্নতি হইবে। কিন্তু পাইলাম গৃহবিবাদ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য। অন্য প্রদেশের কথা জানি না, তবে বাঙ্গালার ভাগ্যে ইহার অধিক কিছু জুটে নাই।

বাঙ্গালার শোচনীয় অবস্থা শেষ অবধি কংগ্রেসের মনে নাড়া দিয়াছে। সদ্য-নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা নোয়াখালী, ত্রিপুরা ইত্যাদি বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের রিপোর্ট দেখিবার জন্য আমরা উদগ্রীব। বাঙ্গালা সরকারের অনুগ্রহে আমরা ঐ সকল অঞ্চলের অত্যাচারের কাহিনীর সত্য খবর পাই না। যাঁহারা বিধ্বস্ত অঞ্চল হইতে পলাইয়া আসিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিছু কিছু প্রেস-রিপোর্ট হইতেও পাওয়া গিয়াছিল। কৃপালনী তাঁহার বিবৃতিতে পূর্ব্বপ্রাপ্ত সংবাদের সমর্থন করিয়াছেন।

আচার্য্য কৃপালনী বলিয়াছেন:—অত্যাচারকারীরা যথারীতি সামরিক কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। যুদ্ধ-প্রত্যাগত সৈনিকরা এই সব আক্রমণ-ব্যবস্থা সংগঠন করিয়াছে। কোন গ্রামে ঢুকিবার পূর্ব্বে লোক পাঠাইয়া সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছে; রাস্তাঘাট, সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা সমস্ত আগেই নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ১০ই অক্টোবরের পূর্ব্ব হইতে ভূতপূর্ব্ব পরিষদ-সদস্যটি মুসলমানদের মধ্যে প্রচারকার্য্য করিয়া তাহাদের উত্তেজিত করিতেছিল। আজো এই লোকটিকে ধরা হয় নাই—তিনি না কি এখনো স্বাধীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়া ধ্বংসাত্মক কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

রাষ্ট্রপতি বহু চেষ্টা করিয়া গভর্ণর বারোজ, চট্টগ্রাম ডিভিশনের কমিশনার ও প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দ্দী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। গভর্ণর স্বীকার করিয়াছেন, যে পরিমাণে দুষ্কৃতকারীদের ধর-পাকড় করা উচিত বা কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, তাহার কিছুই করা হয় নাই। তাঁহার সেক্রেটারীও রাষ্ট্রপতির এই অভিযোগ অস্বীকার করেন নাই। মিলিটারীর সাহায্য অসামরিক গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদের যে ভাবে লওয়া উচিত ছিল তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বে যে সব রিপোর্ট পাইয়াছিলাম, তাহা হইতেই বলিয়াছিলাম, খালি মিলিটারী আমদানী করিয়া কিছু হইবে না যদি তাহাদের গুলী করিবার অধিকার না থাকে এবং অসামরিক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা তাহাদের সাহায্য না গ্রহণ করেন। কলিকাতায় এ ব্যাপার তো সকলে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। মিলিটারী ও পুলিস গোড়ার দিকে কাঠের পুতুলের অভিনয় করিয়াছিল। আচার্য্য কৃপালনী গভর্ণরের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলে তিনি আশ্বাস দেন যে, তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প, অরাজকতা তিনি দমন করিবেনই। তিনি আরো মিলিটারী চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

এদিকে প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দ্দী সাহেবের সহিত আচার্য্য কৃপালনী ও কংগ্রেস-নেতাদের সাক্ষাৎ ঘটিলে প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, নোয়াখালীর অবস্থা আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে। বলা বাহুল্য, গভর্ণর আচার্য্য কৃপালনীর নিকট যাহা স্বীকার করেন, তাহা হইতে নির্ব্বিবাদে বলা যায়, গভর্ণর ও প্রধান মন্ত্রী অবস্থা সম্পর্কে একমত নন। সুরাবর্দ্দী সাহেব আগে বলিয়াছিলেন, সংবাদপত্রের রিপোর্ট সমস্ত অতিরঞ্জিত এমন কি আজগুবি। সম্ভবতঃ গভর্ণর অন্য রকম অভিমত প্রকাশ করায় চতুর সুরাবর্দ্দী সাহেব এসোসিয়েটেড প্রেসের নিকট এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে যাহা ঘটিতেছে তাহা নিছক অরাজকতা ছাড়া কিছু নয়। ইহা দমন করিতে হইবে এবং দমনও করা হইবে। আরো সৈন্য গিয়া পড়িয়াছে; লীগ নিন্দাসূচক এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। স্থানীয় মুসলমানরাও এই সব ব্যাপারের নিন্দা করিয়া মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে প্রধান মন্ত্রী উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছেন, তাঁহার অন্যতম মন্ত্রিগণ মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, মিঃ সামসুদ্দীন এবং লীগ-নেতাগণ বিধ্বস্ত অঞ্চলে রওনা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সেখানে গিয়া গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে চেষ্টা করিবেন। গভর্ণমেণ্টও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। মিঃ সুরাবর্দ্দী কি মনে করেন, সব লোকই তাঁহার অপেক্ষা বোকা, আর তিনি একাই বুদ্ধিমান?

আচার্য্য কৃপালনী বলিয়াছেন, নোয়াখালী, ত্রিপুরার অত্যাচারিত অঞ্চলের সত্য ও সঠিক খবর সংগ্রহ করিবার উপায় গভর্ণমেণ্টের হাতে নাই, তাঁহারাও কোন উপায় করিতে পারেন নাই। তবে এ কথা ঠিক, অবস্থা আয়ত্তাধীন হয় নাই এবং গভর্ণমেণ্ট অত্যাচারিতের যে সংখ্যা দিয়াছেন, তাহার বহু সহস্র গুণ ব্যক্তি অত্যাচারিত হইয়াছে। গভর্ণর কি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন কি ভাবে অত্যাচার ও অরাজকতা দমন করিবেন—কিছুই বলেন নাই।

বাঙ্গালার অবস্থার বেশ বিশেষত্ব আছে। হিন্দু সংখ্যালঘিষ্ঠ সব জেলায় নয়। প্রতিবেশী সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা পাশেই আছে। গভর্ণমেণ্ট যদি অরাজকতা দমন করিতে না পারেন বা না করেন—আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই আছে। বাঙ্গালা তথাকথিত স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে। বড়লাট সেই সর্ত্তেই কংগ্রেসকে অন্তর্ব্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্টে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে মিঃ সুরাবর্দ্দী বাঙ্গালার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। বড়লাট ওয়াভেল ধুরন্ধর ব্যক্তি। পাকিস্থান-যুদ্ধ বাঙ্গালার মাটিতে শুরু হইলেও ইহার প্ল্যান বিলাতের মাটিতেই হইয়াছে—চিঠি-চাপাটি ও তারের সংযোগ পৃথিবীকে ছোট করিয়া আনিয়াছে। মিঃ জিন্না ভারতবর্ষে অবস্থান করিলেও তাঁহার বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও টোরী নেতা চার্চ্চিলের সহিত যোগাযোগের বাধা কিছু নাই।

—

দাঙ্গা-সংবাদ নিয়ন্ত্রণ

২৩শে সেপ্টেম্বর বাঙ্গালার প্রধান সচিব মিষ্টার সুরাবর্দ্দী কলিকাতার সংবাদপত্রের সম্পাদকদের আলোচনা সম্মেলন আহ্বান করিয়া বলেন যে, সংবাদপত্রের দায়িত্বহীনতার জন্য তিনি দেশে শান্তি ফিরাইয়া আনিতে পারিতেছেন না। সেই জন্য তিনি সংবাদ নিয়ন্ত্রণের জন্য এক আদেশ জারী করিবেন স্থির করিয়াছেন। সেই আদেশে নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সম্পর্কে কতটা চাপিতে এবং কতটা ছাপিতে হইবে। আহত বা নিহত ব্যক্তি হিন্দু কি মুসলমান, ঘটনা-স্থল কোথায়, কি অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, এ সকল কথা উল্লেখ করা দণ্ডনীয়। এই সঙ্কল্পের অর্থ—সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা, কণ্ঠরোধ করা। বাঙ্গালার সাংবাদিকরা, অবশ্য লীগপন্থীরা বাদে ইহার আপত্তি করিয়া বলেন যে, তাঁহাদের চিন্তা করিবার সময় দেওয়া উচিত। প্রথমে প্রধান সচিব সময়

দিতে সম্মত হ'ন, পরে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর বলেন যে, ৩০শে সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে ১১টায় সময় তিনি এ বিষয়ে পুনরায় আলোচনা করিবেন।

সাংবাদিক কমিটি পরদিনই জানান যে, এ বিষয়ে তাঁহারা ২৮শে সেপ্টেম্বর এক বিশেষ অধিবেশনে আলোচনা করিবেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহারা সমবেত হইতেই তথায় একটি জরুরী সরকারী পত্র পান,—সেই দিনই অপরাহ্নে প্রধান সচিব তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিতে চান।

এদিকে সাংবাদিকরা স্থির করিলেন যে, তাঁহারা প্রতিদিন সন্ধ্যায় সমবেত হইয়া সকল সংবাদপত্রের সংগৃহীত রিপোর্ট মিলাইয়া একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন। এই কার্য্যের জন্য একটি সাব-কমিটিও গঠন করা হয় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সংবাদপত্রের ৭ জন প্রতিনিধি লইয়া।

(১) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার ('আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড') (২) শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন ('ভারত') (৩) শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ('অ্যাডভান্স') (৪) ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ সেন ('অমৃতবাজার পত্রিকা') (৫) মিষ্টার ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ অথবা মিষ্টার রীড ('ষ্টেটসম্যান') (৬) ডক্টর জিলানী ('মর্ণিং নিউজ') (৭) মিষ্টার আজাদী ('ষ্টার অব ইণ্ডিয়া')।

অপরাহ্নে প্রধান সচিব এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন, এবং দুই দিন সময় দিবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া নিষেধাজ্ঞা প্রচারের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, সংবাদপত্রে উত্তেজনামূলক সংবাদ প্রকাশ বন্ধ হইলে তিনি ৩ দিনে দাঙ্গা বন্ধ করিতে পারেন। প্রতিবাদ-স্বরূপ এক সপ্তাহ কাল সকল জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ থাকে, কিন্তু ৩ দিনের স্থানে ৭ দিন সময় পাইয়াও লীগ সচিবমণ্ডলী কিরূপ শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই কণ্ঠরোধকারী আইন কেবল জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের উপরই প্রয়োগ করা হইয়াছিল। লীগ-পন্থী সংবাদপত্রের উপর তাহার কোন প্রভাবই পড়ে নাই। আজাদে' 'মর্ণিং নিউজে' সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার খবর প্রকাশিত হইতে থাকে। অবশ্য প্রত্যেক সংবাদেই মুসলমান হত এবং আহত হইয়াছে এবং আততায়ী হিন্দু বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ কমিশনার এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখেন সকল সংবাদই ভিত্তিহীন। কিন্তু মিষ্টার সুরাবর্দ্দী ঐ সকল পত্রের কৈফিয়ৎ তলব করেন নাই, এমন কি তাহাদের সতর্ক করিয়া দেওয়াও প্রয়োজন মনে করেন নাই। যে দেশের সরকারের প্রধান কর্ণধার এইরূপ দায়িত্বজ্ঞানহীন, পক্ষপাতদুষ্ট, সে দেশের ভাগ্যে যে অনেক দুর্গতি লেখা আছে তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহারই অক্ষমতা, অব্যবস্থা ও পক্ষপাতিত্বের জন্য দুই মাস ধরিয়া সাম্প্রদায়িক দাবাগ্নি বাঙ্গালা দেশকে ভস্মীভূত করিতেছে।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জের

লীগ গুণ্ডাদল শস্যশ্যামলা বাঙ্গালার বুকে মনের সুখে প্রলয় তাণ্ডব ও ধ্বংসলীলা চালাইতেছে। কলিকাতার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জের হিসাবে পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যে অরাজকতা ও পাকিস্থানী জেহাদ চলিতেছিল, নোয়াখালীর পাশবিক হত্যাকাণ্ডে তাহা একেবারে চরমে উঠিয়াছে। পাইকারী হারে হত্যাকাণ্ড, গৃহদাহ, লুণ্ঠন, নারীহরণ, সতীত্বনাশ এবং ধর্ম্মান্তরকরণ চলিতেছে। লীগ সচিব-সঙ্ঘ, লীগ-সমর্থক গভর্ণর, আর লীগ-পদলেহনকারী পুলিশ—এই ত্র্যহস্পর্শে বাঙ্গালা দেশটা নন্দন-কাননে পরিণত হইয়াছে। লীগ গুণ্ডারা জানে, এদেশে সরকার বলিয়া কিছু নাই, পুলিশ হাতের পাঁচ, সচিবসঙ্ঘ তাহাদেরই সমর্থক এবং আইন ও শৃঙ্খলা স্রেফ মুখের কথা। সুতরাং বাঙ্গালা দেশ পাকিস্থান হইয়াই গিয়াছে। অতএব তাঁহারা যা খুসী করিতে পারে। অথ ইতি প্রতিপাদ্য!

লীগ সচিবসঙ্ঘ বাঙ্গালার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন, কোন সত্য কথাই প্রকাশ করিবার উপায় নাই। ইহা সত্ত্বেও প্রেস এডভাইসারী কমিটির প্রেস-নোটের মারফৎ নোয়াখালীর যে সংবাদ আসিতেছে, বীভৎসতায় এবং বর্ব্বরতায় তাহা পৃথিবীর রেকর্ড। অনেক কথাই চাপা পড়িতেছে, কিন্তু যতটুকু ছাপা যাইতেছে তাহাতেই এই অবস্থা। সবটা প্রকাশ করিতে পারিলে ব্যাপারটা আরও কত ভীষণতর রূপ ধারণ করিত তাহা কল্পনারও অতীত।

প্রায় দুই শত বর্গ-মাইল স্থান জুড়িয়া এই হত্যাকাণ্ড চলিতেছে। সেখানে কোন লোক যাইতেও পারিতেছে না, সেখান হইতে কেহ আসিতেও পারিতেছে না। যাঁহারা কোনক্রমে প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা বলিতেছেন, চারি দিকে অগ্নিশিখা ভিন্ন আর কিছুই নাই। হিন্দুর দেব-মন্দির আজ ধ্বংস হইয়াছে, হাজার হাজার নিরীহ হিন্দু গ্রামবাসী লীগ গুণ্ডাদের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে, বলপূর্ব্বক প্রায় পঞ্চাশ সহস্র হিন্দুকে মুসলমান করা হইয়াছে শত শত নারীকে পাকিস্থানী সেনারা অপহরণ করিয়াছে এবং বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়াছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলিতেছেন যে, এ হত্যালীলা প্রকাশ করিবার মত জোর কোন ভাষারই নাই।

বাঙ্গালার গভর্ণর এই আগুনের আঁচ সহ্য করিতে না পারিয়া দার্জ্জিলিং শৈলাবাসে দিন কাটাইতেছেন। তিনি এক সময় লেবর পার্টির সভ্য ছিলেন। সমাজতন্ত্রেরও তিনি বিশেষ ভক্ত! মনে হয়, তাঁহার বিশ্বাস, সমাজ ধ্বংস না হইলে সমাজতন্ত্র গঠন করা যায় না। তাই তিনি দূর হইতে এই ধ্বংসলীলা দেখিতেছেন। এবং পুলকিত হইতেছেন এই ভাবিয়া যে, এইবার বাঙ্গালা দেশ সমাজতন্ত্রের জন্য ঠিক ভাবে প্রস্তুত হইতেছে। ধ্বংসকার্য্য সম্পূর্ণ হইলে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিস্থাপন কার্য্য আরম্ভ করা যাইবে। যেমন গভর্ণর, তেমনই সচিবসঙ্ঘ! আর সেই সঙ্গে সিভিলিয়ানেরা জুটিয়াছে তদ্রূপ। সকলেই যেন অক্ষমতার মূর্ত্ত প্রতীক। তাঁহাদের নিকট সাহায্য অথবা প্রতিকার আশা করা বৃথা।

মিষ্টার জিন্না আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক লীগ সরকারে তথা পাকিস্থানী আমলে নির্ব্বিঘ্নে বসবাস করিতে পারিবে। পূর্ব্ব-বাঙ্গালার এই ব্যাপক অনাচার, অত্যাচার ও অরাজকতার পরে তাহার সত্যকার মর্ম্মান্তিক পরিচয় মনুষ্য সমাজ লাভ করিল। বোধ হয় ভালই হইল।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত
১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।